॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩৯ বর্ষ

(১৪ সংখ্যা থেকে ২৬ সংখ্যা পর্যন্ত)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীআশিস চৌধুরী

উপন্যাস

প্রতিধ্বনি ফেরে ৪·০০

ঘনাদা-কাহিনী

আগ্রা যখন টলমল ৪·০০
তাঁর নাম ঘনাদা ৪·৫০

উপন্যাস

বাতিঘর ৪·০০
নগ্ন নির্জন ৪·০০
অলিন্দ বসন্ত ৪·০০

প্রকাশিত হল

গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে দু জনে

গৌরকিশোর ঘোষ

[illegible] বাতাবরণে মোড়া কলকাতার নাগরিক জীবনের যখন নাভিশ্বাস শোনা যাচ্ছে, সেই সময় মিনু আর তার স্বামী টালা থেকে [illegible] পার্কে গিয়েছিল বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। খেয়ে উঠতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বাস ট্যাক্সি কিছুই পেল না ওরা। অগত্যা হাঁটতে হাঁটতে ওরা [illegible] গড়িয়াহাট ব্রিজের উপরে উঠে এসেছিল। আর তখনই ঘটেছিল সেই অঘটন। দাম ৪.০০

এই লেখকের:

আমরা যেখানে ৫·০০ **সাগিনা মাহাতো** ৪·০০ **লোকটা** ৩·০০
নন্দকান্ত নন্দাযুগিট ৫·০০

উপন্যাস

লোকারণ্য ৪·০০
ভ্রষ্টলগ্ন ২·৫০
অনাগত ২·০০

জীবন চরিত

শ্রীগৌরাঙ্গ ৩·০০

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ-সংগ্রহ ৫·০০
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০
ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ৪·০০

উপন্যাস

উজ্জ্বল উদ্ধার ১০·০০
বেলা-অবেলার গান ৬·০০
দ্বিতীয় দর্পণ ৮·০০
রাঙা ভাঙা চাঁদ ৪·০০

উপন্যাস

পিকনিক ৫·০০
পরাজিত সম্রাট ৪·০০
বনপলাশির পদাবলী ৮·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

কে বলে আমি মৃত ?
কংগ্রেসের মধ্যে
অন্তর্দ্বন্দ্ব

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচার

পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনী আসর এখনও জমেনি। এত তাড়াতাড়ি জমবে বলে আশা করাও যায় না। নির্বাচন দেখতে দেখতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন যে নির্বাচন শুনলেই তাঁরা উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন না। নির্বাচনটাকে ১৯৭১ সন থেকেই তাঁরা বেশ সহজ ভাবে নিচ্ছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটার কোনও কারণ নেই।

দলগুলি অর্থাৎ যাঁরা নির্বাচনী আসরটা জমান তাঁরাও এখন খুব বেশি আগেভাগে আসরে নেমে অযথা শক্তিক্ষয় করতে রাজি নন। গতবার থেকে তাঁরাও বুঝে গিয়েছেন, খুব আগে আসরে নেমে কোনও লাভ নেই। "ভোট কর" করে খুব আগে থেকে চেঁচালে তার তেমন কোনও ছাপ জনমানসে পড়ে না। তার চেয়ে বরং শেষ দিকে আসরটা গরম রাখতে পারলে ভাল হয়। কারণ, একদল লোক শেষ পর্যন্ত দোদুল্যমান থাকেন এবং শেষ দিকের প্রচার তাঁদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

প্রার্থীরা এবং দলগুলি দেরিতে আসরে নামার আর একটা বড় কারণ হল খরচা বৃদ্ধি। প্রত্যেকটা জিনিসেরই দাম বেড়েছে। তাই নির্বাচনী প্রচারের ব্যয়ও বেড়েছে। আগে অর্থাৎ ১৯৫২ সনে যিনি নির্বাচন করতেন পাঁচ হাজার টাকায়, এখন তাঁরই নির্বাচনী ব্যয় দাঁড়িয়েছে বিশ হাজার। এর দুটো কারণ। এক, মূল্য বৃদ্ধি। দুই, ব্যয়বাহুল্য। ১৯৫২ সনে যে পোস্টার ছাপার খরচা পড়ত ১০০ টাকা, এখন তার খরচা কম করেও ২৫০ টাকা। আগে ছোট মঞ্চ করে, গোটা দু তিন লাউড স্পীকার খাটিয়ে একটা মাঝারি গোছের জনসভা করতে খরচা পড়ত বড় জোর দু' শ টাকা। এখন খরচা কম করেও চার শ। প্রতিদিন মহল্লা নির্বাচনী অফিস চালাতে আগে দশ পনেরো টাকায় হয়ে যেত। এখন পঞ্চাশ টাকার কমে হয় না।

পারটিগুলি এবং প্রার্থীরাও খরচের বহর বাড়িয়েছেন। কর্মী পিছু খরচা বেড়েছে। নির্বাচনে গাড়ি ঘোড়া ট্যাক্সির খরচাও বেড়েছে। আগে নির্বাচনে যত গাড়ি চলত বা ট্যাক্সি দৌড়ত এখন তার চেয়ে অনেক বেশি ট্যাক্সি ও গাড়ি ব্যবহৃত হয়। এই বাবদ খরচা ভীষণ বেড়েছে। নির্বাচনে দল এবং প্রার্থীরা চাকচিক্যও বাড়িয়েছেন।

খরচার ভয়েও আজকাল প্রার্থীরা এবং দলগুলি নির্বাচনী প্রচারটা একটু দেরিতে শুরু করতে চান।

*

তবে, প্রচারটা এখনই পুরোদমে শুরু না করলেও পারটিগুলি প্রচারের ধারা মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছেন। এবং সেভাবে এখন থেকেই কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন।

প্রথমেই আসা যাক সি পি এম প্রসঙ্গে। ১৯৭১-এর নির্বাচনে সি পি এমই একক বৃহত্তম দল হিসেবে বেরিয়ে এসেছিলেন। সি পি এম এবারও বলছেন : কংগ্রেসী এবং পুলিসী সন্ত্রাস না চললে আমরা এবার নির্বাচনে একক গরিষ্ঠতা পাবই।

এই একটা কথা থেকেই সি পি এমের এবারের নির্বাচনী প্রচারের মূল সুরটা বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে যে সি পি এম এবারের নির্বাচনী প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে "কংগ্রেসী এবং পুলিশী সন্ত্রাসের" অভি-যোগটা সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরবেন।

ইতিমধ্যেই অবশ্য সি পি এম এই কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বলছেন। নির্বাচন ঘোষণার আগেও তাঁরা এই কথা বলছেন। কার্যত, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর থেকেই সি পি এম "পুলিসী এবং কংগ্রেসী সন্ত্রাসের" কথা বলে আসছেন। কাগজেপত্রে লেখালেখি করা বা জনসভায় বলা ছাড়াও সি পি এম সদস্যরা সংসদে বার বার এই অভিযোগ তুলেছেন। এবার নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে সি পি এম এই সন্ত্রাসের অভিযোগ আরও জোর দিয়ে বলছেন।

এই "পুলিশী এবং কংগ্রেসী সন্ত্রাসের" অভিযোগই হবে সি পি এমের এবারের

স্যামসন

শামসুর রাহমান

ক্ষমতামাতাল জঙ্গী হে প্রভুরা ভেবেছো তোমরা,
তোমাদের হোমরা চোমরা
সভাসদ, চাটুকার সবাই অক্ষত থেকে যাবে চিরদিন?
মৃত এক গাধার চোয়ালে, মনে নেই ফিলিস্তিন,
দিয়েছি গুঁড়িয়ে কতো বর্বরের খুলি? কতো শক্তি
সঞ্চিত আমার দুটি বাহুতে, সেও তো আছে জানা। রক্তারক্তি
যতই কর না আজ, ত্রাসের বিস্তার
করুক যতই পাত্রমিত্র তোমাদের, শেষে পাবে না নিস্তার।

আমাকে করেছো বন্দী, নিয়েছো উপড়ে চক্ষুদ্বয়।
এখন তো মেঘের অঢেল স্বাস্থ্য, রাঙা সূর্যোদয়,
শিশুর অস্থির হামাগুড়ি, রক্তোৎপল যৌবন নারীর আর
হাওয়ায় স্পন্দিত ফুল পারি না দেখতে। বার বার
কী বিশাল দৃষ্টিহীনতায় দৃষ্টি খুঁজে মরি। সকাল সন্ধ্যার
ভেদ লুপ্ত; মসীলিপ্ত ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে চকিতে মন্দার
জেগে উঠলেও অলৌকিক শোভা তার থেকে যাবে নিস্তরঙ্গ
অন্তরালে। এমন কি ইঁদুরও বান্ধব অন্তরঙ্গ
সাম্প্রতিক, এমন নিঃসঙ্গ আমি। নিজ দোষে আজ
চক্ষুহীন, হৃতশক্তি, দুঃস্বপ্নপীড়িত। এখন আমার কাজ
ঘানি ঠেলা, শুধু ভার বওয়া শৃংখলের। পদে পদে
কেবলি হোঁচট খাই দিনরাত্রি, তোমার অটল মসনদে।

শত্রু-পরিবৃত হ'য়ে আছি; তোমাদের চাটুকার,
উচ্ছিষ্ট-কুড়ানো সব আপনি-মোড়ল, দুঃস্থ ভাঁড়
সর্বদাই উপহাস করছে আমাকে। দেশবাসী
আমাকে বাসে তো ভালো আজো—যাদের অশেষ দুঃখে কাঁদি, হাসি
আনন্দে। পিছনে ফেলে এসেছি কতো যে রাঙা সুখের কোরক
যেমন বালক তার মিষ্টান্নের সুদৃশ্য মোড়ক।

আমাকে করেছো অন্ধ, যেন আর নানান দুষ্কৃতি
তোমাদের কিছুতেই না পড়ে আমার চোখে। স্মৃতি
তাও কি পারবে মুছে দিতে? যা দেখেছি এতদিন—
পাইকারী হত্যা দিগ্বিদিক রমণীদলন আর ক্লান্তিহীন
রক্তাক্ত দস্যুতা তোমাদের, বিধ্বস্ত শহর, অগণিত
দগ্ধ গ্রাম, অসহায় মানুষ তাড়িত, ক্লান্ত, ভীত
—এই কি যথেষ্ট নয়? পারবে কি এ সব ভীষণ
দৃশ্যাবলী আমূল উপড়ে নিতে আমার দু চোখের মতন?

দৃষ্টি নেই, কিন্তু আজো রক্তের সুতীব্র ঘ্রাণ পাই,
কানে আসে আর্তনাদ ঘন ঘন, যতই সাফাই
তোমরা গাও না কেন, সব কিছু বুঝি ঠিকই। ভেবেছো এখন
দারুণ অক্ষম আমি, উদ্যানের ঘাসের মতন
বিষম কদম-ছাঁটা চুল। হীনবল, শৃংখলিত
আমি, তাই সর্বক্ষণ করছো দলিত।

আমার দুরন্ত কেশরাজি পুনরায় যাবে বেড়ে,
ঘাড়ের প্রান্তর বেয়ে নামবে দুর্দমনীয়, তেড়ে-
আসা নেকড়ের মতো। তখন সুরম্য প্রাসাদের
সব স্তম্ভ ফেলবো উপড়ে, দেখো, কদলী বৃক্ষের অনুরূপ। দম্ভ
চূর্ণ হবে তোমাদের, সুনিশ্চিত করবো লোপাট
সৈন্য আর দাস-দাসী-অধ্যুষিত এই রাজ্যপাট।
৬/১০/৭১

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যে মানুষ হয়ে জন্মেছি, এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু নেই। না জন্মাতেও পারতাম এবং তাতে আর কারুর কোনো ক্ষতি হতো না। না জন্মালে দেখতে পেতাম না এই ষড়ৈশ্বর্যময়ী পৃথিবী, আমার নিশ্বাসের জন্য বরাদ্দ বাতাসটুকু নেওয়া হতো না, আকাশের দিকে যারা তাকিয়ে দেখে—তাদের মধ্যে একজন মানুষ কম পড়তো। জলের ওপর আঙুল দিয়ে একটি শিশু ছবি আঁকতো না। ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের ওপর উঠে একটি বালকের উল্লাসে ফেটে পড়া—কখনো উপস্থাপিত হতো না সেই দৃশ্য। একটি নারীর অনাবৃত ঝকঝকে বুকে মাথা রেখে যে চাঞ্চল্যকর শান্তি পাওয়া যায়—কখনো পেতাম না তার সন্ধান।

আমি না জন্মালে—আমার মা, বাবা, কয়েকজন কাকা ও জ্যাঠা, ভাই বোন, আত্মীয়, কয়েকটি অনাত্মীয়া নারী, চার পাঁচটি নদী ও দুটি দেশ নিয়ে আমার যে সম্পূর্ণ নিজস্ব জগৎ, এত ব্যাকুলতা ও মমতা—থাকতো না এর কোনো অস্তিত্ব। বিশ্বাসই করা যায় না! বিশ্বাস করা যায় না বলেই পুনর্জন্ম নিয়তি, কর্মফল—এই সব ভালো ভালো মায়াময় বিশ্বাস তৈরী হয়েছিল একসময়। এখন আবার আকস্মিকতায় ফিরে এসেছি, তাই ভাবতে গেলেও বুক কাঁপে। আমি না জন্মালে এই ক্ষুদ্র জগতটিতে আমার অনুপস্থিতি কেউ অনুভব করতো না, কেউ অপেক্ষা করতো না আমার জন্য। যা নেই, তার জন্য আবার অপেক্ষা কি! আর সবাই থাকতো, 'আমি' থাকতাম না, এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি আর হয় না মানুষের। মৃত্যু চিন্তার চেয়েও মর্মান্তিক। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে আমি তিন চারবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। অনেকেই ভাবে। আত্মহত্যারও একটা মর্ম আছে। কখনো কখনো গৌরবও থাকে—কিন্তু না জন্মানো? মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই বুঝতে পারি, না-জন্মানো মানে কি অসীম শূন্যতা। আমি মনুষ্যজন্ম পেয়েছি, আমি ধন্য।

মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হয়, এই জীবনের সার্থকতা কী? এই যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমাকে দেওয়া হলো, কি এর শ্রেষ্ঠ ব্যবহার? অবহেলায় ঔদাসীন্যে ধুলে

কামায় ফেলে রাখার জিনিস তো এ নয়! এই দেহ নিয়ে জন্মাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, মোম-বাতির ওপরে শিখাটুকুর মতন মানুষের জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকে আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার অলৌকিক চোখ নিয়ে দুর্দান্ত অবাধ্য বালকের মতন সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে চারদিক, সে আরও কিছু চায়। জীবন যেখানে থেমে আছে, তা ছাড়াও আরও কিছু। কি সেটা? যশ, অর্থ, ভোগ বা ভালবাসাও শেষ নয়। যৌবন পেরিয়ে গেলে কোনো এক বাদামী সন্ধে-বেলা মানুষের মনে হয়, এই জীবন অন্যরকম হবার কথা ছিল। কৈশোরের যে মহিমা উজ্জ্বল জীবনের ছবি ভেসে উঠতো চোখে, কোথায় গেল সেই মহিমা? যেমন আকাশের জ্যোৎস্নার মতন চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে স্বপ্নের শব। মনে হয়, যদি আর একবার নতুন করে জীবনটাকে শুরু করা যেত—শৈশব থেকে আবার ফিরে আসা! রাষ্ট্রপতিকেও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। কোটিপতিও শ্বেতশুভ্র বাথটবের ঠাণ্ডা-গরম জলে শরীর ডুবিয়ে আরাম করতে করতে হঠাৎ ক্ষুর দিয়ে হাতের শিরা কেটে ফেলে। কেননা আমরা তো প্রায়ই ভুলে যাই, যে আমরা কুকুর অথবা পিঁপড়ে হয়ে জন্মাইনি! আমরা মানুষ, এই উত্তরাধিকারের দায়িত্ব কি বিরাট! একটি সিংহ আর একটি সিংহকে কখনো হত্যা করে না, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করার সময় নোখ গুটিয়ে রাখে। মানুষই শুধু তার ভাই, বন্ধু, পরিজন ও প্রতিবেশীকে খুন করার জন্য আবিষ্কার করেছে কতরকম অস্ত্র। জন্মসূত্রে যে সে একা এই কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সে বারবার গোষ্ঠীবদ্ধ হতে গিয়ে গোষ্ঠীকে ভাঙে।

কখনো কখনো যেন একটা বিশাল কঠিন, বন্ধ দরজার গায়ে দুম দুম করে আঘাত করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, বলো, বলো, কার নাম সার্থকতা! বলে দাও! ইতিহাসের কোনো কোনো শতাব্দীতে এক আধজন ধর্মগুরু সেই দরজা একটু ফাঁক করে বলতে চেয়েছেন, শোনো, আমি বলছি। এই পথ অনুসরণ করলে মনুষ্য-জন্ম তার সম্পূর্ণতা পাবে। আমার কাছে এসো, আমি পথ দেখাচ্ছি......। কিন্তু সব কথা শোনা যায় নি, সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি, তার আগেই ধূপ ধুনোর ধোঁয়া, আর চাটুকারিতার হট্টগোলে সব ঢেকে গেছে। দু'এক শতাব্দীতেই কেটে যায় ঘোর। তারপরও হাজার হাজার অতৃপ্ত মানুষ ধাক্কা মেরে সেই দরজা ভেঙে ফেলতে চায়।

হয়তো এই সার্থকতার সন্ধানও সবার মনে জাগে না সারা জীবনে। কেন না, এই পৃথিবীতে অনেক নেশা আছে। বাদুড়ের ডানায় একবার হাত দিলে সেই তেলতেলে কালো রং সহজে উঠতে চায় না, গন্ধও লেগে থাকে। অনেকের হাতে একবার রুপোর টাকা ছুঁলে রুপোর নেশা লেগে যায়—তারপর সারা জীবন দু'হাতে রুপো ছড়াছড়ি করতে ভালোবাসে। সেই রকমই, নারী। কেউ চায় অন্যের ওপর প্রভুত্ব করতে কিংবা অন্যদের নিজের মতে চালাতে। এই নেশাটাই সবচেয়ে তীব্র। একটা দেশ বা একটা শহর বা একটা দল বা একটা অফিস বা নিছক নিজের পাড়ার পাণ্ডা হবার জন্য কি আকুল বিপুল চেষ্টা। বহু রকম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকবে না—সেই পৃথিবীকেও সে দখল করার জন্য প্রাণপাত করে। এই শরীর [illegible] সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ এই কঠোর সত্য জেনেও কত মানুষ [illegible] কথা ছড়িয়ে যায়। অনেকেই আবার [illegible] ছোট করে আনে, নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয়দের নিয়ে ছোট সংসারের বাইরে আর কিছু দেখতে চায় না—এদের খুশী বা সুখী করার জন্য সারাজীবন ভূতের বেগার দিয়ে যায়। একই মানুষ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে ছেলেকে আদর করে সম্পূর্ণ স্নেহে, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে ভক্তিভরে প্রণাম করে শ্রীরামকৃষ্ণর ছবির সামনে এবং অফিসে গিয়ে ঘুষ নেয়—এও তো নেশার ঘোর। এমন [illegible] মানুষ অনেক দেখেছি।

যাই হোক, আমি আমার ছেলেবেলা থেকেই একজন মানুষকে জানি, যিনি জীবন সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন ও সংশয়ে [illegible] গেছেন। তিনি আমার পিসেমশাই। তখন অবশ্য সব বুঝিনি। সেই লম্বা চওড়া, সুপুরুষ, সদাহাস্যময় মানুষটি মাঝে মাঝে করুণ বিষণ্ণ হয়ে যেতেন। তিন চারদিন ধরে কারুর সঙ্গে কথা বলতেন না, তিন

বয়েসে। সতেরো বছর বয়েসে অমরনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তখন আমার পিসিমা গর্ভবতী। এর এক বছর আগেই অমরনাথ ভাদুড়ী আমার ঠাকুর্দার কাছে পূর্ণিমা পিসীমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানান। আমার ঠাকুর্দা ঐ অমরনাথ ভাদুড়ী নামক উদ্ধত ছোকরাকে রূপো বাঁধান লাঠি দিয়ে মেরেছিলেন। কেন না বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিধবা বিবাহের তত্ত্বটি অনেকেই কাগজ-কলমে সমর্থন করলেও নিজ পরিবারে চালাতে দেন নি। তারপর পূর্ণিমা পিসীমার ঐ অবস্থাটা জানার পর আমার ঠাকুর্দা দেয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে রক্ত বার করে ফেলেছিলেন। হায় হায় করেছিলেন অন্তত এক হাজার বার। কারণ, তখনকার দিনে ভদ্র-ঘরের বিধবারা যাতে দুশ্চরিত্রা না হয়ে যায় সেজন্য নিরাপদ ব্যবস্থা ছিল তাদের কাশী পাঠিয়ে দিয়ে দশ পনেরো টাকা করে মাসোহারা পাঠানো। তারপর সেখানে তারা বাঁচুক মরুক বা চরিত্র নষ্ট করুক, সে খবর এত দূরে এসে পৌঁছুবে না। আমার ঠাকুর্দা নেহাৎ কন্যার প্রতি মায়াবশত এ ব্যবস্থা না নিয়ে ঐ ভুলটি করেছিলেন।

পূর্ব বাংলার ছোট শহরে ঐ ঘটনায় কি রকম হৈ-হল্লা হয়েছিল তা বোঝাই যায়। তাছাড়া অমরনাথ ভাদুড়ী ছিলেন অজ্ঞাত কুলশীল। তখনকার দিনে একটা চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। জমিদার বাড়িতে বা অনেক অবস্থাপন্ন বাড়িতেই পাঁচ-দশটি দুঃস্থ ছেলেকে থাকতে খেতে দিয়ে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। আমাদের পাড়াতেই রায়চৌধুরী বাড়িতে ঐ রকম দশটি ছেলে থাকতো, অমরনাথ ভাদুড়ী তাদের মধ্যে একজন, তিনি তখন কলেজের ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে বিরাট বিরাট শূন্য দুপুরে, রায়চৌধুরীদের বাড়িতে কত ফাঁকা জায়গা, কত বড় বাগান! পূর্ণিমা পিসীমা ঐ বাগানে জামরুল কিংবা কামরাঙা ফল পাড়তে যেতেন।

যাই হোক, অমরনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে পূর্ণিমা পিসীমার নমো নমো করে বিয়ে দিয়ে রাতারাতি তাদের দেশছাড়া করে দেওয়া হলো। কলকাতাতেও না কারণ সেখানেও অনেক চেনাশুনো লোক আছে, ওঁরা গিয়ে ঘর বাঁধলেন পাটনায়। তারপর ওঁদের ভুলে গেল সবাই। পূর্ণিমা পিসীমা মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন, কেউ কোনোদিন তাঁকে বাপের বাড়ি আসার কথা বলেনি। এমন কি, পূর্ণিমা পিসীমার দু' বছরের মেয়েটি যখন স্মল পক্স-এ মারা গেল, তখনও কেউ দেখতে যায়নি আমাদের বাড়ি থেকে।

আমার ঠাকুর্দা মারা যাবার পর, আমার বাবা আর কাকারা হঠাৎ যেন উদার হয়ে উঠলেন। ততদিনে পিসেমশাইরা পাটনা থেকে এলাহাবাদে চলে গিয়ে ব্যবসা করে বেশ বড়লোক হয়েছেন। আমার বাবা দিল্লিতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে ফেরার সময় এলাহাবাদে পূর্ণিমা পিসীমাদের বাড়িতে থেকে এলেন। কয়েকদিন পর ফিরে এসে গল্পের আর শেষ হয় না। পিসেমশাইদের এলাহাবাদের বাড়িতে তিনজন ঝি-চাকর, একজন দারোয়ান, বাগানের জন্য একজন মালি— এবং সবচেয়ে বড় কথা, একজন জমাদার রোজ সকালে এসে বাথরুমে পরিষ্কার করে যায়। দোতলার বাথরুমে জমাদারের আসা-যাওয়ার জন্য বাড়ির পেছনে আলাদা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। পাড়াগাঁর মানুষের চোখে এসব অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

তার পরের বছর পুজোর সময় পূর্ণিমা পিসীমারা বেড়াতে এলেন আমাদের দেশের বাড়িতে। গাঁঠরি বাঁধা বাঁধা সব ধুতি-শাড়ি কম্বল এনেছিলেন গরিব মানুষের মধ্যে বিলোবার জন্য। বাড়ির প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা উপহার। পূর্ণিমা পিসীমা আমার মাকে দিয়েছিলেন জার্মান সিলভারে বাঁধানো বড় আয়না। পিসেমশাই-এর সুন্দর চেহারা। অঙ্গে পুরোপুরি সাহেবী পোশাক—তবু তিনি তাঁর ছেলেবেলার-পরিচিত মানুষজনের বাড়িতে গিয়ে দাওয়ায় বসে হুঁকোয় তামাক খেতেন—এইজন্য তাঁর খাতিরের সীমা ছিল না। একদিন এই জায়গা থেকে তিনি অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছিলেন—আজ সেখানেই ফিরে এসেছেন প্রবল প্রতাপে। সব মানুষই বোধহয় এরকম ভাবে ফিরে আসতে চায়। কাউন্ট অফ মন্টেক্রিস্টো গল্পের মতন।

পূর্ণিমা পিসীমার বয়েসী বিধবা কিংবা স্বামী না-নেওয়া অরক্ষিত বউ আমাদের সেই ছোট শহরে তখন অনেক ছিল।

একবারও শ্বশুরবাড়িতে যায়নি কিংবা সারা জীবনে তিন চার বারের বেশী স্বামীকে চোখে দেখে নি—ব্রাহ্মণ পরিবারের এমন মেয়ে মানুষের সংখ্যা তখন অজস্র। তিন চার বছরের মেয়েকে থালার ওপর বসিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাত পাক ফেরানো কিংবা বড় মায়ের স্বামীর অভাবে কলাগাছের সঙ্গে সেসব মেয়েদের বিয়ে দেওয়াও বেশী দিনের ঘটনা নয়। সেই রকম কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান আমি চোখে দেখিনি বটে, তবে সেই সব বৃদ্ধাদের আমি দেখেছি। কচি বয়েসের বিধবাকে সেই সময় চলতি কথায় বলা হতো কাড়ে রাঁড়ী। তারা পূর্ণিমা পিসীমার সৌভাগ্য দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। পূর্ণিমা পিসীমারও তো ঐ রকম অবস্থাই হওয়ার কথা ছিল। এখনও সবাই গল্প করে যে পূর্ণিমা পিসীমার স্বভাব খুবই নরম, কারুর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলতেন না। কিন্তু প্রতিবেশিনী কোনো নারীরা পূর্ণিমা পিসীমা সম্পর্কে লিখেছিলেন, ঐ জাত খোয়ানো নারীর দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না। অত সুখ

কপালে সইলে হয়!

সীতাই সহ্য হয়নি। সেবার এলাহাবাদে ফিরে যাবার পর কিছুদিন বাদেই পূর্ণিমা পিসীমার চিঠিতে অন্য সুর দেখা দিতে লাগলো। প্রায়ই পিসেমশাই সম্পর্কে নানা-রকম অভিযোগ। পিসেমশাইয়ের ব্যবসায় মন নেই, হঠাৎ হঠাৎ কোথায় চলে যান তিন চারদিনের জন্য, বাড়িতে কিছু বলা কওয়া নেই। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে খুব মেশেন, মানুষটা বুঝি এবার সন্ন্যাসীই হয়ে যাবেন! এক বছর বাদে আবার অন্যরকম অভিযোগ, এবার আরও গুরুতর। পিসে-মশাই একটি মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে পাগল হয়েছেন। জ্যাঠামশাই এলাহাবাদে ছুটে গেলেন তাঁর বোনকে বাঁচাতে। ফিরে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পূর্ণিমার কপালে দুঃখু আছে। অমরনাথকে ফেরানো যাবে না—সে বড় অভিমানী মানুষ, অন্য কারুর কথা শোনে না। তা ছাড়া সেই মুসলমান মেয়েটির মতন সুন্দর নারী এ দুনিয়ায় দুর্লভ, তাকে দেখলে মাথার ঠিক রাখা অনেক পুরুষের পক্ষেই শক্ত! পতিব্রতা ... তার দিকে তার নাচ দেখতে হয় নিরালায়। অমরনাথ এবার সর্বস্বান্ত হবে।

আমার ঠাকুমা তখনও বেঁচে, তিনি ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছিলেন, পূর্ণিমাকে তুই নিয়ে চলে এলি না কেন? ও জামাইয়ের সঙ্গে আমরা আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমাদেই জানাও—

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, পূর্ণিমা আসতে চায়নি। আমি ইচ্ছে করে আনি নি। পূর্ণিমা একবার চলে এলে বিষয় সম্পত্তির আর কিছুই কি ও পাবে? সব জলাঞ্জলি যাবে। শুধু ও সেটুকু সামলে রাখতে পারে—

এরপর দু'চার বছরের ইতিহাস একটু অন্যরকম। পিসেমশাই এলাহাবাদের বাড়ি বিক্রী করে চলে গেলেন গোয়ালিয়রে— পূর্ণিমা পিসীমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং নর্তকীটিও। পূর্ণিমা পিসীমার একটি মেয়ে হয়ে মারা গিয়েছিল, আর কোনো ছেলে-পুলে হয়নি। সেই নর্তকীর একটি ছেলে হয়, তার নাম সূর্য। এই ছেলেটি তিন বছর বয়েস থেকে পূর্ণিমা পিসীমার কাছেই বেশী থাকতো। পূর্ণিমা পিসীমা তখন তাঁর আইন বহির্ভূত সতীনের সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছিলেন। সতীন থাকা তো তখনকার দিনে খুব অস্বাভাবিক ছিল না। আমার ঠাকুর্দাই তিনটি বিয়ে করেছিলেন, তার মধ্যে একবার—আচ্ছা, আমার ঠাকুর্দার বিয়ের ইতিহাসের কথা পরে হচ্ছে।

এলাহাবাদের সেই নর্তকীর নাম ছিল বুলবুল। পোশাকী নাম নাসিম-আরা বানু। এলাহাবাদ থেকে গোয়ালিয়রে আসবার পর তাঁর ভক্ত সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এই নিয়ে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে মন কষাকষি দেখা দেয়। তাঁর ছেলে সূর্যের বয়েস যখন পাঁচ বছর, তখন বুলবুল হঠাৎ আত্মহত্যা করেন বিষ খেয়ে। বুলবুল সেই সময় গোয়ালিয়র রাজবাড়িতে মুজরো পেতে শুরু করেছিলেন—অনায়াসেই অমরনাথ ভাদুড়ীর মতন একজন মানুষকে পরিত্যাগ করতে পারতেন, তার বদলে আত্মহত্যা করার কোনো মানেই হয় না। সূর্য সেই থেকে পুরোপুরি পূর্ণিমা পিসীমারই ছেলে হয়ে গেল।

পূর্ণিমা পিসীমার শেষ জীবনটা মোটামুটি সুখেই কেটেছিল। স্বামীকে আবার সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেয়েছিলেন এবং শেষবার অসুখের সময় পেয়েছিলেন স্বামীর হাতের সেবা। বাবা আর মা গিয়েছিলেন সেবার, ফিরে এসে বললেন, পুরুষ মানুষ যে ওভাবে সেবা করতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অমরনাথের মনটা ভীষণ নরম—

পূর্ণিমা পিসীমার মৃত্যুর পর সূর্যকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে পিসেমশাই দু'-বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কেউ আর তাঁর কোনো পাত্তা পায় নি। ওঁর গোয়ালিয়রের বিষয় সম্পত্তি এবং ব্যবসা অরক্ষিত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন এক মুখ চুল দাড়ি নিয়ে এসে উদয় হলেন। সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় এই বাড়ি কিনলেন।

এসবই আমার জন্মের আগেকার কথা। পূর্ণিমা পিসীমাকে আমি চোখেও দেখিনি কখনো।

একেবারে ছেলেবেলার স্মৃতি মাঝে মাঝে দু'এক ঝলক মনে পড়ে, কিন্তু তার সত্যতা যাচাই করা যায় না। যে-পুকুর পাড়ে তিন বছর বয়েসে খেলা করেছি মনে হয়, আসলে সে পুকুরটা ঠিক সেই রকম দেখতে নয়। একটা শিউলি গাছের তলায় ফুল কুড়োতে যেতুম, প্রত্যেকটি শিউলি ফুলেই কি শিশির মাখা থাকতো? স্মৃতি কেন সেই ছবি দেখায়? দুর্গাপুজোর এক

Karlsbad.
1.11.34

My dear Professor,
I am leaving for Vienna tomorrow (Friday) morning and shall break journey at Prague for a few hours. I arrive in the afternoon and again take the night train for Vienna. If you have time, I would like to meet you in the late afternoon or in the evening. My train is at 10 P.M. and any time after 6 P.M. would suit me. I am writing to Mr Nambiar to fix up an appointment with you.
Please do not make any arrangements for dinner, as you very kindly do, whenever I am in Prague. I have some other engagements and moreover I am eating something very light in the evening now-a-days. I shall be glad to have a talk with you, when we could discuss matters concerning the Indo-Czechoslovak Society and other topics of common interest.

Best regards
Yours very sincerely
Subhas C Bose

Prof. Dr. Lesný
Zborovska 66
Praha XVI

KARLOVY VARY

ARCHIV ČSAV

ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটের দপ্তরে রক্ষিত ডাঃ লেসনিকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠি

হচ্ছে। ডিরেকটর, ডেপুটি ডিরেকটর ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ডিপার্টমেন্টের প্রধানরা রয়েছেন— যেমন আফ্রিকা ডিপার্টমেন্ট বা পশ্চিম এশিয়া ডিপার্টমেন্ট। নেতাজী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ডিপার্টমেন্ট ও ইন্ডলজি ডিপার্টমেন্টের সদস্যরা। ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটের তিনজন মনীষীর নামকরা হয় যাঁরা ভারত-চেকোশ্লোভাক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী ছিলেন। এঁরা হলেন—লেসনি, মরিজ উইনটারনিৎস এবং পারটোলড্।

রাসা একটা ছোট ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে এ-গলি সে-গলি ঘুরে আবার এক সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাদের নিয়ে একটা দেড়তলা মত জায়গায় হাজির হলেন। সেখানে দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় একটা প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। আমরা ইনস্টিটিউটের বাড়ির পিছন দিক এসে পড়েছি। এখানে ভলটাভা নদীর ওপর সেতু—চার্লস ব্রীজ, একমাত্র প্রাচীন সেতু। ব্যবহার হয় না, আগে যেমন ছিল রাখা আছে। অন্যান্য ব্রীজের আধুনিকীকরণ ঘটেছে—এর নয়। রাস্তার ওপারে একটা ছোট দোকানে রাসা আমাদের নিয়ে ঢুকলেন—এটা একটা মশলার দোকান—সবরকম ভারতীয় মশলা পাওয়া যায় এবং সুন্দর প্রাচীন পাত্রে রাখা আছে। সমস্ত দোকানে একটা গন্ধ ভুরভুর করছে। এর পর আমরা নাপ্রেসটেক মিউজিয়াম দেখে ওল্ড টাউন স্কোয়ারে এসে পড়লাম। স্কোয়ারে টাউন হলের সামনে টুরিস্টদের ভীড়—সবাই হাঁ করে টাউন হলের মাথায়

আলোচনা সভায় গিয়ে তরুণী দেখল প্রধান বক্তার আসনে সেই ছাত্রটি। আর তিনি ঠিক দার্শনিক নন, রাজনৈতিক নেতা—নাম সুভাষচন্দ্র বসু। সেদিন যে সামান্য পরিচয় হল কালে তা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। নাৎসী আমলের মাঝামাঝি সময় মেয়েটি বার্লিন ছেড়ে আমেরিকা চলে যায়। সুভাষচন্দ্র সেই রকম পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বার্লিন আর তোমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। আজ নেতাজীর ওপর একটি সুন্দর বই-এর রচয়িত্রী হিসেবে কিটি কুর্টির নাম অনেকের জানা। এখন তাঁর বয়স হয়েছে সত্তরের কোঠায়। প্রাগ-এ তাঁর মা-ভাই সমস্ত পরিবার রয়েছে। মিসেস কুর্টি সপ্তাহে অন্তত তিনখানা করে চিঠি লিখছিলেন। —তোমরা প্রাহা যাচ্ছ, আমার অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে—আমার মা-ভাইদের সঙ্গে অবশ্য দেখা করো।

নব্বুই বছরের বৃদ্ধা মিসেস কেজলার নিজে হোটেলে এসে নেমন্তন্ন করে গেছেন—তাঁদের সঙ্গে একটা দিন কাটাতেই হবে। আচ্ছা, য়ুরোপে থাকলে লোকে বয়সটা কি ভাবে থামিয়ে রাখে? বৃদ্ধা বললে মিসেস, কেজলার বেজায় চটে যান। আমাদের সঙ্গে গাড়িতে সারাদিনের মত হৈচৈ করতে বেরিয়ে পড়লেন। আমি ওঁর জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেই বলেন—কিটি তোমাকে কি লিখেছে বলতো? আমাকে খুব বুড়ী বলে লিখেছে বুঝি! আমি তাড়াতাড়ি মাথা চুলকে বলি—না না, তা ঠিক নয়। কেজলার পরিবারের সঙ্গে আমরা স্লাপিচলে গেলাম। প্রাগের বাইরে বাঁধ আর হ্রদ। এরা যেমন সাধারণত করে—পাশেই সুন্দর হোটেল, খাবার জায়গা, কফি-বার-লাউঞ্জ করে হ্রদে ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করার কায়দা এরাই জানে। প্রাগ থেকে স্লাপি পর্যন্ত পুরো পথটা ভলটাভা নদীর তীর দিয়ে অপরূপ সুন্দর। মিসেস কেজলার মায়ের মত আদর যত্ন করতে লাগলেন। গরম লাগছে উলের জামাটা গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছেন—উঁহু, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মায়ের বয়স কত? বললাম, সাতষট্টি। বললেন, বল কি, সো ইয়ং! কথাটা সেইদিনই কলকাতায় লিখে দিলাম।

কেজলার পরিবার আমাদের নিয়ে কি করবে ভেবেই পাচ্ছে না। এদের আনন্দের ঘটা দেখছি আর ভাবছি কবে ১৯৩৩ সালে কুরফুর্স্টেনডামের পথে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কিটি কুর্টির আকস্মিক যোগাযোগ— কে জানত তার এত বছর বাদে তারই জের টেনে কেজলারদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। প্রাগে যেন নিজেদের লোকের মাঝে পরিবেষ্টিত হয়ে আছি মনে হল।

জীবনের সব ভাল জিনিসের মত প্রাগের দিনগুলিও এক সময় শেষ হল। প্রাগ এয়ারপোর্টে বোজেনা আমার হাতে ছোট একটা কাট গ্লাসের উপহার গুঁজে দিতে দিতে বললে—ভেঙে ফেলো না যেন, সাবধানে নিও। বোজেনাকে আমার গলার মালাটা খুলে দিলাম—ভারতীয় বন্ধুকে মনে রাখার জন্য। ডাঃ মিরোস্লাভ ক্রাসা হাত বাড়িয়ে দিলেন—শান্ত, ধীরভাবে হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় চাইছেন—হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মনে পড়ে গেল। যখনই ক্রাসার সঙ্গে কথা বলেছি তখনই মনে হত কার মত যেন চেনা-চেনা লাগে—কার কথা মনে পড়িয়ে দেয় প্রতিটি হাব-ভাব—কিছুতেই ঠিক মনে করতে পারি না। সেদিন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে পড়ল। আমাদের মাস্টারমশাই সুপণ্ডিত অধ্যাপক তারকনাথ সেনের ঠিক এই রকম দৃঢ় অথচ শান্ত ব্যক্তিত্ব ছিল আর ঠিক এই রকম নিরভিমান পাণ্ডিত্য।

(ক্রমশ)

ভারতের কোন সাহিত্যিকের বই প্রকাশ না করায় খুবই আশ্চর্য হলাম। তিনি জানালেন : স্যার, আমি দস্যুবৃত্তি করে মুনাফা বাড়াতে চাই না। রবীন্দ্রনাথ তারাশংকর, সমরেশ বসুর যে সব বই এখানে দেখছেন তার বেশির ভাগই ছাপা হতো লাহোরে। আর এই বেআইনী ব্যবসা করতো কিছুসংখ্যক অবাঙ্গালী। বিক্রি করার জন্য তারা ঢাকায় কিছু এজেন্ট নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অসাধু ওইসব প্রকাশক অন্যভাবে নিজেদের দোষ স্খালনের চেষ্টা করছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরও কিছু বই এভাবে ছাপানো হয়েছে। এখানকার কবি ও সাহিত্যিক ডক্টর সুফিয়া কামাল চান যে, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রতিনিধি দলকে এখানে এসে সাহিত্যের বইয়ের বাজারে এই কারচুপি বন্ধের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। যতদূর জানি, এ সম্পর্কে ডক্টর শ্রীমতী কামাল বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীআবদুস সামাদ আজাদের সংগেও কথা বলেছেন।

*

ঢাকায় এখন সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল যানবাহনের। কলকাতা থেকে বোয়িং-এ বা ফকার ফ্রেন্ডশিপ যেটা চড়েই আসুন না কেন, তেজগাঁও এয়ারপোর্টে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবেন আপনি আপনার গন্তব্যস্থলে যেতে পারছেন না। বাইরে রিকশা কিছু দাঁড়িয়ে থাকে। দু একখানা তিন চাকার স্কুটার দিল্লির মত। তবে তাও সব সময় পাবেন না। নিজেদের গাড়ি না থাকলে চলতে হলে রিকশাতেই চেপে বসতে হবে। ট্যাক্সি আছে শুনেছি, একদিনও দেখিনি। এখানকার লোক বলে ঢাকার ট্যাক্সি কলকাতার মতই দেখতে। কালো-হলুদ রেখানো। প্রাইভেট কার এখানে বড় বড় হোটেলে ভাড়া পাওয়া যায়। গাড়িগুলো দেখতে ভাল, চড়েও আরাম, ভাড়াও কম। বাস দু চারদিন হল দু একটা রুটে চলতে শুরু করেছে।

দূর থেকে এখনও অনেকে নৌকোয় চড়ে ঢাকায় 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারিও' করেন। বিকেল বেলায় সদরঘাটে বুড়িগঙ্গায় গেলে নৌকোর ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন, বুড়িগঙ্গার এপারে ঢাকার সেই ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ 'নবাব প্যালেস'। ওপারে—ছিনভিন্ন প্রাসাদের সৌন্দর্যের আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। জীর্ণ বাড়িটি কত বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী হয়ে বোবার মত বুড়িগঙ্গার তীরে আজও দাঁড়িয়ে আছে। এরই সামনে এখনও সিঁড়ির ঘাট আছে। বুড়িগঙ্গার তীরে সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ছোট ছোট নৌকো পাল তুলে এগিয়ে চলেছে। একজন বৃদ্ধ কাছে এগিয়ে এলেন। বয়সের চাপে ন্যুব্জ। বাড়িটার বড় গম্বুজের দিকে তাকিয়ে বললেন : জানেন সাহেব, এই গেট দিয়েই কারজন সাহেব দরবারে যাইতেন। সূর্য ডুবে গেল। বৃদ্ধকে আর খুঁজে পেলাম না।

সুদেব রায়চৌধুরী

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি

গত বছর ভারতের রপ্তানি কতটা বেড়েছে সে সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য সর্বদা একরূপ নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিবেদনে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিবেদনে আমরা যে তথ্য পাই তার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সম্প্রতি ভারত সরকার ১৯৭০-৭১ সালের রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে দেখা যায় গত বছর রপ্তানির পরিমাণ হয়েছিল প্রায় ১৫২৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা; ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭০-৭১ সালে রপ্তানির বৃদ্ধি হয়েছে ৮·৫ শতাংশ। এর মধ্যে এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়েছে ৪০৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার; ১৯৬৯-৭০ সালে তার পরিমাণ ছিল ৩৭৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। শুধু জাপানেই রপ্তানি করা হয়েছে ২০২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার জিনিস; ১৯৬৯-৭০ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিম ইউরোপে রপ্তানি করা হয়েছে প্রায় ৩৯৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব ইউরোপে রপ্তানি করা হয়েছে প্রায় ৩১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৭০-৭১ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়েছে ২০৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার জিনিস। আফ্রিকার দেশগুলিতে গত বছর প্রায় ১৩৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকার জিনিস রপ্তানি করা হয়েছে; ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭০-৭১ সালে এই অঞ্চলে রপ্তানির পরিমাণ ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এবং সুদান ভারতীয় জিনিস বেশি আমদানি করে থাকে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিও ভারতীয় জিনিস আমদানি গত বছর প্রায় দ্বিগুণ করেছে। ক্যানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ উত্তর আমেরিকার অঞ্চলে ১৯৬৯-৭০ সালে রপ্তানি হয়েছিল প্রায় ১৬৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার জিনিস; ১৯৭০-৭১ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ হয়েছে প্রায় ২৬৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

ভারতীয় জিনিস আমদানি করে যেসব দেশ সেগুলিকে গুরুত্ব অনুক্রমে সাজালে এভাবে সাজানো যেতে পারে—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, যুগোশ্লাভিয়া, সুদান, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র (পশ্চিম জার্মানী), সিংহল, চেকোশ্লোভাকিয়া, ক্যানাডা ইরাণ, জার্মান গণ-

তন্ত্রী প্রজাতন্ত্র (পূর্ব জার্মানী), অস্ট্রেলিয়া এবং নেপাল।

চিরাচরিত জিনিসের বাইরে অন্যান্য জিনিস (non-Traditional goods) রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতে সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। রেলওয়ে ওয়াগন এবং যন্ত্রপাতি রপ্তানির মূল্য ১৯৭০-৭১ সালে ছিল ২৮·১৭ মিলিয়ন টাকা; ১৯৬৯-৭০ সালে তার পরিমাণ ছিল ৮·৩৮ মিলিয়ন টাকা। এ বছরেও ভারত পোল্যাণ্ডে ৫০০ রেলওয়ে ওয়াগন রপ্তানি করবে। অস্ট্রেলিয়ার পোস্ট-অফিস বিভাগ থেকে ভারত ৩২৫টি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সরবরাহের অর্ডার পেয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ১০০০ টেলিফোন যন্ত্রপাতির অর্ডার পাওয়া গেছে। এছাড়া ইরাণ এবং লিবিয়া থেকে বস্ত্র সরবরাহ লাইসেন্স এবং সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রের জন্য অর্ডার পাওয়া গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Arkansas Power and Light Company থেকে ২০০০ টনের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফর্মার টাওয়ারের অর্ডার পাওয়া গেছে। ১৯৭০-৭১ সালে ভারত আফ্রিকার কয়েকটি দেশে, সিংহলে এবং এমন কি ইংল্যাণ্ডেও টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের যন্ত্রপাতি রপ্তানি করেছে, এবং এই রপ্তানির মূল্য হয়েছে ৫·৬ মিলিয়ন টাকা। চিরাচরিত জিনিস ছাড়া অন্যান্য ভোগ্য-সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে কফি সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৬৯-৭০ সালে ভারত প্রায় ১৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার কফি রপ্তানি করেছিল; ১৯৭০-৭১ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। জার্মানী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স, বৃটেন, সুইডেন নরওয়ে, যুগোশ্লাভিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভারতীয় কফি রপ্তানি হচ্ছে। ভারতীয় কফির গুণগত মান খুব উন্নত হওয়ায় উল্লিখিত দেশগুলির মধ্যে কোন কোন দেশ নিজেদের দেশে তৈরি কফির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় কফি মিশিয়ে নেয়।

সম্প্রতি ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুবই বেড়েছে। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১১৫৯ মিলিয়ন ডলার; শুধু অক্টোবর মাসেই ৩১ মিলিয়ন ডলার রিজার্ভ বেড়েছিল। ১৯৭০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১১০৬ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬৮ সাল থেকে ভারতকে আর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ধার করতে হয়নি। বরং ১৯৭১ সালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারকে ৬৫ মিলিয়ন ডলার ধার শোধ করেছে। তবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার

রিজার্ভ অক্টোবর মাসের তুলনায় কিছু কমেছে।

ব্যাংকের কাছে একই সংগে একাধিক ঋণ গ্রহণ প্রতিরোধ করার প্রয়োজন

দেশের চৌদ্দটি বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর থেকে কৃষকদের বেশি করে ঋণ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির তৎপরতা অনেক বেড়েছে। কিন্তু সম্প্রতি একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে. একই কৃষক অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। একটি ব্যাংকের ঋণ শোধ করতে না পেরে কৃষক অন্য একটি ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন এমন নজির আছে। অন্ধ্রপ্রদেশে ইতিমধ্যেই কয়েকজন কৃষক একটি ব্যাংকের কাছে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছেন এবং আরেকটি ব্যাংকের কাছে ফসল দৃষ্টিবন্ধ রেখে টাকা ধার করেছেন এমন খবর পাওয়া গেছে। এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঋণ গ্রহণ বন্ধ করার জন্য ব্যাংকগুলির মধ্যে পারস্পরিক খবরাখবর রাখার জন্য একটি ব্যবস্থা থাকা দরকার। রিজার্ভ ব্যাংকের একটি সমীক্ষা দল শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি প্রদত্ত ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় এজেন্সি গঠন করার সুপারিশ করেছেন। সব বাণিজ্যিক ব্যাংকেরই ঋণ প্রদান সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় রিজার্ভ ব্যাংকের জানা থাকে। কিন্তু কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ থাকা দরকার। যাতে একই কৃষক একটি ব্যাংকের কাছে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত অন্য কোন ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে না পারেন। এজন্য বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। একই পঞ্চায়েতের ভিতর যে কটি ব্যাংকের শাখা থাকে তাদের মধ্যে এই ব্যাপারে তথ্য বিনিময় করা দরকার। তা না হলে ব্যাংকেরও লোকসান হবে, কৃষকদেরও আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে না।

ব্যাংকের কাছ থেকে অথবা সমবায় সমিতিগুলির কাছ থেকে ঋণ পাবার আগে কৃষকদের নির্ভর করতে হত গ্রাম্য মহাজনদের উপর। তখন কৃষকরা একসংগে একাধিক মহাজনের কাছে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং কখনই ঋণ পরিশোধ করতে পারতেন না। ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়েছে এবং কৃষকরাও ব্যাংক-প্রদত্ত ঋণের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু কৃষকরা যাতে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন এবং ব্যাংকগুলিও ঋণ-প্রদান নীতি সার্থকভাবে অনুসৃত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

সুব্রত গুপ্ত

আগে। ক্রমশ রাণী ঝাঁসি বাহিনী সমান ভাবে I N A-র সকল বিভাগে কাজ করবে এই ছিল পরিকল্পনা।

জাপানীরা রাণী ঝাঁসি বাহিনী সম্বন্ধে প্রথম থেকেই সন্দিহান ছিলেন। মেয়েরা যুদ্ধে কি করবে? ললিতলবঙ্গলতার মত কমনীয় নমনীয় ভারতীয় সুন্দরী লড়াই-এর কি জানে? পুরো ব্যাপারটি হাস্যকর হবে এই ছিল জাঁদরেল জাপানী সেনানায়ক-দের ধারণা। নেতাজী কিন্তু মেয়েদের শক্তিতে পূর্ণবিশ্বাসী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর মা প্রভাবতী দেবী হাটখোলার দত্ত পরিবারের মেয়ে। দত্ত পরিবারে মেয়েরা পরম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে বিখ্যাত ছিলেন। উত্তর জীবনে প্রভাবতীর প্রভাব তাঁর নয়টি সন্তান ও স্বামী জানকী-নাথের উপর যথেষ্ট ছিল। সুভাষ তাই বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন শক্তির শক্তিতে। সেই জাপানীদের ডেকে দেখালেন বাহিনীর প্যারেড। রাইফেল কাঁধে রাণীদের কুচ-কাওয়াজ। সত্যিই তাঁরা রণীর মত দৃপ্ত ছিলেন। রাণীদের দেখে বাহাদুর জাপানী সৈন্য দলের নেতা হতবাক! এমন আগে দেখেননি তো কোথাও। হার মেনে গেলেন। রাণী ঝাঁসি বাহিনী সম্বন্ধে আর তাঁদের সন্দেহ হয়নি।

আর একটি ঘটনা বলি। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে যখন ব্রিটিশ বর্মার রাজধানী রেঙ্গুন পুনরাধিকারের কাছাকাছি—জাপানীদের মধ্যে হট্টগোলের সীমা নেই। নেতাজী শান্ত, স্থির। ফিরে যেতে হবে ব্যাঙ্ককে। নেতাজী বিমানপোতে দু ঘণ্টায় যেতে পারতেন। কিন্তু I N A-এর শতখানেক অফিসার এবং ঝাঁসির রাণীদের একদল তাঁর সঙ্গে। নেতাজী বললেন, পায়ে হেঁটে গেলেও ঝাঁসির বাহিনীকে বিপদের মুখে ফেলে যাবেন না। চারখানা গাড়ি ও বারোটি লরি ভরে চললেন নেতাজী। সঙ্গে ঝাঁসি বাহিনী। ২১ দিনের পথ ব্যাঙ্কক। ঝাঁসি বাহিনীর কারও ভয় নেই, ভাবনা নেই। দিনে একটিবার খাওয়া। সমানে বম্ব পড়ছে, শত্রু বিমান থেকে মেশিনগান চলছে, দিনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা, রাতের আঁধারে পথ চলা। রাণী ঝাঁসির কচি কচি মেয়েরা হাসিমুখে মেনে নিয়েছিল। ধন্য ভারতবর্ষের শক্তিস্বরূপার দল। বর্মার জঙ্গলের অজস্র বর্ষণে তাঁরা কাতর হননি। নেতাজী তাঁদের বলেছেন দিল্লি যাবার পথ অনেক কিন্তু পথের লক্ষ্য দিল্লিই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, অল্প দিনেই বিদেশী শাসক ভারত ছাড়বে। অগাস্ট মাসের ১৫ই, ১৯৪৭ সাল ভারত স্বাধীন হলো কিন্তু ঝাঁসি বাহিনীর কে কোথায় জানি না। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীকে দিল্লিতে দেখেছিলাম। এখন তিনি কানপুরে আছেন শুনেছি। গৃহিণীপনার মাঝে হয়তো বা বিগত দিনের রাণী কাহিনী মনে পড়ে। কিন্তু সেই একই ধারায় সিক্ত হয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। তাঁদের নিয়ে বাহিনী তৈরি হয়নি কিন্তু তাঁরা বাহিনীর বাড়া। সর্বস্ব পণ করে তাঁরা সর্বত্র বিরাজ করেছেন। আড়ালে, অন্তরালে, সামনে পিছনে নারী দিয়েছে সংগ্রামের সকল উৎসাহ। যে অনমনীয়া, সহনের সীমায় সমান অবিচল সেই শাশ্বত নারীর প্রতীক। তা সে বাংলাদেশ হক বা ভারতের বাইরে রাণী বাহিনীতে হক। আমরা তাদের জন্যই এ অভিনন্দন, জানাই নমস্কার।

শ্রীমতী

tion, পরে এই বইটি বিস্তৃত সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে Women's Education in Eastern India নামে প্রকাশিত হয়। বাংলা বইখানির নাম—বাংলার স্ত্রী-শিক্ষা। ১৯৬৭ সালে এই বিষয়ের উপর আর একখানি বই প্রকাশিত হয়; তার নাম—স্ত্রী-শিক্ষার কথা। এই সব বইয়ের তথ্যাদি সরকারী দলিলপত্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই রকম নিখুঁতভাবে কার্য সম্পাদন করাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

ইদানীং চোখের দৃষ্টি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার পরও হাতে তাঁর প্রচুর কাজ ছিল। বর্তমানে বই বাংলায় তর্জমা করা, মুক্তি সন্ধানে ভারত পুস্তকের কয়েকটি অধ্যায়ের পরিবর্তন ও সংযোজন ইত্যাদি ত' ছিলই, তাছাড়া তিনি অতুলপ্রসাদ সেন ও রজনীকান্ত সেন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে সে সুযোগ দিলেন না। প্রথম-দিকে নানা অসুস্থতায় জীর্ণ হলেও শেষ পর্বে তিনি সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে ৭ই জানুয়ারী, শুক্রবার নীলরতন সরকার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করুন।

বাজচ্ছে সে তো আমিও শুনতে পাচ্ছি! সে শব্দ নয়, আর একটা শব্দ শুনতে পেলে না?

কৈলাশ গোমস্তা বললে—আজ্ঞে না।

কর্তাবাবু ধমালো—তুমি দেখছি দিন-দিন কানে কালা হয়ে যাচ্ছো! যাও, শুনে এসো কীসের শব্দ হলো ওখানে—

কৈলাশ গোমস্তা তাড়াতাড়ি উঠে নিচেয় চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্তাবাবু ধমক্ দিলেন। বললেন—তুমি আবার কোথায় যাচ্ছো?

—আজ্ঞে নিচেয়!

—আজ্ঞে নিচেয়! তোমাকে বলেছি না তুমি সব সময় আমার কাছে কাছে থাকবে। আমার কাছে সিন্দুকে টাকা রয়েছে! বলেছি না তোমাকে?

কৈলাশ গোমস্তা কথাটা শুনে আবার তার নিজের জায়গায় এসে বসলো।

কিন্তু ওদিকে হর্ষনাথ চক্রবর্তী মশাই তখন নবদ্বীপে চলেছেন। তাঁর জীবনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁর আর কোনও আসক্তি নেই তখন। নাবালক ছেলে দুজন রইলো, গৃহিণী রইলো। আর রইলো নায়েব নরনারায়ণ। জমি-জমাও রইল অনেক। অনেক কিছুই তিনি রেখে গেলেন। কিন্তু যাবার সময় কিছুই সঙ্গে নিলেন না। যাবার সময় কারো সঙ্গে কিছু থাকেও না। একলাই এসেছিলেন সংসারে, সেই সংসার ফেলে একলাই আবার চলে যাচ্ছেন। আসক্তি নেই, কামনা নেই, আকাঙ্ক্ষাও আর নেই। একমাত্র আসক্তি ছিল তাঁর ওই টাকাকড়ির ওপর। তা সেটাও গেল। সেটাও তিনি ত্যাগ করলেন। এবার মুক্তি। এবার আর কোনও কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারবে না।

নায়েব নরনারায়ণ সঙ্গে চলেছেন। চলতে চলতে একদিন নবদ্বীপ শহর এসে পৌঁছুলো।

কর্তা বললেন—চলো, আমাকে রাধা-মাধবের আশ্রমে নিয়ে চলো।

তাঁর কথামত সেই রাধা-মাধবের আশ্রমেই তাঁকে তোলা হলো। কিন্তু সেখানেও বেশি দিন তাঁকে থাকতে হলো না। দুদিন পরেই কর্তা বললেন—এবার আমার সময় হয়েছে, আমাকে গঙ্গায় নিয়ে চলো—

নায়েব নরনারায়ণ তাঁকে শেষে গঙ্গার ধারে নিয়ে গেলেন। কর্তা সিঁড়ি দিয়ে গঙ্গার জলে নামলেন। প্রথমে হাঁটু জল। তারপর কোমর। তারপর বুক। সেই বুক-জলেই দাঁড়ালেন কর্তা।

সত্যিই এ-সব কথা আজ এই বিয়ে-বাড়ির উৎসবের মধ্যে ভাবা অন্যায়। ওই সদরের দোতলায় যে-পঙ্গু মানুষটি লোহার সিন্দুকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটাচ্ছেন তাঁর এ-সব কথা ভাবতে নেই। ভাবলে আজ এই তাঁর নাতির বিয়ে পণ্ড হয়ে যাবে। এই অতিথি-অভ্যাগতে ভরা জমজমাট ঐশ্বর্যের ওপর কালো ছায়া পড়বে। জীবনের সার সত্য মোক্ষ নয়, শান্তি নয়, ত্যাগও নয়। আসল সত্য হলো এই ঐশ্বর্য, এই জাঁক-জমক আর এই সিন্দুক। কালিগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তী নির্বোধ ছিলেন তাই তিনি আসক্তি ত্যাগ করেছিলেন। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নিজের মুক্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি ত্যাগে বিশ্বাস করি না, মুক্তিতে বিশ্বাস করি না, অনাসক্তিতেও বিশ্বাস করি না। আমি বাঁচতে চাই। এই জমি-জমা-জাঁক-জমক-ঐশ্বর্য-বিলাস সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে থেকে বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই আমার জমির মধ্যে দিয়ে। বাঁচতে চাই আমার সন্তানের মধ্যে দিয়ে। আমি বাঁচতে চাই আমার বংশ-পরম্পরার উত্তরাধিকারের মধ্যে দিয়ে। যে সেই বাঁচার পথে অন্তরায় হবে তাকে আমি নিপাত করবো, নিঃশেষ করবো। আমার বংশী ঢালী সেই নিঃশেষ করার পথে আমাকে সাহায্য করবে। সেই জন্যেই তো আমি তাকে মাসোহারা দিয়ে রেখেছি।

বংশী ঢালী যখন বার-বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন কালিগঞ্জের বৌ সেখানে নেই। এমন কি তার সেই পালকিটারও চিহ্ন নেই সেখানে।

প্রকাশ মামা মা-জননীকে নিয়ে তখন একেবারে ভেতর-বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। কালিগঞ্জের বৌ সম্বন্ধে চৌধুরী-বাড়িতে যত অশ্রদ্ধাই থাক, তার সঙ্গে চৌধুরী-বংশের ঐশ্বর্যের ক্ষীণ সূত্রটার কথা জানতে কারো বাকি নেই। অন্ততঃ আর কেউ না-জানুক চৌধুরী-বাড়ির গিন্নী সে-কথা জানে।

—কোথায় গো, বৌমা কোথায়?

কালিগঞ্জের বৌ এতবার এ-বাড়িতে এসেছে টাকার তাগাদা করতে কিন্তু এদিন কার কখনও অন্দর-মহলের চৌহদ্দির মধ্যে আসেনি।

বৌমা বাস্ততার মধ্যেও চিনতে পেরেছে। বললে—আসুন আসুন মা—

কালিগঞ্জের বৌ বললে—আমাকে তুমি চিনতে পারবে না বৌমা। আমার নাত-বৌ এসেছে বাড়িতে তাই আশীর্বাদ করতে এলুম। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো বৌমা?

—ওমা তাড়িয়ে দেব কেন আপনাকে!

কালিগঞ্জের বৌ বললে—না, আমাকে তো আসতে কেউ নেমন্তন্ন করেনি বৌমা, আমি এমনিই এসেচি, আমাকে তুমি এত খাতির কোর না। আমি শুধু নাত-বৌকে আশীর্বাদ করেই চলে যাবো—কই, নাত-বৌ কোথায়?

নয়নতারা তখন একটা ঘরের মধ্যে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে ছিল। আশ-পাশে আরো ক'জন পাড়ার বৌ-ঝি বসে আছে।

গৌরী পিসি সঙ্গে করে নিয়ে গেল। বললে—বৌমা, এঁকে প্রণাম করো, ইনি হচ্ছেন কালিগঞ্জের জমিদারের বৌ, তোমার গুরুজন—

কালিগঞ্জের বৌ হাতের পাট করা শাড়িখানা এগিয়ে দিতেই নয়নতারা সেখানা হাত বাড়িয়ে নিলে। তারপর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

—থাক্ থাক্ মা, আশীর্বাদ করি সুখী হও, শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে সংসার করো—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। যেন চলে আসতে পারলেই বাঁচে। যেন সকলের চোখের আড়ালে চলে যেতে পারলেই তৃপ্তি পায়। মুখ নিচু করে যেমন এসেছিল তেমনি আবার বার-বাড়ির দিকে চলে গেল।

গৌরী পিসি বাইরে আসতেই প্রীতি জিজ্ঞেস করলে—কী রে, মাগী চলে গেছে—?

গৌরী পিসি বললে—হ্যাঁ বিদেয় হয়েছে—

—কী দিয়ে বৌ-এর মুখ দেখলে রে?

—সে আর বোল না বৌদি। একটা বাঁদি-পোতার গামছা—

—সে কী রে? গামছা? গামছা দিয়ে আমার ছেলের বৌ-এর মুখ দেখলে?

গৌরী বললে—তা সে গামছাই একরকম বলতে পারো। আমাদের বিবিগঞ্জের হাটে জোলাদের হাতে বোনা যেমন শাড়ি পাওয়া যায় তেমনি।

—কত দাম হবে?

—তা তিন টাকাও হতে পারে, পাঁচ টাকাও হতে পারে—

প্রীতি বললে—ঢং, ঢং দেখে আর বাঁচিনে, অথচ যদি নেমন্তন্ন করে ডেকে আনা হতো তো তাও বুঝতুম—

গৌরী বললে—অথচ মাগীর দেমাক দেখ না, কর্তাবাবুকে সেবার কত গালাগালি দিয়ে গেল, এখন আবার এসেছে ভাল-ভালবাসা দেখাতে—লজ্জাও করে না মা, ছিঃ।

প্রীতির সেসব মনে ছিল না। বললে—গালাগালি দিয়েছিল? কর্তাবাবুকে? কী গালাগালি দিয়েছিল রে?

—ওমা, তোমার মনে নেই, ওই বার-বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলেছিল—তুমি নির্বংশ হবে নারাণ, আমি বামুনের মেয়ে হয়ে তোমাকে শাপমন্যি দিয়ে গেলুম তোমার বংশ থাকবে না—

প্রীতি বললে—ওমা, তুই আমাকে আগে মনে করিয়ে দিলিনে কেন? আমি তাহলে আজ ঝাঁটা ঘাব দিতুম মাগীর মুখে।

তা বটে। গৌরীও সেই কথাই বললে।

কালিগঞ্জের বৌ-এর মুখে খ্যাংরা ঝাঁটা ঘষে দিলেই বুঝি ভালো হতো! এই সদানন্দর বিয়ের ব্যাপারেই কি কম ঝগড়া দিয়েছে কালিগঞ্জের বউ? পাছে বিয়ে ভেঙে যায় সেই জন্যে খোকাকে পর্যন্ত নিজের বাড়িতে সমস্ত রাত আটকে রেখেছিল। এখন লজ্জা নেই তাই আবার ঢং করে একটা তিন টাকা দামের গামছা দিয়ে বৌ-এর মুখ দেখতে এসেছে।

কিন্তু ভেতর-বাড়িতে যখন এসব মন্তব্য চলেছে কালিগঞ্জের বৌ তখন সোজা বার-বাড়ির উঠোনে গিয়ে দুলালকে খুঁজছে। কোথায়, দুলালরা কোথায় গেল! তাদের পালকি! পালকিটাই বা গেল কোথায়?

প্রকাশমামা বাইরে শামিয়ানা খাটানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ পালকিটা দেখতে পেয়ে বললে—তোমরা এখেনে কেন হে? এখানে পালকি রেখে আমার জায়গা আটকে রেখেছ কেন? যাও যাও, বাইরে যাও—

দুলালরা পালকি সরিয়ে নিয়ে একেবারে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আর ভেতরের দিকে চেয়ে দেখছিল। মা-জননী এখনও আসছে না কেন? কালিগঞ্জে ফিরে যেতে যে রাত পুইয়ে যাবে!

সদানন্দ সামনে দিয়ে যেতে গিয়েই পালকিটা তার নজরে পড়লো। এ তো চেনা পালকি!

বললে—হ্যাঁ গো, এ পালকি কার? কালীগঞ্জের বৌ এসেছে নাকি?

দুলাল বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, মা-জননী এসেছে—

—তা কোথায় তিনি?

—ভেতরে গেছে'

সদানন্দ আর দাঁড়ালো না। এক দৌড়ে ওপরে দাদুর ঘরে চলে গেল। কালীগঞ্জের বৌ এখানে এসেছে নাকি কৈলাশকাকা?

কৈলাশ গোমস্তা কী বলবে ভেবে পেলে না। তারপর বললে—আমি তো ঠিক জানি নে খোকাবাবু—

কর্তাবাবুর কানেও কথাটা গিয়েছিল। বললেন—কে? কে কথা বলছে কৈলাশ? খোকা না?

কিন্তু সদানন্দ আর সেখানে দাঁড়ালো না। তাহলে নিশ্চয় ভেতর-বাড়িতে গেছে।

—মা!

—খোকা কী রে?

—হ্যাঁ মা কালিগঞ্জের বৌ এসেছে বুঝি? কোথায়?

—এই তো এখুনি বৌ-এর মুখ দেখে চলে গেল!

সদানন্দ বললে—কিন্তু এখানেই কোথাও আছে, পালকি যে বাইরে রয়েছে দেখলুম—

বলে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল আবার। কীর্তিপদবাবু তাঁর ঘরের মধ্যে

ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি! কেমন ক'রে বলবো ওকে?

বসে তামাক খাচ্ছিলেন। নাতিকে দেখে বললেন—এই যে খোকা, কোথায় গিয়েছিলে?

কিন্তু ও-সব বাজে কথা বলবার তখন সময় ছিল না সদানন্দর। সেখান থেকে সোজা বারবাড়িতে গিয়ে একেবারে প্রকাশ-মামার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ালো।

—মামা, কালিগঞ্জের বৌ এসেছে বুঝি?

—হ্যাঁ দেখলাম তো তাই।

—কিন্তু গেল কোথায়? কোথাও তো দেখতে পাচ্ছি না—বাবার কাছে চণ্ডীমণ্ডপে আছে নাকি?

সেখান থেকে চণ্ডীমণ্ডপে! সদানন্দের মনে হলো এক মুহূর্ত দেরি হলে যেন আর কালিগঞ্জের বৌকে দেখতে পাবে না সে। কিন্তু বিয়ে বাড়িতে তো আসবার কথা ছিল না কালিগঞ্জের বৌ-এর। তবে কি দাদুর কাছে টাকা চাইতে এসেছে! দাদু কি টাকা দিয়েছে তাহলে? দাদু কি তাহলে কথা রেখেছে? সেই দশ হাজার টাকা!

ভাবতে ভাবতে সমস্ত বাড়িটা চষে ফেলতে লাগলো সদানন্দ! এত ভিড় চার-দিকে। সমস্ত লোকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে খুঁজতে লাগলো সেই তার আসল লক্ষ্যবস্তুটাকে। কই, কোথায় গেল কালি-গঞ্জের বৌ? পালকি থাকতে তো হেঁটে ফিরে যাবে না এখান থেকে।

শেষকালে সে আবার ফিরে এল সদরে। তখনও দুলালরা বারবাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

—কী গো, তোমাদের মা-জননী এসেছে?

—আজ্ঞে না, আমরা তো মা-জননীর জন্যেই হা-পিত্যেশ করে তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। সন্ধ্যের আগেই রওনা দেবার কথা আমাদের—

—তাহলে দেখি, কোথায় গেল—

বলে সদানন্দ আবার ভেতরের দিকে ঢুকলো। হ্যাজাগ বাতি লাগানো হচ্ছে গেটের ওপর। প্রকাশমামা কোমরে তোয়ালে বেঁধে সেই তদারক করতেই ব্যস্ত। বাজে-কাজে সময় নষ্ট করবার অবসর নেই তার। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর। সদানন্দকে দেখেও যেন দেখলে না প্রকাশমামা।

কিন্তু বংশী ঢালী তার কাজে কখনও ঢিলে দেয়নি জীবনে। সে যে কখন নিঃশব্দে সকলের চোখের আড়ালে তার ডিউটি করে বসে আছে তা কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু এটাও যে খুব সোজা কাজ তা নয়। কালীগঞ্জে যখন কর্তাবাবুর কাছে সে কাজ করতো তখন সে এই কালীগঞ্জের বৌকেই একদিন মা-জননী বলে ডেকেছে। একদিন এরই নিমক খেয়েছে। কিন্তু বংশী ঢালীরা টাকার জন্যে সব করতে পারে। টাকার বদলে তাদের নিমক-হারামী করতেও বুঝি বাধে না।

—কে? ওখানে কে?

বংশী ঢালীরা তখন নিঃশব্দে তাদের কাজ সমাধা করে ফেলেছে!

—কে? কে ওখানে?

সদানন্দর মনে হলো চণ্ডীমণ্ডপের পেছনে আতা গাছের ঝোপের তলায় অন্ধকারে যেন ফিস-ফিস করে কারা কথা বলছে।

সদানন্দ কাছে যেতেই বংশী ঢালী অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—বংশী, এখানে অন্ধকারে কীসের একটা আওয়াজ হলো না? যেন মেয়েমানুষের গলার মত আওয়াজ পেলাম—

বংশী অবাক হয়ে গেল—মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ! এখানে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ কোত্থেকে আসবে খোকাবাবু?

—তা তুমি এখেনে এখন কী করছিলে? সবাই কাজ করছে আর তুমি এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী দেখছো?

বংশী বললে—না, এই আমার ঘরে ঢুকেছিলাম, এখন বেরোচ্ছি—

বলে কথা এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি বার-বাড়ির লোকজনের ভিড়ের দিকে চলে গেল। কিন্তু সদানন্দর কেমন সন্দেহ হলো। এ জায়গাটা একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। বংশী চলে যাবার পর সদানন্দও চলে আসছিল। কিন্তু আবার সেই অন্ধকারের দিকেই ফিরে গেল। বংশীকে দেখলেই কেমন ভয় করতো সদানন্দর। ও যেন হিংসার প্রতিমূর্তি! ও এমন সময় তো এখানে একলা থাকবার লোক নয়। আর এদিক থেকেই তো আওয়াজটা এসেছিল। মেয়েমানুষের গলার মত আওয়াজ।

বংশীর ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলতে গেল সে। কিন্তু মনে হলো যেন তালা ঝুলছে। অন্ধকারের মধ্যে তালাটায় হাত দিলে। হাত দিয়ে নাড়ালে। আর বোধহয় তাড়াতাড়িতে ভালো করে তালায় চাবি লাগানো হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে গেল। সদানন্দ ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। মনে হলো ভেতরে যেন তখনও কার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—

কিন্তু বংশী আবার এসে হাজির হয়েছে তখন।

—এখানে কী করছো খোকাবাবু?

—ঘরের ভেতরে কী বংশী? গোঙাচ্ছে কে?

বংশী ঢালী সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কর্তাবাবু তোমাকে ডাকছে খোকা-বাবু, লোক এসেছে, তাড়াতাড়ি ডেকেছে—

—আমাকে? আমাকে ডেকেছে?

বংশী ঢালী বললে—হ্যাঁ—এখুনি দেখা করে এসো—

—কিন্তু ঘরের মধ্যে কে?

বংশী ঢালী বললে—ঘরের মধ্যে আবার কে থাকবে? আমি তো তালা-চাবি দিয়ে রেখেছিলুম। খুললে কে? বলে ট্যাঁকের ঘুনসী থেকে একটা চাবি বার করে বোধহয় তালাটা আবার বন্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

—কিন্তু ঘরের মধ্যে কার গলার আওয়াজ শুনলুম, ওখানে কে আছে বলো? বলো ওখানে কী হয়েছে? কে আছে ওখানে?

কিন্তু বংশী ঢালী অত সহজে ভাঙবার পাত্র নয়। বললে—তুমি ভূত দেখেছ খোকাবাবু, ভূতের ভয় লেগেছে তোমার নিশ্চয়!

সদানন্দ বললে—বাজে কথা রাখো, বলো ভেতরে কী হয়েছে? বলো ভেতরে কে আছে? তুমি নিশ্চয় কালিগঞ্জের বউকে ভেতরে আটকে রেখে দিয়েছ—এখনও বলো কে ওখানে—

বংশী ততক্ষণে দরজায় বেশ করে তালাচাবি বন্ধ করে আবার চলে যাচ্ছিল। সদানন্দ ছাড়লে না, বললে—বলো, কে ওখানে আছে? কাকে তালাচাবি বন্ধ করে রেখেছ?

বলতে বলতে বংশীর পেছন-পেছন একেবারে সদরের বার-বাড়ির কাছে এসে পড়েছিল। প্রকাশমামা দেখতে পেয়েছে। বললে— এ কী রে, তোর গেঞ্জীতে এত রক্ত কেন? (ক্রমশ)

॥ ৩২ ॥

ডেভিড জে ম্যাককাচ্চন

আজ পয়লা মাঘ ১৩৭৮ সাল: ইংরেজীর পনেরোই জানুয়ারি ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ। কিছুক্ষণ আগে, বিকেলের পড়ন্ত আলোয়, কলকাতার ভবানীপুর সমাধিক্ষেত্রে ডেভিড জে ম্যাককাচ্চনের মরদেহ সমাহিত হল। পুরোহিত বাইবেল থেকে ধীরে ধীরে পাঠ করে শোনালেন চিরশান্তি, চিরবিশ্রামের বাণী। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানালেন—ক্লান্ত যাত্রার শেষে মৃতের আত্মা যেন তাঁর ক্ষমাসুন্দর ক্রোড়ে চিরআশ্রয় পায়।...এক অল্পবয়সী ইংরেজের সদ্যখনিত কবরের কাছাকাছি তখন শতাধিক শোকার্ত বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ নত মস্তকে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মধ্যে অন্নদাশংকর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী। সকলের চোখেই অশ্রুধারা। আজ থেকে বারো বছর আগে, কেম্ব্রিজের এক মেধাবী ছাত্র প্রখর বুদ্ধি ও উৎসাহের দীপ্তি নিয়ে বিশাল ভারতের আর কোথাও না গিয়ে ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে এসেছিল বিশ্বভারতীতে। এদেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের সূচনা সেখানেই। তারপরে ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে, উত্তর বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে দীর্ঘ পথপরিক্রমার শেষে আজ সে চিরনিদ্রিত। সহসা কেন জানি অসংলগ্নভাবে মনে হল—শান্তিনিকেতনে থাকবার সময় বা অন্য কখনো সে কি শুনেছিল রবীন্দ্রনাথের সেই অপরূপ সুন্দর গান—"সম্মুখে শান্তি পারাবার"? ইদানীং সে বাংলা বেশ ভালই শিখেছিল। শীতল কফিনে ঢাকা তার মৃতদেহ যখন ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হল কবরের গভীরে তখন ভাবলাম, এক বাঙালী কবির লেখা গান আজ সঙ্গতভাবেই যথার্থভাবে এক ইংরেজের অন্ত্যেষ্টিসংগীত হতে পারত। "সম্মুখে শান্তি পারাবার; ভাসাও তরণী হে কর্ণধার! তুমি হবে চিরসাথী, লও লও হে ক্রোড় পাতি; অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুব তারকার।"...

কিন্তু না, এ গান যতই কেননা মর্মস্পর্শী হোক, মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে নির্বাপিত এক উজ্জ্বল জীবনদীপের উপযুক্ত সমাপ্তিসংগীত হত কিনা সন্দেহ।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি নিশ্চিতভাবে জানি, অসমাপ্ত এত কাজ ফেলে রেখে এত সহসা অসীমের পথে যাত্রা করবার কোন ইচ্ছাই ডেভিডের অন্তরে ছিল না। তার থেকে অনেক অক্ষম, অনেক অনগ্রসর আমরা কয়েকজন সহযাত্রীও মনে-প্রাণে আশা করেছিলাম, একটানা দশ-বারো বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলা মন্দিরকলা বিষয়ে যে অজস্র উপাদান সে সংগ্রহ করেছিল তার সদ্ব্যবহার সে করে যেতে পারবে। কোন ফাউণ্ডেশন, স্কলারশিপ বা ফেলোশিপের সাহায্য সে কখনো নেবার চেষ্টা করেনি। প্রায় একক প্রচেষ্টায়, নিজের শেষ কপর্দকটি ব্যয় করে রাশি রাশি তথ্য ও আলোকচিত্র সংগ্রহ করেছিল। আর ঠিক যখন সে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিল এই ভূরি পরিমাণ তথ্য কিভাবে পরিবেশন করবে, তখনই নিষ্ঠুর মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলেও, ডেভিডের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস আজ পরিষ্কার দেখতে পেলাম। ভারতীয় ও বঙ্গসংস্কৃতির অবহেলিত একটা বিশাল দিক যে অসামান্য কুশলতায় ডেভিড খুলে দিতে পারত তা আর কোনদিন ততখানি বিশদভাবে, ততখানি পারদর্শিতায়, উন্মোচিত হবে কিনা সন্দেহ। অনাড়ম্বর ক্লেশবরণের সঙ্গে এত সাবধানী একনিষ্ঠ অধ্যয়নরীতির, স্বাচ্ছন্দ্য পরিহারের সহজ প্রবণতার সঙ্গে এমন তীক্ষ্ণ মেধার

ডেভিড ম্যাককাচ্চন : মৃত্যুর ১৫ দিন পূর্বের ছবি।

সমন্বয় এ দুর্ভাগা দেশে আবার কবে সম্ভব হবে জানি না। আজ গভীর শোকতপ্ত হৃদয়ে এ লেখা লিখছি। যা হারালাম, দেশ যা হারালো, আচ্ছন্নের মতো তবুও হাতড়ে তার পরিমাপ করবার চেষ্টা করছি। কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবু ভারতবিদ্যায় নিবেদিতপ্রাণ এই মহান বিদেশীর স্মৃতিতর্পণের সময় একবার নিজেদের দিকেও তাকানো দরকার। মেনে নেওয়া ভাল যে অনাহারে অনিদ্রায় গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর ক্লান্তিহীন দীর্ঘ ক্লেশে আমাদের অধিকাংশ গবেষকের গভীর অনীহা। মেনে নেওয়া ভাল, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রমসাপেক্ষ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রগুলিতে বাঙালী গবেষকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। মেনে নেওয়া ভাল, সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠা পেলেই আমাদের উচ্চ কোটির গবেষকরা সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব ও বাণী বিতরণ ছাড়া সাধারণত আর কিছুই করেন না। ব্যতিক্রম অবশ্যই কিছু আছেন। কিন্তু ডেভিড ম্যাককাচ্চনের নির্বাচিত বিষয়ে তার সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, তার প্রগাঢ় জ্ঞানের ভগ্নাংশমাত্রও আমাদের কোন গবেষকের অধিগত এমন অসম্ভব কথা—মার্জনা করবেন—আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। তার মহাসম্ভাবনাময় জীবনের অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি অনেকের কাছেই গভীর শোকের কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত মনস্তাপের অতীত ভারত-বিদ্যার যে অপূরণীয় ক্ষতি হল তা ঢের বেশি শোকাবহ।

*

ইংল্যাণ্ডের কোভেন্ট্রিতে এক নিম্নমধ্য-বিত্ত পরিবারে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিডের জন্ম হয়। সেখান থেকেই ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে, দেশের প্রচলিত বিধি অনুসারে; সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতা-মূলকভাবে কাজ করে এক বছর। তারপর, কেমব্রিজের জীসাস কলেজ থেকে ইংরেজী, জর্মন ও ফরাসী এই তিন বিষয়ে আধুনিক ভাষাসাহিত্যের স্নাতক হয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ও স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করে চার বছর পরে। ইতিমধ্যে, ফরাসী দেশে দু' বছর অধ্যাপনা করবার পর, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সে বিশ্বভারতীতে যোগ দেয় ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে। আমি যত দূর জানি তার ভারতপ্রীতির হাতেখড়ি সেখানেই। আজও শান্তিনিকেতনের অনেকেই এই উজ্জ্বলদর্শন তরুণ অধ্যাপককে মনে রেখেছেন তার অনাড়ম্বর জীবন ও মিশুকে প্রকৃতির জন্য। ১৯৬০ সালে সে আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ও মাত্র চার বছরের মধ্যে সেখানকার 'রীডার' পদে উন্নীত হয়। শিক্ষক হিসেবে তার কৃতিত্বের কথা অনেকের কাছেই শুনেছি আর অধ্যাপনা বিষয়ে নিজের চোখেই দেখেছি তার চূড়ান্ত সততা। মন্দির-কলার চর্চায় সে না যেতে পারত এমন স্থান নেই, না করতে পারত এমন কাজ নেই। তবু দূর মফঃস্বলে মন্দির কভারেজের কাজ অসমাপ্ত রেখে বারংবার তাকে কলকাতায় ফিরে আসতে দেখেছি সন্তোষজনকভাবে 'লেসন' তৈরি করে ক্লাস নিতে হবে বলে। আমার বাসার খুব কাছে যে বাড়িতে একখানা ঘর নিয়ে সে 'পেয়িং গেস্ট' হিসেবে থাকত সেখানে, নিতান্ত প্রয়োজনে, সকালের দিকে গেলে সে যে প্রচ্ছন্নভাবে অসন্তুষ্ট হত তা বুঝতাম। কেননা, সাধারণত তখনই ছিল তার কলেজের পাঠ তৈরি করার সময়। আমি ডেভিডকে চিনতাম সে জন্য কখনও মর্মাহত হইনি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত থাকার সময়ে বহু উচ্চ শ্রেণীর সাময়িকপত্রে অজস্র গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছে ডেভিড। বিষয়—প্রধানত ভারতীয় ও বাংলা মন্দিরকলার বিভিন্ন দিকের বিশদ ও দক্ষ আলোচনা, কখনো বা সাহিত্য। প্রতিটি প্রবন্ধে দেখেছি মনীষার দ্যুতি, গভীর অধ্যয়নের ছাপ আর আশ্চর্য সুন্দর ইংরেজীতে নতুন কিছু পরিবেশন। প্রকাশিত প্রবন্ধের 'অফ্-প্রিন্ট' হাতে এসেছে যখন তখন কত আলোচনা হয়েছে সে সব লেখা নিয়ে। আজ চোখের জল মুছে এই কঠোর সত্যটাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি, আমাদের মন্দিরকলা বিষয়ে এত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ভবিষ্যতে কখনো যদি বা লেখাও হয়, লেখকের হাত থেকে তার কাপি নেবার বা তার সঙ্গে সে সম্পর্কে আলোচনা করবার সুযোগ জীবনে আর পাব না।

বিক্ষিপ্তভাবে অনেক লিখলেও ডেভিডের দুঃখ ছিল এতদিনে তার গবেষণা-গ্রন্থ একটাও প্রকাশিত হল না। বছর দেড়েক আগে এসিয়াটিক সোসাইটি তার এই ক্ষোভ দূর করবার সিদ্ধান্ত নেন। স্থির হয়, তার দীর্ঘ অধ্যয়নের প্রথম ফসল, "লেট মিডিভাল টেম্পলস অব বেঙ্গল" তাঁরা প্রকাশ করবেন। ১৯৭০-এর শেষ দিকে, বছর খানেকের ছুটিতে দেশে যাবার আগের কয়েক সপ্তাহ সে-পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করবার কাজে তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখেছি। বৃষ্টিবাদলে কয়েক-দিন গৃহবন্দী থেকে সে সময়ে একবার ডেভিডের বাড়ি গিয়ে দেখি তার ঘর সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড। ফাটো ছাদের এত অসংখ্য স্থান দিয়ে জল পড়ছে যে তার রাশি রাশি বই, কাগজপত্র, পুরাকীর্তির সংগ্রহ ছত্রখান করে সরিয়ে ফেলতে হয়েছে চারিদিকে। আর তারই মাঝখানে, একটু নিরাপদ জায়গায়, এক স্যুটকেসের ওপর ড্রইং কাগজ বিছিয়ে সে নিবিষ্টচিত্তে একের পর এক মন্দিরের ভিত্তিচিত্র এঁকে চলেছে—তার প্রস্তাবিত বই-এর জন্য। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি যথাসময়ে এসিয়াটিক সোসাইটিতে জমা দিয়ে সে বিলেতে গিয়েছিল। খুব আশা করেছিল, ফিরে আসবার আগেই বইটি প্রকাশিত হবে। নানা কারণে সে বই প্রকাশিত হতে আরও মাসখানেক লাগবে। মৃত্যুর আগের দিন সকালে, পোলিও রোগের মারাত্মক আক্রমণে যখন তার নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ, যখন সদাব্যস্ত হাত দু'টিও নাড়াবার তার শক্তি নেই, তখনও, অ্যাম্বুলেন্স-এ উঠতে উঠতে, সেই বই-এর শেষ না-দেখা প্রুফ্‌টি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য গৃহকর্ত্রীর কাছে অনুনয় করেছিল। নিজের নির্বাচিত বিষয়ের প্রতি এমন নিবেদিতপ্রাণ গবেষক আমি আর দেখিনি। এসিয়াটিক সোসাইটির সংবাদে প্রকাশ—"লেট মিডিভাল টেম্পলস অব বেঙ্গল" বইটিতে বড় সাইজের ৮৮ পৃষ্ঠা, ১৫৬টি আলোকচিত্র ও ৬টি অঙ্কিত নক্সা থাকবে। মুদ্রণ শেষ হলে তাঁরা ডেভিডের স্মৃতির উদ্দেশে সেটিকে উৎসর্গ করবার জন্য এক স্মরণসভার আয়োজন করবেন। এছাড়া এ বিষয়ে এখন আর কীই বা করবার আছে।

দুঃখে সুখে এতদিনের এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য সত্ত্বেও ডেভিডের শেষ সময়ে যে তার কাছে থাকতে পাইনি, সে মনস্তাপ আমাকে চিরদিন পীড়িত করবে। কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থা অনুযায়ী এগারোই জানুয়ারি সকালে উডল্যাণ্ড নার্সিং হোমে স্থানান্তরের সময় থেকে পরদিন রাত্রি দশটা অবধি ধীরে ধীরে সর্বশরীর অসাড় হয়ে এলেও তার জ্ঞান ছিল। বারোই জানুয়ারি রাত এগারোটায় তার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ পিতামাতা ও স্বদেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে, বন্ধুবান্ধবদের অনুপস্থিতিতে কী চিন্তাভাবনা তার অন্তিম মুহূর্তগুলিতে ভীড় করে এসেছিল তা কিছুটা অনুমান করতে পারি। আমিও একবার মৃত্যুর বড় কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। সাত-আট বছর আগে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে চুঁচুড়া থেকে পি জি হাসপাতাল অবধি প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা আসবার সময় অ্যাম্বুলেন্সের স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়ে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা বারবার মনে এলেও অসমাপ্ত কাজের কথাই ভেবেছিলাম বেশী। ডেভিডের জ্ঞানভাণ্ডার আমার থেকে অনেক অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল। বহুগুণ বেশি পরিশ্রম নিয়োজিত হয়েছিল সে-ভাণ্ডার তিলে তিলে গড়ে তুলতে। কঠিন কষ্টার্জিত সে অমূল্য সম্পদ মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে ছেড়ে যাবার সুতীব্র বেদনা আমি অনায়াসে অনুভব করতে পারি। প্রায়ই তাকে বলতে শুনতাম, ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলাদেশের মন্দিরকলা সম্পর্কে বিশদভাবে সব কথা

লিখতে গেলে দশ ভল্যুম-এর বই হয়। তাঁর জ্ঞানের পরিধি, তাঁর সংগ্রহের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা না থাকায় এ উক্তিকে আমি কখনো অতিশয়োক্তি বলে মনে করিনি। আরও আশ্চর্য এই যে, ভাষা-সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও দুরূহ এক বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁকে অর্জন করতে হয়েছিল অন্যের সাহায্য ব্যতীত শুধু নিজের চেষ্টায়। আমাদের অল্পবিদ্যা অথচ উন্নাসিক পণ্ডিত সমাজে, হায়, এহেন দৃষ্টান্ত কত বিরল!

ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিশাল ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণশীল হলেও টেরাকোটা মন্দিরের প্রতি ডেভিডের এক সুগভীর প্রীতি ও মমত্ববোধ ছিল। সে জন্যই বছরের পর বছর মন্দিরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ডকুমেন্টেশনের কাজ সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় সে শেষ করেছিল। ডকুমেন্টেশন বলতে দূর থেকে মন্দিরের এক-আধটি মামুলি ছবি মাত্র নয়, তাদের প্রতি অংশের, প্রতি বৈশিষ্ট্যের বিশদ ফোটোগ্রাফ। এ ছাড়া সর্বাঙ্গীণ মাপজোখ তো ছিলই। প্রকৃত বলতে, এই অমূল্য কৃতিসম্পদগুলি রক্ষা করবার জন্য সরকারী বা বেসরকারী কোন রকম চেষ্টারই যখন অস্তিত্ব নেই, তখন অবধারিত বিনাশের আগে এদের যতগুলি ডকুমেন্টেশন করে রাখা যায় ততই ভাল। যানবাহনের সুবিধা থাকলে যে একই সময়ের মধ্যে আরও অনেক বেশি কাজ করতে পারত এবং তাহলে আরও বহু লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় মন্দিরের নিদর্শন যে উত্তরকালের জন্য রক্ষিত হত সে দুঃখও প্রকাশ করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডেভিডকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে হয় পায়ে হেঁটে নয় সাইকেলে চেপে। নিজের যে সাইকেলটি ছিল কলকাতায় ব্যবহার করত ট্রাম-বাসের ভীড় এড়াবার জন্য। দূর মফস্বলে সেটি নিয়ে যেতে পারত না বলে ঘড়ি বাঁধা দিয়ে, জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে এই অপরিচিত বিদেশী স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে সাইকেল জোগাড় করত। তারপর, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অগ্রাহ্য করে, গ্রামীণ বন্ধুর পথে বেরিয়ে পড়ত দশ-পনেরো মাইল দূরের মন্দির কাজের জন্য। বিদেশের কোন ফাউণ্ডেশন, এদেশের কোন সংস্থা—যারা কত অপাত্রকে পোষণ করে থাকেন—ডেভিডকে এ বিষয়ে কণামাত্রও সাহায্য করেন নি। করলে, তাঁরা গৌরবান্বিত হতেন, এ দুর্ভাগা দেশও লাভবান হত। সে-বস্তুর ব্যক্তিগত ক্লেশের দিকটাতে তাকে কিন্তু কখনো গুরুত্ব আরোপ করতে দেখিনি। দ্রুততর যানবাহনের অভাবে, সীমিত সময়ের মধ্যে সে যে উত্তরকালের জন্য সর্বাধিকসংখ্যক মন্দিরের বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে পারল না, শুধু এ-ই ছিল তার আক্ষেপ। 'সার্ভিস বিফোর সেল্ফ'-এর এহেন জীবন্ত অথচ

দূর মফঃস্বলে পথশ্রমে ক্লান্ত ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন ও লেখক।

এত করুণ দৃষ্টান্ত আমি আর দেখিনি। খ্যাতি, আরাম সব কিছুর মোহ ত্যাগ করে, দূরে বিদেশের কৃষ্টিসম্ভার উদ্ধার করবার জন্য কোন বাঙালী বা ভারতীয় এভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন বলেও আমার জানা নেই। ডেভিডের অকাল মৃত্যু সে জন্য শুধু গভীর শোকাবহই নয়, মর্মান্তিক লজ্জার বিষয়ও বটে।

গত কয়েক বছরে পশ্চিমবাংলার দূর-দূরান্তে অসংখ্য জায়গায় আমরা একত্র গিয়েছি: ডেভিডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দৈহিক ক্লেশ, বাধাবিপত্তি হাসি মুখে সহ্য করেছি। আমাকে ছাড়া আরও বহু স্থানে সে অবশ্য একলাই গিয়েছে। আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রে, আমার নির্জন পড়ার ঘরে বসে সেসব যৌথ পর্যটনের কত অজস্র কাহিনী, কত টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার কতটুকুই বা বলা যাবে! প্রাক্তন হৃদ্‌রোগী আমি, ডাক্তারের পরামর্শে, পিঠে বালিশ দিয়ে, বিছানায় পা ছড়িয়ে বসেই লেখাপড়া করি। প্লাইউডের হালকা একটা টেবিল পায়ের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা থাকে। সেই টেবিল ঘেঁষে, বিছানার ওপাশে বসে (যেমন সে বরাবরই বসত) গোটা একটা সন্ধ্যা ডেভিড কাটিয়ে গেল মৃত্যুর ঠিক সাত দিন আগে। ওড়িশার অতি দুর্গম অঞ্চলে প্রায় পনের দিনের সফর সেরে সবে ফিরেছে। বললাম—বেশ রোগা হয়ে গেছ ডেভিড, কালোও হয়েছে একটু। অভ্যাস-মাফিক এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললে—খাওয়াদাওয়ার সামান্য কিছু অসুবিধা হয়েছে আর যানবাহনের অভাবে হাঁটতেও হয়েছে একটু বেশি। পরে, তার সঙ্গীদের কাছে, এই অভিযাত্রী দলের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা শুনেছি। তাঁদের ধারণা, ওড়িশা ও তার অব্যবহিত পূর্বে মধ্যপ্রদেশে ভ্রমণের মাত্রাতিরিক্ত ক্লেশই হয়ত ডেভিডের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কিন্তু তার মুখ থেকে সেরকম কোন আভাসও পাইনি। তার বদলে শুনলাম, তার রাশি রাশি টাটকা অভিজ্ঞতার খবর। শেষের দিকে বললে—এখনও এত কাজ, এত কভারেজ বাকি পড়ে আছে যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা বোধ হয় ছেড়েই দিতে হবে। তারপরে, কোনও পিছুটান না রেখে, একটানা যদি দুটো বছর দেশময় ঘুরে বেড়াতে পারি তা হলে প্রস্তুতিটা মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়। এবং, কেমব্রিজে ফিরে গিয়ে, ভারতীয় ও বাংলা মন্দিরকলা নিয়ে সচিত্র একটা বড় কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে। হায়! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, ডেভিডের শরীর তখনই ভিতরে ভিতরে এত দুর্বল যে তার আয়ু দু বছর তো দূরের কথা আর এক সপ্তাহেরও বেশি নয়। ভাবলে, সদ্যোমুক্ত বাংলাদেশে বেশ বড়সড় একটা পরিক্রমার প্রস্তাব তুলতেই পারতাম না। পূর্ববঙ্গে ছিলাম সেই একেবারে ছেলেবেলায়, তারপর আর যাইনি বললেই চলে। ডেভিড বহুবার সেখানে গিয়েছে, রাশি রাশি কভারেজ করে এনেছে। সে সব দেখে হতাশায় আমি নীরব থেকেছি। সেদিন কথাটা তুলতেই ডেভিড লাফিয়ে উঠল। বললে, বাংলাদেশে কত জায়গা এখনও দেখা বাকি—চলো দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। হায়! তখনো ভাবিনি তার আয়ু মাত্র আর সাত দিন! ভবিষ্যতে কখনো হয়ত যাব বাংলাদেশে। কিন্তু ডেভিড তখন আমার সঙ্গে থাকবে না।

এই সঙ্গে না থাকার কথাটাই আজ বিকেলে ডেভিডের কবরের কাছ থেকে চলে আসবার সময় তীব্র বেদনার সঙ্গে আর একবার মনে পড়েছিল। পুরাতত্ত্বের সন্ধানে আমরা দুজন কত বার কত সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছি। বীরভূমের ইলমবাজারে অথবা বাঁকুড়ার হাটে, কৃষ্ণনগরে নীলকরদের গোরস্থানে, বহরমপুরে-কাশিমবাজারের আশেপাশে আর্মেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কবরখানায়, কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে একত্র গিয়েছি, ছবি তুলেছি, নোট করেছি। তারপরে কাছাকাছি পাশা-পাশি থেকে প্রতিবারই ফিরে এসেছি একসঙ্গে। আজ ভবানীপুরে সমাধিক্ষেত্র থেকে চলে আসবার সময়, ফুলে ফুলে ঢাকা ডেভিডের কবরটির দিকে তাকিয়ে নিতান্ত অবোধের মতো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। এই প্রথমবার ডেভিড আমার সঙ্গে ফিরে এলো না।

১৫-১-৭২

(ক্রমশ)

[আলোকচিত্র : তারাপদ সাঁতরা]

ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন : এক বেদনাময় স্মৃতি

প্রণব রায়

সেই বিদেশী সরল সাধাসিধে মানুষটিকে আর কোন দিন দেখা যাবে না। বিলেতের সাদা চামড়ার অধিকারী হয়েও যাঁর চামড়ার রঙ ধূসর হয়ে গিয়েছিল বাঙলার গ্রামের ধূলির ছোঁয়ায়। কেম্ব্রিজের এম-এ ও কলকাতার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েও যিনি সরলভাবে মিশে গিয়েছিলেন গ্রাম বাঙলার মানুষের সঙ্গে—কি এক দারুণ দুর্বার নেশায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে, কলকাতায় আরামের চাকুরি আর নানা রকমের আমোদপ্রমোদের মোহ তাঁকে আদৌ টানতে পারে নি কাছে বরংখানি পেরোছিল বাঙলার ধুলোকাদায় মাখা ছোট ছোট গ্রাম, আর তাদের মাঝে আকাশছোঁয়া চূড়ো নিয়ে বিরাজ করছে যুগ যুগ ধরে যে মন্দিরগুলি—তারা, সেই বিদেশীটিকে টেনে নিয়ে এসেছিল তাদের বর্তমান দুর্দশা আর ভাষাহীন বেদনার কথা জানাতে বিশ্ববাসীকে।

মন্দিরকে অনেকেই ভালোবেসেছেন—ভালোবেসেছেন সেগুলি বাঙলার তথা ভারতের এক প্রাচীন শিল্পকর্ম বলে। মন্দিরশিল্পের খুঁটিনাটি নিয়ে মোটা মোটা বইও লিখে ফেলেছেন অনেকে। কিন্তু আমাদের ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়নের কাছে ছিল মন্দির এক বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। বিলেতে জন্ম ও সেখানেই শিক্ষাপ্রাপ্ত বিয়াল্লিশ বছরের সেই বিদেশীটির কথা বাঙলাদেশের আজ অনেকেই জানেন না। পণ্ডিতগোষ্ঠীর গুটিকয়েক লোক ও কিছুসংখ্যক গবেষক আর বাঙলার অনেক গ্রামের কোন কোন মন্দিরপ্রেমী ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষক ছাড়া ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন নামটি অনেকের কাছেই অপরিচিত ঠেকবে। কিন্তু যে সংবেদনশীলতা ও মানবপ্রেম জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও শিক্ষার অভিমান থেকে মানুষকে অনেক ওপরে তোলে, ডেভিড সে ধরনের মানুষ ছিলেন। জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি আধুনিক বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও তিনি বাঙলাভাষা শিখেছিলেন ভালোভাবে। বাঙলার তথা ভারতের নানা শ্রেণীর মন্দিরের কথা হয়তো তিনি তাঁর স্বদেশে বসেই শুনেছিলেন আর হয়তো মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন সেই মূক ও পরিশ্রান্ত মন্দিরগুলিকে কবে তিনি সামনে গিয়ে দেখবেন, নিজের হাতে করে তাদের গায়ের ময়লা একটু একটু করে ঝেড়ে ফেলে ছবি তুলবেন আর বাইরের জগৎকে জানিয়ে দেবেন তাদের কথা—প্রাচীন বাঙলার এ গৌরবকে।

কিন্তু ডেভিড পারেন নি তাঁর সেই স্বপ্নকে সম্পূর্ণ বাস্তব রূপ দিতে। উনিশ শ' ষাট সালে যাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র তিরিশ, কেম্ব্রিজের সেই এম-এ পাশ যুবকটি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে। তারপর দীর্ঘ বারো বছর ধরে চলল তাঁর নিরলস একাগ্র সাধনা ভারতের মন্দির ও তন্ত্র পোড়ামাটির শিল্প নিয়ে। হাতে, ক্যামেরা, কাঁধে ছোট্ট একটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি ভারত তথা বাঙলার প্রাচীন লুপ্ত গৌরবকে উদ্ধার করতে। মন্দির সম্পর্কে কৌতূহল ও তা নিয়ে গবেষণার সঙ্গে তাঁর পেশার কোন যোগ ছিল না।

বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের পিতলের আলগোছটুংগী রথ।

আলগোছটুংগী রথের চূড়াও মন্দিরের অনুরূপ তৈরী হত। এটি এক চূড়ার (আলগোছটুংগী—ছুতারের দেওয়া নাম) রথ। কাঠের সতেরো **চূড়ার রথ** মহিষাদলের রাজবাড়িতে আছে।
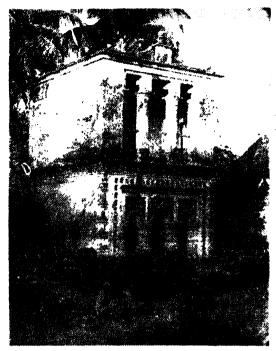
কাটানের দোতলা চাঁদনী মন্দির

তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাই মন্দির সম্পর্কিত গবেষণার দ্বারা উচ্চতর ডিগ্রীলাভ ও তার সাহায্যে চাকুরিতে উচ্চতর পদপ্রাপ্তি এর থেকে সম্ভব ছিল না। ডেভিড ভালোবাসতেন বাঙলার এই প্রাচীন শিল্পটিকে অন্তর দিয়ে। অসাধারণ নিরভিমান ও পোশাকে-আসাকে অদ্ভুত সরল এই ব্যক্তিটি যখন একটি ক্যামেরা নিয়ে গাঁয়ের ধুলোকাদার ওপর দিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতিতে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলতেন শুধু মন্দিরকে একটিবার দেখবার জন্যে—আর যখন একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত নামের মন্দিরগুলি অপূর্ব পোড়ামাটির কাজে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হত তখন তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন অবাক বিস্ময়ে—ভুলে যেতেন বর্তমানের পঙ্কিল আবহাওয়াকে, এক একটি করে আলোকচিত্র তুলে নিতেন তাদের। বাঙলার মন্দিরগুলির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সকলের থেকে বেশী, এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙলার বিভিন্ন স্থানের একই জায়গায় তিনি বহুবার এসেছেন আর অসংখ্য আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন তিনি এ সব অঞ্চলের মন্দিরের। আজ সে সব মন্দিরের অনেকগুলিই ভেঙে পড়ছে ও চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে, ডেভিডের এক মহান সংকল্প ছিল বাঙলার এই মন্দিরগুলো ভবিষ্যতে লুপ্ত হয়ে গেলেও স্পষ্ট আলোকচিত্রগ্রহণ ও সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করে তিনি ভাবীকালের কৌতূহলী গবেষকের কাছে তাদের স্মরণীয় করে রাখবেন। পশ্চিম বাঙলা ও বর্তমান বাঙলাদেশের এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে তিনি মন্দিরের খোঁজে যান নি। নিজের দেহের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ও অক্লান্তকর্মা এই ব্যক্তিটিকে যিনিই দেখেছেন তিনিই অবাক হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় কলা বিষয়ের খ্যাতনাম্নী অধ্যাপিকা ডঃ স্টেল্লা ক্রামরিশ মধ্যযুগীয় হিন্দুমন্দির সম্পর্কে সুদীর্ঘকালের গবেষণালব্ধ দু খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি বই প্রকাশ করেন উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে। এ বইয়ের এক স্থানে ডঃ ক্রামরিশ বলেছেন, ভারতের মন্দির সম্পর্কে ভালো করে জানতে হলে প্রথমেই লক্ষ করতে হবে যে এ সব মন্দির রূপপ্রকল্পে হিন্দু জনসাধারণের মনোবৃত্তি কিরূপে ছিল। এ ছাড়া আরও দেখতে হবে মন্দিররূপের ক্রমবিকাশে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার কতখানি প্রভাব রয়েছে। শুধুমাত্র নানা রীতির মন্দিরের ক্রমবিকাশ, কোন বিশেষ অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও শিল্পগত বিশেষত্ব বা ইঙ্গিত মন্দিরস্থাপত্যশিল্পের গবেষণায় যথেষ্ট নয়, উপরন্তু মন্দিররূপ প্রকল্পে জনমানসের গতিপ্রকৃতির কথা আগে চিন্তা করে দেখতে হবে। ডেভিড মন্দিরস্থাপত্যশিল্পের গঠনরীতি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে যে এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ বোধ হয় ছিল এটি। গত দু বছর ধরে তিনি যে নানা শ্রেণীর দেউল ও মন্দির সম্পর্কে এক দীর্ঘ গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত দাসপুরের চেতুয়াবাসুদেবপুর গ্রামের প্রবীণ পণ্ডিত গবেষক রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রবংশীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়কে ১৯৭০-এর ২৬ জুলাই তারিখে লেখা চিঠির একটি অংশই তার প্রমাণ। তিনি লিখেছিলেন :

"I have been extremely busy writing a long 'classification of the Temple Types of Bengal' which I must finish and get ready for the press before I leave for England. There will be important mention of you in the book." এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পশ্চিম বাঙলার প্রবীণ মন্দিরগবেষক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় দীর্ঘকাল ধরে বাঙলার মন্দির নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দিরের রীতি ও গঠনপ্রণালী নিয়ে তিনি অনেক আগে থেকেই কলকাতার নানা খ্যাতনামা পত্রপত্রিকায় অনেক গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখেছেন। শ্রীযুক্ত রায় এখন সপ্ততিপর বৃদ্ধ। গ্রামপ্রান্তে বসে জরা ও অসুস্থতার সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি আজও বঙ্গভারতীর অক্লান্ত সেবা করে চলেছেন। মন্দিরপ্রেমী ডেভিড যে কীভাবে এই জ্ঞানতপস্বীর সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন তা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়, তবে এই দুই সরল জ্ঞানতপস্বীর অন্তরের মধ্যে যে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ম্যাকাচ্চিয়ন তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণাপ্রসূত ও প্রচুর আলোকচিত্রসম্বলিত এ বইটির পাণ্ডুলিপি কলকাতার একটি প্রেসে দিয়েছিলেন ১৯৭০ সালে বিলেত যাবার আগে। আজও সে বইটি প্রকাশিত হয় নি। বইটি প্রকাশিত হলে বাঙলার মন্দির বিষয়ে অনেক প্রামাণিক ও প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ অনেক তথ্য জানতে পারা যাবে। ডেভিডের অভাবে সে দায়িত্ব আজ কে নেবে !

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডেভিড সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব আফ্রিকান অ্যান্ড এশিয়ান স্টাডিজ-এ গবেষণা করতে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। গত দশ বছর ধরে যে অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করেছিলেন সে পরিশ্রমের ফলকে তিনি তাড়াতাড়ি উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন সুধীমণ্ডলীর সামনে। বোধ হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর দিন তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসছে। বিলেত থেকে ১৯৭১

সালের ২ জুন তারিখে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তাঁর প্রবীণ বন্ধু শ্রীযুক্ত রায়কে বোধ হয় এর আভাস দিয়েছিলেন। বড় বেদনার সঙ্গে তিনি লিখেছেন: 'How much longer will it be possible for me to work there (Bengal)?' এককালের পূর্ব পাকিস্তান আর এখনকার বাঙলাদেশে আজ স্বাধীনতার সূর্যোদয় হয়েছে। আজ ডেভিড বেঁচে থাকলে ওপার বাঙলার আরও বহু মন্দির বিষয়ে তাঁর সমীক্ষা চালাতে পারতেন অবাধে। কিন্তু সে আশা তাঁর অপূর্ণই রয়ে গেল।

ম্যাকাচ্চিয়ন মন্দির সম্পর্কে বহু পড়াশুনা করলেও তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ও বর্তমান গবেষকদের মতামতকে কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন শ্রীযুক্ত রায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠির (১৯৭০, ৭ সেপ্টেম্বর) অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে। চিঠির এ অংশটি থেকে প্রমাণিত হবে যে, শুধুমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থের ওপর নির্ভর না করে স্থানীয় বিশেষজ্ঞের মতামতকে তিনি কতখানি গুরুত্ব দিতেন। সঠিকতার প্রয়োজনের নিষ্ঠা তাঁর ছিল। তাই সব সময়েই তাঁর চেষ্টা ছিল বাঙলার মন্দিরগুলিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে ও দর্শনের পর মন্দির ও তার কলাকৌশলকে বুঝতে চেষ্টা করা। এ বিষয়ে স্থানীয় গবেষকের সাহায্য ও তাঁর মতামতকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। চিঠিটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে:

". . . . . I have been extremely busy trying to bring to completion (Final revision) my complicated long article for the Asiatic Society journal. In it I am mentioning all the technical terms you told me, attributing them to the sutradharas of Daspur on information received from you. Please confirm that all the following terms are from the Daspur sutradharas: algoshtungi, chandni, utkalia deul, 'Bishnupuri at-chala', Islamiya deul, imarati pillar, kalagechhya, darun, hansgola, high-court, khilan, chamchika khilan, rasun chura. If any of them are not from the Daspur sutradharas, if any of them are your own invention, please let me know."

পশ্চিম বাঙলার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাসপুর থানায় এককালে মন্দির-শিল্পী অনেক সূত্রধর বাস করতেন। তাঁদের অনেকের দেওয়া মন্দির গঠনরীতির অনেক নাম আজও ঐ অঞ্চলে চলিত আছে। এর প্রতিটি নামই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। মন্দিরাংশেরও অনেক নামকরণ তাঁরা করেছিলেন। আবার কিছু কিছু নাম মন্দিরগবেষকদের দ্বারা পরে যুক্ত হয়েছে। প্রবীণ গবেষক শ্রীযুক্ত রায়ও এ ধরনের কিছু কিছু নামের উদ্ভাবক এবং

চেঁচুয়ার (মেদিনীপুর জেলা) রাধাগোবিন্দের মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ (টেরাকোটা)।

আলগোছটুঙ্গী ইত্যাদি নাম আজ যেখানে প্রায় লুপ্ত তিনি সেগুলি প্রবীণ অনেক লোক ও সূত্রধরদের মুখ থেকে শুনে তা সাধারণের কাছে প্রকাশ করেছেন। বাঙলার মন্দিরসমূহে প্রধানত তিনটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়: (১) নিজস্ব, (২) মিশ্র ও (৩) বৈদেশিক। দোচালা, চারচালা ইত্যাদি ও চাঁদনী শ্রেণীর মন্দিরগুলি হল প্রথম শ্রেণীভুক্ত। আলগোছটুঙ্গী ও বিভিন্ন রত্ন-মন্দিরগুলি হল মিশ্র শ্রেণীর। এ শ্রেণীর মন্দিরে বাঙলার নিজস্ব রীতি ও বাঙলার বাইরের যথা উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি স্থানের মন্দিরশৈলীর এক মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। বিদেশী শ্রেণীর মন্দিরগুলি হল বুদ্ধ বা উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দির টাইপের। বাঙলাদেশের মন্দিরগুলিকে এ ধরনের এক বৈজ্ঞানিকসম্মত পদ্ধতিতে যে বিভাগ শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় করেছেন, সে বিষয়ে ম্যাকাচ্চিয়নও একমত ছিলেন। এই দুই মন্দিরপ্রেমীর মধ্যে অন্তরের এক বিরাট যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। বিলেতে থাকাকালীন পল্লীর এই জ্ঞানতপস্বীকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন নি। বহু চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করেছেন তাঁরা উভয়েই। ম্যাকাচ্চিয়ন বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির দেখে অকপটে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন তাঁর প্রবীণ বন্ধু শ্রীযুক্ত রায়কে। তাঁর আর একটি পত্রের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি:

. . . . "Do-chala temples are rare in W. Bengal, commoner in East Pakistan (e.g. Bardhankuti in Rangpur, Puthia in Rajsahi, Hatikumrul and Handial in Pabna, Naldanga and Lohagara in Jessore, etc.) In W. Bengal the best are at Baranagar in Murshidabad (char bangla mandir & panchanan Shibmandir): the biggest is at Devgram in W. Dinajpur. Most of the others I have seen are very plain, like the one at Rampur, e.g. at Amadpur in Burdwan dt., Ganpur in Birbhum dt., and others I can't remember off-hand. I found the ruin of one at Sribati near Katwa in Burdwan, and only three days ago in Murshidabad dt. at Pachanpara on the road from Jangipur to Sagardighi. I was looking at another ruined one. Of course the beautiful wooden chandimandaps at Atpur, Birnagar, Sukhira, etc. are do-chala (thatched) or now tin roofed." (Date: 27th January, 1970).

উপরের উদ্ধৃতিটি থেকে বুঝতে পারা যায়, মন্দিরের আকর্ষণে কিভাবে দিকে দিকে ঘুরে বেড়িয়েছেন ডেভিড। আর এরই ফলশ্রুতি হিসেবে বিলেতে থাকাকালীন ১৯৭১-এর জুলাই-অগস্ট সংখ্যার কোয়েস্ট পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন তাঁর এক দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ Pinnacled Temples of Bengal বা বাঙলার রত্ন-মন্দির। এতে বাঙলাদেশের বহু বিচিত্র মন্দির ও তার টেরাকোটা নিয়ে তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছেন। অনেক লুপ্ত মন্দির যা আর কোনদিনই দেখতে পাওয়া যাবে না ডেভিড বেঁচে থাকলে সেগুলির আলোকচিত্র সহ বিস্তৃত বিবরণ রেখে যেতে পারতেন। এর জন্যে তিনি প্রস্তুতও হচ্ছিলেন। বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সেখানে যদিও তখন বাধা-নিষেধের গণ্ডী ছিল অনেক বেশী। তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি বাণীরূপ দিয়ে গেছেন তাঁর সুলিখিত এক দীর্ঘ প্রবন্ধে 'পূর্ব পাকিস্তানের মন্দির' শীর্ষক তাঁর

লাওদার (দাসপুরের সন্নিকট) মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ
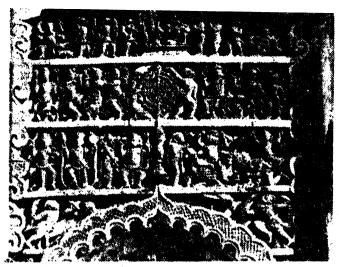
সেই প্রবন্ধটি ঢাকার ইতিহাস পরিষদের 'ইতিহাস' পত্রিকার পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ডেভিড এ প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন ইতিহাস পরিষদের পরাকীর্তি সেমিনারে ১৩৭৫ সালের পৌষ মাসে। Pinnacled Temples of Bengal বলে যে মূল্যবান নিবন্ধটি ডেভিড লণ্ডন থেকে কোয়েস্ট পত্রিকায় গত বৎসর প্রকাশ করেছিলেন সেটি প্রবীণ মন্দিরগবেষক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয়কে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন :

"To Sri Panchanan Ray without whose invaluable assistance it would not have been possible for me to see the temples of Midnapore . . . ." এর থেকে প্রমাণিত হয় বিদেশী ডেভিড এ দেশের পল্লীর এক প্রবীণ জ্ঞানতপস্বীকে কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন!

ডেভিডের হৃদয় ছিল ফুলের মতো সুন্দর আর মন ছিল শিশুর মতো সারল্যে ভরা ও অনুসন্ধিৎসায় পূর্ণ, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল গভীর ও তীক্ষ্ণ। মেদিনীপুরে শ্রীযুক্ত রায়ের সঙ্গে তখনো ডেভিডের ছিল অবাধ যাতায়াত। মন্দির দেখে মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করে পাঠাতেন শ্রীযুক্ত রায়কে নিতান্ত সহজভাবে। মেদিনীপুর শহরের কাছাকাছি কর্ণগড়ের এরূপ একটি প্রায়বিধ্বস্ত মন্দির দেখে শিশুর মতো সরল প্রশ্ন করে উঠেছিলেন, তাঁর গুরুকল্প বহুদর্শী শ্রীযুক্ত রায়কে :

"In the old Rajar Garh at Karnagarh, one of the Algochtungi temples is still standing in a ruinous condition also a char-chala and a Vishnupuri at-chala. Do you know what deities were in these temples? There is also a ruin of a large long temple, laterite, with a central domed chamber and two side chambers; there is a similar temple at Pathra: do you know what purpose these were used for, or what deity they housed?"

গত বছর (১৯৭১) বিলেত থেকে ফেরার পরই এই অক্লান্তকর্মা ব্যক্তিটি আবার বেরিয়ে পড়েছিলেন বাঙলার বাইরের মন্দিরের আকর্ষণে। মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িষ্যার মন্দিরগুলি শেষবারের মতো দেখে ফিরে এলেন কলকাতায় অতিমাত্র পরিশ্রান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের আশায়। কিন্তু এবার তিনি পেলেন চিরবিশ্রাম। ১২ জানুয়ারি বুধবার রাতে কলকাতার উডল্যাণ্ড নার্সিং হোমে শেষবারের মতো তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ঘুম আর ভাঙলো না। তাঁর আশা রয়ে গেল অপরিপূর্ণ। যে স্বপ্ন তিনি একদা দেখেছিলেন সে স্বপ্নকে বাস্তবরূপে দিতে সুদূর বিলেত থেকে ছুটে এসেছিলেন তিনি তাঁর স্বপ্নে দেখা মন্দিরের দেশ ভারতে; আর মন্দিরের আকর্ষণে কলকাতার মোহ কাটিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন কোন শহরের আনাচে-কানাচে, পল্লীর খেতপ্রান্তরে; আতিথ্যগ্রহণ করেছেন কোন পল্লীকুটিরে—আর সকলকে কাছে টেনে এনেছেন বন্ধুভাবে, এবং যাঁরাই তাঁকে সাহায্য করেছেন—তাঁদের কথা কোনদিনই ভুলতে পারেন নি তিনি। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব বেশী দিনের না হলেও লক্ষ করেছি এই সংযতবাক্ নিরভিমান ব্যক্তিটির মধ্যে এ দেশের পুরাতত্ত্ব ও মন্দিরের প্রতি তাঁর কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল! কি পরম যত্নে ভগ্ন মন্দিরের আবর্জনা ও ধূলি কিছু কিছু অপসারিত করে একটার পর একটা ছবি তুলে গেছেন তিনি। কিন্তু তিনি তাঁর আরব্ধ কাজকে শেষ করে যেতে পারলেন না, তাই রয়ে গেলেন পুরাতত্ত্বান্বেষী ও মন্দিরপ্রেমীদের মনের মণিকোঠায় বেদনাময় স্মৃতিরূপে চিরদিনের জন্যে।*

---

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চিয়ন কর্তৃক গৃহীত।

জোহান কেপলার।

চারশ বছর পরেও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস, কল্পনা এবং দর্শনবিলাসের আঙ্গিনা থেকে বাইরে নিয়ে এসে তিনিই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। অথচ ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তাঁর জীবন নিষ্ঠুর বাস্তবতার সঙ্গে এক করুণ এবং আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক। ১৯৭১ কেপলারের চার শততম জন্মজয়ন্তী।

বিশিষ্ট এই বিজ্ঞানী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানারকম বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন। তবু নিজের বিশ্বাস এবং উপলব্ধি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে কখনই তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। ...... আমাকে তুমি ক্ষমা কর, আমি উৎফুল্ল হব। যদি ক্রুদ্ধ হও, সেটা সহ্য করার ক্ষমতা আমি রাখি। কারণ দাবার দান ছাড়া হয়ে গেছে। আমার বই লেখা শেষ। এ বই এখনই কেউ পড়ুক, অথবা পরে, সে ব্যাপারে আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। সত্যিকারের পাঠকের জন্যে হয়ত এটিকে আরও এক'শ বছর অপেক্ষা করতে হবে, একজন আদর্শ দর্শকের জন্যে যেমন ঈশ্বরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে একটানা ছয় হাজার বছর।

ঠিক এমনই একটি প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রহগতি সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন জোহান কেপলার। তিনটি সূত্র। এক, প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে বেষ্টন করে উপবৃত্তীয় পথে পরিক্রমণ করে এবং ওই উপবৃত্তের একটি নাভিতে সূর্যের অবস্থান নির্দিষ্ট। দুই, সূর্য এবং কোন গ্রহের পারস্পরিক দুইটি কেন্দ্র যদি একটি কাল্পনিক রেখা দিয়ে সংযুক্ত করা হয়, দেখা যাবে ওই রেখা নির্দিষ্ট সময়ে সমান সমান ক্ষেত্রতল অতিক্রম করছে। এর অর্থ, সূর্যের কাছাকাছি এলেই গ্রহগুলির গতিবেগ বেড়ে যায়। তিন, কোন দুইটি গ্রহের সময়কালের বর্গ সূর্য থেকে তাদের গড় দূরত্বের ঘনর আনুপাতিক। উল্লেখ্য, সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে কোন গ্রহের যতটা সময় লাগে, ওই সময়কে বলা হয় গ্রহটির সময়কাল বা পিরিয়ড।

গ্রিক ভাষায় 'প্লানেট' কথাটির অর্থ পরিব্রাজক। ১৫০ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত মিশরীয় জ্যোতির্বিদ টলেমি বিশেষ এক ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। এর সাহায্যে কোন গ্রহের সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি আভাস যোগান সম্ভব হয়। কিন্তু ওই পদ্ধতির সবচাইতে বড় ত্রুটি, পৃথিবীকে এখানে স্থির কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল। ফলে টলেমির পক্ষে কোন গ্রহেরই আপাত গতিবেগ সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হয় নি।

অথচ বিস্মিত হতে হয়, টলেমিরও প্রায় চার শ বছর আগে গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যারিস্টারকাস বিশ্বাস করতেন, সূর্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু। তাকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্রের আনাগোনা। কিন্তু উত্তরকালে অ্যারিস্টারকাস-এর এই তত্ত্ব কেউই গ্রহণ করতে চান নি। সকলের বিশ্বাস, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সূর্য, নক্ষত্র এবং আর সমস্ত গ্রহ চলাফেরা করছে।

১৫৪০ সালে পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস খানিকটা পর্যবেক্ষণ এবং বেশির ভাগ অংশ গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে জানালেন, গ্রহগুলির জটিল গতি স্পষ্টভাবে বোঝান সম্ভব, যদি ধরে নেয়া যায়, তারা সকলেই ওই উজ্জ্বল নক্ষত্র অর্থাৎ সূর্যের চারপাশে ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করে।

অতঃপর কেপলারের কণ্ঠেও একই প্রতিধ্বনি। বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে তিনি গ্রহগতির সম্পর্কে সুস্পষ্ট সূত্রও ছকে ফেললেন। সেই সঙ্গে প্রমাণ করলেন, প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে যে পথে পরিক্রমণ করে চলেছে সে পথ বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তীয়।

সেটা ১৬১৮ সালের মধ্যযুগীয় ইউরোপ। মানুষের সমস্ত চিন্তা ভাবনা তখনও গির্জার চার দেওয়ালের অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন। কেপলার জানতেন, গ্রহ সম্পর্কীয় তাঁর তত্ত্ব সাধারণের কাছে তাঁকে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করবে। কারণ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গ্রহ এবং নক্ষত্র জগৎ আবর্তন করছে, পুরনো এই বিশ্বাসের মূলে তিনিও কুঠারাঘাত করেছেন। তৎকালীন ধর্মীয় অনুশাসনে যা এক জঘন্য অপরাধ। তবু গ্রহগতি তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনরকম কুণ্ঠা না রেখেই তিনি বলেছিলেন, প্রাচীন মিশরীয় পৃথিবীতে, প্রায় ছয় হাজার বৎসর আগে নক্ষত্র বিষয়ক নিয়ম কানুন সম্পর্কে যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছিল, তার যথার্থ প্রত্যক্ষদর্শীর জন্ম হল ছয় হাজার বছর পর। এবং সে দর্শক স্বয়ং তিনি। অতএব গ্রহগতি তত্ত্বের সত্যিকারের তাৎপর্য বুঝে ওঠার জন্যে পৃথিবীকে যদি আরও একশ বছর অপেক্ষা করতে হয়, তাতে তিনি মোটেই অবাক হবেন না।

কেপলার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জ্যোতির্বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনিই প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যাবলী জানার ব্যাপারে পদার্থ বিজ্ঞানকে কাজে লাগান। জানুয়ারি ১৭, কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে কেপলারের চার শ' তম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন আমাদের জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। উদ্বোধনী ভাষণে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির কলকাতার কনসাল জেনারেল ডঃ এইচ এফ লিনংলার বলেন জ্যোতিষীর রাজ্য থেকে কেপলার জ্যোতির্বিজ্ঞানের উত্থান ঘটান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিড়লা শিল্প এবং প্রযুক্তি বিষয়ক সংরক্ষণশালার পরিচালক শ্রীঅমলেন্দু বসু, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের কিউরেটর শ্রী আর সুব্রাহ্মনিয়াম, প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী ডঃ জি স্বরূপ, এবং কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনের পরিচালক ডঃ জে ইউ ওহলাউ। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা কনসাল জেনারেল ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি, এবং কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবন, বিড়লা শিল্প এবং প্রযুক্তি সংরক্ষণশালা এবং বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম।

সত্যকে উপলব্ধি করতে গিয়ে যে সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে, তারও তুলনা নেই। পারিবারিক অশান্তি, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী। খুব কম বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। ফলে দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্র দেখার সৌভাগ্য থেকে তিনি আংশিক বঞ্চিত হন। কিন্তু তাঁর চূড়ান্ত সাফল্যের মূলে ছিল, জ্যামিতি এবং পরিসংখ্যান বিদ্যায় উপর অভূতপূর্ব পারদর্শিতা। ওই সঙ্গে বহুবার যে কোন কাজে বিফল মনোরথ হয়েও শেষ পর্যন্ত তা থেকে বিরত না হওয়ার মত অস্বাভাবিক ধৈর্য। এর জন্যে তাঁকে নানাভাবে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে। প্রতিপক্ষের তীব্র সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে।

জন্ম ডিসেম্বর ২৭, ১৫৭১ (দ্রঃ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা)। জার্মানির ভুর্টেমবার্গের ভেইল-এ। বাবার বংশ পরিচয় খুব একটা খারাপ না হলেও, মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন কুঁড়ে প্রকৃতির এবং অনির্ভরযোগ্য। প্রথম জীবনে তাঁকে কাজ করতে হয় ভুর্টেমবার্গের ডিউকের সেনা বিভাগের একজন সামান্য অফিসার হিসেবে। মা অত্যন্ত সাদাসিধে। কিন্তু খিটখিটে স্বভাবের। তিনি প্রায় সব সময়ই খাপ্পা হয়ে থাকতেন। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় মাস দুই আগেই জোহানের জন্ম হয়। ফলে ছোট বয়স থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না। ওই সময় বাবা গেলেন ডাচ যুদ্ধে। মা তাঁর অনুগমন করলেন। ছোট ভাই হায়েনরিশের হাত ধরে তাঁকে উঠে আসতে হল ঠাকুর্দার বাড়ি। কিন্তু সেখানেও বছর চার তাঁর যেতে না যেতেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর অবস্থা দাঁড়াল অন্ধের মত। নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে চোখ দুটি রক্ষা পেলেও তার জের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে টানতে হয়েছে।

প্রথম পাঠ ভেইল-এরই একটি স্কুলে। কিন্তু যখন তাঁর বয়স নয় বছর, জনৈক খাতক তাঁর বাবার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ জানাল। ভদ্রলোক তাঁর কোন এক বন্ধুর ব্যাপারে জামিন ছিলেন। বন্ধুটি শেষ পর্যন্ত ঋণ শোধ করতে না পারায় নিজের পকেট থেকেই সে দেনা তাঁকে শোধ করতে হয়। ফলে সংসারে নেমে এল প্রচণ্ড দারিদ্র্য। স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে কেপলার কাজ নিলেন তাঁর বাবার পানশালায় গেলাস বোতল ধোয়া পোছার সাহায্য করতে। আর এই ভাবেই শুরু হল ভবিষ্যতের বিশ্বখ্যাত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জীবন।

তিন বছর পর আবার নতুন করে কেপলার শুরু করলেন তাঁর পড়াশুনোর কাজ। ১৫৮৪ এবং ১৫৮৬ সালে তিনি আদেলবর্গ এবং মাউলব্রুন-এর কনভেন্টে ভর্তি হন। সেপ্টেম্বর ১৫৮৮ সালে স্নাতক উপাধি লাভ। পরের বছর তিনি উচ্চতর পাঠ গ্রহণের জন্যে আসেন টুবিনগেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এখানেই আগস্ট, ১৫৯১ সালে অবশেষে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ। তিনি আশা করেছিলেন, ছাত্র জীবনের বড় রকমের সাফল্য হয়ত তাঁকে সরকারী মন্ত্রণালয়ে বড় রকমের চাকরি যোগাতে সাহায্য করবে। কিন্তু বস্তুতে সে আশা ব্যর্থ হল। কারণ পৃথিবী তখন মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের শাসনে। একজন সাধারণ সৈনিকের ছেলে, তাঁর কোন হাঁকডাক করবার মত বংশ মর্যাদা নেই, তাঁর পক্ষে এই ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাতুলতা মাত্র।

সৌভাগ্যবশত টুবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করার সময় কেপলারের প্রতিভা একজনের দৃষ্টি কিন্তু এড়িয়ে যায়নি। তিনি মাইকেল মিস্টলিন। মিস্টলিন তখন টুবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা অধ্যাপক। উঁচু মহলে তাঁর নাম ডাকও যথেষ্ট। এই সময়ে কোপার্নিকাসের একটি সংকলন গ্রন্থ গ্রহ এবং নক্ষত্র সম্পর্কে কেপলারকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে

তোলে। মিস্টলিন নিজেও কোপারনিকাসের সৌরমণ্ডল সম্পর্কীয় তত্ত্বের উপর তখন অগাধ বিশ্বাসী। কেপলার কল্পনাশক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এবং অবশেষে তাঁরই চেষ্টায় ১৫৯৪ সালে তিনি গ্রাজ-এ গণিতের অধ্যাপক পদ লাভে সমর্থ হন। অবশ্য এই পদ গ্রহণ করার মূলে ছিল তাঁর অর্থনৈতিক দূরবস্থা। কারণ ওই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অমন কোন পদ টাকা পয়সা বা সম্মানের দিক দিয়ে তেমন কিছু আহামরি করার মত ছিল না। তবু অবস্থা যখন অচল, তখন যা কিছু হাতের কাছে মেলে, তাই ভাল।

১৫৯৭ সালে বিয়ে করলেন কেপলার। প্রথমে প্রেম, পরে পরিণয়। এই ভদ্রমহিলার এর আগেও আরও দু-বার বিয়ে হয়েছিল। কেপলার পরিণয়সূত্রে বেশ বড় রকমের সম্পত্তি পেলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত বিয়েটি তেমন সুখের হয় নি।

গ্রাজ-এ অধ্যাপনা করার সময় কেপলার সৌরমণ্ডলে বিভিন্ন গ্রহের পর্যায়ক্রমিক অবস্থান নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। উল্লেখ্য, এই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মাত্র ছয়টি গ্রহের কথাই জানতেন। এই ছয়টি গ্রহ যথাক্রমে, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। কেপলার জানতেন, সূর্য থেকে বুধের যা দূরত্ব, শুক্রের দূরত্ব সে তুলনায় আরও বেশি। এমনি করে পরপর গ্রহগুলির দূরত্ব বেড়ে গেছে। এবং যে-কোন গ্রহের দূরত্ব সূর্য থেকে যত বেড়ে যায়, তার গতিবেগও তুলনায় কমে আসে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সৌরমণ্ডলের প্রতিটি গ্রহ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে সজ্জিত রয়েছে। জ্যামিতির উপর অভূতপূর্ব দক্ষতা তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু সমাধান বের করতে সহায়তা করে।

তিনি বললেন, ছয়টি গ্রহের মধ্যে আছে পাঁচটি শূন্যস্থান। এই পাঁচটি শূন্যস্থান তাঁর মনে পাঁচটি সিমেট্রিকাল বা প্রতি-সম নিরেট বস্তুর ছবি মেলে ধরল। এদের প্রথমটির চারটে তল, দ্বিতীয়টির তল ছয়টি, তৃতীয়টির আটটি, চতুর্থটির বারোটি এবং পঞ্চমটির কুড়িটি তল। এবার গ্রহগুলিকে এইভাবে সাজান যাক। ধরা যাক, পৃথিবীর পরিক্রমণ পথটিকে নিয়ে একটি গোলক আঁকা গেল। এই গোলকের চারপাশে তিনি একটি বারোটি সমান তলের নিরেট বস্তু কল্পনা করলেন। এই বস্তুটির চারপাশে আঁকা হল আর একটি গোলক। তিনি বললেন, এই গোলকটির উপর অবস্থান করবে মঙ্গল গ্রহের সঞ্চারপথ। এবার মঙ্গলের সঞ্চারপথ ওয়ালা এই গোলকের চারপাশে আঁকলেন একটি চতুস্তলক। এই চতুস্তলের চারপাশে আঁকলেন বৃহত্তর আরও একটি গোলক। এই গোলকই বৃহস্পতির সঞ্চারপথ। শেষোক্ত গোলকটির চারপাশে আঁকা হল ছয়টি সমতল বিশিষ্ট ঘনক-এবং ওই ঘনকের চারপাশে আরও একটি গোলক। এই গোলক শনির সঞ্চারপথ। তারপর পৃথিবীর সঞ্চারপথবাকহী গোলকের মধ্যে তিনি আঁকলেন কুড়িটি সমতলের একটি নিরেট বস্তু। ওই বস্তুর মধ্যে একটি গোলক। এই গোলক শুক্র গ্রহের সঞ্চার-পথের ধারক। তার ভেতরে ধরা গেল একটি অষ্টতলক। অষ্টতলকের মধ্যে আরও একটি গোলক। এই গোলকের ওপর দিয়ে গেছে বুধের সঞ্চারপথ।

গ্রহদের সঞ্চারপথ দেখানর ব্যাপারে এ এক জটিল পদ্ধতি। এর জন্যে কেপলারকে প্রচণ্ড পরিশ্রমও করতে হয়েছিল। তবু গ্রহদের সঞ্চারপথ সম্পর্কিত তাঁর প্রকল্প প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, এই আবিষ্কার আমাকে যে কী দারুণ আনন্দ দিয়েছে, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে কঠিন। অনেকটা সময় আমাকে নষ্ট করতে হয়েছে। তার জন্যে কোন দুঃখ নেই। পরিশ্রম আমাকে ক্লান্ত করতে পারে নি। গ্রহগুলির সঞ্চারপথ সম্পর্কে কোপারনিকাস যা বলে গেছেন, নিজের প্রকল্প তার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় কী না, সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পরিশ্রম করেছি, উত্তেজনা এবং অফুরন্ত আগ্রহ নিয়ে। শুধু জানতে, আমার চিন্তা কতখানি খাঁটি, না তার সবটাই শুধু ফাঁকা আওয়াজ।'

১৫৯৬ সালে প্রকাশিত হল 'মিস্টেরিয়াম কসমোগ্রাফিকাস।' কেপলার তাঁর এই গ্রন্থে নিজের তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক রীতিমত উত্তেজনা। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রাজের এমন একজন মানুষের চোখে নিমেষে ধরা পড়লেন, যিনি তাঁর জীবনের মোড়টাই দিলেন ঘুরিয়ে। মানুষটি প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাইকো ব্রাহে। উল্লেখ্য, ডেনিস জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রাহে তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন রাতের পর রাত শুধু গ্রহ-নক্ষত্র জগতের দৈনন্দিন অবস্থান এবং গতিপ্রকৃতি বের করার কাজে। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে আকাশে যে নতুন জ্যোতিষ্কটি এখন দেখা যায়, ১৫৭২ সালে ব্রাহেই প্রমাণ করেন, সেটি একটি নক্ষত্র। তিনিই পুরনো একটি ধারণা সর্বপ্রথম ভেঙে দিয়ে প্রমাণ করেন ১৫৭৭ সালে আকাশের বুকে যে ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল, তার জন্ম পৃথিবীতে নয়, মহাকাশে বিচরণরত সেটি একটি ভিন্নতর সামগ্রী।

ব্রাহে কেপলারকে প্রাগে আসার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর ইচ্ছে, গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে যে সমস্ত নথিপত্র তিনি সংগ্রহ করেছেন, কেপলার সেগুলির উপর গবেষণা চালান। ব্রাহের পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা ছিল অভূতপূর্ব। কিন্তু গণিত শাস্ত্রে দক্ষতা কম। ওদিকে কেপলারের দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হওয়ায় গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে তিনি প্রায় অকেজোই বলা চলে। তবে তাঁর গণিতের উপর প্রচণ্ড দখল। ব্রাহে বুঝেছিলেন, তাঁর পর্যবেক্ষণ লব্ধ ফলাফল কেপলারের গণনায় বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। তিনি কোপার-নিকাসকে অনুসরণ করেন নি। এবং এর জন্যেই কেপালারকে তিনি উপদেশ দেন, 'ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মকানুন সম্পর্কে অহেতুক অবান্তর কোন নীতি তৈরির দিকে চেষ্টা করো না। বরং বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটা শক্ত ভূমি তৈরি কর। তার ওপর ভিত্তি করেই জাগতিক কার্যকারণের মূল সূত্র বের করার চেষ্টা করবে।'

কেপলার ব্রাহের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর যাবতীয় নথিপত্র খুঁটিয়ে পড়লেন। এবং শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন গ্রহদের সঞ্চারপথ সম্পর্কে যে তত্ত্ব তিনি খাড়া করেছেন, সেটা অসাড়। ব্রাহেও তাঁর ব্যবহারে খুশি হলেন। অবশেষে ধর্মীয় গোলযোগে গ্রাজে অধ্যাপনা চালান যখন শক্ত হয়ে দাঁড়াল, কারণ কেপলার নিজে ছিলেন একজন প্রোটেস্টান্ট। ১৬০১ সালে তিনি চলে এলেন প্রাগে। সেখানে সম্রাট রুডলফ-২-এর তিনি রাজকীয় গণিতবিদ-এর পদ পেলেন। কাজ—প্রধান গণিতবিদ

তাইকো ব্রাহেকে সাহায্য করা। এর কিছুকাল পর ব্রাহে পরলোকে গমন করেন। তাঁর পদে বৃত হলেন কোপারনিকাস। তবে ব্রাহের চেয়ে কম বেতনে। কখনও কখনও সেই বেতনও বাকী পড়তে লাগল। শুরু হল অর্থনৈতিক দুরবস্থা।

উপর নির্ভর করে একটি বিরাট গ্রহ সংক্রান্ত তালিকা তৈরির ভার দেন কেপলারের ওপর। সম্রাট রুডলফের সম্মানে যার নাম রাখা হয়েছে রডলফিয়ান টেবল।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল পারালিপোমেনা ইন ভাইটেল্লিওনেম। এই [illegible] লেন্স ব্যবহার সংক্রান্ত [illegible]।

বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি এবং সমীকরণের তত্ত্বের চল শুরু হওয়ায় এই সময় জ্যামিতির উপর কাজকর্মে অনেকটা ভাটা পড়ে যায়। কেপলার সেই ভাটার বুকে জোয়ার আনতে প্রয়াসী হন। 'পারালিপোমেনার চতুর্থ পরিচ্ছেদে পৃথিবীর গণিত জগতে তিনিই সর্বপ্রথম এক নতুন ধরনের গাণিতিক সূত্রের সংযোজন ঘটালেন। যার নাম 'প্রিন্সিপল

অব কনটিনিউইটি।

ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক অবস্থা ক্রমেই ঘোরাল হতে শুরু করেছে। মাইনে প্রায় সব সময় বকেয়ার উপর চলতে লাগল। সংসার চালান শক্ত। ওদিকে স্ত্রীর তখন ফিটের ব্যামো। ১৬১২ সালে এল পর পর দুর্ঘটনা। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী রাজা রুডলফ মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেতন বন্ধ হল। অল্পদিনের মধ্যে ছেলেমেয়েরা রোগে আক্রান্ত হল। একজন বসন্ত রোগে গেল মারা। এর কিছুদিন পর স্ত্রীও পরলোকে গমন করলেন। এমন নিদারুণ যখন অবস্থা, ডাক এল ইউনিভার্সিটি অভ লিনজ থেকে। ওঁরা ওকে অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত করেছেন। দ্বিধা না করে অবশিষ্ট দুই সন্তানের হাত ধরে কেপলার নতুন কাজে যোগ দিলেন। পেছনে পড়ে রইল বকেয়া মাইনে ৮০০০ মার্ক। অবশ্য অধ্যাপনার কাজেও রোজগার কম। তাই জীবিকা-নির্বাহের জন্যে তাঁকে জ্যোতিষির কাজও করতে হয়। এই সময় তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন।

কেউ কেউ বলেন, এবারকার বিয়ের ব্যাপারে কেপলার নাকি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি কনে দেখেছিলেন মোট তেরজন। তাঁদের প্রত্যেকের আঙুলের ডগা পরীক্ষা করে জ্যোতিষী মতে যাঁকে তিনি মনোনীতা হিসেবে গ্রহণ করেন, অবস্থায় তিনিই ছিলেন সব চাইতে বেশি দরিদ্র এবং বাপ-মা মরা মেয়ে। তবে এবারকার বিয়ে আগের চেয়ে সুখের হয়েছিল।

অদ্ভুত ব্যতিক্রম। এত বাস্তব বিশ্বাসী হয়েও প্রাচীনকালের আর সমস্ত জ্যোতি-বিজ্ঞানীর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন দিগন্ত বিস্তৃত মহাকাশে নিরত যে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র বিচরণ করে চলেছে, কালের বিধানে তার সঙ্গে মানুষের ভাগ্য যেন জড়িত। যদিও, তাঁর জ্যোতিষী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক বিজ্ঞানী বলেছেন, সাধারণের ভাগ্য নিরূপণ করতে গিয়ে যেসব কথা তিনি বলতেন, আজকের দিনে হলে তার জন্যে তাঁকে হয়ত জেলে যেতে হত।

একথা স্বতন্ত্র। কেপলার যে কারণে আজ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সেটা মুখ্যত তাঁর গ্রহগতি তত্ত্ব। তাইকো ব্রাহের তালিকার মধ্যে তিনি পান তাদের বাস্তব অস্তিত্ব। এর আগে অনেকেই মনে করতেন, এমনকি কোপারনিকাসও—যে, গ্রহগুলি পরস্পর বৃত্তীয় পথে পরিক্রমণ করে। কিন্তু ব্রাহের তালিকার সূত্র ধরে গণিতের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করলেন, না, বৃত্ত নয়, প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে এক একটি উপবৃত্তীয় পথে আবর্তন রছে এবং ওই উপবৃত্তের একটি নাভিতে অবস্থান করছে সূর্য। তিনি দেখালেন, সূর্য এবং কোন গ্রহের কেন্দ্রকে যদি একটি সরল রেখা দিয়ে যোগ করা যায় তাহলে ওই রেখা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রতল অতিক্রম করবে। মনে করুন, সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তীয় পথে যে কোন একটি গ্রহ—ধরুন মঙ্গল নির্দিষ্ট সময় অন্তর যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি জায়গায় অবস্থান করে। চ এবং ছ যথাক্রমে শীর্ষবিন্দু। সূর্য (স) উপবৃত্তের নাভিতে অবস্থান করছে। তাহলে কেপলারের সূত্র অনুসারে চ স ক, ক স খ, খ স গ, গ স ঘ, এদের ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান হবে।

তৃতীয় সূত্রও তিনি প্রমাণ করলেন এই ভাবে :

মনে করুন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব =১ একক এবং মঙ্গলের দূরত্ব=১·৫২৩৭ একক। পৃথিবীর সময়কাল=১ বছর অর্থাৎ পৃথিবী উপবৃত্তীয় পথে সূর্যকে এক বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। অতএব কেপলারের তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা পাই :

$$\frac{(\text{মঙ্গলের সময়কাল})^{\text{২}}}{(\text{মঙ্গলের দূরত্ব})^{\text{৩}}} = \frac{(\text{পৃথিবীর সময়কাল})^{\text{২}}}{(\text{পৃথিবীর দূরত্ব})^{\text{৩}}}$$

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{(\text{মঙ্গলের সময়কাল})^{\text{২}}}{(\text{১·৫২৩৭})^{\text{৩}}} = \frac{\text{১}^{\text{২}}}{\text{১}^{\text{৩}}}$$

$$\text{অতএব, মঙ্গলের সময়কাল} = \sqrt{(\text{১·৫২৩৭})^{\text{৩}}} = \text{১·৮৮০৪ বছর।}$$

পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, মঙ্গল সত্যি সত্যিই ১·৮৮০৪ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। আর সমস্ত গ্রহের ব্যাপারেও এই সূত্রটি সত্য। এবং এইভাবেই কেপলার
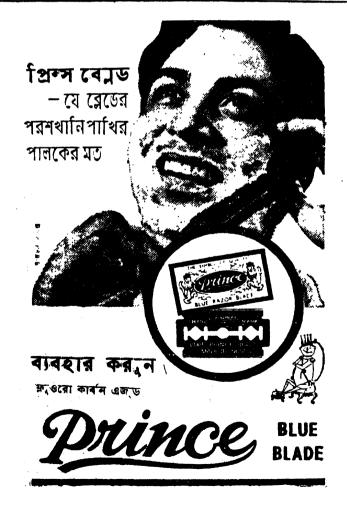
নক্ষত্র এবং গ্রহবিষয়ক বিজ্ঞানকে যুক্তি এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণের আঙ্গিক সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন।

বস্তুত, নিছক কল্পনা এবং দর্শন বিলাসের আঙিনা থেকে কেপলার জ্যোতির্বিজ্ঞানকে দাঁড় করান ভৌত বিজ্ঞানে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তের গণ্ডির মধ্যে। যা উত্তরকালে গ্যালিলিওর তত্ত্ব এবং নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্ব বিশ্লেষণে দারুণভাবে সাহায্য করেছিল। এমন কি, আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানেও কৃত্রিম উপগ্রহ অথবা মহাকাশযানের সঞ্চারপথ নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারেও কেপলারের গ্রহগতি তত্ত্ব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

মৃত্যু, নভেম্বর, ১৬৩০। ভগ্নস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা এবং হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে। পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়েছিলেন কেপলার প্রাগে। টাকা পান নি। সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিলেন জ্বর। এবং এই জ্বরই তাঁর নিয়তির মত কাজ করল। তিনি পরলোকে গমন করলেন রেমানবার্গে। সে লোকান্তর আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দ্বারোদ্ঘাটন।

সমরজিৎ কর

মোরগ (লিনোকাট) —প্রণব মজুমদার

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ সম্প্রতি কলেজ ভবনে তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ছবি ও ভাস্কর্য সমেত প্রদর্শনীতে ৩৪৭টি নিদর্শক দেখা যায়। সকলেই নানা রীতিতে কাজ করেছেন, কয়েকজনের রচনায় পরীক্ষা-প্রবণতাও চোখে পড়ে। নিদর্শনগুলি দেখে মনে হয় যে অনেকেই প্রথাগত অংকন-রীতিটুকু ভালভাবে আয়ত্ত করেছেন ও স্বাধীনভাবে সমকালীন রীতিতে ছবি এঁকেছেন। কয়েকজনের রচনায় পরিচিত শিল্পীবিশেষের প্রভাব ধরা পড়ে। দু-একটি স্কেচও মন্দ লাগেনি। কমার্সিয়াল বিভাগে নতুন পরিকল্পনা ও চিন্তাধারার পরিচয় মেলে কয়েকটি নিদর্শনে, বিশেষ উল্লেখ্য কাজও চোখে পড়ে। ভাস্কর্য বিভাগে কয়েকটি প্রতিকৃতির দর্শন মেলে, কম্পোজিশনের সংখ্যা বিরল। তবুও প্রদর্শনীটি পরিক্রমা করলে বোঝা যায় যে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ নানা অব্যবস্থা ও অসুবিধার মধ্যেও পরম নিষ্ঠা-ভরে কাজ করছেন। শিশির ভট্টাচার্য, গৌতম চৌধুরী, প্রণব মজুমদার ও অরুণ পালের ছবিগুলি প্রথমেই চোখে পড়ে যায়। প্রথমজন সবুজ ও ইণ্ডিয়ান রেড প্রধান পিরামিডভিত্তিক রচনাটিতে সুন্দর কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন (বিউটি ডেডিকেটেড)। লাল রঙের সুকৌশল ব্যবহারের জন্য দ্বিতীয়জনের দি বার্ড দ্রষ্টব্য। তৃতীয়-জনের রচনাটি শ্লেষাত্মক, পরিকল্পনার জন্য প্রশংসনীয়। সমাজের ভণ্ডজাতীয় অবাঞ্ছিত লোকের যথার্থ রূপ শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন নামাবলী ও মুরগীর মাংসের প্রতীকের মধ্য দিয়ে (মাস্ক)। চতুর্থজনের রঙ ব্যবহার কৌশল দেখা যায় পিপ ইনটু দি লাইট-এ। অপূর্ব কৌশলে এই ছাত্রটি কেবল রঙের মাধ্যমে কোলাজ তথা ত্রিআয়তনিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। জলরঙের কয়েকটি স্কেচ মন্দ লাগেনি। এই প্রসঙ্গে প্রণব মজুমদারের উওম্যান মার্কেট, নীতা সরকারের জওহরলাল নেহরু রোড, তরুণ প্রধানের আলোকস্নাত পল্লী-কুটীর ও পূর্ণিমা দেবের হীডেন গার্ডেন-এর নাম করা চলে। প্রদর্শনীতে গ্রাফিকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখা যায়। এই বিভাগে প্রণব মজুমদারের মোরগ (লিনোকাট), রীতা নন্দীর এচিং, মিনতি
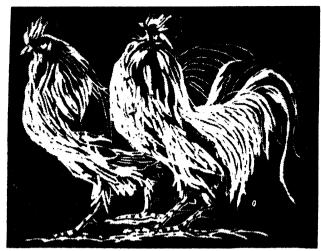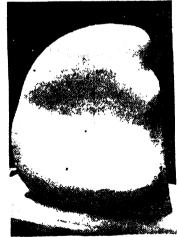
সাবিং (পোড়ামাটি) —অলোক সেন

রায়ের ইনটাকিও ও বিশেষ করে প্রতিমা সম্পাতের গার্জী (লিনোকাট) উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ছবির মধ্যে গভীর রঙের স্তরভেদ প্রণালীর জন্য ইজেল কর্নার (পার্থনাশ শিকদার), ফ্লাওয়ার স্টাডি-২ (রমা সেন), দি বিউটি বাথ (নন্দিতা রায়)-এর নাম করা চলে। কমার্সিয়াল বিভাগে বই ও পত্রিকার প্রচ্ছদপট, বিজ্ঞাপন, প্রাচীরপত্র, রেকর্ড কভার, ক্যালেণ্ডার নিদর্শন চোখে পড়ে। এগুলি দেখে বোঝা যায় যে, সকলেই আধুনিক রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছেন ও সেই সঙ্গে নানা জাতীয় কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি প্রাচীরপত্র ভাল লাগল—বিশেষ কার বক্তব্য প্রকাশ করার সার্থক প্রচেষ্টা দেখে। যেমন, নৃত্য প্রতিযোগিতার জন্য প্রতীকমূলক ঘুঙুর জড়ানো দুটি পা (সুকুমার পাল), জেব্রা (কোলাজ, চাঁড়য়া-খানা, সমীর সিংহ রায়), বৃত্তপ্রধান রচনা ফিল্ম ফেস্টিভাল (প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত) ও এয়ার ট্রিকটিস্ (দিলীপ দাস)। রেকর্ড কভারের মধ্যে সুজিত দস্তিদারের ফোক মিউজিক ও বিশেষভাবে পপ মিউজিক উল্লেখ্য। ক্যালেণ্ডারের মধ্যে ১৯৯ (সুজিত দস্তিদার) ও টাটা টেক্সটাইল (দিলীপ সাহা)-এর নাম করা চলে। ভাস্কর্য বিভাগে পোড়ামাটি, প্লাস্টার অব প্যারিস ও সিমেন্টের কাজ

দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য দু-একটি নিদর্শন চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই অলোক সেনের সবিং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি মাটির স্তূপ থেকে শিল্পী সুন্দর একটি ইঙ্গিতপ্রধান ছন্দের সৃষ্টি করেছেন। জিতেন রায়ের মিউজিসিয়ানে (সিমেন্ট) ধনরাজ ভগতের কিছু প্রভাব দেখা গেলেও প্রয়াস হিসাবে সার্থক। অনিল সেনের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড (সিমেন্ট) সমকালীন রীতির নমুনা হিসাবে উল্লেখ্য। প্রতিকৃতির মধ্যে ১১১ (জিতেন রায়) মন্দ লাগে নি।

✻

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস পরিচালিত স্টুডিওতে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকা শেখে, কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি তাদের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। আঁকার বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধ তথা তাদের মনের ওপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া। বলা বাহুল্য, এক হিসাবে সমকালীন হলেও বিষয়বস্তুটি, বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে জটিল। কারণ, যুদ্ধের ভয়াবহ, বীভৎস রূপের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেকেরই নেই। সুতরাং ছেলেমেয়েরা যা এঁকেছে সব কল্পনাপ্রসূত বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিলিপি মাত্র। প্রদর্শনীতে ৫২ জন শিক্ষার্থীশিল্পীর মোট ৮৬টি অঙ্কন নিদর্শন দেখা যায়। সকলেই প্যাস্টেল বা জলরঙে বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যখন নেই তখন যে তারা কল্পনার সুতো দিয়ে নানা জাল সৃষ্টি করবে তা স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই। অনেকেই কাগজের ওপর মাত্র কয়েকটি হিজিবিজি জাতীয় রেখা এঁকেই মনোভাব প্রকাশ করেছে এবং দু-একজনের এই শ্রেণীর নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে, তারা অন্তত কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখা এঁকেই কাগজ ভরে ফেলেছে। জলরঙে আঁকা কয়েকটি ছবি অবশ্য চোখে পড়ে, কারণ সেগুলি বিষয়বস্তু অবলম্বনেই রচিত। ট্যাংক, কামান, জাহাজ, ফাইটার জাতীয় প্লেন এঁকে অনেকেই যুদ্ধের পরিবেশ বোঝাবার চেষ্টা করেছে। আবার অনেকে বাংলাদেশের অসহায় শরণার্থীদের দুঃখদুর্দশাও বর্ণনা করেছে। প্রথম শ্রেণীর ছবি যারা এঁকেছে তাদের মধ্যে প্রথমেই অতনু দে (বয়স ১১) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণে রাত্রির আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে গেছে, শত্রুপক্ষের বোমারু প্লেনের ঝাঁককে মিত্রপক্ষের ট্যাংক ও অ্যাক-অ্যাক বন্দুকে যোগে বিনাশ করা হচ্ছে বা শত্রুপক্ষের বর্বর সৈন্যদল নৃশংসভাবে নির্দোষ অসহায় গ্রামবাসীদের হত্যা করছে, এগুলি বালক শিল্পী কৃতিত্বের সঙ্গে রূপায়িত করেছে (৩০, ৩১, ৩৪)। রঙ ব্যবহারের দিক থেকে শালিনী খান্নার ছবিটিও অনেকের চোখে পড়ে (৪৭)। এই প্রসঙ্গে সৌমিত্র রায়চৌধুরীর জাহাজ রচনাটিরও নাম করা যায়। প্যাস্টেলের সুকৌশল ব্যবহারের জন্য জগজিৎ সিং-এর লাল রঙ প্রধান ৮২ নং ছবিটি উল্লেখ্য। অন্যান্য ছবির মধ্যে দীপা ঘোষের শরণার্থী মা ও শিশু অনেকের ভাল লাগে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন সে কথা সকলেই স্বীকার করেন। তবে প্রদর্শনীর আয়োজন উপলক্ষে ছবি নির্বাচন ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ অধিকতর সচেতন হতে পারতেন, কারণ, বলতে বাধা নেই, বহু ছবিই বাদ দেওয়া যেত।

✻

অবন মহল-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অবন মহল কর্তৃপক্ষ দু' সপ্তাহব্যাপী আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। মুখ্যতঃ ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হলেও বয়স্ক ও রসিক জনসাধারণও যে এই আনন্দ পরিবেশনে মুগ্ধ হয়েছেন তা প্রতিদিনই বিরাট জনসমাবেশ দেখে বোঝা যায়। দুটি সঙ্গীত নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়া এই উপলক্ষে ছেলেমেয়েদের একটি চিত্রপ্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীতে আট থেকে ১৬ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের আঁকা ৩৭৫টি ছবি দেখা যায়, সেই সঙ্গে বহু কারিগরী ও হস্তশিল্প নিদর্শনও চোখে পড়ে। এবারের প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, বহু বিদেশী ছেলেমেয়ের ছবিও দেখা যায়।

ক্যাট —ওয়াল্টরাউট বারনার (পূর্ব জার্মানী)

প্রথমেই বলা প্রয়োজন মনে করি যে, প্রদর্শনীটির মান উচ্চ। প্রায় প্রত্যেকটি ছবিই সুনির্বাচিত। বাস্তবিকই এত ভাল ছবি ছিল যে, বিচার করাও অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। জলরঙ, প্যাস্টেল ও কালিকলমে সকলে কাজ করেছে। বলতে বাধা নেই, ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে অনেকে ছবি আঁকলেও কয়েকজন নিসর্গ দৃশ্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ছোটদের বিভাগে ওয়াল্টরাউট বারনার (পূর্ব জার্মানী)-এর ক্যাট প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে নূপুর ভট্টাচার্য (জলরঙ), সুদীপ্ত দাস (কালি-কলম), পার্থ পাল (জলরঙ), নিলাদ্রি ঘোষ (প্যাস্টেল), অনুরাধা চ্যাটার্জী (স্টিল লাইফ), কৃষ্ণশ্রী বসু (জলরঙ)-এর নাম করা যায়। বড়দের বিভাগে অনেকেই ড্রয়িং ও রঙ ব্যবহারে নিজস্ব পরিকল্পনা ও চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছে। প্যাস্টেলের কাজ হিসাবে রাওয়াল উস্মা ও বিনোদ চন্দ্রর দুটি ছবির নাম করা যায়। এ বিভাগে অন্য যাদের ছবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের মধ্যে জগেশ কারিরা (সিটিস্কেপ), নীলাঞ্জন বসু (ড্রয়িং ও রঙচাতুর্য), তাপস রায়চৌধুরী (নিসর্গ দৃশ্য), মঞ্জুলা হরলালকা, দেবকী বসু (ভারতীয় রীতি) ও জয়ন্তী পাঠক (জলরঙ)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে শর্মিলা বসুর ফিটিংয়েরও নাম করা যায়।

❋

'বসে আঁকো' শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

অন্যান্য বৎসরের মত এবারেও সাধারণতন্ত্র দিবস ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৭২ সুভাষ উদ্যান (নর্দার্ন পার্ক) ভবানীপুর কলকাতায় ২২ পল্লী সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে চতুর্থ বার্ষিক সারা বাংলা বসে আঁকো শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিশু বিদ্যালয়গুলি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুল ছাত্রছাত্রীর এই প্রতিযোগিতায়

যোগদানের সুযোগ থাকে এবং এই বছর প্রায় ১৪০০ প্রতিযোগী অংশ নেয়।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীহীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রথমে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন সংস্থা, সংবাদপত্র এবং স্থানীয় জনসাধারণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। প্রধান অতিথি প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী সুন্দর একটি ছোট ভাষণে শিশুদের এক-একটি রঙিন ছবির সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, প্রতি মুহূর্তে তাদের রূপ বদলায়, রঙ বদলায়। যশস্বী চিত্রশিল্পী এবং সাংবাদিক শ্রীডেসমণ্ড ডইগ সভাপতির ভাষণে বলেন যে, তাঁর কাছেও শিশুদের এক-একটি রঙিন ছবি বলে মনে হয়।

এর পর প্রতিযোগিতায় আঁকার বিষয়বস্তু ঘোষণা করা হয়। শিশুদের 'যা খুশী আঁকো' আঁকতে বলা হয়। বালক ও কিশোরদের জন্য দুটি বিষয়ের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে আঁকতে বলা হয়। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়' অথবা যা খুশী আঁকা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে শ্রীদেবনারায়ণ দত্ত, শ্রীউমানাথ নাথ ও শ্রীপশুপতিনাথ লাহার নাম উল্লেখযোগ্য।

চিত্রপ্রিয়

ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ঘরানা

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

শীতের রোদ্দুরে বসে আমরা যখন বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' পড়ি, কিংবা জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা', তখন সে লেখা আমাদের দেশের নিজস্ব জলমাটি আর গাছপালার মতই সহজভাবে আমাদের ভাল লাগে, তাকে আমরা বিদেশ থেকে আমদানিকরা কোন মাপকাঠি দিয়ে বিচার করি না। বিভূতিবাবু শুধু যে ভাল লেখক ছিলেন তাই নয়, তাঁর সাহিত্যে তিনি একটা জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন, সেটা আমাদের মনোলোকের খুব কাছাকাছি। তাঁর ভাল লেখাগুলো বিশ্বসাহিত্য নামক কোন সার্বজনীন বস্তুর নিছক বাঙালী নমুনা নয়, খুব উৎকৃষ্ট খাঁটি বাংলা সাহিত্য বলেই তা সর্বজনের আদরণীয়। কতকটা এই একই কথা আধুনিক বাংলাসাহিত্যের যে কোন ভাল সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে খাটে। সাহিত্যের রাজ্যে আমরা এখন এমন একটা ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছি যার ফলে ভালমন্দ বিচারের ব্যাপারে আর আমরা অন্যের মুখাপেক্ষী নই, আমাদের আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। একশ বছর আগেও এই আত্মবিশ্বাস ছিল না। তখন আমরা মাইকেলকে বাংলার হোমার, বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার স্কট এবং হেম বাড়ুজ্যেকে বাংলার লংফেলো বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার স্কট বলে এখন আর আমরা আনন্দ পাই না, তার একটা কারণ স্কট এখন আর আমরা পড়ি না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পড়ি। তবু এই দুর্বল প্রতি-তুলনার স্মৃতি একটা কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। দেড়শ বছর আগে যখন আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গোড়াপত্তন হচ্ছিল, তখন নতুন যুগের মনের কথা নতুন করে বলতে গিয়ে তাকে বারবার বিদেশী সংস্কৃতির সাহায্য নিতে হচ্ছিল। সংস্কৃত কাব্যনাটক এবং পুরনো বাংলা-সাহিত্যের উত্তরাধিকার তার আরম্ভের মধ্যে থাকলেও এই নতুন সাহিত্যের বাইরের ছকটা ছিল ঔপনিবেশিক। যাঁকে আমরা বাংলার স্কট বলে আদর করতে চেষ্টা করেছি, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় প্রথম এই ছকের মধ্যে দেশের প্রাণপ্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর একটু একটু করে পট বদলেছে। উপনিষদ থেকে শুরু করে বাউল গান আর বৈষ্ণব পদাবলী পর্যন্ত এ দেশের সাবেকী সাহিত্যের যে ধারা, আধুনিক বাংলাসাহিত্য নতুন করে সেই ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মস্থ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়ে তাকে যে শুধু নবজন্ম দিলেন তাই নয়, আমাদের হাতে সাহিত্যের নতুন মাপকাঠিও তুলে দিলেন। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে বড় মাপের সাহিত্যের একটা নিজস্ব নিরিখ আমরা পেলাম। বোধ হয় এরই ফলে আর আমরা দেশের সাহিত্য বিচারের জন্য বিদেশের দিকে তাকাই না। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাল চর্চা হয় জেনে এখনও আমরা খুশী হই, কিন্তু কৃতার্থ বোধ হয় হই না। একটু একটু করে এসব ব্যাপারে আমরা ক্রমশ আরও বয়স্থ হচ্ছি। এমন কি যে ডাব্লিউ বি ইয়েটস ইংরেজী গীতাঞ্জলির উচ্ছ্বসিত ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছিল, রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে তাঁরও মূল্যাভাবের কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ইদানীং আমাদের নজরে পড়তে শুরু করেছে। হয়ত এগুলো ডিটেলের ব্যাপার, কিন্তু সাংস্কৃতিক মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এরও কিছু মূল্য আছে।

সাহিত্যের সুন্দর নিসর্গকে ছেড়ে যদি বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করি, তবে দৃশ্যটা কেমন দাঁড়ায়। সাহিত্যচর্চার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চার তুলনাতে অনেকেই আপত্তি করবেন। প্রথমত, বাংলাসাহিত্য বলতে কি বোঝায় তা আমরা সকলেই মোটামুটি জানি, কিন্তু বাংলা রসায়ন বলতে মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল ছাড়া চট করে আর কিছু মনে আসে না। বাংলা গণিত বলতে কিছু বোঝায় কি? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অবশ্য হিন্দু রসায়নের ইতিহাস বিষয়ে বিখ্যাত একটি বই লিখেছিলেন, কিন্তু সে এমন যুগের ইতিহাস যখন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে চিন্তা আর তথ্যের বিনিময় আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল। বিজ্ঞানকে তখন স্বাধীন অধীতব্য শাস্ত্র হিসেবে নয়, মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক সিদ্ধির অন্যান্য সাধনার আনুষঙ্গিক হিসেবে, বিশেষ করে ধর্মীয় প্রকরণের অংশ হিসেবে, দেখা হত। ফলে রসায়ন আয়ুর্বেদ ইত্যাদি বিজ্ঞানগুলির শরীরে দেশকালের ছাপ অনেকটা বেশী পড়েছিল। ইদানীং যোগা-

যোগ ব্যবস্থার বিস্তারের ফলে এক দেশের বিজ্ঞানীর সঙ্গে অন্য দেশের বিজ্ঞানীর নানাভাবে সংযোগরক্ষাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া বিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয় এবং পদ্ধতি ক্রমশ যে পরিমাণে স্থানীয় গণ্ডির অতীত বলে স্বীকৃত হয়েছে, তার চর্চাও সেই পরিমাণে আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের সতীর্থ বিজ্ঞানীরা শুধু যে এখন একই শাস্ত্রের চর্চা একই ব্যাকরণ অনুযায়ী করেন তাই নয়, তাঁদের মুখের ভাষা চলাফেরার ধরণ মায় মুদ্রাদোষগুলি পর্যন্ত অনেকটা এক রকমের হয়ে গেছে। পৃথিবীজুড়ে এক নতুন ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট যার নাম দিয়েছেন কিউ এস ই, অর্থাৎ কোয়ালিফায়েড সায়েন্টিস্ট্স অ্যান্ড ইঞ্জিনীয়ার্স। এঁদের মধ্যে যাঁরা নৈকষ্যকুলীন, অর্থাৎ নিজের নিজের বিষয়ে মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরা নানা দেশের ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী বেসরকারী গবেষণাগারে স্বচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করেন, অধীত বিদ্যার সঙ্গে জড়িত সমস্ত আন্তর্জাতিক সভা-সমিতি এবং অনুষ্ঠানে ঘুরে-ফিরে তাঁদের দেখতে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক এয়ার লাইনগুলোর এঁরা অন্যতম আদৃত পৃষ্ঠপোষক। ইংরেজীতে যাকে বলে গুড লাইফ, আধুনিক নাগরিক জীবনের সেই সমস্ত উপচার এঁদের করায়ত্ত, এঁরা বুনো রামনাথের জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী নন। যাই হোক, একদিকে কাজ আর অন্য দিকে জীবনভঙ্গি এই দুই মিলিয়ে বিজ্ঞানীরা ক্রমশ একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছেন। কাজের মিল ক্রমশ তাঁদের মধ্যে মনের মিল এনে দিচ্ছে।

ভারতবর্ষ যে আধুনিক বিজ্ঞানের এই বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণে একেবারে প্রবেশ করে নি তা নয়। এ দেশেও অনেক বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবু সাধারণভাবে এ দেশের বৈজ্ঞানিক পরিবেশের দিকে তাকালে একটা জিনিস নজরে পড়বে। সেটা আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব। অনেক জায়গায় বিজ্ঞানের ভাল ভাল কাজ হচ্ছে, কিন্তু সেই কাজের মান সম্বন্ধে এখনও আমাদের মনে খুব একটা আস্থা নেই। এখনও আমরা বিদেশের গুণীদের কাছে সম্মানলাভ স্বীকৃতি পেলে তবে খুশী হই। আমাদের মধ্যে যাঁরা ভাল বিজ্ঞানী তাঁদের অনেকে নানা কারণে হয় বিদেশবাসী নয় বারবার [illegible] আমাদের কিছু [illegible]

[illegible] করা দরকার। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, বারবার বিদেশ যাওয়াটাই কৃতিত্বের মাপকাঠি বলে ধরে নেওয়া হয়। ব্যাপারটা কখনো কখনো হাস্যকর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়—অনেকে বাড়িতে নানা ধরনের বিদেশী উপকরণ আর সরঞ্জাম জমিয়ে রেখে তার ভিতর দিয়েই নিজেদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রচার করতে চান। আবার কখনো কখনো বিদেশবাসী কোন তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী অল্পদিনের জন্য এ দেশে এলে তাঁকে নিয়ে তুমুল হইচই পড়ে যায়। আগন্তুক বিজ্ঞানীর গবেষণাকর্ম সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের কিছু জানা থাকে না, জানা হয়ত সম্ভবও নয়, কিন্তু তিনি যে প্রবাসী এবং প্রবাসে আদৃত শেষ পর্যন্ত এটাই আমাদের মনে এক ধরনের রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে।

সোজা ভাষায় বলতে হয়, বিভূতিবাবু কিংবা জীবনানন্দ সম্বন্ধে আমাদের যে বিশ্বাস ও গর্ববোধ আছে, স্বদেশবাসী বিজ্ঞানীদের কাজের বিষয়ে তেমন কোন অনুভূতি এখনও তৈরি হয় নি। একে তো বিজ্ঞান আমাদের অনেকের কাছেই খুব দূরের ব্যাপার, তার কারসাজি ক্রিয়াকলাপ অনেকটা যাদুবিদ্যার মত। যার ভিতরকার তত্ত্ব আমরা বুঝি না, যার চর্চা আমাদের কাছে শৌখীন বিদেশী আমদানি, তেমন একটা বিষয়ে যেন আমরা বিদেশীদের অর্থাৎ সাহেবদের মতামতের উপরে নির্ভর করাকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। এমন কি যাঁরা নিজেরা গবেষণা করেন তাঁরাও অনেক সময় সাহেবদের স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী। এ দেশে অনেক গবেষণা হয় যা সাহেবদের কাজের উপরেই একটু আধটু রাঁদা আর বাটালি বুলিয়ে শেষ হয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটা ঘুরে-ফিরে সেই উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়, যে উনিশ শতকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন 'Rajmohun's Wife' দিয়ে, যে উনিশ শতকে মধুসূদন দত্ত বিলেত যাবার আশায় খৃষ্টান হয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, 'The Captive Lady' লিখে। সাহিত্যিক বয়ঃপ্রাপ্তির আনুষঙ্গিক এই স্তর রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করতে পেরেছিলেন কিছুটা তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য আর পারিবারিক আবহাওয়ার গুণে, কিছুটা বোধ হয় এই কারণে যে ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব একটা কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিদেশীর দেওয়া নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর হঠাৎ আকস্মিকভাবে আদর বেড়ে যাওয়ার বক্রের অভিজ্ঞতা তাঁকেও সহ্য করতে হয়েছিল। সাহিত্যে প্রধানত তাঁর কীর্তির ভিতর দিয়েই এই বিশেষ পর্যায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি, কিন্তু বিজ্ঞানে সেটা এখনও সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এখনও তেমন করে তৈরি হয় নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজকের বিজ্ঞানের এই আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় সুযোগ নিয়েও স্থানীয় পরিবেশে স্থানীয় ঐতিহ্য রচনার কোন অবকাশ আছে কি? খানিকটা যে আছে তার প্রমাণ পাই আজও 'ইতালীয়ান পদার্থবিদ্যা' অথবা 'কোপেনহেগেন স্কুল অব ফিজিক্স' ইত্যাদি শব্দসমষ্টির ব্যাপক ব্যবহারের মধ্যে। আসল কথা, শেষ পর্যন্ত মানুষেই বিজ্ঞান করে। অন্যান্য বিদ্যার মত বিজ্ঞানেও মানুষের মন চায় মানুষেরই মন। একমনের সঙ্গে অন্য মনের বিক্রিয়ার ভিতর দিয়েই নতুন চিন্তার ঘষামাজা চলতে থাকে, কখনো কখনো আকস্মিক স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি ঝলসে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞানে যৌথ কাজের উপযোগিতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। শুধু বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার পারস্পরিক বিনিময় নয়, অনেক কাজ আছে যা একাধিক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ধারাবাহিক সহযোগিতা ছাড়া করাই সম্ভব নয়। এই সব কারণে ক্রমশ দেশে দেশে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গবেষণার দল বা স্কুল গড়ে উঠছে, যেখানে ভাল যন্ত্রপাতি বা অন্য সুযোগ সুবিধার চেয়েও পরস্পরের সাহচর্যই বিজ্ঞানীদের পক্ষে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। চিন্তাভাবনা এবং কাজের এই সংযোগ যখন যথার্থ ফলপ্রসূ হয়, তখন এমন একটা আনন্দময় উদ্দীপনাময় পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে যা ঠিক গবেষণা প্রবন্ধ বা রিপোর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগে এমনি এক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল কোপেনহেগেনে নীলস বোরের ইনস্টিটিউট ফর থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স-এ। এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের পক্ষে একটু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ১৯১৩ সালে বোর যখন তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন, তখন ডেনমার্কের বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া আজকের ভারতবর্ষের আবহাওয়ার তুলনায় খুব বেশী উৎসাহজনক ছিল না। তখনকার কালের সুপ্রতিষ্ঠিত ডানিশ বিজ্ঞানীরা প্রথমে তাঁকে খুব বেশী পাত্তা দেন নি। যদিও প্রথম থেকেই তিনি ভাল কাজ করে এসেছেন। ইচ্ছে করলে তিনি অনায়াসে ব্রিটেন অথবা জার্মানির কোন ভাল গবেষণাগারে স্থায়ীভাবে আশ্রয় নিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি। প্রায় জনবেদে বিদেশে গেছেন, কিন্তু তাঁর আস্তানা ছিল ডেনমার্কেই। ক্রমশ যখন তাঁর খ্যাতি একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ল, তখন সারা ইউরোপ থেকে তরুণ পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁর ইনস্টিটিউটে আসতে লাগলেন, শুধু ছাত্র হিসেবে নয়, সহযোগী কর্মী এবং বন্ধু হিসেবে। হল্যান্ড থেকে ক্র্যামার্স, সুইডেন থেকে ক্লাইন, ইংল্যান্ড থেকে ডিরাক, জার্মানি থেকে হাইসেনবার্গ, ফ্রান্স থেকে ব্রিলুয়াঁ, অস্ট্রিয়া থেকে পাউলি, রাশিয়া থেকে লানদাউ এবং গ্যামো এই সব দিকপাল বিজ্ঞানীরা এসে কাজ

করে গেছেন তাঁর ইনস্টিট্যুটে। ১৯৩২ সালে ধনী সুরাব্যবসায়ী কার্ল য়াকবসেন একটি প্রাসাদোপম বাড়ি বোরকে উপহার দিলেন আজীবন বসবাসের জন্যে, সেই বাড়িটি এবার হয়ে দাঁড়াল তাঁর সহযোগী বন্ধুদের মনোরম পান্থশালা এবং কাজ-কর্মের কেন্দ্র। এই বাড়িতেই একটু একটু করে নানা বিজ্ঞানীর মধ্যে আলোচনা আর আড্ডার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠল কোয়াণ্টাম থিয়োরীর সেই উপপত্তি যাকে বলা হয় কোপেনহেগেন ইনটারপ্রিটেশন অব কোয়াণ্টাম থিয়োরী। এখনকার কালের স্বনামধন্য পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর ভাইসকফ তখন ছিলেন এই দলের এক উদীয়মান সদস্য। তাঁর জবানীতে সে যুগের কোপেন-হেগেন স্কুলের কথা শোনা যাক।

"নীলস বোরের একটা মস্ত ক্ষমতা ছিল, নিজের আশেপাশে তিনি সে যুগের সব চেয়ে সক্রিয়, সব চেয়ে প্রতিভাশালী এবং সব চেয়ে তীক্ষ্ণধী পদার্থবিদদের জড়ো করতে পেরেছিলেন। ঠিক এই সময় এই সমস্ত মানুষকে নিয়েই কোয়াণ্টাম তত্ত্বের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। এখানেই অনির্দেশ্যবাদের সূত্রটি প্রথম উদ্ভাবিত এবং আলোচিত হয়েছিল। এখানেই কণা আর ঢেউয়ের দ্বৈতান্বিত সত্তা ক্রমশ উপলব্ধ হল। দুজন চারজনের ছোট ছোট বৈঠকে জমাট আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্রমশ বস্তুজগতের গড়নের নানা রহস্য একটু একটু করে উদ্ঘাটিত হতে লাগল। তখনকার সেই কোপেনহেগেন, সে এক আশ্চর্য আবহাওয়া, কি প্রাণপ্রাচুর্য আর বুদ্ধির কি বিপুল উদ্যম। বোরের সাহচর্যের আশ্চর্য প্রভাব তখন আমরা সকলে অনুভব করেছি। এইখানে তিনি তাঁর সেই বিশিষ্ট স্টাইলটি সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে বলতে পারি 'কোপেনহাগানের গাইস্ট' অর্থাৎ কোপেনহাগানের মেজাজ। পদার্থবিদ্যার উপর তাঁর এই বিশিষ্ট মনোভঙ্গির ছাপ তিনি রাখতে পেরেছিলেন। চোখ বুজলেই মনশ্চক্ষে এখনো তাঁকে দেখতে পাই, সহকর্মীদের মধ্যে তিনি সম্রাট, নবীন এক দল উৎসাহী আশাবাদী এবং সরস মানুষের মধ্যে তাঁদেরই একজন হয়ে উঠছেন বসছেন কাজ করছেন কথা বলছেন। প্রকৃতির গভীর-তম ধাঁধাগুলির মোকাবিলা করছেন ধরতাই চিন্তার পরোয়া না করে, এমন একটা আনন্দের ভাব নিয়ে যা ঠিক বলে বোঝান যায় না।"

এই যে কোপেনহাগানের গাইস্ট, এর উপজীব্য ছিল বিজ্ঞান, কিন্তু এটা নিছক বিজ্ঞানের ব্যাপার নয়, বরং মনের এমন একটা অবস্থা যা ভাল কাজকে মহৎ উপভোগ্য এবং সার্থক করে তুলতে পারে। সেই একটা বড় অর্থে আমরা বলতে পারি, নীলস বোর কোপেনহেগেনে তাঁর একটা ঘরানা সৃষ্টি করেছিলেন। সাহিত্য সংগীত আর ছবি-আঁকার রাজত্বে এই ধরনের ঘরানার অস্তিত্ব যেমন সুবিদিত, বিজ্ঞানে হয়ত তেমন নয়। সৃজনশীল মানুষের মানসিক অবস্থার প্রত্যক্ষ ছাপ কলাসংগীতে যেমন পড়ে বিজ্ঞানে হয়ত ঠিক তেমনভাবে পড়ে না, পড়বার কথা নয়। কিন্তু ভাল কাজ করতে গেলে বিজ্ঞানীর পক্ষেও একটা বিশিষ্ট মানসিক পরিমণ্ডল দরকার। এই পরি-মণ্ডল তার কাজকে উঁচু পর্দায় ধরে রাখে এবং এমন একটা তন্ময়তা এনে দেয় যা আর কিছু না হোক কাজের উৎকর্ষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

কোপেনহেগেনের তুলনায় আরো পুরনো আরো বনেদী যেসব গবেষণাগার, যেমন কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ কিংবা জার্মানীর গ্যোটিংগেন, সেখানে কাজের উপজীব্য বিষয় কালক্রমে অনিবার্যভাবে বদলে গেলেও একটা ধারাবাহিক সত্তা থাকে,-যা একদিকে বিশিষ্ট-ভাবে স্থানিক, কিন্তু অন্যদিকে অনেকদিনের সঞ্চিত প্রাণশক্তির ঔদার্যে বিশ্বজনীন। অনেকদিন ধরে একটু একটু করে একটা সমাহিত আত্মবিশ্বাস এইসব জায়গায় গড়ে ওঠে, প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া আর কর্মীদের মানসিকতায় তার ছাপ থাকে, নতুন কর্মী আর অভ্যাগতদের মনে তা প্রেরণা যোগায়। কোন প্রতিষ্ঠানই চিরকাল বাঁচে না, কিন্তু যে-কোন ভাল প্রতিষ্ঠান অন্তত একটা আবহাওয়া তৈরি করে দিয়ে যায়, নেমে যাওয়া বন্যার মত কিছু পলিমাটি ফেলে দিয়ে চলে যায় যার উপর অন্য কোন দল এসে আবার নতুন করে ফসল বুনতে পারে।

আমাদের দেশে ক্যাভেণ্ডিশ বা কোপেন-হেগেনের মত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান যে এখনো তৈরি হয়নি, এটা খুব আশ্চর্য নয়। একটা কিছু গড়ে তুলতে হলে বুনিয়াদ চাই, উপাদান চাই। আর্থিক বিকাশে যেমন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি বুনিয়াদ আর উপাদানের এই যুগল সম্মিলন বা ইনফ্রা-স্ট্রাকচার খুব মূল্যবান জিনিস। ইয়োরোপে রেনেসাঁসের পর বিজ্ঞানের খুব দ্রুত বিকাশ হয়েছে, কিন্তু তার আগেও নানা ধরনের কারিগরী বিদ্যার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে ছিল। এই প্রাথমিক টেকনলজী পরে সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে আরো শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আজকের পদার্থবিদ্যার জটিল তত্ত্বকে সেকালের সরল টেকনলজীর আত্মীয় বলে সহজে চেনা যায় না। তবু মানতেই হবে, সিঁড়ির প্রত্যেকটা ধাপ যেমন অমোঘভাবে পরবর্তী ধাপকে কেবলই কাছে এনে দেয়, তেমনি একটু একটু করে মধ্য-যুগের টেকনলজীও আজকের বিজ্ঞানকে সম্ভবপর করে তুলেছে। উন্মুক্ত সমুদ্রে দিকনির্দেশ করতে হলে গ্রহনক্ষত্রের গতি-বিধির উপর নির্ভর করতে হয়, তাই রেনে-সাঁসের আমলে নৌবিদ্যা ক্রমশ জ্যোতি-র্বিজ্ঞানকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এই জ্যোতির্বিজ্ঞান আবার পরে কাজে লেগেছে কলবিদ্যার (mechanics) অগ্র-গতিতে। এককালে লোহার যে নল দিয়ে কামান তৈরি হত, সেই নল পরে স্টীম ইঞ্জিন গড়বার সময় কাজে লেগে গেল। আবার এই কামানের গোলার গতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েই জন্ম হল গতিবিদ্যার (dynamics)। এমনি অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে।

অপরপক্ষে আমাদের দেশে অনেক অনেকদিন আগে কারিগরী বিদ্যার ধারাটি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বহু শতাব্দী ধরে তার আর কোন বিকাশ হয়নি। এর একটা কারণ বোধ হয় আমাদের প্রথাবদ্ধ জাতিভেদ, যা এককালের শ্রমবিভাজনকে ক্রমশ অপরি-বর্তনীয় বিধিদত্ত শাস্তি অথবা পুরস্কার হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। শারীরিক শ্রম-মাত্রকেই আমরা শূদ্রোচিত বলে ভেবেছি, তাই কারিগরী বিদ্যাও ক্রমশ শিক্ষা ও ধীশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে যথার্থই ছোট-কাজে পর্যবসিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়িয়েছে এই যে প্রায় দু'হাজার বছরের ইতিহাসে আমাদের বস্তুগত সংস্কৃতির (material culture) খুব একটা বদল হয়নি। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে গেলে এটাই বোধ হয় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সবচেয়ে মর্মান্তিক মন্তব্য। দু' হাজার বছর আগে একজন সাধারণ গ্রামবাসী ভারতীয়ের বাড়িতে যে সমস্ত যন্ত্র ও তৈজস ব্যবহৃত হত, ইংরেজ আসবার সময় পর্যন্ত তার বিশেষ কোন রূপান্তর হয় নি। সাবেক আমলের কাঠের লাঙল থেকে শুরু করে অনেক যন্ত্র সম্বন্ধেই একথা খাটে। গোরুর গাড়ির চাকাতেও টেকনলজী নিশ্চয় আছে, কিন্তু তা নিতান্ত প্রাচীন এবং অনগ্রসর টেকনলজী। এই স্থবির টেকনলজী আর যাই হোক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল নয়। এর পিছনে একটা নিরুদ্বেগ নিরুত্তাপ বদ্ধ মানসিকতা আছে যা একদিকে প্রকৃতির রহস্য এবং অন্যদিকে মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে তার সম্বন্ধ এই দুই বিষয়ে মোটেই উৎসুক নয়। বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশ এবং উপাদানের মধ্যে যে নিয়ম কাজ করে, নতুন নতুন যন্ত্রের মধ্যে সেইসব নিয়মকে সজ্ঞানে কাজে লাগিয়েই টেকনলজী ক্রমশ এগোতে পারে। আমাদের সনাতন ভারতবর্ষের স্থবির মন এই অগ্রগতির সম্ভাবনাতে অনেকদিন যাবৎ কোন উত্তেজনা খুঁজে পায় নি। যন্ত্রের মধ্যে কিছু সাবেক ফর্ম আর প্রকৃতির সম্বন্ধে অনেকগুলি সাবেক সংস্কার, এই নিয়েই আমাদের স্বদেশী বিজ্ঞানের হাটুভাঙা চেহারাটা গড়ে উঠেছিল।

দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের একটা

গুরুত্বপূর্ণ দিকে এই শূন্যতা এযুগে প্রথম যাঁর নজরে পড়েছিল, তাঁর নাম রামমোহন রায়। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিখানি এই কারণেই বিশেষ তাৎপর্যময়। রামমোহন রায় থেকে জগদীশচন্দ্র বসু—প্রায় সত্তর বছরের ব্যবধান। বিজ্ঞানের প্রয়োজন সম্বন্ধে উপলব্ধি থেকে শুরু করে তার প্রথম সার্থক চর্চায় পৌঁছতে প্রায় সত্তর বছর সময় লেগেছিল। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাও ব্যাপক কোন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পূর্বাভাষ ততটা নয়, যতটা অদম্য একক উদ্দীপনার ব্যাপার। মনে রাখতে হবে, ইংরেজ সরকার অনেক দেশী অধ্যাপকের এই আপাত পাগলামিকে মোটেই সুনজরে দেখেননি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জগদীশচন্দ্র যখন গবেষণার জন্য বিদেশে গেছেন, তাঁর সরকারী প্রভুরা তখন চাকরি এবং ছুটিছাটা সংক্রান্ত সরকারী নিয়মের সুচারু প্রয়োগে তাঁর পথ যথাসাধ্য বিঘ্নিত করেছেন। বস্তুত জগদীশচন্দ্র থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে ধারা এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত এদেশে চলেছে, তার প্রায় পুরোটাই বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের একক সংগ্রামের ইতিহাস। এবং যেহেতু বিজ্ঞানের লাইনে সহযোগী কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সরঞ্জামের অভাব সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় বেশী ক্ষতিকর, সেইহেতু এতেসব অসুবিধার মধ্যে মুষ্টিমেয় এই কজন পথিকৃৎ বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব ভারতীয় রেনেসাঁসের উজ্জ্বল ইতিহাসেও অগ্রগণ্য বলেই স্বীকৃত হওয়া উচিত। যেখানে দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাই মুখস্থবিদ্যার—অর্থাৎ কোনক্রমে প্রচলিত তথ্যের অন্যমনস্ক আহরণের—আয়োজন ছাড়া কিছু নয়, সেখানে এঁরা চেয়েছেন বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক প্রবাহে নিজেদের দিক থেকে কিছু যোগ করতে। বিদেশী সরকার শেষ পর্যন্ত এঁদের এই দুঃসাহসকে সহ্য করেছেন বোধ হয় এই ভেবে যে, বিজ্ঞানচর্চা অন্ততপক্ষে রাজনীতির চেয়ে কম ক্ষতিকর। এঁদের প্রতিভা আর উদ্যমকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েও একটা কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার। ইংরেজ আমলে যথার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থায়ী ঐতিহ্য বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এদেশে রচিত হয় নি। অন্য যে-কোন সৃষ্টিধর্মী কাজের মতই বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও প্রতিভার মূল্য অপরিসীম। কিন্তু শুধু প্রতিভাকে ভিত্তি করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা যায় না, বৈজ্ঞানিক চর্চার অবিচ্ছিন্ন ধারা শুধু প্রতিভার উপর নির্ভর করে তৈরি করা যায় না। বরং প্রভূতসংখ্যক ভাল কর্মী যদি ক্রমাগত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার সুযোগ পান, তবে কালক্রমে প্রতিভার বিকাশের উপযোগী জমিও বোধহয় একটু একটু করে তৈরি হয়ে যায়।

এসব কথা এখানে তোলবার একটু কারণ আছে। আমাদের দেশে একটা প্রশ্ন কোন কোন মহলে ইদানীং প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। যথা, ইংরেজ আমলে গবেষণার জন্য টাকার বরাদ্দ অনেক কম ছিল, তবু জনকয়েক দিকপাল বিজ্ঞানী তখন এদেশে জন্মেছিলেন। কিন্তু তারপর আর তেমন কাউকে দেখা যায় না কেন? বরং যে কজন ভারতীয় বিজ্ঞানী সম্প্রতি সুপরিচিত, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রবাসী, তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রবাসেই শিক্ষাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ দেশে আর নতুন করে ভাল বিজ্ঞানী তৈরি হচ্ছেন না। অথচ বাজেট বেড়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞানের গবেষণা আর বিকাশের (research and development) খাতে এখন আমাদের বাৎসরিক ব্যয় একশ চল্লিশ কোটি টাকা। বিজ্ঞান এবং টেকনলজীতে বিভিন্ন স্তরে অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা এখন প্রায় বারো লক্ষ। অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির তুলনায়ও এই সংখ্যা মোটেই কম নয়, একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত রাশিয়াতেই এর চেয়ে বেশী লোক বিজ্ঞান ও টেকনলজীর শিক্ষা পান। অনেকে মনে করেন, এই বিপুল উদ্যম থেকে এখনও আমরা বিশেষ কিছু ফল পাচ্ছি না। এর একটা বড় অংশকে তাঁরা ব্যয়বহুল বিলাসিতা বলেই মনে করেন।

এই যে প্রশ্ন এবং এই যে অভিযোগ, এর উত্তর কিন্তু অনেকটা নিহিত আছে অবস্থার উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যেই। ইংরেজ আমলে অল্পসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তির কাজের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানচর্চার একটা ভাল নজির এদেশে তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু কয়েকটি উল্লেখ্য ব্যতিক্রম ছাড়া তার মধ্যে ধারাবাহিকতার প্রতিশ্রুতি ছিল না। ব্যাপক কাজের স্থায়ী ঐতিহ্য গড়া শুরু হয়েছে আজকের ভারতবর্ষেই। আগের তুলনায় অনেক অনেক বেশী ছাত্র-ছাত্রী এখন বিজ্ঞানের অন্তত একটা মোটা ধরনের শিক্ষা পাচ্ছেন, ফলে দেশের চিত্তভূমিতে এই প্রথম বিজ্ঞানের জন্য একটা স্থায়ী আসন পাতা হচ্ছে। এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে বিজ্ঞান আর কোন সুদূর রোমান্টিক কল্পনার বস্তু নয়, অনেক বেশী প্রত্যক্ষ, প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক। গবেষণা এবং শিক্ষার মান হয়ত এদেশে এখনও আশানুরূপ নয়। কিন্তু আগের তুলনায় এত বেশী লোক যে বিজ্ঞানকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করছেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে যথার্থ ভাল কাজ হবার কিছু আশা রয়েছে। প্রতিভা গড়ে তোলবার অন্য কোন সুবর্ণ পন্থা যখন আমাদের জানা নেই, তখন একমাত্র ব্যাপক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়েই ক্রমশ ভাল কাজের পথকে সুগম করে দিতে হবে। আমাদের বিদ্যালয় ও গবেষণাগারে ত্রুটিবিচ্যুতি নিশ্চয় আছে। কিন্তু ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমাদের বুদ্ধির ঘরের চাবির গোছা যদি নেহাৎ চুরি করে না নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে বিগতযুগের ঔপনিবেশিক সমাজে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা যেটুকু কৃতিত্ব অর্জন করেছিলাম, এখন তাকে অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে মোটেই দুরাশা হওয়া উচিত নয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

আশ্রয় / শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো রাত্রির আকাশ থেকে কালো মেঘের কালি ঝরছে অবিরল, বাতাস ক্ষ্যাপা জন্তুর মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গোঁ-গোঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছে, তবু আমরা, বলতে গেলে, নিরাপদেই আছি। 'আমরা' বলতে 'আমি' আর 'আরেকজন'। এই 'আরেকজন' যে মানুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন তার চেহারা, বয়স কতো; কিছুই এখন পর্যন্ত বুঝতে পারি নি। আকাশ থেকে ঝরে-পড়া অবিরাম কালি মাখছি, আর মনে মনে ছটফট করলেও শরীরটাকে সরাতে পারছি না, এমন সময় অনুভব করলুম, আমার ডানদিকে—টিনের চালটার প্রান্তদেশে কেউ এসে উঠলো। উঠলো, হয়ত বা আমার উপস্থিতি টেরও পেলো, কিন্তু কাছে ঘেঁষলো না, ওই প্রান্তটুকু আঁকড়ে বসে রইলো। আমার বয়স কতো, দেখতে আমি কীরকম সে-ও সেটা সঠিক বুঝতে পারলো বলে মনে হলো না। কালিমাখা দুটি ছায়ামূর্তির মতো আমরা দু'প্রান্তে বসে রইলাম। বসে রইলাম, কিন্তু পরস্পরের সাড়া নিলাম না। টিনের চালার দুটি অংশ যেখানে ঢেউয়ের মতো উঁচু হয়ে একটা সরল রেখায় মিশেছে, সেই রেখার ওপর দুই বিপরীত বিন্দুতে আমরা দুজনে বসে আছি, পা দুটি সামনের দিকের ঢালু অংশে কখনো ছড়িয়ে দিচ্ছি, কখনো গুটিয়ে নিচ্ছি। একবার ভাবলাম, ডেকে জিজ্ঞাসা করি, সঙ্গে ছাতা আছে? কিন্তু প্রশ্নটা জাগতেই মনে মনে হেসে ফেললাম, নিরর্থক। এমন নিরর্থক প্রশ্ন করে লাভ আছে কিছু? মনে হলো, ওরও মনে হয়ত ঠিক এই সময় এইরকম জিজ্ঞাসার বুদ্বুদ উঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

রাত্রে তো গ্রামাঞ্চলে কতো রকম শব্দ ওঠে—ব্যাঙ ডাকে, শেয়ালেরা প্রহর-ঘোষণা করে, চোখে ঘুম না থাকলে বাদুড়ের ডানার ঝটপটও শোনা যায়। কিন্তু যেখানে আছি, সেটি গ্রামাঞ্চল হলেও ও ধরনের কোনো শব্দ শুনছি না। ভয়ার্ত বাদুড়গুলো যে কোন্ গাছের মাথায় আশ্রয় নিলো তা জানি না, ব্যাঙ বা শেয়ালগুলো স্রোতের মুখে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে!

সামনে তাকালাম। টিনের চালার সামনে-পিছনের অংশ যে-সরলরেখায় উঁচু হয়ে এসে মিশেছে, সেখানে বসে-থাকা এই শরীরটাকে যদি ঢালুর দিকে খেলাচ্ছলে গড়িয়ে দেই, তাহলে যেখানে পড়বো, সেখান থেকে যত দূরে দৃষ্টি যায়, তত দূর, এই ঘন অন্ধকারেও একটা আবছা রূপোলী চাদরের মতো মনে হচ্ছে। অতিকায় একটা চাদর দূরে আকাশ যেখানে হুমড়ি খেয়েছে, সেখানে পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই যেন কুয়াশার মতো অন্ধকারের পুঞ্জ পুঞ্জ ঢেকে গেছে বিলীন হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে এ-ধার ও-ধার গাছের ঝাঁকড়া-মাথাগুলো কালো কালো কবন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে কোথাও-কোথাও এক-পায়ে-দাঁড়িয়ে-থাকা তাল বা নারিকেল গাছের অস্তিত্বও অনুভব করা যায়। তাদের অতি লম্বা লম্বা ঠ্যাং-গুলো কে যেন কেটে বেশ ছোট করে নিয়েছে।

এখানে, এই টিনের চালায় এসে ওঠবার পর যেভাবে আকাশ ভেঙে কালি ঝরছিল, আপাতত সেটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে প্রায় বিরল হয়ে এসেছে বলা চলে। অর্থাৎ আকাশের দোয়াতের সব কালিগুলো ঢালা হয়ে গেছে, এখন দু'এক ফোঁটা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে মাত্র। হাওয়ার ক্ষ্যাপামী এখনো আছে, মাঝে মাঝে এসে চড় মারছে, সারা শরীরটা শিউরে শিউরে উঠছে সেই প্রহারে। কিন্তু উপায় নেই, সহ্য করতেই হবে। যেমন করে সহ্য করছি পেটের ভিতরকার মোচড়। খিদেটা অবুঝ জন্তুর মতো পেটের ভিতরে ঢুঁ মারছে বারবার, কিন্তু করার কী আছে? বাঁ হাতের মুঠোয় একটা থলির মুখ আঁকড়ে আছি, ডান হাতটা খালি। মাথার জটপাকানো চুলের জঙ্গলে হাত চালিয়ে যতটা সম্ভব নিংড়ে ফেলেছিলাম। মুখটা হাত দিয়ে মুছে ফেলেছিলাম। এ-ছাড়া আর কিছু করবার নেই। পায়ের আগাদুটো মনে হচ্ছে বরফ, প্যান্টটা দু' পায়ে সেঁটে বসে আছে। মাঝে মাঝে পা গুটিয়ে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে বরফ গলাবার চেষ্টা করছি, আবার পা মেলে দিচ্ছি। গায়ের জামা, ভিতরের গেঞ্জি সব সপসপে ভিজে। বুকের ওপর হাত ঘষে ঘষে হৃদ্‌পিণ্ডটাকে চালু রাখার চেষ্টা করছি। ঘাড়ের কাছটায় হাত ঘষে ঘষে কিছু উত্তাপ সঞ্চার করছি, কিন্তু ভারী থলিটা নিয়ে করবো কী? বাঁ-হাতটা কে অসাড় হয়ে আসছে? বারকয়েক হাত বদল করলাম। থলিটার ভার রেখেছি দুই চালের সংযোগ-রেখায়,—কিন্তু মুঠো করে ওটা ধরে রাখাও যে কষ্টকর!

ও প্রান্তের মানুষটাও কিন্তু আশ্চর্য-রকম নীরব। নীরব বিশ্ব চরাচর, শুধু পায়ের খানিকটা নিচে, যেখানে চালাটা শেষ হয়ে রূপোলী চাদরের আরম্ভ সেখানে মেয়েলী গলায় ফিসফিসিয়ে কথা বলার সুরে একটা মৃদু কল্লোল চলেছে অনর্গল। কান পাতলে দূরের আওয়াজও শোনা যায়। রূপোলী পাতটাকে যত দূরে দেখা যায়, সেই প্রান্ত থেকে একটা মৃদু অথচ গম্ভীর শব্দ যেন পাক খেয়ে দূরে থেকে দূরান্তে চলে যাচ্ছে। এর ওপরে আছে ক্ষ্যাপা হাওয়ার দৌরাত্ম্য। কখনো বুনো শুয়োরের মতো গাছগুলোর ঝাঁকড়া-মাথায় গিয়ে ঢুঁ মারছে, কখনো বা হাতির শুঁড়ের মতো নারকেল বা তালগাছের ঝুঁটি ধরে প্রবল-ভাবে নাড়া দিচ্ছে।

ও-প্রান্তের মানুষটির সঙ্গে আমিই কথা শুরু করতে পারি, কিন্তু কী জানি সে কে, কেমন, প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে কিনা—এই সব সাতপাঁচ ভেবে ওর মতো আমিও নীরব রয়ে গেলাম। এবং নীরব রইলাম বলেই বোধহয় নিজের দিকে মন গেল। হাত বদল করে ঘাড় ঘষছি, পা ঘষছি—কিন্তু থলিটা তবু ছাড়ছি না। একবার মনে হলো, ছেড়ে দিলে কেমন হয়? হয়ত ওটা পিছন দিকে গড়াবে, না হয়ত সামনের দিকে গড়াবে। গড়িয়ে, ঝুপ করে রূপোর পাতের ওপর গিয়ে পড়বে। কিন্তু তারপর? সত্যিই ত আর পাতটা রূপো নয়, ঘুটঘুটি অন্ধকারে আবছা রূপো-রূপো দেখাচ্ছে।

পাড়াগাঁয়ে মাস দুই হলো এসেছি বটে, আসলে ত আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে নই। তাই, এ-যা দেখছি, আমার কাছে অভি-নব। কাগজে পড়তাম কলকাতায় বসে, কিন্তু চোখে কখনো আগে দেখিনি। আর এ শুধু দেখাই নয়, এ যেন ছবি-আঁকতে আঁকতে নিজেই সে ছবির মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ঘেরাটোপের মধ্যে ঐ কবন্ধ-গাছগুলো, এই টিনের চালা আমি আর ওই নিস্পন্দ মানুষটি সব মিলিয়ে যেন এক এক্সপ্রেশানিস্ট শিল্পীর আঁকা কোনো বিশেষ ব্যঞ্জনার প্রতীকসমৃদ্ধ ছবি।

হাওয়ার ক্ষ্যাপামি এতক্ষণে আস্তে আস্তে কমে আসছে। সারা শরীরে যে কনকনানি ভাবটা ছিল, সেটাও কিছু স্তিমিত। আমি পা দুটো গুটিয়ে নিলাম। বাঁ হাতের থলিটা কোলের ওপর কোনক্রমে রেখে হাতটাকে মুক্ত করে ডান হাতের তালু দিয়ে ঘষে নিলাম। এই সব করতে করতে এক সময় টের পেলাম, আমার ডানদিকের প্রান্তবর্তী ছায়ামূর্তিতেও বুঝি একটা প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। সে বসার ভঙ্গী পরিবর্তিত করছে কিম্বা আমার মতো পা গুটিয়ে নিচ্ছে, এমন একটা কিছু হবে। আমি আড়চোখে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে হলো, সে সামনের দিকে কী একটা গড়িয়ে দিলো, বস্তুটা গড়াতে গড়াতে সামনের তরল রূপোলী পাতের মধ্যে টুপ্ করে পড়ে গেল। আবার আরেকটা। গোলাকার কিছু একটা হবে, ছোট্ট বলের মতো গড়িয়ে 'টুপ্' করে ডুবে গেল।

—কী পড়লো!

আমার অজান্তেই আমার গলা থেকে একটা বিদ্ঘুটে আওয়াজ বেরুলো। এটা যে আমারই কণ্ঠস্বর, প্রশ্নটা যে আমিই করলাম—এটা বুঝতেই আমার কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

অপর প্রান্তের মানুষটি নিস্পন্দ হয়ে গেল। হয়ত সে আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছে, কিন্তু ওর আর আমার মাঝে অন্ধকারের ঘনত্ব এতো বেশি যে সেটাও ভালো করে আমার লক্ষ্যে পড়লো না। এটুকু বুঝলাম, ছায়া মূর্তিটি এবার একটু নড়েচড়ে বসলো। একটু যেন গলা খাঁকারি দিলো। তারপর সর্দি-বসা গলা থেকে যেরকম আওয়াজ বেরোয়, সেরকম ফ্যাঁস-ফেঁসে স্বরে উত্তর ভেসে এলো — ফেলে দিলাম।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলে উঠলাম—কী?

উত্তর নেই। লোকটা বোধ হয় কিছু ভাবছে। ভাবনা-চিন্তা করেই বোধহয় আমার জিজ্ঞাসার সরাসরি জবাব না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করলো, আমরা বোধ হয় একটু কাছাকাছি গিয়ে বসতে পারি, তাই না?

বললাম—আপনি সরে আসতে পারেন।

মানুষটি এবারে খুব সন্তর্পণে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো ভঙ্গি করে কিছুটা এগিয়ে চালার মাঝামাঝি এসে বসলো। মাঝ-মাঝি, কিন্তু দুই চালু টিনের চালের মধ্যেকার সরলরেখার ওপরেই। আমি সরিনি। ঘন অন্ধকার হলেও এবার যেন কিছুটা স্পষ্ট ওকে দেখতে পাচ্ছি। পরনে আমার মতোই সরু প্যাণ্ট, কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা আলখাল্লার মতো কী যেন পরে আছে। মাথার চুলটাও কপালের সামনে সুবিন্যস্তভাবে এগিয়ে আছে এবং তা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে না বা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে না দেখে আন্দাজ করা যায়, ওটা আদপে চুলই নয়—একটা ক্যাপ—বোধ হয় কান পর্যন্ত ঢাকা। গলার স্বর ফ্যাঁস্ফেঁসে হলেও তা যে বুড়োহাবড়ার নয় এটাও অনুভব করা যায়। ওর মতো আমিও এদিক থেকে ওর কাছে পর্যন্ত সরে বসতে পারতাম, কিন্তু আমার কোলের ওপরে-রাখা থলিটার দিকে তাকিয়ে সে-কাজটা করতে গিয়ে করা হলো না। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকেই বলে উঠলাম, —ঐ যে গড়িয়ে ফেললেন, জিনিসটা কী?

লোকটা সে কথার উত্তর এবারও এড়িয়ে গেল, ঘাড়ের কাছে, আলখাল্লা ব'লে যেটাকে মনে করছিলাম, সে বস্তুটার কলার ছিল—সেই কলারটা ভালো ক'রে উঠিয়ে দিতে দিতে বললে—অনেকটা দূরে সাঁতরে আসতে হয়েছে, হাত-পা ঠান্ডা।

—দূরে কেন? দূরের মানুষ নাকি আপনি? গাঁয়ের নন?

উত্তর এলো—না। কাছেই যে শহর আছে, সেখানকার লোক আমি, গাঁয়ে এসে-ছিলাম একটা কাজে। জল দিয়ে রাস্তাঘাট ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু বৃষ্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নদী যে এমন ফেঁপে ফুলে উঠবে, ভাবতে পারিনি। জলের তোড় বাড়ছে, লোকজনও পালাচ্ছে—আমি আর কতদূরে পালাবো? গাঁয়ের অন্ধি-সন্ধি ঘাং-ঘোঁৎ আর কতটুকু জানি? একটা গাছে উঠে বসে ছিলাম। গাছটাও মড় মড় করে ভেঙে পড়লো, আমিও জলে পড়লাম। তারপরেই সাঁতার। বাব্বাঃ! স্রোতও কী সাংঘাতিক? যে কাজে এসেছি তার ওপরে আছে গায়ে চাপানো এই পলিথিনের ওয়াটার প্রুফ! এটা নিয়ে সাঁতার কাটা কি সহজ? এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে লোকটা যেন হাঁপাতে লাগলো।

বললাম—ওঃ, গায়ে আপনার ওয়াটার প্রুফ আছে তাহলে? আমি ভাবছিলাম, আলখাল্লা গোছের কিছু একটা হবে।

বোধ হয় একটু হাসলো, বললে আমাকে কি বাউল-টাউল মনে করেছেন নাকি যে আলখাল্লা থাকবে?

বললাম—আপনাকে কিছুই মনে করতে পারছি না। কারণ দেখতেই পাচ্ছি না ভালো করে। আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?

সে বললে—প্রথম থেকেই দেখছি। কিন্তু কথা বলিনি। বলবো কী করে? সাঁতরাতে দম ফুরিয়ে গিয়েছিল।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। সে বললে—বাঁচোয়া যে বৃষ্টিটা ধরে গেছে। ওঃ। গায়ে যেন তীর ফুটছিল!

বললাম—তবু ত গায়ে আপনার বর্ষাতি আছে, মাথায় ক্যাপ।

—আপনার?—ঈষৎ বিস্ময়মিশ্রিত প্রশ্নটা ভেসে এলো।

বললাম—আমার যে কিছু নেই সে তো দেখতেই পাচ্ছেন!

উত্তর এলো—না, অতটা স্পষ্ট ঠাওর হয়নি।

বলে মানুষটি বোধ হয় ধীরে ধীরে আরও একটু কাছে সরে এলো। বোধ হয় দেখতে লাগলো আমাকে। আমিও দেখছিলাম। গোঁফ-দাড়ি-কামানো তরুণ একটি মুখ। আমাদের বয়সীই হবে, দু'-এক বছরের ছোটও হতে পারে। সে যে সমবয়সী, এটা মনে হতে প্রথমেই একটা সন্তোষ অনুভব করলাম। বললাম—গলাটা ধরা-ধরা কেন?

উত্তর এলো — সর্দি। ঠান্ডা লেগে —

বাধা দিয়ে বললাম—কোন্ ইয়ার?

—মানে?

বললাম—এই যেমন আমি। আমার সেকেন্ড পার্ট দেওয়ার কথা ছিল দু-বছর আগে কিন্তু —

ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করলাম না। সে কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে

রইলো। অনুভব করলাম সে একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। আমি আমার কথার জের টেনে বললাম—সায়েন্স

তখনো কোনো উত্তর নেই। অল্প একটু হেসে বললাম—বাবার ইচ্ছে ছিল আমি তাঁর মতো ইঞ্জিনীয়ার হবো।

সঙ্গীটি গম্ভীর গলায় বলে উঠলো—কলকাতা থেকে আসা হয়েছে, না?

প্রশ্নের ধরনে মুহূর্তে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। মনে হলো, আমি ভুল করেছি। মনের এক অভাবিত শিথিল মুহূর্তে কয়েকটা কথা এমন বলে ফেলেছি যা আমার হয়ত বলা উচিত হয়নি। এ যে কে, কোন্ দলের—কিছুই না জেনে আত্ম-কথন বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এও গাঁয়ে এসেছে কাছের শহর থেকে। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। ভাবতে ভাবতে খানিকটা সময় নীরবতার মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেল। ও-পক্ষও সামনে মুখ করে ভাবছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে হলো। মনে হলো, এমনও ত হতে পারে আমরা দুজনেই এক কাজ করতে এসেছি, দুজনের লক্ষ্যই এক, শুধু বন্যার আগে সংযোগটুকুই হয়ে ওঠেনি।

মনে হলো সেও এমনি ধরনের কোনো চিন্তা করছিল নইলে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে প্রশ্ন করতো না—পড়ায় ছেদ পড়েছে ত?

বললাম—অগত্যা।

সে বললে—আমার পড়েনি। ফার্স্ট পার্ট দিয়েছি—অনার্স ছিল।

হেসে বললাম সে তো আমারও ছিল।

—কীসে?

—ফিজিক্সে।

সে বললে—আমারও ছিল—ইতিহাসে।

হেসে বললাম—তাহলে আমরা দুই প্রান্তের লোক?

—হ্যাঁ। তবে একই সরলরেখার দুই প্রান্ত।

—অর্থাৎ উভয়েই আমরা ছাত্র, এই ত?

—এগজ্যাক্টলি।

বললাম—আর তাছাড়া বোধ হয় আমরা একই লক্ষ্যে বেড়িয়ে পড়েছি।

—বোধ হয়।

একটু হাসলাম, বললাম—এইবার বুঝতে পারছি, তুমি টিনের চালের ওপর দিয়ে কী গড়িয়ে জলে ফেলে দিয়েছো।

ছেলেটি বোধ হয় একটু চমকে উঠলো, তারপরে সেটা সামলে নিয়ে সম্ভবত একটু হাসলো, বললে—মনে হচ্ছে, ধরতে পেরেছো।

কিন্তু কী হবে রেখে, ভিজে গিয়েছিল।

—মাত্র দুটোই ছিল?

—হ্যাঁ।

বললাম—ফেললে কেন? পরে শুকিয়ে নিতে পারতে।

ছেলেটা এবার স্পষ্টতই হেসে উঠলো, বললে—যা অবস্থা, শুকোনোর ভরসা হয় না।

আমি আমার কোলের ওপর রাখা থলেটার দিকে তাকালাম। ও যা ফেলে দিলো, সেরকম জিনিস আমার থলেতে আছে গোটা ছয়েক। একেবারে অকেজো, ভিজে টইটম্বুর। কিন্তু একদিন শুকিয়ে নিতে পারবো বলেই না থলেটা এখন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি।

একটুক্ষণ থেমে থাকবার পর ওকে প্রশ্ন করলাম—বন্যার জল আর কতদিন থাকবে বলে মনে হয়?

সে হাসলো—কতদিন? বলা শক্ত। তবে যেরকম অবস্থা, অর্থাৎ জল যখন টিনের চালা পর্যন্ত ছুঁতে পেরেছে তখন এ ব্যাপার দু'একদিনের জন্য নয়। কে বলতে পারে, হয়ত বা বেড়েও যাবে। আমাদের ভাসিয়েও নিয়ে যেতে পারে। কিছুই আশ্চর্য নয়।

চুপ করে রইলাম।

ও বলে উঠলো—সঙ্গে সিগারেট আছে, কিন্তু সব ভিজে।

—আমার তাও নেই, পকেট ফাঁকা।

বললে—একেবারেই ফাঁকা? সিগারেট না থাকুক, অন্য কিছুও কি নেই?

সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের পকেটে হাত দিলাম, কিছু অনুভব করে নিলাম, বললাম—যা আছে তা না থাকার মতন। বুলেট নেই। ফুরিয়ে গেছে।

—তাহলে আর ওটা রেখে লাভ কী?—বলে সে হা-হা করে হেসে উঠলো। হাসির শব্দটা ভেসে ভেসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তারপরে এক সময় হাসি থামিয়ে বললে—আমারও আছে। ঠিক তোমার মতন অবস্থা। বুলেট নেই।

—তাহলে তুমিই বা রেখেছো কেন?

গম্ভীর হয়ে গেল, বললে—ভাবছি। ভাবছি ওটাও জলে ছুঁড়ে দেবো কিনা। ভাল কথা, দেশলাই আছে?

—না।

—আমার ছিল। ভিজে গেছে। সিগারেট ধরাতে পারলে মন্দ হতো না, কী বলো?

বললাম—তুমি ও-কথা ভাবছো? আমি ভাবছি, এক টুকরো বিস্কুট বা পাউরুটি পেলে ভালো হতো।

ছেলেটি স্তব্ধ হয়ে গেল, কিছু বললো না।

বললাম—শেষ খাওয়া জুটেছিল কাল রাত্তিরে, তারপরে সারাটা দিন গেছে, রাত হয়েছে, রাতও বোধ হয় কাবার হতে চললো।

সে বললো, কী খেয়েছিলে? ভাত?

—হ্যাঁ।

—কী দিয়ে খেলে?

—এক টুকরো মাছ ছিল।

—ঝোল?

—না, ভাজা।

—কী মাছ?

—রুইয়ের বাচ্চা-টাচ্চা হবে।

সে জিভে একটা শব্দ করে বলে উঠলো, তোফা! তারপর? আর কী ছিল?

—ডাল।

—একবাটি?

—হ্যাঁ।

সে লোভীর মতো মুখের আওয়াজ করে বললে, চমৎকার!

—খাওনি বোধ হয় অনেকদিন?

—খেয়েছি। মুড়ি। কাল-পরশু, দু' দিনই, সে বললে, ভাতের আর মাছের স্বাদ যেন ভুলে গেছি। তা, তুমি ওসব কোথায় পেলে?

বললাম, যে চালার ওপর বসে আছি, এই চালারই নিচে।

জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে এই বাড়িতেই ছিলে? কতদিন?

বললাম, কতদিন আবার? একদিন। কালই আমার এক বন্ধু এখানে এসে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, হবে, বিকেলের দিকে সব। তখন বৃষ্টি ছিল, হাওয়া ছিল, জলও ছিল, কিন্তু এমন করে ঘরবাড়ি গ্রাস করেনি।

—তোমার বন্ধুর এটা চেনা বাড়ি?

ভেবে বললাম, বোধ হয় না, তবে পাইপ-গানের সামনে টুঁ শব্দ করবে কে? বন্ধু আমাকে এখানে তুলে দিয়ে চলে গেল। এই চালার নিচে একটা আড়া আছে। আড়া মানে বোঝো ত? চালের নিচে আরেকটা চাতা বা বাঁশের তৈরি পাটাতন, যাতে জিনিসপত্র রাখা হয়।

সে একটু থেমে বললে, জানি। দরকার হলে আবার মানুষও ওখানে উঠে শুতেটুতে পারে।

ঠিক তাই, বললাম, আগের দু' দিন খুব খাটুনি হয়েছিল, ঘুমোতেও পারিনি, তাই আড়ায় উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ এক সময় দেখি বাড়ির লোকও ওপরে উঠে এসেছে, আর ঘরে জল, সেই জলে বোধ হয় মানুষ ডুবে যায়।

—তারপর?

বললাম, বাঃ! তুমি ইনটারেস্ট পাচ্ছো যেন?

—না পাবার কী আছে?

হেসে বললাম, তাহলে শোনো। বলার মতো অবশ্য কিছু নয়। আমি আড়ার এ-প্রান্তে, আর ওরা ও-প্রান্তে, বাক্সটাক্স নিয়ে কখন উঠেছে টের পাইনি। আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল, যেন আমি ডাকাত, যেন আমি ওদের খুন করতে এসেছি। কর্তা-গিন্নি, ছোট-ছোট দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। বড়ো মেয়েটা এমন ভয়ে-ভয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল, যেন আমি এখুনি তার ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়বো! আমি মনে-মনে হেসে কর্তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম, বন্যার জল যে ভীষণ বাড়লো। আরও বাড়বে নাকি? সে বললে, তা বাড়তে পারে। বললাম, তাহলে? তাহলে এরপর কোথায় যাবে? সে বললে, চালার ওপরে উঠবো। ব্যস, আর কোনো কথা নয়, খাওয়া-দাওয়া সব মাথায় উঠলো, ভয় ভয় চোখে শুধু জলের দিকে চেয়ে থাকা। আমার সম্বলের মধ্যে এই থলিটা। এটা আঁকড়ে ধরে আড় হয়ে শুয়ে আছি, তারপর দিন গেল, রাত এলো, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি জলে ভিজছি। অর্থাৎ জল আড়া ছাপিয়ে উঠছে। চমকে বিপরীত প্রান্তে তাকিয়ে দেখি ওখানে জনপ্রাণী বলতে কেউ নেই। মনে হলো, ওরা বোধ হয় কোনরকমে ওখান থেকে বেরিয়ে চালে গিয়ে উঠেছে। আমি ত ওদের চোখে ভয়ঙ্কর জীব, তাই আমাকে আর ডাকেনি।

—তারপর কি করলে?

বললাম, কষ্টেসৃষ্টে থলিটা নিয়ে চালে এসে উঠলাম। দেখি, চালেও ওরা নেই। ওরা ভেসে গেছে, কি অন্য কোথাও আশ্রয় পেয়েছে কিছুই জানি না। কলকাতার ছেলে হলেও সাঁতার শিখেছিলাম শখ করে, তাই বাঁচোয়া। নইলে চালে এসেও উঠতে পারতাম না।

সে একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। বোধ হয় আমার কাছ থেকে শোনা ঘটনাটাই মনে মনে পর্যালোচনা করছিল। এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে বললে, থলিতে কী আছে?

—উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

—সে বললে, পেটো? কটা?

চুপ করে রইলাম।

সে বললে, কী আর হবে ওতে? ছুঁড়ে ফেলে দাও। জঞ্জাল না থাকাই ভালো।

এবারেও কথা বললাম না।

সে বললে, কাছে সরে আসছেন না কেন।

বললাম, তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না বলে।

—কেন? না বোঝবার কী আছে?

বলে উঠলাম, কোন্ দলের?

এবার দেখলাম, সে-ই চুপ করে রইলো।

হেসে বললাম, কী? বলতে পারছো না ত?

সে বললে, কলকাতা থেকে গ্রামে কাজ করতে এসেছো না? অ্যাকসন-স্কোয়াড?

—এর উত্তর তো পাবে না।

সে একটুক্ষণ থেমে থাকার পর গম্ভীর গলায় বললে—দেখ, সোজাসুজি কথা বলাই

ভালো। তুমি বা তোমরা কারা, বোধ হয় বুঝতে পেরেছি। আমাদের গ্রুপ ছিল এ অঞ্চলে—আমরা তা ছাড়বো কেন? তাই বিরোধ। হ্যাঁ, বিরোধ তোমাদেরই সঙ্গে। এসো না, মীমাংসা করে ফেলি?

—কী করে?

সে বললে—রাতের অন্ধকার এখনো জমাট বেঁধে আছে, পরস্পরের মুখ ভালো করে চিনে নেবার সুযোগ এখনো নেই। কাছে এসে আমাকে জলে ঠেলে ফেলে দাও, কিম্বা আমি তোমাকে জলে ফেলে দেই।

—তাতেই কী মীমাংসা হবে? দুজনেই সাঁতার জানি, সাঁতরে গিয়ে কোনো গাছে-টাছে আশ্রয় নেবো।

অল্প একটু হাসলো, বললে, সোজা নয়। আমি সাঁতরে এসেছি আমি জানি। প্রবল ঘূর্ণিস্রোত পাক খাইয়ে কোথায় নিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই।

—তুমি এলে কী করে?

—প্রাণান্ত চেষ্টায়। এখানে না এসে পৌঁছতেও পারতাম।

বললাম, বেশ। সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু ঠেলাঠেলির প্রশ্ন উঠছে কেন?

বললে, আমরা ত তাই করতেই এসেছিলাম এ অঞ্চলে, তাই না? বন্যা না হলে—

থেমে গেল। বললাম, দাঁড়াও আসছি।

বলে, হাতের থলিটি সজোরে ছুঁড়ে ফেললাম জলে।

ও একটু চেঁচিয়েই উঠলো, বললে ওটা কী করলে?

জঞ্জাল যখন, তখন ফেলে দেওয়াই ভালো।

বলতে বলতে পকেট থেকে ছোট্ট ছুরিটা বার করে হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরলাম, তারপরেই হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে গিয়ে বসলাম। অতো অন্ধকারেও ছুরির চকচকে ফলাটা চিনতে কষ্ট হলো না, দেখি, ও-ও ওটা বার করে প্রস্তুত হয়ে আছে।

হেসে বললাম, খুব শার্প ত? টের পেয়েছো, আমিও ছুরি বার করেছি?

—তা পেয়েছি।

বললাম, ঠেলাঠেলির কথা ছিল, ছুরি-মারামারির নয়।

—তবে, তবু ওটা বার করলে কেন?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললাম, বোধ হয় এটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

—না,—সে গম্ভীর গলায় বললে—আসলে আমরা পরস্পরকে ঘোরতর অবিশ্বাস করি।

—সেটাই ত স্বাভাবিক।

সে বললে, চারদিক সব যখন প্রবল স্রোত এসে ডুবিয়ে দিয়েছে, তখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে স্থিতাবস্থার। এসো, ছুরিও জলে ফেলে দি।

বললাম, সে হয় না। তবে, ফলা গুটিয়ে পকেটে রাখতে পারি।

—রাখো।

বলে, সে কিন্তু ফলাটা গোটালো না, টিনের ওপর গড়িয়ে সেটা জলে ফেলে দিলো।

ছুরিটা পকেটে যথাস্থানে রেখে দিলাম। সে পকেট থেকে পিস্তলটাও বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। দিয়ে, আমার দিকে ফিরে হঠাৎ দু-হাতে আমার দুটো কাঁধ শক্ত করে ধরলো, বললে, কমরেড ভেবে দেখেছো, আমরা কী? হোয়াট আর উই?

—সৈনিক। জাস্ট সোলজার্স।

—অ্যান্ড অপোনেণ্টস।

—ইয়েস।

সে আমার কাঁধ দুটোতে অল্প ঝাঁকি দিয়ে বললে বাট, ফর দি টাইম বিয়িং, লেট আস বি হিউম্যান এগেন।

ওর হাত দুটো আস্তে সরিয়ে দিয়ে বললাম, কথাটার মানে কী? আমরা কি মানুষ নই নাকি?

—পাসির নট, সে বললে, আমরা এক বড়ো ইচ্ছার পতাকাবাহী যন্ত্র হয়ে গেছি।

—ইচ্ছা বলছো কেন, আদর্শ বলো?

—না, ওর সঙ্গে বুর্জোয়া সেণ্টিমেণ্ট জড়িয়ে আছে।

বললাম, হিউম্যান বলার পিছনেও কি সেণ্টিমেণ্ট নেই?

তার গলার স্বর কাঁপতে লাগলো, বললে, লেট আস বি সেণ্টিমেণ্টাল! শুধু আজ রাত্তিরটার জন্য। ফর্সা হোক তখন আবার পরস্পরের অপোনেণ্ট হবো। যন্ত্র হবো।

হাসলাম, বললাম, তুমি যে সব ফেলে দিলে?

—অকেজো বলে ফেললাম। কাজ চলবে জানলে ফেলতাম না।

—একটাতে কাজ চলতো। বুলেট থাকলেই কাজ চলতো।

—আঃ! কেন ওকথা বলছো? সে বলে উঠলো। বুলেট যখন আবার পাবো, তখন ওটাও আবার পাবো। লেট আস ফরগেট অল অ্যাবাউট ইট।

চুপ করে রইলাম। সে হঠাৎ আমার মাথায় হাত দিলো, চুলে আঙুল ডোবালো, বললে, ইস! জলে ভিজে! বলেই পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে আমার মাথাটা মুছিয়ে দিলো। আমি বাধা দিলাম না, স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে দোষ কী? সে তার মাথার ক্যাপ খুলে আমায় পরিয়ে দিলো। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বর্ষাতিটা খুলে আমার দেহে ঝুলিয়ে দিলো। বললে, শীতে কাঁপছো! খানিকটা গরম হবে।

—তোমার?

সে বললে, আমার জামা শুকোনো। সী?

বলে আমার হাতটা টেনে তার বুকের ওপর রাখলো, যেখানে শরীরটা যে আছে, তার স্পন্দন অনুভব করা যায়।

বললাম, দাদার সব তো হলো, কিন্তু পেটে যে খিদের মোচড় দিচ্ছে, তার কী হবে?

সে চোখ বুজে রইলো কয়েক মুহূর্ত, বললে—এক কাজ করা যাক। ভালো ভালো খাবারের কথা মনে করা যাক।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মায়ের শাঁখা আর রুলি-পরা হাত দুখানি মনে পড়লো। থালা-ভর্তি গরম ভাত, ঘি, পটল আর মাছ-ভাজা যেন আমার সামনে এগিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে উঠলাম, না সে হয় না।

সে বললে, হুঁ। কথাটা ঠিক, ওতে কষ্ট বাড়ে। ভাবতে গেলে বাড়ির কথা মনে হয়।

চুপচাপ রইলাম কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ এক সময় সামনে তাকিয়ে মনে হলো, জমাট কালিটা যেন তরল হয়ে যাচ্ছে, দিগন্তে যে কুয়াশার পুঞ্জ ছিল, সেখানে যেন গাছপালার সারি দেখতে পাচ্ছি। হাওয়া বইছে, কিন্তু তার সে রুদ্রবেগ যেন আর নেই। আমাদের ডান কোণে, অদূরেই একটা গাছের ঝাঁকড়া-মাথা, আমাদের বাঁ-দিকে পিছনে, জলে-ডোবা গাছগুলোর মাথা যেন স্পষ্ট আকার নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

বললাম, ভোর হচ্ছে নাকি?

উত্তর এলো, না ভোরের সামান্য আভাস মাত্র।

বললাম, আচ্ছা ধরা যাক, সকাল হলো, তখন কী করা যাবে?

বললে, রেস্‌কু-পার্টির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর কী?

—আসবে রেস্‌কু পার্টি?

—আসতেও পারে। আশা করতে দোষ কী?

বললাম, আমাদের দেখলেও রেস্‌কু করবে কী?

—কেন করবে না?

বললাম, কাগজে পড়েছিলাম, কোন্ এক বন্যায়, সবার আগে মিলিটারি নামিয়েছিল। এবারেও হয়ত নামাবে।

—সো হোয়াট? তাতে কী হয়েছে?

ওর মুখের দিকে তাকালাম। বেশ ফর্সা, সুন্দর মুখখানা। শুধু একটা কাঠিন্যের আভাস পাওয়া যায় চোয়ালের কাছে। চোখের নিচে এখন অবশ্য কালি পড়েছে, সারামুখে একটি ক্লান্তির ছাপ। বললাম, কী হলো? মিইয়ে গেলে মনে হচ্ছে? সে একটু ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার যেন চাঙ্গা হয়ে বসলো। বললে, বাড়ির কথায় বড্ড বাবার কথা মনে পড়ছে আমার। আমার বাবা ভীষণ হিউম্যানিস্ট। পরের দুঃখে মানুষের চোখে যে সত্যি সত্যি জল আসে, তা বাবাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

—কত দিন বাড়ি ছাড়া?

—তা, দিন পনেরো হবে।

কথা। এখনকার কথা ভাবো। পেটে অসহ্য ক্ষিদে নিয়ে কতক্ষণ লড়াই করবে তুমি?

কথা বলতে পারলাম না, ওর উত্তেজনার স্পর্শ আমার বুকের ভিতরটাতেও কী যেন এক অজানা আবেগ সৃষ্টি করলো, আমার কণ্ঠস্বর আটকে গেল।

ও সোজা হয়ে বসলো, তারপর নিজেকে সামলে অপেক্ষাকৃত ধীর গলায় বলতে লাগলো, আমি গাঁয়ের লোকগুলোর কথা ভাবছি, শিশুদের কথা ভাবছি, কোথায় গেল তারা? তাদেরই যদি সমাধি হয়ে যায় ত, কাদের জন্য তুমি-আমি কাজ করবো।

আমার একটা হাত ধীরে ধীরে ওর হাতটা স্পর্শ করে একটু চাপ দিলো। ও সেই স্পর্শে একটু কেঁপে উঠলো, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো, তারপরে মৃদু গলায় বললে, সকাল হয়ে আসছে। তার মানে সব-কিছু স্পষ্ট হয়ে আসছে। চারদিকে জল-জল আর জল। জলের স্রোত তীব্র বেগে পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে বিষের মতো, মৃত্যুর মতো। এর থেকে নিশীথ অন্ধকারই বোধ হয় ভালো ছিল।

হঠাৎ, আমাদের ডানদিকে, কোনাকুনি যে ঝাঁকড়া-মাথা গাছটা কিছু দূরে জল ছুঁয়ে রয়েছে, সেদিকে আমার চোখ সঞ্চারিত হতে হতে কী যেন দেখতে পেয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম, ওটা কী? চমকে সে ও তাকালো আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে। সাদা-সাদা পুঁটলি মতন কী যেন একটা আটকে রয়েছে গাছের ডালে। গাছের ডাল মানে, জলের ঠিক ওপরে, প্রায় জল ছুঁয়ে, গুঁড়িটা যেখানে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই হাঁড়িকাঠের মতন জায়গাটায় সাদা একটা বড়ো কাপড়ের পুঁটলি যেন জড়িয়ে রয়েছে। ও খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর হঠাৎ এক সময় প্রায় চিৎকার উঠলো, ওটা কাপড়ের পুঁটলী, না, মানুষ?

—মানুষ!

—হ্যাঁ, একটু নড়ছে-চড়ছে মনে হচ্ছে না। ভালো করে দেখো।

সূর্য জলভরা মেঘে ঢাকা, তবু এটা প্রভাতকাল। দেখতে দেখতে মনে হলো, একটা মানুষের দেহ যেন মাঝখানে দুমড়ে হাঁড়িকাঠের ওপর পড়ে রয়েছে। এবং সেটা একটু নড়ছে-চড়ছে এটাও বেশ বোঝা যায়।

ও আমার হাত চেপে ধরলো, বললে, নির্ঘাৎ মানুষ এবং জ্যান্ত।

আমি অবাক হয়ে সেই গাছটার দিকে লক্ষ করছিলাম। গাছটা না বলে হাঁড়িকাঠ বললেই ভালো হয়। মনে হলো, ওখানে দেহটা যেন ঘুরছে, মনে হচ্ছে ঝুলে-পড়া একরাশ চুলও যেন দেখতে পেলাম।

ও বলে উঠলো, মেয়েছেলে। দেহটা দুমড়ে আছে, কোমরের কাছ থেকে মাথাটা বিপরীত দিকে ঝুঁকে আছে। ওঠাতে চেষ্টা করতে পারছে না।

—এটা কীরকম হলো?

ও বললে, আমি বুঝতে পেরেছি। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। জ্ঞান ফিরে আসতে ছটফট করছে। মনে হাত দিয়ে কিছু ধরতে পারছে না। মনে হচ্ছে, বাঁচবার চেষ্টা করছে।

আমি ভ্রূদুটো কুঁচকে বললাম, সাদা শাড়ি পরা, না?

—হ্যাঁ, সাদা শাড়ি, আর কালো পাড়।

—ছিপছিপে গড়ন।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। মাথায় অনেক চুল।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, এই বাড়ির মেয়ে নরত?

—এই বাড়ির মেয়ে, মানে?

বললাম, ঐ যে আড়ায় উঠেছিলাম তোমাকে বলেছিলাম না? মেয়েটা বিপরীত দিকে আড়ায় বসে, মা-বাবার আড়াল থেকে আমার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়েছিল? আমার মনে হচ্ছে সেই মেয়েটা। আঠারো-উনিশ বয়েস হবে।

ও বললে, সে যাই-ই হোক, কিন্তু চোখের সামনে এটা দেখবো?

—কী?

ও বললে—মেয়েটা বাঁচবার চেষ্টা করছে, আমরা ওকে রেসকিউ করবো না?

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, কিভাবে রেসকিউ করবে!

ও বললে, এসো না, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সাঁতরে ওই গাছটাতে উঠি।

—তারপর?

—মেয়েটিকে বাঁচাই?

—বাঁচিয়ে?

—এখানে নিয়ে আসবো।

—এখানে যদি স্রোত ঠেলে ওকে নিয়ে আসতে না পারো?

—তাহলে গাছটাকেই আশ্রয় করবো।

বললাম, তখন হবো আমরা তিনজন।

—হলাম। তাতে কী?

—অর্থাৎ তিনজনে মিলে এক সঙ্গে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা।

—মৃত্যু কেন, জীবন। রেসকিউ পার্টি যদি আসে?

—এলো। কিন্তু তারপর?

—আমরা বেঁচে গেলাম।

বললাম, না। জেলে গেলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকেও ওরা—

ও বলে উঠলো, আঃ! মেয়েটাকে ওরা টরচার করবে কেন? মেয়েটা ত আমাদের কেউ নয়।

—ওরা বিশ্বাস করবে কেন?

ও একটুক্ষণ থেমে কথাটা ভাবলো। তারপরে হাতদুটো তুলে একটা ভঙ্গি করে বলে উঠলো, ভুলোর যাক এসব পরের কথা। আপাতত ওকে উদ্ধার করাই উচিত। এসো।

বলে, ছেলেটা আর অপেক্ষা করলো না, সন্তর্পণে করে টিলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ঝপ করে জলে পড়লো। আর আশ্চর্যকাণ্ড আমার শরীরটাও আমার বারণ না শুনে সেই বর্ষাতি-পরা অবস্থায় ওর পথই অনুসরণ করে জলে গিয়ে পড়লো। প্রথমটায় অনুভব করিনি, কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম, অনুকূল স্রোত বইলেও স্রোতের প্রতিকূল আমাদের টেনে নিচ্ছে অন্যদিকে, হাঁড়িকাঠের দিকে যেতে দিচ্ছে না। ও প্রাণপণে মুখ ঘুরিয়ে গাছের দিকে যেতে লাগলো, আর আমার মিইয়ে-পড়া ঝিম-ধরা শরীরেও যে কোথা থেকে বল এলো কে জানে, আমিও স্রোতের টান উপেক্ষা করে হাঁড়িকাঠের দিকেই এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমাদের লক্ষ্য এখন এক,—হাঁড়িকাঠ। যেরকম করেই হোক হাঁড়িকাঠে যেতেই হবে; যে অশরীরী কাপালিক মেয়েটাকে হাঁড়িকাঠে ফেলে বলি দিতে চায়, তার হাত থেকে মেয়েটাকে যে-করেই হোক বাঁচাতেই হবে। ছেলেটা সাঁতরে ঠিক পথ করে নিচ্ছে, আমিই বার বার স্রোতের টানে গিয়ে পড়ছি, কারণ, আমার সাঁতরাতে অসুবিধা হচ্ছিল, গায়ে পলিথিনের বর্ষাতিটা থাকায়। কিন্তু লক্ষ্যের দিকে দুর্জয় ঐকান্তিকতা থাকলে শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সুফল ফলে। আমরা হিউম্যানিস্টের মতো মেয়েটাকে উদ্ধার করতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ও আগে, আমি পরে। মেয়েটিকে ও কী কৌশলে কাঠ-গড়া থেকে ছাড়িয়ে গাছের গুঁড়ির ওপরে বসিয়ে দিলো, সেটা বুঝলাম না। আমি একটা ঝুঁকে-পড়া ডাল ধরে ওদিকে আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে দেখলাম, মেয়েটা সর্বাঙ্গ সিক্ত অবস্থায় ওখানে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছে। ছেলেটা পাশের একটা মোটা ডালে উঠে বসেছে।—কখনও নড়বেন না, চুপচাপ বসে থাকুন। কোনো ভয় নেই।

মেয়েটা মুত্তকল্প চোখ দুটি তুলে ছেলেটিকে দেখতে চেষ্টা করছে। আমি গাছের ডাল ধরে ধরে কাছাকাছি গিয়ে পড়লাম। আমার নিম্নাংশ জলের তলায়, হাত দুটো উঁচু করে ডাল ধরে আছে। মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। ফ্যাকাসে মুখ, জলে ভেজা। আমি চমকে উঠলাম। সেই ঐ বাড়ির মেয়েটাই যে আড়ায় উঠে আমার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়েছিল। কোনক্রমে বললাম, চিনতে পারছো আমাকে? তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছিলাম। তোমরা খাওয়ালে। আমি আড়ায় ছিলাম। বন্যা বাড়তে তোমরাও এসে উঠলে?

মেয়েটি হাঁপাচ্ছিল। আমার মনে পড়লো, বন্ধু যখন আমাকে প্রথম ওদের বাড়ি নিয়ে আসে আমাকে রাখবার প্রস্তাব নিয়ে, ওর বাবা রাজি হয়নি, বিরক্ত হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বারবার বলছিল,—না-না। কিন্তু পরক্ষণেই সে রাজি হলো আমাদের হাতে বন্দুকের নল দেখে। অর্থাৎ ভয় পেয়ে সে সব কিছু মেনে নিয়েছিল। আমরা কে, কী করতে চাই, কী আমাদের লক্ষ্য,—সেসব আমরা তাকে বুঝিয়ে বলিনি, শুধু ভয় দেখিয়েছি, প্রাণের ভয়।

কিন্তু থাক সে পুরনো কথা। আপাতত দেখছি, মেয়েটি হাঁপাচ্ছে, দম নিচ্ছে, মুখখানা সাদা, শুকনো; বহুদিন ধরে হাসপাতালে শুয়ে থাকলে যেরকম চেহারা হয়, ঠিক সেই রকম চেহারা। অথচ বাড়িতে আড়ার ওপর যখন ওকে দেখেছিলাম, তখন এ-রকম ছিল না। ফর্সা-ফর্সা সুশ্রী মুখখানার আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীরে একটা কোমল মাধুর্যের দ্যুতি ছিল।

এ সবই আমার মুহূর্তের চিন্তা। মেয়েটা আমার কথা শুনে হাঁপাতে হাঁপাতেও আবার আমার দিকে ধীরে ধীরে চোখ ফেরালো। অবসাদে সে যেন ভেঙে পড়ছে। হাঁড়িকাঠের আশ্রয়ে বসে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে দেহের ভর রাখছিল মোটা ডালটার ওপর। আমাকে দেখতে-দেখতে ওর ঐ পাণ্ডুর মুখের ভাবও বদলে যেতে লাগলো। চোখ দুটি বিস্ফারিত করে উঠলো, আতঙ্কে ওঠার মতো করে আমার দিকে তাকালো। যেন এখুনি ক্ষুধার্ত হায়নার মতো ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বো, এই রকম একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠলো ওর চোখে-মুখে।

দেহটা যেন দুলছে, এখ্‌খুনি পড়ে না যায়। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ওর দিকে আরও একটু এগিয়ে গেলাম। কী যেন বলেও ছিলাম, কিন্তু আতঙ্কে বোধ-হয় সে ভারসাম্য রাখতে পারলো না, টলে পড়ে গেল। মাটির প্রতিমা বিসর্জনের দিনে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে ঠেলে ফেলে দিলে যেমন খানিকটা চিৎ হয়ে প্রতিমাটি জলের মধ্যে মিশিয়ে যায়, তেমনি ঝুপ করে একটি শব্দ তুলে সে যেন মিলিয়ে গেল।

ছেলেটি এতসব বুঝতে পারেনি। সে আর্ত চীৎকার করে উঠলো, —একি! পড়লো কী করে? বলতে বলতে সে-ও ঝাঁপ দিল জলে। আবার একটা ঝুপ করে শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে খুঁজে বেড়ায় সে। পাগলের মতো খুঁজছে, জল তোলপাড় করছে। তাকে খুঁজে বার করতে না পারলে যেন তার জন্ম বৃথা! সারাজীবন ধরে সে যেন খুঁজে বেড়াবার জন্যই পৃথিবীতে এসেছিল। খুঁজতে খুঁজতে চলেছে সে। হয়ত সফল হবে, হয়ত হবে না। কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমি ধীরে সুস্থে হাঁড়িকাঠে উঠে বসে আছি। আমি ভয় আর আতঙ্ক সৃষ্টি করেই ওদের সংসারের সামনে এসেছিলাম, নিজের কোনো কোমলতার পরিচয় প্রথম আবির্ভাবের সময় ওদের সামনে তুলে ধরতে পারি নি। পারলে, অর্থাৎ নিজেকে বোঝাতে পারলে এখন আমাকে দেখে ও অমন করে আতঙ্কে কেঁপে উঠে ভারসাম্য হারাতো না।

ছেলেটি উন্মত্তের মতো তখনো খুঁজছে। কখনো স্রোতের অনুকূলে খুঁজছে, কখনো প্রতিকূলে। কখনো দূরে যাচ্ছে, কখনো কাছে আসছে।

আর আমি? আমি স্থির হয়ে হাঁড়িকাঠে লগ্ন হয়ে বসে রইলাম। এখন এই কঠিন হাঁড়িকাঠ বা যূপকাষ্ঠই আমার আশ্রয়।

(দি ৬)

পাহাড়ী সান্যাল

মানুষ অতুলপ্রসাদ

॥ চোদ্দ ॥

পৃথিবীতে এতদিন জীবন কাটানোর ফলে একটা কথা খুব ভাল করে বুঝতে পারি যে, যে-বয়সের কথা আমি পাঠকদের কাছে লিখছি, সে-বয়সে—অন্তত তখনকার দিনে—আমি আমার মনের কথাগুলো ভেবে সহজেই বিভোর হয়ে থাকতে পারতাম। যে কথাগুলো না বুঝতে পেরে মনে মনে ছটফট করেছি, সেই ছটফট করার মধ্যেও যেন কেমন একটা সহজ আনন্দ ছিল। কখনো মন ভারাক্রান্ত হয়েছে, তার ফলে অবসন্ন বোধ করেছি, কিন্তু বিষাদ আসেনি। মনের অবসন্নতা কেমন যেন আমাকে আরও একাগ্র করে তুলেছে। চিত্তের ওই চঞ্চলতাকে প্রশ্রয় দিতে তখন অসম্ভব রকম ভাল লেগেছে।

তখনকার দিনে মনের সেই অস্থিরতাটা আমার অজান্তে আমার চেহারার মধ্যে নিশ্চয় ফুটে উঠেছে। কারণ মনের চেহারাটাকে মুখোস দিয়ে ঢেকে রাখতে তখনো শিখিনি। আর সেইজন্যই বোধহয় অতুলদা আমার মনের অস্থিরতার সন্ধান পেয়েছিলেন আমার চেহারার মধ্যে।

আজকের দিনে আমি ভণ্ডামী করে এ কথাটা বলতে শিখেছি যে আমি জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আসলে আমি একটা মেকির মুখোস আমার নিজের চেহারায় ভাল করে এ'টে নিতে শিখেছি। আমার মনের ক্যানভাসের আসল রূপটা ঢাকবার জন্য সেই মুখোসের গায়ে নানারকম রঙ ফলাতে শিখেছি। আমার inhibition ও Complex-এর চেহারাগুলো পাছে ধরা পড়ে, তাই আমি সেগুলিকে মোটা তুলি দিয়ে আঁকতে শিখেছি।

সেই রাতে বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখনো মন সুস্থির নয়। ঘরে বসে মনে হল সারা পৃথিবীর যত অস্বস্তি সব যেন আমায় ঘিরে ধরেছে। মনের অবচেতনে যা সব ঘটছে সচেতন মন তার নাগাল কিছুতেই পাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হল সন্ধ্যার সময় মিউজিক স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই কালো মেয়েটির মনে আবার আমি অযথা আঘাত দিয়েছি। আর সেইজন্যেই হয়তো সে অন্যমনস্কতার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল তখন। বুঝতে পারলাম, তাকে ব্যথা দিতে গিয়ে নিজেই ব্যথা পেয়েছি বেশি। আবার মনে হল যে, এই ব্যথা পাওয়া এবং দেওয়ার খেলায় কোথায় বুঝি একটা আনন্দও আছে।

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে উঠেই মনে [illegible]

সেটা আজ কেমন করে কেটে গেছে জানি না। সারা দিন সন্ধ্যার উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় থেকে সেই সন্ধ্যা যখন এল তখন আরও উদ্‌গ্রীব হয়ে কিসের সন্ধানে যেন বেরিয়ে পড়লাম।

হেমদিদের বাড়ি গিয়ে দেখি আরও কারা যেন এসেছেন বেড়াতে। ফলে অতিথি সৎকারের পালা চলেছে। প্রতিভাকে দেখলাম চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত। তার ওই ব্যস্ততাটুকু দেখতে ভারি সুন্দর লাগল। পরক্ষণেই আবার মনে হল, দূর ছাই, মানুষের বাড়িতে এত অতিথির ঘটা ঘটেই বা কেন?

মনের চাঞ্চল্যটা তখন নাগালের মধ্যে সংযমের যত দড়িদড়া খুঁজে পেলাম তা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখলাম। সব বিরক্তি চেপে রেখে বেশ হাসিমুখেই সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিলাম।

কিছু পরে অতিথিরা বিদায় নিতে আরম্ভ করলেন। হেমদি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই যেন এখনই চলে যাস না পাহাড়ী।"

শুনে মনে হল, আহা, এ যেন মধুক্ষরণ।

অতিথি বিদায়ের পালা শেষ হলে প্রতিভা এসে জিজ্ঞেস করল, "আর এক পেয়ালা চা খাবেন নাকি?"

ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওকে কেমন যেন সুন্দর লাগছে দেখতে। আমি অকারণেই বলে উঠলাম, "আপনার সঙ্গে যেভাবে রূঢ় ব্যবহার করি তার পরেও কি আমাকে চা দিতে ইচ্ছে করছে আপনার?"

মেয়েটি যেন কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "কি হল, নিজের পায়ে কি নিজেই কুড়ুল মারলাম! চা বুঝি আর পাওয়া যাবে না?"

মেয়েটি বলল, "থাক, কুড়ুল যখন আমার পায়ে পড়ে নি তখন হেঁটে গিয়ে চা করে আনতে আমার কষ্ট হবে না।"—এই বলে একটু হেসে সে চা করতে চলে গেল।

তার চা করবার খুঁটিনাটি ব্যাপার সব দেখতে লাগলাম বটে, কিন্তু সেটা শুধুই তাকিয়ে দেখা মাত্র। আমার মনের দৃষ্টি তখন হৃদয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি যে খুঁজে বেড়াচ্ছে তা দৃষ্টি আমার বুঝল না। সে তখন হৃদয় সাজাবার সৌন্দর্য সম্ভারের মধ্যে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি খুঁজছে তা বুঝতে পারছে না, কিন্তু সব কিছুই যেন তার কাছে আরও সুন্দর লাগছে।

হঠাৎ চমক ভেঙে শুনলাম, "চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—"

কথা শুনে কি দৃষ্টিতে প্রতিভার দিকে তাকিয়েছিলাম জানি না, কিন্তু তার দিকে ভাল করে চোখ তুলে দেখি, ওর ওই কালো চেহারাতেও কোথায় যেন রক্তের আভা ফুটে উঠে উঠেছে। তার দিকে তাকিয়ে থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিতে গিয়ে অজান্তে কেমন করে তার আঙুলগুলো আমার আঙুলে ঠেকে গিয়েছিল জানি না। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল হৃদয় সাজাবার সামগ্রীগুলো কেমন যেন আনন্দের সাড়া তুলল সারা মনে। আমার বিহ্বল কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, "ঠাণ্ডা চা খাওয়া যে আমার অভ্যেস আছে সেটা তো তোমার অজানা নয়।"

কথাটা বলেই চমকে উঠলাম। হঠাৎ তাকে 'তুমি' বললাম কেন? পার্থিব প্রথা অনুযায়ী বললাম, "সরি।"

সে চোখ দুটো আরও বড় করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

আমি বললাম, "সভ্যতাবিরুদ্ধ কাজ করেছি। 'তুমি' বলে ফেলেছি। অন্যমনস্ক হয়েই বলে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না।"

সে কি যেন একটা কিছু ঢাকতে গিয়েও মুখ ফুটে বলল, "অন্যমনস্কতা বজায় রাখলেই বা ক্ষতি কি?"

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

এমন সময় হেমদি হঠাৎ এসে বললেন, "কি রে, আবার চা খাচ্ছিস নাকি।"

আমি বললাম, "খাচ্ছি না, খাব।"

হেমদি বললেন, "তাহলে শরবৎ খেলেই পারতিস। ওটা কি আর চা আছে!"

আমি প্রতিভার দিকে এক পলক তাকিয়ে কেন জানি না বলে উঠলাম, "ঠাণ্ডা হলেও মিষ্টিটা কমে নি।"

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে যে অন্ধকার ঘিরে আসে সেটা যেন সেদিন খেয়ালই ছিল না। হেমদিদের বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল, তাইতো, অন্ধকার হয়ে গেল যে!

আমার মনে কিন্তু সে সময় ভীষণ আলো। ওই আলোর পথ ধরে এবং রেশ নিয়ে মন চাইল অতুলদার কাছে ছুটে যেতে। গিয়ে দেখি অতুলদা বাড়িতেই রয়েছেন। আমাকে আদর করে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে আমিও অত্যন্ত আদরে হাসি হেসে বললাম, "আজ একটা খুব ভাল দেখে গান শিখিয়ে দাও তো অতুলদা।"

ভীষণ আবদার করে বলেছিলাম কথাটা। দেখলাম অতুলদার মুখটাও কেমন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, "শেখার ঝোঁক। চমৎকার একটা গান তোমায় আজ শেখাব।"

যে গান শিখলাম তার প্রথম ছত্রটি হল,

"জল কহে চল মোর সাথে চল/তোর আঁখিজল হবে না বিফল।" [গায়ক-গায়িকারা সকলেই গান "জল বলে চল"। বইতে ছাপাও তাই আছে। কিন্তু আমার মত যারা অতুলদার কাছ থেকে এ গানটি শিখেছে, তারা শিখেছিল "জল কহে চল"।]

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই গানখানি তুলে নিতে পেরেছিলাম। পূর্ণাঙ্গ গানখানি যখন অতুলদাকে শোনালাম তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাঃ, বা পাহাড়ী! কি সুন্দর তুমি গেয়েছ। এমন করে আমার গান গাইলে যেন আমার মনে হয় বুঝি আমার আয়ু বেড়ে গেল।"

কথাগুলি বলতে বলতে অতুলদার চোখ দুটো যে ছলছল করে উঠেছিল তা আমার খুব ভাল করেই মনে আছে। আমার তখন মনে হল, এই তো সেই পরম মুহূর্তটিকে আবার আমি খুঁজে পেয়েছি।

সেদিন কোথা দিয়ে যে সন্ধ্যাটা কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। অতুলদা আমায় বললেন, "আমাকে আরও কিছু গান শোনাও পাহাড়ী।"

আমি ঠুংরী, দাদরা ইত্যাদি নানান রকমের গান তাঁকে শোনালাম। সেদিন গায়কেরও যেমন একাগ্রতা, শ্রোতারও তেমনি তন্ময়তা।

এর মধ্যে খানসামা দুবার এসে বলে গিয়েছে, "হুজুর, মেজ্ তৈয়ার হ্যায়।" অর্থাৎ চলতি ভাষায় আমরা যাকে বলি, টেবিল তৈরী আছে।

অতুলদা হাতের ইশারায় তাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন, আর উঁচু গলায় হাসতে হাসতে আমায় বলেছেন, "আজ বুঝি গানের মধ্যে দিয়েই পেট ভরানো যায়। খাবার কথা মনেই পড়ছে না।"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেশ লাজুক লাজুক ভাবে, তাঁর কথা বলার সে বিশেষ ভঙ্গীটিতে তাঁর সরল অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যেত সেই ভঙ্গীতেই বললেন, "আমার...মানে আমার কাছ থেকে শেখা গান...মানে...তার দু' একটা গাইবে নাকি?"

এ ধরনের অনুরোধ অতুলদা সচরাচর করেন না। তাঁর কথা শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত মনে একের পর এক অতুলদার শেখানো গান গেয়ে চললাম। সে এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সন্ধ্যায়।

মনে আছে রাত প্রায় দশটার সময় খেতে বসেছিলাম। খেতে খেতে অতুলদা বললেন, "কাল সন্ধ্যায় তোমাকে ওরকম অবস্থায় দেখে বড় দুঃখ পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম, আবার কবে তুমি আসবে। আজ তুমি এসেছ, খুব খুশি হয়েছি। আজ তোমায় দেখে কি মনে হচ্ছে জান, মনে হচ্ছে যেন কোন একটা আলোর সন্ধান তুমি পেয়েছ।"

এই যে এতক্ষণ সময় অতুলদার সঙ্গে পরম আনন্দে কাটালাম, আমার মনে হয়, কিছুটা দূরে থেকেও সেই কালো মেয়েটিও বোধ হয় সেই আনন্দের অংশ-ভাগী ছিল।

এর পরে ঘটনাচক্রে অতুলদার সঙ্গে প্রতিভার পরিচয় হয়েছিল। আমিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। [সে কথায় পরে আসছি।

ক্রমশঃ]

॥ চুয়াল্লিশ ॥

থানার একটা ঘরে গিয়ে আমরা জমা হলাম সবাই। বাড়িটার সামনে একটা পার্ক আছে নজরে পড়ল। ছোটখাট পার্কটা। সেন্ট জেমস্‌ স্কোয়ার, বলতে শুনলাম একজনকে।

মুচিপাড়া থানায় নিয়ে এসেছে আমাদের, সে জানালো।

ঘরজুড়ে আমরা গুলতানি পাকাচ্ছি সবাই মিলে।

রিনি আর আমি একধারটিতে বসে গল্প করছিলাম। দেবেনও ছিল কাছাকাছি।

একেকজনকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল পাশের ঘরে। ওসির কাছে। যে যাচ্ছিল সে আর ফিরে আসছিল না।

তার পরে ডাক পড়ছিল আরেকজনের।

'ফিরছে না কেন ওরা? গালে হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে নাকি? না, কী করছে কে জানে!' আমার আশংকা প্রকাশ পায়।

'না না। নাম ধাম জিজ্ঞেস করে লক-আপ্‌-এ নিয়ে পুরছে। সেখানে আমাদের সবাইকেই পুরবে, দ্যাখো না।'

'লক-আপ্‌টা কী ব্যাপার ভাই?'

'থানার হাজত বলে না? তাই।' দেবেন বলে, 'সারা রাত আজ হাজতবাস আমাদের। কাল সকালে দশটার সময় সবাইকে প্রিজন্‌ভ্যানে করে ব্যাংশাল কোর্টে হাজির করবে। সেখান থেকে একেবারে সটান জেলখানায়।'

'আমি ফ্রক না পরে শাড়ি পরে এলে বোধ হয় ভালো করতাম।' রিনি বলল মাঝখান থেকে।

'কেন, এ কথা বলছিস কেন?'

'বড় দেখাত আমায়। শাড়ি পরলে মেয়েদের বড়সড় দেখায় না? তা হলে আর ওরা বয়েস টের পেত না আমার.....ছাড়া পেতুম না...ছেড়ে দিতে পারত না আমাকে।'

'তা বটে! এমনিতেই তো মেয়েদের বয়েস টের পাওয়া যায় না! শাড়ি পরলে তো আরও।' তার কথায় আমি সায় দিই।

'ফ্রক পরলে কেমন বাচ্চা বাচ্চা দেখায় না? খুকী ভেবে আমায় ছেড়ে দেয় যদি? শাড়ি পরলে আমি নিজেকে চব্বিশ বলে চালিয়ে দিতে পারি। অনায়াসেই।'

'কেন বলেই তোমায় ছেড়ে দেবে ওরা, খুকী বলে নাকি?' দেবেন ঠাট্টা করে।

'তা হলে আমি দেখে নেব...কালকেই দেখে নেব ওদের...' বলতে বলতে তারও ডাক এসে গেল।

সেও পাশের ঘরে চলে গেল। সেও ফিরল না তারপরে আর।

'লক-আপেই পুরেছে। ছেড়ে দিলে সে নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা করে যেত। যেত না? এ ঘরে তার আসার তো বাধা ছিল না কোনো।'

দেবেন আমায় ভরসা দেয় বটে কিন্তু তার কথায় কোনোই আমি সান্ত্বনা পাই না। এবারও রিনি তার ঠিক ঠিকানাটা দিয়ে যায়নি। কে জানে সে আবার আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল কি না! এবারে একেবারে চিরদিনের মতই হয়ত বা।

মুচিপাড়া থানার থেকে আমরা সেই রাত্রেই লালবাজারের হেডকোয়ার্টারে রওনা হয়ে গেলাম।

প্রিজনভ্যানে উঠে আমি দেবেনকে বলি, 'রিনি কোথায়? সে তো কই নেই আমাদের সঙ্গে এই ভ্যানে?'

'একটাই ভ্যান ছিল নাকি? পাঁচ পাঁচটা ভ্যানে করে এলাম না আমরা? সেই পার্কের

দিয়েছে। ঠিকই রয়েছে সে।'

আহা, তাই যেন হয় গো। মনে মনে বলি। তাই ভেবে ভরসা পেতে চাই নিজের মনে।

কিন্তু না, লালবাজার লক-আপ-এ গিয়ে যখন আমরা নামলাম, সেখানেও দেখা গেল না রিনিকে।

'তুমি যে বললে সে আমাদের সংগে এসেছে? কোথায় সে?' শুধাই আমি দেবেনকে।

'আলাদা ঘরে রেখেছে।' জবাব পাই দেবেনের—'মেয়েদের ছেলেদের সংগে রাখে নাকি কখনো? বিশেষ করে এই রাত্তির বেলায়?'

'রাখে না? কেন রাখে না? কী হয় রাখলে?'

'কী হয় কে জানে! কেন রাখে না তা কে বলবে! তবে রাখতে নেই নাকি। রাখে না যে তাই জানি।'

রিনিকে এখানে রাখলে, আমাদের সংগে থাকলে কী যে ওর ক্ষতি হত আমি তো তা ভেবে পাই না। এমন বিচ্ছিরি লাগে আমার যে!...জেলে যাওয়াটাই যেন কেমন ব্যর্থ বলে মনে হতে থাকে।

যে জেলখানা স্বর্গোদ্যানের ন্যায় চোখের সামনে উদ্ভাসিত ছিল তা যেন পলকের মধ্যে অশোকবনের মত নির্বাসিত হয়ে যায়। সব আলো যেন নিবে যায় এক লহমায়।

লালবাজারের হাজতঘরে পৌঁছানোর পরে আমরা চা আর টোস্ট পেলাম। দেবেন বলল, 'রাতের মত এই যা খেলে। এর পর চারিমত্তর! এসো এখন শুয়ে পড়া যাক আরাম করে—কী বলো?'

সকালে উঠে আবার আমরা সেই এক কাপ চা আর খান দুই টোস্ট পেলাম।

কিন্তু রাতউপোসী খিদে কি তাতে বাগ মানে? পেট চুঁই চুঁই করতে লাগল আমার।

'আর কিছু খেতে দেবে না এরা? একদম না?' আমি কুঁই কুঁই করি—'আবার কখন খেতে দেবে তাহলে?'

'এখানে বোধ হয় আর নয়।' দেবেন কয় 'দুপুরে টিফিনের সময় সেই আদালতের লক আপ-এই যা চা টোস্ট পেলে—দেবে হয়ত—এই রকম আবার। সেখান থেকে জেলে নিয়ে যাবার পর সেইখানেই মিলবে আমাদের ভরপেট খাবার। ডাল রুটি তরকারি—বেশ মোটা মোটা রুটি পাতলা পাতলা ডাল আর জংলী যত তরকারি। সন্ধ্যার আগেই খেতে দেবে সবাইকে। খাইয়েই ঢুকিয়ে দেবে যার ঘর সেলে।'

'সেই সন্ধের সময়?' শুনেই আমি মুষড়ে যাই। তার কথাটা কেমন যেন খট্ করে কানে লাগে—খট্‌কাটা লেগেই থাকে।

'জংলী তরকারিটা কী ভাই?' উদ্‌গ্রে উঠি আমি তার পরেই। জানতে চাই।

'বনজঙ্গল কেটে বানানো। পাড়াগাঁর ঝোপঝাড়ে যে সব কাঁটা গাছকাছ আর আগাছা গজায় না? তাই সব কেটে ছেঁটে নিয়ে আসে কোথ্‌থেকে। তারই ঝপাখিচুড়ি করে দারুণ এক ঘাঁট বানায়। যত খুশী খাও—যত চাও। এন্‌তার দেবে।'

'কী রকম খেতে?'

'ওই একরকম।' সে বলে—'রোজই ওই একরকম। রোজ বিকেলেই ওই রুটি তরকারি। সকালে ঘুম থেকে উঠে অবশ্যি কিন্তু অন্য রকম—গাদাখানেক লপ্‌সি দেবে তোমায়—মুখ ফেরাতে পারবে তখন। খাও না কবে যত খুশি। পেটভর্তি পাবে তোমার।'

'লপ্‌সিটা কী জাতীয়? কি রকম আবার?'

'ডালে চালে মেশানো ঘণ্টের মতন।'

'ও! খিচুড়ি! তাই বলো না! সে তো খেতে ভালোই হে! খাসা! উপাদেয়।'

'খাসা? হ্যাঁ, খাসাই বটে।' দেবেনের স্মিত দেখি না—'সকালে খিদে পেটে খেতে মন্দ লাগে না বলতে কি!'

'রোজ দেয়? ঐ লপ্‌সি—রোজ রোজ?'

'রোজ রোজ।' সে বলে—'কিন্তু সে ওই সকাল বেলাতেই কেবল।'

'তবে তো ভালো। খুবই ভালো তা হলে।' এতক্ষণে আমি উৎসাহ পাই, লালায়িত হয়ে উঠি—'সকালবেলাতেই আমি অনেকখানি করে নিয়ে রাখব। আর সারা দিন ধরে খাব—একটু একটু করে—যখনই আমার খিদে লাগবে। ওই লপ্‌সিই তো আমি মল্লিকবাড়ির সদাব্রতে খাই হে। সেখানকার ভান্ডারায় তাই তো দেয়!'

লপ্‌সির কথায় মল্লিকবাড়ির স্মরণে খিদেটা যেন চাগাড় দিয়ে উঠল আরো। পেটের ভেতর ছুরি মারতে লাগল কেমন!... এমন সময় অভাবনীয় এক আবির্ভাব!

জনকতক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক চাংগারি চাংগারি পুরি কচুরি লাড্ডু চাপাটি প্যাড়া বরফি হালুয়া বালুসাই নিয়ে হাজির, আমাদের সবাইকে খাওয়াবার জন্যই। অযাচিত অভাবিত আমন্ত্রণ!

'আরে! এ লোকগুলো যে আমাদের চেনা রে।' দেবেন চেঁচিয়ে উঠেছে আচম্‌কা।

'চেনা কি রকম? আমি জানতে চাই—'আমি তো কস্মিনকালেও দেখিনি কাউকে এদের।'

'আমি দেখেছি। অনেক অনেক দিন

দেখেছি। এরা সব বড়বাজারের মাড়োয়ারি পট্টির মারাঠী গুজরাটি ব্যাপারী যত। বিলিতি কাপড় ব্যাচে এঁরা সবাই। বড়বাজারে দিনের পর দিন এদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করেছি আমরা। কোনো খদ্দেরকে কিনতে দিইনি কিছু, ঢুকতেই দিইনি দোকানে—এদের চিনব না?'

'বলো কী হে?'

'এরাও চিনে রেখেছে আমাদের। ভালো করেই চিনে রেখেছে। কত দিন আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছি—এরা সব চিনে রাখছে আমাদের লক্ষ করছিস? এদের যা ক্ষতি করছি না আমরা? কোনদিন গুন্ডা লেলিয়ে দেবে আমাদের পেছনে। গুমখুন করবে আমাদের। মওকা পেলেই হয়ত বা খতম্ করে দেবে আমাদের দেখিস্।' আড়ালে আবডালে অলিগলিতে সেই সব গুন্ডারা বেটপকা পেলে বেমক্কা ... লাগাবে আমাদের।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই আমাদের ধারণা হয়েছিল। যাদের আমরা লাখ লাখ টাকার লোকসান করেছি তারাই আজ খাবার নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছে আমাদের! আশ্চর্য!'

'মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য!' এই বলে অম্লানবদনে তাদের পুরি কচুরি মুখের মধ্যে পুরতে থাকি আমরা।

খেয়েদেয়ে হাঁক ছাড়ি—'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়'।

খাইয়ে দাইয়ে খুশী হয়ে হাসি মুখে চলে যায় তারা সবাই।

লক-আপের পাহারোলারাও মৃদু স্বরে আমাদের জয়ধ্বনিতে যোগ দিয়েছে। আমাদের পুরি কচুরির ভাগ তারাও পেয়েছিল কিছু কিঞ্চিৎ। সেখানকার ঝাড়ুদাররাও বঞ্চিত হয়নি।

ভাগ্য কারো একলার নয়, একজনের জন্য প্রসন্ন হয় না—কদাচিৎ না। সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয় বলেই তবে না ভাগ্য। ভাগের যোগ্য বলেই ভাগ্য—আমার মতে হাত খোয়া। একেকজনের বরাতে যে খোলে হঠাৎ, তার কারণ তার সঙ্গে অনেকের বরাত দেওয়া থাকে তাই। কারো মানসসরোবরের ভান্ডার আকাশ থেকে বর্ষণ নামে, জল জমে ওঠে, গোমুখী বেয়ে নেমে আসে তাই—ছড়িয়ে যায় সারা ভূভারতে। কেবল গঙ্গাধরের জন্যই নয় গঙ্গা, জহ্নুমুনীর জন্যও না, যে ভগীরথ টেনে আনলো তারও একলার নয়কো—সবার জন্যেই সেই ভাগিরথী।

সবাইকে খয়রাতির এই দায়ভাগ যে মানে না, রাতারাতি ক্ষয় পায় তার ভাগ্য। ভাগ্যের সঙ্গে এহেন ফেরেরবাজি যে করে, তার বরাতেই ফের আর দেখা দেয় না সেই সৌভাগ্য। নেহাত মন্দ ভাগ্য হয়ত না হলেও তার আদায়ভাগে মন্দা পড়ে যায়। তার নিজের বরাতই বাড়ন্ত হয়।

লালবাজার থেকে যথাসময়ে আমরা চালান হয়ে গেলাম ব্যাংশাল কোর্টে। সেখানে দু মিনিটের মামলা। খানিকক্ষণেই পালা খতম্।

কলকাতার বিভিন্ন এলাকার থেকে পিকেটিং আর আইন লংঘন করে যারা যারা ধরা পড়েছিল, গোছায় গোছায় জজ সাহেবের সামনে কাঠগড়ায় এনে খাড়া করা হচ্ছিল তাদের।

তারা বন্দেমাতরম্ হেঁকে গান্ধিজীর জয়ধ্বনি দিয়ে হাজির হচ্ছিল দলের পর দল।

তারপর মামুলি বাঁধা গৎ।

আদালতের থেকে প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে থাকে পরম্পরায়।

'তোমরা দোষী না নির্দোষ?'

কিচ্ছু আমরা কবুল করি না।

'আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাও তোমরা? নিজেদের উকীল টুকীল দেবে?'

'না, একদম না। এ আদালতকে মানিনে আমরা! করব না নিজের পক্ষ সমর্থন। যা করেছি বেশ করেছি। ছাড়া পেলে আবার করব। ইংরেজের আদালতকে আমাদের থোড়াই কেয়ার! আপনাদের আইনকানুনের ধার ধারি না!'

ইত্যাকার নানা জনের নানান জবাব।

ব্যস্! ঐ পর্যন্তই! ঐ খানেই আমাদের খেলা খতম। পালা শেষ। তারপর দু মাস চার মাস ছ মাস করে জেল হয়ে যায় জজ-সাহেবের মর্জি মাফিক।

তারপরেই আমরা প্রকান্ড ভ্যানে চড়ে চলে যাই সটান কলকাতার ফাটক কয়েদখানায়।

গান্ধিজীর জয়ধ্বনি দিয়ে আমাদের পিঁজরেয় গিয়ে ভর্তি হই আমরাও। নামি এসে একেবারে জেলখানার সেই চত্বরে।

কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে জেলের সেই চত্বরটা তার চৌহদ্দির ভেতর অনেক ছেলে, নানা-বয়সের, বয়স্ক যুবকরাও ছিল তার মধ্যে, ঘুরছিল, ফিরছিল ইতস্ততঃ। আমরা নামতেই বন্দেমাতরম্-এর হুংকার দিয়ে সমাদরে তারা সবাই অভ্যর্থনা করে নিল আমাদের।

এগিয়ে গেলাম আমরা।

জেল আমার এই প্রথম দর্শন জীবনে। অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলাম চারদিকে। সবার দিকেই।

এমন কি, যদিও তার আগেকার দেখা তবু দেবেনেরও বেশ তাক লেগে গেছে মনে হল।

সেও বেশ তাকিয়ে তাকিয়ে জেলখানাকে দেখছে লক্ষ করলাম।

'এ আবার কোন জেলে নিয়ে এলো হে আমাদের!' চারধার দেখে সে বললে অবশেষে।

'এখানে তো এসেছো তুমি আগে, তবুও চিনতে পারছ না?'

'না, এ জেল সে জেল নয়।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে, 'কেমন জেল যে কে জানে! ধরতে পারছিনে ঠিক।'

'তোমার সেই নিমগাছটা কই? দেখতে পাচ্ছ না তাকে' গোড়াগুড়ি সবটাই দাতন করে ফেলল নাকি আমার সন্দেহ হয়।

'নাঃ, কোথায় নিমগাছ! কোথথোও নেই!'

'দেশবন্ধুও নেই তাহলে এখানে?'

'নাঃ!' তার দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বিতীয় প্রস্থ।

'হায়, কোথায় এলে? তোমার গঙ্গাও হারিয়ে গেল শেষটায়।' হা-হুতাশে আমার সহানুভূতি জানাই।

'গঙ্গা হারাবে কেন? ওই সামনেই তো গঙ্গা।' অচেনা একজনা মাঝখান থেকে কথা পাড়ল, যোগ দিল আমাদের আলোচনায়—'গঙ্গার ধারেই তো আমাদের এই জেলটা হে। এসো না দেখবে, দেখবে এসো, গঙ্গা পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমাদের।'

গেলাম গঙ্গার সামনে।

গঙ্গার বুকে দূরে অদূরে অতিকায় যত মালোয়ারী জাহাজ নোঙর করা।

'খিদিরপুর ডক ছিল এটা। তার সব জেলে কয়েদী আটছে না কি না, হাজার হাজার ছেলে আসছে তো ঠেলে, রোজই আসছে। তাই খিদিরপুরের এ ডকটাকে ঘেরে ঘিরে নিয়ে আনকোরা এই জেলখানাটা বানিয়েছে। এর মধ্যেই হাজার চারেক এসে গেছে এখানেও।' ছেলেটি জানাল।

'না ভাই! এ গঙ্গা সে-গঙ্গা নয়।' গঙ্গার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়ল দেবেন। —'গঙ্গা আমাদের হারিয়ে গেল ভাই! গঙ্গা বোধহয় আর পেলাম না আমরা—পাব না আর এ জীবনে!'

'আমার সুরধুনীও বুঝি হারিয়ে গেল সেই সঙ্গে।' নিজের মনে মনেই আমি আওড়াই। জীবনের মতই বুঝি এবার! অন্তরের মধ্যেই আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে!

(ক্রমশ)

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হবেন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজী প্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে, যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশল শূন্য; নয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়ামাত্র। ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননা প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব দিব কেন?

ইংরাজী ভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদের "ভাষায়" যে রূপ শ্রদ্ধা তাদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই।..."

বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় এইরকম পত্র সূচনা ছিল। সেই বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ ঘটনার শতবর্ষ পূর্ণ হবে এই ১লা বৈশাখে। বাংলা ভাষায় এরকম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা এ যাবৎ আর প্রকাশিত হয়নি, সবুজ পত্রের সঙ্গে খানিকটা তুলনা চলে হয়তো, তাও খুব কাছাকাছি পৌঁছোয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাসই প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গদর্শনে। 'বিষবৃক্ষ' দিয়ে শুরু। এছাড়া প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি দিয়ে তিনিই বঙ্গদর্শনের অনেকগুলি পাতা ভরিয়ে রাখতেন। বস্তুত, বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবল প্রতাপে শাসন করতেন তৎকালীন বাংলা সাহিত্য। কখনো কখনো তাঁর আচরণ যে কিছুটা ডিকটেটর সুলভ হয়ে যেত—তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

১২৭৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন প্রথম বেরিয়েছিল। প্রথম চার বছর সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তারপর এক-বছর বন্ধ থাকার পর আবার বেরুতে শুরু করলে সম্পাদক হন বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র। সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা চালাবার মেজাজ সঞ্জীবচন্দ্রের ছিল না—সুতরাং তাঁর নামের আড়ালে বঙ্কিমই বেশীর ভাগ দেখাশুনো করতেন। পাঁচ বছর পর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক হন, তখন বেরিয়েছিল মাত্র চারটি সংখ্যা। মোটামুটি দশ বছর ছিল বঙ্গদর্শনের জীবন। এর আঠেরো বছর পর রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন আবার বেরিয়ে চলেছিল পাঁচ বছর।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যকে সম্মানের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বঙ্কিমের খুবই প্রিয় ছিল এই পত্রিকা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকা সম্পর্কেও বীতস্পৃহ হয়েছিলেন। সঞ্জীববাবুর ব্যবস্থাপনা তাঁর পছন্দ হয়নি। সঞ্জীবচন্দ্র মাঝখানে পত্রিকার 'টোন' একটু নিচু করেছিলেন, সেই জন্য রাগ করে বঙ্কিম বেশ কয়েকমাস লেখা দেননি।

বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ রচনাতেই লেখকদের নাম থাকতো না। বঙ্কিমচন্দ্রের নামও থাকতো খুব কম। তিনি ছদ্মনামও ব্যবহার করেছেন অনেক—কমলাকান্ত ছাড়াও রামকট, ভজরাম, দর্পনারায়ণ পাতিতুণ্ডি ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শনের নানাবিধ প্রবন্ধে ও পুস্তক সমালোচনায় বঙ্কিম মাঝে মাঝে এমন কঠোর মন্তব্য করেছেন যে দেখলে এখনও চমকে যেতে হয়। অবশ্য পুস্তক সমালোচনার কোন কোনটি বঙ্কিমের তা স্পষ্টভাবে জানা মুশকিল, তবে ভাষার ব্যবহার দেখলে চেনা যায়। তাছাড়া, বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী ছিলেন দারুনভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত। অনেকের লেখা প্রবন্ধ ইত্যাদি যে বঙ্কিমচন্দ্র আগাপাছতলা কাটাকুটি করে বদলে দিয়েছেন, তাও জানা যায়। কোনো একটি পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে মন্তব্য করা হয়েছিল, "আমরা কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, এরূপ নীচাশয় লেখকদিগের সংখ্যা দিন দিন অল্প হউক, এরূপ লেখকদিগের দ্বারা সাধারণের কোন মঙ্গল সিদ্ধ হয় না, বরং অমঙ্গল জন্মে।" একটি কবিতার বই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "সচরাচর বাঙ্গালা কবিতা যে-রূপ অপ্রশংসনীয়, ইহাও সেইরূপ।" একজন মহিলা কবি সম্পর্কে, "স্ত্রী পুরুষের সমান বিচার করিব, স্ত্রীলোক বলিয়া ক্ষমা করিব না।"

"বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন" নামের প্রবন্ধে বঙ্কিম বেশ কিছু উপদেশ দিয়েছেন। কিছু কিছু অংশ এই রকম : যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।"... কখনো কখনো তিনি আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন। নতুন লেখকদের সম্বোধন করেছেন তুমি বলে। লিখেছেন, "কাহারও অনুকরণ করিও না, অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজী বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।"

বঙ্কিমচন্দ্র মহৎ লেখক ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বর্তমান লেখকের কিছু অভিযোগ আছে। সে সম্পর্কে আগামী কোনো সংখ্যায় আলোচনা করা যাবে।

বঙ্গদর্শনের ফাইল এখন দুষ্প্রাপ্য। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য "বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন" নামে একটি গবেষণা গ্রন্থে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। ঝরঝরে ভাষায় লেখা চমৎকার বই।

সনাতন পাঠক

সাহিত্য গ্রন্থাবলী

কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। মূল্য কুড়ি টাকা।

কোনো কবির বা কোনো সাহিত্যিকের খুচরো খুচরো বই সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত বা সাধারণ লাইব্রেরি পুষ্ট ও পূর্ণ করে তোলা বেশ কষ্টকর। যতক্ষণ সম্পূর্ণ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া না যায় ততক্ষণ কোনো লেখকের সম্পূর্ণ চেহারা যেন পরিস্ফুট হয় না। এই কারণে গ্রন্থাবলী প্রকাশের উপকারিতা অনেক। এর আগে অনেক প্রকাশক অনেক স্মরণীয় লেখকের গ্রন্থাবলী বা রচনাবলী প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যাবতীয় বই সংগ্রহ করা এখন কঠিন। অথচ সত্যেন্দ্রনাথকে এখনো বিস্মৃত বা উপেক্ষিত বলা যায় না। ১৯২২ সালে তাঁর মৃত্যু, এখন ১৯৭২ সাল। তাঁর মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর গত হয়েছে। তবুও যে আমরা তাঁর কথা মনে রেখেছি তাঁর রচিত কবিতা অনেকে এখনো স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে যে পারেন—এইটেই যথেষ্ট প্রমাণ যে তিনি কেবল পাঠকদের স্বীকৃতিই লাভ করেন নি, তিনি আর-একজনের কবল থেকেও উদ্ধার পেয়েছেন যাকে বলে মহাকাল। অর্থাৎ সময়ের পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ।

ছন্দের জাদুকর বলে সত্যেন্দ্রনাথ স্বীকৃত ও কীর্তিত। ছন্দ তাঁর কাছে ছিল অনেক, কিন্তু ছন্দই তাঁর সর্বস্ব ছিল না। কবিতাই ছিল তাঁর প্রাণ। তিনি প্রাণমন সমর্পণ করে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ করে রচনা করেন অজস্র কবিতা। সেসব কবিতা আমাদের চোখের আড়ালে যাতে চলে না যায় তারই জন্যে শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ। অশেষ পরিশ্রম করে তিনি সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, এবং সম্পাদনা করেছেন এই গ্রন্থ। এটি প্রথম খণ্ড মাত্র। আরও কয়েকটি খণ্ডে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাবলী একত্র করা হবে, এ আশ্বাস এখানে আছে।

এই খণ্ডে 'বেণু ও বীণা' কাব্য, 'হোমশিখা' কাব্য, 'তীর্থসলিল' কাব্য, 'জন্মদুঃখী' উপন্যাস, 'রঙ্গমল্লী' নাটক, 'চীনের ধূপ' প্রবন্ধ এবং নাট্য কাব্য পদ্য ও চিঠিপত্র-জাতীয় কতকগুলি বিবিধ রচনা রয়েছে।

এ এক বৃহৎ গ্রন্থ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪৬।

সত্যেন্দ্রনাথ কবি, এই পরিচয়েই তিনি সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু কবির কলমে উপন্যাস নাটক ও প্রবন্ধ কতটা উৎরেছে তার পরিচয় পেতে হলে এমন-একটি গ্রন্থ হাতের কাছে থাকা ভালো।

কাব্যগ্রন্থ উপন্যাস বা নাটক—এই গ্রন্থাবলীতে যে সকল রচনা সংকলিত হয়েছে তার অনেকগুলির সঙ্গে পাঠকের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। তবুও সেগুলি পুনরায় পাঠের সুযোগ পাওয়ায় বাড়তি আনন্দ এতে পাওয়া যাবেই। এটি সহজ সত্য কথা। সে সুযোগ গ্রহণ করতে অনেকেই উৎসুক হবেন।

কিন্তু যা সহজে পাওয়া যাবে না তার পরিবেশনের ব্যবস্থা এইগ্রন্থে রেখে সম্পাদক তাঁর কর্তব্য বিশেষ ভাবে পালন করেছেন। সে হচ্ছে ঐ 'বিবিধ' বিভাগটি। এই বিভাগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে (যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি) বিভিন্ন ধরনের রচনা সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এইটেই নিপুণতার ও নিষ্ঠার পরিচয়।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে, সেই পরিচয় উত্তরকালে নিবিড় শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্কে পরিণত হয়। এই স্নেহ যে কতটা কমনীয় ও রমণীয় হয়ে উঠেছিল সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর শোকসভায় পঠিত (এবং রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত) কবিতা থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা এই গ্রন্থটি হাতে পেয়ে সেকালের কবি সাহিত্যিক সমাবেশের একটি মনোরম পরিবেশ যেমন স্পষ্ট দেখতে পাই, তেমনি পাই সেকালের একটি ইতিহাস। রাজা-রাজড়ার সংগ্রামের ইতিহাস না, কবি-সাহিত্যিকদের সৌহার্দ্যের ইতিহাস।

'বিবিধ' বিভাগে চিঠিপত্র অংশে সত্যেন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে। এই চিঠিগুলি দুষ্প্রাপ্য।

চিঠিপত্রের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে যেসব চিঠিপত্র সংকলিত হয়েছে তাতেই সত্যেন্দ্রনাথের মনের মেজাজের রুচির প্রকৃতির শ্রদ্ধার ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে পরিচয় মিলবে। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে সম্পাদক মহাশয় কাজ করেছেন বলেই আমরা এখন অকৃত্রিম আনন্দ লাভের সুযোগ পেয়েছি।

গ্রন্থশেষে, গ্রন্থপরিচয় অংশে, এই গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থ সম্বন্ধে যাবতীয় পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'তীর্থসলিল' গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন কবির কবিতার অনুবাদ। গ্রন্থ পরিচয়ে বিদেশী কবিদের সমস্ত পরিচয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথের জীবনকথাও এতে আছে, লিখেছেন শ্রীঅলোক রায়। এতে বইটি সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে।

সংকলন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সম্পাদনা : যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মুক্তধারা, ৯, অ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৯। মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এই বইটির সংকলন ও গ্রন্থনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিল, সুতরাং বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সমিতি কতকগুলি রচনাকে গ্রন্থভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—স্বাভাবিকভাবেই বইটির প্রাথমিক তাৎপর্য ফুরিয়েছে। শ্রীঅন্নদাশংকর রায়ের স্বল্পায়তন ভূমিকা ছাড়া বইটিতে প্রায় নটি রচনা রয়েছে। সব লেখাই যে মূল্যবান তা নয়। আলমগীর-জামান-এর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' এবং মোহাম্মদ ইউনুস-এর 'বাংলাদেশ—অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' লেখা দুটি সাময়িক হয়েও স্থায়িত্বের আভাস দিচ্ছে। তাহালুতা তাঁদের বিশ্লেষণী শক্তিকে আচ্ছন্ন করে নি। প্রথম লেখায় লেখক জামান সাহেব বলছেন, এই মুক্তিযুদ্ধ নিছক রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়। তিনি বিপ্লবে সাংস্কৃতিক উদ্বোধের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তারপর ধীরে ধীরে অর্থনীতির প্রশ্নে উত্তরণ করতে চেয়েছেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লব আগে না অর্থনৈতিক বিপ্লব আগে—এ নিয়ে বুর্জোয়া ও কট্টর মার্কসীয়দের মধ্যে বিস্তর 'বিতর্ক' চলতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভাষা ও সংস্কৃতিই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। মোহাম্মদ ইউনুস-এর অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় চাষের জমি, জমির মালিকানা, বিভিন্ন শস্য ধান, পাট, শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্পের অবস্থা ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায়। ডাঃ হৃদয়ানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ও মীরা গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশের সূত্রপাত এবং স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী অবস্থার একটি ছোটখাট ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। লেখাটি অসম্পূর্ণ। আওয়ামী লীগের ইতিহাস-ই মুক্তি চেতনা ও সংগ্রামের একমাত্র ইতিহাস নয়। তাছাড়া, শেষ দিকে তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন সম্ভবত খবরের কাগজ থেকে। তাতে অনেক ভুল খবর

ছড়িয়েছিল; ছড়ানো হয়তো অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখন ধোঁয়া ও কুয়াশা খানিক সরেছে। ফলে, জানা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের কুঠিবাড়ি কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে খাসি ঠেকবে, এই সংকলন-গ্রন্থের সম্পাদকীয়টি। দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতিকদের মতো একজন বুদ্ধিজীবিও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না কেন বলে অস্থির হয়েছেন জেনে খুব হতাশ লাগে। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারা গেছে যে, স্বীকৃতি দেবারও উপযুক্ত সময় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের দুরবস্থার অন্যতম কারণ বোধহয় এটাও যে, এখানকার বুদ্ধিজীবিরা প্রায়শই তরলমতির। সম্পাদক আরো বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন যে, এক দেশ অন্য দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পন্ন করে দিয়ে এসেছে, এমন নজির ইতিহাসে নেই। দিলেও তাতে নাকি ফাঁকি থেকে যায়। বলা বাহুল্য, তাঁর এই প্রত্যয় ও উপলব্ধি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ফাঁকির কথা এখন থাক্। প্রত্যক্ষদর্শীর যে-কটি বিবরণ রয়েছে তার মধ্যে আহমদ ছফা-র 'ঢাকায় যা দেখেছি যা শুনেছি' রচনা হিসেবে খুব পরিচ্ছন্ন অথচ রক্তশূন্য নয়।

২৫০/৭১

স্মারক গ্রন্থ

Rajaji—93 Souvenir. Published by T. Sadasivam for Rajaji—Ninety-three Souvenir Committee from Kalki Buildings, Chetput, Madras-31. Up. 336. Price Rs. 12.

ভারতীয় রাজনীতিতে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী একজন অনন্য ব্যক্তি। সাত দশকেরও বেশী তিনি ভারতের জাতীয় জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। আইনজীবী, রাজনীতিক নেতা, চিন্তানায়ক, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা, স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর-জেনারেল — সর্বক্ষেত্রেই রাজাজী নিজের প্রজ্ঞা ও মনীষার স্বাক্ষর রেখেছেন। গান্ধীজী একসময়ে বলতেন, রাজাজী তাঁর বিবেকের রক্ষক। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে রাজাজীর বাধেনি নিজের আদর্শে অবিচল প্রত্যয়ের জন্যে। এই আত্মপ্রত্যয় রাজাজীর চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে।

গত ৮ই ডিসেম্বর এই বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার ৯৩ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে শ্রী টি সদাশিবমের নেতৃত্বে 'রাজাজী নাইনটিথ্রি স্যুভেনির কমিটি একটি বিরাট স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এতে স্থান পেয়েছে দেশের ও বিদেশের দ্বিশতাধিক সুধী ও বিশিষ্ট ব্যক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি এই ভারতীয় মনীষীর প্রতি। রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি থেকে আরম্ভ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মহামান্য দলাই লামা, হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, লর্ড কেসি, চেসটার বোলস্, রাজা মহেন্দ্র, ইউ থানট, জেনারেল কুমারমঙ্গলম, বিনোভা ভাবে, জি ডি বিরলা, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মীরা বেন—এমন কি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ আয়ুব খান পর্যন্ত।

রাজাজীর বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র—বিশেষ করে গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে—গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। রাজাজীর বিভিন্ন রচনা থেকে উদ্ধৃতি এবং একটি গ্রামফোন রেকর্ডে তাঁরই স্বকণ্ঠে তাঁর দুটি ভাষণ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে সংকলনকারীরা সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

কবিতা

মনেমনে। অরুনী নাগ। মণিমালা প্রকাশনী, ১ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা-১১। দাম তিন টাকা।

কবির নাম মুছে দিলে যেসব কবিতার মালিকানা হারিয়ে যায় তরুণতম কবি অরুনী নাগের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মনেমনে' তার প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। বিচিত্র প্রেম-ভাবনার মধ্য দিয়ে নিজের পৃথিবী এবং পরিপার্শ্ব দর্শন, নিজের মন এবং যৌবনকে আস্বাদন, এই কবিতাগুচ্ছের কৃতকর্ম। গীতল এবং চিত্রল ভাষার যোগপদ্যে কবিতাগুলি রমণীয়। কোথাও অস্পষ্টতা কিংবা দুর্বোধ্য কূটনীতি নেই, চাতুর্য দিয়ে কবি পাঠককে ধাঁধা লাগান নি। স্বচ্ছ সুন্দর অনুভূতি পরম্পরায় অন্তরের সাবলীল আত্মপ্রকাশ পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করবে।

উৎকট পরীক্ষা নিরীক্ষার ঝোঁকে যখন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে সুর-স্বপ্ন-সৌন্দর্যের হৃদয়মুখী ধারা হারিয়ে যেতে বসেছে সেই সময়ে এ যুগেরই এক তরুণ কবি আবার নতুন করে রোমাণ্টিক কবিতাবলী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন, এ ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। 'মনে মনে' গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতাই মনের মধ্যে অনুকম্পন জাগায়, সুরের রেশ রেখে যায়। কিছু কিছু চিত্র ও চিত্রকল্প স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। মিতভাষণ এবং অর্থব্যঞ্জনা কোথাও কোথাও জাপানী কবিতার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

রাজনীতি

কোরিয়ার গণযুদ্ধ। সুভাষ সমাজদার, গ্রন্থপ্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৮। মূল্য ৬, টাকা

মুক্তিসংগ্রাম, গেরিলাযুদ্ধ, এসব কথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ভূখণ্ডে আজ আর কারো অজানা বিষয় নয়। কী অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে, কী অভূতপূর্ব মনোবল নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের কিষাণ, ছাত্র, মজদুর—সে ঘটনা আজ ইতিহাসের পাতায় সোনার লেখার মত জ্বলজ্বল করছে।

এমনি প্রতিরোধ উত্তাল হয়ে উঠেছিল জাপানী শাসনে নির্যাতিত কোরিয়ার মানুষ এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। কেমন করে শাসক শক্তিকে কোরিয়ার মানুষ সেদিন প্রতিরোধ করেছিল বর্তমান গ্রন্থে তার বিশদ বিবরণ আছে। বইটিতে লেখক কোরিয়ার জীবাণু যুদ্ধের কথাও লিখেছেন। মার্কিনীরা কি ভাবে কোরিয়ার শহরে-জনপদে-গ্রামে মহামারী আর মৃত্যুর হাহাকার সৃষ্টি করেছিল আকাশ থেকে জীবাণু ছড়িয়ে সেকথাও লেখক সুন্দরভাবে বইটিতে তুলে ধরেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি কোরিয়ার (১৯১০-৪৫) মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা, তাই বইটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করি।

ফুটবলের দ্রোণাচার্য

ফুটবল খেলে এক সময় যাঁরা খ্যাতি কুড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে ফুটবলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। কেউ প্রশিক্ষণে, কেউ প্রশাসনে, কেউ বা ক্লাব কর্মকর্তা পরিচয়ে।

আগে খেলোয়াড় পরে প্রশিক্ষক হিসাবে আমরা জানি অমল দত্তকে, স্বরাজ ঘোষকে, প্রদীপ ব্যানার্জিকে এবং চুনী গোস্বামীকে। আরও আছেন। এরা সবাই প্রায় যুদ্ধোত্তর কালের খেলোয়াড়। প্রাক যুদ্ধকালের খেলোয়াড় যাঁরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে ফুটবল খেলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র খেলোয়াড় হচ্ছেন টি সোম যিনি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রেখে আধুনিক ফুটবলের প্রথা প্রকরণ এবং বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে ডুবে আছেন। এবং সম্ভবত টি সোমই সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের গার্ডপোস্ট তাদের কীর্তির সোপান তৈরি করে দিয়েছেন।

কে নয়? মেওয়ালাল, মোহিনী ব্যানার্জি, বিমল কর, ডালু বসু, আলাউদ্দিন, এস নন্দী, অনিল নন্দী, নিখিল নন্দী, সুনীল নন্দী, সুশীল ভট্টাচার্য, স্বরাজ ঘোষ, অমিয় ভট্টাচার্য, প্রদীপ ব্যানার্জি, প্রশান্ত সিংহ, পরিমল দে, কাজল মুখার্জি, প্রবীর মজুমদার, পিন্টু চৌধুরী, কাজল ঘোষ, ভূপতি মিত্র প্রভৃতি কে টি সোমের কাছ থেকে ফুটবলের কোচিং নেয়নি? নিজের দুই ছেলে তাপস ও পরলোকগত অসীমের নাটকীয় কথা ছেড়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের চার পাঁচ বছর আগে থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কত ফুটবল খেলোয়াড় যে টি সোমের হাত দিয়ে বেরিয়েছে তার হিসাব নেই। ষোলো-সতেরো বছর আগে তোলা একখানি ফটোতে নাটকীয় সঙ্গে শিক্ষারত ষোলো-সতেরোটি ছেলেকে দেখিয়ে দুঃখময় অতীত স্মৃতি চেপে রেখে বাঘাদা বললেন, এদের সবাই প্রায় প্রথম ডিভিসনে খেলেছে।

আগেই বলেছি সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়-দেরই সাফল্যের সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছেন বাঘাদা। বাঘাদাও বললেন, "দেখ ট্যালেন্টেড প্লেয়ার্স আর বর্ন, নট মেড। ভারবাহী বলদ ঘোড়াকে রেসের ঘোড়া তৈরি করা যায় না। বড় জোর তার দৌড়ের গতি একটু বাড়ানো যায়। সহজাত ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের জোরেই খেলোয়াড় বড় খেলোয়াড় হয়ে ওঠে। তবে অবশ্যই তার তালিমের প্রয়োজন আছে, ভুল সংশোধনের প্রয়োজন আছে, আছে শিক্ষার প্রয়োজন। আবার উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে এবং সঠিক পথে পরিচালিত না হলে সম্ভাবনাও অঙ্কুরে শেষ হয়ে যায়। ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতাই বল, দৃষ্টিশক্তিই বল, কিংবা ইনটিউশনই বল—একটু খেলা দেখেই আমি যেন ধরে নিতে পারি ছেলেটির মধ্যে সম্ভাবনা কতখানি।"

এই ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের জোরেই খেলোয়াড় টি

অবসর সময়ে ফুটবলের বই পড়ছেন
টি সোম

সোমের চেয়ে কোচ টি সোম অনেক বড়। খেলোয়াড় জীবনেও অবশ্য খ্যাতি কম নয়। এবং সেখানেও রয়েছে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের পরিচয়।

ঢাকা উয়াড়ি, মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গল, রেল দলের এক সময়ের খ্যাতিমান হাফব্যাক টি সোম প্রথম জীবনে সোজা মাঠ থেকে যেয়ে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। কিন্তু সেখানেও ফুটবলের চর্চা ছাড়েননি। মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন অনেকদিন। বাঘা বাঘা রেজিমেন্টাল টিমের সঙ্গে তখন খেলতে হয়েছে বাঘা সোমকে। তখন মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সেক্রেটারী মেজর শৈলেন বসু ও ছিলেন ওদের রেজিমেন্টে। একদিন ডেভনশায়ার রেজিমেন্টের সঙ্গে ওদের রেজিমেন্টের খেলা। ২—০ গোলে ওরা হেরে গেলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ওরা হারালেন ডেভনশায়ারকে ৩—২ গোলে। ওই জয়ের মূলে ছিল বাঘা সোমের দূরদৃষ্টি। বিরতির সময়ে ০—২ গোলে পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ছক বদলে দিলেন বাঘা সোম। ওদের ছোট ছোট পাসগুলি মিলিটারি সাহেবরা লম্বা লম্বা পায়ে আটকে দিয়ে আক্রমণের গতি রোধ করে দিচ্ছিল। বাঘা সোম সহ-খেলোয়াড়দের বললেন লম্বা লম্বা পাসে খেল এবং বল বাড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে মাঠ কভার কর; দেখবে ওরা পাত্তা পাচ্ছে না। তাই হল। ৩—২ গোলে হেরে গেল ডেভনশয়ার। কর্নেল ব্যারেট তো মহা খুশী। বাঘা সোম তখন বুট পরে বিশেষ সুবিধা করতে পারতেন না বলে কর্ণেল ব্যারেট হুকুম দিয়েছিলেন—'অল মাস্ট উইয়ার বুটস এক্সসেপ্ট সোম'।

চিরদিন এই দূরদৃষ্টির অধিকারী বাঘা সোম। মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গল রেলে যিনি অতি সুনামের সঙ্গে খেলেছেন, খেলেছেন ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় দলের বার্ষিক আন্তর্জাতিক ম্যাচে, তিনি সক্ষম থাকা সত্ত্বেও ১৯৩৬-এ প্রথম ডিভিসন থেকে অবসর নিয়েছিলেন সামান্য একটি ঘটনা লক্ষ করে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ই বি আর-এর খেলা। বাঘা সোমের গর্ব ছিল গতিবেগে ওকে কেউ হারাতে পারবে না। কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিংয়ের রহিম তখন উঠতি তরুণ। দুবার ওর পাশ দিয়ে বল নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাঘাদা বললেন, আর নয়। আর খেলেনওনি প্রথম ডিভিসনে। তারপর থেকেই প্রশিক্ষণে।

১৯৩৭-এ ইংলন্ডের ইসলিংটন কোরিন্থিয়ান ফুটবল দল এসেছিল ভারত সফরে। বাঘাদা তখন ঢাকায় প্রশিক্ষণে ব্যস্ত। আমাদের এখানে খেলা হত প্রতি অর্ধে ২৫ মিনিট করে ৫০ মিনিট। ইসলিংটন কোরিন্থিয়ানের সঙ্গে খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল ৩৫ মিনিট করে ৭০ মিনিট। ওই সময়টাকেই ক্লু হিসাবে ধরতে পেরেছিলেন বাঘা সোম। ঢাকার খেলোয়াড়দের স্ট্যামিনা বাড়াবার জন্য ওর চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। বোধ করি ওই জন্য ভারতে ৩২টি খেলার মধ্যে ইসলিংটন কোরিন্থিয়ানকে একমাত্র পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল ঢাকায় ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ১—০ গোলে।

কোচ হিসাবে খেলোয়াড় আবিষ্কারের বহু ঘটনার মধ্যে বিশেষ করে প্রদীপ ব্যানার্জি এবং প্রশান্ত সিংহের আবিষ্কারের কথা জানালেন বাঘাদা।

জামসেদপুরের পক্ষে যখন আই এফ এ শীল্ডে খেলতে এসেছিল প্রদীপ তখনই ওর উপর বাঘাদার নজর পড়েছিল। এরিয়ান ক্লাবে প্রদীপ তেমন সুবিধা করতে পারছে,

না দেখে বাঘাদাই প্রদীপকে রেলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার পরের প্রদীপ ব্যানার্জি প্রধানত বাঘাদার সৃষ্টি। তবে প্রদীপের নিষ্ঠা ও সাধনার অসঙ্কোচ প্রশংসা করলেন বাঘাদা।

একটি ছেলে ছোট বেলায় দু'একদিন ওর কাছে খেলা শিখতে এসে কোথায় পালিয়ে গেল। বাঘাদা হন্যে হয়ে খুঁজতে আরম্ভ করলেন ছেলেটিকে। ছেলেটির কাঁধের উপরে একটি ছোট টিউমার ছিল। কালোপানা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছেলে দেখলেই বাঘাদা চেয়ে দেখেন তার কাঁধের উপর টিউমার আছে কিনা। শেষ পর্যন্ত শিয়ালদা স্টেশনে রেলের এক ভদ্রলোকের মুখের আদলের সঙ্গে ছেলেটির মুখের আদলের মিল দেখে আবিষ্কার করলেন ছেলেটিকে। বললেন, "আপনার ছেলেকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে।" ও বড় খেলোয়াড় হবে। ছেলেটির নাম প্রশান্ত সিংহ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কথা। ই বি আর দল মাঠে নেমেছে। দু'জন খেলোয়াড় আমাদের অপরিচিত। এক শিক্ষানবীশ ক্রীড়াসাংবাদিককে প্রেস বক্স থেকে আমরা পাঠিয়ে দিলাম মাঠের পাশে বসা বাঘাদার কাছে সব খেলোয়াড়দের নাম জেনে নিতে। ছেলেটি দশ-বারো মিনিট ধরে বাঘাদার কাছ থেকে আট-নয়জন খেলোয়াড়ের নাম উদ্ধার করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে জানাল, সব নাম পাওয়া গেল না। আমরা আগেই জানতাম ছেলেটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। খেলার সময় বাঘাদার কাছ থেকে খেলোয়াড়দের নাম জানা রীতিমত ধৈর্যের দরকার। কেননা, বাঘদা যে মাঠের বাইরে থেকেও খেলায় অংশ নিতেন। খেলাতে খেলাতে কি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়? প্রতিটি খেলোয়াড়ের প্রতি মুভমেন্টের সঙ্গে, প্রতি শটের সঙ্গে, প্রতি আক্রমণের সঙ্গে ওঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং মুখের ভাব আমরা লক্ষ করতাম। কতদিন বিপদে পড়েছি।

"বাঘাদা, বলুন, আপনার আজকের টিম কি?"

'দেখ' বলেই বাঘাদা চীৎকার করে উঠলেন—'আরে দেখলে বিমল কি গোলটা নষ্ট করল।'

বিমল করের গোল নষ্টের পর বাঘাদার কাছ থেকে আর তিন চারটি নাম উদ্ধার করতে চার পাঁচ মিনিট কেটে যেত। তার মধ্যে কতবার ভুলু বসুকে গালাগালি দিতেন, কতবার নীধু মজুমদারকে উপদেশ দিতেন, কতবার খেলা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে পড়তেন।

এই হচ্ছেন বাঘা সোম, ফুটবলের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ বাঘা সোম। বলতে গেলে বিদ্যা-ধর্ম-কর্ম-মর্ম সবই ফুটবল।

ফুটবল মরসুমের সকালে শিয়ালদার নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের মাঠে গেলে দেখা যাবে অনেকগুলো ছেলেকে নিয়ে বাঘাদা ট্রেনিং দিচ্ছেন। গোলের পেছনে চক দিয়ে ছক কেটে ঠিক করে দিচ্ছেন শট করার নিশানা। গোলের তিন কাঠের মাঝখান লক্ষ করে নয়, এক, দুই, তিন, চার নম্বর দেওয়া নিশানা লক্ষ করে শট করতে হবে যেমন লক্ষভেদে গুরু দ্রোণাচার্যের নির্দেশ ছিল—পাখিও না, পাখির মাথাও না, শুধু চোখ। হ্যাঁ চোখ লক্ষ করে তীর ছুঁড়তে হবে। আধুনিক ফুটবলের দ্রোণাচার্য বাঘা সোমেরও ওই ধরনের নির্দেশ। আর নির্দেশ স্বাস্থ্যটাকে ভাল করে তৈরি কর, চরিত্র ঠিক রাখ, সংযমী হও। বেশী খেলায় অংশ নেওয়ার বদলে প্রথম দিকে বেশী খেলা দেখ কে কি ভুল করছে ভাল করে লক্ষ কর, কখনও অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং সাধনায় ফাঁকি দিও না। শ

টি সোমের আসল নাম তেজেশ সোম অনেকের কাছে অপরিচিত। বাঘা সোম যা 'বাঘাদা' নামেই ফুটবল মহলে সার্বজনীন পরিচিতি। তোলা নামের ইংরাজী আদ্যাক্ষর 'টি' হওয়ায় এবং ডাক নাম 'বাঘা' বলে কেউ কেউ ওঁকে টাইগার সোম নামেও ভেবে নেন। বোধ হয় ঠিকই ভাবেন। না হলে এই ৭১ বছর বয়সেও এমন অদম্য উৎসাহ! শিয়ালদায় কাইজার স্ট্রীটে বাঘাদার রেল কোয়ার্টারে ঢোকার মুখেই প্রথমে আপনার চোখে পড়বে দরজার পাশে সাজানো রয়েছে ডজনখানেক ফুটবল। ওঁর বার্ধক্যের সদাসঙ্গী।

মুকুল

হকি মরসুম শুরু হল

কলকাতার ক্রিকেট মরসুম শেষ না হতেই হকি মরসুম শুরু হয়ে গেল। প্রতি বছরই এমন হয়। আবার হকি শেষ না হতেই হয়তো আরম্ভ হবে ফুটবল খেলা। ক্রিকেট ও ফুটবলের মাঝে হকি মরসুমের পরমায়ু আড়াই তিন মাসের মত। খেলার সংখ্যা কিন্তু কম নয়। প্রথম ডিভিসনেই ১৯টি ক্লাব, দ্বিতীয় ডিভিসনে ১৭টি, তিন গ্রুপে তৃতীয় ডিভিসনে ৩০টি। তা ছাড়া নক আউটের বহু প্রতিযোগিতা আছে, আছে বেটন কাপের খেলা।

হকিকে কেন্দ্র করে দুই তিনটি বড় ক্লাবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাল্লা চললেও কলকাতার হকি কিন্তু অবহেলিত। এবারকার তোড়জোড় যেন আরও কম। প্রতি বছর বাইরে থেকে কিছু কিছু ভাল খেলোয়াড় এসে কলকাতার হকিকে কিছুটা চাঙ্গা করে তোলে। এবার কিন্তু সাত-আটজনের বেশী খেলোয়াড় কলকাতা আসছে না। যারা আসছে তাদের মধ্যে কোন গালভরা নাম নেই। তার উপর ইস্টবেঙ্গলের কুশলী ফরোয়ার্ড গোবিন্দ এ রাজ্য থেকে ছাড়পত্র নিয়ে নিজ রাজ্য মহীশূরে চলে গেছে। ইস্টবেঙ্গলে নাম থাকলেও কৃতী খেলোয়াড় ইনামুর রহমান গত বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলেনি, এবারও খেলবে কি না সন্দেহ। ইনামুর আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রও সই করেনি। গতবারের, গতবারের কেন, গত তিন

বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং গতবারের বেটন কাপের যুগ্ম বিজয়ী মোহনবাগানের দল এবার কেমন দাঁড়াবে বলা শক্ত। মোহনবাগানের কুশলী লেফট আউট সইদ নূর এবার ইস্টবেঙ্গলে চলে গেছে। তবে ইস্টবেঙ্গলের ব্যাক জারনেল সিং মোহনবাগানে আসায় মোহনবাগানের রক্ষণভাগের শক্তি বেড়েছে। খেলোয়াড়দের উল্লেখযোগ্য দলবদলের মধ্যে আর রয়েছে ইকামুর রহমান। লীগ রানার্স ইস্টার্ন রেল থেকে ইকামুর এসেছে ইস্টবেঙ্গলে। মোটের উপর খেলোয়াড়দের দল বদলের ফলে শক্তিসাম্যের বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। পুলিস এবং আর্মেনিয়ান্স ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যাওয়ায় এবার প্রথম ডিভিসনে তাদের স্থান দখল করবে রেঞ্জার্স এবং বেঙ্গল ইউনাইটেড। কিন্তু আগমন কি আবার দ্বিতীয় ডিভিসনে গমনের জন্য? প্রকৃতপক্ষে গুটি পাঁচেক টিম ছাড়া প্রথম ডিভিসনের এগারো-বারোটি টিমের মধ্যে যে কেউই দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যেতে পারে, এদের খেলার মান এমনই নিম্নস্তরের। অসম প্রতিযোগিতা কলকাতা হকি লীগের

আকর্ষণহানির এক বড় কারণ। বোধ হয় মানের উন্নতি না হওয়ারও এক কারণ।

অলিম্পিক হকি

মুানিখ অলিম্পিকের আর বেশী দেরী নেই। কোন ১৬টি দেশ মুানিখ অলিম্পিকে খেলবে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন তাদের নাম ঘোষণা করেছেন।

১৬'টি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। 'এ' গ্রুপে আছে পাকিস্তান, পশ্চিম জার্মানি, স্পেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া, আর্জেন্টিনা ও উগান্ডা।

'বি' গ্রুপে আছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, কেনিয়া, হল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, ব্রিটেন, মেক্সিকো ও পোল্যাণ্ড।

আমরা জানি, ১৯৬৮-র মেক্সিকো অলিম্পিক থেকে শুরু করে এই চার বছর আন্তর্জাতিক হকিতে আমরা কোন বড় সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। মেক্সিকোয় তৃতীয় স্থান পাবার পর ব্যাঙ্কক এশিয়াডে পেয়েছি দ্বিতীয় স্থান। বার্সিলোনায় প্রথম বিশ্ব হকি কাপের খেলায় সেমি-ফাইনালে হেরেছি পাকিস্তানের কাছে।

মুানিখ অলিম্পিকে ভারতের গ্রুপে আর যে পাঁচটি দল রয়েছে তাদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার কাছে আমরা হেরেছিলাম মেক্সিকোর সেমি-ফাইনালে, নিউজিল্যাণ্ডের কাছে গ্রুপ লীগের খেলায়। তা ছাড়া হল্যাণ্ড এবং কেনিয়ার কাছেও ভারতের হকি দলকে একাধিকবার হার স্বীকার করতে হয়েছে। সুতরাং মুানিখে পাকিস্তানই শুধু আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, গ্রুপ লীগের চারটি দলও রীতিমত শক্তিশালী।

পুরনো কথাই আবার বলতে হচ্ছে। মেক্সিকোয় পরাজয়ের পর আমাদের হকির কর্মকর্তারা বলেছিলেন এশিয়ান গেমসে আমরা জিতব। এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পরাজয়ের পর বলেছিলেন, বার্সিলোনার বিশ্ব কাপে দেখে নেব। বার্সিলোনার পরাজয়ের পর অবশ্য মুখ খোলেননি। ভালই করেছেন। আশা করব, মুখে কিছু না বলে কাজের পথে, প্রস্তুতির পথে তারা এগিয়ে যাবেন বিশ্ব হকিতে ভারতের হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য।

বন্দী জীবনে ক্রীড়াচর্চা

কিছুদিন আগে ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেণ্টে পাক যুদ্ধবন্দীদের ক্রিকেট খেলার এক ছবি চোখে পড়েছিল। সঙ্গের ছবিতে দেখা যাচ্ছে মুানিখ অলিম্পিকের সম্ভাবনাময় নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা ববি লী হাণ্টার আমেরিকার কারাগারে বন্দী অবস্থায় স্কিপিং করে চলেছে শরীর ও মনকে ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে।

বন্দী জীবনে কারাগারের মধ্যে স্কিপিং করছে নিগ্রো মুষ্টিক ববি লী হাণ্টার

একুশ বছর বয়সী মুষ্টিক ববি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হয়ে ১৮ বছর কারাদণ্ড ভোগের আদেশ পেয়েছে। তবে ঠিক কারাগার নয়, চরিত্র সংশোধনের কারাগার। কারাগারের মতই বন্দী অবস্থা এবং নিয়মশৃঙ্খলা। কিন্তু ববি মুষ্টিযুদ্ধকেই তার জীবনের প্রতিষ্ঠার পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। এজন্য বন্দী শিবিরের কর্তৃপক্ষ এবং সহবন্দীদের সমবেদনাও পেয়েছে ববি লী হাণ্টার।

ববি ফ্লাই ওয়েট বিভাগের মুষ্টিযোদ্ধা। প্যান আমেরিকান গেমসে যোগ দিয়ে ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছে। সেমি-ফাইনালে ওকে নাকি জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যাই হোক, অলিম্পিকে স্বর্ণপদক পাবার জন্য এখন ববির চেষ্টার ত্রুটি নেই। বন্দী জীবনে কাজ মুষ্টিযুদ্ধের বই পড়া আর নিজেকে প্রস্তুত করে গড়ে তোলা।

ক্যারোলিনার সংশোধনকারী বন্দী-শিবিরের বন্দীরা এখন অর্থ সংগ্রহ করছে ববিকে মুানিখ পাঠাবার জন্য। ববির জন্য অবশ্য অর্থের প্রয়োজন হবে না। সে অর্থ অলিম্পিক সংস্থাই দেবে। ববির সঙ্গে বন্দী-শিবিরের যে প্রহরীকে পাঠাতে হবে তার জন্যই অর্থের প্রয়োজন। বন্দীরা বলছে, ববি যেভাবে অনুশীলন করে চলেছে তাতে ও অলিম্পিকে যেতে না পারলে ভেঙে পড়বে। ওকে আমরা অলিম্পিকে পাঠাবই। ও নিশ্চয়ই পদক জিতে ফিরে আসবে। ববিরও দৃঢ় বিশ্বাস ও একদিন মুষ্টিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ন হবেই।

একলব্য

বাংলাদেশের ছবি "প্রতিশোধ"-এ (পরিচালনা : নূরুল হক বাচ্চু) রাজ্জাক ও সুচন্দা রায়হান

বাংলাদেশের চিত্র-মুক্তি

বাংলাদেশের ছবি কলকাতায় নিয়মিত মুক্তি পাবে কি না, কিংবা কলকাতার ছবি বাংলাদেশে, এ-নিয়ে চলচ্চিত্র মহলে এবং দর্শকদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলছে। কিছুদিন আগে এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতির মুখপাত্র জানান, দুই বাংলার মধ্যে কীভাবে ছবি বিনিময় করা যায় এ-নিয়ে তারা ভাবছেন।

সমিতির মুখপাত্র বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাদের বলেন, এ-বিষয়ে তাঁরা ই আই এম পি এ-এর সাথে কথা বলছেন। ই আই এম পি এ থেকে এ-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার কথা এখনো জানা যায়নি। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশে কলকাতার বাংলা ছবির অবাধ প্রদর্শন যাতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে না পারে সে-বিষয়ে নজর রাখা হবে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি রেখেই কোন একটা ব্যবস্থা হয়ত অচিরেই গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতির পক্ষ থেকে চিত্রপরিচালক ফজলুল হক সাংবাদিকদের জানান, পাক বর্বরতার দরুন গত নয় মাসে বাংলাদেশের ফিল্মের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কাজ চলছে। তাই কলকাতার ছবি যেমন বাংলাদেশে দেখানো হবে তেমনি বাংলাদেশের ছবিও যাতে পশ্চিম বাংলায় নিয়মিত মুক্তি পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

সমিতির পক্ষ থেকে চিত্রপ্রযোজক আঞ্জুমান হুসনা মিঠু সাংবাদিকদের জানান, বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীরা পশ্চিম বাংলায় অলস দিনযাপন করেননি। মুক্তি-সংগ্রামের কাজে তাঁরা কোন না কোনভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। মুক্তি-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য অনেক শিল্পী ও কলাকুশলী চলে গিয়েছিলেন সীমান্তে। আবার কলকাতার মঞ্চেও নাটক অভিনয় করে তাঁরা পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে বাংলাদেশের

বাংলাদেশের ছবি "স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা"-র একটি দৃশ্যে রাজ্জাক, কবিতা ও সুমিতা দেবী

মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন। কলকাতায় তাঁরা যে সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছেন তাও সমিতির মুখপাত্ররা সকৃতজ্ঞচিত্তে বর্ণনা করেন। এ-ক্ষেত্রে ই আই এম পি এ সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতার কথা তাঁরা বিশেষভাবে বলেন। প্রামাণিক চিত্রনির্মাণে ই আই এম পি এ বাংলাদেশের পরিচালক ও কলাকুশলীদের সাহায্য করেন। চিত্রপ্রযোজক মিঠু জানান, পশ্চিম বাংলায় তাঁরা একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্রের কাজেও হাত দেন। এই ছবি তৈরী হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের ভিত্তিতে।

বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের

জনতার আদালত

জনতা পিকচার্স

জমিদারি প্রথা তখন বিলুপ্ত, তবুও যে "জনতার আদালত"-চিত্রকাহিনীতে সেই সাবেকি জমিদারি অত্যাচার ও শোষণ রাখা হয়েছে এর কারণ, বলা বাহুল্য, নাটকসৃষ্টি। এই কাহিনীতে তবুও যে জলসাঘর ও বাঈজির নাচ-গান রয়েছে তারও কারণ নিশ্চয়ই দর্শকের মনোরঞ্জন। অবশ্য "জনতার আদালত" জনতার দরবারে কতখানি আদর পাবে সেটা ভিন্ন প্রশ্ন।

জমিদারি প্রথা যে রদ হয়েছে সেটা কাহিনীতে বলা হয়েছে। তাই ছবিতে অত্যাচারী জমিদারকে (অসিতবরণ) জোতদার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আসলে জমিদারি শাসনেই গ্রামের জীবন নিয়ন্ত্রিত। সেই একই জমিদারি ঠাট।

অত্যাচারিত গ্রামবাসীর কাছে একদিন এসে উপস্থিত হয় কাশ্মীরী যুবক (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়)। তার কথাবার্তা বিপ্লবীর মত, যদিও সে বিপ্লবীদলের নয়। তার নেতৃত্বে যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের বিস্তার হতে পারত ছবিতে তা নেই। পরে অবশ্য জানা গেল ওই যুবক সেই গ্রামেরই ছেলে—হরি রায়ের পুত্র। অতএব গ্রামের লোকেরা তাদের যুবক নেতাকে আরও আপন করে নেয়। হরি রায়ের ঘরে আগুন লাগিয়েছিল গ্রামের ওই জমিদার। আগুনে হরি রায়ের স্ত্রী মারা যান। শিশুপুত্রকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে সুদূর কাশ্মীরে চলে যান হরি রায়। তাঁরই ছেলে ফিরে এসেছে গ্রামে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। তার মুখে ভাঙা ভাঙা বাংলা, বেশির ভাগ হিন্দী শুনতে ভাল লাগে। গতানুগতিক ব্যাপারের মধ্যে ওই এক ব্যতিক্রম, তথা এক বিশেষ আকর্ষণ। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও খুব চিত্তাকর্ষক।

গ্রামের অপরাপর চরিত্রগুলি মামুলি—যাকে বলে স্টক ক্যারেকটর। তা সত্ত্বেও গঙ্গাপদ বসু, রঞ্জা ঘোষাল, নির্মল ঘোষ, অসিতবরণ, সন্ধ্যারাণী, বঙ্কিম ঘোষ, সুখেন দাস, দেবাজিৎ প্রমুখ শিল্পীরা অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন। তবে নাটক যে বাঞ্ছিত ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছতে পারত ছবিতে সেটা আর দেখা যায়নি। তেমন নাট্যমুহূর্ত নেই বলে আবহসুরও (কালীপদ সেন-রচিত) সেরকম তাৎপর্যপূর্ণ মনে হল না। তবে "সোনার বাংলা" গানের সুর ব্যবহার সুকল্পিত। জনতার আদালতে জমিদার তথা জোতদারের বিচার হতে পারত। তার আগে জমিদার বিষপান করেছেন। ওই মুহূর্তে চরিত্রটির ট্র্যাজেডি অসিতবরণের অভিনয়ে প্রতিফলিত।

গ্রামের পটভূমিতে ছবি। তাতে স্টুডিওর সেটগুলি দৃষ্টিকটু লেগেছে। জমিদার বাড়ির সেট মন্দ নয়। বিশেষত জলসাঘরের, যেখানে ভারতী রায়ের নাচ যতটা উপভোগ্য গান ততটা নয়। গ্রামবাসীর মুখে লালন ফকিরের একটি গান শুনতে ভাল লেগেছে। ছবির গানগুলির সুর দিয়েছেন বাপী লাহিড়ি।

সরল গ্রাম্যজীবন এবং অত্যাচারী জমিদারের শয়তানির কাহিনীতে পরিচালক মধুকরগোষ্ঠী বোম্বাই-চিত্রের প্রমোদ-উপকরণও আমদানি করেছেন। জমিদারের অপকর্মের সহযোগী এক অবাঙালী ব্যবসায়ীর গুণ্ডা ভাড়া করার দৃশ্যে হিন্দী-চিত্রসুলভ হোটেলসেটে বিলিতি নাচের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই প্রচেষ্টা অসার্থক।

ছবির খবর

মুক্তি আসন্ন

কে সি প্রোডাকসনসের **"বিরাজ বৌ"** ছবির মুক্তি আসন্ন। শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য সলিল সেনের, পরিচালনা মানু সেনের, সংগীত পরিচালনা কালীপদ সেনের। প্রধান চরিত্রের শিল্পী: উত্তমকুমার, মাধবী চক্রবর্তী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, কমল মিত্র, তরুণকুমার, জহর রায়, জীবেন বসু, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নিলীমা দাস, শিবানী বসু এবং অন্যান্যরা।

• • •

সরকার প্রোডাকসনসের **"অপর্ণা"** ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায়। জরাসন্ধ রচিত কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির পরিচালক সলিল সেন ও সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায় গঙ্গাপদ বসু, অমরনাথ, তরুণকুমার, জহর রায়, গীতা নাগ, গীতা দে প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

• • •

রূপ ও বাণীর **"শপথ নিলাম"** ছবির মুক্তি আসন্ন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনের পটভূমিকায় এ ছবির কাহিনী

"অপর্ণা" (পরিচালনা: সলিল সেন) ছবিতে তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

রচনা করেছেন শৈলেশ দে এবং পরিচালনা করেছেন শচীন অধিকারী। সংগীত পরিচালক সুকুমার মিত্র। বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন সমিত ভঞ্জ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চৌধুরী, সুশীল চক্রবর্তী, তপন দত্ত, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, শিবানী বসু ও সুনন্দা দাশগুপ্ত।

• • •

আর্ট ইন্টারন্যাশনালের **"চিঠি"** ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায়। কাহিনী ও পরিচালনা নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের। সুরকার শ্যামল মিত্র। প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় শিল্পী: সমিত ভঞ্জ, সন্ধ্যা রায়, রবি ঘোষ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, জহর রায়, লোলিতা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অনুভা ঘোষ, শিউলি মুখোপাধ্যায় শিবানী বসু প্রভৃতি।

• • •

নবরূপার "ছন্দপতন" ছবি মুক্তির অপেক্ষায়। পুলক মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা করেছেন অমিয় মুখোপাধ্যায়। পরিচালক গুরু বাগচী ও সুরকার শৈলেশ রায়। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী: সমিত ভঞ্জ, নন্দিনী মালিয়া, অনিল চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, অনুভা ঘোষ, শিবানী বসু, জহর রায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

• • •

শুভায়ু পিকচার্সের **"শেষ পর্ব"** ছবির মুক্তি আসন্ন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য দীপ বর্মার। পরিচালক চিত্ত বসু এবং সংগীত পরিচালক [illegible]। প্রধান [illegible]

"বনপলাশির পদাবলী" (পরিচালনা : উত্তমকুমার) ছবিতে শিপ্রা দেবী, নির্মল-কুমার ও বিকাশ রায়

শিল্পী পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, সমিত ভঞ্জ, অনুপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বীর ঘোষ, অনুভা ঘোষ, লিলি চক্রবর্তী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও মিঠু মুখোপাধ্যায়।

নির্মীয়মাণ

উত্তমকুমারের পরিচালনায় **"বনপলাশির পদাবলী"** ছবির কাজ এগিয়ে চলেছে। রমাপদ চৌধুরীর ওই নামের উপন্যাসের চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে শিল্পী সংসদের উদ্যোগে। সম্প্রতি ওই ছবির অন্যতম সংগীত পরিচালক সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে তাঁর নিজের এবং উৎপলা সেনের দুখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন শিল্পী সংসদের সদস্য-শিল্পীরা।

* * *

কলামন্দির-এর **"ছিন্নপত্র"** ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী : উত্তমকুমার, মাধবী চক্রবর্তী, কমল মিত্র, অসিতবরণ, হরিধন, চন্দ্রাবতী দেবী, অপর্ণা দেবী এবং দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া দেবী।

* * *

রেবী জুন প্রোডাকসনসের **"স্ত্রী"** ছবির কাজ প্রায় শেষ। বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সলিল দত্তের। সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অমরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

বাদল পিকচার্সের **"নতুন দিনের আলো"** ছবির কাজ সমাপ্তির মুখে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অজিত গাঙ্গুলির। সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, বিদ্যা রাও, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, বিকাশ রায়, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, বিনতা রায়, শমিতা বিশ্বাস, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি শিল্পী।

চিত্রপরিচালকের লোকান্তর

চিত্রপরিচালক শ্রীপূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী কিছুকাল রোগভোগের পর গত ২৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে

তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২। তিনি বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাকে রেখে গেছেন।

তাঁর পরিচালনায় আদ্যাশক্তি মহামায়া, ত্রিনয়ণী মা, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছবিগুলি জনপ্রিয় হয়েছে। একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে চলচ্চিত্র মহলে তাঁর সুনাম ছিল। মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি বহু লোকের প্রিয় ছিলেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

গত সপ্তাহে স্থানীয় তেজপাল মঞ্চে 'বিকাশ'-এর সৌজন্যে বহুরূপীর 'অপরাজিতা' নাটক মঞ্চস্থ হল। মাত্র তিনটি শো, বৃহস্পতি, শনি এবং রবিবার। প্রতিভাময়ী তৃপ্তি মিত্র অপরাজিতা রায় হয়ে যখন অবতীর্ণ হন এবং তারপর থেকে যে ধরনের সাবলীল অভিনয়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যান, তার ফলে দর্শক মহলে কী কাণ্ড হয় তার ইতিবৃত্ত 'দেশ'-এর পাতায় লিখতে বসা মানে মা-র কাছে মাসীর গল্প করার মত। সুতরাং সে পর্ব থাক।

'তেজপাল' স্থানীয় রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যে নানা কারণে বিশিষ্ট। হলটি মোটামুটি ছোট। কিন্তু তেজপালের প্রতিভাস অন্য মঞ্চের ঈর্ষার বিষয়। বম্বের বেশির ভাগ ভাল নাটক মঞ্চস্থ হয় এখানে। হলটি ছোট হবার দরুন তাড়াতাড়ি ভরে যায়। এবং ঐ একই কারণে শেষ সারির লোকের চোখ এবং কান নিয়ে টানাটানি করতে হয় না মঞ্চস্থ শিল্পীদের। তেজপাল হলে শব্দস্রোত কোন অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে না। সুতরাং যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করলেও দর্শক-শ্রোতার কোনো অসুবিধা হয় না। এ ছাড়া তেজপাল অবস্থিত বম্বের বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ এলাকার মধ্যবিন্দুতে। তবু রবিবার সকাল সাড়ে দশটায়, অপরাজিতায় তৃপ্তি মিত্রের একক অভিনয় দেখবার জন্য, ঐ ছোট হলের এক-তৃতীয়াংশও ভরেনি। শনিবার এর আগের দুটি শো-তে হাউস প্রায় পরিপূর্ণ ভরা ছিল। বম্বেতে যাঁরা নাটক করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই 'অপরাজিতা' দেখেছেন। বেশ কয়েকজন দুবার করে দেখেছেন। এবং সকলেই তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ে পরিতৃপ্ত। কেবল ভাষা না জানার জন্য বিষয়বস্তুর বিশেষ বিশেষ খোঁচগুলো ঠিকমত বুঝতে পারেননি। তবুও তাঁরা আনন্দে অধীর। প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'তেজপাল' হলের কর্মকর্তা প্রায় খেদের সুরেই বললেন, 'দর্শকদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা খুব কম দেখলাম।' হেসে বললাম, 'বাঙালী কি মুখ দেখলেই চেনা যায়?' তাতে ভদ্রলোক বললেন 'না অনাদের চিনি বলে বলছি। যাঁদের চিনি না, তাঁদের সকলেও যদি বাঙালী হন তবু এই তিন দিনে দর্শকদের শতকরা কুড়িজনও বাঙালী ছিলেন না।' কথাটা শুনে আশ্চর্য লাগলো। বিশেষ করে রবিবার সকালের হাউসের অবস্থা দেখে। কিন্তু ধন্যি মেয়ে তৃপ্তি মিত্র ঐ সামান্য সংখ্যক দর্শকদের সামনে এমন অসামান্য অভিনয়, এ ঐ তৃপ্তি মিত্রই পারেন।

দৌড়ে নিয়ে অঙ্গনায় রবিবার সকালের শো-য় অনেকেই আসতেন না। তা ছাড়া বম্বের একটি বিশেষ সংবাদপত্রে নাকি 'অপরাজিতা' প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখই করা হয়নি। রবিবারের ঐ রকম হাউসের জন্য নাকি সেটাও দায়ী। কিন্তু আসলে আরো একটা কারণ আছে বাঙ্গালীদের অনুপস্থিতির। সেটা হচ্ছে ঐ রবিবারটা হচ্ছে সরস্বতী পুজোর আগের শেষ রবিবার, এবং বম্বের নাটকপ্রিয় বাঙ্গালীদের অধিকাংশই বাণীবন্দনায় ব্যস্ত। চাঁদা তোলা, মণ্ডপের বিছানাপাতা, মিটিং, প্যান্ডেলওয়ালাদের দিয়ে ঝক্কি সামলানো ইত্যাদিতে তাঁরা এমন ব্যস্ত এবং মগ্ন যে তার হিসেব দেওয়া কঠিন। তবু সেই দিন অর্থাৎ রবিবারের সকালের শো-তে অন্তত একটি সংস্থার অনেককেই নাটক দেখতে দেখলাম, যাঁরা বাণীবন্দনাও করছেন এবং নাটকও করছেন। সুতরাং ঘটনাটা ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু কিছু না বুঝেও এটা অনায়াসে বলা যায় যে, যাঁরা 'অপরাজিতা' দেখলেন না, তাঁরা এমন কিছু থেকে বঞ্চিত করলেন নিজেদেরকে যা অহরহ হয় না।

'বিকাশ' একক থাকতে বেশ কয়েক বছর যাবৎ বঙ্গ সংস্কৃতি আমদানী করছেন বম্বে প্রান্তে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উনি যথেষ্ট বিচলিত। কিন্তু সত্যি সত্যি বিচলিত হবার বোধ হয় কোন কারণ নেই। এটা নিশ্চয়ই কোনো একটা অনিবার্য কার্য-কারণের ফল। এই অনিবার্য কার্যকারণ প্রতিবারেই প্রতিবন্ধক হবে এমন কথা মনে করাও নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। সুতরাং এই কথা বলে শেষ করি যে, 'বিকাশের' সৌজন্যে এই ধরনের অনুষ্ঠান এ প্রান্তে আরো অনুষ্ঠিত হবে, বম্বের সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে বঙ্গ-প্রান্তের পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হবে। স্থানীয় বাঙ্গালীরা প্রবাসে আমাদের উৎকর্ষ দেখে আনন্দিত হবেন।

সরল শর্মা

চিৎপুর-চিত্র

বছর দুই আগে, বর্ষার এক সকালে বেহালায় যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। দিনটা ছিল রবিবার। উত্তর শহরতলি থেকে দক্ষিণ শহরতলিতে যে বিরাট দূরত্ব তা পাড়ি দিতে হয়। বাস থেকে ট্রাম, ট্রাম থেকে বাস—সবশেষে সাইকেল রিকশার দৌলতে গিয়ে পৌঁছলাম [illegible]। ডাইনে বাঁশের ঝাড়, বাঁয়ে আগাছার ঝোপ—মাঝ দিয়ে প্রশস্ত রেখার মতন সরু পথ ধরে মোরগাড়ায় এসে দাঁড়াতে জানতে পারলাম, ফণীবাবু বাড়িতেই আছেন।

'[illegible]' ছবিতে (পরিচালনা: নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়) সন্ধ্যা রায় ও রবি ঘোষ

শুনে স্বস্তি পেলাম। দীর্ঘ পথভ্রমণের ক্লান্তি অনায়াসে ঝাড়িয়ে ফেলতে পারলাম শরীর ও মন থেকে।

খবর গিয়েছিল ভেতরে। ওঁর শোবার ঘরে বসে দুটি ফোটো দেখছিলাম আমি। যুবা বয়সের ফণী মতিলালের ছবি। একটি ঘরোয়া পরিবেশের, অন্যটি কোনো পালার বিশিষ্ট চরিত্রের রূপসজ্জায়। ঠিক মনে করতে পারছিলাম না ছবিটি কোন যাত্রাভিনয়ের কোন চরিত্রের! সাজসজ্জা ইতিহাসের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল অথচ ঠিক মনে পড়ছে না...এমন সময় ভেতরবাড়ি থেকে ফণীবাবু এলেন। তাঁর পরনে ধুতি, গায়ে সাবেককালের ফতুয়া। মুখে উজ্জ্বল হাসি। বললেন: খবর সব ভাল তো?

বললাম, খারাপ খবর কি আর কষ্ট করে বয়ে এনেছি?

ফণীবাবু অল্প উঁচু খাটের ওপর উঠে বসলেন। অনেক অনেক রোগা হয়েছেন বলে দেখতে স্বল্পদীর্ঘ এই মানুষটিকে আরও ছোটখাটো মনে হচ্ছিল। কিন্তু মুখময় হাসির উজ্জ্বলতা অমলিন। বললেন: চিৎপুরের খবর বলুন।

না, চিৎপুরের খবর ওঁকে দিইনি। তার আগে দুটিকয় চিঠি সামনে এগিয়ে দিলাম। অবাক হয়ে বললেন, 'এ-সব কী?' আমি বললাম, 'অগণন মানুষের দাবি।' শুনে হাসলেন শব্দ করে। বললেন, 'চোখে ভাল দেখতে পাই না বলে পড়ার কথাই ওঠে না। বরং সকলের কথাগুলো আপনি আমাকে সরল করে বলুন।' তাই বলতে হল। বললাম: আজকের যাত্রার যাঁরা তরুণ দর্শক, 'ছোটকাগ' এই নামটা যাঁদের কাছে প্রায় রূপকথার মতন, চিঠিগুলো তাঁরাই লিখেছে। না, সরাসরি ফণীবাবুকে নয়; আমাকে। ওঁদের সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছা বাংলার চিরনবীন সিরাজকে ওঁরা অন্তত একদিনের জন্য হলেও দেখতে চায়। মঞ্চে হলে ভালই; নয়তো আসরেও আপত্তি নেই।

শুনে হাসলেন। এ হাসি শব্দহীন, বর্ণহীন—বোধ হয় করুণ কান্নার চেয়েও তার তরঙ্গ মারাত্মক। কী বলতে গিয়ে থামলেন। কিছু ভেবে নিচ্ছিলেন বোধ হয়। পরে মুখ তুললে দেখলাম ওঁর চোখের কোল ভেজা। 'আসরে আপত্তি নেই?' শরীর দুলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করলেন। 'কিন্তু আসরটা কোথায়? কলকাতায় মঞ্চের পর মঞ্চ হতে পারে, নয়তো সিনেমা, কিন্তু যাত্রার আসরের জন্য কেউ পাঁচকাঠা জায়গা কিনেছে একথা বোধ হয় জীবদ্দশায় শুনে যেতে পারব না?'

বললাম, 'পারবেন। কলকাতায় যাত্রা স্টেডিয়াম হবে। সেই স্টেডিয়ামে অভিনয় করার মতন পরমায়ু যেন ভগবান আপনাকে দেন।'

আবার সেই অদ্ভুত, বর্ণহীন ধারালো হাসি। বললেন, 'বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী ও-কথা প্রথম বলেছিল। তারপর দশ বছর পার হয়ে গেছে। মাঝে শোনা গিয়েছিল যাত্রার মালিকেরা এজন্য একটি তহবিল খুলে অর্থ সংগ্রহ করবেন। আরও পরে ব্যক্তিগত প্রয়াসে যাত্রা স্টেডিয়াম স্থাপনের কথাও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় নি। সিনেমা থিয়েটারের জন্য সরকার আছে, যাত্রার জন্য কে আছে বলুন?'

অনেক অনেক কথা। অনেক ব্যর্থতা,

"ফেরারি" (পরিচালনা : অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে বিভূতি ভট্টাচার্য, রবি ঘোষ, সত্যেন গাঙ্গুলী ও তুহিন মুখার্জি

পরাজয়, স্বপ্নভঙ্গের বর্ণনা একের পর এক দিচ্ছিলেন। সামনে বসে তা শুনলে চোখের জল রোখা দায়। অথচ কিছুতে থামাতে পারছিলাম না। সারা অভিনয়-জীবনে যিনি দু হাত ভরে যশের সম্ভার কুড়িয়েও ফুরোতে পারেননি, কে জানে তাঁর মনের গভীরে এমন অতল কান্নার উৎস লুকিয়ে আছে!

সব শোনার পর আমার কথা ফুরিয়ে এসেছিল। বেলা বাড়ছে। উঠতে উঠতে বললাম, 'এঁদেরকে কি কোনো আশার কথাই লেখা যাবে না?'

বললেন, 'যাবে। আমি ঠিক গিয়ে দাঁড়াবো। কিন্তু তার আগে কলকাতায় একটি স্থায়ী যাত্রার আসর প্রতিষ্ঠিত হোক। নাই বা হল স্টেডিয়াম, শোভাবাজার রাজবাড়ির মতন একটা যাত্রার আসর কি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসানো যায় না?'

—সূত্রধার

অবন মহলে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠান

দক্ষিণ কলকাতার একেবারে শেষ প্রান্তে, গড়িয়াহাট ব্রিজের কাছটায় গত কয়েকদিন এক মনোজ্ঞ উৎসব হয়ে গেল। চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটারের ক্ষুদে শিল্পীরা ছিলেন এই উৎসবের কুশীলব, তাদেরই নানাবিধ কৃতিত্বে আর কারুকৃতিতে উজ্জ্বল এই উৎসবে শ্রোতা এবং দর্শকের সংখ্যা কিন্তু এবার আশানুরূপ হয়নি। তবে ছুটির দিনে ভিড় ছিল খুব। শিশু রঙমহলের ২০তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে এবারও ছিল নানারকমের অনুষ্ঠান সূচী, যা ভালো না লেগে পারে না।

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখবার জিনিস এঁদের সংগঠন-শক্তি। ১৯৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিল তিল করে এঁরা গড়ে তুলেছেন এই প্রতিষ্ঠানটিকে, যা আজ না হলেও ভবিষ্যতে তিলোত্তমা হয়ে উঠবে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের মানসিক পুষ্টির এতবড় সাংস্কৃতিক সংগঠন আর কোথাও আছে বলে এখনো জানা নেই। সভ্য জগতে শিশুদের গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে 'বালভবন' একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, অথচ এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের চেহারা আজো যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য নয়। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত কিছু প্রচেষ্টা ছাড়া তেমন সরকারী উদ্যোগ চোখে পড়ে না।

কিন্তু শিশু রঙমহল তাঁদের সমবেত শক্তি নিয়ে সেই অভাব মেটাতে প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন। ১৯৬৫ সালের নভেম্বরে তাঁরা গড়িয়াহাটের অবনমহল উদ্বোধন করেছেন। প্রচণ্ড আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে শিশু রঙমহলে কাজ চালাবার মত এমন অনেক কিছু করা হয়েছে যা রীতিমত প্রশংসনীয়। এখানে নিজেদের মঞ্চ ছাড়াও রেকর্ডিং স্টুডিওর কাজও প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। নিজেরা তো বটেই, এমনকি কলকাতার সমস্ত স্কুল-কলেজের এবং নানা রকম শিশু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও এই স্টুডিওতে নামমাত্র খরচে রেকর্ড করা হয়ে থাকে। নাচ, গান, ছবি আঁকা প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দুই শতাধিক সদস্য নিয়মিত তালিম পাচ্ছে, এখানে রয়েছে ছবির প্রদর্শনী-ঘর,

লাইব্রেরী, আভ্যন্তরীণ খেলাধুলোর ব্যবস্থা, পুতুল নাচের আসর, ছেলেদের জন্য সিনেমা, শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে বর্তমান শিশু রঙমহল একটা চিলড্রেন ইউনিভার্সিটির চেহারা নিয়েছে। পরিকল্পিত পাঁচতলা বাড়িটি এখন মাত্র তিনতলা, দু তলা উঠতে যেমন বাকী, তেমনি বাকী রয়েছে ছেলেদের ছবি সেণ্টার, একটা ছোট্ট পার্ক এবং আরো নানা প্রয়োজনীয় জিনিস। কিন্তু উদ্যম দিয়েই তো সব সমস্যার মোকাবিলা করা যায় না, ফলে এঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর বহুলাংশই পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে টাকার জন্যে। বাড়িটার গায়ে যে এখনো মনোহারি রং-এর প্রলেপ পড়েনি, সিঁড়িগুলো যে এখনো অমার্জিত, মঞ্চের চারপাশে এখনো যে দৈন্যদশা তার মূল কারণও টাকা। যতটুকু ইতিমধ্যেই করা হয়েছে সে শুধু উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠা আর কিছু লোকের ব্যক্তিগত সাহায্যের যোগফল।

অথচ অনুষ্ঠান দেখতে বসে দর্শকদের এসব সমস্যা আর সংকটের কথা ভুলে যেতে হয়। ভুলিয়ে দেয় শিশু রঙমহলের শিল্পীরা—যাঁদের বয়স প্রত্যেকেরই পনেরোর নিচে। এ বছরের সূচীতে দুটি নতুন অনুষ্ঠান সংযোজিত, একটি অতুলপ্রসাদের গানের ভিত্তিতে তৈরি নৃত্য আলেখ্য; আরেকটি সমর চ্যাটার্জী-কৃত 'রূপলেখা।' অতুলপ্রসাদের নটি গানের ওপর নৃত্যের পরিকল্পনা, যা খণ্ড খণ্ড রূপে এক অখণ্ড সৌন্দর্য পেয়েছে। নাচগুলির মধ্যে ভারত নাট্যম্, কথক, মণিপুরী ও 'কথাকলি'র প্রভাব থাকায় গোটা আসরটি বৈচিত্র্যে মণ্ডিত। অধিকাংশ নৃত্য পরিকল্পনাই দলগত। গ্রুপ ডান্সের ক্ষেত্রে দলগত নৃত্য সংগীত অনুষ্ঠানকে যে কি রকম রূপ-লাবণ্য শ্রীমণ্ডিত করে তোলে শিশু রঙ-মহলের 'মধুরাঙ্গা' তারই সার্থক উদাহরণ।

রূপলেখার নাচ কথক-এর ভিত্তিতেই গ্রথিত। এটি একটি সরল কাহিনীর আশ্রয়ে এগিয়েছে, যে কাহিনী ছোটরাও সহজে অনুধাবন করতে পারে। দর্শকদের কাছে শিশু রঙমহলের এই অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে থাকবার মর্যাদা পাবে। যেমন নাচ, তেমনই এর গান। এই আলেখ্যে কিছু কিছু দ্বৈত নৃত্য ছিল, অন্যান্যগুলি সবই সমবেত এবং তাও ঐ কথক রীতিতে। নামভূমিকার শিশু শিল্পী এই অনুষ্ঠানে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে দর্শকদের স্মৃতিতে তা অনেক-দিন অম্লান থাকবে। নামভূমিকার শিল্পী ছাড়াও ছোট বড় সব ভূমিকার শিল্পীরাই তাঁদের কৃতিত্বে 'রূপলেখা'কে দর্শকদের মান উজ্জ্বল করে রেখেছে। অন্যান্য অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে 'আনন্দবিচিত্রা' 'শকুন্তলা' 'রামায়ণ' 'ভূত পত্রীর যাত্রা' এবং পুতুল নাচ 'আলাদীন' মনে রাখবার মতো **অনুষ্ঠান। পাপেট শো 'আলাদীন' এক**

"ছিন্নপত্র" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী, উত্তমকুমার ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

চমৎকার প্রযোজনা। এমন উচ্চাঙ্গের পাপেট শো এ-দেশে বড় একটা দেখা যায় না। এ-ব্যাপারে সুরেশ দত্তর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবারের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে যুক্ত হয়েছিল শেষ দিনে শিশু রঙমহলের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর নৃত্যানুষ্ঠান। শ্রীমতী পাণিগ্রাহীর নাম ওড়িশী নৃত্য জগতে সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষত ওড়িশী নৃত্যে তাঁর সমাজ্ঞীর মর্যাদা। বলাই বাহুল্য, শ্রীমতী পাণিগ্রাহী তাঁর অনুষ্ঠানে সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তেইশ দিনের এই উৎসবে আরো একটি মজার বিষয় ছিল ছোটদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। জলরং, প্যাস্টেল, সাদা কালো সব মিলিয়ে অনেকগুলি ছবি এখানে প্রদর্শিত, এক কথায় যার বিশেষণ হতে পারে—চমৎকার!

নাট্য-সমালোচক

'মুক্তি সংগ্রাম'

গত রবিবার (২৩ জানুয়ারি) কলামন্দিরে শ্রীতিমিরবরণ বিরচিত এবং শ্রীরাজেন্দ্রমল কাংকারিয়া প্রযোজিত "মুক্তিসংগ্রাম" অর্কেস্ট্রা আসর শুনে অনেক কথাই মনে হয়েছিল। প্রথমত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এখনও এদেশে অর্কেস্ট্রার জন্য শ্রোতাদের উদ্দীপনা দেখা দেয়নি। এবং এই পরিস্থিতিতেও যে মুক্তিসংগ্রামের মত অত মননশীল অর্কেস্ট্রেশন হতে পারে তা অবশ্যই সৌভাগ্যের কথা। যখন বিশ্বজোড়া 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য' সংগীতের মহড়া চলেছে সে সময়েই তিমিরবাবুর অর্কেস্ট্রায় সেই ধরনের কিছু একটার স্নিগ্ধ সান্নিধ্য **পাওয়া ভোলার জিনিস নয়। তবে প্রশ্ন এই** যে, পূর্ব-পশ্চিমের গান বাজনা নিয়ে যাঁরা খুবই উৎসাহী তাঁরা কি তিমিরবাবুর প্রচেষ্টার যথাযথ খোঁজ রাখেন?

সেদিনের অর্কেস্ট্রার নিবেদনকে পঞ্চাশ জনের মত শিল্পী ছিলেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সেতার, সরোদ, বাঁশী, সানাই, তবলা, ঢাক, জলতরঙ্গ, একতারা, বেহালা, ঢোলক, বাংলা গোছের একটি যন্ত্র ইত্যাদি বহু কিছুই ছিল। সুর এবং ছন্দের আধারে প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি কম্পোজিশনের এক একটা নিজস্ব বক্তব্য ছিল। বিরতির পূর্বের বিষয়গুলি ছিল রঞ্জনী, মানভঞ্জনী, বঙ্গজননী ইত্যাদি। তবে ভাল লেগেছিল-বিশেষ করে মানভঞ্জনী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যান নির্ভর এই রোমাণ্টিক কম্পোজিশনের চলাচলে সুরের প্রাধান্য লক্ষণীয়। স্থানে স্থানে গানের মত সুখশ্রাব্য পরিচ্ছেদে রাবীন্দ্রিক ও অতুলপ্রসাদীয় "টোন" ছিল। এছাড়া কীর্তনাঙ্গের সুরলাবণ্য ও উচ্ছল ছন্দোবোধ মানভঞ্জনীকে একটা আধুনিক ব্যাখ্যার পর্যায়ে ফেলে।

বঙ্গজননীতে ব্যবহৃত হয়েছে পূর্ব-বাংলার একান্ত নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রাদি। এর প্রয়োগেও পূর্ব-বাংলার মেঠো সবুজ ভাটিয়ালীর চরিত্র অটুট। কম্পোজিশন হিসেবে বঙ্গজননী যে শ্রেণীতেই পড়ুক না কেন (দেশের অবস্থাটির পরিপ্রেক্ষিতে বলছি) রচনাটি পূর্ব-বাংলার গানের স্বভাবসুলভ দরদে সমৃদ্ধ। উপরন্তু আসরের মধ্যে কম্পোজিশন 'মুক্তিসংগ্রাম' যেটি সেদিন বিরতির পর শোনা গেল, বঙ্গজননী তার জন্য অভিপ্রেত আবহাওয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল।

মুক্তিসংগ্রাম একটা অভিজ্ঞতার পর্যায়ে পড়ে। পুরো রচনাটাই প্রতীকী। পূর্ব-

বাংলার জাগরণ হল তার বিষয়। আমার সোনার বাংলা, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, বাঁধ ভেঙে দাও প্রভৃতি গানের সংযোজনায় রচনাটি অনেকটা পাশ্চাত্য সংগীতের 'কান্তাতা' গোষ্ঠীতে পড়ে। এমন কি, বাণীবদ্ধ গান ও সুরগ্রন্থনায় যে একটা মহত্তর গানের সৃষ্টি হয় (যার সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণা শ্রোতৃবৃন্দ বেটোফেনের Ninth *Symphony*-তে *Ode to Joy*-এর ব্যবহারে কিংবা শুবার্টের *Durchkompouiert* বা *through composed* শ্রেণীর রচনাগুলিতে পেতে পারেন) তার সামান্য সামান্য আঁচ পাওয়া যায় মুক্তিসংগ্রাম শুনে।

মুক্তিসংগ্রামের দোষের মধ্যে ধরা যেতে পারে কয়েকটি প্রতীকী সংকল্পকে যেগুলো বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এছাড়া কতকগুলি হাহাকার ও ক্রন্দনধ্বনি যেমন যেন রচনার কাঠামোর বাইরে চলে যাওয়ার অভিপ্রায় বোঝায়। এই ধরনের নাটকীয়তা সুরের প্রতীকেও গড়ে তোলা সম্ভব। যন্ত্রণার আক্ষরিক অনুবাদ সংগীতে কিংবা সাহিত্যে একটা অশৈল্পিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যে বিচারে *Arnold* তাঁর *Empedocles on Etna*কে পরবর্তী কালে মহৎ কীর্তি বলতে কুণ্ঠিত ছিলেন, ঠিক সেই বিচারেই সুষ্ঠু সংগীতের উপকরণ হিসেবে বেহিসেবী নাটকীয়তা বর্জনীয়।

তবে ঐ কতকগুলি প্রয়োগ ব্যতীত মুক্তিসংগ্রাম অবশ্যই অনবদ্য। সমঝদার এবং সাধারণ শ্রোতা উভয়েই প্রভূত আনন্দ পাবেন এই কম্পোজিশনটি শুনে। ওপার বাংলার মুক্তিকে একটা নতুন ইঙ্গিতে বোঝাবার এই প্রচেষ্টা যদি এপার বাংলার মানুষ আশানুরূপ অনুরাগে গ্রহণ করতে পারেন, তবে যথেষ্ট আনন্দের কারণ থাকবে।

সংগীত-সমালোচক

কলকাতায় জেমিনি সারকাস

কলকাতায় শীতের পালা ফুরিয়ে আসছে। শীতের সঙ্গে প্রমোদলোকের যে-বিশেষ অনুষঙ্গ আমাদের মনে জড়িয়ে থাকে তার নাম সারকাস। দুঃভাগ্যেই এবার নানা কারণে তার দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রধান কারণ সকলেই জানেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি। যাই হোক, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক; দেশে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনায় সকলে আনন্দিত। শীত শেষ হবার আগে সেই প্রমোদ-ব্যবস্থারও আয়োজন হয়েছে। বেটার লেট দ্যান নেভার—এ-কথায় কে না বিশ্বাস করেন?

পার্ক সারকাস ময়দানে জেমিনি সারকাসের তাঁবু পড়েছে, এই সংবাদে তাই সুখী হবেন অনেকেই, বিশেষ করে প্রমোদ-রসিক নাগরিকরা এবং বিদ্যালয়ের শিশু-কিশোর ছাত্র-ছাত্রীরা। জেমিনি সারকাসের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ২৯ জানুয়ারী সন্ধ্যায়। এখন কয়েক সপ্তাহ নিয়মিত প্রদর্শনী চলবে।

গত ২৪ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সভায় জেমিনি সারকাসের ম্যানেজার শ্রী এ রাজন রাজ্য সরকার ও কলকাতা পৌর-সভার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কলকাতায় সারকাস প্রদর্শনী করার ব্যাপারে তাঁদের যে সব অসুবিধা হচ্ছে তার কথাও বললেন। বড় রকমের সারকাস প্রদর্শনীর উপযুক্ত জায়গা তাঁর মতে কলকাতার ময়দান, ওয়াই এম সি এ গ্রাউন্ডের বিপরীত দিকে বিস্তৃত যে-অংশ। এখানে তাঁবু ফেলবার সুযোগ এখনও তাঁরা পাননি। অনেক দিনের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। কর্তৃপক্ষ সারকাস দলের প্রয়োজনের দিকটা বিবেচনা করে এ-ব্যাপারে তাঁদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেবেন এই তাঁর আশা।

জেমিনি সারকাস যেসব খেলায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন সেগুলির অধিকাংশ এবারও দেখানো হচ্ছে। তাছাড়া কিছু নতুন সংযোজনও আছে। এবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, শ্রীরাজন জানালেন, শারীরিক শক্তির খেলার উপর। এইসব খেলার মাধ্যমে আমাদের বীর জওয়ানদের প্রতি জানানো হচ্ছে জেমিনির অভিবাদন।

চমকপ্রদ নতুন খেলাগুলি কী ধরনের? এ-বিষয়ে শ্রীরাজন সাংবাদিক-সভায় বিস্তারিত কিছু বলতে রাজী হননি। সেক্ষেত্রে চমকের মজা কমে যাবে বলে তিনি মনে করেন। "আর পুডিং কেমন তা কি বলা যায়? সেটা খেয়ে দেখাই ভাল!"

তরুণ যাদুকরের খেলা

তরুণ যাদুকর মদনকুমার যাদুকর জগতে সর্বকনিষ্ঠ হলেও ইতিমধ্যে তার কারসাজি খেলা দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি

সিকিম, নেপাল, কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং আসামের বিভিন্ন জায়গায় তার খেলাগুলি ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। তার জনপ্রিয় খেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন এনেছে ছুটন্ত রাইফেলের গুলি দাঁতে কামড়ে ধরার খেলাটি। অন্যান্য খেলাগুলির মধ্যে আছে করাত দিয়ে মহিলা দ্বিখণ্ডিত করা এবং জোড়া দেওয়া, মস্তকবিহীন যাদুকর, আরোহী সমেত মোটরগাড়ি অদৃশ্য, মাটির নিচে জীবন্ত মানুষ সমাধিস্থ করা প্রভৃতি।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

ওয়াকার-কাকা* আমি আর টিম অলিম্পিয়ানদের নামতে চাই।
বড় হয়ে নামবি।
*অরণ্যদেবকে কাকা বলে ওয়াকার-কাকা

ওবিজু ফিরে না এলে এই ট্রফি আমরা আবার জিতব কী করে? সেই তো আমাদের চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়।
ফিরবে ফিরবে। এই ট্রফিটাও তো তাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তুমি নাকি দেশে ফিরছ?
আমরা তোমার সঙ্গে যাব। তোমাদের অলিম্পিক্স দেখব।
বাইরের লোকের সেখানে যাওয়া নিষেধ।
ওবিজু!
ওবিজু, আমরা জানতুম, তুমি ফিরবে।
ফিরতে তো হবেই।
হুঁ হুঁ বাবা, আমরা কি আর খেলা দেখতে চাই!
আমাদের অন্য মতলব।
চলো, যাওয়া যাক।

ওবিজুর দেখা পাওয়া যাবে তো?
পেতেই হবে। তাই না ম্যাক?
শুম। ওর গ্রাম আমি চিনি। রাস্তাও আমার চেনা।

ওবিজু!
এসো ওবিজু, এই ট্রফি তোমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে।
এবং আবার এটা জিতে আনতে হবে।

লোকে বলে, যে-কেউ, অরণ্যদেবের ট্রফি নির্ভয়ে বয়ে নিয়ে যেতে পারে....
আমরা কি তোমার সঙ্গে যাব, ওবিজু?
না, আমি একাই যেতে পারব।
6/13

এ-ট্রফি সকলের, তাই সকলেই একে রক্ষা করবে।
এই পথেই ওবিজুর যাবার কথা—।
দেখা যাক।

২২তম প্রজাতন্ত্র বার্ষিকীর প্রাক্কালে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির বাণী এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এই বাণীতে তিনি মৈত্রী ও সহযোগিতার এক নবযুগ সৃষ্টির জন্য এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান জানান।
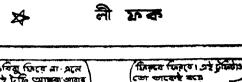
ভারতের প্রতি অসদিচ্ছা পরিত্যাগের জন্য পাকিস্তানের নেতাদের প্রতি বিশেষ আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "আসুন আমরা অতীতের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠি। আমরা—ভারতের জনগণ বাংলাদেশের জনগণ এবং পাকিস্তানের জনগণ—আমাদের সকলের সাধারণ মঙ্গলের জন্য এবং সারা বিশ্বের মানবিক স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য নিজেদের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক গড়ে তুলি।" রাষ্ট্রপতি সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানান। দেশে তিন বছর ধর্মঘট ও লক-আউট বন্ধ রাখার আবেদন তিনি পুনরাবৃত্তি করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন : আমাদের জনগণের ঐক্য ও দৃঢ়তা এবং আমাদের সশস্ত্র-বাহিনীর শৌর্য ও বীরত্বের জন্য আমরা সাম্প্রতিক পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছি। গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী সার্বভৌম বাংলা-দেশের অভ্যুদয়কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

তিনটি বিদেশী তেল কোম্পানীই আমদানী করা অপরিশোধিত তেলের দাম পিপে প্রতি ১১ সেন্ট বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। এই তিনটি কোম্পানী হলো—বার্মা শেল, এসো ও ক্যালটেকস।

৩০ জানুয়ারি—দীর্ঘদিন আলোচনার পর আজ কংগ্রেস-সি পি আই গণতান্ত্রিক মোরচা গঠন করা হয়েছে। দুই দলের নেতারা যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন, মোরচা পশ্চিমবঙ্গে প্রগতিশীল এবং স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য নির্বাচনে লড়াই করবেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে ১৮৮১ সালের নিগোশিয়েবল ইন স্ট্রুমেণ্ট অ্যাকট অনুযায়ী ছুটি ঘোষণার পদ্ধতি প্রায় তুলে দেওয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র ভারতের রাষ্ট্রপতি যদি মারা যান তা হলে ওই অ্যাকট অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন সেই স্থানে ছুটি ঘোষণা করা হবে।

দেশী সংবাদ

২৪ জানুয়ারি—বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আসছে। সেই সঙ্গে আসছে মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশের জনগণের তাড়া খাওয়া কিছু কিছু দুষ্কৃতকারী। পূর্বতন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগকারী এইসব ব্যক্তি বাংলাদেশে টিকতে না পেরে এখন ভারতে পালিয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে গত কয়েক সপ্তাহে ৫০ জন পাক দুষ্কৃতকারী ধরা পড়েছে।

প্রখ্যাত আইনজীবী এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শ্রীনির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আজ রাত ৮-৪০ মিনিটে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর। তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে ও তিন মেয়ে বর্তমান। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে তিনি হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বরাবর কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন।

২৫ জানুয়ারি—সি পি এম-এর নেতৃত্বে ব্যাপকতর বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। সাতটি দল এই ফ্রন্টের আচরণবিধি সম্পর্কে একমত হন। আসন ভাগাভাগির কাজও মোটামুটি শেষ হয়েছে। ফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার কি হবে তা ওইসব দলের নেতারা আর একটি বৈঠকে স্থির করবেন। সেদিন এই ফ্রন্টের নামকরণও হবে।

১৯৭০ সালে জনৈক কংগ্রেস কর্মীকে হত্যা করার অভিযোগে আজ কোর্টে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ১০ জন কর্মীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ডাইকোম থানাকের ভেজোর গ্রামে একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে জনৈক কংগ্রেস কর্মীকে ছুরিকাঘাত করে পিটিয়ে মারা হয়।

২৭ জানুয়ারি—ফরওয়ারড ব্লক সি পি এম নেতৃত্বে গঠিত ফ্রন্টের দিকে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এ নিয়ে দুপক্ষে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফরওয়ারড ব্লকের ওই সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে সি পি আই-এর রাজ্য সম্পাদক শ্রীগোপাল বানার্জি দুঃখজনক বলে উল্লেখ করে বলেন, সি পি আই নব কংগ্রেসের সঙ্গেই থাকবে।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ বলেন, পশ্চিমখণ্ডে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আগে পাকাপাকি স্থির করতে হবে। তারপর ভারত সাম্প্রতিক যুদ্ধে পাকিস্তানের দখলী

জায়গা থেকে সৈন্য সরানোর কথা ভাববে। তা ছাড়া তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ থেকে সৈন্য সরানোর প্রশ্নে পাকিস্তানের কোন কথা বলারও অধিকার নেই। ভারত ও বাংলাদেশ নিজেদের মধ্যে এ-বিষয় ঠিক করবে।

১৮ জানুয়ারি—শ্রীপ্রকাশচাঁদ শেঠী আগামীকাল ভুপালে রাজভবনে মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন। তার একঘণ্টা আগে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্যামাচরণ শুক্ল রাজ্যপাল শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করবেন।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীম্যাকনামারা আজ নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বণিক সভা ও শিল্প সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীকনোরিয়া ও অন্যান্য শিল্পপতিদের সঙ্গে এক বৈঠকে বলেন, ভারতকে সাহায্যদান অব্যাহত তো থাকবেই, তা ছাড়া আরও বাড়ানোও হবে। গত ৬ মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক অন্য বছরের তুলনায় ভারতকে বেশী সাহায্য দিয়েছে।

২৯ জানুয়ারি—আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী পদত্যাগ করেছেন। আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার পর শ্রীচৌধুরী পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। সোমবার শিলংয়ে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য আসাম রাজ্য বিধানসভা কংগ্রেস দলের বৈঠক বসবে।

বিদেশী সংবাদ

২৪ জানুয়ারি—সোভিয়েট রাশিয়া গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ মাঝরাতে এই ঘোষণা করা হয়। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে রাশিয়াই প্রথম এই নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিল।

২৫ জানুয়ারি—বাংলাদেশ ও সোভিয়েট রাশিয়া দূত বিনিময়ে সম্মত হয়েছে। নতুন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান কনসাল জেনারেল ভি এফ পোপোভ চার্জ দ্য এফেয়ার্স নিযুক্ত হচ্ছেন এবং মস্কোর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পদে শামসুল হকের নাম শোনা যায়।

২৭ জানুয়ারি—হাঙ্গেরি আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে রুমানিয়া আলবেনিয়া ছাড়া পূর্ব ইউরোপের সমস্ত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রই বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিল। কানাডাও শিগগির স্বীকৃতি দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

২৮ জানুয়ারি—বাংলাদেশের খসড়া সংবিধানে সংসদীয় সরকার গঠনের অঙ্গীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ৩৫০ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে এককক্ষের একটি আইনসভা গঠন করা হবে। নতুন এই রাষ্ট্র গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে অভিহিত হবে। এই রাষ্ট্রের মৌল নীতিগুলি অবশ্যই গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২৯ জানুয়ারি — শ্রীজুলফিকার ভুট্টো সোমবার পিকিং-এর পথে ইসলামাবাদ ত্যাগ করছেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে সেখানে আলোচনা হবে—(এক) চীনা কর্তৃপক্ষ ভারতের হাতে পাকিস্তানের পরাজয়ের কারণগুলি জানবেন। (দুই) বাংলাদেশে পাকবাহিনীর ধ্বংসের পরিণামে উপমহাদেশে সামরিক সাম্য বজায় রাখার প্রশ্ন। (৩) চীন থেকে জরুরী সামরিক সাহায্য পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা।

৩০ জানুয়ারি—পাকিস্তান আজ কমনওয়েলথের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিল। এর আগে ব্রিটেন অসট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড কমনওয়েলথভুক্ত এই তিন দেশ পাকিস্তানকে জানায়, তারা গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপ কুণ্ডু

অলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড় অ্যানাসিন ব্যবহার করেন। উনি বলেন,
"আমি সবসময় হাতের কাছে অ্যানাসিন রাখি।"

আমার চাই
সবচেয়ে সাদা
ক'রে
কাপড় ধোয়ার পাউডার

আমার দরকার
সবচেয়ে উজ্জ্বল
ক'রে
কাপড় ধোয়ার পাউডার

আমার চাই কাপড় আর
আমার হাতেরও পক্ষে
সবচেয়ে নিরাপদ
পাউডার

৩ জন নারী। ৩টি একেবারে আলাদা চাহিদা। মানে, ৩টি আলাদা আলাদা কাপড় ধোয়ার পাউডার? "মোটেই না"—বলেন আমাদের গবেষণা কুশলী। "আমরা কাপড় ধোয়ার এমন একটি পাউডার তৈরী করব যা এই ৩টি চাহিদাই পূরণ করবে।"

ফলশ্রুতি:

নতুন তিন ভাবে কার্যকর ডেট

- নতুন ডেট একটি খুব সাদা পাউডার···যাতে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।
- নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি। এটি কাপড়ের পুরনো ময়লাও দূর ক'রে দেয় আর রঙীন কাপড় উজ্জ্বল ক'রে তোলে।
- নতুন ডেটে প্রচুর ফেনা হয় আর এই ফেনায় রয়েছে কাপড়-চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ। এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ···তেমনি আপনার হাতের পক্ষেও সবচেয়ে নরম।
- ৫টি নতুন সাইজে পাবেন: ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০

তাছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে—নীল ডেট

অনেক সিগারেটই খেয়ে দেখলাম-
আসল তামাকের স্বাদে
উইল্‌স প্লেনের
তুলনা হয় না
(আর ৮০ পয়সা* প্যাকেট—দামের
সুবিধা ত' বটেই)
WILLS
NAVY CUT
MADE IN INDIA
উইল্‌স প্লেন খান
-ভাল লাগবে
*সর্বাধিক দাম স্থানীয় কর সাপেক্ষ
ইণ্ডিয়া টোবাকো কোম্পানী লিমিটেডের
একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৫
শনিবার ২৯ মাঘ ১৩৭৮
Saturday, 12 February 1972

নির্বাচনের প্রস্তুতি

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আর মাত্র একটি মাস বাকি। অন্য সময় হলে এতোদিনে পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী-আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠত। এবারে তার যথেষ্ট অভাব; তবে আদপেই নেই এমন কথা বলা যায় না। মহল্লায় মহল্লায় দলীয় প্রচার-লিখন শুরু হয়ে গেছে, কোথাও কোথাও দেওয়াল-দখলের কাজ শুরু হয়ে গেলেও এখনও লেখালেখি [illegible] হবে; অন্তত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবার পর। কংগ্রেস বা শাসক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সি পি আই দলও তাঁদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন। এই হল একতরফ। অন্য তরফের সি পি এম গোষ্ঠীও তাঁদের প্রার্থীদের নাম সদ্য ঘোষণা করেছেন।

প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর নির্বাচনের প্রাথমিক ভূমিকা শেষ হয়ে যায়; তারপরই শুরু হয় প্রচার, সভা, পাড়ায় পাড়ায় মিছিল। মনে হয়, এই মাসের শেষাশেষি থেকে আমরা তা প্রত্যক্ষ করতে পারব।

নির্বাচনের সময় শান্তি শৃঙ্খলা রাখা যাবে কি যাবে না সে-প্রশ্ন অনেকের মনে এসেছে। রাজ্য সরকারও এবিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় তার জন্যে সর্ববিধ ব্যবস্থা থাকবে প্রয়োজন হলে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যও নেওয়া হতে পারে।

আমাদের মনে হয়, গত নির্বাচনে যখন বড় রকমের কোনো ঘটনা ঘটে নি, তখন এবারের নির্বাচনের সময় মারাত্মক কিছু ঘটার সম্ভাবনা কম। তবে সি পি এম গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বার বার বলা হচ্ছে যে, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আবহাওয়া নেই। শাসক দল তাঁদের বিরোধী দলকে নির্বাচনী কাজে এগুতে দিচ্ছে না। শ্রীজ্যোতি বসু অভিযোগ করেছেন, তিরিশ পঁয়ত্রিশটি কেন্দ্রে নাকি তাঁরা ঢুকতেই পারছেন না। এটা কত দূর সত্য তা জানা মুশকিল। তবে গত দু দুটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, বিরোধী দলকে নিজের এলাকায় ঢুকতে না দেওয়া, নিজেদের 'পকেটে' বাধ্যতামূলকভাবে নিজেদের দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ানোর চেষ্টা, ভোটদাতাদের ভীতি ও সন্ত্রস্ত করে তোলার বিভিন্ন পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বসে থেকেছেন এবং তাঁর চোখের সামনে ছাপ মেরে মেরে ভোটের কাগজ নিজেদের দলের প্রার্থীর বাক্সে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ শোনা গেছে। কিন্তু সেই নির্বাচন যে অসঙ্গত তা কেউ বলেন নি, যিনি যেখানে হেরেছেন তিনি এবং তাঁর দলই শুধু বলেছে। এই ধরনের নির্বাচন নিশ্চয় সঙ্গত নয়, অবাধ নয়। কিন্তু যা চলু হয়ে গেছে এত শীঘ্রই তাকে থামানো মুশকিল। থামতে পারে, যদি সব কটি রাজনৈতিক দলই নীতিগত এবং কর্মগতভাবে ভোটদাতাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার মেনে নেন। সেটা যতদিন না মেনে নেওয়া হচ্ছে ততদিন অবাধ নির্বাচন কী সম্ভব?

রাজনৈতিক দলগুলির মতলব, কৌশল, প্রতাপ যতই থাক—ভোটদাতাদের উচিত নির্বাচনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যটুকু মনে রেখে নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা। আমাদের মনে রাখতে হবে, গত চার পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কোনো স্থায়ী সরকার গঠিত হয় নি, বার বার নির্বাচন হয়েছে, অথচ আমরা এমন কিছু করতে পারি নি যাতে স্থায়ী একটি সরকার নিশ্চিন্তে বসে এই রাজ্যের হাল ধরতে পারেন। এবারের নির্বাচনে যেন সেই প্রহসনের শেষ হয়।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা
মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা-১ থেকে সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৩৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে শুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টা ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৬.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৮.২৬

ভারতে
(অর্ডিনারি ডাকে)
বার্ষিক — টা ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৯.৭৩

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৪৬.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৩.০২
ত্রৈমাসিক — টা ১১.৭৩

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক — টা ২১.৭৩

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টা ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৯.০২
ত্রৈমাসিক — টা ১৪.৭৩

[illegible]
বার্ষিক — টা ১৫৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৩৮.৭৩

ওহে, ছোকরা! একটা কাগজ দাও তো. কংগ্রেসের নতুন খবর কী আছে একবার দেখি!
শেঠী, সিংহ গদী পেলেন। জোর খবর। নব কংগ্রেসের নির্বাচনী তালিকা চূড়ান্ত হল। জোর খবর।

ভোট দেব কাকে

এই সংবাদভাষ্য যখন লোকের চোখে পড়বে, ততদিনে এই প্রশ্নটা আরও চোখা হয়ে জেগে উঠবে। যাঁরা আলস্য কিংবা ছেঁদো আভিজাত্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভোটের লাইনে গিয়ে দাঁড়ান না—এমন শিক্ষিত লোকের সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে, যাঁরা কখনোই ভোট দিতে যাননি বলে বিশেষ গর্ববোধ করে থাকেন—তাঁদের আমি কিছুতেই দায়িত্বশীল নাগরিক বলে ভাবতে পারিনে। আবার এমনও অনেকে আছেন নিজেরা কখনোই ভোট দিতে যান না, কিন্তু চায়ের টেবিলে উপদেশামৃত বর্ষণে যাঁদের উৎসাহে কখনোই ভাটা পড়ে না। এঁরাও, আমার চোখে, আদর্শ নাগরিক নন। ভোট আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব-বজায় রাখার হাতিয়ার।

আমি ভোট দিই। প্রতিবার আমি ভোটাধিকারপ্রাপ্ত আমার পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধবকে ভোট দেবার জন্য উসকাই, তাদের ভয় ভাঙাতে চেষ্টা করি। একবার আমি, আমার স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে ভোট দিতে গিয়ে নগ্ন কৃপাণ ও নানাপ্রকার মারণাস্ত্রে সজ্জিত মারমুখী জনতার সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। দলটি ছিল সি-পি-এম সমর্থক এবং তারা অনতিদূরেই তাদের বিরোধী দলের একজন ভোটদাতাকে সনাক্ত করে, প্রায় আমাদের চোখের উপরেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আধমরা করে ছেড়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট, ত্রাস সৃষ্টি করে ভোটার ভাগিয়ে দেওয়া এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কংগ্রেস (বর্তমানে আদি) মনোনীত প্রার্থী। আমার মায়ের হার্টের অসুখ, তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন, আমার স্ত্রীর মুখ স্বাভাবিক কারণেই শুকিয়ে এসেছিল. তবু আমরা সেই সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে, জীবন বিপন্ন করেও এগিয়ে গিয়ে ভোট-বাকসে ভোটের কাগজ জমা দেবার পবিত্র কর্তব্য পালন করেছিলাম। আমরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলাম। কেননা, কমিউনিস্ট শাসন থেকে কংগ্রেস শাসনকে ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় রাখার পক্ষে অধিকতর অনুকূল বলেই আমার মনে হয়েছিল। যুক্ত ফ্রন্টের আমলে বড় শরিক সি পি এম উন্মত্ত অরাজকতার ঢাকনা উন্মুক্ত করে এবং প্রশাসনকে সার্থকভাবে পঙ্গু করে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, আমার সিদ্ধান্ত অসার ছিল না।

আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সেই আদি কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রর মুখে যখন ফতোয়া শুনি "নব কংগ্রেস থেকে সি-পি-এমও ভাল", তখন ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্র-সচেতন একজন নাগরিক হিসাবে তাঁকে এই কথাই বলতে ইচ্ছা যায়, "যদি দেবার মত কোনও কর্মসূচী না থাকে, সরে যান, যদি বলার মত কোনও কথা না থাকে, অবসর নিন। এই ধরনের অপরিণামদর্শী মত প্রকাশ করে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। কেননা আজকের দিনের বিচার্য বিষয় অতীব জটিল, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।"

আজকের বিচার্য বিষয়টি কী? এর উত্তর খুব সহজ। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পুনর্গঠন কার হাতে ত্বরান্বিত হতে পারে? নব কংগ্রেস অথবা সি পি এম—বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আগামী নির্বাচনে এইটেই ভোটারদের বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধু অথবা মুক্ত বাংলাদেশের গৌরব-গরিমার খোলা হাওয়া পালে লাগিয়ে কূলে ভিড়বার প্রচেষ্টার উপর জোর না দিয়ে, আগামী পাঁচ বছরে সমস্যার ভারে জর্জরিত এই রাজ্যটির দুঃসহ যন্ত্রণা লাঘবের উপযোগী কোন্ কোন্ দাওয়াই নব কংগ্রেসের ঝুলিতে আছে, পরিষ্কার করে তা ভোটারদের জানিয়ে দেওয়া উচিত। সদা-অর্জিত সকল নেতৃত্বের অনস্বীকার্য গ্লামার ছাড়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ-ধান্দা দূর করার জন্য আর কী দিতে পারেন, "গরীবী হটাও"—এই বায়বীয় আওয়াজটির বাস্তব রূপ কী, সচেতন ভোটদাতাদের পক্ষে এগুলো জানাই জরুরী। খুব বড় আওয়াজ না তুলে, আগামী পাঁচ বছরে সমাপনযোগ্য, বাস্তবসম্মত এক উন্নয়ন পরিকল্পনাই এই রাজ্যের নব কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, এখনও পর্যন্ত এমন কোনও কর্মসূচী রাজ্যের নব কংগ্রেস নেতারা আমাদের দিতে পারেননি। তাঁদের ঝোঁকটা বরং প্রধানমন্ত্রীর গরবে গরবিনী সাজার দিকেই প্রবল।

তবু নব কংগ্রেস নয় সি পি এম, এবার আমার কাছে এরাই একজনকে বেছে নেবার সওয়ালই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং এও জানি, সি-পি-এম-এর পক্ষে কোনও গঠনমূলক কর্মসূচী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসাবে ভোটারদের সামনে পেশ করা সম্ভব হবে না। কেননা, ভারতের রাষ্ট্র-কাঠামোয় এখনও যেটুকু গণতন্ত্র বজায় আছে তার মধ্যে সি-পি-এম ভোটে গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তার পক্ষে প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণে অসুবিধা আছে। তাতে তার বৈপ্লবিক রঙ ধুয়ে যাবে। কাজেই এই কাঠামোর মধ্যে সি-পি-এম একটি মাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই, গরিষ্ঠতা অর্জন করলে পর, সরকার গঠন করতে পারে, আর তা হল সরকারী প্রশাসনযন্ত্রটিকে পঙ্গু করে দেওয়া। এই কারণেই সি-পি-এম-এর পক্ষে বাস্তব-সম্মত উন্নয়নমূলক কোনও কর্মসূচী প্রণয়ন এবং সেটা রূপ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে জনপ্রিয়তা খোয়ানোর চেয়ে, এলোমেলো করে দিয়ে জনসাধারণের মনে বিক্ষোভের ইন্ধন জুগিয়ে চলাই অধিকতর লাভজনক। এবং এই কারণেই দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রের কাছেই সি-পি-এম এবং তার রাজনীতি পরিত্যাজ্য।

তা হলে অবস্থাটা দাঁড়াল এই, নব কংগ্রেস রাজ্যের উন্নয়নের উপযোগী স্পষ্ট কোনও কর্মসূচী এখনও দেয়নি কিন্তু সি-পি-এম এই ধারই কখনও মাড়াবে না। আমাদের এই দুটি বিকল্পের একটিকে বাছতে হবে। এই দুই-এর মধ্যে আমার কাছে বাছাইটা এবার তপ্ত খোলা অথবা গনগনে উনুনের মধ্যে বাছাই-এর সওয়ালের মত নেতিবাচক নিশ্চয়ই নয়। বরং অনেকটা ইতিবাচক। এক দিকে উত্তরণের আশা আর অন্য দিকে অরাজকতার ভয়াবহ ফাঁদে পা দেওয়া, এবার আমার সামনে মাত্র এই দুটো বিকল্প।

তাই, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন তবু নব কংগ্রেসের পক্ষেই সম্ভব, এই কথা ভেবে আমাকে এই পক্ষেই ভোট দেবার ঝুঁকি নিতে হবে। ঝুঁকি এই কারণে যে, নব কংগ্রেসের সমর্থকদের অনেক কাজ আমাকে পীড়িত করে, সি-পি-এম স্টাইলে তাদের পেশী আস্ফালনকে আমি সমর্থন জানাতে পারিনে। তবুও, সচেতন নাগরিক হিসাবে এবং গণতন্ত্রবাদী হিসাবে, নব কংগ্রেসের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর পেশী-বাহিনীর সঙ্গে এক অস্বস্তিকর সংগ্রাম হয়ত বা আসন্ন জেনেও, এবার এক স্থিতিশীল উন্নয়নক্ষম সরকার গঠনের জন্যই নব কংগ্রেসকে আমার বেছে নিতে হবে। কারণ ভোট নষ্ট করা এবার হবে মূর্খ [illegible]

বাংলাদেশের স্বীকৃতি

একটার পর একটা দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় ভুট্টো সাহেবের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। ভুট্টো প্রথমে ভেবেছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তাঁর অনুরোধ রাখবে, চট করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না। তিনি যখন দেখলেন অনুরোধে কাজ হচ্ছে না তখন তাঁদের ভয় দেখাতে শুরু করলেন—বললেন, যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে পাকিস্তান তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু হুঙ্কারেও তেমন কাজ হল না। ভারত ও ভুটানের পর পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি যখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল তখন ভুট্টো সাহেব বদলা নিলেন—তাঁদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করলেন। কিন্তু যখন স্বয়ং রাশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল তখন ভুট্টো বদলা নিতে সাহস পেলেন না। তিনি পিছিয়ে গেলেন। শুধু প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

এবার পশ্চিম ইউরোপ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভুট্টো তাতেও বিক্ষুব্ধ। এবং এই ব্যাপারে বৃটেনের ভূমিকায় রুষ্ট হয়ে ভুট্টো সাহেব কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। কিন্তু তা বলে তিনি বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে সাহস পান নি। সাহস পান নি পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতেও। এরপর আরও বহু দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসবে। জাপানও ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে তারাও আর দেরি করবে না।

স্বীকৃতি দিন দিন আরও আসবে। ভুট্টোর অসুবিধাও দিন দিনই বাড়বে। কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র "ধর্মীয় একাত্মতার" জিগির তুলে শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে। আর থাকতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। কিন্তু তাঁরাও ইতিমধ্যেই নানা বিচার বিবেচনা শুরু করে দিয়েছেন।

আমেরিকার এ ব্যাপারে একটা বিশেষ সুবিধা হল তার নানা এজেন্সী আছে। সরাসরিভাবে বাংলাদেশকে না মানলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক কার্যত আমেরিকারই একটা এজেন্সী। আমেরিকা আপাতত বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতি এজেন্সীর মাধ্যমেই কাজ চালিয়ে যাবে।

তাছাড়া ঢাকায় আমেরিকার যে কনসুলেট ছিল এখনও সেটা তুলে নেওয়া হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে এই কনসুলেটের আনুগত্য ছিল পাক সরকারের প্রতি। বাংলাদেশে স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠার

আগে এই কনসুলেট ছিল পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন দূতাবাস। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অবলুপ্তির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ঢাকার দূতাবাস তুলে নেয়নি। বাংলাদেশ সরকারও সেজন্য তাঁদের ওপর কোনও চাপ দেন নি। মোটামুটিভাবে বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব মেনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঢাকার মার্কিন দূতাবাস বজায় রেখেছে—যদিও তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারকে মানেন না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশের সঙ্গে তেমন কোনও সম্পর্ক না রাখতে চাইত এবং বাংলাদেশ সরকার যদি ততটা মার্কিন বিদ্বেষী হতেন তাহলে নিশ্চয়ই ঢাকার মার্কিন কনসুলেট নিয়ে এতদিনে প্রশ্ন উঠত। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে এখনও মার্কিন পতাকা উড়ছে। এখনও মার্কিন দূতাবাসের বিশিষ্ট কর্মীরা সবাই কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট সব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন ও নিচ্ছেন। দু পক্ষের সম্পর্ক খারাপ থাকলে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতই।

*

চীন কিন্তু একটা কাজ করেছে—প্রথম সুযোগে তারা ঢাকা থেকে দূতাবাস গুটিয়ে নিয়েছে। চীন যে অদূরভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী নয় এটা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

কিন্তু তা বলে চীন কি বাংলাদেশ সম্পর্কে তার সব আশাই ছেড়ে দিয়েছে? ঢাকায় যাঁরা চীন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত তাঁরা কিন্তু তা মনে করেন না। তাঁদের বক্তব্য : চীন বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রথম যে অনুমানটা করেছিল সেটা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। চীন নিজেও বুঝেছে সেটা কতটা ভুল ছিল। পাক সরকার পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছিল চীন তা পছন্দ করেনি। কিন্তু চীন সে কথা খুব জোর দিয়ে প্রকাশ্যে বলতেও যায়নি। কারণ চীনা নেতৃত্ব প্রকাশ্যে তার বন্ধু রাষ্ট্র পাকিস্তানকে খুব অসুবিধায় ফেলতে চায়নি। চীন যখন দেখল বাংলাদেশে পাকিস্তান এত তাড়াতাড়ি এভাবে পর্যুদস্ত তখন তাড়াতাড়ি সে তার দূতাবাসই তুলে নিল।

এইসব বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন : চীনা নেতৃত্বও অনেকের মতই কল্পনা করতে পারেননি যে ভারত সরাসরিভাবে যুদ্ধে নামবে এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে মাত্র ১০।১১ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করবে। অনেকের মত তাঁরাও আশা করেছিলেন, পাক সেনাবাহিনী ঢাকা এবং পদ্মা-মেঘনার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে অন্তত একমাস রক্ষা করতে পারবে। তাই আরও অনেকের মত চীনের সব হিসেবও বাতিল হয়ে গিয়েছে। চীন এখন নতুন করে হিসেব করবে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে চীনের নতুন নীতিটা কী হতে পারে? এই প্রশ্নে ঢাকার চীন-বিশেষজ্ঞরা সকলে একমত নন। তাঁদের অধিকাংশের মতামতটা হল এইরকম : (১) চীন এখনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না। চীন বর্মা ও নেপালের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর নজর রাখবে। এই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নেপাল ও বর্মা, বিশেষ করে বর্মা যে এত শীঘ্র বাংলাদেশকে মেনে নিল তার পেছনে নিশ্চয়ই চীনের হাত আছে। (২) বাংলাদেশ পুরোপুরি সোভিয়েট ব্লকে চলে যাচ্ছে মনে না করলে চীন প্রকাশ্যে খুব বেশি বাংলাদেশ বিরোধিতা করবে না। এবং (৩) চীন পাকিস্তানকে বোঝাবার চেষ্টা করবে যে বাংলাদেশের আশা তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

চীন পাকিস্তানকে কতটা সাহায্য করবে সেটা নির্ভর করবে ভারত-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যতের উপর। ঢাকার চীন-বিশেষজ্ঞরাই বলেন : এবারের পাক-ভারত যুদ্ধের আগে মনে হয়েছিল চীন সত্যিই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করতে চায়। ঢাকার চীনা দূতাবাসের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরাও তেমন কথাই বলতেন। তারপর ভারত-সোভিয়েট চুক্তির পরই যেন চীনের মতিগতি পাল্টে গেল। চীন আবার উগ্রভাবে ভারত বিরোধী হয়ে উঠল। যুদ্ধের পর চীন কীভাবে এগোবে এখনও তা বোঝা যাচ্ছে না। চীন যদি এরপরও তার ভারত-বিরোধিতা জোর কদমে চালিয়ে যেতে চায় তাহলে সে হয়ত পাকিস্তানকে কাশ্মীর দখলের সাহায্য ও পরামর্শ দেবে।

এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মনে করেন, চীন কিছুতেই ভারতের সঙ্গে কোনও সমঝোতায় আসতে পারে না। কারণ চীন জানে এশিয়ায় তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ভারত। সে সুযোগ সে ভারতকে দিতে চাইবে না। তাই এবারের যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে

ভারতের যে মর্যাদা বেড়েছে চীন তা খর্ব করার জন্য চেষ্টা করবেই।

বিশেষজ্ঞদের অন্য একটা অংশ কিন্তু মনে করেন, চীন এরপরও ভারতের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি হবে। কারণ তাঁদের ভাষায়, চীন পশ্চিমে ও উত্তরে সমবেত প্রায় ৯ লক্ষ রুশ সৈন্যকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে দক্ষিণে ভারতের সঙ্গে আর একটা ফ্রণ্ট খোলা এখন চীনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া তাঁরা আরও মনে করেন চীন এখন জাতীয় শিল্পকে সুদৃঢ় করার কাজে সবচেয়ে বেশি নজর দেবে। এইসব কারণে চীন আপাতত ভারতের সঙ্গেও খুব বেশি বিরোধ বাড়িয়ে তুলবে না। এইসব বিশেষজ্ঞ বলেন : এই জন্যই চীন এবারের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কোনওভাবে মাথা গলাতে এল না।

চীনের মূল লক্ষ্য যাই হোক, আপাতত সে যদি পাকিস্থানকে সমরসজ্জিত ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব নেয় তাহলে তাকে বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে। অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে পাকিস্থান এখন বিধ্বস্ত। এ ব্যাপারে চীনের প্রধান সহযোগী হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে পাকিস্থানকে খুব বেশি মদত দিতে পারবে না, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের একটা অংশ এই নীতির ঘোর বিরোধী। পাকিস্থানকে যদি এখনই আবার ভারতের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হয় তাহলে চীনকেই তার প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে।

*

চীনই হোক, রাশিয়াই হোক, আর অন্য যে কোনো দেশগুলিই হোক, সবাই তার পররাষ্ট্র নীতি স্থির করে নিজ দেশের স্বার্থে। যেমন ধরুন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারটা। পাকিস্থান যখন পূর্ব বাংলার মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে তখন কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্র সব কিছু দেখেও চোখ বুজে থেকেছে। রাশিয়া থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ দেশেরই বক্তব্য ছিল, পাকিস্থানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে একটা সমঝোতা হোক—একটা হাল্কা ধরনের কনফেডারেশনের মধ্যে পাকিস্থানের দুই অংশ থেকে যাক। পাছে পাকিস্থান চটে এই ভয়ে তাঁরা কেউ তখনও পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্থান ছাড়া আর কিছু বলতে ভরসা পান নি। তারপর যেমনি বাংলাদেশ স্বাধীন হল অমনি কিন্তু অনেকেরই মতামত পাল্টে গেল। তাঁরা নানাভাবে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হলেন। কারণ, এখন থেকে সকলেরই নজর অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রতি। বাংলাদেশের কাঁচা মালের উপর এবং বাংলাদেশের বিরাট বাজারের উপর আজ অনেকেরই দৃষ্টি।

বাংলাদেশের বাজার যে আগামী দশ বছরে আরও বাড়বে তাতে কারুরই সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বাড়লেই ভোগ্য পণ্যের বাজার বাড়তে বাধ্য। এবং নিজ দেশে নানারকমের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে বাংলাদেশের এখনও বেশ সময় লাগবে। তাই বহু শিল্পসমৃদ্ধ দেশ বাংলাদেশের বাজারের জন্য লালায়িত।

এই অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া মুশকিল। তবে প্রকাশ্য বাণিজ্যিক লেনদেনের হিসাব কিছু কিছু পাওয়া যায়।

পূর্ব বাংলা থেকে কে কত টাকার কাঁচা মাল নিতেন তার একটা হিসাব পাওয়া যায়। ১৯৬৮-৬৯ সনের। সেই হিসাবটা এই রকম :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৮,৬৮,৩৯,০০০ টাকা
বৃটেন ১৮,৯১,০৮,০০০ „
কমন মার্কেটের দেশগুলি
(বৃটেন তখনও কমন
মার্কেটের সদস্য হয়নি) ৩০,৭৪,১৯,০০০ „
রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ
১১,৫১,৯৫,০০০ „
চীন ৪,১৮,২৯,০০০ „

পূর্ব বাংলায় কে কত টাকার শিল্পজাত দ্রব্য পাঠাতেন। (এটাও ১৯৬৮-৬৯ সনের হিসাব) :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৮,৯০,৮৭,০০০ টাকা
বৃটেন ২০,৩৯,১৪,০০০ টাকা
কমন মার্কেটের দেশগুলি
২১,১০,৪৩,০০০ টাকা
রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ
১৯,৪৫,৬২,০০০ „
চীন ১০,৬৯,৯৯,০০০ „

পূর্ব বাংলার প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের একটা বড় অংশ আসত পশ্চিম পাকিস্থান থেকে। সেটাও এখন বন্ধ। ১৯৬৮-৬৯ সনে তার পরিমাণ ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা। এই জিনিসপত্রগুলিও অপাতত বিদেশ থেকেই আনতে হবে।

এত বড় বাজার! এই বাজারের লোভে সবাই তাই এখন টপাটপ আসবে। ভুট্টো সাহেব সবই গোনা করুন'

৬-২-৭২।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

লক্ষণ ভালো নয়

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন তাঁর তেইশে জানুয়ারির টেলিভিসন ভাষণে ভিয়েতনামে যুদ্ধ চুকিয়ে ফেলবার যে আট-দফা পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন তাঁর প্রস্তাব কম্যুনিস্টরা সরাসরি বাতিল করে দেয়নি তবে একটা ন' দফা পালটা প্রস্তাব তারা পাঠিয়েছেন। নিক্সন যেন এই কথটাই দেশের লোককে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এর পর প্যারিস বৈঠকে দুই দুই পালটা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলবে, হয়তো বা একটা মিটমাটও হয়ে যাবে। নিক্সনের প্রস্তাব খালি টেলিভিসনেই প্রচার করা হয়নি; প্যারিস বৈঠকেও সরকারী দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছিল। সেখানে আবার মার্কিন প্রতিনিধি উইলিয়াম পোর্টার গেয়ে রেখেছিলেন এ তাঁদের শেষ কথা নয়, এর রদবদল করতে তাঁদের আপত্তি নেই। আমেরিকা দর কষাকষি করে ভিয়েতনামে লড়াইয়ের ফয়শালা করতে চায় এমনই একটা আভাস তাঁর কথাবার্তা থেকে পাওয়া গিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে সে গুড়ে বালি। ৫ ফেব্রুয়ারি হ্যানয় সরকার নিক্সনের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন এই বলে যে ওটা একটা ধাপ্পা।

উত্তর ভিয়েতনামের পালটা ন' দফা প্রস্তাবে যে কী ছিল তা জানা গেছে ৩১ জানুয়ারি। জানিয়েছেন অবশ্য মার্কিন সরকার নয়, খোদ উত্তর ভিয়েতনাম সরকারই। তাঁদের পক্ষ থেকে সে দলিলও পেশ করা হয়েছে প্যারিস শান্তি বৈঠকে। সেটা পেশ করার সময় উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি এনগুয়েন ভান থান লো বেশ দু' কথা শুনিয়ে দিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে তাঁদের না জানিয়ে এক তরফা মার্কিন প্রস্তাব ফাঁস করে দেওয়ার জন্যে। নিক্সনের গোপন দূত ডঃ কিসিংগারের হাতে তাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের পালটা প্রস্তাব গেল বছর ২৬ জুন। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন গোপনে আলাপ-আলোচনা আরও কিছুকাল চলবে। কিন্তু তার কোনও সুযোগ না দিয়ে সে আলোচনা মাঝপথেই ভেঙে দিয়েছেন নিক্সন বলে তাঁরা খুব চটেছেন। এক রকম নিরুপায় হয়েই উত্তর ভিয়েতনামকে নিজেদের পালটা প্রস্তাব দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে হয়েছে। নইলে লোকে হয়তো ভাবতো তাঁরা বুঝি এমন সব শর্তে ভিয়েতনামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে রাজী যা তাঁদের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়—লড়াই চালিয়ে তাঁরা বুঝি এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন যে যুদ্ধ থামলে তাঁরা বর্তে যান।

তা যে সত্যি নয় সেটা হ্যানয়ের ন' দফা শান্তি প্রস্তাবের বয়ান দেখলে কারু বুঝতে কষ্ট হয় না। উত্তর ভিয়েতনামের প্রথম শর্ত ছিল ১৯৭১-এর মধ্যে মার্কিন দেশ আর তার মিত্রদের ফৌজকে চাটিবাটি গুটিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে। দু' নম্বর, ফৌজ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দু' পক্ষ সমস্ত বন্দী-দের ছেড়ে দেবে, একজনকেও তখন আর আটকে রাখা হবে না। তিন, দক্ষিণ ভিয়েত-নামের থিউ সরকারকে বিদেয় নিতে হবে, তার জায়গায় গড়ে তুলতে হবে নতুন জাতীয় সরকার। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকার। চার, উত্তর ভিয়েতনাম আর অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারকে খেসারত দিতে হবে আমেরিকা ভিয়েতনামের যে ক্ষতি করেছে তা পূরণ করার জন্যে। পাঁচ, ভিয়েতনামে আমেরিকা আর নাক গলাবে না, উপরন্তু ১৯৫৪ আর ১৯৬২তে ইন্দোচীন আর লাওস সম্পর্কে যে জেনিভা চুক্তি হয়েছিল তা মেনে চলবে। ছয়, ইন্দোচীনের সমস্যাগুলোর মীমাংসা সেখানকার দলগুলো নিজেরাই করবে। সাত, এই সব চুক্তি হলেই সব পক্ষই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে। আট, আন্তর্জাতিক তদারকির ব্যবস্থা হবে। নয়, ইন্দোচীনের সব লোকেদের মৌল অধিকার, দক্ষিণ ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়া আর লাওসের নিরপেক্ষতা, এ অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার আন্তর্জাতিক আয়োজন হবে।

১৯৭১-এর সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রস্তাবের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার কথা। তবুও এর জের ১৯৭২-এ টানাও হয়তো অসম্ভব হতো না যদি নিক্সনের সে ইচ্ছে থাকতো। কিন্তু তাঁর তো কাজ হয়ে গিয়েছে, যা তিনি চেয়েছিলেন তা তিনি পেয়েছেন। সেটা আর কিছু নয়, নির্বাচনে নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়া। উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে যে বলা হয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি শান্তি প্রস্তাবকে নির্বাচনী পুঁজি হিসেবে কাজে লাগাতে চাইছেন তা কিছু মিথ্যে নয়। নিক্সনের দল বল শুধু নয়, তিনি নিজেও তা একরকম কবুল করেছেন। তাঁর এ মোক্ষম চাল একেবারে ব্যর্থও হয়নি। ভিয়েতনামে যুদ্ধ থামাবার জন্যে তিনি কিছু করছেন না বলে যে সব বিরোধী নেতা এতদিন নিক্সনের কড়া সমালোচনা করছিলেন তাঁদের এখন মুখ বন্ধ। মিউ মিউ করে দু'-এক কথা কেউ কেউ হয়তো বলছেন, কিন্তু তাঁদের বেশীর ভাগই তাঁর এ চালে মাত হয়েছেন। সাধারণ ভোটারদের এমন জ্ঞান নেই যে তারা ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝে। তাই আমেরিকাতে হাওয়াটা নিক্সনের দিকেই ঘুরেছে, তাঁর প্ল্যান যতই অসার হোক না কেন।

কিন্তু দরকার তো নিক্সনকে তরাবার নয়, দরকার ভিয়েতনাম সমেত গোটা ইন্দো-চীনকে বাঁচানো। তার কী হবে? ভিয়েত-কংয়ের তরফ থেকেও একটা সাত দফা শান্তি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তার মোদ্দা কথা হচ্ছে—মার্কিন ফৌজকে ভিয়েতনাম ছাড়তে হবে এখনই, দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি থিউকে ইস্তফা দিতে হবে আর নিক্সন যে লড়াইটার দায়িত্ব ভিয়েতনামীদের ওপর চাপিয়ে দেবার নীতি নিয়েছেন তা বর্জন করতে হবে। উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে ভিয়েতকংদের মনের আর মতের মিল রয়েছে। কাজেই ভিয়েতকং অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের এ প্রস্তাবে সায় দিয়েছে হ্যানয়ও। তাদের মুরুব্বি চীনও এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমেরিকাকে এক হাত নিয়েছে। কিন্তু পিকিংয়ে যাওয়ার জন্যে নিক্সন পা বাড়িয়ে থাকলেও তার উপরোধে যে ভিয়েতকংয়ের ওই ঢেঁকি গিলবেন এমন পাত্র তিনি নন। তা ছাড়া দু'চারটে মামুলি টিপ্পনী কাটা ছাড়া চীনও যে এই সাত দফা প্রস্তাব মেনে নেবার জন্যে তাঁর ওপর চাপ দেবে এও মনে হচ্ছে না।

ব্যাপারটা যা হয়েছে তাতে সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না—উত্তর ভিয়েতনাম কী ভিয়েতকংয়ের শর্ত আমেরিকা, আর আমেরিকার শর্ত উত্তর ভিয়েতনাম-ভিয়েতকং মানবে না। গোল-টেবিলে বসে ভিয়েতনামে অশান্তির আগুন নেবানো যাবে না। ভিয়েতনাম ছেড়ে সরে যেতে আমেরিকা তো রাজী, চলে তাদের সেনাসামন্ত যাচ্ছেও, কিন্তু থিউকে সরিয়ে দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামটাকেও কম্যুনিস্টদের হাতে তুলে দিতে তার ঘোর আপত্তি। ভিয়েতনামের দক্ষিণ অঞ্চলকে কম্যুনিস্টদের কবল থেকে আমেরিকা যদি বাঁচাতে পারে তা হলে এত ক্ষতি, এত নিন্দে হওয়ার পরেও জিত হবে মোটের ওপর তারই, হার হবে উত্তর ভিয়েতনামের। ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট-দের ঠেকাতেই তো আমেরিকা সেখানে ফৌজ পাঠিয়েছিল। হ্যানয় এত সহজে হার স্বীকার করবে কী? তার আর কিছু না থাক আছে অটুট মনোবল, অদম্য উৎসাহ, লড়াইয়েও তার ফৌজ পোক্ত। কাজেই শান্তি রাতা-রাতি ভিয়েতনামে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। ঝিমিয়ে পড়া লড়াইয়ের আগুন সেখানে আবার জ্বলে উঠবে টেট পরবের সময়ে এই ফেব্রুয়ারি মাসেই, এই ভয়ই লোকে করছে দেশে-বিদেশে।

রঙ বদল

রঞ্জন

রবীন্দ্রনাথের ছিল বাড়ি বদলের বাই। আজ উদয়ন, কাল শ্যামলী, পরশু উত্তরায়ণ। কারণ কিছুটা কবিহৃদয়ের অরোগ্যাতীত অস্থিরতা আর বাকিটা জমিদারি মেজাজের স্বাভাবিক ব্যাপ্তিপ্রবণতা। "ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট," সমস্ত শহরবাসীর প্রতি এমন শ্রদ্ধারিক্ত অনুকম্পা আর কে দেখাতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া? জীবনানন্দ দাশ তো কলকাতার ট্রাম লাইনে দেহরক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, তিনি একান্তই কলকাতাবাসী ছিলেন। অন্য বসতি তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে গেছেন বিশ্বভ্রমণে, অবাধে বিচরণ করেছেন ওড়িশা বা বাঙলাদেশে, শান্তিনিকেতনের খোলা হাওয়া তো ছিল তাঁর নিঃশ্বাসের জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন। এমন মুক্তভাগ্য আমাদের কোষ্ঠীতে লেখা নেই। আমরা বাস করি কলকাতার সংকীর্ণ ফ্ল্যাটে। হাওয়ার প্রবেশ সেখানে প্রায় নিষিদ্ধ বললেই হয়। বিবিধ ক্ষুদ্রতা এর অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ।

তবু এককালে এই কলকাতারই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর একেবারে অসম্ভব ছিল না। আমি নিজেই তো গত পঁচিশ বছরে তিনবার কলকাতায় থেকেছি, থেকেছি দক্ষিণে, এখন আছি মধ্য কলকাতায়। পুনরায় বাসান্তরের সম্ভাবনা প্রায় অকল্পনীয়। কোথায় ফ্ল্যাট পাব? কত বেশী ভাড়া দিতে হবে? বাড়ি সন্ধানের সময় কোথায়? সেলামী চাই কত? বর্তমান বাড়িওয়ালার নির্বিকার ঔদাসীন্য তবু অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নতুনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সহজ হবে না। আমার বর্তমান বিনীত ফ্ল্যাটের ত্রুটি আদৌ সামান্যসংখ্যক নয়। আবার, এগুলিও অভ্যাসের অন্তর্গত। তার উপর মনে থাকে পুরানো আবাস ছেড়ে যাবার বিড়ম্বনা। বাড়িবদলের সম্ভাবনা যখন শূন্য, অগত্যা তাই স্থির হোলো যে পুরানো ফ্ল্যাটেরই ফেস-লিফ্‌ট বা মুখোওরণ চাই। এলো ঠিকাদার, এসেছে মিস্ত্রিকুল। সবাই কর্মব্যস্ত। ফলত আমি প্রায় উদ্বাস্তু ও একাধারে কর্মহীন।

✻

এখানে দাঁড়াবার উপায় নেই ওখানে বসা বারণ। সবত্র ধুলো আর বালি। আসবাব ছড়ানো যত্রতত্র। বইগুলি আশ্রয় নিয়েছে নানাবিধ পর্দার তলায় বা খাটের নীচে। লেখবার কাগজ কোথায় কেউ জানে না। এমন অবিশ্বাস্য বিশৃংখলা ইতিপূর্বে দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারিনে। অথচ উদ্দেশ্য স্পষ্টতই সুন্দরীকরণ। দীর্ঘাবহেলিত দেয়ালগুলির চেহারা ফিরবে। তার আগে আমাদের চেহারা কী হবে ভেবে শংকিত আছি। চূণকাম করতে ক'দিন লাগবে, এখনো জানিনে। পাশের ঘরে চলছে সশব্দ সংস্করণ। আগে তো বিদায় করতে হবে পুরানো রঙকে। নবজন্মের আগে চাই পুরানোর সমাধি। কাজটা পরিচ্ছন্ন হতে পারে না কখনোই। নৈঃশব্দ্যও আশার অতীত। উপায় নেই কোনো কাজে মন বসাবার। একটি গান আমি এখন গাইছি না। সেটি হোলো "দে তোরা আমায় নূতন করে দে, নূতন আভরণে"। আমার আধার ভাঙে।

অথচ বাড়িবদল যখন অসম্ভব তখন রঙ বদল ছাড়া উপায় ছিল কী? সব কিছু এখন যতই অগোছালো হোক শীঘ্রই আসবাবগুলি ফিরে যাবে স্বস্থানে। আবার আমি খুঁজে পাব আমার "গীতবিতান" বা "চলন্তিকা"। ধূসর দেয়ালগুলি পাবে নতুন একটা রঙ। বাড়িটার প্রয়োজন ছিল এই পুনর্জন্মের। বোধ হয় আমারও প্রয়োজন ছিল একটা পরিবর্তিত পটভূমির। তা পরিবর্তনের পদ্ধতি যতই অপ্রীতিকর হোক। এমনও হতে পারে যে, আমার ফ্ল্যাটটার মতো আমিও পুরানো হয়ে যাচ্ছিলাম। হায় রে, উপায় নেই আমাকে নতুন এক কোট রঙ দেবার।

✻

আমার বাড়ির প্রাচীরের প্রসাধন সমাপ্ত হলে আমার কি মনে হবে নতুন বাড়িতে উঠে এসেছি? যুগপৎ আশা ও আশংকা এই যে, হবে না। আমি আমার বইগুলো আবার চাই পুরানো জায়গায়, যেখানে আমি জানি কোথায় কী আছে। অভ্যাসের প্রতি আনুগত্য অপরাধ নয়। নূতনের অন্বেষণ এবং অবিমিশ্র প্রগতিশীলতা। শুনেছি, এ দুয়ের সংমিশ্রণ সম্ভব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি তার প্রয়াসকেও ভয় পাই, যদিও পুরাতনের সব কিছুই আমার মনঃপূত নয়, এবং নতুন কিছু দেখলেই আমি আনন্দে আত্মহারা হইনে। আপাতত আমি চাই মিস্ত্রিদের অন্তর্ধান আর আমার পঠন ও লিখন অভ্যাসের প্রত্যাবর্তন।

সামান্য শব্দ আমাকে অশান্ত করে। আমি পরিবর্তনবিমুখ নই, কিন্তু জীবনে অনেক জিনিস আছে যা ধরে রাখার মতো বলে মনে করি। আমার জীর্ণ দেয়ালগুলি নিশ্চয়ই সে পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু কী একটা নীরব নিমর্মতা আছে যেন ওদের বর্ণ পরিবর্তনে। ইংরেজিতে বলে, দেয়ালের কান আছে। ওরা সব কিছু শোনে। ওদের জিহ্বা থাকলে ওরা কি স্বীকৃতি দিত এই নতুন প্রলেপে! জানিনে।

বাসাবদল

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এইভাবে আমাদের পৌঁছানোর কথা ছিল :
বাপ্টির দু হাত ভরে বাপ্টির খেলনা
তোমার খোঁপায় ফুল, হাতে অন্তরঙ্গ সরঞ্জাম
—পুরুষ গোচরতাহীন—
আমার দক্ষিণ হাতে বাড়ির যকৃত—যতো দরবারি দ্রব্য ও দলিল—

অথচ এখন দ্যাখো আমরা পৌঁচেছি অন্য ধাঁচে :
বাপ্টির বাঁ-হাতে স্তব্ধ তোমার গোপন অন্তর্বাস,
আমার শরীরে বনফুল, আমি কাঁখে শুধু জড়ো করি ছেলেবেলাকার
নির্দোষ খেলেনা;
তুমি গোটা বাড়ি বও ভয়াবহ ভামিনী হে নাকি এক দানবী যক্ষিণী—

আমরা কি সত্যিই পৌঁচেছি?

ভয়

তুষার রায়

গোলাপের এত লাল দেখে ভয় করে
বাগানে আসেনা তাই সেই প্রিয় হাওয়া
ঘুরে ঘুরে চলে যায় দূর শালবনে,
একটা মানুষ নেই ওইখানে, কাঠুরে কি চাষী,
একাকী কৃষ্ণচূড়া ঝলকে ঝলকে যেন রক্তবমি করে,
তাই ওই শিমুল শিরীষ পানে তাকাতে পারি না,
স্ট্রেপটোমাইসিন দিন ওদের, ডাক্তার, নাকি
ওদের ওষুধ ওই কুঠার করাত
চেলা কাঠ হয়ে জ্বলে মৃত কোনো রোগীকে জ্বালানো
ভয় করে গলাচাপা অন্ধকারে প্যাঁচা ও বাদুড়
চাঁদ উঠলে নিঃশ্বাস নিই, বিশ্বাস ফিরে আসে,
বেঁচে আছি, আজো এই হিজল ছায়ায় চাঁদে
বেঁচে বসে আছি।
কে বলেছে বেঁচে থাকতে, নিমডালে প্যাঁচা
অথবা সে দূর ওই পপলার গাছে, আটকে থাকা চাঁদ?
কেউ নয়,—বাড়ির চিঠিও নেই, দেয়না এখন,
সিস্টার সিস্টার আমাকে একটু প্লিজ
সেডাটিভ দিন ঘুম
শিশির সমস্ত শাদা, বড়ি আর টু ফিফটিন গ্লাসে,
তারপর লাল কম্বলে ঢাকা উষ্ণ অন্ধকারে ঘুম; দিন,

তবুও

তুষার রায়

সে নারীকে আর আমি দেখিনি কোথাও, কোনোখানে
যার চোখে, পক্ষে যেন জেগেছিলো ঘুমন্ত মিশর
তারপর ল্যাব্রাডর প্রণালীর আঁধারে আঁধার
যেন ভেসে যায় গাল্‌ফস্রোতে দূর কানাডায়,
আমাদেরও গ্রামের ভিতরে গ্রাম ছিলো, শোনো
বুকের ভিতরে ছিলো প্রেম, আমাদেরও
বালুচ সেনার মতো কোনো সূঁচ ফুটেছে সেখানে,
ভোরের পাখালী তুমি ডেকে যাও ফিরে।
ফিরে ফিরে তবু নাচ, গান গায় মাড়িয়া যুবক
ধ্যানীবক চুপে থাকে মাছের সন্ধানে, কেননা
তাদের নেই জাল
আমাদের জাল আছে, হরেক রকম জেনো তুমি
জাল নোট, জাল ওষুধ, শিশুদের দুধ
তাতেও তো জল মানে জাল, তবু জ্বাল দিলে
জল মরে দুধ হয় খাঁটি, তবুও সোনার
বাটি কোথা পাবে
কোনদিকে যাবে প্রেম ভেবেই পায় না
নেকড়ের চেয়ে বড়ো চিতা ও হায়না
সবই আছে জেনে তবু তোমার কুকুর
—ভাদ্রমাসে জোর প্রেম করে

॥ চার ॥

অধ্যাপক লেসনির ছেলে ডাক্তার, পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট। তার সঙ্গে একদিন দীর্ঘ আলোচনা হল। কাজ, বেড়ানো, এন্টারটেনমেন্ট সব কিছু উনি ওদের প্রাগের প্রোগ্রামে নিখুঁতভাবে প্ল্যান করে রেখেছেন। লেসনি জুনিয়রের সঙ্গে আমরা "ল্যাটার্না ম্যাজিকা" দেখছিলাম। প্রাগ-এ বেড়াতে এলে ল্যাটার্না ম্যাজিকা দেখতেই হবে—ওটা একটা মাস্ট। থিয়েটর ও সিনেমার সমন্বয়। পাত্রপাত্রীরা কখনো সিনেমার পর্দায় কখনো বা সশরীরে স্টেজে উপস্থিত। টেকনিক্যাল বিস্ময় বটে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তবে শিল্পকলা হিসেবে কতটা গ্রহণযোগ্য তা তর্কাতীত নয়। শংকরস্কোপ আমার দেখা হয়ে ওঠেনি, উদয়শংকরের প্রেরণা এখান থেকে কিনা বলতে পারি না। যাই হোক, শো শেষ হয়ে যাবার পর লেসনি সাহেব বললেন, থিয়েটরে বসে তো কথাবার্তা কিছু হল না, এসো কোথাও একটু বসি। রাত যদিও গভীর হয়েছিল, একটা কফি হাউসে বসে পুরনো দিনের কথা শুরু হল। কফি হাউসে ঢুকে ডাঃ বসু এদিক ওদিক চাইছেন। জায়গাটা কেন চেনা মনে হচ্ছে? লেসনি বললেন, "উল্টো দিকের দরজাটা দেখছো, ওটা অনেক ক্লাব। আমার বাবা এর মেম্বার ছিলেন এবং অতিথি অভ্যাগতদের এখানেই ডাকতেন। সেবার শরৎচন্দ্র বসুকে এখানেই উনি ডিনার দিয়েছিলেন।" খাওয়াতে ভালবাসতেন লেসনি সাহেব। সুভাষচন্দ্রের চিঠিতে দেখতে পাই হয়ত লিখছেন—অমুক দিনে আমি প্রাগে পৌঁছব, কিন্তু আপনি যেন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না—যখনি আসি তখনি তো আপনি খাওয়ান। কথায় কথায় ডাক্তার লেসনি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বললেন—আমাদের পরিবার তোমাদের কাছে একান্তভাবে ঋণী। কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি। উনি বললেন, "যুদ্ধের সময় আমার বাবাকে নাৎসীরা ধরে নিয়ে যায়। প্রাণে বাঁচবার আশা কমই ছিল। নিরুপায় হয়ে আমি বার্লিনে সুভাষচন্দ্র বসুকে একখানা চিঠি লিখে সব জানাই। তার অল্পদিনের মধ্যেই ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের হস্তক্ষেপের ফলে বাবার প্রাণ রক্ষা হয়।" এই চিঠি লেখার ঘটনাটা এই প্রথম শুনলাম। সাধারণভাবে একথা আগেই শুনেছিলাম যে উনি নেতাজীর বন্ধু অধ্যাপক লেসনির এই পরিচয় সেই দুঃসময়ে রক্ষাকবচের কাজ করেছিল।

চেক ভাষায় লেখা প্রোগ্রামে চোখ বুলিয়ে আগেই দেখেছিলাম বিকেলের অধিবেশনে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে "পানি কৃষ্ণা বোসোভা'র নাম লেখা আছে। 'বোসোভা' ধ্বনিটি কানে বেশ লাগল। তবে পানি মানে কি তখন জানতাম না, পরে জেনেছিলাম। আমাদের কালচারাল আমেরিকান অ্যাটাশে মিঃ জোনস গাড়ি সম্বন্ধে আলোচনার জের আসর বসেছিল। রাতে আমাদের পৌঁছে দিতে বেরিয়ে জোনস সাহেব রাস্তা হারিয়ে ফেললেন। নির্জন পথে এক ভদ্রমহিলা হেঁটে চলেছেন। গাড়ি থেকে মুখ বার করে দিশাহারা জোনস সাহেব হঠাৎ "পানি, পানি" বলে হাঁক দিয়ে উঠলেন। তখনি শুনলাম পানি মানে মিসেস বা ম্যাডাম।

চা-এর বিরতির ঠিক আগে আমার নিজের পেপার পড়তে ডাক পড়ল। নেতাজীর জীবনে কয়েকটি রমণী সম্পর্কে আমি কিছু বলেছিলাম। মোটের উপর আমি বলতে চেয়েছিলাম নেতাজীর জীবনে তথা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণাদাত্রী রূপে কয়েকটি নারীর নীরব দান কম নয়, আমাদের দেখা উচিত তাঁরা যেন ইতিহাসে উপেক্ষিতা না হন। আমার বক্তব্য ডাঃ ক্রাসা, ডাঃ ভাইটেল প্রভৃতির সমর্থন পাওয়া গেল। কিন্তু চা খেতে যেতে ভেরোনিকা ও অন্যান্য কয়েকজন আমার বক্তব্য সম্বন্ধে তাদের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে সে কথা বলছিল।

তারা বলছিল, অমুকের জীবনে নারী—এই ধরনের কিছু বললেই একটা রোমান্স ও রহস্যের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু যে কজন নারী নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তার মধ্যে বেশীর ভাগই মাতৃস্থানীয়া। পাশ্চাত্ত্য জগতের কাছে এটা একটু দুর্বোধ্য ঠেকে। সবাই মা—? ওঁর নিজের মা তো রয়েছেন, তারপর দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তী দেবী তাঁকেও বললেন 'মা'গো', আবার মেজবউদিদি, তিনিও ওঁর জীবনে 'সেকেণ্ড মাদার'। এ কি এক ধরনের

খাদার কমপ্লেকস? ওদের বলছিলাম আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীর জীবনে এটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের জাতীয় সংগ্রাম বন্দেমাতরম্ মন্ত্র দিয়ে শুরু। "কি ভগবান কি স্বদেশ—আমাদের আরাধ্য যা কিছু—আমরা তাহা মাতৃমূর্তিরূপে কল্পনা করেছি"—নেতাজীর এই কথার তাৎপর্য আমার বিদেশী শ্রোতাদের যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলছিলাম।

পাশের ঘরে তখন প্রাগ রেডিওর সংবাদদাতা মারি হলভাচকোভা রেডিওর পক্ষ থেকে ডাঃ বসুকে ইনটারভিউ করছেন। প্রশ্ন করছেন, স্বাধীনতার আগে ভারতবাসীর কাছে সুভাষচন্দ্রের ভাবমূর্তি কি ছিল? উত্তর: সুভাষচন্দ্র আমাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের নায়ক ছিলেন। প্রশ্ন: স্বাধীনতার পর ভারতবাসীর মনে সুভাষচন্দ্রের কোন্ আদর্শ সবচাইতে বেশী জেগে আছে?

উত্তর: সমাজবাদের ভিত্তিতে যে নূতন ভারতবর্ষ তিনি গঠন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই আদর্শ।

ঘর অন্ধকার করে নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ডকুমেন্টারি ছবি শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন করছেন। ভিত্তি স্থাপন উৎসবে মঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র—দুজনাই চেকদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। সমবেত চেক দর্শকরা অভিভূত। কাঁপা কাঁপা গলায় কবি আবৃত্তি করছেন বাংলার মাটি, বাংলার জল—পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান। হরিপুরা, ত্রিপুরির পর্ব পার হল। শেষের দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকাণ্ড দেখানো হচ্ছে। একটি বিশেষ দৃশ্যে নেতাজী সুপ্রীম কম্যানডারের পোশাক পরিহিত, এরোপ্লেন থেকে দৃপ্ত পদক্ষেপে নেমে এলেন। বিমানবন্দরে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অভ্যর্থনা করছেন নেতাজীকে। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হল, আরো একটা, আরো একটা—নেতাজীর মুখের স্মিত হাসি ফুলের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এবার কে যেন হাতে গুঁজে দিল মস্ত এক ফুলের তোড়া। গলায় মালার স্তূপ, ফুলের তোড়া হাতে এগিয়ে আসছেন নেতাজী। বেনেডিকটে হঠাৎ অন্ধকারে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, দিস ইজ নট দি ফেস অফ এ সোলজার, দিস ইজ দি ফেস অফ এ সেন্ট (saint)! বেনেডিকটের মন্তব্যে হঠাৎ চমকে গেলাম। সমস্ত পর্দা জুড়ে তখন সুভাষচন্দ্রের মালাশোভিত মুখ, স্নিগ্ধ, যেন বুদ্ধদেবের মত করুণাঘন অভিব্যক্তি।

প্রাগ-এর বাঙালী ও ভারতীয় বন্ধুরা পরে বিশেষভাবে অনুযোগ করেছিলেন—প্রাগ-এ সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা সভা হল, বিশেষত একটা ডকুমেন্টারি ছবি দেখানো হল, আমরা দেখতে পেলাম না, একটু খবর পেলাম না? ভারতীয় দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে শ্রীঘোষের বাড়ি ডিনারে অনেকের সঙ্গে দেখা হল, তাঁরাই বলছিলেন। শ্রীমতী ঘোষ আস্ত মাছ কিনে এনে বাথটাবে জিইয়ে রেখেছিলেন। তাই দিয়ে সুস্বাদু ডিনার প্রস্তুত করেছেন, সঙ্গে আছে ঘরে তৈরী সন্দেশ। খেতে খেতে দোষটা যে ঠিক কোথায় তা আর খুঁজে করে উঠতে পারলাম না। আমাদের এমব্যাসি অবশ্যই খবর পেয়েছিল। কারণ তাঁদের কালচারেল এফেয়ার্স অ্যাটাশে স্বয়ং সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাই হয়ত ভারতীয়দের ঠিকমত জানিয়ে উঠতে পারেননি। অথবা এও হতে পারে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট একটি একান্তভাবে অ্যাকাডেমিক সেমিনারই চেয়েছিলেন তাই অযথা ভিড় বাড়াননি। পরে বন-এ যে সম্মেলন হল তা আকারে অনেক বড় ছিল, জাঁকজমকও বেশী ছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি প্রাগ-এর সেমিনারের অ্যাকাডেমিক চরিত্রই এর বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে কাজের কথা বলা, ঘরোয়া আলাপ আলোচনা করা সহজ হয়েছিল। একটি বিশেষ বিষয়ে একান্তভাবে আগ্রহান্বিত একদল নরনারী মিলিত হলেই সেটা সম্ভব হয়।

ডঃ ক্রাসা নির্দেশ দিলেন সেমিনারের কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে কার্লসবাদ বা কার্লোভি ভারি অবশ্যই যেতে হবে। কার্লোভি ভারি সুভাষচন্দ্রের প্রিয় জায়গা। একাধিকবার তিনি এখানে এসেছেন। ১৯৩৭-এর শরৎকালে একটানা দুমাস উনি এখানে ছিলেন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন, সেই সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'
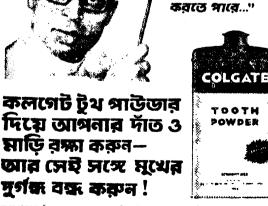
বহু লেখার কাজও চলছিল। অতএব কার্লসবাদের ওপর নেতাজীর লেখাটি গাইড হিসেবে নিয়ে রওনা হওয়া গেল। প্রাগ থেকে কার্লোভি ভারি পথটি মনোরম। মাঝে মাঝেই পথের দুধারে বেড়া দিয়ে ঘেরা আঙুরলতার চাষ।

কার্লোভি ভারি ছবির মত সুন্দর। চারিদিকে গাঢ় সবুজ পাহাড়ে ঘেরা, মাঝখানে ছোট উপত্যকা। বাড়িগুলি সার সার পুরনো ধাঁচের সুশ্রী দেখতে। এরই মধ্যে দেখি একপাশে বিরাট এক মালটি স্টোরি প্রাসাদ মাথা তুলছে। শুনলাম এক বিরাট আধুনিক হোটেল তৈরি হচ্ছে। এখনো শেষ হয়নি, কাজ চলছে। সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অনেক কালের ঘরবাড়ির সুসমঞ্জস সৌন্দর্যের মধ্যে মূর্তিমান ছন্দপতনের মত দাঁড়িয়ে আছে এই অট্টালিকা। দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। কোথাও গিয়ে এদের হাত থেকে নিস্তার নেই।

কার্লোভি ভারির প্রধান রাজপথ গড়ে উঠেছে উষ্ণ জলের প্রস্রবণগুলির পাশ দিয়ে। দলে দলে নরনারী পদচারণা করছে। রাস্তার ওপরে। সকলের হাতে হুঁকোর মত দেখতে হাতল দেওয়া [illegible] কাচের পাত্র। তাতে ঝরনার [illegible] উষ্ণ পানীয় ঢেলে সবাই চুমুক দিচ্ছে। [illegible] পাত্রে মাঝে মাঝে চুমুক দেওয়া চলছে আর গম্ভীর মুখে সবাই হাঁটছে—সে এক মজার দৃশ্য। আমরাও জল নিয়ে একই ভঙ্গীতে হাঁটা ধরলাম। একে গরম জল, তায় নোনতা, প্রথমবার এক চুমুক খেয়ে মুখ বিকৃত করলাম। তবে আমার মনে হয় আধুনিক কবিতা বা আধুনিক ছবি বুঝবার জন্য যেমন মন ও চোখ তৈরি করতে হয়—কার্লোভি ভারির জলের জন্যও তেমন রুচি তৈরি করে নিতে হয়। প্রথমবারের মত পরে অত খারাপ লাগল না। এর বেশ কিছুদিন পরে যখন জার্মানির উইসবাডেনে গিয়ে আবার উষ্ণ জলের প্রস্রবণের জল খেলাম তখন রীতিমত সুস্বাদু লাগল।

পথে হাঁটতে চোখে পড়ছে একাধিক বাড়িতে প্লাক লাগানো—এই বাড়িতে গেটে থাকতেন। সবশেষে [illegible] উনি এখানে এসেছিলেন। গেটে বলে গেছেন কার্লোভি ভারির উষ্ণ জল পান করে উনি নবজীবন লাভ করেছেন। আর একটি বাড়ির গায়ে লেখা চোখে পড়ল—কার্ল মার্কস এখানে বাস করেছেন। আমরা তখন নেতাজী কোন বাড়িতে থাকতেন খুঁজে বেড়াচ্ছি। নেতাজী লিখছেন আলেকজান্দ্রা, কয়নিগিন-এ যে কুরহাউস-এ (Kurhaus) উনি আছেন সে জায়গাটি [illegible] উপর শস্তা অথচ আরামের অভাব নেই। এতকাল পরে রাস্তাঘাটের নাম বদলে গেছে, দু'এক জায়গায় বাড়ি মেরামত করে চেহারা গেছে একদম পাল্টে। হয়ত কি হবে আমাদের থেকে চেক বন্ধুদের উৎসাহ বেশী। বাড়িতে বাড়িতে নক করে ঢুকে অনুসন্ধান শুরু হল। শেষ পর্যন্ত বোজেনা সে বাড়ি আবিষ্কার করে তবে ছাড়ল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বাড়িটার দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হল একটা প্লাক কি কোনদিন লাগবে না এ বাড়ির গায়ে—ভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু এখানে এই বাড়িতে ছিলেন?

বাড়িটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এদের স্বস্তি ছিল না। এবার নিশ্চিন্ত মনে ফানিকুলার অর্থাৎ পাহাড়ের ট্রেনে চড়ে ওপরে উঠে গেলাম। নেতাজীর কার্লসবাদের ওপর লেখা মাঝে মাঝেই সবাই খুলে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে। নেতাজী বলছেন আমাদের দেশে কেন এমনটি হবে না। আমাদের যেমন পাহাড়ের ওপর সুন্দর শহর আছে, আছে সমুদ্রের ধারের শহর তেমনি আমাদের উষ্ণ জলের ঝরনাও রয়েছে। শুধু গভর্নমেন্ট ও মিউনিসিপ্যালিটির অবহেলার জন্যই এ ঝরনাগুলি ঘিরে ভ্রমণেচ্ছুকদের জন্য সুন্দর কিছু গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এতে যেমন দেশের লোকেরা স্বাস্থ্যোদ্ধারে যেতে পারে তেমনি

বিদেশী ট্যুরিস্ট এসে আমাদের আয়ের পথ সুগম হয়। ওঁরা বলছিলেন—কথাগুলো নেতাজীর উপযুক্ত। যেখানে যা ভাল ও নতুন দেখছেন স্বদেশে কিভাবে তা প্রয়োগ করা যায় সেই কথা ভাবতেন। ওঁরা মনে করিয়ে দিলেন নেতাজীর কথাগুলো আমরা এখনো কার্যকর করতে পারিনি।

পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা কত যে রাস্তা উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে চোখে পড়ে অপূর্ব প্যানোরামা। এক এক রাস্তায় উঠতে এক এক পথের মোড়ে এক এক রকম দৃশ্য। নেতাজী লিখেছেন এই পথগুলিতে হাঁটতে তাঁর বড়ই ভাল লাগত। পরিশ্রান্ত হলে জিরিয়ে নাও, পথের বাঁকে বেঞ্চি পাতা আছে। পাহাড়ের ওপর রয়েছে কফি হাউস। নামবার সময় আমরা আর ফুনিকুলার চড়লাম না। নির্জন বনপথে হেঁটে নামতে লাগলাম। মনে হল এ পথে সুভাষচন্দ্রের পায়ের চিহ্ন পড়েছে বহুবার। পথের পাশে ঐ যে শূন্য বেঞ্চি কে জানে হয়ত ঠিক ওখানে বসেই উনি খবর কাগজ পড়েছেন।

রাজা চতুর্থ চার্লস হলেন কার্লসবাদের আবিষ্কারক। গল্প আছে উনি শিকারে বেরিয়েছেন, এক হরিণ পাথরের ওপর থেকে লাফ দিল। দেখতে পেয়ে কুকুরগুলি তাড়া দিয়ে এগিয়ে গেছে এমন সময় রাজার কানে এল তার এক কুকুরের মর্মভেদী আর্তনাদ। ছুটে এসে দেখেন কুকুরটি গরম জলের ঝরনায় পড়ে পুড়ে গেছে। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় কার্লসবাদ আবিষ্কৃত হল। একটি হরিণের মূর্তি দিয়ে জায়গাটি চিহ্নিত রয়েছে।

কাছাকাছি আরো এই ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। নেতাজীই লিখেছেন ১৯৩৩এ উনি ফ্রান্সেনজবাদ গিয়েছিলেন, অসুস্থ বিঠলভাই প্যাটেল ওখানে ছিলেন। ওখানকার জল হার্টের অসুখের পক্ষে ভাল। এ ছাড়া আছে মারিয়ানবাদ, জোয়াকিমস্থাল। কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতি কার্লসবাদেরই বেশী। এখানকার জলে সব রকমের পেটের রোগ, গলব্লাডারের অসুখ, লিভারের অসুখ সারে। জল ছাড়া কার্লোভি ভারির পোর্সেলিন বিখ্যাত। দোকানের কাঁচের আড়ালে কাটগ্লাসের অপূর্ব সমারোহ। সতৃষ্ণ নয়নে কফির পেয়ালা দেখছিলাম। ভিতরে সোনালী রং ঝকমক করছে। এই ভিতরে সোনালী কাজ করা কাপ কার্লসবাদের বিশেষত্ব। উইন্ডো শপিং পর্যন্তই হল—নাহলে খরচ বাড়ে।'

মনে পড়ল ভিয়েনায় একদিন আন্টির (শ্রীমতী এমিলি শেংকল) সঙ্গে বসে আইসক্রীম খাচ্ছি—আইসক্রীমের কাঁচের পাত্রটি খুবই সুন্দর। খাওয়া থামিয়ে বাটি এডমায়ার করছি দেখে আন্টি বললেন—এটা কোথাকার জানো? সেই ১৯৩৪এ যখন আংকেলের (সুভাষচন্দ্র) সঙ্গে কার্লোভি ভারি যাই তখন কিনেছিলাম। একটা বাটি অসাবধানে ভেঙে গিয়েছিল, পরের বছর যখন আবার গেলাম তখন আর একটা কিনে নিলাম।'

ভাবলাম এবার ইতিহাসের সন্ধানে বেরিয়েছি বলে কি সর্বত্রই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা! শেষ পর্যন্ত আইসক্রীমের পাত্রেও যে ইতিহাস! খাওয়ার পর কিচেন বেসিনে 'ডুয়িং দি ডিশেস' করার সময় সাবধানে পাত্রগুলো ধুয়ে রাখলাম।

নীচে নামতে পাহাড়ের চূড়া থেকে কার্লসবাদ এতটা পথ কে জানত। নেতাজী অপূর্ব বনশোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন—একথা ভেবে যথাসাধ্য স্পিরিটস উঁচু রাখার চেষ্টা করলেও শেষদিকে পথ হেঁটে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। লজ্জাও করছিল—কই চেকোশ্লোভাকিয়ার মেয়ে বোজেনা বা ডেনমার্কের মেয়ে বেনেডিকটে তো ক্লান্ত হয়ে পড়ছে না! প্রায় নিজের দেশের সম্মান নিয়ে টানাটানি তাই কষ্ট হলেও মুখ বুজে সহ্য করলাম। শেষ পর্যন্ত শহরে এসে নামলাম। বিকেল হয়েছে, লোকজন বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পথে বেরিয়ে পড়েছে। অন্তত সেদিন কার্লোভি ভারিতে আমিই একমাত্র শাড়িপরা হওয়ায়—সকলে বিশেষভাবে নজর করছে। ছেলেমেয়েরা হাঁ করে চেয়ে আছে, পাশ দিয়ে চলে গিয়ে আবার পিছন ফিরে দেখছে। বেনেডিকটে বলল, 'বড়রা দেখছে, বড়রা একবার একপলক দেখে নিয়েই চোখ অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে—ছোটরা এত সব জানে না, ওরা তোমাকে অবাক বিস্ময়ে দেখছে।' একটি সুদৃশ্য রাশিয়ান চার্চের পাশে এলাম। ভিতরে ঢুকে একটু দেখলাম। রাশিয়ান চার্চের গম্বুজ অনেকটা মসজিদের মত।

বড় সুন্দর শহর এই কার্লসবাদ বা কার্লোভি ভারি। গাড়িতে উঠতে উঠতে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম। ফিরতি পথে গাড়িতে বেনেডিকটে বলল 'তুমি আর বোজেনা নিশ্চয় বাংলায় গল্প করতে চাও, করতে পারো, আমি কিছু মনে করব না।' কিন্তু সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সকলে মাত্রার উপর ক্লান্ত। কোন ভাষাতেই খুব একটা গল্প করার মত অবস্থা নয়। টাটরা গাড়ি একশ' ষোল কিলোমিটার স্পীডে চালিয়েও প্রাগে এসে পৌঁছতে বেশ রাত্রি হল।

[ক্রমশঃ]

কঠিন হযবরল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সে আজ সকাল থেকে ডেথ ডেথ খেলা খেলছে। সে রোজ এমনভাবে খেলে না। এবং সে একা একা কখনও খেলে না। ওদের ডেকে নেবার কথা থাকলে সে ঠিক ডেকে নিত। যেমন অন্যদিন কিছু ভাল না লাগলে, সে ওদের নিয়ে খুব জ্যামের সময় অথবা কখনও কখনও রাস্তা ফাঁকা থাকলে কেমন ঘুরে ফিরে রাস্তা পার হয়ে যায়। গাঁক গাঁক করে বাসের হর্ন সে কান পেতে শোনে। এবং কোন কোন সময় ড্রাইভারদের ইতর কথাবার্তা। তবু নেশার মতো খেলাটা ওদের মাঝে মাঝে পেয়ে বসলে, শহরের বড় বড় রাস্তায় অথবা মোড়ে, ডাবল ডেকারের মুখে এক আশ্চর্য মুগেল হাত তুলে ডেথ ডেথ খেলা হয়। ভারি মজা লাগে। নেশার মতো, বুকের ভিতর কঠিন ইচ্ছারা তখন ঘোরাফেরা করে।

অথচ আজ সে একা। সকাল থেকেই একা। সকাল থেকেই একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক বড় রাস্তার পাশে। খুব জোরে আসছে একটা বাস, খুব জোরে—কত স্পিড হবে সে ঠিক জানে না, তবু মনে হয় অনেক স্পিড, রকেটের মতো মাটি ফুঁড়ে যেন উঠে আসছে। সে তার ভিতর ঠিক টাইমিং রেখে বাসের গা ঘেঁষে রাস্তার ও-পারে উঠে যাবে। অনেকটা সে নিমেষে, যেন এটা তার কাছে খেলা, সে খেলার মতো করে একটা বাসের সামনে বিপজ্জনক রাস্তাটা পার হয়ে যাবে।

আর যা হয়, পার হয়ে যেতেই, শালা হারামি এবং আর যা গালাগাল না দিলে রক্তের ভেতরে বাস চালানো যায় না—তেমন সব ছোট হরফ-গেরস্ত কথাবার্তা সে শুনতে পেল। সেও ছেড়ে কথা বলল না। সে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল দরাজ গলায়, আমার বাবাকে তুমি শালা গাল দিচ্ছ। তোমার বাবাকেও আমি শালা গাল দেব। এসব কথা সে এখন হামেশাই বলে থাকে। কারণ শহরের যা কিছু তার ভাল লাগে সবই তার নাগালের বাইরে। ওর ভাল

লাগে নদীর পাড়ে অঞ্জুকে নিয়ে বসে থাকতে। অঞ্জু এখন আর নদীর পাড়ে বসতে চায় না। নদীর পাড়ে সে একা একা বসে থাকে, অঞ্জু আসে না। যেমন ভাল লাগে তার, সে একটা সুন্দর বাড়ি করবে। বাড়ির চারপাশে নানা রঙের ফুলের গাছ, কিছু ক্যাকটাস, আর সব লতাপাতা। লতাপাতায় ঢাকা একটা পাঁচিলের নীচে সে আর অঞ্জু, কিছু কবিতার বই টিপয়ে, নীল রঙের খামে প্রেমিকার চিঠি। অথবা অঞ্জু আর সে বসে থাকবে পাশাপাশি এবং এই যেমন রো-আপ ছবির দুটো একটা দৃশ্য নিয়ে কথাবার্তা, একটু সোনালী মদ সামনে। কখনও কথা বলতে বলতে হা হা করে হাসবে। তারপর সাদা জ্যোৎস্না উঠলে সব আলোগুলো নিবিয়ে দেবে সে। অঞ্জু আর সে তখন সাদা জ্যোৎস্নায় বাড়ির চারপাশে ঘুরে ঘুরে যে সব ফুল ফোটার কথা তাদের রাত জেগে ফোটাতে দেখবে।

সে চেঁকে উঠল তখন, হেই।

গাড়ির ভিতর থেকে অঞ্জু মুখ বের করে বলে উঠল, ওমা, দ্যাখো সজলদা। অঞ্জু লম্বা একটা টান ঝুলিয়ে দিল—স-জল-দা... আ!

—আরে সজল তুমি?

—হ্যাঁ মাসিমা আমি।

—এ-ভাবে রাস্তা পার হতে হয়!

—এই একটু দেখছিলাম, পার হতে পারি কি না।

—তোমার বাবা কেমন আছেন?

—ভাল না। কাল পরশু মরে যেতে পারে।

—তোমার দিদির চাকরিটা আছে তো?

—আছে বোধ হয়।

—তুমি এখন কি করছ?

ওর বলার ইচ্ছা ছিল ভেরান্ডা ভাজছি। কিন্তু অঞ্জু আছে গাড়িতে। একেবারে সোজাসুজি অপমান অঞ্জু পছন্দ নাও করতে পারে। সে বলল, পার্কসার্কাসে একটা ভাল ফ্রেসকো আঁকার কাজ পেয়েছি। কাজটা করতে পারলে অনেক টাকা। 'অনেক' কথাটা সে বেশ লম্বা হিজলের সারির মতো বলে গেল।

—তুমি যে কি লিখছিলে টিখছিলে?

গাড়ি থামিয়ে এতক্ষণ কেউ ওর সংগে কথা বলে না। ভাবল, সে আর গাড়ি পেল না, ডেথ্ ডেথ্ খেলা সে এরই সংগে খেলতে গেছে। সে এখন ওদের ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে। তবু বাবার এক সময়ের বন্ধুপত্নী বাবার সংগে পরোকাল, একটা সম্পর্ক'ও থাকলে থাকতে পারে ভেবে সে খুব সত্যবাদী হতে চাইল, ফলে লেংথের একটা উপন্যাস লিখে দশ টাকা পেয়েছি মাসিমা।

—দশ টাকা!

—দশ টা...কা! সে লম্বা টান ঠিক ঠিক সেই হিজলের বনে ঢুকে দৌড় দেবার মতো।

—দশ টাকায় কি হয়! খুব দুঃখের সংগে কথাটা যেন বলছেন মাসিমা। চোখে মুখে ভীষণ কাতর ভাব।

—কিছু হয়না মাসিমা, তবে দশ টাকায় ইচ্ছা করলে আপনি কয়েক বাণ্ডিল মোমবাতি কিনতে পারেন।

মাসিমা ওর অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে বললেন, ঠিক আছে তোমার বাবাকে একদিন দেখতে যাব।

সে খুব ভাল ছেলের মতো ঘাড় কাত করে বলল, আচ্ছা মাসিমা।

অঞ্জুর মা ওকে [illegible]— কিন্তু অঞ্জুর কথা শেষ হচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে ভয়ংকর রেগে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে।

অঞ্জু বলল, তুমি সজল দা এই সকালে কোথায় বের হয়েছো?

—কলেজ স্ট্রীটে যাব ভাবছি।

—ওঠে এসনা। নামিয়ে দেব।

সুতরাং আর কোন দিকে না তাকিয়ে সে খোলা দরজা খুলে পিছনে বসে পড়ল। এতটা রাস্তা রোজ রোজ হেঁটে যেতে কষ্ট হয়। কোন কোনদিন আর হাঁটতে ইচ্ছা না হলে সে ডেথ ডেথ খেলা খেলতে খেলতে রাস্তা পার হয়ে যায় এবং এক সময় ঠিক সেই লাইট পোস্টের নীচে পুরোনো বইয়ের দোকানের সামনে, সে সারি সারি সিনেমা স্লাইডের মতো সরে সরে যায়। গাড়িতে বসে ভীষণ ভাল লাগছে। সে আনন্দে বলেই ফেলল, মাসিমা মোমবাতি কিনেছেন কখনও।

এমন প্রশ্নে অঞ্জুর মা হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছে না। হ্যাঁ কত! কালীপূজোর সময় কত!

—কি যে মা বলছ না! এখন আর আমরা মোমবাতি জ্বালি!

কথাটা [illegible] যেন, এত বড় বাড়ি, গাড়ি ফুল ফলের বাগান করে কি আর মোমবাতি জ্বালানো যায়।

—এই স্বীপ-ফিপ কিনে ফেলতে পারলেই ধনকুবের হওয়া যায়।

—তাই কিনে ফেল।

—পয়সা হলে তাই করব। শহর ফহর আমার ভাল লাগে না। আমি যখন দশ টাকার মোমবাতি কিনতে পারি, পয়সা হলে স্বীপও কিনতে পারি।

অঞ্জু বলল, তা পার। সামনের মোড় পার হতে পুলিসের হাত। সে জোরে ব্রেক কষল।

—সম্পাদকমশাই দশ টাকা কাটলেট খেতে দিয়েছিলেন।

অঞ্জু গাড়ি স্টার্ট করার সময় বলল, একা কাটলেট খাবে না।

—কিন্তু আমি যে দশ টাকারই মোমবাতি কিনে ফেললাম।

—দশ...টা...কার! যেন কাচ খুকির চুল কেড়েছে, কিন্দুনি শাঁখার শখ। কিন্দুনি বেঁধে আশ্চর্য হয়ে গেছে অঞ্জু।

—দশ টাকায়। ইচ্ছা ছিল একটা কাঠি জ্বালিয়ে মুখের ওপর নোটটা পুড়িয়ে দেই।

—দিলে না কেন?

—সাহস হল না। পরে যদি লেখা

পূর্ণ ভেবে আমরা বসে আছি—মনে নেই দৃশ্যটা, ভা...বা যা...র...না...

—আরে সজল! কতক্ষণ?

—সকালেই বের হয়েছি দাদা। অনেকদিন পর আবার পুরোনো সেই ডেথ্ ডেথ্ খেলাটা সকালে একটু খেলে দেখলাম। তা বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু অন্তটা সব গোলমাল করে দিল। বেমক্কা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা। না হলে এখনও হয়ত খেলতাম। একটু থেমে কি দেখল. কারণ এখন ওর পাশে আরও দু-চারজন বসবে. ওর কবিতা মুখস্থ বলে যাবে তারা। ছড়ায় জুড়িদার তার আর নেই। অথচ চোখেমুখে ঈগলের মতো কঠিন বাসনা। সে বলল, প্রেমিকার সঙ্গে সকালে আজ একটু ডেথ্ ডেথ্ খেলা জমে গেল। খ...টি...র জমেছিল দাদা। যত নষ্টের গোড়া ওর মাটা।

—তুমি সজল কিছু খাবে?

—কি যে বলেন দাদা, আপনি বললে না বলতে পারি! সে ওমলেটের এক টুকরো ভেঙে মুখে পুরে দেবার সময় বলল, আমার ... দাদা, কাঁঠাল ... রান্না হয় জানেন! ...দিন আপনারা সবাই মিলে আসুন না, ... খুশী হবে। মার হাতের রান্না নাই ... পলতা পাতা সম্বারে—সে ... গ্র্যাণ্ড। গ্র্যাণ্ড কথাটা সে ... করে বলবে, কিন্তু মুখে ...লেটের কাঁচ, বলতে গেলে জিভের ... সে খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে ...। আপনারা এলে মা কত খুশী হন। ... আসছেন, মাকে বলব। সবই ... সজল ... বলতে পারে, কারণ সে মনে মনে ... যেমন তার ভাবনা সে অনেক ... করে সব সময়। কাজের জন্য ... নেই। সে তাই সময় মতো ... করতে পারে না। শরীরের ... দিন দিন তাই এমন হচ্ছে।

—কতক্ষণ বসবে?

—বেশী সময় বসতে পারছি না। বড়-বাজারে ...সাহেবের ঘরে একটা কাজ পেয়েছি। শোবার ঘর। দুটো নুড আঁকতে হবে। প্লাস্টারের কাজ। সকালে বের না হলে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয় না। একবার দেখা না হলে ভাল লাগে না। সে ওঠার সময় বলল, সারাটা দিন লেগে যাবে। কখন ফিরব ঠিক নেই। তাই একটু বসে গেলাম।

এবং এ-ভাবেই সে আহার শেষ করে, কথা শেষ করে এবং নিদারুণ ব্যথার কথা লুকিয়ে যায়। সে যে কতদিন না খেয়ে থাকে। তার যে ইচ্ছা: একটা সুন্দর ছোট্ট বাড়ি, ফুলে ফলের গাছ, মসৃণ ঘাসের জমি এবং অঘ্রাণ মাসে ভালবাসার মেয়ে—যার হাতে মোমের মতো, যার পায়ে কোমল উষ্ণতার ছবি এবং ... হাত রাখলে চারপাশ থেকে সব সুন্দর সুন্দর দৃশ্য উঠে আসে। একটা বড় মাঠের কথা মনে হয়, একটা জলাশয়ের কথা মনে হয় আর গাছপালার ভিতর দিয়ে সে ছুটেছে, অথবা ছুটছে এমন মনে হয়।

এমন মনে হলেই সে আবার রাস্তায় হাঁটে। ক্রমান্বয়ে হেঁটে যাওয়া শুধু। কোথাও গিয়ে একটু থামে। ঈষৎ ঘাড় তুলে আকাশ দেখার চেষ্টা করে। অথবা মানুষজন ভিড়। ট্রামগাড়ি, ফুলের দোকান এ-সবের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনে হয় কোথাও ওর একটা কাজ করার কথা আছে। সে সেই কাজ করবে বলে যাচ্ছে। অথচ সঠিক ঠিকানা সে জানে না। সে কেবল হাঁটে। এবং কোন এক বড়বাজারি মানুষের কাছে একটা ছবি এঁকে দেবার বাসনা জানালে আশ্চর্য

অপরিচয়ের মুখ করে রাখে মানুষটা। তার তখন সুন্দর সুন্দর খেলনা কিনে নিতে ইচ্ছা হয়। মনে মনে সে রাজ্যের সব খেলনা কিনে ফেলে। তার ভারি শখ মাথায় থাকবে নীল রঙের পালক, গায়ে আলখাল্লা, মির্জাপুরি চটি পায়ে। চটিতে বাহারি কাজ থাকবে কিছু। সে মুখে সাদা লম্বা দাড়ি গজিয়ে নেবে এবং শীতের দেশে চলে যাবে। চারপাশে কেবল বরফ, পাইন গাছ, উঁচু নীচু পথ, ওর স্লেজ গাড়িটা ছটা কুকুরে টানছে। আর চারপাশে নীল লাল রঙের কাঠের বাড়ি, দরজা জানালা ঈষৎ খুলে গেলে সব সুন্দর সুন্দর শিশুদের মুখ, নীল চোখ ওদের। সোনালি চুলের শিশুরা হাত পাতলে সব টফি আর খেলনা দিয়ে সে চলে যায়। ছড়াগুলো বড় চেনা, ওদের মুখে সব ছড়া, কিছুটা ধর্মীয় সঙ্গীতের মতো তার কানে বাজে। সে সারাক্ষণ কান পেতে শুনতে শুনতে স্থির হয়ে গেলে মনে হয় চারপাশে তুষারপাত হচ্ছে, ক্রমে সে বরফে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে এবং দূর থেকে কারো ডাক ভেসে আসছে। দিদি যেন অনেক দূরে মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকছে—স...জ...ল। কাটু।

✻

—কাজটা দিন, খুব ভালভাবে করব।

—তিনটে টেন্ডার এসেছে। রেট ওদের খুব কম।

—টেন্ডারে এসব কাজ হয়, না টেন্ডারে ছবি আঁকানো যায়।

বড়বাজারীর মনুবটি হাসলে। অর্বাচীন। সে বলল, বাই বই ধারিয়াল সাব। চলি।

এবং এ-ভাবে আবার চলা। সারাটা দিন এভাবে কাটাতে হবে। কি করা যায়। বাবুঘাটে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকলে হয়। বাবুঘাটে এসেই মনে হল, পাশের মাঠে ঘাসগুলো বেশ নরম আর মসৃণ হয়ে গেছে।

এমন একটা মাঠের ওপর দিয়েই তো অঞ্জুর হাত ধরে বিকেলের দিকে তার রোজ রোজ হাঁটার কথা ছিল। সে আজ একা হাঁটবে বলে ঘাসের ভিতর নেমে গেল। বেশ চার পাশে গাছপালা, জলাশয়। পাশে ইডেনের লোহালক্কড় এবং দূরে আরও বড় মাঠ। মাঠ দেখলে মনটা তার হতাশায় ভরে যায়। অঞ্জু সত্যি চলে যাচ্ছে। কাজটা না পেয়ে ওর বুকের ভিতর অপমানের বোঝাটা বেশ ভারি ঠেকছে। এবং এ-ভাবে সে যে এখন কি করবে—ভাবতে ভাবতে মনে হয় সে একটা পুরু লেংথের ছবি করছে। সে ফ্রেমে দাঁড়িয়ে আছে। নায়ক নায়িকার মুখে মুখোশের ছবি। ওরা নানারকমের মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা কামনা বাসনার, কোনটা লোভের। কোনটা ইতর মুখের ছবি আর কোন ছবি দেখলে মনে হয়—আহা কি ভালমানুষ, ভদ্র, বাংলা কথায় জেন্টেলম্যান। সে ভাবল ডিরেকশন দেবে বংশায়। সে ঘাসের ওপর দিয়ে চোখে ক্যামেরা লাগিয়ে থপ থপ করে যেন হেঁটে চলেছে। আলো বেশী না কম দেখছে। খুব দ্রুতগতিতে একটা ঘোড়া ছুটে আসছে। দু'পাশে পাহাড়। কি গ্র্যাঞ্জার ছবির! শালা বাংলা বইয়ে কেন আর গ্র্যাঞ্জার আনা যাচ্ছে না। তার ছবি হবে একটা বড় উটের মতো। উটটা মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হেঁ...টে যাচ্ছে। হেঁ...টে... যা...চ্ছে।

—স...জ...ল!

কেউ যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে!

সে চারপাশে তাকাল। না কোথাও কেউ নেই। চারপাশে সব অপরিচিত মুখ। এখন সূর্য পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে। নানা রঙের শাড়ি পরা মেয়েছেলে সব মাঠে নেমে আসছে। এদের কেউ ওকে চিনবে না। চেহারাগুলো দেখলেই মনে হয়, ওরা কেউ কবিতা পড়ে না। কবিতা না পড়লে সজলকে চিনতে পারবে না। সুতরাং সে বেশ নিশ্চিন্তে দশ পয়সা খরচ করে চিনাবাদাম খাচ্ছিল। তখনই কেউ যেন ওর কাঁধে হাত রাখল। সে পিছন ফিরে তাকাল। বলল, তুমি কি আমাকে ডাকছিলে?

—না তো! রাইটার্সে যাচ্ছি। দেখি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ।

—আমাকে কে যেন ডাকল। স...জ...ল। সে যেমন ভাবে ডাকটা শুনেছিল, হুবহু তেমনি লম্বা করে কথাটা বলল। —আমাকে এতদূরে থেকে কে আর ডাকতে পারে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। মা এ-ভাবে আমাকে ডাকত। দিদি আমাকে খুঁজে না পেলে এ-ভাবে ডাকত। এখন আমাকে আর এ-ভাবে কেউ ডাকে না। বেদনায় ওর মুখ কেমন ভার হয়ে গেল।

—এখানে একা একা কি করছ?

—এই একটা কাজ করছি। ফ্রেসকো। ম্যাকটা পার্ক স্ট্রীটে। সকাল থেকে কাজ করতে করতে হাতের আঙ্গুল অবশ হয়ে গেছে। বলে, সে মট মট করে আঙ্গুলগুলো ভেঙে ওর চোখের সামনে জড়তা কাটিয়ে নিল। তারপর হাই তুলতে তুলতে বলল, বড় একঘেয়ে কাজ। দুটো ন্যুড আঁকছি। সূর্যাস্তের আগে দুই যুবক যুবতীর শরীর—ওরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যাস্তের আগে অর্থাৎ যখন আকাশ, মাঠ, গাছপালা লাল লাল হয়ে যায় তখন নদীর পাড়ে কোনো সুন্দরী যুবতী নগ্ন হলে যা হয়। এসব ছবি কেউ কেউ ঘরে রাখতে খুব পছন্দ করেন।

—কত পাবে?

—কত আর। আজকাল সবাই ফড়েকোটের বাবু। তবু বলেছি সাতশ টাকার কমে হবে না। দিতে চায় না। ফের বললাম, সাতশ টাকায় ছবি হয় না, ছবির ফ্রেম হয়। কিন্তু হাতে কাজ না থাকলে বসে তো থাকা যায় না। ভদ্রলোকের কথাটা খুব লেগেছে। ভদ্রলোক সাতশোই দিতে রাজি হয়ে গেল।

—এ-বাজারে সাত শো! কম কোথায়।

তারপর সজলের চোখ মুখের ছবি দেখে বলল, তোমাকে খুব রুগ্ন দেখাচ্ছে।

—খুব খাটুনি। সেই কোন সকালে কাজে বের হয়েছি। দুজন অ্যাসিস্টেন্ট আছে। ওরা কাজকর্ম ভাল বোঝে না। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হচ্ছে। কাজ থেকে একটু ছুটি পেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবছি তখন অঞ্জুকে নিয়ে উটি থেকে ঘুরে আসব।

—তা হলে তোমার সঙ্গে অঞ্জুর সেটেলমেন্ট।

—কবে। আমিই ঠিক মত দিতে পারছি না। বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

[illegible]রা ভাল না হলে পিঁড়িতে বসে যাওয়া ঠিক না।

তখন এদিকে ডাবল ডেকার, অন্যদিকে কলা বিক্রি করে খায় এমন এক মানুষ, তার মাঝখানে সে। বেশ একটা আড়াল। এবারে ভিড়ের মধ্যে কেটে পড়া যাক। সে কেটে পড়ল। সে প্রায় লাফিয়ে পার হল ফুটপাথ। কোন জায়গা খুঁজছে যেখানে এমন সব লোকদের সঙ্গে তার দেখা হবে না। দেখা হলেই একটা না একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে। বেকার হলে করুণা ছাড়া আর কেউ কিছু করে না। আবার কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে কি বলবে ঠিকঠাক করে ফেলে। আর তুমি? কি খবর?

—খবর কিছু নেই দাদা, এই কিছুদিন এখানে ছিলাম না। একটা ডকুমেণ্টারি তুলতে বিষ্ণুপুরে গেছিলাম। প্রাচীন মন্দির টন্দির নিয়ে ছবিটা। এ-ভাবে একজন যুবক, এ-সময়ের যুবক, তাকে কলকাতার যুবকও বলা চলে—গড়ের মাঠ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে চুপচাপ মাঠের ভিতর বসে থাকবে। এবং সূর্যাস্ত হলেই হাঁটা। চুপি চুপি, ভিড়ের ভিতর ক্রমে হারিয়ে যাওয়া। তারপর বড়বাজারের ভিতর ঢুকে [illegible] পরামানিক লেনের [illegible]কাণ্টার কাছে গেলেই ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়। তারপর ছবির [illegible] মতো একটার [illegible] ঢেকুরটা মুখে ফেলে দেয়। [illegible] সুস্বাদু খাবারের মতো চেটে চেটে খেয়ে ফেললেই মনে হয়—এই [illegible] সে খুব সুন্দরভাবে বেঁচে [illegible]। তার যা কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, [illegible] একেবারে চোখের ওপর সব [illegible] হয়ে যায়।

প্রথম দিকে যা হয় থাকে, মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। চোখ কান কেমন একটু ঝাপসা ঝাপসা করে, তারপর এক সুন্দর নেশা, সুন্দর দৃশ্যের মতো উঠে আসে। হাত পা অবশ মনে হয়। মনে হয় সব তার আলগা। সে যখন যেখানে খুশি যে কোন হাত, পা, মাথা খুশিমতো খুলে এখানে সেখানে রেখে দিতে পারে। সারাটা পথ সে কখন যে কোথায় এভাবে হাত পা মাথা রেখে হাঁটতে থাকে নিজেও জানে না। কোনটা টাটা বিল্ডিংএর ওপর, কোনটা মনুমেণ্টের নীচে, আবার দেখা যাবে ওর ডান হাত রয়েছে বহুবাজারের বাজারের কাছে নন্দীবাবুর কাঠ-গোলায়। বাড়ি ফিরতে গেলে সব আবার ঠিকঠাক করে নিতে হয়। তখন সে হেঁটে পারে না। পায়ের নীচে খড়মের মতো কিছু পরে নেয়। সে লম্বা হয়ে যায় ক্রমে। হাত পা লম্বা [illegible] মানুষ বাস ট্রামের ওপর দিয়ে, রাস্তার ওপর দিয়ে ভিক্ষা করতে থাকে যেন। যখন যেখানে খুশি সে উঠে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে। এই ফুটপাথ, রাস্তা, ছাদ, ল্যাম্প পোস্ট ট্রাম বাসের ওপর—যখন যেখানে খুশি উঠে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে। খুব দ্রুত সে যাচ্ছে বলে, কখনও রেল গাড়ির মতো দু পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, গড়ের মাঠ সব ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওর পা মাথা হাত সব ছিটকে পড়ছে চারদিকে, তবু সে আছে, সজল বলে এক যুবক আছে—গায়ে তার এখন লম্বা পোশাক, মাথায় মাংকি ক্যাপ এবং হাতে সাদা দস্তানা। সে একেবারে বরফের দেশের মানুষ হয়ে গেছে। কেবল বরফ, বরফময় কলকাতা। বরফের নীচে কলকাতায় বাড়ি ঘর যানবাহন। কেবল আছে মনুমেণ্ট। সাদা রঙের মনুমেণ্ট, তার তলায় একটা আলগা মাথা। সে মাথাটা তুলে নিতেই বুঝল এটা সে এখানে রেখে গেছিল। কি করা যায়। উটকো একটা বেশী মাথা যখন পাওয়া গেল, বগলের নীচে রেখে দিলে মন্দ হয় না। সে সজল, এক কঠিন জীবন, হ য ব র ল যে জীবন, বগলের নীচে জীবন নিয়ে বরফময় কলকাতায় টিক করে বেড়াচ্ছে।

সজল জানে না, এখন সে একটা লাইট

পোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে একটা কুকুর। ট্রাম বাস হুস হাস বের হয়ে যাচ্ছে।

কখনও সে লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। কখনও বেঁটে। এবং সে লম্বা হয়ে গেলে মনে হয় আকাশটা খুব কাছে। সে তখন আকাশটাকে বোর্ডের মতো ব্যবহার করতে পারে। বড় বড় ছবি আঁকতে পারে, যা সে এতদিন ধরে কোন দেয়ালে অথবা রেস্তোরাঁয় আঁকবে বলে স্থির করেছিল। তার এখন যা খুশি করে ফেলতে পারে। আকাশের এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে, কারণ সে তার বরফের পা পাহাড় এত বেশী সহজ হয়ে গেছে যে সে নিজেও জানে না, যে কোন সময় টুপ করে মহাশূন্য থেকে ছিটকে পড়তে পারে। এবং এ-ভাবে মহাশূন্যে ভাসমান ছোট্ট ভেলার মতো সে যখন ভেসে বেড়াচ্ছিল তখন একটা কুকুর—জীবনের এক কঠিন হ য ব র ল, ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কুকুরকে ভীষণ ভয় তার। সে তাড়াতাড়ি জায়গাটা বদল করে নেবে ভাবল। কোথা থেকে আবার একটা নচ্ছার কুকুর বোধ হয় অন্তুর মা কুকুরটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে—এই মহাশূন্যে তাড়া করছে। সে যে এখন কি করে—যেদিকে সে ভেসে যাচ্ছে, কুকুরটাও সেদিকে। কোথাও একটা গীর্জা অথবা মন্দির পেলে হত। গীর্জার মাথায় অথবা মন্দিরের চূড়ায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কুকুরটা কিছুতেই নাগাল পাবে না। গীর্জার কথা মনে পড়তেই স্কেটিঙ করে দু' লাফে সেণ্ট পল গীর্জার মাথায় উঠে গেল। কিন্তু কুকুরটা একটা স্পুটনিকের মতো ছুটে আসছে। এখানেও রেহাই নেই। সে এবার বেশ দু পা ফাঁক করে বরফের পাহাড়ে স্কেটিঙ করার মতো টাটা বিল্ডিং-এর মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বিল্ডিংএর নীচে এই শীতের রাতে কুকুরটা এসে ওৎ পেতে বসে আছে কিনা দেখবে বলে উঁকি দেবার সময় কি যেন হয়ে গেল তার। সে নড়তে পারছে না। সে নুতে পারছে না। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কুকুরটা এখানে আছে কি চলে গেছে। সে শক্ত হয়ে গেছে। বরফের মতো শক্ত। স্থির এবং স্থবির। হাত পা-গুলো পাথরের মতো শক্ত। সে একটা পাথরের মূর্তি হয়ে যাচ্ছে। এবং বুঝতে পারছে, মূর্তিটা আর কেউ না, সেই বিলেতের লোকটা—হ্যাপি প্রিন্স।

সে টাটা বিল্ডিং-এর মাথায় হ্যাপি প্রিন্স অথবা বলা যেতে পারে বাংলাদেশের সুখী রাজপুত্র। মাথায় রবিন পাখি। অন্তু পড়তে যাচ্ছে। চার পাশে তার সারি সারি মোম জ্বলছে। সারা গায়ে তার রাজপুত্রের পোশাক। কোমরে তরবারি। মাথায় রাজপুত্রের মুকুট। মধ্যরাত্রি বলে হিমে সব মোম নিবে যাচ্ছে। শুধু মাথার ওপর নীল আকাশ, অজস্র নক্ষত্র এবং কোর্টের ওপাশে নদীতে জাহাজ—জাহাজে ব্যাণ্ডের বাজনা বাজছে। তার মনে হচ্ছে আকাশ উজ্জ্বল এবং তরবারির মতো শীতল হিমেল স্পর্শ চার পাশে।

সে এ-ভাবে কতকাল ধরে যে টাটা বিল্ডিং-এর মাথায় দাঁড়িয়ে আছে! মাথার ওপর রবিন পাখিটা কতকাল থেকে বাস করছে। সে মাঝে মাঝে এভাবে বাংলাদেশের সুখী রাজপুত্র হয়ে গেলে চোখের মণিতে যে দামী মুক্তো আছে তা দিয়ে আসতে বলে।

—কাকে দেব, সুখী রাজপুত্র?

—সেই যুবককে, যে আশা করেছিল মানুষের সঠিক ডকুমেণ্টারী করবে ছবিতে।

—তারপর?

—সেই যুবককে, যে আশা করেছিল আকাশের মতো বড় ক্যানভাসে মানুষের সঠিক মুখ আঁকবে।

—আর কাকে কি দেব?

—সেই যুবককে যে আশা করেছিল শিশুদের জন্য কেবল ছড়া লিখে যাবে।

পাখিটা কেবল উড়ে বেড়ায় মাথার ওপর। তার ভারি কষ্ট চোখের মণি তুলে নিলে সুখী রাজপুত্র আর কিছু দেখতে পাবে না।

—না, তবু তুমি যাও। সেই যে একটা বাড়ি আছে, কাঠের বাড়ি, রেলিঙ ঘেরা লতাপাতায়, অন্ধকার সব সময় ঘরের ভিতর, একজন মানুষের অসুখ, কঠিন অসুখ, অভাবে অনটনে চিকিৎসা হচ্ছে না, শিয়রে আমার দুঃখিনী মা জেগে—সেখানে যাও। মায়ের জন্য পার তো আমার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নাও। কট।
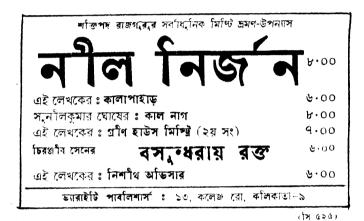
আগামী বাজেট সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর ইঙ্গিত

অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে যাঁরা লেখেন তাঁদের এক সভায় ভাষণ দেওয়া কালে অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই ভি চাবন আগামী বাজেটে আরও বেশী করে কর ধার্য করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর করার জন্য এবং বাংলা দেশকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আরও কর ধার্যের মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় সংহতিকরণের উপর অর্থমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আগামী ১৬ই মার্চ লোকসভায় ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট পেশ করা হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক ১৯৭১-৭২ সালের শরণার্থী চাপ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের আর্থিক অবস্থার উপর যে খুব চাপ পড়েছে তার প্রতিফলন হবে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে। যদিও আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র ১৪ শতাংশ কর ব্যবস্থার আওতায় এসেছে, তবুও আমাদের কর-কাঠামো এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে, বাড়তি কর ধার্য করতে গেলেই তার বোঝা সাধারণ মানুষের উপর বেশী হয়। আমাদের আয়করের হার বর্তমানে খুবই বেশী। আয়কর ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ কর হল ধন কর, সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর, মূলধনী মুনাফা কর প্রভৃতি। প্রত্যক্ষ করের সবগুলিরই হার যথেষ্ট প্রগতিশীল; বিশেষ করে ব্যক্তিগত আয়করের সর্বোচ্চ হার আমাদের দেশের জাতীয় আয় ও জন প্রতি আয়ের অনুপাতে অতিরিক্ত বেশী। পরোক্ষ করের উপরেও সরকার অত্যধিক নির্ভর করছেন। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মোট রাজস্ব ধরলে দেখা যাবে ৭০ শতাংশেরও বেশী রাজস্ব আসে পরোক্ষ কর থেকে। এই অবস্থায় নতুন করে কোন কর-প্রস্তাব দেওয়া সহজসাধ্য নয়, শ্রীচাবন তা বুঝতে পেরেছেন এবং তাই তিনি স্বীকার করেছেন "... outside the rural sector the scope for fresh taxation is getting increasingly narrowed." আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্র যে সরকারী রাজস্ব নীতিতে অপেক্ষাকৃত অবহেলিত হয়েছে সে বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। এখন ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রের অবদান প্রায় ৫০ শতাংশ। অথচ সরকারী রাজস্বে কৃষিক্ষেত্রের অবদান ৩০ শতাংশেরও কম। পরিকল্পনা কমিশন কৃষিক্ষেত্র থেকে আরও সম্পদ আহরণ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমরা আশা করতে পারি, ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে কৃষিক্ষেত্র থেকে আরও রাজস্ব আদায় করার জন্য সুস্পষ্ট প্রস্তাব

অর্থমন্ত্রী দেবেন। তবে সমস্যা হল, কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য করার অধিকার হল রাজ্য সরকারের, কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ করতে পারেন যাতে কৃষিজাত আয়কর ব্যবস্থার সংস্কার করা হয় এবং গ্রামীণ সঞ্চয় বাড়াবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বেশী এগোতে পারেন না। তবে কৃষিক্ষেত্রে এমন কোন কর ধার্য করা যায় কিনা যা রাজ্য সরকারের আওতার বাইরে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ভেবে দেখতে পারেন, এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের সঞ্চয় আরও বাড়ানো যায় কিনা সেদিকে চেষ্টা করতে পারেন।

অর্থমন্ত্রী বাংলা দেশকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। ইতিমধ্যেই ভারত বাংলা দেশকে ২৫ কোটি টাকা সাহায্য (কাঁচা মাল কেনার জন্য) এবং ৫০ লক্ষ স্টার্লিং ঋণ দিয়েছে। তা ছাড়া শীঘ্রই ভারত বাংলা দেশকে ৪ লক্ষ টন গম এবং ১ লক্ষ টন চাল পাঠাবে। বাংলা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যও ভারত সাহায্য করবে—যেমন রেলওয়ের যন্ত্রপাতি বাবদ ১০ কোটি টাকা, ২টি জাহাজ ও ২টি এয়ারক্র্যাফট স্বল্পকালীন সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে। তা ছাড়া বিগত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আমাদের প্রতিরক্ষা সামগ্রীর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার জন্যও প্রচুর টাকার প্রয়োজন হবে। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যও বাজেটে নতুন কর প্রস্তাব করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করে অর্থমন্ত্রী খাদ্যশস্যের উৎপাদন খুবই ভাল হওয়ায় এবং মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বমুখী গতি প্রতিহত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে বেসরকারী বিনিয়োগ যে আশানুরূপ সফল হচ্ছে না, অর্থমন্ত্রী সে কথাও উল্লেখ করেন। সরকারী উদ্যোগেও বিনিয়োগ আশানুরূপ বাড়ছে না, এবং অর্থমন্ত্রীর মতে তার প্রধান কারণ হল সরকারী সঞ্চয়ের স্বল্পতা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি এবং বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যাংক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত অর্থ সরবরাহে এখনও সফল হয়নি। সেজন্য অর্থমন্ত্রী জাতীয় সঞ্চয় বাড়াবার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ভাষায়

"... what is most crucial is our ability to harness more surplus through the fiscal system."

সকলেও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সবাই একমত যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় রাজস্বের পরিমাণ যেভাবেই হোক বাড়াতে হবে, তবুও একটি প্রশ্ন থেকে যায়, "কালো" টাকা "সাদা" করার জন্য কঠোরতর ব্যবস্থা কি সরকার গ্রহণ করতে পেরেছেন? আমাদের দেশে যে পরিমাণ কালো টাকা আছে তা যদি উদ্ধার করা সম্ভব হত তবে সে টাকায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার আরও এক ধাপ এগিয়ে নেওয়া যেত। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য আসা বন্ধ আছে। চতুর্থ পরিকল্পনার যদি কোন সংকোচন না করতে হয় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চতুর্থ পরিকল্পনায় অবশিষ্ট তিন বছরে (বর্তমান বছর সহ) যতটা সাহায্য পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছিল, সেই পরিমাণ টাকার বিকল্প ব্যবস্থা করা দরকার। এই বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বাড়িয়ে—কিন্তু গরীবদের উপর আরও কর ধার্য করে সঞ্চয় না

(স ১০৬)

বাড়িয়ে মুনাফাখোরদের কালো টাকা উদ্ধার করে সঞ্চয় বাড়ানো যেতে পারে। গত এক বছরে আমাদের অর্থনীতির উপর যে চাপ পড়েছে তার তুলনা নেই; এই চাপের জের কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। তবুও চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে সঞ্চয় বাড়ানোর একটি সাহসিক কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।

বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত নতুন খবর

ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ চলা কালে জাপান সাময়িকভাবে ভারতকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করলেও আবার নতুন করে সাহায্য দেওয়া আরম্ভ করেছে। সম্প্রতি জাপান ভারতকে ১০১ মিলিয়ন ডলার বা ৭৩·১৬ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। জাপান সরকার এখন সুনিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, ডিসেম্বর মাসের দুই সপ্তাহের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ কোন অবনতি হয়নি এবং যে সকল প্রকল্পের জন্য ভারত ঋণ গ্রহণ করছে সেগুলি সম্পূর্ণ করতে ও সেই ঋণের সদ্ব্যবহার করতে ভারত সক্ষম।

সুব্রত গুপ্ত

ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ঘরানা

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

বাস্তবিক চেষ্টা করলে এদেশেও যে বিজ্ঞানের উঁচু দরের ঐতিহ্য গড়ে তোলা যায়, তার অন্তত কিছু কিছু দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই আছে। বিজ্ঞানের একটি বিশেষ বিভাগে এদেশের একটি প্রতিষ্ঠান শুরু থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার নাম ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, সংক্ষেপে আই এস আই। প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সংক্ষেপে তা স্মরণ করা যেতে পারে। উনিশ শ' ত্রিশের দশকে যখন অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলিতেও পরিসংখ্যানবিদ্যার সবে গোড়াপত্তন হচ্ছিল, তখন আচার্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার ল্যাবরেটরিতে কিছু কিছু সেমিনারের ভিতর দিয়ে এদেশে প্রথম ঐ বিদ্যার চর্চার সূত্রপাত করেন। সেই ঘরোয়া পরিবেশে আই এস আইয়ের শুরু। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এর বয়স পরিসংখ্যানবিদ্যার বয়সের প্রায় সমান। সংগঠনের ব্যাপারে প্রশান্তচন্দ্রের একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল, খুঁজে খুঁজে তিনি তীক্ষ্ণধী কিছু সহযোগীকে একত্র টেনে আনলেন কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। এঁরা কেউই শুরুতে পরিসংখ্যানবিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন না, কেননা সে-বিদ্যা তখনও স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর শাস্ত্র হিসেবে খুব একটা স্বীকৃতি লাভ করেনি। প্রশান্তচন্দ্র নিজে ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, আলিপুরের আবহাওয়া দপ্তরের কর্তা হিসেবেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। সম্ভবত শেষোক্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে পরিসংখ্যানবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর কনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে রাজচন্দ্র বসু ছিলেন বিশুদ্ধ এবং ফলিত এই দুই রকমের গণিতেই এম এ ডিগ্রীর অধিকারী কৃতী ছাত্র। প্রশান্তচন্দ্র যখন তাঁকে সেমিনার করতে আমন্ত্রণ জানালেন, তখন তিনি আশুতোষ কলেজে গণিতের অধ্যাপক। ক্রমশ শুভেন্দু শেখর বসু, সমরেন্দ্র নাথ রায় ইত্যাদি আরও অনেককে নিয়ে একটা দল গড়ে উঠল, এঁরা গণিতের বিভিন্ন শাখায় নিজেদের ব্যুৎপত্তিকে একটা নতুন বিজ্ঞান গড়ে তোলার কাজে লাগালেন। পরিসংখ্যান বিদ্যা একদিকে যেমন ছিল বিজ্ঞান হিসেবে অর্বাচীন, তেমনি বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতের নানা ফলাফলকে ব্যবহারিক কাজে লাগাবার সুযোগ তার মধ্যে ছিল। ফলে বেশ একটা উদ্দীপনার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি এই ফলিত শাস্ত্রটি গড়ে উঠল। ফিশার প্রমুখ দিকপাল পরিসংখ্যানবিদ তখন যেসব নতুন নতুন কাজ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আই এস আই-য়ের দলটির কাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিদেশের গবেষণার দুর্বল অনুসরণ এঁরা করেন নি, পাশাপাশি প্রথম সারিতেই কাজ করে গেছেন। ফলে ক্রমশ এঁরা যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন, সেটা প্রথম শ্রেণীর একটা স্কুলের স্বোপার্জিত গৌরব। সারা পৃথিবীতে যে আজ পরিসংখ্যানবিদ্যায় ভারতীয়দের স্থান খুব উঁচুতে, তার অনেকটা কৃতিত্ব আই এস আইয়ের। এক আধজন নয়, বহু ভারতীয় আছেন পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে। এমনিতে ভারতীয় গবেষণা পত্রিকাগুলির খুব একটা আদর নেই বিদেশে। কিন্তু আই এস আই থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত 'সংখ্যা' পত্রিকাটি এর সুযোগ্য ব্যতিক্রম। সারা পৃথিবী থেকেই ভাল ভাল গবেষণা প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়। এটাও সম্ভবপর হয়েছিল গোড়ার দিকে কিঞ্চিৎ কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে। তখনকার দিনে প্রশান্তচন্দ্র এবং তাঁর সহযোগীরা অনায়াসে নামকরা যে-কোন বিদেশী পত্রিকাতে লেখা ছাপাতে পারতেন, কিন্তু তা না করে ঐ 'সংখ্যা' পত্রিকাতেই তাঁদের সব লেখা ছাপা হত। ফলে বিদেশী কর্মীদের কাছেও নিছক প্রকাশিত কাজের উৎকর্ষের জোরেই পত্রিকাটি ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠল।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে আই এস আইয়ের এই যে সাফল্য, এর মূলে নিশ্চয় একদিকে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য প্রশান্তচন্দ্রের প্রতিভা, নেতৃত্বগুণ এবং দূরদর্শিতা, আর অন্যদিকে তাঁর সহযোগীদের পরিশ্রম ও ধীমত্তা,—এইসব ব্যক্তিগত গুণের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তাছাড়াও এদেশে বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ হিসেবে তাঁরা যে নীতি অনুসরণ করেছেন,

সেই নীতিরও কিছু তাৎপর্য আছে। শুধু পরিসংখ্যানবিদ্যা নয়, সাধারণভাবে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধেও কিছু ইঙ্গিত তার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

কিছুদিন আগে পদার্থবিদ ফ্রীম্যান জে ডাইসন 'ফিজিক্স টুডে' পত্রিকাতে 'পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যৎ' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি সুলিখিত, কিন্তু তার মধ্যে একটি গল্প আছে যা আরো সুন্দর। এবং বিজ্ঞানের কর্মপন্থা সম্বন্ধে আমরা যা বলতে চাইছি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালে স্যার লরেন্স ব্র্যাগ যখন তাঁর জায়গায় কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারের অধ্যক্ষ হলেন, তখন তাঁর অবস্থাটা দাঁড়াল খুব বড় এক জোড়া জুতোর পা ঢোকালে যেমন হয়, কতকটা তেমন। রাদারফোর্ড ছিলেন নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বলতে গেলে জন্মদাতা। তাঁর আমলে উত্তরোত্তর বেশী শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের সাহায্যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, অর্থাৎ পরমাণুকেন্দ্রের যে বিজ্ঞান, তার উপরে গবেষণা চালিয়ে ক্যাভেণ্ডিশের খুব নাম হয়েছিল। ব্র্যাগ অবশ্য নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তবু অনেকে আশা করেছিলেন যে নতুন আমলে বসে তিনিও রাদারফোর্ডেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, অর্থাৎ কেম্ব্রিজে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের আরো উন্নতি ঘটাবেন। কার্যকালে দেখা গেল, ব্র্যাগ ওদিকে গেলেন না। একদিকে তিনি মার্টিন রাইলকে উৎসাহিত করলেন রেডিও অ্যাস্ট্রনমির মত এক আনকোরা নতুন বিষয়ের চর্চায়, আর অন্য দিকে ম্যাক্স পেরুজ আর ফ্রান্সিস ক্রিক লাগিয়ে দিলেন মলিকিউলার বায়োলজি নামক প্রাণতত্ত্বের সম্পূর্ণ অর্বাচীন এক বিভাগের উন্নয়নে। তখনকার দিনে এই বিদ্যাই ছিল গুণীমহলে অপাংক্তেয়, প্রতিষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীরা বড় একটা ও দিকে ঘেঁষতেন না। অথচ ব্র্যাগের উৎসাহে এইসব খ্যাপা পদার্থবিদদের প্রচেষ্টা কালক্রমে কেম্ব্রিজকে প্রচুর খ্যাতি এনে দিল। একদা যে-বিদ্যার একটা সরকারী নাম পর্যন্ত ছিল না, অনেক যুগান্তকারী কাজ হতে লাগল সেই মলিকিউলার বায়োলজীতে। এবং এই কাজের পুরোভাগে রইলেন ক্যাভেণ্ডিশের দল। রেডিও অ্যাস্ট্রনমিতেও তাই।

ব্র্যাগের একটি চমৎকার উক্তি ডাইসন এইসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, "নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কেমন করে করতে হয় তা আমরা এতদিন দুনিয়ার লোককে ভালভাবে শিখিয়েছি। আসুন এবার তাদের অন্য কিছু শেখানো যাক।" এ উক্তি যে নিছক রসিকতা বা সম্ভোক্তি নয় তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। আসল কথাটা খুব পুরনো, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বাজারে কক্তকী হয় ফুরিয়ে গেলো কে না নিয়ে এলো ফকির্ণাতর নাম। বরং তা দেখে আমাদের নিয়ে এসো।" বিজ্ঞানের রাজ্যেও একটা ফ্যাশনের ব্যাপারে আর সেখানে একবার ফ্যাশন নামলে আর চট করে যেতে চায় না। এর মধ্যে নেতৃস্থানীয় তাঁরাই যাঁরা সময়মত আনারসে আগ্রহী করেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে এর কাজ করবার আছে, এতদিনে প্রতীতি আছে যে আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের সঙ্গে কাটুকাটু আমাদের না হওয়াই ভাল, বরং ঠিক সময়ে লাগাম দিক আমাদের চাই, ... দিতে পারলে ... উৎস ... পারি। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এদেশের পরিসংখ্যানবিশারদেরা এই কাজটি করেছিলেন। ফলে একদিকে যেমন তাঁরা গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে ক্রমাগত ফ্রণ্ট লাইনে থাকতে পেরেছেন, তেমনি অন্যদিকে দেশের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে যোগ রেখে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটা গবেষণার বিশিষ্ট ধারাও সৃষ্টি করতে পেরেছেন। বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতের যে উপকরণ তাঁদের হাতে ছিল, নতুন এক ফলিত বিজ্ঞানের বিকাশে সার্থকভাবে তার প্রয়োগ করেছেন। নানাভাবে তাঁদের কাজের সুফল আমরা ভোগ করছি।

বিষয় হিসেবে পরিসংখ্যানবিদ্যার এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাতে তাকে বলতে পারি বিশেষভাবে আধুনিক। বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতের নানা অঙ্গের চমৎকার প্রয়োগ এই বিদ্যায় করা হয়, কিন্তু শুধু গণিত বলা

থাকলেই ভাল পরিসংখ্যানবিদ হওয়া যায় না। সমস্ত ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যেও পরিসংখ্যান হচ্ছে একেবারেই ফলিত একটি বিজ্ঞান, নানা ব্যবহারিক কাজে লাগানো যায় বলেই এর এত বোলবোলাও। অর্থনীতি, সমাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, কৃষি এবং পদার্থবিজ্ঞান, এমন কোন বিজ্ঞান নেই যেখানে এর প্রয়োগ নেই। তাই পরিসংখ্যানবিদকে অল্পবিস্তর নানাবিদ্যার কারবার করতে হয়, বিভিন্ন বিষয়ের সংশিলষ্ট সমস্যাগুলি তাঁর জানা চাই। শুধু পরিসংখ্যান নয়, আরো নতুন নতুন সব বিজ্ঞান আছে যেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এতে সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। কিন্তু ক্রমশই দেখা যাচ্ছে এক বিদ্যার সঙ্গে অন্য বিদ্যার ভেদ বজায় রাখা শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বাস্তব প্রয়োজনেই এমন অনেক বিদ্যার উদ্ভব হচ্ছে যেখানে একাধিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি আর অভিজ্ঞতা অনিবার্যভাবে কাজে লাগাতে হচ্ছে। বিজ্ঞানের কাজ তো একদিকে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করা এবং অন্যদিকে সেই উদ্ঘাটনলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলা। এই প্রকৃতি যে সর্বদা মানুষের বুদ্ধির মাপসই হবে, তার ছোট ছোট সুন্দর শ্রেণীবিভাগ আর শ্রম বিভাগকে মেনে চলবে, এমন কোন কথা নেই। বরং ইদানীং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানীদের সামনে এমন সব সমস্যা এসে হাজির হচ্ছে, যার সমাধানে বিশেষ কোন পরিচিত বিদ্যার কচকচানির চেয়েও বেশী প্রয়োজন সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এবং স্বচ্ছ নতুন চিন্তার। প্রশ্ন হচ্ছে, খুব ব্যাপক অর্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে কিছু আছে কিনা। যদি থাকে, তবে তার বৈশিষ্ট্য বোধহয় যে-কোন সমস্যাকে নির্লিপ্তভাবে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা এবং মোটামুটি তার মধ্যে একটা কার্যকারণের পরম্পরা খুঁজে বের করে সমাধানের চেষ্টা করা। বিজ্ঞানী যে হিসেবেই স্পেশালাইজ করুন না কেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে। বিজ্ঞানের খাতিরে যদি তিনি এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হন যেখানে তাঁর নিজের বিশেষ অধীত বিদ্যার খুঁটিনাটি জ্ঞান বিশেষ কাজে লাগছে না, সেখানেও শেষ পর্যন্ত তাঁর শিক্ষার এই ধারাকে তিনি চেষ্টা করলে কাজে লাগাতে পারেন। সাহস করে বিজ্ঞানীরা যখন এই ধরনের কুমারী-মৃত্তিকার কর্ষণে এগিয়ে গেছেন, তখনই নতুন নতুন বিদ্যার জন্ম হয়েছে। প্রথমে যাকে মনে হয়েছে বড় সহজ, বড় বেশী মাটিঘেঁষা ফলিত বিজ্ঞান, বিকাশের অমোঘ আভ্যন্তরীণ শক্তির বলে তার থেকেই ক্রমশ জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন প্রত্যয়, সমীক্ষার নতুন পদ্ধতি, বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত এবং প্রসারিত করবার মত অনেক নতুন দিগন্ত। সৃষ্টির আরো অনেক ক্ষেত্রের মতই এখানেও দেখা গেছে মানুষের বুদ্ধি বারবার বাস্তব প্রয়োজনের সোঁদামাটি থেকেই আহরণ করেছে নতুন প্রাণশক্তি, নতুন চেতনা, এমনকি বিশুদ্ধ ধীশক্তির নতুন নতুন লীলাক্ষেত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এম আই টি আর প্রিন্সটনে এইভাবেই গড়ে উঠেছিল কম্প্যুটার বিজ্ঞান, ইনফরমেশন থিয়োরীর মত চমৎকার একটি বিদ্যার শুরুও হয়েছিল ঐ একই পরিবেশে। সৃষ্টির বিশুদ্ধ আনন্দ, বিশুদ্ধ কল্পনা আর যুক্তির সমাহারে তত্ত্বের সংগঠন, এসবের সঙ্গে এসে মিলেছিল উঁচুদরের যান্ত্রিক উদ্ভাবনী শক্তি।

আজকের ভারতবর্ষের যা অবস্থা, তাতে প্রথাগত অনেক চর্চার স্থান থাকলেও, বাস্তব চাহিদা হয়ত এই ধরনের বিদ্যার সংগঠনের দিকে কিছুটা ইঙ্গিত করছে। ভবিষ্যতের পুরো চেহারাটা ভেবে নেওয়া সহজ কাজ নয়, অনেক আলোচনার অবকাশ আছে সেখানে। আলোচনা হওয়া উচিত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণাগারে,

বিদ্যুজ্জনমণ্ডলীতে। এবং শেষ পর্যন্ত সরকারী দপ্তরগুলিতেও। এখানে কেবল দুয়েকটি উদাহরণের কথা ভাবা যেতে পারে।

খুব সম্প্রতি পশ্চিমদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়, জলস্থলে অন্তরীক্ষে আর চারপাশের প্রাণীলোক নিয়ে মানুষের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ (environment), তার বিষয়ে একটা নতুন সচেতনতা দেখা দিয়েছে। আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ তার পরিবেশকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে ক্রমশ তার নিজস্ব অস্তিত্বই বিপন্ন হতে চলেছে। বিশেষ করে ভারীশিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলে প্রচুর ধোঁয়া আকাশকে আচ্ছন্ন করেছে, কারখানার পরিত্যক্ত আবর্জনা নদী হ্রদ এমনকি সমুদ্রকেও কলুষিত করেছে। চাষের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক ওষুধ পশুপাখী এবং মানুষের খাদ্যে সঞ্চারিত হয়ে ক্ষতিসাধন করছে। সব মিলিয়ে বিজ্ঞানের অমিত ব্যবহারের ফলে প্রকৃতির মধ্যে জীবনের সূক্ষ্ম স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হতে চলেছে। যুগ যুগ ধরে গাছপালা কীটপতঙ্গ মাছ পাখী বৃহত্তর প্রাণী আর মানুষের মধ্যে একদিকে হিংসা আর অন্যদিকে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে সহাবস্থানের যে পরম্পরা গড়ে উঠেছে, তা ক্রমেই ব্যাহত হচ্ছে। এর প্রতিকার করতে গিয়ে যে বিদ্যার অভ্যুত্থান ঘটছে, তার নাম ইকলজী (ecology), অর্থাৎ পরিবেশ-বিজ্ঞান। পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়ন যে বিশুদ্ধ অর্থে বিজ্ঞান এটা ঠিক সে-অর্থে কোন সুগঠিত বিজ্ঞানই নয়। পদার্থবিদ্যা কিংবা প্রাণতত্ত্বে যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত কিছু পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সমাহারে পরিচ্ছন্ন এক একটি ডিসিপ্লিন গড়ে উঠেছে, ইকলজীতে সেটা হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই কারণে যে, এখানে যে-কোন একটি সমস্যার কথাই ভাবা যাক না কেন, তার মূলে চলে গেছে প্রকৃতির নানা অংশে, নানা শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে গেছে তার জটিলতা। তাই একই সঙ্গে পদার্থবিদ, ভূগোলবিদ, অর্থনীতিবিদ, প্রাণীবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী কৃষিবিশারদ ইত্যাদি নানা বিদ্যার কারবারীদের সহযোগিতা এখানে প্রয়োজন। এই সহযোগিতা কোন বিশেষ বিষয়ের প্রচলিত গবেষণার ধারাকে অনুসরণ করে চলবে না, বরং সামনে যে প্রত্যক্ষ সমস্যা রয়েছে তার সমাধানে প্রত্যেকে কাজ করবেন অন্যের পরিপূরক হিসেবে। প্রচলিত বিজ্ঞানগুলি যে-পরিমাণে এ-লাইনের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধানে কাজে লাগবে, সেই পরিমাণে তারা নিজেরাও উপকৃত হবে। অন্তত দৃষ্টিভঙ্গীর ঐশ্বর্যের দিকে। আর যে-পরিমাণে নতুন কল্পনা, নতুন পদ্ধতি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন হবে এইসব কাজে, ইকলজীও হয়ে উঠবে ঠিক সেই পরিমাণে নতুন এক বিজ্ঞান।

ভারতবর্ষে এখনো ভারীশিল্প ঠিক ততখানি ব্যাপক আকার ধারণ করেনি যাতে সে বৃহৎ সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সমাজ এখনও প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক। বড় বড় ঘনবসতি কেন্দ্র এখানে কম, যদিও তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। শিল্পজাত নানা পণ্য এবং সেই পণ্য প্রস্তুতি ও ব্যবহারের আনুষঙ্গিক আবর্জনা এখনো এদেশে তেমন স্তূপীকৃত হয়ে ওঠেনি। তাই আমেরিকাতে যে-ধরনের ইকলজী চলছে আমাদের দেশে এখনই ঠিক সেই ধরনের ইকলজীর চাহিদা জরুরী নাও হতে পারে। কিন্তু আরেক ধরণের ইকলজীর দিকে বোধহয় আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পশ্চিমের শিল্পপ্রধান দেশের প্রচেষ্টাকে যদি বলি সংশোধনমূলক (corrective) ইকলজী, তবে আমাদের দেশে যা চাই তার নাম দেওয়া যেতে পারে গঠনমূলক (constructive) ইকলজী।

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভাবা যেতে পারে। সচরাচর আমরা যাকে বলি পশ্চিমীকরণ (westernisation), তার একটা বড় অংশ হচ্ছে বিজ্ঞান আর টেকনলজীর ব্যাপক ব্যবহার। যেহেতু আধুনিক টেকনলজীর প্রায় সবটাই এদেশে সাম্প্রতিককালে পশ্চিম থেকে আমদানী করা, সেহেতু টেকনলজী বললেই আমরা সচরাচর পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণকে বুঝি। আধুনিক বিজ্ঞানে বরং ভারতীয়দের কিছু কিছু অবদান আছে, আধুনিক টেকনলজীতে তাও নেই। ফলে ওদেশের ডিজাইন আর ব্লুপ্রিন্ট আমরা খোলনলচে শুদ্ধ নকল করি। আধুনিক স্থাপত্য মানে তাই পশ্চিমের স্থাপত্যের কিছু কিছু ভঙ্গীর আশ্চর্য নির্বিবাদ অনুকরণ। কিছু কিছু ব্যতিক্রম বোধহয় নিয়মকেই প্রমাণ করে। গ্রামের কোঠাবাড়ি থেকে যখন আমরা শহরে গিয়ে উঠি তখন যে দালানে বাস করি, তা প্রায়ই পুরনো ব্রিটিশ স্থাপত্যের অক্ষম প্রতিচ্ছবি। আর এই ট্রপিক্যাল আবহাওয়াতে কাচবাক্স স্থাপত্যের উৎকট ছড়াছড়ির কথা নাই বা বললাম। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্য নিয়ে আমাদের আবহাওয়ার উপযোগী গৃহ-নির্মাণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকতা কিছু বার করা যায় কিনা, তা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ এখনো এদেশে হয়নি। অথচ এটা একটা অত্যন্ত বাস্তব সমস্যা, এর উপরে আমাদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি নির্ভর করছে। মাটির বাড়িতে তাপের ওঠানামা একটু কম হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তার উপযোগিতা এই একটা ব্যাপারে কংক্রীটের চেয়ে বেশী। মেক্সিকো এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে অডোব অর্থাৎ মাটি আর খড় মিশিয়ে তৈরী কাঁচা ইঁট নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ গবেষণা হওয়া দরকার। কম খরচে প্রচুর সংখ্যায় দ্রুত তৈরী করা যায় এমন বাড়ির ডিজাইন, উপাদান ও নির্মাণপ্রণালী নিয়েও আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী গবেষণা হওয়া উচিত ছিল, কেননা তাছাড়া আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাস্তুসমস্যা কোনদিন মিটবে না।

আবহাওয়ার কথা ভাবলেই আর একটা কথা মনে পড়ে। মৌসুমী বৃষ্টি আর আবহাওয়ার খামখেয়ালের উপর নির্ভরশীল দেশ বোধহয় পৃথিবীতে আমাদের মত আর একটিও নেই। এখনও আমাদের চাষবাস প্রধানত মৌসুমের উপরই নির্ভর করে। একমাত্র এই কারণেই অন্তত আবহবিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠ হওয়া দরকার। বিশেষ করে মৌসুমী জলবায়ুর ব্যাপারে। আবহবিজ্ঞান এখন একটি exact বিজ্ঞান, এতে পদার্থবিদ্যা, গণিত ও পরিসংখ্যানের সার্থক ব্যবহার হয়ে থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি ক্রমশ নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠছে, বিশেষ করে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ মাঝামাঝি অক্ষাংশগুলিতে। এসব জায়গায় এখন ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত পূর্বাভাস ভালভাবেই দেওয়া হচ্ছে। ট্রপিক্যাল অঞ্চলগুলিতে কিন্তু এতটা সম্ভব হয়নি। বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী—যেটা আমাদের খুবই দরকার—এখনও খুব ভালভাবে করা যাচ্ছে না। পরিবেশ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত দেশগুলিতে এসব কাজ আরো এগিয়ে যাবে, হয়ত বড় বড় ভূখণ্ড জুড়ে সংবৎসরের পূর্বাভাস অচিরেই দেওয়া চলবে। আমাদের দেশে বিশেষ করে পদার্থবিদেরা এইদিকে অনেক বেশী সংখ্যায় অগ্রণী হলে ভাল হয়।

কৃষিতে আমাদের অগ্রগতি সম্প্রতি যে একটু উৎসাহের সঞ্চার করেছে। গম ও ধানের নতুন বীজ নিয়ে ভাল কাজ হয়েছে, আরও হওয়া উচিত। বিশেষ করে ধান চাষের ব্যাপারটা অত্যন্ত সুকুমার ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে আছে, প্রকৃতি আমাদের চাহিদা ঠিক সময়ে ঠিক মাত্রামত মেটাবেন এ আশায় বসে থাকা উচিত নয়। দ্রুত ফলনশীল ধান তো চাই-ই, উপরন্তু অল্প সময়ে বিশেষ বিশেষ ধরনের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মাতে পারে এমন প্রজাতির সৃষ্টি করতে হবে। একমাত্র এইভাবেই আমরা অন্নভোজী ভারতীয়েরা প্রকৃতির খামখেয়ালের হাত থেকে ক্রমশ মুক্তি পেতে পারি।

ভারতবর্ষের জীবন বরাবরই নদীনির্ভর। কতকগুলি রাজ্যে তো নদীগুলি ধমনীর কাজ করে আসছে। এই বাংলাদেশের পর্তুগীজরাও জানতেন 'গঙ্গাহ্রদি' বলে। সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরী প্রত্যেকটির সঙ্গে জড়িত আছে বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট সভ্যতার ইতিহাস। নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে আবহমান কাল থেকে বন্যানিয়ন্ত্রণ আর সেচের কাজ হয়ে আসছে। সেচের ব্যাপারটা প্রাচীনকাল থেকেই যুগে যুগে—রাজাদের মধ্যে যাঁরা ভাল সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন দেখা যায় তাঁরাই বেশী

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হতেন। অথচ আধুনিক ভারতবর্ষে নদীবিজ্ঞান (river science) এবং সেচ বিজ্ঞানের (irrigation engineering) নিজস্ব কোন ধারা নেই। আচার্য মেঘনাদ সাহা তাঁর অত কাজের মধ্যেও দামোদর অববাহিকা সম্বন্ধে অনেক কাজ করে গেছেন, সেই ধারাকে পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করা দরকার।

ভেবে দেখলে বোধহয় এই ধরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আসলে এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। যে বিজ্ঞান এখন আমরা করছি তার সঙ্গে আমাদের দেশের জলমাটি হাওয়া আর প্রাণের পরিবেশকে কোথায় কতখানি যুক্ত করা যায়, কোথায় তাকে বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে উদ্দেশ্যমণ্ডিত করে তোলা যায়, তা-ই ভাবতে হবে। তা যদি করা যায়, তবে এ-দেশে খুব বেশী বিজ্ঞানচর্চা হচ্ছে না খুব কম, উনিশ শ ত্রিশ সনের পর আর আমরা নোবেল প্রাইজ পেলাম না কেন, খোরানা এদেশে ফিরে এলে কত ভাল হত, এসব দুশ্চিন্তা ক্রমশ আপনি দূর হয়ে যাবে। বিকাশের যে স্তরে আমরা আছি তাতে এখনও বেশ কিছুদিন ফলিত গবেষণাকেই এদেশে কিঞ্চিৎ প্রাধান্য দিতে হবে। ফলিত বিজ্ঞানের ভিত্তি পাকা হলে তা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকেও সহজ করে তুলবে। এখন যাদের আমরা অগ্রসর দেশ বলে জানি, তেমন প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাসে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যাবে। ল্যান্ড গ্রান্ট কলেজ আর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়েই আজকের আমেরিকা বিজ্ঞানে তার অবিসংবাদী প্রাধান্য লাভ করেছে। আর সোভিয়েত রাশিয়াতে ফলিত বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তো এযুগের চমকপ্রদ ঘটনা। ফলত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেও তার নেতৃত্ব আজ সর্বজন-স্বীকৃত। আমাদের দেশে শিল্প কৃষি এবং টেকনোলজীর নিজস্ব আদর্শ আমাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে তুললে বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে তার সুফল ছড়িয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে মৌলবিজ্ঞানের চর্চার যে ধারা এদেশে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে, তাকে নিশ্চয় অব্যাহত রাখতে হবে। মৌল বিজ্ঞানের একটা লক্ষণ এই যে, সে সার্বজনীন। আধুনিক মানুষের সংস্কৃতির সে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার দেবদেউলের প্রদীপের মত তাকে লালন করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের উত্তরাধিকার হিসেবে। ভারতবর্ষের মানুষের যে মন একসময় উপনিষদের শ্লোক রচনা করেছে সৃষ্টির অপার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে, সেই একই মন তাকে গণিত পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির সংগঠিত সৌন্দর্যের দিকে চালিত করছে এবং করবে। তবে ঐতিহ্যগত অথবা আর্থিক কারণে কখনো কখনো এইসব চর্চায় সামান্য ঝোঁকের তারতম্য থাকতে পারে। এবং ফলিত বিজ্ঞানের জীবন্ত প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হলে তার লাভবান হওয়ারই সম্ভাবনা।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে বৃহৎ আয়োজন এদেশের জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে কিছু কিছু ভাল কাজ ইতিমধ্যেই হয়েছে। কেবল একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে হয়। ভাল গবেষণাগোষ্ঠী (ressearch group) গড়ে ওঠার যেসব দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করলাম, সেদিক থেকে মনে হয় গবেষণাগারের নাম করে সহসা ঘরবাড়ি অফিস কেরানী ও পাহারাওয়ালা-সমেত একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নাও হতে পারে। কার্যত দেখা যাচ্ছে, এতে অনেক সময় ঢাকের কাড়িতে মনসা বিকিয়ে যায়। আমাদের দেশে কেরানী চাপরাশী এবং পাহারাদারের এমন একটা স্থায়ী আভিজাত্য আছে যে তারা যেখানেই যাক অনায়াসে সবটা জায়গা জুড়ে বসে। অপরপক্ষে বিজ্ঞানীর কাজটাই এমন খামখেয়ালের ব্যাপার, এমন বিচিত্র বেয়াড়া তার সময়সূচী, যে তাকে ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে ফেলা শক্ত। অনেক কনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর কথা আমরা জানি যাঁরা সারাদিনে পাঁচবার কফি খান এবং বাকী সময়টা পাইপের সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বলা বাহুল্য কোন নিষ্ঠাবান কুলীন কেরানীর পক্ষে এই দৃশ্য সহ্য করা শক্ত, ফলে আমাদের দেশের অনেক গবেষণাগারে আকাডেমিক বনাম নন্-আকাডেমিক কর্মীদের ঝগড়া প্রায় লেগেই আছে। কেরানী চাপরাশীরা সংখ্যায় ভারী, তাই ন্যায়সংগত ডেমোক্রাটিক দাবী নিয়ে অনেক জায়গায় তারা বিজ্ঞানীদের তাড়া করছেন। সম্ভবত এইসব কারণেই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভাগীয় সেক্রেটারী পদে অনেক সময় অধ্যাপক অথবা গবেষক ছাত্রের স্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়। স্ত্রীরা এমনিতেই আমাদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে ক্ষমাশীলা এবং আমাদের কাজের মহত্ত্বে বিশ্বাসী, সুতরাং...। সে যাই হোক, কার্যত দেখা যায়, ওদেশে গবেষণাগোষ্ঠীগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটু একটু করে ছোট থেকে বড় হয়। প্রথমে দুয়েকজন সহযোগী বিজ্ঞানী কোন বিশেষ গবেষণাকর্মে উৎসাহী হয়ে একত্র কাজ শুরু করেন, ক্রমে সেই কাজের বিকাশ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দলটিও প্রয়োজনমত বাড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত যদি কাজের খাতিরেই গোষ্ঠীটির পক্ষে একটি স্বতন্ত্র গবেষণাগার হিসেবে গঠিত হওয়া সমীচীন বলে মনে হয়, তখন টাকা জোগাড় করা কষ্টকর হয় না, দলের কর্মগত প্রতিষ্ঠাই পথ সুগম করে দেয়। এতে একটা সুরাহা হয় এই যে বাইরের প্রতিষ্ঠানগত আয়োজন কখনোই গবেষণার কাজকে ছাপিয়ে ওঠে না। ঠিক ততটুকু ব্যবস্থা রাখা যায় যাতে আসল কাজটা চলে। আবার অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, সত্যি যেখানে তিনজন বিজ্ঞানী মিলে একটা ভাল কাজ করছেন কোন একটা বিষয়ে, যেখানে তাঁদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কাজের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, সেখানে খামখা আরো তিনজন বিজ্ঞানীকে আমদানী করে পাশাপাশি আরেকটা বিভাগ খুলে দিলেই যে কাজের পরাকাষ্ঠা হবে এমন কোন কথা নেই। বরং আমাদের দেশে চাকরীতে যে নিয়োগপদ্ধতি এখনও চলে আসছে তাতে নিয়ম অনুযায়ী এই শেষোক্ত তিনজন হবেন পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত তিন ব্যক্তি। খুব সম্ভবত যথেষ্ট গুণী, কিন্তু এঁদের একজনের কাজ এবং আগ্রহের সঙ্গে অন্যদের বোধহয় কোন যোগ না থাকাই সম্ভব। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের গবেষণাগারগুলিতে এতগুলি স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে চাকরীর জন্য একত্র জড়ো করে কাজ যে চলছে, এটাই আশ্চর্য।

আবার অন্যদিকে কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে নানা অসুবিধার মধ্যেও এমন গবেষণা চলছে যা খরচের অনুপাতে অনেক বড় গবেষণাগারের তুলনায় বেশী ফলপ্রসূ বলে গণ্য হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানা হট্টগোলের মধ্যেও অনেকসময় দুচারজন মানুষ নিজের রুচিমত কাজের উপযোগী ছোট কোটর খুঁজে নিতে পারেন। এই ধরনের ছোট ছোট গোষ্ঠী উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সাহায্য পেলে ভাল কাজ করতে পারেন। ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠান-গুলি হয়ত একটু একটু করে এদের ভিতর দিয়েই গড়ে তোলা যায়, যদি সাহায্য-ব্যবস্থাকে খুব সূক্ষ্ম হিসেবের উপর চালানো যায়, কখনোই খুব বেশী কিংবা খুব কম টাকা না দিয়ে।

সম্প্রতি আমাদের রাজনীতি এবং সমাজ-নীতিতে একটা আত্মপ্রত্যয়ের সুর আমরা শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, জীবনের এই ব্যবহারিক দিকগুলিতে আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হতে চলেছি। আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার মধ্যেও ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্তির চেতনা আসুক, এই কামনা করি।

—শেষ—

নিকট আমার নিবেদন" এই নামে ১৫।২০ পৃষ্ঠায় লিখিত একটা লেখা পুস্তিকাকারে বাহির করিব। লেখাটা ধীরেন দত্ত, ডাঃ শৈলেন সেন, দেবেশ ভট্টাচার্য, ফণী মজুমদার, অতীন রায় ও স্বদেশ নাগ দেখিয়াছে। লেখার মধ্যে আছে, "ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সংখ্যালঘুদের অবস্থা ও তাহাদের দাবী।" আমি ঢাকা গিয়া বই ছাপাইব এবং বিতরণের জন্যে কয়েক কপি তোমার নিকট পাঠাইব, তুমি বিভিন্ন দলের নেতা ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করিবা।

ধীরেন দত্ত ও ফণী ঢাকা আসিয়াছিল। মনোরঞ্জন ঢাকা আসিয়া কংগ্রেসের সভা করিয়া গিয়াছে। মনোরঞ্জন আগামী ইলেকসনে কংগ্রেসের নামে লোক দাড়া করাইবে। তাহার (মনোরঞ্জন ধর, উকিল, প্রাক্তন মন্ত্রী) যুক্তভাবে কিছু করার ইচ্ছা নাই।

ধীরেনবাবু পুত্রকন্যা ও রবি নাগ সহ স্বদেশ নাগের বাসায় উঠিয়াছিলেন। তাহার কন্যা কলিকাতা চলিয়া গেল ও তাহাকে প্লেনে উঠাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। ধীরেনবাবুর সহিত অল্প কতক্ষণ আলাপ হইল। তাহার মতে যে যে পার্টিতে খুসী ঢুকিয়া পড়ুক। সংখ্যালঘুদের আলাদা দল করা চলিবে না। তিনি সম্ভবতঃ আওয়ামী লীগে ঢুকিবেন। আমি তাহার সহিত কয়েক মিনিটের আলাপে বিচ্ছিন্ন না হইয়া প্রস্তাব করিয়াছি, আমরা অন্তরঙ্গ কিছু লোক একত্র হইয়া আলাপ আলোচনার পর যাহা হয় স্থির করিব। ধীরেনবাবু কুমিল্লায় সভা ডাকিবেন। আমি ধীরেনবাবুর নিকট আমার নামের লিষ্ট পাঠাইয়াছি এবং ইহাও লিখিয়াছি, তাহার ইচ্ছামত অন্য লোকও ডাকিতে পারেন। আমার লিষ্টের নাম—(১) বীরেন সরকার (২) দেবেন ঘোষ (৩) ফণী মজুমদার (৪) রমেশ দত্ত (৫) ডাঃ শৈলেন সেন (৬) দেবেশ ভট্টাচার্য (৭) স্বদেশ নাগ (৮) সুধাংশু হালদার (৯) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (১০) পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত (১১) অতীন্দ্রমোহন রায় (১২) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তুমি ঐ সভায় উপস্থিত থাকিবা।

আমার ইচ্ছা কিছু লোক দাড়া করাইয়া দেওয়া। আমি ও ফণী বীরেন চৌধুরীর সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তুমি দাড়াইলে তিনি দাড়াইবেন না। ইতি—

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

১৯৫৪ সনে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টির পুরাতন বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক কর্মীদের নিয়ে মহারাজের ইচ্ছা ছিল ১৯৭০—৭১ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, 'পূর্ব পাকিস্তান'এ সংখ্যালঘু হিন্দুদের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ১৯৫৪ সনের ঐ পার্টির নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ), রমেশ দত্ত [illegible], দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বরিশাল), ডাঃ শৈলেন সেন (ঢাকা), ফণী মজুমদার (মাদারীপুর) প্রভৃতি। যদিও জীবনের শেষ দিকে তিনি রাজনীতি, নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, তবু হিন্দুদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ইচ্ছা ছিল মিলিতভাবে কিছু প্রার্থী দেওয়ার। কিন্তু যখন মহারাজ দেখলেন, তাঁর এই সম্মিলিত প্রয়াস ব্যর্থতার দিকে (বিশেষ [illegible] মনোরঞ্জন ধর ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত [illegible] পৃথক দলে দাঁড়ানোর পক্ষপাতী এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের আলাদা দল গঠনের বিরোধী), তখন মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। মহারাজ জীবিত থাকলে তিনি হয়ত গত নির্বাচনে প্রার্থী দিতেন। মহারাজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'পাকিস্তানে' সংখ্যালঘুরা নিজেদের অসহায় বালকের মত মনে করতেন। যাদের একমাত্র হতাশ-ক্রন্দন বা আবেদন-নিবেদন ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। তিনি বলতেন—"আমরা দেখিতে পাই, গত ১৮ বৎসরের মধ্যে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক গভর্নর, চীফ সেক্রেটারী, আই জি পুলিশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয় নাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কোন রাষ্ট্রদূত নেওয়া হয় নাই। সৈন্য বিভাগেও নেওয়া হয় না। আমি এই দেশের নাগরিক, দেশরক্ষায় আমার অধিকার থাকিবে না কেন? চাকুরীক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় করাণী বা কনষ্টেবলের চাকুরী লইয়াই সংখ্যালঘুরা সন্তুষ্ট থাকিবে কেন?"

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী বিশ্বাস করতেন, পূর্ব বাংলার স্কুল-কলেজের বাংলা ভাষা-ভাষী ছাত্রছাত্রীরাই ভবিষ্যৎ; এরাই একদিন শোষণের কারাগারকে ভেঙে চুরমার করবে। তাই তাঁর সমস্ত লেখা তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেক সময় বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। এই বিশ্বাসও তাঁর ছিল, গণতান্ত্রিক সংবিধান, নির্বাচন না হলে সেখানকার হিন্দুদের দুঃখদুর্দশা মোচন হবে না। তাই তিনি অপর এক পত্রে লিখেছেন—

কল্যাণীয় বীরেন,

.............সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ এবং জাতির ভবিষ্যৎ আগামী নির্বাচনের উপর নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা নির্বাচিত হইবেন, তাঁহারাই ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন শক্ত লোক থাকা প্রয়োজন। সংখ্যালঘুরা পৃথকভাবে নির্বাচিত হইতে পারিবে না, এজন্যে প্রয়োজন কোন প্রগতিশীল দলের সহযোগিতা। আগামী নির্বাচনে তোমার দাড়াইতে হইবে।

আমি কুমিল্লায় ধীরেনবাবুর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছি। এখানে শেখ মুজিবরের সহিত আলাপ করিয়াছি। এখন বিভিন্ন জিলায় আমাদের যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ করার প্রয়োজন। সকলের সহিত আলাপ করার পর স্থির-সিদ্ধান্তে পোঁছিব। আমি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা আসিব, তখন আমাদের সকলের একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা করিব, তুমি তখন উপস্থিত থাকিবা। অন্য লোককে ডাকা হইবে না, শুধু নিজেরা কয়েকজন [illegible] হইব। পত্রের উত্তর বাড়ির ঠিকানায় দিবা। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি।

আশীর্বাদক

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

মহারাজের স্থির প্রত্যয় ছিল, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে, অর্থাৎ জনগণই [illegible] শক্তির অধিকারী না হলে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি, দেশ শক্তিশালী হতে পারে না। তাই সংখ্যালঘুরা চায় গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের অভাবেই তাদের এই দুর্দশা। তাঁর দুঃখ, "গত দুই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক যাইতে পারে নাই। প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাও অতি নগণ্য। জাতীয় পরিষদে সংখ্যালঘু মন্ত্রী নাই। সংখ্যালঘুদের দাবী, পাকিস্তান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইবে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা বলবৎ থাকিবে।"

প্রবাদ আছে, মনীষী ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্ক্ষা, দূরদৃষ্টিজাত স্বপ্ন কখনও বিফলে যায় না। মহারাজের স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে। তাঁর অতীতের 'পূর্ব পাকিস্তান' এখন 'ধর্ম নিরপেক্ষ, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক' বাংলাদেশ। মহাপ্রয়াণের আগে বীরেনবাবুকে লেখা এইটাই মহারাজের শেষ চিঠি :

৪৭১ সেণ্ট্রাল রোড।
কলকাতা-৩২
২৩-৭-৭০

"কল্যাণবরেষু,"

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বাগুবাবু ও আরো বহু লোক প্রত্যহই আমার সহিত আসিয়া দেখা করিয়া যাইতেছে। আমি প্রভাসবাবুর (প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী) সহিত দেখা করার জন্য বহরমপুর যাইব। ত্রিদিব চৌধুরী বহরমপুর লইয়া যাইবে। আমি আগষ্ট মাসের মধ্য ভাগে ঢাকা ফিরিয়া যাইব। আশা করি কুশলে আছ। ইতি।

আশীর্বাদক

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী

মহারাজও তাঁর 'সোনার দেশ'-এ আর ফিরে যেতে পারলেন না; পত্র প্রাপক বীরেন্দ্র সরকারও দেখতে পেলেন না তাঁর বাড়ির উপরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা আজ কি সুন্দরভাবে উড়ছে।

॥ ১৩ ॥
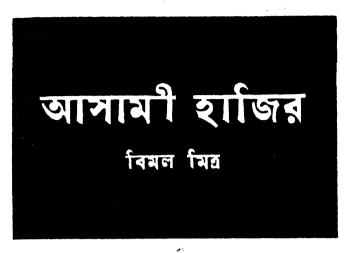
এ সব অনেক দিন আগেকার ঘটনা। তবু এতকাল পরে চৌবেড়িয়া থেকে বেরিয়ে নবাবগঞ্জের পথে যেতে যেতে সেইদিনকার সেইসব কথাগুলোর যেন নতুন মানে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন সদানন্দবাবু! এতকাল পরে নবাবগঞ্জে গেলে সেখানে কী দেখবেন কে জানে! সেই নবাবগঞ্জ কি আর সেরকম আছে! ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যখন সব জিনিসেরই আসল-নকল যাচাই হয়ে যায় তখন নবাবগঞ্জেরও হয়ত একটা নতুন যাচাই হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। সেই ফুলশয্যার আগের রাত্রের সেই দুর্ঘটনার কথা আজ তিনি ছাড়া কি আর কারো মনে আছে! আর মনে থাকলেও তাঁর জীবনে এ ঘটনার তাৎপর্য যেমন করে ছায়াপাত করেছে তেমন করে আর কার জীবনে ছায়াপাত করবে? শুধু নবাবগঞ্জ কেন, পৃথিবীতে কোনও দুর্ঘটনাই তো কাউকে চিরকালের মত এমন অভিভূত করে রাখে না। সংসারে বোধহয় তাই তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি তো আর সকলের মত সুখে স্বচ্ছন্দে স্ত্রী-পুত্র-সংসার নিয়ে আপোস করে চললেই পারতেন! কেন তবে সব থাকতে তিনি এই চৌবেড়িয়ার অতিথিশালায় অজ্ঞাতবাসের দুর্ভোগ সইছেন।

পরের দিন কেষ্টগঞ্জ থেকে পুলিস এসে সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছিল।

বলেছিল—আপনি কেমন করে বুঝলেন যে এখানে খুন হয়েছিল? খুন হলে তো রক্তের দাগ থাকবে!

সদানন্দ বলেছিল—কিন্তু আমার গেঞ্জিতে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে, আমার কাপড়ে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে, আমার হাতেও তখন রক্তের দাগ লেগে ছিল। সে দাগ সবাই দেখেছে—

পুলিসের দারোগাবাবু তার আগেই কর্তাবাবুর সঙ্গে দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে আধ ঘণ্টারও বেশি কথাবার্তা বলেছে। সদানন্দ জানতো না ফয়সালা যা হবার তা সেখানেই সব কিছু হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে ফয়সালার জন্যে কর্তাবাবুর সিন্দুকের ভেতরে সব সময়েই মশলা মজুদ থাকে। সেই মশলা দিয়েই নরনারায়ণ চৌধুরী এতদিন রাজত্ব করে আসছেন। প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা প্রতাপ সব কিছু কায়েম করে সকলের মাথার ওপরে বসে আছেন। শুধু পুলিসের দারোগা কেন, কোর্টের জজ থেকে শুরু করে আদালতের পেয়াদা পর্যন্ত ওই মশলার জোরে তাঁর কাছে মাথা নিচু করেছে।

তাই কেষ্টগঞ্জের দারোগার কানে সেদিন সদানন্দর কথাগুলো ভালো লাগেনি।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু কাকে খুন করা হয়েছে?

সদানন্দ বলেছিল—কালিগঞ্জের বউকে। কালিগঞ্জের জমিদারের বিধবা স্ত্রী—

—কিন্তু তাঁকে তো নেমন্তন্ন করা হয়নি। তিনি কেন ফুলশয্যার আগের দিন বিনা নিমন্ত্রণে আসতে যাবেন?

সদানন্দ বলেছিল—তাই যদি হয় তাহলে তিনি গেলেন কোথায়? কালিগঞ্জেও তো তিনি নেই। তিনি তো কালিগঞ্জেও ফিরে যাননি। তাঁর পালকি-বেহারাদেরও তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি তাঁর পালকিটাও কোথাও নেই!

সত্যিই এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! কালকে এ মানুষটাকে সবাই দেখেছিল, একখানা শাড়ি নিয়ে এসে নতুন বউকে আশীর্বাদ করে গেছে, সে মানুষটা এমন করে অদৃশ্য হলোই বা কী করে! এমন কি তার পালকিটা পর্যন্ত রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে!

কিন্তু সাক্ষ্য দেবার সময় সবাই বললে—কই, আমি তো পালকি দেখিনি!

দারোগাবাবু বার-বার সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কেউই দেখেন নি কালিগঞ্জের বউকে?

সবাই একবাক্যে বললে—আজ্ঞে না, আমাদের কাজকর্ম ছিল, কারো দিকে দেখবার সময় ছিল না তখন।

—আর আপনি? আপনি দেখেছেন? আপনিই তো সদরে দাঁড়িয়ে শামিয়ানা খাটাচ্ছিলেন। সবাই বললে—

প্রকাশমামার কাজের তখনও শেষ হয়নি। পুলিস দেখে তার পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। বললে—আমি? আমাকে বলছেন দারোগাবাবু? আমার কি মরবার ফুরসৎ আছে?

যতক্ষণ না ফাঁসগাছা কাটে ততক্ষণ আমার মরবার পর্যন্ত ফুরসৎ নেই—

সদানন্দ মাঝখানে বলে উঠলো—কিন্তু মামা তুমি তো কালিগঞ্জের বউকে পালকি থেকে নামতে দেখেছ, তুমিই তো বেয়ারাদের সদর থেকে পালকি সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছ! এখন তুমি সব বেমালুম ভুলে গেলে?

দারোগাবাবু বললে—আপনি থামুন, আমি যাকে জিজ্ঞেস করছি তিনিই উত্তর দেবেন!

তারপর প্রকাশমামার দিকে চেয়ে দারোগাবাবু আবার বলতে লাগলো—তারপর কখন আপনার শামিয়ানা খাটানো শেষ হলো?

প্রকাশমামা বললে—ধরুন, তখন মাঝ-রাত্তির—

—তখনও কি কিছু সন্দেহ করেছিলেন যে এ বাড়িতে কেউ খুন হয়েছে?

প্রকাশমামা বললে—রামো, সে সন্দেহ করতে যাবো কেন? ওই আমার ভাগ্নেই কেবল সকলকে বলে বেড়াতে লাগলো কালিগঞ্জের বউ কোথায় গেল, কালিগঞ্জের বউ কোথায় গেল! তা আমি বললুম কালিগঞ্জের বউ কোথায় আবার যাবে? কালিগঞ্জেই আছে—কিন্তু ও কিছুতেই শুনবে না। শেষ পর্যন্ত সেই রাত্তিরে আমার ভাগ্নে কালিগঞ্জে গেল। গিয়ে যখন ফিরে এল তখন আমার ঘড়িতে রাত প্রায় একটা। সেখানেও নেই। তখন পাগলের মতন ছটফট করতে লাগলো। তখন আমি বললুম—এতই যদি তোর সন্দেহ তাহলে পুলিসে খবর দে! আমার কথাতে তখন ও আপনার কাছে গেল—

—আপনি তা হলে বলতে চান এ বাড়িতে কেউই খুন হয়নি?

প্রকাশমামা বললে—না, হলে আমি জানতে পারতুম। তখন সকলের আগে আমিই আপনাকে গিয়ে খবর দিতুম।

পুলিসের কাজ বড় নিখুঁত। বিশেষ করে কেষ্টগঞ্জের পুলিসের। তারা নবাবগঞ্জের নরনারায়ণ চৌধুরীর কোনও [illegible] কোনও চিহ্ন খুঁজে পায়নি। এর আগে নবাবগঞ্জে যতবার লাঠিবাজি হয়েছে জমি দখল হয়েছে, বিশেষ করে সেই যেবার বারোয়ারিতলার অশথ গাছের ডালে কপিল পায়রাপোড়া গলায় দড়ি দিয়েছিল, কোনও বারেই কেষ্টগঞ্জের দারোগারা কোথাও কোনও খুঁত পায়নি। প্রত্যেকবারেই নবাবগঞ্জে এসেছে, এসে কর্তাবাবুর দোতলার দরজা-বন্ধ ঘরে বসে নিরিবিলিতে সব মামলার ফয়সালা হয়ে গেছে, কোর্ট পর্যন্ত আর সেসব গড়ায়নি।

আর আশ্চর্য ওই বংশী ঢালীর দল! তাদের যেন কোনও যথোচিত শাস্তি হতে নেই। তারা যেমন সেই ইতিহাসের আদি যুগেও ছিল, তেমনি এখনও আছে, আবার সুদূর ভবিষ্যতেও তারা থাকবে। তাদের জন্যে পেনাল-কোড তৈরি হয়েছে, থানা-পুলিসের ব্যবস্থা হয়েছে, কোর্ট-কাছারি-জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের মোটা মাইনে দিয়ে পোষা হয়েছে। তবু তারা নিঃশেষ হয়নি। তাদের বংশ বেড়েই চলেছে বরাবর। এ যে কেমন করে সম্ভব হয় তা হয়ত ওই নরনারায়ণ চৌধুরীরাই একমাত্র বলতে পারেন, আর বলতে পারে তাদের সিন্দুকের টাকা। আর টাকা তো মানুষ নয় আর টাকার মুখও নেই, তাই হয়ত সে মুখের ভাষাও নেই। যদি ভাষা থাকতো তা হলে বলতো—আমিই সব, আমিই সৃষ্টি, আমিই স্থিতি, আবার আমিই প্রলয়। একাধারে আমিই নরনারায়ণ চৌধুরী, আমিই বংশী ঢালী আবার আমিই পুলিস। উকিল-জজ-আসামী-ফরিয়াদী সব কিছুই আমি। সুতরাং আমাকেই মনে-প্রাণে ভজনা করো।

সেইজন্যেই সেদিন বংশী ঢালীর ভয় ছিল না। খোকাবাবু যখন কালিগঞ্জের বউকে সারা বাড়ির ভেতরে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন বংশী ঢালীরা গা-ঢাকা দিয়ে আতা গাছের অন্ধকারে চণ্ডীমণ্ডপের দরজার তালা আবার খুলেছে। তাদের পাকা হাতের কাজ। আগের বারে তাড়াতাড়িতে কাজটা কেঁচে গিয়েছিল। তাই খোকাবাবুর গেঞ্জিতে-ধুতিতে রক্ত লেগে গিয়েছিল। এবার আর তা নয়। এবার সমস্ত ঘরের মেঝে, দেয়াল, দরজা-জানালা জল দিয়ে ধুয়ে একেবারে সাফ করে ফেললে। তারপর সেই চণ্ডীমণ্ডপের খিড়কী দিয়ে লাশটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল একদল। আর গেল পালকি বেহারাদের অদৃশ্য করে দিতে। তারা তখনও সদরের সামনে মা-জননীর জন্যে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

একজন কাছে গিয়ে বললে—হ্যাঁ গো, কালিগঞ্জের লোক এখানে কারা?

দুলাল বললে—আমরা গো বাবু, আমরা—

লোকটা বললে—আরে, তোমাদেরই তো খোঁজাখুঁজি হচ্ছে! এতক্ষণ তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান। তোমরা বার-বাড়ির উঠোনে ছিলে, বাইরে আসতে কে বললে?

—আজ্ঞে, একজন বাবুমশাই তো আমাদের এখেনেই দাঁড়াতে বললে। আমাদের জন্যে তাঁর কাজের অসুবিধে হচ্ছিল।

—কী মুশকিল দেখ দিকিনি। আর ওদিকে মা-জননী তোমাদের খুঁজে খুঁজে মরছে। খুব লোক যাহোক তোমরা।

—তা মা-জননী কোথায়?

—আরে, তিনিই তো ডেকে পাঠিয়েছেন তোমাদের। এসো, আমার সঙ্গে এসো, পালকি তুলে নিয়ে এসো—

—কিন্তু কোথায় মা-জননী? কোন্ দিকে?

৯

তখন চৌধুরী বাড়িতে হ্যাজাগ-বাতি জ্বলে উঠেছে। পুকুর-পাড়ে মিস্তিরি ভিয়েন বসেছে, তারও ও-পাশে আলোর ব্যবস্থা। মাছ-মাংস কাটা হচ্ছে। আর একদিকে লোহার কড়ায় গরম ঘিয়ের ওপর ময়দার লুচিগুলো ফোস্কার মত ফুলে-ফুলে উঠছে। বাড়ির লোকজন খাবে, খাবে বাড়ির কর্তা-গিন্নী-কুটুম। তার সঙ্গে খাবে নতুন বউ।

নয়নতারা বিকেল থেকে এসে ঘরের মধ্যে এক জায়গায় বসে আছে। আগের রাতে বাসর-ঘরে ঘুমোতে পারেনি। তারপর সকাল বেলা কাঁদতে কাঁদতে ট্রেনে উঠেছে। তখন থেকে ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় সমস্ত রাস্তাটা কাটিয়েছে। এ বাড়িতে এসে যে বেশি করে যত্ন করেছে সে হলো গৌরী পিসী।

গৌরী পিসীরই যেন কত জ্বালা। বললে—ওগো, তোরা একটু সর তো বাছা, বউমাকে একটু হাঁফ ছাড়তে দে। সর বাছা
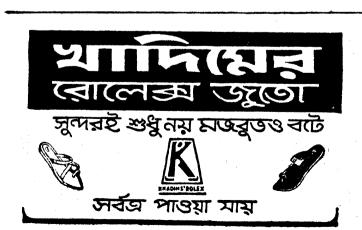
তোরা সব—এখন তোরা যার-যার বাড়ি যা, কালকে আবার বউ দেখতে আসিস—

তারপর নয়নতারার হাতখানা ধরলে।

বললে—এসো বউমা এসো, মুখ-হাত-পা ধুয়ে নাও, কুয়ো-পাড়ে চলো—

তা ব্যবস্থা ভালেই করেছিল। কুয়োর কাছে এক পাশে খানিকটা জায়গা চাটাই দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল, নতুন বউ-এর জন্যে। একটু আড়াল হবে। নতুন বউ তো আর আমাদের মত গা খুলে চান করতে পারবে না। তার জন্যে আড়াল চাই। চান করবে, সাবান মাখবে, গা ডলবে।

গৌরী পিসী বললে—তুমি বউমা লজ্জা করো না যেন। খিদে-টিদে পেলে বলবে। এ এখন থেকে তোমারই বাড়ি মনে করে নাও। প্রথম প্রথম বাপ-মায়ের জন্যে একটু মন কেমন করে বটে, কিন্তু তারপর দেখবে যখন সোয়ামীর ওপর মন বসে যাবে তখন আর কেষ্টনগরে যেতেই মন চাইবে না। সোয়ামী এমন জিনিস গো—

সমস্ত অচেনা পরিবেশের মধ্যে নয়নতারার কাছে তখন সব কিছুই খারাপ

লাগছিল। শুধু ভালো লাগছিল গৌরী পিসীর কথাগুলো।

গৌরী পিসী বললে—আমি তোমার আপন পিস-শাশুড়ি নই গো, আপন পিস-শাশুড়ি নই। তুমি বুঝি ভাবছো আমি তোমার আপন পিস-শাশুড়ি?

নয়নতারা কী আর উত্তর দেবে। 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

গৌরী পিসী বললে—আমার সামনে লজ্জা করো না বউমা, তোমার গায়ের বেলাউজ খুলে ফেল, আমি পিঠে সাবান মাখিয়ে দিই—

তবু নয়নতারার কেমন লজ্জা করতে লাগলো।

গৌরী পিসী বললে—খোল খোল, লজ্জা কী, কাক-পক্ষীতে দেখতে পাবে না তোমাকে, তোমার চানের জন্যেই তো এই জায়গা তৈরি হয়েছে—

এবার নয়নতারা প্রথম কথা বলে উঠলো। বললে আপনারা কোথায় চান করেন?

—আমরা? আমরা সবাই ওই পুকুরে। পুকুরে বাঁধানো ঘাট আছে। তোমার শাশুড়িও সেখানে চান করে। প্রথম প্রথম তুমি এই কুয়োপাড়ে চান করো। শেষকালে একটু পুরোন হয়ে গেলে তুমিও আমাদের মত পুকুরের ঘাটের পৈঁঠেতে বসে চান করবে —

নয়নতারার পিঠে তখন গৌরী পিসী ঘষ্ ঘষ্ করে সাবান ঘষতে আরম্ভ করেছে।

সাবান ঘষতে ঘষতেই গৌরী পিসী বললে—আমাদের এইটুকু জায়গায় চান করে সুখ হয় না মা। তোমার শাশুড়ি আর আমি তো আগে সাঁতার কেটেছি কত! তা তুমি সাঁতার জানো বউমা?

—সাঁতার? আমি তো সাঁতার জানি না।

—সাঁতার জানো না? তা তোমাদের কেষ্টনগরে বুঝি বাড়িতে পুকুর-ঘাট নেই?

নয়নতারা বললে—না, আমাদের টিউব-ওয়েল আছে—

গৌরী বললে—ও, আমি দেখেছি, ওই সদার মামার বাড়িতে ওই কল আছে, টিউব-কল। ঢেঁকির মত পাড় দিতে হয়, বুঝতে পেরেছি। তা তোমার ভাবনা নেই বউমা, আমি তোমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেব। এই দু'-চার দিন ঝাঁপাই-ঝুড়লেই তোমার রপ্ত হয়ে যাবে, তখন আর দেখবে জল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করবে না—

তারপর গা-ধোওয়া, ভিজে-কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় বদলানো, মুখে পাউডার মাখা, চুল আঁচড়ে নতুন খোঁপা বাঁধা, সবই করিয়ে দিলে গৌরী পিসী। নয়নতারার জন্যে নতুন ঘর। ঘরের ভেতর নতুন খাট, নতুন আলমারি, গদি-বিছানা।

গৌরী পিসী নয়নতারাকে সেই ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

বললে—এই দেখ, এই হলো তোমার শোবার ঘর। কালকে এইখানে তোমার ফুলশয্যে হবে—

নয়নতারা দেখলে।

গৌরী পিসী বললে—আজ একটা রাত কোনও রকমে নাক-কান বুজে কাটাও, কাল রাত থেকে এখেনে তোমরা দু'জনে শোবে।

নয়নতারা এর জবাবেও কিছু বললে না। শুধু কান দিয়ে কথাটা শুনলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে ঘরে থাকা হলো না। পেছন থেকে শাশুড়ীর গলা শোনা গেল—ওলো, ও গৌরী, বউমাকে খেতে দিয়েছিস?

সত্যিই খাবার কথা মনে ছিল না গৌরী পিসীর। বললে—চলো বউমা, ওদিকে তোমার শাশুড়ী আবার রাগ করবে, এসো এসো। এখন আর এসব দেখে কী হবে। কাল থেকে তো এখেনেই চিরকাল কাটাতে হবে তোমাকে। তখন দরজায় হুড়কো দিয়ে থাকবে তোমরা, কাউকেই আর ভেতরে ঢুকতে দেবে না। এসো—

ভেতরে জল খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। শাশুড়ী বললে—এখন এই মিষ্টি কটা খেয়ে নাও বউমা, তারপরে রাত্তিরের খাওয়া পরে খেও। তখন পেট ভরে লুচি তরকারি মাছ মাংস খেও—গৌরী ঠাণ্ডা জল দে বাছা বউমাকে—

মিষ্টিগুলোর দিকে চেয়ে নয়নতারা ভাবছিল অত খাবে কী করে! হঠাৎ বাইরে যেন কীসের আওয়াজ হলো। কীসের আওয়াজ! মুখটা তুলতেই হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে যাওয়াতে মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে। সদানন্দ!

সদানন্দ ভেতরে এসে নয়নতারাকে দেখে প্রথমে একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর ডাকলে—মা, মা কোথায়?

মা আসবার আগেই গৌরী পিসীকে দেখে বললে—পিসী, কালিগঞ্জের বউ এখানে এসেছে?

গৌরী পিসী তো অবাক। বললে—হ্যাঁ এসেছিল, কিন্তু সে তো চলে গেছে—

—কোথায় চলে গেছে? কোন্ দিকে?

ততক্ষণে মা এসে গেছে ভাঁড়ার ঘরের দিক থেকে। বললে—কী রে খোকা? কী চাস?

সদানন্দ বললে—কালিগঞ্জের বউ ভেতর বাড়িতে এসেছিল?

—কেন? তার সঙ্গে তোর কী দরকার?

সদানন্দ বললে—দরকার আছে। তুমি বলো না কোন্ দিকে গেল?

—তা কী দরকার তাই বল না। তাকে তো নেমন্তন্ন করা হয়নি, কিছুই না, তবু সে কেন আসে এ বাড়িতে? আবার বুঝি তোকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার বাড়িতে আটকে রাখবে? ভারি তো একটা তিন টাকা দামের বাঁধপোতার গামছা দিয়ে আদিখ্যেতা করতে এসেছে। যেন আমরা গামছা কিনতে পারি না, আমাদের গামছা কেনবার যেন পয়সা নেই। ঢং, মাগী ঢং দেখাতে এসেছে—

সদানন্দ রেগে গেল। বললে—তোমার ওসব কথা শুনতে চাইনি আমি, আমি যা জিজ্ঞেস করছি তারই জবাব দাও তুমি, বলো কালিগঞ্জের বউ ভেতর-বাড়িতে এসেছিল কি না—

মা বললে—তা সে যদি এসেই থাকে তো তোর কী? তোর সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক?

সদানন্দ বললে—আমার সম্পর্কের কথা আমি বুঝবো, আমি যা জিজ্ঞেস করছি আগে তার জবাব দাও তুমি—

নয়নতারা চুপ করে সব শুনছিল। এরই সঙ্গে তার কাল বিয়ে হয়েছে! মানুষটাকে খুব রাগী লোক বলে মনে হলো তার কাছে! কিন্তু কালিগঞ্জের বউ কে! বাসর-ঘরে তো এরই কথা হয়েছিল, এখন মনে পড়লো! অথচ আশ্চর্য, এ যে এত রাগী মানুষ চেহারা দেখে তো তা বোঝা যায় না।

কিন্তু ততক্ষণে সদানন্দ সেখান থেকে চলে গিয়েছে। তারপরে আরো রাত হলো। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে বসে বসে আরো অনেক মেয়েলি কথা কানে এল। সবাই তার রূপ দেখে প্রশংসা করছে। সবাই বলছে এমন বউ নাকি হয় না। কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগলো নয়নতারার। নিজের রূপের প্রশংসা আগেও সে অনেক শুনেছে। বাপের বাড়ির লোকরা বলতো এ মেয়ে যে বাড়িতে যাবে সে-বাড়ি আলো করে রাখবে। যার সঙ্গে এ মেয়ের বিয়ে হবে সে নাকি বড় ভাগ্যবান। তাহলে এমন রাগারাগি কেন করলে তার সামনে। আর চব্বিশ ঘণ্টা পরেই তো ওই মানুষটার সঙ্গে তাকে একটা বিছানায় এক ঘরে কাটাতে হবে। তাহলে তারই সামনে মা'র সঙ্গে কেন অত রাগারাগি করতে গেল। তার রূপ দেখে তো তার ভুলে যাওয়া উচিত ছিল! একটা দিনের জন্যেও সে তার রাগ সামলাতে পারলে না। তাহলে কীরকম চরিত্রের মানুষ ও!

তারপর সবাই খেতে বসলো। তাদের মধ্যেও নয়নতারাও খেতে বসেছে। খেতে খেতে কত লোকের কত কথা তার কানে এল। কত হাসাহাসি, কত গল্প। সকলেরই নজর নতুন বউ-এর দিকে। ভালো ভালো জিনিস তার পাতে দিয়েছে শাশুড়ী। নয়ন-তারার মনে হলো শাশুড়ী মানুষটা কিন্তু ভালো।

একবার শাশুড়ী বললে—কই বউমা তুমি তো কিছু খাচ্ছো না? খাও, এরকম না খেলে চলবে কেন? মাছ খাচ্ছো না যে,

ঝাল হয়েছে বুঝি? তুমি বুঝি ঝাল খাও না?

নয়নতারা ঘাড় নেড়ে ইংগিতে জানালে সে ঝাল খায়। আর তা ছাড়া ঝাল সে খাক আর নাই খাক, সব জিনিসে 'হ্যাঁ' বলতেই সে শিক্ষা পেয়েছে মা'র কাছে।

মা বলতো—শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে শাশুড়ী যা বলে তাই শুনবে মা, 'না' বোল না যেন।

—ঝাল খাও? তা হলে আর একখানা মাছ দেব, খাবে?

গৌরী পিসী বললে—জিজ্ঞেস করছো কেন বউদি, দাও না আর একখানা মাছ।

খেতে খেতে মা'র কথাই মনে পড়তে লাগলো নয়নতারার। এমন করে মা ও তাকে খাওয়াতো আর বকতো। বলতো—কোথায় কাদের বাড়িতে পড়বি তখন কেউ পেট ভরবে না তোর। এখন দিচ্ছি খেয়ে নে। মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছ তখন সব রকম অবস্থার জন্যে তোমাকে তৈরি হয়ে থাকতে হবে মা। বিয়ের আগে আমার কত বায়নাক্কা ছিল, এখন সেসব কোথায় চলে গেল মনেও পড়ে না আর—

অচেনা মুখ, অজানা দেশ অদেখা পরিবেশ। তাই মা'র কথাগুলোই বার-বার মনে পড়তে লাগলো নয়নতারার।

গৌরী পিসী হঠাৎ ভাবনার মাঝখানে বললে—চলো বউমা। শোবে চলো—

একটা বড় খাট। শ্বশুরের শোবার ঘর। সেখানেই সেদিনকার মত নয়নতারার শোবার বন্দোবস্ত হয়েছে। এক পাশে শাশুড়ী আর তার পাশে নতুন বউ। বাপের বাড়িতেও বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে মা তাকে পাশে নিয়ে শুতো। আজই প্রথম অন্য বিছানায় অন্য লোকের পাশে শোওয়া। কাল থেকে আবার আর একজনের পাশে শুতে হবে তাকে।

আস্তে আস্তে চারদিকের সমস্ত শব্দ থেমে এল। রাত বাড়ছে। একটা পাতলা তন্দ্রার মধ্যে মনে হলো যেন কেষ্টনগরের মাও তাকে ভাবছে। মারও তার মতন একলা শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছে না হয়ত। মারও যেন মনে হচ্ছে খুকুর কথা। খুকু সেখানে খেলে কি না, খুকুর চোখে ঘুম এল কিনা। মারও মনে হচ্ছে খুকুর কথা। খুকু সেখানে এতক্ষণ হয়ত শাশুড়ীর পাশে শুয়ে মা'র কথা ভাবছে! আশ্চর্য, মেয়েমানুষের জীবনটাই ভগবান এক আশ্চর্য ধাতুতে গড়েছে। ছোটবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে অন্য লোকের হাতে তুলে দিতে হয়। তারপর সেখানেই সে থাকবে। চিরকালের মত থাকবে। বাবা-মা'র কথা আর ভাববে না। তখন তার নতুন সংসার নিয়েই মেতে থাকবে। তার সেই সংসারকেই সে নিজের সংসার বলে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকবে। এই-ই

নিয়ম। সংসারে আদিকাল থেকে বুঝি এই নিয়মই চলে আসছে মানুষের জীবনে!

—কই বউমা, তোমার ঘুম আসছে না বুঝি?

নয়নতারা একটু নড়তেই শাশুড়ী বোধ হয় বুঝতে পেরেছে।

বললে—নতুন জায়গা তো, তাই অসুবিধে হচ্ছে। দু'দিন বাদে তখন আবার সব অভ্যেস হয়ে যাবে। ঘুমোও, ঘুমোতে চেষ্টা করো। কাল আবার বউভাত, সকাল থেকেই হই-চই শুরু হয়ে যাবে। তখন আর এক দণ্ডের জন্যে দু'চোখ এক করতে পারবে না। যতটুকু পারো এখন একটু ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করো—

নয়নতারা দু' চোখ বুজে মা'র কথাগুলোই আবার ভাবতে শুরু করলে। মা'র কথা ভাবলেই মনটা কেমন আনন্দে ভরে যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে মা'র কথা ভাবতেই তার ভালো লাগলো তখন। সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারার দু' চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে এল।

নয়নতারা স্বপ্ন দেখতে লাগলো। ঠিক স্বপ্ন নয়, অথচ যেন স্বপ্নই। মন খারাপ দেখে বাবা যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে—খুকুর কথা ভেবো না তুমি, সে খুব ভালো জায়গায় পড়েছে গো, সে কত বড় বাড়ি, কত জমিজমা তাদের। তার সেখানে কোনও কষ্ট নেই, সে খুব আরামে আছে, তুমি তার কথা ভেবে মন খারাপ করো না—

আসবার সময় মা নয়নতারাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়েছিল। বলেছিল—জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থাকো মা, স্বামীর মন যুগিয়ে চলো, আশীর্বাদ করি হাতের শাঁখা সিঁথির সিঁদুর যেন তোমার অক্ষয় হয়...

কথাগুলো বলছিল বটে মা কিন্তু মেয়েও যত কাঁদছিল, মা'ও তত কাঁদছিল। তাদের দেখাদেখি আশেপাশে যারা দেখছিল তাদের চোখও আর শুকনো ছিল না। তারপর ট্রেনের টাইম হয়ে যাচ্ছিল। ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছিল বরকর্তা—কই বেয়াইমশাই, এত দেরি হচ্ছে কেন, ওদিকে যে ট্রেন ছেড়ে দেবে—মা-লক্ষ্মীকে একটু তাড়াতাড়ি করতে বলুন—

হঠাৎ যেন তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। তন্দ্রাটা ভাঙতেই নয়নতারা ধড়মড় করে চারদিকে চেয়ে দেখলে। একেবারে অন্য পরিবেশ। এখানে কেষ্টনগরের মত দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে চলবে না। পাশের দিকে চেয়ে দেখলে জায়গাটা খালি। শাশুড়ী কখন বিছানা ছেড়ে উঠে চলে গেছে টের পায়নি। আর দেরি করলে না সে। বিছানা ছেড়ে উঠলো। হঠাৎ মনে পড়লো ঘোমটা দিতে হবে। আগের মত আর মাথা খালি রাখলে চলবে না।

—ওমা, তুমি উঠেছ?

গৌরী পিসী চুপি-চুপি ঘরে উঁকি মেরে দেখতে এসেছিল বউ উঠেছে কিনা। উঠেছে দেখে বললে—ঘুম হয়েছিল তো বউমা? চা খাবে? চা খাওয়া অভ্যেস আছে তোমার?

নয়নতারা বললে—না—

—অভ্যেস নেই? অভ্যেস থাকলে বলো। বলতে লজ্জা করো না। আমাদের এখানে চা হয়। চা খাওয়ার লোক আছে এখানে। তোমার যে মামা-শ্বশুরকে দেখেছ, তোমাকে কেষ্টনগর থেকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, উনি চা খান, চা না হলে ওঁর একদণ্ড চলে না—

বাড়িটাতে তখন আবার লোকজনের গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। আজ বউভাত। বিকেলের পর থেকেই লোকজনের আসা শুরু হবে। তার জন্যে চারদিকে ম্যারাপ বাঁধা হয়ে গেছে। তারপর কেষ্টনগর থেকে বাবা মা'র তত্ত্ব পাঠাবে। বিপিন আসবে। তার কাছ থেকেই মা-বাবার খবর পাওয়া যাবে। হয়ত মা-বাবা আসতেও পারে। এখন থেকে সারা দিন আর বিশ্রাম নেই কারো।

—নাও নাও বউমা, কুয়োপাড়ে জল দিয়েছে, কাপড়-চোপড় নিয়ে যাও, চান করতে হবে। চলো আমি দেখে দিচ্ছি কোন্ শাড়িটা পরবে তুমি—

সকাল বেলা এ-বাড়িটার আবার অন্য চেহারা। কাল রাত্রে এখানকার অন্য চেহারা দেখেছে সে। তখন চারদিকের এই গাছপালা-বাগান-পুকুর দেখে কেমন যেন জঙ্গল-জঙ্গল মনে হয়েছিল তার কাছে। আর আজ রোদ ওঠবার পর সব যেন ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সব কিছু যেন তার কাছে ভালো লাগতে লাগলো।

ততক্ষণে গ্রাম থেকে আরো ক'জন বউ-ঝি তাকে দেখতে এসেছে। কাল সন্ধ্যেবেলা যারা আসতে পারেনি তারা আজ দিনের আলোয় নতুন বউকে দেখবে। গরীব গ্রামের বউ-ঝি সব। খালি গা, খালি পা। জমিদার বাড়ির নতুন বউকে তারা দূর থেকে একবার শুধু দেখে যাবে। আর তারপর সন্ধ্যে বেলা এসে পাতা পেতে পেট ভরে খাবে আর ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ কে যেন একজন দৌড়তে দৌড়তে ভেতরে এল।

—খুড়ীমা, পুলিস এসেছে বার বাড়িতে—

—পুলিস? পুলিসকে আবার কে নেমন্তন্ন করতে গেল রে? পুলিস কী করতে এল রে আবার? বউ দেখবে নাকি

কথাটা তখন চারদিকেই রটে গেছে পুলিস-দারোগা কী করতে আসে এখানে কোনও চুরি ডাকাতি হয়েছে নাকি! খুন-খারাবি!

খবর এল—দারোগাবাবু ওপরে কর্তাবাবুর ঘরে বসে কথা বলছে—

—তাহলে উনি কোথায়? তোদের চৌধুরী মশাই?

—ছোটবাবুও তো সঙ্গে রয়েছেন।

—আর প্রকাশ? প্রকাশ কোথায় গেল তাকে একবার আমার কাছে ডেকে আন তো বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে একজন দৌড়লো শালাবাবুকে ডাকতে! নয়নতারার কানে সব কথাই যাচ্ছিল। তারও কেমন অবাক লাগলো। চুরি! ডাকাতি! খুন! কে কী চুরি করলো! আর যদি খুনই হয় তো কে-ই বা কাকে খুন করলো!

ছেলেটা আবার দৌড়তে-দৌড়তে ভেতরে এল। শাশুড়ী জিজ্ঞেস করলে—কী রে, শালাবাবু কী বললে? আসছে?

—হ্যাঁ খুড়ীমা, শুনলুম কে নাকি এখেনে খুন হয়েছে, তাই পুলিস এয়েচে—

খুন!

নয়নতারার মাথাটা এক মুহূর্তে যেন বোঁ-বোঁ করে ঘুরে উঠলো। খুন! খুন এখানে কখন হলো! কে খুন হলো! কে খুন করলো! কাকে খুন করলো।

(ক্রমশ)

মুরগির লড়াই

॥ ৩৩ ॥

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খালেখালি মারামারি করাটা কি মানুষের মজ্জাগত স্বভাব? বহু যুগের ধরে ক্রম তার আদিম প্রবৃত্তিগুলোর উপর পালিশ যে একটু ভদ্রতার আবরণ পড়েছে তা কি যথেষ্ট ঘাতসহ? নিজের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে এখনও কি আমাদের একজন আরেক জনের টুঁটি টিপে ধরতে সদা-উদ্যত নই? গত দু'তিন হাজার বছরের মানবসভ্যতার ইতিহাস এতই রক্তরঞ্জিত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে রক্তলাঞ্ছন এতই অকারণ যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে ব্যাপক জিঘাংসার দায় থেকে একেবারে বেকসুর খালাস দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সাবেক প্রবণতাগুলো এখনও যে সংযমের বাঁধনে যথেষ্ট সংহত হয়নি তার প্রমাণ দিকে দিকে।

কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না মনে করেন এই নৃশংসতা আজকের অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলোর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষে যাঁরা আদিবাসী বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যে আদিম অরণ্যচারী জীবনের অনেক রেশ এখনও অবশিষ্ট বর্তমান। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত সমাজেও একক বা দলবদ্ধ হৃদয়হীনতার নজিরের অভাব নেই। শুধু এদেশেই নয়, পৃথিবীময়।

মৃগয়া বা শিকার দুনিয়ার রাজারাজড়াদের ব্যসন সেই ইতিহাস-পূর্ব কাল থেকেই। গরিবেরা, অশিক্ষিতরাও চিরকাল বনের প্রাণী মেরেছে সত্য। কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণে পশুহত্যা সমর্থন করা গেলেও নিছক কালহরণ বা চিত্তবিনোদনের জন্য তা করা যায় কিনা সন্দেহ। অথচ সভ্যতা-অভিমানী উচ্চ কোটির লোকেরাই এই গর্হিত অপরাধটি করে এসেছেন অনাদিকাল। হিংস্র শ্বাপদ নিধনের মধ্যে লোকহিতৈষণা থাকা সম্ভব কিন্তু সেক্ষেত্রেও 'টপ' কাউন্টই মাত্রা নির্ধারণে শিকারীর সংখ্যা যে আওয়াজে শোনা যায় সে কথা না বললেও চলে।

আরও লজ্জার কথা, হিংস্র প্রাণীকে বন্দী করে তারপরে বহু লোকের সামনে তাকে আহত বা নিহত করা অতীতের বিভিন্ন সভ্য সমাজে রীতিমতো এক গণ-বিলাসে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন রোমে (রোমক সভ্যতা যখন তুঙ্গে) অ্যারিনায় দাঁড়িয়ে ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাসদের হাতে অস্ত্র দিয়ে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ছেড়ে দেওয়া হত। কালক্রমে, এই নিষ্ঠুর প্রথা সভ্যতাগর্বী রোমের শৌখিন নাগরিকদের মনোরঞ্জনের জন্য এক উত্তেজক খেলায় পরিণত হয়েছিল। এন্ড্রোক্লিস নামে এমন এক ক্রীতদাস ও সিংহের কাহিনীটি এতই সর্বজনবিদিত যে তা থেকে এই হৃদয়হীন ব্যসনের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু ঘরপালানো ক্রীতদাস ছাড়াও অন্যান্য বলশালী ক্রীতদাসদেরও যে এ খেলায় নিয়োগ করা হত তা হয়ত সকলে জানেন না। এই নিষ্ঠুর প্রমোদের জনপ্রিয়তার কালে, রোমের সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা নিজ ব্যয়ে বাছা বাছা জোয়ান ক্রীতদাস পুষতেন। ঠিক আজকের দিনে ঘোড়দৌড় জিতবার জন্য ধনীরা যেমন ঘোড়া পোষেন সেই রকম। নানাবিধ ট্রেনিং-এ শিক্ষিত করে, হাতে একটি তলোয়ার দিয়ে তাদের প্রাচীর ঘেরা মল্লভূমিতে নামিয়ে দেওয়া হত ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে। বিশেষভাবে তাদের বাছাই করা ও শিক্ষা দেওয়া হত শুধু এই "মহৎ" উদ্দেশ্যে যে লড়াইটা যাতে বহুক্ষণ চলে, সম্ভ্রান্ত দর্শকদের প্রমোদ হতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, আনন্দ-কৌতুকে যাতে তাঁরা এ ওঁর গায়ে ঢলে পড়তে পারেন। এহেন অসম সমরে ক্রীতদাসরা খুব কম ক্ষেত্রেই জয়ী হত। সিংহও অবশ্য হত অল্পসংখ্যক। মল্লভূমিতে ছিন্নভিন্ন শরীর ক্রীতদাস ও রক্তাক্ত সিংহের দিকে তাকিয়ে দর্শকেরা উল্লাসে ফেটে পড়তেন। এইচ জি ওয়েলস লিখেছেন, রোমকরা এই নিষ্ঠুর প্রথাটি বর্বর ইট্রাসকান সমাজ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, রোমসাম্রাজ্যের প্রতিপত্তির কালে মানব সভ্যতার যে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল এমন দাবি প্রায়শই করা হয়ে থাকে।

সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ

তুকতাক ও মন্ত্রসহযোগে পায়ে হুক পরানো

মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডে বহুলপ্রচলিত "বেয়ার গার্ডেন" নামে নিষ্ঠুর খেলাটিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদেশ থেকে আমদানি করা ভালুককে খুঁটিতে লম্বা দাড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর এক পাল হিংস্র শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হত। রজ্জুবদ্ধ ভালুক চতুর্দিকের আক্রমণকারীর সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তাক্ত মৃত্যু বরণ করত। এই হৃদয়হীন তামাসা দেখবার জন্য বিলেতের অভিজাত সমাজে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে রানী প্রথম এলিজাবেথ যে এ খেলা দেখে বেশ আনন্দিত করেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তার উল্লেখ আছে। আমি পাঠকদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্ব-কালেই (১৫৫৮—১৬০৩ খৃষ্টাব্দ) সেকস্‌পীয়র তাঁর অমর সাহিত্যসম্ভার রচনা করেছিলেন। সে নিরিখে ইংলণ্ডকে কিছুতেই অসভ্য দেশ বলা যায় না। অথচ এহেন এক বর্বর প্রমোদ যে সে দেশের অভিজাত মহলে তখন খুবই সমাদৃত ছিল সে কথাও সত্য। এই বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ভার পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

বিলেতের ভালুক-কুকুরের লড়াই পরে বেআইনী ঘোষিত হলেও স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই এখনও সেখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় আনন্দোৎসব। এ খেলায় ধারালো শিং-ওয়ালা, ক্ষিপ্রগতি ও বেশ হিংস্র প্রকৃতির যেসব ষাঁড় অংশগ্রহণ করে তাদের শুধু বংশ পরিচয় বিচার ক'রে নির্বাচন করাই হয় না, উপযুক্ত তালিম দিয়ে বিশেষভাবে শিক্ষিতও করা হয়। অগণিত দর্শকের প্রমোদকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন সশস্ত্র মানুষ তিন দফায় এই নিরস্ত্র পশুর উপর আক্রমণ চালিয়ে বাহাদুরি অর্জন করে। প্রথমে আসে বর্শাধারী দুই অশ্বারোহী বা পিকাডোর। তারা বিপরীত দিক থেকে পর্যায়ক্রমে বর্শার খোঁচায় ষাঁড়কে কিছুটা আহত ও উত্তেজিত ক'রে তোলে। তারপরে আসে দু'জন বর্শাধারী পদাতিক বা ব্যাণ্ডে-রিলেরো। তাদেরও কাজ ষাড়কে ক্ষিপ্ত ও হয়রাণ করা। এই দু' পর্যায়ের প্রাথমিক লড়াইয়ে ষাঁড় যখন বেশ পরিশ্রান্ত তখন আসে শেষ বীরপুঙ্গব—মাটাডর। তার বাঁ হাতে থাকে উগ্র লাল রঙের এক প্রস্থ কাপড় আর ডান হাতে দীর্ঘ তীক্ষ্ণ তর-বারি। লাল কাপড়টি সামনে ধরলে ষাঁড় যখন তেড়ে আসে তখন বিদ্যুদ্‌গতিতে পাশে সরে গিয়ে মাটাডর তার তরোয়ালের আঘাতে ষাঁড়ের কণ্ঠনালী ভেদ করবার চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষাঁড়কে ধরাশায়ী করতে বহুবার অস্ত্রাঘাতের প্রয়োজন হয়। আর সে সময়টায় "সভ্য" দর্শকদের একটানা হর্ষধ্বনিতে কানে তালা ধরে যায়। বর্বরতার এখানেই শেষ নয়। মাটাডর ও তার প্রথম দু' পর্যায়ের সঙ্গীরা যখন মল্লভূমি প্রদক্ষিণ করে বীরের অভি-

নন্দন কুড়োতে থাকেন তখন অন্য সহকারীরা এসে ষাঁড়ের শিরশ্ছেদ করে মুণ্ডহীন ধড়টা প্রাঙ্গণের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। বিশেষ আদরযত্নে পালিত হবার জন্য এসব বলির পশুর মাংস নাকি খুবই সুস্বাদু হয় এবং চড়া দামে বিক্রীও হয়ে যায় অভিজাত ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে। স্পেন দেশে কুশলী মাটাডররা গণ্যমান্য নাগরিক বলে স্বীকৃত ও উচ্চ সরকারী খেতাবেও ভূষিত হন বলে শুনেছি। কেননা তাঁরা যে নামকরা স্পোর্টসম্যান।

এ তো গেল বাছা বাছা সভ্য সমাজে পশু নির্যাতনের কাহিনী। অগণিত রসজ্ঞের চোখের সামনে মানুষের মানুষ মারাও যে জনপ্রিয় স্পোর্টস হতে পারে

লড়াই শুরু

মুখের চেহারা

তার পরিচয় পাই হাল-দুনিয়ার সভ্যতম (অনেকের মতে) দেশ আমেরিকায়। ম্যাডিসন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ মুষ্টিযুদ্ধে লোকে লোকারণ্য হয়, টিকিট বিক্রী হয় লক্ষ লক্ষ ডলারের। সেই মল্লভূমিতে প্রতিপক্ষের মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে কত মুষ্টিযোদ্ধা যে নিহত হয়েছেন বা চিরদিনের মতো দৃষ্টিহীন বা পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তা সত্ত্বেও সেখানে দর্শকের কোনদিন কমতি হয় না। সেই সুবেশ, সুসভ্য জনতার সামনে মুষ্টিযোদ্ধাদের মুখ বুক যখন রক্তে ভেসে যায়, অথবা তাঁদের কেউ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যখন গোঙাতে থাকেন বা অসাড় হয়ে যান তখন চাঁদে-পাড়ি-জমানো দেশের সংস্কৃতিবান মানুষেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। এই কর্কশ বৈপরীত্যের মধ্যে কি ভাবে যে সামঞ্জস্য করা যায়—জানি না।

সামঞ্জস্য শুধু এক উপায়েই হতে পারে। অপ্রিয় শোনালেও কথাটা হয়ত সত্য যে আজকের সভ্য মানুষের চরিত্রে মার্জিত-রুচির খোলসটা খুবই পাতলা আর তার ঠিকই নীচেই আদিম প্রবৃত্তির পুরু পুরু স্তর এখনও বেশ বহাল তবিয়তে বর্তমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলির নিম্নবর্ণের হিন্দু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মুরগির (বা মোরগের) লড়াই নামে যে প্রমোদটি বহুলপ্রচলিত তাতে আমি খুব নিন্দনীয় কিছু দেখি না। এই অঞ্চলে ও সংলগ্ন বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের বহু অনগ্রসর এলাকায় চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পূজা, পার্বণ ও মেলায় সে উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয়। তা ছাড়া এহেন জনগোষ্ঠীর জীবনে সভ্যতার প্রলেপ প্রায় কিছুই পড়েনি ব'লে, আদিম অরণ্যচারী অস্তিত্বের রেশ যে এখনও অনেকটা অব্যাহত আছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বনে জঙ্গলে হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ ক'রে তাদের এখন বেঁচে থাকতে হয় না সত্য, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সশস্ত্র সংগ্রামও এখন অতীত দিনের কাহিনী। তবু সেই সদাশঙ্কিত, রক্তাক্ত যুগের স্মৃতি এত সহজে মুছে যাবার নয়। তাই নিহত পশু বা প্রতিপক্ষের রক্তাপ্লুত দেহের উপর দাঁড়িয়ে উল্লাস করবার দিন গত হওয়ায়, মুরগির লড়াই প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রমোদের মধ্য দিয়ে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদেরই শুধু দায়ী করা যায় কিনা সন্দেহ। এই তো সেদিনও কলকাতার সম্ভ্রান্ত 'বাবু' সম্প্রদায় বুলবুলির লড়াই, মেড়ার লড়াই প্রভৃতিতে

পায়রতাড়া করে সুযোগ সন্ধান

মশগুল ছিলেন। বর্ণহিন্দু সমাজ বলিদান প্রথা আজও উঠে যায়নি। রাজনীতিক্ষেত্রে হাল আমলের ঘুনোঘুনির কথা না হয় নাই তুললাম।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী যে এলাকাগুলির উল্লেখ করেছি মুরগির লড়াই শুধু সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় আর কোথাও হয় না, এরকম ধারণা করাটা সম্পূর্ণ ভুল হবে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (১৯৬২ সংস্করণ; পঞ্চম খণ্ড) প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, গ্রীস, এশিয়া মাইনর রোম; মধ্য যুগের ইংলণ্ড, ইটালী, জার্মানী, স্পেন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আমেরিকা, কিউবা, মেক্সিকো, পুয়েটোরিকো প্রভৃতি দেশে এ খেলার জনপ্রিয়তার বিশদ বিবরণ আছে। জি আর স্কট-এর লেখা 'দি হিস্ট্রি অব কক-ফাইটিং' নামে অতি উপাদেয় ও দুষ্প্রাপ্য বইটিতে (কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এক কপি আছে) সম্ভবত এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেখান থেকে দেখছি, খৃষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি ও শেষদিকে ভারতবর্ষে মুরগির লড়াই-এর কেন্দ্র হিসাবে লখনউ খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে লড়াই-এর উপযোগী করবার জন্য কুলশীল বিচার করে বাছা বাছা মোরগকে দীর্ঘকাল তালিম দেওয়া হত, যাতে তাদের ক্ষিপ্রতা ও হিংস্রতা বাড়ে, যাতে তারা পরপর দু তিন দিন অবধি যুদ্ধ করতে পারে। বলা বাহুল্য, লখনউ-এর অভিজাত সম্প্রদায় এই প্রমোদের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সে সময়ে ইংলণ্ডে লড়াকু মোরগকে শিক্ষিত করবার ব্যাপারে সবচেয়ে নাম কিনেছিলেন কর্নেল মরডণ্ট নামে এক ব্যক্তি। বিলেতের মুরগির লড়াই-এ তাঁর মোরগরা প্রায় সর্বদাই জয়লাভ করত। লখনউর খ্যাতির কথা শুনে তিনি একবার তাঁর দল-বল নিয়ে সেখানে এসেছিলেন 'নেটিভ'দের গর্ব খর্ব করতে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লখনউ শহরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় মরডণ্ট সাহেবের প্রত্যেকটি পাখিই পরাজিত হয়। এই ঘটনাকে বিষয়বস্তু করে সেকালের বিখ্যাত চিত্রকর জোহান জোফানী যে ছবিটি এঁকেছিলেন তার একটি প্রতিলিপি ওই গ্রন্থের ১২৮নং পৃষ্ঠার মুখোমুখি মুদ্রিত হয়েছে। ছবিতে দেখা যায়—গণ্যমান্য ইউরোপীয়েরা ডানদিকে এক শামিয়ানার নীচে উপবিষ্ট। অন্য সব দিকে কৌতূহলী ভারতীয় দর্শকের ভিড়। সামনে যুদ্ধোন্মত্ত দুই মোরগ। মল্লভূমির বাঁদিকে দাঁড়িয়ে মরডণ্ট সাহেব উত্তেজিতভাবে দুহাত বাড়িয়ে তাঁর পাখীকে উৎসাহিত করছেন আর ডানদিকে দুজন পাগড়িপরা ভারতীয় সাবাশ দিচ্ছেন তাঁদের পাখিকে। দুপক্ষেরই সহকারীরা অন্য মোরগ হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছেন দুপাশে। জোফানীর আঁকা ছবি যাঁরা দেখেছেন (কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে তাঁর কয়েকটি মূল ছবি রক্ষিত আছে) তাঁরাই সেগুলির
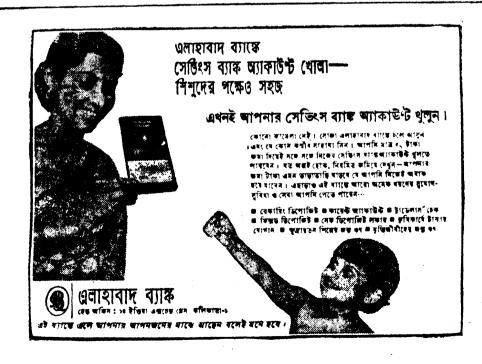
উৎকর্ষের কথা জানেন। এ ছবিটিতেও সে সব গুণাগুণ বর্তমান।

লখনউ-এ মুরগীর লড়াই এখনও হয় কিনা সঠিক জানি না তবে সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে ভারতীয় অভিজাত সমাজে এ প্রমোদটি এখন আর তেমন সমাদৃত নয়। এ খেলার বর্তমান পৃষ্ঠ-পোষক গ্রাম-গ্রামান্তরের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ যাদের অনটনক্লিষ্ট শ্লথগতি জীবনে এহেন উত্তেজনাপূর্ণ বৈচিত্র্যের হয়ত বা প্রয়োজন আছে।

প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলি বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ থানার ঝিলিমিলি ও আর কয়েকটি গ্রামে তোলা। সেখানে প্রধানত আদিবাসীদেরই বাস। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী বহু গ্রামেও মুরগীর লড়াই হতে দেখেছি। শীতের এক সকালে ঝিলিমিলির হাটতলার কাছে বহু লোকের বেষ্টনী দেখেই বুঝলাম সেখানে মুরগির লড়াই-এর আসর বসেছে। ভিড় ঠেলে দেখি মুরুব্বীরা সবে সমবেত হয়েছেন; তাদের পায়ে পরানো দড়ি ভারী ইট বা পাথরের টুকরোর সঙ্গে বাঁধা। নিজের নিজের চৌহদ্দির মধ্যে তারা নিরীহভাবে মাটি থেকে দানা খুঁটে খাচ্ছে। দেখলে বোঝাই যায় না লড়াই-এর সময় এরা কতদূর ক্ষিপ্র ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। মোরগের মালিকরা এদিক-ওদিক ঘুরছেন, পায়ে যারা হুক পরিয়ে দেবেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। কোন্ কোন্ মোরগের জোটবন্দী হবে তা স্থির করছেন। মোরগের ডান পায়ে হুক পরাবার ব্যাপারে নিয়মকানুন আছে, তুকতাক আছে। ছোট ছোট কাপড়ের থলিতে নানারকম হুক নিয়ে যে কয়েকটি লোক মালিকদের কাছে ঘুরছেন তারাই এ "শিল্পে" পারদর্শী; ফিতে দিয়ে অঙ্কুশ এঁটে দেবার সময় বিড়বিড় করে যে মন্ত্র পড়া হয় তা শুধু তাঁরাই জানেন। শত অনুরোধেও আমাকে কেউ সে মন্ত্র বললেন না, কেননা তাহলে মন্ত্রের কার্যকারিতা নাকি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়াও তুকতাক আছে—যা পাখীর মালিকদের কাছে শুনলাম। মোরগ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় উত্তর ছাড়া অন্য দিকের দুয়ার দিয়ে বার হওয়াই বিধি। কেননা, উত্তরে মুখ করে বেরোলে যমের দক্ষিণ-মুখী দুয়ারের সামনাসামনি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাতে পাখীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বাড়ি থেকে হাটতলা এই সারা পথ পাখীকে চাদরে ঢেকে আনাই প্রশস্ত, তাতে কেউ কুদৃষ্টি দিতে পারে না। অথচ হাটতলায় পৌঁছে প্রতিপক্ষের চোখের সামনে পাখীকে মাঠে ছেড়ে দিতে বাধা নেই। জোটবাঁধাটা যতদূর সম্ভব সমানে সমানেই হয়ে থাকে; ছোট পাখীর সঙ্গে বড় পাখীকে লড়তে দেওয়া হয় না। অলিখিত নিয়ম অনুসারে পরাজিত মোরগের (সে মৃত বা আহত যাই হোক না কেন) একটি ঠ্যাং পান যিনি বিজয়ী মোরগের পায়ে হুক বেঁধেছেন তিনি আর

বিজয়ীর রণহুংকার—জয়!

তুমুল লড়াই

বাকি খড়টার হকদার বিজয়ী মোরগের মালিক। আহত পাখী যদি আর লড়াই করতে না চায় তাহলে তাকে পরাজিত বলেই সাব্যস্ত করা হয়। দু'টি পাখীই গররাজী হলে খেলা 'ড্র' হয়ে যায়। এসব অলিখিত নিয়ম সবাই এত দীর্ঘকাল মেনে এসেছে যে এ নিয়ে কোন বিতণ্ডা হয় না বললেই চলে।

মোরগের পায়ে হুক পরানো হলে, দুই মালিক তাঁদের পাখীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ছেড়ে দেন। দু'পক্ষের সমর্থক ও সাধারণ দর্শকদের তুমুল উৎসাহধ্বনির মধ্যে মোরগরা ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ পাঁয়তাড়া কষে, এপাশ-ওপাশ ঘুরে আক্রমণের সুযোগ সন্ধান করে। তারপরে, হঠাৎ ডানায় ভর দিয়ে মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে, শরীর ও মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রেখে, সশস্ত্র পা চালায় অন্য মোরগের দেহ লক্ষ্য করে। কখনও কখনও মোক্ষম জায়গায় অস্ত্রাঘাতের দরুন দু'-এক মিনিটের মধ্যেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময় লাগে বেশী। এক-একবার লাফিয়ে উঠে হুটোপাটির পরে মাটিতে নেমে আবার পাঁয়তাড়া কষা—আবার আক্রমণ—এইভাবে লড়াই চলতে থাকে যতক্ষণ না কোন অতর্কিত আঘাতে এক পক্ষ পঙ্গু বা ধরাশায়ী হয়। বিজয়ী মোরগ তখন দর্পিত ভঙ্গিতে বার কয়েক গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে। তারপরে আসে আরেক জুটি, তারপরে আরও। সমবেত জনতার উত্তেজিত চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হতে থাকে। নিরানন্দ গ্রামীণ জীবনের বেশ কিছু মুহূর্ত কেটে যায় এক তীব্র উদ্দীপনাময় পরিবেশে।

অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ, শীতের এই তিনটি মাস মুরগির লড়াই-এর জন্য প্রধানত নির্দিষ্ট। তবে অন্যান্য মাসেও এ খেলা নিষিদ্ধ নয়। কোন কোন অঞ্চলে বহু রণজয়ী মোরগের মালিককে ফুলের মালা পরিয়ে বা শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে অভিনন্দিত করাও হয় শুনেছি। ফলকথা, নিষ্ঠুর হলেও, আদিম প্রবৃত্তির স্মারক হলেও, এ খেলা আমাদের গ্রামীণ জীবনের অঙ্গ এবং সেজন্যই বঙ্গ-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রবন্ধ রচনায় সেটাই কৈফিয়ত।

(ক্রমশ)

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

ভ্রম সংশোধন : 'দেশ'-এর ১৫ মাঘ সংখ্যায় 'দাঁইহাট'-শীর্ষক প্রবন্ধে চাণ্ডিল নামক স্থানটি বিহারের অন্তর্গত না বলে ওড়িশার অন্তর্গত বলে উল্লেখিত হয়েছে।

উদ্ভিদ এবং মাধ্যাকর্ষণ

ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করুন। মাটির বুকে আপনি বীজ পুঁতে দিলেন। এই বীজের স্বাভাবিক অংকুরোদ্গমের জন্যে ঠিক যা যা করণীয় সবই করা হল। উপযুক্ত পরিমাণ জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দেওয়া হল, সেই সংগে প্রয়োজন মত অক্সিজেন পাওয়ার ব্যবস্থাও। তারপর অপেক্ষাও করুন। নির্দিষ্ট সময় পর দেখা যাবে, সুপ্ত বীজের একটি অংশ থেকে জীবনের অস্তিত্ব স্বরূপ বিকশিত হয়ে উঠছে অংকুর। অঙ্কুর ক্রমেই বড় হল। অবশেষে তার একটি অংশ নিচের দিকে নেমে গেল, মাটির স্তরের ভেতরে। যার নাম মূল। অপর অংশ উপরের দিকে ঠেলে উঠল ক্রমে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পল্লবিত হয়ে উঠল। যার নাম কাণ্ড।

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় উদ্ভিদের মধ্যে এইভাবে সক্রিয় জীবন লাভ হয়ত একটা সাধারণ ঘটনা। কেউ কেউ বলবেন এটাই তো প্রাকৃতিক নিয়ম? কিন্তু উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাছে দীর্ঘকাল ধরে এটা একটা বড় রকমের রহস্য। বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে জীব-রসায়ন বিজ্ঞানে অসাধারণ কৃতিত্ব উদ্ভিদ বিষয়ক কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নকে নতুনভাবে উন্মীলিত করেছিল। যেমন ধরুন গাছের শেকড় উপরের দিকে না উঠে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে কেন? সাধারণ ধারণা, মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, কারণ, গাছের প্রয়োজনীয় কতকগুলি খাবার মাটির মধ্যেই থাকে এবং এর জন্যেই আকর্ষণ মাটিকে কেন্দ্র করে।

তা না হয় হল। কিন্তু ওই শেকড় শাখা প্রশাখা বিস্তার করে মাটির গভীর স্তরে প্রবেশ করার সময় এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে, যা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে আজও বড় রকমের এক বিস্ময়। যেমন ধরুন, দ্বিপত্রবীজ উদ্ভিদের প্রধান মূল

অতঃপর পুরাকীর্তির সত্যতা প্রমাণেও সন্দেহ? স্বাভাবিক, কারণ পৃথিবীতে এক ধরনের লোক আছে যাঁরা পুরাকীর্তি সংগ্রহের ব্যাপারে একেবারে পাগল এবং আর এক ধরনের লোক আছে যাঁরা তাঁদের ঠকানোর ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। শুধু ভারতেই নয়, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মোক্ষম আড্ডা রোম, কায়রো, মধ্যপ্রাচ্য এবং প্রায় সর্বত্র সংগ্রহের নেশার ঘোরে প্রথম শ্রেণীরা। দ্বিতীয় শ্রেণীরা নানা রকম কারচুপি মাখিয়ে যা কিছু তাই দু দশ হাজার বছরের পুরনো জিনিস বলে তাঁদের হাতে তুলে দেন। প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা না থাকলে এদের হাতে যে কেউ ঠকে যেতে পারেন। অথচ পুরো মাশুলের অঙ্কটা তার জন্যে পকেট থেকে বের করে দিতে হয়। সম্প্রতি এই অপকর্ম বন্ধ করার এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন ব্রিটেনের র‍্যাঙ্ক প্রিসিশন ইনডাসট্রিজ। নাম অ্যাটম স্পেক অ্যাটোমিক অ্যাবসরপশন স্পেকট্রোফটোমিটার। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ডঃ মাইকেল হাঘস যন্ত্রটির সাহায্যে কয়েকটি পুরাকীর্তি ঝুটা না খাঁটি, পরীক্ষা করে দেখছেন। এই যন্ত্র খৃষ্টপূর্ব ৪000 থেকে ২000 বছরের পুরনো সামগ্রীর সত্যতা প্রমাণ করতে পারে। পুরা কীর্তি সংগ্রহকারীর যন্ত্রটির সাহায্য নিয়ে অনিবার্য ঠগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন, সন্দেহ নেই

বেশির ভাগ সময় সরাসরি নিচের দিকে নেমে যায়, সমতলের সংগে প্রায় উলম্ব-ভাবে। অথবা মাটির স্তর ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার সময় যখনই বাধা পায়, সামনে কোন পাথর বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুর সামনে পড়ে তখনই সংগে সংগে তারা নিজস্ব গতিপথ পরিবর্তন করে। এমন ধরনের পথ পরিবর্তনের আসল দায়িত্ব কার ওপর থাকে?

প্রথম প্রশ্নটি আরও একটু খতিয়ে দেখা যাক। ধরা যাক, শেকড়কে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং যেহেতু শেকড় সংগ্রহ করতে পারে এমন ধরনের খাবার মুখ্যত মাটির মধ্যেই মেশান থাকে, অতএব শেকড়কে মাটির মধ্যে প্রবেশ করতেই হবে। অর্থাৎ অধোগতি ছাড়া তার আর কোন পথ নেই। এ ধরনের যুক্তিও শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধোপে টেঁকে নি। বিশেষ করে গত দশকে কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানের মধ্যে উদ্ভিদ বিষয়ক যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চালান হয়েছিল কোন কোন বিজ্ঞানীর মনে তারা যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। ওই সমস্ত পরীক্ষায় কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য জুগিয়ে কিছু কিছু বীজের অংকুরোদগম করা হয়। দেখা যায় স্বাভাবিক অংকুরোদগমের পর বীজগুলি থেকে যে সমস্ত শেকড় শাখা প্রশাখা বিস্তার করে খাবারের মধ্যে প্রবেশ

করল, তাদের চালচলনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কেমন যেন একটা বিভ্রান্তির ভাব। অঙ্কুরোদ্গমের পর শেকড় প্রথমে নিচের দিকে নেমে এল। তারপর শুরু হল তাদের এলোপাথারি চলাফেরা। মূল শেকড়ের কোন একটি শাখা নিচের দিকে নামতে নামতে হঠাৎ দ্রুত পাশ বরাবর এগিয়ে যেতে লাগল। কোনটি কিছুদূর পাশ বরাবর এগিয়ে উপর দিকে ঠেলে উঠতে লাগল। আবার এক একটি শাখা ঘুরপাক খেয়ে এমনভাবে চলতে শুরু করল, যা দেখে মনে হয় তারা যেন সত্যিকারের পথ নির্দেশটি গুলিয়ে ফেলেছে।

আধুনিক জীব-প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের মতে গাছের শেকড় সব সময়ই তার উপর প্রতিক্রিয়াশীল অভিকর্ষবলের প্রতি বিশেষ অনুগত। অভিকর্ষ টানের অভিমুখ বরাবর সে অগ্রসর হয়। ফলে পৃথিবীর বুকে যে সমস্ত গাছপালা জন্মায় তাদের শেকড় সব সময় পৃথিবীর অভিকর্ষ টান বরাবর এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। মহাকাশ যান বা কৃত্রিম উপগ্রহে যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তার কারণ, ওই সমস্ত যান বা উপগ্রহের নিজস্ব কৃত্রিম অভিকর্ষ বল সব সময় নিচের দিকে সমানভাবে কাজ করে না। কখনও কখনও তাদের লব্ধি বা রেজালট্যান্ট পাশ বরাবর বা উর্ধ্বমুখী হয়। এবং এর জন্যেই সেখানকার পরিবেশে উদ্ভিজ্জের শেকড় এদিক সেদিক বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করে।

এ তো গেল শেকড়ের কথা। শেকড়ের মত গাছের কান্ড এবং তার শাখা প্রশাখা বিস্তারের ব্যাপারটিও জীব-প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের কাছে আরও একটি বড় রকমের ধাঁধা। ভাবতে গেলে সত্যিই যেন অবাক হতে হয়। এক একটি গাছ অঙ্কুরোদ্গমের পর কান্ডের উপর ভর করে কেমন শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে। কোন ডাল গেল সোজা আকাশের দিকে। কোন ডাল ডান পাশে, চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে শুধু একটি মাত্র কান্ডের উপর ভর করে প্রকৃতির এক জটিল নিয়মে কী সুন্দরভাবেই না ভারসাম্য বজায় রাখে। কোন গাছের গুঁড়ি এক দঙ্গল ডালপালা নিয়ে কেমন এক দিকে ঝুঁকে রয়েছে। কারোর বা দু একটি ডাল অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। তবু তাদের নিজস্ব ভার, ঝড়ের ধাক্কায় বা মৃদু ভূমিকম্পে পুরো গাছ একটিমাত্র গুঁড়ির উপর ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকে, সহসা ভেঙে পড়ে না। অদ্ভুত মনে হয়। বড় বড় বাড়ি তৈরি করার সময় যাঁরা স্থপতি, ওই সমস্ত বাড়ির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে তাঁদের কত কসরৎই না করতে হয়। কিন্তু ওই সমস্ত গাছপালা যাদের শাখা প্রশাখা বিন্যাসের ধারা আরও বেশি জটিল প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে যেন আপনা থেকেই ভারসাম্যের কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায়। তাদের শাখা প্রশাখা, ফলফুল প্রত্যেকের ভরকেন্দ্রের লব্ধি বা রেজালট্যান্ট একটি স্থির ভারকেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হয়, যার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় গুঁড়ির পক্ষে তাদের ভার সহ্য করা সহজ হয়ে পড়ে।

এবং আসল রহস্য এখানেই। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গাছে ডালপালা এবং বিভিন্ন ধরনের শারীরবৃত্তীয় যন্ত্রপাতি যে নিয়মিত সাড়া দেয়, উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা একথা অনেক কাল ধরেই বিশ্বাস করে আসছেন। কিন্তু কীভাবে, এর যথাযথ উত্তর যোগান সংশয়াতীতভাবে আজও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, চিংড়ি মাছ অথবা খোলাওয়ালা অনুরূপ কোন প্রাণী গতিশীল অবস্থায় নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে যে ধরনের যন্ত্রপাতি কাজে লাগায়, উচ্চ পর্যায়ের কোন কোন উদ্ভিদের দেহেও নাকি অনুরূপ যন্ত্রপাতি থাকা সম্ভব। চিংড়ি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের সঙ্গে তাল রেখে চলাফেরার জন্যে ঠিক যে ধরনের পদ্ধতির স্মরণাপন্ন হয়, ওই একই কারণে উদ্ভিদও ওই ধরনের কলাকৌশল অবলম্বন করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, চিংড়ি বা অনুরূপ খোলা জাতীয় জলজ প্রাণীর দেহে স্ট্যাথোলিথস নামে এক ধরনের যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ওই সমস্ত প্রাণী পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান কোথায় কীভাবে কাজ করছে, সেটা বুঝতে পারে। এর জন্যে চিংড়ি মাছ ছোট্ট থোলের মত দেখতে স্ট্যাথোলিথসের মধ্যে খুদে খুদে বালুকণা ভরে নেয়। চিংড়ি সাঁতার কেটে চলার সময় বিভিন্ন কোণ সৃষ্টি করে পাশ ফিরলে স্ট্যাথোলিথসও ওই সঙ্গে এক পাশে ঝুঁকে পড়ে। তার ভেতরকার বালুকণা তখন গড়িয়ে গিয়ে ধাক্কা মারে ঝুঁকে পড়া দেওয়ালের গায়ে। চিংড়ি যখন যে দিকে কাত হয়, বালুকণাগুলি সেই দিকে অগ্রসর হয় এবং গমনপথে স্ট্যাথোলিথসের যে অংশটি সামনে পায় তার গায়ে গিয়ে আঘাত করে। অর্থাৎ কখন কোথায় গিয়ে তারা ধাক্কা সৃষ্টি করবে সেটা নির্ভর করে, সাঁতার কেটে চলার সময় চিংড়ি কোন দিক বরাবর কাত হল তার উপর। অতঃপর স্ট্যাথোলিথস নামের ওই কক্ষটির সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুতন্ত্র সেই ঘাতের স্পর্শ মুহূর্তে পৌঁছে দেয় চিংড়ি মাছের মস্তিষ্কে। স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে বয়ে আসা এই সঙ্কেতের সাহায্যে চিংড়ি বুঝতে পারে তার দেহের কোন অংশটি কীভাবে জলের মধ্যে অবস্থান করছে।

জলের মধ্যে সাঁতার কেটে চলার সময় মাধ্যাকর্ষণের অনুভূতি পাওয়ার জন্যেই যে স্ট্যাথোলিথস নামের এই অদ্ভুত যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেটা প্রমাণ করার জন্যে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছেন। একটি পদ্ধতিতে, জলের চৌবাচ্চার মধ্যে বালির পরিবর্তে লোহার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর চৌবাচ্চাটির মধ্যে কয়েকটি চিংড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। দেখা গেল, বালির অভাবে মাছগুলি তাদের স্ট্যাথোলিথসের মধ্যে টপাটপ লোহার গুঁড়োই ভরে নিচ্ছে এবং বালির সাহায্যে ঠিক যেভাবে তারা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অনুভব করে থাকে, ওই গুঁড়োর সাহায্যেও সেই কাজটি চমৎকারভাবে চালিয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু গোল বাধল, যখন এক খন্ড চুম্বক নিয়ে এসে চৌবাচ্চাটির মধ্যে সাঁতার কাটা অবস্থায় যে সমস্ত চিংড়ি বিচরণ করছিল তাদের আশপাশে সেটিকে সঞ্চারণ করা হল। দেখা গেল, চুম্বকটির স্থান পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলি কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। নিজেদের ভারসাম্য যেন হারিয়ে ফেলেছে, এমন ভাব।

অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম। চুম্বকের অনুপস্থিতিতে লোহার গুঁড়োগুলি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে এদিক সেদিক চলাফেরা করার সুযোগ পেলেও যে মুহূর্তে, চুম্বকের প্রভাব তাদের সামনে এসে হাজির হল, তারা সেই প্রভাব অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করল। চুম্বকটিকে যখন বাঁ পাশে নিয়ে যাওয়া হল স্ট্যাথোলিথসের মধ্যে বোঝাই করা লোহার গুঁড়ো ছুটে চলল বাঁ পাশে। আবার চুম্বকটিকে নিচের দিকে সরিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তারা গিয়ে ধাক্কা মারল ওই থলির নিচের দিকে। চুম্বকটিকে যখন এলোপাথাড়ি এদিক সেদিক সঞ্চারিত করা হল, থলির মধ্যেকার লোহাচুর তখন বিক্ষিপ্তভাবে স্ট্যাথোলিথসের গায়ে ধাক্কা মারতে লাগল। ফলে চিংড়িরা তাদের গতিসাম্য দারুণভাবে হারিয়ে ফেলে এবং উদ্ভ্রান্তের মত এলোমেলো পাক খেয়ে জলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে দেয়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের ধারণা, গাছপালার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চারণের ব্যাপারে এবং বৃদ্ধি বিস্তারের সময়, চিংড়ির স্ট্যাথোলিথসের মধ্যে অবস্থিত বালিকণার মত তাদের শরীরেও এক ধরনের কণিকা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে বাড়ন্ত গাছের ক্ষেত্রে তো বটেই। এরা স্টার্চ কণা। শেকড় অথবা কান্ডের যে সমস্ত অংশ দ্রুত বেড়ে চলে এবং শারীরবৃত্তীয় যে ধারা মাধ্যাকর্ষণে সাড়া দেয় স্টার্চ নামে ওই জটিল রাসায়নিক যৌগের কণিকার সমাবেশ সেখানে সবচাইতে বেশি। পরস্পর সংঘবদ্ধভাবে তারা অবস্থান করে। কেউ কেউ মনে করছেন, মাধ্যাকর্ষণের টানে ওই কণিকারা কোষের গায়ে ধাক্কা সৃষ্টি করে উদ্ভিদের

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মাধ্যাকর্ষণের অভিমুখে সঞ্চালিত করে।

লন্ডনের বেডফোর্ড কলেজের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক আউডাস ব্যাপারটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : মনে করুন, বাক্সের মত একটি উদ্ভিদ কোষের মধ্যে ভিড় করে আছে কিছু সংখ্যক স্টার্চ কণা। মাধ্যাকর্ষণের টানে ওই কণার কয়েকটি নিচের দিকে নেমে এল। এসে তারা ঘাত সৃষ্টি করল কোষের নিচের দিককার প্রাচীরের গায়ে। এই ঘাত বিশেষ ধরনের রাসায়নিক যৌগ সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্ভিদ-কোষকে উদ্দীপিত করল। ইংরেজীতে একে বলা হয় কেমিক্যাল মেসেঞ্জার বা রাসায়নিক দূত। সোজা কথা, এটি এক ধরনের উদ্ভিজ্জ হরমোন। এই হরমোনই কান্ড বা শেকড়ের কোন একটি অংশকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। কোষের বৃদ্ধি অভিকর্ষের দিকে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক আউডাস জটিল এই বিষয়টি বোঝানোর জন্যে অদ্ভুত একটি মডেল তৈরি করেছেন। প্লাস্টিকের বাক্স। বাক্সের মধ্যে ভরে নেওয়া হয় এক ধরনের তেল। এই তেল প্রোটোপ্লাজমের ভূমিকা গ্রহণ করল। তেলের মধ্যে রাখা হল প্লাস্টিকের চূর্ণ। ঠিক যেন প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান স্টার্চ কণিকা। অতঃপর বাক্সটিকে বিভিন্ন কোণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অধ্যাপক আউডাস প্রোটো-প্লাজমের মধ্যে সঞ্চরণরত স্টার্চ কণিকার গতিবিধি নির্ণয় করেন। ওঁর বক্তব্য, কোষের কৌণিক অবস্থানের উপর নির্ভর করছে, কতটা পরিমাণ স্টার্চ কণিকা কোন দেওয়ালের উপর জমবে, কতটা ঘাত সৃষ্টি করবে এবং কোন দিক বরাবর। এবং এদের উপরই নির্ভর করবে উদ্ভিদ কী পরিমাণ বৃদ্ধিজনিত-হরমোন তার নিজের দেহ থেকে নির্গত করবে। যার কাজ উদ্ভিদের শেকড় বা কান্ডকে বাড়িয়ে তোলা এবং প্রয়োজন মত বিশেষ দিক বরাবর সঞ্চারিত করা।

অধ্যাপক আউডাসের এই মন্তব্য মহাকাশযানের গাছপালাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একটু আগেই বলেছি, নভোচরেরা লক্ষ করেছেন, মহাকাশযানের মধ্যে উদ্ভিদের কান্ড বা শেকড় বিক্ষিপ্তভাবে বাড়তে থাকে। সম্পূর্ণ কৃত্রিম পরিবেশে সেখানকার কৃত্রিম মহাকর্ষের দিক প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হতে পারে। ফলে মহাকাশযানের মধ্যে উদ্ভিদের বাড়ন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর মহাকর্ষের টান নানা দিক থেকে ঘটা সম্ভব। অতএব অধ্যাপক আউডাসের যুক্তি অনুসারে বলা চলে, সেখানে কোন উদ্ভিদ কোষের ভেতরকার স্টার্চ কণাগুলি যে দিক থেকে বেশি আকর্ষণ পায়, সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে সামনের কোষ-প্রাচীরে আঘাত করে এবং ওই আঘাতের অভিমুখ বরাবর উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে,

অতি সম্প্রতি নতুন এই তত্ত্বটির সপক্ষে কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে। যেমন ধরুন, কোন কোন বিজ্ঞানী কয়েকটি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদকে স্টার্চ দ্রবণকারী রাসায়নিক তরলের মধ্যে রেখে দেন। এর ফলে তাদের দেহকোষে সঞ্চিত সমস্ত স্টার্চ ওই দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে যায়। পরে দেখা গেল, গাছগুলি মাধ্যাকর্ষণের টানে আর কোন রকম সাড়া দিচ্ছে না। তাদের শেকড় এবং কান্ডের অভিকর্ষজনিত বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে।

অবশ্য এর ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে। যেমন কোন কোন গাছকে স্টার্চ অপসরণ-কারী দ্রবণে ভাল করে ধুয়ে নিলেও তাদের বৃদ্ধি মোটেই ব্যাহত হয় না। এমনও দেখা গেছে, বড় বড় গাছের ডালে এক ধরনের ছত্রাক আনুভূমিক তল বরাবর বেড়ে যায়, মাধ্যাকর্ষণের প্রতি তাদের অনুভূতি যথেষ্ট প্রবল। অথচ এই সমস্ত ছত্রাকের শরীরে স্টার্চ তৈরির কোন রকম ব্যবস্থাই নেই। উল্লেখ্য, প্রাণীদের শরীরে একাধিক যন্ত্র থাকে, যারা অভিকর্ষের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। অতএব এমনও হতে পারে, ওই সমস্ত ছত্রাক এবং কোন কোন উদ্ভিদের দেহেও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অনুভব করার মত একাধিক ব্যবস্থা থাকে? আর সত্যিই যদি তেমন কিছু থাকে, তা হলে ভবিষ্যতে বড় রকমের একটি সমস্যার হাত থেকে হয়ত আমরা রেহাই পেতে পারব। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, আপাতত দেখতে হবে, ঠিক কী কী রাসায়নিক হরমোন অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ অথবা ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। অতঃপর জীব-রসায়নিক পদ্ধতিতে ওই সমস্ত উদ্ভিদ এবং ছত্রাকের মাধ্যাকর্ষণ অনুভূতিতে সাড়া দেয় এমন ধরনের হরমোন সংশ্লেষণ বন্ধ করে দিয়ে তাদের বাড় বন্ধ করা সম্ভব হতে পারে?

উদ্ভিদের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আধুনিক জীববিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্তের সূচনা। এক সময়ে ধারণা ছিল, ভাল বীজ, উপযুক্ত সার, আলো এবং বাতাস—উদ্ভিদের জীবনচক্রে এরাই বুঝি একমাত্র মাপকাঠি। উত্তরকালে মিউটেশন বা গাঠনিক পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্ভিদের নিজস্ব চরিত্র অনেক কিছু পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ সমস্তেরও বাইরে, আমাদের চিরপরিচিত এই বসুন্ধরা পৃথিবী তার নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং নানা রকম জৈবিক কাজকর্মকে যে নিয়ন্ত্রিত করে, কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হলেও, গত দুই দশক আগেও এ ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানীরা গৌণ এবং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে করে এসেছিলেন। তার সাক্ষাৎকারের স্বরূপ জানার জন্যে বড় রকমের কৌতূহল আমরা লক্ষ করিনি।
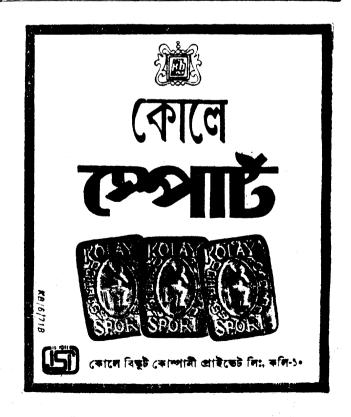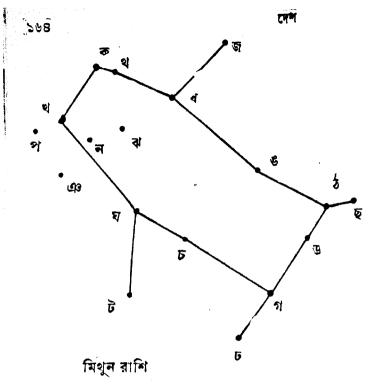
মিথুন রাশি

দীঘার সমুদ্র সৈকতের শৌখিন জ্যোতিবির্জ্ঞানীরা দিগন্ত রেখা থেকে প্রায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঊর্ধ্বাকাশে পূব দিক বরাবর মিথুন রাশি দেখেছিলেন। ক এবং খ যথাক্রমে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক প্রথম পুনর্বসু এবং দ্বিতীয় পুনর্বসু

উদ্ভিদের উপর মাধ্যাকর্ষণের সক্রিয়তার রহস্য উন্মীলিত হলে উদ্ভিদবিষয়ক কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের হয়ত আমরা সমাধান পেয়ে যাব। যেমন ধরুন, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তার মাধ্যাকর্ষণ বল ভিন্নতর। তা যদি হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদের উপর প্রভাবও ভিন্নতর হবে। অতএব কোন গাছে পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের সাড়া দেবে, আফ্রিকা, ব্রাজিল বা রাশিয়ায় তার প্রকাশ ঘটবে ভিন্নতরভাবে। এ ছাড়াও আমরা দেখেছি, কোন কোন লতান গাছ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যে দিক বরাবর লতিয়ে ওঠে, দক্ষিণ গোলার্ধে ওঠে ঠিক তার বিপরীতভাবে। লতিয়ে ওঠার দিকের উপর নির্ভর করে ওই সমস্ত গাছের ফল ধারণের ক্ষমতা। ব্যাপারটা লক্ষ করুন। সার, আলো বাতাস এ সব ছাড়াও গাছের স্থূলে এই বিন্যাসও যে ফল উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এ সত্য কিছুদিন আগেও আমাদের জানা ছিল না। উদ্ভিদ-প্রযুক্তি-বিদদের মতে, লতানো গাছের এই ডান-বাঁয়ের ব্যাপারের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণ ঠিক কী ভাবে তাদের জৈবিক কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেটা উদ্ধার করাই এখন মৌলিক সমস্যা। বর্তমান দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে কাজ চলছে। কলকাতার ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিকেল ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক টি এ ডেভিস ইতিমধ্যে এর উপর যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গবেষণাও চালিয়েছেন এবং চালাচ্ছেন। এঁদের গবেষণা উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এক নব উত্তরণের সূচনা করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আকাশ দর্শন

সম্প্রতি।

হ্যাঁ, ও'রা দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্গোপসাগরের নীলাম্বু মুখর দীঘার সমুদ্র সৈকতে। ও'দের মধ্যে ছিলেন কলকাতার বিজ্ঞানী, ছাত্র-ছাত্রী, কাঁথী এবং স্থানীয় স্কুল-কলেজের উৎসাহী ছেলেমেয়েরা, শিক্ষক শিক্ষিকা। সূর্যাস্তের পর আকাশের বুকে একে একে ফুটে উঠতে লাগল লক্ষ-কোটি তারকার মুখ। দূরবীনে চোখ এ'টে ওদের অবস্থান এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে লাগলেন প্রত্যেকে একের পর এক। ও'রা সকলেই সৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। অধ্যাপক অরূপরতন ভট্টাচার্য সাবলীল কল্পনায় উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ এবং গ্রহগুলির সঙ্গে ও'দের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বস্তুত, ভারতে এ ধরনের প্রচেষ্টা সম্ভবত এই প্রথম। এর উদ্যোক্তা কলকাতার বিজ্ঞান প্রসার সমিতি এবং বিড়লা শিল্প এবং প্রযুক্তি বিষয়ক সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালার পরিচালক শ্রীঅমলেন্দু বসু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই শিবিরটির উদ্বোধন করেন। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন, বিজ্ঞান প্রসার সমিতির শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য।

ওই দিন 'আজকের আকাশ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেন, প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত তারকামণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম সপ্তর্ষিমণ্ডল, শিশুমার মণ্ডল এবং কালপুরুষ মণ্ডল। তারকাদের মধ্যে অন্যতম অগ্নি, ব্রহ্মহৃদয়, অগস্ত্য, প্রজাপতি প্রভৃতি। প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ নক্ষত্র বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিল মুখ্যত একটি কারণে। সেটা ঋতুচক্র সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়ার প্রয়োজনে। আকাশের নক্ষত্র দেখে ও'রা বোঝার চেষ্টা করেন, কখন বর্ষা নামবে অথবা শীতকাল শুরু হবে, ইত্যাদি। পালা পার্বণ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়সূচীও তৈরি হত মহাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলীর উদয়, অস্ত বা অবস্থানের উপর লক্ষ রেখে।

আলোচনার সময় মাথার ওপর যে সমস্ত তারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের মধ্যে ছিল কালপুরুষ মণ্ডল, বৃষরাশি, মিথুন, কৃত্তিকা, রোহিনী এবং আর্দ্রা। এ ছাড়া খালি চোখে সবচাইতে উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধক এবং দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অগস্ত্য। আকাশে ওই সময়ে শুক্র, মঙ্গল এবং শনি এই তিনটি গ্রহেরও সমাবেশ ঘটেছিল। উপস্থিত দর্শকেরা দূরবীনের সাহায্যে শুক্র এবং শনিগ্রহ প্রত্যক্ষ করেন। শনির রহস্যময় বলয়ও।

অনুষ্ঠানের শেষে 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং 'মানুষ ও চন্দ্র', এই দুটি চলচ্চিত্র দেখান হয়। উদ্যোক্তাদের এ ধরনের প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

সমরজিৎ কর

বিনে স্বদেশীয় ভাষে পুরে কি আশা

মাতৃভাষার প্রতি প্রবলতম এবং ব্যাকুলতম অনুরাগ বোধ করি বাংলাদেশের গীতিকারদের মধ্যেই সবচেয়ে গভীরভাবে দেখা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্", হিন্দু মেলার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা", দ্বিজেন্দ্রলালের "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা", অতুলপ্রসাদের "আ মরি বাংলা ভাষা" প্রভৃতি বহু গানের বহু পূর্বে চার লাইনের আশ্চর্য আবেগপূর্ণ একটি গান রচিত হয়েছিল। এ গানটি বাংলা ভাষার সম্পর্কে রচিত হলেও জাতি দেশ নির্বিশেষে সবাইকার মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। নিজের ভাষাকে যে মানুষ কতখানি ভালবাসে, অন্য কোনও ভাষার ঐশ্বর্যে যে মাতৃভাষার অভাব কদাচ পূর্ণ হতে পারে না, সেটি একটি ছোট্ট তুলনা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এই গানে। এ গান লিখেছিলেন এবং গেয়েছিলেন রামনিধি গুপ্ত যিনি নিধুবাবু নামে পরিচিত। সেখানে বসে এই প্রবন্ধ লিখছি তাঁর বাস ছিল এই পল্লীতেই। কুমারটুলির ২০ নম্বর নন্দরাম সেন স্ট্রীটেই তিনি অবস্থান করতেন। এইখানেই তিনি অতি প্রবীণ বয়সে নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেন।

নিধুবাবুর নাম আজ আর কেউ জানে না। ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকগণ হয়ত নেহাৎ পঠন পাঠন সম্পর্কেই তাঁর নামকে স্মরণে রেখেছেন। গাইয়েদের মধ্যে নিধুবাবুর টপ্পা প্রচলিত নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। অথচ এক সময় নিধুবাবু ছিলেন বাংলার সঙ্গীত সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং বৈদগ্ধ্য-সম্পন্ন পুরুষ। শোভাবাজারে তাঁর গান শোনবার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হত। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পরেও সঙ্গীতে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

এর একটা প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল, আমাদের দেশে যেটা প্রায়ই ঘটে থাকে। কোথা থেকে রটে গেল নিধুবাবুর গানগুলি অশ্লীল। শিক্ষিত সভ্যসমাজ এসব গান বর্জন করলেন। ক্রমে একটা যুগের অনেক সমৃদ্ধ রচনাই সমাজের বিশিষ্ট পংক্তি থেকে বিচ্যুত হল। আমরা যখন বালক তখন আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, নির্দোষ প্রেমসঙ্গীত, নীতি এবং নিষ্ঠাবাচক বিবিধ সঙ্গীত শিখেছি কিন্তু নিধুবাবুরা যা রচনা করেছিলেন সেই টপ্পাজাতীয় গান শিখিনি। অবশ্য এখানে সেখানে কিছু কিছু যে না শুনিনি

এমন নয়। কেউ কেউ তখনও এসব গান গাইতেন। রিপন কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময় নিধুবাবুর সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলেন আমাদের বাংলার অধ্যাপক বিশিষ্ট কবি শ্রীঅজিত দত্ত মহাশয়। তিনি তরুণ বয়স্ক ছাত্রদের বলেছিলেন নিধুবাবুর গান সম্বন্ধে অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার হয়েছে। তাঁর গান অশ্লীল তো নয়ই বরঞ্চ এমন সংযত এবং মার্জিত রচনা সেকালের বাংলা সাহিত্যে কমই পাওয়া যায়। তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের অনেকের নিধুবাবুর গান সম্বন্ধে জানবার প্রবল বাসনা হয়। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে তখন বহু প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যেত। সেখান থেকে প্রাচীন সঙ্গীত সংগ্রহগুলি জোগাড় করে নিধুবাবু ও তাঁর সমসাময়িক গীতিকারদের রচনা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম।

নিধুবাবু সাড়ে পাঁচশোর মত গান রচনা করেছিলেন। এর অধিকাংশই প্রেমসঙ্গীত কিন্তু ব্যতিক্রম এই একটি গান যাতে তিনি মাতৃভাষার অতুলনীয় গৌরবকে সুরে, ছন্দে গীতে আমাদের মর্মে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। গানটি হচ্ছে—

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনে স্বদেশীয় ভাষে পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর
কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?
(কামোদ খাম্বাজ-জলদ তেতালা)

এই গানের একটি ইতিহাস আছে। ওপার বাংলায় যেমন উর্দুর আবশ্যিক আরোপে জনগণের মধ্যে মাতৃভাষার অবমাননায় ক্ষোভ জাগ্রত হয়েছিল, এই রচনার মূলেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে নিধুবাবু বাংলা ভাষার প্রতি এত আসক্ত হয়েছিলেন।

নিধুবাবু ছাপরায় গিয়েছিলেন ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে। সেখানে তিনি একজন মুসলমান ওস্তাদের কাছে গান শিখতেন। তখন পশ্চিমী টপ্পার খুব কদর ছিল। নিধুবাবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অল্পদিনেই আশাতীত যোগ্যতা অর্জন করলেন। তাঁর ওস্তাদ শিষ্যের প্রতিভায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন

—নানা অছিলায় আর শেখাতে চাইলেন না। তখন নিধুবাবু—"মিঞা সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিলেন, আমি তোমারদিগের জাতীয় বার্বানিক গীত আর গান করিব না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দী গীতের অনুবাদ পূর্বক রাগরাগণী সংযুক্ত করিয়া গান করিব।" অবশ্য তিনি বাংলা ভাষায় গান রচনায় হাত দিয়েই হিন্দী গীতের অনুবাদের আবশ্যকতা বিশেষ অনুভব করেননি, নিজের প্রতিভাতেই অনন্যসাধারণ মানবিক ও সংবেদনশীল সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত "বিদগ্ধ তদর্পণ" নামক নিধুবাবুর সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন—"এই গান লেখার কারণ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র ইঙ্গিত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'নিধু গুপ্ত' প্রবন্ধে আছে। তিনি লিখেছেন—দেওয়ানজী ও অন্যান্য ধনী শৌখীন বাবুদের বৈঠকে বা মজলিসে পশ্চিমে খেয়াল বা টপ্পা গীত হইত বটে, কিন্তু তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়কে সুখ দিতে পারিলেও মনকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারিত না।" এটা খুবই সত্য কথা এবং নিধুবাবু যখন তার অনুপম ভঙ্গীতে বাংলা রাগ-

সঙ্গীত রচনা করতে আরম্ভ করলেন তখন শ্রোতামাত্রেই বিশেষ পুলকিত বোধ করছিলেন।

নিধুবাবুর এই ক্ষুদ্র দেশাত্মবোধক গানটির কিন্তু প্রকৃত মূল্যায়ণ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই গানটিতে যে ভাবধারা তিনি প্রচার করেছিলেন তাতে একটা প্রচণ্ড বিপ্লবের কাজ হয়েছিল। এই প্রেরণার ফলেই সঙ্গীত জগতে হিন্দী গানের অধীনতা থেকে বাংলার গায়ক সমাজ মুক্তিলাভ করেছিলেন। তাঁরা গাইবার মত গান পেয়েছিলেন এবং সঙ্গীত রচনা করবার উত্তম মাধ্যমও খুঁজে পেয়েছিলেন। নিধুবাবু যা করে গেলেন তা তো হিন্দী গানের অনুবাদ নয়, ভারতীয় সঙ্গীতে বাংলা গানের একটি নিজস্ব স্থান নিরূপণ। দেশিক সমাজে, অর্থাৎ ইনটেলেকচুয়েল ক্ষেত্রে তিনি অনেক পূর্বেই একটি "জয় বাংলা" ধ্বনি সার্থকভাবে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। যে যুগে বাংলা ভাষার ধারণাশক্তি সম্বন্ধে তেমন চেতনা ছিল না এবং যে যুগে মঙ্গলকাব্যের আদিম ধারাই বাংলাদেশে প্রবহমান ছিল সেই যুগে তিনি স্বীয় ভাষার বিপুল সম্ভাবনার বিষয় চিন্তা করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে পথনির্দেশও করেছিলেন। তাঁর গৌরব এইখানেই। কেবলমাত্র পাঁচশো বাংলা টপ্পা বা রাগসঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেননি। তাঁরই প্রভাবে একটি গোটা শতাব্দীর সঙ্গীত গড়ে উঠেছিল। তাঁর প্রচেষ্টার সার্থকতা থেকেই পরবর্তী কালেও বহু প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠেছিল।

এই গানটির একটি প্রচলিত সুর আমি খুব অপ্রত্যাশিত এবং আশ্চর্য পরিবেশে শুনতে পেয়েছিলাম। বোধ করি সেটা ১৯৩৮ সাল হবে। আগরতলায় দুর্গা পূজোর প্রাক্কালে আমাদের বাড়িতে একজন বৃদ্ধ তালুকদার এসেছিলেন। তিনি তখন প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন। কলকাতায় এবং উত্তর ভারতের নানাস্থানে তিনি বহু কষ্টই গান বাজনা শিখেছিলেন কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের ফলে তাঁর বিষয় সম্পত্তির আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আর্থিক অভাব এবং রোগভোগে শেষ জীবন তিনি কষ্টে অতিবাহিত করেছিলেন। গান ছিল এঁর স্বভাবের সঙ্গে জড়িত, কথায় কথায় গানের পদ গেয়ে উঠতেন। সেদিনও তিনি আমাদের বৈঠকখানায় আপন মনে গান করে যাচ্ছিলেন—এমন সময় আমার কানে গেল তিনি গাইছেন—"নানান দেশের নানান ভাষা।" সেই করুণ, মধুর আবেগপূর্ণ সুরটি তাঁর কাছ থেকে আমি সংগ্রহ করেছিলুম। এই ভদ্রলোকের কোনও পরিচয় আমার জানা ছিল না। তিনি এখানে চিকিৎসার জন্য আসতেন এইটুকু জানতুম। শুনেছিলাম তিনি কমলাসাগর (কসবা) অঞ্চলের কোথাও থাকতেন। এঁর সুরটিতে কামোদ খুব স্পষ্ট ছিল, প্রধান সুর ছিল খাম্বাজ। এই গানে তিনি বোলতান প্রয়োগ করেছিলেন তাও মনে আছে। এই সুরের স্বরলিপি বোধ হয় আমি বিশ্বভারতী পত্রিকায় দিয়েছিলুম স্মরণ হচ্ছে। সেটি কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল মনে পড়ছে না। আর কাউকে আমি এ গানটি গাইতে শুনিনি। কালীপদ পাঠক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এ গানের সুর তাঁর জানা ছিল না।

সম্প্রতি সমতট অঞ্চলে স্বাধীনতার পটভূমিকায় বাংলা ভাষার সম্মানিত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনেক আলোচনা, অনেক গান, অনেক কবিতায় উদ্ধৃতি দেখেছি কিন্তু মাতৃভাষার এই প্রাচীনতম বন্দনাটির উল্লেখ দেখতে পাইনি। প্রায় দুশো বছর পূর্বে যে গীতিকবি স্বদেশীয় ভাষার গৌরবকে এত ব্যাকুলভাবে প্রচার করেছিলেন আজকের দিনে সেই গানটির ঘোষণা না হলে আমাদের জাতীয় কর্তব্য পালন করা হবে না।

রাষ্ট্রীয় সম্মান

স্বনামধন্য সরোদ বাদক শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র মহাশয় অ্যাকাডেমীর পুরস্কার লাভ করেছেন, এ সংবাদে আমরা আনন্দিত। তিনি বহুকাল ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীত চর্চা করছেন এবং শিক্ষক হিসাবেও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। যোগ্য ব্যক্তির প্রতি সমাদর প্রদর্শনের জন্য অ্যাকাডেমী প্রশংসিত হবেন। এই সঙ্গে পদ্মশ্রী সম্মান লাভের জন্য শ্রীসলিল ঘোষ এবং শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরও অভিনন্দিত করি। সলিলবাবু আমাদের সুপরিচিত। তাঁর সদাহাস্যময় মধুর ব্যক্তিত্বে আমরা বার বার আকৃষ্ট হয়েছি। তাঁর প্রতিভা বহুদিকে বিস্তৃত। কিছুকাল পূর্বেই ইনি শ্রীশচীন দেববর্মণ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশ করেছেন। কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আসরে দেবদুলালবাবুর আবেগপূর্ণ আবৃত্তি শুনে অনেকেই আনন্দিত হয়েছেন, বেতারে তাঁর কণ্ঠ সর্বজনপরিচিত। এই নিরহংকার, লাজুক তরুণটিকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে চেনেন তাঁরা তাঁকে গভীরভাবেই ভালবাসেন।

শার্ঙ্গদেব

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

অমরনাথ যখন বাদলকে নিয়ে বেরুলেন, তখন বিকেল পাঁচটা। গ্রীষ্মের শুরু। বছরের এই সময়টা বঙ্গোপসাগরের বিখ্যাত বাতাস এসে কলকাতাকে ভাসিয়ে দেয়। আকাশে ধোঁয়া নেই। বাড়ির ছাদে ছাদে ছেলেদের ঘুড়ি ওড়াবার খুব হুল্লোড়। মহাত্মা গান্ধী তখন কলকাতায় এসেছেন।

অমরনাথ পরেছেন ফিনফিনে কোঁচানো ধুতি ও কাঁদনার পাঞ্জাবি, কাঁধে উড়ুনি পায়ে নিউ-কাট পাম্পশু, হাতে বেতের ছড়ি। চুল এখনও কালো, তবে গোঁফে পাক ধরেছে। শিশিরবাবুর মতনই মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত থাকে থাকে নামানো। জামার ঘড়ি-পকেটে মস্ত বড় গোল সোনার ঘড়ি। বাদলকে তার মা হাফ প্যান্ট ও সাটিনের জামা পরিয়ে দিয়েছেন, মাথার চুল পাতা কেটে আঁচড়ানো। সে মহা উৎসাহে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে অমরনাথের পাশে পাশে। অমরনাথ বললেন, উঁহু, ওরকম করবে না, সব সময় আমার হাতের এই আঙুলটা ধরে থাকবে।

বড় রাস্তার ওপর বাদলের বাবা চিররঞ্জন কথা বলছিলেন আর একটি লোকের সঙ্গে। অমরনাথের সঙ্গে ছেলেকে দেখে একটু অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন বড়বাবু, কোথায় চললেন? গুরুদাসে নাকি?

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে প্রায়ই বিকেলের দিকে গল্প করতে যেতেন বড়বাবু। ওখানে, জীবিতকালে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসতেন প্রায়ই।

অমরনাথ বললেন, না হে, একটু দক্ষিণে যাবো। তোমার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আবার রাত্তিরে ভালো চোখে দেখতে পাই না তো। একটু দেরী হলে চিন্তা টিন্তা করো না।

অমরনাথের দৃষ্টিশক্তি খুবই ভালো, বই পড়ার সময় একটা রিম-লেস চশমা ব্যবহার করেন মাত্র, কিন্তু তিনি সামান্য রাতকানা।

মোড়ের মাথায় এসে বড়বাবু প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রি সিগারেটের একটা টিন কিনলেন। ধপধপে সাদা এই সিগারেটের টিন খালি হয়ে যাবার পর বাড়ির মেয়েদের কাছে খুব প্রিয় ছিল তখন। ঢাকনা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরের টিন ফয়েল কেটে অমরনাথ প্রথমে পুরো টিনটার গন্ধ নিলেন নাকে, তারপর একটা সিগারেট বার করে ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ উদাসভাবে তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। অমরনাথ আজ বেশ অন্যমনস্ক।

বাদলের ইচ্ছে ছিল ঘোড়ার গাড়ি চড়ার, কিন্তু বড়বাবু তা নিলেন না। বাসের জন্য দাঁড়ালেন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। বৃষ্টি না হলে বিকেলের দিকে হুড-খোলা দোতলা প্রাইভেট বাসে ভ্রমণ করা তখন চমৎকার বিলাসিতা। সেই রকম একটা বাসেই ওপরে জায়গা পাওয়া গেল। বাদলের উত্তেজনার শেষ নেই। এরকমভাবে এর আগে আর সে কলকাতায় বেড়ায় নি। শহরটাকে মনে হয় যেন মায়াপুরী। দু' পাশের বিরাট বিরাট বাড়ির মাঝখান দিয়ে রাস্তা—চলন্ত বাসের ওপর দিয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, এ সবই যেন ছবির বইতে দেখা জগৎ। সদ্য গ্রাম থেকে আসা বাদলের চোখে ট্রামগুলোকে মনে হয় ছোট ছোট স্টিম লঞ্চের মতন। মাঝে মাঝে বাড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নতুন তৈরী হাওড়া ব্রীজ—যতবার দেখতে পাচ্ছে, ততবারই বাদল চেঁচিয়ে উঠছে, বড়বাবু, ঐ যে! ঐ যে!

চৌরিঙ্গিতে সাহেব-মেমের ভিড়ই বেশী। ময়দানে দেখা যায় অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গদের। ইলেকট্রিক অফিসের মাথায় উজ্জ্বল গ্লোব বহুদূর থেকে চোখে পড়ে মেট্রো সিনেমার আলো জ্বলছে, চওড়া থেকে শুরু হয়ে যাওয়া লম্বাটে তিন থাক আলো রয়েছে হলের মাথায়, তখনকার দিনে এর নামই ছিল মেট্রো প্যাটার্ন, লোকে আংটি তৈরী করতো এই ডিজাইনে। পাশেই হোয়াইটওয়ে লেড ল'র বিশাল দোকান কার্জন পার্কের দিকে সার বেঁধে দাঁড়ানো ঘোড়ার গাড়ি। বালকের বিস্মিত চোখ এই সব দৃশ্যের ছাপ বুকে এঁকে নেয়। অমরনাথ চুপচাপ বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন।

বাড়িটার সামনে লোহার গেট, সেখানে নোটিস ঝোলানো, 'কুকুর হইতে সাবধান' কিন্তু গেটের ওপাশে বাগানে কুকুর কিংবা মানুষ জনের কোনো চিহ্ন নেই। বাদল বানান করে বাংলা পড়তে পারে। অমরনাথ দু' বার চেঁচিয়ে ডাকলেন, সুরেশ্বর সুরেশ্বর! কোনো সাড়া নেই। অমরনাথ তখন হাতের ছড়িটা দিয়ে লোহার গেটে ঠং ঠং করে আওয়াজ করতে লাগলেন। একটু বাদেই একজন বৃদ্ধ চাকর এসে উঁকি মেরে বললো, দাঁড়ান, কুকুর বেঁধে আসি। এ প্রথম একটি কুকুরের গম্ভীর হিংস্র ডাক শোনা গেল, বাদল গুটিসুটি মেরে দাঁড়ালো বড়বাবুর পেছনে।

লোহার গেট পেরিয়ে একটি ছো[illegible] বাগান। তার ঠিক মাঝখানে খানিকটা ঘে[illegible] জায়গায় জল, সেখানে খেলা করছে লা[illegible] নীল মাছ। জলের ওপারে একটা সা[illegible] পাথরের পরী ডানা মেলে আছে, যে[illegible] এক্ষুনি উড়ে যাবে। বাদল সেদিকে ছু[illegible] যাচ্ছিল, অমরনাথ বললেন উঁহু, ওদিকে ন[illegible] ভেতরে এসো!

বসবার ঘরটা মস্ত হল ঘরের মতন দেয়ালে দেয়ালে অনেক ছবি। অধিকাংশ ফ্যামিলি পোর্ট্রেট, এ ছাড়া পঞ্চম জর্জ এ[illegible] হাতে সীতাকে ধরে রেখে অন্য হাতে রাব[illegible]

জটার, বধ করছেন এবং কনস্টেবলের আঁকা প্রকৃতি-দৃশ্যের কপি। ছাদ থেকে ঝুলছে মস্ত বড় ঝাড় লণ্ঠন কিন্তু সদ্য স্থাপিত ইলেকট্রিক বাল্‌বই আলো দিচ্ছে। কল টিপলেই জল পড়ে এবং সুইচ টিপলেই আলো জ্বলে—এই বিস্ময়ের ঘোর তখনও পুরোপুরি কাটেনি।

একজন মাঝবয়েসী লোক ঘরে ঢুকলেন। সিল্কের লুঙ্গি ও সিল্কের ফতুয়া পরে আছেন, মাথায় সম্পূর্ণ টাক। মাথায় একটাও চুল নেই, এরকম মানুষ বাদল আগে কখনো দেখেনি। বাদল বড়বাবুর চোখের দিকে তাকালো, বড়বাবু ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ ইনিও ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম করতে হবে। অব্রাহ্মণ বয়স্ক ব্যক্তিদেরও তখন ব্রাহ্মণ শিশুরা প্রণাম করে না। বড়বাবু বললেন, ইটি আমার মেজ শালার ছেলে। সুরেশ্বর, ব্যস্ত ছিলে নাকি? হঠাৎ এসে পড়লাম।

টাক মাথা ব্যক্তিটি অমরনাথকে প্রণাম করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আজ্ঞে, না না, কিছু ব্যস্ত ছিলাম না! আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এ তো আমাদের সৌভাগ্য! তবে একটু আগে থেকে যদি খবর দিয়ে আসতেন, তাহলে জাফর আলি খাঁ সাহেবকে বলে রাখতাম, একটু গান বাজনা করা যেত। আপনি এখনও চর্চা রেখেছেন তো?

অমরনাথ উদাসীনভাবে বললেন, না, ওসব চুকে গেছে।

সুরেশ্বর বললেন, সে কি! গোয়ালিয়রে সেই সেবার আপনার মুখে যে আলাহিয়া বিলাবল শুনেছিলাম, এখনও কানে লেগে আছে!

—সে নেশা আমার কেটে গেছে! সুরের চর্চা করে কেন মানুষে, আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য তো? আমার সে সব কিছু হলো না। সুরের চর্চা করেছিলুম শুধু গলা দিয়ে, আর কিছু না—শুধু কণ্ঠস্বরের খেলা!

—ও কথা বলছেন কেন! আনন্দ পাওয়াটাই বড় কথা। যে আনন্দ –

সুরেশ্বর হঠাৎ বাদলের দিকে ফিরে বললেন, খোকা, তুমি এখানে চুপটি করে বসে আছো কেন? তুমি ওপরে চলে যাও না! তোমার বয়েসী আরও ছেলেপুলে আছে—খেলা করবে না?

বাদল লাজুক, সে একা একা ওপরে যাবে না। সে তার ছোট্ট শরীরে একটু মোড়ামুড়ি দিল।

অমরনাথ বললেন, সুরেশ্বর, আমিও একটু উপরে যাবো। তোমার মা এখন কেমন আছেন?

সুরেশ্বরের মুখে সামান্য একটু বিস্ময়ের ছায়া খেলেই লুকিয়ে গেল। বললেন, মা? এই একরকমই, মানে—

—এখন এখানেই আছেন? এই সপ্তাহে তোমার এখানে আনানো হবে শুনেছিলাম।

—হ্যাঁ, কাল এসেছেন!

—আমি একটু দেখা করবো? দেখা করা যাবে? আমি সেইজন্যই এসেছি।

—দেখা করবেন। তা বেশ তো! দেখছি, ঘুমিয়ে আছেন কিনা।

—শোনো! উনি বাইরের লোক দেখলে বিরক্ত হন না তো?

—আপনি তো বাইরের লোক নন; অন্তত মা'র কাছে আপনি......

—সেটা যদি আমাকে চিনতে পারেন—চিনতে পারেন এখন সবাইকে? স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে?

—মা'র স্মৃতিশক্তি এত ভালো যে, বিশ্বাসই করা যায় না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মা'র অনেক সময় কাছাকাছি সময়ের ঘটনা মনে থাকে না—অথচ বহু পুরোনো ঘটনা এমন মনে আছে...কিন্তু কখন কথা বলবেন, কখন চুপ করে থাকবেন, তার কোনো ঠিক নেই! দাদা মারা যাবার পর সেই যে মাথাটা কী রকম হয়ে গেল

—চলো, একবার যাই—

দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরেই বিরাট পালঙ্কে শুয়ে আছেন মন্দাকিনী। ঠিক শোয়া নয়, তিন চারটে বালিশে হেলান দিয়ে বসা চাদর দিয়ে শরীর ঢাকা। ঘরের সব জানলা বন্ধ, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল একটা
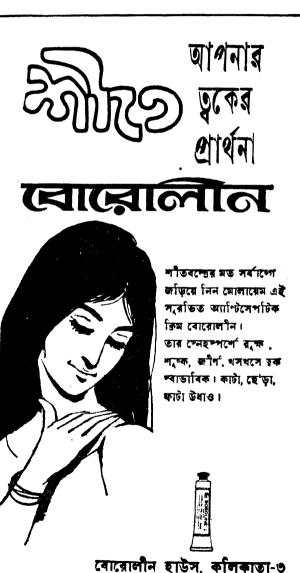
আলো জ্বালানো রয়েছে। ঘরের সব আসবাবপত্রে ঐশ্বর্যের ঝকঝকে চিহ্ন। একটা কাচের আলমারি ভর্তি দামি দামি জার্মান পুতুল। কালো মেহগনি কাঠের তৈরী আর একটি আলমারির মাথায় একটি অপরূপ ঘড়ি, প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর তার ভেতর থেকে একটা কোকিল বেরিয়ে এসে ডেকে যায়। ইংলণ্ডের ডার্বি লটারির ফার্স্ট প্রাইজ সাড়ে সাত লাখ টাকা একবার পেয়েছিলেন মন্দাকিনী।

বিছানার ওপর আধো শোয়া তাঁর চেহারা দেখে ঠিক মানুষ বলে মনে হয় না। মাথা ভর্তি ধপধপে সাদা চুল। আর্তিরক্ত ফর্সা ও বিবর্ণ মুখখানা মনে হয় মোমের তৈরী, ঠোঁট দুটি অস্বাভাবিক রকমের লাল। সব মিলিয়ে যেন একটা অপ্রাকৃত পুতুল অবিশ্বাস্য শীর্ণ একখানা হাত বুকের ওপর রাখা, সেই হাতে চারখানা আংটি, বহুমূল্য পাথর বসানো। মন্দাকিনী চোখ বুজে আছেন।

অমরনাথ সুরেশ্বরের সঙ্গে সেই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জনে ঘর ভরে গেল। বেশ কয়েকজন মহিলা, কয়েকটি শিশু। সবাই প্রণাম করলো অমরনাথকে। অমরদা প্রণাম করলো ওদের। একজন রূপসী মহিলা অমরনাথের হাত ধরে বললেন, দাদা কি সুন্দর ছেলেটি! এই, এই, মুখ নিচু করে আছো কেন? তাকাও আমার দিকে, তোমার নাম কি? সেই ঘরের মধ্যে সবাই বেশ স্বচ্ছন্দে গোলমাল করছে।

অমরনাথ সুরেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘুমোচ্ছেন নাকি? তা হলে এখন যাই বরং—

সুরেশ্বর বললেন, আপনার ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মা আজকাল প্রায় একরকমই কানে শুনতে পান না! জেগেই আছেন বোধহয়।

অমরনাথের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। খুব নিরাশ হয়ে গেলেন মনে হয়। আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু, আমি যে ওঁর কাছে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

—কি কথা? আমাকে বলুন না!

—তুমি পারবে না। সে সব শুধু উনিই জানেন।

—ঠিক আছে, মাকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। শান্তি, তুমি মা'র পাশে একটু বসো তো!

সেই রূপসী মহিলা বসলেন মন্দাকিনীর মাথার কাছে একটা চেয়ার নিয়ে। অমরনাথ চাদরের ওপর দিয়েই মন্দাকিনীর পা দুটি স্পর্শ করলেন। চোখ না মেলেই মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করলেন কে?

ওঁর গলার স্বর কিন্তু আশ্চর্য রকম পরিষ্কার এবং তীক্ষ্ণ। বয়েসের কোনো জড়তা নেই।

অমরনাথ বললেন, বড়মা, আমি অমর!

মন্দাকিনীর চোখ বোজাই রইলো। মাথার কাছে বসা সেই মহিলা মন্দাকিনীর একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফু দেবার মতন করে বললেন, মা, অমরদাদা এসেছেন! অমরদাদা!

মন্দাকিনী এবার চোখ খুলে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, একটুও মুখ ফেরালেন না। তারপর হাত দিয়ে পাশে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। শান্তিলতা তাড়াতাড়ি যে-জিনিসটা মন্দাকিনীর হাতে তুলে দিলেন, সেটা দেখে বাদলের মনে হয়েছিল, হাতল লাগানো গোল আয়না, কিন্তু আসলে সেটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। সেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মন্দাকিনী অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন অমরনাথকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন, অমর, তুই বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিস নি কেন? অ্যাঁ, তোর চোখের চামড়া নেই? নিমকহারাম!

অমরনাথ লাজুকভাবে ঘরের সবার দিকে চকিতে তাকালেন। মন্দাকিনীর পায়ের কাছে বসে থাকা ঐ বিশাল চেহারার পুরুষটিকে তখন শিশুর মতন লাগছিল। পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা। অমরনাথ বিয়ে করেছিলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে—সেই সময়কার ব্যাপার নিয়ে কেউ এখন অভিযোগ করতে পারে, তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তাঁর বিয়ে হয়েছিল অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে—সে কথা এখন বলা যায় না।

তাছাড়া এই প্রশ্ন মন্দাকিনী তার আগেও অনেকবার জিজ্ঞেস করেছেন। অমরনাথ কোনো উত্তর দিলেন না।

মন্দাকিনী আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ বউকে সঙ্গে এনেছিস? কোথায় সে?, পেন্নাম করেছে?

অমরনাথ মৃদু গলায় বললেন, পূর্ণিমা মারা গেছে।

কাকাতুয়া পাখি যেরকম চিৎকার করে ওঠে, সেইরকমভাবে মন্দাকিনী চেঁচিয়ে উঠলেন, কি? কি বললি?

তখনও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস চোখের সামনে রাখা। সোজা তাকিয়ে আছেন অমরনাথের মুখের দিকে। খুব সম্ভব ঠোঁট নাড়া দেখে তিনি কথা বোঝার চেষ্টা করেন, এখনও পারছেন না।

শান্তিলতা আবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, উনি বলছেন, ওঁর স্ত্রীর নাম পূর্ণিমা, তিনি বেঁচে নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ মারা গেছেন! পাঁচ-ছ বছর আগে।

মন্দাকিনী আবার চুপ। কথাটা তাঁর মগজে ঢুকতে কিছুক্ষণ সময় লাগলো যেন। তারপর আবার সেই রকম তীক্ষ্ণ গলায় জানালেন, ভালোই হয়েছে! বেঁচে গেছে

মেয়েটা! ওর মতন একটা বাউণ্ডুলে, অলপ্পেয়ে, লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়েছিল—
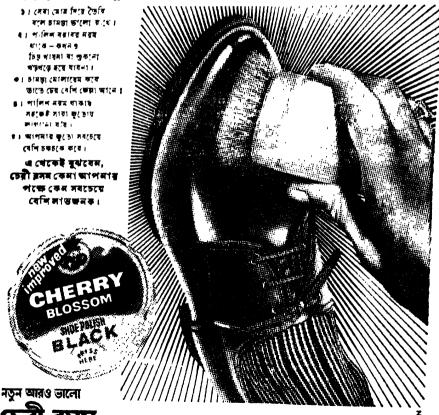
ঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বাদল। তার অমন গম্ভীর রাসভারি পিসেমশাইকে কেউ অমনভাবে ধমকাতে পারে, সে কথনো কল্পনাই করতে পারেনি। পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ব্যাপার আছে!

—ছেলেপুলে কিছু হয়েছিল? না বংশনাশ করবি?

একটু ইতস্তত করে অমরনাথ উত্তর দিলেন, আমার একটি ছেলে আছে। হাজারীবাগের বোর্ডিং ইস্কুলে পড়ে।

চাদরের তলা থেকে আর-একটি হাত বার করে মন্দাকিনী অন্য কি যেন খুঁজছেন। শান্তিলতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলেন একটা পিকদানী। মন্দাকিনী নিঃশব্দে কি যেন ফেললেন তাতে, মনে হয় টুকটুকে লাল রক্ত, অথবা পানের পিকও হতে পারে। কেননা, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর-এক খিলি পান মুখে দিলেন। তারপর আর একটু উঁচু হয়ে বসে বললেন, তুই কাকে যেন বিয়ে করেছিলি?

—তার নাম ছিল পূর্ণিমা।

—না-না, কাকে বিয়ে করেছিলি যেন, ঠিক মনে পড়ছে না।

—পূর্ণিমা, ফুলবাড়ির মুখুজ্যেদের মেয়ে।

—হুঁ! মনে পড়ছে। তুই বিধবা বিয়ে করেছিলি! ঠিক?

—হ্যাঁ।

শান্তিলতাকে আর বলে দিতে হল না, মন্দাকিনী ঠোঁট নাড়া দেখে নিজেই প্রায় সব বুঝতে পারছেন। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে তিনি কঠোরভাবে বললেন, তুই আমার বিছানা ছুঁয়েছিস কেন? যা চলে যা! বিদায় হ!

অমরনাথ এই প্রথম হাসলেন। প্রফুল্ল মুখে বললেন, বড় মা, আমি একটি মুসলমান মেয়েকেও বিয়ে করেছিলাম।

মন্দাকিনী শান্তিলতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি? কি বললো?

শান্তিলতা অবনত মুখে বসে রইলেন। বলতে পারলেন না। মন্দাকিনী আবার তাড়া দিলেন, বৌমা, কি বললো ঐ নচ্ছারটা? এই, তুই কাছে এগিয়ে আয়, নিজে বল্‌ আমার কানের কাছে!

অমরনাথ দ্বিতীয়বার কথাটা উচ্চারণ করার পর মন্দাকিনী বুঝতে পেরে চোখ বুজলেন। আস্তে আস্তে বললেন, বেরিয়ে যা! দূর হয়ে যা! এক্ষুনি যা!

অমরনাথ বললেন, না, আমি যাবো না।

—এই সন্টু! একে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দে! এই আপদটাকে কেন ঘরে ঢুকতে দিয়েছিস!

—বড়মা, আমি যাবো না।

—সন্টু! রামপিয়ারীকে ডাক! একে দূর করে দে বাড়ি থেকে!

—বড়মা, আমি যাবো না।

সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। তাঁরও মুখে একটু একটু হাসির চিহ্ন। এইসব কথাবার্তা তিনি আগেও শুনেছেন, দেখেছেন এই দৃশ্য।

—তুই কেন এসেছিস? টাকা! টাকা চাস্ আমার কাছে? আমি কারুকে এক পয়সা দেবো না। আমি আরও অনেকদিন বাঁচবো। কম্পানির কাগজ সব উইল করে রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে যাবো—গয়না-গাঁটিগুলো হামানদিস্তে দিয়ে গুঁড়িয়ে রাস্তার ধুলোয় মিশিয়ে দেবো। বুঝলি! আমার কাছ থেকে কেউ একটা পয়সাও পাবে না।

—আমি টাকা চাইতে আসিনি! বড়মা, আমি তোমার কাছ থেকে কি কোনোদিন টাকা-পয়সা চেয়েছি? ভগবানের ইচ্ছেয় সেরকম অবস্থা আমার কখনো হয়নি।

—কিছু পাবি না! দূরে হয়ে যা!

—আমি [illegible]

মন্দাকিনী আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন অমরনাথকে। তারপর হঠাৎ খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই কেন এসেছিস?

—আমি তোমার কাছে আমার মায়ের কথা শুনতে চাই।

—কি?

—আমাকে আমার মায়ের কথা বলো।

—মা? তোর আবার মা কে? আমিই তো তোর মা! অকৃতজ্ঞ, কুলাঙ্গার! তুই আমার বুকের দুধ খাসনি? তিন-তিনটে বছর ধরে আমি তোকে ঘুম পাড়াইনি প্রত্যেক রাত্তিরে? গু-মুত পরিষ্কার করেছি পর্যন্ত! তারপর ডানা গজাতেই পাখি উড়ে গেল। আমার আর খোঁজ করেছিলি? সেবার যখন আমি মরতে বসেছিলুম, একবার●

এসেছিলি? এখন আসা হয়েছে মায়ের জন্য দরদ দেখাতে!

বড়মা তোমার কাছে আমি আমার নিজের মায়ের কথা শুনতে এসেছি।

—কি বলছিস কি? আমি কানে শুনতে পাই না, জানিস না? শুয়োরের মতন গাঁক গাঁক করে চ্যাঁচাতে হবে না, তাই বলে—মানুষকে সন্ধ্যে লোককে জানিয়ে! বরং কাছে আয়, আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বল—

—ক'দিন ধরে আমার মায়ের কথা খালি মনে পড়ছে। মাকে কখনো দেখিনি, তুমি ছাড়া আমার মায়ের কথা এখন আর কেউ জানে না। তুমি বলো তো কিরকম দেখতে ছিল তাকে? খুব রাগী ছিল? কিংবা খুব জেদী ছিল?

মুখে কিছু না বলে একটা অংশ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, বোস এখানে। তোকে দেখলে আমার গা জ্বলে! কেন আসিস?

মন্দাকিনী তাঁর শীর্ণ হাতখানা রাখলেন অমরনাথের গায়ে। আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, জন্মরাত্রিতেই মা মরা গেলে, সেই ছেলে কখনো বাঁচে? লাখে একটা বাঁচে কিনা সন্দেহ। তেকে বাঁচিয়েছিল এই বাঙালী, বুঝলি? আমার বাবা বলতেন, ও ছেলেকে জলে ডোবালে কিংবা আগুনে পোড়ালেও মরবে না! ও অমর! তা স্বাস্থ্যটি তো এখনও দিব্যি আছে দেখছি, কত বয়স হলো?

—উনষাট!

—আমার রত্নেশ্বর বেঁচে থাকলে এই বয়েস হতো। সে তো দিব্যি আমার আগেই ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল! একটু চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত নেই! তা সে মরলো কেন, তার বদলে তুই যেতে পারলি না?

—আমার ওরকম নাম রেখেছিলে কেন?

—রত্নেশ্বর আর তুই একবয়েসী। দেড় মাস আগে পরে জন্ম। তোর মা চোখ বোজার আগে আমার হাত ধরে বলেছিল—দিদি, তোর ছেলে যদি বাঁচে, তাহলে আমার ছেলেও যেন বাঁচে—

—বড়মা, ওসব জানি। তুমি আমার জন্মের আগের কথা বলো!

—কতকাল আগের কথা, সেকি আমার মনে থাকে?

—যেটুকু মনে পড়ে।

—কেন, হঠাৎ শুনতে চাইছিস কেন?

—ক'দিন ধরে খুব মনে পড়ছে। আচ্ছা, আমার মাকে দেখতে কেমন ছিল?

—সে তো আমার থেকেও ফর্সা ছিল। তুই তোর গায়ের রং পেয়েছিস বাপের মতো। মায়ের রং ছিল একটু চাপা। তোর বাপ তো দোজবরে বিয়ে করেছিল। ঘর করে সুখ কখনও পায়নি। আমার মনে আছে, তোর যখন দেড় বছর বয়েস, তখন তোর হতচ্ছাড়া বাপ এলো একদিন, তুই তখন আমার কোলে, তোর বাপ বললো, দিদি, আপনার পুত্তুর বুঝি! সে আবার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতো তো! মরে যাই, মরে যাই! ঝাঁটা মারি ওরকম পুরুষ মানুষের মুখে!

—আমার বাবার কথা আমি জানি। তুমি আমার মায়ের কথা বলো। তাকে দেখতে কিরকম ছিল!

—কি আর বলবো! মুখপোড়ারা একটা ছবিও তুলে রাখেনি তার! একটা চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

অমরনাথ পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভেলভেট মোড়া বাক্স বার করলেন। তার মধ্য থেকে অনেকগুলো কাগজের পরত খোলার পর বেরিয়ে এলো একটা বহুকালের পুরোনো বিবর্ণ কাগজ। সেটার ওপর একটি নারীর পায়ের ছাপ আঁকা। অমরনাথ সেটা সাবধানে তুলে ধরে বললেন, এই যে, আমার মায়ের শুধু এইটুকু চিহ্ন আছে আমার কাছে। তুমিই দিয়েছিলে। আচ্ছা বড় মা, এই ছাপটা কি বিয়ের দিন তোলা হয়েছিল, না অন্য কোনো সময়ে?

দলিল পরীক্ষা করার মতন মন্দাকিনী ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কাগজটা দেখলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমার মনে নেই। আমি জানি না।

—তুমিই তো এটা আমাকে দিয়েছিলে। তুমি জানো না?

মন্দাকিনী খুব জোরে কাশতে কাশতে পিকদানীটা তুলে নিলেন। আবার তাতে ফেললেন রক্তের মতন কিছু। তারপর মুখ তুললেন, দেখা গেল তাঁর চোখে জল।

অমরনাথ একটু অপেক্ষা করলেন। চোখের জল তখনও থামছে না দেখে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুছিয়ে দিলেন মন্দাকিনীর মুখ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাঁপানী কি বেড়েছে?

—চুপ কর তো হতচ্ছাড়া! দরদ দেখাতে হবে না!

—বড়মা, বলো, এই ছাপটা নিশ্চয়ই—

—হ্যাঁ, যা ভাবছিস তাই। সরোজিনীকে চিতায় তোলার পর তার পায়ে আলতা লাগিয়ে এই ছাপ তোলা হয়েছিল। আমার ছোট বিণ্টু, বুদ্ধি করে তুলেছিল। তুই তখন একরত্তি ছেলে; আমি তোর গায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছি, বাঁচানো যাবে কিনা ঠিক নেই, বিণ্টু শ্মশান থেকে ফিরে বললো, দিদি এর মাথায় এই কাগজটা ছুঁইয়ে নাও!

—আমার মায়ের সঙ্গে তোমার এত ভাব ছিল কি করে? আমার মা তো গরীবের মেয়ে ছিলেন—মামা বাড়িতে মানুষ।

—তুই তখন একরত্তি ছেলে, এইটুকু—এখন লম্বা চওড়া জোয়ান হয়ে মাথে থই হয়েছে।

অমরনাথ হাসতে হাসতে বললেন, এখনও জোয়ান বলছো? এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি! তুমি অনেকদিন পরে দেখছো।

মন্দাকিনী রেগে উঠে বললেন, বুড়ো? ছেলেমানুষ ছেলে! এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দুপদাপ করে হামাগুড়ি দিচ্ছিস! খুব লোভ ছিল তোর, খেজুরের গুড় পেলে চোখ বুজিয়ে খাবে। গুড় খেয়ে খেয়ে পেটে এই বড় বড় কিরমি হলো—

—বড়মা, তোমার এসব কথাও মনে আছে?

—আমার সব মনে আছে। আমি কিছু ভুলি না।

—তা হলে, আর একটা কথা বলো তো! আমার জন্যই কি আমার মা মারা যায়?

—কথার ছিরি দেখো ছেলের? এতদিনেও ঘটে একটু বুদ্ধি হলো না? ছেলে কখনো মাকে মারে! তুই তোর মাকে মারবি কেন, তুই সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিস!

মন্দাকিনী অতিকষ্টে পাশ ফিরালেন। রোগা হাতখানি ছোঁয়ালেন অমরনাথের গালে। খুব নরমভাবে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে কেন?

—জানি না। এমনিই—

—শোন, রোজ রাত্তিরে ইসবগুলের ভূষি জলে ভিজিয়ে রেখে সকালবেলা খাবি। তাতে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে।

—আমার মা কি খুব কষ্ট পেয়েছিল?

—কখন?

—আমার জন্মের সময়? না হলে আমার জীবনটা এরকম হয়ে গেল কেন?

দোতলার চওড়া বারান্দায় বাচ্চারা তখন খেলা শুরু করে দিয়েছে। বাদলকেও টেনে নিয়ে গেছে। চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা। কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ—ছুঁয়েই নাম বলতে হবে। বাদল ওদের কারুর নাম জানে না—ওরাও বাদলের

নাম জানে না। বাদলের চেয়ে বছর অনেক বয়েসে বড় একটি ছেলে বললো, এই, তোর নাম কি রে? হোয়াট ইজ ইওর নেম?

—মাই নেম ইজ বাদলরঞ্জন মুখার্জী। আই রীড ইন ক্লাস টু।

—কি নাম বললি? বা—দ—অল! না বাদোল! তুই বুঝি বাঙাল?

অমনি আর সব ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠলো, বাঙাল! বাঙাল!

বড় ছেলেটি বললো, এই চুপ! জ্যাঠাইমা বকবে! বাদল আবার কি নাম? ওরকম নাম তো চাকরদের হয়।

বাদলের মনে খুব আঘাত লাগলো। অনেক কিছু প্রতিবাদ করবে ভেবেও সে শুধু বললো, মোটেই না!

—যাক গে, বুঝেছি, বাঙালদের ওরকম নাম হয়। তোর ভালো নাম কি? তোর ভালো নাম নেই?

বাদলের একটাই নাম। ডাকার সময় বাড়ির লোক বলে বাদলা! কিন্তু সেটা তো ওদের জানানো যায় না। সে মাথা নাড়লো দু'দিকে!

—এ মা, ডাক নাম আর ভালো নাম এক? আমাদের সক্কলের দুটো করে নাম। এই তো, ওর নাম গগনেন্দ্র আর ডাক নাম হেবো, ওর নাম শঙ্করী আর ডাক নাম চুটকি, এর নাম পার্থসারথি আর ডাক নাম পলতা, আর এই যে, এই রেণু, তোর ভালো নাম কি রে?

একটা তিন-সাড়ে তিন বছরের পাঁচকে মেয়ে আঙুল চুষতে চুষতে বললো, ইন্দ্রাণী!

সেই ছেলেটি বললো, ও তো আমার আপন বোন নয়, তাই ওর ভালো নাম আমি জানি না। রেণু আমার মাসতুতো বোন! ওরা হাতিবাগানে থাকে, বেড়াতে এসেছে। তুই হাতিবাগান চিনিস?

বাদল বললো, হ্যাঁ, চিনি।

—ঠিক বলছিস? হাতিবাগানে কটা হাতি আছে বল তো!

—একটাও না।

—ইল্লি আর টকের আলু! রোজ সন্ধেবেলা ওখানে হাতি বেরোয়—কিচ্ছু জানে না!

রেণু নামের মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বললো, হ্যাঁ, দুটো হাতি আছে, আমাদের বাড়ির সামনে।

বাদল তার কথায় কান না দিয়ে সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, আর তোমার নাম বললে না?

ছেলেটি গর্বিতভাবে বললো, আমার নাম জীমূতবাহন। ডাক নাম হটু।

নাম বলেই ছেলেটি সাগ্রহভাবে তাকিয়েছিল বাদলের দিকে। বাদলের ঠোঁটে সামান্য হাসির আভা দেখেই সবাককে জিজ্ঞেস করলো, হাসছিস যে? হাসির কি আছে?

বাদল ফিক করে হেসে বললো, ওরকম আবার কারুর নাম হয় নাকি? বাহন মানে তো ঘোড়া!

ছেলেটি এবার বাদলের জুলপি টেনে ধরে বললো, তোকে বুঝি লেখাপড়া শেখায় না! বাহন মানে ঘোড়া? যার পিঠে চড়ে যাওয়া যায় তাকে বলে বাহন। কার্তিকের বাহন কি, বল্ বল্ বল, ওয়ান, টু—

—ময়ূর?

—সরস্বতীর বাহন কি?

—হাঁস!

—শিবের বাহন কি?

—গরু!

—মোটেই না। ষাঁড়।

জুলপি ছেড়ে দিয়ে ছেলেটি এবার বিজ্ঞের মতন বললো, জীমূত মানে মেঘ। মেঘ কার বাহন জানিস? পাঁচটা গুনলেও তো বলতে পারবি না! ইন্দ্র। আমার নামের মানে ইন্দ্র।

পরবর্তী জীবনে এই জীমূতবাহন নামের ছেলেটির সঙ্গে বাদলের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। যৌবনে এরা দু'জনে এক সঙ্গে একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। (ক্রমশ)

বিড়লা অ্যাকাডেমি আয়োজিত বাৎসরিক প্রদর্শনীটি যে ক্রমশ শিল্পীবৃন্দের ব্যাপক সহযোগিতা লাভ করছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চম বাৎসরিক প্রদর্শনীর বিপুল শিল্পসম্ভার দেখে। অ্যাকাডেমির দুটি বৃহৎ গ্যালারীতে শিল্প ও ভাস্কর্য নিদর্শন সমেত ১০৭ জন শিল্পীর ১৪৪টি কাজ দেখা যায়। সুচারু সজ্জা পরিকল্পনা ও বিশেষ করে শিল্পী পরিচয়সহ সুন্দর পরিচিতি-পুস্তিকা প্রকাশ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই। প্রদর্শনীতে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের অনেক শিল্পীর সাক্ষাৎ

দুলারী —রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
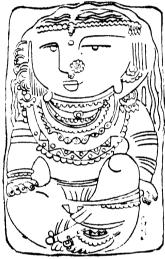
পেলেও, দেশের অন্যান্য শিল্পীর অধিক সংখ্যক কাজ চোখে পড়েনি। ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ যদি প্রচারকার্য বিষয়ে একটু সচেতন হন তাহলে অচিরেই এই প্রদর্শনীটি যে সর্বভারতীয় আকার পরিগ্রহ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতীয় রীতির কয়েকটি কাজ থাকলেও প্রদর্শনীতে বিমূর্ত, সমবিমূর্ত, কোলাজ ও গ্রাফিকের বহু নিদর্শন দেখা যায়—সে হিসাবে এটিকে সমকালীন বলা চলে। ছবিগুলি সুনির্বাচিত হলেও ওপরের গ্যালারীর দু'একটি ভারতীয় চিত্র ও নীচের গ্যালারীর সমকালীন কয়েকটি নিদর্শন বাদ দিলে প্রদর্শনীর মান আরও উন্নত হত। তেল ও জলরঙে গ্রাফিক ও কোলাজের কয়েকটি কাজ চোখে পড়ে এবং বলতে বাধা নেই, তরুণ শিল্পীদের প্রাধান্যই অধিক। বয়ঃজ্যেষ্ঠ দু'একজন শিল্পী আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য বিভাগে কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শন চোখে পড়ে। সমকালীন কাজের অধিকাংশ নিদর্শনই পরীক্ষামূলক, বিশেষ করে নীচের গ্যালারীতে। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুনীল দাস, বিকাশ ভট্টাচার্য, ভি মেনন, মাধবী পারেখ, প্রকাশ কর্মকার ও রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুনীল দাসের ডিজাস্টার একটি উল্লেখ্য রচনা—এটিতে শিল্পী তাঁর পরিকল্পনা ও ড্রয়িংয়ের আপন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বিকাশ ভট্টাচার্যের লাইফ ইন দি নেম অব রিলিজান প্যানেল-প্রধান রচনা। তেলরঙ ও কোলাজ মাধ্যমে শিল্পী নানা খণ্ড খণ্ড প্রতীকের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের ধারাবাহিক জীবনযাত্রার রূপ ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সুকৌশল শূন্য স্থান বিভাজন লক্ষণীয়। চতুষ্কোণভিত্তিক ও বোতল-সবুজ রঙপ্রধান টুইগ পিকচার্স-এর ভি মেনন অনবদ্য ছন্দ রূপায়িত করেছেন। তেলরঙ ও প্যাস্টেলে মাধবী পারেখ গুরু-তে সূচিশিল্পের অপূর্ব কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আকারকে কেন্দ্র করে একটি বলিষ্ঠ সামগ্রিক আকারের অবতারণা করাই প্রকাশ কর্মকারের বৈশিষ্ট্য। নীল ও বিশেষ করে গভীর লাল রঙ প্রধান কম্পোজিশন (৭৯)-এ তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি কাজই অনবদ্য। লোকচিত্রভিত্তিক দুলারীতে তাঁর সাবলীল রেখা ব্যবহার অনুকরণীয়। মুড ইন ব্লু কোলাজ নিদর্শন। গভীর নীলরঙের দুটি স্তরভেদপ্রধান কাগজের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর লালরঙের কাগজের দুটি মূর্তি স্থাপনা করে শিল্পী এক অপরূপ মায়ালোকের সৃষ্টি করেছেন। বিজলী বাতির তীব্র আলোকমালার মধ্যেও যেন তাঁর এই ছোট্ট ছবি দুটি স্নিগ্ধ প্রদীপশিখার মত আপন মহিমায় জ্বলতে থাকে। কম্পোজিশনের দিক থেকে যোগেন চৌধুরীর পেন্টিং-১ উল্লেখ্য, বিশেষ করে তাঁর রঙ ব্যবহার রীতি দ্রষ্টব্য। আকার সৃষ্টি ও কারুকার্যের দিক থেকে অমরেন্দ্র চৌধুরীর দি ফেস উল্লেখ্য। নির্মল দত্তের বৈশাখী পূর্ণিমায় রঙের স্তরভেদ সৃষ্টি অনেকের চোখে পড়ে। অপরাপর ছবির মধ্যে অরুন্ধতী ব্যানার্জির হোয়্যার দি স্কাই ইজ বাউণ্ড (কোলাজ), মৈত্রেয়ী ব্যানার্জীর কালো, বেগুনী ও বোতলসবুজ রঙভিত্তিক কোয়ায়েট ভিক্টর, বরেন বসুর নীল, হলুদ ও লালরঙ প্রধান কারুকার্যমূলক কার্নিভাল অব লাইফ, শুভ্রপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের অদিম সরলতার প্রতীক, আউট-বার্স্ট, বি আর পানেসকের নিসর্গদৃশ্য ফার অ্যাণ্ড নিয়ার, করুণা সাহার ফেস্টিভ মুড, গোপাল সান্যালের স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্স, সজল রায়ের ডেসট্রাকসন, রবিন মণ্ডলের মেটাফিজিক্যাল, সনৎ করের

ফলেন হিরো —অজিত চক্রবর্তী

ক্লেল ফ্লাওয়ারস, গণেশ হালুইয়ের ডন, বালভদ্র আগরওয়ালের পেন্টিং, জগদীশ ব্যানার্জীর দি বার্ড, ভারতী চৌধুরীর অন দি ওয়ে (কোলাজ)-এর নাম করা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রশংসা দাবি করেন বাতায়নে শাকলাত (গডেস), মানব বড়ুয়া (হার টয়েজ) ও অমল চাকলাদার (দি অ্যারকেড)। ফ্রুড-এ গোপাল ঘোষ তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। পেন্টিং-এও সুবল পালের নিজস্ব অঙ্কনরীতির পরিচয় মেলে। রঙ ব্যবহার কৌশলের জন্য পরিতোষ সেনের থ্রু দি গ্লাস-এর নাম করা যায়। ইশা মহম্মদের ফাইট ও মানু পারেখের পেন্টিংও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। গ্রাফিক প্রিন্ট নিদর্শনের মধ্যে অমিতাভ ব্যানার্জীর হোলি কেভ (রঙীন এচিং) প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিশেষ করে প্রতীকপ্রধান সূক্ষ্ম রেখাচাতুর্যের জন্য। পরিকল্পনা ও ও সূক্ষ্ম রেখাজাল মাধ্যমে ইমেজারি সৃষ্টি করার জন্য শ্যামল দত্তরায়ের কমপোজিশন (রঙীন এচিং) অনেকের নজরে পড়ে। আর একটি নিদর্শন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—শৈলেন [illegible] দি ড্রুম। এতে তাঁর বিভিন্ন প্রয়োগ রীতি ও গভীর খোদাই কাজ দ্রষ্টব্য।

ভাস্কর্য বিভাগে কয়েকটি কাজ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুত এই প্রদর্শনীতে কর্তৃপক্ষ যে এতগুলি নিদর্শন সংগ্রহ করতে পেরেছেন সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। কারণ, বার্ষিক প্রদর্শনীগুলিতে সচরাচর ছবির সংখ্যাই থাকে অধিক। ভাস্কর্যের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে অজিত চক্রবর্তীর ক্র্যাব ও ফলেন হিরো, মাধব ভট্টাচার্যের রিক্লাইনিং টর্সো ও মানিক তালুকদারের কাপল। পরিকল্পনা ও অভিনব গঠন এবং আকারদানের দিক থেকে ক্র্যাব (কাঠ) উল্লেখ্য। ফলেন হিরো-ও (পাথর) পরিকল্পনা ও খোদাইয়ের দিক থেকে প্রশংসনীয়। এটির মধ্য দিয়ে ভাস্কর বিগত শৌর্যের সুন্দর প্রতীক প্রকাশ করেছেন। ভাস্কর্যের বহু পরীক্ষিত বিষয়বস্তু হলেও রিক্লাইনিং টর্সো-তে (কাঠ) মাধব ভট্টাচার্য একটি নতুন আকারভঙ্গী ও সাবলীল কাব্যরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। মাণিক তালুকদারের কাপল (প্লাস্টার) লোকচিত্রভিত্তিক। সামান্য মিশরীয় শিল্পের প্রভাব থাকলেও নিছক সরলতা ও গঠন-প্রণালীর জন্য এটি চোখে পড়ে যায়। আকার, গঠনরীতি ও কারুকার্যের দিক থেকে রাহুল ধারিওয়ালের ড্রিম (কাঠ) অনেকের ভাল লাগে। নতুন পরিকল্পনা ও বিশেষ করে আকারের মধ্য দিয়ে অন্য আকার (penetrating forms) সৃষ্টি করার জন্য তারক গড়াইয়ের কমপোজিশন (প্লাস্টার) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে সুভাষ রায়ের নুড (কাঠ), মনজিৎ সিং সিধুর লাইং ফিগার (কাঠ) ও অতুল বড়ুয়ার উইন্টার ওয়াকিং (ব্রঞ্জ)-এর নাম করা চলে।

*

জীবনের পথে চলতে চলতে বহির্জগতের বহু দৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু সবগুলিই হয়ত আমাদের মুগ্ধ বা বিচলিত করে না। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখে হয়ত আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি, কিন্তু শহরে বা পল্লীগ্রামের [illegible] শ্রেণীর বিচিত্র শাখাপ্রশাখা তথা নানাজাতীয় পত্রবিন্যাস চোখে পড়ে শুধু তাঁর যাঁর থাকে শিল্পীসুলভ রূপসন্ধানী দৃষ্টি চোখ। বুরো কারজি ঠিক এইজাতীয় এক শিল্পী। আসামবাসী এই শিল্পী নানাস্থানে ঘুরেছেন, বিভিন্ন ও নানা আকারের গাছের শাখাপ্রশাখা লক্ষ করেছেন ও তাদের মধ্য থেকেই নানা সুন্দর আকারের সন্ধান পেয়েছেন বিশেষ করে ছোট ছোট ডালপালার মধ্যে যে কত সুন্দর ও স্বাভাবিক আকার নিহিত থাকতে পারে তার তিনি প্রমাণ দেন অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনীতে। ছোট ছোট ডালপালার নানা নিদর্শন তিনি প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখেন। বলা বাহুল্য, লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রত্যেকটিই যেন এক একটি পরিচিত জীব। কোনটি দেখে মনে হয় উট, কোনটি বা টিকটিকি, আবার কোনটি দেখে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও নিদর্শন। বুরো কারজি প্রয়োজনমত এগুলি স্বাভাবিক রেখেছেন আবার কোথাও হয়ত বা ডালের ছাল চেঁচে কোনও অংশ ঘষে প্রয়োজনমত পরিচিত কোনও আকার দান করেছেন। অধিকাংশ স্থলেই তিনি স্বাভাবিক আকার রেখেই প্রচ্ছন্ন রূপের সঙ্গে সকলের পরিচয়সাধন করেছেন। বলাবাহুল্য, মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে এগুলি বিশেষ উপযোগী। বুরো কারজিকে এ জাতীয় নিদর্শন সংগ্রহ করতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করতে হয়েছে সন্দেহ নেই, তবুও মনে হয় মূল্য বিষয়ে তিনি যদি একটু বিবেচনা করেন তাহলে এগুলির বহুল প্রচার সম্ভব। আর একটি কথা। এ জাতীয় প্রদর্শনী নতুন নয়, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিত্রপ্রিয়

আর ছোটটির এখনও এক বছর পার হয়নি। চোখে জল দেখে অপু মায়ের কাছে এগিয়ে যায়। মা আব্দা করে আসবে, কবে আসবে ......। 'জীবন থেকে নেওয়া'র পরিচালক জহির রায়হানের সর্বশেষ চিত্র 'লেট দেয়ার বি লাইট'। এটি ইংরেজি। শোষিত মানুষের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত এই চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় নেমেছেন সুচন্দার ছোট বোন ববিতা। এটি এখনও মুক্তির প্রতীক্ষায়।

আরও অনেক রিপোরটার এসে পড়লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় সুচন্দা দেবীকে বললাম, স্বামীর সঙ্গে আপনার একখানা ছবি দেবেন। —ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। ওঁর সঙ্গে আমার তো কোন ছবি নেই। প্রথমে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। পরে দেখলাম, সত্যিই ঘরে কোথাও কোন ছবি নেই। সুচন্দা বললেন, উনি এসব পছন্দ করেন না। স্বভাবে সাদামাটা, সবকিছুতেই সাধারণ। এরই ভিতর একটি ছোট্ট ছবি ... একখানি ছবি আছে। আমার জন্মদিনের ও দিদির। প্রথম পাঠাবেন কিন্তু।......

—সুদেব রায়চৌধুরী

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে মার কথাগুলোই মনে পড়ছিল কেবল...সকলের দায় মিটিয়ে সবার ভাগ বিলিয়েই ভাগিরথী।

দুনিয়ায় কেউ একলার ভাগ্য নিয়ে আসেনা রে, বলেছিলেন মা, সবার সঙ্গে সবার ভাগাভাগি। নিজের ভাগ্যে খায় না কেউ, সবাইকে ভাগ দিয়ে সবার ভাগ থেকে নিয়েই খেতে হয় পেতে হয় সবাইকে। দিলে পরে তবেই পায়। সবাই সবার ভাগের ভাগীদার।

একই দেহের অংশ প্রত্যংশের ন্যায় সবাই সবার অংশীদার। সবার সুস্থতায় সর্বাঙ্গীণ কুশল।

দাঁড়াতে হয় অবশ্যি নিজের পায়েই, পরের ওপর ভর দিয়ে নয়—সেভাবে দাঁড়ানোই যায় না আদৌ, এমনকি খাড়া থাকাটাই দায়, কিন্তু তাছাড়া আর সব দিকে স্বভাবতই আমরা পরমুখাপেক্ষী। নিতেই পেতে হয়, পেয়েই দিতে হয়—সব কিছুই—সব কিছুতেই। না দিয়ে পাওয়ার উপায় নেই—ঠিক যেন ওই চুমুর মতই।

এমন সময় একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এল—'তোমাদের নাম কি শিবরাম আর দেবেন?'

'হ্যা, কেন? কী হয়েছে?'

'ডাক পড়েছে আপিসঘরে। জেলের আপিসে। নাম রেজেস্ট্রি করাতে হবে না? কম্বল টম্বল থালা গেলাস্ দেবে যে তোমাদের।'

গেলাম আমরা। দুখানা করে কম্বল দিল দুজনকে—একটা গায়ে দিতে আর একটা পাতবার জন্যে। এনামেলের থালা গেলাসও পেলাম সেই সঙ্গে।

'এসো আমার সঙ্গে তোমরা। কোথায় থাকবে ঠিক করে নাও, এসো। দেখে শুনে নাও সব।

গেলাম তার সঙ্গে।

বিপুল পরিধি নিয়ে বিরাট গুদামঘর। থাকে থাকে খাড়া করা যত স্টীলফ্রেমের শেলফ পরের পর সাজানো—চলে গেছে সারি সারি এধার থেকে ওধার অব্দি। শেলফগুলি তাকিয়ে দেখার মতই—পাঁচ ছটা করে তাক প্রত্যেক শেলফে—তাকগুলো লম্বা চওড়ায় পাঁচ ছ হাত করে।

বেশির ভাগ তাকেই কম্বল বিছানো। কম্বলের নিশানায় জানা গেল কারো না কারো দখলে। বুঝলাম এই তাকগুলিই আমাদের থাকবার জায়গা।

'এবার পছন্দ করে বেছে নাও কে কোনটা চাও।' বলল ছেলেটা।

'নিলেই হোলো একটা। নিতেই হবে যখন—পছন্দটা কিসের!' আমি বলি—'আচ্ছা ভাই, এইসব তাকগুলোয় থাকত কী আগে? ইয়া ইয়া এই সব তাকে?'

'ডক ছিল না আগে এটা? ডকের গুদাম ছিল তো—ডাকের যত আসবাব—মালপত্তর থাকত কিনা এখানে। লোহা লক্কর যন্তর টন্তর—এই সব মনে হয়।'

ছেলেটি ব্যক্ত করে—'নাও, পছন্দমত যে কোনটায় তোমরা কম্বল বিছিয়ে ফ্যালো। এই দুটো তাক্ নাও, কেমন?'

তাকিয়ে দেখি।—'দুজনে এক তাকে থাকলে হয় না? আমরা বন্ধু তো, একসঙ্গে থাকি যদি? শুয়ে শুয়ে বেশ গল্প করা যায় তাহলে।'

'কোনো বাধা নেই। দুজন করে একটা তাকে থাকলে ভালোই তো। এর মধ্যেই অনেক ছেলে এসে গেছে, আরো কত আসবে। জায়গার টানাটানি পড়বে তখন। কাউকেই

তখন একটা ডাক একলার জন্য দেওয়া যাবে না।'

'সব জেলেই তো ওয়ার্ডার-রা থাকে, থাকে না? কিন্তু এখানে তেমন দেখছি না কেন হে?' জানতে চায় দেবেন। —'এ এক সৃষ্টিছাড়া জেল! সত্যি।'

'হঠাৎ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে কিনা! আছে জনকতক জেলের ওয়ার্ডার। খাবার দেবার সময় তাদের দেখতে পাবে। পুলিস পাহারাওলারাও আছে কয়েকজনা—ঐ সদরেই থাকে। গেটের কাছটায় আপিস না? সেখানেই গেট আগলে রাখে, পাহারা দেয়।

...নাও, থালা বাটি সব রেডি করো, রেডি হও, রুটি তরকারি—রাতের খোরাক সব এসে পড়বে এক্ষুনি।

আহারপর্ব সমাধার পর শয়নপর্ব। এমন ঘুম পাচ্ছিল আমার যে...

সবে শীতের মৌসুম! কলকাতার মধ্যে হলে তেমন কিছু শীত নয়। কিন্তু এই গঙ্গার ধারে ডক-এরিয়ায় শীত যেন ডাকাতের মতই পড়ল। এমন হঠাৎ পড়ল যে হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল আমাদের—রাত খানিকটা এগুতেই না। শেষ রাতে যা দাঁড়ালো তা আর বলবার নয়।

কম্পান্বিত কলেবরে গুটিসুটি মেরে যে করেই হোক কাটালাম তো রাতটা। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়েছি বাইরে। ঠান্ডায় হাত পায় খিল লেগে যাচ্ছিল, সূর্য উঠতেই বেরিয়ে পড়েছি চত্বরে—রোদ লাগিয়ে একটুখানি গায় গরম হবে। ঠান্ডামারা দেহটা বাগিয়ে নিতে হবে। সব ছেলেই রোদ পোহাতে বেরিয়েছে। কাঁটা তারের বেড়ায় ঘেরা বিরাট সেই প্রাঙ্গণটা এখন ছেলেয় ছেলেয় ভর্তি—গুলতানিতে গুলজার! বাঙালী আছে বিহারী আছে পাঞ্জাবীরা আছে সেই দঙ্গলে—কত হবে সংখ্যায়? এক হাজার? দু হাজার? আড়াই হাজার? কে জানে কতো।

খাতার পরে হিসেব কষতেই আমি পোক্ত নই, এমনি মাথাগুনতিতে পাল্লা পাবে?

দেবেনও এসে জুটেছে একটু পরে।

খানিকবাদে ঘণ্টা বাজল সদরে। সদর ফটকের কাছটায়।

'কিসের ঘণ্টা ভাই?' শুধোলাম এক-জনকে।

'খাবার ঘণ্টা।' সে বললো—'খিদে পায়নি তোমাদের? ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা পড়লো। [illegible] এবার। তোমাদের থালা বাটি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াও গে! লাইন দিতে [illegible]?'

'তাই নাকি?' আমি আর দেবেন [illegible] থালাবাটি আনতে দৌড়ই। ঘুম ভাঙার পর থেকেই খিদের ঘণ্টা বাজছিল পেটে। সকালের খিচুড়িভোগের ভিড় গিয়ে দাঁড়াতে আমাদের দেরি হলো না।

খাদ্যখাদক সম্পর্ক চোকার পর শীতটা যেন কাটলো খানিকটা। শীত শীত ভাবটা কেটে একটু গরম হোলো হাত পা।

'এতক্ষণে যেন বাঁচলাম—উঃ!' হাঁক ছাড়লাম আমি। —'ঠান্ডাটা কাটলো ভাই!'

'ইস্, কী ঠান্ডাই না গেছে কাল রাত্তিরে! কী বলব ভাই, সারা রাত্তির আমি ঘুমোতে পারিনি...।'

'নাক ডাকিয়েছ সমানে।' আমি বাধা দিচ্ছি তার কথায়।

'সে ওই তন্দ্রার ঘোরে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা লাগে না? না ঘুমোলেও? লাগে না? [illegible]।'

'তোমার তন্দ্রায় আমারো যা লেগেছে ভাই...' বলতে যাই।

সে বলে—'ঐ দারুণ শীতে কি ঘুমোনো যায় নাকি? একটা কম্বলে শানায় কখনো? অমনি চারখানা কম্বল হলে তবে যদি গিয়ে এই বাঘা শীত কাটে।'

'তা বটে।' আমার কোনো দ্বিমত ছিল না এ বিষয়ে।

[illegible] খাওয়ার পর [illegible] দিয়ে গড়িয়েছি খানিক। তারপর ঘুরে বেড়িয়েছি সারা জেল। বিরাট প্রকাণ্ড জেল, যেন তার চেয়েও বিরাট এক মেলা বসেছিল—মেলাই ছেলে মিলে জম জমাট চারধার।

কোথাও তাস পিটছে কয়েকজনায়। দাবা নিয়ে বসেছে ফের কোথাও। কোথাও আবার স্বদেশী গান গাইছে কেউ কেউ।

মাঝে মাঝে কয়েকটা ছেলে দেখি টেক্সট বই নিয়ে বসে গেছে—পড়াশোনায় মন দিয়েছে ওর মধ্যেই।

আলাপ হোলো ওদের সঙ্গে।

টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করে এসেছে তারা সব। তাদের অভিভাবকরা বইপত্তর জমা দিয়ে গেছল আদালতে। জজ সাহেব এখানে বই আনতে কোনো বাধা দেননি। ফাইনালের জন্যে তৈরি হচ্ছিল তারা। দু-এক মাস করে জেল তো সবার। বেরিয়ে গিয়েই তারা পরীক্ষা দিতে বসবে। তারপরে ফের জেলে আসবে। ফের আবার—ডাক পড়ে যদি।

ভালো ছেলে তারা সবাই। আমার মতন এ উড়ুক্কে ভবঘুরে নয়।

বিকেল একটু গড়াতেই গঙ্গার ভেতর ঠান্ডা ছড়াতে শুরু করেছে।

বাইরের চত্বরে চলে এলাম। বিকেলের পড়ন্ত রোদ এমন মিষ্টি লাগে যে—।

দেবেন একাএকাই ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল।

'তোমার অপেক্ষায় ছিলাম হে! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম জেলখানাটা। ...আগাপাশতলা দেখলাম।

'খানা আবার কোথায়? একখানাই তো ঘর মোটে। —যদিও একটু বড়ো সাড়া। জেল বলতে হয়তো হাঁ, আমাদের প্রেসিডেন্সিকে। কতো সেল, কতো ঘর—কখানা ব্লক। কতোরকমের কয়েদী যে। ফাঁসির আসামীও রয়েছে তার ভেতর—কনডেমড সেল—একেবারে পৃথক। ফাঁসিকাঠ দেখতে পাবে তুমি, যেখানে খুদিরাম কানাইলাল হাসতে হাসতে ফাঁস পরেছিল গলায়। সেই হচ্ছে জেল—যার ভেতর দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে এখন। জাগ্রত গঙ্গা—সেই দেশবন্ধু! এটা কি জেল নাকি? এটা তো স্রেফ ডক ইয়ার্ড। জেলের নামে 'ইয়ার্কি' একটা।'

'তা হোক, তোমার সে জেল তো আমি দেখিনি ভাই! এখানে একখানা ঘর তা ঠিক—কিন্তু কতো বড়ো একখানা! কী বিরাট ঘর বাবা! একটা গোটা ফুটবল মাঠ এঁটে যায়। একখানাই অনেক। কতোজনের

সঙ্গে আলাপ হোলো যে এতক্ষণে...।

'খুব সাবধান! যার তার সঙ্গে ভাব জমাতে যেয়ো না যেন, বেঘোরে মারা পড়বে শেষটায় বলে দিলাম।'

'কেন, মারামারিটা কিসের আবার?'

'এর মধ্যেই বিপ্লবী দাদারা রয়েছেন—তা জানো? টের পেয়েছি কালকেই। গান্ধীমার্কা টুপি মাথায় দিয়ে নিজেদের দলে ছেলে রিক্রুট করার তালে ঢুকেছেন তারা। তার পেছনে আবার সি আই ডি-র স্পাইরাও সেঁধিয়েছে নিজেদের তালে। এই দুই চাকার চাপে পড়ে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে না যাও।'

'ল্যাপটোতে গেলে তো! ও ব্যাপারে হাতে খড়ি হয়ে গেছে আমার। ঢের ঢের আগেই। মা আর দারোগা—দুজনের কাছে নাকে খৎ দিয়ে ছাড়ান পেয়েছিলাম। ছেড়ে দিয়েছি সে-পথ। ও-পথ আমার নয়। জেনে গেছি আমি।'

'নাকে খৎ দিয়ে পথ ছেড়েছো—কিরকমটা?'

'পিস্তল সমেত ধরা পড়ে ছিলাম না? অমনি ছাড়ান পেলে নাকি? রীতিমতন মন্তর আওড়াতে হয়েছে তার জন্য...।'

'মুচলেকা দিতে হয়েছিল বুঝি? জামীন দাঁড়িয়েছিলেন বাবা?'

'না না। বললাম না মন্তর?'

'শুনি মন্তরটা।'

'এই দিই নাকে খৎ/এই করি দণ্ডবৎ/আর প্রভু/আমি কভু/মাড়াবো না ওই পথ॥ ...এই মন্তর!'

'বাঃ! দারোগার সামনে আর ছড়া কাটতে হয় না কাউকে। ইয়ার্কি করবার জায়গা পাওনি আর? পুলিসের কাছে মামদোবাজি? আমি বুঝিনে বুঝি?'

'বেশ। ইয়ার্কি তো ইয়ার্কি।'

'রাত হলেই আবার সেই শীতের ধাক্কা। এমন ভয় করছে আমার না...' সুর পাল্টায় তার—'তাই ভেবে এখন থেকেই কাঁপুনি দিতে লেগেছে।'

'কাঁপছি আমিও। তবে শীতের ভয়ে ততটা নয় যতটা কিনা তোমার ভয়ে ভাই!'

'আমার ভয়? তার মানে? আমাকে আবার কিসের ভয়?' সে হতবাক হয়।

'অধঃপতনের একটা আশঙ্কা থাকে না মানুষের? পদে পদে ভয় থাকে না তার?'

'কিসের অধঃপতন শুনি? খুলে বলবে তো!'

'তুমি যে এমন তুখোড় খেলোয়াড় তা কি আমি জানি! কাল রাত্তিরে সেটা টের পেলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখছো খালি! বল নিয়ে চষে বেড়াচ্ছো সারা মাঠ। এই পাস করছো, এই শুট করছ, এই কর্নার করলে! এই মধ্যেই আবার গোল দাঁড়িয়ে বসেছো। একেবারে। গো-ও-ও--ও-ওল!'

'গোওল গোওল বলে চেঁচাচ্ছিলাম নাকি?' সে হাসে।

'চেঁচালে তো রক্ষে ছিল! শুধু কি চেঁচানি! তোমার পাসের ধাক্কায় আমার প্রাণ যায় যায়! এমনই অবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল। এমন শট ঝাড়ছিলে মাঝে মাঝে যে তেতালার থেকে পড়ে মরি আর কি! শেষটায় যখন গোল বাধালে না, তখন কোনোরকোমে অধঃপতনের হাত থেকে সামলেছি। সেই তেতলার তাক থেকে সেতালায় পড়লে হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে যেতাম।'

'জাগিয়ে দিলে না কেন আমায়?'

'হ্যাঁ, জাগিয়ে দিই আর তুমি ঘুম ভেঙে ধরে মার লাগাও আমায়।'

'কেন, মারবো কেন? মারতে যাবো কিসের জন্যে?'

'ঠিক শট করার মুখটাতেই গোলটা তোমার আটকে দিলুম বলে? অমনটা হলে রাগ হয় না তখন? আমি কি জানিনে! গোলে শুট করতে যাচ্ছে এমন সময় রেফারি অফ্ সাইড হাঁকলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে প্লেয়ারদের? তখন ওই রেফারিকেই মেরে বসে—আমি কী ছার!'

'আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি তোমায়—আজ অমনটা হবে না আর। তুমি আমায় জাগিয়ো দিয়ো।'

'না ভাই, আজ আর আমি তোমার সঙ্গে এক তাকে শুচ্ছিনে! ঐ তেতলায় তো কিছু নেই নয়। আমি আজ একতলার তাকে শোবো। একলাই। তার থেকে ঘুমের ঘোরে পড়ে গেলেও ততটা আর লাগবে না গায়।'

'আরো বেশি শীত শীত করবে তখন। দেখো তুমি। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে যাবে। জায়গাটা ভয়ংকর ড্যাম্পো না? যত না ওপর থেকে ছপ্পর ফেড়ে পড়ে তার চেয়ে ঢের বেশি ঠাণ্ডা নীচের থেকে মাটি ফুঁড়ে ওঠে। গঙ্গার ধারের গুদোমঘর—মানুষ বসবাসের জন্যে তো বানানো হয়নি। স্যাঁৎসেঁতে মেজেটা দ্যাখোনি কি!' সে দম নিয়ে কয় : 'আকাশের চেয়ে মাটির ঠাণ্ডার জোর বেশি তা জানো? তাতেই মানুষ বেশি ঘায়েল হয়। তাতেই প্লুরিসি নিউমোনিয়া ধরে—বুঝেছ?'

'না ভাই!' অবুঝের মত বলি—'সেই ভুঁইফোড় ঠাণ্ডাও সইবে আমার কিন্তু তোমার শ্রীচরণের মার...মানে, ঐ ঠ্যাংএর ঠ্যাঙানি খেলে আর বাঁচবো না।'

'তোমার যা খুশি।...কিন্তু একজনাকে একটা তাক নিয়ে থাকতে দেয় না যে—সকলে না সেই ছেলেটা কালকে?' সে অন্য কথা পাড়ে। 'ঢের ঢের ছেলেরা আসছে না আরো? শরদে কোথায় জেলে, শুনি?'

'না যদি থাকতে দেয়, তুমি তোমার মতই আরেকজন খেলোয়াড়কে জুটিয়ে নিয়ে শোও গে! এত ছেলের ভেতর কি তোমার মনের খেলার কি আরেকটা পাবে না?'

'আর তুমি? তোমাকেও তো একটা তাকে

একগাটি থাকতে দেবে না। তুমি কী করবে?'

'দেখি নেহাৎ ঠাণ্ডা গোছের কাকে পাওয়া যায় আমার জন্যে। কে থাকে দেখা যাক। তার তাকে থাকতে হবে।'

'থাকো গে!' বলে রাগ করে বিরাগভরে সে চলে যায় আমায় ত্যাগ করে। আমি একা একা ঘুরতে থাকি গঙ্গার ধারটায়। ঘরে ফিরে যার কথাগুলোই মনে পড়তে থাকে আমার। গঙ্গার কলধ্বনির সঙ্গে মিশিয়ে।

এমন সময় প্রিজন্ ভ্যানে করে আদালতের থেকে আমদানি একদল ছেলে এসে পড়ল জেলের সদরে। দেখতে পেলাম দূর থেকেই। গেট খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গাড়িটা ঢুকল এসে চত্বরের মধ্যে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে নামল নতুন ছেলের দল।

এধার থেকেও সমধ্বনি উঠল তাদের সম্বর্ধনায়—তাদের অভ্যর্থনায়। এ ধারের যে ছেলেগুলো এখানে সেখানে ঘুরছিল তাদের সামনে ছুটে গেল সবাই। একটু বাদেই দেখেন এসেছে আমার কাছে ছুটতে ছুটতে।

'তোমাকে আর তাকে তাকে থাকতে হবে না। পেয়ে গেছো তাকে। না চাইতেই পেয়ে গেছো তোমার বরাত।'

'পেয়েছি কী?' কথাটার ঠিক ঠাওর পাই না।

'সেই মেয়েটার ভাই... তাই হবে বোধ হয়। সে তো এসেছে এখানকার আমদানিতে। আর তাই নিশ্চয় তার মতই দেখতে দেখেছি।'

'তার মতন দেখতে?'

'তোমার সেই মেয়ে বন্ধুটির মতন গো! তোমার অনেক পার্টনার। যার তাকে তুমি চিনো গো! সে জানায়—'আর তোমাকে কে পায় এবার!'

শোনামাত্রই আমি দৌড় লাগাই। একটু এগিয়েই দেখতে পাই...

সেও দেখতে পেয়েছিল আমাকে। ছুটে এল আমার দিকে। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। জড়িয়ে ধরল আমাকে...

'ইস্, তোমাকে এখানে পাব আমি আশা করিনি...' বলল সে।

তার দিকে চেয়ে আমি কথা কইতে পারি না।

'ইস্! কী করেছিস রে রিনি! তোর এমন সুন্দর বেণী—চুলটুল সব ছেলেদের মতন ছেঁটে ফেলেছিস।'

'ঠিক ছেলেদের মত না। বরং বৌবিদের মতন বব করা—বলতে পারো।'

'কিন্তু সেই চুল? আহা!' ওর কথায় আমার খেদ চুলমাত্র কমে না।

'আবার হবে। দেখতে দেখতে হয়ে যাবে, দেখো না!...এখন বলো তো হাফপ্যান্টে আমায় কেমন মানিয়েছে বলো না?'

এবার ওকে আপাদমস্তক দর্শন করি—মাথার থেকে পা পর্যন্ত।

'কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোকে না। কী বলব। তুই ছেলে হয়ে জন্মালেই ভালো করতিস বোধহয়। তাহলে এই হাফপ্যান্ট পরে থাকতে পারতিস চিরকাল। তাহলে আর কোনোদিন তোকে শাড়ি-ফাড়ি পরতে হোতো না। এখন দুদিন বাদেই তো শাড়ি ধরতে হবে তোকে—পরতে হবে দিনরাত।'

'ওরা কিন্তু ধরতে পারেনি একদম। কেমন ধোঁকা দিয়েছি ওদের দেখছো তো। বলেছিলাম না যে আমি আসবই? এলাম না ঠিক? আটকাতে পারলো আমাকে? আমার সঙ্গে কেউ পারে? শুধু কেবল এই ভয় করছিল আমার...' বলতে বলতে সে থেমে যায়।

'কী ভয় করছিল?'

'কোন জেলে পাঠায় আমাকে কে জানে। সেই জেলে যদি তোমার দেখা না পাই তখন?...এ কি তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছো না যে? খালি খালি আমার পা দেখছো কেবল...কেন আমার পা কি তুমি দ্যাখোনি নাকি আগে?'

'দেখব না কেন? ফ্রক পরেই তো থাকতিস দিন রাত—কাজে দেখেছি।'

'তবে এখন ওদিকে নজর দিচ্ছ যে খালি খালি। কেন আমি কি আর দ্রষ্টব্য নই?'

'তোর মুখশ্রী তো দেখছিই দেখবই, সমস্তটাই পাব চিরদিন কিন্তু—' আমি বলি—'কিন্তু তোর আতোখানি খালি পা তো দেখিনি কখনো। ফ্রকে যে অনেকটা ঢাকা পড়ে থাকে। হাফপ্যান্টে আরো অনেকখানি বেশি দেখা যাচ্ছে না? চেয়ে দেখছিলাম তাই হ্যাণ্ডসাম মেয়ে তো অনেক আছে, তোর মতন আছে কি না জানি না...।'

'আহা! কী আমি এমন হ্যাণ্ডসাম। কী রূপের ছিরি আমার। আমার চেয়ে ঢের ঢের সুন্দর মেয়ে দুনিয়ায় আছে, আমারই চোখে পড়েছে। বুঝলে? অনেক দেখেছি আমি।'

'আমি দেখিনি। একটাও দেখিনি এখনো। আমার নজরে পড়েনি অন্তত। থাকে থাকুক গে। আমার বয়ে গেল। আমি তা দেখতে চাইনে। তবে একথা আমি বলবই, হ্যাণ্ডসাম মেয়ে আরো থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তোর মতন এমন লেগস্‌ম মেয়ে আর দুটি নেই।'

'যাও। তোমার যতো ফক্কুড়ি কথা...'

'একটা কথা বলব রাখবি? তুই কখনো ভুলেও শাড়ি পরিসনি, ফ্রক পরে থাকিস চিরটাকাল...বুঝেছিস?'

'কেন, শাড়ি পরলে কী হয়? ভালোই তো দেখায় গো।' আরো ভালো দেখায় মেয়েদের।'

'তা হলে তোর এই সুন্দর পদপল্লব তো আমি আর দেখতে পাব না...'

'তাতে কি। মুখপদ্ম তো দেখতে পাবে?' বলেই সে কী মিষ্টি না হাসে যে।—'তাতেই তোমার লোকসান পুষিয়ে যাবে মশাই।' (ক্রমশ)

যখন যেখানে যেমনটি চাই থ্যাকারসে কাপড়ের তুলনা নাই
সুখি পথচারী যারা মানে না মানে সোজা বা সংকীর্ণ পথের চলার ধারে, তাদের উপযোগী—থ্যাকারসের তৈরী সুতীর কাপড়; পপলিনস, লোন, ভয়েলস্ ও কেম্ব্রিক। যেখানেই যান না কেন, আপনাকে মানাবে সেই পরিবেশে,থ্যাকারসের স্নিগ্ধ শীতল কাপড় পরে গ্রামে বা সহরে চলার পথে আপনি নির্ভিক ও নির্বিকার পথিক। বেছে নিন আপনার পছন্দ সই রঙ ও প্রিন্টস,যদি আপনি অরণ্যের বন্য পরিবেশকে পছন্দ করেন তাহলে আপনার জন্য থ্যাকারসের কাপড়, শাড়ি ড্রেস মেটিরিয়াল, শার্টিং ও স্যুটিং।
থ্যাকারসের 'টবিলাইজড' সুতির কাপড় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে কোঁচ বা ভাজ পড়ে না আর 'স্যানফোরাইজড'—যার জন্যে কাপড় খাটো হয় না।
TF
থ্যাকারসে গ্রুপ অব মিলস্
১৬, অ্যাপোলো স্ট্রীট, বম্বে-১

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গবাসীর আত্মজিজ্ঞাসা

বাংলাদেশের বিজয় ও নবজন্ম লাভ আমাদের অনেক তাত্ত্বিক হিসেব বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের স্বভাবগত আবেগ তুঙ্গে উপনীত হয়েছে। প্রায় মন্ত্রকচ্ছ হয়ে অনেকেই পূর্ব বাংলায় ফেলে-আসা জমিজিরেত ফেরৎ পাবার স্বপ্ন দেখছেন। এ অবস্থায় আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা অপরিহার্য, এ কথাটা কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছিল। 'দেশ'-এর দুটি সংখ্যায় (৮ ও ২২ জানুয়ারি ১৯৭২) প্রকাশিত শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের দুটি প্রবন্ধ—'ফেরা যায় না, তবু যেতে চাই' এবং 'বাংলা থেকে ফিরে'—আমাদের আত্ম-সমীক্ষার সহায়ক হয়েছে বলে আমার ধারণা।

এই মুহূর্তে আমরা বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধে ভারতের মহান অবদান উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছি আর সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ-বাসীর কৃতজ্ঞতা খুব বেশি করে দাবি করছি। এর মধ্যে যে বিপদ আছে সে বিষয়ে আমরা সতর্ক নই। অথচ সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ আবেগ ও কৃতজ্ঞতার ঢেউ একদিন নেমে যাবে, সেদিন বাস্তব প্রেক্ষিতে ইমোশন আমাদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে না। এ বিষয়ে ভারত সরকারের সতর্কতা ও সংযম প্রশংসনীয়, কিন্তু তা পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর ব্যবহারে ও কথায় ফুটে উঠেছে কি?

এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর—এই নমাস ঢাকার একজন মুসলমান অ্যাডভোকেট কখনো একা, কখনো-বা স্ত্রীপুত্র নিয়ে কলকাতায় আমার বাসায় অনিয়মিত অতিথি হিসেবে ছিলেন। এবং আমাদের অনেকেই এভাবে অনেককে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়েছেন। কিন্তু তার জন্য আমি ও আমরা যদি চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতা দাবি করি তার ফল শেষ পর্যন্ত সুখকর হবে না। এই সতর্ক ইঙ্গিত শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের লেখায় পেয়েছি। ঢাকার যে অ্যাডভোকেট অতিথি আমার বাসায় ছিলেন খুব সহজ-বোধ্য কারণে তাঁর নাম গোপন রাখছি। ঢাকা-বিজয়ের পর তিনি আগরতলা-কুমিল্লার পথে ঢাকায় ফিরে গেছেন। ঠিক একমাস পরে সম্প্রতি তাঁর চিঠি পেলাম।

ঢাকার মহম্মদপুর থেকে তিনি লিখছেন: "চিঠি লিখতে দেরি হল। আশা করি ক্ষমা করবেন। এখানে এসেছি একমাস, কিন্তু নিজের বাড়িতে এসেছি কাল। এখনও চলছে মেরামত। মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, পারিবারিক নানা ঝামেলার মাঝে চিঠি লেখার সময় করতে পারিনি। বিপদের দিনে যারা আত্মীয়ের মত সাহস, সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়েছে তাদের কাছে শুধু আমি ব্যক্তিগতভাবে নয়, সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞ একথা সত্য এবং আমি শুধু জানাতে পারি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মনে পড়বে আপনাদের কথা।...এখানে আসবার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি...নতুন সুরে জীবনের ছিন্নতারগুলো বাঁধবার চলছে প্রচেষ্টা, নিদারুণ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর কাজে সকলেই ব্যস্ত। সংসারের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হচ্ছে নতুন করে, এদিকে অর্থের সমাগম আপাতত হবার লক্ষণ নেই।"

কোনো পরিবর্তন না করে চিঠির অংশবিশেষ তুলে দিলাম। ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের নতুন অবস্থায় খাপ খাওয়াতে চাইছেন। চিঠি পড়লেই বোঝা যায় সব কিছুই এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়নি। এই অবস্থায় আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা দলে দলে বাংলাদেশ ভ্রমণে গেলে সেটা দু পক্ষের কাছেই শেষ পর্যন্ত সুখকর হবে না।

তবু আমরা ফিরে যেতে চাই, তার কারণ নসট্যালজিয়া, জন্মভূমির টান, ছেড়ে-আসা জীবনের স্বপ্নমোহ।

অন্যদিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গ। এই স্বপ্নভঙ্গ অবস্থা থেকে পালাতে চাই বলে আমরা অতীত স্বপ্নের দেশে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু আমরা মনে রাখতে চাই, যে দেশ ছেড়ে বিশ-তিরিশ বছর আগে আমরা অনেকে চলে এসেছি, সেই পূর্ব বাংলা আর নেই। একটা জাতি তার আত্মপ্রত্যয়

নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সেখানে গিয়ে অনবরত কৃতজ্ঞতা ও আতিথ্য দাবি করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে কিনা তা বিচার্য।

শ্রীসন্তোষ ঘোষের প্রথম প্রবন্ধে মধুর নস্টালজিয়ার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে আমাদের জীবনের রিক্ততা ও মর্মান্তিক লজ্জা। আমাদের এই মুহূর্তের বড়াই করার পিছনে যে ফাঁকি আছে তিনি সেটা ধরে দিয়েছেন। "'বাঙালী' বলে প্রধান একটা জাতির নাম ওরা জগৎ সভায় বড় বড় হরফে লিখে দিয়েছে। বাঙালী বলতে অতঃপর প্রধানত ওদেরই বোঝাবে। অতি-চালাক, অতি-চালবাজ, আত্মমর্ষক, কলহ-ক্লান্ত, বুদ্ধি-অভিমানী আমাদের নয়। এই সার কথা বুঝতে পেরেছি।"

পেরেছি বলেই আমরা আত্মপ্রতারণা করছি। শ্রীঘোষ নিপুণ শল্য চিকিৎসকের মতো পশ্চিমবঙ্গবাসীর এই মানসিকতাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এখন এই লজ্জা কোথায় লুকোব?

কিন্তু এই আত্মোদ্‌ঘাটন কি আত্মনিন্দা নয়? দ্বিতীয় প্রবন্ধে শ্রীঘোষ তার উত্তর দিয়েছেন। "স্বাধীনতার এই সিকি শতক পরে এই বাংলার চারদিকে চেয়ে তার (জাতি হিসেবে আমাদের আত্মপরীক্ষার) কিছু কি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি? কোথায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে, শিক্ষায়, সরকারী কাজকর্মে বাংলা ব্যবহারের ক্রম-প্রসার? সেখানে তো দূরের দিল্লি বাধা দিচ্ছে না বা দেয়নি! আসলে একটি বিকৃত সামাজিক রুচি আর ইংরেজিনবিশ এক শ্রেণীর কর্তাদের অভিরুচি মাতৃভাষা প্রবর্তনের রাস্তা রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা মুখের ভাষাকে বুকে তুলে নিইনি; উন্নাসিক উদাসীনতায় শিখিনি হিন্দী। সঙ্গে সঙ্গে আসলে ইংরেজীও ভুলেছি।"

তার ফলে "বিশ্বাসে সাহসে ওরা এগিয়ে যায়, আর ভ্রান্ত, সংশয়গ্রস্ত, ক্লান্ত, আমরা পিছিয়ে পড়ি।"

আসলে আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক পুনর্গঠনের চিন্তায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। আমরা দেব বাংলাদেশের স্বনির্ভর অভিযানে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বনাশ নিয়ে ততটা উদ্বেগ নেই। দিল্লী সম্পর্কে আমাদের অভিমান ও বিরোধিতার শেষ নেই। নিশ্চয়ই তার পিছনে অনেকটাই সত্য আছে। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন, গত সিকি শতাব্দে পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টি রাজনৈতিক দল কখনো একজোট হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য অধিকার দাবি করেছেন? কখনো কি বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব, হরিয়ানার মতো সব দল মিলে কেন্দ্রের কাছে দাবি আদায়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি? পশ্চিমবঙ্গের গরীব ভূমিহীন চাষীদের দুর্দশার কথা, লাখ লাখ তরুণ বেকারের সমস্যা, পিছিয়ে-পড়া শিল্প ও কৃষির কথা ভেবেছি? তার জন্য লড়াই দিতে চেয়েছি? না। আমরা পার্টি বড়, আমার রাজ্য বড় নয়—একথাই ভেবেছি। সুভাষচন্দ্রের পর সর্বজনমান্য রাজনৈতিক নেতাকে দেখেছি? না। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য দরদে বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনে আমরা অগ্রসর হইনি। বাংলাদেশকে উপলক্ষ করে পশ্চিমবঙ্গ আজ যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনায় নিযুক্ত হয়, তবেই আমাদের আবেগ শুদ্ধ ও সার্থক হবে, নয়ত আত্মপ্রতারণার পঙ্কে ডুবে যাবো। একথা যেন 'ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে'।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
বঙ্গভাষা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মানুষ অতুলপ্রসাদ

পাহাড়ী সান্যাল

॥ পনের ॥

বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটারও বেশি হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। বাড়ির সামনে এসে দেখি, সেজদা বারান্দার এধার থেকে ওধার ঘোরাঘুরি করছেন। এতক্ষণের স্বপ্নের ঘোর কেমন যেন খান খান হয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার কড়াকড়িটা তখন খানিকটা হ্রাস পেলেও মনে পড়ল যে রাত এগারটার পর ফেরবার স্বাধীনতা তখনও পাই নি। তাই ভয়ে গা-টা ছমছম করে উঠল।

সেজদা কিন্তু খুব সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, "এত রাত হল যে! তোমার খাবার ঢাকা দিয়ে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে।"

সেজদার কথার ভঙ্গিতে ভয়টা ভেঙে গেল। বললাম, "অতুলদার বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। আর কিছু খাব না।"

সেজদা একটু হেসে বললেন, "থাক তবে। কাল সকালে কোন গরিব মানুষ তোমার খাবারটা খেয়ে বাঁচবে।"

আজকের দিনে আমরা গরিব হয়ে ভিক্ষার ঝুলি এগিয়ে রাখি। তখনকার দিনে কিন্তু ভিখিরি দেখলে সানন্দচিত্তে খাবার ভাগ করে নেওয়াতে কোন গ্লানি বোধ করিনি।

উপরে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে কেমন যেন ফুলের মত হালকা মন নিয়ে শুয়ে পড়লাম। একবার বালিশে মাথা ঠেকালেই ঘুম কেমন আপনা থেকেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠত। কিন্তু সেদিন বুঝি ঘুমের কোথায় যেন হিংসা হয়েছিল। তাকে অনেক সাধ্যসাধনা করলাম, কিন্তু সে কেবলই বলে, তোমার ওই কালো মেয়েটিকে নিয়েই তুমি থাক, আমি চললাম।

ঘুমের যে এত হিংসা আছে সেটা বোধ হয় সেদিনই প্রথম বুঝলাম। কিন্তু ঘুম আবার ভারি লক্ষ্মীও। কখন যেন এসে আমায় জড়িয়ে ধরে সব কিছু ভুলিয়ে দিলে। জেগে উঠে দেখি : রজনী নাহিকো বাকি/ঘুম প্রিয়া দেছে ফাঁকি।

সেদিন সকালের আলোটাও কেমন যেন অন্যরকম লাগল। অন্তরে যে কিসের স্ফূর্তি তা হৃদয় জানল হয়তো, মন কিন্তু তার আবছা ছোঁয়াচ পেল শুধু। সারাদিন সবই যেন কেমন ভাল লাগতে লাগল। যারা আমার প্রিয় তাদের প্রিয়তর মনে হল। যা কিছু অপ্রিয় তাও হয়ে দাঁড়ালো প্রিয়।

আজকের দিনে মন গেছে পাল্টে, হৃদয়ের সৌন্দর্যসম্ভারগুলোতে পড়েছে মরচে, তাই প্রেমে পড়ার আবেগটাও গেছি ভুলে। আজ আমি সম্পূর্ণ মেকি। তখন কিন্তু প্রেমে পড়ার অর্থটা আমার কাছে ছিল অন্য রকম। আজও আমি প্রেমে পড়ি, কিন্তু তারও চেহারাটা পাল্টে গেছে। আজ শরীরের আকর্ষণ গেছে বেড়ে, মনের খোরাক গেছে ফুরিয়ে। সব গ্লানি কাটিয়ে অতুলদার সঙ্গে আমার প্রেম কিন্তু আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তখনকার দিনে আমার মনের মধ্যেকার মানুষটা ছিল বেঁচে। আজ সে মারা গেছে। সে মারা যাওয়াতে একটা সুফল ফলেছে। মনুষ্যত্ব জিনিসটাকে আজ চিনতে শিখেছি। কিন্তু বোধ হয় একটু দেরি হয়ে গেল।

এর পর থেকে যেসব গান অতুলদার কাছে শিখেছি, তার মধ্যে জীবনের অন্তরঙ্গতার সাড়া পেয়েছি। আর সেই কালো মেয়েটির সঙ্গে আন্তরিকতা তখন ক্রমশই বর্ধমান। ফলে আমি যেন আবার নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছি।

প্রতিভা আর আমি আমাদের অজান্তেই নিজেদের কাছে সহজ হয়ে উঠেছি। নানা-জনের মাঝখানে থেকেও আমরা দুজন দুজনের কাছে নিভৃতির সন্ধান পেয়েছি। প্রায় প্রত্যহ অনেক রাত পর্যন্ত হেমদিদের বাড়ির ছাদে বসে কি সব কথাবার্তা বলেছি মনে নেই, কিন্তু তার অনুভূতিটা আজও ভুলিনি। আবার অনেক সময় হয়তো দুজনেই নিস্তব্ধ হয়ে থেকেছি, কিন্তু সে

নিস্তব্ধতা যেন আরও অনেক বেশি বাঙ্ময়।

এরই মধ্যে একটা ভারি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। সব সময় আমার কেমন ভয়ানক ইচ্ছা করত একবার অতুলদার সঙ্গে প্রতিভার পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে ভারি ভাল হত। যে কাজটা খুব সহজেই করা যেতে পারত সেটাই হয়ে পড়ল সব থেকে শক্ত। মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সরাসরি অতুলদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তাতে বাধা কোথায়? কিন্তু বাধা যে সত্যিই কোথায় সেটা আজকালকার পাঠককে বোঝানো শক্ত। কারণ স্ত্রী-পুরুষের প্রকাশ্যে মেলামেশাটা আজ যেমন প্রায় সহজ হয়ে উঠছে সেদিন তা ছিল না। কারণ সেদিন সমাজ ছেলে-মেয়েদের গতিবিধির উপর দারোগাগিরি করত কিন্তু আজ ছেলেমেয়েরা সমাজের গতিবিধির উপর দারোগাগিরি করে।

আমার ইচ্ছাটা কিন্তু পূর্ণ হল, আর সেটা যেভাবে ঘটল তা যেমন আকস্মিক তেমনই অদ্ভুত। রাধাকুমুদদার বাড়িতে গান-বাজনার একটি আসর বসবে। রাধা-কুমুদদা অর্থাৎ রাধাকুমুদ মুখার্জি। সারা পৃথিবীতে যাঁর পরিচিত বিশিষ্ট বিদ্বান রূপে। আরও যেন কারা সব সেই আসরে গাইবেন। আমি অতুলদার সঙ্গে যাব তাঁর শেখানো গান গাইবার জন্য এবং কিছু অন্যান্য গানও বটে।

গিয়ে দেখি কুমুদদার বৈঠকখানায় প্রচুর জনসমাগম। অতুলদার পাশটিতে গিয়ে বসলাম। যতদূর চোখ গেল তার মধ্যে দিয়ে অনেক চেনা মুখ দেখলাম। প্রথমে স্থানীয় দু-একজন গান করলেন। সেখানে ঝুনুদি—মানে শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত (স্বর্গত নির্মল সিদ্ধান্তর স্ত্রী)—রয়েছেন। তাঁর আমি স্নেহধন্য। আর অতুলদার সূত্রে এইসব বিদগ্ধ মানব-মানবীর সঙ্গে আমার পরিচয়।

ঝুনুদি আমাকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, "তুই এসেছিস! ভারি ভাল লাগছে। কতদিন আমার বাড়ি যাস নি বল্ তো!"

ঝুনুদির সঙ্গে পরিচয়ের ব্যাপারটা পরে লিখব। আপাতত যা নিয়ে এই আসরের অবতারণা সেটাই লিখি।

দু-একজন গাইবার পর ঝুনুদিকে গাইতে বলা হল রবীন্দ্র সংগীত। এত ভাল রবীন্দ্র সংগীত আমি খুব কম মানুষের কণ্ঠেই শুনেছি। যখন তন্ময় হয়ে ঝুনুদির গান শুনছি, হঠাৎ এক সময় ঘরের মধ্যে একটু দূরে একটি চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। লিখে বোঝাবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই—চেহারাটি প্রতিভার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এই তো সুবর্ণ সুযোগ।

ঝুনুদির গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদের পালা শুরু হল। সেটা শেষ হতেই কুমুদদা এবং আরো অনেকে আমাকে গান গাইতে বললেন। তখন আমি খুব সহজভাবে অতুলদাকে বললাম, "এখানে এমন একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন অতুলদা যিনি চমৎকার রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারেন, আর আমার কাছ থেকে কিছু অতুলপ্রসাদের গানও শিখেছেন।"

অতুলদা ভীষণ খুশি হয়ে বললেন, "তাই নাকি! আরে ডাকো ডাকো—"

তখন নিভৃতে দুজন দুজনকে তুমি বলে ডাকলেও লোকসমক্ষে আপনি-আজ্ঞের ঘটাটাই ছিল প্রকট। আমি প্রতিভার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আসুন মিস সেনগুপ্ত, অতুলদা আপনার গান শুনতে চাইছেন।"

সে কিন্তু তখন লজ্জায় অবোধবদন। আর আমতা আমতা করে কি সব আপত্তি জানাচ্ছে। তখন কুমুদদা স্বয়ং উঠে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এলেন। বললেন, "এসো এসো, গাও। লজ্জা কিসের!"

অতুলদাও আবার অনুরোধ জানালেন। প্রতিভা বলল, "মিসেস সিদ্ধান্তর সামনে আমি আর রবীন্দ্র সংগীত কি গাইব। বরং আপনার যে সব রচনা আমি পাঁচড়ীবাবুর কাছে শিখেছি তাই গাইবার চেষ্টা করি।"

গান গাইবার আগেই আসরে এই কথাটা প্রকাশ করে দিলাম যে ভদ্রমহিলা মিউজিক কলেজের একজন কৃতী ছাত্রী। তাতে অতুলদা বলে উঠলেন, "আরে তাই নাকি! বা বা, বেশ—গাও—"

সেই আসরে প্রতিভার গাওয়া গানগুলি যে আমার কাছে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর লেগেছিল তা নাই বা বললাম। তবে আসরে সাধুবাদের ঘটা দেখে মনে হয়েছিল বোধ হয় ভালই গেয়েছে।

এরপরে অতুলদাকে প্রণাম করে প্রতিভা নিজের আসনে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু অতুলদা বললেন, "এস এস, আমার কাছে বস। চমৎকার গেয়েছ।"

আমার মনের আনন্দ তখন বুঝি আর ধরে রাখতে পারছি না। তাই দু-একখানি ঠুংরী-দাদরা জাতীয় গান গেয়ে নিয়েই আমি একের পর এক অতুলদার গান গেয়ে চললাম। আসরে অনুরোধেরও বিরাম নেই, গায়কেরও ক্লান্তি নেই।

এম সময় গান যখন শেষ হল আসর যখন ভাঙল, বুঝতে পারলাম কোন সূত্রে প্রতিভা এই আসরে এসেছে। তারই স্কলার একটি ছাত্রী কুমুদদাদের কিরকম দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। এবং সেই সূত্রেই প্রতিভার এখানে উপস্থিতি।

আবার বলি, নিয়তি কেন কথাতে। একেই বোধ হয় বলে অভাবিত সংযোগ।

সে রাত্রে প্রতিভার সঙ্গে আর কোন আন্তরিক বাক্যালাপের অবকাশ ঘটল না। অতুলদা তাঁর গাড়িতে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। যদিও গানের আসরে বেশ ভাল জলযোগের ব্যবস্থা ছিল তবুও বাড়ি ফিরে মনে হল অসম্ভব খিদে পেয়েছে। খুব খেলাম। বিছানায় যেতেই মহানন্দে ঘুম এসে আলিঙ্গন করল।

কেমন করে যে ভগবান মানুষের জীবনকে চালনা করেন তা কি সাধারণ মানুষ কোনদিনও বুঝতে পেরেছে। আজ এটা আমার ইতিহাস হিসেবে পাঠকদের জানাচ্ছি কিন্তু বাস্তবটা যে আরও কত

ঐতিহাসিক তা লেখার যা বলার তার আমার জানা নেই। তবে যেটুকু পারব সেটুকু খুব স্পষ্টভাবেই, পাঠকের কাছে তুলে ধরব।

তার পরের দিন সন্ধ্যায় ছুটলাম হেমদিদের বাড়িতে। মনের মধ্যে কত যে আলোড়ন তা কি দিয়ে বোঝাব। গিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "মিস সেনগুপ্ত, অতুলদাকে আপনার কেমন লাগল?"

এর উত্তর কিন্তু পেলাম ডক্টর জি সি দাস আর হেমদির কাছ থেকে। সেটা চা খাবার সময়। কাজেই টেবিলে তখন ডক্টর দাস, হেমদি, তাঁদের দুটি ছেলেমেয়ে, সকলেই উপস্থিত। আর ওই কালো মেয়েটি তো আছে বটেই।

হেমদি বললেন, "ও তো কাল রাত্রে বাড়ি ফেরার পর থেকে সেন মশায়ের প্রশংসায় শতমুখ। তা হ্যাঁ রে পাহাড়ী, তোর ছাত্রী গান করল কেমন?"

বললাম, "আমার ছাত্রী যখন তখন আর নিজের মুখে কি প্রশংসা করব। তবে হ্যাঁ, সাধুবাদের রোল শুনে মনে হল গান বোধ হয় ভালই গেয়েছিল।"

প্রতিভা তাতে বলল, "ওরে বাবা, আমার তখন যা বুক ঢিপঢিপ করছিল! কি গাইলাম তা নিজেই শুনতে পেলাম না। কিন্তু সেনমশায়কে এত সহজ সরল মানুষ বলে মনে হল যে তাঁর রচিত গান যে তাঁরই সামনে গাইতে পারছি সেই সৌভাগ্যের কথা ভেবে অনেকটা ভয় আর লজ্জা কেটে গিয়েছিল।"

এরকম ধরনের কথাবার্তার পর প্রতিভা বললে, "আজকে আমাকে আর একখানা অতুলপ্রসাদের গান শেখাবেন?"

সেও হেসে বললে, "আপনার যদি মনে হয় পারিতোষিক আমার প্রাপ্য—তবে তাই।"

সে সন্ধ্যায় কি গান তাকে শিখিয়েছিলাম তা আমার মনে নেই। কারণ তখন আমি আনন্দে অন্যমনস্ক। মোটামুটিভাবে গানটা শিখিয়ে দুজনেই কখন গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছি জানি না। গল্পের বিষয়বস্তু কিন্তু অতুলদা। প্রতিভা অতুলদার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, যেটা আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম সেটা যে সত্যিই ঘটেছে এটা ভেবেই তখন আমি আত্মহারা।

আমার মনে হয়, প্রতিভা যে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে সে কথা ভেবে সেও আত্মহারা। এই মানসিক একাত্মতার মধ্যেই বোধ হয় আমাদের দুজনের হৃদয় আরও নিকটতর হয়েছিল।

তখন আমার যৌবনের প্রারম্ভ। তাই বোধ হয় আমি অতুলদাকে ভুলে নিজের হৃদয়ের রত্নসম্ভার সাজাতেই ব্যস্ত। তখন মনে হচ্ছিল হৃদয়সৌধ গড়ে তোলবার একটা ভাস্কর্যের রূপরেখা বুঝি খুঁজে পেয়েছি। আর আমার অজান্তেই বুঝি ওই কালো মেয়েটি হয়েছে আমার দোসর।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ অতুলদার কথা মনে হওয়াতে ছুটলাম তাঁর বাড়ি। যতদূর মনে আছে তখন সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি। গিয়ে কিন্তু হতাশ। অতুলদা বাড়ি নেই। অতুলদার বাড়ির বেয়ারা-চাকরেরা ততদিনে আমাকে খুব ভাল করেই চিনে গিয়েছে। তারা হাসিমুখে আমাকে বললে, "আপ বইঠিয়ে সরকার, সাহাব কহ্ গায়ে হ্যাঁয় উহ্ জলদ্‌হী ওয়াপস আ যাএংগে। আপ তব্‌তক্ চায়-উয়াএ পীজীএ।"

আমি বললাম, "থাক, সাহেব এলেই যাব এখন।"

তারা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমিও নিজের অবচেতনে ডুব দিলাম। এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে একা মনে হল না। কারণ মন তখন আমার দোসরের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। একাকিত্বের প্রশ্নই ওঠে না।

কতক্ষণ এইভাবে আত্মমগ্ন ছিলাম জানি না। অতুলদার গাড়ি পোর্টিকোতে এসে দাঁড়ানোর আওয়াজ পেয়ে বহির্জগৎ সম্বন্ধে আবার সচেতন হলাম।

অতুলদা ঘরে ঢুকেই একগাল হেসে বললেন, "কি হে, কোথায় পালিয়েছিলে তুমি? সেদিন গানের আসরের পর থেকে তো আর আসই নি।"

আমি নিজের অপ্রস্তুত ভাবটাকে ঢাকতে গিয়ে ছেলেমানুষের মত উত্তর দিলাম, "তুমি এত ব্যস্ত থাক যে বারবার এসে তোমাকে জ্বালাতন করতে লজ্জা করে।"

অতুলদা তাঁর সেই অননুকরণীয় হাসি হেসে বললেন, "ওয়াণ্ডারফুল! আই ফাইণ্ড ইউ হ্যাভ বিকাম অ্যান অ্যাডালট।"

অতুলদা যদিও বয়সে আমার থেকে অনেক বড়,—বিদ্যা বুদ্ধি মানবতার কথা ছেড়েই দিচ্ছি—কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকদের বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি যে, অতুলদা যে বয়সে আমার থেকেও অনেক বড় সে কথাটা আমার কোনদিন মনেই আসেনি। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠলাম, "কেন, এতদিন কি তুমি আমায় ছেলেমানুষ ভাবতে নাকি?"

উনি বললেন, "না না, তুমি তো একেবারেই লায়েক হয়ে উঠেছ।"

কথাটার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল কিনা আমি জানি না। অতুলদা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চা খেয়েছ?"

আমি বললাম, "না, বেয়ারারা খেতে অনুরোধ করেছিল, আমি বলেছিলাম তুমি এলে খাব।"

অতুলদা আবার হেসে বললেন, "যাক, আমার বেয়ারাগুলো দেখছি আমার থেকেও ভদ্র। তা আমি তো এখন আর চা খাব না। তুমি খাও, আমরা গল্প করি।"

ইদানীং আর অতুলদা আমাকে খেতে যাবার জন্য অনুরোধ জানাতেন না। ওটা ধরে নেওয়াই ছিল। অতুলদার কাছে গেলেই যে আমি গান শিখতাম তাও নয়। আমি ছেলেমানুষের মত কি সব যেন বলতাম আর অতুলদাও আমারই মতন ছেলেমানুষের রূপ ধারণ করে সেই সব কথার খুব সহজ হয়ে উত্তর দিতেন। কোনদিন তাঁকে বিরক্ত হতে দেখি নি।"

তাই বলে যে তিনি কোনদিনও আমার উপর বিরক্ত হন নি সে কথাও বলব না। যখনই কোনদিন তাঁর অভিমান হত আমার কথায় বা ব্যবহারে, তখনই নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে তাঁর সে বিরক্ত ভাবটা প্রকাশ পেত।

আমার মন তখন অর্বাচীন। তাই দুঃখ পেয়ে, তাঁর স্নেহের তাৎপর্য না বুঝে তাঁর কাছ থেকে সরে থাকতাম আর বেশ কিছুদিন ডুব দিতাম। তারপরে যেন কবে আবার ছুটে যেতাম অতুলদার কাছে। দেখতাম অতুলদার সেই সাময়িক অভিমান অপসৃত। [ক্রমশ]

আধুনিক গদ্য

নতুন লেখকরা নতুন বিষয়বস্তু আনার বদলে প্রথমেই ভাষাটাকে বদলাতে চান। কারণ, যে ভাষায় অনবরত সাহিত্য রচিত হচ্ছে, সেই ভাষাটাকেই আমূল বদলে না ফেললে নতুন চরিত্র সহজে ফুটে উঠতে পারে না।

এই ভাষা বদলের ঝোঁকটা যেমন খুবই স্বাভাবিক, তেমনি খানিকটা বিপজ্জনকও বটে। কেননা, বহুল প্রচলিত ভাষা আসলে সহজবোধ্য ভাষা, সেটাকে বদলাতে গেলে প্রথম ঝোঁকই আসে দুর্বোধ্যতার দিকে—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সব লেখক পাঠকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। নতুনত্ব মানে যে বলার ভঙ্গির নতুনত্ব—সেটা বিস্মৃত হয়ে শব্দ সাজানোর ব্যাপারে নতুনত্ব খুঁজতে গেলেই এই বিপদ আসে। তা ছাড়া যে জিনিস সহজেই বোঝা যায়, সেটাই আসলে হালকা বিষয়—এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে যে-কোনো কথাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার লোভ হয়—তাতে পাঠকের শুধু বিরক্তিই জন্মায়। আর একটি বিপদ, গদ্যের মধ্যে কবিত্ব করার চেষ্টা। কবি আর কবি-কবি মানুষ যেমন এক জাতের নয়, তেমনি কবিতা ও কবিতা-কবিতা গদ্য। শেষোক্ত গদ্য যে-কোনো উত্তম রচনার পক্ষেই পরিত্যাজ্য।

আধুনিক বাংলা গদ্য এখন কি রকম লেখা হচ্ছে, বিচার করা যাক। আধুনিক অর্থে, যে-সব লেখকের রচনা এখনও লিটল ম্যাগাজিন নির্ভর এবং পরীক্ষামূলক। আমার হাতের কাছেই 'অবনী বনাম শান্তনু' নামে একটি বই, লেখক উদয়ন ঘোষ। এতে অবনী আর শান্তনু এই দুটি চরিত্র নিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায়কে একটি ছোট গল্প বলা যায়। সবগুলোকে বলা যায় না। এই লেখকের গদ্য বেশ জটিল। পড়তে পড়তে বোঝা যায়, ইনি গদ্য ভাষাটি খুব ভালো জানেন এবং বেশ চেষ্টা করেই ভাষাকে মসৃণ হতে দেননি। তাঁর বর্ণনা ঘটনানির্ভর নয়, চিন্তানির্ভর—তাই গতি এরকম সর্পিল। কিন্তু একথাও ঠিক, চিন্তার গতি অনুযায়ী হুবহু গদ্য রচনা অসম্ভব ও অবাস্তব—সে সম্পর্কে যে-কোনো রকম চেষ্টা কৃত্রিম হতে বাধ্য। তাঁর প্রথম রচনাটিতে সাড়ে পনেরো পাতার মধ্যে মাত্র দুটি কি তিনটি প্যারাগ্রাফ আছে—এ রকম লেখার আর কি যুক্তি থাকতে পারে—একমাত্র কমলকুমার মজুমদারকে অনুসরণ করা ছাড়া। এ রকম জমাট লেখা চোখকে কষ্ট দেয়। যদিও তাঁর এই গল্পটা খুবই ভালো। এই লেখকের গদ্যভঙ্গি এই রকম: "অবনী সেই য পথে উঠছিল, উঠেইছিল মাত্র, এক ফোঁটাও হাঁটেনি, থেমেই আছে, তার বাড়ির

দরজাটা সটান খোলা, সে মেশিনের অটোমেশনের ন্যায় ইতিমধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, কী যেন সে করে যাচ্ছে, ভালো লাগছে না, এমন সম্বিতে সে, অবনী, সিগারেটটা দেখলো নিজের নাকের নিচে।" লক্ষ্য করার বিষয়, একটাই বাক্যের মধ্যে বেশ কয়েকবার 'সে' এবং 'অবনীর' ব্যবহার এবং একবার স্রেফ পাশাপাশি। এই গদ্য নিশ্চয়ই আলাদা জাতের—কিন্তু কতখানি অবধারিত তার বিচার ভবিষ্যৎ পাঠকের কাছে।

'নাগকেশর' একটি সাম্প্রতিক ছোট গল্পের সংকলন। অনুমান হয়, লেখকেরা সবাই বয়েসে তরুণ। এতে লিখেছেন ১২ জন। উদয়ন ভট্টাচার্য রচিত "ক্ষেত্রের আকাশ ও সন্ধ্যা" নামের গল্পটির আরম্ভ এই রকম: "ক্ষেত্র দেখছিল সন্ধ্যা, তার বিস্তার, কুয়াশার মতো এক আস্তরণে সারা বিকেলের আবীর ঢেকে যাচ্ছিল, ক্ষেত্র দেখছিল আকাশ, তার সমস্ত মনে কে যেন এক শীতল হাওয়া বুলিয়ে দিচ্ছিল। ক্ষেত্র তার হাতে ধরা সিগারেট নিয়ে আকাশ এবং সন্ধ্যা দেখছিল।" পৌনঃপুনিকভাবে সন্ধ্যা ও আকাশ দেখার বর্ণনার ঠিক কারণটি বোঝা যায় না। ক্ষেত্রর বয়েস বত্রিশ—ঐ বয়েসের পুরুষের যতগুলি করণীয় কাজ থাকে, তার মধ্যে আকাশ ও সন্ধ্যা দেখা পড়ে না। অথচ পুরো গল্পটির পরিপ্রেক্ষিতেই এই আকাশ ও সন্ধ্যা রয়েছে এবং গল্পটির ক্ষতি করেছে। জীবন্ত সরকারের গল্পের আরম্ভ: '... থেকে ফিরছিল ও। অথচ কোন্ স্টেশন। কেন এসেছিল—ট্রেন চলাচল দেখতে, না যাত্রীদের ওঠানামা আসাযাওয়া দেখতে, তা কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।" নিশ্চয়ই নতুন ধরনের আরম্ভ। কিন্তু ও বা সে বা লোকটা দিয়ে নায়ককে পরিচিত করানোর ঝোঁক এখন একটু বেশী। তা ছাড়া, অনিশ্চয় ভঙ্গী দিয়ে ফ্রানৎস কাফকা উপন্যাস শুরু করেছিলেন বহু বছর আগে। সংকলনের প্রথম গল্পে শংকর দাশগুপ্ত বাংলাদেশের মানহারা কোনো মানবীর কথা লিখেছেন। কিন্তু এরই মধ্যেই তিনি এনেছেন একটা সিম্বল, তিনি লিখেছেন, "ঘাসের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকা ধবধবে সাদা একটা সিংহ দেখছিলাম আমি।" ধবধবে সাদা সিংহ কৌতূহল উদ্রেক করে। এখানে প্রথমেই পাঠককে বলে দেওয়া হচ্ছে, সিংহটা বাস্তব নয়, লেখক সিম্বল ব্যবহার করছেন। কিন্তু আজকালকার লেখায় দেখি, প্রতীক যদি বাস্তবের ছদ্মবেশ ধরে না আসে, তা হলে ঠিক মনে গাঁথতে চায় না।

আমি শুধু গদ্যেরই আলোচনা করছি। ঐ সংকলনটির বেশ কয়েকটি গল্প ভালো এবং নতুন।

তুষার রায়ের 'শেষ নৌকা' একটি উল্লেখযোগ্য গদ্য গ্রন্থ। সদ্যমুদ্রিত এই বইটির মধ্যে বেপরোয়াভাবে বাংলা গদ্যকে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত আছে। শেষ নৌকা একটি বড় রচনা— কোনো এক কাল্পনিক সমুদ্র পারে —যদিও নাম আছে গোপালপুর—একটি কয়েকদিনব্যাপী সাহিত্য সভায় যোগ দিতে এসেছেন কিছু যুবক ও যুবতী—তাদের কাহিনী। যদিও তুষার রায় ঠিক কাহিনী সৃষ্টি করতে চাননি—এই সব চরিত্র নিয়ে খানিকটা ফ্যানটাসি তৈরী করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়। সে ব্যাপারে তিনি সার্থকও হয়েছেন—খানিকটা স্বপ্নের ভেতরে হাঁটা চলার আভাস পাওয়া যায়। গদ্যভঙ্গি কোথাও কোথাও নিশ্চিত নতুন

ধরনের, যেমন, "হায় দুর্বল জীবসকল, হায় শিল্পী—তোমরা কিনা পাখা উদ্গাত পিপড়ের মতো উড়ে উড়ে কখনো মোকাবিলা করতে চাও ভগবানের সঙ্গে—যার হাতে কিনা মৃত্যুর মতো বিশ্বখেকো অস্ত্র। ফঃ ফঃ—"। কিংবা, "নিত্য এ ধরনের বর্ণ বিস্ফোরণে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও পাখিরা ভয় পায় কেন না তারা পাখি।"

কিন্তু তুষার রায়ের কয়েকটি মুদ্রাদোষ তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে প্রকট। যেখানে সেখানে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল প্রয়োগ, কানে লাগে। পাশ্চাত্ত্য ধরনের জীবনযাত্রার ছবির প্রতি তাঁর মোহও একটু অস্বাভাবিক। গোপালপুরের সমুদ্রতীরে তাঁর কাহিনীর চরিত্র হিপ পকেট থেকে আবসাঁথ নামের মদের বোতল বার করে চুমুক দেয়, ওখানে সী বার্ড-এ স্যান্ড পাইপার পাখি দেখা যায়, ওষুধের দোকানকে তিনি লেখেন ড্রাগ স্টোর, ট্যাক্সিওয়ালাকে ক্যাব ড্রাইভার। এসব দরকার হয় না। প্রথম দিকে পাছা শব্দটি এত অজস্রবার ব্যবহার করেছেন যে, এবং, কিন্তু, অথবার মতন সাধারণ মনে হয়।

সনাতন পাঠক

ছোটগল্প সংকলন

উত্তর জাহ্নবী। সম্পাদক শ্রীরবীন রায়চৌধুরী ও শ্রীত্রিদিবনাথ চট্টোপাধ্যায়। বহরমপুর সারগাছি আশ্রম (মুর্শিদাবাদ) থেকে প্রকাশিত। পরিবেশক—গ্রন্থমিত্র, ৪৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, দাম চার টাকা।

'উত্তর জাহ্নবী'র সম্পাদকদ্বয়ের প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য, এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিনবও বটে। কারণ, এই সংকলনের যাঁরা লেখক, তাঁরা অনেকেই বেশ খ্যাতিমান বা সুপরিচিত; সম্পাদকদ্বয়ের দাবীমতে তাঁরা সবাই আবার মুর্শিদাবাদ জেলার লোক এবং 'এই জেলাওয়ারী মনোভাবের একমাত্র যুক্তি, ...গল্পকাররা এই জেলার; এই জেলা কলকাতার কলেজ স্ট্রীট নয়।' সম্পাদকদ্বয় আরও বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্য কলকাতার... সম্পত্তি নয়।' অবশ্যই নয়। কার বুকের পাটা যে এমন উদ্ভট দাবী করতে পারে? কলকাতা যেহেতু সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম বাণিজ্যকেন্দ্র, এবং সাহিত্য প্রকাশনা ব্যাপারটা পরিণামে আরও পাঁচটা জোগান-পণ্যের মতোই—সেইহেতু আধুনিক অর্থনীতির নিয়মানুসারে সেখানে বাংলা সাহিত্যের ঘাঁটি হয়ে গেছে। এমনকি সেই নিয়মেই 'উত্তর জাহ্নবী'র পরিবেশনার স্থানও কলকাতা—কলেজ স্ট্রীটের কাছেই। তাছাড়া আমরা জানি, বাংলা সাহিত্যের এযাবৎকালের লেখকরা কিছু আর কলকাতার অকৃত্রিম লোক নন—প্রায় সকলেই নানা জেলার নানা জায়গা থেকে গজিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও 'উত্তর জাহ্নবী' সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ছোটগল্প সংকলন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে যাঁদের গল্প আছে তাঁরাঃ যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক), সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি সেন, দুর্গাদাস ভট্ট, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিদিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিমল চক্রবর্তী, দিব্যেশচন্দ্র লাহিড়ী, সুনীল সরকার ও রবীন রায়চৌধুরী। এঁদের এই গল্পগুলি একদা কলকাতারই নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পাঠকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। কল্লোলের কাল থেকে সাম্প্রতিক দশকের অব্দি প্রবীণ ও নবীনদের একত্র সমাবেশে ছোট গল্পের রূপান্তরের ছাপ ও স্বাদও এই গ্রন্থে কিছুটা ধরা পড়েছে। একটা কথা—লেখক সমাবেশ যখন জেলাওয়ারী, একটি দুটি গল্প ছাড়া কিন্তু কোথাও সেই জেলাওয়ারী পরিবেশ অর্থাৎ জেলার মাটি ও মানুষদের চিহ্ন নেই। থাকলে আরও ভাল হত।

ধর্ম

পত্রপ্রসাদ—গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২০/বি, ইন্দ্ররায় রোড হইতে প্রকাশিত। দাম—পাঁচ টাকা।

'পত্রপ্রসাদ'কে পুরোপুরি গ্রন্থ না বলে পদ্যগ্রন্থ বলাই বোধ করি শ্রেয় হবে।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর পিতার মধ্যে একদা যেসব পত্রালাপ হয়েছিল আলোচ্য পুস্তকে তারই সন্নিবেশ। কিন্তু পিতা-পুত্রের সেইসব ব্যক্তিগত পত্রালাপের মধ্য থেকেই একটি অধ্যাত্মদর্শন ও সর্বজনীন সত্য প্রকাশ পেয়েছে যার আবেদন সর্বকালীন। বলা বাহুল্য, সে জন্যেই পুস্তকটি সাধারণ পাঠকদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এখানে যে সমস্ত উপদেশ, কথা, এবং ধর্মীয় তত্ত্বের প্রকাশ আছে সেগুলিতে অধ্যাত্ম পথের পথিক মাত্রেরই সহজ অধিকার। এবং এইখানেই পুস্তকটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে! এ ছাড়াও, 'মহাজন-সংবাদ' শিরোনামে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির পত্রও এখানে মুদ্রিত। এখানে যে সমস্ত পত্রের সংকলন করা হয়েছে তার মধ্যে থেকে এমন একটি তত্ত্ব এবং এমন কিছু তথ্য সহজেই পাঠকরা পেয়ে যাবেন যা সর্বজনীন ও সনাতন সত্যে দীপ্তিময়। পুস্তকটির বড় সাফল্য এইখানেই।

জিমন্যাস্টিকসের সম্ভাবনাময়ী মেয়ে

পশ্চিম বাংলার আন্তঃ স্কুল জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের গ্রুপে বীম ব্যালান্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবার চেতলা গার্লস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী গোপা চক্রবর্তী। অসীমা গলের সঙ্গে সম পয়েন্টে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন। তাছাড়া ফ্লোর একসারসাইজে গোপা তৃতীয় স্থান পেয়েছে, ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে হয়েছে দ্বিতীয় এবং প্রধানত গোপার কৃতিত্বে দক্ষিণ কলকাতা স্কুল পেয়েছে টিম চ্যাম্পিয়নশিপ। গোপাই ছিল দক্ষিণ কলকাতা দলের অধিনায়িকা।

বাংলার জিমন্যাস্টিকসে নীলিমা ও অসীমা গল বহুদিন থেকে পরিচিত দুটি নাম (এর আগে 'দেশ'-এর পাতায় এই দুই বোনের কথাই লেখা হয়েছে)। বলবার কথা, ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন অসীমার সঙ্গে প্রায় সমানে পাল্লা টেনে গোপা পেয়েছে সর্বসাকুল্যে দ্বিতীয় স্থান। অসীমা পেয়েছে ২৪·৫০ পয়েন্ট, গোপা পেয়েছে ২৩·৯০ পয়েন্ট। এই ফলাফলই বলে দিচ্ছে গোপা বাংলার সবচেয়ে সম্ভাবিত মেয়ে যার পক্ষে জিমন্যাস্টিকসের শীর্ষস্থান দখল শুধু সময়ের ব্যাপার।

মাত্র তিন বছরের শিক্ষাতেই গোপার এতখানি উন্নতি। তার আগেও অবশ্য শিখেছে এক বছর। কিন্তু সে শিক্ষা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জিমন্যাস্টিকসের নয়, রোলার, বোনলেস, ল্যাডার, ট্রাপিজ প্রভৃতি শো-এর।

চেতলায় ওদের বাড়ির খুব কাছেই মহাবীর ব্যায়াম সমিতি। সেখানে পাড়ার ছেলেমেয়েরা যেত খেলাধুলো করতে আর গোপা চেয়ে চেয়ে দেখত। দেখতে দেখতেই ক্লাব ওকে কাছে টানল। শুধু একা গোপা নয়, গোপা, গৌতম, রূপা, উত্তম—শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দুই মেয়ে এবং দুই ছেলে, চারজনই ভরতি হল মহাবীর ব্যায়াম সমিতিতে। সেখানে জিমন্যাস্টিক সেক্রেটারি পঞ্চানন সেন গোপার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেলবতা ও রিদম দেখে ওকে ভবিষ্যৎ জিমন্যাস্ট হিসাবে কল্পনা করে নিয়ে শিক্ষার ভার দিলেন মোহিত বসুর উপরে। এটা উনিশশো আটষট্টির কথা। এক বছরেই গোপা শো দেখাবার নানা কসরৎ ও প্রক্রিয়ায় পটু হয়ে উঠল। কিন্তু উনিশশো উনষাটে এন আই এস-এর পাস করা জিমন্যাস্ট কোচ দিলীপ দাস শিক্ষার ভার নিয়ে দেখলেন মোমের মতো পেলব দেহের কালো মেয়েটির মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং শুরু হল আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা। ওই বছরেই রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের ফ্লোরে গোপা পেল তৃতীয় স্থান। ফলে কয়েক মাস পরে পূর্ব জার্মানী থেকে আগত জিমন্যাস্টদের সঙ্গে প্রদর্শনী জিমন্যাস্টিকস দেখাবার জন্য গোপা নির্বাচিত হল। ইডেনে ওই প্রদর্শনী দেখিয়ে দর্শকদের হাততালিও পেল মাঝে মাঝে। উনিশশো সত্তরে হাততালির সঙ্গে বেশ কিছু প্রাইজও হাতে এল। প্রথম কটকের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান, তারপর লেনিন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান, স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ, স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ, ত্রিবান্দ্রামের জাতীয়

বীম-এর উপর গোপা চক্রবর্তীর একটি ফিগার

স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। কোথাও ফ্লোরে থার্ড, বীমে সেকেন্ড, কোথাও বীমে থার্ড, ফ্লোরে সেকেন্ড, ভল্টিংয়েও থার্ড। আবার কোথায় সর্বসাকুল্যে দ্বিতীয় স্থান। ত্রিবান্দ্রামের জাতীয় স্কুল গেমসে পশ্চিম বাংলা রানার্স হওয়ায় কৃতিত্বের জাতীয় স্বীকৃতিও মিলেছে; প্রতি মাসে ৫০ টাকা হিসাবে স্পোর্টস ট্যালেন্ট বৃত্তি। তবে মাসিক ৫০ টাকা নয়, এককালীন ৬০০ টাকা হাতে এসে গেছে গোপা চক্রবর্তীর।

উনিশশো একাত্তর দিল্লিতে জাতীয় জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থানাধিকারী বাংলা মহিলা দলের সহ-অধিনায়িকা ছিল চতুর্দশী গোপা চক্রবর্তী। বাংলার কর্মকর্তারা অবশ্য দাবি করেন অধিনায়িকা অসীমা গল যদি প্রতিযোগিতার সময় আনফিট না হয়ে পড়ত, তবে বাংলার মেয়েরা চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার নিয়েই দিল্লি থেকে ফিরে আসত। বাংলার মেয়েদের একাধিক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল দিল্লিতে। প্রথম অসুবিধা অন্যান্য দলের ৬ জনের সঙ্গে বাংলার ৫ জনের দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে অসীমার অভাবে। ফলে পয়েন্ট কমে গেছে। দ্বিতীয় অসুবিধা বীম ও ফ্লোরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে নিরূপিত সময়ের মধ্যে। এতদিন এক একটি ফিগারের জন্য সাধারণত আড়াই থেকে তিন মিনিট সময় পাওয়া যেত। কিন্তু দিল্লিতে সর্বপ্রথম বীমের জন্য ১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড এবং ফ্লোরের জন্য ৯০ সেকেন্ড সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। তবু গোপা ওখানে যথেষ্ট সুনাম কুড়োয়।

দিলীপ দাসের কোচিংয়ে নিজের ফিগারগুলির মধ্যে পরিমার্জন আনতে গোপার চেষ্টার ত্রুটি নেই। কোচ শ্রীদাসও ওর সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী। বীমেই গোপা বেশী পটু। আগে এক একটি ফিগারের মাঝে বিরতির অবসর মিলত। এখন বিরামহীনভাবে ফিগারগুলি করে যেতে হয়। থামলেই পয়েন্ট কাটা যায়। ননস্টপ টার্ন, জাম্প, হ্যান্ড স্ট্যান্ড টার্ন ওভার, ফিগার জাম্পিং প্রভৃতির মধ্যে সত্যিই আর্ট এসেছে, রিদম এসেছে। ফিগার যত আর্টিস্টিক হবে, তার মধ্যে যত রিদম থাকবে ততই পয়েন্ট আসবে।

—'তোমার অ্যাম্বিশান কী?'

—'জিমন্যাস্ট হব'।

—'জিমন্যাস্ট তো হয়েছোই'।

—'এখনো ভাল জিমন্যাস্ট হতে পারিনি। অনেক ভাল হতে চাই'।

—'কার মত হতে চও? ভেরা ক্যাসলাভসকার মত?'

এবার বড় বড় দুটি চোখ আরও বড় করে গোপা চেয়ে রইল। ভাবখানা তা কি সম্ভব।

সত্যিই সম্ভব নয়। সুযোগ কোথায়? জিমন্যাস্টিকসে মেয়েদের চারটি বিষয়ের মধ্যে ওদের আন-ইভন প্যারালাল বার করার সুযোগ নেই বারের অভাবে। হর্স, বীম ও ফ্লোরের মধ্যেই অনুশীলন সীমাবদ্ধ। আধুনিক জিমন্যাস্টিকসে উন্নতি করার জন্য যেসব অ্যাপারেটাস দরকার তার অবস্থাও সঙ্গীন। সঙ্গে মিউজিকের ব্যবস্থা নেই, বড় আয়নায় নিজের ভুলত্রুটি দেখার সুযোগ নেই। তবু বাবা ও মার উৎসাহ এবং কোচের শিক্ষায় গোপা ভারতের শীর্ষে উঠতে চায়। তারপর ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যেতে চায় ভারতের বাইরে বড় সম্মানের জন্য।

মুকুল

রোভার্স কাপ সহ হর্ষোৎফুল্ল মোহনবাগান খেলোয়াড়। বোম্বাইতে জয়ের পর তোলা ছবি

মোহন বাগানের আবার রোভার্স

গোয়ার ভাসকো স্পোর্টস ক্লাবকে ফাইনালে ১—০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান ক্লাব বোম্বাই থেকে আবার রোভার্স কাপ জয় করে ফিরে এসেছে। এই জনই আবার বলতে হচ্ছে যে, মোহনবাগান গতবারও রোভার্স জয় করেছিল। পর পর দু বছর রোভার্স কাপ লাভ অবশ্যই কৃতিত্বের পরিচয়। কিন্তু বোধ করি তার চেয়েও বড় কথা মোহনবাগানের একটানা আট বছর রোভার্স ফাইনাল খেলার কৃতিত্ব। গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে হায়দরাবাদ সিটি পুলিসের উপর্যুপরি পাঁচ বছর রোভার্স জয়ের অনন্য কৃতিত্ব আছে। কিন্তু একটানা আট বছর একটি প্রধান প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় নজির নেই এক মোহনবাগানের ছাড়া, যদিও ফাইনালে মোহনবাগানের জয়ের চেয়ে পরাজয়ের সংখ্যা বেশী। এবার নিয়ে মোট ১৩ বার ফাইনাল খেলার মধ্যে মোহনবাগান ৫ বার রোভার্স জয় করেছে, ফাইনালে হেরেছে ৮ বার।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং—কলকাতার তিন প্রধানই রোভার্সের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলার সুযোগ পায়। মোহনবাগান প্রথম খেলায় পরাজিত করে ৫১৫ আর্মি রেস দলকে ২—০ গোলে। কোয়ার্টার ফাইনালে গোয়ার সালগাওকার স্পোর্টস ক্লাবকে ০—০ ও ৩—২ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনালে পরাজিত করে কলকাতারই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিংকে ১—১ ও ২—০ গোলে। আগেই বলেছি ফাইনালে জয় ভাসকো স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে ১—০ গোলে যে ভাসকোকে ১৯৬৬-র ফাইনালে একই ফলাফলে হারিয়ে মোহনবাগান দ্বিতীয়বার রোভার্স জয় করেছিল। বলবার কথা ১৯৬৬-র ওই ফাইনালে মোহনবাগানের পক্ষে জয়-সূচক গোলটি করেছিলেন প্রণব কাঞ্চন। এবারও কাঞ্চনের একমাত্র গোলে মোহন-বাগান বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে।

পাক-ভারত যুদ্ধের আগেই এবার রোভার্সের খেলা আরম্ভ হয়েছিল। যুদ্ধ এবং জরুরী অবস্থার জন্য মাঝখানে খেলায় ছেদ পড়লেও এবার রোভার্সের খেলা শেষ মুখে জমে উঠেছে প্রধানত কলকাতা ও গোয়ার ফুটবল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। আমরা দেখেছি কলকাতার তিন প্রধানই সেমি-ফাইনালে উঠেছে। মোহনবাগান বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং সেমিফাইনালে হেরে গেছে। আরও দেখেছি মোহনবাগান হারিয়েছে গোয়ার দুটি নামকরা ক্লাব সালগাওকার ও ভাসকো স্পোর্টস ক্লাবকে। ইস্টবেঙ্গলকেও খেলতে হয়েছে গোয়ার দুটি ক্লাবের সঙ্গে। প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গল গোয়ার লীগ চ্যাম্পিয়ন ডেমপো স্পোর্টস ক্লাবকে ২—০ গোলে হারিয়েছে। দ্বিতীয় খেলায় কলকাতার বি এন আরকে ১—০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। সেমি-ফাইনালে গোয়ার ভাসকো স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে তিনদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গেছে।

ইস্টবেঙ্গল হেরে গেছে বললে অবশ্য ঠিক বলা হবে না। বলা উচিত ইস্টবেঙ্গল স্বেচ্ছায় সরে গিয়ে সেমিফাইনাল থেকে বিদায়

নিয়েছে। প্রথম দিন ২—২ গোলে খেলাটি শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলা অমীমাংসিত থাকে ১—১ গোলে। তৃতীয় দিন ভাসকো প্রথমার্ধে একটি গোল করে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য রেফারি অ্যালেক্স ডাজ ইস্টবেঙ্গলের কাজল মুখার্জিকে মাঠ থেকে বার হয়ে যাবার আদেশ দিলে কাজল সেই আদেশ মানতে অস্বীকার করে। কাজল ছাড়া ইস্টবেঙ্গল দলও খেলবে না বলে জানায়। ফলে রেফারির পক্ষে খেলা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। রেফারির রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিচালক সমিতি পরের দিন ইস্টবেঙ্গলকে স্ক্র্যাচড করে দিয়ে ভাসকো স্পোর্টসকে ফাইনালে খেলার সুযোগ দেন।

রোভার্সের ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের মধ্যে মতবিরোধ দানা বেঁধে উঠেছে এবং প্রকাশ, ইস্ট-বেঙ্গলের অধিনায়ক সুনীল ভট্টাচার্য কলকাতায় ফিরে এসে অধিনায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এটা অবশ্য ইস্ট-বেঙ্গলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, কিন্তু রোভার্সে ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের আচরণ যে ক্লাবের সুনাম ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের উত্তেজিত হবার মত কারণ থাকতে পারে। সংবাদে প্রকাশ, দ্বিতীয় দিনের সেমিফাইনাল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকার পর ইস্টবেঙ্গল অতিরিক্ত সময়ে একটি গোল করেছিল। কিন্তু রেফারি অফ-সাইডের অজুহাতে বাতিল করে দিয়ে-ছিলেন সেই হক গোলটি। তবু বলব তৃতীয় দিন তাঁদের মাথা গরম করে খেলা অর্থহীন। বিশেষ করে হাতে যখন গোল শোধ করার প্রচুর সুযোগ ছিল এবং খেলার প্রথা প্রকরণ এবং কলাচাতুর্যে তিনদিনই ইস্টবেঙ্গল টেক্কা দিয়েছিল ভাসকো খেলোয়াড়দের উপর।

যাই হক, আগেই বলেছি প্রধানত কলকাতা ও গোয়ার খেলোয়াড়দের ফুটবল দ্বন্দ্বেই রোভার্সের শেষ দিকের খেলা জমে উঠেছিল। সালগাঁওকার ক্লাবও কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে দুইদিন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গেছে। প্রথম দিন গোলশূন্যভাবে একবার এগিয়ে যায় মোহনবাগান, একবার গোল শোধ করে এগিয়ে যায় সালগাঁওকার। মোহনবাগান আবার গোল শোধ করে অতিরিক্ত সময়ে করে জয়সূচক গোল। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে মোহনবাগানকে সেমি-ফাইনালও খেলতে হয়েছে দুইদিন। প্রথম দিন মহমেডানই প্রথম গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল। মোটের উপর শক্তিশালী

রোভার্স ফাইনালে মোহনবাগানের গোলদাতা পুঙ্গব কান্নন। ১৯৬৬-র ফাইনালেও কান্ননের গোলে ভাসকো স্পোর্টসকে হারিয়ে মোহনবাগান রোভার্স জয় করে

ভাসকোকে প্রথম দিনের ফাইনালেই ১—০ গোলে পরাজিত করলেও মোহনবাগানের রোভার্স জয় কষ্টার্জিত সন্দেহ নেই।

মহমেডান স্পোর্টিং প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বাঙ্গালোরের অ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেল দলকে ৪—১ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইনালে জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনদিন। প্রথম দিন লীডার্স ২—০ গোলে লীড নিয়েও জিততে পারে না। দ্বিতীয় দিনের খেলা থাকে গোলশূন্য। তৃতীয় দিন মহমেডান জেতে ৩—২ গোলে।

রোভার্সে কলকাতার অপর দলগুলির মধ্যে খিদিরপুর তৃতীয় রাউন্ডে বারাণসী জেলা একাদশকে ৫—০ গোলে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে বাঙ্গালোরের সি আই এল-এর কাছে হারে ২—৩ গোলে। বি এন আর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে টাটা স্পোর্টসকে ২—১ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নেয়।

বিশ্ব একাদশের রাবার

এ্যাডিলেডের শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ২—১ জয়ের সুবাদে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ রাবার পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবর্তে বিশ্ব একাদশের এই অস্ট্রেলিয়া সফর ভাল জমেনি। ভারতের যে তিনজন খেলোয়াড় বিশ্ব দলের পক্ষে খেলেছেন তাঁরাও সুনাম বজায় রাখতে পারেননি। ফারুক এঞ্জিনিয়ার, সুনীল গাভাসকার এবং বিষেণ সিং বেদী—তিন-জনের ভূমিকাই মাঝারিয়ানার মধ্যে। কেউই অস্ট্রেলিয়ায় চমক সৃষ্টি করতে পারেননি।

বিশ্ব একাদশের অস্ট্রেলিয়ায় খেলা শেষ হবার পরই আরম্ভ হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিউজিল্যান্ড দলের ক্রিকেট সফর। এরপর রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ইংলন্ড ভ্রমণ। বিশ্ব একাদশের কাছে পরাজিত হলেও অস্ট্রেলিয়া এই খেলার মাধ্যমে অ্যাসেস যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতির কাজটা সেরে নিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

এ্যাডিলেডের শেষ টেস্টে বিশ্ব একাদশের জয়ের মূলে প্রধানত দ্বিতীয় ইনিংসে ইন্তিখাব আলমের ও বেদীর প্রশংসনীয় বোলিং। খেলার গতি ছিল স্থ-র দিকে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩১১ রানের উত্তরে বিশ্ব একাদশ ৩৬৭ রানে ইনিংস শেষ করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ২০১ রানে শেষ হয়ে যাবে এটা ছিল কিছুটা অপ্রত্যাশিত। ওই ২০১ রানের মধ্যে অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলের ১১১ নট আউট থাকার কৃতিত্ব উল্লেখ্য। চ্যাপেল ছাড়া এ খেলায় আর সেঞ্চুরি করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড় গ্রাম পোলক। অস্ট্রেলিয়ার জন বেনোর দুর্ভাগ্য মাত্র এক রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেনি। প্রথম দিনের খেলার শেষ বলে ৯৯ রানের মাথায় বেনো আউট হয়ে যায়।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৩১১ (জন বেনো ৯৯, গ্রেগ চ্যাপেল ৮৫, মারস ৫০, গ্রেগ ৩০ রানে ৬ উইকেট, ইন্তিখাব আলম ৯৫ রানে ৩ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ—প্রথম ইনিংস—৩৬৭ (গ্রাম পোলক ১৩৬, জাহির আব্বাস ৭৩, একারম্যান ৩১; ম্যালেট ১১৬ রানে ৪ উইকেট, ও'কিফে ৬০ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—২০১ (ইয়ান চ্যাপেল নট আউট ১১১, জন বেনো ২৭; ইন্তিখাব আলম ৭৪ রানে ৪ উইকেট, বিষেণ সিং বেদী ৫৪ রানে ৩ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ—দ্বিতীয় ইনিংস—১ উইকেটে ১৪৬ (একারম্যান ৭৯, গাভাসকার ৫০)

একলব্য
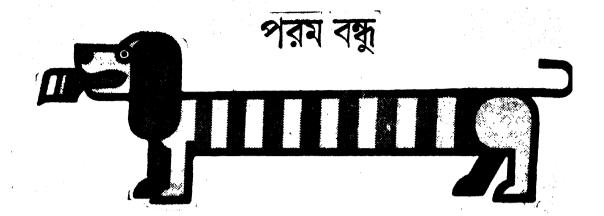
টেকসই ড্যুলাক্স রঙের এই তো বৈশিষ্ট্য

ড্যুলাক্স রং দেখতে সুন্দর ও টেকসই—
লাগালে মসৃণ দেখায়, ফাটে না বা চটে যায় না।

আপনার ঘরদোরেও টেকসই ড্যুলাক্স রঙ লাগিয়েছেন তো? খরচ কিন্তু যত ভাবছেন তত নয়।

- **অল্প রঙে ভালো ফিনিশ**
  এক লিটার ড্যুলাক্সে অনেকটা জায়গা রঙ করা চলে—রঙ কম লাগে ব'লে খরচও কম পড়ে।
- **ধুয়ে পরিষ্কার রাখা যায়**
  ওপরকার দাগ, ধুলো ময়লা সাবান-জলে সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়।
- **ফিকে হয় না, ফেটে বা চটে যায় না, সুন্দর ফিনিশ হয়**
  পরীক্ষিত, উচ্চ গুণমানসম্পন্ন মালমসলা দিয়েই ড্যুলাক্স তৈরী।

পছন্দসই ১২১ রকম ঝলমলে রঙের বাহার

আপনার বাড়ির জন্যে কি রকম রঙ চাই? ড্যুলাক্সের রকমারি শেড মিলিয়ে-মিশিয়ে আপনার পছন্দমত সুন্দর সুন্দর রঙ বানিয়ে নিতে পারবেন আর আপনার ঘরদোর করে তুলতে পারবেন ঝলমলে সুন্দর। আপনার কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলুন—তাঁর পরামর্শ নিন, ড্যুলাক্স শেড কার্ড দেখাতে বলুন।

ড্যুলাক্স—ভারতে প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা:
দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
ড্যুলাক্স—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, লণ্ডন-এর ট্রেডমার্ক। রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী: দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

"আলো আমার আলো" (পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সুচিত্রা সেন

নিউ থিয়েটার্সের কালে
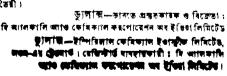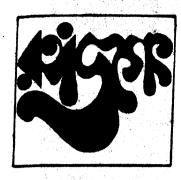
জীবজাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্—নিউ থিয়েটার্সের প্রতীক চিহ্ন-ব্যবহৃত কয়টি কথা, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প ইতিহাসের বৃহত্তম ও সার্থকতম অধ্যায়। এই স্বর্ণযুগের কিছু কথা সেদিন সাংবাদিকরা শুনলেন শ্রী বি এন সরকারের কাছ থেকে। নিউ থিয়েটার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসরকার এবার "ফালকে পুরস্কার" পেয়েছেন। তা ছাড়াও তিনি এ বছর পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এই উপলক্ষে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে গত ৩১ জানুয়ারী বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে শ্রীসরকার সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে নিউ থিয়েটার্স আমলের অনেক তথ্য ব্যক্ত করেন। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম ছবি "দেনা-পাওনা"। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই নাভেলটির চিত্রস্বত্ব কেনা হয়েছিল মাত্র দেড় হাজার টাকায়। রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা" তৈরি হয়েছিল মাত্র তিন দিনের শুটিংয়ে। "চণ্ডীদাস" তৈরি হয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায়। নিউ থিয়েটার্সের ছবির মধ্যে সব চাইতে বেশি পয়সা দিয়েছে বাংলায় "উদয়ের পথে" ও হিন্দীতে "ওয়াপস"। এমন অনেক তথ্য ওইদিন জানা গেল শ্রীসরকারের কাছ থেকে।

নিউ থিয়েটার্স বড় বড় শিল্পী ও কলাকুশলীর জন্ম দিয়েছে। একই সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানে ও'রা কাজ করতেন। কিন্তু ছবি তৈরির কাজে কোনদিন শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়নি। বড় বড় প্রতিভার একত্র সমাবেশে যে পারস্পরিক সহযোগিতা দেখা গেছে তা অতুলনীয়। শ্রীসরকার জানান, এর প্রধান কারণ, শিল্পী ও কলাকুশলীরা পরিচালককেই বিনা প্রশ্নে মেনে চলতেন। কোন্ গল্প নিয়ে ছবি হবে এবং কোন্ ভূমিকায় কে অভিনয় করবেন সে-ব্যাপারে পরিচালকের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। সবটাই ছিল একটা প্রতিষ্ঠানের কাজ, তাই নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল অটুট। কোন রকম স্টার-সিস্টেম তখন ছিল না।

ফালকে পুরস্কার ও পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত শ্রী বি এন সরকার

আজকের দিনে যে-ভাবে ছবি তৈরি হয় সে-সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য কী জানতে চাওয়া হলে শ্রীসরকার বলেন, এখনকার ফিল্ম তৈরির কাজের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নই। অতএব আমার পক্ষে এ-বিষয়ে কোন মন্তব্য করা কঠিন। তবে শুনতে পাই, আজকাল ছবি তৈরির ব্যাপারে বড় বড় স্টারদের ইচ্ছা অনুযায়ী নাকি ডায়ালগ, এমন কী সিচুয়েশনও পালটাতে হয়। আমাদের আমলে সেটা অভাবনীয় ছিল। তখন জনপ্রিয় শিল্পী কম ছিলেন না। তাঁরা পরিচালকের নির্দেশের উপর কোন কথাই বলতেন না।

আজ আপনি চিত্রপ্রযোজনার প্রেরণা পান কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসরকার বলেন, বর্তমান ব্যবস্থায় আমার পক্ষে ছবি তৈরি করা সম্ভব নয়। এ যুগে আমি অনুপযুক্ত। কিছুক্ষণের জন্য শ্রীসরকার যেন পুরনো দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রায় প্রায় দেড়শো ছবি নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে তৈরি। শেষ ছবি "বকুল"। বিলাত থেকে ফিরলেন এঞ্জিনীয়ার হয়ে। এঞ্জিনীয়ার

ছিলাবে কাজও করেছেন কিছুকাল। তারপর কলকাতার প্রতিষ্ঠা করবার সাধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চলে এলেন সিনেমা প্রযোজনায়। নিজের জীবনের কথাও বলছিলেন শ্রীসরকার। সিনেমার কাজে আসার ব্যাপারে অভিভাবকের অমত ছিল প্রথম দিকে। শেষ অবধি সব বাধাই দূর হয়। নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের গোড়াপত্তন শুরু হয়। নিউ থিয়েটার্স ও প্রভাত — ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এই দুইটি নাম অমর। একই সপ্তাহে শ্রীসরকার পদ্মভূষণ উপাধি এবং ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন বলে কলকাতার চলচ্চিত্র মহল আনন্দিত। একটু বিলম্ব হলেও ভারত সরকার যে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম কর্ণধার এবং বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের জনক শ্রী বি এন সরকারকে সম্মান জানিয়েছেন, তাতে এখনকার চলচ্চিত্র মহলের ক্ষোভ দূরীভূত। শ্রীসরকারকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক ও চিত্রব্যবসায়ী শ্রীদীপচাঁদ কাংকারিয়া গত ৭ জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাতে চলচ্চিত্রলোকের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রথম করেন বি-এফ-জে-এ। সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীসরকারকে মানপত্র দেওয়া হয়। তাতে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে শ্রীসরকারের দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

ছবির খবর

"উপহার" এ-সপ্তাহে

রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের "উপহার" এ-সপ্তাহে মেট্রো চিত্রগৃহে মুক্তি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের এই হিন্দী চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক সুধেন্দু রায়। স্বরূপ দত্ত ও জয়া ভাদুড়ী ছবির নায়ক-নায়িকা। সংগীত পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

"আজকের নায়ক"-এর (পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত) নায়িকা সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ শুরু

শতরূপা পিকচার্সের "ত্রিশিকন্যা" ছবির কাজ শুরু হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মিঠু মুখোপাধ্যায় ছবির নায়ক-নায়িকা।

* * *

ইন্দিরা চিত্রমের "সেদিন চৈত্র মাস" ছবির কাজ সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। কাহিনী শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা করছেন চিত্রভানু। সংগীত পরিচালক রাজেন সরকার। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মধুছন্দা, চন্দ্রাবতী দেবী, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী ও সন্ধ্যারানী প্রমুখ শিল্পী এ ছবিতে অভিনয় করবেন বলে জানানো হয়েছে।

মুক্তি আসন্ন

সঙ্গীতা পিকচার্সের "আজকের নায়ক" ছবির মুক্তি আসন্ন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত। পরিচালনা করেছেন দীনেন গুপ্ত। অলোক ভট্টাচার্যের সংগীত পরিচালনায় এ ছবির গান গেয়েছেন মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কাজল গুপ্ত, জয়শ্রী রায়, ভারতী দেবী, গীতা দে, সমিত ভঞ্জ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও নবাগতা সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নির্মীয়মাণ

উর্বী ফিল্মসের "অগ্ন অতীত" ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ ছবির পরিচালক হীরেন নাগ এবং সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, গীতা দে, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ ও বরেন হাজরা ছবির বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী।

* * *

রাধারাণী পিকচার্সের "জীবন সৈকতে" ছবিটি সমাপ্তির মুখে। তীর্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে এ ছবি পরিচালনা করছেন স্বদেশ সরকার। সংগীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত। বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, চন্দ্রাবতী দেবী, দিলীপ রায়, কণিকা মজুমদার ও মণিকা মিত্র।

* * *

সরকার ফিল্মসের 'সোনার খাঁচা' ছবির কাজ শেষের মুখে। বীরেশ্বর সরকার রচিত ও সুরারোপিত এ ছবির চিত্রনাট্য মিহির সেনের। পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত। বিভিন্ন চরিত্রের কুশীলব : উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, কণিকা মজুমদার, সুব্রতা চৌধুরী প্রভৃতি।

* * *

দিনেশ চিত্রমের "বহুরূপী" ছবির কাজ দ্রুত অগ্রসরমান। প্রণব রায়ের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির পরিচালক বিশু চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক অমর পাল। শিল্পী তালিকায় রয়েছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মধুছন্দা, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুমা বসু, তরুণকুমার, রসরাজ চক্রবর্তী প্রভৃতি।

* * *

সমিত ভঞ্জ ও জাহ্নবী চক্রবর্তীকে নিয়ে উড়িষ্যার সারাণ্ডা ফরেস্টে একটানা ১৭ দিন কাজ করে পরিচালক অজিত লাহিড়ী তাঁর "আরণ্যক" ছবির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী "আরণ্যক"-এর প্রযোজনা করছেন

ভাইব্রেন্স প্রোডাকসন্সের। কাহিনীর লেখক সংগীত পরিচালনায় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমা ভট্টাচার্যের গান সম্প্রতি রেকর্ড করা হয়েছে এ ছবির জন্য।

* * *

মাত্র ২৪ দিনে মুনমুন ফিল্মস-এর "মরা মিছিল" ছবির কাজ শেষ করেছেন পরিচালক পীযূষ গাঙ্গুলি। বিশিষ্ট মঞ্চ-শিল্পী শম্ভু ও তৃপ্তি মিত্রের কন্যা শাঁওলী মিত্র এ ছবির নায়িকা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন সুখেন দাস, অনুপকুমার, চন্দ্রাবতী দেবী, রসরাজ চক্রবর্তী, শ্যামল ঘোষাল, শমিতা বিশ্বাস, মোম মুখার্জী প্রভৃতি। এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য সুখেন দাসের। সংগীত পরিচালক অজয় দাস।

* * *

গৌতম চিত্রমের "জীবনটাই নাটক" ছবি পরিচালনা করছেন অভিযাত্রী ইউনিট। কাহিনী ফণী চক্রবর্তীর এবং সুরকার সুধীর বাগচী। বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী: সমিত ভঞ্জ, সন্ধ্যা দেবী, আরতি ভট্টাচার্য, দিলীপ রায় ও চিন্ময় রায়।

হিন্দী ছবি

নীতিন ফিল্মসের "মন তেরা তন মেরা" ছবির মুক্তি আসন্ন। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন বি আর ইশারা। পরিচালক ইতিপূর্বে তাঁর "চেতনা" ছবির জন্য বিদগ্ধ মহলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী: রেহানা সুলতান, অনিল ধাওয়ান, অসিত সেন, মনমোহন কৃষ্ণ, জনি হুইস্কি, দুলারী, রঞ্জনী, রুক্ষণা ও শত্রুঘ্ন সিনহা। সংগীত পরিচালক স্বপন জগমোহন।

* * *

এ কে প্রোডাকসন্সের "সোনার" ছবির কাজ বোম্বাইয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আশাপূর্ণা দেবীর একটি বাংলা উপন্যাস এ ছবির কাহিনী-অবলম্বন। কয়েক বছর আগে এই কাহিনীর ভিত্তিতেই পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় একখানি 'ওড়িয়া' ছবি করেন এবং আঞ্চলিক পুরস্কারে ছবিটি সম্মানিত হয়। হিন্দী ছবিটিও পরিচালনা করছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। মান্না দে-র সংগীত পরিচালনায় ছবির দুখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর ও সুরকার স্বয়ং। আরও তিনখানি গান ছবিতে থাকবে যা এই মাসেই গৃহীত হবে।

এ ছবির নায়িকা নবাগতা মল্লিকা সারাভাই। শ্রীমতী মল্লিকা স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ বিক্রম সারাভাইয়ের কন্যা। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী যতীন, সুলোচনা, ইফতেকার, গুরনাম, সোনা এবং সুলতা চৌধুরী।

নাট্য-সমালোচনা

মঞ্জরী

স্টার থিয়েটার

স্টার থিয়েটার মঞ্চে এবারেও মধ্যবিত্ত ঘরের কাহিনী, তবে পারিবারিক নাটকের প্রথাসিদ্ধ ঘটনা ও উপকরণ মঞ্জরীতে খুব বেশি অনুসরণ করা হয়নি। নাট্য সংঘর্ষের মূল বিষয়টি অথবা সমস্যাটি আধুনিক। অধ্যাপক অভিমন্যুর স্ত্রী মঞ্জরীর সাধ সে একবার সিনেমায় অভিনয় করবে। ভাগ্য খুব বিরূপ না হলে শুধুমাত্র একবার সিনেমার পর্দায় চেহারা দেখিয়ে সিনেমা জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া যায় না। গ্ল্যামার, জনশ্রুতি ও অর্থের মোহ মঞ্জরীকে কতখানি বিভ্রান্ত করেছিল কিংবা আদৌ তা মঞ্জরীর মনে মোহ বিস্তার করেছিল কিনা নাটকে সেটা খুব স্পষ্ট নয়। নাট্য সংঘাতের বীজ অন্যত্র। অভিমন্যুর অনুমতি নিয়েই মঞ্জরী সিনেমার অভিনেত্রী হয়। তবে সিনেমার পটে যে মঞ্জরীকে দেখা গেল তাকে আর সকলে প্রশংসা করলেও অভিমন্যু কিছুতেই অভিনন্দন জানাতে পারল না। বরঞ্চ অভিনেত্রী মঞ্জরীর অভিব্যক্তি তার কাছে কদর্য বলেই মনে হল।

সংঘাত এইখানেই। স্বামীর কাছ থেকে মঞ্জরী তার সব কাজের সপ্রশংস স্বীকৃতি চায়। অভিমন্যু যে মঞ্জরীর সিনেমা অভিনেত্রী হওয়ার সাধ মেটাতে চেয়েছিল সেটা ছিল তার নিজেরই একটি সাধের মতো। অন্তরের গোপন আপত্তির খোঁজ বুঝি সে নিজেই রাখত না। সিনেমায় আত্ম-

মঞ্জরী-তে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

মঞ্জরী-তে সবিতাব্রত দত্ত

প্রকাশের পর মঞ্জরীর আর এক ইমেজ দেখে সে আপত্তি কিংবা আশংকা বুঝি ছিটকে বেরিয়ে আসে। একদিকে মঞ্জরীর অহংবোধ ও ক্ষুব্ধ অভিমান, অন্যদিকে অভিমন্যুর নিজস্ব অধিকারের চেতনা—এই দুয়ের সংঘাতের পরিণতিতে মঞ্জরী বাড়ি ছেড়ে পুরোপুরি ফিল্ম অ্যাকট্রেস হয়েছে, হিন্দী ছবিতে অভিনয়ের জন্যে বোম্বাইয়ে গেছে।

আমরা দেখলাম, অভিনেত্রী মঞ্জরীর বাইরের খোলসটাই পালটেছে, ভিতরে সেই আগের স্বামীগতপ্রাণ মঞ্জরীই আছে। দুর্জয় অভিমানই ওদের মধ্যে বিচ্ছেদের হেতু, নতুবা কুলবধূ মঞ্জরীকে ফিল্ম স্টার মঞ্জরীর মধ্যে খুঁজে নিতে দর্শকের অসুবিধা হয় না। তাই নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত ক্লাইম্যাক্সে ওদের মধ্যে সমঝোতা দেখাতে পেরেছেন অতি সহজেই। কিছুকাল বিচ্ছেদের পর বোম্বাইয়ে মঞ্জরীর বাড়িতে গিয়ে অভিমন্যু জানতে পেরেছে মঞ্জরী ফিল্ম স্টার হলেও স্টার জীবনের সম্ভাব্য পাপ বরাবর প্রতিরোধ করে এসেছে। অন্যদিকে স্বামীকে কাছে পেয়ে মঞ্জরী এতদিনের চাপা কষ্ট আর গোপনে রাখতে পারেনি, কেঁদে স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। অভিমন্যু তখন বিদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত। মঞ্জরী বলেছে সে তার ডাকের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। অভিমন্যুর ডাক এলেই তখনই সব ছেড়ে সে চলে আসবে অভিমন্যুর কাছে। এইখানেই ক্লাই-ম্যাক্স। একটি গম্ভীর নাট্য সংঘর্ষের আচমকা, সহজ ও সরল পরিণতি। এই মুহূর্তে কে কতখানি বাস্তবের প্রতিভূ সে বিচারের অবকাশ আছে। তবে নাট্যকার দর্শকের ইচ্ছাপূরণের কথা ভেবে ওদের ভবিষ্যৎ মিলনের আভাস দিয়েছেন, কিন্তু যে ঘটেনি সেজন্য তিনি সাধুবাদ পাবেন।

এই নাটকের কোন্ চরিত্র বা কোন্ ঘটনা কতখানি বাস্তব নাটক দেখার কালে সে বিচারের সুযোগ অবশ্যই ঘটে না। কারণ, আশাপূর্ণা দেবীর যে কাহিনীর ভিত্তিতে এই নাটক তাতে বাড়ির ছোট বউয়ের সিনেমার নামা নিয়ে এমন একটা সহজ স্বচ্ছ দেখা গেছে এবং তার প্রতিক্রিয়া শাশুড়ী, ননদ এবং বড় ও মেজ বউয়ের মধ্যে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যাতে নাট্যক্রিয়া গড়ে উঠেছে অনায়াসেই। দর্শক এই পারিবারিক নাটকের প্রতিটি সিচুয়েশন যখন উপভোগ করে যান তখন স্বভাবতই যুক্তি বিচারের কাজটি স্থগিত থাকে। তখন একটি মামুলী চরিত্রও হাসায়, একটি গতানুগতিক পরিস্থিতিও আচ্ছন্ন করে রাখে। আসলে পটক চরিত্র এবং পরিস্থিতিই নাটকে বেশি। তবুও সামগ্রিকভাবে যে নাটকটি উপভোগ্য তার কারণ এতে মূল বিষয় হিসাবে রাখা হয়েছে দাম্পত্য জীবনের ভুল বোঝাবুঝি অথবা ম্যাল-অ্যাডজাসটমেন্ট। এই প্রসঙ্গ আধুনিক। সমস্যাটিও অনেকটা বাস্তব। যদিও মঞ্জরীর মনে গ্ল্যামার ও যশ যে বিশেষ রেখাপাত করেনি সেটা খুব বাস্তব-সম্মত নয় তবু স্বামী-স্ত্রীর অহংবুদ্ধি ও পরস্পরের উপর অধিকারের সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশের যে গভীরতার মধ্যে নাটকটি শেষ-ভাগে স্থিতিলাভ করেছে তা আধুনিক বুদ্ধিবাদী দর্শকদের খুবই ভালো লাগবে। এই জটিলতা শুরু হবার আগে সুখী দম্পতির সুখমুহূর্তগুলি দেখানো হয়েছে। ঐ সব হালকা মুহূর্তে এবং পরে গম্ভীর নাট্যপর্বে সবিতাব্রত দত্ত (অভিমন্যু) এবং সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় (মঞ্জরী) সপ্রাণ ও অনুভূতিদীপ্ত অভিনয়ের ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সবিতাব্রত দত্ত সুগায়ক, সে কারণেই হয়তো অধ্যাপক অভিমন্যুও গায়ক। তবে অধ্যাপকের মুখে এত আধুনিক গান কি ভাল লাগে? অবশ্য কমলেশ মৈত্র'র সুরারোপ সুন্দর, শ্রীদত্ত'র কণ্ঠও মধুর, তাই গান নাটকের একটি বিশেষ উপকরণ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে নাটকটি যখন সিরিয়াস হয়েছে তখন অভিমন্যুর মুখে গান না দিলেই ছিল ভাল, কারণ শিল্পীর সংবেদনশীল অভিনয় এমনিতেই মনে দাগ কাটে। দর্শকের মনে দাগ কেটেছেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ও, যখন তিনি বাড়ি ছেড়ে অভিনেত্রী হয়েছেন, অন্য এক অভিনেত্রীর বাড়িতে এসে উঠেছেন, যখন
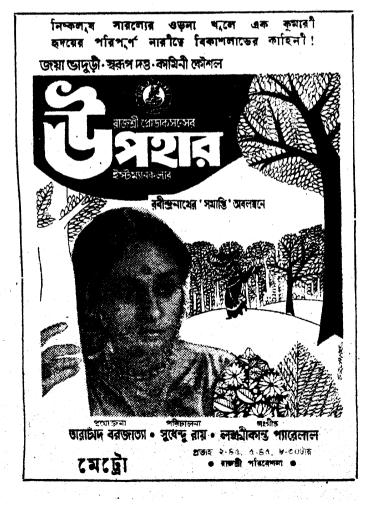
তিনি এক গভীর অন্তর-যন্ত্রণায় পীড়িত। ফিল্মের জন্য এক অভিনেত্রী সেজেছেন দীপিকা দাশ। অতি স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক তাঁর অভিনয়। নাটকে আর যাঁদের দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা দাশ অভিনয়ের জন্য বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য। প্রশংসা আরো অনেকেরই প্রাপ্য—যেমন, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, মেনকা দাশ, অপর্ণা দেবী ও হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে মেনকা দাশকে স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য বেশ লাগল। কয়েকটি পার্শ্ব ভূমিকায় শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা প্রভৃতি শিল্পীর অভিনয় চরিত্রোচিত।

নাটকের নায়িকা যেহেতু সিনেমার মেয়ে তাই মঞ্চে শুটিং পর্বও দেখানো হয়েছে। তাতে চিত্র পরিচালক হিসাবে প্রেমাংশু বসু এবং প্রোডাকসন ম্যানেজার হিসাবে সুখেন দাস বিশেষভাবে নজরে পড়েন। শ্রীবসু স্বাভাবিক, সংযত অভিনয় করেছেন। প্রোডাকসন ম্যানেজার হিসাবে কমিক চরিত্র তৈরি করতে গিয়ে সুখেন দাস কিছুটা বাড়াবাড়ি অভিনয় করেছেন। তাঁর মুখে বারে বারে 'ঠিক আছে' ঠিক নয় বলেই মনে হয়। সিনেমার হিরো হিসাবে দেখা গেছে সতীন্দ্র ভট্টাচার্যকে, ম্যানারাইজড অভিনয় তাঁর সিনেমার হিরোর মত কি? যাই হোক, মঞ্চে ফিল্ম প্রোডাকসন ও শুটিং-এর ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্য। মহুরীর অনেক প্রমোদ উপাদানের মধ্যে এই সিনেমা পর্বও একটি।

বোম্বাই বিচিত্রা

জাতীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসব এবার কোলকাতায় হবার কথা ছিল। কিন্তু হোল না সম্ভবত কোলকাতা বিক্ষুব্ধ এলাকা বলে। বোম্বাই সেদিক থেকে শান্তিপ্রিয় স্থান, সুতরাং জাতীয় পুরস্কার বিতরণের উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল স্থানীয় 'সম্মুখানন্দ' হলে। ভারতের বৃহত্তম প্রেক্ষাগৃহ সম্মুখানন্দ হল। প্রায় হাজার তিনেক লোকের বসার ব্যবস্থা। সুতরাং জাতীয় পুরস্কার জাতীয় অনুষ্ঠান এই হলেই হওয়া বাঞ্ছনীয়! গত কয়েক বছর যাবৎ ফিলিমওয়ালাদের আবদার রক্ষার্থেই জাতীয় পুরস্কার-এর উৎসব অনুষ্ঠান ঘুরে ফিরে বম্বে, মাদ্রাজ, কোলকাতা এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলে নাকি ফিলিম জগতের সংগে এই 'জাতীয় অনুষ্ঠানের' সুপরিচয় হবে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় তার যা নমুনা দেখলাম, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তিন হাজার দর্শকের মধ্যে সম্ভবত আড়াই হাজারই ছিলেন ফিলিম লাইনের বাইরের লোক। যাঁরা এবার পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেবল মান্না দে ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু দর্শকদের মধ্যে একমাত্র দর্শনীয় ব্যক্তি ছিলেন রাজ কাপুর। পুরস্কার বিতরণের জন্য আসার কথা ছিল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর, অনিবার্য কারণে তিনি আসতে পারেননি। সুতরাং বক্তৃতা এবং পুরস্কার বিতরণ দুটোই করতে হ'ল শ্রীমতী নন্দিনী সত্পথীকে। নতুন যাঁরা পুরস্কার পেলেন, তাঁরা আনন্দিত হয়েও কেমন যেন চুপসে গেলেন। এই পুরস্কার রাষ্ট্রের বড় কর্তার হাত থেকে নেবার আকাঙ্ক্ষাটা বোধ হয় খুবই স্বাভাবিক। যাই হোক, জাতীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের যে স্বাভাবিক গাম্ভীর্য থাকা উচিত সে গাম্ভীর্য সেদিন সম্মুখানন্দ প্রেক্ষাগৃহে ছিল না। যে ফিলিমওয়ালাদের অনুরোধে এই অনুষ্ঠানসূচী দিল্লী থেকে এত দূরে এলো তাঁরাও ছিলেন না। পুরস্কার বিতরণের পর যখন পুরস্কৃত শ্রেষ্ঠ ছবি 'সংস্কার' দেখানো হ'ল তখন অর্ধেকের বেশী হল খালি। এক কথায় যা দেখলাম তাতে মনে হ'ল জাতীয় পুরস্কারের মান রক্ষা হ'ল না। মাদ্রাজে বা কোলকাতায় জাতীয় পুরস্কার কি পরিবেশে বিতরিত হয় বা হবে তা আন্দাজ না করেই বলছি এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান রাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লীতেই হওয়া উচিত। পুরস্কৃতদের বৈঠকখানায় গিয়ে পুরস্কার দিলে পুরস্কারের মূল্য কমে যায়। তাছাড়া উনিশ শো সেভেন্টি-এর পুরস্কার উনিশ শো বাহাত্তর-এ পেলে তারও কোনো মূল্যো থাকে না। আশা করি সরকার এবার থেকে একটু সচেতন হবেন।

সরল শর্মা

ঢাকায় বাংলাদেশ পরিভ্রমণরত ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের অন্যতম শিল্পী শ্রীমতী মালা সিন্‌হা অনুরাগীদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন

রঙমহলে "সুবর্ণগোলক"

রঙমহলের পরবর্তী নাটক সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "সুবর্ণগোলক"। বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির কথা স্মরণে রেখে এই প্রাচীন সামাজিক কাহিনীটি বর্তমান সমাজের দর্শকের সামনে উপস্থিত করবার আয়োজন করেছেন মঞ্চ-কর্তৃপক্ষ। নাট্যরূপ দিয়েছেন সন্তোষ সেন। রঙমহলের নিয়মিত শিল্পী ছাড়াও কয়েকজন নতুন শিল্পীকে এই নাটকে দেখা যাবে।

বীতংস

নান্দীকার সংস্থা তাঁদের নতুন প্রযোজনা "বীতংস" প্রতি শনিবার রঙ্গনা মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করছেন। সংস্থার বিশিষ্ট শিল্পীরা এই নাটকে অভিনয় করছেন। নাটকটি রূপান্তর ও নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিৎপুর-চিত্র

চিৎপুর জুড়ে নাকি ভয়ানক অনাচার চলছে। অভিযোগ করেছেন কোনো এক যাত্রাদলের মালিক। এক পত্রে যাত্রা-শিল্পের বর্তমান অবস্থার ওপর মুহ্যমান নায়ক-নায়িকা জুটির প্রবল অত্যাচারকে তিনি বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতন মনে করে তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। বলা

বাহুল্য পত্রখানি দীর্ঘ। সুতরাং পুরোটা উল্লেখ না করে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি।

"মহাশয়, চিৎপুর যাত্রাদলে নারী-শিল্পীর কদর বৃদ্ধি পাইবার পর হইতেই অবশ্য জুটি প্রথা চালু হইয়াছিল কিন্তু এই সকল জুটিরা দাবার মারাত্মক ঘুঁটি হইতে পারে নাই। এখন তাহাই হইয়া পড়িয়াছে। আগে এইরূপ জোড় বাঁধিত এক মরশুমের জন্য। এখনকার বন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হয় বলিয়া দল গঠন করিবার সময় একজনকে ধরিয়া টান দিলে আর এক জনও উঠিয়া আসে। অর্থাৎ জুটির আর একজন যতই নিকৃষ্টতম হউক না কেন, আমরা লইতে বাধ্য হই—না হইলে বকস্ হয় না, ভয় পাই বায়না হইবে না বলিয়া। না সূত্রধার মহাশয়, বিপদ যে আগে আসে না তাহা আপনিও জানেন। বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় পরে। ষষ্ঠীর দিন হইতে যে গাওনা শুরু, তারপর মাসখানেক কাটিতে না কাটিতেই ঘুঁটিদের চাল শুরু হইয়া যায়। ম্যানেজারের তখন প্রাণান্তকর অবস্থা। আমাদের কথা নাই-বা বলিলাম।..."

না, পত্রে তেমন কোনো নতুন সমস্যার উল্লেখ নেই। বোধহয় যাত্রাদলটির মালিক নায়ক-নায়িকা জুটির ব্যবহারে ভয়ানক আহত হয়ে পত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, "আপনি অনেক কিছুই করিয়াছেন, এবং করিতেও পারেন। তাই আপনার নিকট বিনীত প্রার্থনা, দয়া করিয়া এই ভয়ংকর অবস্থা হইতে যাত্রাদলকে বাঁচান।..."

শাসনের লালচোখ দেখিয়ে দুষ্টু ছেলেকে হয়তো ভয় দেখানো যায় কিন্তু যাত্রাদলের শিল্পীরা সত্যি ছেলেমানুষ নয়, বোধহয় দুষ্টুও না। তবু ভদ্রলোকের আকস্মিক ভীতি আমাকে উদ্যোগী করে তুলল। দিন দুই পরে চিৎপুরপাড়ার একজন প্রথমশ্রেণীর অভিনেতার সঙ্গে দেখা। তাকে শুধোতে তিনি হাসলেন। বললেন, 'এ-আর জিজ্ঞেস করার কী আছে দাদা। ঘটনা সত্যি...'। বললাম, 'কী রকম?' নায়ক মশাই হেসে বললেন, 'মোদ্দা অভিযোগ আমরা অস্বীকার করি না। কারণ নিজের পাওনাটুকুকে আর কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিতে ছেড়ে দেয় বলুন?'

একজন দলমালিককে ফোন করেছিলাম। প্রসঙ্গ তোলামাত্রই তিনি বলতে শুরু করলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে, চিঠির কথা অনুল্লেখ রেখে শুধোলাম, 'জুটি সিস্টেম চালু হবার পর থেকে কি আপনারা সমস্যায় পড়েছেন?' ফোনেই বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোক খুব চেঁচিয়ে কথা কইছেন। বললেন, 'আলবৎ। জুটিরা সব সময় আমাদের শশব্যস্ত করে রেখেছে। ঘর, খাওয়া, ট্রান্সপোর্ট—সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে আজকাল। দলের ম্যানেজাররা মশাই একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে এই [illegible]

মালিকের মুখেই এক কথা শুনলাম। একজন তো বলতে বলতে প্রায় কেঁদেই ফেললেন আর কি। তিনি বললেন, 'জুটিটা তবু ভালো ছিল, বই নিয়ে কিছু রাজনীতি করে পার পাওয়া যেত। এখন আবার বিয়ের ধুম পড়ে গেছে।'

প্রৌঢ় এক শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, "দোষ কারও না—ওটা যুগেরই ধর্ম। সিনেমা থিয়েটারে যা চলে, যাত্রায় তা চলবে না কেন মশাই। আমরা কি কিছু কম যাই?"

আসলে এও বোধ হয় সত্য নয়। মনে আছে বহুদিন আগে যাত্রাবিষয়ক এক আলোচনা-সভায় একজন দলমালিক বলেছিলেন, "মালিক আর শিল্পীতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক।" আসলে এখানে ঠিক সেই সম্পর্কই কাজ করছে কিনা বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক, ভদ্রলোক যাকে অনাচার বলতে চেয়েছেন সেরকম অবস্থা যেন সত্যিই যাত্রাদলে কখনও না-আসে।

—সূত্রধার

বিশ্বরূপায় 'আমি সুভাষ'

আগামী ১৬ ফেবরুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় তরুণ অপেরার 'আমি সুভাষ' অভিনীত হবে বিশ্বরূপায়। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন শান্তিগোপাল, বর্ণালী ব্যানারজি ও শিব ভট্টাচার্য।

শিশুরঙ্গন-এর মিতুল নামে পুতুলটি

গত ২৬ জানুয়ারি রবীন্দ্রসদনে 'শিশুরঙ্গন' নিবেদন করেন শৈলেন ঘোষের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বই 'মিতুল নামে পুতুলটি'র নাট্যরূপ। ছোটদের এমন মনমাতানো অভিনয় সম্প্রতি দেখা যায়নি। যেমন তাদের চলন বলন, তেমনি তাদের সপ্রতিভ অঙ্গভঙ্গী। বাঁদর মোরগ মিতুল রাজকন্যা ও নানা ধরনের অন্য পুতুল নিয়ে যে অত্যাশ্চর্য রূপকথার জগৎ, সেই জগতে সেদিন উপস্থিত সব দর্শককে শিশু অভিনেতারা নিয়ে যেতে পেরেছে। সংলাপ ও সংগীত নেপথ্যের 'টেপ' থেকে এসেছে এবং ওরা নিখুঁত কায়দায় তার সঙ্গে হাত-পা চালিয়েছে, ঠোঁট মিলিয়েছে, বুঝতেই দেয়নি, নেপথ্যেরও ভূমিকা রয়েছে। এমন অভিনয় ও প্রযোজনা বারবার দেখার মত।

অভিনয় সকলেরই প্রশংসনীয়। নাটকে যোগ দেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য, সমর্পিতা ভট্টাচার্য, দীপেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীরূপা মজুমদার, শ্রবণা মজুমদার, অলক ভড়, রূপা ভড়, দীপক ভড়, শিবরাম কর্মকার, বিজন বড়ুয়া, শ্রীলতা সরকার, বলরাম কর্মকার, বরুণ বসু, ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত, বিশ্বজিৎ গোস্বামী দেবযানী দে, দেবস্মিতা দে, রঞ্জা রায়, অসীম ভড়, অরূপ দাস, প্রণব দে, [illegible]

পাল, স্বর্ণালী ব্যানার্জি, মীরা দাস, প্রীতি দাস। পরিচালক শৈলেন ঘোষ। সংগীত ও নৃত্য পরিচালক যথাক্রমে ধনঞ্জয় মল্লিক ও দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠসংগীতে কাবেরী চট্টোপাধ্যায়।

জেমিনি সারকাস

প্রমোদ উপভোগের ক্ষেত্রে সারকাস একটি বিশিষ্ট মাধ্যম। শহর এবং শহরতলীর দর্শকরা এই মরশুমে জেমিনি সারকাস-এর উপভোগ্য অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাবেন। গত ২৯ জানুয়ারি থেকে পার্ক সারকাস ময়দানে তাঁদের তাঁবু পড়েছে। উদ্বোধন দিনের প্রথম প্রদর্শনীতে কলকাতা

জেমিনি সার্কাসের একটি মজার খেলা

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি মুখোপাধ্যায় ও পৌরপ্রধান শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

কুশলী স্ত্রী-পুরুষ খেলোয়াড়ের নানারকম কসরৎ, আলোর বর্ণাঢ্য পরিবেশ এবং আরও অনেক কিছু দর্শকেরা দেখতে পাবেন ওই তাঁবুর নীচে।

অন্ধকারে ফ্লাইং ট্রাপিজের খেলা, সিমপাঞ্জি দম্পতি এবং হাতির সাইকেল চড়া, বাঁদরের জেমিনি ট্রেন চালনা, জাগলিং, ব্যালান্সের খেলা, কামানের মুখে মানুষ ইত্যাদি ছাড়াও হাতি, বাঘ, জলহস্তী, সিংহ, শীল মাছ প্রভৃতি জন্তু সমানভাবে খেলা দেখিয়ে আনন্দ দিয়েছে। এছাড়া কয়েকজন "জোকার" তো আছেনই। তাঁরাও কিছু কম যান না।

এক কথায় জেমিনি সারকাস-এর খেলাগুলি খুবই আকর্ষক হয়েছে বলা যেতে পারে।

অরণ্যদেব ☆ লী ফক

অরণ্যের মানুষেরা অলিম্পিক-অনুষ্ঠানের জায়গায় এসে সমবেত হচ্ছেন।

ট্রফি এসে পৌঁছামাত্র অনু… শুরু হবে
ওবিজু ট্রফি নিয়ে আসছে.. একটু বাদেই পৌঁছে যাবে।

অরণ্যের অলিম্পিক
শুরু হোক
উনগান সর্দার, তোমাদের ওবিজু এখনও এল না কেন?
এক্ষুনি নিশ্চয় পৌঁছে যাবে।

আগের বারের চ্যাম্পিয়ন উনগান-দলের ওবিজু। সে ট্রফি নিয়ে ছুটে আসছিল, এমন সময়·····

!
ওই তো সেই ট্রফি!
এসো ওবিজু, মণিমুক্তোগুলো আমরা ভাগাভাগি করে নিই।
সকলেই রাজা হয়ে যাব।
6/20

না!

গুড়ুম!

অরণ্যের অনেক চোখ -----
!

সদ্যজাত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কলকাতায় জন-সম্বর্ধনা বর্তমান সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৬ ফেবরুয়ারি অপরাহ্নে কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শেখ মুজিবরকে ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সম্বর্ধনা সভায় মুজিবর রহমান জানিয়েছেন ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ক্ষুণ্ণ করবার শক্তি পৃথিবীতে কারও নেই। এই সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ মুক্ত করতে ভারত যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি গড়তেও সাহায্য দেবে। দুজনেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সহায়তা করার জন্য আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বারবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানান। সোমবার উভয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আর একদফা আলোচনার পর একটি যৌথ বিবৃতি প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা। বঙ্গবন্ধুর সম্বর্ধনা সমাবেশে যে বাঁশের বেষ্টনী রচনা করা হয়েছিল তা পর পর যোগ করলে হবে লম্বায় দশ মাইল। পাঁচ শ' লোক সাতদিন ধরে রাতদিন পরিশ্রম করে এই বিশাল সমাবেশের মঞ্চ তৈয়ার করেছেন। দুই প্রধানমন্ত্রী মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচু প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন।

দেশী সংবাদ

৩১ **জানুয়ারি**—পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সংস্থার ৮২ জন গেজেটেড ও ৭৬ জন নন-গেজেটেড অফিসার সহ মোট ১৪৮ জনকে চারজশিট দিয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সি বি আই সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির কাছে সুপারিশ করেছে বলে সরকারীভাবে জানা যায়। ১৫ জনকে সরাসরি চাকুরি থেকে বরখাস্তের সুপারিশ করা হয়েছে।

ভাল খাদ্যের দাবিতে আজ বেলা দশটা থেকে যাদবপুরে কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালের একদল রোগী হাসপাতালের সম্পাদক ও সুপারিনটেনডেনট সহ ৬ জন চিকিৎসককে ঘেরাও করেন। সাত ঘণ্টার পর পুলিস গিয়ে সকলকে ঘেরাও মুক্ত করেন। এ সম্পর্কে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে ৭ জন রোগী। ১ জন বাইরাগত।

১ **ফেবরুয়ারি**—বাংলাদেশ যেতে হলে পাসপোরট বা ভিসার আর কোন দরকার নেই। শুধু 'পারমিট' হলেই চলবে। আজ থেকেই এই নতুন প্রথা চালু হচ্ছে। কলকাতায় ১১/এ ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পুরনো পাসপোরট অফিস থেকে এই পারমিট দেওয়া হবে। যে কোন ভারতীয় নাগরিক এই পারমিট নিয়ে বাংলাদেশে যেতে পারবেন। মফস্বলে জেলা কর্তৃপক্ষ এই পারমিট ইসু করবেন।

২ **ফেবরুয়ারি**—নব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের জন্য ২১৬ জন কংগ্রেস প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেন। [illegible] ও [illegible] এই দুটি কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির উপর ভার দেওয়া হয়েছে।

কয়েকটি ভোগ্য দ্রব্য যাতে নির্দিষ্ট মূল্যে জনসাধারণকে দেওয়া যায় সেরকম একটি সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার কথা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করছেন বলে জানা যায়। সংগ্রহ এবং সরবরাহের কাজ কি রকম-ভাবে চলবে সেটা এখনও ঠিক হয়নি। খাদ্য-শস্য, চিনি, কেরোসিন তেল ইত্যাদি এই স্কীমের মধ্যে থাকবে।

৩ **ফেবরুয়ারি**—দর কষাকষি, মন কষাকষি এবং শেষ পর্যন্ত আলটিমেটাম। ফরওয়ারড ব্লকের তিনটি আসনের দাবি সি পি এম যদি মেনে না নেয় তবে আর কোনক্রমেই সি পি এম-এর সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত নয়। ফরওয়ারড ব্লক [illegible] কার্যকরী [illegible] ওই মর্মে এক [illegible]।

৪ **ফেবরুয়ারি**—স্বীকৃতি পায়নি—সারা দেশে এমন রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫৬টি। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় ওই ধরনের রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫৬টি, বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় ওই ধরনের রাজনৈতিক দলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এখানে এরূপ দলের সংখ্যা ১৪টি। এই-সব দল কমিশনে রেজিস্ট্রিভুক্ত বটে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন প্রতীক পাওয়ার অধিকারী নয়।

মৌলানা মাসুদি এবং অপর কুড়িজনকে গ্রেফতার করার ফলে এবং বেগম আবদুল্লার ওপর বহিষ্কৃতির আদেশ জারির দরুন কাশ্মীরে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে পাকিস্তান-সমর্থক মহল যে দাবি করেছেন তার কোন সত্যতা আছে বলে মনে হয় না

৫ **ফেবরুয়ারি**—প্রত্যক্ষ কর তদন্ত কমিটির অনুমান বছরে প্রায় ১ হাজার ৪ শত কোটি কালো টাকা ভারতের টাকার বাজারে চালু থাকে। হিসাবহীন টাকার সৃষ্টি কারণ অনুসন্ধানে ও তা বন্ধ করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছে তার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কালো টাকা সৃষ্টি বন্ধ করার জন্য নাকি ব্যাপক ও কার্যকর পন্থার নির্দেশ করেছে।

৬ **ফেবরুয়ারি**—দমদম বিমান ঘাটিতে আচমকা রিপোরটার ও ফটোগ্রাফারদের উপর পুলিস লাঠি চারজ করে। ফলে অন্তত দশ-জন রিপোরটার ও ফটোগ্রাফার আহত হয়েছেন। বাংলাদেশের একজন সরকারী ফটোগ্রাফারের ক্যামেরাটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার সন্তোষ সেনের আঘাত গুরুতর।

২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে [illegible] [illegible] একই দিনে দুটি যাত্রীবাহী বাস পথের ধারের পুকুরে পড়ে যায়। এই ঘটনায় একজন শিশু সহ ৪ জন নিহত ও ৪০ জন [illegible]। সন্দেহ করা হচ্ছে পুকুরের গাদায় কিছু মৃত-দেহ পড়ে থাকতে পারে।

বিদেশী সংবাদ

৩১ **জানুয়ারি**—নেপালাধিপতি রাজা মহেন্দ্র গতকাল থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আজ ভোরে কাঠমানডু থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে ভরতপুরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বৎসর। বিশ্রাম গ্রহণের জন্য রাজা কিছু দিন আগে ভরতপুরে গিয়েছিলেন। আজ সকালে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ২৭ বৎসর বয়স্ক যুবরাজ বীরেন্দ্রকে নেপালের নতুন রাজার পদে অভিষিক্ত করা হয়। সন্ধ্যায় রাজা মহেন্দ্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১ **ফেবরুয়ারি**—বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য দায়ী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কয়েকজন বিশিষ্ট অফিসার জেঃ টিক্কা খাঁ, জেঃ নিয়াজী এবং জেঃ রাও ফরমান আলি লুঠতরাজ চালিয়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। পাকিস্তানের লেঃ জেঃ আতিকুর রহমান একথা জানিয়েছেন আতিকুর রহমানের উক্তিতে আরও প্রকাশ যে, শ্রীজাট্টো বিদেশের ব্যাংকগুলিতে ৩১ কোটি টাকা রেখেছেন।

২ **ফেবরুয়ারি**—চীন সফর শেষ করে পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ভুট্টো দেশে ফিরেছেন। চীন থেকে তিনি কি নিয়ে এসেছেন সঠিক-ভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। পর্যবেক্ষকদের ধারণা বাংলাদেশ এবং অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর দাবি পূরণে চীন রাজি হয়নি। ভুট্টো এবং চু এন লাই-এর মধ্যে এই মত পার্থক্য [illegible] ইস্তাহারে সুস্পষ্ট।

৩ **ফেবরুয়ারি**—ঢাকার উপকণ্ঠে মীরপুর পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ খুবই উদ্বিগ্ন। গত কয়েকদিনে এই এলাকায় পাক সহযোগী ও তাঁদের দালালরা বেশ কিছু লোক খুন করেছে। কিছু লোক নিখোঁজও হয়েছেন। পাক সহযোগীরা অধিক সংখ্যায় মীরপুরে আশ্রয় নিয়েছে।

৪ **ফেবরুয়ারি**—আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে ব্রিটেন, পশ্চিম জারমানী ও ইউরোপের আরও সাতটি দেশ এবং সেই সঙ্গে ইজরায়েলও। আরও যে সব দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে শীঘ্রই স্বীকৃতি দেবার কথা ভাবছে তারা হল বেলজিয়াম, নেদারল্যানড, জাপান ও লাকসেমবারগ।

৫ **ফেবরুয়ারি**—সেনেটর অ্যাডলাই স্টিভেনসন আজ ওয়াশিংটনে বলেন যে, মারকিন সরকারের এটা বোঝা উচিত যে, আমেরিকা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে শেষ পর্যন্ত আমেরিকাও বিশ্বের ওই অঞ্চলে কোন সাড়া পাবে না। আমেরিকান কূটনীতিকরা ঢাকা থেকে চলে আসতে বাধ্য হবেন। শেখ মুজিব ওই মর্মে নির্দেশ দিতে বাধ্য হবেন।

৬ **ফেবরুয়ারি**—বাংলাদেশে পাকিস্তানী শিল্পপতিদের পরিত্যক্ত ৩৯৭টি শিল্প-সংস্থা এ পর্যন্ত সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ৩২টি পাটকল, ১৮টি কাপড় কল, ৭টি জুট প্রেসিং মিল, ১০টি ইনজিনিয়ারিং ও ৩৩টি [illegible] [illegible] [illegible]।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজিত দত্ত

রিচব্রু নিন -
নিন উচ্ছল
জীবনের
স্বাদ
যেমন
সরেস
তেমনি
স্বাদু
তেমনি
LIPTON'S
RICHBRU
TOP QUALITY LEAF TEA
লিপটনের
রিচব্রু

বসন্ত মালতী তেল

সি. কে. সেন এণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ০ দিল্লী

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৬
শনিবার ৬ ফাল্গুন ১৩৭৮
Saturday, 19 February, 1972

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত

কয়েকদিন ধরে আমাদের এখানে ছাত্রদের পরীক্ষার নামে যে প্রহসন চলছিল, সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করেছেন সেই প্রহসনের ইতি ঘটাতে হবে। উদ্দেশ্য খুবই সাধু: শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে যাঁরা চিন্তিত তাঁরা নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেবেন। এই শুভ কর্মটি শুরু করার মুখেই বিশ্ববিদ্যালয় যে এই বছরেই কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন তার একটি হিসাবও দাখিল করা হয়েছে। এই হিসাব মতে চলতি বছরে যে চারটি বড় পরীক্ষা হয়েছে, তাতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৯ হাজার। এর মধ্যে মোটামুটি হাজার দশেক ছাত্রের পরীক্ষা আংশিক বা পুরোপুরিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বাতিল করে দিয়েছেন। এছাড়া স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় হাজার খানেক এবং পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় হাজার ছয়েক ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষাও একইভাবে বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ সতেরো হাজার ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য এই যে, এরা পরীক্ষা হলে টোকাটুকি করেছিল, ফলে তাদের পরীক্ষা নাকচ হয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই, কেননা পরীক্ষা ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্ন থেকে যায় যে, যাদের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে তারাই কী শুধু পরীক্ষা হলে টোকাটুকি করেছিল? নাকি আশি নব্বই হাজার, কিংবা তারও বেশি ছাত্র নিরপরাধ? বোধ হয় সে-কথা বলা যায় না। উপাচার্যমশাইও তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে সেকথা জোর করে বলতে পারেন নি, বলেছেন—এতে হয়ত কিছু নির্দোষ পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু পরে টোকাটুকি বন্ধ হয়ে গেলে সৎ এবং ভাল ছেলেরা উপকৃত হবে। অর্থাৎ—ভবিষ্যতের সৎ এবং ভাল ছেলেদের জন্যে আজ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ভাল ছেলে থেকেও থাকো, তোমরা ক্ষতিটা স্বীকার করে নাও। যুক্তিটি চমৎকার।

এ বছরের যে পরীক্ষাগুলি হয়ে গিয়েছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের অভিমত আমরা জানি। এঁদের সকলেই প্রায় কোনো না কোনো কলেজে পড়ান। দুঃখের বিষয়, আমরা শুনেছি, কলকাতায় এমন কলেজ হয়ত নেই যেখানে ব্যাপকভাবে টোকাটুকি না হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা বাতিল কি সর্বত্র হয়েছে? একই কলেজের একটি ঘর হয়ত অপরাধীরূপে চিহ্নিত হয়েছে—বাকি ঘরগুলিতে পরম তৎপরতার সঙ্গে টোকাটুকি চলেছে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারে তারা শাস্তির আওতায় আসেনি। উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন নিজেও স্বীকার করেছেন, এবারে তাঁদের ব্যবস্থা ভাল ছিল না, ফলে সব জায়গাতে ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শকদল যেতে পারেননি। তাঁদের রিপোর্ট ছাড়া কিছু করা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী জানেন, বিভিন্ন কলেজে কী ভাবে পরীক্ষা চলেছে? অল্পসংখ্যক সৎ ছাত্রছাত্রীদেরও কোন অবস্থায় পরীক্ষা দিতে হয়েছে? পারট টু পরীক্ষায় যেসব কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল তার মধ্যে কটি কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা ও আবহাওয়া বিধিসম্মত ছিল? বোধ করি, সে-বিষয়ে তাঁরা বিশেষ কিছু জানেন না।

টোকাটুকি বন্ধ করার চেষ্টা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয় কিছু বলার নেই। কিন্তু সিন্ডিকেট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে-উপায়টি অবলম্বন করেছেন আমাদের মনে হয় না তা ত্রুটিহীন। তাঁরা নিজেরাই জানেন, আংশিক বা পুরোপুরি পরীক্ষা বাতিল করার অর্থ অসাধু ছাত্রদের ভীতি প্রদর্শন মাত্র—, তার বেশি কিছু নয়। পরীক্ষা হলে যে টোকাটুকি হয়েছে তার ন্যায়সঙ্গত বিচার তাঁরা করতে পারেন নি। জলের তোড়ে অনেক আবর্জনাই দিব্যি বয়ে গেছে।

একটা কথা আমরা বুঝি না। শুনেছি প্রত্যেকটি কলেজে নামমাত্র কিছু ছেলে থাকে যারা সমস্ত অন্যায় ও অপরাধের পাণ্ডা। এই ছেলেদের ওপর বিশেষ নজর থাকলে, তাদের দুষ্কর্মের উপযুক্ত শাস্তি হলে হয়ত সাধারণ ছাত্ররা অন্যায় সুযোগ নিতে সাহস করবে না। স্থানীয় কলেজগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফের কর্তাব্যক্তিরা সে-চেষ্টা করেন না কেন? তাঁরা যা পারেন না তার জন্যে তাঁরা দায়ী, ছাত্রছাত্রীরা নয়।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-১২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ৮ পয়সা হারে
ডাকমাশুল সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টা ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক — টা ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টা ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৪৫.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৩.০২
ত্রৈমাসিক — টা ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক — টা ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টা ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৯.০২
ত্রৈমাসিক — টা ১৪.৭৬

[illegible]
বার্ষিক — টা ১৫৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৩৮.৭৬

ভোটের হাটের পণ্য

কিছুদিন আগে আমি বলেছিলাম, বাঙালী শিক্ষিত হিন্দু সমাজ তার প্রতিবেশী মুসলমানদের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করেনি এবং শিক্ষিত মুসলমান হিন্দু প্রভাবিত সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুবিচার পাওয়ার আশা রাখেনি এবং মুষ্টিমেয় উঠতি মধ্যবিত্ত মুসলমান হিন্দু মধ্যবিত্তদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এমন আত্ম-বিশ্বাসও সঞ্চার করতে পারেনি এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেশ বিভাগ। এতে কিছু গোলমাল উঠেছে। কথাটার সত্যতা তাতে ধুয়ে যায়নি। বাঙালীদের একদিকে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ ওরফে পূর্ব পাকিস্তান ওরফে বাংলাদেশ। এটা হল প্রকাশ্য দেশ বিভাগ। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গও যে দুটো ভাগে বরাবরই বিভক্ত ছিল, এবং এখনও আছে, একটা হিন্দুদের আর একটা মুসলমানদের, এই দুটো সমাজ পাশাপাশি বাস করেও যে এক অপরের অচেনা, এ ব্যাপারে আমরা কখনোই সচেতন হতে চাইনি। আর সচেতন নই বলেই একে অপরকে সন্দেহ করে চলেছি। এবং অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের মূল আমাদের ভিতরে এত দূর ঢুকে গিয়েছে যে, এটাকে এখন সচেতন প্রয়াসে উপড়ে ফেলতে না পারলে, দেশের ইমারতটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আমরা পরস্পরকে কম জানি বলেই আমাদের ব্যক্তি সত্তা সাম্প্রদায়িক সত্তার নিচে সর্বদাই চাপা পড়ে থাকে। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখুন। আমার আপনার চোখে মতি নন্দী কি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একজন লেখক। ওরা হিন্দু কি খ্রীষ্টিয়ান কি বৌদ্ধ এ কথা মনেই পড়ে না। কিন্তু সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ বা আবদুল জব্বার 'শুধু লেখক' নন, 'মুসলমান লেখক'। এই যে ওদের মুসলমানত্বের প্রতি আমাদের একটা বাড়তি সচেতনতা, আমি বলতে চাই, এইটেই আমাদের দূরত্বটাকে সর্বদাই বজায় রেখে চলেছে। ব্যাপারটা এতই গা-সওয়া যে, এটা যে একটা অস্বাভাবিকতা তাও ধরা পড়ে না।

এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এবং সত্যের খাতিরে এও স্বীকার করতে হয়, যন্ত্রণার বড় ভাগটাই মুসলমানদের কপালে জুটেছে।

নির্বাচনের মুখেই যে এমন একটা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম, তার একটা কারণ আছে। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর, কলাত্রসর এই সমাজের লোকদের নিয়ে ভোটের সময় প্রতিবার এক নিষ্ঠুর খেলা চলে। সে খেলা এবারও শুরু হয়েছে। আমরা, পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষিত সমাজ দেশের অনগ্রসর অংশটাকে, কি হিন্দু, কি মুসলমান আর কি তফশিলী (বর্তমানে সমাজের সব থেকে উপেক্ষিত ট্রাইব্যাল সমাজও, যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের আবির্ভাব ঘটেছে তন্মুহূর্ত থেকেই, সাম্প্রদায়িক সত্তায় নিজেদের বিলীন করে দিয়ে যূথবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলে নিজেদের অভীপ্সাকে চরিতার্থ করতে চাইছে), কখনোই আত্মীয় বলে গ্রহণ করিনি। তবে ভোটের সময়, কেননা ভোটের সময়েই অকাতরে গিল্টিকরা ভাই-ভাই ভাব দু হাতে বিতরণ করেছি।

মুসলমান বা অন্যান্য অ-বর্ণহিন্দু সমাজের অনগ্রসর লোকের ভিতরে আধুনিক জগতের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মশাল বর্ণ-হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় কখনোই বহন করে নিয়ে যাবার ক্লেশ স্বীকার করেন নি। ফলে এই উপেক্ষিত অংশটার লোকের অন্তরের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অবিদ্যার প্রভাবকে দূর করতে আমরা পারিনি, কেননা চেষ্টাই করি নি। অথচ আমাদের ফাঁপা বাগাড়ম্বরে তারা অভিভূত হয়ে আমাদের ভোটের বাক্স পূর্ণ করে দেবে, এই আবদার না মিটলে ধৈর্য হারিয়েছি। তখন যথা ইচ্ছা কুৎসা রটিয়ে পরস্পরের দূরত্ব বাড়িয়েই দিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা ইহাদিগকে (মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের) কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই, মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই,

আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরে দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেই জন্য সহসা একদিন ইহাদের সুপ্তপ্রায় ঘরের কাছে ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবি করিয়াছি।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, সরকারী সংস্করণ, ১২ খণ্ড, পৃঃ ৮২৫)

ভোটের সময় এলে এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটারদের অবস্থাটা গোহাটার গোরুর মতই করুণ হয়ে ওঠে। কেননা, তার চোখের উপরই তার দরদাম সাব্যস্ত হয়, দস্তুরি দালালী ঠিক হয়। সে নীরব দর্শক।

অধিকাংশ মুসলমানই বয়স্কদের এবং মোল্লা মৌলভীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরই সুযোগ নিয়ে মোল্লা মৌলভীরা, অধিকাংশই ক্ষমতা, সম্মান অথবা সম্পদ প্রাপ্তির আশায় ভোটের হাটে ফড়ে বনে যান। এবং তাদের ফতোয়া অনুসারে 'নেক মজহ' প্রাপ্ত প্রার্থীর বাক্সে ব্লক ভোট পড়ে। এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় নেবার জন্যই যে দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী রাজনীতি আজও মুসলমান সমাজকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছে, এ অভিযোগ নিতান্ত অমূলক নয়।

এবং যেবার যারা প্রত্যাশামত ভোট পায়নি সেবার তারাই বড় গলা করে চেঁচিয়েছে, এ খা ন কা র মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক, তারা পাকিস্তানের চর এবং এবার তার সঙ্গে একটা নতুন কথা যোগ করা হয়েছে, এরা বাংলাদেশের খেলাফ। পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানী চর নেই, আমি এ কথা বলছিনে। এ বিষয়ে এমন সব পার্টির সদস্যদের নামে মামলা চলছে, যাদের কেউ সাম্প্রদায়িক বলবে না। এবং এটাও জেনে রাখা ভাল, পাকিস্তানী চরদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাও কম নয়। আর ইন্দিরা গান্ধী যে পাকিস্তান ভেঙে দিয়ে 'এখানকার মুসলমানদের' সর্বনাশ করে দিয়েছেন, এ কথা তো মারকসবাদীরাই রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশের সব থেকে বড় বিরোধী তো নকশালপন্থীরা। এবং মজার কথা এই যে, এইসব সর্বহারা-হিতৈষী প্রাইভেট লিমিটেড কোমপানি-গুলিও তো উচ্চবর্ণ হিন্দু, অধ্যুষিত পারটি।

এই যেখানে প্রেক্ষাপট, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত এবং সমাজহিতৈষী মুসলমান মাত্রেরই দায়িত্ব যে কত বড় এবং কত ভারি তা সহজেই অনুমান করা যায়। এখন, এই ভোটের মুখে, তাঁদের প্রথম কাজই হওয়া উচিত, সাহস করে এগিয়ে এসে তাঁদের বিরুদ্ধে যে সব অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার জবাব দেওয়া এবং যারা এই ধরনের কুৎসা রটাচ্ছে, তাদের চিনিয়ে দেওয়া। মাতব্বরের কথা শুনে ভোটের বাক্সে গোষ্ঠী-ভোট উজাড় করে ঢেলে দেবার প্রবণতাও রোধ করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোক নেই, এ কথা সত্য নয়। আর এটা তো আমাদের পক্ষে কলঙ্কেরই কথা যে, এতদিনে আমরা তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে অসাম্প্রদায়িক করে তুলতে পারিনি। তাঁদেরকে সাম্প্রদায়িকতার খোঁয়াড়ে বন্ধ রেখে আমরাই সস্তা ভোটের কেবল ভোটের হাটের পণ্য করে রেখেছি। আমাদের স্নেহ প্রেম ভালবাসা না পেলে ওঁরা এই দুষ্টচক্র থেকে কী করে বেরিয়ে আসবেন?

নির্বাচন

মনোনয়নপত্র দাখিল, প্রত্যাহার এবং পরীক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী পরিস্থিতিটা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

এবার রাজ্যের নির্বাচনী আসরের দিকে তাকালে যে জিনিসটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা হল প্রার্থীর সংখ্যা হ্রাস। আসরে এত কম প্রার্থী এর আগে কখনও দেখা যায় নি। প্রত্যেকবারই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা আসনগুলির জন্য মোট প্রার্থীর সংখ্যা হাজারের ঊর্ধ্বে যেত। এবার শেষ পর্যন্ত আসরে ন' শ প্রার্থীও থাকবেন কিনা সন্দেহ। বহু কেন্দ্রে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। কোনও কেন্দ্রেই ছয় সাতজনার বেশী প্রার্থী নেই।

দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা দিনকে দিন কমছে। নানা কারণেই এই পরিণতি। একটা বড় কারণ হল, রাজ্যের দলগুলির জোট বাঁধার প্রবণতা। এ রাজ্যে এখন আর একা কেউই নির্বাচনে নামতে ভরসা পান না। ১৯৬৯ পর্যন্ত কংগ্রেস একা নির্বাচনে নেমেছিল। তারপর থেকে কংগ্রেসও আর একা সব আসনে প্রার্থী দিচ্ছে না। ১৯৭১-এও দেয় নি। ১৯৭২-এও দিল না। কংগ্রেস-বিরোধীরা চিরকালই

জোট বাঁধতে আগ্রহী। ১৯৬৯ সনে তাঁদের জোট হয়েছিল সবচেয়ে ব্যাপক। রাজ্যের উল্লেখযোগ্য সব কংগ্রেস-বিরোধী দল এক জোট হয়েছিলেন। এবারও কংগ্রেস-বিরোধীরা জোট বেঁধেছেন। তবে সবাই এক হতে পারেন নি। কংগ্রেস-বিরোধী প্রধান জোটটি হয়েছে সি পি এমের নেতৃত্বে। আর একটা জোট হয়েছে কংগ্রেস (সংগঠন), বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতিকে নিয়ে। তাঁরা অবশ্য সব আসনে প্রার্থী দিতে পারেন নি। জোটের বাইরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন মুসলিম লীগ, জনসঙ্ঘ এবং গোর্খা লীগ।

এই জোট বাঁধার রাজনীতির ফলে যেমন আসরে প্রার্থী কম, তেমনি প্রার্থীর সংখ্যা কম নির্দলদের স্বল্পতার জন্য। অভিজ্ঞতা যত বাড়ছে, নির্বাচনটা যতই জমছেন ততই নির্দলরা আসর থেকে সরে যাচ্ছেন। ভোটদাতারাও এখন নির্দলদের সম্পর্কে কম আগ্রহী। কারণ এখন রাজ্যে টলমাটাল অবস্থা। একটা ভোটেও সরকার এদিক ওদিক হতে পারে। তাই ভোটদাতারাও এখন বেশি করে দলীয় প্রার্থীদের দিকেই ঝুঁকছেন। নির্দল প্রার্থীরা আগে বিরাট বিশালভাবে আসরে অবতীর্ণ হতেন। ১৯৫২ সনে কলকাতার একটা কেন্দ্রে প্রায় বারোজন নির্দল প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন। এবার কোনও কেন্দ্রে তিনজন নির্দল প্রার্থীও খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

*

দ্বিতীয় যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হল, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির টার্ন।

জোট বাঁধার রাজনীতিটা এখন পাকা হয়ে গিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে সি পি এম তার নিঃসঙ্গতা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি শুরু হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সি

পি এম ক্রমে ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়ে আসছিল। উল্লেখযোগ্য কোনও বামপন্থী বা কংগ্রেস-বিরোধী দল তার সঙ্গে ছিল না।

এই নিঃসঙ্গতা চূড়ান্তে পৌঁছেছিল ১৯৭০-৭১ সনে। '৭২-এ নির্বাচনের মুখে কিন্তু সি পি এম আর তেমন নিঃসঙ্গ নয়। কংগ্রেস-বিরোধী কয়েকটি দল আজ তার সঙ্গে। যে ফরওয়ারড ব্লক ১৯৬৭ থেকে ঘোরতর সি পি এম-বিরোধী ছিল আজ সেও সি পি এমের সঙ্গে। এস ইউ সি এবং আর এস পি তো সি পি এম নেতৃত্বে গঠিত ফ্রন্টেই যোগ দিয়েছে।

*

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এবার মুসলিম লীগের পরিস্থিতি।

মুসলিম লীগ এবার একা। এতদিন ছিল কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক প্রভৃতির সঙ্গে। মন্ত্রিসভায়ও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চাইল না। সি পি আইয়ের ইচ্ছা ছিল মুসলিম লীগকে সঙ্গে রাখে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পারলেন না। কারণ, কংগ্রেস কিছুতেই তাতে রাজি হলেন না।

মুসলিম লীগকে সি পি এমও সঙ্গে নেয় নি। মুসলিম লীগ তাই আবার একা আসরে নামছে। যেমন নেমেছিল ১৯৬৯ সনে।

কিন্তু মুসলিম লীগ বর্জিত হলেও এবার নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত হয় নি। বরং, ভয়াবহভাবে এসেছে। পাকিস্তান ধ্বংসের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ভোটদাতাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজোট করার চেষ্টা চলছে। এমন জিনিস '৪৭ সনের পরে আর কখনও এ দেশে হয় নি।

মুসলিম লীগ এবং সি পি এম জোট—এই দু পক্ষই এবার মুসলমান ভোট সম্পর্কে বিশেষ আশান্বিত।

মুসলমানরা কতজন এই বিপজ্জনক সাম্প্রদায়িক প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন জানি না। তবে এটা জানি যে, তাঁরা যদি সাম্প্রদায়িক বিচারে ভোট দেন, যদি পশ্চিম বাংলার ভোট যুদ্ধে ইস্যু করেন "পাকিস্তান প্রেম"কে তা হলে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের চরমতম বিপদ ডেকে আনবেন।

১২-২-৭২

নবারুণ গুপ্ত

অনাধুনিক কাল

রঞ্জন

চার্লি চ্যাপলিন সম্প্রতি লণ্ডন গিয়েছিলেন। বয়স এখন বিরাশি। বাস করেন সুইটজারল্যাণ্ডে। চলন না ক অবিচল নয়। কানা বললেই হয়। শ্রুতি অতি ক্ষীণ। পুনর্দর্শন পুরোপুরি চিত্তগ্রাহী হয়নি। লণ্ডনের যে অঞ্চলে তাঁর জন্ম সেখানে গরিবি হঠানো শুরু হয়েছে। যেখানে ছিল বিস্তীর্ণ বস্তি সেখানে এখন উত্তুঙ্গ, উদ্ধত, অশ্লীল অট্টালিকা। মানুষের বদলে অফিস। পুরোনো পানালয় আজ চরিত্রহীন। এ লণ্ডন সে লণ্ডন নয়। যেমন এ নিসার সে নিসার নয় বলে একদিন ঘোষণা করেছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। সরল জীবন সম্বন্ধে মোহ আমার পরিমিত। দারিদ্র্যে আমি বিন্দুমাত্র গর্ব দেখিনে। একবার বার্নার্ড শকে দরিদ্রবান্ধব বলে অভিহিত করায় তিনি স্পষ্টই বলেন: "আমি গরিবদের বন্ধু নই; আমি চাই ওদের অবিলম্বে অবসান।" আমিও তাই চাই, কিন্তু নবসমৃদ্ধি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ কিছু আছে। চ্যাপলিন তাঁর পুরোনো ইস্ট এণ্ড না দেখতে পেয়ে শোচনা করেছেন। ক্ষীয়মাণ স্মৃতির প্রলেপ পেলে অতীতের দারিদ্র্যও হয় মধুময়, বিশেষত দারিদ্র্য যখন অপরের অভিজ্ঞতা। আমার কাছে তবু উল্লেখযোগ্য এই ঘটনা যে চ্যাপলিন লণ্ডন গিয়েছিলেন তাঁর সর্বশেষ নীরব ছবি "মডার্ন টাইমস"-এর পুনর্মুক্তির জন্য। ছবির জন্ম ১৯৩৬ সালে।

আমি তখন সবে কলকাতায় এসেছি, কলেজে পড়তে। ছবি প্রথম দিনেই না দেখলে ইজ্জতের হানি হয়। থাকি হস্টেলে। তখন হস্টেলে কারুর কোনো দিনেমায় চ্যাপলিনের "মডার্ন টাইমস" দেখতে হবে। উপায় কী না দিয়ে সবচেয়ে সস্তা টিকিট চার আনা। তার বেশি দেবার সাধ্য তখন কোথায়? (দারিদ্র্য সম্বন্ধে আমার মোহ তাই আজও পরিমিত।) কম যখনো সস্তা ছিল তখন রেস্তু ছিল (কোথায়?) চ্যাপলিনের ছবি তবু দেখতেই হবে। হস্টেল থেকে বেরোলাম সকাল সাতটায়। সাজপোশাক কিছু তখন অজানা ছিল। টিকিটবিক্রেতা গুণ্ডাদের আধিপত্য ছিল অবাধ। চার আনার টিকিট কিনতে হতো এক টাকা দু' আনা দিয়ে। সিনেমায় গুণ্ডাদের রাজত্ব নাকি আজকাল আর তেমন নেই। এর অবসানের জন্যও কি অশ্রু-বিসর্জন করতে হবে? অতীতকে অতি-মূল্য দিতে পারব না কিন্তু তাকে অস্বীকার করব কী করে? উনিশ শো ছত্রিশ সালের সেই প্রভাতে আমার একমাত্র কাম্য ছিল চ্যাপলিনের "মডার্ন টাইমস" দেখা। না দেখলে মুখ দেখাব কী করে সতীর্থদের কাছে?

*

পরবর্তী ঘটনা একমাত্র চার্লি চ্যাপলিনই দেখাতে পারতেন তাঁর কোনো ছোটো ছবিতে। কল্পনা করুন দৃশ্যটি। আমি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পেভমেণ্টে দণ্ডায়মান। একেবারে টিকেট ঘরের দরজার সামনে। টিকেট ঘর খুলবে দু' ঘণ্টা পরে, ন'টায়। আপাতত সব কিছু শান্ত। যার যেখানে বসবার সে সেখানে বসে আছে, যেমন আমি আছি টিকেট ঘরের সংকোচপ্রসারণ-পারগ দরজা আঁকড়ে। সহসা আবির্ভাব হলো পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রীর। নন্দুর পথে হাজ অপেক্ষমাণ টিকেটপ্রার্থীদের মস্তিষ্কসমুদ্র। সন্তরণ অতি সহজ, পদচারণ অনাবশ্যক। অচিরেই আমি উদ্বাস্তু। বসে আছি রাস্তার ধারে। চোখের চশমা নিরুদ্দেশ। ধৈর্যশীল প্রতীক্ষার স্থান নিয়েছে বর্ষাবান পেশীর উন্মত্ততা। আমার স্থান কোথায় এমন সমাজে? রাস্তায়। শার্ট ছিঁড়ে গেছে। দৃষ্টি সীমিত। চ্যাপলিনের ছবি দেখার আশা তিরোহিত। সেই মুহূর্তে নিজেকে নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল চ্যাপলিন বলে মনে হয়েছিল। "গোল্ড রাশ" ছবিতে চ্যাপলিন নৈশাহার করেছিলেন এক পাটি জুতো আর তার ফিতে অর্থাৎ পেরেক নিয়ে। আমার শীন চটিও যে উধাও। প্রাতরাশ প্রত্যাশার অতীত।

ঠিক এই নৈরাশ্যের অন্তিম অধ্যায়ে কী ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ আজ দিতে পারব না। হয়তো সেদিনও দিতে পারতাম না, কেননা অকস্মাৎ পরিবর্তিত হলো সারা দৃশ্যপট। যে আমি পথপ্রান্তে বসেছিলাম ভিখারীর মতো সে হঠাৎ তাকে দেখল টিকেট ঘরের দরজার সামনে। কালো বাজার কথাটা তখনো তেমন চালু হয়নি। কিন্তু অধিক মূল্যে টিকেট বিক্রেতারা এমন একটা আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল যার ফলে সেই মারাত্মক বিশৃঙ্খলা ছিঁড়ে গিয়ে এলো এক অবিশ্বাস্য শৃঙ্খলা। স্বীয় চেষ্টা ব্যতিরেকেও আমি প্রত্যাবর্তিত টিকেট ঘরের সামনে। ফিরে পেলাম চশমা আর চটি। সন্ধ্যায় দেখে এলাম চ্যাপলিনের "মডার্ন টাইমস"। এমন অঘটন কী করে ঘটল? চ্যাপলিন এ দৃশ্য ব্যবহার করতে পারতেন। ঘটনাটি আমার মনে পড়েছিল অনেক বছর পরে ভিট্টোরিয়ো দে সিকার "মিরাকল ইন মিলান" দেখবার সময়। সুন্দরই দেখিয়েছেন, শেষ হাসি সর্বহারাদের।

*

সর্বহারা হতে আজ আমার বিন্দুমাত্র রুচি নেই। চ্যাপলিন তো লক্ষাধিপতি বা তারও অনেক বেশী। তবু, নিঃসহায় দারিদ্র্যের যে চিত্র তিনি একদা সৃষ্টি করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। আজ কেবল একমাত্র সাচ্ছল্যানির্ভর সম্ভ্রম আমি, ইংরেজী কথায়, লবণদ্রাবীত গ্রহণ করতে পারিনে। আগেই বলেছি যে, দারিদ্র্য আমার জ্ঞানে শ্রদ্ধেয় নয়। চার্লি চ্যাপলিন তবু দেখিয়েছেন যে, দারিদ্র্যের মধ্যেও একদা সৌন্দর্য ছিল, ছিল মাধুর্য আর মনুষ্যত্ব বা বর্তমানে অজ্ঞাত। সমৃদ্ধির আজো সমন্বয় হলো না সৌন্দর্যের সঙ্গে। দারিদ্র্যের উপাসনা আমার কাছে অগ্রাহ্য। আমার বাড়ি নয় সর্বহারাদের বা ওয়াধার। কিন্তু দারিদ্র্যের দ্বিতীয় রূপ আমাকে আজো আকর্ষণ করে। চ্যাপলিন বা সত্যজিৎ রায় নাকি বিপ্লবী নন; ডিকেন্সের মতো ওঁদেরও ক্রিসমাসের শেষে নাকি পুডিং আছে সবায়ের জন্য। ক্ষতি কী? সবাই বিপ্লবী হলে সংসার চলে না।

আমি তাই রয়ে গেলাম চ্যাপলিনের অনুরাগী। ওঁর প্রতিভার পরিমিতি আমার অজানা নয়। তবু তিনি একটা আপন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। এই জগতের ভিত্তি ছিল বাস্তবে, যে বাস্তবে আমরা সবাই দেখেছি কিন্তু উপলব্ধি করিনি। "মডার্ন টাইমস", বা আজকে অনাধুনিক কাল, ছবির প্রধান বক্তব্যই তো ছিল এই যে, যন্ত্রযুগে মনুষ্যত্বের অন্তর্ধান আসন্ন। তবু শেষ দৃশ্য মনে আছে। নবনিষ্কৃত পলেট গডার্ডের সঙ্গে চ্যাপলিনের আলিঙ্গন আর নৃত্য। নানা নিপীড়নের শেষে এমনি প্রাণপ্রাচুর্য কোথা থেকে এলো? জীবনের বিবিধ বিষয়ে আমার সহজাত অনাস্থা, আমি অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারিনে। কিন্তু চ্যাপলিন কখনো বিশ্বাস হারাননি একটা অধরা আদর্শে যার আধুনিক নাম নাকি মানবিকতা। নামটা আমার কানে আজো বেসুরো বাজে কিন্তু অবিশ্বাসেরও থামতে হয় সাম এসে। দারিদ্র্য আর সমৃদ্ধির যুগ্ম বর্ণিত এখন নৃত্যের পশ্চাতেও দাঁড়িয়ে আছে এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য।

মেশিনগানের কণ্ঠে

মাহবুব তালুকদার

মাঝে মাঝে রক্তের মধ্যে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে
কখনো রক্তের ছিটেয় অনিন্দ্য ফুলের পাপড়ি হেসে ওঠে
যন্ত্রণার ভেতর থেকে তখন জন্ম নেয় রূপময় ভালবাসা
কখনো মৃত্যুকে মনে হয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার নবজাতক।

ভাইয়ের শোণিতমাখা শার্ট দু হাতে উড়ালে জানি মুক্তির নিশান
মনের অব্যক্ত ব্যথা রেখাঙ্কনে অবিকল পোস্টারের অলৌকিক ছবি
তখন স্বদেশমুখী কবিতাও গ্রেনেডের মত বিস্ফোরক,
মেশিনগানের কণ্ঠে তখন সোনার বাংলার গান।

একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

জিয়া হায়দার

সারারাত ধরে খালি পায়ে শিশির এবং ঘাস মাড়িয়ে
হেঁটে হেঁটে হেঁটে
কোন্ সমাধিক্ষেত্রে আমি যাবো—
বাংলা দেশের সমগ্র ভূখণ্ডই স্মৃতির সমাধি।

কোন্ কবরের পাশে অজস্র ভিড়ের দাপাদাপিতে
মুহূর্তের জন্যেও স্থির না দাঁড়িয়ে
আমি নীরবে একান্ত মনে
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো—
কয়েক লক্ষ বরকত রফিক সালাম জব্বার শফিউর
কয়েক লক্ষ কবর দিয়ে বাংলার মানচিত্র নির্মিত!

একটি, কেবল একটি ফুল আমি ছড়িয়ে দেবো
বাংলা দেশের যে-কোনো শস্যক্ষেত্রে
যে-কোনো সড়কে
যে-কোনো বাড়ির উঠোনে
যে-কোনো নদীর স্রোতে—
কোথাও একটি ফুলও নেই
পাতাগুলো পর্যন্ত আগুনে ছাই হয়ে গেছে।

কেবল প্রার্থনা শেষের পবিত্র এবং নিঃশব্দ সমাহিতিকেই
আমি ছড়িয়ে দিতে পারি।

'আটই ফাগুন'

সাহেরা খাতুন বেলা

লাখো শহীদের রক্তকণিকার তৃপ্তি হাসিগুলো
আমার মায়ের নীরব বুকের
হৃদয় নিংড়ানো অর্ঘ্যের নির্বাক বাণী।
পলাশের লালের আলোয়
রক্তের বিশাল গালিচা স্বদেশের মাটিতে
শীর্ণ চোখ দিগন্তে মিলিয়মান
জীর্ণ হাড়ের তীব্র অগ্নিশিখায়
আমার শহীদ ভায়ের মুখ হাসছিল।
ডালে ডালে শহীদের মুখ
শহীদ কাতারে দণ্ডায়মান হাজার ইচ্ছের পালকগুলো
গ্রেনেডের মত লাল শিখার লেহনে
ঘুরে ঘুরে পড়ছিল
স্বদেশের রক্তসিক্ত মাটিতে
আজন্ম শহীদ হওয়ার বাসনায় উদ্দীপ্ত আমি
কখনও দাঁড়াই লালে ছাওয়া পলাশের কুঁড়িতে
রক্তে নাওয়া বাংলার বধ্যভূমিতে
আবার যখন আসে ফাগুনের আগুনঝরা রক্ত
তখনও রক্ত শোনায়
আগামী দিনের শান্ত আশাগুলোর বাণী
তখন আবার নতুন করে শিখি
রক্তই এনেছে আটই ফাগুন
রক্তই দিয়েছে স্বাধীনতা।

ডাকো

পূর্ণেন্দু পত্রী

অবেলায় রক্ত ঝরেছিল। এখন ললাটময় সেই রক্তে চন্দনের টিপ্।
এখন আবার গাছে ফুল, ফুলে গন্ধ, গন্ধে চেতনার আভা ফিরে আসে।
আবার আকাশমুখী শিখা তুলে দীর্ঘ হবে মানুষ ও মাটির প্রদীপ,
যদিও এখনো বহু পরিচিত ভালবাসা শুয়ে আছে হিমে, ভিজে ঘাসে।

এই তো সময়। ডাকো। পাল তুলি। পা ফেলি পার্বণে।
[illegible]সব হোহো-র মত জলে স্থলে করতলে একাকার মিলি ও মেলাই।
[illegible] বসে পুরানো বানান কেটেকুটে [illegible] আপনার মনে
ইতিহাস ছাপা হলে আমরাই হবো তার কেন্দ্র জুড়ে সবুজ সেলাই।

এপারে ওপারে এবং একুশে | শংকর

একুশে ফেব্রুআরির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, চার বছর আগের এক ফেব্রুআরি মাসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ১৯৬৮ সালের এমনই একদিনে আমার লেখার খাতায় প্রথম পাতায় একটা নতুন শিরোনাম লিখেছিলাম : এপার বাংলা ওপার বাংলা। মনের মধ্যে তখন যে সংকোচ এবং শঙ্কা ছিল না তা বললে সত্যের অপলাপ হবে। সত্যি বলতে কি 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বলতে ঠিক সে কী বোঝাতে চাই তা আমার নিজের কাছেও তখনও সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল না। আপাতঃ নানা বৈষম্যের মধ্যে ভরসা ছিল একমাত্র একুশে ফেব্রুআরি — দেশ দুটি, কিন্তু ভাষা তো এক। ভাষার সেতু দূরের মানুষকে যে কাছে টানে এবং আপন করে তা বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে বিশেষভাবে উপলব্ধি করে এসেছি।

মনে আছে, লেখাটা শেষ করে সারা রাত অসহ্য যন্ত্রণায় কাটিয়েছিলাম। পরের দিনই ছুটেছি এক বন্ধুর কাছে। বন্ধু আমার মত সেন্টিমেন্টাল নন। যুক্তি, তর্ক ও তথ্যের মধ্য দিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান।

লেখাটা পড়া শেষ করে তিনি চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে।"

"যে-লেখা মানুষকে ভাবিয়ে তুলতে পারে তাই তো ভাল লেখা!" আমি নিজেই নিজের উকিল হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করলাম।

বন্ধু কিন্তু নরম হলেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, "তোমার লেখা নয়, তুমি নিজেই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ।"

এবার সত্যিই বিচলিত হবার পালা। ওঁকে অনুরোধ করলাম, "আর সাসপেন্সে রাখবেন না। খোলাখুলি বলুন।"

বন্ধুর নির্দয় উত্তর : "মার্কিনী বদান্যতায় তুমি গেলে 'নিউ ওয়ার্লড' দেখতে। তোমার রচনায় আমরা সেই দেশ সম্পর্কে খবরাখবর প্রত্যাশা করছি। কিন্তু তুমি আমেরিকা ভ্রমণ করে এসে লিখতে বসলে পূর্ব পাকিস্তানের বন্দনা!"

"এ কেমন কথা?" বন্ধু আবার আক্রমণ করলেন।

অভিযোগটার মধ্যে বেশ কিছুটা সত্য ছিল, তাই আমতা-আমতা করতে লাগলাম। তারপর নিবেদন করলাম, "যা বলছেন তা হয়তো ঠিক, কিন্তু প্রাণ যে ওপার বাংলার কথা লিখতে চাইছে।"

"প্রাণে যা চায় তা লেখবার স্বাধীনতা আমাদের এই ভারতবর্ষে এখনও পুরো-পুরি রয়েছে—সুতরাং তোমার সংকোচের কোনো কারণ নেই। কত লোক তো চীনের চাচাদের নিয়ে মাথায় করে নাচছে, কত লোক বিদেশের বাবাকাকাদের মন্দিরে বসিয়ে পুজো করছে—তুমিও ইচ্ছে করলে পাকিস্তানীদের প্রেম কীর্তন করতে পার।" বন্ধু নির্দয়ভাবে তাঁর মতামত জানিয়ে দিলেন।

বললাম, "বাঙালীদের উদ্দেশ্যে প্রেম মনে করবেন না। এটা গভীর প্রেমের উপলব্ধি—এক [illegible] মধুর আবিষ্কার—অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত আমার কাছে তাই [illegible]।"

বন্ধু টিপ্পনী [illegible] "[illegible] এই [illegible] ব্যাপার! [illegible] মনে হয়, [illegible] নামই তো প্রেম। পশ্চিম বাং[illegible] তুমি যখন পদ্মাপারের পাকিস্তানীদের ব্যবহারে মুগ্ধ, যখন তাদের কাছে হৃদয় অর্পণ করতে চাও, তখন করো। কিন্তু মনে রেখো, দুই দেশেই অসংখ্য মানুষ

আছে যাদের পক্ষে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের কলকাতা, তার পরবর্তী সময়ের নোয়াখালি, এবং এই অল্প কিছু দিন আগের শিয়ালদহ স্টেশনের ফুটপাথগুলো ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। রিফিউজী ক্যাম্পের আধা নরকে যারা জ্বলে পুড়ে মরছে তারা সবাই বলতে রাজী নয়—"মেরেছিস কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।" দিব না।"

বন্ধুর বিদ্যার ওপর আমার আস্থা আছে, তাঁকে শ্রদ্ধাও করি। তাঁর হাত দুটি ধরে বললাম, "এ-সবকে অবহেলা বা অস্বীকার করবার মতো বড় মানুষ নই আমি। কিন্তু অতীতের একটা কলঙ্কিত পৃষ্ঠা আর কতকাল আমাদের রক্তচক্ষু দেখাবে? কানে-শোনা অতীতটাই সত্যি হয়ে থাকবে, আর আমার নিজের চোখে যে মানবতা এবং আদর্শ দেখে এলাম তা মিথ্যে হয়ে যাবে?"

বন্ধু বললেন, "এসব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। তবে নিজের বক্তব্যগুলো ঠিক করে রেখো—আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পাঠকের আদালতে তোমাকে দাঁড়াতে হতে পারে। আমি কেবল তোমাকে আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। দেওয়াটা আমার কর্তব্য, কারণ এতদিন ধরে লেখক হিসেবে তুমি গল্প-উপন্যাসের নিরাপদ কোম্পানি-বাগানে বিচরণ করছিলে, এবার রাজনীতির লরি-বোঝাই গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডে প্রবেশ করছো।"

"যারা ভাল লোক তাদের ভাল বলার মধ্যে রাজনীতি কোথায়?" আমি বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলাম।

বন্ধু বলেছিলেন, "এর থেকেই পলিটিকস জন্ম নেয়। দলগতভাবে একটা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে—তার পিছনে ইতিহাস কাজ করে। আর এই যে তোমাদের গল্প-উপন্যাসের ভালবাসাবাসি, তার পাত্র-পাত্রীরা প্রেমের ঘোরে ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন এমনকি অর্থনীতি পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে।"

মনের মধ্যে এই বিপুল দ্বন্দ্ব ও দুশ্চিন্তা নিয়েই দেশ পত্রিকার পাঠকদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' লেখার জন্যে আমাকে সমালোচনা এবং ভর্ৎসনা সহ্য করতে হতে পারে; তার জন্যে আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আমার এবং আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর সমস্ত সংশয় মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই দূরে হলো। সীমান্তের দুই পারের মানুষের হৃদয়ে এতদিনের এত চেষ্টার পরেও যে কোনো 'পার্টিশন ওয়াল' তোলা সম্ভব হয়নি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, সামান্য একটি লেখার জন্যে সাধারণ মানুষের এমন আন্তরিক অভিনন্দন আমার সাহিত্যজীবনে এক নতুন ঘটনা। দুই বাংলার মানুষের মধ্যে যে অদৃশ্য সেতুবন্ধন শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সম্ভব হয়েছে তা অসংখ্য অনুভূতিশীল পাঠকের আশীর্বাদ এবং চোখের জলেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অনেক জন্মের পুণ্যের ফলে বাংলাদেশের লেখক হওয়া যায়—ধন্য আমি।

সত্যি সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! যাঁরা দেশ বিভাগের পরবর্তী যুগে জন্ম হয়েছেন, যাঁরা ওপার বাংলায় কোনো-দিন যাননি, তাঁদের মানসিক উদারতার তবু একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু যা আমাকে অভিভূত করলো, তা হলো সেই সব হতভাগ্য মানুষের সমর্থন যাঁরা সীমান্তের অপরপারে সর্বস্ব খুইয়ে এদেশে 'রিফিউজি' নাম গ্রহণ করেছেন।

দুই বাংলার ভ্রাতৃত্বের প্রতি আমার সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত, নবীন-প্রবীণ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে উষ্ণ অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল, তা আমার কল্পনাতীত। লেখক হিসেবে এই অভিনন্দনকে নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দেবার লোভ যে হয়নি এমন নয়। কিন্তু

কলকাতার পাকিস্তান দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার! টেলিফোন মাধ্যমে এই উচ্চপদস্থ রাজদূত আমার মত এক সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবলার তাগিদ অনুভব করেছেন। তার কিছুদিন পরেই, শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের এই প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে গেল।

সেদিন আরও কয়েকজন অতিথি ছিলেন। ভিড় থেকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রদূত বললেন, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গর্ববোধ করছি।"

বললাম, "আমার জীবনে আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

ইমামসায়েব আমার উত্তর শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, "কেন বলুন তো?"

"কোনো বিদেশী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলার সুযোগ আমার জীবনে এই প্রথম।" আমার উত্তর শুনে মিস্টার ইমাম গম্ভীর হয়ে গেলেন।

একটু পরে মিঃ ইমাম জিজ্ঞেস করলেন, "নিজের মাতৃভাষার প্রতি লোকের এত টান হয় কেন বলুন তো?"

আমি বললুম, "মায়ের ভাষা যে। ভাষারূপ জননীও বলতে পারেন।"

ইতিমধ্যে আমাদের পাশে আর এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ইংরিজীতে বললেন, "ভাষা নিয়ে অনেকে অযথা সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত বেধে যায়।"

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে, আমাকে মনে করিয়ে দিতে হলো, "বাঙালীর ইতিহাসে তার কোনো নজির নেই। বঙ্গভাষীরা কখনো অন্যের ভাষার ওপর আলকাতরা লেপে দেয়নি, কোনো ভাষাকে 'হটাও' বলেনি। বরং আমরাই বিনা কারণে, শুধু আমাদের মাতৃভাষাকে ভালবাসার অপরাধেই লাঠির ঘা খেয়েছি। বন্দুকের গুলিও বুক পেতে নিতে হয়েছে।"

ভদ্রলোক নিখুঁত ইংরিজীতে মন্তব্য করলেন, "কিছু মনে করবেন না, বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ এবং বেঙ্গলি লিটারেচারের কথা উঠলেই আপনারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন!"

মিস্টার ইমাম একটু বিরক্ত বোধ করলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "আমি সরকারী চাকরি করি, ভাষা-সাহিত্যের খোঁজখবর রাখি না। তবে এক্ষেত্রে শংকরবাবুর লেখা থেকে একটা কোটেশন দিতে পারি। কথাগুলো অবশ্য ওঁর নিজের নয়, পাকিস্তানের এক প্রাচীন ভদ্রলোক ওঁকে বলেছিলেন: বাংলার সাহিত্য, বাংলার গান কখনও নীচতার প্রশ্রয় দেয়নি, বাংলার কবি গাড়োয়ানের সন্দিগ্ধ স্বার্থ খুলতেই বলেছে, বন্ধ করতে নয়।"

আমি অবাক হয়ে মিস্টার ইমামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি যে এমন মন দিয়ে দেশ পত্রিকা পড়েছেন তা আমি আগে বুঝতে পারিনি।

আমাদের সঙ্গী ভদ্রলোকটি এবার হেসে বললেন, "তা হলে ল্যাংগুয়েজ সমস্যার সমাধানটা কী?"

"সমাধান অতি সহজ", আমি উত্তর দিলাম। "নিজের মায়ের প্রতি ভালবাসা দেখানোর জন্যে অপরের মাকে নিগৃহীত করবার প্রয়োজন নেই।"

মিস্টার ইমাম এবার ঘরের মধ্যে একটা সোফায় বসে পড়লেন। বললেন, "ক'দিন হল কলকাতায় আছি। শুনেছেন বোধ হয়, আমি রাশিয়াতে অ্যামবাসাডর হয়ে যাচ্ছি। আসুন একটু গল্পগুজব করা যাক। কোথায় থাকেন আপনি?"

বললুম, "আপনি বিদেশী রাষ্ট্রদূত, আপনাকে জায়গাটা ঠিক বোঝাতে পারবো না। ভি-আই-পিরা ভুল করেও ওদিকে পা দেন না। নাম হাওড়া।"

মৃদু হেসে মিঃ ইমাম বললেন, "অত বলতে হচ্ছে কেন? হাওড়ার কোনখানে বলুন তো?"

কূটনীতিবিদ্‌রা যে নিপুণভাবে সব রকম অস্বস্তিকর প্রসঙ্গের মুখোমুখি হতে পারেন তার প্রমাণ পেলাম। তবু ভদ্রতা রক্ষার জন্যে বললাম, "হাওড়া স্টেশন থেকে মাইল খানেক পশ্চিমে নেতাজী সুভাষ রোড থেকে একটা ছোট্ট গলি বেরিয়েছে, নাম বিহারী চক্রবর্তী লেন।"

এবারের উত্তর একেবারে অপ্রত্যাশিত। পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার বললেন, "কালীবাবুর বাজারের পরেই তো রাস্তাটা?"

আমি তাজ্জব। ভদ্রলোক কী ম্যাজিক জানেন!

মিস্টার ইমাম হেসে ফেললেন। বললেন, অবাক হচ্ছেন কেন? আপনি সাহিত্যিক হিসেবে হাওড়াকে ভালবাসতে পারেন, আর আমরা পারি না?

"আমাকে আর সাসপেন্সে রাখবেন না", আমি অনুনয় করি।

মিস্টার ইমাম শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "আপনি আমাকে হাওড়ার রাস্তা চেনাচ্ছেন! হাওড়ার রিপণ ইস্কুল থেকে আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। বিহারী চক্রবর্তী লেন, কালী ব্যানার্জী লেন, সদর বক্সী লেন, পঞ্চাননতলা আমার নখদর্পণে ছিল।"

ইতিহাসের ব্যাপারটার নাটকীয়তায় আমি কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গিয়েছিলাম। রিপন ইস্কুলের সেই ছাত্রই এখন বিদেশী!

ইমাম সাহেব বললেন, "একটা ঘটনা বলি, কোনোদিন হয়তো আপনার সাহিত্যের কাজে লেগে যাবে। রিপণ ইস্কুলের এক মাস্টারমশায় আমাকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু রেগে গেলে প্রায়ই বলতেন, তোর কিছু হবে না! কলকাতায় এবারে এসে ইচ্ছে হলো, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। তা খুঁজে খুঁজে একদিন হাওড়ার সরু গলিতে সেই পুরনো বাড়িতেই মাস্টারমশায়কে আবিষ্কার করলাম। আমি কর্মজীবনে উন্নতি করেছি শুনে তাঁর কী আনন্দ—প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।"

ইমাম সাহেব এরপর সামান্য ক্ষণ থামলেন। তারপর একটু গম্ভীর হয়েই বললেন, "কয়েক দিন পরে কাগজে কিন্তু একটা খবর বেরিয়েছিল। পাকিস্তান হাইকমিশনের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে শহরতলীর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে গোপনে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে।"

সেদিন ইমাম সাহেবের সঙ্গে আরও অনেক গল্প হয়েছিল। বলেছিলেন, "বদলি হয়ে যাচ্ছি, কবে আবার আসবার সুযোগ হবে জানি না, তাই বাংলা বই ও বাংলা রেকর্ড যতটা পারি নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।"

বিদায়ের বেলায় আমাকে আবার এক কোণে ডেকে নিয়ে মিস্টার ইমাম বলেছিলেন, "আপনি আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিয়েছেন। সরকারী কর্মচারি হিসেবে আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া করা উচিত। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বলে যে কথাটা চালু করলেন—এটা বাইরে থেকে যতই নিরীহ এবং নিরাপদ মনে হোক, আমাদের কাছে ওটা বিপজ্জনক টাইম বোমার মত।"

আমি একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলাম, "আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ বোমা-বাজীতে বিশ্বাস করি না।"

ইমাম সায়েব বললেন, "পাকিস্তানী অফিসার হিসেবে আপনাকে আমার জিজ্ঞেস করা উচিত—ওপার বাংলা বলতে আপনি কী প্রোপাগান্ডা করতে চাইছেন? এপারে আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ আছে, কিন্তু ভূগোলের কোনো বইতে ওপারে বাংলার

কোনো চিহ্ন নেই—র‍্যাডক্লিফ সীমানার ওদিকে যে দেশ আছে তার নাম পাকিস্তান।"

আমি হেসে বললাম, "জানেনই তো সাহিত্যিকরা একটু ঢিলেঢালা হয়—ইতিহাস, ভূগোল, মানচিত্রের অনুশাসন মিলিয়ে তারা সব সময় লেখালিখি করতে পারে না।"

ইমাম সায়েব আমার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমার ডান হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুমি বলছি, কিছু মনে করো না। আমার থেকে বয়সে তুমি অনেক ছোট। ঐ যে ইতিহাস, ভূগোল, মানচিত্রের কথা বললে ওসব খুঁটিয়ে দেখে ঝগড়া করবার জন্যেই মোটা মাইনে দিয়ে আমাদের রাখা হয়েছে। তোমরা লেখকরা ওসবের মধ্যে যেয়ো না—তোমরা নিজের কাজ করে যাও।"

চার বছর আগে ১৯৬৮ সালে একজন পাকিস্তানী কূটনীতিবিদ্-এর পক্ষে কথাগুলো উচ্চারণ করা কতখানি শক্ত ছিল তা আজ আমি বুঝতে পারি। দুই বাংলার অগণিত মানুষের কথা স্মরণ করে যখনই কলম ধরতে বসি, তখনই অনেক মুখের মধ্যে ইমাম সায়েবের মুখটাও ভেসে ওঠে। ইমাম সায়েবের সঙ্গে এখন দেখা হলে বলতাম, "ইতিহাস, ভূগোল, মানচিত্রের মুশকিল হলো—প্রতি সংস্করণেই ওসব পাল্টানো যায়। কিন্তু যা সত্য, বছরে বছরে তার পরিবর্জিত, পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত, অমূল্যে সংশোধিত সংস্করণ বের হয় না। ভারত মহাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তা আর একবার প্রমাণ করলে।"

আমার দুর্ভাগ্য ইমাম সায়েবকে সাক্ষাতে এই কথা বলার সুযোগ আর কোনোদিন পাবো না। কলকাতা থেকে বদলি হবার কিছুদিন পরেই বার্মাতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাতের স্মৃতি বহু দিন অটুট থাকবে।

এপার-ওপার সম্পর্কে ওপারের তদানীন্তন সরকারী ভাষ্যের ইঙ্গিত যেমন ইমাম সায়েব দিয়েছিলেন, এপারেও তেমন কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হয়নি বললে সত্যের অপলাপ হবে। চোস্ত ইংরিজী-বলিয়ে জনৈক ভদ্রলোকের জেরার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এইবার। পৃথিবীর ক্যালেন্ডারে ২৫শে মার্চ তখনও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এই ভদ্রলোকের প্রশ্ন : "'এপার বাংলা ওপার বাংলা' কথাটা এমন ঝট করে বাঙালীরা গ্রহণ করলো কেন?"

একটি রাষ্ট্রের একটি প্রদেশের অন্য একটি রাষ্ট্রের একটি প্রদেশের জন্যে এমন প্রেমে ডগমগ হওয়ার নজির নাকি আন্তর্জাতিক ইতিহাসে নেই।

হেসে উত্তর দিয়েছিলাম, "হবেও বা। আমরা উকিল নই যে সব সময় নজির দেখিয়ে কাজ করবো।"

এর পরের প্রশ্ন আরও কঠিন। "ভারতীয়ত্ববোধ এবং বাঙালীত্ববোধ এই দুটির মধ্যে কোনটা আমাদের কাছে সত্য?"

আমি বলেছিলাম, "অযথা দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে ব্লাডপ্রেসার বাড়াবেন না। আমাদের জীবনে দুটোই সত্য—দুটোর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বও নেই।"

"যেমন?" ভদ্রলোক উদাহরণ চেয়েছিলেন।

আমার উত্তর : "কাঁঠালের অখণ্ডত্ব প্রমাণ করবার জন্যে কাঁঠালের কোয়ার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার প্রয়োজন হয় না।"

আমার উত্তর তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন, "রসিকতা করে বড় সমস্যাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

আমি বলেছিলাম, "মোটেই না। আমাদের এই বিরাট দেশের সঙ্গে একমাত্র কাঁঠালেরই তুলনা করা চলতে পারে। কোয়াদের স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু তার মানেই তাকে আলাদা ফলের মর্যাদা দিতে হবে এমন কথা নেই। আবার, কাঁঠালের একটা কোয়া শুকিয়ে গেলে বা পচলেই সমস্ত কাঁঠালটা বরবাদ হয়ে যাবে এমন কথা নেই—যদিও একটা কোয়ায় পচন লাগা মানেই সমস্ত কাঁঠালের অস্তিত্ব বিপন্ন।"

"সমস্ত পৃথিবীটাই তাহলে কাঁঠালের প্রিন্সিপ্যালে তৈরি বলা যায়", ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন।

"নিশ্চয় বলতে পারেন", আমার উত্তর। "এপার বাংলা ওপার বাংলা কেন? একটু নজর উঁচু করলেই বলা যায় 'এপারে পৃথিবী ওপারে পৃথিবী', 'এপারে মানুষ ওপারে মানুষ।' আবার নিচু দিকে নামতে নামতে বলতে পারেন 'এপারে ভারত ওপারে পাকিস্তান', 'এপারে চব্বিশ পরগণা ওপারে যশোর'। আবার বলতে পারেন- 'এপারে হরিদাসপুর ওপারে বেনাপোল', 'এপারে সেটলমেন্ট প্লট নম্বার ২২৭ ওপারে প্লট নাম্বার ৩৩৬'। এপার-ওপারের ওই ছোট ছোট প্লটের ওপর যে রাম ও রহিম দাঁড়িয়ে আছে তারা নগণ্য হয়েও বিশ্বমানবের এবং বিশ্বমানবতার প্রতিনিধি।"

আমার কথাবার্তায় সেদিন বিশেষ কোনো ফল হয়েছিল মনে হয় না। কিন্তু ১৯৭১ সালে ওপার বাংলায় ইতিহাসের ডমরু বেজে উঠতেই আমরা এক নতুন অগ্নিপরীক্ষায় নিজেদের শুদ্ধ করে নেবার সুযোগ

পেলাম। আত্মশুদ্ধির এমন সুযোগ মানুষের ইতিহাসে ক'বারই বা আসে? এলেও, ক' জনই বা তার সদ্ব্যবহার করতে পারে? ভারতীয় হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে আমরা জনগণমন বিধাতার কাছে এইটুকু বলবার অধিকার অর্জন করেছি যে, দারুণ অন্ধকার মাঝে গহন রাত্রির দুয়ার ভেঙে যখন চরম লগ্ন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমরা ঘুমিয়ে থাকিনি, অথবা অন্য অনেক সুসভ্য জাতির মত জেগে থেকেও অচৈতন্য হয়ে থাকার ভান করিনি। আমরা চরমমূল্য দিয়েই আমাদের ঋণ শোধের চেষ্টা করেছি।

প্রলয়ংকরী এই যে ঝড় এর প্রথম ইঙ্গিত আমরা দেখেছিলাম অনেক বছর আগে এক অখ্যাত একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতে। মায়ের দেওয়া মুখের ভাষা যেসব দস্যু ছিনিয়ে নিতে এসেছিল তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল গুটিকয়েক বাঙালী তরুণ। সেদিনের একুশে ফেব্রুয়ারিকে অনেকে ওপার বাংলার একান্ত নিজস্ব ঘটনা বলে ভুল করেছিল। সেদিনকার সমস্ত তাৎপর্য এপার বাংলার মানুষের কাছে তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের স্বীকৃতির জন্যে অপেক্ষা করে না থেকে ক্রমশঃ আপন মহিমায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। তারপর একদিন আমরাও উপলব্ধি করেছি। যাদের রক্তে একুশে ফেব্রুয়ারি রাঙিন হয়ে উঠেছিল তারা কেন শুধু ওপারের বাঙালীদের ভাই হতে যাবে? যে-ভাষার জন্যে বুড়িগঙ্গা নদীতীরের সেই অকুতোভয় যুবকবৃন্দ জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেছিল সেই ভাষা কি এপারের বাঙালীর প্রাণেও বাঁশি বাজায় না? দাঁড়াও পথিকবর বলে যে শব্দহীন বাণী সেই সব শহীদদের সমাধিক্ষেত্রে আহ্বান করছে, আমরাও বা কেন তার উত্তরে সাড়া দেব না? অর্থাৎ এপার ওপারের দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্বের মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি অকস্মাৎ এক সেতু বাঁধল। নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় যা আমরা হাজার-হাজার বছরের জন্যে হারাতে বসেছিলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবৎকালেই তা ফিরিয়ে দিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমার পরম গর্বের, পরম শ্রদ্ধার দিন। গত বছরের একুশে ফেব্রুয়ারি লিখেছিলাম, আরেক কারণে একুশে ফেব্রুয়ারি আমার পরমপ্রিয়। একুশে ফেব্রুয়ারি আমার ভাষাজননীকে বিশ্ব-সভায় সগৌরবে একটি স্বাধীন দেশের ভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই শতাব্দীতে আদর্শবাদী বাঙালীরা যত স্বপ্ন দেখেছিল তার কোনোটাই সফল হয়নি। আমাদের হীরের টুকরো ছেলেরা মায়ের কোল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বারবার দুঃখে আলিঙ্গন করেছে, জেলে পচেছে, ফাঁসি কাঠে ঝুলেছে, তাজা রক্তে রাজপথ ভিজিয়ে দিয়েছে—কিন্তু সাফল্যের আশীর্বাদ পায়নি। সমুদ্রমন্থনে যদি বা কখনও কিছু উঠেছে বাঙালীর ভাগ্যে বিষকুম্ভটুকুই জুটেছে। বহু বছরের এই বারংবার ব্যর্থতা আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের সোনার ছেলেদের আশাহীন করে তুলেছে। কোনো কিছু হবে না জেনেই তারা বুকের রক্ত দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে—অবিচার, অনাচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, রক্তের যে কোনো দাম আছে, তা আমরা ভুলতেই বসেছিলাম।

ব্যর্থতার এই শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের মধ্যেই একমাত্র একুশে ফেব্রুয়ারিই শতদল পদ্মের মত বিকশিত হয়ে উঠল। আমরা তাকে নমস্কার করব না?

গত বছর এমন দিনে আমার খাতায় লিখেছিলাম, "আমার জীবনে তিনটি দিন স্মরণীয়—৭ই ডিসেম্বর, ১৫ই আগস্ট এবং একুশে ফেব্রুয়ারি। ৭ই ডিসেম্বর আমি গর্ভধারিণী মাকে স্মরণ করি—পরম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ঐদিন তিনি আমাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন। ১৫ই আগস্ট আমার দেশজননীকে স্মরণ করি। আর এই একুশে ফেব্রুয়ারি আমার ভাষাজননী সন্তানের মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন।"

১৯৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমার খাতার এক কোণে আরও লিখে রেখেছিলাম, "একুশে ফেব্রুয়ারি প্রত্যেক বাঙালীর জীবনে এক পরম পবিত্র দিন—পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকো না কেন, হে পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে তবে এই পবিত্র দিনে ক্ষণকালের জন্যও নতমস্তকে একবার তোমার ভাষাজননীকে স্মরণ করো, তাঁকে তোমার প্রণাম জানাও।"

আরও লিখেছিলাম, "সময়ের ব্যবধানে সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব কমে যায়। কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম এই একুশে ফেব্রুয়ারি। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন আরও মহিমান্বিত হয়ে উঠছে বাঙালীর একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু তখনও কি জানতাম '৭১-এর সেই একুশে ফেব্রুয়ারির পর ইতিহাসের দেবতা আর একবার এমনভাবে প্রলয় নাচনে মত্ত হবেন। হে বিধাতা, এমন বীভৎস প্রতিকারহীন বিষাক্ত বর্বরতার শেষ প্রত্যক্ষদর্শী যেন আমরাই হই। আমাদের পরম শত্রুও যেন বাংলাদেশের কোথাও কোনোদিন যেন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন না হয়। আমাদের অনাগত বংশধরদের প্রতি হে বিধাতা তোমার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কোরো, তাদের [illegible] যেন ২৫শে মার্চ আর কোনোদিন না ফিরে আসে।

পঁচিশের মার্চের সেই কালরাত্রিকে অবজ্ঞা করে একুশে ফেব্রুয়ারি আবার আসছে। অন্তহীন বর্বরতার অন্ধকার অরণ্য পেরিয়ে যে একুশে ফেব্রুয়ারি আবার আবির্ভূত হচ্ছে সে এক নতুন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এতদিন যা ছিল বাঙালীর একান্ত নিজস্ব ধন, এবার 'বিশ্বমাঝে দিয়েছি তারে ছড়ায়ে।' নতুন এই একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল বাংলাদেশ-বাসীর একান্ত সম্পদ নয়—পৃথিবীর যেখানেই পরপদানত, কণ্ঠরুদ্ধ মানুষ নিজের প্রাণের কথা বলতে চাইবে সেখানেই একুশে ফেব্রুয়ারির স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে নবজন্ম দান করবে। [illegible] থেকে উদ্ধার করে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমরা সমগ্র পৃথিবীর মাতৃভাষাদিবস রূপে স্মরণীয় করে তুলবো। তুমি পৃথিবীর যে-অংশেরই মানুষই হও, এই পরম পবিত্র দিনে তোমার ভাষাজননীকে স্মরণ করো। মে দিবস এবং সাতই নভেম্বরের মতো ফেব্রুয়ারির একুশে-দিবসও বঙ্গভূমের ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তে স্নাত হয়ে পৃথিবীর বর্তমান ও অনাগত যুগের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার দীপশিখা হয়ে উঠবে।

শোক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সকালে উঠেই ফোনটা পেলাম।

'আপনিই কি লেখক কল্যাণকুমার [illegible]?'

বললাম, 'হ্যাঁ। বলুন।'

নারী কণ্ঠ। গলা শুনে মনে হল বয়স বেশি নয়। গলাটা কিন্তু চেনা মনে হল না।

আমার পরিচয়টুকু জানবার পর ওপারের কণ্ঠটি নীরব হয়ে রয়েছে।

আমি আবার বললাম, 'বলুন।'

'আপনি কি লীনা রায়কে চিনতেন? ও একটা [illegible] বের করেছিল। আপনি তার লিখেছিলেন।'

বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ চিনি ওকে। তাই কি? আপনি কি ওর বন্ধু?'

'আমি ওর বউদি। আমার কথাও ও আপনাকে একবার লিখেছিল। আপনি জবাবও দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন দেখা হলে আলাপ করবেন।'

বললাম, 'হ্যাঁ, লিখেছিলাম মনে পড়ছে। লীনা কেমন আছে?'

ওপারের কোমল কণ্ঠটি আবার একটুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর ফের সেই গলা শুনলাম। এবার আবেগে আর্দ্র।

'লীনা আর নেই।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সে কি!'

জন্মের মত মৃত্যুও নিত্যকার ঘটনা। তবু আত্মীয় বন্ধু—এমন কি সাধারণ পরিচিত কারো মৃত্যুও আমাদের বিচলিত করে, বিস্মিত করে। মনে হয় যেন এমনটি হবার কথা ছিল না। বিশেষ করে একুশ বছরের একটি মেয়ের মৃত্যুর কথা কে আর আগে থেকে ভেবে রাখে?

দু' তিন সেকেণ্ড সময় নিয়ে আমি বললাম, 'কী হয়েছিল?'

'কিছুই হয়নি। ও সুইসাইড করেছে। আপনি আসুন। এলে আপনাকে সব বলব।'

আমি বললাম, 'গিয়ে আর কী করব?'

লীনার বউদি কাতরকণ্ঠে বললেন, 'না না, আপনি আসুন, ওর বাবা মা আপনাকে দেখতে চাইছেন। আপনি আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।'

ভাবলাম, ঠিকই কথা দিয়েছিলাম সে তো আর নেই। তার বাড়ির আর কারো সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়নি। গিয়ে কী আর হবে।

আবার অনুরোধ এল, 'আজ ওর কাজ হচ্ছে। এসব কাজ তো চতুর্থীতেই করতে হয়। আমাদের সবাইর ইচ্ছা আপনি আসুন। আপনি এলে ওর আত্মা তৃপ্তি পাবে।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আজ আবার আমার আর এক জায়গায় বেরোবার কথা আছে। দেখি চেষ্টা করে।'

'চেষ্টা না, আপনি দয়া করে আসুন। এলে আমরা সবাই খুশি হব। ও আপনার কথা প্রায়ই বলত।'

আমি বউদির কাছ থেকে ঠিকানা নিলাম, গিরিশ পার্কের কাছে বিবেকানন্দ রোডের ওপর তিনতলা বাড়ি। চিনে নিতে কোন অসুবিধা হবে না।

টেলিফোনে বললাম, 'আমার যেতে দেরি হতে পারে।'

লীনার বউদি বললেন, 'তা হোক। তবে দুপুরের মধ্যেই আসবেন। তারপর ওর বাবা মা এখান থেকে চলে যাবেন।'

আশ্চর্য, আজ সকালে যেখানে আমার নিমন্ত্রণ, সেও এক শ্রাদ্ধবাড়ি। এক মাস আগে আমার এক প্রবীণ সহকর্মীর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। আজ তাঁর পারলৌকিক কৃত্য।

সকালে লেখাপড়া আর হল না। তাড়াতাড়ি শেভটেভ করে নিয়ে বেরিয়ে

পড়লাম। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে একটু অগ্রপশ্চাৎ ভাবলাম। কোথায় প্রথমে যাব? দমদমে লোকেশবাবুর বাড়িতে নাকি গিরিশ পার্কে?

লোকেশবাবুর বাড়িই আগে সেরে আসা সঙ্গত মনে হল। ও'র বাড়িতে আমি এর আগে কখনো যাইনি। ও'র স্ত্রীর সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিল ব্যাধিতে তিনি ভুগছিলেন এই খবরটুকুই শুধু জানি। 'তিনি কেমন আছেন' বলে মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়েছি।

বাসে করে গেলেও আধ ঘণ্টার মধ্যেই লোকেশবাবুর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। সামনে কয়েকটি মোটরগাড়ি দাঁড়ানো। লোকেশবাবু বিত্ত-প্রতিপত্তিশালী মানুষ। তাঁর অতিথি অভ্যাগতরা সেই শ্রেণীর হওয়াই স্বাভাবিক।

দোতলা বড় বাড়ি। সামনে বাগান। আরও খানিকটা ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে। সেই জায়গা ঘিরে নিয়ে এখন কীর্তনের আসর বসেছে। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে এক এক আসরে এক এক কীর্তনিয়া। কিন্তু পালা একটিই—চিরবিরহের মাথুর।

যেখানে লোকেশবাবু শ্রাদ্ধের কাজে বসেছেন আগে সেখানে গেলাম।

জন দুই পুরোহিত আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যস্ত। একজন বর্ষীয়সী তাঁদের সহায়তা করছেন। খাটের উপর লোকান্তরিতার বড় একখানি প্রতিকৃতি। দামী ফ্রেমে বাঁধানো। তার চারদিক ঘিরে রজনীগন্ধার মালা।

বহু লোকের যাতায়াত। আশেপাশে নানা ধরনের নানা স্বরগ্রামের ধ্বনিপুঞ্জ। ঠিক ঐকতান রচনা করেছে বলা যায় না। একদিকে কাঁসার বাসনকোসন, নানা দ্রব্যসামগ্রী। ষোড়শের উপচার।

এক ফাঁকে আমি গিয়ে লোকেশবাবুর কাছে দাঁড়ালাম। তখন কিছুক্ষণের জন্যে মন্ত্রপাঠে বিরতি হয়েছে। বললাম, 'আপনি নিজেই সব করছেন?'

লোকেশবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসলেন. 'কী করব? আমার তো ছেলেমেয়ে কেউ নেই। আমিই সব।'

বললাম, 'আপনার ভাইপোরা আছেন শুনেছি।'

'তারা তাদের করণীয় কাজ করছে। আমার করণীয় তো আমাকেই করতে হবে। আমারও তো এই শেষ কাজ। তিনিই সব ছিলেন।'

আমি চুপ করে রইলাম।

এত আয়োজন সম্ভার, এত কণ্ঠ-কোলাহলের মধ্যে ওই একটি কথা কিছুক্ষণের জন্যে আমার মনে গাঁথা হয়ে রইল। সদ্য স্ত্রীবিয়োগকাতর রিক্তসর্বস্ব এক প্রৌঢ়কে নীরব সহানুভূতি জানিয়ে আমি চলে এলাম।

তিনি বললেন, 'কিছু খেয়ে যাবেন কিন্তু। তিনি লোকজন খাওয়াতে বড় ভালোবাসতেন।'

তারপর আরও অভ্যাগতেরা এলেন। পুরোহিত আবার তাঁর আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করলেন।

আমি খানিকক্ষণ কীর্তনের আসরে গিয়ে বসলাম। সহকর্মীদের সঙ্গে ভোজের আসরেও বসতে হল।

তারপর এক ফাঁকে সেই বৃহৎ শ্রাদ্ধবাসর থেকে বেরিয়ে এলাম।

দু'তিনজন সহকর্মী গাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিলেন। আমিও একটু তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এবার মনে পড়ছে আরো এক জায়গায় আমার যাবার কথা।

গাড়িতে দু'একজন অপরিচিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হল। পারস্পরিক পরিচয় জ্ঞাপন। কে কোথায় থাকি, কে কী করি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। আমি তাঁদের পাশে বসে নিভৃত চিন্তার অবকাশ পেলাম।

'তিনি আমার সব ছিলেন।'

আমি তার সব, সে আমার সব এই অনুভব কি আমাদের সারা জীবনের সত্য? যদি হত—জানি না তাহলে কী হত। একটি ব্যক্তি কি একটি বস্তুর মধ্যে যদি আমরা সর্বস্বকে পেতাম, স্বকে পেতাম শুধু একটি বাসনার সঙ্গে গ্রথিত, একটি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অঙ্গীকৃত তা হলে জীবনের এই সম্পত্ত এই বৈচিত্র্য হয়তো থাকত না। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র জীবনখণ্ডের মধ্যে আমি অখণ্ড এক সমগ্রতাকে অনুভব করতে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরোবে। কেউ অধ্যাপনা করবে, কেউ বা অন্য কিছু। ওরাই হবে পরিণত বয়সের নাগরিক। ভাবাই যায় না। কেন যে ভাবা যায় না তাও জানি। কারণটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। ওরা ঠিক জায়গাতেই আছে। কিন্তু আমি আর আমার জায়গায় নেই। বয়স আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সেই দূরেবর্তী আসন থেকে যুবকদের কিশোরের মত দেখায়, কিশোরদের বালক বলে ভ্রম হয়।

তারপর আরো দু-একবার ফোনে তাগিদ। আমি সময় নিলাম, তারিখ বললাম।

শেষ পর্যন্ত লেখাটি শেষ করলাম।

লীনাই গল্পটি নিতে এল। সঙ্গে আর একটি মেয়ে। না, আরতি কি প্রশান্ত আজ আর আসেনি। অন্য একজন এসেছে। লীনার প্রতিবেশিনী।

টেলিফোনে আগেই কথা বলে রেখেছিল। এবার আমি ওকে বাড়িতে আসতে বলেছিলাম।

দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতে প্রথম দিনের আড়ষ্টতা ছিল না। তবে সেদিনও বেশী কথা ও বলেনি। আমিই বরং জিজ্ঞেস করে করে জেনে নিলাম ওর কে কে আছেন, ও নিজেও লেখে কি না, কী লেখে।

কথায় কথায় ও বলল, 'আমরা গিরিশ পার্কের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি। বাবা বাড়ি করেছেন গ্রামের দিকে। সেখানে শিগগিরই চলে যাব। আপনি যাবেন তো বেড়াতে?'

হেসে বললাম, 'বেশ তো যাওয়া যাবে।'

'আমি গিয়ে চিঠি লিখব। আপনি জবাব দেবেন তো?'

হেসে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

তারপর দু-তিনবার পত্র-বিনিময়ও হয়েছিল। আমি ওকে লিখেছিলাম, 'তোমার নামটি সার্থক। তুমি একেবারে নিজের মধ্যে নিজে ডুবে আছ। অন্তর্লীনা।'

ও প্রতিবাদ করে লিখেছিল, 'আপনি যা ভেবেছেন তা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমি বাইরের বন্ধুদের সঙ্গেও বেশ মিশতে পারি। তাদের নিয়ে হৈ-চৈ কম করিনে। জিজ্ঞেস করে দেখবেন আরতিদের।'

সপ্তপর্ণীতে ওর যে রম্যরচনাটি বেরিয়েছিল তাতেও ওর বন্ধুপ্রীতির দৃষ্টান্ত কম ছিল না। প্রত্যেকটি বন্ধুর পরিচয় দিয়ে লীনা উপসংহারে লিখেছিল, 'এরা সবাই ভালো। আর সবচেয়ে ভালো লীনা রায়। কারণ সে ওদের ভালোবাসে।'

লক্ষ্য করেছিলাম সাক্ষাতে ও যতখানি নিরীহ লেখায় ততটা নয়। কলমে ওর অন্য মূর্তি ফুটে ওঠে। সে রূপ প্রাণোচ্ছলতায় চঞ্চল।

অনুমান করেছিলাম আমার কাছে যে মেয়েটি অমন শান্ত মুখচোরা হয়ে থাকে সে হয়তো তার সমবয়সী বন্ধুদের কাছে তেমন থাকে না। সেখানে সে অশান্ত হতেও জানে, অশান্ত করতেও জানে।

তৃতীয়বার দেখা হয় আমাদের অফিসের গেটের সামনে। সেদিন সে দল বেঁধে এসেছিল। কমপ্লিমেন্টারী কপি নিতে। কিন্তু দল থেকে একটু যেন দূরে, একটু যেন আলগা হয়ে ও দাঁড়িয়েছিল।

আমি এক ফাঁকে ওকে বলেছিলাম, 'তোমার চিঠি পেয়েছি। পরে জবাব দেব।'

চিঠির কথায় ও যেন একটু বিব্রত বোধ করেছিল। পরে আমার মনে হয়েছে লেখালেখির ব্যাপারটা বন্ধুদের কাছে প্রকাশ হোক এটা ও চায় না। গোপনতাটুকু ও উপভোগ করতে চায়।

কিন্তু এই স্বল্প পরিচয়ের মধ্যে আমার মনে কখনোই একথা আসেনি ওর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা আছে, ও নিজেকে হঠাৎ একদিন বিলীন করে দিতে পারে।

'এই যে গিরিশ পার্কে নামবেন বলেছিলেন? নামুন তা হলে।'

পাশের সহযাত্রীটি আমাকে একটু ঠেলা দিয়ে হেসে বললেন, 'একেবারে

তন্ময় হয়ে রয়েছেন। কী ব্যাপার বলুন তো?'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'কিছু না।'

সঙ্গী অত সহজে ছাড়লেন না। তেমনি পরিহাসের সুরে বললেন, 'কিছু না বললেই হল? সারাটা পথ আপনি একইভাবে এলেন। কী ভাবছিলেন বলুন তো? গল্পের প্লট? না কোন হিরোইনের কথা?'

হেসে জবাব দিলাম, 'যা বলেছেন।'

গাড়ি থেকে নেমে হাত-ঘড়ির দিকে একবার তাকালাম। বড্ড বেলা হয়ে গেছে। প্রায়-বারোটা। এমন অসময়ে কোন অপরিচিত বাড়িতে কি যাওয়া যায়?

কার্তিক মাস হলে হবে কি মাথার ওপরে রোদ বেশ চড়া। প্রখর মধ্যাহ্ন।

রাস্তা পেরোলাম। বাড়ির গায়ে নম্বর লেখা নেই।

একটি দর্জির দোকান চোখে পড়ল। সেখানে গিয়ে বাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার সেলাই-কল থেকে মুখ তুলে বললেন, 'বাঁয়ের ওই সরু গলি দিয়ে এগিয়ে যান। গেলেই সিঁড়ি দেখতে পাবেন। সিঁড়ি দিয়ে সোজা তিন তলায় উঠে যাবেন। সেখানেই সব আছে।'

পথের এই নির্দেশটুকু দিয়ে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন, 'আপনি ওদের কেউ হন নাকি?'

বললাম, 'না। হইনে কিছু।'

মাঝবয়সী ভদ্রলোক আবার আমার দিকে তাকালেন, 'আপনি কি এই প্রথম খবর পেয়ে আসছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

দর্জি হাতের কাজ ফেলে রেখে বললেন, 'বড় দুঃখ হয় জানেন? মেয়েটাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। কত জামা-টামা করে দিয়েছি। স্কুলে যেতে দেখেছি, কলেজে যেতে দেখেছি। আমার এই দোকানের সামনে দিয়েই তো যাতায়াতের পথ। অমন শান্ত ধীর স্থির মেয়ে। কেন যে অমন কাণ্ড করে বসল।'

বললাম, 'আচ্ছা আমি এখন যাই। অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাঁর বোধ হয় আরো কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল।

সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠলাম। একটি ঘরের দোর ভেজানো। আস্তে কড়া নাড়তে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তিনিও প্রৌঢ়। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। বেশ সুন্দর চেহারা।

তিনি বললেন, 'আপনি?'

নাম বললাম।

তিনি একটু হেসে বললেন, 'ও আসুন আসুন। আমি লীনার বাবা।'

তার পরেই বিষণ্ণ হয়ে গেলেন।

করিডোর দিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি বড় ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোরের বাইরে কয়েক জোড়া জুতো। মেয়েদের জুতোই বেশি।

মেঝেয় মাদুর বিছানো। সেই মাদুর এখন প্রায় খালি। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা হয়তো এতক্ষণে চলে গেছেন। একটু দূরে জনকয়েক মহিলা বসে আছেন।

একখানি টুলের ওপর লীনার মাঝারি আকারের একটি ফটো। কবেকার তোলা জানিনে। এই ফটোতে লীনার মুখে হাসি লেগে রয়েছে। তার আত্মীয়স্বজনের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে সে যেন এখন হাসছে।

পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে অল্প একটু জায়গায় শ্রাদ্ধের কাজ হচ্ছে। পুরোহিত একটি যুবককে মন্ত্র পড়াচ্ছেন। তার বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। পরনে নতুন ধুতি গায়ে উড়ুনি।

আমি লীনার বাবাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাজ কে করছেন?'

'আমার ছেলে। লীনার দাদা।'

একটু আগে স্বামীকে দেখেছি পারলৌকিক কাজ করতে। এখানে দেখছি ভাইকে। অবিবাহিতা কন্যার পারলৌকিক কৃত্যের অধিকারী তার সহোদর।

আমি বললাম, 'এঁর স্ত্রীই কি আমাকে ফোন করেছিলেন?'

লীনার বাবা বললেন, 'না না সে আমার আর এক বউমা। ভাইপোর স্ত্রী। সুদেব এখনো বিয়ে করেনি। গীতাকে খবর দিচ্ছি। সে ভিতরে একটু ব্যস্ত আছে। বউটা কেঁদে কেঁদে অস্থির। লীনাকে বড় ভালোবাসত। চলুন আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি।'

পাশের ঘরে এলাম। খান দুই সোফা পাশাপাশি পাতা রয়েছে। খান-কয়েক গদি-আঁটা চেয়ার। সবই প্রায় শূন্য। এক ভদ্রলোক বসে খুব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। আর একজন আনমনে চুরুট টানছেন। লীনার বাবা তাঁদের সঙ্গে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'মিঃ গুপ্ত, মিঃ মেনন আমার বন্ধু। আমরা একই কোর্টে প্র্যাকটিস করি।'

লীনার বাবা আমার সামনের চেয়ারটায় বসলেন। বললেন, 'আপনার কথা লীনা আমাদের বলেছে। আপনি ওকে খুব স্নেহ করতেন।'

আমি চুপ করে রইলাম। বার-তিনেক মেয়েটিকে দেখেছি। খান-দুই চিঠি লিখেছি। তাতে পরিচয়ের সূত্রপাত মাত্র ছিল। স্নেহের আতিশয্য ছিল না। লীনার বাবা বলতে লাগলেন, 'আপনি আমাদের মৌরীগ্রামের বাড়িতে একবার যেতেও চেয়েছিলেন। মেয়ে আমাদের সব বলত। আমাদের কাছে কিছুই তার গোপন ছিল না।'

একটি সুন্দরী বউ ঘরে ঢুকল। ছোটখাটো চেহারা। পুতুলের মত নরম। চোখ দুটি ফোলা-ফোলা।

লীনার বাবা বললেন, 'এই যে গীতা। কল্যাণবাবু তোমার খোঁজ করছিলেন। তোমার কাকীমাকেও একবার ডাকো। একটু এসে দেখা করে যাক। উনি এত কষ্ট করে এসেছেন। বড্ড আপসেট হয়ে পড়েছে। মা তো।'

গীতা বলল, 'আপনার আসতে দেরি হল। ওর সহপাঠীর বন্ধুরা সবাই এসেছিল। আপনি আসবেন শুনে অনেকক্ষণ ছিল। খানিক আগে চলে গেছে।'

বললাম, 'হ্যাঁ। আমার একটু দেরি হয়ে গেল।'

এর মধ্যে লীনার মা এলেন। তিনিও দেখতে বেশ সুশ্রী। গায়ের রং ফর্সা। চল্লিশ বিয়াল্লিশের বেশি বয়স মনে হয় না। মা-বাপের তুলনায় মেয়েই বরং দেখতে কালো ছিল।

তিনি মেঝেতেই বসতে যাচ্ছিলেন।

গীতা তাঁকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিল। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনি চুপ করে রইলেন।

কিছু একটা বলতে হয়, কিন্তু এই শোকার্তা জননীর সঙ্গে কী বলে যে কথা আরম্ভ করব ভেবে পেলাম না।

একটু বাদে তিনিই কথা বললেন।

'আপনি একদিন আমাদের বাড়িতে যাবেন লীনা বলেছিল। কিন্তু এইভাবে এমন অবস্থায় আপনি আসবেন—'

তিনি থেমে গেলেন। আর কিছু না বলে মুখ নিচু করলেন। তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

গীতা বলল, 'কাকীমা, আপনি বরং ও ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। আপনি এখানে থাকলে আরো অস্থির হয়ে পড়বেন।'

লীনার বাবাও বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যাও। এখন তোমাকে নিয়েই চিন্তা। তুমি আবার কোন বিপদ ঘটাবে কে জানে। গীতা, ওঁকে শুইয়ে দিয়ে এসো।'

গীতা তাঁকে তুলে নিয়ে গেল। মহিলাটি পরম বাধ্য একটি বালিকার মত তার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে চলে গেলেন।

লীনার বাবা বললেন, 'ওঁর শরীর ভালো না। প্রেসার হবে তো। তারপর এই ব্যাপার। ওঁকে সামলানোই এখন কঠিন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন তো সব দিক দেখতে হবে।'

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

দেখলাম লীনার মা-র চেয়ে বাবা বেশ শক্ত আছেন। তিনি নিজেকে এরই মধ্যে সামলেও নিয়েছেন।

এবার আমি ওঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীভাবে গেল? পটাসিয়াম সায়নায়েড নাকি স্লিপিং পীল—'

মিঃ রায় বললেন, 'না না, ওসব কিছু নয়। এই বাড়িরই চারতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। লাফিয়ে বোধ হয় ঠিক পড়েনি। তা হলে অমন অক্ষত অবস্থায় ওকে পাওয়া যেত না। কার্নিশের ওপর গিয়ে আলগোছে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও তো কোথাও না কোথাও লাগবে? ফেটে যাবে, ভেঙেচুরে যাবে। কিন্তু কোথাও কিছু হয়নি আশ্চর্য ব্যাপার। আমি দেখিনি, কিন্তু যারা এসে দেখেছে তারা সবাই বলেছে লীনা প্রতিমার মত মাটিতে শান্তভাবে শুয়েছিল। সবই আছে, শুধু প্রাণপুতুলটুকু নেই।'

যিনি কাগজ পড়ছিলেন তিনি মুখ তুলে বললেন, 'ভগবানই ওকে দু-হাতে কোল পেতে তুলে নিয়েছেন, নইলে এমন হতে পারে না। আমরা এখান থেকে ওখানে পড়ে গেলে ছড়ে যায় কেটে যায় কত ভাঙচুর হয়। আমি সেবার বাস থেকে পড়ে গিয়ে সেই যে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলাম তাতে তিন মাস আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। আর অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়েও ওর গায়ে আঁচড়টি লাগল না—এর কী ব্যাখ্যা করবেন বলুন।'

যিনি চুরুট টানছিলেন তিনি বললেন, 'হয়তো পড়ে যাওয়ার আগেই ওর প্রাণ ভয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ... জায়গাতেই পড়েছিল। আশেপাশে ... ছিল, কিন্তু সে-দিকটায় পড়েনি।'

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'যাই বলো, তাতেও সব ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে আমাদের ধারণাতীত এক পরমাশ্চর্য শক্তি রয়েছে যার রহস্য আমরা কোনদিন উদ্ঘাটন করতে পারব না—একথা স্বীকার করতে বাধা কি ভবেশবাবু?'

ভবেশবাবু একটু হেসে বললেন, 'বাধা নেই। কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রোচটা কী হবে তাই নিয়ে কথা। রহস্যকে আমরা মানি। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আমরা সেই রহস্য উন্মোচনের পথে এগোতে চাই দেবতোষদা।'

দেবতোষবাবু বললেন, 'কতটুকু জোর আপনার সেই যুক্তি-বুদ্ধির। আমরা তিন জনেই ওকালতি করে খাই। খেয়ে পরে আছি। যার যেমন সাধ্য গাড়ি বাড়িও করেছি। কিন্তু সেই বুদ্ধির জোরে বিজ্ঞান নিয়ে গর্ব করা আমাদের সাজে না। বিজ্ঞানের আমরা ক-টুকুও কি জানি ভবেশবাবু?'

শোকের বাসরে এই অপ্রাসঙ্গিক তর্ক-যুদ্ধে আমি বিব্রত বোধ করছিলাম।

লীনার বাবার দিকে তাকিয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কেন এমন করল? কারণ কিছু জানিয়ে গেছে?'

মিঃ রায় মাথা নেড়ে বললেন, 'না, কিছু

জানায়নি। শুধু সবাই যেমন লেখে থাকুও তেমনি লিখে রেখে গেছে তার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। আর বড় একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে তার মাকে। তাতে সব তত্ত্বকথা। আমরা যেন কেউ দুঃখ না করি। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শুনুন কথা! বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে খাওয়ালাম, পরালাম, পেলে-পুষে বড় করলাম, তাকে নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা কত স্বপ্ন গড়ে তুললাম, এখন সে শুনিয়ে গেল, সে যে ছিল আর সে যে নেই এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।'

ভদ্রলোকের গলা ধরে গেল।

আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না।

একটু বাদে মিঃ রায় নিজেই ফের কথা বললেন, 'প্রত্যক্ষ কারণ কিছু দেখি না। তবে ওর একটা ব্যাধি ছিল অ্যাজমা। ছেলেবেলা থেকেই এই রোগ। অনেক চিকিৎসাপত্র করিয়েছি, সারেনি। ও তার জন্যে মাঝে মাঝে খুব আনমনা হয়ে পড়ত। মৃত্যুচিন্তাও করত। কখনো কখনো বলত কী হবে অর বেঁচে। আমি তো আর জীবনে কাউকে সুখী করতে পারব না। আমি ওকে বলতাম কেন পারবি নে। সুখের চেহারা কি এক? এর চেয়েও কত কঠিন কঠিন ব্যাধি নিয়ে মানুষ বিয়ে করে, সুখীও হয়। সব ক্ষেত্রেই অসুখ সুখের বাধা হয় না। তবু তোর যদি বিয়ে-থা করতে ইচ্ছা না হয়, নাই বা করলি। লিখবি পড়বি, তাই নিয়ে থাকবি। সারা জীবন জ্ঞানের চর্চায় যদি ডুবে থাকা যায় তাতেও কি কম সুখ?'

এবার ভক্তিকামী আর যুক্তিকামী দুই ব্যবহারজীবীই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, প্রায় একই সঙ্গে বললেন, 'আমরা চলি। বড় বেলা হয়ে গেল।'

মিঃ রায় বললেন, 'চলুন, আপনাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। গীতা, তোমরা এ-ঘরে এসো। ওঁর কাছে এসে বোসো। আমি নিচ থেকে এক্ষুনি আসছি।'

ওঁরা চলে গেলে গীতা আর একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এল। পরিচয় করিয়ে দিল। পিসতুতো বোন হয় লীনার। বাসবী সেন। বি এস-সি পড়ে।

এবার গীতার হাতে বড় একটি অ্যালবাম দেখলাম। অ্যালবামে বেশির ভাগই লীনার নানা বয়সের ফটো। ওর সেই শিশু বয়স থেকে যৌবন পর্যন্ত নানা সময়ের নানা মূর্তি দেখতে দেখতে আমি ভাবলাম, মেয়েটির মনে কোথায় কবে যে আত্মনিধনের সংকল্প এসে বাসা বেঁধেছিল তার এই জীবনলীলায় তা বুঝবার উপায় নেই। অ্যালবামের এই সব ছবিতে, লীনা কখনো তার বন্ধুদের সঙ্গে আছে, কখনো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে, কখনো নাচছে, কখনো কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে মিলে থিয়েটার করছে, কখনো কনভোকেশনের ধরাচূড়া পরে প্রসন্ন পরিতৃপ্ত মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। এই উজ্জ্বল উজ্জ্বল চিত্রমালার মধ্যে কোথাও মৃত্যুর বীজকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু মৃত্যু [illegible] মৃত্যু সব সময় গৌরবের নয়। অকালমৃত্যু, অপমৃত্যু। এই মৃত্যুর স্বাদ আমি নিজেও কি পাইনি? শুধু স্বজনবন্ধুর মৃত্যু নয়, স্বকীয় মৃত্যুর? বীরেরা একবার মরে, কাপুরুষেরা শতবার। মহাকবির উক্তি। কিন্তু তারাই সংসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই কাপুরুষেরা, যারা জীবনে অসংখ্যবার ভয়ে মরে, লজ্জায় মরে, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে মরে। আত্মহত্যার ইচ্ছা তাদের মনেও জাগে। কিন্তু সে সাহসে কুলোয় না। সাহস! আত্মহত্যাকারীকে আমরা সাহসী বলি না। হত্যাকারীকে বরং সে মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু যে আত্মহত্যা করে সে ভীরু, চিরকালের পলাতক। সে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না বলে, জীবনকে সহ্য করতে পারে না বলেই পালায়। লীনা, আমি জানি না, তোমার এই প্রগাঢ় যৌবনে কেন তুমি এই ভীরুতার অপবাদ নিয়ে চলে গেলে।

লীনার মা আবার উঠে এসেছেন। একটি

প্লেটে করে সন্দেশ নিয়ে এসেছেন কয়েকটি।

আমি বললাম, 'এ সব কী? এই কি খাওয়ার সময়?'

তিনি বললেন, 'একটু মিন। তার আত্মা

...

স্মৃতি আর কল্পনা ছাড়া তার আর কোথাও কি কোন অস্তিত্ব আছে?

একটি মিষ্টি তুলে নিলাম। এক গ্লাস জলের প্রায় পুরোটাই খেয়ে ফেললাম।

এবার আমিও উঠব। হঠাৎ আমার মনে হল, যে ছাদ থেকে লীনা লাফিয়ে পড়েছিল সেই জায়গাটা একটু দেখে যাই।

প্রস্তাবটা একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই করলাম।

গীতা বলল, 'চলুন না।'

সে আর বাসবী আমাকে নিয়ে ছাদে উঠল। বেশ বড় বাড়ি। এ ঘরের পাশ দিয়ে ও ঘরের সমুখ দিয়ে পথ। সরু সিঁড়ি। ছাদের ওপরও সারি সারি ঘর তোলা হয়েছে। উত্তর দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। পুবে পশ্চিমে প্রসারিত কার্নিশ। নীচে ছায়াচ্ছন্ন সরু গলি।

আমরা কার্নিশের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। গীতা বলতে লাগল, 'এ আমাদের আত্মীয়ের বাড়ি। আমরা ভাড়াটে ছিলাম। তারপর গাঁয়ে বাড়ি করে লীনার বাবা মাত্র মাস-তিনেক আগে উঠে চলে গেছেন। আজীবন লীনার

...

রোজ সন্ধে... এখানে ... আর আমি। রাত হয়ে যেত, তবু নামতে ইচ্ছা করত না। দুজনে মিলে কত গল্প, কত গল্প। কত সব কথা। কে জানত ওর মনে এই ছিল। ও এখান থেকেই—'

হঠাৎ কার্নিশের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গীতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সে কান্না আর থামে না।

আমি মহা অপ্রস্তুত। আগে জানলে কে আর এখানে আসতে চাইত।

বাসবী বলল, 'এ কী হচ্ছে বউদি, এ কী হচ্ছে। উনি কী ভাববেন বলতো।'

তারপর খানিক আগে গীতা যেমন লীনার মাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, বাসবীও তেমনি সস্নেহে সযত্নে শোকার্তা বউদিকে তুলে ধরে আগলে নিয়ে চলল।

আমি ওদের সঙ্গে নিচে নেমে এলাম। ততক্ষণে লীনার বাবাও ফিরে এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়।

সেই দর্জির দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আশেপাশের বাড়িগুলির দোর-জানলা বন্ধ

...

এর মধ্য থেকে এক স্তব্ধ নিস্তব্ধতা অনুভব করলাম।

একটু এগোতেই দেখি একটি যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিনতে পারলাম। সেই সপ্তপর্ণীর প্রশান্ত।

বললাম, 'আরে তুমি?'

প্রশান্ত বলল, 'আপনিও এসেছিলেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি ওপরে যাওনি?'

প্রশান্ত উদাসভাবে বলল, 'না, ওপরে গিয়ে আর কী হবে?'

আমি বললাম, 'তোমাদের প্রথম সংখ্যা কাগজ পেয়েছি।'

প্রশান্ত বলল, 'প্রুফের অনেক ভুল ছিল কিছু মনে করবেন না।'

আমি বললাম, 'লীনাও সে কথা আমাকে লিখেছিল। আমার লেখার প্রুফটা নাকি ওরই দেখে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পেরে ওঠেনি।'

প্রশান্ত একটু হেসে বলল, 'দেখলেও যেন কত ভালো হত। ও যেন কত প্রুফ দেখতে জানত।'

বললাম, 'তোমাদের দ্বিতীয় সংখ্যায় লেখা দেওয়ার জন্যে লীনারা আমার কাছে আরো একবার গিয়েছিল।'

প্রশান্ত বলল, 'জানি। আমি সেদিন ছিলাম না। দ্বিতীয় সংখ্যা কি আর বেরোবে?'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা, কেন এমন করল বল তো? কারণটা কী?'

প্রশান্ত আমার দিকে তাকাল। তারপর একটু রুক্ষ কিন্তু উদাস সুরে বলল, 'কারণ আমিও কিছু জানি না। শুনেছি পুলিস ওর সব চিঠিপত্র ডায়েরি-টায়েরি নিয়ে গেছে। তারা যদি খুঁজে খুঁজে বের করতে পারে করুক। আমার কোন কৌতূহল নেই। একজন ছিল, সে চলে গেছে। আর জানবার কী আছে, বলুন?'

তরুণ বন্ধুটি এই ছেলেটির এই নির্বেদ বৈরাগ্যে আমি চুপ করে রইলাম। একটু যেন লজ্জাও হল। নিঃশব্দে ওর সঙ্গে সঙ্গে মোড়ের দিকে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ প্রশান্তর মুখের পাশে আর একটি মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সদ্য-বিপত্নীক সংহত শোক এক প্রৌঢ়ের মুখ।

তাঁর মুখেও এই একই স্থিরতা একই বৈরাগ্য আজ সকালে দেখে এলাম।

॥ পাঁচ ॥

এ-যাত্রায় নানা দেশের নানারকম এরোপ্লেন চড়া হল। প্রাগ থেকে ইণ্টারফ্লুগ অর্থাৎ পূর্ব জার্মানীর এয়ার লাইনে পূর্ব বার্লিনের আকাশ পথে রওনা হলাম। অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পর এবার জার্মানীতে প্রবেশ করব।

অস্ট্রিয়ার কথা আগে বলিনি। কারণ ভিয়েনাতে আমরা ঠিক ইতিহাস খুঁজতে যাইনি। ভিয়েনাতে যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক, সেখানে আণ্টি (শ্রীমতী এমিলি শেংকল) রয়েছেন। অন্য একটা কারণ হল মেডিকেল কংগ্রেস। ভিয়েনাতে সে সময় অন্তর্জাতিক শিশুচিকিৎসক সম্মেলন হচ্ছিল হফবুর্গ প্যালেসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আট হাজার প্রতিনিধি জড়ো হয়েছেন। ডাঃ বসু যখন কংগ্রেস করছিলেন আমি তখন বাড়িতে বসে প্রাগের সেমিনারের কাগজ পত্রে ফিনিসিং টাচ্ দিচ্ছিলাম।

আণ্টির ওখানে বসে কাগজপত্র দেখতে সুবিধা হবে। কারণ যখন যে বইয়ের দরকার সব হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি। একটা কাচের বই-এর আলমারীতে নেতাজীর নিজের লেখা এবং নেতাজীর সম্বন্ধে লেখা সব বই যত্ন করে গুছিয়ে রাখা আছে। তাছাড়া যখন যা চাই—কাগজ চাই, কার্বন পেপার চাই, টাইপরাইটার চাই সবই আণ্টি সাপ্লাই করে যাচ্ছেন। একদিন টাইপ করতে করতে কাগজ ফুরিয়ে গেল, সেদিন রবিবার, দোকানপাট সব বন্ধ। মুশকিলে পড়ে গেলাম। আণ্টি বললেন, দাঁড়াও দেখি। তারপর এ-দেরাজ সে-দেরাজ ঘাটাঘাটি করে হাজির করলেন এক গোছা কাগজ। সব সেই '৪২ সালের বার্লিনের ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের কাগজ। আমি তো এ কাগজ ব্যবহার করব না সঙ্গে করে কলকাতার নেতাজী মিউজিয়ামের জন্য নিয়ে যাব, ঠিক করে উঠতে পারলাম না। একদিন একটা ইংরেজী বানান নিয়ে খটকা লাগল। আলমারিতে অন্যান্য বই-এর মধ্যে একটা ইংরেজী অভিধান। খুলতে প্রথম পাতায় চোখে পড়ল আণ্টির নাম লেখা রয়েছে, হাতের লেখাটা নেতাজীর। শুনলাম বহুকাল আগে একবার ডিকশনারিটা ওঁর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন।

কি জানি কেন ভিয়েনাতে খুব শান্তিতে কাজ করতে পারছিলাম। কলকাতা এত প্রিয় শহর তবু এক এক সময় যেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, নার্ভের ওপর চাপ পড়ে যায় অত্যধিক। সেপ্টেম্বর মাসের ভিয়েনা তখনো সবুজ, নীল আকাশ আর ঝলমলে রুদ্দুর। গরম কাপড় ঠিক দরকার হয় না অথচ শীত আসি আসি করছে। ভিয়েনার সমৃদ্ধি যেন আগের চেয়ে বেড়েছে মনে হল। শহরের ভিতরে দোকানপাট ঝলমল করছে। মারিয়া হিলফার স্ট্রাসে—আমরা যাকে ভিয়েনার রাসবিহারী অ্যাভেনিউ বলি—অথবা কারণ্টনার স্ট্রাসে অপেক্ষাকৃত অভিজাত দোকানপাটের এলাকা ধরে হাঁটলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মারিয়া হিলফার স্ট্রাসের ওপর তখন "ইণ্ডিয়া বাজার" খুলেছে। খুব গলা-কাটা দামে ইণ্ডিয়ান জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। আমরা চাই বা না-চাই এ যাত্রা ইতিহাস আমাদের ছাড়বে না মনে হল। নয়ত শর্মার সঙ্গে ভিয়েনাতে দেখা হবে এটা আমরা প্রত্যাশাই করিনি। বালকৃষ্ণ শর্মার নাম যদি নাও শুনে থাকেন ওর কণ্ঠস্বর শুনলে অনেক বয়স্ক বঙালী ও ভারতীয়ের মনে হবে এ কণ্ঠস্বর এত পরিচিত কেন! যুদ্ধের সময় বার্লিন থেকে প্রচারিত আজাদ হিন্দ রেডিও যাঁরাই শুনেছেন—
Azad Hind Calling. Azad Hind Calling. This is the voice of Azad Hind, the voice of Free India — বালকৃষ্ণ শর্মার কণ্ঠস্বর তাদের নিশ্চিত পরিচিত হতে বাধ্য।

ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে গেলে দু' ধরনের উৎস পাওয়া যেতে পারে। দলিল-

জাতের। আজো তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য রয়েছে নেতাজীর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি। শর্মাকে ধরলাম—একবার বলুন না সেই লাইনগুলো যা রোজ আজাদ হিন্দ রেডিওতে শুরুতে বলতেন। প্রথমে বললেন, ভুলে গেছি। হেলা উৎসাহ দিয়ে বললে—[illegible] চেষ্টা করো, নিশ্চয় ভুলে যাওনি। একটু ভেবে ঠেকে ঠেকে পুরোটা না হলেও অনেকখানিই বলে গেলেন—

—To arms, to arms, the heavens ring with the clarion call to freedom's fray....

শেষ হত এই কথা বলে—our cause is Just.

বার্লিনে আজাদ হিন্দ রেডিওতে শর্মা যখন কাজ শুরু করেন তখন দুটি ভাষায় প্রচার হত। পরে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় দশটি ভাষায়। প্রচারের কত কায়দাকানুন নেতাজী নিজ হাতে শিখিয়ে দিতেন। ওদের [illegible] সামান্য। এদিকে রোজ রেডিওতে [illegible]—আমাদের লণ্ডন প্রতিনিধি [illegible] ইত্যাদি—অথবা আমাদের প্যারিস করেসপনডেন্ট 'রিপোর্ট' দিচ্ছেন [illegible] প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন লোক [illegible] পারিসে নেই। প্রথম দিকে [illegible] খবর কাগজ ও অন্যান্য [illegible] রিপোর্ট স্টাডি করে এগুলো তৈরী করে দিতেন। "এরপর এ কাজ আমাদের হাত থেকে গেল" শর্মা বললেন। "এই সব রিপোর্ট যে কত নিখুঁত হত [illegible] শত্রুপক্ষ কতখানি বিভ্রান্ত হত সেটা পরে নিজে বিশেষ বিপদে পড়ে জানতে পারি। যুদ্ধের পর যখন ইংরেজদের হাতে শর্মা বন্দী তখন জিজ্ঞাসাবাদের সময় [illegible] শুরু হল, বল তোমাদের [illegible] প্রতিনিধি কে ছিল, প্যারিস প্রতিনিধির [illegible] কি? সত্যি কথাই বলছেন যে এমন লোক কেউ ছিল না— কিন্তু কে বিশ্বাস করবে!

[illegible] সাধারণভাবে শর্মা ব্রিটিশদের [illegible] বন্দী অবস্থায় খুব খারাপ ব্যবহার [illegible] যে ব্রিটিশ অফিসারের হাতে তিনি [illegible] তিনি প্রথমেই বললেন—ওয়েল [illegible] আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম [illegible] তুমি যা করেছ আমিও ঠিক তাই [illegible]। এই ব্রিটিশ অফিসারের নীচেই [illegible] ভারতীয় অফিসার ছিলেন—ব্রিটিশ [illegible] আর্মির সেই অফিসারটির চেয়ে শর্মা ও অন্যান্য আজাদ হিন্দ আন্দোলনের বন্দীদের ইংরেজ অফিসারটি সম্মানের চোখে দেখতেন। একই কথা পরে [illegible] কাছেও শুনেছিলাম। সুযোগ [illegible] আঁচ বেশী। ব্রিটিশ [illegible] চাইতে ঢের ভারতীয় [illegible] অনেক সময় বেশী জমক-ঝমক [illegible] নাম্বিয়ার বিদেশে [illegible] রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন। একবার কার্যোপলক্ষে দিল্লী এসে নেহরুর সঙ্গে রয়েছেন, একদিন শুনলেন একজন আর্মি অফিসার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। এসে দেখেন এ যে সেই ভারতীয় অফিসার যার চার্জে উনি ছিলেন। নেহরুর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা এবং বর্তমান উচ্চপদ দেখে অফিসারটি একটু শঙ্কিতবোধ করেছিলেন, কি জানি নাম্বিয়ার পূর্বেকার খারাপ ব্যবহারের কথা স্মরণ রেখেছেন কিনা। নাম্বিয়ার তাকে আশ্বস্ত করলেন।

শর্মার বন্দীজীবন অসহনীয় হয়ে ওঠেনি আর একটি কারণে—তাঁর বন্দী অবস্থায় দুই সঙ্গী ছিলেন হাবিবুর রহমান (ইনি পূর্ব এশিয়ার হাবিবুর রহমান যিনি সাইগন থেকে বিমানে নেতাজীর সঙ্গী ছিলেন তিনি নন) এবং রামচন্দ্র যার অপর দুই নাম হল ফিশার ও অগেহানন্দ। এরকম অপূর্ব দারুন সঙ্গী পেলে সময় ভাল কাটবারই কথা। ফিশার বা রামচন্দ্র বা পরবর্তীকালের সন্ন্যাসী অগেহানন্দ জাতিতে অস্ট্রিয়ান। কিন্তু সে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে ভালবাসে। বলে, ভারতবর্ষকে ও'র মাতৃভূমি রূপে আডপ্ট করেছে। অতএব এই স্বেচ্ছাবৃতা মাতৃভূমির সেবা করবার জন্য এক রকম জোর করে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে ঢুকে পড়ে কিছু কাজের ভার নিয়েছিল। ইংরেজদের হাতে বন্দী হবার পরও সে সমানে দাবি করতে লাগল যে সে ভারতীয়। ব্রিটিশ অফিসারদের সে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। তার অনর্গল হিন্দি কথা শুনে ব্রিটিশরাও বিভ্রান্ত। যদি সে তার সত্য পরিচয় দেয় তবে বন্দী হিসেবে সে অনেক সুবিধা ও ভাল ব্যবহার পেতে পারে। শর্মারা তাকে অনেক বোঝায় কিন্তু সে কিছুতে মানবে না। এদিকে ভারতীয় বন্দীরা যা খাদ্য পায়, রামচন্দ্রের দশাসই চেহারা, তাতে তার কিছু হয় না। সব বন্দীরা তাদের খাবার থেকে একটু করে দিয়ে রামচন্দ্রের জীবনরক্ষার চেষ্টা করে। তবু দেখতে দেখতে তার ওজন কমে অর্ধেক হয়ে গেল। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত তার সত্য পরিচয় পাওয়া গেল। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার নাম হয় অগেহানন্দ।

হাবিবুর রহমান আর এক চরিত্র, অত্যন্ত করিৎকর্মা। সিগ্রেট চাই, আর কিছু নিষিদ্ধ জিনিস? জেলখানায় হাবিবুর

রহমান ঠিক এনে হাজির করল। নাম্বিয়ারকে একবার বললে, ডিম চাই? ডিম! কোথায় পাব? নাম্বিয়ার তো অবাক। সে তোমার ভাবতে হবে না। এর পর থেকে রোজ ডিম সাপ্লাই চলল। রহস্যটা পরে জানা গেল। একজন পাদ্রী রোজ জেল খানায় আসতেন বন্দীদের পরলোকের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য। হবিবর রহমান এমন ভাব করতে লাগলেন যে, খৃষ্ট ধর্মের প্রতি এবং বিশেষ করে এই পাদ্রী সাহেবের উপদেশাবলীর প্রতি উনি বিশেষ রকম আকৃষ্ট হয়েছেন। শরীর খারাপের অছিলায় পাদ্রী সাহেবকে বলে ডবল ডিমের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

গল্প শুনে আণ্টি হাসলেন। বললেন, জাস্ট লাইক হিম। ও এই রকমই ছিল। তাই তো যুদ্ধের পর য়ুরোপে থেকে গিয়ে জাঁকিয়ে ব্যবসা করেছিল। মাত্র অল্প দিন আগে প্রচুর সম্পত্তি রেখে হবিব ভেনিসে মারা গেছে। ভেনিস থেকে ওর জার্মান স্ত্রী দুঃসংবাদ দিয়ে আণ্টিকে টেলিফোন করেন। আণ্টির মনে হল হবিব একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য এককালে সত্যি দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন। ভিয়েনার দূতাবাসে খবরটা দিয়ে উনি অনুরোধ করেন ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে যেন কাজের সময় কারো উপস্থিত থাকা উচিত। দূতাবাসের একজন অফিসার ভেনিসে হবিবের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে চলে যান।

গ্রিনসিংগ ভিলেজের সেই টাভার্ন বাইরের বাগানে আর বসা যাচ্ছে না। অন্ধকার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেল। সেদিনকার মত সভাভঙ্গ। ঠিক হল শর্মাদের ওখানে আমরা একদিন লাঞ্চ খাব আর বার্লিনের আরো গল্প শোনা যাবে সেদিন।

ভিয়েনার অ্যাফ্রো এশিয়ান ইনস্টিটিউটে নেতাজী ইন-অ্যাকশন ছবি দেখাবার ব্যবস্থা ভারতীয় দূতাবাস করেছিলেন। আমরা অবশ্য এর আগেই একদিন আটমিক এনার্জি এজেন্সির চমৎকার হল-এ বন্ধুবর মি: মুখার্জির উৎসাহে ছবিটি দেখতে গেছিলাম। অ্যাফ্রো-এশিয়ান ইনস্টিটিউটে ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে আর একটি সন্ধ্যার কিছু আলোচনা ও ফিল্ম শো হল। আলোচনায় দূতাবাসের তরফে মি: ফ্যাবিয়ান, শর্মা, রয়টারের কৃষ্ণমূর্তি ও ডাঃ বসু অংশ নিলেন। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ভারতীয়র চাইতে মনে হল সংখ্যায় বাংলাদেশের ছেলেরাই বেশী ছিল। ভিয়েনাতে কার্যসূত্রে যে সব বাংলাদেশের ছেলেরা আছে আগেই একদিন তারা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তখন সেপ্টেম্বর মাস—এরা অত্যন্ত দুঃখ ও মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করছে। "Why Bangla Desh"

জার্মানীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে নেতাজী

নামে একটি সুলিখিত প্যামফ্লেট আমাদের হাতে ওরা দিল। একজন বললে, আমরা মাউন্টেনের কাছে কিই বা করতে পারি! ওদের বলা হল—শর্মাকে জিজ্ঞাসা করো ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার যখন বার্লিনে গঠিত হয় ওরা ক'জন ছিল?

শর্মাজি মাঝে মাঝে অপ্রিয় সত্য বলতে ভালবাসেন। বললেন, "কিছু মনে করো না, একটা কথা বলি। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষ থেকে যে সব ছাত্র, তরুণ য়ুরোপে আসত তাদের কাছ থেকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাদের জাতই ছিল আলাদা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, স্বার্থ-জ্ঞানহীন, সব কাজে আন্তরিক। তারপর তথাকথিত স্বাধীনতার পর যারা আসতে লাগল দিনে-দিনে তাদের মান শুধু নেমে যেতেই দেখলাম। আজ এই যে তোমরা একটা বিরাট ঘা খেয়েছ, ভালই হয়েছে। আবার আশা হচ্ছে কিছু সৎ, সাহসী, দেশের জন্য সর্বস্ব দিতে চায় এমন তরুণের দেখা পাব।"

শর্মাদের সঙ্গে মাঝে ক'দিন দেখা হল না। আমরা একদিন ভিয়েনার বাইরে বাডেনে চলে গিয়েছিলাম। বাডেনে কিছু ভিয়েনিজ আত্মীয় কুটুম্ব আছেন, কিছু পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদন করার ছিল।

শর্মাদের সঙ্গে লাঞ্চ অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট রাখতে ওদের ফ্লোরিয়ানিগাসের বাড়িতে হাজির হলাম একদিন।

বেলা তিনটে নাগাদ পৌঁছেছিলাম। খাবার অমন চমৎকার রান্নাবান্না সত্ত্বেও আমাদের মন পড়েছিল শর্মার গল্পের ওপর। কি করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম রিক্রুট সংগ্রহ করা হত সেদিন সেই গল্প শুনেছিলাম। না, কাউকে কোনদিন জোর করে আজাদ হিন্দ ফৌজে ঢোকানো হয়নি। এরকম কথা যদি কেউ বলে তা মিথ্যা প্রচার ছাড়া কিছু নয়। নাম্বিয়ারও এ কথা সমর্থন করেছিলেন। নাম্বিয়ার বললেন, দশ হাজার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে মাত্র তিন হাজার য়ুরোপের আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। জোর করে করতে চাইলে এর চাইতে ঢের বেশী করা যেত। শর্মা বললেন নেতাজী এইসব যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে কথা বলতেন বোঝাতেন। ওদের মধ্যে একটা আনুগত্যের দ্বন্দ্ব অবশ্যই দেখা দিত। "নিমক" কথাটা খুব বেশী শুনতাম। পুরুষানুক্রমে ব্রিটিশ আর্মিতে আছে এমন সব ভারতীয় সেনারা বলত—'নিমক' খেয়েছি কেমন করে আনুগত্যের শপথ ভাঙব? ওদের নেতাজী বোঝাতেন কোন্ আনুগত্য বড় হওয়া উচিত। তোমাদের দেশের অন্নজলে তোমরা পুষ্ট। তার কি কোনই দাম নেই? তোমার স্বদেশের চাইতে বিদেশী প্রভুর কাছে আনুগত্যের শপথই কি বড় হবে?

একদিনের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা শর্মা প্রায়ই বলতেন। নেতাজী অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর সেদিন বেশ কিছু সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছে। শর্মারা সকলেই খুশি। কিন্তু একটা কারণে মনের মধ্যে খচখচ করছে সবাইর। একটা পুরো মারাঠী রেজিমেণ্ট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মারাঠীরা অত্যন্ত দেশপ্রেমিক এ কথা সবাই জানে। নেতাজীর উদ্দীপনাময় ভাষণের পর এদের কাছ থেকে কোনই সাড়া পাওয়া যাবে না এটা ঠিক আশা করা যায়নি। পরদিন সকালে মারাঠী সেনাদলের কম্যাণ্ডার নেতাজীর সঙ্গে দেখা করে কি বলতে এলেন। বাইরে এসে সবাই দেখেন পুরো দলটি মিলিটারি ফরমেশন্ করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা একসঙ্গে শৃংখলাবদ্ধভাবে নেতাজীর কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে এসেছে। খাপছাড়াভাবে দশজন কুড়িজনের দলে তারা কিছু করবে না বলেই কাল চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

অকস্মাৎ "ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ কি জয়" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য দলগুলি কেউ বা "আল্লাহো আকবর", কেউ বা "হর হর মহাদেও" কেউ বা "সৎশ্রী অকাল" ধ্বনি তুলল। তারপর সকলে মিলিত কণ্ঠে এই বিভিন্ন ধ্বনি দিতে লাগল। নেতাজী ও উপস্থিত অফিসাররা অভিভূত, অনেকের চোখে জল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই আজাদ হিন্দ ফৌজের সময়ই একবার ধর্ম ও আঞ্চলিকতার বিভেদ সবাই ভুলে গিয়েছিল। "জয় হিন্দ" ধ্বনি শুধু মুখের কথা ছিল না। আমরা ভারতীয়, ভারতবর্ষ আমার দেশ—এই ছিল একমাত্র পরিচয়।

সকলেই এখন জানেন হিটলারের গভ-মেণ্টের কাছ থেকে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের স্বীকৃতি বা রেকগনিশন পেতে নেতাজীকে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে

হয়েছিল। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে চটাবার কোনই বাসনা হিটলারের ছিল না। তাছাড়া স্বীকৃতি দেবার আগে ওদেরও তো ভাবতে হবে। নেতাজী তো সহজ মানুষ নন। এমন আবদার ধরেন যা নাৎসি রাজত্বে একজন জার্মান চিন্তাও করতে পারে না। বার্লিনের আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে যা কিছু প্রচার হবে তা কোনমতেই সেন্সার করা চলবে না—এই জিদ ধরে থেকে শেষ পর্যন্ত নেতাজীই জিতলেন। প্রচারিত হয়ে যাবার পর নিয়মরক্ষা হিসেবে স্ক্রিপ্টগুলি জার্মান গভর্নমেণ্টের কাছে পাঠানো হত। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে বসেও আমরা বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির চাপের কাছে কত সময় নতি স্বীকার করতে বাধ্য হই। ভাবতে অবাক লাগে, পরাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক সুভাষচন্দ্র ওদেরই মাটিতে বসে কেমন করে হিটলার, মুসোলিনি বা তোজোর মত ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র নায়কদের কাছে নতি স্বীকার করা দূরে থাক, নিজের অধিকার আদায় করে ছাড়তেন। বার্লিনের ফ্রি-ইণ্ডিয়া সেণ্টারের জন্য জার্মান সরকার যে অর্থসাহায্য করতেন নেতাজী তা ধার হিসেবে নিতেন। কথা ছিল স্বাধীন ভারত-

হর্ষ সে ধার পরিশোধ করবে। নাম্বিয়ার বলেছিলেন পূর্ব এশিয়াতে যখন ভারতীয় অর্থে আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ হল তখন নেতাজী ধার শোধ হিসেবে কিছু টাকা—পঞ্চাশ হাজার ইয়েন মত—ফেরৎ পাঠালেন। টাকার অংক যত সামান্যই হোক না কেন এই ঘটনাতে আমাদের আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় আছে। জার্মানদের কাছে আমরা মাথা উঁচু করে চলতে পারতাম।

সরকারী স্বীকৃতি বা রেকগনিশন তখনো মেলেনি, নেতাজী হামবুর্গ পরিদর্শনে গেলেন। শর্মা তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। এই হামবুর্গ পরিদর্শন শর্মার বিশেষ ভাবে মনে আছে। কারণ সেই প্রথম নেতাজীকে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে অভ্যর্থনা করা হয়। সামনে মোটর সাইকেলের সার [illegible] মোটরকেড চলেছে। পথের দু পাশে ভারতীয় চরকা-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা ও নাৎসী জার্মানীর পতাকা এই দুটো পাশাপাশি শোভা পাচ্ছে। জনগণমন ভারতীয় জাতীয় সংগীত হিসেবে [illegible] অর্কেস্ট্রাতে বেজেছিল। এত [illegible] 'জনগণমনের চেয়ে পারে [illegible] না। সভায় নেতাজীর ভাষণ [illegible] মুগ্ধ করেছিল। শর্মার কাছে [illegible] কথা যা শুনলাম পরে যখন হামবুর্গে গিয়ে পৌঁছলাম রাটহাউসের [illegible] সবই আমার [illegible] জার্মান [illegible] অর্কেস্ট্রাকে কত টাকা দেওয়া [illegible] দিল, মায় কি খাওয়া [illegible]।

১৯৪৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী [illegible] ভারতীয়েরা নেতাজীর জন্মোৎসব [illegible]। ওঁরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের [illegible] প্রতিকৃতি আঁকিয়ে সেখানা [illegible] উপহার দিলেন। জন্মোৎসবের [illegible] মধ্যে কে যেন সামনের [illegible] কি করা যাবে এমনি কি [illegible] নেতাজী হঠাৎ বললেন—সামনের [illegible] আমি তোমাদের মধ্যে না-ও [illegible] পারি। ধমক করে উঠল শর্মার [illegible]—তবে কি নেতাজী দূরে কোথাও যাবার কথা ভাবছেন? নেতাজী [illegible] থাকবেন না এ কথা যে ভাবাই [illegible] না। শর্মা বললেন "তখনও তো [illegible] সব প্ল্যান হয়ে গিয়েছিল। [illegible] পর ৮ই ফেব্রুয়ারী উনি [illegible] যাত্রা করলেন। এত শীঘ্র [illegible] অবশ্য বুঝতে পারি [illegible] মন খারাপ হয়েছিল। হেলাকে [illegible] "নেতাজী আমাদের মধ্যে [illegible] আর নেই।" নেতাজীর কথা [illegible] [illegible] বললেন—স্বাধীনতা এমনি পাওয়া যায় না, যেদিন অন্তত দু লক্ষ প্রাণ স্বাধীনতার জন্য বলি হবে সেদিন দেশ স্বাধীন হবে।

শর্মা ও আর্ণিট দুজনেই নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ডকুমেন্টারি দেখে অভিভূত। ছবিটি নিয়ে আলোচনা চলছিল। দুজনেই বললেন য়ুরোপে সংগঠন গড়ার কাজে ওরা কাছ থেকে নেতাজীকে দেখেছেন। কিন্তু পূর্ব এশিয়াতে ঠিক কি হয়েছিল সবই জানা আছে, কানে শোনা আছে, বই-এ পড়া আছে—কিন্তু সেদিন ডকুমেন্টারী ছবির পর্দায় দেখে যেন সত্যিকারের উপলব্ধি হল।

কে যেন হঠাৎ তদন্ত কমিশনের কথা তুলল। কমিশনের কাজকর্ম কেমন চলছে, চিরদিনই কি একটা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকতে হবে? আর্ণিট কোনদিন ব্যক্তিগত কথা বলতে চান না, চিরদিন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেই ভালবাসেন। সেদিন শর্মার সঙ্গে স্মৃতিচারণায় যোগ দিয়ে মাঝে মাঝে এটা-ওটা বলছিলেন। হঠাৎ বললেন—"বিমান দুর্ঘটনার কথাটা আমি প্রথম কি ভাবে শুনলাম জানো? সাধারণত কিচেনে বসে একটা উলের গোছা জড়িয়ে জড়িয়ে বল বানাচ্ছিলাম। কিচেনের একপাশে রোজকার মত রেডিওতে সান্ধ্য খবর বলে চলেছে। ঘরের অন্য কোণে মা আর আমার বোন কি যেন করছে। হঠাৎ শুনি রেডিওতে বলছে—ইণ্ডিয়ান কুইসলিং সুভাষচন্দ্র বোস তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। মা আর বোন চমকে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল। আমি আস্তে কিচেন থেকে বেরিয়ে পাশে শোবার ঘরে উঠে চলে গেলাম। সেখানে অনীতা তখন নিতান্ত শিশু, অঘোরে ঘুমিয়ে আছে—ওর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম।" একটু চুপ করে থেকে যথাসাধ্য সহজ গলায় বললেন—'অ্যাণ্ড [illegible] আই ওয়েপট, আমি কাঁদলাম।'

আমরা সবাই চুপ। হেলা বিচলিত হয়ে বলে উঠল—এই রকম একটা নিষ্ঠুর খবর এইভাবে শুনলে তুমি—কি মর্মান্তিক! দুপুরবেলা খাবার টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল, বাইরে কখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে কেউ খেয়াল করিনি। হেলা উঠে জানলার পর্দা টেনে দিয়ে ঘরের আলো জেলে দিল।

(ক্রমশ)

চোখে যখন নামে স্বপন...

আমার মুখে বিনাকা ডীপ ক্লীনজিং কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো ক'রে লাগালাম আর সারাদিনের বাসী মেক্‌ আপ আর ময়লা যাতে একেবারেই না থাকে তার জন্যে সেটা তুলো দিয়ে মুছে ফেললাম।

শুতে যাবার আগে আবার একবার ওঠা লাগালাম মুখে।

ঘুমে আমার চোখ বুজে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিনাকা ডীপ ক্লীনজিং কোল্ড ক্রীম কাজ করতে শুরু করল আমার ত্বকের গভীরে।

চোখে ঘনিয়ে এলো ঘুম......ঘুম......ঘুম......

ঘরে বাইরে

শিশু ও কিশোরের উপর ছায়াছবির প্রভাব

সিনেমা নিয়ে সমালোচনা আমাদের "ঘরে বাইরে" ব্যাপ্তিতে ঠিক আসে না। তবে ছায়াছবির প্রভাব আধুনিক যুগের শিশু ও কিশোরকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে এ ভাবনা মূলত মায়ের। সম্প্রতি টেলিভিশন প্রভাবিত যুব সমাজ পাশ্চাত্য মানসিক ভারসাম্যহীনতার একটি দিক। ভারতবর্ষে টেলিভিশনের যুগ এখনও দূরে আছে। কিন্তু ছায়াছবির প্রভাব অতি ব্যাপক। দরিদ্র দেশে সস্তা মনোরঞ্জন সিনেমা। কাজেই বিত্তবান ও স্বল্পবিত্ত শিশু কিশোর কেউ বাদ যায় না মনোরঞ্জনের এই সহজ মাধ্যম থেকে।

ছায়াছবির প্রভাব নূতন নয়। ছায়াছবির জন্ম থেকেই সে অমিত শক্তিশালী। কতবার কত সামান্য মন্তব্য শুনে অবাক হয়ে গেছি। প্রভাবের সীমানার অসীমত্ব অপরিমেয়। ট্রামের সামনের সীটে দুটি কিশোরী। তখন উত্তম-সুচিত্রা যুগল রোমান্সের যুগ। একটি কিশোরী সঙ্গিনীকে বলছে, উত্তম আর সুচিত্রা যখন কাছাকাছি আসে তখন তার নাকি শিহরণ হয়! এমন অস্বাভাবিক কথা কিছু নয়। চোর ডাকাত, রিভলবার, বন্দুক, খুন অল্পবয়স্ক বালক বালিকাকে এমন আকৃষ্ট করে যে খুনী তার চোখে কখনও বা ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করে।

ভারতবর্ষে দু একবার ছায়াছবির প্রভাব নিয়ে সার্ভে করার চেষ্টা হয়েছে। তেমন সার্থক হয়নি। শিশু মনের প্রতিক্রিয়া দেশ বিদেশে বলতে গেলে একই রকম। এ জন্যই ১৯৬৮ সালে খোসলা কমিশন বিশেষভাবে হেনরি জেমস্ ফরম্যান-এর বই Our Movie Makes Children-এর সাহায্য নিয়েছিলেন। খোসলা কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল সেনসরশিপ বা সরকারী অধিকারিকের ছায়াছবির প্রদর্শন অনুমোদন সম্বন্ধে সার্ভে করা। প্রাপ্তবয়স্ক আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন সম্বন্ধে নিজে যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন এই মত বিশ্বের বহু দেশে শিক্ষিত মানুষ পোষণ করেন। দেশের আইন উপেক্ষা না করলেই হলো।

শিশু কিশোর কিন্তু সমাজের সেরা দায়িত্ব। চিত্রনির্মাতা যদি সকলের জন্য অথবা বিশেষভাবে শিশুর জন্য সিনেমার ছবি করেন তাঁর মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশের মতই ছায়াছবির প্রভাব কচিমনে প্রচুর। প্রাপ্তবয়স্ক হয়তো বুঝতেও পারেন না ছায়াছবির ঘটনা কত গভীরভাবে তাদের মনে দাগ কাটে। এমন কি মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষায় দেখেছেন শৈশবে বা কৈশোরে দেখা প্রভাব অবচেতন মনে বছরের পর বছর আত্মগোপন করে কোন এক অসতর্ক অবসরে অবলীলাক্রমে যৌবনের চঞ্চল মুহূর্তকে গ্রাস করেছে। অনেক আগে একবার আলোচনা করেছিলেম শিশুমনের বিচিত্রগতির কথা। যে কথা আমরা ভাবি শিশু বোঝে না, যে পরিস্থিতিতে তাকে ফেলতে দ্বিধা করি না কারণ—"ও তো অবোধ বাচ্চা মাত্র"—সে কথা, সে পরিস্থিতি একদিন তাকে ছেয়ে ফেলতে পারে, আচ্ছন্ন করে দিতে পারে তার বিবেচনা শক্তিকে। সিনেমা হলের নিবিড় ঘন একান্ত পরিবেশ, সমস্ত মনোযোগ ঐ রূপোলী পর্দায় জমা রয়েছে, চারদিকে গাঢ় অন্ধকারের মাঝে জ্বলজ্বল করছে, প্রেক্ষাগৃহের সকল আগ্রহের প্রদর্শনী ঠিক চোখের সামনে, এমন অবস্থায় সরল শিশুমনে প্রভাব না পড়ে যায় কোথায়?

হেনরি ফরম্যান সাহেব বইখানা প্রকাশ করেছিলেন ১৯৩৩ সালে। খোসলা কমিশন অন্তত মনে করেন আজও তাঁর নিরীক্ষা সমান সত্য। তিনি বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্করা সিনেমা দেখে যতটা হৃদয়ঙ্গম করেন, প্রায় ততটাই অল্প বয়সের বালক বালিকা করে। মোটামুটিভাবে তাদের বোধশক্তি প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা ৭০। হেনরি ফরম্যানকে সাহায্য যাঁরা করেছিলেন তাঁরা সকলেই বিশেষজ্ঞ। ব্যাপক নিরীক্ষা বা সার্ভে করে যে রিপোর্ট তাঁরা দিয়েছিলেন তা থেকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে ফরম্যান সাহেব পেশ করেছেন বাছা বাছা তথ্য। সিনেমার মাধ্যমে পাঠ ও শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ উপযুক্ত তিনিই প্রথম বলেছিলেন। Educational Film বা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তৈরী ছায়াছবি থেকে গ্রহণ করা জ্ঞান অন্য যে কোন মাধ্যমের চেয়ে শতকরা ২০ থেকে ৪০ অধিক কার্যকরী। কাজেই অভিভাবক যদি

ছবির পর্দায় ভয়াবহ দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া

সুযোগ পান তবে ছায়াছবির মাধ্যমে শিক্ষার যতটা ব্যবস্থা করবেন ততটাই ভাল। লেখক আরও বলেছেন যে : আচরণ, মনোভাব, ধারণা, সামাজিক মূল্যবোধ [illegible] সহজে বালকবালিকা সিনেমা থেকে গ্রহণ করতে পারে তত সহজে কোন বাক্য বা উপদেশ দিয়ে হতে পারে না। [illegible] বালকবালিকা কোন্ ছবি দেখবে সে-বিবেচনাও অভিভাবকের [illegible]। ফরম্যান সাহেব অপরাধ সম্বন্ধে [illegible] পর্যালোচনা করেছেন। অপরাধীর [illegible] সব সময় ছায়াছবিতে থাকে না, যদি [illegible] তখনও সাজার অধ্যায় কাহিনীর একেবারে শেষে। প্রথমেই তার বাহাদুরি [illegible] শিশুর মন কেড়ে নিয়েছে। [illegible] তারকা, চমক লাগানো সাজগোজ, [illegible] বলনের কায়দা হাঁ হয়ে দেখছে [illegible] মনের কোথায় সে-বাহাদুরির কি ছাপ পড়ছে কে জানে।

প্রেম ছায়াছবির মুখ্য উপজীব্য। সে প্রেমের সেরা আবার অবৈধ প্রেম। শিশু বা কিশোর নিজের অজ্ঞাতে সমর্থন করে পরকীয়াকে। প্রেমপাত্রীকে যদি [illegible] পরনারী হওয়া অন্যায় মনে করে [illegible] সমাজে শৈশবের কাঁচা মনে এমন [illegible] সংগ্রহ পর্যন্ত অন্যায়। একজন বিশেষজ্ঞ [illegible] করেছিলেন যে ছায়াছবির জগৎকে [illegible] অলীক ও অস্বাভাবিক [illegible]

'A tawdry population often absurdly overdressed, shady in character, much given to crime and sex with little desire or

need of supporting themselves on this difficult planet

আরও একটি তথ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সিনেমা দেখলে বাচ্চা সাধারণত ভালভাবে ঘুমোয় না। তাদের অন্যান্য খেলা আমোদ প্রমোদের পর যেমন টানা ঘুমে রাত কেটে যায় তেমন ব্যাঘাতবিহীন সুখ-শয়ন সিনেমা দেখার পর খুব কম বাচ্চার হয়। আবার বালকের ব্যাঘাত হয় বেশী, বালিকার কম। তথ্যটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। নিদ্রার গভীরতা মাপবার একটি যন্ত্র আছে। নাম তার Hypnograph। এই যন্ত্রে দেখা যায় শতকরা ৯৯টি শিশু ছবি দেখার পর একটি পুরো ঘন্টাও গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে না।

ভয়ের ছবির এই সব দৃশ্য শিশুমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে

ভয়ের ছবি, যেমন 'ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড' 'দি গোরিলা' ইত্যাদি শিশুমনে সাংঘাতিক আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সে আতঙ্ক সময় সময় বছরের পর বছর থেকে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক পরিণতমন কাল্পনিক ভয়ঙ্করতা কাল্পনিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু শিশুমন পারে না। অনেক কুসংস্কার বা প্রতিকূল ধারণার জন্মও সিনেমা থেকে হয়। মার্কিন দেশে নিগ্রো সম্বন্ধে শৈশব থেকে বিরূপভাব হেনরি ফরম্যানের কালে ছায়াছবি থেকে যথেষ্ট হতো। ফরম্যানের সার্ভেতে আরও দেখা গেছে, যেসব প্রধান শিশু অপরাধী অর্থাৎ Juvenile delinquent শ্রেণী সেখানে বালকবালিকারা gangster ছবি বা দুর্বৃত্তপনা কামপূর্ণ ছবি দেখে প্রচুর। তার মধ্যে বালকরা পছন্দ করে স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল দুর্বৃত্তপনাভরা ছবি আর মেয়েরা
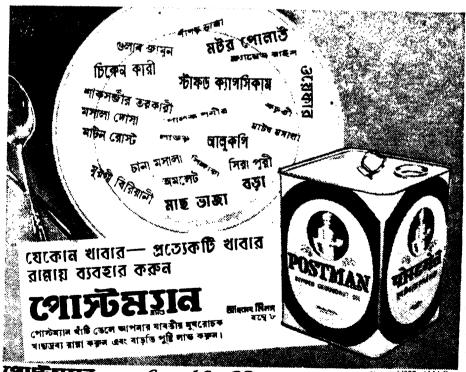
চায় যৌন আবেদনের রোমাঞ্চময় ছবি। এক রিফরমেটরি স্কুলের ২৩ বছর বয়সের ছেলে ফরম্যান সাহেবকে বলেছিল, "চুরি বা ডাকাতির ছবি বালকবালিকার কখনও দেখা উচিত নয়। গ্যাংস্টার ছবি দেখে আমি চুরি করতে শিখেছিলাম। কেমন করে মোটর গাড়ি চুরি করা যায় আমি সিনেমাতে দেখেছিলাম।"

যৌন আবেদনভরা ছবি দেখে কামজ অপরাধ যে সমাজে যথেষ্ট হয়। ছবি যাঁরা প্রস্তুত করেন তাঁদের বা সরকারের দায়িত্ব তো আছেই, অভিভাবকও যেন সচেতন থাকেন। সিনেমা-পাগলামি কিশোর বা কিশোরীকে যেন পেয়ে না বসে। আর দশটা নেশার মত এও এক বিষম নেশা। সময় থাকতে সতর্ক হওয়া ভাল।

সিনেমার বেপরোয়া জীবনে দর্শককে মাতিয়ে ব্যবসায়ীরা দু' পয়সা কামাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কাঁচমনকে নিয়ে সংবাদ। তাদের বিপথে নিয়ে গেলে সমাজকে যে মূল্য দিতে হয় তা' প্রতি সংসারে স্মরণ রাখার মত বিষয়।

শ্রীমতী

লক্ষ্মণের শক্তিশেল : উচকরণ (বীরভূম)

সে সব লেখায় পোড়ামাটির সজ্জার উপরে সচরাচর যতটা গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখি, দেবালয়ের গঠন পদ্ধতির উপর তত দেখি না। এই অসম মনোযোগ চিরদিনই অপরিবর্তিত থাকবে এমন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছু খাঁটি গবেষক এই শেষোক্ত বিষয়টির চর্চা করছেন। আশা করা যায়, তাঁদের প্রকাশিত তথ্যে সাধারণ অনুসন্ধিৎসুরাও যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত হয়ে উঠবেন ও আজকের ঘাটতি যথাসময়ে পূর্ণ হবে।

মন্দিরকলার আর একটি দিক সম্বন্ধেও অদ্যাবধি যথেষ্ট অনুসন্ধান বা অধ্যয়ন হয়নি। সেটি মন্দিরদ্বার বা মন্দিরের দরজা সম্পর্কে। 'টেরাকোটা' মন্দিরের বহিরঙ্গ সজ্জার মতোই গর্ভগৃহে প্রবেশের কপাট দুটিও যে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরূপ কাঠ-খোদাইয়ের কাজে মণ্ডিত হত সে কথা সুবিদিত নয়। এর প্রধান কারণ এ-জাতীয় নিদর্শনের স্বল্পতা। পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার 'টেরাকোটা' মন্দিরের মধ্যে খানকেও এ-রকম অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমি নিজে এখনও পনের-কুড়িটির বেশি দেখিনি। অন্য গবেষকদের কাছ থেকে আরও কিছুর খবর পেয়েছি। তবে উভয় বাংলায় দেবালয়ের সংখ্যা এতই অগণিত ও তাদের অধিকাংশের অবস্থান এমন দূর পল্লী অঞ্চলে যে কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাদের সবগুলি দেখা নিতান্তই অসম্ভব। সেজন্য অলংকৃতদ্বার মন্দিরের সঠিক সংখ্যা কত তা না বলা গেলেও আমাদের কয়েকজনের দীর্ঘকালের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে মোটামুটি একটা হিসাবে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর—এ তিনটি জেলাতেই যে এ-জাতীয় মন্দির প্রধানত কেন্দ্রীভূত তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা, সেখানেই কাঠ-খোদাই শিল্পীরা একদা যথেষ্ট সংখ্যায় কাজ করেছেন। এখনও তাঁদের দু-চারজন অবশিষ্ট আছেন, তবে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁদের সংখ্যা খুবই হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে কাঠের ভাস্কর্য একরকম লোপই পেয়েছে বলা চলে, যদিও অলংকৃতদ্বার দেবালয়ের কয়েকটি নিদর্শন বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলাতেও দেখা যায়। কাঠের কারিগররা আগে কোথায় কোথায় কেন্দ্রীভূত ছিলেন তা জানা যায় কাছাকাছি প্রাচীন রথ, বৃষকাষ্ঠ বা কাঠের দেবদেবীমূর্তি থেকে। কাঠের বিগ্রহ উত্তরবঙ্গে এতই দুর্লভ যে সেখানকার অধিবাসীরা এ-জাতীয় নিদর্শন হয়ত খুব কমই দেখে থাকবেন। বিখ্যাত কাঠের রথও সেখানে নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে, হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া, চন্দননগর, মাহেশ ও দশঘরা; হাওড়া জেলার অমরাগড়ি ও মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল, রামবাগ, নাড়াজোল প্রভৃতি স্থানের কাঠের রথগুলি আকার ও কারুকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এ তিনটি জেলায় কাঠের কালী, ভৈরবী প্রভৃতি দেবদেবীমূর্তিও এত অধিক সংখ্যায় বর্তমান যে তাদের নির্মাণে যে একদা অগণিত সূত্রধর শিল্পী নিয়োজিত হয়েছিলেন সে সিদ্ধান্তে কোন সন্দেহ থাকে না।

এই কারিগরগোষ্ঠীর একটি শাখা হাওড়া জেলার আমতা থানার থলিয়া-রসপুর গ্রামে এখনও সক্রিয় আছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষদের নামাঙ্কিত বহু কাঠের রথ ও বিগ্রহ এখনও নানা স্থানে দেখা যায়। বছর দুই-তিন আগে এ গ্রামটি পরিদর্শনের সময় ৮৫ বছরের বৃদ্ধ এক কাঠের কারিগরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনি তখনও কর্মী ছিলেন ও পুরনো দিনের নানান খবরাখবর পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে। মন্দিরের অলংকৃত দরজার কাজ তাঁর বাপ-জ্যাঠার আমলে যথেষ্ট হয়েছে; তিনি নিজেও কিছু কিছু করেছেন। তিনিই একমাত্র প্রাচীন শিল্পী যাঁর এ বিষয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনবার সুযোগ হয়েছিল। সেগুন কাঠই নাকি সচরাচর ব্যবহৃত হত। পুরু তক্তার ওপর প্রার্থিত নকশাটি খড়ি বা কাঠকয়লা দিয়ে এঁকে নিয়ে খোদাই কাজ

ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ : বরদাবাড় (হাওড়া)

ব্যবহারের বেলায় ভাস্কর্যের অঙ্গহানি হবার সম্ভাবনা প্রায় থাকত না বললেই চলে। পোড়ানো টালি পরে চোট লেগে বা হাত থেকে পড়ে গিয়ে হয়ত ভাঙচুর হতে পারত, কিন্তু সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করলেই এরকম ঝুঁকি এড়ানো যেত। খোদাই-করা প্যানেলগুলির বেলায় কোন অংশ ভেঙে গেলে বা মনোমত না হলে, বাড়তি কাঁচা মাটি জুড়ে দিয়ে বা আবার খোদাই করে তাদের প্রার্থিত রূপায়ণে কিছুমাত্র অসুবিধা হত না। তারপর ভাটিতে পোড়ানোর সময় একটু হুঁশিয়ার থাকলেই কাজ শেষ হত ভালভাবে। কিন্তু কাঠ-খোদাইয়ের বেলায় ছাঁচ ব্যবহারের প্রশ্ন তো ওঠেই না। প্রযুক্ত উপকরণও কাঁচা বা আধ-শুকনো মাটির থেকে অনেক নিরেট ও শক্ত হওয়ার দরুন কোথাও কোন ভাঙচুর হলে তা সংশোধন করা অসম্ভব হত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে আজকের মিস্ত্রীরা বজ্রলেপ জাতীয় আঠার সাহায্যে কাঠের সঙ্গে কাঠ জুড়তে পারেন। কিন্তু দেড়-শ দু-শ বছর আগেকার সূত্রধর শিল্পীরা এ-জাতীয় সুবিধার অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয়-না। ফলে কাঠের ভাস্কর্যে অনেক বেশী অভিনিবেশ ও সাবধানতার প্রয়োজন হত। অপেক্ষাকৃত শক্ত উপাদানের জন্য মেহনতও পড়ত অনেক বেশি। এমনও হতে পারে, এসব বিপত্তির জন্যই হয়ত এত অল্পসংখ্যক 'টেরাকোটা' মন্দিরে নকাশি কাঠের দরজা নিবদ্ধ হয়েছে।

আরও এক গুরুতর অসুবিধা ছিল কাঠের ভাস্কর্যের। উই ধরে, জলে ভিজে বা অন্যভাবে এ জাতীয় শিল্পকৃতিগুলি যত সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পোড়ামাটির অলংকরণ তা হয়নি। বহু ক্ষেত্রে দু-তিন শ' বছরের পুরনো 'টেরাকোটা' সজ্জা যে এখনও সজীব আছে তার কারণ মাটি নির্বাচনের সময় যথেষ্ট বাছবিচার করা ছাড়াও টালিগুলিকে সম্ভবত অল্প আঁচের আগুনে অতি যত্নের সঙ্গে পোড়ানো হত। অধিকাংশ 'টেরাকোটা' মন্দিরেই পোড়ামাটির প্যানেলগুলি রৌদ্রবৃষ্টিতে অবারিত থেকেছে সুদীর্ঘকাল। কিন্তু খুব খেলো কারিগরি ছাড়া, তাতেও তাদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কিন্তু তুলনায় মন্দিরের দরজার কাঠের কারুকার্য অনেক স্বল্পস্থায়ী হয়েছে। উভয় বাংলার জলবায়ুর অত্যধিক আর্দ্রতা ও উই ভোমরা ইঁদুর প্রভৃতির উপদ্রবই তার কারণ। সম্ভবত আরও বড় কারণ উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। কি পূর্ব কি পশ্চিমবঙ্গে এ-সব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতারা গত হবার পর তাঁদের বংশধরদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়েছে। প্রতি পরিবারে শরিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াটাও সংরক্ষণের সহায়ক হয়নি। ধর্মীয় আসক্তিও হ্রাস পেয়েছে সেই সঙ্গে। ফলে, চোখের উপর নকাশি কাঠের এই অপরূপ নিদর্শনগুলি নষ্ট হতে দেখেও কেউ কিছু প্রতিবিধান করেননি। অলংকৃতদ্বার মন্দিরের সংখ্যা এখন শ'-খানেকের মতো বলে আমি যে অনুমান করেছি, তা হতাবশিষ্টগুলির পরিসংখ্যান মাত্র। আগে যে এ-জাতীয় দেবালয় আরও বেশী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এইজন্য যে বহু মন্দিরের সেবায়েত বা পুরোহিতদের কাছে শুনেছি, কারুকার্যখচিত পুরনো কপাট অব্যবহার্য হওয়ায় তাঁরা নতুন সাদাসিধা দরজা তৈরী করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এমন মন্দিরও দেখেছি যার একটি কপাট অলঙ্কৃত, অন্যটি নয়।

এসব পরিত্যক্ত শিল্পসম্ভারের কিছু কিছু নিদর্শন আমাদের কয়েকটি সংগ্রহশালাতেও রক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ম ও রাজবলহাটের (হুগলী জেলা) অমূল্য প্রত্নশালার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। 'টেরাকোটা' অলঙ্করণের থেকেও বেশী মূল্যবান এ-

জাতীয় কারুকীর্তি গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে যাঁদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয় তাঁরা এসব মিউজিয়ম পরিদর্শন করতে পারেন।

কি ধরনের ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হত এসব দেবালয়ের দরজায়? এখানেও 'টেরাকোটা' সজ্জার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, বিবিধ সামাজিক আলেখ্য মায় ফিরিঙ্গী-জীবনচিত্র শিকার দৃশ্য, রাশি রাশি ফুলকারি নকশা প্রভৃতি সবই ব্যবহার করা হয়েছে মন্দির টেরাকোটা'র অনুকরণে। বর্তমান সিরিজের প্রবন্ধগুলির সীমিত পরিসরে পাঁচ-ছ'টির বেশী ছবি মুদ্রিত হওয়া সম্ভব নয়, যদিও—পরিতাপের বিষয়—অলঙ্কৃত মন্দিরদ্বার সম্পর্কে আমার 'নেগেটিভ'-এর সংখ্যা প্রায় দু-শোর মত। পাঠকদের আরও বেশী আলোকচিত্র দেখাতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু তার উপায় নেই। সে যাই হোক, প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ছ'টি ছবি থেকেই 'টেরাকোটা' সজ্জার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সঙ্গে এ-জাতীয় কাঠের ভাস্কর্যের নিবিড় সাদৃশ্য প্রতীয়মান হবে বলে আশা করি। কপাটের উপর প্যানেলগুলি সাজানোর সময় কি কোন ক্রম বা বিধিবদ্ধ বিন্যাসরীতি অনুসরণ করা হত? এ প্রশ্নের উত্তরেও 'টেরাকোটা' সজ্জার সঙ্গে সাদৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না। পোড়ামাটির অলঙ্করণ অনেক বেশী জায়গা জুড়ে নিবদ্ধ হত বলে সেখানে হয়ত বা এ-হেন সংস্থানবিধি কার্যকর করবার উপায় ছিল। কিন্তু উচ্চতায় অনধিক ছ' ফুট ও প্রস্থে কমবেশি তিন ফুট জায়গা জুড়ে মাত্র দুটি কপাটের ক্ষেত্রে সুসমঞ্জস কোন পর্যায় অনুসরণ করার অসুবিধা ছিল বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত কোতলপুর গ্রামের হাজরা পরিবারের পরিত্যক্ত লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির থেকে গৃহীত প্রথম ছবিটির প্যানেলগুলির উল্লেখ করতে পারি। [মুদ্রিত অবস্থায় সেগুলি পরিষ্কার বোঝা যাবে এমন ভরসা করি না।] সর্বোচ্চ সারির বাঁ দিকে এক শিবলিঙ্গ পুজারী ও ডান দিকে এক উপবিষ্ট শঙ্খবাদিকা। মধ্যের সারির বাঁ দিক থেকে, যথাক্রমে, কৃষ্ণ, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, ঢোলবাদক ও দৈহিক কসরৎ দেখানোয় নিযুক্ত এক বেদেনী। নীচের সারিতে, অনুরূপ পরম্পরায়, গণেশ, কার্তিক, কালী ও হুঁকোসেবী এক বাবুর সামনে ভূমিষ্ঠ প্রণত এক ভৃত্য। এ মন্দিরের দরজায় মোট আট সারি ভাস্কর্যে কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনী ছাড়াও ফিরিঙ্গীদের শিকার ও যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য এবং লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দের মূর্তি রূপায়িত হয়েছে। অল্প জায়গায় এত বিভিন্ন বিষয়ের সন্নিবেশ করতে গিয়ে তাদের বিন্যাসে সুশৃঙ্খল কোন ক্রম অনুসরণ করা যায়নি। অনুরূপ অন্যান্য দরজার নজিরে একথা বলা যায়, এ বিষয়ে নিয়মের অভাবই ছিল নিয়ম।

দ্বিতীয় ছবিটিতে শক্তিশেলের আঘাতে মূর্ছিত লক্ষ্মণকে রাম জড়িয়ে ধরে আছেন।

স্তন্যদান : বরদা বাড় (হাওড়া)

॥ ১৪ ॥

নতুন জায়গায় এসে নতুন পারিবেশে কেমন যেন ভয় করতে লাগলো নয়নতারার। এ কেমন বাড়িতে তার বিয়ে হলো! বিয়ের দিনের পরই খুন! গৌরী পিসী সামনে দিয়ে যেতেই নয়নতারা তাকে ডাকলে পিসীমা, পুলিস এসেছে শুনলুম, শুনলুম কে নাকি খুন হয়েছে?

গৌরী পিসী কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। বললে কে জানে কউ-মা কে খুন হয়েছে, কার কপাল পুড়েছে—

নয়নতারা তবু ছাড়লে না। বললে—এই যে কে এসে বলে গেল, তুমি শোন নি?

গৌরী পিসী বললে আমার কি শোনবার সময় আছে বৌমা, যত ঝক্কি সব আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে সবাই। তুমি ও-নিয়ে মাথা ঘামিও না বৌমা, ও-সব ভাবার অনেক লোক আছে এ-বাড়িতে! ক'দিন পরেই ফুল-শয্যার তত্ত্ব আসবে, তাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে, তারপর গাঁ সুদ্ধু নেমন্তন্ন হয়েছে, তাদের ঝামেলা সমস্ত আমাকে পোয়াতে হবে—

বলতে বলতে আবার কোন্ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল গৌরী পিসী।

বাড়ির ভেতরে তখন তুমুল কাজের বহর। কারোর যেন সময় নেই। শুধু কয়েকজন গ্রামের বউ-ঝি গিন্নীবান্নি মানুষ তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। যেন এক অদ্ভুত বস্তুর সন্ধান পেয়েছে তারা নয়নতারার মধ্যে! যেন নয়নতারা তাদের মত মেয়েমানুষ নয়। যেন নয়নতারা অন্য জগতের জীব। তারা তার শাড়ি দেখছে, গয়না দেখছে; গায়ের রং দেখছে। মাথার খোঁপা দেখছে, চোখে চোখ রেখে যেন নয়নতারাকে গিলতে চাইছে সবাই।

হঠাৎ সেই মানুষটার গলা শোনা গেল আবার—মা, মা, মা কোথায়?

নয়নতারা মাথার ঘোমটাটা আরো যত্ন করে নিচের দিকে টেনে দিলে।

জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা সহজ সম্পর্ক থাকেই। আমরা তা স্বীকার করি আর না-ই করি। একদিন সদানন্দর জন্ম হয়েছিল এই বাড়িতে। সেদিন উৎসব এই বাড়িতে। সেদিন এখানে উৎসব হয়েছিল বেশ ঘটা করে। ওই দাদুই সেদিন একটা সোনার হার দিয়ে নাকি নাতির মুখ দেখেছিল। রাণাঘাট থেকে মামলার শুনানি ছেড়ে নবাবগঞ্জে চলে এসেছিল। ভেবেছিল এই জন্ম এই আবির্ভাব এক শুভ-সূচনা। নিজের বংশকে চিরকালের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই এই জন্ম। কিন্তু সেদিনকার সেই শুভ-সূচনাকে এই এতদিন পরে এই হত্যা দিয়ে এই মৃত্যু দিয়ে কেন অভিষিক্ত করতে হলো! এও কি সদানন্দর জীবনের ক্রম-বিকাশের পক্ষে এতই অপরিহার্য ছিল? কে জানে! নইলে হয়ত সদানন্দর জীবন এমন হতো না। সদানন্দ হয়ত আর পাঁচজনের মত এই নবাবগঞ্জের বংশধর হয়ে দাদু আর চৌধুরী মশাই-এর মত প্রজা খাতকে আর সেরেস্তার কাগজপত্রের মধ্যেই জীবন কাটিয়ে দিত!

তাই সেদিন যখন চৌধুরী-বাড়িতে সবাই বৌভাতের উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনে হিম-সিম খেয়ে মরছে তখন সদানন্দ একবার কালিগঞ্জ আর একবার থানা-পুলিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আকাশ-পাতাল পরিক্রম করে বেড়াচ্ছিল।

কিন্তু দারোগাবাবু কোথাও কিছু খুঁজে পেলে না। আতা গাছের তলায় চণ্ডী-মণ্ডপের পেছনে বংশী ঢালীর যে আস্তানা ছিল সেখানেও সরেজমিনে তদন্ত করলে। কিন্তু সেখানে সব কিছুই স্বাভাবিক। কোথাও কিছু ব্যতিক্রম নেই।

অথচ এখানেই কাল মেয়েমানুষের গলার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল সদানন্দ। অন্ধকারের মধ্যে অবশ্য স্পষ্ট কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার মনে হয়েছিল

—টাকা?

—হ্যাঁ, কালিগঞ্জের বৌকে যে দশ হাজার টাকা দেবার কথা ছিল তা দিলে না কেন দাদু? টাকা দিলে তো কোনও গণ্ডগোলই হতো না আর! তাহলে আমিও কিছু বলতুম না। টাকা তো দিলেই না, তার ওপর পাছে টাকা দিতে হয় তাই কালিগঞ্জের বৌকে খুন পর্যন্ত করলে বংশী ঢালীকে দিয়ে—

প্রকাশমামা বললে—খুন? খুন হলে তুই বলতে চাস পুলিশ-দারোগা টের পেত না? খুন বললেই অমনি খুন করা হয়? তুই যা-তা বলছিস কেন?

সদানন্দর চোখ দিয়ে ততক্ষণে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

প্রকাশমামা সদানন্দর চোখে জল দেখে ঘাবড়ে গেল। বললে—এ কি রে, তুই কাঁদছিস? আজকের এত বড় একটা শুভদিনে তুই চোখের জল ফেলছিস ছি:...

সদানন্দর তখন আর কথা বলবার ক্ষমতা নেই যেন। বললে—আমাকে ছাড়ো তুমি মামা, আমাকে ছাড়ো—ছেড়ে দাও—

প্রকাশমামা তখন আরো জোরে জাপটে ধরলে সদানন্দকে। বললে—পাগলামি করিস নে সদা, ছেলেমানুষি করবার তোর বয়েস নেই আর। এ-সব জিনিস দশ বছর আগে করলে তখন মানাতো। এখন লোকে নিন্দে করবে তোর। তা ছাড়া এখনি ফুলশয্যের তত্ত্ব আসবে কেষ্টনগর থেকে, তারপর তোর শ্বশুর-শাশুড়ি আসবে—তারপর গাঁ-সুদ্ধু লোককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, তারা সব শুনে কী ভাববে বল্ তো...

হঠাৎ কীর্তিপদবাবু সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে কাণ্ডটা দেখে অবাক হলেন। প্রকাশ তাঁর নাতিকে অমন করে জাপটে ধরে আছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কী রে প্রকাশ, খোকাকে অমন করে কী করছিস? ও কী করেছে?

প্রকাশ সদানন্দকে তেমনি করে জড়িয়ে ধরেই বললে—দেখুন না পিসেমশাই, আপনার নাতির কাণ্ড। পালিয়ে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে—

—পালিয়ে যাচ্ছে মানে? কেন পালাচ্ছে? কোথায় পালাচ্ছে?

প্রকাশমামা বললে—কালিগঞ্জে—

—কালিগঞ্জে? কালিগঞ্জে কার কাছে? আসল ব্যাপারটা কী বল্ তো রে প্রকাশ? কাল থেকে কালিগঞ্জের বৌ-এর কথা শুনছি, কে সে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রকাশমামা বললে—সে পিসেমশাই, পরে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবো, এখন একে ছেড়ে দিলে সব কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে—

কীর্তিপদবাবু বললে—পাগল আর হোর বয়েস হয়েছে। পুলিশের দারোগা কেন এসেছিল তাও তো কেউ কিছু বললি নে। সবাই বলছে এখন সময় নেই, পরে বলবে। আর পরে কখন সময় হবে? আমি মরে গেলে তখন কে শুনতে আসবে—

প্রকাশমামা সে-কথায় কান না দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো—দীনু, ও দীনু—

দীনু আসবার আগে চৌধুরীমশাই-এর কানে গেল প্রকাশের চিৎকারের শব্দ। বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে দেখেই দৌড়িয়ে এলেন। শুধু তিনি একলাই নন্। কাণ্ড দেখে অনেকেই এসে জুটলো। বিয়েবাড়ির ভিড়ের মধ্যে এমন কাণ্ড দেখে অনেকেই এসে জটলা করলো।

দীনু দৌড়তে দৌড়তে এসে জিজ্ঞেস করলে—আমায় ডাকছিলেন শালাবাবু—

কিন্তু ততক্ষণে জায়গাটা ভিড়ে ভিড় হয়ে গেছে। সাধারণ লোক যারা কাজকর্ম করতে ব্যস্ত তারাও হাতের কাজ ফেলে এসে কাছে দাঁড়ালো। ওদিকে ভিয়েনের জায়গায় পুরোদমে কাজ চলছিল। মিষ্টি-গুলো তৈরি করে গামলায় তুলে এক-এক করে ভাঁড়ারে গিয়ে জমা করে আসছে। আর পুকুরের পাড়ে ময়দা মাখা হচ্ছিল। সন্ধ্যে হবার পর লুচি ভাজতে আরম্ভ করবে। তার আগে ডাল, মাছের কালিয়া, মাংস, রান্না করে ভাঁড়ারে তোলা হচ্ছে।

চৌধুরীমশাই বিচক্ষণ লোক। তিনি কোনওদিনই বেশি কথা বলেন না। সামান্য একটুখানি শুনেই বললেন—প্রকাশ এখান থেকে সরে এসো, বড় লোকের ভিড়—চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে এসো খোকাকে, ওখানে গিয়ে শুনবো সব—

কীর্তিপদবাবু একবার শুধু বলতে চেষ্টা করলেন—ব্যাপারটা কী তাই খুলে বলো না তোমরা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—

চৌধুরীমশাই শ্বশুরের দিকে চেয়ে বললেন—ও কিছু না, ও নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না—

বলে প্রকাশের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে সদানন্দকে নিয়ে চললেন। কিন্তু কীর্তিপদবাবু জামাই-এর কথায় খুশী হলেন না। তিনিও জামাই-এর পেছন-পেছন চলতে লাগলেন। বললেন—ভাববো না মানে? সব কাজে তোমরা কেবল আমাকে ভাবতে বারণই করছো, তা আমিও তো একটা মানুষ, না কী? আমি বুড়ো হয়েছি বলে আমার কিছু জানতে নেই?

কিন্তু কে আর তাঁর মত বুড়ো মানুষের কথায় কান দেয়। তিনি যে এত সম্পত্তি করেছেন, তিনি যে এত টাকার মালিক, তার জন্যেও কেউ তাঁর কোনও মূল্য দিচ্ছে না।

তিনিও পেছন-পেছন চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে সকলের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন—আমাকে তোমরা কেউ কিছু বলছো না কেন? আমি বুড়ো হয়েছি বলে কি তোমাদের কিছু সাহায্যও করতে পারবো না?

চৌধুরীমশাই শ্বশুরের এই অন্যায় কৌতূহল বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। বললেন—আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনাকে আমরা এ-সব ব্যাপারের মধ্যে কষ্ট দিতে চাই না। আপনি তামাক খান না নিজের ঘরে বসে—দীনু আপনাকে তামাক সেজে দিচ্ছে—

—তুমি থামো! সব কথায় কেবল আমার বয়েস দেখাও কেন?

কীর্তিপদবাবু রেগে গেলেন এবার। বলতে লাগলেন—কী হয়েছে তাই বলো।

তারপর সকলকে অগ্রাহ্য করে একেবারে সোজা সদানন্দকে ধরলেন।

বললেন—কী হয়েছে বলো তো দাদা! তোমার কী হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেন? আমি এসে পর্যন্ত দেখছি তুমি যেন কী রকম হয়ে গেছ! গায়ে-হলুদের দিনে তুমি কোথা লুকিয়ে রইলে। তারপর সকাল থেকে

পুলিস-দারোগা এসে কী সব তদন্ত করে গেল। তারপর এখন আবার এই কাণ্ড। বলো তো এসব কী ব্যাপার? আমার কাছে কিছু লুকিও না—

হঠাৎ কৈলাশ গোমস্তা এসে হাজির হলো।

বললে—বেয়াই মশাই, আপনাকে কর্তা-বাবু একবার ডেকেছেন—

কীর্তিপদবাবু বললেন—দাঁড়াও বাপু, এখন এই ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হয়ে যাক—

ওদিকে ভিড়ের লোকজন আস্তে আস্তে সবাই এসে হাজির হয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপের সামনে। প্রকাশমামার এতক্ষণে সেদিকে নজর পড়েছে। তাদের দিকে চেয়ে তেড়ে গেল—এই, তোরা এখেনে কী করতে এসেছিস, যা বেরিয়ে যা এখেন থেকে। কাজ-কর্ম কিছু নেই তোদের যা, এখান থেকে ভাগ—

ক্রমে ক্রমে খবরটা বাড়ির ভেতরেও পৌঁছে গেল। খোকা নাকি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিল, শালাবাবু তাকে ধরে রেখেছে। ছোট-বাবু সকলকে ডেকে নিয়ে গেছে চণ্ডীমণ্ডপে!

প্রীতি ভাঁড়ার ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল।

কথাটা শুনেই বললে—কেন, চলে যাচ্ছিল কেন খোকা? কোথায় যাচ্ছিল?

গৌরী পিসী বললে—চুপ করো বউদি, [illegible] ন। নতুন-বউ-এর কানে যাবে [illegible] একটু গলা নামিয়ে কথা বলো—

বড়ো কর্তা নিজের ঘরে বসে তখন ছটফট করছিলেন। কৈলাশ গোমস্তা ফিরে আসতেই বললেন—কী হলো রে? বেয়াই-মশাই এসেছেন না?

—হ্যাঁ, এসেছেন।

—খোকাকে আটকে রাখতে বলেছি তো? [illegible] ফের বেরোতে না পারে?

—হ্যাঁ বলেছি। ছোটবাবু ধরে রেখেছেন খোকাবাবুকে।

—যদি কোনও ফাঁকে বেরিয়ে যায়? শেষকালে ফুলশয্যার দিন যেন কেলেঙ্কারি কাণ্ড না বসে।

কৈলাশ গোমস্তা বললে—না, সে ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। খোকাবাবুকে আর একলা ছাড়া হবে না। বংশীকেও বলে দিয়েছেন ছোটবাবু যেন তার ওপর নজর রাখে!

ততক্ষণে কীর্তিপদবাবু এসে গেলেন। এসেই বললেন—বড় চিন্তায় পড়লুম বেয়াই মশাই, খোকা তো আগে এ-রকম ছিল না। [illegible] মজার মজার কথা বলতো। [illegible] একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।

কর্তাবাবু বললেন—বড্ড বেয়াড়া হয়ে গেছে আজকাল। কারো কথা শোনে না—

কীর্তিপদবাবু বললেন—ভালোই করেছেন [illegible] বিয়ে দিয়েছেন, বিয়েটা কম বয়েসে দেওয়াই ভালো—

কর্তাবাবু বললেন—আরো আগে বিয়ে দিলেই ভালো হতো। কিন্তু ভালোমত পাত্রী তো এতদিন পাওয়া যাচ্ছিল না—তাই—

কীর্তিপদবাবু প্রবীণ বিচক্ষণ মানুষ। বললেন—দেখুন বেয়াই মশাই, বয়েস হয়েছে বলে কেউ আমাদের কথাই শুনতেই চায় না আর, যেন আমরা কখনও কম বয়েসের ছিলাম না। এই-ই হয় বেয়াই মশাই, এই-ই হয়—

কর্তাবাবু বললেন—ওসব আর ভাববেন না বেয়াই মশাই, আমাদের যুগ চলে গেছে, আমরা বাতিল—

কীর্তিপদবাবু বললেন—কিন্তু কী ব্যাপারটা বলুন তো, খোকা ও-রকম বেয়াড়া হলো কেন বলুন তো? কে কালিগঞ্জের বউ? তার কী হয়েছে?

কর্তাবাবু বললেন—পাগলের কথার কি মানে আছে? সেই কথায় আছে না পাগলে কী-ই না বলে আর ছাগলে কী-ই না খায়। আপুনি তামাক খান, কৈলাশ বেয়াই মশাইকে তামাক দিতে বলো—

কিন্তু এ প্রসঙ্গ বেশিক্ষণ চললো না। কথার মধ্যেই বাধা পড়লো। হঠাৎ নিচে থেকে শাঁখ বাজবার আওয়াজ হলো।

—ওই, ফুলশয্যার তত্ত্ব এসেছে বোধ হয় কেষ্টনগর থেকে। কৈলাশ যাও যাও, দেখে এসো—

সত্যিই তখন একতলায় হৈ-চৈ ব্যাপার। বিপিনই ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে এসেছে দলের মাথা হয়ে। অনেক দূর থেকে তত্ত্ব এসেছে। শাঁখ বাজার শব্দ শুনেই গ্রাম থেকে ছেলে-বুড়ো জুটে এসেছে। অন্ততঃ বারো জন লোক হবে। সকলের হাতেই জিনিস-পত্র। রেল বাজার থেকে চারখানা গরুর গাড়ি ভর্তি জিনিস-পত্র নিয়ে এসেছে। বড় বড় বারকোষ, হাঁড়ি, থালা। ফলের ঝুড়ি, ছানার মিষ্টি, ফুলের ঝোড়া, দই-এর হাঁড়ি, কোঁচানো শাড়ি। জামাই-এর ধুতি-পাঞ্জাবি।

—ঠাকুর, কড়ায় লুচি ছেড়ে দাও, বারোজন লোকের মতন। একসঙ্গে খেতে বসবে—

ভেতর-বাড়িতেও সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। চওড়া জরির শান্তিপুরে শাড়ি পরে বাড়ির গিন্নী সমস্ত কিছু তদারক করছে। আশে-পাশের বাড়ি থেকে পাড়ার বুড়ো গিন্নী-বান্নি মানুষেরা এসে পরামর্শ দিচ্ছে। কেউ পান সাজতে বসেছে। কেউ তরকারি কুটছে।

বেহারী পালের বউ ক'দিন থেকেই আসছে। বিয়ে বাড়ির কাজ-কর্ম করে দিয়ে অনেক রাত্রে আবার নিজের বাড়ি চলে যায়।

সেদিন বললে—হ্যাঁ বউমা সদার নাকি কী হয়েছে?

প্রীতি বললে—কী আবার হবে মাসীমা? কই, সদার তো কিছু হয়নি—

—শুনলুম নাকি সদা বলেছে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। গাঁয়ে কত রকমের কথা উঠছে, উনি নাকি বারোয়ারিতলা থেকে শুনে এসেছেন—

প্রীতি বললে—কী জানি মাসীমা, তুমি তো এ ক'দিন আসছো, নিজের কানে কিছু শুনেছ?

বেহারী পালের বউও সেই কথা বললে। বললে—আমি তো কর্তাকে তাই-ই বললুম, বললুম সদার যদি বউ পছন্দ না হয়ে থাকে তো আমার কানে সে-কথা একবার আসতোই—

প্রীতি বললে—পাড়ায় লোকের কথা

ছেড়ে দাও মাসীমা। পাড়ার লোকে তো অনেক কথাই বলে। তুমি নিজের চোখেই তো বউ দেখলে। অমন বউ কজনের বাড়িতে দেখেছ বলতে পারো? ছেলের অপছন্দ হবার মত কি বউ করেছি আমি? বলুক দিকিনি কেউ—

কিন্তু তখন অত কথা বলবার আর সময় নেই কারো। তবু বেহারী পালের বউ বললে—তোমার গুণের ছেলে বউ, পাশ করা ছেলে, তুমি যদি এমন বউ ঘরে না আনবে তো কে আনবে বলো? কার এমন সাধ্যি আছে?

কথার মধ্যেখানেই গৌরী পিসী এসে বাধা দিলে। বললে—শুনেছ বউ, কেষ্টনগর থেকে তোমার বেয়াই-বেয়ান কেউ-ই আসছে না—

—কেন?

—তাই তো শুনলুম। ফুলশয্যের লোকেরা এসে তাই তো বলছে। বলছে পণ্ডিত মশাই এখানে এসে তো কিছু খাবেন না। তাই আর আসেননি। আর অনেক দূরের রাস্তা। ওরা সবাই বউমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে—

—তা বউমার কাছে নিয়ে যা না ওদের।

নয়নতারা তেমনি করেই চুপ-চাপ বসে ছিল। তার আগেই সাজানো-গোছানো হয়েছে বউকে। নতুন একখানা বেনারসী পরেছে। গা ভর্তি গয়না। বিপিন আসতেই নয়নতারা চোখ তুলে চাইলে।

জিজ্ঞেস করলে—বাবা আসবে না বিপিন?

বিপিন বললে—না দিদিমণি, তুমি ভালো আছো তো? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে নয়নতা[illegible] বললে—আর মা? মা কেমন আছে?

—মা একটু কান্নাকাটি করছিল। [illegible] এখন চুপ করেছে। বলছে মেয়ে যখন হয়ে[illegible] তখন তো পর হয়ে যাবেই।

নয়নতারা বললে—তুমি গিয়ে মা[illegible] বোল আমি এখানে খুব ভালো আ[illegible] আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ দিদিমণি! খুব খেয়েছি পে[illegible] ভরে। বড় বড় মাছ, মাংস, মিষ্টি, দই খ[illegible] খেয়েছি। তোমার শাশুড়ি খুব ভালে[illegible] মানুষ, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদে[illegible] খাইয়েছেন। এখানকার সবাই-ই খুব ভালে[illegible] লোক। সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে আবার [illegible] হাঁড়ি মিষ্টি দিয়ে দিয়েছেন এরা—

কিন্তু বেশিক্ষণ কথা বলবার সময় [illegible] না। বাইরে ততক্ষণে আবার শানাই [illegible] উঠলো। একে একে আবার লোকজ[illegible] আসতে লাগলো নয়নতারার ঘরে। নব [illegible] ঝেঁটিয়ে লোক আসবে আজ। [illegible] সূচনা। সব অচেনা মুখ। তারা এসে [illegible] জোড়া করে বসলো। সকলের চোখই নয়[illegible] তারার দিকে। নয়নতারা বুঝতে পার[illegible] সবাই তার মুখের দিকেই হাঁ করে দেখছে[illegible] আজকে বুঝি সমস্ত সন্ধেটাই এই [illegible] চলবে। আজকে নয়নতারাই বুঝি এ[illegible] সবচেয়ে বড় আকর্ষণ!

*

কর্তাবাবু এক সময় ছেলেকে [illegible] পাঠালেন। চৌধুরী মশাই আসতেই কর্তা[illegible] বাবু জিজ্ঞেস করলেন কী খবর, ও-দিকে[illegible] খবর কী?

চৌধুরী মশাই বললেন সব তো ঠিক[illegible] চলছে। ফুলশয্যার লোকেদের সকল[illegible] খাইয়ে-দাইয়ে পাঠিয়ে দিলুম। তাদের [illegible] আবার ট্রেন ধরতে হবে—

কর্তাবাবু বললেন না, আমি [illegible] বলছি না, বলছি খোকা কোথায়?

চৌধুরী মশাই বললেন খোকা [illegible] যে কোনও গণ্ডগোল করছে না—

—ওই তোমাদের বুদ্ধি! গণ্ডগোল [illegible] করলেও, কখন কী করে ফেলে তা কি [illegible] যায়। আমি যে বলেছিলুম একটু [illegible] চোখে রাখতে, রেখেছ?

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ, [illegible] দেনো তো প্রকাশকে বলে রেখেছি—

—প্রকাশ কে?

—আমার শালা। সে পাকা লোক। তা[illegible] চোখ এড়াতে পারবে না খোকা—

কর্তাবাবু বললেন—তবেই হয়েছ[illegible] তোমাকে বলেছি না তুমি নিজে একটু নজ[illegible] রাখবে। একলা ছাড়বে না ওকে মোটে। আ[illegible] বংশীদেরও বলে রেখেছ?

—হ্যাঁ, বলেছি।

—[illegible] মিলে ওর আগে[illegible]

আর্থার সি ক্লার্ক
কলকাতায়

একান্ত সাক্ষাৎকারে আর্থার ক্লার্ক

২০০১-এর পৃথিবীর?
'উনবিংশ শতাব্দীর জীবন কী ভাবে শুরু হয়েছিল একবার কল্পনা করুন। এবং ওই সঙ্গে কল্পনা করুন, সে জীবন কী প্রচন্ড গতিতে আগামী শতাব্দীর দিকে ছুটে চলেছে। হ্যাঁ, আমি ২০০১-এর কথা বলছি। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জগতে সে কী দারুণ বিস্ফোরণ। ওই বিস্ফোরণের অভিঘাত পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের উপর গিয়ে পড়বে। মানুষের চিরায়ত দর্শন, কৃষ্টি এবং মননে তার সত্যিকারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখন থেকেই আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। আমি মনে করি, পৃথিবীর প্রত্যেক বিজ্ঞান লেখক, বিশেষ করে সায়েন্স ফিকশন লেখকের ভূমিকা এ ব্যাপারে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ২০০১-এর মানব চেতনাকে পরিপুষ্ট করার দায়িত্ব তাঁদের।......'

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ 'দেশ' সাপ্তাহিকের জন্যে আয়োজিত এক বিশেষ একান্ত সাক্ষাৎকারে এ কথা আমাকে বললেন বিশ্ববিখ্যাত কল্পকাহিনীকার, ২০০১ : এ স্পেশ ওডেসির লেখক এবং ১৯৬১ সালের কলিঙ্গ পুরস্কার প্রাপক আর্থার সি. ক্লার্ক। মুখ্যত দুটি বিষয় নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। এক, আগামী শতাব্দীর সম্ভাব্য বিজ্ঞান জগৎ। দুই, সায়েন্স ফিকশনের বাস্তব ভূমিকা।

হ্যাঁ আর্থার ক্লার্কের সান্নিধ্য এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। মানুষ যখন দৈনন্দিন উৎপীড়নে ব্যস্ত, ক্লার্ক তখন ভিন্ন গ্রহ অথবা নক্ষত্র জগতের অভিমুখী যাত্রী। পৃথিবীর মানব ইতিহাস? তার সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিকতা? এরা দু' হাজার বছর ধরে নাছোড়বান্দার মত মানুষের পাশে পাশে এগিয়ে এসেছে। এবার হয়ত বাধ্য হয়েই ওদের বলব, হে আমার পুরাতন বন্ধু, বিদায়। কারণ, আর মাত্র আঠাশ বছরের মধ্যে জীবন নামক এই বস্তুটি এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়বে, যেখানে তোমাদের ভূমিকা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বরং তখন তোমরা আমাদের বিপদেরও কারণ হতে পার। আর সত্যিই তো, যখন আমরা চলন্ত নগরের অধিবাসী হব, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করব, অথবা মহাকাশযানের জমাট পরিবেশে ভিন্ন গ্রহের দিকে যাত্রা করব, নৈমিত্তিক ঘটনার মত, আমাদের দেহের পরিত্যক্ত সামগ্রীগুলি পুনরুদ্ধার করে আবার খাদ্যরূপে গ্রহণ করব, কৃত্রিম পদ্ধতিতে মানব শিশুর আবির্ভাব হয়ত যখন হবে সাধারণ ঘটনার মত, তখন আজকের প্রচলিত মানবিক ধারণার পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এগুলি ঘটবেই। আর মানব সভ্যতাকে যদি তখন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওটা গ্রহণ করতেই হবে।

হ্যাঁ, এই হল ক্লার্কের মননশীলতা। যতক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম, মনে হয়েছে, রক্ত মাংসের শরীরে উনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি একবিংশতির জগতে বিচরণ করতে শুরু করে দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত

জন্ম ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭ ইংল্যান্ডের মাইনহেডের সোমারসেটশায়ার-এ। বাবা চার্লস রাইট ক্লার্ক, মা নোরা। ১৯৫৩ সালে মেরিলিন মেফিল্ডের সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ। ১৯৬৪ সালে বিচ্ছেদ। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম শ্রেণীর স্নাতক। বর্তমান বাড়ির ঠিকানা ৪৭/৫, গ্রেগোরি রোড, কলম্বো-৭। সিলোন। যদি বৈষয়িক কারণে ওঁকে কারোর প্রয়োজন হয়, যোগাযোগ করুন, স্কট মেরিডিথ লিটারেরি এজেন্সি, ইনক, ৫৮০ ফিফথ অ্যাভেনু, নিউ ইয়র্ক-৩৬, নিউ ইয়র্ক। অথবা ডেভিড হাইম্যান অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড, ৭৬ ডিন স্ট্রীট, সোহো, লন্ডন ডব্লু-১। ইংল্যান্ড। ক্লার্ক মনে করেন, আধুনিক মানুষের ব্যক্তিকুন্ডলী এটুকুই যথেষ্ট। কোন মানুষ সম্পর্কে আর কিছু বেশি জানার কি কোন প্রয়োজন আছে? আর সময় কোথায়? জেনে হবেই বা কী?

যদিও ব্যক্তিজীবনে অনেক কিছুর সঙ্গেই তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। যেমন, ১৯৩৬-৪৪ হিজ মেজেস্টিজ একসচেকার অ্যান্ড অডিট ডিপার্টমেন্টের পদস্থ কর্মচারী, লন্ডনের ইনস্টিটিউশন অব ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারের সহকারী সম্পাদক, ১৯৪৯-৫০। অবশেষে ১৯৫১ থেকে পুরোপুরি লেখক জীবিকা। মাইক উলসনের সহযোগে তিনি অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রিফ এবং সিংহলের মহাসাগর অঞ্চলে ডুবুরীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ১৯৫১ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মহাকাশ বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯৪১-৫৬ রয়েল এয়ার ফোর্সের রেডার শিক্ষক। ওই সময়ে তিনি ফ্লাইট লেফটেনান্ট পদে উন্নীত হন। এ ছাড়াও এক ডজনেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, যেমন ব্রিটিশ ইন্টার-প্ল্যানেটারি সোসাইটি, আমেরিকান অ্যাসট্রোনটিকাল সোসাইটি, সিলোন অ্যাসট্রোনটিকাল সোসাইটি, প্রভৃতির সভ্য। সম্মান এবং অসাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ফ্যান্টাসি অ্যাওয়ার্ড ১৯৫১, কলিঙ্গ পুরস্কার ১৯৬১, ফ্র্যাংকলিন ইনস্টিটিউটের ব্যালেনটাইন মেডেল ১৯৬৩ এবং ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ইন্টারপ্ল্যানেটারি ফ্লাইট, দি একসপ্লোরেশন অব স্পেশ, দি কোস্ট অব

কোরাল, দি রিফ অব ট্যাপরোবেন, ভয়েস অ্যাক্রস দা সি, ইণ্ডিয়ান ওসান অ্যাডভেঞ্চার, ম্যান অ্যাণ্ড স্পেস, ভয়েসেস ফ্রম দা স্কাই প্রভৃতি। বিশ্বখ্যাত সায়েন্স ফিকসন : দি স্যাণ্ডস অব মার্স, এগেইনস্ট দা ফল অব নাইট, একসপিডিশন টু আর্থ, দি সিটি অ্যাণ্ড দা স্টার্স, টেলস ফ্রম দা হোয়াইট হার্ট, দি আদার সাইড অব দা স্কাই, টেলস অব টেন ওয়ার্ল্ডস, ২০০১ : এ স্পেস ওডেসি।

ক্লার্কের বিশ্ব স্বীকৃতি অবশ্যই তাঁর অনবদ্য সায়েন্স ফিকশনের জন্যে। যার মূল সূর : প্রচলিত বিজ্ঞানের বহুমুখী দিকগুলির ওপর নজর রাখা। আর সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মতই তাদের বিকাশের উপর নিশ্চিত সম্ভাব্যতা টানা। একটু নজর করলেই দেখতে পাবেন ভবিষ্যতের অনেক কথাই তাদের মধ্যে উঁকি মারছে।

যেমন?

'টেলস অব টেন ওয়ার্ল্ডস''-এর প্রথম গল্প 'আই রিমেমবার ব্যাবিলন' তার প্রমাণ! ছোট্ট এই গল্পটির এক ফাঁকে ক্লার্ক লিখেছেন : ১৯৪৫-এর কথা ধরুন। তখন আমি রয়েল এয়ার ফোর্সের রেডার অফিসার। বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমার জীবনে মৌলিক অনুভূতির সৃষ্টি সেই প্রথম ঘটল। প্রথম স্পুটনিক মহাকাশে সরব হয়ে ওঠার বারো বছর আগে আমার মনে হয়েছিল, টেলিভিশনের প্রচারের ব্যাপারে কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা একদিন অবশ্যই অপরিহার্যরূপে দেখা দেবে। কারণ ওই ধরনের একটি উপগ্রহের পক্ষে সুদূরে মহাকাশ থেকে পৃথিবী নামক এই গোলকটির অর্ধেকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তেমন কিছু শক্ত ব্যাপার হবে না। হিরোসিমা ঘটনার এক সপ্তাহ পর আমার এই কল্পনাটিকে আমি লিখে ফেলি। তাতে আমি বলেছিলাম, বিষুবরেখার উপর বাইশ হাজার মাইল ঊর্ধ্বাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বসান হোক। এরা দিনে একবার করে পৃথিবীকে বেষ্টন করে পরিক্রমণ করবে। ফলে পৃথিবী

থেকে মনে হবে ঊর্ধ্বাকাশে ওরা যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বেতার সংকেত আদান-প্রদানের জন্যে ওদের তোমরা রিলে স্টেশন হিসেবে ব্যবহার কর ......১৯৪৫-এর অক্টোবর সংখ্যার 'ওয়ার্লেস ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় আমার ওই কল্পনা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়। তখন আমি ভাবতেও পারিনি, এ ধরনের ঘটনা সত্যি সত্যিই একদিন বাণিজ্যিক সমাদর পাবে এবং আমার জীবনে। ওই কল্পনাটিকে পেটেন্ট করে নেয়ার কোন চেষ্টাও আমি করিনি। অবশ্য ওই সময়ে তেমন কিছু করা যেত কী না, সে সম্পর্কে আমার আশংকাও ছিল। ...তবু আমার সে কল্পনাকে বার বার বিভিন্ন লেখায় আমি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। এবং এখন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বেতার সংকেত আদান-প্রদানের ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত বাস্তবতা নিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে, লক্ষ করুন। কীভাবে এর জন্ম ঘটল সে কথা আমরা ভুলেই গেছি।...

বস্তুত, আজকের কৃত্রিম গ্রহ মারফত বার্তা বিনিময়ের উদ্ভাবক হয়ত অনেকে। কিন্তু অস্তিত্ব, বরং বলি বাস্তবতা প্রথম ধরা পড়েছিল ক্লার্কেরই কল্পনায়।

একটি নয়, তাঁর উপন্যাস এবং প্রবন্ধে আগবাড়িয়ে এমন কল্পনার নজির এক ডজনেরও বেশি। তাদের কোন কোনটি ইতিমধ্যে সত্যেও পরিণত হয়েছে। উদাহরণ: ১৯৪৫ সালে ক্লার্ক বলেছিলেন, মানব ১৯৬৯ সালে চাঁদে পদার্পণ করবে। এটি আক্ষিক হিসেবে বাস্তবায়িত। পরবর্তী ভবিষ্যৎবাণী : ১৯৮০র মধ্যে মানুষ ভিন্ন গ্রহে অবতরণ করবে। সম্প্রতি সোভিয়েত আন্তগ্রহযান মার্স-৩-এর মঙ্গল গ্রহের বুকে ধীর অবতরণ তার সম্ভাব্য সত্যের সংকেত। উনি বলেছেন, কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি ২০৩০; অমরত্বলাভ ২০৯০-এ।

যদিও ক্লার্ক মনে করেন, ভবিষ্যৎবাণী বড় কথা নয়। লেখক হিসেবে তাঁর কাজ, যা কিছু ঘটছে অথবা ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সচেতন করে তোলা, মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত করানো। এর জন্য দরকার পৃথিবীর প্রত্যেক অংশের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন।

২০০১!

৪ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান লেখকদের সভায় এই সুরেই কথা বললেন, আর্থার সি ক্লার্ক। হ্যাঁ, আর মাত্র আঠাশ বছর দেরি। তারপর এই মানব সভ্যতা কী ধরনের পরিবেশে গিয়ে পড়বে? আজকের যন্ত্রের ঘটনা সে দিনের মানুষের কাছে নিতান্ত সেকেলে এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে? হয়তো তাই স্বাভাবিক? এমন ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। ক্লার্ক বললেন, ইংলণ্ড,

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ২০০১-এর পৃথিবী সম্পর্কে বলছেন আর্থার ক্লার্ক। সম্মুখের আসনে। ডানদিক থেকে অধ্যাপক ডি এম বসু, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী প্রভৃতি। সর্বদক্ষিণে পিছনের সারিতে ডঃ এম দাশগুপ্ত ফটো—দেশ

সেখানে আমার জন্ম, সেটা এক সময়ে ছিল গণ্ডগ্রাম। আজ তার কী দারুন পরিবর্তন। একবার ভাবুন, টেলিগ্রাফ যখন সৃষ্টি হল তখন সেই ইংলণ্ডের সমাজে কী দারুন প্রতিক্রিয়াই না সৃষ্টি করেছিল? লণ্ডনের লোকজন সেদিন প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ। সুন্দরী যুবতী ... প্রণয়ের ... নেই, তাদের মেয়েদের কী হবে? ওরা যে ... হয়ে পড়বে। এমন সব বিক্ষুব্ধ কথা। পরে বিদ্যুতের আলো যখন জ্বলল, ইংল্যাণ্ডের গ্যাস কোম্পানিদের তখন মাথায় হাত। অথচ পরবর্তীকালে সত্যিই কি তেমন গুরুতর কিছু ঘটেছে?

তবে হ্যাঁ, ২০০১-এর ধাক্কা আরও বেশী। আরও ব্যাপক। কৃষিবিজ্ঞানের কথা ধরুন। মানব সভ্যতার কোন আদিযুগে কৃষিবিজ্ঞান জন্মলাভ করেছিল, সে প্রশ্নের উত্তর প্রত্নবিজ্ঞানীরা দেবেন। কিন্তু যদি বলি, ২০০১-এ কৃষিবিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটবে! এটা এমন কিছু কষ্ট কল্পনা নয়। একটা গরুর কথা ভাবুন। তার জন্ম হল। মাঠে চরে সে ঘাস খেল কয়েক বছর। বড় হল। ওজন দাঁড়াল পাঁচ হাজার পাউণ্ড। আমরা হিসেব করে দেখেছি, এই পাঁচ হাজার পাউণ্ড মাংসের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বেশ কিছুটা সময়। তার জন্যে ঘাসের জমি, এবং অন্যান্য ব্যাপারে কত ত্যাগ করতে হয়েছে আমাদের। উদ্দেশ্য প্রোটিন সংগ্রহ করা। সেটা দুধও হতে পারে অথবা মাংস। অথচ অত সব না করে শুধু পেট্রোলিয়াম থেকেই আমরা মাংস তৈরি করতে পারব। এ নিয়ে কাজও শুরু হয়ে গেছে। অতএব খাদ্যের জন্যে পশু-পালনের এখন কোন দরকার নেই। যা দরকার, সেটা হল, আপনার আত্মকের সাংস্কৃতিক ভুল যাওয়া। জানি, আমার পক্ষেও এটা যেমন অনায়াসসাধ্য নয়। আমি মাংস ভালবাসি। তবে পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি মাংস মনের দিক দিয়ে গ্রহণ করা কতখানি সহজ হবে!

শুধু মাংস কেন? সব রকমের খাদ্যই তখন তৈরি করা সম্ভব হবে ঘরে বসে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে। মানুষের প্রচলিত খাদ্য অভ্যাসের উপর সে এক প্রচণ্ড আঘাত। এ ছাড়াও মহাকাশযানে চড়ে চাঁদ বা অন্য গ্রহে যাওয়া আসার ব্যাপারও তখন দাঁড়াবে দৈনন্দিন ঘটনার মত। সেখানে, অর্থাৎ ওই মহাকাশযানে তার দেহ নিঃসৃত অপদ্রব্যগুলিকে দিয়ে তৈরি করা হবে ভক্ষ্য বস্তু। এর জন্যে প্রথমে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগান হবে। পরে সৌর শক্তিকে। পৃথিবীতেও খাদ্য সংশ্লেষণের জন্যে পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগান হবে।

মলিকুলার বাইওলজির ভূমিকা হবে অপরিহার্য। বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির সাহায্যে জটিল রোগ নিরাময়, খাদ্য প্রস্তুত, প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায়ে কারোর মগজে বিশেষ বিশেষ চিন্তা শক্তি ঢুকিয়ে দেওয়া—এ সবই তখন সম্ভব। মানে পাঠশালার পাট তখন থাকবে না। কারোর অঙ্ক শিখতে হবে, অথবা গান—উপযুক্ত রাসায়নিক অণুর মধ্যে থাকবে তাদের সংকেত। মগজে ওই সমস্ত অণু স্থাপন করলেই কাজ শেষ? ইয়েস, আই মিন ক্যাপস্যুল ফর ইনস্ট্যান্ট মেমারি! প্রজননগত পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের আয়ু অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

প্রচলিত শহরগুলি তখন অবলুপ্ত প্রায়। কাগজের মত হালকা অথচ ইস্পাতের চেয়েও শক্ত পদার্থের ছাউনি দিয়ে তখন তৈরি করা হবে থামে থামে একটি শহর। গম্বুজের মত। ফুলারের নাম হয়ত আপনারা শুনে থাকবেন। অদ্ভুত ধরনের ওই সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে এখন তিনি কাজ করছেন। ওই শহরের ব্যাস হবে দু শ থেকে পাঁচশ' মিটার। খাবার, ব্যক্তিগত আনন্দ, শিক্ষা—জীবনের যা কিছু উপভোগ্য তার সমস্ত ব্যবস্থাই তার মধ্যে থাকবে। এমন কি প্রাকৃতিক পরিবেশও তার মধ্যে তৈরি করা হবে জীবনের সঙ্গে সমতা রেখে। বেলুনের মত দেখতে ওই সমস্ত শহরের এক একটির জনসংখ্যা দুই থেকে পাঁচ হাজার। যখন গরম পড়বে, শহরের ভেতরের বাতাস সম্প্রসারিত হবে। ফলে

To Desh Weekly

"The best message I can convey to my Indian friends is one I heard Sri Nehru speak in Ceylon: "Politics and Religion are obsolete — the time has come for Science and Spirituality."

I hope that your own science-fiction writers can assist in making this come true!

All good wishes

Arthur C Clarke

Calcutta 5 Feb 72.

'দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশ্যে ক্লার্ক

বেলুনের মত সেটি ফুলে উঠে বাইরের বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে চলে যাবে শীতলতর কোন পরিবেশে। আবার সেখানে যখন তাপমাত্রা বাড়বে, ভেসে চলে যাবে অন্যত্র! কী অদ্ভুত কাণ্ড, তাই না?

মানুষের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে তখন আসবে আন্তর্জাতিকতা। আর সেটা হবে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে। আজকের সংবাদপত্র এবং বইপত্র তখন পুরাতন স্মৃতি রূপে হয় মিউজিয়ামে স্থান পাবে অথবা আস্তাকুঁড়ে। কারণ সব কিছুই তো তখন করবে কমপ্যুটার বা ক্ষুদ্রগণক ভিডিও টেপে কোটি কোটি বই [illegible] থাকবে। নিউইয়র্কের কোন লাইব্রেরির সাহায্য নিতে চান? জাপানের কোন অধ্যাপকের সঙ্গে পড়াশুনোর ব্যাপারে যোগাযোগ দরকার? বাড়িতে বসেই সুইচ টিপুন। সঙ্গে সঙ্গে ওই লাইব্রেরির যে বইটির সাহায্য আপনার দরকার তার বিশেষ পাতাটির ছবি আপনার ঘরের দেওয়াল জোড়া টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠবে। এবার দেখে নিন। সুইচ টিপুন, জাপানের জনৈক অধ্যাপক ওই পর্দার উপর ফুটে উঠবেন। এবার জিজ্ঞেস করুন, কী জানতে চান? যদি গান শুনতে চান অথবা পৃথিবীর কোন বিশেষ অঞ্চলের অভিনয়—এর সমস্ত সুযোগই আপনি পাবেন ঘরে বসে, ওই দেওয়াল জোড়া পর্দায়।

ভাবুন, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কী কী দরকার? খাবার, আনন্দ এবং [illegible] [illegible] পাবেন। অন্যদের উপকরণগুলিও সেখানে পাবেন। জীব-রসায়নের কৃপায় দেহের কোষের সমস্ত রকমের বৈকল্য দূর করা সম্ভব হবে। আর এর জন্যে দিনে আপনাকে হয়ত পরিশ্রম করতে হবে কয়েক মিনিট মাত্র। বাকি সময়টা অফুরন্ত অবসর। কীভাবে সেই অবসর যাপন করবেন, সমস্যা সেখানেই।

এই হল ২০০১-এর পৃথিবী।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অনুষ্ঠানে উপস্থিতমণ্ডলীর সঙ্গে ক্লার্ককে পরিচয় করিয়ে দেন অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ বিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

ফেব্রুয়ারি। গ্র্যাণ্ড হোটেল। ২৬৮ নম্বর কক্ষ। সকাল ৯টা।

দরজায় বোতাম টিপতেই ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এল—ইয়েস। আই অ্যাম হিয়ার।

পরমুহূর্তে দরজা খুলল। সামনে এসে দাঁড়ালেন সাতান্ন বছরের 'যুবক' আর্থার সি ক্লার্ক। গায়ে বুস শার্ট। পরনে সিংহলী লুঙি এবং পায়ে সিংহলী চপ্পল।

প্লিজ কাম অন ইন!

ভেতরে গিয়ে মুখোমুখি দুজনে দুটি সোফা দখল করে বসলাম।

এবং পরমুহূর্তে প্রশ্নোত্তর।

প্রঃ মিঃ ক্লার্ক, ১৯৪৫ সালে আপনি অদ্ভুত ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। বলেছিলেন, মানুষ ১৯৬৯ সালে চাঁদে অবতরণ করবে। একেবারে অবাক্ষরে তা মিলে গেছে। তাই না? —[illegible]

মিঃ ক্লার্ক: ও হো! ইটস অল অর্ডিনারি গেজ। দি প্রোবেবিলিটি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাসটাউন্ডিং। ডোন্ট বিলিভ ইট। তবে ১৯৪৫-এ ঐ ধরনের কথা বললেও, ১৯৫২-৫৩ নাগাদ ওটাকে আমি পাল্টে দিয়ে বলেছিলাম, মানুষ ১৯৬৯-এর মধ্যেই চাঁদে পাড়ি দেবে। [illegible] লণ্ডনের ইন্টার প্ল্যানেটারি সভার [illegible] সঙ্গে আমি পাঁচ পাউণ্ড বাজিও ধরেছিলাম। [illegible] পাচ্ছ, আমি [illegible] আমার ভাবী কাহিনীকার কল্পনা করার অধিকার আমার আছে। যদি কোনভাবে সেটা বাস্তবে মিলে যায় ভাল।

প্রঃ এই কল্পনার কথা ধরেই জিজ্ঞেস করি, আপনি বলেছেন ২০৩০-এর মধ্যে মানুষ কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে। এই কৃত্রিম জীবন বলতে কি আপনি মানুষের কথা বোঝাচ্ছেন, মিঃ ক্লার্ক?

আপনার
পরিবারের জন্য
চাই সবচেয়ে
সেরা জিনিস!
COLGATE
DENTAL CREAM
DCG.41BN
কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন...
সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পন্থায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—
যা দাঁতের ... ইতিপূর্বে শোনা যায় নি।
৮৫ ভাগ পর্যন্ত ... দূর করা যায়।
সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিণ্টের গন্ধ—তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেণ্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালবাসে!
মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও উজ্জ্বল দাঁতের জন্য... দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক, অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট!
দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য
ব্যবহার করুন
কলগেট টুথ ব্রাশ
১৫ রকমের—
প্রত্যেকের উপযুক্ত!

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মবধ —শ্রীমতী চন্দ্রকলা দেবী

(শ্রীসন্তোষকুমার বসু, আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে)

পোল্যাণ্ডের উপমন্ত্রী মিঃ জান মিত্রেগা সম্প্রতি একটি অর্থনৈতিক প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন ও উত্তর বিহার অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় মিথিলায় লোকচিত্রাবলীসম্ভার দেখে তিনি মুগ্ধ হন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, মিত্রেগা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের মিথিলা চিত্রসম্ভার কেনার জন্য অর্ডার দেন। শুধু তাই নয়, স্বদেশে ফিরে গিয়ে এই জাতীয় চিত্র-সম্ভারের আরও অর্ডার দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন। সংবাদটি শুধু বিস্ময়কর নয়, অভাবনীয়ও। ইতিপূর্বে কোনও বিদেশী সরকার এই দেশের লোকচিত্র সংগ্রহের জন্য এত বিপুল অর্থব্যয় করেছেন কিনা আমার জানা নেই।

মিথিলার লোকচিত্রাবলী আজ মধুবাণী চিত্র হিসাবে অধিক পরিচিত। ইতিপূর্বেই উত্তর ভারতের এই লোকচিত্রকলা মনীষী-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এবিষয়ে প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হয়। এমন কি, কয়েক মাস পূর্বে বিহার হস্তশিল্প সংস্থা আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে কয়েকটি মধুবাণী চিত্রও দেখা গেছে। আশুতোষ মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সম্প্রতি মধুবাণী চিত্র তথা মিথিলা শিল্পের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আশুতোষ মিউজিয়মের কিওরেটর অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার বসু সম্প্রতি গবেষণা ও সংগ্রহকল্পে উত্তর বিহার ও নেপাল পরিভ্রমণ করেন ও মধুবাণী চিত্র তথা মিথিলা শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করে আনেন। প্রদর্শনীতে মিথিলার লোক-চিত্র ও অন্যান্য শিল্প নিদর্শন দেখার সুযোগ দান করে তিনি ও মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ রসিকজনের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

প্রাচীনকাল থেকেই মিথিলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবাণীতে মহিলাগণ দেওয়ালে নানা ছবি এঁকে আসছেন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে বর্ণিত নানা কাহিনী ও স্থানীয় পূজো-পার্বণ ও লোকাচারকে ভিত্তি করেই এই লোকচিত্রধারা গড়ে ওঠে। চিত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত। সরঞ্জামও সাধারণ ও সামান্য। তুলির পরিবর্তে সরু কঞ্চির সাহায্যে গ্রামের মহিলারা রেখাভিত্তিক ছবি আঁকেন, পরে শূন্য স্থানগুলি কঞ্চির মুখে সরু তুলো জড়িয়ে দেশীয়, গভীর লাল, নীল, কালো ও হলুদ রঙ ভরে ফেলেন। রেখাভিত্তিক ছবিগুলির একটি নিজস্ব গ্রাফিক বৈশিষ্ট্য আছে, সম্ভবত সে জন্যই পোলিশ সরকার এগুলি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ, গ্রাফিক শিল্পকলা ক্ষেত্রে পোল্যাণ্ডের অবদান সুবিদিত। কয়েকটি ছবিতে সূক্ষ্ম সূচি-শিল্প, বিশেষ করে বঙ্গদেশের কাঁথার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। সেটা স্বাভাবিক। লিপি থেকে শুরু করে লোকাচার, লোক ও সূচিশিল্পের ক্রমবিকাশে মিথিলা ও সমগ্র বাংলার মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে। বিশেষ করে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি আজও আমাদের পরমপ্রিয়। প্রদর্শনীতে ৩৪টি মধুবাণী চিত্র দেখা যায়। জগদম্বা দেবীর দুর্গা, ভগবতী দেবীর বৃক্ষ ও অলঙ্কারমূলক খোবা ঘর, ইন্দুকুমারীর নীলরঙ প্রধান ভগবতী অন এলিফ্যান্ট, চন্দ্রকলা দেবীর সূচিশিল্পধারা প্রধান ভীষ্ম ইন ভারত ওয়ার ও যমুনা দেবীর দুর্গা ও কালী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমপোজিশন, রেখা ও রঙ ব্যবহারের দিক থেকে উমা দেবীর ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী এবং দুর্গা অন টুইন টাইগারস এই শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন। হস্তশিল্পের মধ্যে মাটির তৈরী কয়েকটি পাত্র ও মূর্তি চোখে পড়ে। (রিচুয়াল ভাস, অরূপ পণ্ডিত) ছেঁড়া কাপড় ও মাটির তৈরী কয়েকটি পুতুলও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে সিকি ঘাসের তৈরী কয়েকটি রঙীন ঝাঁপি দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন।

*

অনেকের ধারণা যে হাতে তৈরী কাগজ ঠিক দৈনন্দিন লেখার উপযোগী নয়। কারণ তাঁরা মনে করেন এ জাতীয় কাগজে লেখার সময়ে কলম ঠিক আপন গতিতে চলে না, নিব কাগজে বাধা পায় বা কালী কাগজের ওপর ছড়িয়ে পড়ে, অনাথায় কলম দেওয়ামাত্রই কাগজ কালী শুষে নেয়। শুধু তাই নয়, কয়েকজনের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল যে হাতে তৈরী কাগজ সূক্ষ্ম কোনও মুদ্রণ কাজেরও উপযোগী নয়। এই দুটি ধারণাই যে মিথ্যা তার প্রমাণ

পাওয়া গেল অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে প্যাপিরাস আয়োজিত হাতে তৈরী কাগজের এক প্রদর্শনীতে।

কাগজ ও বোর্ড হাতে তৈরী করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন হস্তশিল্পী ও সংস্থা আছে। শহরের দূরে থেকে তাঁরা শহরের রুচিসম্মত চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ে সঠিক জানতে পারেন না। বাজারের চাহিদা ও সেই অনুযায়ী রুচি ও প্রয়োজন মত সরবরাহের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডমেড বোর্ড অ্যাণ্ড পেপার মেকারস্ অ্যাসোসিয়েশনের যোগসূত্র হিসাবে 'প্যাপিরাস' সংস্থার উৎপত্তি। শহরের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও অর্ডার বিতরণ, অর্ডার মত প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ তথা বিতরণ করাই প্যাপিরাসের উদ্দেশ্য। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন শ্রেণীর লেখার প্যাড ও খাম, অন্তর্দেশীয় খাম, শুভবিবাহের জন্য ছাপা নিমন্ত্রণপত্র, ছবি, ক্যালেণ্ডার, পরিচিতি ও ধন্যবাদসূচক কার্ড ইত্যাদি নানা নিদর্শন চোখে পড়ে। বাস্তবিক বিভিন্ন কাজের উপযোগী এত প্রকার কাগজ আজকাল যে এই দেশে হাতে তৈরী হচ্ছে, প্রদর্শনী না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল লেখার প্যাডের অ্যালবাম ও নিমন্ত্রণ লিপির অপরূপ পরিকল্পনা। এগুলিকে আধুনিক রুচিসম্মত ও জনপ্রিয় করার জন্য প্যাপিরাস কর্তৃপক্ষ শিল্পী সংস্থা, বিশেষ করে শিল্পায়নের পরিচিত শিল্পীদের সাহায্য নিয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখার প্যাডের মলাটের দুটি পরিকল্পনাতেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। দুটি ডিজাইনই প্রতীকমূলক, একটি নামাবলীর, অপরটি পুঁথির, দুটিই হাতে তৈরী বিশেষ কাগজে সিল্কস্ক্রীন পদ্ধতিতে মুদ্রিত। বস্তুত শুধু দৈনন্দিন লেখার জন্য নয়, যাঁদের রুচি আছে তাঁরা বিবাহ

হাতে তৈরী কাগজের লেখার প্যাডের মলাট

বা অন্যান্য উৎসবে অনায়াসেই এই জাতীয় লেখার প্যাড উপহার দিয়ে আপন রুচি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন। রেশম সংযোগে তৈরী পাতলা কাগজগুলি নিমন্ত্রণপত্র ছাপার পক্ষে আদর্শ—বিশেষ করে ছাপা একটি নিমন্ত্রণ লিপির নিদর্শন দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। ছোট্ট হাতে তৈরী পরিচিতি কার্ডের বাঁদিকের কোণে ছোট প্রতীক সুরুচির পরিচায়ক। প্রদর্শনীতে ছবি আঁকার উপযোগী নানা জাতীয় কাগজ চোখে পড়ে—বিশেষ করে নূতন ধরনের কাগজের কারুকার্য দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। বলাবাহুল্য চান্দ্র মানব অভিযানের ঐতিহাসিক ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই প্রতীকমূলক এ জাতীয় কাগজ তৈরী করা হয়েছে। প্রদর্শনীভুক্ত বিভিন্ন নিদর্শনই খাদি গ্রামোদ্যোগে কেনা যায়। তবে কর্তৃপক্ষ এগুলির বিতরণ বিষয়ে যদি আরও সচেতন হন তাহলে অচিরেই হাতে তৈরী কাগজের বিভিন্ন নিদর্শন অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করবে। অর্থাৎ বিভিন্ন শহরের পরিচিত এলাকায় যদি এগুলির যথাযথ বিক্রয় ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে জনসাধারণ যে দৈনন্দিন প্রয়োজন ও উৎসবাদিতেও হাতে তৈরী কাগজ ব্যবহারে অভ্যস্ত হবেন ও পরোক্ষে এই শিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের সাহায্য করতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিবেচনা করবেন।

চিত্রপ্রিয়

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মের পেছনে একটা করে রোমহর্ষক গল্প আছে। যে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা প্রতিটি জন্মকে ঘিরে থাকে—তার সঙ্গে তুলনা চলে আর কিসের?

একজন নারীর সারাজীবনে মোট চার শো বার মাসিক হয় অর্থাৎ সেই নারী তার জীবনে চার-শো বার সন্তান জন্ম দেবার জন্য তৈরী হয়ে থাকে। একটি পুরুষ প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ স্পার্ম উৎপাদন করতে পারে। সেই লক্ষ অযুতের মধ্যে কখন একটি-মাত্র গিয়ে ঠিক মিশ খাবে একটি নারীর শরীরের ডিমে, তারপর শুরু হবে আর একটি নতুন প্রাণের ইতিহাস। এই মিলন কখনো পণ্ডশ্রম নাও হতে পারে। অনেক দম্পতি থেকে যায় নিঃসন্তান, অনেক প্রাণ গর্ভেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সেসব বাধা পেরিয়ে গেলেও, তার পরেও চলবে ন-দশ মাস প্রতীক্ষা, আঁতুড় ঘর বা হাস-পাতাল বা নার্সিং হোমের দরজার বাইরে শঙ্কাতুর পিতার পায়চারি, একটি সম্ভাবনাকে গর্ভে ধারণ করে করে সহ্যের শেষ সীমায় আসা ভাবী-মাতার মুখ। তখনও কেউ বলতে পারে না, আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানও সঠিকভাবে বলতে পারেনি, এর পরের মুহূর্তেই যে জন্ম নিতে যাচ্ছে, সে একটি ছেলে না মেয়ে! আমাদের মনে পড়ে না যে আমাদেরও জন্ম এইভাবে। এই নানা অশান্তিময় জীবনের মাঝখানে হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়লে, হাসি পাবেই।

এই বায়োলজিক্যাল জন্মের আগে থেকেই কাহিনী দানা বাঁধে। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিয়ের সব ঠিকঠাক। হঠাৎ জানা গেল, পাত্রী পক্ষের বংশে একটু খুঁত আছে। অমনি ভেস্তে গেল বিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু-জনের মিলিতভাবে যে এক সেট ছেলেমেয়ে জন্মাবার কথা ছিল, সেই সম্ভাবনাটি নিহত হয়ে গেল, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো আর এক সেট ছেলেমেয়ের নিয়তি। এক প্রেমিকা তার প্রেমিককে শেষ মুহূর্তে নিরাশ করে বিয়ে করলো বাপ-মায়ের কথা-মতন এক গোলগাল পাত্রকে, একটি বাপের সুপুত্তুর ছেলে টাকা পয়সা কিংবা রূপের দর-কষাকষিতে শেষ পর্যন্ত বনলো না বলে বিয়ে করলো না প্রতিবেশিনী মেয়েটিকে— এরা কেউ জানে না, এরা এদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের চরিত্র নিয়ে কি রকম ছিনিমিনি খেলছে। এই ধোঁয়াটে অবস্থাটাকে যুক্তি-সিদ্ধ করার জন্য আগেকার দিনে মাসী-পিসীরা বলতেন, যার যেখানে কপালে লেখা আছে, সেখানে বিয়ে হবেই। কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

আমি অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি, বিয়ের আগে আমার মাকেও অন্তত আট-দশবার পাত্র পক্ষের সামনে দর্শন দিতে হয়েছে। ঘর জোড়া সতরঞ্চির একপাশে বসে আছেন গুটিকতক সুসজ্জিত গাট্টাগোট্টা লোক, প্রত্যেকের সামনে প্লেটে সাজানো সন্দেশ-সিঙ্গাড়া, আর সতরঞ্চির ওপাশে লাজুক, নতমুখী—আমার মায়ের কিশোরী বয়েসের শরীর। তখন পাত্র স্বয়ং আসার রেওয়াজ ছিল না, পাত্রের বাবা-কাকারাই আসতেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে রূপ গুণের পরিমাণ। পরে খবর দেবো বলে চলে যাওয়া মানেই কোনো আশা নেই। শেষ পর্যন্ত বরিশালের এক পাত্রের সঙ্গে আমার মায়ের বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, পাত্রের চেহারাও ভালো এবং বিশেষ দাবি-দাওয়া নেই। বিয়ের তারিখ ও লগ্নও যখন ঠিক হয়ে গেল, তার-পর কে যেন একজন এসে খবর দিল যে, পাত্রের নিজের কাকা পাগল। যে-বংশে পাগলামির ধারা আছে, সে বংশে বিয়ে দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তক্ষুনি সেই সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেওয়া হলো আগে বাতিল করা এক পাত্রের সঙ্গে। সেই আগে বাতিল করা পাত্রই আমার বাবা।

বরিশালের সেই ভদ্রলোক যথাসময়ে অন্য একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন, এবং

তাঁরও দুটি ছেলে হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ভদ্রলোক পরিণত বয়েসে সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর ছেলে দুটিও পাগল কিনা খোঁজ পাইনি। আমাদের যে আত্মীয়টি শেষ মুহূর্তে খবর এনে আমার বাবাকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি যদি না আসতেন বা ঐ খবরটা না পেতেন, তা হলে আমার হওয়ার কথা ছিল ঐ পাগল পিতার সন্তান, এবং হয়তো এতদিনে আমিও পাগলামির পথে......। একা ঘরে এই সব ভাবতে ভাবতে আমি হেসে ফেলি।

আমাদের গোটা 'রঞ্জন' বংশের জন্মই একটা হাস্যকর ঘটনা থেকে। আমাদের বাড়ির পুরুষদের সকলেরই নামের মাঝখানে রঞ্জন শব্দটা আছে। যেমন, আমার বাবার নাম চিররঞ্জন, আমার জ্যাঠামশাইয়ের নাম প্রিয়রঞ্জন ইত্যাদি। আমার ঠাকুর্দার নাম সারদারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই সারদারঞ্জন নামের মানুষটির জীবন কাহিনী কি রকম আলোচনা করা যাক।

সারদারঞ্জন পণ্ডিত ছিলেন না, বিশেষ লেখাপড়া করেননি—পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে তা জানা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, কিছু সংস্কৃত শ্লোক ছেলেবেলা থেকেই শুনে শুনে শিখছিলেন—সেইগুলিই স্থানে অস্থানে আউড়ে পণ্ডিতীর ভাণ করতেন। সারদারঞ্জন মূলত পূর্ববঙ্গের অধিবাসী নন। পূর্ববঙ্গে এক সময় ব্রাহ্মণের বেশ অনটন ছিল, বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ আমদানী করা হতো। স্থানীয় কায়স্থ ও বৈশ্য সম্প্রদায় নিজেদের ধনাঢ্যতা ও আর্য-আনা জাহির করার জন্য স্বগ্রামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বাইরে থেকে পুরুত আনাতেন।

আমাদের কুল গোত্র পরিচয়ে দেখা যায়, আমাদের খড়দা মেল। অর্থাৎ কলকাতার কাছাকাছি খড়দা অঞ্চলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বাড়ি ছিল। অনেকে যেমন দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়ে একজন নেপালী চাকর সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে, সেইরকম ভাবেই বিক্রমপুরের রায়েরা কলকাতা থেকে সারদারঞ্জনের বাবা অঘোরনাথকে পূর্ববঙ্গে নিয়ে যান। খড়দা থাকার সময় অঘোরনাথের জীবিকা কি ছিল আমি জানি না, তবে পূর্ববঙ্গে এসে তাঁর প্রধান জীবিকা হয় বিয়ে করা। মোটমাট সাঁইত্রিশটি বিয়ে তিনি করে উঠতে পেরেছিলেন। আরও বেশী যে পারেন নি—তার কারণ অঘোরনাথ দীর্ঘজীবী হন নি। সাঁইত্রিশটি বিবাহের ফলে মোট আশী-নব্বইটি ছেলে মেয়ের একটি বিশাল বংশ তিনি গোটা পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র একশো দশ বছর আগেকার ঘটনা। এদিকে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন সদ্য জন্মেছেন এবং বিদ্যাসাগর মশাই বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন এই কথা বলে দেওয়ায় নানান শত্রুর হাতে খুব নাস্তানাবুদ হচ্ছেন।

কোন্ সন্তানটি পুত্র হবে, কোনটি কন্যা—তা আগে থেকে ঠিক করার কোনো উপায় নেই। তবুও, সব দেশেই নারী পুরুষের সংখ্যার একটা মোটামুটি সমতা থাকে, খুব একটা হেরফের হয় না। কোনো কারণে কোনো দেশে পুরুষের সংখ্যা অকস্মাৎ কমে যেতে পারে—যেমন হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানিতে। সেইরকম কোনো কারণেই কি গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে পুরুষের সংখ্যা কমে গিয়ে বহু বিবাহের এমন পসার জমেছিল? হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই অরক্ষণীয়া মেয়ের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। সাধারণভাবে যে-সব মেয়ের বিয়ে হবার কোনো উপায়ই ছিল না—সেই সব মেয়েকে ব্যবসায়ীরা নৌকো ভরে নিয়ে গিয়ে চালান দিত অন্যত্র। গ্রামের নদীর ঘাটে নির্দিষ্ট এসে ভিড়তো সেই সব নৌকো—প্রকাশ্যে মেয়ে চালান হতো। ঐ সব মেয়েদের বলা হতো 'ভরার মেয়ে'। তাদের কোনো জাত নেই। ঐ উপায়ে মুসলমান মেয়ের সঙ্গে হিন্দুর বিয়ে হয়ে গেছে, এবং বিশ্লবী হিন্দু বাড়ির নতুন বৌ লাউকে কদু বলায় হুলুস্থুলু পড়ে গেছে—এরকম গল্প আছে।

অথচ, রাজামহারাজা কিংবা নবাব বংশ ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন কোনোকালেই ছিল না আমাদের দেশে। ইতিহাস—পুরাণে সেরকম বিশেষ নজির নেই। এমন কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ভোগবিলাসী ঋষিরাও এক-দার। একমাত্র যাজ্ঞবল্ক্যেরই দুই স্ত্রী দেখতে পাচ্ছি।

মুসলমান সমাজের মধ্যে জাতিভেদ নেই বলে তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো শ্রেণী গত শতাব্দীতে বিবাহ ব্যাপারে একাধিপত্য করতে পারে নি। কিন্তু হিন্দু সমাজে জাতি ভেদ প্রথার বীভৎসতম দিকটি এখন প্রকট। জাতির পাঁতি মানতে গিয়ে জ্ঞান, ধর্ম, ন্যায় সব ভেসে গেছে। এবং ব্রাহ্মণ সমাজ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এই প্রথাকে আরও জোরদার করছে। জ্ঞানচর্চা চুলোয় গেছে—বিনা পরিশ্রমে লোকের কাছ থেকে কলাটা মূলোটা আদায় করা, সম্বৎসর খাদ্যের বাঁধা ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং ফাউ হিসেবে শ্রদ্ধা ভক্তি পাওয়া—এর জন্য তারা যে-কোনো নীচতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিল। কত রমণীর

চোখের জল যে তখন এদেশের মাটি ভিজিয়েছে, এখন তা আর জানার উপায় নেই। এবং যেহেতু বংশ মর্যাদা এবং কৌলিন্যের গৌরবই ছিল তখনকার ব্রাহ্মণ-দের একমাত্র ক্যাপিটাল—সেই জন্যই সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাবার সহস্র চেষ্টা। নানারকম বিধিনিষেধ ও ছুৎমার্গের প্রচলন হয় সেই সময় থেকে। বিশ্বামিত্র চন্ডালের বাড়িতে অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন—কিন্তু গত শতাব্দীর ব্রাহ্মণদের অন্য যে-কোনো অব্রাহ্মণের ছোঁয়া থেকেই আপত্তি। অধিকাংশ উপাধ্যায়রাই যে সেন-আমলে এফিডেবিট করা ব্রাহ্মণ সে তথ্য গোপন ছিল। ছুৎমার্গের জন্যই সেই সময় থেকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

যাই হোক সারদারঞ্জনের বাবা অঘোর-নাথ বিয়ে করতে করতে হাঁপিয়ে গিয়েই বোধহয় মারা যান। কুলীনদের তখন খুব রবরবা। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি হলেও আপত্তি নেই, কিন্তু পুরুষদের বংশ মর্যাদায় কোনো ভঙ্গ দোষ থাকলেও চলবে না। সেই সুবাদে একটার পর একটা বিয়ে করা ও সারা বছর কারই শ্বশুরবাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়া। ছেলে-মেয়ে মানুষ করারও কোনো দায়িত্ব নেই। কুলীনদের ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারটা কি, তা আমি এখনও স্পষ্ট বুঝি না, তবে শুনেছি, বিয়ের ব্যাপারে ভঙ্গ কুলীনরাই ছিলেন বেশী তৎপর। বিদ্যাসাগর এদেরই বলেছিলেন 'পাষণ্ড ও পাতকী'। এই রকমই এক ভঙ্গ কুলীনকে এক সময় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার তো এতগুলো শ্বশুরবাড়ি, সব জায়গায় যাওয়া হয়? তিনি বলেছিলেন, যেখানে ভিজিটের টাকা পাই, সেখানে যাই।

অঘোরনাথের বহু সংখ্যক ছেলেমেয়ের মধ্যে অন্যতম সারদারঞ্জন নিজেই নিজের পথ দেখে নেন। ষোল বছর বয়েসেই তিনি ফরিদপুরের ফুলপুর নামের ছোট শহরে এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করেন ও যৌতুক বাবদ সেখানে এক খণ্ড জমি আদায় করেন। শ্বশুরের সহায়তাতেই সেখানে একটি ছোট্ট বাড়ি তুলে তিনি নিজের বংশ স্থাপন করলেন।

সারদারঞ্জনও পর পর বিয়ে করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন সম্ভবত, কারণ, তাঁর আর কোনো জীবিকা ছিল না। কিন্তু তিনটি মাত্র বিয়ে করেই তিনি হঠাৎ থেমে যেতে বাধ্য হলেন। তাদিনে যুগের হাওয়া পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। এবং আমার বাবা যে মাত্র একটি বিয়ে করেছিলেন—এটা একটা বৈপ্লবিক ঘটনার মতন। অঘোরনাথের কাল থেকে আমার বাবা চিররঞ্জনের কাল—মাত্র ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে এই রীতি পরিবর্তন। এক ইংরেজি শিক্ষার কুফল ছাড়া আর কি বলা যায়। তা ছাড়া, বীরসিংহ গ্রামের

সেই খর্বকায় ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করার পর বহু বিবাহ বন্ধ করার জন্যও উঠে পড়ে লেগেছিলেন। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এক একজন কীর্তিমান পুরুষের এক ডজন দু' ডজন স্ত্রীর সংখ্যাও তিনি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এবং বৃদ্ধ বয়েসে একটি কিশোরী কন্যার পানিগ্রহণের অপরাধের জন্য তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরও মুখ দর্শন করতে চান নি—এই গল্প এক সময় সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বরিশাল জেলার কলসকাটি গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুজ্জের পঞ্চান্ন বছর বয়েসেই স্ত্রীর সংখ্যা ছিল একশো সাত, সেই তুলনায় সারদারঞ্জনের বাবা অঘোরনাথ তো ছেলেখেলা করেছেন মাত্র।

লোকে বলে, দুটি বিয়ে করেই সারদারঞ্জনের আশ মিটে গিয়েছিল। তাঁর দুই স্ত্রী তখন একই বাড়িতে। তখন বিয়ে করে বৌকে বাপের বাড়ি ফেলে রাখার নিয়মটি আস্তে আস্তে অপসৃত হচ্ছে। নেহাৎ ধনীরা ছাড়া, অন্য সাধারণ গৃহস্থ মেয়ের বিয়ে দেবার পর সাধ্যমতন বস্ত্র অলংকার দিয়ে তাকে শ্বশুরের ভিটের পৌঁছে দিয়ে যায়। তারপর তার ভাগ্য সে বুঝুক।

১২৭৭ সালে আর একটা ব্যাপার হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ সমাজে প্রায় বজ্রপাতের মতন ঘটনা বলা যেতে পারে। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুজ্জো নামে এক কুলীন মাত্র ছ'টি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর এক স্ত্রী রুক্মিণী ভারী দুঃসাহসিনী। স্বামী তাকে নেয় না—এই জন্য খোরপোশের দাবিতে তিনি আদালতে মামলা করে দিলেন। এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি। আদালতে সাহেব হাকিমের সামনে লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুজ্জো বললেন, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বউদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কুলীনদের থাকে না। তা ছাড়া, আমার এতগুলো বউ, সবাইকে অন্ন খাওয়াবো কি করে? জজ নর্মান সাহেব বললেন, খাওয়াতে পারবে না তো বিয়ে করেছিলে কেন? এখন জেলে যাও!

বাড়িতে একই সঙ্গে দুই স্ত্রীকে নিয়ে সারদারঞ্জন বেশ মুশকিলে পড়েছিলেন। ঝগড়া ঝাঁটির চোটে বাড়িতে কাক চিল বসতে পারে না। মাঝে মাঝে বৈরাগ্যেরও উদয় হয় সারদারঞ্জনের মনে। টাকা-পয়সাও খুব টানাটানি, শ্বশুরবাড়িতে [illegible] প্রধান শ্বশুরে মারা গেছেন। শ্যালকরা উপযুক্ত হয় নি। স্বল্প বিদ্যা সম্বল করে সারদারঞ্জন একটি পাঠশালা খুলেছেন, তাতেও বিশেষ আয় নেই।

সারদারঞ্জনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কোনো সন্তান হয় নি, সেই স্ত্রী বড় সাংঘাতিক ভালো স্বাস্থ্য এবং মুখরা। দ্বিতীয় বিয়েতে দুটি মেয়ে একটি ছেলে। এই ছেলেটি ছিল সারদারঞ্জনের নয়নের মণি। সারদারঞ্জন ছেলেটিকে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করতেন না, তার নাম ছিল বিশ্বরঞ্জন, ডাক নাম বিশু, চেহারাটিও খুব ফুটফুটে। এই ছেলেটির একবার কঠিন অসুখ হয়েছিল। বিবরণ শুনে মনে হয় টাইফয়েড। তার [illegible] কালি হয়ে যায়। শরীর মিশে যায় বিছানার সঙ্গে, স্মরণ শক্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বিশু বিশু বলে ডাকলেও সাড়া দিত না।

প্রথম দিকে, স্বাভাবিক নিয়ম মতন কবিরাজী চিকিৎসাই চলছিল। কিন্তু কোনো ফল দেখা যাচ্ছিল না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা তখন সদ্য গ্রামাঞ্চলে ঢুকেছে, ম্যাজিকের মতন সন্দেহ ও বিস্ময় নিয়ে লোকে গ্রহণ করছে এই পদ্ধতিটিকে। আট-দশ মাইল দূরে একজন এল এম এফ পাস ডাক্তার আছেন, তাঁকে 'কল' দিয়ে আনা হলো এবং তাঁর ওষুধে দু'এক দিনের মধ্যেই রোগীর কিছুটা উন্নতি প্রত্যক্ষ করা গেল। কিন্তু অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়তেই ডাক্তারকে আবার ডাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারটি পূর্বের ভিজিটের টাকা অগ্রিম না দিলে তাঁকে কিছুতেই আনা যাবে না—এবং কলকাতা থেকে বিলিতি ওষুধ আনাবার জন্যেও আরও একগাদা টাকা চেয়ে বসলেন। সারদারঞ্জনের হাতে তখন একটা পয়সা নেই। ঘটি বাটি বন্ধক দেওয়াও হয়ে গেছে। সারদারঞ্জন ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার ছেলেকে আপনি বাঁচিয়ে দিন এবারের মতন। আমি যেমন করে পারি আপনার দেনা একদিন না একদিন শোধ করে দেবো। ডাক্তারটি নিষ্ঠুরের মতন উত্তর দিয়েছিলেন, ওষুধ কোম্পানি কি আপনার একথা শুনবে? ওষুধ চাই, আসল বিলিতি ওষুধ, বুঝলেন? না-হয় তো এক কাজ করুন। কল দ্যাট কবিরাজ এগেন। মকরধ্বজ

ফক্ক খাওয়াক। এসব পাড়াগাঁর জায়গায় এতকাল ঐ সব কবিরাজী ওষুধ খেয়েই তো লোকে মরেছে। আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না। বিনা ওষুধে আমি চিকিচ্ছে করতে শিখিনি।

চিন্তায় ভাবনায় দুঃখে সারদারঞ্জন প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠেছিলেন। আর সহ্য করতে পারছিলেন না। নতুন বৈশাখ এসেছে, কিন্তু সারদারঞ্জন টাকা রোজগারের কোনো উপায় শেখেন নি। শেষ পর্যন্ত কোনোরকম দিশা না পেয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। রুগ্ন ছেলে, অনূঢ়া দুই কন্যা ও দুই স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন সারদারঞ্জন।

ফিরে এলেন আটদিন বাদে। নদীর ঘাটে সারদারঞ্জনের নৌকো লাগতেই পাড়া সুদ্ধ লোক সেখানে ছুটে গিয়েছিল মজা দেখতে। কেন না, সারদারঞ্জন নৌকো থেকে নামলেন বরের বেশে, পেছনে লাল চেলি পরা একটি তের বছরের মেয়ে। মস্ত বড় ঘোমটায় তার মুখ দেখা যায় না। বিস্তর পোঁটলাপুটলি সঙ্গে নিয়ে আরও দুটি লোকও এসেছে। উপায়ন্তর না দেখে অর্থ সংগ্রহের একমাত্র রাস্তা হিসেবে সারদারঞ্জন ঝটিতি আর একটি বিয়ে করে এসেছেন। সম্ভবত কথাবার্তা আগে থেকেই চলছিল। এতদিন সারদারঞ্জন রাজি হন নি, হঠাৎ মনস্থির করেই নিকটতম লগ্নে বিয়ে করে ফেলেছেন, শুধু পণের টাকাটা পাবার জন্য। শোভাযাত্রা সহকারে নদীর ঘাট থেকে এসে সারদারঞ্জন যখন নিজের বাড়ির চৌহদ্দিতে পা দিলেন, তার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রতিবেশীরা তাঁর ছেলেকে পুড়িয়ে এসেছে। সারদারঞ্জনকে দেখেই দুই স্ত্রী আর্তনাদ ও গালাগালি করতে করতে আছড়ে পড়ে মাটিতে। নতুন বৌ ভ্যাবাচ্যাকা। খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল উঠোনের মাঝখানে। ঐ উটকো এবং মোটেই প্রকৃষ্ট-ভাবে আনয়ন করা হয়নি যাকে, সেই নব পরিণীতা মেয়েটিই আমার আপন ঠাকুমা।

তৃতীয় বিবাহের পর সারদারঞ্জনের ভাগ্য অনেকটা ফিরে যায়। ছেলের শোক ভুলতে কিছুটা সময় লেগেছিল। তবে নতুন বউ এসেই অতি দ্রুত দুটি পুত্র সন্তান উপহার দিলেন। তারপর একটি মেয়ে, আবার দুটি ছেলে। সবচেয়ে ছোট ছেলেটির মুখ চোখ অবিকল সারদারঞ্জনের সেই প্রথম মরা ছেলের মতন, যার চিকিৎসার কারণে এই বিয়ে। লোকে বলাবলি করতে লাগলো, সেই ছেলেই আবার তার বাবার কাছে ফিরে এসেছে। একেই বলে মহামায়ার খেলা। সেই ছেলেরও নাম রাখা হলো বিশ্বরঞ্জন, কিন্তু ডাক নাম বিশুর বদলে রঞ্জু। ডাক্তারের খরচ জোটাতে না পারার জন্যই প্রথম বিশ্বরঞ্জন মারা গিয়েছিল, তাই সারদারঞ্জন ঘোষণা করলেন, এই কনিষ্ঠ ছেলেকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। ঢাকায় তখন মেডিক্যাল কলেজ হয়ে গেছে, সেখান থেকে পাশ করিয়ে এনে দেশের বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত করাবেন ডাক্তার ছেলেকে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোকেরা এসে তাঁর বাড়িতে ধর্না দেবে।

তৃতীয় বিবাহের টাকা থেকেই সারদারঞ্জন কিছু ধান্য জমি কিনে ছিলেন। রায়তদের দিয়ে চাষ করাচ্ছিলেন। হঠাৎ কে যেন একজন বুদ্ধি দিল, ঐ নাবাল জমিতে ধান চাষ করে তেমন লাভ নেই, বিঘে প্রতি আট-দশ মন ধান হয় মাত্র, বরং ওখানে পাট লাগানো হোক, পাটের দাম ক্রমশ চড়ছে, জাপানীরা নাকি পাট দিয়ে জামা-কাপড়

মাত্র এক চামচ-
একাই একশো!
MINADEX
ভালো চোখের দৃষ্টি
এর জন্যে চাই ভিটামিন এ। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, চোখের দৃষ্টি ভালো রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ।
সুস্থ রক্ত
এর জন্যে চাই আয়রণ। অধিকাংশ ভারতবাসীর আহারে আয়রণের অভাব থাকে। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এর আয়রণ এই অভাব পূরণ করে।
মজবুত হাড়
এর জন্যে চাই ভিটামিন ডি। এক চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, হাড় মজবুত রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ডি।
মনে রাখবেন, প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ মিনাডেক্স আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করে, আর এর কমলালেবুর স্বাদগন্ধ—বাচ্চার ভালো লাগবেই।
সিরাপ
মিনাডেক্স®
মাত্র একচামচ— তিনগুণের এক টনিক
গ্ল্যাক্সো

পর্যন্ত বানাবে। পাট কাটা হয়ে গেলে সেই সরকারী দোকানির ডাল। অলস ব্রাহ্মণ হলেও সারদারঞ্জনের কিছু পাটোয়ারি বুদ্ধি ছিল নিশ্চয়ই, কেননা ধান চাষের চিরাচরিত ব্যবস্থা ছেড়ে তিনি পাটের দিকেই ঝুঁকলেন এবং অচিরকালের সফলতার মুখ দেখলেন। তাঁর পাঠশালাটিও ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তি-দের অন্যতম হয়ে উঠলেন এবং আমাদের অঞ্চলে ভুল সংস্কৃতে শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে নানা সামাজিক বিষয়ে ফতোয়া জারি করতে লাগলেন।

আমার তিন ঠাকুমার মধ্যে অপুত্রক বড় ঠাকুমা বেঁচেছিলেন অনেকদিন। মেজো ঠাকুমা তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই মারা যান। ছোট ঠাকুমা বা আমার আপন ঠাকুমার নাম ছিল মেঘমালা। ছোটখাট্টো চেহারা, কথা বলতেন কম, সারা বাড়িতে তুর তুর করে ঘুরে বেড়াতেন। এক সংকটজনক অবস্থায় তিনি এবাড়ির বউ হয়ে এসেছিলেন, এসেই বুঝেছিলেন, তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে মুখ বুজে বাড়ির সকলের সেবা করে যাওয়া। তাঁর বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন অনেক ছোট বয়সে, ভাইদের সংসারে মানুষ, বৌদিদের লাথি ঝাঁটা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সেকালের দিনে শ্বশুরবাড়ির হাতে বৌরা যেরকম অত্যাচারিত হতেন, বৌরা ও তেমনি তার শোধ তুলে নিতেন ননদদের ওপর অত্যাচার করে। পুরুষদের বিরুদ্ধে মেয়েরা তো কখনো একজোট হয়ে দাঁড়াতে পারে না — অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েমানুষই হয় মেয়ে-মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। ভাইরা তাই তাড়াহুড়ো করে কোনক্রমে মেঘমালার বিয়ে দিয়ে পার করে দেয়।

বড় ঠাকুমা ও মেজ ঠাকুমার মধ্যে খুব ঝগড়া-ঝাঁটি হলেও বড় ঠাকুমার সঙ্গে ছোট ঠাকুমার কখনো সেরকম কিছু হয়নি। পুত্রহীনা অসহায় বড় ঠাকুমা মনে-মনে জানতেন, এ-সংসারে তাঁর কোনো অধিকারই নেই। সেইজন্যেই জোর করে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। চিৎকার করে, ধমকে, ভয় দেখিয়ে তিনি মাথায় করে রাখতেন সারা বাড়ি। বাসনপত্র আছড়ে আছড়ে ফেলতেন মাটিতে, রান্নাঘর থেকে চ্যালাকাঠ ছুঁড়ে মারতেন উঠোনে। বাড়ি সুদ্ধু সবাই সব সময় তটস্থ। ছোট ঠাকুমা একদিনও গলা উঁচু করে একটাও কথা বলেননি। বরং পোষা বেড়ালটির মতন সব সময় ঘুরঘুর করতেন বড় জায়ের পায়ে পায়ে — সুযোগ পেলেই এটাসেটা খাবার জিনিস এগিয়ে দিতেন তাঁর মুখের সামনে। এবং নিজের সন্তানদেরও এক-এক করে তুলে দিয়েছিলেন বড় জায়ের হাতে।

বড় ঠাকুমা সতীনের ছেলেদের উঠোনে শুইয়ে জবজবে করে সরষের তেল মাখাতেন সারা শরীরে। পুকুরে নিয়ে ঠাণ্ডা জলেও চান করাতেন জোর করে। গামছা দিয়ে গা ঘষে ঘষে ছাল-চামড়া তুলে নিতেন প্রায়। খাবার খেতে বসে কেউ এক কণা খাবার ফেললেও তিনি কান ধরে ওঠবোস করাতেন ঠাস ঠাস করে। ইস্কুল থেকে ফিরতে যদি কেউ একটুও দেরি করতো, তিনি সদর দরজার কাছে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন রণরঙ্গিণী মূর্তিতে। তাদের ঘুম পাড়াবার সময় পিঠে এমন জোর চাপড়া মারতেন যে ধুপধাপ শব্দ শোনা যেত অনেক দূর থেকে। মেঘমালা কোনোদিন এসব নিয়ে একটুও মাথা ঘামাননি। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা কেউ কোনোদিন যদি বলে ফেলতো, ও-বাড়ির বড়বৌ সতীনের ছেলেমেয়েগুলোকে কষ্ট দেয় তাহলেই ঝগড়া করার বদলে কেঁদে ফেলতেন বড় ঠাকুমা।

ওঃ, সে কি কান্না। আমার বড় ঠাকুমার কান্না প্রবাদ-প্রসিদ্ধ ছিল ঐ অঞ্চলে। একবার শুরু করলে তিন-চার ঘণ্টার আগে থামতেন না। চিৎকার করে, আদিবাসীদের ধর্মীয় প্রার্থনার চেয়েও তীব্র স্বরে তিনি যেন তাঁর ভেতরের কোনো শারীরিক কষ্টের কথা জানাতেন। চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দম বন্ধ হয়ে আসতো প্রায়। তিনি নদীর পারে গিয়ে একলা একলা চিৎকার করে কাঁদতেন —যেন, ঐ নদীর মধ্য থেকে কোনো দেবতা এসে তাঁর দুঃখ দূর করবেন। আমাদের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে গিয়ে কাঁদতেন— যেন অরণ্য থেকে আসবে তাঁর উদ্ধারকারী। সেই সময় সারদারঞ্জন তাঁর ধারে-কাছে গেলে তিনি বোধহয় রাগের চোটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলতেন তাঁকে। শুধু মেঘমালাই শেষ পর্যন্ত ভোলাতে পারতেন তাঁকে। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে গিয়ে পড়তেন তাঁর পায়ে। তার কিছুক্ষণ পর আলুথালু চুল, উদভ্রান্ত মুখ বড় ঠাকুমাকে সবাই টানতে টানতে নিয়ে আসতো বাড়িতে।

আমার বাবা-জ্যাঠামশাইরা এখনও যখন তাঁদের বড় মায়ের কথা বলেন, তাঁদের চোখে জল এসে যায়। মাতৃস্নেহের যে একটা আদিম হিংস্র রূপ আছে, ওঁরা শৈশবে তার স্পর্শ পেয়েছিলেন।

সারদারঞ্জনের তখন বেশ সুসময় চলছে। আর্থিক দুরবস্থা ঘুচেছে। বাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে, তারা পড়াশুনোতেও মোটামুটি ভালো। আমার জ্যাঠামশাই প্রিয়রঞ্জন জেলার মধ্যে বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে সবাইকে চমকে দিলেন। জেলাবোর্ডের হাইস্কুলে তাঁর ফ্রি স্টুডেন্টশীপ জুটে গেল। আমার বাবা চিররঞ্জন ছিলেন শিশু-প্রতিভাবিশেষ। ভালো করে অক্ষরজ্ঞানের আগেই তিনি লম্বা লম্বা পদ্য গড়গড় করে নির্ভুল মুখস্থ বলতে পারতেন। সুতক্ষরের আবৃত্তি শুনে...

দের ঠোঁটের ওপরে। অবশ্য অধিকাংশ শিশুর এইভাবেই পরিণতি না হয়, আমার বাবারও তাই হয়েছিল। চিররঞ্জন বড় হয়ে লেখা-পড়ায় খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি। কোনোমতে পরীক্ষা পাশ করেছেন।

মেজো ঠাকুমার দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথম মেয়ের বিয়ে হয়েছিল মোক্তারের সঙ্গে। বিয়ের পরদিনই তিনি পাঁচটি সন্তানের মা হয়ে যান। তার মধ্যে দুটি সন্তান তাঁর চেয়ে বয়েসে বড়। আর এক মেয়ে বিয়ের পরেই পশ্চিমে চলে যায়। পশ্চিম অর্থাৎ উত্তর প্রদেশ—তখন যার নাম ছিল যুক্ত প্রদেশ। তাঁদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা হয় নি।

[illegible] লোক, এ বাড়িতে কন্যা সন্তান তখন একমাত্র পূর্ণিমা পিসীমা। সাত আট বছর বয়সে [illegible] পেড়ে শাড়ি পরে ফুরফুর করে দৌড়োদৌড়ি করতেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন সারদারঞ্জন। তবু দাদাদের কাছাকাছি বসে থেকে পূর্ণিমা কিছু কিছু পড়তে লিখতে শিখেছিলেন। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়, তিনি নাকি পদ্য লিখতে পারতেন। দশ-এগারো বছর বয়সেই তিনি নাকি কিছু পদ্য রচনা করেছিলেন শিব-দুর্গার মহিমা ও নদী বিষয়ে। সেসব পদ্য পরবর্তীকালে কোনো লিখিত আকারে কেউ [illegible] সংগ্রহ করে। তবে ছাড়া-ছাড়া কিছু কিছু মনে আছে এখনও। সম্ভবত কবি চন্দ্রাবতী বা তরু দত্তের মতো স্পষ্ট কবিপ্রতিভা ছিল পূর্ণিমার মধ্যে, কিন্তু তার বিকাশের কোনো সুযোগ ঘটেনি। বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা হওয়ার পরই এই কবিত্ব শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের পর একেবারেই চাপা পড়ে যায়।

পূর্ণিমার পরের ভাইয়ের নাম নিখিলরঞ্জন। অপূর্ব সুন্দর তার মুখশ্রী, টকটকে ফর্সা রং। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই [illegible] ও বোকা বোকা ধরনের। সবাই ভাবতো এই ছেলেটা জড়ভরত হবে। পরে অবশ্য তাঁকে আর ততটা বোকা মনে হয়নি, বরং তাঁর উদাসীন স্বভাবটাই প্রকট হয়েছিল। পরবর্তীকালে [illegible] যে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবেন, তার চিহ্ন বাল্যকালেই সূচিত হয়েছিল। যদিও রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবার আগে একটি বিবাহিতা নারীর প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে একটি ঘোরতর সামাজিক কেলেঙ্কারির প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন।

একেবারে ছোট ছেলে বিশ্বরঞ্জন সম্পর্কে লোকের ধারণা যে—এই বাড়িরই এক ছেলে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়ে এ-বাড়িতে আবার জন্মেছে। চোখ মুখ একেবারে যেন হুবহু বসানো, গলার আওয়াজটিও আগের বিশ্বরঞ্জনের মতন। এই কুসংস্কারটি ক্রমশ বাড়ছিল এবং লোকের মুখে মুখে বেশ ছড়িয়েছিল। এই ছেলের সম্পর্কে লোকের অনেক আশা। সারদারঞ্জন কনিষ্ঠ সন্তানটিকে সগর্বে লোকের বাড়ি দেখাতে নিয়ে যান।

সারদারঞ্জনের তখন প্রধান কাজ সকালে বিকেলে রুপো বাঁধানো ছড়িটি হাতে নিয়ে পাড়া বেড়ানো। পরনিন্দা পরচর্চায় দিব্যি সময় কেটে যায়। ঠোঁটের ওপর পুরুষ্টু সাদা গোঁফ, ভুরুতেও দু-একটি পাকা চুল। দেখলে বেশ একটা শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয় ভাব আসে। নানা বিষয়ে তিনি ভারিক্কী চালে মতামত দেন, লোকে মানেও। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তিনি সব সময় সচেতন। ব্রাহ্ম সমাজের কিছু লোক ওখানে বক্তৃতা দিতে এসেছিল, স্থানীয় লোকরা তাদের তাড়া করে নদী পার করে দেয়। সারদারঞ্জন তাতে খুব খুশী। শিবতলায় সন্ধ্যা আসরে বহুক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প করলেন। তার কিছুদিন পরেই দুর্গাপুজোর ভাসানের সময় মসজিদের সামনে ঢাক বাজানো নিয়ে বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। উত্তেজনা ক্রোধে বিস্ফারিত হবার আগেই স্থানীয় লোকরা একটি সালিশী সভা ডাকলো। প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীন সাহেবকে করা হলো সভাপতি। জমিদারের নায়েব তখন অনুপস্থিত বলে হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হলো সারদারঞ্জনকে। সারদারঞ্জন সেই সভায় রীতিমতন বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেললেন। লোকজনের কথাবার্তা শুনেই বুঝেছিলেন হাওয়া কোন দিকে। জয়নাল আবেদীন দাপটে বক্তৃতা দিয়ে সারদারঞ্জনের দিকে ফিরে, বললেন, মুখুজ্যে মশাই জ্ঞানী গুণী লোক, তিনি যা বিধান দেবেন, তাই আমরা মানবো। তিনি ভুল বিধান দিতেই পারেন না।

সারদারঞ্জন কিছু বলার আগেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। পাকা অভিনেতার মতন কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আজকাল কি আর কেউ শাস্ত্র ধর্ম মানে? বিসর্জনের সময় বাজনা বাজাতে হবে, শাস্ত্রের কোন্ জায়গায় এ কথা লেখা আছে আমাকে দেখাও তো! মাকে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছি, তখন তো কাঁদতে কাঁদতে যাবো। তখন কি নেচে-কুঁদে ঢাক ঢোল বাজিয়ে আনন্দ করা যায়? তুমিই কও জয়নাল ভাই, তা পারা যায়? যতক্ষণ পুজো, ততক্ষণ বাজনা—দধি-মঙ্গলের পরই কান্না, এই হলো নিয়ম! ঠিক কিনা? সবাই খুব খুশী। সারদারঞ্জন নির্দেশ দিয়ে দিলেন পুজোমণ্ডপে যত খুশী বাজনা হবে—প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কোনো বাজনা নয়। তবে হ্যাঁ, একেবারে, বিসর্জনের সময়, নদীর ওপরে নৌকোয় নৌকোয় ঢাকের প্রতিযোগিতা হতে পারে বটে! সে প্রতিযোগিতা প্রতিবারই হয়—সেটা চট করে বন্ধ করার সাধ্য সারদারঞ্জনেরও নেই।

সেই মিটিং-এর পর সারদারঞ্জনের সুনাম আরও বেড়ে গেল। লোকজন আরও বেশী খাতির করে। সারদারঞ্জনের মুখে চোখে বেশ একটা গর্বের ভাব, সাধারণ ছোটখাটো মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখের দিকে তাকান না পর্যন্ত—এক মনে হুঁকোয় টান দিতে থাকেন। সব মিলিয়ে মনে হয় সারদারঞ্জন একজন সুখী মানুষ। কিন্তু সারদারঞ্জনের জীবনে সবচেয়ে কঠিন আঘাত এলো সবচেয়ে বেশী যার ওপর নির্ভর করেছিলেন, তার কাছ থেকেই। ছোট ছেলের ওপর সারদারঞ্জনের এত আশা-ভরসা ছিল, সেই বিশ্বরঞ্জন তাঁকে পদে পদে নিরাশ করতে লাগলো। বিশ্বরঞ্জন বাল্যকাল থেকেই বিষম দুরন্ত, ক্রমে ক্রমে তার অত্যাচারে সবাই সন্ত্রস্ত। অন্য লোকের বাড়ির বাগান তছনছ করা শুধু নয়, সমবয়েসী ছেলেদের মারধোর করা ও নালিশ লেগেই আছে। দুরন্ত দুর্দান্ত ছেলে, বাড়ির কারুর কথা সে গ্রাহ্য করে না—বড় ঠাকুমার বয়েস হয়ে গেছে, তিনিও আর শাসন করতে পারেন না। ইস্কুলে একজন মাস্টারমশাই বিশ্বরঞ্জনকে বেত দিয়ে মারতে এসেছিলেন, দু' ঘা মারার পরই বিশ্বরঞ্জন বেত কেড়ে নিয়ে সেই মাস্টারের নাকে এমন ঘা মারলো যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। তারপর সবাই মিলে বিশ্বরঞ্জনকে প্রচণ্ড মেরে প্রায় আধমরা করে ফেলে। এই ঘটনার পর বিশ্বরঞ্জন একটু শান্ত হয়েছিল, কিন্তু আবার অন্যরকম বিপদ ডেকে আনলো।

খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পূর্ণিমার বিয়ে দিয়েছিলেন সারদারঞ্জন, কিন্তু মাত্র সাত মাসের মধ্যেই সে বিধবা হওয়ায় প্রথম আঘাত পেয়েছিলেন। শ্বশুরের ঘর করা বা স্বামী সম্ভোগ কিছুই ঘটেনি পূর্ণিমার কপালে। তার স্বামী নতুন চাকরি পেয়ে চলে গেল চট্টগ্রামে, সেখানে হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। বিধবা পূর্ণিমার দ্বিতীয় বিয়েতে আরও বেশী আঘাত পেয়েছিলেন সারদারঞ্জন—কিন্তু তাঁর বুকে মৃত্যুশেল বিঁধিয়ে দেয় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ঐ বিশ্বরঞ্জন। (ক্রমশ)

পাদ প্রদীপের আলোয়
দ্যুটি নকশাই সামনে চওড়া। বস্তুত আরো আরামের কথা ভেবেই তৈরি। অথচ খুব একটা বেশি চওড়া নয়। তাই এই জুতো পায়ে আপনাকে আধুনিক দেখাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু কখনই মড মনে হবে না। এনভয় ডার্বি ৫৬ ও এনভয় ক্যাজুয়াল ৯৩-ও এখন পাওয়া যাচ্ছে।
নতুন বাটা এনভয়। আশ্চর্য আধুনিক দুটি নকশা। এনভয় ১০: সামনে চামড়ার স্ট্র্যাপ ও স্থায়ী বকলেস যুক্ত স্লিপ-অন। এবং এনভয় ২৯, ফিতে বাঁধা— সামনে ও দুপাশে সছিদ্র বর্ডার।
এনভয় ১০
সাইজ ৫-১০
৩৬.৯৫
Bata

কালো টাকা প্রসঙ্গে ওয়াংচু কমিটি

প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধান কমিটি অথবা ওয়াংচু কমিটি (সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ওয়াংচুর সভাপতিত্বে গঠিত) তাঁদের প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছেন যে, ভারতে প্রতি বছর কালো টাকার প্রচলনের পরিমাণ প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা। এই কমিটির মতে দেশে কালো টাকার পরিমাণ ১৫০০ কোটি থেকে ৩০০০ কোটি টাকার ভিতর। অবশ্য ওয়াংচু কমিটি দেশে কালো টাকার পরিমাণ সামগ্রিকভাবে কত সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারেন নি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, বিশ বছর আগে কর অনুসন্ধান কমিটি ভারতে মোট কালো টাকার পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকা বলে অনুমান করেছিলেন। তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে ভারতে মোট কালো টাকার পরিমাণ হয়ত ৫০০০ কোটি টাকার কাছা-কাছি হতে পারে। কালো টাকার কালিমা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে এমনভাবে কলুষিত করেছে যে, তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হয়েছে। তাছাড়া দেশে যখন কোটি কোটি কালো টাকার লেনদেন চলছে তখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ-সংস্থানের জন্য সরকারকে সাধারণ মানুষের উপর বেশি করে কর ধার্য করতে হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা দেখা যাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হল কালো টাকার পরিমাণের বৃদ্ধি। ওয়াংচু কমিটি নানাদিক থেকে এই সমস্যার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং কালো টাকার বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ প্রদান করেছেন। কমিটির মতে নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কালো টাকা যাতে না বাড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উপযুক্ত অনু-সন্ধান এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যেমন কালো টাকার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, অনুরূপভাবে কালো টাকা বাড়তে না দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের নানা প্রকার অনুপ্রেরণা দেওয়া যেতে পারে। কমিটির মতে আয়করের প্রান্তিক হার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো উচিত এবং বর্তমানে যে স্তরে প্রান্তিক হার ধার্য করা হয় তার আগেকার স্তরেই প্রান্তিক-হার ধার্য করা উচিত। যাঁরা কর ফাঁকি দেন তাঁদের তালিকাভুক্ত করে ছয় বছরের জন্য কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত: সামাজিক ও সরকারী স্বীকৃতি এবং জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁদের উপেক্ষা করা উচিত। শুধু তাই নয়, কর ফাঁকি যাঁরা দিয়ে থাকেন, তাঁরা যেন কোন ব্যাংক থেকে ঋণের সুবিধা না পান সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে কমিটি অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ওয়াংচু কমিটি মনে করেন রপ্তানির বিপক্ষে আমদানির জন্য অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা কালো টাকার সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ। কমিটির মতে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া উচিত এবং রপ্তানির জন্য আর্থিক সুবিধা দেওয়া উচিত। কমিটি মনে করেন, কৃষিক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ, এবং পশুপালন, ফলের চাষ, হাঁস-মুরগীর পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ হল সরকারকে প্রতারণা করে কালো টাকা বাড়াবার অন্যতম পন্থা: কারণ, এই জাতীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদাই যে আয়ের সঠিক হিসাব রাখা হয় তা নয়। অন্যান্য আয়ের মতো কৃষিগত আয়ের উপর কর ধার্য করার সুপারিশ কমিটি দিয়েছেন। কমিটির মনে অবিভক্ত হিন্দু পরিবার বহু ক্ষেত্রে কর প্রদান করা হতে বিরত থাকার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ-সংস্থানের জন্য আরও সম্পদের প্রয়োজন। আর্থিক সম্পদ বাড়াবার জন্য প্রয়োজন জাতীয় সঞ্চয় বাড়ানো এবং এই উদ্দেশ্যে বেশি করে কর ধার্য করা দরকার। সম্প্রতি আমাদের দেশে করের বোঝা অসম্ভব বেড়ে গেছে এবং এই বোঝা দরিদ্র জনসাধারণকেও বহন করতে হয়। অথচ এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এবং মুনাফাখোর কর ফাঁকি দিয়ে কালো টাকা বাড়িয়ে চলেছেন। এই কর ফাঁকি বন্ধ করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের জন্য প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে গরীব জনসাধারণের উপর আরও কম হারে কর ধার্য করা যেতে পারে এবং বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমানো যেতে পারে। এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা কমানো এবং কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করা। কালো টাকা উদ্ধার করতে পারলে মুনাফাখোর এবং এক শ্রেণীর ধনী লোকের ক্রয়শক্তি খানিকটা কমবে এবং তা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার পক্ষে সহায়ক হবে। আবার কালো টাকা উদ্ধার করে তা উৎপাদনাত্মক বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করলে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণেরও সুযোগ থাকবে। দেশের অর্থনৈতিক শক্তির সম-বন্টনের জন্য কালো টাকা উদ্ধার করা খুবই প্রয়োজন। যদি কর ফাঁকি বন্ধ না হয়, তবে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই আমাদের কর-কাঠামোর মধ্যে এমন কোন গলদ আছে অথবা কর সম্পর্কিত আইনের মধ্যে এমন কোন গলদ আছে যার ফলে কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। প্রয়োজন হলে এজন্য বর্তমান কর-কাঠামোর সংস্কার যেমন করতে হবে, তেমনি নতুন আইনও তৈরি করতে হবে।

বিদেশী সাহায্যের ক্ষেত্রে ফাঁক

বর্তমান বছরে ভারতে বিদেশী সাহায্য পাবার ক্ষেত্রে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার ফাঁক রয়ে গেছে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ বছর আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ না করত, তবে এই ফাঁকের সৃষ্টি হত না। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ভারত চলতি আর্থিক বছরে ৮৫৫ মিলিয়ন ডলার বিদেশী সাহায্য পেয়েছে এবং তা পাওয়া গেছে ভারত-সাহায্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাংক থেকে: এই সাহায্য কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছে প্রকল্প-ভিত্তিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছে প্রকল্প-বহির্ভূত। এ বছর আমাদের বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হল ১১৫০ মিলিয়ন ডলারের; তার মধ্যে ১০০ মিলিয়ন ডলার হল ঋণ পরিশোধের জন্য। তাছাড়া ১০০ মিলিয়ন ডলারের খাদ্য-সাহায্যেরও প্রয়োজন। বিদেশী সাহায্যের ক্ষেত্রে এই যে ফাঁকের সৃষ্টি হল তা দূর করতে হলে রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়ানো দরকার এবং নতুন কোন উৎস থেকে আরও বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করা দরকার। চলতি আর্থিক বছরে যে ৮৫৫ মিলিয়ন ডলার পাওয়া গেছে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান খুবই অল্প। প্রকল্প-ভিত্তিক এবং প্রকল্প-বহির্ভূত সাহায্য হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া গেছে যথাক্রমে ২১ মিলিয়ন ডলার এবং ৩৫ মিলিয়ন ডলার।

সুব্রত গুপ্ত

॥ ছেচল্লিশ ॥

কাঁটা তারের বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রিনি, দুজনেই আমরা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে।

'সেই গানটা একটু গা না রিনি, গাইবি? পরশু মাঁজাপুরের পার্কের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গাইছিলিস যেটা? গুন গুন করে গেয়েছিলি যে সেই?'

ওর দিকে তাকাই। তার রূপ গুণ দুই-ই বুঝি একাধারে পেতে চাই।

'সেখানে আবার কী গান গাইলুম গো? সেই পার্কে? সেটা কি গান করবার জায়গা ছিল নাকি?'

'আহা! চাপা গলায় গাইলি না একটুখানি? আপন মনেই গেয়েছিস, মনের ভুলেই হয়ত বা। টের পাসনি তুই—কিন্তু বেশ লেগেছিল আমার। সেই যে......বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে/দেখা না হইতো জীবন গেলে। পদাবলী কীর্তনের এই কলিটা ধরেছিলি না তুই। ঐ একটা কলিই...... ওপাশের সভায় কে একজন হোমরা চোমরা লোক এসে গেল, আর তোর কলিটা ভালো করে ফুটতে না ফুটতেই ঝরে পড়ল। সে আসতেই যা চেঁচামেচি পড়ে গেল না! তুইও থেমে গেলি তখন।'

'সে কলি তো সেদিনের গো, আজ আবার কেন? আজ তো সে কলি ফুল হয়ে ফুটেছে। এসে গেছি তো আমরা।...সে গান ফের এখন কিসের জন্যে?'

'সেই সুরটা কানে লেগে রয়েছে কিনা আমার এখনো, শুনছি সব সময়। তাই বলছিলাম। কী মিষ্টি যে গাইছিলি না!'

সেদিনের আত্মবিস্মৃতক্ষণের তার স্বগতোক্ত সম্ভাষণের সেই অস্ফুট কলি—তার সুমধুর সুরটি এখনো যেন আমার কানে লেগে। কোনোদিন প্রস্ফুটিত না হয়েই অকালে যদি ঝরেও যায় তবু বুঝি তা চিরকালের মতই আমার প্রাণে লেগে থাকবে।

'জেলখানার কি কেউ গান গায়? এই কি গান গাইবার জায়গা?' রিনি বলে—'উপযুক্ত পরিবেশ কী এটা?'

'নয় কেন? যেখানে কিনা বেশ পরির আমার পাশটিতেই তার মতন পরিবেশ আর আছে নাকি? আমার সামনে গঙ্গা আর পাশেই এই সুরধুনী—এর চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে বল্?'

'গঙ্গা আর সুরধুনী আবার আলাদা নাকি? অবাক করলে!'

'গঙ্গা সবার আর সুরধুনী শুধু আমার—শুধু আমারই।' আমার ভাষ্যকরণঃ 'তুই-ই আমার সুরধুনী!'

'আমি আবার কিসের সুরধুনী!'

'প্রথম সুর আমি তোর গলাতেই শুনি। সুরের সাড়া আর আমার প্রাণের সাড়া পাই তোর কাছ থেকেই। তোদের দিকের বারান্দা থেকে গাইতিস না, এধার থেকে আমি শুনতাম...কতো শুনেছি...সেই যে একদিন গেয়েছিলিস, ও গো দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে/আমার সুরগুলি পায় চরণ/আমি পাইনে তোমারে। তোর ওই গানটা শুনেই না আমার প্রাণে সাড়া পড়ল প্রথম। প্রথম যেদিন এই গানটা শুনি না... আমাকে লক্ষ্য করেই গাইছিলিস তো?'

রিনি হাসতে থাকে...'তোমার মাথা! কী না কী! ছেলেরা কী যে সব আলতু

কালতু ভাবে...কিসের থেকে কোথায় আসে নিজের মনেই কতো কী যে ধরে নেয়...... আশ্চর্য! এটা যে রবিঠাকুরের গান গো, তাও জানো না? ভগবানের উদ্দেশে রচনা—কোনো মানুষ টানুষের উদ্দেশে নয় আদপেই! তোমার জন্যে গাইতে যাবো কেন—কোন দুঃখে?'

'না গাইতেও পারিস, কিন্তু আমার তাই মনে হয়েছিল তাই আমি বলছিলাম। রবিবাবুর গানগুলো সব কেমন ধারা! সব কিছুতেই খাপ খায়—সবখানেই লাগে। মশারির মতন চারদিকেই খাটানো যায়। গানটাকে তুই ভগবানের জন্যে বলছিস? তাও হতে পারে, সত্যি! ভেবে দেখছি তাও হয়। কিন্তু অন্য কাউকে বাগানোর জন্য হলেও এমন কিছু মিথ্যে হয় না।...আমি ভাবছিলাম তুই আমার কানটাকে হাতের নাগালে পাচ্ছিস না, কান ধরে টানতে পারছিস না আমার, তাই ওই সুরের আঁকশি বাড়িয়েছিস! কিন্তু যাই বল তুই, ওই গানটা, কানে আসা মাত্রই তোদের বাড়ি ছুটে গেছলাম, মনে আছে তোর?'

'তুমি তো হরদমই আমাদের বাড়িতে ছুটে আসতে তোমাদের ভাঁড়ারের দরজার ছিটকিনি খুলে—তা যে আমার জন্যই আসতে তা কী করে জানব। আমি ভাবতুম বুঝি খাবার লোভেই। মা তোমাকে এটা ওটা সেটা খাওয়াতেন না...।'

'এখন তো জানলি!...তাতে কী হয়? বিস্কুটের জন্যে গেলে আর অমৃত হাতে পেলে...কিম্বা যদি একটু ঘুরিয়ে বলি, অমৃতের নাগালে যেতে অবাচিত বিস্কুট গালে এলে এমন কি ইতরবিশেষ হয় শুনি? কোনো পাওয়াটাই তাতে মিথ্যে হয়ে যায় না। তারপরে তোর সেই গানটা? আমার বকুল বনে/যেদিন প্রথম ধরেছে কলি/তোমার লাগিয়া/তখনই বন্ধু!/গেঁথে ছন্দ অঞ্জলি! এটা...এটাও কি তোর সেই ভগবানের জন্যেই গাওয়া? ভগবানের জন্যেই বাঁধা কবির এ গানটাও?'

'জানিনে বাপু! ছেলেরা এত কিছু ভাবতেও পারে! এমন সব ধরে নেয় যে...তার কোনো মাথামুণ্ডু যদি পাওয়া যায়?'

'তারপর, তোদের সেই কলকাতার চলে আসার দিনটায় সকালে কেউ আমাদের ঘরে ছুটে এসেছিল না? সেদিন ওই গানটা তুই গেয়েছিলি এখনো তা আমি ভুলিনি...সেদিন দুজনে দেখেছিনু বনে/ফুলেডেলে বাতাসে/ভুলো না...ভুলো না!/সেদিন বাতাসে কী ছিলো তা জানো?/তোমারই মনেরো মাধুরি মাখানো/অকারণে আনন্দে আছিলো ছড়ানো/তোমারো হাসির ফুলে...!'

'মানেটা কী এর শুনি?'

'যাই মানে হোক, ভগবানের কিছু নয়। আমি ভগবানের হাসি কখনো দেখিনি ভাই—তুই হয়তো দেখে থাকতে পারিস। আমি মা কালীর জিভ ভ্যাঙানি পর্যন্ত দেখেছি...দেখলে ভয় করে! তবে হ্যাঁ, আমার মা দুর্গার মুখে টিপে টিপে ঐ হাসিটা আমি ভালোবাসি। কী মিষ্টি যে! তবে এই চর্মচক্ষে নয়, দেখেছি তোর ঐ প্রতিমাতেই। তুইও দেখেছিস। সকলেরই দেখা।'

'গানের মানে...মানে, তার মর্মটা তুমি কী টের পেয়েছিলে বলো তো?'

'মানে, এই যে আমার সামনেই। তোর হাসি তো তুই নিজে দেখতে পাস নে, কী বুঝবি তার! ভগবান তোদের নিজেদের দিকে দেখতে দেননি, নিজেকে দেখতে পাস না তাই রক্ষে—নইলে তোরা কি কোনোদিন এই সব কালো ভূত ছেলেদের দিকে ফিরে তাকাতিস। কোনো ছেলে কি তোদের কৃপাদৃষ্টি পেতো আর? নিজেদের দেখে, নিজে-

দের নিয়েই মশগুল হয়ে থাকতিস! ভুলেও তাকাতিস নে আমাদের দিকে।'

'এই বুঝি সেই গানের মর্ম?'

'আমার মনে হয়েছিল কী—বলব? মনে হয়েছিল যাবার আগে, সেই যে আমরা বিকেলে রোজ মাঠের ধারে ধারে ঘুরতাম, পাটালি গুড় দিয়ে চিঁড়ে খেতাম না? যাবার আগে সেই কথাটাই গানের ছুতোয় মনে করিয়ে দিচ্ছিলি তুই আমায়। সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে—ওর মানে হচ্ছে সোজা বাংলায় গদ্য করে বললে গুড় চিঁড়ের দোকনায় সেদিন যে আমরা ঝুলে পড়েছিলাম, সে কথাটা যেন তুমি কখনো ভুলে যেয়ো না।...'

'এই তুমি বুঝেছিলে! যে চিঁড়ের ডোরে চিরতরে বাঁধা পড়ে গেছি আমরা—এই?'

'গানটায় তো তোর কথা ছিল না, আমার মনের কথাটাই ছিল যে। যে কথাটা নাকি আমার বলবার সেইটাই তুই আমার হয়ে বলে দিয়েছিলিস! ওটা আমারই মর্মের গাথা ছিল...আমার মর্মেই গাঁথা হয়েছিল...সেই আমার মর্মগাথা এখনো এই মর্মে গাঁথা হয়ে আছে...এই গানটিতে।' ওর সুরের 'ভতে আমার মর্ম-গাথাখানি গাড়া করি নিভৃতে—' আসল কথাটা হচ্ছে তোর গানের কোনো তুলনা হয় না যেমন কিনা আমার কাছে তোর কেউ সমতুল নেই। এত গান আর এত এত সুর তুই তুলোর মতন আমার মনের মধ্যে ধুনেছিস না! তাতে তোকে আমার জীবনের সুরধুনি ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারিনে।'

এক কথায় ওর গানের সঙ্গে ওকে আমি তুলনা করি। ধুনে ধুনে পরিমাণ করে নিই।

'এতক্ষণে বুঝলাম! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার!' সে হাসতে থাকে।

তুলনাহীন যে হাসিটি নাকি আকাশে আকাশে ছড়ানো ছিল সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখার আমার ফুরসৎ নেই তখন—হঠাৎ যেন নিমেষের মধ্যে আমার সকাশে সুরের নির্ঝরিণী হয়ে প্রকাশ পায়—সেই হাসি।

এমন সময় সদরে ঘণ্টা পড়ে।

তৎক্ষণাৎ আমি সচকিত—'গান থাক, খাবার ডাক পড়েছে এখন। চল আপিসে যাই, তোর নাম লিখিয়ে লোটা কম্বলগুলো নিয়ে আসি গে......

'লোট কম্বল? লোটা কম্বল কিসের?'

'দুখানা করে জেলের কম্বল দেবে না আপিস থেকে? বিছানা করে পাতবার আর গায়ে দেবার জন্যে—নিতে হবে তাই। সেই সঙ্গে রুটি তরকারি ইত্যাদি—রাত্তিরের খাবার ... তারপর।'

'আর ঐ লোটাটা কিসের জন্যে?'

'জল খেতে—লোটা [illegible] গেলাস দেবে একখানা। তাকে ঘটিই করো আর বাটিই বানাও।'

রিনির নাম রেফেরেন্স করে আপিসের থেকে কম্বল দুটো জোটানো গেল।

'চল্, এখন বিছানাটা পেতে ফেলা যাক গে......'

'আর খাবার?'

'খাবার এসে দিয়ে যাবে সাঁটে সাঁটে ওয়াডাররা। একটু বাদেই দেবে আর থালা রেডি করে রাখতে হবে।...খিদে পেয়েছে বুঝি তোর?'

'তা একটু পেয়েছে...তবে খুব নয়...'

'বাস্, খাবার পর আর তো কোনো কাজ নেই। খেয়েই ঘুম। সারা রাত যত পারিস ঘুমো না! তবে শীত এখানে বেজায়, ঘুমোতে পারলে হয়। মাঝ রাত্তিরে না, হাড় কাঁপিয়ে দেয়—বলতে কি!'

[illegible] বেশ ধবর দেখা যাচ্ছে।' খুঁটিয়ে দেখে সে বলে—'ঘোড়ার কম্বল।'

'জায়গাটা গঙ্গার ওপরেই তো, দারুণ ড্যাম্প—মেজেটাও বেশ স্যাঁতসেঁতে। রাত্তিরে গোটা গুদোম জুড়ে যা কাশির সাড়া পড়ে যায় না—একধার থেকে যা ঐকাতান শুরু হয় যেন!...এটা গঙ্গার পশ্চিম কূল কিনা কে জানে!'

'তার মানে?'

'বাবা বলেন যে, গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। কাশীক্ষেত্রের মতই সেই পুণ্যভূমি নাকি! এটা তাই হবে বোধ হয়। কাশীবাসের পুণ্যফলে কাশীপ্রাপ্তি না হয় শেষটায়...হাড় কখানা এখানেই না রেখে যেতে হয় আমাদের।'

'তোমাকেও ধরেছে নাকি কাশিতে? সারা রাত তুমি কাশবে নাকি গো? তাহলে তো ঘুমোতে দেবে না দেখছি—...'

'এখনো তো ধরেনি কাশিতে, পরে কী হবে কে জানে।'

গুদোম ঘরে ঢুকে দেখি আমাদের [illegible] একেবারে ফাঁকা। আমার কম্বলখানা [illegible] রয়েছে কেবল। দেখেন তার কম্বল [illegible] কোথায় চলে গেছে। যতদূর [illegible] ডেকের পর ডেক তাকিয়ে দেখি [illegible] ফাঁকে কোথাও আর তাকে দেখা [illegible] কোনখানে গিয়ে অদৃশ্য [illegible] জানে!

'এই উপরের তাকটায়...এই যে [illegible] কম্বল পাতা রয়েছে...দেখছিস [illegible] পারবি এই তিন তলায়?'

'অক্লেশে। তোমাদের দেশে [illegible] পেয়ারা গাছে উঠতাম না খেলি [illegible] একতলা দুতলা সবই তো খালি [illegible] —এগুলোয় বিছানা পাতলে হয় না?'

'পাতা হয়। তবে বললাম [illegible] বেশ। ওপর থেকেও পড়ে [illegible] থেকেও ওঠে—ড্যামপো কিনা [illegible] তেতালায় যা ঠাণ্ডা একতলায় [illegible] ডবল হবে বোধ হয়। এক কাজ করা [illegible] আমাদের দুজনের চারখানা কম্বল [illegible] একটা কম্বল শুধু পাতি, তাতেই [illegible] কুলিয়ে যাবে—যাবে না? শীতের [illegible] হাত পা না ছড়িয়ে গুটিসুটি মেরে [illegible] আরাম...!'

'তাই হবে না হয়।' তার [illegible] না—শিবরাম অত আরাম [illegible] নাহয় শোয়া যাবে এখন।'

'আর তিনখানা কম্বল এক [illegible] গায়ে চাপাই? তা হলে শীতের [illegible] দুর্গ ভেদ করতে পারবে না। [illegible] পড়লেও।'

'বেশ, তবে তাই হোক।'

সন্ধ্যের খাবার সেরেই না [illegible]

মাইনে পাও, এই সব। তারপরে বললেন, দেখ বাপু, তাকাতে হলে ভাল করে তাকাও। কোনো আপত্তি নেই। দোষও নেই কোনো—সুন্দর জিনিস দেখবে—তাতে কী! সুন্দর তো দেখবার জন্যেই হে, তবে অমন চোরা চাহনি হানা কিসের জন্যে? ও তো কিছু ঘোমটা টেনে বসে নেইকো। তাকিয়ে দ্যাখো না ভালো করে। দেখবার মতন মুখখানা বটেই তো। তবে মুখ দেখেই যা, মন পাওয়া ভার। আমি আড়াই হাজার টাকার চাকরে, মাসকাবারের সব টাকাটা পায়ের গোড়ায় ধরে দিয়েও মন পাইনে ও'র। আর তুমি কি ওই সামান্য টাকায় পাবে আশা করো?'

'ছেলেটা বোধ হয় মাথা নামিয়ে চোঁচা দৌড় দিয়েছিল তার পর?'

'কে জানে! তা আর লেখেনি বইটায়। তবে আমি ভাবছি কি, বাইরে গেলে পাহারোলারা তোকে ধরে যদি...'

'ধরে ধরুক। আমার কুড়োনো শিলের আদ্দেক ভাগ ঘষে দেব নাহয়......'

'তারা যদি অতো সুশীল না হয়। তাতে না ভোলে যদি...এমন কি, তোর এমন সুন্দর মুখ দেখে?'

'এর জন্যে আরো এক মাস জেল হয় যদি আমার? ভালোই হবে তা হলে বলব। দুজনে মিলে এক সাথে বেরুতে পারব এখন থেকে।'

'আরে না না, সে কথা ভাবছিনে। ধর যদি তোকে পাকড়ে নিয়ে জেলখানার বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসে। বলে যে, যাও ভাগো হি'য়াসে। চরে খাওগে যেখানে খুশি—এখানে আর তোমার ঠাঁই হবে না। তা হলে?'

'তা হলে তো মুশকিল। সেটা ভাবনার বিষয় বটে।' ওর মুখে গুমোট দেখা দেয়।

'তোর চেয়ে আমার ভাবনা আরো।' বৈষ্ণব পদাবলীর একটা কলি, ঠিক গুঞ্জনধ্বনিতে নয়, আমার বেসুরে গলার গঞ্জনায় দমকা গমক হয়ে বেরয়...তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/কৈসে কাটাওব দিন রাতিয়া।

'রাখো! কী সব উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছো—বলো তো!'

'কি রকম? এটা মাঘ মাস নয় তাই বলছিস বুঝি। বৃষ্টি পড়লেই বাদলা হলেই মাঘ মাস ঘনিয়ে আসে। ঋতুতে না হলেও—মনের মধ্যে। মানে মনের মাঘ—বুঝেছিস?'

'আহা! আমি জানিনে বুঝি? পদাবলীর বই পড়িনি নাকি? তোমাদের বাড়ির সব বই-ই তো তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ে পড়েছি—কেবল একটা বাদে। একটা সংস্কৃত বই—তবে তার সঙ্গে বাংলা মানে দেওয়া ছিল। বাৎসায়ন না কার যেন—কামসূত্র না কী! বইটা তুমি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলে, পড়তে দাওনি।'

'খুব খারাপ বই কিনা তাই। তার মধ্যে বিচ্ছিরি সব কথা। আমার হাতে একদিন দেখে না মা আমাকে পড়তে মানা করেছিলেন—এই বয়সে এসব বই পড়তে নেই নাকি।'

'তুমি পড়োনি?'

'আগাগোড়া। কামসূত্রের তামাম আমার পড়া। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি পড়েছিলাম, টের পায়নি মা। টের না পেলেই হলো। মার মনে দুঃখ না দেওয়া নিয়ে কথা।'

'কী ছিলো সেই বইটায়? শুনি?'

'সেসব কথা মুখে আনা যায় না। মানেও বোঝা যায় না ঠিকঠিক। আন্দাজে বুঝে নিতে হয় তার একটুখানি ও'র আঁচ পেয়েছি তার মধ্যেই। এক কথায়, সেসব বলবার নয়, বলনীয় না, করণীয়।'

'তাহলে মার কথাটা তুমি রাখোনি? শোনোনি একেবারে?'

'কোন্ কথাটা শুনেছি মার? জীবনে কোন্ কথাটা রাখলাম! মার কথা শুনলে তো মানুষ হয়ে যেতাম রে। এ দশা কি হতো আর আমার। চাই কি কোনো মহামানব হয়ে যেতেও পারতাম হয়ত। কী সর্বনাশটা যে হতো আমার তাহলে!'

'মহামানব হওয়াটা কি সর্বনাশের?'

'কোনো স্বাধীনতা থাকত না তখন কোনো কিছুর। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধাছাঁদা ছক বাঁধা গণ্ডীর ভেতর একলাটি—এদিকে ওদিকে তাকাবার যো নেই—এ পাশে সে পাশে বেড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে যে, উপায়

নেই তার? সর্বদা ষেনঅন্ধরের মধ্যে বাস করো। ঘোলো ফেলো দিন রাত।'

'তোমায় বলেছে। কেন, বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ হওয়াটা কি খারাপ?'

'কে বলছে? তাঁরা সব ওপর থেকে নামেন, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন—ভগবানের বিশেষ নির্দেশ নিয়ে। তাই পালন করতে আসা তাঁদের। এ কথা তো মা-ই বলেছেন। আর আমরা? মাটি ফুঁড়ে উঠেছি সব—ভুঁইফোড় সবাই। যা খুশি করার যা কিছু হওয়ার স্বাধীনতা গেলে সবই গেল, আমাদের রইলো কি আর। ব্যক্তি স্বাধীনতা সবার চেয়ে বড়ো। তা জানিস? একথাটাও মারই বলা। কিন্তু এটা আমার মনের মতন কথা। এটাই আমি মানলুম। এত উল্টোপাল্টা কথা বলে না মা।'

'মানেটা কী ওর? ঐ ব্যক্তি স্বাধীনতার?'

'কে জানে কী জানে। তবে মোটামুটি আমি বুঝেছি যা—বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগর হতে গেলে আর রঙ্গলাল হওয়া যায় না।'

'রঙ্গলালটা কে আবার?'

'সেই যে—যিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়?'

'সে হচ্ছে ইংরেজের অধীনতার থেকে মুক্তি—সেই স্বাধীনতার কথাই ওতে বলেছিলেন কবি।'

'আমি সেটা সব রকমের স্বাধীনতায় ধরে নিয়েছি। স্বাধীনতা কি আবার ভাগাভাগি আছে নাকি? যোগবিয়োগ হয়? তবে তুই যে বললি, আমি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়েছি। কোথায় চাপালাম শুনি?'

'পদাবলী কীর্তনে ছিলটা কী, আমার মনে নেই নাকি? ছিল যে, সখিরে/হামারি দুখের নাহি ওর/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর।' বলতে বলতে সে গুনগুনিয়ে ওঠে মৌমাছির মতই: তিমির দিক ভরি/ঘোরা যামিনী/অথির বিজুরিকো পাতিয়া/কান্ত পাহুন/বিরহ দারুণ/ফাটি যাও ত ছতিয়া...'

'এই ছিল?'

'এই ছিল, নয় তো—বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়ব/হরি বিনু দিন রাতিয়া...।...এও হতে পারে।'

'বিদ্যাপতি খুব বিদ্বান লোক হতে পারেন কিন্তু সত্যবাদী নন। আমি বলব।'

'সত্যবাদী নন?'

'এ ক্ষেত্রে যে না, তা আমি বলতে পারি। বাদলার দিনে মোটেই হরির জন্যে বিদ্যাপতির প্রাণ কাঁদছিল না...'

'তবে কার জন্যে শুনি?'

'তাহলে পরে বিদ্যাপত্নীর জন্যেই হবে...'

শুনে সে হাসে—'বিয়ে না হতেই বউয়ের কান্না কাঁদতে লেগেছো? বউ-এর বিরহ বুঝতে শিখেছ? টের পেয়ে গেছো এর মধ্যেই? বটে?'

'বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনে কী জিজ্ঞাসা ছিল তা জানিস? 'শুধু বৈকুণ্ঠের লাগি বৈষ্ণবের গান?' বলেছিলেন না তিনি—তাঁর কবিতায়? পড়িসনি?'

'পড়েছি তো।'

'আবার নিজেই সেই প্রশ্নটার জবাবও দিয়ে গেছেন। বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠিত রহে নিজ কুণ্ঠাভারে। বৈষ্ণবের গান শুধু বৈষ্ণবীর তরে।'

'কোথায়ও বলেননি এমন কথা, আমার মনে আছে বেশ। এটা তুমি মুখে মুখে বানালে এক্ষুনি।'

'মুখে মুখে বানাবো এত বড়ো কবি আমি হইনি এখনো। মুখে মুখে শুধু একটা জিনিসই আমি বানাতে পারি, কাব্যটাই হয়ত সেটা, না হলেও কবিতার মতই প্রায়। বানাবো? বানাবো এখন? একটা মোটে? আমি সাধি—কিম্বা আধখানাই—যদি বানাই?'

'না না না।' সে নিজের মুখচাপা দিয়ে কয়, 'এখানে ওসব নয়। কেউ যদি দেখতে পায় না—গেলেই আমাদের ধরে জেলের বার করে দেবে। দুজনকেই। ব্ল্যাক লিসটে নাম তুলে দেবে আমাদের। কক্ষনো আর জেলে ঢুকতে দেবে না। তোমার এই ব্যক্তি স্বাধীনতা শিকেয় উঠবে—কি করে রঙ্গলাল হবে তখন?'

(ক্রমশ)

ফেরা যায় না

৮ জানুয়ারীর দেশে প্রশ্নের শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের 'ফেরা যায় না, তবু যেতে চাই' সম্প্রতিক বাংলাকাণ্ডের উথালপাথাল বাঙালী ভাবনাগুলোকে কুড়িয়ে জড়ো করে একটি পরিষ্কার যুক্তি শৃংখলায় বিশ্লেষক ভাবকে যাচাই করে নেওয়ার আশ্চর্য প্রয়াস। একে তাঁর গদ্যের কোন তুলনা নেই, তার ওপর সুতীব্র সন্ধানী চোখের আলো—তলা অব্দি পৌঁছে গেছে। 'বাংলাদেশ' সম্পর্কে তাঁর নসটালজিয়া স্বাভাবিক—কিন্তু তারি অবাক লাগে, সেই আবেগ তাঁর সত্যদর্শনের দৃষ্টিকোণকে ডিঙিয়ে যেতে পারেনি। তবুও কোন ভাবে আমরা যেন পা না দিই—এই সময়োচিত এ সতর্কতা। ইতিমধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস আশেপাশে তো শোনাই যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের আর কী রইল! কেউ কেউ 'বাংলাদেশ' নামটাতেও আপত্তি নিয়েছেন। সন্তোষবাবু জার্মানী, অস্ট্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের উদাহরণ দিয়েছেন। আমাদের হীনমন্যতা থাকা মোটেও উচিত নয়। 'আত্মসম্মান, আত্মোপলব্ধি'র এখন একটা বড় সুযোগ এসেছে। 'বাংলাদেশে'র ঘোর লেগে আত্মবিস্মৃতি ঘটলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা এক সর্বনাশা ফাঁদে পড়ে যাবেন নিজেদের অজানতেই।

তথাকথিত 'তাত্ত্বিক'দের কথা তুলে সন্তোষবাবু ভালই করেছেন। আশ্চর্য, এঁরাই বরাবর বলতেন, মুজিব তো আমেরিকার লোক! 'পাতি বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত আন্দোলনে'র চুলচেরা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও অনেক শোনা গেছে। আসলে এঁরা বুঝতে পারেন না যে সব তত্ত্বের উপরে বাস্তব জীবন। লেখা তত্ত্বের সঙ্গে না মিললেই এঁরা হকচকিয়ে যান। একটা গল্প শুনেছিলুম ছেলেবেলায়। জোলাদের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম। তাই তারা ঠিক করল একজনকে জ্ঞান বুদ্ধি কিনতে শহরে পাঠাবে। সবাই মিলে চাঁদা তুলে দশটা টাকা লোকটার হাতে দেওয়া হল। বুদ্ধির দাম বাবদ। লোকটা শহরে গিয়ে প্রথমে আলুর আড়তে হাজির। আলু দেখে সে অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলে, এগুলো কী, বলে দিতে পারো ভাই? তাহলে তোমাকে টাকা দেব। চতুর শহরবাসী দরাদরি করে পাঁচ টাকায় রফা করল। তারপর বলে দিল—ওগুলো হচ্ছে গোল আলু। তারপর জোলাটির চোখ পড়ল ঘরবাড়ির ওপর। এমন তো সে দেখেনি কখনও! চতুর শহরবাসী ব্যাপারটা টের পেয়ে আরও পাঁচ টাকা দাবী করল। তারপর বলল ও হচ্ছে পাকা দালান। ব্যস, জোলার ছেলের তো মহা স্ফূর্তি। দশ টাকায় দুটো জ্ঞান বুদ্ধি কিনে সে গম্ভীর মুখে গাঁয়ে ফিরেছে। একদিন হয়েছে কী, গাঁয়ের পাশের রাস্তায় রাজার বিয়ের শোভাযাত্রা চলেছে। সবাই অবাক—এ কী কাণ্ড। অতএব ডাকো তো সেই জ্ঞানী জোলাকে। প্রাজ্ঞ জোলা অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে বিয়ের শোভাযাত্রা দেখার পর মুখ খুলল, ওটা হয় গোল আলু, নয় তো পাকা দালান। অর্থাৎ হয় পাতিবুর্জোয়া আন্দোলন, নয়তো সি আই এ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কলকাতা-১৪

ওদের গরব মোদের আশা

১৯শে জানুয়ারীর দেশে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'মোদের গরব মোদের আশা' পড়লাম। স্বাধীন পূর্ববঙ্গের নাম বাংলাদেশ হওয়া সম্বন্ধে [illegible] বিভ্রান্তিমূলক। লেখক [illegible] সম্পর্কে যায় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর যুক্তি এবং বক্তব্যের মধ্যে আপত্তি করার মত অনেক কিছুই যে রয়েছে, আশা করি, এ বিষয়ে অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

'এরা' শব্দটির ঐতিহ্য আমার জানা নেই। কিন্তু 'আইরিশ ফ্রি স্টেট' আর 'আয়ারল্যাণ্ড'—এ দুটি কি একই শব্দ? একই নাম? 'স্বাধীন বাঙালীদের রাজ্য' আর 'বাংলাদেশ' এক কথা?

বৃহত্তর অংশ সমগ্রের নাম ধারণ করে, অন্নদাবাবুর এ-যুক্তি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একেবারেই অচল। কেননা, ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস অথবা কংগ্রেসকর্তা কাঁথিম, অনেকদিন ধরে

(সি ১০৭৮)

অনেক কৌশলে সেনসাসের কাটা সরকারকৃত এদিক ওদিক ছড়িয়ে। একজন গবেষকের কথা জানি। তাঁর নাম শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের গায়ে গায়ে যে-সব সর্বতোভাবে বাঙালী অঞ্চল উড়িষ্যা বিহার এবং আসামের মধ্যে ঢোকান হয়েছে এবং পূর্ব-পশ্চিম দুই বাংলাকে ছাড়িয়ে আরো যে অনেক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বঙ্গ, যার কথা শ্রীরাধাকমল মুখার্জি তাঁর 'বিশাল বাংলায়' বলেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আজ সতেরো বছর ধরে জন দি ব্যাপটিস্টের মত অরণ্যে রোদন করে যাচ্ছেন. এই নিরলস অদম্য অবিচল গবেষক। 'ভারতপ্রেমিক' বাঙালীরাই তাঁর কথায় কান দেন না, 'ভারতীয়'রা তো দেবেনই না। অথচ এই 'ভারতীয় ভারতপ্রেমিক'রা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ভাষা, ধর্ম, পৃথক জাতিত্ব ইত্যাদি নানান দাবিতে নানান রাজ্য ভাঙাগড়া করছেন।

'বাংলাদেশ' নামের সমর্থনে অন্নদাবাবু সাক্ষী মেনেছেন কৃত্তিবাসকে। কৃত্তিবাস কিন্তু 'বাংলাদেশ' বলেননি, বঙ্গদেশ' বলেছেন, যাই হোক, বঙ্গদেশ নাম রাখলেও আমাদের আপত্তি না করে উপায় ছিল না। কেননা, আমাদের সাক্ষী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি —মানে কি পূব-বাংলা? 'বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল, অমনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালী, আমরা যে এক। বাঙালী কখন যে বাঙালীর এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে, তাহা তো পূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।' (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ, ১৯০৭)—এই বাংলা এবং বাঙালী মানে কী? দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ', জীবনানন্দের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', কাজি আবদুল ওদুদের 'শাশ্বত বঙ্গ, বাংলার জাগরণ', এস ওয়াজেদ আলির 'ভবিষ্যতের বাঙালী' সর্বত্রই দেখছি এক বাংলার ধ্যান। এই নতুন ইতিহাসকে উড়িয়ে দিয়ে আমরা পুরোন ইতিহাসকে ঘাটব? ফিরে যাব আবার সেই পুণ্ড্র-গৌড়-সুহ্ম-রাঢ়-সমতট বঙ্গে? ঘটনার নির্দেশ তো কই সেকথা বলে না?

ভারতীয়ত্ব এবং বাঙালিত্ব—এই দুয়ের মধ্যে একটা কল্পিত বিরোধের ছবি তুলে ধরতে গিয়ে লেখকের বক্তব্য কতগুলি পরস্পরবিরোধী এবং অসত্য উক্তিতে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। খাঁটি ভারতীয়ত্ব এবং খাঁটি বাঙালিত্ব—এ দুয়ের মধ্যে কোনকালে বিরোধ ছিল না, নেই, হবে না। বিরোধ বাধে ভেজাল থাকলে।

ইংরেজের ফাঁদে পড়ে যাঁরা ভারত-বিভাগ করেছিলেন, লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের প্রাণমানসম্পত্তিহানি এবং নির্বাসনের জন্য যাঁরা কেউ প্রত্যক্ষ, কেউ পরোক্ষভাবে দায়ী, তাঁদের ভারতীয়ত্ব নির্ভেজাল ছিল বলে অন্নদাবাবু কি সত্যিই মনে করেন? আমি করি না। আমরা অনেকেই করি না। অপরপক্ষে বাংলার মানুষকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যিনি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা, অখণ্ড স্বাধীন বাংলার জন্যে আন্দোলন করেছিলেন, সেই শরৎচন্দ্র বসু 'অ-ভারতীয়' হলেন এই একটিমাত্র অপরাধে যে, তিনি বাঙালী। তিনি তো ভারত-বিভাগ চাননি। শুধু ভারত-বিভাগ অনিবার্য দেখে বঙ্গবিভাগ রদ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মত ভারতীয় কিছু বেশি সংখ্যায় থাকলে ভারতবিভাগ হতই না। আরো কথা আছে। আজ যাঁরা স্বাধীন পূর্ব-বাংলার নাগরিক, তাঁরা কেউ ভারতীয় রাষ্ট্রের সরকারী নাগরিক নন, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করবে কে? তাঁরা নিজেরাই কি বঞ্চিত হতে চান? তাঁরা নিজেরা তো কই সেকথা বলছেন না? সমস্ত বাদ দিয়ে যদি শুধু রবীন্দ্রনাথকেই ধরি, তাহলে তাঁর গানে জেগে ওঠা একটি জাতির পক্ষে কি সংস্কৃতিতে ভারতীয়তা পরিহার করে চলা সম্ভব?

আসলে কথাটা হল এই। সমস্ত তর্ক-বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে এক অখণ্ড অবিভাজ্য সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক ভাষিক আত্মিক ভৌগোলিক সত্তা এবং সত্য, যার প্রতিমা গড়েছেন, চক্ষুদান করেছেন আবহমানকালের বাঙালী কবি মনীষী শিল্পী কর্মী প্রেমী দরদী, যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ আর শান্তিনিকেতনে পূর্ব আর পশ্চিম বাংলার এই দুই মহাপীঠে বসে—তারি নাম বাংলাদেশ। এই বাংলার ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কোন খণ্ডেরই অধিকার নেই সমগ্রের নাম নেওয়ার, কিংবা দুই খণ্ডেরই সমভাবে আছে। একজন পশ্চিম বাংলা, আর একজন বাংলাদেশ—এটা হতে পারে না।

গৌরীশঙ্কর
কলিকাতা-১০

"পদ্মাপারের লালকুঠি"

দেশ পত্রিকার ৮ই মাঘ সংখ্যায় শ্রীঅরুণ বাগচি লিখিত উপরোক্ত নামের নিবন্ধ পড়ে শিলাইদহ-কুঠিবাড়ি সম্বন্ধে প্রচারিত নানা জনরবে মনের উদ্বেগ দূর হল। কিন্তু নিবন্ধটির গোড়াতেই ঐ ভবন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যটা বিকৃত করা হয়েছে দেখছি। নীলকুঠি, লালকুঠি, কুঠিবাড়ি—এই তিনটি কথা উলটোপালটা করায় মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। শিলাইদহ কুঠিবাড়ি আবার লালকুঠি হল কবে? পাক সরকার কি এতদিনে ঐ ধবধবে সাদা বাড়িটা লাল করে ফেলেছেন? শিলাইদহের নীলকুঠি বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেই পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়েছিল। বর্তমান 'কুঠিবাড়ি' তার বেশ কিছু পরে নির্মিত। লেখক রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' পড়লেই এই কথার প্রমাণ পাবেন। তারপরে ঐ কুঠিবাড়ির স্মৃতিমন্থনে লেখক অনেক কথা বানিয়ে বলেছেন অথচ বিশেষ দরকারী কথাটা লেখেননি। গীতাঞ্জলি ইংরাজী অনুবাদ ঐ ভবনের তেতালার ঘরে জন্মগ্রহণ করে। এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে সেসব এক্ষেত্রে অতি কথন বলে মনে হতে পারে। ঐ কুঠিবাড়ি রক্ষা পেয়েছে, লেখক সেই চাঞ্চল্যকর সংবাদটি সুন্দরভাবে বলেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
চন্দননগর

রাজনৈতিক

পাকিস্তান বনাম পাকিস্তান ঃ ফলাফল বাংলাদেশ। রণজু নাগ। রক্তকরবী, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট-আট। ১১, সেণ্ট্রাল সিঁথি রোড, কলকাতা-৫০।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ববাংলায় শোষণ ও শাসন কায়েম করার জন্য আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কেন দরকার ছিল, বর্তমান গ্রন্থে তার অর্থনৈতিক কারণ বোঝা যাবে। লেখক প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে দুই পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা প্রথম থেকেই লাইসেন্স, সরকারী বিনিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী করেছে। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা পূর্ববঙ্গের প্রতি কী ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে, সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত কারখানার মালিকানা কেমন করে অবাঙালীদের হাতে গেল বা সরকারের উচ্চপদে দুই পাকিস্তানের কত জন লোক আছে—বইটিতে তার বিস্তারিত বিবরণ মিলবে।

তবে বইটিতে প্রদত্ত তথ্য কিছুটা পুরোনো। প্রায় সব বিষয়েই সর্বশেষ পরিসংখ্যান ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত। ফলে গম ও ধান চাষের ব্যাপারে ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিভিন্ন-খাতে যে-সব সাবসিডি দেওয়া হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থে তার কোন উল্লেখ নেই। পশ্চিম

পাকিস্তানে জমির সিলিং সেচ-এলাকায় ৫০০ একর এবং অ-সেচ এলাকায় এক হাজার একর হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষকদের ঋণ পাওয়া অনেক সহজ ছিল।

লেখক বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি মন্তব্য করেছেন, যা আদৌ ঠিক নয়। যেমন, "আর্মি আর ব্যুরোক্রাসীর অধিকাংশ লোকই এসেছেন জমিদার পরিবার থেকে" (পৃঃ ৫৩)। পাঞ্জাবের চাষী-পরিবার, সীমান্ত-প্রদেশ ও বেলুচিস্থানের গরিব বেকার-যুবকেরা রুজির জন্য সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে, এদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। আবার, "উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মার্কিনী সাহায্য কী শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়?" একমাত্র কলম্বো পরিকল্পনা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ছাড়া কোন সাহায্য নিছক অর্থনৈতিক নিরপেক্ষ অনেক দেশ রুশ-সাহায্য পেস্তে। তেমনি, মার্কিন সাহায্যের টাকা দিয়ে যেমন ওই দেশের জিনিস কিনতে হয়" (পৃঃ ৬২)। রুশ, চীন বা পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট

দেশগুলির টাকায় সাহায্য-প্রাপ্ত দেশ অপর কোন দেশ থেকে জিনিস কিনতে পারে না। "আমেরিকার সম্ভাব্য শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযানে পাকিস্তানকে 'বেস' হিসাবে ব্যবহার করার" জন্য পাকিস্তান মার্কিন সাহায্য পেয়েছিল, একজন ভারতীয় হিসাবে লেখক কীভাবে একথা বলতে পারলেন? দক্ষিণ-এশিয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভারতের প্রতিপক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্যও আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে। মার্কিন সরকার যে-কতটা ভারত-বিদ্বেষী বাংলাদেশ সমস্যার মাধ্যমেও লেখক তা বুঝতে পারেননি।

কেবল অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে, লেখকের এ-ধারণা ঠিক নয়। পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃক বাঙালী মুসলমানদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব, তাঁদের মাতৃভাষার উপর আঘাত, বাঙালী মুসলমানদের গণতান্ত্রিক চেতনা এবং অবিভক্ত ভারতে বাঙালী মুসলমানদের প্রতিপত্তির ঘটনা বাঙালী মুসলমানদের বাঙালী ভাবতে বাধ্য করেছে। এ-সব বিষয় বর্তমান গ্রন্থে স্থান পায়নি। লেখক বইয়ের শেষে যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে ডঃ জয়ন্তকুমার রায়ের "ডেমোক্রাসি অ্যান্ড ন্যাশানালইজম অন ট্রায়াল" (১৯৬৮) অথবা শ্রীসমর গুহের "স্বাধীন পূর্ব বাংলা" বইটির উল্লেখ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে ডঃ রায়ের বইটি সবচেয়ে প্রামাণ্য এবং দুই পাকিস্তানের বৈষম্য সম্পর্কে শ্রীগুহের বইটি বাংলা ভাষায় এই বঙ্গে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

ধর্ম

ব্রহ্মবিদ বলরাম: শ্রীবিজ্ঞানকিঙ্কর সুরেশ দাস। খড়দহের শ্রীবলরাম ধর্মসোপান থেকে প্রকাশিত। দাম—দু'টাকা।

খড়দহের শ্রীবলরাম ধর্মসোপানের রজত জয়ন্তী বর্ষের কর্মসূচী অনুযায়ী এই ধর্মগ্রন্থটি হচ্ছে রজত জয়ন্তী গ্রন্থমালার প্রথম বই। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান আশ্রম যাঁর পুণ্যনামের স্মৃতি বহন করছে, এই গ্রন্থটি সেই মহাত্মা শ্রীবলরাম মহারাজের জীবন চরিত ও উপদেশাবলী। মহাপুরুষের জীবনে যে বৈচিত্র্য এবং অলৌকিক ঘটনা থাকে শ্রীবলরাম স্বামীজীর জীবনেও তার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। বইটির ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ঝরঝরে, ফলে অমনোযোগী পাঠকরাও দু'চারপাতা পড়বার পর বইটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন। স্বামীজীর জীবনের নানা ঘটনা, তাঁর অলৌকিক অনুভূতি, উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ। পরিশেষে স্বামীজীর পাঁচিশটি উপদেশের সংকলন রয়েছে যা পাঠমাত্রেই চিত্তশুদ্ধি অনুভব করা যায়।

ভ্রমণ কাহিনী

। মধু-বৃন্দাবনে । শঙ্কু মহারাজ, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫-২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দশ টাকা।

সম্প্রতিকালে বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে শঙ্কু মহারাজ একটি জনপ্রিয় নাম। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক তাঁর বৃন্দাবন-পর্যটনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তবে প্রচলিত অর্থে ভ্রমণ-সাহিত্য বলতে নিছক অভিজ্ঞতা-সার যে ধরনের গ্রন্থ বোঝায় মধু-বৃন্দাবনে সে জাতীয় রচনা নয়। এবং এইখানেই লেখক স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত। রচনাটির পটভূমিতে ভ্রমণ-বিলাসীর কৌতূহল আছে। একটা বিশেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি বৃন্দাবন পর্যটন করেছেন। ফলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনরীতি, তাদের আচরণীয় ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির সরস বর্ণনায় গ্রন্থখানিতে কড়চা অথবা ডায়েরী জাতীয় রচনার সরসতা আদ্যন্ত লক্ষণীয়। ভ্রমণ-কথাকে কিভাবে সাহিত্যকর্মে রূপান্তরিত করা যায়—সেই শিল্পসামর্থ্যও লেখকের করায়ত্ত। তবে, 'মধুবৃন্দাবনে' নিছক ভ্রমণ বিলাসীর অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ন নয়। সেই সঙ্গে লেখকের মনীষা ও পাণ্ডিত্যও সুপ্রকট। মথুরা-বৃন্দাবনের ইতিহাসকাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। এবং যা লেখার গুণে শুধু অনুসন্ধিৎসু গবেষক-দের কাছেই আদরণীয় বলে বিবেচিত হবে না—সাধারণ পাঠকেরও কৌতূহল আকর্ষণ করবে। বৃন্দাবন-পরিক্রমায় শুধু ইতিহাস-কথা নয়, সেই সঙ্গে বৃন্দাবনের মৃত্তিকা ও মানুষ, বিভিন্ন মন্দির এবং ঘাট, চৈতন্যদেব এবং ষড়গোস্বামীদের মর্ত্যলীলার কথা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলত, 'মধু-বৃন্দাবনে' মথুরা-বৃন্দাবন-বিষয়ক আকরগ্রন্থের মর্যাদা পাবে। আর সেই সঙ্গে রয়েছে লেখকের প্রখর শিল্প-বোধ।

গ্রন্থারম্ভে বৃন্দাবন-বিষয়ক কয়েকখানি আলোকচিত্র আছে, যা বইটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। সব মিলিয়ে 'মধু-বৃন্দাবন'-এ সর্ব-শ্রেণীর পাঠকেরই প্রশংসা কুড়োবে।
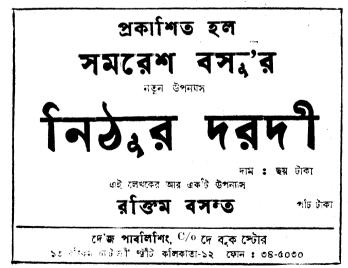
(সি ১৪০৪/২)

বেস্ট স্কুল ফুটবলার

ভেটারেন্স ক্লাব এবার হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তনের ষোলো বছর বয়সী ছাত্র অজয় ব্যানার্জিকে বেস্ট স্কুল ফুটবলার নির্বাচিত করেছেন। গত বছরের অর্থাৎ ১৯৭১-এর ফুটবল মরসুমে সারা বাংলার খেলোয়াড়দের গুণাগুণের নিরিখেই এই নির্বাচন। এবং অতীত দিনের জ্ঞানীগুণী ক্রীড়াবিদ, যাঁদের মতামত সর্বজনগ্রাহ্য তাঁদের নিয়েই ভেটারেন্স ক্লাবের নির্বাচক সমিতি। সুতরাং স্কুল ছাত্রদের মধ্যে অজয়ের শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনস্বীকৃত বলে ধরে নেওয়া যায়। শুধু ক্রীড়াগুণেই শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নয়—খেলোয়াড়ের ক্রীড়াশৈলী, তার ব্যক্তিত্ব এবং মাঠের মধ্যে ও মাঠের বাইরে তার আচরণের ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচন করা হয়। অজয় খেলায়ও যেমন পটু ও দক্ষ, তেমন তার আচরণও প্রকৃত স্পোর্টসম্যানের।

"খেলতে নেমে অনেক সময়ই ফাউল করার কারণ ঘটে, বিশেষ করে আমার মত ডিফেন্সের খেলোয়াড়ের। কিন্তু মাঠে নেমে জেনেও আমি কোনদিন ফাউল করেছি বলে মনে পড়ে না। আমি খেলতে চাই, আমি বল জুগিয়ে দলকে খেলাতে চাই"—এ কথা থেকেই ছোট খেলোয়াড়টির মানবিক গঠন ও ভাবমূর্তির পরিচয় মেলে।

হ্যাঁ, অজয় ডিফেন্সের খেলোয়াড়। খেলে ব্যাক হয়ে। প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো রাইট ব্যাকে, কখনো লেফট ব্যাকে। ছ সাত বছর বয়স থেকে খেলা শুরু। হাওড়ার পাঁচটি ... অঞ্চলে ওদের সার্কুলার রোডের বাড়ির পাশেই ছোটদের ফুটবল খেলার মত একখণ্ড জমি আছে। ১৯৬০ সালে ওখানেই অজয়ের দাদা অশোক ভাঙ্গা-গড়া ক্লাব নামে একটি ক্লাব গঠন করে। দাদার ক্লাবে খেলা শুরু করলেও খেলা শেখানোর ব্যাপারে কিন্তু বাবা। গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপের চাকরি থেকে ফিরেই বাড়ি এসেই বাবা গণেশচন্দ্র ব্যানার্জি ছাদের উপর বসে অজয়ের খেলা দেখতেন। আস্তে আস্তে নেমে এসে দেখিয়ে দিতেন কিভাবে শট করলে বল কিভাবে যায়, কিভাবে বল রিসিভ করতে হয়, কিভাবে হেড করলে বলের গতিবেগ বাড়ে এবং নিশানা ঠিক হয় ইত্যাদি প্রথাপ্রকরণ। বাবার উৎসাহে অজয়েরও উৎসাহ বাড়ে।

ডালমিয়া পার্কে হাওড়ার জুনিয়র লীগে বালক সংঘের ইনসাইড খেলে একটি নজরে আসার পর ১৯৬৪-৬৫ সালে খেলতে আরম্ভ করে কলকাতার অ্যাসেন লীগের টিম ব্যান্ডোর স্পোর্টিংয়ের পক্ষে। কিন্তু কলকাতার বড় ক্লাবের নজরে আসার মূলে হাওড়ার কাসুন্দিয়া হাজারহাত কালীতলা মাঠেরই একটি খেলা। সে খেলায় কলকাতার প্রথম ডিভিসনের বেশ কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড়ও অংশ নিয়েছিল। তাদের খেলা কিন্তু নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল ওই ছোট ছেলেটির খেলার চমকে। তার ফলেই ১৯৬৯-এ রাজস্থান ক্লাবে ওর ডাক। ১৯৭০ থেকে কালীঘাট ক্লাবে। রাজস্থানে প্রথম বছর অবশ্য প্রথম ডিভিসন ম্যাচে খেলেনি। প্রথম বছর কালীঘাট ক্লাবেও চার-পাঁচটি ম্যাচের বেশী নয়। গত মরসুমে

অজয় ব্যানার্জী

খেলেছে প্রথম ডিভিসনের ১৫টি ম্যাচ।

কিন্তু প্রথম ডিভিসনের খেলার বিচারে অজয় স্কুলের বেস্ট ফুটবলার নির্বাচিত হয় নি। এ সম্মান এসেছে স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

১৯৭০-এ ত্রিপুরায় ন্যাশনাল স্কুল গেমসে বাংলার দল গড়ার জন্য অজয়ের ডাক পড়ল কালীঘাটের বয়েজ ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশনের কোচিং ক্যাম্পে। বাড়ি থেকে তল্পিতল্পা বেঁধে এসে কয়েক দিন ক্যাম্পে কাটাতে হয়েছিল। সেখানে ছেলেদের খেলা দেখছেন কয়েকজন কোচ। ক্যাম্পের শেষে বাংলার দল গড়া হল। নির্বাচিত ছেলেরা ত্রিপুরা যাবার জন্য ওখান থেকেই দমদম বিমান বন্দরে যাত্রা করল। দল থেকে বাদ পড়া অজয় যাত্রা করল উল্টো দিকে বাড়ির পথে চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

"দলে স্থান পাব বলে এত আন্তরিকতা নিয়ে খেলেছিলাম যে স্থান পাওয়া সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। তাই বাদ পড়ার পর কিছুতেই কান্না চেপে রাখতে পারিনি"—চোখের জল সম্পর্কে অজয়ের সহজ উত্তর।

১৯৭১-এর শুরু থেকেই দলে স্থান পাবার জন্য অজয় দৃঢ় হল। চুঁচুড়ায় আন্তঃ স্কুল ফুটবল অর্থাৎ রেঞ্জার্স জুবিলি কাপের খেলায় অজয় হাওড়া জেলা দলের অধিনায়ক। হুগলী, বর্ধমান এবং দক্ষিণ কলকাতা—তিনটি দলের বিরুদ্ধেই হাওড়া বিজয়ী হয়ে সেমিফাইনাল খেলতে এল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে মেদিনীপুরের সঙ্গে। মেদিনীপুরের কাছে হাওড়া অবশ্য ৩—২ গোলে হেরে গিয়েছিল। কিন্তু চুঁচুড়ায় ও কলকাতায় এত ভাল খেলেছিল যে অজয় ব্যানার্জি নামের ওই ছেলেটিকে কেউ স্কুলের ছাত্র বলে বিশ্বাস করেনি। সবাই ধরে নিয়েছিল প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড়কে ধার করে এনেছে হাওড়া। অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের উত্তরে অজয় বলেছিল, হ্যাঁ প্রথম ডিভিসনেই খেলি, বিশ্বাস করুন আমি অক্ষয় শিক্ষায়তনের ছাত্র, ক্লাস টেন-এ পড়ি।

রেঞ্জার্স জুবিলির খেলার পর গুজরাটের গান্ধী নগরে অল ইন্ডিয়া স্কুল ফুটবলে বাংলার দল গড়ার জন্য আবার কোচিং ক্যাম্প। এবার আর অজয়কে চোখের জল ফেলতে হল না। ওর অন্তর্ভুক্তি এক রকম নিশ্চিতই ছিল। অক্ষয় শিক্ষায়তনের আরও দুটি ছাত্র—রবীন দাস ও শ্রীকান্ত মল্লিকও গুজরাটগামী বাংলা দলে স্থান পেল।

তবে গুজরাটেও অজয়কে চোখের জল ফেলতে হয়েছিল ফাইনালে রাজস্থানের কাছে 'টাই ব্রেকারে' হেরে গিয়ে। ওড়িশা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে বাংলা ফাইনালে উঠেছিল। ফাইনালে রাজস্থানের সঙ্গে ৭০ মিনিটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১—১ গোল। অতিরিক্ত সময়ের ১৫ মিনিটেও গোল হল না। এবার 'টাই ব্রেকার পেনাল্টি কিক'। পাঁচটি করে পেনাল্টি কিকে দুই দলই পাঁচটি করে গোল করল। ষষ্ঠ পেনাল্টি কিক থেকে গুজরাটের কর গোল শোধ হল অজয়ের পেনাল্টি কিকে। ওরা আবার সপ্তম গোল করল। এবার পেনাল্টি মিস করল অজয়েরই স্কুলের ছাত্র রবীন দাস। হেরে গেল বাংলা। অজয় কেঁদে ফেলল।

দলের জন্য এই দরদ এবং আন্তরিকতা অজয়ের বৈশিষ্ট্য। আন্তরিকতার প্রমাণ

অনুশীলনের সময়ও। সকালে মাঠে গেছে প্র্যাক্টিস করতে। অন্য ছেলেরা আসেনি। অজয় মাঠের মধ্যে ইট সাজিয়ে বা পোস্ট পুঁতে কাল্পনিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অনুশীলন করে চলেছে। আঁকাবাঁকাভাবে বল নিয়ে তাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে, কিংবা ড্রিবল করছে, কখনো বলের সংগে ছুটে চলেছে তীরবেগে।

খেলার সময় প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে নিজ খেলোয়াড়দের পায়ের সামনে বল যোগানো এবং খেলাটাকে যতদূর সম্ভব ফাস্ট করাই অজয়ের খেলার মূল নীতি। কাজল মুখার্জি ওর আদর্শ খেলোয়াড়। বলল, কাজলদার মত বল কন্ট্রোল এবং সমগ্র দলকে খেলানোর কায়দা কানুন রপ্ত করাই আমার প্রধান লক্ষ।

মুকুল

ফুটবল লীগে এ বছর থেকে আবার ওঠা-নামার ব্যবস্থা হবে—ফুটবল উৎসাহীদের কাছে এটা ভাল খবর। কিন্তু নীচের ডিভিশন থেকে একটি দল উপরের ডিভিশনে উঠলে কিংবা উপরের ডিভিশন থেকে একটি দল নীচের ডিভিশনে নেমে গেলেই কি বাংলার ফুটবলে সার্বিক উন্নতি হবে?

ফুটবল খেলার উন্নতির জন্য প্রয়োজন অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান এবং প্রথম ডিভিশনে খেলার প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন অল্পসংখ্যক দলের মধ্যে 'রবীন' লীগ খেলার ব্যবস্থা করা। এর সংগে অবশ্যই বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এবং সম্ভবত সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন রয়েছে মেকি অ্যামেচার থেকে ফুটবলকে উদ্ধার করে ফুটবলের মধ্যে প্রোফেশনালিজম প্রবর্তন। ফুটবল নিয়ে যতই আমরা হৈচৈ করি, যতদিন আমাদের ফুটবলে প্রফেশনালিজম চালু না হবে, ততদিন আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমরা কোন স্থান পাব না। খেলা থেকে নিছক আনন্দ লাভ আর মাঝেমাঝে বিদেশ সফর এবং বিদেশে যাবার সুযোগে কিছু কিছু সওদা করেই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকতে চাই তবে পৃথক কথা।

তবু অস্বীকার করা যায় না, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি অ্যামেচার স্পোর্টসের প্রধানপ্রবর্তক শ্রীআভেরি ব্রুন্ডেজ অ্যামেচার স্পোর্টস নিয়ে যতই হৈচৈ করুন, খেলাধূলো আস্তে আস্তে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনেকদিন থেকেই হয়েছে। বর্তমানে আরও বেশী করে হচ্ছে। উন্নত ক্রীড়ামান খেলোয়াড়দের সামনে প্রচুর রুজি রোজগারের স্বর্ণদুয়ার খুলে দিচ্ছে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক খেলাধূলোর সংগে সংগতি ও তাল রেখে চলতে হলে আমাদের খেলাধূলোয়, বিশেষ করে ফুটবলে প্রোফেশনালিজম চালু করতেই হবে। তাতে খেলোয়াড়রা আরও উৎসাহ পাবে, খেলাকেই জীবনের বৃত্তি হিসাবে বেছে নিয়ে তার উন্নতির সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করবে।

এটা অবশ্য শুধু বাংলার ব্যাপার নয়, অন্য অঞ্চলের ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু সেহেতু ফুটবলেই প্রথম পেশাদারবৃত্তি চালু হওয়া উচিত। এবং যেহেতু আই এফ এ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ফুটবল সংস্থা, সেহেতু আই এফ এ-কেই অগ্রণী হয়ে এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পেশাদার বৃত্তি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোথায় সেই দৃষ্টিভঙ্গি? কাগজের লেখালেখি এবং ক্রীড়ামোদিদের গালাগালিতে ওঁরা লীগে লীগে শুধু ওঠা-নামার পুনপ্রবর্তন করেই দায় সারলেন।

অবশ্য আমি মনে করি না সংবাদপত্রের সমালোচনা বা জনমতের কাছে এটা ওঁদের নতি স্বীকার। ওস্তাদের মতই ওঁরা ক্রীড়ামোদিদের পুতুল নাচ নাচাতে পারেন একবার ওঠা-নামা নাকচ করে; একবার ওঠা-নামা প্রবর্তন করে। হাতের সুতো ওঁদের হাতেই থাকে। একবার আলগা করেন, একবার টেনে ধরেন। সেই ফাঁকে আপনাপন দলগুলিকে প্রথম ডিভিসনে এনে গোষ্ঠী-স্বার্থ বজায় রাখেন। এবার নিয়ে কলকাতার ফুটবলে কতবার যে ওঠা-নামার বিধান চালু ও নাকচ হল সে হিসাব দিতে গেলে এ সপ্তাহে আর কিছু লেখা সম্ভব হবে না।

প্রথম ডিভিসন থেকে ২০টি দল কমিয়ে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসানে ওঁদের কোন আগ্রহ নেই। রবীন লীগের পুনপ্রবর্তন ওদের অনভিপ্রেত। আর ফুটবলে প্রোফেশনালিজম? শুধুই ওঁদের মুখের বুলি। বহুদিন থেকে বলে আসছেন কাজে কিছুই করছেন না। গতবার অবশ্য সুপার লীগের খেলা হয়নি। লীগ ও শীল্ড শেষ তার আগে ওঠা-নামার বিধান বর্জিত আকর্ষণহীন একক লীগের পর সুপার লীগের যে একটা বাড়তি আকর্ষণ ছিল এবার তারও ব্যবস্থা নেই। সুতরাং শুধু ওঠা-নামার পুনর্প্রবর্তন ফুটবলের উন্নতির দিক দিয়ে কোন আশার আলো নয়। ওঠা-নামা পুনর্প্রবর্তনের পিছনেও কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা কে জানে। গোষ্ঠীচক্রের কোন নতুন সহযোগীকে প্রথম ডিভিশনে ঠাঁই দেবার জন্য নয় তো! ওঠা-নামার বিধান যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়, তবে এতবার তার রদবদলই বা কেন? আর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গভর্নিং বডির সদস্যদের রুদ্ধ-দুয়ার ঘরে বসারই বা কি প্রয়োজন ছিল? বাংলা ফুটবলের ভাগ্যবিধাতাদের মতিগতি এখনো ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছি না।

ক্রিকেটের খবর

ক্রিকেট খেলার জন্য ভারত পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত। এই পাঁচটি অঞ্চলের মধ্যে রণজি ট্রফি ও দলীপ ট্রফির খেলার বিধি বিধান এবং এই পাঁচটি ভারতের টেস্ট কেন্দ্র। রণজিতে আঞ্চলিক লীগে রাজ্য দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর নক আউট প্রথার খেলা। দলীপ ট্রফিতে আঞ্চলিক দলগুলির সরাসরি নক আউটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রাজ্য দলকার সার্ভিসেস ও রেলওয়ে দলও রণজিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং এই দুই সংস্থার খেলোয়াড় দলীপ ট্রফিতেও খেলার অধিকারী।

রণজির লীগের খেলা আগেই শেষ হয়েছে। দলীপের একটি কোয়ার্টার ফাইনাল এবং একটি সেমিফাইনাল খেলাও শেষ হল। নাগপুরে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় মধ্যাঞ্চল এক ইনিংস ও ১৭ রানে উত্তরাঞ্চলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। এখন মধ্যাঞ্চল খেলবে দক্ষিণাঞ্চলের সংগে। জামসেদপুরে সেমিফাইনাল খেলায় পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসের ফলে ২৩৪ রানে পূর্বাঞ্চলকে হারিয়ে উঠেছে ফাইনালে।

রণজির আঞ্চলিক লীগে পূর্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলা, রানার্স বিহার; পশ্চিমাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বোম্বাই, রানার্স মহারাষ্ট্র; পাঞ্জাব পেয়েছে উত্তর অঞ্চলের

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

ট্রফি বহন করে আনছিল গুবিজু!
আরে, এই বাচ্চাটা আমাদের দেখে ফেলেছে!
!

শুরু করো!
শুরু করো!
গুলির শব্দ শুনলুম যেন!

অরণ্যে ডাকাতি —
এই বাচ্চাটা আমাদের দেখেছে! সাক্ষী রাখা হবে না!
গুড়ুম!

ব্যাটারা একদম খতম হয়েছে তো?
!
নিশ্চয়। আমার টিপ ফসকায় না। এখন তাড়াতাড়ি সরে পড়া যাক।
6/27

কাছেই, অরণ্যের অলিম্পিক-স্টেডিয়ামে···
সর্দার, সবাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে, খেলা শুরু করতে আর দেরি করা ঠিক নয়।
কিন্তু ট্রফি না আসা পর্যন্ত খেলা শুরু হবে কীভাবে?
শুরু করো!
শুরু করো!

উবলান সর্দার, তোমাদের গুবিজু এখনও ট্রফি নিয়ে আসছে না কেন?
ট্রফি আমাদের সকলেরই···
কী, তোমরা আমাদের চোখ রাঙিয়ে কথা বলছ?

উবলানরা চোর নয়, বুঝলে?
ট্রফি নিয়ে এসো!
আরে, এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

আঃ!
অরণ্যদেব, গুবিজুকে গুলি করেছে!

'উপহার' ছবির নায়িকা জয়া ভাদুড়ি

উপহার

রাজশ্রী প্রোডাকশনস

রবীন্দ্রনাথের "সমাপ্তি" নিয়ে যখন আবার একটি হিন্দী ছবি হল, যার নাম "উপহার", তখন, আর কিছু না হোক, হিন্দীচিত্রের দর্শকরা গল্প বস্তুর দিক থেকে একটি সুখের স্বাদ অবশ্যই পাবেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে যে-ছবি তাতে আনন্দ বক্শীকে দিয়ে গান না লেখালেই ছিল ভাল। রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারের উপায় যদি না থাকে না থাকুক, মামুলি নিয়মে ছবিতে গান দিতেই হবে এমন কী কথা আছে? লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল গানের সুরে তাঁদের ক্যামদের মনভুলানো করেছেন ঠিকই, কিন্তু বিচার-বোধের সঙ্গে যাঁরা ছবি দেখেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের "সমাপ্তি" নায়কের মুখে হিন্দী চিত্রের নায়কোচিত ভঙ্গিসহ গান কি সহ্য করবেন? নায়ক অনুপ (মূল গল্পে যার নাম অপূর্ব) বিয়ের পর মৃন্ময়ীকে নিয়ে শ্বশুরের কাছে গেছে। সেখানে এক সুন্দর নির্জন জায়গায় অনুপ "ম্যয় এক রাজা হুঁ তু এক রানী হ্যায়" গানটি না গেয়ে থাকতে পারেনি। দুরন্ত মৃন্ময়ী তখন ছুটে বেড়াচ্ছে।

মৃন্ময়ীর দুরন্তপনা এবং পুরুষালি স্বভাব জয়া ভাদুড়ি ঠিক ঠিক দেখিয়েছেন। বরং তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়ের ক্ষমতা পরিচালক সুধেন্দু রায় একটু বেশি কাজে লাগিয়েছেন। এই কারণে মৃন্ময়ীর দুষ্টুমি সময় সময় তার অপ্রকৃতিস্থতা মনে হয়। অবশ্য জয়া ভাদুড়ির অভিনয়ের শক্তির পরিচয় ফাঁকে ফাঁকে পাওয়া গেছে, বিশেষ করে তার মধ্যে নারীর ভাব, রমণীর প্রেম ও লজ্জা জাগার পর। স্বরূপ দত্তের অনুপকুমারকেও বেশির ভাগ সময়ে রবীন্দ্র-কাহিনীর চরিত্রের মতই শান্ত—মার্জিত মনে হয়েছে। কোন কোন অংশে যদি তাঁকে বেশ-ভূষায় ও হাব-ভাবে আধুনিক হিন্দী ছবির নায়কের মত মনে হয় সে দোষ শিল্পীর নয়। হিন্দী ছবিতে স্বরূপ দত্তের এই প্রথম অভিনয় ভাল লেগেছে।

এই গল্পের ছবিতে পরিচালক পাত্র-পাত্রীদের বেশবাস এবং পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষ সজাগ থাকতে পারতেন। নায়ক কিংবা তার জননীর (কামিনী কৌশল) রূপসজ্জার ব্যাপারে যেমন পরিচালকের সচেতন থাকা দরকার ছিল তেমনি ওই বাড়ির যুবতী পরিচারিকার পোশাকের দিকেও পরিচালক নজর দিতে পারতেন। ওই পরিচারিকার বুকের এক পাশে শাড়ি সব সময় সরেই আছে। তা-ছাড়া নায়কের জননীকে আর একটু বয়স্কা দেখালে ভাল হত। মৃন্ময়ীকে পরিচালক যে-ভাবে সাজিয়েছেন তাতেও তাকে এমন একটা কিছু অল্প বয়সের মেয়ে মনে হয়নি যে সব সময় সে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে ছুটোছুটি করতে অথবা গাছে চড়তে পারে। ছবির ওই পল্লীগ্রাম বা নদী বাংলাদেশের নয়। পরিবেশ এবং মেয়েদের শাড়ি পরার কায়দা বাংলাদেশের নয়। ছবিটি রবীন্দ্রনাথের গল্পের মেজাজ হারিয়েছে ওইখানে অনেকখানি।

তবে সুখের বিষয়, মূল গল্প ছবিতে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত। যদিও পরিচালক সুধেন্দু রায় রবীন্দ্র-রচনার প্রতি অনুগত, তবু তিনি যে এই গল্পের ভিত্তিতে একটি নতুন স্বাদের উপভোগ্য ছবি উপহার দিতে পেরেছেন তা অস্পষ্ট নয়। নতুবা অনুপ-মৃন্ময়ীর বিয়েতে পুতুল নাচ ও সুন্দরীর নাচের ব্যবস্থা এবং অকারণ গানের আয়োজন থাকত না। তা-বাদে নাটকীয় মুহূর্ত গড়ে তোলার কাজেও পরিচালক যত্নবান হয়েছেন। এ কাজে তাঁকে অভিনয়ে সাহায্য করেছেন মৃন্ময়ীর বাবার চরিত্রে নানা পালসিকার এবং নায়ক-জননী কামিনী কৌশল। অতএব ড্রামার আস্বাদও দর্শকরা ছবিতে পাবেন। এত সব প্রমোদ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও সাধারণ হিন্দী চিত্রের সারিতে "উপহার" একটি অতি বিশিষ্ট ছবি। বিষয়ের দিক থেকে তো বটেই। শিল্প-নির্দেশক সুধেন্দু রায়ের চিত্র পরিচালনার কাজে জায়গায় জায়গায় রুচি ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে ভূষিত "সংস্কার"

কানাড়ী ছবি "সংস্কার" দেখে খুব একটা উচ্ছ্বসিত হবার কারণ নেই, তবে ছবিটি ভাল, বেশ ভাল। হঠাৎ একটা সুন্দর কানাড়ী ছবি তৈরি হয়েছে। এই সৎপ্রচেষ্টা যে সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার পেল তাতে ক্ষোভ নেই। অন্তত স্বর্ণ-পদকটি অপাত্রে পড়েনি। প্রতিযোগী ছবির তালিকায় অবশ্য "প্রতিদ্বন্দ্বী" ছিল। যদিও সিনেমাটিক কাজ কিংবা গোটা ফিল্ম হিসাবে "সংস্কার" কখনই "প্রতিদ্বন্দ্বী"-কে হারাতে পারে না, তবু সত্যজিৎ রায়ের ছবির বাইরে কোন না কোন সৎপ্রয়াসকে স্বীকৃতি বা উৎসাহ দেওয়া দোষের কিছু নয়।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটিকে ধন্যবাদ, তাঁরা "সংস্কার" দেখার সুযোগ করে

দিয়েছেন। "প্রতিদ্বন্দ্বী"-কে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিতে পারে যে ছবি সেটা দেখবার কৌতূহল তো ছিলই। "সংস্কার" অদ্বিতীয় নয়, ভারতীয় ফিল্মে অসামান্য একটা ব্যাপার ঘটে গেছে তাও নয়, তবে এর নায়ক প্রাণেশ আচার্যকে (গিরিশ কারনাড) ভোলা যায় না। চেহারায়, বাক্যে, ব্যবহারে এক সত্যিকার ব্রাহ্মণ প্রাণেশ আচার্য। এখানে শিল্পী নির্বাচন এবং শিল্পীর অভিনয় বা অভিব্যক্তির দিকটাই আগে নজরে পড়ে। প্রাণেশ আচার্যের মত ব্রাহ্মণ কি আজও আছে? না থাকুক, ব্রাহ্মণত্বের একটা চমৎকার ইমেজ ওই প্রাণেশ যা কাব্যে সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে প্রাণেশ মানুষকে নীতিশিক্ষা দিয়ে এসেছেন। প্রাণেশের সংযম কি স্বাভাবিক প্রাণাবেগকে উপেক্ষা করেই নিজে দিয়ে [illegible] উঠেছিল? [illegible] থেকে [illegible] তুলনায় সবটুকু [illegible] সুন্দরী রমণীর পায়ে ফেলে দেন [illegible] এক বিষম অন্তর সংকটের প্রতিমূর্তি।

সংযমীর এই [illegible] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এই সংঘর্ষ "সংস্কার"-এর মূল মানবীয় বিষয় বা গল্পাংশ। বাইরের গল্পও একটা আছে, যেখানে ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কার এবং পরিবেশ বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। পথভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ নারানাপ্পা প্লেগে মারা গেছে। তার সৎকার করতে পারেন কি ব্রাহ্মণরা? এই সমস্যা নিয়েই গল্পের সূত্রপাত। শুরুতে পরিচালক পট্টভী রামা রেড্ডি গ্রামাপরিবেশে ব্রাহ্মণ সমাজের চেহারাটা ছোট ছোট দৃশ্যের সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন। এখানে তাঁর

কজ কিছুটা রিপোর্টাজের রূপ। খণ্ড খণ্ড ঘটনা এবং কয়েকটি মানুষের চেহারা ও সংলাপের ভিতর দিয়ে পরিচালক একটা বিশেষ জগৎ, তার প্রজ্ঞার ও সংস্কারের রূপটি প্রকাশ করেছেন। সিনেম্যাটিক ফর্ম এখানে বড় কিছু নয় অবশ্য। ব্রাহ্মণসমাজ প্রাণেশ-আচার্যের নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান। প্রাণেশ উত্তর খুঁজছেন। এখানেই মানবতা ও চিরাচরিত সংস্কারের মধ্যে সংঘাতের বীজ। প্রাণেশ আরাধ্যদেবতার কাছ থেকেও কোন আদেশ পান না। পরিচালক তারপরেই সত্যসন্ধানী তাপসকে শক্ত মাটির ভিত্তিতে এনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন।

এই মুহূর্ত থেকে ছবিতে প্রাণেশের ব্যক্তিগত গল্পের অবতারণা। ফিলমের গুণের দিক থেকে বরঞ্চ আগের ভাগটি ভাল। সেখানে আমরা সহজেই একটা কালেকটিভ লাইফ-এর সহজ পরিচয় পাই। প্রাণেশের পার্সোনাল ড্রামা-তে ছবি যখন পর্যবসিত তখন এর ফিলমিক চমকও অন্তর্হিত। থীম-এর দিক থেকেও কি গভীর কিছু পেলাম?

সারাদিনের কৃচ্ছ্রসাধনা সত্ত্বেও মন্দিরে দেবতার কোন সাড়া না পেয়ে প্রাণেশ সংশয়কাতর কিনা জানি না, অন্তত তার আভাস ছবিতে নেই, তবে একটা নৈরাশ্য বা ফ্রাস্ট্রেশন-এর তাড়না তার মনে এসেছে হয়ত। তার পতনের দরজা খুলে গেছে বুঝি এই নৈরাশ্যের ধাক্কায়। মন্দির থেকে বেরিয়েই সে মৃত নারানাপ্পার রক্ষিতাকে দেখতে পায়। তাঁর সংযমের বাঁধ তখনই ভাঙে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের এই অকস্মাৎ মতিভ্রম বা পদস্খলনে অনেকটা পৌরাণিক কাহিনীর মেজাজ। পুরো গল্পবস্তুটাকে রূপক ভেবে নিলে খুবই সুবিধা। কারণ সব ঘটনা বা পরিস্থিতি এবং সব চরিত্রের বাস্তব-লক্ষণ ছবিতে অনুপস্থিত। আসলে জীবনবাসনা ও ধর্মানুশাসনের সংঘর্ষজনিত যে মানবীয় সমস্যা এখানে পরিচালকের বিশ্লেষণের বস্তু তাতে ওই ধরনের একটি পরিবেশ ও সমাজের পরিকল্পনা প্রায় অপরিহার্য। কিন্তু প্রাণেশের ব্যক্তিগত কাহিনীতে যে জটিলতা ও গভীরতার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা স্বল্পাংশে পরিণত। পরিচালকের সাহস আছে। তিনি দেখিয়েছেন, নিজের স্ত্রী যখন রুগ্ন, মুমূর্ষু, তখনই প্রাণেশ মৃত নারানাপ্পার রক্ষিতার সঙ্গে দেহমিলনে লিপ্ত হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য কামলিপ্সা দেখাতে পরিচালক ভয় পাননি। নারানাপ্পার মৃতদেহেরও তখনও সৎকার হয়নি। প্রাণেশকে পরিচালক বাস্তবের কঠিন ভূমিতে নামিয়ে এনেছেন, কিন্তু সত্য ও অসত্যের, প্রেয় ও শ্রেয়র অনিবার্য সংগ্রামের কোন গভীরতর রাজ্যে দর্শকদের তিনি নিয়ে যেতে পারেননি। পতনের পর প্রাণেশের মধ্যে আত্মিক রিক্ততা দেখা গেছে, তিনি মুখ ঢেকে অনেক পথ পরিক্রমা করেছেন। কিন্তু সাময়িক পরাজয়ের মধ্যে কি ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক বিজয়ের আস্পৃহা তিনি খুঁজে পেয়েছেন? ছবিতে তা স্পষ্ট নয়। প্রাণেশ কি মাটির সত্যকেই মেনে নিয়েছেন? তাও অস্পষ্ট। তবে প্রাণেশ স্বীকারোক্তির মধ্যে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর ব্যর্থ, পরাজিত, ক্লান্ত মুখে মুহূর্তের জন্য হাসির রেখা দেখা গিয়েছে। স্বীকারোক্তির মধ্যেই হয়ত তিনি প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজে পেয়েছেন। প্রাণেশ তাঁর গ্রামে আবার ফিরে গিয়েছেন। নারানাপ্পার অন্ত্যেষ্টিতে হয়ত তাঁর আর কোন আপত্তি নেই। মিথ্যার অন্ত্যেষ্টির পর হয়ত সত্য আবার আত্মপ্রকাশ করবে। পরিচালকের অন্তত এ বিষয়ে স্পষ্টত বলবার কিছুই ছিল না। বাস্তবের একটা কঠিন সত্যের দিকে একবার তাকিয়েই পরিচালক যেন আর কিছু দেখতে পেলেন না। তারপর সব ঝাপসা। ক্যামেরা এমন কিছু আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেনি যা দেখে মুগ্ধ হব। বক্তব্যও এমন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেনি যে আমরা আচ্ছন্ন হব। বরঞ্চ প্রাণেশের পতনটাই এখানে একমাত্র সত্য, পতনোত্তর প্রাণেশকে চিনে নিতে পারলাম না।

'বিরাজ বৌ' (পরিচালনা : মানু সেন) ছবিতে উত্তমকুমার ও মাধবী চক্রবর্তী। ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

সত্যজিতের আগামী ছবি "একটি জীবন"

একটি ছবি শেষ করার পরই সত্যজিৎ রায় তাঁর পরবর্তী ছবি কোন্ বিষয় এবং কী গল্প নিয়ে করছেন সে সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড কৌতূহল থাকে দেশে-বিদেশে সর্বত্র। "সীমাবদ্ধ"-র পর কি? —এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। দেশ-এর প্রতিনিধির সঙ্গে সাম্প্রতিক এক একান্ত-সাক্ষাৎকারে শ্রীরায় তাঁর পরবর্তী ছবি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁর আগামী ছবির নাম "একটি জীবন।" ছবির নাম শেষ অবধি বদলাতে পারে।

"একটি জীবন" বুদ্ধদেব বসুর কাহিনী। কাহিনীর ব্যাপ্তি চল্লিশ বছর জুড়ে। ঘটনার শুরু তিশের দশকের গোড়ায়। পটভূমি অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার একটি গ্রাম।

গ্রামের এক পণ্ডিতমশাই এ-কাহিনীর নায়ক। সংস্কৃতের পণ্ডিত, কিন্তু ছেলেদের বাংলাও পড়ান। একদা এক কিশোর ছাত্রের প্রশ্নে তিনি আবিষ্কার করলেন দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনেক শব্দই ভুলভাবে উচ্চারিত হয়। প্রয়োজন বোধ করলেন একটি শুদ্ধ অভিধান রচনা করার। এই মহান প্রয়াসে ব্রতী হতে গিয়ে তিনি নিদারুণ দারিদ্র্যের মুখোমুখি হলেন, সংসার অচল হল, ছেলেদের অকাল-মৃত্যুর কারণ হলেন। সবচেয়ে বড় বিপর্যয় : দেশবিভাগ। সম্মানিত পণ্ডিত অতঃপর ভারতে আগত উদ্বাস্তু-তালিকার একটি নাম মাত্র।

দেশ থেকে সর্বস্ব খুইয়ে এসেছেন পণ্ডিতমশাই, কিন্তু বুকে করে যত্ন এনেছেন দীর্ঘ সাধনার ধন—অভিধানের পাণ্ডুলিপি। সেই রত্নের সন্ধান পান এক পুস্তক প্রকাশক। অভিধান প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে আলোড়ন পড়ে যায়। কিন্তু এই সম্মান, এই স্তুতি যাঁর উদ্দেশ্যে তিনি তখন উদ্বাস্তু কলোনীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীর্ণ শয্যায় মৃত্যুর মুখোমুখি।

"এই কাহিনী নিয়ে "চারুলতা"-র স্ট্যাণ্ডার্ডের একটি ক্লাসিক ছবি তৈরী হতে পারে"—দেশ-এর প্রতিনিধির এই মন্তব্যে সত্যজিৎ রায় বলেন, "পথের পাঁচালী"রই বা নয় কেন?

উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। 'পথের পাঁচালী'-র মত এ ছবির পটভূমি গ্রাম বাংলা। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন। সেদিক থেকেও মিল আছে।

ছবির খবর

প্রতিভা পিকচার্সের অগ্নীশ্বর ছবির কাজ নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওতে ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে আরম্ভ হয়েছে। বনফুলের ঐ নামেরই কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্যায়িত এই ছবির পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যও পরিচালকের তৈরি। প্রধান চরিত্রের শিল্পী উত্তমকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অসিতবরণ, জহর রায় ও অন্যান্য শিল্পীরা। ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

"দুশমন" (পরিচালনা দুলাল গুহ) ছবিতে মমতাজ

• • •

এস বি এনটারপ্রাইসের '[illegible]' ছবি পরিচালনা করছেন শচীন অধিকারী। বিমল করের ওই নামের উপন্যাসের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পীযূষ বসু। সুকুমার মিত্রের সংগীত পরিচালনায় মান্না দে-র গাওয়া এ ছবির দুখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে উত্তমকুমার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার এবং বোম্বাইয়ের কানন কৌশল ও দেবকুমার অভিনয় করবেন বলে জানা গেছে।

বোম্বাই বিচিত্রা

কিছুদিন আগে এক বিশিষ্ট চিত্র-সাপ্তাহিকের ম্যানেজার হয়ে এসেছেন এক প্রখ্যাত ব্যক্তি। ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন জগতের এক বিশেষ বিশেষজ্ঞ। প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেই তিনি প্রতিষ্ঠানের সকলকে সজাগ করার নামে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। 'সকলকেই নতুন ঢঙে কাজ করতে হবে'। 'সময় পালটাচ্ছে, সুতরাং সেইভাবে সামলে চলতে হবে' ইত্যাদি। গত কয়েক সপ্তাহের কাগজ দেখে তিনি দেখলেন যে কোনো স্টুডিওর বিজ্ঞাপন নেই কাগজে। ভদ্রলোক অবাক হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল সম্পাদকের। সম্পাদক এলেন। ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন, "কাগজে স্টুডিওর কোনো বিজ্ঞাপন নেই কেন?" সম্পাদক সবিনয়ে জানালেন, "বিজ্ঞাপন দেন প্রযোজকরা এবং পরিবেশকরা, স্টুডিও ওনারদের বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন হয় না। সেরকম কোনো রেওয়াজও নেই।" ম্যানেজার অবাক হলেন, "প্রয়োজন সৃষ্টি করতে হবে, রেওয়াজ তৈরী করতে হবে, এমনভাবে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন?" সম্পাদক চুপ করে রইলেন। ম্যানেজার বললেন, "চলুন আমার সঙ্গে, আমি মেহবুব খানের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই।" সম্পাদক বিনয় বজায় রেখে বললেন, "মাফ করবেন স্যার, মেহবুব সাহেবের কাছে আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারব না, সেখানে গেলে আপনাকে একাই যেতে হবে। তবে যদি আমার কথা শোনেন, আমি বলব এত তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে না যাওয়াই ভাল।" ম্যানেজার চটে গেলেন। অন্যের কাছে উপদেশ নেওয়া তাঁর অভ্যাস নেই। সম্পাদককে বিদায় দিয়ে তিনি মালিকের কাছে সম্পাদকের বেয়াদবির কথা জানালেন। মালিক সম্পাদককে ডেকে পাঠালেন, "কি মশাই, আপনি ম্যানেজার সাহেবকে মেহবুবের কাছে নিয়ে যেতে অস্বীকার করেছেন?" সম্পাদক বললেন, "ঠিক অস্বীকার করিনি স্যার, অক্ষমতা প্রকাশ করেছি এবং এখনো করছি, কারণ উনি কাজের লোক, এত তাড়াতাড়ি মেহবুব সাহেবের কাছে ওঁর যাওয়া উচিৎ নয়।" সম্পাদকের কথা শুনে মালিকও চটে গেলেন, বললেন, "উনি যদি তাড়াতাড়িই যেতে চান, হু আর ইউ টু স্টপ হিম, এক্ষুনি যান ওঁকে নিয়ে, আমি শুনেছি মেহবুব সাহেব খুব ভাল লোক।" সম্পাদক কাচুমাচু হয়ে বললেন, "কিন্তু স্যার মেহবুব সাহেব মৃত, তিনি এখন স্বর্গবাসী। সেখানে আমি ম্যানেজার সাহেবকে কি করে নিয়ে যাই।" মালিক একটুও অপ্রতিভ না হয়েই বললেন, "ইফ মেহবুব ইজ ডেড, দেন হোয়াই আওয়ার ম্যানেজার ওয়ান্টস টু সী হিম—ইউ গো নাউ অ্যান্ড আস্ক হিম টু সী মি,—মৃত মানুষের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন এক্সপেক্ট করা ভীষণ আনএথিক্যাল—"

সরল শর্মা

রাশিয়ার লোকনৃত্যের আসরে

কখনো মনে হচ্ছিল একরাশ আগুনের ফুলকি, কখনো মনে হচ্ছিল ঝোড়ো হাওয়ার দাপাদাপি, কখনো মনে হচ্ছিল একগোছা বাহারি ফুল, আবার কখনো বা মনে হচ্ছিল ব্যর্থতার ভারে নুয়ে পড়া কিছু জমাট বাঁধা কান্না।

মানুষের শরীর আর মানুষের হাতের যন্ত্র যে মানুষেরই নির্দেশে এমন এক আশ্চর্য রূপকল্প সৃষ্টি করতে পারে—তা ৪, ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারির তিনটি সন্ধ্যা যাঁরা রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত না থেকেছেন তাঁদের বিশ্বাস করানো কঠিন। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সোভিয়েট রাশিয়ার "মোয়সেভ" লোকনৃত্য সংস্থার শিল্পীরা ওই তিনটি সন্ধ্যায় তাঁদের দেশের বিখ্যাত লোকনৃত্যের কিছু নিদর্শন পেশ করলেন। এই অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীর অংগীভূত।

রুশ দেশের লোকনৃত্যে নানা বৈচিত্র্যের সমাহার। ওঁদের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-নৃত্যের একটি বিশেষ ঐতিহ্য আছে। সে ঐতিহ্য বহন করে দেশে-বিদেশে প্রচারিত করার যোগ্যতা যে মোয়সেভ সংস্থার আছে সে বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। ওই তিন সন্ধ্যার সবগুলি অনুষ্ঠানই যে মনে গভীরভাবে দাগ কেটে বসতে পেরেছে এমন কথা জোর গলায় বলা যাবে না। কিন্তু তার অনেকগুলিই যে অনেক দিন পর্যন্ত ভোলা যাবে না—সে কথা, অন্তত এই প্রতিবেদক, স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয়। এক-একটি অনুষ্ঠানের নাম ঘোষণার পর মুহূর্তে সেই নৃত্যের আঞ্চলিক রূপটি মঞ্চের উপর ভেসে উঠেছে, নৃত্য, সংগীত, রূপসজ্জা আর শিল্পীদের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে। মঞ্চব্যবস্থার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় না থাকায় তালভঙ্গ যদি বা কখনো ঘটেছে, কিন্তু গতিভঙ্গ কদাচ নয়। আর ভাবভঙ্গ শব্দটি রুশ নৃত্যশিল্পীরা তাঁদের নাচের অভিধানে বোধ হয় কোনদিনই প্রবেশ করতে দেন নি।

এক সহযোগী প্রশ্ন করেছিলেন, নাচের সঙ্গে শারীরক্রীড়া প্রদর্শনের ঝোঁক রুশ শিল্পীদের কি একটু বেশি নয়? আপাত-দৃষ্টে সেটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশেও তো নরম-সরম লোক-নৃত্যের সঙ্গে পাঞ্জাবী ভাংরা ভারতীয় লোকনৃত্যে সংহতি রচনা করেছে। আর লোকনৃত্যের চেহারা সর্বদাই অবগুণ্ঠিতা হবে এটাই বা কেন? উত্তালতা, উচ্ছলতা আর উন্মত্ততা কি জীবনের বাইরেকার ব্যাপার?

তবে রুশ লোকনৃত্যে এত রূপের আর এত রসের সমাহার যে সত্যিই অবাক হতে হয়। অবাক হতে হয় সমগ্র দলটিকে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত আবর্তিত হতে দেখে। নির্দেশক কি নিপুণ কুশলতায় সুর-ছন্দ-ভাব ও তালকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছেন তা দেখে বিস্ময়বোধ না করে পারা যায় না। ঠিক যেন সেই জাহাজের নাবিকদের জীবন নিয়ে রচিত 'এ ডে অন এ শিপ'-এর মত। অথবা সেই দুই নৃত্য-শিক্ষার্থীর হাতে হাত মিলিয়ে নাচতে গিয়ে একটি বাঁধনে বাঁধা পড়ে যাওয়া—যা খুলতে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন নাচের ভঙ্গী নির্মিত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সংগীতেও রূপ বদলের আভাস, আর শিল্পীদের ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, বিস্মিত মুহূর্তগুলি রচনা করে চলেছে জীবনের নানা গোলকধাঁধার বৃত্ত। পরিপূর্ণ হাস্যরসের মধ্য দিয়ে জীবন-দর্শনের এই অভিজ্ঞতা সত্যিই আশ্চর্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত পার্টিজ্যানস—একরাশ কালো বাদুড়ের একত্র ও বিচ্ছিন্ন চংক্রমণের মধ্য দিয়ে নাটকীয় রচনা অভিভূত করে রাখে মনকে।

কিন্তু নাচের বাহার দেখতে গেলে, ক্লাসিক রসের আস্বাদ পেতে গেলে মলডাভিয়ান স্যুইট, স্যুইট অব ওল্ড রাশিয়ান ড্যান্সেস, পলিয়ান্‌কা, জিপসি ড্যান্স, ইউক্রেনিয়ান ফোক ড্যান্সেস, উজবেক ফোক ড্যান্সেস ইত্যাদি ইত্যাদি নাচগুলির মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে। ওই সব মুহূর্তগুলি যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে জীবন-প্রদক্ষিণের সুখস্মৃতি।

নৃত্য-সমালোচক

রাশিয়ার 'মোয়সেভ' লোকনৃত্য সংস্থা পরিবেশিত লোকনৃত্যের একটি দৃশ্য

সুরেশ সঙ্গীত সম্মেলন

গত ২৬শে জানুয়ারী সুরেশ সংগীত সংসদ আয়োজিত তিনদিনব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন শেষ হয়ে গেল। ২২ ও ২৪শে জানুয়ারীর শীতের দুটো রাত্রি এবং ২৬শে জানুয়ারীর সকালবেলাটা কলামন্দিরে কাটিয়েছেন বাংলার সঙ্গীতরসিকেরা।

প্রথম দিনের প্রথম শিল্পী মঞ্জু গুপ্তের গলায় অতুলপ্রসাদের গান "দিলদরিয়ার বান ডেকেছে" এবং "কেন সে গাহিতে বলে" বেশ মিষ্টি শুনিয়েছিল। এই মিষ্টি রেশ টেনে রেখেছিলেন বিনায়কবুয়া পটুবর্ধন তাঁর আনন্দ কেদারা খেয়ালে। নন্দ ও কেদারা মিশিয়ে তৈরী এই রাগটিতে মিশ্রণ ও কারুণ্যের একটা সুন্দর সংমিশ্রণ দেখে-ছিলাম। আলাপচারীতে গুরুত্ব ছিল, পরিবেশনায় পরিচ্ছন্নতা ছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে তৃতীয় সপ্তকে শিল্পীর গলায় রুক্ষতা দেখা দিয়েছিল। তবে সরগম, তান ও তরাণাতে পটুবর্ধনজী তাঁর সুনাম রেখেছিলেন। পরে কাফী বন্দীশে মীরাবাঈ-এর "সাধু কি সঙ্গতি পায়ি রে" ভজনে তিনি ভারী তৃপ্তি দেন। ওঁর সঙ্গে তবলায় সুন্দর সঙ্গত করেন রামজী মিশ্র। সারেঙ্গীতে গোপাল মিশ্রের সাহচর্যও প্রশংসনীয়।

পরের শিল্পী শ্রীমতী নয়নন্দী যোশী বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই কথক নাচ পরিবেশন করেছিলেন। ওঁর হিসেবী চেহারাই,

থাকতে পারে)। দরবারী টৌড়ী বস্তুত তাঁদেরই হাতে বেশী খোলে যাঁরা চিন্তা এবং অনুভবকে পুরো পুরো মিলিয়ে নিতে পারেন। আলোচনায় ত্রুটি থেকে যাবে যদি সুব্রতর বাজনার সঙ্গে আনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলা সঙ্গতের নিপুণতার কথা এড়িয়ে যাই।

ওস্তাদ মুনাব্বার আলী খাঁর গুণকেলী খেয়াল রসগুণে ভরপুর ছিল। রস ছিল আলাপে। গুণ ছিল তানকর্তবে। আজকের গানের দুনিয়ায় মুনাব্বার আলীর তান, সরগমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়। এবং সে শ্রদ্ধা সুবিবেচিত। গুণকেলী মুনাব্বারের অন্যতম প্রিয় রাগ। এটি তিনি প্রায়ই গেয়ে থাকেন। অথচ কখনই একঘেয়ে লাগে না। এবং পুরোন জিনিসকে নতুন করে মেলে ধরার চমৎকারিত্বের জন্যই মুনাব্বার মুনাব্বার। সেদিনও মুনাব্বার আলী তাঁর গলার কাজের চিকণতা দেখিয়েছিলেন ক্ষুদ্রতম ডিটেলের রূপায়ণে।

পরে ঠুংরীর সময় অবশ্য মুনাব্বারের খেয়ালী পাণ্ডিত্য একটু-আধটু কানে বাধল। কিন্তু সমস্ত অভিযোগ ভুলে গেলাম যে মুহূর্তে শিল্পী ধরলেন ওঁর পিতৃদেবের যুগান্তকারী গান "আয়ে না বালাম/কা করু সজনী।"

২৬শে জানুয়ারীর সকালেও আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। শ্রীসুবিনয় রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্রীধীরেন মিত্রের নজরুলগীতি, শ্রীহিমাংশু রায়চৌধুরীর পুরনো বাংলা গান। পূর্ব বাংলার শিল্পী মহম্মদ সফীর বাউল গীতি এবং শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থাপনা একে একে "এপার বাংলা ওপার বাংলা" দিনটাকে ভরে তুলেছিলো। সবশেষে সেতার নিয়ে বসলেন শিল্পীর শিল্পী ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। প্রায় দু-দুটো বছর কেটে গেছে বিলায়েৎ খাঁর কলকাতার শেষ বাজনার পর। স্বভাবতই শ্রোতৃমহলে খুব আগ্রহ ছিল ওঁর বাজনা শোনার জন্য। সে আগ্রহ আরও বেড়ে গেল ওঁর সেদিনের বাজনার গুণে। বিলায়েৎ খাঁ বাজালেন বিলাসখানী টৌড়ী। বাজনার মত বাজনা। খুবই temperamental লোক বিলায়েৎ। ওঁর বাজনাও তেমন। শুনেই ধরে নেওয়া যায় সেটি বিলায়েতের বিলাসখানী টৌড়ী। মাঝে মধ্যে বিলাসখানীর পদসংকল্পে আঁচড় লেগেছে। অথচ মেজাজ অটুট। আলাপে ওঁর গায়কী ঢঙের ভেল্কী ছিল। গতের অংশে যে হাতের কাজের নৈপুণ্য বিলায়েৎ দেখালেন তার প্রশংসা না করা দুষ্ট সমালোচনা। সত্যি বলতে কি, সেদিনের বেশ কিছু জোড়, তান ও তেহাই-এর কাজ শ্রোতাদের সংগীতচিন্তায় নতুন নতুন ডাইমেনশন খুলে দিয়েছে। বললে দোষ হবে না, বিলায়েৎ যা ভাবেন তা বাজিয়ে

'ন্যাটু' (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) ছবিতে শ্রীমান প্রিন্স

দেখাতে পারেন। দেখিয়েছেনও। ওঁর ভৈরবী ঠুংরীতে, ঠুংরী মাপের আলাপের পর যে ভৈরবী গতটি তিনি বাজান তার আবেদন বিলায়েতের ব্যক্তিত্বের মতই অনমনীয়। ভৈরবীতে ওরকম সুরের প্রাচুর্য শিল্পীর রোমান্টিক সংগীতচরিত্রের যথাযথ ভাবসনুকুল।

—সংগীত সমালোচক

মনের কৌশল

মানুষের মনের মধ্যেই বাস করে দেবতা এবং দানব। প্রত্যেকের জীবনেই আবহমানকাল ধরে চলে আসছে ভিন্নমুখী দুই সত্তার দ্বন্দ্ব। লোভের হাতছানি আর প্রবৃত্তির বিকারের কাছে যারা পরাজিত তাদের অন্তরে দানবের অধিকার প্রতিষ্ঠিত, দেবতা তখন তাকে পরিত্যাগ করে। ফলে মনুষ্যত্বহীন সেই মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে, ন্যায়-অন্যায়ের ভেদরেখা সে বুঝতে পারে না। মানুষের মনের জগতে তাই অহোরাত্রি চলে এক অদৃশ্য সংঘর্ষ—শুভ আর অশুভের লড়াই। পরিবেশ এবং আত্মশক্তি এই লড়াইতে মানুষকে আপন আপন বিশ্বাস অনুসারে চালিত করে থাকে।

নাট্যকার শংকরদাস বাগচীর সাম্প্রতিক নাটক 'মনের কৌশল' এই চিরায়ত বক্তব্যের ভিত্তিতেই রচিত। রচনাক্ষেত্রে নাট্যকার বিশেষ কোন কায়দা কানুন না করে সহজ ভঙ্গিতে একটি গল্প বলে যাবার চেষ্টা করেছেন। নাট্যকার গল্পটি আকর্ষক এবং নাট্যপরিণতিতেও দর্শকদের বাঞ্ছাপূরণের ব্যবস্থা। তাই নাটকের শেষে দেখা যায় অপরাধী তার ভুল বুঝতে পেরেছে এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। নাট্য-কাহিনী বিন্যাসে নাট্যকার আগাগোড়াই প্রধানুগত্য দেখিয়েছেন এবং নাট্যমুহূর্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তার ত্রুটি রাখেন নি। ফলে নাটকের কিছু কিছু অংশ মামুলী মনে হলেও, সুখের কথা, কাহিনীর আবেদন এবং উপভোগ্যতা কোনক্ষেত্রেই নষ্ট হয়নি।

নাটকের মতো এর প্রযোজনাও একটু ছক অনুসারী। কিন্তু শিল্পীদের অভিনয় গুণে নাটকটির বহু অংশই সপ্রাণ এবং হৃদয়গ্রাহী। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ঠাকুরদাস মিত্র, মিণ্টু চক্রবর্তী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, মানস ঘোষ, সুনীত মুখার্জি, সন্তোষ রায়-চৌধুরী, দেবব্রত সেনগুপ্ত, মমতা ব্যানার্জি, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায় ও পূর্ণদাস বাউলের অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অভিনয় পরিবেশিত হল কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। উমাশংকর মিশন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ শংকরদাস বাগচীর জন্মদিন উপলক্ষে এই নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন উমাশংকর রিক্রিয়েশন ক্লাব।

নাট্য-সমালোচক

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

গ্রান্ট অ্যাডভার্টাইজিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা সম্প্রতি কলামন্দিরে অভিনয় করলেন শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'দমকল' নাটক। আধুনিক সমাজে অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দিয়ে যারা আজ বিত্তবান এই নাটকে তাদের নিয়েই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আয়োজন। লঘু সুরে নাটকটি রচনা, অতএব দর্শকরা হাসবার উপকরণও এই নাটকে পাবেন যথেষ্ট। দলগত অভিনয়ে নাটকটি সহজেই জমে উঠতে পেরেছে। নাট্য নির্দেশক পিকলু নিয়োগী দর্শকদের কাছ থেকে এ জন্যে সাধুবাদ পাবেন। সুপ্রযোজিত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ভালো অভিনয় করেছেন চুনী ব্যানার্জি, ইন্দ্রজিৎ দে, প্রভাস দাস, বাসুদেব ভাদুড়ী, গৌরীশংকর বসু, ভক্তকৃষ্ণ নন্দী, সুকৃষ্ণ ঘোষ, বটকৃষ্ণ মণ্ডল, সুখেন পোদ্দার, শীতল নাথ, কিশলয় বর্ধন, ধীরেন রায়, নারায়ণ ঘোষ, বীথি গাঙ্গুলী ও প্রতিমা পাল।

দেবদন্স রিক্রিয়েশন ইউনিট-এর চতুর্থ অনুষ্ঠান "টিপু সুলতান" অভিনয় সম্প্রতি সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে সম্পন্ন হয়। দলগত অভিনয় প্রশংসা অর্জন করে। অভিনয়ে সুখেন্দু রায়, অনিল সিংহ, সুজিত সেন, সত্যজিৎ গোড়, আশীষ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা পাল ও নব হালদার কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়।

পাকিস্তানের করাচিতে ভুট্টোর নিজের দলেই বিক্ষোভ এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেনট জুলফিকার আলি ভুট্টোর নিজের দল পিপলস পার্টির সদর দফতরেই এখন বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আঠার সদস্যের সংগ্রাম কমিটি করাচিতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি দখল করে নিয়েছে। এদিকে সৈন্য ও আধা-সামরিক বাহিনীকে হায়দরাবাদে (সিন্ধু) ৪০০ ধর্মঘটী পুলিসের কাছ থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ভার নিয়ে নিতে বলা হয়েছে। পাকিস্তান পিপলস পার্টির সংগ্রাম কমিটি বিক্ষুব্ধ কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে কমিটি দাবি করেছেন। দলের মধ্যে পরিবর্তনের দাবিকে সোচ্চার করার জন্য তারা কার্যালয়টি জবর দখল করেছেন বলে জানান। দলের প্রবীণ সদস্যরা এই কর্মীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্থান ত্যাগ করাতে পারেন নি। এমন কি প্রেসিডেনটপত্নী বেগম নুসরত ভুট্টোরও সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কমিটির নেতা বলেন, দলের সভাপতি ভুট্টো বা প্রাদেশিক সভাপতি মিন রসুল বক্স তালপুরের সঙ্গে ছাড়া তাঁরা আর কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। ভুট্টো বর্তমানে করাচিতে। তিনি স্বীকার করেন যে, ২০ ডিসেম্বর তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ঘেরাও ও জ্বালাও একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশী সংবাদ

৭ ফেব্রুয়ারি—ভারত বাংলাদেশকে আগামী তিন মাসে প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র দেবে। ওই সব জিনিসের মধ্যে রয়েছে কাপড়, কয়লা, জ্বালানি, সরষের তেল, ওষুধ প্রভৃতি প্রায় ১৫০ রকম জিনিস।

সি পি এম-এর প্রথম সারির নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার এবার নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না। দাঁড়াচ্ছেন না শ্রীসত্যপ্রিয় রায়, শ্রী কে জি বসু, শ্রীসাধন গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন বড়াল এবং আসানসোলের ডাঃ লোকেশ ঘোষও। শ্রীজ্যোতি বসু বরানগরে এবং শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ বেলেঘাটা উত্তর কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন। শ্রীবসুর বিরুদ্ধে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থী দিয়েছেন শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্যকে (সি পি আই)।

৮ ফেব্রুয়ারি—বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যদের সরিয়ে আনার কাজ আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে শেষ হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। এই মর্মে একটি যুক্ত ইশতাহার যুগপৎ ঢাকা থেকেও প্রকাশিত হবে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ মন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম আজ নয়াদিল্লিতে ভারতকে বিশ্বের এ অঞ্চলের সবচে[illegible] শক্তিশালী দেশ বলে অভিহিত করেছেন। তিনিই প্রথম একটি ইউরোপীয় সরকারের প্রতিনিধি যিনি ভারতকে শক্তিশালী বলে স্বীকার করলেন।

৯ ফেব্রুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে। গত অকটোবর মাস থেকে হিসাব করে কর্মচারীরা এই টাকা পাবেন। এই অতিরিক্ত ভাতা পাবেন প্রায় দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার সরকারী কর্মী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পরীক্ষা হলে ব্যাপক টোকাটুকি বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কৃতসংকল্প। [illegible] এ বছর যে চেষ্টা শুরু হয়েছে আগামী দিনে তা আরও জোরদার করা হবে।

১০ ফেব্রুয়ারি—বাইরে পার্ট টুর ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভের ফলে আজ [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] সমস্ত [illegible] বন্ধ হয়ে যায়। [illegible] সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরীক্ষা [illegible] না করা পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।

নির্বাচনে বোঝাপড়ার প্রশ্নে কদিন ধরে ফরওয়ারড ব্লকে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, তা আজ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফরওয়ারড ব্লকের অন্যতম নেতা ও বিধানসভার স্পীকার শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার এদিন চব্বিশ পরগনার বাগদা কেন্দ্রে নির্দল হয়ে দাঁড়ালেন বলে ঘোষণা করেন। কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে না।

১১ ফেব্রুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গে এবার নির্বাচনে এবার প্রার্থীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় অনেক কম। সরাসরি লড়াই বেশী। ত্রিমুখী লড়াইও কম নয়। নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা কমের দিকে, হয়ত রেকরড করবে।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিজ্ঞান ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম বলেন—আগামী দু বছরের মধ্যে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র ও সকল স্তরের ইনজিনিয়ারদের কর্মসংস্থান হবে। পরিকল্পনা [illegible] যে সব প্রকল্প আছে সেগুলি [illegible] বহু কর্মী চাই।

১২ ফেব্রুয়ারি—[illegible] সমস্যা মোকাবিলার জন্য বেকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি তাঁদের অন্তর্বর্তী রিপোরটে আয় এবং যৌথ কোমপানিগুলির করের উপর বিশেষ-কর্মসংস্থান-সারচারজ বসানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। এইভাবে অর্থ সংগ্রহ করে আগামী ২ বছরে ৪০ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব দিয়েছেন।

কংগ্রেস এবং সি পি আই যুক্তভাবে নির্বাচনী প্রচারের বিস্তারিত কর্মসূচী তৈরি করেছেন। সি পি আই-এর চেয়ারম্যান শ্রী এস এ ডাঙ্গে [illegible] কলকাতা আসছেন। তিনি দুদিন ধরে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা দিবেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি—কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে আর গণেশ আজ ভুবনেশ্বরে এরূপ আভাস দেন যে কর ফাঁকি দেওয়া আর গোপন করাকে আগের চেয়ে গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য করার জন্য দেশের কর সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হবে।

অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ছয় বৎসরের জন্য ১৭ জন কংগ্রেস কর্মীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিষিদ্ধ করেছেন। সরকারী কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

৭ ফেব্রুয়ারি—ভুট্টো প্রশাসন বাংলাদেশকে হেয় করার জন্য একটি গুজব রটিয়েছিলেন। গুজবটি হল এই যে, বাংলাদেশে বিহারী মুসলমানদের কচুকাটা করা হচ্ছে। ভেবেছিল যে, এতে সারা দুনিয়ায় হায় হায় রব উঠবে। কোথাও কিছু হয়নি। মাঝখান থেকে পাকিস্তানের শহরে শহরে ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ করছে।

৮ ফেব্রুয়ারি—করাচিতে বাঙ্গালীদের উপর হামলা শুরু হয়েছে। পাকিস্তানে এখন চার লক্ষ বাঙ্গালী আছেন। অধিকাংশই করাচি অঞ্চলে বাস করেন। শুধু হামলা নয়। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের দাবি : বাঙ্গালীদের বন্দী শিবিরে পাঠানো হোক।

৯ ফেব্রুয়ারি—প্রেসিডেনট নিকসন আজ বলেন যে, আমেরিকা ভারতের সঙ্গে নতুন করে বৈষয়িক ও রাজনৈতিক কথাবার্তা চালাতে প্রস্তুত। তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী এই দেশটি এই উপমহাদেশে তাদের প্রতিবেশী দেশগুলির প্রতি কি মনোভাব নেয় তা জানতে আমরা আগ্রহী।

১০ ফেব্রুয়ারি—বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক সেকরেটারিয়েটের সাধারণ সম্পাদক শ্রীটুংকু আবদুল রহমানের প্রশ্ন করেন, [illegible] লক্ষ [illegible] করেছেন। [illegible] নিরপরাধ মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে আপনি টু শব্দটি করেন নি।

১১ ফেব্রুয়ারি—মার্কিন প্রেসিডেনটের যুদ্ধ বাধাবার ক্ষমতা খর্ব করার জন্য সেনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি একটি বিল তৈরি করেছেন। [illegible] মার্কিন প্রেসিডেনটের সমগ্র বিদেশে যে কোন [illegible] যুদ্ধ বাধাবার প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আছে।

১২ ফেব্রুয়ারি—বাংলাদেশে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হবে বাংলা। আজ ঢাকায় সরকারীভাবে একথা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের এক খবরে প্রকাশ : আগামী ১ মার্চ থেকে সব সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতন হ্রাস পাবে।

১৩ ফেব্রুয়ারি—বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে যে সব বীমা পলিসি করা হয়েছে, সেগুলি বাতিল বলে গণ্য হবে। এই ঘোষণায় বলা হয়, পলিসি হোল্ডারেরা বাতিল পলিসির পরিবর্তে নতুন পলিসি পাবেন।

জনতা গ্রুপ সঞ্চয় পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনা
আপনাকে একটি

৫০,০০০ টাকা পাবার সুযোগ দিচ্ছে
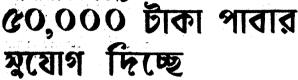
১২টি সুযোগ পাবেন একটি ফিয়াট গাড়ীর জন্য

২০,০০০ টাকা পাবার * ৮টি সুযোগ পাবেন

একটি মোটর সাইকেলের জন্য **৪,০০০ টাকা পাবার**

১২টি সুযোগ পাবেন একটি ফ্রিজের জন্য ২,৫০০ টাকা পাবার

৬০টি সুযোগ ১,২৫০ টাকার চিটভ্যেলু পাবার * ১২টি সুযোগ ৭৫০ টাকা পাবার

৪৮টি সুযোগ ৫০০ টাকা পাবার * ২৮টি সুযোগ ২৫০ টাকা পাবার

আর পাবেন ৫০ টাকা করে প্রত্যেক ১০৮০ সদস্য ৬০টি ড্রতে ২১ বার ড্র
হবে প্রতিমাসে প্রতিমাসে মাত্র ২৫ টাকা বিনিয়োগে আপনার সঞ্চয় ৫০
মাসের জন্য নিরাপদ, ১০০ টাকার বোনাস অবশ্যই পাবেন। আপনার সঞ্চয়ের সাথে ৭২তম মাসে।

আজই সদস্য হোন। মাত্র ৪৯৯৯ জন সদস্য এই পরিকল্পনায় গ্রহন করা হবে।

জনতা গ্রুপ

নিউ ভারত সেভিংস ইউনিট কোং প্রাঃ লিমিটেড

তাহের ম্যানসন, ৮, বেন্টিক স্ট্রীট, কলিকাতা-১

মোট বিজয়ী
১২৬১
মোট পুরস্কার
৫,২১,০০০ টা:
মোট বোনাস
৪,৯৯,৯০০ টা:

জনতা গ্রুপ আপনার সঞ্চয় বাড়াতে সাহায্য করে

২৭-২-৭২ তারিখে জনতা গ্রুপের প্রথম পুরস্কার বিতরণ হবে। এজেন্ট চাই।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীমনু পারেখ

অসাধারণ
পোদ্দার
স্যুটে
অনন্য পুরুষ
এ রকম পুরুষের প্রয়োজন শুধু সুবিধাজনক আরামদায়ক পোদ্দার স্যুট—পাট ভাঙে না, কোঁচ পড়ে না এমন টেরীন® ও 'টেরীন'-এর মিশ্রণে তৈরী স্যুটিং।
বহু ধরনের শোভন চিরস্থায়ী বর্ণে ··নির্ভীক বিজয়ী ডিজাইন।
আর যেখানে আপনিই একমেব পুরুষ সেখানে তো আপনার ঠিক এই রকমটিই দরকার—সুদর্শন পরিপাটি নির্ভরযোগ্য স্যুট ·· পোদ্দার স্যুট।
পোদ্দার স্যুটিংস্
পোদ্দার মিলস্ লিঃ
পোদ্দার সিল্কস্ অ্যাণ্ড সিন্থেটিকস্ লিঃ
পোদ্দার প্রোসেসার্স
পোদ্দার স্পিনিং মিলস্
পোদ্দার নিটিংস্ লিঃ
® Regd. T. M of CAFI
PODAR textiles
বিজয়ের পরওয়ানা

আমরা
সবাই
মাখি
বসন্ত মালতী তেল
বসন্ত মালতী তেল আজ ঘরে ঘরে সমাদৃত '
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে
বিখ্যাত জবাকুসুম তেলের প্রস্তুতকারক
সি কে সেনের প্রায় একশো বছরের অভিজ্ঞতা।
চুলের সহজাত সৌন্দর্য্য ধরে রাখতে যে সব
দেশীয় উপাদানের প্রয়োজন তার সবগুলিই
বসন্ত মালতী তেলে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।
এই তেল মাখলে চুল বেশ পরিপাটী
থাকে। এর মন মাতানো গন্ধ সারা দিন
আপনাকে খুসীর আনন্দে ভরিয়ে রাখবে।
সি. কে. সেন এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ও দিল্লী
Basant
malati

একেবারে নতুন!!
ল্যাক্‌মে
আল্ট্রা-সিল্ক
ফেস পাউডার আর কম্প্যাক্ট মেক-আপ
ভারতের প্রত্যেকের রঙের
সৌন্দর্য্য বাড়াতে
আটটি চমৎকার রঙে
L
L

ইতিহাস-আখ্যান

দেবদাসী	৬·০০
হারেম	৫·০০
ঠগী	৫·০০

প্র ব ন্ধ

সমাজ ও ইতিহাস	৩·০০
প্রগতির পথ	৩·০০
গণযুগ ও গণতন্ত্র	৩·০০

চি ত্রে জী ব নী

রাজার রাজা	৪·০০

প্রকাশিত হল

একা একা

বিমল কর

জীবন থেকে প্রায় সব রঙ মুছে যাওয়া, আয়ু প্রান্তে এসে পৌঁছনো একদা প্রেমিক-প্রেমিকা দুটি নরনারী, আর ফুটন্ত ফুলের মতন জীবনের সকল দুর্লভ বর্ণালী ও সৌরভ আহরণে উৎসুক দুটি সদ্যোপরিচিত তরুণ-তরুণী—এই চারটি একা একা মানুষ আর একা নয়, বন্ধুত্ব সান্নিধ্য মমতার উত্তাপে সংযুক্ত। অন্তবেলার বিষন্ন ম্লানিমার পটে উদয়রাগের উজ্জ্বল মাধুর্যের এক অপরূপ চিরন্তন খেলার অপূর্ব চিত্র 'একা একা' ॥ দাম ৫·০০

এই লেখকের : **ভুবনেশ্বরী** ৪·০০ **মৃত ও জীবিত** ৪·০০ **একদা কুয়াশায়** ৬·০০ **কুশীলব** ৩·৫০ **আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন** ৪·৫০ **যদুবংশ** ৭·০০ **পূর্ণ অপূর্ণ** ১০·০০ **পরিচয়** ৪·০০ **বালিকা বধূ** ৩·০০ **গ্রহণ** ৪·০০ **খড়কুটো** ৪·০০ ॥

উ প ন্যা স

স্মরগরল	৭·০০
আঁধার পেরিয়ে	৫·০০

ছো ট দে র গো য়ে ন্দা - উ প ন্যা স

ভয়ের মুখোশ	৪·০০

জী ব ন চ রি ত

বিবেকানন্দ চরিত	৭·০০
ছেলেদের বিবেকানন্দ	২·০০

উ প ন্যা স

দুঃখের বা সুখের জন্য	৫·০০
নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান	৪·০০

ক্রী ড়া সা হি ত্য

ক্রিকেটের আইনকানুন	৫·০০

জী ব ন চ রি ত

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর	৩০·০০
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা	৩·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯ ॥

নির্বাচনের আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আর পক্ষকাল বাকি। নির্বাচনী আবহাওয়া পূর্বের তুলনায় কিছুটা উষ্ণ হয়ে উঠেছে যদিও তবু যে ধরনের উত্তেজনা সচরাচর দেখা যায় তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। অবশ্য নির্বাচনের মুখে মুখে সেটা দেখা দিতে পারে। একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায় বোধ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, যারা একেবারেই সাধারণ, রাজনীতি করে না, দলীয় রাজনীতির ঘোরপাঁচ বোঝে না, অথচ ভোটের সময় খুবই মূল্যবান হয়ে ওঠে—তারা গত পাঁচ বছরে এই রাজ্যের রাজনীতির অনেক ওঠাপড়া দেখেছে। দেখে দেখে কিছু সাধারণ শিক্ষা বোধ হয় লাভ করেছে। এই শিক্ষাই তাদের মুখ আপাতত বন্ধ করে রেখেছে। রাস্তাঘাটে, ট্রামেবাসে, ট্রেনে ভোট নিয়ে আলোচনা কিংবা তর্ক করা যে অর্থহীন—এটা অন্তত তারা বুঝে নিয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও বুঝেছে, তার ভোটের যেটুকু মূল্য সেটুকু সে ভোটের দিন সদ্ব্যবহার করবে, তার আগে হইচই করে কোনো লাভ নেই। কে কি বলেছে, কার নামে কি লেখা হচ্ছে—এ-সব চোখে দেখে রাখা কিংবা কানে শুনে রাখাই ভাল।

এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতাদের একটি অংশ নিশ্চয় সচেতন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর একটি বৃহৎ অংশ আছে যারা আজও অচেতন ও অজ্ঞ। রাজনীতির একটা কৌশলই হল, অজ্ঞদের নিজ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা। সে চেষ্টা আমাদের এখানে আগে ছিল, এখনও আছে। এবারে এই কৌশলের অন্যতম একটি হল, মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটকে অভিসন্ধিমূলক প্রচারের দ্বারা নিজেদের ভাগে টেনে নেওয়ার চেষ্টা।

আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে দুটি প্রধান দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে সে দুটি দল হল—নব কংগ্রেস আর সি পি এম। নব কংগ্রেসের নিজের ক্ষমতা ছাড়াও এই নির্বাচনে তার প্রধান সহায় সি পি আই দল। সি পি এম তার সাবেক জোটের বাইরে আরও তিনটি, বামপন্থী দলকে সহায় হিসেবে পেয়েছে, এস ইউ সি, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক। এটা ঠিকই যে, এই ধরনের বামপন্থী জোটের যেটুকু মূল্য তা নির্বাচনের সময়, তার পরে অবশ্য নয়। অন্তত আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা সে কথাই বলে। সি পি এম যে রাতারাতি তার উদ্দেশ্য ও নীতি সংশোধন করে সেদিনের ঘোরতর শত্রুদের কোল দিতে এগিয়ে এসেছে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। ছোট দলরা যে সেটা না বোঝে এমন নয়, কিন্তু এই ধরনের গাঁটছড়া না বাঁধলে নিজেদের অস্তিত্ব থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথাও এই প্রসঙ্গে আসে। জ্যোতিবাবুরা বেশ কিছুদিন ধরেই বলছিলেন, তাঁদের দলকে অবাধে ঘোরাফেরা ও নির্বাচনের কাজকর্ম করতে দেওয়া হচ্ছে না। এ-বিষয়ে তাঁর দল ও অনুবর্তীরা এতই সোচ্চার হয়েছিলেন যে, শ্রীসেনবর্মা সম্প্রতি এদিকে একটা সফর সেরে চোখে কানে সব দেখে-শুনে গেলেন। শ্রীসেনবর্মা কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভাল, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কোনো বড় রকমের অসুবিধে হবে না। জ্যোতিবাবুরা নিশ্চয় এটা স্বীকার করবেন না। তাঁরা বলবেন, পুলিস নিরপেক্ষ নয়, পুলিস উঠিয়ে নেওয়া হোক, তাঁরা তাঁদের দলের হাজার হাজার ছেলে ঢুকিয়ে অবস্থা আয়ত্তে এনে নেবেন। এ ধরনের কথাবার্তা দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয় না। কিংবা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর মতন নেতার বাড়িতে বোমা তৈরী করা এবং করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়াও ভাল দৃষ্টান্ত নয়। এ-রকম ঘটনা আরও আছে।

আগামী নির্বাচনে ভোটদাতাদের দায়িত্ব তাই সবচেয়ে বেশী। তাদের হাতেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ।

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৭
শনিবার ১৩ ফাল্গুন ১৩৭৮
SATURDAY 26 FEB. 1972

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা—১ থেকে সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে অন্তঃশুল্ক সমেত)

কলিকাতায়

বার্ষিক	—	টাঃ ৩২.০৪
ষান্মাসিক	—	টাঃ ১৬.০২
ত্রৈমাসিক	—	টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)

বার্ষিক	—	টাঃ ৩৭.০৪
ষান্মাসিক	—	টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক	—	টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	—	টাঃ ৪৫.০৪
ষান্মাসিক	—	টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক	—	টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	—	টাঃ ৮৪.০৪
ষান্মাসিক	—	টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক	—	টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	—	টাঃ ৫৭.০৪
ষান্মাসিক	—	টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক	—	টাঃ ১৪.৭৬

সমস্ত বায়ু ডাকে বারক

বার্ষিক	—	টাঃ ১৫৭.০৪
ষান্মাসিক	—	টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক	—	টাঃ ৩৮.৭৬

ভোটদাতার সুখের মুহূর্ত

সমদর্শীর সংবাদভাষ্য

পশ্চিমবঙ্গের মর্মপীড়া

"কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়নই শ্রমিকদের কল্যাণ চিন্তা করে, একথাটা একেবারে ভ্রান্ত। ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কাজই হওয়া উচিত, দিবারাত্র উৎপাদন।" আমাকে দোষ দেবেন না, কথাটা আমার নয়। নয় কোনও পুঁজিবাদী মালিকের পোষা প্রচারবিদেরও। উক্তিটা খোদ 'ডেইলি ওয়ারকার' কাগজের। 'ডেইলি ওয়ারকার' পিকিং থেকে প্রকাশিত জনগণতান্ত্রিক চীনের বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠন-সমূহের সরকারি মুখপত্র। ১৯৫৭ সালে যখন সমালোচনার জন্য সমালোচনার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, সেই 'শতপুষ্প বিকশিত' হবার যুগে ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রশাসনের বিরুদ্ধে যখন সরব হয়ে উঠেছিল, সেই সময় (৩০ জুলাই, ১৯৫৮) শ্রমিক সংগঠনগুলিও সমালোচনার দুঃসাহসকে নিন্দা করে উক্ত হুঁশিয়ারী দেওয়া হয় এবং এও বলা হয় সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থকে উঁচুতে স্থান দেন।

১৯৫৪ সালের এক আইনে চীনের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়: ট্রেড ইউনিয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হল, "সরকারি আইন মেনে চলা, শ্রম নিয়মশৃঙ্খলা যে-কাজে অটুট থাকে সেই কাজ এগিয়ে যাওয়া, জনকল্যাণে ব্রতী হওয়া এবং বিরোধ মিটিয়ে ফেলা।"—(নাগরিক কর্মীদের সংগঠন-বিধি, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৪)।

জানি না, পশ্চিমবঙ্গের 'দেশপ্রিয়' শ্রমিক শ্রেণীর কতজন মহাবিপ্লবী নেতা কমিউনিস্ট চীনের এই বিধিকে শ্রমিক সংগঠনের আদর্শ বলে গ্রহণ করবেন। উৎপাদন অপেক্ষা উৎপাদন পণ্ড করাই যেখানে শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান কৃত্য সেখানে উন্নতির আশা করা আর বন্ধ্যা রমণীর কাছে সন্তান কামনা করা এক কথা। এই সাদা কথাটা আমাদের প্রগতিশীল ইনটেলেকচুয়ালের দল যেমন আমল দিতে চান না। অনেক সংখ্যাতত্ত্বের জঞ্জাল ঘেঁটে পশ্চিমবঙ্গের মর্মপীড়ার কারণানুসন্ধানে যেসব প্রগতিশীল প্রতিভা ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের মতে কেন্দ্রের অবিচারই পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশার হেতু। সন্দেহ নেই, এর মধ্যে সত্য কিছু আছে। কিন্তু সেটা পূর্ণ সত্য নয়। তাঁরা হাতির শুঁড়টায় হাত দিয়েই সিদ্ধান্ত পেয়েছেন হাতির দেহটা অজগর সাপের তুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশার প্রধানতম কারণটির উৎস দিল্লি নয়, এই রাজ্যেরই নেতিবাচক বাম-রাজনীতি, এবং যে রাজনীতি সর্বদাই সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক উদ্যোগ আয়োজন পণ্ড করাকেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছে। এদের নীতি ছিল পরিষ্কার, অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে একদিকে মধ্যবিত্তদের মনে হতাশা এবং অন্যদিকে দরিদ্র চাষী ও শ্রমিকদের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করা। বৃটিশ আমল থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বেশি, এবং তার উপর উদ্বাস্তুর চাপ নিদারুণভাবে বেড়ে যাওয়ায় লোকের মনে বিক্ষোভ এবং হতাশা সংক্রমণের অনুকূল ভূমি প্রস্তুত করা নেতিবাচক বাম-রাজনীতির পক্ষে সহজ হয়েছিল।

সেই সময় দেশহিতৈষী বাস্তুমানেরই কর্তব্য ছিল, উদ্বাস্তুদের সামনে কঠোর জীবন সংগ্রামের বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরা এবং উদ্বাস্তুদের বাড়ির বিধবা মেয়েদের সরকারের গলগ্রহ হিসাবে না রেখে তাদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার উপযোগী জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাম-রাজনীতির কাছে মানুষের ভবিষ্যতের চেয়ে বরাবরই তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধিটা বড়। তাই তাঁরা উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রত্যেকটি পরিকল্পনা এবং চেষ্টা বানচাল করে দেন। আন্দামানে বাঙালী উদ্বাস্তু পাঠানোর প্রচেষ্টা বাম-রাজনীতির বৈপ্লবিক বাধাদানের ফলে আধা পথেই বানচাল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশ তার সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিজেদের বাড়তি জনসংখ্যা সেখানে পাঠিয়ে দিল। দণ্ডকারণ্যেও সেই একই গতি হল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তু ছড়িয়ে দিয়ে এই রাজ্যকে জনসংখ্যার বিপুল বোঝা বইবার দায় থেকে মুক্ত করার যত চেষ্টা করা হয়েছে, সে-সবই 'উদ্বাস্তু দরদী' বামপন্থীরা একে একে বানচাল করে দিয়েছে। বহু সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎকে এইভাবে সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে বামপন্থীরা নষ্ট করেছেন এবং এদেরকে শুধু ব্যবহার করেছেন বিস্ফোরণের কাঁচামাল হিসাবে।

সেচ বাঁধ নির্মাণ, যানবাহন, শিক্ষা, খাদ্য ও কৃষিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, ধর্মঘট করে সমগ্র বাঙালী জাতির মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে দিয়েছেন। কলকাতাকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার মোড় ঘোরাবার জন্য দুর্গাপুর-আসানসোলে যে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে, প্রথমদিন থেকে সেখানে এমন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে সেখানে কেউ মূলধন নিয়োগ করতে ভরসা না পায়।

কলকাতা শিল্পাঞ্চলের অস্থিরতার কথা তো আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যদি এই ধারণাই ঠিক হয় যে, কেন্দ্র বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গকেই গলা টিপে মারবে বলে ঠিক করেছে (কেন মারবে? কেন্দ্র বাঙালী-বিদ্বেষী বলে? তা হলে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য কেন্দ্র এত ঝুঁকি নিল কেন? ইত্যাদি স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রশ্নগুলি স্বভাবতই মনে জাগে। এর উত্তর কী? কেন্দ্র বেছে বেছে বাঙালীদের বিরুদ্ধেই বা ষড়যন্ত্র করছে কেন?), তা হলে এখানে বামপন্থীদের ধ্বংসাত্মক কাজ-কারবার দেখে কি এই সন্দেহ হয় না যে এঁরাই সেই 'কেন্দ্র' নামক পদার্থটির সিক্রেট এজেন্ট?

এঁরা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কলোনি। পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভরতাই এঁদের কাম্য। এ পর্যন্ত বাম-রাজনীতি এমন কোন কাজ করেছেন, একটা উদাহরণ পেলেও খুশী হতে পারি, যাতে বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়েছে। বরং আমরা দেখি, এদের প্রতিরোধমূলক আন্দোলন এই রাজ্যের শিল্প উৎপাদন এত কমিয়ে দিয়েছে যে ক্রমেই পশ্চিমবঙ্গের টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা ভোগ্যপণ্য কেনার ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষীই হয়ে পড়ছি।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের স্বাভাবিক উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে, বাঙালীর ব্যবসা লাটে তুলে দিয়ে (পশ্চিমবঙ্গের শিল্প মানেই বাঙালীর ব্যবসা নয়) পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভরতা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? শুধু অসার ফাঁপা স্লোগানে কী তা সম্ভব? কর্মের প্রতি বিমুখতা, উৎপাদনের প্রতি অবহেলাই যে পশ্চিমবঙ্গের মর্মপীড়ার মূল কারণ, এই সত্য ঢোলের ঢাকের ফাঁকা আওয়াজে ঢাকা দেওয়া যায় কি?

নির্বাচনের পটভূমিকার পরিবর্তন

একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, পাঁচ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যেগুলি প্রধান ইস্যু ছিল এবারের নির্বাচনে তার কোনও একটাকে নিয়েও কোনও রাজনৈতিক দল তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না।

পাঁচ বছর আগে, ১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন হয়েছিল। বিধিমত তারপর পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হওয়ার কথা এবার—অর্থাৎ ১৯৭২-এ। কিন্তু তা না হয়ে ইতিমধ্যে এ রাজ্যে আরও দুটো বাড়তি নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। এবার হচ্ছে আর একটা নির্বাচন।

কিন্তু এই পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের, ভারতের এবং এই উপমহাদেশের সামগ্রিক আবহাওয়া এতটা পাল্টে গিয়েছে যে, এবার এ-রাজ্যে নির্বাচনী ইস্যুগুলি একেবারে ভিন্ন।

১৯৬৭ সনের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে একটা বড় ইস্যু ছিল খাদ্যসমস্যা এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব। সেবার কংগ্রেসবিরোধী দুই নির্বাচনী ফ্রন্টই কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তুলেছিল খাদ্য নিয়ে। বলেছিল, কংগ্রেসের জন্যই দেশে এত খাদ্যসংকট—কংগ্রেস সরকারকে বিতাড়িত করলেই খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যাবে। রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং খাদ্যমূল্য হ্রাসের প্রতিশ্রুতিও তারা দিয়েছিল ব্যাপকভাবে।

এমন কি, নির্বাচনে যখন কংগ্রেস পরাজিত হল এবং দুই বামপন্থী ফ্রন্টই যখন একত্রে সরকার গঠন করল তখনও তাদের সামনে প্রধান সমস্যা খাদ্য। খাদ্য নিয়ে ফ্রন্টের ভেতরে মতভেদ দেখা দিল, খাদ্য নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ফ্রন্ট সরকারের জোর মতভেদ হল—খাদ্যের দাবিতে দিল্লিতে ধর্না দেবার জন্যও মন্ত্রিরা ছুটলেন।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে দেখুন খাদ্য সমস্যা আর তেমন কোনও ইস্যুই নয়। খাদ্য সমস্যা নিয়ে এবার কোনও রাজনৈতিক দলই

আর তেমনভাবে মাথা ঘামাচ্ছেন না।

মাথা ঘামাবার সুযোগও নেই। খাদ্যকে ইস্যু করার মত অবস্থাও এখন আর দেশে নেই। আগে নিয়মিত কাগজে খবর দেখা যেত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছে অত লক্ষ টন চাল বা গম চেয়েছে। এমনও খবর দেখা যেত, কেন্দ্র বলেছে চাহিদামত চাল-গম পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া যাবে না—কারণ দেশের সর্বত্রই খাদ্যাভাব। রেশনে চাল-গমের পরিমাণও মাঝে মাঝেই কমানো হত। একবার তো রেশনের পরিমাণ কমানো নিয়ে যুক্ত-ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় একটা সংকটই সৃষ্টি হয়েছিল। ফ্রন্ট এবং ক্যাবিনেট রেশনের পরিমাণ হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সি পি এম এবং এস ইউ সি প্রকাশ্যে সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। বলেছিল, যে মিটিং-এ রেশনের বরাদ্দ হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আমরা সে মিটিং-এ ছিলাম না। অতএব এ-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই।

দেশের খাদ্য পরিস্থিতি আজ কতটা পাল্টে গিয়েছে সাম্প্রতিক একটা খবর তার প্রমাণ। খবরটা এইরকম : ভারত কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে গমজাত দ্রব্য রফতানির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ময়দা এবং সুজি রফতানি করা হবে। তা ছাড়া এ বছর বাংলাদেশকেও ভারত প্রচুর পরিমাণে গম পাঠাবে।

এই খবরটা কোথাও খুব বড় করে বের হয়নি। কিন্তু খবরটার গুরুত্ব বিরাট। কারণ ভারতীয় অর্থনীতির এক ব্যাপক পরিবর্তনের খবর রয়েছে এই ঘোষণার মধ্যে। কী বিরাট পরিবর্তন ভাবুন একবার। যে ভারত ১৯৬৭-৬৮ সনেও একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই পি এল ৪৮০-র বরাদ্দ অনুসারে ২৮৫ কোটি টাকার গম আমদানী করেছিল সেই ভারত আজ গম রফতানি করছে। গত বছর ভারত সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে খাওয়ালো। কিন্তু তাতেও ভারতে কোনও খাদ্যাভাব দেখা দিল না।

আমাদের নির্বাচনে শুধু নেগেটিভ জিনিসগুলিই ইস্যু হয়—তাই দেশের খাদ্য পরিস্থিতি এবার কোনও ইস্যুই হল না।

১৯৬৭ সনের নির্বাচনে আর একটা বড় ইস্যু ছিল দুর্নীতি।

তখন কংগ্রেস রাজত্ব চলছে। সাধারণ মানুষের অনেকেই কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে কোনও অভিযোগ বিশ্বাস করতেন। বামপন্থী বা কংগ্রেস-বিরোধী নেতারাও কথায় কথায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলতেন। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনে তাই দুর্নীতি একটা বড় ইস্যু ছিল। দুই বামপন্থী বা কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্টের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছিল, আমরা সরকারী ক্ষমতা হাতে পেলেই সরকারী পর্যায়ে দুর্নীতির অবসান ঘটাবো এবং কংগ্রেসী আমলে যত দুর্নীতি হয়েছে তার সব কিছু উদ্ঘাটন করে দোষীদের সাজা দেব। কংগ্রেসবিরোধীরা যখন নির্বাচনে জিতলেন এবং যখন দুই ফ্রন্ট মিলে একটা ফ্রন্ট হল তখনও দুর্নীতি দমন ও অনুসন্ধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। বলা হল, সরকারী ক্ষমতা হাতে নিয়েই আমরা দুর্নীতি তদন্ত কমিশন বসাবো এবং সব দুর্নীতিবাজকে সাজা দেব।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল কিছুই হল না। কোনও কমিশনও হল না, কোনও দোষী বা দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের

করে সাজাও দেওয়া হল না।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা নিয়ে ফ্রনটের মিটিং-এ কিছুটা কথাবার্তা উঠত। যাঁরা মন্ত্রিসভায় ছিলেন না তাঁরা বলতেন, কী হল দুর্নীতির তদন্তের? যাঁরা মন্ত্রিসভার মধ্যে ছিলেন তাঁরা বলতেন, হবে হবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুই হল না। একটা ব্যাপারে কিছুটা তদন্ত হল। একজন অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস-কে দিয়ে ফ্রনট মন্ত্রিসভা কংগ্রেসী আমলে বাসের পারমিট বিতরণের ব্যাপারে একটা তদন্ত করালেন, কিন্তু তাতেও কাউকেই পিনপয়েন্ট করা গেল না। ব্যাপারটা ওই তদন্তেই চাপা পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে কিন্তু যুক্তফ্রনটের বিভিন্ন দল এবং মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সেই বাসের পারমিট দেওয়া নিয়েই এবারও দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। অভিযোগ উঠল পারক হোটেলকে লাইসেনস দেওয়া নিয়ে। নানা অভিযোগ উঠল বড়লোকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার ব্যাপারেও।

এইভাবে দুর্নীতির ব্যাপারে দু-পক্ষেই একটা প্লাস-মাইনাস হয়ে গিয়েছে। তাই এবার আর দুর্নীতির ইসু নয়।

এবারের নির্বাচনে প্রধান ইসু হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের প্রশ্ন। সব পক্ষই সেই প্রশ্ন তুলছে। কংগ্রেস-সি পি আই জোট বলছেন, একমাত্র আমরাই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আনতে পারি। সি পি এমের নেতৃত্বে গঠিত বামপন্থী জোটও সেই কথাই বলছেন।

১৯৬৭ সনের নির্বাচনে কিন্তু রাজনৈতিক স্থায়িত্বের কথা কেউ তোলেনি। কারণ, তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বস্তুটা আমাদের জানাই ছিল না। কংগ্রেস ছিল। কংগ্রেসই রাজত্ব চালাত। এবং আমরা অনেকে সেই কংগ্রেস সরকারকে প্রাণভরে গালিগালাজ করতাম। ১৯৬৭ সনের পর থেকেই এল রাজনৈতিক স্থায়িত্বের প্রশ্ন। প্রথম যুক্তফ্রনট সরকারের খুব বেশি গরিষ্ঠতা ছিল না। দ্বিতীয় যুক্তফ্রনটের কিন্তু সেই অসুবিধা আর রইল না। কারণ ১৯৬৯ সনের নির্বাচনে যুক্তফ্রনট বিরাট বিশালভাবে গরিষ্ঠতা পেল। তবু সেই মন্ত্রিসভা টিকল না। নির্বাচনের কিছু-দিনের মধ্যেই ফ্রনটের শরিকে শরিকে মারামারি খুনোখুনি শুরু হয়ে গেল। প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দলীয় স্বার্থে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ তুলতে শুরু করল। এবং শেষ পর্যন্ত এইসব ঝগড়াকে কেন্দ্র করেই ১৯৬৯ সনের যুক্তফ্রনট মন্ত্রিসভাও ভেঙে গেল। আবার নির্বাচন হল ১৯৭১ সনে। সে নির্বাচনে কেউই স্থায়ী সরকার গড়ার মত গরিষ্ঠতা পেল না। জোড়াতালি দিয়ে একটা কোয়ালিশন সরকার গঠিত হল। কিন্তু তাও বেশি দিন টিকল না।

তাই পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ বছরের মধ্যে এই চতুর্থবার নির্বাচন হতে চলেছে। স্বভাবতই এবার রাজনৈতিক স্থায়িত্বের প্রশ্ন উঠছে। রাজনৈতিক স্থায়িত্ব যতদিন ছিল ততদিন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। রাজনৈতিক স্থিরতা হারাবার পর আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছি। কারণ এতদিনে আমরা ঠেকে বুঝেছি রাজনৈতিক স্থায়িত্বের মূল্য কতটা।

রাজনৈতিক স্থিরতা হারাবার ফলে কতভাবে পশ্চিমবঙ্গের কতটা ক্ষতি হয়েছে তা কিন্তু আমরা এখনও জানি না।

এবারে নির্বাচনে আর একটা বড় ইসু হল আইন ও শৃংখলা। আইন ও শৃংখলা যে এরকম একটা ইসু হয়ে উঠতে পারে ১৯৬৭ সনের আগে তা কেউ জানত?

১৯৬৭ সনের আগে এরকম রাজনৈতিক খুনোখুনি মারামারির কথা সাধারণ মানুষ কেন, রাজনৈতিক নেতারাও কল্পনা করতে পারেন নি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সনে নানা দল নানা অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু এ অভিযোগ কেউ তোলেন নি যে কংগ্রেস বিরোধী পার্টিগুলিকে পেটাচ্ছে। বা কংগ্রেস পুলিসের সাহায্যে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে বিরোধী পার্টি-গুলি নির্বাচনী প্রচারেই নামতে পারছে না। বস্তুত কোনও পার্টিই কোনও পার্টির বিরুদ্ধে তখন মারামারির অভিযোগ তুলত না। কারণ তখন রাজনৈতিক মারামারি জিনিসটাই ছিল না। সেটা এল প্রথমে ১৯৬৭ সনে। যুক্তফ্রনট ক্ষমতায় আসার পর। মারামারিটা চূড়ান্তে পৌঁছল ১৯৬৯ সনে। অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় যুক্তফ্রনট সরকার চালু হল। মারামারিটা এত বাড়ল যে যুক্তফ্রনটের শরিক দলগুলি ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিল। প্রায় প্রত্যেকেই অভিযোগ তুলল, সি পি এম জ্যোতিবাবুর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সুযোগ নিয়ে দলের স্বার্থে পুলিসকে ব্যবহার করছে। তারপর এল নকশাল আন্দোলন। অবস্থাটা একেবারে চরমে উঠল। প্রথমে খুনে নামল নকশালরা ও সি পি এম। তারপর এল পুলিস। তারপর এল একদল কংগ্রেস। ১৯৭০-৭১ সনে অবস্থাটা একেবারে চরমে উঠল। তাই ১৯৭১ সনের নির্বাচনে আইন ও শৃংখলাটাই ছিল প্রধান ইসু।

১৯৭২ সনে রাজনৈতিক মারামারি খুনোখুনি কমেছে। কিন্তু তা বলে কেউ বলতে পারবেন না একেবারে থেমেছে। অর্থাৎ ১৯৬৭ সনের অবস্থায় এসেছে। এখনও প্রতিদিন খবরের কাগজে মারামারি খুনোখুনির খবর থাকে।

তাই এবারের নির্বাচনেও শহুরে মানুষের কাছে আইন শৃংখলা একটা বড় ইসু। ১৯৪৭ থেকে '৬৭ পর্যন্ত যা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রনট সরকার আসার পর থেকে যা নিয়ে সবাই মাথা ঘামাতে বাধ্য হল এখনও সেই ভূত অর্থাৎ সেই রাজনৈতিক মারামারি খুনো-খুনি নিয়ে সবাইকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। কারণ, কম হলেও এখনও কিছু মারামারি খুনোখুনি পশ্চিমবঙ্গে চলছে। আইন ও শৃংখলা তাই এবারও বেশ একটা ইসু— যদিও সি পি এম যেভাবে ইসুটাকে তুলতে চাইছিল সেভাবে তুলতে পারল না।

এবারের নির্বাচনে আর একটা বড় ইসু বাংলাদেশ। ১৯৬৭ সনে কেউ ভাবতেও পারে নি পাঁচ বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হয়ে যাবে এবং সেই স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টিতে ভারত সরকার এত বড় একটা ভূমিকা নেবে।

২০-২-৭২ নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

অথই জলে

লণ্ডন থেকে ব্রাসেলস্ আর কত দূরে? আকাশ পথে সোজাসুজি দু-ই মাইলের বেশী নয়। কিন্তু ওই টুকু পার হতেই বিলেতের টোরি সরকারের জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী হীথের বড় সাধ তিনি তাঁর দেশকে ইউরোপের বারোয়ারি বাজারের ঘাটে ভিড়িয়ে দিয়ে অক্ষয় কীর্তি রাখবেন। চেষ্টার তাঁর ত্রুটি নেই। সে বাজারে ঢোকবার তাঁর আর্জি পার্লামেণ্টও মঞ্জুর করেছেন গেল অক্টোবরে। তারই জোরে তিনি জানুয়ারি মাসে আরও তিন উমেদারের সংগে একজোট হয়ে বারোয়ারি বাজারের চুক্তি সই করার অনুমতি চান পার্লামেণ্টের কাছে। সে হুকুম তাঁর মিলেছে, বারোয়ারি বাজারের সভ্য হবার সনদে স্বাক্ষরও তিনি করে এসেছেন ব্রাসেলসে। ব্রিটেনের সংগে সে সনদে সই দিয়েছে একই দিনে আয়ার্ল্যাণ্ড, নরওয়ে আর ডেনমার্ক। সই করার সংগে সংগে নিয়মতান্ত্রিক অনুষ্ঠান সব চুকে গেছে বটে, চার দেশ কিন্তু বারোয়ারি বাজারের পাকা সদস্য এখনও হয়নি। ১৯৭৩ সনের পয়লা জানুয়ারি ছয়ের জোট দশের জোট হবে ইতিমধ্যে কোন দেশ যদি তার মত না পালটায়।

মত পালটাবার ইচ্ছে অবশ্য চার উমেদারের কারুরই নেই। কিন্তু চারটে দেশেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু আছে, স্বৈরতন্ত্রের ধার তাদের মধ্যে কোনও দেশই ধারে না। কাজেই যা খুশি করা চার সরকারের কারুরই পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের লোকের মত নিয়ে তাদের এগুতে হচ্ছে প্রতি পদে। তারা যদি বিগড়ে যায় তা হলে সবই ভেস্তে যাবে। তাই বারোয়ারিপন্থী চার সরকার চলছেন খুব সন্তর্পণে, খুব হিসেব করে। চার দেশে সব লোকই তো আর একমত নয়, কেউ বারোয়ারি বাজার পছন্দ করে, কেউ আবার করে না। এ নিয়ে এক দলের সংগে যেমন আর এক দলের মতের মিল নেই, তেমনই দলের ভেতরেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দু মত। আয়ার্ল্যাণ্ডে ব্যাপারটার ফয়শালা করা হবে গণভোট নিয়ে, ডেনমার্কেও তাই। কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে তাদের যদি গণ-ভোটের রায় বারোয়ারি বাজারের বিপক্ষে যায়। বিলেতে আর নরওয়েতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পার্লামেণ্টে। পার্লামেণ্ট মত না দিলে ওদের বারোয়ারি বাজারের দরজা থেকেই ফিরতে হবে।

সে একটা খুব আপশোসের ব্যাপার হবে। কিন্তু সে ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া তো পথ নেই। ঝুঁকিটা যে কত বেশী তা বুঝছেন বিলিতী প্রধানমন্ত্রী হাড়ে হাড়ে। ২৮ অক্টোবর গেল বছর বিলিতী পার্লামেণ্টে যখন বারোয়ারি বাজারে ঢোকার আর্জি নীতিগতভাবে মঞ্জুর হয় তখন প্রধানমন্ত্রী আহ্লাদে আটখানা হয়েছিলেন। কমন্স্-সভায় তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল টেনেটুনে ২৬। সেই জায়গায় তাঁর বারোয়ারি বাজার সম্পর্কে প্রস্তাব পাস হয়েছিল ১১২ ভোটে। সে অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল বিলেতের পার্লামেণ্টারি রেওয়াজ অগ্রাহ্য করে টোরি, শ্রমিক আর উদারনৈতিক তিন দলেরই কোনও কোনও সদস্য দলের রীতির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াতে। বিদ্রোহ করেছিলেন টোরি আর শ্রমিক দলের বেশ কিছু সদস্য আর উদারনৈতিক দলের একজন। টোরিরা চায় তাদের নেতা হীথের নির্দেশ মেনে নিয়ে বারোয়ারি বাজারে যোগ দিতে। জনকতকের তাতে ঘোর আপত্তি। তাদের নেতা বর্ণবিদ্বেষী এনখ পাওয়েল। শ্রমিকরা চায় আপাতত বাজারের বাইরে থাকতে যদিও সেখানে ভেড়বার চেষ্টা তারাই শুরু করেছিল দশ বছর আগে। একজন বাদে উদারনৈতিকরা বাজারের পক্ষে।

হীথকে প্রথমবার বাঁচিয়েছিল শ্রমিক-দের নিজেদের ভেতরে এই নিয়ে বিভেদ। তাঁদের ৬৯ জন তখন ভোট দিয়েছিলেন সরকারের দিকে। উইলসন কিন্তু তার পরে ঘর সামলে নিয়েছেন। শ্রমিক দল এখন এককাট্টা। তাই যখন হীথ কমনসের দরবারে হাজির হলেন বাজারী চুক্তিতে সই করার অনুমতি চাইতে সে ছাড়পত্র মিললো বটে কিন্তু এবারে তাঁর জিত হলো কুল্লে ২১ ভোটে। তাতে অবশ্য তাঁর কিছু এসে গেল না এক ধুকপুকুনি বাড়া ছাড়া। ২২ জানুয়ারি তিনি ব্রাসেলসে গিয়ে বারোয়ারি বাজারে যোগ দেওয়ার চুক্তিতে সই করে এসেছেন। ঠিক তার আগেই তাঁর মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছিল বাজার-বিরোধী একটি মেয়ে প্রহরীদের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে। সে অপমান গায়ে না মেখে হীথ তাঁর কাজ শেষ করেছেন।

বিলিতী পার্লামেণ্ট বড় কঠিন ঠাঁই। সেখানে আচমকা কোনও বিল পাশ করানো যায় না। বিল তিনবার পার্লামেণ্ট পাস না করলে তা আইন বলে সাব্যস্ত হয় না। সেখানে বার বার হীথকে আসতে হচ্ছে বারোয়ারি বাজার সংক্রান্ত নানা আইনের খসড়া নিয়ে। তার একটিও যদি খারিজ হয়ে যায় তা হলেই চিত্তির—বাজারী হওয়ার সখ তাঁর মিটবে না। আরও মুশকিল তাঁর দলের বিদ্রোহীরা এখনও বশ মানেনি অথচ উইলসন তাঁর শ্রমিক দলকে মোটের ওপর বাগিয়ে এনেছেন, যদিও দু-চারজন এখনও বেতালা গাইছেন। বারোয়ারি বাজার বিলের দ্বিতীয় দফাওয়ারি আলোচনায় সময় সরকার তাই হারতে হারতে বেঁচে গেছেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি এ নিয়ে যে ভোটাভুটি হয়েছে কমন্সসভায় তাতে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়েছে মাত্র আট। এবারে শ্রমিক দলের কেউই দলের হুইপ অমান্য করে উল্টো দিকে ভোট দেন নি যদিও জন ছয়েক ছিলেন নিরপেক্ষ। ওদিকে সরকারী টোরি দলের ভাঙন এখনও জোড়া লাগেনি। তাদের জন ছয়েক আদৌ ভোট দেননি আর জন পনেরো ভোট দিয়েছেন সরকারের বিপক্ষে। হীথ সরকারের কেবল মুখ রক্ষে করেননি উদারনৈতিকরা, ভরাডুবির হাত থেকে তাঁদের বাঁচিয়েছেনও।

এত করেও শেষ রক্ষে করতে কী হীথ পারবেন? তাঁর সরকার কী পুরো পাঁচ বছর টিঁকে থাকবে? এবারে ভোটাভুটির আগে তিনি বিদ্রোহী টোরি-দের জনে জনে ডেকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, এবার যদি কমন্সে তাঁর হার হয় তা হলে অন্য কারুর ওপর তিনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন না—পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। তা হলে সেও একরকম গণভোটই হতো। তার দরকার আপাতত হচ্ছে না—মৃত্যুবাণ তাঁর রগ ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে। যেরকম সমস্যার সমুদ্দুরে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন তাতে তাঁর উদ্ধার পাওয়া শক্ত। বারোয়ারি বাজার নিয়ে ভোটাভুটি যখন হয় তখন বিলেতে কয়লা খনির শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় দেশে একরকম নিষ্প্রদীপ চলছিল। ছ হপ্তা চলার পর সে ধর্মঘট মিটে গেছে, কিন্তু ধর্মঘটীদের দাবি সরকারকে মেনে নিতে হয়েছে। মুখরক্ষে করার জন্যে একটি তদন্তের ব্যবস্থা হীথ তার আগে করেছিলেন বটে, তাতে তাঁর মান বাঁচেনি। বিলেতে বেকার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, তাতে অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তার ওপর গোল বেধেছে রোডেশিয়ার ঘোর বর্ণবিদ্বেষী আয়ান স্মিথ সরকারকে তোয়াজ করার চেষ্টা করাতে। অথই জলে পড়ে হীথ আর কূল পাচ্ছেন না।

একে একে নিবিছে দেউটি

রঞ্জন

সাড়ম্বরেই কুখ্যাত সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্তিম ব্যালান্স শীট—না কি চরমপত্র—আজও প্রকাশিত হয়নি। আমার এক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তো রানী ভিক্টোরিয়ার সরকারকেও জ্ঞান করতেন কোম্পানির উত্তরাধিকারী বলে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও একবার তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন কী এক কথিকার জন্য। অধ্যাপক তো অবাক। অল ইণ্ডিয়া রেডিও সে আবার কী? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন বিভাগ ওটা? অপর দিক থেকে উত্তর এলো যে, রেডিও এখন সরকারের অংশ বিশেষ। অধ্যাপক বললেন, "সরকার? গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া? আমি তো আজও ওকে কোম্পানি বলি।" সেই কোম্পানির প্রধান অংশীদার ছিলেন প্রথম রানী এলিজাবেথ। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক স্পানিশ আর্মাডা থেকে যে স্বর্ণসম্ভার লুঠ করেছিলেন, তার একাংশই হলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মূলধন। এই লগ্নী থেকে কত লাভ হয়েছিল তার হিসাবের [illegible] বিক্র[illegible] [illegible] দিন [illegible] না। শুধু মনে আ[illegible] দীর্ঘকাল পরে [illegible] লর্ড [illegible] প্রভুদের প্রখ্যাত উক্তি: সাচ ইজ দি পাওয়ার অব কমপাউণ্ড ইণ্টারেস্ট।

তারপর গেল অন্তত চার শতাব্দী। রানী এখন দ্বিতীয় এলিজাবেথ। [illegible] টেলিভিশনে নাকি দেখানো হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। [illegible] ম্যাগাজিন একবার লিখেছিলেন যে নেহরু হচ্ছেন ভারতবর্ষের সর্বশেষ বড়লাট। উড়িয়ে দিতে পারিনে কথাটাকে। কোথায় যেন চলছে একটা ঐতিহাসিক প্রবহমানতা, যদিও এখানে ওখানে কিঞ্চিৎ [illegible] অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান সচিবদের বর্ণ আলাদা; ইংরেজী সাধারণত [illegible]। বাণিজ্যিক মহলে মহাজনদের বেশ আজ আলাদা, তাঁদের গুরুরা একটা রকমের ইংরেজী বলতে শিখতে শুরু করেছেন। এই সবের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী। অনুকরণ অপরাধ নয়। আজকের নিঃসম্বল বাঙালীর অধিকার নেই অন্য প্রাগ্রসর (প্রধানত বৈষয়িক অর্থে) ভারতীয়দের তিরস্কারের। তবু নেতাজী সুভাষ রোডে নিরন্তর হাত বদলের পালা কোথায় যেন আঘাত করে আমার বাঙালী হৃদয়ে। গত সপ্তাহে জানা গেল যে আরো একটি ম্যানেজিং এজেন্সি হাউস হস্তান্তরিত হচ্ছে। অন্তরাত্মা [illegible] হতে পারে বাঙালী হৃদয়।

✽

ব্যবসায়-জগতে বাঙালীর ভূমিকা কখনোই প্রধান ছিল না। তবু ইংরেজ বণিকদের [illegible] হিসাবে সে কোন মতে স্থান করে নিয়েছিল তৎকালীন সোনার তরীতে। সেই সাজানো বাগান আজ শুকিয়ে গেছে। উত্তরসূরীকে অভিশাপ আজ নিরর্থক। বাঙালীকে বিক্রয় করেছে বাঙালী [illegible]

কিন্তু এ তো শুধু বৈষয়িক সম্পত্তির প্রশ্ন নয়। Who steals my purse steals trash। আমার বক্তব্য এই যে, বাঙালী সে বড় ব্রিটিশ বাণিজ্যিক হৌসগুলির সঙ্গে বাঙালী জীবনের অন্য একটা সাংস্কৃতিক যোগ [illegible] ছিল যা আজ বিপন্ন। বিলাতী বাণিজ্যে কর্মরত বাঙালী বাবুগণ আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না কখনোই, কিন্তু একটা কোথায় যোগসূত্র ছিল [illegible]নিকের অর্থলিপ্সা আর শোষিতের অপটু সংশয়ী ভূমিকার অভিনয়ে। ওটা আসলে অভিনয়ই ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর সেকালের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন কিন্তু তাঁর ব্যয় ছিল আয়ের অনেক বেশী। [illegible] অরুচি ছিল না আদৌ কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সামাজিক উন্নয়ন-সাধনে। এর ধ্বংসাবশেষের সবিশেষ বর্ণনা দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রাপ্য।

তবু একটা কোথায় যেন যোগ ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্য আর বাঙালী সংস্কৃতির যোগ। এমন কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ী [illegible] এসেছিলেন যাঁরা ভারতকে [illegible] আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন। নইলে হিউম কী করে হলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা? তাঁর অন্যান্য কীর্তিও অজানা নয়। আসল কথা এই যে, এ-সবের অধিকাংশ কর্মই ছিল বাঙালীভিত্তিক। সাম্প্রতিক পরিবর্তনে এই বাঙালী অংশটাই যেন প্রথম পলাতক। পূর্ণ [illegible] আগে অপরাধের মধ্যে অপরাধ-বণ্টনে আমার প্রবৃত্তি অতি সামান্য। তবু সত্য এই যে, ব্রিটিশবিদায় আজ প্রধানত বাঙালীবিদায়। বাঙলাভাষী বিভীষণদের প্রশ্ন অবশ্য বিভিন্ন। ওরা শুধুই মীরপুর বা খুলনায় নেই।

✽

ব্যবসায়িক জগতে বাঙালীর সসম্ভ্রম প্রত্যাবর্তন আজ প্রায় অভাবনীয়। মূলধন নেই, নেই প্রসরণাভিলাষ। প্রাদেশিকতার অভিযোগ একেবারেই অবান্তর। ভারতের কোন রাজ্য আশ্রয় নেয়নি হীনতম প্রাদেশিকতার? সাহায্য নেয়নি অক্ষম সংখ্যাগরিষ্ঠতার? পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন নেই এমন প্রশ্রয়ের। প্রয়োজন আছে পশ্চিমবঙ্গের আত্মপ্রত্যয়ের। আর তারই অনাবির্ভাবে আমি আজ অভিভূত বিষণ্ণ বিস্ময়ে। কোনো একটা ম্যানেজিং হৌসের লণ্ডনের পূর্বপ্রত্যাশিত নিঃশব্দ হস্তান্তর, সে তো প্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিত নয়, [illegible] নির্বাসন।

কোনো বিশেষ অধিকার ছিল না বাঙালীর ব্রিটিশ বাণিজ্যে। একমাত্র এই অহংকার ছিল যে, আমরা প্রথম এসেছিলাম তোমাদের শরিক হতে। কতিপয় বাঙালী পরিবার দু'পয়সা করেছেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কারবার করে। তাদের ঈর্ষা করবার কারণ দেখিনে। কিন্তু এই দ্বৈধ সম্পর্কের সাংস্কৃতিক অংশের ঘনায়মান সায়াহ্ন আমাকে কিঞ্চিৎ আহত করে। ব্রিটিশ রাজ যখন অব্যাহত ছিল তখনও সাংস্কৃতিক বিনিময় পুরোপুরি ব্যাহত হয়নি। আণ্ডরুজ, পিয়ার্সন তখনো থাকতেন শান্তিনিকেতনে। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা পণ্ডিতের স্থান ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিশ্বভারতীতে। রাধাকৃষ্ণন, রমন, আরো কত কৃতী পশ্চিমবঙ্গে বাস করেছেন, কাজ করেছেন। কলকাতার নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত কাজে সহায়তা করেছিলেন।

✽

পশ্চিমবঙ্গের নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক চরিত্রপরিবর্তনে আমি অবশ্যই আশঙ্কিত। আশঙ্কার যোগান দেয় কলকাতার ব্যবসায়িক বেশপরিবর্তন। কয়েকটি ধনী পরিবারের সংস্কৃতি-শকুনিতা সত্ত্বেও বাণিজ্যের সঙ্গে সংস্কৃতির সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সরকারী হাতছানির দৈন্য আর ব্যবসায়ী প্রাচুর্যের সমুদ্রের মধ্যে আমি কোনো একটাকে বেছে নিতে একেবারেই অপারগ। একদা উদ্যোক্তা ছিল নীরব, নিঃশব্দ। আজ উভয় পক্ষের টাকার ঝনঝনাই কানে বাজে। মন ভরে না।

মেঘ

হরপ্রসাদ মিত্র

মেঘের পরে মেঘ। পাহাড় নয়, সমুদ্র নয়; যেন মরুভূমি
আকাশময়। বাতাসে জুঁইলতা দোলে। রাস্তায় আবিল
জল।

খুন জখম আর্তনাদের মধ্যে ভাঙা হাঁটু ছেঁড়া মনের টিঁকে
থাকার ধান গম চাই। হে আকাশ জলদগম্ভীর!

ভালবাসার জোলো হাওয়া ঐ জুঁইলতায়। এদিকে ঘরের
মধ্য দিয়ে ঘরে যাবার পথ। তারপর অন্ধকার। উঠোনে
নামলে রাত গভীর হবে। তখন মেঘ নেই, বিষ্টি নেই;
শুধু নক্ষত্রের চুমকি, আর, সিন্দুকের মধ্যে সিন্দুক আমাদের
চেতনা।

সব ঝুট হায়, মেহেরালি। টক্ টক্ করে হাঁটছে সময়ের
কাঁটা। ঘামে ভেজা আপিসের জামার মধ্যে মেরুদণ্ড
ধনুকের মতো বাঁকা। মদ জুয়া বেশ্যারা অবসন্ন। বিশ্বাস
উদ্বায়ী, প্রমা পরিশেষে অমা।

সলিলমারুতে স্নিগ্ধ জুঁইলতা একান্ত প্রতীক বুকে রেখে
কে পেরুবে মেঘমরুভূমি?

এখনো মানুষই পারে মানুষের শত্রুকে হারাতে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নিষ্ঠুর হিংস্রের চেয়ে মানুষের প্রবৃত্তিই বড়ো—
আজ, এই দেশে, এই জনারণ্যে, সংস্কৃতিসংকুল
চেতনার রঙ রক্ত সবই লাল, সবই রুদ্ধশ্বাস......
শুধু তার মধ্যে এক অনাবিল সান্ত্বনা রয়েছে
এখনো মানুষই পারে মানুষের শত্রুকে হারাতে
অন্য কেউ নয়, অন্য কিছু নয় সংশ্লিষ্ট তেমন
নীতি ও দুর্নীতি নিয়ে, জীবন-মৃত্যুকে নিয়ে, ভাবে—
এবং যে-মনুষ্যত্ব স্বর্গে যায়, নরকেও যাবে।
সমান, অতুলনীয় ভবিতব্য ব'লে মূঢ়তাকে
প্রশ্রয় দেবার দিন আজো শেষ হয়নি যেহেতু
মানুষের ভুল হয়, ত্রুটি হয়, রক্তমাখা হয়
শুধু যা হয় না, তাকে সুসময় ভালোবাসা ব'লে
অভিষিক্ত করা হয় মাত্রাহীন ভাষণে-ভূষণে
এবং প্রতিমা গড়ে পুজো করে নিশ্চিতই মানুষ।

শূন্য পাতা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার প্রস্তুতি চলে আড়ালে-আড়ালে,
নিরন্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি।
বহু রক্তপাত, ক্ষয়, রাজ্যজয়, ভূমির সীমানা বৃদ্ধি,
নির্বাচন, সন্ত্রাস বিপ্লব
গোপনে-গোপনে ঘটে যায়।

সব কিছু গোপনে-গোপনে ঘটে যায়,
সাক্ষী থাকে শুধু গত জন্মের বাতাস।
তুমি নির্বিকার, শ্বেত প্রস্তরের মতন হৃদয়,
অবিচল, স্থির।
কখনো রুমাল তুলে মুখ ফেরাও, কখনো চুম্বন
এঁকে দাও কপালে জয়ীর।

॥ ছয় ॥

ভিয়েনা ও প্রাগ-এ আদর যত্নের আতিশয্যে আমরা যে বেশ স্পয়েল্ড হয়ে গিয়েছি সেটা পূর্ব বার্লিন এয়ারপোর্টে নেমে বুঝতে পারলাম। পৌঁছে যখন দেখলাম কোন বন্ধুবান্ধবের দেখা নেই তখন হঠাৎ বেশ একটু অসহায় বোধ করলাম। আমাদের পূর্ব জার্মানী আসার সিদ্ধান্ত একটু আকস্মিক হলেও আমরা জার্মান বন্ধুদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলাম। পরে দেখেছিলাম পূর্ব বার্লিনের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করতে অস্বাভাবিক রকম বিলম্ব হয়। যাই হোক, পূর্ব জার্মানীতে নেতাজীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, এ ব্যাপারে জর্মান স্কলাররা বিশেষভাবে উৎসাহী, এ খবর আমাদের জানা ছিল। কলকাতাতেই তাঁদের কারো কারো সঙ্গে আমাদের পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটেছিল। Tiger und Schakal (Tiger and Jackal) নামে নেতাজীর ওপর বই পূর্ব জার্মানীর লেখক ডঃ স্নাবেল (Schnabel)-এর লেখা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ক্রুগার, ওয়াইডেমান (Weidemoun) প্রভৃতি ভারত-বিশেষজ্ঞ স্কলাররা নেতাজীর ওপর তাঁদের গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পূর্ব জার্মানীতে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন সম্পর্কে দলিল ও নথিপত্র পাওয়া গেছে প্রচুর। অতএব আমাদের সফরে পূর্ব জার্মানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

স্যুটকেসটা কি করে যে এত ভারী হয়ে গেল জানি না। হাত প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে—বিমানবন্দরের মধ্যেই এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করে বাইরে এসে শহরগামী বাসে চাপলাম। মিনিট দশেক গিয়েই বাস একটা নিতান্ত মফঃস্বল চেহারার একটি স্টেশনে আমাদের নামিয়ে দিল। শুনলাম বাস আর যাবে না। এ হল বিমানবন্দরের স্টেশন, এখান থেকে শহরের ট্রেন ধরতে হবে। স্টেশনে মস্ত এক ওভারব্রীজ। একটি স্যুটকেস ঘাড়ে করে ওভারব্রীজ পার হবার অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। কোন মানে হয়? হয় আমাদের মত সাবেকি থাকো নয়ত পুরোপুরি আধুনিক হও। য়ুরোপের সর্বত্রই এসকালেটর বা চলমান সিঁড়ি নয়ত মুভিং এলিভেটর (অর্থাৎ চলমান-লিফট—দরজাবিহীন লিফট এসকালেটরের মত সর্বদাই উঠছে নামছে, টুক করে লাফ দিয়ে উঠে পড়তে বা নেমে পড়তে হবে)—নিদেনপক্ষে মালপত্র বইতে পুশকার্ট থাকে। ভবিষ্যতে একখানা মাত্র শাড়ি খবর কাগজে জড়িয়ে ভ্রমণে বার হব এইরকম একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করে ট্রেনে চেড়ে বসলাম। প্রথমদিকে মাঠঘাটের ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে, বিশেষ কিছু দেখার নেই। শহর নিকটবর্তী হতে ঘরবাড়ি দেখা যেতে লাগল এবং ঠিক শহরে ঢুকবার মুখে কতকগুলো ঘরবাড়ি দেখলাম যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন গায়ে নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন এসে থামল ফ্রিডরিকস্ট্রাসে (Friedrichstrasse) স্টেশনে। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে এই ফ্রিডরিকস্ট্রাসে স্টেশনে নেতাজী এসে নেমেছিলেন। এ কাহিনী লোথার ফ্রাংকের। ডাঃ লোথার ফ্রাংক এখন থাকেন পশ্চিম জার্মানীতে ফ্রাংকফুর্টের কাছে উইসবাডেনে। নেতাজীর যে আন্তর্জাতিক জীবনী জার্মান ও জাপানী ভাষায় বেরিয়েছে এবং শীঘ্র ইংরেজিতেও বার হতে চলেছে তার লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম হলেন ফ্রাংক। সে সময় বার্লিনের ইন্ডো-জার্মান সোসাইটির পক্ষ থেকে নেতাজীকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন ফ্রাংক। প্রায়ই খুব গর্ব করে বুক ফুলিয়ে ফ্রাংক আমাদের বলতেন—জানো, জার্মানীর মাটিতে আমিই প্রথম জার্মান যার সঙ্গে নেতাজী হ্যান্ডশেক করেছিলেন। সেবার ফরেন অফিস থেকে নেতাজীকে হারনাক হাউস নামে এক গেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও একবার এখানে কয়েকদিন ছিলেন। কিন্তু নেতাজী জার্মান গভর্নমেন্টের অতিথি হয়ে থাকতে চাইলেন না। উনি চলে গেলেন বার্লিনের শার্লটেনবর্গ এলাকায় যে গ্রান্ড হোটেল আছে সেখানে। সেবার উনি হিটলারের সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ফরেন অফিসে দু'একজন বন্ধুভাবাপন্ন লোক থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ মনোরথ হন। নানা অজুহাতে, যেমন হিটলার বড় ব্যস্ত আছেন ইত্যাদি বলে ওঁকে ফিরিয়ে ঘোরানো হয়। ওঁর দেখা করতে চাইবার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিটলার তাঁর Mein Kampf বইতে যেসব ভারত-বিরোধী কথা লিখেছেন তার প্রতিবাদ করা। ওঁর দৃঢ় ধারণা ছিল মুখোমুখি কথা হলে

উনি হিটলারকে তাঁর ধারণা কতটা ভুল তা বোঝাতে সক্ষম হবেন। এ সুযোগের জন্য তাঁকে প্রায় দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৪২ সালের মে মাসে যখন তাঁর হিটলারের সঙ্গে যে একমাত্র সাক্ষাৎকার ঘটে সে সময়ে তিনি তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। চলতি গল্প হচ্ছে হিটলার কথা দিয়েছিলেন, পরের সংস্করণে তিনি কথাগুলো তুলে নেবেন। এ কথাটা সঠিক কিনা তা বলা যায় না। হিটলারের দোভাষী পল স্মিৎডথ বলেন, কথোপকথন কি হয়েছিল ওঁর ঠিক মনে নেই। নাম্বিয়ার বলেন, হিটলার এরকম কোন প্রমিস করেননি। কিন্তু সে আমলে হিটলারের মুখের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং উনি তা চুপ করে শুনেছেন এও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বার্লিনের ফরেন অফিসে বিশেষ সুবিধা হল না। নেতাজী তখন মিউনিকে চলে গেলেন। সেখানে জার্মান অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর ডঃ থিয়েরফেলডর মারফৎ উনি ফরেন অফিসে কিছু প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেছিলেন।

লোথার ফ্রাংক যখন নেতাজীকে ফ্রিডরিকস্ট্রাসে রেল স্টেশনে অভ্যর্থনা করেন তখন নেতাজী ওয়ারস' থেকে আসছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অনেক টালবাহানা করে তারপর ওঁকে শুধু অস্ট্রিয়াতে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সুযোগ নিয়ে নেতাজী য়ুরোপের একাধিক দেশে পরাধীন ভারতবর্ষের বার্তা বহন করে এনেছিলেন। ওঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যা এড়িয়ে যাওয়া শক্ত হত। প্রথমেই ভিয়েনাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার কনসাল ওঁর সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত প্রীত হয়ে ওঁকে প্রাগ-এ যাবার অনুমতিপত্র দিলেন। প্রাগ-এর পোলিশ কনসাল আবার আরো একধাপ এগিয়ে ওয়ারশ যাবার অনুমতি তো দিলেনই, আবার পোল্যান্ডে গণ্যমান্য লোকদের কাছে পরিচয়পত্রও লিখে দিলেন। প্রাগের ব্রিটিশ কনসাল কোন প্রশ্ন না তুলেই ওঁর পাসপোর্ট সব এনডোর্স করিয়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে নাম্বিয়ার এক মজার গল্প বলেছিলেন : নেতাজী প্রাগের ব্রিটিশ কনসালের কাছে গিয়ে যখন বললেন, উনি পোল্যান্ড যেতে চান তখন ওঁর যে অস্ট্রিয়া ছাড়া অন্য কোথাও যাবার কোন বাধা আছে, সে কথা উল্লেখ করলেন না। [illegible] যদি বাধা থাকে সেটা ব্রিটিশ কনসালেরই জানবার কথা এবং তার জন্য যা [illegible] নিতে হয় তিনিই নেবেন। যখন [illegible] পাসপোর্ট সব ঠিক করে দেন, তখন [illegible] ওঁর মনে [illegible] সন্দেহ— এই ভদ্রলোক [illegible] ইংরেজের [illegible] কি হবে, হয়ত চাকরী নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে। পরদিন তিনি আবার [illegible]। [illegible] ওঁকে [illegible] নিজের পরিচয়, [illegible] ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের [illegible] নেই। উনি অস্ট্রিয়ার জন্য শুধু ওঁকে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছিল ইত্যাদি। চুপ করে সব শুনলেন ব্রিটিশ কনসাল। তারপর বললেন— দেখো, তুমি আমাকে এতক্ষণ যা বললে আমার তো তা জানবার কথা নয়। আমার কাছে কোন ব্রিটিশ পাসপোর্টের অধিকারী যদি এসে বিশেষ কোন দেশে যাবার অনুমতি চায় তাকে তার থেকে বঞ্চিত করবার আমার কোন অধিকার নেই। তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যখন আলাদা কোন নির্দেশ নেই [illegible] আমার যা স্বাভাবিক [illegible] তাই করেছি। এ নিয়ে আমার বা তোমার আর কোন মাথাব্যথা নেই।

বার্লিন ১৯৩৩, একটি সভায় বক্তৃতারত সুভাষচন্দ্র

'কিছুদিন পরে যখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কাগজপত্র ঘাঁটছিলাম তখন পুরো এক ফাইল বেরিয়ে পড়ল এই ঘটনাটির ওপর। সেক্রেটারি অব স্টেট থেকে শুরু করে চুনোপুঁটি অফিসার পর্যন্ত নোটের পর নোট দিচ্ছে। প্রাগের কনসালকে "স্টুপিড" বলা হয়েছে। আরে বাবা, নির্দেশ না-হয় দেওয়া নেই, তাই বলে দেখতে পাচ্ছো দাগী আসামী তাকে কিনা যেখানে সেখানে যেতে দিচ্ছ। এই বুদ্ধি নিয়ে ডিপ্লোমেটিক সার্ভিস করবে। ফাইলের পাতা ওলটাতে দেখি সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে ইংরেজ ব্যুরোক্রাটদের মধ্যে। যা হবার হয়ে গেছে এখন যেমন করে পারো লোকটাকে ইংলণ্ডে ঢুকে পড়া থেকে থামাও। সুভাষচন্দ্রের ইংলণ্ড আসা নিয়ে এদের এত কি আপত্তি, এত ভীতিই বা কেন ঠিক বুঝলাম না। যেন উনি এলেই ওঁদের দেশের সব নি—য়—ম ভেঙে পড়বে। এদিকে আবার ইংরেজের স্বাভাবিক ন্যায়বোধ যায় না। একজন অফিসার নোট দিলেন—ব্রিটিশ পাসপোর্ট যার আছে তার ব্রিটেনে আসতে কোন আলাদা এনডোর্সমেণ্ট লাগে না। আজ যদি সুভাষ বোস এসে ইংলণ্ডের কোন বন্দরে নামেন তাঁকে আইনত আমরা কোন বাধা দিতে পারি না।' ওপরতলা থেকে নোট এল তার কাছে—এই স্বাধিকারের কথাটা মনে হয় সুভাষ বোস জানেন না, কারণ তিনি চিকিৎসার ও রকমারি অজুহাত দেখিয়ে আসবার অনুমতি চেয়েছেন। আমাদের সব কনসালেটকে অ্যালার্ট করো যেন এমনভাবে ভান করে থাকে যাতে সুভাষ বোসের এই ভুল ধারণাটা না ভাঙে। ইংরেজের চাতুর্যের সেবার জয় হল। নেতাজী ইংলণ্ডে আসতে পারলেন না। সেবার লণ্ডনে পলিটিক্যাল কনফারেন্সে সুভাষচন্দ্রের যে লিখিত বক্তৃতা ওঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করা হয় তার মধ্যে উনি বিশ্বসভায় ভারতের ভূমিকা সম্বন্ধে এক দৃপ্ত ভবিষ্যবাণী করেছিলেন। বলেছিলেন — সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড পৃথিবীর সভ্যতাকে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র উপহার দিয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স নিয়ে এল স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর বাণী, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী উপহার দিল মার্কসের দর্শন আর বিংশশতাব্দীতে রাশিয়া তার প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবের পথে পৃথিবীকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। এরপরই নেতাজী

৯৩নং লিটকুইজের অফিসিয়াল এনট্রি [illegible]

মোট পুরস্কার : ১৯৫,০০০ টাকা। বন্ধের শেষ তারিখ বুধবার, ৮-৩-৭২

ঠিকানা : **LITQUIZ NO. 93, ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7**

বিঃ দ্রঃ (১) প্রতি লাইনে যে শব্দটি আপনি বাতিল করবেন সেটি কালি দিয়ে কেটে দিন। (২) যদি সব কুপনগুলি না পাঠান তাহলে বাকি কুপনগুলি বাতিল করুন। (৩) যদি এম ও দ্বারা এনট্রি ফি পাঠান তাহলে পোস্ট অফিস থেকে প্রাপ্ত এম ও রিসিটখানি অবশ্যই এনট্রি ফরমের সঙ্গে পাঠাবেন। এম ও রিসিট ছাড়া এনট্রি অগ্রাহ্য হবে। (৪) আই পি ও ক্রস করবেন না, LITQUIZ NO. 93 AT BOMBAY-7. কে প্রদেয় করুন।

MAIN	1	Re. 1	2	Re. 1	3	Re. 1	4	Re. 1
1	ACQUISITION	AMBITION	ACQUISITION	AMBITION	ACQUISITION	AMBITION	ACQUISITION	AMBITION
2	AGE	ART	AGE	ART	AGE	ART	AGE	ART
3	BEAUTY	CALAMITY	BEAUTY	CALAMITY	BEAUTY	CALAMITY	BEAUTY	CALAMITY
4	BOOR	BORE	BOOR	BORE	BOOR	BORE	BOOR	BORE
5	COMPETITION	CRITICISM	COMPETITION	CRITICISM	COMPETITION	CRITICISM	COMPETITION	CRITICISM
6	DEFEND	DESCRIBE	DEFEND	DESCRIBE	DEFEND	DESCRIBE	DEFEND	DESCRIBE
7	FARMING	FIGHTING	FARMING	FIGHTING	FARMING	FIGHTING	FARMING	FIGHTING
8	GREATNESS	SUCCESS	GREATNESS	SUCCESS	GREATNESS	SUCCESS	GREATNESS	SUCCESS
9	JEALOUSY	LUNACY	JEALOUSY	LUNACY	JEALOUSY	LUNACY	JEALOUSY	LUNACY
10	LIFE	LOVE	LIFE	LOVE	LIFE	LOVE	LIFE	LOVE
11	PAINTER	THINKER	PAINTER	THINKER	PAINTER	THINKER	PAINTER	THINKER
12	PERSON	PRODUCT	PERSON	PRODUCT	PERSON	PRODUCT	PERSON	PRODUCT

BIGQUIZ — *ONE COUPON FREE WITH EACH MAIN COUPON*

93	FREE 1		FREE 2		FREE 3		FREE 4	
1	ACQUISITION	AMBITION	ACQUISITION	AMBITION	ACQUISITION	AMBITION	ACQUISITION	AMBITION
2	AGE	ART	AGE	ART	AGE	ART	AGE	ART
3	BEAUTY	CALAMITY	BEAUTY	CALAMITY	BEAUTY	CALAMITY	BEAUTY	CALAMITY
4	BOOR	BORE	BOOR	BORE	BOOR	BORE	BOOR	BORE
5	COMPETITION	CRITICISM	COMPETITION	CRITICISM	COMPETITION	CRITICISM	COMPETITION	CRITICISM
6	DEFEND	DESCRIBE	DEFEND	DESCRIBE	DEFEND	DESCRIBE	DEFEND	DESCRIBE
7	FARMING	FIGHTING	FARMING	FIGHTING	FARMING	FIGHTING	FARMING	FIGHTING
8	GREATNESS	SUCCESS	GREATNESS	SUCCESS	GREATNESS	SUCCESS	GREATNESS	SUCCESS
9	JEALOUSY	LUNACY	JEALOUSY	LUNACY	JEALOUSY	LUNACY	JEALOUSY	LUNACY
10	LIFE	LOVE	LIFE	LOVE	LIFE	LOVE	LIFE	LOVE
11	PAINTER	THINKER	PAINTER	THINKER	PAINTER	THINKER	PAINTER	THINKER
12	PERSON	PRODUCT	PERSON	PRODUCT	PERSON	PRODUCT	PERSON	PRODUCT
13	RICHES	WISHES	RICHES	WISHES	RICHES	WISHES	RICHES	WISHES
14	SAVAGERY	TREACHERY	SAVAGERY	TREACHERY	SAVAGERY	TREACHERY	SAVAGERY	TREACHERY
15	SEVERITY	SOLEMNITY	SEVERITY	SOLEMNITY	SEVERITY	SOLEMNITY	SEVERITY	SOLEMNITY
16	WEALTH	WISDOM	WEALTH	WISDOM	WEALTH	WISDOM	WEALTH	WISDOM

MINIQUIZ

FREE AFTER 4 MAIN (& 4 BIGQUIZ) COUPONS

ACQUISITION	AMBITION
AGE	ART
BEAUTY	CALAMITY
BOOR	BORE

PERSON	PRODUCT
RICHES	WISHES
SAVAGERY	TREACHERY
SEVERITY	SOLEMNITY
WEALTH	WISDOM

এই কুইজ প্রতিযোগিতার যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিয়ম ও শর্তাবলী এবং সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও আইনতঃ বাধ্য বলে মেনে নিচ্ছি। প্রত্যেকটি কুপনের জন্য প্রবেশ মূল্য ১ টাকা। এই সম্পূর্ণ এনট্রি ফরমটির জন্য প্রবেশ মূল্য ৪ টাকা। এম ও রসিদ আই পি ও/লিটকুইজ ক্যাশ রসিদ এই সঙ্গে দেওয়া হল। প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর..... ....

৯৪নং ফরম পাবার জন্য এটি ভর্তি করুন

পুরো নাম..

....

ঠিকানা..

পোঃ অঃ........................জেলা..................

৯৩ দেশ

ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে লিখুন

পুরো নাম..

....

ঠিকানা..

পোঃ অঃ........................জেলা..................

এটি কেটে নিয়ে এই পুরো ফরমটি পাঠান

বিনামূল্যে বড় এবং মিনি

দ্রষ্টব্য : এইগুলি উন্মুক্ত মত। সম্পাদকের নির্বাচিত শব্দই সঠিক সমাধান। লিটকুইজ সাপ্তাহিকে প্রাইজ লিস্ট ছাপা হবে। অগ্রিম : ১৯-৩-৭২। চূড়ান্ত তালিকা : ২৬-৩-৭২। সঙ্গে সঙ্গে সঠিক সমাধান পেতে হলে আপনার এনট্রির সঙ্গে স্বনামঠিকানা লেখা ১০ পয়সার পোস্ট কার্ড পাঠান। বিনামূল্যে লিটকুইজ উইকলির স্পেসিমেন কপির জন্যে লিখুন : এজেন্ট : নেপচুন ট্রেডার্স, ৩৬, এজরা স্ট্রীট, ৪র্থ তল, কলকাতা

৯টি কুপন মাত্র ৪ টাকা

বলছেন—"পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এর পরবর্তী বিশিষ্ট অবদানের ডাক আসবে ভারতবর্ষের কাছ থেকে।"

প্রাগে ও ওয়ারসতে উনি সেবার দুটো বিশেষ জিনিস্ স্টাডি করে এসেছিলেন—এক, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পরাধীন চেকোস্লোভাকিয়ার বাইরে চেকোস্লোভাক লিজিয়ন বা মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল ইংরেজ ও রাশিয়ার সাহায্যে। আর জাপানে গঠিত হয়েছিল পোলিশ লিজিয়ন বা মুক্তি ফৌজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। জানতে ইচ্ছা হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিকল্পনার বীজ কি তখনই তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল?

ফ্রিডরিকস্ট্রাসে স্টেশন থেকে ভারতীয় দূতাবাস বেশ কাছেই। একটা মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলাম আমাদের পতাকা পত পত করে উড়ছে। বিদেশে নিজের দেশের ফ্ল্যাগ দেখলে এত ভাল লাগে। আমাদের কনসাল-জেনারেল আজমানী আমাদের দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন—এয়ার-পোর্টে আমার মেসেজ পাননি। পাইনি তো! কোন ফ্লাইটে আমরা আসছি ঠিকমত না জানাতে আমরা এসে পৌঁছলে যেন ফোন করি—এই রকম একটা মেসেজ দেওয়া ছিল। যাই হোক, আজমানী সাহেব আমাদের জন্য লাঞ্চ তৈরী করিয়ে অপেক্ষায় বসে আছেন। শুধু তাই নয়—আমাদের যা কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন সব কিছু করে আমাদের কাজ গুছিয়ে রেখেছেন। বললেন—যদিও যোগাযোগের গণ্ডগোলে সব কিছু খবর নিতান্ত দেরীতে পেয়েছি তবুও এত শর্ট নোটিসে হলেও যাতে আপনাদের নেতাজী মিশন যথাসাধ্য সার্থক হয় তার চেষ্টা করছি। পূর্ব বার্লিন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম আমার ভবিষ্যৎ লেখায় এই চ্যাপটারটির নাম দিতে হবে—friendless in East Berlin—। বিধাতা অন্তরীক্ষে হেসে থাকবেন। আজমানী সাহেবের আতিথ্যে ও সহযোগিতায় পূর্ব বার্লিনে আর যাই হোক বান্ধবহীন মনে হয়নি এক মুহূর্তও।

বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলির কাজকর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা প্রায়ই শুনতে পাই। কি পাকিস্তান বা চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক লড়াইতে, কি ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্যান্য প্রচারকার্যের ব্যাপারে—আমাদের দূতাবাসের অফিসারদের অক্ষমতার জন্য আমাদের দেশকে প্রায়ই অপদস্থ হতে হয়—এমনি একটা অভিযোগ আছে। এ অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন তা কিন্তু নয়। বিদেশে পাঠাবার আগে আমাদের অফিসারদের যোগ্যতা, নিজের দেশ ও যে দেশে তিনি কার্যরত সেই দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষভাবে যাচাই করে দেওয়া উচিত। কিন্তু এবার এদিক-ওদিক—প্রাগ, পূর্ব বার্লিন ও বনে দু একটি বেশ স্মার্ট,

বলেছেন—"পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এর পরবর্তী বিশিষ্ট অবদানের ডাক আসবে ভারতবর্ষের কাছ থেকে।"

প্রাগে ও ওয়ারসতে উনি সেবার দুটো বিশেষ জিনিস স্টাডি করে এসেছিলেন—এক, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পরাধীন চেকোস্লোভাকিয়ার বাইরে চেকোস্লোভাক লিজিয়ন বা মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল ইংরেজ ও রাশিয়ার সাহায্যে। আর জাপানে গঠিত হয়েছিল পোলিশ লিজিয়ন বা মুক্তি ফৌজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। জানতে ইচ্ছা হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিকল্পনার বীজ কি তখনই তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল?

ফ্রিডরিকস্ট্রাসে স্টেশন থেকে ভারতীয় দূতাবাস বেশ কাছেই। একটা মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলাম আমাদের পতাকা পত পত করে উড়ছে। বিদেশে নিজের দেশের ফ্ল্যাগ দেখলে এত ভাল লাগে। আমাদের কনসাল-জেনারেল আজমানী আমাদের দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন—এয়ার-পোর্টে আমার মেসেজ পাননি। পাইনি তো! কোন ফ্লাইটে আমরা আসছি ঠিকমত না জানাতে আমরা এসে পৌঁছলে যেন ফোন করি—এই রকম একটা মেসেজ দেওয়া ছিল। যাই হোক, আজমানী সাহেব আমাদের জন্য লাঞ্চ তৈরী করিয়ে অপেক্ষায় বসে আছেন। শুধু তাই নয়—আমাদের যা কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন সব কিছু করে আমাদের কাজ গুছিয়ে রেখেছেন। বললেন—যদিও যোগাযোগের গন্ডগোলে সব কিছু খবর নিতান্ত দেরীতে পেয়েছি তবুও এত শর্ট নোটিসে হলেও যাতে আপনাদের নেতাজী মিশন যথাসাধ্য সার্থক হয় তার চেষ্টা করছি। পূর্ব বার্লিন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম আমার ভবিষ্যৎ লেখায় এই চ্যাপটারটির নাম দিতে হবে—**friendless in East Berlin**—। বিধাতা অন্তরীক্ষে হেসে থাকবেন। আজমানী সাহেবের আতিথ্যে ও সহযোগিতায় পূর্ব বার্লিনে আর যাই হোক বান্ধবহীন মনে হয়নি এক মুহূর্তও।

বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলির কাজকর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা প্রায়ই শুনতে পাই। কি পাকিস্তান বা চীনের সাথে কূটনৈতিক লড়াইতে, কি ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্যান্য প্রচারকার্যের ব্যাপারে—আমাদের দূতাবাসের অফিসারদের অক্ষমতার জন্য আমাদের দেশকে প্রায়ই অপদস্থ হতে হয়—এমনি একটা অভিযোগ আছে। এ অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন তা কিন্তু নয়। বিদেশে পাঠাবার আগে আমাদের অফিসারদের যোগ্যতা, নিজের দেশ ও যে দেশে তিনি কার্যরত সেই দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষভাবে যাচাই করে নেওয়া উচিত। কিন্তু এদের এদিক ওদিক—প্রাগ, পূর্ব বার্লিন ও বনে দু একটি বেশ স্মার্ট,

কর্মক্ষম অফিসার দেখে দূতাবাসগুলি সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই বলে মনে হয়েছে।

পূর্ব বার্লিনে কনসাল-জেনারেলের পদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের কনসুলেটটি সবে অল্প দিন খোলা হয়েছে। আজমানী অত্যন্ত উৎসাহী ও দক্ষ, ভাল জার্মান বলেন। যদিও এর আগে বেশ কয়েক বছর ধরে জাপানে ছিলেন। আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন কাজ-চলার মত জাপানীও শিখে নিয়েছিলাম। আমরা থাকতে থাকতেই দেখলাম উপস্থিত ভারতীয় নাগরিকদের উনি খুবই দেখাশুনো করেন। নানা কারণে পূর্ব বার্লিনে বিদেশীর পক্ষে এই অফিসিয়াল সাহায্যটুকু প্রয়োজন হয়। অবশ্য কেউ যদি ওদেশের সরকারী অতিথি হিসেবে আসেন তাঁর কথা আলাদা। এখানে যে-কোন বিদেশীকে হোটেলে গিয়ে থাকতে হলে ডবল চার্জ দিতে হয়। আজমানী যখন পার্টি দেন ওঁর বাবুর্চিই সব ব্যবস্থা করে, নয়তো হোটেলে প্রচণ্ড খরচ। ওঁর বাবুর্চি একটি রত্ন—চমৎকার রাঁধে, চট্টগ্রামে বাড়ি। যে কদিন ছিলাম নিত্য নূতন রেঁধে খাওয়াত।

প্রথম দিনেই একচক্কর ঘুরে পূর্ব বার্লিন দেখে নিলাম। প্রধান রাস্তা দুটি—বিখ্যাত উনটার ডেন লিনডেন (Unter den Linden) এবং কার্ল মার্কস আলে, কিছু কাল আগে এ রাস্তার নাম ছিল স্ট্যালিন আলে। বড় বড় হোটেল, ঝলমলে দোকান সবই এখানে। দূরে বিরাট টি ভি টাওয়ার, তার ওপর ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁ। আলেক-জাণ্ডার প্লাৎস ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওদের মস্ত বড় ডিপার্টমেণ্ট স্টোর সেনট্রুমে ঢুকে পড়লাম। ক্যামেরার ফিলম, সাবান-টুথপেস্ট জাতীয় টুকিটাকি জিনিস কিনেও ফেললাম। আজমানী অনেক সময় পশ্চিম বার্লিনে কেনা-কাটা করেন। বেরোবার সময় জিজ্ঞাসা করতেন—ওয়েস্ট বার্লিন যাচ্ছি কিছু দরকার আছে নাকি?

উনটার ডেন লিনডেন এককালে ছিল থিয়েটার, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির রাস্তা। এখন এর চরিত্র গেছে পালটে। প্রায় সবই অফিসিয়াল ঘরবাড়ি, রাস্তার অনেকখানি জুড়ে রাশিয়ান দূতাবাস। বার্লিনের পার্গামন মিউজিয়াম দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। দিনের বেলায় ঘুরে ফিরে পূর্ব বার্লিন দেখে আমার খুবই ভাল লাগল। তবে ঘুরতে ফিরতে চোখে পড়ে বার্লিনের দেওয়াল আর ব্রানডেনবুর্গ গেট। কিন্তু রাত্রে আজমানীর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়ে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রাত আটটা হয়েছে কি হয়নি—সমস্ত পথঘাট জনশূন্য খাঁ-খাঁ করছে, ঠিক যেন কলকাতার হরতালের দিন। দিনের বেলা দেখেছিলাম মোটর-গাড়ির সংখ্যা খুবই কম—বড় বড় পার্কিং স্পেস ফাঁকা পড়ে রয়েছে। য়ুরোপীয় দেশে এটা খুব অস্বাভাবিক ঠেকে। লণ্ডনে বাড়ি থেকে গাড়িতে বেরিয়ে য়ুনিভার্সিটি এলাকা পর্যন্ত এসে গাড়ি পার্ক করে উল্টো দিকের বাসে চেপে লেস্টার স্কোয়ারে থিয়েটার দেখতে গেলাম—এইরকমটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাত্রের পূর্ব বার্লিন আমার একান্ত অস্বাভাবিক মনে হল। পশ্চিম বার্লিন ও হামবুর্গের রাত্রের ঝলমলে রূপ পরে দেখ[illegible]। [illegible]য়েনার রাত্রির মন ভোলানো চেহ[illegible] এখা[illegible] না হয় বাদ দিচ্ছি—কিন্তু প্রাগে [illegible]ই দেখে এলাম সারারাত ঘড়ঘড় করে ট্রাম চলে, রাত ১২টার পর ট্রামের ভাড়া অবশ্য দ্বিগুণ হয়ে যায়। তবুও কত রাত্রি অবধি রাস্তা লোকজনে পূর্ণ হয়ে থাকে। আজমানীকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেরা সব গেল কোথায়? আজমানী রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, এখানকার লোকেরা স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, কাজকর্মের পর সবাই সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটাতেই ভালবাসেন।

(ক্রমশ)

তুমি তো বুঝবে না কেন আমার ঘুম আসছে না। সত্যি আসে না ঘুম। আমার মতো এরকম অবস্থায় যদি পড়তে হত তাহলে বিশ্বাস করতে যে আর কারুর কথা ভেবে মন উড়ু-উড়ু না হলেও ইনসমনিয়ার অসহ্য আক্রমণে মানুষ ছটফট করতে পারে। কোনো উপায় নেই। জানি তোমায় খুশী করা যেত, যদি বলতে পারতাম 'সুজয়া, তোমার সঙ্গ পাবার পিপাসায় বড় কাতর আমি, তাই চোখে ঘুম নেই।' যদি বলতে পারতাম 'বিরহ-জ্বালা অস্তিত্বের কোষে-কোষে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে...' হায়, সুজয়া বড় কষ্ট পাই যখন টের পাই প্রেমের মতো সুখময় ভুল করবার মতো স্বপ্ন দেখার নেশা আর নেই। তাই তোমার মন রাখার সান্ত্বনাকে এড়িয়েই এই অতন্দ্র শয়ন মনকে দুনিয়ার এলোমেলো ভাবনার ডাস্টবিন ঘাঁটিয়ে তামাশা পাচ্ছে। আমি সেই কুকুরটাকে দেখতে পাচ্ছি—যার লেজে ফুলঝুরির কাঠিটা জ্বালিয়ে দিয়ে একপাল 'নেংটে-ফাজলা-কেষ্টা' উল্লাসে হাততালি দিচ্ছে আর দল বেঁধে ভীত সন্ত্রস্ত কেলো-কুত্তার পিছনে দৌড়চ্ছে। কুত্তাটাকে ওরা খুব ভালোবাসে, অনেক সময় আদর করে উচ্ছিষ্ট খেতে দেবার জন্যে প্রাণপণে চিৎকার করে, 'আয়, আয়, কেলো—আঃ—আঃ—কম্হিয়া—আ—'। এ পাড়ার ছেলের দলও আমায় কম ভালোবাসে না। দাদা ডেকে খাতির করতেও কসুর নেই। কিন্তু রাত দুপুর হয়েছে বলে 'মাইক' বন্ধ করবে? অসম্ভব। এরকম আবদারের স্পর্ধা কেন আমার হল! রাত বারোটা, তাই কি—মাইক বন্ধ করলে ছেলেরা রাত জাগতে পারবে নাকি? রাতারাতি রাস্তার দু-ধারে পীচের বুক ছ্যাঁদা করে আটষট্টিটা গর্ত না

খুঁড়তে পারলে বাঁশের 'পোল' (ওরা খুঁটি বলে না, তাতে নিঅনবাতির ইজ্জত ঢিলে হয়) বসবে কি করে দাদা! সার-সার বাতি কি অমনি জ্বলবে? আপনাদের আর কি, মজা করে পুজো দেখবেন...! অতএব যে তিমিরে ছিলাম দুর্গা পুজোয়, কালী পুজোতেও সেই শব্দব্রহ্মার তাণ্ডবে রাত্রির সংগে আমিও দলিত-মথিত হচ্ছি। জানি সরস্বতী পুজোও এমনি বিভীষিকার মধ্যে কাটবে। শুধু হলেই এক হপ্তার দায়ে নিশ্চিন্দি।

আচ্ছা তুমিই বলো অনিমেষ, যে যন্ত্রটা ছেলেদের রাতের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় সেটা কি করে আমায় ঘুম পাড়াবে? আমি যে পথের ধারে একতলার ঘরে থাকি। সকাল বেলায় জানলা দিয়ে হাত বাড়ালে খবরের কাগজ যখন হকারের কাছ থেকে নিই তখন বেশ মজা লাগে—বাড়ির সকলের আগে ওটা হাতাই। কিংবা একটু জোরে হাঁক দিলেই পথের ওপার থেকে পৌঁছা পানটা-সিগারেটটা এসে পৌঁছে দেয়—দোকানে যাবার মেহনত বাঁচাই। আসলে আমি পথেরই বাসিন্দা—মাঝে যা একটা দেওয়ালের ব্যবধান। কাজেই, পথের ধারে যা ঘটছে তার অংশীদার না হয়ে করি কি? বুঝলে অনিমেষ, তুমি যেদিন গা-ঢাকা দিয়ে গভীর রাতে অনায়াসে আমার পাশে আশ্রয় নিতে পেরেছিলে (কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের থাবা এড়াতে পারোনি তাই এখন জেলখানার ভেতরে আছো) তাও সম্ভব হয়েছিল আমি রাস্তার ধারে থাকি বলেই চাপা গলায় ডেকে সাড়া পেয়েছিলে। আমার বিছানায় আজ যদি তুমি থাকতে, বেশ হত অনিমেষ, তোমার কাছে বিপ্লবের কাহিনী শোনা যেত!

কিন্তু এসব ভাবছি কেন? ঘুম না এলে কি করব! বলো সঞ্জয়, তুমি সেদিন সোজাসুজি জবাব দিলে—মন দেওয়া-নেওয়ার ওসব ছেলেমানুষী অচল। পেটের ভাত জোটাতে পারলে তখন প্রেমের কথা ভাবা যাবে।' সেদিনই না কি করতে পেরেছিল এই সন্তোষ রায়! কেমন অসাড় হয়ে আমার (আবেগ-অনুরাগে উদ্বেল প্রাণের সেই) শক্ত মুঠিটার কারেন্ট অফ হল আর তোমার নরম ঘামে-ভেজা হাত-খানা খসে পড়ল। ওই দেখ, আবার দিয়েছে সেই সাত শ' বার বাজানো (যে মামুনা...) রেকর্ডখানা। জানলার বাইরে অসহায় গরুর মত চোখে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকি। ওরা তিনজন কেমন উৎসাহ নিয়ে শাবল চালাচ্ছে। ...এইটা হলেই খতম।... আচ্ছা, যোগেশের একটা শহীদবেদী করলে কেমন হয়...মা কালীর সামনে। যোগেশকে এখন সবাই চেনে। এক মাস আগে কে-ই বা চিনতো? দু-দলের লড়াইতে বেচারা মরেছে। শুনেছি কোন বাজারে সে গেঞ্জী বিক্রি করত। এখন তুমি পথে ঘাটে হাতে-লেখা পোস্টার দেখবে। কমরেড যোগেশ, তোমায় ভুলি নি, ভুলবো না।...কমরেড যোগেশকে হত্যার বদলা চাই।...একটা মার্বেল পাথরের বেদীও যোগেশের স্মরণে তৈরী হয়েছে বড় রাস্তার মোড়ে।

শহীদবেদী তো এখন পাড়ায় পাড়ায় দেখা যাচ্ছে। প্রতিহিংসার এমন সনাতন প্রতিশ্রুতি বুঝি আর হয় না। রাম মরেছে অতএব রহিমকে খুন করতে হবে—যেন রহিমই রামের মৃত্যুর কারণ—অথবা রহিম রামের। যে-কোনো রাম বা যে-কোনো রহিমই এই প্রতিহিংসার খোরাক যোগানোর শিকার হতে পারে। অনিমেষ, তুমি চটে যাচ্ছ! কেন, এতে রাগ করার কি থাকতে পারে (...ও ঘাটে জল আনিতে যাবো না)। আগে ছিল। এখন আর রাম-রহিমের মামলা ভাবতে নেই। ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরোধটা এখন রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতায় দাঁড়িয়েছে। যদি তা না হত যোগেশ কি মরতো? (যদিও শুনেছি যোগেশ যাচ্ছিল তার গেঞ্জীর মোট নিয়ে—দু-পক্ষের লড়াই-এর মাঝে পড়ে গুলি খেয়েই শহীদ হল।)...এই—এই পুলিশের গাড়ি। খবরদার কেউ পালাবে না।...হ্যাঁ, আমরা নিজেদের কাজ করছি।...এই মাইক বন্ধ কর।...না, না, চলুক, ওরা যেন ডাউট না করে।...কি হয়েছে? আমরা পালাবো কেন!

সত্যিই কি পুলিশ আসছে! পুলিশ কি মাইক বন্ধ করার জন্য!

দুড়দাড় পালানোর পদাঘাত। ছোকরা-দের কথাবার্তা থেমে গেছে। কেবল শাবলের আওয়াজ আসছে। মাইকের কণ্ঠরোধ হয়েছে। অসহ্য মাথাটা কেমন হালকা। হাতে না থাকলে আচমকা ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ে যেতাম মাটিতে। কয়েক ঘণ্টার বেশি মাইকের আওয়াজটা অন্তিত্বের আকাশে দখল কায়েম করে ছিল। জীপখানা ঠিক আমার ঘরের ওপর প্রচণ্ড গর্জন করে দাঁড়ালো।...এ্যাই, তোমরা এখানে কি করছ?...পিছনে বড় ভ্যানখানার চাকার আওয়াজও গড়াতে গড়াতে চুপ করল। তারপর অনেকগুলি ভারী বুটের পর্বদৃপ্ত পদাঘাত ঘোষণা।

ভাবতে অবাক লাগে। রাতের বেলা পুলিশ! এ পাড়ায় এ বছরের ইতিহাস খুঁজলে মিলবে কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, দিনে-দুপুরে দ্রুত গতিতে বড় রাস্তা দিয়ে পুলিশ ভ্যান যেতে দেখা গেছে। গলির মধ্যে ঢোকার মতো আহাম্মক ছিল না! তাতে কি বিপদ হত? কে জানে! পুলিশও যেন আত্মরক্ষার জন্যেই বিপদ থেকে [illegible] চলছে!

আজ আইনশৃঙ্খলার পাহারাদারদের আওয়াজে পুরনো দাপটের আমেজ আছে। ...বড় রাস্তার কাছাকাছি একটা ছেনতাই

হয়েছে। দুজনকে এদিকেই ছুটে আসতে দেখা গেছে। এই দলের মধ্যেই তারা নিশ্চয় গা-ঢাকা দিয়ে মিশে রয়েছে। ভ্যানখানা সামনে এগোলো। যেখানে প্রতিমার মণ্ডপ বানিয়ে পথটা রোধ করা হয়েছে, সেখানে ডাইনে বাঁয়ে পায়ে চলা দুটো বস্তির গলি ঢুকে গেছে। ওসব গলির কোনো নাম নেই। আছে নম্বর—সতের নম্বর আর একত্রিশ নম্বর। এখন তো তবু নম্বর হয়েছে, আগে ছিল জলাজমি আর জঙ্গল আর বাগান। বিরাট আমবাগান ছিল। যেখানে মহেশ সর্দারের আড্ডা ছিল।—ডাকাতের সর্দার মহেশ তার হেড কোয়ার্টার বানিয়েছিল, কেননা রেল-লাইনের কোলে জনবসতি থেকে দূরে নিরিবিলিও বটে—তা ছাড়া মোতিবিবির বাগিচাও এখান থেকে বেশী দূরে নয়।...এরা ওসব জানে না। আমিও কি জানতাম নাকি। বাড়ির বুড়ী ঝি গল্প করে, তাই—।

থানার বড়বাবুর তর্জন-গর্জন। সব কটাকে ভ্যানে তোলা হবে। হাজতে পুরে দেবো সেটা ভালো হবে?...এমনিতে তোমাদের কাছ থেকে কথা না বেরুলে!...আমরা স্যার কাজ করছি, কোথায় কি হয়েছে জানবো কি করে?...দুজন তো তোমাদের সামনে দিয়েই পালিয়েছে। দেখ নি বলতে চাও? দেখতেই পাচ্ছেন। রাতারাতি ফিনিশ করতে হবে কাজ। কোথায় কি হয়েছে জানবো কি করে স্যার।...এখানে আর কে-কে ছিল?...

আধ ঘণ্টা চলল চাপের উপর চাপ। একজনকে ভ্যানে ওঠানোর হুকুম হল। তাকে গাড়িতে তুলতে না-তুলতে কে যেন বলল... আমরা কিছু করি নি স্যার, ঝটমট হামলা করছেন স্যার।...তবে বল কে-কে পালিয়েছে!

একটা নাম মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। সেই পালিয়েছে। ওই গলির ভেতর ঢুকেছে। ও গলির শিরা-উপশিরা পুকুর-ডোবার এপাশ ওপাশ দিয়ে এক দিকে রেল-লাইনে ঠেকেছে আর শাখা প্রশাখা পৌঁছেছে উত্তরে দক্ষিণে বড় রাস্তাগুলোতে।...এখানে যেটুকু রেড লাইট আছে ওসব বন্ধে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। সারি সারি বস্তির খাপরার ঘর—প্রতিটি ঘরের পেটের মধ্যে কচিকাঁচা নিয়ে দশ বারোজনের পরিবার বেঁচে থাকে!

যার উপর বড়বাবুর রোখ পড়েছে, সে বয়সে একটু বড়—সে-ই এ দলের সকলকে সাহস যোগাচ্ছিল এবং কথাবার্তা চালাচ্ছিল। এ-ই তার অপরাধ। জানি সে বেচারী একটু মোড়লি ভালবাসে। চুরি জোচ্চুরি কখনো করেছে বলে শুনিনি। হুঁ, তাকেই ভ্যানে তোলা হল। আর যে পালিয়েছে তাকে খোঁজার জন্যে জন কয়েক রাইফেলধারী বুটের শব্দ করে গলিতে ঢুকল। কিন্তু ওরা বেশিদূর এগোয় নি—কেন না মিনিট কয়েক বাদেই ফিরে এল এবং পলাতকের বাড়ি কোনটা তাই কবুল করাবার জন্যে ছেলে-ছোকরাদের জেরায় জেরবারে হুমকি ধমকি জুড়ে দিল।

তর্জন-গর্জন করে পুলিশের বাহিনী ফিরে গেল।

রাতটা হঠাৎ যেন মৃতদেহ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। নিষ্প্রাণ পৃথিবী।

জানো সুজয়া, তোমাকেই বলি : এই যে মাইকের প্রচণ্ড আওয়াজ আর এত যে আলোর রোশনাই—এ সবই যেন ওদের (ওই অলিগলির ছেলে ছোকরাদের) জীবনের আসল দীনতাজর্জর অস্তিত্বকে ভুলিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস। ওরা বাঁচতে চায়। আনন্দ আর আলোর মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চায় বছরের একঘেয়ে অভাব-অনটনের দুঃসহ অবসন্নতাকে। এখন, যখন মাইক বাজছে না, হল্লা হচ্ছে না, তখনই এই উপদ্রবকারী একপাল ছোকরার জন্যে মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। কি বিচিত্র বেয়াড়া মন বল তো! তোমার দাদা অনিমেষ যে কোন্ আদর্শের নেশায় পাগল হয়ে হিংসার পথে নিজেকে নিয়ে গেছে তা বুঝি। এই এদেরই জন্যে তার মহানুভব প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। সে কান্না আজ আমার শুকনো বিছানাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। আগেও বুকের ভেতরটা

যন্ত্রণায় টনটন করেছে কতবার। কিন্তু প্রাণের মায়া, নিজের ওপর মমতা কি করে ঘোচাবো? পারি নি। জানি কোনো দিনই তা পারব না। আর নিজের মৃত্যু যে না চায় সে কি করে! অন্যের প্রাণ নেবার কথা ভাববে? কেন? অধিকারে! অনিমেষ হেসে উঠেছিল আমার এ কথায়। তোমার দাদা, আমার ছোটবেলার খেলার সাথী, কলেজের সহপাঠী অনিমেষ। হাজার তদবির করেও প্রতাপশালী অম্বুজ চাটুয্যে তাঁর মেয়েকে অনার্সের পরীক্ষায় ফার্স্ট করাতে পারেন নি যে অনিমেষের জন্যে সেই অনিমেষ! সে আজ আই-এ-এস হয়ে তোমাদের অনটনক্লিষ্ট পরিবারকে রক্ষা করতে পারতো। তোমায় তো তা হলে স্কুলের মাস্টারিও করতে হত না। কিন্তু সে অনায়াসে আমার মুখের ওপর জবাব দিয়ে বসল—দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি মুহূর্তের তিল-তিল যে মৃত্যু ঘটছে তার যোগফল কষে দেখেছিস সতু? একটা প্রাণই তোর কাছে বড় হল? বিপ্লব ছাড়া এই জংধরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। বিপ্লব আপনি আসে না রে। আমাদের শক্তি দিয়ে সেই বিপ্লবকে আনতে হবে। ভগীরথ গঙ্গাকে এনেছিলেন যে অটল সংকল্প নিয়ে সেই শক্তি আমাদের। এত বড় দেশের জনগণকে এইভাবে তিলে তিলে মরতে দেখার চেয়ে বড় পাপ কল্পনা করা যায় না রে।

তুমি কেন, আমিও নিজেকে বীরপুরুষ ভাবতে পারি না। নইলে সব ব্যাপারেই দর্শক হয়ে তফাতে থাকবো কেন! অথচ কেই বা তা চেয়েছিল? ইনকিলাব জিন্দাবাদ জিগির দিয়ে নগরের পথে পথে কালোবাজারী মুনাফাখোর আর অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জেহাদের মিছিলে আমিও ছিলাম তো! কিন্তু যেদিন আমার হাতে পেটো ধরিয়ে দেওয়া হল—নেবার সময়ই হাত কেঁপে গেল। ধমক খেলাম। অনিমেষ পাশে ছিল, বলল—'সতু, হাত ফসকে পড়ে গেলে তুই মরবি।' খুব সহজ, শান্ত তার কণ্ঠস্বর। এত স্বাভাবিক যেন খবরের কাগজের হেডলাইন—স্পষ্ট অথচ নির্বিকার। ওর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছিলাম, মনের কথাটা কি করে জানাই। অনিমেষ সেই সংকট থেকে উদ্ধার করল—বুঝেছি, তুই ভয় পাচ্ছিস। ঠিক আছে—'। বোবা মৃত্যুর দূত, গোলাকার সেই বস্তুটা অনিমেষ আমার হাত থেকে নিয়ে একটু অপ্রসন্ন সুরে মন্তব্য করল—'অ্যাকশন ছাড়া বিপ্লব হয় না সতু। পোস্টার, স্লোগান, মবিলাইজেশন দিয়ে গ্রাউন্ড তৈরি করা যায় না। কিন্তু অ্যাকশন আর চষা জমিতে ফসল বোনা এক ব্যাপার' কি যেন বলতে চেয়েছিলাম। ওদের ব্যস্ততার মধ্যে সেটুকু শোনার ফুরসত ছিল না। অব্যাহতি পেলাম। ওরা আমায় ফেলে রেখে বেরিয়ে গেল অ্যাকশনে। কি করব? অক্ষমতায় শরমে মরে গেছি, পায়ের তলার মাটি সরে গিয়ে, অতল কোন গহ্বরের দিকে আমায় ছুঁড়লো। সেটা ছিল খালধারের বিরাট পুরনো ইমারতের পিছনের একটা পোড়ো ঘর। সেখান থেকে যখন বেরুলাম তখন চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সামনে যে বাসখানা পেলাম তাতেই চড়ে বসলাম।...নাঃ, একটু যে নিশ্চিন্ত হয়ে তলিয়ে ভাববো তারও উপায় নেই, বাবার হাঁপানির টান উঠেছে। সাঁই-সাঁই ঘড়-ঘড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর মনে হচ্ছে, সকালেই কোথাও পাঠাবেন। হাতে একখানা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে অনুযোগ করবেন—নিজের মুরোদে তো কিছু হল না। বিপদভঞ্জন বলেছিল, ওর কাছেই নিয়ে নিত। টাইপরাইটিংটা শিখলে আজ এইভাবে বাপের পাখা হয়ে থাকতে হত না যাও...' প্রমোদরঞ্জন কিংবা ওইরকম কারুর কাছে।

যেতেই হবে। এর আগেও কম করে উনপঞ্চাশ জনের কাছে চাকরির উমেদারিতে যেতে হয়েছে। কেউ বলেন, ইস্ বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে বাবা। ভূপেনের ছেলে তুমি, নিশ্চয় করতাম তোমার জন্যে। তিনজনকে নেওয়া হল—তুমি তার একজন হতে পারতে আর সাত দিন আগে এলে।...কিংবা শুনেছি, পরে এসো...অথবা, আরে, এই বাজারে চাকরি চাইলেই কি জোটে, আমাদের হাতে কিছু নেই, সব ওই ইউনিয়নের খপ্পরে। ...আরও আছে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দোহাই, ঘুষের বিরুদ্ধে গালিগালাজ উদ্গার।...বাবার হাঁপানির টান যেন আমাকে খোঁচায় দগ্ধে মারারই একটা কৌশল। মায়ের মুখের দিকে কতদিন যে সোজাসুজি তাকাতে পারি নি তা তোমায় বলতে পারব না, সুজয়া। মনে হচ্ছে, ওদের মাইকটা যদি এখন জোরে চালিয়ে দিত তা হলে অন্তত বাবার ওই কাতরানিটা টের পেতাম না।

বাইরে ছেলেদের মধ্যে আবার জটলা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মত। সেই ছোকরা, যাকে পুলিশে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে, ফিরে এসে তড়পাচ্ছে।...ব্যাটা হাবলাটা পয়লা নম্বরের হাঁদা। আরে, তোর কি দরকার ছিল নামটা বলবার। খামোকা—খামোকা...। আরে, মরদ হবি তো জান গেলেও একটা কথা পেট থেকে বার করবি না। দেখলি তো আমায় ভ্যানে তুললো। তাতে আমি কি ভয়ে মরে গেলাম! চল বাবা, নিয়ে চল। হাজতে পুরে পেটাবি? তাই বি আচ্ছা! জানি তো দৌড়টা। শালা তুমি ডরেছো কি মরেছো! আর তুমি ডাঁটসে থাকতে পারলে ওরাই বাপ বাপ করে ছেড়ে দেবে।...তোকে কি করল? ...কি আবার করবে। মোড় অবধি নিয়ে যেতে, আমিও মেজাজসে বললুম, দেখুন স্যার! আমায় ঝটমট নিয়ে যাচ্ছেন কেন। জরুরী কাজ, কারখানায় কামাই হলে গবমেন্টের লোকসান

হবে। বস্তিতে থাকি বটে, কিন্তু কাজ করি খান জায়গায়। আমায় আটকালে ডিল্লি অর্বাদ খপর হবে। শেষে আপনাদের কাছেই মেলেটারি থেকে কৈফেত চাইবে।...বললি? ...হুঁ। ভয়টা কিসের বে?...কি বললি? কোথায় কাজ করিস বললি?...আরে, গান-অ্যাণ্ড-শেলের নাম করে দিলুম। তারপর বড়বাবু শালা বিয়ে করা বউ-এর মতো গলা নরম করে বললে, তা সেটা আগে বলতে হয়?' আমিও ছেড়নেবালা নই, বললুম—'সে টাইম দিলেন কই? যাকে-তাকে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করেন সেইজন্যে তো পাবলিকও বেজার!' ব্যাস, শালা ঠাণ্ডা। ভ্যান থেকে নামিয়ে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।...তুই যে গান-শেলের নাম করলি, যদি ওরা খোঁজ করে?...আবে লেঃ, ওদের কত হিম্মত। শালা, দেখিস না লোহার জাল, রিভলবার, ঢাল এসব নিয়ে গাড়িতে বোরখা বিবির মতো ঘোরে। না ঘরে কারে কি বল শালা, নকশালরা বোমা-পাইপগানের গুঁতোয় উস্তম-খুস্তম করছে না? জানের ভয় কার নেই বল। চোখের ওপরেই দেখলি তো সেটা কিন্তু নকশালদের কাজ নয়।...আরে ওই হল, নকশাল, নয় সি পি এম, নয় ফরওয়ার্ড ব্লক, নয় ওইরকম পার্টি।...হাঁ, যেখানে যে পার্টির এলেকা সেখেনে হামলা-ঝামেলা বাধলে পুলিশভ্যান যদি থামাতে গেল তো সব ঝাল তখন ওই খোচরের ওপরেই গিয়ে পড়ে। এ ভারী মজার ব্যাপার।...যা বলিচিস। লাগা, লাগা, মাইক লাগা। বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগছে।...কটা বাজলো?...তিনটে।... ইস, এবার কিন্তু ওদের দুগ্যা পুজোকে আমাদের আলোর জেল্লা টেক্কা মেরে দেবে।

আলোর আলোচনার মধ্যেই মাইকে সানাই বজাতে শুরু করল। কোনো এক স্বপ্নরাজ্যের আভাস—। চিৎকার উঠল... থামা, থামা।...বন্ধ কর শালা ওই কান্নার প্যানপ্যানানি।

আবার গাঁকগাঁক করে ঝাঁঝিয়ে উঠল—'আরে হো-ও ও-ও গাড়িয়া কাহাঁ তেরা দেরা।' আশ্চর্য, সঙ্গীতের কোনো সুকুমার কোমল আবেদন ওরা একদম বরদাস্ত করতে পারে না। সানাই বন্ধ হল বাইরে, কিন্তু আমার মনে পড়ল সেদিনের সেই সানাই-এর সুর যা তোমাদের বাড়ির বারান্দায় বসে শুনেছিলাম। সেই যেদিন অনিমেষকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রথমেই তোমার পাশে ছুটে না গিয়ে পারিনি, সুজয়া।... জানলার গায়ে ঠেস দিয়ে ওরা কথা বলছে। সেদিকেই কান পেতে দিলাম। কেননা, তোমার কাছ থেকে সেদিন যে রূঢ় আঘাত এসেছিল সেটা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না। অবিশ্যি এখন সেই যন্ত্রণা ভোঁতা হয়ে গেছে। তবু—। ওরা বলছে, আশী হাজার টাকা চাঁদা তুলেছে। শালা একবার আন্দাজ করতে পারিস!...আ রে, এক হপ্তা আগেই দেখিচি বাসে যেতে যেতে। শালা আধ মাইল ধরে—বড় রাস্তার দু ধারে যত বাড়ি আছে না, শালা সবগুলো আলোর মালায় সাজিয়ে দিয়েছে মাইরি।...মাইরি কতো টাকা খরচা হয়েছে একবার ভাবলে টারা হয়ে যাবি।...আর, আর আলো দিয়ে ফুটবল খেলা হচ্ছে, শুনিচিস।...শালা, সেরেফ টাকার খেলা! কিন্তু এভাবে পাড়ার ভিতরে ছেনতাই করলে সেধো, কাজটা খারাপ হয়েচে।...আরে না-না, সেধোর কম্ম নয়, এ পাড়ার মাল নয় ভাই।...যে-ই করুক, ঝামেলা শালা এখন তো সেধোকে পোয়াতেই হবে। ইদিকে মা পাঁচ বাড়ি বাসন মেজে বেড়াচ্ছে, বাবা করচে মজুরের কাজ, বোনগুলো আজ এর ঘরে, কাল ওর কোলে করছে—ও শালা দিব্বি টেরিলিন হাঁকড়ে কাপ্তেনি করছে। ছেনতাই না করলে এসব কোত্থেকে আসে?...যে শালা কাঠ খাবে তাকে আংরা হাগতে হবে। ওসব ভেবে কি হবে বল।...যা বলিচিস, তার চেয়ে ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুলে কাজ দেখবে। আবার তো কাল সক্কাল বেলার মানিকতলায় ছুটতে হবে।...তোদের কারখানা খুলল?...নাঃ, ও শালা ইউনিয়নে আর মালিকের লটর-পটরও মিটবে না,

আমাদেরও জান পরেশান।...না খুললে, খামোখা এদ্দূর থেকে মরতে দৌড়ুস কি জন্যে।...একটা বিড়ি ছাড়। বলছি তারপর...।

মাইকে এখন 'পা-আঃ-পা-আঃ পা-আঃ' নাচের তালে গান চলছে। ওরা হাততালি দিচ্ছে। হঠাৎ একজন বলল—এ বে সবটা ফু'কে দিস না।...লেঃ, ধর! তা বুঝলি, ন'গাড়ে এই সাড়ে ছ মাইল অমনি কি আর চুয়াত্তর দিন হাটাহাঁটি করছি। কোন্ যদি টুকুস করে ফ্যাক্টারির গেটটা খুলে যায়, বলা তো যায় না—আমি হয়তো সেদিনেই মাগা করে বসলুম, আর পরদিন গিয়ে শুনবো আমার জায়গায় অন্য লোক নেওয়া হয়ে গেছে। এরিয়ার মাইনেপত্তর সব গুজব হয়ে যাবে। তখন হারামীদের পায়ে তেল মালিশ করো। তোকে বলবো কি চাকুরির বাজার বড় খারাপ হয়ে পড়েছে।...কোন্ বাজারটা ভালো আছে। চালের লাইনেও আজকাল লাভ থাকে না। আমার আবার উপরী জ্বালা এই দাড়ি।...কেন, দাড়িতে কি হ'ল আবার?...ওই বালে কে, সন্নেস নিলুম এক বছরের। চুল-দাড়ি রেখে মানত করলুম। মানত ক'রে তো আর ওজানে চুরি-জোচ্চুরি করা, কি মিছে কথা বলা যায় না। আর খদ্দেরের কাছে মিছে কথারই দাম। যদি বলি, দু পয়সা লাভ করছি—শালারা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। এই অমাবস্যে পেরুলেই শালা এই সাধুগিরি নিকেশ করবো। তখন দেখিস—এই এক বছরের লোকসান কি ক'রে উশুল করি।

বড় তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু এমন জমাট আসর ছেড়ে নড়তে মন সরছে না। ওরা জানলা থেকে সরলেই উঠবো। আমিও একটা বিড়ি ধরাবো।

...তা কি হয় রে। যা যায় তা আর ফেরে না। তা ছাড়া তুই ত আর পয়সার ধান্দায় করিস নি মানসিক। যে জন্যে করলি।...গুলি মার, মেয়েমানুষের জাত আর বেড়াল দুইই এক। মাঝখান থেকে ক্ষ্যাপাবাবার কেসলামিতে পড়ে আশায় আশায় গোটা বচ্ছর নাকানিচুবুনিই সার। ...তোকে তো আগেই হুশিয়ার করেছিলুম। মনে আছে?..., কি বলিছিলি?...আরে, সোনাদার চায়ের দোকানে বসে বললুম, তুই ফুলটুসীর মায়া ছাড়, ও শালী শম্ভুর সঙ্গে ফিট আছে। যদি মরদ হোস তবে অন্য মালের সঙ্গে ঝুলে পড়। নিজে না পারিস বল, আমি জোনাকি কি ময়নার সঙ্গে তোকে ফিট করে দিচ্ছি—! তা গরীবের কথা তো, মন উঠবে কেন। কোথাকার ক্ষ্যাপা-বাবা। আরে আজকাল শালা কোন্ জিনিসটা খাঁটি আছে? সাধু সাম্নিসিতেও ভেজাল হয়েছে। ক্ষ্যাপা বাবা তোকে ক্ষেপিয়ে টু পাইস করে নিল।

এরপর আর জমলো না। কেননা একজন অন্যের কাছে দুটো টাকা ধার চাইল আর জবাবে অন্যজন বলল—আগের সেই ষোলো টাকার তো একটি পয়সা উপুড়হস্ত করার নাম নেই, উল্টে আরো?...শালা রোম্প এতখানি পথ খালি পেটে হাটাহাঁটি ক'রে আর পারি না। দে মাইরি, সুদ দেবো। কারখানায় জয়েন করি তখন দেখিস যদি না দিয়েছি তো কুত্তার নামে নাম রাখিস।... নেই ভাই, বিশ্বাস কর।...দেখি শালা পকেট সার্চ করব।...ওদের একজন ছুটল অন্যজন পিছু ধাওয়া করল।

ওরা হারিয়ে গেল রাতের সমুদ্রে। অতল অন্ধকার ওই গলির ভেতরে। আর আমি বাবার হাঁপানির টান—সাঁই-সাঁই শব্দের কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। চোখ দুটো জ্বালা করছে। আচ্ছা এমন কেন হচ্ছে? মনকে তো আমি এখন ময়না বানিয়ে ফেলেছি। যা বলি তাই শোনে। নইলে এই ধরো না, প্রায় রোজই তো আমি যাই ও-পাড়ায়। ভুলেও তোমার সামনে পড়ি না—কখ্খনো না। দেখি।

কী দেখি ভালো সুজয়?
তুমি যা দেখ, আমিও তাই দেখি!

শোনো তবে। না না, তার আগে একটা বিড়ি ধরানো যাক। জমিয়ে নিই মনের অগোছালো সুতোগুলো।

কালোয়ারপট্টির সামনে ফুটপাথখানা ওদেরই জং-ধরা লোহা-লক্কড়ে বোঝায় হয়ে উপচে পড়ে পাঁচের গাড়িচলা পথেরও অনেকখানি গিলে খেয়েছে। কাদা, জল আর সেই জলে চীনেবাদামের ছোট ছোট নৌকোর মত খোলাগুলো সেখানে দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছে। দেখেছো তো নিশ্চয়। দু'বেলা ওই পথ দিয়েই তো তোমায় অন্নের ধান্দায় পাড়াতে যেতে হয়। না, লুকোবার চেষ্টা করো না—তুমি কি শুধুই লাল (না, ঠিক উগ্‌ডগে লাল নয়। ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপের পাপড়ির মতো) রং-এর দেয়াল, রেলিং আর গেট্‌ওলা বিরাট ইমারতের ভেতরে মার্বেল পাথরের পুরুষমূর্তিটিই কি কেবল দেখ? নাকি, তাও না? তার এপারে, দেখ ওগুলো কাদের প্রাসাদ জানো? একদা যেসব জায়গায় সাহেব সুবোর ল্যান্ডো, ভিক্টোরিয়া, ব্রুহাম গাড়ির ঘোড়া-দাবড়ানি শোনা যেত, যে-সব কক্ষের বেলোয়াড়ী ঝাড়ে নর্তকীর হীরে-জহরতের জেল্লা বিচ্ছুরিত হত — আমি কল্পনা করি এগুলো সেইসব ইতিহাসের হাড়-পাঁজরা। কি করি বলো। কখন

তুমি যাবে এই বাড়ির পাশ দিয়ে, আর আমি এক নজর দেখতে পাবো—সেইজন্যে ভিড়ের মানুষে সেজ এধার-ওধার পায়চারি করি—সময় বয়ে যায় না, আমায় না ভাবিয়ে। তাই এগুলো গড়ে তুলি ওই দিকে তাকিয়ে। তুমি যাও। তোমায় যখন আসতে দেখি দূরে এপারে দাঁড়িয়ে তখন টের পাই সংগ্রামের সৈনিক এক বাস্তবের সংগে মোকাবিলা ক'রে বড়ই যেন শ্রান্ত, অবসন্ন। হতে পারে এ শুধু আমারই কল্পনা। হয়তো সত্যি তুমি ক্লান্ত নও, হয়তো ভাবলো এমনি ক'রে হাটকে হাটকে বিশল্যকরণীর দেখা পেয়ে জখম-হয়ে-যাওয়া সংসারে প্রাণসঞ্চার ক'রে ফেলবে। আশা।

আশা আমারও আছে, সঞ্জয়।

যখন সন্ধ্যা নামে। এই যেমন কাল পরশু নেমেছিল। মণিবাবুর অফিস থেকে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ঠিক সময়টির ঝুঁটি ধরলাম। তুমি ফিরবে। মণিবাবু ভরসা দিয়েছেন। লেগে থাকো। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে! তবে আপাতত হাতে কিছু নেই, দেখতেই পাচ্ছ। তা ব'লে আসা বন্ধ করো না। কখন কোন্ পার্টি আসবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে আসবেই —আর এলে তোমায় ট্যাগ্ ক'রে দেবো।' মণিবাবুর সঙ্গে দিশী-বিদেশী অনেক কোম্পানীর কারবার। আর সেইজন্যে তাঁর দোরে খাটছি।

যাক গে, ওসব এখন থাক। এক দিকে মণিবাবু আশা দিচ্ছেন। কিন্তু তুমি টাইশান সেরে ফেরাটা তো আর নিছক আশা নয়। তোমাকে একদিন বলতে পারবো পাশে দাঁড়িয়ে, কিংবা চলতে চলতে—আমারও অন্নসংস্থান হ'ল, সঞ্জয়।

পর পর দু'দিন। বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামলো। অথচ তুমি এলে না। ভাবলাম হয়তো সময় পাল্টে গেছে। এদিকে একটা ঠেলাগাড়ি 'পার্ক' করা আছে লাইট-বাড়ির সামনের পথে। ফুটপাথে মাটির কলসীর গায়ে ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো। একটা নয়, কয়েকটি বড় বড় কলসী। খানিকটা তফাতে সাজানো হয়েছে। আর যৌবন-পার-হয়ে-যাওয়া একটি ক'রে স্ত্রীলোক তার পাশে বসে আছে। কোনো রিকশাওয়ালা, কোথাও বা ঝাঁকামুটে—তার বোঝা নামিয়ে উবু হয়ে বসছে। কাঁচের গ্লাসে ক'রে ওই রমণী সেই কলসী থেকে নিয়ে রস ধরিয়ে দিচ্ছে। তাড়ি। কাল পরশু দেখেছি এই তাড়ির বেসাতি। ওইখানেই একটা মিশ্-মিশে কালো লোক, পরনে তার লাল গামছা বা লুঙ্গি বোঝবার উপায় নেই—লোহার গেল থেরাটোপের গায়ে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে বসে বোধ হয় ঈশ্বরের অপার মহিমার ধ্যানে রত। লোকটার পা কিন্তু সাদা। শুভ্রতায় তার চরণযুগল জ্যোতিঃ-বিভাসিত বক্ষকেও হার মানাতে পারে—কেন-না, প্লাস্টার করা। ভাঙা পা নিয়ে লোকটা কি জন্যে ওখানে বসে আছে কে জানে!

তুমি হয়তো বিরক্ত হচ্ছ। এসব কথা তোমায় কেন বলা? তোমার মনে সহানুভূতি জাগানোর প্রচ্ছন্ন প্রয়াস? মোটেই তা নয়। তুমি যদি ঠিক সময়ে অংকের উত্তরের মত নির্ভুল মূর্তিতে পথ দিয়ে চ'লে যেতে, তা হ'লে আমারও ছুটি মিলতো। তা হ'ল কই? তবে একটা কথা শুনলে তোমার মন খারাপ হবে নির্ঘাত। এইভাবে ওই সময়ের পথ আমার মনকে বন্দী ক'রে ফেলে-ছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার জন্যে প্রতীক্ষার কথা। আমিও একবার ওই পিপাসা মেটানোর আয়োজনে আকৃষ্ট হ'য়ে বসে পড়তে চেয়েছিলাম, সঞ্জয়। ওরা, ওই যারা অনায়াসে ঢেলে দিচ্ছে আর যারা তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে বসে পড়ছে—দু' তরফের মধ্যে মনের কারবার নেই, আছে প্রয়োজনের।

তারপর দমকল ছুটলো ঘণ্টা বাজিয়ে। না, আগুন নেবাবার দমকল নয়। ভক্তির বন্যায় যারা ভগবানের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, তাদের জন্যে মন্দিরের ঘণ্টা বেজে ওঠার শব্দটা আমি দমকল ব'লে ভুল ক'রে চমকে উঠেছি।

তোমার খবর নিতে মেছোবাজারের আলোয় ছেয়ে যাওয়া পথ ধরলাম। পথটা ভুল হ'ল। অত আলো। সব যেন এলো-মেলো ক'রে দিল। তোমার অসুখ? না-কি তোমার ওই টাইশানটা খতম? নাকি অনিমেষের কোনো বিপদ হয়েছে!

আগে হ'লে সোজাই হাজির হওয়া ছিল সহজ। কৈফিয়তের কোনো গরজ দরকার বোধ করিনি। কিন্তু কাল বা পরশু ওই আলোর তলা দিয়ে হাটতে হাটতে কেবলই মুচড়ে উঠেছে কলিজা। যদি এই অজস্র আলোর স্রোতের তলা থেকে কোনো গোপন অভিসন্ধি আবিষ্কৃত হয়—যদি প্রশ্ন ক'রে বসো, সে প্রশ্ন এমন হয় যাতে তোমার এতদিনের রচিত দুর্গ ধসে চুরমার হয়ে যায়—! তাই যাইনি।

আমি জানি।

আজও বাবা পাঠাবেন। আমি যাবো। কিছু পাবো না।

যাবো মণিবাবুর কাছে।......

তারপর সেই কালোয়ারপট্টির পথে বিকেল আমার সন্ধ্যে পেরিয়ে দেবে।

জানি, তুমিও ফিরবে না। অথবা ফিরবে। দূরের হাওয়ায় পরিচিত গানের ধাক্কাও শেষ হবে। তবু আমি দেখবো ওদের।

সবচেয়ে ভয়ের কথা কি জানো? ওই আলোর নীচে—যে আলোর জন্যে হাজার হাজার টাকা পুড়ছে — সে আলোর নীচে কত অন্ধকার তাই ভাবছি। আর ভাবছি। যেসব বাড়িকে এইসব মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে, তারই একটিতেই তো তুমি আছো, আর যে থাকতে পারতো সেই অনিমেষ নেই! যে অনিমেষ বিপ্লব আনতে জেল-খানার ওপারে চলে গিয়েছে! আমার অন্নের সংস্থান হবে একদিন। তখন কিন্তু—! এই কাল-পরশুর মতো তোমার কাছে যাবার পথটা খুঁজে পাবো না—পরন্তু

থাকবে না। আমারও না, তোমারও না।

ওরা এখন শহীদবেদী বানাচ্ছে আর জোর গলায় নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছে। ওরা খবরের কাগজে ছবি পাঠাবে—একই কালীমূর্তির ছবি। কিন্তু ছাপবে না। ছাপবে তাদেরই পাঠানো ছবি যাদের রক্তচক্ষুকে তারা ভয় করে। আচ্ছা সুজয়, প্রেমও কি তাই! মাইকে এখন চিৎকার উঠেছে, ময়ূরকে পেখম মেলতে হুকুম করছে কোনো বিখ্যাত গায়ক। হায় ময়ূর, তোমার পেখমের রঙ কি এখানে এই আমাদের মনে এক কণাও ছড়াবে না! আহা! কী অপূর্ব উচ্চারণভঙ্গী। না, না, বরং নির্ভুলই বলা উচিত। কেননা, কালের কবলে পড়ে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সিংহাসনটি—যার নাম ময়ূরের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে জড়ানো, সেটির যে গতি হয়েছে, সরকারের সৌকর্যে পেখমের 'প্যাখম্' হওয়াও তেমনি অনিবার্য। কালের গতি! তবে কি জানো অনিমেষ, বিপ্লব শুরু হয়েছে — পথে পথে এইসব শহীদবেদীর ব্যারিকেড্ আর সমাজের মাথা থেকে পা, পা-ই বা বলি কেন, পায়ের তলা অবধি সর্বত্র সত্য-শিব-সুন্দরের সেই হিমালয়সদৃশ রাজত্বে খাণ্ডবদাহনের তাণ্ডবলীলায় মেতে উঠেছে। অনিমেষ, তুমি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় না পেলে আজ তোমার স্মৃতিতেও শহীদবেদী রচনা হ'ত পথের ওপর। সত্যি এক ময়ূরসিংহাসন ঘুচে গিয়ে কত শত এইসব ময়ূর সিংহাসন গড়ে উঠছে বল তো? বল তো সুজয়া, তোমার কানেও এই গানের সুর পৌঁছাচ্ছে কিনা! এই যে এখন আবার 'প্যাখম্ ম্যালো' ব'লে চিৎকার করছে মাইকখানা। একটা খবর তোমায় দেবো কি, তবে আজ নয়। যেদিন আমি অন্নের সংস্থান করতে পারবো, সেই দিন—। সেদিন বলতে পারবো যে, আমাদের পিসীর বাড়ি যেখানে প্রথম তোমায় চুমু খেয়েছিলাম, আর তুমি মাথা মুখ নামিয়ে কাঁপা সুরে বারণ করেছিলে (কণ্ঠে তোমার জোর ছিল না, ছিল আবেগ—প্রশ্রয়ের মিনতি) —সেই পিসীদের পাশের বাড়ির বেদানাবাবু (যার নাম শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলে আর একটু হলে—ভাগ্যে হাতে ধরেছিলাম)—বেদানাবাবুর মোটর গ্যারেজে এখন এক জোড়া ময়ূর পোষা হয়েছে। মোটরখানা বেচে দিয়ে, সেইখানে এই যে 'বার্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠা, এ কি কম কথা! যদিও বাইরের লোকের দেখার উপায় নেই (গ্যারেজটা এমনভাবে বন্ধ যে, হাওয়ারও ঢোকবার জন্যে ছেঁদা খুঁজতে হয়)। ওই গ্যারেজে বসে যে বুড়ীটা বাবুদের বাসন মাজে সেই-ই খবরটা চাউর করেছে। চোখে না দেখলেও ময়ূরের খবরটা সবাই শুনেছে—আমিও!

সুজয়া তুমি বিরক্ত হচ্ছ! চাকরী একটা হল বল। মণিবাবু আশ্বাস করেছেন। খানিকটা এগিয়েও গেছে কথাবার্তা। বলছি না। যদি শিকে শেষকালে না ছেঁড়ে! কালই তো দুপুরে খিদিরপুর ডকে আমায় পাঠিয়েছিলেন। কি বলব, এমনই ইন্টেলেক যে, তোমায় ভেড়ার মাংস খাওয়াবার একটা চান্স হাতে পেয়েও কাজে লাগাতে পারলাম না—পকেটে যদি দশটা টাকা থাকতো, কি দিনেন সাত-আট টাকা—তা হলেই হ'ত। অবাক হচ্ছ? আরে, বার বেন ময়দানে একপাল ভেড়া নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ আটটা ভেড়া ছুটে এসে ট্রামের চাকার তলায় শহীদ হয়ে গেল। না, ওদের কোনো লীডার ছিল না। [illegible] অচল ট্রাম থেকে নেমে সেই [illegible] [illegible] পারে? কিন্তু [illegible] বলিষ্ঠ মনের বল [illegible] শুরু করল। চোখের ওপর দেখলাম, মরে গেল ভেড়াগুলো। বিকারে গেল আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিটের মধ্যে। টাকা ছিল না, থাকলে কি হ'ত বলা যায় না—! সেই দৃশ্যের মধ্যে একটা প্রশ্ন শুধু জন্ম নিয়েছে। আচ্ছা, যারা এই আদর্শবাদের বলি হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তাদের লাশ কত দিয়ে কে কিনবে! কেউ কি কিনবে! অন্য একটা বাসে চড়ে যখন ডকে পৌঁছলাম তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

যাক গে। চাকরি পাওয়া অবধি তুমি যেন আমার জন্যে থেকো সুজয়া। তোমার কাছেও যেন 'বড্ড দেরী হয়ে গেছে' না ঘটে—শুধু এই কথা ব'লে দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দিচ্ছি সুজয়া।

শহীদবেদী তৈরী নিয়ে ওদের দলের মধ্যেই বিতর্ক উঠেছে। কে একজন হেঁকে উঠল, রাখ! ওসব ফ্যাশনের দরকার নেই। শালা, শহীদবেদী করলেই হ'ল! তার ইজ্জত দিতে পারবি? কাকে, শালিকে হেগেমুতে দিয়ে যায় ঝিলের ধারের পার্কের শহীদবেদীতে দেখিস! কেউ কোনোদিন সাফ করেছিস? এই ক'মাস আগে আমি চোখের ওপর দেখলুম এক শালার লীডার ইলেকশনে জিতে পার্টির লোকদের মিষ্টি বিলুচ্ছে। ভিড়ে-ভিড়। রাস্তার গাড়ি অবধি বন্ধ হয়ে গেছে। এক শালা কমরেড কিনা শহীদবেদীর ওপর পা রেখে একটু চাঙা লেকচার দিচ্ছে!...কত বড় অন্যায়। ছি ছি!...কিন্তু কমরেড যোগেশ আজ বেঁচে থাকলে এখানে আসতো, খুশিতে গানে মাত ক'রে রাখতো।...আর সেই যোগেশকে আমরা যখন পাচ্ছি না... তার নামে বেদী না বানালেই আমরা তাকে ভুলে যাবো নাকি? কি রে!...(মিছিলের প্রতিধ্বনি আমার মনে: 'ভুলি নি, ভুলবো না!') হয়তো মরে গেলে আর বিস্মৃতির আশঙ্কা থাকে না। সত্যি সুজয়া এইভাবে যারা মরেছে তারা অন্তিমকালে এই বিশ্বাস নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে তার আদর্শ নিশ্চয় জয়ী হবে। আর তার পশ্চাতে পড়ে থাকা বন্ধুরা বারবার তাকে মনে রাখবে, সেই মনে রাখা পবিত্র বেদনায় স্নিগ্ধ। তাই না? আমার কানের পর্দায় সেই আটটি মৃত্যুমুখী ভেড়া যন্ত্রণার চিৎকারে পাগল করে তুলছে। বাঁচাও—বাঁচাও! শহীদ কি তা করে? করে না। সত্যি সুজয়া আমি যদি কোনো বিরাট আদর্শের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে মরতে পারতাম তা হলে তোমার মনের ময়ূর সিংহাসন আমার কেনা হয়ে যেত!

কি বলছ? এখনো সময় আছে? এখনো আমি আদর্শের পিছনে ছুটতে পারি। দেরী হয়ে যায় নি? সত্যি বলছো! আহা, তোমার নাগাল যেন পাই—পেতে চাই আমি যে-কোনো মূল্যের বিনিময়ে।

ঢাকায় ছিলাম। রেডিওতে শুনেছি, টেলিভিশনেও দেখেছি। খুবই ভাল লেগেছে। আমার কথা শেষ না হতেই অশোকবাবু বললেন: আপনার বক্তৃতার প্রশংসা আমার স্ত্রীও করেছে। আমার তো ভাল লেগেছেই। শেখ সাহেবের মুখে স্মিত হাসি। নিজের নামের কোটের দু পকেটে হাত রেখে বললেন: ধরতে পারেন নাই। আমি আমার কলকাতার বক্তৃতায় ভুল করে একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছি। এবং সে শব্দটি হল অ্যাডভাইজ। ওটা না বললেই ভাল হত। আপনারা তো জানেন, আমি এবং আমার মন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে সব কিছুই বাংলায় হবে। একজন বিদেশী ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। শেখ সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে তিনি বললেন: টু ডে ইজ এ রেড লেটার ডে ইন মাই লাইফ।

বিদেশী ভদ্রলোকের চোখেমুখে খুশীর ছাপ সুস্পষ্ট।

* * *

পূর্বাণী হোটেলের ঝুল বারান্দায় দাঁড়ালে ঢাকা শহরটাকে দেখতে বেশ লাগে। সকালে পরনা সরাতেই রোদ। মোটরগাড়ি, সাইকেল রিকশা, অটো-স্কুটার সব কিছুই এখানে বসে দেখা যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর সব কিছুই ঝিমিয়ে পড়ে। মোটরগাড়ির হেড লাইটের আলো ছাড়া আর কিছু বড় একটা দেখা যায় না। বড় বড় দোকান সকাল সকাল বন্ধ হয়ে যায়। রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের চলাফেরাও কমে আসে। হোটেলের পাশের ঘরের ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, বড় বড় অস্ত্রশস্ত্র জমা পড়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনো যে ঢাকা শহরের আশেপাশে মুক্তিবাহিনীর ছদ্মবেশে রাজাকার বা আলবদর চলাফেরা করছে না এ কথা কি জোর করে বলা যায়? তা ছাড়া ২৫ মার্চের পর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে ঢাকার মানুষের মধ্যে যে আড়ষ্টতা এসেছিল তা পুরোপুরি এখনও কাটেনি। সময় লাগবে। লক্ষ্য করেননি, ঢাকা শহরে কোন পাখির কলরব শোনা যায় না। এমনকি রমনা পারকে গেলেও একটি পাখি দেখতে পাবেন কি না বলা শক্ত। সত্যিই সদরঘাটে বুড়ি গঙ্গার আনাচেকানাচে গোটা কতক কাক ছাড়া আমিও ঢাকা শহরে কোন পাখি দেখতে পাইনি। সবই গুলির প্রতিক্রিয়া। তবে এখানে এসে প্রথম দিকে ভোর থেকে শুরু করে রাত্রি বারটা-একটা পর্যন্ত যে পরিমাণ গুলিগোলার আওয়াজ শুনেছি এখন তার তুলনায় কিছুই নেই—মোটেই নেই বললেই চলে। ঢাকা এখন শান্ত। রাত্রিতে আরও শান্ত।

সুদেব রায়চৌধুরী

সংবাদ

সোভিয়েট আন্তর্গ্রহযান মার্স-৩ মঙ্গল গ্রহের বুকে ধীর গতিতে অবতরণ করে মহাকাশ বিজ্ঞানে এক নজিরহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ছবিটি 'দেশ' সাপ্তাহিকের জন্যে বিশেষ ভাবে সংগৃহীত হয়েছে।

দিনে কুড়ি ইঞ্চি

হ্যাঁ প্রতিদিন, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, জীব জন্তু, ঘর বাড়ি, এমন কি পাহাড় পর্বত, বলতে গেলে সব কিছুই। পৃথিবীর শক্ত মাটির বুকে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই প্রতিদিন গড়ে কুড়ি ইঞ্চি ওঠা নামা করছি। এবং এর মূলে কাজ করছে চাঁদ এবং কিছুটা সূর্য। ওদের প্রচণ্ড আকর্ষণে পৃথিবীর কঠিন ভূ-স্তর জলের বুকে জোয়ারের মতই খানিকটা ফেঁপে ওঠে এবং টান বরাবর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে প্রায় কুড়ি ইঞ্চির মত দূরত্ব। চাঁদ এবং সূর্য দূরে সরে গেলে এই টান কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভূস্তরও নেমে আসে তার স্বাভাবিক অবস্থান বরাবর। এর অর্থ, দৈনিক কুড়ি ইঞ্চি করে একবার চাঁদের দিকে এগিয়ে যাই। আবার পিছু হটি।

ভূবিজ্ঞানীদের মন্তব্য : পৃথিবীর গভীর ভূস্তর পর্যন্ত দুটি জিনিসের প্রভাব অনেক বেশি কার্যকর। এক, বাতাসের চাপ। এই চাপের সামান্যতম পরিবর্তনও ভূস্তরের জমাট অবস্থার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এবং দুই, ওই স্তরে এর চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করে চাঁদের টান। চাঁদ এবং পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণে পৃথিবীর ভূস্তর ক্রমে অসম্বদ্ধ হতে থাকে। জনৈক পর্যবেক্ষকের মতে, ভয়ঙ্কর ধরনের কোন ভূমিকম্প ঘটার আগে তার প্রস্তুতি চলে কম করেও দু' বছর তক। কঠিন ভূস্তরের বাঁধুনি ক্রমে দিন দিন হাল্কা হয়। দুই একটি জায়গার স্তর আলগা হওয়ায় অবিরত চাপ কাজ করতে থাকে। আর, সব চাইতে মজার ব্যাপার, আশপাশে যদি কোন গেজার থাকে, তার প্রভাব সেই গেজারের ওপরও গিয়ে পড়ে। দেখা গেছে, প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প ঘটার আগে গেজারের জলের চাপ প্রথমে বাড়তে থাকে। ফলে প্রতিদিন মাটি থেকে তার জল অনেক বেশি উঁচু পর্যন্ত উঠে যায়। তারপর ভূমিকম্প ঘটার দুই তিন সপ্তাহ আগে হঠাৎ সেই জলের চাপ যায় কমে। এর অর্থ, জল আর বেশি দূর পর্যন্ত উঠতে পারে না। অতঃপর ভূমিকম্প।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, গেজারের গতি প্রকৃতি এবং পৃথিবীর সর্বত্র চাঁদের দৈনিক আকর্ষণের কার্যকলাপ পরীক্ষা করে অদূর ভবিষ্যতে কখন কোথায় ভূমিকম্প ঘটতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বাভাস যোগান সম্ভব হবে।

চাঁদে জল, জল মঙ্গলেও

খবরটা অবশ্য গত ১৫ অক্টোবর প্রথম প্রকাশ করেছিলেন রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জন ফ্রিম্যান, জুনিয়ার। ওই দিন সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম আশ্বাসবাণী : চাঁদের ভূস্তরে একটি ফাটলের মধ্যে দিয়ে প্রবল বেগে জলীয় বাষ্প বের হতে দেখা গেছে। হাবভাবটা তার পৃথিবীর গেজারের মত। ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসার পর ওই জলীয় বাষ্প চাঁদের আকাশে মেঘের স্তর সৃষ্টি করে ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করছিল। তাঁর অভিমত, ওই মেঘের শতকরা নিরানব্বুই ভাগই জল কণা। যান্ত্রিক চোখে যতটুকু ধরা পড়েছে, ঘনীভূত করলে সেটুকু মেঘ থেকে অন্তত এক কোয়ার্টের মত তরল

জল সৃষ্টি করা সম্ভব হতো। বলা বাহুল্য, যে যন্ত্রের কথা এই মাত্র উল্লেখ করলাম, চাঁদের দেশে তাদের স্থাপন করে এসেছিলেন অ্যাপলো ১২ এবং ১৪র নভোচররা। চান্দ্র ভূখণ্ডের নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করার ফাঁকে ৭ মার্চ, ১৯৭১ ওঁরা জলীয় বাষ্পের মেঘের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।

ডঃ ফ্রিম্যানের সহযোগী ডঃ কেণ্ট হিল্‌স অবশ্য মন্তব্য করেছেন, এ ব্যাপারে এখনই অতিউৎসাহী হওয়ার কারণ নেই। আমরা বংসামান্য জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি। এবং তাও অতি সীমিত অঞ্চল থেকে। এ ছাড়াও চাঁদের বুকে বৈজ্ঞানিক চোখ যতটা জল সেখানে বেরিয়েছে তার নামমাত্র একটি অংশ শুধু ধরতে পেরেছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়, পুরো চান্দ্র ভূখণ্ডে জলের পরিমাণ কতটা দাঁড়াতে পারে। উল্লেখ্য, যে যন্ত্রটি ওই জলীয় বাষ্পের সন্ধান দিয়েছে, তার নাম সুপ্রাথার্মাল আয়ন ডিটেকটার। অ্যাপলো ১২ এবং ১৪-র নভোচররা যে দুটি গবেষণাগার সেখানে বসিয়ে এসেছেন, তার প্রত্যেকটিতে একটি করে এই যন্ত্র রাখা হয়েছে।

ডঃ ফ্রিম্যান বলেছেন, ডিটেকটারের সংকেত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চাঁদের ফাটল পথে বেরিয়ে আসার পর ওই মেঘ ঊর্ধ্বাকাশে প্রায় দশ বর্গমাইলের মত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে চাঁদের ঝঞ্ঝা সাগরের পূব দিক বরাবর। কিন্তু মুশকিল হল, দুটি মাত্র স্টেশনকে কেন্দ্র করে তার যথাযথ অবস্থান বের করা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ঠিক যে সময়ে সেখানে রহস্যজনক ওই গেজারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তখন সেখানকার ভূস্তরেও কয়েকবার মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। এ থেকে বিশেষজ্ঞদের মনে হয়েছে, শুধু জলই নয়, চাঁদের গভীরে আরও কিছু কিছু গ্যাস বাস করছে। হয়ত সেখানকার আগ্নেয় লীলা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

কিন্তু একই সাথে আরও কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। চাঁদ থেকে ফিরে আসা নভোচরদের সকলেই বলেছেন, সেখানকার বহু, চাপ অস্বাভাবিক রকমের কম। বলতে গেলে সেখানে কোন বাতাসই নেই। যদি তাই হয়, তাহলে চাঁদের অভ্যন্তর থেকে জলীয় বাষ্প অথবা অন্য কোন রকমের গ্যাস, প্রায়শই যা বাইরে বেরিয়ে আসে, তারা যায় কোথায়? একথা ঠিক, অবশ্য মাধ্যাকর্ষণ কম হওয়ার দরুন কিছুটা বস্তু-সামগ্রী সব সময় মহাকাশে ছিটকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বরং যায়ও। এ ঘটনা শুধু চাঁদেই নয়, পৃথিবীর ক্ষেত্রেও সত্য। আণবিক গতির দরুন পৃথিবীর পরিমণ্ডল থেকেও প্রতিদিন টন টন বাতাস মহাকাশের দিকে চলে যাচ্ছে। সেই বাতাস কখনও আমরা আর ফিরে পাই না। চাঁদেও এটা ঘটে। তবু নিয়মিত সেখানে যে পরিমাণ বাষ্প আবহাওয়া মণ্ডলে জমে, তার সবটাই কি দ্রুত মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়? যদি যায়, কী ভাবেই বা যায়?

হয়ত এমনও হতে পারে, চুম্বকশক্তি অভাবে চাঁদে সূর্যের বিকিরণ সেখানে অবাধভাবে সক্রিয়। সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মি জলীয় বাষ্পের উপর আঘাত হেনে আয়নিত করে দেয়। ফলে তৈরি হয় অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন আয়ন। পরে বিভিন্ন আইসোটোপেও পরিবর্তিত হতে পারে। তারপর বৈদ্যুতিক কণাগুলো পরস্পর বিক্রিয়া এবং অবশেষে ঘাত প্রতি-

খাতের মধ্যে দিয়ে চান্দ্র জগৎ থেকে প্রস্থানের পালা।

তবু আশাবাদীর মত বলা যায়, জল যদি সত্যিই চাঁদের গভীর স্তরে সঞ্চিত থাকে, ভবিষ্যতের চন্দ্রচারীর কাছে তার চেয়ে বড় সুসংবাদ আর কিছু হতে পারে না। তেমনকিছু ঘটলে পৃথিবী থেকে তাঁদের আর প্রচুর খরচ এবং তার চেয়েও বেশি যান্ত্রিক অসুবিধে পুইয়ে সেখানে জল বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। এমনও সম্ভব, ওই জলকে কৃত্রিম উপায়ে ব্যবহার করে উদ্ভিদ জগতও সেখানে গড়ে তোলা সম্ভব?

এ সবের উত্তর হয়ত আমাদের কাছে আরও পরিস্কার করে বলতে পারবেন আগামী অ্যাপলোর অভিযাত্রীরা। সংবাদ, অ্যাপলো-১৬, ১৬ এপ্রিল চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

★

ওদিকে মঙ্গলের খবর আরও আশাপ্রদ। সম্প্রতি মার্কিন অন্তর্গ্রহযান মেরিনার-৯ এর সংবাদ, লোহিত ওই গ্রহটির বুকে ঘন মেঘের আস্তরণ দেখা গেছে। এবং সে মেঘের অন্যতম অংশ জলীয় বাষ্প। এ ছাড়াও, অন্তর্গ্রহযানটির পাঠানো কয়েকটি ছবি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন, সেখানে নাকি স্রোতস্বিনী নদীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। মেরুর বরফ গলছে। সেই জল নদীধারা হয়ে সমতলের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদিকে সোভিয়েত অন্তর্গ্রহযান মার্স-৩, যা এখন মঙ্গলের বুকে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত, কিছু কিছু উদ্ভিদের সন্ধান জানাচ্ছে বলে কেউ কেউ অনুমান করছেন। সেখানকার আবহাওয়া মণ্ডলের যে অংশ ভূস্তরের কাছাকাছি তার মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণও, এতদিন আমরা যেটুকু জেনে এসেছি তার চেয়ে বেশি থাকা সম্ভব। তুলনামূলক ভাবে বলা হচ্ছে, মানুষের বাস করার পক্ষে মঙ্গলের পরিবেশ চাঁদের চেয়ে অনুকূল।

হলদে বামনের রহস্য

সূর্য আমাদের কাছে জীবনের উৎস রূপে পরিগণিত হলেও, আসলে এটি একটি সাধারণ মাঝারি ধরনের নক্ষত্র। একদিকে নীলাভ নক্ষত্র, জ্যোতির্মণ্ডলে যারা সবচাইতে বেশি উষ্ণ, তপ্ত। আর এক পাশে শীতলতম নক্ষত্র, যাদের রঙ লাল। এদেরই মাঝামাঝি একটি পর্যায়ে পড়ে আমাদের সূর্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলা হয় 'ইয়েলো ডোয়ার্ফ' বা হলদে বামন। উল্লেখ্য, শীতলতম নক্ষত্র মানে এই নয়, নক্ষত্রটি বরফের মত ঠাণ্ডা। আসলে ওই সমস্ত নক্ষত্রও যথেষ্ট উষ্ণ, শুধু তুলনামূলক ভাবে অন্য সমস্ত নক্ষত্রের চেয়ে অনেক কম। পৃথিবীর কাছাকাছি

বিচিত্র এই শিল্পের স্রষ্টা মানুষ নয়—প্রত্যক্ষভাবে একটি কমপ্যুটার।

ছবি : জার্মান ফিচার্স, হামবুর্গ।

বলে, সূর্যের প্রভাব পৃথিবীর উপর সব চাইতে বেশি।

একথা ঠিক, অন্যান্য নক্ষত্রের চেয়ে এ পর্যন্ত আমরা সূর্যের ওপরেই সব চাইতে বেশি অনুসন্ধান চালিয়েছি। যদিও ওই অনুসন্ধানের অনেক ফলাফলই আজও পর্যন্ত হাইপোথেসিস বা প্রকল্পের পর্যায়েই থেকে গেছে। যেমন ধরুন, কেউ কেউ মনে করেন, সূর্যের অভ্যন্তরে কেন্দ্রের কাছাকাছি বস্তু বিরাজ করছে গ্যাস হিসেবে। অদ্ভুত সেই গ্যাস। তার ঘনত্ব সিসের চেয়ে বহুগুণ বেশি। অর্থাৎ ওজনে সিসের চেয়ে অনেক ভারী। অথচ গুণাগুণের দিক থেকে সমস্ত কিছুই তার সাধারণ গ্যাসের মত। তাদের পরমাণুগুলি পরস্পর জড়ো হয়ে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে। পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে তাদের বাইরের অংশের ইলেকট্রনকণা ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও গ্যাসে কণিকারা পরস্পর প্রবল সংঘর্ষ সৃষ্টি করে তৈরি করছে তীব্র একস-রশ্মি।

কিন্তু তীব্র এবং যথেষ্ট শক্তিশালী হলে কী হবে, সূর্যের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে খুব যে একটা সহজ কাজ, তা বলা চলে না। কেন্দ্রের কাছাকাছি থেকে নির্গত হয়ে সূর্যের পরিমণ্ডল ত্যাগ করতে ওই গ্যাসের সময় লাগে গড়ে কুড়ি হাজার বছর। অতঃপর তার স্বচ্ছ প্রতিপ্রভ স্তর ভেদ করে যখন ওই গ্যাস এসে পৌঁছয় ফটোস্ফিয়ারে, তখন তার বিকিরণ রূপান্তরিত হয় অতি বেগনী রশ্মি এবং দৃশ্যমান আলোক ছটায়। পরবর্তী প্রায় আট মিনিটে আলোর সেই গোলা এসে পৌঁছয় পৃথিবীর বুকে।

আজ থেকে এগার বছর আগে একটি অদ্ভুত ঘটনা বেশ খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি

করেছিল। পৃথিবীর তাবৎ বেতার সংযোগ ব্যবস্থা হঠাৎ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিমান এবং সমুদ্রগামী জাহাজের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল, তাদের দিক দেখিয়ে চালিয়ে নেবার, অথবা সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি যাদের কাজ ছিল সংকেত আদান প্রদানের, হঠাৎ তারা যেন অবাধ্য হয়ে উঠল, যন্ত্রগুলির চৌম্বক চালিত নির্দেশক ছাতল পরিমাপক স্কেলের উপর এলোপাথারি ছোটাছুটি শুরু করল। আর পৃথিবীর আকাশে একটা লালচে প্রভাবে মুহুর্মুহু ভাস্বর হয়ে উঠতে লাগল। সৌরবিজ্ঞানীদের ভাষায় এটা সূর্যের বিস্ফোরণ জনিত ঘটনাবলীর বিবরণ।

অর্থাৎ হঠাৎ এক ঝলক উজ্জ্বল আলোর ঝলসানির সংগে সংগে সেদিন সূর্যের বুকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। সংগে সংগে সেখান থেকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসে শক্তিশালী এক্স-রশ্মি, অতিবেগুনী এবং অবলোহিত রশ্মির মাঝামাঝি সমস্ত রকমের রশ্মি—জোরাল, স্বাভাবিকের চেয়ে বহুগুণে জোরাল। যখন হয় সাময়িক এই বিস্ফোরণের সময় যে এক্স-রশ্মি নির্গত হয় তার তীব্রতা এবং

শক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশি। এ ছাড়াও সৌরস্তর থেকে নির্গত হয় শক্তিশালী হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্র, প্রোটন এবং ভারী পদার্থের পরমাণু কেন্দ্র।

এই সমস্ত সামগ্রী চাঁদের কঠিন বুকে গিয়ে আঘাত করে সেখানে অবক্ষয় ঘটায়। এছাড়া সূর্যের ওই হাইড্রোজেনের মেঘ সবেগে যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর এসে পড়ে তখন তার আঘাত প্রচণ্ড শক্তিশালী হারিকেনের চেয়েও বেশি হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সূর্যের বুকে নিয়ত বিস্ফোরণ ঘটছে। রোজই ঘটে থাকে। তবে প্রতি এগার বছর অন্তর ঘটে প্রবল উচ্ছ্বাস। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে যায়। কিন্তু বিস্ফোরণের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই হাইড্রোজেন—যা প্রবল উচ্ছ্বাসে বায়ুমণ্ডলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার চাপে বায়ুমণ্ডলের চাপ দারুণভাবে বেড়ে যায়।

অতএব আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে সূর্যের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একটা বড় রকমের সমস্যা।

এ ছাড়াও, সূর্যের বিকিরণ ঊর্ধ্বাকাশের অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাসকে আয়নিত করে। আবার আণবিক অক্সিজেনের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ঘটিয়ে প্রচুর পরিমাণ উত্তাপ শক্তিও নির্গত করে। যা পরোক্ষভাবে বাতাসের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে।

বেতার এবং টেলিফোন ব্যবস্থার উপর সৌর-বিস্ফোরণের ব্যাপারটাও প্রযুক্তিবিদরা এখন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন। উদ্দেশ্য, তার প্রভাব থেকে মুক্ত করে ভবিষ্যতের বেতার সংযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা।

ভবিষ্যতে লেজার রশ্মির সাহায্যে সার্বিক বার্তাবিনিময় বা সংকেত আদান-প্রদানের চেষ্টা চলছে। লেজার রশ্মির উপর সৌর-ঝটিকার কোন প্রভাব আছে কী না, বিজ্ঞানীরা এখন তার ওপরও পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন।

কোয়ার্টজ হাত ঘড়ি

পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে তাল রেখে আমরা সময় নির্ণয় করি। এ ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিই পৃথিবী তার নিজের অক্ষের চারপাশে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। অতএব একটি আবর্তনকালকে প্রথমে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া গেল এক ঘণ্টা। অতঃপর ঘণ্টাকে মিনিট সেকেন্ড প্রভৃতিতে ভাগ করে নেওয়া।

কিন্তু গোল বাধল ১৯৩৬ সালে। ওই বছর বার্লিন ইনস্টিটিউট অফ ফিজিকস অ্যান্ড টেকনোলজির পদার্থবিজ্ঞানী অ্যাডলফ শাইবে এবং ইউডো অ্যাডলস-বার্গার প্রমাণ করলেন, না, পৃথিবী তার নিজের অক্ষের চারপাশে কখনই সমান গতিতে আবর্তন করে না। চাঁদ, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের পারস্পরিক অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপর তাদের আকর্ষণের হের ফের হয়। ফলে কখনও পৃথিবীর আহ্নিক গতি যায় বেড়ে। কখনও শ্লথ হয়। অবশ্য এই হেরফেরের পরিমাণ দৈনিক খুবই কম। এক সেকেন্ডের দু হাজার ভাগের এক বা দুই ভাগ মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে সময় মাপার ব্যাপারে জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা ভাবিত হয়ে পড়লেন।

সময়ের এই তারতম্য ধরা পড়ে কোয়ার্টজ-এর কেলাসের সাহায্যে।

ব্যাপারটি এই রকম। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কুরী দম্পতি সর্বপ্রথম লক্ষ করেন কোয়ার্টজ, টুরমেলিন বা চিনির কেলাসের উপর যখন প্রচণ্ড যান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তখন তাদের সামনা-সামনি দুই তলে হঠাৎ বিদ্যুৎ আধানের সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারটির ওঁরা নাম রাখেন 'পিয়েজো ইলেকট্রিক এফেকট।'

পরে দেখা গেল, এর বিপরীত ঘটনাটিও সত্য। অর্থাৎ ধরণের কেলাসের উভয় পার্শ্বে দুটি পরিবাহী জুড়ে দিয়ে তাদের মধ্যে বিদ্যুৎ আধান পাঠালে, কেলাসগুলি সংকুচিত বা সম্প্রসারিত হয়। পরে এই তত্ত্বের উপর কেন্দ্র করেই তৈরি করা হয়েছে কোয়ার্টজ ঘড়ি। সম্প্রতি উদ্ভাবিত ইনটিগ্রেটেড সারকিটের সাহায্যে পশ্চিম জার্মানির ফোরৎহাইনস প্রতিষ্ঠান কোয়ার্টজ-এর হাত ঘড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। ওঁদের বক্তব্য, এই ঘড়ির সময় বছরে চল্লিশ সেকেন্ডের মত এদিক সেদিক হতে পারে।

সমরজিৎ কর

সুস্বাদু মাখন-

পলসন মাখন

সুস্বাদু সোনালী মাখন! একটু চেখে দেখুন—রোজ-রোজ খেতে চাইবেন।

(everest/263/PL ben)

॥ ১৫ ॥

শুধু যে তাতে কর্তাবাবুই নিশ্চিন্ত হলেন তা-ই নয়, হয়ত নবাবগঞ্জের চৌধুরীবাড়ির সবাই-ই নিশ্চিন্ত হলেন। চৌধুরীমশাইও নিশ্চিন্ত হলেন। যাক্, আর কোনও দুর্ভাবনা নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছেই পূর্ণ হলো। সদানন্দ এতক্ষণে নতুন বউ-এর আকর্ষণে গা ঢেলে দিয়ে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব ভুলে গিয়েছে। আর কোনও দুর্ভাবনাও কারো নেই, আর কোনও আশঙ্কাও নেই কারো। যা ভয় ছিল সকলের তা হলো না। সব সমস্যা নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল। তিন দিন আগেও যে সমস্যা সকলের অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল তার সমাধি হলো। কোথা থেকে এক পাগলা ইতিহাসের কুটিল শক্তি সাপ হয়ে ফণা তুলেছিল। মনে হয়েছিল সেই ফণা বুঝি এ সংসারের সুখ-শান্তি-ঐশ্বর্যের মাথায় ছোবল মেরে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু আর তা হবার সম্ভাবনা নেই। এবার নয়নতারা এসেছে। ফুলশয্যার ওপর নয়নতারার চোখ জোড়ানো রূপ আর মন ভোলানো ভালবাসা সব কিছু সদানন্দের কাছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আর ভয় নেই। এবার ঘুমোও, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো সবাই। তোমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে এ ক'দিন ধরে। গায়ে-হলুদের আগের দিন রাত্রে যেদিন থেকে সদানন্দ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল সেই দিন থেকেই তোমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে। তারপর অনেক ঝড়-ঝাপটা অতিক্রম করে শেষ রক্ষা করেছে বংশী ঢালী। যেটুকু বংশী ঢালী পারেনি, সেটুকু শেষ করবে নতুন-বউ নয়নতারা। নয়নতারাই আজ ফুলশয্যার রাত্রে সদানন্দকে জীবনের আসল মানে বুঝিয়ে দেবে। নয়নতারাই বুঝিয়ে দেবে লেখাপড়া যা কিছু, সব শিখেছিল ও সবই তো [illegible] জন্যে, স্কুল-কলেজে পড়াবার জন্যে, পড়ে পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে। কিন্তু জীবন আলাদা জিনিস। সে-জীবনে একমাত্র সত্য হলো ভোগ। ভোগ তার সংসারের বিলাসের মধ্যে দিয়ে, তার অর্থ উপার্জনের মধ্যে দিয়ে, আর সেই ভোগের পথে যত বাধা আসে তা যে-কোনও উপায়ে অপসারণের মধ্যে দিয়ে। এরই নাম হলো জীবন!

কর্তাবাবুও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তন্দ্রার ঘোরটা যেন চট্ করে একটু ভেঙে গেল। মনে হলো কে যেন কাঁদছে। যেন কাছা-কাছি থেকে কারো কান্নার আওয়াজ আসছে!

এই আনন্দের দিনে এত রাতে কে আবার কাঁদে! অভ্যাসমত ডাকলেন—দীনু—

অন্য সময় হলে দীনু সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হতো। হুকুম তামিল করবার জন্যে দীনুর মত অত বাধ্য মানুষ তিনি আর দেখেন নি। কালিগঞ্জের কর্তাবাবুর কাছে যখন তিনি কাজ করতেন তখন তিনি নিজেও অত বাধ্য হয়ে হুকুম তামিল করেন নি কখনও।

কর্তাবাবুর ডাকে কেউ-ই সাড়া দিলে না। তা না সাড়া দিক। আহা, সারা দিন খাটুনির পর বোধহয় দীনু ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোক। ঘুমোক সে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছিল কে কাঁদছে! অথচ কাঁদার তো কথা নয় কারো। আজকে তো আনন্দের দিন। আজকে তো তাঁর নাতির বিয়ে। বিয়ে ঠিক নয়, ফুলশয্যে। আজকে তো তাঁর প্রজারা এসে তাঁর নাত-বউকে আশীর্বাদ করে গেছে। আজকে সবাই তাঁর বাড়িতে এসে পাতা পেতে পেট ভরে খেয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ খাবার পর ছাঁদা বেঁধেও নিয়ে গেছে। গ্রামে তো আজ আর কেউই উপবাসী নেই। সবাই পরিতৃপ্ত, সবাই পরিশ্রান্ত। এখন তারা যে-যার বাড়িতে গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এখন কেন তারা কাঁদতে যাবে! কীসের দুঃখ তাদের!

কর্তাবাবু আবার চোখ দুটো জোর করে বুজিয়ে প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কর্তাবাবু তখনও জানতেন না যে তিনি ঘুমোতে চেষ্টা করলেও ইতিহাসের কখনও ঘুমোতে নেই। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই আজ কালিগঞ্জের বউকে দেবতার প্রাণ দিতে হয়। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই এত রাত্রে তাঁর কানে কার চাপা আর্তনাদ ভেসে আসে। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই তাঁর নাতি বিয়ের দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে কালিগঞ্জে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবার ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই তাঁর নাতি বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেই টাকা চায়!

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক। এখন সবাই সুখী, এখন সকলের শান্তি। এখন সবাই ঘুমোও। আমি অসুস্থ লোক, আমার বয়েস হয়েছে, আমি জেগে থাকলেও তোমরা ঘুমোও!

—মা!

সমস্ত বাড়িময় যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে। অনেকের একটা চাটাই কিংবা বালিশও জোটেনি। কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়ে একটা ছাদের তল খুঁজে নিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। কাজ শেষ হতে রাত প্রায় একটা বেজে গিয়েছিল। মাছের কাঁটা আর মাংসের এঁটো হাড়ের লোভে কিছু বেওয়ারিশ কুকুর পুকুরপাড় এসে অনেকক্ষণ কাড়াকাড়ি করে তখন পেট শান্ত করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বলতে গেলে কেউই আর তখন জেগে ছিল না। চৌধুরীমশাইও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বড় খাটুনি গিয়েছিল তাঁর। যখন সদানন্দ ফুলশয্যার ঘরে শুতে গেল তখনই শুধু একটা নিশ্চিন্তের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন। যাক্, বাঁচা গেল। চৌধুরী-পরিবারের বংশধারা রক্ষা পেল। আর কোনও দিন কোনও কালিগঞ্জের বউ এসে তাঁর কোনও ক্ষতিসাধন করতে

পারবে না। এই বংশ শাখাপ্রশাখা মেলে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ বিস্তারলাভ করবে। ওই সদারও আবার একদিন সন্তান হবে। সেই সন্তানের আবার একদিন গায়ে-হলুদ হবে, একদিন বিয়ে হবে, একদিন ফুলশয্যাও হবে।

আর তারপর? তারপরের কথা ভাবতে গিয়েই চৌধুরীমশাই-এর দু' চোখ কখন ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল।

—মা!

চৌধুরী-মশাই চমকে উঠলেন। কে যেন কাকে ডাকছে! মেয়েলি গলা! তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। পাশেই বিছানার ওপর গৃহিণী ঘুমোচ্ছিল। বড় অঘোর ঘুম তার। আহা, ঘুমোক। অনেক দিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে আজ সবে একটু বিশ্রাম করবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু কে-ই বা ডাকছে তাকে। এত রাত্রে তাকে কেনই বা ডাকছে!

তিনি গৃহিণীর গায়ে ঠেলা দিলেন, বললেন—ওগো, ওগো, শুনছো—

ধড়মড় করে উঠে পড়লো প্রীতি। বললে—কী হলো?

চৌধুরীমশাই বললেন—দেখ দিকিনি, কে যেন ডাকছে তোমাকে—

—আমাকে? ডাকছে? কে ডাকছে!

—কী জানি! একজন মেয়েমানুষের গলা মনে হলো—

মেয়েমানুষের গলা! এত রাত্তিরে কে মেয়েমানুষ তাকে ডাকবে? এই তো সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে তিনি ঘরে এসে শুয়ে পড়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন—রাত কটা হলো গো?

চৌধুরীমশাই ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললেন—রাত তিনটে—

রাত তিনটে মানে ভোর হয়ে এল! এত রাত পর্যন্ত ঘুম হয়েছে! তবে তো অনেকক্ষণ ঘুম হয়েছে! কিছুই টের পায়নি সে।

আবার বাইরে থেকে ডাক এল—মা—

প্রীতি তাড়াতাড়ি কাপড়টা গুছিয়ে নিতে নিতে ঘরের খিল খুলে বাইরে এলো। চার দিকে অন্ধকার। সামনের বারান্দায় যে-যেখানে যেমনভাবে পেরেছে গড়া-গড়া শুয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে যেন মনে হলো কে একজন অন্ধকারে তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রীতি তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

মূর্তিটা বললে—আমি—

—আমি? আমি কে?

প্রীতি একেবারে মূর্তিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, মূর্তিটার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই চমকে উঠেছে। বউমা? তুমি? তুমি হঠাৎ এত রাত্তিরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

নয়নতারা তখন থরথর করে কাঁপছিল। বললে—আমার ভয় পাচ্ছে—

—কেন? ভয় পাচ্ছে কেন? খোকা কোথায়?

নয়নতারা এ-কথায় কোনও জবাব দিলে না।

শাশুড়ি বললে—কী হলো, জবাব দিচ্ছ না কেন? খোকা কোথায় গেল? খোকা ঘরে নেই?

এবারও নয়নতারা কোনও কথার উত্তর দিলে না।

কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো শাশুড়ির মনে। বললে—চলো, চলো, তোমার ঘরে চলো, কিছু ভয় নেই। চলো—

নয়নতারাকে হাতে ধরে নিয়ে প্রীতি তার শোবার ঘরের দিকে গেল। নয়নতারার শোবার ঘরের দরজা তখন হাট করে খোলা পড়ে ছিল। ভেতরে একরাশ ফুলের গন্ধ। দেয়ালের গায়ে টিমটিম করে তখনও দেয়াল-গিরিটা জ্বলছে। বিছানা যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে। চাদরে কোথাও এতটুকু ভাঁজও পড়েনি কোথাও। বিছানায় যে কেউ শুয়েছিল তার সামান্যতম চিহ্নও কোথাও নেই। বিছানাটা যেন ব্যবহারও করা হয়নি এক মুহূর্তের জন্যে।

চারদিকে চেয়ে প্রীতি খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলো, যেন সমস্ত অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করলে। তার পর নয়নতারার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—খোকা কোথায় গেল?

নয়নতারা কথা বলতে গিয়েও কথা বলতে পারলে না। শাশুড়ির চোখের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে মুখটা নিচু করে নিলে।

—বলো, খোকা কোথায় গেল? বলো?

নয়নতারা চুপ। তার চোখ দিয়ে তখন টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

—খোকা ঘরে শোয়নি?

এবার প্রীতি আর পারলে না। নয়নতারার চিবুকটা ধরে উঁচু করে নিজের মুখোমুখি ধরলে। নয়নতারা শাশুড়ির সেই দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে চোখ দুটো বুজিয়ে ফেললে। বোজা চোখ দুটো দিয়ে তখন জলের ধারা আর বাধা মানছে না। দরদর করে গাল বেয়ে শাশুড়ির হাতের পাতার ওপর পড়তে লাগলো।

—বলো বউমা, আমি তোমার শাশুড়ি হই, আমার কাছে লজ্জা করো না, খোকা তোমার বিছানায় শোয়নি?

নয়নতারার মুখে তখন আর জবাব দেবার মত কোনও ক্ষমতাই আর নেই।

—বলো জবাব দাও, খোকা শোয়নি?

এতক্ষণে নয়নতারার ঠোঁট দিয়ে একটা ছোট্ট কথা বেরোল—না—

—শোয়নি? তা হলে কোথায় গেল সে?

নয়নতারা বললে—তা জানি না।

—কিন্তু তাকে তো আমরা তোমার ঘরে ঢুকিয়ে দিলুম। সে দরজায় খিল দিলে, তাও জানি। তারপর কী হলো? তারপর কখন সে বেরিয়ে গেল?

নয়নতারা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

প্রীতি বললে—বলো বউমা, আমার কথার জবাব দাও, তারপর কখন সে বেরিয়ে গেল? তোমার সঙ্গে কী কথা হলো? তুমি কি কিছু বলেছিলে তাকে? কী বলেছিলে?

নয়নতারা কাঁদতে কাঁদতেই বললে—কিছু বলিনি—

—কিছু বলো নি?

—না!

—সে তোমাকে কিছু বলেছিল?

—না।

প্রীতি একটু ভেবে নিলে। তারপর বললে—তোমাদের দু'জনের মধ্যে কোন কিছুই কথা হয়নি?

নয়নতারা বললে—না—

—তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল সে?

নয়নতারা হঠাৎ এ-কথার জবাব দিতে পারলে না।

প্রীতি বললে—বলো, বউমা, আমি তোমাকে বলছি, আমি তোমার শাশুড়ি হই, আমি তোমার মায়ের মত। এখানে তোমার মা থাকলে যেমন তাকে সব কথা বলতে তেমনি আমাকেও তুমি বলো। মনে করে নাও এ-বাড়িতে আমিই তোমার মা। আমাকে কোনও কিছু বলতে তুমি লজ্জা করো না। বলো, তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল সে?

নয়নতারা এবার শাশুড়ির বুকের মধ্যে ভেঙে পড়লো। শাশুড়ি বউকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে—কেঁদো না বউমা, চুপ করো, কেঁদো না। আমাকে সব খুলে বলো তুমি। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই। আমি তো রয়েছি, তোমার কী ভয়? মার কাছে কি কেউ কিছু বলতে লজ্জা করে? বলো তো লক্ষ্মী মেয়ে, সদা বুঝি তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল, আর তুমি বুঝি আপত্তি করেছিলে?

নয়নতারা প্রীতির বুকের মধ্যেই মাথা নেড়ে বললে—না—

—তবে? তবে কেন খোকা চলে গেল?

এর উত্তর কী দেবে নয়নতারা? নয়নতারা কি নিজেই এর উত্তর জানতো! সে কি কল্পনা করতে পেরেছিল এমন করে তার ফুলশয্যা রাত্রের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? কত দিন কত মেয়ের কাছে তাদের ফুলশয্যা রাত্রের মুখরোচক গল্প শুনেছে। তারাও তার সঙ্গে এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছে। তাদের বিয়ে হবার পরে তারাই গল্প করেছে সে-সব ঘটনার। বিয়ের আগে নয়নতারাও নিজের ফুলশয্যার রাত্রের অনেক স্বপ্ন তিলে তিলে মনের ভেতরে পুষে রেখেছিল। ভেবেছিল তার ফুলশয্যার রাত্রের ঘটনা তাদের বলবে। অন্তত বলবার মত একটা কিছু ঘটনা ঘটবে। কিন্তু এ কী হলো? কারো বাড়িতে কি বউভাতের রাত্রে পুলিস আসে! এমন ঘটনা তো তার কোনও বন্ধুর বিয়েতে ঘটেনি। পুলিসই বা কেন হঠাৎ আসতে গেল, আর খুনই বা হলো কে? সব কিছু মিশিয়ে যেন এক রহস্যজনক বিপর্যয় ঘটে গেল তার জীবনে। কান্না কি
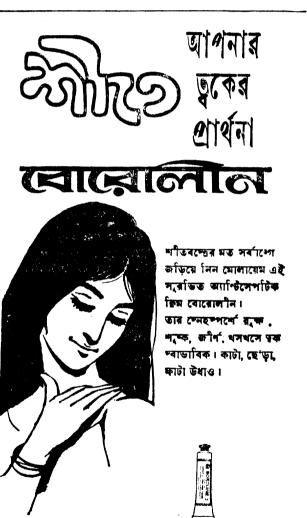
মানুষের চোখে সহজে আসে! আজ যদি মা এখানে থাকতো তো নয়নতারা তাকে জিজ্ঞেস করতো—মা তুমি এমন জায়গায় আমার বিয়ে দিলে কেন? একটু খোঁজ-খবরও নিতে পারলে না ভালো করে?

প্রীতি কী করবে তখন বুঝতে পারছিল না। বললে—কেঁদো না বউমা, আমার সঙ্গে কথা বলো, আমি যে-কথা বলছি তার জবাব দাও—

বলে নয়নতারাকে বুক থেকে সরিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করালো। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে বউমার চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললে—এবার বলো তো বউমা, সত্যিই কী হয়েছিল? সব সত্যি করে বলবে, কিছু লুকোবে না—বলো—

নয়নতারা বললে—কিছু হয়নি মা—

শাশুড়ি বললে—কিছু হয়নি তো শুধু শুধু খোকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল? ফুল-শয্যার রাত্তিরে বর কখনও মিছিমিছি বউকে ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়? এমন কথা কখনও কেউ শুনেছে? নিশ্চয় কিছু হয়েছে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ! বলো সত্যিই কী হয়েছিল?

নয়নতারা বললে—সত্যি বলছি মা, কিছু হয়নি—

—কিছু না হলে খোকা এমনিই বেরিয়ে গেল? আমার ছেলে তো পাগল নয়। পাগল হলে না-হয় বুঝতুম, তবু তার একটা মানে ছিল। শুধু শুধু সে বেরিয়ে গেল কেন? তুমি নিশ্চয়ই তাকে কিছু বলেছিলে!

—বিশ্বাস করুন মা, আমি কিছুই বলিনি!

—তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করবো? যখন তুমি দেখলে যে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তুমি তাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন সে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে?

নয়নতারা অপরাধীর মত বললে—আমি জিজ্ঞেস করিনি—

—কেন জিজ্ঞেস করোনি?

—আমার ভয় করেছিল!

—ভয়? কীসের ভয়?

কীসের যে ভয় তা নয়নতারা নিজেই জানে না তো শাশুড়িকে বোঝাবে কেমন করে? বললে—আমি জানিনা কীসের ভয়!

প্রীতি এবার যেন একটু অসন্তুষ্ট হলো। বলে উঠলো—তা তুমি যখন দেখলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তাকে ধরে রাখলে না কেন? তাহলে কীসের জন্যে ভগবান এত রূপ দিয়েছিল তোমাকে? তাহলে অন্য এত মেয়ে থাকতে কেন তোমাকেই বা এ-বাড়ির বউ করে নিয়ে এলুম? আর এইটুকুই যদি তুমি না করতে পারবে তো এত রূপ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? আমি রূপসী বউ চেয়েছিলুম কি আমার নিজের জন্যে?

কিন্তু কথাগুলো বলেই প্রীতি বুঝলো ঠিক এই সময়ে এ-কথাগুলো বলা যেন তার উচিত হচ্ছে না।

নয়নতারা তখনও শাশুড়ির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল। প্রীতি বললে—আর কেঁদো না বউমা, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কিছু দোষ নেই। আর সত্যিই তো তুমিই বা কী করবে। তুমি তো নতুন এ-বাড়িতে! এক কাজ করি, এখনও কিছুক্ষণ রাত আছে, আমি এসে তোমার কাছে শুচ্ছি। সারা রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ হবে—তুমি একটু থাকো এখানে, আমি আসছি—

বলে নয়নতারাকে বিছানার ওপর বসিয়ে আবার নিজের ঘরে চলে এলো।

চৌধুরীমশাই তখন নিজের ঘরের ভেতর ছটফট করে পায়চারি করছিলেন। ঠিক বুঝতে পারছিলেন না কোথায় কী গোলমাল বেধেছে। এখন যদি সমস্ত বাড়িময় জিনিসটা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে একেবারে। সমস্ত নবাবগঞ্জময় লোক জেনে যাবে যে, তাঁর ছেলে ফুলশয্যার রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়েছে! কথাটি হয়ত শেষ পর্যন্ত কেষ্টনগরে বেয়াই-বাড়িতেও গিয়ে পৌঁছোবে! তখন

হঠাৎ গৃহিণী এসে ঘরে ঢুকলো।

চৌধুরীমশাই সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর দিকে এগিয়ে গেলেন—কী হলো? বউমা কী বললে?

—যা ভেবেছিলুম তাই-ই হয়েছে, খোকা ঘরে নেই—

—ঘরে নেই?

গৃহিণী বললে—হ্যাঁ, বউমার একলা থাকতে ভয় করছিল, তাই আমাকে ডাকতে এসেছিল। আমি যাই বউমার কাছে। তোমাকে তাই বলতে এলুম—

—কিন্তু খোকা গেল কোথায়?

গৃহিণী বললে—তা কী করে ও জানবে? বউমার সঙ্গে খোকার কোনও কথাও হয়নি, ঘরে ঢুকেছে আর সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে—

—খোকা বেরিয়ে গেল আর বউমা আটকাতে পারলে না?

গৃহিণী বললে—কী যে তুমি বলো! নতুন বউ, এখনও খোকার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি আর খোকাকে আটকাবে? নতুন বউ-এর অত সাহস থাকে? অচেনা জায়গা, অচেনা মানুষ, একেবারে বলতে গেলে প্রথম রাত, এর আগে কোনওদিন একটা কথাও হয়নি, তাকে কী বলে বাধা দেবে? তোমার এত বয়েস হলো আর তুমি এই কথা বলছো।

আমার ফুলশয্যার রাতে যদি তুমি অমনি করতে তো আমি তোমাকে বাধা দিতে পারতুম? তা কি কোনও মেয়ে পারে? কী যে তোমার বুদ্ধি—

চৌধুরীমশাই বললেন—তাহলে কী হবে?

গৃহিণী বললে—এখন কী হবে তাই-ই ভাবছি। বউমা একেবারে ভেঙে পড়েছে। বেচারী এই রাত তিনটে পর্যন্ত একলা কী করবে ভেবে পায়নি, শুধু ভয়ে কেঁপেছে, শেষকালে আর কোনও উপায় না পেয়ে লজ্জা সরম সব ঠেলে ফেলে আমাকে ডাকতে এসেছে—

—তা তুমি কী বলে এলে বউমাকে?

—কী আর বলবো! আর আমারই কি ছাই মাথার ঠিক আছে এখন! প্রথমে খুব বকালুম, কিন্তু শেষে বুঝলুম বউমারই বা কী দোষ। খুব কাঁদছিল, আমি তার মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বসিয়ে রেখে দিয়ে এলুম। এখন যাই, যে রাতটুকু আছে, পাশে গিয়ে শুই, চেষ্টা করে দেখি যদি একটু ঘুম পাড়াতে পারি, তারপর সকাল হলে যা-হয় ঠিক করা যাবে—

চৌধুরীমশাই বললেন—ঠিক আর কী করবে তুমি! খোকা কি আর ফিরে আসবে?

—সে সব এখন আর ভাবতে পারছি না আমি। আমারও মাথায় সব গোলমাল হয়ে গেছে। আমিও আর দাঁড়াতে পারছি না—

বলে গৃহিণী চলে যাচ্ছিল।

চৌধুরীমশাই পেছন থেকে ডাকলেন। বললেন—আর একটা কথা শোন—

গৃহিণী ফিরলো। বললে—কী?

—দেখ, বউমাকে বলে দিও যেন এ-সব কথা কাউকে না বলে! বাইরের লোক এ-কথা শুনলে নানান কেলেঙ্কারি রটাবে। কেষ্টনগরের বেয়াই-বেয়ানের কানেও যেন না ওঠে।

গৃহিণী বললে—বউমাকে না হয় বারণ করবো, কিন্তু তোমার ছেলে? তোমার ছেলেই যদি দশজনকে বলে বেড়ায়! আর যদি না-ও বলে তো এ-সব কথা তুমি কদ্দিন চেপে রাখতে পারবে?

চৌধুরীমশাই বললেন—সে পরের কথা পরে ভেবে দেখা যাবে। এখন আজকের কাণ্ডটা যেন দু-কান না হয়। তোমার বাবা রয়েছেন এখানে, আত্মীয়-কুটুম সবাই এসেছে, এই অবস্থায় বাইরে জানাজানি হওয়া ভালো নয়, তারপর বাবার কানেও যেন না-যায় কথাটা, তুমি একটু বউমাকে ভালো করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে দিও—

গৃহিণী বুঝলো কি বুঝলো না তা বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে চলে গেল। চৌধুরীমশাই তখন ঘরের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে পায়চারি করতে লাগলেন।

নয়নতারা তখনও পাথরের মত ঠাণ্ডা শরীরে বিছানার ওপর কাঠ হয়ে বসে ছিল। শাশুড়ি ঘরে ঢুকেই বললে—ওমা, তুমি এখনও শোওনি? এসো এসো, শুয়ে পড়ো—

বলে নয়নতারাকে পাশে নিয়ে শুইয়ে দিলে। তারপর পায়ের দিকে পাট করে রাখা চাদরটা তার গায়ে ঢাকা দিয়ে নিজেও তার পাশে শুয়ে পড়লো।

বললে—কিছু ভয় নেই বউমা, খোকাকে তুমি ভুল বুঝো না, ও ওইরকম। একটু খেয়ালী ছেলে। আজকে ওইরকম ব্যবহার করলে বটে, কিন্তু দু-এক দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে—তখন দেখবে ও-রকম স্বামী হয় না। আমি ওর মা, তবু আমার সঙ্গেও ও ওই রকম করে। তুমি কিছু ভেবো না বউমা, লক্ষ্মীটি।

বলে প্রীতি নয়নতারার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তারপর আস্তে আস্তে বললে—একটা কথা বউমা, তুমি এসব কথা কাউকে বোল না যেন, আমি সব ঠিক করে দেব। এখনও তো তোমাদের ভালো করে জানাশোনা হয়নি, তাই একটু লজ্জা হয়েছে আমার খোকার। বড় লাজুক ছেলে কিনা আমার সদা—দু'দিন ঘর করলেই বুঝতে পারবে সব। তুমি যেন তোমার বাবা-মাকে এসব কথা কিছু বোল না, বুঝলে—

নয়নতারা বুঝলো কি বুঝলো না তা ঠিক বোঝা গেল না। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। শাশুড়ি তখনও নয়নতারার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। সমস্ত বিয়ে-বাড়ি নিস্তব্ধ। বিকেল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত যে কোলাহল চলছিল তার চিহ্নমাত্র নেই আর কোথাও। সবাই ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। দূরে কোন্‌ পাড়ায় কাদের মুরগী ডেকে উঠলো। এইবার ভোর হবে। এইবার একে একে আবার সবাই ঘুম ভেঙে উঠবে। আবার ডাক পড়বে প্রীতির। তার

আঁচলে বড়-ভাঁড়ারের চাবি। এতগুলো লোক জল-খাবার খাবে, কারো দুধ, কারো লুচি, কারো চা, কারো বা চিঁড়ে-মুড়ি। সকলের সব ফরমাস তামিল করতে হবে একা তাকেই। যেন কেউ না বলতে পারে চৌধুরীমশাই-এর ছেলের বিয়েতে নেমতন্ন খেতে এসে পেটটুকু ভরেনি আমাদের।

না, আর দেরি করা নয়। এরপর যদি একটু তন্দ্রা এসে যায় তখন বেলা গড়িয়ে যাবে। তখন জানাজানি হয়ে যাবে যে চৌধুরীমশাই-এর ছেলের ফুলশয্যা হয়নি। ছেলের বদলে শাশুড়ি এসে নতুন-বউএর পাশে শুয়ে রাত কাটিয়েছে। আস্তে আস্তে প্রীতি উঠলো। একবার নিচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করলে বউমা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। বউমা তখনও ঠিক সেইভাবে বালিশে মুখ গুঁজে স্থির হয়ে শুয়ে পড়ে আছে!

প্রীতি আর শব্দ না করে টিপি টিপি পায়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। বারান্দার ওপর তখনও মানুষ-জন গড়া গড়া

শুয়ে আছে। তখনও যেন তাদের কাছে গভীর রাত।

কিন্তু সকালের আগে উঠেছে প্রকাশমামা। প্রকাশমামার ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়ার রোগ আছে। ঘুম থেকে উঠে সেইটেই তার প্রধান কাজ। বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, যা কিছু হোক, ওটি তার প্রথমেই চাই।

আগের রাতে শেষ নিমন্ত্রিত বাড়িটি চলে না-যাওয়া পর্যন্ত প্রকাশমামার শান্তি ছিল না। সকলকে নিজে দাঁড়িয়ে খাইয়েছে প্রকাশমামা। জোর জবরদস্তি করে পেট ভরে সকলকে খাইয়েছে। যে দশখানা লুচির বেশি খেতে পারবে না, তাকে জোর-জবরদস্তি করে তিরিশ-চল্লিশখানা লুচি খাইয়েছে। মনে মনে সবাই বাহবা দিয়েছে শালাবাবুকে। হ্যাঁ, কেউ বলতে পারবে না যে সদানন্দর বিয়েতে ভালো করে খাতির-যত্ন হয়নি, পেট ভরে খেতে পায়নি। গাঁ-গঞ্জে এই-ই নিয়ম। বিয়ে-বাড়ির এমন খাওয়া বছরে কচিৎ কদাচিৎ কপালে জোটে। চাষা-ভুষোদের বিয়ে-বাড়িতে সাধারণত চিঁড়ের ফলারের বন্দোবস্ত।

প্রকাশমামা কোথায় ঘুমিয়ে ছিল কেউ জানে না। চোখ মেলেই চেঁচিয়ে উঠলো—কই রে, চা হয়েছে?

কিন্তু কথাটা বলেই বুঝলো আজকে শালাবাবুর হুকুম তামিল করবার কেউ নেই আশে-পাশে। আজকে সবাই ঘুমোচ্ছে। কদিনের খাটুনির পর সকলেরই গায়ে-গতরে ব্যথা হয়ে বিছানায় গড়াচ্ছে। কিন্তু তা বললে তো নেশা শুনবে না। নেশার রসদ যোগাতেই হবে।

আস্তে আস্তে আড়ামোড়া খেয়ে প্রকাশমামা উঠলো। উঠে একবার রান্নাবাড়ির দিকে গেল। কিন্তু সেদিকে সব ভোঁ-ভাঁ। কারোর টিকির পাত্তা নেই। একবার পুকুরপাড়ের দিকে গেল। সেখানেই কালকে ভিয়েন চড়েছিল। মোটা-মোটা কাঠগুলো পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে রয়েছে। কিন্তু ঠাকুর-চাকরদের কারো দেখা নেই। ঘুমোতে যেতে সেই রাত একটা বেজে গিয়েছিল কাল।

হঠাৎ একটা চেনা লোকের মুখ দেখেই খুশীতে লাফিয়ে উঠলো। লোকটা মাঠের দিক থেকে আসছিল।

প্রকাশমামা তাকেই ধরলে—এই যে হে, উঠেছ? কী নাম যেন তোমার?

—আজ্ঞে বিন্দাবন?

—বৃন্দাবন! বেশ বেশ! বেশ নাম তোমার! চা খেয়েছ তুমি?

—আজ্ঞে চা আমি খাইনে!

প্রকাশমামা যেন একটু হতাশ হলো কথাটা শুনে। বললে—চা খাও না? তা না-হয় না খেলে, চা তৈরি করতে পারো তো?

—আজ্ঞে, তা পারি!

—তবে তো ভারি গুড। চা এক বাটি তৈরি করো দিকিনি।

লোকটা জানতো শালাবাবুর হাতেই সব ক্ষমতা। মজুরি নেবার সময় এই শালাবাবুকেই ধরতে হবে। তখন চায়ের কথাটা মনে থাকবে! প্রকাশমামা বললে—বেশ কড়া করে বানাবে, বুঝলে? দুধ-ফুদ যদি না পাও তো ক্ষতি নেই, রংটা যেন লংকার মত লাল হয়। এই চায়ের জন্যে মাঠে যেতে পারছি না, সব আটকে গেছে, পেট-টেট সব বোম্ মেরে আছে—

লোকটা অদ্ভুত করিৎকর্মা বটে! কোথা থেকে কাকে ধরে চা, দুধ, চিনি জোগাড় করে নিয়ে এল। তারপর কাঠকয়লায় আগুন ধরিয়ে তার ওপর জল চড়িয়ে দিলে।

প্রকাশমামা বললে—দু'বাটির মত জল দাও, আমি খাবো, পিসেমশাই খাবে। পিসেমশাইকে চেনো তো? ওই যে বরের দাদামশাই, ওঁকেও এক বাটি দেব। কুটুম মানুষ, লজ্জায় চায়ের কথা মুখ ফুটে বলতে পারবেন না। তবে আমার ও-সব লজ্জা-ফজ্জা নেই ভাই, আমি দিল-খোলা মানুষ। খাওয়ার ব্যাপারে লজ্জা-সরম করি নে। পেট হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়, জানো বিন্দাবন। পেটের জন্যেই দুনিয়া চলছে। আরো বড় একটা জিনিস আছে অবিশ্যি, কিন্তু পেট তার চেয়েও বড়। সেটা না হলেও চলে, কিন্তু পেট না হলে চলে না—

বৃন্দাবন জল গরম করছে আর প্রকাশমামা উন্মুনের সামনে তাই দেখছে। হঠাৎ সদরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। আরে সদা না! এত ভোরে কোথায় গিয়েছিল!

আর বসা হলো না প্রকাশমামার। উঠে দাঁড়ালো। সদানন্দ ভেতরের দিকেই ঢুকেছিল। প্রকাশমামাও তার দিকে যেতে লাগলো।

একেবারে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, তুই? তুই আজ এত সকালে উঠে পড়েছিস যে?

সদানন্দর মুখের ভাব দেখে প্রকাশমামার কেমন সন্দেহ হলো।

বললে—তোর চেহারা এ-রকম হলো কেন রে? কী হয়েছে বল্ তো?

সদানন্দ বললে—না কিছু হয়নি—

প্রকাশমামা বললে—কিছু না হলেই ভালো! কাল তুই যা ভাবিয়ে তুলেছিলি সকলকে। আমি তো ভেবেছিলুম তুই একটা কিছু কাণ্ড করে বসবি। নতুন-বউ বাড়িতে এসেছে। এই সময়ে কিছু করলে কেলেংকারির হয়ে যেত মাইরি। তা যাক্, শেষ পর্যন্ত তোকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে তবে আমি [illegible] খুব ভাবনায় পড়েছিল। আমি যখন গিয়ে বললুম যে সদা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল্ দিয়ে দিয়েছে, তখন বুড়ো নিশ্চিন্ত হলো—

তারপর একটু থেমে বললে—তা যাক্ সে-সব বাজে কথা, কাল রাতটা কেমন কাটালি বল্—কে প্রথম কথা বললে? তুই না তোর বউ? —

সদানন্দ কোনও জবাব দিলে না।

প্রকাশমামা তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলো—কী রে? কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে? বল্ না বল্! আমাকে বলতে তোর লজ্জা কীসের? মাইরি বলছি, আমি কাউকে বলবো না। আমাকে বলতে তোর দোষ কীসের? আমি না তোর বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলুম, আর আমার সঙ্গেই তুই বেইমানি করছিস্।

সদানন্দ বললে—বলছি তো কিছু বলবার নেই—

—বলবার নেই মানে? তুই কি সারা রাত নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছিস্ নাকি? অ্যাঁ? ছিঃ ছিঃ, তুই একটা আস্ত হাঁদা-গঙ্গারাম—মেয়েটা কী ভাবলে বল্ দিকিনি? বেচারা কতদিন ধরে এই রাতটার দিকে চেয়ে বসে ছিল, আর তুই কিনা নাক ডাকিয়ে ঘুমোলি?

সদানন্দ বললে—এখন ও-সব কথা ভাল লাগছে না প্রকাশমামা, পরে সব বলবো—

বলে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রকাশমামা ছাড়লে না। বললে—ওরে শয়তান, আজ আমি পর হয়ে গেলুম, না? অথচ আমিই এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে তোর বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলুম, আর আমি কেউ নয়। বেইমান তুই, জাত্ বেইমান—

কিন্তু কথার মধ্যিখানেই বাধা পড়লো। ওদিক থেকে চৌধুরীমশাই আসছিলেন। হঠাৎ সদানন্দকে দেখে এগিয়ে এলেন।

বললেন—খোকা, তুমি একবার ভেতরে আমার সঙ্গে দেখা করো তো—

বলে আর দাঁড়ালেন না। সোজা যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই চলতে লাগলেন।

সদানন্দও তাঁর পেছনে-পেছনে সেই দিকে চলতে লাগলো। (ক্রমশ)

একটি বিশেষভাবে ব্লেণ্ড করা
'টেরিন' স্যুটিং

নতুন
ভিজাত বৈশিষ্ট্যময়
স্যুটিং
-ield
গোয়ালিয়র
সুটিং
নির্মাতাদের অবদান
বছরের সবচেয়ে সেরা! ক্রশফিল্ড মানেই হ'ল
উচ্চশ্রেণীর। চমৎকার ও আভিজাত্যপূর্ণ। ভাঁজনিরোধী
এবং মেজাজ অনুযায়ী। এখন সমস্ত রকম
ডিজাইনে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া অদৃষ্টপূর্ব
রঙ এবং প্যাটার্নে।
GWALIOR FABRICS

॥ ৩৫ ॥

বারুইপুর : হস্তশিল্প কেন্দ্র

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বারুইপুরের মতো নানান আকর্ষণে পূর্ণ স্থান গ্রাম-বাংলায় কমই আছে। এ পল্লীর জন্য মানানসই একটা বিশেষণ খুঁজতে গিয়ে many-splendoured এই ইংরেজী কথাটাই বারবার মনে আসছে। সে রকমারি দীপ্তির বিবরণই প্রথমে একটু দিয়ে নিই।

বারুইপুরের যে অংশের নাম আটিসারা সেখানে শ্রীচৈতন্যদেব একদা স্বয়ং এসেছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে তার নিম্নরূপ উল্লেখ আছে।

"সেই মত প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরীতে॥
সেই আটিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন প্রভু আসি তাহার আলয়।
কি কহিব আর তার ভাগ্য সমুচ্চয়॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হৈলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
সর্ব রাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
(অন্ত্য খণ্ড : দ্বিতীয় অধ্যায়)

সেদিনের অনন্ত পণ্ডিতের ভিটায় এখন শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত। সেখানে উপাসিত অষ্টধাতুর কৃষ্ণরাধিকা ও কাঠের গৌর-নিতাই মূর্তিগুলির মতো সুঠাম বিগ্রহ কমই দেখা যায়। এ পাটবাড়ি ও সে সময়ে অদূরে প্রবাহিত আদিগঙ্গাকে ঘিরে এত ইতিহাস ও কিংবদন্তী ছড়ানো যে তা নিয়ে অনায়াসেই এক পৃথক প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব।

বারুইপুরের পুরানো বাজারের কাছে 'রাজবল্লভ ভবন' নামে যে প্রাচীন অট্টালিকাটি দেখা যায় সেটিও এক উপাদেয় লেখার বিষয়বস্তু হতে পারে। মেদনমল্ল পরগণার এককালীন অধীশ্বর মদন রায়ের বংশধরদের এক অংশ এখন এখানে বাস করেন। মদন রায়ের ইতিহাস (ও কাহিনী), বিগত যুগের গৃহস্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে এ বাড়ির গুরুত্ব, পুরোনো দিনের বিবিধ গৃহদেবতা ও তাদের উৎসব পার্বণ প্রভৃতি নিয়েও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ অনায়াসেই লেখা চলে।

বারুইপুরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কের কথাই বা কম যায় কিসে? সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীর (প্রথম খণ্ড) যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত ভূমিকা থেকে দেখা যায় যে, বঙ্কিম ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মে অবধি বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। এই তিন বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম দুখানি কালজয়ী উপন্যাস- দুর্গেশ-নন্দিনী (মার্চ, ১৮৬৫) ও কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে)। সাহিত্যকীর্তি ছাড়াও তাঁর বারুইপুরের জীবন সম্বন্ধে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে "সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশিত এক পত্রে বলা হয়েছিল—"...সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুক্তবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ বিচার বিষয়েও গভর্নমেন্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। ...বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে

পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য সম্পাদন করেন। কার্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তি স্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করিয়াছেন। স্বকার্য বিষয়িনী কর্তব্যতা পক্ষেও ইঁহার নিকট অনেক বিচারক পরাস্ত হন।...অতএব বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।" ছাব্বিশ থেকে উনত্রিশ বছর অবধি বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে ছিলেন। সে পল্লীর পটভূমিতে এই যুগান্তকারী প্রতিভার উন্মেষকাল সম্পর্কে নিশ্চয়ই উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা সম্ভব।

বারুইপুরে মন্দিরাদি বিশেষ কিছু নেই। তবু বিশালাক্ষীর দালান-মন্দিরে কাঠের তৈরী বৃহৎ দেবীমূর্তি ও দু'পাশের নারায়ণ মূর্তি দু'টি অভি-নিবেশের যোগ্য। মন্দিরের সামনে ক্যানিং যাবার প্রধান রাস্তার ওপাশে, কাছের এক পুকুর থেকে পাওয়া প্রায় চার ফুট উচ্চতার কষ্টিপাথরের যে দরজার বাজুটি মাটিতে পোঁতা আছে তাও কম দর্শনীয় নয়। প্রাচীন কোন মন্দিরের এই অংশটিকে অবলম্বন ক'রে রীতিমতো অনুসন্ধান চালালে উল্লেখযোগ্য পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে পারে।

বারুইপুরের আর এক অংশ বাগানি-পাড়ার "বিবি মা" এক আশ্চর্য লৌকিক দেবী। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আরাধ্য। এ দেবীর থান অন্তত একশ' বছরের প্রাচীন। কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে বনবিবি, কিন্তু ওলাবিবিরূপে উপাসিতা "বিবি মা" মূলত মুসলমানদের উপাস্য হলেও তাঁর বাৎসরিক উৎসবের দিন মাঘী পূর্ণিমায়, যা হিন্দু মতে পবিত্র দিন। সেদিন কাছেপিঠের যাবতীয় হিন্দু পরিবারের প্রধানা গৃহিণীরা যে সূর্যাস্তের পরে পূজা শেষ হওয়া অবধি নিরম্বু উপবাস করে থাকেন তা আশ্চর্য শোনালেও সত্যি। এই "বিবি মা"কে নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে।

বারুইপুর থেকে ক্যানিং-এর রাস্তায় কিছু দূর গেলে পথের ডান ধারে "পিয়ালী টাউন" নামে যে নূতন পত্তন গড়ে উঠেছে, সেখানকার শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানাটিও নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। স্টেনলেস স্টীল থেকে নানাবিধ সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট নির্মাণে এ কারখানার এতই নামডাক যে বিদেশাগত সরকারী অতিথিদের এখানে আনাটা প্রায় প্রথায় পরিণত হয়েছে। সব দিক খুঁটিয়ে লিখলে, এই অভিনব প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়েও সুন্দর রচনা হতে পারে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এ সব বিবিধ বিষয়ের কোনটির উপরেই আর কিছু লিখব

ছাঁচে-তৈরী শোলার পেঁচা

না। অতি সংক্ষেপে যেটুকু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলুম, তার বেশী আলোচনা করবার জায়গাও নেই। তবে আর একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলব, যা many-splendoured বারুইপুরের গৌরবের অন্যতম নিদর্শন। আমি স্থানীয় হস্তশিল্প কেন্দ্রটির কথা বলছি যেখানকার কর্মীরা আমাদের চিরাচরিত গ্রামীণ কুটির শিল্প-গুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য নানাভাবে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতদূর ফলবতী হয়েছে এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

*

কলকাতা শহরের পাঁচ ও ছ' নম্বর বাস দক্ষিণ প্রান্তবর্তী যে টারমিনাসে এসে

ছাঁচে-তৈরী শোলার ঘোড়া

থামে সেই গড়িয়া থেকে ক্যানিংগামী পৃথক বাসে চেপে, বারুইপুর শহরের আরও কিছু দক্ষিণে "পিয়ালী টাউন"-এ এসে নামলেই এ হস্তশিল্প কেন্দ্রটিতে পৌঁছনো যায়। গড়িয়া থেকে সময় লাগে আনুমানিক চল্লিশ মিনিট। বাসের ভাড়া সঠিক মনে নেই, তবে টাকাখানেকের বেশী নিশ্চয়ই নয়।

আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটিকে সংক্ষেপে হস্ত শিল্প কেন্দ্র বলে উল্লেখ করে থাকলেও সরকারী পরিভাষায় কিন্তু এর সঠিক নাম এক্সপেরিমেণ্টাল ওয়ার্কশপ কাম রিসার্চ ইনস্টিটিউট। সর্বভারতীয় হ্যাণ্ডিক্রাফট্স বোর্ডের প্রেরণা ও পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহার ও মহীশূরেও অনুরূপ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এগুলির ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে বহন করেন। উদ্দেশ্য—অবহেলিত ও ক্ষয়িষ্ণু কুটিরশিল্পগুলিকে উন্নততর মডেল, ডিজাইন, নমুনা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এবং উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রির ব্যবস্থা করে তাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা।

বারুইপুরের কেন্দ্রটিকে সাহায্য করবার জন্য ও একই পরিকল্পনার অন্তর্গত "পেপার ডিজাইন সেন্টার" নামে রাজ্য সরকারের আর একটি সংস্থা আছে যাদের কাজ কুটিরশিল্পে ব্যবহারযোগ্য যাবতীয় উন্নততর ডিজাইন, যা কাগজে ছকে দেখানো যায়, তা উদ্ভাবন করা। এ সব নকশা ও ভারত সরকারের কলকাতাস্থিত রিজিওনাল ডিজাইন সেন্টার কর্তৃক প্রস্তুত নানাবিধ মোটিফ বারুইপুরের কেন্দ্রে রূপায়িত হয়। প্রাপ্ত নমুনা নিয়ে কাজ করা ছাড়াও বারুইপুর কেন্দ্র ভারত সরকারের ডিজাইন সেন্টারকে তাঁদের নিজস্ব নকশা প্রভৃতি রূপায়ণেও সাহায্য করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ডিজাইন সেন্টার ঢোকরা কর্মকার-দের শিল্পপদ্ধতির উন্নতির জন্য বহু দিন যাবৎ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার অধীনে তাঁদের কারিগরেরা বারুইপুর কেন্দ্রে থাকবার ও কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন ও রীতিমতো উপকৃত হয়েছেন। কলকাতা ও বারুইপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এ দুটি প্রতিষ্ঠান পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বেশ ফলপ্রসূ এক কর্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন দীর্ঘকাল।

বারুইপুর কেন্দ্রের তিনটি অংশ—নকশা রচনা ও হস্তশিল্প বিভাগ, যন্ত্র-পাতির উন্নতিসাধন বিভাগ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উৎকর্ষবিধান বিভাগ। প্রথম বিভাগের অধীনে যে কুটির শিল্পগুলিকে নিবিড় উন্নতিসাধনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে তারা হল—শোলা, শিঙ, ঝিনুক, বাঁশ, বেত, মাদুর, মসলন্দ, শিশল তন্তুর মাদুর, শাড়ি ছাপানো, বাটিক ও ন্যাকড়ার পুতুল। এ সব শিল্পের কারিগররা কলকাতার এক শ' মাইলের মধ্যেই যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করেন বলে প্রশিক্ষণ-দল পাঠিয়ে তাঁদের উপদেশ-নির্দেশ দেওয়ার যথেষ্ট সুবিধা হয়। শোলার পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামীণ শিল্পীরা কখনই ছাঁচের ব্যবহার করেননি। অথচ যৎসামান্য শিক্ষায় এই নতুন পদ্ধতি আয়ত্ত করে উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণাগুণ প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। শিঙ ও ঝিনুকের সামগ্রী এতদিন স্বতন্ত্রভাবেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই দুই উপাদানের সংমিশ্রণে যে অভিনব ও উন্নতর সৃষ্টি সম্ভব সে কথা সাবেকী রীতির কারিগরদের কখনো মনে পড়েনি। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত ড্রাগনের ছবিটি থেকে সহজেই বোঝা যায় শিঙ ও ঝিনুকের সুসমঞ্জস ব্যবহারে কত সুন্দর শিল্পসৃষ্টি করা যেতে পারে। বাঁশ, বেত

শিং ও ঝিনুকের সমবায়ে নির্মিত অভিনব ড্রাগন

ও শরকাঠির মিশ্র ব্যবহার বা শোলা সহযোগে অভিনব সামগ্রীর উদ্ভাবনও কারিগরদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। পাল্কির ছবিটিতে নকশা রচনার মুনশীয়ানা ও বাঁশের মতো সামান্য উপকরণের মনোহারী প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মেলে। শরকাঠি ও শোলার সমন্বয়ে নির্মিত দেওয়াল-সজ্জার নিদর্শনটিও যথেষ্ট বৈচিত্র্য-পূর্ণ। মাদুর, মসলন্দ প্রভৃতিতে এতদিন চিরাচরিত শরকাঠি বা মাদুর-কাঠিই ব্যবহার হয়ে এসেছে। কিন্তু শিমূল তন্তুও যে এজন্য কাজে লাগানো যায় তা বারুইপুর কেন্দ্রেরই আবিষ্কার। বাটিক ও ছাপা শাড়ির ক্ষেত্রে রুচিসম্মত নকশার আমদানি ও ন্যাকড়ার পুতুলের বেলায় জাপানী পদ্ধতির প্রয়োগ গ্রামীণ শিল্পীরা অনেক স্থানে গ্রহণ করেছেন। তবু কিছু অন্তরায়ও আছে। গ্রাম বাংলার কুটির-শিল্পীরা এখনও বহু সংখ্যায় স্থানীয় দাদনদার মহাজনদের বশীভূত। তাঁরা যে নকশার বায়না দেন তা সরবরাহ করতেই শিল্পীদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয় বলে নতুন ডিজাইন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তাঁদের পক্ষে বিশেষ সম্ভবপর হয় না। তা ছাড়া সাবেক ঐতিহ্য থেকে বিযুক্ত নকশার কত দূর কাটতি হবে সে বিষয়েও তাঁদের মনে যথেষ্ট সংশয় থাকে। শেষোক্ত আশঙ্কা দূর করবার জন্য বারুইপুর কেন্দ্রের কর্মীরা খুবই কার্যকর এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সেলস এম্পোরিয়াম, বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিস অ্যাসোসিয়েশন, হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডি-ক্রাফ্‌টস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন, পশ্চিম-বঙ্গ স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন প্রমুখ বড় বড় ক্রেতাদের দিয়ে নতুন নকশা, ডিজাইন বা মডেলগুলি অনুমোদন করিয়ে বিক্রির ভাল মতো আশ্বাস পেলে তবেই কুটিরশিল্পীদের কাছে সেগুলি প্রচার করেন। বহুক্ষেত্রে গ্রামীণ কারিগররা মনোনীত পণ্য এ সব খরিদ্দারদের কাছে পরে সরাসরি যোগান দিয়ে থাকেন। এইভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে তাতে আরও একটা উপকার হয়। এ সব বৃহৎ ক্রেতারা অনেক সময় সাবেক ধরনের পণ্যও প্রচুর পরিমাণে খরিদ করেন, দেশী বা বিদেশী বাজারে বিক্রির জন্য। অন্য দিকে, নতুন নকশার দু পাঁচটা জিনিস তৈরি করলেও এসব শিল্পী সনাতন ছাঁদের পণ্যও যথেষ্ট উৎপন্ন করেন। সে জন্য এ সব জাতের অর্ডার তাঁরা সরাসরি পান তাঁদের কুলীন ক্রেতাদের কাছে যা দূর মফস্বলে বসে থাকলে তাঁরা কখনও পেতেন কিনা সন্দেহ। এইভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যের ক্ষতি না করে এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তার শ্রীবৃদ্ধি করে বহু কুটির-শিল্পী নতুন নকশা, মডেল প্রভৃতিরও চর্চা করবার অবকাশ পাচ্ছেন।
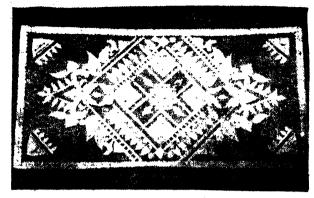
শরকাঠি ও শোলার উপকরণে নির্মিত দেওয়ালসজ্জার সামগ্রী

বারুইপুর কেন্দ্রে যে সব উন্নত যন্ত্র-পাতির উদ্ভাবন করা হয়েছে তার অনেক-গুলি বিদ্যুৎচালিত বলে, বিদ্যুৎবিহীন গ্রামাঞ্চলে এখনও তাদের প্রসার সম্ভবপর হয়নি। সে জন্য, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে, পাদানি-চালিত পালিশ করবার যন্ত্র বা টার্নিং-এর সহজ যন্ত্রপাতির নকশা সরবরাহ করা হয়ে থাকে যাতে গ্রামের কারিগররা নিজেরাই সেগুলি তৈরি করে নিতে পারেন। কাছাকাছি অবস্থিত সরকারী কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য এহেন সাদাসিধা যন্ত্র রাখাও হয়, আবার শিল্পীদের বিকল যন্ত্রগুলি সারিয়েও দেওয়া হয়।

রাসায়নিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে, নিরন্তর গবেষণার ফলে বাঁশের ঘুণধরা রোধ ও বাঁশ ব্লীচ করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে সে জ্ঞান সংশ্লিষ্ট কারিগরদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সামুদ্রিক ঝিনুকে যে গোলাপী আভা থাকে তা দূর করে মুক্তার ঔজ্জ্বল্য আনবার উপায়ও বার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এ জাতীয় ঝিনুক ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপ-গুলি থেকে সংগ্রহ করে জাপান তার বিবিধ কুটিরশিল্পে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়া-গুলি এত গোপন রাখা হয় যে, তা জানবার উপায় নেই। দেশী বেতকে ব্লীচ করে মালাক্কা বেতের মতো রং ও টেক্সচার আনা সম্ভব হয়েছে যাতে দেশী বেত-শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিমূল তন্তুতেও যে হাতির দাঁতের মতো সামান্য হলদেটে রং থাকে তা দূর করে ধবধবে সাদায় পরিণত করা গিয়েছে। ফলে, এ উপকরণটিকে এখন আরও পাঁচ রকম কাজে লাগানো সম্ভব হবে। বাটিকের কাজ-করা ছাতা শৌখিন মহিলাদের প্রিয় হলেও আচ্ছাদনী কাপড়কে জলনিরোধক করা এতদিন এক সমস্যা ছিল। বারুইপুর কেন্দ্র এ প্রশ্নেরও সমাধান করেছেন।

বেশ কিছুদিন আগে, আমি যখন একাধিকবার এ কেন্দ্র পরিদর্শন করি, তখনকার কথাই লিখলাম। সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে আরও নতুন নতুন প্রক্রিয়া
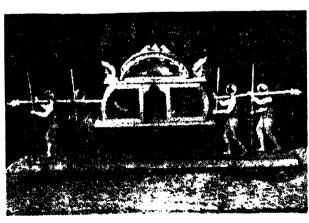
বাঁশের চিলতের পালকি

আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আমাদের অবহেলিত কুটিরশিল্পগুলি তা থেকে লাভবান হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা যদি বর্তমান অবস্থার কথা "দেশ" পত্রিকার সম্পাদকের কাছে তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে গ্রাম বাংলার অগণিত কারিগরের প্রভূত উপকার হতে পারে।

কথক নর্তকী : জাপানী প্রথায় নির্মিত ন্যাকড়ার পুতুল

নিবিড় উন্নয়নের জন্য যে কুটিরশিল্পগুলিকে নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের কথাই এতক্ষণ বললাম। এ ছাড়া মাটির ভাস্কর্য ও খেলনা পুতুল এবং কাঠ-খোদাইয়ের কাজও কিছু কিছু হয় বারুইপুর কেন্দ্রে। বলা বাহুল্য, সেখানেও নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে যাতে উৎপন্ন দ্রব্য আধুনিক রুচিসম্মত হয়, যাতে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সহজেই।

প্রশ্ন উঠবে, খরিদ্দারের মনোরঞ্জনের তাগিদে আমাদের গ্রামীণ শিল্পগুলির "চরিত্র" এভাবে পরিবর্তিত করা কি ঠিক হচ্ছে? আমি যতদূর বুঝি, নিছক নীতি-গতভাবে হয়ত পুরাতন ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকা উচিত। কিন্তু তাতে সাবেকিয়ানা বাঁচলেও অনেক ক্ষেত্রে কারিগরদের মৃত্যু নিশ্চিত---যেমন ঘটেছে আমাদের বহু প্রাচীন কুটিরশিল্পের বেলায়। আমি সে জন্য এ প্রসঙ্গে একটুও শুচিবায়ুগ্রস্ত নই। শিল্পী মারা গেলে, তার শিল্প যে কি করে বেঁচে থাকবে তা বোঝা দুষ্কর। তবুও এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। সে সব বাঘা বাঘা মুনি যে এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশ-এর "আলোচনা" কলমের দিকে ভীমবেগে ধাবিত হবেন এমন আশঙ্কা হয়ত অমূলক নয়।
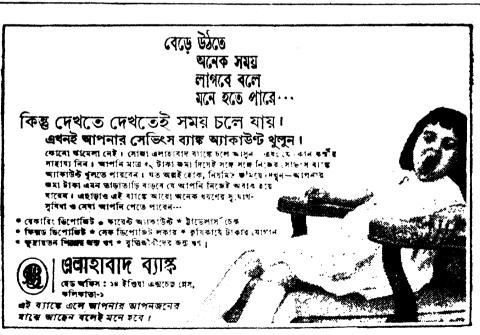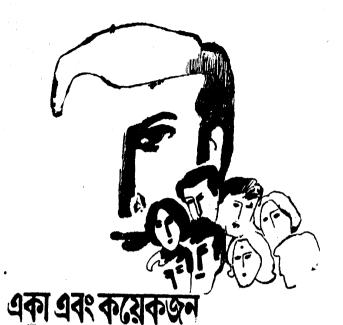
(ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

রাজত্ব চলেছে। ইলেকট্রিক আলো কেউ চোখে দেখেনি। হ্যাজাক বাতি জ্বালানো হয় শুধু উৎসবের সময়। ডিগবয়ে পেট্রোল ও কেরোসিন আবিষ্কারের পর থেকেই মাত্র হ্যারিকেনের যুগ শুরু হয়েছে, তার আগে পর্যন্ত রেড়ির তেলের সেজবাতি।

সারদারঞ্জনের বাড়ি বলতে এতদিন পর্যন্ত ছিল দু'খানি টিনের চালা দেওয়া মাটির দেয়ালের ঘর ও একটি খড়ের চালার রান্নাঘর। সম্প্রতি তিনি একটি একতলা পাকা দালান তুলেছেন। তার সামনের দিকে বৈঠকখানা, পেছনে ছোট ছোট ঘরে ছেলেদের পড়াশুনো ও শোবার জায়গা। কাঠের সিন্দুকটাও দালানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, কিন্তু সারদারঞ্জন দুই স্ত্রীকে নিয়ে এখনও মাটির ঘরেই থাকেন।

ছেলেরা ধাঁ ধাঁ করে বড় হয়ে যাচ্ছে।

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

ফুলবাড়ি নামের জায়গাটিকে শহর না বলে গঞ্জই বলা ভালো। নদীর ধারে হাটখোলা, আশেপাশের কয়েকখানি গাঁয়ের মানুষ আসে সওদা করতে। সপ্তাহে দু'দিন এখানে স্টিমার আসে, সেই জন্যই জায়গাটির যা কিছু গুরুত্ব। কার অ্যান্ড টেগোর কম্পানির আমল থেকেই এখানে স্টিমারঘাটা স্থাপিত হয়েছে। সেই উপলক্ষে গোটা তিনেক পাইস হোটেলও আছে। সকাল নটায় স্টিমার থামে, তার মধ্যেই গরম গরম ডাল-ভাত ও মাছের ঝোল তৈরী হয়ে যায় হোটেলগুলোতে। পূর্ববঙ্গে মাছ সস্তা, তবু তিন পয়সা প্রতি পীস রান্না মাছ খাবার লোক যাত্রীদের মধ্যে বেশী থাকে না। 'শুধু ডাল ভাত খেলেও ছয় পয়সার কম খাওয়া নাই'—এই নোটিশ বাইরে ঝোলানো।

হাটখোলার পেছনে মাটির বাড়িতে তিনঘর বেশ্যার বাস। হাটবারেই তাদের পসার জমে, অন্য অন্যদিন তারা নদীর ধারে চুল মেলে, পা ছড়িয়ে বসে চাটাই বোনে কিংবা ধামা, কুলো বানায়। অনেক হাটুরের সঙ্গেই তাদের দিদি কিংবা মাসীর সম্পর্ক। রেট আট আনা।

এছাড়া ফুলবাড়িতে আছে একটি পোস্ট অফিস, তিনটি পাঠশালা, একটি বোর্ড স্কুল—সেখানে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ানো হয়, একটি হাই স্কুলও সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশের গ্রাম হাসানবাড়ির হাইস্কুলটি সুপ্রাচীন। কেউ কাছারির জন্য এলাকার মানুষকে যেতে হয় ফরিদপুরে জেলা সদরে। ফুলবাড়িতে পাকা রাস্তা একটিও নেই—একটি শুরকির রাস্তা তিন চার মাইল গিয়ে বড়খালে ডুব দিয়ে আবার ওপারে উঠেছে। খালে কোনো সেতু নেই। এ শহরে পাকাবাড়ির সংখ্যা দশ বারোখানার বেশী নয়। ব্রাহ্মণ আছে পাঁচ ঘর, কায়স্থ ও বৈদ্য বেশ কিছু, নমঃশূদ্রের সংখ্যা অনেক। পাশের গ্রামটি মুসলমান প্রধান। ফুলবাড়ির প্রধান মাতব্বর জয়নাল আবেদীন—তাঁর ছিট কাপড় ও বেনেতি মশলার বিরাট ব্যবসা। যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে বাঁশবন, তার মধ্যে ডাউক বা ডাহুক আর কুবো পাখির ডাক শোনা যায় সব সময়। সন্ধের পরই প্রান্তর ভরিয়ে ভেসে ওঠে শেয়ালের ডাক, দিনের বেলা কিন্তু তাদের টিকিটিও দেখতে পাওয়া যায় না। সুন্দরবন থেকে দু'একটা কেঁদো বাঘ কদাচিৎ কখনো ছটকে এদিকে আসে। একবার একটা বুনো হাতিও এসেছিল, কোথা থেকে এসেছিল কে জানে। লোকে বলে আসামের বন্যায় ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছিল হাসানবাড়িতে। সাপ আছে প্রচুর। এবং ভূত, প্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যের তখনও অপ্রতিহত

প্রিয়রঞ্জন ম্যাট্রিক পাশ করেই সরকারি কালেক্টারিতে চাকরি পেয়ে গেল, থাকতে হয় বরিশালে—মাসে একবার করে বাড়িতে আসে। ঝালোকাঠির এক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়েও দেওয়া হলো। পূর্ণিমা বিধবা হয়ে ফিরে এসে বাপের সেবা করে। চিররঞ্জন ম্যাট্রিক পাশ করে পড়তে চলে গেল কলকাতার কলেজে। খবরের কাগজ দেখে নিজেই চিঠিপত্র লিখে চিররঞ্জন কলকাতার একটি বাড়িতে ছেলেমেয়ে পড়াবার বিনিময়ে থাকা-খাওয়া জোগাড় করে নিয়েছে। নিখিলরঞ্জনের মনের গতি টের পাওয়া যায় না, চুপচাপ গম্ভীরভাবে থাকে ও স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে। একবার ম্যাট্রিকে সে ফেল করেছে। ছোট ছেলে বিশ্বরঞ্জনের পড়াশুনোয় বেশ মাথা আছে, কিন্তু এখনও মন নেই। তাকে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসিয়ে রাখার উপায় নেই। গ্রামের ইস্কুলে মারামারি করার পর তাকে হাসনাবাড়ির হাইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। গোঁয়ারের মতন রোজ চার মাইল হেঁটে সে সেই স্কুলে যায়, কোনোদিন একবারও আপত্তি তোলেনি। কিন্তু ইস্কুল থেকে ফেরে অনেক দেরী

করে দে। দাদারা কখনো এরকম সাহস পেত না।

সারদারঞ্জনের বাড়ির পাশেই একটা বড় পুকুর—দীঘি বলা হতো তাকে—তার ওপাশে রায়চৌধুরীদের বাড়ি। ও বাড়িতে দুর্গা পুজো কালী পুজো হতো খুব ধুমধাম করে। মস্ত বড় বাড়ি, উঠোনে বিরাট ধানের গোলা, রায়চৌধুরীদের বন্দুকও ছিল। বাড়ির কর্তারা অবশ্য প্রায় কেউই থাকতেন না—কলকাতায় বাসা করতেন—উৎসবের সময় আসতেন দলবল নিয়ে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির দুখানা ঘরে থাকতো আট দশটি ছেলে — অনাথ, দরিদ্র বা বাড়ি থেকে পালানো ছেলেরা দরখাস্ত করে এখানে জায়গা পেত—তাদের খাওয়া, থাকা ও পড়ার খরচ লাগতো না। ঘর দুটো জুড়ে তক্তাপোশ পাতা তার ওপর ঢালাও বিছানা—সে বিছানা গোটানো হতো না কখনো। সকালে মুড়ি ও গুড়, দুবেলা পেটভরা ভাত, মাসে দুটাকা হাত খরচ এবং দুর্গা পুজোর সময় দুখানা করে ধুতি ও জামা—এই ছিল বরাদ্দ। রায়চৌধুরীদের বাড়িতে ঐসব আশ্রিত ছেলেদের মধ্যে একজন পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী হয়েছিলেন, একজন হয়েছিলেন কলকাতার [illegible] টাকা ভিজিটের ডাক্তার ও একজন চলচ্চিত্র পরিচালক।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর ঐসব ছেলেরা চলে যেত, আসতো নতুন ছেলেরা। কিন্তু পুরোনো ছেলেদের মধ্যে অনেকেই ও বাড়ির মায়া কাটাতে পারতো না—ফিরে ফিরে আসতো বারবার—এবং বাড়ির ছেলের মতোই তাদের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। তারা ঐ ছোট শহরে নিয়ে আসতো বাইরের জগতের হাওয়া—তারা ফুটবল ক্লাব, নাট্য পার্টি গঠন করতো, তারা একটা ছোটখাটো পাবলিক লাইব্রেরীও তৈরী করেছিল। ঐ রকম একজন প্রাক্তন ছাত্র ছিল অমরনাথ ভাদুড়ী। বরিশালে বি এম কলেজে বি এ পড়তে পড়তেও প্রায়ই ছুটিতে সে আসতো [illegible]। এখানকার ছেলেদের মধ্যে তার খুব প্রভাব—সব [illegible] সংগঠনে অমরনাথ থাকে [illegible]—অমরনাথের গানের গলাও ছিল [illegible]। অমরনাথের পারিবারিক পরিচয় কেউ জানতো না। কোনোদিন সে কারুকে নিজের বাবা-মায়ের কথা ঘুণাক্ষরেও বলে নি। সারদারঞ্জনের ছেলেরা রায়চৌধুরী-বাড়ির ঐ ছাত্রাবাসে আড্ডা দিতে যেত নিয়মিত। কয়েক বছর পর পুলিশ এসে ঐ ছাত্রাবাসটি ভেঙে দেয়—কারণ আস্তে আস্তে সেটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত বিপ্লবীদের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

অমরনাথ এসে পূর্ণিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবার পর সারদারঞ্জন যখন তাকে [illegible] উঠেছিলেন, তখন সারদারঞ্জনের ছোট ছেলে বিশ্বরঞ্জন মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে বাপের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেয়। বিশ্বরঞ্জনের বয়স তখন সবে চোদ্দ, কিন্তু সবল চেহারা। লাঠিখানা কেড়ে নিয়েই হাঁটুর জোর দিয়ে মট করে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবার মুখোমুখি চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ায়। তার সেই চোখে অদ্ভুত ধরনের ঘৃণা আর ক্রোধ। সেইদিনই সবাই বুঝেছিল, এই ছেলে বিপজ্জনক। এই গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলেকে ঘাঁটানো সহজ হবে না।

পড়াশুনোয় মন ছিল না বিশ্বরঞ্জনের—কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে ফার্স্ট ডিভিশানে পাশ করলো। এবং তারপরই ঘোষণা করলো, সে আর পড়াশুনো করবে না। বই পড়তে তার ভালো লাগে না।

ছেলের সাফল্যে সারদারঞ্জন যেমন গর্বিত হয়েছিলেন তেমন নিরাশ হলেন এই ঘোষণায়। কত সাধ ছিল, এই ছেলেকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। এখন তাঁর সেই সামর্থ্যও হয়েছে। ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, পড়াশুনো করবি না, তা হলে তুই কি করতে চাস!

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বরঞ্জন উত্তর দিল, কিছু না।

—কিছু না মানে? একথার মানে কি?

বিশ্বরঞ্জন নীরবে সোজা চোখ তুলে বাবার দিকে তাকালো। চোখের পলক পড়ে না। অর্থাৎ সব কথার মানে সে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে প্রস্তুত নয়। নিজের বাবাকেও নয়।

ক্রমশ আবিষ্কৃত হলো, বিশ্বরঞ্জন একজন শিল্পী। বাড়ির পেছনের আমবাগানে বহুকালের পরিত্যক্ত একটা গোয়ালঘর ছিল। সেখানে বিশ্বরঞ্জন মাটি দিয়ে নানা রকম মূর্তি তৈরী করে। সরস্বতী, মহাদেব, লাঙলকাঁধে কৃষক, সম্রাট শাহজাহান, গাছের নীচে গৌতম বুদ্ধ। একটি মূর্তি খুব বিরাট, বজ্রাঙ্গী চেহারার সিন্ধবোদ নাবিকের কাঁধের ওপর বৃদ্ধরূপী দৈত্য। সেই গোয়ালঘরে সাপখোপের বাসা—কিন্তু বিশ্বরঞ্জন ওসব কিছু গ্রাহ্য করে না। তার সেই শিল্পকলার চর্চার স্থানটি বিশ্বরঞ্জন বহুদিন গোপন রেখেছিল, আস্তে আস্তে সেটি পাড়া প্রতিবেশীর গোচরে আসে।

শিল্পী বললে যে-রকম মানুষের কথা মনে হয়, বিশ্বরঞ্জনের মোটেই সেরকম ছিল না। তার গুণ্ডার মতন চেহারা, লোকের সঙ্গে মারধোর করে, শাসায়—আবার কখনো কখনো সে আমবাগানের গোয়ালঘরে একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মাটি দিয়ে মূর্তি বানায়। তখন নাওয়া-খাওয়ার কথাও মনে থাকে না তার। অথচ তার চরিত্রে একটা নিষ্ঠুরতা ছিল সব সময়েই। তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না, প্রায় কৈশোর থেকেই তাকে কেউ কাঁদতে দেখেনি—হাল্কা রসিকতা বা আমোদপ্রমোদে তার কখনো রুচি দেখা যায়নি। পাশের গ্রামের শেয়াল-মারা পার্টিতে বিশ্বরঞ্জন অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। শেয়ালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাসানবাড়ির লোকেরা একদিন দল বেঁধে শেয়াল মারতে বেরোয়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বল্লম হাতে বিশ্বরঞ্জন। দিনেরবেলা শেয়ালগুলো লুকিয়ে থাকে মাটির তলায়—ওপারে অনেকগুলো গর্ত। একটা দিয়ে খোঁচ খাঁচ করলে আর একটা দিয়ে পালায়। খুঁজে খুঁজে সব কটা গর্তের মুখ বন্ধ করে, শেষ গর্তটায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, ধোঁয়ায় আর আগুনের আঁচে শেষ পর্যন্ত শেয়াল বেরুবেই। দূরে দূরে লোকজন লাঠি হাতে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—বেরুলেই লাঠিপেটা করে মারা। কিন্তু অসমসাহসী বিশ্বরঞ্জন একটা শেয়ালকে বল্লম দিয়ে গেঁথে সেই গগনভেদী চিৎকাররত প্রাণীটিকে পুনর্বার আগুনে নিক্ষেপ করলো। দগ্ধ শরীরে শেয়ালটা যতবার ছুটে আসছে বিশ্বরঞ্জন সেটাকে আবার আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেই শিয়াল বিশ্বরঞ্জনের ঊরু কামড়ে ধরেছিল—ইফতিকার নামে একটি ছেলে কোনোক্রমে ছাড়িয়ে না দিলে বিশ্বরঞ্জনের প্রাণ বাঁচানো শক্ত হতো। এই বিশ্বরঞ্জনই আবার তন্ময় হয়ে বসে বসে নিজে গড়া মূর্তির চোখের পাতা আঁকে।

একদিন সারদারঞ্জন এসে হাজির হলেন সেই আমবাগানের স্টুডিওতে। বহুক্ষণ ধরে বিশ্বরঞ্জনকে খেতে ডাকা হচ্ছিল তার কোনো সাড়া নেই, সারদারঞ্জন নিজেই চলে গেলেন সেই গোয়াল ঘরে। সেই সব মূর্তিটূর্তি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি?

বিশ্বরঞ্জন কোনো উত্তর দিল না। দুহাতেই কাদা মাখা, কি যেন একটা অতিকায় প্রাণী তৈরী করছিল সে।

সারদারঞ্জন আবার জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি হচ্ছে কি? শেষ পর্যন্ত কি তুই কুমোর হবি নাকি? না পটো হবি? এইসব লক্ষ্মী, সরস্বতী—এসব বানিয়েছিস কেন? বিক্রী করবি?

—না।

—তাহলে? জানিস না, এসব ঠাকুর দেবতার মূর্তি বানালে পুজো করতে হয়? এমনি এমনি কেউ রাখে? পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এইসব? ছি ছি ছি!

—আমি মেজদাকে চিঠি লিখেছি। আমি কলকাতায় গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হবো

—আর্ট ইস্কুল? সে আবার কি? কোনো ভদ্রবংশের ছেলে সেখানে যায়? আর্টের আবার ইস্কুল! ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে তুই কি আবার ইস্কুলে ভর্তি হবি?

—আপনি সব খবর রাখেন না......

পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিশ্বরঞ্জন বাবাকে আপনি সম্বোধন করে কথা বলতো বটে, কিন্তু কথাবার্তায় বিনয় বা শ্রদ্ধা দেখানোর ভাব তার ধাতে ছিল না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই সারদারঞ্জন হঠাৎ রাগে দপ করে জ্বলে উঠলেন। বাক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য হুংকার দিয়ে বললেন, এসব চলবে না! এসব চলবে না বলে দিলাম!

বিশ্বরঞ্জন একটুও ভয় পায় না। ক্রোধে অন্ধ হয়ে সারদারঞ্জন হাতের লাঠি দিয়ে শিবের মূর্তির ওপর জোরে আঘাত করলেন। মূর্তিটার অনেকখানি ভেঙে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো ভেতরের অন্ধকার।

এতটা বাড়াবাড়ি করে সারদারঞ্জন বোধহয় একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বরঞ্জনের প্রতিক্রিয়া হলো অন্যরকম। নিজেই সে লাথি মেরে মেরে অন্য মূর্তিগুলো ভাঙতে লাগলো। সরস্বতী, শিব মূর্তি তার সবল পদাঘাতে ছিটকে পড়তে লাগলো চতুর্দিকে।

সারদারঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ ছেলেকে তিনি চেনেন না। বাবা মায়ের মনে সবচেয়ে বেশী আঘাত লাগে যখন কোনো সন্তানের আচরণ তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। যে সন্তানকে চোখের সামনে এইটুকু থেকে বড় হতে দেখলেন, সেই-ই যখন একদিন স্নেহ মমতার ঘেরা বেড়ার সীমানা ভেঙে দিয়ে বাইরে দাঁড়ায়—তখন এই পৃথিবী রসশূন্য হয়ে যায়।

পূর্ণিমার বিয়ের পর ফুলবাড়িতে আর একটি আলোড়ন ঘটালেন গঙ্গাধর দত্ত। লোকের মুখে মুখে এঁর নাম হয়ে গিয়েছিল, পর-পরলৌকিক খাস খার দত্ত! এই নামের উৎস এই, গঙ্গাধর তাঁর বাবা মারা যাবার পর শ্রাদ্ধ করেননি, মাথাও নাড়া করেননি। স্থানীয় হিন্দু সমাজকে চমকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, মরা মানুষের আত্মা তো আর পিণ্ডি খাবে কি? মরা গরু কি ঘাস খায়? এর উত্তরে দত্ত বংশের কুলপুরোহিত মন্তব্য করেছিলেন, বৎস গঙ্গাধর, তোমার ব্যবহারটা কিয়ৎ পরিমাণে গো-বৎসের মতন, কিন্তু তোমার বাপও যে গরু ছিলেন, তা তো আমরা জানতাম না!

গঙ্গাধর বেশ কিছুকাল দেশ ছাড়া ছিলেন। তাঁর বিধবা দিদি ও বুড়ো-বুড়ি বাবা-মা থাকতেন শহরের একটেরে বাড়িতে। বুড়ি আগেই মরলেন—সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রেখে সতী লক্ষ্মীর মতন। কিন্তু বুড়ো মরার কিছুদিন আগে ফিরে এলেন গঙ্গাধর। মুখে এক মুখ দাড়ি ও অনর্গল হিন্দী ও ইংরিজি বুলি! লম্বা চওড়া চেহারা, ব্যবহারে একটা বেপরোয়া ভাব। মফঃস্বল শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনে এইসব মানুষ এক একটা ঝড়ের মতন। গঙ্গাধর তার বাবার শ্রাদ্ধ করতে অস্বীকার করায় সকলের মনে হলো, এরকম কাণ্ড ইতিহাসে কোনোদিন ঘটেনি। শুধু পারলৌকিক কাজ করতে অস্বীকারই নয়, মরা গরু কি ঘাস খায় কিংবা বামুনকে দিয়ে টাকা সিকি আর [illegible] ফাঁক, ফাঁক — এই ধরনের অশ্রদ্ধেয় উক্তি। যদিও এর বহু আগেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁর ডাক নাম ছিল মহর্ষি, তিনিও যে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন, সে খবর এখানে কেউ রাখে না।

গঙ্গাধর দত্তকে শাস্তি দেবার জন্য স্থানীয় হিন্দু সমাজ রে রে করে উঠলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, শাস্ত্র বহির্ভূত নিছক লোকাচার নির্ভর হিন্দু সমাজের নিয়মকানুন খুব কড়া হলেও ভেতরে ফক্কা, শাস্তি দেবার বিশেষ কোনো অস্ত্র তাদের হাতে নেই। বিশেষত গঙ্গাধরের মতন শক্ত সবল গোঁয়ার মানুষকে। যত জারিজুরি মেয়েদের ওপর। সামাজিক অনুশাসন অসহায় বিধবাদের একাদশীর দিন জলও খেতে না দিয়ে মাটি চাটিয়েছে, কিন্তু পুরুষের রাস আগলাতে পারে নি। গঙ্গাধর দত্ত চণ্ডীমণ্ডপের বৃদ্ধমণ্ডলীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। গঙ্গাধরের ধোপা নাপিত বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো। গঙ্গাধরের মুখ ভর্তি দাড়ি আর মাথায় লম্বা লম্বা চুল—তার নাপিতের দরকার নেই। বাড়িতে বিধবা বোনটা রয়েছে, জামা কাপড় সে-ই কেচে দেয়। গঙ্গাধর হা-হা করে হেসে বললো, আউর কেয়া হায়, বোলো! আউর ক্যা? সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তার নেমন্তন্ন বন্ধ—তাতেও কিছু যায় আসে না, কারণ ইতিমধ্যেই আশেপাশের কারখানা গাঁয়ের ছেলেছোকরারা গঙ্গাধরের অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল।

তখন চারদিকে রটে গেল যে, গঙ্গাধর দত্তের বাবার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ রাত্তিরে

এসে শ্মশানতলার পাশে বাঁশবাগানের মধ্যে কাঁদে। অনেকেই সেই কান্না শুনেছে। এক রাত্তিরে দলবল নিয়ে গঙ্গাধর নিজে গেলেন শ্মশানতলায়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সত্যিই শুনতে পেলেন সেই কান্না। একটা প্রচণ্ড কাঁপা কাঁপা অতিপ্রাকৃত আওয়াজ সাইরেনের মত উঁচুতে উঠে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। কোনো মানুষ বা জীবজন্তুর গলা থেকে এরকম শব্দ বেরুতে পারে না। এরপর একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। অত সাহসী ও প্রচণ্ড নাস্তিক গঙ্গাধর দত্তের ভূতের ভয় ছিল খুব। রাত্তির বেলা তাঁর ভূতের ভয়ের কাছে কোনো যুক্তিতর্ক টিঁকতো না। ভয় পেয়ে পাশের সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরে গঙ্গাধর কাতরভাবে বলতে লাগলেন, ট্রু অর ফলস্? ট্রু অর ফলস? ভোলা, শিগগির বল্, আমি একাই শুনতে পাচ্ছি, না তোরাও শুনেছিস?

সে রাত্তিরে ভয় পেয়ে তারা সদলবলে পালিয়ে আসে। তারপর গঙ্গাধর তিন চার দিন জ্বরে ভুগলেন। কিন্তু হার মানলেন না। সেরে উঠে আবার একদিন গেলেন শ্মশানে। সেদিনও শোনা গেল, সেই দুর্বোধ্য আর্তনাদ। গঙ্গাধর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আপনি কিছু বলবেন? শব্দটা একবার হয়েই থেমে যায়। তারপরই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ও বাঁশবনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ওদের সঙ্গে একটা টর্চ পর্যন্ত নেই—দুটি হ্যারিকেন। সেদিন ঐ দলে আর একজন যুবক ছিল। একটি হ্যারিকেন নিয়ে সে একা এগিয়ে গেল বাঁশ বনের দিকে। বলাই বাহুল্য, সেই যুবকটি বিশ্বরঞ্জন।

কিন্তু তারপরই আর একটা কাণ্ড হল। হঠাৎ হাওয়ায় নিভে গেল গঙ্গাধরদের সঙ্গের হ্যারিকেনটা। তখন অলৌকিক বিশ্বাসের হাওয়া বইছে চারদিকে। হ্যারিকেন নিভে যাওয়া তো ভয়ের ব্যাপারই। সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, রঞ্জু, রঞ্জু ফিরে আয়! শিগ্গির!

বাঁশবনের সেই শব্দ কিছুদিন পর আপনা আপনি থেমে যায়। কিন্তু রহস্যের মীমাংসা হলো না। গঙ্গাধরের বাবার প্রেতাত্মার কান্নার গল্প স্থায়ী হয়ে গেল ফুলবাড়িতে।

একদিন জয়নাল আবেদীন সারদারঞ্জনকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, পণ্ডিতমশাই, আপনার ছেলেকে সামলান।

ছোট ছেলের সম্পর্কে নিত্য নতুন অভিযোগ শোনা গা-সহা হয়ে গিয়েছিল সারদারঞ্জনের। কিন্তু জয়নাল আবেদীনের মতন গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ছেলে কি করতে পারে?

বিবর্ণ মুখে সারদারঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, কেন, সে কি করেছে? আপনার কোনো ক্ষতি করেছে সে হারামজাদা?

জয়নাল আবেদীন অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ওরা দল বেঁধে গুণ্ডামি করতে আসে আমার দোকানের সামনে। কিন্তু সেটুকু সামাল দেবার ক্ষমতা আমার আছে। সে সব আমি পরোয়া করি না। তবে, আপনি মানী লোক, আপনাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য। আপনার ছেলে অস্থানে কুস্থানে যায়! ছেলের এবার তাড়াতাড়ি বিয়ে শাদী দিন।

—কোথায় যায়? কোথায় যায় বললে?

—স্টিমারঘাটায় কসবীদের ঘরের সামনে রোজ সন্ধেবেলা সে ঘোরাঘুরি করে। আমার লোক দেখেছে।

সারদারঞ্জনের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। তাঁর ভাগ্যে এমন ছিল, এরকম কথাও শুনতে হলো তাঁকে? তাঁর ছেলে বেশ্যাপল্লীতে যায়!

তক্ষুনি ছেলের খোঁজে ছুটলেন সারদারঞ্জন। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাকে? সে তো বেশীর ভাগ সময় বাড়িতেই থাকে না। আমবাগানের গোয়ালঘরেও আজকাল যায় না। পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়িতেও নেই। শেষ পর্যন্ত সন্ধেবেলা সারদারঞ্জন নিজেই গেলেন স্টিমারঘাটায়।

সেদিন হাটবার, বেশ ভিড়। সবে একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। নদীর ওপর পাতলা আস্তরণের মতন জমে আছে কুয়াশা। টাটকা সতেজ তরিতরকারি এসেছে দোকানে। চাষীদের হাতে আউস ধান বিক্রির কাঁচা টাকা। বেশ্যাদের ঘরগুলোর সামনে আটদশজন মানুষ হাতে হাত ধরাধরি করে শিকল বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে গঙ্গাধর এবং বিশ্বরঞ্জন। তারা কোনো খদ্দেরকে ঢুকতে দেবে না। আর ঘরের ভেতর থেকে মেয়েগুলো ওদের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করছে পৃথিবীর কুৎসিততম গালাগাল। গঙ্গাধরের দলবল একটু আগে জয়নাল আবেদীনের দোকানের সামনে বিলিতি বস্ত্র বর্জনের আবেদন জানিয়ে পিকেটিং করে এসেছে।

ভিড় ঠেলে সারদারঞ্জন সামনে এসে দাঁড়ালেন। অপমানে তাঁর মাথা কাটা যাচ্ছে। চিৎকার করে বললেন, রঞ্জু, এক্ষুনি চলে আয়।

বিশ্বরঞ্জন শুনেও শুনতে পেল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। গঙ্গাধর এগিয়ে এসে হাত জোড় করে বললেন, মুখুজ্জো কাকা, আপনি বাধা দেবেন না। আমরা এদের ভালোর জনাই...

সারদারঞ্জন ফুঁকড়ে উঠে বললেন, ছুঁয়ো না, তুমি এত কাছে এসো না—নিজে কুলাঙ্গার, এখন আমার ছেলেকেও—

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সারদারঞ্জন বড় দুই ছেলেকে বাড়িতে আনালেন। তিনি তাদের বললেন, ফুলবাড়িতে থেকে বিশ্বরঞ্জন যদি এ সব কীর্তি করে বেড়ায়, তা হলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

দাদারা অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিশ্বরঞ্জনকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে কলেজে ভর্তি করে দিল। বাবার ইচ্ছে মতন তাকে ডাক্তারী পড়াবার পরিকল্পনাই বহাল রইলো।

ঢাকায় যাবার পর বাড়ির সংগে সম্পর্ক প্রায় ঘুচেই গেল বিশ্বরঞ্জনের। মেজদা চিত্তরঞ্জনের বিয়ের সময় একবার মাত্র বাড়িতে এসেছিল, তারপর আর এক বছরের মধ্যে ছুটিছাটাতেও তার দেখা পাওয়া যায় না। কদাচিৎ মাসে দু'এক লাইন চিঠি লেখে।

এক বছর পরেও বিশ্বরঞ্জন বাড়ি ফিরলো না, কিন্তু তার খোঁজে এলো পুলিস।

ফুলবাড়ির মানুষ জলজ্যান্ত সাহেব বেশী চোখে দেখে নি। কদাচিৎ স্টিমারের রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ানো সাহেব মেমদের দেখা গেছে দূরে থেকে। কাচিৎ কখনো জেলার কালেক্টর সাহেব কয়েক ঘণ্টার জন্য থেকেছেন ফুলবাড়িতে। তাঁকেও সকলের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় না। কর্মোপলক্ষে যে সব গ্রাম্য মানুষ কখনো বরিশাল বা ঢাকায় যায়, তারাই বাড়ি ফিরে এসে চাক্ষুষ সাহেব দেখার গল্প বলে। সাহেবরা তখনও রূপকথার মানুষ। একেবারে গায়ের রং দেবতাদের মতন। এই টুপীওয়ালারা অসাধ্যসাধন করতে পারে, ভয়ডর বলে কোনো বস্তু এদের শরীরে নেই। সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এসে এরা এত বড় দেশটাকে হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে।

ফুলবাড়ির রাস্তা দিয়ে প্রথম একজন সাহেব, স্থানীয় দারোগা আর তিনজন সিপাইকে সংগে নিয়ে প্রকাশ্যে হেঁটে এসে সারদারঞ্জনের বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। সারদারঞ্জনের নাকের সামনে ব্যাটন তুলে বললো, তোমার টক টকুর নাম? টিম রঞ্জন, ব্লাডি বং বং বোঝো! হোয়ার ইজ হি হাইডিং?

সারদারঞ্জন এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না। দারোগা তর্জনগর্জন করে অনুবাদ করে দিল। তোমার ছেলে বিশ্বরঞ্জন কোথায় লুকিয়ে আছে, বলো! মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। ব্রিটিশ শাসনের লম্বা হাত তাকে ঠিক খুঁজে বার করবে!

অত ছোঁয়াছানির বাতিক সারদারঞ্জনের, কিন্তু সেই ম্লেচ্ছ সাহেব ও যবন সেপাইরা জুতো পরেই ঢুকে গেল ঘরে ঘরে। সমস্ত জিনিসপত্র উল্টে পাল্টে তছনছ করে দেখলো।

বড় শহরের খবর এখানে তিন চার দিনের আগে পৌঁছোয় না। তবু পুলিস এক ধারণা করতেই পারেনি যে, সারদারঞ্জন কিছুই জানেন না। দু দিন আগে সারদারঞ্জনের ছেলে বিশ্বরঞ্জন ঢাকার পুরোনো পল্টনে সাহেব পুলিস কমিশনারকে গুলি করে মেরে ফেলে পালিয়েছে। হিউবার্ট সাহেব তখন যুব সমাজের ত্রাস। বিশ্বরঞ্জন তিনটি গুলিতে তার মস্তক ভেদ করে দেয়। সারা দেশে তাই নিয়ে হইচই, শুধু জানে না আসামীর বাবা মা।

বিশ্বরঞ্জন আর ধরা পড়েনি। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এর পর পঁচিশ বছরের মধ্যেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। লোকের ধারণা সে সাধু হয়ে হিমালয়ে আছে কিংবা জাভা-সুমাত্রার দিকে পালিয়ে গেছে।

প্রথম পুলিস আসার দিন দশেক বাদে আবার পুলিস এসে সারদারঞ্জনকে ঢাকা শহরে নিয়ে যায়। মর্গে তিনটে পচা গলা শব দেখিয়ে তাঁর ছেলেকে সনাক্ত করতে বলে। কয়েকদিন আগে নদীর ওপর পলাতক অবস্থায় এই তিনজনকে পুলিস গুলি করে মারে। সারদারঞ্জন দু দিকে মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন, এর মধ্যে তাঁর ছেলে নেই।

বাড়ি ফিরে আসার কয়েক ঘণ্টা বাদেই সারদারঞ্জনের পক্ষাঘাত হয়। সেই অবস্থায় বেঁচে ছিলেন দেড় মাস। বাকশক্তিও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাঁ করে মাঝে মাঝে কিছু বলতে চাইতেন, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন শুধু, চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তো। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে হঠাৎ যেন অপ্রাকৃত শক্তিতে তিনি বিছানার ওপর উঠে বসলেন, গলা দিয়ে অদ্ভুত কাতর শব্দ বার করতে লাগলেন। উপস্থিত আত্মীয়

স্বজনের ধারণা, বিশ্বরঞ্জনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতেই তিনি মারা গেছেন।

পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে বিশ্বরঞ্জনের নিরুদ্দেশ থাকাটা সম্ভবত গুজব। নানা সাহেব কিংবা সুভাষ বসু সম্পর্কে যে রকম গুজব প্রচলিত আছে। ওরকম সাধারণত হয় না। এমনও হতে পারে, স্বর্গের মৃতদেহগুলির মধ্যে সারদারঞ্জন তাঁর ছেলেকে চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করেন নি সে কথা। নইলে তার পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন? বিশ্বরঞ্জনের পক্ষে কোথাও অপঘাতে এবং অজ্ঞাতনামা হিসেবে মৃত্যুবরণ করাই সম্ভব। কিন্তু বিশ্বরঞ্জনের আত্মা মরে নি।

এই পরিবারে প্রথম বিশ্বরঞ্জন মারা যায় অতি অল্প বয়েসে—তাকে বাঁচানোর কত চেষ্টা হয়েছিল। লোক-বিশ্বাস অনুসারে সে-ই আবার ফিরে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বরঞ্জনের মধ্যে। সেই বিশ্বরঞ্জনও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পূর্ণ যৌবনের আগে। বহু বছর বাদে বিশ্বরঞ্জনের আত্মা আর একবার ফিরে এসেছিল এই পরিবারে—সম্পূর্ণ অন্য চেহারায়, অন্য চরিত্রে।

(ক্রমশ)

করবার সময় তিনি সেখানকার কিছু কিছু স্টাইল অবলম্বন করেছিলেন। সে সব গানে তিনি যে সব টেকনিক নিয়েছেন তা সীমিত ভাবেই প্রয়োগ করেছেন, যে সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন তাও বুঝে শুনেই করেছেন, তাঁর গানকে যাতে পুরোপুরি হিন্দী ঢঙে গাইতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্যে করেননি নিশ্চয়। অতএব এ ক্ষেত্রেও অতুলপ্রসাদের একটি গানকে একেবারে ঠুংরীতে রূপান্তরিত করবার প্রয়াসটি খুব মহৎ প্রয়াসরূপে গণ্য হবে না। কোনও কোনও গায়ক আছেন যাঁরা সুযোগ পেলেই মনের মত একটা কিছু তৈরি করে দিতে বিশেষ তৎপর—সেটা যে কি দাঁড়াবে তা তাঁদের চিন্তায় আসে না, কারণ কোনও সুরকারের সঙ্গীতচিন্তা যে কি, সে বিষয়ে তাঁদের অন্ততঃ কোনও চিন্তার বালাই নেই। এঁদের আদর্শ গ্রহণ করলে কোনও সুরকারের সুরকেই বজায় রাখা যাবে না। সেটা কজন সঙ্গীতরসিকের অভিপ্রেত জানিনা, কিন্তু আমাদের নয়।

গত কয়েকটি অনুষ্ঠানে কেউ কেউ নাকি অতুলপ্রসাদের গান নিজের সুরে গেয়েছেন। দু একজন পত্রলেখক এরকম দু একটি গানের উল্লেখও করেছেন এবং বলেছেন যে উক্ত গানগুলি শোনবামাত্র তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এ সুর অতুলপ্রসাদের হতে পারে না। আবার একজন জানিয়েছেন যে অতুলপ্রসাদের সামান্য কয়েকটি গানেরই নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি পাওয়া যায়। এই কটি গানের বার বার আবৃত্তি ঘটানোর চেয়ে আরও কয়েকটি গানে সুর দিয়ে গাইলে আপত্তি কি—যখন গানের উপরে নির্ধারিত সুরের উল্লেখ আছে। এই ধরনের প্রচেষ্টাকে সাধু প্রচেষ্টা বলতে আমার একান্ত আপত্তি আছে সঙ্গীতে উদারপন্থী হওয়া সত্ত্বেও। প্রথম কথা, এতে কবির প্রতি একান্ত অবিচার করা হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ—ইতিহাসকে বিকৃত করবার কোনও অধিকার কারুর থাকতে পারে না, তৃতীয়তঃ — এই ধরনের প্রচেষ্টা যাঁরা করেন তাঁদের প্রতিভা এমন স্তরের নয় যে তাঁদের সুরের কোনও মূল্য প্রদান করা যায়। এটা অবশ্যই দুঃখের বিষয় যে অতুলপ্রসাদের মাত্র কয়েকটি গানের মূল সুর আমরা পাই, কিন্তু আরও অনেক দুঃখের বিষয় হবে যদি তার মধ্যে যথেচ্ছ-ভাবে ভেজাল দেওয়া যায়।

তবে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুর নিয়ে একটা সমস্যা দেখা যায়। এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা কবির কাছ থেকে কয়েকটি গান শিখেছিলেন যেগুলির স্বরলিপি বেরোয়নি, এমন কি গ্রামোফোনেও রেকর্ড করা হয়নি। সে সব ক্ষেত্রে গানগুলিকে প্রামাণিকভাবে স্থাপন করা এক সমস্যা। আমাদের তরুণ বয়সে অতুলপ্রসাদের অনেক গান প্রচারিত ছিল মুখে মুখে। এইরকম কয়েকটি গান আমরাও শিখেছিলুম। সেগুলি কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হলেও আসলে যে কবির নিজস্ব সুরই ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ সেটা কবির জীবিতকালে বা তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরের কাল। এখন সেগুলিকে প্রমাণ সহকারে তুলে ধরাও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও কয়েকটি গান আছে যেগুলির গ্রামোফোন রেকর্ড আছে অথচ স্বরলিপি নেই। সেগুলি কবির জীবদ্দশায় করা হয়েছে। সেগুলি উদ্ধার করা হলেও একটা সমস্যা দেখা দেবে কবি সত্যিই তাদের ভাল করে শুনে অনুমোদন করে-ছিলেন কিনা। যাই হোক, শুনছি অতুল-প্রসাদের গানের এযাবৎ যত রেকর্ড করা হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে। এরকম তালিকা যদি আত্মপ্রকাশ করে তাহলে বিষয়টি ভাল করে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে।

সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

এবারে পদ্মশ্রী উপাধি পেয়েছেন বিষ্ণুপুরের বর্ষীয়ান সঙ্গীতাচার্য শ্রীসুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি আশীর কোঠার অপর প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। বিষ্ণুপুর ধারার তিনি একজন প্রধান ধারক। অপর পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহু প্রামাণিক স্বরলিপির জন্যও তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন। সঙ্গীতের প্রচারই তাঁর জীবনের ব্রত এবং আজ এই অপটু দেহেও তিনি যথার্থ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গীয় সংগীতজগতের একজন গৌরবময় পুরুষের এই রাষ্ট্রীয় সম্মানে আমরা আনন্দিত এবং তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

শার্ঙ্গদেব

জলাতঙ্ক

পাশের ফ্ল্যাট থেকে ছোট্ট ছুটে ছুটে এসে চাইলো একটুখানি দুধ। কুকুর ছানাটা কিছুই খাচ্ছে না। যদি দুধ একটু খাওয়ানো যায়। নামগোত্রহীন সারমেয়-শাবকটি দিন কতক পাড়ার সব বাচ্চার মন কেড়ে নিয়েছে। তাকে নিয়ে সারাদিন খেলা করা, আদর করা, খাওয়ানো নিয়ে তারা মত্ত।

দুধটুকু নিয়ে কুকুরছানাকে খাওয়াবার কি দারুণ চেষ্টা চললো বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। সে দুধ তো মুখে নেয়ই না বরং করুণ এক আর্তনাদে কাকুতি জানায় 'খেতে যে পারছি না।' বাচ্চার দলের স্কুলে যাবার সময় এল। একা পড়ে কুকুর-ছানা ককিয়েই যাচ্ছে। কানে শুনলেও কষ্ট হয়। ভাবলাম কুকুরের ডাক্তারকে একবার দেখাই। নিয়ে গেলাম সযত্নে। পশুচিকিৎসক দেখে বললেন, 'সর্বনাশ, এ তো জলাতঙ্ক।' তাকে ওই হাসপাতালে রেখে এলাম। পরদিন সে মারা গেল। তার মস্তিষ্কে ভীষণ জলাতঙ্কের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পাড়ার সমস্ত বাচ্চাকে দিনের পর দিন ইনজেকশন নিতে হলো। তবু সৌভাগ্য বলতে হবে যে জলাতঙ্কের বীজ ধরা পড়েছিল। এমনও হতে পারতো যে সারমেয় শাবকের মৃত্যুর কারণ জানা গেল না। জলাতঙ্ক সাংঘাতিক রোগ। অজানা আতঙ্ক আজও মানুষ জলাতঙ্ককে এক ভয়ানক অভিশাপের পর্যায়ে ফেলে।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ প্রায় ২৩০০তেও জলাতঙ্কের খবর মানুষ জানতো। অ্যারিস্টটল জলাতঙ্ক রোগের বিপদ বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন অস্ত্রোপচার করে ক্ষতস্থান থেকে জলাতঙ্কের বিষ নির্মূল করার বিধি দিতেন। কিন্তু লুই পাস্তুরের নামের সঙ্গে জলাতঙ্কের প্রতিবিধান বিশেষ ভাবে জড়িত। তিনিই প্রথম পাগলকুকুর কামড়ালে তার জলাতঙ্ক হবার সম্ভাবনা দূরীকরণের টিকা আবিষ্কার করেন। জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে প্রতিষেধক টিকারও তিনি সূচনা করে গিয়েছিলেন।

এত সত্ত্বেও জলাতঙ্ক রোগের অপরিসীম কষ্টদায়ক মৃত্যুর সংখ্যা এখনও যথেষ্ট। ভারতবর্ষের বিশাল জনসংখ্যার সঠিক সংবাদ গ্রহণ শক্ত। তবু সরকারী হিসাবে প্রায় ৩,০০০ মানুষ বছরে হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগে মারা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বছরে চার থেকে পাঁচ হাজার জন্তু জলাতঙ্ক রোগে মারা যায়। প্রায় ৩০,০০০ হাজার মানুষ প্রতিষেধক ইনজেকশন নেয়। বৃটেন-এর মত আয়তনে ছোট দেশে জলাতঙ্ক সম্বন্ধে সতর্কতার ফলে রোগটি প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু আয়তনে বড় হলে শত চেষ্টাতেও সাবধান হওয়া সব

সময় সম্ভব নয়। আমাদের দেশে তো কথাই নেই।

সম্প্রতি দুটি একটি জলাতঙ্ক মৃত্যু বিশিষ্ট মানুষের হওয়াতে সকলের নজর পড়েছে। সামান্য মাত্র অবহেলাতেও এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। শিশুদের বেলায় মা বা অন্য অভিভাবক কেবলমাত্র নিজে সতর্কতা অবলম্বন করে জলাতঙ্কের হাত থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না। ছোট ছেলে-মেয়েদের রোগটি সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া দরকার। অন্য বাড়ির পোষা কুকুর, রাস্তার অজানা জন্তু চট করে যেন তারা মাখামাখি না করে। রাস্তার কুকুর যাকে সাধারণত পারিয়া কুকুর বলা হয়, তারাই নাকি জলাতঙ্কের শ্রেষ্ঠ বাহক। শেয়ালের জলাতঙ্কও যথেষ্ট ব্যাপক। কাজেই যেখানে শেয়াল বেশী, বিশেষত পল্লী অঞ্চলে শেয়ালের জলাতঙ্ক থেকে মানুষের এ রোগ যথেষ্ট হয়। কিছুদিন আগে বিহারের বাবনুবাবা নামক স্থানে একদিনে ১০০ জন মানুষকে পাগল শেয়াল কামড়েছিল।

জলাতঙ্কের আর একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে অতি ধীরে রোগ প্রকাশ হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল একটিবার। আমাদের নিকট এক আত্মীয় কলকাতার বাইরে থাকতেন। কলকাতা এসেছিলেন বিশেষ কাজে। হঠাৎ একদিন সকালে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে আঁতকে উঠলেন। চা তো খেতে পারছেন না। মুহূর্তে তাঁর মন চলে গেল নিজের বাড়ির অসুস্থ পোষা কুকুরটির কাছে। সে যে মারা গেছে সে সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু তার যে জলাতঙ্ক হয়েছে কে বা জানতো। অসুস্থ কুকুরকে তিনি সেবা করেছিলেন। নিজ হাতে তার মুখে খাবার দিয়েছিলেন। এখনও জলাতঙ্ক হলে তার নিরাময়ের আশা প্রায় ছাড়তে হয়। আমাদের সেই আত্মীয়টির করুণ মৃত্যু চোখের উপর দেখলাম। এমনকি প্রতিষেধক টিকাও বাধ্য হয়েই নিতে হয়। এ টিকার বিষময় ফল অনেক ক্ষেত্রে অতি দুঃখের হয়ে দাঁড়ায়। খরগোস বা মেষের মস্তিষ্কে এ vaccine তৈরি করা হয়। injection-এর ফলে মানুষের মস্তিষ্কে

হানি হতে দেখা গেছে। অল্পমেয়াদী পক্ষাঘাতের লক্ষণ, এমনকি পাকাপাকির পক্ষাঘাতের লক্ষণও কখনও দেখা যায়। ২০,০০০ vaccine-এর মধ্যে হয়তো একটি হয় কিন্তু সেই একটি কে হবে কে জানে। বিদেশে এজন্য নাকি হাঁসের ডিমের সাহায্যে জলাতঙ্ক vaccine তৈরি করা হয়েছে। তবে পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে, হাঁসের ডিমের vaccine মেষ বা খরগোসের মস্তিষ্কের vaccine-এর চেয়ে অনেক কম কার্যকরী। বোম্বাই-এর হ্যাফকিন ইনস্টিটিউট আর দক্ষিণ ভারতে কনুরে পাস্তুর ইনস্টিটিউট এ বিষয় অনেক গবেষণা করছেন।

জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া দুয়েরই মানে এক। রোগের বীজাণু বা virus স্নায়ুমণ্ডলীকে বাহক করে। মস্তিষ্কে প্রবেশ করে স্নায়ুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলিকে ঘায়েল করে। মস্তিষ্কের কোষ নষ্ট হয়ে স্ফীতি ও প্রদাহ আরম্ভ হয়। গলনালীর pharynx-এ মাংসপেশীর প্রচণ্ড আক্ষেপ হওয়ায় জল পর্যন্ত গিলতে পারে না রোগী। এজন্য তার জলাতঙ্ক হয়। ক্রমশ রোগী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় ও অতি কষ্টদায়ক মৃত্যু-বরণ করতে হয়।

কাজেই যাঁরা কুকুর পোষেন, তাঁরা কুকুর সম্বন্ধে যত্নবান হবেন। কুকুর যেমন মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, এই রোগটি তেমনই ভয়ানক। কুকুরকে নিয়মিত টিকা দিলে রোগের আশংকা খুব কম থাকে। রাস্তার মালিকহীন কুকুর ধরে নেবার ব্যবস্থা বড় বড় শহরে আছে। সন্দেহস্থলে রাস্তার কুকুরের পাল যাতে বৃদ্ধি না পায় তাও প্রতি নাগরিকের দেখা দরকার।

টুকিটাকি

চৌকো বা সমায়ত অর্থাৎ rectengular টেবিলের চেয়ে গোল টেবিলে বেশী লোক বসে খেতে পারে। অবশ্য বড় গোল টেবিল ঘরের জায়গা বেশী নেয়।

আলমারি কিনবার সময় দেখবেন যেন বেশ গভীর হয়। ৫৬ সেন্টিমিটার গভীর আলমারিতে হ্যাঙ্গার কাপড় রাখতে সুবিধে হবে। হ্যাঙ্গারে শাড়ি, ব্লাউজ রেখে দেখবেন অতি চমৎকার পাট থাকে এবং রাখতে এবং বার করতে খুবে সহজ হয়।

দেরাজ বা টেবিলের টানা যেন সহজে খোলা ও বন্ধ করা যায়। ভিতর যেন মজবুতে কাঠ লাগানো হয়। দেরাজ টানার ভিতর খুব মসৃণ হবে যাতে বার বার খুলে ও বন্ধ করতে কোন কষ্ট না হয়।

যে আসবাব মাটিতে রাখা হবে তার পা যেন অসমান না হয়। দেওয়ালের গায়ে রাখা আলমারি ইত্যাদির পিছন দিক ততো ভাল কাঠ না হলে যদি বা চলে যায়, যে আসবাব-এর চারদিকে দেখা যায় তার চার দিকই সমান হওয়া দরকার।

টেবিল কিনবার সময় ভাল আলোতে দেখবেন। আলোতে ধরা পড়বে টেবিলে উঁচু নীচু বা দাগ আছে কিনা। কোনগুলি সব আসবাবে ভাল করে দেখা দরকার বিশেষ করে টেবিলে।

আয়না কিনতে সতর্ক হবেন। আয়নার কাঁচ যেন ঝকঝকে হয় ও তাতে প্রতিবিম্ব বিকৃত না হয়। প্রসাধন পর্বের সবটাই ভাল আয়নার উপর নির্ভর করে।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অথচ সবচেয়ে সাধারণ দোষ হয় আসবাবের হাতলের বেলায়। দেখবেন হিসেব করে কী আলমারি বা দেরাজে হাতল ভাল করে। যদি হাতল লাগাতেই হয় তবে হাতল ঠিক ভাবে যেন লাগে।

শ্রীমতী

গ্রীটিং দ্য ড্রম —চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়
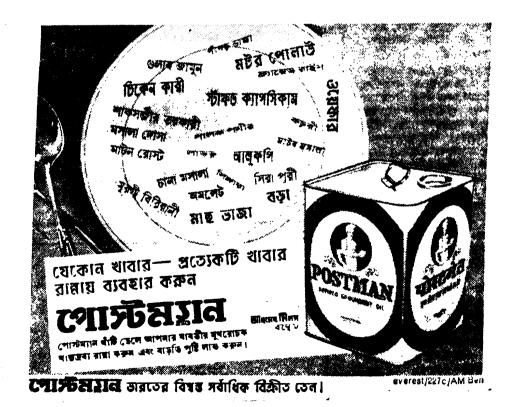
কলকাতা শহরের বিভিন্ন শিল্পী-গোষ্ঠীর উদ্যোগে এখানে প্রায়ই নানা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং অনেকেই সেই প্রদর্শনীগুলি দেখার সুযোগ পান। শহরের আশপাশেও এ-জাতীয় দু'একটি শিল্পীগোষ্ঠী তথা শিক্ষাকেন্দ্র আছে যাদের শিল্পপ্রচেষ্টার বিষয় জানা যায় বাৎসরিক বা ষান্মাসিক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। উত্তরপাড়ার চৈতন্য কলাবিজ্ঞান কেন্দ্র এই জাতীয় একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। প্রবীণ ও খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পরিচালনায় গত কয়েক বছর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন শিল্পী কলা-সাধনায় নিযুক্ত আছেন। ইতিপূর্বে কয়েকবার এই প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হয়েছে। বলতে বাধা নেই, সবগুলিই ঠিক সুনির্বাচিত হয়নি। তবে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, নির্বাচন ও রস পরিবেশন, উভয় দিক থেকেই এটি উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীতে চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের ১৮টি ছবি ছাড়া ১০ জন শিক্ষার্থী শিল্পীর ৪৪টি অংকন নিদর্শন দেখা যায়। তেলরঙে আঁকা ছবি থাকলেও এখানে জলরঙ, টেম্পারা ও কালিকলমের ড্রইংয়ের সংখ্যাই অধিক। ভারতীয় রীতির প্রাধান্য থাকলেও দু'একজন আধুনিক ধারায় পরীক্ষামূলক কাজও করেছেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের যোগ্য শিষ্য হিসাবে চৈতন্যদেব এককালে সুনাম অর্জন করেন। প্রদর্শনীভুক্ত তাঁর ছবিগুলি প্রায় ৩০ বছর পূর্বে রচিত। নিভুল ড্রয়িং, কমপোজিশন ও রঙ নির্বাচন তথা ব্যবহার রীতির জন্য এগুলি উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে গ্রীটিং দি ড্রম, ওয়রশিপিং দি পিপাল ট্রি—সকলেরই চোখে পড়ে। গঙ্গারঘাটের বিভিন্ন ছবি এঁকে তিনি এককালে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বহু পূর্বে আঁকা স্নানশেষে মাইনার সূর্য প্রণাম এখনও অনেকের মনে আছে। প্রদর্শনীতে আফটার দ্য বাথও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে এই চিত্রমালার কয়েকটি ছোট ছবিও। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথমেই মুকুন্দ ভাদুড়ী ও সুপ্রিয় রাহার শিল্প নিদর্শনগুলি চোখে পড়ে। প্রথমজনের কালিকলমের কাজগুলি বলিষ্ঠ। সূক্ষ্ম অথচ বলিষ্ঠ রেখা ও প্রয়োজনমত কাগজের ছোট ছোট শূন্য স্থান কালী ও ছোট প্রতীক ভরে ফেলে তিনি সুন্দর গ্রাফিকজাতীয় কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন এবং মূলত কালি ও রেখাজালের মধ্য দিয়েই আকার প্রকাশ করেছেন, যেমন হর্স। ড্রয়িং হিসাবে এটি উল্লেখ্য। তেল ও জলরঙে আঁকা দ্বিতীয়জনের কাজ মিশ্র শ্রেণীর। পৃষ্ঠভূমির গভীর রঙের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমিত লাল রঙ ও রেখা সাহায্যে তিনি পরিচিত সমকালীন দৃশ্য উপস্থাপিত করেছেন (অন হিউম্যান ট্রাজেডি)। এই প্রসঙ্গে কালো, সবুজ, নীল ও লাল রঙে রচিত কমপোজিশনও উল্লেখ্য। বিমূর্ত রচনাটির বহুরূপে ব্যবহার রীতি চোখে পড়ে। শচীন্দ্রকুমার ব্যানার্জির রচনাগুলি সমবিমূর্ত শ্রেণীর, তবে দু'-এক স্থলে জটিল মনে হয়। দু' একটিতে আলঙ্কারিক ও রীতিমুখর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, বিশেষ করে দি সীড অ্যান্ড ইট্‌স্ কালমিনেসন-এ। বাণীনাথ ঘোষের ছবি দেখে বোঝা যায় যে, ড্রয়িংয়ে তিনি সুপটু—বিশেষ করে কয়েকটিতে পরিচিত আকারেরই তিনি নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, যেমন প্রজাপতি। নিছক সরলতার দিক থেকে এই শিল্পীর ইউথ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিলীপ মুখার্জির নিদর্শনগুলি ছোট, সমবিমূর্ত শ্রেণীর ও পরীক্ষামূলক। দ্য ওয়ান অন অ্যান্ড ও—মন্দ লাগে নি। প্রতিকৃতি অঙ্কন নিদর্শন হিসাবে নিতাই ব্যানার্জির পোরট্রেট ও শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের পোরট্রেট-২ ও ৩-এর নাম করা চলে।

*

পোলিশ গণতন্ত্র সরকারের কলকাতাস্থ কনস্যুলেটের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে পোল্যান্ডের একটি চিত্রকলা

হংস
—মুকুন্দলাল ভাদুড়ী

প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ৩৮ জন পোলিশ শিল্পীর শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে পোল্যাণ্ডের যে দু'একটি শিল্পীগোষ্ঠী প্রাচীন ও প্রচলিত শিল্পধারার স্থলে নতুন ও সমকালীন অঙ্কনরীতির প্রবর্তন করে তাদের মধ্যে ফরমিস্ট গোষ্ঠী অন্যতম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পরীক্ষা কেন্দ্রিক আরও কয়েকটি শিল্পীসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যাদের মধ্যে ব্লক, প্রেসেনস এবং আর্তেস ও ক্র্যাকো প্রধান। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে জোসেফ প্যাঙ্কউইচের নেতৃত্বে আর একটি শিল্পসম্প্রদায় গড়ে ওঠে—যার নাম কাপিস্টি। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন শিল্পীর পরবর্তী রচনায় বিমূর্ত তথা আধুনিক অঙ্কনরীতির পরিচয় মেলে। প্রদর্শনীতে সমকালীন কয়েকটি নিদর্শন থাকলেও বিগত শতাব্দীর অঙ্কনবৈশিষ্ট্য-বিশেষ করে নিসর্গ দৃশ্য দেখা যায়। রিয়ালিস্টিক, নিও-রিয়ালিস্টিক রচনা নিদর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক কোলাজ, বিশেষ করে সূচিশিল্প জাতীয় অতি সূক্ষ্ম রচনার নমুনাও চোখে পড়ে। প্যাঙ্কউইচের দ্য গ্রীন গেট ও পোরট্রেট অব মাদার প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচলিত শিল্পধারা থেকে প্যাঙ্কউইচ কিভাবে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন, দ্য গ্রীন গেটের প্রতীকমূলক গোলাকার গাছেই তা জানা যায়। দ্বিতীয়টি সরলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চিরপরিচিত একটি দৃশ্যকে কিভাবে চিরস্মরণীয় করে রাখা যায় তার পরিচয় মেলে উইসপিয়ানস্কির মেটার্নিটিতে। ঊনবিংশ শতকে সূক্ষ্মতম বস্তুর প্রতিও শিল্পী কিরূপে লক্ষ দিতেন তার প্রমাণ মেলে জারমেনটোস্কির চমৎকার পার্বত্যদৃশ্য—পিনিন মাউনটেনস-এ। এই প্রসঙ্গে জুলিয়ান ফালাতের ল্যাণ্ডস্কেপ উইথ এলক্স-এর বিরাট নীল আকাশ ও কুণ্ডলীভূত মেঘদলও দ্রষ্টব্য। জোনাজ স্টার্ন-এর ফিশেস হুইচ ওয়ানটেড টু সুইম, কোলাজের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিরাট জাল ও বঁড়শি ছিঁড়ে মাছ আবার জলে লাফিয়ে পড়ছে—নানা প্রক্রিয়ার কোলাজ মাধ্যমে শিল্পী এটিকে রূপায়িত করেছেন। স্টিল লাইফ-এর মধ্যে অন্যান্য রজনানস্কার ভাসেস উইথ ফ্লাওয়ার্স ও কেলউইনস্কির সিনারেরিয়াজ উল্লেখ্য। অন্যান্য ছবির মধ্যে মাকোস্কির খেলনাজাতীয় এ বয়, চেলমোনস্কির ডিপারচার ফর হান্টিং, লাবিশ-এর সিন ইন দ্য বাথ, এটবিশ-এর গার্ল উইথ দ্য ব্লু বুক ও বিশেষ করে মেরিয়া জারেমার পোনট্রেশন উল্লেখযোগ্য।

✻

পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ তাঁদের বার্ষিক উৎসবে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকীর পরিসমাপ্তি উৎসব এবং অতুলপ্রসাদের শতবার্ষিকী পালনের আয়োজন করেন।

নন্দলাল বসুর পুত্র শিল্পী শ্রীবিশ্বরূপ বসু, প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপ্রশান্ত রায়, সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যাপক সুপরিচিত ভাস্কর শ্রীসুনীল পাল প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশে খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীধীরেন দেববর্মণ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের আর্ট গ্যালারীটি আচার্য অবনীন্দ্রনাথ স্মরণে "অবনীন্দ্রনাথ আর্ট গ্যালারী" হিসাবে উৎসর্গ করেন।

রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যাপীঠে প্রতিষ্ঠিত অবনীন্দ্রনাথের ভারত মাতার ভাস্কর্য প্রতিলিপি
ভাস্কর—সুনীল পাল

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অসিত হালদার, মুকুল দে, যামিনী রায় প্রমুখ শিল্পীদের রচনাসম্ভারে এই সংগ্রহশালার মূল্যবান সম্পদ। সম্প্রতি ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয় এবং আরো অনেক বিখ্যাত শিল্পী তাঁদের ছবি স্বেচ্ছায় এই প্রতিষ্ঠানকে উপহার দিয়েছেন। সমসাময়িক শিল্পীদের শিল্প নিদর্শন সংগ্রহের পরিকল্পনাও এই বিদ্যালয়ের আছে। তাঁরা এই জন্য শিল্পীদের কাছে একটি দুটি কাজ উপহার দেবার জন্য আবেদন করেন। এই ব্যাপারে তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিল্পশিক্ষক রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

এই উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল প্রশান্ত রায় কর্তৃক সুনীল পালের তৈরী অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা চিত্রের মূর্তির উদ্বোধন।

অতুলপ্রসাদের শতবার্ষিকী পালনও এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যথোচিত নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে। এই উৎসবটির প্রাণকেন্দ্র ছিলেন সর্বজনপ্রিয়, প্রবীণ অভিনেতা শ্রীপাহাড়ী সান্যাল। অতুলপ্রসাদের গানের মালা দিয়েই ছাত্রগণ অতুলপ্রসাদকে বরণ করেন।

এই দুটি শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষ একটি সুচিন্তিত স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশিত করেন।

ভ্রম সংশোধন

বরোদা কারুশিল্প প্রদর্শনী আলোচনায় (দেশ, ২৯ মাঘ) প্রকাশিত 'শাখাপ্রশাখা' ও 'ডালপালা' স্থলে পড়তে হবে 'গাছের শিকড়'। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

চিত্রাগ্রহ

॥ সাতচল্লিশ ॥

বেশ কিছুক্ষণ গুম্ থাকার পর গুমোট কাটে ওর। 'তুমি অবাক করে দিয়েছ আমায়। বড়ো হবার বাসনা নেই তোমার? বিদ্যাসাগর হতে চাও না তুমি!'

'চাইলেই হওয়া যায় বুঝি? বিদ্যাসাগর হওয়া কি এতই সোজা ভাই।' আমি গুমরাই।

'চাইতে দোষটা কী? সবাই বড়ো হতে চায়। উচ্চাশা পোষণ করে। তুমি কেমন সৃষ্টিছাড়া যেন! বাবা বলেন, সাত হাত লাফাতে চাইলে তবে লোকে পাঁচ হাত লাফাতে পারে—সেটাও কিছু কম নয়। সকলেই ধনে মানে জ্ঞানে গুণে বড়ো হতে চায়, তুমি যেন কী?'

'আমি কিছুই না।' আমার সায় তার কথায় : 'কিছুই হতে চাইনে আমি। আমি শুধু আমিই হতে চাই—আমিত্বের এই অহমিকা ছাড়া কিছুই আর নেই আমার বুঝেছিস। কিছু না হওয়ার মজাটাও কিছু কম নয় রে!'

'বুঝেছি। কিন্তু ওই আমিত্ব ফলিয়ে চলা তোমার চলবে না—তোমাকে মানুষ হতে হবে—মানুষের মত মানুষ। বড়ো হতে হবে, উঁচুতে উঠতে হবে—আরো—আরো—আরো... ...'

'রক্ষে কর। আমার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—মনের কোনো কোণেও না। উঁচু নজর নেই আমার, নীচু নজরও নেই অবশ্য তেমনটা, আমার ইচ্ছেটা কী জানিস? সবার সঙ্গে সমান—সবার মতন সাধারণ হতে চাই—যাকে বলে সমদৃষ্টি—সমতার প্রীতি মমতা.....'

'তুমি বড়ো হতে চাও না! আশ্চর্য্য!' ঘুরে ফিরে তার মুখে সেই এক কথা। আমার নিরাকাঙ্ক্ষা নিয়েই তার মাথাব্যথা যত না!

'বড়ো হওয়ার মত বড় দুঃখ আর নেই। বড় হওয়ায় ভারী কষ্ট—তা জানিস? বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবনী তুই পড়েছিস? চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, বাড়িতে আছে আমাদের। তোদের পাড়ার লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে পড়িস না! পড়লে জানবি তখন। অনেক দুঃখে তিনি বড় হয়েছিলেন, বড় হয়ে অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন। অত দুঃখ কষ্ট সইবার সামর্থ্য আমার নেই ভাই। আমি অমন কষ্টসহিষ্ণু না।'

'অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে বড় হয়েছিলেন তাতে কী, বড় হতে হলে অমনি করেই হতে হয়। তাতেই জীবন সার্থক।'

'কে বলেছে? ছোট হয়েই বড়ো সুখ। ছোটখাটোতেই যতো সুখ আর মজা আর আনন্দ। অনেক কিছু ছেড়ে ছেড়ে অনেকখানি ছেড়ে দিয়ে তবেই গিয়ে বড় হয় মানুষ। আমি জীবনের কোনো কিছুই ছাড়তে চাইনে, ছাড়তে পারব না, সব কিছুই পেতে চাই, সব কিছুই হতে চাই আমি। সর্বত্যাগী বিদ্যাসাগর হয়ে কোনো সুখ নেই রে! অনেক আত্মত্যাগ করেই বিদ্যাসাগর আর অনেক আত্মসাৎ করেই আমরা—সর্বসাধারণ! তাঁর দিয়ে যাওয়া আর আমাদের হয়ে যাওয়া।' মুহূর্তে মুহূর্তে আদান প্রদানে মুহূর্মুহুঃ এই হওয়া আমাদের।'

'তোমায় বলেছে! তার মানে তুমি মোটেই পরিশ্রম করতে চাও না—শ্রমবিমুখ—সেই কথাই বলো? অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করলেই বিদ্যাসাগর হওয়া যায়। বিস্তর পড়াশুনা করতে লাগে। বিদ্যার্জন করতে করতেই তো বিদ্যাসাগর হয়।'

'আর, ওইটিই আমার দ্বারা হবার নয়। বিদ্যার্জনে আমার উৎসাহ নেই। আমার বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ—'

'অথচ ভয়ের কিছু নেই তো পড়াশুনোয়। রোজ রোজ অল্প অল্প বিদ্যালাভে—তার ফলেই মহাবিদ্বান হওয়া যায়। বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠা যায় একদিন। বিন্দুর সঙ্গে আরেক বিন্দু জল—এই মিলেই—বিন্দু বিন্দু জলযোগেই সাগর হয় তা জানো?'

'বিন্দু বিন্দু জলযোগে ডিসপেপসিয়াও হতে পারে তেমনি আবার। স্বাস্থ্য সমাচারে আমি পড়েছি। যখন তখন টুকটাক

খেয়ে খেয়েই অম্বল দাঁড়ায় একদিন।'

'যেটা কিনা তোমার ব্যারাম। সব সময় মুখ নড়ছে। চলছে টুকটাক......'

'পেলে তো খাই, খেলেই তো পাই। টুকটুকে দেখলেই টুকটাক খাই......কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?'

'হচ্ছে কী? বলেছি না যে কেউ দেখলে পরে তক্ষুনি ধরে জেলের বার করে দেবে? ঢুকাতে দেবে না এখানে আর?'

'না দেয় বয়েই গেল আমার! এখানে আসার জন্যে প্রাণ যেন কাঁদছে এমন!'

'না আসতে চাও নাই এলে! কে আসতে বলছে তোমায়? কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে পড়াশুনোয় মন দেবে বাবা! আমিও তাই বলব। ইস্কুলে ফিরে যাবে আবার। তুমিও যাবে তো, কেমন? পড়াশুনো না করলে মানুষ হবে কি করে? মানুষের মত মানুষ? বিদ্যাসাগর না হতে পারো উপসাগর তো হতে পারবে। মাথা থাকলেই হওয়া যায়।'

'মাথা থাকলেই হওয়া যায় না মশাই, হৃদয় থাকা চাই। মাথা তো কত লোকেরই দেখা যায় কিন্তু হৃদয় কজনার হয়? বিদ্যাসাগরের মতন অমন হৃদয়? আছে আর কারো? সেই তাঁর ছিল আর আছে এ চিত্তরঞ্জনের।'

'অতশত জানিনে বাপু, বিদ্যালাভ হচ্ছে অর্থলাভের জন্যে এই বুঝি। বিদ্যে না হলে টাকাকড়ি হবে না তাই জানি। আর টাকাকড়ি না হলে কোনো সুখই নেই জীবনে।'

'বিদ্যার মানেই জানিসনে তুই। বিদ্যে তোর ওই পুঁথিগত নয়—অত সোজা নয় ওর মানে।'

'বিদ্যালাভ যে সহজ নয় সবাই জানে।' তিনি বলে: 'কিন্তু সহজ না হলেও বই-টই-পত্তর পড়েই তা আয়ত্ত করতে হয়, বুঝলে?'

'বিদ্যা মানে বিদ্যমানতা। সেটা পুঁথিগত নয় মোটেই, অস্তিত্বগত। সোজা কথায় —হওয়ার মধ্যে। বিদ্যা বিদ্যে তো সবাই করে কিন্তু তার মানে জানে কটা লোক? জানে শুধু আমার মা—মার কাছ থেকেই জানা আমার।'

'মোটেই সহজ মানে না। তা জানি।'

'সহজই তো! বিদ্যার মর্ম বোঝা মোটেই সহজ নয়, বিদ্যাটাই সহজ। বিদ্য সর্বদাই হচ্ছে আমাদের দেহে মনে জীবনে হচ্ছেই। হয়ে চলেছি অনর্গল। যেমনটা নিশ্বাস প্রশ্বাস, যেমন কিনা রক্ত সঞ্চলন তার মতই হচ্ছে সহজে। সেটা টের পাবার বুদ্ধি যখন তোর হবে...তোর কিম্বা আমার কিম্বা অপর কারো—তখনই তার বিদ্যাবুদ্ধি হয়েছে, বুঝলি?'

'ছাই বুঝলাম!'

'তুই নিজে হচ্ছিস তা বুঝতে পারিস না? কিসে হচ্ছিস, কিসে তোর নিজের অস্তিত্ব টের পাচ্ছিস সেটা টের হয় না তোর? বলিস কিরে! সেই অস্তিত্বের হওয়াটাই তো বিদ্যমানতা—সেইটেই বিদ্যা। মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা হলে তো জানা যায়, যায় না? সেটা মনের বিদ্যমানতা। মনের সেই ইচ্ছাটাকে কর্মের দ্বারা জীবনে বিদ্যমান করা, মানে কিনা, রিয়ালাইজ করার কৌশলই হচ্ছে বিদ্যা—কৌশলই বল আর বুদ্ধিই বল। বিদ্যা আর বুদ্ধি প্রায় এক জিনিস—হরিহরাত্মা। একটা হলেই আরেকটা হয়।'

'ওই হচ্ছে বিদ্যার মানে?'

'হ্যাঁ, এই বিদ্যার দ্বারাই, সেই যে বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে বলেছে না—সেই অমৃত লাভ করা যায়। আমার বাবা কথাটা প্রায়ই আওড়ান কিন্তু মানে জানেন না মোটেই—জানে আমার মা। এবার তো বুঝলি?'

'বিদ্যায় অমৃত লাভ করা যায়? অমৃতটা কী? সেই যে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধে লেখা থাকে দেখেছি—যেন হং নামৃতাস্যাম্ তেন হং কিম কুর্য্যাম? সেই অমৃত?'

'সেই সময়েতেই। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেব?'

'দাও।' সে ঘাড় নাড়ে।

'ধর এখন আমার মনে যে ইচ্ছাটা বিদ্যমান, যে ইচ্ছেটা হচ্ছে না? সেটা যদি আমার কাছে দিয়ে এই জীবনে ফলাও করি তাহলে যা হয় কিনা তাই হোলো বি-বি-[illegible]'

বিদ্যা বিতরণে বাড়ে। বিতাড়িত বিস্মৃতি লাভের পরে আমার মুখ ফেটে—'এই যে, আমরা মুহূর্তের জন্য বিদ্যমান হলুম না? পরস্পরের অস্তিত্ববোধ করলুম তো? সেই বিদ্যাটাই হোলো গে অমৃত। আর তাই হোলো গে আমাদের হওয়া।'

'তুমি মোটেই কোনো শিষ্ট আচরণ শেখোনি। হচ্ছে একটা সিরিয়াস কথা তার মধ্যে এই ছ্যাবলামি? এটা কি শিষ্টতা?'

'সেই জন্যেই তো বিশিষ্ট হতে চাইনে রে। বিশিষ্ট হতে গেলে শিষ্ট হতে হয় গোড়াতেই। বড় হওয়ার ভারী অসুবিধে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা চলে যায়। আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকে না। যা খুশি হওয়া যায় না, যা ইচ্ছে করা যায় না। যা ইচ্ছে তাই হওয়ার করার অধিকার চলে যায়।'

'তুমি যাচ্ছেতাই হয়ে যেতে চাও?'

'পদে পদে বাধা পেয়ে বাঁচতে চাই না। প্রতি পদে বাধা হয়ে থেকে কী লাভ? সমানে [illegible] অমানিশা নিয়ে? আমি চব্বিশটি ঘণ্টা [illegible] পূর্ণ হয়ে বাঁচতে চাই—যখন কিনা সামনে আমার [illegible]। [illegible] তুই না তোর [illegible] সেই [illegible] সম্বন্ধে। এখন আমার মুখে যা আসে বলব, বলব।'

'নাঃ, তোমাকে মানুষ করতে পারলাম না।' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার—'আমি চাইছিলাম তুমি মানুষ হও, মানুষের মত মানুষ হও একটা।'

'আমাকে মানুষ করতে চাইছিলিস নাকি? আমার মা হবার [illegible] আর তুই পারবি?' আমি হাসলাম—'তবে হ্যাঁ কখনো যদি [illegible] [illegible] তখন কী হয় বলা যায় না। তখন আমার হাল [illegible]।'

'যাঃ ওঃ!'

'তবে এ মানেতে [illegible]—এ কথা আমি বলবই। তাহলেও এমনই হতে চাই আমি, যেমনটার কিনা কবির ভাষায় [illegible] হবার হবে নির্ঘাৎ। তা হলেও আমার সে [illegible]...সেই [illegible] কবির ভাষায়... তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো আমার জয়। তবে আবার ইংরিজি বাংলা দুটো বানানেই হয়। এক কথায়, joy [illegible]।'

'কথা [illegible] থাক। [illegible] পাড় [illegible] থেকে [illegible] এই [illegible]। পাকা পাকা কথা কইতে [illegible] হবে।' সে বলে, 'তোমার মত কোনো ছেলের

আলুকাবলি খেতে খেতে যেতে পারি......

মুখে এ সব কথা—এ ধরনের কথা কখনো শুনিনি।'

'তারা সব বিদ্যেসাগর হবে—সাগর না হলেও বিদ্যের আড়ত হবে নিশ্চয়ই। আদব কায়দায় রপ্ত হয়ে কায়দাকানুনে পোক্ত হয়ে একেকটা দিগ্‌গজ হবে তারা। আমি সে অসুবিধের মধ্যে পড়তে চাই না......'

'অসুবিধের মধ্যে?'

'অসুবিধা নয়? যখন যা খুশি করতে পারব না, যা ইচ্ছে খেতে পাব না তার চেয়ে ঘোরতর অসুবিধা আর কী আছে? সাধারণ লোকের নানান সুবিধে, অসাধারণের তো নেই। ধর, আমি রাস্তায় আলুকাবলি খেতে পারি...খেতে খেতে যেতে পারি কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর হলে? লোকে আঙুল দিয়ে দেখাবে—বিদ্যাসাগরটা কী করছে দ্যাখো না! আমার ওপর নজর থাকবে সবাইকার। আমি কাউকে নজর দিতে পারব না, নজরানা তো নয়ই। তা হলেই নিন্দে রটবে। আমার নিন্দের আমি পরোয়া করিনে...অতো নিন্দেমন্দর ভয়ে ভয়ে চললে বাঁচার মতন বাঁচাই হয় না—কিছুই করা যায় না জীবনে। নিজের কলঙ্ক কেয়ার করিনে, কিন্তু বিদ্যাসাগর-গোত্র হয়ে সারা বিদ্যাসাগর সমাজের মুখে কালিমা লেপন করতে চাইনে আমি।'

'রাস্তায় ওই আলুকাবলি খাবার খাতিরেই?'

'কেবল আলুকাবলি কেন, আরো কতো কীই তো খাওয়া যায় রাস্তায়। রাস্তা ছাড়া জায়গা কোথায় খাবার? আমার কি বাড়িঘর আছে? আমার খাবার রাস্তা ওই রাস্তাতেই। পাবার রাস্তাও সেইখানে। ভালোমন্দ কিছু খেতে হলে পেতে হলে ওই পথচলতি। পথে যেতে যেতেই খেতে হয় আমায়!'

'কোনো ভদ্রলোক কখনো রাস্তায় খায়?'

'ভদ্রতার বালাই অনেক, বলছি না? ভদ্রলোক হতে চাইনে সেই কারণেই। এমন কি, চলার পথে সাথী, মনের মত সঙ্গী হলে—কবির কথায়, আমার পথ চলাতেই আনন্দ! দুজনে মিলেই খেতে খেতে যাও না! বাধা কী? কিসের অসুবিধে? এমন কি, যে জিনিস দুজনে মিলেই খাব, খাওয়া যায় নাকি যুগপৎ, পেলেই খায় আর খেলেই পায় যে জিনিস, তাও তুমি

ওই যেতে যেতেই খেতে পারো খেতে খেতেই যেতে পারো...'

'সেই মহার্ঘ জিনিস? রাস্তায়?' শুনেই সে হাঁ হয়ে যায়।

হাঁ-করা মেয়ে আমার মোটেই সহ্য হয় না। বিশেষ করে চোখের সামনে। আমি সেই হাঁকারটা অবলীলায় বুজিয়ে দিতে যাই...

কিন্তু আমার মুখবন্ধের ভূমিকাতেই সে হাঁ হাঁ করে ওঠে—। 'ও কী হচ্ছে? বারণ করলুম না তোমাকে?'

'না দিস নাই দিলি! তার জন্যে তোর সঙ্গে মারামারি করতে চাইনে। জানি তো, এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে। যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে। তবু যতই বেড়ে হোক না, কেড়ে নেবার জিনিস নয়। তবে একথাও কই, একটা না হোক আধখানা দিতে পারতিস। চাঁদমুখের আধেক দিয়ে ওইভাবেও কি আমায় অর্ধচন্দ্র দেওয়া যেত না?'

'অমন করলে এখান থেকে উঠে যাবো—একতলায় শোব গিয়ে।'

'তবুর কম্বল উম্বল সব নিয়ে? তাই যা। কোন দুটো তোর, ঢাকা মেরে রাখিস তো। ওপরের দুটোই টেনে নে তুলে...'

'দুটো চাইনে, একটাই ঢের। একটাতেই হবে আমার। সেটাই পাতবো, তারই আধখানা গায়ে জড়ানো যাবে। একটাতেই হবে।'

'শীত করবে না?'

'আমাদের মেয়েদের অতো শীত করে না গো! দার্জিলিঙের ঠাণ্ডাতেও মেয়েরা দিনে ফিনে শাড়ি পরে ঘোরে দ্যাখোনি?'

'কবে আর দেখলাম! তোরা বড়োলোক, দার্জিলিং গেছিস—আমার একদম দার্জিলিং নেই। তবে হাঁ, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি দুটো। আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায়—আকাশ ফাঁকা থাকলে। ...ছেলেবেলায় দেখেছিলাম বটে কাঞ্চনজঙ্ঘা...সেই ছাদেই......' আমার মনে পড়ে।— 'সে-সে-সে-সে সেই কা-কা-কা-কাঞ্চন...' কথাটা মুখে আনতে দাঁতে দাঁতে খিটিমিটি বাধায়, কাঁপুনির মধ্যে কাঁদুনি হারিয়ে যায় আমার।

'ও মা! এ কী কাঁপছ যে তুমি?'

'হুঁ-হুঁ-হুঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ...' হিহি করতে করতে আমি হাঁ হাঁ করি।

'এত শীত করছে তোমার?'

'করবে না? একটু আগে বর্ষাটা হয়ে গেল না? তারই বর্শা এসে আমায় বিদ্ধ করছে এখন। এতক্ষণে। কী রকম করছে যে! দারুণ শীতে মানুষ হার্টফেল করে তা জানিস?'

'দাদার মুখে শুনেছি বটে। তুমি এমন শীতকাতুরে যে তা তো জানতুম না!' সে আমার গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখে—'হ্যাঁ কাঁপছো তো সত্যিই!'

পাহাড়ী সান্যাল

অতুলপ্রসাদ

॥ বোল ॥

এর পরে যেসব ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেল সেটা সবিস্তারে না লিখলেও চলবে। শুধু এইটুকু লিখি, ততদিনে আমিও বুঝতে শিখেছি যে আমি প্রতিভাকে ভালবেসেছি, আর প্রতিভাও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে যে সে আমার প্রতি আকৃষ্ট।

তার সেই আকর্ষণ ঢাকবার জন্য সে প্রচুর চেষ্টা করত। আর সেটা করতে গিয়ে কেমন সব অদ্ভুত কথা বলে উঠত থেকে থেকে। যেমন, একদিন রাত্রে আমরা দুজনে ডক্টর জি সি দাসের বাড়ির ছাদে বসে গল্প করছি। কি কথা হচ্ছিল তা আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু সেইসব কথার মধ্যে হঠাৎ প্রতিভা বলে উঠল, "আমি তোমার থেকে পাঁচ বছরের বড়। তুমি আমাকে দিদি বলে ডাকনা কেন?"

কথাটা শুনে আমি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে প্রতিভার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার-পর হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "তুমিও তো আমার সঙ্গে দিদির মত ব্যবহার কর না। তাই আর দিদি বলা হয়ে ওঠেনি।"

একটা কথা পাঠকদের আগে বলা হয়নি যে, প্রেমের আদান প্রদান ততদিনে খুব চঞ্চল গতিতে বেড়ে গেলেও প্রেমালাপ জিনিসটা আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন-দিন হয়নি। অবশ্য কি ভাষায় যে প্রেমালাপ করা যায় সেটা সেদিনও যেমন জানতাম না, আজও তেমনি জানি না। আমার শুধু এইটাই মনে হয়, ভাষাটা হল বাহ্য, ভাবটাই হল আসল। কারণ অন্তরঙ্গতাটা হল ভাবের বস্তু, ভাষার নয়। অনেক সময় দেখেছি, বললাম হয়তো একটা কথা, ভাষার দিক থেকে সেটা একেবারে বিপরীতপন্থী হলেও ভাবের মধ্যে তার প্রেমের অন্ত-রঙ্গতাটাই ফুটে ওঠে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ একদিনকার একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বললে হয়তো কিছুটা বোঝা যাবে।

সেদিন ছুটির দিন। তেমনিদের বাড়িতে আমি আর ডক্টর জি সি দাসের ছোট ছেলে বুদি বসে ক্যারম খেলছি। সে ছেলেমানুষ হলেও ক্যারামটা আমার থেকে ভালই খেলত। খেলার মধ্যে প্রতিভা হঠাৎ বলে উঠল, "তুই যদি পাহাড়ীবাবুকে হারাতে পারিস বুদু, তবে তোকে দুটো রসগোল্লা খাওয়াব।"

বুদি আমাকে সেদিন সত্যিই ক্যারমে হারালো। তার ভাগে পড়ল রসগোল্লা।

কিন্তু আর একজনের মানসিক জয়মাল্য পেলাম আমি। আসল হারটা হল আমার প্রতিভার কাছে। ওই হারের ফলে প্রতিভা যে কত মিষ্টি করে আমাকে জ্বালাতন করবার সুযোগ পেল, আর সেইটাই হল তার সত্যিকারের আনন্দ।

এরই মধ্যে একদিন রাত্রে হেমদিদের ছাদে বসে গল্প করতে করতে প্রতিভা হঠাৎ বলে উঠল, "আমার সঙ্গে এইভাবে রোজ রোজ বসে গল্প করতে তোমার বেশিদিন ভাল লাগবে না। তুমি কত সুন্দর মেয়ে খুঁজে পাবে। তখন আর আমাকে মনেও থাকবে না।"

পাঠকরা কি বিশ্বাস করবেন যে তখন ওই কালো মেয়েটিই হয়ে উঠেছে আমার কাছে সব থেকে সুন্দরী? তার চেহারা সৌন্দর্যের কোন দাবি না রাখলেও তার চোখ দুটি ছিল সত্যিই সুন্দর। আর আমার

দিকে সে তাকিয়ে থাকলে আমি বুঝতে পারতাম যে ওর ওই চোখ দুটোর দৃষ্টি দিয়ে সে আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে এবং আমার হৃদয়ের সৌন্দর্যসম্ভারগুলোকে সাজাচ্ছে সাজাচ্ছে আর সাজাচ্ছে।

এইভাবে আরও কয়েকদিন যাবার পর একদিন রাত্রে, তখন এগারটা বেজে গেছে, প্রত্যহ রাত্রে আমরা যেমন দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই আর প্রতিভা দরজা বন্ধ করে উঠে যায়, সেদিনও সেইরকম নামবার সময় অন্ধকারের মধ্যে আমার পা-টা হঠাৎ পিছলে গেল। আমি যখন নিজেকে সামলে নিতে কিছু ধরবার জন্য অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি তখন প্রতিভা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "আঃ, একটু দেখে চলতে পার না!"

এই প্রথম আমরা উভয়ে উভয়ের দেহ স্পর্শ করলাম। আমার মুখ দিয়ে পাগলের মত বেরিয়ে গেল, "পিছলে না গেলে কি তুমি আমায় জড়িয়ে ধরতে!" এই কথা বলে আমিও তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

এই যে স্পর্শের শিহরণ, এই যে প্রথম যৌবনের অনুভূতি, এটা ভাষায় অবর্ণনীয়। কিন্তু সেই মুহূর্তটার কথা ভাবলে আজও মনে কোথায় শিহরণের স্পর্শ লাগে।

প্রতিভা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, "পাগলামি কোরো না। বাড়ি যাও!"

হঠাৎ চমক ভেঙে দেখলাম, আমি ওর বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছি। কোন কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। প্রতিভাও দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে গেল।

সাইকেল নিয়ে পথে বেরিয়ে আমার কেবল মনে হল জীবনটা যেন হঠাৎ পূর্ণিমাদের পালা এসেছে।

একটা কথা বলে রাখি। এর মধ্যে আমি কলেজের পড়াশোনাটাকে একেবারে তুলে দিয়েছি। সেজদাও বুঝতে পেরেছেন পড়াশোনায় আমার আর এগোনো সম্ভব হবে না। একদিন সেজদার কাছে বলে ফেলেছিলাম, "পড়াশোনা করতে আমার ভাল লাগে না।"

সেজদা উত্তরে বলেছিলেন, "ভাল না লাগলে আমি আর তোমাকে পড়াশোনা করতে বলব না। কিন্তু ভবিষ্যতে কি করবে সেটা একটু ভেবে দেখো।"

এই কথা বলে সেজদা চুপ করে গিয়েছিলেন আর আমিও নীরবে সরে গিয়েছিলাম সেখান থেকে।

পড়াশোনা ছেড়ে দেবার ফলে আমার জীবনের সব নিয়মানুবর্তিতা ঘুচে গেল। সেজদাও তখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়েছেন।

যে নতুন আমেজ নিয়ে সে রাত্রে আমি বাড়ি ফিরলাম তাতে করে আমার কেমন মনে হল যে এটা যেন ঠিক আমি নয়, আমার ভাবনা বুঝি অন্য কেউ ভেবে দিচ্ছে। কেমন যেন একটা নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছি। সকালে উঠে মনে হল, হয় আমার দৃষ্টি বদলে গেছে, নয়তো বা পৃথিবীর রঙটাই গেছে বদলে।

পাঠকদের ভেবে দেখতে বলি যে সেই বয়সে, অর্থাৎ কিনা একুশ বছর বয়সে মন যখন আমার পরিপক্ক নয়, তখন একটা মানসিক আলোড়নের মধ্যে আমি কি ভাবে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার মনের কথাগুলি কার কাছে গিয়ে যে বলব, কে যে আমার পথ দেখিয়ে দেবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

কতবার ভাবলাম অতুলদার কাছে ছুটে যাই, কিন্তু পারলাম কই! আমার মনের যা কিছু সাহস সব তখন সামাজিক আবিলতার মধ্যে আচ্ছন্ন। এর থেকেও বড় বিপদ হল, কি করে গিয়ে প্রতিভার সামনে দাঁড়াব। কখনো মনে হচ্ছে যে এইতো দুজন দুজনকে ঠিক চিনতে পেরেছি, তারপরেই আবার মনে হয়েছে, নিশ্চয় সে আমার ব্যবহারে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই দোটানার মধ্যে কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

ফলে প্রায় পাঁচ-ছ দিন আর ডক্টর দাসের বাড়ির ধারে-কাছে গেলাম না। আর যে মিউজিক কলেজে যাবার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে সাইকেল নিয়ে পথে নেমে পড়তাম, সে সময়টাও দিলাম বদলে। পাছে প্রতিভার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এই ক'দিনের মনের অবস্থা আমাকে এমন বিহ্বল করে তুলল যে মাঝে মাঝে ছটফট করে আকুল হয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কি যে তাঁর কাছ থেকে চাইছিলাম তা নিজেই বুঝতে পারলাম না। শুধু আমার মনের আকুলিবিকুলিটাই বুঝতে পারছিলাম।

হঠাৎ ঠিক করলাম, অতুলদাকে গিয়ে সব কথা বলব। ছুটে গেলাম তাঁর বাড়িতে এক সন্ধ্যায়। তাঁকে বাড়িতে পেলামও। কিন্তু বলা হল না কিছুই। অতুলদা যতই তাঁর সেই স্বাভাবিক আদর দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন, আমার মন ততই আড়ষ্ট হয়ে উঠল। আমার সব কথা কেমন যেন গেল গুলিয়ে।

হঠাৎ অতুলদা জিজ্ঞেস করলেন, "আজ আবার তোমার কি হয়েছে?"

কথাটা শুনে চমকে উঠে বুঝতে পারলাম অতুলদার কাছে কত সহজে আমি ধরা পড়ে যাই।

আমি ছটফট করে বলে উঠলাম, "না, কিছু না। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। আমি আজ বাড়ি যাই অতুলদা।"

অতুলদা আমার হাত দুটো চেপে ধরে বসিয়ে বললেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও, অত ব্যস্ত কেন! তোমার চেহারাটা সত্যিই খারাপ লাগছে। তুমি একটু বস। সাইকেলটা এখানে থাক। তোমায় আমার গাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কাল তোমার সাইকেল আমার ড্রাইভার পৌঁছে দেবে।"

আমার স্পষ্ট মনে আছে, এই কথা শুনে আমি ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। অতুলদা আমার মাথায় কতক্ষণ হাত বুলিয়ে আদর করে কি সব যে বললেন আমার কিছুই কানে গেল না। আমি তখন একেবারে দিশাহারা। কেমন যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হতে লাগল। অতুলদার আদরের স্পর্শে প্রতি মুহূর্তে আমার এতগুলো কথা একসঙ্গে মনের মধ্যে হুড়োহুড়ি করতে লাগল যে সে অবস্থাটা কাউকে বোঝানো প্রায় অসম্ভব।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি যে অতুলদা আমার ওইরকম অবস্থা দেখে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে বসিয়েছেন যাতে অন্য কেউ আমার এই অপ্রস্তুত অবস্থাটা না দেখে ফেলে।

হঠাৎ দরজার বাইরে বেয়ারাকে বলতে শুনলাম, "হুজুর, এক সাহাব আপসে মিলনে আয়ে হঁয়।"

অতুলদা আমায় অত্যন্ত স্নেহভরে বললেন, "একটু বস। আমি আসছি।"

উনি বেরিয়ে গেলেন। আমিও বুঝতে পারলাম আজ আর আমি অতুলদার কাছে সহজ হতে পারব না। তাই কিছু না ভেবে চিন্তে, অতুলদার অনুমতি না নিয়েই পাশের একটা দরজা দিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে সাইকেলটা তুলে নিয়ে ছুটে দূরে সরে যেতে চাইলাম। কিন্তু নিজের কাছ থেকে দূরে সরতে পারলাম না তো! তখন আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীতে কারুর মুখোমুখি আমি দাঁড়াতে পারব না।

বাড়িতে গিয়ে অস্থিরভাবে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা দিলাম বন্ধ করে। কত কি ভাববার চেষ্টা করলাম, কত ভাবে নিজেকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চাইলাম, কিন্তু বুঝলাম, সবই বিফল।

[ক্রমশ]

বেকারি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাব এবং আরও কাজের সুযোগ

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারত অনেক অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে। সমস্যাগুলির মধ্যে আছে বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা এবং আরও অনেক কিছু। খাদ্য সমস্যার সমাধান ভারত করতে পেরেছে—বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও এখন যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি—উন্নয়নশীল দেশে তা করা সম্ভবও নয়। এবং ভারতে গত কয়েক বছর যাবৎ মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা খুবই বেড়েছে। তবুও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করলে এবং সরকার দৃঢ়সংকল্প হলে এই সমস্যার তীব্রতা কমানো অসম্ভব হবে না। কিন্তু বেকার সমস্যার তীব্রতা দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁচসালা যোজনায় বেশি করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। এমন কি এই দুইটি যোজনায় কী পরিমাণ কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করা হবে তার লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, কোন যোজনাতেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা তো দূরের কথা, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। চতুর্থ যোজনায় কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করা অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা না করে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পূর্বনির্ধারিত কোন লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করার নীতি গ্রহণ না করে সরকার গোড়া থেকেই বেকার সমস্যার তীব্রতা কমানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর 'গরিবী হটাও' শ্লোগান তখনই সার্থক হবে যখন বেকার-জীবনের গ্লানি, যন্ত্রণা ও হতাশা থেকে লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম ভারতীয় মুক্তি পাবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীবিজয় ভগবতীর সভাপতিত্বে একটি বেকার-বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, মহীশূর, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্র প্রদেশ সফর করেছেন। সম্প্রতি কমিটি আরও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ সম্পর্কে একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন দিয়েছেন। কমিটির মতে, বেকার সমস্যা শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে পশ্চিমবঙ্গে। এই কমিটির মতে আগামী দু' বছরে ৪০ লক্ষাধিক লোকের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে যদি অতিরিক্ত ৭৪০ কোটি টাকা খরচ করে কয়েকটি শ্রম-নিবিড় প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ প্রকল্প, সার নির্মাণের প্রকল্প, রাস্তাঘাট ও বাসস্থান নির্মাণের কাজ, গ্রামীণ শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন, নদী পরিবহণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প প্রভৃতি। অবশ্য অধিকাংশ প্রকল্পের কথাই চতুর্থ যোজনায় বলা হয়েছে এবং এগুলি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু কমিটি যে জিনিসটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল, এই প্রকল্পগুলিতে আরও বেশি করে বিনিয়োগ করা। শ্রীভগবতী বলেছেন, সড়ক ও নদী পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ফলে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের কাজের সংস্থান হওয়ার আশা আছে। ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পে যে বিনিয়োগ হবে তার ফলে সাড়ে চার লক্ষ কর্মীনিপুণ এবং তেইশ লক্ষ অনিপুণ কর্মীর কাজের ব্যবস্থা হবে। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জলসরবরাহ প্রকল্পে যে বিনিয়োগ হবে তার ফলে ৫২,০০০ লোকের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কাজের ব্যবস্থা হবে বলে আশা করা যায়; তার মধ্যে ৮০০০ হবেন ইঞ্জিনিয়ার এবং অবশিষ্ট ৪৪,০০০ হবেন অনিপুণ কর্মী। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার বাড়াবার ক্ষেত্রে ২·৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থা যে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বেকার-বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে তা স্বীকৃত হয়েছে।

ভগবতী কমিটি যে অতিরিক্ত ৭৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা বলেছেন তার মধ্যে ২৪০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের ভিতর সংস্থান করার কথা বলা হয়েছে—অনুরূপ ২৪০ কোটি টাকা বিভিন্ন ঋণ-প্রদানকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৪০ কোটি টাকা গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য কমিটি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রশ্ন হল, কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে ২৪০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করবেন, এই প্রশ্নের উত্তরও কমিটি দিয়েছেন। কমিটি সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছেন আয়কর এবং যৌথ কোম্পানিগুলির করের উপর বিশেষ কর্মসংস্থান-সারচার্জ (Special employment surcharge on income and corporation taxes) বসানো হোক। কমিটির আরেকটি প্রস্তাব হল, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের উপর কর বসানো হোক। কৃষি ও অ-কৃষি আয় মিলিয়ে যৌথ আয়কর (integrated income-tax comprising both the agricultural and non-agricultural incomes) বসানোর সম্ভাবনাও পরীক্ষা করে দেখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে যদি এ ধরনের যৌথ আয়কর ধার্য করা হয় তবে কৃষি-আয়ের ক্ষেত্রে একটি সর্বোচ্চ ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে বলে কমিটি প্রস্তাব করেছেন।

বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে যে কোন গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবকে সবাই স্বাগত জানাবেন। ভারতের মতো এত বড় দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক এখন বেকার এবং যেখানে জাতীয় আয় ও জনপ্রতি আয় খুবই অল্প, সে ক্ষেত্রে বেকার-ভাতার ব্যবস্থা করা খুবই ব্যয়সাধ্য। ভারত সরকারের হাতে এত টাকা নেই যে, লক্ষ লক্ষ লোককে বেকার-ভাতা দেওয়া যায়। তবে বেকার সমস্যার আশু সমাধানকল্পে বর্তমানে স্বল্পকালীন ব্যবস্থাগুলির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে অর্থের সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভারত সরকার ১৯৭১-৭২ সালে ৫০ কোটি টাকার একটি জরুরী কর্মসূচী (crash programme) গ্রহণ করে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন; তা ছাড়া আরও ২৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষিত যুবকদের কাজের ব্যবস্থা করার জন্য। প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যবস্থা খুবই সামান্য। ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যের জন্য ৩৬০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ভারত সরকার নিশ্চয়ই এই অবস্থার জন্য এক বছর আগে প্রস্তুত ছিলেন না এবং যদি এই অবস্থার সম্মুখীন না হতেন তবে সরকার নিশ্চয়ই বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য আরও অর্থ বিনিয়োগ করতেন। যেভাবেই হোক এখন ভারত সরকারকে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে বেকার-বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সুব্রত গুপ্ত

ভোটবাগান

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, সংখ্যায় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'ভোটবাগান' একটি ইতিহাসপূর্ণ বিবরণ, কিন্তু ওঁর ভুটান এবং তিব্বতের রাজনৈতিক সম্পর্কের উল্লেখের মধ্যে ইতিহাসের একটি রহস্য লুকিয়ে আছে। সেইটা পরিষ্কার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পত্রটি লেখা হল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন যে, ভুটান কোচবিহার রাজ্যটি দখল করে নিলে কোচরাজ ইংরাজদের সাহায্যপ্রার্থী হন এবং ইংরাজেরা ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার দখল করে নেয়। তিনি আবার লিখছেন যে, 'অন্য দিকে, ভুটানরাজ তিব্বত ও চীনের সহায়তা চাইলে তিব্বতের বিচক্ষণ রাজনীতিক তাশী লামা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতাপের কথা মনে রেখে ভুটানরাজকে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বলেন ও মীমাংসা যাতে সহজতর হয়, সেজন্য পুরাণ গিরির মারফত হেস্টিংসের কাছে এক চিঠি পাঠান।

ভুটানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জুধুরকে ভুটানের দেবরাজা মনোনীত করা হয়। রাজ্য শাসন ব্যাপারে দেবরাজা সর্বেসর্বা হলেও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভুটানের ধর্মরাজার অধীনে প্রধানমন্ত্রীরূপে কার্যভার পরিচালনা করিতেন। কেহ কেহ মনে করেন, দেবরাজের ক্ষমতা দেওয়ান, উজীর দেশী বা Regent এর বেশী ছিল না। যাহা হউক, এই সময় ভুটানের ধর্মরাজা নাবালক ছিলেন বলে Lama Rimboche ধর্মরাজার কার্যের ভার প্রাপ্ত হন। সহসা দেবরাজা জুধুর Lama Rimboche-এর সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু করলেন। তিনি Lama Rimboche-কে প্রায় বন্দী অবস্থায় রেখে তাঁহার সঙ্গে কোন প্রকার পরামর্শ না করেই নিজের ইচ্ছাধীন রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। ধর্মরাজ এবং লামা পুরোহিতদের হাত থেকে নিজেকে স্বাধীন করার জন্য দেবরাজা জুধুর তিব্বতের তাশী লামা এবং নেপালের রাজার সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য জুধুর চীন রাজের মোহরও ভুটানে প্রচলন করেছিলেন। তারপর তিনি Lama Rimboche-এর মতকে উপেক্ষা করে কোচবিহার আক্রমণ করেন।

উপরোক্ত স্বেচ্ছাচারিতার জন্য দেবরাজা জুধুর ধর্মরাজা, লামাগোষ্ঠী এবং ভুটানের জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন হয়ে উঠলেন। তাহারা সকলেই জুধুরকে দেবরাজার পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করলেন। তাই দেবরাজা জুধুর যখন বকসাদুয়ারের নিকট ইংরাজদের বিরুদ্ধে সৈন্যপরিচালনা করছিলেন, তখন ধর্মরাজার সমর্থক লামার দেবরাজা জুধুরের রাজধানী থেকে সৈন্য নিয়ে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁহাকে দেবরাজার পদ থেকে পদচ্যুত করে নূতন দেবরাজা মনোনীত করলেন এবং জুধুরকে বন্দী করার জন্য নির্দেশ জারী করলেন। জুধুর এই খবর পেয়ে প্রাণরক্ষার জন্য তিব্বতে তাশী লামার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

নূতন দেবরাজা চীন সাম্রাজ্যের মোহর ভুটানে প্রচলন নিষেধ করে দিলেন এবং ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

জুধুর তিব্বত থেকে ভুটানের তাঁহার সমর্থকদের অনেক প্ররোচনা দিয়েও ভুটানে আর ক্ষমতায় আসীন হতে পারেননি। তিনি কিন্তু তাশী লামাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইংরাজেরা তাঁহার কর্মে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাঁহাকে দেবরাজার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তাশী লামা মনে করলেন যে, ইংরাজেরা যদি জুধুরের সঙ্গে শত্রুতার ভাব ত্যাগ করে তা হলে জুধুর পুনরায় ভুটানের দেবরাজা হতে পারবে। এই ভেবে তাশী লামা জুধুরের পক্ষ হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসকে পুরাণ গিরির মারফৎ পত্র দিয়েছিলেন যেন ইংরাজেরা জুধুরের উপর দয়া পরবশ হয়ে তাঁহাকে ক্ষমা করে দেয় ও তাঁহার সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে নেয়।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা পরিষ্কার অনুমান করা যায় যে (১) ভুটান সরকার ইংরাজদের বিরুদ্ধে তিব্বতের এবং চীন সাম্রাজ্যের নিকট কোন প্রকার সাহায্য চাননি। (২) তাশী লামা বিতাড়িত জুধুরের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বলে তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব ভুটানের Defacto এবং Dejure সরকারের উপর ছিল না। (৩) সেই জন্য ভুটান সরকার ইংরাজদের সঙ্গে কোনও প্রকার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য তাশী লামাকে অনুরোধ করতে পারে না এবং (৪) তাশী লামা জুধুরের পরামর্শে এবং জুধুরের সঙ্গে ইংরাজদের মিত্রতার জন্য হেস্টিংসকে যে পত্র দিয়েছিলেন ইহাতে ভুটান সরকারের কোন প্রকারের জ্ঞান বা সমর্থন ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জর্জ বোগলের ভুটান হয়ে তিব্বত যাত্রার খবর যখন তাশী লামা জানতে পারলেন তখন তিনি ভাবলেন যে, ভুটানের সম্পর্ক ইংরাজদের সঙ্গে দৃঢ়তর হলে বোধ হয় জুধুরের ভুটানের উপর সব অধিকার একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। এই ভয়ে তাশী লামা বোগলকে অনুরোধ করে পত্র দিয়েছিলেন যে, তিব্বতে ইংরাজদের প্রবেশের অধিকার নেই, সেই জন্য তিনি যেন কলিকাতায় ফিরে যান। এই দিকে ভুটানের দেবরাজা বোগলের খুব সমাদর করলেন এবং পরে তিনি যখন জানতে পারলেন যে বোগল তিব্বত যাইতে ইচ্ছুক তখন তাঁহার মনেও সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল যে, তিব্বত এবং ইংরাজদের বন্ধুত্ব এই সময় ভুটানের জন্য প্রতিকূল হতে পারে। তাই তিনিও বোগলকে কলিকাতায় ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন।

ভুটান গিয়ে বোগল জানতে পেয়েছিলেন যে, তখন ভুটানের সঙ্গে তিব্বতের কোনও বিশেষ বন্ধুত্বের ভাব ছিল না। তিনি ভুটানের রাজধানী Tassisudan (Tashichcha Dyong) বর্তমান

খিমজু থেকে ১৭৭৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে হেস্টিংসকে লিখেছিলেন যে, "I believe there is no great cordiality between the two. The Lama's mediation in regard to the peace was procured during the government [sic] of his predecessor, who, upon his expulsion in February last, fled to him, and is now in his country. The present chief is jealous of this, as well as apprehensive of the Nepal Rajah taking him by the hand, and would be glad if the Teshu Lama would give him up, when I imagine there would be little scruple of throwing him into the Pachu-Chinchu, as was done with a chief who was deposed about forty on fifty years ago".

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রিচার্ডসন ভুটানের রাজার সহায়তার জন্য তিব্বতের তাশী লামাকে অনুরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন যে, "the intervention on behalf of Bhutan appears to have been entirely by his [Tashi Lama's] own initiative; and its upshot in the visit of Bogle was clearly not welcomed at Lhasa, for the Panchen Lama [Tashi Lama] was unable to arrange for Bogle to go there."

উপরের বিবরণ হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ভুটানরাজ ইংরাজদের সংগে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য তিব্বত অথবা চীনের সাহায্য চাননি।

ডঃ শিবসাধন ভট্টাচার্য
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়

মোদের গরব মোদের আশা

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের "মোদের গরব মোদের আশা" (দেশ, ১৩ সংখ্যা) শীর্ষক আলোচনায় বাংলাদেশের নামকরণ সম্পর্কে লেখক যেসব মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে অন্তত দু'একটির আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। পূর্ব বাংলার নাম বাংলাদেশ হয়েছে, বর্তমানে এটি ঐতিহাসিক সত্য—তা প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন তর্কের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত রায় লিখেছেন, "বৃহত্তর খণ্ড যে সমগ্রের উত্তরাধিকারী হয় এর আরো নজির ইতিহাসে আছে।" এ প্রসংগে তিনি জার্মানীর ইতিহাসের উল্লেখ করেছেন। দয়া করে তিনি সে দেশের ইতিহাস যদি বর্তমান কাল পর্যন্ত অনুসরণ করেন তবে দেখবেন পরবর্তীকালে জার্মানী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, দ্বিধা বিভক্ত। বৃহত্তর অংশ পশ্চিম জার্মানী কিন্তু জার্মানী নাম ধারণ করেনি। কেবলমাত্র তর্কের খাতিরে ইতিহাসের বিশেষ অংশ বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করলে ইতিহাসের মূল সূত্রটির অপব্যাখ্যার আশংকা থাকে। তাছাড় "বৃহত্তর খণ্ড" সব সময় শুধুমাত্র আকৃতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য "ক্ষুদ্রতর খণ্ডের" উত্তরাধিকারী হবে, এটি গণতন্ত্র বা সাম্যবাদের অজুহাতে

বৃহৎ কর্তৃক ক্ষুদ্রের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার সামিল।

আলোচনার অন্যত্র শ্রীযুক্ত রায় মন্তব্য করেছেন, "বেঙ্গল শব্দটির আদিতে বঙ্গদেশ।" বেঙ্গল বা বাংলা শব্দ দুটি বঙ্গদেশ বা বঙ্গ হতে উদ্ভূত শব্দ কিনা তা বিবেচনা সাপেক্ষ। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে—"খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর এবং সম্ভবত আরও প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গ ও বঙ্গাল দুইটি পৃথক দেশ ছিল এবং অনেকগুলি শিলালিপিতে এই দুইটি দেশের একত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গাল দেশের নাম হইতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের বাংলা এই নামকরণ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন তবে এককালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের তটভূমি যে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৩ পৃঃ ২) তা হলে কি বলা চলে না বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের কিয়দংশ বঙ্গাল দেশের অন্তর্গত ছিল এবং বাংলাদেশ নামে এ অংশেরও অধিকার আছে!

পূর্ব বাংলার নাম বাংলাদেশ, তা প্রমাণ করার জন্য শ্রীযুক্ত রায় সাক্ষী মেনেছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাসকে। সাক্ষী হাজির করলেই কি আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়! তা হলে এ প্রসঙ্গে আরেকজন সাক্ষী হাজির করালে কেমন হয়। এবারের সাক্ষী অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। শ্রীকান্তের ১ম পর্ব, ১ম অধ্যায়ের সূচনাতেই তিনি লিখেছেন, "ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ।" তা হলে কি বলা চলে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালীরা বাঙালী নন!

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩১।

বাংলাদেশ থেকে ফিরে

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের 'বাংলাদেশ' বিষয়ক রচনাটি পড়েছি। সম্প্রতিকালে বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন আমাদের মনে জেগেছে বা ওঠে সেসব অনেকগুলিই লেখক উত্থাপন করেছেন এবং আলোচনা করেছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন সে অনেক বিষয়েই পিছু টান টেনে লাভ নেই, ছিদ্রান্বেষী হয়ে লাভ নেই। অতীতকে আমরা দেখবো অভিজ্ঞতা হিসেবে, যাতে বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে শুদ্ধ করে, সুন্দর করে গঠন করতে পারি। একথাটা বাংলাদেশ এবং ভারত উভয়ের পক্ষেই নিজ নিজ স্থলে প্রযোজ্য।

কিন্তু তবু একটা কথা। সেটা ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এর আগেকার কথা। পাকিস্তান হবার পর ধাপে ধাপে অধিকাংশ হিন্দুই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে, তাদের সোনার বাংলা ছেড়ে চলে এসেছিলো। তারা দেশত্যাগী হয়েছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য আসা, শিক্ষার জন্য আসা, সাংস্কৃতিক কারণে আসা—সেটা তো অন্য কথা। কিন্তু পাকিস্তানে থাকা যাবে না—সে কথাও তো এক কথা নয়। আজ যখন সে অবস্থা নয়, বাংলাদেশ মুক্ত, স্বাধীন সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, আজ কি বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণ, মুসলমান নেতৃবৃন্দ, রাজার রাজা শেখ মুজিবুর রহমান দু'হাত প্রসার করে দেশত্যাগী হিন্দু ভাইদের ডাকবেন সোনার বাংলায় ফিরে যেতে? বা কোন হিন্দু যদি স্বেচ্ছায়ই বাংলাদেশে, তার একদা ভিটাতে, পূর্ব পুরুষের ভিটাতে ফিরে যেতে চায়, তাকে বাংলাদেশের বাঙালীরা গ্রহণ করবেন? এ প্রশ্ন হিন্দু অনেকের মনে আছে।

শ্রীশশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য
কলকাতা-২৬

বই চুরি

বন্ধুবান্ধবের বাড়ি থেকে কোনো বই পড়তে আনার নাম করে ফেরৎ না দেওয়া খানিকটা দোষের কাজ বটে, কিন্তু কেউ এটাকে চুরি বলে গণ্য করে না। তা ছাড়া এই প্রথাটি বহুকাল ধরে চলে আসছে।

কিন্তু গ্রন্থস্বত্ব চুরির ব্যাপারটা নাক্কারজনক। এতে বঞ্চনা করা হচ্ছে বইয়ের মালিককে শুধু নয়, বইয়ের লেখককেও—যাঁর পরিশ্রমের ফসল ঐ বইখানি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় লেখকদের বই সেখানকার অসাধু প্রকাশকরা বেআইনীভাবে ছাপিয়ে বাজারে বিক্রী করতেন। এ খবর আমরা অনেকবার শুনেছি। এখন ঐ ব্যাপার বন্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু ভারতেও পুস্তক-দস্যুতা যে অবাধে চলে, সে সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়নি। সম্প্রতি 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকা খোদ রাজধানী দিল্লিতেই এ ধরনের চোরা কারবার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন।

দিল্লির একটি দুষ্টচক্র এই ব্যাপার বহুদিন ধরে চালাচ্ছে। যে-কোনো জনপ্রিয় ব্রিটিশ বা মার্কিন দেশের বই এরা অতি দ্রুত ছাপিয়ে বাজারে ছেড়ে দেয়। পাঠকদের কাছে চাহিদা আছে, এমন যে-কোনো বই, সে ব্যাপারে ওদের কোনো চক্ষুলজ্জাও নেই। 'সেনজুয়াস উওম্যান' নামে একটি নবেল এখন দিল্লি-বোম্বাইতে বেশ বাজার কেড়েছে, বোম্বাইয়ের এক প্রকাশক সেখানি ভারতে প্রকাশের আলাদা স্বত্ব সংগ্রহ করে। কিন্তু সেই প্রকাশকের বই দপ্তরিখানা থেকে বেরোবার আগেই জাল বইয়ে দোকান ছেয়ে গেল। ঐ জাল বই অন্তত পাঁচ হাজার বিক্রী হয়েছে শুধু দিল্লিতে।

দিল্লির একজন সাংবাদিক সম্প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে একটি বই লিখছিলেন ইংরেজিতে—কিন্তু তিনি লেখা শেষ করার আগেই হতবাক হয়ে দেখলেন, তাঁরই নামে ঐ বই বাজারে বেরিয়ে গেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, তিনি কয়েকটি অধ্যায় লিখে তাঁর প্রকাশককে দেখতে দিয়েছিলেন—প্রকাশকের কাছ থেকে সেটা "কোনোরকমে" বাইরে চলে যায়—তারপর সেইটুকুই ছাপা হয়ে মলাটে মুড়ে বইয়ের দোকানে।

দু' ধরনের জালিয়াতি হয়। পুরো বইটাই হুবহু বেআইনীভাবে ছাপানো। অথবা জনপ্রিয় বইয়ের অংশ বিশেষ একটু আধটু বদলে, খানিকটা অন্য চেহারায় আইন ফাঁকি দেবার চেষ্টা। খুব বেশী চেষ্টারও দরকার নেই। কারণ, কপিরাইট, আইন অত্যন্ত গোলমেলে। এবং লেখকরা সাধারণত মামলাপ্রবণ নন, সহজে আদালতে যেতে চান না। আইনের থেকে আইনের ব্যাখ্যা আরও জটিল—সুতরাং এই ধরনের মামলা দীর্ঘসূত্রী অলস স্বভাবের আদালত বহুদিন ধরে টানবে, তাতে প্রকৃত সুবিচার প্রার্থীরও বহু সময় ও টাকা নষ্ট অবধারিত।

শুধু ইংরেজি বই নয়, প্রাদেশিক ভাষায় বই নিয়ে জোচ্চুরিও রাজধানীতে চলছে। বাংলা বা তামিল বা অন্য ভাষার জনপ্রিয় লেখকদের রচনা অনুমতি না নিয়েই হিন্দী অনুবাদ করে ছাপানোর ঘটনা বিরল নয়। পাকিস্তানের জনপ্রিয় উর্দু বই গোপনে পাচার করে এনে অন্য নামে ভারতে ছাপা হচ্ছে। তেমনি কিছু কিছু হিন্দী বইও উর্দু অনুবাদে ছাপা হচ্ছে পাকিস্তানে। সবটাই সীমান্তের চোরাকারবারিদের মাধ্যমে চলছে।

পশ্চিম বাংলার চিত্রটা কি? পশ্চিম বাংলায় অনুবাদ বই জনপ্রিয় হয় না। ইংরেজি বই বেআইনীভাবে ছাপানোর কোনো দৃষ্টান্ত চোখে পড়েনি। এখানে চলছে আরও সহজ ব্যাপার। এখানকারই লেখকদের বই বেআইনীভাবে ছাপানো সবচেয়ে সুবিধাজনক। দপ্তরিখানা থেকে ফর্মা চুরি করে কিংবা প্রেস থেকে বেশী সংখ্যায় ছাপিয়ে নেবার খবরও শোনা যায়।

একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত হচ্ছে "বালিকা বধূ"। বিমল কর রচিত এই উপন্যাসটি বছর দু'এক আগে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল—অবিলম্বে তার ভেজাল সংস্করণ বেরিয়ে গেল, কিন্তু সেখানে লেখকের নাম বিমল মিত্র! দুজন লেখকের নাম এক সঙ্গে ভাঙাবার বিচিত্র কৌশল! এইরকম বেশ কিছু বই নিয়েই চালাও ব্যবসা চলছে।

সরলমতি পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, আসল বই থাকতে জাল বই লোকে কিনবে কেন? উত্তরটি খুব সোজা। জাল বইতে

লেখককে কোনো রয়ালটি দিতে হয় না, সেই টাকায় কিছু অংশ বর্ধিত কমিশন হিসেবে পুস্তক বিক্রেতাদের দেওয়া হয়। বর্ধিত হারে কমিশনের এইসব বই—বড় বড় দোকানে জায়গা না পেলেও মফঃস্বলের বিক্রেতাদের কাছে লোভনীয়!

ভারতীয় কপিরাইট আইনের অতি সরল নির্গলিতার্থ এই যে, এই দেশের সীমানার মধ্যে যে-কোনো স্থানে কোনো লেখকের বা তাঁর উত্তরাধিকারীর বিনা অনুমতিতে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ নিষিদ্ধ। লেখকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর তাঁর রচনা যে কেউ প্রকাশ করতে পারে। মোটামুটি আন্তর্জাতিক আইনও এই।

এই আইন যারা অমান্য করছে, তাদের কিভাবে দমন করা যেতে পারে? লেখকের নাম সমেত হুবহু নকল করা বই বাজারে বেরুলে পুলিস সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে—এবং শাস্তি অবধারিত। কিন্তু সামান্য কিছু অদল বদল করে নিলেই আইন সেখানে বহু শাখা বিস্তার করে। তখন লেখক বা পুলিসের কিছু করার থাকে না। সেক্ষেত্রে পাঠক বা পুস্তক বিক্রেতারা সজাগ হলে এই ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহ করা যায়।

আরও একটি সহজ উপায় আছে—লেখকরা যদি তাঁদের সমস্ত রচনা থেকেই অধিকার ছেড়ে দেন। তিনি লিখেই খুশী থাকবেন, টাকা পয়সা চাইবেন না—যার ইচ্ছে ছাপুক, যার ইচ্ছে পড়ুক। জ্ঞান বা শিল্প মূল্যের অতীত এবং সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে যাক।

একটি প্রশ্ন

বাংলাদেশে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা এবং বই কলকাতায় বিক্রী হবার কি ব্যবস্থা হয়েছে? এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব কার? গত সাত বছর ধরে উভয় বাংলার সাহিত্য বিনিময় বন্ধ আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃত্রিম ব্যবধান দূর হয়ে যাবে—এইরকম আশা আমাদের ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কথাবার্তা চলছে, বাংলাদেশ থেকে কত হাজার মন মাছ আসবে—তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা—অথচ বই-পত্র সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। ব্যাপারটা কি?

শাসক সম্প্রদায়ের কর্তাব্যক্তিদের একটা ধমক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, আপনারা বাংলাদেশ বিষয়ে এত সহানুভূতি দেখাচ্ছেন কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের আন্দোলনের সূত্রপাত—এখন সেই ভাষা ও সাহিত্যকে বিস্মৃত হয়ে শুধু কয়লা-লোহা-পাট-মাছ নিয়ে মাথা ঘামানো মূর্খতা নয়?

সনাতন পাঠক

একটি উপন্যাস সবার পক্ষেই লেখা সম্ভব—এই ধরনের একটা কথা শোনা যায়। কথাটা নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জন। তবে কথাটার মূলে একটু সত্যি রয়েছে। অন্তত একটি উপন্যাসের উপযোগী উপকরণ প্রত্যেকের জীবন থেকে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য মালমশলা পাওয়া গেলেই তো আর উপন্যাস হয় না; উপন্যাস লিখতে হয় এবং সবাই লিখতে পারে না। সবাই লিখতে পারে না বলে সবাই ঔপন্যাসিক হয় না, যদিও সবার সামনে অন্তত একটি আত্মজীবনাশ্রয়ী উপন্যাস লেখার পথ খোলা থাকা সম্ভব।

কী হলে একটি উপন্যাস হয়? এই প্রশ্নের উত্তর অজস্র। আবার বলা যায়—এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। আসলে লেখা না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই কিছু হবে কি না বলা যায় না।

এই উপন্যাসটি লেখবার সময় অ্যাল ইয়াং কল্পনার কাছে তেমন কোনো উপকরণ চান নি। কল্পনা, অথবা লেখকদের যে উদ্ভাবন-শক্তির কথা শৈশবে শুনেছি, এখানে তার দরকার ছিল না। 'স্নেক' অ্যাল ইয়াংয়ের প্রথম উপন্যাস। প্রায় আত্মজীবনাশ্রয়ী। এই ধরনের উপন্যাস লিখতে কল্পনার দরকার হয় না? অবশ্যই হয়, তবে সে-কল্পনা অন্য জাতের, তার কাছে অন্তত ভিত তৈরির মালমশলা চাইতে হয় না।

'স্নেক' উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্রের

Snakes. By Al Young. Sidgwick & Jackron, London.

নাম এর্মাস। তার গায়ের রঙ কালো। আমেরিকার ডেট্রয়ট শহরে নিগ্রোদের সঙ্গে সে বড় হয়ে উঠছে। তার বড় হয়ে ওঠা নিয়ে এই উপন্যাস। কৈশোর থেকে এগিয়ে বইটির শেষ পাতায় সে যৌবনের চৌকাঠে পা রেখেছে। অবশ্য কৈশোর দুঃসহ, বিশেষত যদি অনুভবে ধার থাকে। এর্মাসের অনুভব ধারালো, কৈশোরেই সে পাখসাট মেরে কয়েকবার এই চৌকাঠ ডিঙিয়ে এসেছে।

স্কুলের গণ্ডি পেরোবার অনেক আগে থেকেই এর্মাসের শরীর মন একদিকে ঝুঁকে আছে—সঙ্গীতের দিকে। একটা ইলেকট্রিক গীটার তার সব সময়ের সঙ্গী। তার বন্ধু শেকেস্ ড্রাম বাজায়। শেকসের মতন আরো বন্ধু জুটিয়ে সে একটা দল তৈরি করল। নিগ্রো হওয়া সত্ত্বেও তারা যে-সুযোগ পেল তা আমাদের দেশে নতুনদের পক্ষে অভাবনীয়। 'স্নেক' নামে তাদের জ্যাজ সঙ্গীতের একটা রেকর্ড ডেট্রয়টে বিক্রি, দিন দেশ জনপ্রিয় হল।

এর্মাস সব সময় নেশাগ্রস্ত—সঙ্গীতের

গ্রন্থ প্রচ্ছদ

নেশা। সঙ্গীত তার কাছে শুধু ধ্বনিনির্ভর নয়। সাপ, অনেক সাপ ক্রমান্বয়ে পাক খেতে থাকলে তার কানে না হলেও চোখের সামনে সঙ্গীত তৈরি হবে। যে মেয়ে তার চোখে সুন্দর তার শরীরে সঙ্গীতের নিঃশব্দ প্রবাহ। সংগীত শুধুই বাস্তব কিছুকে আশ্রয় করে তার কাছে আসে না; সঙ্গীতের পুরোপুরি 'বিমূর্ত' ভাবনার জন্যও তার মনে পরিপাটি আসন পাতা। শহরের রাস্তায়, গ্রামাঞ্চলে, মানুষের কণ্ঠস্বরে, হাঁটার ভঙ্গিতে, নিগ্রোদের বিশিষ্ট জীবনযাত্রায় এর্মাস সঙ্গীত খুঁজে পায়, খুঁজে পেয়ে সে নেশায় বুঁদ হয়ে

থাকে। ধ্বনিনির্ভরতা অতিক্রম করে সঙ্গীত বিভিন্ন বিচিত্র রঙের কুয়াশা হয়ে যায়, সেই কুয়াশা তাকে সব সময় ঢেকে রাখে, সেই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায় এমসি। তার মনের গভীরে লুকোনো একটা যন্ত্রণাবোধের সঙ্গে তার সঙ্গীতচেতনা মিশে যায়। এমসি ভুলতে পারে না, তার বাবাকে রাস্তার দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হয়েছিল, কারণ তার বাবার গায়ের রঙ কালো। রাত দুপুরে তাদের গলিতেই বার বার পুলিস আসে। যেন একমাত্র ওদের পাড়াতেই সমাজ-বিরোধীরা থাকে। অন্ধকার ঘরে বালিশে মুখ চেপে এমসি দেখতে পায়, গলির শেষে একটা কালো চামড়ার লোককে ঘুম থেকে তুলে চকচকে পিস্তল হাতে পুলিস তার পেটে লাথি মারছে, লোকটার গোঙানি এমসির কানে সঙ্গীত হয়ে বাজে। সে বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁপতে থাকে।

স্কুলে ক্লাসের ক্লাসের পর বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে তুলো চিবুনি চালাচ্ছিল এমসি। পাশের একটি সাদা চামড়ার ছেলে রসিকতা করল—চুলে কি তো নুই ব্রান্ড পমেড মেখেছিস? গীটার বাজানো আঙুল মুহূর্তে কুঁকড়ে ইস্পাত হয়ে গেল, সাদা ছেলেটার ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। অথচ এমসি মারকুটে ছেলে নয়। এমন হয়ে গেল, কারণ ছেলেটা লুইয়ের গায়ের রঙ কালো।

সেই এমসি নিউ ইয়র্ক যাবে। তার কিশোরী প্রেমিকা জোন লী নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অভিমানী গলায় বলল—ওখানে কত ঝলমলে সুন্দরী; তুমি আমাকে ভুলে যাবে! এমসির দিদিমা তাকে নিউ ইয়র্কের বাসে তুলে দিলেন। বাস চলতে শুরু করলে এমসি জানলা দিয়ে দেখল, দিদিমার চোখ থেকে গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। এমসির মনে হল, তাঁর গলায় কিছু একটা আটকে আছে, গলে যেতে যেতে শক্ত হয়ে যাচ্ছে আবার। যেন কোনো মামুলি বাংলা উপন্যাসের একটি পাতার অনুবাদ।

একদা এজরা পাউণ্ডের পাঠকদের মনে হয়েছিল, তাঁর কবিতা শুধু ইংরেজি ভাষায় লেখা নয়। পাউণ্ড নিজের কবিতার জন্য নিজস্ব একটি ভাষা তৈরি করে নিয়েছেন। একালের তরুণ নিগ্রো লেখকদের উপন্যাসের গদ্য শুধু ইংরেজি গদ্য মনে হয় না। অন্তত এই বইটিতে ব্যবহৃত শব্দের একটি বড় অংশ আমাদের জানা কোনো অভিধানে নেই। চেনা শব্দও হঠাৎ অচেনা লাগে, কারণ বানান আঞ্চলিক উচ্চারণ অনুসারী, যার ফলে আঞ্চলিকতার রঙ আরো ঘন হয়েছে।

বইটি পড়তে পড়তে জেরোম ডেভিড স্যালিঞ্জারের 'ক্যাচার ইন দি রাই' উপন্যাসটি মনে পড়ে যায়। ওই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলডেন কলফিল্ড আমেরিকায় দু চার বছর আগেও ছিল কৈশোরের প্রতিরূপ। আইভান কারামাজোভ ও হাকলবেরি ফিনের বিদ্রোহের সঙ্গে হলডেনের বিদ্রোহের তুলনা করা হয়েছে। এভাবে ডস্টয়েভস্কি ও মার্ক টোয়েনের সঙ্গে স্যালিঞ্জারের সিঁড়ির প্রথম ধাপটি ছুঁয়েছেন এবং হলডেন ও এমসির মিল শুধু কৈশোরের দুঃসহ অনুভবে।

সুধাংশু ঘোষ

শিল্পকলা

ART OF SUNIL MADHAV SEN. Oxford Book & Stationery Co., 17 Park Street, Calcutta-16, Pp. 15; Price Rs. 20.00.

চিত্রকলা বিষয়ে লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের দেশে অল্প। কারণ এ জাতীয় গ্রন্থের চাহিদা সীমাবদ্ধ, তা ছাড়া প্রকাশন ব্যয়সাধ্যও বটে। ফলে প্রকাশকগণ সহজে এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিতে চান না। এদেশে বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজের কয়েকটি প্রকাশনসংস্থা শিল্পকলা বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশিত করেছেন। ললিতকলা অ্যাকাডেমিও দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের জীবনী তথা অঙ্কন বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নিয়মিতভাবে পুস্তিকা প্রকাশিত করে আসছেন। তবে স্বাধীন দেশের শিল্পকলার ব্যাপকতর পরিচিতি ও প্রচারের জন্য বেসরকারী প্রকাশন সংস্থাগুলির চেষ্টাও বাঞ্ছনীয়, কারণ প্রকাশক হিসাবে এবিষয়ে তাঁদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। সুতরাং আলোচ্য পুস্তকটি প্রকাশ করার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

আইনজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সুনীলমাধব সেন আজ শিল্পী হিসাবে সুপরিচিত। বাল্যকাল থেকেই ছবি আঁকার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। তিনি আপনার মনে ছবি আঁকতেন, সেই সঙ্গে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, জে পি গাঙ্গুলী, অতুল বসুর স্টুডিওতে যাতায়াত করতেন। পরে তিনি

শিল্পী হেমেন্দ্র মজুমদারের স্টুডিওতে কাজও করেন। নিজস্ব প্রতিভা ও গুণীজনের সাহচর্যে, বিশেষ করে চল্লিশ দশকে ক্যালকাটা পেন্টারস-এর শিল্পী সদস্য হিসাবে তিনি পরিচিত হন। ড্রয়িং ও রেখা

সুনীলমাধব সেন অঙ্কিত একটি রেখাচিত্র

অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই ছোট পুস্তকটিতে তাঁর শিল্পীজীবনের প্রথম দিক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম অঙ্কনরীতির ক্রমধারা বর্ণিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিল্পীর আঁকা ছবির ১৩টি হাফটোন, তিনটি লাইন ও একটি রঙীন প্লেটও মুদ্রিত হয়েছে। ভূমিকাটুকু পড়ে ও প্লেটগুলি দেখে শিল্পীর অঙ্কনধারার পরিচয় পেলেও, মনে হয়, সাম্প্রতিক অঙ্কনরীতির আরও কয়েকটি নিদর্শন থাকলে ভাল হত। দেশের ঐতিহ্য, বিশেষ করে প্রাচীন মন্দিরের অপরূপ ভাস্কর্যসম্ভার অবলম্বনে সুনীলমাধব সেন আজকাল নানা উপাদান ও রঙের সাহায্যে নতুন ধরনের শিল্পসৃষ্টি করে চিত্রকলাক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মে শিল্পীর চিন্তাধারা ও কারিগরের সৃজনশীলতার সুন্দর সমন্বয় দেখা যায় এবং এটিই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বইটিতে এ শ্রেণীর ছবির আরও কয়েকটি প্রতিলিপি থাকলে পাঠক সম্প্রদায় তার যথার্থ পরিচয় পেতেন। শুধু তাই নয়, মুদ্রিত রঙীন প্লেটের পরিবর্তে সাম্প্রতিকতম নির্দশনের কোনও রঙীন প্লেট থাকলে বইখানি আরও আকর্ষণীয় হত, এবং তার মধ্য দিয়ে শিল্পীর বিশিষ্ট শিল্পধারার পরিচয় মিলত।

রবীন্দ্র-ভাবনা

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। চতুর্থ খণ্ড। নেপাল মজুমদার। পরিবেশক : চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড। ৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম পনেরো টাকা।

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ের প্রথম তিনখানি গ্রন্থ বিভিন্ন পণ্ডিত মহল এবং রসিকজনের কাছে এখন বিশেষ সমাদৃত। শ্রীনেপাল মজুমদারের শ্রম, নিষ্ঠা এবং গবেষণার জন্যে দেশ পত্রিকায় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য পত্রিকায় যে সমস্ত
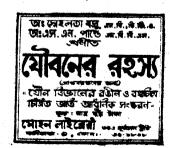
প্রশংসামূলক আলোচনা হয়েছিল, এখন তারই অংশবিশেষ আলোচ্য চতুর্থ খণ্ডের জ্যাকেটে মুদ্রিত। বলা বাহুল্য, চতুর্থ খণ্ডের মধ্যেও শ্রীমজুমদার তাঁর তথ্যনিষ্ঠা, সজাগ বিচারশক্তি এবং বিরাট প্রেক্ষাপটের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মতামত ও ভাবাদর্শের অনুসরণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। বরং বলা যায়, আলোচ্য খণ্ডে তিনি যেন আরও অনেক বেশি তথ্যানুসন্ধ, আরও বিস্তারিত। অনেকেই হয়ত আশা করেছিলেন, বর্তমান খণ্ডেই শ্রীমজুমদার তাঁর বিরাট আলোচনার সমাপ্তি ঘটাতে পারবেন। কিন্তু মাত্র তিন বছরের আন্দোলন ও কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণীতেই প্রায় পাঁচশ পাতায় এই খণ্ডটি ভরে উঠেছে। বইটি পড়তে পড়তে এর কারণও বোঝা যায়।

জীবনের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ এক বিরাট আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, স্বদেশের ও বিদেশের প্রতিটি আন্দোলনের তরঙ্গ তাঁকে আঘাত করছে। অজস্র সংগঠন ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সক্রিয়; পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ভাববিনিময় এখন সবচাইতে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এখন সমস্ত মুখোশ খুলে তাদের নগ্ন নখদন্ত বিস্তার করছে। গণতন্ত্র মানবকল্যাণের ধ্বজাধারী শক্তিগুলিরও প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হচ্ছে, এই পর্বে। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ তাই এই পর্বে আর সৌন্দর্যসাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন না। প্রতিবাদে, ধিক্কারে, কঠোর সমালোচনায় গর্জন করে ওঠে তাঁর কণ্ঠ।

লেখক ইতিহাসের এই অস্থির পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কর্মোদ্যমের প্রায় দিনানুদৈনিক তালিকা সংকলন করেছেন। একদিকে স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ মুহূর্ত—এই প্রচণ্ড ঘূর্ণির মধ্যে দাঁড়িয়ে চিরকালের শান্ত সমাহিত রবীন্দ্রনাথের মত কবিও কী নিদারুণ ভাবে মথিত তার এক সুন্দর আলেখ্য উপহার দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে চতুর্থ খণ্ড। নাৎসীর থাবা পড়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর, উদ্যোগ চলেছে মিউনিক প্যাক্টের — এখানেই শেষ করছেন শ্রীমজুমদার। পাঠক মাত্রই এর পর গভীর উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করবেন পরবর্তী অধ্যায়ের আরও বিক্ষুব্ধ ও আগ্নেয় দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ও ভাবনার ইতিহাসের জন্য।

সরল গীতানুবাদ

ভাগবতী কথা। বিভাবতী দেবী। কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১০, গোকুল মিত্র লেন থেকে প্রকাশিত। দাম—৮·৫০।

সরল বাংলায় দেব মাহাত্ম্যের বই এখনো এদেশে যথেষ্ট নয়। ধর্মতত্ত্ব কিংবা অধ্যাত্মবাদের অধিকাংশ গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত, ফলে ধর্মজিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনেক সময় তাদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। সেদিক থেকে শ্রীমতী বিভাবতী দেবী রচিত 'ভাগবতী কথা' কাব্যগ্রন্থটি বহু ভক্তজনের বাঞ্ছা পূরণে সহায়ক। গ্রন্থের বিষয়বস্তু শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধ, এই অংশে শ্রীকৃষ্ণলীলাই প্রধান বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত হিন্দুদের কাছে এক পরমপ্রিয় গ্রন্থ কিন্তু সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য করে তুলে ধরে বিভাবতী দেবী এখানে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেছেন। সরল বাংলায় কবিতাগুলি সবই ত্রিপদী ছন্দে রচিত এবং কোথাও কোথাও ধর্মভাবের সঙ্গে সংগীতপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় ভাষার ব্যবহার পাঠককে মুগ্ধ করে।

দেবকীর গর্ভে শ্রীভগবানের আবির্ভাব নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থের সূচনা এবং দুই শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী শ্রীকৃষ্ণলীলার নানা ঘটনা আর মাহাত্ম্যের এক অনবদ্য রসলহরী চিত্রিত। সবমোট তিরাশিটি বিষয় এই গ্রন্থের অবলম্বন। সবগুলিই সুলিখিত এবং হৃদয়গ্রাহী। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ মূলত দুইটি প্রধান বিষয় অবলম্বনে রচিত— একদিকে আছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশী শক্তির প্রকাশ। লেখিকাও এই কাব্যগ্রন্থে তা-ই উপহার দিয়েছেন পাঠকদের।

সাঁতার-বীর প্রফুল্ল ঘোষ

পৃথিবীর সাঁতার মান অনুযায়ী ভারত অনেক পিছিয়ে থাকলেও ভারতে নাম করা সাঁতারুর অভাব নেই। ডাঃ বিমল চন্দ্র, আরতি সাহা (বর্তমানে আরতি গুপ্ত), মিহির সেন, নীতিন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখ সাঁতারুরা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেও এত খ্যাতি অর্জন করেননি। কিন্তু সাঁতারে আর কারা ভারতে প্রফুল্ল ঘোষের মত শোরগোল তুলতে পেরেছেন ক'জন?

সাধারণ মানুষ প্রফুল্ল ঘোষকে এন্ডিওরেন্স সুইমিং-এর শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবেই জানে। কেননা প্রফুল্ল ঘোষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুকুরে ২৮ ঘণ্টা থেকে শুরু করে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট পর্যন্ত অবিরামভাবে জলের বুকে সাঁতার কেটেছেন। আবার হাতে শেকল বাঁধা অবস্থায় জলের বুকে বিরামহীন ভেসে থেকেছেন দীর্ঘ ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। কলকাতায়, ঢাকায়, রেঙ্গুনে তাঁর এইসব সাঁতারকে কেন্দ্র করে তৃতীয় দশকে যে মহা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার গল্প কথা এবং আলোচনা আজও শেষ হয়ে যায়নি।

এন্ডিওরেন্স সুইমিং অবশ্যই স্বীকৃত স্পোর্টস নয়। আন্তর্জাতিক সাঁতার সংস্থা বা কোন জাতীয় কিংবা রাজ্য সংস্থার দ্বারাও স্বীকৃত অনুষ্ঠান নয় অবিরাম সাঁতার। তাই বর্তমানে প্রতি-যোগিতামূলক সাঁতারের নিরন্তর পরীক্ষার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সাঁতারের রেওয়াজ কমে গেছে। ওর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পাল্লার তীব্র উত্তেজনা না থাকায় ও সম্বন্ধে মানসিকতাও কিছুটা দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই—মনোবল, সহনশীলতা, শারীরিক শক্তি এবং সাঁতার পটুতার দিক দিয়ে অবিরাম সাঁতারেরও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। তাছাড়া ১৯২৯ সালে হেদোয় অবিরাম সাঁতারের প্রথম প্রয়াসে প্রফুল্ল ঘোষ শুধু জলের ওপর ভেসেই থাকেননি, ২৮ ঘণ্টা জলে থেকে আজাদ হিন্দ বাগের ওই পুকুর পারাপার করেছিলেন ২৭৮ বার। আরও অনেকবারও হয়তো এপার-ওপার করতে পারতেন যদি না তৎকালীন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতেন। পুলিশ কমিশনার এই জন্যই অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, প্রফুল্ল ঘোষের সাঁতার দেখবার জন্য শহরের মানুষ হেদো অঞ্চলে এসে ভীড় জমিয়েছিল। ভীড়ের জন্য রাস্তাঘাট, যানবাহন সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সারা শহরে সৃষ্টি হয়েছিল দারুণ চাঞ্চল্য। যাই হক পরবর্তী সময়ে প্রফুল্ল ঘোষের অবিরাম সাঁতার অবশ্য নিছক জলের বুকে ভেসে থেকে এবং মাঝে মাঝে সাঁতার কেটে সময় কাটানো। তখন সাঁতারু মহলে খবর ছিল, অবিরাম সাঁতারে মার্কিন সাঁতারু আর্থার ডিসোর

বিশ্ব রেকর্ড ৬২ ঘণ্টা ২ মিনিট। এই রেকর্ড ভাঙ্গার জন্য প্রফুল্ল ঘোষ ১৯৩০ সালে দেশবরেণ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর পৌরোহিত্যে হেদোয় এক অনুষ্ঠানের পর জলে নামলেন। ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট জলে

শিল্পীর তুলিতে প্রফুল্ল ঘোষ

থেকে ভাঙলেন তথাকথিত বিশ্ব রেকর্ড। প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন জাতীয় বীর। 'বীর-পূজো' আরম্ভ হল। কলকাতা কর্পোরে-শনের পক্ষ থেকে জানানো হল নাগরিক সংবর্ধনা। পৌরসভার পক্ষ থেকে কোন ক্রীড়াবিদকে নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপনের সেইটিই প্রথম ঘটনা।

১৯৩১-এ কলকাতায় খবর এল লোটি মরে নামে একটি মার্কিন মেয়ে ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট জলে ভেসে অবিরাম সাঁতারের নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছে। প্রফুল্ল ঘোষ ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট জলে থেকে ওই রেকর্ড ভাঙ্গার পর আবার জানা গেল : না, লোটি মরে নয়, ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিটের বিশ্ব রেকর্ড'ও নয়। আসলে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী রুথ লিসিজ নাম্নীয় মার্কিন তরুণী। রেকর্ড সময় ৭৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। তবে মিস রুথ ৭৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট জলের মধ্যে জীবিত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেননা ওই সময়ের পর রুথের প্রাণহীন দেহটিই জল থেকে টেনে তোলা হয়েছিল।

জীবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল প্রফুল্ল ঘোষেরও। ৭২ ঘণ্টা জলে থাকার তাঁর প্রলাপ বকুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শেই তাঁকে জল থেকে একরকম জোর করে টেনে তোলা হয়েছিল।

তবু প্রফুল্ল ঘোষ ওই রুথের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙ্গার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরের বছরই সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন তিনি রেঙ্গুনে গিয়ে রয়াল লেকে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সাঁতার কেটে। বর্মাবাসী এবং বর্মা প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সেদিন তরুণ বাঙালী বীরকে এ নিয়ে কি অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা! শহরের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব ছুটি হয়ে গিয়েছিল। পৌরসভা প্রফুল্ল ঘোষকে জানিয়েছিল নাগরিক সংবর্ধনা।

হাতে শেকল বাঁধা অবস্থায় প্রফুল্ল ঘোষ ৫৪ ঘণ্টা ছিলেন ঢাকার জগন্নাথ হলের পুকুরে ১৯৩৪ সালে। ১৯৩৬ সালে হেদোয় একই অবস্থায় সাঁতার কেটেছিলেন ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট।

কিন্তু শুধুই কি এন্ডিওরেন্স সুইমিং? প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারেই বা প্রফুল্ল ঘোষের ক'জন জুড়ি মেলে? আবার শুধু সাঁতারের কথাই বা বলি কেন, ওয়াটার পোলো খেলা, ডাইভিং-এ, জিমন্যাস্টিকসে এবং অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের দৌড়, লাফ ঝাঁপেও কৃতিত্বের কিছু কিছু নজির আছে। যেমন শিল্পীর সৌন্দর্যে তাঁকে ডাইভিং করতে দেখেছি, তেমন দেখেছি নিপুণ হাতে ওয়াটারপোলো খেলতে। ব্যাকহাফের পদে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তবে সবচেয়ে সুন্দর ছিল ফ্রি স্টাইল সাঁতারের সবলীল ভঙ্গি, অবিরাম হাত ও পায়ের ছন্দোময় কাজে জল কেটে এগিয়ে যাবার নয়নাভিরাম দৃশ্য।

গঙ্গা বক্ষের সাঁতারে ১০ মাইলে প্রথম বা তেইশ মাইলে দ্বিতীয় হবার কথা বলছি না। কিংবা বোম্বে থেকে ট্রম্বে পর্যন্ত আরব সাগরের বুকে ১৪ মাইল সাঁতার কাটার কথাও না। বলছি ১৯২৩ সালে বাংলার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ফ্রি স্টাইলের পাঁচটি বিষয়েই প্রফুল্ল ঘোষের প্রথম হওয়ার কথা। ১০০ থেকে শুরু করে ২০০, ৪০০ ও ৮০০ মিটার এবং এক মাইলে নতুন রেকর্ড করার কৃতিত্বে প্রথম, যে রেকর্ড অম্লান ছিল প্রায় ১০ বছর। কতখানি ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের অধিকারী হলে এই কৃতিত্ব অর্জন করা যায় সহজেই অনুমেয়।

প্রফুল্ল ঘোষের গৌরবদীপ্ত জীবনে নিখিল ভারত প্রতিযোগিতার আয়োজন হত না। ১৯২৭ সালে মাত্র একবারই কলেজ স্কোয়ার পুকুরে নিখিল ভারত সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৫০ মিটারে প্রথম স্থান দখল করার পর বোম্বের ভিক্টোরিয়া সুইমিং ক্লাবের কোচ নিযুক্ত হওয়ায় প্রফুল্ল ঘোষ অপেশাদার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ হারান। কিন্তু দীর্ঘ ৭ বছর পরেও ভারত চ্যাম্পিয়ন সাঁতারুকে তাঁর সঙ্গে পাল্লায় হার স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯৩৯ সালে হেদোয় এমন এক প্রতি-

যোগিতায় প্রফুল্ল ঘোষের কাছে হেরেছিলেন তখনকার ভারত চ্যাম্পিয়ন রাজারাম সাহু।

জলের বুকে কলতান তুলে কিছুদিন আগুন নিয়েও খেলা করেছেন প্রফুল্ল ঘোষ, যাকে জীবন-মরণের খেলাও বলা যেতে পারে।

১৯৩০ সালে বোম্বের চৌপাটিতে ভিক্টোরিয়া সার্কাসে আমি প্রফুল্ল ঘোষের ফায়ার ডাইভিংএর কথাই বলছি। বরেণ্য বীরের বৈচিত্র্যময় জীবনের ওটা অবশ্যই অপ্রধান অধ্যায়। তবু ওরই মধ্যে চিরদিনের ডানপিটে ছেলেটির দুঃসাহসের পরিচয় মেলে, জীবনে বড় ঝুঁকি নেবার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রফুল্ল ঘোষের জন্ম ১৯০০ সালে। বয়স এখন ৭২ বছর। খুব ছোট বেলায় বিখ্যাত জিমন্যাস্ট প্রিয় বসুর কাছ থেকে জিমন্যাস্টিকস শেখার ফলে এবং পরে বোসেজ সার্কাসের সদস্য হিসাবে নানা রকম খেলা দেখাবার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার জোরে বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে ভিক্টোরিয়া সার্কাসে যোগ দেন ১৯৩০ সালে। সেখানেও নানা খেলা দেখাতেন। সবচেয়ে তার আকর্ষণীয় খেলা ছিল ওই ফায়ার ডাইভিং। সাংঘাতিক দুঃসাহসী খেলা। সারা গায়ে পেট্রল মেখে তাতে আগুন ধরিয়ে ৭০ ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হত নীচেকার ছোট্ট জলকুণ্ডে। একটু এদিক-ওদিক হলে জীবন নাশের আশংকা। এই ফায়ার ডাইভিং দেখাতে গিয়েই সেবার কলকাতার পোড়াবাজার কার্নিভালে একটি বাঙালী ছেলে জীবন হারিয়েছিল। ওই দুর্ঘটনার পর মায়ের একান্ত অনুরোধে ভিক্টোরিয়া সার্কাসের তখনকার দিনের দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে প্রফুল্ল ঘোষ কলকাতায় চলে আসেন। অর্থের প্রলোভন বোম্বাইতে বেঁধে রাখতে পারেনি দুরন্ত ছেলেটিকে।

দুর্জয় জীবনে অর্থের পরোয়াও করেন নি প্রফুল্ল ঘোষ। বছর চারেক আগে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবার পর যাকে রাজ্য সরকারের সামান্য সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে, দুর্জয় জীবনে তিনি কি কোনদিন অর্থের পরোয়া করেছেন? সাঁতারের মাধ্যমে কত অর্থ রোজগার করেছেন তার সঠিক হিসাব করা কোনদিন সম্ভব হয়নি বেহিসাবী জীবনের এই মানুষটির পক্ষে। নিশ্চয়ই ওটা ওঁর বোকামি। ডাক নামও অবশ্য 'বোকা'। বোধ করি জীবনে ওর সবচেয়ে বড় বোকামির পরিচয় উদ্যোগ আয়োজন এবং সব পরিকল্পনা ঠিক করেও ইংলিশ চ্যানেল অভিযানে না যাওয়া।

১৯৩৮ সালে একখানি নীল রঙের মোটরগাড়ি অহরহই কলকাতার রাজপথে ঘুরে বেড়াতো। তার পিছনে ইংরেজিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল: "প্রফুল্ল ঘোষ অন ওয়ে টু ক্রস ইংলিশ চ্যানেল উইথ বাণী ঘোষ।" কলকাতার রাজপথ ছেড়ে ওই গাড়ি ভারতের নানা শহর পরিক্রমার পর আফগানিস্থান পর্যন্তও গিয়েছিল। সম্ভবত অর্থকরী পরিকল্পনা ত্রুটিহীন ছিল বলে প্রফুল্ল ও বাণী, গুরু-ছাত্রী দুজনকেই অভিযানের বাসনা ত্যাগ করে ফিরে আসতে হয়েছিল। যদি পরিকল্পনা ত্রুটিহীন হত সম্ভবত প্রফুল্ল ঘোষই পেতেন প্রথম ভারতীয় হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সম্মান।

সম্মান, অভিনন্দন এবং মনীষীদের স্নেহ অবশ্য প্রফুল্ল ঘোষ কম পাননি। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, কবি সত্যেন দত্ত, সাহিত্যিক শরৎ চট্টোপাধ্যায়, দেশ-নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর স্নেহধন্য সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সঙ্গেই শিশু থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রফুল্ল ঘোষের অচ্ছেদ্য বন্ধন। ক্লাবের প্রথম পর্বে ওখানে নিয়মিত সাহিত্যিক আড্ডা জমে উঠতো যাতে যোগ দিতেন কবি সত্যেন দত্ত, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিক। [illegible] কাছেই বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ। হারানো দিনের সেই সব স্মৃতি নিয়ে আজও সাঁতারের মধ্যে ডুবে আছেন প্রফুল্ল ঘোষ। ওঁর হাতে গড়া সাঁতারুর সংখ্যাও কম নয়।

মুকুল

কিংসটনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট, প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য দিল্লিতে আয়োজিত দ্বিতীয় প্রদর্শনী ক্রিকেট এবং কলকাতায় পি সেন ট্রফির প্রথম বছরের ফাইনাল—উল্লেখযোগ্য তিনটি ক্রিকেট খেলা শেষ হবার মুখে হাতে কলম নিয়ে বসেছি। তিনটি খেলার ফলাফল অবশ্য আন্দাজ করা শক্ত নয়। কিংসটন টেস্ট অমীমাংসিতভাবেই শেষ হবার সম্ভাবনা, আর দিল্লিতে রাবার বিজয়ী ভারতীয় দলের কাছে এবং কলকাতায় কালীঘাট ক্লাবের কাছে মোহনবাগানের পরাজয়ের সম্ভাবনা। তবে মহা অনিশ্চয়তাই ক্রিকেটের বড় আকর্ষণ। ভবিষ্যৎবাণী সব সময় হিসাব মত মেলে না।

কে ভাবতে পেরেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫০৮ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার) রানের বড় ইনিংসের বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ড এত ভাল খেলবে? খেলার ফলাফল যাই হোক, এই টেস্টের দুটি ঘটনা বিশেষভাবেই উল্লেখের দাবী রাখে। প্রথম ঘটনা, জীবনে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তরুণ ব্যাটসম্যান লরেন্স রোর ডাবল সেঞ্চুরি। দ্বিতীয় ঘটনা, নিউজিল্যাণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান গ্লেন টার্নারের সারা ইনিংসে অপরাজিত থেকে ২২৩ রান সংগ্রহ।

প্রথমাবির্ভাবে লরেন্স রোর ডাবল সেঞ্চুরি টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে দ্বিতীয় নজির। প্রথম নজির ইংলণ্ডের আর ফস্টারের। সে ৬৮ বছর আগের কথা। সিডনী মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নেমে ফস্টার করেছিলেন ২৮৭ রান। টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগে ফস্টার প্রায় ট্রিপল সেনচুরিই করতে যাচ্ছিলেন। তখন সকলেরই ধারণা হয়েছিল ফস্টারের এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারবে না। ৬৮ বছরের মধ্যে পারেওনি কেউ। কিন্তু [illegible] ভাঙার জন্যই যে রেকর্ডের সৃষ্টি [illegible] লরেন্স রো ডাবল সেঞ্চুরি করে [illegible] করলেন, যদিও ফস্টারের [illegible] রেকর্ডটি এখনো অম্লান। একদিন [illegible] দেখা যাবে এটিও ভেঙে গেছে। [illegible] বয়সী জামাইকার ছেলেটির [illegible] সপ্তাহে এই নিউজিল্যাণ্ডের [illegible] জামাইকার পক্ষে সে ২২৭ রান করে [illegible] টেস্টে করল ২১৪। রো নিঃসন্দেহে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট আকাশের নতুন [illegible] ওরেল, উইকস, ওয়ালকট, সোবার্সের [illegible] উত্তরসূরি।

নিউজিল্যাণ্ডের গ্লেন টার্নারের কৃতিত্ব কম নয়। একেই বড় রানের ইনিংসের [illegible] প্রথম ব্যাট করতে নামলে [illegible] আরম্ভ হয়, তার উপর ঘন ঘন উইকেট পড়তে থাকে। ১০৮ রানের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড দলের অর্ধেক ব্যাটসম্যানকে [illegible] প্রায় পরাজয়ের সম্ভাবনার মধ্যে এসে [illegible] কিন্তু ওপেনার গ্লেন টার্নার এবং [illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৯ জন [illegible] রুখে দিয়ে তৃতীয় দিনের শেষেও অপরাজিত

হকি লীগে মোহনবাগান ও রেঞ্জার্সের খেলায় ভি পেজ মোহনবাগানের প্রথম গোল করছে

থাকে। শেষ পর্যন্ত ৩৮৬ রানের ইনিংসে টার্নার অপরাজিত থাকে ২২৩ রান করে। টেস্ট খেলার ইনিংসে নট আউট থাকার ঘটনা অবশ্য এর আগে আরও ১৮ বার ঘটেছে এবং টার্নারের জীবনেও ঘটেছে আর একবার। তিন বছর আগে লর্ডস টেস্টে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ডের ১৩১ রানের ইনিংসে ওপেনার টার্নার ৪৩ রান করে অপরাজিত ছিল।

দিল্লির প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ক্রিকেটের ফলাফল সবার কাছেই মূল্যহীন। ভারতের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের সমাবেশে প্রতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং চিত্তহর্ষক ও উপভোগ্য ক্রিকেটে দর্শকদের আনন্দ দানই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর একটি উদ্দেশ্যও আছে। সেটি আগামী মরসুমে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলার প্রস্তুতিপর্ব এবং খেলোয়াড়দের গুণাগুণ পরখ করা।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতের বাদবাকী দলের অধিনায়ক ওয়াড়েকর, আবিদ আলী, ভেঙ্কটরাঘবন, গাভাসকর, মানকড় প্রভৃতি হাতে বল মেরে প্রাণবন্ত ক্রিকেটের পরিচয় দিলেও খেলা দেখার জন্য দর্শক সমাগম আশানুরূপ হয়নি। অবশিষ্ট দলের নির্বাচিত অধিনায়ক মনসুর আলী খেলতে আসেননি। গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন কয়েকজনের দাবি উপেক্ষা করে কয়েকজন নতুন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হলেও নির্বাচক সমিতির একজন সদস্য ছাড়া আর কেউ মাঠে হাজির থাকেননি। এই সব কারণে খেলার গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেছে। কলকাতায় আয়োজিত প্রথম প্রদর্শনী খেলাও জাঁকা জমেনি। এখন বাকি বোম্বাইয়ের তৃতীয় প্রদর্শনী খেলা।

অলিম্পিকের প্রস্তুতি

সারা বিশ্বে এখন ম্যুনিখ অলিম্পিকের প্রস্তুতি। সময় বেশী হাতে নেই। মাঝখানে মাত্র পাঁচ মাসের মত সময়। ২৬ আগস্ট থেকে ম্যুনিখে বিংশতিতম বিশ্ব অলিম্পিকের পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হবে, শেষ হবে ১০ সেপ্টেম্বর।

প্রস্তুতি ভারতেও। কোট্টায়ামে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকসের পর অ্যাথলেটিকস কোচিং ক্যাম্প খোলা হচ্ছে। রেঙ্গুনে প্রাক অলিম্পিক ফুটবল খেলার জন্য সম্ভাবিত ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়রাও এখন বোম্বাইয়ের কোচিং ক্যাম্প শিক্ষারত। হকি কোচিং ক্যাম্পের জন্যও ২০ জন খেলোয়াড়কে মনোনীত করা হয়েছে। যদিও

ম্যুনিখ অলিম্পিকের প্রতীক "স্পাইর‍্যাল" অর্থাৎ শাঁকের মত পেঁচালো নকশা, ক্যাদ্রকায় কুকুর ড্যাসহাণ্ডের ছবি এবং অলিম্পিকের পঞ্চবলয়ে এখন জার্মানির বাজার ছেয়ে গেছে। ঘরে ঘরে প্রতি দ্রব্যসামগ্রীতে ওই সব প্রতীকচিহ্ন। অন্যান্য দেশেও এই সব জিনিসপত্রের চাল ও বাজার। ছবিতে একটি জার্মান মেয়ে অলিম্পিক প্রতীকের পোশাক পরে এবং 'স্পাইর‍্যাল' নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারত সফরকারী পশ্চিম জার্মান হকি দলের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জনাই দিল্লির কোচিং ক্যাম্পে ২০ জন খেলোয়াড়ের আমন্ত্রণ, তবু অলিম্পিকের দিকে নজর রেখেই ২০ জনকে মনোনীত করা হয়েছে। জলন্ধরে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর ৩০ জন খেলোয়াড়কে বেছে নিয়ে বিখ্যাত খেলোয়াড় বাবুর পরিচালনায় লক্ষ্ণৌয়ে ২০ দিনের এক কোচিং ক্যাম্প খোলা হবে। তারপর ৩০ জন খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে ১০ জনকে বাদ দিয়ে ম্যুনিখ অলিম্পিকের দল গড়ার আগে আর একটি শিক্ষা-শিবির খোলা হবে ১৫ দিনের জন্য।

কলকাতার হকি খেলা এখনো ভালভাবে জমে ওঠেনি। তবে প্রথমে যেমন শোনা গিয়েছিল অন্য রাজ্য থেকে এবার বেশী খেলোয়াড় কলকাতায় খেলতে আসবে না, এখন দেখা যাচ্ছে সে কথাটি সত্য নয়। নামকরা সব দলেই দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন মুখ। কলকাতার মামুলী ধরনের হকি মরসুমের পক্ষে এটা আশার কথা। কোচিং ক্যাম্পের জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত ২০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে কলকাতারও তিনজন খেলোয়াড় রয়েছে। এরা হচ্ছে গোলকিপার সমর মুখার্জি, হাফ ব্যাক পেজ এবং ফরোয়ার্ড ধ্যানচাঁদপুত্র অশোক কুমার। কলকাতার হকি সমৃদ্ধ হলে এদের খেলারও উন্নতি হবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে।

জলন্ধরের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলার দল গড়ার জন্য প্রথম ডিভিসনের খেলাকেই ট্রায়াল খেলা হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লেসলি ক্লডিয়াস, গুরুবক্স সিং এবং হোরেস রডরিগসের যুগ্ম দায়িত্বে একটি কোচিং ক্যাম্পও খোলা হচ্ছে। অলিম্পিক দল গড়ার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এটাও প্রশংসনীয় উদ্যম।

একলব্য

অরণ্যদেব

লী ফক

ছেলেটির কথা শুনে সবাই হতভম্ব .....
অরণ্যদেব, আমি তোমার দাদাকে ...
ওবিজু কোথায়?

!
ওবিজু ট্রফি নিয়ে আসছিল, তাকে... গুলি... করেছে...

দর্শকের কারও মুখে কথা নেই। একটা ছুঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে।
ওবিজু কি মারা গেছে?
আমি জানি না। আমি দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।
? ?

গাড়িতে এসেছিল। অনেক লোক। বিদেশী। ওবিজুকে গুলি করে ট্রফি কেড়ে নিল। তারপর আমাকে গুলি করল।
ওবিজু কি মারা গেছে?
ও তা জানে না।
7/4

আমি চললুম। চোরদের কাছ থেকে ট্রফি উদ্ধার করে ফিরব।
খেলা শুরু ES করো।
? ?

ওবিজু ....

DR AXEL'S HOSPITAL

আর একটু দেরিতে এলে ওঁকে বাঁচাতে পারতুম না।
কতক্ষণ পরে ওর জ্ঞান ফিরবে, ডাক্তার?
আগামী সপ্তাহে চোখের খোঁজে ৮

সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত রবিশঙ্কর

গাঁজা, আনডারগ্রাউনড সিনেমা, হিপি, আমেরিকার যোগী-ভেকধারী ভারতীয়দের গুরুগিরি, মিয়া ফারোর অভিনয়, ফিল্ম মিউজিক ইত্যাদি অনেক বিষয়ই ছিল পণ্ডিত রবিশঙ্করের প্রেস কনফারেনস-এর আলোচনার অন্তর্গত। সাংবাদিক বৈঠকে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে তাঁকে। সাংবাদিকরা জেনেছেন, বাংলাদেশের জন্য রবিশঙ্কর-জর্জ হ্যারিসন ফাউনডেশনের লক্ষকার্যের কথা। কলকাতায় প্রায় দু'বছর পর তিনি এসেছিলেন মাত্র কয়েকদিনের জন্য। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ম্যাকসমুলার ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেন উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার। শ্রীমতী অমলাশঙ্করের আমন্ত্রণে সাংবাদিকরা পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে এই বৈঠকে মিলিত হন। সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে বসেন, একের পর এক প্রশ্ন করেন। শিল্পীকে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর ফটো-দেশ

মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি কলামন্দিরে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন রবিশঙ্করের সেতার শুনতে। অনুষ্ঠানের ফাঁকে গ্রীনরুমে গিয়ে তাঁর প্রিয় শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন টেড। ছবিতে বাঁদিকে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্রীমতী অমলাশঙ্কর

ফটো—দেশ

কিন্তু সানন্দে তিনি সব প্রশ্নেরই উত্তর দেন। বরং ওইদিন রবিশঙ্করকে খুব কাছের মানুষ মনে হয়েছিল। তিনি বললেন, "দেশে ফিরে অবধি আর বিশ্রাম পাইনি। ডিসেম্বরে ফিরে ভারতের নানা জায়গায় বাজিয়ে বাজিয়ে খুবই ক্লান্তি বোধ করছি।"

পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবারেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, "যাঁরা বলেন বিদেশের শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আমি ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য থেকে সরে যাচ্ছি কিংবা পাশ্চাত্ত্য সংগীতের আদলে ও প্রভাবে বাজিয়ে চলেছি, তাঁরা ভ্রান্ত।" একটু হেসে তিনি বললেন, "আমার বাজনায় নাকি এখন কেউ কেউ ব্যাঞ্জোর ধ্বনি শুনতে পান। একথা যাঁরা বলেন তাঁদের কিছুই বলবার নেই। সত্যি বলতে কী, যখন আমি বাজাতে শুরু করি তখন আমি আমাদের দেশের প্রাচীন সংগীতের ঐতিহ্যে ডুবে যাই। সেখানে কোন আপস নেই।"

"তবে অবশ্য" রবিশঙ্কর আবও বললেন, "একদিক দিয়ে আমার ডাবল লাইফ। অনেক সময় কিছু একসপেরিমেনট করতে হয়। যেমন একটা লং-প্লেয়িং রেকর্ডে লণ্ডন সিমফনি অরকেস্ট্রার সঙ্গে আমাদেরই রাগ-রাগিণী একটু ভেঙে সাজাতে হয়েছে। সেটা ওদের বাজাবার সুবিধার জন্য।"

কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "লণ্ডন সিমফনি অর্কেস্ট্রা খুবই রক্ষণশীল। আধুনিক আবহাওয়া তাঁরা সযত্নে এড়িয়ে চলেন। ওঁদের সঙ্গে যখন কাজ তখন আমাকেও ক্লাসিকাল মিউজিকের ভিত্তিতেই সব কিছু করতে হয়েছে।"

"যাঁরা বলেন আমার বাজনা "ওয়েস্টার্নাইজড" হয়ে গেছে তাঁরা হয়ত জানেন না, এখন আমেরিকায় ও ইউরোপে ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের খাঁটি "অ্যাপ্রিসিয়েশন" কত ব্যাপক। অন্তত বছর তিন ধরে এই অ্যাপ্রিসিয়েশন বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি। এর মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপের বড় বড় শহরে তো কত বাজালাম। দেখেছি শ্রোতারা এখন প্রকৃত সমঝদার। ভারতের সংগীত সম্পর্কে যে "ফ্যাড" বা বাতিক গোড়ায় দেখেছি এখন তা মোটেই নেই।"

সাংবাদিক বৈঠকে আলোচনার প্রসঙ্গ ছিল অনেক। সিনেমার কথা উঠতেই রবিশংকর বললেন, "এখন আমেরিকার সিনেমায় নতুন ধারা এসেছে। সুযোগ পেলেই ছবি দেখতে যাই। কিন্তু ছবিতে নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট দেখছি।"

সিনেমায় রবিশংকরের সংগীত পরিচালনার কথা উঠতেই তিনি বলেন, "যদি বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব দেখতে পাই তবেই সিনেমায় সংগীত পরিচালনার উৎসাহ পাই। "চার্লি" সংগীত পরিচালনার কাজ সে কারণেই নিয়েছিলাম। অনেকটা চ্যালেঞ্জ-এর মত। কিন্তু ছবিটা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। আমার কিছু কিছু কম্পোজিশান বাদ গেছে। সংগীত ব্যবহারে চিত্র পরিচালকের স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। কিন্তু "চার্লি" দেখে আমার মনে হয়েছে, পরিচালক সংগীতের অতটা অংশ বাদ না দিলেও পারতেন। আপনারা তো দেখেছেন 'চার্লি'। "চার্লি"-র মিউজিকের রেকর্ডও বেরিয়েছে। শুনলে বুঝতে পারবেন, কী ছিল আর কী নেই।"

রবিশংকর বিশেষভাবে "অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড" (পরিচালনা : জোনাথন মিলার) এবং "চ্যাপাকুয়া" (কনর্যাড রুক্স পরিচালিত) ছবি দুটির কথা বিশেষভাবে বলেন। দুটি ছবিতেই তিনি সুররচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবিশংকর এখানকার সিনেমা-সেন্সরশিপের কথা বলেন। "সেন্সরের জন্য অনেক ভাল ছবি পুরোপুরি আপনারা এখানে দেখতে পান না। ওখানে আন্ডারগ্রাউন্ড সিনেমা বা নতুন ধারার যে-সব ছবি হচ্ছে সেগুলি সত্যিই দেখবার মত।" এই দেশে সিনেমায় নতুন শিল্পীদের কথা উঠতেই রবিশংকর বলেন, "এখানকার সিনেমাতেও শুনেছি নতুন শিল্পীরা খুব ভাল অভিনয় করছেন। জয়া ভাদুড়ি ও অমিতাভ বচ্চনের কথা খুব শুনেছি। ওঁরা চমৎকার অভিনয় করেন, তাই না?" তিনি এই দেশের অভিনেত্রীদের মধ্যে মিয়া ফারোর কথা বিশেষভাবে বলেন। "চমৎকার অভিনেত্রী মিয়া ফারো"—রবিশংকরের মন্তব্য। "তবে তিনি এখন যোগ সাধনায় খুব উৎসাহী। সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারি না, শিল্পী হিসাবে তাঁর এখন খুব কদর"। কথা প্রসঙ্গে রবিশংকর বললেন, "আমাদের দেশের কেউ কেউ আমেরিকায় গিয়ে নাম-কীর্তন সাধন-ভজন আরম্ভ করে দিয়েছেন

ওরাই আমাদের সংগীতের ভবিষ্যৎ। যদিও বা স্কুল, কলেজ না করি (স্কুল-টুলে ঠিক গান বাজনা শেখান যায় না) অন্তত গুটি কয়েক তরুণদের তালিম দেব। ইচ্ছে আছে কিছু ভাল সেতারী বানাবার। ওটাই আমার এদেশের সবচেয়ে আরাধ্য কাজ হবে। তবে এই দুই বছরও বাইরে প্রাণপণ খাটব। আমি চাই বিদেশীরা সম্যক বুঝুক আমাদের সংগীত কত মধুর, কত শান্তিময়, কত গভীর, কত ঐশ্বরিক।

—সংগীত-সমালোচক

রবিশঙ্করের সেতার—একটি অভিজ্ঞতা

কলামন্দির, ১৫ই ফেব্রুয়ারী। কাল সন্ধ্যা। রবিশংকর ধরেছিলেন তাঁর সেতারে সন্ধ্যার রাগ মাড়োয়া। পুরিয়া স্বরনির্ভর এই রাগটির মেজাজ গম্ভীর ও গভীর। রবিশংকর তাঁর আলাপচারীতে সেই গাম্ভীর্যের প্রতি শৈল্পিক আনুগত্য দেখিয়ে বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন। কজক-গুলো নিপুণ হাতের কাজে এবং বিস্তার সমাবেশে তিনি রাগটির তাৎপর্য সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গকে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাছাড়া মাড়োয়ার বিশেষ তানের (ধ ধ র্ম গ রি গ র্ম রে সা) উপরও শিল্পীর মনীষার ছাপ ছিল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিচার করে দেখতে গেলে রবি-শংকরজী অত্যন্ত কলানিষ্ঠ হয়েও মাড়োয়ার উপর তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার ছাপ রাখতে পেরেছেন। এবং বোধ হয় এই কারণেই তাঁর মাড়োয়া বহুকাল মনে থাকবে যেমন আছে গংগুবাঈ হাংগলের কি ওস্তাদ আমীর খাঁর মাড়োয়া শুধু, রক্ষতার আড়ালে মাড়োয়াতে যে হৃদয়-ভেদী আবেদন লুকিয়ে আছে (রাগটির চারিত্র বিশ্লেষণ একটা ট্রাজেডীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেটা অবার পুরোপুরি ট্রাজেডীও নয়) রবিশংকর সেই আবেদন ভরে তুলেছিলেন তাঁর আলাপ। এবং আমার

দের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁকে নিজের ছেলেকে একটু একটু মনেও হয়েছিল যেন আলাপটা আরও কিছুক্ষণ হলে ভাল হয়।

জোড়ের অংশে বৈচিত্র্যের বিলাসিতা ছিল। ঝালা যদিও ছোট্ট করে শেষ করেছিলেন রবিশংকর তাতে এক ধরনের তীক্ষ্ণতাও নজরে পড়েছে। ঝাপতালে বাঁধা গতেও কারুকার্যের অভাব ছিল না। তাল এবং লয়কারী নিয়ে শিল্পী তাঁর তবলার সঙ্গী আল্লারাখার সঙ্গে সুন্দর বোঝাপড়া দেখালেন। তেহাইএর পর তেহাই, ছন্দচক্রের উপর নতুনতর ছন্দসংকল্প, এবং তান-কর্তবের অভিনবত্বে কান ভরে উঠেছিল। তবে এই সবিস্তার প্রশংসায় বুঝি খাঁটি রবিশংকর থাকবে না যদি পাঠকের ধারণা জন্মায় এই আলোচনা পড়ে যে শিল্পীর সেদিনের মাড়োয়া তাঁর ভুবনজয়ী পরমেশ্বরী বা পূরিয়া কল্যাণের (দ্বিতীয় রাগটির একটা পার এক্সাল্‌স পরিবেশনা আমি ওঁর হাতে শুনেছি) সম পর্যায়ের। মাড়োয়ার বিস্তারের কতকগুলি ইশারা দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে রবিশংকর এর চেয়েও গভীরত্বে পৌঁছতে পারেন।

রবিশংকর মাড়োয়া শেষ করে বাজিয়েছিলেন দু দুটো তিলকশ্যামের গত্‌। এমনিতেই তিলকশ্যাম ভারী মিষ্টি শুনতে। রবিশংকর তাতে যোগ করলেন লাবণ্য। ক্রমে ক্রমে শিল্পীর ডিটেলের চেতনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। দ্রুত অংশে প্রাণে আলোড়ন জাগাচ্ছিল তাঁর সেতার। তিলকশ্যাম এর আগে কখনও আমার কানে এত মধুর অথচ এত ভাবনামগ্ন হয়ে ধরা দেয়নি। একটা মিশ্র রাগের এরকম সংবদ্ধ মূর্তি সত্যিই মানুষকে ভাবিয়ে তুলতে পারে। এই রাগ বাজানোর সময় তান এবং লয়কারীর নৈপুণ্যে দ্রুত আনন্দ দিয়েছিলেন রবিশংকর। আল্লারাখার সঙ্গতও এই পর্যায়ে সব চেয়ে ভাল লেগেছিল।

বিরতির পর যোগ বাজালেন রবিশংকর। পুরো আলাপটাই একটা অভিজ্ঞতা। শুদ্ধ অচারবিশেষে রূপে, রসে, মাধুর্যে রবিশংকর গড়েছিলেন তাঁর আলাপ। অনেক শিল্পীকেই যোগ বাজাতে গিয়ে তিলঙের ডাকে সাড়া দিতে দেখেছি। রবিশংকর শুনে বুঝেছিলাম যোগের বিশুদ্ধ রূপ কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। মীড়ের কতকগুলি মনোহর দ্যুতি এখনও কানে ধরে আছে। গতের অংশের তাৎপর্যগুলিও ভোলবার নয়।

রবিশংকরজীর হাতে ধুন আমি আগেও বহু শুনেছি। সে কথা আমি ভুলিনি, তবে সেই স্মৃতি এবার একটা নতুন ডাইমেনশন পেয়েছে সেদিনের আসরের বাংলা ধুন শোনার পর। রবিশংকরের সেদিনের বাজানো বাংলা ধুনে বাংলার প্রাণের কথা। ধুনটি সেই ভাবেই বাঙালীর মনকে নাড়া দেয় যে ভাবে নাড়া দেয় বাংলার কীর্তন, বাংলার ভাটিয়ালী, রবীন্দ্রনাথ কি অতুলপ্রসাদের গান কিংবা জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কিংবা জসীমুদ্দিনের 'নকসী কাঁথার মাঠ'। মোদ্দা কারণ হয়ত এই যে ধুনটিতে ভাটিয়ার, পাহাড়ী রাগের সুর-লিপি ছাড়াও কীর্তন-ভাটিয়ালীর করুণ কোমলতা আছে। সাত রঙের রামধনুর মত এই ধুনটি সুরের পর সুর ঢেলে একটা সুন্দর, সবুজ বাংলার নকশা এঁকে দেয়। পাঠকরা মাপ করবেন; আর একটা কথা বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে। রবিশংকরের ধুনটি শ্যামানের পাস্তোরালের রোমাণ্টিকতার সঙ্গে বাখ-এর ফিউগগুলির ঈশ্বর-চেতনার সমন্বয়।

উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টারের সাহায্যার্থে রবিশংকরের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। —সংগীত-সমালোচক

গঙ্গা তেরা পানি অমৃত

প্রগতি চিত্র ইনটারন্যাশনাল

প্রগতি চিত্র ইনটারন্যাশনালের এই হিন্দী চিত্রে প্রগতির কথা অবশ্যই আছে। গল্পের বিষয়টাও মূলত প্রগতি-মূলক, যে-কারণে নায়ক দীনেশ (নবীন নিশ্চল) কলেজে পড়াশুনা শেষ করে কৃষিকর্মেই মন দিয়েছে। তার প্রেমিকা মঞ্জু (যোগিতাবলী) সেটা মেনে নিয়েছে। প্রেমাস্পদের মনোরঞ্জনের জন্য কলেজে-পড়া মেয়েটিও কৃষক-কন্যা বা গ্রাম্য বালিকার বেশ ধরে ফেলেছে। এতে অবশ্য শিল্পীর গ্ল্যামারের ক্ষতি হয়নি। ছবির শেষে দেখা গেল নায়ক তার স্বপ্ন প্রায় সাকার করে তুলেছে। ছবি আরম্ভ হবার আগে স্বপ্নের কথা নেপথ্যে ভাষণে এবং পর্দায় লিখে জানানো হয়েছিল। নায়কের স্বপ্ন, জমির আল ভেঙে সকল কৃষকের এই বড় জমিতে একত্র চাষ।

এই তো গেল ছবির আইডিওলজির দিক। গল্পের দিকটাও কম বড় নয়। গল্পের অনেক শাখা-প্রশাখা। নায়ক-নায়িকা তো আছেই। তাছাড়া নায়কের বাবা-চাচার গল্প, নায়কের চাচার সংসারের গল্প, নায়িকার বাবা-মার গল্প ও দুই ডাকাতের গল্প, যারা পরে কৃষক-দরদী। এর উপর প্রমোদ-উপকরণ হিসাবে নানা ঘটনার ছড়াছড়ি—নাচ-গান সমেত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নারী-ধর্ষণ। নায়কের পিতৃকুলের গল্পে দেখানো হয়েছে অতিরিক্ত অর্থলালসা মানুষের জীবনে কী বিপত্তি ডেকে আনে। অর্থের মোহে পড়ে নায়কের চাচা (প্রাণ) আদর্শভ্রষ্ট হয়েছিলেন। তিনি শান্তি পাননি। তাঁর ছেলে ও মেয়ে যথাক্রমে নীচতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন তিনি নিজের ভুল বুঝে আবার গ্রামের মাটিতে ফিরে এসেছেন তখন কৃষক-

"গঙ্গা তেরা পানী অমৃত" ছবির নায়িকা যোগিতাবলী

গুলি করতে হয়েছে। জমির অধিকার নেবার জন্য পিতৃদ্রোহী ছিলেন গুণ্ডো নিয়ে এসেছিল। শেষের দিকের ওই দৃশ্যেও আকর্ষণ।

নায়িকার বাবা-মার মেলোড্রামাতেও আদর্শবাদের ছোঁয়া আছে তবে এতে নাটকীয়তাই বেশি। নায়িকার জননী গৃহ বিতাড়িত, ঋণের দায়ে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগকালে মারা যান। মরবার আগে মেয়েকে কাছে ডেকে পাঠান। নায়িকা তখনই জানতে পারে কে তার মা। তার পিতাকে (অশোককুমার) তখন দেখানো হয়েছে নিঃসঙ্গ ও অনুতপ্ত। এ-রকম একাধিক উপাখ্যানে ভারাক্রান্ত ছবির চিত্রনাট্য। তবে পরিচালক বীরেন্দ্র সিন্‌হা আদর্শবাদ এবং গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য ছবিতে যতই প্রচার করুন দর্শকের চিত্ত-বিনোদনের দিকটা মোটেই ভোলেন নি। হিন্দী চিত্রের নিয়মিত দর্শকরা এই ছবিতে তাঁদের বাঞ্ছিত প্রমোদ-উপকরণ সবই পাবেন। তবে বিচারশীল দর্শকদের ছবির অনেক কিছুই অবাস্তব ও সাজানো মনে হবে বিশেষত নায়কের জীবনদর্শন। একমাত্র গান (রবি সুরারোপিত) সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকবার কথা নয়। সব কটি গানই ভাল, মান্না দে'র গাওয়া ধাম-গান হয়ত খুবই জনপ্রিয় হবে।

বোম্বাই বিচিত্রা

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই অন্তত তিন ধরনের শিল্পী কাজ করে থাকেন। এক ধরন হলেন যাঁরা পেটের জন্য শিল্প করেন, অর্থাৎ শিল্প করেন না, ব্যবসা করেন। শিল্পের শর্তকে এ'রা মানেন না, মুনাফার দাঁড়িপাল্লায় এ'দের কর্মমান নির্ধারিত। অন্যধরন হলেন তাঁরা যাঁরা শিল্পের জন্য শিল্প করেন না নিজেদের জন্য শিল্প করেন অর্থাৎ শিল্পের শর্ত মনে রেখে এ'রা কাজ করেন, অন্য কারুর মন রাখার কথা মাথায় আনেন না। এ'দের পেটের সঙ্গে শিল্পকর্মের কোনো যোগসাজস নেই। এ'রা খেতে পেলেও শিল্প করেন, না খেতে পেলেও শিল্প করেন। অর্থাৎ শিল্প করার জন্য বাঁচতে চান এবং শিল্প করতে গিয়ে মরেন। আরেক ধরন আছেন যাঁরা শিল্প নিয়ে আন্দোলন করেন, অর্থাৎ শিল্প যত না করেন তার থেকে বেশী শিল্প সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, লেখালেখি করেন, আলোচনা সমালোচনা করেন। আমাদের ফিল্মের দুনিয়াতেও এই তিন ধরনের শিল্পীই আছেন। অন্যান্য শিল্পের দুনিয়া দৈহিক দিক থেকে ফিল্মের দুনিয়ার থেকে অনেক ছোট। তাই সেইসব দুনিয়ার শিল্পীদের উত্থান পতনের ইতিহাস নিয়ে তেমন আলোড়ন হয় না, যেমনটি হয় ফিলম দুনিয়ায়।

যাঁরা ফিল্ম আন্দোলন করেন, বক্তৃতা করেন, লেখালেখি, সভাসমিতি করেন, তাঁদের বোঝা ভয়ংকর শক্ত কাজ! ইদানীং কালে ফিল্ম সংক্রান্ত আন্দোলন করে যাঁরা প্রায় প্রতিষ্ঠিত তাঁদের ফিল্ম দেখে কিছু বুঝতে পারি আর নাই পারি, তাঁদের কথাবার্তা শুনে এবং লেখাটেখা পড়ে অন্তত একটা কথা বুঝতে পারি যে, এ'রা নতুন কিছু বলতে চাইছেন ফিল্মের মাধ্যমে। এ'রা যখন বলেন তখন শুনতে বেশ লাগে, এ'রা যখন লেখেন তখন লেখাও বেশ সুপাঠ্যই মনে হয়—এবং মন দিয়ে

পড়ে এবং শুনে দেখেছি যে এঁদের কথা এবং লেখার বক্তব্য জটিল হলেও বুঝতে অন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এঁদের ফিল্ম যখন দেখতে যাই তখনই হয় বিপদ। কারণ এঁদের ফিল্ম ফুটনোট ছাড়া কিছুতেই বোঝা যায় না।

এই অসুবিধার কথা এঁদের সংগে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকবার যারপরনাই নাজেহাল হয়েছি। তবু আমি নাছোড়বান্দা। কারণ আমি এখনো পর্যন্ত কিছুতেই নিজেকে একথা বুঝিয়ে উঠতে পারিনি যে 'এমন ফিল্ম হতে পারে যা আমি নাও বুঝতে পারি'। আমার কেবলই মনে হয় যে, যে কোনো ফিল্মই ভালো বা খারাপ লাগতে পারে কিন্তু এমন ফিল্ম বানানোই সম্ভব নয় যা বোঝা যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ফিল্মের দুনিয়ায় এমন প্রতিভাবান শিল্পীও আছেন যাঁরা ঐ রকম ফিল্ম বানাতে পারেন যা বোঝা যায় না। আর যাঁরা এই অবোধ্য শিল্পের জনক তাঁরা যে কী জিনিস তা তো নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন।

সেদিন এই গোত্রের একজনের সংগে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় বললাম, "আচ্ছা মশাই এমন কাণ্ডটা করেন কি করে বলুন তো?" শিল্পী মৃদু হেসে বললেন, "দুটি উপায়, একটি হচ্ছে আনফিনিশড প্রোডাক্টকে ফিনিশড বলে চালিয়ে অন্যটি হচ্ছে ফিনিশড প্রডাক্টের সংগে অংশচ্ছেদ করে।" অবাক হয়ে বললাম, "কিন্তু কেন?" ভদ্রলোক আবার মৃদু হেসে বললেন, 'জানেন না, শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, শিল্প হল একটি রিলেটেড সম্ভাবনা। আমিই যদি সব বলে দেব তাহলে দর্শক হিসাবে আপনার ভূমিকা কি রইলো। আপনি কেন দেখবেন আর চলে যাবেন? সে রকম ইনডিফারেন্ট দর্শক আমি চাই না। ইউ মাস্ট পার্টিসিপেট। আমি ভুল দেখাবো, ঠিক দেখাবো, কোনটা আপনি আন্দাজ করে নেবেন। আমার সাজেশনের সংগে আপনার কল্পনা মিশবে তবেই তো আমার শিল্প হবে সার্থক। বললাম, "আপনার তো কেবল সাজেশন, কল্পনাটা যখন আমার তখন—" ভদ্রলোক বাধা দিলেন, "কল্পনাটা তো কল্পনা, সাজেশনটাই তো আসল।" বললাম, "কিন্তু কল্পনা ছাড়া আপনার সাজেশনটা তো সম্পূর্ণ নয়।" ভদ্রলোক চটে গেলেন, "শিল্প নিয়ে তর্ক চলে না, আইদার টেক ইট অর লীভ ইট!"

এরপর আর কথা চলে না।

সরল শর্মা

চিৎপুর-চিত্র

চিৎপুরের অভিযোগ : আমাদের সরকার যাত্রাগানের প্রতি বিমাতৃ-সুলভ আচরণ করে আসছেন।

আমাদের সরকারের উদাসীনতার বিষয়ে প্রায়শ আলোচনা হয় চিৎপুরে। এ-গদীতে, নয়তো আর এক গদীতে। শুনতে শুনতে অবশেষে আমাকে প্রশ্ন করতে হল। জানতে চাইলাম, চিৎপুরের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো আসামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগটি সবচেয়ে বড়। জবাবে একজন বললেন, প্রমোদ করের কথা। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে ব্যবসায়িক নাট্যপ্রযোজনা প্রমোদকরমুক্ত সেখানে ব্যবসায়িক যাত্রাভিনয়ের গলায় কেন প্রমোদকরের ফাঁস দিন দিন এঁটে বসবে? ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্য সরকার তাঁর রাজ্যের সংস্কৃতিকে, ঐতিহ্যকে, শিল্পকে প্রমোদকরের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করেছেন অথচ পশ্চিমবাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির প্রয়াস বারংবার ব্যর্থ হচ্ছে। এ-সমিতি নাটক ও যাত্রাকে প্রমোদকর মুক্ত করবার জন্য জনমত সংগ্রহ করেছিলেন। সরকার সে সংগ্রহের কোনো মূল্য দিতে নারাজ।

অবশ্য প্রশ্ন তুললে, তুলনা করলে দেখা যাবে চলচ্চিত্রও তো প্রমোদকরমুক্ত নয়। বিক্ষুব্ধ চিৎপুরবাসীরা এ-যুক্তিও খণ্ডন করেছেন। এ-ক্ষেত্রে ওঁদের কথা এই যে, ক্ষেত্র বিশেষে বহু বিশেষ ছবিকেই প্রমোদকর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ গুণের দিক থেকে প্রায় সমকক্ষ যাত্রাপালা দেশ-কাল থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এ-মরশুমে প্রকাশিত অনেক নতুন পালার মধ্যে তরুণ অপেরার 'আমি সুভাষ', ভারতী অপেরার 'লাল নটিনী', বৈকুণ্ঠ যাত্রা-সমাজের 'অগ্নি অরবিন্দ' জীবননাট্য হিসাবে, অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর 'রক্ত রঙা কাশ্মীর' দেশাত্মবোধক পালা হিসাবে বোধ হয় ওই সুবিধে পাওয়ার দাবি তুলতে পারে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং শেখ মুজিবের দেশপ্রেমকে যাত্রা যতখানি শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে প্রচার করেছে তা অন্যত্র সম্ভব হয় নি। লোকনাট্যের 'জয় বাংলা', নিউ প্রভাস অপেরার 'আমি মুজিব বলছি' নিউ আর্য অপেরার 'বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান'কে তারই উজ্জ্বলতম নজির বলা চলে। বলা বাহুল্য সরকারের দরজায় একাধিকবার প্রার্থনাপত্র পৌঁছে দেওয়া সত্ত্বেও নাকি চিৎপুরী প্রয়াস কেবল পেয়েছে নীরব উপেক্ষা।

পুঞ্জীভূত বেদনা নিয়ে ওঁরা একের পর এক অভিযোগ রেখেছেন। কিন্তু ওরই মধ্যে ওঁরা পরম শ্রদ্ধায় এ-কথাও স্বীকার করেছেন যে, অন্তত এক বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোটা তিনেক যাত্রাপালাকে প্রমোদকর থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। কেন্দ্র সরকার যাত্রাশিল্পকে আকাদেমি পুরস্কার দিয়ে অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যেন ওখানেই শেষ হয়ে গেছে তামাম যাত্রাদলের এই সবিনয় অভিযোগ। ওঁরা বলছেন : পালা সাহিত্য স্বীকৃতি পাক, কেন্দ্র সরকারের বৃত্তি যাত্রাশিল্পকেও দেওয়া হোক। সংগীত নাটক আকাদেমির আর্থিক সাহায্য যাত্রা-শিল্প কেন পাবে না এ-প্রশ্নও চিৎপুরবাসীদের মন জুড়ে রয়েছে।

—সূত্রধার

ছবির খবর

চিত্র-প্রযোজক থেকে পরিচালক

"ইন্টারভিউ" এবং মৃণাল সেনের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ "ক্যালকাটা সেভেন্টিওয়ান" ছবির প্রযোজক দয়াশংকর সুলতানিয়া এখন নিজেই চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন। ছবিটি হিন্দী ভাষায় তোলা হচ্ছে কলকাতা থেকে। নাম : "পরিবর্তন"।

শ্রীসুলতানিয়া স্টার সিস্টেমে বিশ্বাস করেন না। তাঁর "পরিবর্তন" ছবিতে তাই বেশ কিছু নতুন মুখ দেখা যাবে। ওই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন হিনা কওসর, মনীষা, সুধা শিবপুরী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জালাল আগা, চিন্ময় রায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, মেঘ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান রাজীব, ভাস্কর চৌধুরী প্রভৃতি।

উদয়শংকরের পুত্র আনন্দশংকর এ ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই তরুণ সংগীতকারের নবধারার সংগীতচিন্তা ছবির বিশেষ মর্যাদার কারণ হবে বলে শ্রীসুলতানিয়া মনে করেন। ছবিতে চারখানি গান থাকবে। কিশোরকুমারের গাওয়া একটি গান ইতিমধ্যেই রেকর্ড করা হয়েছে।

মেমসাহেব

"মেমসাহেব" ছবির দ্বিতীয় পর্বের সংগীত গ্রহণ করা হয়েছে সম্প্রতি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। অসীমা ভট্টাচার্যের সুরে তাঁর এবং মান্না দে-র গাওয়া একটি দ্বৈত সংগীত এবং বাণীচক্রের শিশু শিল্পীদের একটি সমবেত কণ্ঠের রবীন্দ্র সংগীত রেকর্ড করা হয়। শ্রীমতী অসীমা ভট্টাচার্য এ ছবির প্রযোজক এবং পিনাকী মুখার্জি পরিচালক। শ্রী মুখার্জী এখন উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেনকে নিয়ে দিল্লী, আগ্রা ও জয়পুরের ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করছেন।

সূচীপত্র

(সি ২২১৪)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজিত দত্ত

নির্বাচনে শান্তিশৃংখলা রক্ষা

আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার দুশ্চিন্তা থেকে সরকার এখনও মুক্ত হতে পারেন নি। নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই দেখা যাচ্ছে যে, শান্তি-রক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা করতে সরকারের ত্রুটি নেই। তার মধ্যে সৈন্য-বাহিনীকে মোতায়েন রাখা এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার কোনো কোনো জায়গায় ইতিমধ্যেই সৈন্য বাহিনীকে শান্তি বজায়ের কাজ দেওয়া হয়েছে. সীমান্ত এলাকার কোথাও কোথাও রক্ষীবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নির্বিঘ্নে নির্বাচনের কাজ যাতে হয় সে ব্যবস্থা করতে। এছাড়া যে সব এলাকা উপদ্রুত বলে বর্ণিত তার প্রতিও নজর দেওয়া হয়েছে। এ-রকম এলাকার সংখ্যা উনচল্লিশটি। সরকারীভাবে এই উনচল্লিশটি নির্বাচন কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য স্থানীয় শাসক-কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে, শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে সৈন্য তলব করা চলবে।

নির্বাচনে শান্তি রক্ষার জন্যে সাধারণ ভাবে পুলিস রাখার বন্দোবস্ত বরাবরের। সর্বত্রই এটা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে গত বারের নির্বাচন থেকেই বিশেষ করে এই রাজ্যে একটা একটানা শান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে এমন ব্যবস্থা করতে হয় বলে শুনি নি। এখানে কেন হচ্ছে সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, কেননা আমরা এর কারণটা বুঝি। গতবারের নির্বাচনে তবু একটা কৈফিয়ত ছিল, নকশাল আন্দোলন। এবারে কৈফিয়ত কোথায়?

এবারে সন্ত্রাসের কথা তুলেছে সি-পি-এম গোষ্ঠী। প্রথম থেকেই। এই দলের নির্বাচনী গায়েনই হল, কংগ্রেসী সন্ত্রাস রুখতে হবে। যুক্তফ্রন্টের দু দফা শাসনের পর এই রাজ্যে যে অরাজকতা, সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল তার দিকে আঙুল তুলে কংগ্রেস দল শুধু নয়, অন্যান্য কয়েকটি বামপন্থী দলও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক খুন-খারাপি, দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্যে সি-পি-এমকে দায়ি করা হয়। তার মধ্যে সাঁই-বাড়ি, এবং আসানসোলের কোলিয়ারী অঞ্চলে কিছু শ্রমিক হত্যা ও লাশ গুম করার ঘটনা নৃশংসতম। জনসাধারণের মনে একটি প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় সৃষ্টি হয়েছিল। আজ সেই সন্ত্রাসের পাল্টা অভিযোগ আনছে সি-পি-এম, বলছে কংগ্রেস এই রাজ্যে জনজীবনে হিংসা আমদানি করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে কোনো অভিযোগ এনেই বিপক্ষকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা হয়ে থাকে। তবে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দলের সব প্রচার যে স্বীকার করে নেন বা মেনে নেন তেমন নয়। যেমন, এক বছর আগের কলকাতা শহর আর আজকের কলকাতা শহর একই ধরনের ভয়ভীতি, হিংসাশ্রয়ী ঘটনার কেন্দ্রস্থল হয়ে নেই—এটা লোকে জানে। কয়েকটি জেলাতেও যে অরাজকতা ছিল এখন তা নেই। যেমন বীরভূম জেলা। বীরভূম জেলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেখা দিয়েছে। এই সব দৃষ্টান্ত বিচার করলে মনে হয়, সন্ত্রাসের তীব্রতা বেড়েছে এটা বলা যায় না। বরং বলা যায়, সেটা বহু পরিমাণেই কমেছে।

জনসাধারণ যখন নির্বাচনের কথা চিন্তা করবেন তখন নিছক প্রচার এবং দেওয়াল-লিখন বা দেওয়াল-চিত্র দেখে প্রভাবিত হবেন এমন মনে হয় না। তবে একথা ঠিক, আমাদের দেশে বোধবুদ্ধি-সম্পন্ন ভোটদাতার সংখ্যা নগণ্য, কাজেই অধিক সংখ্যক ভোটদাতাই প্রচারে বিভ্রান্ত হন। তবু, আশা করা যায়, আসন্ন নির্বাচনে ভোটদাতা মাত্রেই তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা একেবারে ভুলে যাবেন না।

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৮
শনিবার ২০ ফাল্গুন ১৩৭৮
Saturday 4 March 1972

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
দ্বিজেন্দ্রকুমার রাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
৩৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
শুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টাঃ ৩২.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৭.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৫.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ২৩.০৪
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৭৬

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৪.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৫৭.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১৪.৭৬

লন্ডন আকাশ ডাকে
বার্ষিক — টাঃ ১৫৪.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৩৮.৭৬

কাগুজে ভাল্লুক নয়!
রাশিয়া
নিক্সন
মাও

[illegible]

ক[illegible] কমিটির [illegible] চেয়ারম্যান পথচারী দত্ত [illegible] স্ট্রীটের ফুটপাথ ভাড়া খাটাবার [illegible] ঘোষণা করায় চারদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে গিয়েছে। বস্তুত এমন [illegible] পৌরপিতা ক্যালকাটা [illegible] আর কেউ জন্মো-ছেন, এমন কোনও রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না।

পথচারী বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বারট্রাম স্ট্রীটের ফুটপাথের সবটা যেন ভাড়া দিয়ে না দেওয়া হয়। খানিকটা জায়গা যেন চেয়ারম্যান মহোদয়ের সমাধির জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়। কারণ যথাকালে ঐ সমাধিস্থলের উপর কাচের তাজমহল নির্মাণ করে চেয়ারম্যান মহোদয়ের পবিত্র মূর্তিটি তার ভিতরে রেখে তাঁর এই যুগান্তকারী কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। যাবতীয় খরচ পথচারী বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকেই নির্বাহ করা হবে।

ফুটপাথ ভাড়া দেবার সিদ্ধান্তে নাগরিকদের ভিতর স্বস্তির ভাব দেখা যায় এবং আর কখনও ফুটপাথে পা দেবার কারণ ঘটবে না জেনে তাঁরা নানাভাবে আহ্লাদ প্রকাশ করতে থাকেন।

ফুটপাথ ভাড়া দিয়ে দিলে লোকজনের যাতায়াতের কোনও ব্যাঘাত ঘটবে কিনা জানতে চাইলে জনৈক ঐতিহাসিক জানান, কলকাতার ফুটপাথে কখনও লোক চলেছে, এমন কোনও প্রমাণ তিনি খুঁজে বের করতে পারেননি।

জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিকও বিভিন্ন যুগে তোলা স্লাইড দেখিয়ে বললেন, প্রমাণ বরং উলটো-টাই বলছে। এই দেখুন এক নং চিত্র। দেখা গেল ফুটপাথ জুড়ে দুটো ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে। দুই নং চিত্রে দেখা গেল, ফুটপাথের উপর এক বিরাট দুগ্ধবতী গাভী দাঁড়িয়ে একটা বড়া বাছুরের গা চাটছে এবং এক গোয়ালা তাকে দোহন করছে। তিন নং চিত্র, ফুটপাথে দেবালয়। চার নং চিত্র, ফলের মত দেহাতিশরা ফুটপাথে সারি সারি বসে প্রাতঃকৃত্য সারছে। পাঁচ নং চিত্র, ফুটপাথে বালির পাহাড়। ছয় নং চিত্র, ফুটপাথে স্তূপীকৃত ইঁট, বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সাত নং চিত্র, ফুটপাথে ডাঁই করা পাথরের কুঁচি, উদ্দেশ্য রাস্তা মেরামত। আট নং চিত্র, ফুটপাথে পাথরের ইঁট জমে আছে, ট্রাম রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। নয় নং চিত্র, ফুটপাথে পূজার মণ্ডপ—(ক) দুর্গা, (খ) কালী, (গ) সরস্বতী, (ঘ) লক্ষ্মী, (ঙ) কার্তিক, (চ) বিশ্বকর্মা, (ছ) শেতলা (জ) নেতাজী, ইত্যাদি ইত্যাদি। দশ নং চিত্র, ফুটপাথে বাস। এগার নং চিত্র, ফুটপাথে

লরি। বার নং চিত্র, ট্যাকসি। তের নং চিত্র, প্রাইভেট কার। চোদ্দ নং চিত্র, টেম্পো। পনের নং চিত্র, ঠেলা ও রিকশার জটলা। ষোল নং চিত্র, অটোমোবাইল রিপেয়ার। সতের নং চিত্র, টায়ার সারাই। আঠের নং চিত্র, লোহা লক্কড়ের কারখানা। উনিশ নং চিত্র, গ্যাস-সিলিনডারের গুদাম। বিশ নং চিত্র, ফুটপাথে আহার ও বসবাস। একুশ নং চিত্র, মীনা বাজার। বাইশ নং চিত্র, জামা কাপড়ের হাট। তেইশ নং চিত্র, বিবাহ, পৈতা, চূড়া, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ; গর্ভাধান ইত্যাদি উপলক্ষে ভোজের প্যানডেল। চব্বিশ নং চিত্র, ময়দানের খেলা—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সাইকেল রেস, স্কেটিং ইত্যাদি। পঁচিশ নং চিত্র, কালচারাল ফাংশান। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রত্নতাত্ত্বিক বললেন, আদি যুগ থেকেই দেখা যাচ্ছে কলকাতার ফুটপাথ চলার প্রয়োজনকে কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি।

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ও সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন, আমিও সেই কথা ভেবে ফুটপাথ ভাড়া দিয়ে দিলাম।

জনৈক সাংবাদিক : মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, বিনা টেন্ডারে ফুটপাথ ভাড়া দেওয়াটা কী বে-আইনি নয়?

মাননীয় চেয়ারম্যান : আর টেন্ডার ডাকলে সেই ছিদ্রপথে বড়লোকেরা যে ফুটপাথ দখল করে বসত, সেটা বুঝি ভাল হত!

নগর প্ল্যানিং কমিটির সদস্যগণ : গরীব মেরে বড়মানুষী চলবে না চলবে না।

সাংবাদিক : সেদিক থেকে বিচার করলে অবিশ্যি বলার কিছু নেই।

আরেকজন সাংবাদিক : মাননীয় চেয়ার-ম্যান স্যার, যারা ফুটপাথ ইজারা প্রথম নেবার গৌরব অর্জন করেছেন, সেই ভাগ্যবান গরীবদের নামগুলো অনুগ্রহ করে ঘোষণা করবেন কী?

মাননীয় চেয়ারম্যান : দোহাই আপনাদের, ভদ্রতার খাতিরে অন্তত নাম জানতে চাইবেন না। ওরা গরীব হতে পারে, কিন্তু মানুষ বটে তো। ভাগ্য দোষে ওরা গরীব [illegible] পারি? বলুন?

[illegible] রিপোর্টার : তা তো বটেই। [illegible] মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আপনি কী ভাবছেন আরও ফুটপাথ ভাড়া দেবেন?

চেয়ারম্যান : আলবৎ দেব। এই তো সবে শুরু। এর পরে চৌরঙ্গী, তারপরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, তারপর ক্রমে ক্রমে গোটা কলকাতার সব ফুটপাথ আমরা গরীবদের ভাড়া দিয়ে দেব। না হলে কী হবে জানেন, সি-এম-ডি-এ ফুটপাথের দখল নিয়ে তা রাস্তায় মিশিয়ে দেবে। আহ্ হা হা মশাই, আগে কী জানি ব্যাটাদের এই মতলব, তাহলে কী আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভি-নিউ আর বেন্টিংক স্ট্রীটের মোড়ের ঐ ফুটপাথে ওদের হাত দিতে দিই হায় হায় হায়, কী টাকাটাই না পিটতে পারতাম মশাই বলুন।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, শুধু কি ফুটপাথই ভাড়া দেবেন, না এর থেকেও কোনও বৃহত্তর পরিকল্পনা আছে আপনার?

চেয়ারম্যান : পরিকল্পনা কি একটা! সারা মাথায় নানান পরিকল্পনা গিসগিস করছে। তবে শুনুন। ফুটপাথের পর রাস্তা ভাড়া দিতে শুরু করব। প্রথমেই শিয়ালদার সামনে, এদিকে হ্যারিসন রোড আর ওদিকে বউবাজার। ওখানটায় বাজার বসিয়ে দেব, তারপর শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা। ওখানটাও বাজারের পক্ষে বেশ সুটেবল। তারপর ধীরে ধীরে সব রাস্তাই ভাড়া দেব। তারপরে পুকুরগুলো। ওগুলো ধোপাদের দিয়ে দেব। তারপর ভাড়া দেব করপোরেশন বিলডিংস। ওটায় পাগলা গারদ হবে, না পাবলিক হাউস, তাই নিয়েই ব্যাপারটা ঝুলে আছে।

[illegible]

আ[illegible] পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আবার ভোট দিতে যাব। পাঁচ বছরে এই চতুর্থ বার। আগের তিন তিন বার আমরা যে রায় দিয়েছিলাম তাতে প্রত্যেকবারই একটা করে সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কোনও সরকারই স্থায়ী হয় নি। পাঁচ বছর বাঁচে নি। অর্থাৎ পূর্ণ আয়ু পায়নি।

তিনবারের দুবার আমরা কোনও স্পষ্ট রায়-ই দিই নি। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনে কোনও পক্ষই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায় নি। কংগ্রেস পেয়েছিল ১২৭। আর দুটো কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট এবং অন্যান্যরা মিলে পেয়েছিল বাদবাকি আসন। নির্বাচনের ফলাফল বের হওয়ার পর দুই কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট এবং অন্যান্যরা মিলে একটা সরকার গঠন করেছিলেন। নাম নিয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার। কিন্তু সে সরকার বেশি দিন টিকল না। কেন টিকল না সেটা দীর্ঘ ইতিহাস। এবং সে ইতিহাস অনেকেরই জানা।

১৯৬৯ সনে কিন্তু স্পষ্ট রায়ই জানা গিয়েছিল। রায় বেরিয়েছিল যুক্তফ্রন্টের পক্ষে। বিপুল বিশালভাবে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সরকার টিকল না। ফ্রন্টের কয়েকটা দল নিজ নিজ পার্টি বাড়াবার প্রচণ্ড বাসনায় এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে ভেতর থেকেই বিস্ফোরণ ঘটতে থাকল। এবং সে সরকারও কিছুদিনের মধ্যেই পদত্যাগ করলেন। এর বিস্তারিত ইতিহাস, এই সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতাও জনসাধারণের অজানা নয়।

তারপর এল ১৯৭১-এর নির্বাচন। প্রধানত কেন্দ্রীয় নির্বাচনের প্রয়োজনেই এই নির্বাচন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। এই নির্বাচনের ফলে কেন্দ্রে একটা অভাবনীয় স্থিরতা এল। কিন্তু রাজ্যে কোনও স্থিরতা এল না। ১৯৬৭ সনের রায়ের চেয়েও ১৯৭১ সনের রায় অস্পষ্ট হল। সরকার কিন্তু এবারও একটা হয়েছিল। এবং সে সরকারও খুব অল্প দিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

এইভাবে ১৯৬৭ সন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলছে একটা অদ্ভুত রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ রাজনৈতিক অস্থিরতার ভয়াবহ শিকার হয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ। রাজনৈতিক অস্থিরতার এত বড় শিকার ভারতের কোনও রাজ্য কখনও হয়নি। উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নষ্ট হয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে ভিত্তি করে ভবিষ্যতের জন্য পরি-

[illegible] দেখিয়েছেন।

[illegible] এই [illegible] এসেছিল আর একটা [illegible]। সেটা হল খুনোখুনি মারামারির রাজনীতি। এটা আমাদের যুক্তফ্রন্টের অবদান। রাজনৈতিক অস্থিরতা ভারতের অনেক রাজ্যেই এসেছে। যার যার এসেছে উড়িষ্যায়, কেরলে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ওসব রাজ্যে ব্যাপক খুনোখুনি মারামারির রাজনীতি আসে নি। যেমনটা এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে। এবং যার রেশ এখনও পুরোপুরি শেষ হয় নি।

এই জিনিসটা এনেছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার। যখন তাঁদের বিরাট বিপুল গরিষ্ঠতা ছিল। সেই গরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করেই ফ্রন্টের কিছু শরিকদল গায়ের জোরে, প্রশাসন যন্ত্রের জোরে দল বাড়াবার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। ফলে এসেছিল মারামারি খুনোখুনি। পশ্চিমবঙ্গে মারামারি খুনোখুনির ব্যাপক আমদানীতে যুক্তফ্রন্টের অবদান চিরস্মরণীয়।

১৯৭২ সনে পশ্চিমবঙ্গে আবার নির্বাচন এসেছে। এবার তাই দুটো প্রশ্ন প্রধান। প্রথম প্রশ্ন, এবারের ভোটে রাজনৈতিক স্থিরতা আসবে কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন, এবারের রায়ে খুনোখুনি মারামারির রক্ত-নীতির অবসান ঘটবে কিনা?

*

রাজনৈতিক স্থিরতা পশ্চিমবঙ্গে এমনিতেই ভীষণভাবে প্রয়োজন। তার উপর বাংলাদেশের জন্য অন্তত এ রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিরতা আরও বেশি করে দরকার।

কংগ্রেস সরকারের বহু দোষ ত্রুটি ছিল। কিন্তু সেই সব নানা দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও

পিকিং থেকে ফিরে

দেবরাজ

জন্ম সার্থক হয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের। ২১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি চীন মুল্লুকে পাড়ি দিয়ে আবার তিনি দেশে ফিরে এসেছেন বেশ মেজাজে। সেখানে তিনি সাত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য চীনের পাঁচিল দেখেছেন। দেখেছেন হ্যাংচাওয়ের হ্রদ যা নাকি চীনেদের কাছে মর্ত্যের স্বর্গ, পিকিংয়ের নিষিদ্ধ পুরীতেও তিনি এক চক্কর ঘুরে এসেছেন। তাঁর আট দিন সফরের সময় অতিথিসৎকারে কোনো খুঁত রাখেননি প্রজাতন্ত্রী চীনের নায়করা। তাঁরা নিক্সনকে খাইয়েছেন দাইয়েছেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়েছেন, তাঁকে আর তাঁর গিন্নীকে উপহার দিয়েছেন, আমেরিকা থেকে আনা উপহারও দিব্যি নিয়েছেন। পিকিংয়ে পৌঁছুনোর সময় খাতিরটা তেমন জমকালো না হওয়াতে নিক্সন আর তাঁর দলবলের একটু অবশ্য মন খুঁতখুঁত করেছিল। তা অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল চু এন-লাইয়ের আদর আপ্যায়নে। চীনের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে খানাপিনায় তুষ্ট করেছেন, অতিথির মান রেখেছেন তাঁর নেমন্তন্ন নিয়ে। আলাপ আলোচনা নিক্সনের সঙ্গে খালি চু এন লাই করেননি, করেছেন কমিউনিস্ট চীনের প্রাণপুরুষ মাও সে তুংও। শেষ বেশ, চু-নিক্সন যুক্ত ইশতাহারও একটা বেরিয়েছে।

দুটো দেশ যদি নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতাতে চায় তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। এক তো সেটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার, তার ওপর দুনিয়ার এখন যা অবস্থা তাতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মনের মিল যত হয় ততই ভাল। তাতে উত্তেজনা ঘুচবে, লড়াই বাধার সম্ভাবনা কমে যাবে, সব দেশই নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের নিজের চরকায় তেল দিতে পারবে। এ ছাড়া যাদের সম্পর্কটা আদায় কাঁচকলায় এমন দুটো দেশ যদি পুরোনো বিদ্বেষ ভুলে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কটা স্বাভাবিক করে তুলতে চায় তো হলে তামাম দুনিয়ার তো তাদের অভিনন্দন জানানো উচিত। সে হিসেবে সব দেশের উচিত নিক্সন আর চু এন লাইকে বাহবা দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা সম্বন্ধে উপদেষ্টা ডঃ হেনরি কিসিংগারকেও। বিশ বছর ধরে প্রজাতন্ত্রী চীনকে একরকম একঘরে করে রেখেছিল আমেরিকা। তাকে নিজে স্বীকৃতি তো দেয়ইনি, আরও পাঁচটা দেশকে না দিতে বাধ্য করেছে। জাতিপুঞ্জে ও ই লাল চীনের ঠাঁই হয়নি গেল বছর পর্যন্ত। নিজের গড়া সে পাঁচিল নিজের হাতেই ভেঙেছে সে দু দশক বছর পরে এটা কী নিক্সনের কম বাহাদুরি?

বাহাদুরি প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানদেরও কম নয়। এই সেদিন পর্যন্ত আমেরিকা ছিল তাঁদের চোখে নয়া উপনিবেশিকতার মূল ঘাঁটি। দুনিয়ার সব জাতকে তাঁরা মার্কিন ডাকাবুকোদের খপ্পরে না পড়তে উপদেশ দিয়ে এসেছেন। নিক্সন যখন পিকিংয়ে পা দিয়েছেন তখনও টিয়েন আন মান স্কোয়ারে বড় বড় হরফে লেখা ছিল—তামাম দুনিয়া এক হও আর মার্কিনী অত্যাচারীদের আর তাদের পোষা কুত্তাদের শিক্ষা দাও। এত তাড়াতাড়ি যে তাদের মন বদলাবে এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল? দেখা যাচ্ছে, কূটনীতিক আর রাজনীতিকদের অভিধান থেকে অসম্ভব কথাটা বাদ পড়েছে। যারা নিজেদের জাহির করে কম্যুনিস্ট সমাজে নৈকষ্য কুলীন বলে মাও সে তুংয়ের শিষ্য সেই চীনেদেরও বুর্জোয়াদের মধ্যমণি মার্কিনীদের কোল দিতে যে বাধেনি তাতে অবাক হবার কিছুই কিছু নেই। এতে দু জোটের যারা অনুগামী তাদের যেমন খুশী হবার কথা তেমনই যারা জোট-ছাড়া তাদেরও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যুগলমিলন দেখে কোনও দেশই আহ্লাদে আটখানা হয়নি—না কম্যুনিস্ট দেশ, না গণতন্ত্রী দেশ। বরঞ্চ সবাই যেন একটু ভয় মেশানো সন্দেহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে মার্কিন-চীন গলাগলির জল কতদূর গড়ায়।

ভয় পেয়েছে ছোট-বড় বিস্তর দেশ। অন্তত তিনটে দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে চু-নিক্সন সমঝোতার ওপর বলে অনেকের ধারণা। সে তিনটে হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর তাইওয়ান। উত্তর ভিয়েতনাম চীনের হাতে তার ভাগ্য সঁপে না দিলেও চীনের মতিগতি বদলালে তার বিপদ বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনের আরও তিনটে দেশের সরকার-বিরোধী কম্যুনিস্টদের। কাম্বোডিয়া, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েতনাম—এ তিনটে দেশেই কম্যুনিস্টরা লড়াই চালাচ্ছে ক্ষমতা দখল করার জন্যে। তাদের প্রধান বাধা আমেরিকা। ও সব দেশে সরকারকে আমেরিকা মদত যদি না দেয় তা হলে তাদের পক্ষে টিঁকে থাকাই শক্ত। তেমনি চীন হাত গুটোলে কম্যুনিস্টরাও কমজোর হয়ে পড়বে, তবে বৃটিশরা তাদের সহায় হয়েও থাকবে আর তার ভরসাতেই ওদের এখন লড়তে হবে। চীনের সঙ্গে দু ... জমাবার জন্যে যদি নিক্সন তিন দেশের দক্ষিণপন্থী সরকারকে ডুবিয়ে দেন তা হলে অবশ্য পোয়া বারো হবে কম্যুনিস্টদের অবস্থা সঙ্গীন হবে উঠবে তাইওয়ানেরও।

চু-নিক্সন যুক্ত ইশতাহারে এমন ... কথা নেই যাতে ইন্দোচীনের কম্যুনিস্ট... বাড়বে, দক্ষিণপন্থীদের ধড়ে প্রাণ ... কিংবা তাইওয়ান স্বস্তি পাবে। চীন স্পষ্ট বলে দিয়েছে, ভিয়েতনাম, লাওস আর কাম্বোডিয়ার জনগণকে যে মদত দিয়ে ... কোরিয়াতে উত্তরের বামপন্থী সরকারকেও। এর মানে আর কাউকে বলে দিতে হবে না। ভিয়েতনামে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে ভিয়েতকংরা যে সাত দফা প্রস্তাব দিয়েছে চীন তা পুরোপুরি মেনে নিয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে পিকিংয়ে পাড়ি দিয়ে ইন্দোচীনের ব্যাপারে অন্তত নিক্সন কিছু সুবিধে করতে পারেননি। চীনকে সালিশ মেনে সেখানকার লড়াইয়ের নিষ্পত্তি করার মতলব যদি তাঁর থেকে থাকে তো তা ভেস্তে গিয়েছে। অবশ্য তাইওয়ানকে তো তিনি পথে বসিয়েছেন। সে দ্বীপ যে চীনেরই অচ্ছেদ্য অংশ তা তিনি স্বীকার করেছেন। তার অর্থ পিকিংয়ে যে সরকার রাজত্ব করবেন তাইওয়ানও আয়ত্তে পড়বে তাঁদেরই এক্তিয়ারে। সমস্যাটার মীমাংসা হবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বলে তিনি যে আশা প্রকাশ করেছেন তা নেহাতই মুখরক্ষে করার জন্যে। তাইওয়ান থেকে ফৌজ সরিয়ে আনার কড়ার তো তিনি করেই এসেছেন, তারপর তাইওয়ান যুঝবে কিসের জোরে?

আটদিন সফর করে নিক্সন পেলেন কী? তাঁর নিজের লাভ যথেষ্ট হয়েছে। দেশের লোকের কাছে নাম কিনেছেন তিনি খুব। যা কেউ আজ পর্যন্ত আমেরিকায় পারেনি—তিনি চীনের ড্রাগনের পিঠের ওপর চেপে দিব্যি ঘুরে এসেছেন, তার পেটের ভেতরে তাঁর ঠাঁই হয়নি। নির্বাচনী কড়িও তিনি বেশ কিছু পেয়েছেন। চীনের সঙ্গে বোঝাবুঝির পালা এখনও শেষ না হলেও তার গোড়া পত্তন তো তিনি করে এসেছেন। তাই বা কী কম? সে কাজ তিনি পাকা করে তুলবেন আরও চার বছর গদিতে থাকলে—এই বলে তিনি ভোট কুড়োতে নামবেন। আমেরিকান ভোটারদের মন এতে কতটা ভিজবে তা সময়ে বোঝা যাবে। আপাতত দেখা যাচ্ছে বড় একটা দাঁও কিছু তিনি কষাতে পারেননি। দু রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলে দূত বিনিময় করতেও চীন রাজী হয়নি। তবে যাতায়াত আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কড়াকড়ি খানিকটা আলগা করতে সে রাজী। বোঝা যাচ্ছে, চীনের সন্দেহ এখনও যায়নি। আমেরিকাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে সে পারছে না।

ঘরে ফিরছে মানুষ

তারাপদ রায়

বেনপোলে আনন্দিত আমগাছের নতুন মুকুল
ফিরে আসা টুনটুনি পাখিকে ডাকে,
এসো এসো বাড়িতে ফিরে এসো
ঘরে ফিরছে ছেঁড়া চাদর, খালি পা, অনন্ত মানুষ
যেন কোনো অপার গোধূলিতে
এক সঙ্গে হাজার হাজার হাট ভেঙেছে
যে যার বাড়ি ফিরছে যত তাড়াতাড়ি পারে।
কিন্তু কোনো হাট নয়, তুচ্ছ কেনা-বেচা নয়;
অশ্রু, রক্ত, আগুন ও মৃত্যুর বদলে, বহু দামে,
সবচেয়ে বিলাসী উড়োজাহাজের চেয়েও দামী টিকিটে
বাড়ি ফিরছে সর্বস্বান্ত মানুষেরা।

ট্রাকের পর ট্রাক, ট্রাকের পর ট্রাক, ট্রাকের পর
মানুষের পর মানুষ,
হরিদাসপুর থেকে নাভারন—
রাস্তার বুক ভেঙে এখনো ফুটে আছে ট্যাঙ্কের চাকা,
হয়তো হাওয়ায় কান পাতলে, জোরে নিশ্বাস টানলে
এক শো দিন আগের সেই কামানের শব্দ, বারুদের গন্ধ
এখনো পাওয়া যাবে।

ধুলো উড়ছে, ধুলোর উপরে ধুলো,
সেই পথ ধরে ঝিকরগাছার ভাঙা পুল পেরিয়ে,
কুয়াশার ভিতর দিয়ে, যশেশ্বরীর দিকে মুখ করে
কালীঘাটের বাজারে দামদর করে কেনা কম্বল হাতে
বাড়ি ফিরছে আমার বাবা-মা, আমার ভাই,
বাড়ি ফিরছে ছানু, দাশু, টুকু আর টুকুর বউ
আর পবন দাসের কোলে দশ মাসের পুঁটিদাসী—
নিষ্পাপ সবুজের সমারোহে রক্তবৃত্তে মথিত
সেই অমল নিশানের সঙ্গে একই লগ্নে যার জন্ম।

ঝিকরগাছার পুলের ধারে বুড়ো গাছের পোড়া ডালে
বহু দিন পরে ফিরে এসেছে শালিকের ঝাঁক;
অনাবাদী ধানখেতের আল ধরে পিছন তাকাতে তাকাতে
পুরোনো পাড়ার দিকে চলেছে নিহত মনিবের নিঃসঙ্গ কুকুর
তার তলপেটে এখনো রাইফেলের আগুনের ঘা।

কিন্তু সেই যে লক্ষ্মী গরু ছিলো গোয়ালে
সারা দিন আহ্লাদী বাছুরকে চাটছে তো চাটছেই,
সেই যে লেজ-ফোলা বেড়াল
চোখ বুজে শুয়ে থাকতো রান্নাঘরের সিঁড়িতে,
আর সেই জালালিয়া পায়রা
বহু দিনের পুরোনো দালানবাড়ির ফাঁকে ফাঁকে,
আর সেই সাতজন্মের গৃহদেবতা শিবঠাকুর,
গুলির শব্দ তাদের কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে,
কোন্ মেঘালয়, কোন্ লবণহ্রদ থেকে কবে ফিরবে তারা?

তবু ফিরে চলেছে ভাঙা কুপি হাতে মুশকিলআসান ফকির,
পঙ্গু পুরোহিতের ময়লা চাদরে বাঁধা শালগ্রাম শিলা,
ফিরে চলেছে রমেশ হলের ছেঁড়া বই,
বিন্দুবাসিনীর হারানো ছেলে।
মরা কৃষ্ণচূড়ার নিচে আমাদের বিন্দুবাসিনী,
যেন আর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না তুমি আছো,
কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,
রমেশ হলের সামনে অমর বকুলগাছের তলা দিয়ে
হেঁটে যাচ্ছেন শেখ মুজিব, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,
বিন্দুবাসিনীর মাঠে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে
হাজার হাজার বন্দুক।

বন্দুক তুমি কার?
বন্দুক তুমি মুক্তির। বন্দুক তুমি স্বাধীনতার।
সেই যে নিরীহ শিক্ষক দুপুরবেলায় ঘরের ভিতরে
যাকে মায়ের চোখের সামনে, ছেলের চোখের সামনে
কুপিয়ে কুপিয়ে কাটা হলো,
সেই যে ফুলের মত মেয়ে ইস্কুলের পথে
চিকন খালের মত তরতর করে চলে যেতো
তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না;
সেই যে বোকা ব্রাহ্মণ বাড়িতে সৈন্য ঢুকেছে দেখে
পুজোর ঘরে ঠাকুরের সামনে প্রার্থনা করতে গিয়ে
মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো আর উঠলো না,
সেই যে বুড়ো হাজী পানাপুকুরে মাথা লুকোতে গিয়ে
চিরদিনের মত লুকিয়ে গেলেন;
বন্দুক তুমি মুক্তির, বন্দুক তুমি স্বাধীনতার;
তুমি সেই অসহায়ের শেষ সম্বল।
বন্দুক তুমি মুক্তির, বন্দুক তুমি স্বাধীনতার;
প্রতিটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়েছো
কালীহাতির মাঠে, মধুপুরের জঙ্গলে, রূপসার ধারে।

বন্দুক, ঘরে ফিরে চলেছে ঘরপোড়া মানুষ
ঘরে ফিরে চলেছে আত্মীয়-হারা মানুষ;
এক কোটি মাইকেল মধুসূদনের হাত ধরে
ফিরে চলেছেন এক কোটি জীবনানন্দ দাশ,
এক কোটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাত ধরে
ফিরে চলেছেন এক কোটি ফজলুল হক।
ফিরে চলেছে শাজাদপুরে শাড়ির কাঁখে ইসলামপুরী কলসী,
পদ্মার ইলিশের পিছু পিছু সুন্দরবনের রয়াল-বেঙ্গল,
গয়নার নৌকোর সঙ্গে কাঁচা রাস্তার টমটম।
এক হাতে চোখের জল মুছে,
আরেক হাতে শক্ত করে শিশুর হাত ধরে
এবড়ো-খেবড়ো যুদ্ধের রাস্তায় ফিরে চলেছে
সর্বস্বান্ত মৃত্যুহীন মানুষ।

"সেই সময় দেখা গেল, কৃষ্ণ 'পিঙ্গলবর্ণ' মুণ্ডিত মস্তক বিকটাকার কালপুরুষ গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছেন।...মূষিকের দল নিদ্রিত মানবগণের নখ ও কেশ ছেদন করছে।...মানবগণ পরস্পরের হত্যায় প্রবৃত্ত হয়ে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে নিপাতিত করছেন।"

মহাভারত, মৌষলপর্ব।

মামাতো বোনের বিয়ের উপলক্ষে মন্ময় তাই এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছে। আসবার সময় মা আনন্দময়ী অনেক উদ্বেগ-আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—হোক ভাইঝির বিয়ে কলকাতার সম্বন্ধে আজকাল যে-সব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে কোন মা-ই সেখানে ছেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না! কলকাতা শহরের খুনোখুনির যেটুকু সংবাদ বাইরে প্রকাশ পেয়েছে তাতে যে-কেউ শঙ্কিত হবে। বিশেষ করে কলকাতায় যাদের আত্মীয়-স্বজন আছে। আর মন্ময়ের মার তো কথাই নেই, তাঁর বাপের বাড়ি এই কলকাতায়!

উত্তর কলকাতার মন্মথনাথের বড় মেয়ের বিয়ের চিঠি পেয়ে এলাহাবাদের আনন্দময়ী ছেলেকে বলেছিলেন, মনুকে লিখে দে, মার শরীর খুব খারাপ, হার্টের অসুখে ভুগছেন, এ অবস্থায় গাড়ি-ঘোড়া চড়া ডাক্তারের বারণ। মা আশীর্বাদ করছেন—

মন্ময় বলেছিল, তা কি ঠিক হবে? ছোটমামা এত করে লিখেছেন! কেউ না গেলে ভাল দেখায় না! তা ছাড়া তোমাকে দেখার তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছে।

সে-কথা কি আনন্দময়ী আর ভাবেননি, কতকাল তিনি বাপের বাড়ি আসেননি। আসা-যাওয়া একেবারেই উঠে গেছে! বাবার অসুখের সময় সেই বুঝি তাঁর বাপের বাড়ি শেষ আসা!

আনন্দময়ী বলেছিলেন, যাবার তো ইচ্ছে

লিখেছিলেন তার সঙ্গে একেবারেই মিলছে না। ছোটমামা যেন কেমন একরকম হ'য়ে গেছেন।

খেতে বসে ছোটমামা বললেন, আমি তো ভেবেছিলুম তোরা হয়তো কেউই আসবি না। বাইরে এ রাজ্যের যে সুনাম ছড়িয়েছে!

মলয় বললে, মা রাতদিন ভয়ে ভয়ে আছেন, কোথায় কি শুনেছেন আর অমনি ও'র মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কেউ একবার গেলে হয়, সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনা চাই!

ছোটমামা বললেন, যত না তার বেশি লোকের মুখে প্রচার হয়েছে! এই তো তুই এলি, রাস্তাঘাটে কিছু দেখলি? কটা খুন জখম হল?

না, সেরকম মলয় কিছু দেখেনি, সোজা রাস্তায় সোজাভাবেই মামার বাড়ি পৌঁছে গেছে। বরং মামার বাড়িতে এসে যেন কেমন থমথমে ভাব দেখছে। গোয়ালটুলির এত বড় বাড়িটা যেন শবাধারে শায়িত মৃতদেহের মত মনে হ'চ্ছে, মড়া বার করার অবস্থা যেন!

মামার দুই ছেলে সুভাষ সন্দীপ, এত রাত হ'য়ে গেল, এখনো ফেরেনি! তাদের কথা কেউ জিজ্ঞেসও করছে না। পরের আত্মীয় কাছে এলে যে আনন্দ-মুখরতা জাগে তার কিছুই মলয় উপলব্ধি করতে পারছে না। আরো বিস্ময়ের আজ বাদে কাল বিয়ে কিন্তু বিয়ে বাড়িতে তার কিছুই প্রকাশ নেই! না ব্যস্ততা, না লোক সমাগম, না সাজ-সজ্জার কোন আবরণ!

ছোটমামা হঠাৎ যেন উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলেন, খেতে খেতে মুখ তুলে বললেন, দেখ তো কে এল?

মামীমা বললেন, কে আবার, দুই বাবুর কেউ!

তেমনি উৎকর্ণ হ'য়ে ছোটমামা বললেন, এগিয়ে গিয়ে দেখ না! সদর দরজাটা কি বন্ধ ছিল না?

মাসীমা বিরক্ত হ'য়ে বললো, কতবার বন্ধ করবো, কে কখন আসছে যাচ্ছে তার ঠিক আছে! বাবুদের জন্যে সব সময়—

মামীমার কথা শেষ হলো না, ছোট-মামার সেজ মেয়ে ইরা খাবার ঘরের দোর-গোড়ায় এসে বললে, বাবা দাদাকে খুঁজতে দুজন লোক এসেছে। দাদা বাড়ি নেই বলতে তোমাকে ডাকতে বললে।

মলয় লক্ষ্য করলে, ছোটমামার মুখটা যেন কেমন হ'য়ে গেল। মৃদুস্বরে বললেন, বাইরের ঘরে বসতে বল

মামীমা চেঁচামেচি ক'রে বললেন, দেখ আবার পুলিস-টুলিস এল কিনা, চারদিকে যা কাণ্ড হ'চ্ছে!

ছোটমামা ধমক দিলেন, তোমার সব তাতে মন্তব্য! যা জান না। বকুনী খাওয়া ছেলের মত শান্ত সুরে মামীমা বললেন, পুলিস না হলেই ভাল! আজকাল বাড়িতে জোয়ান ছেলে থাকলেই ভয়। সেদিন তুমিই তো বললে আজকাল পুলিস যাকে পারছে তাকে ধরছে।

কিছু নয় বা কিছু হয়নি, ভাবটা দেখাতে গিয়ে ছোটমামা নিজের মধ্যে ভয় বিহ্বলতাটা যেন বড় বেশি প্রকাশ করে ফেললেন, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে বললেন, তুই বসে বসে খা, আমি দেখি রাতদুপুরে আবার বাবুদের কে খোঁজ করছে!

মলয় মামীমার মুখের দিকে চাইলে। সে মুখে কেমন উদ্বেগ আর চিন্তার ছাপ! ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যের মত মনে হচ্ছে, বিয়ে বাড়িতে বিয়ের আয়োজন নেই, হঠাৎ পুলিস আসবে কেন? ছোট-

মামার দুই উপযুক্ত ছেলে, তাদেরও কোন পাত্তা নেই!

পুলিসের লোকই এসেছিল। তাদের সংগে তর্ক করে ছোটমামা নাকি বলেছেন, কখনোই হতে পারে না! তাঁর ফার্স্ট ক্লাস এম-এ পাশ করা ছেলে কখনো কোন সমাজ বিরোধী কাজ করতে পারে না! নিশ্চয়ই পুলিস ভুল করছে।

পুলিস বলেছে, তা জানি না, আমাদের কাছে প্রমাণ আছে।

রেগে-মেগে ছোটমামা বলেছেন, তা হলে আপনারা বসুন, তাকে আসতে দিন!

অনেক রাত পর্যন্ত সুভাষ ফেরেনি। পুলিসের লোক ঘর-দোর তল্লাসী করে চলে গেছে।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙতে মলয় দেখলো, তার পাশের খাটে সুভাষ অঘোরে ঘুমুচ্ছে!! সন্দীপের বিছানা খালি!

সুভাষকে ঘুমতে দেখে মলয়ের ইচ্ছে হল, এক থাপ্পড় মেরে জাগিয়ে দিয়ে বলে, এই বেড়াতে যাবিনি?

কিন্তু সংগে সংগে আবার কেমন ভয় হয়। ঘুমন্ত হলেও সুভাষের মুখে-চোখে কৈশোরের সরলতার চিহ্ন নেই, পরিবর্তে কেমন যেন একটা কাঠিন্য সে-মুখ ঘিরে। মলয় সমীহ না করে পারে না—সুভাষ একজন ফার্স্ট ক্লাস এম-এ। গত রাতে পুলিস এসে সুভাষের সম্বন্ধে যা বলেছে তাও তো বড় ভয়ের।

মলয় অবশ্য বিশ্বাস করে না, একজন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ওই সব কাজ করতে পারে। সুভাষকে কি সে চেনে না! সুভাষ তাদের আত্মীয় স্বজনদের গর্বের বস্তু!

বিশ্বাস না হলেও সুভাষকে মলয় এই মুহূর্তে বড় ভয় করে। খাট থেকে নেমে মলয় ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। বিয়ে বাড়ির কোন সাড়াশব্দ নেই। আলো ফোটেনি শহরের ওপর অস্বচ্ছতার একটা ভারি আবরণ যেন! শেওলা-ধরা কার্নিশে রেলিং ঘেরা বারান্দাটা দাঁত পড়ে যাওয়া মুখের মত ঢিলে-ঢালা, শিথিল! কত কাল যে বাড়িটার সংস্কার হয়নি কে জানে! দাদামশায়ের সময় এ বাড়িটা কত না জমজমাট ছিল। ছোটবেলায় লুকোচুরি খেলার কথা মনে পড়ল। খুব বড় বাড়ি, বড় হলে কি এমনি দেখতে হয়, যেন একটা বৃদ্ধ মৃত্যুর অপেক্ষায় ঘর জুড়ে পড়ে আছে।

বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরের দিকে বাড়িটা, দোতলা বাসের ওপর উঠলে চিলে কোঠাটা দেখা যায়। ছোট বেলায় কতদিন ওই নিশানা দেখে মলয় বাস থেকে নেমে পড়েছে। যতদূরে যাক মামার বাড়িটা চিনতে ভুল হয়নি। না, মলয়ের মনে পড়ল, একবার খুব ছোটবেলায় এই বাড়ি থেকে সে নাকি হারিয়ে গিয়েছিল। মা এখনো বলেন, সে কি কাণ্ড! চারদিকে ছোটাছুটি, খোঁজাখুঁজি—মলয় কোথায় গেল, কেউ দেখেছিস?

ছোটবেলায় সব ছেলেরাই নাকি একবার না একবার অমনি হারিয়ে যায়। বড় হয়ে এই নিয়ে সুভাষ আর সে অনেক গবেষণা করেছে। মলয় ভেবে পায়নি কেন যে তাদের কৈশোরেও মাঝে মাঝে এমনি হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। লোকে বলে রহস্যের সন্ধান, অ্যাডভেঞ্চার!

মার কথা মলয়ের মনে হচ্ছে, আসবার সময় মা সাবধান করে বলে দিয়েছেন,

দেখিস বাবা কলকাতায় যাচ্ছিস, ভুলে ভুলে কোথাও যেন যাসনি! বর-কনে চলে গেলেই সোজা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসিস।

মলয়ের এখন মনে হচ্ছে, ভুলে ভুলে সে যেন আর কোন বাড়িতে এসে পড়েছে! বড় রহস্যজনক মনে হচ্ছে বাড়িটা।

'মলয়দা!' ঘাড় ফিরিয়ে মলয় দেখলে, শেলী চায়ের কাপ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। এরি মধ্যে স্নান সেরে ফেলেছে, পিঠময় ভিজে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে। বাঃ শেলীটাকে বেশ দেখতে হয়েছে! একটু ছুঁয়ে দেখবে নাকি? কৈশোরে সুভাষ-সন্দীপের কাছে তাড়া খেয়ে মলয়ের কাছেই শেলী প্রশ্রয় পেত। একবার সেই প্রশ্রয়টা মলয়ের কেমনতর ব্যবহারে নিজেদেরই গর্হিত মনে হয়েছিল, দুজনেই বেশ লজ্জায় পড়েছিল। ইরা-মীরা বলে, মলয়দা দিদিকেই বেশি ভালবাসে।

মলয় জিজ্ঞেস করলে, সুভাষ উঠেছে?

শেলী মাথা নাড়লে। ঘরে ঢুকে মলয় হই-চই লাগিয়ে দিলে, কাল থেকে এসেছি, বাবুর দেখাই নেই! কি ব্যাপার?

সুভাষ বিছানায় উঠে বসেছে চোখ-মুখ থম-থম করছে, তার দিক থেকে কোন সাড়া এল না। মলয় থমকে গেল, ভাবলে ফার্স্ট ক্লাস এম-এ হয়ে সুভাষ বদলে গেছে! মলয় অপ্রস্তুত বোধ করলে।

সুভাষ বললে, অমন ক'রে কি দেখছো?

ম্লান হেসে মলয় বললে, তোকে!

কেন দেখনি কোনদিন?

দেখলেও চিনতে পারছি না যে—ফার্স্ট ক্লাস এম-এ!

সুভাষ বললে, রাখ, রাখ! বল কি খবর, কখন এলে, পিসিমা এসেছেন? যেন অভিমান ভরে মলয় বললে, আমাদের আবার খবর! এসে পর্যন্ত দুজনের একজনকেও দেখতে পাইনি! চাকরি-বাকরি করচিস বুঝি? খুব খাটুনি?

গম্ভীর হয়ে সুভাষ বললে, হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টা!

কই ছোটমামা তো কিছু বললেন না! তোর চাকরি হয়েছে জানলে মা কত খুশী হতেন।

আরো গম্ভীর হ'য়ে সুভাষ বললে, খুশী হবার দরকার কি?

মলয় ক্ষুণ্ণ হল, সুভাষের একথা বলার অর্থ কি! সে কি জানে না তাকে নিয়ে তারা যেমন গর্বিত, তেমনি তার একটা ভাল চাকরির জন্যে সবাই বিশেষ উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত।

সুভাষ বললে, যাক গে, তুমি এখন আছ তো? ভালই হল তোমরা এসেছ, একটু ম্যানেজ করে দাও দেখে শুনে!

মলয় এবার রাগ দেখিয়ে বললে, কেন তোমরা ম্যানেজ করতে পার না? ধেড়ে ধেড়ে দুটি মদ্দ!

আছি, আছি—অত আর রাগ করে না! চটা জড়িয়ে গেল! সুভাষ বললে।

তেমনি রাগ দেখিয়ে মলয় বললে, আছ যে তো দেখতে পাচ্ছি! বিয়ে বাড়িতে এখনো কোন ব্যবস্থাই হয়নি—আলো [illegible] হয়নি, নহবৎ বসেনি, লোকজন আসেনি—

ওসব ভুলে যাও। তবে অনুষ্ঠান ঠিক হবে। বর আসবে, বরযাত্রী আসবে, লোকজন এসে খাওয়া দাওয়াও করবে, কোন ব্যতিক্রম হবে না!

মলয় বললে, [illegible] ইয়ার্কি করিসনি। ছোটমামাকে হেল্প কর!

সুভাষ গম্ভীর হয়ে বললে, তুমি বিশ্বাস করবে না? কলকাতায় [illegible] [illegible] বিয়ের আসর [illegible] আজকাল [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] সমিতি [illegible] [illegible] [illegible] বাজিয়ে পাড়া জাগিয়ে বিয়ে দিলে [illegible] খরচ করলে [illegible] [illegible] তার দু গুণ আরো খরচের কথা ভাবতে হবে—।

কেন? কিসের [illegible]? মলয় উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে।

পাড়ার রক্ষা কর্তাদের [illegible]! [illegible] না বোধ হয়—তবে [illegible] [illegible] ছোরার হাত থেকে বাঁচার [illegible] [illegible] বাবাকে!

সে আবার কি! [illegible] [illegible]? পুলিস নেই, শাসন নেই, সরকার নেই?

সব আছে, কিন্তু ওগুলো বড় [illegible]! ইহাই নিয়ম! বাবা একসঙ্গে খরচ করতে রাজী নয় বলে ওসব হয়নি!

মলয় কি বলবে ভেবে পেল না। মার মুখে একদা এ বাড়িতে বিবাহের যে আড়ম্বর আয়োজনের কথা শুনেছে, তার কিছু যে মিলছে না!

মলয় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, তোরা তা হলে কি করতে আছিস—ভয়ে পড়ে কিছু করবি না? তোরা বড় হসনি?

বড় হলেই কি সব কিছু করা যায়! আজকাল আত্মরক্ষাটা অত সহজ না কলকাতা শহরে।

কেন ওরা পারে, তোরা পারিস না?

তার মানে মারামারি! সেই তো অরাজকতা।

মলয় সুভাষের কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারছে না। থেকে থেকে সেই এক কথা মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে, সত্যি সুভাষ কি এ সবের মধ্যে আছে! কাল যার বোনের বিয়ে সে কেমন নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনায় বিছানায় পড়ে আছে! লজ্জা করে না!

লজ্জা করে সুভাষ বললো, কি ভাবছো?

কিছু না। মলয় মুখ ঘুরালো।

রাগ করছো? তোমার ধারণার সঙ্গে মিলছে না? ভেবেছিলে এসে দেখবে খুব বড় চাকরি করছি, বোনের বিয়েতে খুব হই-হই করছি! তুমি হতাশ হয়েছ!! কিন্তু কি করবে, এই চিত্র আজ সমাজের! একে বদলাতে হবে!

মলয় সবিস্ময়ে মামাতো ভায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। পুলিস তা হলে ঠিকই সন্দেহ করেছে! ইচ্ছে করলো চীৎকার করে বলে, সুভাষ, এ তুই কি করছিস, এ কি ভাবছিস?

বলতে বলতে সন্দীপ এসে ঝড়ের বেগে ঢুকলো। কি ইশারা করলো, সুভাষ তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে মুহূর্তে মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা মলয় বুঝতে পারলো না। সন্দীপকে জিজ্ঞেস করতেও কেমন যেন ভয় আর সংকোচ হল। ঠিক সে সময় মামীমা এসে পড়লেন, বাস্ত সমস্ত হয়ে বললেন, তোরা এখানে কি করছিস—দেখ দেখ যোগাড়-যন্তর কি হলো ওদিকে।

দুপুরে একটু অবসর পেতে মলয় মাকে চিঠি লেখতে বসলো। কি লিখবে ভাবতে যেন অনেকটা সময় কেটে গেল। মনের মধ্যে কেমন একটু জড়তা বোধ করলো। হঠাৎ পিছন থেকে পিঠে খোঁচা খেয়ে চমকে উঠে মুখ ফেরালো। হাসতে হাসতে সুভাষ বললো, আড়ালে বসে কি হচ্ছে? মলয় সুভাষের দিকে চেয়ে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল—এ সুভাষকে সে যেন চেনে না। সুভাষ বললো, অমন করে কি দেখছো! বোধ হয় বিরক্ত করলুম?

মলয় অস্ফুটে বললো, না, বসো!

কাকে চিঠি লিখছো? প্রেম-পত্র নাকি!

চিঠিটা বাড়িয়ে ধরে মলয় বললো, পড়।

চোখ বুলিয়ে সুভাষ বললো, পিসিমাকে লিখছো! কেন—

মা রোজ চিঠি লিখতে বলেছেন।

'ফরেনে' আছ নাকি?

বিদেশের বাড়া! যা দেখছি—মা'র কথাই ঠিক—

সুভাষ বিদ্রূপ করে বললো, গুড বয়!

গুড বয় মলয় বললো গুড-ই তো! না হলে তোদের মত! এত লেখাপড়া শিখে এই পরিণতি।

কত বড় হাব বাজিহাল—

ছোট দেখলে কোথায়? মলয়কে ঠেলা দিয়ে সুভাষ বললো।

ছোট নয় তো কি! চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস, কোথায় কি করছিস,—

সুভাষ উত্তর দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিলো। বাইরে থেকে তার অক্রোশভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।...

চিন্তার কোন কারণ নেই, মাকে লিখলেও দেখে-শুনে মলয় বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে। এ কোথায় কোন মামার বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে! চেনাজানা মানুষগুলো হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে। ওই সুভাষ, সন্দীপ ওরাও যেন কি হয়ে গেছে। সুভাষের সম্বন্ধে অদ্ভুত নীরবতা মামার বাড়িতে। কোন কাজে ওদের কথা হলে মামীমা বলেন, থাক থাক, ওদের প্রসঙ্গ কেন! তোর মামাকে বলিস না! অদ্ভুত ব্যাপার! ছোটমামাও কি কিছু জানেন না, না জেনে-শুনে চুপ করে আছেন? সুভাষরা যা করছে তার পরিণাম কি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, না দেখেও চোখ বুজিয়ে আছেন? এ কি স্নেহ না সর্বনাশ!

বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠান আয়োজন মলয়ের মনঃপূত হয়নি। ম্যারাপ বাঁধা হয়নি, শালু দিয়ে বিবাহ-বাসর মোড়া হয়নি, গেট তৈরি হয়নি, সানাই বাজেনি। কেবল বাড়ির ভেতর উঠোনটা চন্দ্রাতপ দিয়ে ঘেরা হয়েছে, সেখানে গোটাকতক চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে। কোন মতে যেন নিয়ম রক্ষা করা হচ্ছে। ছোটমামা বার বার বলেছেন, এ ঘ বাড়ি এখানে

ম্যারাপ ট্যারাপ দরকার হয় না! লোকজন বসাবার যথেষ্ট জায়গা আছে। কত আর লোক হবে, নিজের আত্মীয়স্বজন আর বরযাত্রী কজন!

মনটা মলয়ের খুঁতখুঁত করে। বেচারা শেলী একদিন বড় মুখ করে বলেছিল, আমার বিয়েতে খুব ধুমধাম হবে, তোমরা কিন্তু আসবে মলয়দা!

আজ শেলী দেখেশুনে কি ভাবলে কে জানে! পয়সা নেই বলে নয় কি একটা একটা কারণে কলকাতার সামাজিক জীবনে উৎসব আয়োজনের ওপর কালো ছায়া নেমেছে—একটা বিমূঢ় আতংক আর ভয় সমস্ত জীবনকে স্তব্ধ করে রেখেছে। ইঁদুরের মত গর্তবাসী সবাই!

এলাহাবাদে বসে লোকমুখে বা খবরের কাগজে কলকাতার অবস্থার যে-সব খবর পেত তাতেই তাদের মনে নানা ভয়-ভাবনা উদ্বেগের সৃষ্টি হত। এখানে এসে ও বাড়ির আবহাওয়া দেখে তার বেশি বই কম নয়। মাকে কি লিখবে! মাঝে মাঝে কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মত মনে হয় শহরটাকে। সমাজের ভিতে কে যেন কী যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। কেন এই মারামারি কাটাকাটি, বিদ্বেষ? কাদের জন্যে এত ধ্বংস-খেলা? সুভাষকে মলয় জিজ্ঞেস করেছিল, এসব করে কি হচ্ছে?

সুভাষ কোন উত্তর দেয়নি। মলয় বারবার বলেছিল, এই কি বিপ্লব?

আস্তে গিয়ে সুভাষ বলেছিল, ও তুমি বুঝবে না।...

যাক গে, ভালোয় ভালোয় এখন কাজ-কর্ম চুকে গেলে হয়। মলয় ছোটমামাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। ছোটমামী বলছেন, তুমি এসে পড়েছিলে, না হলে কি যে হত বলা যায় না। ছেলে দুটোর তো কোন পাত্তাই নেই!

শেলী [illegible] মনে মনে [illegible] সব [illegible] কাজ [illegible] করছে, মলয়ের [illegible] দেখছে। মলয় হঠাৎ করে বলছে, [illegible] বিয়েতে আর [illegible] না। [illegible] কে জানত!

বোনেরা শুরু করেছে, কেন আমাদের পাড়ার কি কোন গোলমাল হয়েছে? ক'টা বোমা পড়েছে, ক'টা খুন হয়েছে?

কথাগুলো এমন সহজ করে এরা বলে যেন কোন ভয় বা ভাবনার কিছু নেই। [illegible], খুন যেন ডাল-ভাত! কাগজের ছাপা খুনোখুনির খবরগুলো যেন এদের [illegible] মনে হয় না। আশ্চর্য!

সন্ধ্যার আগেই বর এসে গেল, [illegible] গেল, নির্বিঘ্নে ও এক বিয়েটা [illegible] আশঙ্কা [illegible] এখন কেবল রাতটা পার [illegible] বসে খেয়ে যে-যার বাড়ি ফিরতে পারে

হয়েছে। নার্স বলতে আনুষ্ঠানিক সব ঘটনা মলয়ের মনে পড়ল!

এখন মলয়ের জন্যে বাড়িশুদ্ধ সবাই অপরাধী হয়ে আছে। বিয়ে বাড়িতে এসে এ কি কাণ্ড হল। মন্মথবাবু তো বিশ্বাসই করতে পারছেন না, দুই ছেলের জন্যে এই দুর্ভোগ। তিনি ভাবতে পারেন না কবে থেকে তাঁর দুই ছেলে তাঁর অভিভাবকদের বাইরে চলে গেছে।...

হাসপাতাল থেকে ফিরে কি মনে করে ইরা মলয়ের সুটকেশ গোছাতে বসল। মলয়দা যে ঘরে ছিলেন সে ঘরটা এলোমেলো হয়ে আছে, কাল পুলিস সার্চ করে গেছে। পুলিসের ধারণা সুভাষ এই বোমা-ফেলার ব্যাপারে আছে, নিশ্চয়ই বিপক্ষ কাউকে লক্ষ্য করে কাজটা করা হয়েছে। পুলিসের যেমন কথা মন্মথবাবু উড়িয়ে দিয়েছেন। প্রমাণ খুঁজতে পুলিস বাড়ি তল্লাসী করে গেছে। সুভাষকে থানায় যেতে বলেছে। মন্মথবাবু অনেক তর্ক করেছেন, কিন্তু পুলিস তার ধারণা নিয়ে আছে।

সুটকেস গোছাতে গিয়ে ইরা দেখল মলয় দু তিন খানা চিঠি লিখে রেখে গেছে। সবগুলোই এলাহাবাদের পিসিমাকে লেখা! কিন্তু পোস্ট করেনি কেন? চিঠিগুলো ইরা উল্টেপাল্টে দেখলে, সবই এখানকার খবর—ভাল আছি, সাবধানে আছি, নিরাপদে পৌঁছেছি ইত্যাদি। মনে মনে ইরা কৌতুক বোধ করে—কেন মলয়দা কি জলে পড়েছিল, না কোন বিদেশ বিভূঁই-এ এসেছে? অত বড় ছেলে যেন ছেলেমানুষ! এলাহাবাদ থেকে কি কলকাতা অনেক দূরে? অত যদি ভয় তা হলে আসবার কি দরকার ছিল! সব ভয়েই মল!

কিন্তু এ কি! হঠাৎ লেটার প্যাডের মধ্যে থেকে একটা চিঠি বেরল। হাতের লেখা দেখে ইরা চিনলে। ওঃ তাই বলি! ইরা মুখ গম্ভীর করে চিঠিটা নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করলে, পড়বে কি না ভাবলে।

পরের চিঠি পড়া উচিত নয়, তবু ইরা চিঠিটা থেকে চোখ ফেরাতে পারলে না—শেলী মলয়কে কলকাতায় আসবার জন্যে লিখেছে। ইনিয়েবিনিয়ে ছেলেবেলার কথা লিখেছে!

মনে আছে?' না এলে—আরো কত কি লিখেছেন। ইরার রাগ হল, মলয়দা চিরকাল দিদিকে বেশি ভালবাসে! মনে মনে বললে, বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে, এবার কত মনে করবে কর! দিদি তো দিব্যি শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তুমি হাসপাতালে মর! পিসিমা আসেননি যখন তুমি তা হলে এসেছিলে কোন সাহসে? বুঝেছি, বুঝেছি—

রাগে সুটকেসটা বন্ধ করতে গিয়ে হাতটা চেপে গেল। উঃ বলে হাতটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তে মনে হল কে যেন আচমকা তাকে সামনে ঠেলে দিলে। নীচে তখন একটা আর্ত কোলাহল আরম্ভ হয়েছে। মা বুঝি কাঁদছেন!

ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইরা দেখলে, সবাই মিলে আনন্দময়ীকে ধরাধরি করে এনে উঠোনে শুইয়ে দিয়েছে। মলয়দার বড় ভাই সমরদা [illegible] বললেন, হাওড়ায় এসে মা যখন [illegible] ওঠেন বেশ সুস্থ ছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে একবার কেবল জিজ্ঞেস করেছিলেন [illegible] কি হয় [illegible] কিছু লক্ষ্য করিনি। কখন যে—

হায় মা হা-হুতাশ করছেন। [illegible] দিয়ে [illegible] গেল!

বারান্দার রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে ইরার মনে হল [illegible] টানছে—এখনি বুঝি হাত-আলগা হয়ে পড়ে যাবে!

ইরা প্রাণপণে রেলিংটা আঁকড়ে ধরে। [illegible] পড়ল, [illegible] ঠিক ঐ জায়গাটিতে [illegible] পড়ে গিয়েছিলেন। [illegible] ওই রকম [illegible] দাঁড়িয়ে ছিল!

সার্ধজন্মশতবর্ষে রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধনী কাব্যের একস্থানে লিখেছিলেন,

বিজ্ঞেন্দ্র রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান-আধার,
বিলাত পর্যন্ত খ্যাতি হয়েছে বিস্তার.
ভূতপূর্ব-বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়,
ক্ষত্র-বংশে তুলেছেন সেনরাজচয়,
রহস্যসন্দর্ভপত্র-যোগ্য-সম্পাদক,
পিতৃহীন ধনশালী শিশুর শিক্ষক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা পুরাতত্ত্ববিদ সমালোচক এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অসামান্য মনস্বী পুরুষ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (জন্ম ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ খ্রী: মৃত্যু ২৬ জুলাই ১৮৯১ খ্রী) আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হল।

রাজেন্দ্রলালের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন'। চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর তিনি মাসিক একশত টাকা বেতনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এখানে কর্মগ্রহণের পর থেকেই তাঁর গবেষণা জীবনের সূত্রপাত। অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি য়ুরোপীয় পণ্ডিত সমাজে ভারত-তত্ত্বানুরাগী রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মাক্সমুলার রাজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে লিখেছেন

'Babu Rajendralal reads Sanskrit of course with the greatest ease. He is a pandit by profession, but he is at the same time, a scholar and critic in our sense of the word. He has edited Sanskrit texts after a careful collection of manuscripts, and in his various contributions to the Journal of the Asiatic Society of Bengal, he has proved himself completely above the prejudices of his class, freed from the erroneous views on the history and literature in India in which every Brahman is brought up, and thoroughly imbued with those principles of criticism which men like Colebrooke, Lassen and Burnouf have followed in their researches into the literary treasures of his country.'

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলালের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। পাল ও সেন যুগ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেন-বংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই তাঁহার মতের সংপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে তাঁহার মত সকলের গ্রাহ্য হয় নাই: কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রতিবাদী, তাঁহারা এমন কোন কারণ নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন। গথ্ কর্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক আবিষ্কৃত সেন-পাল-সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত ঐতিহাসিক মনে করি।'
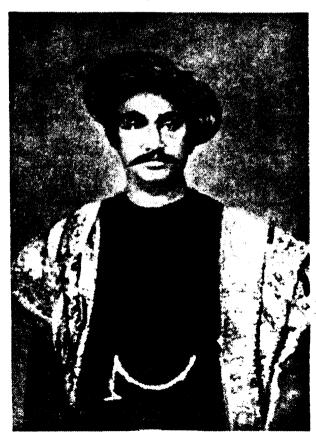
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘকালের ইচ্ছা ছিল বাঙলা দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিত হোক। ঊনিশ শতকে বাঙলা দেশে ইতিহাসচর্চায় যে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য লক্ষিত হয় তার পথিকৃৎ হিসাবে রাজেন্দ্রলালের নাম স্মরণীয়। কিন্তু বহুবিধ গবেষণা ও কর্মপ্রবাহের মধ্যে তিনিও বাঙলা দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখে যাবার অবকাশ পাননি। অথচ এ কাজে তিনিই যে যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন তা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেন। বঙ্গ দর্শনে ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, 'এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্যে ক্ষমতাবান্ বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না।'

রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে সমকালীন আরও একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গ দর্শনে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ইঁহার বিবিধার্থ-সংগ্রহ বাঙ্গালাদেশের সর্বপ্রধান সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা। বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে ইনি নিজে দক্ষাগ্রগণ্য, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য ইঁহার চেষ্টারও কিছু মাত্র ত্রুটি নাই। ইনি বরণেকুলার লিটরেচর সোসাইটি এবং স্কুল বুক সোসাইটির অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রন্থকারকে যে উৎসাহ দিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে।'

ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ এবং স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে সেকালে শিক্ষার্থীদের জন্য নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। রাজেন্দ্রলালেরও কয়েকটি বাংলা পুস্তক এই দুই সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যেই রাজেন্দ্রলাল তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রকাশের সুযোগ পান। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে, ১২৫৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে 'পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণীবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদিদ্যোতক - মাসিক-পত্র' বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

শৈশবে এই বিবিধার্থ-সংগ্রহ পাঠের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে বিবৃত করেছেন।

'রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি-মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে। এই ধরনের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন।'

বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রকাশের পূর্বেই সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। সেই বিজ্ঞাপনে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে। ১৮৫১র ১২ সেপ্টেম্বর তারিখের প্রভাকরে 'শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ-সংগ্রহ সম্পাদক' জানিয়েছেন, 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে উপরোক্ত নামক এক নূতন মাসিক পত্র আগামী আশ্বিন মাসাবধি প্রকটিত হইবেক। যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমং সৎ ও আনন্দজনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় পেনি মেগাজিন নামক পত্রের অনুবর্তিত্ব এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধার্থে অবিরত সম্যক চেষ্টা করা যাইবেক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং

হবেক। প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক।'

বিবিধার্থ-সংগ্রহ সপ্তম পর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। প্রথম ছয় পর্বের সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল, সপ্তম পর্ব সম্পাদন করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। বিবিধার্থ-সংগ্রহে রাজেন্দ্রলালের বহু মূল্যবান নিবন্ধ ও সমালোচনা মুদ্রিত হয়েছিল যার অনেকগুলি অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। এই বিবিধার্থ-সংগ্রহেই মধুসূদনের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের কিয়দংশ প্রথমে মুদ্রিত হয়। রাজেন্দ্রলাল ব্যতীত যাঁদের স্বাক্ষরিত রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিবিধার্থ-সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল সমকালীন বহু গ্রন্থের মূল্যবান সমালোচনা প্রকাশ করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই পত্রিকার 'নতুন গ্রন্থের সমালোচন' বিভাগটির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে প্রভাবিত হন ও স্বীয় বঙ্গদর্শনে সাহিত্য-সমালোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। রাজেন্দ্রলাল তাঁর পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বলেছিলেন, 'যাহাতে সাধারণ লোকে নূতন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থের দোষ-গুণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব।' বিবিধার্থ সংগ্রহের সপ্তম পর্বের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত পত্রিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বিবিধার্থ নিয়ত শুদ্ধ সাধারণের হিতচেষ্টায় বিরত ছিল; উহাতে কখন কাহার নিন্দা বা সম্পদ্-সুলভ সম্মান-লোভে ধনীর উপাসনা করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের সমালোচন সময়ে কখন কখন কোন কোন গ্রন্থকারের উপর কটাক্ষের আভাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্র; তাহাতে কেবল গ্রন্থই উদ্দেশ্য, কদাপি কোন গ্রন্থকারের নিন্দা অভিপ্রেয় হয় নাই। তাহা পরিশুদ্ধ সরল-হৃদয়-সম্ভূত, তাহাতে দোষ বা রোষের লেশও লক্ষিত হয় না; বরং ভারতবর্ষীয় বর্তমান গ্রন্থকারকুলের কল্যাণসাধনই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য।'

রাজেন্দ্রলাল তাঁর বিবিধার্থ-সংগ্রহে মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের উক্তি লক্ষণীয়। রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লেখেন, 'Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Vividartha? I suppose you have. It is kind.'

বিবিধার্থ-সংগ্রহের পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মাসিকপত্র রহস্য-সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। বিবিধার্থ-সংগ্রহের ন্যায় রহস্য-সন্দর্ভ পত্রিকা সম্পাদনেও রাজেন্দ্রলাল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

স্বসম্পাদিত পত্র ব্যতীত তৎকালীন দেশী ও বিদেশী বহু পত্রপত্রিকায় রাজেন্দ্রলালের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain, Anthropological Society of London, Calcutta Review, Hindoo Patriot, Statesman, Englishman Friend of India. প্রভৃতি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজেন্দ্রলালের কর্মময় জীবনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমকালীন কোনো কোনো বাংলা পত্রিকার গুরুত্ব কম নয়। পুরাতন সংবাদ প্রভাকর ও সোমপ্রকাশ পত্রিকা থেকে রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে বহু তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। রাজেন্দ্রলালের কিছু কিছু মূল্যবান ভাষণও সোমপ্রকাশে মুদ্রিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ১২৭৭ বঙ্গাব্দের

২৮ তারিখের সোমপ্রকাশ মূল্যবান। সংবাদের শিরোনাম, 'ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতির প্রতিবাদকারিণী সভা'। সভার মূলে প্রস্তাব হল, 'লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়া যান এবং তাঁহার পর পর গবর্ণর জেনেরলেরা যাহাতে উৎসাহ দান করেন, তদ্দ্বারা অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা এ দেশের সমাজ ধর্মনীতি ও বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক উপকার হইয়াছে। এক্ষণে ইংরাজী কলেজে ও বিদ্যালয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে সাহায্য দিতেছেন, তাহা রহিত ও ন্যূন করিলে তাহা এ দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।' রাজেন্দ্রলাল এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। সোমপ্রকাশ লিখছেন, 'বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এক তীব্রতর বক্তৃতা করিয়া এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, ইংরাজী শিক্ষা ভিন্ন এ দেশের কুসংস্কার দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষার্থ আবেদন করেন। এই নিমিত্ত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ও মেকলে বর্তমান প্রণালী স্থাপনার্থে যত্নবান হন। গবর্ণমেণ্ট বলেন আমরা বিনাব্যয়ে শিক্ষা পাইতেছি। একথা অমূলক। কাহার টাকায় আমাদিগের শিক্ষা হইতেছে? তাহা কি আমরা করস্বরূপ দিতেছি না? আর আমাদিগের নিমিত্ত অধিক ব্যয় হয় এ কথাও সম্পূর্ণ অলীক। অক্সফোর্ডে এক্ষণে উপদেশ শ্রবণের ব্যয় ৩৫ টাকা মাত্র হইয়াছে, কিন্তু বাঙালী ছাত্রেরা ১৯ টাকা প্রদান করেন। ইটালি ও ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা অধিক টাকা ব্যয় করেন। বঙ্গদেশের শিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৭ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয় দেন। যেখানে ১৮ কোটি টাকা আয়, সেখানে ইহা কি যথেষ্ট ব্যয়? জাতীয় ভাষা উত্তম বটে, কিন্তু ইউরোপীয় ভাষার দ্বারা অলংকৃত করিবার পূর্বে ইহাতে শিক্ষা হইতে পারে না। জাতীয় ভাষা যাহা হইতে তৎপ্রতি আসক্ত থাকা যথার্থ দেশহিতৈষীর কাজ নহে। যাহা যে ভাষার ভাল তাহা গ্রহণ করাই যথার্থ কর্তব্যকর্ম।'

উল্লিখিত ভাষণে রাজেন্দ্রলাল এ দেশে ইয়োরোপীয় শিক্ষার গুরুত্বের কথা নির্দেশ করেছেন। তাঁর এই ভাষণ বাংলা ভাষার প্রতি অনাদর হিসাবে কল্পনা করলে ভুল করা হবে। বাংলা ভাষার উন্নতি সাধন প্রয়াসে তিনি যে শুধু পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশ করেছেন তাই নয়, এই ভাষার উন্নতির উপায় সম্বন্ধে তিনি সমগ্র জীবন নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেছেন। বাংলা পরিভাষা রচনা প্রয়াসে রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ এ প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা পরিভাষা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় সারস্বত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার সভাপতি হন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সহকারী সভাপতি হিসাবে মনোনীত হন বঙ্কিমচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ। বাংলা পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে এই সভার উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বলিতে গেলে যে কদিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই

আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সম্ভবতো রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের ছিল।...তখন যে বাংলাসাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্রমহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত, তবে বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।'

এই সভার প্রথম অধিবেশনে সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা সহ সভার প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণী রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত তাঁর তৎকালীন একটি ডায়েরি বা খসড়াখাতা থেকে উদ্ধার করা গিয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের উক্ত পাণ্ডুলিপি থেকে এখানে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল।

'১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বাংলাভাষার সাহায্য করিতে হইলে কি কি বিষয়ে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, বানানের উচ্ছৃঙ্খলতা। বাংলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কি না এবং শব্দবিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ উপযোগী কি না, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারো কাহারো মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নাম সকল বাংলায় কিরূপে বানান করিতে হইবে তাহা স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সমস্কৃত নামকে অনেকে 'ভিক্টোরিয়া' বানান করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজী "V" অক্ষরের স্থলে অন্তঃস্থ ব সহজেই হইতে পারে। ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাংলায় বিস্তর গোল যোগ ঘটিয়া থাকে—এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায়—ইংরাজী

সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রদত্ত ভাষণ। সমাজ-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্ত সভার স্বহস্তলিখিত কার্যবিবরণী।

Isthmus শব্দ কেহবা "ডমরু-মধ্য" কেহবা "যোজক" বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের মধ্যে কোনটিই ঠিক সার্থক হয় নাই। অতএব এই সকল শব্দ নির্বাচন বা উদ্ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য। উপসংহারে সভাপতি বলিলেন এই সকল,

এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে—যদি সভাগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে সমাজের কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন।

স্থির হইল—বিদ্যার উন্নতিসাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।

তৎপরে তিন চারিটি নামের মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল সারস্বত সমাজ।'

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন

THE [handwritten] SANSKRIT BUDDHIST LITERATURE [handwritten]
OF
NEPAL.
BY
RAJENDRALALA MITRA, LL. D., C. I. E.

CALCUTTA:
PRINTED BY J. W. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS.
AND PUBLISHED BY
THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL, 57, PARK STREET.
1882

রাজেন্দ্রলাল-স্বাক্ষরিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal

'এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সংগে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।'

রাজেন্দ্রলালের গবেষণা-কর্মের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ চণ্ডালিকা নাটিকা। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি প্রথমেই বলেছেন, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।' রাজেন্দ্রলাল সংকলিত উক্ত গ্রন্থের নাম The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

চব্বিশ বৎসর বয়সে যে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাজেন্দ্রলাল একদিন একশত টাকা দক্ষিণার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সেই এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে সভাপতিরূপে গ্রহণ করে তাঁর প্রতি যথার্থ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য ও মনীষার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে তদানীন্তন সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর (১৮৭৭ খ্রীঃ), সি আই ই (১৮৭৮ খ্রীঃ) এবং রাজা (১৮৮৮ খ্রীঃ) উপাধি প্রদান করেন। সরকার তাঁকে যতই রাজা বা রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করুন, রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত সব্যসাচী নামেই রাজেন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় প্রকাশিত।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের পটভূমিকায়

ক্ষণভঙ্গুর জিনিসের কথা বলতে গিয়ে লোকে বলে তেরাত্তিরও টিকবে না। একটি জাতির জীবনে পঁচিশ বছর কাল কিছুই নয়। সেই হিসেবে বলা যেতে পারে পাকিস্তান রাষ্ট্র তেরাত্তিরও টিকল না। জন্ম মুহূর্তেই ও দ্বিখণ্ডিত—ধড়টা এক জায়গায় মুণ্ডুটা আরেক জায়গায়। কন্ধকাটা কবন্ধ যাকে বলে। শুধু যে ভৌগোলিক দৃষ্টিতে কিম্ভূতকিমাকার এমন নয়, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হ য ব র ল-র হিজি বিজ বিজ-এর গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছে — এক বৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করে যেই না তার নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পাকিস্তানেরও সেই দশাই হয়েছে।

বিনাশের বীজ যে জন্মলগ্নেই ওর মধ্যে রয়ে গেছিল সে কথা বুঝতে পারেনি মুসলিম লীগ, আর পারেনি কুচক্রী ইংরেজ যে মতলবে ওর জন্মদাতা। ইংরেজ ভেবেছিল গোটা ভারত সমগ্রটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, যেটুকু তার হাতে রাখা যায় সেইটুকুই লাভ। তৈরি হল ধড়মুণ্ডটা, কর্তাদের হাতে অনুগত dummy এক রকম। Dummy এই কারণে বলছি যে, ওর জন্মলগ্নেই dummy। আর্থিক জগতে সম্পদের কোন দিকে কিছু কমতি ছিল না। পৃথিবীতে কত কত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিজ নিজ মান মর্যাদা বজায় রেখে দিব্যি বেঁচে বর্তে আছে। কিন্তু ও যে টিকতে পারল না তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী ওর নেতৃবৃন্দ। প্রধান নায়ক জিন্না ভারতীয় রাজনীতিতে যখন একেবারে অপাংক্তেয় হলেন, তখন নিজে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। আশেপাশে যাঁরা এসে জুটলেন তাঁরা বরাত গেলেন রাজনীতি ক্ষেত্রে অজ্ঞাতকুলশীল। দেশের স্বাধীনতা বা জনগণের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে কোন কালে এঁরা মাথা ঘামাননি। ইংরেজ কবি যে hollow men-এর কথা বলেছেন এঁরা তার নিকৃষ্টতম প্রতিভূ— 'Stuffed men leaning together/ Headpiece filled with straw' ইংরেজ প্রভুর কাছে একমাত্র প্রার্থনা—দেশ ভাগ করে আমার ভাগ আমাকে দিয়ে যাও। আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করিনি, বরাবর লক্ষ্মী ছেলের মত ব্যবহার করেছি, আমাকে তার বখশিশ দিয়ে যাও। বখশিশের দাম লোকসানে যায়। সেই লোকসান আজ ঘটল।

লোকসান বাদ দিয়ে পাকিস্তানের যেটুকু আজ বাকি আছে, সেটুকুও বেশি দিন থাকবে না, যদি না ও-দেশে নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয় যেমনটা হয়েছে বাংলা দেশে।

কোন নতুন রাষ্ট্রের যখন জন্ম হয়, তখন একমাত্র তার viability সম্বন্ধেই প্রশ্ন ওঠে অর্থাৎ এর অর্থনৈতিক ভিত্তিটা মজবুত কিনা, টিকে থাকবার মত এর সহায় সম্বল আছে কিনা। কিন্তু viabilityর চাইতেও বড় প্রশ্ন আছে, সেটি validityর প্রশ্ন অর্থাৎ আলাদা নতুন রাষ্ট্র গড়বার কোন সঙ্গত কারণ আছে কিনা। বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের কোনই সঙ্গত কারণ ছিল না। অল্পসংখ্যক বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী মুসলিম নেতা স্থির করলেন বিশাল ভারতবর্ষে তেমন সুবিধে হচ্ছে না, শুধু মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি আলাদা রাজ্য যদি গড়া যায়, তাহলেই রাজত্ব করবার সুবিধে হয়। তাঁরা জানতেন না যে, রাজত্ব করবার শখ থাকলেই রাজ্য গড়া যায় না। রাজ্য গড়তে গেলে রাজধর্ম পালন করতে হয়। রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্যোগ আয়োজনকেই বলে রাজধর্ম। অবশ্য আগে যাকে বলত রাজধর্ম আজকাল তার নাম হয়েছে রাজনীতি। এখন আবার রাজনীতির অর্থ দাঁড়িয়েছে, কূটনীতি। কুটিলতা এবং শঠতার চর্চার নামই হয়েছে রাজনীতির চর্চা। পাকিস্তানের জন্ম-দিন থেকেই তার নেতারা দেশবাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা শুরু করেছেন। যে সরলপ্রাণ

অশিক্ষিত জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে রাজত্ব আদায় করেছিলেন গদি দখলের পর তাদের দিকে আর ফিরেও তাকাননি। দরিদ্রের ঘরে নুন ভাত খাবার নুনটুকু নেই, আলো জ্বালবার কেরোসিন নেই, উনান ধরাবার কয়লা নেই কিন্তু বাজারে বিদেশী বিলাস দ্রব্যের ছড়াছড়ি, ধনীগৃহে টেলিভিশান সেট্। ভারতবর্ষ থেকে অলাদা হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মজার কথা এই যে, চব্বিশ বছর ধরে ভারতবর্ষই তাঁদের ধ্যান জ্ঞান। নিজ দেশের কথা যতটুকু ভেবেছেন তার শত গুণ বেশি ভেবেছেন ভারতের কথা। আগে বলতেন হিন্দুদের জন্য মুসলিমরা মাথা তুলতে পারছে না, এখন বলতে লাগলেন হিন্দুস্থান দুর্বল না হলে পাকিস্তান কখনো সবল হবে না। অতএব অন্নবস্ত্রের আগে চাই অস্ত্রশস্ত্র, ঘর দোরের আগে গোলা বারুদ।

পাকিস্তানের গত চব্বিশ বছরের ইতিহাস একদিকে যেমন লজ্জাকর অপরদিকে তেমনি হাস্যকর। সূচনাতেই দেখা গেল যে ক'জন মুসলিম নেতা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার ভার নিলেন যাঁরা, তাঁরা স্বাধীনতার জন্য ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটি তুলে কোন কালে বিদেশী প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেননি। এঁদের চোখে দেশপ্রেম সব চাইতে বড় অপরাধ। এঁরা যে রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্য প্রমাণিত হবেন, সে কথা কারোরই অজানা ছিল না। সকলেই স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী — কে কাকে ঘায়েল করে ক্ষমতা দখল করবে তারই লড়াই চলতে লাগল। দেশ গড়ার কাজ, জনসেবার কাজ শিকেয় তোলা রইল। প্রাসাদকক্ষে নিশ্ছিদ্র চক্রান্তের ফাঁদে একের পর এক নেতা

বীর ধরাশায়ী হতে লাগল। চব্বিশ বছরে এগারো বার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে হামেশাই যা হয়ে থাকে অকস্মাৎ ক্ষমতা একাধিক জঙ্গীশাহীর করায়ত্ত হয়, পাকিস্তানেও তাই হল। চব্বিশ বছরের জীবনে চৌদ্দ বছর জঙ্গীশাসনের অধীন। জঙ্গীশাসনের অর্থ যে সর্বপ্রকার স্বাধীনতার বিলোপ সাধন পাকিস্তানের জনগণ অনারবধি তা বুঝতে পারেনি। কি করে বুঝবে? ইসলাম ইসলাম করে জনগণের চোখে বেঁধে দিয়েছে ঠুলি, কানে [illegible] দিয়েছে ভারত তোমার মহাশত্রু, সে তোমার স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত। সরলপ্রাণ মানুষ বুঝতে পারেনি যে, যারা তাদের ক্ষেপিয়েছে তারাই সকল অধিকার হরণ করে বসে আছে। এ সব নেতারা [illegible] অশিক্ষিত মানুষের অজ্ঞতাকেই একমাত্র মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। মুসলিম জাতীয়তা নামক এক অবাস্তব জিনিস দিয়ে সরল মানুষকে ভোলাতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, মুসলিম জাতীয়তার কোন [illegible] নেই। দেশের মাটির সঙ্গে জাতীয়তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। যদি বলি ভারতের মুসলমান, আরব দেশের মুসলমান, তুর্কির মুসলমান এবং ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান এক জাতি, তাহলে [illegible]

[illegible]

রক্তক্ষয়ী হলেও তার মধ্যে শুশ্রূষা আছে। বিগত দুটি মহাযুদ্ধে বিশ্বের শান্তি সুনিশ্চিত হয়নি বরং মানুষের সুখ শান্তির অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের যুদ্ধ সম্বন্ধে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এর ফলে পৃথিবীর একটি অংশে অন্তত শান্তির পথ সুগম হয়েছে। এ যুদ্ধ নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধ নয়। এটি সর্বতোভাবে এক মুক্তি সংগ্রাম—বন্ধন মুক্তির সংগ্রাম। মানুষের কত রকমের যে বন্ধন! কেউ শাসন করে, কেউ শোষণ করে, কেউ ধর্মের দোহাই দেয়, কেউ সমাজের বিধান দেয়। কত সংস্কার কত অজ্ঞতা, কত অন্ধতা! অশিক্ষার চাইতে কুশিক্ষা বেশি—ধর্ম আচরণে নয় আচারে, ঘৃণা অধর্মের প্রতি নয়, বিধর্মীর প্রতি। সহস্র সংস্কারের জালে বাঁধা পড়ে আছে মন। সেই মনের মুক্তি চাই। পায়ের বেড়ি খসানো সহজ, মনের বেড়ি খসানো বড় কঠিন।

বাংলাদেশ সেই দুঃসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়েছে। পায়ের বেড়ি যেমন খসিয়েছে তেমনি মনের বেড়িও। মন মুক্ত হয়েছে বলেই দেশের এবং জাতির মুক্তি সম্ভব হয়েছে। বাঙালী—হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই—নিজ ভাষা সংস্কৃতি পরিবেশ পরিজন সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজ্ঞান বলে তার জাতীয়তাবোধ অতিশয় তীব্র। বাঙালী মুসলিম সমাজ—ইসলাম বিপন্ন, মুসলিম সংহতি, ধর্মীয় রাষ্ট্র ইত্যাদির ডাকে অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়েছে কিন্তু তাদের জাতীয়তাবোধ কখনো সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়নি। তিরিশের দশক থেকে মুসলিম লীগ সারা ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতার এমন এক জাল বিস্তার করেছিল যে বাঙালী মুসলিম সমাজও সে অন্ধতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। পাকিস্তানের দাবিতে তাঁরাও সেদিন কণ্ঠ মিলিয়ে-ছিলেন। পাকিস্তান হয়ে একদিক থেকে ভালই হয়েছে। বিষকে জিইয়ে রাখার চাইতে বিষ নিঃশেষ হয়ে যাওয়াই ভাল। পাকিস্তান না হলে ধর্মীয় রাষ্ট্রের স্বরূপটা ঠিক প্রকাশ পেত না। সে বস্তুটা কি গত চব্বিশ বছরে বাংলাদেশের অধিবাসীরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে যে পাকিস্তানী হতে গিয়ে তাদের বাঙালীত্ব বিসর্জন দিতে হচ্ছিল। আরো বড় কথা, বুঝতে পেরেছে যে, তাদের মুখের ভাষা, পেটের অন্ন যারা কেড়ে নিচ্ছে তারা বিদেশী ইংরেজ নয় বা বিধর্মী হিন্দু নয়, কেড়ে নিচ্ছে ধর্মীয় ভাই মুসলমান। ধর্মের দোহাই শুনে যাদের মনে করেছিল স্বজাতীয়, দেখা গেল তাদের মত বিজাতীয় আর কেউ নয়। কোথাও মিল নেই—ভাষায় নয়, অশনে বসনে নয়, স্বভাবে নয়, আচার ব্যবহারে নয়। প্রচলিত ধর্মের চাইতে ঢের বড় জিনিস মানুষের স্বধর্ম অর্থাৎ স্বভাব-ধর্ম। সাময়িক বিভ্রমে বাঙালী মুসলমান তার স্বধর্ম ত্যাগ করেছিল, তাতেই এই বিপত্তি ঘটল। এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে পাকিস্তানের ধর্ম তার কাছে পরধর্ম। নইলে বাঙালী মুসলমান তার পাকিস্তানী ধর্মভাইদের কাছে একটা অসম্ভব কিছু দাবি করে নি। সে শুধু তার ভাষা ব্যবহারে, [illegible] সংস্থানে, তার শিক্ষা ব্যবস্থায়, তার সমাজ গঠনে আত্মকর্তৃত্ব চেয়েছিল। এইটুকু ন্যায্য দাবি। কিন্তু [illegible] স্বভাবই এমন, সে কারো দাবি [illegible] হতে না দিয়ে, শুধু দাবিয়ে রাখতেই জানে।

অতীতে দেখা গিয়েছে মুসলিম সমাজ একমাত্র ধর্মের নামেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। স্বদেশপ্রেম বা স্বাধীনতার আদর্শে সামগ্রিকভাবে অনুপ্রাণিত হলেও ইসলামের [illegible] যুগে যে কোন সময়ে তাদের [illegible] আকাঙ্ক্ষা এবং বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করা গিয়েছে। এবারকার মুক্তি যুদ্ধে সেই সর্বপ্রথম দেখা গেল, বাঙালী মুসলিম সমাজ ধর্মান্ধতার সংকীর্ণতা বর্জন করে একান্তভাবে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য মরণ পণ করেছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে নিরস্ত্র [illegible] কত বীর্য [illegible] কী দুর্জয় দুঃসাহসে উদ্বুদ্ধ করতে পারে বাংলাদেশের মানুষ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছে। সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে স্তব্ধ। আধুনিকতম অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে, পশুশক্তির নিষ্ঠুর বর্বরতার বিরুদ্ধে [illegible] হাতিয়ার নিয়ে—বলতে গেলে একমাত্র মনোবলের [illegible] যে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল—পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। [illegible] স্বাধীন বাংলার বেতারে শুনেছি। [illegible] শুনতে মনটা আনন্দে গর্বে ভরে উঠত। [illegible] ওদের সংকল্প, কী দৃঢ়তা ওদের কণ্ঠে। কী নিষ্ঠা, কী আত্মবিশ্বাস ওদের বাক্যে কর্মে উদ্যোগে আয়োজনে! দুঃখের আগুনে পুড়ে ওরা খাঁটি সোনা হয়ে গিয়েছে। অত্যাচার উৎপীড়ন [illegible] যে আগুন জ্বালিয়েছে [illegible] অতীতের বহু ভুলভ্রান্তি অন্ধ সংস্কার বিদ্বেষ অবিশ্বাস পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মানুষের সত্য সম্পর্ককে তারা আজ নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে। [illegible] বাংলাদেশে এক নতুন যৌবন শক্তির উদ্ভব

হয়েছে। এই শক্তি, এই সংকল্প নিয়ে এ সব ছেলেমেয়েরা যে এক নতুন জাতি গড়ে তুলতে পারবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। যুদ্ধের ফলে, পাকিস্তানী বর্বরতার ফলে বিপুল ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তথাপি যে সংকল্প যে নিষ্ঠা বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায় দেখিয়েছে তাতে আশা করা যায় দশ বারো বৎসরের মধ্যে সে ক্ষয়ক্ষতির দাগ মিলিয়ে যাবে। অগ্নিশুদ্ধ ফিনিক্স পাখির ন্যায় আপন ছাই থেকে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক সমৃদ্ধ সমুজ্জ্বল বাংলাদেশের জন্ম হবে। সেই বাংলাদেশ সমগ্র মুসলিম জগৎকে নেতৃত্ব দেবে। এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলি বলতে গেলে একশো বছর পিছিয়ে আছে। ধর্মান্ধতা এর প্রধান কারণ. পাকিস্তানী [illegible] তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল। পাকিস্তানের বাইরে যে কোন সুসভ্য রাষ্ট্রের [illegible] রোধ করা উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, পৃথিবীর একটি মুসলিম রাষ্ট্রও পাকিস্তানকে তার অমানুষিক বর্বরতার জন্য ধিক্কার দেয়নি। বরং বাংলাদেশের ব্যাপারেই তারা ক্ষুব্ধ এই ভেবে যে, মুসলিম হয়েও তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করতে চাইছে। এদের চোখে বাংলাদেশের অপরাধ—মুসলিম হয়েও [illegible] এই অবস্থা থেকে মুক্তি না পেলে [illegible] মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কোন মতেই আধুনিক যুগের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। এই ব্যাপারে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রকেই এক বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সময়ে অসময়ে ইসলাম ইসলাম রব না তুলেও নীরবে সর্বজনে সমব্যবহারের উদারতা দেখিয়েই তাঁরা ইসলামের প্রকৃত মহিমাকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রামকে ব্যাপকতর অর্থে বলা যেতে পারে —The Revolt of Islam— ইসলামিয়ানার খপ্পর থেকে পবিত্র ইসলামের মুক্তি সংগ্রাম। সর্বতোভাবে সার্থক হলে শেলী রচিত কাব্যের চাইতেও মহত্তর কাব্য রচিত হবে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে রাষ্ট্রের কোন আলাদা জাতি ধর্ম নেই। রাষ্ট্রকে শুধু রাষ্ট্রধর্ম পালন করতে হয়। সে ধর্ম সকলকে সমান অধিকার, সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া, এক কথায় সকলকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা। লৌকিক ধর্ম লোকে পালন করবে, রাষ্ট্র তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এমনকি ভারত কারণে অকারণে যা করে থাকে—আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—নিরন্তর এ সব বুলি উচ্চারণেরও কোন প্রয়োজন নেই। ধর্মকথা রাষ্ট্র যত কম বলবে তত ভালো। উন্নত দেশে ধর্ম কখনো একটা রাষ্ট্রগত ব্যাপার নয়, সেটা অধিবাসীদের যার যার নিজস্ব ব্যাপার। সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তুলতে পারলে সমাজ জীবনে যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শ্রী সৌন্দর্য ফুটে উঠবে সেটিই হবে রাষ্ট্রের আসল পরিচয়। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলাম ধর্ম পালন করতে গিয়ে রাষ্ট্রধর্ম পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যে দৃষ্টান্ত দেখে অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে। এটিকেই বলেছি বাংলাদেশের বিপ্লবী ভূমিকা। আমার মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, এই অভিজ্ঞতার পর বাংলাদেশের নবীন রাষ্ট্রই হবে মুসলিম জগতের সব চাইতে প্রগতিশীল রাষ্ট্র। অপর সকল মুসলিম রাষ্ট্রের যে হবে পথপ্রদর্শক, এমনকি ভারতবর্ষকেও যে পথ দেখাবে। ভারতবর্ষ পঁচিশ বছরে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি বাংলাদেশ তার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দশ বৎসরে তা করবে। আজকের এই নিষ্ঠা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারলেই তা সম্ভব হবে। শত্রুজয়ে যে শক্তি দেখিয়েছে, দেশবাসীর চিত্ত জয়ে সেই শক্তি দেখাতে হবে।

প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ এই শুরু হতে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর কাজ রাজনৈতিক মুক্তিতেই শেষ হয় নি। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যে মুক্তির আস্বাদ এবং জয়ের উল্লাস তাঁরা লাভ করেছেন সে মুক্তির আহ্লাদ এবং আশ্বাস দেশের বঞ্চিত জনগণের মনে জাগিয়ে দিতে হবে। তবেই শিক্ষায় দীক্ষায়, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে আনন্দোজ্জ্বল সমাজ-জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সুখের বিষয়, শেখ মুজিব দেশবাসীর কাছ থেকে যতখানি আনুগত্য লাভ করেছেন খুব কম দেশনেতার ভাগ্যেই তা জুটেছে। এর ফলে তাঁর কাজ একদিকে যেমন অপেক্ষাকৃত সহজ হবে অপর দিকে তেমনি তাঁর দায়িত্বও বহুগুণে বেড়ে যাবে। দেশের নবলব্ধ চেতনাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করবার দায়িত্ব তাঁর একক নেতৃত্বের উপরে নির্ভর করছে। সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ বলতে গেলে একজন মানুষের মুখাপেক্ষী। সেই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করে প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে সাবধান হতে হবে। এখানে একটি কথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, শেখ মুজিব মুক্তি লাভের পর একই দিনে দিল্লি এবং ঢাকার জনসম্বর্ধনায় যে দুটি ভাষণ দিয়েছেন সে দুটিতেই গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর Second Largest Musilm Country। সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা শুনতে আমার ভালো লাগেনি। মুসলিম ইসলাম ইত্যাদি কথা গত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে এত বেশি আমরা শুনেছি এবং এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের এত অনিষ্ট হয়েছে যে, এ সব কথা যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। দেশ

মেলার পুতুলের পটুয়া শিল্পী : বাসুদেবপুর (মেদিনীপুর জেলা)

বললেন—এই মাঠটুকু পেরোলেই ওইখানে আখড়াপুঞ্জি গ্রাম।

আমার আসবার উদ্দেশ্য আগেই বলেছিলাম; পথ চলতে চলতে পটুয়াদের সম্বন্ধেই প্রধানত কথাবার্তা হতে লাগল। স্থানীয় লোক তাঁদের পটিদার বলে জানেন; বাস তাঁদের গ্রামের স্বতন্ত্র এক অংশে—পোটোপাড়ায়। সংখ্যায় ১৫।১৬ ঘর হবে। তাঁরা নানারকম প্রতিমা ও মেলার পুতুল তৈরি করেন; পট আঁকার রেওয়াজ এখন আর নেই বললেই চলে। পূর্বপুরুষেরা পট আঁকতেন কিনা, সে পট দেখিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে গান গেয়ে বেড়াতেন কি না অথবা আগেকার সেসব পট এখনও কারও কাছে সঞ্চিত আছে কি না সে বিষয়ে যুবক কিছু জানেন না। হঠাৎ যুবকটি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো নিশ্চয়ই খবরের কাগজের লোক; তা নাহলে এত কষ্ট করে এই অজ পাড়াগাঁয়ে পটিদারদের খোঁজ করতে আসবেন কেন। বললাম—ঠিক সে রকমটা নয়, তবে কাগজ-টাগজে লিখিটিখি, এই আর কি। উৎসাহ বেড়ে গেল যুবকের। বললেন—দেখুন, আমরা ব্রাহ্মণ; গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবার। সেইজন্যই বলি—আপনি যখন পটিদারদের সম্বন্ধে লিখবেন তখন এরা হিন্দুদের সংগে কিরকম প্রবঞ্চনা করে সে কথা লিখতে যেন ভুলবেন না। আমার প্রশ্নের জবাবে বিষয়টা তিনি আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন। শুদ্ধি হয়ে যে দু এক ঘর পটিদার হিন্দু হয়েছে তারা ছাড়া আখড়াপুঞ্জির বাকি সব পটিদার মুসলমান। কিন্তু দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি পূজার মরসুমে তারা যখন বেহালা বা ডায়মণ্ডহারবারের বাজারে অস্থায়ী ডেরা বেঁধে হিন্দুর কাছে বিক্রীর জন্য রাশি রাশি প্রতিমা বানায় তখন গ্রামের কামাল পটিদার নাম নেয় কমল চিত্রকর, মালেক পটিদার হয় মানিক চিত্রকর আর কালু পটিদার নিজেকে প্রচারিত করে কালীপদ চিত্রকর বলে। এভাবে নাম ভাঁড়িয়ে হিন্দু নাম নেওয়ার মধ্যে যে প্রবঞ্চনা প্রতারণা আছে,—আপনার লেখায় তার যেন স্পষ্ট উল্লেখ থাকে।

না-হিন্দু না-মুসলমান এই পটুয়া সম্প্রদায়ের তৈরি প্রতিমা যে খাঁটি হিন্দুরা বিনা প্রতিবাদে আবহমান কাল কিনে আসছেন; প্রধানত মুসলমান দর্জিদের তৈরি রেডিমেড পোশাক ও টুপি যে হিন্দুরা খরিদ করেন হামেশা, মুসলমান বাবুর্চির হাতের রান্না যে শহরের হোটেল-রেস্তোরাঁয় হিন্দু রসনার ব্যাপক তৃপ্তি সাধন করে থাকে

—এসব যুক্তি দিয়ে ব্রাহ্মণ যুবককে টলানো গেল না। বাকি পথটুকু প্রায় নীরবেই হেঁটে এলাম দুজনে, কিন্তু মনে হল, এই পটুয়া গোষ্ঠী কেন যে দীর্ঘকাল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাইরে এক স্বতন্ত্র জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন সে প্রশ্নের যেন জবাব পেয়ে গেলাম। হর্ষচরিত ও মুদ্রারাক্ষস থেকে জানা যায়, পটুয়া সম্প্রদায় ভারতবর্ষে মুসলিম আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলমান শাসনকালে, আরও বহু অন্ত্যজ হিন্দুর মতো তাঁরাও ধর্মান্তরিত হন। কিন্তু গণ-ধর্মান্তর যত সহজে সম্পন্ন হয়, বিকল্প জীবিকা নির্দেশ তত সহজে সাধিত হয়নি। ফলে, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর পট আঁকা ও সে বিষয়ে পালা গান করে বেড়ানো এবং প্রতিমা-নির্মাণ তাঁদের পেশা হিসাবে থেকেই যায়। সেজন্য ধর্মীয় আচরণে মুসলমান হলেও হিন্দু-ঘেঁষা জীবিকার কারণে তাঁরা কখনই খাঁটি মুসলমান বলে স্বীকৃত হননি। পক্ষান্তরে, প্রতিমা নির্মাণের সংশ্লিষ্ট দক্ষতা ও হিন্দু পুরাণের নানা কাহিনী কণ্ঠস্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ইসলামী জীবনযাত্রা হিন্দু সমাজে প্রবেশের অন্তরায় হয়েছে। দুই ধর্মের মাঝামাঝি পড়ে তাঁরা উভয় ধর্মেরই রীতিনীতি গ্রহণ করেছেন। এই স্বতঃবিরুদ্ধ অস্তিত্ব থেকে তাঁরা হয়ত সাবেক হিন্দুয়ানিতে ফিরে আসতে পারতেন যদি হিন্দু সমাজ তাঁদের প্রতি সদয় হতেন, সামাজিকভাবে তাঁদের যদি অপাঙক্তেয় করে না রাখতেন। জীবিকা ও ধর্মীয় জীবনে তাহলে একটা মেলবন্ধন ঘটতে পারত। কিন্তু সংগী যুবকটির কথায় তাঁদের অচ্ছুত করে রাখবার মনোভাব বর্ণ হিন্দু সমাজে এখনও যে কত প্রবল তার প্রমাণ পেলাম। অন্য দিকে, হিন্দু পুরাণ ও প্রতিমাশিল্পে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এ সম্প্রদায়ের মুসলমান সমাজে পুরোপুরি

সরস্বতী প্রতিমার পটুয়া শিল্পী : কুলগাছিয়া (হাওড়া জেলা)

স্বীকৃতি পাওয়াও যে কত দুরূহ সে কথাও সহজেই অনুমেয়। এই শিল্পীগোষ্ঠীর না-হিন্দু না-মুসলমান অস্তিত্বের এই হল পটভূমি।

গ্রামের পোটোপাড়ায় যখন এসে পৌঁছলাম তখন এরকম নানান চিন্তারই আলোড়ন চলছিল মনে মনে। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জানলাম ১৫।১৬ ঘরের এই পটুয়া সম্প্রদায় কয়েক পুরুষ আগে মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার অন্তর্গত চৈতন্যপুর ও ২৪-পরগনা জেলার ডায়মণ্ডহারবার থানার বাগদা গ্রাম থেকে এসে এখানে বসতি করেন। ঠিক কি কারণে এই স্থানান্তর ঘটে এখন তা আর জানা যায় না। চৈতন্যপুর ও কাছাকাছি গ্রাম ঠাকুরপুরের সক্রিয় পটুয়ারা এখনও বাস করেন। শেষোক্ত পল্লীর শম্ভুনাথ চিত্রকর তাঁর কৃতিত্বের জন্য কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। বাগদা গ্রামের খবর আমার ঠিক জানা নেই। সে যাই হোক, ভাগীরথীর পূর্ব ও পশ্চিমের দুই গ্রাম থেকে সাবেক পটুয়ারা যে এখানে এসে একত্র বসবাস শুরু করেন সেটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অখড়পাড়ির পটুয়ারা এখন পট আঁকা বা পট দেখানো ছেড়ে দিয়েছেন উপার্জনের স্বল্পতার জন্য। প্রতিমা ও খেলার পুতুল তৈরি করাই বর্তমানে তাঁদের প্রধান জীবিকা। দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কালী, শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা পঞ্চানন্দ ইত্যাদি প্রতিমাই প্রধান। অন্য মূর্তিও বায়না পেলে, প্রয়োজনে ফোটো দেখে,

প্রতিমা নির্মাণে মহিলা পটুয়া : প্রশস্থ (হাওড়া জেলা)

তাঁরা তৈরি করে দিতে পারেন। বড় বড় পুজোর মরসুমে, কারিগরদের প্রায় সকলেই বেহালা বা ডায়মণ্ডহারবারে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন থেকে সেখানে প্রস্তুত প্রতিমা সেখানেই বিক্রী করে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। মেলার পুতুল ও পশুপাখি প্রভৃতি গ্রামেই তৈরি হয় যথেষ্ট পরিমাণে। সেগুলি কাছাকাছি মেলায় কিছু কিছু বিক্রী হয়, তবে বেশী অংশ কেনেন সারবার হাটের পাইকাররা। অল্প দক্ষতাসাপেক্ষ এসব সস্তা জিনিস সাধারণত মহিলারা বা ছোট ছেলেমেয়েরা তৈরি করে থাকেন। প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা কম নয়; সেখানেও তাঁরা রীতিমতো সাহায্য করেন পুরুষদের। পরিবারের প্রায় সকলেই উপার্জনে অংশ নেন বলে আখড়াপাড়ার পটুয়াদের জমি-জায়গা বিশেষ না থাকলেও আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়।

এখানকার পটুয়ারা চারটি উপাধি ব্যবহার করেন—পটিদার, চিত্রকর, গাজি ও গায়েন। প্রায় কুড়ি বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সংঘ যে তিনটি পরিবারের শুদ্ধি করান তাঁরা এক পল্লীতে বাস করলেও অন্য পরিবারগুলি থেকে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে স্বতন্ত্র। চলতি কথায় তাঁরা হিন্দু, অন্যরা মুসলমান। কিন্তু এই তথাকথিত মুসলমান সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ অন্যান্য স্থানের মুসলমান পটুয়াদের মতই চমকপ্রদ। তাঁদের সুন্নত হয়, মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়, রোজা পালন করতে হয়, স্থানীয় মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তেও হয়। মহরম, ঈদ প্রভৃতি উৎসব সকলেই পালন করেন। মৃত্যু-উত্তর অশৌচের কাল সাধারণত ৪১ দিন। বিয়ে হয় দিনের বেলায়, হিন্দুদের মতো রাত্রে নয়। নিকা, তালাক প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে এবং চার বিবি অবধি বিবাহ করা চলে। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে নাম মুসা, ঈসা, মালেক, খয়রুদ্দি, খালেক, কামালও যেমন আছে, তেমনি আছে কানাই, বলাই প্রভাস, রণজিৎ, অনিল, সুরেশ, বিমল প্রভৃতি। তাছাড়া কবর দেবার আগে মৃতদেহের মুখাগ্নি করা প্রচলিত। পুরুষেরা কেউ দাড়ি রাখেন না। এঁদের সধবা মহিলারা অধিকাংশই সিঁদুর ব্যবহার করেন, শাঁখাও ব্যবহার করেন অনেকে কিন্তু নোয়া কেউ পরেন না। গ্রামের একান্তে পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর যে 'থান' আছে সেখানে আপদ-বিপদে মেয়ে-পুরুষ সকলেই মানত করেন, মনস্কামনা পূর্ণ হলে পুজো দেন। অন্য দিকে, শুদ্ধিপ্রাপ্ত তিন ঘর পটুয়া এখন পুরোপুরি হিন্দু রীতিনীতি মেনে চলেন। তাঁদের নিয়ে দু একটি কাহিনী শুনলাম যা রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক। শুদ্ধি হবার পরও এঁদের একজন মৃত্যুকালে নির্দেশ দিয়ে যান চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁকে যেন কবর দেওয়া হয়। হিন্দু হলেও সে নির্দেশ পালন করা হয় তাঁর ক্ষেত্রে। আর এক পরিবারের কর্তা ও বড়ছেলে মুসলমান থেকে যান, ছোট ভাই শুদ্ধি নিয়ে হয় হিন্দু। কিছুদিন পর কর্তা মারা গেলে, বড় ভাই বললেন তাঁকে কবর দিতে হবে, ছোট ভাই বললেন

দাহ করতে হবে। বড় ভাই-এর কথাই টেঁকে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে করতেই দেওয়া হয়।

পটুয়াদের মুসলমান ও হিন্দু অংশের মধ্যে যে বিবাহাদি হয় না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, পটুয়া সমাজের বাইরের সাধারণ মুসলমান বা হিন্দু পরিবারের সঙ্গেও এ দুই অংশের কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। কেননা এঁদের না হিন্দু, না-মুসলমান অস্তিত্বের জন্য এঁরা এতই পতিত যে নিম্নতম শ্রেণীর কোন হিন্দু বা মুসলমানও এঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে উৎসাহী নন। ফলে, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা প্রভৃতি জেলায় দূরে-দূরান্তে বিচ্ছিন্নভাবে যে-সব হিন্দু বা মুসলমান পটুয়া বাস করেন, তাঁরা বহু পরিশ্রমে পরস্পরের খোঁজ করে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেন। আখড়াপাড়ুইর এক হিন্দু পটুয়া এইভাবে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন হাওড়া জেলার প্রশস্থ ও কুলগাছিয়া গ্রামের হিন্দু পটুয়াদের সঙ্গে। বিবাহের ক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ হওয়ায় যাবতীয় কুফল কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পটুয়াদের সমভাবেই ভোগ করতে হয়। এটাই সাধারণ অবস্থা, তবে এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। আর্থিক বা অন্যভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে হিন্দু বা মুসলমান পটুয়ারা বাইরের স্বধর্মীদের কাছে বিয়েসাদির ব্যাপারে যে

গ্রহণযোগ্য হন না এমন নয়।

আখড়াপুঞ্জি গ্রামে সেদিন পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যার কিছু আগে। পুতুল প্রতিমা তৈরির পাট সেদিনের মতো চুকে গেছে—ছবি-তোলা আর হল না। মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুর ও হাওড়া জেলার প্রশস্থ এবং জুলগাছিয়া গ্রামের পটুয়া-পল্লী থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ফোটো সেজন্য বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। আচার-আচরণ ও জীবিকায় সেখানকার ও আখড়া-পুঞ্জির পটুয়াদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

পরিদর্শন শেষ করে ফিরতি পথ ধরব, এমন সময় ভিড়ের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে অনুরোধ করলেন—আমার বাড়িতে এসে এক কাপ চা খেয়ে যান। অনেক পরিশ্রম হয়েছে আপনার। এতখানি পথ আবার হেঁটে যেতে হবে। তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। একটু দূরে তাঁর কুঁড়েঘরের মাদুর-বিছানো দাওয়ায় গিয়ে বসলাম।

শীতের রাত্রি। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে অদূরের গাছপালায়। চালের বাতা থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। তার আলো গিয়ে পড়েছে সামনের কৌতূহলী জনতার উপর। দাওয়ায় বসে আমি আর গৃহস্বামী কথা বলছি। তারা সে কথা শুনছে নীরবে, একমনে।

গৃহস্বামী শুদ্ধি-হওয়া হিন্দু পটুয়া। বললেন—আমরা দু' ভাই। বড় ভাই হিন্দু হননি, আমি হয়েছি। সেজন্য কোন অসুবিধা ছিল না, কেননা পোটোপাড়ার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বরাবরই সম্প্রীতি আছে। কিন্তু মুশকিল হল, যখন আমাদের বাবা মারা গেলেন। দাদা বললেন, তাঁর কবর হবে, আমি বললাম, তাঁর দাহ হওয়াই উচিত।

তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম—এ ঘটনার কথা আর কেউ যেন বলছিলেন একটু আগে। তিনি বললেন,—হবে হয়ত, আমি তখন সেখানে ছিলাম না। যাই হোক, সালিশীতে শেষ-মেষ ঠিক হল কবরই হবে। মুখাগ্নি করে বাবার তো কবর হল। আমি কালীঘাটে গিয়ে পুরুত ধরে, মাথা মুড়িয়ে, ভাল করে বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি করে এলাম। গ্রামে ফিরে অশৌচ পালন করলাম হিন্দু মতে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার মা কি বেঁচে আছেন? তাঁর কী মত ছিল এবিষয়ে?

গোড়ানোতেই মত ছিল তাঁর। তিনিও তো হিন্দু। আমার সংসারেই থাকেন। দাদার বাড়িতেও যান মাঝে মাঝে, তবে সেখানে থাকেন না।

আমার বড় ইচ্ছা হল মা'র সঙ্গে একবার দেখা করি। কথাটা বলতেই গৃহস্বামী অন্দরে খবর দিয়ে এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

পরিষ্কার নিকানো উঠোনের একপাশে একটি তুলসীমঞ্চ। সেখানে জ্বালানো সন্ধ্যাপ্রদীপটি তখন নিবে গেছে। কাছেই সাদা থান ধুতি-পরা এক বর্ষীয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে। মাথার ঘোমটা তাঁর অনেকখানি নামানো।

তাঁর অস্বস্তি কাটানোর জন্য গোড়াতে দু-একটা প্রশ্ন করলাম—সধবাদের শাঁখা, সিঁদুর, নোয়াপরা সম্বন্ধে। অল্প কথায় জবাব দিলেন তিনি। তারপরে, আর প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে, জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, মা, এই যে আপনার এক ছেলে মুসলমান আর এক ছেলে হিন্দু, এটা কিরকম লাগে আপনার?

কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না মহিলা। তারপরে বেশ স্থির গলায় জবাব দিলেন—তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই বাবা! আমার এক ছেলে হিন্দু আর এক ছেলে মুসলমান।

এইবার এ-রচনার শেষে ফিরে যেতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-জননীকে দেখেছেন কবি-কল্পনায়। আমি দেখলাম প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, রক্তমাংসের শরীরে—যাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, উত্তরও পাওয়া যায়। আমার সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। (ক্রমশ)

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

॥ সাত ॥

পরদিন আক্রমানীর সঙ্গে ওঁর গাড়িতে আমরা পটসডাম রওনা হয়ে গেলাম। পূর্ব জার্মানীর ইনস্টিটিউট ফর ইন্টার-ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স পটসডামে অবস্থিত। সেখানকার সাউথ ইস্ট এশিয়া বিভাগের ডঃ ওয়াইডেমানের সঙ্গে কলকাতাতেই আলাপ হয়েছিল। প্রথমে আমরা ওয়াই-ডেমানের বাড়িতেই গেলাম। সেখান থেকে উনি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে নিয়ে গেলেন। ইনস্টিটিউটের বাড়িটি একটি বিরাট প্রাসাদ, বেশ জাঁকজমকপূর্ণ চেহারা, খুব সুরক্ষিতও বটে। ফটকে শান্ত্রীকে ছাড়পত্র দেখিয়ে তবে ভিতরে যাবার হুকুম হল। ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর ডঃ হান্ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ডাঃ হান্-এর সঙ্গে একটা ছোটখাট কফি বৈঠক হল। প্রথমে ওঁরা ওদের ইনস্টিটিউটের কাজের ধারা সম্বন্ধে বললেন। এই ইনস্টিটিউটে পূর্ব জার্মানীর সব ডিপ্লোম্যাটদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। কলকাতার বর্তমান পূর্ব জার্মান কনসাল-জেনারেলও এখানকার ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং অধ্যাপক ডঃ হানের ছাত্র। এ ছাড়া গবেষণার কাজও এখানে সমানে চলে। ট্রেনিং-এর কাজ ও গবেষণার কাজ দুটো এক সঙ্গে কখনো কখনো একটু বেশীই হয়ে পড়ে।

এরপর ওঁরা নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কাজের ধারা সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করলেন। পূর্ব জার্মানীতে নেতাজী সম্বন্ধে গবেষণার কাজ হচ্ছে অনেক জায়গায়। স্নাবেলের লেখা বই-এর কথা তো আমরা জানি। লাইপজিগের কার্ল মার্কস য়্যুনিভার্সিটিতে ডাঃ ক্রেন্টার কাজ করছেন, বার্লিনের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে ডঃ ক্রুগার গবেষণা করছেন। ওয়াইডেমান নিজে কিছু কিছু কাজ করছেন। নেতাজীর জীবনী লেখবার একটি প্রস্তাব ওঁর আছে। ইস্ট জার্মানীর জনসাধারণের মধ্যে নেতাজীর একটি পপুলার জীবনীর বিশেষ চাহিদা দেখা দিয়েছে বলে পাব্লিশাররা বলছেন। কিন্তু ডিপ্লোম্যাটদের ট্রেনিং দেওয়া ও ছাত্রদের রিসার্চের কাজ দেখাশুনো করা ইত্যাদি করে এ কাজে হাত দেবার সময় পাননি ওয়াইডেমান। বললেন—যদি লিখি যথেষ্ট সময় নিয়ে ভালভাবে লিখতে চাই। পটসডামের পলিটিক্যাল আর্কাইভস-এ নেতাজীর ওপর অনেক দলিলপত্র রয়েছে। ওঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭৩-এ সমস্ত দলিলপত্র প্রকাশিত হবে। এ সব কাজে ওঁরা নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

পূর্ব জার্মান স্কলাররা নেতাজী সম্পর্কে আলোচনায় যে জিনিসটির ওপর জোর দেন তা হল এই যে, হিটলার ও তার নাৎসী গভর্নমেন্ট নেতাজীকে বিশেষ কোন সাহায্য দিতে তো ইচ্ছুক ছিলেন না বরং প্রতিটি ব্যাপারে যথেষ্ট বেগ দিয়ে-ছিলেন। কারণ নেতাজী তো নাৎসী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি শুধু তাঁর নিজের দেশের মুক্তি আন্দোলন ত্বরা-ন্বিত করতে তাদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। এ কথাগুলো সত্য এবং যারা নেতাজীকে ফ্যাসিস্ট বলে অপবাদ দেবার চেষ্টা করেন তাঁদের অনুধাবন যোগ্য।

আবার তেমনি এ ব্যাপারের অন্য একটা দিক আছে। তদানীন্তন জার্মান গভর্নমেন্ট নেতাজীকে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করে-ছিলেন। একথা স্বীকার না করা আমাদের ভারতীয়দের পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হবে। আমাদের সঙ্গে আলোচনাকালে নাম্বিয়ার ও বালকৃষ্ণ শর্মা দুজনেই মুক্তকণ্ঠে একথা বলেছিলেন যে, 'জার্মানেরা যখন একবার আমাদের ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার ও নেতাজীকে মেনে নিল তখন যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত তারা আমাদের ছেড়ে যায়নি। যুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানরা নিজেরাই তখন পর্যুদস্ত, আমরা তাদের উপর একটা বোঝা তবু আমাদের সঙ্গে তাদের যা কিছু চুক্তি, যা কিছু প্রতিশ্রুতি সব তারা রক্ষা করে চলেছিল।' আমার মনে হয় এটা নাৎসী বা অ-নাৎসীর কথা নয়, এটা জার্মান চরিত্রের একটা মূল কথা।

ওয়াইডেমানের বাড়িতে ফিরে এলে পর মিসেস ওয়াইডেমান অনেক যত্ন করে চা খাওয়ালেন। ছেলেমেয়েরা সবাই বাড়িতে ছিল না। যে ছেলেটি বাড়িতে ছিল সে 'হ্যালো' বলে লজ্জিতভাবে এসে দাঁড়ালো। বিদেশে গেলে আমি সব সময় বিদেশীদের ঘরোয়া পরিবেশে ঢুকতে ভালবাসি। সেখানেই যেন সহজে অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়। হোটেল, রেস্তরাঁয় সভাসমিতিতে তা

হয় না। একই কারণে বিদেশী বন্ধুরা কলকাতা এলে তাদের রেস্তোরাঁ বা ক্লাবে নিয়ে না গিয়ে নিজেদের বাড়িতে এনে ডাল ভাত খাওয়ালেও ভাল লাগে। পটসডামে তাই ওয়াইডেমান-গৃহে কিছুক্ষণ কাটাতে পেরে খুব আনন্দ হল।

আজমানীকে পশ্চিম বার্লিন যেতে হবে একবার বিশেষ কাজে। দেরী হয়ে যাচ্ছে। যেখান-সেখান দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম জার্মানী যাওয়া যায় না। আজমানীকে ফিরতে হবে পূর্ব বার্লিনে, সেখানে দুটো চেক পয়েন্ট দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি ও'র আছে। ওয়াইডেমান প্রস্তাব করলেন —আজমানী সাহেব গাড়ি নিয়ে ফিরে চলে যান—তোমরা পটসডাম ঘুরে ফিরে দেখে রাত্রে ফিরে যেও। অনেক ট্রেন আছে।

ওয়াইডেমা'নের কল্যাণে আমাদের পটসডাম দেখা হয়ে গেল। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পর পটসডাম চুক্তির কথা এত শুনেছি, এই চুক্তি যেখানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই সিসিলিয়েনহোফ কাসল দেখাতে নিয়ে গেলেন ওয়াইডেমান। ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখালেন—এই ঘরে স্টালিন বসতেন, এখানে প্রথমে চার্চিল পরে এটলি (কারণ পটসডাম সম্মেলন চলার মধ্যে চার্চিল নির্বাচনে পরাজিত হলেন), এ ঘরে ট্রুম্যান। এই সিঁড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন সমবেত সাংবাদিকরা। আর তাদের মধ্যে ছিলেন জন এফ কেনেডি—তিনি সাংবাদিকতা করছিলেন। বড় বড় টেবিল চেয়ার দড়ি দিয়ে ঘের দেওয়া। একবার এক আমেরিকান ট্যুরিস্ট ছুরি দিয়ে ট্রুম্যানের ব্যবহৃত টেবিল না চেয়ার কিসের যেন কাঠের টুকরো কেটে নিয়ে গিয়েছিল স্যুভেনির হিসাবে—তারপর থেকে আরো সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। সিসিলেয়েনহোফ কাসলের সংলগ্ন লাগোয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বাগান। এক পাশে আর একটি বাড়িতে মিলিটারি মিউজিয়াম। সিসিলিয়েনহোফ কাইজার উইলহেলম (দ্বিতীয়) ১৯১৩-১৬ সালে যুবরাজের জন্য বানিয়ে দিয়েছিলেন। পটসডামে দেখবার মত সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ আরো বেশ কয়েকটি রয়েছে। আমরা ট্রামে চেপে ঘুরে ঘুরে যতটা সম্ভব দেখলাম। তখন বিকেলবেলা, সব স্কুল-অফিস ছুটি হয়ে গেছে, বেশ ভীড়ের ট্রাম। প্রতিবারেই হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে যেতে হল। হাসি-খুশি উজ্জ্বল চেহারা স্কুলের ছেলেমেয়েরা পিঠে ব্যাগ বাঁধা দল বেঁধে কিচির-মিচির করতে করতে চলেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে প্রশ্ন জাগল কম্যুনিস্ট অ-কম্যুনিস্ট দুনিয়ার সব দেশের ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা একই রকম হয় কেন?

সন্ধ্যাবেলা ওয়াইডেমান পটসডাম স্টেশন থেকে দোতলা ট্রেনে তুলে দিলেন। বললেন, দোতলায় বসো বেশী ভাল লাগবে। ট্রামের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে অথবা পটস-ডামের সব সেকালের বড়লোকী প্রাসাদের অপূর্ব সুন্দর বাগানে হাঁটতে হাঁটতে ওয়াইডেমান সমানে নেতাজী সম্বন্ধে আলোচনা করে চলেছেন। পৃথিবীর কোথায় কি কাজ হচ্ছে নেতাজী সম্বন্ধে সব খবরই রাখেন। একবার বললেন, পশ্চিম জার্মান টেলিভিশন নেতাজীর উপর যে ডকুমেন্টারি ছবি তৈরী করেছে সেটা কি দেখেছ? পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনের কর্তাদের সঙ্গে পরে যখন হামবুর্গে দেখা হল ওরা জানতে চাইল—শুনেছি পূর্ব জার্মানরা নেতাজীর উপর একটা ডকুমেন্টারি করতে চায়, তোমরা কিছু খবর পেলে নাকি? ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম বার্লিনের ফ্রিডরিকস্ট্রাসে স্টেশনে।

[illegible] পূর্ব থেকে পশ্চিম বার্লিনে সীমানা পার হবার সময় বড় হাঙ্গামা হয়, দেরী হয় অনেক। ভিয়েনাতে বন্ধু মুখার্জি বলছিলেন ওঁদের দু' ঘণ্টা লেগেছিল, আর ওদের মোটরগাড়ি তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছিল। আজমানী নিজে সঙ্গে এসে ওদের ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের গাড়িতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে পার করে

দেখেছিলেন তখন এ পথের চেহারা নিশ্চয় ভিন্ন ছিল। ওর বইয়ের গোড়ার প্যাসেজটা মনে পড়ছিল—

"১৯৩৩। বার্লিন, জার্মানী। আমি কুরফ্যুরস্টেনডামের পথে হেঁটে চলেছি। বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া, গাছগুলিতে ফুল ধরেছে, লেসের মত কারুকাজ করা পাতার বাহার। কিন্তু আমি সুখী নই। ফুলের দোকানে ফুল উপচে পড়ছে, লাল-টুকটুকে গাল, মোটাসোটা স্ত্রীলোকটি আমাকে নীল, সুগন্ধি ভায়োলেট ও মধুরঙা ড্যাফোডিল দিতে চাইল। কিন্তু আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি সুখী নই। কারণ মাত্র তিন মাস হল অ্যাডলফ হিটলার ক্ষমতায় এসেছেন, অস্ট্রিয়ান অ্যাডলফ হিটলার।"

অসুখী মিসেস কুর্টি পথ হেঁটে যেতে যেতে আকস্মিকভাবে দেখেছিলেন একজন ভারতীয়কে, দেখেই মনে হয়েছিল—a man of Spirituality.

যুদ্ধের সময় নেতাজী বার্লিনে সোফিয়েন স্ট্রাসের ওপর একটি বাড়িতে থাকতেন। বেশ প্রকাণ্ড ভিলা, পিছনে মস্ত লন। জার্মান গভরমেণ্ট তার ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। এই বাড়ির গল্প আণ্টির কাছে এবং পরে নাম্বিয়ারের কাছে অনেক শুনেছি। লোথার ফ্রাংকেরও পরিচয় ছিল এই বাড়ির সংগে। নাম্বিয়ার বলেছিলেন—অন্তত ত্রিশটা ঘর ছিল এই বাড়িতে, নেতাজী ব্যবহার করতেন মাত্র দুখানা। একটা আপিস ঘর, আর একটা শোবার ঘর। চিরদিন ওঁর যেমন সাদাসিধে জীবনযাপন। কিন্তু তা হলে কি হবে। জার্মান গভরনমেণ্ট বাড়ি যখন দিয়েছে তখন মস্ত বড় ও পদমর্যাদার যোগ্য বাড়ি দিতে হবে বই কি! এ বিষয়ে উনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এখানে ভারতবর্ষের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। যুদ্ধের শেষের দিকে বোমা পড়ে এই বাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়—হতাহতও হয়েছিল অনেক। নাম্বিয়ার নিজে তখন ও বাড়িতে রয়েছেন।

আণ্টি বলতেন—সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে। একবার তাই খোঁজ করে জানতে পারি ওখানে আর একটা বাড়ি হয়েছে, সেটা 'কারিটাস' সংস্থার। তোমরা যখন বার্লিন যাবে তখন খুঁজে দেখো। অতএব আমরা একদিন সোফিয়েনস্ট্রাসের সন্ধানে বার হলাম। যাকেই বলি সে-ই একটু অবাক হয়ে থাকে। কিছু আণ্ডার-গ্রাউণ্ড কিছু পায়ে হেঁটে অনেক খোঁজা হল। একবার এক ফুলওয়ালী এমন এক পথ নির্দেশ দিলে যে আমরা সোফিয়েন-শার্লট স্ট্রাসে নামে সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায় এসে পড়লাম। জায়গাটা খুঁজে না-পেয়ে দুঃখিত হলাম। পরে সুইজারল্যাণ্ডে এসে নাম্বিয়ারকে যখন দুঃখের কথা বলছি উনি বললেন, সে জায়গাই আর নেই, তোমরা খুঁজে পাবে কি করে। এখন যেখানে রয়টার প্লাৎস—রাস্তাটা সেখানে ছিল। ও বাড়ির বাগানে পায়চারী করতে করতে নেতাজী অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। ঘরের ভিতর সব কথা বলা সব সময় নিরাপদ ছিল না। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাগানে কথা বলে কাটাতেন।

আণ্টির কাছে একটা মজার গল্প শুনেছিলাম। ওটা ছিল হিরো ওয়ারশিপের যুগ। একবার একটি অল্পবয়সী মেয়ে—নেতাজীর গুণমুগ্ধ বলা চলে—কেমন করে যেন সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে বাগানে ঢুকে পড়েছিল। নেতাজী হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকে বললেন একটা কাণ্ড হয়েছে, একটি মেয়ে বাগানে ঢুকে পড়েছে।

আণ্টি হেসে বললেন, তা আমি কি করব, আমার জন্য নিশ্চয় আসেনি। আঃ—নেতাজী বিরক্ত হলেন। তখন বাগানে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল সে কি চায়। সে শুধু নিঃশ্বাস ফেলে আর বলে—I have seen him—দেখে এলেম তারে।

অনেক কষ্টে তাকে বোঝানো গেল দেখা যখন পেয়েছ তখন আর কেন, এবার তবে এসো।

ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের দপ্তর অবশ্য ছিল বার্লিনের টিয়েরগার্টেন এলাকার লিখটেনস্টাইন আলেতে (Leechtenstein Allee)। কিন্তু নেতাজীর সোফিয়েনস্ট্রাসের বাসভবনই ছিল সব কর্মতৎপরতার কেন্দ্র-স্থল। এই বাড়ি আজ আর নেই অথচ এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আর একটা সেণ্টিমেণ্টাল দিকও আছে—সুভাষ-চন্দ্রের স্বল্পস্থায়ী গৃহীজীবন এই বাড়িতে কেটেছে। (ক্রমশ)

॥ ১৬ ॥
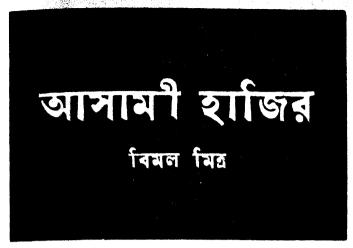
মনে আছে সেদিন সদানন্দ বাবার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চৌধুরী-মশাই সোজা গিয়ে উঠলেন তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে। আসলে কর্তাবাবু যেদিন পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন সেই দিন থেকেই তিনি নিজের আসন করে নিয়েছিলেন ওইখানে। ওইখানে বসেই তিনি ক্ষেতের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। সেই যে সকালবেলা গিয়ে সেখানে বসতেন, তখন থেকে বেলা একটা দুটো পর্যন্ত তাঁর ওই চণ্ডীমণ্ডপে কাটতো। এক-এক করে সবাই আসতো নানান কাজে। তিনি চাইতেন তাঁর সঙ্গে খোকাও ওখানে বসুক, তাঁর কাজ-কর্ম আস্তে আস্তে দেখে শুনে নিক। তিনি থাকতে থাকতে ছেলে তাঁর কাছে সব কিছু শিখে নিক কাজ-কর্ম।

কিন্তু ছেলের মতি-গতি তাঁর ভালো লাগতো না কোনও দিনই। বাপের কথা ছেলে অমান্য করতো না বটে, কিন্তু তেমন মানাও ঠিক করতো না যেন। যেন কাজ-কর্ম না করতে হলেই সে বেঁচে যেত।

কীর্তিপদবাবু জামাইকে বলতেন—এখন থেকে তোমার ছেলেকে সব কিছু বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিচ্ছ তো বাবাজী?

জামাই বলতো—আমি তো বুঝিয়েই দিতে চাই, কিন্তু তার তো এসব দিকে একেবারে মন নেই—

শ্বশুর বলতেন—এ-বয়েসে মন তো থাকবেই না, আমারও ছিল না। আমার বাবা আমাকে কত বুঝিয়েছেন, তখন ওসব ভালোও লাগতো না, কিন্তু পরে তাই নিয়েই তো মেতে আছি। এখন ও ছাড়া আর কিছু বুঝিই না—

কিন্তু আজ মনে হলো এবার আর দেরি নয়। যে ছেলে বিয়ের দিন এই কাণ্ড করতে পারে সে বড় সাধারণ ছেলে নয়। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে জীবন ছেলে-খেলার জিনিস নয়। শুধু লেখা পড়া আর আড্ডা দিয়ে বেড়ালে আর যা-ই চলুক সংসার চলে না। সংসার মানে দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া।

চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে একটা তক্তপোশ পাতা ছিল। তার ওপরে মাদুর পাতা। মাদুরের ওপর সামনের দিকে একটা কাঠের ক্যাশ বাক্স। চৌধুরীমশাই সেই ক্যাশ বাক্সের পেছনে গিয়ে বসলেন। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—বোস—

সদানন্দ বসলো না। তেমনি আড়ষ্ট হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো।

—কই, বসলে না যে! বোস! তোমার কানে কি কথা যাচ্ছে না?

সদানন্দ এবার তক্তপোশের ওপরেই পা ঝুলিয়ে বসলো।

কাল রাত্রেই চৌধুরীমশাই কথাগুলো ভেবে রেখেছিলেন। সেই রাত তিনটের সময়। গৃহিণী যখন বউমার ঘরে চলে গিয়েছিল। অনেক ভেবে চিন্তে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। অবশ্য বিয়ে তিনিও একদিন করেছিলেন। জীবনে বিয়ে করার কী মর্ম তা তিনি জানেন। মর্মও যেমন জানেন তেমনি তার সঙ্গে দায়িত্বের কথাটাও তিনি কখনও হাল্‌কা করে দেখেন নি। কর্তাবাবুর মত তিনিও একদিন বুড়ো হয়ে যাবেন। তখন হয়ত ঠিক তাঁরই মত পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকবেন। তখন এই খোকাই এসে এই চণ্ডীমণ্ডপে বসে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু যে ফুলশয্যার রাতে এই রকম কাণ্ড করতে পারে তার ওপর কতটা নির্ভর করা যায়!

হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোল। বললেন—কোথায় ছিলে সমস্ত রাত?

সদানন্দও জবাব দিতে দেরি করলে না। বললে—বাইরে—

চৌধুরীমশাই ছেলের জবাব শুনে খানিকক্ষণ থমকে রইলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বাইরে মানে?

সদানন্দ বললে—বাইরে মানে বাইরে। আমি বাড়িতে ছিলুম না সারা রাত—

আরো অবাক হয়ে গেলেন চৌধুরী মশাই। তাঁর মুখের সামনে এমন করে তো কখনও আগে কথা বলেনি খোকা! হঠাৎ এত সাহস পেলে সে কোথা থেকে?

বললেন—তুমি জানো যে বাড়ির বাইরে থাকা এ-বাড়ির নিয়ম নয়! আর শুধু এ-বাড়ি কেন, কোনও বাড়িতেই নিয়ম নেই বাড়ির ছেলের রাত্রে বাইরে রাত কাটানো!

কাটালে নিন্দে হয়, দশজনে দশ কথা বলে—

সদানন্দ উঠে দাঁড়ালো। বললে—আপনি কি আমাকে এই কথা বলতেই এখানে ডেকে এনেছেন?

সদানন্দর হাব-ভাব দেখে চৌধুরীমশাই তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলেন ছেলের দিকে। খানিক পরে বললেন—কেন, তোমাকে এখানে ডেকে এনে এই কথা বলা কি অন্যায় হয়েছে?

সদানন্দ বললে—ন্যায় অন্যায়ের কথা আপনারা তুলবেন না। কাকে ন্যায় বলে আর কাকে অন্যায় বলে তা আমি ভালো করেই জানি। আমি কি এখন যেতে পারি?

চৌধুরী মশাই বললেন—তুমি উঠে দাঁড়ালে কেন, বোস না—

সদানন্দ বললে—না, আমি এখানে বসবো না। যা শোনবার আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পারবো—

চৌধুরীমশাই বললেন—তাহলে বলো তুমি কেন এ-রকম করলে? বউমা তোমার কাছে কী অপরাধ করেছে? আর আমি আর তোমার মা, আমরাই বা তোমার কাছে কী অপরাধ করলুম যে দশের কাছে আমাদের তুমি বে-ইজ্জত করতে চাও! আমাদের বংশ মর্যাদা, বউমার বংশমর্যাদা, কোনও কিছুর কথাই কি তুমি ভাববে না? জবাব তো দেবে—

সদানন্দ কথা না বলে চুপ করে রইল।

—কথা বলছো না যে, একটা কিছু জবাব দাও—

তবু সদানন্দ কিছু কথা বললে না। তেমনিই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবার চৌধুরীমশাই উঠলেন। উঠে সদানন্দর কাছে এলেন। তারপর বললেন—চলো, ভেতর-বাড়িতে তোমার মা'র কাছে চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে—

বলে সদানন্দকে হাতে ধরে চণ্ডীমণ্ডপের বাইরে নিয়ে এলেন। বাইরে তখন বেশ স্পষ্ট সকাল হয়েছে। বিয়েবাড়ির লোকজন তখন একে একে করে জেগে উঠেছে। [illegible] সদানন্দকে [illegible] সামনে দিয়ে একেবারে সোজা তাকে ভেতর-বাড়িতে নিয়ে এলেন। সেখানে মেয়েদের আনাগোনা। তখন তারাও উঠেছে ঘুম থেকে। চারদিক অগোছালো। সদানন্দ চৌধুরীমশাইএর পেছন-পেছন যাচ্ছিল। অনেকেই ছোটবাবুকে দেখে ঘোমটা টেনে সামনে থেকে সরে গেল।

রাত্রে ভাল করে ঘুম হয়নি, তাই প্রীতি ভোর বেলাতেই তৈরি হয়ে নিয়েছিল। [illegible] দিনেটার সময় সবেমাত্র একটু [illegible] জুড়ে এসেছিল এমন সময় এই দুর্যোগ। মনটাও বিষিয়ে ছিল তার পর থেকেই। নতুন-বউএর কাছে মুখ দেখাতেও যেন লজ্জা হচ্ছিল তার। ছেলে ফুলশয্যার রাত্তে বউএর সঙ্গে এক ঘরে শোয়নি, এ লজ্জা যেন ছেলেরও নয় বউএরও নয়, এ লজ্জা যেন শাশুড়িরই নিজের। অথচ এ এমন এক ঘটনা যা বাইরের লোককে বলাও যাবে না। যা বলে কারোর কাছ থেকে সহানুভূতিও পাওয়া যাবে না। নিজের মনে মনে [illegible] পুষে রেখে [illegible] আগুনে জ্বলতে হবে।

হঠাৎ কর্তাকে সেই অবস্থায় ঘরে [illegible] দেখে প্রীতি অবাক হয়ে গেল। বললে—কী হলো, খোকার খোঁজ পেয়েছ?

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখলে, পেছনে খোকাও রয়েছে।

চৌধুরী মশাই সদানন্দকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিলেন।

বললেন—এই তো খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম তোমার কাছে—

সদানন্দ তখন অপরাধীর মত মা'র সামনে [illegible]।

চৌধুরীমশাই বললেন—আমি ওকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছি, [illegible] কথার জবাব দিচ্ছে না, দেখ, তুমি যদি কিছু কথা আদায় করতে পারো—

প্রীতি ছেলের মুখের দিকে [illegible] চোখ রেখে বললে—হ্যাঁ রে খোকা, কোথায় ছিলি তুই সারা রাত?

চৌধুরীমশাই বললেন—আমিও ওকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছি। [illegible] বাইরে-বাইরে কাটালো, অথচ নতুন বউমা, সে বেচারি নতুন জায়গায় ভয়ে কেঁপে অস্থির—সে কী দোষ করলে?

প্রীতি ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে [illegible] দিতে চাইলে। বললে—কী হয়েছিল তোর বল্ তো বাবা? বউমাকে পছন্দ হয়নি? আমাকে খুলে [illegible] মনে থাকে বল্, কী হয়েছিল তোর, বল্ কী হয়েছিল তোর? আমি কাউকে কিছু বলবো না। আমাদের কাছে বলতে তোর কীসের [illegible]? আমাকে তো তুই আগে সব বলতিস, এখন তোর কী হলো যে আমাকে একেবারেও

কেন, বললি না—আমি কি তোর পর? তুই কি আমাদের পর মনে করিস?

সদানন্দ তখনও চুপ।

চৌধুরীমশাই বলতে লাগলেন—গায়ে-হলুদের সময় তুই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলি, ভাবলুম বিয়ের পর সব মিটে-টিটে যাবে। তারপর থানা-পুলিস কত কী হলো। তাও তো এক রকম করে সব মিটলো, এখন পরের মেয়ে এ-বাড়িতে এসেছে, সে বেচারি কী ভাবছে বল্ দিকিনি—

মা ছেলের দিকে চেয়ে বললে—কী রে, কথা বলছিস নে যে? বাড়িতে এখন এত লোকজন এসেছে, এদের কানে যদি কথাটা যায় তো তারাই বা কী ভাববে বল্ দিকিনি!

এতক্ষণে সদানন্দর মুখ দিয়ে কথা বেরোল।

বললে—মা...

কিন্তু কথা বলতে গিয়েও যেন সব কথা মুখের মধ্যে আটকে গেল।

মা বললে—কী, কী বলছিলি বল্, থামলি কেন?

সদানন্দ এবার মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ বাইরে থেকে কৈলাস গোমস্তার গলা শোনা গেল—ছোটবাবু—

গৃহিণী বললে—ওই, গোমস্তামশাই তোমাকে ডাকছে, যাও—

কিন্তু এই অবস্থায় চৌধুরীমশাই-এর ঘর থেকে চলে যাবার ইচ্ছে ছিল না।

চৌধুরীমশাই দরজা খুলে বাইরে আসতেই গোমস্তা মশাই বললে—রেল-বাজার থেকে প্রাণকৃষ্ণ মশাই এসেছেন—

প্রাণকৃষ্ণ শা! প্রাণকৃষ্ণ শা রেলবাজারের [illegible] মস্ত লোক বটে! উঁকে দরকার হলে চৌধুরীমশাইকে ওই প্রাণকৃষ্ণ শা'র কাছেই হাত পাততে হয়।

জিজ্ঞেস করলেন—তা তিনি এই সময়ে কেন?

কৈলাস বললে—কাল সন্ধ্যেবেলা বউভাতে আসতে পারেন নি, এখন এসেছেন, বউমার মুখ দেখবেন।

চৌধুরীমশাই বিরক্ত হলেন মনে মনে। ঘরের ভেতর ঢুকে গৃহিণীকে বললেন—দেখছ আক্কেলখানা! এই অসময়ে প্রাণকৃষ্ণ শা এসে হাজির, নতুন বউয়ের মুখ দেখবে! মুখ দেখবার আর সময় পেলে না! এখন কী করি বলো দিকিনি!

গৃহিণী বললেন—তা এসেছেন যখন তখন তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু একটু বসতে বলো গে। বউমা এখন ঘুমোচ্ছে, বউমা উঠবে, উঠে মুখ হাত ধোবে। তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে তবে দেখাবো—তার আগে নয়—

চৌধুরীমশাই বিরক্ত হলেন। নিজের মনেই বললেন—আড়তদার মানুষ তো, [illegible] আক্কেলের মাথা খেয়ে বসে আছে একেবারে।

রাত-সকালে বউ দেখতে চাইলেই অমনি দেখানো যায়! এখনও কারো বাসি কাপড় ছাড়া হয়নি—

আবার বাইরে এসে কৈলাশকে বললেন—শা' মশাইকে বসিয়েছে তো?

—আজ্ঞে, তিনি তো কর্তাবাবুর কাছে বসে আছেন। কর্তাবাবুই আপনাকে ডাকতে পাঠালেন!

চৌধুরীমশাই বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি—তুমি যাও—

বলে নিজেও আর দাঁড়ালেন না। সোজা চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলে গেলেন। সেখানেও কিছু লোকজন বসে আছে। তারা প্রাত্যহিক প্রয়োজনে আসে। হুকুম নেয় ছোটবাবুর কাছে। কোথায় কোন্ জমিতে লাঙল দিতে হবে, কোন্ জমির সর্ষে কাটতে হবে, কোন্ ক্ষেতের বেড়া বাঁধতে হবে—সব নির্দেশ ছোটবাবু সকাল বেলাই দিয়ে দেন। তারপর আছে মজুরি দেওয়া কাজ। রোজকার মজুরিটা ছোটবাবু রোজই দিয়ে দেন। ওটা পড়ে থাকে না। তার ওপর আছে উকিল-মুহুরি-মোক্তারের আনা-গোনা।

ওপারে কর্তাবাবুর ঘরে তখন প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাই বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। নাতির বিয়েটা দিয়ে দিয়েছেন বলে খুব বাহবা দিচ্ছেন কর্তাবাবুকে। বললেন—খুব ভাল কাজ করলেন কর্তাবাবু, একটা কাজের মত কাজ করে গেলেন—

কর্তাবাবু বললেন—আমার তো এই একটা কাজই বাকি ছিল, এবার রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেল, এখন যেতে পারলেই হয়—

প্রাণকৃষ্ণ শা বললেন—ও-কথা বলবেন না কর্তাবাবু, নাতির তো এই সবে বিয়ে হলো, এখন তার ছেলে হোক, অন্নপ্রাশন হোক, আমরা পাত পেড়ে ভোজ খাই, তবে তো...

প্রাণকৃষ্ণ শা'র সঙ্গে কর্তাবাবুর পুরোনো সম্পর্ক। সম্পর্কটা লেনদেনের হলেও কালক্রমে সেটা বন্ধুত্বের বন্ধনে নিবিড় হয়েছে। তাঁকে চৌধুরী-বংশ সহজে অস্বীকার করতে পারে না। তাই তাঁর অত্যাচারও সহ্য করতে হয় এদের মুখ বুজে।

এতক্ষণে চৌধুরী মশাই এসে গেছেন। বললেন—আপনি কাল আসেন নি, তাই খুব ভাবছিলুম—

প্রাণকৃষ্ণ শা বললেন—তা শুভ কাজ নির্বিঘ্নে মিটে গেছে তো, তাহলেই হলো, বাবাজী

চৌধুরীমশাই বললেন—তা মিটে গেছে আপনাদের আশীর্বাদে!

কর্তাবাবুও তাই বললেন। বললেন—হ্যাঁ, আমার বড় উদ্বেগ ছিল শা'মশাই। আমার নাতি যেমন বেয়াড়া, ভেবেছিলুম একটা কাণ্ড না আবার বাধিয়ে বসে। আজকালকার ছেলে-ছোকরা তো আর আমাদের মত নয় এরা সব অন্য রকম!

চৌধুরীমশাই কথার মাঝখানে বললেন—আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু, বউমা আমার সবে ঘুম থেকে উঠেছেন তো, একটু মুখ-হাত-পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নেবেন—

প্রাণকৃষ্ণ শা মশাই বললেন—না না, তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না, আমার তাড়া নেই, আমি ততক্ষণ গল্প করছি—

কিন্তু ওদিকে সদানন্দ তখনও মা'র সামনে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে!

মা বললে—কই, বল, কী হয়েছে তোর, বল—

সদানন্দ এতক্ষণে আবার কথা বলে উঠলো। বললে—কেন তুমি বার-বার এক কথা জিজ্ঞেস করছো, বলো তো?

মা বললে—তা তুই কেন বউমার কাছে শুবি নে তা বলবি তো?

সদানন্দ বললে—আমি তো বলেছি—

—কী বলেছিস?

—আমি তো বলেছি তুমি বার-বার ও-কথা জিজ্ঞেস কোর না আমাকে। আমি বলবো না।

মা বললে—তা আমাকে না বলিস, তুই বউমাকে বল। বউমার সঙ্গে তুই একবার কথা বল গিয়ে। সে বেচারি কাল রাত্তিরের সময় ভয় পেয়ে আমাকে ডাকতে এসেছে, আমি গিয়ে তার পাশে শুই, তবে বেচারি একটু ঘুমোতে পারে। জানিস আমাকে জড়িয়ে ধরে কী কান্নাটা সে কেঁদেছে! তাকে আমি কী বোঝাই বল তো? বল, তাকে আমি কী বলে বোঝাবো?

—তুমি কী বোঝাবে তা আমি কী করে জানবো?

—তুই যদি তা না জানবি তো ঘর থেকে পালিয়ে গেলি কেন? বউমা তোর কী দোষ করলো?

সদানন্দ বললে—তা আমি তো তোমাদের আগেই বলেছিলুম আমি বিয়ে করবো না!

মা বলে উঠলো—তা বিয়ে করবিই বা না কেন? বিয়ে কে না করে শুনি?
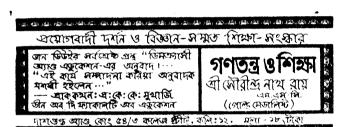
সদানন্দ বললে—তুমি সব কথা জানো না মা! তুমি যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।

মা এবার ছেলের মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে সোজাসুজি চেয়ে রইল। যেন কী একটা আতঙ্ক জেগে উঠলো মনে। বললে—তুই তাহলে কি কোনও দিনই বউমার কাছে শুবি নে নাকি?

সদানন্দ বললে—না—

—তাহলে পরের মেয়েকে বাড়িতে এনে তুই এত কষ্ট দিবি?

—তা সে জন্যে তো আমি দায়ী নই!

—কিন্তু সে বেচারি তাহলে এখানে কী করবে? সে এমন কী পাপ করলে যে তাকে তুই এমনি শাস্তি দিবি? তোর ধর্ম বলেও কি কিছু নেই? দয়া মায়া ভগবান—কিছুই তুই মানবি নে? তুই তার দিকটা একটু ভেবে দেখবি নে? তার কথা না ভাবলেও আমাদের কথাও কি তুই একবার ভাববি নে? আমরাই বা লোকের কাছে কুটুম্বদের কাছে মুখ দেখাবো কী করে? চিরকাল তো আর একথা চাপা থাকবে না, একদিন-না-একদিন তো এ দশ-কান হবেই, তখন?

সদানন্দ বলে উঠলো—তা এসব কথা তোমরা আগে ভাবোনি কেন। যখন কালীগঞ্জের বউকে দাদু টাকা দিলে না, তখন এসব কথা কেন একবার ভাবলে না? যখন দাদু তাকে খুন করে মারলে তখনও তো কেউ একটা কথা পর্যন্ত বললে না তোমরা!

মা ছেলেকে চুপ করিয়ে দিলে। বললে—তুই আস্তে কথা বল বাবা, একটু আস্তে, বাইরের সবাই শুনতে পাবে—

সদানন্দ আরো চেঁচিয়ে উঠলো—কেন, চুপ করে থাকলেই কি চিরকাল সব চাপা থাকবে তুমি বলতে চাও?

মা বললে—তোর দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চল আমার সঙ্গে চল। বউমার কাছে চল—বউমার কাছে গিয়ে তুই এই কথাগুলো বলবি চল্!

সদানন্দ বললে—কেন, বউমার কাছে আমি যাবো কেন? তোমরা তাকে বউ করে নিয়ে এসেছ, তোমরাই তার সঙ্গে ঘর করো, আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ওর মধ্যে টেনো না—

—পাগলামি করিস নে, আয় আমার সঙ্গে আয়—

বলে ছেলেকে হাত ধরে টানতে লাগলো প্রীতি।

সদানন্দ জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলে। বললে—তুমি কি আমাকে এতদিনেও চিনলে না? ভেবেছ তুমি হাত ধরে টানলেই আমি যাবো? আমি ছেলেমানুষ?

—তা তুই না যাস আমি বরং বউমাকে ডেকে তোর কাছে নিয়ে আসছি, তার কাছেই সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাক।

সদানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই মা খপ করে তার হাতখানা ধরে ফেললে। বললে—কোথায় যাচ্ছিস?

সদানন্দ বললে—কোথায় যাচ্ছি তার কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই—

মা বললে—তা আমাকে যদি না-ই বলিস তো বউমাকে বলে যা। বউমাকে বলে যা কেন তুই তার ঘরে থাকবি না। আমার দায়িত্বটা অন্তত কাটুক। আমি অন্তত মুক্তি পাই। তোরা দু'জনে নিজেদের মধ্যে যা ইচ্ছে বোঝাপড়া করে নে, আমি কেন মাঝখানে থেকে পাপের ভাগী হই?

সদানন্দ একথার কোনও উত্তর দিলে না।

মা এবার ছেলের আরো কাছে সরে এলো। বললে—কে কী দোষ করলো, তার জন্যে হেনস্তা হবে আমার আর ওই এ ফোঁটা দুধের মেয়ের? এই-ই কি বিধান?

সদানন্দ বললে—তুমি বড় বড় কথা না মা, ও-সব বড় বড় কথায় আমি ভুলবো না, তা জেনে রেখো। আমি যা করবো আমি ঠিক করেই রেখেছি—

—কী ঠিক করে রেখেছিস?

—কী ঠিক করেছি তা তুমি দেখতেই পাবে! আমাকে আর জিজ্ঞেস কোর না।

মা বললে—তাহলে তুই কোনওদিনই বউমার ঘরে শুবি নে?

সদানন্দ চুপ করে রইল।

মা আবার জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, উত্তর দিচ্ছিস নে যে? কথা বল, জবাব দে—

সদানন্দর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি ডান হাত দিয়ে সেটা মুছে নিতে যাচ্ছিল, মা সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ধরে ফেলেছে।

বললে—তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস? ভেবেছিস আমার কাছে মনের কথা লুকোয় তুই পার পাবি? তাহলে কেন আমি তোর মা হয়েছিলুম? কেন আমি তোকে দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছিলুম? তোর জেদটাই বড় হবে রে, আর আমি কেউ নই? আমার কথার কোনও দাম নেই তোর কাছে? এই-ই তোর বিচার?

সদানন্দ মা'র কথা শুনতে শুনতে আর থাকতে পারলে না। দেখলে মা'র চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সদানন্দ মা'র দিকে চেয়ে বললে—মা...

মা বলে উঠলো—না, আমি তোর মা নই। আজ থেকে আমি তোর কেউ নই, আমাকে তুই এখন থেকে আর মা বলে ডাকিস নে—না—

বলে পাঁচ এক-পা পিছিয়ে গেল। সদানন্দ মা'র দিকে এগিয়ে গেল। বললে—মা—

প্রীতি বললে—না, আমাকে তুই মা বলে আর ডাকিস নে, আমার ঘর থেকে তুই বেরিয়ে যা। আমি আর তোর মুখ দেখতে চাই নে—যা, বেরিয়ে যা—

সদানন্দ তবু মা'র দিকে এগিয়ে গেল। বললে—মা, তুমি আমার ওপর রাগ কোর না, আমার কথা শোন—

—তোর কোনও কথা শুনতে চাই নে, তুই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা—

এবার সদানন্দ মা'র সামনে গিয়ে মাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। বললে—মা, তুমি আমার কথা শোন মা, আমার কথাগুলো শোন—

মা ছেলের হাত দুটো ধরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। বললে—না, তুই চলে যা আমার সামনে থেকে, চলে যা—আমি তোর মুখ দেখতে চাই নে—

সদানন্দ বললে—না না, তুমি আমার ওপর রাগ কোর না, তুমি আমার দিকটা মোটে ভেবে দেখছ না। শুধু তোমাদের দিকটাই দেখছো। কিন্তু আমি কী করবো বলো তো, আমি কী করবো তুমি বলে দাও, আমি যে আর পারছি না—

মা বললে—কেন, কী হয়েছে তোর?

সদানন্দ বললে—কী হয়নি আমার, তাই আমাকে জিজ্ঞেস করো? আমি তোমাদের এই পাপের সংসারে কী করে থাকবো? কী করে তোমাদের সঙ্গে আমি মানিয়ে চলবো তাই শুধু আমি ভাবছি। আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে মা, সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছো না?

—কেন? কীসের জন্যে তোর বুক ফেটে যাচ্ছে?

সদানন্দ বললে—তুমি তো বাড়ির ভেতরে থাকো, তুমি সেসব কথা জানবে কী করে? কপিল পায়রাপোড়াকে জানো? মানিক ঘোষকে জানো? ফটিক প্রামানিক? কত লোকের নাম জানো তুমি? তারপরে এই কালিগঞ্জের বউ? মা, তুমি কেবল আমার নামেই দোষ দিতে পারো, আর কই, এতকাল ধরে যে এ বাড়িতে এত অন্যায় চলে আসছে, তার বিরুদ্ধে তো তোমরা কিছুই বলোনি?

মা বললে—তা ওসব কথা নিয়ে তুই অত মাথা ঘামাস কেন? ওসব নিয়ে তোর ভাববার দরকারই বা কী? ওসব ব্যাপারে তুই কানে তুলো দিয়ে রাখলেই পারিস—

সদানন্দ বললে—তা আমি যদি মাথা না ঘামাই তো ওরা কি এমনি করেই মরে যাবে? কেউ ওদের দেখবে না?

বাইরে থেকে ডাক এল হঠাৎ—ও বউদি, বউদি—

মা বললে—ওই তোর গোরী পিসী ডাকছে। আমি যাই, কাজের বাড়ি, তোর

লণ্ডে এতক্ষণ আমার কথা বলবার কি সময় আছে! যাই, আমি বাইরে যাই—

বলে একটু থেমে ছেলের দিকে চেয়ে বললে—তাহলে এবার থেকে আমার কথা শুনবি তো?

কিন্তু বাইরে থেকে আবার দরজা ঠেলার শব্দ—ও বউদি, বউদি—

প্রীতি দরজা খুলে দিতেই গৌরী পিসী বললে—কী করছিলে বউদি ঘরের ভেতর?

তারপর সদানন্দকে দেখে আর কিছু বললে না। সদানন্দ খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সদানন্দ চলে যেতেই গৌরী বললে—খবর শুনেছ?

—কী খবর?

গৌরী গলা নিচু করে বললে—বউমার বাপের বাড়ি থেকে লোক এসেছে—

—কেন? এই তো কাল বিকেলেই ফুলশয্যের তত্ত্ব নিয়ে লোক এসেছিল। এই সাত-সকালে আবার কী হলো?

গৌরী বললে—সব্বনাশ হয়েছে বউদি খারাপ খবর নিয়ে এসেছে কেষ্টনগরের লোক—

—কী খারাপ খবর?

—বউমার মা'র নাকি খুব অসুখ।

—অসুখ? বউমাকে নিতে এসেছে নাকি? দেখ দিকিনি, কী কান্ড! তুই ওঘরে গিয়ে দেখিছিলি? বউমা কী করছে?

গৌরী বললে—আমি এ খবর দিতে পারবো না বাপু বউমাকে। তুমি দাও গে—

প্রীতি বললে—তা ছোটবাবু কোথায়? ছোটবাবু জানে?

—ছোটবাবুর কাছে তো বউমার বাপের বাড়ির লোক চিঠি নিয়ে দিয়েছে। বউমার বাপ নাকি চিঠিতে সব কথা লিখেছে—

প্রীতির মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। সারারাত এত কান্ডের পর প্রাণকৃষ্ণ শাস্মশাই এসে হাজির বউ দেখবে বলে। তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছে এতক্ষণ। এর পর বউমাকে মুখ-হাত-পা ধুইয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে শাস্মশাইকে দেখাতে হবে। এরই মধ্যে আবার বেয়ানের কিনা অসুখ! অসুখের কি আর সময়-অসময় নেই গো। আর অসুখই যদি হলো তো এখনি সে খবর পাঠাতে হয়! একদিন পরে খবর পাঠালে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত! এই সবে ফুলশয্যের রাত কাটলো, এখনও বাসি মুখে জল পড়েনি, এর মধ্যে খবরটাই বা বউমাকে দেওয়া যায় কী করে। হয়ত কেঁদে কেটে একসা করবে!

—আচ্ছা তুই যা, আমি দেখছি—

বলে সোজা বউমার ঘরে গেল। বাইরে থেকে যেমন দরজা ভেজিয়ে রেখে গিয়েছিল তখনও ঠিক তেমনি ভেজানোই রয়েছে।

প্রীতি আস্তে আস্তে নিঃশব্দে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিলে। উঁকি দিয়ে দেখলে বউ বিছানার ওপর শুয়ে বালিশের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। মনে হলো বোধহয় জেগেই আছে।

আস্তে আস্তে প্রীতি ভেতরে ঢুকলো। তারপর বিছানার কাছে গিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে বউমা সত্যিই জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে।

বোধহয় প্রীতির পায়ের আওয়াজ নয়নতারার কানে গিয়েছিল। নয়নতারা মাথা তুলে দেখতেই প্রীতি বললে—তুমি জেগে আছ বউমা?

শাশুড়ির কথার উত্তরে নয়নতারা ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে—হ্যাঁ—

—একটুও ঘুম হয়নি? তোমাকে ঘুম পাড়িয়েই তো গেলাম। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলে না কেন?

নয়নতারা কোনও উত্তর দিলে না।

প্রীতি বললে—ঠিক আছে বউমা, তুমি একটু বোস, কিছু ভেবো না। আমি এখুনি আসছি। তোমার চা খাওয়া অভ্যেস আছে তো? তুমি চা খাও?

নয়নতারা বললে—হাঁ—

তাহলে আমি চা তৈরি করে নিয়ে আসছি। তারপর একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি কালকে আসতে পারেন নি, আজকে ভোর থেকে এসে বসে আছেন। তোমার মুখ দেখে আশীর্বাদ করেই চলে যাবেন! তার আগে তোমাকে মুখ-হাত-পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতে হবে—

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি একটু অপেক্ষা করো বউমা, আমি এখুনি আসছি, আমি যাবো আর আসবো—

বলে প্রীতি বাইরে চলে গেল। যাবার আগে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

বাইরে গিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, পথে আবার চৌধুরীমশাই-এর সঙ্গে দেখা। চৌধুরীমশাই [illegible] গৃহিণীকে দেখেই বললেন—ওগো, বলি, কোথায় ছিলে তুমি?

গৃহিণী বললেন—বউমার কাছে, কেন?

—বউমা কেমন আছেন এখন?

—থাক থাক আর কী! সারারাত ঘুমোয়নি। [illegible] চোখ দুটো [illegible] লাল হয়ে রয়েছে। [illegible] চা তৈরি করতে আসছি। [illegible] নাকি বউমার মায়ের খুব অসুখ? বউমার বাপের বাড়ি থেকে নাকি লোক এসেছে বেয়াইমশাই-এর চিঠি নিয়ে? [illegible] নাকি অসুখ?

—তোমায় কে বললে?

—গৌরী। [illegible] অসুখের খবরটা কি আজকেই না-পাঠালে হতো না?

চৌধুরীমশাই হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। গলাটা নিচু করে বললেন—তোমাকে চুপি চুপি বলি, কাউকে যেন এখন বোলো না। এই দেখ, বেয়াই মশাই এই চিঠি দিয়েছেন। খুবই দুঃখের খবর! বউমার মায়ের অসুখ নয়, ওটা [illegible] গৌরীকে ঘুরিয়ে বলেছি। আসলে বউমার মা কাল মারা গেছেন।

—অ্যাঁ?

প্রীতির মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। বললে—বলছো কী তুমি? কখন মারা গেলেন? কী হয়েছিল? কালকে তো কিছু বলেনি ওদের লোকেরা!

(ক্রমশঃ)

"...চার শতাধিক ছাত্র-শিল্পী ও উচ্চখ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী-শিক্ষকসমৃদ্ধ এই মহাবিদ্যালয়ের একমাত্র দাবি হল, এই মহাবিদ্যালয়কে সরকার কর্তৃক পূর্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দিয়ে আশু অচলাবস্থা দূর করা হোক. মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারী সারা বিশ্বের প্রায় বেশির ভাগ দেশেই আছে। শুধু নেই ভারতবর্ষের কোনও শহরে। আমরা পৌরপ্রধানকে আবার বলছি, কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের অনেক বৃহৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ দেখিয়েছে। কলকাতার মধ্যে এক নতুন গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করে পৌরপ্রধান মহাশয় কি সেই মহৎ উদাহরণ সৃষ্টি করবেন না?"

উপরে-লিখিত অংশটুকু একটি ইস্তাহার থেকে উদ্ধৃত। ইস্তাহারটি [illegible] সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক চারুমেলায় সকলকে বিতরণ করা হয়। বলা বাহুল্য, প্রায় অবলুপ্তির পথ থেকে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজকে রক্ষা করা ও সেই সাথে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র কলকাতা শহরে একটি মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারী স্থাপন করার [illegible] ও আবেদন জানিয়েই ইস্তাহারে শিল্পীবৃন্দের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। [illegible] এবং এই দুটি ব্যাপারেই যে শিল্পী [illegible] আছে [illegible]। শিল্প ও চারুকলা মেলা [illegible] বিশেষ করে চতুর্থ বার্ষিক [illegible] নতুন করে কিছুই বলার নেই। [illegible] সাহায্য [illegible] স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ [illegible] উৎসাহে এই মেলার আয়োজন করেন। প্রতি বছরের মত এবারেও পরিচিত, অপরিচিত ও শিক্ষার্থী শিল্পীদের নানা [illegible] ও ভাস্কর্য নিদর্শন মেলায় দেখা যায়। [illegible] চারুমেলার [illegible] দেখেছি। বইয়ের [illegible] ছিল সেই সঙ্গে ছিল [illegible] সময় অনুষ্ঠিত ২২ পল্লী সাংস্কৃতিক [illegible] ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে বসে [illegible] (on the spot) প্রতিকৃতি [illegible] একটি ছবিও; ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি উল্লেখ্য প্রাচীর পত্রও চোখে পড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, এই চারুমেলার মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাগণ জনমানসে শিল্পপ্রীতি জাগিয়ে তুলেছেন। মেলায় প্রায় [illegible] বিভিন্ন জাতির নরনারী ও শিশু অংশগ্রহণ করেছেন, ঘুরে ঘুরে মেলাটি দেখেছেন এবং কয়েকজন স্বল্পমূল্যে ছবি কিনেছেন। প্রতি বছরের মত এবারেও কয়েকজন শিক্ষার্থী শিল্পী মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে অনেকের প্রতিকৃতি এঁকে দিয়েছেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। এমন কি বিদেশী যুবকাকেও নিজ প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিতে দেখেছি। সরকারী আর্ট কলেজের শৈবাল ঘোষ, গৌতম বসু, রামলাল ধর, সমীর মণ্ডল ও মনোজ সরকার এবং ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের তপন বিশ্বাস, বিমল দাস ও দীপক চন্দকে প্রায় প্রতিদিনই প্রতিকৃতি আঁকাতে দেখেছি। শহরের কেন্দ্রস্থলে যদি একটি ছোট ঘরের ব্যবস্থা করে এঁরা সকলে সন্ধ্যার দিকে নিয়মিত প্রতিকৃতি আঁকার আয়োজন করেন তা হলে একদিকে যেমন ছাত্র অবস্থাতেই এঁরা কিছু অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবেন, অন্য দিকে তেমনই শিল্পানুরাগী জনসাধারণও নিয়মিতভাবে প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিয়ে শিল্পপ্রীতি তথা শিল্পপ্রচারে সহযোগিতার পরিচয় দেবেন। এবারের চারুমেলার আর একটি

জগন্নাথ —তপন মিত্র

বৈশিষ্ট্য ছিল আলোচনা-চক্র। খ্যাতনামা শিল্পীদের জীবনী ও শিল্পসমস্যা বিষয়ে পরিচিত শিল্পিবৃন্দ আলোচনা করেন ও বহু শিল্পী ও শিক্ষার্থী এই ঘরোয়া আলোচনায় যোগদান করেন।

*

প্রথাগত অঙ্কনধারা তথা রীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রছাত্রীগণ যে আজকাল পরীক্ষামূলক নানা উল্লেখ্য শিল্পকর্ম সৃষ্টি করছেন তা তাঁরাই স্বীকার করবেন যাঁরা বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ক্যানভাস আর্টিস্টস সার্কল আয়োজিত কলাভবনের সাতজন শিল্পী-শিক্ষার্থীর কলানিদর্শন দেখেছেন। প্রদর্শনীতে উৎপল চক্রবর্তী, শাকেহা আহমেদ, ছায়া শ্রীবাস্তব, সুকুমার সিংহ, রক্তকমল ঘড়াই, সুলেখা রায় ও তপন মিত্রের অঙ্কন ও ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়। এঁদের সকলেরই শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ। জল ও তেল রঙ, কোলাজ মাধ্যমে কয়েকজন ছবি এঁকেছেন। কাঠ, প্লাস্টার, সাদা সিমেণ্ট, লোহা ও পাত ব্যবহার করে কয়েকজন ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছেন। পরীক্ষামূলক হলেও ছবি ও ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পিবৃন্দ পরিণত চিন্তাধারা ও গঠনকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, সমকালীন রীতিতে কাজ করেও তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কয়েকটি আয়তক্ষেত্রের আকার থেকে শুরু করে গোলাকার ও অর্ধগোলাকার সাদা সিমেণ্ট ও প্লাস্টারের বিভিন্ন আকার নানাভাবে

তবু উন্নতির সোপান বেয়ে ভারত এগিয়ে এসেছে। এবং মোটামুটিভাবে তার খনিজ সম্পদকে এখন আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। এক, যে যে খনিজ সম্পদ আমাদের প্রয়োজনেরও বেশি এদেশে আছে। দুই, যে সমস্ত খনিজ পদার্থ বর্তমান এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পক্ষে যথেষ্ট এবং তিন, জাতীয় প্রয়োজনের তুলনায় যাদের পরিমাণ অনেক কম। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ছে, কয়লা, ফেল্সপার, ইলমেনাইট, লোহার আকর, কাইয়েনাইট, ম্যাগনেসাইট, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র এবং স্টেটাইট। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, অ্যালুমিনিয়াম, বেরাইটস, ক্রোমাইট, সোনা, জিপসাম, লবণ এবং সল্টপিটার। এবং শেষের শ্রেণীটির মধ্যে পড়ছে, অ্যাসবেসটস, তামা, হীরে, গ্র্যাফাইট, সিসে, নিকেল, পেট্রোলিয়ম, ফসফেট, রুপো, গন্ধক, টিন এবং দস্তা।

একথা অবশ্য ঠিক, সব রকমের খনিজ সম্পদেই কোন দেশ পুরোপুরি স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না। উপরের তালিকা দেখে বলা যেতে পারে ভারতের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। যদিও বলা চলে, আমাদের দেশে এমন কিছু কিছু আকরিক পদার্থ আছে পরিমাণের দিক দিয়ে যাদের মোটেই উপেক্ষা করা চলে না, অথচ তা থেকে উপযুক্ত পরিমাণ ধাতুও নিষ্কাশন করা যাচ্ছে না। যেমন ধরুন, অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক পদার্থ বক্সাইট।

একটা হিসেবে বলা হয়েছে, শুধু ১৯৬৮ সালেই ভারত ৩৭০০ মিলিয়ন টাকার মত খনিজ পদার্থ উৎপাদন করেছিল। যার শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ বিদেশে রফতানি করা হয়। এই রফতানির আবার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ছিল লোহার আকর। অথচ ওই বছর ভারতের মোট খনিজ সামগ্রীর আমদানির পরিমাণ ১২১৩ মিলিয়ন টাকার মত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে পরিমাণ খনিজ পদার্থ বাইরে থেকে আমাদের সংগ্রহ করতে হয় তার পরিমাণ আমাদের নিজস্ব উৎপাদনের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। উল্লেখ্য, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বিহারের খনিজ সম্পদের পরিমাণ সবচাইতে বেশি। দেশের মোট খনিজ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ। এবং যে সমস্ত খনিজ উপর শতকরা পঁচানব্বই ভাগ আমাদের নির্ভর করতে হয় তাদের মধ্যে প্রধান কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, চুনা পাথর এবং অভ্র।

ডঃ ওয়েস্ট উল্লেখ করেন, ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে কয়লার মোট উৎপাদন ছিল ৩৪ মিলিয়ন টন। এখন এই পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ৭১ মিলিয়ন টন। আরও উল্লেখযোগ্য, আমাদের ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিভাগ মির্জাপুরের এবং সিধি জেলায় যে সিংগ্রাউলি কয়লার খনি আবিষ্কার করেছে, তার কয়লার স্তর প্রায় ১৩৪ মিটার পুরু। সম্ভবত এদিক দিয়ে পৃথিবীতে এই খনিটির স্থান দ্বিতীয়। অনুমান, এখান থেকে মোট ১৯০ মিলিয়ন টন কয়লা সংগ্রহ করা যাবে। যার দাম ৫০০০ মিলিয়ন টাকারও বেশি। এক সময়ে দেশের রেল বিভাগই ছিল কয়লার প্রধান গ্রাহক। কিন্তু ডিজেল এবং বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিন চালু করার পর তাদের কয়লার খরচ অনেকটা কমে গেছে। যেমন ধরুন ১৯৬৩-৬৪ সালে তাঁরা যেখানে ১৮·৮০ মিলিয়ন টন কয়লা জ্বালিয়েছিলেন, ১৯৬৯-৭০ সেই পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৬·২০ মিলিয়ন টনে। অতএব কয়লাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা এখন অনেক বেশি।

লোহার কথাই ধরুন। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি মুখ্যত রেল-বিভাগের প্রয়োজনে শুরু হয়েছিল লোহার খনি খোঁজার কাজ। ভাবলে অবাক হতে হয়, এদেশে প্রথম লোহা নিষ্কাশনের কাজ শুরু হয় ১৮৩[illegible] খ্রীষ্টাব্দে, কুমায়ুনে। এর জন্যে কাজে লাগানো হয় স্থানীয় অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা লোহার আকরিক। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় [illegible] কাঠ। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রমথনাথ বসু মধ্যপ্রদেশের বেইলাডিলা এবং রাজহরায় লোহার খনির সন্ধান দেন। অতঃপর ১৯০৩ সালে ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনিই প্রথম ময়ূরভঞ্জে উচ্চমানের লোহার আকর আবিষ্কার করেছিলেন। যার উপর নির্ভর করে উত্তরকালে টাটার লোহার কারখানা গড়ে উঠেছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় ভারতের খনি দফতর [illegible] এবং বেইলাডিলা এলাকায় প্রচুর উচ্চমানের লোহার সন্ধান পেয়েছে। রাজহরার লোহার আকরিক পদার্থ এখন ভিলাই ইস্পাত কারখানায় কাজে লাগানো হচ্ছে। বেইলাডিলার লোহা রফতানি করা হচ্ছে জাপানে। বিশাখাপটনমে প্রস্তাবিত লোহার কারখানা তৈরি হলে গোয়ার লোহা সেখানে ব্যবহার করা হবে। ভবিষ্যতে লৌহ শিল্পে ভারতের ভূমিকা পৃথিবীতে অন্যতমরূপে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্ভাবনার ছবি ফুটে উঠেছে আরও কয়েকটি খনিজ উৎপাদনে। যেমন ম্যাঙ্গানিজ। খনিজ তেলের প্রাপ্তি এদেশে অনেক কম। ভূ-তাত্ত্বিকরা অবশ্য ইতিমধ্যে কিছু কিছু নতুন উৎসের সন্ধান দিয়েছেন। এর ওপর আরও কাজ চালানো দরকার। ইতিমধ্যে আকাশ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে বিহার ও রাজস্থানে তামা এবং

বেশি জড়িয়ে পড়েন যে, শেষ পর্যন্ত নিয়মিত পড়াশুনোর ব্যাপারেও তাঁরা পিছিয়ে পড়েন। পরীক্ষায় বসার মত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। অসন্তোষ তারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন : কীভাবে এর সমাধান হতে পারে, এটা কি আপনারা ভেবে দেখেছেন?

উত্তর : জটিল প্রশ্ন। বড়রা [illegible] এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তবে আমাদের মনে হয়, এক, প্রত্যক্ষ রাজনীতি [illegible] কাজকর্ম শিক্ষা বা গবেষণাগারে [illegible] না আসাই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যক্ষ [illegible] নীতি বলতে অবশ্য দলগত রাজনৈতিক কাজকর্মের কথাই বোঝাচ্ছি। দুই বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত [illegible] পাঠের সংস্কার। তিন, [illegible] আমাদের কাছে এটাই [illegible] গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, [illegible] না করতে পারলে অসন্তোষ [illegible] যাবে না। এটা সম্ভব হলে পরে [illegible] বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকে [illegible] করা যাবে।

*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] শ্রী এ এস উইলস প্রমুখ [illegible] এবং [illegible] বিজ্ঞানীদের [illegible] বিজ্ঞানের উপর [illegible] [illegible] পরিবর্তন ঘটছে, [illegible] বিজ্ঞান [illegible] আমাদের গুরুত্বপূর্ণ [illegible] করতে হবে।

অ্যাকাডেমিশিয়ানদের কাছে এবারকার সবচাইতে বড় আকর্ষণ ছিলেন বিজ্ঞানী অধ্যাপক বার্টন। উল্লেখ্য, জৈব রসায়নে অনবদ্য কীর্তির জন্য ১৯৬৯ সালে তাঁকে নোবেল পারিতোষিকে ভূষিত করা হয়েছিল। বর্তমানে ইনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক। বিজ্ঞান কংগ্রেসের আমন্ত্রিত অতিথিরূপে তিনি পেনিসিলিনের গঠন তত্ত্বের উপর বক্তৃতা করলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা। তাঁর মূল বক্তব্য, পঞ্চাশের দশকে পেনিসিলিনকে আমরা পেয়েছিলাম প্রায় সংশ্লেষিত সামগ্রী রূপে। পরবর্তীকালে নানাভাবে এর গঠনটিকে যাচাই করা হয়েছে এবং ক্রমে এর সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হচ্ছে। সমস্যা হল এই, পেনিসিলিন অণুকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি ডান এবং বাঁ দিকে অংশে দেখা যাবে, বাঁ দিকের গঠন-

তাত্ত্বিক ব্যাপারটা যথেষ্ট সাম্য অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ডান দিকের অংশের গঠনে নানাভাবে হেরফের ঘটিয়ে বিভিন্ন রকমের জীবরসায়নগত গুণাগুণ আমরা লক্ষ করেছি। এ ধরনের গবেষণার উদ্দেশ্য ওষুধরূপে পেনিসিলিনকে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য করে তোলা—টু অ্যাটেইন মোর বাইওলজিক্যাল সাসেপটিবিলিটি। অধ্যাপক বার্টনের বক্তৃতা উপস্থিত গবেষকদের মধ্যে দারুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে ছিল, সাম অ্যাসপেকটস অভ দি কেমিসট্রি অব সাইক্লোহেকসেন, নিউট্রিশন অ্যান্ড নিউরাল কনট্রোলস অব এক্সি-জেনটির সিগনালাইজেশন, ইনটেসটাইনেল হেলমিনথিয়াসিস অব ম্যান ইন ইন্ডিয়া, ডঃ সি আর রাও-এর ইউনিফায়েড থিওরি অব সেকশনাল লিনিয়ার এসটিমেশন, ডঃ এস পি রায়চৌধুরীর মাইকোপ্লাজমা ডিজিজ অব প্ল্যান্টস, ডঃ বি মুখার্জির কারেন্ট ট্রেনডস ইন ক্যানসার কেমোথেরাপি, অধ্যাপক শ্যাডিন-এর বোর হোল জিও-ফিজিকস, ডঃ বি আর সেনগুপ্তের লিপিড ডিসঅর্ডারস ইন ডায়াবেটিস মেলিটাস, অধ্যাপক এ এস পেইন্টলকর-এর ক্রস ব্রিডিং ইন ম্যামালিয়ান স্পার্ম ফাইবারস প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য বক্তৃতার মধ্যে ছিল, অধ্যাপক এস কে চক্রবর্তীর ভূমিকম্প—তার প্রকৃতি এবং লক্ষণ; ডঃ আত্মারামের বিজ্ঞান ভাবনা। প্রবীণ ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ নীলরতন ধর তাঁর বক্তৃতায় খাদ্য এবং জনসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, সুষম খাদ্যের দিকে আমাদের জোর দিতে হবে। টমাটো, পালং, আলু, এমন সহজলভ্য সবজী, ডাল প্রভৃতির অপচয় বাঁচিয়ে তাদের যথাযথ ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বলেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

এ ছাড়াও বিভিন্ন আলোচনা চক্রে বিজ্ঞানের নানারকম সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত আলোচনা চক্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রসার এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনা প্রসঙ্গে মতামত বিনিময় করেন কয়েকজন বিজ্ঞান লেখক। সকলের মত, মাতৃভাষার মাধ্যমেই জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ে বই পত্র লেখার উপর জোর দিতে হবে।

অধিবেশন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই সঙ্গে ছিল পুস্তক প্রদর্শনীও। দুঃখের বিষয় এই প্রদর্শনীতে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বিজ্ঞান-গ্রন্থ বা অন্যান্য প্রকাশনা যেটুকু দেখেছি, তা টিমটিমে প্রদীপের মত। শতকরা নিরানব্বই ভাগ ইংরেজী বই। বাংলা ভাষায় রচিত কিছু সংগ্রহ দেখালেন একমাত্র বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এমন একটি সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা বইপত্র দেখবেন বলে অনেকেই আশা করেছিলেন।

*

দেশ এবং বিদেশ থেকে প্রায় দুই হাজারের মত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সম্মেলনে যোগদান করেন। পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েত দেশ, ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানী। ছিলেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। ওঁদের নেতৃত্ব করেন প্রাচীন রসায়নবিদ অধ্যাপক ডঃ কুদরাত এ খুদা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ডঃ খুদা এক সময়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে আসীন ছিলেন। বাংলাদেশে থাককালীন তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান, বাংলা ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান-পাঠ্যপুস্তক রচনাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব প্রয়াস। খানিকটা অপ্রিয় হলেও প্রসঙ্গত বলা চলে, আমরা আজ যখন বিজ্ঞান মাতৃভাষায় পড়ান হবে না ইংরেজীতে এবং সেই সঙ্গে পরিভাষা নিয়ে বৈঠকের পর বৈঠক চালাচ্ছি, এরই ফাঁকে ওপার বাংলার মানুষ আজ থেকে কয়েক বছর আগেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন এবং সার্থকভাবে। ডঃ খুদার নিজস্ব রচনা 'জৈব রসায়ন' স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর উপযোগী করে লেখা। তিনি সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন, বাংলা ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা সম্ভব, অবশ্য যদি কাজটি উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে পড়ে।

বস্তুত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও কলকাতায় অনুষ্ঠিত এবারকার সম্মেলন যথেষ্ট নতুনত্ব দাবি করতে পারে।

সমরজিৎ কর

মনোনয়নের দায়িত্ব

ভোটের বাজার সরগরম। ক'দিনই বা বাকী আছে আর। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার অর্ধেক যেমন মেয়ে, ভোটার সংখ্যারও প্রায় অর্ধেক মেয়ে। কোথাও মেয়ের সংখ্যা বেশী, কোথাও কিছু কম। কাজেই গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস করেন তবে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের দায়িত্ব আপনার বিচারবুদ্ধি ও বিচক্ষণ সতর্কতার সম্যক ব্যবহার করে নির্বাচনপর্বে অংশ নেওয়া। ভোট দেওয়া মস্ত দায়িত্ব। স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মান যত এগিয়ে চলেছে ততই মনোনয়ন ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জীবনযাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখা বলতে গেলে মেয়েদেরই কাজ। রাজনৈতিক জগতে যে শাসকগোষ্ঠী আমাদের সমষ্টিগত জীবনকে পরিচালিত করবে ... ... বইকি। আদর্শে এবং কাজে ... তাঁরা কেমন, দলগত আদর্শ কি—... মিল রাখতে পারেন ... ... হয় না।

ভারতবর্ষের পাঁচটি প্রদেশ ছাড়া সব প্রদেশেই এবার প্রাদেশিক নির্বাচন হবে বলে আশা করা যায়। বিহার এবং মহারাষ্ট্র বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা বেশি, কাজেই

ভোটার-সংখ্যা সর্বাধিক। পশ্চিমবঙ্গে ২৮০টি আসনের জন্য ২২,৩০৪,৮৫৬ জন ভোটার। লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। লোকসংখ্যা আনুমানিক ৪৪,৪৪০,০৯৫।

সর্বভারতীয় পার্টি সাতটি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এর চিহ্ন বা প্রতীক গাই-বাছুর। ... অর্গানাইজেশন কংগ্রেসের প্রতীক চরকা কাটছেন একটি মহিলা। ... দলের তারকা। জনসঙ্ঘের প্রদীপ। সি পি আই এবং কম্যুনিস্ট পার্টির চিহ্ন কাস্তে ধানের শিষ। সমাজবাদীদের ... এবং মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের কাস্তে, হাতুড়ি ও তারকা। সর্বভারতীয় পার্টিগুলো

প্রাদেশিক ভিত্তিতে কিছু পার্টি আছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং রেভোলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি। ত্রিপুরায় ত্রিপুরা কংগ্রেস। ফরওয়ারড ব্লকের প্রতীক সিংহ এবং রেভোলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টির কোদাল এবং 'স্পেড' বা কয়লা দেবার বেলচা।

বহু প্রাদেশিক পার্টির প্রতীক এক। যেমন পাঞ্জাবের শিরোমণি আকালি দল এবং মহীশূরের জনতা পক্ষ—দু-এরই চক্র দাঁড়িপাল্লা। প্রার্থী হিসেবে মেয়ের সংখ্যা আশানুরূপ নয়। যে কোন কারণেই হোক, রাজনীতিতে গভীর আগ্রহের অভাবেই হোক অথবা রাজনৈতিক দলের ইচ্ছায় হোক, মেয়ে প্রার্থী-সংখ্যা যথেষ্ট নয়। আশা করি, মেয়েরা ভোট দেবার বেলায় তাঁদের সচেতনতার সম্পূর্ণ প্রমাণ দিয়ে দেবেন।

ভোটরঙ্গ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস ... বৈচিত্র্যময়। তার একটি ধাপ ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ... স্বায়ত্তশাসনের ... ... ভোটের ... ... তারই একটি ... ।

'৩৭ সালে উত্তর প্রদেশে ভোটদানের

ELECTION SYMBOLS (1972)

মহোৎসবে নেমেছিলেন এক ধনী বণিকের বনিতা। ভোটপর্ব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বণিক অকাতরে পয়সা ঢালছিলেন। অবিনাশ ছেলেরা বেকার। লেখাপড়া তেমন শেখেনি। গাঁয়ের ছেলেছোকরা দলের পাণ্ডা। ভোটের বাজারে যাচঞা করার কাজে কায়দা রপ্ত করে নেওয়া তার পক্ষে এমন কঠিন নয়। অবিনাশ নিযুক্ত হলো সেই ধনীর গৃহিণীর ভোট যাচঞা করার কাজে। মাইনে হলো ষাট টাকা। অবশ্য জামাজুতো থেকে পুরী কচৌরি সবই বিনামূল্যে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে। দলবল নিয়ে ট্রাকে চড়ে এ-গাঁ থেকে ও-গাঁ বমশিঙগা বা ভেঁপু সহযোগে চিৎকার করে বেড়ানো তার দায়িত্ব। দেখতে দেখতে তিনমাস কেটে গেল। ভোটে হেরে গেলেন অন্নদের প্রার্থী। অবিনাশের কাজও শেষ। এতদিনের রোমাঞ্চকর উত্তেজনার পর আবার অবসাদ। ওদিকে যে তিনমাসের মাইনে নেওয়া হয়নি অবিনাশের তা মনে ছিল না। পকেটে টান পড়তেই মনে হলো। শত হাঁটাহাঁটি করে অবিনাশ একশ আশি টাকা আদায় করতে পারলে না। দেখাই পাওয়া ভার মালিকের। কোথায় গেছে সেই বিনয়নম্র ব্যবহার, আর কোথায় গেছে আদর আপ্যায়ন সব। অবিনাশ নিরুপায়।

ধনীরা মানমর্যাদা সম্মান, খাতির থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত কখনই হন না। ভোটে হেরে অবিনাশের অন্নদাতা আর পাঁচটা জনহিতকর কাজে লেগে গেলেন। হয়তো সরকারী খেতাব মিলবে, হয়তো বা আর কিছু। পল্লী অঞ্চলে বড় বড় মিটিং ডেকে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন তিনি। বেলা চারটেতে মিটিং, হয়তো সকাল থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডে ফিল্মি সঙ্গীত বাজিয়ে লোকজন আকর্ষণ করার মহড়া চলে। ঐ এলাকার বড়লোকের বাড়িতে মেঠাই-এর পাহাড় জমা হয়। এই রকম একটি মিটিংএ অবিনাশের ভূতপূর্ব মনিব এসেছেন। লোকে লোকারণ্য। অবাক হয়ে সবাই শুনছে ত্যাগের কাহিনী। ধনীর অন্দর মহলের শত আরাম উপেক্ষা করে তিনি এসেছেন সর্বহারাদের মাঝে ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে মোসাহেবেরা, খোশামুদে পার্শ্বচর সব এনেছে পুষ্পহার। হয়তো সেই ধনীর দপ্তরের অ্যাকাউণ্টে কেনা।

হঠাৎ সবাই অবাক হয়ে শুনলো কে যেন পিছন থেকে বলছে, "বিশ্বাস করবেন না ওঁকে। আমার একশ আশি টাকা মাত্র, তাও ঠকিয়ে নিয়েছেন।..." মৌচাকে ঢিলের মত সমস্ত জনতা গুঞ্জরিয়ে উঠলো। কে কোথা থেকে এসে অবিনাশের পকেটে গুঁজে দিল একমুঠো

"নোট।" চুপ চুপ, ১৪০ টাকার চেয়ে অনেক বেশী দিলাম। অবিনাশ মানুষ মন্দ ছিল না। টাকা পেয়ে আর হট্টগোল করেনি।

আবার পূর্ব বাংলা অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশের সেকালের একটি ঘটনা। দলে দলে পল্লীবাসীকে ট্রাকে নিয়ে ভোটদান কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পালায় পল্লীবাসী পাচ্ছেন জামাই আদর। তাঁরা জীবনে কখনও এমন পানি চক্ষেও দেখেননি যে পানি বোতলে ভরা থাকে, খুললে ফসফসিয়ে ওঠে। লেমনেড আর বরফ। গরমের দিন। কলিজাটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এমন অতিথি সৎকারের প্রতিদানে তারা ভোট দেবে, সে আর বিচিত্র কি।

ফিরবার সময়ও যানবাহনের বন্দোবস্ত পাকা। হৃষ্টচিত্তে সবাই গিয়ে উঠলেন ট্রাকে। পানি কই, পানি! তেষ্টা পেয়ে গেছে। মাটির ঘড়া, মাটির গেলাস রয়েছে। খাও যত ইচ্ছা পানি। কিন্তু যে পানি ফস করে সে পানি কই? ভোট-রঙ্গের প্রযোজকদের মধ্যে একজন গম্ভীরভাবে বললেন, ভোট দিতে যাবার সময় ফস করে পানি, ফিরবার সময় নয়!!

শ্রীমতী

১৯৭১ সালের অর্থনীতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক সমীক্ষা

ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পরিষদ (The National Council of Applied Economic Research) ১৯৭১ সালে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তার প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, এই সমীক্ষা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৭১ সালে একমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই উৎপাদনের হার সন্তোষজনকভাবে বেড়েছে। কিন্তু তুলা ও তৈলবীজের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। ১৯৭১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আরও ১.৫ মিলিয়ন টন বেড়েছে এবং খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ১১২ মিলিয়ন টন। নতুন আবাদ-কৌশল প্রয়োগ অপেক্ষা সময়মত বৃষ্টি ও ভাল ফলনই এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেশি সহায়ক হয়েছে বলে সমীক্ষায় জানা গেছে। এই তথ্য থেকে দেখা যায় ভারতে "সবুজ বিপ্লব" এখনও সার্থকতা অর্জন করেনি। যদিও খাদ্যশস্যের উৎপাদন পর পর চার বছর ধরে ক্রমেই বেড়ে গেছে এবং পঞ্চম বছরেও উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে, তবুও সামগ্রিকভাবে কৃষি-কাঠামো একটি উন্নত হয়নি অথবা কৃষি উৎপাদন এতটা বাড়েনি যাতে সবুজ বিপ্লব সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। পাটের উৎপাদন সন্তোষজনক হারে বেড়েছে। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১৯৭২ সালে দেশের অর্থনৈতিক

নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় শতাংশ থেকে দশ শতাংশ শিল্পোৎপাদন বাড়ানো এবং যতটা প্রয়োজন ততটা বৈদেশিক মুদ্রা এজন্য ব্যবহার করা উচিত ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অথবা কাঁচামাল আমদানি করা উচিত। যদি শিল্পোৎপাদন নয় শতাংশ থেকে দশ শতাংশ বাড়ে এবং সেই সঙ্গে কৃষি-উৎপাদন পাঁচ শতাংশ বাড়ে তবে ১৯৭২ সালে জাতীয় আয় ৭ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব হবে। ১৯৭১ সালে জাতীয় আয় ৩ শতাংশ বেড়েছে বলে অনুমিত হয়েছে। পরিষদের মতে যদি ইস্পাত ও সার উৎপাদনে মোট উৎপাদনী ক্ষমতার ৭৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আমদানি বাবদ দেয় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কম হবে এবং এদিকে যে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচবে তার সাহায্যে সামগ্রিকভাবে শিল্পোৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করা যাবে। আমদানির ক্ষেত্রে সরকারকে একটি নির্বাচনমূলক নীতি অনুসরণ করতে হবে যাতে বিনিয়োগ-উদ্যোগ বাড়ে এবং দেশের উন্নতি দ্রুত অর্জিত হয়। উৎপাদন বাড়লে তা সরকারের রাজস্বের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। উক্ত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশের আর্থিক সম্পদ বাড়াবার জন্য এবং জাতীয় সঞ্চয় বাড়াবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পরিষদের মতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ করের বোঝা নতুন করে জনগণের উপর চাপাবার মত কোন উপায় নেই। তাই আমাদের যা কিছু সম্পদ আছে তার প্রকৃত ব্যবহার হওয়া দরকার।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমীক্ষায় বলা হয়েছে ১৯৭২-৭৩ সালেও পাঁচ শতাংশ হারে রপ্তানি বাড়াবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ১৯৭১-৭২ সালে আমদানির পরিমাণ ৩০০ মিলিয়ন ডলার বাড়বে বলে অনুমিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দূর করা এবং বিদেশী ঋণ পরিশোধ করার দায়-দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়েছিল বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের ফলে। ১৯৭১-৭২ সালে বাণিজ্য-ঘাটতির পরিমাণ ৩৫০ মিলিয়ন ডলার বা ৬৭৫ কোটি টাকা হবে। ১৯৭১ সালে বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলে আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। আগামী বছরে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার কমবে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, "While we strive to learn to live with less foreign and without sacri-

facing development, we can, to begin with at any rate, afford to spend the new issue of Special Drawing Rights and draw on reserves for a while." সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সমীক্ষায় বলা হয়েছে, যদিও ১৯৭১-৭২ সালে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আহরিত হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির বাজেট এক সঙ্গে ধরলে ঘাটতির পরিমাণ অভূতপূর্ব হবে। ১৯৭২-৭৩ সালে বাজেট প্রণেতাদের সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে; কারণ আগামী বছরে নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ খুবই অল্প হবে।

১৯৭১ সালে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অবস্থা কেন সন্তোষজনক হয়নি তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—বাংলাদেশ থেকে নয় মাসের জন্য প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর আগমন এবং ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ দেশের অর্থনীতির উপর এমন একটি চাপের সৃষ্টি করেছিল যা আগে কোনদিন দেখা যায়নি। অনেকে অভিযোগ করেন, শ্রীমতী গান্ধীর "গরিবী হঠাও" একটি নিছক ধাপ্পাবাজি, কিন্তু যারা একথা বলেন তাঁরা ভুলে যান যে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতায় আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে অবিরাম স্রোতে শরণার্থী আসতে শুরু করেছিল। ভারতের যা আর্থিক সম্পত্তি তাতে এই সমস্যার মোকাবিলা খুবই কঠিন। নিরুপায় হয়েই ভারতকে বিরাট বাজেট-ঘাটতির বোঝা বহন করতে হয়েছে এবং আরও ৭০ কোটি টাকার লেভি ধার্য করতে হয়েছে। শরণার্থীদের ত্রাণকার্যের জন্য ১৯৭১ সালে ভারত সরকারকে খরচ করতে হয়েছে ৩৬০ কোটি টাকা। যদি শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি না হত, তবে ভারত সরকার নিশ্চয়ই এই টাকা দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা আরও উন্নত করার জন্য ব্যয় করতে পারতেন—অথবা ভারত সরকার এই সুবিপুল ঘাটতি-বাজেটের চাপ কমাতে পারতেন। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণকল্পে ১৯৭১-৭২ সালের বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং শিক্ষিত বেকারদের কাজের বন্দোবস্তের জন্য আরও ২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে। "গরিবী হঠাও" শ্লোগানকে ফলপ্রসূ করার জন্য এই বরাদ্দ খুবই সামান্য। কিন্তু একথা বলা চলে না যে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার জন্য সরকারের দিক থেকে সদিচ্ছা বা আন্তরিকতার অভাব আছে। তবে সরকারের মনে রাখা উচিত, শুধু শ্লোগান দিয়ে সাধারণ মানুষকে বেশিদিন ভুলিয়ে রাখা যাবে না। ১৯৭২ সালে যাতে দেশের অর্থনৈতিক নীতি স্থির সংকল্পে লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগোতে পারে এবং দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগোতে পারে তার চেষ্টা এখন থেকেই করতে হবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন [illegible] পরিমাণে বেড়েছে এবং [illegible] এই দিকগুলিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ, কিন্তু সেই সঙ্গে শিল্পোৎপাদন হ্রাস, বেকার সমস্যার বৃদ্ধি, দারিদ্র্য এবং দেশের অর্থনৈতিক [illegible] স্থিতিশীলতার অভাব নিশ্চয়ই সরকারের অর্থনৈতিক নীতির সাফল্যের পরিচায়ক নয়।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে সরকারের পক্ষে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা ও উৎপাদন কর্মসূচী কার্যকর করা সম্ভব হবে কিনা বলা কঠিন। কারণ বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে চতুর্থ যোজনার লক্ষ্য কতটা পূর্ণ হবে কিনা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা আশা করতে পারি, আগামী বছরের বাজেটে দেশের অর্থ-কাঠামোর এমন পরিবর্তন হবে যাতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর নির্ভর করে চতুর্থ যোজনা অব্যাহত রাখা যায়।

সুব্রত গুপ্ত

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫ ॥

সেই বয়েস মানুষ খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলে, যে-বয়েসে প্রত্যেকটি সকালকেই মনে হয় নতুন। ঘুম ভাঙার পর চোখে খানিকটা বিস্ময়ের ঘোর লেগে থাকে। শরীরে ভর করে না পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার অবসাদ। বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে বাইরে ছুটে যাওয়া যায়।

বাদল তার মায়ের থেকেও আগে ওঠে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু একটু শিরশিরে লাগে তাকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে তাদের বাড়ির সামনের চওড়া রাস্তার দিকে। কিছু কিছু দৃশ্য, কিছু মানুষকে সে প্রত্যেকদিন দেখে। যেন এদের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, দেখা না করলে চলবে না। প্রথমেই সে দেখে দু'জন মানুষকে, তারা রাস্তার চাপাকলের সঙ্গে লম্বা হোসপাইপ লাগিয়ে জল ছড়ায়। হোসপাইপটা নেতিয়ে পড়ে থাকে—তার মধ্যে জল ঢুকলেই সেটা আস্তে আস্তে সাপের মতন জীবন্ত হয়ে ওঠে, নিজে নিজেই নড়ে চড়ে। একজন লোক সেটা হাতে তুলে নিয়ে জল ছড়ায়—তখন ফট ফট করে আওয়াজ হয়—কত দূর পর্যন্ত যায় জল, হঠাৎ মনে হয় রাস্তার সব পথিককে ভিজিয়ে দেবে—কিন্তু কারুর গায়ে কোনোদিন জল লাগে নি, ঠিক পায়ের কাছে এসে থেমে যায়। বাদলের মনে হয়, এটা একটা খেলা।

শীতে সকালেই পথে অনেক মানুষ থাকে। অধিকাংশই গঙ্গাস্নান যাত্রী, কেউ কেউ শীতের জড়তা কাটাবার জন্য গান গাইতে গাইতে যায়। মহিলারা যান রিকশায়—অনেক ঠং ঠং শব্দ পরস্পরকে পাল্লা দেয়। একজন বৃদ্ধ মাড়োয়ারী গিরিশ পার্কের সামনে রোজ পায়রাদের গম খাওয়ান। ছড়িয়ে দেন মুঠোমুঠো গম—ঝাঁক ঝাঁক পায়রা এসে বসে রাস্তার মাঝখানে—দূর থেকে তাদের মনে হয় চঞ্চল ফুলের মতন। একটু বাদেই একটা বিশাল চেহারার ষাঁড় এসে ঢুকে পড়ে পায়রার ঝাঁকের মধ্যে। পায়রাদের খাবারে সে ভাগ বসাতে যায়। বৃদ্ধ মাড়োয়ারীটি পরম স্নেহে ষাঁড়টির গায় হাত বুলিয়ে বলেন, আয় বেটা, চুঃ চুঃ—

একটা লোক কলাপাতায় মুড়ে মাখন বিক্রী করে। সাদা ও হলদে দু'রকম মাখন—নুন ছাড়া ও নুন মেশানো—ছোট ছোট কলাপাতার প্যাকেট দাম দু পয়সা। লোকটি বাদলদের বারান্দার তলায় এসে রোজ মুখ তুলে বলে, মাখন চাই নাকি, খোকাবাবু? মাখন।

বাদল ঘাড় নেড়ে না জানায়। লোকটি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দু' চারবার যেন বাদলকেই শোনাবার জন্য দু'তিন রকম সুরে মাখন, মাখ্খন, মাখনন্ হাঁক ছাড়ে। বাদল কোনোদিন কেনেনি, তবু লোকটা বিরক্ত হয় না।

এর পর ধামা মাথায় করে আসে আর একটি লোক, সে ঠোঁট দুটোকে গোল করে বলে, মুড়ির চাক, ছোলার চাক, চিঁড়ের চাক চাই-ই! বাদল বেশ কিছুদিন, এই লোকটি কি বলে যে চ্যাঁচায়, তা বুঝতেই পারে নি! সেই জন্যই মায়ের কাছে ঝুলোঝুলি করে এই লোকটিকে একদিন ডেকেছিল। ওমা, এই লোকটি মোয়া বিক্রি করে। তবে চিঁড়ের মোয়াগুলো গোল নয়, চ্যাপ্টা, আর ছোলার মোয়া বাদল আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু মুড়ির মোয়াকে এ কেন মুড়ির চাক বলে, বাদল তা বুঝতে পারে না।

হঠাৎ ঝনঝন আর কপ্ কপ্ শব্দে চতুর্দিক সচকিত হয়ে যায়। রাস্তা ছেড়ে দেয় লোকজন। সেই ঘোড়ার গাড়িটি আসছে। দুটি বিশাল অশ্ব টেনে আনছে একটা কালো রঙের চকচকে গাড়ি, কি সুন্দর তার পালিশ—ঝকমক করে। গাড়ির ওপরে উর্দি পরা কোচয়ান বসে থাকে চাবুক হাতে নিয়ে—পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে আর একজন উর্দি পরা লোক, সে একটা পেতলের জিনিসে ঝনঝন আওয়াজ করে। গাড়িখানা দেখলেই সম্ভ্রম হয়—কিন্তু গাড়িটার দুটি দরজাই বন্ধ, ভেতরে কে আছে বোঝা যায় না। বাদল কোনোদিনই জানতে

পারেনি, ঐ সুদৃশ্য গাড়ির রহস্যময় অতিথি প্রতিদিন ভোরে কোথায় যায়।

আর একটু পরেই মা হাতে খানিকটা ছাই নিয়ে এসে বলেন, এই নে। সাড়ে ছটা বেজে গেছে কখন, আর তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস!

ছাই দিয়ে দাঁত মেজে ফেলে বাদল, মুখ নিজেই ধোয়, কিন্তু চোখ ধুইয়ে দেন মা নিজে। মা চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে ভালো ভাবে পরিষ্কার করে দেন চোখ। একবার জ্বরে ভোগার পর বাদলকে সর্ষের তেল আর নুন দিয়ে দাঁত মাজতে হয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে ছাই দিয়ে মাজাই তার পছন্দ হয়।

মুখ ধুয়ে এসে চট করে দুধ মুড়ি খেয়ে নেয়, তার পরেই জামা প্যান্ট বদলে মাথা আঁচড়ানো। বাড়ির অন্য ছেলেদের দুপুরে ইস্কুল—কিন্তু বাদলকে পড়তে হয় সকালের ইস্কুলে। বাদলের দুই দিদি—সান্ত্বনা আর শ্রীলেখার ইস্কুলও সকালে, বাদল তাদের সঙ্গে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাদল দেখতে পায় একতলায় বসবার ঘরে খবরের কাগজ সামনে মেলে বসে আছেন বড়বাবু, হাতে সিগারেট। বড়বাবু কখনো চোখ তুলে তাকান ওদের দিকে, কোনো কোনোদিন একটাও কথা বলেন না। আবার কোনো কোনোদিন বাদলকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকেই দু হাতে তাকে শূন্যে উঁচু করে তোলেন, কি রকম লেখাপড়া শিখছিস, দেখি! বলতো, পিপীলিকা বানান কি?

বাড়ির চাকর সঙ্গে সঙ্গে আসে, কিন্তু বাদল দিদিদের হাত ধরে যায়। শ্রীলেখাদের কাছে পয়সা থাকে, বাদল এক একদিন আব্দার বায়না করে শ্রীলেখাদিকে দিয়ে লাঠি লজেঞ্চুস কেনায়। তারপর দিদিরা তাকে ইস্কুলের দরজায় পৌঁছে দিয়ে নিজেদের ইস্কুলে চলে যায়।

বাদলদের ইস্কুলের নাম যদু পণ্ডিত বিদ্যালয়—কিন্তু লোকের মুখে মুখে এর নাম যদু পণ্ডিতের পাঠশালা। এই ইস্কুল ক্লাস সিক্স পর্যন্ত, সুতরাং ছাত্ররা সবাই শিশু। সকালবেলার গাছ ভর্তি পাখির মতন গোটা স্কুল বাড়িটা জুড়ে শিশু কণ্ঠের রিনরিন আওয়াজ। ঠিক সাতটার সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলেই সব আওয়াজ থেমে যায়। সবাই ক্লাস ঘর ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড টাকওয়ালা হেড মাস্টার মশাই দু হাত উঁচু করে বলেন, রেডি! ওয়ান, টু, থ্রি—

সবাই এক সঙ্গে গান শুরু করে :

জয় ভগবান
সর্ব শক্তিমান
—
জয় জয় ভবপতি...ইত্যাদি।

গান শেষ হওয়া মাত্রই ছেলেরা দৌড়োয় যে-যার ক্লাস ঘরের দিকে। যে আগে যাবে সে সামনে বসবে।

ইস্কুলে বাদলের মন ভালো থাকে না। এখনও অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তার ভাব হয়নি। একেই সে লাজুক, তার ওপরে বাঙাল উচ্চারণের জন্য সে কথাই বলতে চায় না সহজে। অন্যান্য ছেলেরা মাস্টার-মশাইকে লুকিয়ে কাটাকুটি খেলে, ছুরি দিয়ে কাঠের ডেস্কে নাম খোদাই করে—বাদল আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। [illegible] পাশে একটা ছেলে মাঝে মাঝেই নিজের পকেটে হাত ঢোকায়, তারপর সেই হাতটা মুখের কাছে এনে ভেতরে একটা কিছু পুরে দেয়, কচ্‌ কচ্‌ করে চিবোয়। বাদল সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে [illegible] একদিন সে বাদলকে বললে, খাবি?

বাদল কিছু উত্তর দেবার আগেই পরিতোষ তার মুঠো করা হাতটা [illegible] বাদলের মুখের কাছে চেপে ধরলো। [illegible] বাদল বুঝতে পারছে না, জিজ্ঞেস করলো, কি? পরিতোষ বললে, ছোলা!

দুপুরে ভাত খাবার পর বাদল [illegible] ঠাকুমাকে ছোলা চিবোতে দেখেছে বটে। কিন্তু এমনি এমনি কেউ বসে বসে ছোলা খায় এটা তার ধারণাই ছিল না। [illegible] এইটুকু ছেলে।

দিদিদের ছুটি হবার আধ ঘণ্টা আগেই বাদলের ছুটি হয়ে যায়। সেই সময়টা তাকে একলা একলা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গেটের কাছে। অন্য ছেলেরা দল বেঁধে চলে যায়, কেউ কেউ তাকে ডাকে, তবু বাদল যেতে পারে না। বাদলের ওপর কড়া হুকুম, কক্ষণো সে একলা একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না। কলকাতায় ছেলেধরা আছে, তারা একলা বাচ্চা ছেলে পেলেই ঝোলায় ভরে নিয়ে চলে যায়। তারপর তাদের হাত পা কেটে ভিখিরি বানিয়ে দেয়। বাদল

বাড়ির রাস্তা চেনে, তার ইচ্ছে করে এক ছুটে বাড়ি চলে যেতে—কিন্তু হুকুম অমান্য করার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না।

স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা আলুকাবলি কিংবা হজমি কিনে খায়, কিন্তু বাদলের হাতে পয়সা দেওয়া হয় না। সবচেয়ে লোভনীয় হচ্ছে 'বুড়ির মাথার পাকা চুল'—লাল তুলোর মতন মিষ্টি জিনিস—এই জিনিসটা বাদলের বাড়ির কাছে কেন যে পাওয়া যায় না!

লাল পাগড়ি মাথায় একজন কুচকুচে কালো চেহারার পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে বাদলদের ইস্কুলের কাছেই। কলকাতার রাস্তার পুলিস সে সময় বেশ একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার। ছেলেরা পুলিসটিকে দেখলেই চেঁচিয়ে বলে, পুলিস, সেলাম। পুলিস, সেলাম!

পুলিসটি উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসে। কয়েকটা দুষ্টু ছেলে অবশ্য একটু দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে,

বন্দে মাতরম

পুলিসের মাথা গরম।

বলেই তারা দৌড়ায়।

এরকম ভাবেই ছেলেরা 'পাগলা হাবু'কে জ্বালায়। পাগলা হাবু অত্যন্ত ভালোমানুষ পাগল। মোটাসোটা চেহারা, খালি গা, সারা পিঠ জুড়ে কালসিটে পড়ে গেছে। সে একখানা মোটা লাঠি নিয়ে নিজের পিঠে নিজেই মারে—আর কি যেন চ্যাঁচায়। আগে বাদলের মনে হতো, ও বলছে বাংলা কাবু। পরে মনোযোগ দিয়ে শুনে বুঝেছে, ও বলে, পাগলা হাবু। যেন নিজের পাগলামির জন্য নিজেকেই শাস্তি দেয় সে।

কিন্তু কৈশোরে অধিকাংশ মানুষই নিষ্ঠুর। অমন যে নিরীহ পাগলা হাবু তাকেও ছেলেরা নিষ্কৃতি দেয় না। যেহেতু পাগলা হাবু নিজেকে ছাড়া আর কারুকে কখনো মারে না, তাই ছেলেরা নির্ভয়ে তার কাছে গিয়ে চিলুবিলু করে—তাকে খোঁচায়, চিমটি কাটে, কেউ কেউ ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মারে। পাগলা হাবু তখন কাঁদো কাঁদো ভাবে উঁউঁ করে।

সপ্তাহে একদিন বাদল মাকে নিয়ে গঙ্গায় যায়। আগে মা আর জ্যাঠাইমা দু'জনে মিলে যেতেন। ইদানীং জ্যাঠাইমা বাতে শয্যাশায়ী হওয়ায় মাকে একাই যেতে হয়, তিনি বাদলকে সঙ্গে নেন।

রিকশা করে গিয়ে ঘাট থেকে একটু দূরে নামতে হয়। পথের দু'পাশে বসে থাকে অসংখ্য ভিখিরি। পুণ্য অর্জনের জন্য লোকেরা তাদের এক পয়সা বা আধলা দেয়। কেউ কেউ বাড়ি থেকে চাল নিয়ে আসে। কেউ কেউ আবার অধিকতর পুণ্য অর্জনের জন্য ভিখিরিদের পয়সা না দিয়ে সেই পয়সা গঙ্গায় ছুঁড়ে দেয়। বাদল শুনেছে, গঙ্গার জলে ডুব দিলেই সব পাপ চলে যায়। জলে ডুব দিয়ে থাকলে পাপগুলো শরীর ছেড়ে অদৃশ্য ফড়িং-এর মতন জলের ওপর অপেক্ষা করে, মাথা তুললেই আবার চেপে বসে। বারবার ডুব দিলে, পাপগুলো হয়তো বিরক্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। সেই জন্যই অনেককে মরার একটু আগে গঙ্গার কিনারায় নিয়ে আসা হয়—গঙ্গার জল ছুঁয়ে থেকে মরতে পারলে তার আর কোনো পাপ সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় না। এই সব শোনার পর—বাদল একদিন গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলের মধ্যেই পেচ্ছাপ করে ফেলেছিল—তখন তার কি ভয়! কিন্তু বাদলের যে কোনো উপায়

বিজ্ঞপ্তি

দেশ (সাপ্তাহিক)

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (সেণ্ট্রাল) রুলস-এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল

১। প্রকাশস্থান : ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

২। প্রকাশকাল : সাপ্তাহিক

৩। মুদ্রাকর : শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
ভারতীয় নাগরিক
১, বলরাম মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৫।

৪। প্রকাশক : শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
ভারতীয় নাগরিক
১, বলরাম মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৫।

৫। সম্পাদক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
ভারতীয় নাগরিক
২০, মদনমোহনতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৫।

৬। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা :

(ক) মালিক—আনন্দবাজার পত্রিকা
প্রাইভেট লিমিটেড,
৬, প্রফুল্ল সরকার
স্ট্রীট, কলি—১।

(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও
অধিক শেয়ার গ্রহীতা :

১। শ্রীঅশোককুমার সরকার
২। শ্রীযুক্তা অলকা সরকার
৩। শ্রীঅভীককুমার সরকার
৪। শ্রীঅরূপকুমার সরকার
৫। শ্রীঅদীপকুমার সরকার

২০, মদনমোহনতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৫।

আমি শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরের তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর

শ্রী সীতাংশু কুমার দাশ গুপ্ত।

প্রকাশক

তারিখ—১-৩-৭২

ছিল না—ঠাণ্ডা জলে নামা মাত্রই তার এমন শেছাপ পেল—কিছুতেই সে আটকাতে পারেনি—কেউ দেখেনি অবশ্য, মা-ও কিছু জানতে পারেননি—কিন্তু ঠাকুর দেবতারা যে সব টের পেয়ে যান।

বেশীর ভাগ দিনই অবশ্য বাদল স্নান করে না। বাদলের কাজ হলো মায়ের কাপড় চোপড় পাহারা দেওয়া। এখানে খুব চোরের উপদ্রব। গঙ্গায় শুধু লোকে পুণ্য করতেই আসে না, এখানে পাপ করতেও অনেকে আসে। মায়ের কাপড়-জামা বুকে চেপে ধরে বাদল দাঁড়িয়ে থাকে। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না অবশ্য। এখন তার আট বছর বয়েস, এখন আস্তে আস্তে তার সাহস বাড়ছে। মায়ের স্নান সেরে আসার মোটামুটি সময়টা তার জানা। সেই সময়টুকু সে এদিক-ওদিক ঘুরে আসে।

মানুষ গিসগিস করছে চারদিকে। গঙ্গায় বুক জলে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ স্তোত্র পাঠ করে। কোনো কোনো দুঃসাহসী সাঁতরে ভাসমান বয়ার কাছে চলে যায়। দুরন্ত স্রোত। এক একটা স্টিমার চলে গেলে বড় বড় ঢেউ এসে বাঁধানো ঘাটে আছড়ায়। স্টিমারের গম্ভীর বিষণ্ণ ভোঁ অনেকক্ষণ কানে লেগে থাকে।

ঘাটলায় ছোট ছোট কাঠের চৌকি পাতা। সেইখানে উপুড় হয়ে শুয়ে মোটা-সোটা লোকেরা সারা শরীরে তেল মাখায় পয়সা দিয়ে। তাদের ঘাড়ের ওপর, পিঠের ওপর চড়ে তৈলমর্দনকারীরা প্রচণ্ড শব্দে চপেটাঘাত করে, গুম গুম করে কিল মারে—আর নিচের লোকটি মহানন্দে পড়ে আছে। বাদল হাঁ করে এই দৃশ্য দেখে।

পাশেই শ্মশান। বাদল একবার মাত্র মায়ের সঙ্গে শ্মশানে ঢুকেছিল, তারপর থেকে একা একা প্রত্যেকদিন যায়। মা জানতে পেরে বারণ করেছিলেন, বাদল তবু যায়। এটা তার নেশার মতন। সব সময় দু' তিনটে চিতা জ্বলে, মানুষ আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদে—বাদল চুপটি করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে তার ধারণা ছিল, কোনো যুক্তি নেই এ ধারণার, যে মানুষ বুঝি শুধু রাত্তিরবেলাই মরে, রাত্তিরবেলাই তাদের পোড়ানো হয়। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে এসে সে কোনো দিন সবকটা নেভানো চুল্লি দেখেনি।

সেদিন ছিল কি যেন একটা বিশেষ তিথি। ভিড়ে ভিড়াক্কার। কিন্তু বাদল এখানে অনেকবার এসেছে বলে এখন সব কিছু চেনা। তার ভয় করে না। মেয়েদের কাপড় ছাড়ার জায়গাটার পাশেই সে দাঁড়িয়েছিল মায়ের অপেক্ষায়। এত ভিড় যে স্নানার্থীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াবার গেটে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। এত ভিড়ের মধ্যেই আবার কোনো একজন গণ্যমান্য লোকের মৃতদেহ নিয়ে এসেছে একটা দল। মস্ত বড় পালঙ্ক ফুলে ফুলে ছয়লাপ, মৃতদেহ দেখাই যায় না, সেটা বয়ে নিয়ে আসছে যারা—তারা এই ভিড়ের মধ্যে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে একজন আবার খইয়ের সঙ্গে পয়সা ছড়াচ্ছে—আর তাই নিয়ে কাঙালীদের হুটোপাটি।

মা এসে কাপড় ছেড়ে নিলেন, তারপর বাদলকে বললেন, শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরে থাকবি। বড় রাস্তা পর্যন্ত না গেলে রিকশা পাওয়া যাবে না।

ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে ওরা। একটা জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক, তাদের এড়িয়ে এগোনো যায় না। মহা মুশকিল। লোকজনেরা জিভ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করছে—বাইরে থেকে কৌতূহলী মানুষেরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করছে, কি হয়েছে? এখানে কি হয়েছে?

একটি বাচ্চা মেয়ে হারিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে সে এখানে দাঁড়িয়ে একা একা কাঁদছে। চেহারা ও পোশাক দেখলে মনে হয় সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়ে। ফুটফুটে রং, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

একজন মাতব্বর ধরনের লোক হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করছে, এ খুকি, তোমার নাম কি? নাম জানো না?

মেয়েটি কিছুই বলছে না, শুধু কাঁদছে ফুলে ফুলে। এত মানুষ দেখে ওর মাথার ঠিক নেই।

—তোমার বাবার নাম জানো না?

—তুমি কোথায় থাকো?

—কার সঙ্গে এসেছো?

মেয়েটি একটা কথাও বলতে পারছে না। কারা কজন সাগ্রহে মন্তব্য করলো, এ মেয়েকে তো এখানে ফেলেও যাওয়া যায় না। শেষে জোর-জোচ্চোরের খপ্পরে পড়বে! কলকাতা শহর যা জায়গা—

বাদলের মা বললেন, আহা রে, ঐ মেয়েটার মা বাবার মন এখন কি রকম আকুলি-বিকুলি করছে। ঐটুকু মেয়ে—

সেই সময় ভিড়ের ফাঁক দিয়ে বাদল এক ঝলক দেখতে পেল মেয়েটিকে। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললো, মা, ওকে আমি চিনি!

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই চিনিস? কি করে চিনলি ওকে?

বেশ উত্তেজিত হয়ে গেছে বাদল, [illegible] কথা বলতে পারে না। কোনোক্রমে বললো, [illegible] ভবানীপুরে [illegible]

মা বললেন, হ্যাঁ, সেই ভবানীপুর থেকে এতদূর আসবে কি করে ও?

ভবানীপুরে নয়, ওরা হাতিবাগানে থাকে।

—কি নাম ওর?

—ওর নাম রেণু।

মা তাঁর পার্শ্ববর্তী একজন মহিলাকে বললেন, আমাকে একটু মেয়েটির কাছে যেতে দেবেন? আমি ওকে একটু কথা জিজ্ঞেস করবো!

ভিড় সরিয়ে মাকে কাছে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। মা জিজ্ঞেস করলেন, খুকি, তোমার নাম কি রেণু? তুমি কি হাতিবাগানে থাকো?

মেয়েটি বড় বড় চোখ মেলে মায়ের দিকে তাকালো। তারপর ছুটে এসে মায়ের হাত চেপে ধরলো শক্ত করে।

(ক্রমশ)

মানুষ অতুলপ্রসাদ

পাহাড়ী সান্ন্যাল

॥ সতের ॥

পরের দিন সকালে নিজের সঙ্গে নিজের মনের বোঝাপড়া করবার জন্য সাহসে ভর করে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। মন আর হৃদয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত করলাম যে, না, আমার এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। জীবনের একটা পথ আমি কোনদিন কোন ভাবে সহ্য করতে পারিনি। সুতরাং [illegible] আমাকে হতেই হবে।

তখন আর একটা দরজা দেখা দিল যে, আগে প্রতিভার সঙ্গে মোকাবিলা করব না অতুলদার সঙ্গে আগে? নাঃ, আগে প্রতিভার সঙ্গে দেখা করাই দরকার। এর বাইরে কোন দিক দিয়ে এগোবার আর আমার কোন অধিকার নেই।

ডক্টর জি সি দাশের বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে সাইকেলটা নিচের ঘরে রাখলাম বটে, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার ক্ষমতা যেন তখন হারিয়েছি। সেই সময় পর্যন্ত অত বড় সমস্যার সম্মুখীন আমি কোনদিন হইনি কাজেই কেমন যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হতে লাগল।

এই পাঁচ-ছদিন প্রতিভাকে না দেখে মন যেমন আকুলি-বিকুলি করছিল এখন কিন্তু ঘটল ঠিক তার বিপরীত। হঠাৎ মনে হল, প্রতিভার সঙ্গে আর কোনদিন সাক্ষাৎ না হলেই যেন ভাল হয়। কিন্তু সাক্ষাৎ করাটা তখন আমার একটা দায়িত্ব। নিজের প্রতি দায়িত্বও বটে, আর তার প্রতি দায়িত্ব তো নিশ্চয়ই।

আরও কম বয়সে কিছু কিছু কৈশোর-সমস্যা যে আমার জীবনে ঘটেনি তা নয়। যেমন, আমাদের বাড়িতে দাদাদের পাঁচ-ছখানা টাঙ্গা ছিল যার দৈনন্দিন আয়ের পয়সা আমার কাছে জমা করে যেত টাঙ্গাওয়ালারা। হিসেব মিলিয়ে সেগুলি আমার একটি বাক্সের মধ্যে রেখে দেবার কথা। কিন্তু পয়সাগুলি সচল হয়ে ওই তালাবন্ধ বাক্সর মধ্য থেকে কেমন করে যেন বেরিয়ে আসত আর নানারকমের রেস্তরাঁ থেকে সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের রূপ ধারণ করে আমার পেটের মধ্যে গিয়ে বাসা নিত। বাক্স খুলে যখন মনে হত যে এত টাকার হিসেব দাদাদের দিতে হবে তখন দেখতাম অনেকগুলি পয়সাই আর তার মধ্যে নেই। সেটা ছিল একটা সমস্যা। ছেলেমানুষ আমি, বড়দের খানিকটা বকুনি খাবার আর কৈফিয়ৎ দেবার ভয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না তখন। কিন্তু আজ তো আর আমি ছেলেমানুষ নই। আমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত। নিয়মানুবর্তিতার বাঁধন আমার নেই, কাজেই কৈফিয়ৎ আমার নিজের কাছে নিজেকেই দিতে হবে। সমস্যার বেড়াজাল থেকেও নিজেই নিজেকে মুক্ত করতে হবে। সেই সমস্যাবেষ্টিত পায়ের বেড়ি আমাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। ওপরে উঠতে পারছিলাম না কিছুতেই।

হঠাৎ এক সময় মরীয়া হয়ে বেড়ি-গুলোকে ভেঙে সজোরে উঠে গেলাম। উঠতে উঠতে যে বিভীষিকার কথা ভাবছিলাম, দোতলার ড্রইংরুমে ঢুকে সে বিভীষিকা এক মুহূর্তে মুছে গেল।

দেখলাম হেমদি আর প্রতিভা দুজনেই খুব হালকা গল্পে মশগুল। এই দেখে সাময়িকভাবে আমার নিজেকেও অত্যন্ত হালকা মনে হল। আমিও ওদের গল্পের শরিক হয়ে উঠলাম।

কিন্তু মিনিট পাঁচ-ছয় পরেই লক্ষ্য করলাম যে প্রতিভা থেকে থেকে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠছে। সেটা সত্যিই তাই কিংবা আমার অপরাধী মনের প্রতিক্রিয়া সেটা ঠিক বলতে পারব না।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিভা খুবই স্বাভাবিক হাসি হেসে বললে, "চা খাবেন নিশ্চয় ?"

আমিও কেমন আপাতনির্বিকারভাবে বললাম, "সেটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে।"

চায়ের পর্ব শেষ হল। হেমদি হঠাৎ বললেন, "রোজ তো রাত এগারটার পরে এখান থেকে বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা কড়কড়ে খাবার খাস—"

এই পর্যন্ত শোনার পরেই আমি চমকে উঠে ভাবলাম হেমদি বুঝি আমায় এখানে বেশি রাত পর্যন্ত থাকতে বারণ করতে চান, তাই এই ইঙ্গিত। কিন্তু না, পরের কথাগুলি শুনে মনে হল, ওটা আমার 'চোরের মন বোঁচকার দিকে'র মতনই একটা ভাব।

হেমদির কথাগুলি কানে এল, তিনি বললেন, "আজ প্রতিভা মাংস রেঁধেছে। রাত্রে এখানেই খাস।"

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জ্বর ছাড়লেও পোস্ট-ফিভার যে গ্লানি থাকে সেটা থেকে অব্যাহতি পেলাম কই! পেটুক মানুষ আমি, প্রতিভার রান্না মাংস খাব এ কথা ভেবে বোধ হয় সাময়িকভাবে মনটা হালকা হল।

প্রতিভা বললে, "মাংসটা বোধহয় এতক্ষণে সেদ্ধ হয়ে গেছে। নামিয়ে রেখে আসছি।"

এর পরে হেমদির সঙ্গে বসে যে কি গল্প করেছি কিছুই মনে নেই। হেমদি ছিলেন অত্যন্ত সরল মানুষ। কাজেই আমার চাঞ্চল্য বা অন্যমনস্কতা হেমদি কিছুই লক্ষ্য করেন নি।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিভা ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর জি সি দাসও তাঁর লেখার পাতা শেষ করে ঘরে ঢুকে বললেন, "আহারটা আইজ এইখানেই খাইয়া যাও। প্রতিভা কেমন মাংস রান্না করে সেইটা পরীক্ষা করতে অইব।" ওঁর কথার মধ্যে চলতি বাংলা এবং ঢাকাই ভাষার একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল যেটা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগত।

একথা শুনে প্রতিভা একটা এমন অদ্ভুত হাসি হাসল যেটা দেখে আমি ভাবলাম, ইস, এই পাঁচ-ছয় দিন ধরে আমি এই মেয়েটিকে না দেখে ছিলাম কেমন করে!

যথাসময়ে খেতে বসা গেল। সত্যিই চমৎকার রেঁধেছিল প্রতিভা মাংস রান্না। ডক্টর দাস এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা সকলেই ধন্য ধন্য করে উঠল। আমার অবস্থাটা কি বলে বোঝান দরকার?

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিভা আর আমি চড়ে বসলাম ... বেড়াতে চলে গেল। বাড়ি প্রায় অন্ধকার রাস্তা দিয়ে। আমার মনটা ও সম্পূর্ণ নিথর। নিজের অন্তরের মনের চেহারাটা নিজেই ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না।

তাদের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে দুজনে বসলাম। প্রায়-নিস্তব্ধ স্মৃতি হাতড়ে মনে পড়ছে তখন ছিল শুক্লপক্ষ। মনে হল আমাদের দুজনেরই সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সেই অনুভবেও অতি সজাগ। মনটাও বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য একেবারেই অসাড় হয়ে গিয়েছিল। আমরা দুজনে কেনই বা এভাবে বসে আছি; কি যেন দুজনে দুজনকে বলতে চাই অথচ বলতে পারছি না—এরকম একটা মনের ভাব দাঁড়িয়েছিল তখন।

রাত বোধহয় তখন এগারটা বাজে। হঠাৎ প্রতিভাই প্রথম কথা বলে উঠল। তার গলার স্বরটা আমার কানে কেমন কর্কশ লাগল। কথাগুলি যা শুনলাম, তা হল: "তুমি বাড়ি যাবে না?"

নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ! কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে প্রতিভার দিকে তাকিয়ে আমি বোধহয় খানিকটা নির্বিকারভাবেই বলে উঠলাম, "হ্যাঁ যাব, কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে।"

সে আরও কর্কশ হয়ে বলল, "কি বাজে কথা বলছ!"

আমি উত্তরে যে ধরনের কথাগুলো বলেছিলাম সেটা হল: "তোমার কাছে কথাটা বাজে শোনালেও আমি সত্যিই কাজের কথা ভেবে বলেছি। কারণ তোমার সঙ্গ আমি চাই। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

ওই প্রায়ান্ধকার পরিবেশের মধ্যেও দেখলাম তার চোখদুটো জ্বলে জ্বলে উঠে আবার কেমন নিভে গেল। সে বলল, "তুমি ছেলেমানুষ। অমন কথা আমাকে বলতে নেই। কাল থেকে বরং তুমি আর এখানে এস না।"

আমার তখন মরীয়া অবস্থা। আমিও গলার জোর দিয়ে বলে উঠলাম, "বেশ, আসব না। কিন্তু আমার কথা তুমি যেন ভুলে যেও না।"

এই কথা বলেই আমি উঠে পড়লাম।

প্রতিভা আমার হাত দুটি নিজের হাতে নিয়ে চোখে মুখে ... গলায় বলে উঠল, "লক্ষ্মীটি, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আমি তোমায় ভুল বুঝিনি বলেই বলছি। তোমার ভালই আমি চাই।"

আমি বললাম, "তুমি না চাইলেও তা আমার চাই। তার জন্যে তোমার মাথা-ব্যথার প্রয়োজন নেই।"

মনে মনে বুঝেছিলাম আমি অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছি। তাই অমন কড়া কথাগুলো বলতে পারছি। আমি এখন প্রেম-ভালবাসার কথা ভুলে গিয়ে শুধু অভিমানটাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছি।

শুনলাম প্রতিভা বলে চলেছে, "এমন অসম্ভব কথা মনেও এনো না। প্রথম কথা আমি তোমার থেকে বয়সে অনেক বড়, আর আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা দিয়ে তোমাকে ধরে রাখতে পারব। দ্বিতীয় কথা, তুমি যা ভাবছ তা যে সমাজে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ... লক্ষ্মীটি তুমি এ ভাবনা আর মনে স্থান দিও না। আমাদের দুজনের সাক্ষাৎ না হওয়াতেই তোমার মঙ্গল।"

আমার মনটা তখন ছটফট করে উঠেছে। কোন দিক দিয়েই নিজেকে সামলে উঠতে পারছি না। তাই একটি কথাও না বলে সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম; আর নিচের দরজা খুলে সাইকেল নিয়ে ছুটে পেছনে বেরিয়ে এলাম। প্রতিভা দরজা বন্ধ করল কিনা সে হুঁশও আমার রইল না।

বাড়ি ফিরে আমার সেই অত্যন্ত পরিচিত ঘরখানাকে কেমন যেন একটা ভাঙা দেউল বলে মনে হল। মনে হল ঠাকুর বুঝি আমার কাছ থেকে সরে গেছেন। সারা রাত ঘুমোতে পেরেছিলাম কি না জানি না, কারণ যে শূন্যতা তখন আমাকে ঘিরে ধরেছিল তার মধ্যে যেন কোন ভাবেরই সংজ্ঞা আর ছিল না।

এক সময় সকালের আলো ফুটেছে, কিন্তু আমার মনে সে আলোর কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। শুধু একটা কথাই মনের মধ্যে আসছে, ওই কালো মেয়েটির সঙ্গে তার কোনদিন দেখা হবে না। আমি জানি প্রতিভা অত্যন্ত ব্যথাভরা মন নিয়েই আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করেছিল। আমি অভিমানভরেই তাকে ভুল বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম সে বুঝি আর আমাকে চায় না। এত ভুল বোঝাবুঝি, এত অস্থিরতার মাঝেও কোথায় যেন একটা ব্যথাভরা আনন্দের রস পাচ্ছিলাম।

এটা লিখে পাঠককে কিছু বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না, কিন্তু যাঁরা জীবনে এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁদের কাছে আমার এই অবস্থাটা নিশ্চয় স্পষ্ট।

দিন গড়িয়ে চলল সন্ধ্যার দিকে। যেমন যেমন পৃথিবীতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল, সূর্যের আলো গেল নিভে, আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন মন তেমন তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কারণ সেটাই যে আমার নিয়মিত অভিসারের মুহূর্ত।

সাইকেল তুলে নিয়ে পথে বেরোলাম। যাব সেই কালো মেয়েটির কাছে। পথ চলতে গিয়ে বুকটায় কেমন মোচড় দিয়ে উঠল—কি করে হবে অভিসার! অভিসারের সাথী যে দূরে সরে গেছে। কত জায়গায় গিয়ে নিজের মনটাকে ভোলাবার কথা ভাবলাম। কিন্তু কার কাছে যাব? কে বুঝবে আমার ব্যথা?

হ্যাঁ, যেতে পারতাম বড় অতুলদার কাছে, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যেভাবে পালিয়ে এসেছি, আর কোন্ সাহসে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

পথে পথে সাইকেলে করে যত বা এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছি ততই অস্থির এবং আরও বেশি এলোমেলো হয়ে উঠছে আমার মনটা। হঠাৎ কখন লক্ষ্য করলাম উইংফিল্ড পার্কে ঢুকেছি সাইকেল নিয়ে। সেটি হল লখনৌয়ের জুওলজিক্যাল গার্ডেনস। অতি সুন্দর পরিবেশ। সবুজ ঘাসে ভরা নানা রঙের ফুলে সাজানো একটি মনোরম বাগান। সাইকেলটি রেখে একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়লাম।

নিশুতি রাত।* লোকজন চলাচল নেই বললেই চলে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে চিড়িয়াখানার কিছু কিছু জন্তু এবং পাখিরা। কতক্ষণ সেখানে বসে ছিলাম জানি না, হঠাৎ ঘড়িই স্মরণ করিয়ে দিল রাত্রি দশটা বেজে গেছে। বিষণ্ণ মনে ভাবলাম, এর পর কি?

অনেক ভেবে স্থির করলাম, অতুলদার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

এরপর তিন-চারদিন আমি যে বুকভাঙা মানসিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে গিয়েছি সে অভিজ্ঞতাটা আমার একান্তভাবেই নিজস্ব। মানসিক পরিশ্রম বলতে বোঝাচ্ছি, সাহস গড়ে তোলবার পরিশ্রম। অতুলদার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

মন্দির মসজিদ আর গীর্জার মতই ঢাকার মানুষের কাছে আজ যে সবচেয়ে বড় তীর্থ ঢাকার শহীদ মিনার তা সেদিন আবার নতুন করে প্রমাণিত হল। বিশে আর একুশে ফেবরুয়ারির এই দুদিন ধরে ঢাকার এমন কেউ ছিলেন না যিনি একবার যাননি শহীদ মিনারে। ২০ ফেবরুয়ারি সকাল থেকেই দেখা গেল, ফুল হাতে করে দলে দলে মানুষ খালি পায়ে চলেছেন শহীদ মিনারের দিকে। তারপর রাত বারোটা বাজতেই সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। হাজার মানুষের মিছিল। নগ্নপদ পুরুষের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। গায়ে চাদর। মেয়েরা পরেছিলেন বাসন্তী রঙের শাড়ি। ঋতুর সংগে মিলিয়ে। সবারই বুকে আঁটা কালো ব্যাজ। আলোকিত সরণী ধরে পায়ে পায়ে হেঁটে শহীদ মিনারে পৌঁছতে অনেকেরই লেগেছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়। কিন্তু ঢাকায় সেদিন সারা রাত ধরে কেউ ঘুমোয়নি।

ঢাকার শহীদ মিনার বাংলাদেশের স্ট্যাচু অব লিবার্টি। সেদিন বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীসুবিমল দত্ত বলছিলেন, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক। ভাষা আন্দোলন দিয়েই ওঁদের স্বাধীনতার জয়যাত্রা শুরু। তাই ২৫ মার্চের পর ইয়াহিয়াশাহীর সবচেয়ে বেশী ক্রোধ গিয়ে পড়েছিল শহীদ মিনারের ওপর। ওরা ভেঙে দেয় শহীদ মিনার। সেখানে তার বদলে তৈরি করে এক মসজিদ। সেই বিধ্বস্ত শহীদ মিনার এবারের একুশে ফেবরুয়ারিতে যে ফুলে ফুলে ভরে যাবে, সেদিন যা ছিল শোক আজ যে তা জাতির দীক্ষা গ্রহণের দিনে এসে পরিণত হবে, তা বোধ হয় বুঝতে পারেনি ইসলামাবাদের গর্বোদ্ধত শাসকগোষ্ঠী।

ভাষা ও সাহিত্য নিষ্ঠার সংগে এখানকার বাঙালীদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে আরও গভীর সূক্ষ্ম রুচিবোধ গড়ে উঠেছে ও মার্জিত শিল্পমানসের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল এবারের এই একুশে ফেবরুয়ারির অনুষ্ঠানে। শহীদ স্কোয়ারে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা হার্ডবোর্ডের সাহায্যে কয়েকটি প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন, তার একটি হচ্ছে পরাধীনতার শিকল ভাঙার প্রতীক। এই প্রতিকৃতির পাশে একটি লম্বা হার্ডবোর্ড দাঁড় করানো। এর ওপর লেখা "একুশের প্রেরণাতে আমরা লড়েছি, ছিন্ন করেছি শৃংখল।"

এ ছাড়া ছিল আরও কয়েকটি তৈলচিত্র। বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন থেকে চূড়ান্ত বিজয়লাভের মুহূর্ত আঁকা সে সব ছবিতে।

লম্বা হার্ড-বোর্ডের আর একটি শিল্পসম্মত প্রতিকৃতি রাখা হয়েছে দেখলাম রমনার মোড়ে। এ ছাড়াও তৈরি হয়েছে তোরণ — ছোট-বড় অসংখ্য তোরণ।

✲

এবারের একুশে ফেবরুয়ারির বড় আকর্ষণ ছিল কলকাতার শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনুষ্ঠানে যোগদান। একুশে ফেবরুয়ারির বিকেলে ছাত্র লীগ পল্টন ময়দানে যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে কয়েক লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। কলকাতার সাহিত্যিকদের এখানে আনার ব্যাপারে

তার কিছু কিছু বই এখনও অবশিষ্ট আছে। তবে নতুন করে বই কিনতে হবে। একটি তথ্যপত্রিকা প্রকাশের কথাও দূতাবাস ভাবছেন।

ধানমণ্ডীর দু নং রোডে ভারতীয় দূতাবাস দুটি বিরাট বাড়ি নিয়েছেন। সেদিন গিয়েছিলাম দূতাবাসে। স্থানীয় পুরনো দূতাবাস কর্মীদের অনেকেই আবার চাকরি পেয়েছেন। বাড়িটি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। কয়েকজন তরুণ অফিসারের সঙ্গে আলাপ হল, যেমন ফারস্ট সেক্রেটারি শ্রীলামবা আর শ্রীমতী অরুন্ধতী ঘোষ। ওঁদের সামনে প্রচুর কাজ। শ্রীমতী ঘোষ বললেন, দুপুরে খেতে যাবার সময় পর্যন্ত পাচ্ছি না। দিল্লি থেকে ঘন ঘন মেসেজ আসছে। শ্রীমতী ঘোষের ওপর অর্থনৈতিক সাহায্য তদারকির ভার। আর এটাই তো এখন দূতাবাসের বড় কাজ।

*

এবারের শহীদ দিবসে ছাত্ররা আরও ব্যাপকভাবে বাংলা চালু করার জন্য শপথ নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় ছাত্র নেতারা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব ছেলেমেয়ে পড়তে আসবেন তাঁরা যেন বাঙালী পোশাক পরে আসেন। দোকানে দোকানে ইংরাজী সাইনবোর্ড থাকলে তার বিরুদ্ধেও জেহাদ হবে। ছাত্ররা বুরুশ আর আলকাতরা নিয়ে বার হলেন। ইতিমধ্যেই স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি অভিযোগ করতে শুরু করেছে যে, কার্যক্ষেত্রে বাংলা কমই চালু হয়েছে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলায় যতটুকু কাজ কর্ম চালু হচ্ছে না যেটুকু প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত দেখা গেছে তার মূল্যও কিছু কম নয়। সর্বস্তরে বহুল ব্যবহারের ফলে বাংলা কবিতা ও কাব্যধর্মী গদ্য এখন জনজীবনে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এখানে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মুখের ভাষাতেও সেই সুরটি শোনা যায়। সংবাদপত্রের ভাষা [illegible] রীতিমত পরিশীলিত। সংগ্রামের [illegible] লেখা হয় কবিতায়। এবারের একুশে [illegible] বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা [illegible] বিজ্ঞাপনে যে বাংলা ব্যবহার করেছেন [illegible] পড়ে [illegible]। যেমন একটি [illegible] সংস্থা লিখেছেন : [illegible]

বিভাগ ও জুতো প্রস্তুতকারক [illegible] শহীদ দিবসকে স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের শাজাহান কবিতা থেকে একটি লাইন তুলে দিয়ে। হে সম্রাট কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ। একটি [illegible] লিখেছেন, [illegible] কারো প্রাণ—হঠাৎ একুশের সূর্য [illegible] চোখ মেলে রক্তমুখী ফসল—স্বাধীনতা। কেউ তুলেছেন, সুকান্তের কবিতা, কেউ রবীন্দ্রনাথের, কেউ জীবনানন্দ দাশের।

একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওঁরা ভালবাসেন বাংলা সাহিত্যকে এবং সাহিত্যের মধ্যে কবিতাকে। কারণ, সংবাদপত্র খুললেই কবিতা আর কবিতা। একদা এক বাঙালী কবি লিখেছিলেন, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। ওঁদের কাছে কিন্তু ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী কাব্যময়।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

অস্বাভাবিক? সেক্সপীয়ার, টলস্টয়, মিলটন, বায়রন্ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী মোপাসাঁ এদের লেখা রূপদর্শীর যতই প্রিয় হোক্ না কেন তবু কি তিনি ভুলতে পারবেন যে তাঁরা ইউরোপীয় লেখক? আসল কথা তা নয়, আসল কারণ অন্যত্র। আমাদের বাংলা সাহিত্যে আমরা এত অল্পসংখ্যক মুসলমান লেখককে পাই যে হাজারটা হিন্দু লেখকের ভিড়ে মুসলমান লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই—এইটাই সচেতনতার মূল কারণ। যখন মুসলমান লেখকদের আমরা অধিক সংখ্যায় পাব তখন তাদের প্রতি আমাদের এই বাড়তি সচেতনাটুকুও আর থাকবে না।

অপূর্ব সাহা
বোকারো

বাঙ্গালীর ইতিহাস

গত ২২-১-৭২ তারিখের দেশে 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রসঙ্গে আলোচনায় শ্রীঅরুণ রায় চৌধুরী লিখেছেন—তিনি 'ভারত কোষ' নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে দেখেছেন রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ বর্তমান হাওড়া-বারহারোয়া লাইনের চিরুটি স্টেশনের রাজবাড়ি ডাঙা। এবং শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের বইতে আছে মুর্শি-দাবাদ জেলায় রাঙামাটি গ্রামই বিলুপ্ত রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। অতএব শ্রীরায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে'—ভুল তথ্য আছে এবং তার পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। লেখক শ্রীরায়চৌধুরী এবং সকলেরই জ্ঞাতার্থে জানাই:

ঐ চিরুটি স্টেশনে নেমেই দেড় মাইল দূরবর্তী রাঙামাটি গ্রামেই রাজা শশাঙ্কের রাজধানী প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ। ঐ জায়গার বিভিন্ন অংশের নাম রাজবাড়ি ডাঙা, রাক্ষসী ডাঙা, সন্ন্যাসী ডাঙা ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওখানে খননকার্য শুরু হয়েছে এবং যে 'রক্তমৃত্তিকা' বিহারের উল্লেখ আছে হিউ-এন-সঙের বিবরণীতে তারও নিদর্শন ওখানেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুধীরঞ্জন দাসের তত্ত্বাবধানে এই খননকার্যের ফলে উপরোক্ত তথ্য জানা গেছে।

কাজেই শ্রীরায়চৌধুরী জানলে আশ্বস্ত হবেন শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'-এ কোন ভুল তথ্য নেই। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি ওখানে গিয়েছি এবং যাঁরা বাংলার ইতিহাস বিষয়ে সামান্য মাত্রও আগ্রহী তাঁদের ঐ জায়গায় যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলেই মনে করি।

উৎপল চক্রবর্তী
খাণীপুর, ২৪ পরগণা

॥ ২ ॥

৮ মাঘ, ১৩৭৮ সংখ্যা দেশের আলোচনা বিভাগে 'বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রসঙ্গে' ভারতকোষে প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখ অধ্যাপক অরুণকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'কর্ণ সুবর্ণের অবস্থান ব্যান্ডেল-বারহারোয়া (পূঃ রেলওয়ে) লাইনের চিরুটি স্টেশনের নিকটবর্তী রাজবাড়ি ডাঙাতে।.. কিন্তু এই নতুন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (১৯৬৮)টি পাঠ করলেও মনে হবে যে বেভারিজের ধারণাই (অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটিই কর্ণসুবর্ণ) বুঝি বর্ত-মানেরও প্রচলিত ধারণা।'

এই দুই বিবরণের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। চিরুটি স্টেশন মুর্শিদাবাদ জেলাতে বহরমপুর শহরের অনতিদূরে এবং যেখানে খননকার্য হয়েছিল সেই গ্রামের নামই রাঙা-মাটি, রাজবাড়ি ডাঙা ঐ গ্রামেরই অংশবিশেষ। সুতরাং ভুল তথ্য সংশোধনের জন্য সং-স্করণের প্রয়োজন অন্তত আলোচ্য ক্ষেত্রে কিছু নেই বলে মনে হয়।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
[illegible]

॥ ৩ ॥

গত ২২ জানুয়ারি তারিখের দেশ-এ (পৃঃ ১২৩৮) প্রকাশিত এক পত্রে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'-এর পরে প্রকাশিত বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধীয় কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর তালিকায় একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম বাদ পড়েছে। সেটি হল ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৪৫ খ্রীঃ)। এতে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস যেমন রয়েছে (রাজনৈতিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোন জাতির ইতিহাস লেখা যায় না, নীহারবাবুর বইতেও 'রাজবৃত্ত' শীর্ষক অধ্যায়ে রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হয়েছে)—তেমনি সে যুগের বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিশদ পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে।

এখানে এই ইতিহাসের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার বাংলা দেশের ইতিহাস রচনার কথা উল্লেখ করেন। স্যার এ এফ রহমান পরবর্তী বৎসর ভাইস-চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ইতিহাসের তদানীন্তন অধ্যাপক-প্রধান ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুপ্রেরণায় ও আন্তরিক সহযোগিতায় কয়েকজন কৃতবিদ্য ঐতিহাসিক এই কাজে ব্রতী হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক History of Bengal, Vol. 1 প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত History of Bengal-এর তিনটি খণ্ড তারই ফলশ্রুতি।

'বাংলা দেশের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) নীহারবাবুর 'বাঙালীর ইতিহাস'-এর মত স্ফীতকায় নয়, কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থের তুলনায় এই বইতে যে তথ্যাদি কম পাওয়া যায় তা নয়। 'বাংলা দেশের ইতিহাস'কে বাংলা ভাষায় লেখা বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রথম সার্থক গ্রন্থ বলা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নীহারবাবুর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ অথবা ঐ বইয়ের আর কোন খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'বাংলা দেশের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। ডঃ মজুমদার ছাড়াও ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ অমরনাথ লাহিড়ী দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে যোগদান করেছেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করলে এবং প্রথম খণ্ডটিকে সংশোধিত আকারে ছাপালে খুবই আনন্দের বিষয় হবে। কিন্তু, তিনি তা না করতে পারলেও বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে না, সে কথা বোধহয় 'বাংলা দেশের ইতিহাস'কে দেখে বলা যায়।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বয়স এখন ৮৪ বছর এবং তিনি জাতীয় অধ্যাপকের পদেও নিযুক্ত হননি। অন্য নানা কাজেও তিনি ব্যস্ত। তা সত্ত্বেও বর্তমানে তিনি এই বইটির চতুর্থ খণ্ড রচনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

সুরজিৎচন্দ্র দাস
কলকাতা ১৩।

সমালোচনায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও হিং টিং ছট বিতর্ক

বর্তমান সংখ্যা (১৫ই জানুয়ারি, ১লা মাঘ) দেশে প্রকাশিত সুজিতকুমার সেনগুপ্ত রচিত "সমালোচনায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও হিং টিং ছট্ বিতর্ক" প্রবন্ধটি পাঠ করে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছি। সাহিত্য সম্বন্ধীয় এ রকম একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধ বহুদিন চোখে পড়েনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বিখ্যাত "মসীযুদ্ধ" সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আমাদের জানা ছিল কিন্তু প্রবন্ধকার সুজিতকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় বিভিন্ন অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ করে একটি সুন্দর মালা গেঁথে আমাদের সামনে রাখলেন।

এই প্রবন্ধটি একটি গবেষণা-পত্র বলেও পরিগণিত হতে পারে। আমরা যারা সাহিত্যের ছাত্র তারা এই প্রবন্ধে প্রভূত উপকৃত বোধ করছি, সেই সঙ্গে জানাচ্ছি লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং চন্দ্রনাথ বসু—এই ত্রয়ীর মিলিত ঘাত প্রতিঘাত খুবই রোমাঞ্চকর, বাঙলা সাহিত্যের সেই নব উন্মেষের দিনে সাহিত্যিক বিতর্কের অসামান্য বিবরণ সত্যিই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ঐসব সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিতর্কে ধর্মের এত প্রভাব দেখে। ইতিপূর্বে বা সমসাময়িক কালে বা কিছু পরে (১৮৪০—১৯২০) যত সাহিত্যিক বিতর্ক সাহিত্যের আঙিনায় রথী মহারথীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ধর্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব থেকেই গেছে। কোথাও হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্মে, কোথাও বা খ্রীষ্টধর্ম হিন্দুধর্মে, কোথাও বা খ্রীষ্টধর্মে ব্রাহ্মধর্মে। আজকাল সাহিত্যিক বিতর্কে ধর্মের কোন স্থান নেই বললেই হয়। (অবশ্য তার জায়গায় হিংস্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের, মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে বটে।)

চন্দ্রনাথ বসু-র চরিত্রটি সত্যিই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। এঁর সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতাম না বললেই হয়। বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে এক কালের এই দোর্দণ্ডক্ষমতাশালী সাহিত্যিকের প্রভাবও মুছে গেছে একেবারেই। এবং এর কারণ হিসেবে লেখক যা বর্ণনা করেছেন প্রবন্ধের উপসংহারে, সেইটেই খুব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়—"আসলে একটা পৌরাণিক ও পুরাতন যুগের শেষে একটা নতুন যুগের অভ্যুদয় আসন্ন হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রনাথ ছিলেন বিগত পুরাতন যুগের প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনাথ নতুন যুগের। নতুন যুগের অরুণোদয়ের দিনে তাই চন্দ্রনাথকে কারো মনে পড়েনি। [illegible] নীরবেই বিদায় নিয়েছেন।"

বাসুদেব ঘোষ
কলিকাতা-৬

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের ৫৪তম অধিবেশন দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের উদ্যোগে ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ১লা জানুয়ারী ১৯৭২ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হল। এ সম্পর্কে অমলেন্দু [illegible] লিখিত [illegible] (১৫ই জানুয়ারী ১৯৭২ দেশ) অংশটুকু অতি আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে পড়লাম। এই অর্থনৈতিক সম্মেলন সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় 'দেশের' পাঠকদের অবগতির জন্য আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন [All India Economic Conference] [illegible] অর্থনীতিবিদদের [illegible] একটি প্রধান সম্মেলন। [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] ও [illegible] নতুন [illegible] উদ্ভাবনী [illegible] প্রকাশের ও আলোচনার একটি [illegible] [illegible] ভারতীয় অর্থনীতি সমিতি [Indian Economic Association]। এই সমিতির বার্ষিক সম্মেলনই নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন। [illegible] শিক্ষক ও গবেষক ছাত্র ও দেশের [illegible] নৈতিক [illegible] [illegible] [illegible] এই সম্মেলন। আলোচনা ও পত্র নিবন্ধের মাধ্যমে একটি জাতির অর্থনৈতিক রূপদান করা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। [illegible] অর্থনীতির তত্ত্ব ও [illegible] [illegible] ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির [illegible] অবতারণা এই সম্মেলনে [illegible] লাভ করে।

এই সম্মেলন অর্থনীতির শিক্ষক [illegible] ছাত্রদের অর্থনীতি পাঠে আরও উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন বি-

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞানগম্ভীর আলোচনা এবং বিষয়টির উপস্থাপনা শুধু যে চিত্তাকর্ষক তাহাই নহে, এই আলোচনায় বিষয়টি শিক্ষণের ক্ষেত্রেও বাস্তবাভিমুখী। প্রকৃতপক্ষে এরকম সম্মেলনের দ্বারা একটা refreshers course-এর কার্য সমাধা হয়। এ প্রসঙ্গে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পি আর ব্রহ্মানন্দ ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্লান দত্তের সুললিত আলোচনা অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীকে এক অপূর্ব রসাস্বাদনের তৃপ্তি দান করবে। ডঃ ব্রহ্মানন্দের অকুণ্ঠ প্রয়াস ও অকৃত্রিম সারল্য এবং এই সম্মেলনকে প্রাণদান করার যে নিরলস প্রচেষ্টা তাহা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। এ রকম প্রাণবন্ত ও ভাবাবেগে গভীর ব্যক্তি শিক্ষকতার আদর্শ।

বর্তমান ৫৪তম অর্থনৈতিক সম্মেলন বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যখন অন্যান্য সম্মেলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়েছিল তখন এই সম্মেলন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হওয়ায় যথেষ্ট কৃতিত্বের লক্ষণ। বস্তুত, আমাদের অনেক আশা-নিরাশার অবসান ঘটল যখন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ডঃ জ্ঞানচাঁদ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের অডিটোরিয়ামে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন।

অন্যান্য আলোচনা [দেশ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭২] ছাড়া যে দুটি বিষয়ে এই সম্মেলনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তাহা: (১) বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও (২) অর্থনীতি শিক্ষণ। ডঃ অশোক মিত্রের আলোচনা ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হলেও ডঃ ভি কে আর ভি রাও-এর মতামত একটি সুচিন্তিত তত্ত্বের অবতারণার সহায়ক। ডঃ রাও বৈদেশিক সাহায্যের খরচের উপর যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে এই খরচের বোঝা উন্নয়নের পরিপন্থী। এ সম্পর্কে বিশদ তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে গবেষণার কার্য পরিচালনা করার গুরুত্ব আরোপ করেন ডঃ রাও।

বর্তমানে অর্থনীতির একটি বিশেষ স্থান শিক্ষা ও বাস্তবজীবনে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ও তত্ত্বের অবতারণা করতে হবে। এক্ষেত্রে বাস্তবাভিমুখী ও দেশের সমস্যার ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতি শিক্ষণ প্রয়োজন।

দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের ডঃ নাকভীর (Naquvi) অর্থনীতি শিক্ষণের ওপর আলোচনা আমাদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। এ কথা স্মরণ করা যায় যে, আমাদের দেশে ১৯৪৭-এর পূর্বে অর্থনীতি পঠনপাঠন এতটা ব্যাপক ও বিশেষীকরণের দিকে ছিল না। বর্তমানে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি শিক্ষা ও শিক্ষণে যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

পরিশেষে অতি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই সম্মেলনের গুরুত্ব যত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে পরিমাণ উৎসাহ পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখাতে পারছে না। এ বছর সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র দুজন উৎসাহী শিক্ষক অর্থনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। আমি আপনার এই বহুলপ্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে অনুরোধ জানাই, তাঁরা যেন এই সম্মেলনে যোগদান করেন ও তাঁদের গবেষণার আলোকবর্তিকার দ্বারা অপরের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে প্রজ্জ্বলিত করেন। সার্থক সমবায় সকলেরই কাম্য।

পবিত্র সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৬১

এই তার পুরস্কার

বেশ কিছুদিন হলো শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ধারাবাহিক উপন্যাস 'এই তার পুরস্কার'-এর শেষ কিস্তি আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ করেছি আলোচনা বিভাগে এই উপন্যাস সম্বন্ধে কোন চিঠিপত্রই প্রকাশিত হয়নি। দেশ পত্রিকার সুধী পাঠকবর্গ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন চিন্তাশীল রচনারই সমালোচনা করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে ১৩৭৬-এর সাহিত্য সংখ্যা দেশে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্বন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা মনে পড়ছে। শ্রীযুক্ত নন্দী ঠাট্টার সুরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'জানো ভাই বই যদি সেরকম বিক্রি না হয়, তবে লেখার তেজও কমে যায়। লেখার সময় সেই যে একটা যা খুশী করার ইচ্ছে সেটা আর আসে না।' তিনি এও বলেছিলেন, 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসটা অনেক মন দিয়ে লিখেছিলাম—কিন্তু সেটাও পাঠকেরা বুঝতে পারল না।'

যে লেখক চাকরি ছেড়ে দিয়ে শুধু লেখার জন্যই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, একটার পর একটা সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যকে মণিমুক্তা দিয়ে সাজাচ্ছেন—পাঠকেরা তার যথার্থ মূল্য দিচ্ছেন না। 'এই তার পুরস্কারের' মত সম্পূর্ণ মৌলিক উপন্যাস রচনার সাহস শুধু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীরই সম্ভব। কবি রামানন্দের বাঁচা ও কবিতা সম্বন্ধে হতাশায় কি আত্মহত্যার ছোঁয়া নেই? 'এই তার পুরস্কার' গ্লানি ও হতাশা থেকে সম্পূর্ণভাবে উত্তরণের এক অসামান্য উপন্যাস।

'এই তার পুরস্কার' পড়বার আগে আমরা কয়জন পাঠক জানতাম যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একজন শক্তিশালী কবিও?

সনৎ মজুমদার
গড়িয়া (২৪ পরগণা)

ইয়াহিয়ার চল্লিশ সওয়াল

গত ১লা মাঘ, ১৩৭৮ তারিখের 'দেশ'-এ শক্তিপদ গঙ্গোপাধ্যায়-এর লেখা "ইয়াহিয়ার চল্লিশ সওয়াল" প্রবন্ধের এক স্থানে লেখা আছে: 'আর কিছু সংস্কৃতি-সাহিত্য পোড়ানো হয়েছিলো কয়েক বছরে। পশ্চিম পাকিস্তানে (সম্ভবত পাকিস্তানের হবে) তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস বাংলায় তর্জমা হয়ে বাজারে বেরোলো: খোদা কি বস্তি। এই রকম আর কি! অপাঠ্য।'

বইটি তৃতীয় শ্রেণীর কিনা তা আমি জানিনে। তবে এই বই দশ বছর আগে ভারতে হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় অনুবাদ ছাড়াও মূল উর্দু সংস্করণও আছে। প্রবন্ধকার হয়তো জানেন না যে ভারতের বাইরেও রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে প্রায় সতেরটি ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। তাছাড়া আইয়ুবশাহী আমলে করাচী টেলিভিশন-এ যখন ধারাবাহিকভাবে এই বই-এর চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয় তখন সেখানে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জামাতে ইসলামী সহ কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল এটি বন্ধ করে দেওয়ার দাবি তোলে। আইয়ুব সরকারও তখন এর প্রদর্শন বন্ধ করে দেয়।

[illegible] বইটি [illegible] সংহতি প্রচারে সহায়ক কিনা প্রবন্ধকার কি তা পড়ে দেখেছেন? পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তানে) যে কতিপয় লেখক পাক সরকারের কাছে বিপজ্জনক ব্যক্তি, খোদা কি বস্তির লেখক জনাব শওকত সিদ্দিকীও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আর যদি তাঁদের সকলকেই এক রকম বলে ধরা হয় তাহলে জোশ মালিহাবাদী, ফয়েজ আহমদ এঁদের কেউ বাদ পড়েন না।

পাকিস্তানে বিগত পঁচিশ বছরে বহু সংস্কৃতি-সাহিত্য পোড়ানো হয়েছিলো। সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নয়—[illegible] বইটির প্রকাশ কাল ১৯৭০-এর শেষ ভাগে। অর্থাৎ হিন্দী অনুবাদ প্রকাশের প্রায় দশ বছর পরে। প্রবন্ধকার হয়তো এসব কিছু না জেনেই [illegible] ও সম্বন্ধে [illegible] করেছেন। আশা করি এবার তাঁর বিভ্রান্তি দূর হবে।

কাজী মাসুম
[illegible]
ঢাকা

ভাষার দূরত্ব

ফেব্রুয়ারির শেষ শনি ও রবিবার কলকাতায় পূর্বাঞ্চল লেখক সম্মেলন হয়ে গেল। আসাম, মণিপুর, পশ্চিম বাংলা, ওড়িশা ও বিহারের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী। পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। কেউ কেউ বলেছেন, এই সম্মেলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর আগে এরকম কোনো সম্মেলন হয় নি।

কলকাতার মানুষের পক্ষে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু বাইরের বহু সংখ্যক সাহিত্য অনুরাগী এর খবর জানলেন সংবাদপত্র মারফৎ। আমি যদিও কলকাতার মানুষ, কিন্তু ঐ সময় কলকাতায় উপস্থিত ছিলাম না বলে সংবাদপত্রে প্রতিবেদনের মাধ্যমে যাঁরা ঐ খবর জেনেছেন—আমিও তাঁদের দলে, এবং এই সংবাদ পাঠে তাঁদের কি কি প্রতিক্রিয়া হয়, আমি তা অনুভব করতে পেরেছি।

কয়েকটি প্রশ্ন জাগে। যেমন, প্রথমেই এই সম্মেলন কলকাতায় কেন বা কি করে হল? কলকাতার লেখকদের মধ্যে এমন কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নেই—যাঁরা এই ধরনের সম্মেলন আহ্বান করতে পারেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এখনো টিকে আছে বটে, কিন্তু এই ধরনের উদ্যোগ থেকে পরিষৎ বহুকাল বিরত, এমন কি সাহিত্য সমাজের সঙ্গে এর যোগাযোগই অত্যন্ত ক্ষীণ। যাই হোক, এই প্রশ্নের একটি সন্তোষজনক উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা বাঙালীরা নয়, ওড়িশার তরুণ লেখক সম্মেলন। তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের সুবিধার জন্য কলকাতাকে কেন্দ্রস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ওড়িশার এই তরুণ লেখক সম্মেলন একটি সজীব প্রতিষ্ঠান—প্রতি বছর নিজ রাজ্যে এঁরা অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে ওড়িয়া সাহিত্য সম্মেলনের বন্দোবস্ত করেন। এবার তাঁরা তাঁদের সীমা বিস্তৃত করেছেন। উদ্বোধক হিসেবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর উপস্থিতিকেও ঠিক সরকারী পিঠ চাপড়ানি মনে না করলেও চলে। শ্রীমতী শতপথী নিজেও একজন লেখিকা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা কি ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন? কোনো সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এর উল্লেখ নেই। এ সম্পর্কে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা এই যে, কোথাও কোনো কারণে তামিলনাড়ু, পশ্চিম বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের সাহিত্যিকরা একত্র হলে সেখানে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয় ইংরাজী। সে এক হাস্যকর অবস্থা। সেখানে প্রখ্যাত লেখকদের মুখ থেকে অনর্গল ভুল ইংরাজী শোনার পীড়া সহ্য করতে হয়, অথবা যারা আদৌ সাহিত্যিক নয়, কিন্তু ফরফর করে ইংরেজী বলতে পারে—তাদের মোড়লী সহ্য করতে হয়। এই ধরনের ঘটনার কোনো প্রকার উপযোগিতা থাকে না।

আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে হিন্দী ভাষা প্রতিরোধ বা সমর্থন কিছুই পায় নি, পেয়েছে ঔদাসীন্য।

সরকারী আনুকূল্য পাবার জন্যও হিন্দী শিখতে কেউ উৎসাহী নন্। লোকমান্যদের সঙ্গে কাজ চালানো হিন্দী বলতে পারলেও সাহিত্য বিষয়ে মতামত দেবার মতন হিন্দী জ্ঞান এদিকের কোনো লেখকের আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং ধরেই নেওয়া যেতে পারে, এই সম্মেলনে বক্তৃতার মাধ্যম হিন্দী ছিল না। ইংরেজীর সম্ভাবনাই বেশী। অথবা, যে-যার আপন মাতৃভাষায় বলেছেন? সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। তাতে পুরোপুরি মন দেওয়া-নেওয়া না হলেও আধাআধি আশা করা যেতে পারে।

আর একটি প্রশ্ন, এই সম্মেলনে সবাই কি সত্যি কথা বলেছেন, না মন রাখা কথা বলেছেন? সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দেখা যায়, অনেকেই বেশ মূল্যবান ও সার কথা বলেছেন—কিন্তু তার অধিকাংশই পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। যেমন, ধরা যাক, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা উচিত, এটা একটা সার সত্য কথা, কিন্তু এর কোনো ধার নেই। ভালোবাসা বা সুসম্পর্ক স্থাপনের পথগুলি নিয়ে আলোচনা না করে শুধু ঐ চিরন্তন সত্যটির উচ্চারণ বিশেষ কোনো ফল দেয় না। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীরা এক সঙ্গে মিললে আমরা খুব সতর্ক হয়ে উঠি। ভদ্রতা ও সৌষ্ঠব অনুযায়ী আমরা এমন কোনো কথা উচ্চারণ করি না—যাতে অপরের মনে কিছুমাত্র আঘাত লাগতে পারে। তার ফলে নিয়মরক্ষা হয়, কিন্তু আসল কাজ কিছুই হয় না। এক ধরনের পেপ টক্ দিয়ে সময় ভরানো হয়। সংবাদপত্রে যাঁদের ভাষণের উদ্ধৃতি আছে, তাঁদের ভাষণ নানা প্রসঙ্গে আমরা আরও দেখতে পাই—কিন্তু যে-তরুণ লেখকরা এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা, তাঁদের কোনো বক্তব্য জানতে পারা গেল না।

এই সম্মেলনের প্রতিবেদন পাঠক হিসেবে একটি প্রস্তাব আমার মনের মধ্যে অনবরত উঁকিঝুঁকি মারছে। সেটি প্রকাশ না করে পারা যায় না। পূর্বাঞ্চলের এই কয়েকটি রাজ্যের সাহিত্যকে আরও কাছাকাছি আনার কোনো ব্যবস্থা কি আমরা করতে পারি না? এবং সেটি হতে পারে একটিমাত্র উপায়ে, এই গোটা অঞ্চলে একটি সাধারণ লিপি ব্যবহারে। আসাম, মণিপুর, পশ্চিমবাংলা, ওড়িশা, মিথিলায় যদি একটি সাধারণ লিপি চালু হয়—তাহলে আমরা এক সাহিত্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত হতে পারি। এবং এই সঙ্গে আমরা পেয়ে যাবো প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে। আঞ্চলিক বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও এক বর্ণমালা ও লিপির মাধ্যমে আমাদের সকলের সাহিত্য হতে পারে বিরাট সম্পদশালী, পৃথিবীতে এর স্থান উঠে যাবে অনেক উঁচুতে। এবং হিন্দী ও ইংরেজীর সঙ্গে এর সুস্থ প্রতিযোগিতা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

বাংলার সঙ্গে অসমীয়ার লিপিভেদ অতি সামান্য। বাঙালী ও অসমীয়াদের পক্ষে পরস্পরের সাহিত্য পাঠ করা কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়। মণিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে যে ভাষার প্রচলন আছে, তার লিপি ও অসমীয়া-বাংলা লিপি বস্তুত একই। অপর-পক্ষে ওড়িয়া ও মৈথিলী ভাষার লিপি আলাদা, কিন্তু কানে শুনলে আমরা এই ভাষা সহজেই বুঝতে পারি। মৈথিলীর সঙ্গে হিন্দীর যোগাযোগ বেশী না বাংলার —সে সম্পর্কে অভিমত দিতে পারবেন পণ্ডিতেরা, আমার সে জ্ঞান নেই। কিন্তু ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দীর যোগা-যোগের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সাঁওতালী ভাষাকেও এই সমান স্তরে আনা যায়। সারা ভারতকে আরও বেশী আঞ্চলিক ভাষার প্রশ্ন তুলে খণ্ড খণ্ড করে না দিয়ে —কাছাকাছি ধরনের ভাষাগুলিকে এক হবার জন্য কোনো ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কথা কেউ ভাবেন নি। ভাষার আঞ্চলিকতাকে প্রকট করে তোলা হয় রাজনৈতিক কারণে। রাজনীতি যখন ভাষা ও সাহিত্যের শক্তিকে ব্যবহার করে—তখন রাজনীতির বেশ লাভ হয় বটে, কিন্তু সাহিত্যের বিশেষ কোনো লাভ হয় না।

এই সাধারণ লিপিটি কি হবে? অবশ্যই হুবহু বাংলা নয়। কিন্তু যে-হেতু বাংলা একটি গরিষ্ঠ অংশের ভাষা, সেই জন্য এর বর্তমান কাঠামোটি রেখে কিছু কিছু ওড়িয়া, দেবনাগরী ও অসমীয়া বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা যেতে পারে। তাহলে অন্তত পনেরো-ষোলো কোটি মানুষ একটি ভাষার আওতায় আসতে পারে।

জানি, একজন বাঙালীর পক্ষে এই প্রস্তাব উত্থাপনের বিপদ আছে। এটাকে বাংলাসাহিত্যের সাম্রাজ্যবাদ বা সম্প্রসারণবাদ হিসেবে মনে করা হতে পারে। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে—এতে আমাদের সকলেরই ক্ষতির চেয়ে উপকারের সম্ভাবনা অনেক বেশী। সাহিত্যকে ছোট ছোট গণ্ডিতে না বেঁধে, তার সীমানা বিস্তৃত করার এই একটি উপায় আছে। পৃথিবী-ব্যাপী এক ভাষা এসপারেন্টো বাস্তবে চলেনি, কিন্তু এক ভৌগোলিক এলাকায় বিভিন্ন ভাষার বদলে একটি সাধারণ ভাষার সম্ভাবনা খুঁজে দেখতে দোষ কি? এ সম্পর্কে অসমীয়া, মণিপুরী, ওড়িয়া, মৈথিলী ও সাঁওতালী ভাষার চিন্তাবিদদের মতামত জানতে ইচ্ছা হয়।

অ্যাকাদেমি পুরস্কার

এ বৎসর সাহিত্য আকাদেমি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ১৪টি পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের নাম ঘোষণা করেছেন। এবং আর একটি ইংরেজি ভাষার জন্য। প্রত্যেকটি পুরস্কারের অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

বাংলার জন্য মনোনীত হয়েছে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনী মণিমহেশ। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম সাহিত্যিক মহলে বেশী শোনা যায় না বটে, কিন্তু তাঁর ভ্রমণকাহিনীগুলি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান। তবুও বাংলা ভাষায় বছরের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে এই মনোনয়ন বিভিন্ন ধরনের কৌতূহলের উদ্রেক করে। ইংরেজীর জন্য পেয়েছেন ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ—তাঁর গ্রন্থের নাম মর্ণিং ফেস, একটি উপন্যাস। ওড়িয়া সাহিত্যে পুরস্কৃত মনোরঞ্জন দাসের নাটক, অরণ্য ফসল। মৈথিলীতে সুরেন্দ্র ঝা 'সুমন'-এর কবিতা 'পয়স্বিনী'। হিন্দীতে পেয়েছেন প্রখ্যাত সমালোচক নামোয়ার সিং; তাঁর সমালোচনা গ্রন্থের নাম 'কবিতাকে নয়া প্রতিমা'। ডোগরি: মেরি কবিতা মেরি গীত—শ্রীমতী পদ্মা সচদেব। গুজরাতী: নাট্য গাথারিয়ান—সি সি মেহতা। কানাড়া: কালিদাস—আদ্য রঙ্গচারি। মালয়ালম: ভিদা—ভি এস মেনন। মারাঠী: পৈস—শ্রীমতী দুর্গা ভগৎ। পাঞ্জাবী: এহো হামারা জীবন—দলিপ কউর তিউয়ানা। সিন্ধী: কুমাচ—কৃষিণ রাহী। তামিল: সমুদয় বিধি—এন পার্থসারথী। তেলেগু: বিজয়বিলাসামু হৃদয়োল্লপক সমবকম—থাপি ধর্মরাও। উর্দু: গালিব কি সাক্কাৎ আউর সায়েরি—রসীদ আহমেদ সিদ্দিকী।

এ বছর সংস্কৃত, কাশ্মীরী ও অসমীয়া ভাষার কোনো গ্রন্থ পুরস্কৃত হয়নি। প্রতি বছরই দু'একটি ভাষা এরকম বাদ যায়। এর কারণ কি? অসমীয়া ভাষায় হোসেন বরগোহাইন-এর 'বিভিন্ন নরক' গ্রন্থটি অবশ্যই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

সনাতন পাঠক

বাংলাদেশের সংগ্রাম

বাংলা দেশ। প্রদীপ্তকুমার সান্যাল; প্রাপ্তিস্থান : দেজ বুক স্টোর্স, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলি-১২। দাম ছয় টাকা।

এই বইখানি বাংলাদেশ সম্পর্কিত হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার পূর্ববর্তী পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক কার্যকারণের বিশ্লেষণ ও তথ্যে সমৃদ্ধ। বইটি সুলিখিত যদিও মুক্তি আন্দোলনের পূর্ণ বিবরণ এতে স্থান পায়নি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ অধ্যায় এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়নি, তথাপি লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস দেখিয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি পর্যন্ত কিছু ইতস্তত ঘটনার উল্লেখ এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকে বাঙালীদের উপর পাকিস্তানী

সামরিক শাসকবৃন্দের শোষণ এবং অত্যাচারের কথা ও পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগের আন্দোলন পর পর দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তথ্যের সাহায্যে আন্দোলনের রূপটি তুলে ধরা হয়েছে। তরুণ লেখক তাঁর এই প্রচেষ্টায় নিশ্চিতভাবেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। স্বল্প পরিসরে যতটা সম্ভব ইতিহাসকে তিনি ধরে রেখেছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি তথ্যভিত্তিক রচনা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

বইটির পরিসর অনুযায়ী মূল্য একটু বেশী মনে হল। তথাপি, তরুণ লেখকদের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। স্বাধীন বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় এই ধরনের বইয়েরও প্রয়োজন আছে।

২০।২।২৭

ছোটগল্প

পরিত্যক্ত পান্থশালা ও তার। চারজন। কল্যাণ সেন। শিল্প সাহিত্য। ৪৯, পটলডাঙা স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। দাম : চার টাকা।

কার্পেট। বলরাম বসাক। অরুণা। কলকাতা। দাম : তিন টাকা।

কল্যাণ সেন আধুনিক, তরুণ গল্পকার। তিনি নিপুণ কাহিনী সৃষ্টির চমৎকারিত্ব বা আঙ্গিকের নিয়মে গল্পকে শিল্পের স্তরে উত্তরে দেবার প্রচেষ্টায় ব্রতী নন, তাঁর গল্পের বিষয় নির্বাচনও স্বচ্ছন্দ সেজুজেন। বক্তব্যের ভঙ্গি শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন রচনাশৈলী অনায়াসপটু, কখনও কখনও কাব্যিক সংযমমণ্ডিত। বস্তুত পরিত্যক্ত পান্থশালার অনেক গল্পেই নির্জন, গভীর কিছু অনুভূতি উচ্চারিত হয়েছে যা পাঠককে প্রায়শ আকর্ষণ করে।

গল্পকার বলরাম বসাক মেজাজের দিক দিয়ে অতি-আধুনিক, গল্পের প্রকরণে আদৌ ঐতিহ্যবিশ্বাসী নন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উগ্র বিরূপধী। কার্পেটের গল্পগুলির শ্রেণী বিভাগ করা শক্ত। কিন্তু গল্পহীন গল্প, আকস্মিক অনুভূতি, পারিপাট্যহীন কাণ্ড সহজবদ্ধ শব্দচয়নে কার্পেট একটি বিশেষ ধরনের আঙ্গিকের ফলশ্রুতি। এ ফলশ্রুতি আনন্দগ্রাহ্য কি না তা পাঠকের বিচার্য।

তবে, ইদানীং পাঠকের উৎসাহ বেশী, কাজেই আশা করা যায়, কল্যাণ সেন বলরাম বসাক তাঁদের রচনার সমঝদার পেলেও পেতে পারেন।

আবেদন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মারকগ্রন্থের জন্য তাঁর অপ্রকাশিত চিঠি, রচনা ও ছবি দিয়া সাহায্য করুন।

আশা দেবী
৩/সি পঞ্চাননতলা রোড, কলি-১৯
ফোন ৪৬-৮৫২৯

সংশোধন

৪৮৩ পাতায় 'বিশ্ববিজ্ঞান'-এর চিত্র-পরিচিতিতে বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় ডাঃ ওয়েস্ট হবে, তৃতীয় নয়।

হকির এবারের শিরোনাম-'অমিত'

কলকাতার হকি খেলার এ বছরের শিরোনাম অমিত দাশগুপ্ত। গোলের পরে গোল করে মোহনবাগানের এই সেণ্টার ফরোয়ার্ডটি বিপক্ষ রক্ষণভাগে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছে। এই নিবন্ধ লেখার সময় (২৭-২-৭২) পর্যন্ত আটটি খেলায় তিনটি হ্যাট্রিক সহ করেছে ২১টি গোল। গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষস্থানে তো রয়েছেই, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর চেয়ে গোলের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী।

এরিয়ান দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের চারটি গোলের মধ্যে অমিতেরই চারটি। হকি মরসুমের প্রথম হ্যাট্রিক। পরের খেলায় রাজস্থানের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের পাঁচটি গোলের মধ্যে অমিতের একারই চারটি অমিতেরও মরসুমের দ্বিতীয় হ্যাট্রিক দু' দিন সংবাদপত্রের খেলার পাতায় শিরোনামে অমিত। পরের দিন রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের সাতটি গোলের মধ্যে অমিতের তিনটি। এদিনও অমিত হ্যাট্রিক করতে পারত যদি মাঝখানে গোপালরাও একটি গোল করে না বসত। সুতরাং শিরোনামে সংবাদ হল "অমিত তিনটি গোল করেও হ্যাট্রিক করতে পারল না।" যদি হ্যাট্রিক করতে পারত অবশ্যই শিরোনাম হত "পর পর তিনটি খেলায় হ্যাট্রিক করার অনন্য গৌরব"।

ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে খেলায় মোহনবাগান ৩—০ গোলে জিতল। অমিত কোন গোল করতে পারল না। সেদিন ওর গোল করতে না পারটাই সংবাদ হল। পরের খেলায় সমর্থক ও সাংবাদিকদের আক্ষেপ মিটিয়ে দিল অমিত উয়াড়ির বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ২—০ গোলে জয়ের দুটি গোল করে। তার পরের খেলা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের সঙ্গে, যে পুলিস দল শক্তিশালী ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করে একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে কিন্তু মোহনবাগান জিতল ৭—০ গোলে। সেণ্টার ফরোয়ার্ড অমিত একাই করল হ্যাট্রিকের কৃতিত্ব সমেত পাঁচটি গোল। তৃতীয় হ্যাট্রিক।

সেদিনই খেলার পর অমিত দাশগুপ্ত এসে আমাদের অফিসে। বিসেপশনে বসে ছিল ও আমরা। মোহনবাগানের তরুণ সেণ্টার ফরোয়ার্ড, যে রোজ সংবাদপত্রে শিরোনাম পাচ্ছে তাকে দেখার স্বাভাবিক কৌতূহলও ছিল আমাদেরই। কিন্তু ওকে দেখবার পর কেউ বিশ্বাসই করতে চাইল না যে, ও অমিত দাশগুপ্ত। "এ যে একেবারে বাচ্চা ছেলে"—একজন বললেন।

বাচ্চা ছেলেই বটে। যদিও অমিত এ বছর যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে তবু দেখলে মনে হবে না ওর বয়স ষোল-সতেরোর বেশী। মাঠের চেয়ে আরও ছোট দেখায়। ক্ষীণতনু ছেলেটিকে দেখলে মনে হয় স্কুলের ছাত্র।

বহুকাল আগের কথা। হুমায়ুন কবীরের তখন দেশভরা নামডাক। মফস্বলের একটি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছেন। লোকে লোকারণ্য। কবীর সাহেব বক্তৃতা করতে উঠে দাঁড়ালে কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না উনি হুমায়ুন কবীর। তারা ওঁর নামডাক শুনে ধরে নিয়েছিল খুব বড় মাপের মানুষ হবেন। কিন্তু যখন দেখল একটি ছোটখাটো ছেলে ডায়াসে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল এ নিশ্চয়ই হুমায়ুন কবীরের ছেলে হবে।

'একেবারে বাচ্চা ছেলে'—অমিত সম্পর্কে এই মন্তব্যে কবীর সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল।

হকি দুরন্ত গতি ও ছুটন্ত বলের খেলা। খেলার মধ্যে কব্জির পেলবতা এবং স্টিকের চাতুর্য। কিন্তু এর বাইরেও আধুনিক কালের হকিতে যেটা অপরিহার্য তা হচ্ছে শারীরিক শক্তি, প্রতিপক্ষের ধকল সহ্য করার মত সুপটু স্বাস্থ্য। অমিতের শরীরে সে শক্তি নেই, অমিতের সে স্বাস্থ্য নেই। সম্ভবত এই কারণে অমিতের খেলার মধ্যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও গতবার বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলায় মাঠের বাইরে বসে থেকে ওকে হা-হুতাশ করতে হয়েছে। উনিশ শো সাতষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত, চার বছর এরিয়ান ক্লাবে খেলে গত বছরই মোহনবাগানে এসেছিল। মাত্র ৯টি খেলার সুযোগ পেয়েছিল। তার মধ্যেই তিনটি হ্যাট্রিক সমেত করেছিল ১৩টি গোল। এবারের মত গতবারেও দুটি খেলায় মোহনবাগানের সব কটি গোলই করেছিল অমিত। পুলিসের বিরুদ্ধে চারটির মধ্যে চারটি, রাজস্থানের বিরুদ্ধে দুটির মধ্যে দুটি।

অমিতের এ বছরের ও গতবারের সাফল্যই বলে দিচ্ছে হকি খেলার শ্রেষ্ঠ সম্পদে অর্থাৎ গোল করার কৃতিত্বে ও সিদ্ধহস্ত। পরিকল্পনামত খেলার বুদ্ধি আছে মাথায়, হাতে আছে চাতুর্য, কব্জিতে পেলবতা। স্টিক-ওয়ার্ক বেশ ভাল। হিটও জোরালো। শুধু বল রিসিভিং একটু ডিফেক্টিভ। কিন্তু একবার বল ধরে এগোতে আরম্ভ করলে ওকে রোখা দায়। বলের সঙ্গে প্রচণ্ড ফাস্ট।

খুব ছোট বেলা থেকেই অমিতের হকি খেলার প্রতি ঝোঁক। সেণ্ট লরেন্স স্কুল, দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন এবং যাদবপুর কলেজ—যখন যেখানে পড়েছে সেখানেই হকি খেলার সুযোগ পেয়েছে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকিতেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে চার বছর। খেলা ওর পড়াশুনার কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। স্কুল ও কলেজের ভাল রেজাল্ট থেকেই তার প্রমাণ মেলে। শুধু হকি নয়, ক্রিকেটেও অমিতের মোটামুটি ভাল হাত। ক্রিকেট খেলে দক্ষিণ কলকাতা সংসদে। ওখানকার অধিনায়ক, এ বছর গোটা কুড়ি খেলায় সাত শোর মত রান করেছে। তবে হকিতেই ওর আগ্রহ বেশী। আরও অনেক দিন হকি খেলতে চায়। তাই এমন একটি চাকরি খুঁজছে যে চাকরি খেলার ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। বর্তমানে জাতীয় হকিতে বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে যেতে চায় জলন্ধরে। কোচিং ক্যাম্প অনুশীলনে ওর ফাঁকি নেই। তারপর? ভবিষ্যতই বলতে পারে আন্তর্জাতিক হকিতে অমিত ভারতের জার্সি গায়ে দেবার সুযোগ পাবে কিনা।

মুকুল

অমিত দাশগুপ্ত

ব্যাডমিন্টনে নতুন নজির

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ৩৬তম জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার খেলায় বাঙ্গালোরের সতেরো বছর বয়সী কলেজ ছাত্র পাড়ুকোন প্রকাশ এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছে একই সঙ্গে জুনিয়র ও সিনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়ে। ভারতের ব্যাডমিন্টন খেলার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কেউ এ সম্মান লাভ করতে পারেনি। অন্য কোন দেশে কেউ পেরেছে কিনা সন্দেহ।

গতবারের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন পাড়ুকোন এবারও জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হবে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে যে চমকের পর চমক সৃষ্টি করে ভারতের প্রথম সারির সিনিয়র খেলোয়াড়দেরও হারিয়ে দুটি সিঙ্গলসে জয়ী হবে এতটা আশা করা যায়নি। প্রথম চমক শীর্ষ বাছাই এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ন সুরেশ গোয়েলকে কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে ওঠা। দ্বিতীয় চমক একই দিনে জুনিয়রের সেমি-ফাইনালে মহারাষ্ট্রের সঞ্জয় শর্মাকে হারিয়ে এবং সিনিয়রের সেমি-ফাইনালে তিন নম্বর বাছাই খ্যাতনামা খেলোয়াড় রমেন ঘোষকে হারিয়ে ফাইনাল খেলার সুযোগ লাভ। শেষ চমক শেষ দিনের ফাইনালে প্রথমে চার নম্বর বাছাই পাঞ্জাবের দেবীন্দার আহুজাকে হারিয়ে সিনিয়রের চ্যাম্পিয়নশিপ, পরে জুনিয়রের ফাইনালেও অন্ধ্র প্রদেশের হনুমন্ত রাওকে হারিয়ে দ্বিমুকুট লাভ।

দ্বিমুকুট লাভ অবশ্য বড় কথা নয়, দ্বিমুকুট এবং ত্রিমুকুট লাভের ঘটনা অনেকই ঘটে থাকে। জুনিয়র খেলোয়াড় হয়েও সিনিয়রে বিজয়ী হওয়া অনন্য গৌরব।

প্রথিতযশা খেলোয়াড়দের একে একে পরাজিত করেই শুধু পাড়ুকোন প্রকাশ

অ্যাথলেটিকসের নতুন তারকা ইনগে হেল্টন-এর উপর পশ্চিম জার্মানির অনেক আশা। মিউনিখ অলিম্পিকের সম্ভাবিত প্রতিযোগিনী হেল্টন ১১.১ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে জার্মানির নতুন রেকর্ড করেছে। অ্যাথলীট বিশারদদের ধারণা এক সেকেণ্ডে একাদশাংশ সময় উন্নতি করে হেল্টন শীঘ্রই বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করবে

চমক সৃষ্টি করেনি। চমক ছিল খেলার মধ্যেও। শীর্ষ বাছাই সুরেশ গোয়েলের কাছে প্রথম গেম হেরে গিয়েও প্রকাশ জিতেছে পরের দুটি গেম পর পর পেয়ে। তিন নম্বর বাছাই এবং বর্তমানের ক্রমপর্যায় এক নম্বর খেলোয়াড় রমেন ঘোষের বিরুদ্ধেও সেমি-ফাইনালে প্রথম গেম হেরে গেল ১১—১৫-য়। পরের গেমটি অবশ্য সহজেই জিতল ১৫—২ পয়েন্টে। মীমাংসা-সূচক তৃতীয় গেমে পাড়ুকোন ৪—১১ পয়েন্টে পিছিয়ে। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে ১৫—১২ পয়েন্টে ম্যাচ জেতা যে কতখানি ধৈর্য মানসিক এবং কোর্ট ক্রাফটের প্রয়োজন বুঝতে কষ্ট হয় না।

ফাইনালেও প্রায় একই ঘটনা। এখানেও পাড়ুকোন প্রথম গেম হারল দেবীন্দার আহুজার কাছে ৮—১৫ পয়েন্টে। দ্বিতীয় গেম জিতল ১৫—৩-এ। মীমাংসাসূচক তৃতীয় গেমেও এগিয়ে গেল ৫—০ পয়েন্টে। কিন্তু এ দেবীন্দার আহুজা ভারতের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন এবং দুই নম্বর বাছাই দীপু ঘোষকে সেমি-ফাইনালে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে সে কম কুশলী খেলোয়াড় নয়। অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়ে এগিয়ে গেল ১১—৮ পয়েন্টে, তারপর ১৩—১০-এ। আর মাত্র দুটি পয়েন্ট পেলেই দেবীন্দার হবে ভারতের নতুন চ্যাম্পিয়ন। তাদের মধ্যে দলাবদলি আরম্ভ হল অভিজ্ঞতার অভাবেই উঠতি খেলোয়াড় পাড়ুকোন হেরে

যাচ্ছে। তবু দর্শকদের সমবেদনা প্রকাশের প্রীতি, তার সমর্থনে ঘন ঘন হাততালি। অচিরেই দেখা গেল তারুণ্যের তেজ। নতুন নজির সৃষ্টির জন্য চোয়াল শক্ত করে প্রকাশ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে ১৪—১৪ পয়েন্টে যখন 'ডিউস' করল তখন দর্শক-ঠাসা হলে দারুণ উত্তেজনা। এবার ৪ পয়েন্টে ম্যাচ সেট হল। অর্থাৎ ১৪—১৪ ডিউসের পর যে প্রথম ৪ পয়েন্ট করতে পারবে সেই হবে ভারতের নতুন চ্যাম্পিয়ন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আরম্ভ হল স্ম্যাশ, ড্রপ শট ও প্লেসিং-এর পাল্লা, বুদ্ধির লড়াই। তার মধ্যে পাড়ুকোন প্রকাশ পর পর তিনটি পয়েন্ট পেয়ে এগিয়ে গেল ১৭—১৪ পয়েন্টে। চ্যাম্পিয়ন হতে বাকি একটি পয়েন্ট। নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যে তিন-তিনবার ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে দেবীন্দর ১৭—১৭ পয়েন্টে পাড়ুকোনের সঙ্গে সমান হল। এবার দুজনেই চ্যাম্পিয়নশিপের মুখে। যেন জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজন খেলছে। জাতীয় ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে এমন অবস্থা আগে কোনদিন সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে পড়ে না। হলে যেমন উত্তেজনা, খেলার সময় তেমনই নৈঃশব্দ। কান পাতলে আলপিনটি পড়ার শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কানে তো তখন সবাই কালা। সব চোখ দুজনের দিকে, ব্যাডমিন্টন কোর্টে পাঞ্জাব ও মহীশূরের জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের দিকে। এবারও দুবার ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচাল পাঞ্জাবপুত্র দেবীন্দর আহুজা, কেন-না বাঁচাল মহীশূরের মূর্তি তরুণ পাড়ুকোন প্রকাশ। তৃতীয়বার মদ্র দেশের মাটিতে পাঞ্জাবের পতন। ১৮—১৭ পয়েন্টে গেম ও ম্যাচ জিতেছেই এবার যে আনন্দের বান ডাকল তার মধ্যে ভেসে গেল পাড়ুকোন প্রকাশ। ভালবাসার অত্যাচারে বিব্রত হয়ে উঠল ভারতের তরুণ চ্যাম্পিয়ন।

এই ফলাফল অবশ্যই ভারতের ব্যাডমিন্টনের পক্ষে আশার কথা। বুঝতে কষ্ট হয় না গতানুগতিকতার বাঁধ ভেঙে নতুন একজন খেলোয়াড় উঠছে। এবারকার জাতীয় ব্যাডমিন্টনের অন্যান্য খেলায় তেমন অপ্রত্যাশিত ফলাফল সংঘটিত না হলেও মহিলাদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কেরলের ১৫ বছরের মেয়ে জয়া ফিলিপের কাছে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন সরোজিনী গোগতের পরাজয় উল্লেখের দাবি রাখে। জয়া ফিলিপ নিজ রাজ্যের মৌরিন পাড়ুয়ার সঙ্গে খেলে মহিলাদের ডাবলস ফাইনালেও উঠেছিল।

ফাইনাল খেলাগুলির ফলাফল :

পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল—মহীশূরের পাড়ুকোন প্রকাশ ৮—১৫, ১৫—৩ ও ১৮—১৭ পয়েন্টে পাঞ্জাবের দেবীন্দার আহুজাকে পরাজিত করে।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনাল—মহারাষ্ট্রের শোভা মূর্তি (গতবারের চ্যাম্পিয়ন) ১১—৩ ও ১১—২ পয়েন্টে অন্ধ্রের রাফিয়া লতিফকে পরাজিত করে।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—রেলওয়েজের সুরেশ গোয়েল ও দীপু ঘোষ ১৫—১১ ও ১৫—১১ পয়েন্টে ওড়িশার রমেন ঘোষ ও সতীশ ভাটিয়াকে পরাজিত করে।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল—মহারাষ্ট্রের শোভা মূর্তি ও মৌরিন ম্যাথিয়াস ১৫—৩ ও ১৫—৫ পয়েন্টে পরাজিত করে কেরলের মৌরিন পাড়ুয়া ও জয়া ফিলিপকে।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল—আসফ পারপিয়া ও মৌরিন ম্যাথিয়াস ১৫—১১ ও ১৫—১১ পয়েন্টে গৌতম ঠকর ও শোভা মূর্তিকে পরাজিত করে।

ছেলেদের জুনিয়র সিংগলস ফাইনাল—মহীশূরের পাড়ুকোন প্রকাশ ১৫—১১ ও ১৫—১০ পয়েন্টে পরাজিত করে অন্ধ্রের হনুমন্ত রাওকে।

মেয়েদের জুনিয়র সিংগলস ফাইনাল—মহারাষ্ট্রের আমি ঘিয়া ১১—৫ ও ১১—৩ পয়েন্টে পাঞ্জাবের কানোয়াল ঠাকুর সিংকে পরাজিত করে।

ক্রিকেটেও নতুন নজির

সকলের ধারণামত কিংস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে, মোহনবাগানকে ফাইনালে হারিয়ে প্রথম বছরেই কালীঘাট ক্লাব পেয়েছে পি সেন ট্রফি, দিল্লির প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ক্রিকেটে রাবার বিজয়ী ভারতীয় দল অবশিষ্ট ভারতীয় দলকে হারিয়েছে ১৫২ রানে।

আগের সপ্তাহেই ফলাফলের এ আভাস ছিল। কিংস্টন টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তরুণ ব্যাটসম্যান লরেন্স রো প্রথমাবির্ভাবে ডাবল সেঞ্চুরি করে ক্রিকেটে দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি করেছিলেন সে সংবাদও পরিবেশিত হয়েছিল। তার পরেও যে রো প্রথম নজির সৃষ্টি করেছেন সেটাই বড় খবর। শুধু নজির নয়, টেস্টে প্রথমাবির্ভাবে সেঞ্চুরি ও ডাবল সেঞ্চুরি করার নতুন বিশ্ব রেকর্ড। একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও ডাবল সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব পৃথিবীর মাত্র দুজন খেলোয়াড়ের—অস্ট্রেলিয়ার ডগ ওয়াল্টার্সের আর আমাদের সুনীল গাভাসকারের। কিন্তু প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে আজ পর্যন্ত কেউ এ কৃতিত্ব লাভ করতে পারেনি। লরেন্স রো প্রথম ইনিংসে ২১৪ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও করেছে নট আউট থেকে ১০০ রান।

এই টেস্টে নিউজিল্যান্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান গ্লেন টার্নারের শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে ডাবল সেঞ্চুরি করার কথাও আগের সপ্তাহে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের আর একজন খেলোয়াড়, মারক বার্জেসও সেঞ্চুরি করেছে এবং করেছে পর পর তিনটি টেস্টে সেঞ্চুরি। ১৯৬৯-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করেছিল ১১৯, গত বছর স্বদেশে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে করেছিল ১০৬, এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১০১।

প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ক্রিকেটে পুরস্কার

রাবার বিজয়ী ভারতীয় দল ও অবশিষ্ট ভারতীয় দলের মধ্যে দিল্লিতে আয়োজিত প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী খেলার আসল উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল না হলেও খেলাটি দর্শকদের কিছু আনন্দ দিতে পেরেছে। আসল উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়নি এই জন্যই বলতে হচ্ছে যে, খেলার শেষে দিল্লি ও ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানিয়েছেন তাঁরা এই খেলা থেকে সংগৃহীত কুড়ি হাজার টাকার মত জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দিতে পারবেন। একে রাজধানীতে খেলার আসর। তার উপর এক মনসুর আলী বাদে ভারতের প্রথম সারির সব খেলোয়াড় সেখানে সমাগত। তবু খেলা থেকে মাত্র ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ দিল্লির অধিবাসীদের ক্রিকেট অনুরাগের পরিচয় নয়।

যাই হোক দুই দলের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও খেলাটি দর্শকদের কিছু আনন্দ দিয়েছে, কয়েকজন খেলোয়াড়ও ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে নৈপুণ্য দেখিয়ে কিছু নগদ অর্থ পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার দিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কাস্টোডিয়ান শ্রী এস সি টিক্কা। শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে রাবার বিজয়ী দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকার এবং শ্রেষ্ঠ বোলার হিসাবে রাবার জয়ী দলের বিষণ সিং বেদী এক হাজার টাকা করে পেয়েছেন। উদীয়মান ব্যাটসম্যান হিসাবে অবশিষ্ট দলের সেঞ্চুরিকারী পার্থসারথী শর্মা এবং শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে মদনলাল পেয়েছেন ৫০০ করে টাকা। মদনলাল বোলিংয়ে সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৬ রান করে এবং দুই ইনিংসে অনেকগুলি ক্যাচ ধরে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। অজিত ওয়াড়েকরের উপভোগ্য সেঞ্চুরি এবং দুই ইনিংসে বেদীর ১০টি উইকেটের জন্যই পুরস্কার প্রাপ্তি।

একলব্য

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

DR. AXEL'S HOSPITAL
গভীর অরণ্যে ডঃ অ্যাকসেলের হাসপাতাল। গেটের উপরে অরণ্যদেবের বন্ধুত্বের শুভচিহ্ন।

অস্ত্রোপচার ভালই হয়েছে। মনে হয়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গুবিন্দু জ্ঞান ফিরে পাবে।
জ্ঞান ফিরবামাত্র ওর সঙ্গে আমি কথা বলব, ডাক্তার।

অলিম্পিবা-অনুষ্ঠান শুরু হল…
ট্রফি ছাড়াই খেলা শুরু হবে?
অরণ্যদেব বলেছেন, তিনি ট্রফি নিয়ে ফিরবেন। তিনি মিথ্যে বলেন না।

কাঁটার বাধা ডিঙিয়ে প্রতিযোগীরা ছুটছে…

গুবিন্দু, কে তোমাকে গুলি করে ট্রফি নিয়ে পালিয়েছে?
দুষ্টু লোক। তাহাতে একসঙ্গে কাজ করতুম। ম্যাব, কার্কি। আর একটা মাত্র মনে নেই। আমারই দোষ। আমি ট্রফির কথা গোপন রাখিনি।
7/11

DR. AXEL'S HOSPITAL
যেমন করেই হোক, ট্রফি উদ্ধার করে ফিরতে হবে আমাকে। নইলে হাঙ্গামা হবে।

চোরের দল আর অরণ্যদেবের ট্রফি।
ওরেব্বাস! এর দাম লাখ লাখ টাকা!
কী জানি!
'কী জানি' মানে?

মণিমুক্তোগুলো নকলও তো হতে পারে। আমরা তো আর আসল-নকল চিনি না।
তাহলে কী করব?
জহুরীর কাছে যাব।

কে এল কাপুর ফিল্মসের "শ্রীমান পৃথ্বিরাজ" (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে নতুন কিশোর-শিল্পী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়চৌধুরী

বিরাজ বৌ

কে সি দাস প্রোডাকশনস

নাটকীয়প্রধান ফিল্ম দর্শকদের কাছে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর কদর খুব বেশি। তার উপর "বিরাজ বৌ" রি-মেক-এ বিরাজ ও নীলাম্বর হয়েছেন যথাক্রমে মাধবী চক্রবর্তী ও উত্তমকুমার। আজকের দিনে এই দুজন শিল্পী ছাড়া বিরাজ ও নীলাম্বরের কথা ভাবাই যায় না। এঁরা অভিনয়ের শক্তিও যথেষ্ট দেখিয়েছেন ছবিতে, যার বিচ্ছুরণ একটি অতি দুর্বল ও ক্লান্তিকর চিত্রনাট্যের মধ্যেও ফাঁকে ফাঁকে দর্শকদের চমকে দেয়। "বিরাজ বৌ" উপন্যাসটিকে ফিল্মের উপযোগী করে তোলা হয়নি। স্ক্রিপ্ট অতি দীর্ঘ, অবান্তর দৃশ্যও অনেক। তাই ছবি উপভোগে বাধাও বিস্তর। কিন্তু প্রধান দুই চরিত্রের অভিনয়ে এমন একটা সাবলীলতা আছে যা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। উত্তমকুমারের নীলাম্বর ও মাধবী চক্রবর্তীর বিরাজের জন্য ছবিটি শেষ পর্যন্ত দেখা চলে। নীলাম্বরের সরলতা ও মধুর ব্যক্তিত্ব এবং বিরাজের প্রেম, সহিষ্ণুতা ও তেজ এই দুই শিল্পীর অভিনয়ে মূর্ত।

পরিচালক মানু সেন কিছু কিছু ঘটনা ছবিতে রেখেছেন যার ভিতর দিয়ে দর্শক এই দুই চরিত্রের গোটা পরিচয় পেতে পারেন। এর কোন দরকার ছিল না, চিত্রনাট্য থেকে ঘটনা ছাটাইয়ের ব্যাপারে পরিচালক আরও নির্মম হতে পারতেন। ছবি যেন আর কিছুতেই শেষ হতে চায় না, শেষের দিকে, বিরাজ বাড়ি ছাড়ার পর, দর্শকের ধৈর্যের অগ্নি-পরীক্ষা। ওই অংশ এত বিস্তারিত না হলে দর্শক খুশি হতেন। বিরাজকে যে নীলাম্বর ভুল বুঝেছে এবং বিরাজ যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে এখানেই স্বামীসোহাগিনী নারীর চরম ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডিকে আরও বিশেষভাবে দেখানোর জন্য অন্ধ বিরাজকে নিয়ে ক্যামেরার যথেচ্ছাচারের প্রয়োজন ছিল না। ছবির এই অধ্যায় রীতিমত যন্ত্রণাদায়ক।

পরিচালক অবশ্য কাহিনীর সব চরিত্রকেই মোটামুটি ছাঁচে দেখাতে চেয়েছেন। তাতে চরিত্রের ভিড় হয়েছে, গল্প তেমন জমজমাট হয়নি। এদের মধ্যে অবশ্য বিকাশ রায় (নায়েব), অনুপকুমার (পীতাম্বর), সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় (পীতাম্বরের স্ত্রী) প্রভৃতি শিল্পীকে শরৎ-কাহিনীর চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় সরল পল্লীবধূ হিসাবে খুবই চমৎকার অভিনয় করেছেন। জমিদার হিসাবে দিলীপ রায় অথবা গ্রামের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে তরুণকুমার ও কমল মিত্রকেও ভাল লাগে। বিরাজের বাড়ির ঝি সুন্দরীর বেশে নীলিমা দাসও মন্দ অভিনয় করেননি। যদিও তাঁর কেশসজ্জা সে যুগের নয়। কিন্তু শিল্পীরা সাধ্যমত অভিনয় করেও ছবিটিকে সামগ্রিকভাবে খুব সুখভোগ্য করে তুলতে পারেননি। কারণ গোড়ায় গলদ—চিত্রনাট্য। পরিচালক অবশ্য বিরাজের বাড়িতে যথাসাধ্য নাটক সৃষ্টি করেছেন, কয়েকটি নাট্য-মুহূর্তও গড়ে তুলেছেন। তবে সব মিলিয়ে "বিরাজ বৌ"-এর নাট্যসুখের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেননি। গান (কালীপদ সেন সুরারোপিত) শুনতে ভাল লেগেছে, একটি নজরুলের গান ও "কৃষ্ণ বিহনে বৃন্দাবনে" সুশ্রাব্য। কাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে গান যে খুব একটা এফেক্ট সৃষ্টি করেছে তাও নয়। গান গল্প থেকে আলাদা করে নিয়ে শুনতেই ভাল, যেমন অভিনয় আলাদা-ভাবে দেখতে উপভোগ্য। মূলে কাহিনীর বিন্যাস কিছুতেই রসসমৃদ্ধ হল না।

"বিরাজ বৌ" ছবির নামভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তী

মা ও মাটি

সংগীতা প্রোডাকশন

ছবির যা বক্তব্য তাতে মা ও মাটি অভিন্ন নয়—মাই মাটি, মাটিই মা। তবে মানুষ মায়ের কাহিনীও ছবিতে আছে। "মা ও মাটি"-র একদিকে চাষ-আবাদ সংক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য, অন্য দিকে মেলোড্রামা। চিত্রনাট্যও প্রায় দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম অংশে সমাজকল্যাণ, দ্বিতীয় ভাগে নাটক। ছবির পটভূমি, বলা বাহুল্য, পল্লীগ্রাম। কৃষি কলেজ থেকে

"মা ও মাটি" (পরিচালনা : অর্ধেন্দু সেন) ছবিতে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও নন্দিনী

পাশ করে গ্রামের ছেলে ইন্দ্র (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়) চাকুরির মায়া ত্যাগ করে উন্নত চাষ-আবাদে মনোনিবেশ করে। ইন্দ্রর সমাজবাদী মন গ্রামের জোতদারের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ছবির প্রথম ভাগে দেখানো হয়েছে সরল গ্রাম্য চাষীরা ইন্দ্রর পক্ষে। অবশ্য কখনো যে তারা ইন্দ্রকে ভুল বোঝেনি তা নয়। তবে জোতদার বনাম ইন্দ্রর সংঘর্ষের একটা ক্ষেত্র গোড়া থেকেই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নাটকীয় সংঘাত বা অ্যাকশনের বড় বিস্ফোরণ এই অধ্যায়ে ঘটেনি। কারণ হয়ত এই, চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অর্ধেন্দু সেনকে আবার আর একটি নাটকের দিকে নজর দিতে হয়েছে, যেখানে ইন্দ্র তার হারানো দিদিকে খুঁজে পেয়েছে। এই বিষয়বস্তু প্রাধান্য পেয়েছে ছবির দ্বিতীয় ভাগে।

এই নাটকের শেষ অঙ্কে ইন্দ্রর দিদি কুহেলী (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়) এক ভিলেনের হাতে খুন হয়েছে। এই খুনের পিছনেও জোতদারের মদৎ। অর্থাৎ জোতদার ও ইন্দ্রর সংগ্রাম বোম্বাই-চিত্রের ফরমুলায় পর্যবসিত। পরিচালক-চিত্রনাট্যকার এই ছবিতে কোন দিক রাখবেন কোন দিক ছাড়বেন তা নিয়েই যেন দ্বিধাগ্রস্ত। চিত্রনাট্যে জোতদারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ গ্রামবাসীর সংগ্রামের যে প্রস্তুতি ছিল তা সম্পূর্ণ হতে না হতেই কুহেলীর গল্প শুরু হয়ে যায়। যাত্রার দলের অভিনেত্রী কুহেলী তার গর্ভধারিণীর সন্ধান পেয়েও তার সঙ্গে মিলিত হতে পারল না। এদিকে কুহেলীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই গ্রামবাসীরা [illegible] কাতারে কাতারে মশাল ও লাঠি হাতে নিয়ে জোতদারের বাড়ি ঘিরে ফেলে। জোতদারের কাছ থেকে তারা জবাব চায়। জোতদারের বিরুদ্ধে যে এত গ্রামবাসী একতাবদ্ধ সেটা ছবির গোড়ায় বোঝা যায়নি। তাদের জাগরণ আগে কেন ঘটল না তাও দুর্বোধ্য।

যাই হোক, এই ফাঁকে পরিচালক তাঁর আর এক নাটক দেখিয়ে দিয়েছেন। কুহেলীর মাতৃভক্তিও দেখা গেছে। ছবিটি আসলে বহু উপকরণবিশিষ্ট। জোতদারের কলেজে-পড়া মেয়ে রাজশ্রীর (নন্দিনী মালিয়া) প্রচ্ছন্ন অনুরাগও দেখানো হয়েছে আদর্শবাদী ইন্দ্রর প্রতি। কৌতুক-উপাদানও বাদ যায়নি, এই পর্বের শিল্পীরা হলেন রবি ঘোষ ও রত্না ঘোষাল। "মা ও মাটি"-র এত সব ব্যাপারের মধ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (জোতদার), শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন এবং তাঁরা এর সদ্ব্যবহারও করেছেন। যাত্রাদলের অর্থ-লোভী মালিক এবং পরে কুহেলীর হত্যাকারী ভিলেনের ভূমিকা সুসম্পন্ন করেছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়ও ভাল। কিন্তু ছবিতে এই চরিত্র মারফৎ কৃত্রিম উপকরণ আনা সত্ত্বেও ছবিটি যে খুব উপভোগ্য হয়েছে তা নয়। কয়েকটি মুহূর্তে অবশ্য পরিচালক দর্শকদের নাটকের আস্বাদ দিতে পেরেছেন। ছবির শেষ দুটো দৃশ্য যেন তাড়াতাড়িই গড়ে তোলা হয়েছে। অনিল বাগচী সুরারোপিত গানের মাধুর্য মন্দ নয়। গানের সুরও ভাল। ছবিতে [illegible] যখন ছিল তখন পরিচালক গানের সুযোগ আরও ভালভাবে নিতে পারতেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রথম ছবি "[illegible]" বাংলা"-র মহরৎ হয়েছে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। [illegible] কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন [illegible]। পরিচালনা করছেন সরোজ রায়। মুখ্য চরিত্রে বাংলাদেশের নায়ক রাজ্জাক অভিনয় করবেন বলে জানা গেছে। সংগীত পরিচালনা করছেন পূর্ণ দাস বাউল।

মুক্তির অপেক্ষায়

সাহা ফিল্মসের "অর্চনা" ছবিটির মুক্তি আসন্ন। হিরণ্ময় সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সুখেন দাস। পরিচালক পীযূষ গাঙ্গুলি ও সংগীত পরিচালক অজয় দাস। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী : মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, অনুভা ঘোষ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, সুধীর সাহা প্রভৃতি।

এই প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ছবির জন্য প্রফুল্ল রায় রচিত "জন্মভূমি"-র চিত্রস্বত্ব কিনেছেন বলে জানা গেছে।

* * *

কল্যাণীদের নিবেদিত "ছিন্নপত্র" ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। সুরকার নচিকেতা ঘোষ। উত্তমকুমারের এ ছবিতে দুটি ভূমিকা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী চক্রবর্তী, কমল মিত্র, অসিতবরণ, অপর্ণা দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, সাধন সেনগুপ্ত ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা।

* * *

মনীষা আর্ট ইন্টারন্যাশনালের হাসির ছবি 'ঠিকঠিক' মুক্তির অপেক্ষায়। পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় এ ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন। সুরকার শ্যামল মিত্র। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন সন্ধ্যা রায়, সমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু, অসীম চক্রবর্তী, জহর রায় ও অনুভা ঘোষ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

নির্মীয়মান

শিল্পী সংসদ প্রযোজিত 'অমর্ত্যলোকের পদাবলী' ছবির সংগীত গ্রহণ করা হয়েছে সম্প্রতি। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, উৎপলা সেন, সতীনাথ ও মানবেন্দ্র গান গেয়েছেন। এ ছবির চারজন সংগীত পরিচালক। তাঁরা হলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র। সমাপদ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালনা ও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার। চলচ্চিত্র, মঞ্চ ও যাত্রা জগতের শিল্পীদের নিয়ে গঠিত শিল্পী সংসদের সদস্যরা এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রের রূপকার।

'নিশিকন্যা' (পরিচালনা : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মিঠু মুখোপাধ্যায়

* * *

টেকনিসিয়ানস ও প্রোডাকসনসের "মেঘের পরে মেঘ" ছবির কাজ এগিয়ে চলেছে। পরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এ ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন। সংগীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী : অনিতা চট্টোপাধ্যায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, অজয় গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বি-এফ-জে-এ নির্বাচিত ১৯৭১-এর শ্রেষ্ঠ চিত্র, শিল্পী ও কলাকুশলী

বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মতামতে তরুণ মজুমদার প্রযোজিত ও পরিচালিত "নিমন্ত্রণ" ১৯৭১ সনে মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। ওই একই ছবির জন্য শ্রীমজুমদার শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ করেছেন। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় এই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

বছরের শ্রেষ্ঠ দশটি ভারতীয় ছবির নাম (গুণানুসারে) : নিমন্ত্রণ, আনন্দ, সীমাবদ্ধ, চেতনা, সারা আকাশ, মাল্যদান, গুড্ডি, এখনই, ভেরে মেরে সপনে, খামোশি।

বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠদের সম্মানে চিহ্নিত : পরিচালনা (বাংলা) : তরুণ মজুমদার (নিমন্ত্রণ); হিন্দী—হৃষীকেশ
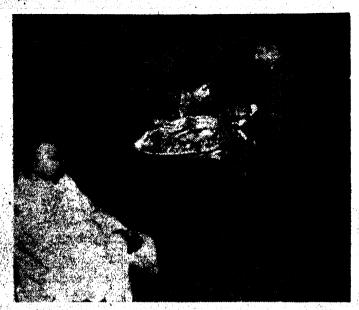
ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীশ্যামলাল জালান গত ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাসভবনে ফালকে পুরস্কার ও পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত শ্রী বি এন সরকার এবং পদ্মশ্রী উপাধিতে সম্মানিতা শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে সংবর্ধনা জানান। ছবিতে বাঁ দিক থেকে : শ্রী বি এন সরকার, শ্রীমতী সুচিত্রা সেন ও শ্রীশ্যামলাল জালান

ফটো—দেশ

মুখোপাধ্যায় (আনন্দ)। অভিনয় (বাংলা)—উত্তমকুমার (এখানে পিঞ্জর), সন্ধ্যা রায় (নিমন্ত্রণ); হিন্দী—রাজেশ খান্না (আনন্দ), রেহানা সুলতান (চেতনা)। সহ-অভিনয় (বাংলা)—চিন্ময় রায় (এখনই), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (মালাদান); হিন্দী—অমিতাভ বাচ্চন (আনন্দ), ফরিদা জালাল (পারস)। চিত্রনাট্য (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (সীমাবদ্ধ), হিন্দী—বাসু চট্টোপাধ্যায় (সারা আকাশ)। সংলাপ (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (সীমাবদ্ধ) ও তপন সিংহ (এখনই); হিন্দী—গুলজার (আনন্দ)। সংগীত পরিচালনা (বাংলা)—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জয়-জয়ন্তী); হিন্দী—শংকর-জয়কিষণ (আন্দাজ)। গীত-রচনা (বাংলা)—শ্যামল গুপ্ত (জয়জয়ন্তী), হিন্দী—হসরত-জয়পুরী (আন্দাজ)। আলোক-চিত্রগ্রহণ (বাংলা)—শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (নিমন্ত্রণ); হিন্দী—কে কে মহাজন (সারা আকাশ); রঙিন চিত্রগ্রহণ—ভি রাত্র (তেরে মেরে সপনে)। শিল্পনির্দেশনা (বাংলা)—সুনীতি মিত্র (কুহেলী); হিন্দী—দেশ মুখোপাধ্যায় (জল বিন মছলি)। শব্দগ্রহণ (বাংলা)—বাণী দত্ত, নৃপেন পাল, সুজিত সরকার (কুহেলী); হিন্দী—এ কে পারমার, মঙ্গেশ দেশাই (জল বিন মছলি)। সম্পাদনা (বাংলা)—দুলাল দত্ত (সীমাবদ্ধ) হিন্দী—বিজয় আনন্দ (জনি মেরা নাম)। নেপথ্য সংগীত (বাংলা)—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (ধনি মেয়ে), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (জয়-জয়ন্তী); হিন্দী—কিশোরকুমার (আন্দাজ), লতা মঙ্গেশকর (তেরে মেরে সপনে)।

বিশেষ পুরস্কার পাবেন "গুড্ডি" চিত্রের মুখ্য অভিনেত্রী জয়া ভাদুড়ি।

বিদেশী ছবি

১৯৭১ সনের শ্রেষ্ঠ তিনটি বিদেশী ছবি (গুণানুসারে) : "চারলি", "উডস্টক", "মিডনাইট কাউবয়"। "উডস্টক" ছবির পরিচালক মাইকেল ওয়াডলেই শ্রেষ্ঠ পরিচালনার সম্মান অর্জন করেছেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন যথাক্রমে ক্লিফ রবারটসন (চারলি) ও সোফিয়া লোরেন (সানফ্লাওয়ার)।

কচ ও দেবযানী

(নৃত্যনাট্য)

একটি নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের জন্য যদি রবীন্দ্রনাথের যে-কোন কাব্যকাহিনী হলেই চলে তবে ভিন্ন কথা, নতুবা "কচ ও দেবযানী" নৃত্যনাট্যে "বিদায় অভিশাপ"-এর রস ও মাধুর্য খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এক্ষেত্রে মনে হয় "বিদায় অভিশাপ" একটা উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য শুধু নৃত্য ও গীত। কিন্তু রবীন্দ্রানুরাগী যে-কোন দর্শক নৃত্যনাট্যের ভিতর মূল রচনার স্বাদটুকুই খুঁজবেন। এবং তাঁরা "কচ ও দেবযানী" দেখে হতাশ হবেন।

"কচ ও দেবযানী"-তে মাঝে-সাঝে "বিদায় অভিশাপ"-এর কিছু অংশ অবশ্যই শোনা গেছে। আবৃত্তি নেপথ্যে। নৃত্যনাট্যের পরিচালক অথবা "বিদায় অভিশাপ"-এর নাট্যরূপদাতা কাব্যকাহিনীর ভাব অনুসরণে বেশ কিছু অতিপরিচিত রবীন্দ্র সংগীত এই নৃত্যনাট্যে ব্যবহার করেছেন। গানগুলি শুনতে নিশ্চয়ই ভাল লাগে, বিশেষত গানগুলি যখন গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীরা। কিন্তু গানগুলি অন্য রচনায় অন্য রসমুহূর্তের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, এই সব গান শোনবার সময় অন্য অনুভব এবং অন্য স্মৃতিই মনকে অধিকার করে নেয়। "বিদায় অভিশাপ"-এর রস বিশেষ মেলে না।

অতএব "কচ ও দেবযানী"-র ক্ষেত্রে "বিদায় অভিশাপ"-এর প্রসঙ্গ অবান্তর। তবে একটি নৃত্যনাট্য হিসাবে 'কচ ও দেবযানী'-র আলাদা বিচার চলে। সে ক্ষেত্রে দর্শকরা পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় ও সাধন গুহর নাচ দেখে খুশি হবেন। নাচে এঁরা দুজনই খুব পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ছোট দেবযানীর ভূমিকায় শিল্পীর নাচও প্রশংসনীয়। দর্শকরা "কচ ও দেবযানী"-তে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক উপভোগের সুযোগ পাবেন। প্রযোজনায় পারিপাট্যও বিশেষ লক্ষণীয়।

বোম্বাই বিচিত্রা

যতদূর মনে পড়ে গল্পটা শুনেছিলাম শ্রীমতী শোভনা সমর্থের কাছ থেকে। আজকাল অনেকেই শ্রীমতী সমর্থকে নূতন এবং তনুজার মা হিসেবেই চেনেন, কিন্তু শোভনাজী নিজ গুণেই স্বনামধন্যা। কিন্তু থাক সে কথা। গল্পটার কথায় আসা যাক। গল্পটা নূতনের কিশোরী কালের। পুরোপুরি যুবতী হবার আগেই নূতন চিত্রজগতে নায়িকা হয়ে প্রবেশ করেন। যে ছবির গল্প হচ্ছে সে ছবির নাম 'নাগিনা'. সম্ভবত নূতনের প্রথম ছবি। নায়িকা নূতন। নায়ক নাসির খান (দিলীপ কুমারের ভাই)। বয়সে নাবালিকা, দেখতে কোনোরকমে সাবালিকা নূতনের ছবি, 'নাগিনা' যখন রিলিজ হল তখন দেখা গেল সে ছবি কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। ঘটনাটা শুনে নূতন তো অবাক। কিন্তু তারপর যে ঘটনা ঘটল সেটা আরো আশ্চর্য। মানে প্রায় হতবাক হবার মত। 'নাগিনা' রিলিজ হয়েছিল কোনো ইংরেজি হলে। সুতরাং প্রথম প্রদর্শনীর রাত্রেই নূতন এবং তার বেশ কয়েকজন বন্ধু 'নাগিনা' দেখতে পেল না। গেটকীপার ঢুকতে দিলে না, বললে, "কিডস্ গো হোম, দিস ইজ এ ফিল্ম ফর দ্য অ্যাডাল্টস"—প্রথমে তো নূতন অবাক, তারপর কোনোরকমে সাহস সংগ্রহ করে সে বললে, যে এ সে-ই এ ছবির নায়িকা। তবু গেটকীপারের মন ভিজলো না। ওরা গেল ম্যানেজারের কাছে। তিনিও নিয়ম ভঙ্গ করলেন না। নূতন 'জনতার সঙ্গে' নাগিনা দেখতে পেলো না। এটা অনেক বছর আগের ঘটনা। সেই সময়ে কোনো ছবি অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেট পেলে প্রযোজক/পরিবেশকরা চিন্তিত হতেন। কোনো কোনো পরিবেশক ছবি রিলিজ করতেই চাইতেন না।

কিন্তু আজকাল হয়েছে ঠিক তার উল্টো। আজকাল যদি পরিবেশক মহলে ছবিকে হটকেক করতে চান তাহলে "ম্যানেজ টু গেট অ্যান অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেট"। আজকাল অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেটওয়ালা ছবির দাম বেশী। কারণ অ্যাডাল্ট ছবি দেখার বাসনা অ্যাডাল্টদের চেয়ে অ্যাডোলেসেন্টদের অনেক বেশী—আর ছবি হিট হয় ওদেরই জন্য। ছবির পাবলিসিটিতে নগ্নতার অভাব দিয়ে দিন আর পাশে বড় বড় করে লিখে দিন "প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য", ব্যস, আর দেখতে হবে না। সেন্সর বোর্ড যে কারণে বিশেষ কোনো ছবিকে অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেট দিচ্ছে, ঠিক সেই কারণটাই প্রচারের গুণে সিনেমা হলে অ্যাডোলেসেন্টদের ভীড় বাড়াচ্ছে। সেদিন সেন্সর বোর্ডের কয়েকজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এ প্রসঙ্গে। একজন বললেন, "কী করা যায় কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। যেই কোনো ছবিকে আমরা শিক্ষামূলক বললাম, অমনি সেটা আর কেউ দেখতেই গেল না। অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেট দিলাম তো আবাল-বৃদ্ধবনিতা গিয়ে সিনেমায় লাইন লাগালো। হয়তো কোনো ছবিকে অসামাজিক ভেবে ব্যান করে দিলাম তো সেই ছবিই হয়ত পরে রাষ্ট্রীয় স্বর্ণপদক পেয়ে গেল। অর্থাৎ আমরা যা চাইছি হচ্ছে তার ঠিক উল্টো।" যে কজন ছিলাম সবাই হো হো করে হাসলাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে হাসিটা ঠিক জমল না।

'সোনাল' (পরিচালনা : প্রভাত মুখোপাধ্যায়) হিন্দী ছবিতে মল্লিকা সারাভাই ও সুলোচনা

সরল শর্মা

রেকর্ড আলোচনা

রবিশংকরের কনচেরতো

কলকাতায় সম্প্রতি পণ্ডিত রবিশংকর একটি ছাড়া আর কোন অনুষ্ঠানে বাজাতে পারেননি। যাঁরা এবার তাঁর বাজনা শুনতে পাননি তাঁরা একটি অসাধারণ লং-প্লে রেকর্ডের মধ্য দিয়ে সে অভাব পূরণ করে নিতে পারেন। এইচ-এম-ভির এই রেকর্ড রবিশংকরের 'কনচেরতো' ফর সিতার অ্যানড অর্কেস্ট্রা'। গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে রবিশংকর এই রেকর্ড উৎসর্গ করেছেন। কারণ এই রেকর্ড রবিশংকরের শিল্পী-জীবনের এক বিশেষ কীর্তি। যাঁরা অভিযোগ করেন, রবিশংকরের বাজনা 'ওয়েস্টার্নাইজড' হয়ে গেছে তাঁরা রেকর্ডটি শুনে ভুল শুধরে নিতে পারেন। আঁদ্রে প্রেভিনের পরিচালনায় লন্ডন সিমফনি অর্কেস্ট্রার সহযোগিতায় রবিশংকর এক বিশেষ এক্সপেরিমেন্ট করেছেন এই রেকর্ডে। রবিশংকরের সেতারের ভিত্তি ভারতীয় রাগ। বিভিন্ন রাগের (খাম্বাজ, সিন্ধু ভৈরবী, আড়ানা ও মাঞ্জ খাম্বাজ) শুদ্ধতা বজায় রেখে তিনি যে কনচেরতো উপহার দিয়েছেন তাতে পশ্চিমের বাদ্যযন্ত্রগুলির এবং বিশেষত তবলার বদলে বোঙ্গোর (টেরেন্স এমরি পরিবেশিত) জাত পালটেছে। অর্থাৎ পশ্চিমী যন্ত্রগুলি যেন 'ইনডিয়ানাইজড' হয়ে গেছে। এখানে পাশ্চাত্যের অর্কেস্ট্রা প্রাচ্যের রাগ-সংগীতের

পণ্ডিত রবিশংকর অল্প কয়েক দিনের জন্য স্বদেশে এসেছিলেন। এরই মধ্যে তিনি দমদমে গ্রামোফোন কোম্পানির নবনির্মিত রেকর্ডিং স্টুডিও পরিদর্শন করে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ছবিতে : এইচ এম ভি-র পরিচালক শ্রী ভি পি অম্বোরাম পণ্ডিত রবিশংকরকে কোম্পানির সুপারস্টারিও সাউন্ড সিসটেমের একটি সেট উপহার দিচ্ছেন

সঙ্গে নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছে। যোগফলে আমরা আমাদের সংগীতই পাচ্ছি। রবিশঙ্করের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অপূর্ব। পশ্চিমের যন্ত্রের অ্যাডাপটেশান-এ খেয়াল অঙ্গের আড়ানা কিংবা ঠুংরী অঙ্গের মাজ খাম্বাজ উপভোগে কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি।

অন্য একটি ই-পি রেকর্ডের (জয় বাংলা) এক দিকে রবিশঙ্কর ও আলী আকবর খানের যুগলবন্দী বাজনা (রাগ মিশ্র ঝিঁঝোটি) আর একটি সম্পদ। এতে তবলা বাজিয়েছেন ওস্তাদ আল্লারাখা। অপর পিঠে বাংলাদেশ সম্পর্কিত সমবেত গান—রবিশঙ্করের কণ্ঠসংগীত যার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এইচ-এম-ভি'র একটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড **"রিডিংস ফ্রম শ্রীঅরবিন্দ"**। শ্রীঅরবিন্দের কবিতা ও গদ্য-রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেছেন করণ সিং। শ্রীঅরবিন্দের ক্লাসিক কাব্য "সাবিত্রী"-র অংশও আবৃত্তি করেছেন শ্রী সিং। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব ও ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দী দেশাত্মবোধক গান গেয়েছেন **মান্না দে ও লতা মঙ্গেশকর।** এঁদের গানের এইচ-এম-ভি ই-পি রেকর্ড দুটি সময়োপযোগী। মান্না দে-র গাওয়া "মেরী প্যারী জন্মভূমি" কিংবা "ইস বার লড়াই লানেওয়ালা" (সুর : কনু ঘোষ) এবং লতা মঙ্গেশকরের "সন্তানের জন্যে" ও "যো সমর মেঁ হো গায়ে অমর" গানগুলি অভিভূত করে।

চিৎপুর-চিত্র

মরসুমের আয়ু যত ফুরিয়ে আসে তত চাঞ্চল্য বাড়ে চিৎপুরের। ষষ্ঠীর বাদ্য বাজল কি বাজল না থেকে সেই যে শুরু, তারপর বেশ কয়েকটা দিন উৎসবের সৌরভ ছড়িয়ে থাকে। হাওয়ায় হিমের ভাব যত গাঢ় হয়ে আসতে থাকে ততই চঞ্চল হয় চিৎপুর এবং বাসন্তী হাওয়া বইবার আগেই সকল শলা প্রায় শেষ হয়ে আসে। প্রশ্ন করেছেন কেউ কেউ বরাবরের মতন এবারেও কি সেই ভাঙাগড়ার ষড়যন্ত্র শেষ হয়ে গেছে?

ষড়যন্ত্র বলতে যা বোঝায়, চিৎপুরের গোপন শলাকে ঠিক ওই অর্থে ব্যবহার করলে অন্যায় হবে। কথায় আছে : কোনো দেশের বুলি—অন্য দেশের গালি। এখানে অনেকটা সেরকমই। কোন্ দল থেকে কোন শিল্পীকে কে ভাঙিয়ে নেবে এমন কিছু হঠাৎ তা স্থির হয় না। পারলে দলের মালিক নিজেই ওঁর শক্তানুসারে গতিবিধি ক্রিয়াকর্মের ওপর গোপন দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ শিল্পী অনেক ক্ষেত্রে নিজেও জানেন না যে, সত্যি তাঁর এক খাপ ওঠার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। নেহাৎ যদি বাস্ত মালিক হন তো এ কাজটা সারেন দল-পরিচালক স্বয়ং। সবশেষে চলে যোগসূত্র রচনার খেলা।

এ-মরসুমে ওই যোগসূত্র রচনার কাজটি কিন্তু অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। বরাবর ফাল্গুনের মধ্যে প্রধান শলার কাজ সমাপ্ত হয়ে থাকে, কিন্তু এ-সালের চিৎপুরে সেই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। পৌষের শেষ থেকেই মৃদু গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছিল ইতিউতি, কিন্তু মাঘ প্রৌঢ় হতে না হতেই তা স্তব্ধ হয়ে গেল। ফলে দাঁড়াল এই যে, অমুককুমারের যে অমুক দলে যাওয়ার কথা রটেছিল তার মধ্যে সত্যিই কতটা থাদ ছিল তা আবিষ্কার করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। টপ আর্টিস্টদের অনেকেরই দল বদলের সিদ্ধান্ত স্থির হতে হতে শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। হঠাৎ আমাকে একজন দুরভাষে ধরে বসলেন। ভদ্রলোক চিৎপুরের এক বিখ্যাত স্টার। আমাকে আঁচ নিতে বলছিলেন। অর্থাৎ গোপনে যে-দলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল, হঠাৎ সে-দলের মালিকের নিস্পৃহ আচরণ শিল্পীকে কতখানি বিচলিত করেছে বুঝতেই পারছেন। ভদ্রলোকের বক্তব্য : আমি যেন সেই বিশেষ মালিকের প্রকৃত মনোভাব জেনে ওঁকে জানাই।

মাপ চেয়ে নিতে হয়েছিল। তবে মালিকপক্ষের সঙ্গে সত্যি কিন্তু একটা আলোচনা আমার হয়। ওঁরা বললেন, অনেকটা কাজ এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যাত্রার ব্যবসায় যে দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে চলছে, তাতে সত্যিই মাইনে-ভাতাদি ও খরচার পরিমাণ (কাটিং) না কমালে যাত্রার ব্যবসায় রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং......।

সুতরাং আসছে মরসুমে স্টার সিস্টেমের ওপর জবর এক আঘাত পড়বে। পাঁচ-দশ হাজারী নয়, তিন হাজারী আর্টিস্টও সেই মোক্ষম আঘাত থেকে বোধ হয় রেহাই পাবেন না। জানি না বিখ্যাত শিল্পীরা তার জন্য কতটা তৈরী হয়ে আছেন।

—সূত্রধার

টুমলুরু ভগ্নীদের নাচ

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে ললিতকলা সমিতি টুমলুরু ভগ্নী-দ্বয়—কুমারী গৌরী ও কুমারী লক্ষ্মীর ভারতনাট্যম আরঙ্গেত্রম নাচের আয়োজন করেছিলেন। উভয়ের নাচেই শাস্ত্রীয় নৃত্যের শুদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে। হংসধ্বনি রাগে আলারিপু এবং বসন্ত রাগে যতিস্বরম অংশে দুজনেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। গৌরীর রাগমালিকায় শব্দম উপভোগ্য। দশ বছর বয়স্কা লক্ষ্মী সুকঠিন বর্ণম্ অংশে চমৎকার পায়ের কাজ দেখিয়েছে। তবে সেই সন্ধ্যার সবচেয়ে উপভোগ্য অনুষ্ঠান ছিল জনপ্রিয় যদুকুলা কাম্বোজী পদম্ "কনাক্ক থাবা"।

টুমলুরু ভগ্নীদ্বয়—কুমারী গৌরী ও কুমারী লক্ষ্মী

প্রদীপ সরকারের ইন্দ্রজাল

যাদুকর পি সি সরকারের শূন্যস্থান অবশ্যই পূর্ণ হবার নয়, তবে তিনি তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন। তিনি প্রদীপ সরকার—পি সি সরকার জুনিয়র। কলামন্দিরে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি যাঁরা প্রদীপ সরকারের ইন্দ্রজাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সত্যিই পি সি সরকার জুনিয়রকেই দেখেছেন। প্রদীপের ইন্দ্রজালের মধ্যেই বাকি পি সি সরকার বেঁচে আছেন। সেই শো-ম্যানশিপ, সেই বাকপটুতা, সেই হিউমর। আর একটি দিকও আছে। পি সি সরকারের যাদু প্রদর্শনীতে একটা দেশচেতনার পরিচয় থাকত, প্রদীপ সরকার সেটাও অটুট রেখেছেন। যাদু খেলার ভিতর ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এবং সর্বোপরি জাতীয় সংহতির পরিচয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্কেস্ট্রাতেও বারে বারে বেজে উঠেছে দেশাত্মবোধক গানের সুর। পি সি সরকার যখনই বিদেশে গেছেন তখন শুধুই তিনি যাদুকর ছিলেন না, ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি। প্রদীপ সরকার তাঁর পিতার সেই ভূমিকা বিস্মৃত হননি। এটা তাঁর ইন্দ্রজাল দেখে বোঝা গেছে।

প্রদীপ সরকারের বয়স বাইশ। এই অল্প বয়সেই তিনি জাপানে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে ফিরে এসেছেন। প্রদীপ সরকার আবার বিদেশে যাচ্ছেন একটানা ছয় বৎসরের জন্য। কোরিয়ায় এবং বিদেশের অনেক জায়গায় তাঁকে পুরো ছয় বৎসর ইন্দ্রজাল দেখাতে হবে। জাপানে পিতার অসম্পূর্ণ

প্রদীপ সরকার

অনুষ্ঠান অভাবনীয় কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ করে ভারতে এসে প্রদীপ সরকার ভারতীয় জওয়ানদের জন্য ইন্দ্রজাল দেখিয়েছেন। মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর হাতে অর্পণ করেছেন। কলামন্দিরে এই সংবাদ ঘোষণার পর দর্শকরা বিপুল হর্ষধ্বনির ভিতর শ্রীসরকারকে অভিনন্দন জানান। বিদেশ যাবার আগে ১০ মার্চ থেকে কয়েকদিন শ্রীসরকার কলামন্দিরে ইন্দ্রজাল দেখাবেন।

সেদিনকার অনুষ্ঠানে পরিচিত খেলাধুলো ছিল অনেক। প্রদীপ সরকার তাঁর পিতার কয়েকটি প্রিয় খেলা দেখান। নতুন খেলাও ছিল। কিছুকাল আগে তালাবন্ধ বাক্সে বন্দী অবস্থায় সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ফিরে আসার যে আশ্চর্য যাদু দেখিয়ে প্রদীপ সরকার সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন তারই আদলে আর একটি খেলা তিনি দেখালেন মঞ্চে। আরও অনেক বিস্ময়কর খেলা ছিল সেদিন—ইলেকট্রিক নারীদেহ, নারীদেহ দুভাগ করা, মৃত রাজকুমারীর দেহ শূন্যে তোলা ও পরে অদৃশ্য করে দেওয়া, এক্স-রে চোখের যাদু, রুটির খেলা, অপ্টিক্যাল ইত্যাদি। রসময়ের কৌতুকের সঙ্গে সব খেলা দেখাতে পেরেছে। ইন্দ্রজালে আবার কৌতুক-নক্সাও ছিল।

বিচিত্র আলোকসম্পাত, মেয়েদের সাজ এবং এফেক্ট মিউজিক—এই সব কিছু দর্শককে ইলিউশানের জগতে পৌঁছিয়ে দেয় অতি সহজেই। যাদু-পরিবেশনে তীব্র গতি, এবং প্রতি খেলার আগে ও পরে প্রদীপ সরকারের সপ্রতিভ ভাষণ ইন্দ্রজালের আকর্ষণ বিশেষভাবে বাড়িয়েছে। এক কথায়, পরিবেশন-পারিপাট্যের দিক থেকে প্রদীপ সরকারের অনুষ্ঠান তাঁর পিতার ইন্দ্রজালের ঐতিহ্যকে মূর্ত করে তুলেছে।

পিতার জন্মদিনে প্রদীপ সরকার তাঁর অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। সেদিন পিতাকে প্রণাম জানালেন প্রদীপ। এবং পিতার যোগ্য উত্তরসাধক যে তিনি সে পরিচয় দিলেন সেদিনকার আমন্ত্রিত অতিথি-বৃন্দকে।

টেকনিক স্কুল অব মিউজিক-এর উৎসব

টেকনিক স্কুল অফ মিউজিক সঙ্গীত শিক্ষায়তনের দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্প্রতি মহাজাতি সদনে সম্পন্ন হল। অন্যান্য ছাড়াও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নজরুল গীতি, পিণ্টু ভট্টাচার্যের আধুনিক গান ও কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

আসর জমাবার মেজাজ নিয়েই যেন গান গাইতে বসেছিলেন সেদিন পিণ্টু ভট্টাচার্য। অন্যান্য গানের মত আধুনিক গানেরও যে এক মনজয়ী আবেদন আছে শিল্পীর গানে এই বক্তব্যই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। গাওয়ার গুণে দারুণ জমেছিল সেদিন চলনা দীঘার সৈকত ছেড়ে, শেষ দেখা সেই রাতে, জানি পৃথিবী আমার, তুমি নির্জন উপকূলে, আমার দুখের রজনী, জানি না কখন সে যে, এক ও জমেছিল। নজরুল গানের আসরটিকে আকর্ষক করে তুলতে কোন ত্রুটি রাখেননি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও। আহীর ভৈরোঁয় বাঁধা 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী' দিয়ে তিনি শুরু করলেন, অনুষ্ঠান শেষ করলেন মিশ্র ভৈরবী সুরে 'আধো আধো বোলে' গানটি গেয়ে। এর মাঝে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই', 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া', 'এত জল ও কাজল চোখে', 'ভোরের ঝিলের জলে' প্রভৃতি জনপ্রিয় গানগুলি তিনি পরিবেশন করলেন।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সেদিন ছিল কিশোরী কণ্ঠশিল্পী শম্পা চক্রবর্তীর জয়জয়কার। রবীন্দ্রসংগীত, শ্যামাসংগীত, পল্লীগীতি, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান, আধুনিক ও [illegible] সাতটি বিষয়ে প্রথম পুরস্কার লাভ করে ও সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সেদিন। যন্ত্রসংগীতে: পাশ্চাত্য, নজরুল, আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করে একই খেতাবের অধিকারী হলেন গীটার শিল্পী গোলাম মোরতাজা।

আ-চ

সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা

বহরমপুরে কালেকটোরেট ক্লাব আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় এবার অংশ নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ষোলটি নাট্যদল। প্রতিযোগিতার বিচারে জাগরণ সংঘের 'সোনালী স্বপ্ন' প্রথম স্থান লাভ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পায় প্রান্তিক গোষ্ঠীর নাটক 'পিতামহের উদ্দেশে' ও ছান্দিক নিবেদিত ভূমিকম্প। জাগরণ সংঘের পিন্টু মজুমদার এ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতার সম্মান পান। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে নির্বাচিত হন প্রশান্ত সান্যাল, শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা অহিভূষণ মুখার্জি। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মনীশ গুপ্ত। এই উপলক্ষে ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি সুন্দর স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

লোকায়ন সংস্থা আগামী ১০ মার্চ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের "মালিনী" নাটক অভিনয় করবেন মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। নাট্য পরিচালনা করছেন অরুণ রায়। সংগীত পরিচালনা রাজেশ্বর ভট্টাচার্যের এবং সংগীতাংশে রয়েছেন সুচিত্রা মিত্র। মঞ্চ ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রাজেন তরফদার ও পিন্টু বসু।

দুর্গাপুরের ইয়ংমেনস রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ম্যাক্সিম গোর্কির 'সামান্য ঘটনা'র ছায়া অবলম্বনে রচিত শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের "সামান্য অসামান্য" নাটকটি কনক বক্সির সফল নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি দর্শকদের মন হাসিতে ভরিয়েছিল নির্মল চক্রবর্তী, কালিপদ চট্টোপাধ্যায় ও ইলা চক্রবর্তীর সুঅভিনয়ে।

'অনুভব' নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের নতুন নাটক 'সওদাগর' আবার মঞ্চস্থ করবেন ৬ মার্চ, সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটির রচনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন দীপেন্দু সেনগুপ্ত।

'রঙ্গরস' তাদের নতুন নাটক 'ভালোবাসার অপমৃত্যু' নিয়মিতভাবে অভিনয় করবে বলে স্থির করেছে। এই নাটকের প্রথম অভিনয় গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বালীগঞ্জ শিক্ষাসদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী অভিনয় মুক্ত অঙ্গনে ৭ এপ্রিল। নাটক ও নির্দেশনা—মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের।

দক্ষিণ কলিকাতার সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা সুরসভার তিনদিনব্যাপী সংগীত সম্মেলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন কান্তি মৈত্র ও গৌর বসাক। রবীন্দ্র সংগীত ও অন্যান্য লঘু সঙ্গীত পরিবেশন করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সাগর সেন, সমরেশ রায় ও অনুপ ঘোষাল। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে রবীন মুখোপাধ্যায়, নীতি দাস, লক্ষ্মী গুপ্ত ও শাশ্বতী গুপ্তের গান বিশেষ প্রশংসা পায়।

বর্তমান সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হলো প্রেসিডেণ্ট নিকসনের চীন সফর। ২১ ফেব্রুয়ারি মারকিন প্রেসিডেন্ট রিচারড নিকসন পিকিং পেঁছেই চীনের প্রধান নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মাও সে তুং ও চু এন-লাই-এর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনায় বসেন। তারপর তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক ভোজ-সভায় তিনি শান্তির উদ্দেশ্যে আমেরিকার সঙ্গে 'একত্রে লং মারচ শুরু' করার আবেদন জানান। তিনি বলেন: একই পদক্ষেপে নয়, পৃথক পৃথক পথে একই লক্ষ্যের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু বলেন, মৈত্রীর তোরণ এখন চূড়ান্তভাবে খুলে গিয়েছে। বানদুং সম্মেলনে গৃহীত পঞ্চশীলের ভিত্তিতে তিনি দুই দেশের সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব করেন। দুই দেশের মধ্যে যে বিরাট ফারাক উভয়-পক্ষই তা স্বীকার করেন। তবে দুই পক্ষই নীতির দিক থেকে আপস ছাড়াই দুই দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের আশা প্রকাশ করেন। নিকসন এবং চু এন-লাই দুই দেশের মধ্যে ছাত্র, গুণীজন ও সাংবাদিক বিনিময়ে একমত হয়েছেন। চীন আমেরিকার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত। কিন্তু ভিয়েতনাম প্রশ্নটি এখনও এই পথে কাঁটা হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া চীন মারকিন যুক্ত ইস্তাহারের খসড়া রচনায় সম্প্রতি কিছুটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সপ্তাহ ভোর আলোচনার কয়েকটি মূল বিষয় সম্পর্কে প্রেসিডেনট নিকসন ও চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই একমত হয়েছেন। তার মধ্যে তাইওয়ান থেকে মারকিন সৈন্য, ঘাটি সরিয়ে নেওয়া অন্যতম।

দেশী সংবাদ

২১ ফেব্রুয়ারি—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ নয়াদিল্লিতে এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেন: যে কোন দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টাকে ভারত চিরদিনই সাদর স্বাগত জানিয়েছে। নিকসন-চু বৈঠকের উদ্দেশ্য যদি বন্ধুত্ব স্থাপন হয়, তাকে আমরা স্বাগত জানাব।

এবার নদীয়া জেলার ১০৬২৩৪ জন ভোটারের মধ্যে ১২ জনের বয়স ১০০ বছরের ওপর। তাঁদের মধ্যে ৯ জন বিধবা। এই ভোটার তালিকায় ১৮০ জনের বয়স ৮০ বছরের ওপর এবং ৯৫০ জন ৭০ বছরের ওপরে আছেন।

২২ ফেব্রুয়ারি—সামরিক বাহিনী আগামী ৭ মারচ থেকে জলপাইগুড়ি জেলার বারোটি থানার ভার নেবে। জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি কমিশনার আজ বলেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রত্যেক মহকুমার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায্য করার জন্য সামরিক বাহিনী ২০ ফেবরুয়ারি থেকে বিভিন্ন এলাকায় শিবির স্থাপন করেছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি—নির্বাচনের মুখে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায্য করতে রাজ্যের নানা জেলায় নানাস্থানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। প্রয়োজনে মিলিটারী টহলের ব্যবস্থাও হবে। বুধবার থেকে সেই তোড়জোড় শুরু হয়।

বিনা অয়াসে নাগরিকদের কর্মস্থানে যাওয়া ও ভ্রমণের সুবিধার জন্য কলকাতায় ছয় শতের মত মিনি বাস চালাবার পারমিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নানাদিক থেকে ডালহৌসি স্কেয়ার পর্যন্ত বারটি রুটের প্রত্যেকটিতে ৫০ করে বাস চলবে। মিনি বাসের যাত্রীরা মাঝপথে নামতে পারলেও, উঠতে পারবেন না। এই বাসে চড়লেই ন্যূনতম ভাড়া ৫০ পয়সা।

২৪ ফেব্রুয়ারি—আগামী সাধারণ নির্বাচনে ১৬টি রাজ্য ও ২টি কেন্দ্র শাসিত এলাকায় বিধানসভার মোট ২৬৯৫টি আসনের মধ্যে সরাসরি লড়াই হচ্ছে মাত্র ৩৫০টি ক্ষেত্রে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সরাসরি লড়াই হয়েছিল ২৮৯ জায়গায়। পশ্চিম বাংলায় সরাসরি লড়াই হচ্ছে মাত্র ৯৮টিতে।

আজ সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি জেল থেকে উগ্রপন্থী বলে বর্ণিত ১৫ জন বন্দী পালিয়ে যান। বন্দীদের সঙ্গে ওই সময়ে এক সংঘর্ষে

জেলের ৩ জন ওয়ারডেন এবং একজন পুরানো কয়েদী গুরুতররূপে আহত হন। রাতের দিকে ওই পলাতক ১৫ জনের মধ্যে চারজনকে খুঁজে বের করা হয়েছে।

২৫ ফেব্রুয়ারি—জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস ও সোস্যালিস্ট পারটি বাংলাদেশ থেকে বিহারী মুসলমানদের ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবি করায় সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ দুঃখ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেন: কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের পক্ষে ওইসব পারটির দাবি ভারতীয় স্বার্থবিরোধী ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

১৭ জন পীড়িত: ভারতীয় যুদ্ধবন্দী, আন্তর্জাতিক রেডক্রসের একটি বিমানে রাওয়ালপিনডি থেকে দিল্লিতে এসে পেঁীচেছেন। এদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের একজন প্রতিনিধি ও একজন ডাক্তার এসেছেন। ২৭ জন গুরুতর পীড়িত ও আহত পাকিস্তানী যুদ্ধ-বন্দীকে নিয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের একটি বিমান দিল্লি থেকে রাওয়ালপিনডি যাত্রা করে।

২৬ ফেব্রুয়ারি—বিচারপতি শ্রীতারাপদ মুখারজি তাঁর তদন্ত রিপোরটে বর্ধমানের সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সি পি এম সমর্থক জনতাকে সরাসরি দায়ী করেছেন। আর দায়ী করেছেন বর্ধমানের তদানীন্তন জেলা শাসক, পুলিস এবং বর্ধমানের সদর এস ডি ও-কে। সি-পি-এম নেতা শ্রীসুবোধ চৌধুরীকে রিভলবারের লাইসেনস মঞ্জুর করার ঘটনাটিও অনুচিত হয়েছে বলে রিপোরটে মন্তব্য করা হয়েছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, ভারত আজ তার নিজের দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এসে পেঁীছেছে। ভবিষ্যতে আমরা কোন পথে যাব বা আমাদের লক্ষ্য কি হবে তাই এখন নির্ধারণের সময়।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বাংলাদেশে অবস্থানকারী "বিহারী মুসলমান-দের" ভারতে ফিরিয়ে আনার যে দাবি কোন কোন মহল থেকে উঠেছে তা সরাসরি নাকচ করে দেন। পাল্টা প্রশ্ন করে তিনি বলেন, আমরা কেন তাঁদের নেব। এঁরা ভারতকে নিজের মাতৃভূমি বলে স্বীকার করেননি।

বিদেশী সংবাদ

২১ ফেব্রুয়ারি—দিন কয়েকের মধ্যে, সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীর মসকো রওয়ানা হওয়ার আগেই বাংলাদেশ ঢাকায় মারকিন মিশনকে ৭২ ঘণ্টার নোটিস দেবে। জানা গিয়েছে, এই সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২২ ফেব্রুয়ারি—চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই দুটো বৃহদাকার সাদা পাণ্ডা (হিমালয়ের ভল্লুক জাতীয় প্রাণী) মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন। শ্রীমতী প্যাট নিকসন ওই কথা জানিয়ে বলেন, প্রেসিডেনট নিকসন চীনকে যে দুটো কস্তুরী ষাড় উপহার দিয়েছেন এগুলি তারই পরিবর্তে পাঠানো হচ্ছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি—"পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা শুরু করেছেন"—এই মর্মে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের নিকট এক বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ সরকার তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চারসাড্ডাতে পুলিস আজ এক ছাত্র মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে। প্রায় একই সময়ে সীমান্ত প্রদেশের আর একটি শহর নৌশেরাতে ছাত্র-পুলিসে প্রচণ্ড সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়েছে।

২৫ ফেব্রুয়ারি—পিকিংয়ে পর্যবেক্ষকরা আজ লক্ষ্য করেছেন, এক ব্যক্তি সর্বত্র ছায়ার মত নিকসনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার পরণে একটি রেন কোট ও হাতে একটি কালো রঙের সুটকেশ। এই সুটকেশের মধ্যে বিখ্যাত কালো বাকসটি রয়েছে। প্রকাশ, গুরুতর কোন প্রয়োজন দেখা দিলে ওই কালো বাকসের সাহায্যে আমেরিকার পারমানবিক শক্তিকে সক্রিয় করে তোলা যাবে।

২৬ ফেব্রুয়ারি—সোভিয়েট চন্দ্রযান লুনা-২০ গতকাল নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে এসে পেঁীছেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নির্দিষ্ট স্থানেই চন্দ্রযানটি ভূমি স্পর্শ করে। মনুষ্যবিহীন ওই চন্দ্রযান একদিনের কিছু বেশী সময় চাঁদে থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীর দিকে বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করে।

২৭ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তানের সামনে আর এক বিপদ। পিণ্ডির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে পূর্ব বাংলা বাংলাদেশে রূপান্তরিত হল মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে। এবার বিচ্ছিন্নতার ধুয়া তুলেছেন পাঠানরা। তাঁদের দাবি নিজেদের জন্য একটি স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্র।

আমরা চাই
সবচেয়ে সাদা
ক'রে
কাপড় ধোয়ার পাউডার

আমার দরকার
সবচেয়ে উজ্জ্বল
ক'রে
কাপড় ধোয়ার পাউডার

আমার চাই কাপড় আর
আমার হাতেরও পক্ষে
সবচেয়ে নিরাপদ
পাউডার

৩ জন নারী। ৩টি একেবারে আলাদা চাহিদা। মানে, ৩টি আলাদা আলাদা কাপড় ধোয়ার পাউডার? "মোটেই না"—বলেন আমাদের গবেষণা কুশলী। "আমরা কাপড় ধোয়ার এমন একটি পাউডার তৈরী করব যা এই ৩টি চাহিদাই পূরণ করবে।"

ফলশ্রুতি:

নতুন তিন ভাবে কার্যকর ডেট

* নতুন ডেট একটি খুব সাদা পাউডার···যাতে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।
* নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি। এটি কাপড়ের পুরনো ময়লাও দূর ক'রে দেয় আর রঙীন কাপড় উজ্জ্বল ক'রে তোলে।
* নতুন ডেটে প্রচুর ফেনা হয় আর এই ফেনায় রয়েছে কাপড়-চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ। এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ···তেমনি আপনার হাতের পক্ষেও সবচেয়ে নরম।

৫টি নতুন সাইজে পাবেন: ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০

তাছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে—নীল ডেট

Shilpi-HPMA 61P/71 Ben

সূচীপত্র

বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বঙ্গের রত্নমালা ৬.০০

নারায়ণ সান্যাল

অপরূপা অজন্তা

(রবীন্দ্র-পুরস্কার-ধন্য ১৩৭০) ১২.০০

বাস্তু-বিজ্ঞান ১০.০০

(বাংলায় বিল্ডিং কনস্ট্রাকসন)

ডঃ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শাক্তদর্শন ও শাক্তকবি ৮.০০

ডঃ শুকদেব সিংহ

শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য ১৫.০০

সুখময় মুখোপাধ্যায়

বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর (স্বাধীন সুলতানদের আমল) ১৫.০০

রবীন্দ্রসাহিত্যের-নবরাগ ৬.০০

মোহিতলাল মজুমদার

কাব্য-মঞ্জুষা ১০.০০

যতীন্দ্র মজুমদার

মৃত্তিকা-বিজ্ঞান ১২.০০

ডঃ সুধীর করণ

লোকসাহিত্যে ঈশপ ৬.০০

ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

উজ্জ্বল নীলমণি ১২.০০

বিশ্ববন্ধু সান্যাল

সাগর বেদে ৬.০০

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

মানব সমাজ ৭.৫০

নারায়ণ চন্দ

শ্রীচৈতন্য ৭.০০

সামারসেট মম্

শ্রীমতী ক্রাডক ৬.০০

বাসবদত্তা

গৃহস্থ বধূর ডায়েরী ৭.০০

ডঃ মনোরঞ্জন জানা

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ) ৮.০০

রবীন্দ্রনাথ — কবি ও দার্শনিক ১২.৫০

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ৭.৫০

রামনাথ বিশ্বাস

লাল চীন ৩.৫০

অন্ধকারের আফ্রিকা ২.৫০

মাউ মাউ-এর দেশে ২.৭৫

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

ইতিহাস শিক্ষণ ৮.০০

ভারতী বুক স্টল

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯
ফোন নং ৩৪-৫১৭৮

ঘোষ ও মজুমদার

সাধারণ কৃষি-বিজ্ঞান ৫.

অশোক কুণ্ডু

বঙ্কিম অভিধান ১৫.০০

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

রূপ হতে অপরূপ ২.৫০

ভগিনী নিবেদিতা ৬.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ৬.০০

শ্রীমা ৩.০০

সুপ্রকাশ রায়

মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক ২.৫০

সুশীলকুমার পাল

সমৃদ্ধির পথে ৩.০০

বিমল দত্ত

বিদেশী গল্পগুচ্ছ ২.৭৫

চেকভের গল্প ৪.০০

মোঁপাশার গল্প ৩.৭৫

মল্লিনাথ প্রণীত

মেঘদূত ৪.০০

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতি ৪.০০

ডঃ কার্তিকচন্দ্র রায়

পাগল হরনাথ ১৬.০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সংস্কৃতির ধর্ম ৮.০০

ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী

বিদ্যাপতি সমীক্ষা ৮.০০

সূচীপত্র

স্পা ওয়াশিং পাউডার
গুণে অসাধারণ কেন জানেন?
BLUE
Spa
POWDER
নীল
স্পা
বিশেষ উপাদানে তৈরী
স্পা ওয়াশিং পাউডারের পরিষ্কার করার ক্ষমতা ঢের বেশী! খুব ঘন ফেনায় ময়লা কাটিয়ে দেয়! এমন কি খর জলে কাচলেও যেকোন গভীর দাগ অনায়াসেই উঠে যায়!
জোরদার স্পা ওয়াশিং পাউডারে কাচা কাপড়-চোপড়ে একটা বাড়তি উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। খর জলে কাচলেও তার হেরফের হয় না। পরিষ্কার ও ঝকঝকে ক'রে কাচার বিশেষ উপাদান রয়েছে এই ওয়াশিং পাউডারে। অন্য ওয়াশিং পাউডার হার মানলেও স্পা কখনো হাল ছাড়ে না। এর অফুরন্ত ফেনা কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা ধুলোময়লা সব সাফ করে দেয়। আপনার জামাকাপড় অনায়াসে পরিষ্কার ও ঝকঝকে হয়ে ওঠে। কাজেই গিন্নীরা আজকাল বেশীর ভাগই স্পা ব্যবহার শুরু করেছেন। আপনিই বা বাকী থাকেন কেন?
স্পা
অনায়াসে কাপড় কাচার
একটি শক্তিশালী ওয়াশিং পাউডার!
কুসুম প্রডাক্টস লিমিটেড

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ — শ্রীমতী জিনলোম দত্ত

বাসনপত্র কেনার সময় কেমন ক'রে বুঝবেন সেগুলো ক্ষতিকর বাজে ধাতুর তৈরী নয়?

শুধু দেখে নেবেন প্রত্যেকটি বাসনের পেছনে ছাপা আছে

হিণ্ডালিয়াম ছাপমারা সমস্ত বাসনপত্র বহু বছরের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত উৎকৃষ্ট ধাতু দিয়ে তৈরী। তাই এগুলি যেমন সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ তেমনি আপনার স্বাস্থ্যেরও সম্পূর্ণ অনুকূল।

হিণ্ডালিয়াম আপনার পক্ষে উৎকর্ষের গ্যারান্টি

HINDALIUM®
রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন লিঃ,
রেণুকূট (উত্তর প্রদেশ)

HINDALCO

Sobhagya HAC-371 BEN

"খোকন হবে দশের সেরা"
জীবন বীমা করান
জীবন সুখে ভ'রে উঠবে
লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

একেবারে নতুন!
ল্যাকমে
আল্ট্রা-সিল্ক
ফেস পাউডার আর কম্প্যাক্ট মেক-আপ
ভারতের প্রত্যেকের রঙের
সৌন্দর্য্য বাড়াতে
আটটি চমৎকার রঙে

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৯
শনিবার ২৫ ফাল্গুন ১৩৭৮
Saturday 11 March 1972

নির্বাচন

এই লেখাটি যেদিন প্রকাশিত হচ্ছে সেদিন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কয়েক হাজার ভোট কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোট পড়ছে। আমরা আশা করব, এই দিনটি নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে কেটে যাবে, ভোটদাতারা তাঁদের মনোমত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারবেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভোটপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবার সব রকম ব্যবস্থাই করা হয়েছে, পুলিস ছাড়াও সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষার জন্যে নানা জায়গায় টহল দিতে শুরু করেছে।

নির্বাচনের ফলাফল কী হবে সে প্রশ্ন অবান্তর। সমস্ত রাজনৈতিক দলই তাদের অভিজ্ঞতা থেকে মোটামুটি একটা অনুমান করে, তার সঙ্গে বাস্তব ফলাফল কদাচিৎ মিলে যায় হয়ত, কিন্তু বহুক্ষেত্রে মেলে না। ভোটের ফলাফল সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করা তাই অনুচিত। ফলাফল যেমনই হোক, মেনে নিতে হবে যে পশ্চিমবাঙ্গের অধিকাংশ মানুষের মনোভাব তারই মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য একটা কথা থাকে। গত দু তিনটি নির্বাচনের মধ্যে এমন ব্যাপকভাবে অসাধুতা ও জবরদস্তি ভোট আদায় ঘটেছে যে যথার্থই সেই ফলাফল সাধারণ মানুষের মনোভাব কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারীভাবে যে ফলাফল স্বীকৃত হয়েছে আমাদেরও তা স্বীকার করে নিতে হবে। এবারের ভোটদান যাতে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত হয় তার জন্যে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ দু একটি নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তার মধ্যে ভোটপত্রে ভোটদাতার নাম সই কিংবা বুড়ো আঙুলের ছাপ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় নাকি ইতিপূর্বে বেশ সাফল্য লাভও করেছেন তাঁরা। যদি জাল ভোট, জবরদস্তি ভোট, অসাধু উপায় ইত্যাদি বন্ধ করা এখন সম্ভব হয় তবে গণতন্ত্রে ভোটদান-ব্যবস্থার যে মর্যাদা আছে তা রক্ষা পাবে।

পশ্চিমবঙ্গে গত পাঁচ বছর নির্বাচন অনুষ্ঠান খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল; সরকার হয়, ভাঙে, নির্বাচন হয়, আবার সরকার গড়ে ওঠে, আবার ভাঙে, সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের দাবী ওঠে। আর রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে এই রাজ্য পড়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মতন রাজ্যের পক্ষে এটা কৃতিত্বের কথা নয়। আমরা যদি আমাদের রাজ্যের দুর্গতির কথা ভাবি, বেকার সমস্যার কথা ভাবি, কৃষি সমস্যা, জলসেচ এবং আরও বহুবিধ সমস্যার কথা ভাবি, তাহলে এই রাজ্যে একটি কর্মক্ষম মন্ত্রিসভার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব। নিজেদের বাঁচাতে হলে এছাড়া পথ নেই। স্থায়ী সরকার গঠিত হলে সেই সরকার রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের জন্যে দায়ী হবেন। কেন্দ্র আমাদের দিচ্ছে না—এই কান্না কেঁদে লাভ নেই। কেন্দ্র যা দিয়েছে তার দ্বারাই বা কী কাজ হয়েছে? কয়েকটি খাতে কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থ খরচ না হয়ে আবার ফিরে গেছে—এ খবরই বা ক'জনে জানে! যাই হোক, আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্থায়ী সরকার, যে সরকার দলীয় রাজনীতির সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্যে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করবেন। আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দল, নেতা ও কর্মীদের বোঝা উচিত, ভারতের এক দিক অনুন্নত রাজ্য শ্রম, অধ্যবসায়ের জন্যে আশ্চর্যভাবে উন্নত হয়ে গেছে, অথচ পশ্চিমবঙ্গ গত দশ পনেরো বছর ধরে ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে পড়তে আজ হতশ্রী রাজ্য হয়ে উঠেছে। এই শোচনীয় অবস্থার সংশোধন চাই। সমবেত উদ্যম, আদর্শ, কর্মশক্তি ও অধ্যবসায় দিয়ে এই কঠিন কাজটি করতে হবে। ভোটদাতাদের মনে এবার অন্তত এই ইচ্ছা থাক যে, তাঁরা ১৯৭২ সনের নির্বাচনের পর স্থায়ী সরকার দেখতে চান।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা
মোট : ৬২ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-৯১৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
শুল্কসমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টাঃ ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(সাধারণ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৫.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৭৬

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১৪.৭৬

সংযুক্ত রাজ্য বাদে
বার্ষিক — টাঃ ১৫৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৩৮.৭৬

পিকিং-এ নৈশ ভোজ
কিন্তু ভুট্টোকে তাঁরা ভোলেন নি!

রাজদর্শীর সংবাদভাষ্য

হুররর

আপনারা কখনও এইরকম অবস্থায় পড়েছেন কিনা জানিনে। একই সঙ্গে রেডিওতে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোর ভাষণ এবং সি পি এম ও সি পি আই নেতাদের নির্বাচনী বক্তৃতা কখনও শুনেছেন? আহা, কী যে মিস্ করেছেন, আপনারা জানেন না।

সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়ির উত্তরের গায়ের রাস্তায় ছিল সি পি আই-এর মিটিং। দক্ষিণের গায়ের রাস্তায় ছিল সি পি এম-এর মিটিং। ঘরে ঢুকে দেখি বন্ধুটি বারান্দায় রেডিও পাকিস্তান খুলে রেখেছেন। ভুট্টোর ভাষণ ঘরে গমগম করছে। আর বন্ধুটি ক্রমাগত একবার উত্তরের জানলা বন্ধ করে দক্ষিণের জানলা খুলে দিচ্ছেন, আবার দক্ষিণের জানলা বন্ধ করে উত্তরের জানলা খুলে দিচ্ছেন। এই সময়ে রেডিওর আওয়াজ কমিয়ে দিচ্ছেন। আবার রেডিওর আওয়াজ যখন বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তখন দুটো জানলাই বন্ধ করে দিচ্ছেন।

অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হে!

বন্ধু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন, শ্‌-শ্‌। চুপচাপ শুনে যাও। একটা স্টিরিওফোনিক গবেষণা চলছে। বলেই ছুটে গিয়ে দক্ষিণের জানলা খুলে দিলেন।

দক্ষিণের জানলা দিয়ে সি পি এম নেতার আওয়াজ ভেসে এল : কংগ্রেস সরকার মুখে প্রগতিশীলতার ভান করে জনগণকে প্রতারিত করছে, কিন্তু বাস্তবে জমিদার-পুঁজিপতিদের স্বার্থে জনগণের উপর নিত্য নতুন বোঝা ও জনজীবনে সংকট বাড়িয়ে চলেছে। সারা দেশে দমনমূলক আক্রমণ বাড়িয়ে তুলছে এবং পশ্চিমবাংলা সোজাসুজি আধা ফ্যাসিস্ত আক্রমণকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণের জানালা বন্ধ হল। উত্তরের জানালা খুলল। সি পি আই নেতা : ১৯৬৯ সালে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু পুলিশ দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৯ সালের ৬ মে ২৪ পরগণা জেলার এস ইউ সি সমর্থক কৃষকদের উপর আক্রমণ এবং ১৬ মে আলিপুরদুয়ারে আর এস পি সমর্থক গ্রামবাসীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে সি পি এম কর্মীরা শ্রেণী সংগ্রামের ডাক দিলেন। গুলাসপুরে কৃষকদের হত্যা, ঝাড়গ্রামে প্রধান শিক্ষককে হত্যা, সোনারপুরে ৫৪ বছর বয়স্ক মহিলা জ্ঞানদা [illegible] থেকে টেনে এনে কুপিয়ে [illegible] নিষ্ঠুরভাবে হত্যা, নকশাল নেতা প্রদীপ চৌধুরীর স্ত্রী শিল্পী নাগকে খুন, প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা সুধীন ধর চৌধুরীকে খুন, আরামবাগ গ্রামে আর এস পি সমর্থক বাস্তুহারাদের গণহত্যা, শ্রীপল্লী কোন্নগরে এস এস পি সমর্থকদের খুন করে গণকবর দেওয়া, নারকেলডাঙ্গায় ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীদের খুন, কুচবিহারে ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীদের গণহত্যা, বর্ধমানে সাঁইবাড়িতে ছেলেদের হত্যা করে তাদের রক্ত মায়ের দেহে নিক্ষেপ করা, নবগ্রামে নয়জন তরুণকে খুন করে তাদের মৃতদেহে নুন লাগিয়ে মাটির তলায় কবর দেওয়া প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত করে সি পি এম নজই প্রথমে এই রাজ্যকে সন্ত্রাসের পথে টেনে নামিয়েছিল।

রেডিও পাকিস্তানে ভুট্টোর ভাষণ : বন্ধুগণ! আমার প্রিয় দেশবাসীবৃন্দ। আজ আমি জনগণের লোক হিসাবেই কথা বলতে এসেছি। আমি গণতন্ত্র আনব, আমি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করব। আমি মালিকদের বলছি, লক আউট করো না। কারখানা বন্ধ করো না। শ্রমিকরা যেন কষ্ট না পায়। কারণ তারাই আমাদের প্রভু। আমরা কৃষককে উচ্ছেদ করতে দেব না।

সি পি এম : আমরা পশ্চিমবাংলা সর্বকিছু পুঁজি ও বিদেশী পুঁজির লুট বন্ধ করব, একচেটিয়াদের মুনাফা খর্ব করব।

ভুট্টো : যে-সব পুঁজিপতি পাকিস্তানের বাইরে পুঁজি সরিয়ে নিচ্ছেন, তাঁরা যেন অবিলম্বে সেই পুঁজি দেশে ফিরিয়ে আনেন। যদি স্বেচ্ছায় তাঁরা না আনেন, তবে এমন ব্যবস্থা নেব যার জন্য আমাকে দোষ দেওয়া চলবে না।

সি পি এম : ১৩ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং তার জনগণের জন্য যা করেছে, কংগ্রেস তার ২৫ বছর রাজত্বে কেন্দ্রে বা কোনও রাজ্যে করতে পারেনি।

সি পি আই : বর্ধমানে সি পি এম জোটভুক্ত আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি দল কিছুদিন আগে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে "সন্ত্রাসের জনক" বলে যে-সব অভিযোগ করেছিলেন তা এখনও তাঁরা প্রত্যাহার করে নেন নি। আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরী এম-পি বলেছেন (১৪ জুন, ১৯৭০), "সি পি এম-এর বর্বরতা পরিকল্পিত সংঘর্ষের পরিবর্তন সমস্ত ঘটনাকে ছাপিয়ে, সাম্প্রতিক বর্ধমানের ঘটনাকে ছাড়িয়ে যায়। শুধু যে একটি গোটা গ্রামকে ভস্মসাৎ করা হয় তাই নয়, বালক ও বৃদ্ধের সাহায্যে নারী পুরুষ শিশু সকলকেই নির্বিচারে আক্রমণ করা হয়। এ এক ফ্যাসিস্ত ধরনের বর্বরতা।"

ভুট্টো : আমি এমন এক প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করতে চাই যা শুধু পাকিস্তানেরই নয়, আরও অনেক দেশের অগ্রগতির সহায়ক হবে।

সি পি এম : আমরা এমন এক বামপন্থী সরকার গঠন করব যা জনগণের সাহায্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এমন এক প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড করবে, যা সারা ভারতের ৫৫ কোটি মানুষের নিকট আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

ভুট্টো : আমার নীতিকে বানচাল করার জন্য যদি কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হয় তবে আমি সমস্ত শিল্প, সব জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেলব।

সি পি এম : আমরা বন্ধ কারখানা দখল করে চালু করব।

সি পি আই : সি পি এম ফ্রন্টের শরিক এস ইউ সি নেতা সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে, ২৪ মে ১৯৭০) বলেছেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে সি পি এম-এর নীতি প্রধান বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

সি পি এম : বিনামূল্যে ভূমিহীন চাষী ও গরীব কৃষককে জমি দেব, বেকারী দূর করার জন্য শত শত কারখানা—

ভুট্টো : আমি এমনভাবেই দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব যাতে রাস্তার লোকও এসে আমাকে বলতে পারে, "তুমি ক্ষমতা ছেড়ে যাও।" আমি তোমাদের কোনও কথা বিশ্বাস করিনে।"—(রাষ্ট্রপতি হিসাবে ভুট্টোর প্রথম ভাষণ, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।

প্রচার শেষ

পশ্চিম বাংলায় আর একটা ভোটপর্ব হয়ে গেল। এই নির্বাচনেও যদি এ রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিরতা না আসে তাহলে আমাদের কপালে আরও অনেক দুর্ভোগ আছে।

এবারও স্থিরতা এল কিনা তা জানার জন্য অবশ্য আমাদের আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। কংগ্রেস-সি পি আই জোট এবং সি পি এমের নেতৃত্বে গঠিত বামপন্থী ফ্রন্ট দু'পক্ষই আশা করছেন তাঁরাই জিতবেন এবং সরকার গঠন করতে পারবেন—যদিও কেউই মনে করছেন না একটা খুব ভাল মেজরিটি পাবেন। এখন দেখার ভোট বাকস কী বলে—আসল এবং জাল ভোট মিলিয়ে কী ফল প্রকাশিত হয়।

চেষ্টার অবশ্য কেউই কোনও ত্রুটি রাখেন নি। দু'পক্ষই সম্ভব অসম্ভব সব কিছু করেছেন। নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলগুলি কোনও কিছুকেই অন্যায় মনে করেন না এবার পশ্চিমবঙ্গে আবার তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল।

কিন্তু আসল কথাটা হল এত করেও হবে কিনা। অর্থাৎ, এত করেও কেউই পাঁচ বছর সরকার চালানোর মত পরিস্থিতি পাবেন কিনা। সামান্য মেজরিটি নিয়ে কোনও পক্ষই যে একটা ভাল সরকার গড়তে পারবেন না সেটা রাজ্যের সকল রাজনৈতিক নেতার কাছেই পরিষ্কার।
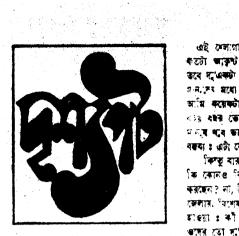
শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এবার কী দাঁড়াল তা জানার জন্য আমাদের আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতেই হবে। অনুমানের ভিত্তিতে জল্পনা-কল্পনায় গিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে আসুন আমরা এবারের নির্বাচনী প্রচারের কয়েকটা দিক নিয়ে আলোচনা করি।

❀

নির্বাচনী প্রচারের ব্যাপারে এবার কংগ্রেস জোট যে জিনিসটার উপর সর্বত্র সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন তা হল স্থায়ী সরকার গঠন। তাঁদের একটা প্রধান শ্লোগান ছিল : স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসকে ভোট দিন।

এই শ্লোগানে শহুরে মানুষকে কংগ্রেস কতটা আকৃষ্ট করতে পেরেছেন জানি না, তবে দু'একটা জেলায় দেখেছি গ্রামের গরীব মানুষের মধ্যে এতে কিছুটা কাজ হয়েছে। আমি কয়েকটা জেলায় ঘুরেছি। দেখেছি বছর বছর ভোট হওয়ার ব্যাপারটা সাধারণ মানুষ খুব ভাল চোখে দেখছেন না। তাঁদের বক্তব্য : এটা যে একটা পরব হয়ে দাঁড়াল!

কিন্তু বার বার ভোট হওয়ার জন্য তাঁরা কি কোনও বিশেষ পার্টিকে দোষী মনে করছেন? না, ঠিক তাও নয়। তবে কতগুলি জেলায়, বিশেষ করে বাঁকুড়ায় দেখেছি একটা হাওয়া : কী হবে আর ভোটটা নষ্ট করে, ওদের তো দু' দুবার দিনু, দাঁড়াতে পারল না, এবার কংগ্রেসকেই দিব—দেখি, দাঁড়াতে পারে কিনা। কংগ্রেস-বিরোধীদের ভোট দেওয়া মানে ভোট নষ্ট করা। অর্থাৎ সরকার না হতে পারা—এই ধারণাটা বাঁকুড়া জেলার অনেক গরীব খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যেও এসেছে।

কিন্তু এই জিনিসটা বীরভূম বা মুর্শিদাবাদে দেখিনি। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা অঞ্চলে বরং দেখেছি বহু দরিদ্র কৃষকের বদ্ধমূল ধারণা : এবার যুক্তফ্রন্টই নির্বাচনে জিতবে।

যে কটা জেলায় গিয়েছি তার প্রায় সব কটাতেই দেখেছি, মোটামুটি একটা পরিষ্কার রাজনৈতিক ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে—একেবারে গরীব লোক বামপন্থীদের পক্ষে, তাছাড়া আর প্রায় সবাই তাদের বিরোধী; আর, কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী দলগুলি প্রায় সবাই গ্রামাঞ্চলে গরীব মানুষের কাছে সি পি এম বলে পরিচিত। পাঁচ বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গের খুব কম জেলার গরীব মানুষ নামে সি পি এমকে চিনত। এই গ্রামের গরীবদের কাছে বামপন্থীদের সরাসরি প্রচার : আমরা জিতলে তোদের ভাল হবে; জমি পাবি, মজুরি বাড়বে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এখানে বোধহয় একটা জিনিস বলে রাখা ভাল। গ্রামে প্রধানত দিনমজুর বা মুনিষ বা দিন খেটে খাওয়া মানুষ গরীব বলে পরিচিত। ছোট্ট একটা চায়ের দোকানের মালিক বা সাইকেল সারাবার দোকানদারও গ্রামে গরীব বলে পরিচিত নয়। যে ভাগে দশ-পনেরো বিঘা জমি চাষ করে সেও ঠিক গরীব বলে পরিচিত নয়। যার কোনও ভাগ চাষও নেই—যে স্রেফ দিনমজুরী খাটে বা কারো বাড়িতে বাৎসরিক চুক্তিতে কাজ করে সেই গরীব। বহু গ্রামে এখনও দেখি সেই অদ্ভুত প্রথাটা চলে আসছে—গরীব লোককে অর্থাৎ কোল, ভিল, সাঁওতাল বা দুলে বাগদীদের "ছোটলোক" বলা হয়।

এমন কি ওরা নিজেরাও নিজেদের তাই বলে।

সব জেলায় যে "গরীব-বড়লোকের" রাজনৈতিক ভাগাভাগি সমানভাবে স্পষ্ট তা নয়। বর্ধমানে এ জিনিসটা যতটা স্পষ্ট নদীয়ায় তা নয়। বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে কালনা অঞ্চলে দেখলাম গ্রামে যাঁরা "মধ্যবিত্ত" বলে পরিচিত তাঁরাও অনেকেই সি পি এমের বিরুদ্ধে। এ জিনিসটা কিন্তু হুগলীর গ্রামাঞ্চলেও একটা স্পষ্ট নয়।

গ্রামের গরীব লোকদের কাছে প্রধান ইস্যু, জমি পাওয়া, মজুরি বৃদ্ধি এবং কাজ পাওয়া। তাদের কাছে আইন ও শৃঙ্খলা তেমন কোনও ইস্যুই নয়। সি পি এম যে আইন ও শৃঙ্খলার ইস্যুটা তুলেছে সেটা মূলত শহুরে মানুষের জন্য।

*

মফস্বল বাংলায়, বিশেষ করে গঙ্গার পশ্চিম পারে এবার বাংলাদেশের ইস্যুটা বেশ জোর ভাবেই উঠেছে। সি পি এম নেতারা বলবেন তাঁরা নির্দেশ দিয়ে কাজটা করেন নি। কিন্তু মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ায় গেলেই যে কোনও লোক দেখতে পাবেন বামপন্থী ফ্রন্টের কর্মীরা কতকগুলি এলাকায় মুসলমানদের মধ্যে কী প্রচার চালাচ্ছেন। তাঁরা সরাসরিভাবে বলছেন, যে কংগ্রেস পাকিস্তানকে ধ্বংস করেছে মুসলমানরা তাদের ভোট দেবে কেন? এদেরই আবার হিন্দু এলাকায় বলতে শুনেছি: বাংলাদেশ সমাধানের কৃতিত্ব ইন্দিরা গান্ধী বা নব কংগ্রেসের নয়। সে কৃতিত্ব ভারতের জনসাধারণের এবং জওয়ানদের। জওয়ানরা কি নব কংগ্রেসের ক্যাডার?

জওয়ানরা নিশ্চয়ই নব কংগ্রেসের ক্যাডার নয়। এবং জনসাধারণও নিশ্চয়ই বাংলাদেশের লড়াইয়ে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের লড়াইয়ে যদি ভারত হারত বা যদি বাংলাদেশ সমস্যার কোনও সমাধান ভারত সরকার না করতে পারতেন তাহলে সি পি এম সমর্থকরা তার জন্য কাকে দোষী করতেন—জওয়ানদের? জনসাধারণকে? না, ইন্দিরা গান্ধী এবং কংগ্রেস সরকারকে?

জিতলে তার কৃতিত্ব তোমার প্রাপ্য নয়, হারলে কিন্তু তার জন্য তুমিই দায়ী।

সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বরাবরই রাজনৈতিক দলগুলি কিছুটা কিছুটা নেন। তবে, দিন দিনই জিনিসটা বাড়ছে। ১৯৬৭ সন থেকেই ভীষণভাবে বাড়ছে। এবং বাড়তে বাড়তে এবার সেটা বাংলাদেশ ইস্যুতে জঘন্যতম আকার নিয়েছে। মুসলীম লীগ এবারের নির্বাচনী সভাসমিতিতে প্রকাশ্যে বলছে, কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করেছে, সুতরাং কংগ্রেসকে এবার কোনও ভোট নয়। বামপন্থীরা ঠিক জনসভায় একথা বলছেন না—তবে এই ব্যাপারে মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ার কতকগুলি মুসলমানপ্রধান এলাকায় তাঁরা প্রচার চালাচ্ছেন। বর্ধমান বা হুগলী বা বীরভূমে অবশ্য এ প্রচারটা তেমন জমে নি—যদিও ওই সব জেলায়ও যথেষ্ট মুসলমান রয়েছেন। তবে, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ায় এই প্রচার বেশ দানা বেঁধেছে। আমি উত্তরবঙ্গে যাই নি—সুতরাং ওখানের অবস্থা বলতে পারব না। বৃহত্তর কলকাতায়ও এই প্রচার প্রচণ্ডভাবে চলেছে—বিশেষ করে অবাঙালী মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিতে।

*

এবারের নির্বাচনে আর একটা বড় ইস্যু ইন্দিরা গান্ধী। কংগ্রেস চেয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তার সুযোগ নিতে। এটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়।

শহরাঞ্চলে এই ব্যাপারে তাঁরা কতটা সফল হয়েছেন বলতে পারি না, তবে গ্রামাঞ্চলে যে তাঁরা খুব সফল হন নি সেটা পরিষ্কার। সি পি এম নেতারা যাই বলুন গ্রামের সাধারণ মানুষের, এমন কি বহু গরীব মানুষেরও দেখেছি ধারণা যে ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের ভাল করতে চান—ইন্দিরা গান্ধী গরীবের পক্ষে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী মানেই কংগ্রেস—এটা তাঁরা সবাই ধরতে রাজি নন। বরং, অনেকেই দেখেছি মনে করেন, ইন্দিরা গান্ধী মানে কংগ্রেস নয়—ইন্দিরা গান্ধী গরীবের ভাল করার কথা বললেও কংগ্রেসীরা তা হতে দিচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে কংগ্রেস গরীবের পার্টি বলে পরিচিত নয়।

প্রশ্নটা যদি এখনও এইভাবে আসে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের কাছে—তুমি ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে না ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে, তাহলে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষেই বেশি ভোট পড়বে বলে আমার ধারণা।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে গ্রামের গরীব মানুষের কাছে প্রশ্নটা সেভাবে আসে নি। এবার তাদের কাছে প্রশ্ন, কংগ্রেস না সি পি এম। যেখানে কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট সব নিম্ন-মধ্যবিত্তকে পাবে সেখানে সে জিতবে, যেখানে সি পি এম গরীবের সঙ্গে নিম্নবিত্ত-দেরও পাবে সেখানে সেই জিতবে। যদি না এবারও জাল ভোট ব্যাপকভাবে পড়ে।

৪-৩-৭২

নবারুণ গুপ্ত

থেকেও নেই

দেবরাজ

তিন মাসও হয়নি পাকিস্তানে পালা বদল হয়েছে। জঙ্গীশাহীর উচ্ছেদ ঘটেছে, অসামরিক শাসন চালু হয়েছে। ইয়াহিয়া খাঁ গেছেন, জুলফিকার আলি ভুট্টো এসেছেন। ধরতে গেলে এ সব কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। এক রাষ্ট্রপতি যাচ্ছেন আর এক রাষ্ট্রপতি আসছেন এ তো হামেশা দেশে দেশে হচ্ছে। তবে সে সব আসা যাওয়া হয় নিয়মতান্ত্রিক প্রথায়, নির্বাচনের মারফত। এমনই হয় ফ্রান্সে, আমেরিকায়, এদেশে। কোথাও কোথাও আবার ক্ষমতা জবর দখল করেন কেউ, কেউ নির্বাচন কিংবা গণতন্ত্রের তোয়াক্কা না করে। পাকিস্তানে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন একরকম হ-য-ব-র-ল। ভুট্টো রাষ্ট্রপতি বনেছেন নির্বাচনে জিতেও নয়, একটা বিপ্লব ঘটিয়েও নয়। তাঁকে রাষ্ট্রপতি বানানো হয়েছে একরকম জোর করে। এ প্রায় সেই রূপকথার ঘটনার মতো—নতুন রাজা খুঁজতে বেরিয়ে শাদা হাতী হঠাৎ একজনকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে পিঠের ওপর তুলে সোজা বসিয়ে দিয়েছে সিংহাসনে। পথ থেকে না হলেও ওয়াশিংটন থেকে ভুট্টোকে ডেকে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানী মসনদে।

কিন্তু কান্ডটা করলো কে? পাকিস্তানী জনগণের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের রায় তো ছিল অন্য। সে রায় মানতে গেলে পাকিস্তানের গদীতে বসাতে হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর দল সত্তরের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী আসন পেয়েছিল ও-দেশের জাতীয় পরিষদে। ২০ ডিসেম্বর যখন ভুট্টো রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন, তখন তো সে সম্মান যাঁর ন্যায্য প্রাপ্য তিনি জেলে পচছেন। ভুট্টোর অভিষেক নেহাতই গা-জোয়ারী ব্যাপার। কিন্তু কাদের? তখনও পর্যন্ত পাকিস্তানে কায়েম ছিল ফৌজী প্রধানদের রাজত্ব, তাঁরাই ছিলেন সর্বেসর্বা। যা কিছু তখন হয়েছে তার মাস্টার গুরু ছিলেন তাঁরাই—ফিল্ড মার্শাল ইয়াহিয়া খাঁ আর তাঁর চেলাচামুণ্ডারা। যুদ্ধে গোহারান হেরেই যে ইয়াহিয়া খাঁ আমিরী ছেড়ে ভুট্টোর হাতে সর্বস্ব তুলে দিয়ে ফকির বনতে চেয়েছিলেন অনুতাপের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে এমন উদ্ভট কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। যুদ্ধে হেরেও ইয়াহিয়া খাঁ আর তাঁর দলবলের চৈতন্য হয়নি।
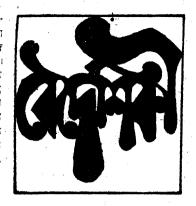
পথে আসতে হয়েছে তাঁদের গুঁতোর চোটে। যে গুঁতো এসেছিল ফৌজী সর্দারদের কাছ থেকেই। বাইরের লোকে টের না পেলেও চোদ্দ দিনের লড়াই শেষ হবার পর ফৌজী বিদ্রোহ একটা হয়েছিল পাকিস্তানে। স্থল জল আকাশ—তিন বাহিনীর সর্দাররা কেউ চাননি আরও ধাষ্টামি করতে। তাঁরা চেয়েছিলেন কেবল রণে ভঙ্গ দিতে নয়, প্রশাসনেও ইস্তফা দিতে। তাঁদের পান্ডা ছিলেন বিমানবাহিনীর কর্তা এয়ার মার্শাল আবদুর রহিম খাঁ। ইয়াহিয়া খাঁ আর তাঁর দোস্তরা উপায় না পেয়ে তাঁদের মতেই মত দিয়েছিলেন ভুট্টোকে ডেকে এনে তাঁর ওপর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সঁপে দিতে। যে পাকিস্তানে একটানা তেরো বছর ফৌজী শাসন চলেছে সে পাকিস্তান তখন আর নেই। তার বড় অংশটাই আলাদা হয়ে গিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্রী বাংলাদেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ডামাডোলের বাজারে যেমন জলে-ডোবা মানুষ কুটো ধরে বাঁচতে চায়, তেমনই ভুট্টোকে আঁকড়ে ধরেছিলেন মান খুইয়ে জাঁদরেল জেনারেল, এয়ার মার্শাল আর অ্যাডমিরালের দল।

কিন্তু কাটি অসামরিক নেতা ভুট্টোর হাতে তুলে দিলেও চাবিকাঠিটা নিজেদের জিম্মায় রেখেছিলেন ফৌজী পান্ডারা। সেই জন্যেই বুঝি নতুন রাষ্ট্রপতি হলেন সামরিক আইন প্রশাসকও। ভুট্টো ক্ষমতা পেয়েই বরখাস্ত করতে লাগলেন গণ্ডায় গণ্ডায় সামরিক বাহিনীর প্রধানদের। পয়লা চোটেই গর্দান গেল ইয়াহিয়া খাঁ সমেত সাতজন জেনারেলের। বরখাস্ত হলেন নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ ভাইস আডমিরাল মুজাফ্ফার হোসেন। তাঁর জায়গায় এলেন কমোডর হাসান হাফিজ আহমেদ। আবদুল হামিদ খাঁর জায়গায় স্থল-বাহিনীর অধ্যক্ষ হলেন লেফটেনান্ট জেনারেল গুল হাসান। বিমানবাহিনীর দায়িত্ব রইলো এয়ার মার্শাল রহিম খাঁর হাতেই। চার প্রদেশের চারজন গভর্ণর ছিলেন মিলিটারির লোক। তাঁদের সরিয়ে ভুট্টো সেখানে বসালেন তাঁর পিপলস্ পার্টির চার ধুরন্ধর নেতাকে। এ ছাড়া প্রশাসনিক রদবদল তিনি বিস্তর করলেন নিজের খেয়ালখুশী মাফিক। বাইরে থেকে মনে হলো জঙ্গী জমানার শেষ হয়ে নতুন জমানার পত্তন হয়েছে পাকিস্তানে।

দেখা যাচ্ছে সে ধারণাই ভুল। লোকের চোখে ধুলো দিয়ে ঘাপটি মেরে ছিলেন মাস দুই-আড়াই ফৌজী নেতারা। আবার তাঁরা মাথা চাড়া দিয়েছেন পাকিস্তানে। হঠাৎ দেখা গেল তেসরা মার্চ ভুট্টোর পেয়ারের সেনাপতি গুল হাসান আর বিমানবহরের প্রধান রহিম খাঁ ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের জায়গায় এসেছেন টিক্কা খান আর জাফর চৌধুরী। গুল হাসান আর রহিম খাঁ ইচ্ছে করে অমন চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এমন কথা অতি সাদাসিধে লোকও বিশ্বাস করছে না পাকিস্তানে। তাঁরা যাননি—তাঁদের যেতে হয়েছে—ভুট্টো তাঁদের ওপর চটেছেন বলে নয়, তাঁদের সহকর্মীরাই আর তাঁদের চাইছেন না বলে। ভুট্টোকে এতদিন বাজিয়ে দেখছিলেন ফৌজী পান্ডারা, বুঝতে চাইছিলেন তাঁর দৌড় কত দূর। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন নতুন রাষ্ট্রপতির বকনিই সার, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা তখন তাঁরা আবার নিজ মূর্তি ধরলেন। ভুট্টোর তো নিজের জোর কিছু নেই, ফৌজ, বিমানবহর নৌবহর বিগড়ে গেলে তাঁর পক্ষে টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। যখন তিনি দেখলেন ফৌজী পান্ডারা বেঁকে বসেছেন, তখন তিনি নিজের ভাগ্য তাঁদের হাতেই সঁপে দিলেন।

যত দূর মনে হচ্ছে ভুট্টো আর থেকেও নেই। তাঁর অনুগত প্রধানরা সরে যাওয়াতে কী স্থল, কী জল, কী বিমানবাহিনী কোনওটাই আজ তাঁর বশে নয়। তিনি হয়ে উঠেছেন নতুন ফৌজীচক্রের হাতের পুতুল—তারা তাঁকে যেমন নাচাবেন তিনি তেমনই নাচবেন। তবুও বাইরের ভড়ং তো বজায় থাকবে সেই আশাতেই তিনি পুতুল রাষ্ট্রপতি হতে রাজী হয়েছেন। তাঁর প্রয়োজন ফৌজী নেতাদের কাছে এখনও ফুরিয়ে যায়নি বলে তাঁকে সামনে খাড়া করে তাঁরা বাইরের ঠাট আজও বজায় রেখেছেন। বিদ্রোহী ফৌজী পান্ডাদের কান্ডজ্ঞান একেবারে লোপ পায়নি। তাঁরা বিলক্ষণ বোঝেন পিকিং আর ওয়াশিংটনে ভুট্টোর কিছু খাতির এখনও আছে। চু এন-লাই আর নিক্সন বেঁকে বসলে পাকিস্তানের দুর্গতি বাড়বে বই কমবে না। তাই ভুট্টোকে নামে রাষ্ট্রপতি রেখে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন যুদ্ধবাজ ফৌজীচক্র। সে চক্রের নেতা জল্লাদ টিক্কা খান। তাঁদের পক্ষে চীন আর আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলা খুব শক্ত হবে না। তখনই ঘনিয়ে আসবে ভুট্টোর আসল বিপদ, সঙ্গে সঙ্গে এ উপমহাদেশেরও।

কয়েকটি অসংলগ্ন ভাবনা

রঞ্জন

আমার লোরেটোগামিনী ষোড়শী কন্যার পাত্র সন্ধানে বিজ্ঞাপন দিতে হলে আমি আনন্দবাজার পত্রিকার সংশ্লিষ্ট বিভাগে উপস্থিত হব। আমার দ্বাদশ বর্ষীয় পত্র এখনো মনঃস্থির করতে পারেনি সে কি ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করবে, না বাঙলাদেশে। বিবাহ তার চিন্তাবহির্ভূত, যেমন পরবর্তী পরীক্ষা ইস্কুলে। অতএব আলোচ্য বিষয় তাই আদৌ ব্যক্তিগত নয়। তবু সম্প্রতি এক বন্ধু-দুহিতার বিবাহানুষ্ঠানে গিয়েছিলাম এবং সেখানে এত লোক ছিল যে কিঞ্চিৎ বাঞ্ছিত একাকিত্ব অসম্ভব ছিল না। বৃহৎ জনসমাগমে আমি একা হতে পারি। অসহায় লাগে তিন-চারজনের প্রগল্‌ভতার বন্যায়। অতএব সেদিন বিবাহবাসরে কী মনে হলো আমার!

প্রথম, আমি নিজেকে একেবারেই অসামাজিক করে তুলেছি। দ্বিতীয়, সে দোষ সম্পূর্ণ আমার। তৃতীয়, আজো কার আমি একেবারে পরিবর্তনবিমুখ নই কিন্তু একমাত্র পরিবর্তন বলেই কোনো কিছু আমার কাছে স্বতঃগ্রাহ্য নয়। এই তালিকা আরো অনেক দীর্ঘ করা যেত, কিন্তু আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে আমার স্বেচ্ছানির্বাসন অন্তত অংশত সাম্প্রতিক বাঙালী ইতিহাসের উপজাত দ্রব্য। আমি একা অপরাধী নই। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম হয়তো এইজন্যই যে আমার সমাজ থেকে আমার আর বিশেষ কিছু নেবার ছিল না, আর আমার ছিল না বিশেষ কিছু দেবার সেই সমাজকে। ব্যালান্স শীট পুরো হলো না নিশ্চয়ই। আমার ঋণ এখনো প্রচুর। কিন্তু বিচ্ছেদের বীজ ছিল অন্তর্জাত। রবীন্দ্রনাথ নেহরু ইত্যাদি ভদ্রবৃন্দ অনায়াসে কাছে থেকে দূর রচতে পারতেন, ইচ্ছা হলে দূরে থেকে কাছে। সে সমৃদ্ধি তাঁদের ছিল। আমি যে হায় কাছেও থাকতে পারিনে, দূরেও যেতে পারিনে। হয়তো চাইওনে। কিন্তু বিবাহবাসরের সানাইয়ের সুর সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে আমি উপস্থিত এক বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে। এখানে আমার আচরণ হতে হবে বিধিসম্মত। এই সচেতনতা অপ্রীতিকর ও অস্বাভাবিক কিন্তু আতিথেয়তার আন্তরিক প্রাচুর্যে আমার অকিঞ্চিৎকরতা অদৃশ্য ছিল বলেই আশা করি।

*

সুহৃদবরের নিমন্ত্রণ অবশ্যই সানন্দে গ্রহণ করেছিলাম ব্যক্তিগত সম্প্রীতির জন্য। কিন্তু প্রথম মনে ধরেছিল নিমন্ত্রণপত্রটি। প্রাক-রাবীন্দ্রিক লিখনলিপি আজকাল প্রায় বিস্মৃত। আমরা এখন কে লিখিনে অন্তত কিছুটা রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের অনুকরণে? নিমন্ত্রণপত্রে দেখা গেল একেবারে সাবেকী লিখনপদ্ধতি। যেন শ্রীরামপুর বা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে নির্গত কোনো দলিল। যেন কোনো বৃক্ষবল্কে লেখা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের শ্লোক। এই পুরাতন লিপি সাম্প্রতিক কালেও ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু কিছু বিজ্ঞাপনে বা বিশ্ববিখ্যাত প্রাগসর বাঙলা চলচ্চিত্রের পাণ্ডুলিপিতে। পুরাতনীর প্রতি এই শ্রদ্ধা আমি "গিমিক" বলে অগ্রাহ্য করতে নারাজ।

*

এবার অপর প্রশ্ন দুই চারিটি। আমার মন তখন উধাও গত সপ্তাহের বিবাহবাসর থেকে। সব অতিথি সমান, এমন নিয়ম বোধ হয় পৃথিবীতে কোথাও কখনো বিজ্ঞাপিত বা পালিত হয়নি। তবু কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছিলাম যখন এক বিবাহবাসরে শুনলাম যে কন্যাদায়মুক্ত পিতা অপেক্ষা করছেন কতিপয় ভি আই পি বা অতি প্রতাপান্বিত ব্যক্তির অভ্যর্থনার জন্য। প্রধানের এই প্রতীক্ষায়, সন্দেহ করি, লুক্কায়িত আছে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মবিশ্বাসের প্রসরমান মরুভূ। বাসর কেন আসর দেবে মন্ত্রীকে বা সান্ত্রীকে? শাসকদের স্বাগত না হবার কিছুমাত্র কারণ নেই। সাধারণত ওঁরাও মানুষ। কিন্তু আতিথ্যের আইনে আমার সামান্য প্রতিবেশী অনিমন্ত্রিত হলে আলাদা কথা, কিন্তু আমন্ত্রিত হলে তাঁর মর্যাদা সমান। সাম্য সে কথামাত্র রাষ্ট্রবিবর্তনে, রুশে কিংবা চীনে: উদ্‌ভ্রান্ত বাঙালী চিত্তে আতিথ্যের অর্থ তবু ছিল। এই সেদিনও। আতিথ্য আজ সমাধিস্থ অর্থাভাবের বিশাল কবরে: কেওড়াতলায় আছে কালোবাজারির নিঃস্বার্থ ভস্মাবশেষ। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

শুভবিবাহের সানাইয়ের সুরে এ কী চিন্তা? আমার একান্ত আন্তরিক কামনা এই যে সদ্যোবিবাহিত যুবক ও যুবতী এমন জগতে বাস করবে যা আমরা জানিনি। আমরা বন্ধ্যা চন্দ্রে পৌঁছেছি; অন্যত্র কোথাও পৌঁছেছি কিনা সন্দেহ। তোমাদের জগৎ অংশত আমাদেরই সৃষ্টি। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

*

এবার অন্য ও লঘুতর প্রসঙ্গ। নিমন্ত্রণের সাদর গ্রহণের পরমুহূর্তেই আবিষ্কৃত হলো যে কোন ভদ্র বাঙালী হিন্দু বিবাহবাসরে যাবার মতো পোশাক আমার নেই। আছে ধুতি। আছে বাহারী বেনারসী চাদর। কিন্তু নেই কোনো অচ্ছিন্ন পাঞ্জাবি। অতএব আমার স্ত্রীকে বাহির হতে হলো আমার বেশদৈন্যের পরিশোধনের প্রচেষ্টায়। একাদশ মুহূর্তে আবির্ভূত হলো এক অতিদীর্ঘ খদ্দরের পাঞ্জাবি। নেই মামার চেয়ে কানা মামা নিশ্চয়ই ভালো। বিবাহবাসরেও কেউ সহিংস মন্তব্য করেননি আমার অতি অহিংস বেশ সম্বন্ধে। আমিও কিছু বলব না সেই অগণিত অতিথিদের সম্বন্ধে যাঁরা একটি হিন্দু বিবাহে গিয়েছিলেন কোট-প্যান্ট বা বুশ শার্ট আর ট্রাউজারস পরে। আজকের নীতি বোধ হয় আপ রুচি পরনা। পোশাকী পুলিস আমি সামান্যই মানি। জাতীয় পোশাক বা ন্যাশনাল ড্রেস—সে তো না ঘরকা, না পরকা।

আহার? আমি ভোজনরসিক নই। কিন্তু বিবাহভোজনে পলান্ন বা পোলাও আমার ঘ্রাণে বা জিহ্বায় সহজগ্রাহ্য হয়ও "মটন বিরিয়ানির" বারংবার ঘোষণা আমার অনভ্যস্ত কর্ণে সুধাবর্ষণ করেনি। মুঘলাই খানার সঙ্গে বাঙালী বিবাহের সহজ সরল তরকারি আমি সহজেই ত্যাগ করতে পারি। মটন বিরিয়ানি যেন এমন বাবুয়ানি যাতে নেই ঢাকার বিনীত সুবাস বা দিল্লি বা পিণ্ডির উদ্ধত ঔৎকট্য। বাঙালী হিন্দু বিবাহে এ বস্তুর পরিবেশন হতে পারে নব কোনো সিন্থেসিস বা সমন্বয়ে যার সূত্র আমার অজানা। সত্যজিৎ আর সিদ্ধার্থ রায়ের মধ্যে আমার স্থান কোথায়? ভারতে কিছু মাছ আর সব্জি এলেই বাঁচি। আর চাই বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিস্রুত চিন্তা। বিবাহবাসরে এমন চিন্তাও অপ্রাসঙ্গিক।

আমার সহনীয় অস্বস্তির প্রধান কারণ বোধ হয় ছিল স্বীয় পরিধান। আমার পাঞ্জাবি ছিল খদ্দরের। আমিও একদা তকলি কেটেছি। চরকা ঘুরিয়েছি। নাইলনকে এখনো ঠিক মেনে নিতে পারিনি যদিও খাদির সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ। পুরো এই প্রজন্মের দীর্ঘ ইতিহাসচিন্তা সম্ভব ছিল না সানাইনন্দিত এক বিবাহবাসরের অসীম ও আন্তরিক আপ্যায়নে। আমার বেনারসী চাদর আর খদ্দরের পাঞ্জাবির মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক ছিল। আশা করি আমি ছাড়া আর বিশেষ কেউ তা লক্ষ করেননি। যদি আর কোনো বিয়েতে যাই তখন অন্য বেশ ও অন্য চিন্তা অবশ্যম্ভাবী হবে। ধনবান বন্ধুর আমার সর্বাধুনিক আতিথ্যপরায়ণ বন্ধুর জন্য। তাঁর সানাই বা অন্যান্য জৌলুস আমার বিবাহ ও বাঙালী সমাজ সম্পর্কিত কয়েকটি টুকরো চিন্তায় বাধা দেয়নি। যে-কোনো বিয়েবাড়ি থেকে একটি বা তারও বেশী উপন্যাসের জন্ম সম্ভব। একটি প্রবন্ধের অবিন্যস্ত সামগ্রীও বড় সামান্য পুরস্কার।

মেঘলা দিনের গাছ

রত্নেশ্বর হাজরা

কাউকে কাউকে চিনতে পারি অনেককেই চেনা যায় না-
অনেককেই ভুল করে স্বপ্নের ভিতরে আসতে বলি
আসে আর সেই সব মুখগুলো দু হাতে মুখের কাছে তুলে
আনলেই
ম্লান হয়ে যায় ম্লান...ম্লানতর...সেই সব মুখ......

সেই সব মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব লেগে থাকে সেই সব
দুঃখের কতটা দুঃখ বিষাদের কতটা বিষাদ
আমিও জানি না—
জেগে হয়তো চেনা যায় (ঘুমের মধ্যেও হয়তো) কিন্তু সুষুপ্তির
খুব কাছাকাছি গেলে সব কিছু মুছে যেতে থাকে
অথবা সামান্য থাকে (সামান্যই) বড় জোর ছায়া—
মেঘলা দিনের গাছ যতটা ছায়ার মধ্যে
তার চেয়ে ঢের বেশী গাছের ভিতর
এখন আর কি একটু-আধটু (কাউকে কাউকে)
পুরোপুরি কিছুই চিনি না—
যেমন অচেনা রইল শরীরের কাছে এসে যে-সব উষ্ণতা আজও
রক্তে মাংসে উষ্ণ হয় তপ্ত হয় জ্বলে জ্বলে ওঠে।
একটু-আধটু বুঝতে পারি (হয়তো পারি)
চিনতে প্রায় কিছুই পারি না।

বাংলা দেশে হঠাৎ আমি

কামাল হোসেন

বাংলা দেশে হঠাৎ আমি অপরিচিতর মতো
থমকে দাঁড়ালাম,
যদিও,
একদা আমি জন্মেছিলাম বাংলা দেশে :
কাদামাখা বালিহাঁসের পেছনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে
বিনা পক্ষীরাজে পাড়ি জমাতাম
স্বপ্নময় সবুজ ঘাসের জঙ্গলে......
নতুন বাংলা দেশে হঠাৎ অপরিচিতর মতো
থমকে দাঁড়ালাম,
কারণ,
বালিহাঁসের পেছনে ছুটতে ছুটতে
সোনালী ধানের সমুদ্রে হারিয়ে যেতে
এখন আমার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই,
কিন্তু,
বালিহাঁস রক্তাক্ত
আমার সামনে ছটফট করছে,
আমি শক্তিহীন;
সিদ্ধার্থের মতো তাকে বুকে তুলে নিয়ে
অসীম সাহসে বলতে পারছি না—
'ধানের সমুদ্র লাল হলেও দেবদত্তর ক্ষমা নেই।'

আম্মা

গিরিধারী কুণ্ডু

আম্মা
আজ আর দাওয়াতে থেকে বলো না
তোমার ঘর নেই, হেঁশেল নেই
বসতে কোথায় দেবে?
দানাপানি যা ছিল সব তো ফুরিয়েছে!

আম্মা
আজও হয়নি গোসল ছোটবেলাকার ওই নদীতে—
যার পাশাপাশি তোমার নরম মুখখানা
ভোরের মতন সুন্দর দেখাত!
এখন শরীর শুধু ভেজে চোখের পানিতে!

হায় খোদা!
এত কাছ থেকে
এভাবে কখনও চাইনি আমার আম্মাকে দেখতে
টিয়া রঙা শাড়িখানা হারিয়ে সে এখন
লজ্জা লুকতে ঝোপের ভেতর রয়েছে!

আমার কলুষ ধুইয়ে দাও

কালীকৃষ্ণ গুহ

মা এসেছেন, এই তো পবিত্র হ'লো মাটি। এবার
আমার কলুষ ধুইয়ে দাও।

পথের মধ্যে বৃক্ষ, চিরদিন দীর্ঘছায়া পড়ে, হেমন্তকাল
আসে।
আমি হেমন্তকালের ভিতরে এইখানে এসে দাঁড়াই।

এইখানে বুদ্ধ বৈরাগী হত হয়েছেন, নির্জন, এইখানে
দীর্ঘ মিছিলের পেছন থেকে সূর্য উঠেছে রোজ, অন্ধকারে
কেঁদে উঠেছে নবজাতক—

এই পথ পার হয়ে মা এসেছেন, করতল
ভীষণ হলুদ হয়েছে তাঁর

হে ঈশ্বর, এবার আমার কলুষ ধুইয়ে দাও।

শব

শিশির লাহিড়ী

অদিতি চলে গেল।

কাজে বসেছিল বিভাস, কাজ আর হল না। দুটো ছোট গল্প, কয়েকটা ফ্যাশন-প্যারেডের ফটো, নববর্ষ সংখ্যা ঢাউস একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বিছানায় পড়ে রইল। সেগুলো উল্টেপাল্টে যে তাক-মাফিক ছবি, কি হেড-পিসের জন্যে প্যারেডের নকল রেখাচিত্র আঁকবে —এমন আর মনে হল না।

ইজেলটা এক পাশে দাঁড় করানো, টেবিলে রঙতুলি, ছবি আঁকার কাগজ-টাগজ, বিছানায় বিস্রস্ত পাণ্ডুলিপি;—বিভাস মাথার বালিশটা টেনে বুকের নিচে চেপে শুয়ে পড়ল। সামান্য একটু যন্ত্রণা,—সে যন্ত্রণাটা ঠিক কোথায় বুঝতে পারছে না বিভাস,—বুকের মাঝখানে, মাথায়, না চিন্তা-স্মৃতিতে। বাঁ হাতের আঙুলে ডান হাতের মণিবন্ধে নাড়িটা অনুভব করতে চাইল বিভাস,—না, ঠিক চলছে, সেই ডুবডাব...ডুবডাব..., বাড়তো নেই, স্তিমিত ম্রিয়মান ভাবও নেই। মোটে নরমাল। বিভাস মনে মনে ভাবল—এই সাতাশ বছরের পরিচিত প্রাত্যহিক পদ-ক্ষেপেই হাঁটছে নাড়ি। মাথার লম্বা চুলে হাত ডুবিয়ে চুল টানল বিভাস। লাগছে। যন্ত্রণা থাকলে লাগত না, বরং আরাম পেত বিভাস।

বিভাস পাশ ফিরে শুল, সিগারেট

ধরাল। একরাশ ধোঁয়া গিলে, দম বন্ধ করে চোখ বুজল।

—এই! আমি যাচ্ছি।

—যাচ্ছো!

—হুঁ।

—আর আসবে না?

—না।

—না কেন?

—না বলেই না। —না!...না!...না!...

ফোট্! মুখে শব্দ তুলে বিভাস বিরক্তি প্রকাশ করল। দু' আঙুলে গোল করে সিগারেটটা নাড়াতে নাড়াতে ছাই ঝেড়ে ফেলল। লুডোর ছক্কার মত স্মৃতি নিয়ে অন্যমনা সাপ-লুডোর ছকে চাল চালছে বিভাস। কিন্তু কি আশ্চর্য! স্মৃতিটুকু মই বেয়ে যদি উঠতে না-উঠতেই আবার নতুন চালে সাপের মুখে পড়ে একেবারে লেজের কাছে এসে ঠেকেছে।

ছোটোবেলায় পড়া কথামালার গল্পটা মনে পড়ল বিভাসের। জলের কলসীতে তলানি একটু জল। তৃষ্ণার্ত কাক। কথামালার সেই কাকের মত বিভাস স্মৃতির নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে হয়রান হচ্ছে, অথচ কিছুতেই তৃষ্ণার জলটুকু ঠোঁট এসে ঠেকছে না।

—অদিতি!

—হুঁ!

—আর একবার ভেবে দেখ।

—ভাববার কিছু নেই কি।

—নিজের মনকে ঠিক চিনেছ অদিতি!

—ঠিক।

—মনকে চেনা কি এতই সহজ?

—চিনতে চাইলে সহজ, না চাইলে নয়।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বিভাস। হাতের সিগারেট টোকা মেরে জানালা দিয়ে ফেলে দিল। বাইরের আকাশ বিকালের ম্লান, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মলিন হয়ে আসছে। জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে বিভাস বোর্ডের দিকে তাকাল। একটা অস্পষ্ট মূর্তির ছায়া-শরীর, ঘরের অস্বচ্ছ আলোয় আরও ম্লান দেখাচ্ছে। কি আঁকতে চাইছিল বিভাস?—বিভাস ভাবল। অদিতির একটা ন্যুড স্টাডি করবে বলেছিল বিভাস। হাসি চাপতে চাপতে অদিতি বলেছে—নিজের মন থেকে আঁকো বি—

—সে যে আমার মত হয়ে যাবে—তোমার মত নয়। বিভাস বলেছে।

—ক্ষতি কি! অদিতি বলেছিল।

আঙুলের চাপে রগের কোল দুটি চেপে ধরল বিভাস। একটা ভোঁতা বিস্বাদ যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণাটা দীর্ঘচঞ্চু কাঠঠোকরার মত অনবরত ঠক্‌ঠক্...ঠক্‌ঠক্...ঠক্‌ঠক... শব্দ তুলেই চলেছে।—না, এই বন্ধ ঘরে থাকলে বিভাস পাগল হয়ে যাবে। যেতে হবে—কোথাও যেতে হবে। কুঁচকে যাওয়া পাজামা হাতে টেনেটুনে ঠিক করল, গেরুয়া পাঞ্জাবির খোলা বোতাম আঁটল। কপালে ঝুঁকে পড়া চুলগুলো আঙুলে আঙুলে সরিয়ে দিতে দিতে, চটিতে পা গলিয়ে নিল বিভাস। খুচরো পয়সা কটা হাতের তালুতে নিয়ে বিভাস অভ্যাসমাফিক শান্তিনিকেতনী ব্যাগটা কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিল। বের হচ্ছে যখন, তখন না-হয় একবার পত্রিকাটার অফিসটা ঘুরে আসবে। কটা টাকা পাওনা আছে, লেখা-টেখা পেলেও নিয়ে আসবে না-হয়। টাকা পেলে একটু মাল খাবে বিভাস। মাল খেলে যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে, তখন আবার মন দিয়ে কাজ করতে পারবে।

শিস দেবার মত ঠোঁট জোড়া করে বিভাস থমকে দাঁড়াল। অদিতি বারকয়েক টাকা ধার নিয়েছে, ফিরিয়ে দেবে বলে নিয়েছে, দেবে না বলে নয়। বিভাস টাকা দিয়েছে আবার টাকার কথা ভুলেও গিয়েছে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে টাকার কথা মনে পড়ে বিভাস হারানো শোকে বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল। —বোকা! বাঁদর! বিভাস নিজেকে নিজে বলল—তুমি বাচ্চা! আস্ত ইডিয়ট! তুমি টাকা গুনেছ, আর অদিতি সে টাকা খরচ করেছে মদনাকে ভালমন্দ খাইয়ে গ্র্যান্ড রাস্তা বানাতে। —শালা মদনা! বিভাস মনে মনে হাসলাম—তুমি বাচ্চু' অদিতির রমনায় খুব চরছো, আর আমি শালা শুয়োরের বাচ্চা মদত দিচ্ছি।

প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে গিয়ে বিভাসের কেমন যেন হাসি পেল। এখনও রগের কাছে চুলগুলো রাগে কাঁপছে, চোখের পাতা কানাকানি করছে, অদিতি তাকে ছাল ছাড়ানো অন্য একটা অদ্ভুত মানুষের চেহারা দিয়ে গেছে—তবু যেন রাগতে পারছিল না বিভাস, নিজেকে কেমন একটা উপহাসের আর করুণার পাত্র বলে মনে হচ্ছিল।

দু হাতের তালুতে মুখ বিঁধিয়ে বিভাস চাপা গলায় বললো—মা, চা।

বারান্দার কোণ থেকে মনোরমার উত্তর

শোনা গেল—নিয়ে আসব, না তুই আসবি।

—আসছি।

ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসে বিভাস বলল, —একটু আদার রস দিও।

মনোরমা চোখ তুলে তাকালেন। মুখটা থমথম করছে বিভাসের, কেমন যেন লালচে ভাব। —কেন রে, মনোরমা বললেন—সর্দি-টর্দি হয়েছে নাকি?

—না। বিভাস ঘাড় নাড়ল। —মুখটা তেতো হয়ে আছে।

—পিত্তি পড়ছে। মনোরমা চোখ না ফিরিয়েই বললেন—শরীরের ওপর এত অত্যাচার সয় কখনও? খাবার সময়-অসময় নেই, তা ছাড়া দিনরাত কি যে ফুকফাক খাস, সব সময় দেখছি মুখেই রয়েছে।

বিভাস হেসে ফেলল। মা তার সিগারেট খাওয়া নিয়ে অভিযোগ করছে। অদিতিও করত, বিভাসের মনে পড়ল। —তোমার কাছে বসা যায় না, কি বিশ্রী গন্ধ। গন্ধটা সইয়ে নাও, বিভাস হাসত, নইলে চুমু খাব কি করে? নিজের অজান্তেই ঠোঁটের ওপর আঙুল বুলিয়ে ঠোঁট মুছে নিত অদিতি —খেতে দিলে তো! খুচরো আদরের হাত বাড়িয়ে অদিতির গলা জড়িয়ে বিভাস বলত —দেখ, আমি চাইলে তুমি কেমন না বলতে পার।

মনোরমা বললেন—কি রে, কথার উত্তর দিলিনে যে বড়।

বিভাস অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

বিভাস চোখ ফিরিয়ে মার দিকে চাইল। কি আশ্চর্য! বিভাস অবাক হচ্ছিল, কত দিন যেন মাকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেনি। রঙ আর তুলির নরম অভিরাম, মুখ-চোখ, ছবি আঁকতে আঁকতে ঘরের কোণে এত সুন্দর এই মায়ের মুখ চোখে পড়েনি বিভাসের। বিভাস মা-র মুখ দেখছিল। ঈষৎ লম্বা মুখ, থুতনির কাছে অভিমানের একটু ভাঁজ। গাল যেন অনেক ঝরে গিয়েছে, দু-একটা বলিরেখা পড়েছে কপালে, চোখের কোণে। গন্ধলেবুর মত ভাসা দুটি চোখ, নাক বরাবরই একটু চাপা বোধ হত। রুক্ষ জটপাকানো চুল এখনও চকচকে কালো, কেবল সিঁথির পাশে একথুপি পেকে, ইন্দিরা গান্ধী। বিভাস হাসির গলায় বলল —প্রাইম মিনিস্টার!

মনোরমা চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন—মা কথা বললেই প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যায়!

বিভাস কিছু বলল না, দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল। পায়ের ভাঁজে ধরেছে বিভাস। মনোরমা টাল সামলে কাতর গলায় বলে উঠলেন—ছেড়ে দে! ছেড়ে দে। পড়ে যাব যে!

বিভাস কি জানি কেন, ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছিল। সেই যখন এতটুকু ছিল বিভাস, কোলে কোলে ফিরত মার, আঁচলের পর্দা-টানা বুকে মুখ রেখে চুকচুক করে দুধ খেত, ছোট ছোট দুটি হাতে মার বুক ধরে—সামান্য ঝুঁকে, দাঁতে ঠোঁট কাটতে কাটতে দস্যি ছেলেকে দুধ খাইয়ে শান্ত করতে ব্যস্ত মা, বিভাস সেই হারানো শৈশবে ফিরে যাচ্ছিল। —আচ্ছা, বিভাস ভাবল, এখনও কি সে সেইরকম শিশু হয়ে যেতে পারে? দুটি হাতে মার বুক ধরে পুটুস পুটুস দাঁতে হাসতে হাসতে দুধ খেতে পারে!

ফোট! বিভাস সোজা হয়ে বসল। কি যা-তা ভাবছে সে। শুনলে মা-ই লজ্জা পাবে। চায়ে চুমুক দিয়ে বিভাস আবার ভাবল—আচ্ছা! মেয়েরাই তো মা হয়। অদিতি থাকলে অদিতিও মা হত। চোখের সামনে আয়নায় ফেলা তীব্র সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরণের মত বিভাস দেখল—অদিতি মা হয়ে যাচ্ছে, আর বিভাস শিশু হয়ে অদিতির নিটোল বুকের ওপর মুখ দিয়ে শুয়ে শুয়ে সুখে পা নাড়ছে।

এতক্ষণ যেন যন্ত্রণার কথাটা ভুলে গিয়েছিল বিভাস, মুখের তেতো ভাবটা কেটে যাচ্ছিল। এখন আবার সেই যন্ত্রণাটা বিভাস অনুভব করল—এই মনে, শরীরে, না চিন্তায়-স্মৃতিতে সেই বোধ-বিহ্বল যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস, কাঠঠোকরার ঠকঠক শব্দ তুলেই চলেছে।

বিভাস উঠে দাঁড়াল। মাথা নাড়ল। চলে যেতে যেতে বলল—মা, আমার দেরি হতে পারে।

—দেরি করিসনে। মনোরমা বলছেন—একলা একলা কত আর থাকবে বল! আর পারিস তো—একটু থামলেন মনোরমা—দিতিদের বাড়িটা একবার ঘুরে আসিস। মেয়েটা অমন শুকনো মুখে হনহন করে চলে গেল; যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে গেল না।

বিভাস থমকে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—ওর কথা ছেড়ে দাও, মা। ও একটা বাজে মেয়ে।

নিজের ছাল-ছাড়ানো অন্য চেহারার মত মা-র মুখ এখন কেমন হয়েছে দেখবার লোভ হচ্ছিল বিভাসের। ঈষৎ চমকে গিয়ে মা নিশ্চয়ই ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক করেছেন. ঠোঁটের কোণ বেঁকা। চোখের তারা পাথরের চোখের মত স্পন্দনহীন, থুতনির দিকে গালের গড়ানে জমি ছাঁচে ঢালা মূর্তির মুখের কঠিন উত্তাপহীন স্পর্শ হয়ে যাচ্ছে। হাত সামান্য তোলা. মা যেন বলতে চাইছেন—না, না! খোকা, তুই ভুল করছিস। দীতি আমার তেমন মেয়ে নয়।

রাস্তায় পা দিয়ে অন্ধকারে মুখ ঢেকে বিভাস নিশ্বাস ছাড়ল। মা-র বিশ্বাসে অকরুণ আঘাত দিয়েছে সে। এখন রাস্তায়
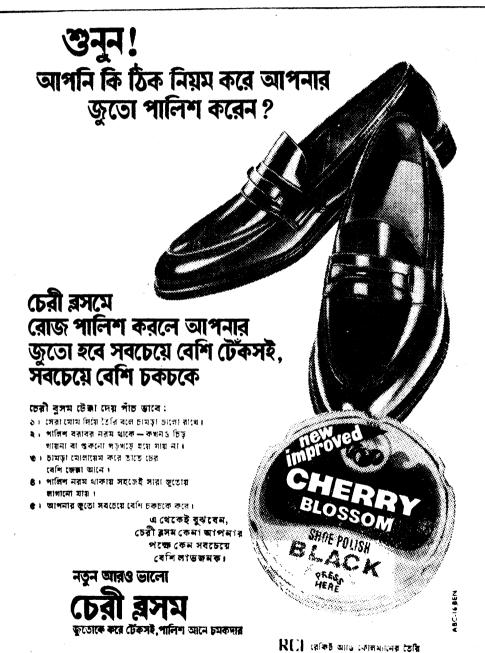
আলো থাকলে নিজেরই লজ্জা করত। বিভাস মনে মনে আলোভাঙা। কংসদের ধন্যবাদ দিয়ে সিগারেট ধরাতে গেল। কাঠিটা জ্বলে উঠতেই সভয়ে চোখ বুজে আর্তনাদের গলায় মনে মনে চিৎকার করে উঠল—আলো চাই না! আলো চাই না আমি!

খালাসিটোলা থেকে ফিরতে রাত হয়ে এল। রাস্তায় বেরিয়ে বিভাসের বোধ হল, সামান্য বৃষ্টি হয়ে গেছে কখন। ভিজে বাতাসে আর্দ্র ভাব। মাথা টিপটিপ করছিল, ঠাণ্ডা শীতল হাওয়ার স্পর্শে এখন সে ভাবটা কিছু কম। একটা পান খেলে হয়। বিভাস ভাবল। বিভাস পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল। ষাঁড়ের শিঙে কে যেন গাঁদার মালা পরিয়ে দিয়েছে। ষাঁড়টা মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিব দিয়ে সে ফুলের মালাটা খাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পথের পাশেই একটা খারাপ গাড়ি জ্যাকের ওপর তোলা। মেকানিক বোধ হয় গাড়ির নিচে মাটির উপর শুয়ে সামনের একটা চাকা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে চলেছে। চাকার চকচকে নিকেল করা ক্যাপের ওপর হাত-লাইটের আলো ঠিকরে ঘুরন্ত একটা আলোর বৃত্ত ঝকমক করছে। বিভাস ক্ষণমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াল। ঘুরন্ত সে আলোকচক্র ঘুরতে ঘুরতে বড় হয়, ক্রমশ আবার হলুদ-জাফরানি রঙা ছোট একটা আলোর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যাচ্ছে। বিভাস চোখ কচলে নিল, পাতার ওপর পাতা ফেলল, আবার খুলল। পানের দোকানের ঝোলানো দড়িতে লোকে বিড়ি ধরাচ্ছে। খোঁপায় ফুলের গোড়ে এক পরমা সুন্দরী জল ফেলি—জল তুলি হাঁটা হাঁটিতে হাঁটিতে চলেছে—পিছনে অনেক মানুষ ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, পানের লালচে ধারা সরু সুতোর মত ঝুলছে।

প্রসন্ন ছাড়ল না, ধরে নিয়ে গেল। বলল—কি হে মিস্টার পিকচার! এরকম হুলো বেড়ালের মত গোমড়া মুখ কেন? ব্যাপার কি? একটু হাসল প্রসন্ন—ব্যাটারি ডাউন! রি-চার্জ করিয়ে নেবে নাকি?

—কি যে বলেন দাদা, বিভাস হেসেছিল, দু পকেট উল্টে দেখিয়েছিল প্রসন্নকে—বুঝলেন না পকেট গড়ের মাঠ—বেবাক ফাঁকা।

প্রসন্ন চশমা তুলে বিভাসের দিকে তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল। লম্বাটে ধরনের মুখ হঠাৎ গাম্ভীর্যে ভারী হয়ে এলে কেমন যেন ঝোলা-লাউয়ের চেহারা নেয়। থুতনির কয়েকটা রঙ-কটা ফুরফুরে দাড়ি মাকড়শার সাতভাঙা অষ্টপদের মত, চোখ দুটো কোটরে বসা অথচ জ্বলছে। খুচরো কিছু চুল মুখে উড়ে এসে কপালটাকে ছায়ায় আড়াল করেছে। প্রসন্ন মৃদু মৃদু হাসছিল—যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় নজন। তা আমি রাজার, সুজন-নাইয়ার কাণ্ডারী! তেঁতুলপাতায় নজন হতে পারলে, তুমি আমি খালাসিটোলায় এক গেলাসের ইয়ার হতে পারব না!

বিভাস মৃদু আপত্তি তুলেছিল, প্রসন্ন শোনেনি। —একটু চাঙ্গা হয়ে নাও, তারপর আমার সঙ্গে চল ফলেন-হোমে।

—ফলেন-হোম!

—পাতালঘর! প্রসন্ন বাঁ চোখ ছোট করে টিপে বলেছে—বুঝলে না। আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে, যে সব অদৃশ্য পোকারা কিলবিল করে, ওরা তাদের আদি, অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ মতে শোধন করে দেয় হে! বেড়ে জায়গা। খাসা!

বিভাস উঠে পড়েছিল। —না, দাদা। সহ্য হবে না!

—তা সহ্য হবে কেন, প্রসন্ন চোখ টেরা করে তাকিয়েছে। তোমাদের তো আবার

পোষা মুর্গি না হলে জুতসই হয় না হে! তা তোমারও তো আবার একটি আছে বলে শুনেছি—কি সেই দৈত্য-দানবদের মা দি-দি—দিতি না অদিতি কি যেন নাম!

—অ-দি-তি!

অদিতির নামটা মনে পড়তেই বিভাস চমকে উঠেছিল। এতক্ষণ সে যেন নিরালম্ব শূন্যতায় ভাসছিল, এখন আবার ঠোকর খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছে। বোবা বিস্ময় যন্ত্রণা। বিভাস মাথার চুল হাতের মুঠিতে একবার ধরল, আবার ছেড়ে দিল। ঠিক এই মুহূর্তে কাঠঠোকরার মত কোন দীর্ঘচঞ্চু অদৃশ্য ঘাতকের হাতে বিভাস তার সমস্ত দেহ মন ছেড়ে দিয়ে ক্লান্তিকর, একঘেয়ে, পৌনঃপুনিক আঘাতের জন্য অপেক্ষা করছে।

...অদিতি বিছানায় কনুই ভেঙে শুয়েছে... খাটের ধারে বসে পা দোলাতে দোলাতে হাই তুলল অদিতি...লম্বা ঘুমের দুপুরে হাতে হাত দিয়ে সিনেমা দেখছে বিভাসের সঙ্গে... বিভাসের ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে দেলানা হাত-ব্যাগে টাকা পুরতে পুরতে বলছে—মদনের জন্য ওষুধটা না কিনলেই নয়। ওরা খুব গরীব তো!...দোলের দিন আবীর মাখাবার সময় আঁচল সামলে, অদিতি হাসি চেপে, চাপা গলায় বলছে—অসভ্য! *

চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে নিল বিভাস। না, অদিতি নয়, অদিতিকে ভুলতে চায় বিভাস। অদিতি নেই, অদিতি আর কোনদিন আসবে না, চিরকালের জন্য অদিতি চলে গিয়েছে, মুখের ওপর বলে এসেছে—আমি চললাম। এত স্পষ্ট, দ্বিধাহীন, সহজ, সরলভাবে মনের কথা জানিয়েছে অদিতি যে, বিভাসের ভুল করবার কোন পথই নেই। অদিতি গেছে,—চিরকালের জন্যে গেছে,—আর কোনদিন বিভাসের মুখোমুখি হবে না।

বিভাসের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। অদিতির চলে যাওয়া নিঃসংশয়ে তার লজ্জা, অগৌরবের। কিন্তু কেন চলে গেল? শালা মদনার জন্যে! মদনার মত টিংটিঙে, রোগা, তালপাতার সেপাইয়ের কথা মনে পড়ে বিভাসের হাসি পাচ্ছিল।—মদনা তোমাকে কি দেবে, অদিতি? বিভাস মনে মনে বলল—কি দেবে? —সুখ? ঐশ্বর্য! প্রেম!

বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে বিভাস। ঘুম আসছে না। মুখের ওপর চাদরটাকে টেনে রেখেছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মুখের চাদর সরিয়ে উঠে বসল বিভাস। টেবিলের কাছে এই ডান কোণে রাখা মোড়াটায় প্রায়ই বসত অদিতি। পায়ের ওপর পা ভাঁজ করে তোলা, পিঠে সামান্য এলিয়ে দিত। অদিতির চিকণ ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা, কপালে ঝরো কয়েকটি চুল। কাজ করতে করতে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বিভাস কাছে টানত অদিতিকে। ধনুকের টান ছিলার মত একটু বুঝি কাছে সরে আসত অদিতি, তারপর হাত ছাড়িয়ে দেওয়ালে পিঠ রাখত। অন্যমনস্ক চোখে তাকাতে গিয়ে বিভাস দেখল, দেওয়ালের গায়ে লম্বা একটা বেণীর দাগ স্যাঁতাপড়া ছবির মতন আঁকা।

স্মৃতি বড় স্বেচ্ছাচারী! বিভাস দার্শনিকের মত ভাবতে গিয়ে শূন্যতায় হারিয়ে যাচ্ছিল। এই বিছানায়, বালিশে লেগে থাকা অদিতির দু-একটি কোঁকড়ানো বিবর্ণ ধূসর চুল এখনও হয়তো খুঁজে পেলেও পেতে পারে বিভাস। আজও দুপুরে এ ঘরে এসেছে অদিতি। পায়ে সরু ফিতের চপ্পল, ময়লা নোংরা শাড়ি। দুপুরের খাওয়া সেরে আঁচলে হাত মুছেছে বুঝি, হলুদ-তেলের দাগ সে শাড়ির আঁচলে। লাল ব্লাউসটার ঘাম-পড়া কাঁধে ময়লা-ময়লা গন্ধ ঘাম, তেল, যৌবন মেশানো।

বিভাস চোখ মেলে বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে সাপের মত কোঁকড়ানো কিছু চুল আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল; আবার চোখ বুজে অদিতির শরীরের বাসী গন্ধটুকু প্রশ্বাসে যেন অনুভব করল। এখন কেমন যেন গন্ধটুকু টকে উঠেছে, বিভাসের মাথা ধরে আসছিল। বমি পাচ্ছে।

বিছানা ছেড়ে আতঙ্কে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল বিভাস, জানালার কাছে সরে গিয়ে বাইরের বাতাসটুকু পাঁচ আঙুলের মুঠোয় ধরতে চাইছে। বদ্ধ নিশ্বাসের দম-

চাপা কণ্ঠে হাঁফাতে হাঁফাতে বিভাস বলল—বুকে দেওয়ালগু বেঁধে শালা মনকাকে নিয়ে তুমি রাসলীলা করছ। অদিতি—কারো আমি তোমাকে কেয়ার করি না।—এই দেখ, আমি মদ খেয়েছি। মাল খেলে লোকে যন্ত্রণা ভোলে। আমি আমার যন্ত্রণা ভুলে যাচ্ছি অদিতি, তোমাকেও ভুলে যাচ্ছি। তোমার মুখখানা জলে মোছা খড়ির লিখনের মত আমার মনের স্লেটে আবার কালো হয়ে আসছে।...লুক হিয়ার!...লুক হিয়ার, অদিতি!...তুমি মুছে যাচ্ছ!...তুমি মুছে যাচ্ছ!...

বিভাস শব্দ করে হাসল। আলো জ্বালল। একটা সিগারেট ধরাল। লম্বা টানে দীর্ঘস্থায়ী ধোঁয়ার স্রোত কণ্ঠনালী দিয়ে পাকস্থলী ঘুরিয়ে এনে, বিভাস হঠাৎ চাড়ে নাসারন্ধ্রের ফাঁকে বাইরে বার করে দিল। অদিতিকে ভুলে গিয়ে এখন বেশ ভাল লাগছে। বিছানায় পড়ে থাকা গল্পটা আঙুলে আঙুলে নাড়ল বিভাস।—না, বড্ড আধুনিক,—কঠিন দুর্বোধ্য, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গল্পটা রেখে দিয়ে বিভাস ফ্যাশন-প্যারেডের ফটোগুলো দেখতে শুরু করেছে।—ওপরের পোশাকটুকু আঙুলের চাপে খুলে ফেললেই বেশ জ্যান্ত যৌবন দেখতে পাওয়া যাবে, বিভাস এমন কিছু ভাবল। একটা ফটোর গন্ধ শুঁকল বিভাস, আর একটার বুকে ছোট্ট চুমকুড়ি এঁকে বিছানায় আবার শুইয়ে দিল।

অদিতি চলে যেতে যে বিশ্রী যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করেছিল বিভাস, এখন সে ভাব অনেক স্তিমিত, নিস্তেজ হয়ে আসছে। মুখের তেতো তেতো ভাব অন্য রকমের নিস্পৃহ উদাসীনতায় ভরে উঠছে। স্মৃতির টুকরো নাড়তে-চাড়তে গেলে আচমকা ক্ষুরধার কাচের কণিকায় হাত-পা-মুখ কেটে রক্তক্ষয় হচ্ছে; মনে মনে বিভাস অস্বস্তিকর, গ্লানিময় এক পরাজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এই সাতাশ বছরের ব্যর্থতার হিসাব নিতে বাধ্য হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত বিভাস জিতে এসেছে; ছবি আঁকবার জোর নিয়ে একদা ঐতিহাসিক সংগ্রামে সে ছাত্রজীবনে কর্তৃপক্ষকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল, নিজেও এক ধরনের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে "সম্ভাবনাময়", "প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন" এমন সব বিশেষণ সংগ্রহ করে। পেট চালানোর জন্য যে কাজ, সে কাজের কথা নয়, অন্য কাজ। "ইন দি টোয়াইলাইট" ছবিটার কথা মনে পড়ছে বিভাসের। পড়ন্ত সূর্যের শেষ কিরণে, কনে-দেখা-আলোয়, একাকার পীতাভ রঙের উৎসবে, কেবল অদিতির মুখ আর স্রোতের মত কালো ঢেউ খেলানো চুল; স্রোতের মত কালো ঢেউ-খেলানো চুল; প্রস্ফুটিত।

অদিতি!...অদিতি!...অদিতি!... বিভাস ব্যথের শেষ পাক আঙুলে টিপে মারল। অনেকদিন আগে অদিতির নামটা আবার স্মরণে এসে যেন বিদ্যুৎ যন্ত্রণার ঝাপটা দিচ্ছে। না অদিতি তুমি নও তুমি শুধু উপন্যাসে পাণ্ডুলিপি পাতা আঙুলে টেনে তুলল বিভাস। পাতা ওল্টাল। ঘুম আসছে না। রক্তে নেশার রঙ এখনও ফিকে হয়ে আসছে। বিভাস পাতা উল্টে পড়তে শুরু করেছে।...

এইমাত্র মিহির আমার ঘর থেকে চলে গেল। মিহিরের চোখে আমি সর্বনাশের নেশা দেখেছি। ঝড় যে নিকটে বাতাস যে, এ কথা মিহিরকে কেমন করে বোঝাব।

ঠোঁটের কোণটা কুঁচকে গেল বিভাসের। —যা-তা! কে লেখক তুমি? বিভাস মনে মনে বলল।—একেবারে আগমার্কা সিল টিনের মত টোন্।—না, তোমাকে নিয়ে চলবে না।

বিভাস আবার পাতা ওল্টাল। বেশ কয়েক পাতা ফরফর করে সরিয়ে দেখল...মিহিরের কথা...লতা আর মালার কথা মনে উঠলেই দুটো উপমা মনে আসে আমার। মালা যেন হাল-ফ্যাশনের এয়ার-কন্ডিশনড সুপার লিমুজিন, একবার চেপে বসে এঞ্জিন স্টার্ট করতে পারলেই মনের আনন্দে হু হু করে উড়ে যাওয়া যায়।—আর লতা! লতা মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে, শুচিশুভ্র পোশাক, নির্মল মনের টিকিট, খালি-পা চাই। তারপর প্রার্থনা। নিজেকে আমি...

বিভাসের হাসি পাচ্ছিল। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত মিহির টকটক্... টকটক...করে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরেই চলেছে এমন একটা ছবি দেখতে পেল বিভাস।—চিয়ারিও! বিভাস বলল—বেঁচে থাক তুমি, গাছেরও খাও, তলারও কুড়োও বাবা!

সিগারেট পুড়ে এসেছে, ঠোঁটে তাত লাগছে। বিভাস সেটুকু ফেলে দিয়ে একবার মালাকে দেখতে চাইছে। তুমি বাবা কি মাল, একটু দেখি! বিভাস এমন ভাবল।

...এখনও আমি নিরাভরণ, নিরাবরণ হয়ে আমার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। নিজেকে দেখতে নিজেরই বড় ভাল লাগছে। মিহিরের মনে আজ যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছি, সে নেশার মাতাল, বুঁদ হয়ে আছে মিহির। পুরুষ হবে আগুনের মত—নিজেও পুড়বে, অন্যকে পোড়াবে। যে পুরুষ শুধু নিজেই পোড়ে, অন্যকে পোড়াতে পারে না, তাকে দেখে শ্রদ্ধা হতে পারে—ভালবাসা নয়। পুরুষের এই খুনী, সর্বনেশে রূপটা না থাকলে পুরুষকে পুরুষ বলেই মনে হয় না।...

—বাঃ! মালা! বাঃ! বিভাস লাফিয়ে উঠল।—আয়নায় তোমার ছবি আমারও রক্তে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, মালা! বেঁচে থাক! তুমি অদিতি নও, তুমি তুমিই। অদিতি এতদিন আমাকে খেলিয়ে খেলিয়ে, আজ লালা মদন-মন্দিরে আরতি করতে গিয়েছে। অদিতি এখন লতার পার্ট প্লে করছে, বুঝলে।—তোমার একটা ছবি আঁকব মালা, তারপর বুঝলে অদিতির ছাল ছাড়িয়ে নেব। দেখ মালা, অদিতি আমায় কি রকম ছাল-ছাড়ানো অন্য মানুষের চেহারা দিয়ে গিয়েছে; দেখ, আমায় কি রকম যন্ত্রণা দিচ্ছে অদিতি, আর শালা আমি শুয়োরের বাচ্চা! কাদার খোঁয়াড়ে ঢুকে কুঁ কুঁ করছি।...আমি এর প্রতিশোধ নেব না, মালা? কি বল, নেব না?

বিভাসের তেল-পালিশ চোখ দুটো চকচক করে উঠল, নিশ্বাসে অম্ল গন্ধ, বিভাস ইজেলের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। মালাকে যেন দেখতে চাইছে, এমন দৃষ্টিতে একবার আয়নার দিকে তাকাল বিভাস।—মালা নয়, অদিতি ঘরে। খাটের বাজুতে হেলান দেওয়া সেই পরিচিত ভঙ্গি, বুকের আঁচল পিঠে ঘুরিয়ে তোলা, পায়ের ওপর পা। দাঁতে ঠোঁট কাটতে কাটতে অদিতি হাসছিল।

—কি, হাসছ কেন? বিভাস রাগের গলায় চিৎকার করে উঠল।

—তোমাকে দেখে।

—আমাকে দেখে?

—হ্যাঁ! মুখে আঁচল চাপা দিল অদিতি।—কি চেহারাই করেছ! দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র যেন লাশকাটা ঘর থেকে বের হয়ে এলে।

বিভাস বিস্মিত চোখ তুলে অদিতিকে দেখছিল। সেই বিষণ্ণ, সরল, মধুর মুখ। চন্দনভেজা তুলসীপাতার মত আলসে দু' চোখের পাতা, টিকালো নাক বোঁটার দিকে সামান্য তোলা, মোম-মোম গাল, ভরাট বুক, আঁচলে ঢাকা পাতলা ঠোঁটের নিচে চিকন দাঁতের পাটি দুটিও যেন দেখতে পাচ্ছিল বিভাস। বুকের গোড়ায় চমকে-থামা চাপা নিশ্বাসটুকু ছেড়ে বিভাস ক্ষুব্ধস্বরে বলল—বাইরের চেহারাটাই সব নয়, অদিতি —মানুষের ভেতরেরও একটা চেহারা আছে।

অদিতি বিবর্ণ হয়ে এল—সে চেহারা বড় নিষ্ঠুর, দি।

—নিষ্ঠুর! বিভাসের গলায় রাগের ছোঁয়া লাগল—তোমার সে চেহারাটা একবার দেখে যাবে না, অদিতি।

অদিতি অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভীত, ত্রস্ত, আর্তস্বরে বলে উঠল—না, না। সে চেহারা দেখতে চাই না আমি।—আমি যাই।

—যাবে! নিজেকে দেখে যাবে না! বিভাস ডাক ছেড়ে হেসে উঠল। ইজেলের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভাস। হাত নিষ্কম্প, শানিত ছুরির মত হাতে তুলি ধরা।—ফোট! তুমি একটি মাল মেয়ে, অদিতি!...ইতর!...লোচ্চ!...লোফার! তোমাকে চিনতে বাকি নেই আমার। আমারই গলায় হাত দুলিয়ে, আমারই পকেট কেটেছ তুমি। আমারই বুকে গাল রেখে, তুমি শালা মদনার সঙ্গে মনে মনে পিরীত করেছ! কি ভেবেছ তুমি? তোমাকে আমি ছেড়ে দেব? না, না। আমি ছাড়ব না। আমি তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেব, অদিতি—তোমাকে খুঁড়ে-খুঁড়ে তোমার নোংরা থার্ড ক্লাস চেহারাটা তুলে ধরব। তখন আর হাসতে হবে না, অদিতি। নিজের চেহারাটা দেখে নিজেই শিউরে উঠবে।—যাই! বিভাস অদিতির গলার স্বর নকল করে ভেংচে উঠল।—যেতে তোমাকে হবেই! তোমার বাসী মৃতদেহের গন্ধে এখনই আমার বমি পাচ্ছে, অদিতি! বমি পাচ্ছে!

পর পর কয়েকটা হিক্কা তুলল বিভাস। একটু থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ যেন প্রচণ্ড আক্রোশে নিশি-পাওয়া মানুষের মত বোর্ডে অদিতিকে এঁকে গেছে বিভাস। সমস্ত রাগ, ঘৃণা, যন্ত্রণা উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে। বোধ-বিস্বাদ স্বাদ, মুখের তিক্ত ভাব মিলিয়ে আসছে। বিভাস চোখ বুজল।—আঃ! বড় শান্তি! বড় তৃপ্তি! সহস্রাবলির মত রেখাঙ্কিত অদিতির তিলক-কাটা চেহারাটা দেখে অদিতি নিশ্চয়ই শিউরে উঠছে।—কী কুৎসিত! কী বীভৎস!

হাসির দমক পেটের ভেতর গুড়গুড় করে দুলিয়ে উঠছিল। হাসি চাপতে গিয়ে বিভাস ছবির ওপর ঝুঁকে পড়ল, তারপর হড়হড় বমির মত নোংরা একরাশ হাসি হেসে বিভাস হল্লা করার গলায় বলে উঠল—অদিতি, চিনতে পারছ!

অদিতিকে আর একবার দেখতে চাইল বিভাস। চোখের পাতা স্থির, নিশ্বাস থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এ কি করেছে বিভাস! নেশাগ্রস্ত, মাতালের মত এ কি করেছে সে! কি এঁকেছে! এ তো অদিতি নয়—এ এক পুরুষ। আতঙ্কে, বিস্ময়ে দু' হাতে মুখ ঢাকল বিভাস।—সহস্রলাঞ্ছিত, বাঞ্ছিতা এই শরীরটা বড় সুন্দর, বড় ভালবাসার। এ যে স্বয়ং বিভাস।

বাইরে নির্জন রাত, দূরে কোথাও একটা নিঃসঙ্গ কুকুর ডাকছিল। হাতের তালু থেকে চোখ তুলে বিভাস নিজেকে আর একবার দেখতে চাইল। যন্ত্রণার পোকাটা আর গর্তায় নিহিত নয়, মৃত। এখন এই শরীরে, মনে, চিন্তায় বা স্মৃতিতে কোথাও কোন বেদনাবোধ হচ্ছে না। মাথা হালকা, ভারসাম্যহীন শরীর বেলুনের মত মাটিতে পা ছুঁইয়ে থাকতে চাইছে না। বিভাস হাই তুলল, মণিবন্ধে আঙুল রেখে নাড়ির ডুবডাব ...ডুবডাব...শব্দটা আর একবার শুনতে চাইল। আবার হাই তুলল বিভাস। শূন্য! এ এক আশ্চর্য শূন্যতার অনুভূতি। বিভাসের চোখ জড়িয়ে আসছে, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশ শিথিল, সুস্থির হয়ে এল। ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়ল বিভাস; তারপর শোকহীন আনন্দহীন, সুখদুঃখহীন শূন্যতার এক নৈকষ্য অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে বিভাস ভাবল—মড়ার কোন যন্ত্রণা থাকে না, ন...ভা...র...কো...ন...ও ও...ও।

পরীক্ষায় গণটোকাটুকি

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার হলে গণটোকাটুকি বন্ধের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা বাতিল করার যে পদ্ধতি নিয়েছেন, এর বিরুদ্ধে ইদানীং নানা সমালোচনা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বীকার করবেন যে, বর্তমানে পরীক্ষার হলে গণটোকাটুকি চলছে। এর ফলে ভাল ছাত্রদের ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে এবং তারাও ক্রমে এই দুর্নীতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। এভাবে আর দু'এক বছর চললে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। এই দুর্নীতির প্রতিকার কি তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেন এ কথা ঠিক। কিন্তু পরীক্ষা হয় বিভিন্ন কলেজে। প্রত্যেক পরীক্ষার সময় কলেজের অধ্যক্ষকে প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হয় এবং পরীক্ষার হলগুলিতে শিক্ষকগণ গার্ড দিয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থা বহুদিন থেকে চলে আসছে এবং এর পরিবর্তে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যাঁরা পরীক্ষার হলে গার্ড দিতেন তাঁরা কোন ছাত্রকে নকল করতে দেখলে তাকে ধরতেন ও তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট নকলের প্রমাণ সহ রিপোর্ট দাখিল করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই ছাত্রদের বিচারের জন্য একটি বোর্ড অফ ডিসিপ্লিন গঠন করেছেন। যতদিন আমাদের রাজ্যে রাজনৈতিক আবহাওয়া শান্ত ছিল ও ব্যাপক বোমাবন্দুকের ব্যবহার চালু হয় নি, ততদিন এই পদ্ধতি অনুযায়ী অসাধু ছাত্রদের শাস্তি দেওয়া হতো। তখনকার দিনেও প্রায় প্রত্যেক হলেই কিছু ছাত্র নকল করত। এদের মধ্যে হয়ত অধিকাংশই ধরা পড়ত। কিছু কিছু অসাধু ছাত্র নিশ্চয়ই ধরা পড়ত না। কিন্তু কেউ এ প্রশ্ন তুলতেন না যে, সব দোষী ছাত্রকে যখন ধরা যাচ্ছে না, তখন যারা যারা ধরা পড়ছে তাদের কেন শাস্তি দেয়া হবে?

এরপর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া পালটে গেল। সর্বস্তরে ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতার মৃত্যু ঘটল। বোমা ও পাইপগান তৈরীর কুটির শিল্পে দেশ ছেয়ে গেল এবং মানুষ হত্যা ডাল-ভাতের ন্যায় সহজ হয়ে গেল। যাকে যখন ইচ্ছা খুন করা যায়—তার কোন শাস্তি নেই। কারণ ভয়ে কেউ সাক্ষী দেবে না। দুর্নীতিপরায়ণ ছাত্রেরাও এই পদ্ধতি শিখে নিল এবং নকল ধরা হলে শিক্ষকদের প্রহার ও হত্যার ভয় দেখাতে শুরু করল। অপমান, প্রহার ও প্রাণের ভয়ে শিক্ষকগণ ও অধ্যক্ষেরা অসাধু ছাত্রের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট দেয়া বন্ধ করলেন। তাঁরা পরীক্ষার হলে হয় চুপ করে বসে সব দেখতেন কিংবা হলের বাইরে পায়চারি করতেন। অনেকে অধ্যক্ষকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা পরীক্ষার হলে যাবেন না। প্রাণের ভয়ে তাঁরা তাঁদের গুরুদায়িত্বের কথা ভুলে গেলেন। ফলে কিছু টোকাটুকি দেখা দিল পোহালে শর্বরী গণ-টোকাটুকি রূপে। ভাল ছাত্র—যারা কম সংখ্যায় হলেও নকল করে নি—তাদের অবস্থার কথা কেউ ভেবে দেখলেন না। হয়ত দেখবার কোন উপায়ও ছিল না।

এই সব গণ-টোকাটুকির সংবাদ গোপন থাকে না—লোকমুখে সংবাদপত্রের মারফতে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই দাবি ওঠে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কি করছেন? ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব নেয়া হয় যে, এই ধরনের সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করে দেয়া হোক। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন। বাতিলের খবর প্রকাশ হবার পর নানা ছাত্রবিক্ষোভ এবং সংবাদপত্রে সমালোচনা হচ্ছে। সেই জন্য এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক টোকাটুকি হলেও শিক্ষক এবং অধ্যক্ষেরা দোষী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্টই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না। কাজেই কোন্ কোন্ কেন্দ্রে ব্যাপক নকল হচ্ছে তা জানবার জন্য কর্তৃপক্ষ পরিদর্শক টিম পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। টিমের সভ্যেরা কোন খবর না দিয়ে কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত হন এবং সেখানে কিভাবে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, নকল হচ্ছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দেন। কোন কোন কেন্দ্র থেকে সেন্টার-ইন-চার্জও রিপোর্ট পাঠান—কখনও দু'একজন শিক্ষক এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। এই সমস্ত রিপোর্ট আলোচনা করে পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। লিখিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কেন্দ্রের পরীক্ষাই বাতিল করা হয় নি। প্রশ্ন করা হয়েছে যে, পরিদর্শক টিমের সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তার প্রমাণ আছে কি? কোন একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। যাঁরা পরিদর্শক টিমের সভ্য তাঁরা হয় সেনেট বা আকাডেমিক কাউন্সিলের

অধ্যাপক-সভা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদস্থ কর্মচারী। এ'দের রিপোর্ট অবিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি? ছাত্রেরা নকল করার কথা কোনদিন স্বীকার করবে না। তাদের অভিভাবকেরাও নিজেদের ছেলে মেয়ের কথা মেনে নেবেন। ছেলেমেয়েরা কিভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে এ সংবাদ তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাখেন না। অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকগণও কোন রিপোর্ট পাঠান না। বরং তাঁরা ছাত্রদের চাপে পড়ে লিখে জানান যে, তাঁদের কেন্দ্রে কোন ছাত্রই নকল করে নি। আইন কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ও প্রধান পরীক্ষকদের কথা অনেকেই জানেন। তাঁরা হাইকোর্টে সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন যে, তাঁরা কোন পরীক্ষকের নিকট থেকে নকলের রিপোর্ট পান নি এবং নিজেরাও কোন রিপোর্ট দেন নি। অথচ মহামান্য জজসাহেব কিছু খাতা দেখার পরই বুঝতে পারেন যে ব্যাপক টোকাটুকি চলেছিল। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কার কথায় বিশ্বাস করবেন? নিজেদের বাছাই করা টিমের সভ্যদের রিপোর্ট, না অন্য লোকের কথা—যাঁরা সব ঘটনা জানেন না বা জানলেও লেখার সাহস রাখেন না?

এ কথাও উঠেছে যে টিমের সভ্যেরা কি কেন্দ্রটির সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখেছেন? অর্থাৎ যতগুলি ঘরে পরীক্ষা চলছে সব ঘরে গেছেন? আর যদি নকল দেখলেন, তবে নকলকারী ছাত্রদের কেন ধরলেন না? দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর প্রথমে দেওয়া যাক। টিমের সভ্যেরা পরীক্ষার হলে গার্ড দিতে যান নি। তাঁদের সে অধিকার ছিল না। তাঁরা দেখতে গেছেন পরীক্ষার কেন্দ্রে কিভাবে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে—ব্যাপক নকল হচ্ছে কিনা। প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অনেক রিপোর্টেই বিভিন্ন ঘর পরিদর্শন করার কথা লেখা আছে। কোন কোন কেন্দ্র সম্বন্ধে লেখা আছে যে, টিমের সভ্যেরা অতর্কিতে যে প্রথম ঘরটিতে যাওয়ার পর অন্য ঘরে সে খবর পৌঁছে দেয়া হয় ও সেখানকার ছাত্রেরা সঙ্গে সঙ্গে বইপত্র এখানে-ওখানে সরিয়ে ফেলে সাধু ছাত্র সেজে বসে থাকে। এই ধরনের ঘটনা বহু কেন্দ্রে হয়েছে। কোন কোন পরিদর্শক টিম বলেছেন যে, স্থানীয় সেণ্টার-ইন-চার্জ বা শিক্ষকেরা তাঁদের যে যে ঘরে পরীক্ষা হচ্ছে বলে দেখিয়েছেন তাঁরা সেখানেই গেছেন।

কোন কোন ছাত্র এই প্রশ্ন করেছেন যে, অন্য যে সব কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল হয় নি সেখানে কি নকল হয় নি? যদি হয়ে থাকে এবং তাদের মতে নিশ্চয়ই হয়েছে—তবে শুধু এই কয়েকটি কেন্দ্রের পরীক্ষা কেন বাতিল করা হলো? যে কেন্দ্রগুলির পরীক্ষা বাতিল করা হয় নি—তাদের দুই ভাগে ভাগ করা উচিত হবে। প্রথম, মফঃস্বলের অধিকাংশ কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করা হয় নি। কারণ সেখানে ব্যাপক নকল হয় নি তা নয়—সেখানে পরিদর্শক টিম পাঠান সম্ভব হয় নি। পাঠান গেলে এদের মধ্যে অনেক কেন্দ্রের পরীক্ষাই হয়ত বাতিল করা হতো। এখন প্রশ্ন এই যে, কয়েকটি কেন্দ্র থেকে যদি কোন রিপোর্ট না পাওয়া যায়, তবে যে কেন্দ্র থেকে খারাপ রিপোর্ট এসেছে সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া চলবে না? অন্য অনেক অসাধু ছাত্র ধরা পড়ছে না বলে যাদের নকল ধরেছি তাদের কোন শাস্তি দেয়া উচিত হবে না—এই কি ঠিক কথা? বরং এই বলা কি ঠিক হবে না যে, যারা দোষ করেছে তাদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য দোষী-দের ধরবার চেষ্টা করা হোক। অন্য দশজন অসাধু ছাত্রকে ধরা সম্ভব হয়নি বলে যে দশজনকে ধরা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোন

চমৎকার স্বাদ হচ্ছে এক জিনিষ

আর শক্তিদায়ক পুষ্টি যোগানো আরেক জিনিষ

আর কেমন মজা কোরে চিবিয়ে খেতে খেতে সেই পুষ্টিলাভ করা যায়! পার্লে গ্লুকো বিস্কুটে দুধ,গম আর চিনির যাবতীয় উপকারিতা পাওয়া যায়—প্রোটিনে আর ভিটামিনে একদম ভরপুর।

গ্লুকো বিস্কুট

ভারতের সর্বাধিক বিক্রীত বিস্কুট

বাচ্চাদের পক্ষে সবিশেষ উপকারী

everest/6/PP/Ben

ব্যবস্থা নেয়া চলবে না এই কি ন্যায়বিচার?

দ্বিতীয় ভাগে পড়ে কলকাতার ৯৬টি কেন্দ্রের মধ্যে বাকি ৭৫টি কেন্দ্র—যেখানে পরিদর্শক টিম গিয়েছিল ও পরীক্ষা বাতিল করা হয় নি। ছাত্রদের ধারণা যে, এই সব কেন্দ্রেও প্রচুর নকল চলেছে। কিন্তু এদের ছেড়ে দেয়া হলো কেন? এই প্রশ্ন-কারী ছাত্রেরা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিচ্ছে যে, বাতিল কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক নকল হয়েছে। আসলে অন্য কেন্দ্রগুলিতে নকল হলেও অনেক কম নকল চলেছে। পরিদর্শক টিমের সভ্যেরা পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, এই সমস্ত কেন্দ্রে মোটামুটি ভালভাবে পরীক্ষা হয়েছে এবং পরীক্ষা হলের আবহাওয়া অনেকটা সুস্থ ও স্বাভাবিক। অল্প নকলের অপরাধে সমস্ত কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করা যায় না। নকলের পরিমাণ large-scale বা ব্যাপক হওয়া চাই। যেখানে অধিকাংশ ছাত্রই নকল করছে এবং যেখানে অধিকাংশ ছাত্র নকল করছে না—এই দুটি কেন্দ্র সম্বন্ধে একই ব্যবস্থা নেয়া যায় কি?

সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে নিরাপরাধ ছাত্রদের নিয়ে। ধরা যাক যে, কোন কেন্দ্রে অধিকাংশ ছাত্রই নকল করেছে। কিন্তু সব ছাত্র কি করেছে? কিছু ছাত্র নিশ্চয়ই সাধু ও নিরপরাধ। তাদের পরীক্ষাও কেন বাতিল করা হলো? একজন নিরপরাধকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে ৯৯টি দোষীকে ছেড়ে দেওয়াই নাকি প্রকৃষ্ট নীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই নীতি লঙ্ঘন করেছেন। প্রশ্নটির মধ্যে নীতির কথা আছে, আর আছে কিছু অতিরঞ্জন। যে নীতির কথা তোলা হয়েছে সেই নীতি কি পৃথিবীতে সর্বজনগ্রাহ্য? ফরাসী দেশে কি এই নীতি চালু আছে? রুশ দেশে কি এই নিয়ম মেনে চলা হয়? কিংবা এই নীতি কি আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল বা আছে? আমরা কি এ কথা বলি না,—"ত্যজেদেকং বহু স্বার্থে গ্রামং জনপদ স্বার্থে"? কয়েকজনের সামান্য ক্ষতি করে যদি বহুজনের হিত করা যায়, তবে কি নীতির দিক দিয়ে অন্যায় হবে? অতিরঞ্জন হচ্ছে নিরপরাধ ছাত্রেরা 'শাস্তি' পাচ্ছে এই কথা বলা। ঘটনা যা ঘটেছে তা হচ্ছে এই যে, হলের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র বেপরোয়া নকল করেছে, কয়েকটি ছাত্র করে নি। স্থানীয় শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ কেউই নকল করা ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট পাঠান নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিম বাইরে এসে জানালেন যে, এই কেন্দ্রে বেশি মাত্রায় নকল হচ্ছে। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ যদি এই কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল না করতেন, তবে কি সাধু ছাত্রদের বেশি উপকার হতো? অসাধু ছাত্রেরা নকল করে অনেক নম্বর পেয়ে যেত। সাধু ছাত্রেরা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারত না। ফলে তারা নানা-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং পরের বৎসর থেকে সাধু ছাত্রদের অনেকেই স্বার্থরক্ষার জন্য নকল করা শুরু করত। সাধু ছাত্র ও জাতির পক্ষে কি এটা ভাল হতো? পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় অসাধু ছাত্রেরা তাদের অন্যায় কর্ম থেকে লাভ করতে পারবে না। এর পর নূতন পরীক্ষা যদি অপেক্ষাকৃত ভালভাবে নেয়া যায় তবে ভাল ছাত্র ভাল নম্বর পাবে। খারাপ ছেলে নকল করে তাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে না। এই ব্যবস্থায় কি সাধু নিরপরাধ ছাত্রকে "শাস্তি" দেওয়া হলো, না সত্যিকারের উপকার করা হলো? পরীক্ষা বাতিলের ফলে সাধু নিরপরাধ ছাত্রকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে—এ কথার মধ্যে তাহলে কতটুকু সত্য আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিরপরাধ ছাত্রদের উপর নকল অপরাধের দুর্নাম চাপিয়ে দিচ্ছেন—এ কথাও অনেক শোনা যাচ্ছে। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই দুর্নাম বিশ্ববিদ্যালয় চাপিয়ে দিচ্ছে না, দিচ্ছে তাদের সহপাঠী অসাধু ছাত্রের দল। তারা পরীক্ষার হলে ব্যাপকভাবে নকল করেছে—সমস্ত সংবাদপত্রে এ কথা বেরিয়ে গেছে। ফলে সবাই জানে যে, এই ব্যাচের ছাত্র নকলী ছাত্র—আসলী চিজ্ নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় নকলের দুর্নাম থেকে ভাল ছাত্র-দের রক্ষা করার জন্য লড়াই দিচ্ছে। এই ধরনের কঠোর ব্যবস্থাবলম্বনের ফলে যদি ছাত্রদের মতিগতি ফেরে, নকল কমে যায়, তবে সাধু ছাত্রদের সুনাম ও ভবিষ্যৎ দুই-ই রক্ষা পাবে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি পরীক্ষা বাতিল না করে অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের মত চোখ বুজে থাকতেন, তবে কি নিরপরাধ ছাত্রদের উপকার ও সুনাম বেশি হতো? কাজেই কর্তৃপক্ষ নিরপরাধ ছাত্রদের "শাস্তি" দিচ্ছেন একথা বলা কি ঠিক হচ্ছে? এই ছাত্রদের কিছু অসুবিধা হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরীক্ষা বাতিল পদ্ধতি থেকে যদি কোন সুফল পাওয়া যায় তবে এদের এবং ভবিষ্যতের বহু নিরপরাধ ছাত্রের প্রভূত উপকার হবে। পরীক্ষার হলে যখন বিরাট টোকাটুকি চলেছিল ও অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণ ভয়ে চোখ বুজেছিলেন, তখন সমালোচকেরা কেউ নিরপরাধ ছাত্রদের ক্ষতির কথা ভেবে বিনিদ্ররজনী যাপন করেন নি। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যখন এদের সত্যিকারের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিলেন, তখন এই ছাত্রদের সাময়িক অসুবিধার কথা ভেবে সমস্ত অপরাধ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্কন্ধে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এইভাবে বহু কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল না করে অন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া কি সম্ভব নয়। যার ফলে নিরপরাধ ছাত্রের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হবে না? কেবলমাত্র

একটি ব্যবস্থায় নিরপরাধ ছাত্রকে বিপদে পড়তে হয় না। যে কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা হচ্ছে সেখানকার অধ্যক্ষকে এবং অধ্যাপকগণ যদি ঠিক মত গার্ড দেন, সাহস করে দোষী ছাত্রের রোল নম্বর ও রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পাঠিয়ে দেন তবেই নির্দোষী ছাত্র এই ধরনের বিপদে পড়ে না এবং দোষী ছাত্রের শাস্তি হয়। কিন্তু অধ্যক্ষ ও শিক্ষকেরা ভয়ে কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠান না। তা যদি না করা হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয় আর কি ভাবে দোষী নির্দোষীর প্রভেদ করবেন? কেউ কেউ বলেছেন যে, পরীক্ষার হল থেকে যখন কোন নকলের রিপোর্ট আসছে না, তখন পরীক্ষকদের বলা হোক যে তাঁরা খাতা দেখে কে কে এবং কতটা নকল করেছে সে সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করুন। এখানেও সেই একই বাধা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষকেরা কোন রিপোর্ট দেন না। আইন পরীক্ষার সময় কি হয়েছিল তা পূর্বেই লেখা হয়েছে। পরীক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আবার বলেন যে, কোন লেখা নকল ও কোনটি মুখস্থ করে লেখা এ প্রভেদ সব সময়ে করা যায় না। সেই জন্য তাঁরা নকলের রিপোর্ট দিতে পারেন না। তা ছাড়া রিপোর্ট দেয়া নিয়ে ভয়ও যথেষ্ট আছে। যাদের বিরুদ্ধে নকলের রিপোর্ট হবার সম্ভাবনা তারা সব সময়ে শান্ত স্থির ছাত্র নয়। কোন পরীক্ষক তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছেন এ জানা তাদের পক্ষে খুব শক্ত হবে না। তারপর তাদের আক্রোশ গিয়ে পড়বে এই সব পরীক্ষকের উপর। সুতরাং পরীক্ষার হলে হাতেনাতে ধরা খাতা দেখে নকল রিপোর্ট দেওয়া উভয় ব্যবস্থায় একই বিপদ রয়েছে। বিশেষ ভাবে এম-এ, এম-কম, ল প্রভৃতি পরীক্ষায়—যেখানে শিক্ষকেরাই খাতা দেখেন। সুতরাং এই পদ্ধতিও কার্যকর করা যাবে না।

ছাত্রদের মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে কে দোষী কে নির্দোষী তা ঠিক করার কথাও অনেকে বলেছেন। মৌখিক পরীক্ষায় নকল সম্ভব হয় না—কারা পড়াশুনা করেছে বা করে নি—তা সহজেই বোঝা যায়। পরীক্ষার খাতায় টুকে নম্বর পেলেও মৌখিক পরীক্ষায় ঠিক ধরা পড়ে যাবে। পার্ট টু পরীক্ষায় প্রায় দশ হাজার ছাত্রের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদের মৌখিক পরীক্ষা নিতে বহু সময় লেগে যাবে। আর তাছাড়া এই ব্যবস্থায়ও বহু গলদ আছে। দোষী ছাত্র এই অজুহাত নিতে পারে যে, "বহুদিন হয়ে গেছে সব ভুলে গেছি।" তখন কি করা যাবে? তাছাড়া ভাল ছাত্রেরা অর্থাৎ যে নকল করে নি সেও একথা বলতে পারে এবং তার বেলায় কথাটা সত্যি হতে পারে। অনেক নিরপরাধ ছাত্র মৌখিক পরীক্ষার সময় এমন ভয় পেতে পারে যে ঠিকমত উত্তর করতে পারবে না। আর এই ব্যবস্থাতেও ভয় দেখানোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। অসাধু ছাত্র অধ্যাপককে ভয় দেখাতে পারে যে আমাকে পাস না করিয়ে দিলে আপনাকে দেখে নেব ইত্যাদি। সুতরাং যতদিন একদল ছাত্র ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করে নেবে এই নীতি অনুযায়ী চলবে এবং অধ্যাপকগণ এই ভয়ের নিকট নতি স্বীকার করবেন ততদিন পরীক্ষার হলের রিপোর্ট, খাতা দেখার রিপোর্ট ও মৌখিক পরীক্ষার রিপোর্ট—কোন ব্যবস্থাই কার্যকর করা যাবে না।

সমস্ত কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল খুব কড়া ব্যবস্থা। শুধু কেবল কড়া শাসন

করলেই এ রোগের চিকিৎসা হবে কি? বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘুণ ধরেছে এবং এর সংস্কার অবিলম্বে না করা হলে শুধু কেবল নকলের বিরুদ্ধে অভিযান করলে চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে কিছু করছেন না কেন? শুধু একদিকে দৃষ্টি দিলে হবে না—দুদিকই দেখতে হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কথা এবং এর আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কর্তৃপক্ষও জানেন। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে আলোচনা চলছে। পরীক্ষা সংস্কার শিক্ষা-ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির একটি প্রধান অঙ্গ এবং একে সেইভাবেই দেখতে হবে। আসলে শুধু কেবল পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে নকল বন্ধ করা যাবে কিনা সন্দেহ। পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দু-একটি সংস্কারের কথা আলোচনা করলেই এটা বোঝা যায়। অনেকে বলেন যে, দু-এক বৎসর অন্তর একটি পাবলিক অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড পর্যায়ের পরীক্ষা করার ফলে নকল বাড়ছে। কারণ ছাত্রেরা এত পড়ার চাপ সইতে পারছে না। সেচনাক্ত পরীক্ষা বা সেমিস্টার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে আরো ঘন ঘন পরীক্ষা নেয়া

হোক। অর্থাৎ প্রতি চার পাঁচ মাস অন্তর এই কয় মাসে যা পড়ান হয়েছে তার ভিত্তিতে পরীক্ষা নেয়া হোক। পরীক্ষা অবশ্য স্কুল বা কলেজে হবে। এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল যোগ দিয়ে প্রত্যেক ছাত্রের পাস ফেল ঠিক করা হবে। সমস্ত পাঠ্যবিষয় একসঙ্গে তৈরী করার দায় থেকে ছাত্রেরা মুক্তি পাবে—অল্প অল্প কোর্স পড়ে ঘন ঘন পরীক্ষা দেবে। তার ফলে আশা করা যায় যে নকল করার ইচ্ছা বা প্রয়োজন কমে যাবে। এ হলো স্বাভাবিক অবস্থার কথা। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র—যারা নানা কারণে পড়াশুনো করে না বা করতে চায় না—তারা কলেজের পরীক্ষায় যে নকল করবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে? তারা যে ভয় দেখিয়ে জোর করে নম্বর আদায়ের চেষ্টা করবে না তা কি বলা যায়? কিছু ছেলে নকল করে বেশ ভাল নম্বর পাচ্ছে ও তাদের কেউ ধরতে সাহস পাচ্ছে না—এ দেখলে অনেক ছেলেই নকলের পথ ধরবে। সুতরাং এই ধরনের সংস্কার করা হলেই যে নকল কমে যাবে এর নিশ্চয়তা নেই।

আবার অনেকে বলেন যে, নকল যাতে না করতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দেয়া হোক। এমন ধরনের প্রশ্ন দেয়া হোক যার উত্তর কোন বই থেকে পাওয়া যাবে না। তাহলে ছাত্রদের বলা হোক যে তোমরা ইচ্ছা করলে বই দেখেও লিখতে পার। প্রথম নম্বর—হলের ভিতরে ভাল ছাত্রদের খাতা জোর করে কেড়ে নিয়ে তার লেখা উত্তর টুকে নিচ্ছে—এ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। এ বন্ধ করা যাবে কি—প্রহার ও খুনের ভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে? দ্বিতীয়ত, পরীক্ষার হলে গিয়ে যখন দেখবে যে প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাচ্ছে না তখন এই সব ছাত্র টেবিল চেয়ার ভেঙে পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেবে না কি? এখন যেমন তারা তাদের তৈরী প্রশ্নের বাইরে প্রশ্ন এলে করে থাকে? যাঁরা বলেন যে, পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের অভাবে ছাত্রেরা নকল করছে তাঁরা বিষয়টি ঠিকমত তলিয়ে দেখছেন কিনা সন্দেহ। নকল করাটা এত বেশি কেন বেড়েছে তার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যতদিন পর্যন্ত কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সমস্ত ছাত্র থাকবে যারা লেখাপড়া করতে চায় না বা লেখাপড়ার উপযোগী জ্ঞান বা ইচ্ছা বা সময় যাদের নেই—ততদিন নকল করা বন্ধ হবে কিনা সন্দেহ। এই শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বেড়ে চলেছে কয়েকটি কারণে। এক,—হাইয়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা পাস করে চাকুরি মিলছে না। সুতরাং বহু ছাত্র কলেজে এসে ভীড় করছে যাদের লেখাপড়া বিষয়ে কোন আগ্রহ বা যোগ্যতা নেই। এরা কলেজে আসছে এই ভেবে যে কোন প্রকারে আর একটি ডিগ্রি জোগাড় করতে পারলে হয়ত চাকুরির বাজারে সুবিধা হবে। এদের লক্ষ্য যেন তেন প্রকারেণ ডিগ্রি নেয়া—লেখাপড়া করা নয়। নানা কারণে এই শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে,—বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু কর্মীও এর মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কলেজগুলিতে ঠিকমত পড়াশুনো না হওয়া। বৎসরের মধ্যে কম দিনই ক্লাস হয়। আর শিক্ষকেরাও অনেক সময় ঠিকমত পড়ান না—সমস্ত কোর্স শেষ করার কোন চেষ্টা করেন না। কাজেই কিছু ছাত্র বাধ্য হয়ে চলে নকলের পথে যায়। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে সেই সমস্ত ছাত্র—যারা প্রথম দিকে নকল করতে চায় নি। কিন্তু এরা দেখছে যে নকল করে কিছু ছাত্র বেশ ভাল নম্বর পাচ্ছে এবং তাদের কোন শাস্তি হচ্ছে না। কাজেই তারাও নকলের পথে এগিয়ে চলেছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, এই কাজে তারা অনেক সময়ে অভিভাবকের সমর্থন পায়। এই শ্রেণীর ছাত্রদের কিছু অংশ বিপ্লবী ছাত্রদের টেকনিক অনুসরণ করে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের নিষ্ক্রিয় করে দিতে পেরেছে বলেই সাধারণভাবে ছাত্রদের নকল করার সুবিধা বেড়ে গেছে। নকল করলে যখন কোন শাস্তি নেই—উপস্থিত শিক্ষকেরা কিছু বলছেন না—তখন অনেক ছাত্রই নকলের সহজ পথ বেছে নিচ্ছে।

এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষকদের সম্মিলিত সহযোগিতা ব্যতীত নকল বন্ধ করা যাবে কিনা সন্দেহ। তাঁরা যদি দৃঢ় নীতি নিয়ে পড়ান ও পরীক্ষার হলে সাহস করে নকলের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তবে দু এক বৎসরের মধ্যে নকল বহু পরিমাণে কমে যাবে। পরীক্ষার হলে সাহস করে দাঁড়াবার মূলে আছে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, বিশেষ করে আইনশৃংখলার উন্নতি। তা না হলে শিক্ষকদের পক্ষে নকলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সম্ভব হবে না। কয়েকটি ছাত্র এই প্রশ্ন তুলেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু শিক্ষকগণ তাদের কর্তব্য ঠিকমত করছেন না বলেই ত আজ এই অবস্থা হয়েছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের শাস্তি না দিয়ে শুধু কেবল ছাত্রদের শাস্তি দিচ্ছেন কেন? সব দোষ ছাত্রদের ঘাড়ে কেন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? শিক্ষকদের এই কথা বলতে তাঁরা জবাব দিয়েছেন যে ছাত্রেরা যদি শিক্ষকদের অপমান, প্রহার ও হত্যার নীতি ত্যাগ করে তবেই শিক্ষকদের কর্তব্যচ্যুতির কথা ওঠে। এবং তখনই তাদের শাস্তি দেবার কথা উঠবে। কিন্তু ছাত্রেরা যতদিন এই ধরনের সন্ত্রাসের নীতি ত্যাগ না করে ততদিন শিক্ষকদের দায়ী করা উচিত হবে কি? সমস্ত প্রশ্নটি তাহলে আইনশৃংখলার বিষয়াধীন হয়ে পড়ছে ও ছাত্র আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা দরকার হতে পারে।

ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করার সুযোগ যারা নিচ্ছে তারা আইনশৃংখলার বিশেষ উন্নতি না হলে সে পথ ছাড়বে বলে মনে হয় না। নকলের জন্য ছাত্রদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। কাজেই তাদের দিক থেকে এর বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থাবলম্বনের কথা ভাবতে হবে। একথা ঠিক যে বর্তমানের সন্ত্রাসের নীতি চালু থাকলে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকেরা অসাধু ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন রিপোর্ট পাঠাবার সাহস পাবেন না। এই অবস্থায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কিভাবে করা যায় এ খুবই কঠিন সমস্যা। শুধু তাই নয়, কোন প্রকারের পরীক্ষাই ঠিকমত নেয়া সম্ভব হবে কিনা একথাও ভাবতে হবে। এই শ্রেণীর ছাত্রদের কার্যকলাপের ফলে পরীক্ষা ব্যবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে কোনরকম পরীক্ষা সংস্কার করে এই রোগের চিকিৎসা হবে কিনা সন্দেহ। বরং একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তুলে দেয়া হোক। প্রত্যেক কলেজ থেকে ছাত্রদের সার্টিফিকেট দেয়া হোক যে তারা কলেজে নিম্নলিখিত কোর্সগুলি পড়েছে। ঠিকমত পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হলে একথাও সার্টিফিকেটে লেখা যায় যে তারা পরীক্ষা পাস করেছে। চাকুরির বাজারের যারা মালিক তারা ছেলেমেয়েদের যাচাই করে কাজ দেবেন—যা আজকাল প্রায় অধিকাংশ সরকারি পোস্টের জন্য করা হচ্ছে। শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের সময় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেই এই ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে। আমাদের এই বিরাট দেশে যেখানে জনসংখ্যা বিপুল—এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হলে বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং ছাত্র জীবন থেকেই বাধ্যতামূলক দুর্নীতি গ্রহণের হাত থেকে বহু ছাত্র রক্ষা পাবে।

॥ ৩৭ ॥

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ শুধু মানচিত্র নয়, বিস্তৃত এক ভূখণ্ডও নয়, অগণিত নরনারীর শুধু সমাবেশও নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত।"

দেশ-দেশান্তরের মানুষের এই প্রকাশের ধারা যে কত বিচিত্র, কত ক্লান্তিহীন, কত ঐশ্বর্যময় তা ভাবলে অবাক হতে হয়। চিন্ময় বাংলার ক্ষেত্রেও দেখি তার শাশ্বত মনোময় রূপটি দূরকালব্যাপী নিরলস সাধনায় পুষ্ট। পরিসরের বিস্তৃতিতে উপকরণের বৈচিত্র্যে ও সঞ্চয়ের অপরিমেয়তায় বঙ্গ-সংস্কৃতি-নিকেতন যেন কুবেরের ধনভাণ্ডার। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে সে কৃতিসম্পদ দিকে দিকে প্রসারিত। লক্ষ্মীর পদপাতে, চারুকলায়, স্থাপত্য ভাস্কর্যে, মূর্তিশিল্পে, লোকাচারে, কিংবদন্তীতে, অশন-বসন-রূপসজ্জায়, তার গার্হস্থ্যালীর কমনীয় মাধুর্যে তা বিধৃত। পটুয়ার চিত্রে, সূত্রধরের কারুকার্যে, বাউলের গানে, গ্রামীণ লোকনৃত্যে, পৌরাণিক কথকতায় যাত্রাভিনেতার অভিনয়ে, কুলবধূর নকশি-কাঁথায়, পল্লীবালার আলপনায়—বাঙালীর চিরায়ত সংস্কৃতি বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত। বাঙালীর বাঙালিয়ানা তার নিজস্ব খেলনা-পুতুলে, তার ছেলে-ভুলানো ছড়ায় যেমন অভিব্যক্ত তেমনি প্রকাশিত তার মঙ্গলকাব্যে, সুললিত বৈষ্ণব পদাবলীতে অথবা বিস্ময়কর রবীন্দ্র-সাহিত্যে। দিগন্ত-বিস্তৃত এই সুবিশাল কৃতিসম্পদ উভয় বাংলার গ্রামে নগরে যুগ-যুগান্তর ধরে অনুশীলিত হয়েছে, সংবর্ধিত হয়েছে। কিন্তু কালের প্রকোপে বা অন্য কারণে রক্ষিত হয়নি অনেক ক্ষেত্রে। জাতীয় ঐতিহ্যের নানাবিধ নিদর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে সব প্রতিষ্ঠান সে সবের সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন তাঁদের ভূমিকার যথেষ্ট প্রশংসা করা যায় কিনা সন্দেহ। সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গে এ-জাতীয় সংগ্রহশালা বেশ কয়েকটি আছে। ফলে, চিরায়ত বঙ্গ-সংস্কৃতি বিষয়ে কেউ যদি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আহরণ করতে চান তবে তাঁর পক্ষে এসব গ্রামীণ মিউজিয়মগুলি পরিদর্শন করা অপরিহার্য। বর্তমান ও পরবর্তী কয়েকটি পর্বে গ্রামবাংলার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালাগুলি সম্বন্ধে লিখব। কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর বা আশুতোষ মিউজিয়ম থেকে তারা অনেক ছোট হতে পারে, কিন্তু গ্রামীণ ঐতিহ্যের প্রতিফলন ও কর্মীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তারা সমুজ্জ্বল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা বহু দিনের নিরলস সাধনায় যে উৎকৃষ্ট সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলেছেন সেটিই আজকের আলোচনার বিষয়।

বাঁকুড়া জেলার মহকুমা-শহর বিষ্ণুপুরে ট্রেনে কিংবা বাসে যেভাবেই উপস্থিত হওয়া যাক না কেন, মল্ল আমলের বিখ্যাত রাসমঞ্চ অথবা অতি-আধুনিক কালের টুরিস্ট লজের অদূরে অবস্থিত এ মিউজিয়ম ভবনে পৌঁছাতে কারোরই কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। বাঁকুড়ার সুসন্তান আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রাঢ় অঞ্চলের, বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার সংস্কৃতি-সম্পদ সংগ্রহ করবার জন্য এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন। কয়েকটি পুরাবস্তু দান করে তার পত্তনও করেন তিনি। কিন্তু সেই বীজকে আজকের মহীরুহে পরিণত করতে যিনি দীর্ঘকাল একক পরিশ্রম করেছেন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক শ্রীমানিকলাল সিংহ। তাঁর মতো নিরলস কষ্টসহিষ্ণু ও নিরভিমান 'ফিল্ড-ওয়ার্কার' আমি বেশি দেখিনি। প্রধানত তাঁর এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর চেষ্টায়, বিদ্যানিধি মহাশয়ের নামের সঙ্গে যুক্ত এই "আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে" বাঁকুড়া ও রাঢ়ের চিরায়ত সংস্কৃতির পরিচায়ক যত অসংখ্য বস্তু সংগৃহীত হয়েছে তার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন করেন কবিশেখর কালিদাস রায়। বিদ্যানিধি

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ ভবন

সুপ্রাচীন 'টেরাকোটা' তীর্থংকর মূর্তি
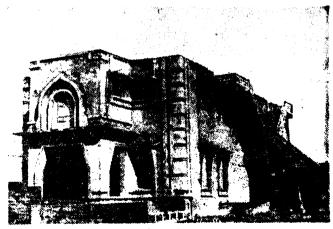
মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৪ সালে তাঁর অনুমতিক্রমে মিউ-জিয়মটির বর্তমান নামকরণ করা হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা আর "আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন" পরস্পরের পরিপূরক প্রতিষ্ঠান। দুটি একই গৃহে অবস্থিত এবং তাদের উদ্দেশ্য একই—বাঁকুড়া জেলা তথা রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর আলোকপাত করা। গত কুড়ি-একুশ বছরের চেষ্টায় যে ভূরি পরিমাণ কীর্তিসম্পদ তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, দুঃখের বিষয়, তা প্রদর্শনের জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় স্থান নেই। ভবনটি দোতলা করবার পরিকল্পনা থাকলেও, অর্থাভাবে, একতলাটি কোনরকমে সম্পূর্ণ হয়েছে। তাও হয়ত হত না যদি স্থানীয় ভট্টাচার্য পরিবার দশ কাঠা জমি দান না করতেন, বিষ্ণুপুরের কে জি ইঞ্জি-নিয়ারিং বিদ্যায়তনের জনৈক সহৃদয় অধ্যাপক ইমারত নির্মাণের যাবতীয় দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে পালন না করতেন ও পরি-ষদের তৎকালীন সভ্য নানাভাবে সাহায্য না করতেন।

এবার "আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন"-এর সংগ্রহের আলোচনায় আসা যাক। সংখ্যার দিক থেকে প্রাচীন পুস্তক-পত্রিকা ও পুঁথিই প্রধান—প্রায় পাঁচ হাজার। আর কোন গ্রামীণ মিউজিয়মে এত বিশাল পুঁথি-সংগ্রহ আছে বলে আমার জানা নেই। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা সব ভাষারই পুঁথি এখানে আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পুঁথি-গুলি সাধারণত সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত। এদের মধ্যে প্রায় ৪৫০ বৎসরের প্রাচীন, তারিখযুক্ত, একটি বিষ্ণুপুরাণের কপি খুবই উল্লেখ-যোগ্য। অন্যদিকে বাংলা পুঁথিগুলির বিষয় প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, লৌকিক কাব্য, পাঁচালী ইত্যাদি।

বাঁকুড়া জেলার গ্রাম-গ্রামান্তর থেকেই এদের অধিকাংশ সংগৃহীত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এই জন্য যে, মল্ল-আমলে বিষ্ণুপুর সাহিত্য, সংগীত ও অন্যবিধ কৃষ্টিচর্চার প্রখ্যাত কেন্দ্র ছিল এবং সে বৈভবের পরিমণ্ডল শুধু রাজধানীতে সীমিত না থেকে চারদিকের গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ এ প্রতিষ্ঠানের বিরাট পুঁথিশালায় বসে যে কোন গবেষক ধারণা করতে পারবেন অতীতে কী সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্র ছিল বিষ্ণুপুর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল। দীর্ঘকাল পরে সে নষ্ট সম্পত্তির অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র উদ্ধার করে "যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের" এত বড় পুঁথিশালা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় দাশগুপ্ত পরিবারের প্রদত্ত সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের এক অমূল্য সংগ্রহ ও আর একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে পাওয়া রবীন্দ্র সাহিত্যের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়।

পাথর, পোড়ামাটি ও কাঠের মূর্তি, শিলালেখ, শীল, মৃৎপাত্র, অস্ত্র প্রভৃতির সংগ্রহটি খুব বড় না হলেও বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বিভাগে আছে নবাপ্রস্তর যুগের বিবিধ হাতিয়ার; অতি প্রাচীন পোড়ামাটির বাসনকোসন, শীল, জৈন তীর্থংকর মূর্তি; মন্দির টেরাকোটার প্রচুর নিদর্শন; গুপ্ত-পালযুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের পাথরের সূর্যমূর্তি, অনন্তশয়ান বিষ্ণুমূর্তি, ত্রিমুখ দশভুজা দুর্গা, নটরাজ, উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণুপট্ট, শিখর-দেউলের দুটি ছোট নিখুঁত নিদর্শন ও গরুড়ধ্বজের উপরের গরুড়-মূর্তি প্রভৃতি এ বহুসংখ্যক শিলালিপি। শেষোক্ত পুরাবস্তুগুলির নজিরে বাঁকুড়া জেলার অধুনালুপ্ত কয়েকটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এই বিভাগের সংগ্রহ কার্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আমি কৃতার্থ। প্রসঙ্গত বলছি অনন্তশয্যায় শয়ান পাথরের বিষ্ণুমূর্তিটি আমি জয়পুর থানার গোকুলনগর গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে একদা এই মিউজিয়মে দান করেছিলাম। সকলেই জানেন, পাল-সেন যুগের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু-মূর্তি যথেষ্ট আবিষ্কৃত হলেও অনন্ত-বিষ্ণুমূর্তি বেশি পাওয়া যায়নি। সেদিক থেকে, প্রায় সাড়ে চার ফুট দীর্ঘ ও দু ফুট উচ্চ এই বৃহদাকার প্রস্তর-ভাস্কর্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

"যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের" প্রাচীন মুদ্রা-সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ। মৌর্য, কুশান, গুপ্ত ও মুসলমান যুগের বিবিধ মুদ্রার অধিকাংশই বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। প্রাপ্তিস্থান—বহু ক্ষেত্রে—পুরাতন মন্দিরের সংলগ্ন তুলসীমঞ্চ। মনে হয়, অতীত কালে, তুলসীমূলে সোনারূপা দান করার রীতিতে মুদ্রাও উৎসর্গ করা হত।

মধ্য-রাঢ়ের লোকশিল্পের বহু নিদর্শন এই সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। ডোকরা-কামারদের তৈরি বিবিধ তৈজসপত্র, দেব-দেবী মূর্তি ও "লক্ষ্মী-সাজ"; বিষ্ণুপুর, হাটগ্রাম প্রভৃতি কেন্দ্রের বিখ্যাত শাঁখের কাজ; মাটি খুঁড়ে পাওয়া আদিবাসী রমণীদের প্রাচীন অলঙ্কার; বিষ্ণুপুরে প্রস্তুত রেশমবস্ত্রের ধারাবাহিক সংগ্রহ; পাঁচমুড়া সোনামুখী প্রভৃতি গ্রামের মৃৎশিল্পের নিদর্শন; বাঁকুড়া জেলার পটুয়াদের আঁকা নানারকম পট; দু-তিন শ বছরের প্রাচীন বেশ কয়েকটি পুঁথির চিত্রিত "পাটা"; বিভিন্ন প্রকারের দশাবতার তাস ইত্যাদি। স্থানীয় কুটিরশিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন ও জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রেও এ প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। পাঁচমুড়ার মাটির হাতি-ঘোড়া ও বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস প্রভৃতি দিল্লি ও কলকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে তাঁরাই সর্বপ্রথম সেসব গ্রামীণ শিল্পকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া আজ

লেখক কর্তৃক সংগৃহীত অনন্ত বিষ্ণুমূর্তি

প্রাচীন শিলালিপি

শুধু অল-ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস বোর্ডের প্রতীক-চিহ্নই নয়, দেশে বিদেশে বিপুল-ভাবে সমাদৃতও বটে।

বাঁকুড়া জেলার অসংখ্য পুরাকীর্তির আলোকচিত্র সংগ্রহটিও এ মিউজিয়মের গৌরবের বিষয়। সাধারণ লোকের ধারণা, এ জেলার যাবতীয় মন্দির বুঝি বিষ্ণুপুর শহরেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু উৎকর্ষে ও প্রাচীনত্বে অধিকতর মূল্যবান বহু মন্দির যে এ জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়ানো সে কথা দর্শনার্থীরা এই ফটোগুলি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

"যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের" বিশাল সংগ্রহের কথাই এতক্ষণ বললাম। কিন্তু এগুলি শুধু সাজিয়ে রেখেই এ প্রতিষ্ঠান তাঁদের কর্তব্য শেষ করেননি। গত কুড়ি একুশ বছর ধরে সমস্ত জেলার পক্ষে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তাঁরাই বহন করেছেন একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বিষ্ণুপুরের সংগীত-ঐতিহ্য বঙ্গ-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সে 'ঘরানা'র সুস্পষ্ট রূপনির্ণয়ের জন্য এই প্রতিষ্ঠান ও বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ যৌথভাবে "গোপেশ্বর স্মৃতি-বক্তৃতামালা"র ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনন্দগোপাল সেন-গুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্রালঙ্কার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ-দের রচিত সে বক্তৃতাগুলি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশের পথে। কয়েক মাস আগে বিষ্ণুপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতেও সমস্ত জেলার সংগীতরসিকেরা যোগদান করেন। এ ছাড়া, পুরাবস্তুদাতাদের দান স্বীকার করবার জন্য প্রতি বৎসরই সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে তাঁদের পদক বা প্রশংসাপত্র দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। এসব অনুষ্ঠানে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু প্রমুখ সুধীজন সভাপতিত্ব করেছেন।

এতক্ষণ "যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন" ও বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের বিচিত্র কার্য-ক্রমের যে বর্ণনা করলাম, তা সহজেই জানা যায়, সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এ-সবের অন্তরালে যে প্রবল প্রাণশক্তি এ-দুটি প্রতিষ্ঠানকে সজীব রেখেছে তা কেবল অনুভবযোগ্য। আমার মতে, চারিদিকে প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে নিবিড় ও নিরন্তর সংযোগ রক্ষা করা যে কোন লোক-সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রধান কর্তব্য। সে স্রোত-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলো তাদের সংগ্রহশালা অন্ধকারভাণ্ডার। সুখের বিষয়, বিষ্ণুপুরের এ প্রতিষ্ঠান দুটি বাঁকুড়ার জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত সংযোগ রেখে তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন। জেলার দূর পল্লী অঞ্চলেও তাঁরা অপরিচিত নন; তাঁদের সংগ্রহভাণ্ডারে আরও দান করবার জন্য গ্রামবাসীরা সর্বদাই উদ্গ্রীব। এই যোগাযোগ ও সহমর্মিতা যদি অব্যাহত থাকে তা হলে রাঢ়ের কৃষ্টিসম্পদে "যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন" যে অদূর ভবিষ্যতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠবে তাতে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই।

(ক্রমশ)

[প্রবন্ধে আলোকচিত্রগুলি বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ ও অন্যান্য স্থান থেকে লেখক কর্তৃক গৃহীত]

।। আট ।।

বন-এ নেতাজী সম্মেলন কয়েকটা দিন পিছিয়ে গেল। যে সময়ে দিন স্থির ছিল তার মধ্যে একটা উইক-এন্ড পড়ে যাওয়াতে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ডাঃ আলেকজান্ডার ওয়ার্থ চিঠি লিখলেন—জার্মান ফরেন আফিস এবং সংবাদপত্রের লোকেরা কাজের সুবিধার জন্য কয়েকদিন পিছিয়ে দিতে বলছে, বন-এর ভারতীয় দূতাবাসেরও তাই মত। আমাদের আপত্তির কোন কারণ নেই আমরা পুরানো বন্ধু ডাঃ লোথার ফ্রাংকের সঙ্গে কয়েক দিন কাটাতে উইসবাডেন চলে গেলাম।

বার্লিন থেকে প্যান-আম-এ ফ্রাংকফার্ট এসে নামলাম। পশ্চিম বার্লিনের টেম্পল-হোফ বিমান বন্দরটি খুবই সমৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত মনে হল। হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এই ফ্লুগহাফেনের মাধ্যমেই প্রধানত বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পশ্চিম বার্লিনের যোগ। ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্ট থেকে লোথার ফ্রাংক আমাদের উইসবাডেন নিয়ে এলেন। ফ্রাংকফুর্ট-উইসবাডেন পথের দু ধারে আপেল গাছের সার। গাছগুলো আপেলের ভারে আনত, আপেলের গাঢ় লাল রঙে গাছের সবুজ ঢাকা পড়ে গেছে। গাছের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে কত আপেল। শুনলাম এদেশ আপেলে অরুচি, ভাবলাম পারলে কিছু কলকাতা নিয়ে যেতুম।

উইসবাডেন একটি সুন্দর জার্মান, পাহাড়ী শহর। অবশ্য এ শহর সুইটজারল্যাণ্ডে হতে পারত, কাশ্মীরেও হতে পারত। ফ্রাংক যখন তাঁর নেতাজী সংক্রান্ত লেখার কাজের জন্য কিছুকাল কলকাতায় কাটিয়েছিলেন তখন কলকাতার হতশ্রী চেহারা ওঁকে খুব পীড়া দিত। আমি এতে কষ্ট বোধ করতাম। থিয়েটার রোডে ওঁর বাসস্থান থেকে এলগিন রোডে নেতাজী ভবনে ছিল ওঁর নিত্য যাতায়াত। আমি ভাবতাম এ তো কলকাতার পরিচ্ছন্নতম এলাকা, এতেই এত কাতর হবার কি আছে। উইসবাডেনে পা দিয়ে বুঝলাম এ শহরের অধিবাসীর পক্ষে কলকাতায় প্রবাসজীবন যন্ত্রণাদায়ক হতে বাধ্য।

প্রকৃতি যেমন অকৃপণ হাতে উইসবাডেনকে সুন্দর করে গড়েছে, মানুষের হাতের ছোঁয়ায় তেমনি এ শহর সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। শহরের মাঝখানে বিস্তীর্ণ গালিচার মত সবুজ মাঠ, তাতে মরসুমি ফুলের বাহার, মাঝে মধ্যে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ। চারপাশে পাহাড়ের ঢালে ঘরবাড়ি, গাছপালা সব মিলে মিশে নিখুঁত প্যাটার্ন। পথঘাট পরিষ্কার, ঝকঝক করছে। শহরের কাছাকাছি কোন কারখানা করবার অনুমতি দেওয়া হয় না—পাছে কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় আবহাওয়া পঙ্কিল হয়। শহর থেকে কিছু দূরে রাইন নদীর তীরে একটি মাত্র কারখানা আছে, তাতে শ্যাম্পেন তৈরি হয়। বার্লিন থেকে এসে আরো যা ভাল লাগে, যুদ্ধের কোন ক্ষতচিহ্ন এ শহরের গায়ে নেই। উইসবাডেনে আমেরিকানদের একটি এয়ার-বেস আছে। ফ্রাংক তাই বলেন—ওরা আস্তানা গাড়বে বলে জায়গাটা আগেই পছন্দ করে রেখেছিল কিনা, তাই আর বোমা-টোমা ফেলে ধ্বংস করেনি। যদিও অদূরে ফ্রাংকফুর্ট শহর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ফ্রাংকদের ছিমছাম, ছোট, দোতলা বাড়ি। পিছনে বাগানে পীচ ফলের গাছ ফলে ভরে আছে। গাছ থেকে পীচ পেড়ে নিয়ে খেতে খেতে বাগানে ঘুরে ঘুরে মিসেস ফ্রাংকের সঙ্গে গল্প হত রোজ। ওদের রাস্তাটার নাম Schauinsland—সার্থকনামা বলা যায়। সত্যিই সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়।

ফ্রাংক বললেন আলেকজান্ডার ওয়ার্থ যে রকম আয়োজন করছেন বন-এ—টেলিফোনে রোজ যা খবর পাচ্ছি—বন-এ পৌঁছলে তোমরা এক মিনিট নিঃশ্বাস ফেলতে সময় পাবে না, একেবারে মিনিট-টু-মিনিট প্রোগ্রাম। উইসবাডেনে কদিন একটু রিল্যাক্স করে নাও। সেই রকমই ইচ্ছা ছিল। ফ্রাংকের কাছে ত্রিশ দশকে নেতাজীর য়ুরোপে প্রবাসজীবনের গল্প শুনব আর মাঝে মাঝে মিসেস ফ্রাংক গাড়ি চালিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু বিশ্রামের যে খুব সময় পাওয়া গেল তা নয়।

হাইডেলবার্গ থেকে সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ ডিটমার রোথারমুন্ড টেলিফোন করলেন। ওঁরা উইসবাডেন আসবেন আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে, না আমরা হাইডেলবার্গ যাব ওঁদের কাছে—এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। রোথারমুন্ডের ভারতীয় স্ত্রী ইন্দিরা বললেন, তোমরাই আমাদের কাছে এসো। তুমি তো হাইডেলবার্গ দেখোনি দেখা হয়ে যাবে,

ডাঃ বসু অনেক দিন আগে এসেছেন—পুনর্দর্শনে ভালই লাগবে।

মিসেস ফ্রাংক ড্রাইভিং-এ সুদক্ষ। ও'র হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং, পাশে আমি সিটের সঙ্গে বেলট দিয়ে বাঁধা, পিছনে ডাঃ বসু ও লোথার ফ্রাংক হাইডেলবার্গ রওনা হয়ে পড়লাম। এবার য়ুরোপে কি চেকোশ্লোভাকিয়া, কি জার্মানী, কি সুইজারল্যান্ড—সর্বত্র বেলটের বাঁধনে গাড়ি চড়েছি। অটোবান বা মোটরওয়ে দিয়ে যে প্রচণ্ড স্পীডে গাড়ি চলে তাতে নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য। আমাদের সুইস বন্ধু গিডিয়ন গাড়িতে উঠেই এয়ার হোস্টেসের গলা নকল করে বলে উঠত—"ফ্যাসেন ইওর সীট বেলট আনড নো স্মোকিং প্লিজ।" অবশ্য আমার মনে হত এরকম প্রচণ্ড গতিতে গেলে সত্যিই যদি কিছু হয় তবে বেলট বাঁধা বা না বাঁধায় কিছু কি যায় আসে।

ডিটমার ও ইন্দিরা রোথারমুনডের বসবার ঘরে টেবিলের ওপর নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর বুলেটিন ও জার্মান ভাষায় লেখা নেতাজীর জীবনী Der Tiger Indiens সাজানো রয়েছে দেখে ভাল লাগল। গৃহস্বামিনীর প্রভাবেই বোধ হয় এদের সংসারে ভারতীয় ছাপ পড়েছে অনেক জায়গায়। লাঞ্চের সময় ও'র ভারতীয় রেকর্ড সংগ্রহ থেকে রোথারমুনেড জয়া বিশ্বাসের সেতার বাজনা শোনালেন। এক সময় ঘরের কোণে রাখা একটি শাঁখ তুলে নিয়ে দুবার ভোঁ করে বাজিয়ে দিলেন। মিসেস ফ্রাংক শঙ্খধ্বনি শুনে মুগ্ধ, এমন গম্ভীর, সুন্দর আওয়াজ কোনদিন শোনেননি। কলকাতা ফিরে গিয়ে ও'কে একটা শাঁখ পাঠাতে হবে মনে মনে ভেবে রাখলাম।

খাওয়াদাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে সকলে মিলে আলোচনা হল। য়ুরোপের সাউথ এশিয়া সংক্রান্ত স্কলার যাঁরা তাঁরা সকলেই নেতাজী সম্পর্কে একটা নূতন আগ্রহ অনুভব করছেন দেখে উৎসাহ বোধ হয়। রোথারমুনডের বন্ধুস্থানীয় ডাঃ ফয়ট (Voigt) বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে আছেন। তিনিও নেতাজী সম্পর্কে কাজ করছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কলকাতা সফরের সময় নেতাজীর ওপর তাঁর একটি পেপার মাক্সমুলার ভবনে আমরা অনেকে শুনেছিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজীর য়ুরোপে যে ভূমিকা সে সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু জানেন। জার্মানেরা এ বিষয়ে আরো জানবেন তা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ১৯৩৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৮-এর জানুয়ারী পর্যন্ত নেতাজী য়ুরোপের দেশে দেশে ভারতীয় জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের বার্তা বার বার বহন করে এনেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই বছরগুলির কথা কিঞ্চিৎ অবহেলিত। রোথারমুনড তাই ফ্রাংকের কাছে এই দিনগুলির কথা শুনে চমৎকৃত হচ্ছিলেন।

লোথার ফ্রাংকের কাছে এই কাহিনী শোনার আরো একটা চমকপ্রদ দিক আছে। ফ্রাংক একজন সুস্পষ্ট হিটলার-বিরোধী। যুদ্ধের সময় হিটলার-প্রেমিক ছিলেন অথচ যুদ্ধের পর—রাজনৈতিক উত্থানপতনের ইতিহাসে যেমন হয়েই থাকে—রাতারাতি হিটলার বিরোধী হয়ে গেছেন এমন লোক কিছু দেখতে পাওয়া যায়। ফ্রাংক তাদের দলে পড়েন না। ত্রিশের দশক থেকেই উনি ঘোরতর হিটলার-বিরোধী। যুদ্ধের গোড়ায় ৫ জন্য উনি জেল খেটেছেন, একবার জাহাজে করে ও'কে নির্বাসনে পাঠানোর সময় ডেক থেকে ঝাঁপিয়ে সমুদ্রে পড়ে সাঁতার কেটে পালান। সে আর এক

ভারত বন্ধু, 'গান্ধী ও লেনিন' বই-এর লেখক রেনে ফুলপমিলার ও শ্রীমতী ফুলপমিলারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র (ভিয়েনা, ১৯৩৪)

রোমাঞ্চকর কাহিনী। শেষের দিকে উনি নাৎসিদের নজরবন্দী মত ছিলেন। ওই যুদ্ধের সময় নেতাজীর সঙ্গে ওঁর মাত্র কয়েকবারই সাক্ষাৎ হয় এবং প্রতিবারই গোপনে।

সেই ১৯৩৩ সালেই ফ্রাংক নাৎসি দলের সাদা ডিভিডেন্ড গ্রুপ বা বিদ্রোহী দল বলা যায় তাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ করে দেন। এরা নাৎসি দলের ভিতর থেকে গোপন সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করত। এঁরা একটি গোপন সংগঠন ভারতবর্ষকে কিছু সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিল। এর জন্য একটা "প্যাক্ট" তৈরি হয়। চারটি খণ্ডে জার্মান ট্রেডমার্কের এই কোডগুলি সাংকেতিক ছিল। নানা কারণে এই সাহায্যের প্রস্তাব বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি।

ফ্রাংকের সঙ্গে আলোচনায় এই কথাই স্পষ্ট হয় যে সুভাষচন্দ্র নাৎসি জার্মানীর চারিত্রিক শক্তি ও দুর্বলতা দুইদিক সম্বন্ধেই পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। সব কিছু জেনেশুনেই উনি যুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানদের সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন। হিটলার ও তাঁর গভর্নমেন্টের সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ওঁর কোন মোহ ছিল না। তবু উনি কেন জার্মানদের সঙ্গে গেলেন? এ প্রশ্ন আমাকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আমাদের এই তথ্যানুসন্ধানী অভিযানে ফ্রাংক, অ্যালেকজাণ্ডার ওয়ার্থ, নাম্বিয়ার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে সব কিছু ছাপিয়ে মূল একটা কথা আছে তা হল এই যে, সাধারণভাবে জার্মান জাতির ওপর নেতাজীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল।

জার্মান প্রেসে এই সময় ভারত-বিরোধী প্রচার শুরু হত। নাৎসি সরকারের সংকীর্ণ racialist দৃষ্টিভঙ্গী এর জন্য দায়ী ছিল, সুভাষচন্দ্রের এদিকে ছিল সতর্ক দৃষ্টি। ক্রমাগত উনি এই ধরনের সব প্রচারের বিরোধিতা করে গেছেন। কখনো সম্পাদককে চিঠি লিখে, কখনো সরকারী অফিসের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতে। মিউনিখের জার্মান অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর ডাঃ থিয়েরফেলডার ছিলেন সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী এবং ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল। অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টাইন থেকে ডাঃ থিয়েরফেলডারকে লেখা '৩৬ সালের একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্রের ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে। উনি লিখছেন—

"When I first visited Germany in 1933, I had hopes that the new German nation which had risen to a consciousness of its national strength and self-respect, would instinctively feel a deep sympathy for other nations struggling in the same direction. Today I regret I have to return to India with the conviction that the new nationalism of Germany is not only narrow and selfish but arrogant."

থিয়েরফেলডারকে উনি বলছেন যে, এরকম দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাতেও ইন্দো-জার্মান সমঝোতার জন্য চেষ্টা উনি চালিয়ে যাবেন ঠিকই—কিন্তু সে সমঝোতা আমাদের জাতীয় আত্মমর্যাদার মূল্যে কখনোই হবে না।

"When we are fighting the greatest empire in the world for our freedom and for our rights and when we are confident of our ultimate success, we cannot

[illegible]

কবি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে হিটলার সম্পর্কে চিঠি লিখছেন সুভাষচন্দ্র (১৯৩৩)

brook any insult from any other nation or any attack on our race or culture."

একই সময় কবি অমিয় চক্রবর্তী মশাইকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুদীর্ঘ এই চিঠিতে হিটলারের ভারত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে এ কথা বলেও উনি বলছেন, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে হিটলারের ক্ষমতাচ্যুত হবার কোন লক্ষণ উনি দেখছেন না। যদি একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধে তবেই শুধু তা হওয়া সম্ভব।

জার্মান গভর্নমেন্টের সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক না কেন, কিছুতেই সুভাষচন্দ্র দমে যাননি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮-এর জানুয়ারী পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা, প্রাগ, ওয়ারশ, বার্লিন, রোম থেকে শুরু করে লণ্ডন, ডাবলিন সর্বত্র ভারতবর্ষের রোভিং অ্যামবাসাডর হয়ে ঘুরেছেন। সব জায়গাতেই তিনি ভারতহিতৈষী বন্ধু জোগাড় করে তুলতে পেরেছিলেন। অস্ট্রিয়ান-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, চেকোশ্লোভাক-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান-আইরিশ ইনডিপেনডেনস লীগ—এই ধরনের বহু ভারতীয় সংস্থার হয় সুভাষচন্দ্র উদ্যোক্তা নয় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশের সাথে এই সংযোগ যে কত অমূল্য, কত প্রয়োজনীয় ছিল তা তখনকার ভারতীয় নেতারা সকলেই যে উপলব্ধি করেছিলেন তা মনে হয় না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন জওহরলাল নেহরু, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উৎসাহী ছিলেন। কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাহায্য যদি সুভাষচন্দ্র আর একটু পেতেন, ওঁর কাজ হয়ত সহজ হত। কিন্তু তার বিপরীতই হয়েছিল।

ভি জে প্যাটেল তাঁর মৃত্যুকালে উইল করে সুভাষচন্দ্রকে বেশ কিছু অর্থ দিয়ে যান, নির্দেশ ছিল এ অর্থ বিদেশে ভারতবর্ষের প্রচারকার্যে ব্যয় করা হবে। সেই অর্থ থেকে সুভাষচন্দ্রকে বঞ্চিত করা হয়, সে কাহিনী সবাই জানেন।

ব্রেখারলেড বলছিলেন সেই জীবনী জার্মান জীবনীর নাম Der Tiger Indiens দেওয়া ঠিক হয়নি। এই রোমান্টিক নামের জার্মানদের অর্থাৎ সাধারণ জার্মান নাগরিকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বেড়েছে বই কমেনি। The India Tiger —এই ধরনের বইয়ের নাম দেখলে হঠাৎ ভেবে বসবে হয়ত কোন বাঘ শিকারের কাহিনী।

সব জার্মান শহরেই যেন একটা করে কাসল্ দেখার থাকে। ইন্দিরা জোর দিয়ে বললেন এখানকার কাসলটা দেখে যাও। অতএব কাসল্ দেখতে যাওয়া হল। কাসল দেখে পাহাড় থেকে নেমে নেকার নদীর তীরে এলাম। সেখানে এক পুরোন গীর্জার পাশে একটা ছোট্ট কাফেতে ঢুকে কফি খাওয়া হল। টুরিস্ট রীতি অনুসরণ করে পিকচার পোস্টকার্ডে সবাই নাম সই করে কলকাতায় পাঠাতেও ভুল হল না।

নেকার নদীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে মনে হল মন ভরিয়ে দেখা হাইডেলবার্গ শহর এইবার চিনতে পারলাম। হাইডেলবার্গ এখন বিরাট হয়ে গেছে। ব্রেখারলেডরা যেদিকে থাকেন সেদিকটা আধুনিক এলাকা, আমেরিকান মিলিটারি ঘাঁটি সেদিকে। বড় বড় অট্টালিকা, ব্লকের পর ব্লক ফ্ল্যাট বাড়ি। কিন্তু এধারে হাইডেলবার্গের পুরোন এলাকা—সংকীর্ণ গলিপথ, দু'পাশে কাঠের খড়খড়িওয়ালা সাবেক প্যাটার্নের বাড়ি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নদী বয়ে চলেছে, তার ওপরে সেতু। যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি। একটা গান শুনেছিলাম—জার্মান গান, কথা ভাল বুঝি না—প্রথম লাইনটা ছিল এই ধরনের—

Ich habe Mein herz in Heidelberg verloren— অর্থাৎ I have lost my heart in Heidelberg.

বহু হৃদয় হারায় এখানে গীতিকারকে দোষ দেওয়া যায় না একটুও।

[ক্রমশ]

কদিন ধরে দেখছি রমনা রেসকোর্স ময়দানে মাপজোক চলছে। বেশ কিছু নতুন ইঁট এসেছে। তৈরি হচ্ছে উঁচু বেদী। শুনতে পেলাম ১৭ মার্চ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসবেন। তারই তোড়জোড়। সেদিন ফরেন অফিসে দেখি আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের চারজ-ডি-অ্যাফেয়ার্স দীক্ষিত সাহেব ফাইল নিয়ে ছোটাছুটি করছেন। শ্রীমতী গান্ধীর ঢাকা সফর নিয়ে প্রটোকলের ব্যাপারে দুই সরকারের মধ্যে ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছে।

শ্রীমতী গান্ধী ১৭ মারচ রমনার মাঠে বক্তৃতা দেবেন। আশা করা যাচ্ছে, শেখ সাহেব ফিরে বক্তৃতা করবার সময় যত লোক হয়েছিল এবার সে-রকমই ভিড় হবে। আর কিছুদিন পরেই ঢাকা আবার গমগম করবে।

ভাবতে অবাক লাগে শ্রীমতী গান্ধী ঢাকার রেসকোর্সে বক্তৃতা করছেন। এই তো গেল বছর এই সময় ঢাকা ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। বিক্ষোভ আর উত্তেজনা তখনও চরম সংগ্রামের রূপ ধরেনি। পশ্চিমী শাসকরা তখনও থাবা গেড়ে বসে আছে এই শহরে। এই রমনার মাঠেই শেখ সাহেবের সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতা হয়েছিল ৭ মার্চ।

এই ফাগুন মাসটাই ঢাকার জনজীবনে আগুন জ্বালানোর মাস। ২১ ফেবরুয়ারি সেও এই ফাগুন মাসে। আবার ৭ মার্চের বজ্রকণ্ঠও শোনা গিয়েছিল এই ফাগুনে। ফাগুন শেষে চৈত্র যখন এল কালবৈশাখীর কেতন উড়িয়ে তখনই সেই বিপ্লবের শুরু।

কলকাতার সঙ্গে ঢাকার একটা তফাৎ। কলকাতাকে দেখে মনে হয় কেন এই শহরের মানুষ বিপ্লব করে না। আর ঢাকাকে দেখে মনে হয়, কেমন করে এই শহরে বিপ্লবের জন্ম হতে পারে? ঢাকার দৈনন্দিন জীবনে কোন টেনশন নেই। নিরুদ্বিগ্ন লিরিক কবিতার মত জীবন। এখানে এখনও কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি। রমনা গ্রীনে এখনও প্রতি বসন্তে পলাশ ফোটে। তা সত্ত্বেও এখানে বিপ্লব হয়। হয়েছে। এই শান্ত মানুষগুলো এক কথায় কেমন করে রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়ে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

হাঁ, যা বলছিলাম, এক বছর পরে ঘুরে ঘুরে এসেছে আরেক ফাগুন। এ ফাগুনে আর গত বছরের ফাগুনে অনেক তফাৎ। এবারের ফাগুন এসেছে স্বাধীনতার দখিনা বাতাস নিয়ে।

শ্রীমতী গান্ধী ঢাকায় আসার আগেই ঢাকা থেকে শেষ ভারতীয় সৈন্য চলে যাবে। ১৪ মার্চ স্টেডিয়ামের মাঠে বাজবে শেষ বিদায় সঙ্গীত। প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান ভারতীয় সৈন্যদের বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ করবেন।

ভারতীয় সৈন্যদের ঢাকার রাস্তায় আর আগের মত দেখা যায় না। তার কারণ, ক্যান্টনমেন্ট থেকে অধিকাংশ সৈন্যই দেশে ফিরে গেছেন। যাবার সময় তাঁরা প্রত্যেকে কিনে নিয়ে গেছেন দুখানা করে ঢাকাই শাড়ি। শুধু ভারতীয় সৈন্যরা কেন, ঢাকায় যাঁরাই বাইরে থেকে আসছেন খানকতক করে জামদানি শাড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। চাহিদা অনুসারে যোগান না থাকায় জামদানির দাম এখন দেড়গুণ দুগুণ হয়ে গিয়েছে; তাহলেও বিক্রির কমতি নেই। ঠাট্টা করে সেদিন কে একজন বলছিলেন, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীর পিছনে এখন সবচেয়ে বড় কাজ করছে ঢাকাই জামদানি। এবং আমার মনে হয় শ্রীমতী গান্ধীও ঢাকায় এসে ঢাকাই শাড়ির লোভ সামলাতে পারবেন না। এবার এসে দেখলাম ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনটি আবার বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রপুরের অক্লান্ত

কর্মী কালীপদ মহারাজ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের ভার তুলে নিয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঢাকার হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়েছে। ঢাকায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিখ গুরুদ্বার। পুরনো বৌদ্ধ মন্দিরটি তো আছেই। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার অধীনে বাঙালী বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মিলন স্থান ঢাকা স্টেশনের কাছের বৌদ্ধ মন্দিরটি।

অন্যদের কথা বারান্তরে বলব, আগে রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বলি। ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাস যতটুকু শুনেছি, তৈরি হয় ১৯১৬ সালে। গোপীবাগে ৮ বিঘা জমির ওপর মিশন। ভেতরে গাছ-গাছালি, পুকুর। একটি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি। ছেলেদের ক্লাস এইট পর্যন্ত স্কুল ও সেই সঙ্গে একটি ছাত্রাবাস আর লাইব্রেরী। সবই ছিল ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের।

বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের মোট ১১টি কেন্দ্র ছিল। তার মধ্যে সব কটির ওপারেই পাক সরকারের কোপ গিয়ে পড়ে। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অস্থাবর সব সম্পত্তি লুঠ হয়ে যায়। নারায়ণগঞ্জ আশ্রম ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাবার পর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা আবার ঢাকায় এসে পৌঁছান। এতদিন তাঁরা ভারতে শরণার্থীদের মধ্যে কাজ করছিলেন। এবারেও তাঁরা এগিয়ে আসেন ত্রাণ কাজে। যশোর, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় খাদ্য সামগ্রী ধুতি-শাড়ি, ছেলেমেয়েদের পোশাক ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা খুলেছেন সাহায্য ভাণ্ডার। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ত্রাণের কাজ চলছে। আমাকে কালীপদ মহারাজ জানালেন, রামকৃষ্ণ মিশন মানুষের সেবাতেই বিশ্বাস করে এবং এই সেবাধর্মের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানের কোন সম্পর্ক নেই।

*

এবারে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ওপার বাংলার প্রখ্যাত শিল্পী আমিনা মুনসীর ৩০ খানি ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল ঢাকা বাংলা একাডেমিতে। অমদাবাদের এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা প্রকৃতি সব মিলিয়ে তুলির পরশে সুরের মূর্চ্ছনা তুলতে চেয়েছিলেন শিল্পী। ঢাকায় শিল্পরসিক মানুষের অভাব নেই। এখানেও নতুন নতুন শিল্প ভাবনা গড়ে উঠছে। তবে ওপার বাংলার কোন শিল্পীর আঁকা ছবির প্রদর্শনী এপারে এই প্রথম।

অমদাবাদের ছবি নিয়ে এসেছিলেন কেশব রায়। ইনি কলকাতা স্টেটব্যাঙ্কের কর্মী এবং মূলত লোকসঙ্গীত শিল্পী। বাড়ি ঢাকায়। কেশব প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি যেখানেই থাকেন ঢাকায় চলে আসেন। গত বছর গণ্ডগোলের মধ্যেও এসেছিলেন এবং গান করেছিলেন। কেশব এখানে এসে এবার প্রতিদিনই প্রোগ্রাম করেছেন। অমদাবাদের চিন্তাধারায় তিনি অনুপ্রাণিত। তাঁর গীতি নকশাটির নামও 'বাংলা মাগো তুই রূপসী'। এখানকার তরুণ উদ্যমী ও প্রচণ্ড রকমের বিপ্লবী কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে গঠিত চাতক চক্র ও কল্লোল সাহিত্য গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে কেশব প্রথম তাঁর গীতি নকশাটি পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এই অনুষ্ঠানে কাজী সব্যসাচী নজরুলের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

*

বাংলাদেশে বছরে চল্লিশটা করে যে বাংলা

ছবি রিলিজ হয় তা জানতাম না। সেদিন এখানকার তরুণ চিত্র পরিচালক মুস্তাফা মেহমুদের সংগে কথা বলে জানলাম।

মুস্তাফা মেহমুদের একটি ছবি 'মানুষের মন' এখানকার স্টার সিনেমাতে প্রতিদিন হাউস ফুল যাচ্ছে। ছবিটির রজতজয়ন্তী হয়েছে। ছবিটি আমি সেদিন দেখলাম। একটা মজার কথা বলি, অল্পের একজন হাবিলদারের সঙ্গে ছবিটা দেখতে গিয়ে আলাপ হল। সে একবর্ণ বাংলা বোঝে না। কিন্তু এ ছবিটি সে তিনবার দেখেছে। কারণ বিষয়বস্তুটা তার খুব ভাল লেগেছে।

এখানে চলচ্চিত্র শিল্পে কাহিনী বা টেকনিকের এখনও খুব জোর হয়নি তবে অভিনয় আর গানের দিক দারুণ সমৃদ্ধ।

মুস্তাফার সঙ্গে বসে এখানকার চলচ্চিত্র শিল্পের নানান সমস্যা নিয়ে কথা হচ্ছিল। এখানে স্টুডিওর ব্যবস্থা ভাল। সরকারী চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের নিজস্ব স্টুডিও আছে। তাতে ৫টি ফ্লোর, ১৬টি ক্যামেরা, দুটো প্রজেকশান রুম। বছরে ৬০টি করে ছবি হতে পারে।

বাংলাদেশে ছবি করতে তিন লাখ টাকার মত লাগে। শিল্পীদের রেটও কম। হিরো-হিরোইন ৩৫ হাজার পেলেই সন্তুষ্ট। ৬০০ টাকা দিলে ক্যামেরা শুদ্ধ এক শিফট ফ্লোর ভাড়া পাওয়া যায়। সাধারণত একটি ছবি ১০টি হলে এক সঙ্গে রিলিজ হয়। চেন হল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও নারাণগঞ্জ। তবে বাংলাদেশে সিনেমা হলের সংখ্যা কম। মাত্র ১৮৬টি হল। তাও ভেঙেচুরে এখন আছে ১১৯টি। সিনেমা শিল্পে এখানেও ক্রাউড। ৮০ জন পরিচালক আর ১২০ জনের মত শিল্পী। সিনেমায় এখানে কাহিনীকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। গল্প ও স্টারের আবেদনই বেশী।

মুস্তাফা চাইছেন, চলচ্চিত্র সম্পর্কে সরকার এখনই নীতি নির্ধারণ করুন। দুই বাংলার চলচ্চিত্র বিনিময় সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্ধারিত হোক। বর্তমানে বেআইনী-ভাবে নাকি দু-একখানি ভারতীয় ছবি বাজারে ঢুকেছে। এতে এখানকার পরিবেশক ও প্রযোজকরা ক্ষুব্ধ। তাঁরা চাইছেন সুষ্ঠু নীতি। ১১৯টি সিনেমা হল নিয়ে বছরে ৪০ খানা ছবি চলতে পারে না, আর তাছাড়া এখন ফাইনানসিয়ার পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ টাকা বার করতে চাইছেন না।

*

দর্পণ, রেখায়ন, অতিথি, তুলির পরশ, উত্তরণ, ঔষধি, প্রহসাজ, রূপজ—এগুলি সব ঢাকার বিভিন্ন দোকানের নাম। রেস্তরাঁর নাম 'অতিথি' আর ওষুধের দোকানের নাম যাঁরা 'ঔষধি' রাখতে পারেন বুঝতে হবে তাঁদের বাংলা প্রীতি শ্লোগান-সর্বস্ব নয়।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পরলোকে সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওস্তাদ শওকত আলী খাঁ

গত সংখ্যায় বিষ্ণুপুরের স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ্মশ্রী উপাধি প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলুম। চব্বিশে ফেব্রুয়ারির কাগজে দেখলুম ছিয়াশি বৎসর বয়সে তিনি আগের দিন পরলোকগমন করেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা শ্রীযুক্তা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী বর্তমান। বিষ্ণুপুরের আর এক দিকপাল চলে গেলেন। তিনি

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিলেন সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। তাঁর অপর দুই অগ্রজ ছিলেন স্বনামধন্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুকাল আগে রামপ্রসন্ন-শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি কলকাতায় আসতে পারেননি, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অসাধারণ ধ্রুপদী তো ছিলেনই, এছাড়া চমৎকার বাজাতেন সেতার ও এসরাজ। সঙ্গীতের সংরক্ষণে যাঁরা অক্লান্তভাবে ব্রতী হয়েছিলেন এবং পথ-প্রদর্শকের কাজ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বিবিধ ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীতের স্বরলিপি করে তিনি যশস্বী হয়েছেন। যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধেও তাঁর বই আছে। শুনেছি অতুল-প্রসাদ সেনের অনেক গানও তিনি জানতেন এবং সেগুলির স্বরলিপিও করেছিলেন। তিনি নিজে একজন উত্তম শিক্ষক ছিলেন। ইদানীং তিনি বার্ধক্যে অশক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তথাপি বিষ্ণুপুরে সাম্প্রতিক-কালে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরাই ওঁর গান শুনে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তৃপ্ত হয়েছেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেই তিনি কলকাতায় এসে তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত সভায় গান শুনিয়ে গেছেন; যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর লোকান্তরে তাঁর পরিবারবর্গ এবং সমগ্র বিষ্ণুপুরের সঙ্গে আমরা গভীরভাবে শোকসন্তপ্ত। তাঁর আদর্শে দেশবাসী অনুপ্রাণিত হোক—এই আমাদের একান্ত কামনা।

ওস্তাদ শওকত আলী খাঁ সাহেব তানসেন পুত্র বিলাস খাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে শুনেছি। তিনি রবাব ও সুর-শৃঙ্গার শিক্ষা করেছিলেন ওস্তাদ মোহম্মদ আলী খাঁর কাছ থেকে। তিনি সেনী সঙ্গীত সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি বিশিষ্ট ঘরানার পরিচয় থেকে আমরা বঞ্চিত হলুম।

ছবিমেলা তথা সুকুমার কলার ভাবগত সম্মেলন

গানের আসরে ছবিমেলার কথা তোলা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু সুকুমার কলার একটা সর্বজনীন আবেদন আছে—সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি।

চার বছর ধরে ছবির একটি ছোটখাটো মেলা নিউ মার্কেট সংলগ্ন মার্কেট স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই মেলাটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এর একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। চিত্রজগতের ইনটেলেক-চুয়েলরাই যে এর পৃষ্ঠপোষক তাই নয়, বহু সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন বিষয়ের লেখকগণও এই মেলায় এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন। এতে এমন একটি দেশিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়—যা অপর কোথাও দেখিনি। মেলায় প্রতিদিন বিভিন্ন বক্তার আলাপ-আলোচনা থাকে। যাঁরা ছবি দেখতে আসেন, তাঁরাও তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এই মেলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে চিত্রকে কেন্দ্র করে শিল্পী, সাহিত্যিক ও অপরাপর সুকুমার কলার চর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান। এইসব আলাপ-আলোচন কিছুটা শুনেছি এবং উপকৃত হয়েছি। আমার শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বন্ধু বিমল কর যা বলেছেন, আমাদের চিন্তা-ধারাও তদনুরূপ। চিত্রের মর্ম অনুধাবন করতে গেলে তার জন্য বিশেষ জ্ঞানের দরকার, কিন্তু সুকুমার কলার প্রকাশে যে কতগুলি রীতি আছে, সেখানে নানা দিক দিয়েই যেন সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী এবং সঙ্গীতশিল্পীর মধ্যে মিল আছে। এই প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমের বিচিত্র বৈষম্যই

যেন প্রতিটি সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করছে। আসলে সকলেই আর্টিস্ট—সকলেই একটি বৃহৎ মানসলোক থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পথে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আমাদের অলংকার শাস্ত্রে একটি শব্দ আছে, যাকে বলা হয় 'ধ্বনি'। যা চোখের সামনে দেখছি, প্রত্যক্ষভাবে পড়ছি বা শুনছি, তাকে অতিক্রম করেও একটি সূক্ষ্ম আবেদন আছে, সেই অনুভবের বস্তুই হচ্ছে ধ্বনি। সাহিত্যে এই অসামান্য বুদ্ধিগ্রাহ্য ইঙ্গিতকেই বলা হয় ধ্বনি। চিত্রেও রঙ, তুলি, বর্ণ এবং পটভূমিকাকে ছাড়িয়ে আমাদের চিন্তায় আলোড়ন তোলে যে বিচিত্র অনুভূতি, তাকেই ধ্বনি বলেই অভিহিত করতে হবে। আবার সঙ্গীতেও সুর দিয়ে এমন একটি আবেদন সৃষ্টি করা যায়, যা মননশীল কাব্যপাঠে বা ভাষণে প্রকাশ করা যায় না। এই যে 'ধ্বনি', যা অতি সূক্ষ্মভাবে চিত্রে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে প্রত্যক্ষ দর্শন, পঠন ও শ্রবণের অতিরিক্ত একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের আবেদন রচনা করে, এইটাই বোধ হয় এই আকর্ষণের মূল রহস্য।

ছবিমেলার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। আবার আগামীবারের অপেক্ষায় থাকব এবং রসলোকের অনির্বচনীয় আনন্দে অভিষিক্ত হব।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের একটি প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ছে। বৎসর কয়েক পূর্বে লেখক যখন রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, তখন জানা গিয়েছিল যে, ওপরের বারান্দা তাঁরা এরকম অনুষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করবেন, যেখানে লেখক, শিল্পী, গায়ক—সকলেই মিলিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে পারেন। এই আয়োজন আজও সম্পূর্ণ হয়নি। এরকম একটি নিভৃত অথচ সুরম্য পরিবেশ এই কারণে বিশেষ প্রয়োজন। এটি হলে বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই সব অনুষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। আশা করি, পূর্ব প্রস্তাবটি রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষের স্মরণে আছে এবং শীঘ্রই সেটি কার্যকর হবে।

নজরুল-গীতি সম্বন্ধে একটি চিঠি

মহাশয়,

বর্তমানে নজরুল-গীতি যেভাবে গাওয়া হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক মনে করি। কাজী নজরুল ইসলামের গান কালে প্রচারের মাধ্যমে এখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে এবং তা হওয়া উচিত বলেই মনে করি। আজকাল নজরুলগীতির বহু অনুষ্ঠানও আয়োজিত হচ্ছে, এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীরাও তাঁর গান পরিবেশন করছেন। নজরুল-গীতির কয়েকটি একক অনুষ্ঠানে গান শোনবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। এইসব সঙ্গীতানুষ্ঠান শুনে একটা

কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছে যে, নামী-দামী শিল্পীরা তাঁর গানগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন, অথচ তাঁদের গলা বেশ মিষ্টি, সাক্ষা সুরের কাজও তাঁদের গলায় আছে; তবু গানে প্রাণ নেই, কবির গানগুলি তাঁরা নিজেদের খেয়াল-খুশী ঢঙে গেয়ে চলেছেন, যাঁর যেরকম শৈলী রপ্ত আছে, নজরুলের গানের মাধ্যমে তাই-ই পেশ করছেন। মাঝে মাঝে গান-গুলি শুনে মনে হচ্ছে যে, নজরুলের গীত-রচনাকে অবলম্বন করে তাঁরা নানা বৈচিত্র্য রাগপ্রধান বাংলা গান গেয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রকাশরীতি ও গায়ন প্রভাবে কাজী নজরুল ইসলাম উধাও হয়ে যাচ্ছেন। এমনও হচ্ছে যে, শিল্পীদের রেকর্ড-করা গান এক রকম, আর নানা অনুষ্ঠানে গাওয়া গান আর এক রকম। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, নজরুলের কিছু গান স্বরলিপি আকারে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেই স্বরলিপিগুলির সাথে গায়কদের গাওয়া গানের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

কাজী নজরুলের গানের এরই মধ্যে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে সন্দেহ নিবেদন করি যে, তাঁর গানের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল নয়। অচিরেই সেগুলি মামুলি গীতিকারদের গানের পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে। একথা অবশ্য মানি যে, কবি তাঁর গান গাওয়ার সময় শিল্পীকে কিছু স্বাধীনতা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন যে, তাঁর গান যেন শেকলে বাঁধা ছকবন্দী না হয়—কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নিশ্চয়ই নয়। আমরা কৈশোরে সেকালের কিছু, কিছু, প্রখ্যাত শিল্পীর গান শুনেছি এবং এখনও সেই সব রেকর্ড মাঝে মাঝে শুনি। সেগুলো তো এখনও খারাপ লাগে না, বরং কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা তাঁর গানের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি।

এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত ও আলোকপাত আশা করি।

৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বেহালা।

লেখকের বক্তব্য—

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানে ফার্সী, উর্দু গজলের এবং উত্তর ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন গীতির শৈলী সংযোগ করে তাঁর একটি নিজস্ব স্টাইলের প্রবর্তন করেন। যে সব গানে এই স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটেছে, সেগুলি আজ আর বড় একটা কাউকে গাইতে শুনি না। যদি বা শুনি, তাহলে দেখা, তার মধ্যে শিল্পী নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কতকগুলি প্রয়োগ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। যেখানে কবি 'বেশ' বা সুর করে কাব্যপাঠ ইচ্ছে করেই প্রবর্তন করেননি, সেখানে সে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে—তাও নিকৃষ্ট কাওয়ালীর ঢঙে, পেশাদারী অতিরিক্ত কম্পন সহযোগে। এইসব কারুকলার অবাঞ্ছিত প্রয়োগ এত বেশী থাকে যে, নজরুলের সহজ সরল অ্যাপ্রোচকে তার ভিতর থেকে খুঁজে বের করা শক্ত। অধিকাংশ শিল্পীরই নিজেদের তেমন অভিজ্ঞতা নেই, সঙ্গীতে ব্যাপক সমীক্ষাও নেই, অথচ বাহাদুরির দুঃসাহস আছে। ফলে যা হবার, তাই হচ্ছে। আবার আর একটা করুণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কোনও কোনও শিল্পী নিজের যোগ্যতা বা প্রতিভা সম্বন্ধে কাল্পনিক উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের যে আরও অনেক শেখবার বা জানবার আছে, সেটা তাঁদের বোঝানো যায় না। এই জাতীয় শিল্পী যখন একক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তখন সে অনুষ্ঠান শ্রবণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

সাধারণভাবে লিরিক বা কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল চিরাচরিত রচনার রীতিকেই অবলম্বন করেছিলেন। সহজ, সরল বাণীসৃষ্টির এবং আন্তরিকতায় তা জনগণকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি জনগণের গীতিকার। কিন্তু তাঁর সমকালীন কম্পোজার দিলীপকুমার রায় বা হিমাংশু-কুমার দত্তের অভিমুখীনতা ছিল ইনটেলেক-চুয়াল। তাঁদের সুরের ইডিয়মকে ফুটিয়ে তোলা সবাইকার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু কবিতায় নজরুল সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে তাঁর বৈশিষ্ট্য একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁকে সঙ্গীতের মত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে খুশী করে চলতে হয়নি।

তথাপি, পূর্বেই বলেছি, গজল দাদরার যে-সব শৈলী নজরুল প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে একটা নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। রুমা ঝুমা রুমা ঝুমা কে এলে নূপুর পায়, মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর, কত রাতি পোহায় বিফলে হায়, করুণ কেন অরুণ আঁখি—প্রভৃতি গানে নজরুলকে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই ধরনের গানগুলি আজকালকার পরিশীলিত কণ্ঠে মনোজ্ঞ করে গাইলেই নজরুলের প্রতি সুবিচার করা হবে। আর যে সব গান তিনি সাধারণ কাব্যসঙ্গীত হিসাবে রচনা করেছেন, সেখানেও তাঁর সহজ, সরল, দীপ্ত ভঙ্গীটি অক্ষুণ্ণ রাখাই ভাল। সেগুলিকে রাগপ্রধান করে তুলতে গেলে আর যাই হোক, শিল্পী তাঁর প্রাধান্য কিছুমাত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবেন না। অতএব তাঁর পক্ষে নিষ্ফল প্রয়োগের আতিশয্য থেকে নিবৃত্ত হওয়াই ভাল।

নজরুল একাডেমী—ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি'

নজরুল একাডেমী—ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' আমাদের হাতে এসেছে। বর্তমানে পাঁচটি খণ্ড আমরা পেয়েছি। এতে নজরুলের বহু জনপ্রিয় গীতির সংকলন আছে। আরও কয়েকটি খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। এটি একটি উত্তম প্রচেষ্টা। আশা করা যায়, 'বাংলাদেশ' তাঁদের ঐতিহ্য রক্ষাকল্পে উক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গীতি ও সুর সংগ্রহ করে এইভাবে প্রকাশ করে জাতীয় কর্তব্য পালন করবেন। এই পাঁচটি খণ্ডে দু-একটি গান চোখে পড়ল, যা নজরুলের রচনা নয়। তৃতীয় খণ্ডে 'আবেশে আমার যায় উড়ে' গানটি প্রসিদ্ধ গীতিকার শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থের রচনা। উক্ত খণ্ডেই প্রকাশিত 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে' গানটি পরলোকগত কবি অজয় ভট্টাচার্যের রচনা। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির কর্তৃপক্ষও এটি সমর্থন করলেন, কারণ এইটিই শচীন দেব-বর্মণের প্রথম রেকর্ড ছিল। নজরুল একাডেমী এবারে বোধ হয় তাঁদের সংগৃহীত গানগুলি যাচাই করে দেখবার অধিকতর সুযোগ পাবেন।

শার্ঙ্গদেব

সুবাসে মাতাও ধরা

একালে ভারতবর্ষের সুরভি জগতে আধুনিকধারার প্রবর্তক বা পাইওনিয়ার ছিলেন বাঙ্গালী। এইচ বোসের নাম তখন ভারতের সর্বত্র সাধারণ মানুষ জানতেন। পাশ্চাত্য সৌরভে আমোদিত সমাজের সীমানার কথা বলছি না। স্বল্প মূল্যে ল্যাভেণ্ডার, ইভনিং ইন প্যারিস বা পাম্পিয়া সেন্ট তখন অবশ্য অনেকেই মাখতেন। তা সত্ত্বেও এইচ বোস-এর বিজ্ঞাপনটুকু পর্যন্ত ছিল চমক লাগানো! "কেশে মাখো কুন্তলীন, অঙ্গবাসে দেলখোস সুবাসে মাতাও ধরা, ধন্য হউক এইচ বোস।" পারলে, নাতোয়ান এইসব সেন্ট মাসীমাসিদের বাক্সে মজুদ থাকতো। বউদিদিরা তরল আলতার বাক্সের তলায় লুকিয়ে রাখতেন দু-একটি শিশি। সেকালে শাশুড়ীরা যে এসব সবসময় সুনজরে দেখতেন না। মেয়ে-পোয়ে যে সম্বন্ধ তার ভাঙনের ভয় একটু ছিল বেশী। তবে সুরভির যে আদর concentrate তা অনেক সময়ই আসতো বিদেশ থেকে। পারফুমের মূল সুগন্ধিসার বা concentrate শ্বেতশুভ্র আসতো জার্মানী থেকে। এমন কি কান্তা সেন্টের সার কলকাতা কেমিক্যালের ল্যাব-রেটরিতে দেখেছি পরম মূল্যবান বিদেশী concentrate। কারণ সুরভিজগতে সেরা

বলে স্বীকৃত ছিল প্যারিসের পারফিউম। স্বদেশীর প্রচণ্ড আন্দোলনও কেমন করে যেন সুরভিত সবাই পশ্চিমের স্পর্শ চাইতো, চাইতো পরদেশী আমেজ।

এই কলকাতা শহরেই আবার সুরভির অন্য এক জগৎ ছিল। কলুটোলা স্ট্রীটের মস্ত সব ব্যাপারী। আতর, গোলাপ নির্যাস তাঁরা আবার আর এক অভিজাত সমাজ সম্প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুবাসের সে সব দোকান কিছু পরিবর্তন হলেও আজও আছে। নবাব, রাজামহারাজা ধনী জমিদার সবাই ছিলেন আতরের পরম ভক্ত। সেজন্যই সম্ভবত কলকাতার কলুটোলায় এমন সরগরম ব্যবসা গড়ে উঠেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গড়লেন সব পত্তনী পরগনা, টিপু সুলতানের সংসার আর নবাব ওয়াজেদ আলি এলেন কলকাতার টালিগঞ্জ আর মেটিয়াবুরুজে। নেট দিয়ে ঘাড় উঁচায় জীবনযাত্রার লখনৌর পাল নিয়ে তাঁরা প্রবেশ করলেন নতুনতর আভিজাত্যের খাস-মহলে। সুগন্ধী তার সঙ্গী। আতর গোলাপ রেশ বজায় রেখে তাল মিলিয়ে যাত্রা করল। চিৎপুরবাজার স্ট্রীটের শেখ ফসিউল্লার গোলাপ নির্যাসে মুখ ধুয়ে পাতা কেটে চুল বাঁধতে বসতেন ধনীঘরের মানিনীরা। সেই শেখ ফসিউল্লাও নেই। হয়তো তাঁর সুগন্ধ ব্যবসায়ও হারিয়ে গেছে। ঠিক বলতে পারি না।

সুবাস কিন্তু এগিয়েই চলেছে। বিশেষ করে ভারতীয় সুগন্ধি আর পাঁচটা ভারতীয়তার মত মন কেড়েছে সারা বিশ্বের। আশ্চর্য ব্যাপার! প্রাচ্যের চন্দন, যাই এখন প্যারিস-এর সেরা সুগন্ধকে মাত করেছে। এক কোটি টাকার ভারতীয় সুরভির সার রপ্তানী হয়েছে গত এক বছরে। কয়েক লাখ টাকার মাল যেতো বিদেশে। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর বা মুসলিমপ্রধান মধ্য প্রাচ্যের বাজারে বিকোতো আতর সুবাস গোলাপ-জল। এখন ভারতীয় চন্দন সাবান, ধূপকাঠি পাগল করছে পাশ্চাত্য মানুষকে। কলকাতার সুবাস ব্যবসায়ী কপূর সাহেব বললেন, ভারতীয় সুগন্ধির জয়যাত্রা তো সবে শুরু,

শান্তি ও সৌহার্দ্য

দেশের গোলাপ থেকে নুরজাহান আবিষ্কার করেছিলেন আতর—এমন একটি গল্প প্রচলিত আছে। হামামে ফেলা হতো রাশি রাশি গোলাপ। হামামবিলাসিনী সম্রাজ্ঞী নুরজাহান একদিন দেখলেন জলের উপর তৈলাক্ত পদার্থ। হাতে করে তুলে ঘ্রাণ নিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। সেই হলো আতর। এভাবে পুষ্পসার আগে হতো কিনা জানা যায় না। তবে প্রত্যেক ফুলের একটা তৈলাক্ত অংশ আছে। সেই অংশই সুগন্ধসার ধারণ করে। কনৌজে আধুনিক প্রথায় সুগন্ধসার প্রস্তুত হচ্ছে এখন। মহার্ঘ তার কণামাত্র। তাকে মেশানো হয় নানা মাধ্যমে বাজারের উপযুক্ত করে। সে কাজ হয় প্রধানত ফার্মাসিউটিক্যাল লেবরেটরিতে। আতরের মাধ্যম চন্দন তেল। বিদেশের সেন্টের মাধ্যম অ্যালকোহল। সাবানে, নানা ওষুধপত্রে, খাদ্যসামগ্রীতে বহুভাবে সুগন্ধির ব্যবহার হয়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধির যোগান দেয়। নাগাল্যান্ডে আছে নানারকম ভেষজ সুগন্ধির গাছপালা। যেমন মেন্থল, পিপারমেণ্ট, সিট্রোনেলা ইত্যাদি। ভারতের অনেক জায়গায় চন্দন হয়, কিন্তু মহীশূরে এবং তামিলনাড়ুর চন্দন শ্রেষ্ঠ। কাবেরী নদীকে বলা হয় দক্ষিণ দেশের গঙ্গা। পাহাড়ী নদী কাবেরী স্বচ্ছসলিলা। তলা দেখা যায়। তার দু-পাশে চন্দনের বন। একদিকে তামিলনাড়ু অন্য দিকে মহীশূর। সে চন্দনের সংবাদ ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সেই চন্দন একদিন আরব বণিকের হাতে পাশ্চাত্যের শৌখীন সমাজে হাজির হয়েছিল। আজ আবার চন্দন স্বীয় মর্যাদায় পূর্বস্থান ফিরে পেয়েছে।

দুঃখ এই যে, আমাদের দেশের মানুষ এখনও বিদেশী মোহকে কাটাতে পারেনি। হগ সাহেবের বাজারে দেখেছি, বোম্বাইয়ের কোলাবায় দেখেছি, মাদ্রাজের প্যারীজ কর্নারে লক্ষ করেছি চতুর্গুণ মূল্য দিয়ে বিদেশী পণ্যের জন্য কি আকুলতা। হয়তো বা পণ্য মেকী বা ভেজালও হতে পারে। লুধিয়ানাতে তৈরী সোয়েটার লণ্ডনের ছাপ মেরে এলে আমরা পছন্দ করি বেশী!! সুগন্ধির বেলাতেও তাই। এখন ভরসা এই যে, বিদেশীরা যখন কদর করছে, আমরা হয়তো আস্তে আস্তে বুঝবো ভারতীয় সুগন্ধির মর্যাদা।

শান্তি এবং সৌহার্দ্য

আবার একটি জাপানী ফুল সাজানো বা ইকেবানার প্রদর্শনী দেখলাম। প্রদর্শনীর রচনাগুলির বিষয়বস্তু of theme শান্তি ও সৌহার্দ্য। সবচেয়ে ভাল লাগলো উপকরণের সরলতা। সাধারণ জিনিসে

হয়েছে। কোথায় গিয়ে ঠেকবে তার ঠিকানা নেই।

কাপুর সাহেব আরও বললেন, গত কয়েক বছরে বিদেশে সুগন্ধির সমাদর বেড়েছে অনেক। বিশ্বের ধনী দেশে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ বেড়েছে আর ভারতে শতকরা বিশ। সুগন্ধির মধ্যে সর্বাধুনিক সংস্করণ হয়েছে গৃহ সুবাসিত করার আয়োজন। বড় হোটেলের লিফট থেকে নিয়ে গৃহস্থবাড়ির স্নানাগার পর্যন্ত সুবাসিত রাখার ফন্দি চলেছে। দুর্গন্ধনাশক নয়, সুগন্ধ প্রসাদক। নববধূর বাসরে, মজলিশে বা নানা আসরে বর্ষনশীল বায়ুতাড়িত মেঘের মতই সূক্ষ্ম কণিকায় ছড়িয়ে পড়ে পছন্দসই সুবাস। প্রাচীন ভারতের ধূপ আর পুষ্পচন্দন যেন আধুনিক সংস্করণে নূতন করে গৃহপ্রবেশ করেছে।

সুগন্ধি ব্যবসায়ের পীঠস্থান কনৌজ। ইতিহাসের পরম প্রসিদ্ধ কান্যকুব্জ। যে কান্যকুব্জ থেকে ব্রাহ্মণ এসে বাংলার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আসন বসিয়েছিল, যে কান্যকুব্জ ছিল সংযুক্তার পিত্রালয়। জয়চাঁদের গড় আজও আছে। সে গড়ে সন্ধান মিলেছে হর্ষবর্ধনেরও আগের কত স্মৃতিচিহ্ন। কানপুরের কাছে ফতেপুর। ফতেপুর থেকে মাইল পঞ্চাশ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গেলে কনৌজের কাছে পৌঁছে যাবেন। আমাদের

সাজানো হয়েছে অসাধারণ রূপরাজ্যের মোহ। শ্রীমতী সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনা বিশেষ করে দেখলাম। পাকাটি, তিনটি গোলাপ, ফুলঝাটার কাঁচা সবুজ গুচ্ছ এই মাত্র উপকরণ। লম্বা চিনামাটির ফুলদান, কাঠের একটি গোল পাত্র এই দুটি আধার রয়েছে সামনে পিছনে। পাতাবাহার asparagus কিছু গুঁজে দেওয়া হয়েছে পূর্ণতার জন্য। তিন কোণা বোর্ডে রচনাটির ভিত। পাকাটিগুলি উঁচু দেওয়া যেন হাত দুখানা ঝুলে আছে। গোলাপ একটি লাল দুটি সাদা।

ফুল সাজানোর ধারায় ক্রমশ উপকরণের আড়ম্বর কমছে। কলকাতার হোটেল হিন্দুস্থানের ফুলসাজের অধিকারিণী শ্রীমতী নলিনী মিস্ত্রীর কাজেও দেখলাম একান্ত আড়ম্বরহীন আটপৌরে জিনিসে সুন্দর রচনা। নলিনী ওয়াকু ধারার শিক্ষয়িত্রী নামিরা বসুর ছাত্রী। ফুল সাজানো শিক্ষাদান ভিন্ন হোটেল ইত্যাদিতে রচনার কাজ এখন অনেক মেয়ের উপজীবিকা হয়ে উঠছে। উপজীবিকার জন্য এমন সুন্দর পথ আর কি বা হতে পারে।

শ্রীমতী

আগামী বাজেট সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা
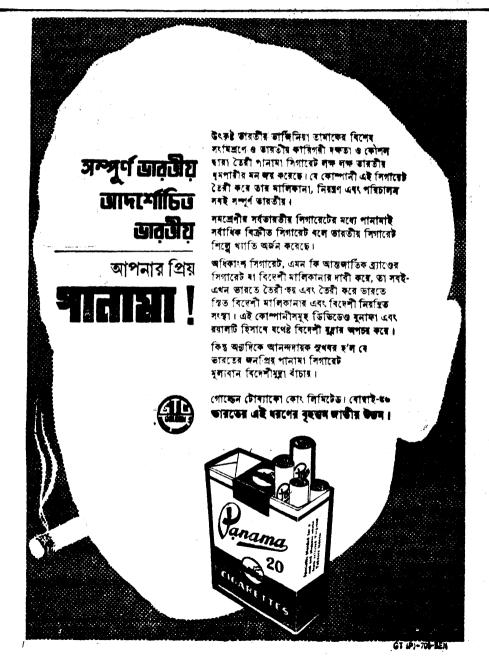
মার্চ মাসের ষোল তারিখে অর্থমন্ত্রী শ্রী চ্যবন লোকসভায় ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট পেশ করবেন। এই বাজেটে যে নতুন কর ধার্য করা হবে এবং বর্তমান করগুলির পুনর্বিন্যাস করা হবে, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৫০-৫১ সালে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হয়; তারপর থেকে বছরের পর বছর কর ধার্যের পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে করের বোঝা ৬৩৫ শতাংশ বেড়েছে; এই সময়ের মধ্যে জাতীয় আয় বেড়েছে ৭০ শতাংশ। ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের ৫·৫ শতাংশ সঞ্চিত হয়েছিল এবং বিনিয়োগ করা হয়েছিল; ১৯৭০-৭১ সালে তার পরিমাণ হয়েছে ১১·৩ শতাংশ, এবং চতুর্থ যোজনার শেষে তার পরিমাণ ১৪·৫ শতাংশ হতে পারে। প্রথম যোজনায় অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়েছিল ৬৩৭ কোটি টাকা; দ্বিতীয় যোজনায় অতিরিক্ত কর থেকে পাওয়া গিয়েছিল ১০৫২ কোটি টাকা; তৃতীয় যোজনায় অতিরিক্ত কর থেকে রাজস্বের পরিমাণ হয়েছিল ২৮৯২ কোটি টাকা। তৃতীয় যোজনার পর যে তিনটি বাৎসরিক যোজনা হয়েছিল, সেই সময়ের ভিতর অতিরিক্ত কর থেকে ৯১০ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া গিয়েছিল। চতুর্থ যোজনায় যদিও ৩১৯৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব হিসাবে পাওয়া যাবে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয়েছিল, চূড়ান্ত হিসাবে অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ হয়ত তার চেয়ে অনেক বেশী হবে।

১৯৭১-৭২ সাল অর্থমন্ত্রীর পক্ষে একটি কঠিন বছর বলে চিহ্নিত হবে। ইতিমধ্যেই ৩৬০ কোটি টাকা শরণার্থীদের কাজে খরচ হয়ে গেছে। এ বছরেই পার্লামেন্টের কাছে নতুন ব্যয়ের অনুমোদন চাইতে হয়েছে সরকারকে; তাছাড়া ৭০ কোটি টাকা লেভির ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকার বেশী হয়েছে বলে অনুমিত হয়েছে। এ বছরেই ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে এবং বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়াও বন্ধ হয়েছে। তার ফলে ১৯৭১-৭২ সালে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যথাক্রমে ৮০ মিলিয়ন ডলার এবং ১৫০ মিলিয়ন ডলার পাওয়া বন্ধ হয়েছে। অথচ ভারতকে প্রতি

বছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে এমন কোন প্রস্তাব নিশ্চয়ই থাকবে যার ফলে সাধারণ মানুষের উপর নতুন বোঝার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণও আগামী বছরে অন্ততঃ ৩০০ কোটি টাকার কাছাকাছি হবে বলে আশা করা যায়।

ভারতের সাম্প্রতিক কর ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আয়করের অনুপাতে কর্পোরেশন কর এবং কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের গুরুত্ব অনেক বেড়েছে, অন্যান্য পরোক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণও অনেক বেড়ে গেছে। প্রথম যোজনা আরম্ভ হবার সময়ে, অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে আয়কর, কর্পোরেশন কর, আবগারী শুল্ক ও বাণিজ্য শুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৩·৯ কোটি টাকা, ৩৯·৮ কোটি টাকা, ৬৭·৫ কোটি টাকা এবং ১৫৭·২ কোটি টাকা; ১৯৭০-৭১ এই উৎসগুলি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ হয়েছিল যথাক্রমে ৪৩৮ কোটি টাকা, ৩৪২ কোটি টাকা, ১৮১৪·৯ কোটি টাকা এবং ৪৬৫ কোটি টাকা। অন্যান্য পরোক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১৭১·৪ কোটি টাকা; ১৯৭০-৭১ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৩৬৯·৮ কোটি টাকা। দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করপোরেশন করের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়লেও, সরকারের পক্ষে রাজস্বের প্রধান উৎস হল বিভিন্ন পরোক্ষ কর। পরোক্ষ কর বেশি বাড়াবার ফলে সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বেশি চাপানো হয়। ভারতের মানুষ খুবই গরীব। এই অবস্থায় বেশি করের বোঝা তাঁদের উপর চাপানোর পরিণতি হল দারিদ্র্যের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেওয়া; কারণ এক্ষেত্রে একদিকে সবাইকে কর দিতে হয়, অপরদিকে পরোক্ষ করের পরিণতি হিসাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে কর-ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আবগারী শুল্ক এবং অন্যান্য পরোক্ষ কর বাড়িয়ে যদি বাড়তি রাজস্বের ব্যবস্থা করা হয় তবে তার বোঝা সাধারণ মানুষের উপরেই পড়বে। অথচ সাধারণ নাগরিকদের কর প্রদান করার ক্ষমতা এখন শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ভারতীয়দের জনপ্রতি জাতীয় আয় বিবেচনা করলে স্বীকার করতেই হবে যে, অন্যান্য দেশের অনুপাতে করের বোঝা ভারতে অনেক বেশি, যদিও জাতীয় আয়ের প্রায় ১৪ শতাংশ সরকার রাজস্ব হিসাবে পেয়ে থাকেন। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অথবা ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়েও বেশি রাজস্ব আদায় করা হয়। কিন্তু উন্নত দেশগুলির অধিবাসীদের কর প্রদান ক্ষমতা ভারতীয়দের কর প্রদান করার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি।

ভারত সরকার কর-ব্যবস্থার নতুন পরিবর্তন কী করতে পারেন? যতদূর মনে হচ্ছে, আয়কর, সম্পদ কর এবং দান করের কাঠামো ও হার পরিবর্তিত হবে। কৃষি-আয়কর এখনও রাজ্য সরকারের আওতায়। জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রের অবদান সবচেয়ে বেশি। অথচ কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত আয়ের উপর ঠিকভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। বেকারি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কমিটি কৃষিক্ষেত্রে আয় এবং কৃষিক্ষেত্রের বাইরে সৃষ্ট আয়ের উপর একটি সুসংহত কর-ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। গত বছর রাজ্য সরকারগুলির কাছেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কৃষি ও অ-কৃষি আয়ের উপর একই হারে কর ধার্য করার একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন; কিন্তু রাজ্য সরকারগুলির কাছে সেই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সম্প্রতি কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্য করা সম্পর্কে অধ্যাপক কে এন রাজের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। আশা করা যায় ৩০শে সেপ্টেম্বরের ভিতর এই কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে কৃষি-আয় সম্পর্কে নতুন কোন ব্যবস্থা ঘোষিত হবে বলে মনে হয় না। তবে কি নতুন অন্তঃশুল্কগুলির মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন হারে শুল্ক পুনর্বিন্যাস করা হবে? আমাদের আশংকা, হয়ত তা-ই হবে। রেলওয়ে বাজেটেও এয়ারকন্ডিসন্ড শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব থাকবে। কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন করে জাতীয় সঞ্চয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা সরকার নিশ্চয়ই চালাবেন এবং তার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কিন্তু, দরিদ্র জনসাধারণের উপর যাতে আর করের বোঝা বাড়ানো না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

সুব্রত গুপ্ত

॥ ১৭ ॥
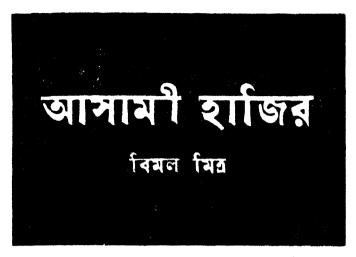
এ বাড়ির যে গৃহিণী তারই যেন সব দায়, নতুন বউ বাড়িতে এসে গৃহিণীর দায়িত্ব কোথায় কমবে, তা নয়। যেন আরো বেড়ে গেল। একে ক'দিন থেকেই ঝঞ্ঝাট চলেছে তার ওপর আছে ছেলের বেয়াড়াপনা। এখন বউকে সামলাবে, না ছেলেকে সামলাবে, সেই ভাবনাতেই অস্থির। তার ওপর আবার এই নতুন ঝঞ্ঝাট। মাথার ঠিক রাখাই দায় হয়ে পড়েছিল প্রীতির।

প্রীতি বললে—এখন কী করি তাহলে আমি? বউমাকে কথাটা বলি কী করে? খবরটা শুনে তো বউমা একেবারে কেঁদে ভাসাবে। তখন আমি সামলাবো কী করে?

চৌধুরী-মশাই বললেন—আমিও তো তাই ভাবছি। কী যে করি আর কার সাহায্য বা পরামর্শ করি তাও বুঝতে পারছি না—

—তা বেয়াই-বাড়ির লোক কী বলছে?

—ওরা আর কী বলবে? ওরা তো আমাদের খবর দিতে এসেছে। বেয়াই-মশাই নিজেও কিছু ঠিক করতে পারেননি, ওদিকে লোকজন সবাই শ্মশানে গেছে, আর এদেরও পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে। এখন যা করবার তা আমরা করবো।

বলে চৌধুরী-মশাই কিছু সমাধান বার করতে না পেরে দু হাতে মাথার চুলগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। যেন মাথার চুলগুলোই সমস্যা সমাধানের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু অত কথা শোনবার বা ভাববারও সময় তখন কারো ছিল না। না প্রীতির, না চৌধুরী-মশাইয়ের। চৌধুরী-মশাই বললেন—ওদিকে আবার প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাই বসে আছেন বউমা তৈরি আছে তো?

প্রীতি রেগে গেল—কী করে তৈরি থাকবে? যখন-তখন ওমনি বউ দেখতে এলেই হলো? মানুষের শরীর-গতিক বলে একটা জিনিস নেই?

চৌধুরী মশাই বললেন—না না, আমি তা বলছি না। তাঁকে তো আমি বসিয়েই রেখেছি।

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, তিনি বসে থাকুন। যখন বউমা তৈরি হবে তখন দেখাবো, তার আগে নয়। আর আমারও তো শরীর-গতিক আছে! সারা রাত তো আমিও ঘুমোতে পারিনি। আমার মাথা টলছে, আমিও আর কিছু ভাবতে পারছি না—

বলে গৃহিণী তার নিজের কাজে চলে গেল।

চৌধুরী মশাই খানিকক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনিও বার-বাড়ির দিকে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগলেন।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সেদিন সমস্ত বাড়িটার মধ্যে সৃষ্টি হলো। কেউ জানলো না কোথায় সংসারের কোন্ কোণে একটা ফাটল ধরেছে। সবাই উৎসবের আনন্দে উন্মত্ত। যারা নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে তারা খাওয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যারা বউ-এর মুখ দেখে গেছে তারাও বউ-এর রূপের প্রশংসায় মুখর। ঐশ্বর্যের, প্রাচুর্যের আর বিলাসের জাঁকজমকের ঝলমলানিই তারা দেখলে, তার অন্তরের দুর্যোগের দুর্দশাটার চেহারাটা তারা উপলব্ধি করতে পারলে না। ওটা চাপা থাক, ওটাকে পুলটিশ দিয়ে ঢেকে রাখো। তোমার বাইরের ঐশ্বর্যটাই তাদের কাছে সত্যি হোক, কেউ যেন তার দারিদ্র্যটা না দেখতে পায়। ওটা দেখতে পেলে তোমার সম্মান সমৃদ্ধি আর সম্পদের সৌধটা ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে যাবে। তা হলে কেউ আর তোমায় সেলাম করবে না, কেউ তোমাকে হিংসেও করবে না। অথচ সংসারে তোমাকে কেউ সেলাম আর হিংসে না করলে তোমার মাথাই বা উঁচু থাকবে কী করে? তুমি যে তাহলে সাধারণ হয়ে যাবে। একেবারে সাধারণ। আর সাধারণ হয়ে

বেঁচে থাকা মানেই তো নিচু হওয়া। অর্থাৎ অন্য সবাইয়ের সমান হওয়া, সকলের সঙ্গে একাকার হওয়া।

যখন উৎসবের বাড়িতে আবার সবাই আগেকার বউভাতের জের টেনে সকালবেলা থেকেই খুশির হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে, যখন সবাই বাসি লুচি-বেগুনভাজার ভোজে বেসামাল, বাড়ির গিন্নীর তখন মেজাজ সপ্তমে চড়ে উঠেছে। অথচ কাল রাত্রেও এমন ছিল না। বাড়ির গৃহিণী তখন শান্তিপুরের চওড়া জরির পাড়ওয়ালা শাড়ি পরে সবাইকে অভ্যর্থনা করেছে। কিন্তু আজ তারই আবার তখন অন্য চেহারা, অন্য মেজাজ। গৌরী পিসী কী একটা আর্জি জানাতে এসে বকুনি খেয়ে ফিরে গেল।

প্রীতি বলে উঠলো—আমার একটা তো মাথা, আমি কোন্ দিক সামলাবো শুনি! না খেলে তো বয়ে গেল! দরকার নেই কারো খেয়ে। আমার নতুন-বউয়ের মুখে এখনও জল পড়েনি, আগে আমি তাই ভাববো না তোদের কথা ভাববো!

গৌরী পিসী বললে—আমি তো সে-কথা বলিনি। বলছি রাঁধুনি-বামুনেরা জিজ্ঞেস করছে কত ময়দা মাখবে—

প্রীতি ঝাঁঝিয়ে উঠলো—কত ময়দা মাখবে তা আমি এত আগে থেকে কী করে বলবো, আমি কি গুনতে জানি যে আগে গুনে বলবো আমার এতজন বাড়িতে খাবে...

এর পরে আর কথা চলে না। কিন্তু শুধু এই-ই শেষ নয়, সামান্য-সামান্য ব্যাপারেই সকাল থেকে বাড়ির গিন্নীর মেজাজটা সকলের নজরে পড়লো।

সবচেয়ে বেশি করে চড়লো প্রকাশমামার কথা শুনে।

প্রকাশমামা এসেই বললে—দিদি, শুনলুম বউমাকে নাকি বাপের বাড়ি পাঠানো হচ্ছে?

দিদি বললে—কেন, কে তোকে বললে?

—তুমি কথাটা সত্যি কি না তাই বলো না! কথা নেই বার্তা নেই অমনি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেই হলো? এখনও তো আট দিনও কাটলো না!

প্রীতি বললে—কিন্তু এ-সব কথা কে বললে তোকে?

—কে আবার বলবে, বলেছে জামাই-বাবু!

—তা যে বলছে তাকেই জিজ্ঞেস করো কেন বউমাকে পাঠানো হচ্ছে।

প্রকাশমামা বললে—তা হলে যা শুনেছি তা সত্যি।

প্রীতি বললে—সত্যি-মিথ্যে আমি জানি নে। আমার অত জানবার সময় নেই বাপু—

বলে আবার তার নিজের কাজে চলে গেল। কিন্তু প্রকাশমামা ব্যাপারটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। আসলে চুপ করে বসে থাকা তার স্বভাবেই নেই। আবার দৌড়ে গেল চৌধুরী মশাইয়ের কাছে। বললে—জামাইবাবু, দিদি তো কই কিছু বলছে না—

চৌধুরী মশাই তখন নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। প্রকাশের কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন—কীসের কী?

—এই যে আপনি বললেন বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

চৌধুরী মশাই চটে গেলেন। বললেন—তা বউমা একবার বাপের বাড়িও যাবে না? বিয়ে হয়েছে বলে কি একেবারে চিরকাল শ্বশুরবাড়িতেই বাঁধা হয়ে থাকবে? বাপ-মা'র জন্যে একটু মন-কেমন করে না? ছেলেমানুষ বউ, বেশি তো বয়েস নয়—

—কিন্তু এখানে কিছুদিন তো অন্তত থাকবে। একটা হপ্তা থাকুক, আপনি এত তাড়াতাড়ি কেন ফেরত পাঠাচ্ছেন?

চৌধুরী মশাইয়ের কেমন যেন সন্দেহ হলো। বললেন—তা বউমার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন হে? বউমা কিছু বলেছে তোমাকে?

—বউমা? বউমা কেন বলতে যাবে? আপনি কী যে বলেন!

—তা হলে? তা হলে কে তার হয়ে তোমাকে ওকালতি করতে বললে? বলো, কে বললে?

প্রকাশমামা আর কী বলবে! হঠাৎ বলে ফেললে—সদা! সদা বলছিল—

চৌধুরী মশাই অবাক। বললেন—সদা? সদা তোমাকে বলেছে?

প্রকাশমামা বললে—হ্যাঁ—

—কী বলেছে সদা?

—বলছিল এরই মধ্যে কেন বাবা বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে, সেই কথা জিজ্ঞেস করছিল!

—জিজ্ঞেস করেছে তোমাকে?

প্রকাশমামা বললে—তা জিজ্ঞেস করবে না? সবে কাল ফুলশয্যে হয়েছে। এখনও ভালো করে ভাব-ভালবাসা হয়নি, এরই মধ্যে কিনা আপনি বউমাকে কেষ্টনগরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন!

—সদা কোথায়? তাকে ডেকে নিয়ে এসো তো আমার কাছে!

প্রকাশমামা সদাকে আনতে চলে গেল। আসলে খবরটা কেউই বলেনি প্রকাশমামাকে। ঘুম থেকে উঠে ঠাকুরদের বলে চা তৈরি করিয়ে নিয়ে খেয়েছিল। পিসেমশাইকেও গিয়ে এক কাপ খাইয়ে এসেছিল। বিরাট বাড়ি। বার-বাড়ি, ভেতর-বাড়ি। বার-বাড়ির উঠোন, ভেতর-বাড়ির উঠোন। কাল বউ-ভাতের রাত্রে সমস্ত বাড়িটা লোকজনে ভরে গিয়েছিল। তারপর কখন কে খেলে, কে না-খেলে, সব তদারক করেছে। সঙ্গে সঙ্গে

বউমার কানে যদি কোনও রকমে কথাটা ওঠে তো সে এক মর্মান্তিক কান্ড!

প্রকাশমামা তখনও জিজ্ঞেস করলে—তা বউমাকে আপনি সত্যি-সত্যিই পাঠিয়ে দেবেন নাকি?

চৌধুরীমশাই অন্যমনস্কভাবেই বলে ফেললেন—হ্যাঁ, তুমি এখন যাও, আমার কাজ আছে—

তখন থেকেই ছটফট করতে লাগলো প্রকাশমামা। সদাকে খুঁজতে লাগলো। কোথাও নেই সে! ভেতর-বাড়িতে দিদির কাছে গিয়েও কোনও সুরাহা হলো না। যাকে দেখে তাকেই জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ রে, সদাকে দেখেছিস? সদা কোথায় গেল?

কেউই দেখেনি সদাকে। যাকে ঘিরে এত কান্ড সে এই সময়ে কোথায় পালালো! পিসেমশাই-এর ঘরে গিয়ে দেখলে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন। প্রকাশমামা তাঁকে গিয়েও জিজ্ঞেস করলে—সদাকে দেখেছেন নাকি পিসেমশাই?

কীর্তিপদবাবু অবাক হয়ে গেলেন—সদা? খোকার কথা বলছো? তা সে আবার কোথায় যাবে? আবার পালালো নাকি?

—না, তাকে দরকার।

কীর্তিপদবাবু বললেন—তা দেখ গিয়ে সে হয়ত এখন নতুন নাত-বউ-এর কাছে ঘুর-ঘুর করছে—সে কি আর আজকে বুড়ো মানুষের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করবে!

তা বটে! প্রকাশমামা আবার ভেতর-বাড়িতে ঢুকলো। দিদি তখন ভাঁড়ার নিয়ে ব্যস্ত। একেবারে সোজা গিয়ে সদার শোবার ঘরের ভেতর দিকে চেয়ে দেখলে। নতুন বউ চুপ করে বসে ছিল। পাশে গৌরী পিসী তাকে পাথরের বাটিতে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে!

—হ্যাঁ গো গৌরী, আমাদের সদা কোথায় গেল? সদা এখানে আছে?

নয়নতারা মামা-শ্বশুরকে দেখেই মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিলে। গৌরী পিসী বললে—খোকা এখেনে থাকতে যাবে কেন গো মামাবাবু, বার-বাড়িতে গিয়ে দেখ—দিনের বেলা বর মানুষ কখনও বউএর কাছে থাকে?

প্রকাশমামা সদাকে না পেয়ে আবার অন্য দিকে চলে গেল।

কর্তাবাবুর কাছে খবর গেল প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাই এবার বউএর মুখ দেখতে আসতে পারেন। আড়তদার লোক। অনেক টাকা নিয়ে নাড়া-চাড়া করা মানুষ। টাকাও যেমন তিনি দেখেছেন, মানুষও দেখেছেন তেমনি অনেক। নতুন-বউ খাটের ওপর বসে ছিল। আবার তাকে বেনারসী পরানো হয়েছে। আবার সারা গায়ে গয়না উঠেছে।

গৌরী পিসী বললে—বউমা, তুমি ওই কার্পেটের আসনের ওপর বোস—শা' মশাই এলে তাঁকে প্রণাম করবে—

ওদিকে প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাইকে নিয়ে চৌধুরীমশাই ভেতর-বাড়িতে এসে পড়েছেন। তাঁদের কথাবার্তা কানে আসছে। গণ্যমান্য লোক, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে বৈষয়িক ব্যাপারে ক্ষতি হবে এ-বাড়ির। যেন আদর-আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি না হয় কোথাও।

বাইরে এসে চৌধুরীমশাই গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—গৌরী, বউমা তৈরি? আমরা যাবো?

ভেতরে গৌরী পিসী নয়নতারাকে নিয়ে আসনের ওপর বসিয়ে দিতে দিতে বললে—হ্যাঁ, আসুন—

কিন্তু বসতে গিয়েই একটা কান্ড ঘটে গেল। পাথরের জল-খাবারের গেলাসটা নয়নতারার পায়ে লেগে উল্টে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে গেলাসটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। তারপর ঘরের মেঝেয় চার-দিকে ছড়িয়ে গেল। গেলাসের বাকি জল-টুকুও ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারদিকে জলে জল-ময় হয়ে গেল।

চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাই তখন ঘরে ঢুকে ওই দৃশ্যের সামনে হতভম্ব হয়ে গেল হঠাৎ।

কারোর মুখেই তখন কোনও কথা নেই। না নয়নতারার, না গৌরী পিসীর, দুজনেরই মনে হলো যেন চরম সর্বনাশ ঘটে গেল তাদের চোখের সামনে। যেন আজকের সমস্ত অনুষ্ঠানের কেন্দ্র চরিত্র নয়নতারারও অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে হতভম্ব হয়ে গেল হঠাৎ।

বাইরে প্রীতির কানে গেল শব্দটা! প্রীতি বুঝতে পারলে ঘরের ভেতর যেন কী

একটা ভারি জিনিস হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল।

—কী যেন ভাঙলো না?

বেহারী পালের বউ সকালবেলাই এসেছিল। সেও বললে—ওমা, কী ভাঙলো গো ঘরের ভেতরে?

প্রাণকৃষ্ণ শা মশাই ওই পরিস্থিতির মধ্যে আর দাঁড়ালেন না। যা সঙ্গে করে এনেছিলেন সেটা তাড়াতাড়ি নতুন বউ-এর হাতে তুলে দিয়েই বিদায় নিতে পারলে বাঁচেন। যেন তাঁর অপরাধেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো।

মাঝখানে ভাঙা পাথরের টুকরোগুলো, আর জল। তার একপাশে নতুন বউ দাঁড়িয়ে, আর একপাশে প্রাণকৃষ্ণ শা'মশাই। নতুন বউ দু' হাত পেতে উপহারটা নিয়ে শা'মশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। কিন্তু শা'মশাই বলে উঠলেন—থাক থাক, আমি চলি—

সত্যিই, তাঁর অপরাধ-বোধ তাঁকে আর সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দিলে না। পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন চৌধুরী মশাই। তিনিও ঘটনার আকস্মিকতায় তখন স্তব্ধ হতচকিত।

—চলো বাবাজী, চলো—

দু'জনেই তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থল থেকে বাইরে বার-বাড়ির দিকে চলে গেলেন। যেতেই প্রীতি ঘরে ঢুকলো। চোখের সামনে যে দৃশ্য তার নজরে পড়লো তা দেখে তার মুখ দিয়ে তখন আর কোনও কথা বেরোল না।

নতুন-বউ তখনও তার কার্পেটের আসনটার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। তার সমস্ত শরীর তখন থর-থর করে কাঁপছে। ভাঙা পাথরের গেলাসের টুকরোগুলো যেন তখনও তার বুকে গিয়ে ফুটছে। তার যন্ত্রণাতেই যেন সে ছটফট করতে আরম্ভ করেছে।

বেহারি পালের বউও পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বললে—ওমা, এ কী, পাথরের গেলাসটা ভেঙে গেল নাকি?

কিন্তু কে আর তখন তার কথার উত্তর দেবে। সকলেই ঘটনার আকস্মিকতায় যেন মুহ্যমান।

প্রীতি চাইলে গৌরীর দিকে। বললে —হ্যাঁ রে, গেলাসটা ভাঙলি?

গৌরী বললে—বউমার পা লেগে ভেঙে গেল বৌদি—

ঝাঁঝিয়ে উঠলো প্রীতি। বললে—বউমার পা লেগে ভেঙে গেল তো তুই কোথায় ছিলি? তুই দেখতে পাসনি? তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিলি? তুই গেলাসটা একপাশে সরিয়ে রাখতে পারিস নি?

গৌরী বললে—শা'মশাই আসছিল তাই আমি তাড়াতাড়ি বৌমাকে আসনের ওপর বসাতে গেলুম......

—তা যখন দেখলি পায়ের সামনে গেলাসটা রয়েছে তখন ওটা সরাতে পারলিনে? দিন দিন তোর কী হচ্ছে, কী? আজকের এই দিনে পাথরের জিনিস কি ভাঙা ভালো হলো?

বেহারি পালের বউও পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিল। বললে—বেস্পতিবারের বার-বেলায় ব্যাপারটা ভালো হলো না বউ।

কথাটা সকলেরই মনে গিয়ে লাগলো। এমনিতেই পাথরের জিনিস। তার ওপর বৃহস্পতিবার। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সকলের বুকই ধক্-ধক্ করে উঠলো। এ যে কত বড় অমঙ্গল সে-কথাটা যেন কারো হৃদয়ঙ্গম হতে আর বাকি রইলো না। সকলেরই মনে হলো এত বড় দুর্ঘটনা যেন ভাবী কোনও অমঙ্গলের সূচক। অথচ এর কী প্রতিবিধান তাও সেই মুহূর্তে কারো যেন মাথায় এলো না।

বাইরে এসে বেহারী পালের বউ বললে —কাজটা ভালো হলো না বউ, নতুন বউ বাড়িতে এসেই পা দিয়ে পাথরের গেলাসটা ভেঙে ফেললে এটা কিন্তু ভালো হলো না—

প্রীতির তখন চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে। বললে—আমি কত দিক সামলাই

বলো তো মাসীমা? আমার কি একটা জ্বালা? আর মানুষদেরও আক্কেল কী-রকম দেখ, কালকে বউভাত গেল, কাল আসতে পারেনি বলে আজ এই অসময়ে আসতে হয়? আসবার আর সময় পেলে না কেউ? বউ তো পালিয়ে যাচ্ছে না বাড়ি থেকে! আর একটু বেলা করে এলে কী এমন ক্ষেতি হতো?

বেহারী পালের বউ বললে—তা কী আর করবে বলো, মঙ্গলচণ্ডীতলায় গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে হবে!

—পুজো?

বেহারী পালের বউ বললে—ওমা, তা পুজো দেবে না? অন্য কেউ হলে তত কিছু না করলেও চলতো, কিন্তু নতুন বউ বলে কথা! তোমার নতুন বউকেও নিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু মাসীমা, ওদিকে আর এক বিপদ হয়ে গেছে আমার।

বলতে বলতে প্রীতির গলাটা যেন বন্ধ হয়ে এল। বললে—কাউকে যেন বোল না মাসীমা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি এখন কাউকে বোল না। বউমার কানে গেলে আবার কেঁদেকেটে একসা করবে—

বেহারী পালের বউ গোপন কথার ইঙ্গিত পেয়ে আরো কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

বললে—আমায় কাউকে বলতে বয়ে গেছে, কথাটা কী শুনি না?

—তোমাকে আমার ঘরের লোক মনে করি বলেই বলছি, এখনও কেউ জানে না...

—আরে কথাটা কী তা-ই বলো না?

—বউমার মা মারা গেছে!

—ওমা, সে কী? কবে? কখন? কোত্থেকে খবর এল?

প্রীতি বললে—এই সকাল বেলা বেয়াই মশাই খবর পাঠিয়েছেন। এখন আমি যে কী করি, কার সঙ্গে পরামর্শ করি তাই ভাবছি। বউমাও জানে না কথাটা! পুরুত-মশাইকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কর্তারা সে-সব করছেন! এখন বাড়ির মধ্যে আমি কী করবো তা বুঝতে পারছি নে!

বেহারী পালের বউ বললে—বেশ ভালোই করেছ বউমা! তাহলে এক কাজ করো। আজকে আজ মাছ-টাছ কিছু খেতে দিও না বউমাকে। নিরিমিষ থাক, তারপর চতুর্থী করার ব্যবস্থা করতে হবে—

—কিন্তু ওরা তো বৌমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। তা বাপের বাড়িতে তো মা ছাড়া আর দ্বিতীয় মেয়েমানুষ কেউ নেই। বেয়াই মশাই খুবই ভেঙে পড়েছেন। আমি ভাবছি বউমাকে কেষ্টনগরে পাঠিয়ে দিই।

বেহারী পালের বউ ভেবে চিন্তে বললে—তা তাই-ই দাও বরং—

তারপর যেন কী ভাবলে। বললে—একে মা মারা যাওয়ার খবর এল, তার ওপর বেস্পতিবারে পা দিয়ে পাথরের জিনিস ভাঙলে, এসব ভালো লক্ষণ নয় বউমা. এতে কারোর ভালো হবে না, তোমার ছেলের পক্ষেও ভালো নয়! তোমার ছেলের একটু কষ্ট হবে বটে। কদিন বউকে ছেড়ে থাকতে পারবে তো?

প্রীতি বললে—আমার ছেলের কথা ছেড়ে দাও—

—তা ছেলে যদি তোমার রাগ না করে তো বউমা সেখানেই থাক। তারপর শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেলে, তখন না হয় ফিরবে! এই সময়ে বাপের কাছে থাকলে বাপও মনে একটু শান্তি পাবে—আর না-হয় ছেলেকেও বউ-এর সঙ্গে সেখানে পাঠিয়ে দাও। ছেলে যদি বউকে ছেড়ে থাকতে না পারে তো তাই-ই না হয় করো—

প্রীতি কিছু ভাঙলে না। মুখে বললে—দেখি, কী করি—কিন্তু বউমাকে খবরটা আমি কী করে দেব তাই ভাবছি মাসিমা—বউমা তো এখনও কিছু জানে না—

—তা আমি গিয়ে খবরটা দেব?

প্রীতি বললে—না, মাসীমা, আমি বলি এখন থাক। কর্তাও বলছিলেন খবরটা এখন বউমাকে দিয়ে দরকার নেই। শেষকালে কান্নাকাটি করলে আমি আর বউমাকে সামলাতে পারবো না—

—তা তোমার ছেলে কী বলছে? সদা?

—ছেলের কথা তুমি ছেড়ে দাও মাসীমা। সে শুধু বিয়ে করেই খালাস। সে কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। ভোর বেলা থেকে কোথায় যে সে ঘুরছে কেউ তার মুখও দেখেনি। খবরটা যে তাকে বলবো, তা তার দেখা পেলে তবে তো?

বেহারী পালের বউ বললে—তাহলে কর্তা যেমন বলেন সেই রকমই করো তুমি বউমা। ছেলের কানে গেলে যদি আবার সে বউমাকে বাপের বাড়ি যেতে না দেয়!

হঠাৎ চৌধুরী মশাই ভেতর বাড়িতে এলেন। প্রীতি কাছে এগিয়ে গেল। গলা নিচু করে জিজ্ঞেস করলে, কী খবর ওদিকের?

চৌধুরীমশাই বললেন—পুরুত মশাইকে বিদেয় করে দিয়ে এলুম। লোকের আক্কেল দেখে অবাক। আর সময় পেলে না, অসময়ে এসে হাজির! পাথরের গেলাসটা ভেঙে গেল মাঝখান থেকে! দেখ দিকিনি কী অমঙ্গলের ব্যাপার—

—সে আর ভেবে কী হবে! কিন্তু পুরুত মশাই কী বললেন? বউমা আজ নিরিমিষ খাবে তো?

—তা জেনে-শুনে আর আঁশ খেতে দেওয়া যায় কী করে বলো!

—কিন্তু কেষ্টনগরে যাওয়া?

চৌধুরী মশাই বললেন—পরেতে মশাই তো বলছেন সেখানে পাঠিয়ে দিতে। দু' দিন পরে তো পাঠাতেই হতো সেখানে। না-হয় একদিন আগেই গেল। আমি ভাবছি সেইটেই ভালো হবে। খোকা যে-কাণ্ড করছে, আজকেও যদি খোকা বউমার ঘরে না শোয় তো তাতেও বউমার মনে সন্দেহ হবে। তার চেয়ে বউমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো হবে—

—সংগে কে যাবে?

চৌধুরী মশাই বললেন—খোকা গেলেই ভালো হতো! কিন্তু কোথায় সে?

—থাকলেই কি সে সেখানে যেত? খোকা যদি না যায় তো প্রকাশ আর গৌরী সংগে যাক। এখানকার আমাদের তরফের কেউ গেলেই ভালো হতো।

—কিন্তু সংগে খোকা গেলেই সবচেয়ে ভালো হয়। তাহলে আর কারো যাবার দরকার হয় না।

প্রীতি বললে—তা দেখ না তাকে খুঁজে। যদি রাজি করাতে পারো—

চৌধুরী মশাই বললেন—সে না-হয় আমি দেখছি। কিন্তু তুমি ততক্ষণে বউমাকে তৈরি করিয়ে রাখো। খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখে দাও। বেরোলে এখুনি বেরোতে হবে। রজব আলীকে বলেছি গাড়ি তৈরি করতে। বেলডাঙার ট্রেনে পাঠানোই ভালো। প্রকাশ আর গৌরীকেও আমি তৈরি হতে বলছি—

বলে তিনি আবার যেমন এসেছিলেন তেমনি বার-বাড়ির দিকে চলে গেলেন!

*

হায় রে কপাল! তখনও নয়নতারা জানতো না যে যে-বাড়ি থেকে তাকে একদিন চিরকালের মত চলে যেতে হবে এই-ই বুঝি তার সূত্রপাত। এই ফুলশয্যার রাতই বুঝি তার জীবনের এক অমোঘ সূচনা। নইলে অমন করে পাথরের গেলাসটা পায়ে লেগে ভেঙে গেলই বা! অথচ এসব কথা যখন মা বলেছে তখন বিশ্বাসই করেনি সে। ভেবেছে মার যত সব কুসংস্কার। কোথায় কত দূরে রইল তার মা, আর কোথায় চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে সে চলে এল এই নবাবগঞ্জে। আর এই নবাবগঞ্জেই হয়ত তাকে সারা জীবন কাটাতে হবে।

সারা জীবন এখানে কাটাবার কথাটা মনে হতেই কেমন যেন আতংকে শিউরে উঠলো সে। কাল রাত থেকেই সে ভয়ে কাঁপছে। কীসের ভয়? তার তো এখানে ভয় থাকবার কোনও কারণ নেই! তার শাশুড়ি মানুষটা তো ভালো! শ্বশুরও তো ভালো। আর...

আর সেই তার স্বামীর কথাটা ভাবতে গিয়েই যেন সব কিছু তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেল! কে সে! কী রকম মানুষ! কী রকম স্বভাব চরিত্র সে-মানুষটার। শুধু বিয়ের সময় হাতে তার হাতের ছোঁওয়া লেগেছিল কিছুক্ষণ! কেষ্টনগরের সবাই-ই বলেছিল—ও-রকম বর নাকি সাধারণত দেখা যায় না।

আসবার সময় নয়নতারা যখন খুব কাঁদছিল তখন মা নিজের আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল—কাঁদিস নে মা, তোর কীসের দুঃখ, তুই যেমন স্বামী পেয়েছিস অমন স্বামী ক'জনের আছে বল তো! কাঁদিস নে—

তা সত্যি, বিয়ের দিন বাপের বাড়িতে একে একে সবাই তাকে এ-কথা বলে গেছে। যাদের বিয়ে হয়নি, কিম্বা যাদের বিয়ে হয়েছে সবাই তার বরের রূপ দেখে হিংসে করেছে।

হঠাৎ গৌরী পিসী ভাতের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বললে—এই নাও বউমা ভাত খেয়ে নাও—

নয়নতারা অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—এত সকাল-সকাল যে ভাত দিচ্ছ পিসীমা? ক'টা বাজলো এখন!

গৌরী পিসী বললে—সকাল-সকাল খেয়ে নাও, তুমি আবার কেষ্টনগরে যাবে যে আজ—

—কেষ্টনগরে? আজকে? কেন?

গৌরী পিসী বললে—তোমার শ্বশুরের ইচ্ছে যে তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে তুমি একবার দেখা করে আসবে। তুমি নাকি আসবার সময় সেদিন খুব কেঁদেছিলে, তাই। মাকে দেখতে তোমার খুব ইচ্ছে করছে না?

নয়নতারা বললে—হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করছে পিসীমা। মার জন্যে খুব মন-কেমন করছে আমার। কিন্তু তোমরা কী করে জানতে পারলে? আমি তো তোমাদের কিছু বলিনি।

গৌরী পিসী বললে—আহা, মন কেমন করবে না? মা কি যেমন-তেমন জিনিস বউমা?

নয়নতারা বললে—জানো পিসীমা, আমি কালকে রাত্তিরে মাকে স্বপ্ন দেখেছি। মা যেন আমার বউভাতের দিনে এই নবাব-গঞ্জে এসেছে, এসে আমাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম—মা, তুমি যে খবর দিয়েছিলে আসবে না। তবে এলে কেন? শুনে মা কী বললে জানো? মা বললে—তোর বউভাতের দিনে আমি না-এসে কি থাকতে পারি রে? ... তারপর হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি, আমার চোখ দুটো জলে ভেসে গেছে। কখন কেঁদেছি মনেও নেই—

গৌরী পিসী বললে—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও বউমা, দেরি হয়ে যাবে আবার। আজকে কিন্তু মাছ নেই, খেতে পারবে তো?

—মাছ নেই কেন পিসীমা?

গৌরী পিসী বললে—আজকে তোমার মাছ খেতে নেই—

—কেন পিসীমা? আজকে কী?

গৌরী পিসী সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তোমার জন্যে আর একটু দুধ এনে দি বউমা—

খেতে খেতে নয়নতারা কেবল মার কথাই বলতে লাগলো। মা কেমন চমৎকার রান্না করে, মা কেমন সেলাই করে, মা কেমন কথা বলে। মার কথা বলবার লোক পেয়ে নয়নতারা যেন বেঁচে গেল।

গৌরী পিসী বললে—তোমার শাশুড়িও খুব ভালো বউমা, তোমার শাশুড়ির মত মানুষ হয় না—

নয়নতারা বললে—মা'ও আমাকে তাই বলেছে। বলেছে—এখন থেকে শাশুড়িকেই মায়ের মত ভক্তি করবে—

গৌরী পিসী বললে—ও কটা ভাত দুধ দিয়ে খেয়ে নাও বউমা, আমি একটা সন্দেশ আনছি—

গৌরী পিসী বাইরে চলে গেল। কেষ্ট-নগরে যাওয়ার কথা ভাবতেই নয়নতারার সব দুঃখ যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার যেন নতুন করে বেঁচে উঠলো সে। আবার যেন সে নিজের সত্তা ফিরে পেলে। বেঁচে থেকে যে এত সুখ তা যেন সে এতদিন এমন করে আর কখনও উপলব্ধি করতে পারেনি। পাখিদের মত যদি পাখা থাকতো তার তাহলে বেশ উড়ে যাওয়া যেত। কেষ্টনগরে যেতে তাহলে আর তার এত দেরি হতো না।

হঠাৎ যেন বাইরে তার সেই মামা-শ্বশুরের গলা শোনা গেল।

—হ্যাঁ গো গৌরী, বউমা হঠাৎ বাপের বাড়ি যাচ্ছে কেন গো? কী হয়েছে?

গৌরী পিসীর গলা শোনা গেল তারপর। গৌরী পিসী বললে—অত জোরে কথা বোল না মামাবাবু, একটু আস্তে, বউমার কানে যাবে। বউমার কানে গেলে অনর্থ বাধবে—

—কেন, কী হয়েছে? বউমার কানে গেলে ক্ষতি কী?

গৌরী পিসী বললে—বউমার মা যে মারা গেছে—

—অ্যাঁ? মা মারা গেছে? সদার শাশুড়ি? কীসে মারা গেল? কখন খবর এল? আমি তো কিছুই টের পাইনি, আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি—

গৌরী পিসী বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো—আঃ, বলছি আস্তে। বউমা ঘরের ভেতরে রয়েছে, শুনতে পাবে যে—

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। গৌরী পিসী ঘরে ঢুকতেই দেখলে বউমার চোখ দুটো কেমন বিহ্বল হয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রয়েছে। হয়ত এখনি টলে পড়ে যাবে।

গৌরী পিসী তাড়াতাড়ি পাশে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। বললে—কী হলো বউমা, তোমার শরীর খারাপ হলো নাকি!

নয়নতারার মুখে যেন তখন কথা বলবার শক্তি নেই। কোনও রকমে বলে উঠলো—আমার মা মারা গেছে? তোমরা তো আমাকে কিছু বলোনি পিসীমা...

বলতে বলতে নয়নতারা সেইখানে কান্নায় ভেঙে পড়লো। (ক্রমশ)

বাংলাদেশের অগ্রজ-বিজ্ঞানী

কুদরাত এ খুদা

স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রজতম বিজ্ঞানী হিসেবে আপনি কী ভাবছেন? ওঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে কেন জানি না, এই প্রশ্নই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্ষণিক নীরবতা। মুহূর্তের জন্যে আত্মসমাহিত হয়ে পড়লেন তিনি। পরক্ষণেই দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, বাংলাদেশের সর্বসাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানের আধুনিকতম দিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। আমি চাই নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে ওদের আত্মপ্রত্যয় জাগুক। এর জন্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের বহুল চর্চার প্রয়োজন আছে। এবং দেশজ সম্পদকে কত বেশি জনকল্যাণে কাজে লাগান যায়, সেটা আবিষ্কার করাই হবে আমাদের বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক লক্ষ্য।

এটাই কি আপনাদের মৌলিক গবেষণা?

ওঁর তাৎক্ষণিক উত্তর: দেখুন, 'মৌলিক গবেষণা' এই কথাটির নতুন মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এতদিন গবেষণাগারে বসে জড় এবং জীবজগতের মৌলিক রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াসকেই আমরা 'মৌলিক গবেষণা' বলে জেনে এসেছি। যার ফলশ্রুতি আজকের দিনের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অসাধারণ আবিষ্কার। এবার উল্টো রথের পালা। এত বড়, এত ব্যাপক, এত বহুমুখী এই যে সাফল্য, মানুষের মৌলিক চাহিদা বা প্রয়োজন কতখানি তারা মেটাতে পেরেছে? বিজ্ঞানের কাছ থেকে কী আমরা চেয়েছিলাম, কতখানি আমরা পেয়েছি? দার্শনিকের অস্পষ্টতা নয়, আমি বলব, বিজ্ঞানীরাই এর উত্তর দিন। হ্যাঁ, এই উত্তরের অনুসন্ধানই হবে বড় রকমের এক মৌলিক গবেষণা।

ডঃ মুহাম্মাদ কুদরাত এ খুদা বললেন, 'আমি তো এখন রিটায়ার্ড লোক। আয়ুব খাঁর চাপে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে অবসর নিতে হয়েছে।' কিন্তু বাস্তবতায় এখন তিনি শতকরা একশ ভাগ বিজ্ঞান-সেবী

বাংলাদেশের অগ্রজ-বিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মাদ কুদরাত এ খুদার এই হল আসল মানসিকতা। প্রচলিত নিয়মে এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী। কারণ তিনি নিজেই বললেন, 'আমি তো এখন রিটায়ার্ড লোক। ১৯৬৬ সালেই আয়ুব খাঁর চাপে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে অবসর নিতে হয়েছে'। কিন্তু বাস্তবতায় এখন তিনি শতকরা একশ ভাগ বিজ্ঞান-সেবী। স্বাধীন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কী ধরনের কাজ করবেন, এ নিয়ে যেমন তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন, ওই সঙ্গে নিয়মিত লিখে চলেছেন বাংলা ভাষায় সবস্তরের বিজ্ঞান-গ্রন্থ। শুধু জনপ্রিয় বিজ্ঞান নয়, উচ্চতর পাঠ্যপুস্তকও। ওঁর মন্তব্য, 'পশ্চিমাদের (পশ্চিম পাকিস্তান) হাতে পড়ে বাংলা ভাষার যথেষ্ট বিকৃতি ঘটেছে। সেটার সংস্কার করা দরকার'।

আমি বললাম, জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনাকে সার্থক করে তুলতে পারলে, সাধারণ মানুষকে অনেক তাড়াতাড়ি বিজ্ঞানমুখী করে তোলা সম্ভব হবে। এপার বাংলায় অনেক তরুণ লেখক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভালই লিখছেন। আমার মনে হয়, পরিভাষার থেকেও এখন সব চাইতে বড় প্রশ্ন, কী লিখব এবং কেন লিখব, সে সম্পর্কে সতর্ক হওয়া। এ ছাড়া বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার উন্নতি করতে হলে চাই, বিজ্ঞান লেখকদের লেখাটাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। কারণ শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান—সব কিছুই যতক্ষণ না পর্যন্ত 'প্রোফেশনাল' স্তরে উন্নীত হচ্ছে বা হয়, ততক্ষণ যথাযথ একটি মানে পৌঁছন কখনই সম্ভব নয়।

প্রবীণ বিজ্ঞানী আমার বক্তব্য সমর্থন করলেন।

ওঁর সঙ্গে এটা আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মহাসম্মেলনে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদলের নেতৃত্ব করছিলেন তিনি। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছিল ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। প্রথম দিন থেকেই সরকারী এবং বেসরকারী নানান অনুষ্ঠানে দারুন ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে তাঁর সময় কাটছিল। বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বসুবিজ্ঞান মন্দিরে জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার উপর একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। ওই সভার পৌরোহিত্য করলেন আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিশিষ্ট অতিথি বাংলাদেশের প্রবীণ বিজ্ঞানী ডঃ খুদা।

ওই অনুষ্ঠানে আমি নিজেও একজন বক্তা। শহর কলকাতার যানবাহনের কল্যাণে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। যখন উপস্থিত হলাম, দেখলাম দীর্ঘদেহী পরিণত বয়স্ক এক ব্যক্তি উদাত্ত কণ্ঠে গভীর আন্তরিকতায় সঙ্গে বাংলা পরিভাষার উপর কথা বলছেন। দেখা হল কলকাতার সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর ডঃ জয়ন্তকুমার বসুর সঙ্গে। ওঁকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, ডঃ খুদা বক্তৃতা করছেন।

সেই প্রথম দর্শন।

ডঃ খুদা বলছিলেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান রচনায় বাধা কোথায়, তার ওপর। তিনি বললেন, বহুল প্রচলিত যে সমস্ত ইংরেজী বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দে আমরা অভ্যস্ত, তাদের বাংলা পরিভাষা তৈরি করার প্রয়োজন নেই। আসল বক্তব্যকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে, এটাই আমাদের কর্তব্য।

ডঃ খুদার পর বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও বক্তৃতা করলেন। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে আহ্বান জানালেন।

বক্তৃতার পর ডঃ খুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ভেষজ গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস।

সেই প্রথম সাক্ষাৎ। খানিকটা সাক্ষাৎকারও বলা চলে।

ডঃ বিশ্বাস বললেন, ডঃ খুদা এর আগেই আপনার কথা বলছিলেন। গত বছর 'দেশ' পত্রিকার বাংলাদেশ সংখ্যায় 'বাংলাদেশের বিজ্ঞান চর্চা' প্রসঙ্গে আপনার লেখা ওঁর খুব ভাল লেগেছে।

ডঃ খুদা আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, 'দেশ' কর্তৃপক্ষের কাছে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই সঙ্গে আপনাকেও আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বললাম, এটা আমার কাছে আশীর্বাদ। কিন্তু বাংলাদেশের বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনার নিজের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

ডঃ খুদা বললেন, আগামীকাল আসুন। আমি গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় উঠেছি। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ আসবেন।

তখনকার মত আর বেশি কিছু কথা বলা সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞান কলেজে আরও একটি আলোচনা সভায় যোগ দেবার জন্যে উদ্যোক্তাদের তাগাদায় তাঁকে ছুটতে হল।

উনি চলে যেতেই ডঃ ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাসকে অনুরোধ করলাম, আপনার কিছুটা সময় আমি নষ্ট করব। বিজ্ঞানী হিসাবে গোড়া থেকেই ডঃ খুদার সঙ্গে আপনার পরিচয়। ওঁকে আপনি জানেন। আমাদের সাক্ষাৎকারে আপনার সাহায্য চাই।

ডঃ বিশ্বাস এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

পরদিন, ফেব্রুয়ারি ২৪। বিকেল পাঁচটায় উপস্থিত হলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগে। সেখান থেকে ডঃ বিশ্বাসের সঙ্গে আন্তর্জাতিক অতিথিশালার দিকে যাত্রা।

পথে যেতে যেতে ডঃ খুদা সম্পর্কে ডঃ বিশ্বাস যা বললেন, তার সার কথা: কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে থাকার সময় থেকেই দুটি জিনিসের উপর ডঃ খুদা গুরুত্ব আরোপ করেছেন সব চাইতে বেশি। এক, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা। দুই, দেশজ সম্পদকে গবেষণার মাধ্যমে উন্নত করে একটি জাতীয় ট্র্যাডিশন সৃষ্টি করা। বয়েস একাত্তর। ছাত্র হিসেবে চিরদিনই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
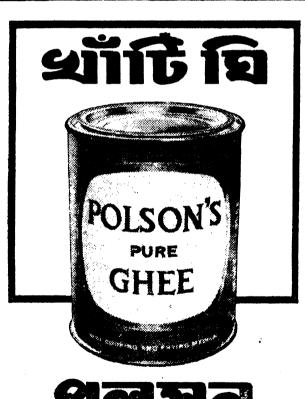
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের এম এস-সি, পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও লাভ করেন। অতঃপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস-সি এবং ডি আই সি উপাধি লাভ। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ডি পি আই-এর পদে বহাল হন। পরে পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান-কারিগরি গবেষণা সংস্থার অন্যতম পুরোধা। এবং অবশেষে বিজ্ঞান উপদেষ্টা।

তৈরি হল কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড। এই বোর্ডের বিশিষ্টতম সহযোগীরূপে কাজ শুরু করলেন ডঃ কুদরাত এ খুদা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-অভিধান থেকে শুরু করে উচ্চতর পাঠ্যক্রমের পাঠ্যপুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হল জৈব রসায়ন। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত অনার্স এবং এম এস-সি মানের এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে সেই প্রথম যেন এক ইতিহাস রচনা করে বসল। এতদিন যাঁরা বলে এসেছেন বা এখনও বলে থাকেন, বাংলা ভাষায় উচ্চতর মানের বিজ্ঞানের বই লেখা সম্ভব নয়, ডঃ খুদার এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে তার এক প্রতিবাদ।

দেশ পত্রিকার জন্যে আয়োজিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ডঃ খুদা আমাকে বলেছেন, বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণাটি যদি পরিষ্কার থাকে, এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার উপর দখল, আমি মনে করি যে কোন স্তরের বিজ্ঞান রচনায় তখন বাধা থাকার কোন কারণই নেই। যে ভাষায় কথা বলি, যে ভাষায় চিন্তা করি, সে ভাষায় লিখিতভাবে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারব না, এটা ভুল ধারণা। অবশ্য এই না পারার পেছনে একটা সংস্কার কাজ করে। ইংরেজী ভাষাটাকে আমরা সংস্কারের মত গ্রহণ করেছি। এটা ভুলতে হবে।

প্রঃ ডঃ খুদা, এই সঙ্গে আর একটা দিকও তো ভাবার আছে? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ ভীষণভাবে এগিয়ে রয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে বিদেশী ভাষা তো একটা জানা চাই? ইংরেজীতে আমরা মোটামুটি অভ্যস্ত বলে, এ ক্ষেত্রে ইংরেজীতেই কাজ করা ভাল?

খুদাঃ ঠিক। আমি কিন্তু এ কথা বলছি না, ইংরেজী শেখার দরকার নেই। ভাষা এবং বিজ্ঞান দুটো কিন্তু পৃথক ব্যাপার। বিজ্ঞান হল বিষয়, ভাষা সেই বিষয়কেই প্রকাশ করার মাধ্যম। আমার কথা হল, স্বাস্থ্যসম্মত খাবারটা চীনে মাটির প্লেটে খাবেন না কলাপাতায় খাবেন। যেখানে কলাপাতা সুলভ এবং সহজে পাওয়া যায় সেখানে [illegible] প্লেট বাদ দিলেও কোন ক্ষতি নেই। বিশেষ অতিথির জন্যে একটা প্লেট রাখতে পারেন। অর্থাৎ

আমার বক্তব্য, আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে যাঁরা কাজ করেন এমন বিজ্ঞানী বা গবেষকের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। তুলনায় অবশিষ্ট যাঁরা বিজ্ঞান চর্চা করেন তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। বিজ্ঞান শিক্ষাকে, বিজ্ঞান ভাবনাকে যদি ব্যাপকভাবে সার্থক করে তুলতে হয়, ও'দের কথাই প্রথমে আমাদের ভাবা দরকার। গুটিকয় 'আন্তর্জাতিক মানের' বিজ্ঞানীরা সহজেই প্রয়োজন মত বিদেশী ভাষা শিখে নিতে পারেন?

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক মুহম্মদ এনামুল হক 'জৈব রসায়ন'-এর প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ 'আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শুধু নিজের কাজে নহে, দেশের কাজেও নিয়োজিত করিয়া আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, দেশকেও উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে।...শিক্ষার নিম্নস্তর হইতে শুরু করিয়া উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করিয়া নাগরিকদের লব্ধ জ্ঞানকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইবে।...বলিতে বাধা নাই, যাঁহারা শিক্ষাবিদ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যতা রাখেন, তাঁহাদিগকেই এ কাজ করিতে হইবে।'

জৈব রসায়ন-এর ভূমিকায় ডঃ খুদা লিখেছেনঃ ...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে দিন বাংলা ভাষাকে মধ্যস্তরের শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করে, সেই দেশের নূতন ভবিষ্যতের সূচনা হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেই ১৯৩৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য বিজ্ঞানের পুস্তক আজও আমাদের হস্তগত হইল না। বিজ্ঞানের গতি কিন্তু অপ্রতিহত এবং উত্তরোত্তর অগ্রগামী। সুতরাং আমরা যদি এ বিষয়ে অবহিত না হই তাহা হইলে চিরদিনের জন্যই আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ থাকিব বলিয়া ভয় হয়।..." ওই ভূমিকায় আর এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, জাপান পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান আলোচনাকে নিজ ভাষায় আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া বিজ্ঞান এবং শিল্প ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা করি বলিয়া এখনও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সক্ষম হই নাই...।'

ডঃ বিশ্বাসকে প্রশ্ন করলাম, এ ধরনের সংস্কারমূলক কাজে হাত দিতে গিয়ে ডঃ খুদা বাধা পান নি?

বাধা? ডঃ বিশ্বাস বললেন, 'প্রচুর বাধা ছিল। তবে ভাষা আন্দোলনের সাফল্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লেখার ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছে। ডঃ খুদার সাফল্যে আমরা গর্বিত। তবে বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাধা ছিল অনেক। ডঃ খুদা চেয়েছিলেন, বাংলা দেশের বিজ্ঞান গবেষণার কাজ উন্নত মানের হোক। পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান কারিগরি গবেষণার দপ্তর বা সি এস আই আর তৈরি হওয়ার পর পশ্চিমারা ভাল ভাল কাজ ওদের দেশেই করাতে লাগল। ডঃ খুদার চেষ্টায় এখানেও গবেষণাগার তৈরি হল। এর জন্য অনেকটা কাঠখড় ওঁকে পোড়াতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নতুন একটা জগাখিচুড়ির আইন করে ডঃ খুদাকে ওরা অবসর নিতে বাধ্য করে। কিন্তু তাতেও একটা মজা হল। পশ্চিমে যে ভদ্রলোক এ দপ্তরের হোতা। অর্থাৎ যার যোগসাজশে অমন আইন তৈরি হল, শেষ পর্যন্ত ওই আইনের আওতায় সেও এসে গেল। ফলে সে বেচারাও চাকরি হারাল। ১৯৬৬-৬৭ নাগাদ অবসর নেয়ার পর ডঃ খুদা এখন মুখ্যত বাংলা ভাষায় উচ্চতম পাঠ্য পুস্তক রচনায় কাজ করছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় পৌঁছলাম ঠিক ছটায়। বিজ্ঞান কংগ্রেসের তরফ থেকে যে ছেলেটির ওপর এ'র দেখাশুনো করার ভার পড়েছিল, তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, ডঃ খুদা এইমাত্র ফিরলেন। সারাদিন আজ দপ্তরেই কেটেছে। মিনিট পনের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

এবং ঠিক মিনিট পনের পরই সেই মুহূর্ত এল। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে। ডঃ বিশ্বাস বললেন, ডঃ খুদা এই বয়েসেও প্রচণ্ড সময় ধরে চলেন।
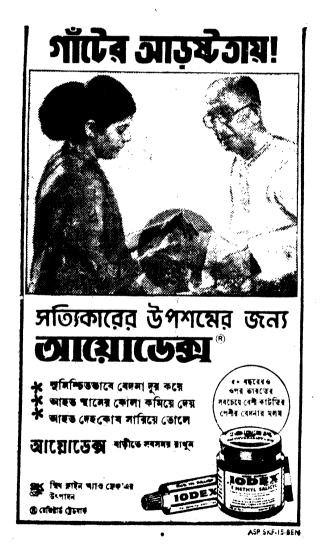
ডঃ খুদা এবং আমি পাশাপাশি বসলাম। মুখে আত্মভোলা হাসি। প্রতিটি কথার মধ্যে অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়। জোর করে পাথর চাপা দেওয়া প্রস্রবণের মুখ থেকে পাথরটুকু যেন সদ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে, পরিবর্তে তার ভেতর থেকে সবেগে বেরিয়ে আসছে অফুরন্ত ধারা প্রবাহ। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। কাজ অনেক। ভাবনা অনেক। এই সুরেই অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন প্রবীণ বিজ্ঞানী।

প্রঃ : ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস কেমন লাগল, ডঃ খুদা?

ডঃ খুদা : খুবই ভাল লেগেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর খোলাখুলিভাবে আপনাদের এবং বেশ কিছু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানীরা ভাব বিনিময় করার সুযোগ পেলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হল। এতে করে পারস্পরিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী প্রভৃতির আদান প্রদান সহজতর হওয়ার পথ খুলে গেল। এটা দরকার। বিজ্ঞান এবং কারিগরি ক্ষেত্রে ভাব বিনিময় করা সহজ হবে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আনন্দিত। কারণ, কলকাতা তো আমার কাছে বিদেশ নয়। আমার বিজ্ঞানী জীবনের শুরু এখানেই। কংগ্রেসে এসে বহু পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। এটা আমার ব্যক্তিগত লাভ।

প্রঃ : ডঃ খুদা, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে এটাই কি আপনার প্রথম অংশ গ্রহণ?

ডঃ খুদা : প্রথম বললে ভুল হবে। ১৯৩০-এর কাছাকাছি সায়েন্স কংগ্রেস দেখেছি। তবে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার মত সুযোগ আমার তেমন ছিল না। পড়াশুনার কাজকর্ম, পড়ানো, গবেষণা এসব করতেই সময় চলে যেত।

প্রঃ : ঠিক এই মুহূর্তে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। তবু আপনার মত একজন প্রবীণ এবং দূরদর্শী শিক্ষাবিদের কাছে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে চাই। বর্তমান ছাত্র-অসন্তোষ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

ডঃ খুদা : দেখুন, ছাত্র অসন্তোষ কোন দেশে কোন কালেই কোন নতুন জিনিস নয়। এখন অবশ্য এটা ব্যাপকতর হয়ে দেখা দিয়েছে। ঢাকাতেও এসব আমরা দেখেছি। এর জন্যে, আমি বলব শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকই শতকরা নব্বই ভাগ দায়ী। ছাত্রদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক রাখার যোগ্যতা অনেক শিক্ষকের আজ নেই। শিক্ষকরা যদি তাদের ভালবাসেন এবং আন্তরিকতাব সঙ্গে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন, ছেলেরা কখনই বিক্ষোভ করতে পারে না। আমার মনে আছে, যখন আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়াচ্ছি, একদল ছাত্র নিয়ে গেলাম টাটার কারখানা দেখাতে। সেখানে একদিন খবর পেলাম, একটি ছাত্র মারাত্মক রকমের অশালীন ব্যবহার করেছে কার সঙ্গে। ওকে বিকেলে ডেকে বললাম, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কাল থেকে আমাদের সঙ্গে আর বেরোবে না। মনে পড়ে, ছেলেটি রাতে চুপি চুপি আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বলল, কখনও এ ধরনের অপরাধ আর সে করবে না। পরে ওকে আমি ক্ষমা করেছি। পরবর্তী জীবনে সে অনেক বড় হয়েছে। কই, কেউ তো এ ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করল না?

প্রঃ : শুনেছি, দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের বিজ্ঞান কারিগরি গবেষণার সঙ্গে আপনি জড়িত হন। এ সম্পর্কে কতটা কাজ আপনারা করতে পেরেছিলেন, ডঃ খুদা?

ডঃ খুদা : যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়েছে, তব পূর্ব বাংলার মানুষ সুফল তেমন

কিছুই পায় নি। প্রথমত গোড়ার দিকে পাকিস্তানে কোন রিসার্চ অর্গানাইজেশন ছিল না। পরে অবশ্য সি এস আই আর-এর পত্তন হয়। পূর্ব বাংলায় এর রূপায়ণের দায়িত্ব দুজনের ওপর ছিল। ডঃ সবুর এবং আমার ওপর। বিজ্ঞানী হিসেবে ডঃ সবুর ভালই ছিলেন। কিন্তু বড় বেশি তৎকালীন সরকারের কোলে ঝোল টেনে বেড়াতেন। আমি তিনশ জন ছেলেকে বিদেশে থেকে পি এইচ ডি এবং স্নাতোকত্তর গবেষণায় শিক্ষিত করে নিয়ে এলাম। একে একে ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রামে একটি করে মোট তিনটি গবেষণাগার তৈরি হল। কিন্তু মুশকিল হল, গবেষণা চালানর জন্যে যতটা টাকা দেওয়া দরকার সে তো পশ্চিমারা দিতই না, বরং বরাদ্দ টাকাও যাতে ঠিক মত না পাই, তার জন্যে নানা রকম লালফিতের মারপ্যাঁচ চলতে।

প্রঃ : কী কী ধরনের কাজের উপর আপনারা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন?

ডঃ খুদা : প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন কাঠ, প্রাণী প্রভৃতি। পাট, খাদ্য সংরক্ষণ, বিশেষ করে মৎস সংরক্ষণ। আপনারা নিশ্চয় জানেন, পূর্ব বাংলায় অঢেল মাছ। ভাল সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে শুধু দেশবাসীর কল্যাণেই যে তাদের কাজে লাগান যায় তাই নয়, বিদেশেও প্রচুর রফতানি করা যেতে পারে।

প্রঃ : কিছু যদি না মনে করেন, ডঃ খুদা, ব্যক্তিগতভাবে কী ধরনের গবেষণার সঙ্গে আপনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন, অনুগ্রহ করে যদি কিছু সে সম্পর্কে বলতেন—।

ডঃ খুদা : কতকগুলি ক্ষেত্রে আমরা খুবই ভাল কাজ করেছিলাম। যেমন ধরুন পাট। বাংলাদেশ পাটের জন্যে বিখ্যাত। আমরা দেখলাম, পাটের আঁশ বিক্রি করার পর যে পাট কাঠি পড়ে থাকে, একমাত্র জ্বালানি এবং কিছুটা বাগানের বেড়া দেওয়া ছাড়া কোন কাজেই তাদের লাগান হয় না। এই বস্তুটির উপর আমরা গবেষণা চালিয়ে তৈরি করলাম শক্ত বোর্ড, ঢেউ খেলান টিনের মত সামগ্রী প্রভৃতি। কারিগরি অভিজ্ঞতা বা যাকে 'নো হাও' বলা হয় সেটা আমাদের। পাটকাঠি থেকে সেলুলোজ বের করে মণ্ড তৈরি করি। ওই মণ্ড থেকেই ওই সমস্ত জিনিস তৈরি করা হয়। সুবিধে হল, ওরা অত্যন্ত হাল্কা, শক্ত, তাপসহ। ঘর ছাওয়ার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। দামে দারুণ সস্তা। আরও একটি লাভ। কিন্তু পরিণত হলে পাটকাঠি বিক্রি করেও লোকেরা লাভবান হতে পারবে। এখন এক মন কাঠির দাম যেখানে আট আনা, তখন তার দাম হয়ত দাঁড়াবে পাঁচ টাকা? আমাদের এই পদ্ধতিতে প্রায় একশ মন পাটকাঠি থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মন মণ্ড তৈরি করা সম্ভব হয়। অথচ বাঁশের ক্ষেত্রে কখনই তিরিশ মনের বেশি পাওয়া যায় না। পাটকাঠির সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানও মণ্ড তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শতকরা দশ ভাগের বেশি মণ্ড কখনও ওরা করতে পারে নি। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা এই কাঠি থেকে এক ধরনের কাগজ তৈরি করেন। যা সাধারণ কাগজের তুলনায় বহুগুণে শক্ত এবং উন্নত মানের। পাটকাঠি থেকে আমরা কৃত্রিম সিল্কও তৈরি করেছি। আসল সিল্কের পাশে রাখলে বুঝতে পারবেন না এটি আসল, না নকল?

প্রশ্ন : বাবসায়িক ভিত্তিতে এ নিয়ে কি কোন কাজ করা হয়েছে?

ডঃ খুদা : না। পাকিস্তানীরা চেয়েছিল 'নো হাও' বাগাতে। আমরা দিই নি। গোড়া থেকেই ওরা চেয়েছিল দেশের শিল্প ওরা চালাক, মালপত্র ওরা তৈরি করুক। সেগুলি আমাদের কাছে বেচে করে পয়সা লুটুক। এটা কখনই আমরা হতে দিতে চাই নি। আরও ভাল ভাল গবেষণাও করা হয়েছে। যেমন ধরুন লাটাই ফল নামে এক ধরনের ফল থেকে তৈরি করা হয়েছে মূল্যবান প্রোটিন। বাংলাদেশে প্রচুর হলুদ জন্মায়। বছরে উৎপন্ন ফলনের পরিমাণ ৫০,০০০ টন। নিজস্ব পদ্ধতির সাহায্যে এই হলুদ থেকে আমরা এক ধরনের তেল তৈরি করি যার দাম প্রায় বাইশ কোটি টাকা। এই তেল জীবাণু নাশকের কাজে ব্যবহার করা চলে। তা ছাড়া তেল বের করার পরও যে অধঃক্ষেপ পড়ে থাকে তা দিয়ে খাবার রঙ করা যেতে পারে। অবশ্য তেলের ব্যবহারের ব্যাপারে এখনও গবেষণা চলছে। কালমেঘ প্রভৃতির উপর ভেষজ গবেষণাতেও ভাল কাজ হয়েছে।

ডঃ খুদা জানালেন, তিতাস অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান। বগুড়ায় মাটির প্রায় পাঁচশ ফুট নিচে পাওয়া গেছে চুনা পাথরের পাহাড়। উত্তর বঙ্গে প্রচুর কয়লার সন্ধান মিলেছে, যা কম করেও একশ বছর বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা পূরণ করতে পারবে। কক্স বাজারে মোনাজাইট পাওয়া গেছে। পারমাণবিক গবেষণায় এই মোনাজাইটকে কাজে লাগান যেতে পারে।

, হাঁ, আছে। অতীতে বাধা হয়ত অনেক পড়েছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সামনে এখন গবেষণার কাজ পথ উন্মুক্ত। মাছ চাষ, কৃষি-বিজ্ঞান, মেরিন বাইওলজি বা সমুদ্র-জীববিদ্যা, খাদ্য সংরক্ষণ। যে প্রচুর কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে তাকে কেন্দ্র করে নানা রকম রাসায়নিক কারখানাও গড়ে তোলা অসম্ভব হবে না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের পারমাণবিক গবেষণার আদর্শ কী হবে। ডঃ খুদা?

ডঃ খুদা : পারমাণবিক সম্ভার আমাদের কম। তবু এ ব্যাপারে যতটুকু আমাদের উদ্যোগ, তার লক্ষ্য হবে মানব-কল্যাণ। কৃষি-বিজ্ঞান, ওষুধ প্রভৃতিতেই একে আমরা কাজে লাগানর চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : মৌলিক গবেষণা প্রসঙ্গে আপনি কী ভাবছেন?

ডঃ খুদা : বিশেষ বিশেষ মৌলিক গবেষণার উপর অবশ্যই আমাদের জোর দিতে হবে। যে কোন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিককে সুষ্ঠু এবং উন্নততর করার জন্যে মৌলিক গবেষণা অবশ্যই চাই। নইলে বিদেশীদের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে।

প্রায় দুই ঘণ্টা। কী ভাবে যে কেটে গেল, জানি না। একাত্তর বছরের বিজ্ঞানী খুদা তরুণের মন নিয়ে যা কিছু ভেবে চলেছেন তার সমস্তই আজ বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটুক, বিজ্ঞান এবং কারিগরির সার্থক রূপায়ণ সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সুযোগ সহজতর করুক।

সমরজিৎ কর

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৬ ॥

রেণুদের বাড়ি যে পাড়ায়, সেটা স্টার থিয়েটারের কাছাকাছি। এরই কাছা-কাছি আর একটি বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন কিছুদিন। লোকে বলে, ঐ বাড়ি থেকেই শ্রীঅরবিন্দ গোপনে ফেরারের মতন ব্রিটিশ রাজত্ব ছেড়ে চলে যান।
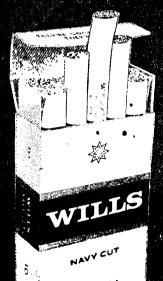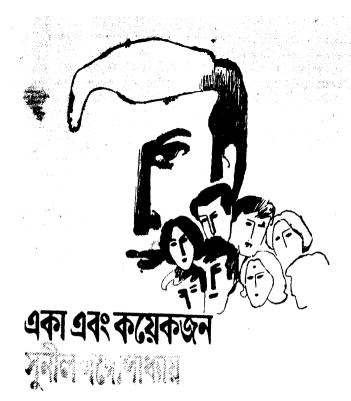
রাস্তা থেকে রেণুদের বাড়ির ভেতরটা কিছুই দেখা যায় না। এই ধরনের বসত-বাড়ি পরবর্তীকালে কলকাতা শহর থেকে লোপ পেয়ে যায়। মস্ত বড় কাঠের গেট দিয়ে সামনেটা সম্পূর্ণ ঢাকা, একটা পাল্লার মধ্যখানে কাটা একটা হাফ দরজা—সেখান দিয়েও ঢোকা যায়। ঢুকলেই একটা ছাদ-ঢাকা চওড়া গলি, গলির দু-পাশে শ্বেত পাথরের রক। তারপর একটা গোল উঠোন, উঠোনের একদিকে ঠাকুর দালান, অন্য তিন দিকে এলোমেলো ঘর—একতলায় অবশ্য কেউ থাকে না। দোতলায় তিন তলায় কত যে ঘর, কত যে মানুষজন তার ইয়ত্তা নেই। গোটা বাড়িটাই একটা উপনিবেশের মতন, কে কখন আসছে যাচ্ছে, তার কোনো হিসেব রাখা অসম্ভব।

ঠাকুর-দালানের স্তম্ভের দু-পাশে দুটি কালো পাথরের হাতি। ছেলেমেয়েরা ওদের পিঠে চড়ে খেলা করে বলে পিঠগুলো মসৃণ হয়ে গেছে। দালানের ভেতরে শূন্য বেদী, কোনো দেবতার মূর্তি নেই।

এ বাড়ির ভেতরে পা দিলেই বোঝা যায়, এককালে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যে বাড়িটা গমগম করতো, কিন্তু কোনো এক মধ্যরাত্রে লক্ষ্মী চুপি চুপি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আর ফেরেননি। দেয়ালের নোনা-ধরা দাগের মতন দারিদ্র্যের শাখাপ্রশাখা-মেলে হাত চতুর্দিকে ছাপ লাগিয়ে দিচ্ছে। এ বাড়ি রং করা হয়নি অনেক দিন। দোতলা-তিনতলার কার্নিশ থেকে বেরুনো বট ও অশ্বত্থ গাছের চারা মহীরুহ হবার স্বপ্ন দেখছে। তিনতলার একটি ব্যালকনি দেখলে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে সবসুদ্ধ ভেঙে পড়তে পারে—সেখানে কারুর যাওয়া নিষেধ, তবু ছোট ছেলেমেয়েরা খেলার ঝোঁকে সেখানে কখনো কখনো চলে যায়। শিশুদের তো মৃত্যুভয় থাকে না! মেরামত করার বদলে সেই ব্যালকনিটা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়াই নিরাপদ, কিন্তু কারুর সেটা খেয়াল হয় না। এই ধরনের একদা-ধনী বাড়িতে দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ঔদাসীন্যও এসে জেঁকে বসে। পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই যে-রকম চলছে, যতদিন চলছে চলুক—এই রকম মনোভাব নিয়ে আছেন, আর দু-একজন আবার বিনা উদ্যমে, ফাঁকতালে হঠাৎ বড়-লোক হয়ে যাবার চিন্তায় মশগুল। তখন পর্যন্ত হঠাৎ বড়লোক হবার একমাত্র মরীচিকা ছিল রেস খেলা। কয়েক বছর বাদেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে গেলে অবশ্য হঠাৎ বড়লোক হবার আরও অনেক সুযোগ এসে যায়। তবে, অভিজাত মধ্যবিত্ত এবং বানিয়া সম্প্রদায়ই সে সুযোগ গ্রহণ করেছে বেশি।

গঙ্গার ঘাটে হারিয়ে যাওয়া মেয়ে রেণুকে পৌঁছে দিতে বড়বাবুই এসেছিলেন এ বাড়িতে। বাদলও সঙ্গে এসেছিল। ওরা ভেবেছিল, এ বাড়িতে পা দেওয়া মাত্রই একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে। কিন্তু ঢুকেই যার সঙ্গে দেখা হলো, রেণুর সেই কাকা কিছুই খবর জানেন না। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে বড়বাবু রেণুকে কোলে করে নিয়ে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলেন, রেণু তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। চোখের জলে তার জার্মান সিল্কের ফ্রকের বুকের কাছটা ভিজে গেছে। রেণুর বয়েস তখন পাঁচের কাছাকাছি—মাথা ভর্তি কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল।

রেণুর কাকা বিস্মিতভাবে বললেন, কি ব্যাপার? আবার বুঝি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল? এই মেয়েটা যখন তখন বাইরে চলে যায়—

বড়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, যাক; তা হলে আপনাদেরই বাড়ির মেয়ে? ওকে গঙ্গার ঘাটে পাওয়া গেছে। হারিয়ে গিয়েছিল।

রেণুর কাকা ভুরু তুলে বললেন, গঙ্গার ঘাটে? হোয়াট, দ্যাট ইজ নেক্সট টু ইম-পসিবল্! এই মেয়েটা, তুই কার সঙ্গে গিয়েছিলি, অ্যাঁ?

রেণুর কাকা চালিয়াৎ ধরনের মানুষ। চুলে টেরি কাটার খুব বাহার, কানের ডগা পর্যন্ত লম্বা জুলপি, বুকের বাঁ পাশের দিকে বোতাম লাগানো বড়ুয়া-কায়দার পাঞ্জাবি পরা। বড়বাবুকে তিনি একটিও ধন্যবাদ বাক্য জানালেন না বা বসতে বললেন না। কথাবার্তা হচ্ছিল উঠোনে দাঁড়িয়েই।

বড়বাবু খানিকটা শাসনের সুরে ওকে বললেন, আপনি মেয়েটির বাবা কিংবা মায়ের কাছে খবর পাঠান। আমি এ বাড়িতে একেবারে অপরিচিত নই, অনেককাল আগে একবার এসেছি—একটি গানবাজনার আসর হয়েছিল ঐ দরদালানে। সুরেশ্বর আমাকে নিয়ে এসেছিল।

—কোন্ সুরেশ্বর?

—সুরেশ্বর রায়। ভবানীপুরে থাকে। সে আমার সহোদর ভাইয়ের মতন।

—ও, মেজ জামাইবাবু!

একটু বাদেই জানা গেল রেণুর মা ভেতরে অজ্ঞান হয়ে আছেন। বাড়ির এক অংশে কান্নাকাটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। আর একটা অংশে কোনো খবরই এসে পৌঁছোয়নি। রেণুর মা ঐ বাড়ির আরও তিনজন মহিলা ও দুজন দাসী ও একটি

দরোয়ান সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলেন, তার মধ্যেই রেণু কি করে যেন হারিয়ে যায়। সবার ধারণা, সে চুরি হয়ে গেছে। তখন ছেলেধরা মেয়েধরার গল্প আকছার শোনা যায়—ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে ভিখিরি বানানো হয়, আর বাঙালী মেয়েদের নাকি বিক্রী করা হয় আরব দেশে। কয়েকদিন আগে এ বাড়ির সামনে নিশির ডাক শোনা গিয়েছিল, সেই জন্য আরও ভয়।

তিনমহলা বাড়ির একেবারে ভেতর মহলে নিয়ে বসানো হলো ওদের। রেণুর মা হেসে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠলেন। কতবার যে বাদলের কাছে গল্পটা শুনতে চাইলেন, তার শেষ নেই। তিনি কক্ষনো বাইরের পুরুষ মানুষের সামনে এসে কথা বলেন না, কিন্তু তখন বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে একটুও লজ্জা নেই। রেণুর বাবা বাড়িতে ছিলেন না তখন, রেণুর জ্যাঠামশাই এসে বড়বাবুর সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। তখন দেশের শিক্ষিত মানুষ মাত্রই কংগ্রেস ও লীগ মিনিস্ট্রির ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তিত।

সেই থেকে বাদল এ বাড়িতে প্রায়ই আসে। বাদলের তখনও কোনো ভাই ছিল না। তার নিজের দিদি ছাড়াও জ্যাঠা-মশাইদের সব কটিই মেয়ে। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে থেকে থেকে বাদলও পুতুলের বিয়ে ও রান্নাবাটি খেলা শিখছিল। মা বলতেন, আমার যাও বা একটা ছেলে হলো, তারও মেয়েলি স্বভাব। এর পর ওকে শাড়ি পরিয়ে রাখতে হবে দেখছি! দিদিদের সঙ্গে মিশে মিশে বাদল ব্রতকথার ছড়া মুখস্ত করে, ফুলের মালা গাঁথে, এমন কি কাঁটা দিয়ে উল বোনারও চেষ্টা করে। বাড়ি থেকে তার বেরুবার হুকুম নেই, সে আর খেলার সঙ্গী পাবে কোথায়? রেণুদের বাড়িতে এক গাদা ছেলেমেয়ে, সারা বিকেল তারা ঠাকুর-দালানের সামনের উঠোনে হুটোপাটি করে কিংবা সারা বাড়ি কাঁপিয়ে চোর-চোর খেলে। দুই বাড়ির মহিলাদের মধ্যে আরও দু-একবার যাতায়াত হবার পর ঠিক হলো বাদল বিকেলবেলা এ বাড়িতে খেলতে আসবে। বাদলদের বাড়ির চাকর তাকে রেখে যায়, এ বাড়ির দারোয়ান তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে।

এ বাড়িতে রেণুই বয়েসে সবচেয়ে ছোট। রেণুর খুড়তুতো-জাঠতুতো এগারো ভাই বোন তাকে যতটা না ভালোবাসে, তার থেকেও বেশী জ্বালাতন করে। রেণুও বড্ড ছিঁচকাঁদুনে, কথায় কথায় ভাঁ ভাঁ করে কেঁদে ফেলে। তখন সবাই মিলে সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু দিয়ে অথবা চুল টেনে তাকে আরও রাগিয়ে দেয়। অবিলম্বেই বাদল এই খেলাটায় বেশ মজা পেয়ে গেল, এবং অন্য সবার সঙ্গে যোগ দিয়ে রেণুকে কাঁদাতে লাগলো।

এই এগারোজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে কখনো কখনো ভবানীপুরের বাড়ির ছেলে-মেয়েরাও এসে যোগ দেয়, তখন চাঁচামেচি আর দুপদাপ শব্দে সারা বাড়িতে আর কান পাতা যায় না। জীমূতবাহন এসেই সব ছেলেমেয়েদের নেতৃত্ব নিয়ে নেয়। তার মধ্যে নেতা হবার একটা সহজাত গুণ আছে। বা লুকোচুরি খেলার জন্য এতবড় বাড়িতে প্রচুর লুকোবার জায়গা—তাও ছেলেমেয়েদের ঠেলাঠেলিতে কখনো শোবার ঘরের আলনা উলটে পড়ে, জলের কলসী ভাঙে, কাঠের সিঁড়ির ওপর পাতা জরাজীর্ণ কার্পেট ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে যায়।

বাড়ির ছাদখানা ফুটবল গ্রাউণ্ডের মতন প্রকাণ্ড। রেণুর চার ভাইবোনের মধ্যে বড় দাদা থাকেন দিল্লিতে। সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া দাদা সুপ্রকাশ বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখে কৃপার দৃষ্টিতে। বিশেষত তার কলেজী বন্ধুদের সঙ্গে সে যখন আড্ডা দেয়, তখন ছেলেমেয়েদের গোলমাল করা একেবারে বারণ। কলেজী বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ দাড়ি রাখে এবং মোহিতলাল মজুমদারের চেয়ে নজরুল ইসলাম যে অনেক বড় কবি এ সম্পর্কে তারস্বরে আলোচনা জুড়ে দেয়। দু একজন আবার তৎকালীন ফ্যাশান অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গজদন্ত মিনারবাসী আখ্যা দিয়ে খুব এক চোট নিন্দে করে। সুপ্রকাশের আর একটি শখ হচ্ছে ঘুড়ি ওড়ানো। এই ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারটাকে সে আর্টের পর্যায়ে এনে ফেলেছে। বিশেষভাবে অর্ডার দেওয়া শুধু কড়ি টানা দেড়-তে কালো চাঁদিয়াল ঘুড়িই সে ওড়ায়—পাড়ার অন্য ঘুড়ি-রসিকরা বলে ওটা হচ্ছে কালো-চাঁদিয়ালের বাড়ি। তখন বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকের ঘুড়ি ওড়াবার বাতিক ছিল, বাগবাজারে বোসেদের বাড়ির মাঠে কিংবা ধর্মতলার ময়দানে সাড়ম্বরে ঘুড়ি-ওড়ানোর প্রতিযোগিতা হতো। সুপ্রকাশ যখন ঘুড়ি ওড়াতো, তখন চুপ করে থাকতো বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা। দুর্ধর্ষ বাজপাখির মতন সুপ্রকাশের কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি টহল মারতো ঐ এলাকার আকাশ। কখনো কখনো বাজপাখিরই মতন ছোঁ মেরে নেমে এসে সেই ঘুড়ি পড়তো অন্য ঘুড়ির ঘাড়ে—সুপ্রকাশের দু-হাত চলতো বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের মতন, বাচ্চারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠতো ভো-মু-মারা! আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে আসতো বাদলের, কিন্তু সর্বক্ষণ উত্তেজনায়

শরীর টং হয়ে থাকতো। সুপ্রকাশের ঘুড়ি অন্যরা কেটে দিয়েছে, এমন ঘটনা কচিৎ ঘটেছে। যদি বা কখনো কাটতো, সুপ্রকাশের সুতোর হাত্তা ধরতে সচরাচর সাহস করতো না কেউ, কোনো হঠকারী দৈবাৎ ধরে ফেললেও সুপ্রকাশ বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠতো, এই, এই! মাথা ভেঙে দেবো!—বাড়ির অন্যান্য ছেলেরা ইঁট পাটকেল হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকতো ছুঁড়ে মারার জন্য।

সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এলে, আকাশ থেকে যখন অন্য সব ঘুড়ি মুছে গেছে, কাক-পক্ষীরাও ফিরে গেছে বাসায়—সুপ্রকাশ তখনো অনবরত সুতো ছেড়ে ছেড়ে ঘুড়ি আরও বাড়িয়ে যেত। কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি একটু অন্ধকার হলেই আকাশের সঙ্গে মিশে যায়—অতি কষ্টে দেখা যায় শুধু ভেতরের সাদা চাঁদটুকু—অনবরত উঁচুতে উঠে উঠে সুপ্রকাশের চাঁদ মার্কা ঘুড়ি যেন আকাশের চাঁদ ধরতে যাচ্ছে। ঘুড়িটা সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে হাতের কাছ থেকে সুতো ছিঁড়ে দিয়ে সুপ্রকাশ সেটাকে পাঠিয়ে দিত নিরুদ্দেশে। একবার আকাশে উড়িয়ে সেই ঘুড়িকে আর মাটিতে নামিয়ে আনতো না সুপ্রকাশ। তারপর সে লাটাই গুটিয়ে বগলে নিয়ে ছাদ থেকে নামতে নামতে গুনগুন করে গান গাইতো পরম তৃপ্তির সঙ্গে। তার গলায় একেবারেই সুর ছিল না অবশ্য।

মাঝে মাঝে দু-একদিন বাদল সকালেই এ বাড়িতে চলে এসে সারাদিন থেকে যেত। তার স্বভাবের মধ্যে মেয়েলিপনা তখনো একটু থেকে গেছে। কিন্তু এ বাড়িতে এসে সে মেয়েদের বদলে ছেলেদের সঙ্গেই বেশী মেশে। এ বাড়িতে ছটি মেয়ে ও পাঁচটি ছেলে—তারা বিকেলবেলা সবাই একসঙ্গে খেলাধুলো করলেও সকালে দুপুরে তারা আলাদা আলাদা। স্কুল ছুটি থাকলে দুপুরে ছেলেরা ক্যারম খেলে কিংবা হুটোপুটি করে, মেয়েরা পুতুলের ঘর সাজায়। বাদলের বেশী ভাব রেণুর খুড়তুতো ভাই বিষ্ণুর সঙ্গে। বিষ্ণু আবার গল্পের বইয়ের পোকা, কত বই সে পড়েছে— বাদল তার নামও জানে না।

এই প্রথম বাদল তার নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য একটা পরিবারের মানুষজনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেল। নিজের বাড়িতে সে কনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং সবাইকেই জন্ম থেকে দেখছে—সুতরাং তাদের অস্তিত্ব আকাশ, জল ও হাওয়ার মতন অবধারিত। কিন্তু এ বাড়ির সকলেই তার চোখে নতুন মানুষ, এদের কথাবার্তা রীতিনীতিও আলাদা। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাদল টের পেয়ে গেল, এখানে সবাই এক বাড়িতে থাকলেও সকলের মধ্যেই কেমন যেন একটা আলাদা আলাদা ভাব। এমন কি ছোট ছেলেমেয়েরাও কখনো কখনো এটা আমাদের জিনিস, এটা তোমাদের জিনিস—এই রকম বলে। বাড়ির বউরা চেঁচিয়ে ঝগড়া করে পাড়া মাত করে দেয়। রেণুর বাবারা পাঁচ ভাই তিন বোন, তার মধ্যে বড় ভাই মারা গেছেন, তাঁর বড় দুই ছেলে বিবাহিত, এ-বাড়িতেই আছেন। এক বোন বিধবা হয়ে দুটি সন্তান নিয়ে ফিরে এসেছেন এ-বাড়িতে। তা ছাড়া মাসীমা পিসীমা শ্রেণীরও আছে বেশ কয়েকজন—সবার আলাদা আলাদা ঘর। তিনজন ঠাকুর সারাদিন ধরে রান্না করে যাচ্ছে, বাড়ির যার যখন খুশী খেয়ে নেয়।

রেণুর মা খুব ভালোবাসেন বাদলকে। ইতিমধ্যে বাদলের মা-র সঙ্গেও তাঁর খুব ভাব হয়ে গেছে। রত্নপ্রভা বাদলকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ রে, তোর মাকে নিয়ে এলি না কেন? কালকে ঠিক মাকে নিয়ে আসবি, কেমন? রত্নপ্রভা মানুষটি ছোট-খাটো, এবং অসম্ভব ভুলো মন। হ্যাঁ রে, চাবিটা কোথায় ফেললুম দেখ তো! কিংবা, এই যা, দুলটা বোধ হয় ফেলে এসেছি কল-ঘরে—এই করতে করতেই তাঁর সারাদিন কেটে যায়। দুপুরবেলা বারান্দায় শীতল-পাটি পেতে বাড়ির অন্যান্য কয়েকটি নারীকে ডেকে খুব মন দিয়ে টুয়েন্টি নাইন খেলতে বসেন—অন্য খেলুড়েরা যে তাঁকে বার বার ঠকাচ্ছে, তিনি বুঝতেও পারেন না। রেণুর বাবা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, সারাদিন তাঁকে দেখা যায় না বাড়িতে।

বস্তুত এ বাড়ির বয়স্ক পুরুষদের প্রায় সকলকেই খুব কম সময় বাড়িতে দেখা যায়। বাড়িটিতে মহিলা ও শিশুদেরই রাজত্ব। রেণুর পরের ভাই অনিরুদ্ধর সঙ্গে বাদলের তেমন ভাব হলো না কোনোদিনই। অনিরুদ্ধ তার থেকে মাত্র তিন বছরের বড় হলেও হাবভাব পাকা পাকা। তা ছাড়া অনিরুদ্ধ সারা বছরই আমাশয় রোগে ভোগে বলে তার মেজাজটাও খিটখিটে।

কোনোদিন সকালবেলা এসে পড়লে বাদল আগে রত্নপ্রভার কাছেই আসে। রত্নপ্রভা যত্ন করে তাকে খাবার খাইয়ে দেন—তারপর বাদল এক ছুট্টে চলে যায় বিষ্ণুদের ঘরে। রেণুরা থাকে দোতলায় উত্তরের দিকের ঘরে, আর বিষ্ণুরা থাকে তিনতলায় একেবারে দক্ষিণে। সুতরাং বাদলকে সারা বাড়িটাই পেরিয়ে যেতে হয়—এ বাড়ির সব কিছুই তার জানা।

বিষ্ণু তার বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে এবং এ বাড়িতে ভাইদের মধ্যে বিষ্ণুর বাবার অবস্থাই খানিকটা সচ্ছল। এক ছেলে বলে বিষ্ণুর আদরের শেষ নেই—কত তার খেলনা, কত রকম তার পোশাক। বিষ্ণুর জন্য নিজস্ব একটি চাকর রাখা আছে, বিষ্ণু একটু হোঁচট খেলেই তার মা হা-হা করে ছুটে আসেন। এত আদরেও কিন্তু বিষ্ণুর মাথা খারাপ হয়নি—সে ন্যাকা কিংবা আব্দারে ছেলে হয়নি। প্রায় শিশুকাল থেকেই সে স্বপ্ন-দেখা মানুষের দলের অন্তর্গত হয়েছে। সে নানান বই পড়ে এবং স্বপ্ন দেখে—এক-দিন সে সমুদ্রের বুকে জাহাজ ভাসিয়ে ম্যাগেলানের মতন ভূপ্রদক্ষিণ করবে। কিংবা, যে এভারেস্টের চূড়ায় এ পর্যন্ত কোনো মানুষ উঠতে পারেনি, একদিন বিষ্ণু নিশ্চয়ই সেখানে উঠবে। সে বাদলকে জিজ্ঞেস করে, তুই আমার সঙ্গে যাবি?

বাদলের চোখে এ বাড়ির সবচেয়ে বিস্ময়কর মানুষ ছিলেন হৈমন্তী। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। হৈমন্তীর মতন লম্বা চেহারার মহিলা বাদল

আগে কখনো দেখেনি, পরেও দেখেনি। শুধু লম্বা নয়, হৈমন্তীর স্বাস্থ্যও ছিল সেই রকম ভালো, সব মিলিয়ে বিশাল নারী। ঐ শারীরিক বিরাটত্বের জন্য মনে মনে হৈমন্তীর নিশ্চয়ই খুব লজ্জা ছিল, কেননা তাঁর মুখখানা ছিল লাজুক শিশুর মতন। অন্য যে-কোনো নারীর চেয়ে হৈমন্তী ছিলেন লম্বায় অন্তত আধ হাত উঁচু। ছেলেবেলায় সব কিছুই বড় মনে হয়, বাদলের মনে হতো হৈমন্তীর মত আকারের কোনো মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই, থাকতে পারে না। কিছুদিন আগেই সে স্কুলে জ্যাক অ্যান্ড দা বীন স্টকের গল্পটা পড়েছিল। একটা সীম গাছ বেয়ে বেয়ে মেঘের মাথা উঠে গেলে সেখানে থাকে এক কৃপণ দৈত্য আর তার বৌ। হৈমন্তীকে দেখলেই বাদলের মনে পড়তো সেই দৈত্যের বউয়ের কথা। সেই দৈত্যের বউয়েরই মতন দয়াবতী ছিলেন হৈমন্তী।

তিনতলায় বিকাদের ঘরের কাছেই হৈমন্তীর ঘর। ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো। কেন কে জানে, হৈমন্তীর ঘরে বাড়ির অন্য কেউ বিশেষ আসে না। সমস্ত দিন, বিকেল, সন্ধ্যে ও রাত্রি হৈমন্তীর অসীম নিঃসঙ্গতায় ভরা। কোনো কোনো সন্ধ্যেবেলা তাঁর ঘর থেকে ভেসে আসতো অর্গানের আওয়াজ, রীডগুলোর ওপর যেন আক্রোশভরে জোরে জোরে চাপ দিচ্ছেন হৈমন্তী। এ কথা জানতে বাদলের বহু দিন লেগে গিয়েছিল যে হৈমন্তীর স্বামী শঙ্করনাথ এক থিয়েটারের অভিনেত্রীকে নিয়ে আলাদা বাড়ী ভাড়া করে থাকেন রামবাগানে। মাসে একবার কি দুবার তিনি এ বাড়িতে আসেন। তখন তাঁর অসম্ভব খিটখিটে মেজাজ, টাকা পয়সার হিসেব ছাড়া আর কোনো বিষয় কারুর সঙ্গে কথা বলেন না।

একদিন সকালবেলা বাদল যাচ্ছিল বিকাদের ঘরে, হৈমন্তী তখন উল্টো দিকের কলঘর থেকে স্নান সেরে নিজের ঘরে আসছিলেন। গায়ে ভিজে শাড়িটা জড়ানো, সমস্ত শরীরটা স্পষ্ট। বাদলের বুকের ভেতর ছমছম করে উঠলো। বাদলের তখন সবে ন' বছর পূর্ণ হয়েছে, কোনো নারীকে দেখে বুকের ভেতর ছমছমানি জাগার সেই শুরু। লজ্জায় মুখ নিচু করার বদলে সে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলো হৈমন্তীর দিকে। মায়ের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে যে বিস্ময় নিয়ে সে মড়া পোড়ানো দেখে, সেই জাতীয় বিস্ময় নিয়েই সে দেখতে লাগলো এই অতি-জীবিত শরীর। মর্মর মূর্তির মতন সুগঠিত হৈমন্তীর দেহে পাতলা ভিজে শাড়ীটি জড়ানো—স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার তাজা বাতাবি লেবুর মতন দুই স্তন, তাদের চূড়ায় গোলাপী আভা। থুতনি থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে। পিঠখানা সোনার ঢালের মতন। অত বড় শরীরের তুলনায় আশ্চর্য রকমের সরু কোমর। অনাবৃত পেটে ছোট্ট নাভি। নিতম্বের ওপর শাড়ীটা কুঁকড়ে আছে, জঙ্ঘায় খাঁজ স্পষ্ট। এই সব রমণীর শরীরে একটা অসম্ভব তেজী আহ্বান থাকে। ইহকাল পরকাল লুপ্ত করা ডাক শোনা যায়। মসৃণ উরুর কাছে হৈমন্তীর একটা হাত রাখা, অন্য হাতে ভিজে সেমিজ ও ব্লাউজ। সেই দেবদুর্লভ রূপ এক মিনিটের মধ্যে বাদলের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। হৈমন্তী বাদলকে দেখতে পাননি। আশেপাশে কোনো পুরুষের উপস্থিতি মেয়েরা ঘুমন্ত অবস্থাতেও বুঝতে পারে। এমনকি পিঠের দিকে, তাদের দৃশ্য-অনুভূতি থাকে। বাদল নেহাৎ ছেলেমানুষ, তাই খেয়াল করেননি হৈমন্তী।

বাদল এর আগে এই একই রকম অবস্থায় কতবার নিজের মাকে দেখেছে, তার দিদিদেরও দেখেছে। কিংবা আসলে দেখেনি। এই প্রথম সে দেখলো, কাকে বলে নারী। কিন্তু এইটুকু ছেলে তো, প্রথম দেখার ব্যাপারটায় অবসন্ন বোধ করল সে, বেশ কিছুক্ষণ তারপর কথা বলতে পারেনি। তাব বোঝার কোনো ক্ষমতাই ছিল না যে তার মধ্যে কি ব্যাপার ঘটে গেল। এর পরেও আরও বেশ কয়েক বছর সে এ ব্যাপারে আবার ঘুমন্ত ছিল। কিন্তু এই দৃশ্যটা তার মনে চিরস্থায়ী হয়ে এঁকে যায়।

বিকুর সঙ্গে হৈমন্তীর কাছে বাদল তারপর কয়েকবার গেছে। ওদের দেখলে হৈমন্তী খুব খুশী হয়ে উঠতেন, অনর্গল গল্প জুড়ে দিয়ে আর ছাড়তেই চাইতেন না। চাকরকে দিয়ে তেলেভাজা বেগুনি—ফুলুরি আর আলু কাবলি আনিয়ে দিতেন। এই সব খাবারই তাঁর পছন্দ ছিল, বেশী ভালোবাসতেন টক খেতে। আলু কাবলি খেতে খেতে টক আর ঝালের রমণীয় সুস্বাদে জিভ দিয়ে টকাস টকাস শব্দ করেন, অবিকল ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে—এমন কি খাটে বসে পা দোলানও সেই রকম। এত বড় চেহারার একটি শিশু, তাঁর জীবনে এই রকম কষ্টপ্রাপ্য ছিল না।

হৈমন্তী যখন বাদলের মাথার চুলে হাত দিয়ে আদর করতেন, বাদল একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে যেত। এত লজ্জা তার কোথা থেকে আসে, সে বুঝতে পারে না। হৈমন্তী ঠিক দিদির মতন স্নেহে বাদলের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, প্রত্যেক দিনই একটা না একটা কিছু উপহার দেন। হৈমন্তী বাদলকে একটা চমৎকার মাউথ অর্গান দিয়েছিলেন।

হৈমন্তী সম্পর্কে আর একটা দৃশ্যও বাদলের খুব মনে আছে। শশীভূষণের বাড়ি ছেড়ে একেবারে চলে যাবার আগে হৈমন্তী এবাড়ির নৈতিকতায় বেশ একটা ঘা দিয়েছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে ওঠার পর তিনি সুপ্রকাশের কলেজে পড়া বন্ধুদের নিজের ঘরে ডেকে নিলেন। একতলার বৈঠকখানা থেকে কি উপায়ে তারা তিনতলায় উঠে এলো, সেটা একটা রহস্য বটে, কিন্তু এই ছেলেরা সকাল বিকেল নিয়মিত আসতে লাগলো এখানে। সুপ্রকাশও হঠাৎ খুব ভক্ত হয়ে গেল তার কাকীমার। ঐ ঘর থেকে তখন প্রায়ই শোনা যায় হাসির আওয়াজ ও হৈ-হৈ করে গল্পগুজব, কখনো কখনো কোরাস গান ভেসে আসে—। শোনা গেল, হৈমন্তীর ঘরে থিয়েটারের রিহার্সাল চলছে।

বলাই বাহুল্য, বাড়ির সকলে এই ব্যাপার মোটেই ভালো চোখে দেখলো না। কিন্তু যে-হেতু এ পরিবারে একজন কেউ সর্বময় কর্তা নেই, ভাইরা সবাই স্বাবলম্বী ও সম্পত্তির অংশ পেয়ে গেছে—তাই কেউ কারুর শাসন মানে না। আড়ালে নিন্দা করা ছাড়া আর কোনো শাসনের উপায় নেই। পরনিন্দার ভ্রূক্ষেপ নেই হৈমন্তীর।

একদিন শেষ বিকেলে বাদল ঐ বাড়ির সব বাচ্চাদের সঙ্গে নিচের উঠোনে খেলা করছিল, হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখলো, তিনতলার সেই ভাঙ্গা ব্যালকনিতে এসে হৈমন্তী দাঁড়িয়েছেন, হাসতে হাসতে দুলে পড়ছেন। যে ব্যালকনিতে শিশুদেরও যাওয়া নিষেধ, সেখানে হৈমন্তীর মতন বিশাল চেহারার একজন—সবাই ভয়ে আতকে উঠলো। কয়েকজন যুবক দূর থেকে আতঙ্কিত হয়ে বলছে, এ কি করছেন, এ কি করছেন, চলে আসুন! হৈমন্তী তত বেশী হাসছেন।

কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি অবশ্য। কয়েকটি চাপড়া ঝুপ ঝুপ করে ভেঙ্গে পড়লো নীচে। হাস্যমুখী হৈমন্তী পা ঠুকে ঠুকে আরও ভাঙ্গতে লাগলেন।

বেশ কিছু বছর পর হৈমন্তীর সঙ্গে আবার দেখা হলে বাদল এই দৃশ্যটার কথা উল্লেখ করেছিল। হৈমন্তী তখনও হেসেছিলেন।

(ক্রমশ)

॥ চুয়াল্লিশ ॥ ১

সকালে ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে দেখি সে আমার পাশটিতে শুয়ে। বক্ষ-বিহারের ফেঁক কখন সে আমার পার্শ্ব-দেশে নেমে এসেছে কিছুই টের পাইনি।

'নামলি কখন? টের পাইনি তো!'

'যখন তোমার কাঁপুনিটা থামলো, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ দেখলাম—তার পরেই।'

'ঘুম হয়েছিল তোর?'

'ঐভাবে শুলে কখনো ঘুম আসে? অমন করে ঘুমোনো যায় নাকি?'

'আমি তো তোর গরমের আওতায় চমৎকার ঘুমিয়েছি। কিন্তু আমি তোর কোলের আরাম পেলেও তোকে তো আর গদির মজা দিতে পারিনি......খটখটে এই কখানা হাড়ের খাটিয়ায় শুয়ে...সত্যিই!' যথার্থই আমার দুঃখ হয় ওর জন্যে।

'শরীরটা বাগালেই পারো। কষ্ট করে দিনকতক নিয়মমত একটু ব্যায়াম করলেই মাসকুলার বডি বানানো যায়। তোমার বন্ধুর মতই চমৎকার চেহারা হতে পারে।'

'বন্ধু আবার কোটা আমার? কার কথা কইছিস?'

'দেবেন তোমার বন্ধু না? তার কথাই বলছিলাম।'

'ওর চেহারাটা খুব ভালো বুঝি?' ওর কথায় আমার কান জ্বালা করে, প্রাণে জ্বালা ধরে যায়।

'ভালো নয়? গামার মতন নাদুস-নুদুস না হলেও...তাহলেও গদগদ হবার মতই চেহারা বইকি।'

'বুঝেছি।'

আমার মনে গুমোট নেমে আসে, আমি কোনো কথাই কই না আর। দেবেনের ওপর এমন রাগ হতে থাকে আমার যে...! কিন্তু সেই অন্তর্দাহের ওপরেই রিনির সদুপ-দেশের কথামৃত বর্ষিত হতে থাকে।

'খালি যদি তোমার শরীরটাই বানাও স্বাস্থ্যটাই মজবুত করো, কেবল দেহটা বাগাতে পারলেই আর্ধেক মানুষ হওয়া যায়। তার পরে ফের কিছু বিদ্যে সাধ্যিও হয় যদি—বাকী আট আনাও এসে গেল তোমার। তার ওপর যদি টাকা কড়িও হয় আবার... এমনটা হলে হতে বাধাই, তখন তো ষোলো আনার ওপর আঠারো আনাই হোলো—পুরোপুরিই মানুষ হয়ে গেলে।'

'মানুষ হয়ে কাজ নেই আমার। কোনো গরজও নেই তেমন।'

'আর কিছু নয়, রোজ একটুখন আলাদা করে সময় রেখে একটুখানি ফ্রি-হ্যানড একসারসাইজ করলেই হয়। তাতেই ঢের। আমার দাদারা তো তাই করে। তাদের শরীরটা দেখেছো কেমন? তোমার ওই দেবেনের মতন অত সুঠাম না হলেও ভালোই বলতে হবে। তাও যদি না পারো—না করতে চাও তো মাইলটাক রোজ দৌড়লেও হয়। বাবার মতে দৌড়টাও কিছু খারাপ ব্যায়াম নয়। এমন কি, জোর কদমে কিছুক্ষণ হাঁটলেও হয়, তাতেও দম বাড়ে। সেও অনেকখানি।'

'কার জন্যে দৌড়ব শুনি?'

'কেন, আমার জন্যেই। রোজ সকালে কি বিকেলে, যখন তোমার সুবিধে, আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসবে। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য। আর তোমার সেই আসাটা নেহাত পায়চারিতে না হয়ে এক দৌড়েই এসে গেলে না হয়। একটু তাড়াতাড়িই এসে পৌঁছবে তাহলে।'

'যাব যে, তোদের বাড়ির ঠিকানা কি দিয়েছিস আমায়?'

প্রকাশিত হল : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

কামনার সুখদুঃখ

মার্কিন মুলুকে এক ধরনের গল্প উপন্যাস লেখা হয়—যার পাত্র-পাত্রীরা দুর্ধর্ষ, আদিম এবং অসামাজিক প্রকৃতির মানুষ। এগুলোকে বলা হয় 'ওয়েস্টার্ন স্টোরিজ'। আমাদের দেশেও এমন মানুষ আছে। প্রেম-অপ্রেম ও জিঘাংসার দ্বন্দ্বে কতবিক্ষত সেইসব মানুষদের কথা এই উপন্যাসে লেখা হয়েছে। মূল্য ৬.৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

রাতের সমুদ্র ৭.০০

প্রলয় সেনের **সীমান্তবর্গ**

আসন্ন প্রকাশ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের **নতুন ভুবন**

মুক্তির যুদ্ধে বাংলাদেশ ॥ কণাদ ॥ ৮.০০

বীরু চট্টোপাধ্যায়ের **মানুষ যখন পশু হয়** ৪.৫০

চিরঞ্জীব সেনের **অপরিচিতা রূপসী** ৪.৫০

অজাতশত্রুর **অন্য নাম নরক** ৬.৫০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **চুপি চুপি আঁধারে** ৫.০০

প্রফুল্ল গ্রন্থাগার : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

(সি ২৮৬৪)

ঠিকানা দিতে লাগে না। কতো বড় রাস্তা 'আহিরিটোলা, ক'খানা বাড়ি সেখানে? একটা রাস্তায় ক'জনা ডাক্তার থাকে গো? পাড়ার সবাই সেখানকার ডাক্তারকে চেনে। চিনে রাখে, এলাকার প্রায় সবাই পেশেন্ট, কখনো না কখনো যেতেই হয় ডাক্তারের কাছে—খবর রাখতে হয় ডাক্তারের।'

'খবর কেউ কখনো দেয় নাকি কাউকে? কলকাতার লোকদের তুই এখনো চিনিস নি বিনি। কাউকে যদি শুধোই তিপ্পান্ন নম্বর বাড়িটা কোথায় দাদা? বলবেন দয়া করে? তক্ষুনি তার জবাব আসবে, ঐ যে, বাহান্ন নম্বরের ঠিক পরেই—বুঝেছো দাদু? বাহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। লাও ঠ্যালা!'

'আহা, নাই কেউ জানালো, তাই বলে কি কোনো ডাক্তারের পাত্তা পাওয়া যায় না নাকি? ডাক্তারদের বাড়ির সদরের দরজার গায় তাদের নেমপ্লেট লাগানো থাকে না? তাই দেখেই তো বোঝা যায় কে ডাক্তার আর কে নয়—কার নাম কী। তার থেকেই তুমি ঠাওর পেতে কোন্ বাড়িতে আমি থাকি। পেতে না?'

'তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু আমি এধারে তোর জন্যে ছুটোছুটি করে মরি আর তুই ওধারে পাড়ার কোনো রাসকুলার বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পাড়াস বেড়াতে। আমার আসার আগেই ফুড়ুৎ!'

'তা কখনো হয় না গো। বাজিয়ে একবার দেখলেই না হয়?'

'না বাজিয়েই তোর যা ঢং দেখছি না।' আমার ঢনংকার ওর কথায়: 'বাজালে তো তোর ঢঙের আর অন্ত থাকবে না!'

বিনি বলে, 'আমি কোথাও নড়বো না। বাড়ির থেকে—তুমি দেখো। তুমি আসবে আর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। তোমার ওপরে কি একটুখানিও টান নেই আমার—তুমি বলতে চাও?'

'বেশ, সেটা হাতে হাতেই বাজিয়ে দেখা যাবে না। আমার ওপর যা তোর টান তা দেখাই গিয়েছে।' আমি তক্ষুনি তাকে টেনে দেখাতে চাই।

'না না না! দেখছ না কখন সকাল হয়েছে। একক্ষণে জেগে উঠেছে সবাই। কেউ আর এখন কম্বলের তলায় মুখ গুঁজে শুয়ে নেই।'

'কেউ তোর দিকে তাকাচ্ছে না। বুট তো আর কেউ নেই যে, তোর দিকে তাকাবে। আমি ছাড়া তোর দিকে দৃকপাত করার কে আছে এখানে আর?'

'অনেকে আছে। তুমি জানো না—তুমি কিছুই জানো না। সুন্দর ছেলেকেও লোকে তাকিয়ে দ্যাখে। তা জানো?'

'সে খালি তোরা মেয়েরাই তাকাস—ওই ছেলেদের দিকে।'

'না মশাই, অতো লোকনজর নেই আমাদের ছেলেদের ওপর। আমরা মেয়েদেরই বেশি লক্ষ্য করি। মেয়েদেরও ঠিক, নয়, তারা কী পরেছে আর কেমন সাজগোজ করেছে তাই দেখি আমরা। কিন্তু তোমাদের ছেলেদের দুদিকেই নজর—মেয়েদেরও তাকাও আবার ছেলেদের দিকেও লক্ষ্য থাকে।'

'তোর ওপর এখানে তাক পড়েছে নাকি কারো? কারো নজরানা পেয়েছিস তুই?'

'নজর কেন? আর বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। সে অন্য রকম চাউনি—যার জন্য কেবল সেই বুঝতে পারে আর কেউ নয়। যে বোঝে সেই বোঝে কেবল। সে আরেক রকমের দৃষ্টি!'

'কি রকম দৃষ্টিটা? দেখে মূর্ছা যাবার মতো? নাকি, একটু একটু সন্দিগ্ধ? হয়তো তুই ঠিক ছেলে নোস তাই ভেবেই...?'

'না না, সে সব নয়। সে রকম সন্দেহ

কাজো-হয়নি। কি করে হবে, যা একখানা ব্যান্ডেজ বেঁধেছি না, খবরের যো নেই কারো।'

'জবে আমার কী জাবে তাকাবে...আহা রীর চাটুনি যদি না হয়!' রুক্মারি নজরের কোনো আঁছ টাওর পাই না। তার কোনো নজির কখনো পাইনি ত?

'সে তুমি বুঝবে না। সে আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। সে যেন কেমন একরকমের চাওয়া। যাকে চায় সেই টের পায় কেবল।'

'বুঝেছি। ওই বলে তুই আমায় ভোলাতে পারবিনে। তুই যে তোর বাসায় আমার মুখাপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকবি আমি তার প্রমাণ চাই। সেটা আমি হাতে হাতে পরীক্ষা করে দেখতে চাই...'

'হাতে হাতেই?'

'হাতে হাতে নয়, মুখোমুখি। আমার সম্মুখেই...এখনেই...এক্ষুনি।'

'কক্ষনো না। বাড়ি যেয়ো আমাদের—তখন যত চাও, যত খুশি...যতো ইচ্ছে তোমার...'

'না। তুই কাল সারা রাত আমায় গাল দিয়েছিস, আমি তার কোনো জবাব না দিয়ে ছাড়বো? তার শোধ আমি নেব না—ভেবেছিস তুই?'

'না না না। এখানে এত লোকের সামনে, এত জনার চোখের ওপর...কে কোথায় তাকিয়ে আছে, লক্ষ্য করছে আমাদের—কে জানে। এখানে না, এখন না, দোহাই লক্ষ্মীটি। দেশের জন্যে জেলে এসে এমন করে নিজেদের মুখ পোড়াতে নেই।'

'না...আমি শুনব না...কিছুতেই না...'

'ওমা, সত্যি তো! মুখটা তো পুড়িয়ে দিলে সত্যিই! কী হয়েছে তোমার গা? গালটা এমন ছাঁৎ করে উঠল যে আমার?'

'কিছু হয়নি—কী আবার হবে আমার? কেন, এখন আবার যে?...আমায় গাল দিচ্ছিস যে বড়ো? না সাধেতেই নিজের থেকেই দিচ্ছিস যে ফের?'

'তোমার গা এত গরম কেন গা? জ্বর হয়েছে বোধ হয়। রাত্তিরের সেই কাঁপুনি-দেয়া ঠাণ্ডাটা লেগেই...' ভালো করে আমার আঁচ নিয়ে তার পরে সে আঁচায়—

'বেশ জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জাই হবে হয়ত। তোমার এমন জ্বর হয়েছে আর তুমি তা টের পাচ্ছ না?'

'তুই থাকতে তোকে ছাড়া আর কিছুই আমি টের পাই না। টের পেতেও চাই না আর কিছু।'

'দাঁড়াও, তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি আগে।' বিছানার ওপর সে উঠে বসে—বসে চারদিকে তাকায়—'জেলের অফিসে গিয়ে খবর নিই গে। জেলখানায় ডাক্তারখানা থাকে আমি জানি। সব জেলেই থাকে, না থেকে পারে না। এখানেও আছে নিশ্চয়। হাসপাতাল ডিসপেনসারি সব

আছে। আমার বাবা যখন মহকুমার শহরে কাজ করতেন তখন তিনি যেমন জেলার ডাক্তার তেমনি ঐ জেলের ডাক্তারও ছিলেন। রুগী দেখতে বাবাকে নিয়মিত যেতে হত জেলখানায়।'

'না তোকে কোথাও যেতে হবে না। এখানে থাক। আমার কাছে থাক। তুই থাকলেই ভালো থাকব আমি।'

'কতক্ষণের জন্যে গো? যাব আর আসব তো। তারপর সারাক্ষণই থাকব এখানে। আমার তো জেলে থাকা ছাড়া কোনো কাজ নেই আর। খালি খাওয়া আর শোয়া।'

'আমারও কাজ প্রায় তাইতো ভাই: শোয়া আর খাওয়া: শুয়ে শুয়ে খালি খাওয়া কেবল।'

'সেকথা বলছিনে। বলছি যে এখানে নাওয়া-টাওয়া তো নেই একদম—সে পাটই নেই যে দু মাস এখানে আছি। যা ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছি না, কাউকে আর টের পেতে হবে না আমাকে। কিন্তু নাইতে গিয়ে গা খালি করলেই হয়েছে।'

'দরকার কি নাইবার? নেয়ে ধুয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে। আমিও তো নাইব না। শীতে আবার নায় কে?'

'কেন, তোমার আবার কী হোলো? নাইবে না কেন? নাইতে কী হয়েছে তোমার?'

'আমারো খালি গা হতে লজ্জা করে ভারী। এত লোকের সামনে—সবার কেমন সুগঠিত শরীর—আর তার মধ্যে আমার এই হাড় জিরজিরে চেহারা নিয়ে সকলের চোখের ওপর...'

'ব্যায়াম করতে বলছি তো সেই জন্যেই গো! দেখতে না দেখতে ওদের মতই হয়ে যাবে দেখো।'

'ওদের সব জন্ম থেকে পাওয়া—ব্যায়াম করে পায়নি কেউ। তবে কেউ কেউ তার ওপরেও ফের ব্যায়াম করে কিছু বাড়িয়ে থাকতে পারে—ঐ দেবেনের মতই হয়ত।'

'একই কথা। কেউ বড়লোক হয়ে জন্মায়, কাউকে আবার জন্মাবার পর বড়লোক হতে হয়। বড়লোক হওয়া নিয়ে কথা।'

'তবে হ্যাঁ, বাহাদুরি বটে তোর।' কথাটা আমি পালটাই: 'যা একখানা ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছিস না। তোর বাঁধুনির তারিফ করতে হয়। তুই ডাক্তারি পড়লে পারিস—বড়ো লেডি ডাক্তার হবি। নির্ঘাৎ!'

'হবো তাহলে। পড়বো তাহলে—যদি তুমিও ডাক্তারি পড়ো, ডাক্তার হও—আমি কথা দিচ্ছি তোমায়। তুমিও ডাক্তার হবে, আমার সঙ্গে তোমাকেও হতে হবে কথা দাও তবে।'

'ইস, কী মুশকিলেই যে পড়লাম! তুই আমায় মানুষ না করে ছাড়বি না দেখছি—তোর মতন মেয়ের পাল্লায় পড়লে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কারো কিছু থাকে না আর।'

আমি হাঁফ ছাড়ি—'আচ্ছা, হবো ডাক্তার।'

হবেই না হয়, কী হয়েছে? এখন তো নয়, পরে। পরের কথা পরে। যখনকার কথা তখন।' যখন হবে তখন দেখা যাবে।'

'এখনকার কথা হচ্ছে এখানকার ডাক্তারের খবর নেওয়া। এক্ষুনি যাই—দেরি করলে বেশি বেলায় ডিস্পেনসারিতে ভিড় জমে যায় বেজায়।'

আলতো করে একটুখানি আদর ছুঁইয়ে সে উঠে পড়ে—'চুপ করে শুয়ে থাকো লক্ষ্মীটি। নেমোটেমো না। বেরিয়ো না বাইরে। জেলের গেটের কাছেই আপিসটা তো? যাবো আর আসবো।'

একটু বাদেই ফিরে এসে জানাল—'হ্যাঁ, আছে এই জেলে ডাক্তারখানা। ওষুধ দেয় রুগীদের—তবে এখানে তারা কেউ তোমায় দেখতে আসবে না, সেখানে গিয়ে দেখাতে হবে।'

'বকুল বুঝি আপিসে?'

'না, আপিস পর্যন্ত যেতে হয়নি। বেরুতেই তোমার বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তার কাছেই শুনলাম। এর মধ্যেই সে এখানকার সব কিছু জেনেছে... দেবেনদাই বলল আমায়।'

'আঁ, তুই কী বললি?' ফোঁস করে উঠলাম আমি শুনেই না—'এর মধ্যেই দেবেনটা তোর দাদা হয়ে গেছে? দেবেনদা?'

'বারে! সে আমায় গোড়ায় রিনিদি বলল যে! দাদা না বলে আমি কী করি তখন?'

'রিনিদিও বলা হয়ে গেছে—বটে? টের পেয়েছে সে এর মধ্যেই? সমস্ত?'

'হ্যাঁ, আমাকে ও রিনিদি বলেছে বটে কিন্তু আমাকে ঠিক বলেনি। আমার সঙ্গে দেখা হতেই সেই আগ বাড়িয়ে এসে শুধোলো—তুমি রিনিদির ভাই না? তাই না? এক্ষুনি আমি বা সামলে নিয়েছি না! বলেছি—কী করে টের পেলেন? রিনিদির মতই দেখতে কিনা অবিকল। তোমার নামটি কী ভাই? আমি বললাম—রিনটু। আবার কেমন সামলে নিয়েছি দ্যাখো। তখন সে বলল, বাঃ, বেশ নাম তো! রিনি নম্বর টু—রিনটু! রিনিদিকে আমি দিদি বলি তো। তুমিও ভাই বলো। আমরা তাহলে ভাই ভাই হলাম আজ থেকে, কেমন কিনা? তার জবাবে তখন আর আমি কী করি? হ্যাঁ, দেবেনদা। আজ থেকে তাই।' আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছি তার কথায়। কী করব?'

'কী আর করবি। সত্যি! ছেলের মতই কাজ করেছিস। কিন্তু সেই শিকেয় থেকে গলায় আসার পথে কোন ফাঁকে যে সে তোকে দিদি বলে ডেকেছিল আমি তো টেরই পাইনি।'

'আমিও না। এর আগে তার সঙ্গে আলাপই হয়নি আমার। দিদি হওয়া তো দূরের কথা।......হয়তো মনে মনে ডেকে থাকবে।'

'ভারী মিথ্যুক তো ছেলেটা।' এমন

রাগ হতে থাকে আমার দেবেনের ওপর—এক নম্বরের ল্যায়ার। হামবাগ কোথাকার। ফেথলেস, ট্রেচারাস, বিশ্বাসঘাতক।'

'ছেলেরা ওরকম বানিয়ে বলে, বাড়িয়ে বলে থাকে, ওতে কোনো দোষ হয় না। পরের মন রাখা কথা কইতে ওরা ওস্তাদ। পারি হলে তো কথাই নেই।'

'ওর মনরাখা কথা আমি বার করছি। বদমাইসের ধাড়ি। পাজি ইস্টুপিট গাধা অ্যাক্সেমাক...।'

'আহা, রাগছো কেন এত?'

'রাগব না? পরের দিকে হাত বাড়াতে চায়? পরের জিনিস লুফে নিতে হাত বাড়ায়! লোফার একটা—!'

'রাগ করছো কেন? রাগেরটা কী হল? ভাই ভাই কি ভাইবোন এসব সম্পর্ক কি খারাপ?'

'বাঃ! আমি দাদা হতে পেলুম না, তুই আমায় দাদা বলে ডাকলিই না কোনোদিন—আর ও হতভাগাটা কোথ থেকে উড়ে এসেই না দাদা হয়ে গেল হঠাৎ?'

'দাদা হতে চাও তুমি? দাদা হবে আমার? বললেই হয়।' সঙ্গে সঙ্গে সে সতর্কবাণী আওড়ায়—'ডাকতে কী আর। কিন্তু মনে রেখো, দাদা হলে কিন্তু দাদাই হয়ে গেলে চিরদিনের মতন—তারপর আর আপসোস করতে পাবে না। কোথাও যদি কিছুতে আটকায়, আমার কোনো দোষ নেই, সেটা কিন্তু বলে রাখলাম।'

'কোথায় আটকাবে? কোনো বাধা আমি মানলে তো? কেন, দাদাদের কি নিজের বোনদের আদর করার রাইট থাকে না?'

'তা থাকে। দাদার তো বার্থরাইট আদর করার, তবে যতটা শোভা পায় ততটাই। আদর করতে পাবে তুমি আমায়—কিন্তু ঐ বোনের মতই। মনে রেখো।'

'তবে আর কোথায় আমার আটকালো শুনি? তার বেশি আর আমি চেয়েছি কী? আসলে, পেলেই হোলো আমার।'

'যখন আটকাবে তখন টের পাবে।... এখন তার কী।'

'তাহলে আর কোথায়, কখন আমার আটকাতে পারে...। শুনি? শুনিই না?'

'গোধূলিলগ্নে গিয়ে।' সে মুখ টিপে হাসে—'যদি আমাদের বিয়ে আটকায়?'

গোধূলি লগ্নীকৃত দশায়, সেই সূত্রহিবুকযোগের সমস্যাটা আমি আমলই দিই না। অন্যভক্ষ্য ধনুর্গুণী চিরকালের বাউণ্ডুলের ভাবিবাৎ ভাবনার বালাই নেই।

'কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই।' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। 'আমি মানুষ হলে তবে তো তুই আমায় বিয়ে করবি...আমি ডাক্তার হব, শরীর ভালো করব, খুব টাকা-কড়ি উপায় হবে আমার...তোকে দোষ দিইনে, সব মেয়েই তাই চায়। নিছক ভালোবাসার জন্যে কখনো কাউকে বিয়ে করে না মেয়েরা—আমি ভালোই জানি। নভেলেও পড়েছি বিস্তর। তা আমিও মানুষ হয়েছি আর তুইও আমায় বিয়ে করেছিস! দুই-ই শিবের অসাধ্য। শিবঠাকুরের সাধ্য কী! সাত মণ তেল পুড়লে তবেই নেচেছে আমার রাধা!' আমি বলি—'না, আমি অত গাধা নই ভাই! গাছের মেওয়ার জন্যে হাতের নগদ লাড্ডুটা ছাড়তে যাই কেন? তার আগে, তের আগেই—এখনই তো আমি দাদা হতে পারি যখন।'

'তা পারো। হতে চাও তো বলো।'

'হ্যাঁ, চাই হতে। এক্ষুনি—এই দণ্ডেই...'

'বেশ, ডাকছি তবে। দাদা...দাদা... দাদা...'

'কী বললি? শুনতেই পেলাম না। কানেই এল না—কথাটা ভালো করে বলার হোক। যেমন করে বললে শুনতে পাই তেমনিভাবে বলা যাতে বেশ করে টের পাই আমি।'

'আরো চেঁচিয়ে বলব? গলা ফাটিয়ে? লোকজন জোটাব নাকি?'

'তাহলেও কানে ঢুকবে কি না কে জানে। আমার সন্দেহ থাকে—কান ফাটিয়ে বললেই কি শোনা যায় রে সব কথা। কান দিয়ে শোনাও যায় না—শোনবারো নয় সব—অন্য রকমে বলতে হয় শুনতে হয়—তবেই কিনা শোনা যায়।'

যে কথায় কর্ণপাত করা যায় না, দৃকপাত করারও নয়, তা বুঝি মুখপাতে মুদ্রিত হলেই ভালো হয়। কিন্তু আমার সেই ধারণা ব্যক্ত করার আগেই কালকের রাতের অপ্রত্যাশিত শিলাবৃষ্টির মতই অতর্কিত অকালবর্ষণ নেমে আসে......

'শিব্রাম্‌দা... শিব্রাম্‌দা... শিব্রাম্‌দা...' মৃদুল ছোঁয়ার রিনিঝিনি শুনি ওর মাঝে—'শিব্রাম্‌দাঃ! হয়েছে? টের পেয়েছো তো?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। এতক্ষণে টের পেলাম।'

যথোচিত কথাটা যথাযথভাবে কইলে কে না শুনতে পায়? কেবা না বুঝতে পারে? কার বা বোঝার অসুবিধে?

(ক্রমশ)

অন্তর্জলী যাত্রা

এমন উপন্যাস যে-কোনো ভাষাতেই কদাচিৎ প্রকাশিত হয়, যে উপন্যাস বহু বছর ধরে সজীব থাকে। যে-গ্রন্থ সম্পর্কে বিতর্কের শেষ হয় না। কমলকুমার মজুমদার রচিত 'অন্তর্জলী যাত্রা' সেই রকম একটি উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এক যুগ আগে, তারপর থেকে প্রতি বছরই নানান পত্র পত্রিকায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়। অতি সম্প্রতি 'উলুখড়' নামের একটি সাহিত্য পত্রিকায় সুধীর রায়চৌধুরী এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন চিত্তাকর্ষক উপায়ে। রমামোহন রায়, কমলকুমার মজুমদার এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং রমামোহন এর ভাষা সম্পর্কে আপত্তি জানাচ্ছেন।

আমাদের দেশে এমন পাঠক ও লেখক অনেক আছেন, যাঁরা কমলকুমার মজুমদারের নামই শোনেন নি। এমন কিছু সংখ্যক পাঠক থাকাও বিচিত্র নয়, যাঁরা এই লেখকের রচনা দু' এক পাতা পড়ে আর পড়তে উৎসাহী হন নি। আবার এমন বহুসংখ্যক পাঠক ও লেখক আছেন যাঁরা কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যের নিবিষ্ট অনুরাগী, কেউ কেউ অন্ধ ভক্ত। পূর্ব বাংলার সঙ্গে এতদিন আমাদের যোগাযোগ বন্ধ ছিল—তবু ঢাকা শহরে আমি কমলকুমারের ভক্ত পাঠক দেখে এসেছি। কোনো একজন লেখক সম্পর্কে এ রকম পরস্পর-বিরোধী মনোভাবও তুলনা রহিত।

'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল একটি শারদীয় সাহিত্য পত্রিকায়, সম্ভবত সেটির নাম ছিল 'নহবৎ'। সেই পত্রিকার একশোটি কপি লেখক পেয়েছিলেন—তার থেকে নিজের উপন্যাসের অংশটুকু ছিঁড়ে সাদা কাগজের মলাট বেঁধে তিনি কিছু লোককে উপহার দিয়েছিলেন। আমার মতন অর্বাচীনও এক কপি পেয়েছিল—এ পর্যন্ত এর চেয়ে বেশী মূল্যবান কোনো উপহার আমি পাইনি। উপন্যাসটির আরম্ভ এই রকমঃ 'আলোক্রমে আসিতেছে। আকাশ মুক্তা ফলের ন্যায় হিম নীলাভ।'

বেশ কয়েক বছর বাদে 'অন্তর্জলী যাত্রা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরোয় তাঁর ছোট গল্পের সংগ্রহ, 'নিম অন্নপূর্ণা'। তারপর বছরের পর বছর ধরে শোনা যাচ্ছিল, 'মল্লিকা বাহার' নামে তাঁর আর একটি গল্প সংগ্রহ এবং "শ্যাম নৌকা" নামের ছোট উপন্যাস গ্রন্থাকারে বেরুবে—কিন্তু এখন তার সম্ভাবনা প্রায় লুপ্তই মনে হয়। তাঁর অনেকগুলি রচনা ছড়িয়ে আছে পত্র পত্রিকায়। তাঁর কয়েকটি গল্প বেরিয়েছিল "দেশ" পত্রিকায়—এ ছাড়া চতুরঙ্গ, সাহিত্যপত্র, কৃত্তিবাস, এক্ষণ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প-উপন্যাস মুদ্রিত হয়েছিল, বর্তমানে "এক্ষণ" পত্রিকাতেই তাঁর নতুন রচনা আশা করা যায়।

কমলকুমার মজুমদারের যে-কোনো গল্প উপন্যাস যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছেন, তিনিই এঁর চমকপ্রদ প্রতিভার কথা অবনত মস্তকে স্বীকার করবেন। কিন্তু অনেকেই শুরু করে শেষ করেন না। প্রধান প্রতিবন্ধক এঁর ভাষা। এঁর ভাষা ভয়ঙ্কর সুন্দর, প্রচণ্ড শক্তিশালী, আশ্চর্য

দীপ্তিমণ্ডিত এবং অসম্ভব দুরূহ। ঠিক কঠিন ভাষা বলতে যা বোঝায়, সে রকম নয়, অম্বিনী দত্ত বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যে-রকম। 'প্রাচীন পন্থী' বললেও ভুল বলা হয়। সুধীর রায় চৌধুরী রামমোহনের মুখে দিয়ে ঐ কথা বলিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় আসলে অন্যান্য অনেকের মতনই রামমোহনও এঁর লেখা মন দিয়ে পড়েন নি। কমলকুমারের সাহিত্যরীতি প্রচণ্ড রকমের আধুনিক। শব্দ, ভাষাও এটা নয়। কারণ, কথোপকথনে বা বর্ণনাভঙ্গিতে প্রচুরভাবে চলতি, কখনো কখনো গ্রাম্য শব্দেরও অপরূপ প্রয়োগ আছে। কমলকুমারের বাক্যগঠন রীতিই অত্যন্ত জটিল—একই বাক্যে দু তিন রকমের ক্রিয়াপদের ব্যবহার থাকে এবং কখনো কখনো একটি বাক্যই পাতার পর পাতা লম্বা হয়। "সুহাসিনীর পমেটম" নামের উপন্যাসটির ১৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে একবারও দাঁড়ি নেই। আঙ্গিকের চলতি বাক্যরীতির পাশে পুরু গম্ভীর সংস্কৃত ঘেঁষা বিশুদ্ধ শব্দ এবং সংস্কৃত ঘেঁষা ভুল শব্দ পাঠককে থতমত খাইয়ে দেয়। এই ভাষা বাংলা পাঠকের অভিজ্ঞতার অতীত, এবং পাঠকের সামনে একটি নিরেট বাধা স্বরূপ।

এই ভাষা ব্যবহারের যুক্তি কি? লেখক কোনো যুক্তি প্রদর্শন করেন না। কথায় কথা প্রসঙ্গে তিনি দুটি মত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলা গদ্যের মূল কাঠামো ইংরেজি সিনট্যাক্সের অনুকরণে তৈরী হয়েছে—তিনি এটা পছন্দ করেন না—বাক্য গঠনে তিনি ফরাসী রীতির পক্ষপাতী। এর যুক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে অবশ্য। আর একবার বলেছিলেন, তিনি সাধারণ চলতি মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনা পছন্দ করেন না—কারণ মানুষের মুখের ভাষারও হেরফের হয়। হাট-বাজারে বা রিকশাওয়ালার সঙ্গে আমরা এক ধরনের শব্দ ব্যবহার করি—আবার গুরুজন বা বিদগ্ধজনের সঙ্গে অন্য শব্দাবলি। সুতরাং বাক্যরীতির সঙ্গে সংযোগে অন্য রকম শব্দ আসতে বাধ্য।

একজন লেখক নিজের রচনায় কি ভাষা ব্যবহার করবেন, সেটা সম্পূর্ণ তাঁরই বিচার্য বিষয়। তিনি বলতে পারেন, কেন আমি এ রকম লিখবো, যার খুশি পড়ুক, যার খুশি পড়ুক না। কেউ কেউ পাঠকের [illegible] হয়ে ভাষা তৈরী করেন—[illegible] কিছু না—কিন্তু [illegible] সে-জাতীয় লেখক নন। [illegible] ইনি কোনো রকম [illegible] একটি বাক্য—এবং [illegible] বহু পরে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এঁর এই প্রকার ভাষা ব্যবহারের সমর্থক নই—যদিও এঁর লেখা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে আমার অসুবিধে হয় না।

"অন্তর্জলী যাত্রা" প্রথম পাঠ করে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম, সেই মুগ্ধতা এখনও কাটে নি। এ বই পুরনো হয় না। বৃদ্ধ মুমূর্ষু সীতারামকে গঙ্গার ধারে এনে রাখা হয়েছে, সেই অবস্থায় তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় নব যুবতী যশোবতীর; আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্য যশোবতীকে সতীদাহ করে পুণ্যার্জন। প্রধান আপত্তি এক চণ্ডালের, মহাকাল সাক্ষী, যে প্রতিটি মড়া পুড়িয়ে গুণে গুণে দড়িতে গিঁট দিয়ে রাখে গর্বের সঙ্গে—কিন্তু জীবন্ত দেহ পোড়ানো সে দেখতে পারে না। গল্পের আবরণ সামান্য, কিন্তু চরিত্র ও বাক্যের ব্যঞ্জনায় এই লেখক মানুষকে মূর্তিময় তুলেছেন, তা অনন্য। এখন কেউ কেউ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে অনুপযোগী বা অর্থহীন বলছেন—কিন্তু আমরা বিশ্বাস করছি, একটি রচনার সর্বাঙ্গকেই বলা হয় সাহিত্য, আলাদাভাবে বিষয়বস্তুটাকে বার করে এনে বিচার করে সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিক রাজনীতিবিদ বা গবেষকরা।

এই উপন্যাস চিরকাল বাংলা সাহিত্যে আলাদা দাঁড়িয়ে থাকবে। সবাই পড়বে না, যারা পড়বে, তারা বিমল আনন্দ পাবে। আমার বিশ্বাস, কমলকুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা "গোলাপ সুন্দরী"—যা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সাহিত্যকে যাঁরা ভালোবাসেন, যাঁরা সত্যিকারের সাহিত্য রসের স্বাদ পেলে অন্য পরিতৃপ্ত হন বলে মনে করেন, তাঁরা এই সব রচনা নিশ্চিত সংগ্রহ করে পড়বেন। সংগ্রহ করতে কষ্ট হবে—পড়ে শেষ করতে আরও বেশী, কিন্তু তা সার্থক। ইনি লেখকদের লেখক, কবিদের কবি।

কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে কেউ কিছু লিখলেই উনি খুব চটে যান। শারীরিক প্রহারেরও সম্ভাবনা থাকে। আমি ঝুঁকি নিচ্ছি ভালোবাসায়।

সনাতন পাঠক

কবিতা

আমার রক্তের দাগ। মনীন্দ্র রায়। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। চার টাকা।

অন্তর বাইরে মাটিতে। অরুণ মিত্র। সারস্বত লাইব্রেরী। চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মজার ঝরোখা। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'কৃষ্ণচূড়া'র কবি মনীন্দ্র রায় 'মোহিনী আড়ালে' এসে বহুলাংশে পরিবর্তিত। এই বিবর্তন তাঁর নির্ভুল পরিণতিরই চিহ্ন। ছন্দ-মিলে অসামান্য দখলের ভূমিটি ক্রমশ সরিয়ে দিয়েছেন তিনি, বক্তব্য স্পষ্টতর হয়েছে; গভীর ভাবনা সহজ সুরে বলার প্রবণতা তাঁর সাম্প্রতিক কবিকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'আমার রক্তের দাগ' কাব্যগ্রন্থেও এই সুরই প্রধানত চোখে পড়ে। এখন তিনি সোজাসুজি বলেন :

'ভালো-মন্দ শূন্য থেকে ঝোলে না:......
অসলে সত্য বা মিথ্যা, রক্তপাত আর
কোলাকুলি, কোনটা ভাল কোনটা বা
খারাপ—
বুকের মতোই সেটা জীবন্ত শরীরে;
বাঁচার সিঁড়িখে সত্য—কিবা পুণ্য আর
কিবা পাপ,
চাল ও বদলায় রোজ,
—পুরনো তালিকা ছিঁড়ে ছিঁড়ে।'

কিংবা

'কিছু ফেলে দেওয়া ভালো;
কিছু ভাঙা; ধুলোতে গুঁড়ানো।
এমন কি লোহা তারও হিতকারী বুকে
জন্মে নাকি মরচের হলুদ?
এগোনো মানেই তাই শান দিয়ে
মুছে মুছে ফেলা
যা কিছু পুরনো।'

বোঝা যায় যে, বলার কথাকেই তিনি এখন সবচেয়ে জরুরী মনে করছেন, বলার ভঙ্গিকে ততটা নয়। শুধু প্রেম নয় কিংবা শুধু স্মৃতিও নয়, জীবনের যাবতীয় মূল্যবান অভিজ্ঞতাবলীই মনীন্দ্র রায়ের সাম্প্রতিক কবিতার ঘোষণার মতো জোরালো ভাবে উপস্থাপিত। অভিজ্ঞতার বহু স্তর পার হয়ে এখন স্পষ্ট করে তিনি যা জেনেছেন তা তাঁর কবিতা থেকেই উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'আসল কথাটা বাঁচা, প্রতিটি মিনিটে
নিবিড় গভীরে চাষে, নিজের ভিতরে
ফসল ফলানো, আর তোলা খামারে;
আসল কথাটা বাঁচা, বছরে বছরে
নব নব যুবকের, বালকের, শিশুদের জন্যে
তাদেরই পায়ের নিচে মাটি চিনে চিনে
বাঁচা—মানে নিরন্ত নির্মাণ।'

'আমার রক্তের দাগ' এই নিরন্ত নির্মাণের এক অনন্য ফসল।

গদ্য ভঙ্গিতে রচিত কবিতার কাব্যের দ্যোতক আবেগ শেষটানের জন্যে নিভৃত

অনায়াস দক্ষতা প্রায় প্রবাদের মতো স্বীকৃত। 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা-গ্রন্থ। বহিরঙ্গের দিক থেকে তাঁর কোনো পরিবর্তন এ-গ্রন্থে সূচিত হয় নি; একটি-কি দুটি কবিতায় মিলের সামান্য চিহ্ন রয়েছে বটে, কিন্তু তা বেশ অস্বস্তিকর: আসলে গদ্য ভঙ্গিতেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য এবং মুক্তি। তিনি যখন লেখেন :

'আরও কত তর্ক হল মনে নেই,
মোদ্দা কথা বোঝা গেল অদৃশ্য তিলক
অতঃপর চওড়া ক'রে এঁকে নিয়ে
যেতে হবে পোঁতা আছে যেখানে কীলক'

কিংবা

তাকে এখন ফিরিয়ে আনবে কে?
মার্কিন না রুশ?
না হাজরা মোড়ের ঐ জুতো-বুরুশ?

তখন সন্দেহ জাগে মিলের জন্যই এই লঘু-তো না লঘু কবিতা বলেই মিল? কিন্তু অন্যত্র তাঁর শব্দ মন্ত্রের মতো গমগম ক'রে ওঠে :

'তুমি যে হিংস্র রোদে বেরিয়ে এসেছিলে
তোমার পড়ন্ত বেলা রক্তে জ্বলেছিল
চেনা অচেনা মুখের যন্ত্রণায়
তোমার অন্ধকার চৌচির হয়েছিল...'

কিংবা

'কোন গন্ধকে তুমি একান্তে উৎসর্গ করেছ? দিনের বেলায় এই প্রশ্ন আমি তোমার কাছে রাখি। একটা শীষ আমার চোখের মণিতে প্রতিফলিত রয়েছে। তাকে যেন আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি যখন অনিশ্চয়ের উপরে মাথা রেখে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তুমি হাত তুলে ইঙ্গিত করো। তোমার তর্জনীতে একটা জলের কণা চিকচিক করে। সে তোমার অশ্রু না, শিশির তা কখনো জানব না, জানতে চাইব না।'

অথবা 'যে-সময়টা আমরা নির্বাচন করেছিলাম সেটা গোধূলি, যখন একটা হাওয়া দিলে সোনার শীষ ফোটে।'

শেষ উদ্ধৃতাংশের চিত্রকল্পটি নিঃসন্দেহে সহজ হয়েও অসংলগ্ন।

বক্তব্যের দিক থেকে নিবিষ্ট কোজাগরী'র থেকে 'রক্তাক্ত ঝরোখায়' অবস্থান খুব বিষম দূরত্বে নয়, তবু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের এই সর্বশেষ কবিতা গ্রন্থ তাঁর নিজস্ব মেজাজের বৃত্তে একটি তৃপ্তিকর সংকলন। কবিতার বিষয় ও অনুভূতির মিলের দিকে লক্ষ রেখেই তিনি তিনটি পৃথক গুচ্ছে বিন্যস্ত করেছেন গ্রন্থটিকে : প্রেমিকের সংসারে, রক্তাক্ত ঝরোখা এবং ক্যাম্পের খড়ু।

পঞ্চাশের প্রধানতম এই কবির কবিতার সুরের ছন্দ, ছন্দ ও অন্ত্য মিলের বিস্ময়কর কারুকার্য, গঠন-নৈপুণ্য এখনো সমানভাবে পরিদৃশ্যমান। অথচ, বক্তব্যের দিক থেকেও তাঁর বিবর্তন ও পরিণতি লক্ষণীয়। বিদগ্ধ নাগরিক অভিজাত ও গ্রাম্য শব্দের প্রায় পাশাপাশি অবস্থান অলোকরঞ্জনের কবিতায় এক অনন্য স্পন্দন জাগায়। রক্তাক্ত ঝরোখায় তাঁর উচ্চারণ তীব্র বেগে ও জ্বালায় আক্রান্ত :

'অলুক দেবতার অম্মার আপেল চিরে রক্ত
আমি সইতে পারছি না।'

'তরুণীর কাছ ক'ছি ধাব আজি বাড়া,
বেশি তুচ্ছ শাসন,
ওকে যেন ঈশ্বর কাঁদান,
ঈশ্বর ভীষণ জোরে ওকে যেন টেনে
নিয়ে যান...
তা না হলে আমি নিজে ভেঙে ফেলব
তুচ্ছ কামনা।'

রক্তাক্ত ঝরোখার শেষে তাঁর ভূমিকা প্রমাণের :

'তবে আমার এখন থেকে জেগে থাকার
আনন্দ-ভূমিকা—
নিসর্গের যেমন জাগরণ
সন্তাপের ভিতরে জ্বলে শ্রাবণী মেলার
ধারায় ভিজে
মাঘের তুষার তুষানলে ভিজে ভিজে
বারোকাল, সারা জীবন:

তাঁর এই বর্জন-যোজন চলতে থাকার অভিজ্ঞতার ফসল পরবর্তী কাব্যের ভূমিকা নির্মাণ করবে এ-আশা রইল।

গ্রন্থাবলী

গিরিশ রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড : সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্য : সাহিত্য সংসদ : মূল্য কুড়ি টাকা।

সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে স্মরণীয় গ্রন্থকারদের রচনার পুনর্মুদ্রণ সাধুবাদের যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের সুলভ মূল্যে প্রকাশিত রচনাবলীতে মার্জিত রুচির এবং পরিচ্ছন্ন সম্পাদনার দিকও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটকার গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী এঁরা প্রকাশ করছেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি তারই অংশ। সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য। মোট

বাইশটি নাটক, দুটি উপন্যাস ও দুটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে লিখিত কতকগুলি নাটক, গীতিনাট্য এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে। রচনাগুলি কালানুক্রমিক নয়।" নির্বাচনের মানদণ্ড আমাদের জানা নেই। বোধ করি সমগ্র চার খণ্ডে উল্লেখযোগ্য রচনাকার্য-গুলিকে স্থান দিয়ে প্রতিটি খণ্ডের প্রয়োজনীয়তা রক্ষা করবার চেষ্টাই এর কারণ।

দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পাদক দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত মীরকাসিম রচনাটিকে স্থান দিয়েছেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞার জন্য গ্রন্থটি এতকাল অপ্রকাশিত ছিল। বইটি পুনর্মুদ্রিত করে একালের বাঙলার নাট্যামোদীদের প্রীতিভাজন হয়েছেন সম্পাদক। দ্বিতীয় খণ্ডে অধ্যাপক ভট্টাচার্য গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা তথ্যনিষ্ঠ, মনন সমৃদ্ধ। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করে সেই ছন্দের করণ-কৌশলের মধ্যেই যে গৈরিশ ছন্দের সম্ভাবনা ছিল সে কথা সম্পাদক উল্লেখ করেছেন। মধুসূদনের ছন্দের অভিনয়ের প্রয়োজনে অসম পংক্তিবিন্যাসের উৎপত্তি। একে রাজকৃষ্ণ রায় আভিনায়িক ছন্দ বলেছেন। গিরিশচন্দ্র কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছেও ঋণী। তবে প্রধানত তিনি মেঘনাদ বধ কাব্যের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে এর অভিনয়যোগ্যতা নিয়ে এলেন পংক্তি-বিন্যাসের নানাবিধ পরিবর্তনের দ্বারা। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যেই যে নাট্যসম্ভাবনা ছিল দেবীপদবাবু সে প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। বস্তুত মেঘনাদ বধ কাব্য এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের নাট্যমূল্য অনস্বীকার্য। মধুসূদনের নাটকেও এই ছন্দ ব্যবহৃত। এক দিকে যেমন মধুসূদন, অন্য দিকে তেমনি শেক্সপীয়র অটওয়ে ইত্যাদি নাট্যকারদের অভিনয় উপযোগী রচনার পরিবর্তনও এঁরা লক্ষ করেছিলেন। সেই প্রেরণাও বাংলা রঙ্গমঞ্চকে গৈরিশ ছন্দ প্রবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। অধ্যাপক ভট্টাচার্য গৈরিশ ছন্দের ইতিহাস রচনা করে একটি মূল্যবান দায়িত্ব পালন করলেন। নবীনচন্দ্র সেনের কাছে গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রবর্তিত ছন্দের জন্য যে দাবি করেছিলেন সম্পাদক সে দাবির প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।
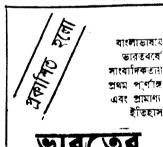
গৈরিশ ছন্দের রহস্যমোচনের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োগ গিরিশ নাট্যসাহিত্যকে কতটা উৎকর্ষে পৌঁছে দিয়েছে সে বিষয়ের আলোচনা সম্পাদকের কাছ থেকে প্রত্যাশা পাঠকের নিশ্চয়ই আছে।

সম্পাদক প্রত্যেকটি নাটক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধার করেছেন। এ বিষয়ে পূর্বাচার্য-গণের সাহিত্যকর্মকে তিনি সর্বদাই স্মরণে রেখেছেন। গিরিশ জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যবান গ্রন্থ অধ্যাপক ভট্টাচার্যের যথেষ্ট কাজে লেগেছে। তথাপি কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাল-তারিখ উল্লেখে তিনি নূতন তথ্যও সন্নিবেশ করেছেন। সব তথ্যকেই তিনি বিচারের দ্বারা গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োজন হলে বর্জন করেছেন। এক কালের প্রতিথযশা নট এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি এখন অস্তাচলে। বাংলা নাট্য আন্দোলন এখন নূতনত্বের প্রয়াসী। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন। দেশ-কালের পরিধিতে বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যকলা ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। নাট্যমূল্য ছাড়াও এগুলির অপর মূল্যও অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেদিক থেকে গিরিশ রচনাবলীর পুনঃপ্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য।

গৌরব মিশ্রের নতুন গৌরব

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টেনিসে বহু গৌরবের অধিকারী অভিজ্ঞ রামনাথন কৃষ্ণনকে ফাইনালে হারিয়ে ভারতের জাতীয় টেনিসে নতুন চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছেন ২২ বছর বয়সী খেলোয়াড় গৌরব মিশ্র। গৌরব মিশ্র জীবনে সর্বপ্রথম ফাইনাল খেলার সুযোগ পেয়েই চ্যাম্পিয়ন হলেন। অপরদিকে রামনাথন কৃষ্ণন ১৩ বারের ফাইনালে পরাজয় স্বীকার করলেন পঞ্চমবার। জাতীয় টেনিসে আটবারের চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণন প্রথম ফাইনালে ওঠেন ১৯৫৫ সালে। প্রথম বিজয়ী হন ১৯৫৫-য়। শেষবার বিজয়ী হন ১৯৬৫-তে এবং শেষ ফাইনালে ওঠেন ১৯৬৭ সালে।

ইংরেজী প্রবচন অনুযায়ী ১৩ সংখ্যাটি অমঙ্গলসূচক। কিন্তু বহু স্মরণীয় টেনিস যুদ্ধের বিজয়ী বীর, যিনি অনেকদিন আগেই খেলোয়াড় হিসাবে নিজের মঙ্গল চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ভারতীয় টেনিসের মঙ্গল চিন্তা করতে শুরু করেছেন, জাতীয় টেনিসের ত্রয়োদশ ফাইনালে তাঁর চেয়ে ১২ বছরের কনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পরাজয় সম্ভবত ভারতীয় টেনিসের কল্যাণেরই ইঙ্গিত।

অনেক আগেই ডেভিস কাপে কৃষ্ণনকে আবার ভারতের অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে। শুধু অধিনায়কই নন, দল গড়ার কর্তৃত্বও ওঁর উপর ন্যস্ত। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে পুনায় এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, তিনি ডেভিস কাপে খেলছেন না। সাংবাদিকরা বলেছিলেন, তুমি যখন প্রেমজিতলালকে হারিয়েছ তখন খেলবে না কেন? কৃষ্ণন বলেছিলেন, প্রেমজিতলালের শরীর সেদিন ভাল ছিল না বলেই আমি জিতেছিলাম। তাছাড়া তরুণের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। বিজয় অমৃতরাজ জাতীয় দলে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর গৌরব মিশ্র সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উঁচু। বিশেষ করে গ্রাসকোর্টে গৌরব খুবই ভাল। এখন অবশ্য গৌরবের খারাপ সময় যাচ্ছে। কিন্তু আমার ধারণা খুব তাড়াতাড়ি এই দুঃসময় কাটিয়ে উঠে গৌরব তার নিজ যোগ্যতার প্রমাণ দেবে।

সত্যিই গৌরব প্রমাণ দিয়েছেন এবং টেনিসের সুনিপুণ শিল্পী স্বনামধন্য কৃষ্ণনকে ফাইনালে হারিয়েই ভারতীয় টেনিসের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছেন।

পুনায় যেদিন গৌরব মিশ্র সম্পর্কে কৃষ্ণন ভবিষ্যৎ বাণী করেন, সেদিন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় রাউন্ডে অখ্যাত খেলোয়াড় পারভিন কুমারকে হারাতে গৌরবের দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। খেলা চলে পাঁচ সেট পর্যন্ত। পরের দিন গৌরব মিশ্র হেরে যান উদীয়মান খেলোয়াড় চিরদীপ মুখার্জীর কাছে স্ট্রেট সেটে। বাছাই তালিকায় সপ্তম স্থান পেয়ে সেই গৌরব মিশ্র একে একে জয় রয়াপ্পা, প্রেমজিৎলাল, শ্যাম মিনোত্রা ও কৃষ্ণনকে হারিয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হবেন এ কথা কৃষ্ণন ছাড়া কে ভাবতে পেরেছিলেন?

সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের যোগ্যতা এবং গুণগরিমার নিরিখেই সাধারণত বাছাই তালিকা তৈরী করা হয় এবং বাছাই তালিকা অনুযায়ী তৈরী হয় খেলার তালিকা। এবারকার জাতীয় টেনিসের বাছাই তালিকা তৈরী হয়েছিল নিম্নলিখিতভাবে :

১। জয়দীপ মুখার্জী, ২। প্রেমজিৎলাল, ৩। বিজয় অমৃতরাজ, ৪। রামনাথন কৃষ্ণন, ৫। আনন্দ অমৃতরাজ, ৬। স্টিফেন ওয়ারবয়েজ (ব্রিটেন), ৭। গৌরব মিশ্র, ৮। আর্মিস্টাড নিলি (আমেরিকা)।

মহিলা : ১। মিসেস নিরুপমা মাঁকড়, ২। মিস মেরি লন টেশ (অস্ট্রেলিয়া), ৩। কিরণ পেশোয়ারিয়া, ৪। রাজন নোবেল (অস্ট্রেলিয়া)।

বলা প্রয়োজন রয়াপ্পা ও শ্যাম মিনোত্রা বাছাই তালিকায় স্থান না পেলেও দুজনই উঠতি খেলোয়াড়। বাছাই তালিকার তৃতীয় স্থানের অধিকারী এবং এশিয়ান টেনিসের রানার বিজয় অমৃতরাজকে শ্যাম মিনোত্রার কাছে হার স্বীকার করতে হয়। আর কৃতী খেলোয়াড় প্রেমজিতলাল তো বাছাই তালিকার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। প্রেমজিৎ, মিনোত্রা এবং কৃষ্ণন পরপর তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে গৌরব মিশ্রকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হতে হয়েছে। কৃষ্ণনের সঙ্গে খেলতে হয়েছে পুরো পাঁচ সেট। প্রেমজিত ও মিনোত্রার সঙ্গে চার সেট খেলতে হলেও দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দুটি-সেট এবারকার জাতীয় টেনিসের স্মরণীয় খেলা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। একটি সেটের মীমাংসা হয় ১২—১০ গেমে, আর একটির ১৬—১৪ গেমে। দুটিই গৌরবের স্বপক্ষে।

গৌরবের জয়ের মূলে তার খেলার তীব্র গতি এবং মাটি কাঁপানো সার্ভিস ঠিক তার কীর্তিখ্যাত পিতা সুমন্ত মিশ্রেরই মত। যদিও আকতার আলী গৌরব মিশ্রের টেনিস কোচ তবু ওর খেলার মধ্যে মিশ্র ঘরানার ছাপ। মিশ্র ঘরানার যোগ্য উত্তরসূরি।

আজ মনে পড়ছে কুড়ি বছর আগের কথা যেদিন সাউথ ক্লাবে দুইবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সুমন্ত মিশ্রকে সিংহাসনচ্যুত করে ১৬ বছরের ছেলে রামনাথন কৃষ্ণন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সেদিন গৌরব চার বছরের শিশু। কুড়ি বছর পর সেই সাউথ ক্লাবের কোর্টে কৃষ্ণনকে হারিয়ে গৌরব মিশ্র পরিবারের টেনিস ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করলেন।

এবারকার জাতীয় টেনিসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা চলে আমেরিকার ১৫ নম্বর খেলোয়াড় আর্মিস্টাড নিলির কাছে এক নম্বর বাছাই সদ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন জয়দীপ মুখার্জীর কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজয় যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমন অপ্রত্যাশিত গৌরব মিশ্রের কাছে দুই নম্বর বাছাই জুনিয়র উইম্বলডনের রানার এবং দুই নম্বরকে একই দিনে বিদায় নিতে হয়। অপ্রত্যাশিত ফলাফল তার আগেও ঘটে মিনোত্রার হাতে তিন নম্বর বিজয় অমৃতরাজের এবং চিরদীপের হাতে ৬ নম্বর বাছাই জুনিয়র উইম্বলডনের রানার ইংল্যান্ডের স্টিফেন ওয়ারবয়েজের পরাজয়। ৫ নম্বর বাছাই আনন্দ অমৃতরাজ কৃষ্ণনের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে এবং ৮ নম্বর বাছাই আর্মিস্টাড নিলি কৃষ্ণনের কাছে সেমি-ফাইনালে হেরে গেছেন।

যে নিলি সিডিং-এ শীর্ষস্থানাধিকারী জয়দীপকে হারালেন তিনি কৃষ্ণনের কাছে হারলেন কেন? কেনই বা মহিলাদের বিভাগে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন কিরণ পেশোয়ারিয়া এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ন ও এক নম্বর বাছাই নিরুপমা মাঁকড়ের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে অস্ট্রেলিয়ার একুশ বছর বয়সী মেয়ে মেরি লন টেশ এর ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ? মনে হয় কলকাতার সাউথ ক্লাবে এবারকার জাতীয় টেনিসের ফলাফল খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য ও যোগ্যতার যথাযথ পরিচয়ের

ফাইনালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণণ ও গৌরব। বহু গৌরবের অধিকারী কৃষ্ণনকে হারিয়ে জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গৌরব মিশ্র

প্রমাণ নয়। টেনিসে অপ্রত্যাশিত ফলাফল হামেশাই ঘটে থাকে। কিন্তু এবার যেন খাপছাড়া ফলাফলের বহর বেশী ছিল। যদি ধরে নিই জয়দীপ ও প্রেমজিতের উপর বয়েসের ছায়া পড়েছে, তবে কৃষ্ণনকেই বা ধরব না কেন? অথচ কৃষ্ণন তো তাঁর র‍্যাকেটের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে—বশ্যকে ইচ্ছেমত চালনা করে তরুণ আনন্দ অমৃতরাজ ও আনিস্টার নিলককে পরাজিত করেছেন। গৌরব মিশ্রকেও কম বেগ দেননি।

যাই হোক, পুনায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ডাবলস ফাইনালে আনন্দ ও বিজয়ের হাতে জয়দীপ ও প্রেমজিতের পরাজয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই ডাবলসের আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল—যদি কলকাতার জাতীয় টেনিসে অমৃতরাজ ভ্রাতৃদ্বয় ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হয়, তবে ডেভিস কাপে জয়দীপ-প্রেমজিতের বদলে ওরাই ডাবলস খেলবে। কিন্তু আনন্দ ও বিজয় সেমিফাইনালে উঠে প্রতিদ্বন্দ্বী জুটি কৃষ্ণন ও গৌরবের সঙ্গে খেলেনি বিজয়ের অসুস্থতার অজুহাতে। ফলে জয়দীপ-প্রেমজিত আবার ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার মেরিলিন টেশই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি দ্বি-মুকুটের অধিকারিণী হয়েছেন মহিলাদের সিংগলস এবং আমেরিকার নিলির সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলে মিক্সড ডাবলসে বিজয়িণীর সম্মান পেয়ে।

নীচে ফাইনাল খেলাগুলির ফল দেওয়া হল।

পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল—গৌরব মিশ্র ৪—৬, ৬—৪, ৮—১০, ৭—৫ ও ৬—৯ গেমে রামনাথন কৃষ্ণনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনাল—অস্ট্রেলিয়ার মিস মেরিলিন টেশ ৬—৪ ও ৬—২ গেমে ভারতের নিরুপমা মানকড়কে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিত লাল ৫—৭, ৬—৩, ৬—৪ ও ৯—৭ গেমে রামনাথন কৃষ্ণন ও গৌরব মিশ্রকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল—আমেরিকার আরমিস্টাড নিলি ও অস্ট্রেলিয়ার মেরিলিন টেশ ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে ভারতের বলরাম সিং ও সুশান দাসকে পরাজিত করেন।

ডুরান্ড কাপ

জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় জলন্ধরেরই অপর দল লীডার্স ক্লাবকে ১—০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ লাভ করেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স প্রথম ডুরান্ড কাপ পায় ১৯৬৮-৬৯ সালে কলকাতার শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ফাইনালে পরাজিত করে। পরের বছর ফাইনালে তারা গোরখা ব্রিগেডের কাছে হেরে যায়। সুতরাং চার বছরের মধ্যে তিন বছর ফাইনালে উঠে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দু'বার ডুরান্ড কাপ জয় করল। লীডার্স ক্লাবের এটিই ছিল ডুরান্ড ফাইনালে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বীতা। যদিও লীডার্স ক্লাব একবার রোভার্স কাপের ফাইনাল খেলেছে এবং ৪ বার খেলেছে ডি সি এম ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল তবু কোনবার বিজয়ী হতে পারেনি। ডুরান্ড ফাইনালেও পারল না। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ত্রিবান্দ্রমের এ জি ও আর সি-কে ২—১ গোলে, অন্ধ্র পুলিসকে ৩—০ গোলে, মোহনবাগানকে ২—০ গোলে এবং দেরাদুনের গোরখা ব্রিগেডকে ২—১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপরদিক থেকে ফাইনালে ওঠে লীডার্স ক্লাব এম আর সি-কে ২—২ ও ৩—০ গোলে পাগোয়ারা জে সি টি এম দলকে ২—১ গোলে ও রাজস্থান আর্মড কনস্টেবলারি দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে।

অলিম্পিক দলে স্থান পাবার মত সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়রা বোম্বাইয়ের প্রাক-অলিম্পিক কোচিং ক্যাম্পে আটকা থাকায় অনেক দলই এবার তাদের পূর্ণ শক্তি

দিয়ে ডুরাণ্ড খেলতে পারেনি। সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েছিল গতবারের রানার্স মোহনবাগান ক্লাব। মোহনবাগানের প্রথম সারির ৬ জন খেলোয়াড় বোম্বাইয়ে আটকা ছিল। শুধু মোহনবাগানই ডুরাণ্ড খেলেছে। গতবারের বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং তো এ বছর ডুরাণ্ড খেলেইনি ওই কারণে। ফলে ডুরাণ্ডের খেলাও এবার ভাল জমেনি।

ডুরাণ্ডে অংশ গ্রহণকারী কলকাতার তিনটি ক্লাবের মধ্যে বাটা স্পোর্টস ক্লাব দ্বিতীয় রাউণ্ডে রোভার্স রানার্স গোয়ার ভাসকো স্পোর্টস ক্লাবের কাছে ০—৩ গোলে হার স্বীকার করে। বি এন আর-ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে ২—৩ গোলে পরাজয় স্বীকার করে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দলের কাছে। মোহনবাগানের আধা-ছেঁড়া দল আম্বালা হিরোজকে ২—১ গোলে এবং ইণ্ডিয়ান নেভি দলকে টাই ব্রেকারে ৫—৩ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। সেখানে ডুরাণ্ড বিজয়ী বর্ডার সিকিউরিটির কাছে পরাজিত হয় ০—২ গোলে।

দেব আনন্দের "হরে রাম হরে কৃষ্ণ" ছবিতে জিনাত [illegible] ও দেব আনন্দ।

হরে রাম হরে কৃষ্ণ

আজকের হিপি-সমাজকে নিয়ে দেব আনন্দই বোধ হয় প্রথম ছবি করলেন, যার নাম "হরে রাম হরে কৃষ্ণ"। হিপি-চরিত্র এর আগেও কোন কোন ছবিতে দেখা গেছে, কিন্তু হিপি-সমাজ কী চায় কী খোঁজে, কীভাবে তাদের দিন কাটে, তাদের আচার-আচরণই বা কী ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাতের চেষ্টা এর আগে এদেশের ছবিতে দেখা যায়নি। চিত্র পরিচালক-কাহিনীকার দেব আনন্দ আধুনিক কালের হিপি-সমাজের চেহারাটাই দেখাতে চেয়েছেন। ছবির কাহিনীস্থল কাঠমাণ্ডু, হিপিদের বসতি বা তীর্থস্থান। একদিক থেকে ছবিটি সমকাল-চিহ্নিত, কিন্তু হলে হবে কী, শেষ অবধি সমকালীন [illegible] বোম্বাই হিন্দী চিত্রের নিয়মমাফিক ব্যাপারগুলির সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেছে। [illegible]ভাবে হিপিদের নিয়ে এই ছবি নয়, অন্য গল্পও আছে যেখানে নায়ক (দেব আনন্দ) প্রেমেও পড়েছে ভিলেনের (প্রেম চোপড়া) সঙ্গে সমানে লড়েও গিয়েছে। নায়ক-নায়িকা ছবির শেষে অবশ্যই মিলিত, ভিলেনও নিহত।

কিন্তু পরিচালক-কাহিনীকার নায়কের বোনকে বাঁচাননি। নায়কের বোন (জিনাত আমন) হিপি। হিপি-সম্প্রদায় থেকে তাকে উদ্ধার করবার জন্যই নায়ক কাঠমাণ্ডুতে যায় এবং সেখানেই চিত্রকাহিনী হিন্দী চিত্রের মামুলি নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। ছবির আরম্ভ মনট্রিলে। সেখানে ছোটবেলা থেকে ভাই-বোনের জীবনের অশান্তি ও নিঃসঙ্গতা দেখিয়ে পরিচালক নায়কের বোনের হিপি হওয়ার একটি সম্ভাব্য যুক্তি উপস্থিত করেছেন। নায়ক ও তার বোন ছোটবেলা থেকেই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতার কারণ তাদের বাবা-মায়ের (কিশোর সাহু ও অচলা সচদেব) বিবাহিত জীবনে চরম অশান্তি এবং পরিণামে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

ছবিতে গতানুগতিক গল্পের পাশে নায়কের বোনের হিপি-জীবনচর্যার ঘটনাগুলিও রয়েছে। হিপি-প্রসঙ্গে দেব আনন্দ এই নতুন যাযাবর-গোষ্ঠীর ফ্রাস্ট্রেশন, মানসিক প্রতিক্রিয়া, হরে কৃষ্ণ হরে রাম নামকীর্তনের মধ্যে তাদের আত্মবঞ্চনা ও মিস্টিসিজমের প্রবণতা এবং এমন কী জেনারেশন গ্যাপ-এর কথাও বলেছেন। দেব আনন্দের হিপি-চরিত্র বিশ্লেষণ অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য। তা-ছাড়া কাঠমাণ্ডুতে এই সম্প্রদায়ের জীবনধারা, গঞ্জিকা ও এল-এস-ডি সেবন, নেশার বুঁদ হয়ে নামসংকীর্তন ইত্যাদি পরিচালক অনেকটা বাস্তবসম্মত-ভাবে দেখিয়েছেন। কাঠমাণ্ডু লোকেশানের ব্যবহার খুবই সুন্দর। ছবিটি ভিস্যুয়াল সৌন্দর্যের দিক থেকে আকর্ষক। ওই চমৎকার লোকেশানে বহু লোকের সামনে উন্মুক্ত স্থানে নায়িকার (মমতাজ) নাচও নতুন লাগল—সেটা পরিবেশের গুণে।

নায়কের হিপি-বোন শেষ পর্যন্ত পূর্ব জীবনে ফিরে আসতে পারল না। সে আত্মহত্যা করেছে। কাহিনীকার-পরিচালক এখানে মেলোড্রামা সৃষ্টি করেছেন। বোনকে উদ্ধার করার জন্য নায়কের সব প্রচেষ্টার মধ্যেই নাটকীয়তা ও রোমাঞ্চ। দেব আনন্দ যখনই সেখানে হিপিদের এনে হাজির করেছেন ছবিটি সেখানেই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। এর একটি বিশেষ কারণ জিনাত আমনের অসাধারণ অভিনয়। এমন উচ্চাঙ্গের চরিত্রচিত্রণ এর আগে ভারতীয় চিত্রে অল্পই দেখা গেছে। দেব আনন্দ ও মমতাজ তাঁদের ফ্যানদের খুশী করবেন নিশ্চয়ই। রাহুল দেব বর্মণের দেওয়া সুরে ছবির গান তো অনেকই হিট করেছে, যেমন "দম মারো দম মিট যায়ে গম"। এদিক থেকে হিন্দী চিত্রের নিয়মিত দর্শকদের পোয়াবারো। বিদগ্ধ দর্শকদের জন্য রয়েছে হিপিসমাজ। দেব আনন্দ অবশ্যই এই সমাজের আরও গভীরে ঢুকতে পারতেন।

আজকের নায়ক

[illegible]

"আজকের নায়ক" আজকের সিনেমারই নায়ক। একালের অশান্ত, অস্থির ছেলের ইমেজ-এ নায়ক দেবুর চরিত্রটি কল্পিত হলেও তার গোত্র পরিচয়হীন। ছবির শুরুতে দেবু (সৌমিত্র ভঞ্জ) রকবাজ, গুণ্ডা, বেকার। দেবু ও তার সঙ্গীদের প্রথমদিকের কয়েকটি দৃশ্যে পরিচালক দীনেন গুপ্ত একটি কনটেম্পোরারি ফিল্মের লক্ষণ দেখিয়েছেন। এই অংশে চিত্র পরিচালনার ধরনটি আধুনিক, বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করার মত। দু-এক রীল দেখার পর মনে আশাও জেগেছে হয়ত একটি সমকালীন সমস্যার গভীরে ঢুকছি। কিন্তু যখন মুখ বুজে বিনা অপরাধে দেবু জেলে গেল তখন থেকেই সিনেমার গতানুগতিক নিয়মগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রাস্তায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর দেবুর বাড়ি তল্লাসি করে পুলিস চোরাই কারবারের মাল ভর্তি যে বাক্সটি পেল সেটা দেবুর নয়। তার এক স্মাগলার বন্ধু সেটা পুলিসের ভয়ে দেবুর বাড়িতে রেখে যায়। দেবুর বোন রমাও (জয়শ্রী রায়) সেটা জানে। অথচ মামলা চলাকালে সত্য কথাটি কেউ বলল না। স্মাগলার যে দেবুর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু তাও নয়। এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নও ওঠে না। কারণ স্মাগলার মিথ্যা কথা বলেই বাক্সটি দেবুর কাছে রেখে গেছে। অথচ দেবু বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদেরই মত নীরব।

নাটকের স্বার্থে এই মামলার নিয়ম সংগ্রামের পথ থেকেই "আজকের নায়ক"-এর ব্যাপারগুলি কেমন জোলো হয়ে উঠেছে।

নাটক জমেছে ঠিকই, তবে সমকালের কাহিনী আর রইল না। অবশেষে নায়ক ফিরোজের সংগে বোম্বাই-মিয়ার এক হাত লড়েছে। এই ফিরোজ আর কেউ নয়, নায়কের সেই আপনার বন্ধু চণ্ডী (নিরঞ্জন রায়)। ক্লাইম্যাক্সে দেবু ও নায়িকা রত্নার (সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়) মিলনের ব্যবস্থা পাকা। প্রতিবেশী রত্নার দিকে দেবুর অনুরাগ দেখা গেছে প্রথমেই। রত্না অবশ্য এক ধনী যুবকের ছলনায় ভুলে এবং অনেক দুর্দশা ভুগে চিত্রনাট্যের বিধান অনুযায়ী দেবুর কাছেই ফিরে এসেছে।

কাহিনীতে দেবু যে মানসিক প্রতিক্রিয়া

"আজকের নায়ক" (পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত) ছবিতে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও কাজল গুপ্ত

বদলে পাপের পথে যায়নি এটা অবশ্য সুখের কথা। চিত্রনাট্যকার-কাহিনীকার শেখর চট্টোপাধ্যায় নায়কের রূপান্তর দেখিয়েছেন। নায়ক সৎপথে চেষ্টা করে একটি ছোট কারখানা খুলে ফেলেছে। এতে তার বেকার ও মস্তান বন্ধুরাও যোগ দিয়েছে। কারখানার পরিচালন-ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের। এই কারখানার পরিচালক দীনেন গুপ্ত আর কিছু না হোক শিল্পী রবি ঘোষকে (নায়কের বন্ধু) দিয়ে কিছু কৌতুক পরিবেশনের সুযোগ পেয়ে গেছেন। করুণ নাট্যরসের দিকেও পরিচালকের নজর ছিল। তিনি দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির হাতে নায়িকা-ধর্ষণের উদ্যোগপর্বটি বিশদভাবেই দেখাতে চেয়েছেন। দৃশ্যটি সাজানো বলেই দৃষ্টিকটু। পুলিস-তাড়িত একজন রাজনৈতিক কর্মীকে কেন্দ্র করেও পরিচালক আবেগ বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। চরিত্রটি প্রক্ষিপ্ত। রাজনৈতিক কর্মীর প্রতি পরিচালকের যত সহানুভূতিই থাকুক নাট্যক্রিয়ার দিক থেকে ব্যাপারটি তেমন ফলপ্রসূ হয়নি।

বরং নায়ক-নায়িকা, নায়কের বন্ধুবর্গ

এবং তার পরিবারের সকল বিষয়কে পরিচালক তরুণ মজুমদারের যে প্রয়াস করেছেন তা অবশ্যই সফল। এক্ষেত্রে শিল্পীদের সাবির-পারদের ধন্য উল্লেখযোগ্য। নায়কের ভূমিকায় সমিত ভঞ্জ বেশ স্বাভাবিক সংযত অভিনয় করেছেন। মস্তান-জাতীয় চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের বিশেষ ক্ষমতা আগেও দেখা গেছে, এবারেও দেখা গেল। নায়কের পিতা-মাতার ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারতী দেবী পারিবারিক নাটকে আবেগ সঞ্চারের প্রয়োজন সিদ্ধ করে তুলেছেন। নায়কের বোনের ভূমিকায় জয়শ্রী রায়ের চরিত্রচিত্রণ খুবই স্বাভাবিক।

গল্পটি নায়কপ্রধান হলেও ছবিতে নায়িকার স্থান সামান্য নয়। নায়িকা চরিত্রে নবাগতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছবিতে এই প্রথম অভিনয়ের পরই জনপ্রিয় হবেন আশা করা যায়। পরিচালক তাঁকে প্লামার শিল্পী হিসাবেও উপস্থিত করেছেন। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের প্লামার এবং অভিনয়ের শক্তি দুই-ই আছে। অন্যান্য চরিত্রে কাজল গুপ্ত (নায়িকার দিদি), নির্মলকুমার রায়, চিন্ময় রায়, ইন্দুভূষণ মজুমদার, কল্যাণ চ্যাটার্জি প্রভৃতি চিত্রনাট্য-অনুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন।

চিত্রনাট্যে সব চরিত্রের উপস্থিতিই যে অপরিহার্য ছিল এমন বলা যায় না। তবে পরিচালক গল্পটি বিন্যাসের ক্ষেত্রে এডিটিং-এর সুন্দর সদ্ব্যবহার দেখিয়েছেন। প্রথম ভাগে সেটা বিশেষ লক্ষণীয়। নায়িকার অতীত কাহিনীর ফ্ল্যাশব্যাক উপস্থাপনাও সুন্দর। প্রয়োগকর্ম এবং টেকনিক্যাল পারিপাট্যের দিক থেকে, বিশেষত ক্যামেরার কাজে (পরিচালক দীনেন গুপ্ত-কৃত), ছবিটি নিখুঁত। তবে নাটকের তাগিদে সমসাময়িক সমস্যা যখন চাপাই পড়ে গেল এবং দর্শককে চিরাচরিত পন্থায় আমোদদানের উদ্দেশ্যই যখন প্রধান হয়ে উঠল তখন পরিচালক আরও গান ব্যবহার করতে পারতেন। দুটি গান অবশ্য ছবিতে আছে। সুরারোপ (অসীমা ভট্টাচার্য-কৃত) সুন্দর।

চেক চলচ্চিত্র উৎসব

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উদ্যোগে কলকাতায় সপ্তাহব্যাপী চেক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে ৩ মার্চ সন্ধ্যায় লাইট হাউস চিত্রগৃহে। উৎসবের উদ্বোধন করে প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রী পি বি মুখার্জি আধুনিক চেক-চলচ্চিত্রের সমাজ-সচেতনতা, প্রাণ-প্রাচুর্য ও নানা বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেন। সংগীত ভবন দেন শ্রীপান্নালাল সামন্ত। শ্রীসামন্ত চেক রাষ্ট্র এবং চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন। ভারতস্থ চেক দূতাবাসের

"পরিবর্তন" (পরিচালনা : নবাগতের সুশ ভানিয়া) হিন্দী ছবিতে বিনা কস্তুর ও রঞ্জিত মল্লিক

কালচারাল অ্যাটাশে শ্রীজান ব্লাস্কিক আশা প্রকাশ করে বলেন, উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি কেবল প্রমোদমূল্যেই বিবেচিত হবে না, দুই দেশের মধ্যে একটি চমৎকার বোঝাপড়ার সুযোগ এনে দেবে। সমাগতদের ধন্যবাদ জানান আঞ্চলিক সেন্সর অফিসার শ্রী এ কে সরকার। উদ্বোধন-সন্ধ্যার ছবিটির নাম 'ট্রিকস অব ডিসেপটিভ লাভ'।

থিয়েটার ইউনিটের প্রহসন মেলা

কলকাতায় হাসির নাটকের অভিনয় উৎসব বড় একটা দেখা যায় না। মাঝে মধ্যে এখানে-ওখানে দু'একটি প্রহসন নাটকের অভিনয় দেখা গেলেও একসঙ্গে একাধিক নাটক নিয়ে প্রহসন মেলা বসানোর উদ্যোগ এই শহরে প্রায় বিরল ঘটনা। এদেশে সিরিয়াস নাটকের অভাব নেই, প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরেই সিরিয়াস নাটকের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয়ে আসছে। অধুনা, সেই প্রবণতা যেন আরো বেশি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। ফলতঃ এদেশে ভালো হাসির নাটক দেখাও হচ্ছে কম। তাই হঠাৎ কোথাও সুঅভিনীত একটি হাসির নাটক দেখলে আমার মতো অনেক দর্শকই মরুভূমিতে মরূদ্যান দেখার উল্লাস বোধ করেন। থিয়েটার ইউনিট আয়োজিত তিনদিনের প্রহসন মেলা আমার মতো অনেককেই সেই সজ্ঞান উল্লাসটুকু উপহার দিয়েছে।

রঙমহল থিয়েটারে তিনটি সকালে এঁরা অভিনয় করলেন চারটি হাসির নাটক। নাটকগুলির একাধিক অভিনয় ইতিপূর্বে এই সংস্থা পরিবেশন করেছেন, তার কিছু কিছু আমাদের দেখাও আছে। তবু সুখের কথা, এই উৎসবে তাঁদের পূর্ব অভিনীত নাটকগুলির অভিনয় আরো পরিণত, আরো অভিনয় দক্ষতায় চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষত 'পঞ্চশর' নাটকে শিল্পীদের অভিনয় সাফল্য এবং টিমওয়ার্ক মুগ্ধ হয়ে দেখবার মতো।

উৎসবের প্রথম নাটক 'অলীকবাবু' (রচনা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) আগাগোড়াই সুপ্রযোজিত। স্থানে স্থানে প্রধান শিল্পী উত্তীয় দেবকে যে সামান্য বাড়াবাড়ি করতে হয়েছিল সেটুকু মেনে নিলে নাটকটি সর্বত্র সুঅভিনীতও। দ্বিতীয় নাটক 'পঞ্চশর' র‍্যানডম টমাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রূপান্তরের কাজটি শেখর চট্টোপাধ্যায়ের। হাস্যরসের দিক থেকে এইটিই উৎসবের সেরা নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্রে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নিপুণ অভিনয়ও বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতো যা প্রেক্ষাগৃহে অনবরত হাস্যরোল তুলেছে। শেষদিনে অভিনীত হয়েছে দুটি ছোট নাটক, 'বিদূষী' এবং 'কৃপণের ধন'। প্রথম নাটকটি মলিয়ের রচনা অবলম্বনে রচিত। রূপান্তর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের। দ্বিতীয় নাটক অমৃতলাল বসুর। অভিনয় গুণে এই দুটি নাটকও আমাদের যথেষ্ট হাসিয়েছে এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রেক্ষাগৃহে হাসির তুফান ছুটিয়েছে। প্রাণ খুলে যাঁরা হাসতে ভালবাসেন থিয়েটার ইউনিট-এর 'প্রহসন মেলা' দেখে তাঁরা তৃপ্ত পাবেন। কেননা, হাস্যরস সৃষ্টিতে এই সংস্থার শিল্পীদের দক্ষতা প্রায় সংশয়াতীত। ফলে উৎসবের চারটি নাটকই আমাদের প্রাণ খুলে হাসবার সুযোগ এনে দিয়েছে—যে সুযোগ আমাদের জীবনে

প্রায় মহলোক হয়ে এসেছে এখন। দর্শকদের পক্ষ থেকে মন্তব্য এই কারণেই থিয়েটার ইউনিট ধন্যবাদের যোগ্য। চারটি নাটকেরই নির্দেশনায় ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন নাটকে অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন সাধনা রায়চৌধুরী, অলোক রায়চৌধুরী, অনিন্দিতা চৌধুরী, উত্তীয় দেব, গৌর গোস্বামী, প্রবীর বসু, মৃণাল চ্যাটার্জি, কানাই ব্যানার্জি, কমল দাস, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চক্রবর্তী, দীপিকা ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র গুপ্ত, জয় গাঙ্গুলী, প্রভাত রায়চৌধুরী, দেবী চট্টোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ ও শেখর চট্টোপাধ্যায়।

জেমিনি সার্কাসের একটি খেলা

জেমিনির তাঁবুতে

কলকাতায় প্রায় ৮-৯ সপ্তাহ ধরে চলছে জেমিনি সার্কাস (পার্ক সার্কাস ময়দানে) এখনও একটি অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। সার্কাস-তাঁবুর বাইরে লোকে গমগম, সারি সারি দোকান, সন্ধ্যায় আলোর ঝলমল—যেন এক ছোট্ট নতুন শহরের পত্তন। আসল মজা, শুধু মজা বলি কেন, রোমাঞ্চও বটে, কিন্তু তাঁবুর ভেতরে। মেন গেট দিয়ে ঢুকতেই ডান পাশে দেখি শেকল বাঁধা হাতিগুলো দাঁড়িয়ে। ছোটদের মনে এই মুহূর্ত থেকেই রোমাঞ্চের সূত্রপাত। জেমিনির সার্কাস যখন শুরু হয় তখন আর শ্বাস ফেলবার সময় থাকে না। এবার ট্রাপিজেও নতুনত্ব। নতুন খেলাও অনেক আছে। কোন খেলা যে বেশি ভাল লেগেছে বলা কঠিন। মেয়েদের পিরামিড তৈরী নাকি জর্জের লক্ষ্যভেদ। জেমিনি সার্কাসের ছেলেমেয়ে সব শিল্পীরাই এবার নানা আশ্চর্য খেলা দেখিয়েছেন। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেয়েরা যে নৈপুণ্য ও কসরৎ দেখিয়েছেন তা মুগ্ধ হয়ে দেখবার মত। পশুদের খেলাও কম আশ্চর্যের নয়। শিম্পাঞ্জির সাইকেল চালানো, একটি চমৎকার খেলা। সাইকেল চালানোও আছে।

এইসব খেলার ফাঁকে ফাঁকে জোকারদের আবির্ভাব। কৌতুকে নকশা ও বাদ যায়নি। বিশেষ লক্ষণীয় জেমিনির পরিবেশন-কৌশল। সব কিছু ঘটে যাচ্ছে অদ্ভুত গতির মধ্য দিয়ে। তার ওপর শো-ম্যানশিপ তো আছেই। এই দর্শকের সার্কাসের খেলা যেমন ভাল লেগেছে তেমনি ভাল লেগেছে আনুষঙ্গিক জাঁকজমক। গোল মঞ্চের ধারে বসে মঞ্চ

ছিলেন ফণীবাবু। সত্যি জীবদ্দশায় তা দেখে যেতে পারলেন না।

দেখলাম জনাকয়েক গুণমুগ্ধ। দু' একজন চিৎপুরের লোকও ছিল ওখানে। বাকি সকলেই আত্মীয় কি প্রতিবেশী। ও'দের কাছেই জানতে পারলাম, সকালে চা খাচ্ছিলেন। সেজ ছেলেকে হঠাৎ বললেন শরীর খারাপের কথা। উঠতে যাচ্ছিলেন—পড়ে গেলেন। তারপর আর সাড়া নেই। মেজ ছেলে 'বাবা বাবা' বলে ছুটে এসে ধরল। কিন্তু আকস্মিক হৃদরোগ চিরকালের মতন একটি তরতাজা মানুষের শরীরকে চিরহিমাবৃত করে ফেলেছে। পুত্ররা ডেকেছে, স্ত্রী আছড়ে পড়েছেন বক্ষে: বাঙলার ছোটফণী, আসলে শ্রীফণিভূষণ মতিলাল তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্টি ভঙ্গিতে প্রত্যুত্তর করতে পারেন নি।

ও'র পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে সকলেই বাপের মতন অভিমানী। বললাম 'তোমরা কেন খবর দাও নি।' সকলে কেঁদে ফেলল। বলল, 'মানা করেছিলেন। কয়েক বছর ধরেই বলতেন, যেন তাঁর মৃত্যু-সংবাদ চিৎপুরে না পৌঁছয়।' আমার নিজেরও মনে আছে, একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলেন, ওটা চিৎপুর নয় ভাই, বিচিত্রপুর, বেইমানপুর। বাস্তবিক ১৯৬৬ সালে সেই যে শেষ অভিনয় করে বাঁড়ষার বাড়িতে ফিরে গেলেন—তারপর থেকে কোনো যাত্রাদলের মালিক (শ্রীমাখনলাল নট্ট ছাড়া) একটি ঘণ্টার জন্যও ও'র সংবাদ নিতে যান নি।

ফণী মতিলাল আট বছর বয়সে শশী হাজরার দলে সখী হিসাবে যাত্রাগান করতে এসেছিলেন। তারপর এলেন নট্ট কোমপানিতে স্ত্রী চরিত্রের শিল্পীরূপে। সে বছর এ-দল হরিপদ চাটুজ্যে মশাইয়ের 'খনা' খুললেন। নাম ভূমিকার ফণীরাণীই ফণী মতিলাল। অসম্ভব যশ পেলেন। ওই পালায় মিহির সাজতেন মোশনমাস্টার শ্যামসুন্দর গোঁসাই। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। অবশেষে একদিন ও'রা যুক্তি করে পার্ট বদলে নিলেন। শ্যামবাবু সাজলেন 'খনা' ফণীবাবু 'মিহির'। অভিনেতা 'ছোটফণী'র আবির্ভাবকাল আসলে এখান থেকেই শুরু। পরে ছোট-ফণীবাবু 'লীলাবসান' পালার 'শাম্ব', 'প্রবীরার্জুন'-এ 'প্রবীর', 'জরাসন্ধ' পালায় 'কৃষ্ণ' এবং 'কৈকেয়ী'র 'ভরত' চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। বড় ও ছোটফণীর মধ্যে কে বড় শিল্পী এই নিয়ে এক প্রতিযোগিতা-মূলক অভিনয় ও'রা করেছিলেন 'চক্রছায়া' পালাতে। নাট্যভারতীর 'উপেক্ষিতা' পালায় তাঁর 'ভীষ্ম' চরিত্রায়নের কথা ভোলবার নয়। তবু সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে আছে তাঁর 'সিরাজ'।

বৃহস্পতিবার, ২ মার্চ সকাল ৭-৪৫ মিনিটে ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন তাঁর পৈতৃক আমলের বাড়ি বাঁড়ষায়। ছেলেরা সকলে কাছে ছিলেন। তিন মেয়ের দু' মেয়েও। বড় ছেলে বলছিলেন, আগের দিনেও যাত্রাশিল্প নিয়ে উনি কথা বলেছেন। রাত পোহাতেই বাংলার অভিমানী সূর্য অস্তাচলে চলে পড়লেন।

চিরকালের নিঃসঙ্গ অভিমানী মানুষটি সত্যিই যখন যান তখনও তাঁকে নিয়ে হইচই করতে রাজী ছিলেন না। তাঁর শবযাত্রা নিয়ে বিশাল মিছিল হল না। শবযাত্রা চিৎপুরের মাটিও স্পর্শ করে গেল না—এমনি করেই তাঁর অভিমান তিনি বজায় রেখে গেলেন।

—সূত্রধার

(জি ২৭৮৬)

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

পঃ বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাবের সদস্য শিল্পীরা গত ১০ জানুয়ারি 'আমি মুজিব নই' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন স্টার থিয়েটারে। হরিপদ খাসনবীশ, বিনয় ভৌমিক, পুতুল চক্রবর্তী, সমীর গুপ্ত ও পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় এ-দিন দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। বিশেষ করে ওদের ঘরোয়া দৃশ্যগুলি খুবই উপভোগ্য হয়। প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাট্যাভিনয়ের অন্যান্য চরিত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন দুলাল মিত্র, বিনয়রঞ্জন চৌধুরী, গীতা প্রধান, প্রশান্ত চৌধুরী, ঝুমা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সাগর সেনের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় রবিরশ্মির 'বিশ্বজন মোহিছে' আগামী ১৮ মার্চ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদন মঞ্চে পরিবেশিত হবে। রবীন্দ্র সংগীতের বিপুল বৈচিত্র্যময় রূপাসঙ্গের প্রকাশ এই অনুষ্ঠানটির মুখ্য বিষয়বস্তু। নৃত্য সহযোগিতা করবেন মঞ্জুলিকা দাস ও রামগোপাল।

নিউ ইয়র্কে টেগোর সোসাইটি আয়োজিত "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার ও অন্যান্য শিল্পী

নিউইয়র্কে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য

নিউ ইয়র্কের টেগোর সোসাইটি কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে। অতএব, উদ্বৃত্ত অর্থ ৭৫০ ডলার উদ্যোক্তারা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়েছেন। 'শ্যামা' চরিত্রে মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের সফল্য অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলে। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন অমিয় ব্যানার্জি। মোট পনেরজন শিল্পী সংগীতে যোগ দেন। নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন চরিত্রে কয়েকজন আমেরিকান নৃত্যশিল্পীও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নৃত্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন সুখেন্দু দত্ত, শিহরণ দাশগুপ্ত, পিনাকী সেনগুপ্ত, মাইকেল ডি-নুজ্জো, সারা বার্নেট পল্লবী ভট্টাচার্য, গেইল পিনাকী, অম্বালিকা মিশ্র, মেলানী মানসন ও শ্যামশ্রী সেনগুপ্ত। সংগীতশিল্পীরা হলেন, অমিয় ব্যানার্জি ফারুকুল ইসলাম, শ্যামল মৈত্র, সুধীর লাহিড়ী, শিপ্রা ব্যানার্জি, জয়শ্রী চক্রবর্তী, নীলাঞ্জনা ধর, করবী নাগ, বাদল রায় চৌধুরী, অমর সান্যাল, অরুণ ভৌমিক, সত্য মুখার্জি ও তপু সেনগুপ্ত। শ্যামার আগামী অনুষ্ঠান মেক্সিকো ও ওয়াশিংটনে হওয়ার কথা।

অরণ্যদেব

লী ফক

চার্লি, অমূল্য হিরেগুলো এই জুতো সুন্দর দিয়ে দাও চুক্তি করে, এখন জহুরীর কাছে যাও।
জহুরী যদি বলে যে, ওগুলো আসল চিজ, আর.....

ও যদি ফিরে এসে বলে যে, ওগুলো ঝুটা, তাহলে?
মুখ সামলে কথা বলো!
আরে, আরে থামো!

চোরের দল আর অরণ্যদেবের ট্রফি ....
নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ নেই। তোমরা দুজনে বরং একসঙ্গে যাও। জিতে জেনে এসো, এগুলো আসল চিজ কিনা।
বেশ।
আমি এখানে অপেক্ষা করব।

দুটোই আসল জিনিস। নিখুঁত।
কত দাম হবে?
তা এক একটার দাম হবে অন্তত দশ হাজার ডলার!
কিনতে চাও?

এত দাম দেবার সাধ্য তো আমাদের নেই।
বেশ অর্ধেক দামে দাও, তাতেই আমরা রাজী।
বেশ!

ম্যাককে বলব যে, এগুলো সব ঝুটো মাল। সব গুলো মণিমুক্তো আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে নেব।
ও কিছু টেরও পাবে না।
প্রচুর লাভ হবে আমাদের।
যা বলেছ
7/14

শুনলে ম্যাক, সব ঝুটো মাল! আরে....
ম্যাক কোথায়? বাদবাকী মাল নিয়ে ব্যাটা সরে পড়েছে!

না সরে পড়িনি। তোমাদের শাস্তি দেবার জন্যে অপেক্ষা করছি।
জহুরীকে ফোন করে সব জেনেছি। এখন তোমাদের মেরে এগুলো সব আমি একাই নেব।
!!

পাক সেনা প্রধান হিসাবে টিক্কা খানের নিয়োগ বর্তমান সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কুখ্যাত কশাই টিক্কা খান পাকিস্তানী সেনা প্রধান হয়েছেন। ফৌজের উপর মহলের কয়েকজন বিতাড়িত হয়েছেন। তাঁদের অবসর দেওয়া হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। বড় রকমের বেশ কিছু রদবদল হয়েছে। পাক প্রেসিডেনট ভুট্টো বলেছেন যে, তিনি পাক ফৌজকে এশিয়ার সেরা জঙ্গী-যন্ত্রে পরিণত করতে কৃতসংকল্প। কিন্তু পর্যবেক্ষকদের ধারণা তিনি মুখে যাই বলুন, তাঁর প্রভাব এখন ক্ষয়ের পথে। ভুট্টো আরও বলেছেন যে, ভারত সম্পর্কে পাকিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। উদ্যোগটি যে কি তা তিনি বলেন নি। মুজিবের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা তিনি নতুন করে প্রকাশ করেছেন। আর হুমকি দিয়েছেন সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানকেঃ খবরদার কোন আন্দোলন চলবে না। সামরিক আইন তোলা হবে না। সংবিধান শিকেয় তোলা থাকবে। লেফটেনান্ট জেনারেল টিক্কা খান এখন পুরো জেনারেল হয়েছেন।

দেশী সংবাদ

২৮ ফেব্রুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ রাঁচীতে ঘোষণা করেন যে, ভারত কাশ্মীরে অন্য দেশের নাক গলানো বরদাস্ত করবে না। কাশ্মীরে গণ্ডগোল বাধাবার জন্য যেসব দেশ অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তিনি তাদের সতর্ক করে দেন। এছাড়া এদিন তিনি এক সভায় বলেন যে, বাংলাদেশের বিহারী মুসলমানদের নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান সেই দেশের সরকার ও পাকিস্তানের মধ্যেই হবে। এ ব্যাপারে ভারতের কিছুই করণীয় নেই।

কলকাতা পৌর আইনের বিধান স্মরণ করিয়ে দিয়ে কমিশনার শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার আজ অফিসারদের উদ্দেশে লিখিত নির্দেশ জারি করে বলেছেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া শহরের জায়গা জমি বিলি বণ্টনের ব্যাপারে কোন অফিসার যুক্ত হয়ে পড়লে তাঁকে আইন-ভঙ্গ করা ও অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে।

১ মারচ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মুরশিদাবাদের হরিহর পাড়ায় এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেনঃ কংগ্রেস জিতলে পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী সরকার হতে পারে। জনগণ যদি কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসান, তবে রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন।

একমাত্র লবণ হ্রদের ১৫০ জন বসন্ত রোগাক্রান্ত শরণার্থী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শিবিরে আর কোন শরণার্থী নেই। আরোগ্য লাভের পর তারাও চলে যাবেন। লবণ হ্রদের শিবিরেই ছিলেন দু'লক্ষ শরণার্থী। শিবিরের বাইরে দেড় লক্ষ। বাংলাদেশ থেকে মোট ৯৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩০৫ জন শরণার্থী ভারতে এসেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বেসরকারী অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছেন। গত ১৯৭১ সালের ১ অক্টোবর থেকে হিসাব করে এই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের ক্ষেত্রে মাসিক ৭ টাকা হারে এবং শিক্ষক, করণিক ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রে মাসিক ৮ টাকা হারে মহার্ঘ-ভাতা সরকার মঞ্জুর করেছেন।

২ মারচ—গতকাল মেদিনীপুরে এক নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বলেন, কংগ্রেস ও সি পি আই-এর মধ্যে এই মর্মে সমঝোতা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেলে সি পি আই মন্ত্রিসভায় যোগ না দিয়ে বাইরে থেকে কংগ্রেসকে সমর্থন জানাবে।

পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জি পি ...য়ার আজ আঞ্চলিক কমিটির সভায় এই আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের

প্রয়োজনে যেসব ট্রেন এখানে বাতিল করা হয়েছিল, আগামী ১৫ এপ্রিল নাগাদ সেগুলি পুনরায় চালু করা হবে.

৩ মারচ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারত অন্য কোন দেশের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না।

আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে অচল হয়ে যায়। এতদিন তবু ক্লাস চলছিল, এদিন তাও হয়নি। নির্দিষ্ট দিনের দিন তিনেক বাদেও মাইনে না পাওয়ায় আশাহত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের তালাও খোলে নি। ছাত্রদের অনুরোধে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এতদিন কাজ করছিলেন, ফলে ক্লাসও চলছিল।

৪ মারচ—রাজ্যের যেসব অঞ্চলে হাঙ্গামার আশংকা রয়েছে, এসব অঞ্চলে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হতে পারে এজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজবিরোধীদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে। পুলিশী তল্লাসি চলছে। পুলিসকে সাহায্যের জন্য মিলিটারিও থাকছে।

আজ পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন শুরু হচ্ছে। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। রাজ্যের সংখ্যা ১৬, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ২, মোট আসন ২৭২৭, ভোটদাতা ১৯৫২৩৮৫২৮, নির্বাচন কেন্দ্র ২৭২৭, প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ১১৯৩৮, ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ২৬৯০৮৮, নির্বাচ্য কর্মীর সংখ্যা ১৪ লাখের মত।

৫ মারচ—দমদমের পার্বতী সিঁথি অঞ্চলে আজ কংগ্রেসের একটি মিছিল আক্রান্ত হয়। মিছিলে বোমা পড়ে এবং রাইফেল থেকে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ, পরে দমদম স্টেশনের কাছেও সংঘর্ষ চলে। পুলিসী সূত্রে বলা হয়, এই ঘটনায় পাঁচজন নিহত হন। আহতের সংখ্যা পঁচিশ।

ছয়টি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আজ ৫৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের প্রথম পর্যায় শেষ হল। মোট ভোটদাতা ৩ কোটি ৫৫ হাজার। কিন্তু ভোট দিয়েছেন শতকরা ৪৫ থেকে ৫০ জন। ভোট পড়েছে মোটামুটি শান্তিতেই। অশান্তির খবর এসেছে শুধু বিহার থেকে। একটি বুথে ভোট গ্রহণের ঠিক আগে একজন হোমগারড সেখানকার প্রিসাইডিং অফিসারকে গুলি করে মারে।

বিদেশী সংবাদ

২৮ ফেব্রুয়ারি—শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল মসকো সফরে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআবদুস সামাদ। এদিকে আজ মারকিন কনসাল জেনারেল শ্রীসামাদের সঙ্গে দেখা করে বলেন : বাংলাদেশের বাস্তবতা উপলব্ধিতে মারকিন সরকার ভুল করবেন না। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তাঁর সরকার সম্পূর্ণ সচেতন।

১ মারচ—মারকিন বিমান বাহিনী আজ এমন একটি উন্নত ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছেন যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীন কোন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলে তা জানা যায়। প্রায় ১ টন ওজনের এই গুপ্তচর উপগ্রহটিকে টাইটান ৩-সি রকেটে উৎক্ষেপণ করা হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটা বড় রকমের গোলযোগের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে রাওয়ালপিন্ডির 'নিউ টাইমস' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার এক খবরে জানা গেল। জনগণের মন বোঝেন এমন কয়েকজন নেতার মতে : এই প্রদেশে গৃহযুদ্ধ আসন্ন, প্রশ্নটা সময়ের।

২ মারচ—চোরাকারবার বন্ধের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা নিয়েছেন। এজন্য সরকার পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর ৯ হাজার ব্যক্তিকে সাতদিনের মধ্যেই সীমান্ত প্রহরার কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩ মারচ—মানুষের বিজ্ঞান-প্রতিভার সৃষ্টি বৃহত্তম গতিবেগ নিয়ে পাওনিয়ার-১০ মহাকাশযান জুপিটার বা বৃহস্পতির দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। সৌরমণ্ডলের সব চেয়ে বড় এই গ্রহটির কাছে গিয়ে সে তার ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাবে। বারোটি চন্দ্র তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। বৃহস্পতির আকাশের নীচে হয়তো জীবনও থাকতে পারে। 'পাইওনিয়ার-১০' ঘণ্টায় ৫০ হাজার মাইল গতিতে সৌরজগতের সীমানার দিকে ছুটে চলেছে। একুশ মাস পরে একদা সে বৃহস্পতির আকাশে হাজির হবে।

৪ মারচ—গতকাল পাক সেনাবাহিনীতে যে বড় রকমের রদবদল হল, তাতে যুদ্ধবাজ বলে পরিচিত জঙ্গীনায়করাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায় এলেন। ফলে পাক-রাজনীতিতে পট-পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। নয়াদিল্লির ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে উপ-মহাদেশের শান্তি বিপদাপন্ন। বিপদাশঙ্কা ভারতেরও।

৫ মারচ—কুখ্যাত জল্লাদ টিক্কা খানকে পাক স্থলবাহিনীর প্রধান পদ দেওয়ায় মসকোর ওয়াকিবহাল মহল অশুভ ইঙ্গিতের সূচনা দেখতে পাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর সঙ্গীদেরও তাই মত। তাঁরা আজ তাসখন্দ থেকে ঢাকা ফিরে যাচ্ছেন।

"রেক্স বেকিং পাউডার দিয়ে
তৈরী কেক খুব সুস্বাদু—
চায়ের সঙ্গে খেতে ভাল"
কর্ন প্রোডাক্টস্-এর
নির্বাচিত
পুরস্কৃত
পাকপ্রণালী
অরেঞ্জ
টী কেক
রেক্স
বেকিং পাউডার
দিয়ে তৈরি

সূচীপত্র

গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ?
গ্ল্যাক্সোজ-ডি® মুহূর্তে ক্লান্তি দূর করবে।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি যেমন ভাবেই খান না কেন, অতি উপাদেয়।

গরম যতই বাড়বে, ক্লান্তিও বাড়বে। প্রায়ই মনে হবে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন। কিছুতেই মন লাগবে না। এক গেলাস জলে দু'চামচ গ্ল্যাক্সোজ-ডি মিশিয়ে খেয়ে নিন্। দেখবেন, গ্ল্যাক্সোজ-ডি সঙ্গে সঙ্গে শক্তি ফিরিয়ে আনবে। মুছে দেবে ক্লান্তি। কাজে উৎসাহ পাবেন। কি ভালোই যে লাগবে!

উপহার!

১·২৫ টাকার

৩টি প্লাস্টিকের গেলাস

১০০ গ্রামের প্রতি প্যাকেট

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®-র সঙ্গে

শিগ্‌গির কিনুন! গেলাসের স্টক্ ফুরিয়ে গেলে কিন্তু পাবেন না।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®
যোগায় দ্রুত শক্তি

dCP/GL/27 ben

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : মুস্তাফা মানোয়ার

নিয়তিঃ
কেন বাধ্যতে !
মানুষের নিয়তির কথা কে বলতে পারে ! যে যাবার সে
চলে যায়—রেখে যায় অসহায় বিধবা স্ত্রী,
আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে…
এরকম অভিশাপ কার জীবনে কখন যে আসে, কে বলতে
পারে ? এর থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র জীবন বীমা।
সময় থাকতে জীবন বীমা করালে আর ভাবনা থাকে না।
আপনার জীবদ্দশায় জীবন বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে—
পুরো টাকা আপনার হাতে আসবে। আর, যদি আপনার
কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা
আপনার পরিবার পাবেন। ফলে, আপনার অবর্তমানে
আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের আর্থিক
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবেন।
বিস্তারিত বিবরণের জন্যে নিকটতম বীমা
এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
জীবন বীমা করান
জীবন সুখী করুন।
লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

উপন্যাস

নুনের পুতুল সাগরে ১০·০০

কবিতা

ছেলে গেছে বনে ৩·০০

উপন্যাস

সাক্ষী বালুচর ৪·০০

কবিতা

উলঙ্গ রাজা ৩·০০

উপন্যাস

দিনরাতের খেলা ১০·০০

স্মৃতিচিত্র

উপল-ব্যথিত গতি ৫·০০

উপন্যাস

নিশীথ ফেরী ৫·০০

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আবহবিজ্ঞান

মেঘ বৃষ্টি রোদ ৩·০০

উপন্যাস

জাহান্নম হইতে বিদায় ৫·০০

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর

গবেষণা-গ্রন্থ

বাংলার লৌকিক দেবতা ৬·০০

উপন্যাস

সন্ধিক্ষণ ৪·০০

সুভাষচন্দ্র বসুর

রাজনৈতিক সাহিত্য

তরুণের স্বপন ৬·০০

ভ্রমণ-উপন্যাস

শিবঠাকুরের আপন দেশে ৪·০০

ক্রীড়া সাহিত্য

ফুটবল খেলতে হলে ১০·০০

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের

রম্যরচনা

ইন্দ্রজিতের আসর ৩·০০

মুকুল দত্তের

ক্রীড়া সাহিত্য

ফুটবলের আইনকানুন ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯ ॥

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২০
শনিবার ৪ চৈত্র ১৩৭৮
Saturday 18 March 1972

আনন্দবাজারের সুবর্ণ জয়ন্তী

আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চাশ বর্ষের পূর্ণ হয়ে সুবর্ণ জয়ন্তীর যে আনন্দ বহন করে এনেছে, তার মধ্যে শুধু পত্রিকার প্রাতিষ্ঠানিক আশার পরিতৃপ্তি নয়, জাতির আশার পরিতৃপ্তিও সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বাস্তব সত্য এই যে, পত্রিকার প্রতিষ্ঠানের আশা জাতির জীবনের আশার সঙ্গে একাত্মক হয়ে ঐতিহাসিক কর্তব্যের ব্রত পালন করেছে। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে বহু সমস্যা ও বহু সঙ্কট এসে পত্রিকার নিষ্ঠা ও শক্তির পরীক্ষা নিয়েছে। পত্রিকা সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের কালে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও নির্ভয় অভ্যুত্থানের প্রেরণা বহন করে জাতিকে প্রবুদ্ধ করবার কর্তব্যে পত্রিকার প্রতিজ্ঞায় ও নিষ্ঠায় সামান্যতম রিক্ততাও দেখা দেয়নি। সেদিনের রাজরোষ পত্রিকার কর্তব্যের উৎসাহ ম্রিয়মান করে দেবার জন্য নিষেধ ও শাস্তির অনেক জ্বালা নিক্ষেপ করেছিল; কিন্তু পত্রিকা যেন অগ্নিশুদ্ধ হয়ে তার সঙ্কল্পের ও আদর্শের পরিচর্যায় আরও বড় শক্তি অর্জন করেছে। একটুও অতিশয়োক্তি হবে না, যদি বলা হয় যে, এক্ষেত্রে এবং এই কর্তব্যে সারা ভারতের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকাই মহত্তম কৃতিত্বে গৌরবান্বিত হবার সৌভাগ্য পেয়েছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতীয় জীবনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনাতে নূতন আগ্রহের প্রতিষ্ঠায় এবং নূতন অন্বেষণা সৃষ্টির প্রয়াসে যে-সব লোকবরেণ্য জ্ঞানী গুণী ও জননেতার প্রতিভা কর্মোন্মুখ হয়ে নব ভারতের বনিয়াদ স্থাপন করেছে, আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁদের সবারই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভি[illegible] করেছে।

লক্ষ্য করতে হয়, আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হবার ঘটনা নিতান্ত অস্তিত্ব রক্ষা করে দিনযাপনের একটি মন্দাক্রান্ত অধ্যায় নয়, উন্নতির অধ্যায়। যেমন প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনে ও পরিচালনায় তেমনই জনপ্রিয়তায় বৃহৎ হতে বৃহত্তর উন্নতির পর্যায়ে উপনীত হয়ে পত্রিকা আজ সারা দেশের মধ্যে বৃহত্তম প্রচারসংখ্যায় চিহ্নিত জয়মুকুট লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, পঞ্চাশটি বৎসরের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ হয়েও পত্রিকার জীবন তার শক্তি ও উৎসাহের চিরনবীনতা অটুট রেখেছে। যোগ্যতায় এবং গুণে, কর্মে ও প্রতিভায় পত্রিকা বস্তুত চিরনূতন-পথিকের আশাময় প্রাণশক্তি নিয়ে নূতন দিগন্তের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি'—কবির উক্তির সত্যতা আনন্দবাজার পত্রিকার জীবনে ও কৃতিত্বে নিদর্শনীয় রূপ লাভ করেছে।

দেশের মানুষ এই পত্রিকাকে শুধু রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার বান্ধব বলে মনে করেনি; সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রহের, বস্তুত উন্নতিশীল পরিবর্তনের সার্বিক চেতনার বান্ধব বলে মনে করেছে। আধুনিকতম চিন্তাকে, যুগের প্রয়োজনের অজস্র দাবীকে ভাষায়িত করবার আগ্রহে পত্রিকা বাংলা গদ্যকে ভাবপ্রকাশের নূতন শক্তি দিয়ে রূপায়িত করেছে।

পত্রিকা যেমন জনমতের মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করে এসেছে, তেমনই জনসাধারণও পত্রিকার অভিমতের মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করে এসেছে। এই সত্যটিও পত্রিকার পক্ষে একটি সুবিনীত শ্লাঘার বিষয়। সংবাদ পরিবেশনে পত্রিকার অধ্যবসায় কোনদিনও গুরুত্ব বিচার করবার ক্ষেত্রটিকে সঙ্কীর্ণ করেনি। এক্ষেত্রে পত্রিকা বস্তুত সার্বজনীন উদারতার নীতি অনুসরণ করেছে। সমালোচনায় পত্রিকা তার অভ্রান্ত নির্ভয় এবং আত্মপ্রত্যয়ের ঐতিহ্য অটুট রেখে বিচারের বাণী ধ্বনিত করেছে। বাহিরের কোন মত ও মতবাদ, বিশেষ কোন দলীয় সংহতির ভ্রূকুটি, কিংবা সরকারী ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন প্রভাব পত্রিকার সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের স্থিরতাকে বিচলিত করতে পারেনি। আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চাশ বৎসর বস্তুত জাতির প্রতি অকুণ্ঠ হিতৈষণার পঞ্চাশটি বৎসর। এবং জয়ন্তীর আনন্দ যেন পত্রিকার সাংবাদিক কৃতিত্বের ও অধ্যবসায়ের বিপুল এক আনন্দবহ সফলতার হর্ষ।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
শীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
শুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টাঃ ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৬.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৮.২০

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৭৫

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ [illegible]
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৭০

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১৪.৭৬

[illegible]
বার্ষিক — টাঃ ১৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ [illegible]

দুর্গম পথের যাত্রী!

যে অনুষ্ঠান হতে পারত

প্রেস ক্লাবের বার্ষিক ভোজসভায় পশ্চিমবাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা কমরেড জ্যোতি বসুকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট প্রধান অতিথির জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত আসনে বসিয়ে দিলেন। প্রেস ক্লাবের সদস্যগণ করতালি দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন।

প্রেসিডেন্ট মহোদয় যথোচিত আড়ম্বর সহকারে প্রধান অতিথির সঙ্গে অষ্টাদশ বারের ন্যায় আবারও সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, শ্রী বসু, আমাদের প্রেস ক্লাবের এই বার্ষিক ভোজসভায় আপনি আতিথ্য গ্রহণ করতে স্বীকৃত হওয়ায় আমরা অন্যান্যবারের মত এবারও, এটা নিয়ে প্রেস ক্লাব উনিশবার আপনার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হল, আমরা কৃতার্থ বোধ করছি। এবং এই প্রসঙ্গে আমার পূর্ব পূর্ব বিদায়ী প্রেসিডেন্টগণ যা বলে গিয়েছেন, আমি তারই পুনরাবৃত্তি করছি—"আমরা যতক্ষণ নিজ নিজ কাগজে কাজ করি, ততক্ষণ আমরা নিজ নিজ মালিকের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করি, আর তার জন্য আপনাকেও আপনার শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য আমাদের প্রতি মাঠে ময়দানে কত না কঠোর কথা শোনাতে হয়। এবং আমরা এও জানি, এর জন্য আপনি কত না অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু প্রেস ক্লাবের এই ভোজসভায় আমরা যখন মিলিত হই, তখন আপনিও মানুষ আমরাও মানুষ, তাই আমরা সহজভাবে একে অপরকে জানতে পারি। মহাত্মন্, আপনার এবং আপনার দলের বার বার এইরূপ নজির জাগানো সাফল্যের কারণ কী?

স্যুপ পরিবেশন করা হল।

শ্রী বসু : প্রেসিডেন্ট মহোদয়, আপনাকে ধন্যবাদ। এটা যেহেতু ময়দানের সভা নয়, তাই স্বভাবতই এখানে আপনাদের কোনও গালিগালাজ করব না। আপনাদেরকে মানুষ হিসাবেই ট্রিট করব।

ফটোগ্রাফার ফ্ল্যাশ মারল।

শ্রী বসু : এ ফটো কী কাগজে বেরুবে, না, আপনারা বাড়ির অ্যালবামে বাঁধিয়ে রাখবেন।

প্রেসিডেন্ট : আমরা আজ এখানে মালিকের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার কাজে তো ঠিক আসিনি, আজ এ মানুষ হিসেবেই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তবে আমরা—

শ্রী বসু : তবে আর খামাখা বাক্য নষ্ট করতে হবে না। মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি জানি, আপনারা মালিকের কর্মচারী হিসাবে আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি।

সেই কারণেই খোলা মনে আমি আমাদের সাফল্যের কারণ এই প্রথম আপনাদের কাছে ব্যক্ত করছি। আশা করি গোটা ব্যাপারটাই অফ্ দি রেকর্ড থাকবে।

প্রেসিডেন্ট : যদিও প্রোফেশনালি আমাদিগকে সর্বদাই মালিকের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করে চলতে হয়, তবু আমরা যখনই 'আপনিও মানুষ আমরাও মানুষ' এই লেভেলে মেশামেশি করার সুযোগ পাই তখনই আমরা যে দুর্দান্তভাবে নিরপেক্ষতা রক্ষা করে চলি তা আপনি জানেন। কেন না আমাদের নিরপেক্ষতা সর্বদাই আপনাকে কিছু না কিছু লাভ দিয়েছে। তাই সেই নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে বলতে পারি, আমরা আপনার গুহ্য তত্ত্ব ফাঁস করে দেব না।

শ্রী বসু : গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর অবিচল আস্থাই আমাদের সাফল্যের মূল কারণ। আপনারা সকলেই জানেন, নির্বাচন একটা গণতন্ত্রসম্মত পন্থা। তাই নির্বাচনে আমাদের জিততেই হয়। এবং একমাত্র আমাদের দলই ফ্রি অ্যানড ফেয়ার ইলেকশন চায় এবং নির্বাচন যাতে সর্বদাই ফ্রি অ্যানড ফেয়ার হয় তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এর জন্য বিশেষ ধরনের নানারকম মেশিনারি তৈরি করেছি।

প্রশ্ন : ফ্রি অ্যানড ফেয়ার ইলেকশন বলতে আপনি কী বোঝেন?

ততক্ষণে তৃতীয় পদ ভাজা প্রোটিনযুক্ত খোরাক সামনে এসে পড়েছে।

শ্রী বসু : এক কথায় বলতে গেলে ভোটদাতারা যাতে নিজের জ্ঞান বুদ্ধিমত ভোট দিতে পারেন, তার অবাধ ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন : এই বিষয়ে আপনার দল কীভাবে ভোটদাতাদের সাহায্য করেছে?

শ্রী বসু : আমাদের দলীয় ক্যাডাররা ভোটদাতাদের মনে সাহস ও উৎসাহ সঞ্চারের জন্য অক্লান্তভাবে প্রচারকার্য চালিয়েছে। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নানা কৌশলে জেনে নিয়েছে, কারা আমাদের দলে আর কারা আমাদের বিরুদ্ধে। তারপর গণতন্ত্রের উদারতম আদর্শ স্থাপনের জন্য বিরুদ্ধপন্থী ভোটদাতাদের কাছে গিয়ে খুব বিনয় করে বলেছে আমাদের বিরুদ্ধে আপনারা যত খুশি ভোট দিন, আপনাদের বিপদ আপদ কিছু হবে না, আমরা গ্যারান্টি।

প্রশ্ন : এতে আপনাদের ক্ষতি হয়নি?

শ্রী বসু : ক্ষতি! বরং বলুন, ঐটেই সাফল্যের চাবিকাঠি। কেননা আমাদের ক্যাডারদের এই প্রকার ভদ্র এবং গণতান্ত্রিক আচার ব্যবহারে আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় ভোটদাতারা এতই চক্ষুলজ্জায় পড়ে যেতেন যে ভোটকেন্দ্রে পাছে তাঁদের সঙ্গে আমাদের গণতান্ত্রিক ক্যাডারদের চোখাচোখি হয়ে যায়, এই কারণে তাঁরা ভোট দিতেই যেতেন না।

এবার আইসক্রিম এসে গেল।

শ্রী বসু : সরকারি যন্ত্র যাতে সব সময় নিরপেক্ষভাবে তার কাজ করে যায়, কো-অরডিনেশন কমিটির মাধ্যমে আমরা সর্বদাই তার উপর নজর রেখেছি। এতেও খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। কারণ প্রগতি ভাবাপন্ন অফিসাররা বিভ্রান্ত ভোটারদের সর্বদাই নিরপেক্ষভাবে সঠিক পথটি ধরিয়ে দিয়েছেন।

কফি এসে গেল।

প্রেসিডেন্ট : ধন্যবাদ শ্রী বসু। আশা করি গণতন্ত্রের পথে আপনার এবং আপনার দলের জয়যাত্রা এই রকম অব্যাহত থাকবে।

শ্রী বসু : ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, এই জগতে কোনও পদ্ধতিই চিরকাল সাফল্য আনতে পারে না। আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটি পেটেন্ট করে রাখিনি। আর জানেন তো, আমাদের মত এমন বিশুদ্ধ নীতিবাদী পলিটিক্স করনেওয়ালা আর তো দুটি নেই, তাই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্লজ্জের মত এই-সব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হুবহু আত্মসাৎ করতে লেগেছে। সেই কারণেই উপস্থিত একটু চিন্তায় আছি। তবে এটা জানবেন, আমরা যদি ২৮০টা আসন পাই, তা হলেই বুঝতে হবে নির্বাচন ষোল আনা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হয়েছে। যে-অনুপাতে আমাদের আসন কমবে, নির্বাচন ততটাই আনফেয়ার হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। প্রতিবাদ আমরা জানিয়েই রেখেছি।

বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী

বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী চলে এসেছে। ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢাকা পৌঁছেছিল। বাংলাদেশে ঢুকেছিল তারও আগে। ৩ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খাঁ তার শেষ যুদ্ধ শুরু করে। সেই দিন রাত্রেই চতুর্দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিসেনাদের সঙ্গে একযোগে বাংলাদেশে ঢুকেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দখলদার পাকবাহিনী "সম্পূর্ণ পরাজয়" স্বীকার করে নেয় ১৬ ডিসেম্বর। সেইদিনই ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী ঢাকা পৌঁছেছিল।

১৬ ডিসেম্বর থেকেই বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারপর থেকেই বাংলাদেশের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার। তারপর শেখ মুজিবুর রহমানও ফিরে এসেছেন। বাংলাদেশে স্বাধীন সরকার এখন পুরোপুরিভাবে চালু। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন ছাড়া পৃথিবীর সব বড় রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এশিয়ার নানা মতের নানা জাতিও ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সরকারকে মেনে নিয়েছে।

এখন বাংলাদেশের উপর বাইরের আক্রমণের কোনও সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত, আর একদিকে সাগর। সামান্য কয়েক মাইল সীমান্ত রয়েছে বর্মার সঙ্গে। স্থলপথে বাংলাদেশের আর যা সীমান্ত সবই ভারতের সঙ্গে। ভারতকে না খতম করে বা ভারতীয় এলাকা দখল না করে স্থলপথে বাংলাদেশ আক্রমণ বাইরের কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বাইরের প্রত্যক্ষ আক্রমণের আশংকা থেকে মুক্ত। পাকিস্তান আর যাই করুক জল বা বিমান পথে বাংলাদেশ আক্রমণের সাহস

পাবে না। কারণ, পাক নেতারা যতই উগ্র হন, নিজেদের জীবনের ভয় তাঁদের ষোল আনা আছে। এই ধরনের কোনও আড়ম্বরকার করতে গেলে তার পরিণতি কী হতে পারে তারা তা জানে। তাই ওপথে যাওয়ার সাহস তাদের হবে না।

বাংলাদেশে আপাতত সশস্ত্র বাহিনী যা প্রয়োজন তা আভ্যন্তরীণ শত্রুদের জন্য। বাংলাদেশের শত্রু এখন দু দল। একদল যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চায়। আর একদল যারা শুধু লুঠতরাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে বিপদে ফেলছে। এই দুই দলই সশস্ত্র। এই দুই দলকে মোকাবিলা করার জন্যই তাই বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনী প্রয়োজন।

এই কাজ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দিয়ে হতে পারে না। বাংলাদেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীরই।

*

বাংলাদেশের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শোচনীয় বলে যারা চিৎকার করেন আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। যে পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের জন্ম তাতে অবস্থা আরও অনেক খারাপ হলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। হয়নি তার অনেক কারণ। প্রধান কারণ, বাংলাদেশের মানুষ। এই উপ-দেশের মানুষই সাধারণত শান্তিপ্রিয় এবং নির্বিবাদী। তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করে না। না হলে বাংলাদেশের সর্বত্র ৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে যত অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে ছিল এবং প্রশাসনের অবস্থা যে অবস্থায় পৌঁছেছিল তাতে অনেক কিছু হতে পারত। যদি বাংলাদেশের মানুষের একটা সামান্য অংশও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নামত তাহলে অবস্থা অন্যরকম হত।

কিন্তু বাংলাদেশের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আদর্শস্থানীয় তাও বলা যায় না। এখন প্রধানত সক্রিয় অরাজনৈতিক গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা। রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীরাও এই সুযোগে কিছুটা কিছুটা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যদি বাংলাদেশ সরকার শুরুতেই এদের শায়েস্তা করতে না পারেন তাহলে ক্রমেই এই দুই শ্রেণীর লোকের সাহস বেড়ে যাবে। এবং তখন এদের ক্রিয়াকলাপও আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এরা যে বাংলাদেশ সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারবে তা নয়। কিন্তু এরা বাংলাদেশের জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারবে। এবং তার ফলে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আস্থা কমে যাবে। যে কোনও সরকারের পক্ষে এটা খারাপ জিনিস।

তাছাড়া, প্রথম দিকে এই শ্রেণীর লোককে দমন করা সহজ। ব্যাপকতা বাড়লে তখন প্রতিরোধ করতে সরকারকে ব্যাপক দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। তাতে অনেক সময় সাধারণ নির্দোষ মানুষের গায়েতে গিয়ে হাত পড়ে। যেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

সেইজন্য তথাকথিত রাজনৈতিক বা স্রেফ অরাজনৈতিক গুণ্ডাশ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে শুরুতেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ভাল।

আর একটা জিনিস, সর্বত্রই দেখা গিয়েছে এরা শুধু মৌখিক হুঙ্কারে ভয় পায় না। ভয় পায় কাজের কাজকে। গুণ্ডাশ্রেণীর মানুষ সহজে আবেদন নিবেদনের কাছে নতিস্বীকার করে না। যখন তারা দেখে ও বোঝে যে, গুণ্ডামি করতে গেলে বিপদে পড়তে হবে তখনই গুণ্ডামির পথ ত্যাগ করে।

*

ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে তার ভূমিকা যেভাবে পালন করেছে তার তুলনা

নেই। শুরু থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এক গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে।

প্রথম জিনিস, লড়াইয়ে তাদের বিরাট সাফল্য। এই লড়াইয়ে তারা যত দ্রুত শত্রু-পক্ষকে পর্যুদস্ত করেছে তা বহু বিচারে অসাধারণ। প্রচুর গোলাগুলি সহ তিরানব্বই হাজার সশস্ত্র লোককে বিনাশর্তে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করানো সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে নদীনালা বেষ্টিত পূর্ববাংলার মত দেশে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস মুক্তি-সেনাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতা এবং বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর ব্যবহার। ত্রুটিবিচ্যুতি কোথাও হয়নি এটা দাবি করা মূর্খামি। প্রায় ন' ডিভিশন (অর্থাৎ প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার) সৈন্য যে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে সেখানে ছোট বিচ্যুতি কিছু হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

এটা তো সবাই জানেন যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যে সব ভারতীয় সেনা অংশ নিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই বঙ্গভাষাভাষী নন। বরং, তাঁরা যাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন তারাই অনেকে সমভাষাভাষী। তবু ভারতীয় বাহিনীর জওয়ানরা পর্যন্ত বঙ্গভাষাভাষী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যে একাত্মতা গড়ে তুলেছিলেন তা অভাবনীয়। একটি প্রফেশনাল আর্মির সঙ্গে মোটামুটিভাবে একটা নন-প্রফেশনাল অন্যভাষাভাষী বাহিনীর এইভাবে একাত্ম হওয়ার ঘটনা পৃথিবীতে বিরল।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহারেরও তুলনা নেই। আমি ৩ ডিসেম্বর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছি। ১৬ তারিখ সড়কপথে ঢাকা পৌঁছেছি। যেখানে গেছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সর্বতোভাবে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। দু হাত তুলে সর্বত্র তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর ব্যবহারও চোখে পড়েছে। কোথাও তাদের কোনও খারাপ ব্যবহার আমার চোখে পড়েনি। কোথাও সাধারণ মানুষের উপর ভারতীয় বাহিনীকে জোরজুলুম করতে দেখিনি। বরং, ভাল ব্যবহারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছে।

একটিমাত্র উদাহরণ দেব। আমরা তখন ঢাকা থেকে ফিরছিলাম। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ। ময়মনসিংহ হয়ে। ময়মনসিংহের কাছে ফেরি পার হতে হয়। অনেকগুলি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল লাইন দিয়ে। প্রথম দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিছু ট্রাক। পেছনে বাংলাদেশের কয়েকটা জিপ এবং আমাদের গাড়ি। একটা জিপে এক ভদ্রলোক সপরিবারে ছিলেন বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। ভারতীয় জওয়ানদের চোখে পড়ল। তাদের একজন এগিয়ে এসে জিপের চালককে বললেন : আপনি আগে চলে যান, আপনার সঙ্গে বাচ্চা আছে। সেই জওয়ানই জিপটিকে আগে ফেরি-বোটে তুলে দিল।

আমরা ফেরিবোটে উঠলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। বোটের অন্যান্য লোকদের জিজ্ঞেস করলাম ভারতীয় জওয়ানদের ব্যবহারের কথা। সবাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। বললেন : জানেন, এর আগে খানসেনারা বোটে উঠলে আমরা সবাই ভয়ে পালাতাম। বোটের ধারে কাছে যেতাম না, এদের সঙ্গে আমরা গল্প করি, একসঙ্গে বোটে উঠি, হাসিতামাশা করি। এরা একেবারে অন্যরকমের সৈন্য।

যুদ্ধ বিদেশে যে কোনও প্রফেশনাল আর্মির এইরকম ব্যবহার অভাবনীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্ব ইউরোপে রুশ সেনাবাহিনীর ব্যবহারও বহু ক্ষেত্রেই প্রশংসাযোগ্য হয়নি। ভারতীয় সেনারা যে বিশেষভাবে শিক্ষিত তা নয়। তারা সাধারণ জওয়ান। গ্রামের সাধারণ মানুষদের নিয়ে গঠিত বাহিনী। এই বাহিনীর লোক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে সে সম্পর্কে অনেকেরই আশংকা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে দেখেছি এরা কত প্রশংসনীয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

যুদ্ধের পর বাংলাদেশের নানা কাজেও, যেমন ত্রাণ বিতরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দেওয়া, রাস্তা-ঘাট তৈরী ইত্যাদি ব্যাপারেও ভারতীয় সেনা-বাহিনী যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নেই।

বাংলাদেশের সমস্যা বিরাট। অভাব অনটনও বিরাট। রাস্তাঘাটও বহু বিধ্বস্ত। সব কাজ যে ভারতীয় বাহিনী করে উঠতে পেরেছে তা নয়। তবে যতটা সম্ভব করেছে। এবং যুদ্ধের ধ্বংসলীলার পরই যে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে মোটামুটি একটা যোগাযোগব্যবস্থা চালু হয়েছে সেটাও প্রধানত ভারতীয় বাহিনীর জন্য।

বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর ভূমিকা ভারতীয়দের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

১২-৩-৭২

নবারুণ গুপ্ত

আশায় আশায়

দেবরাজ

পশ্চিম জার্মানিতে শেষ নির্বাচন হয়েছে ১৯৬৯ সনের সেপ্টেম্বরে। নিয়ম মাফিক সে দেশে আবার নির্বাচন হবার কথা আসছে বছরের সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ ঠিক চার বছর পরে। কিন্তু গতিক যা দেখা যাচ্ছে তাতে সে নির্বাচন এক বছর আগেই না হয়। পশ্চিম জার্মান লোকসভায় যদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয় তাহলে সংসদ ভেঙে দিতে হবে। করতে হবে নতুন করে নির্বাচন। তেমন সম্ভাবনা হালে দেখা দিয়েছে দুটো আন্তর্জাতিক চুক্তি উপলক্ষ্য করে। তার একটা পোল্যাণ্ডের সঙ্গে, আর একটা রুশিয়ার। প্রথমটাতে যুদ্ধের আগের অখণ্ড জার্মানির যে সব এলাকা যুদ্ধের পর পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলোর ওপর দাবী ছেড়ে দিয়ে ওডের নাইসে নদী বরাবর দু দেশের সীমানাকে পাকা বলে মেনে নিয়েছে পশ্চিম জার্মানি। এতকাল এ নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যে মন কষাকষি ছিল তা দূর হয়েছে। দ্বিতীয়টাতে নতুন করে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে রুশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম জার্মানি, তাতে সারা ইউরোপে উত্তেজনা কমে গিয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

দুটো চুক্তিই সই করেছেন পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী উইলি ব্রাণ্ডট। কিন্তু তিনি সই করেছেন বলেই দলিল দুটো পাকা হয়ে যায়নি। তার জন্যে চাই সংসদের অনুমোদন। অধিকাংশ সদস্য যদি চুক্তি দুটোর পক্ষে ভোট না দেন তা হলে তারা খারিজ হয়ে যাবে, তাদের শর্ত অনুসারে কাজ করার ক্ষমতা ব্রাণ্ডট সরকারের থাকবে না। তাঁর সইকরা চুক্তি সংসদে নামঞ্জুর হলেই তাঁকে ইস্তফা দিতে হবে আইনের এমন বাধা-বাধকতা অবশ্য নেই। কিন্তু সত্যিই যদি তেমন ঘটে, তাঁর দেওয়া কথা তিনি যদি রাখতে না পারেন তা হলে কোন লজ্জায় আর ব্রাণ্ডট মুখ দেখাবেন? মান বাঁচাবার জন্যে তখন তাঁকে চ্যান্সেলরের গদি ছাড়তেই হবে। আর স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াতে তিনি যদি না চান তা হলে তাঁর বিরোধীরা কি আর ছেড়ে কথা কইবে? তারা তখন অনাস্থা প্রস্তাব সরাসরি এনে তাঁকে বিদেয় নিতে বাধ্য করবে। ব্রাণ্ডট অতটা জল ঘোলা করবেন বলে মনে হয় না। তিনি যদি দেখেন সংসদ তাঁর সইয়ের মর্যাদা রাখতে নারাজ তা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দেবেন বলেই লোকে আঁচ করছে।

অবশ্য ব্রাণ্ডট গেলে একটা বিকল্প সরকার তৈরি করে কাজ চালাবার চেষ্টা করবেন সরকার বিরোধীরা। সে কাজটা একেবারে যে অসম্ভব তাও নয়। উনসত্তরের নির্বাচনে পশ্চিম জার্মান লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনও দল পায়নি, ব্রাণ্ডটের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলও নয়। এমন কী পয়লা নম্বর দলও তারা হতে পারেনি। সে সৌভাগ্য হয়েছিল খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটদের। পশ্চিম জার্মানির জন্ম থেকে তারাই সে দেশ শাসন করে এসেছে শেষ নির্বাচন পর্যন্ত। সে নির্বাচনে তারা পয়লা নম্বর দল হয়েও নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পায়নি। ওদিকে নির্বাচনের আগে পর্যন্ত বিরোধী দলের নেতা উইলি ব্রাণ্ডটের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সদস্য ২০২ থেকে বেড়ে হল ২২৪। খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটদের চাইতে ১৮টা কম। এরা ছাড়া আইনসভায় আছে আরও একটা দল—ফ্রী ডেমোক্র্যাট। তারা দখল করেছিল ৩০টা আসন। দেখা গেল মিশ্র সরকার গড়া ছাড়া গতি নেই, আর যাদের দিকে যাবে ফ্রী ডেমোক্র্যাটরা কোয়ালিশন সরকার গড়তে তারাই পারবে। বড় দুটো দল টানাটানি করতে লাগলো ছোট দলটাকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত সে দল ভিড়লো গিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে।

উইলি ব্রাণ্ডটের অনেক দিনের আশা পূরলো, তিনি হলেন পশ্চিম জার্মানির প্রথম সমাজতন্ত্রী চ্যান্সেলার। লোকসভায় তাঁর মিশ্র সরকারের গরিষ্ঠতা হলো কুল্লে বারো। রাজ্যসভায় তাও হলো না। সেখানে খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটরা হল দলে ভারী। তাদের গরিষ্ঠতা কুড়ি কী একুশ। তবে লোকসভায় গরিষ্ঠতা থাকলেই মন্ত্রিসভা টিঁকে যায়। সেই জন্যে এতকাল ব্রাণ্ডটকে গদি খোয়াতে হয়নি। গরিষ্ঠতা না পেলেও তিনি ইচ্ছেমত দেশ শাসন করতে পারছেন। পারছেন সর-কারের নিয়ম কানুনে চালাতে, ভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে। তিনি ক্ষমতা হাতে পেয়েই যে কাজে হাত দিয়েছেন তা হচ্ছে পূব পশ্চিমে আকচা আকচি বন্ধ করে তাদের সম্পর্কটা সহজ আর সরল করা। সেই জন্যেই তিনি পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সীমান্ত চুক্তি করেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণের। শুধু তাই নয়, পূবে জার্মানির অস্তিত্ব উড়িয়ে না দিয়ে তার সঙ্গেও আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন একটা আপসের জন্যে। এর ফলে বার্লিন নিয়েও চার প্রধানের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তা নিয়ে একটা চুক্তিও হয়েছে যদিও সেটি এখনও কাঁচা।

ব্রাণ্ডটের পূবালি নীতি—যাকে বলা হয় অস্টপলিটিক—তাকে কিন্তু পশ্চিম জার্মানির সবাই সুনজরে দেখছে না। খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটরা তো তার ঘোর বিরোধী। তাতে কিছু এসে যেত না যদি ব্রাণ্ডটের নিজের দলে ও নিয়ে ভাঙন না ধরতো। সে ভাঙনের হাওয়া মিশ্র সর-কারের অন্য অংশীদার ফ্রী ডেমোক্র্যাটদের গায়েও লেগেছে। দল ছেড়েছেন ইতিমধ্যেই দু জন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, আর জন দুই ফ্রী ডেমোক্র্যাট। সরকারের গরিষ্ঠতা কমতে কমতে চারে এসে ঠেকেছে। পশ্চিম জার্মানির লোকসভার মোট সদস্য হচ্ছে ৪৯৬। সরকারের পক্ষে এখন আছে ২৫০। এর পর যদি আর দু একজন দল ছাড়েন তা হলে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না ব্রাণ্ডটের। কেউ কেউ বলছেন দলে যে ভাঙন ধরেছে তা ঠেকানো চ্যান্সেলারের পক্ষে সম্ভব হবে না। বিশেষ করে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তির আর পূবে জার্মানির সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টার অনেকেই বিরোধী পশ্চিম জার্মানিতে। তাই উসখুস করছেন দু দলের দু চারজন সদস্য।

খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটদের নেতা এখন বিরোধীদলের নেতা। তিনি উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করছেন রাজনীতির গতি। মাঝে মাঝে পশ্চিম জার্মানির জনমত জানার চেষ্টা হচ্ছে লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সে চেষ্টার শেষ যে ফলাফল বেরিয়েছে ১০ মার্চ তাতে দেখা যাচ্ছে ৪৯ শতক লোক চ্যান্সেলর হিসেবে চায় ব্রাণ্ডটকে আর মোটে ৩১ শতক লোক বিরোধী নেতা ডঃ রেনার বারজেলকে। এতে কিন্তু ডঃ বারজেলের মুষড়ে পড়ার কারণ নেই। কেন না ৫০ শতক লোকের মতে এখনই নির্বাচন হলে জিতবে খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটরা, ৪৫ শতকের মতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা। নির্বাচনে জিতবে একদল আর প্রধানমন্ত্রী হবেন আর একদল থেকে এতো আর হয় না। এখনই নতুন নির্বাচন হলে বারজাল মনে করছেন তাঁরই পোয়াবারো। আর তাই বা তিনি হতে দেবেন কেন? রাজ্যসভায় সরকারকে তাঁরা হারিয়ে-ছেন পোল্যাণ্ড-রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তি নামঞ্জুর করে। লোকসভায়ও তাঁরা যদি তা করতে পারেন তা হলে তিনিই তো হবেন নতুন চ্যান্সেলর—হোক না তাঁর গরিষ্ঠতা নামমাত্র। আশায় আশায় একটা ছায়া মন্ত্রিসভাও তিনি গড়ে ফেলেছেন এর মধ্যেই।

বিনীত বিদ্রোহ

রঞ্জন

বছর বিশেক আগে কোথায় কী একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রধানত অর্থার্জনের মহতী অনুপ্রেরণায় এমন কত সহস্র লেখা লিখছি তার হিসাব কে রাখবে বা কেন রাখবে? কবি পারে তার থাকে নিজ মেমোরিয়ালের; সাংবাদিকতার বাক্যস্রোতের সংগত সমাধি সে আপনি রচে। একমাত্র অন্তরায় অতিকৃত আত্মম্ভরিতা। যাই হোক, সে অন্য প্রসঙ্গ। যতদূর মনে আছে, আমার সহজবিস্মর্তব্য নিবন্ধের মূল সুর ছিল— না জাগিলে এই ভারতললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না। কোথাও থেকে কুড়ানো একটা হিসাব উদ্ধার করে নিবেদন করতে চেয়েছিলাম যে ভারতীয় নারী হচ্ছে আমাদের দেশের অতিপরিচিত খোলা উনুনের মতো। প্রত্যহ অপচিত এর নবাংশ উত্তাপ। নিত্যবর্ধমান জাতীয় সমৃদ্ধি নিয়ে অবিরাম কলরব তাই আমার কানে [illegible] বর্ষণ করেনি। নারীশক্তির এই অনাকাঙ্ক্ষিত অপচয় আজও অবাধে আছে পাশে, বরং জাত অপৌরুষেয় আস্পর্ধায়।

সামান্য প্রবন্ধের নিঃশব্দ প্রকাশের পর প্রভাতেই জনৈকা বর্ষীয়সী মহিলা মৃদু কণ্ঠে আমাকে টেলিফোন করে বললেন, আপনার লেখার কয়েকটা কথা আমার বড়ো ভালো লেগেছে। একদিন চা খেতে এলে খুশী হব। আমি যে যুগের কথা বলতে পারি তা আজ অনেকেরই অজানা। বোধ হয় আপনারও। সেই চা খাওয়া হয়নি। বিগত যুগ সম্বন্ধে আলাপও রয়ে গেল অশ্রুত। যিনি টেলিফোন করেছিলেন তিনি মৃণালিনী সেন। প্রায় নিরানব্বই বছর বয়সে গত সপ্তাহে তাঁর তিরোধান হয়েছে। না, খবর বেরোয়নি। সভা হয়েছে কিনা জানিনা। তিনি যে উপযুক্তও ছিলেন না। তবু কালে, উনবিংশ শতাব্দী যখন বিংশ শতকে সলজ্জ পদক্ষেপে উদ্যমী, তখন বিপ্লবের ভাষা ছিল বিভিন্ন। নিভৃতিকে তখনো বিভক্ত হয়নি অভিজাত শালীনতা থেকে। এই স্বরে কথা বলতেন মৃণালিনী সেন।

*

বাঙলা দেশের এই উনবিংশ শতাব্দীর কথা ভাবলেই আমার সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের অবধি থাকে না। উপন্যাস তো আমরা ভুলে গেছি। একটি ছোটগল্পের কথাই ভাবুন। মাত্র তেরো বছর বয়সে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হলো এক পড়ন্ত রাজবাড়িতে। দু বছরেই স্বামী অন্তর্হিত। সতীদাহ ইতিমধ্যে আইনত নিষিদ্ধ। মেয়েটি কিন্তু পরিব্যাপ্ত বৈধব্যের বিস্তীর্ণ জীবন্ত সমাধিতে আশ্রয় নিল না। আপন জীবনের ভার নিল আপন হাতে। মাঝে কিছু কবিতা লিখল। তারপর অন্তর্ধান একেবারে সাত সমুদ্র আর তেরো নদী পেরিয়ে লণ্ডনে। পুনর্বিবাহ স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম পক্ষের সঙ্গে। অচিরেই এই বঙ্গমহিলা লণ্ডনের [illegible] সুপরিজ্ঞাত। প্রবাসী ভারতীয় [illegible] একান্ত বান্ধবী। মেয়েরা তখনো ভোট পায়নি বিলেতে। তার জন্য সংগ্রাম করছে কারা? তার মধ্যে একজন একটি বাঙালী মেয়ে। মৃণালিনী সেন। সদ্যোজাত বিংশ শতাব্দীর অনুজ্জ্বল পরিপ্রেক্ষিতে এমন অনুদ্ধত বিদ্রোহ যদি বাঙালী গল্পকার আজ না ব্যবহার করে তা হলে বুঝতে হবে যে একটা বিগত যুগের সঙ্গে বর্তমানের বিচ্ছেদ মর্মান্তিকভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। গল্পের নায়ক শুধু সম্ভ্রান্ত? আর নায়িকা?—থাক না বলাই ভালো।

বলা বাহুল্য, মৃণালিনী সেনের যুগ ছিল মুষ্টিমেয়র অভিজাত্য আর আধিপত্যের যুগ। সামাজিক স্বাধীনতায় তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। সেখানে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করতেন সর্বশ্রেণীকে। কিন্তু সহজাত ও অর্জিত অভিজাত্য বর্জন করে কুলত্যাগভাবিনী জনপ্রিয়তার সমন পরিধান তাঁর আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। নিঃশব্দ অন্তর্ধান তার চেয়ে শ্রেয়। গত কয়েক বছর তিনি আমাদের মধ্যে থেকেও ছিলেন না। সংবাদপত্রে বিবৃতি দেননি [illegible] বা নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে, যদিও তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচেতন ছিলেন সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে। সংবাদ প্রতিবেদন তাঁর আত্মসম্মানিত সামগ্রী নয়। সবাই তো আজ ট্রানজিস্টর চালিয়ে [illegible]। নীরব প্রতিবাদের অপ্রতিরোধ্য শক্তি আমরা জানতে ভুলে গেছি। অবিরাম কলরবের রাজত্বে বাস করে মাঝে মাঝে মনে পড়ে মৃণালিনীর "কল্লোলিনী"।

*

এমন সময় শুধু মনে পড়ে দুটো একেবারে আলাদা যুগের কথা। আমরা স্বাধীন হলাম তো এই সেদিন। তারপর আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে বইকি। সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বাধীন করে আমরা নতুন আত্মসম্ভ্রম অর্জন করেছি। আমার বিনীত বক্তব্য শুধু এই যে, স্বাধীনতার আগেও আমরা সমগ্র জাতি হিসাবে অবহেলিত বা অবমানিত হলেও ব্যক্তি হিসাবে আমাদের অগ্রহণ বা [illegible] চলতো স্বাভাবিক নিয়ম ছিল না। বাধা আজও বিস্তর; বিক্রয়পারঙ্গম সামান্য পটুয়া আজও বিশ্ববরেণ্য হয়; কিন্তু রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ থেকে রমন পর্যন্ত সত্যকার প্রতিভা কখনো একেবারে অবহেলিত থাকেনি য়ুরোপে তা শুধুমাত্র ভারতীয় গর্বে জাত বলে। বরং সাম্প্রতিক সিন্থেটিক ভারতপ্রীতির আনুকূল্যে নানা মেকী ভারতপ্রতিভা বর্তমানে বর্ধমানে না লিখে লণ্ডনে প্রকাশিত। মৃণালিনী সেনের যুগ ছিল একেবারেই আলাদা।

স্বদেশে বিধবাবিদ্রোহ ছিল একান্ত অভাব্য। তার উপর পুনর্বিবাহ কিনা ব্রহ্মানন্দ-সন্তানের সঙ্গে। এমন গর্হিত বিদ্রোহের পরে মহিলার ধৃষ্টতা হলো লণ্ডন যাবার। সেখানে ভিক্টোরীয় কঠোরতা আর সপ্তম এডোয়ার্ডীয় শৈথিল্য তখন অবিবর্তিত। যে বিধারবিচ্ছিন্ন কলকাতা সমাজ পরিত্যাগ করে মৃণালিনী সেন লণ্ডনে পৌঁছলেন সে সমাজের একান্নবর্তিতাও তখন সংকটাপন্ন। তবে তিনি নিজের আসন করে নিলেন অনায়াসে। সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিতা একটি বাঙালী কন্যা ইংরেজী শিখলেন, মেমসাহেব হলেন, কিন্তু মনেপ্রাণে রয়ে গেলেন একান্তই বাঙালী। যত দূর জানি তিনি কারাবরণ করেননি কখনো, কিন্তু বিখ্যাত [illegible] গান্ধীজীকে বাংলায় সামান্য তালিম দিয়েছিলেন তিনিই। ব্রিটিশ সরকার কী ভেবেছিল এই সরকারী কর্মচারীর সহধর্মিণীর অপ্রত্যাশিত অসহযোগ সম্বন্ধে? সরোজিনী নাইডুর সাথেই বা এত সৌহার্দ্য কেন? লণ্ডনপ্রবাসিনী মৃণালিনী সেনের মনে এ-জাতীয় ক্ষুদ্র প্রশ্নের উদয় হয়েছিল বলে জানিনা। স্বাধীনতা অর্জন সে তো ভালো কথা। ব্যক্তিগত অভিমান কেন বাধক হবে সেজন্য? জাতিগত, ধর্মগত, শ্রেণীগত নানা বিরোধের ঊর্ধ্বেও যে অপর একটি সত্তা সম্পর্ক সম্ভব মানুষে মানুষে মৃণালিনী সেন তাঁর দীর্ঘ জীবনে এই সহজ সত্যের নিরুচ্চার, কিন্তু অভ্রান্ত নিদর্শন রেখে গেছেন।

জনসভায় আমি সাধারণত যাইনে। কিন্তু কাগজে কাগজে দেখি, বিদ্রোহের ভাষা আজ অতীব কর্কশ। ক্ষমতার উৎস নাকি বন্দুকের নলে। হয়তো তাই। সবার উপরে অস্ত্র সত্য তাহার উপরে নাই। সামাজিক ও অন্যান্য পরিবর্তনবিধানে সংঘর্ষের ভূমিকা একেবারে অস্বীকার করি কী করে? কিন্তু তার উচ্চারণ কি হবেই হবে সর্বদাই উচ্চগ্রামে? ভাবতে ভালো লাগে যে, মৃণালিনী সেন আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে সেকালের হৃদয়হীন হিন্দু সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গিয়েছিলেন ভিন্ন এক জগতে সম্পূর্ণ [illegible] আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। দেশে ফিরে দেখলেন তিনি পুরোপুরি বাঙালীই আছেন! দুই যুগ, দুই সংস্কৃতির মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দ সেতুবন্ধন একটিমাত্র জীবনে। আমার তাঁর সঙ্গে চা খাওয়া হয়নি। অর্থাৎ অনাস্বাদিত রয়ে গেল বাঙালী জীবনের আংশিক অতীতের অনেক কিছু। সামান্য প্রবন্ধে তার কোথা পরিমাণ?

আমি যত দূরে যাই

শোভন সোম

আমি যত দূরে যাই তোমার আঁচল তত খোলে
অপরূপ নকশী কাঁথা ফুল লতা বৃক্ষ দল
জলের ছলাৎ মিশে নীলিমায়
লাবণ্যের উমে
আমাকে সম্পূর্ণ ঢাকো প্রবল বিস্ময়ে
ঘুমপাড়ানিয়া যাদুকরী টান
আমি যত দূরে আসি স্মৃতির আঁচল মেলে
সম্মুখে দাঁড়াও
তোমার অস্তিত্ব রাখো আমার নিশ্বাসে
জাগরণে
মুখের ভাষায়
অভিমানে সুখে দুঃখে ভাবনার পরতে,
সর্বময়ী,
জাল বিছিয়েছ
তোমার শ্যামল বাহু উষ্ণ বুকে করুণাধারায়
শস্যের পুলকে নত মৃত্তিকায় প্লাবনে খরায়
আমার সর্বস্ব একটি নিশ্চিত বিন্দুতে স্থির ধরে রাখো

যত দূরে আমি যাই, তুমি জেগে থাকো
অই অমোঘ শুকতারা।

মানুষের নামে

শ্যামলকান্তি দাশ

এক দিকে যাওয়ার আগে যারা দশ দিকে যায়
দ্যাখো, আমি তাদের পাঁড়শত্রু, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছি
তীর্থের কাক
যে হাত এতদিন শূন্য, সেই হাতের ভিতর লটকে
রেখেছি পরমায়ু
সেখানে এখন কোন শৃঙ্খলা অথবা কররেখা নেই
আমি শুধু গোছগাছের সময় আড়াল করে রাখছি সংসার
মরে যাবার আগে তুলসীমঞ্চে ঢেলে দিচ্ছি সবটুকু গঙ্গাজল
আমি শুধু মানুষের নয়, দ্যাখো, তাদের পিতাদের
নাম ভুলিয়ে
অনন্ত হৃদয়পুরে হেঁটে যাচ্ছি, জামার বোতাম খুলে
দেখাচ্ছি ইন্দ্রজাল
সমস্ত সাজঘর এবং নাটমঞ্চ ভেঙে দিয়ে এই আমি এখানে
যারা কেন্দ্রে যাবার আগে উঠোনে বসে, মাঠে যাদের
হেলানো ছায়া পড়ে
তাদের পেছনে আছি, তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার শরীর
মুঠির ভিতর ডগডগে ভোজালি এবং তেজস্ক্রিয় পাপ
দ্যাখো, মানুষের নামে আমি কেমন উন্নতিশীল
আমার ভিতর-বুক ফুলে উঠছে বেলুনের মত
এক দিকে যাওয়ার আগে যারা দশ দিকে যায়
দ্যাখো তাদের পেছনে আমি ম্রিয়মাণ, আর
অইদিকে গাড়ি ছাড়বার সময়সূচী, ভূর্জপত্রে মানুষের মহিমা
অইদিকে লকগেট রেলপুল কাঁচা জ্যোৎস্না পুরাতন মাঠঘাট
এবং দমকল।

সহজেই

সুভাষ ঘোষাল

দুটি গাছ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে
আমি তো একেই ভালোবাসা বলতে পারি।

আর এই যে আমি ফিরছি
দূর থেকে দেখতে দেখতে
গাছের কোমর পর্যন্ত মানুষের ঘর উঠে আছে
টুকরো টুকরো হয়ে যাবার
এই তো যোগাযোগ।

এখন ঘরের দরজা খোলা পাবার কথা
ঘর জনহীন বেবাক হবার কথা
শুধু মৃত আত্মীয়
তার শুধু প্রতিকৃতি ভেদ করে ঠিকরে বেরোবে
যখন হাওয়া দেয় ভরা বাদলের।

আমার চরিতার্থতা
বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে পারায়
অপেক্ষা করতে করতে
ব্যর্থ আর ব্যর্থ হয়ে যেতে পারায় সহজেই।

তুমি গ্রহণ করো আজকাল এই একটা সময়

হরিপদ রায়

এই একটা সময়, আজকাল নিজে কষ্ট পেয়ে তোমাকে কষ্ট
দিতে ইচ্ছে করে
এই একটা সময়, যখন মরে গিয়ে তোমাকে বোঝাতে চাই
আমি তোমার কতটা জুড়ে আছি
তুড়ি মেরে তুমি আমাকে উড়িয়ে দিতে পারো না,
ভাঙা কুলোর বাঁও দিতেও তোমার কষ্ট হবে ফের
ছিঁড়ে যাবে তোমার গোলাপময় হৃদয়

সকল ঠাঁই, বনগাঁ জলঙ্গি ব্রিজ ন্যাশনাল হাইওয়ে সরকারী
রিজার্ভ ফরেস্ট সোনাডাঙ্গা দেবগ্রামে
আমার প্যারিস্ কোলে চকোলেট টফি লজেঞ্জুস তৃষ্ণা মৃত্যু
ব্যাপে আছে
উলের বলের মতো এই এক অদূরবর্তী প্রতিশোধ আমার হাতে,
এই এক অমোঘ প্রতিশোধ তোমার চোখে আমার বিনীত
নিবেদন রাখছি
তুমি গ্রহণ করো আজকাল এই একটা সময়

রক্তের নিকট সম্বন্ধ হুইস্কির গেলাসে সেদিন কি কঠিন এবং
সহজ প্রেরণা ছিল
আমার আঙুলে লেগে আছে আমার শেষ দিন
এতগুলো ব্যাপার এক ছাঁচে পুরে কোনো রম্য প্রতিমা
বানাতে পারি না
ক্ষমা করো আমার এই অক্ষমতা, তুমি নিজেই রম্য হয়ে ওঠো
রম্য হও
আমি শুধু তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো যতকাল বলো

রঙ্গভূমি

তুলসী সেনগুপ্ত

বেশ কয়েক বছর আগে আমি আর তাপস একটা হিন্দী ছবি দেখেছিলাম। ছবির প্রথম দৃশ্যটা খুব সুন্দর একটা মজার ব্যাপার ছিল। মায়ের কোলে ইন্দুসেহলার মত একটা বাচ্চাকে ঘিরে বাড়ির লোকজন, পাড়া প্রতিবেশীর ভিড়। অবশ্য তার কারণ ছিল। শিশুটির হাত দেখছিল এক জ্যোতিষী। ছেলেটা মাঝে মাঝেই পিটপিট করে তাকাচ্ছিল; আর তাই দেখে জ্যোতিষী খুব বজ্রদারের মত লম্বা লম্বা হাঁ, হুঁ শব্দ বের করছিল মুখ দিয়ে। বাড়ির লোকের ও প্রতিবেশীদের ধৈর্য বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যের একজন ছুঁচোল মুখঅলা লোক জ্যোতিষীকে প্রশ্ন করছে, এ লেড়কা কো তগদির্ মে কেয়া হ্যায় মহারাজজী? জ্যোতিষী গম্ভীর গলায় উত্তর দেন, 'এ তো রাজা হ্যায়, রাজা। ইসকো আগে পিছে মোটর ঘুমেগা, মোটর।' দরিদ্র পাড়াপ্রতিবেশী ও বাড়ির লোকের চোখে জল এসে গেল মুহূর্তেই! তারপরেই দেখান হচ্ছে কুড়ি বছর পরের ঘটনা। যখন সেই শিশুটি কুড়ি বছরের যুবক। ট্রাফিক পুলিসের পোশাকে দাঁড়িয়ে জনবহুল রাস্তায় ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে। তার ব্যস্ততার মাঝেই একবার তাকে বলতে শোনা গেল, 'জু কাঁহা মহারাজজী: আজ আপকো মিলনেসে গোড় পাকাড় লেতা। কেয়া প্রেডিকশন কিয়া আপনে'। দৃশ্যটি দেখে হলের লোক হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু সে সময় আমি লক্ষ করেছি, তাপস গম্ভীর মুখে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। তাপসকে আমি চিনি, ওকে বেশি ঘাটাতে ভরসা পাই না। আমি যে তাপসকে দেখেছি এটাও বুঝতে দিতে চাই না। হলের আর দশজনের মত আমিও হাসছিলাম। আমার মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তাপস বলে বসবে, চল বেরিয়ে যাই, সিনেমা দেখার মেজাজটাই নষ্ট হয়ে গেল। সত্যিই যদি তাপস সে কথা বলে বসে তা হলে আমার পক্ষে প্রতিবাদ করার কোন সাধ্যই থাকবে না: কেননা, প্রতিবাদ যারা করতে জানে আমি সেই শ্রেণীর মধ্যে পড়ি না। তাপসকে নিয়ে সেই জন্য আমার কোনই স্বস্তি নেই: বরং বলা চলে একটা চাপা অস্বস্তি সব সময় আমাকে পেয়ে বসে।

তাপস আমার বন্ধু; তবু ওকে মাঝে মাঝে আমার অনেক দূরের মানুষ মনে হয়। আকাশের নক্ষত্রগুলোকে কাছাকাছি দেখালেও ওদের ব্যবধান যেমন অজস্র মাইলের, তাপসের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক তেমনি। কিছুতেই মুখ ফুটে তাপসের বিরুদ্ধে যেতে পারি না। তাই এক জাতীয় হীনমন্যতা আমাকে পেয়ে বসে। মাঝে মাঝে আমার ভেতরে একটা দুরন্ত প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। অথচ, তাকে কাজে লাগাতে না পেরে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করি।

আমি অনেক চেষ্টা করেও ওর মত আচরণ করতে পারি না। তাপস সহজ হতে পারে যত সহজে, আমি পারি না। মনে পড়ে স্কুলে পড়ার সময় ইংরেজীর মাস্টারমশাই শচীনবাবু তাপসকে কিছুতেই প্রথমে পড়া জিগ্যেস করতেন না। ক্লাসের
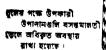
সব ছেলেকে জিগ্যেস করার পর তাপসের দিকে মৃদু হেসে বলতেন, 'জানি তুই পারবি'। একদিন তাপস আমাকে কানে কানে বলেছিল, 'আজ আমার পড়া হয় নি, সমু'। শচীনবাবু ক্লাসে ঢুকতেই আমি সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, 'তাপস আজ পড়া করেনি স্যার'। সঙ্গে সঙ্গে তাপসও উঠে বলেছিল, 'হ্যাঁ স্যার, আজ আমার পড়া হয়নি'। শচীনবাবু হেসে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, আগামীকাল পড়া কর'। তারপর আমার দিকে ফিরে শচীনবাবু কঠোর গলায় শক্ত শক্ত প্রশ্ন করে আমাকে নাজেহাল করছিলেন। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কান দুটো গরম হয়ে গিয়েছিল, চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। ক্লাসের সকলে আমাকে দেখে হাসছিল কিন্তু তাপস মাথা নীচু করে বসেছিল চুপ করে। তাপস যদি আর সকলের মত হাসতো, তা হলে আমি হয়তো খুশী হতাম। কিন্তু তাপসের বিপরীত আচরণ আমার কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

সেই তাপসের সংগে আমার অনেকদিন পর দেখা। মাঝে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। চলন্ত ট্রেনের জানালার পাশে বসে বাইরের গাছপালা, টেলিগ্রাফ পোস্ট, বাড়ি-ঘর যেমন দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, আমার সংগে তাপসের অদর্শনের বছরগুলো ঠিক তেমনি মনে হয়েছে আমার। হিসেব করে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়; বারো বছর আমরা কেউ কারোরই খোঁজ রাখিনি। আমার বেশ মনে পড়ছে, তাপসের বাবা দিল্লীতে বড় পোস্টে চলে গেলেন বদলি হয়ে। যাবার সময় তাপস বলে গেল, শিগ্‌গীরই ও ফিরে আসছে কলকাতায়। প্রথম প্রথম আমারও ধারণা হয়েছে, তাপস নিশ্চয়ই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ফিরে আসবে। তার পরের কথা আমার আর তেমন মনে নেই। সত্যি সত্যি তাপসকে আমি মনেই করতাম না; তাপসও হয়তো তাই।

ও আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল অবাক হয়ে। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে ওঠে পর সহাস্যে প্রশ্ন করলো, 'কেমন আছিস'?

'ভালোই'। পাল্টা প্রশ্ন করবো কী করবো না এ নিয়েই বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর এক সময় প্রশ্ন করি, 'তুই কিন্তু একটুও পাল্টাসনি তপু। ঠিক আগের মতই রয়ে গেছিস'।

ও কথায় সুন্দর হাসল তাপস। বলে, 'ঠিক ধরেছিস; আমি এখনও শৈশব পেরোতে পারি নি'।

তাপসের সব কথার অর্থ আমি সব সময় বুঝে উঠতে পারি না। কিরকম ধোঁয়াটে মনে হয়। কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকি।

তাপস গম্ভীর গলায় বলে, 'আমার ছেলেবেলাটা আমাকে বড় কষ্ট দেয় রে।

আচ্ছা সমু, তোর সেই ছবিটার কথা মনে আছে'?

'কোন ছবিটা'? আমি শুধোই।

'কেন সেই' একটু থেমে তাপস যেন অনেক দূরের অতীতে গিয়ে বলতে থাকে, 'যাতে জ্যোতিষী নবজাতকের হাত দেখে গম্ভীর গলায় রায় দিয়েছিল...'

বলতে লজ্জা নেই আমি সেই ছবির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। স্মৃতির জগতে শ্যাওলা জমে জমে কীভাবে যে সব কটা জানালা কপাট বন্ধ করে দিয়েছিল, তার খেয়াল করিনি কখনও। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন কিছুই উদ্ধার করতে পারিনি তখন তাপসকে একটু ঠেস দেবার জন্যই বলি, 'আমি তো আর তোর মত শৈশবে আটকা পড়ে নেই যে, কবে কি করেছি, তা মনে করে রাখব'। বলে আমি একটু স্বস্তি পাই। আমি নিজে যাতে জড়িত নই, সে সব আমার মনে পড়ে না। তাই তাপসের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলেও নিশ্চিন্ত হই এই ভেবে যে, যে-ছবিটার কথা তাপস বলছে তাতে নিশ্চয়ই আমি কোনভাবেই জড়িয়ে নেই।

তাপস একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'স্মৃতি হারিয়ে বসেছিস, তাহলে বাঁচবি কী নিয়ে'?

আমি উত্তর দি, 'অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কিছুই করার নেই। কেননা, অতীত ভবিষ্যৎ আমার কাছে মূল্যহীন। ও দুটো আমার কাছে কীরকম জানিস', বলেই সুন্দর করে বোঝাবার জন্য বলি, 'মায়েদের পেটে যখন বাচ্চা থাকে তখন সে বাচ্চা ছেলে হবে কি মেয়ে হবে এ নিয়ে আমার কোন চিন্তা থাকে না। আর সেই বাচ্চা ভবিষ্যতে চোর জোচ্চর না সাধুসন্ত হবে তা নিয়েও আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি শুধু জানি, এখন আমি কেমন আছি। বাস্ এর বেশি আর কিছু আমাকে ভাবায় না'।

চলতে চলতে তাপস সেই ছবিটার কথা বলল। আমার মনে পড়ে গেল সব। সেই মুহূর্তে ওর দুর্বলতা নিয়ে একটু রসিকতা করতে ইচ্ছে হল। এমন সময় তাপস সামনের দিকে চেয়ে গলা ছেড়ে বলল, 'দ্যাখ সমু, দ্যাখ, কত ঝুরি নেমেছে বট গাছটায়। কতকাল এরকম গাছ দেখি না। চল্ না, ওই গাছটার নিচে গিয়ে একটু বসি'।

বলল বটে কিন্তু ও আমার জন্য অপেক্ষা করল না। দ্রুত পা চালিয়ে গাছের ছায়ায় বসে অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগল। সে হাসিটা শিশুর হাসির মতই মনে হচ্ছিল আমার। কিন্তু তাপস অমন করে হাসে এটা কেন যেন আমার সইল না। মনের মধ্যে কতগুলো হিজিবিজি চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুলতে লাগল। একটু বিদ্রূপ মেশানো গলায় জিগ্যেস করি, 'ট্রাফিক পুলিস দেখলেই কী খোঁজ করতে যাস্ নাকি...?'

খুব ধারাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাপস আমাকে দেখল। পরে অস্ফুট স্বরে বলে, 'ঠিক বলেছিস তুই, ট্রাফিক পুলিস দেখলেই আমার মনটা ভীষণ নরম হয়ে যায়। ইচ্ছে হয় কাছে গিয়ে জিগ্যেস করি সে কখনও জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছে কিনা।' কিছুক্ষণ থেমে ফের বলতে থাকে তাপস, 'কী অধিকার আছে মানুষের যে মানুষকে নিয়ে অমন করে ব্যঙ্গ করে'?

চেষ্টা করি তাপসকে উপেক্ষা করতে। তাই হেসে বলি, 'আমাদের কুলগুরুও তো আমার হাত দেখে বলেছিলেন আমার কিছু হবে না। কিন্তু মজা দেখ, আমি আমাদের ফ্যামিলীতে সবচেয়ে সাকসেসফুল। ও সব দুঃখটুঃখ আমার কাছে কীরকম ন্যাকামী বলে মনে হয়। আসলে আদায় করতে জানা চাই, তা সে যেমন করেই হোক'।

এ কথায় তাপস কীরকম চোখে যেন আমাকে দেখে। আমার ওতে ভীষণ অস্বস্তি হয়। তাই অন্য প্রসঙ্গে যাবার জন্য বলি, আমার বাবা ডাক্তারী করতেন, অথচ, পুজোআচ্চা না করে কিছুতেই বাবা রুগী দেখতেন না। এসব সংস্কার কী না বল?'

'ভাগ্য আমিও বিশ্বাস করি না। তবে কী জানিস,' বলে তাপস যেন ইচ্ছে করেই আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলতে থাকে, 'আমরা সকলেই বড় দুঃখী। তাই দুঃখী মানুষদের নিয়ে যদি কেউ রঙ্গ তামাসা করে আমার তখন খুব কষ্ট হয়।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে যায় তাপস। পকেট থেকে রুমাল বের করে ভাল করে মুখটা মুছে নিয়ে আপন মনেই যেন বলে, 'বলাই কী এখনও ব্রহ্মপুত্রের তীরে দাঁড়িয়ে তার বাবাকে খোঁজে?'

কথাটা কানে যেতেই আমার সমস্ত শরীরটা কীরকম ছমছম্ করে ওঠে। মনে পড়ল, বলাইকে নিয়ে আমরা বিদ্রূপ করতাম। পাগলা বলাই বলে ওকে ক্ষ্যাপাতাম।

বলাইয়ের বাবাকে ব্রহ্মপুত্রে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বলাইয়ের ধারণা ছিল, বাবা ওদের সকলের ওপর অভিমান করে আশে পাশে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। তাই বলাই একা-একা ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে বাবাকে ডাকতো আর কাঁদতো। আমরা সেবার অদ্ভুত একটা খেয়ালে মেতে উঠে ছিলাম। রোজ বিকেলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে জল যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে অনেকগুলো পাটকাঠি পুঁতে রেখে পরদিন সকাল বেলা দেখতে আসতাম জল আর কত দূরে বেড়েছে। কিন্তু কোনদিনই সেই পোঁতা পাটকাঠিগুলোকে আমরা খুঁজে পেতাম না। তাপস একদিন খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিল, 'বলাইয়ের বাবা আমাদের পোঁতা পাটকাঠিগুলোকে সঙ্গে নিয়ে একদিন না একদিন ভেসে আসবে।

এসব কথা যেন আমার মনে পড়েনি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে তাপসকে বলি, 'এত বছর দিল্লিতে কাটালি, সাধুসন্তের মত জীবনটাকে গোমড়া করে রাখলি। এসব কি করছিস?'

এ কথায় তাপস আমার হাতটাকে চেপে ধরল। একটা গরম নিশ্বাস ফেলল। ওর চোখ দুটো ভীষণ চকচক্ করছিল সে সময়। আমার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'ছেলেবেলার সেই পাটকাঠিগুলোকে হঠাৎ যদি কখনও ফিরে পাই আর সেই সঙ্গে বলাইয়ের বাবাকে, তাহলে কেমন হয় সমু?'

ক্রমে ক্রমে তাপস আমার কাছে ভীষণ অসহ্য হয়ে ওঠে। আমি অতীতে ফিরে যেতে চাই না। অথচ, বার বার তাপস আমাকে অতীতের সেই ধূসর রংগভূমিতে নিয়ে আসে। অসহ্য একটা অস্থিরতা আমার মাঝে দাপাদাপি শুরু করে দেয়। অসহায় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। ঠিক সেই সময় আমি তাপসের বলিষ্ঠ হাতের চাপ অনুভব করি। তাপসের চোখে চোখ রাখতে আমার ভীষণ ভয় করে।

'কিরে, উত্তর দিচ্ছিস্ না যে?' তাপস প্রশ্ন করে বসে।

প্রায় 'চৎকার করেই উত্তর দি, 'ওসব আমার একদম ভাল লাগে না। কোনো মানুষের জন্য আমার কোন রকম সফট কর্নার নেই।'

'নেই? ঠিক বলছিস?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।'

'চিলমারীর পাতকুড়ুনী বুড়ীটার কথা মনে আছে তোর? যার কিছুই ছিল না; ছিল কটা মাত্র বিড়াল ছানা!'

'হ্যাঁ, মনে আছে। আর সেই বিড়াল ছানাগুলোর মধ্যে সাদা-কালো ডোরা কাটা বিড়ালটাকে তো আমিই চুরি করেছিলাম।'

'তুই?' পাথরের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে তাপস।'

'হ্যাঁ আমি। আমিই চুরি করেছিলাম বুড়ীর বিড়ালছানাটাকে।'

তাপস আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হল, তাপস আমাকে ভীষণ মমতায় কাছে টানছে। মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছে করল, 'তপু, দোহাই তোর, তুই আমাকে ছেড়ে দে'।

ধীর শান্ত গলায় জিগ্যেস করে তাপস, "কেন? কেন ওর বিড়ালছানাটাকে চুরি করেছিলি সমু?'

মাথা নিচু করেই উত্তর দি, 'বুড়ীটার অত সুখ যেন আমার সইছিল না।' বেশ কিছুক্ষণ আমি আর কোন কথাই খুঁজে পাই না। এবার বুড়ীটাকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। দশ বাড়ির পাত কুড়োতো বুড়ীটা। এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে ভিক্ষে করতো। বিড়ালছানাগুলোকে পরম যত্নে খাইয়ে, পাতে যা পড়ে থাকতো তাই খুঁটে মুখে দিয়ে বিড়ালগুলোর দিকে চেয়ে ফোকলা দাঁতে খিলখিল করে হাসতো বুড়ীটা। তারপর একটাকে মাথার কাছে, একটাকে বুকের ওপর, আর দু' পাশে দুটোকে পাশে রেখে ঘুমোতো। যতক্ষণ না ঘুম আসতো, ততক্ষণ বিড়ালছানাগুলোর মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতো। এমনি করতে করতে সব কটা প্রাণী এক সময় ঘুমিয়ে পড়তো। আমার সব মনে পড়ল, সব। লুকিয়ে লুকিয়ে বুড়ীটার ওই সব দেখতাম। আর ভেতরে ভেতরে একটা অসহ্য জ্বলন অনুভব করতাম। তাই একদিন সাদা-কালো ডোরা কাটা বিড়াল-ছানাকে ভীষণ আক্রোশে চুরি করে ফেললাম।

তাপস বলে, 'বিড়ালছানাটার জন্য বুড়ীটা কেঁদে কেঁদে যখন ঘুরে বেড়াত, তখন তুই কিন্তু হাসতিস'।

একটা সিগারেট ধরাই। দু-তিনটে

টান দিয়ে সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলি। কেননা, সে সময় সব কিছুই কীরকম বিস্বাদ মনে হচ্ছিল। আকাশের আলো আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে আসছে। মনটা ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে। হঠাৎ কী হলো, তাপসের ডান হাতটাকে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা তপু, সত্যি কি বুড়ীটা বিড়ালছানাটার জন্য মরে গেছল?' তাপসের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ফের বলতে থাকি, 'তাহলে বিড়ালটাও বুড়ীটার শোকেই মরে গিয়েছিল। মরার আগে বিড়ালটা মিউ-মিউ করে এদিক-ওদিক তাকাত। কিছু খেতো না। কী যেন খুঁজতো সারাক্ষণ। তারপর একদিন এক সকালে দেখি বিড়ালটা শক্ত হয়ে মরে পড়ে রয়েছে। আমার দু' চোখ জ্বালা করে উঠলো। বুকের ভেতরে একটা চাপা ব্যথা আমার দম আটকে দিচ্ছে বলে মনে হল।

দিনের আলোর শেষটুকু ঝুপ করে নিভে যায়। অন্ধকারের মধ্যেই আমি তাপসের মুখটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে মনে ভাবি, তাহলে বুড়ীটা আর ওই বিড়ালছানাটার মৃত্যুর জন্য কী আমিই দায়ী?

তাপসের ব্যবহার ক্রমশই আমার কাছে রহস্যময় হয়ে ওঠে। চিরকালই তাপস আমার কাছে দুজ্ঞেয়। একটু আগে যে বক্সাইটের জন্য, গ্রাফিক পত্রিকার জন্য বাড়ীটার জন্য দুঃখ বোধ করছিল, সেই তাপস এখন আমাকে সহজ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে আমাকে বলে, 'মিছিমিছি মন খারাপ করছিস। কোন সময়েই অনুশোচনা রাখবি না।'

ও-কথা তাপসের মুখেই মানায়। আমাকে মানায় না। আমি চুপ করে থাকি। তাপসের চোখে চোখ রাখতে ভরসা পাই না।

এখন চতুর্দিকটা বেশ অন্ধকার। অন্ধকারে বটের ঝুরিগুলোকে সাপের মত মনে হচ্ছে। গাছের ডাল কামড়ে অনেকগুলো সাপ যেন লেজ ঝুলিয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তের মানসিকতাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যই বলি, 'চল তাপস তোকে নন্দিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।'

তাপস হাসতে হাসতে বলে, 'তুই একটা স্কাউণ্ড্রেল। এতক্ষণ সে কথা বলতে কী হয়েছিল?'

এক কথায় রাজী হয়ে যাবে ভাবি নি। বেশ প্রসন্ন হাসি হেসে ও বলে, 'চল'।

তাপসকে নিয়ে বাড়ি আসার সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ট্রামে অসম্ভব ভীড়। অনেক লোক বাইরের দিকে ঝুলছিল। পর পর দু'খানা ট্রাম আমাদের ছেড়ে দিতে হল। আমি বারবার তাপসকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করছিলাম। তাই ফাঁক বুঝে তাপসকে বলে ফেললাম, 'রাত বাড়ছে, ট্যাক্সিতে যাই চল।'

ও কোনই উৎসাহ প্রকাশ করল না। উপরন্তু দূরের ট্রাম লাইনের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর আগের থেকে স্বল্প ফাঁকা একটা ট্রাম এসে দাঁড়াতেই ও আর আমি উঠতে চেষ্টা করলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, জনা তিনচারেক লোক আমাদের ঘিরে রয়েছে। কিছুতেই আমাদের উঠতে দিচ্ছে না। ঠিক সেই সময় পেছনের লেডিস্ সিটের এক ভদ্রমহিলা চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনার পকেট মারছে; দেখুন দেখুন, এই লোকটা।'

ট্রামটা থেমে গেল। ভদ্রমহিলা তাপসকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'আপনাকে বলছি'। কথাটা ভদ্রমহিলা বেশ জোরে বললেও যেন কারো কানে গিয়ে পৌঁছল না। কেননা, এর থেকেও একটা সাংঘাতিক ঘটনা চোখের সামনে তখন ঘটতে শুরু করেছে। একজন

পায়জামা পরা কালো ছিপ্‌ছিপে চেহারার লোককে ঘিরে কতগুলো লোক চিৎকার করছে, কিল চড় ঘুঁষি মেরে চলেছে। লোকটার ঠোঁট কেটে গিয়ে কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে নামছে। আর ঠিক তার পায়ের কাছেই একটা মানিব্যাগ পড়ে রয়েছে। কী হলো, তাপস অবলীলাক্রমে সকলকে ধমকে উঠলো যেন, 'কী করছেন আপনারা। ও আমার পকেট মারে নি। এই দেখুন আমার ইনসাইড পকেটে টাকা রয়েছে।' কথাটা কানে যেতেই রোগা ছিপ্‌ছিপে লোকটা মুহূর্তেই কী এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে বসে। পায়ের কাছ থেকে মানিব্যাগটা কুড়িয়ে তাপসের দিকে চেয়ে নিরুদ্বেগে হন্‌হন্‌ করে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে যায় দক্ষিণ দিকে। ভীড়ও দেখতে দেখতে পাতলা হয়ে যায়। তাপস ইশারা করে আমাকে নামতে বলে।

উত্তেজনায় আমার নিশ্বাস দ্রুত পড়তে থাকে। প্রশ্ন করি, 'এ সবের কী মানে হয়?' কেন না সেই সময় তাপস আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল খুব।

তাপস কোনই উত্তর দেয় না, সে শুধু হাসে।

জানি না, ব্যাগটাতে কত টাকা ছিল। তাপসকে একটুও দুঃখিত দেখাচ্ছিল না। আর আমি বহুদিনই হিসেব করে পয়সা গুণে ভিখিরীদের ভিক্ষে দিয়েছি। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হয়েছে, ও পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খাবে না; বিড়ি কিনবে নয় তো বা জমানো পয়সা দিয়ে সিনেমার লাইন দেবে। এসব ভাবনা আমার মাথায় এসে পড়ে। পয়সার শোক কিছুতেই আমার মনকে হালকা করে না। ফলে, একটা অস্বস্তি আমাকে ভীষণ বিপন্ন করে তোলে। একটা ফাঁকা ট্যাক্সি থামিয়ে, তাপসের সম্মতির অপেক্ষা না করেই বললাম, 'ওঠ, আর দেরী করা চলে না।'

ট্যাক্সিতে বসে তাপস স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিগেস করে, 'দেরী হলে বউ রাগ করে?'

একটু টেনে উত্তর দি, 'নাহ্। সে সব প্রথম প্রথম হতো।' আর তাছাড়া, একটু থেমে বলি, 'মাঝে মাঝেই আমাকে পার্টি-টার্টিতে অ্যাটেন্ড করতে হয় সুতরাং—' কথা শেষ করি না আমি। সেই সময় তাপসের কাছ থেকে অনেক কিছুই শোনার ইচ্ছে হচ্ছিল। ও কেন জিগেস করছে না, নন্দিতা কেমন দেখতে, গান জানে কী না, পার্টির হ্যাবিট তৈরী করতে পেরেছে কী না; লেখাপড়াই বা কদ্দুর। তাহলে আমি এই ট্যাক্সির আধো আলো, আধো অন্ধকারের মধ্যে বলে যেতে পারি, নন্দিতার তুলনা নেই; হিজ্‌মাস্টারস-এ গোটা কুড়ি রেকর্ড আছে; কিংবা আমি ইদানীং কত টাকা মাইনে পাই, ভাড়া বাড়িতে থাকি, না, নিজের বাড়িতে! অফিসে পার্টির লোকের সঙ্গে যেমন করে কথা বলি ঠিক তেমনি কায়দা

করে বলতে পারি, বেলগাছিয়ার বাড়িটা নন্দিতার পছন্দ নয় বলে নিউ আলিপুরে ছ'শ টাকার ফ্ল্যাট নিয়ে চলে যাচ্ছি আগামী বুধবার; তবে মুশকিল এই, ফার্নিচার, ফ্রিজ এসব নিতেই পুরো একটা দিন চলে যাবে। কিন্তু না, তাপস, এসব কিছুই জিগ্যেস করল না, আর আমিও এসব না বলতে পেরে সূঁচ ফোটান যন্ত্রণা অনুভব করি।

বাড়ি এসে গেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ইশারা করে থামতে বলি। ট্যাক্সি থেকে নেমে নজরে পড়ে চতুর্দিকটা ভীষণ অন্ধকার। বাতাস বইছে না। লেকের পাড়ের গাছ, লেকের জল সব কিছুই ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। এ অঞ্চলের আলো প্রায়ই গণ্ডগোল করে। কিন্তু তা বলে আজ? আজকের এই দিনটাতে, বিশেষ করে তাপসকে দেখিয়ে দিতে চাই আমি সৌমেন মিত্র, উড্রমন অ্যান্ড ফ্রাঙ্কলিন কোম্পানির চীফ পারচেজিং অফিসার, মাস গেলে চার অঙ্কের একটা মোটা মাইনে পাওয়া সাকসেসফুল ম্যান, দেখুক তাপস, বিস্ময়ের চোখ মেলে দেখুক, মানুষ বুদ্ধির সঙ্গে চালাকি মিশিয়ে কত দূরে উঠতে পারে। কিন্তু না, তাও হয়তো দেখান গেল না তাপসকে আজ। রাগে দুঃখে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে আমার। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ইচ্ছাকৃতভাবেই তাপসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি, 'তুই একেবারেই সাধুসন্তের মত আচরণ করছিস্। এ বয়সে ওসব বেমানান। নে, একটা ফুঁকে দে'।

সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে নেয় তাপস। পরে গম্ভীর গলায় বলে, 'না নিলে রাগ করতিস তাই নিলাম। এবার আমি তোকে এই সিগারেটটাই অফার করছি, নে।'

আমি কী রকম চুপসে যাই। হাত বাড়িয়ে তাপসের দেয়া সিগারেটটা নিয়ে দেশলাই জ্বালি।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দাঁড়াল নন্দিতা। ঘরে মোমের গরম আলো চোখে পড়ল। নন্দিতা এক পাশে সরে দাঁড়াল। বললাম, 'তাপস'।

নন্দিতা সহাস্যে বলল, 'ভেতরে আসুন। ওঁর কাছ থেকে আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

হেসে তাপস উত্তর দেয়, 'সমুটা চিরকালই আমাকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে।'

আমি লক্ষ করি নন্দিতার চোখে বিস্ময়ের ঘোর। আড়চোখে নন্দিতাকে দেখতে গিয়েই ধরা পড়ে যাই। খুব কষ্ট করে সে ভাবটা গোপন করে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট জ্বালি।

ইদানীং নন্দিতা আমার সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। অবশ্য তা নিয়ে আমার খুব একটা মাথা ব্যথা নেই। প্রেম ভালোবাসা জাতীয় কিছু নন্দিতার কাছ থেকে আমি আশা করি না। অল্প সময়ের মধ্যে নন্দিতা তাপসের কাছে খুব সহজ হয়ে যায়। যেন কথায় পেয়ে যায় নন্দিতাকে।

নন্দিতার এত উচ্ছ্বাস এই মুহূর্তে আমার ভাল লাগে না। তাই ওকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বলি, 'তাপসকে শুধু মুখে বসিয়ে রাখলে যে! একটু খাবার দাবারের ব্যবস্থা কর।'

নন্দিতা মুহূর্তেই অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বলে, 'আপনি যে আজই প্রথম এলেন, তা কিন্তু মোটেই মনে হচ্ছে না।' উঠে চলে যায় নন্দিতা। ওকে বাধ্য মেয়ের মত উঠে চলে যেতে দেখে আমি অজস্র সুখ অনুভব করি।

নন্দিতা চলে গেলে পর তাপস গম্ভীর গলায় বলে, 'সমু, সত্যি তুই একটা স্কাউন্ড্রেল'।

ও-কথায় আমি হাসি কিন্তু কোন উত্তর দিই না। ঠিক এই সময় আলো জ্বলে

উঠলো। ঘরটা আলোয় ভরে গেল। আমি কথা খুঁজে পাই। বলি 'এই গানটা যদি আরো মিনিট পনেরো আগে দিতিস, তা হলে অনেক আগেই আমরা আলো বাতাসে মন ভরাতে পারতাম।'

সেণ্টার টেবিলটাকে টেনে এনে তাপসের সামনে বসাল নন্দিতা। তারপর পাকা গৃহিণীর মত একের পর এক কাজ মুখ বুজে করে গেল।

তাপস বলল, 'কী ব্যাপার, এত সব আমার পেটে সইবে না।'

'যা পারেন খান। আপনার সঙ্গে ভদ্রতা করছি না।' নন্দিতা সুন্দর করে কথাগুলো বলল।

সোফা থেকে উঠে ফ্রিজ খুলে একটা বিয়ারের বোতল নিয়ে এসে বসলাম। বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে যেন আপন মনেই বলি, 'যা গরম পড়েছে আজ'।

তাপস প্লেটটাকে কোলের ওপর তুলে নিয়ে একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিল।

বিয়ারে চুমুক দিয়ে আমি নন্দিতাকে লক্ষ করে বলি, 'তোমার ওই লেটেস্ট গানটা একটু শোনাও না?'

নন্দিতা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। ওর অবাক হবার কারণ আমার জানা। নন্দিতার গান আমি কদিন শুনেছি গুণে বলতে পারি।

নন্দিতা উত্তর দেয়, 'এ সময় ও-গানটা মানায় না।' নন্দিতা তন্ময় হতে চাইল যেন। মিনিট কয়েক চোখ বুজে থেকে নন্দিতা খালি গলায় পর পর তিনখানা গান গাইল।

এক সময় উঠে দাঁড়ায় তাপস। সে সময় তাপসকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। ও আবার কবে আসছে জানতে চাইল নন্দিতা।

তাপস বলল, 'যে কোন সময়, যে কোন দিন চলে আসতে পারি।'

ওকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই তাপস আমার কাঁধে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বলে, 'সমু, তোর জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে রে।' একটু থেমে ফের বলল তাপস, 'তবে জানতে চাস না, উত্তর দিতে পারবো না। আমি একাই যেতে পারবো সমু।'

দম দেওয়া পুতুলের দম ফুরিয়ে গেলে যেমন হঠাৎ থেমে যায় আমিও যেন ঠিক সেই রকম থেমে গেলাম। দেখলাম তাপস খুব শান্ত ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর শরীরের ছায়া দীর্ঘ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়। আমার সমস্ত শরীর ছমছম করে ওঠে।

*

অন্ধকার ঘরে নন্দিতা আর আমি পাশাপাশি শুয়ে। আমার ঘুম আসছে না; বুঝি নন্দিতাও জেগে আছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। মাথার পাশের জানালা দিয়ে শরতের হিম হাওয়া এসে লাগে। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি —অসংখ্য নক্ষত্র জ্বল জ্বল করছে। নন্দিতার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না; ও ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে ঘেয়ো কুকুরের চিৎকার। স্মৃতির ধূসর রঙ্গভূমিতে আবার আমি ছুটে যাই। মনে পড়ে, অনেক রাতে কুকুরের চিৎকার শুনলে মা বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে বলতেন, 'সমু, ওই শোন ভোলা কাঁদছে!' ভোলা বলে আমাদের একটা কালো লোমঅলা কুকুর ছিল। ওর পিঠে চড়ে ঘোড়া খেলতাম আমি। ওর লোমে ঘষা লেগে একবার আমার একটা ফুসকুড়ি গলে গিয়েছিল। সেরাতেই আমার ভীষণ জ্বর হয়। সারা শরীর সেপটিক হয়ে গিয়েছিল। বাবা সদর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। পর দিন ভোলার গলায় দড়ি বেঁধে অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে ভোলা আর আমাদের বাড়ি আসেনি। মা অমন করে যখন বলতেন, তখন আমার খুব হাসি পেতো। বহুদিনই আমি ভোলার খোঁজ করেছি। চিলমারী ছেড়ে আমার কিছু দিন আগে ভোলাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। ওকে চেনাই যাচ্ছিল না। ঘেয়ো কুকুরগুলোর মতই দেখতে লাগছিল। ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেদিন আমার যা মনে হয় নি আজ এই মুহূর্তে আমার মনে হতে লাগল, ভোলার ওই দশার জন্য মূলত আমিই দায়ী। এই প্রথম আমি অনুভব করি আমার দু চোখ জলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

তাপসের শরীরের সেই দীর্ঘ ছায়া যা সেই সময় ছুঁয়ে গেছল, এখন তা ক্রমশ আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে বলে উঠলাম, 'তপু, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তুই আমাকে ছেড়ে দে, আমাকে ছেড়ে দে!'

পঁয়তাল্লিশ

'হলো তো? এবার ছাড়ো তাহলে লক্ষ্মীটি! জেলের ডাক্তারখানার থেকে তোমার ওষুধটা নিয়ে আসি গে, কেমন?'

'জেলের ডাক্তারখানাটা কোথায় তুই জানিস?'

'দেবেনদার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব আজ।'

'না, দেবেনের সঙ্গে যেতে পাবিনে।'

'আজই তো খালি। কাল থেকে আমি একলাই যাবো। আজ দিনটা কেবল।'

'না। আজকেও না। কারো সঙ্গে আমি তোকে যেতে দেব না। আজও না, কালও না, কোনোদিনই না।'

'ওরে বাবা! দেবেনদা কি খেয়ে ফেলবে আমায়?'

'না খেলেও। আমি প্রাণ ধরে তোকে আর কারো সঙ্গে ছাড়তে পারব না বলে দিচ্ছি সাফ। তাতে ওষুধ না খেয়ে মারা যাই সেও আমার ভালো।'

'ইস্! কী হিংসুটে গো তুমি! ভারী সন্দিগ্ধ মন তো তোমার! ভাগ্যিস্, তুমি দাদা পাতিয়েছ সেই রক্ষে! বড্ড ফাঁড়াটা কেটে গেছে আমার। বৌ হলে তো তুমি বোরখা পরিয়ে রাখতে আমায় বোধ হয়।'

'মোটেই না। আমি নিজেই তোর বোরখা হয়ে থাকতুম দিনরাত। বোরখার মতই তোকে ঘিরে রাখতুম সব সময়। কারো নজর পড়তে দিতুম না তোর ওপর।'

'কি রকম?'

'কোনোদিকে একটুও ফাঁক পেতিস নে তুই। তোর পূর্বে আমি, পশ্চিমে আমি, উত্তরে আমি, দক্ষিণে আমি...এক আমি একাই একশ। যেমন কিনা, আমাদের এই বঙ্গদেশ। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে ব্রহ্ম, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহারের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তেমনি...'

'বুঝেচি। রাতদিন পাহারা দেবে আমায়—বুঝেলাম। কাজকর্মের ধান্দায় বেরুতে হত না তোমাকে?'

'আমার আবার কী কাজ? এক বৌই তো বড় কাজ। তার ওপর কারো কাজ আছে নাকি আরো? থাকে নাকি?'

'খেতে কী?'

'সে আমি ঠিক খেতাম। ঠিকই খেতুম, খাওয়ার ব্যাপারে কিছু অবহেলা কোনো ত্রুটি থাকত না আমার।'

'তাতে পেট ভরত না মশাই। আমি বলছিলুম, অন্নবস্ত্র জুটত কোথ্থেকে শুনি? কাজ কর্ম না করলে।'

'মা অন্নপূর্ণা যোগাতেন। তিনিই যুগিয়ে যেতেন ঠিক ঠিক। সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর একটা গল্প বলি শোন্ তাহলে—উঁসতবুসের গল্পটা শুনেছিস এর আগে?'

'না তো। উঁসতবুসটা কী? কে?'

'এক সাধু। গল্পটা বলি তোকে। একবার এক সাধু নাকি আমাদের বাজবাড়ির পিলখানায় এসেছিল। এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতীদের খাওয়া দেখছিল সে। বড় বড় গামলা ভর্তি চাল, গুড়, কলার থোড়, আরো কত কী—মেখেচুখে বড় বড় গরাস করে মাহুতেরা হাতীদের শুঁড় ধরে দিচ্ছে তুলে তারা আয়েসে আরামে চোখ বুজে আয়েস করে গিলছে—প্রত্যেক হাতীর জন্যেই আধ মণ করে বরাদ্দ। সবচেয়ে বড় দাঁতালো হাতী মোহনপ্রসাদের জন্যে তার ওপর রাজবাহাদুরের পাঠানো নিত্যকার রাজভোগ তার প্রিয় খাদ্য এক হাঁড়ি গাঙ্গুরামের দোকানের ইয়া বড়ো বড় রসগোল্লা। তাই দিয়ে রাজোচিত মর্যাদায় তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হোতো রোজ। একজন মাহুতকে

সাধু নাকি শুধিয়েছিল, কেন, এমন করে এদের খাইয়ে দিতে হচ্ছে কেন? এরা কি গোরু ভ্যাড়ার মত চরে খেতে পারে না, নিজেরা মুখে তুলে নিতে পারে না? খেটে-খুটে খেতে শেখে নি? কি পাখিদের মতন খুঁটে খেটে? না সাধুজী! জবাব দিয়েছিল মাহুতটা, হাতী সেরকম জানোয়ারই নয়। এদেরকে এমনি করে খাইয়ে দিতে হয়। নইলে এরা এমনিতে খাবে না। মুখে তুলে না দিলে কিছুই মুখে তুলবে না কিছুতেই। উঁসিতরসে খিলানে হোগা। খোদা এইসা বানায়া এ লোগ কো না! উনহি ইসি তরে বানায়া উনহি উঁসিতরসে খিলাতা!'

"তারপর?'

'শুনে তো সাধুটি হাঁ; তারপর কাল কি সে, রাজবাড়ির শ্রীরাম মন্দিরে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ল—পড়ে থাকে দিনরাত, খায় না চায় না, কারো কাছে কিছু চায় না। পূজারী পুরুতেরা রামচন্দ্রর প্রসাদ এনে ধরে দিল ওর সামনে, ও ছুঁলো না, শুধু বলল উঁসিতরসে। যে কিছু ভালোমন্দ খাবার-দাবার ফলমূল নিয়ে আসে—সাধু ছোঁয় না—খায় না—খালি বলে উঁসিতরসে। রাজাবাহাদুর খাবার নিয়ে এলেন, রাণী মা-ও এলেন তাঁর সঙ্গে—সাধুর শুধু ঐ এক বুলি—উঁসিতরসে। সবাই হাঁ করে তাকায়, হতাশ হয়ে ফিরে যায়, ওর কথার মর্ম কেউ বোঝে না।

সাতদিন এইরকম ঠায় উপোসে পড়ে থাকার পর একদিন শেষ রাতে কে নাকি এসেছিল তার কাছে খাবার হাতে করে—খাওয়ার জন্য সাধতে। তার বহুৎ সাধ্য-সাধনায় চিঁ চিঁ করে সাধু বললে—ঐ এক কথাই! উঁসিতরসে। শুনে লোকটা যেই না তাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে গেছে অমনি সাধু গরাসটা ফেলে রেখে দু' হাতে পাকড়ে ধরেছে তার পা—ঠাকুর! এইবার তো ধরেছি তোমায়। ধরা পড়ে গেছ তুমি। আর তো তোমায় ছাড়ছিনে! আর কোথায় পালাবে! যিনি হাতীকে খাওয়ান তুমিই সেই তিনি! আমার ভগবান! তুমি ছাড়া তো আমার এই কথাটার মানে আর কারো জানবার কথা নয় ঠাকুর!'

'ভোর রাতের সেই কাণ্ডটা কেউ দেখেছিল নিজের চোখে?' বিনি শুধোয়।

'কেউ না। কে জেগে বসে ছিল তখন? তবে তার পরদিন সকালে কেউ আর সে সাধুটির দেখা পায় নি। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দিব্য অঙ্গ মিশিয়ে গেল কি না কে জানে!'

'তুমি এসব বিশ্বাস করো?'

'মা বলে তাই বলছি। মার কথায় কি কেউ অবিশ্বাস করে?'

'তোমার বাবা কী বলেন এ বিষয়ে?'

'বলেন, গাঁজাখুরি। তিনি আবার

কবিতাও আওড়ান, মহাকবি হেমচন্দ্রের। 'ছিল বটে আগে তপস্যার বলে/কার্যসিদ্ধি হত এ মহীমণ্ডলে/আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে/সংগ্রাম করিত অমরগণ।/এখন সেদিন নাহিক রে আর/দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার/হবে না হবে না খোল্‌সা তরবার/এসব দৈত্য নহে তেমন॥'

তোমার বাবাই ঠিক কথা বলেন। দেবতার সাহায্যে, দৈবলীলায় যেমন ভারত উদ্ধার হবার নয়, তেমনি কেউ নিজেকেও উদ্ধার করতে পারবে না। তুমিও পারবে না। তোমাকে কাজ করতে হবে—রীতি-মতন; সবার মতন। প্রাণপণে কাজের মানুষ হতে হবে, মানুষের কাজ করতে হবে... টাসিতস্‌-এর কৃপা কখন বর্ষে তার ভরসায় হাঁ করে বসে থাকলে চলবে না।'

'বাবা আরো কী বলেন জানিস? বলেন উদ্যোগিনঃ পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তী। এর মানে হচ্ছে...'

'বলতে হবে না, আমি জানি। দৈবের কৃপায় কিছুই মেলে না, সব কিছুই চেষ্টা করে পেতে হয়—এই তো। তোমার বাবার কথাই ঠিক।'

'তুই তো বলবিই। তোর কথার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে কি না! কিন্তু আমি ওকথা মানিনে। চেষ্টা করে কিছুই আমি কখনো পাইনি, যা আমি চাই—যা আমি পাবো বলে কখনো ভাবতেই পারিনি তাও কেমন করে কে জানে আচম্‌কা পেয়ে গেছি। দৈবাৎ আমি পেয়ে যাই।'

'দৈবাৎ পাও? দেবতার কাছে প্রার্থনা করে পাও? কোন্ দেবতার কাছে শুনি?'

'কোনো দেবতার কাছেই কিছু প্রার্থনা করিনে। এমন কি চাইতেও হয় না! এমনিতেই আসে...এই যেমন তুই! এলি না এই আমার জীবনে? ঠিক সেইরকমটাই।'

এমনিতেই মিলে যায়? তা কি করে হয়! হতে পারে কি কখনো? আশ্চর্য তো!'

'তাই তো দেখছি জীবনভোর। কবি তুলসীদাসের একটা কথা বলেন মা। যো যাকো শরণ লিয়ে/সো তাকো রাখে লাজ।/উলট্ জলে মছলি চলে/ভাসি যাওয়ে গজরাজ॥'

মার কাছে শোনা তুলসীদাসের দোঁহা-র গাওয়া আমার।

'তার মানে?'

'যে যার শরণ নেয় সেই তার লজ্জা বাঁচায়, রক্ষা করে। মাছেরা সব নদীর আশ্রিত তো? তারা বিপরীত স্রোত কাটিয়েও অনায়াসে কেমন উৎরে যায়। কিন্তু মহাশক্তিধর মদমত্ত ঐরাবতও স্রোতের মুখে পড় কুটোর মতন কোথায় যে ভেসে যায় তার হদিশ মেলে না। তেমনি কেউ যদি ঠিক ঠিক ভগবানের প্রত্যাশায় থাকে সে কখনো ভেসে যায় না, বুঝলি?'

পড়েলেও যায় না, ডুবেও যায় না ঠিকই সে ঠিকই, কিন্তু তার ঐ ভেসে থাকাটাই সার হয়। নাই বা সে ডুবলো, কোনোদিন সে কোথাও পৌঁছতেও পারে না কখনো, তাও ঠিক। তুমি কি ফকির বৈরিগী ভিখিরিদের দ্যাখো নি, খালি ভগবানের প্রত্যাশায় হাঁ করে বসে থেকে কী দশা হয়েছে তাদের?'

'দেখব না কেন? মামাকেই দেখেছি আমার। ভালো চাকরি করতেন কোন্ সদাগরী আপিসে, সুখদেব না দুখদেব কোন এক গুরুর পাল্লায় পড়ে চাকরি-বাকরি ছেড়ে ছুড়ে হরিনাম কীর্তনে মেতেছেন, আর সেই গুরুদেবটা তাদের আশ্রমে চাকরের মত খাটাচ্ছে তাঁকে—তার মতন আরো সব শিষ্যদের—বিনা বেতনে খানসামাগিরিতে। কী দুর্দশা যে তাদের কী বলব। মামাকে আমি বলেছিলাম কৃষ্ণকে ভজে আর গুরুসেবায় মজে তোমার এ কী হাল হোলো মামা। মামা আবার তাঁর সাফাই গান—যে করে আমার আশ/করি তার সর্বনাশ॥/তবু যদি না ছাড়ে আশ/হই আমি তার দাসের দাস।'

'তাতে লাভ? কী এলো গেলো আমার?'

'তাই ত বলে কে? আমারই বা দাস হবার দরকার কী তাঁর, আর তাঁকেই বা দাসের দাস বানিয়ে কী চতুর্বর্গ লাভ আমার? তোর কথাটা যে মিথ্যে তা আমি বলিনে। তবে আমি ভগবানের ভরসা করিনে রে। ভগবানের দ্বারা কারো কখনো কিছু ছাড়া হতে আমি দেখিনি। তাঁর কাছে হাকার প্রার্থনাতেও কচু হয়। আমি তাঁরই প্রত্যাশা করি ভাই, সবাই যাঁর প্রত্যাশায় এমনকি ঐ ভগবানও, স্বয়ং শিবও যার দুয়ারে ভিখারী।'

'কার?'

'আমার মার। আমার মা, তোর মা, আমার মারও মা, সবার মা, সারা বিশ্বের মা বিশ্বজননীর। তাঁকে ডেকে কেউ কখনো ভিখিরী হয়ে যায় না, না চাইলেও তিনি তোর দু হাতের মুঠো ভরে দেবেন মুহুর্মুহু দশ দিক থেকে দশ হাতে। তাঁরই ভরসা করি আমি। করবও চিরকাল।'

'আমার বাবা কী বলেন জানো? ভগবানকে ডাকো—তাঁর কাছেও চাও, আবার সেই সঙ্গে তোমার প্রাণপণ চেষ্টাও চালাও—দুইই চালিয়ে যাও—তবেই হবে তোমার। কে একজন জেনারেলও এই কথা বলে গেছেন নাকি। 'প্রে টু গড বাট কীপ ইওর পাউডার ড্রাই—যদি-যুদ্ধে জিততে চাও। সংসার সংগ্রামেও ঠিক সেই কথাই।'

'তোর কথাটা মিথ্যা না, তোর বাবার কথাও সত্যি। জেনারালি কথাটা খাটে কিন্তু সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে না? সত্যকে যা প্রমাণ করে? আমি আমার মার কথাটাই মানব। কথাটা আমার মনের মত।'

'তার মানে কথাটায় তোমার কর্তৃত্বের সায় পাও কিনা। মোটেই খাটতে চাও না তুমি। তোমার মা-ই তোমার মাথা খেয়েছেন বুঝতে পারছি।'

'আর আমার মা কী বলে জানিস? তুই-ই আমার মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেয়েছিস। বাঁধিয়েছিস আমাকে।'

সবার মা-ই সেই রকম বলে। সব মা-ই একরকম। তাঁরা নিজের ছেলেমেয়ের কোনো দোষ দেখতে পান না বিশ্বাস করেন না—পরের ছেলেমেয়েদের দায়ী করেন তার জন্যে। জানি আমি।...বেশ ত, তোমার মার কথাটাই মানো না।...সেই বিশ্বমায়ের ওপর ভরসা রেখেই ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার ওষুধটা নিয়ে আসিগে। ভয়টা কিসের? তিনিই দশ হাতে আমাকে সামলাবেন—দেবেন তাঁরেন সবার খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে, তোমার হাতে তুলে দেবেন শেষ পর্যন্ত।'

'তা তুই যাই বল, তোর কথায় আমি ভুলছি না। ছাড়ছিনে তোকে। তুই এখানে থাক—আমার কাছটিতে বসে। মার কথা-মতন আমি সেই মার ভরসাতেই থাকি বরং, দ্যাখ তুই, আমি বিনা চিকিৎসায় কোনো ওষুধ বিষুধ না খেয়েই সেরে উঠি কিনা। তাহলে তো তখন বিশ্বাস হবে তোর?'

'নেচারও সারে। সারে না কি? বাবা বলেন, ন্যাচারালিও সারা যায় কিন্তু ভুগতে হয়। ওষুধ থাকতে অকারণে ভোগবার দরকারটা কি?'

'মাই বল আর নেচারই বল তার ভরসায় থেকে বরং নাচার হবো তবু কারো ভরসাতেই তোকে আমি ছাড়তে পারব না। আমি জানি, দোকানটা তোর জন্যে ওৎ পেতে আছে বাইরে। হাড়ে হাড়ে শয়তান। তাকে আমি চিনিনে!'

'সব ছেলেই তোমার মতন নয়। উদার মন অনেকের। কেন, অন্য ছেলের সঙ্গে মিশলে কি আমি ক্ষয়ে যাবো নাকি? কই, আমি তো তোমার মতন নই। তুমি অন্য মেয়ের সঙ্গে মিশলে আমার তো কোনো রাগ হয় না, মনের কোণেও কোনো সন্দেহ জাগে না, হিংসে করে না মোটে।'

'মিশব যে, মেয়েটা কোথায়? তাহলে প্রমাণ পাওয়া যেত তোর কথার। হাতে হাতে বাজিয়ে দেখতাম।'

'মিশতে চাও তুমি?'

'মেয়ে কোথায় এই জেলে? আছে এখানে কোনো মেয়ে।'

'আছে বইকি। আমার মতই আছে কত। তোমরা ধরতে পারবে না। আমাদের চোখে ধরা পড়বে। ধরতে পেরেছি আমি কজনাকে। তারাও আমায় ঠাউরে নিয়েছে 'ঠিক!'

'বলিস কিরে? এখানে...' আমি জানতে চাই—'এসেছে কেন তারা?...দেশের জন্যে? নাকি, বন্ধুদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার নেশায়?'

'তারাই জানে! তবে তুমি যে বলো এই ব্যক্তিস্বাধীনতা সবাই চায় এমন কি ঐ মেয়েরাও। কেন, মেয়েরা কি ব্যক্তি নয়?'

'কে বলে নয়? তুই তো রীতিমতই এক অভিব্যক্তি!'

'আবার এমনও হতে পারে যাদের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল সেদিকে এখন মন নেই ওদের, এই সুযোগে ওই ছুতো করে পালিয়ে এসেছে বাড়ির থেকে...তুমি কি ওদের কারো সঙ্গে ভাব করতে চাও? চাও তো বলো।'

'আমি চাইলেই তারা চাইবে কেন ভাব করতে—ভূতের মতো চেহারা এই আমার সঙ্গে মিশতে কেন যাবে?' আমি নিশ্বাস ফেলি—'আমার সঙ্গে কোনো মেয়েই মিশতে চায় না—এমন কি তোর দিদিও নয়।'

'মেয়েরা চেহারায় ভোলে না গো। মন বুঝে মেশে। যার সঙ্গে মনের খাপ খায়

তার সংগেই মেশে তারা, বুঝেচ? তার সংগেই ঘর বাঁধে গিয়ে শেষটায়।'

'অতো মন বোঝাবুঝির গরজ নেই আমার। একে তো মেয়েদের মন বোঝাই যায় না লোকে বলে! বইয়েও লেখে তাই। এখন নতুন করে মেয়ের মন বুঝতে যাবার সময় নেই আমার! কাণ্টেসপ্টে যে একজনের একটুখানি বুঝতে পেরেছি তাই বজায় রাখতে পারলেই বাঁচি! ও! বুঝতে পেরেছি! আমি এদিকে নতুন মন বোঝার চেষ্টায় হয়রান হই গে, আর তুমি ওদিকে দেবেনের সঙ্গে গিয়ে ভাব জমাও! না বাবা, সেটি হচ্ছে না। গাছের ফলে হাত বাড়াতে গিয়ে হাতেরটা আমি খোয়াতে চাই না।"

"ঘাবড়াচ্ছো কেন অতো? আমি তো হাতের পাঁচ, হাতেই আছি, যাচ্ছি কোথায়? যেমন তলারটা কুড়োবে তেমনি গাছেরটা পেলে আরো ঢের মজা না? তাছাড়া তারা প্রত্যেকেই খুব সুন্দর—আমার চেয়েও। দারুণ সুন্দর সব! দেখো তুমি।'

'সুন্দর না ছাই। আমি কারো সংগে আলাপ করতে চাইনে। দেখতেও না।'

'মেয়ে যে তা তুমি টের না পেলেও সুন্দর যে সেটা দেখলেই মালুম হবে—ওই ছেলে সেজে থাকলেও। ওই তো একজনা ওধারে দাঁড়িয়ে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে রয়েছে এই দিকে—আমাদের দিকে নজর দিচ্ছে, চেয়ে দ্যাখো না!"

'আমার দরকার নেই দেখবার।' সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিই আমি—'একটি যে আমার আছে তাই বেঁচে বর্তে থাকলেই ঢের, তার বেশি আমি চাইনে। তুই ওদেরকে দেবেনের সঙ্গে ভাব করিয়ে দে বরং, দেখিয়ে দে দেবেনকে। যা শত্রু পরে পরে...ওদের ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে যাক আমার।'

'আমার দরকার করবে না দেখাবার। দেখবার হলে তারাই নিজেরাই ঠিক দেখে নেবে।' বলে সে নিশ্বাস ফ্যালে—'ভালোই করছিলাম তোমার, আরো আরো মেয়ের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিচ্ছিলাম কেমন। বোনের কাজ বন্ধুর কাজই করছিলাম। অনেকের সঙ্গে আলাপ হলে তুমি নিজের মনের মতটিকে খুঁজে পেতে তার ভেতরে...সুখী হতে পারতে হয়ত একদিন...'

'আবার সেই এক কথা! বলছিনে, সুখী হবার আমার দরকার নেই। এই বলে ভুলিয়ে তুই যদি আমায় ছেড়ে যেতে চাস, তোকে অতো করে বোঝাতে হবে না, এমনিই সোজাসুজি চলে যা। আমার ঘাড়ে আর কাউকে গছিয়ে দিয়ে যেতে হবে না।' আমিও নিশ্বাস ফেলি—'তোকে না পাই নাই পাবো, আর কাউকে আমি চাইবো না। চাইও না। কক্ষনো নয়।'

'আমি ঠিক তোমার মনের মতটি নই, আমি জানি—কিন্তু তুমি তা জানো কি? এখন না জানলেও আর সবার সঙ্গে মিশলে তুলনায় জানতে পারতে তখন। জানো, আমাকে চাইলে পরে অনেক কষ্ট পেতে হবে তোমায়। আমায় নিয়ে দুঃখ দুঃখ আছে তোমার বরাতে—অনেক ভোগান্তি জীবনে...'

'আমি জীবনের মত চেয়েছি কি? তুই তো বোনের মতই হতে চেয়েছিস—তাহলে আর দুঃখটা কোথায়? বোনরা কি কষ্ট দেয়? বন্ধুর মত পেলেই আমার ঢের।'

'সেভাবে পেতে হলেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে তোমাকে। আমার মনের মতটি হতে হবে তোমায়। বন্ধুরাও বেশ কষ্টদায়ক হয়—তা জানো? যে বন্ধু তোমার সত্যিকার ভালো চাইবে সে তোমায় দুঃখ না দিয়ে পারবে না। আমার বন্ধু হতে হলে গোড়াতেই তোমায় আলসেমি ছাড়তে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, পরের প্রত্যাশায় থাকলে চলবে না...'

'আমি মোটেই অপরের প্রত্যাশায় নেই। পরের কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করিনে, যদি করি তো কোনো পারির...'

'কথা ঘোরালে চলবে না। একটু আগেই তুলসীদাসী দোঁহা আউড়ে কতো কী গেয়েছো, ভুলে গেলে এর মধ্যে? তুমি পরের ভরসাতেই থাকো কি ঐ পরংপরের ভরসাই রাখো, ফল একই। তোমার ভবিষ্যৎ ফর্সা। স্বখাত সলিলে ডুবে মরলে জগন্মাতাও দশ হাতে তোমায় টেনে তুলতে পারবেন না। কোমর বেঁধে তাঁর শরণ নিয়েই যদি ডোবো, তাহলেও নয়।'

'জগন্মাতা তার আগেই বাঁচাবেন আমায়, নির্ঘাৎ জানি। খাত কাটতেই দেবেন না আমাকে। স্বখাত হলে তবে তো সলিল জমবে, ডুবে মরতে হবে? সেই খাল কেটে

কুমীর আনতে আমার দিচ্ছে কে?' আমি কই : 'তাহলে তুই গাইতিস কেন চাঁদলে— নিশিদিন ভরসা রাখিস/ওরে মন হবেই হবে/যদি তুই পণ করে থাকিস/সে পণ তোর রবেই রবে॥/গাইতিস কেন তাহলে?'

'ওসব হচ্ছে ভাবের কথা—কাব্যে গানেই শোভা পায়। উচ্চ কথারা যতো তুচ্ছ কথাই। অভাবের মুখে পড়লে কোথায় যে এ সব

তত্ত্ব উড়ে যায় তার পাত্তাই মেলে না।'

'এত সব তুই শিখলি কি করে? কোথ্থেকে? ভারী যে পাকা পাকা বুলি ঝাড়চিস?'

মেয়েরা অনেক কিছুই জানে, মনেতে চেপে রাখে, মুখের বাইরে আনে না। সব সময় তাদের চোখ কান খোলা থাকে তা জানো? চারদিকে নজর রাখে, দেখে শিখতে পারে তারা। ছেলেদের সেখানে ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়। ঠকে ঠকে শেখে তারা। তাই বলছিলাম, যদি জীবনে কোথাও ঠেকতে না চাও, ঠকতে না চাও তাহলে আগে নিজেকে মানুষ করে গড়ো, তারপর অপরকে মানুষ করো, দেশের সেবায় লাগো।'

'কি রকম মানুষ হতে বলছিস তুই? কার মতন মানুষ?'

'কেন ঐ সুভাষ বোস, কি ঐ দেশবন্ধু! আগে হয়েছে, পেয়েছে—তারপরে দিয়েছে বিলিয়েছে। তোমার কোনো কিছুর পুঁজি নেই—না স্বাস্থ্য না অর্থ না বিদ্যে—এই দুনিয়ার মানুষ হয়ে তুমি দুঃখ পাবে দুঃখ দেবে দুঃখ বাড়াবে পৃথিবীর। ষোলো আনা হয়নি যে, নেই যার, সে কি ষোলো আনা দিতে পারে? এইভাবে চললে দেখো তোমার হাঁড়ির হাল হবে একদিন। তোমার দুঃখে দেশের শেয়ালকুকুর কাঁদবে।'

শুনে আমি চুপ করে থাকি, জবাব-দিহির ভাষা খুঁজে পাই না।

'রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি! যাই আমি, ওষুধটা নিয়ে আসি গে তোমার। চুপটি করে শুয়ে থাকো ততক্ষণ। আমি যাবো আর আসব।'

'না, আমিও তোর সঙ্গে যাব তাহলে ডিসপেনসারিতে।'

'না। তোমার গিয়ে কাজ নেই। নড়া-চড়ায় জ্বরটা বাড়বে। বাবা বলেন ইনফ্লুয়েঞ্জায় কমপ্লিট রেস্ট। আমি তোমার সীমটম্ বলে ওষুধ আনতে পারব। ডাক্তারের মেয়ে না আমি? ওষুধ চিনি।'

'কিন্তু ওই দেবেনটা যে ওৎ পেতে আছে ওখানে...।'

'দেবেন মোটেই ওখানে বসে নেই। ছেলেরা ছটফটে হয়—জানো না? দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এক জায়গায়? কোথায় চলে গেছে এতক্ষণ। দেবেনের সঙ্গে আমি মিশব না, তাকে আমার সঙ্গে মিশতে দেব না কথা দিচ্ছি, গায়ে পড়ে মিশতে এলেও আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাবো তক্ষুনি।'

'বেশ, যা তুই। কিন্তু যদি সে এই ফাঁকে একটুখানিও মিশে নেয় আমার কত ক্ষতি হবে যে...! সেই ক্ষতিপূরণ কে দেবে আমায়? সেই ক্ষতিপূরণটা দিয়ে যা তুই তা হলে।'

'পরে দেব। রাত্তিরে। মাঝ রাত্তিরে সবাই ঘুমোবার পর—সেই কালকের মতন...।'

'না। এখন। আগাম চাই। বেশি না, মোটমাট পাঁচটা। তা না হলে ছাড়ব না...'

'চার দিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছে দেখেছো? এর ভেতর মেয়েরাও সব রয়েছে...বেশি বেশি নজর দিচ্ছে তারাই... না, তুমি যতই বলো, তাদের সামনে নিজের মান আমি খোয়াতে পারব না। কিছুতেই না। তারা কী ভাববে বলো তো!'

'তবে তোর ভাবনা নিয়েই তুই থাক্। ওষুধ আনতে গিয়ে কাজ নেই তোর। শান্তিতে মরতে দে আমায়।'

'আচ্ছা চুমুখোরের পাল্লায় পড়লাম তো! কী মুসকিলেই যে পড়েছি...।'

বয়সে বড়ো একজনা যাচ্ছিলেন আমাদের তাকের পাশ দিয়ে। রিনির কথায় থমকে দাঁড়ালেন—'কী হয়েছে? কী মুসকিল! কিসের মুসকিল শুনি?'

'দেখুন না, কাল রাত্তিরে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে দাদার, জেলের হাসপাতালে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে আসব, কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না আমাকে...বলছে তুই থাক এখানে। এদিকে দেখুন! দাদার গাটা কী গরম হয়েছে যে!...'

বলে সে তার গালটা আমার কপালের ওপর এনে রাখল—'ইস্! পুড়ে যাচ্ছে আমার মুখখানা! কী গরম!'

তারপর কপালটোলার থেকে নেমে তার মুখ আমার গালের ওপর এসে থামল, ইস্ট গালুডি স্টেশন থেকে গালুডি ওয়েস্টে চলে গেল সটান—মাঝখানের মধুপুর জংশন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ছুঁয়ে জানান্ দিয়ে—একবার নয়, এমনি পাঁচবার।

রেলোয়ের ভূগোলে এমনটা ঠিক না মিললেও সেদিনের গণ্ডগোলে কেমন করে যেন মিলেছিল? ভেবে এখন অবাক হই।

যে নাকি এতক্ষণ ধরে এত ওজোর করছিল, এতজনের নজরের পরোয়া ছিল যার, সেই কিনা এখন এক দাদুতুল্য লোকের চোখের ওপর অকাতরে অম্লানবদনে...এক লহমার এক ম্যাজিক দেখিয়ে দিল যেন!

আশ্চর্য এক ভেল্কি খেলাই দেখলাম।

(ক্রমশ)

॥ নয় ॥

উইসবাডেনে একদিন কুরহাউস দেখতে যাওয়া হল। কার্লোভি ভারিতে নেতাজী থাকতেন একটা কুরহাউসে, বাদগাসটাইনে যে কুরহাউসে থাকতেন তার নাম কুরহাউস হকল্যাণ্ড। কুরহাউস ব্যাপারটা কি একবার দেখবার শখ ছিল। কুরহাউস অনেকটা ক্লাবের মত। উইসবাডেনের এই কুরহাউসে উষ্ণজলের ঝরনা থেকে পান করার ও স্নান করার ব্যবস্থা রয়েছে। কুরপার্কে প্রাঙ্গণে রয়েছে নাচ-গানের ব্যাণ্ড বাজাবার আয়োজন। ভিতরে আছে কনসার্ট হল, কনফারেন্সের ঘর। একদিকে বড় হল ঘরে লাইব্রেরী—রিডিং রুম, কেউ সিরিয়াস পড়াশোনা করছে, কেউ বা পড়ছে খবর কাগজ। অন্যদিকে একটা বড় হল ঘরে জুয়াখেলা বা গ্যাম্বল করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

ফ্রাংকের মাঝে মাঝে মাথায় কি সব আইডিয়া ঢোকে। বললেন, এসো গ্যাম্বল করা যাক। অনেক কষ্টে ওকে নিরস্ত করা গেল। ফ্রাংকের অন্য প্যাশন হচ্ছে যোগ ব্যায়াম করা। রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই শীর্ষাসন করে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন ঘড়ি ধরে বেশ কিছুক্ষণ। আমাকেও উনি এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছিলেন। মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকার উপকারিতা সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চলেছিলেন। যোগ সম্বন্ধে ওঁকে প্রথম উৎসাহিত করেন নেতাজী, সেই থেকে উনি নিষ্ঠা সহকারে যোগ করে যাচ্ছেন।

গ্যাম্বল্ করা ও শীর্ষাসন করা দুটো থেকেই আমি ফ্রাংককে নিরাশ করলাম। এবার ধরলেন তবে সাঁতার কাটতেই হবে। ফ্রাংক-দের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই হবি বা বলা যেতে পারে "ফ্যাড" হল সাঁতার কাটা। উইসবাডেন শহরের কাছেই পাহাড়ের ওপর ওপেলবাদ—চমৎকার সুইমিংপুল। তার একপাশে একটা রাশিয়ান চ্যাপেল, অতি সুন্দর সোনালী গম্বুজ। এখানে এক ডাচেসের সমাধি আছে—তিনি রাশিয়ার কোন এক জারের কন্যা না ভাইঝি। ওপেলবাদ ছাড়া ফ্রাংকরা ধরে নিয়ে গেল শ্লাংগেনবাদ—অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক বনা জোয়ার মধ্যে মানুষের হাতের আধুনিক সুইমিং পুল। দিনটা ছিল ছুটির দিন। সেদিন বুঝলাম শুধু ফ্রাংকদের নয়, উইসবাডেন শুদ্ধ লোকের সাঁতার কাটার 'ফ্যাড' আছে। শ্লাংগেনবাদের কাছাকাছি মোটরগাড়ির সুদীর্ঘ কিউ, শামুকের মত শ্লথগতিতে এক-পা করে অগ্রসর হচ্ছে যত সব প্রচণ্ড বেগবান গাড়ি।

শামুক বলতে মনে পড়ল। উইসবাডেনের ফ্যাশনেবল সুইস রেস্তোরাঁ 'মুভেনপিক'এ শামুক বা snail-এর ডিশ খুব ভাল। মিসেস্ ফ্রাংক একদিন খেতে গিয়ে অর্ডার করলেন। আমি অবশ্য ভয়ে ভয়ে সনাতন টার্কিই ধরে থাকলাম, ফ্রাংক পছন্দ করলেন খরগোশ। উইলহেলম্ স্ট্রাসেতে বেড়াতে বেড়াতে রিটায়ার করে উইসবাডেনে এসে বসবাস করলে কেমন হবে ফ্রাংকের সঙ্গে সেইরকম সিরিয়াস আলোচনা চলতে লাগল।

ফ্রাংকফুর্টের গ্যেটে হাউস একদিন দেখতে যাওয়া হল। য়ুরোপ-আমেরিকায় এই লাইফ মিউজিয়মগুলি দেখলে অনেক কিছু শেখা যায়। আমাদের ভারতীয়দের ইতিহাসচেতনা সাধারণত বেশ একটু কম। ১৯৫৭ সালে যখন নেতাজী ভবনে প্রথম নেতাজীর ব্যবহৃত ঘরগুলি জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত করে নেতাজী মিউজিয়মের সূত্রপাত, তখন আমাদের জাতীয় নেতাদের ওপর জীবনী-মিউজিয়াম গড়বার চেষ্টা সেই প্রথম। তার কিছুকাল পরে গান্ধী মিউজিয়ম ও আরো অনেক পরে তিনমূর্তিতে নেহরু মিউজিয়ম। আজকাল আমরা আগের চাইতে অনেক বেশী ইতিহাস সচেতন হয়েছি।

এ ব্যাপারে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মতামত অবশ্য একটু অন্যরকম ছিল। উনি কাজের মানুষ। জীর্ণ, পুরাতন কিছু পেলেই ভেঙে ফেলে সেখানে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চাইতেন। দেশবন্ধু বাসভবন ভেঙে চুরে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হয়েছে, উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহ খুবই মহৎ। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের বাসভবনের ঐতিহাসিক চেহারাটি আজ আমরা তো আর দেখতে পাব না। একবার মনে পড়ে কি উপলক্ষে নেতাজী ভবনে এসে বিধান-বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাঁকডাক দিয়ে বলেছিলেন—ওহে, এসো এ বাড়িটা ভেঙে ফেলা যাক। ওঁকে বুঝিয়ে বলা হল এর ঐতিহাসিক চেহারা যথাসাধ্য বজায় রেখে এর সংস্কারসাধন করতে হবে, ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়।

যাই হোক, গ্যেটে ভবনে ঢুকেই চমকে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই সামনের ঘরটিতে স্বয়ং গ্যেটে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। চোখ রগড়ে আর একবার তাকালাম। ভাবলাম এও হয়ত এদের মিউজিয়ামেরই অঙ্গ। কিন্তু তা নয়,

পাশের ঘরে একটি সিনেমার ইউনিট শুটিং এর জন্য তৈরী হচ্ছে। গোয়টের আদলে নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী হবে একটি।

"বন-এ আমাদের জন্য ঝড় অপেক্ষা করছে, ঝড়"—বলতে বলতে ফ্রাংক আমাদের নিয়ে উইসবাডেনে রাইন নদীর তীরে স্টীমার ঘাট থেকে জাহাজে উঠে পড়লেন। কলকাতায় আমরা একবার ফ্রাংককে নিয়ে গঙ্গায় স্টীমার-ট্রিপে গিয়েছিলাম। ফ্রাংক বললেন—তোমাদের গঙ্গার স্টীমার-ট্রিপের মতই—তবে লিটল্ মোর মডার্ন। লিটল্ মোর মডার্ন বলতে অনেকখানিই মডার্ন। আমার তো কলকাতার সেই ট্রিপের কথা মনে করে একটু লজ্জাই করতে লাগল।

উইসবাডেন থেকে বাডগোডেসবার্গ রাইন নদীর ওপর দিয়ে এ জলযাত্রা অনেকদিন মনে থাকবে। দুধারে ঘন সবুজ পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে আঙুর খেত। মাঝে মাঝে রোদ পড়ে খেতের গায়ে আয়নার টুকরোর মত কি যেন ঝকমক করে উঠছে, শুনলাম পাখি তাড়ানোর নানারকম ফাঁদ। এক এক পাহাড়ের চূড়োয় পুরোনো আমলের ভাঙা দুর্গ বা প্রাসাদের অবশেষ। জাহাজের ডেকে রঙবেরঙের পোশাক পরা নরনারীর মেলা। ভাঙা দুর্গের পাশ দিয়ে জাহাজ যাবার সময় যাত্রীদের মধ্যে ছবি তোলার হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় দু পাশের দৃশ্যাবলীর উপর ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছে। নদীর ধারে ছোট ছোট শহর। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মত জাহাজ টিকটিক করে থামতে থামতে চলেছে। কেউ কিছু লোক জাহাজ থেকে উঠছে বা নামছে। নদীটির দুপাশে রেলের লাইন। ট্রেন চলে যাচ্ছে যাত্রী বোঝাই, আমাদের দিকে হাত নাড়ছে সবাই। বেলা যত বাড়ছে যাত্রীদের মনের স্ফূর্তি তত বাড়ছে মনে হল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও অফুরন্ত রাইন ওয়াইন এই স্ফূর্তির জন্য কতটা দায়ী তা নির্ণয় করা শক্ত।

সকালটা মিঠে রোদ্দুরে খোলা ডেকে ডেক চেয়ার পেতে বসে কাটল। মাঝে মাঝে জাহাজ তীরে ভিড়ছে যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখছি। বিংগেন, রুডেশাইম, বাখারাখ, অবেরওয়েসেল, বোপার্ড—কত অপরিচিত নামের বন্দর পার হয়ে চলেছি। লরেলেই (Loreley) কাছে নদীর বাঁকে সব যাত্রীরা সমস্বরে গান ধরল, হাইনের বিখ্যাত এক গান। ফ্রাংক নীচু গলায় গানের ভাবটুকু আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল—সুন্দরী তার সোনালী চুলের পরিচর্যা করছে—সেদিকে চেয়ে মাঝি আর নৌকো সামাল দিতে পারছে না। St Goar শহর পার হতে রোদ কড়া হয়ে উঠল। সকলেই উঠে একে একে ডাইনিং হল-এ আশ্রয় নিতে শুরু করল। আমরাও কাচের জানলার

পাশে একটা টেবিল বেছে বসলাম। কাচের ভিতর দিয়ে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে ধীরে সুস্থে খাওয়া দাওয়া গল্প চলতে লাগল। কফি খেতে খেতে বেলা বাজল তিনটে। ইতিমধ্যে আমরা কোবলেনজ (coblenz) পৌঁছেছি। রাইন নদী আর মোসেল নদীর সঙ্গমস্থল এই কোবলেনজ।

এতক্ষণে রোদ্দুরের তেজ কমেছে মনে করে ডেকে ফিরে এলাম। রোদের তেজ কমেছে বটে, কিন্তু যাত্রীদের উচ্ছ্বাস বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। ডেকের ওপর উদ্দাম নৃত্য হচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়, অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ের অনেকটা আমাদের কীর্তনের খোল বাজিয়ের মত ভাবাবেগ এসেছে মনে হল। যারা নাচছে না তারা গলা ছেড়ে গান ধরেছে—গেলাস-ধরা মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে। দু-একটা গানের টুকরো মনে পড়ে—

Warum ist es am Rhein so schön
—why is it so beautiful on the Rhein ?

সকলেই ক্ষেপে গেছে। এক বর্ষীয়সী ভিনি ও হাত জোড় করে সারা গলায় সুরের ঢেউ খেলাচ্ছেন। এককালে নিশ্চয় সুগায়িকা ছিলেন। গান গাইতে গাইতে আমার কাছে এসে শাড়ির আঁচল স্পর্শ করে বললেন—জাপান, জাপান? আমি হেসে বললাম, ইণ্ডিয়া। সেও হেসে বললে, ইয়া, ইয়া ইন্দিরা গান্ধী।

ডেকের বাইরে চোখ ফেরালে প্রকৃতির অন্য চেহারা। সূর্যের পাটে বসছে, আকাশের একদিকে রক্তিম আভা। নদীর জলে তারই প্রতিফলন। কোবলেনজের পর নদীর দুধারে পাহাড়-পর্বত আর বিশেষ দেখা যায় না, সমতল। মাঝে মাঝে ছোট্ট পাহাড় দু-একটা যা চোখে পড়ছে ক্ষীয়মান দিনের আলোয় তাদের রঙ দেখাচ্ছে কাচের সবুজ।

সাড়ে চারটে নাগাদ বাডগোডেসবার্গ পৌঁছে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কোবলেনজেই শুনলাম আমরা ঘণ্টা দেড়েক লেট চলেছি। ফ্রাংক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বন-এর প্রোগ্রামে লেখা আছে—জাহাজ থেকে নেমে দু' ঘণ্টা বিশ্রাম তারপর কাজ শুরু। ফ্রাংক বললে—দেখলে, বিশ্রামের দু ঘণ্টা কাটা গেল, গিয়েই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমার অবশ্য এই 'ড্রাকেনফেলস' জাহাজে বাড়তি দুঘণ্টা কাটাবার প্রস্তাব ভালই লাগল।

ধীরে ধীরে নীচের ডেকে নেমে এসে দাঁড়ালাম। বাডগোডেসবার্গের ঠিক আগে কনিগসউইন্টার-এ অল্পক্ষণের জন্য জাহাজ ভিড়েছে। অল্প কিছু লোক নামছে। আমার চোখ পড়ল একটি দম্পতির ওপর—সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী

জার্মানীতে ত্রিশদশকে নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডাঃ লোথার ফ্রাংকের সঙ্গে লেখিকা

মহিলাটি রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, ভদ্রলোকটি বিদায় নিয়ে নেমে যাচ্ছেন। এক একবার কিছুদূর গিয়েও আবার ফিরে আসছেন। বিদায় নিতে মন যেন চাইছে না, খুবই করুণ, অন্তরঙ্গ বিদায় দৃশ্য। মনে হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদ ভাবনায় দুজনেই কাতর। অনর্গল জার্মান ভাষায় দুজনে কি বলছে আমি তার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তবুও আমার চোখ সজল হয়ে আসছিল। এমন সময় ফ্রাংক আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে—এদের দুজনের এই জাহাজের ডেকেই প্রথম দেখা ও পরিচয় এবং এই সম্ভবত শেষ, কারণ দুজনেরই যার যার ঘর সংসার আছে। আজকের এই জার্নি পরস্পরের সান্নিধ্যে খুব মধুর কেটেছে—এই কথা বলে দুজনে বিদায় নিচ্ছে। আমি যদিও মুখের ভাব নির্বিকার করে রেখেছিলাম তবুও ফ্রাংকের কি মনে হল একটু হেসে বললে, কলকাতায় তুমি অনেক বেঙ্গলী লাইফের নমুনা আমাকে দেখিয়েছ, তা আজকে এই জলযাত্রায় তুমিও কিছু জার্মান লাইফ দেখবার সুযোগ পেলে।

একটা বিরাট সাদা অট্টালিকার পাশ দিয়ে তীর ঘেঁষে আমাদের স্টীমার চলেছে। ফ্রাংক আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—ওই হোটেলে আমরা উঠব। বড় বড় করে লেখা চোখে পড়ল—হোটেল ড্রেজেন।

হোটেল ড্রেজেন সকলেরই বলে হিটলারের হোটেল। হিটলার যখনই বন-এ আসতেন তখন এই হোটেলে থাকতেন। রাইন নদীর তীরে এই সুরম্য হোটেল হিটলারের প্রিয় ছিল। এ কথা শুনে আমরা কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চিত হলাম যখন শুনলাম হোটেলের ব্যাংকোয়েট হল-এ যেখানে নেতাজী সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে, সেখানে হিটলারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হত। হোটেলের ঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়ালে যতদূর দেখা যায় চোখে পড়ে রাইন নদী বয়ে চলেছে। অবশ্য সে দৃশ্য যে কদিন ছিলাম উপভোগ করতে সময় পাইনি এক মুহূর্তও। মূল সম্মেলন ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে এমনি ঠাসা প্রোগ্রাম ছিল।

হোটেল ড্রেজেন পার হবার অল্পক্ষণের ভিতর বাডগোডেসবার্গ স্টীমার ঘাটায় তরী ভিড়ল। দূর থেকেই পারে দাঁড়ানো থাকা মানুষের ভীড়ে ডাঃ আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থকে চোখে পড়ল। আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে সত্যু সমস্তভাবে ডাঃ ওয়ার্থ বললেন, মুখ হাত ধুতে, আর পোশাক বদলাতে আধ ঘণ্টা সময় নিতে পারি, মিসেস বোস, তার বেশী নয়। ভয়ানক লেট হয়েছে তোমাদের, সমস্ত কাজ অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য। ফ্রাংক আমার দিকে চোখ টিপলে, ভবখানা এই—আগেই বলছিলাম কিনা বন-এ কাজ অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য, কাজ।

(ক্রমশ)

সংবাদ ভাষ্য

পাইওনিয়ার-১ এখন সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির দিকে এগিয়ে চলেছে। শিল্পীর তুলিতে ওই গ্রহ এবং তার বৃহত্তম চারটি চাঁদ বা উপগ্রহ (বাঁ দিক থেকে) ক্যালিস্তো, ইউরোপা, আইও এবং গানিমিডকে দেখান হল। হয়েছে পাইওনিয়ার-১ বাইশ মাস পর বৃহস্পতির পরিমণ্ডলে গিয়ে উপস্থিত হবে। পৃথিবী থেকে যাত্রা শনিবার ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৭২

সবচাইতে তেজষ্ক্রিয় কণা

কে. ম্যাগা, এইচ সাকুইয়ামা, এস কোয়াগাচি এবং টি হারা—এই চারজন জাপানী পদার্থ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, সম্প্রতি তাঁরা সবচাইতে বেশি তেজষ্ক্রিয় মহাজাগতিক কণার সন্ধান পেয়েছেন। অন্ততঃ এর আগে এত বেশি শক্তিশালী কণার অস্তিত্ব আর কখনও ধরা পড়ে নি। এর জন্য দু হাজার মিটার লম্বা একটি সন্ধানকারী যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁরা দেখলেন ওই সন্ধানকারী যন্ত্রের উপর এসে ঠিকরে পড়ল ঝলকে ঝলকে এবং প্রচুর পরিমাণে গৌণ কণার বর্ষণ। যাদের দেখে মনে হয়েছে, অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন কোন কণিকার সঙ্গে বাতাসের বিভিন্ন গ্যাস-কণার সংঘর্ষের ফলেই তারা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মতে ওই কণার শক্তির পরিমাণ ৪×১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট। ইতিপূর্বে কয়েকজন বিজ্ঞানী পৃথিবীর গবেষণাগারে বসেই অত্যন্ত শক্তিশালী কণা তৈরি করতে সমর্থ হন। তাঁদের সেই কণার শক্তির পরিমাণ ছিল ৭×১০০০০০০০০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট। অতএব তুলনামূলকভাবে বলা চলে, নতুন আবিষ্কৃত কণা আগের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশি শক্তিসম্পন্ন। উল্লেখ্য, বায়ুশূন্য জায়গায় এক ভোল্ট পরিমাণ বিভব প্রভেদ অতিক্রম করাতে একটি ইলেকট্রন কণার যতটা শক্তির প্রয়োজন তাকেই এক ইলেকট্রন ভোল্ট বলা হয়।

বস্তুত অতি-শক্তিশালী কণার মূল উৎস সম্পর্কে পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানী আজও নিশ্চিত হতে পারেন নি। সুদূর মহাকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে। শুধু পৃথিবী কেন মহাকাশের সর্বত্রই তাদের অবাধ বিচরণ চলেছে। এই কণার বড় রকমের একটি অংশ অবশ্য যারা পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তাদের কথাই বলছি—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি, যারা মুখ্যত কোন কোন ধাতুর নিউক্লিয়াস বা পরমাণু-কেন্দ্র বাতাসের নাইট্রোজেন অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাসের কণাকে আঘাত করার পর দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি পর্যায়ে পরিণত হয়ে যায়। ক্রমে যতই তারা পৃথিবীর বুকের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, তাদের শক্তিও হ্রাস করে। কে. ম্যাগা, এইচ সাকুইয়ামা, এস কোয়াগাচি এবং টি হারা তাঁদের অনুসন্ধানকারী যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে তেজষ্ক্রিয় বর্ষণের পৌঁছনোর সময় মেপে, ঠিক কোন্ দিক থেকে প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছিল তাও বের করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরা লক্ষ করেছেন, ওই দিক বরাবরই তখন অবস্থান করছিল 3C 409 এবং AP 2015+28। এদের প্রথমটি শক্তিশালী মহাজাগতিক বেতার-শক্তির উৎস। দ্বিতীয়টি পালসার। মহাকাশের ওই অঞ্চল থেকে হয়ত তারাই ওই অতিশক্তিশালী মহাজাগতিক কণা বিচ্ছুরিত করে।

আর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা এইভাবে কাজ করতে শুরু করল। অতি শক্তিশালী কণা বাতাসের প্রথম স্তরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তৈরি হল এক থেকে একাধিক কণা, যাদের বলা হয় সেকেণ্ডারি কসমিক রে বা গৌণ মহাজাগতিক রশ্মি। গৌণ কণিকারা ক্রমে পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে থাকে। সেই সঙ্গে চলে বাতাসের বিভিন্ন স্তরের বিরতিহীন ঘাত-প্রতিঘাত। অবশেষে পৃথিবীর বুকে এসে যখন পড়ে, তখন সংখ্যায় তারা অনেক বেশি বেড়ে যায়। ওই জাপানী বিজ্ঞানীরা তাঁদের অতি সংবেদনশীল যন্ত্রের চার জায়গায় বৃষ্টি নিরূপণ করেন। চার জায়গাতেই প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে কতগুলি কণা পড়েছে সেটা বের করে নেন। তারপর বিভিন্নভাবে হিসেব কষে লক্ষ করেন যে কণিকার তাঁরা সন্ধান পেয়েছেন তার সংখ্যায় ১০০০০০০০০০০০০০। অর্থাৎ এতগুলি কণা তাঁরা ধরতে পেরেছেন। এবং সম্ভবত তারা জন্মলাভ করেছে একটি মাত্র প্রাথমিক মহাজাগতিক কণার সংঘর্ষে। সেটি প্রোটন। এর আগে আরও এক ঝাঁক কণার তাঁরা সন্ধান পান। ওই ঝাঁকে মোট ৫×১০০০০০০০০০০টি তেজস্ক্রিয় কণা লক্ষ করা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাজাগতিক রশ্মি বা গৌণ মহাজাগতিক রশ্মির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ম্যাগা এবং তাঁর সহযোগীরা, যে প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি তাদের উৎপত্তির কারণ, তার যথাযথ শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। সংগ্রাহক যন্ত্-

পরমাণুকে মাটির নিচে রেখে তাদের সামনে লোহা এবং সিসের পুরু পাত বসিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এইভাবে তাঁরা কম শক্তি-শালী কণিকাদের পৃথক করতে সমর্থ হন। কারণ ওই প্রতিরোধ ভেদ করে তারা সংগ্রাহকের উপর গিয়ে পড়তে অসমর্থ হয়। এই পরীক্ষার সাহায্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের কণার উপাদান সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতেও তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। এতে দেখা গেছে ওই বর্ষণের মধ্যেকার সবচাইতে বেশি শক্তিশালী কণা মিউওন। এদের আর একটি নাম ভারী-ইলেকট্রন। কারণ ইলেকট্রন এবং মিউওন-এর চরিত্র প্রায় একই। আর বাতাসের মধ্যে প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমিক ভাবে যে কণিকা সকল পারমাণবিক বিভাজন সৃষ্টি করেছিল তার শক্তি ৪·১০০০০০০০০০০০০০০০০-০০০০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট।

বয়েস এবং স্মৃতিশক্তি

স্মৃতিশক্তি কি নেহাৎ মনমেজাজের উপরই নির্ভর করে? মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কোন কোন ব্যাপার আমরা ভুলে যাই, কারণ আমরা তাদের ভুলতে চাই। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁরা অপরের নাম মনে রাখতে পারেন না। কেউ কেউ আছেন, বিশেষ বিশেষ কোন ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই তাঁদের মনে থাকতে চায় না। কারণ স্বরূপ কেউ কেউ বলেন, আসলে কোন কিছু মনে রাখাটা, যিনি মনে রাখতে চান তাঁর মন-মেজাজ বা আগ্রহের উপরই নির্ভর করে। কেউ অংক মনে রাখেন, কারণ অংকে তাঁর আগ্রহ আছে, অংক তাঁর ভাল লাগে। কেউ কবিতা মনে রাখেন এবং বেশ পরিণত বয়েসেও গড় গড় করে একের পর এক সেগুলি আবৃত্তিও করতে পারেন। আবার অনেক তরুণদের মধ্যেও দেখা যায়, কবিতা মুখস্থ বা বিশেষ কোন লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেবার সময় তাঁরা রীতিমত হিমসিম খেয়ে যান।

কিন্তু মুশকিল হল, কী আপনার ভাল লাগবে, অথবা লাগবে না, সেটা নির্ধারণ করবে কে? এখানেও বলা হয়ে থাকে, আপনার মন-মেজাজ, কাজ কর্ম সব কিছুই নির্ভর করছে আপনার প্রবণতার ওপর। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, প্রবণতা মানুষের মৌলিক ধর্ম। অবশ্য মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও প্রবণতা আছে পরিবেশ যখন অনুকূল হয়, আপনার মনের প্রবণতা তখন অন্তঃসলিলা ভটিনীর মত উদ্দাম ধারায় বেরিয়ে আসে। এবং বিকশিত প্রস্ফুটিত হয়। আধুনিক জেনেটিকস নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁদের বক্তব্য, আমাদের কাজকর্ম বা চরিত্র, যা কিছু, তার সাতা-

কারের ধারক বা নিয়ন্ত্রক হল শরীরের কোষ-মধ্যস্থিত জিন। অর্থাৎ আপনার জ্ঞান লাগবে কী না, সঙ্গীতে আপনার মধ্যে কতখানি বা পারদর্শিতা কাজ করবে এবং ইত্যাদি, তার সব কিছুই নির্ভর করছে আপনার দেহ-কোষের জিনের চরিত্রের উপর। অর্থাৎ বংশসূত্রেই সঙ্গীতজ্ঞ বা গাণিতিকের যোগ্যতা নিয়েই আপনার এ পৃথিবীতে আবির্ভাব। অতঃপর পরিবেশ যখন অনুকূল হল, আপনার ভেতরকার মৌলিক গুণ বিকশিত হয়ে উঠল।

তবু মাঝে মাঝে সময়ের সেতু পেরিয়ে ক্রমে যতই আমরা এগোতে থাকি, কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব আমাদের গ্রাস করতে চেষ্টা করে। মনে হয় শরীরের শক্তিটা কেমন কমে আসছে। বিশেষ করে হামেশাই কোন কিছু মনে রাখার ব্যাপারে প্রায়শই আমাদের স্মৃতিভ্রম হয়, আমরা তখন চমকে উঠি। বয়েসটা তখন বড় বেশি মনের উপর খোঁচা মারতে শুরু করে। সংশয় হয়, এই বুঝি পৃথিবীর সব কিছু হাত ছাড়া হয়ে গেল। কম বয়েসে স্মৃতিশক্তি যতটা আমাদের ছিল সেটা এখন স্বাভাবিক কমে গেছে।

সম্প্রতি কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী অবশ্য কিছুটা আশার কথা শোনাচ্ছেন: তাঁরা বলছেন, স্মৃতিশক্তিটার অত সরলার্থ ধরছেন কেন? তাঁরা সাধারণ মানুষের স্মৃতিশক্তির প্রক্রিয়াকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করছেন। ব্যাপারটা এইরকম : প্রথমে কোন একটা ব্যাপার অনুভব করুন। তারপর ব্যাপারটা কী সেটা বুঝুন। এইবার তাকে বিশ্লেষণ করে শ্রেণীবিন্যাস করা এবং তার পুনরুদ্ধার। বয়েসের বাড় এবং মস্তিষ্কের অবক্ষয়, এর যে ক্ষতি তার দরুন এই পর্যায়গুলি ব্যাহত হতে পারে।

লন্ডনের বারবেক কলেজের ফারগাস ক্রেইক স্মৃতিশক্তিকে দুইভাগে ভাগ করে দেখেছেন। এক, প্রাথমিক স্মৃতি, যাকে বলা যায় প্রত্যক্ষ স্মৃতি। দুই, গৌণ বা পরোক্ষ স্মৃতি। সাময়িকভাবে যে সমস্ত ব্যাপার মনে রাখার কথা, প্রত্যক্ষ স্মৃতি সেগুলি ধরে রাখে। কিন্তু যেখানে কোন ঘটনা বা বিষয়কে দীর্ঘদিন মনের মণিকোঠায় সংরক্ষিত রাখার দরকার এবং প্রয়োজন মত তার পুনরুদ্ধার, সেখানে দায়িত্বটা গিয়ে পড়ে পরোক্ষ স্মৃতির উপর। ক্রেইক-এর বিশ্বাস, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই এই সংরক্ষণের ব্যাপারটা কমজোর হয়ে পড়ে বিশেষ করে সংরক্ষণের শক্তির উপর, সেটা যদি কোন কারণে অকেজো হয়ে যায় বা লোপ পায়, তখন। ক্রেইক দেখেছেন প্রত্যক্ষ স্মৃতির ক্ষেত্রে বয়স্করা কিন্তু তরুণদের মতই সমান সাড়া দেন। পরোক্ষ স্মৃতির বেলায় অবশ্য তারতম্য দেখা যায়। সম্ভবত এর কারণ, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা এবং কাজে মানুষ একপেশে হয়ে যায়। ফলে তার স্মৃতিশক্তিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কাজ করতে অক্ষম হয়।

মঙ্গলের বুকে অতিকায় এই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখটির ছবি তুলে পাঠিয়েছে মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-৯। আগ্নেয়গিরিটির নাম নিক্স অলিম্পিয়া। এর ব্যাস ৫০০ কিলোমিটার। উচ্চতা ৬ কিলোমিটার। শিলীভূত লাভার স্পষ্ট চিহ্ন এর চার পাশে ধরা পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চাঁদের চেয়েও মঙ্গলের গভীরতম অংশ অনেক বেশি তপ্ত। তবে সে উত্তাপ পৃথিবীর চেয়ে হয়ত কম

প্যারিসের দুজন মনোবিজ্ঞানী জে পটিরেনোউট এবং এম প্যারোত কয়েকজন বয়স্ক এবং তরুণকে কিছু শব্দ মুখস্থ করতে দেন। মুখস্থ করার দু ঘণ্টা পর যখন তাদের ওই শব্দগুলি আবৃত্তি করতে বলা হল, দেখা গেল উভয় গোষ্ঠীই সমানে আবৃত্তি করে গেল। এতে প্রমাণিত হয় তরুণ বয়স্ক উভয়েই কোন অভিজ্ঞতা, এক্ষেত্রে শব্দ মনে রাখা, মস্তিষ্কে সংরক্ষিত করার ক্ষমতা রাখে। তবে যাদের মস্তিষ্ক কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা এ ব্যাপারে দারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

আসলে ওঁরা বলতে চান, স্মৃতির সঙ্গে বয়েসের যে সম্পর্ক সেটা শারীরবৃত্তীয় ঘটনা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন কোন কোষ কমজোর হয়ে যেতে পারে। রোগে, আঘাতে বা অন্য কোন কারণে। ফরাসী বিজ্ঞানীরা আশা করেন এদের উপর যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে কোন মানুষের বার্ধক্য প্রকৃত না অস্বাভাবিক কোন কারণে ঘটছে সেটা বলে দেওয়া সহজ হবে।

নিউট্রিনোর ভর কত?

মৌল কণিকা নিউট্রিনোর ভর সম্পর্কে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীদের এতদিন যে ধারণা ছিল, এবার সেটা ভুল প্রতিপন্ন হতে চলেছে। বলা হয়েছিল নিউট্রিনোর স্থির-অবস্থাকালীন ভর বা রেস্ট মাস শূন্য। অর্থাৎ

এর ভর বলে কিছু নেই। কিন্তু সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, এক ধরনের নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তার ভর একটি ইলেকট্রনের ভরের চেয়েও বেশি।

দুই প্রকারের নিউট্রিনো আছে। এক ইলেকট্রন সংশ্লিষ্ট; দুই, মিউওন সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিউট্রিনোর সর্বোচ্চ ভর পাওয়া গেছে ১·৬ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। এবং প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই ভর ·৫১১ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট।

ঘন জল

হ্যাঁ, একেবারে সাধারণ জল থেকেই তৈরি। তৈরি করেছেন সোভিয়েত দেশের ভৌত রসায়ন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ঐ দেরইয়াগিন। সাধারণ জলকে তাঁরা প্রথমে বাষ্পে রূপান্তরিত করে নেন। পরে এই বাষ্পকে ঘনীভূত করে তৈরি করেন ঘন জল। নাম রাখা হয়েছে জল-২।

বিশেষ এই জলের বৈশিষ্ট্য : অনেক কম তাপমাত্রাতেও এই জল জমে বরফ হয় না, বা কেলাসিত হয় না। শূন্যের পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে শুধু কাচের মত জমে যায়। ৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম করলেও এর নিজস্ব ধর্মাবলী অপরিবর্তিত থাকে। তবে তার উপরে তাপমাত্রা তুললে সাধারণ জলে পরিণত হয়ে যায়।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বিশেষ ধরনের এই জল শীতের দেশের মোটরগাড়ির রেডিয়েটরে ব্যবহার করা যেতে পারে। তুন্দ্রা বা সুমেরু অঞ্চলে মোটর-ইঞ্জিন ঠিক রাখা এর দ্বারা সহজতর হবে। তবে সবচাইতে উপকৃত হবেন জীববিজ্ঞানীরা। কারণ জীব-কোষের উপর কোন পরীক্ষা সাধারণ জলের মাধ্যমে কম তাপমাত্রায় করা এখনও একটা বড় রকমের সমস্যা। শূন্য ডিগ্রির নিচে কোন কোষের তাপ নামলে সাধারণ কোষের মধ্যেকার জল জমে দানা বেঁধে কোষকে ভেঙে দেয়। কিন্তু যেহেতু, নতুন এই জল শূন্যের অনেক নিচেও তরল অবস্থায় থাকে, অতএব এই জলকে মাধ্যম করে এবার থেকে তাঁরা জীবকোষের তাপমাত্রা অনায়াসে অনেক কমিয়ে আনতে সমর্থ হবেন। তাতে পরীক্ষার কোষগুলি নষ্ট হবে না।

সংবাদ

পাঠ-বহির্ভূত বিজ্ঞান

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব একস্ট্রাকারিকুলার সায়েন্টিফিক অ্যাকটিভিটিজ-এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভায় ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ রামান্না পরিষদের আগামী বছরের সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত হলেন। পরিষদের আগামী দিনের

বিড়লা সংগ্রহশালার বিজ্ঞান মেলায় জনৈক ছাত্র তাঁর নিজের তৈরি মডেলটির কলা কৌশল দর্শকদের কাছে ব্যাখ্যা করছেন

কার্যক্রম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক আনন্দমোহন ঘোষ বলেন, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান-বিষয়ক জনপ্রিয় লেখা নিয়ে একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশের কথা তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন। এই সঙ্গে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রদর্শনী, আলোচনা প্রভৃতির আয়োজনও চেষ্টা করা হচ্ছে। পাঠ-বহির্ভূত বিজ্ঞান চর্চাকে কীভাবে কার্যকর করে তোলা যায়, সে সম্পর্কে মতামত এবং পরিকল্পনা পাঠানোর জন্যে বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-আগ্রহীদের আহ্বান জানান। ডঃ রামান্না বলেন, বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ আজ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঘটেছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে, আজকের জীবন কল্পনাই করা যায় না। স্কুলের নিম্নতম মান থেকে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী যাতে বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে পারে, সে ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া দরকার। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীসুভাষ রায়, শ্রীশংকর চক্রবর্তী, ডঃ জয়ন্ত-কুমার বসু, ডঃ দেবব্রত বসু, অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ জয়ন্তকুমার বসু বলেন, পরিষদের উচিৎ যে সমস্ত বিজ্ঞান সংস্থা শহরে এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে কাজকর্ম শুরু করেছেন তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং তাদের উন্নতির ব্যাপারে যতটা সম্ভব সাহায্য করা।

প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার উদ্যোগে ওই সংগ্রহশালার উদ্যানে একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞান-মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নয় দিনের এই মেলায় যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় তাতে কলকাতা এবং বাইরের মোট ৩৮টি স্কুল এবং ৪টি বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে। ১৮০টি মডেল এতে দেখান হয়। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী প্রভৃতি জেলার বহু মডেল দর্শকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মডেল তৈরির জন্যে প্রথম পুরস্কার পান সেন্ট টমাস স্কুলের ছাত্র অনাদি মুখোপাধ্যায়। এর জন্যে মাসিক তাঁকে পঁচিশ টাকা করে দু বছরের জন্য সি এস আই আর বৃত্তি অর্পণ করা হয় এবং এই সঙ্গে এক হাজার টাকার কিছু যন্ত্রপাতি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ট্রফিটিও তিনি লাভ করেছেন। দ্বিতীয় পুরস্কার পান কাঁথি উচ্চ বিদ্যালয়ের মন্টুকুমার মণ্ডল তাঁর হস্তচালিত তাঁত কলের জন্যে তিনিও দু বছরের জন্যে মাসিক কুড়ি টাকার বৃত্তি এবং ষাট টাকার যন্ত্রপাতি পেয়েছেন।

জেলায় অনুষ্ঠানাদির সংখ্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য মডেলের মধ্যে ছিল চক্র-যান, পাতাল রেল, শক্তির রূপান্তর, স্বয়ংক্রিয় ভূকম্পন মাপক যন্ত্র, অপটিক্যাল অসিলোস্কোপ, বুলেট ট্রেন, জলপথে শস্য চাষ ক্ষেত্র ইত্যাদি। প্রদর্শনী চলা কালে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিজ্ঞান-মেলাটির উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এন বসু ও অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিব শ্রী জে সি সেনগুপ্ত। পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম, অধ্যাপক এ কে সাহা এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালক অধ্যাপক এস এম সরকার। বিড়লা শিল্প-কারিগরি সংগ্রহশালার এ ধরনের উদ্যোগ জনপ্রিয় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারকল্পে যথেষ্ট সহায়ক হবে, সন্দেহ নেই।

সমরজিৎ কর

॥ ৩৮ ॥

অমূল্য প্রত্নশালা : রাজবলহাট

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় নমাস আগে বর্তমান সিরিজের প্রথম প্রবন্ধে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তুলেছিলাম। বলেছিলাম—"বাঙালীর ইতিহাস নাই"—বঙ্কিমচন্দ্রের এ খেদোক্তি হয়ত চিরকাল সত্য থাকবে না। আজ হোক, কাল হোক, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস নিশ্চয়ই লেখা হবে। সে মহৎ ও বিরাট কাজের উপকরণ সংগ্রহের এখনই সময়। আরও বেশি দেরী হয়ে গেলে সংগ্রহ করবার মতো কোন উপাদানই হয়ত অবশিষ্ট থাকবে না।" ঘরকুনো বুদ্ধিজীবী বাঙালী বা ছুটিছাটা যাঁরা বাংলার বাইরে কাটাতেই ভালোবাসেন তাঁদের দৃষ্টি গৃহমুখী করবার চেষ্টায় আরও বলেছিলাম—"এই বুদ্ধিজীবীদের বাংলাদেশের (এখন উভয় বাংলা অর্থে) গ্রাম-পরিক্রমায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে (যদি পারি) একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। এঁদের মধ্যে অল্পসংখ্যক পর্যবেক্ষকও যদি গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়ানো অপস্রিয়মান সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সংগ্রহ ক'রে আনেন, যাঁর যেমন ক্ষমতা সেই মতই যদি প্রবন্ধাদি লেখেন, তা হলে বেশ বড় একটা কাজের সূত্রপাত হয়। এসব উপকরণের ভিত্তিতেই একদা বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে।"

আমার প্রস্তাব যে একেবারেই উপেক্ষিত হয়েছে এ কথা বলতে পারি না; কিছু কিছু উৎসাহী গবেষক যে তাঁদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন এমন খবর পেয়েছি। আরও কিছু বঙ্গ সংস্কৃতি প্রেমী আমার আবেদনের অপেক্ষা না করেই বহুকাল যাবৎ গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আমাদের কৃষ্টি সম্পদগুলি উদ্ধারের কাজে ব্রতী আছেন। তাঁরা সকলেই শিক্ষিত কিন্তু দরিদ্র। সামাজিক প্রতিপত্তি বলতে তাঁদের কিছুই নেই। কিন্তু এই সহায়সম্বলহীনতা তাঁরা

বহুগুণে পূরণ ক'রে নিয়েছেন তাঁদের উচ্চ আদর্শবাদ ও নিরলস কর্মসাধনা দিয়ে। তাঁদের মহৎ প্রয়াস উচ্চ কণ্ঠে কীর্তিত হবার যোগ্য।

এঁদের একজনের কথা গত প্রবন্ধে বলেছি। তিনি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীমানিকলাল সিংহ। জীবিকার ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ স্কুল-শিক্ষক মাত্র। কিন্তু প্রায় একক প্রচেষ্টায় (তাঁর সহকর্মীদের সাহায্য আমি খাটো করে দেখছি না) দীর্ঘকালের একাগ্র অধ্যবসায়ে বঙ্গ সংস্কৃতি নিদর্শনের যে বহুমূল্য ভাণ্ডারটি তিনি গড়ে তুলেছেন তা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব।

আর একজনের ও তাঁর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের কথা আজ বলব যেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কেননা আমার ধারণা, উভয় বাংলার মফঃস্বলে প্রায়-অজ্ঞাত যে কয়েকটি গ্রামীণ মিউজিয়ম এ রকম সৎ কর্মীদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে, তাদের রকমারি সংগ্রহ বাঙালীজাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য কোন-না-কোন সময়ে যথেষ্ট কাজে লাগবে। আমি হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামের (জাঙ্গিপাড়া থানা) 'অমূল্য প্রত্নশালা' ও তার প্রাণস্বরূপ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা বলছি বিষ্ণুপুরের মানিকবাবুর মতো তিনিও সামান্য কয়েকজন সহযোগীর সাহায্য পেয়েছেন সত্য। কিন্তু তাঁরাই সকলের আগে স্বীকার করবেন যে দলনেতার ত্যাগ ও পরিশ্রমের কাছে তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য নয়।

ধীরেনবাবুর শৈশব অতিবাহিত হয় বিহারের বিভিন্ন স্থানে যেখানে তাঁর বাবা চুন ইত্যাদির কারবারে লিপ্ত ছিলেন।

রথের গায়ে আঁকা রঙিন ছবি

কিন্তু সে ব্যবসা পড়ে যাওয়ায়, রাজবলহাট থেকে তিন-চার মাইল দূরে, মার্টিন রেলের হাওয়াখানা স্টেশনের অদূরে, জয়রামপুর গ্রামে তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে তাঁরা ফিরে আসেন। দারুণ দারিদ্র্যের জন্য, ধীরেনবাবু স্কুলের দশম শ্রেণীর বেশী পড়াশুনো করতে পারেন নি। অর্থাভাবই তাঁকে যে-কোন চাকুরি নিতে বাধ্য করে এবং তাঁর প্রথম চাকুরি জোটে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজ লাইব্রেরীর দপ্তরীর কাজ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে স্বর্গীয় মেঘনাদ সাহা তাঁকে বসু বিজ্ঞান মন্দির গ্রন্থাগারের ক্যাটালগিং-এর ভার দেন। আজ, অবসর গ্রহণের কয়েক মাস আগে, তিনি সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর ডেসপ্যাচ ক্লার্ক মাত্র। আর কিছুদিনের মধ্যে এই পদ থেকেই তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনুষ্যের অযোগ্য এই সামান্য জীবন কাহিনী আমি বিশদভাবে লিখলাম এইজন্য যে সামাজিক কৌলীন্য বা পদমর্যাদার অভাব যে বঙ্গ সংস্কৃতি অনুসন্ধানের কিছুমাত্র অন্তরায় নয়, ধীরেনবাবু তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। প্রচলিত অর্থে তিনি অতি সাধারণ মানুষ হলেও অসাধারণ অধ্যবসায়ে সৃষ্ট তাঁর 'অমূল্য প্রত্নশালা'র পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মহত্তো মহীয়ান্। প্রতিষ্ঠানটির বিবরণ থেকেই সে কথা প্রমাণিত হবে।

এক আকস্মিক ঘটনায় ধীরেনবাবুর দৃষ্টি পুরাবস্তু সংগ্রহের দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয় শুনেছি। বিহারে থাকাকালীন তিনি নাকি একবার এক মুদ্রাকারের কাছে দু'তিন সের পুরনো মুদ্রা সস্তায় সের দরে খরিদ করেন। বিক্রেতা ধুলোবালি মাখা সে ঐশ্বর্যের মূল্য কিছুই জানত না। এই মূলে সংগ্রহ পরিবর্ধিত হয়ে এখন যে রূপ নিয়েছে সেকথা পরে বলছি।

হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল স্টেশনে নেমে রাসদপুরগামী বাসে আটপুরের পরই রাজবলহাট। রাজবলহাটের সংলগ্ন গ্রাম গুলিটা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে রাজবলহাটে 'হেমচন্দ্র পাঠাগার'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৯ সালে, যুদ্ধের হিড়িকের সময়, স্বনামধন্য পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ গ্রামে বাস করতে এসে স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে গভীরভাবে জড়িত করে ফেলেন। সেজন্য 'হেমচন্দ্র পাঠাগারে'রই একাংশে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে

'অমূল্য প্রত্নশালা' স্থাপিত হয়। এখনও তিন কুঠরিযুক্ত এক একতলা দালানে এ দু'টি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি অবস্থিত এবং একই কার্যনির্বাহক সমিতির হাতে তাদের পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে এই মিউজিয়মটি সম্বন্ধে লিখেছেন—"রাজবলহাটের 'অমূল্য প্রত্নশালা'টি একটি ভাল প্রতিষ্ঠান। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার এ রকম উদ্যোগ দেখা যায় না। চেষ্টা করলে এই প্রত্নশালাটি দক্ষিণরাঢ়ের ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির একটি ভাল সংগ্রহশালা হতে পারে।" দুঃখের বিষয়, বিনয়বাবু কসাত লাইনের এক প্যারাগ্রাফে এ প্রতিষ্ঠানের বিবরণ শেষ করেছেন। তিনি যদি আর একটু বিস্তৃতভাবে লিখতেন তা হলে তাঁর ও আমার পরিদর্শনের অন্তর্বর্তী সতের-আঠারো বছরে এটির কতখানি অগ্রগতি হয়েছে তার একটা তুলনামূলক সমীক্ষা করা যেত। তবু ও প্রায় দুই দশক আগে যে এটি এক উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিল সে তথ্যটিও মূল্যবান।

রাজবলহাটের যাবতীয় জনহিতকর উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় ভড় পরিবার (বিশেষ করে 'জহরলাল ভড় মহাশয়) হেমচন্দ্র পাঠাগার ও অমূল্য প্রত্নশালার বর্তমান ভবনটি নির্মাণ করে দিয়েছেন, কিন্তু স্থানীয় চাঁদা ও সরকারী সাহায্যও পাওয়া গিয়েছিল। "দুলালের তাল মিছরী" ও অন্যান্য ব্যবসায় সূত্রে ধনী হলেও তাঁরা কলকাতা-প্রবাসী হয়ে পৈতৃক গ্রামকে ভুলে যাননি। এখনও তাঁরা রাজবলহাটের উন্নতিমূলক বিবিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ধীরেনবাবুকে তাঁরা শুধু উৎসাহই দেননি, গ্রাম-গ্রামান্তরে তাঁর সংগ্রহের কাজে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করেছেন। অর্থ ও সামর্থ্যের আর কি প্রয়োগ হতে পারে জানি না।

গত একাদশ বছরের বিভিন্ন সময় আর যাঁরা এ দু'টি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের পরিচর্যা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শ্রীশ্যামলাল দে, মহাভারত তেওয়ার, ললিতমোহন শীল, ডাক্তার বটকৃষ্ণ সুর, শ্রীঅমূল্যচরণ সুর, নিশীথকুমার দে, বিজনবিহারী চক্রবর্তী প্রভৃতি। সে পরিচর্যার ফলাফলের খবর এবার নেওয়া যাক।

লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করা সকলের উদ্দেশ্য হলেও পল্লী-মিউজিয়মগুলির সম্ভারের বেশ আপেক্ষিক তারতম্য আছে। সহজলভ্যতা এর কারণ হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঠাকুরপুকুরের (২৪-পরগনা) গুরুসদয় মিউজিয়মের নকশী-কাঁথার সংগ্রহটি এতই সমৃদ্ধ যে ভারতে তার তুলনা মেলা ভার। সংখ্যা ও উৎকর্ষে তাঁদের জড়ানো-পটগুলিও খুবই উল্লেখযোগ্য। আবার বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া

অলংকৃত মন্দিরদ্বারের কারুকার্য

জেলা) আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত পুঁথি-সংগ্রহটির মতো মূল্যবান সংগ্রহ এ জাতীয় মিউজিয়মে আর আছে কিনা সন্দেহ। বাগনানের (হাওড়া জেলা) আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালার গ্রাম্য খেলনা পুতুলের নিদর্শনগুলিও খুবই বিশিষ্ট। তেমনি, বালুরঘাটের (পশ্চিম দিনাজপুর জেলা) কলেজ মিউজিয়ম ও জেলা গ্রন্থাগার

"কি করি ভেবেই পাচ্ছি না। আমি কিছু মুখের দুর্গন্ধকে আমাদের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করতে দেব না।"
এই সময় এক দিন রাধার বান্ধবী কুসুম এসে
"এই রাধা, অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন রে?"
"রমেশের মুখে এমন বিচ্ছিরি গন্ধ··· ও আমার কাছে এলেই গন্ধটা আমাকে ঠেলে ফেলে দেয়।"
অথচ বিনাকা গ্রীন ব্যবহার করলে মুখের দুর্গন্ধ সহজেই দূর করা যায়। দুর্গন্ধ ও দন্তক্ষয়ের রোগজীবাণু নাশ করার জন্যে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী বিনাকা গ্রীন। তাছাড়া, এতে রয়েছে ক্লোরোফিল যা মুখের দুর্গন্ধ রোধ করার জন্যে মুখে জোগায় বাড়তি শক্তি।
"কিন্তু আমি যে ওকে ভীষণ ভালোবাসি! কেমন ক'রে বলবো ওকে?"
"ধুৎ, বুদ্ধু! ওকে তোর কিছু বলার দরকার নেই। তোরা যে টুথপেস্ট ব্যবহার করিস, তার জায়গায় ব্যবহার কর বিনাকা গ্রীন।"
এক মাস পরে—
"জানো রাধা, আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন অনুভব করছি। অফিসের লোকেরাও আমাকে আরো বেশী পছন্দ করছে আর আমার আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেছে।"
"হ্যাঁ গো, পরিবর্তনটা আমিও লক্ষ করছি।"
রাধা সব জানে। বিনাকা গ্রীনই তাদের দু'জনকে আরো বেশী কাছে নিয়ে এসেছে।
Binaca
Binaca Green
বিনাকা গ্রীনে রয়েছে ক্লোরোফিল—প্রকৃতির নিজস্ব দুর্গন্ধনাশক পদার্থ... সারা দিন আপনার মুখ তাজা মিষ্টি গন্ধে ভুরভুরে করবে।
CIBA Cosmetics
mcm/cg/13a

ঘরোয়া রান্নায় নতুন স্বাদের রেশ

শামি কাবাব সব চেয়ে সহজ কাবাব। ভাল করে বানাতে পারলে অতি উপাদেয়। চায়ে চলে, সান্ধ্য-ভোজে রুটি পরোটা বা পোলাও যার সঙ্গে ইচ্ছা পরিবেশন করা চলে। কাঁচা স্যালাড্ সহযোগে খেলে খাদ্য হিসাবেও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা আগেও প্রণালীর কথা আলোচনা করেছি। কিমার সঙ্গে নানা মশলা ও ছোলার ডাল, দই ইত্যাদি দিয়ে যে পাক করে নেওয়া জিনিসটি শিলে পিষে নিয়ে লেচি কেটে কেবে কাবাবের আকার দেওয়া হয় তার একটি প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখুন, কাবাবে চমৎকার স্বাদ ও গন্ধ হবে। পিণ্ডাকার মশলাটির পরিমাণ বুঝে একটি বা একাধিক গোল ডেলা পাকান। ডেলার মাঝখানে গর্ত করুন। সেই গর্তে ঘি বা বনস্পতি একটু দিয়ে জ্বলন্ত কাঠকয়লা একটি দিন। এবার কিমার ডেলার গর্ত নিটোল করে ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ পরে খুলে ওই কাঠকয়লা ফেলে দিন। ঘি অবশ্য ওতক্ষণে গলে বেশ ভালভাবে কিমার সঙ্গে মিশে গিয়ে থাকবে। বেশ করে হাতে তালটি চটকে যেমন করে কাবাব গড়েন তেমন করে গড়ে গরম পরিবেশন করবেন। বাড়ীতে ঘিটুকুতে মশান দেবার কাজ হবে ও খেতে খাস্তা ও বেশ মচমচে ভাব হবে। জ্বলন্ত কাঠকয়লার ওই গর্তে নিবে যাওয়ার সুঘ্রাণ কাবাবটিকে দেবে বিশেষত্ব। কাঠকয়লার আঁচে যে স্বাদ বাড়ায় এবং রুচিকর সুগন্ধ আনে মাংসে, এমনকি কোন কোন মাছ রান্নাতেও, এ খবর সর্বজনবিদিত। বিদেশে পিকনিক ইত্যাদিতে শখ করে কাঠকয়লার ঝলসানো মাংস খাবার আয়োজন হয়। ঠিক সেই স্বাদগন্ধের রেশ আপনি নিত্যকার ঘরোয়া পরিবেশনে ধরে দিতে পারবেন। তবে কাবাবটিতে আর পাঁচটা গন্ধ সংযোগ করবার চেষ্টা করলে কেমন দাঁড়াবে সেটা ব্যক্তিগত পছন্দ দিয়ে পরীক্ষা করে নেবেন। ধনে পাতা, পেঁয়াজের কুচি ইত্যাদি যা সাধারণত এই কাবাবে দেওয়া হয়, তারও তো বিশেষ বিশেষ গন্ধ আছে।

নিতান্ত নিরামিষেও নূতনত্ব

শহরে, শহরতলীতে বা গাঁয়ে যেখানেই বাস করেন, ছানা অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। কলকাতায় বড়বাজারে যে বিরাট ছানা কেনাবেচার পাট, তা প্রায় এককালের ঐতিহ্যের ইতিহাসের ঝরাপাতার মত। জনপুকুরের ছানা আজও কলকাতায় ছানা দেয়, তবে নাগাল দেবার সাধ্য চাই। দুধ কাটিয়ে ছানা করলে দুধ অপচয় হয়, এ তত্ত্ব সত্য হওয়া সত্ত্বেও ছানার মিষ্টি বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত সরকার একদিন গ্রহণ করেছিলেন তাতে লোক সন্তুষ্ট হয় নাই।

বাঙ্গালী ভিন্ন ছানার ব্যাপক ব্যবহার আর কোন ভারতীয় করেন না ঠিকই, কিন্তু ছানার তরকারি সবাই খান। নিরামিষ ভোজনে কিঞ্চিৎ দই এবং কখনোসখনো ছানা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কস্মিনকালে একবার রান্নার প্রতিযোগিতায় ছানার এক নূতন পরিবেশন দেখে খুব ভাল লেগেছিল। প্রদর্শনীতে রাখা ছিল, চাখতে পারিনি, কিন্তু রচয়িত্রীর হদিশ পেয়ে প্রস্তুত প্রণালী টুকে এনেছিলাম। দিনকয়েক আগে পরীক্ষা করে দেখেছি। অতি চমৎকার। মৌলিকতার জন্য বিশেষ করে ভাল লেগেছে। সুন্দর করে সাজানো কেক যেমন দেখাতে হয় এটাকে তেমন দেখাতে। পুরোপুরি মৌলিক সৃষ্টি বলে ইচ্ছামত রকমফের করা কোন কঠিন কাজ নয়। প্রণালী যা পেয়েছিলাম ও যা পরীক্ষা করেছিলাম তাই উল্লেখ করছি।

মূল উপাদান আধ কিলো ছানা, আড়াই শ' গ্রাম মাখন এবং আড়াই শ' গ্রাম ক্রীম। টম্যাটো বড় বড় তিনটি। কাঁচা লঙ্কা, ৩।৪
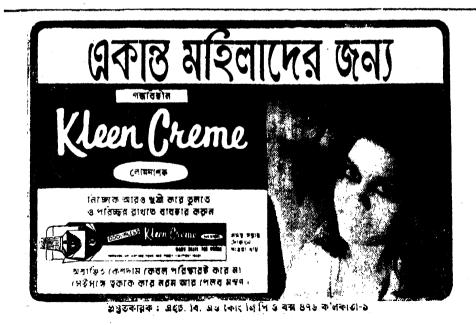
কোরা রসুন, আদাকুচি, অল্প চিনি ও পছন্দমত লবণ।

ছানাটি কেকের আকারে থাবড়ে থুবড়ে ঠিক করে নিন। সামান্য ঘিতে ঐ ছানা বাদামি রং ধরা পর্যন্ত চারদিক সমান করে কাটুন। পছন্দ হলে রসুন বাটা, লবণ, লঙ্কা উপরে মাখিয়ে তার উপর বেসম ছড়িয়ে ভাজতে পারেন। ভাজা হলে আস্তে সাবধানে ছুরি দিয়ে সমান্তরালভাবে দুটি বা তিনটি স্তরে কাটুন। মাখনের সঙ্গে ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, লবণ সব মিলিয়ে প্রত্যেক স্তরে ভাল করে ভরে দিন। চ্যাটালো বড় পাত্রে সাজিয়ে নিন।

এবার উপর থেকে ঢালবার জন্য একটি সস তৈরি করুন। রুচিবর্ধনের এই তরল অনুপান পছন্দমত পরিবর্তন করতে পারেন। মোটামুটি একটি মাখন, ক্রীম এবং টম্যাটো সহযোগে তৈরি করুন। মাখন গরম করে তাতে একটু পেঁয়াজ কুচি ভেজে লাল করুন, আদা কুচি এবং একটি টম্যাটো দিন। টম্যাটো গলে গিয়ে কাদা-কাদা হলে নামিয়ে গরম থাকতে থাকতে ক্রীম ঢেলে দিন। আরও টম্যাটো কুচি করে, ধনে পাতা কুচি করে ওই সঙ্গে দিন। চিনি ও লবণ আন্দাজমত দেবেন। পছন্দ হলে লঙ্কাকুচি দিতে পারেন। সবটা ছানার কেকের উপর ঢেলে পরিবেশন করবেন। চামচ দিয়ে কেটে কেটে নেওয়া যায় অথবা ছুরি দিয়ে কেক কাটার মত করে কেটে খাওয়া যায়। অবশ্য চামচ দিয়ে সসটি তুলতেই হবে।

যাচাই করে কিনবেন

কিছুদিন থেকে শুনছি, খবরের কাগজেও পড়ছি যে এবার বেশ উৎসাহের সঙ্গে নানা স্থানে ভোগ্যপণ্যের একটা যথারীতি যাচাই-এর ব্যবস্থা হবে। Consumer Council of India, Indian Consumers' Union, Consumer Guidance Bureau ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে দেশের নানা থানে খদ্দেরকে সাহায্য করবার আয়োজন গড়ে উঠছে। একটি সংস্থা কিমৎ, অর্থাৎ মূল্য এই নামে পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেছেন। কিমৎ-এর তো কথাই নেই, দামের বেলায় খদ্দের হাল ছেড়েছে। এত দাম দিয়ে যা পাচ্ছে, তার কথাই ভাবুন। কিমৎ পত্রিকা প্রকাশ করেছেন যে ২৫টি বিভিন্ন লঙ্কার গুঁড়ো পরীক্ষা করে দেখা গেছে তার মধ্যে আটটি মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। আটটির পাঁচটিতে কৃত্রিম রং আর তিনটিতে এমন আবর্জনা যে বলবার নয়!

> জাহাজের আবিষ্কার মহান আবিষ্কার। দূরে-দূরান্তর থেকে পণ্য-পসরা বয়ে নিয়ে যায়। আদান-প্রদানের এমন মাধ্যম, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ ঘটানোর এমন উপায় বলেই তার গরিমা। বই কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড়। এক যুগ থেকে অন্য যুগ এক-সূত্রে বাঁধা পড়ে বই দিয়ে। জাহাজ পাড়ি দেয় সাগর আর বই পাড়ি দেয় অনন্ত-কাল-পারাপার। মানুষের অনুভূতি জ্ঞান আর আবিষ্কার বই পৌঁছে দেয় যুগ থেকে যুগান্তরে—বলেছেন ফ্রান্সিস বেকন।

দক্ষিণ ভারতে Southern Consumers Union ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরাও পরম উৎসাহে কাজে লেগেছেন। প্রদর্শনী দিয়ে ও আরও নানাভাবে খদ্দেরকে সচেতন করতে চেষ্টা করছেন। ভাবছি তাই, বাংলায় কেন আমরা
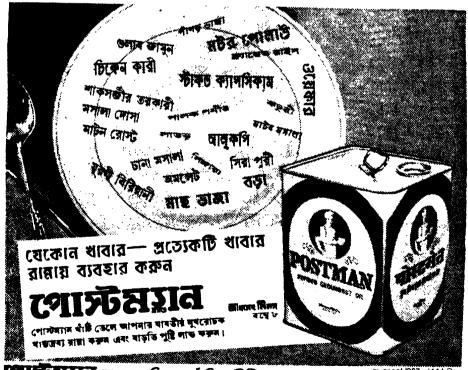
এগিয়ে আসছি না। প্রয়োজন আমাদের কারও চেয়ে কম নয়। বাজারে জানা-অজানা কত জিনিস আমরা নিত্য কিনে থাকি। সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান দিয়ে যাচাই করা থাকলে ভাবনা থাকে না। বর্তমানে কেনা-কাটার কোন নির্ভরযোগ্য নিয়ম নেই। মাত্র কলকাতা শহর নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখার বিরাট অভিযান প্রয়োজন। সাধারণকে সাবধান করে দিতে

সবার আগে ভাল বই পড়ে ফেলুন। কে জানে, না হলে হয়তো পড়বার সুযোগই আর পাবেন না। —বলেছেন থোরো।

সরকারের সাহায্য দরকার। কাজেই, নির্বাচনে যে সরকারই আসুক, সবার মঙ্গল না দেখতে পারলে রাজনৈতিক বক্তৃতার বোলচাল চলবে কি করে? বেসরকারী ব্যবস্থায়ও পর্যাপ্তার প্রভাব হয়তো খদ্দেরের হবে তখনই যখন সরকারী নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ীর শঠতা দমন হবে, তাদের বেপরোয়া অগ্রগতিতে মান সংযোগ করা সম্ভব হবে। লোকে জানবে গরিব দেশের অজ্ঞ খদ্দের অসহায় নয়।

শ্রীমতী

॥ ১৮ ॥
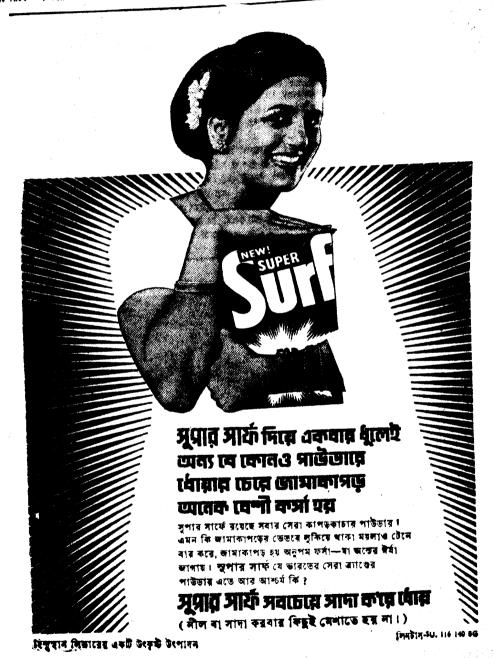
সংসারে যার জীবনের যাত্রাপথ মৃত্যু দিয়ে অভিষিক্ত হলো তার শেষ পরিণতি যে কোথায় কেমন করে কোন্ চোরাগলিতে গিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানবে তা যেমন তার সৃষ্টিকর্তাও বলতে পারে না, তেমনি কোনও ইতিহাস লেখকও বলতে পারে না। তবু তো সৃষ্টির কাজ ব্যাহত হয় না সৃষ্টিকর্তার, লেখককেও লিখে যেতে হয়। কারণ বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়ে যেমন একজন মানুষ, তেমনি এক-একটি মানুষ নিয়েই সমাজ দেশ ভূগোল আর ইতিহাস। যাকে সেই ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয় তাকে কখনও বা মধুর আবার কখনও বা নিষ্ঠুরও হতে হয়। কারো মনোরঞ্জন করার দায় তার নেই, আবার কারো মুখ চাওয়ার দায়িত্ব নিলেও তার চলে না। সে যে নিষ্ঠুর, নিরাসক্ত, নির্বিকার।

অন্তত নয়নতারার সেদিন সেই কথাই মনে হয়েছিল। কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে সে? কার কাছে সে প্রতিকার প্রার্থনা করবে? মাকে সে দু দিন আগেও দেখেছে। দু দিন আগেও মা তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়েছে। মা বলেছে—দেখিস মা, আসছে বেস্পতিবারেই আবার তোকে নিয়ে আসবো, বেয়াই মশাইকে উনি বলে দিয়েছেন—

বেস্পতিবারে মার কাছে যবার প্রতীক্ষাতেই সে ছিল। ভেবেছিল এটা, এই শ্বশুর-বাড়িটা তার সাময়িক আশ্রয়, কেষ্ট-নগরের বাড়িটার আশ্রয় তার শাশ্বত। সেখানে সে আবার ফিরে যাবে। আবার তার বাবা-মাকে ঘিরে তার জীবনের পরিক্রমা আগের মতই সুচারুভাবে চলবে।

কিন্তু হঠাৎ অদৃশ্য-দেবতার কোন অমোঘ নির্দেশে তার সব কিছু বানচাল হয়ে গেল।

নয়নতারা মনে মনে ভাবতে চাইল হয়ত সে যা শুনেছে তা ভুল। ভাবতে ভালো লাগলো যে আসলে তার মা আছে! হে ভগবান, তার ভাবাটাই যেন সত্যি হয়। যেন সে কেষ্টনগরে গিয়ে মাকে দেখতে পায়। মাকে গিয়ে সে বলবে—মা, আমি আর নবাবগঞ্জে যাবো না, আমি এবার এই কেষ্টনগরে তোমার কাছেই থাকবো—

মা তাকে হয়ত বলবে—না মা, ও-কথা বলতে নেই, এখন তোমার বিয়ে হয়েছে, এখন থেকে স্বামীর ঘরই তোমার ঘর, স্বামীই তোমার আপন, স্বামীই তোমার সব—

আশ্চর্য, কে জানতো এই স্বামীই তার কাছে একদিন সবচেয়ে পর হয়ে যাবে, সবচেয়ে দূরে হয়ে যাবে। একদিন যার হাতে নয়নতারাকে তুলে দিয়ে তার মা সব চেয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল সেই সদানন্দই তাকে এমন করে দূরে ঠেলে দেবে—এ-কথাই কি তিনি কোনও দিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই জীবন আরম্ভ করেছিলেন বড় মহৎ আদর্শ নিয়ে। তাঁর আদর্শ ছিল ছেলে মানুষ করবার। শুধু একজন ছেলে নয়, হাজার-হাজার ছেলে। আর শুধু ছেলেই নয়, ছেলে মেয়ে সবাইকে তিনি মানুষ করে যাবেন নিজের আদর্শের মত করে। তিনি বলতেন —জীবনে পাওয়াটাই বড় কথা নয় নিখিলেশ, পেয়ে যেমন অনেকের হারিয়ে যায় তেমনি হারিয়েও আবার অনেকে অনেক কিছু পায়। তথাগত বুদ্ধদেব রাজার ঐশ্বর্য হারিয়ে সম্রাটের ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন। তাকেই বলে সত্যিকারের পাওয়া। কিন্তু আমরা সবাই পেয়ে হারাই নিখিলেশ। আমরাই হলুম আসল লক্ষ্মীছাড়া। আমরা যা পাই তাও ধরে রাখতে পারি না, আবার যা পাই না তার জন্যেও আমাদের আক্ষেপ নেই। এই আমার জীবনটাই দেখ না—

বলে নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। বলেন—আমি কিছুই হারাতে পারলুম না বলে কিছুই পেলুম না—

শুধু নিখিলেশ নয়, মাস্টার-মশাই-এর কথাগুলো আরো অনেক ছাত্র শুনতো। ছুটির দিন সবাই ভট্টাচার্যি মশাই-এর বাড়ি আসতো। কথা বলতে বলতে অনেক বেলা হয়ে যেত তাঁর। নয়নতারা হঠাৎ ঘরে এসে বলতো—বাবা, তুমি আজ চান করবে না, খাবে না?

ভট্টাচার্যি মশাই-এর এতক্ষণে যেন হুঁশ হতো। বলতেন—ওই দেখ, আমাদের বেশ কথা হচ্ছিল, বেশ বিদ্যার জগতে বিচরণ করছিলুম, হঠাৎ অবিদ্যা এসে সব ভেঙে দিলে—

নয়নতারা অভিমান করে বলতো—যা রে, আমি বুঝি তোমার অবিদ্যা?

ভট্টাচার্যি মশাই নিজের ভুল বুঝে নয়নতারাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেন—এই দেখ, আমার মেয়ে আবার রাগ করে বসলো—

মেয়েকে আদর করতে করতে বলতেন—তুমি অবিদ্যা হতে যাবে কেন মা, তুমি হলে

মা আমার সরস্বতী। মা-সরস্বতী তুমি আমার! আমি বলছিলাম কল্পনা আর বাস্তবের কথা। আমরা সবাই বেশ বড় বড় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ তুমি আমাদের বাস্তব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এলে—

নয়নতারা বলতো—বা রে, আমি কী করবো, মা যে তোমাকে ডাকতে বললে—

ভট্টাচার্যি মশাই বলতেন—না না, তোমার মা ঠিকই করেছে মা, বাস্তবকে বাদ দিয়ে তো কল্পনা হয় না। কল্পনার শেকড় থাকে বাস্তবের মাটিতে। তা না থাকলে সে কল্পনারও কোনও দাম নেই, সে কল্পনা হলো ফানুস, ফানুস ফেটে গেলে আর ফানুসের তাই কোনও দাম থাকে না—

নয়নতারা কিন্তু বাবার সে-সব কথায় কান দিত না। সে বাবার ছাত্রদের দিকে চেয়ে বলতো—তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমরা বাড়ি যাবে না? তোমাদের বাড়ি-ঘর-দোর নেই?

ছাত্রদের মধ্যে নিখিলেশ ছিল একটু স্পষ্টবক্তা।

নিখিলেশ বলতো—তা আজকে তুমিই আমাদের খেতে দাও না—আমরা এখানেই দুটি খাই—

নয়নতারা বলতো—ইস্, খাবে। তাহলে রান্না করবে কে? মা'র যে শরীর খারাপ, মা'র বুঝি রাঁধতে কষ্ট হয় না?

নিখিলেশ বলতো—কেন? তুমি রাঁধবে। তুমি আমাদের জন্যে একটু কষ্ট করতে পারো না?

নয়নতারাও কম যেত না। সে বলতো—তোমাদের জন্যে কেন আমি কষ্ট করতে যাবো বলো তো? তোমরা আমার কে?

ভট্টাচার্যি মশাই বলতেন—ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই, কেউ কারো পর নয়, জানো মা! পৃথিবীর সব মানুষকে আপন করে নিতে হবে। যে তা পারে সেই-ই সত্যিকারের মানুষ। হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, সবাইকে নিজের লোক মনে করবে মা—

নয়নতারা বলতো—বা রে বা, তুমি তো আমার বাবা, কিন্তু ওরা কে?

ভট্টাচার্যি মশাই একটু ভেবে নিয়ে বলতেন—ওরা? ওরা তোমার ভাইএর মত। আমি কি শুধু তোমার একলার মা? আমি যে সকলের। আমি যেমন তোমার কথা ভাবি, তেমনি ওদের কথাও তো আমাকে ভাবতে হয়। আমি যে ওদেরও মঙ্গল চাই—

বাড়ির ভেতরে মা বলতো—আমার কথা কে ভাবে তার ঠিক নেই, আমি যাচ্ছি পরের কথা ভাবতে! পরের কথা ভাবতে আমার বয়ে গেছে—

নয়নতারাকে নিজের পাশে শুইয়ে মা বলতো—ওঁর কথা ছেড়ে দে তুই, ও-সব বড়-বড় কথা শুনতে ভালো, বলতে ভালো কিন্তু ওতে তো আর আমার পেট ভরবে না।

যখন বাবা ছাত্রদের নিয়ে লেখা-পড়ার চর্চা করতো মা তখন নিজের সংসার সামলাতেই হিম্‌সিম্ খেয়ে যেত! আর সেই সময় সব সময়ের সঙ্গী থাকতো নয়নতারা। নয়নতারা মা'র কাছে কাছে ঘুরতো সারাদিন।

মা বলতো—ওমা নয়ন, এই চাল ক'টা একটু বেছে দে তো—

মা'র কথায় একটা কুলো নিয়ে নয়নতারা চাল বাছতে বসতো। কিন্তু চাল বাছা শেষ না হতে হতেই মা আর একটা কাজের হুকুম করতো। বলতো—ওরে নয়ন, কোথায় গেলি, বড়িগুলো একটু রোদ্দুরে দিয়ে দে তো মা—

শতবার নয়নতারা বই নিয়ে পড়তে বসতো ততবার মা'র ফরমাস। একটা-না-একটা ফরমাস লেগেই থাকতো মা'র। মা'র সঙ্গে নয়নতারার লেখা-পড়ার যেন আড়ি ছিল। নয়নতারাকে পড়তে বসতে দেখলেই মা যত বাজে কাজ আবিষ্কার করে বসতো।

শেষকালে বিরক্ত হয়ে যেত নয়নতারা। বলতো—আমি পারবো না তোমার কাজ করতে, আমাকে দেখলেই বুঝি তোমার কাজ পায়—?

মা বলতো—একা হাতে কত কাজ করছি তা তুই দেখতে পাচ্ছিস না? আমি খেটে খেটে মরে যাই তা-ই বুঝি তোরা সবাই চাস্?

নয়নতারা বলতো—তা একটা ঝি রাখলেই পারো, ওই তো কল্যাণীদের

বাড়িতে কেমন দিন-রাতের ঝি আছে, সে-ই সব করে—

মা বলতো—আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি রে। এখন যদি এ-সব কাজ না-করিস তাহলে কোথায় কার বাড়িতে যাবি, সেখানে গিয়ে যে শাশুড়ির কাছে বকুনি খেয়ে মরতে হবে। তখন শাশুড়ি আবার তোকে খোঁটা দেবে। বলবে—বাপের বাড়িতে মা কিছুই শেখায়নি মেয়েকে, একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে দিয়েছে।

তারপর মা নিজের মনেই বলতো—আমি যা বলি তা তোর ভালোর জন্যেই বলি রে। আমি মরে গেলে তখন বুঝবি মা তোর ভালোর জন্যেই এত কথা বলতো—

তা শেষকালে যখন নবাবগঞ্জের সম্বন্ধটা এল তখন একেবারে দৌড়তে দৌড়তে মা তার ঘরে এসেছে। বললে—ওরে, তুই এবার জমিদারের বউ হবি, জানিস—

জমিদারের ছেলের বউ হওয়া যে কী জিনিস তা যদি মা তখন জানতো! কিন্তু শুধু মা কেন, নয়নতারা কি নিজেই সে-কথা জানতো। বোধ হয় ভূ-ভারতে কেউই জানতো না। নইলে কোনও মেয়ের ফুল-শয্যার দিনে এমন দুর্ঘটনা ঘটে! কারো পা লেগে শ্বেত-পাথরের গেলাস এমন করে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়?

*

সমস্ত দিন কোথায় ঘুরে ঘুরে সদানন্দ যখন বাড়ি ঢুকলো তখন সব শান্ত। এই কাল পর্যন্ত যে-বাড়িতে লোকজন গিস্-গিস্ করেছে, যে-বাড়িতে ঢুকলেই লুচি-ভাজার ঘিয়ের গন্ধ ভুর-ভুর করেছে তা

আর নেই। একদিন আগেও এখানে উৎসবের জাঁকজমক সব কিছু ভরাট ছিল। প্রকাশমামা একাই ছিল একশো। তার হাঁক-ডাকে বাড়িতে কাক-পক্ষী বসতে পারছিল না।

কিন্তু সেই প্রকাশমামাও এখন নেই।

কর্তাবাবু তখন নিজের ঘরের মধ্যে আসর জাঁকিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। বহুদিন আগে একদিন তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেদিন মনে নানা সংশয় ছিল তাঁর। সংশয় ছিল নানা কারণে। একে তো সোজা পথে তাঁর যাত্রা শুরু হয়নি। অনেক বাধা এসেছে তাঁর জীবনে। একদিক থেকে যেমন উন্নতি অন্যদিক থেকে তেমনি শত্রুতা। শুধু বিধাতার শত্রুতাই নয়, মানুষের শত্রুতাও কম ছিল না। তাঁর জমির আয়তন বেড়েছে, কিন্তু সেই আয়তন বাড়াতে গিয়ে কতবার রাজদ্বারে উপস্থিত হতে হয়েছে। একটার পর একটা মকদ্দমা। সঙ্গে সঙ্গে ছিল অর্থব্যয়। দু'হাতে টাকা বিলিয়েছেন সকলকে। উকিল, মুহুরি, পেশকার থেকে শুরু করে কোর্টের একটা সামান্য পোকা-মাকড় পর্যন্ত তাঁর টাকায় পেট ভরিয়েছে। তারপর আছে পুলিস-দারোগা-কনস্টেবল্। সবাই যেন এক একটা রাঘব বোয়াল। আর তিনিও ছিলেন মুক্তহস্ত। তিনি বলতেন—টাকা নিচ্ছ নাও, কিন্তু দেখো আমার কাজটা যেন উদ্ধার হয় বাপু—

তা মোকদ্দমায় যে কেউ ক্ষতি করেনি তা নয়, করেছে। কিন্তু অনেকে আবার তাঁর কাজও উদ্ধার করে দিয়েছে। লাভ-লোকসান কষাকষি মিলিয়ে শেষমেষ যা দাঁড়িয়েছে তাতে মোটা লাভের দিকেই তাঁর পাল্লা ঝুঁকেছে।

এ সব অতীতের কথা। এখন বলতে গেলে সব দিক থেকেই সুরাহা হয়েছে তাঁর। এখন আর তাঁর জমিদারি নেই বটে। সরকারী আইনের আওতায় এখন তাঁকে আর জমিদার বলা যায় না। সরকারি সেরেস্তার খাতায় জমিদারদের তালিকাটাই পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু তা হোক, তাতে তাঁর কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। তিনি আগেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন। বরং এখন তাঁর সমৃদ্ধি বলতে গেলে আরো বেড়েছে। তাঁর একমাত্র নাতির এতদিন দুর্ভাবনা ছিল তাও এখন নিঃশেষ হয়েছে। আর বাকি ছিল নাতির বিয়েটা। তা ভেবেছিলেন সেদিক থেকেও হয়ত কিছু বাধা আসবে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত তাও নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল কাল। কাল সমস্ত অতিথি-অভ্যাগতেরা তাঁর বাড়িতে এসে নববধূকে আশীর্বাদ করে গিয়েছে। ভেবেছিলেন তাঁর নাতি ফুলশয্যার রাত্রে হয়ত বাড়ি থেকেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। কিন্তু না, সে শোবার ঘরে ঢুকে রীতিমত দরজায় খিল

চায়ের সঙ্গে উপভোগ করুন
নতুন পার্লে মারী বিস্কুট

চায়ের সময়ে অপরিহার্য—
পার্লে মারী বিস্কুট, অনন্য স্বাদে
ভরা, সুন্দর ফয়েল প্যাকে মোড়া।
গ্লুকো, মোনাকো ও আরো অনেক
সুস্বাদু বিস্কুটের নির্মাতা পার্লে থেকে—

অনন্য স্বাদে ভরা সুন্দর ফয়েল প্যাকে মোড়া

everest/1080b/PP/T ben

দিয়েছে। নতুন বউএর সঙ্গে রাত্রি যাপনও করেছে।

কিন্তু তাহলে রাত্রে অমন অমঙ্গলের কান্না কে কেঁদেছিল?

দীনু ভোর বেলার দিকে এল। কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে দীনু, রাত্তিরে তুই কোথায় শুয়েছিলি?

দীনু বললে—আজ্ঞে, বাইরের বারান্দায়—

কর্তাবাবু বললেন—বেশ করেছিস, বারান্দায় শুয়েছিস। তা হ্যাঁ রে, রাত্তিরে কিছু শুনতে পেয়েছিলি?

—কী শুনবো?

—কারোর কান্না?

দীনু কিছু বুঝতে পারলে না। আবার বললে—কান্না? কার কান্নার কথা বলছেন কর্তাবাবু?

কর্তাবাবু বললেন—কার কান্না তা কি আমিই জানি। মনে হলো যেন কে কোথায় কাঁদছে। তা আমি তোকে 'দীনু' 'দীনু' বলে বার দুই ডাকলুম, কিন্তু তোর কোনও সাড়া-শব্দই পেলুম না—

দীনু অপরাধীর মত বললে—আজ্ঞে আমি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—

—তা ঘুমিয়েছিস বেশ করেছিস। সারা দিন খাটুনি গেছে, ঘুমোবি না? হাজার হোক শরীর তো বটে!

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—তুই নিচেয় গিয়েছিলি?

দীনু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ নিচের থেকেই তো আসচি—

—নীচেয় কী দেখে এলি?

—দেখলুম ঠাকুররা উঠেচে, এইবার সব জল-খাবারের ব্যবস্থা হবে, উনুনে আগুন পড়েছে—

কর্তাবাবু বললেন—না না, ও-কথা বলছি না, বলছি ভেতর-বাড়িতে কী দেখলি?

—ভেতর-বাড়িতে এখনও সবাই ঘুমোচ্ছে।

—ঘুমোচ্ছে? তাই নাকি রে! সবাই-ই ঘুমোচ্ছে?

—না, ওদিকে কাল তো রাত অনেক হয়েছিল শুতে তাই এখনও জাগেনি কেউ। তা ছোট কর্তাকে ডেকে দেব আমি?

—দূর, ছোট কর্তাকে ডেকে দিয়ে কী হবে। আমি বুড়ো মানুষ, আমার তো খাটা-খাটুনি হয়নি বেশি, তাই ভালো ঘুমও হয়নি। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক না। এখন ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট সব চুকে গেছে। এখন তো ঘুমোবেই।

তারপর একটু হেসে বললেন—তা ওদিকের কী খবর রে?

—কোন্ দিকের?

—বর-কনের!

—আজ্ঞে, খোকাবাবুর কথা বলছেন? খোকাবাবুকে তো দেখলাম শালাবাবুর সঙ্গে বার-বাড়ির উঠোনে কথা বলছেন।

কর্তাবাবু যেন বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন—ঠিক দেখেছিস তো তুই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভুল দেখতে যাবো কেন?

—কিন্তু এত ভোর ভোর তাহলে উঠতে গেল কেন? নতুন-বউ কোথায়?

—আজ্ঞে নতুন-বউমার ঘরের দরজা তো ভেজানো রয়েছে দেখলুম!

কর্তাবাবু কেমন যেন চিন্তায় পড়লেন। নতুন-বউ, ফুলশয্যায় রাত, সেই রাতে বর কেন এত সকালে উঠলো! এ-দিনে তো একটু দেরি করেই ঘুম থেকে ওঠে সবাই।

বললেন—তুই একবার ছোটবাবুকে ডেকে আন তো আমার কাছে—

দীনু আর দাঁড়ালো না। কিন্তু ততক্ষণে প্রাণকৃষ্ণ শা মশাইও এসে গেছেন। আত্মীয় মানুষ। নতুন-বউয়ের মুখ দেখবেন সোনা দিয়ে। একটু পরে কৈলাশ গোমস্তাও এসে গেল। আর তার পরেই এল চৌধুরী-মশাই নিজে।

নিচের থেকে খবর এল বউমার তৈরি হতে একটু দেরি হবে। কর্তাবাবু বললেন—একটু বসতে হবে শা'মশাই, বুঝতেই তো পারছেন, কাল অনেক রাত হয়েছে সব শেষ হতে .....

কিন্তু এই-ই সব নয়। যখন প্রাণকৃষ্ণ শা'মশাই বউকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন তখন চৌধুরী মশাইকে ডাকলেন কর্তাবাবু। একেবারে একান্তে।

ঘর থেকে তখন সবাইকে বার করে দেওয়া হয়েছে।

কর্তাবাবু গলাটা একটু নামালেন। বললেন—রেলবাজার থেকে দারোগাবাবুর লোক এসেছিল নাকি?
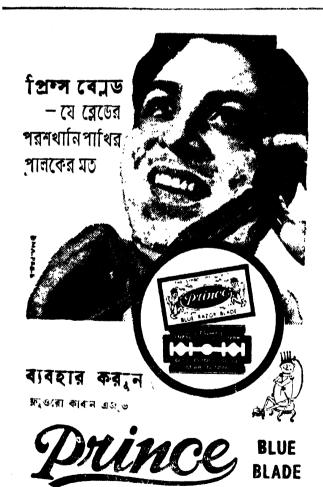
চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ। আমি সব শোধ করে দিয়েছি।

—কত দিলে?

—আজ্ঞে আপনি যা দিতে বলেছিলেন। পুরোপুরি পাঁচশোই দিয়েছি।

—আর বংশী ঢালী?

চৌধুরী মশাই বললেন—ওরা একটু দর কষাকষি করছিল এবার। দেড়শো টাকার কমে ছাড়লে না।

—দেড়শো!

কর্তাবাবু যেন চমকে উঠলেন। বললেন—কেন? সেবার সেগুনবেড়ের বিলের দখলের সময় পনেরোটা লাশ গুম করে মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিলুম, তা-ই তো খুশী হয়ে নিয়ে সেলাম করেছিল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। আর এবার হঠাৎ একেবারে আড়াই গুণ বাড়িয়ে দিলে কেন? এই ক'দিনের মধ্যেই টাকা কি এতই সস্তা হয়ে গেল?

চৌধুরী মশাই বললেন—না, তা নয়, খুবই কান্নাকাটি করতে লাগলো। এমন করতে লাগলো যেন দেড়শো টাকা না পেলে একেবারে মাগ-ছেলে নিয়ে উপোস করে মরবে!

কর্তাবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন—সে উপোস করে মরবে বললে আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে? দেখছি এই রকম করেই তুমি আমার সম্পত্তি রক্ষে করবে। ওরা হলো ছোটলোক, ছোটলোকদের অত প্রশ্রয় দিতে আছে! যদি এতই হাতে-পায়ে ধরেছিল তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই পারতে!...লোক ক'জন?

—আজ্ঞে, চারজন!

—চারজনের লাশের জন্যে দেড়শো টাকা! এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি! টাকা কি গাছের ফল যে পাড়লুম আর খেলুম? কালিগঞ্জে আমি যখন নায়েব ছিলুম তখন এ সব কাজে মাথা পিছু পাঁচ টাকা দিয়েছি, তারাও খুশী হয়ে তাই নিয়ে সেলাম করেছে! এই করেই তোমরা দেখছি সব জিনিসের দর বাড়িয়ে দেবে। এমনি করে যদি ওরা রেট বাড়িয়ে যায়, তাহলে তো আর শেষকালে জমি-জিরেত রাখতে কুল পাবে না। তা টাকাটা দেবার আগে একবার আমাকে জিজ্ঞেস করবে তো। আমাকে জিজ্ঞেস করলে তোমার কী এমন লোকসান হতো! আমি তো এই ঘরেই রয়েছি। পা দুটোই না হয় গেছে, কিন্তু একেবারে তো মরে যাইনি? আমি মরে গেলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো, আমি সে-সব দেখতেও আসবো না—

বকুনি খেয়ে চৌধুরী মশাই বাবার সামনে মাথা নিচু করে রইলেন।

কিন্তু তখনই খবর এল নিচেয় কেষ্ট-নগর থেকে লোক এসেছে!

কর্তাবাবু বললেন—কেষ্টনগর? তোমার বেয়াই-বাড়ির লোক নাকি?

বেয়াই-বাড়ির লোক যে কেন অত ভোর সাত-সকালে এসে হাজির তা প্রথমে কেউই বুঝতে পারেনি। কিন্তু সকলের বোধের এক্তিয়ারের মধ্যেই যে সংসারের সব কিছু ঘটনা ঘটবে এমন কড়ার সৃষ্টিকর্তা তাঁর বিশ্বসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের সঙ্গে তো করেন নি। তাই বিপিনের মুখে যখন খবরটা প্রথম শুনলেন সকলেরই তখন অবাক হবারই কথা।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—শেষকালে কী হয়েছিল?

বিপিন বললে—কিছুই হয়নি। বিয়ের দিন খুবই খাটুনি গিয়েছিল সকলের, তার পরের দিন মেয়ে-জামাইকে বিদেয় দেবার পরই তিনি শুয়ে পড়লেন। বললেন—বুকে কেমন করছে। তারপর ডাক্তারবাবু এলেন। ইনজেকশন দিলেন। ইনজেকশনের পরই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু সে-ঘুম তাঁর ভাঙলো না।

চৌধুরী-মশাই সেখানে আর দাঁড়ালেন না।

বললেন—আমি একবার পুরুত-মশাইকে খবর দিই গে—

কিন্তু তখন একেবারে তাই নিয়ে হই-চই পড়ে গেল বাড়িময়। একদিকে নতুন-বউ, তারপরে প্রাণকৃষ্ণ শা-মশাই, তার ওপর দারোগা, বংশী ঢালী। আর সকলের ওপর কেষ্টনগরের দুঃসংবাদ। সে যে কী দুর্যোগ গেছে সমস্তটা দিন তা কল্পনা করতেও যেন ভয় হয়। তার মধ্যে সদানন্দ যে কোথায় ছিল তা কেউ লক্ষ্যই করেনি। সে বাড়িতে থেকে কি খেলে না সে-দিকেও কারো খেয়াল ছিল না।

শুধু কর্তাবাবু চৌধুরী-মশাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—খোকার কী খবর?

চৌধুরী মশাই বললেন—সে ভালোই আছে—

—আর কোনও গণ্ডগোল-টোল করেনি তো?

চৌধুরী-মশাই বললেন—না—

—তবে যে দীনু বলছিল সকালবেলায় খোকা নাকি ভোরবেলাই বউমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে?

চৌধুরী-মশাই বললেন—হাঁ, দীনু ঠিকই বলেছে—

—তা [illegible] সকাল-সকাল ঘর ছেড়ে বেরোল যে? বউমার সঙ্গে কোনও ঝগড়া-টগড়া হয়নি তো?

চৌধুরী মশাই বললেন—না, ঝগড়া কেন করতে যাবে?

কর্তাবাবু বললেন—না, যে-রকম বেয়াড়া ছেলে তোমার, ও সব পারে। যা হোক, ভালোয় ভালোয় যখন সব মিটে গেছে তখন আর ভয় নেই। আমার তো এই ভয়ই ছিল কিনা। তা নতুন-বউমা কেমন আছে? কেষ্টনগরের খবরটা তাকে দেওয়া হয়েছে?

চৌধুরী-মশাই বললেন—না, এখনও দেওয়া হয়নি। খবর দেওয়া হবে কি না তাই ভাবছি। খবরটা দিলে তো আবার কান্নাকাটি করবে। তারপর পুরুত-মশাইকে জিজ্ঞেস করে তিনি যেমন বলেন তেমনি করা যাবে—

এ-সব ঝঞ্ঝাট যখন শেষ হলো, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। ক'দিন ধরে যে ধকলটা গেল তা যেন তখন খানিকটা শান্ত হলো। কর্তাবাবুও মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। যাক, এঁর বংশ রক্ষা পেয়ে গেল। আর কোনও ভয় নেই। মনে মনে ঠিক করলেন তাঁর নাত-বউয়ের সন্তান হলে কী দিয়ে তার মুখ দেখবেন। একটা দামী কিছু দিতে হবে। এইটেই বোধহয় তাঁর শেষ দেওয়া। নাত-বউয়ের সন্তানকে দিলে সেটা তাঁর নিজেকেই দেওয়া হবে। হয় একটা গিনির মালা, না হয় একজোড়া হীরের বালা। একজোড়া হীরের বালার কত দাম হবে সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে স্যাকরাকে। বেশ ভালো কমল-হীরে দিয়ে বালাজোড়া গড়াতে হবে। তা টাকা যা লাগে তা তিনি দেবেন।

হঠাৎ নিচেয় শাঁখ বেজে উঠলো।

দীনু এল। কর্তাবাবু তার মুখের দিকে চাইলেন। বললেন—কী রে, ওরা রওনা হয়ে গেল?

—আজ্ঞে হাঁ কর্তাবাবু!

—সঙ্গে কে গেল?

—আজ্ঞে, শালাবাবু আর গৌরী পিসী।

কথাটা শুনে আরো নিশ্চিন্ত হলেন কর্তাবাবু। তারপর মনে পড়ে গেল কথাটা। বললেন—একটা কাজ করতে পারিস! রেল-বাজারের কাঞ্চন স্যাকরাকে একবার খবর দিতে পারিস?

—কাঞ্চন স্যাকরা?

কর্তাবাবু বললেন—হাঁ, বলবি সময় মত যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে—

চৌধুরী-বাড়ির সদর রাস্তায় তখন দুটো গরুর গাড়ি সামনে পেছনে চলছে। সামনেটাতে নতুন-বউ নয়নতারা, আর তার পাশে গৌরী। গৌরী পিসী। আর পেছনেরটাতে শালাবাবু। শালাবাবু চিৎকার

করে বললে—একটু পা চালিয়ে চলো রজব, একটু পা চালিয়ে চলো, ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে—দুর্গা, দুর্গা...

সদর রাস্তা ছেড়ে গাড়ি দুটো বারোয়ারিতলায় পড়লো। বিরাট বিরাট বট আর অশ্বত্থ গাছের ছায়া ঘেরা বারোয়ারিতলা। বারোয়ারিতলায় দোকানগুলোর মাচার ওপর তখন বিকেলের আড্ডা চলেছে। হঠাৎ গাড়ির ভেতরে সদানন্দর বউকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। পেছনের গাড়িতে শালাবাবুকে দেখে একটু সাহস পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—এ কি শালাবাবু, কোথায়? নতুন-বউকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

শালাবাবুর তখন অত সময় নেই বাজে কথা বলবার। বললে—এখন ট্রেন ধরতে হবে ভাই, কথা বলবার সময় নেই—

বলে সামনের গাড়ির গাড়োয়ানকে আবার তাগাদা দিলে—একটু পা চালিয়ে চলো রজব, ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে, পা চালিয়ে চলো—

*

সদানন্দকে দেখে মা অবাক হয়ে গেছে। বললে—এ কী রে, তুই কোথায় ছিলি সারাদিন, বাড়িতে এত ঝঞ্ঝাট চললো, আর তোরই দেখা নেই—

প্রকাশমামা থাকলে এতক্ষণে হই-চই লাগিয়ে দিত। কিন্তু প্রকাশমামাও নেই, গৌরী পিসীও নেই। যারা দুজন বাড়ি জমিয়ে রাখে তারা কেউই নেই। বাড়িতে আসতে আসতে ঢুকেই লোকজন না দেখে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। কদিন আগেও এখানে ভিড় ছিল। পুকুরের পাড়ের দিকে ভিয়েন বসেছিল। বারোয়ারিতলার আড্ডার সবাই-ই এখানে এসে নেমন্তন্ন খেয়ে গিয়েছিল। বউ দেখেও খুব তারিফ করেছে তারা। সকাল বেলা বারোয়ারিতলায় যেতেই সবাই ধরেছে—কী রে, এত সকালে?

সদানন্দ বললে—বাড়িতে আর ভালো লাগলো না ভাই, বড্ড ভিড়—

গোপাল বললে—কাল তোদের বাড়িতে খুব খেয়েছি রে, একেবারে পেট ফেটে যাবার দাখিল—

কেদার বললে—তা কী রকম বউ হলো বল্ সদা, পছন্দ হয়েছে তো তোর?

পছন্দর কথা শুনে আশ-পাশে যারা ছিল সবাই কেদারের কথায় হেসে উঠেছে। অমন যার বউ তার আবার পছন্দর কথা ওঠে নাকি! নতুন বরকে দেখে ক্রমে ক্রমে আরো ভিড় জমে উঠলো মাচার ওপর। এতকাল ধরে এই সদানন্দকে তারা দেখে আসছে, অথচ সকলের কাছে আজ রাতারাতি যেন সে নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। এই মানুষটাই তাদের সঙ্গে এতদিন আড্ডা দিয়েছে কথা বলেছে, তাস খেলেছে, যাত্রা করেছে, উঠেছে

বসেছে, তবু যেন সে আজ একটা রাত্রের মধ্যেই সম্পূর্ণ এক অচেনা মানুষ হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। সকলেরই জানতে ইচ্ছে করছে গোপনে শুনে নেয় তার ফুলশয্যার রাতটা কেমন কাটলো। ওদের ফুলশয্যা কি ঠিক আমার মত? সকলেরই নিজের নিজের ফুলশয্যার রাতের কথা মনে পড়তে লাগলো। নিজেদের সঙ্গে সদানন্দর ফুলশয্যার ঘটনাটা একবার মিলিয়েও নিতে চাইলে সবাই। অত সুন্দরী বউ বরের সঙ্গে প্রথম কী কথা বললে সেটাও তাদের জানতে কৌতূহল হলো। কিন্তু সদানন্দ হাসতে লাগলো।

ভৈরব বললে—কী রে, হাসছিস যে?

সদানন্দ বললে—তোদের কথা শুনে ভাই—

—কেন, আমরা গরীব বলে কি মানুষ নই, না আমাদের কালো বউ বলে সে আর বউ নয়?

একজন বলে—ওরে না, যা ভাবছিস তা নয়, অন্ধকারে কালো বউও যা ফরসা বউও তাই, সব সমান!

—তুই থাম্—বলে ধমকে উঠলো কেদার। বললে—তুই যা জানিস না, তা নিয়ে কথা বলতে আসিস নি। তুই বিয়ে করিস নি,

ঢাকার স্টেডিয়াম মাঠে 'বিটিং দি রিট্রিট' বাজিয়ে শেষ ভারতীয় সৈন্যদলও চলে গেলেন। এই ভারতীয় সৈন্যদলের একটি বাহিনীর সঙ্গেই একদিন ঢাকায় এসে ঢুকেছিলাম। তাঁরা চলে গেলেন। পড়ে রইলাম আমরা কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিক। তাঁদের কাজ শেষ। আর আমাদের শুরু।

ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ থেকে চলে গেলেন তাঁদের কর্তব্য সমাধা করে। তিক্ততার মধ্য দিয়ে নয়, সৌহার্দ্যের মধ্য দিয়ে। গ্লানি নয়, গৌরবের বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করে। তাঁরা কেউ এসেছিলেন সুদূর মালাবারের উপকূল থেকে, কেউ বা কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের উপলবন্ধুর জনপদ থেকে, কেউ এসেছিলেন রাজপুতানার রুক্ষ মরুপ্রান্তর থেকে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার তীরের এই পেলব মাটি তাঁদের রক্তে ভিজে গেছে। প্রায় চার হাজারের মত জওয়ান ও অফিসার এই বাংলার মাটিতে চিরকালের

শিশুরা তাদের আঁকা ছবি বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিচ্ছে

জন্য ঘুমিয়ে রয়েছেন। তাঁরা আর কোনদিনও দেশে ফিরবেন না।

যুদ্ধের গতি এমন তীব্র ছিল, রাজনৈতিক পরিণামের জন্য আমরা সে সময় এত ব্যগ্র ছিলাম যে, ভারতীয় জওয়ানদের অপূর্ব বীরত্ব, অপরিসীম আত্মত্যাগ ও অভূতপূর্ব চারিত্রিক সংযমের খুব কম কথাই সে সময় আমরা জানতে পেরেছি। শুধু অপারেশনের ঘটিত বিবরণ নয়, তাঁদের ব্যক্তিগত ও কাহিনীগত বীরত্বের পূর্ণ ইতিহাস করে

পাক সেনাদের বর্বরতার নিদর্শন

অন্দুত হবে জানি না।

শুধু যুদ্ধ নয়—ভারতীয় বাহিনী শান্তিকেও জয় করেছেন এই বঙ্গভূমিতে। যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত একটি দেশকে পুনর্গঠনের যে আন্তর্জাতিক সাহায্যও শুরু হয়ে গিয়েছে, তার শুভারম্ভ কিন্তু ভারতীয় বাহিনীকেই করতে হয়েছিল।

পোড়ামাটির নীতি নিয়ে পাকিস্তান যুদ্ধে নেমেছিল। মুক্তিবাহিনীর কাছেও আগে প্রশ্ন ছিল শত্রুর পরাজয়ের। কাজেই সেতু দু' পক্ষই উড়িয়েছেন। অবশ্য বড় বড় সেতু ধ্বংস করার কুকীর্তি পাক বাহিনীরই। সবসুদ্ধ ২৭৩টি সেতু ধ্বংস হয়েছিল বাংলাদেশে। ১১৮টি প্রধান সড়কের ওপর। তার মধ্যে ৩১টি বড় রেল সেতু তৈরি করে দিয়াছেন ভারতীয় বাহিনী। আরও ৫টি ব্রিজ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। এই ৩৬টি ব্রিজের সমস্ত মালমসলা ভারতীয় বাহিনীর। এছাড়া আরও ৩৪টি ব্রিজ তাঁরা তৈরি করে দিয়েছেন, যার মালমসলা পাকিস্তানীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা।

এছাড়া ওরা ভারত থেকে যে সব আর্মি ফেরি এনেছিলেন, সেগুলিও বাংলাদেশকে দিয়ে গিয়েছেন। সবসুদ্ধ নটি ফেরি তাঁরা দিয়েছেন বাংলাদেশকে।

উদ্বাস্তুদের ফিরে আসা ও দ্রুত সাহায্য আসার ব্যাপারে দরকার ছিল রেলওয়ে সংযোগের। ভারতীয় বাহিনীর ইঞ্জিনীয়াররাই বনগাঁ-যশোর-খুলনা রেলপথ, গেদে-ফরিদপুরে ও করিমগঞ্জ-আখৌড়া রেলপথ সারিয়ে রেল চলাচলের উপযোগী করে দিয়েছেন। এর মধ্যে সেতু সারাতে হয়েছে, মাইন হঠাতে হয়েছে, কোথাও নতুন করে রেল পাততে হয়েছে, সারাতে হয়েছে লাইন। টেলিগ্রাফের ছেঁড়া তার জোড়া দিতে হয়েছে।

এছাড়া ব্রিজ উড়িয়ে দেবার সময় ভগ্ন সেতুর ধ্বংসস্তূপ নদীগর্ভে পড়ে নদীতে নৌ চলাচলের বাধা ঘটাচ্ছিল। প্রায় ৮৬টি এই রকমের ভগ্ন সেতুর মধ্যে অন্ততঃ ৩০টি সেতুর ভগ্ন স্প্যানগুলোকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে নদীপথকে পরিষ্কার করার দরকার হয়ে পড়েছিল। সে কাজও করেছেন ভারতীয় বাহিনী।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজ তাঁরা করেছেন, ৫৫,০০০ মাইন পরিষ্কার করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা অনেক অন্যায়ের মধ্যে একটা বড় অন্যায় করে, তা হল

প্রতিরক্ষার জন্য তারা যে সব মাইন পোঁতে, তার কোন চার্ট তারা রাখেনি। এটি জেনিভা চুক্তির বিরোধী। দেখা যায়, যত্রতত্র মাইন পোঁতা। অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে যুদ্ধের সময়। গ্রামের বহু মানুষ মারা যান মাইনে। অনেকে বিকলাঙ্গ হন। এই অসংখ্য মাইন দিনের পর দিন সাফ করেছেন আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা। এবং মাইন সাফ করা (যেখানে কোন লে আউট চার্ট নেই) যে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার তা না দেখলে বর্ণনা করা যায় না। প্রোডার হাতে করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে জমি পরীক্ষা করতে হয়। এবং একটুখানি হিসেবে ভুল হয়ে গেলেই দুর্ঘটনা ঘটে। যুদ্ধের পর গত তিন মাসে মাইন সাফ করতে গিয়ে আমাদের ৪০ জনের মত সৈনিক কেউ চোখ হারিয়েছেন, কেউ পা, কারও মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। মারা গেছেন জন দুয়েক। একজন ক্যাপটেন আমাকে বলছিলেন, যুদ্ধের সময় এই দুর্ঘটনায় কিছু যায় আসে না। কিন্তু ভাবুন, যুদ্ধ-বিজয়ের পর ঘরে ফেরার মুখে এই সব মানুষগুলোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই।

অনেকের ধারণা, বাংলাদেশের যুদ্ধ-বিজয় খুবই সহজে একরকম বিনা রক্ত-পাতেই হয়ে গিয়েছে। তা নয়, হাজার হাজার সৈনিকের কবরের ওপর দাঁড়িয়ে তবে এ যুদ্ধজয় সম্ভব হয়েছে। বাঙালী মুক্তি-যোদ্ধার রক্তের সঙ্গে ভারতীয় জওয়ানদের রক্ত একসঙ্গে মিশে তবেই এসেছে এই বিজয়। ভারতীয় সৈনাদের বাংলাদেশ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ওই মুক্তিযুদ্ধের অধ্যায়টি শেষ হল। ভারত-ইতিহাসের এই গৌরবময় অধ্যায়টিকে সাংবাদিক হিসাবে খুব কাছ থেকে দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছে, তাই ইতিবৃত্ত হয়ে তাঁরা চলে গেলেও স্মৃতি-ভারে আমি চিরকালই পড়ে থাকব।

*

বাংলাদেশের যুদ্ধ শিশুমনে কী প্রবল রেখাপাত করেছে, তার পরিচয় পেলাম সেদিন এখানকার কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের আঁকা ছবি দেখে। শিশুরা কখনও মিথ্যার স্বর্গে বাস করে না। তারা যা দেখে, অনুভব করে, অকপটে ব্যক্ত করে। এরা গত ন' মাস ধরে যে বর্বরতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, সেগুলি ফুটিয়ে তুলেছে ছবির মাধ্যমে। ফোটোগ্রাফির মত এই ছবিগুলো পাকশাহীর এক মূল্যবান দলিল। আমাদের আনন্দমেলার মত ইত্তেফাক কাগজে কচিকাঁচার মেলা বলে একটি বিভাগ আছে। তার সদস্যরা ছবি-গুলো এঁকে শেখ সাহেবকে দিতে এসে-ছিল সেদিন। শেখ ওগুলো মস্কো নিয়ে গেলেন ওখানকার ছেলেমেয়েদের দেখাবেন বলে। সাংবাদিক ও শিশু সাহিত্যিক রোকনুজ্জামান খান এই বিভাগের পরি-চালক। ছোটদের নিয়ে অনেক কিছুই তারা গড়ে তুলেছিলেন। অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে সদস্যরা শপথ নিয়েছে আবার নতুন করে তারা সব কিছু গড়বে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে আর একজন তরুণ শিল্পী কতগুলো সুন্দর ছবি এঁকেছেন জার্মান গোয়াস দিয়ে। শিল্পীর নাম মহীউদ্দীন।

বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবিদের কবিতা অবলম্বন করে তাঁর ছবি। সব কবিতারই বিষয়বস্তু স্বাধীনতা, আর নিপীড়ন।

মহীউদ্দীন ফরিদপুরের ছেলে। ঢাকার আর্টস কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। নববুদ্ধের চেতনায় লালিত।

এ-দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিক, গীতিকার, কবি সকলের মনকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে, তা থেকে শিল্প ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল এই মরসুমে এঁরা তুলতে পারবেন। কিন্তু ভয় হয়, এই বিরাট শিল্প-সমারোহের পর আবার যেন শূন্য বন্ধ্যা ঋতু না ফিরে আসে—যেমন আজ ওপার বাংলায় এসেছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১৯৭০-৭১ সালের রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে কোন্ তথ্য গ্রহণযোগ্য ?

বিগত আর্থিক বছরে, অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সালে রপ্তানির পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে কত হয়েছে সে সম্পর্কে ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক প্রদত্ত পরিসংখ্যান এবং রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া প্রদত্ত পরিসংখ্যানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গেছে এবং এটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ১৯৭০-৭১ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৫৩৫ কোটি টাকা; ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭০-৭১ সালে রপ্তানির পরিমাণ ৮·৩ শতাংশ বেড়েছিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭০-৭১ সালে রপ্তানির পরিমাণ হয়েছে ১৪০২·৭ কোটি টাকা এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তার পরিমাণ ছিল ১৪০৩·৯ কোটি টাকা। সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রদত্ত তথ্য এবং রিজার্ভ ব্যাংকের প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ১৯৬৭-৬৮ সালে বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১১৯৮·৬ কোটি টাকা, অথচ রিজার্ভ ব্যাংকের প্রদত্ত পরিসংখ্যান ছিল ১২৫৪·৬ কোটি টাকা। আবার ১৯৬৮-৬৯ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৩৬৭·৪ কোটি টাকা; অথচ বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে ছিল ১৩৫৭·৮৭ কোটি টাকা। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি ছিল না; ১৯৬৭-৬৮ সালে পার্থক্যের পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৭০-৭১ সালে প্রাপ্ত দুইটি পরিসংখ্যানের মধ্যে পার্থক্য হল ১৩২·৩ কোটি টাকার। এই বিরাট পার্থক্য স্বভাবিক ভাবেই সাধারণ লোকের মনে অনেক প্রশ্ন তুলেছে; বিশেষ করে অনেকের মনেই সরকারী পরিসংখ্যান সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের স্বার্থেই এ-জাতীয় সন্দেহের নিরসন করা দরকার।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক যে ভিত্তিতে রপ্তানির পরিমাণ পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেছেন রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার অনুসৃত পদ্ধতি তা থেকে আলাদা। তাছাড়া ১৯৭০-৭১ সালের শেষ পাঁচ মাসে জাহাজে মাল পাঠানোর অনুমোদনপত্রগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের হিসেবে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, ১৩২·৩ কোটি টাকার পার্থক্য থাকার কারণ কী? এ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের কর্তৃপক্ষ আরও আলোকপাত করবেন, সাধারণ মানুষ তা-ই আশা করেন। বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক সর্বশেষ যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় ভারতে ১৯৭০-৭১ সালে সামগ্রিকভাবে ৭ শতাংশ রপ্তানি বেড়েছে। যদি প্রকৃতপক্ষে তা-ই হয়ে থাকে তবে গত বছর রপ্তানি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে এবং ভারতের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার ক্ষেত্রে এটা একটা সুদৃঢ় পদক্ষেপ। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে সম্প্রতি ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার 'রিজার্ভ' যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। কৃষি-উৎপাদন এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভারত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু ভারত পিছিয়ে আছে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। যতদূর জানা গেছে ১৯৭১-৭২ সালে শিল্পোৎপাদন মাত্র ৩ শতাংশ বেড়েছে; তবে ১৯৭২-৭৩ সালে শিল্পোৎপাদন ৯ শতাংশ বাড়াবার চেষ্টা চলছে। ১৯৭২-৭৩ সালে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কিভাবে এগোবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে।

রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবার জন্যে অনেক আগেই ভারত সরকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প কার্যকরী করেছিলেন। রপ্তানির

পরিমাণ বাড়াবার পথে যে-সকল বাধা আছে, বিশেষ করে কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় মূলধন, রপ্তানি-সামগ্রীর গুণগত উৎকর্ষ, বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা; প্রাক জাহাজ-বোঝাই মাল পরিদর্শন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলি রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে ভোগ করতে হয় সেগুলি দূর করার জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের (State Trading Corporation) প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। কিন্তু রপ্তানি বাড়াতে আরও সফল হওয়ার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি পর্যাপ্ত নয়; সেজন্য ভারত সরকার কয়েকটি নতুন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। রপ্তানি বাড়াবার জন্য গঠিত বাণিজ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Trade Development Authority) সম্প্রতি দুই হাজারেরও বেশি ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যমায়তন শিল্প-ইউনিটের একটি সমীক্ষা চালিয়েছেন এবং কিভাবে এই ইউনিটগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানো যায় তার একটি কর্মসূচী তৈরি করেছেন। বলা হয়েছে, এই কর্মসূচী অনুযায়ী বর্ধিত পরিমাণে উৎপাদিত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হবে। আফ্রিকার দেশগুলিতে রপ্তানি বাজার আরও সম্প্রসারিত করার জন্য Institute of Foreign Trade এখন একটি সমীক্ষা চালাচ্ছেন। রপ্তানি বাড়াবার সব রকম চেষ্টা করা এখন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের যৌথ দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে। ল্যাটিন আমেরিকায় রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সংস্থাও গঠন করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশ-গুলির সঙ্গে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিবিড়তর করা হচ্ছে। আশা করা যায় বর্তমান বছরের, অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালের শেষে সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের (European Common Market) সদস্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য এবং ঐ দেশগুলিতে ভারতীয় সামগ্রীর রপ্তানি বাড়াবার জন্য ভারত সরকার সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছেন। চা বাণিজ্য কর্পোরেশন (Tea Trading Corporation), পাট কর্পোরেশনের (The Jute Corporation) এবং খনিজ ও ধাতব সামগ্রী বাণিজ্য কর্পোরেশনের (The Mineral and Metal Trading Corporation) রপ্তানি সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাকেও আরও ব্যাপক করা হয়েছে।

সুব্রত গুপ্ত

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

চিররঞ্জন এই পৃথিবীর একজন হেরে যাওয়া মানুষ। প্রথম যৌবনে যখন শরীর সোজা থাকে, স্নায়ু সব সময় সজাগ, আনন্দের উপকরণ আপনা থেকে চলে আসে কাছে, একা একা হেঁটে যাবার সময় গোপনে মনে হয় এই পৃথিবীটা আমার—সেই সময়েই তিনি পর পর দুটি আঘাত পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর মন ভেঙে যায়। আর রুখে দাঁড়াতে পারেন নি, বরং নিরাসক্ত হয়ে যান। পৃথিবীতে দাপটের সঙ্গে বেঁচে থাকার বদলে আরও কিছুদিন কাটিয়ে যাবার মনোভাব দেখা দেয়। কোনো জায়গায় প্রিয়রঞ্জন উপস্থিত থাকলেও তাঁর উপস্থিতি সহজে বোঝা যায় না।

যদিও প্রথম জীবনটা চিররঞ্জন ভালোই শুরু করেছিলেন। গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে পেরেছিলেন নিজের চেষ্টায়। তাঁর বাবা সারদারঞ্জনের কাছে ম্যাট্রিক পরীক্ষাই ছিল শিক্ষার চূড়ান্ত মান। সদরের হাইস্কুলে প্রতি বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয় দশ বারোটি ছেলে, তার মধ্যে পাশ করে দুটি বা তিনটি, তারাই বংশের মুখ উজ্জ্বল করা সন্তান। অত খেটে খুটে পরীক্ষা পাশ করার পর ছেলেরা চাকরি বাকরি জোগাড় করবে—গভর্নমেন্টের চাকরি হলে তো কথাই নেই। সারদারঞ্জনের ইচ্ছে তারপর ছেলেদের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনবেন, নাতি-নাতনীতে সংসার ভরে যাবে, সুখ তো এরই নাম। বড় ছেলে প্রিয়রঞ্জন একবারেই ম্যাট্রিক পাশ করে অল্পদিনের মধ্যেই চাকরিও পেয়ে গিয়েছিলেন, বিয়েও সেরে হয়েছিল যথারীতি। কিন্তু চিররঞ্জনের শখ হলো কলেজে পড়ার।

খরচ চালাবার জন্য নিজেরই চেষ্টায় চিররঞ্জন কলকাতার একটি বাড়িতে থাকা-খাওয়ার টিউশানি জোগাড় করে নিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই পরিবারটি খুব ভালো, সকলের ব্যবহার বেশ আন্তরিক। আমহার্স্ট স্ট্রীটের রায় বাড়িতে চিররঞ্জন দুটি ছেলের গৃহশিক্ষক, এক তলায় একটি ঘর পেয়েছেন—সকালবেলার জল খাবার আসে ওপর তলা থেকে, তবে দুপুরে আর রাত্তিরের খাবারটা খেয়ে নিতে হয় বারোয়ারি রান্নাঘরে গিয়ে। রান্নার ঠাকুররা বাড়ির মাস্টারকে একটু অবজ্ঞা করে, মাছের টুকরো প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু চিররঞ্জন তা নিয়ে কখনো অভিযোগ করেন নি। ছাত্রদের বিধবা পিসীমা মলিনা তাঁকে খুব স্নেহ করেন, প্রায়ই খোঁজ খবর নেন। বাড়িতে নারায়ণের পুজো হয় নিত্য তিরিশ দিন, যদি কোনোদিন পুরুতঠাকুর আসতে না পারেন, তখন চিররঞ্জনকেই নমো নমো করে ঘণ্টা নাড়তে হয়।

চিররঞ্জন আই-এ পাশ করার পর সারদারঞ্জন ছেলেকে আর একবার তাড়া দিলেন দেশে ফেরার জন্য। তিনি তখন ছেলের জন্য চারদিকে পাত্রী দেখে বেড়াচ্ছেন—তাঁর এই ছেলে দুটো পাশ দিয়েছে, এখন তার বাজার দর অনেক বেশী। তা ছাড়া, কলকাতা শহরে কত রকম ডাকিনী-যোগিনী ঘুরে বেড়ায়—কলেজ-কালের ছেলেকে কি সেখানে একা ফেলে রাখতে আছে! সিনেমা-থিয়েটারে যোগ দিয়েই বেশ্যাপল্লীর মেয়েগুলো এক একজন দেবী হয়ে উঠছেন! ঘরের বউরাও ঐ ম্লেচ্ছ শহরে ফিটনে চেপে বরের সঙ্গে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যায়! কিন্তু চিররঞ্জন গ্র্যাজুয়েট না হয়ে ছাড়বেন না। তার আগে বিয়েও করবেন না। এদিকে মলিনার সঙ্গে তাঁর স্নেহ-মমতার সম্পর্ক আস্তে আস্তে প্লেটোনিক প্রেমের দিকে মোড় নিচ্ছে।

বি-এ পরীক্ষা দেবার পর চিররঞ্জন দেশে ফেরার জন্য তৈরী হলেন। তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। ততদিনে সারদারঞ্জন অনেক দেখাদেখি করে তিন জায়গায় ছেলের বিয়ের সম্পর্ক প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন. এখন দর কষাকষি চলছে। সেই সময় পরীক্ষা দিয়েই ছাত্ররা এগজামিনারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতো রেজাল্ট জানার জন্য। তখন ছাত্র সংখ্যা এত বিপুল ছিল না—এগজামিনারও ছিল বাঁধা ধরা। তাঁদের বাড়ির সামনে লম্বা লাইন পড়তো সকাল থেকে—এগজামিনারের কোনো দয়ালু হৃদয় আত্মীয় এক একজনের রোল নাম্বার দেখে নিয়ে নম্বর বলে দিতেন।

চিররঞ্জন পরীক্ষা মোটামুটি ভালোই দিয়েছিলেন, মনে কোনো আশঙ্কা ছিল না—তবু হঠাৎ খবর পেলেন তিনি অংক ফেল করেছেন! নিজেই গরজ করে তিনি অর্থনীতির সংগে অংক কম্বিনেশান নিয়েছিলেন। খবর শুনে চিররঞ্জনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো! পরের বাড়িতে আশ্রিত থেকে যারা লেখাপড়া করে, তাদের পক্ষে ফেল করা যে কতখানি গ্লানির ব্যাপার, তা অন্য কেউ বুঝবে না। এখন কি উপায়? এরপর আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের রায়বাড়িতেও সম্মানের সংগে থাকা যাবে না!

চিররঞ্জনের এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন স্যার আশুতোষ নাকি গরীব ছাত্রদের অবস্থা শুনলে দু-এক সাবজেক্টে ফেল হলেও পাশ করিয়ে দেন। বন্ধু ভবশঙ্করের সংগে চিররঞ্জন একদিন গেলেন রসা রোডে স্যার আশুতোষের বাড়িতে। সকালবেলা লোকজনের ভিড়ে দেখা করাই যায় না। একটু দুপুরে-দুপুরে দুই বন্ধু সট করে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। বাংলার বাঘ তখন স্নানের আগে তেল মাখছেন। মস্ত বড় গোঁফ সমেত বিরাট মুখখানা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, আবার কি হলো? কি চাই তোদের, অ্যাঁ?

লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে চিররঞ্জন কি বললেন তা শোনাই গেল না। নাম গাম স্যার আশুতোষ হুংকার দিলেন, পেন্নাম করলি নে?

দুই যুবা তখনই বসে পড়ে ঝপাঝপ করে প্রণাম করলো পায় হাত দিয়ে। চাকরকে দিয়ে তেল মাখাতে মাখাতে স্যার আশুতোষ সব শুনলেন, খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন চিররঞ্জনের পরিবারের খবর, গ্রামের খবর। কিন্তু পাশ করিয়ে দিতে রাজী হলেন না। ধমকে বললেন, ফেল করেছো, আবার পড়ো। ইউনিভার্সিটিতে কি আমি দানছত্তর খুলেছি? খরচ চালাতে না পারো, কলেজের ফি মকুব করে দেবার ব্যবস্থা করবো। তোমার থেকে আরও অনেক গরীব ছেলে ভালো রেজাল্ট করে!

চিররঞ্জন নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। দুঃখে-লজ্জায় আমহার্স্ট স্ট্রীটের রায় বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। ভেসে বেড়াচ্ছেন এখানে-সেখানে। এই সময় হঠাৎ তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এক লগন ছাড়া পাত্রীর সংগে। এই পাত্রী পক্ষ ফেল করার খবর শুনে চিররঞ্জনকে একবার বাতিল করেছিল, পরে তারাই আবার সাধাসাধি করতে এলো নিজেদের গরজে। নববধূ বেশ সুন্দরী, শ্বশুর বড়লোক—চিররঞ্জন কিছুদিন কাটালেন আমোদ আহ্লাদে। শ্বশুর-বাড়িরই উদ্যোগে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ হোম পুলিস বিভাগে একটা চাকরিও জুটে গেল তাঁর। পাকা চাকরি, কম কাজ, উপরি আছে। সরকারী চাকরি সে আমলে ছিল স্বর্ণপ্রসু হাঁসের মতন। কাজ না করলেও চাকরি যাবার সম্ভাবনা নেই। করপোরেশন অফিসে চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে সারে পড়া কিংবা সরকারী অফিস সাহেবের গার্ড্রোব অনুযায়ী টিফিন করা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ঘুষের সুযোগ প্রায় সব বিভাগেই। বিয়ের বাজারে সরকারী চাকুরে পাত্রকে প্রকাশ্যেই জিজ্ঞেস করা হতো—মাইনে কত আর উপরি কত? মাইনে যত কম উপরি তার তিন-চার গুণ। ব্রিটিশ শাসকরাই খুব যত্নে এই ব্যবস্থাটি পাকা করে রেখেছিল। দেশের একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীকে কিছু বেশী সুবিধা দিয়ে বাকি লোকদের শোষণ করার অনেক সুবিধে হয়। দেশের মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস করে, লাভ হয় বিদেশীদের। তবে দেশ স্বাধীন হবার পরও যে এই ব্যবস্থা টিঁকে থাকবে—তা বোধহয় ব্রিটিশরাও কল্পনা করতে পারে নি।

এমন ভালো চাকরি থেকেও চিররঞ্জন হঠাৎ একদিন বরখাস্ত হয়ে গেলেন। হোম

মুখের দুর্গন্ধ মস্ত অন্তরায়

COLGATE DENTAL CREAM

কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন... সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পদ্ধায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। কারণ, কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়।

সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিন্টের গন্ধ—তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালবাসে!

মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও উজ্জ্বল দাঁতের জন্য···

দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট!

বি-এ পরীক্ষা দেবার পর চিররঞ্জন দেশে ফেরার জন্য তৈরী হলেন। তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। ততদিনে সারদারঞ্জন অনেক দেখাদেখি করে তিন জায়গায় ছেলের বিয়ের সম্পর্ক প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন, এখন দর কষাকষি চলছে। সেই সময় পরীক্ষা দিয়েই ছাত্ররা এগজামিনারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতো রেজাল্ট জানার জন্য। তখন ছাত্র সংখ্যা এত বিপুল ছিল না—এগজামিনারও ছিল বাঁধা ধরা। তাঁদের বাড়ির সামনে লম্বা লাইন পড়তো সকাল থেকে—এগজামিনারের কোনো দয়ালু হৃদয় আত্মীয় এক একজনের রোল নাম্বার দেখে নিয়ে নম্বর বলে দিতেন।

চিররঞ্জন পরীক্ষা মোটামুটি ভালোই দিয়েছিলেন, মনে কোনো আশঙ্কা ছিল না—তবু হঠাৎ খবর পেলেন তিনি অঙ্কে ফেল করেছেন! নিজেই গরজ করে তিনি অর্থনীতির সংগে অঙ্ক কম্বিনেশান নিয়েছিলেন। খবর শুনে চিররঞ্জনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো! পরের বাড়িতে আশ্রিত থেকে যারা লেখাপড়া করে, তাদের পক্ষে ফেল করা যে কতখানি গ্লানির ব্যাপার, তা অন্য কেউ বুঝবে না। এখন কি উপায়? এরপর আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের রায়বাড়িতেও সম্মানের সঙ্গে থাকা যাবে না!

চিররঞ্জনের এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন স্যার আশুতোষ নাকি গরীব ছাত্রদের অবস্থা শুনলে দু-এক সাবজেক্টে ফেল হলেও পাশ করিয়ে দেন। বন্ধু ভবশঙ্করের সংগে চিররঞ্জন একদিন গেলেন রসা রোডে স্যার আশুতোষের বাড়িতে। সকালবেলা লোকজনের ভিড়ে দেখা করাই যায় না। একটু দুপুরে-দুপুরে দুই বন্ধু সট করে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। বাংলার বাঘ তখন স্নানের আগে তেল মাখছেন। মস্ত বড় গোঁফ সমেত বিরাট মুখখানা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, আবার কি হলো? কি চাই তোদের, অ্যাঁ?

লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে চিররঞ্জন কি বললেন তা শোনাই গেল না। নগ্ন গাত্র স্যার আশুতোষ হুংকার দিলেন, পেন্নাম করলি নে?

দুই যুবা তখনই বসে পড়ে ঝপঝাপ করে প্রণাম করলো পায় হাত দিয়ে। চাকরকে দিয়ে তেল মাখাতে মাখাতে স্যার আশুতোষ সব শুনলেন, খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন চিররঞ্জনের পরিবারের খবর, গ্রামের খবর। কিন্তু পাশ করিয়ে দিতে রাজী হলেন না। ধমকে বললেন, ফেল করেছো, আবার পড়ো। ইউনিভার্সিটিতে কি আমি দানছত্তর খুলেছি? খরচ চালাতে না পারো, কলেজের ফি মকুব করে দেবার ব্যবস্থা করবো। তোমার থেকে আরও অনেক গরীব ছেলে ভালো রেজাল্ট করে!

চিররঞ্জন নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। দুঃখে-লজ্জায় আমহার্স্ট স্ট্রিটের রায় বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। ভেসে বেড়াচ্ছেন এখানে-সেখানে। এই সময় হঠাৎ তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এক [illegible] ছাড়া পাত্রীর সংগে। এই পাত্রী পক্ষ ফেল করার খবর শুনে চিররঞ্জনকে একবার বাতিল করেছিল, পরে তারাই আবার সাধাসাধি করতে এলো নিজেদের গরজে। নববধূ বেশ সুন্দরী, শ্বশুর বড়লোক—চিররঞ্জন কিছুদিন কাটালেন আমোদ আহ্লাদে। শ্বশুর-বাড়িরই উদ্যোগে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ হোম পুলিস বিভাগে একটা চাকরিও জুটে গেল তাঁর। পাকা চাকরি, কম কাজ, উপরি আছে। সরকারী চাকরি সে আমলে ছিল স্বর্ণপ্রসূ হাঁসের মতন। কাজ না করলেও চাকরি যাবার সম্ভাবনা নেই। করপোরেশন অফিসে চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে সরে পড়া কিংবা সরকারী অফিসে সাহেবের গতিবিধি অনুযায়ী টিফিন করা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ঘুষের সুযোগ প্রায় সব বিভাগেই। বিয়ের বাজারে সরকারী চাকুরে পাত্রকে প্রকাশ্যেই জিজ্ঞেস করা হতো—মাইনে কত আর উপরি কত? মাইনে খুব কম উপরি তার তিন-চার গুণ। ব্রিটিশ শাসকরাই খুব সযত্নে এই ব্যবস্থাটি পাকা করে রেখেছিল। দেশের একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীকে কিছু বেশী সুবিধা দিলে বাকি লোকদের শাসন করার অনেক সুবিধে হয়। দেশের মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস করে, লাভ হয় বিদেশীদের। তবে দেশ স্বাধীন হবার পরও যে এই ব্যবস্থা টিঁকে থাকবে—তা বোধহয় ব্রিটিশরাও কল্পনা করতে পারে নি।

এমন ভালো চাকরি থাকতে চিররঞ্জন হঠাৎ একদিন বরখাস্ত হয়ে গেলেন। হোম

মুখের দুর্গন্ধ মস্ত অন্তরায়
COLGATE
DENTAL CREAM
কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন...
সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পদ্ধায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। কারণ, কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়।
সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিন্টের গন্ধ—তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালবাসে!
মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও উজ্জ্বল দাঁতের জন্য...
দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট!
দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য ব্যবহার করুন
কলগেট টুথ ব্রাশ
১৫ রকমের—প্রত্যেকের উপযুক্ত!
DCG-48 BN

পুলিস বিভাগে কাজ করে যে ব্যক্তি, তারই ভাই খুন করেছে সাহেব পুলিস কমিশনারকে, এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! শুধু যে এই চাকরিটাই গেল তা নয়, সমস্ত রকম সরকারী চাকরির দরজা চিরকালের মতন বন্ধ হয়ে গেল। এর পরেও নিস্তার নেই, চিররঞ্জন লক্ষ্য করলেন, তিনি যেখানেই যান সব সময় দু'জন লোক ছায়ার মতন তাঁর পেছনে পেছনে ঘোরে। নিদারুণ ত্রাসে চিররঞ্জনের সারাটা দিন কাটে। কোথাও চাকরি খুঁজতে যাওয়ারও উৎসাহ পান না। তাঁর ছোট ভাই ওরকম একটা কাণ্ড করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, এজন্য শোক করারও অবকাশ নেই, নিজের চিন্তাই তখন প্রবল।

চাকরি পাবার পর স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে সবে মাত্র সংসার পেতেছিলেন কলকাতায়, সে সংসার ভেঙে দিতে হলো। ততদিনে সারদারঞ্জন মারা গেছেন, দেশের বাড়িতে থাকাও নিরাপদ নয়। বড় ভাই প্রিয়রঞ্জন বরিশাল শহরে বাসা করেছেন, সেখানে থাকার জন্য আহ্বান জানালেন ওঁদের। কিন্তু দাদার সংসারে বোঝা বাড়ানোর বদলে অনেক ভেবে চিন্তে শ্বশুরের বাড়িতে গিয়েই আশ্রয় নিলেন—তাঁদের বিরাট বড় সংসার, এমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।

শুরু হয়ে গেল চিররঞ্জনের আশ্রিত জীবন। ছাত্র বয়েসেও তিনি পরের বাড়িতে থেকেছেন, তারপর থেকে সারাটা জীবনই প্রায় তাঁকে পরের বাড়িতে কাটিয়ে যেতে হলো। বাকি জীবনটা চিররঞ্জন আর বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারেন নি, সেই উদ্যমই হারিয়ে ফেলেছিলেন। মাঝে মাঝে আরও কয়েকটা চাকরি করেছেন, একবার ব্যবসা করতেও গিয়েছিলেন, কোনোটাই ঠিক মতন দানা বাঁধলো না। চিররঞ্জনের শ্বশুর একজন নামকরা পণ্ডিত লোক, আবার সাংসারিক ব্যাপারেও খুব অভিজ্ঞ, এই জামাইটিকে তিনি জীবনে দাঁড় করিয়ে দেবার অনেক রকম চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যার নিজের পায়েই জোর নেই, সে দাঁড়াবে কি করে! শ্বশুরের সুপারিশে পাওয়া দিল্লিতে একটা ভালো চাকরিতেও চিররঞ্জনের মন বসলো না।

শুভার্থীদের পরামর্শে কিছুদিন নিজের গ্রামে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সেজেও বসেছিলেন। গ্রামে তখনও ডাক্তারের অভাব। মেটিরিয়া মেডিকা এক খানা কিনে আর কিছু ওষুধ পত্তর নিয়েই হোমিওপ্যাথি শুরু করা যায়। কিন্তু যে-লোক সত্যিই ডাক্তারি বিদ্যে জানে না, তাকে ডাক্তার সাজতে হলে মিথ্যে কথা বলায় খুব ধুরন্ধর হতে হয়। চিররঞ্জনের সে গুণও ছিল না। ফলো কেলো রুগী চোর কিংবা মুখচোরা বারবণিতাদের যা অবস্থা হয়, চিররঞ্জনেরও তাই হলো। কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে ডাক্তারখানার ঝাঁপ ফেলে দিলেন।

স্ত্রী-কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে চিররঞ্জন মাঝে মাঝে চলে আসেন কলকাতায় কাজের খোঁজে। এই বিরাট শহরের ভিড়ে মিশে থাকতে তাঁর ভালো লাগে। চিররঞ্জনের চেহারাটা খুব রোগা পাতলা, এখন অল্প বয়েসেই তাকে খানিকটা বুড়োটে দেখায়। মাঝে মাঝে যান আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই রায় বাড়িতে। তাঁর ছাত্র দু'জনের মধ্যে একজন ব্যারিস্টারী পড়তে গেছে বিলেতে, একজন পৈতৃক ব্যবসা দেখছে—সে বেশ খাতির করে মাস্টারমশাইকে। প্রায়ই সে মাস্টারমশাইকে একটা না একটা চাকরির প্রস্তাব দেয়, চিররঞ্জন প্রত্যেকটিই প্রত্যাখ্যান করেন হাসিমুখে। স্যার আশুতোষ মারা গেছেন। এ বাড়িতে মল্লিনাথেরও বয়েস বেড়েছে বোঝা যায়, চুলে সাদা ছোপ ধরেছে একটু। নিয়মিত সন্ধেবেলা এসে চিররঞ্জন মল্লিনাথের থেকে তিন-চার হাত দূরত্ব রেখে বসে গল্প করে যান ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনো কখনো দু'জনের কেউই একটাও কথা বলেন না, দুই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন চুপচাপ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এঁদের দু'জনের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় খুব মিল আছে।

চিররঞ্জন তখন কলকাতায় একটা কো-অপারেটিভ মেস-এর ম্যানেজার। চাকরে বাবুদের মেস, একমাত্র চিররঞ্জনকেই নির্দিষ্ট

হিসেবে অফিসে যেতে হয় না বলে তাঁকে ম্যানেজার করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর চার্জ অর্ধেক। এই সময় টেলিগ্রাম পেলেন শ্বশুরবাড়িতে তাঁর স্ত্রী আর একটি সন্তান প্রসব করেছেন, এবার পুত্র। খবরটা পেয়ে চিররঞ্জন প্রথম দু'দিন বিষণ্ণ হয়ে রইলেন। অনুভব করলেন, সংসার তাঁকে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াচ্ছে। যাঁর স্ত্রীকে চিরকাল বাপের বাড়ি ফেলে রাখতে হয়, তাঁর পুত্র-কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আনন্দিত হবার কথা নয়। টেলিগ্রাম পেয়েও চিররঞ্জন গেলেন না। কয়েকদিন পর চিঠিতে বিস্তারিত খবর এলো। বর্ষাকাল সেদিন ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ অত্যন্ত বেশী আঁতুর ঘরের চাল উড়ে গিয়েছিল, কয়েকটি দিন খুব সংকটজনক অবস্থায় কেটেছে জননী ও নবজাতকের। ছেলের নাম রাখা হয়েছে বাদল।

এই চিঠি পেয়ে চিররঞ্জন হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যেন তাঁর মনে হলো এই ছেলেই তাঁর সব দুঃখ কষ্ট দূর করবে। নিজের জীবনে তিনি যা পারেন নি, এই ছেলে সার্থক করবে সেই সব স্বপ্ন। পুন্নাম নরকের ভয় ছিল না চিররঞ্জনের কিন্তু পুত্রই পিতাকে ভরসা দেয়। খেয়ালের মাথায় এক রাশ টাকা ধার করে তিনি স্ত্রীর জন্য শাড়ি এবং ছেলের জন্য বিলিতি খেলনা পাঠালেন পার্সেল করে।

বড় ভাই প্রিয়রঞ্জন বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন বরিশালে। ফরিদপুরে নিজেদের বাড়িতে বিশ্বরঞ্জনের খোঁজে তখনও ঘন ঘন পুলিশ আসে, তাই দেশের বাড়ির সংগে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়েই দিয়েছিলেন একরকম। ছোট ভাই নিখিলরঞ্জন তাঁর কাছেই থাকে, পড়াশুনোয় মাথা নেই, ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। বি এম কলেজের উল্টোদিকে প্রিয়রঞ্জন একটা কাগজ কলম-পেন্সিল-এর দোকান খুলে ছোট ভাইকে বসিয়ে দিলেন সেখানে। দোকানটা দেখতে দেখতে বেড়ে উঠলো।

প্রিয়রঞ্জন একটু রগচটা ধরনের মানুষ। ছোট ভাইয়ের সামান্য দোষ ত্রুটি দেখলেই মারধোর করতেন। নিখিলরঞ্জন যখন বড় রকমের একটা কেলেঙ্কারি করে ফেললো, তখন প্রিয়রঞ্জন এমন মার মারতে লাগলেন যে, পাড়া প্রতিবেশীরা এসে না আটকালে একটা কিছু অঘটন ঘটে যেত। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রিয়রঞ্জন বলেছিলেন, মারবো না তো কি করবো? নিজের ভাইকে তো পুলিশে দিতে পারি না? আহত নিখিল-রঞ্জন ধুঁকতে ধুঁকতেই সে রাত্রে বাড়ি থেকে সরে পড়লেন। এক মাস বাদে চিঠি এলো আসাম থেকে, দাদা আমি ভালো আছি। আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি ঠাকুরের পাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়াছি।—সেই থেকে নিখিলরঞ্জন রামকৃষ্ণ মিশনে—সাদা কাপড় থেকে আস্তে আস্তে গেরুয়া পেয়েছেন।

চাকরির থেকেও কাগজের দোকানের ব্যবসাতেই প্রিয়রঞ্জনের বেশী উন্নতি হতে লাগলো। অমরনাথ যখন কলকাতায় এসে বাড়ি কিনলেন, তখন প্রিয়রঞ্জন তাঁর সংগে দেখা করতে এসে সেই সংগে কলকাতার ব্যবসার বাজারটিও পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখে বড় শহরের বিস্তৃত সুযোগটা ঠিক ধরা পড়লো। চাকরি ছেড়ে প্রিয়-রঞ্জন কলকাতাতেই ব্যবসা করবেন ঠিক করে ফেললেন। অমরনাথের অত বড় বাড়ি, থাকারও কোনো অসুবিধে নেই। উদাসীন প্রকৃতির অমরনাথ এ প্রস্তাবে এক কথাতেই রাজী, এমন কি প্রিয়রঞ্জনের পিড়াপিড়িতে তিনি ও'র কাগজের ব্যবসায় লগ্নিও করলেন কিছু টাকা। এক বছরের মধ্যে প্রিয়-রঞ্জনের দোকানের দুটি শাখা স্থাপিত হলো কলকাতায়—তিনি চিররঞ্জনকেও সপরিবারে টেনে আনলেন এ বাড়িতে এবং প্রায় জোর করেই ছোট ভাইকেও পার্টনার করে নিলেন ব্যবসায়। যদিও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, এ ভাইটির কাছ থেকে বিশেষ কিছু কাজ পাওয়া যাবে না।

এ বাড়িতে অমরনাথ কর্তা হলেও দেখাশুনোর সব ভার প্রিয়রঞ্জনের। বাড়ির চুনকাম থেকে বাথরুমের দরজা সারানোর তদারকি তিনিই করেন। কোথায় কলের মিস্ত্রি পাওয়া যায়, সিমেন্ট কোথায় সস্তা —এসব তাঁর নখ দর্পণে। প্রিয়রঞ্জনের স্ত্রী

সুপ্রভাই বাড়ির গৃহিণী। সুপ্রভা একটু বেশী মুখরা—এ ছাড়া সংসার সামলাবার সব গুণই তাঁর আছে। ঝি অনুপস্থিত হলে বাড়ির তিনতলা থেকে একতলা তিনি নিজেই ধরে মুছে ফেলতে পারেন। কার পাতে কটুকরো মাছ পড়বে সেদিকেও তাঁর সমান দৃষ্টি। ঝি চাকরদের ওপর তিনি একটু বেশী অত্যাচার করেন বটে, কিন্তু চিররঞ্জনের স্ত্রী হিমানীকে কখনো ঘাটান না। হিমানী বড়লোকের মেয়ে—এজন্য তাঁর মনে একটু সমীহের ভাব আছে। যদিও সুপ্রভার স্বামীর অবস্থা এখন যথেষ্ট সচ্ছল—কিন্তু তিনি সাধারণ গরীব ঘরের মেয়ে—এই মানসিক বৈষম্য কখনো ঘোচে নি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রী ও সন্তানদের নিজের কাছে এনে রেখেছেন বটে, তবু চিররঞ্জনের মনে সুখ নেই তেমন। এটাও তো পরেরই বাড়ি। তিনি পরবাসী হয়েই রইলেন। মাঝে মাঝে কাগজের দোকানে গিয়ে বসেন, কখনো সখনো আলাদাভাবে তিনি নিজেও কিছু রোজগার করে ফেলেন কোনো উপায়ে—তখন বাড়ির সকলকে কিছু না কিছু উপহার কিনে দেন। মোটমাট তিনি সারা জীবন বেকার হয়েই রইলেন। আগেও কম কথা বলতেন, এখন প্রতাপশালী দাদার ছত্রছায়ায় আরও চুপচাপ হয়ে যেতে লাগলেন ক্রমশ। সাংসারিক কোনো ব্যাপার তিনি মাথা ঘামান না।

যে-কোনো কারণেই হোক প্রিয়রঞ্জনের চেয়ে চিররঞ্জনকেই বেশী পছন্দ করে ফেলেলেন অমরনাথ। এই নিরাসক্ত মানুষটির প্রতি তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে কাজের কথা, দরকারী কথা সেরে নিতেন চট করে, আর চিররঞ্জনের সঙ্গে প্রাণের কথা বলতেন। অমরনাথ এটুকু ভালো করেই বুঝতেন যে, ব্যবহারিক সুবিধের জন্য প্রিয়রঞ্জন তাঁকে খাতির করলেও মনে মনে তাঁকে পছন্দ করেন না। অমরনাথ এক সময় প্রিয়রঞ্জনের নিজের বোনকে কষ্ট দিয়েছিলেন, মুসলমান নর্তকীর সঙ্গে বসবাস করেছেন, এসব প্রিয়রঞ্জন কখনই পুরো ক্ষমা করতে পারবেন না। নেহাৎ বাইরে বাইরে মানিয়ে চলছেন। চিররঞ্জন ওসব পুরোনো ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামান না। অমরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, চিররঞ্জন চুপচাপ থাকলেও আশেপাশের সব কিছুই খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করার একটা প্রবণতা আছে তাঁর মধ্যে। এই এক ধরনের মানুষ, যারা ইচ্ছে করে ঠকে। অর্থাৎ যে ঠকাচ্ছে, তাকেও বুঝতে দেয় না যে সে তো বুঝেসুঝেই ঠকছে। অন্যদের মূর্খতা দেখে যে মনে মনে হাসে, অথচ নিজে কখনো তার ওপর টেক্কা দেবার জন্য বেশী চালাকের মতন ব্যবহার করে না। এই নেশায় যারা মজে যায়, তারা সুখী হয় কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু তারা জীবনে উন্নতি করার চেষ্টায় মাতে না কখনো।

অমরনাথ ক্রমশ জানতে পেরেছিলেন, চিররঞ্জন কয়েকটি নিজস্ব ধারণা মিলিয়ে এক ধরনের দর্শন গড়ে তুলেছেন। সেই দর্শনের মধ্যে খানিকটা সিনিসিজম আছে, তবু শুনলে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়।

প্রিয়রঞ্জন একদিন বাড়িতে ঢুকলেন চিৎকার করতে করতে। সদর দরজার সামনেই পাশের বস্তির ছেলেরা হেগে রেখে গেছে, প্রিয়রঞ্জন অন্যমনস্কভাবে তাতে পা দিয়ে ফেলেছেন। ঘেন্নায় ছটফট করছেন একেবারে। বালতি বালতি জল ঢেলে পা ধোওয়া হল, তবু ঘেন্না যায় না। সুপ্রভা মাথায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেন। প্রিয়রঞ্জন তবু ওপরে উঠতে পারছেন না, বালতি সুদ্ধ সাবান গোলা জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এর একটা বিহিত করতেই হবে!

দোতলার বারান্দায় অমরনাথ আর চিররঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশাপাশি। একটু পরে চিররঞ্জন আপন মনেই বললেন, সবই মন। একবার ধুলেও যা, দশবার ধুলেও তা। সবাই জানে। তবু মনে থাকে না।

অমরনাথ শুনতে পেয়ে বললেন, তা তো বটেই, মনই তো সব।

চিররঞ্জন বললেন, অপরের উপবাসেও

ধরে নিয়ে ব্যবহার করা যায় অনায়াসে, হৃদয় আমরা করতে পারি না। কিন্তু জল খাবার গেলাস ধরে নিয়ে ব্যবহার করতে পারি।

অমরনাথ এবার শুধু হাসলেন। চিররঞ্জন আবার বললেন, আমরা ভুলে যাই, আমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে খানিকটা গু আছে। সারাদিন শরীরের মধ্যে গু নিয়ে ঘুরছি! অথচ নিজের শরীরটাকে অপবিত্র মনে হয় না।

অমরনাথ এবার বললেন, কিন্তু এটা তো ভুলে থাকাই ভালো। তাই না?

চিররঞ্জন সংগে সংগে মেনে নিয়ে বললেন, তা ঠিক!

কিন্তু একটা কথা চিররঞ্জনের মাথায় ঢুকলে আর সহজে ছাড়ে না। সারাদিন সেইটাই বোধহয় ভাবতে থাকেন। সেইদিনই সন্ধেবেলা তিনি অমরনাথকে নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বড়বাবু, এমন কোনো সাবালক মেয়ে পুরুষ আছে এ পৃথিবীতে, যারা প্রতিদিন সকালে পায়খানা ঠিক মতন হলো কিনা এই নিয়ে ভাবে না?

বড়বাবু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, বলা শক্ত।

—সন্ন্যাসীদেরও কি এইরকম হয়? মহাত্মা গান্ধীরও হয়?

—হঠাৎ এসব কথা মনে এলো কেন?

—মানুষের মনে বেশীর ভাগ চিন্তাই তো হঠাৎ আসে। তার কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে?

—সন্ন্যাসীদের তো এই জন্যই জিতেন্দ্রিয় বলে। তাঁরা নিশ্চয়ই এ সবের উর্ধ্বে। আমি কিছুদিন ওঁদের সংগে মিশেছিলাম—তখন অবশ্য আমার মনে এ প্রশ্ন আসে নি। তা হলে জেনে নিতুম।

—জিতেন্দ্রিয় বলতে তো কামনা-বাসনা জয় করাই বোঝায়, নিছক যেগুলো শারীরিক প্রয়োজন, যেমন খাওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় খাদ্য শরীর থেকে বার করে দেওয়া—এগুলো কি এড়ানো যায়?

—কামনা বাসনাও শারীরিক প্রয়োজন। তুমি মানো কিনা জানি না, আমি মানি। কামনা-বাসনাকে যারা দূরে সরিয়ে রাখে, তাদের শরীর সেটা সহজে মেনে নেয় না, অনেকে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়। অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীই এক ধরনের উন্মাদ, আমি লক্ষ্য করেছি। ভাবোন্মাদও বলতে পারো। লোকে তাই বলে।

—কিন্তু সব মানুষের সব ইন্দ্রিয় তো সমান শক্তিশালী নয়। কারুর স্পর্শে বেশী আনন্দ, কারুর দর্শনে। পর নারীকে স্পর্শ করা অন্যায়, দর্শনে তো কেউ দোষ দেয় না। অথচ এমন মানুষও তো আছে, যাদের রূপ দেখার চোখ আছে, যারা বিভিন্ন ফুলের রং চিনতে পারে— তারা কোনো নারীর রূপের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে যে আনন্দ পায়...

বড়বাবু টেবিলে টোকা মারতে মারতে বললেন, বুঝতে পারছি, তোমারও বয়েস হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেই এই সব মনে পড়ে। অল্প বয়েসে শুধু চোখে মন মানে না, ছুঁয়ে দেখতেই হয়!

—বুড়ো হয়ে গেলেও আমার দুঃখ নেই। অভিজ্ঞতা না হলে উপভোগ গাঢ় হয় না। ছোকরা বয়েসে তো ছটফট করেই সময় কেটে যায়!

অমরনাথ যেদিন সূর্যকে খুব শাস্তি দিয়েছিলেন, সেদিন চিররঞ্জন পেছন থেকে এসে আলতো তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, কেন শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন?

(ক্রমশ)

খেটে খাই-
ষোল-আনা
তৃপ্তি চাই!
SCISSORS
সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা

রঙ ও তুলি বা ব্রাশের সাহায্যে আপন বক্তব্যটুকু প্রকাশ করাই শিল্পীর ধর্ম। অধিকাংশ শিল্পী বিভিন্ন অঙ্কন রীতি অবলম্বন করে তাঁদের বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। অনেকে আবার অঙ্কনরীতির চেয়ে চিন্তাধারার ওপর অধিক প্রাধান্য দেন। অর্থাৎ বিশিষ্ট ও নির্ধারিত চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করেই ছবি আঁকেন। রঙ ও তুলি-ব্রাশের কারুকার্য অবশ্যই থাকে, তবে সেটা মুখ্য বস্তু নয়। সোজা কথায় এ জাতীয় শিল্পীদের শিল্পকর্মে তাঁদের মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয়ই অধিক মেলে। শিল্পী বাণীপ্রসন্ন এই শ্রেণীর শিল্পী। অ্যাকাডেমি গ্যালারিতে

বাণীপ্রসন্নর একটি শিল্পকর্ম

অনুষ্ঠিত তাঁর প্রদর্শনীতে ঠিক এই বিশেষত্বই চোখে পড়ে। শিল্পী হিসাবে বাণীপ্রসন্ন অপরিচিত নন। ইতিপূর্বে কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন করে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার জন্যে তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রদর্শনীতে স্বরচিত ছড়া, কালি-কলমের স্কেচ ও রঙীন বহু ছবি দেখা যায়। শিল্পীর বিশ্বাস, অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুই সুনিয়ন্ত্রিত মহাবিশ্বের অংশ বিশেষ এবং পারিপার্শ্বিক জগতের প্রত্যেক বস্তুই এই মহাবিশ্বের নিয়মানুবর্তী নিত্য নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে। দুর্বার এক গতিবেগই এই নব নব রূপসৃষ্টির কারণ এবং সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই গতিবেগই পার্থিব জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিত্য নব নব রূপ সৃষ্টি করে চলেছে। এই মূল কথাটিই শিল্পী রঙ ও রেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

বলা বাহুল্য, বিষয়টি জটিল, এবং যাঁরা শিল্পীর চিন্তাধারার মূল সূত্রটির সন্ধান না পাবেন তাঁদের পক্ষে শিল্পীর বক্তব্য বোঝা কঠিন মনে হবে। শিল্পী গভীর রঙের পক্ষপাতী, তাঁর অঙ্কনরীতিতে বিপুল আলোড়ন তথা গতিবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পী তাঁর চিন্তাধারাটি ক্রমানুসারে সুররিয়ালিস্টিক রীতিতে প্রকাশ করেছেন, কয়েক স্থলে আবার এই ধারাই বিমূর্ত বা সমবিমূর্ত রীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে হয়ত শিল্পী প্রতীক মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় রচনা-সম্ভার থেকে বিশেষ কোনও ছবি চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তা হলেও প্রতীকমূলক এক্সপেকট্যান্ট মাদার, বিমূর্ত কাট অ্যান্ড আউল বা টু উইমেন অ্যান্ড আউল অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী ড্রয়িং-এ সিদ্ধহস্ত, ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃত করেও তিনি আকারেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন এবং এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। নিজ বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য তিনি মানুষ ও নানা জীবজন্তুর অবতারণা করেছেন ও বিশেষ করে গভীর নীল, হলুদ লাল ও নীল রঙ ব্যবহার করে আকার বজায় রেখে রঙের স্তরভেদের মধ্য দিয়ে বেগবান বিশেষ জাতীয় শিল্প সৃষ্টি করেছেন। আপাত-দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য হলেও শিল্পীর রচনা নিরর্থক নয়, কারণ এগুলি মনে রেখাপাত করে। তবে এ জাতীয় ছবির নির্বাচন বিষয়ে একটু সংযত হওয়া উচিত মনে করি। কারণ একত্রে এই শ্রেণীর বহু ছবি দর্শকদৃষ্টি ব্যাহত করে।

*

অ্যাকাডেমি গ্যালারিতে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার গ্রাফিক শিল্পের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নেওয়া ৯৯টি মৌলিক গ্রাফিকপ্রিন্ট দেখা যায়। যাঁরা গ্রাফিক শিল্পের সমকালীন ধারার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে নানা প্রক্রিয়া মাধ্যমে একাধিক প্রিন্ট নেওয়াই আজ এই শিল্পের প্রধান লক্ষ। মুখ্যত, আধুনিক গ্রাফিকশিল্প পরীক্ষামূলক। সূক্ষ্ম ও গভীর খোদাই করে বিভিন্ন রঙ প্রয়োগ দ্বারা নানা ইমেজারি সৃষ্টি করাই আধুনিক গ্রাফিক শিল্পের লক্ষ্য। আধুনিক গ্রাফিক শিল্পে আকারের কোনও প্রাধান্য দেখা যায় না—আকারভিত্তিক রূপের পরিবর্তে রঙ ও রেখাজালের মায়া সৃষ্টি করেই আধুনিক গ্রাফিক শিল্পীবৃন্দ আনন্দলাভ করে থাকেন। এক কথায় নিত্য নতুন প্রিন্ট পদ্ধতির ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপ থেকে কয়েকজন শিল্পী অস্ট্রেলিয়ায় আসেন ও প্রিন্ট নেবার নানা নতুন পদ্ধতির সূত্রপাত করেন। প্রদর্শনীভুক্ত অধিকাংশ শিল্পীই তরুণ, সুতরাং তাঁদের শিল্পকর্মে আধুনিক নানা প্রয়োগ কৌশলের পরিচয়

সিজরাস অ্যান্ড মিররস্ — জন ব্র্যাক
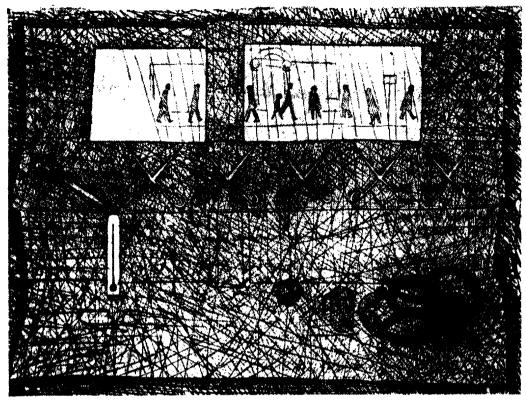
মেলে। তা সত্ত্বেও বয়স্ক কয়েকজন শিল্পীর গ্রাফিককর্মে চিরাচরিত আকার প্রাধান্য দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নেয়েল কুনিহ্যান, মেরী ম্যাককুইন-এর নাম করা যায়। প্রথমজনের অ্যাবরিজিন্যাল মাদার অ্যান্ড চাইল্ড লিনোকাটের সুন্দর নিদর্শন —আদিম যুগের মাতার পুত্রস্নেহ এটিতে চমৎকার ফুটে উঠেছে। বয় ইন হেলমেট-ও (স্ক্রীন প্রিন্ট) উল্লেখ্য। দ্বিতীয়জনের জিরাফস আকার ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে নিখুঁত। সমকালীন প্রিন্টের মধ্যে গ্রেহাম কিং-এর নিদর্শনগুলি প্রথমেই চোখে পড়ে। সূক্ষ্ম রেখাজাল, নীল রঙের স্তরভেদ ও প্রয়োজন মত হলুদ রঙ ব্যবহার করে তিনি প্রায় প্রত্যেক প্রিন্টেই রঙীন স্ফটিকের আকার ও স্বচ্ছতা সৃষ্টি করেছেন, যেমন মাইক্রোফর্ম ২, ৪ ও ৫ (লিথোগ্রাফ)। এচিং-এ জন ব্র্যাকের সূক্ষ্ম খোদাই কাজ লক্ষণীয়, যেমন সিজরাস অ্যান্ড মিররস্। একটি আয়তক্ষেত্রের ওপর বিভিন্নভাবে বিন্দু ব্যবহার ও রঙের তারতম্য সৃষ্টি করে ডেভিড রেজ তার প্রিন্টে আয়তনিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন (গোয়িং অ্যাওয়ে গেম—স্ক্রীন প্রিন্ট)। সূক্ষ্ম কারুকার্য থাকা সত্ত্বেও আকারের দিক থেকে জন নীসনের আনটাইটেলড-১৯৭১ এচিং-এর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ডিটেলের দিক থেকে ড্যানিয়েল ময়নিহ্যান-এর কিং অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অ্যালান লিচ-জোনস ও নর্মানা ওয়াইট-এর প্রিন্ট অলংকারধর্মী (মালিনিস ডায়েরী-২ ও আনটাইটেলড)। গভীর খোদাই ও ছাই রঙ সহযোগে ফ্রেড উইলিয়ামস ওভাল ল্যান্ডস্কেপে সুন্দর ইমেজারি সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য প্রিন্টের মধ্যে আয়তক্ষেত্রভিত্তিক স্টিফেন স্পারিয়ারের মাশরুম (স্ক্রীন প্রিন্ট), জান সেনবার্গস-এর আকারপ্রধান প্রতীক জাতীয় হিল (স্ক্রীন প্রিন্ট), ছোট্ট ছেলের আঁকা ছবির মত সরল সুন্দর। অ্যালান মিটেল-ম্যানের রো-পর (লিথোগ্রাফ ১৯৬৯) ও বারবারা ব্লাসের উইন্ডোজ (স্ক্রীন প্রিন্ট)-এর নাম করা যায়।

*

শিল্পী নীরেশ রায় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। জলরঙ ও টেম্পারায় আঁকা ১৮টি ছবি প্রদর্শনীতে দেখা যায়। শিল্পী ইতিপূর্বেও কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, সুতরাং সে হিসাবে তিনি একেবারে অপরিচিত নন। ভারতীয় রীতিতে আঁকলেও শিল্পীর কয়েকটি রচনা অলংকারধর্মী। শিল্পী অধিকাংশ স্থলেই চাপা রঙ ব্যবহার করেছেন এবং কোনো কোনো ওয়াশও আছে—তবে দুঃখের বিষয়, রচনাগুলি দুর্বল। কয়েক-স্থলে শ্রদ্ধেয় যামিনী রায়ের অনুকরণে বলিষ্ঠ রেখা ব্যবহার দেখা গেলেও ছবি-গুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ হয়নি। অলংকারধর্মী দু একটি ছবি মন্দ লাগেনি, যেমন বৈষ্ণব, মনসা ও বালগোপাল, যদিও রেখা ব্যবহারের দিক থেকে উল্লেখ্য হলেও শেষোক্ত ছবিটির কেন্দ্রস্থল, মুখমণ্ডলে বালসুলভ কমনীয়তা আদৌ ফুটে ওঠেনি। আলঙ্কারিক রূপসৃষ্টিকালে অযথা বাহুল্য বর্জন করলে শিল্পীর বাউল ছবিখানি বোধ হয় রসোত্তীর্ণ হ'ত। রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত ও বহুলপঠিত দু একটি কবিতাও শিল্পী রঙ ও রেখায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু ঠিক সফলকাম হননি। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" অবলম্বনে রচিত ছবিটির আড়ষ্ট-ভাব অনেকের কাছেই ধরা পড়ে। তবে সবুজ ও হলুদ রঙ মাধ্যমে রচিত স্টাডি অনেকের ভাল লাগে।

চিত্রপ্রিয়

ভোটের পণ্য ও এক বাঙালী প্রসঙ্গে

সত্যই ভোটের হাটের পণ্য, মুসলমান সম্প্রদায়। আবার সময়কালে সে 'কানা বেগুন', তার উল্লেখযোগ্য নজির 'মুসলীম লীগের' সাম্প্রতিক অবস্থা। এবার দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থীর ঝুলিতে ওঠেনি সে শুধু 'কানা বেগুন' বলেই। যথাসময়ে যে বেগুনকে তুলে নিলে রসনা তৃপ্তি দিত, কিন্তু তাকে অযত্নে, অবহেলায় কানায় পরিগণিত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন উভয়পক্ষই। এর হাত হতে রেহাই পেতে হলে যা করণীয় তা "দুই বাংলা এক বাঙালী" নিবন্ধে 'রূপদর্শী' মহাশয় জোরালো যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন। তবুও বাংলার দুই মনীষীর বক্তব্য তুলে দিলাম, এই সমস্যার সমাধানের সহায়তা করবে মনে করে। এম এন রায় বলেছেন, গোঁড়া হিন্দুদের কাছে মুসলমানরা, এমন কি যাঁরা উচ্চবংশজাত বা উচ্চশিক্ষিত বা প্রশংসনীয়রূপে সংস্কৃতিবান, তাঁরাও ম্লেচ্ছ, একজন নিম্নতম স্তরের হিন্দুর চেয়ে ভালো সামাজিক আচরণ তাঁরা পান না। কিন্তু সেই সংস্কার আজও বেঁচে বর্তে আছে এবং তা জাতীয় সংহতির পথেই শুধু সক্রিয় বাধা নয়—ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারের পথেও বড় বাধা।

কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন এদেশের মুসলমানের আগমন প্রধানত বিজয়ী ও বিজয়ীদের অনুচর ও পার্শ্বচর রূপে—বিজেতা আর বিজিতদের মধ্যে সম্বন্ধ কোনোদিন মধুর হতে পারে না। এর উপর মুসলমানের চিত্ত হিন্দুর প্রতি বিশেষভাবে বিমুখ ছিল, এই ধরণের প্রভাবে যে হিন্দু কাফের অর্থাৎ মানুষের পূর্ণ অধিকার ভোগের অযোগ্য; মুসলমানদের মধ্যে এমন মনীষী ও সহৃদয় ব্যক্তির অভ্যুদয় হয়েছিল যাঁরা হিন্দুর প্রতি মুসলমানের চিত্তের এই অনুদারতা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন; মহামনীষী আল বেরুনী সেই প্রাথমিক যুগেই মুসলমানদের বলেছিলেন, ভারতের হিন্দু আরবের কাফেরের সমপর্যায়ভুক্ত নয়; কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানের শ্রদ্ধার পাত্র আলবেরুনী ও আকবর তেমন নন যেমন সুলতান মাহমুদ ও আওরঙ্গজেব। এহেন অনাত্মীয় মুসলমানের প্রতি হিন্দুও যদি অনাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করে থাকে তবে উদার তাকে বলা যায় না নিশ্চয়ই কিন্তু অস্বাভাবিক কেমন করে তাকে বলা যায়?

বাংলাদেশের ঘটনাবলী আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা শুধু হিন্দু ও মুসলমান নয়। —আমরা মানুষ। সেই মানুষের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত সুখ, অনন্ত রূপ। সে আজ আমাদের সামনে অস্পৃশ্য অন্ত্যজরূপে এসেছে, মহা প্রেমিকরূপে এসেছে, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান রূপে এসেছে। কিন্তু শুধু এই-ই তার চরম অভিব্যক্তি নয়, মানুষের ইতিহাসের ধারা এইখানে এসেই থেমে যায় নি। মানুষের নব নব দুঃখ, নব নব সুখ, নব নব রূপে কালের পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সে সমস্তের দিকে যদি আমরা না তাকাই, শুধু হিন্দু ও মুসলমান মানুষের এই কোনো একটা যুগের রূপকে তার চরম রূপ বলে মনে করি, তবে শুধু এই পরিচয়ই দেওয়া হবে যে, আমরা অন্ধ। শুধু কথার দ্বারা সম্মোহিত হয়ে আমাদের বহুকাল কেটেছে। আর কত? এইবার তার অবসান হোক। এই শেষবার সমস্ত প্রাণ দিয়ে বলতে হবে—'আমরা আমাদের চার পাশের মানুষের সত্যকার কল্যাণ চাই, শুধু অনাস্বাদিত শাস্ত্রের বাণী উপহার দিয়ে শাস্ত্রকে ও মানুষকে অপমান করতে চাই না।'

সুফী আবদুল আল্লাম
দুর্গাপুর ৫

ভোটের হাটের পণ্য

বহুকাল যাবৎ আপনার পত্রিকা পাঠ করে আসছি, এবং বহু প্রবন্ধ আনন্দের সঙ্গে পড়েছি কিন্তু গত ১৬ সংখ্যার "রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্যের" "ভোটের হাটের পণ্য" প্রবন্ধটি পড়ে এই উপলব্ধি করলাম, খাটি কথা লিখতে আপনার পত্রিকার সমতুল্য কেউ নেই, আমার এই বরাবরের ধারণা সত্যে পরিণত হলো। আমরা তপশীল সমাজের লোকেরা বরাবর বর্ণহিন্দুদের উপর যে অভিযোগ অন্তরে পোষণ করে আসছি, সেটি আপনি উক্ত সমাজের গোষ্ঠিভুক্ত হয়েও এত বড় সত্যটা যে প্রকাশ করেছেন, তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তবে আপনার কাছে আমার এও বক্তব্য, "ভোটের সময় গিল্টিকরা ভাই-ভাই"-এর মত আপনার পত্রিকাতেও যেন কেবলমাত্র ভোটের সময় সংখ্যালঘু ও তপশীলীদের জন্য প্রচার হয়ে এদের সমস্যার প্রকাশ বন্ধ না হয়ে যায়। এ কথা আমি বলতাম না যদি আমি কিছু সাংবাদিকের নিকট আশানুরূপে ব্যবহার পেতাম। তাঁদের মধ্যেও অনেকের ধারণা সরকার এইসমস্ত জাতিদের মধ্যে সংরক্ষিত আসন ও বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রার্থীরা বঞ্চিত

হচ্ছে। এ'রা শহরের এই সম্প্রদায়ের কিছু উন্নত লোকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মেলা-মেশা করে ধারণা করেছেন, এই সম্প্রদায় অনেক উন্নতি করেছে। এ'রা যদি গ্রামের ছবি দেখেন তা হলে বুঝতে পারবেন এখনও তপশীল জাতির উপর কি অত্যাচার চলছে। এখনও বহু বর্ণহিন্দু এলাকার লোক তপশীল অধ্যুষিত এলাকার ভিতর দিয়ে হাটতে নারাজ। এখনও বর্ণহিন্দু সমাজের অনেকের ধারণা মুচি জুতো সেলাই-এর কাজ না করে, যদি সরকারী চাকুরী করে তা হলে জুতো ছিঁড়ে গেলে সারাবে কে? কিন্তু মুচি সম্প্রদায়ের লোকেরা তো বলে না ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাকুরপুজো না করলে দেব-দেবী পুজো বন্ধ হয়ে যাবে ও দেশে মড়ক লাগবে। এখনও শোনা যায় গান্ধীজী যিনি হরিজন সৃষ্টিকর্তা তাঁর জন্মদিনে তাঁরই জন্মস্থান পোরবন্দরে সরকারী টিউবওয়েল থেকে জল নিতে বর্ণহিন্দুরা তপশীলীদের বাধা দেয়। আজও সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, তপশীলীরা সব কিছু সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও আশানুরূপ উন্নতি করতে পারছে না, তবুও সংবাদপত্রে ঐ সম্বন্ধে কোন সমালোচনা বা সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখা যায় না। এর কারণ কি? কিছু বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করে উপলব্ধি করেছি যে, তাঁরা আধুনিক হলেও অন্তরে তাঁরা যে উচ্চ জাতের এই কুসংস্কার এখনও পোষণ করে। আমরা কিন্তু বলি এটা মানুষের দেওয়া স্ট্যাম্প ছাড়া কিছুই নয়। প্রত্যেক মানুষেরই উন্নত জীবনযাপন করার অধিকার আছে।

সেইজন্য আপনার প্রবন্ধটি সমর্থন করে উক্ত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাতে চাই, এই অ-বর্ণহিন্দু সমাজে যেভাবে শিক্ষিতের আবির্ভাব হচ্ছে, তাতে তাঁরা যদি তাঁদের জাতের আভিজাত্য নিয়ে থাকেন তাহা হলে এই উপেক্ষিত জাতের মধ্য থেকে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হবে তার ফল গোটা জাতিকেই ভুগতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, কিছু দিন আগে পুরীর শঙ্করাচার্য যখন অস্পৃশ্য জাতির উপর কটাক্ষ করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং এর জন্য বর্ণহিন্দু সমাজের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ না দেখে আমাদের তপশীলী নেতা প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জগজীবন রাম যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

On 5th April, 1969 Shri Jagjiban Ram gave a serious warning to the Caste Hindus religion leaders that if they do not condemn the statement of Sankaracharya and do not dissociate themselves from the views of Sankara Puri, the untouchables, the scheduled castes, will have no other alternative but to reconsider about the generation of their remaining in Hindu fold. He was speaking in a reception organisation by the citizen of Delhi in a function on his birthday on 5th April, 1969. Presided over by Sri Nilam Sanjib Reddy, the speaker of the Lok-Sava. Sri Ram said that even to-day the untouchability is the cause of social disability. The statement of Puri Sankar has poured Ghee on the burning fire of atrocities upon the Harijans.

এই প্রসঙ্গে বলতে চাই শ্রদ্ধেয় নেতা যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা পূরণ করবার জন্য গত পুণা চুক্তির সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও মুসলীম লীগ, এই তপশীল জাতিকে বর্ণহিন্দু জাতি থেকে পৃথক করে সাম্প্রদায়িকতার রূপ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তদানীন্তন তপশীলী নেতারা সেই ফাঁদে পা দেন নাই। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন, তপশীলীরা আগে হিন্দু, পরে তপশীল, তারা কোন পৃথক সম্প্রদায় নয়।

এমতাবস্থায় বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়েরা যদি শুধুমাত্র ভোটের বাক্স পূরণ করবার জন্য তপশীলীদের মেকী আশ্বাস দিয়ে চালিয়ে যেতে চান, তা হলে একদিন এই সম্প্রদায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে অসমর্থন করে নিজেরাই একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তুলবে এবং নিজের উন্নতি ও সুযোগ-সুবিধার জন্য পথ বার করে নেবে। ফলে শ্রদ্ধেয় নেতার ভবিষ্যৎবাণী যে অদূর ভবিষ্যতে কার্যে পরিণত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তপশীল জাতির জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁরা যদি মনে করে থাকেন তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে তাহা হলে তাঁরা জেনে রাখুন একদিন এই অবহেলিত অ-বর্ণহিন্দু জাতি নিজের চেষ্টায়ই প্রতিষ্ঠিত হবে, কারও দয়ার উপর নয়।

নির্মলচন্দ্র সাহা
কলিকাতা

ডেভিড্ ম্যাকাচ্চিয়ন্

শ্রীডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর অনেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আমি একজন মাত্র; জীবনের নানা আবর্তে দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সংবাদটা প্রিয়জনের মৃত্যুর মত ব্যক্তিগত শোক বলে মনে হল। ব্যক্তিগতভাবে ভাবতে আশ্চর্য লাগে ছাত্র হিসেবে তাঁর সঙ্গে মাত্র তিন বছরের পরিচয়ে আমি এভাবে আহত হলাম কেন। প্রকাশের জন্য এই চিঠি পাঠানো নিয়ে অনেক দ্বিধা ছিল, —কি হবে? কি লাভ? খবরের কাগজে 'মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি' জাতীয় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের মত এ-ও তো আত্মপ্রচারের এক হাস্যকর ছদ্মবেশ। শেষে ভাবলাম, না, এ ক্ষেত্রে আমি কোন ব্যক্তিবিশেষ নই; আমি তাঁর অনেক গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের সম্ভবত অ-নির্বাচিত প্রতিনিধি। ছাত্র হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমরা কিভাবে আত্মীয়তা অনুভব করতাম, যা দীর্ঘদিনের সংযোগ-অভাবেও অনাহত, সে-কথা না জানালে আমাদের দিক থেকে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনে বহু শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসেছি—তাঁদের সকলের প্রতি সমানভাবে সশ্রদ্ধ থেকেই বলছি—শ্রীডেভিড ম্যাকাচ্চিয়নের মত এমন স্নেহময় শিক্ষক আমি অন্তত দেখিনি। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁকে আমাদের কখনো বিদেশী বলে মনে হয়নি। বিজাতীয়-স্বদেশী শিক্ষক নিশ্চয়ই বিরল নয়; কিন্তু এমন নির্ভেজাল বিদেশী বাঙালী শিক্ষক আমি দেখিনি। যদিও তাঁর মুখে সম্পূর্ণ বাংলায় বাক্যালাপের স্মৃতি আমার নেই। আমাদের নাম তিনি নির্ভুল বাংলায় উচ্চারণ করতেন; এমন কি 'মুখার্জি' 'চ্যাটার্জি' জাতীয় পদবীর বানান তিনি 'মুখোপাধ্যায়' 'চট্টোপাধ্যায়' বলে পড়তেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল, একবার তাঁর পকেট-ডায়রীটা কিভাবে ক্লাসে পড়ে গিয়েছিল। আমি কুড়িয়ে পেলাম, তিনি তখন চলে গেছেন। পরের দিন ফেরৎ দেবো, বাড়ি নিয়ে এলাম। যদিও উল্টে দেখা অনুচিত, কিন্তু দেখেছিলাম। টুকটাক কিছু তারিখ, কিছু নাম-ঠিকানা—ডায়রীতে যা নিতান্তই মামুলি; কিন্তু হঠাৎ একটা পাতায় দেখলাম পরিষ্কার বাংলায় বাচ্চাদের মত হস্তাক্ষরে লেখা—"উচ্চে + পলতা = শুক্তো"; একটা পাতায় লেখা—"কোলকাতার বসন্তে বড় গরম।" কিছু নয় কিন্তু উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে এ থেকে তাঁর চরিত্রের

একটা সরল শিশু-সুলভ দিক, বাঙালী-জীবনের নিকটে আসার একটা ইচ্ছা, কোলকাতাকে ভালবাসার, আপন-করার ইচ্ছা—জানি না, আমার মনে হয়েছিল—আছে।

শ্রীডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন বললেই আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর বাঁশ-পাতার মত ঋজু শীর্ণ নমনীয় চেহারা, হয়তো ঈষৎ আনত; মুখে একটা বিষণ্ণতা সব সময়েই থাকতো, কিছু ক্লান্তি, তবু হাসময়, উজ্জ্বল। ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন: মানে শিশুর সরলতা; মানে সুন্দরতা,—তিনি এত কাছে থেকেও কোথায় যেন অনেক দূরে থাকতেন, মনে হত কি-সে যেন মগ্ন হয়ে আছেন, তাঁর দৃষ্টি ছিল অনেক দূরে, আত্মমগ্ন। ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন—উস্কখুস্ক চুল, সযত্ন বিন্যস্ত পোশাক নয়, কখনো কখনো পায়ে চটি—বিদেশী তো মনে হতো না। তিনি এতটুকু উন্নাসিক ছিলেন না। আত্মপ্রচারে তিনি কুণ্ঠ ছিলেন; তাঁকে দেখলেই মনে হত নিজেকে তিনি একেবারে ভুলে গেছেন, সব সময় যেন কাজে মেতে থাকতেন। তাপস শিক্ষক শ্রীডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন।

আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে হয়তো ফিরবো বলে দাঁড়িয়ে আছি, ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন সেই অতি-পরিচিত সাইকেলে ফিরে চলেছেন—নিশ্চয়ই হাসবেন, মাথা হেলাবেন, হয়তো বা সুন্দর মিষ্টি বাংলায় বলবেন 'ভালো?' প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেল, তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ শুনতে পাওয়া দু' একটা বাংলা শব্দের টুকরো যেমন নির্ভুল ছিল, শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদের অন্যমনা করতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে সম্পদ সেই কণ্ঠস্বরের মাধুর্য, বলার ভঙ্গীর সেই চুম্বক আকর্ষণ তাঁর আয়ত্তে ছিল।

তাঁর কাছে পড়াশোনায় যা প্রয়োজন তার কোনটা না পাওয়া যায়? 'কারো' যদি কোন সংকোচ থাকে তিনি ক্লাসঘরের সংলগ্ন দেওয়ালে লিখে টাঙিয়ে দিতেন, কোন্ কোন্ বই আমরা তার কাছে পড়তে পেতে পারি। তিনি আমাদের কত সময় কত কি দিয়েছেন—কোথায় কোন জার্নালে কোন্ প্রবন্ধ বেরিয়েছে যা' আমাদের কাজে লাগবে, তিনি নিজে সংগ্রহ করে ক্লাশে এনে দিয়েছেন প্রত্যেকের হাতে; ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে নিজে টাইপ-করা-নোট এনে দিয়েছেন; কোন বই যদি পড়ে খুব ভাল লাগলো, আমাদের জন্য ক্লাশে এনে দিয়েছেন। গেটের 'তরুণ ওয়েরথারের দুঃখ' বইটা আমি প্রথম তাঁর কাছ থেকে পেয়েই পড়েছি; বইটি কিন্তু তখন আমাদের পাঠ্য ছিল না। তাঁর ঘর ছিল আমাদের কাছে অবারিত, এতটুকু বিরক্ত হতেন না কখনো। যে কোন লেখা যে কেউ যখনই দিয়েছে তিনি সোৎসাহে দেখে দিয়েছেন—তাঁর গবেষণাগত এত ব্যস্ততার কারণেও ফেরত দিতে এতটুকু দেরি হতো না। আমাকে নিয়েই বলছি—আমাদের মধ্যে অনেকেরই ইংরিজী ভাষাজ্ঞান মান অনুযায়ী ছিল না; তিনি কিন্তু কোনদিন আহত-হবার-মত-কিছু বলেননি; যত্ন করে স্কুলের বাচ্চাদের খাতা যেভাবে দেখা হয়, অন্তত উচিত সেইভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংশোধন করে দিয়েছেন। আমাদের অনেকের খাতায়ই এর সাক্ষ্য আছে।

যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ছাত্র সংখ্যা তখন এমনিতেই স্বল্প; তাঁর টিউটোরিয়াল-গ্রুপে তখন আমরা মোটে তিনজন; স্নাতকোত্তর বিভাগে দীর্ঘদিন তাঁর গ্রুপে একটিমাত্র ছাত্রী ছিল। টিউটোরিয়ালের প্রবন্ধ লেখা না হয়ে থাকলেই আমাদের মধ্যে দ্বিধাহীন অনুপস্থিতি ঘটতো; দেরি করে আসার ঘটনাও আমাদের মধ্যে অসাধারণ ছিল না। শিক্ষক হিসেবে তিনি কিন্তু দায়িত্বশীল ছিলেন কত বেশী—অনুপস্থিতির সম্ভাবনা পূর্বাহ্নেই না জানিয়ে কখনো অনুপস্থিত হতেন না। একদিনের অনুপস্থিতি অন্যদিনে সব সময় পূরণ করে দিতেন। অথচ টিউটোরিয়াল ক্লাশে একজনও আসেনি, উনি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ফিরে গেছেন; পরে যখন দেখা হয়েছে এতটুকু অভিযোগ, তিরস্কার কিছুই করেননি; বরং সকৌতুকে হেসেছেন। নিজে কোনদিন ক্লাশে এক মিনিট দেরি করে এলে, যা' অতি অল্পই ঘটেছে, বারবার দুঃখ প্রকাশ করতেন, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাশে পাঁচিশ মিনিট দেরী করে কেউ দরজার কাছে এসে ইতস্তত করলে উনি নিজে বেরিয়ে এসে ডাকতেন, পার্সেণ্টেজও দিতেন। শেষ করার আগে আর একবার অন্তত না বলে তৃপ্তি পাচ্ছি না যে তাঁকে আমরা শিক্ষক হিসেবে শুধুমাত্র শ্রদ্ধাই করতাম না, ভালবাসতাম; আর তিনি শিক্ষক হয়েও আমাদের ছাত্রদের—সম্মান করতেন।

যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যাঁরা নতুন আসবেন তাঁরা এক স্নেহময় শিক্ষককে নিজেদের মধ্যে পাবেন না; আমরা যাঁরা পেয়েছিলাম তাঁর পার্থিব-উপস্থিতির অভাব বোধহয় কোনদিন ভুলতে পারবো না। তাঁর প্রিয়-স্মৃতির জন্য ছাত্র হিসেবে আমাদের কি কিছুই করার নেই? প্রশ্নটা সকলের কাছে, যাঁরা কোনদিন তাঁর কাছে পড়েছিলেন।

তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে।

॥ ২ ॥

গত ২২শে মাঘ, ১৩৭৮ সংখ্যায় ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন সম্পর্কে আমার যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সেটির বিষয়ে আমার দু একটি বক্তব্য পাঠক সাধারণের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন বোধ করছি।

(১) স্বর্গত ডেভিডের পদবীর শুদ্ধ উচ্চারণ হবে 'ম্যাক্কাচ্চন্' 'ম্যাকাচ্চিয়ন' নয়। ইংরেজি রূপটি হল Mccutchion। ডেভিড সাহেবের তোলা পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের কোন কোন মন্দিরের যে ফটো আমার কাছে আছে তাতে ইংরেজী বানান এরূপ আছে। ডেভিড সাহেবের কাছ থেকে আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় Mccutchion-এর বাঙলা রূপ ও উচ্চারণ যে ম্যাক্কাচ্চন্ হবে তা জানতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমিও তাঁর মুখ থেকে এ উচ্চারণই শুনেছি। তাই শিরোনামের লিপিপ্রমাদ নিরসনের জন্যে আমার এ বক্তব্য উপস্থিত করলাম।

(২) এ লেখার একটি জায়গায় বলেছি: ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডেভিড সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব অ্যাফ্রিকান অ্যান্ড এশিয়ান স্টাডিজ-এ গবেষণা করতে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন (পৃঃ ৫২) এ বিষয়ে আমার সঠিক বক্তব্যটি হল, ডেভিড সাহেব সাসেক্সের ব্রাইটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব অ্যাফ্রিকান

অ্যান্ড এশিয়াটিক স্টাডিজ-এ এক বছরের জন্যে অধ্যাপনা করেছিলেন।

অনিচ্ছাকৃত আমার এ ত্রুটির জন্যে বিশেষ দুঃখিত।

প্রণব রায়
অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।

মোদের গরব মোদের আশা

"মোদের গরব মোদের আশা" সম্পর্কে আলোচনা পাঠ করে আমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে বলছি।

বিভক্ত দেশের বৃহত্তর ভাগ সমগ্রের নাম বহন করে ও সেইভাবে অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে এর সব চেয়ে ভালো নজির তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। ইণ্ডিয়া নামের উৎপত্তি হয়েছিল ইন্ডাস নদ থেকে। তারই অন্য নাম সিন্ধু। সেই থেকে হিন্দু ও হিন্দুস্তান। এখন ইন্ডাস পড়েছে পাকিস্তানের ভাগে। তা হলে তো ইণ্ডিয়া তথা হিন্দুস্তান আমাদের এই ভাগের নাম হতে পারে না। হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়াও আমাদের সাজে না। ভারত নামটিও আসমুদ্রহিমাচলের জন্যে কল্পিত। সমুদ্রও তো ভাগ হয়ে গেছে। তা হলে তো ভারত নামটিও ব্যবহার করা উচিত নয়।

এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশের ইচ্ছাই মানা করতে হয়। অধিকাংশ ভারতীয় অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চায়। যদিও ইন্ডাস-বিহীন ইণ্ডিয়া অর্থহীন, সিন্ধুহীন হিন্দু অর্থহীন। গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে চললে অধিকাংশের ইচ্ছাই গ্রহণ করতে হয়। সিন্ধুহীন ভারত যদি যুক্তিসঙ্গত হয়ে থাকে তবে গঙ্গাহীন বঙ্গভূমিও সহ্য হবে।

পূর্ব বাংলার নাম যাঁরা বাংলাদেশ রেখেছেন তাঁরা বৃহত্তর ভাগের অধিকারী। তাঁরাই বাঙালী জাতির অধিকাংশ। তাঁরাই আমাদের বড়ো শরিক। অতীতের সঙ্গে তাঁরা অন্বয় রক্ষা করতে চান। বাংলা ভাষার নামে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারই চরম পরিণতি বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এর পেছনেও একটা লজিক আছে। প্রদেশ হলে বাংলাদেশ নামটি মানাত না, পূর্ব বাংলাই মানাত। বছর কয়েক আগে সেইটেই ছিল স্বপ্ন। কিন্তু সংগ্রামে নেমে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ করে যা লাভ করা গেল তা প্রদেশ নয়, দেশ। তাই তার নাম বাংলাদেশ। ভারত থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর ছেচল্লিশটি দেশ এ নাম স্বীকার করে নিয়েছে। ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বীকার করবে।

জার্মানীর প্রসঙ্গ উঠেছে। গত মহাযুদ্ধের পর জার্মানীও দুভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু একপক্ষের নাম যদি হয় ফেডারেল রেপাবলিক অফ জার্মানী অপর পক্ষের নাম জার্মান ডেমোক্রাটিক রেপাবলিক। কোনো পক্ষই পূর্ব জার্মানী বা পশ্চিম জার্মানী বলে পরিচয় দেন না। স্বীকৃতির বেলাও "পূর্ব জার্মানী" বা পশ্চিম জার্মানী চলে না। জার্মান সমস্যা এখনো অমীমাংসিত।

অন্নদাশঙ্কর রায়
কলিকাতা-৩১

ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ঘরানা

'দেশ' পত্রিকায় ৩৯ বর্ষের ১৪ এবং ১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ঘরানার মত একটি সুচিন্তিত সময়োপযোগী ও সমৃদ্ধ রচনার জন্যে লেখক ও সম্পাদক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের পরিবেশ ও বিজ্ঞানীর চিন্তা নিয়ে যে মৌলিক চিন্তা করেছেন, তা হাতে-কলমে অনুসৃত হলে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের একটি নিশ্চিত সম্ভাবনাময় কর্মকাণ্ডের রূপ দেখতে পাওয়া যাবে। তাঁর লেখায় যে সত্যটা সবচেয়ে স্পষ্ট করে মনে দাগ কাটছে—তা হল—প্রত্যেক দেশের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ীই বিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রয়োজন। পরদেশের মুখী অনুকরণে নয়। Necessity is the mother of invention এ কথা মানলে এ কথাও আমাদের জানা যে আমাদের দেশের necessity এখন সুস্থভাবে বাঁচার necessity। বিজ্ঞানের যে যে শাখায় এই necessity পুষ্ট হবে (উদাহরণস্বরূপ শ্রী চট্টোপাধ্যায় উক্ত ecology, বাস্তু সমস্যা, আবহাওয়া বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞানের কথা ভাবা যেতে পারে) সেই সেই শাখায় হাতের কাছে সহজে যা পাওয়া যায় সেই উপকরণ নিয়েই বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। কাজ সুস্থ পথে শুরু হয়ে এগিয়ে চললে উপকরণের অভাব হয় না। কাজ আরম্ভ করা ও স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলার জন্যে এখনই যা দরকার তা হল ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

সব্যসাচী রায়চৌধুরী
বিদ্যাসাগর কলেজ, সিউড়ী, বীরভূম

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

শ্রীশওকত ওসমান "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্" (দেশ, ১৫ জানুয়ারি) প্রবন্ধে পরলোকগত ঔপন্যাসিকের "চাঁদের অমাবস্যা" উপন্যাসটির বিষয় উল্লেখ করেছেন। স্কুল-মাস্টারের সামনে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হলেও ভদ্রলোক সাহসের অভাবে কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি। পাকিস্তানের স্বৈর শাসনের রূপটি তিনি এভাবেই পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বইটি প্যারিসে বসে লেখা বলে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব হাঙ্গেরির লেখক টাইবোর ডেরির 'নিকি' কাহিনী দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। টাইবোর ডেরিকে বলা হতো "হাঙ্গেরির গোর্কী"। হাঙ্গেরির কম্যুনিস্ট শাসনে সরকার যখন-তখন যাকে-তাকে ধরে নিয়ে যেত। কেন ধরছে, কেউ জানতে পারত না। আর কোন পরিবারে কেউ গ্রেপ্তার হলে ওই পরিবারের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ রাখত না। ডেরি যে-পরিবারের কথা বলেছেন, সেই পরিবারের কুকুরটি (নিকি) কিন্তু পুরুষের মতো নিজের মনোভাব ঢেকে রাখতে পারেনি। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই বইটির জন্য হাঙ্গেরির লেখক সংঘের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং সেই বিরোধের জন্যই ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে গণ-অভ্যুত্থান। বইটি পেঙ্গুইনে পাওয়া যায়। শ্রীশওকত ওসমান সাহেব ও বাংলাদেশের অন্যান্য লেখকেরা বইটি পড়ে দেখতে পারেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও কিছুকাল আগে চোখের সামনে খুন হতে থাকলেও লোকে মুখে কুলুপ এঁটে থাকত। তবে সেটা সরকারের ভয়ে নয়, বামপন্থী বিপ্লবী সমাজবিরোধীদের ভয়ে।

নিরঞ্জন হালদার,
কলকাতা-৪২

ওয়েস্ট ল্যান্ডের পুনরুদ্ধার

টি এস এলিয়টের "দা ওয়েস্ট ল্যান্ড"-এর মূল পান্ডুলিপি নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই নানারকম মত প্রকাশ পেয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগে এর সন্ধান পাওয়া যায়, সম্প্রতি কবির স্ত্রী শ্রীমতী ভ্যালেরি এলিয়ট মূল পান্ডুলিপির হুবহু প্রতিলিপি প্রকাশ করেছেন, এজরা পাউন্ডের মন্তব্য সমেত।

১৯২১ সালে এলিয়ট একজন ব্যাঙ্কের কেরানী, শরীর অসুস্থ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর ইওরোপ জোড়া হতাশা। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য লুসান ও মারগেট-এ অবস্থানের সময় এলিয়ট এই কবিতাবলী রচনা করেন।

এজরা পাউন্ড তখন প্যারিসে, তরুণ ইঙ্গ-মার্কিন লেখকদের শিরোমণি, জ্বলন্ত প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃত। বয়োজ্যেষ্ঠ ইয়েটস্‌কে পর্যন্ত তিনি কবিতা বিষয়ে উপদেশ দেন—এলিয়ট তো বলতে গেলে তাঁরই আবিষ্কার। এলিয়ট কবিতাগুলি পাউন্ডকে পড়তে দিলেন বিনীতভাবে। কলম হাতে নিয়ে কাটাকুটি শুরু করলেন পাউন্ড,—এলিয়টের ভাষায়, মূল পান্ডু-লিপির অর্ধেকই বাদ যায় পাউন্ডের হাতে। এলিয়ট সেটা মেনে নেন, পাউন্ড-সংশোধিত রূপটিই ছাপা হয়ে বার হয়—এতকাল সেটাই "দা ওয়েস্ট ল্যান্ড" কাব্য-গ্রন্থ নামে পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়েছে। শোনা যায়, এলিয়টের বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর কাব্যগ্রন্থ ছাপার জন্য চাঁদা তুলেছিলেন। এই বন্ধুরা অনেকেই পরবর্তীকালে সাহিত্যের দিকপাল—মার্কিন উপন্যাসিকদের মতে যাঁরা লস্ট জেনারেশন নামে পরিচিত—তাঁরাও অনেকে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন প্যারিসে। তাঁরা সবাই এই ক্ষীণকায়, লম্বা, মিতভাষী কবিকে ভালোবাসতেন।

পরবর্তীকালে পাঠক ও গবেষকদের মধ্যে কৌতূহল জাগে, এজরা পাউন্ড কি কি সংশোধন করেছিলেন? এমনও হতে পারে, পাউন্ড তাঁর ব্যক্তিগত রুচিতে যে সব অংশ বাদ দিয়েছেন সেগুলো আরও বেশী ভালো? সেই কারণেই মূল পান্ডুলিপির খোঁজ পড়ে, কিন্তু সেটি তখন উধাও।

এলিয়টের বন্ধু ছিলেন জন কুইন। প্রথম জীবনে এলিয়টের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাউন্ডের পরই জন কুইন-এর নাম করতে হয়। এলিয়ট একবার জন কুইনকে চিঠি লিখেছিলেন, "আপনার উদারতা ও মহত্বের কণামাত্র স্বীকৃতিও আমি এতদিন জানাতে পারি নি।" ঐ পান্ডুলিপিটি কোনো কারণে এই জন কুইন-এর কাছে থেকে যায় —এবং জন কুইন ১৯২৪ সালে মারা গেলে

তাঁর সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে এই খাতাখানাও চলে যায় তাঁর বোনের কাছে। তিনি আবার তাঁর ভাইয়ের সমস্ত বইপত্রের সংগ্রহ 'নিউইয়র্ক' পাবলিক লাইব্রেরির বার্গ কালেকশানের কাছে বিক্রী করে দেন ১৯৫৮ সালে—সেই সঙ্গে এই খাতাটিও যায়—কিন্তু কেউ তখন এর খবর জানতো না। স্বয়ং এলিয়টও নয়। ১৯৬৮ সালে ভ্যালেরি এলিয়ট এটির সন্ধান পেয়ে মাইক্রোফিলম-এ তুলে আনেন। তখনও এর সম্পর্কে খুব গোপনতা রক্ষার অনুরোধ করা হয়েছিল। এতদিনে বেরুলো।

বেশ কিছু সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছিল। "দা ওয়েস্ট ল্যান্ড"-এর প্রথম ৫৩ লাইন কেটে বাদ দেওয়া। "দা ফায়ার সারমন" কবিতাটির প্রথম খসড়াটি ছাপা হয়নি। এই কবিতাটিতে পোপের 'দা রেপ অফ দ্য লক্'-এর ছায়া আছে—পাউন্ড এটা বাদ দিতে বলেছিলেন। ভগবদ্‌গীতা দ্বারা অনুপ্রাণিত দুটি কবিতাও বাদ। কোনো কবিতার মার্জিনে পাউন্ডের মতামত লেখা আছে। ওয়েস্ট ল্যান্ডের 'আনারয়েল সিটি' প্রথম ভাষ্যে ছিল "টেরিবল্ সিটি"—এই চমৎকার পরিবর্তনটি পাউন্ডের সুপারিশেই হয়েছিল, না এলিয়ট নিজেই করেছিলেন, তা ঠিকভাবে বোঝা যায় না।

বাদ দেওয়া কবিতা Exequy থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধার করতে ইচ্ছে হয়:

> Persistent lovers will repair
> In time to my suburban tomb,
> A pilgrimage when I become
> A local deity of love.

ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ডকে এক চিঠিতে এলিয়ট লিখেছিলেন, আমার মনে হয় এই কবিতার বইটিতে অন্তত তিরিশটি ভালো লাইন আছে।

বইটি প্রথম ছাপা হবার পর পাউন্ড চিঠি লিখে এলিয়টকে জানিয়েছিলেন, তুমি এ পর্যন্ত যা লিখেছো—তার মধ্যে এই বইটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এর পাঠক সংখ্যা কম হতে বাধ্য—তারা খুবই নির্বাচিত, কিংবা বেছে নেওয়া পাঠকদের কয়েকজন অথবা উত্তর আনন্দ—এর কাছেই উত্তর পাও।

একটি নিবেদন

আলোচনার জন্য পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা এই বিভাগে পাঠাবেন না। সেগুলি পাঠাবেন "পুস্তক সমালোচনা" বিভাগে। এখানে সাধারণত সাহিত্য সংক্রান্ত খবরা-খবর বা কখনো কোনো বিশেষ বই বা পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

এই বিভাগে আলোচিত এদেশী বা বিদেশী বইয়ের মূল্য বা প্রাপ্তিস্থান অনেকে চিঠি লিখে জানতে চান। সকলকে আলাদা ভাবে সেসব খবর সরবরাহ করা আমার পক্ষে সময়াভাবে সম্ভব হয় না। এসব ব্যাপারে বড় বড় বইয়ের দোকানে খোঁজ খবর করাই বাঞ্ছনীয়।

—সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

'কুড়ি বছর আগে পরে'

গত ৬ই ফাল্গুনের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (৩৯ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা) সনাতন পাঠক 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে 'কুড়ি বছর আগে পরে' শিরোনামে পূর্ব বাঙলায় ভাষা-আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন : "মুখ্যমন্ত্রী তখন নুরুল আমীন। আজকের এই নুরুল আমীন।

তিনি বললেন, কিছু ছাত্র হত্যা করছে বলেই অনির্দিষ্টকাল মুলতুবী রাখা যায় না। মওলানা তর্কবাগীশ এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন তৎক্ষণাৎই মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করলেন। এবং বাইরে এসে ছাত্রদের সমর্থনে বক্তৃতা দিলেন।"

সনাতন পাঠক পরিবেশিত উপরোক্ত তথ্যে ইতিহাসের কিছুটা ব্যত্যয় ঘটেছে। ইতিহাসের স্বার্থেই প্রকৃত ঘটনা সুবিন্যস্ত হওয়া উচিত। প্রকৃত ঘটনা এই যে, একুশে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে প্রাদেশিক পরিষদ-সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন, পরিষদ-সদস্যপদ থেকে নয়। একমাত্র 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও পরিষদ-সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনই ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে পরিষদ-সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এই ঘটনা বিবৃত করে আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "পুলিস প্রথমে কাঁদানে গ্যাস এবং পরে বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করে। ফলে জনতার বেশ কিছুসংখ্যক লোক হতাহত হয়। হতাহতের সংখ্যা কি ছিল এবং তাদের মধ্যে ছাত্রই বা কতজন ছিল সে-সম্পর্কে নানা ধরনের কথা শুনা গিয়েছিল। সঠিক হিসাব যে-কারণেই হোক পাওয়া যায় নাই—পাওয়ার উপায় ছিল না। এ-সংবাদ যখন পেলাম, তখন আমি 'আজাদ' অফিসে কর্মরত অবস্থায় ছিলাম। এই মর্মন্তুদ খবরে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি তখন আমার আইন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করে গভর্নর মালিক ফিরোজ খান নূনের কাছে এক পত্র পাঠিয়ে দিলাম। পদত্যাগের কারণ হিসাবে তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া পুলিসী গুলীবর্ষণকে আমি জাতীয় সরকারের শাসন-ব্যবস্থার এক চরম কলংকময় ঘটনা বলে মনে করি। এ সরকারের আইন-উপদেষ্টা দলের একজন সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে আমি দারুণ মনঃপীড়া অনুভব করছি। কাজেই এর সংশ্রব ত্যাগ করতে আমি বাধ্য হলাম। পুলিসী গুলীবর্ষণ ও আমার ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ত্যাগের খবর নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় 'আজাদ'এর এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।......পরদিন গুলীবর্ষণে নিহতদের স্মৃতিতে যে শোকসভা আহ্বান করা হয়, তাতে আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন এসে আমাকে সে-সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে এমন চেপে ধরেন যে, শোক-বিহ্বল চিত্ত নিয়েও আমার পক্ষে তাদের অনুরোধ রক্ষা না করে উপায় ছিল না। মেডিকেল কলেজের পাশে, বর্তমানে যেখানে শহীদ মিনার অবস্থিত, সেখানেই পরদিন সে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।......এর পরদিন সংবাদ পেলাম, আর একজন এম-এল-এ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি জনাব আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। তিনি অবশ্য আমার মতো এম এল এ-শীপ ত্যাগ করেন নাই, শুধু লীগ পার্লামেন্টারী দলই ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

(অতীত দিনের স্মৃতি, পৃঃ ৩৩১-৩২)

ছিদ্দিক হোসেন
শান্তিবাগ, ঢাকা

ভাষার দূরত্ব

গত ৪ঠা মার্চ সংখ্যা 'দেশ'-এ শ্রদ্ধেয় সনাতন পাঠক মহাশয় 'ভাষার দূরত্ব' দূর করার জন্য একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। সে বিষয়ে আমার মতামত সবিনয়ে জানাচ্ছি।

উনি লিখেছেন, "পূর্বাঞ্চলের এই কয়েকটি রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর, ওড়িশা এবং মিথিলার) সাহিত্যকে আরও কাছাকাছি আনার কোন ব্যবস্থা কি আমরা করতে পারি না? এবং সেটি হতে পারে একটি মাত্র উপায়ে, এই গোটা অঞ্চলে একটি সাধারণ লিপি ব্যবহার।" উনি লিপিটির স্বরূপ সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দিয়েছেন—"(বাংলার) বর্তমান কাঠামোটি ঠিক রেখে কিছু কিছু ওড়িয়া, দেবনাগরী ও অসমীয়া বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা যেতে পারে।" কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তা কি ভাবে সম্ভব? যদিও 'বাংলার সঙ্গে অসমীয়ার লিপিভেদ অতি সামান্য' তবুও ভাষার কথনে পার্থক্য আছে। ধরা যাক, নব্য পরিকল্পনায় বাংলা ও অসমীয়া ভাষা এক হয়ে গেল; কিন্তু তখন বাংলা এবং আসামের সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা কি হবে? তারা কি নিজের নিজের ভাষা ছেড়ে নতুন ভাষায় কথা বলবেন? কারণ, নতুন সাধারণ লিপির আবির্ভাবে শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গী বদলাতে বাধ্য। মনে হয়, মুখের ভাষা বদলাতে কেউ-ই রাজি হবেন না। তবে কি ওই ভাষার শুধু সাহিত্য রচনা হবে এবং সাধারণ মানুষের ভাষা থাকবে আলাদা? তা যদি হয় তাহলে সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ হবে পড়বে বিচ্ছিন্ন এবং তখন, বলাই বাহুল্য সাহিত্য সাহিত্য থাকবে না। এই সমস্যা মণিপুরের বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাকেও কেন্ করে।

কিন্তু বাংলার সঙ্গে ওড়িয়া এব মৈথিলী ভাষার মিলন সমস্যা আরও জটিক কারণ বাংলা ওড়িয়া এবং মৈথিলী ভাষা লিপি পৃথক। এ ক্ষেত্রে "সাধারণ লিপিটি যাই হোক না কেন তা যে ওড়িয়া মৈথিলী লিপির ধাঁচে হবে না এ নিশ্চিত। বরং সেই লিপিতে বাংলা প্রভাব থাকবে সব থেকে বেশী। অর্থাৎ তখ ওড়িয়া এবং মৈথিলী ভাষাভাষীদের নিক সাধারণ লিপিটি সম্পূর্ণ নতুন ঠেকবে এ যদিও তাদের পুরান ভাষার সঙ্গে নতু ভাষাটির উচ্চারণগত মিল থাকবে বেশ তবুও লিখন পদ্ধতিটি তাদের শিখতে হ নতুন করে। 'ভাষার দূরত্ব' দূরীকর ওড়িয়া বা মৈথিলী সম্প্রদায় এতটা ত্র সহ্য করবেন বলে তো মনে হয় বিশেষত যেখানে তাদের নিজস্ব লিপি লুপ্ত হওয়ার আশংকাই প্রবল।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যে পূর্বাঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী নিজেদের পুরান লিপি ছেড়ে 'সাধ লিপিতে' লেখা-পড়া চালাতে রাজি হ তা হলেও বিগত লেখকদের (বাং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ও অন্য প্রদেশগ বিগত লেখকগণের) রচনাগুলিকে কাছে সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠ অর্থাৎ তখন সেগুলি নতুন লিপি অনু অনূদিত হবে, না যা ছিল তাই থাক এ প্রশ্ন নিশ্চয় সবার মনে উঠতে ব আশা করা যায় যে, তখন রচনাগুলি যে লিপিতে ছিল সেই লিপিতে থাকবে কারণ তাহলে বিগতদের সাহিত্যকে জ জন্য পুরান লিপিতেই পঠন-পাঠন চ হবে, আর তার ফলে নতুন সাধারণ লি থিয়োরী হবে বিপন্ন। অতএব ধরে যেতে পারে যে সেক্ষেত্রে বিগতদের সাহি কর্ম অনূদিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্র কিন্তু যদি অনূদিত হয় তাহলে কি অনূদিত উপন্যাস বা কবিতায় রচনার সুর ক্ষুণ্ণ হবে না? আর তখন, বলা বা সেগুলি শুধু উপন্যাস বা কবিতা হ হবে 'অনূদিত উপন্যাস' বা 'অন কবিতা'।

মোহাম্মদ হোসেন মী
কলকাত

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্র অভিধান (চতুর্থ খণ্ড)। সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা-৬। দাম ছয় টাকা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধের দিক্‌নির্দেশক হিসাবে সোমেন্দ্রনাথ বসুর এই রবীন্দ্র অভিধান ইতিপূর্বেই তিন খণ্ড বেরিয়ে গেছে। এই খণ্ডে ক-খ এই আদ্য অক্ষর-সমন্বিত রবীন্দ্ররচনার অভিধানিক সংকলন করা হয়েছে। কবিতা গল্প, নাটক উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংবাদ তো আছেই, গল্পের চরিত্র-পরিচয়ও আছে। প্রবন্ধের নামের সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য দেওয়া আছে, সমজাতীয় অন্যান্য প্রবন্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। গল্পের কোনো বক্তব্যে কোন কবিতার সঙ্গে মিল থাকলে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বই-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আলোচনা আছে। রচনার প্রকাশকাল ও গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ রয়েছে কোথাও। মোটকথা রবীন্দ্ররচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে গেলে রবীন্দ্র-অভিধান অপরিহার্য।

কোনো কোনো রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে সংকলকের ব্যক্তিগত অনেক মন্তব্য আছে। অভিধান-জাতীয় গ্রন্থে ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ না থাকাই ভালো মনে মনে করি। ব্যক্তিগত মন্তব্য মাত্রেই ভুল একথা বলছি না। কিন্তু রবীন্দ্র-রচনা সম্পর্কে পরিচয়, সে রচনা সম্পর্কে রচয়িতা বা সমালোচকের মন্তব্য কিংবা সমজাতীয় মন্তব্যের সমান্তরাল দেশী-বিদেশী উদ্ধৃতি—এগুলি থাকলেই যথেষ্ট। পাঠক তার থেকে মূল রচনার পরিচয় যেমন পাবেন, তার সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্যও পাবেন, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো লেখকের সদৃশ মন্তব্যও পাবেন এবং তার থেকেই পাঠক ধীরে ধীরে স্বকীয় ধারণা গড়ে নেবেন—এইটেই বোধ হয় অভিধান রচয়িতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রচনার সাধারণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মন্তব্য মিশিয়ে দিলে পাঠককে প্রথম থেকেই একদেশদর্শী করার আশঙ্কা থেকে যায়। অভিধান সংকলকের ভূমিকা নিরপেক্ষ হবে—এইটেই কাম্য মনে করি।

আমাদের দেশে দলবদ্ধভাবে কোনো কাজ হয় না অথচ এই ধরনের পরিশ্রমসাধ্য কাজ দলবদ্ধভাবে করলে সহজসাধ্য হয়। তবু বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠাবান কোনো কোনো সাহিত্য-সেবী একক সাধনায় যে এই ধরনের দুরূহ কাজে এগিয়ে চলেছেন একথা ভাবলেও ভালো লাগে। সোমেন্দ্রনাথ বসু সেই দুর্লভ নিষ্ঠাবানদের অন্যতম। তাঁর এই অভিধান সম্পূর্ণ হলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাধারণ পরিচয় যে গবেষক ও ছাত্ররা অনায়াসে পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। সোমেনবাবু এই বিশাল কাজটি সুসম্পূর্ণ করুন এই কামনা করি।

১৯৩।৬৯

ছোট গল্প

একক প্রদর্শনী। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য সংস্থা, ৯, নবীন পাল লেন, কল-৯। দাম চার টাকা।

সাম্প্রতিক গল্পকারদের অন্যতম প্রতিনিধি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের দুটি গল্পের সংকলন এই একক প্রদর্শনী। প্রথম গল্পটির নামেই বইটির নাম। দ্বিতীয় গল্প : চটি। প্রথম গল্পে নায়কের সঙ্গিনীর অ্যাবরশন-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নায়কের পাপবোধ তার কর্মজীবন ও সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক, কলকাতার অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবহাওয়া ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নায়কের ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি ঘটনা ও অনুষঙ্গ গল্পটির পটভূমি ও অগ্রগতির সঙ্গে গড়ে উঠেছে, জীবনের অস্তিত্বসর্বস্বতাকে নায়ক আপেক্ষিকভাবে তার সমস্ত চেতনা দিয়ে গ্রহণ করে চলেছে। নায়কের জীবনে বহু মানুষের যে সংস্পর্শ ঘটেছে তার ভাবনা যেমন তার ব্যক্তিত্বকে স্পষ্ট করেছে তেমনি সেই সব অনুষঙ্গ-নির্ভর চিন্তা নায়িকার সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিণতিকেও স্পষ্ট করবে এইটেই প্রত্যাশিত। কিন্তু মনে হয় কাহিনীর মূল লক্ষ্যবিন্দুর সঙ্গে এই সব ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা শিল্পের নিয়মে সব সময় যুক্ত নয়। কারণ ব্যক্তি-ইতিহাস যতই আপাত-বিচ্ছিন্ন হোক তার বিন্যাসে শিল্পের অমোঘ নিয়ম যে গভীরভাবে কাজ করবে একথা মানতেই হবে। সেইদিক থেকে এ গল্পের ব্যক্তি-ইতিহাস সব সময় তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে নি। তবু বলবো, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ, পাপবোধ, আত্মহননের চেষ্টায় স্বস্তিবোধ—এক কথায় যন্ত্রণাদীর্ণ ব্যক্তি-নায়কের স্বরূপটি মোটামুটি বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আর নায়িকা ও নায়ক ছাড়া আরও যে একটি মানুষের কথা এই গল্পে বলা হয়েছে সে ব্যক্তি যেন নায়কেরই প্রক্ষিপ্ত অপরাধী-ব্যক্তিত্ব যাকে নিষ্পেষিত করে নায়ক শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ, অনুতপ্ত, বিনম্রী হয়েছে।

'চটি' গল্পটি একক প্রদর্শনীর তুলনায় বেশি শিল্পসম্মত মনে হয়। সমস্ত গল্পটিতে চটি সম্পর্কে নায়কের ফিকসেশন, হারানো চটির জন্যে বেদনা ও স্বপ্ন, হারানো চটি-পায়ে এক ভদ্রলোকের প্রবেশ ও নায়ককে দিয়ে চটির ডীড অব রেলিংকুইশমেণ্ট সই করাবার চেষ্টায় ভিতরকার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ—সমস্তটাই নায়কের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের দুই সত্তা-রূপের ব্যঙ্গাত্মক ও করুণ সংগ্রাম বলে মনে হয়। সন্দীপনের গল্প-রচনায় দুঃসাহসিক ক্ষমতাকে স্বীকার করতেই হবে।

অনুবাদ সাহিত্য

যুদ্ধ যখন শুরু হয়। হাইনরিখ বোল—অনুবাদক—নীহার ভট্টাচার্য। অনন্য প্রকাশন : ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৯। মূল্য সাত টাকা।

আমাদের দেশে অনুবাদ সাহিত্য দীর্ঘদিন ধরেই চলছে, কিন্তু সক্ষম অনুবাদকের অভাবে অনেক ভাল বিদেশী সাহিত্যের খবর আমাদের কাছে পৌঁছায় না। দৈবাৎ কখনও দু'একটি ভাল অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারি। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার ক্ষমতা প্রকাশ করেছে। মূল জার্মান ভাষা থেকে অনূদিত এই গ্রন্থটি নিশ্চিতভাবেই তৃপ্তিদায়ক।

জার্মান সাহিত্যের আধুনিক লেখকদের মধ্যে অগ্রণী হাইনরিখ বোল। যুদ্ধের পর জার্মানীতে যে সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয়, তার অন্যতম যোদ্ধা হলেন বোল। যুদ্ধ লেখকের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। যুদ্ধের ভয়াবহতা, বন্দীশিবিরের নৈরাশ্যজনিত চিন্তা এবং পরবর্তী মানুষের ভাবনা আলোচ্য গ্রন্থটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আগাগোড়া উত্তম পুরুষে বর্ণিত নায়কের সঙ্গে আমাদের মন একাকার হয়ে যায়। আবেগবর্জিত অথচ বেদনামিশ্রিত নির্মম ঘটনার কথা—লেখক এমন সুন্দর করে বলেছেন—যা বিস্মিত করে। সেই সঙ্গে সমগ্র রচনায় বোলের সাহিত্যের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও শ্লেষ ধরা পড়ে। যুদ্ধের আবর্তে একটি দেশের মানুষের মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ, এমন পরিমিতভাবে তিনি তুলে ধরেছেন, যে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অনুবাদক সুন্দরভাবে মূল জার্মান থেকে উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন এবং বইটি পড়ে কখনই মনে হয়নি যে কোথাও অনুধাবন করতে অসুবিধা হচ্ছে।

টেবল টেনিসের সুন্দর শিল্পী বার্ণা

ভিক্টর বার্ণার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পৃথিবীর টেবল টেনিস খেলোয়াড় ও টেবল টেনিস অনুরাগীদের কাছে মহাগুরুর মৃত্যু সংবাদের মতই মর্মান্তিক। কেননা বিশ্ববিখ্যাত বার্ণা খেলোয়াড় হিসাবে যেমন ছিলেন অনন্য গৌরবের অধিকারী, তেমন কোচ হিসাবেও ছিলেন অগণিত খেলোয়াড়ের কীর্তি-পথের দিশারী। তার চেয়েও বড় কথা, বার্ণা ছিলেন টেবল টেনিসের সুন্দর শিল্পী, অননুকরণীয় প্রতিভা। সেই বার্ণা মাত্র ৬১ বছর বয়সে পরলোকে চলে গেলেন।

৬১ বছর অবশ্যই পরিণত বয়স নয়। এবং সফরের সময় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিদেশের মাটিতে মৃত্যুবরণও নয় স্বাভাবিক মৃত্যু। তাই মৃত্যু সংবাদের আকস্মিকতায় গুণমুগ্ধেরা আরও মর্মাহত।

২৮ ফেব্রুয়ারি পেরুর লিমা শহর থেকে বার্ণা ভেনেজুয়েলা যাচ্ছিলেন। বিমানে ওঠার মুহূর্তে তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বিমান বন্দর থেকে তাঁকে অ্যাংলো-আমেরিকান ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্রাইটনে অনুষ্ঠিতব্য ইংলিশ ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য এই সপ্তাহেই দক্ষিণ আমেরিকা সফর থেকে বার্ণার ব্রিটেনে ফিরে যাবার কথা ছিল। তারপর যাবার কথা ছিল নেদারল্যান্ডসের রটারডামে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে। পৃথিবীর কোন গুরুত্বপূর্ণ টেবল টেনিস আসর থেকে যিনি জীবনে কোনদিন দূরে সরে থাকেননি, তাঁর এই মৃত্যু ইংলিশ ও ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্যোক্তাদের কাছেও মস্ত বড় দুঃসংবাদ।

কথায় বলে উত্তরকালে প্রতিষ্ঠাবান উত্তরসূরিদের দ্বারা রেকর্ড ভাঙ্গার জন্যই খেলাধুলোয় রেকর্ডের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভিক্টর বার্ণার অবিশ্বাস্য রেকর্ড ভাঙ্গবে কবে? ভাঙ্গবেই বা কে?

১৯৩০ সালে প্রথম এবং ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত একটানা চার বছর, মোট পাঁচবার সিঙ্গলসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত উপর্যুপরি সাতবার এবং মোট আটবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ডাবলস জয়। দুবার মিক্সড ডাবলস এবং সাতবার দেশের পক্ষে (হাঙ্গেরী) সোয়েথলিং কাপ লাভ। তাছাড়া আমেরিকা, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ ছাড়াও কম করে পাঁচবার হয়েছেন ইংল্যান্ডের ওপেন চ্যাম্পিয়ন। পৃথিবীর ছোট বড় আরও বহু প্রতিযোগিতা জয়ের সঙ্গে একটি জীবনের এই বিপুল সাফল্যই বার্ণার ক্রীড়াকীর্তির সামগ্রিক পরিচয় নয়। সে পরিচয়ের জন্য আমাদের খোঁজ করতে হবে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত বিশ্ব টেবল টেনিসের রেকর্ডের পাতা। কোথাও লেখা নেই বার্ণার পরাজয়ের খবর। অথচ ওই চার বছর পৃথিবীর প্রায় সকল নাম করা টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বার্ণা অংশ গ্রহণ করেছেন। কোন খেলায় তো হারেনইনি, কেউ ওই চার বছরের মধ্যে একটি গেমও নিতে পারেনি ওঁর কাছ থেকে। খেলার উপর কতখানি অধিকার এবং নিজের উপর কতখানি আত্মবিশ্বাস থাকলে এই অবিশ্বাস্য রেকর্ডের অধিকারী হওয়া যায় প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়রাই সেটা ভাল বলতে পারবেন।

ভিক্টর বার্ণার অপূর্ব ক্রীড়াভঙ্গি

১৯৫৫ সালের কথা। কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলে এক ক্রীড়া সাংবাদিকের কাছে নিজের মুখে জীবনের কথা বলতে বলতে প্রচার বিমুখ লাজুক স্বভাবের মানুষটি ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে কনুই থেকে তালু পর্যন্ত একটি সরু কালো দাগ দেখিয়ে কপালে করাঘাত করে বলেছিলেন 'বিধি বাম, মোটর দুর্ঘটনা আমাকে মনের আনন্দে টেবল টেনিস খেলতে দিল না।'

খেলতে দিলে? ওই অবিশ্বাস্য রেকর্ডে হয়তো অলৌকিকতা যোগ হত। কীর্তির মধ্যাহ্ন গগনেই দুর্ঘটনার কালো ছায়া। পাঁচবার বিশ্বজয়ী হবার পর ১৯৩৫ সালে মোটর দুর্ঘটনা। বার্ণার জীবন সংশয় হয়েছিল। হাতেও লেগেছিল দারুণ চোট। সেরে উঠবার পর আর আগের মত খেলতে পারতেন না। মারের জলুস কমে গিয়েছিল। বেশীক্ষণ খেললে হাত টনটন করত, যন্ত্রণা হত। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারদের সন্দেহ হল হাতের মধ্যে কোন লোহার ভাঙ্গা টুকরো ঢুকে আছে। সত্যিই ছিল। পরে অস্ত্রোপচার করে সেই লোহার টুকরো বার করা হয়েছিল।

সত্যি কথা, ভিক্টর বার্ণার গৌরবের দিনে টেবল টেনিস মুখ্যত ছিল ডিফেন্সিভ

খেলা। আক্রমণ ছিল কম। কিন্তু আক্রমণের মধ্যে ছিল শিল্পের মাধুর্য, মারের মধ্যে চোখের তৃপ্তি। পরবর্তীকালে জাপান ও চীনের খেলোয়াড়রা পেন হোল্ড গ্রিপে মারের বন্যা ছুটিয়ে টেবিলের টেনিস খেলায় 'বিপ্লব' আনলেও সেল্যুলয়েডের ফাপা বলে ব্যাট চালাবার ক্রীড়া মাধুর্যে কেউ বার্নাকে অতিক্রম করতে পারেনি। বিশেষ করে বার্নার ব্যাক হ্যান্ড ফ্লিককে। বার্নার নিপুণ হাতের ওই অননুকরণীয় মার দেখবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও কারো ক্লান্তি আসত না। আবার বার্নার খেলা একবার আরম্ভ হলে ওই মারের জন্যও করতে হত না হা-হুতাশ। প্রতিনিয়ত শোনা যেত তবলার চাটির মত টেবিলের উপর বার্নার ব্যাক হ্যান্ড ফ্লিকের চটাং-বোল। প্রতিযোগিতায় অবশ্য বার্নার খেলা দেখার সুযোগ পাইনি। কিন্তু প্রদর্শনী খেলায় দেখা তাঁর হাতের ওই নয়নাভিরাম মারের সৌন্দর্য আজও যেন চোখে লেগে আছে।

চিরদিন শেকহ্যান্ড গ্রিপ-এর পক্ষপাতী বার্না পরবর্তী জীবনে লেখনী ধরে পেন-হোল্ড গ্রিপ-এর সমালোচনা করলেও চীন ও জাপানের খেলোয়াড়দের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেননি। মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন—'ওরা আমার চেয়ে অনেক ভাল খেলোয়াড়।' কিন্তু সারা পৃথিবী বার্নাকেই টেবল টেনিসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং টেবল টেনিসের 'গুরুজী' হিসাবে স্বীকার করেছে। ক্রীড়াশৌর্যের সহজাত শক্তিতে বার্না প্রথম জীবনে ফুটবল খেলাতেও সুনাম কিনেছিলেন। জুনিয়র আন্তর্জাতিক ফুটবলে হাঙ্গেরীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

হ্যাঁ, বার্না ১৯১১ সালের ২৪ অগস্ট হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টে জন্মগ্রহণ করেন। হাঙ্গেরীর খেলোয়াড় হিসাবেই টেবল টেনিসে বিশ্ব প্রতিষ্ঠা। কিছুকাল প্যারিসে বসবাস করার পর ইংলণ্ডে বসবাস শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে লাভ করেন ইংলণ্ডের নাগরিকত্ব।

ছোট বেলায় টেবল টেনিস খেলার কোন আগ্রহ ছিল না ভিক্টর বার্নার। ফুটবলের মধ্যেই মেতে ছিলেন; ফুটবলে সুনাম অর্জন করছিলেন। বয়স যখন তেরো-চোদ্দ তখন এক নিমন্ত্রিত বাড়িতে নৈশ ভোজের পর ভোজের টেবিলেই বার্নার প্রথম টেবল টেনিস খেলা শুরু হয়। সে খেলার সংগী ছিলেন আর একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় এল বেলাক। বার্না স্বীকার করে গেছেন তাঁর এই বাল্যবন্ধু বেলাকই তাঁর টেবল টেনিস খেলার প্রেরণাদাতা। টেবল টেনিস খেলায় বার্না যখন আস্তে আস্তে সুনাম অর্জন করতে থাকেন তখন ফুটবল খেলা ছেড়ে দিয়ে টেবল টেনিসকেই আঁকড়ে ধরেন। টেবল টেনিস হয়ে ওঠে ওঁর ধ্যানজ্ঞান। টেবল টেনিস খেলার জন্য সারা বিশ্ব হয়ে ওঠে বিচরণ ক্ষেত্র। খেলা থেকে অবসর নেবার পর প্রশিক্ষণ এবং খেলার প্রসারের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, লেখনী ধরে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। ডানলপ ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদন সংস্থার সংগেও বার্না যুক্ত ছিলেন। টেবল টেনিসের 'বার্না' নামাঙ্কিত বল, ব্যাট এবং টেবিল-এর চাহিদা বিশ্বব্যাপী। ইংল্যাণ্ডে টেবল টেনিসের প্রসারের জন্য ১৯৫২ সাল থেকে বার্না পুরস্কার প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডের যে ছেলে বা মেয়ে টেবল টেনিসে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেয় প্রতি বছর সে এই পুরস্কার পেয়ে থাকে।

বার্নার মৃত্যুতে ভারতীয় টেবল টেনিস সংস্থাও তাঁর সবচেয়ে বড় সুহৃদকে হারিয়েছে। ১৯৩৮ সালে বার্না ও বেলাকের ভারত সফরের পরই এ দেশে টেবল টেনিস খেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বার্নার দানেই ভারতে আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিসের বিজয়ীর পুরস্কার 'বার্না-বেলাক' ট্রফিটি সৃষ্টি হয়। ভারতের জাতীয় টেবল টেনিসে মহিলাদের ডাবলসের বিজয়িনী জুটির পুরস্কার 'সুশান বার্না' কাপটিও বার্না দম্পতির ভারত প্রীতির স্মৃতিচিহ্ন। সহধর্মিণী সুশান ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রিচার্ড বার্গম্যানকে সঙ্গে করে ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয়বার বার্না ভারত সফর করেন। তারপর রাজকুমারী অমৃত-কাউরের শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে ভারতে আসেন টেবল টেনিসের প্রশিক্ষক হিসাবে। তাঁর হাতে গড়া বহু খেলোয়াড় উত্তরকালে এ-দেশে এবং আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসে সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে টেবল টেনিসের বিশ্ব আসর পাতার ব্যাপারেও বার্না সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সাহায্যের জন্য সদা উন্মুখ, সদা হাস্যময় সৌম্যদর্শন সাগর-পারের মানুষটি ছিলেন ভারতীয় টেবল টেনিসের পরম সুহৃদ।

মুকুল

মাত্র এক সপ্তাহের সফরে পশ্চিম জার্মানির হকি দল ভারতে এসেছিল। খেলেছে চারটি ম্যাচ। প্রথম খেলায় ৩—২ গোলে হারিয়েছে পাঞ্জাবের বাছাই একাদশকে। ভারতীয় রেলওয়েজ দলের সংগে দ্বিতীয় খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ করেছে। সার্ভিসেস একাদশের সংগে তৃতীয় খেলা শেষ করেছে ১—১ গোলে। শেষ খেলা অর্থাৎ একমাত্র টেস্ট খেলায় ভারতকে ১—০ গোলে হারিয়ে সফরে অপরাজিত থাকার গৌরবের সংগে পাকিস্তানে গিয়েছে।

অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস এবং বিশ্ব হকির বিজয়ী পাকিস্তানের সংগেও জারমান দলের একটি টেসট খেলার কথা ছিল। কিন্তু জারমান দল লাহোরে লাহোর একাদশকে ১—০ গোলে হারাবার পর মুলতানে পাক হকি ফেডারেশনের সভাপতির দলের সংগে প্রদর্শনী খেলাটি ১৩ মিনিট চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। তার পর আর কোন খেলার খবর পাওয়া যায়নি। অন্তত লেখার সময় পর্যন্ত কোন খবর আসেনি। মুলতানে খেলাটি বন্ধ হবার কারণ পাক সমর্থকদের মাঠের মধ্যে অনুপ্রবেশ। ১৩ মিনিটের মধ্যেই সমর্থকরা তিনবার মাঠে ঢুকে পড়ে। তারপর যখন শয়ে শয়ে দর্শক মাঠে ঢোকে তখন খেলা বন্ধ করতে হয়।

যাই হক, এই উপমহাদেশে বিশ্ব হকির শীর্ষস্থানীয় দুই দেশে জার্মান দল তাদের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছে। ম্যুনিখ অলিম্পিকের আগে পশ্চিম জার্মান দলের এই সফরের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ভারতীয় হকি ফেডারেশনও জার্মান দলের সংগে খেলাকে অলিম্পিকের স্টেজ রিহার্সেল বলে ধরে নিয়েছিলেন। উদ্যোগ আয়োজন এবং প্রস্তুতিও কম ছিল না। টেস্ট খেলার এক সপ্তাহ আগে ভারতের সম্ভাবিত অলিম্পিক খেলোয়াড়দের দিল্লিতে জড় করে অতীত দিনের বিখ্যাত খেলোয়াড় বাবুর নেতৃত্বে কোচিং ক্যাম্প রাখা হয়েছিল।

অবশ্য জার্মান দলের সংগে টেস্ট খেলায় ভারত তার পুরো শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। সেন্টার ফরোয়ার্ড বলবীর সিংয়ের (রেলওয়েজের) পা কেটে যাওয়ার ৭টি সেলাই করতে হয়। মোটা প্যাড পরে

দিল্লিতে ভারত ও পশ্চিম জার্মানি হকি দলের টেস্ট খেলার এক দৃশ্য

বলবীর মাঠে নামে। রাইট হাফ কৃষ্ণমূর্তি এবং গোলকিপার পেরেরা আহত থাকায় তাদের জায়গায় যথাক্রমে সার্ভিসেস দলের বলবীর সিং এবং পাঞ্জাবের চার্লস্‌কে খেলানো হয়। তবে যাদের নিয়ে দল গড়া হয়েছিল তারা ভারতের প্রথম সারিরই খেলোয়াড়। সুতরাং টেস্টে জার্মানদের কাছে ভারতের পরাজয়ের কোন কৈফিয়ৎ নেই।

পশ্চিম জার্মানি মাত্র একটি গোলে ভারতকে পরাজিত করলেও সর্বাংশভাগে বিস্তৃত প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছে। গতিবেগ, ট্যাকলিং, বল কন্ট্রোল এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রেখে জায়গা বদল করে খেলায় তারা নাস্তানাবুদ করেছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের। ভারতের খেলোয়াড়রা কোন সময়ই যোগাযোগ করে আক্রমণ করতে পারেনি, শুধু মাঝে মাঝে স্টিকের কিছু কেরামতি দেখিয়েছে। স্টিকের সূক্ষ্ম কাজের অবশ্যই মূল্য আছে। কিন্তু আধুনিক কালের বলদৃপ্ত খেলা এবং চমৎকার সমন্বয়ের বিরুদ্ধে ঐ সূক্ষ্ম নৈপুণ্য বিশেষ কাজে আসে না। যদি আসত তবে অলিম্পিকে, এশিয়ান গেমসে এবং বিশ্ব হকিতে ভারতকে পরাজয় স্বীকার করতে হত না। যোগাযোগ, গতিবেগ এবং দৈহিক পটুতাই আধুনিক হকিতে সাফল্যের মূল সম্বল। সেদিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে পড়ছি বলেই বার বার হেরে যাচ্ছি। মোটের উপর যে দল হকি খেলায় নষ্ট সুনাম পুনরুদ্ধার করতে চায়, আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে চায়, জার্মান দলের সঙ্গে তাদের এই সাম্প্রতিক খেলা মোটেই উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়।

মেক্সিকো অলিম্পিকের আগে ১৯৬৭ সালের ইউরোপ সফরে ভারতকে এই পশ্চিম জার্মানির কাছে ১—৩ গোলে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু মেক্সিকো অলিম্পিকে লীগের খেলায় ভারত পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়েছিল ২—১ গোলে। অলিম্পিকে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক খেলাতে পশ্চিম জার্মানি প্রথম গোল করলেও ভারত শেষ পর্যন্ত ২—১ গোলে জয়ী হয়েছিল। বার্সিলোনায় বিশ্ব কাপ হকিতেও ভারত ১—০ গোলে পশ্চিম জার্মানিকে পরাজিত করেছিল। সেই পশ্চিম জার্মানি ভারতের মাটিতেই ভারতকে পরাজিত করে গেল! বিদেশের মাটিতে পরাজয়ের চেয়ে দেশের মাটিতে পরাজয় আরও তাৎপর্যপূর্ণ।

পশ্চিম জার্মানি অবশ্যই শক্তিশালী দল। দৈহিক পটুতা, শারীরিক শক্তি এবং ক্রীড়াশক্তি সব দিক দিয়ে। অনেকদিন ধরে তারা অলিম্পিক স্বর্ণ-পদক লাভের অপেক্ষায় আছে। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকেও তারা ভারতের সঙ্গে ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছিল। বর্তমানের জার্মান দল আগের চেয়েও শক্তিশালী। প্রায় দেড় হাজার ক্লাবের খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে জাতীয় দল গড়া হয়েছে। তাদের খেলার টেকনিক ট্যাক-টিকস অর্থাৎ প্রথা প্রকরণের মধ্যেও নতুন চিন্তাধারা। তারজেই তারা খেলছে সুইপার ব্যাক নিয়ে। অর্থাৎ তিনজন ব্যাক, দুজন লিংকম্যান এবং স্থান বদলকারী চারজন ফরোয়ার্ডকে নিয়ে তারা দল সাজিয়ে খেলেছে। ফুটবল খেলার মত এই প্রথা হকি খেলাতেও অবশ্য একেবারে নতুন নয়। এতে রক্ষাব্যূহ বেশী শক্তিশালী হয়। ভারতের কলাকুশলী ফরোয়ার্ডরা সম্ভবত এই কারণেই জার্মান ব্যূহ ভেদ করতে পারেনি। তার উপর জার্মান খেলোয়াড়দের আছে গতিবেগ এবং সংগ্রামী শক্তি। ফলে ভারতকে একরকম পর্যুদস্ত করেই তারা বিজয়ী হয়েছে।

একদিক দিয়ে বলব ভালই হয়েছে। পরাজয়ের পটভূমিকায় ভারত হয়তো নিজেদের দুর্বলতার কিছু হদিস পেয়েছে। অবশ্য পরাজয় নতুন নয়। তবু জার্মান দলের এই হাতেকলমে ক্রীড়াধারার সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হয়ে আমরা যদি দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারি সেটাই হবে পরম লাভ। এখনো সময় হাতে আছে। আবার আশঙ্কাও আছে প্রশাসকদের নিয়ে। হকি প্রশাসনে দলীয় কোন্দল আছে, প্রশাসকদের মাথায় আছে প্রাদেশিকতার বজ্রকীট। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কোন ক্লাবই হক কিংবা জাতীয় অথবা রাজ্য দলই হক, যদি প্রশাসনে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে, মন রেখে মুখ চেয়ে দল গড়া হয় তবে খেলার ফলাফল কখনো ভাল হয় না। হকির নষ্ট সুনাম পুনরুদ্ধার করতে হলে আজ খেলোয়াড় তথা হকি প্রশাসকদের জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রস্তুতি চালাতে হবে; যে কোন মূল্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে।

একলব্য

শর্মিলী

সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকশনস

হিন্দী চিত্রে নায়িকার প্রকৃতপক্ষে শর্মিলী হবার উপায় নেই। নায়িকারা যদি সত্যিই লজ্জাবতী হয় তবে ফ্যানদের নারাজ হবারই কথা। অতএব ছবির নাম "শর্মিলী" দেখে কোন আশঙ্কার কারণ নেই। এ-ছবিতে নায়িকা দুজন—কাঞ্চন ও কামিনী। যমজ বোন। সুতরাং শিল্পী একজনই। কাঞ্চন ও কামিনীর দুই ভূমিকায় রয়েছেন রাখী। যমজ বোনদের চেহারা এক, স্বভাব ভিন্ন। কাঞ্চন যেমন শর্মিলী, কামিনী তেমনই বেশরম। বেশরম বলা ছাড়া উপায় কী, হিন্দী ছবির অতিআধুনিকা নায়িকাদের রমণীর ভূষণস্বরূপ লজ্জা প্রায় থাকেই না। কামিনীর বেশবাসে ও চালচলনে ওই লজ্জা নামক ভূষণটির কোন অস্তিত্ব নেই। নায়ক অজিতের (শশী কাপুর) কিন্তু কামিনীকেই পছন্দ। অজিত জওয়ান, আর্মিতে কাজ করে। ক্যাপটেন অজিত কামিনীকেই আগে দেখেছে, কামিনীকেই কামনা করেছে।

কিন্তু গল্পে অনেক রকম প্যাঁচ। পরিচালক সমীর গাঙ্গুলি শুধুই একটি প্রেমের কাহিনীতে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না হয়ত। ক্রাইমের মামুলি ও অবিশ্বাস্য উপকরণগুলি তিনি ছবি থেকে বাদ দিতে পারেননি। হোটেল-ক্লাব-সুইমিং পুল-বিহারিণী কামিনীর সঙ্গে ছবির ভিলেনের জনৈক সাকরেদের পরিচয় চিত্রনাট্যে (সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকসনস স্টোরি ডিপার্টমেণ্ট) আগে থেকেই রাখা ছিল। অজিতের সঙ্গে যেদিন কামিনীর বিয়ে হবার কথা সেদিনই কামিনী নিখোঁজ। ভিলেনদের ফাঁদে পা দিয়ে কামিনী সেই যে বাড়ি থেকে বেরোল আর ফেরে না। সেই থেকে সেও ভিলেনের দলের একজন, নানা পাপ কাজে লিপ্ত, বিদেশের হয়ে স্বদেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত, খলনায়কের শয্যাসঙ্গিনী এবং হোটেলের গোপন কক্ষের বাসিন্দা। কামিনী প্রতি মুহূর্তেই যন্ত্রণায় ভুগছে, কিন্তু উপায় নেই, তাকে

"শর্মিলী" ছবির নায়ক-নায়িকা শশী কাপুর ও রাখী

ব্ল্যাকমেল করে দলে রাখা হয়েছে। কারণ কামিনীই যে বিয়ের দিন তার সেই পূর্ব-পরিচিত ভিলেন-সাকরেদকে হত্যা করেছে।

অভিনেত্রী রাখীকে এ-ছবিতে দুই রোলে অনেক কাজই করতে হয়েছে। এক বিলাতী ছবির নায়িকার অনুকরণে মোটরের নিচে বারে বারে চাপা দিয়ে ওই লোকটিকে মারতে হয়েছে, যে কামিনীকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ির বাইরে এনেছিল, ধর্ষণ করতে চেয়েছিল এবং তার সুখের পথে কাঁটা হয়ে ছিল। নায়ক অজিত এই সব তত্ত্ব কিছুই তখন জানে না, জানেন দর্শক। অজিত বিয়ের পর জেনেছে তার স্ত্রী কামিনী নয়, কাঞ্চন। কিন্তু মর্মাহত অজিত এর পর আর বাঁচতে চায়নি। তাকে বাঁচাবার জন্যই অবহেলিতা কাঞ্চন শেষ অবধি কামিনী সেজেছে, অর্থাৎ কামিনীর রূপ নিয়ে অজিতকে সুখী করে চলেছে। অতএব কাঞ্চনও তখন খুব একটা শর্মিলী নয়। আসলে পরিচালক রাখীর শর্মিলী রূপটা অল্পক্ষণের জন্যই রেখেছেন। যতক্ষণ রেখেছেন ততক্ষণ রাখীকে দর্শকদের খুবই ভাল লাগবার কথা। অবশ্য দুটি ভূমিকাতেই রাখী হিন্দী চিত্রের প্রথম সারির নায়িকাদের মতই কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। তাঁর গ্ল্যামার যেমন আছে, তেমনি তাঁর অভিনয়শক্তি সম্বন্ধেও দর্শক এ-ছবি দেখে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। তবে এই সব মামুলি ছবিতে, মামুলি চরিত্র শশী কাপুরকে কেমন যেন বেমানান লাগে। তিনি আর সব নায়কদের মত চিরাচরিত নিয়মে সব কিছুই করেছেন, ক্লাইম্যাক্সে সাদ স্টার্ট-নেওয়া প্লেনে লাফিয়েও উঠেছেন, ভিলেনের সঙ্গে এক হাত লড়েছেন বেশ দাপটের সঙ্গে। তবু এ জাতীয় ভূমিকা যেন শশী কাপুরের নয়। তবে দুয়েকটি মুহূর্তে যেখানে মনস্তাত্ত্বিক, তাও ছবিতে সামান্য, সেখানে শ্রীকাপুরের অভিনয় খুব ভাল। ছবির শেষের দিকে নায়ক কাঞ্চনের মহত্ত্বের কথা অনুভব করেছে এবং কামিনীর অধঃপতনের কথাও জেনেছে। তখন কাঞ্চনকে সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়ে অজিত তাদের গ্রহণ করেছে। কিন্তু কাঞ্চন ও অজিতের প্রেম কিংবা

তাদের নবজন্ম দেখাবার অবসর পরিচালকের ছিল না। তিনি তখন নির্মাণসিদ্ধ ক্রাইম-থ্রিলারকে পর্দাটিতে আমার এবং রোমাঞ্চকর অ্যাকশন দেখাবার জন্য তৎপর। দুই বয়স্ক বোনের মাঝখানে একজন পুরুষকে নিয়ে যে নাটকীয় সৃষ্টি করা যেত ছবিতে তা ক্রাইম-থ্রিলারের গতানুগতিক ব্যাপার-স্যাপার এবং অন্যান্য নিয়মমাফিক পরিস্থিতির চাপে হারিয়ে গেছে। তবে একটি প্রধান উপকরণ খুবই আকর্ষক। সে হচ্ছে এস ডি বর্মণের দেওয়া সুরে কয়েকটি গান। গান-গুলির সুরে চমক আছে।

অস্তিত্বের সংগ্রাম

সিম্বলিক বা প্রতীকধর্মী ছবি তৈরির একটা সুবিধা এই যে তাতে অল্পদৈর্ঘ্যের ছবির দৈর্ঘ্য নামমাত্র হলেও চলে। 'স্ট্রাগল ফর এক্জিসটেন্স' যেমন, মাত্র তিন মিনিটের ছবি। তাতে পরিচালক অশোক দে একটি গভীর ও বিরাট বক্তব্য পেশ করেছেন। বক্তব্য : অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম চিরকালের। চিরকালীন এই আদর্শ এবং তারই জন্য মানুষের অন্তহীন সংগ্রাম দেখাবার জন্য পরিচালক কখনও [illegible], কখনও মুখোশ [illegible] কখনও বা [illegible] দেখিয়েছেন। [illegible] হচ্ছে প্রতীকধর্মী। [illegible] অনেক সিম্বল আছে। অবশ্য তিন মিনিটের ছবিতে কত প্রতীকই বা দেখানো যায়। তবে কোনটা কিসের প্রতীক তা পরিচালকের মনে যতটা স্পষ্ট ছবিতে দর্শকের ততটা স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ ছবি নিজে বিশেষ কিছুই কমিউনিকেট করে না। নেপথ্যভাষণ অবশ্যই আছে। তবে ওই ভাষণের সঙ্গে দৃশ্যের ভাবগত ঐক্য অনুধাবনে অসুবিধা হয়।

ছবিটি ক্যামেরার কাজ এবং ধ

ব্যবহারের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সত্যের সন্ধানে যে ছেলেটি ছুটেছে তার দ্রুত দৌড়ে চলার তালে তালে সেলাইয়ের আওয়াজটি সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। "সুইগেল অব একজিসটেনস" পরিচালক শ্রীদে'র প্রথম ছবি। টেকনিক্যাল কাজের দিক থেকে ছবিটি ভাল, বক্তব্য উপস্থাপনেই যা সমস্যা। তবু এই ছবি দেখে চলচ্চিত্রকার হিসাবে শ্রীদে'র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হওয়া যায়।

এ-সপ্তাহে মুক্তি

চারুচিত্রের আলো আমার আলো (পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়) এবং জুপিটারের হিন্দী ছবি সংযোগ (পরিচালনা : এস এস বাসন) এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে।

প্রতিভা বসুর কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরি "আলো আমার আলো" ছবির দুই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

"সংযোগ"-এর দুই প্রধান শিল্পী অমিতাভ বচ্চন ও মালা সিন্‌হা। সংগীত পরিচালক রাহুল দেববর্মণ।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র জয়ন্তের সঙ্গে অভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে গত ১০ মার্চ। বিবাহ বাসরে তোলা এই ছবিতে নব-দম্পতির সঙ্গে হেমন্তকুমার ফটো—দেশ

বাংলাদেশে ছবি রপ্তানি প্রসঙ্গে

ইন্ডিয়ান মোশান পিকচারস এক্সপোর্ট করপোরেশন বাংলাদেশে ছবি রপ্তানির ব্যাপারে কথাবার্তা চালাচ্ছেন বলে যে সংবাদ বেরিয়েছে তাতে কলকাতার চিত্র-প্রযোজকেরা উদ্বেগ ভোগ করছেন। গত ৭ মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠকে ই-আই-এম-পি-এ'-এর প্রযোজক-শাখার সভাপতি শ্রীবিমল দে বলেন, লেনদেনের ভিত্তিতে যে-সব ছবি বাংলাদেশে পাঠানোর কথা হচ্ছে তার অধিকাংশই হিন্দী চিত্র। বাংলাদেশে হিন্দীচিত্র পাঠানো কাম্য নয় বলে শ্রীদে মন্তব্য করেন। তিনি আরও জানান, যদি ভারত সরকারের ব্যবস্থায় বাংলাদেশের সঙ্গে চলচ্চিত্রের লেনদেন হয় তবে যেন শুধু বাংলা ছবিই পাঠানো হয়। এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে যেন পাঠানো হয়। প্রযোজক-শাখার সভাপতির এটাই বক্তব্য।

সাংবাদিক সভায় প্রযোজক-শাখার সভাপতি আরও বলেন, বাংলাদেশে কলকাতার ছবির অবাধ প্রদর্শন এখনকার চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষতি করবে এটা আমরা চাই না। লেনদেনের ব্যবস্থা যদি কিছু হয় তবে বাংলাদেশের সব পরিমাণ ছবি কলকাতায় দেখাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেন, যেখানে কলকাতায় বাংলা ছবিই দেখানোর সুযোগ হচ্ছে না সেখানে বাংলাদেশের ছবিই বা দেখানো হবে কী করে?

সাংবাদিক সভায় যে লিখিত বিবৃতি পেশ করা হয় তাতে পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্র-সমস্যা এবং প্রযোজক-শাখার দাবি-দাওয়ার বিবরণগুলিরও পুনরুল্লেখ করা হয়। প্রসঙ্গত জানানো হয়, প্রযোজক-শাখার তরফ থেকে নির্বাচনের আগে সকল রাজনৈতিক দলের কাছে এই মর্মে আবেদন করা হয় যেন তাঁরা পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পের সংকটমুক্তির জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

স্বামী বিবেকানন্দ হলের সৌজন্যে এখানে একটি শিল্পোৎসব হয়ে গেল। দুইদিনে চারটি নাটক। প্রথমদিন দক্ষিণ বোম্বাই-এর পাটকর হলে অনুষ্ঠিত হল হিন্দী এবং গুজরাটি আর দ্বিতীয় দিন মধ্য বোম্বাই-এর রবীন্দ্রনাট্যমন্দির হল বাংলা এবং মারাঠি। এ অঞ্চলে এই প্রথম বিভিন্ন-ভাষী শিশুরা একই মঞ্চে একত্র হল। হিন্দী, গুজরাতি, বাংলা এবং মারাঠি একত্রে এই চার ভাষার কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই (কেবল সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন ছাড়া) এ যাবৎ দেখিনি।

প্রথম দিন পাটকর হলে যে দুটি নাটক হল সেই নাটক দুটি পরিচালনা করেছেন বোম্বাই-এর দুই প্রথিতযশা অভিনেত্রী। গুজরাতি শিশুনাট্য "মিথ্যাভিমান"। এর পরিচালিকা হলেন দীনা গান্ধী। আর হিন্দী "বাবা হরবোলে আহেত"-এর পরিচালিকা সুলভা দেশপাণ্ডে। "বাবা হরবোলে আহেত"-এর নাট্যকার, বিখ্যাত বিজয় তেন্ডুলকর। দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাট্য-মন্দিরে যে দুটি নাটক হল তার একটি বাংলা, অন্যটি মারাঠি। বাংলায় যা হল তাকে ঠিক নাটক বলা যায় না, কি বললে ঠিক বলা হবে, তাও বলা মুশকিল। তবু একটা আন্দাজ দেবার জন্য এইটুকু বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে বাংলা অনুষ্ঠানটির আধার হল সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল"। আবোল তাবোলের অনবদ্য কবিতাগুলিকে নানান তালের সুরে গেয়ে, সেই গানের এপারে ওপারে কিছু টিপ্পনীর সেতু বেঁধে এঁরা একান্তই শিশুর মাত্র 'আবোল তাবোল' জুড়ে দিয়েছেন। আর মারাঠি নাটকটি হল 'রাজকন্যালা ঘাম হাওয়া'। অর্থাৎ 'রাজকন্যার ঘাম চাই'। এই নাটকটিও বিজয় তেন্ডুলকর-এর লেখা। এবং এটিও পরিচালনা করেছেন সুলভা দেশপাণ্ডে। প্রত্যেকটি নাটকই ব্যঙ্গাত্মক স্বাদে অনবদ্য এবং সুরচিত ও সুপরিবেশিত। মেকআপ ছাড়াও শিশুরা সুন্দর হয়, স্টেজেও শিশুরা অপূর্ব। আবোল তাবোল-এর পাতা থেকে হুঁকো-মুখো হ্যাংলা বা কুমড়োপটাশ যদি সশরীরে স্টেজে আবির্ভূত হয় তাহলে কার না ভাল লাগে দেখতে। আবোল তাবোল দেখতে যত ভাল লাগতো গানগুলো যদি তত ভাল লাগতো তাহলে সোনায় সোহাগা হত।

শিল্পীদের এই নাটকগুলি যারা পরিচালনা করেছেন তাঁরা সকলেই মহিলা। এঁরা প্রত্যেকেই গুণী। হিন্দী এবং মারাঠি নাটকের পরিচালিকা সরোজা দেশপাণ্ডে, গুজরাটির দীনা গান্ধী, বাংলা আবোল তাবোল ইন্দ্রানী আচার্য এবং সুনন্দা মুখার্জি। আশা করি এঁরা এমন অনুষ্ঠান আরো করবেন ভবিষ্যতে।

সরল শর্মা

'গোরুর গাড়ির হেডলাইট'

মঞ্জুশ্রী নাট্যদলের সাম্প্রতিক উপহার 'গোরুর গাড়ির হেডলাইট' কয়েক দিন আগে অভিনীত হল থিয়েটার সেন্টারে। রচনা সরোজ রায়ের, নির্দেশনায় সত্য চট্টোপাধ্যায়। নাম শুনেই অনুমান করা গিয়েছিল যে, এটি হাসির নাটক। নাটকের মধ্যে হাসির সঙ্গে একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপও যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে নাটক দেখার সময় দর্শকদের সেটুকু চিনে নিতে ভুল হয় না। ঘটনার আবর্ত একটি নাট্যদলকে নিয়ে। প্রত্যেকটি চরিত্রের নামকরণ এবং তাদের ক্রিয়াকাণ্ড দর্শকদের হাসাবার পক্ষে যথেষ্ট। হাসির নাটকের ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন হয়, এখানেও তেমনি ঘটনার মধ্যে কোথাও কোথাও ঈষৎ মোটা দাগের আভাস, ঘটনাও সর্বত্র যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কিন্তু নাট্যকারের বড় কৃতিত্ব তাঁর সংলাপ, যার কাছে ছোটখাটো অনেক ত্রুটি ঢাকা পড়ে গেছে। সংলাপ রসসমৃদ্ধ, শিল্পীরা অনায়াসেই সেই রসকে প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। এজন্য শিল্পীদের দলগত অভিনয় ঐক্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রধান চরিত্রের প্রায় সব শিল্পীই নিজ নিজ চরিত্রের দাবি মিটিয়েছেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুবোধ চ্যাটার্জি, সরোজ রায়, গোপাল ঘোষ, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, হরিপদ দাস, সত্য চট্টোপাধ্যায়, অমিত ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার সিংহ, রঞ্জিত ঘটক, দিলীপ বণিক, শ্যামসুন্দর চন্দ্র, ভবানী দে ও উৎপল চক্রবর্তী।

নাট্য-সমালোচক

চিৎপুর-চিত্র

আমার এক ধনশালী বন্ধু যাত্রাগানের নামে পাগল। গত কয়েক বছর ধরেই সে আমাকে বিরক্ত করে চলেছে। তার বড় সাধ সে একটি যাত্রাদল খুলবে। নিখুঁত নিটোল একটি দল। বাজারের সেরা নায়ক থাকবে তার দলে, শ্রেষ্ঠ নায়িকা শোভাবর্ধন করবে দলটির। বাকি যাদের নির্বাচন করা হবে তাঁরাও হবেন খুব শক্তিশালী শিল্পী। এ ছাড়া নাচপার্টি, সুরপার্টি গঠিত হবে সুনির্বাচিত শিল্পীদের নিয়ে ইত্যাদি। পোশাকপত্র? ওটাও হবে খুব জমকালো। ম্যানেজিং স্টাফকে হতে হবে খুব অভিজ্ঞ। দল পরিচালক হিসাবে বেছে নেওয়া হবে হরিপদ বায়েনের মতন একজন যোগ্য লোক।

বন্ধুবরের এই আগ্রহকে এতকাল আমিই গুরুত্ব দিই নি। মাঝে মাঝে ওর বাসনার আগুনে ছাই চাপা দিয়েছি। গত কয়েক বছর ধরে যাত্রাগুলির অস্তিত্ব রক্ষার প্রচণ্ড সংগ্রামের কথা শুনিয়ে, অতিরিক্ত কস্টিংয়ের ভয় দেখিয়ে এবং শেষাবধি গোটা ব্যবসাকে জুয়ার সঙ্গে তুলনা করে ওকে নিরুৎসাহ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু এবার সে নাছোড়বান্দা। গত মাঘ মাসে সে সশরীরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বলল, 'দিনকাল যা পড়েছে তাতে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে বাঁচতে হলে একটি ছোটখাটো সাইড-বিজনেস চাইই চাই।' আমি ব্যবসায়ী নই, তবু বললাম, যাত্রাদল করা খুব ঝুঁকির ব্যবসা। ও বলল, "ব্যবসামাত্রই ঝুঁকির।" অতএব আর কিছু বলার থাকতে পারে না। আমার বন্ধু সেদিনই সাফসুফ বলে গেলো আগামী মরসুমে সে একটি জব্বর যাত্রাদল না খুলেই ছাড়বে না।

ফাল্গুনের প্রথমে কারমাটোর থেকে একটি পত্র এলো। ঠিক পত্র নয়, পত্রাঘাত। বন্ধুবর লিখেছে: আমি বুঝিতে পারি না তুমি কেন আমাকে বারংবার হতাশ করিতেছ। উহাতে তোমার কী লাভ। শুনিয়া রাখ তুমি হাজার বাধা দিলেও এই সনে আমি একটি যাত্রাদল না খুলিয়া ছাড়িব না। পারিলে কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে একটি বাজেট পাঠাইয়া বাধিত করিও। উহা দেখিয়া আমি কার্যে অগ্রসর হইব।

ভেবেছিলাম বাজেট দূরে থাক, পত্রোত্তরও দেব না। কিন্তু আমার জেদী বন্ধুর হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই।

সে তার তূণ থেকে এক-একটি তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে লাগল। অতিষ্ঠ হয়ে শরণাপন্ন হলাম এক ঝানু দল-পরিচালকের। তিনি বললেন, যাত্রার দল করা আর হস্তীযূথ পোষা দুইই এখন এক খরচার। এ-বাজারে 'এ'-ক্লাশ দল খুলতে অন্তত এক লাখ টাকা ক্যাশ চাই। ওই টাকা হাতে নিয়ে নামলে হয়তো বাজারে হাজার তিরিশেক টাকার মতন ধার পাওয়া যেতে পারে।

মানে এক লক্ষ তিরিশ হাজার!

পরিচালক-মশাই হাসলেন। বললেন, তাতেও কিন্তু এ-ক্লাশ দল বলতে যা বোঝায় ঠিক তা হবে না। কারণ ক্লাশ পেতে হয় নাম পেয়ে যশ এনে। স্টারকাস্টে চিৎপুরের দলে ক্লাশ এগোয় না। কয়েকটি নজিরও তিনি তুলে ধরলেন। বললেন, নাট্যভারতী এত বড় সব স্টারদের নিয়ে কারবার করেও চার বছরের মাথায় এ ক্লাশে উঠেছিল। আলোচনা-প্রসঙ্গে ভদ্রলোক মোটামুটি একটি ফিরিস্তি দিলেন। বললেন কাস্ট-আর্টিস্টদের অ্যাডভান্স খাতটাই আসল। ও বাবদ ধরে রাখুন ষাট হাজার।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, 'মাত্র ষাট হাজার...'

পরিচালক বললেন, তাও আপনি নিজে হাতে করলে তবে। নইলে ও টাকা কেবল হিরোকেই অ্যাডভান্স করতে হতো। বলে ভদ্রলোক একটা হিসাব দেখালেন। কাস্ট-আর্টিস্ট—৬০ হাজার, সুরপার্টি—১০ হাজার, নাচপার্টি—৬ হাজার, পরিচালক—৫ হাজার, ম্যানেজার—৫ হাজার, সাজঘর স্টাফ—৪ হাজার, ঠাকুর চাকর ইত্যাদি—৫ হাজার। এ গেল একদিকের অ্যাডভান্স। তারপর ধরুন পালাকারের অ্যাডভান্স। তারপর আসাম পরিচালকের অ্যাডভান্স—৪ হাজার প্রভৃতি। এবার আসুন রিহার্সালের পর্বে। তা সব লোকদের খোরাকী—জলপানি অথবা যাতায়াত খরচা এবং রিহার্সাল বাড়িভাড়া ইত্যাদি মিলিয়ে ৮ হাজারের মতন খরচ না হয়েই পারে না। এরপর আছে পোশাক, উইগ, খুঁটিনাটি রিকুইজিটস—এ-সব মিলিয়ে পার পালা বাবদ খরচা ধরুন ১০ হাজার।

বললাম; এখানেই তো এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, কক্ষনো না। এ তো সবে শুরু। এখন থাকল পাবলিসিটি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাবদ ধরুন ২৫ হাজার। পোস্টার ব্যানার, লিফলেট ধার আরও ধরুন ৬ হাজার। সবলগে ওটা ৩০ করে নিন। ভদ্রলোক বললেন, দেড় লক্ষ হল কী? বললাম, হ্যাঁ। উনি গোটা তিনেক পানের খিলি মুখে পুরে দিয়ে, আঙুলের ডগায় চুন চেটে নিয়ে হাসলেন। বললেন, বাস খরচা ধরিনি, সরকারী তরফের খরচাও না। আসলে এখনও অনেক অনেক কিছু বাকি থাকল।

'অরণ্যক' (পরিচালনা : অজিত লাহিড়ী) ছবিতে প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সমিত ভঞ্জ

ফিরে এসে বন্ধুবরকে মোটামুটি একটি হিসেব দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। লিখেছি : এর পর তুমিই ভেবে দেখ, যাত্রাদল না খুলে সত্যি তুমি ছাড়বে কিনা।

—সূত্রধার

॥ নৃত্য ॥

কলকাতায় কমলালক্ষ্মণ

রবীন্দ্র সদন এবং পরে মোক্ষমূলের ভবনে শ্রীমতী কমলালক্ষ্মণের নাচ দেখলাম। ওঁর সুখ্যাতি অনেক, ওঁর প্রস্তুতিও প্রচুর। উভয়ক্ষেত্রেই কমলা ভারত-নাট্যম, কথক, মণিপুরী, কথাকলি ইত্যাদি অনেক কিছুই নেচেছিলেন। ঠিক কোন একটিতে তাঁকে ভীষণ ভাল লাগেনি। বরং সমস্ত নাচগুলি মিলিয়ে একটা তৃপ্তির বন্দোবস্ত তিনি করেছিলেন। যেমন ধরা যাক, কমলার কুচি-পুরী নাচটি। সন্ত ত্যাগরাজের একটি তেলেগু গানের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্ধ্র প্রদেশের একান্ত বৈশিষ্ট্যের এই নাচটি আমার রবীন্দ্র সদনে ভাল লাগেনি। অথচ মোক্ষমূলের ভবনের নাচে সেটির উৎকর্ষ কমলার প্রতিটি পদসঞ্চরণে। প্রতিটি ভঙ্গিমায় এবং ভাব-কল্পনায় চমৎকৃত হয়েছি।

কমলার কথাকলিটি ছিল দুইটি মালায়ালী গানের আধারে তৈরী। কথাকলির পরিবেশনায় কমলাকে খুব বিবেকী এবং কলাবতী মনে হয়েছে। প্রথম গানটি ছিল গুরুভায়ুর মন্দির এবং দ্বিতীয়টি প্রভু ইয়াপ্পা সম্পর্কিত। একটি গান ছিল দক্ষিণ ভারতীয় রাগিণী কল্যাণীভিত্তিক। দ্বিতীয় গানের সময়ই কথাকলির পুরো আমেজটা প্রকাশ পেল। একটা চিন্তার অবতারণাই সম্ভবত নাচটির প্রেরণা ছিল। একটা স্পিরিচুয়ালিটির ছোঁয়া নাচটির অন্তরঙ্গ মাধ্যমের কাজ করেছিল। ভাব, আঙ্গিকের সংবদ্ধতা এবং সাবলীলতা কমলার কথা-কলির রসসঞ্চার করেছিল।

কমলা আর নেচেছিলেন পুষ্পাঞ্জলি, শিব-পার্বতী, মণিপুরী। মণিপুরীটি খুবই যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল। রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যাখ্যা হিসেবে কমলার মণিপুরী কোনভাবেই কাজ করেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গানের ভাব এবং নাচের 'ভাও' ঝগড়া করেছে। স্থানে স্থানে মিলালেও মিলতে পারেনি। এ সূত্রে বলতে পারি যে, মোক্ষমূলের ভবনে কমলা যে তাণ্ডবের কাজ দেখিয়েছিলেন, সেটির প্রয়োগ হয়ত আলোচ্য রবীন্দ্র-সংগীতের মুদ্রারক্ষায় সক্ষম হত।

রবীন্দ্র সদনের নাচের আসরে মীরা-বাঈ-এর যুগান্তকারী ভজন 'তুমহারে কারণ সব কুছ ছোড়া অব কিউ মুঝে তরসাও' প্রাণ পেয়েছিল শ্রীমতী কমলার 'ভাও' পরিকল্পনায়। এই কারণে ভজনটির লাবণ্য এর খোলামেলা আবেদনে। এর অনাড়ম্বর পবিত্রতা ফুটিয়ে তোলার জন্য চাই যথেষ্ট সংযম, কিছুটা উপলব্ধি। বাড়িয়ে বলছি না, কমলার সেটা ছিল। তাই ওঁর ভজন-নাচের প্রশংসায় এটুকুই বলব, মীরার ভজনকে উনি শুধু রূপ দেননি, সাময়িক উনিই মীরা বনেছিলেন।

সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর ওড়িশী নাচ

কলকাতার কেরল সমাজ গত ১৯ ফেব্রুয়ারী, শনিবার, কলামন্দিরে ভারতীয় নৃত্যকলার একটি আসর উপহার দেন নগর-বাসীদের। আসরের মুখ্য শিল্পী ছিলেন শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী। অন্য কারকাটি নাচ নেচেছিলেন শ্রীমতী কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়।

এ বাবৎ যে সমস্ত নাচ দেখেছি এবং যেটুকু আনন্দ সে সূত্রে পেয়েছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি যে, শ্রীমতী পাণিগ্রাহীর নাচ উৎকৃষ্ট। নাচের উৎকর্ষ শিল্পীর কলানিষ্ঠতার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তাঁর নাচের রসমাধুর্যে পরিব্যাপ্ত। না বলে উপায় নেই যে, বিগত কিছুকালের নাচগুলিতে রসের স্রোতে বেশ কিছুটা ভাঁটা পড়েছে। শ্রীমতী পাণিগ্রাহীর নাচ কিন্তু আমার ভাল লেগেছে ঐ রসের দিকটার জন্য।

কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়ের মণিপুরী আঙ্গিকে কৃষ্ণ অভিসার খুব পরিচ্ছন্ন লেগেছিল। কীর্তনের রসে কৃষ্ণার মণিপুরী লাস্যভঙ্গিমা রূপে রসে মিলেছিল বেশ।

সংযুক্তার সরস্বতী বন্দনা থেকেই একটা সাত্ত্বিকতার প্রসার দেখলাম। এই ভাব-সৌন্দর্য স্থানে স্থানে বাধা পেয়েছে। কতকগুলি মুদ্রাকল্পনায় তাই আশানুরূপ তৃপ্তি পাইনি। কিন্তু সংযুক্তার নাচের বিশেষ গুণ এই যে সেদিনের ওড়িশী নাচের পূর্ণ রূপটির পরিণত মূর্তির মধ্যে সেগুলি ঠিক আঁচড় কেটে বসেনি।

সংযুক্তার পল্লবী ভারী সুন্দর লেগেছে। যে বিস্তারের সূত্র পল্লবীতে শিল্পী একাগ্রভাবে অব্যাহত রেখেছিলেন এবং দ্রুত লয়ের কাজগুলিতে তিনি যে সৌন্দর্য ডেকে এনেছিলেন, তার প্রশংসা না করে উপায় নেই গীতগোবিন্দের শেষ গানটি নিয়ে সংযুক্তার অভিনয়ও খুবই উচ্চমানের হয়েছিল। ঠিক এই মুহূর্তে একটা কথা বলে রাখা দরকার। সংযুক্তার নাচে রসমাধুর্যের একটা বিরাট উৎস ছিল তাঁর নাচের সঙ্গে শ্রীরঘুনাথ পাণিগ্রাহীর গান। শ্রীপাণিগ্রাহীর স্বর অত্যন্ত মিষ্টি, ওর সুরের চেতনাও অসাধারণ। কাজেই যখন একটা সওয়াল-জবাব নৃত্য আসর গড়ে উঠল, সেটা পুরো নাচটিতে একটি নতুন যুক্তি আরোপ করল।

এতক্ষণ গান ছিল নাচের সঙ্গী। সওয়াল-জবাবের রেষারেষিতে সেটি হল নাচের সমস্যা। কিন্তু অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গেই সংযুক্তা সংগীতের প্রস্তাবনাগুলিকে নৃত্যে ব্যবহার করলেন। সেখানে লয়কারী ছিল, তেহাই ছিল, তাল ছিল—ভাব তো ছিলই।

শেষাংশের চূড়ামণি ও দশাবতার ঠিক তেমন ভাল লাগেনি। বরং একটু একঘেয়েই লেগেছিল।

নৃত্য-সমালোচক

॥ সংগীত ॥

সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনের দুটি বিষয়

এবারে কলকাতার দুটি বড় সংগীত সম্মেলন ঠিক একই দিনে পড়ায় বড় মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনের সামান্য কয়টি আসরেই উপস্থিত ছিলাম। এর জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কিছু করার উপায়ও থাকে না। বড় বড় সম্মেলনগুলির আসরের দিনের মধ্যে এ রকম সংঘাত না হওয়াই কাম্য। যাই হোক, সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনের যেটুকু দেখেছি বা শুনেছি, তার অবশ্যই প্রশংসা করব।

অনুষ্ঠানের পঞ্চম অধিবেশনে রবীন ঘোষের বেহালা বাদন উল্লেখের অপেক্ষা রাখে: শুধু এজন্য নয় যে শিল্পীর ঝালার হাত এবং তান, তেহাই-এর দ্যুতি মনে গেঁথে যাবার মতন, আসলে শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়ের তবলা সহযোগিতায় "জন-সম্মোধিনী" রাগটির সূক্ষ্ম রূপটি তিনি বেশ পারদর্শিতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। পরে শিশু শিল্পী পিয়ালী সেনগুপ্তার কথক দেখে আরও অবাক হলাম। এত অল্প বয়সে এত পরিমার্জিত ধ্যান-ধারণার আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। কথক সম্বন্ধে একটা চেতনা মেয়েটির হয়েছে। অনুশীলনেই তার উত্তরোত্তর পরিমার্জনা হবে। পিয়ালীর নাচ দেখে এ ধরনের আশাকে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে নৃত্যশিল্পী পিয়ালী সেনগুপ্তা

দ্বিজেন্দ্র-গীতি

সম্প্রতি শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে দ্বিজেন্দ্র সংগীতের একটি আসর বসেছিল। আসরটি 'উত্তর ভারতী' গোষ্ঠীর একটি বিশেষ আয়োজন। শুধু গান দিয়েই শেষ হয়নি সেদিনের প্রস্তুতি। বস্তুত শ্রীঠাকুরের

দ্বিজেন্দ্রগীতি পরিবেশনে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনার সমাবেশে দ্বিজেন্দ্র-গীতির মূল রূপটি শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে মেলে ধরাই আসরের লক্ষ্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিভিন্ন চিন্তা এবং অনুভবের গানগুলির গ্রন্থনার ভার নিয়েছিলেন অধ্যাপক রজত রায়চৌধুরী। গানগুলি গেয়ে শুনিয়েছিলেন সুখ্যাত গায়ক শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীর সুনিষ্ঠ পরিবেশনায় দ্বিজেন্দ্রগীতির একটা আবহাওয়া তৈরী হয়ে উঠেছিল। শ্রীঠাকুরের আলোচনা সেই গায়কী মেজাজে চিন্তার স্রোত ডেকে এনেছিলেন। কথায় এবং গানে দ্বিজেন্দ্র-কালের সংগীত-সাধনার প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন উপস্থিত সকলের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

সংগীত সমালোচক

রবিবাসরীয় নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় সম্প্রতি ইছাপুরে এ টি এস হল-এ অভিনীত হল "ভূমিকম্পের পরে"। রতনকুমার ঘোষ রচিত এবং রমেন চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকের অভিনয় সহজেই দর্শকদের মুগ্ধ করে। নাট্য মুহূর্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিল্পীদের দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। বিভিন্ন চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন অরুণকুমার হালদার, পশুপতি দাস, শিশিরকুমার সাহা, রঘুনাথ সাহা, নৃপেন্দ্রকুমার, শ্রীমতী কমলা ও সঞ্জীব চৌধুরী। আলো এবং মঞ্চসজ্জার কৃতিত্ব শিশিরকুমার সাহার।

অরণ্যদেব

লী ফক

প্রতিযোগীরা বেড়ুটে সাপ হাতে নিয়ে
দৌড়াচ্ছে। একটু অসতর্ক হলেই মৃত্যু অবধারিত।

ওয়াম্বেসি... ওয়াম্বেসি
অরণ্যদেব যদি না ট্রফি নিয়ে ফেরেন, তাহলে গণ্ডগোল হতে পারে।
হবেই!

পুরোদমে খেলা চলছে! গদার লড়াই... খাদের উপর মল্লযুদ্ধ!

দৌড়-প্রতিযোগীরা পার হয়ে যাচ্ছে ভয়ংকর সব বিঘ্ন!
7/25

ওয়াম্বেসি-গোষ্ঠীর ওয়াম্বা এবারে গদাযুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন!
সব ব্যাপারেই ওয়াম্বেসিরা এগিয়ে আছে! ট্রফি না পেলে ওরা মহা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেবে।
অরণ্যদেব কোথায়? এখনও তিনি ফিরছেন না কেন?

আমাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে? মজা দেখাচ্ছি!
নামাও পিস্তল!
অ্যাঁ?!

ম্যাক ঘুরে দাঁড়াতেই...
অবাধ্য হয়ো না!
!

অন্য দুই চোর ততক্ষণে হামলা চালিয়েছে!
কে হে তুমি আমাদের মাল লুঠ করতে এসেছ?
কে তুমি?
১১
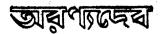
পশ্চিমবঙ্গে ভোট শেষ আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। দু'একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া শনিবার পশ্চিমবঙ্গের ২৮০টি কেন্দ্রের নির্বাচন মোটামুটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। এই সঙ্গে মুরশিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনেরও ভোট সারা হয়। ভোট শেষ হওয়ার পর কলকাতা শিল্পাঞ্চল ও মফস্বলের নানা এলাকা থেকে যে রিপোরট আসে, তাতে বলা হয়—গড়ে শতকরা ৬৫টি ভোট পড়েছে। রবিবার ভোট গণনা শুরু হয়। শেষ ১৫ মারচ। ভোট গ্রহণের সময় কলকাতা ও শহরতলিতে পুলিস, সি আর পি, হোমগারড স্পেশাল পুলিস ছাড়াও সেনাবাহিনী টহল দেয়। মফস্বলেও নানা জায়গায় সেনাবাহিনী টহল দেয়। কলকাতা, বরানগর এবং অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্ত ঘটনায় পাঁচজন নিহত ও কমপক্ষে পঁচিশ জন আহত হন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমা, যাদবপুর ও বেহালা থানা এলাকায় এদিন রাত্রি আটটা থেকে নয় ঘণ্টার জন্য কারফু জারি করা হয়। কলকাতায় ১৪৪ ধারা বলবৎ হয়। কোন জায়গায় নির্বাচন স্থগিত বা পুনর্নির্বাচনের মত অবস্থা হয়নি।

দেশী সংবাদ

৬ মারচ—রাজস্থান ও মণিপুর এই দুই রাজ্যে আজ একরকম শান্তিতেই নির্বাচনের প্রথম প্রস্থ ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। রাজস্থানের ৬৭টি এবং মণিপুরে ১৯টি কেন্দ্রের জন্য আজ ভোটগ্রহণ হয়। রাজস্থানে শতকরা ৫০ জনের বেশী ভোট দেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন দেশের সামনে গুরুতর বিপদের আশংকা রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধে জয়লাভ এবং যুদ্ধ-বিরতির জন্যে জনগণের আত্মতুষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। জাগরীতে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি ওই কথা বলেন।

৭ মারচ—পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এ পর্যন্ত ৬ হাজারের বেশী সমাজবিরোধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখনও দৈনিক বেশ কিছুসংখ্যক লোক গ্রেফতার হচ্ছে।

৮ মারচ—কলকাতা ট্রাম কোমপানির প্রত্যেক শ্রমিক কর্মচারীকে বেতনের সঙ্গে অন্তর্বর্তী-ট্রাকালীন ব্যবস্থা হিসাবে মাসে আরও ১৫ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল থেকে হিসাব করে এই অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হবে। এজন্য অন্যূন ষোল লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।

স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই বয়স এক শত পার হয়ে গিয়েছে। শোলাপুর জেলার বর্সি বিধান-সভা কেন্দ্রে এই শতায়ু দম্পতি ভোট দিতে এসেছিলেন পায়ে হেঁটে। স্বামীর নাম কৃষ্ণাপান বারগাতে, বয়স ১০৯ বৎসর। তাঁর স্ত্রীর নাম শ্রীমতী প্রয়াগবাই, বয়স ১০২।

৯ মারচ—ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে চোরাই রাইফেল বেচতে এসে আজ পারক স্ট্রীট এলাকার এক ব্যক্তি হাতে নাতে গোয়েন্দা পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। লোকটি ওই রাইফেল ফ্যাকটরিরই কর্মী এবং সি পি এম সমর্থক বলে পুলিস সূত্রে প্রকাশ। এদিন কালীঘাট এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গুলি ভরতি একটি রিভলবার সহ গোয়েন্দা পুলিস ধরে ফেলে। এই ব্যক্তিও সি পি এম-এর সমর্থক বলে পুলিস সূত্রে প্রকাশ।

আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাগনানে এক নির্বাচনী সভায় ঘোষণা করেন—"কংগ্রেস গরিবী হটাতে চায়। কংগ্রেস গরিবকে কাম দেবে। কংগ্রেসকে ভোট দিন—এই আমার অনুরোধ।" তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাজেট প্রকল্পের বরাদ্দের বাইরে ১৪৩ কোটি

টাকা মঞ্জুর করেছে।

১০ মারচ—সুপ্রিম কোরট আজ শিল্প ট্রাইব্যুনাল রোয়েদাদ সম্পর্কে এই মতামত দিয়েছেন যে, কারখানায় লাভ না হলে কর্মীরা সেই সময়ের জন্য বোনাস চাইতে পারে না। মহারাষ্ট্রের শিল্প ট্রাইব্যুনাল রোয়েদাদের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের প্ল্যানড সিনেমার কর্মীদের আবেদন সুপ্রিম কোরট অগ্রাহ্য করেন।

সিনদ্রির বিহার ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির ছাত্রদের তাণ্ডবের ফলে ওই শহরের নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত এবং সর্বত্র সন্ত্রাসের ছায়া। ওই ছাত্রদের কুকীর্তির তালিকায় আছে—মেয়েদের প্রতি অশালীন আচরণ, নিরীহ নাগরিকদের বাড়িতে হামলা, সাইকেল ছিনতাই, চলতি গাড়ির উপর পাথর ছোঁড়া, মারপিট ও অগ্নিসংযোগ।

১১ মারচ—আজ আলিপুরের কৈলাস বিদ্যা-মন্দির ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগে পুলিস বাসের আরোহী ছাব্বিশ জনকে গ্রেফতার করে। বাসও আটক করে। ধৃতদের মধ্যে বার জন মহিলা। সন্ধ্যার পর সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উৎকল কংগ্রেস সমর্থক উৎকল ছাত্র কংগ্রেস দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সদর দফতর কলকাতা থেকে ওড়িশায় স্থানান্তরের দাবিতে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি—এক বিবৃতিতে দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, এ রাজ্যে রেলের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে তারা বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছে।

১২ মারচ—আনন্দবাজার পত্রিকা স্থাপনার পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার। ১৯২২ সালের ১৩ মারচ হোলির দিন আনন্দবাজারের প্রথম প্রকাশ। তাই প্রথম সংখ্যার রঙ ছিল লাল। ৭১।১ মির্জাপুর স্ট্রীটে দোতলার তিনখানা ঘর নিয়ে ছিল আনন্দবাজারের কার্যালয়। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪ এবং দাম ছিল ২ পয়সা। ১৯২২ সালের ১ জুন থেকে সম্পাদক হিসাবে প্রফুল্লকুমার সরকারের নাম ছাপা হতে থাকে।

দিল্লি মেট্রোপলিটন পরিষদে এবার কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ। এই গরিষ্ঠতার সুবাদে কেন্দ্রশাসিত দিল্লি শাসনের ক্ষমতা জনসংঘের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল কংগ্রেস। গত পাঁচ বছর দিল্লির প্রশাসনযন্ত্র জনসংঘের হাতে ছিল।

বিদেশী সংবাদ

৬ মারচ—প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো আজ বিরোধীদের চাপে নতি স্বীকার করে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৪ আগস্ট সামরিক আইন তুলে নিতে রাজি হয়েছেন। প্রধান যে দুটি বিরোধী দলের কাছ থেকে তিনি কিছুদিন যাবৎ বাধা পাচ্ছিলেন তারা হল খান আবদুল ওয়ালি খানের জাতীয় আওয়ামী দল (ন্যাপ) ও জমিয়তে উলেমা-ই ইসলাম। এই দুই দলের সঙ্গে শ্রীভুট্টো এই সমঝোতায় এসেছেন যে অন্তর্বর্তী একটি সংবিধানের ভিত্তিতে দেশের সরকার পরিচালিত হবে এবং জাতীয় পরিষদের একটি কমিটি নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরি করবেন।

৭ মারচ—ভারত তৃতীয় দেশ সুতরাং ভারত সম্পর্কে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এবং অকাম্য। তথাপি নিকসন-চু যৌথ ইস্তাহারে কাশ্মীর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে কেন তার ব্যাখ্যা আমেরিকাকে দিতে হবে। ভারত এটাও লক্ষ করেছে যে, এই যৌথ বিবৃতিতে তৃতীয় অন্য কোন দেশের উল্লেখ নেই।

৮ মারচ—মারকিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজারস গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় এই ইঙ্গিত দেন যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলে মারকিন সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

৯ মারচ—বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় পাকিস্তান হুড়মুড় করে অনেকগুলি দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। এখন আবার সেই সব দেশের সঙ্গে ভাবসাব করার জন্য পাকিস্তান আকুলিবিকুলি করছে। ইতি-মধ্যেই কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে যে সব দেশের সঙ্গে তার মধ্যে আছে—বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া সাইপ্রাস।

১০ মারচ—পাক সরকার পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালীদের তাড়াতাড়ি ফেরত পাঠানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করছেন। করাচির ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা ডন সরকারী সূত্রকে উদ্ধৃত করে এই খবর দিয়েছে। পাক সরকার এ ব্যাপারে শীগ্‌গির একটি বিবৃতি দেবেন।

১১ মারচ—আগামীকাল ঢাকা স্টেডিয়ামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদায় কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের প্রাক্কালে ঢাকার বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিক মরনিং নিউজ-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে।

১২ মারচ—পাক প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সরকার দুর্নীতির অভিযোগে ১২০০ জনেরও বেশী পাকিস্তানী অফিসারকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেছেন বলে আজ ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে পুলিস ও পররাষ্ট্র দফতরের অফিসাররাও আছেন।

কাপড় ধোয়ার কেক
ডিটারজেন্ট শক্তিতে ভরপুর

ডেট ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার কেক

**সাবানের তুলনায় ৫০%
বেশী কাপড় অনেক
বেশী সাদা ক'রে ধোয়।**

—তা সে যে ধরণের জলই হোক।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপ দাস

আপনি যদি
জিজ্ঞেস করেন
নেলকো ক্যাপ্রির বৈশিষ্ট্য
কিসে, আপনি কি মেনে নেবেন
যদি আমরা বলি "সব কিছুতে"?
ব্যাটারী ইণ্ডিকেটর
টিউনিং ইণ্ডিকেটর
ফাইন টিউনিং কন্ট্রোল
ওয়েল-স্প্রেড ব্যাণ্ডস
নাইট ডায়াল লাইট
এই সেট বলে দেবে আপনার ব্যাটারীর অবস্থা কিরকম।
এর ফ্রিকোয়েন্সি-সেপারেশন মেক্যানীজম্ এমন কি দুর্বল স্টেশনগুলোকেও একেবারে নিখুঁতভাবে শোনাতে পারে।
এই সেটে এমন ব্যবস্থা আছে যা অবাস্তর বিকৃত শব্দ ছেঁকে ফেলে দিয়ে আশ্চর্য্য-রকম সুন্দর আওয়াজ দেয়। হ্যাঁ, নেলকো ক্যাপ্রির আওয়াজ অসাধারণ—কারণ, একে তৈরী করা হয়েছে অসাধারণভাবে।
এই অসাধারণত্ব এর স্পষ্ট জোরালো আওয়াজ!
৩৮৫ টাকা
স্থানীয় কর আলাদা
৪ব্যাণ্ডওয়ালা
নেলকো
ক্যাপ্রি
টাটার তৈরী
Creative Unit-46-Ben

আপনার কথাই আমরা ভেবেছি ...

আর উৎসাহিত হয়েছি অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকারী ও মনভোলানো
এই বস্ত্রসম্ভার তৈরী করতে

DCM টেক্সটাইল ডিজাইনিং ইউনিট ফ্যাশানের নতুন প্রেরণা এনে দিচ্ছে

আসুন..বসন্ত মেলায়
আবার বসন্ত এলো। তারই আমেজ আকাশে বাতাসে। এই তো ঘুরে ফিরে বেড়ানোর সময়, হাঁটা যখন আনন্দের। যতদূর ইচ্ছে হেঁটে বেড়ান। তবে লক্ষ্য রাখবেন পায়ে যেন আপনার ঠিক জুতো জোড়া থাকে। ঠিক তেমন জুতো যা পাকে বাঁচায়, অথচ এমনই খোলামেলা যে পায়ে হাওয়া লাগতে পারে। এমন জুতোই পাওয়া যাবে বাটার দোকানে। মৌসুমী নকশার বিরাট সমারোহ।
সানওয়ে ৩৪
সাইজ ৪-১০
২০.৯৫
জুবিলি ৭১
সাইজ ৪-১০
১০.৯৫
সানওয়ে ১৬
সাইজ ৪-১০
২০.৯৫
সানশাইন ৩৬
সাইজ ৪-১০
১০.৫০
Bata

শুভ্রাংশু গুপ্তের

রাইটার্স বিল্ডিংসের চাঞ্চল্যকর নেপথ্যকাহিনী

মহাকরণ

দাম ৪·০০

লালদীঘির সেই লালবাড়ি রাইটার্সের চাবি এবার কার হাতে? কোনও একক দলের? না, পাঁচমিশেলী ফ্রন্টের? কিংবা রাষ্ট্রপতির—ওরফে আমলাদের?—এ প্রশ্নের আজ মীমাংসা হয়ে গেছে। ১৯৬৭তে যে পালাবদলের সূচনা হয়েছিল, [illegible] পালারও অঙ্গুলে বদল হয়ে গেল আবার। মঞ্চে এসেছেন আবার সেই পুরোনো প্রাচীন দল—একক শক্তিতে, নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে। কিন্তু মঞ্চে যেই আসুন, নেপথ্যে যাঁরা ছিলেন এবং আছেন, তাঁরাই তো থাকছেন—থাকবেনও। সেই আমলা, কেরানী, কর্মচারীর দল। রাইটার্সের অভ্যন্তরে তাঁদের সেই জগৎ অব্যাহতই থাকছে—সেই আগের মতই; যেমন ছিল ব্রিটিশ-রাজের আমলে, কিংবা তারও আগে—কোম্পানির কালে, বা স্বাধীনতা-লাভের প্রথম যুগে। সেই অপরিবর্তনীয় জগৎ—যার কোনও বদল হয় না; হয়তো হবারও নয়। কিন্তু তাই বলে সেই জগৎ মৃত নয়, নয় অসাড়—বরঞ্চ নানা ঘটনা-সংঘাতে নিত্য উত্তাল, সদা আলোড়িত। সেই জগতের অলাদা একটা জীবন আছে, আছে সম্পূর্ণ আলাদা একটা কাহিনী—যেমন আছে রঙ্গমঞ্চের আড়ালে গ্রীনরুমেরও আলাদা জীবন, আলাদা কাহিনী। এ-যাবৎ কোনও লেখক সেই অজ্ঞাত জীবনের কাহিনীকে সাধারণের সামনে এনে হাজির করেননি। তরুণ সাংবাদিক শুভ্রাংশু গুপ্ত সেই কাজটিই করেছেন তাঁর এই নতুন উপন্যাস 'মহাকরণ'-এ। রাইটার্সের গ্রীনরুমে যেসব অজস্র ঘটনা রাতদিন ঘটে চলেছে, তারই চাঞ্চল্যকর উদ্ঘাটন এ বই।
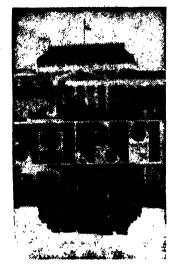
প্রকাশিত হল

রম্য-রচনা

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা ৬·০০

স্মৃতি চিত্র

গান্ধীজীর দূত ১৫·০০

পর্বতাভিযান কথা

রহস্যময় রূপকুণ্ড ৬·৫০

পর্বতারোহণ শিক্ষা

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে ৫·০০

কাশ্মীর সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত

কাশ্মীর '৬৫ ১০·০০

ইতিহাস

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ৪·০০

ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

Students Fight For Freedom 6.00

কীটপতঙ্গের কথা

আমাদের প্রতিবেশী কীটপতঙ্গ ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

বিক্রয়-কেন্দ্র: ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯ ॥

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২১
শনিবার ১১ চৈত্র ১৩৭৮
Saturday 25th March 1972

কংগ্রেসের সাফল্য

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের রায় কংগ্রেসকে শুধু জয়ী করে নি এমন এক মর্যাদা দিয়েছে যা এই রাজ্যে কংগ্রেসের পক্ষে এই প্রথম। বিধানসভার দু'শো আশিটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস লাভ করেছে দু'শো ষোলোটি। আরও সঠিক হিসেবে বলা যায়, কংগ্রেস এই রাজ্যে দু'শো পঁয়ত্রিশটি আসনে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দু'শো ষোলোটি আসন লাভ করেছে, তার পরাজয় মাত্র উনিশটি আসনে। কংগ্রেসের সঙ্গে মোরচা বেঁধে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তারা পেয়েছে পঁয়ত্রিশটি আসন। তাদের দলগত লাভ উল্লেখযোগ্য। অন্য দিকে সি পি এম তার অনুচরদের নিয়ে যে বাম-জোট গঠন করে নির্বাচনে লড়েছিল তাদের সম্মিলিত লাভ হয়েছে মাত্র কুড়িটি আসন; যার মধ্যে চৌদ্দটি আসন একা সি পি এম দলের। কংগ্রেসের এই বিস্ময়জনক সাফল্য সাধারণভাবে কংগ্রেস সমর্থকদেরও বিহ্বল করে দিয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি এ হেন অবস্থায় দিশেহারা।

সি পি এম দলের ধারণা ছিল, এই নির্বাচনে সে তার বামপন্থী জোট নিয়ে ক্ষমতা অধিকার করতে পারবে। দুঃখের বিষয়, সে সাধ মেটেনি। ক্ষমতা অধিকার করা দূরে থাক স্ফীতকায় এই দলটি এখন কোনো রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করার অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। গত তিনটি নির্বাচনে লাফ মেরে মেরে যে আসনসংখ্যা তারা বাড়িয়েছিল এবারে তার গোড়ায় কোপ পড়েছে। গতবারের একশো তেরোটির বদলে মাত্র চৌদ্দ। এই ধরনের শোচনীয় পরাজয়ে নেতাদের মুখরক্ষা করা কঠিন। স্বভাবতই তাঁরা কংগ্রেসী ফ্যাসিজমের, জাল জুয়াচুরির নানা অভিযোগ আনছেন। তাঁদের আসনসংখ্যা যখন অস্বাভাবিক হারে বেড়েছিল তখন কিন্তু এঁরা নীরব ছিলেন। এমন তো হতে পারে, আসন-সংখ্যা বাড়ানোর যে রহস্য সে সময় কাজ করেছিল, এবারে তা ব্যর্থ হয়েছে।

কংগ্রেসের মধ্যে যে জড়তা, জরা, অনুৎসাহ একদা নেমে এসেছিল—সেই পুরোনো কংগ্রেস এখন বিস্মৃতপ্রায়। নতুন কংগ্রেস পুনর্জীবন লাভ করেছে। এটা অনেকেই বোঝেন নি। শ্রীমতী গান্ধীর সংসদীয় নির্বাচনে বিরাট জয়লাভে তার সূচনা। তারপর শ্রীমতী গান্ধী একে একে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন। এবারের নির্বাচনে সারা ভারতে তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। দু একটি ছোটখাটো রাজ্য বাদ দিলে কংগ্রেস সর্বত্রই এবার বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। তার বিরোধীরা এটা কল্পনা করতে পারেন নি। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম দলও বোঝে নি, তারাই একদা সন্ত্রাস যুগের সূচনা করে আজ কংগ্রেসকে রোখবার জন্যে সন্ত্রাস সন্ত্রাস ডাক ছেড়ে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না।

কংগ্রেসের এই জয় নিশ্চয় অভি-নন্দনযোগ্য। আমরা অভিনন্দন জানাই। আরও বলি, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে তরুণের দল কংগ্রেসের নতুন ইতিহাস তৈরী করতে জীবনপণ করেছিলেন তাঁদের সে উদ্যম যেন ক্ষান্ত না হয়। রিক্ত, শ্রীহীন, হিংসায় ক্ষতবিক্ষত, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত পশ্চিম-বঙ্গকে আবার গড়ে তুলতে হবে। গঠনের কাজে দায়িত্ব অনেক এবং তা সময়সাপেক্ষ। প্রশাসন যন্ত্রই সব কিছু গড়ে তুলতে পারে না। উদ্যম, সততা, আদর্শ ও শ্রম চাই। পশ্চিমবঙ্গের যুব-সমাজ যেন সেদিক থেকে সরকারকে সাহায্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রিসভার শপথ নেবার মুহূর্তে এই কথাটি আমরা সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই। মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর মন্ত্রি-সভা ও দলীয় সহকর্মীদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে আবার সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুলুন এই কামনা করি।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
১ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
শুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টা ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক — টা ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টা ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৪৬.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৩.০২
ত্রৈমাসিক — টা ১১.৭৬

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক — টা ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টা ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৮.০২
ত্রৈমাসিক — টা [illegible]

[illegible]
বার্ষিক — টা ১৫৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৩৮.৭৬

সি পি এম

'ইন্দ্রা অটো-ভোটার'

শোনা যাচ্ছে যে, সি পি এম দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে হিন্দুস্থান অটোমেটিক মেশিনারি করপোরেশনের নামে চুক্তিভঙ্গের মামলা দায়ের করা হবে। ইনডিয়ান কনট্রাকট অ্যাকটের সেনটিনারি বছরে এইটেই হবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মামলা। সি পি এম-এর অভিযোগ, এবার উক্ত হিন্দুস্থান অটোমেটিক মেশিনারি করপোরেশন পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসকে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে যে 'ইন্দ্রা অটো-ভোটার' যন্ত্র সরবরাহ করেছেন, সেটি স্বয়ংক্রিয় ভোট খেঁচা যন্ত্রটি ১৯৬৭ সালে সি পি এমকে সরবরাহ করা 'রেড স্টার অটোমেটিক ভোটার পুলার' যন্ত্রেরই অবিকল নকল।

"আমাদের কাছে এই ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ আছে।" এক সাংবাদিক বৈঠকে সি পি এম পক্ষের সিনিয়র কৌঁসুলী শ্রীস্নেহাংশু আচার্য নাটকীয়ভাবে এই কথা ঘোষণা করেন। শ্রীআচার্য বলেন, "পাবলিক সেকটরের শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই রকম জোচ্চুরির আশা করা যায় না। ইটস্ শেমফুল, ইটস্ এ ডিসগ্রেস। হাতে হাতকড়ি পরব। চোদ্দ বছর ঘানি টানিয়ে ছাড়ব। ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য কোম্পানি লাটে তুলে দেব। ভেবেছে কী!"

তারপর শ্রীআচার্য তাঁর জুনিয়ারকে বললেন, "ওহে জ্যোতি, তুমি ইনডিয়ান কনট্রাকট অ্যাকট, ১৮৭২-এর রিলেভেন্ট চ্যাপটারটা ওঁদের পড়ে শুনিয়ে দাও তো। বাই দি বাই, লেট মি, জেনটেলমেন অব দি প্রেস, ইনট্রোডিউস টু ইউ, মাই/আওয়ার জুনিয়র কাউনসেল শ্রীজ্যোতি বাসু, বার অ্যাট ল। প্রকৃতপক্ষে আমার মক্কেল সি পি এম-এর এই মামলাটা আমি আমার এই নবাগত সহকর্মীর উপরই সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি। ডু ইউ নো, হোয়াই? বিকজ আমি নতুন রক্তে বিশ্বাসী। ও-ও দি ইয়ং ওয়ানস, দি গ্রিনস, লাইক টাগোর সেড, ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, ও ইয়েস। নাউ জ্যোতি, প্লিজ গো অ্যাহেড।"

শ্রীবাসু যদিও নতুন গাউন পরে বারে এসেছেন কিন্তু তাঁর চলন বলন দেখে মনে হয় তিনি বুঝি তাঁর সিনিয়রের মতই ঝুনো। আইনের বইটা টেনে নিয়ে পাকা ব্যারিস্টারি ঢঙেই পড়ে চললেন :

"Indian Contract Act, 1872, Chapter VI, **Section 73, compensation for loss or damage caused by breach of contract.** When a contract has been **broken**, the party who suffers by such breach is entitled to receive, from the party who has broken the contract, compensation for any loss or damage caused to him thereby, which mutually arose in the usual course of things from such breach, or which the parties

know when they made the contract, to be likely to result from the breach of it."

আইনের ধারাটা সাংবাদিকদের শুনিয়ে দিয়ে শ্রীবাসু বললেন, "১৯৬৭ সালে আমাদের মক্কেল সি পি এম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা তদানীন্তন নির্বাচনে জয়লাভের জন্য স্বয়ংক্রিয় এমন এক মেশিনারি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন যা ব্যবহার করলে আমাদের মক্কেলের পক্ষভুক্ত প্রার্থীরা অনায়াসে এবং বিপুল সংখ্যায় জয়লাভ করতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের মক্কেল সি পি এম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা 'রেড স্টার অটোমেটিক ভোটার পুলার' যন্ত্রের একটি নকশা প্রস্তুত করান। এবং অবিকল ঐ নকশা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈয়ার করে দিতে উক্ত হিন্দুস্থান অটোমেটিক মেশিনারি করপোরেশন আমাদের মক্কেল সি পি এম-এর রাজ্য কমিটির সঙ্গে এক লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ঐ চুক্তিনামায় আমাদের মক্কেল সি পি এম-এর রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সই করেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এবং উক্ত হিন্দুস্থান অটোমেটিক মেশিনারি করপোরেশনের পক্ষ থেকে ডেপুটি চেয়ারম্যান (সেলস আনড প্রোমোশন) শ্রীগোবর্ধন গিরি। চুক্তিনামায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা এই ছিল যে, আমাদের মক্কেল সি পি এম তাঁর বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বয়ংক্রিয় ঐ যন্ত্রটির যে নকশাটি প্রস্তুত করিয়েছেন সেটাকে গোপনীয় দলিল বলে মানতে হবে এবং ঐ নকশার কথা কোনোমতেই ফাঁস করা চলবে না বা ঐ নকশা অনুযায়ী আর কাউকে অবিকল ঐ যন্ত্র তৈরি করে দেওয়া বিশ্বাসভঙ্গ ও চুক্তিভঙ্গ বলে আমাদের মক্কেল মনে করবেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উক্ত হিন্দুস্থান অটোমেটিক মেশিনারি করপোরেশন ১৯৭২ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের মক্কেল সি পি এম-এর রাজ্য কমিটির প্রবল প্রতিপক্ষ নব কংগ্রেসকে 'ইন্দ্রা অটো-ভোটার' মেশিন তৈরি করে দিয়েছেন এবং আমাদের মক্কেল দৃঢ়ভাবে মনে করেন 'ইন্দ্রা অটো-ভোটার' ব্যবহার করায় আমাদের মক্কেলের প্রতিপক্ষ নব কংগ্রেস আমাদের মক্কেল সি পি এম-এর রাজ্য কমিটি এবং তাঁর নির্বাচনী পারটনারদের হেভি ড্যামেজ করেছেন এবং হেভি লসের কারণ হয়েছেন। সেই কারণেই চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসভঙ্গ এই দুই দফা মামলা আমাদের মক্কেল সি পি এম-এর রাজ্য কমিটি উক্ত হিন্দুস্থান অটোমেটিক মেশিনারি করপোরেশনের বিরুদ্ধে দায়ের করতে চান।"

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নবাগত তরুণ ব্যারিস্টার শ্রীবাসু জানান, এই চুক্তিভঙ্গের ফলে এবারের নির্বাচনে ১৬২টা আসন তাঁর মক্কেলের হাতছাড়া হয়েছে। এটা তাঁর মক্কেলের নিদারুণ লস। আর ড্যামেজ? ওহ মারকস! শ্রীবাসু বলেন, "এই রাজ্যের পরিষদীয় রাজনীতি থেকে আমাদের মক্কেলের নাম মুছে যেতে বসেছে।" শ্রীবাসু চুক্তিপত্রের ফটোস্টাট কপিও সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেন।

হিন্দুস্থান অটোমেটিক মেশিনারি করপোরেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান (সেলস আনড প্রোমোশন) শ্রীগোবর্ধন গিরি এই অভিযোগ "সর্বৈব মিথ্যা", তাঁদের সম্মানের পক্ষে "হানিকর" এবং "বিদ্বেষ প্রসূত" বলে মনে করেন। তিনি বলেন, "আমরা ১৯৬৭ সালে সি পি এমকে যে যন্ত্র তাঁদের নকশা অনুসারে তৈরি করে দিয়েছিলাম তা ছিল চার সিলিনডারযুক্ত হোরাইজেনটাল ম্যাগনেটো মেশিন। ঐ যন্ত্র পোলিং স্টেশনে রেখে দিলে ঐ যন্ত্র তাঁদের ক্লায়েন্ট সি পি এম-এর অনুকূলে অধিকাংশ ভোট অটোমেটিক্যালি খেঁচে নিত। কিন্তু 'ইন্দ্রা অটো-ভোটার' সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একেবারে আধুনিক যুগের যন্ত্র। এটা হচ্ছে ভারটিক্যাল সুপার সেনসিটিভ ট্রানজিসটার চালিত অটো ভলভো মেশিন। 'ইন্দ্রা অটো-ভোটার' নিজ প্রার্থীর অনুকূলে ভোট সংগ্রহের ব্যাপারে বিপ্লব ঘটিয়ে ছেড়েছে। এই যন্ত্র যে-সব বুথে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে ভোটদাতাদের ভোট কেন্দ্রে কষ্ট করে অসার পরিশ্রম বেঁচে গিয়েছে। এই যন্ত্রের এইটাই বৈশিষ্ট্য। কলকাতার শহরতলী, চব্বিশ পরগণার শিল্পাঞ্চলের কয়েকটা নির্দিষ্ট নির্বাচনী কেন্দ্র যথা বরাহনগর, দমদম ইত্যাদি এবং কালনা, নলহাটি প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের নির্বাচনী কেন্দ্রে 'রেড স্টার অটোমেটিক ভোটার পুলার' এবং 'ইন্দ্রা অটো-ভোটার' যন্ত্র দুটোকে পাশাপাশি কাজ করতে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করেছেন দুটো যন্ত্রের টাইপ সম্পূর্ণ আলাদা। এবং দক্ষতায় 'ইন্দ্রা অটো-ভোটারের' কাছে 'রেড স্টার' দাঁড়াতেই পারে না।

নির্বাচনের পরে

১৯৭১ সনে যেমন হয়েছিল, ১৯৭২-এও তেমনি হল—আশাতীত নির্বাচনী ফলাফল। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস যে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করবে সে সম্পর্কে কারু কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস রাজ্যে রাজ্যে এত বড় সাফল্য অর্জন করবে এটা খুব কম লোকই আশা করেছিলেন। এমন কি, বহু কংগ্রেসী নেতাও এতটা সাফল্য অনুমান করতে পারেন নি।

কংগ্রেস নেতৃত্ব এবার অধিকাংশ রাজ্য সম্পর্কেই একরকম নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, মহীশূরে, হরিয়ানায় এবং বিহারে জিতবেনই। কিন্তু ওই সব রাজ্যের ফলাফল কংগ্রেসের পক্ষে অতটা ভাল হবে তা তাঁরাও ভাবতে পারেন নি। গুজরাটে এবং মহীশূরে আদি কংগ্রেসের এত শোচনীয় অবস্থা হবে দলের ঘোরতর শত্রুও তা কল্পনা করতে পারেন নি।

ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে তো নানা মহলে রীতিমত আশংকাই ছিল। শোনা যায়, ত্রিপুরা সম্পর্কে রাজ্যের লেঃ গভর্নরেরই বেশ আশঙ্কা ছিল। তিনি নাকি সেকথা ভারত সরকারকেও জানিয়ে-

ছিলেন। মধ্যপ্রদেশে ভয় ছিল জনসংঘকে। আর পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমকে। দিল্লিতে অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়ত শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে একটা সি পি আই-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাই গঠন করতে হবে। সেই পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ এবং ত্রিপুরায় কংগ্রেসের ফলাফল আশাতীত।

পশ্চিমবঙ্গের কোনও কংগ্রেস নেতাকে একবারও বলতে শুনি নি যে, তাঁরা ২০০-রও বেশি আসন পেতে পারেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু বিশেষ সতর্ক তাঁরা বলেছেন, ১৫০-এর কাছাকাছি পাবই। যাঁরা আবার একটু বেশি আশাবাদী তাঁরা বলেছেন, ১৭০-এর মত হতেও পারে। নির্বাচন যেদিন হয়ে গেল সেদিনও আমরা কয়েকজন রিপোর্টার এ নিয়ে সিদ্ধার্থ-বাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সিদ্ধার্থ-বাবু বলেছিলেন, আপনারা এখনই লিখবেন না, তবে আমরা ১৭০-এর বেশি পাবই। বহু কংগ্রেস নেতাই সিদ্ধার্থবাবুকে একটু বেশি আশাবাদী বলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এইরকম একটা ফলাফল হতে পারে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ বোধহয় তা আঁচও করতে পারেন নি। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী নির্বাচনী অভিযানের অন্যতম সেনাপতি ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নাকি জানতে চেয়েছিলেন: কীরকম ফলাফল হতে পারে? শুনেছি, দেবীবাবু বলেছিলেন: ১৫০—৩৫ কংগ্রেস একা পেয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী নাকি দেবী-বাবুর অনুমান শুনে প্রথমে একটু চুপ করে গিয়েছিলেন। এবং, তারপরই বলে-ছিলেন: কেন, একটা বিপদে ভয়ও তো হতে পারে!

বলা বাহুল্য, এ রাজ্যের কোনও রাজ-নৈতিক নেতা বা ভাষ্যকার বা পর্যবেক্ষক এই ফলাফল অনুমান করতে পারেন নি। অনুমান করতে পারেন নি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কোনও দফতরও। তাঁরা প্রায় সবাই বলেছিলেন, কংগ্রেস এবং সি পি আই মিলে ১৫০-এর মত পাবে।

এমনিভাবে ত্রিপুরার ব্যাপারেও সকলেরই অনুমান ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু কংগ্রেস নেতাকে এমনও বলতে শুনেছি: পশ্চিম-বঙ্গে আমরাই জিতে যাব, কিন্তু ত্রিপুরায় বোধহয় পারব না।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখা গেল, পশ্চিম-বঙ্গ এবং ত্রিপুরায় কংগ্রেস ভালভাবেই জিতেছে।

*

কংগ্রেস আবার প্রায় সেই পুরনো অবস্থায় ফিরে এসেছে। অর্থাৎ, আবার প্রায় সব রাজ্যে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত। ব্যতিক্রম দুটি কয়েক রাজ্য। মাদ্রাজ, ওড়িশা এবং মেঘালয়। কেরলে চলছে কংগ্রেস-সি পি আই-লীগ কোয়ালিশন। আরও কয়েকটি ছোট দল সঙ্গে রয়েছেন।

মেঘালয়ে ক্যাপটেন সাংগমার দলকেও ঠিক কংগ্রেস-বিরোধী বলা চলে না। মাদ্রাজের ডি এম কের সঙ্গে এতদিন কংগ্রেসের সম্পর্ক বেশ ভালই ছিল। ১৯৭১ সনের নির্বাচনের সময় কংগ্রেস-ডি এম কে চুক্তি হয়েছিল। এবং সেই চুক্তি বলেই কংগ্রেস মাদ্রাজ বিধানসভার নির্বাচনে কোনও প্রার্থী দেয় নি। সব আসন ডি এম কে-কে ছেড়ে দিয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ুর কংগ্রেসীরা এখন আর ওই অবস্থাটাকে ঠিক মেনে নিতে রাজি নন। যখন তাঁরা ডি এম কের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তখন ভয় ছিল লোকসভায় শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থকরা নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবেন কিনা। '৭১-এর নির্বাচনের পর সেই ভয় কেটে যায়। বরং, কংগ্রেসীদের সাহস অনেকটা বেড়ে গেল। এবারের নির্বাচনের মুখে পণ্ডিচেরী নিয়ে ডি এম কে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বে বেশ কিছুটা ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। দু' দলের সম্পর্ক এখন তেমন ভাল নয়।

তবে, কংগ্রেসের মুশকিল হয়েছে মাদ্রাজে দল গড়ার মত লোক আপাতত দলের নেই। সংরক্ষণমূলক নিয়ে যে দল গড়া যাবে না সেটা প্রধানমন্ত্রী বুঝে গিয়েছেন। মোহনকুমারমঙ্গলমকে দিয়ে এখন অবশ্য একটা চেষ্টা চলছে।

এবারের নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাব যেমন মাদ্রাজে পড়বে, তেমনি পড়বে ওড়িশায়। ওড়িশায় শ্রীবিজু পট্টনায়কের দলকেও নতুন করে ভাবতে হবে। এই বিরাট "ইন্দিরা-হাওয়ার" প্রভাব নিশ্চয়ই ওড়িশাতেও গিয়ে পড়বে।

শ্রীবিজু পট্টনায়ক একদা রাজনৈতিক-ভাবে শ্রীমতী গান্ধীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তখন নেহরুও বেঁচে। কিন্তু নেহরুর মৃত্যুর পর অবস্থাটা একেবারে পাল্টে যায়। শ্রীপট্টনায়কদের আরও মুশকিল হয়েছে শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথীকে নিয়ে। যাঁরা দেশে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি; কিন্তু ওড়িশায় শ্রীমতী সৎপথীকে নেত্রী বলে স্বীকার করতে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি।

দু-একটা রাজ্য বাদে কংগ্রেস আবার সব রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর অনেকেই ভাবা বা আশঙ্কা করেছিলেন, কংগ্রেস এবার গেল। কেন্দ্রে বা রাজ্যে কংগ্রেসের পক্ষে একা আর বেশি দিন ক্ষমতা রাখা সম্ভব হবে না।

১৯৭১-এর লোকসভার নির্বাচনের পর সে আশঙ্কা অনেকটা কেটে গিয়েছিল। এবারের নির্বাচনের পর আরও কেটে গেল। এক এক রাজ্যে এক এক দলের সরকার হওয়ার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল আপাতত তা দূর হল। এবার আগামী প্রায় পাঁচ বছরের জন্য এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

*

এই সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে "বিরোধী" দলগুলির বিপর্যয়। জনসংঘ তার শক্ত ঘাঁটি মধ্যপ্রদেশ এবং দিল্লিতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। আদি কংগ্রেস গুজরাট এবং মহীশূরে বিধ্বস্ত। সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে অভাবনীয়ভাবে পরাজিত। বিভিন্ন রাজ্যে সোস্যালিস্ট পার্টি এবং স্বতন্ত্র পার্টিরও অবস্থা এবার খুবে কাহিল।

প্রশ্ন হল, এই অবস্থায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি কতটা চলতে পারবে। এক দলের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র চলতে পারে না। বিকল্প একটা সামনে না থাকলে মানুষই বা এক দলকে বাদ দিয়ে আর এক দলের হাতে শাসন ক্ষমতা দেবে কি করে? কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই এটা আশা করা যায় না যে চিরকাল একদলের হাতেই ক্ষমতা থাকবে।

অথচ ভারতে কোনও বিকল্প দল দাঁড়াতে পারছে না। সর্বভারতীয় পর্যায়ে তো পারছেই না, রাজ্য ভিত্তিতেও পারছে না।

আবার বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দল প্রধান হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোও শিথিল হয়ে পড়তে বাধ্য। ভারতের পক্ষে সেটাও বিপজ্জনক। অথচ সর্বভারতীয় কোনও বিরোধী দল যতক্ষণ না দাঁড়াতে পারবে ততক্ষণ রাজ্যে রাজ্যে নানা দলের প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে। এবং, রাজ্যভিত্তিক রাজনীতির প্রভাবে ও ভোটে জেতার দায়ে ওই সব রাজ্যভিত্তিক দলের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে সেটা ক্ষতিকর।

১৯-৩-৭২।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

ছেলেমি

পশ্চিম ইউরোপে কম্যুনিস্টদের একটা বড় ঘাঁটি হচ্ছে ফ্রান্স। সেখানকার কম্যুনিস্ট দলের নমডাক যত, জোর কিন্তু তত নয়। নির্বাচনে অন্তত তাদের শক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। শেষ নির্বাচন হয়েছে ফ্রান্সে চার বছর আগে ১৯৬৮ সনের জুনে। জেনারেল দ্য গলের আমলের সে নির্বাচনে তাঁর ভক্তদের জিততে কোনও অসুবিধে হয়নি। কম্যুনিস্টরা জাতীয় পরিষদের ৪৭০টার সব কটা আসনে লড়ে জিতেছিল মাত্র ৩৪টাতে। তাতে কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর তাদের ভক্তি চটে যায়নি, নির্বাচন বয়কটের কোনও মতলব তাদের নেই। রোমাণ্টিক উগ্র বিপ্লবীপনা তাদের পছন্দ নয়। তাই ১৯৬৮ সনে প্যারিসে রাস্তায় রাস্তায় অবরোধ তৈরি করে ছাত্ররা যে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব বাধাতে চেয়েছিল তাতে তারা যোগ তো দেয়ইনি, বরঞ্চ নকল বিপ্লব বলে ঠাট্টাই করেছিল। সে বিদ্রোহের আগুন অত সহজে যে দ্য গল সরকার নিবতে পেরেছিলেন তার কারণ সরকারী কঠোরতা ছাড়াও খেটে-খাওয়া মানুষদের তা এড়িয়ে চলা। তার মূলে ছিল কম্যুনিস্ট দলের বিরূপ মনোভাব। ফরাসী শ্রমিকদের ওপর কম্যুনিস্ট-দের প্রভাব আজও অটুট আছে।

কোনও দেশেই আজ পর্যন্ত বামপন্থীরা এককাট্টা নয়—সব দেশেই তাদের অনেক শরিক। ফ্রান্সেও তাই। অন্তত নির্বাচনের সময় তাদের এক করে বামপন্থী মোর্চা গড়ে তোলার চেষ্টা গেল নির্বাচনের সময়ও হয়েছিল। তা কিন্তু সফল হয়নি। আবার নির্বাচন হবে ফ্রান্সে আসছে বছর। তার জন্যে তোড়জোড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। চেষ্টা চলছে আবার বামপন্থীদের মধ্যে নির্বাচনী একতা না হোক সমঝোতার জন্যে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে সমাজতন্ত্রী দল তাদের জাতীয় অধিবেশনে দলকে ঢেলে সাজিয়েছে। তারা চায় কম্যুনিস্ট, র‍্যাডিকাল আর খুচরো বামপন্থী সমাজবাদীরা এক হয়ে দ্য গল-পন্থীদের মহড়া নেবে আসছে বছরের নির্বাচনে। কিন্তু বারো রাজপুতের যেমন তেরো হাঁড়ি, ফ্রান্সের বামপন্থীদেরও তাই। আলাদা আলাদা হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে একটা হাঁড়ি করতে তারা নারাজ। সমাজ-তন্ত্রীদের সঙ্গে হাত মেলাতে কম্যুনিস্টরা রাজী হলে কী হয়, র‍্যাডিকালদের কম্যুনিস্ট-দের সঙ্গে জোট বাঁধতে ভীষণ আপত্তি। খুচরো বামপন্থী সমাজবাদীদের দল জোট হলে কী হয় তাদের মতামত চরমপন্থী-ঘেঁষা। তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা র‍্যাডিকালদের পক্ষে অসম্ভব, সমাজতন্ত্রীদের পক্ষেও খুবই শক্ত।

মাওপন্থীরাও আজকাল ফ্রান্সে মাথা চাড়া দিচ্ছে। দলে তারা ভারী নয়, কিন্তু তাদের রোখও যেমন সাহসও তেমন। তারা একেবারে বেপরোয়া। দরকার হলে মানুষ গুম, দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনখারাপি কিছুতেই তারা পেছপাও নয়। ১৯৬৮ সনে বিপ্লবের ধ্বজা ওড়াতে তারাই চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। পড়ুয়াদের ছেড়ে তারা মজুরদের নিয়ে এখন পড়েছে, তাদের দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিপ্লবী মন্ত্রে। তবে এখনও পর্যন্ত পেরে ওঠেনি। তাদেরও আবার সংগঠন একটা নয়, অনেক। ওরই মধ্যে একটির নাম হচ্ছে নবীন গণপ্রতিরোধ। এদের কাগজ গণস্বার্থের সম্পাদক হচ্ছেন বিখ্যাত লেখক জাঁ পল সার্তর। ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় মোটরগাড়ির কারখানা রেনোতে ওরা কিছু শ্রমিককে দলে টানতে পেরেছে। বুলোন-বিল্লাকুরে রেনোর যে কারখানা সেখানে তাদের একটা আড্ডা গড়ে উঠেছে। তা বলে সেখানে তারা এমন জোর-দার হয়ে উঠতে পারেনি যে কম্যুনিস্টদের হটিয়ে দিতে পারে। সেখানকার ইউনিয়নের কর্তৃত্ব এখনও কম্যুনিস্টদেরই হাতে। একাশো জনের মধ্যে কম করে সত্তরজন তাদেরই দিকে, ইউনিয়ন তারাই চালায়।

নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যে মাওপন্থীরা শুরু করলো সন্ত্রাস। ভেবেছিল ওভাবে শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে দলে টানতে পারবে। কাজে কিন্তু তা হলো না। মাঝ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি কারখানার দরজার সামনে একটা হাঙ্গামার সময় গুলিতে মারা গেল একজন ছোকরা শ্রমিক—রেনে পিয়ের ওভেরনে। সে বেচারা বিক্রী করছিল মাও-পন্থী কাগজ গণস্বার্থ। গুলি করেছিল রেনোরই সাদা পোশাকপরা একজন রক্ষী জাঁ আঁতোয়ান ত্রামোনি মাওপন্থীদের দরজার পাহারাদারদের ওপর হামলা রুখতে। ব্যাপারটা নিয়ে প্যারিসে তো বটেই, হইচই শুরু হলো সারা ফ্রান্সে। দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী সব খবরের কাগজেই ঘটনাটার তীব্র নিন্দে করা হলো। সরকারের টনক নড়লো। যে পাস্তলটি গুলি করেছিল তা রক্ষীর হাতে গেল কেমন করে তদন্ত শুরু হলো। সে বেচারা যে পিস্তলটি দিয়ে গুলি করেছিল সেটি কোম্পানির দেওয়া নয় তার নিজের সম্পত্তি। তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিল মাওপন্থীরা সে খুনের বদলা চেয়ে। তাদের সঙ্গে যোগ দিলে আরও কিছু উগ্রপন্থী দল।

কম্যুনিস্টরা কিন্তু এর মধ্যে গেল না। ওভেরনে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভে ফেটে পড়া দূরে থাকুক শ্রমিকরা কারখানার কাজও বন্ধ করেনি—এইটেই তাদের ওপর কম্যুনিস্টদের প্রভাব। কিন্তু দেখা গেল, উগ্রপন্থীদের সমর্থকও কিছু কম নয়। ওভেরনের শবদেহ নিয়ে বিরাট একটা শব-যাত্রা বের করলে সব উগ্রপন্থী মিলে ৫ মার্চ প্যারিসে। মৃতদেহ নিয়ে গেল তারা পেয়র লাশেজ কবরখানায়। ওই এলাকাতেই ১৮৭১ সালে প্যারিস কম্যুনের উদ্ভব হয়েছিল। লাখ খানেক লোক যোগ দিয়েছিল সে শব-যাত্রায় আন্তর্জাতিক সঙ্গীত আর অন্যান্য বিপ্লবী গান গাইতে গাইতে। এদের বেশির ভাগের বয়স অল্প হলেও মাঝবয়সীরাও বাদ যায়নি। কম্যুনিস্ট দলের নেতা জর্জ মার্শের বিরুদ্ধে বিস্তর কটু কথা উচ্চারণ করেছিল তারস্বরে জনতা। তাদের মনের ভাব ছিল, বিপ্লবের দিন এসে গেছে। তাতে অবশ্য কী কম্যুনিস্টরা, কী গলিস্টরা কেউই ঘাবড়ায়নি। এক পক্ষ কাটতে না কাটতেই ধরা পড়লো তাদের হাতে যা ছিল তা বিরাট বোমা নয়, নেহাত ভাবালুতার ভরা ফাঁকা বেলুন।

সে বেলুন চুপসে গেল মাওপন্থীদের বাড়াবাড়িতে। তারা গুম করলে রেনো কারখানার শ্রমিক বিভাগের একজন কর্তা রোবের নোগ্রেটকে। কারখানায় যে সব শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়েছিল মাওবাদ প্রচারের অপরাধে সে সব হুকুম তিনিই দিয়েছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার টুপামা-রোসদের কায়দায় তারা মুক্তিপণ হিসেবে চাইলে বরখাস্ত শ্রমিকদের চাকরিতে আবার বহাল করা হোক। ভয় দেখালে নইলে নোগ্রেট প্রাণে বাঁচবেন না। কিন্তু ফল হলো উলটো। কম্যুনিস্টরা এ অপকর্মের এমন নিন্দে করলে যে বামপন্থী মোর্চা গড়তে না গড়তে ভেঙে গেল। যে সব উগ্রপন্থীরা মাওপন্থীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তারা সরে গেল। এমন ধাষ্টামি সইবেন সে পাত্র তো আর ফরাসী সরকার নন। তাঁদের রুদ্রমূর্তি দেখে মাওপন্থীরা প্রমাদ গণলে। নোগ্রেটকে তারা বিনাশর্তে ছেড়ে দিলে দু-দিন যেতে না যেতেই। মাওবাদীদের বিপ্লব আনার চেষ্টা শেষ হলো নাটকপনায়। কম্যুনিস্টদের জোর বাড়ুক আর না বাড়ুক, দ্য গল-পন্থীদের সুবিধে হলো নির্বাচনের আগে বামপন্থীদের কোণঠাসা করার।

নির্বাচন : পত্রশেষে পুনশ্চ

রঞ্জন

এ বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বৃন্দাবনে এখন তো মানু বিনা গীত নাই। মানু অর্থাৎ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এখন তো আর রাজা নেই; এমনকি রাজন্যদেরও সীমিত ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি বিশেষ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই বিদায় নিয়েছে। মন্ত্রীরাই আজকের ভারতীয় গণতন্ত্রে রাজা, বেনামীতে। ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিও। রাজা হওয়া সুবিধে ছিল। ঠিক ঠিকানায় এবং সঠিক ক্রমানুসারে জন্মগ্রহণ করলেই সারা জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত। মন্ত্রিত্বের রাস্তা : সে যে পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। রাহা খরচ চাই, কিন্তু পথের শেষে পুরস্কার আছে। অবশ্যই সব সময় নগদে নয়। কিন্তু সে অন্য আলোচনা। দেশবন্ধুর দৌহিত্র সিদ্ধার্থ রায় আজ এমন ক্ষমতার অধিকারী যার কাছাকাছি চিত্তরঞ্জন কখনো আসতে পারেননি। ইংরেজবিতাড়নের পর থেকে চাকরিতে বা রাজনীতিতে পদোন্নতির পথ যে সুগম হবে সে তো জানাই ছিল। কিন্তু পথচারীদের আকৃতিও যেন কোথায় খাটো হয়ে গেছে।

এবংবিধ অপ্রাসঙ্গিকতা সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ রায়ের প্রতি আমার স্বাগতজ্ঞাপন আদৌ অনান্তরিক নয়। বামপন্থী সরকারগুলির বিশাল বিফলতা এই রাজ্যে এমন অরাজকতা এনে দিয়েছিল বলে শুনেছি—আমি তখন এখানে ছিলাম না—যে জনগণ শুধু স্বস্তি চাইছিল। স্বস্তির দাবি ন্যায্য দাবি এবং সামান্য দাবি নয়। বিশেষ করে বিপ্লবের দাবি যখন প্রধানত বাক্‌সর্বস্ব ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থাবিরহিত। প্রধানত নেতিধর্মী হলেও এমন স্বস্তি পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তন করলে সিদ্ধার্থ রায় নিঃসন্দেহে অনেকের আশীর্বাদ অর্জন করবেন। স্মরণ রাখতে হবে, স্বস্তি আর স্থায়িত্বই ছিল ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান প্রতিশ্রুতি। বামপন্থীরা এ দুটোর কোনোটাই দিতে পারেননি। তাঁদের ব্যর্থতার অসাফল্য অনেক। অভিসন্ধিও ছিল না সর্বদা সাধু। কনগ্রেসের রাহুগ্রাসের পরের পাঁচ বছরে বামপন্থীদের আচরণ লক্ষ করে বারংবার মনে হয়েছে যে এরা আত্মহননে দৃঢ়সংকল্প। স্বীকার করতেই হবে, চেষ্টাটা সফল হয়েছে আশাতীতভাবে। নিহত বামপন্থীদের কঙ্কালস্তূপের উপর সদম্ভে দণ্ডায়মান সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। কেন নয়?

*

স্বস্তি নিয়ে একটা মুশকিল আছে। স্বস্তি—অর্থাৎ অচিরেই দুশ্চিন্তামুক্ত বা দুর্বিপাকগ্রস্ত হবার আশঙ্কা অবর্তমান—সুযোগ দেয় নিকট বিপদ থেকে মনটাকে সরিয়ে নিতে। মন যায় তখন অতীত নৈরাশ্যের বিশ্লেষণে আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অনুমান-সন্ধানে। দুটির কোনো পরীক্ষাতেই কনগ্রেস অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হবে কিনা সন্দেহ করি। বিশ বছরের কনগ্রেসী কুশাসনের দুর্নীতির পূতিগন্ধময় পুঞ্জীভূত আবর্জনার প্রকাশ্য শতাংশেরও দুর্গন্ধ এমন অসহ্য না হলে প্রায়শ মহৎ প্রতিষ্ঠানটি এমন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হতো না। ইন্দিরা গান্ধী আর তাঁর অনুগামীরা (যথা সিদ্ধার্থ রায়) নব কনগ্রেস সৃষ্টি করেছেন, নির্বাচন জিতেছেন অবিশ্বাস্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে, কিন্তু পূর্ব পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় এখনো বাকি। কণামাত্র দুর্নীতি না থাকলেও এই দুর্ভাগা দেশে দারিদ্র্য থাকবেই। আমাদের জনচরিত্রসহ আমাদের জনসংখ্যা কাল আমেরিকা গেলে নিকসনকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরুতে হবে। দারিদ্র্যাপসরণ তাই আপাতত সাধ্যাতীত, গরিবি হটবে না শুধু বক্তৃতার মুষলধারায়, কিন্তু দারিদ্র্যের অভিশাপ যদি বর্তে শুধু ব্যক্তি আর পরিবারে দুর্নীতি দূষিত করে সমগ্র সমাজ। এই বৃহত্তর ব্যাধি আজো ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপ অস্পৃষ্ট। অরাজকতার জন্ম কি শুধু পাড়ার পাইপ-গান কারখানায়? না অন্য রন্ধনশালায়ও? সি আর পি তার খবর রাখে না।

সিদ্ধার্থ রায়কে সাধুবাদ জানাবে না কে? তিনি সুস্থ গণতন্ত্র চান। অতি স্বল্পসংখ্যক উগ্রপন্থী ছাড়া শান্ত স্বাধীন রাজনীতি চায় না কে? বিশেষ করে আমাদের মতো ভেতো বাঙালীদের মধ্যে? সাম্প্রতিক নির্বাচনে কনগ্রেসের বিপুল জয়টাকেই তবু এই নীতির অন্তিম প্রমাণ বলে মেনে নিতে বাধে। বামপন্থীদের বালতাবিক অভিযোগ যে ছটা বা আঠারোটি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সৎগত বা স্বাধীন হয়নি তো স্পষ্টতই হাস্যকর। আঠারো কেন, ছত্রিশটি আসন কনগ্রেস অনায়াসে কম্যুনিস্টদের খয়রাত দিতে পারে। বামপন্থীদের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। ওদের কর্মসূচী ছিল অনির্দিষ্ট, অতীত বিফলতা অব্যাখ্যাত, বর্তমান সংগঠন দুর্বল। এই নিধিরাম সর্দারের না ছিল ঢাল, না তরোয়াল।

*

কনগ্রেসের বিপুল, প্রায় অবিশ্বাস্য, জয়ে ঢাল আর তরোয়ালের ভূমিকা ঠিক কী ছিল তা বোধ হয় কখনোই জানা যাবে না। সন্দেহ করি, একেবারে ছোট কম নয়।

ইন্দিরা গান্ধী নিঃসন্দেহে দেখিয়েছেন যে সাংগঠনিক ব্যাপারে তাঁর কোনো পাঠ নেবার প্রয়োজন নেই অভিজ্ঞতাসর্বস্ব কল্পনারিক্ত পুরানো সেকুলুদের কাছ থেকে। রাজনীতিতে সংগঠনের স্থান আদৌ সামান্য নয়। (অন্যান্য নীতি অবশ্যই অন্য প্রশ্ন।) কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি প্রমাণ করলেন যে কীটদুষ্ট বৃহৎ বৃক্ষের আশ্রয়ের চেয়ে অনেক নিরাপদ স্বনির্মিত স্বীয় বাসস্থান। উদ্বাস্তু তো আজ মোরারজি, পাতিল আর নিজলিঙ্গাপ্পা। আর স্পষ্টই প্রতীক্ষ যে ইন্দিরা গান্ধী আজ ছলে, বলে, কৌশলে—একটিকেও বাদ দেবার দরকার নেই—সারা দেশটাকেই তাঁর বাসস্থান অর্থাৎ জমিদারি করেছেন। বলা চলে, সংগঠনই সংগঠনকে পরাস্ত করেছে। এ মাসের নির্বাচনে এটাও সামান্য কথা ছিল না যে সরকারটাও ছিল পুরোপুরি ইন্দিরা দেবীরই হাতে। সরকারী যন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবহার অভূতপূর্ব নয় কিন্তু অস্ত্রটা দোধারী করাত, উঠতেও কাটে আবার নামতেও কাটে। দুপক্ষই এই সরল সত্য স্মরণ না রাখলে একদিন দেখা যাবে—না কি ইতিমধ্যেই দেখা হয়ে গেছে?—যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পর্যবসিত হয়েছে মার্কিনী কাল্পনিক গ্যাং ওয়রফেয়ারে। সেই নাটকের সাম্প্রতিক অতি সফল মহড়া মনে সানন্দ শিহরন জাগায়নি। কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত হয়েছি। উদ্দেশ্য আর উপায়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে একদিন বিতর্কের অন্ত ছিল না। ইন্দিরা দেবীর বোধ হয় সময় নেই। উনি ব্যস্ত।

*

সে যাক্‌ গে। পশ্চিমবঙ্গের কুখ্যাত বন্ধ্যা বামপন্থী অপপ্রবণতা সহসা কর্পূরের মতো উবে গেল আর রাতারাতি ভোটের অবিশ্বাস্য বন্যা ধাবিত হলো গোরুবাছুরের বাক্সে। এই পি সি সরকারী ইন্দ্রজালের সম্যক পরীক্ষা নাকি ব্যক্তিগত অবিবেচনার পরিচায়ক। কিন্তু, অতঃ কিম্‌? রাজ্যের অনন্ত সমস্যার একটিও ভোটের বন্যায় জলে ভেসে গেছে বলে জানিনে।

সিদ্ধার্থ রায় কিন্তু নয়াদিল্লির আশীর্বাদে পরিপুষ্ট। কেন্দ্র থেকে কাগজী টাকা আসবে প্রচুর। কাগজী পরিকল্পনার উজ্জ্বলতা তো এখনই শহীদ মিনারকে হার মানায়। বাইরের পৃষ্ঠপোষকতাকে আমি আদৌ হেয়জ্ঞান করিনে। দিল্লির অনেক ঋণ আছে পশ্চিমবঙ্গের কাছে। পরিশোধ প্রাপ্য ছিল বহু দিন আগে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে দর্শাতে হবে, প্রাপ্ত অর্থ কীভাবে সিদ্ধ হবে। বিধান পরিষদে নিষ্কণ্টক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অতি উপাদেয় পদার্থ। কিন্তু আপনার আমার মতো লোকের পছন্দ এখনো হয়তো পুঁটিমাছ আর কোলাব্যাঙ।

শর্ত করো

তুষার রায়

তিনি তো বেদনা-গাঢ় বিন্দুর চোখেতে যেন মানুষের
সংসারে তাকিয়ে দ্যাখেন
কোথায় সে ক্ষমা শান্তি পবিত্রতা, এখনো যে রক্তপাত
বন্ধ হলো নাতো

ক্ষেতে ক্ষেতে কোথায় সোনার ধান, অজস্র কংকাল,
ধাদা বনে কালচিটে হয়ে আছে রক্তের কাদা, গাছে ঝোলে
গলিত শবের লাস, ফাঁস-আঁটা বুলেটে ঝাঁঝরা

তবে কেন লিখেছি কবিতা, গান কেন হয়েছে রচিত
তারকা-খচিত ওই আকাশেতে কেন তবে ওঠে চাঁদ
বিষাদ দুচোখ ছোঁয় সে কবির অশ্রু ঝরে নিভৃত নয়নে
শোকের শয়নে তবে শুতে দাও, আমাকেও লাশ করো
ফাঁসি দাও গাছের ডালেতে, বুলেটে ঝাঁঝরা করো
আমাকেও ওইভাবে, শোনো

তারপর কখনো পাতক, তুমি শর্ত করো হবেনা ঘাতক।

তেমন দুঃখ বাজেনা আর

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

তেমন দুঃখ বাজে না আর তেমন দুঃখ বাজে না আর
তেমন আনন্দ
তেমন শোক আর নেই তেমন শোক আর গ্রস্ত হই না তাতে;
এই কী সেই শেষবেলার দহনহীন আগুনে তার শিখা
এই কী সেই শেষবেলার গ্রহণ-ম্লান সূর্য সেই ক্ষয়
ছায়ার কাছে বাজি ধরেছিল সে আর খুইয়েছে
তার সর্বস্ব তার সঞ্চয়
এখন তার একা এবং অবুঝ অভিমানের ভারি একা
বহন করা বহন করে চলা বহন এবং চলা এবং চলা
পথের পাশে সরাই নেই পাথর নেই নদীও নেই নদী-
স্থিরচিত্র দেয়াল জুড়ে শাসন মেনেছে কার?
স্বীকার করেছে বন্ধন
দিনের দাহ গ্রহণ করে ফিরিয়ে দেবে দিন এমন নদী
দিনের গ্লানি গ্রহণ করে ফিরিয়ে দেবে দিন এমন সরাই
দিনের ভার বহন করে ফিরিয়ে দেবে দিন এমন পাথর
কোথাও নেই পথের উপর ইতস্তত পায়ের চিহ্ন
ইতস্তত স্বাক্ষর
হয়তো এই অর্জিত বোধ বোধের বুকে
প্রোথিত বৈরাগ্য তার আসন
পেতেছে সেই বৃক্ষের তলে সেই বৃক্ষের ছায়ায় সেই বৃক্ষের
ধার—
পাতা ঝরার সময় পাতা ঝরে ফুলের সময় ফুল ধরে
আর—
সেই উদাস বৃক্ষ পোশাক খোলে পোশাক পরে আবার খোলে
সমানই তার রাজা এবং শিশুর খেলা রাজা এবং
শিশুর মতন ছড়ায়
আবার সব কুড়িয়ে নেয় আবার সব ছড়িয়ে দেয় আবার
তেমন দুঃখ বাজে না তার বাজে না তার তেমন আনন্দ
তেমন শোকে মুহ্যমান নয় তেমন শোক গ্রস্ত হয় না তাতে

মালঞ্চে আমার প্রেমিককে

সুলেখা চন্দ

আমার প্রেমিক মালঞ্চে
নক্‌শা আঁকছে ঘাসে।
মন যদি ভালোবাসে—
পরজন্মের আশায়, বয়স বাড়ছে [illegible]।
প্রেমিক আমার মালঞ্চে
বসে বসে
একা বৃদ্ধ হচ্ছে।
নক্‌শা আঁকতে আঁকতে
শালিখ খুঁজছে।
সাতটা শালিখ গোপনতার চিহ্ন জানি,
গুপ্ত কোন সত্তা তার থাকে যদি;
প্রেমিক আমার মালঞ্চে বসে বসে
সৎ হচ্ছে।
শৈশবে পরিব্যাপ্ত ভালবাসা
অলস ছিল।
নাগকেশর ফুটেছিল বিকেল জুড়ে।
সুখ কুড়িয়েছিলাম দুজন মিলে
পরম সৌহার্দ্যে।
একাই এখন মালঞ্চে
প্রেমিক আমার বয়স বাড়াচ্ছে হাতের তালুতে।
খণ্ড খণ্ড প্রাসঙ্গিকতা জুড়ে,
সমগ্রর পাঠোদ্ধার করে,
আমি যদি ধানক্ষেত পরিক্রমা সেরে,
ফিরে যাই।
প্রেমিক আমার মালঞ্চে তাই একক প্রতীক্ষায়
আত্মবিশ্বাসের অভাবে জীর্ণ হচ্ছে,
তপস্বীর মত।

দেখা হয় নাই

"দেখা হয় নাই" সিরিজের "মীরপুর" নিবন্ধটি সম্পর্কে ১-১-৭২ তারিখের 'দেশ' পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত তমলুকবাসী শ্রীতারাশিস মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ সমালোচনাটি যথসময়ে চোখে পড়লেও নানা কারণে উত্তর দিতে দেরী হল বলে দুঃখিত।

'কয়দিন আগে শ্রীসনাতন পাঠক' তাঁর 'সাহিত্য-সংবাদ' বিভাগে লিখেছিলেন—'দেশ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনা করবার জন্য বাঘা বাঘা সব সমালোচক পাড়ুরং, ঝাঁঝা বা রাজাভাতখাওয়ায় ওত পেতে বসে আছেন। তারাশিসবাবু আমাকে তো নানাভাবে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছেনই, তাঁকেও করলেন। ঘরের কাছে তমলুকে যে অন্তত একজন বাঘা সমালোচক বাস করেন, পাঠক মশায় আশা করি তা জেনে রাখবেন।

নিজেকে "নৃতত্ত্বের ছাত্র" হিসাবে বিজ্ঞাপিত করে, তারাশিসবাবু লিখেছেন—কয়েক মাস আগে তিনি মীরপুরে গিয়েছিলেন "নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়" বরং সেখানকার "পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত খৃষ্টান সমাজে গত দশ বছরে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছে তা চিহ্নিত করতে।" নিছক বেড়ানোর বস্তুটিতে আমার প্রীতি উপেক্ষা বলে তাঁকে সবিনয়ে জানাই, গবেষণার জোর স্বরূপ একটি পেপার উপস্থিত করবার জোয়াল ছেড়ে যাঁরা নানা ঐশ্বর্যে ভূষিত আমাদের গ্রামগুলিতে যান, তাঁদের একাগ্রদর্শিতা ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি অনেকাংশে দূরে বলে অনুপ্রেরিত হওয়া তো দূরের কথা,

এবং গর্বিত। বিশেষ কোন 'সাবজেক্ট' বা তার শাখার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত নই বলেই আমার অভিনিবেশের বিষয়ের অন্ত নেই। 'দেখা হয় নাই'-এর পাঠকদের হয়ত তার পরিচয় পেয়ে থাকবেন। কিন্তু অনুমান করি, শব্দ কূপের বাইরে যে উদার জগৎ তার বিচিত্র মাধুর্য তারাশিসবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। তিনি দেখিয়েছেন মীরপুরের লোকসংখ্যা গণনায় আমি ভুল করেছি, বসতবাড়ি ঠিক কটি তারও খোঁজ নিইনি, এমন কি কটির চাল খড়ের আর কটির টিনের তারও নির্ভুল সংখ্যা দাখিল করতে পারিনি। আমার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, অশেষ পরিশ্রমে অজস্র এসব মহামূল্যবান তথ্য তিনি নিজেই পরিবেশন করেছেন। এসব কথার ছাড়া আরও যে গর্হিত ত্রুটির কথা তিনি নিজ গুণে উল্লেখ করেননি, তা হল—কুটিরগুলির প্রতিটি চালে কত গোছা খড় বা কত সংখ্যক টিন ব্যবহৃত হয়েছে তার অভ্রান্ত হিসাবও আমি সংগ্রহ করিনি। তারাশিসবাবুরা যে জাতীয় গবেষণা করেন সেরূপ কর্মে আমি যে একান্তই আনাড়ি সে কথা অকপটে স্বীকার করতে আমার একটুও দ্বিধা নেই। ভগবানকে ধন্যবাদ। আমায় তিনি "নৃতত্ত্বের ছাত্র" করেননি; করলে আমার শিরা-উপশিরা দিয়ে মীরপুরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশকে উপভোগ বা মীরপুর-দুহিতাদের হৃদয়-বেদনা অনুভব করবার (প্রবন্ধে এসবের বিস্তৃত উল্লেখ ছিল) বদলে গবেষণার খাতায় আমাকে শুধু হিসাবের অঙ্ক কষিয়ে মরতে হত।

তারাশিসবাবুর অবগতির জন্য জনান্তিকে বলি—"মীরপুর" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর একাধিক প্রখ্যাত সাহিত্যিক আমাকে অভিনন্দিত করে সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারাশিসবাবু গোসা হবেন না—"নৃতত্ত্বের ছাত্রের স্বীকৃতি থেকে তাঁদের সাধুবাদ আমার কাছে ঢের বেশী মূল্যবান। কেননা, "দেখা হয় নাই" সিরিজের লেখাগুলিকে মামুলি "থীসিস পেপার" জাতীয় জনায় পর্যবসিত হতে দিতে আমার গভীর অনীহা; সেগুলি সচিত্রিত, সুখপাঠ্য ও সরস হলেই আমি খুশি।

এবার "মীরপুর গ্রামের পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত খৃষ্টান সমাজে গত দশ বছরে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছে তা চিহ্নিত করতে চেয়েছিলাম"—তারাশিসবাবুর এই উক্তির আলোচনায় আসা যাক। তাঁর হিসাব মতই এই বিশেষ গোষ্ঠীর বর্তমান সংখ্যা মাত্র ৩৮৪। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এতাবৎকাল অর্থাৎ প্রায় সওয়া দুশ বছর, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁদের মেলামেশা ঘটেছে। ভারতবিখ্যাত এক নৃতাত্ত্বিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায়

নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে এত কমসংখ্যক জনগোষ্ঠী এত দীর্ঘকাল স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশ্রিত হলে তাঁদের সাবেক বৈশিষ্ট্য আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবার কথা নয়; নৃতাত্ত্বিকভাবে তাঁরা বহু পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় জনজীবনের শামিল হয়ে পড়েছেন; গত দশ বছরে তাঁদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা সেজন্য পণ্ডশ্রম মাত্র। তারাশিস-বাবুও পাদরীরা যে আসলে "ফাদার" নামে অভিহিত বা ঠিক কোন্ কোন্ বারে তাঁরা মীরপুরে আসেন অথবা প্রার্থনার সময় ডুগি-তবলা ও আর কি কি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় ইত্যাদির ফিরিস্তি দিতে এত ব্যস্ত থেকেছেন যে গত দশ বছরের নৃতাত্ত্বিক পরিবর্তন বিষয়ে তাঁর মূল্যবান গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে একটি কথাও বলবার অবকাশ পাননি।

আমি "নৃতত্ত্বের ছাত্র" নই। তবু আর একটা বিষয়ে খটকা লাগছে। তারাশিস-বাবু নিজেই বলেছেন, "সেন্সাস (১৯৬১) হ্যান্ডবুক : মেদিনীপুর" পুস্তকের একটি প্রবন্ধ থেকে তিনি মীরপুরের কথা জানতে পেরে কয়েক মাস আগে ওই গ্রামে যান। পুস্তকটির প্রকাশকাল ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ আর তারাশিসবাবুর পরিদর্শনকাল ১৯৭১-এর মাঝামাঝি বা তার কিছু পরে। "গত দশ বছরে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছে তা চিহ্নিত করতে" হলে তিনি ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে নিশ্চয়ই প্রথম দফা সমীক্ষা চালিয়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁর স্বীকৃতি থেকেই দেখছি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে তিনি এ বিষয়ে অবহিতই ছিলেন না। অবশ্য ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সমীক্ষা চালিয়ে তিনি যদি "পরিবর্তন চিহ্নিত" করবার পরিকল্পনা ক'রে থাকেন তবে স্বতন্ত্র কথা।

আমি "নৃতত্ত্বের ছাত্র" নই। তবু তারাশিসবাবুর অবগতির জন্য বলি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বেই বেশ কয়েকজন লেখক মীরপুরের এই জন-গোষ্ঠী নিয়ে অল্পাধিক লিখেছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এল-এস-এস ওম্যালী রচিত মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ারে (পৃঃ ৫৫) অন্যান্য সংবাদের মধ্যে বলা হয়েছে—

"Except that they are Christians and that some have Portuguese names, they cannot be distinguished from their neighbours."

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ 'যুগান্তর' সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর "কালপেঁচার বঙ্গদর্শন" শীর্ষক নিবন্ধমালায় ১৯৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এ গ্রাম সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, তা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' পুস্তকের (পৃঃ ৪৪৬-৫০) অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তিনিও লিখেছেন "তারা খৃষ্টধর্মী, এই তাদের আজ প্রধান পরিচয়। পর্তুগীজদের বংশধর বলে কোন স্বতন্ত্র চেতনা তাদের নেই, থাকতেও পারে না।...কোথা থেকে এই পর্তুগীজদের এখানে আনা হয়েছিল, সে কথা আজ মীরপুরবাসীরা কেউ জানেন না। কেউ কেউ বলেন, গোয়া থেকে আনা হয়েছিল। তা নাও হতে পারে। গোয়ানীজ সংস্কৃতির কোন চিহ্ন নেই কোথাও মীরপুরে। গির্জা ও খৃষ্টান ধর্মাচরণের মধ্যেও যা আছে, তার সবটাই খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতি এবং হিন্দু সংস্কৃতি। এমন কি চেহারাতেও কোন বিদেশী পূর্বপুরুষের কোন ছাপ নেই কোথাও।" ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর পি কে ভৌমিকের যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' নামক নৃতাত্ত্বিক সাময়িক পত্রে (খণ্ড—৪৩; সংখ্যা—৩) প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও মীরপুর সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারাশিসবাবুকে যে এ গ্রাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে ১৯৬৭ সালের 'মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক'-এর জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছে সেজন্য তাঁকে সমবেদনা জানাই।

তারাশিসবাবু তমলুকনিবাসী। তমলুক গেঁওখালির সঙ্গে পিচ-রাস্তা ও বাস-সার্ভিস দ্বারা বহুকাল যুক্ত; দূরত্ব আনুমানিক ১৬ মাইল যা বাসে কমবেশি এক ঘণ্টায় অতিক্রম করা সম্ভব। গেঁওখালি থেকে হাঁটাপথে মীরপুর মাইলখানেক দূরে। অতএব দেড় ঘণ্টায় পৌঁছনো যায় এবং নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক এ গ্রামে তাঁর মতো অনুসন্ধানী "নৃতত্ত্বের ছাত্রের" মাত্র কয়েক মাস আগে প্রথম উপস্থিত হওয়াটা আরও কৌতূহলোদ্দীপক।

তারাশিসবাবু দু'এক জায়গায় মন্তব্য ছড়িয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ ক'রতেও কসুর করেননি। যেমন—"মনে হয়, সময় অভাবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এগুলি দেখা হয় নাই।" অথবা "গৃহস্বামীকে অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।...মুখের কথা টুকে নেওয়া ছাড়াও সম্ভব হলে সব কিছু দেখাই ভাল—যদি পাঠক ও গবেষক-দের পথনির্দেশের ইচ্ছা থাকে।" আমার লেখায় বলেছিলাম—"তাঁদের (সমবেত আবালবৃদ্ধবণিতা) ও গৃহস্বামীকে অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে নানা তথ্য টুকে নিলুম নোট বইতে।" আমার সময়ের ব্যবহার বা কভারেজের পদ্ধতি আমার একান্ত ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যাপার। তারাশিসবাবু সে বিষয়ে কটাক্ষ করে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে প্রতি-আক্রমণের দরজাটা খুলে দিয়েছেন। তাঁকে সেজন্য বলতে পারি, বিদেশী অর্থে, বিদেশী কৃপায় ও বিদেশী সঙ্গীসাথী জুটিয়ে মেদিনী-পুরের অভ্যন্তরে এক ঘাঁটিতে যে জাতীয় গবেষণায় তিনি বহু বৎসর নিয়োজিত আছেন তাতে আমার ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিরই গভীর অনীহা। বারান্তরে এ বিষয়ে আরও খোলাখুলি বলতে বাধ্য না হলেই খুশি হব।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "দেখা হয় নাই" প্রবন্ধমালায় পশ্চিম-বঙ্গের অবলুপ্তপ্রায় জনসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যেসব তথ্য প্রকাশ করছেন সেজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 'দেশ' পত্রিকার ৫ই কার্তিক সংখ্যায়

[ধা]মতোড়' প্রসঙ্গে যিনি মন্দির 'টেরাকোটা' [শি]ল্পের অবনতি ও বিলুপ্তির আনুমানিক [কা]ল সম্পর্কে যে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন [তা] খুবই সময়োপযোগী। 'ধামতোড়' গ্রামের [উ]দাহরণ দিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দেখাতে [চে]য়েছেন যে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকেও [এ]ই কাজের শিল্পীরা একেবারে নিশ্চিহ্ন [হ]য়ে যাননি। পশ্চিম বাংলার মন্দির [ম]সজিদের আলোকচিত্র সহ 'ডকুমেণ্টেশন' করার প্রয়োজনে হাওড়া জেলার গ্রামীণ সংগ্রহশালা 'আনন্দনিকেতন' কীর্তিশালার পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে আমার বহু মন্দির দেখার সুযোগ হয়েছে। ঊনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমে প্রতিষ্ঠিত শিলালিপিযুক্ত যে ক'টি 'টেরাকোটা' মন্দিরের সন্ধান আমি পেয়েছি তার তালিকা হল—মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার খড়ার গ্রামের (রায় পাড়া) মন্দির (১৮৭৮), মেদিনীপুর থানার শিববাজারের মল্লিকদের মন্দির (১৮৮০), পাঁশকুড়া থানার গোবিন্দপুর গ্রামের মন্দির (১৮৮১), ঘাটাল থানার খড়ার গ্রামের (পূর্বপাড়া) মণ্ডলদের মন্দির (১৮৮৮), ডেবরা থানার বালাড়-গোপীনাথ-পুর গ্রামের করণ পরিবারের মন্দির (১৮৯০), ঘাটাল থানার আজুড়ে গ্রামের মন্দির (১৯০২), ঐ থানার কুলপাড় গ্রামের শিবমন্দির (১৯০৫), পাঁশকুড়া থানার শ্রীরামপুর গ্রামের শীতলা মন্দির (১৯০৮), চন্দ্রকোণা থানার রঘুনাথপুর গ্রামের পার্বতীনাথ শিবমন্দির (১৯০৯) এবং সর্বশেষটি হল অমিয়বাবুর আলোচিত ধামতোড়-এর মন্দির (১৯৩১)।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত শ্রীরামপুর গ্রামের মন্দিরটির যিনি স্থপতি সেই চেতুয়া-দাসপুরের দেবেন্দ্রনাথ চন্দ্রই যে এর বাইশ বছর বাদে ধামতোড় গ্রামের মন্দির নির্মাণ করেন এ বিষয়ে আমি 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩৭৬) "বাংলার মন্দির: মন্দির গড়া স্থপতিদের ঠিকানা" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করি। এই ব্যবধানকালে তিনি নিশ্চয়ই আরও অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যা লিপিফলকের অনুপস্থিতির জন্য অথবা মন্দির ধ্বংসের জন্য জানা যায়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও এই সব মন্দিরগড়া শিল্পী যে সক্রিয় ছিলেন সে সম্পর্কে দাসপুর থানার আজুড়ে গ্রামের ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরের শিলালিপির প্রতি আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সূত্রধর-স্থপতিরা তখনও এক প্রধান শিল্পীর অধীনে দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছেন এবং এই ধরনের শিলালিপি মেদিনীপুর জেলার দাসপুর অঞ্চলের অন্যান্য মন্দিরেও পাওয়া গেছে। আলোচ্য শিলালিপিটির বয়ান হল :—

> শ্রীশ্রীমনসা মাতা শ্রীশীতলা মাতা
> মূল ২ সর্বজন মন্দির নির্মাণ কথা
> দাসপুরে বাস মিস্ত্রী মনুরথ
> সিল পরবীণে গাঁথা।
> মিস্ত্রী সঙ্গে ১১ জন কো[illegible]
> মন্দির গঠন
>
> সকল ... [illegible]
> সন ১৩০৮ সালে গেল দিন হরিবোলে
> সন ১৩০৯ সালে [illegible]।"

মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার বল-রামপুর গ্রামে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শিখর-দেউলটির নির্মাণকর্তা চেতুয়া-দাস-পুরের স্থপতি ঠাকুরদাস শীল এবং এ মন্দিরে কোন 'টেরাকোটা' সজ্জা নেই। অথচ এরই চার বৎসর পরে ঐ গ্রামে ঐ একই স্থপতি যে শিখর-দেউলটি নির্মাণ করেছেন তাতে রীতিমত 'টেরাকোটা' অলংকরণ রয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, মন্দির-নির্মাতার অধিক ব্যয়বরাদ্দের উপরই নির্ভর করত মন্দির নির্মাণের ধরনধারণ। রাসমণির মন্দির নির্মাণে যে অর্থব্যয় করা হয়েছিল তাতে যদি 'টেরাকোটা' সজ্জিত মন্দির নির্মাণ করা হত তা হলে সেই মন্দিরের বিশালত্ব হয়ত থাকত না। আর যদি উপযুক্ত অর্থও ব্যয় করবার পরিকল্পনা করা হত, তা হলে অত বড় মন্দিরে 'টেরাকোটা' সজ্জা করতে দীর্ঘ সময় লাগত, যা হয়ত রাসমণির মন্দির-নির্মাতাদের অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রাসমণির মন্দিরের উদাহরণ দেখিয়ে 'টেরাকোটা' শিল্পীদের অবলুপ্তি কল্পনা করা কোন-মতেই উচিত হবে না। অতএব শ্রীসুধাংশু-কুমার রায় ও শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয়রা তাঁদের পূর্বসিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখবেন এই আমার আশা।

নানা কারণে 'টেরাকোটা'র মাধ্যম ত্যাগ

করলেও সংশ্লিষ্ট শিল্পসমাজ মন্দির অলংকরণের কাজ বিস্মৃত হননি। পরবর্তী কালে পঙ্কের কাজে তাঁদের পূর্ব ঐতিহ্যকে যে তাঁরা বজায় রেখেছিলেন তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে নির্মিত হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার বহু মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে।

'টেরাকোটা' সজ্জার অবলুপ্তির সঠিক কাল নির্ণয় করতে হলে গ্রাম-বাংলার সমস্ত মন্দিরের সরকারীভাবে একটা আদমশুমার করা দরকার। এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব দপ্তর সরব ঘোষণা করলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁদের "কেবল ঘুমায়ে রয়" নীতিই অনুসরণ করতে দেখা যাচ্ছে। অন্য দিকে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-চেতনার ঐতিহ্য নিয়ে ভবিষ্যতের কাছে কী জবাবদিহি করবেন, যদি এই সব মন্দির ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়?

তারাপদ সাঁতরা
কিউরেটর, আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা; বাগনান, হাওড়া

মোদের গরব মোদের আশা

পথ চলতে গিয়ে ওপার বাংলায় একটা 'দেশ' (৬ই ফাল্গুন) ফুটপাথের পর দেখতে পেলুম। একটু নেড়ে চেড়ে কিনে ফেললুম। বাসায় গিয়ে 'আলোচনা'র আসরে চোখ পড়ল। দৃষ্টি এড়াল না—বাংলাদেশ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড।

'মোদের গরব মোদের আশা' শীর্ষক পত্রের লেখক জনাব গৌরীশঙ্কর আমাদের বহু কষ্টার্জিত দেশটির নামকরণ নিয়ে একটু এলার্জিক বলেই মনে হ'ল। তিনি বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাঁর বক্তব্যের পেছনে যে মানসিকতা কাজ করছে, নির্দ্বিধায় আমি তা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমার গুটি কয়েক বক্তব্য পেশ না করে পারছিনে।

প্রথমেই ধরা যাক তিনি বলেছেন, "বৃহত্তর অংশ সমগ্রের নাম ধারণ করে, অন্নদাবাবুর এ যুক্তি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একেবারেই অচল।" আমি এ প্রসঙ্গে বিনয়ের সাথে বলছি যে যুক্তিটা একেবারে অচল নয়। তার জ্বলন্ত প্রমাণ ভারত ও পাকিস্তান। 'পাকিস্তান' নামটিতে 'ভারত' কথাটির চিহ্নমাত্রও নেই। অথচ ভারত বিভক্তিতেই পাকিস্তানের সৃষ্টি।

অন্য এক জায়গায় কৃত্তিবাস প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন "এই নতুন ইতিহাসকে উড়িয়ে দিয়ে আমরা পুরোন ইতিহাসকে ঘাঁটব? ফিরে যাব আবার সেই পুণ্ড্র গৌড় সুহ্ম রাঢ় সমতট বঙ্গে? ঘটনার নির্দেশ তো কই সে কথা বলে না?" এবার আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তিনি যদি পুরোন ইতিহাস বা অতীতকে বাদ দিতে চান তবে আমাদের দেশের নামকরণে 'বাংলা' কথাটিই থাকছে না। কারণ, অতি সম্প্রতি, মাত্র এক বছর আগেও এ দেশটি পূর্ব পাকিস্তান বলেই পরিচিত ছিল। লেখকের 'বর্তমান' প্রীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশকে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' নামেই আখ্যা দিতে হয়। 'পূর্ব বাংলা'ও এক্ষেত্রে ব্যাক-ডেটেড।

আগে বাংলা দেশ এক ছিল, ভৌগোলিক দিক দিয়েই। এখন 'বাংলাদেশ' শব্দটি এক হয়ে গেলেও তা যে বস্তুত দ্বিধা বিভক্ত তা বাস্তব সত্য। এর পেছনে বহু কারণ রয়েছে: ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ছাড়াও বৃটিশ রাজের কুটবুদ্ধিও অন্তরালে কাজ করেছিল বই কি। ভাগ হয়ে গেছি সত্যি, কিন্তু তাই বলে কি মনের দিক দিয়ে আমরা ভাগ হয়েছি? নিশ্চয়ই নয় বরং দিন দিন মানসিক সম্মিলনের দিকেই আমরা এগুচ্ছি। তবুও আমাদের দেশের নামকরণের যৌক্তিকতা নিয়ে যে ওপার বাংলায় ঝড় উঠবে তাও আমাদের কাছে অভাবনীয় কিছু নয়। আধুনিক বিশ্বে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, রাজনৈতিক কারণে একই দেশ দু ভাগ হয়ে যাওয়া। কিন্তু একটি দেশ দু ভাগ হয়ে গেলেও সেই নবজাত দুটি দেশ তার পূর্বতন ঐতিহ্য বজায় রেখে তার নব নামকরণে পূর্বের অবিভক্ত দেশের নামটি যুক্ত করছে। তাই আমরা দেখতে পাই জার্মানী দু ভাগ হলেও উভয় জার্মানীই 'জার্মানী' শব্দটি বর্জন করেনি। তেমনি কোরিয়া, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে চীনের নামও উল্লেখ করা যায়। যদিও উপরোক্ত দেশগুলো তাদের প্রাক্তন নামটি নবতর নামে সন্নিবেশিত করেছে তবুও তার সাথে কিছু লেজ জুড়ে দিয়েছে। তেমনি, পূর্ব জার্মানী হয়েছে জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক, আবার পশ্চিম হয়েছে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী।

আমাদের এই নবজাত রাষ্ট্রটিও কেবল 'বাংলাদেশ' হিসেবে পরিচিত হবার অবকাশ পাচ্ছে না। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'—সরকারীভাবে এ নামটি বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে।

জামাল হাসান
ইন্দিরা রোড।
ঢাকা

জননী / সমরেশ মজুমদার

তিন তিনটে শকুন মাথার ওপর পাক খেয়ে গেল। খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা, ডানায় শব্দ তুলে ওপরে উঠে গেল, অনেকটা ওপরে। জলে পা ডুবিয়ে ভেজা বালিতে আধা শোয়া বিন্দু দেখল ডানা টান টান করে মুখ ঝুঁকিয়ে ওরা ওকে লক্ষ করছে।

আকাশটা আজ সকাল থেকেই এই রকম। আধপোড়া কাঠের মত চেহারা। নামছে না একটা ফোঁটাও, অথচ আলো বলতে যেটুকু মরা মাছের চোখেও বুঝি তার চাইতে বেশী চাক। কেমন থম ধরে আছে চারদিক। তিন তিনটে দিন কাঁদিয়ে ভাসিয়ে আজ এ কেমন ধারা গো।

নদীটার অবস্থাও হয়েছে তেমনি। বুড়ো সাপের মত গতর। মতলব বোঝে কার সাধ্য। বৃষ্টি নামার আগে বিন্দুরা দল বেঁধে সাঁতরেছে। সকলেই কেউ না কেউ দেখেছে, ওই যে, কালো মুখ উঁকি মেরে জল সরিয়ে। দাও ঝাঁপ দাও ঝাঁপ। পলকে কত শরীর জলে পড়ে শব্দ করে। চালাকি চলবে না বাপু, বুঝেসুঝে হাত নাড়াও। একটু জোর খাটিয়েছ কি মারবে এমন হ্যাঁচকা যে দেখবে তুমি এই চত্বরের কোথাও নেই। বেয়াদপি করতে গিয়েছিল হারান সেনের ছোট ছেলেটা ওর হাড় মাংসগুলো পাওয়া গেল কিং সাহেবের ঘাট ছাড়িয়ে কাশবনের চড়ায়। অতএব জলের যে দিকে মতি সে দিকেই চল, মাছের মত তারই মধ্যে একটু এ পাশ ও পাশ হও, দেখবে বুড়ি তিস্তা ঠিক তোমাকে নিয়ে যাবে সেইখানে যেখানে কালোমুখ নৃত্য করে। যার সাহস বেশী, বুড়ি তিস্তা যাকে একটু দয়া করবে, সেই দেবে হাত। তারপর শক্ত হাতে হাল হয়ে স্রোত ধরে চল ওটাকে নিয়ে। এক সময় ঠিক চড়ায় গিয়ে ঠেকাবে। সাথে যারা এল গেল, তারা জলে চোখ জবা করে ফিরে যাবে আধ মাইল উজানে। আর যে পেল সে তো মহাখুশী। এখন শুকোক এ কাঠের গুঁড়ি। রোদ্দুরে থাক দিন ভর। তারপর কোপ বসাও মনমতন, টাকায় দশ কিলো তো চোখ বুজে বিক্রী। সেই সকাল থেকে আসে মেয়েগুলো, খানপাড়ার যত রক্তবংশী মেয়ের ঝাঁক ওত পেতে থাকে।

আজ তিন তিনটে দিন জবর বৃষ্টি। এই যে বিরাট বালির চরটা এখানে কেউ পা রাখবে বুকের পাটা কার। বুড়ি তিস্তা ফোঁপাচ্ছে তার নিঃশ্বাসের সামনে কে আসবে গো। এই যে বুড়োর দাপট

মত কাশফুলগুলো একটারও মাথা নেই। এই তিন দিন রাত দাপাই এর দায় ধরে। আজ সকালে যখন আকাশটা এমন চুপচাপ, বিন্দু একটু দৌড়ে এল বাঁধের ওপরে। আর এসেই শরীর হিম হল ওর। হা মা বুড়ি তিস্তা, তোমার এ কি চেহারা গো। মাটি খেয়ে খেয়ে জলের রঙ এত কালো হয়। আই বাপ, বুকে ভয় লাগে। আর কি মোটা হয়ে গেল নদীটা। নদীটারে বুড়ি কে বলবে এখন? স্রোতে কি ছোবল তার! ভর বয়সের বিয়ের জল খোঁজা ছুঁড়ির মত চনমনে।

আর তারপরেই চোখে পড়ল। এই তিন দিন ধরে বিন্দু ভাবছিল। বুড়ি তিস্তার যেখানে জন্ম সেই পাহাড়ে তো এখন রাম রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে নিশ্চয়ই। হায়, কত গাছ ভাঙলো, কত কাঠ ভেসে গেল। আর এখন, বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়েই ওর নজর গেল স্রোতের টানে হাবুডুবু খেতে খেতে চলেছে কালো মানিকের ঝাঁক। বিন্দু বাঁধ থেকে নেমে ছুটলো। ভেজা বালিতে পা টানছে। নইলে কাপড়টা সামলে ও হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিল নদীর ধারে। বাণের আগে এর ডবল পথ হাঁটতে হত। কিন্তু কাছে এসে জলের গায়ে দাঁড়িয়ে বুকে থম ধরল বিন্দুর।

ও মাগো। বিন্দু বুকে হাত দিল। কি পাগলপারা ঢেউ গো। সেই সেবার, রাক্ষসী যখন চলে এসেছিল বাঁধ কেটে ওদের দাওয়ায় সেবার চেহারা এমনতর ছিল। এটা কি বলে ফেলল ও রাক্ষসী কেন বলল? হেই মা, হেই বুড়ি মা, তিন তিনবার গড় করল বিন্দু। তুমি আমাদের খেতে দাও পরতে দাও, জননী গো, পাপ নিও না মা। বিন্দু মনে মনে বড় থানের ঠাকুরের পা ছুঁয়ে নিল একবার।

কিন্তু এ জলে নামবে কে? এই শোঁ শোঁ শব্দ, এই উথালপাথাল ঢেউ। বিন্দু নদীর ওপর দিয়ে তাকাল। ওপারে, যেখানে বানিশ ঘাটের দোকানগুলো আছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিন্দুর চোখ বড় হল বাপ, কি বড় বড় কাঠের গুঁড়ি ঠিক মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে গো। হাত কামড়ানো, কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এদিকে ধারের জলে টান কম। গাছের বাকল, ভাঙা ডাল ঘুরপাক খাচ্ছে এদিকটায়। বিন্দু শাড়ি পেঁচিয়ে জলে নামল। বুড়ি মাগো, এক বুক যাবো, তার বেশী নয়।

বুড়ি তিস্তার জল এমনিতেই মাঘ মাসের হাওয়ার মত, কিন্তু আজ এত শীতল কেন? হাড় মাস কেটে নিচ্ছে গো। কাছিমের মত। জলের তলার টুক করে আঙুল কেটে নিয়ে গেল তুমি টেরও পেলে না। কাশফুলের মত হালকা শরীর বিন্দুর, কোমর জলে ভাসাল। পায়ের তলায় বালির গায়ে পাঁকের সর জমছে, হাঁটবে সাধ্যি কি। আর সেই থেকে টুকরো কাঠ আর বাকল ধরেছে কোমর জলে দাঁড়িয়ে আর জমা করেছে ভাঙা কাশ গাছের গোড়ায়। তা এই করতে করতে দু' প্রহর বেলা গেল গড়িয়ে, আকাশ দেখে বুঝবেটা কে? কাঠ জমেনি এমন কিছু। শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে গেল বিন্দু। চিৎ হয়ে শুয়ে রইল ভেজা বালির ওপর স্থির হয়ে। শুয়ে আকাশ দেখল। তিন তিনটে শকুন চক্কর কাটছে। হিম বাতাস বইছে এখন। ভেজা শাড়ি অঙ্গজুড়ে রাজ্যের শীত আনছে। বিন্দু ভাবল, আর নয়, এবার ফিরতে হবে। ধানপাড়ার কোন মেয়ে আজ আর আসেনি। এই জলে নামবে হিম্মৎ আছে কার? বাতাসে বিন্দুর শরীরে কাঁটা ফুটছিল। বিন্দু দেখল খুব কাছাকাছি নেমে এসেছিল শকুনগুলো ডানায় শব্দ তুলে আবার উপরে উঠে গেল।

আর এই সময়েই ওর চোখ পড়ল। পড়তেই তড়াক করে উঠে বসল ও। বেশ লম্বা, তা হাত দশেক হবে, বিন্দু আন্দাজ করল, একটা কাঠের গুঁড়ি এদিকে আসছে। আয় আয় বাবা, এদিকে আয়। উত্তেজনায় বিন্দু উঠে দাঁড়াল, পাঁচ পয়সার বাতাসা মা, ও মাগো বুড়ি, মানত রইল, ঠেলে দাও এদিকে, ঠেলে দাও।' গুঁড়িটা ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে, কি আশ্চর্য, অল্প জলে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল বিন্দু। জল ঠেলে ঠেলে গা ভাসাল খানিক। গুঁড়িটা আর এদিকে আসছে না। অনেকটা দূরে চলে এসেছে বিন্দু। সমান্তরাল হয়ে চলছে গুঁড়িটার সঙ্গে। হেই মা বুড়ি, একি লোভ দেখালে মা, আমি ফিরব কেমন করে? এখনও অবশ্য বড় ঢেউ অনেক দূরে। গুঁড়িটা একটু এগিয়ে এসেছে। আহা বেশ মোটা গো। বেশ কিলো, মা মণটাক তো হবেই। হাত বাড়াল ও। বুকের কাপড় খুলছে ঢেউ। পাক খেল পেটের তলায় আঁচলটা। টানের চোটে গুঁড়িটা একটু সরে গেল। মা

হল না। মুখ দিয়ে জল ছিটোল বিন্দু। বুক ভরে বাতাস নিল। তারপর মরিয়া হয়ে আর একটু এগোল ও। এই এই, ব্যস। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। গুঁড়ি থেকে বেরোনো একটা ডাল এখন বিন্দুর মুঠোর ভিতরে। কি আরাম! বিন্দু চোখ বুজলো। তারপর ডান হাতে জল কাপতে লাগলো ও। একটু একটু করে স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে চলতে পায়ে বালি এল হঠাৎ। আঃ। বিন্দু দু হাতে গুঁড়িটাকে টানতে লাগল। হেই বাপ, যা ভেবেছিল তা তো নয়। বিরাট বড়, সেই সকুল বাড়ির গাছটার মত গাছ যে। জল নলে টানা যায়। কিন্তু এখন, এই যে চরে লেগে গেল ডালটা, এখন যে আর ওঠে না। প্রাণপণে শরীর বেঁকিয়ে কাদা মেখে খানিকটা ওপরে আনলো বিন্দু। আর্ধেকের বেশী এখন জলে। বেশ মোটা গাছ। বিন্দু বালিতে উঠে এল। হঠাৎ একটা খস খস শব্দে তাকাতেই বিন্দু দেখল এক মানুষ দূরে ছিটকে পড়ল। হেই বাপ! কালসাপ গো। বিন্দুর বুকটায় কোন বাতাস নেই যেন। ফ্যাল ফ্যাল করে ও দেখল কেলাতে দুলতে একটা কালো লেখার গাছের পাতা সরিয়ে সরসর করে বালিতে নামল। তারপর ফণা তুলে বিন্দুকে একবার দেখল। বেশ কয়েক ঢেউয়ে দুলতে বালির ওপর দিয়ে ভাঙা কাশঝোপের জঙ্গলে ঢুকে গেল সাপটা।

বেশ কিছুক্ষণ বিন্দু পাথর হয়ে রইল। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে পায়ে পায়ে গাছটার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর মনে হচ্ছিল সাপটার নিশ্চয়ই একটা সঙ্গী আছে। কাশবনের বালি বরাবর। মনসা গো, হেই মা মনসা-ঠাকুর, অস্থির চোখে বিন্দু একটু সাহস যোগাড় করে মুঠো দিক ছেড়ে দেখল কিছু নড়ে কিনা। যা পাড়া গেছটার।

এখন ভাবো তো কি! এই গাছ ফেলে যাবেই বা কি করে! কমসে কম এক কুড়ি টাকার গাছ। সেই গোঁফওলাকে একবার ডাকবে নাকি! বলবে নাকি, পেয়া ভাগ দাম দেব, একটু হাত লাগাও। না, সে গোঁফওলা আসবে না। ঘরে উঠানে ফেললে নাই কেন, বিন্দু কেথায়! পরণে কাপড় চাই? বিন্দুরে বল। গাঁজার পয়সা?—ও বিন্দু, বিন্দুমাসী! কানের লতি গরম হয়ে গেল ওর। পুরুষ মানুষ, জমি নেই লাঙল নেই কিছু তাই বলে গতরও কি থাকতে নেই! মোষের মত তো চেহারা, গাঁজা খাবে আর ঝিমাবে। দুটো পাঁচটা কাজ বলো, কি ফেরিঘাটে মোট বইতে বল, সে দূরের কথা, গতর থাকলে কি এই আট বছরে বিন্দুকে বাঁজা থাকতে হয়! মরণ মরণ। হেই বুড়ি তিস্তা, তুমি তো সর্বখাকী, ওটারে—। চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটা আক্রোশের বশে ও গাছটাকে নিয়ে টানাটানি করল খানিক।

আর সেই সময়েই ওর নজর পড়ল।

নজর পড়তেই ও একদম সিধে, কলাগাছের মত কাঁপন শরীরে। এ কি হল, হেই মা, এটা কি দিলে। বিন্দু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও ভয়ে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল। এখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিরাট তিস্তার চরটা জনমানব শূন্য। বিন্দুর গলার শব্দ বালির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল। তিস্তার বুকে রাগী মোষের মত অজস্র ঢেউএর গোঁ গোঁ দাপানি। বিন্দু চোখ বড় করে দেখল, কেউ নেই। জলপাইগুড়ি শহরের গা ছোঁয়া এলাকা থেকে, খালপাড়ার মানুষ নেই নাকি! একটু বাদে, বুকের শব্দটা কমে এলে ও জলে নামল। কোমর জলে যেতে হল না। তার আগেই ও পরিষ্কার দেখতে পেল। ঢেউএর তালে তালে শরীরটা এখন দুলছে না। শরীরটা নয়, শরীর দুটো। একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে মিশে রয়েছে। বিরাট গাছটার ডালপালায় শরীর দুটো ঢাকা। পুরুষটার দুটো হাতের মুঠিতে গাছের ডাল ধরা। মুখ বুকের ওপর গোঁজা। পুরুষটার শরীর ধরে কাঁপছে মেয়েছেলেটা, মুখ হাঁ করে। পুরুষটার বউ নাকি! বেঁচে আছে নাকি!

দাঁতে দাঁত চেপে বিন্দু পুরুষটার দুটো

হাতের মুঠো গাছের ডাল থেকে টেনে ছাড়িয়ে আনল। কি শক্ত বাঁধন। হায় গো। তারপর জলের ওপর দিয়ে টানতে লাগল ও। পুরুষটাকে জড়িয়ে ধরেছে যে মেয়েটা তার হাতের বাঁধন একটুও আলগা হল না। বউটার মুখ জলে গোঁজা। কচুরিপানার শেকড়ের মত রাশ রাশ চুল ভাসছে। পুরুষটাকে টানতে বউটাও উঠে আসছিল চরের দিকে। বিন্দুর বুকটা কেমন করছিল।

বালির ওপর ওদের এনে বিন্দু হাঁফিয়ে চলে এল পুরুষটার মাথার কাছে। তারপর ঝুঁকে পড়ে হাত নিয়ে এল পুরুষটার নাকের কাছে। না, বাতাস নেই। শরীরটা ফুলে ঢাই। জামা কাপড়ে মাংস চেপে বসেছে। কদিনের মড়া কে জানে। বউটার মুখ বালির ওপর পাশ ফিরে আছে। উপুড় হয়ে শোয়া। বউটার বয়স কম, সুন্দরই। বিন্দুর থেকে তো কম নিশ্চয়ই। মুখ চোখ দেখে তো সুন্দরই লাগে। বিন্দু দেখল বউটার বাঁ নাকের পাটায় ফুটো আর তাতে একটা সুতো জড়ানো। অজান্তে নাকে হাত দিল বিন্দু। না তার নাক সে ফুটোতে দেয়নি।

এই নিয়ে মায়ের কি রাগারাগি। আট বছরের বিন্দু গোঁ ধরেছিল, না আগে মাকড়ি এনে দাও তবে নাক ফুটোবো। হলুদ সুতো পরবো না। এখন এই বউটার জন্যে ওর হঠাৎ মায়া হল। আহা বেচারী।

পুরুষটার হাত ধরে টানতে লাগল বিন্দু। হেই বাপ, কি ভার শরীরে। জলে খেয়া যায়নি। জলে শরীর খেয়ে নেয় যে। বিন্দু প্রায় ঝুঁকে পড়ে পুরুষটাকে টানতে লাগল। বলা যায় না, যদি সাঁতা না ধরে থাকে। সেই সেবার কাকে যেন মড়া বলে জলে ফেলা হল, সাত বছর পরে সেই আবার বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ফিরে এল। কথায় বলে জলের মরা না মাটির সরা। মাটিকে জলে দাও গলে যাবে। কিন্তু মাটির সরায় প্রাণভোর জল খাও, ঠিক থাকবে। এও তেমন। জলে জলে জীবন পায়। গোড়ালি বালিতে বসে যাচ্ছে, বিন্দুর কপালে ঘাম জমছিল। বালিমাখা শরীর কাদাখোঁচা পাখির মত কাঁপছিল। টানতে টানতে ওদের অনেকটা উঁচুতে, প্রায় কাশ-ফুলের জঙ্গলের গায়ে এনে ফেলল ও। বউটার হাতের বাঁধন একটুও আলগা হয়নি। বালির ওপর দুটো শরীর জঙ্গলের মত [illegible] এসেছে। বিন্দু হাঁপাতে লাগছিল। কখন ওর কেমন ভয় করতে লাগল। এই নির্জন নদীতীরে দুটো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ও কেমন একা বোধ করতে লাগল। অথচ এই এতক্ষণ, জল থেকে ওদের টেনে তোলার সময় ওর মাথা এই কথাটা ছিল না। বিন্দু মুখের কাছে মুখ [illegible] দেখল। না, কিছু, কোথাও নেই। ওর শরীর হঠাৎ সির সির করে উঠল। আর তারই দমকে বিন্দু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল বাঁধের দিকে, বাঁধের পেছনে এক হাঁটু কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা শানপাড়ার দিকে। নদীর বুক থেকে একরাশ ভিজে হাওয়া বিন্দুকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল যেন, বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

পাড়ার ভিতরে এসে বিন্দু থমকে দাঁড়াল। বাইরে কেউ কোথাও নেই। বৃষ্টির জোর বাড়ছে। কাকে বলবে ও। সুরেন সেন পাড়ার মাথা। লোকটার চোখ সব সময় বিন্দুকে দেখলেই চকচক করে। না, ও না। এখন তো সব যে যার ঘরে। একবার চেঁচাবে নাকি? বিন্দুর চাঁকতে গাজুর গল্পটার কথা মনে পড়ে গেল। ভীড় জমলে তি আর পাঁচটা হাত গায়ে পড়বে না? কজনকে সামলাবে ও। এই তিনমাস তো সবাই বেকার। মাছ জল ছেড়ে উঠে এসেছে। পাড়ার এক হাঁটু কাদা ঠেলেও সবাই ছুটবে। না, চেঁচানো চলবে না।

বিন্দু কাপড় সামলে নিজের দাওয়ায় উঠে এল। বুড়ি শাশুড়ি হেমাথা হয়ে কোণায় বসে। বিন্দু দেখেও দেখল না। সোজা ঘরে ঢুকে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'হেই, উঠ উঠ, উঠ না কেন।' বিন্দু হাত ধরে ঝাঁকাল। বিন্দুর স্বামী হাঁ করে কি ভাবছিল, থতমত হয়ে বউকে দেখল। তারপর কাদাবালি মাখা ভেজা শাড়ি জড়ানো অদ্ভুত চেহারাটাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে মুখটাকে ছুঁচলো করল।

'আঃ, মরণ আমার।' একবার নদীর ধারে চল কেন।' বিন্দু ছটফট করছিল।

'নদীর ধারে? এখন? পাগল নাকি!' লোকটা বলল।

'বিরাট গাছ ধরেছি। এক কুড়ি টাকার গাছ। আর জোড়া বরবউ। মড়া।'

'মরা? মরা তুই পালি কোথা?' এবার সে কটা উঠে বসল।

'ওই গাছের সঙ্গে ছিল যে।'

বিন্দু দেখল গেঁজেলটা কি ভাবল খানিক। তারপর 'চল' বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এত সহজে ওকে ঘর থেকে আনতে পারবে ভাবেনি বিন্দু। লোকটা একবার বৃষ্টি দেখল তারপর মাটিতে নামল। বিন্দু চাকাতে দেওয়ালে গোঁজা দা-টা টেনে নিয়ে স্বামীর পিছন ধরল। গাছটাকে কেটে কেটে ছোট করতে হবে।

ওরা দুজনে প্রায় নিঃশব্দে হাটছিল যদিও পাড়ার কেউ বাইরে নেই তবু বিন্দুর সঙ্গে ওর স্বামীকে হেঁটে যেতে দেখলে অনেকের সন্দেহ হতে পারে। এ দৃশ্য খুবই অচেনা সবার। ওরা বাঁধের ওপরে উঠে এলে বিন্দু দৌড় লাগাল। বাতাসে ওর চুল কাপড় উড়ছিল। ওর তর সইছিল না। বৃষ্টি মাথায় করে ও ছুটছিল নদীর দিকে ভেজা বালি মাড়িয়ে। ওর স্বামী দৌড়াবার চেষ্টা করল না। মুখ বেঁকিয়ে দাঁত চেপে গজরাল, 'হেই বাজা মেয়েমানুষটা, দৌড়াস কেন রে, ফুর্তির পোকা মাথায়? আঁ।'

বিন্দুর কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল।

দৌড়ে ও যতই নদীর কাছাকাছি আসছিল ততই ও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। নদীর গায়ে এসে ও থপ করে বালিতে বসে পড়ল। মা, গাছের গুঁড়িটা নেই জল বেড়েছে। বেশ খানিকটা উঠে এসেছে। হেই মা বুড়ি তিস্তা, এটা কি রকম বিচার মা। পাঁচ পয়সার বাতাসা মানত দিলাম তোমারে। বিন্দু আশেপাশের জলে গাছটাকে খুঁজে পেল না। স্রোত কখন এসে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

অবসন্ন হয়ে বিন্দু দেখল অনেক দূরে বালির ওপর দিয়ে ওর স্বামী আসছে। ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর। এই গেঞ্জেলটা ওর যম, ওর অপয়া। বিন্দু রাগে এক দলা থুতু ফেলল বালিতে। তারপর মুখ তুলে দেখল মরা দুটো কাশফুলের গোড়ায় তেরছা পড়ে আছে। আর হ্যাঁ, শকুন তিনটে খানিক দূরে, যেন ওকে দেখেই সরে দাঁড়াল।

খানিক বাদেই গেঞ্জেলটা এসে গেল। এসে কোমরে হাত রেখে মড়া দুটোকে দেখল। তারপর বলল, 'বাহা, বেশ ডাগর বউ হে! শরীর খান জবর।' সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুর মাথাটা ঘুরে গেল। যেন চৈত্রের মাসের ভর দুপুরে উনুনে হাত রাখল সে। দাঁতে ঠোঁট চাপল ও। মেয়েছেলের ন্যাংটো বুক দেখে নোলা ঝরছে। বিন্দুর হাতের মুঠো দা-এর বাঁটে শক্ত করে বসল।

জরিপ করছিল লোকটা। তারপর বলল 'কি করবি লাস দুটো নিয়ে, হ্যাঁ?'

বিন্দু কোন জবাব দিল না।

গেঞ্জেলটা ঠোঁট ছুঁচলো করে একবার চুক চুক শব্দ করল। তারপর চার পাশ দেখে নিয়ে এক গাল হাসল, 'হেই রে কাঠ কষ্ট আঁ!'

বিন্দুর বুকের মধ্যে যেন পোড়া কাঠের ছেঁকা লাগছিল। ওর হাতের মুঠোয় ধরা দা-টা এখন কাঁপছে তিরতির করে।

গেঞ্জেলটা এবার মড়া দুটোর চারপাশে একবার চক্কর মেরে নিল। তারপর হাঁটু গেড়ে পুরুষটার পাশে বসে টেনে হিঁচড়ে বউটার হাতের বাঁধন খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখল। পুরুষটা একটু কাত হয়ে গিয়েছিল। জলে ভিজে শাওলা রঙের শরীর কেমন নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে বেহুশ হয়ে। গেঞ্জেলটা এবার চটপটে হাতে পুরুষটার জামা ধরে টানাটানি করতে করতে কলার খোলার মত শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর বিন্দুর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'এর আর জামার কি দরকার, বল? প্রাণ উড়ে গেলে শরীর মাটি হয়।' বলে কোমরের কসি খুলে কাদা মাখা ধুতিটাও সর সর করে খুলে নিল। ফুলে যাওয়া শরীর থেকে কি করে জামা কাপড় খুলে নিল গেঞ্জেলটা, বিন্দু চোখ চেয়েও বুঝতে পারল না।

একদম উদোম হয়ে পড়ে রয়েছে পুরুষটা। জল খেয়েছে জব্বর। জলে শরীর যেন শুষে নিয়েছে। গেঞ্জেলটার জোড় সারা অঙ্গে। বিন্দু দা হাতে উঠে দাঁড়াল। এই সুযোগ, কেউ নেই, ব্যাপারটার সাক্ষী কেউ নেই। হেই মা তিস্তা, পাপ নিও না গো।

জামাকাপড় থেকে ভাল করে জল নিংড়ে কাঁধে ফেলে বউটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল গেঞ্জেলটা। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বউটা। বুকের পাশে খুলে যাওয়া আঁচলটা তুলে গেঞ্জেলটা বলল, 'আই বাপ নতুন কাপড় হে!' বলে হিড় হিড় করে টান দিল, যেন নৌকোর গুণ টানছে। বিন্দু দেখল বউটার শরীর কয়েক পাক সরিয়ে কাপড়টা খুলে এল।

কাদামাখা শাড়িটা নিয়ে গেঞ্জেলটা দু' পা এগিয়ে এল 'নে ধর, নতুন শাড়ি। হাই বাপ, মা কালীর মত দেখায় যে তোরে। নে মে পরে নে ক্যান!' তারপর গোপন কিছু বলছে এমন মুখ করে বলল, 'শুনিস নাই, মৈথুনে সাপের অঙ্গ-ছোঁয়া বস্ত্র খুব পয়মন্ত। এরাও তো সাপের মত। জলে ভেসে এল যে।' বিন্দুর দিকে শাড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে বাঁধের দিকে কয়েক পা হেঁটে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'লাস দুটো জলে ফেলে দেবে, ভেসে যাক। শালা জবাব দিতে দিতে প্রাণ ভোর হয়ে যাবে কিন্তু।'

কি বলল গেঞ্জেলটা? মৈথুনে সাপের কথা বলল কেন? বিন্দু হতভম্ব হয়ে পড়ল। সত্যি নাকি? বিন্দু ভাবতে পারছিল না কিছু। যে ভাবে ওরা জড়িয়ে ছিল—হে মা মনসা, তুই কি তুমি গাছ থেকে নেমে এলে? বিন্দু ক্রমশ রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

শাড়িটা দেখল ও। নতুন শাড়ি। জলে

ভিজে কেমন আঁশটে গন্ধ হয়ে গিয়েছে। ধার দিয়ে কেটে নিলেই হবে। এই মুহূর্তে কাঠ হারাবার দুঃখও ভুলে গেল।

লাস দুটো পড়ে আছে। বিন্দু পুরুষটার পা ধরে আবার টানতে লাগল। টানতে টানতে এক সময় বালির ওপর থেকে নামিয়ে তিস্তার জলে ফেলল ও। এখন শরীরের দিকে তাকানো যায় না। ঘেন্না ঠিক নয়, কেমন লজ্জাই করে যেন। একবার যখন বউএর বাঁধন খুলেছে তখন আর কেন। পা দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই দূরে চলে গেল লাসটা। তারপর স্রোতের টানে ঘুরপাক খেয়ে পলকে উধাও।

এত ভারী কেন বউটা। পুরুষটার চাইতে ভার বেশী। জল খেয়েছে খুব। বউটার শরীর ধরে বিন্দু এবার টানছিল। ওর কপালে সদ্য জাগা ঘাম বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে। খুব কষ্ট হল ওর বউটাকে জলের কাছে আনতে। একটা হ্যাঁচকা টানে বউটাকে ও জলে নামিয়ে দিল। টানের চোটে ঘুরে গেল শরীরটা, ঘুরে চিৎ হল। আর তখনই, বিন্দুর সারা শরীর থেকে একটা চিৎকার ছিটকে বেরিয়ে এল। মুখে আঙুল দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ও ঝুঁকে পড়ল। এতক্ষণ বুঝতে পারেনি ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি। উপুড় হয়ে ছিল বলে নজরে আসেনি। এখন চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়, ভরা মাসের পেট। হাই মা গো।

ওটা কি! বিন্দু দেখল, নাই-এর পাশে বউটার চামড়া টান টান, পেটটার একটা খোঁচা উঠে আছে। ভেতর থেকে সেটা ঠেলছে নাকি। বিন্দুর শরীরে লক্ষ কদম-ফুল চনবনিয়ে উঠল এবার, ওর কেমন ঝিমুনি এসে গেল। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে কান পাতল বিন্দু, যদি কোন শব্দ হয়। না, নিথর, একদম নিথর। বড় বড় চোখে বিন্দু দেখল, নাই থেকে একটা কালো রেখা নিচে চলে গিয়েছে সোজা। এর মানে ছেলে হবে। পেটের ভিতর বন্দী থাকা সেই মানিকটা এখন কি করে! হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল ও।

তারপর বিন্দু যখন এক সময় হাত সরিয়ে নিল তখন বউটার শরীর দুলতে দুলতে জলের তালে সরে যাচ্ছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল, সেই তিনটে শকুন যেন নাচতে নাচতে বালির ওপর দিয়ে এগোচ্ছে পাখা ফুলিয়ে। তারপর তিনজনেই আলাদা উঁচু গোলকটার মত একটা চক্কর কেটে বউটার শরীরে গিয়ে বসল।

বিন্দু চিৎকার করে উঠল। এমনই ঠেকাবার নয়। সেই বুড়ি তিস্তা, ওরে ডুবায়ে দাও, জননী গো। হাঁটু জল ভেঙে মুঠোয় ধরা কাপড়টা ছুঁড়ে মারল বিন্দু। ঐ গোলকটা—অসুর পাপ। আবরণটা থাকত একটু আড়াল। না, বিন্দু দেখল, শাড়িটা বউটার শরীর পর্যন্ত পৌঁছল না।

শকুন তিনটে দেখছে এক চোখে। জলের কিনার ধরে বিন্দু দা-টা মাথার ওপর তুলে হেট হেট শব্দ করে ছুটছিল। বউটার নাই-এর পাশে বসেছিল যেটা, আলতো করে এবার ঠোকর বসাল। আর বিন্দু তখন তীব্র চিৎকার তুলে হাতের দা-টা ছুঁড়ে মারল শকুনগুলোর দিকে। শনশন শব্দ তুলে হাওয়া কেটে বউটার পেটে গিয়ে বিঁধলো সেটা। আচমকা আক্রমণে শকুনগুলো লাস ছেড়ে উঠল ওপরে। উড়ে ঘুরপাক খেতে লাগল।

দা-টা বিঁধে যেতেই বিন্দুর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। টান টান পেটে দা-টা কি সহজে ঢুকে গিয়ে অনেকখানি চামড়া চিরে ফেলেছিল। আর তার ফাঁক দিয়ে সেই খোঁচা হওয়া জায়গাটা যেন লাফিয়ে বেরিয়ে এল। বিন্দু দেখল একটা প্রায় পুরুষ্ট হাত সোজা পেট থেকে উঠে এসেছে। তার মুঠো যেন আকাশের দিকে বাড়ানো।

বউটার শরীর এবার স্রোতের টান পেল। সেই নিশ্চল হাতটার দিকে বিন্দু বোকার মত তাকাল। শকুন তিনটে ক্রমশ ওপরে উঠে যাচ্ছে।

একটা পাথরের মূর্তির মত সেই নির্জন নদী তীরে দাঁড়িয়ে বিন্দু দেখল, একটা নরম নিটোল হাত আকাশটাকে মুঠো করে কি গভীর সুখে বউটাকে পালের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বাংলাদেশের স্মৃতি

বিজয়কৃষ্ণ আচার্য

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আমি ছিলাম ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার। সে দিনগুলির স্মৃতি আমার কাছে এখনও উজ্জ্বল। ঢাকা তখন পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী এবং ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার তখন শত্রু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। তা সত্ত্বেও বাঙালী জনসাধারণের কাছ থেকে যে সৌজন্য, যে ব্যবহার, এমনকি যে সৌহার্দ্য আমি পেয়েছি তা ভুলবার নয়। আমি বাংলাদেশের সাহিত্য বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখবার চেষ্টা করব না—কিন্তু সে সময়কার স্মৃতির কয়েকটি সামান্য টুকরো পাঠকদের কাছে পেশ করব।

এই ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং তার অব্যবহিত পূর্বের ও পরের ঘটনাগুলি আমার মনে যে দাগ কেটে গেছে তা মুছবার নয়। মনে পড়ে পূর্ব বাংলায় হরতাল—মনে পড়ে জিন্নার হুকুমের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রুখে দাঁড়ানো—মনে পড়ে ১৪৪ ধারা এবং পুলিসের গুলি—মনে পড়ে বরকত, জব্বার, রফিক ও সালাম প্রমুখ প্রায় ৪০ জনের আত্মাহুতি—মনে পড়ে বিরাট শোকের মিছিল, মনে পড়ে গণজাগরণ এবং তাকে দমন করতে গিয়ে সৈন্যবাহিনীকে তলব। মনে পড়ে আমার মাতৃভাষার জন্য ছাত্রদের প্রাণ দেওয়াতে স্বাভাবিক বেদনার সঙ্গে আমার মনের কৃতজ্ঞতা ও গর্ব। এবং এরই সঙ্গে মনে পড়ে একটা মজার কথা—ছাত্রদের একটা ব্যঙ্গ কবিতা—রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী"র একটা প্যারডি। এটি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে নিয়ে:

"ঢাকার গগনে মেঘ—নাহি ভরসা
ক্রোধভরা জনতা খর পরশা"
"গাল তুলে ভুঁড়ি ঝুলে, কে আসে পারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

তারপর মনে পড়ে এই গণ-আন্দোলনকে দমন করবার জন্য লীগশাহীর আপ্রাণ চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে স্লোগান এবং তার সঙ্গে ভারত যে কত বড় বহিঃশত্রু, তা প্রমাণ করবার প্রয়াস। মনে পড়ে ১৯৫২ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান দিবসে ঢাকা রেস কোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরাট প্যারেড এবং সেই প্যারেড প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমার নিমন্ত্রণ। সামিয়ানার নীচে আমার আশেপাশেই বসে ছিলেন চীফ সেক্রেটারী এবং বিভাগীয় কমিশনার—দুজনেই পশ্চিম পাকিস্তানী এবং যে দেশ শাসন করতে এসেছেন তার ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে পড়ে সেদিন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেব ভারতের বিরুদ্ধে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী "জোরদার" বক্তৃতা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁর "জ্বালাময়ী" বক্তৃতার ভাষা ছিল বাংলা—অতএব চীফ সেক্রেটারী ও কমিশনার সাহেব তাঁদের মন্ত্রীর হাত-পা নাড়াটাই দেখলেন—এক অক্ষরও বুঝলেন না। বক্তৃতার শেষে তাঁরা আমাকে অবাক করে দিলেন। যে শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই জোরদার বক্তৃতা, তারই প্রতিনিধি আমাকে ব্যস্তভাবে চুপি চুপি অনুরোধ করলেন তাঁদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাটার প্রধান বক্তব্যগুলো তাঁদের কাছে ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিতে। আমি তাঁদের অনুবাদ করে জানিয়ে দিলাম যে, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আমার দেশের প্রতি এই এই গালাগালি প্রয়োগ করেছেন। আমার মনে হয় এ রকম একটা অদ্ভুত ঘটনা সারা পৃথিবীর কূটনৈতিক জগতে অন্য কোথাও হতে পারে না। যাঁর প্রদেশের প্রধান কর্মচারীরা তাঁদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের একবর্ণও না বুঝতে পারেন এবং না বোঝার দরুণ শত্রু রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে অনুবাদ করে দিতে অনুরোধ করতে হয়, তবেই বুঝুন কায়েদ-আজমের পাকিস্তানের ভিত কত ঠুনকো। আমার

১৪নং লিটকুইজের অফিসিয়াল এনট্রি ফরম

মোট পুরস্কার : ১,১৫,০০০ টাকা। বন্ধের শেষ তারিখ বুধবার, ৫-৪-৭২

ঠিকানা : LITQUIZ NO. 94, ALANKAR BALARAM ST. BOMBAY-7

বিঃ দ্রঃ (১) প্রতি স্তম্ভে যে শব্দটি আপনি বাতিল করবেন সেটি কালি দিয়ে কেটে দিন। (২) যদি সব কুপনগুলি না পাঠান তাহলে বাকি কুপনগুলি বাতিল করুন। (৩) যদি এম ও দ্বারা এনট্রি ফি পাঠান তাহলে পোস্ট অফিস থেকে প্রাপ্ত এম ও রিসিট অবশ্যই এনট্রি ফরমের সঙ্গে পাঠাবেন। এম ও রিসিট ছাড়া এনট্রি অগ্রাহ্য হবে। (৪) আই পি ও ক্রস করবেন না। LITQUIZ NO. ৯৪ AT BOMBAY-7 কে প্রদেয় করুন।

(B)

MAIN	Re. 1	1	Re. 1	2	Re. 1	3
1	ACTIVITY	ACTUALITY	ACTIVITY	ACTUALITY	ACTIVITY	ACTUALITY
2	CLASSICS	CONTRACTS	CLASSICS	CONTRACTS	CLASSICS	CONTRACTS
3	CONSERVA-	MECHANISM	CONSERVA-	MECHANISM	CONSERVA-	MECHANISM
4	EQUALITY	SECURITY	EQUALITY	SECURITY	EQUALITY	SECURITY
5	EXISTENCE	PEACE	EXISTENCE	PEACE	EXISTENCE	PEACE
6	FACT	FAITH	FACT	FAITH	FACT	FAITH
7	FAITH	FUTURE	FAITH	FUTURE	FAITH	FUTURE
8	HUMANITY	SOCIETY	HUMANITY	SOCIETY	HUMANITY	SOCIETY
	IDEALISM	OPTIMISM	IDEALISM	OPTIMISM	IDEALISM	OPTIMISM
	INSTINCT	INTUITION	INSTINCT	INTUITION	INSTINCT	INTUITION
11	MEMORY	MONEY	MEMORY	MONEY	MEMORY	MONEY
12	MORAL	SOCIAL	MORAL	SOCIAL	MORAL	SOCIAL
13	PRESUME	PRETEND	PRESUME	PRETEND	PRESUME	PRETEND
14	REALITY	SANCTITY	REALITY	SANCTITY	REALITY	SANCTITY
15	SALVATION	SURVIVAL	SALVATION	SURVIVAL	SALVATION	SURVIVAL
16	SORROW	SWEETNESS	SORROW	SWEETNESS	SORROW	SWEETNESS

MAIN	Re. 1	1	Re. 1	2	Re. 1	3	FREE
1	ACTIVITY	ACTUALITY	ACTIVITY	ACTUALITY	ACTIVITY	ACTUALITY	
	CLASSICS	CONTRACTS	CLASSICS	CONTRACTS	CLASSICS	CONTRACTS	
	CONSERVA-	MECHANISM	CONSERVA-	MECHANISM	CONSERVA-	MECHANISM	
	EQUALITY	SECURITY	EQUALITY	SECURITY	EQUALITY	SECURITY	
	EXISTENCE	PEACE	EXISTENCE	PEACE	EXISTENCE	PEACE	
	FACT	FAITH	FACT	FAITH	FACT	FAITH	
	FAITH	FUTURE	FAITH	FUTURE	FAITH	FUTURE	
	HUMANITY	SOCIETY	HUMANITY	SOCIETY	HUMANITY	SOCIETY	
	IDEALISM	OPTIMISM	IDEALISM	OPTIMISM	IDEALISM	OPTIMISM	
	INSTINCT	INTUITION	INSTINCT	INTUITION	INSTINCT	INTUITION	
	MEMORY	MONEY	MEMORY	MONEY	MEMORY	MONEY	
	MORAL	SOCIAL	MORAL	SOCIAL	MORAL	SOCIAL	
	PRESUME	PRETEND	PRESUME	PRETEND	PRESUME	PRETEND	
	REALITY	SANCTITY	REALITY	SANCTITY	REALITY	SANCTITY	
	SALVATION	SURVIVAL	SALVATION	SURVIVAL	SALVATION	SURVIVAL	
16	SORROW	SWEETNESS	SORROW	SWEETNESS	SORROW	SWEETNESS	

BIG-MINI ONE COUPON FREE WITH EACH MAIN COUPON

94	FREE	1	FREE	2	FREE	3
1	ACTIVITY	ACTUALITY	ACTIVITY	ACTUALITY	ACTIVITY	ACTUALITY
2	CLASSICS	CONTRACTS	CLASSICS	CONTRACTS	CLASSICS	CONTRACTS
3	CONSERVA-	MECHANISM	CONSERVA-	MECHANISM	CONSERVA-	MECHANISM
	EQUALITY	SECURITY	EQUALITY	SECURITY	EQUALITY	SECURITY
5	EXISTENCE	PEACE	EXISTENCE	PEACE	EXISTENCE	PEACE
6	FACT	FAITH	FACT	FAITH	FACT	FAITH
	FAITH	FUTURE	FAITH	FUTURE	FAITH	FUTURE
	HUMANITY	SOCIETY	HUMANITY	SOCIETY	HUMANITY	SOCIETY
9	IDEALISM	OPTIMISM	IDEALISM	OPTIMISM	IDEALISM	OPTIMISM
10	INSTINCT	INTUITION	INSTINCT	INTUITION	INSTINCT	INTUITION
11	MEMORY	MONEY	MEMORY	MONEY	MEMORY	MONEY
12	MORAL	SOCIAL	MORAL	SOCIAL	MORAL	SOCIAL

BIG-MINI ONE COUPON FREE WITH EACH MAIN COUPON

94	FREE	1	FREE	2	FREE	3
1	ACTIVITY	ACTUALITY	ACTIVITY	ACTUALITY	ACTIVITY	ACTUALITY
2	CLASSICS	CONTRACTS	CLASSICS	CONTRACTS	CLASSICS	CONTRACTS
3	CONSERVA-	MECHANISM	CONSERVA-	MECHANISM	CONSERVA-	MECHANISM
4	EQUALITY	SECURITY	EQUALITY	SECURITY	EQUALITY	SECURITY
5	EXISTENCE	PEACE	EXISTENCE	PEACE	EXISTENCE	PEACE
6	FACT	FAITH	FACT	FAITH	FACT	FAITH
7	FAITH	FUTURE	FAITH	FUTURE	FAITH	FUTURE
8	HUMANITY	SOCIETY	HUMANITY	SOCIETY	HUMANITY	SOCIETY
9	IDEALISM	OPTIMISM	IDEALISM	OPTIMISM	IDEALISM	OPTIMISM
10	INSTINCT	INTUITION	INSTINCT	INTUITION	INSTINCT	INTUITION
11	MEMORY	MONEY	MEMORY	MONEY	MEMORY	MONEY
12	MORAL	SOCIAL	MORAL	SOCIAL	MORAL	SOCIAL

FREE AFTER 3 MAIN (& 3 BIG-MINI) COUPONS

MINIQUIZ

ACTIVITY	ACTUALITY	PRESUME	PRETEND
CLASSICS	CONTRACTS	REALITY	SANCTITY
CONSERVA-	MECHANISM	SALVATION	SURVIVAL
EQUALITY	SECURITY	SORROW	SWEETNESS

FREE AFTER 3 MAIN (& 3 BIG-MINI) COUPONS

ChoiceQuiz

Pick any 4 clues you feel you have correctly solved in your 3rd coupon and indicate them in the adjacent corresponding blank spaces with 'yes' tick-marks (✓). If all your 4 choices prove correct you share the Choicequiz prize of Rs. 10,000.

এই কুইজ প্রতিযোগিতায় যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিয়ম ও শর্তাবলী এবং সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও আইনতঃ বাধ্য বলে মেনে নিচ্ছি। প্রত্যেকটি কুপনের জন্য প্রবেশমূল্য ১ টাকা। এই সম্পূর্ণ এনট্রি ফরমটির জন্য প্রবেশমূল্য ৬ টাকা। এম ও রসিদ/আইপিও/লিটকুইজ ক্যাশ রসিদ এই সঙ্গে দেওয়া হল। প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর........................

১৫নং ফরম পাবার জন্য এটি ভর্তি করুন

পুরো নাম..

....

ঠিকানা..

....

পোঃ অঃ......................জেলা......................

৯৪ দেশ

ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে লিখুন

পুরো নাম..

....

ঠিকানা..

....

পোঃ অঃ......................জেলা......................

এটি কেটে নিয়ে পুরো ফরমটি পাঠান

মনে পড়ে যে এই ঘটনাটা দিল্লীতে আমি রিপোর্ট করি। ১৯৫২ সালেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক অখণ্ডত্ব সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ হয়।

সে সময়ে আমার বাড়ির সামনে চায়ের দোকানে পাকিস্তানী টিকটিকি পুলিস বসে থাকত। তাদের কাজ ছিল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কারা আসেন তার হিসাব রাখা এবং তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখা। এ সত্ত্বেও তদানীন্তন বাঙালী কবি, সাহিত্যিক, গায়ক গায়িকরা আমার গৃহে একাধিকবার এসেছেন এবং আমার গৃহে আব্বাসউদ্দিনের গানের আসর বসেছে। বিশেষ করে তদানীন্তন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের গায়ক গায়িকারা আমার গৃহে বহুবার এসে গান গেয়ে গেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবদুল আহাদ, লায়লা আর্জুমেন্দ বানু, মাস্কা পরভীন বানু প্রভৃতি। আমি লক্ষ্য করতাম যে প্রায়ই এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন—শুধু আমার গৃহে নয়, পাকিস্তান রেডিওতেও। এই রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত কর্তাদের একেবারেই মনঃপূত ছিল না। তাই আচিরেই তাঁরা ফতোয়া দিলেন যে রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান ও আবৃত্তি কমাতে হবে এবং তার জায়গায় ইকবালের কবিতা আবৃত্তি করতে হবে এবং গজল গাইতে হবে। রেডিওর গায়ক গায়িকরা এ হুকুম মেনে নেন নি এবং কিছুদিন এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেন। ফলে এই হুকুম বেশীদিন চালু রাখা গেল না, আবার রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান শোনা গেল।

বাঙালী কবি ও সাহিত্যিকরা স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের জাতীয় কবি ও কবিগুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের হাই কমিশনে পঁচিশে বৈশাখ যখন আমরা রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান করতাম—তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার শহীদুল্লা প্রমুখ অনেকেই যোগ দিতেন। এমনকি একবার ফজলুল হক সাহেবও এসেছিলেন। তখনকার ভাষা-আন্দোলনে ও ভবিষ্যতে বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনে পূর্ব বাংলার কবি ও সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথকে একটা বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন। ১৮ বৎসর পরে ১৯৭০ সালে যখন আমি ইসলামাবাদে হাই কমিশনার ছিলাম এবং সেখান থেকে ঢাকা গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম নূতন কবি নিয়ামত হোসেন লিখছেন:—

"আমাকে কুচি কুচি করে কাটলেও
রক্ত মাংস সবটুকুই
বাংলা
হৃদয়ের দুঃখ শোক প্রেম, শান্তি
সবটুকুই
বাঙালী
বাঙালী বড় বেদনা

তবু এ বেদনা ছাড়াও
অনেক গল্প নাট্যসাহিত্যে
অনেক গানে গানে
হৃদয়ে অনুভব করি
অনেক শেক্সপীয়র দান্তে তলস্তয়ের
স্মৃতিতে
মাথা নীচু হয়
কিন্তু আমার হৃদপিণ্ডের রক্ত ধারায়
গোটা একটা রবিঠাকুর।
খেতে শুতে উঠতে বসতে
বিরহে মিলনে
হৃদয়ের কানে কানে গান গায়
রবীন্দ্রনাথের ভাষা
হৃদয়কে ঘর পার করে পৃথিবীর
পড়শীদের সাথে
মিতালী পাতিয়ে আনে
মিতালী পাতিয়ে আনে
এই ভাষা
প্রতি পদক্ষেপে পরাজয়ের পর
পালাবার পথে
মস্তিষ্কের কোষে কোষে
হৃদয়ের অলিতে গলিতে
নিঃশব্দে পদচারণা করে ফেরে
সবাক অথবা নির্বাক
আমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষা
এ ভাষাই
রবীন্দ্রনাথ
আমরাও বাঙলা।”

অবশ্য যেমন পশ্চিম, তেমনি পূর্ব বাংলার অনেক কবি সচেষ্টভাবে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হবার প্রয়াস করেছেন। এর মধ্যে কবি সিকান্দর আবু জাফর আমার পরিচিত। তিনি কবিগুরুর সম্বন্ধে লিখছেন—

“আমি তাই খুঁজেছি প্রত্যহ
আছে কিনা তেমন পৃথিবী
যেখানে প্রান্তরে পথে
দিগন্তে আকাশে
তোমার দীপের থেকে ধারকরা আলো নিয়ে
জ্বলবে না শুকতারা।”
কিন্তু তিনিও শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন:—
“তবু দুঃখ, সহসা জেনেছি
আমার যে দেখার তৃষ্ণা
সে যে একান্ত চেনা
তোমারই জিজ্ঞাসা।
আমাকে বেষ্টন করে আছো
অবিশ্বাস্য অদৃষ্টের মতো,
আমাকে আচ্ছন্ন করে আছো
প্রতিমুহূর্তের বর্জনের প্রয়াসে থেকেও
অনিবার্য অভ্যাসের মতো।”
কবি জিয়া হায়দার লিখেছেন:—
“তোমার স্মৃতিকে আমি এতোবার
প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া
ক্রুদ্ধ, বেয়াড়া, দামাল কিশোরের মতো
ডুবিয়ে দিতে চেয়েছি নিঃশেষে অন্ধকারে।
অবশেষে অক্ষম শয়তানের মতো
নিজেই কেঁদেছি বিবিক্ত পরাজয়ে;—
তুমি ক্ষমা করো অজ্ঞাতেই।
যেহেতু জেনেছি
আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো।”

২১শে ফেব্রুয়ারীর দমননীতির প্রথম জবাব পাকিস্তানী সরকার পেয়েছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। আমি তখনও ঢাকায়। করাচিতে আমার হাই কমিশনার ছিলেন ডঃ মোহন সিং মেহ্তা। নির্বাচনে লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল হক-সুরাবর্দীর যুক্তফ্রণ্ট। নির্বাচনের ফল সম্বন্ধে লীগ-সরকারের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলি আমার হাই কমিশনারের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, “The election will be a walkover for the League” আমি কিন্তু অনেক দিন থেকেই রিপোর্ট করছিলাম যে লীগের বিরাট পরাজয় হবে। নির্বাচনের ফল যখন বের হল তখন দেখা গেল যে, ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ পেয়েছেন মাত্র দশটি—আর যুক্তফ্রণ্ট ২২৩টি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের Land-slide Victory—পূর্ব বাংলার ইতিহাসে মোটেই নতুন নয়। পূর্ব বাংলার জনগণ চিরকালই দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা পশ্চিম পাকিস্তানী লীগের ইসলাম ভিত্তিক রাষ্ট্রে বিশ্বাস করে না—তারা ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বন্ধনের ধর্মান্ধতার বন্ধনের চেয়ে অনেক গভীর ও মজবুত। তারা প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্বন্ধ চায়—দ্বেষ, হিংসা ও বিবাদের সম্বন্ধ নয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জয়, আওয়ামী লীগের জয়, বাংলাদেশের জয়—এই জয়ের এটাই একটা বড় তাৎপর্য। এটা শুধু এপার বাংলা-ওপার বাংলা'র নামে বাঙালীর ভাবপ্রবণতার মাতামাতি নয়। এটা একটা আদর্শের জয়। যে ধর্মান্ধতার বীজ একদিন ভারত-পাকিস্তান ভূখণ্ডের পশ্চিম দিক থেকে ছড়িয়ে পড়ে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিষাক্ত আগাছায় জঙ্গলে ছেয়ে ফেলেছিল, আজ তার বিরুদ্ধে একটি নবজাত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেখানে নব অরুণোদয়ের রক্তিম আভা দেখা যাচ্ছে। এখনও বাধা অনেক, শত্রু অনেক। কিন্তু যাঁরাই যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাস করেন—তাঁরাই কায়মনোবাক্যে এই নূতন রাষ্ট্রের মঙ্গল কামনা করবেন—তা সেই সব হিতৈষীরা ভারতবাসীই হোন, পাকিস্তানের নাগরিকই হোন, ইংরাজই হোন, ফরাসীই হোন বা রাশিয়ানই হোন। এবং প্রেসিডেন্ট নিকসন বা চু-এন-লাইও হয়তো একদিন চিন্তা করে দেখবেন যে, কেবলমাত্র ভারতকে দাবিয়ে রাখার জন্য অথবা জগতের অন্যত্রও সস্তায় কূটনীতির কিস্তিমাৎ করবার জন্য মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতাকে পরিপোষণ করার তাঁদের যে উৎকট প্রচেষ্টা, এতে সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাসে একটা বিষময় ফল ফলবার সম্ভাবনা আছে কি না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের তাৎপর্য কি এ বিষয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের একটা সাম্প্রতিক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি। ‘সেকুলারিজমের প্রকৃত অর্থ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহ্য করাই নয়, তার প্রকৃত অর্থ হলো সমাজ ও ব্যক্তি চেতনার মূলে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদকে স্বীকৃতি দেওয়া। যুক্তি বা যুক্তির মুক্তি, ও ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে সর্বত্র বিজ্ঞানসম্মত বিচার আচারকে প্রাধান্য দেওয়া।’ ধর্মনিরপেক্ষতার এই আদর্শ যে ভারতেও আজও সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে তা বলা চলে না। এ কথাটা আজ বাংলাদেশে যেমন স্বীকৃত হচ্ছে—সে রকম যদি ভারতেও স্বীকৃত হয় এবং ভবিষ্যতে কোনও দিন যদি পাকিস্তানে এবং আয়র্ল্যাণ্ড প্রমুখ অন্যান্য দেশেও স্বীকৃত হয়—তবেই ২১শে ফেব্রুয়ারি সার্থক। কেউ কেউ ২১শে ফেব্রুয়ারির বিপ্লবকে ফরাসী বিপ্লব, না রুশবিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করেন। এ তুলনা তখনই সার্থক হবে যখন সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক এবং বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সকলেরই কাম্য হবে।

*

হিন্দু বাঙালী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আজও যে মুসলমান বাঙালী সম্প্রদায় একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি, এই সহজ সত্যটা স্বীকার করে বহুলে প্রচারিত পত্রিকায় তুলে ধরার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন মনোভাব সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্যও গ্রহণ করুন আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আদিবাসী সম্প্রদায় আধুনিক সভ্য ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব তো করেই না বরং বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়াসই তাঁদের মধ্যে আন্তরিক। যে কোন সভ্য ভারতবাসীর পক্ষে তা শুভ বোধ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার প্রশ্ন ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের পক্ষে সভ্য ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার কোন কারণ আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, এই ভারতবর্ষের মাটিতেই, সমন্বয় ঘটেছে বহু বিভিন্ন সংস্কৃতির, শক, হুন পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় এই ভারতের মাটিতে একদেহে লীন হয়ে গেছে, পরবর্তীকালে এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই ভারতবর্ষের মহান নেতা পণ্ডিত নেহরুর কণ্ঠে। যদিও 'Unity in diversity' কথাটা বহুল ব্যবহারে জীর্ণ তবু শুনতে মন্দ লাগে না, স্বীকার করে নিলাম ভারতবর্ষ শক, হুন, মোগল, পাঠান প্রভৃতি বহু বহিরাগত জাতিকে আপন করে নিয়েছে, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই সমস্ত বহিরাগত সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ক্ষমতা যখন এতই প্রবল, তখন এমন কি কারণ আছে যাতে একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ভারতবর্ষের প্রায় সাড়ে চার কোটী আদিবাসী এবং খণ্ডজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আপন করে নিতে পারল না, রক্তের সংমিশ্রণের কথা বাদই দিলাম, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন সমন্বয় পর্যন্ত সাধিত হল না! অবশ্য বিরাট হিন্দুসমাজের কুৎসিত জাতি প্রথার দুরারোগ্য ক্ষতলাঞ্ছিত পদপ্রান্তে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কোন কোন শাখা আপন আসন ঠিক করে নিয়েছেন, একথা অস্বীকারের উপায় নেই। কিন্তু তবু হিন্দু সমাজ যে তাঁদের আপনজন বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে তুলে ধরার মত এমন কোন নজীর নেই। খুব বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নেই, পশ্চিমদিকে বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে কিছুটা গেলেই চোখে পড়বে "আধুনিক সভ্য ভারতের টাটানগরে বিংশ শতাব্দীর ইস্পাত সভ্যতা উদগ্র জ্যোতির গর্বে জ্বল জ্বল করছে, কিন্তু তারই চারপাশে মাইল পাঁচেকের মধ্যে সিংহভূমের শালবনে আজও আদিবাসী নরনারী, পাথরের কুঠার কাঁধে নিয়ে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কুটীর নির্মাণের পদ্ধতি পর্যন্ত জানে না। ইস্পাত সভ্যতার পাশেই মূর্তিমান প্রস্তর সভ্যতা।"

সেই সুপ্রাচীন রামায়ণের যুগ থেকে আজ স্বাধীন ভারতের রজতজয়ন্তী বৎসর অবধি এমন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা তথ্য আমাদের মধ্যে নেই যা থেকে নির্দ্বিধায় বলা চলে, আর্য ভারতবাসী প্রাগার্য ভারতবাসীকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। রামায়ণ বর্ণিত গুহক চণ্ডালের উপাখ্যান এ প্রসঙ্গে মনে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকেও মিতা রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। এবং হনুমানকেও তিনি একনিষ্ঠ সেবক এবং বন্ধুরূপে আপন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফলে কি আর্য এবং প্রাগার্যদের কোন সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হয়েছিল? বরং বলা চলে হনুমান এবং গুহকের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা ছিল সামান্য রাজনৈতিক সৌহার্দ্য মাত্র। সাংস্কৃতিক কোন সমন্বয় এই অনার্য দলপতিদের সঙ্গে রাজা রামচন্দ্রের ঘটেনি। প্রবল শক্তিধর প্রাগার্য রাজা রাবণকে পরাভূত করার জন্য এই সমস্ত প্রাগার্য দলপতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ছাড়া শ্রীরামচন্দ্রের গত্যন্তর ছিল না। মহাভারতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। অজ্ঞাতবাসকালে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, হিড়িম্বা এবং নাগকন্যা উলুপীকে কিছুকালের জন্য শয্যাসঙ্গিনী রূপে ব্যবহার করলেও ধর্মপত্নীর মর্যাদা তাঁদের ছিল না। ইন্দ্রপ্রস্থ এবং হস্তীনাপুরের ক্ষত্রিয় গরিমায় প্রত্যাবর্তনের পর এই দুই ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ, তাঁদের নির্বাসিত জীবনের শয্যাসঙ্গিনীকে ভুলে যেতে খুব বেশী সময় নেননি। বহুকাল পরে মনে পড়েছিল পুত্র ঘটোৎকচের কথা। যুদ্ধের

জন্য প্রয়োজন না হলে মনে পড়ত কী না তা বলতে পারতেন একমাত্র মহাকবি বেদব্যাস। প্রাগার্যেরা আর্যদের সমান স্তরে জীবন যাপন করুক, এটা আর্যেরা কখনোই মেনে নিতে পারেননি, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ছড়িয়ে আছে একলব্যের মরণান্তিক ট্র্যাজেডিতে। আর্যদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য অনার্য সন্তান একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষাদানে সম্মত হননি। তৎসত্ত্বেও স্বীয় নিষ্ঠায় এবং একাগ্র সাধনায় একলব্য, আচার্য দ্রোণের প্রিয় শিষ্য অর্জুন অপেক্ষাও অস্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এক অখ্যাত অনার্য সন্তানের এই শ্রেষ্ঠত্ব আচার্য দ্রোণ কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাই প্রিয় শিষ্য তৃতীয় পাণ্ডবের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য অনার্য সন্তান একলব্যের কাছ থেকে দ্রোণাচার্য (যাঁকে একলব্য মনে মনে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন) গুরুদক্ষিণা হিসাবে যা আদায় করে নিয়েছিলেন, অনার্যদের প্রতি আর্য ষড়যন্ত্রের তা এক হীনতম দৃষ্টান্ত।

উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী আর্যেরা বাহুবলে প্রাগার্য সম্প্রদায়কে পরাভূত করেছিলেন, এবং বিজয়ীর সীমাহীন দম্ভে আর্যদের কাছে বিজিত প্রাগার্যেরা ছিলেন ঘৃণিত এবং অস্পৃশ্য। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর্যদের সমস্ত প্রকার আদান-প্রদান মিশ্রণ ও সমন্বয় ছিল নিষিদ্ধ। তথাপি আর্য সম্প্রদায়ের কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সঙ্গে যদি অনার্য সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কোন প্রকার আদান-প্রদান ঘটত তাহলে সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তৎক্ষণাৎ তাঁদের আর্যত্ব হারিয়ে ব্রাত্য বা পতিত বলে ঘোষিত হতেন। আর্যমনের মধ্যে যে জাতিগত ঔদ্ধত্য ছিল আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও তা তেমনি থেকে গেছে। আধুনিক সভ্য ভারতবাসী ধর্মের দিক দিয়ে অনেকখানি উদার হলেও, এই আর্যমনের অহংকার তাঁদের অস্থিমজ্জায় এমন ভাবে শিকড় গেড়েছে যে সাম্যবাদের তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়েও এঁদের অধিকাংশই এই ঘৃণ্য অহংকার বোধ থেকে আজও মুক্ত হতে পারছেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বহু প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রেখে গেছেন তাঁদের স্মরণীয় স্বাক্ষর। কিন্তু রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি মহানায়কদের সৃষ্টি বা সংস্কার কার্যে এমন কোন স্বাক্ষর নেই যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের আদিবাসীদের তাঁরা অন্যান্য ভারতবাসীর সমপর্যায়ের মানুষ বলে ভাবতে পেরেছিলেন। যাঁরা স্বজাতি নিন্দিত এবং বিজাতি বিজিত,

ছোটজাত, ঐ যারা চাষা, ভুষা, তাঁতী, জোলা, মুচি মেথর, বিবেকানন্দ তাঁদের জন্য বেদনা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু আদিবাসী মানুষের যন্ত্রণার বেদনা তাঁকেও তেমনভাবে আহত করেনি। শোনা যায় সভ্য মানুষের ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর একদা স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন কার্মাটাঁড়ের সাঁওতাল পল্লীতে। সেখানকার আদিবাসী জনতা মানবিক ব্যবহারে তাঁর হৃদয় জুড়িয়ে দিয়েছিল। তথাপি সেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বিরাট এবং বিস্ময়কর কর্মজীবনে আদিবাসী সমস্যা কোথাও ঠাঁই পায়নি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কোথাও কোথাও আদিবাসীদের উল্লেখ নেই এমন নয়, কিন্তু উৎসব মুখর সাঁওতাল পল্লীর দ্রিম দ্রিম দুন্দুভি রব কিংবা ক্যামেলিয়া কাব্যে সাঁওতাল মেয়ে তাঁর কাব্যের আবহ সৃষ্টি করেছে মাত্র। ভারতবর্ষে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং যন্ত্রণার কথা কোন কারণে রবীন্দ্রনাথের মত সহৃদয় প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থেকে গেল তা সত্যি ভাবতে অবাক লাগে। ভারতীয় সংস্কৃতির এমন কোন দিক নেই যা রবীন্দ্র-প্রতিভার যাদুস্পর্শে বর্ণময় হয়ে ওঠেনি—ব্যতিক্রম শুধু আদিবাসী সংস্কৃতি।

আধুনিক যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আদিবাসীরা সামাজিক ক্ষেত্রে সভ্য ভারতবাসীর সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এমন কথা বলা যায় না। আর এই রাজনৈতিক স্বীকৃতি যতটা দায়ে পড়ে, ততখানি আদিবাসী সমাজের প্রতি মমতায় নয়। তাই যদি হত, তাহলে ভারতবর্ষের অরণ্যে পাহাড়ে টিলায়, যাঁরা বিদেশী এবং স্বদেশী শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামে নূতন ইতিহাস রচনা করেছিলেন তাঁরা আজও এমনভাবে চুয়াড়, ডাকাত, দস্যু, টাইট্, লুঠেরা বলে পরিচিত থাকতেন না। বিদেশীর ইতিবৃত্তে ছত্রপতি শিবাজীর পরিচয়ও তো দস্যুরূপে। কিন্তু আজ বীর শিবাজীর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে তিনি গ্রহণ করেছেন যথাযোগ্যস্থান। দেশবাসী সক্ষম হয়েছে তাঁর বীরত্বের পরিপূর্ণ মূল্যায়নে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করেছিলেন ঝাড়খণ্ডের যে আদিবাসী রাজা, সিংহভূমির সিংহশিশু সেই জগন্নাথ ধল বা বিরসামুণ্ডা যিনি ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী মানুষের কাছে আজও বিরসা ভগবান রূপে পূজিত, যিনি মহাত্মা গান্ধীরও পূর্বে অহিংস উপায়ে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে তা প্রায় সফল করে তুলেছিলেন—তাঁদের নাম জানেন কজন সভ্য ভারতবাসী? কজনই বা শুনেছেন আদিবাসী নেতা নির্মলমুণ্ডার নাম?

আদিবাসী সমাজের অর্থনীতির দিকটাতে অন্ধকার আরও বেশী ঘনীভূত, এঁদের অধিকাংশই ভূমিহীন। জমি এঁদের কোনকালেই ছিল না এমন নয়। ধূর্ত-মহাজনের প্রতারণায় এবং মাত্রাতিরিক্ত সুদের চাপে তাঁদের জমি বহুকাল আগেই হাত ছাড়া হয়ে গেছে। সুদখোর মহাজন জাত ব্যবসা ছেড়ে পরিণত হয়েছে জমিদারে। আর আদিবাসী কৃষক পরিণত হয়েছে ক্রীতদাসে। সহায় সম্বলহীন আদিবাসীদের কেউবা আশ্রয় নিয়েছেন আসাম উত্তরবঙ্গে চায়ের বাগানে, কেউ বা রাণীগঞ্জ আসানসোলের কয়লাখনিতে। সেখানে তাঁরা কীভাবে জীবন যাপন করেন তা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষের এই সমস্ত ছিন্নমূল কয়েক কোটী আদিবাসী মানুষ, যদি বুঝতে পারতেন তাঁরা কীভাবে বঞ্চিত, তাঁরা যদি বুঝতে পারতেন, তাঁরা কীভাবে শোষিত তাঁরা যদি বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় নিজেদের আলোকিত করতে পারতেন এবং প্রগতিশীল জীবনের জন্য তাঁরা যদি উন্মুখ হয়ে উঠতেন এবং বাঁচার মতন বাঁচার আন্দোলনকে দুর্বার করে তুলতে পারতেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতারা পার্লামেন্টের বক্তৃতা মঞ্চ ছেড়ে পালাতে পথ পেতেন না।

এইখানে আমাকে কিছু ভুল বোঝার অবকাশ আছে। আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে

আর্য সংস্কৃতির আদৌ কোন সমন্বয় হয়নি, আমি কিন্তু সে কথা বলতে চাইনি। সমন্বয় কিছু কিছু নিশ্চয় ঘটেছে এবং আদিবাসীদের কোন কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব হয়েছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁদের এই আত্মসমর্পণ তাঁদের অবস্থাকে করে তুলেছে আরও করুণ এবং অসহায়। যাঁরা হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব আদিবাসী সংস্কৃতি তো হারিয়েছেনই, উপরন্তু হিন্দু সমাজও তাঁদের আপন বলে গ্রহণ করেনি। ফলে তাঁদের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ময়ূর পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মত। সৃষ্টি হয়েছে নূতন একটা সম্প্রদায়ের যাঁরা না আদিবাসী না হিন্দু, তাঁরা যেন সেই "ধোবী কা কুত্তা না ঘরকা না ঘাটকা", হিন্দুধর্মের প্রতি আদিবাসীকে আকর্ষণ তাঁদের শুধু ক্ষতিই করেছে এমন কথা বলতে চাই না, এই হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণই তো সাঁওতালদের মধ্যে ঘটিয়েছে সাফাহড় আন্দোলন, এই আন্দোলনের ফলে তাঁরা জীবনযাত্রার কোন কোন রীতি এবং কুসংস্কারকে অশুচি বা অপবিত্র জ্ঞানে বর্জন করে শুচি বা পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই হিন্দু ধর্মের প্রভাবেই তো ও'রাওদের টানা ভক্ত আন্দোলন তাঁদের সামনে প্রসারিত করেছিল জীবনবোধের নূতন দিগন্ত। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন শূকর এবং গোমাংস ভক্ষণ। শুধু আদিবাসীরাই হিন্দুধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এমন নয়। আর্য সংস্কৃতিও প্রভাবিত হয়েছে আদিবাসীদের সংস্কৃতির দ্বারা। কালী মাতৃতান্ত্রিক প্রাগার্য সম্প্রদায়ের দেবী। তাঁর পূজো করা হয় অমাবস্যা তিথির গভীর নিশীথে। এই দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত হয় জীবজন্তুর রক্ত। চর্মবাদ্য এই উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ। অথচ আর্য সংস্কৃতির দেব-দেবীদের প্রতি অনুরূপ বলিদান নিষিদ্ধ। পুজোর উপকরণ কাংস্য-ঘণ্টা, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু প্রভৃতি। প্রাগার্যদের এই দেবী শক্তির দেবীরূপে হিন্দুদেরও আরাধ্য। এক্ষেত্রে প্রাগার্য সংস্কৃতি প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে আর্য সংস্কৃতিই প্রাগার্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক প্রত্যক্ষভাবেই হউক পরোক্ষভাবেই হউক উভয় সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান, লেনদেন, মিশ্রণ এবং সমন্বয় অনিবার্যভাবেই কিছু কিছু ঘটেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আর্যরা প্রাগার্যদের সমান স্তরের মানুষ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ভারতের আদিবাসীদেরও যে একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে সে সম্বন্ধে সম্রদ্ধ ধারণা সাধারণত আধুনিক ভারতীয়েরা পোষণ করেন না, কারণ সে সম্পর্কে তাঁরা কোন খোঁজও রাখেন না। কাজেই যাঁরা ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবেই নিজেদের পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি তাঁরা কেন, দেশ এবং জাতি গঠনের কাজে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারছেন না, এ ধরনের আক্ষেপ অর্থহীন।

এই অবহেলিত উপেক্ষিত অনগ্রসর আদিবাসী এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য উত্তর-স্বাধীনতা যুগে ভারত সরকার উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। লোকসভা ও বিধানসভার আসনে এবং চাকুরির ক্ষেত্রে তাঁদের সংরক্ষিত আসনের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। জোতদার এবং মহাজনের শোষণ এবং অত্যাচারের হাত থেকে এই সমস্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন আইন। কিন্তু যে মূল লক্ষ্য কল্যাণ সাধন তা আজও চাকুরি, বিধানসভা এবং লোকসভার সংরক্ষিত আসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কল্যাণ সাধন এবং উন্নয়নের চেষ্টা কিছু হয়ে থাকলেও তা এত অকিঞ্চিৎকর যে আদিবাসী মানুষের হৃদয়ে তা কোনভাবেই রেখাপাত করতে পারেনি। ভারতবর্ষের প্রায় সাড়ে চার কোটি আদিবাসী মনুষের (অবশ্যই যদি তাদের মানুষ বলে গণ্য করা হয়) কাছে পশু কল্যাণ পর্ষদ এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মধ্যে কোন ফারাক নেই, পশুকল্যাণ দপ্তরও তো ভারতবর্ষের দুর্লভ বন্য পশুদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন সংরক্ষিত জঙ্গলের এবং আদিবাসী সমাজে এই বোধেরই ফলশ্রুতি আসাম সীমান্তে স্বতন্ত্র নাগাভূমি, এবং মেঘালয় প্রভৃতি পৃথক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং বিহার উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশে ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয়, এই সমস্ত ঘটনা ভারতবর্ষের প্রায় সাড়ে চারকোটি আদিবাসী মানুষের মনে এনে দিয়েছে এক প্রচণ্ড উন্মাদনা, এক নূতন জগতের স্বপ্ন, যেখানে থাকবে না কোন দিকু মহাজন কিংবা জোতদারের শোষণ কিংবা কোন ধর্ম ব্যবসায়ীর নির্মম প্রতারণা, ভারত সরকার যদি এখনো আদিবাসী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে পোষণ করেন চরম উদাসীনতা, তাহলে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা সীমান্তের আদিবাসী মানুষও তাঁদের আপন যাত্রাপথ তৈরি করে নেবেন তাঁদেরই আপন হাতে। আর সেই পথ রচনায় তাঁদের প্রেরণা যোগাবে হাতের কাছের স্বতন্ত্র নাগাভূমি এবং মেঘালয়।

॥ ১১ ॥

বাইরে অল্প-অল্প আলো। সেই আধ-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে মূর্তিটা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সদানন্দ দরজা খুলতেই নয়নতারা আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে এগিয়ে এল।

সদানন্দ বউ-এর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। চোখ দুটো ভিজে উঠেছে।

পেছন থেকে তখন প্রকাশমামার গলা শোনা গেল—আমরা স্টেশনে গেছি আর ট্রেনটাও ছেড়ে দিলে—

গৌরী পিসীও ফিরে এসেছে। সেও বলে উঠলো—কপালের দুর্ভোগ বউদি, গায়ে গতরে একেবারে ব্যথা হয়ে গেল, অথচ কোনও লাভ হলো না।

মা বললে—বউ-মার খুব কষ্ট হলো মাঝখান থেকে—

সদানন্দ তখনও পাথরের মত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। কী যে সে করবে তা বুঝতে পারলে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, না ঘরেই থাকবে! না কি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হয়ত প্রকাশমামা আবার দেখতে পাবে!

হঠাৎ কী যে হলো, নয়নতারার দিকে একটু এগিয়ে গেল সদানন্দ। একটা কিছু কথা বলা তার উচিত! কাল সে ঘর থেকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গিয়েছিল! কিন্তু কেন সে বেরিয়ে গিয়েছিল তা নয়নতারাকে বলা হয়নি। আর কাউকে না বললে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তার নিজের বিয়ে-করা বউকে অন্ততঃ কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত!

সদানন্দ নয়নতারার কাছে গিয়ে বললে —দেখ—

কিন্তু কিছু বলার আগেই নয়নতারা ফোঁস করে উঠেছে। বলে উঠলো—আমাকে ছুঁও না—

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা ভেঙে গেছে। সদানন্দ মাথাটা বালিশ থেকে তুলে চারদিকে চেয়ে দেখলে। কই, কেউ তো কোথাও নেই! ঘর অন্ধকার! আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো সে। তারপর আলোটা জ্বাললে। দরজায় যেমন খিল দেওয়া ছিল, তেমনিই রয়েছে। কেউ কোথাও নেই। ঘরের ভেতরে সে একলাই শুয়ে ছিল এতক্ষণ। ঘরে কেউই ঢোকেনি। আলনার ওপর কোঁচানো শাড়ি আর পাট-করা রাউজটা তখনও একভাবে একই জায়গায় রয়েছে। কেউ তো স্পর্শও করেনি! আশ্চর্য! আশ্চর্য স্বপ্ন তো! কিন্তু স্বপ্নই যদি দেখতে হয় তো এমন স্বপ্ন দেখলে কেন সে! কেন সে এমন স্বপ্ন দেখলে!

আলোটা নিবিয়ে আবার সে বিছানায় গিয়ে শুলো। আবার সব অন্ধকার। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে একটু! মনে হলো আর কোনও ভয় নেই। ট্রেন তারা ফেল করেনি। মিছি মিছি সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ তারা তিনজনেই হয়ত কেষ্টনগরে পৌঁছে গিয়েছে। এতক্ষণ হয়ত খুবই কান্নাকাটি করছে তার স্ত্রী! বিয়ের একদিন পরেই মা মারা গেল! এমন তো সাধারণত হয় না!

কিন্তু অত সব ভাবতে গেলে সদানন্দর চলবে না। সে কারো স্বার্থ, কারো ভালো-মন্দ দেখবে না। তার স্বার্থ, তার ভালো-মন্দর কথা কি কেউ কোনও দিন ভেবেছে! সবাই শুধু তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছে। তার দাদু চেয়েছে এই বংশ, এই বংশের প্রতি-পত্তি প্রতিষ্ঠা অক্ষয় করতে। তার বাবা চেয়েছে সদানন্দ যেন বংশের ধারাকে জীইয়ে রেখে দেয়। কেউ আর কিছু চায় না তার কাছ থেকে। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ কারো কাম্য নয়।

কালীগঞ্জের বউ সেদিন সদানন্দকে সেই কথাই বলেছিল। বলেছিল—তুমি কেন আমার কথা ভাবছো বাবা? তোমার বিয়ে হবে, তোমার সংসার হবে, তোমার ছেলে হবে, তোমার সামনে এখন মস্ত লম্বা

ভবিষ্যৎ পড়ে আছে, আমার তো গঙ্গা-মুখো পা, আমি যেতে পারলেই এখন বাঁচি। আমার কথা আর তুমি ভেবো না বাবা—

বালিশের ওপর মুখটা গুঁজে বারবার কথাগুলো না-ভাববারই চেষ্টা করতে লাগলো সদানন্দ। সত্যিই সে কেন কালিগঞ্জের বউ-এর কথা ভাবে। কেন সে কপিল পায়রাপোড়ার কথা ভাবে। কেন সে মাণিক ঘোষ, ফটিক প্রামাণিকের কথা ভাবে। পৃথিবীর আর কেউ তো তার মত এত বাজে কথা ভাবে না।

না, সদানন্দ এবার আর কিছু ভাববে না। এবার কারোর কথা সে ভাববে না। শুধু নিজের কথা ভাববে। নিজের স্বার্থের কথা, নিজের সুখের কথা।

কোথাকার কে কপিল পায়রা-পোড়া, কোথাকার কে কালিগঞ্জের বউ, তারা তো আর এ পৃথিবীতে নেই। তাদের কথা ভেবেও তো সে তাদের কোনও উপকার করতে পারবে না। তারা মারা গেছে। তাদের দলে কেউ নেই। তাদের পুলিস নেই দারোগা নেই, আইন নেই, গভর্নমেন্ট নেই, সমাজও তাদের বিরুদ্ধে। কেন তাদের কথা সে ভাববে। কেন তাদের কথা ভেবে সে মন খারাপ করবে। তার চেয়ে সে বরং নিজের কথাই ভাববে। নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ, নিজের স্ত্রী, নিজের সম্পত্তির কথা ভাববে। এই পারিবারিক লাখ-লাখ টাকার জমিদারি, এসব কী করে আরো বাড়ানো যায় সেই কথাই সে ভাববে কেবল।

এবার নয়নতারা যদি আসে তা হলে এই ঘরেই সে রাত্রে শোবে। এই ঘরে এক বিছানাতেই সে তার স্ত্রীর সঙ্গে শোবে।

আস্তে আস্তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেও জানতে পারলে না।

সদানন্দ সেদিন বাড়ি ছিল না। নবাব-গঞ্জে তখন বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। গ্রামের লোক শীত পড়লেই ভোর বেলা উঠোনে বেরিয়ে পড়ে। খোলা-মেলা চারদিকে। তখন ক্ষেতেরও কাজ থাকে না কারো। তখন ধান কাটা হয়ে গেছে, পাটও উঠে গেছে। ক্ষেতে শুধু তখন সরষে। সরষে ক্ষেত তখন শুকিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। চৌধুরীবাড়ির বাইরে চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিমে উঠোনময় সরষে ছড়ানো। চারদিকে বাঁকারির বেড়া দেওয়া থাকে। যাতে গরু-ছাগল এসে খেয়ে না যায়। সেই সরষে কেটে বেছে মরাইতে তুলতে হবে। তারপর খেপে খেপে যাবে রেলবাজারের প্রাণকৃষ্ণ শা' মশাই-এর আড়তে। সেখান থেকে নগদ টাকা আসবে নরনারায়ণ চৌধুরীর সিন্দুকে। সেই টাকা দিয়ে আবার জমি কেনা হবে, সেই জমিতে আবার ফসল ফলাবে। এই জমি কেনা আর ফসল ফলানো আর ফসল বেচার টাকায় নরনারায়ণ চৌধুরী মশাই পঙ্গু পা দুটো নিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে অখণ্ড সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখবে আর সেই স্বপ্নের ঘোরেই বছরের পর বছর পরমায়ু নিঃশেষ করে দেবে।

ছোটবেলায় সদানন্দ ওই ধান মাড়া, পাট কাচা, সরষে ভাঙা দেখতো। বিধু কয়াল সেগুলো আবার দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করতো। চৌধুরীমশাই অনেক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ গো বিধুকাকা, এত সরষে কে খাবে গো?

বিধু কয়াল বলতো—কে আবার খাবে, লোকে খাবে—

সদানন্দ বলতো—তা এত সরষে লোকে খেতে পারবে?

বিধু কয়াল হাসতো। বলতো—

পৃথিবীতে লোক কি কম খোকাবাবু, লোকের শেষ নেই। পৃথিবীতে রোজ কত লোক জন্মাচ্ছে, তা জানো?

—কত লোক?

—কোটি কোটি লোক জন্মাচ্ছে। আবার কোটি কোটি লোক মরছেও। কত লোক জন্মাচ্ছে সবাই এই চাল, ডাল, সরষে সব খাবে!

সদানন্দ জিজ্ঞেস করতো—কী করে জন্মায় এত লোক?

বিধু কয়াল বলতো—সে-সব তুমি এখন বুঝবে না, বড় হলে তবে বুঝতে পারবে।

সদানন্দ বলতো—তুমি বলো না, আমি তো বড় হয়েছি, আমি ঠিক বুঝতে পারবো—

বিধু কয়াল তবু বলতো না। কিংবা হয়ত ও-সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাইত না ছোট ছেলের সঙ্গে। আর অত কথা বলবার হয়ত সময়ও ছিল না বিধু কয়ালের। তার অনেক কাজ ছিল। যখন দাঁড়ি-পাল্লার কাজ থাকতো না তখন তাকে অন্য কাজ দেওয়া হতো। কাজ কি চৌধুরী মশাইএর বাড়িতে একটা। গোয়ালের গরু দেখবার রাখাল ছিল, ক্ষেত-খামারে কাজ করবার জন্যে কৃষাণ ছিল, মাল ওজন করবার কয়াল ছিল, কাছারির কাজ করবার গোমস্তা ছিল। তার ওপর ছিল সংসারের কাজ-কর্ম দেখা-শোনার লোক। লোকে-লোকে ভর্তি ছিল সেই বাড়ি। ভোর বেলা থেকে চৌধুরীদের বাড়িতে কাজ শুরু হতো সে-কাজ শেষ হতো সন্ধ্যের পর। সন্ধ্যের পরই যেন একটু ঠান্ডা হতো নবাবগঞ্জ।

সেই বিধু কয়াল একদিন মারা গেল।

সে এক কাণ্ড বটে! একদিন হঠাৎ হই-হই পড়ে গেল চৌধুরী বাড়িতে। কী হয়েছে, না সাপে কামড়েছে বিধু কয়ালকে। সবাই ছুটলো বিধু কয়ালের বাড়িতে। বিধু কয়ালের বাড়িতে কখনও আগে যায়নি সদানন্দ। গিয়ে দেখলে মাটির দাওয়ার ওপর বিধু কয়াল চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর একজন বুড়ো ওঝা মন্তর পড়ছে। ঝাড়-ফুঁক করছে। মনে আছে সদানন্দ এক দৃষ্টে সেই বিধু কাকার দিকে চেয়ে দেখেছিল। সে কী বীভৎস মৃত্যু! কপিল পায়রাপোড়ার মৃত্যু এরকম, সেও বীভৎস। সে-ও এক রকমের অপমৃত্যু। কিন্তু বিধু কয়ালের অপমৃত্যু যেন অন্য রকম। বিধু কাকার অপমৃত্যুর জন্যে সে যে কাকে দায়ী করবে তা সেদিন ঠিক করতে পারেনি। সকলকে জিজ্ঞেস করেছে সদানন্দ। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছে, মাকে জিজ্ঞেস করেছে। গৌরী পিসীকে জিজ্ঞেস করেছে। এমন কি প্রকাশমামাকেও জিজ্ঞেস করেছে। প্রকাশমামা ভাগ্নের কথা শুনে অবাক। বলেছে—আরে, তা সাপে কামড়ালে মানুষ মরবে না? আবার তেমনি বাগে পেলে যে মানুষও আবার সাপকে মেরে ফেলে! যে-যাকে বাগে পায় তাকেই মারে, বুঝলি না?

সদানন্দ তবু বুঝতে পারেনি। বলেছে—তার মানে?

—তার মানে সবাই সবাইএর শত্রু। সবাই সবাইকে বাগে পাবার চেষ্টা করছে। এই যেমন দারুণ মা তোর দাদু কপিল পায়রাপোড়াকে বাগে পেয়েছিল তাই সে মরলো, আবার কপিল পায়রাপোড়া যদি তোর দাদুকে বাগে পেত তো তোর দাদুকেও তাহলে মরতে হতো। এই-ই তো নিয়ম রে। এই নিয়মেই তো দুনিয়া চলছে—

কথাটা অনেক দিন ধরে সদানন্দকে খুব ভাবিয়েছিল। সদানন্দ মাঝে-মাঝে বিধু কয়ালের কথা ভাবতো। তারপর সেই বিধু কয়ালের জায়গায় একদিন তার ছেলে শশী কয়াল এল। তখন থেকে শশী কয়ালই তাদের বাড়িতে কাজ করতো। শশী কয়ালও ঠিক সেই তার বাবার মত ধান মাপতো, পাট মাপতো সরষে মাপতো। তাকে দেখতো আর সদানন্দ ভাবতো দাদু কবে তাকেও হয়ত বাগে পাবে।

একদিন শশীকেও সদানন্দ জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা শশী, তুমি কাকে বাগে পাবার চেষ্টা করছো বলো তো?

শশী কয়াল অবাক। বললে—তার মানে?

সদানন্দ বললে—তার মানে জানো না?

—না।

সদানন্দ বললে—নিশ্চয় মানে জানো তুমি, আমার কাছে বলছো না শুধু। তুমি নিশ্চয়ই কাউকে খুন করবার চেষ্টা করছো। সবাই সেই চেষ্টাই করে। এই-ই নিয়ম। এই নিয়মেই দুনিয়া চলছে—

শশী তার হাতের কাজ থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সদানন্দের দিকে। খোকাবাবু বলছে কী!

কাছ দিয়ে চৌধুরীমশাই যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কী শশী, কী কথা হচ্ছে তোমাদের?

শশী বললে—আজ্ঞে, দেখুন না খোকাবাবু কী বলছে, আমি নাকি কাকে খুন করবার মতলোব করছি।

—তার মানে?

চৌধুরীমশাইও অবাক। সদানন্দর দিকে চেয়ে চৌধুরীমশাই বললেন—কে তোমাকে এ-সব কথা বললে? শশী কাকে খুন করবে?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, আমি জানি—

—জানি মানে? কী জানো তুমি?

সদানন্দ বললে—সবাই সবাইকে খুন করবার মতলোব করছে!

চৌধুরীমশাই আরো অবাক। বললেন—এ-সব বাজে কথা কে তোমাকে শেখালে?

সদানন্দ বললে—প্রকাশমামা!

—প্রকাশমামা?

—হ্যাঁ, প্রকাশমামা বলেছে। কেন, বিধু কাকাকে সাপে কাটেনি? কপিল পায়রা-পোড়াকে দাদু খুন করেনি?

এর পর আর কথা বলেন নি চৌধুরী মশাই। তখনই ছেলেকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে চলে গিয়েছিলেন, তারপর অনেক রকম

করতে লাগলেন ছেলেকে। কে তাকে এ-সব কথা বলেছে। কে শিখিয়েছে তাকে এ-সব প্রশ্ন। সব কথার উত্তরেই সদানন্দ বললে—প্রকাশমামা।

প্রকাশমামাকেও ডাকা হলো, চৌধুরী মশাই তাকেও জেরা করলেন—এই সব কথা তুমি শিখিয়েছ সদানন্দকে?

প্রকাশমামা বললে—আমি? আমি কেন শেখাতে যাবো মামাবাবু? আমার দায় পড়েছে। সদা কি ভাবছেন সোজা ছেলে? ও আমাকে শেখাতে পারে, তা জানেন?

রাত্রে গৃহিণীকে গিয়ে চৌধুরীমশাই সব কথা বললেন—তোমার ভাই কিন্তু খোকাকে খারাপ করে দিচ্ছে, ওর সঙ্গে মিশতে দিও না—

গৃহিণী বললে—কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই। ছেলেমানুষ কী বলেছে তাই নিয়েই তুমি মাথা ঘামাচ্ছো? তুমি তোমার নিজের কাজ-কম্মো নিয়ে থাকো না, ছেলেমানুষদের কথায় অত কান দিতে গেলে চলে?

এর পর আর কোনও কথা হয়নি এ-সম্বন্ধে। সদানন্দ নিঃশব্দে বড় হয়েছে। সে যা শেখবার তা শেখেছে, যা শেখবার তা শিখেছে। কী শেখেছে আর কী শিখেছে তা জানবার সুযোগ হয়নি কারো। চৌধুরী মশাই ব্যস্ত ছিলেন তাঁর সম্পত্তির রক্ষণা-বেক্ষণ নিয়ে আর প্রীতি জড়িয়ে পড়েছিল সংসারের বেড়াজালে। প্রীতির তখন রোজ নতুন করে গয়না গড়ানো হতো আর দুদিন পরেই তা কাঞ্চন স্যাকরাকে দিয়ে ভেঙে আবার অন্য প্যাটার্নের গয়না গড়ানো হতো। তখন ছেলে ছোট। মা-বাবা ভেবেছে ছেলে বুঝি চিরকাল ছেলেমানুষ আছে, এবং বরাবর ছেলেমানুষই থাকবে, কিন্তু সেই রবাবের বেলুনে কেমন করে কপিল পায়রাপোড়া, মানিক ঘোষ, আর ফটিক প্রামানিকের হরনাথ যে সে এতদিন ধরে মনের ভেতর পুষে রাখবে তা কে কল্পনা করতে পারবে? নইলে করালকেই বা কেন সে তার বাবা বিধু কয়ালের কথা জিজ্ঞেস করবে? আর কালিগঞ্জের বউ?

পরের দিন যথারীতি সকাল হয়েছে।

সদানন্দ খেয়ে-দেয়ে কোথায় বেরিয়ে গেল। আগের দিনের লোকজনের আনা-গোনাও আর নেই। হট্টগোলও তেমনি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রকাশমামা নেই, গৌরী নেই। দুটো লোকের অনুপস্থিতিতে সমস্ত বাড়িটাই যেন খাঁ-খাঁ করছে।

চৌধুরীমশাই দুপুরবেলা ভেতর-বাড়িতে খেতে এসেছিলেন। খেয়ে উঠে নিজের শোবার ঘরে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। খানিক পরে প্রীতিও এল।

চৌধুরীমশাই জিজ্ঞেস করলেন—খোকা কোথায়? সে খেয়েছে?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, খেয়েই বেরিয়ে গেল।

—কোথায় গেল?

প্রীতি বললে—তা আমি কী করে বলবো। সে কি কখনও আমাকে বলে যায়?

—কালকে রাত্তিরে তো নিজের ঘরেই শুয়েছিল। বউমা এলেও ওই ঘরেই শোবে তো এবার থেকে?

প্রীতি বললে—আমি তো সে-কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। তা কিছু জবাব দিলে না।

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড না বাধিয়ে বসে। ও যা ছেলে, ও সব পারে। কেন শুচ্ছে না তার কারণটা কিছু বলেছে ও তোমাকে?

প্রীতি বললে—ওর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। ওকে বললে ও কোথাকার কে কপিল পায়রাপোড়া, মাণিক ঘোষ, কেনু ফটিক প্রামানিক, কালিগঞ্জের বউ তাদের কথা তোলে। তা আমি তাই ওসব কথা আর জিজ্ঞেসও করি না ও-সব বুঝিও না।

চৌধুরীমশাই যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন—পাগল, একেবারে আস্ত পাগল! কই, দেশে-গাঁয়ে তো এত ছেলে আছে, এত ছেলে বিয়ে করছে, কেউ তো এমন পাগলামি কখনও করেনি।

প্রীতি বললে—তা যাদের নাম করছে ও তারা কারা? তারা ওর কী করেছে?

চৌধুরীমশাই বললেন—ভগবান্ জানে! কে যে ওর মাথায় ওই সব কথা ঢোকালে তাই-ই ভেবে পাচ্ছি না। ও নিশ্চয়ই প্রকাশের কাণ্ড!

প্রীতি বললে—প্রকাশ? প্রকাশের নামে কেন দোষ চাপাচ্ছো শুনি? দোষ করলো তোমার ছেলে আর দায়ী হলো প্রকাশ—তুমি সব ব্যাপারে প্রকাশকে দায়ী করো কেন বলো তো?

চৌধুরীমশাই বললেন—তা ছোটবেলা থেকে প্রকাশই তো ওকে নিয়ে ঘুরেছে। কোথায় রাণাঘাটে নিয়ে গিয়েছে যাত্রা শুনতে। কোথাও ঢপ্ কীর্তন হচ্ছে সেখানে নিয়ে গেছে। আমি তো তখন থেকেই তোমাকে বারণ করেছিলুম ওর সঙ্গে মিশতে দিও না—তুমি আমার কথা শুনতে না—এখন যা হবার তাই হয়েছে—

প্রীতি বললে—এখন যত দোষ সেই আমার ঘাড়েই পড়লো। তোমার ছেলে, তুমি সব সময় নিজের কাছে রেখে দিলেই তো পারতে।

চৌধুরীমশাই বললেন—তা আমার কি আর কোনও কাজকর্ম নেই? ছেলে ঘাড়ে করে নিয়ে থাকলে আমার চলবে? নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমাকে থাকতে হয়, আমি কখন খোকাকে দেখি বলো দিকিনি। তুমি বাড়ির মধ্যে থাকো, তুমি দেখবে না তো কে দেখবে?

প্রীতিরও রাগ হয়ে গেল। বললে—তোমার একলারই কাজ আছে, আর আমি ঝাড়া হাত-পা, না? আমার কোনও কাজ নেই বুঝি? এই যে এতগুলো লোক বাড়িতে পুষছো, তাদের তদারকি কে করে শুনি? তার বুঝি কোনও মেহনৎ নেই?

চৌধুরীমশাই দেখলেন কথাগুলো ঝগড়ার দিকে মোড় নিচ্ছে। আর বিশ্রাম নেওয়া হলো না। আর একটু হলে একেবারে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। তিনি উঠলেন।

বললেন—একবার চণ্ডীমণ্ডপের দিকে যাই। প্রকাশ বোধ হয় এবার আসবে, তাদের আসবার টাইম হলো।

বলে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। আবার ফিরে এলেন।

বললেন—একটা কথা, একজন বলছিল নানা রকম দৈব ওষুধ নাকি দেয় একজন সাধু—

—দৈব ওষুধ?

—হ্যাঁ, সবাই নাকি ফল পেয়েছে। হাঙ্গামা কিছু নেই, শুধু হাতে পরলেই কাজ হয়।

প্রীতি বললে—মাদুলি?

চৌধুরী মশাই বললেন—মাদুলিও দেয়, খাবার ওষুধও দেয়। ব্যাপারটা আমি ঠিক পুরোপুরি জানি না। আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি—

প্রীতি বললে—তোমার ছেলে কি, ও কি মাদুলি-টাদুলি পরবে?

—ছেলে না পরে বউমা পরবে। বশীকরণ-টশীকরণ কত রকম জিনিস তো থাকে ওদের। কাল রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে আমি তাই ভাবছিলুম।

প্রীতি বললে—ছেলে পরবে না। বউমা পরলে যদি হয় তো না হয় চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু খাবার ওষুধ আমি খাওয়াতে পারবো না, শেষকালে কী হতে কী হয়ে যাবে তার ঠিক নেই। তখন উলটো উৎপত্তি হয়ে যাবে হয়ত—

—দেখি, সে লোকটার এখনি আসবার কথা আছে—

বলে চৌধুরীমশাই চণ্ডীমণ্ডপের দিকে এগোতে লাগলেন।

*

বিকেল বেলার দিকেই হই-হই করে প্রকাশমামা আর গৌরী পিসী এসে হাজির হলো। তারা কেষ্টনগরে বউমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এক রাত সেখানে কাটিয়ে ভোরের ট্রেনে আবার এসেছে। এসব কাজে প্রকাশমামার জুড়ী নেই। শুধু তাকে মাতব্বরি করতে দিতে হবে। অর্থাৎ মোড়লী। মোড়লী করতে পেলে আর কিছু চায় না প্রকাশমামা।

গৌরী এসেই সোজা ভেতর-বাড়িতে ঢুকেছে।

সদানন্দ যখন বাড়ি ঢুকলো তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে। সকালে খেয়ে-দেয়ে সেই যে বেরিয়েছিল তখন থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাড়িতে কী ঘটেছে তা তার জানা ছিল না। চণ্ডীমণ্ডপের কাছে আসতেই চৌধুরীমশাই ভেতর থেকে দেখতে পেয়েছেন।

ডাকলেন—শোন—

সদানন্দ ভেতরে ঢুকতেই দেখলে চৌধুরীমশাই-এর সামনে কে একজন বসে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। লোকটার মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। তেল চকচকে মুখের চামড়া। গায়ে একটা নামাবলী। আর দুটো ভুরুর মধ্যে কপালে একটা মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ।

চৌধুরীমশাই ছেলের দিকে চেয়ে বললে—একে প্রণাম করো—

সদানন্দ কী করবে বুঝতে পারলে না। কে এ, কেন এখানে এসেছে! চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসী মানুষের মত।

—কই, প্রণাম করো। কী, দেখছো কী চেয়ে?

সদানন্দ বললে—কেন, প্রণাম করবো কেন?

চৌধুরীমশাই বললেন—ইনি তোমার ভালো করবেন, এঁকে প্রণাম করলে তোমার ভালো হবে।

সদানন্দ বললে—আমার কী ভালো করবেন?

চৌধুরীমশাই বললেন—তুমি তো বড় তর্ক করো দেখছি। আমি যা বলছি তাই করো না। প্রণাম করলে তোমার ক্ষতিটা কী?

সদানন্দ বললে—আমার ভালোর দরকার নেই, আমি প্রণাম করবো না। যাকে-তাকে আমি প্রণাম করি না—

চৌধুরীমশাই আর থাকতে পারলেন না। হঠাৎই রাগের ঝোঁকে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলো? আমি বলছি ওঁকে প্রণাম করো।

সদানন্দ তবু নির্বিকার। বললে—আমি তো বলেছি আমি প্রণাম করবো না, আবার কেন বার বার বলছেন?

—প্রণাম করবে না?

—না।

এর পর চৌধুরীমশাই ঝোঁকের মাথায়

কী করে ফেলতেন বলা যায় না, সেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে হাত বাড়িয়ে বাধা দিলেন। বললেন—থাম, তুই থাম—

সামান্য কথা। সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী মশাই জল হয়ে গেলেন। যেন মন্ত্রের মত কাজ হলো।

চৌধুরীমশাই ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন—দেখলেন তো বাবা আমার ছেলে কী রকম বাপের অবাধ্য। কেমন মুখের ওপর আমার কথার জবাব দিচ্ছে। আমি কোথায় ছেলের ভালোর জন্যে ভাবছি, আর ছেলে কী রকম ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে দেখলেন তো?

ভদ্রলোক বললেন—তুই শান্ত হ, মাথা গরম করিস নি, সব ঠিক হয়ে যাবে—

—হবে বাবা? সব ঠিক হবে?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ রে, সব ঠিক হয়ে যাবে?

চৌধুরীমশাই তখন আবার নিজের জায়গায় বসে পড়েছেন বটে, কিন্তু উত্তেজনার তখনও হাঁফাচ্ছেন। বললেন—জানেন বাবা, এই ছেলের জন্যেই আমি কী করেছি জানেন? হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি ওর পেছনে। যাতে ও মানুষ হয়, যাতে ও দশ জনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার জন্যেই তো খরচ করেছি! নইলে আমার আর কী স্বার্থ? আমি আর ক'দিন? আমি যা কিছু রেখে যাবো একদিন ও-ই তো তার মালিক হবে! কিন্তু ও এমনই নেমকহারাম যে আমার মুখের ওপর কথা বলে! এত বড় ওর আস্পর্দা!

ভদ্রলোক কিন্তু এত কথার পরও বিচলিত হলেন না। হাসতে হাসতেই বলতে লাগলেন—সব ঠিক হয়ে যাবে রে, তুই কিছু ভাবিস নি! আমি যখন এসে পড়েছি তখন তোর আর কিছু ভাবনা নেই—

চৌধুরীমশাই যেন বিগলিত হয়ে গেলেন। বললেন—সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি বাবাজী! এখন আপনিই আমার ভরসা—

বাবাজী বললেন—তোর ভাগ্য খুব ভালো যে ঠিক সময়েই আমার দেখা পেয়েছিস—

তারপর সদানন্দর দিকে চেয়ে বললেন—তোর নাম কী রে বেটা?

সদানন্দ ক্ষেপে উঠলো। বললে—আমাকে বেটা বলছো কেন?

বাবাজী সদানন্দের কথা শুনে কোথায় রেগে উঠবেন তা নয়, হো হো করে একেবারে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন—এখনও রক্ত গরম আছে তো তাই গরম গরম কথা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। এখনও ষড়ৈশ্বর্যের ভাব যায়নি।

তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সদানন্দর কপালের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলেন।

বললেন—আরে, তোর কপালে যে ভৃগু-পদচিহ্ন রয়েছে রে! কী আশ্চর্য, আগে তো দেখিনি—

চৌধুরীমশাই বললেন—ভৃগু-পদচিহ্ন? তার মানে? তার মানে কী বাবাজী?

বাবাজী বললেন—তোর ছেলে আসলে কে জানিস?

—কে?

—স্বয়ং ভৃগু ঋষি এ-জন্মে তোর ছেলে হয়ে তোর ঘরে জন্মেছে! ভৃগু ঋষির খুব সংসার করবার ইচ্ছে হয়েছিল একবার! গেল জন্মে সংসার করার শখ তো মেটেনি তো তাই এ জন্মে তোর ছেলে হয়ে এই নবাবগঞ্জে এসেছে। তোর বংশের খুব সুসার হবে। তোর বংশে দেশ আলো করা বংশধর জন্মাবে, তোর যশ-খ্যাতি সারা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে—

সদানন্দ এতক্ষণ সব শুনছিল। এবার বললে—ও-সব বুজরুকি ছাড়ো, ওই বলে বাবার কাছ থেকে টাকা হাতাবার জন্যে চেষ্টা করছো...

—খোকা!

চৌধুরীমশাই আবার গর্জন করে উঠলেন ছেলের দিকে চেয়ে।

বাবাজী চৌধুরীমশাইকে আবার ধমক দিলেন। বললেন—আবার তুই ছেলের ওপর রাগ করছিস? ঠিক আগেকার জন্মের মত রাগী মেজাজ নিয়ে যে ও জন্মেছে। ঋষি মানুষের রাগ, ও আর কতক্ষণ। ও রাগতেও যতক্ষণ আবার ও রাগ জল হতেও ততক্ষণ! ভৃগু ঋষি যে এই রকমই রাগী মানুষ ছিলেন রে, তা জানিস না?

চৌধুরীমশাই জীবনে কখনও ভৃগু ঋষির নামই শোনেন নি। শুধু ভৃগু ঋষি কেন, কোনও ঋষিরই নাম শোনেন নি তিনি। মুনি-ঋষিদের ধার-কাছ দিয়েও কখনও যাবার দরকার হয়নি তাঁর। বরাবর জীব - জন্তু - টাকা - কীট - পতঙ্গ-আড়তদার - উকীল - মুহুরী - জজ নিয়েই কেবল মাথা ঘামিয়েছেন। [illegible] কাহিনী জানতে চাইলে শুধু কিছু বলতে পারতেন। কোন্ জন্ম রাগী, কোন্ জন্ম [illegible], কোন্ জন্ম সৎ, কোন্ জন্ম অসৎ তা তাঁর [illegible]। [illegible] মুনি-ঋষির কথা শুনে নির্বাক হয়ে [illegible]। সত্যি সত্যিই যদি ভৃগু ঋষি তাঁর সংসারে ছেলে হয়ে এসে থাকে তাহলে তাঁর [illegible] আরো টাকা আরো সম্পত্তি হবে সেই সহজ কথাটা সহজেই বুঝতে পারলেন। তাই ছেলের বেয়াদপির জবাবে কিছু বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন।

বাবাজী হঠাৎ তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। সদানন্দর দুটো পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকাতেই সদানন্দ তিন হাত পেছিয়ে এল।

বললে—এ্যাঃ কী করছো, বুজরুকি করছো তোমার—

বাবাজী কিন্তু রাগলেন না। বললেন—তুমি রাগ করছো কেন বাবা? আমি তো তোমাকে প্রণাম করছি না, আমি ঋষি শ্রেষ্ঠ ভৃগুকে প্রণাম করছি—

সদানন্দ অনেকক্ষণ বুজরুকি সহ্য করেছে। কিন্তু এবার আর পারলে না। বললে—ওসব বুজরুকি আমি অনেক দেখেছি, আর দেখতে চাই না, আমি যাই—

চৌধুরীমশাই বললেন—চলে যাচ্ছ কেন?

সদানন্দ বললে চলে যাবো না তো কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ন্যাকামি দেখবো? আমি আর দাঁড়াবো না এখানে। যা করতে পারেন আপনি করুন গে—

বলে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তখনই প্রকাশমামা ঢুকে পড়েছে। ঢুকে

শুধু সব দেখে শুনে অবাক। সদানন্দর দিকে চেয়ে বললে—কী রে, কী করছিস এখানে!

চৌধুরীমশাই জিজ্ঞেস করলেন—ওদিকের খবর সব ভালো তো প্রকাশ? বেয়াইমশাইকে কেমন দেখলে?

প্রকাশমামা বললে—খুবই মুষড়ে পড়েছেন বেয়াইমশাই। আমি সান্ত্বনা দিলুম তাঁকে। বললুম—মৃত্যু কি কারো হাত-ধরা! জীবন-মৃত্যু সবই ভগবানের দেওয়া, সবই মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনও উপায় নেই।

—আর বউমা?

—বউমাও খুব কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁকেও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এলুম।

—বউমাকে আবার কবে এখানে পাঠাবেন?

প্রকাশমামা বললেন—বলেছি তো তাড়াতাড়ি পাঠাতে। বলেছি যত শিগ্গির পারেন পাঠিয়ে দেবেন, আমরা বউমার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকবো।

তারপর সদানন্দর হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে এল। বাইরে নিয়ে এসেই বললে—কী রে, তুই নাকি ফুলশয্যের রাত্তিরে বউমার সঙ্গে শুসনি? তুই নাকি বউমাকে একলা ঘরে ফেলে বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলি?

সদানন্দ কোনও কথা বললে না।

—কী রে, কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে? অমন সুন্দরী বউ এনে দিলুম আর তুই তার কাছেই শুলি নে? ব্যাপারটা কী বল্ তো? দিদির কথা শুনে আমি তো অবাক। দিদি তো আমাকেই বকছে। আমারই দোষ দিচ্ছে দিদি। বলছে—তুই কী রকম বউ এনে দিলি যে আমার ছেলেকে ঘরে আটকে রাখতে পারলে না! কী ব্যাপার বল দিকিনি? তুই তো আমাকে বলিস নি। আমি ভেবেছি তুই আয়েস করে নতুন-বউ নিয়ে রাত কাটিয়েছিস, আর এদিকে এই কাণ্ড? কী, হলোটা কী? তোর বউ তোকে কিছু বলেছে? না তোর বউ পছন্দ হয়নি? ব্যাপারটা কী? আমি এত খুঁজে খুঁজে ডানা-কাটা-পরী এনে দিলুম তোকে আর তুই কিনা তাকে অপছন্দ করছিস এমনি করে?

সদানন্দ তবু সে-কথার কোনও জবাব দিলে না। ভেতর-বাড়ি থেকে কে একজন লোক আসছিল, তাকে দেখেই প্রকাশমামা কথা বলতে বলতে থেমে গেল। বললে—আয়, ইদিকে আয়, তোর সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে আমার, একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে জিনিসটার ফয়সালা করতে হবে—

বলে সদানন্দকে পুকুরপাড়ের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

❋

চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরে বাবাজী তখন ভৃগু ঋষির মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যাঁর ছিল নখদর্পণে। একদিন তিনিই দিব্য-চক্ষে দেখতে পেলেন কলিযুগে তিনি নবাবগঞ্জের হরনারায়ণ চৌধুরীর ঔরসে আবার সংসার-ধর্ম পালন করবার জন্যে জন্মগ্রহণ করবেন।

চৌধুরীমশাই এক সময়ে বললেন—আচ্ছা বাবাজী, আমার ছেলের আসল রোগের কথা বলি—

—রোগ? কী রোগ?

চৌধুরীমশাই বললেন—আপনি জানেন তো আমার এত জমিদারি, এত সম্পত্তি, কিন্তু মাত্র ওই একটি ছেলে। এই ছেলের আমি সবে বিয়ে দিয়েছি। কাল ছেলে ফুলশয্যার রাত্তিরে বউ-এর সঙ্গে শোয়নি। কখন সকলের চোখের আড়ালে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছে—

বাবাজী চোখ বুজে কথাগুলো শুনছিলেন। আর মৃদু-মৃদু হাসছিলেন। তেমনি হাসতে হাসতেই বললেন—তারপর?

—তারপর আর কী! সকালের দিকে ওর মা ওকে জিজ্ঞেস করলে কেন ও ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, জবাবে ও বললে বউ-এর সঙ্গে ও শোবে না।

বাবাজী বললেন—কেন? শোবে না কেন?

—ওই কথা বলে কে? আপনিই বলুন আমার যদি বংশ রক্ষা না হয় তাহলে আমার এত সম্পত্তি খাবে কে? কেন তাহলে আমি আমার ছেলের বিয়ে দিলুম? অথচ রূপে গুণে একেবারে জগদ্ধাত্রীর মত রূপ দেখে আমার পুত্রবধূ করেছি!

কথা বলতে বলতে চৌধুরীমশাই-এর যেন হঠাৎ খেয়াল হলো। জিজ্ঞেস করলেন—আজকে রাত্রে আপনার আহারের কী বন্দোবস্ত করবো বাবা?

বাবাজী বললেন—আমি আহার করি না রে, আমি সেবা করি। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর থেকে আহার করা ছেড়ে দিয়েছি—

চৌধুরীমশাই শশব্যস্ত হয়ে বললেন—ঠিক আছে, আপনি বসুন, আমি আপনার সেবার ব্যবস্থাটা আগে করে ফেলি—

(ক্রমশ)

॥৩৯॥

সরকারী শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহশালা

প্রায় ন' মাস হতে চলল, বর্তমান সিরিজের প্রবন্ধগুলি লিখছি। শহরের কথা না বলে পল্লী অঞ্চলকেই আমি বিশেষভাবে ও বিশদভাবে চিহ্নিত করতে চাই। আলোচ্য রচনাগুলি সেজন্য গ্রাম-বাংলার কিছু-না-কিছুর উপরে ভিত্তি করেই লেখা। এ ভাণ্ডারের শেষ আছে বলে আমার মনে হয় না। সপ্তাহান্তে সংগ্রহের যেটুকু 'দেশ'-এর পাতায় খরচ করি, তা অচিরেই পূরণ হয়ে যায় নতুন সঞ্চয়ে। এ প্রবন্ধমালা যেদিন শেষ করব, সেদিন

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঁজিপাটা যে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে, এমন আশঙ্কা করবার কারণ দেখি না। আমার স্থির বিশ্বাস, মন যাঁদের বাধাবন্ধনহীন, তাঁদের অভিনিবেশ আকৃষ্ট করবার জন্য চিত্তাকর্ষক জিনিসের কিছুমাত্র অভাব নেই দুই বাংলায়। কলকাতায় চেয়ার আলো করে যে-সব তাত্ত্বিক গ্রামীণ বিষয়ের উপর আকছার আলোকপাত করছেন, তাঁদের লীলা ও কৌশল কোনটাই আয়ত্তে না থাকায়, বোকার মতো হয়ত হাটে-মাঠে কিছু ঘুরে বেড়িয়েছি সত্য। কিন্তু তার পরিমাণ যে প্রয়োজনের তুলনায় কত কম, সেকথা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে! সে সীমিত পরিভ্রমণ, নিউটনের মতো আমার এ প্রতীতিই শুধু দৃঢ় করেছে যে অনাবিষ্কৃত পরিসর মহাসমুদ্রের মতোই সীমাহীন, যা অতিক্রম করতে যে-কোন কৌতূহলী জিজ্ঞাসুর জন্ম জন্মান্তর কেটে যেতে পারে।

গ্রাম-বাংলার সে অফুরন্ত ভাণ্ডার ছেড়ে কেন যে আজ কলকাতার এক সংগ্রশালার বিবরণ দিতে বসেছি, তার একটু কৈফিয়ত আছে। কলকাতা বা অন্য শহরে অবস্থিত হলেই যে একটি মিউজিয়মের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে এমন কোন কথা নেই। বরং উলটোটা সত্যি হওয়াই বেশি সম্ভব। কেননা বহু নাগরিক-মিউজিয়মের প্রধান সংগ্রহ পল্লী অঞ্চল থেকে আহৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা ও আশুতোষ মিউজিয়মের লোক-সংস্কৃতির বিশাল সংগ্রহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এরকম উদাহরণ আরও আছে, তবে তার বিশদ উল্লেখের হয়ত প্রয়োজন নেই। আমাদের পল্লী জীবনকে ভালভাবে জানতে হলে তার বহুমুখী বিকাশের যে-সব নিদর্শন এ জাতীয় শহুরে মিউজিয়মে রক্ষিত, তাও দেখা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রামীণ সংস্কৃতি-প্রবাহে ডুব দিতে হলে অবশ্যই গ্রামে যাওয়া দরকার, কিন্তু যে স্রোতোবাহিত নিদর্শনগুলি [illegible] যেখানেই তারা রক্ষিত থাকুক না কেন, সেখানেই যাওয়াটা আবশ্যক।

৪৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ের তিনতলায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহশালা এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। অবিভক্ত বঙ্গদেশের সমস্ত অঞ্চলের বস্ত্র, মাদুর, কাঠ ও কুটীর-শিল্পের নানাবিধ নমুনা সংগ্রহ করে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যখন এটির পত্তন হয়, তখন এজাতীয় সংস্থা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে ছিল না। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন—

বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ার 'বেল-পুতুল'

দুর্গাশিল্প : গৃহসজ্জার আধুনিক উপকরণ

"১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত [illegible] প্রদর্শনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সময় এরকম একটা শিল্প-সংগ্রহশালা স্থাপনের কথা প্রথম আমার মনে আসে।... সে প্রদর্শনী সংগঠন করবার সময় আমি ভালভাবেই বুঝতে পারি, স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠানে আমাদের ছোট-বড়ো নানা শিল্পের এবং কারুকলা ও হস্তশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি সংগৃহীত হওয়া উচিত, যাতে সে কেন্দ্র থেকে উৎপাদক ও ক্রেতা সকলেই খবরাখবর, উপদেশ-নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন এই প্রদেশে শিল্পের পত্তন ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রচুর উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল সত্য, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে ও অন্যান্য কারণে সে আবেগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু সে-সব ব্যর্থতা একেবারে বিফলে গিয়েছে, এমন কথাও বলা যায় না। কেননা, তা থেকেই আমরা আমাদের দৈন্য ও অসুবিধার কথা বুঝতে শিখি। সেজন্য, অবাধগতিতে না হলেও, স্বদেশী যুগ থেকে আমাদের শিল্প-প্রচেষ্টায় মোটামুটি একটা অগ্রগতিই সূচিত হয়েছে, যার ফলে এই প্রদেশে এখন বেশ কিছু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের পত্তন হয়েছে। ......সে-সব শিল্প ও গ্রামীণ কারুকলার অগ্রগতি ও সাফল্যের কাহিনী এরকম কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত হওয়া উচিত, যেখান থেকে দেশী ও বিদেশী বাজারের খবরাখবরই শুধু পাওয়া যাবে না, উৎপাদক ও ক্রেতা ছাড়াও সকলের জন্যই সে সংস্থা একটি স্থায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠবে। আমাদের যাবতীয় শিল্প, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের হস্তশিল্প ও কুটির-শিল্পগুলির যথার্থ উন্নতি এভাবেই

[illegible] কক্ষ : আধুনিক কুটিরশিল্পের নিদর্শন

করতে পারেন। সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা থাকায় এই বিভাগের প্রচার সাধারণত খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

লোক-সংস্কৃতির নিদর্শনগুলির বেলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল, দেশ-বিভাগের সাত-আট বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন এ-সংগ্রহশালায় পূর্ববঙ্গের (আধুনিক বাংলাদেশ) সম্ভারও কিছু কিছু স্থান পেয়েছে, যেরকম পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মিউজিয়মে বড় একটা দেখা যায় না। প্রদর্শনী কক্ষের গ্যালারীগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, যথা—যন্ত্রপাতি, খেলনা-পুতুল, বস্ত্র, কুটির ও হস্তশিল্প, নানাবিধ মডেল, বাণিজ্যিক পণ্যের নমুনা এবং দেওয়ালে-টাঙানো তথ্য-লিপি ও প্রাচীরপত্র। এ-প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রহ ও তথ্য-বিতরণ দুই কাজই করতে হয় বলে এত বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে আজকের সমীক্ষার প্রয়োজনে আমরা শুধু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগগুলির আলোচনা করতে পারি।

প্রথমেই ধরুন খেলনা পুতুলের কথা। লোক সংস্কৃতি বিকাশের এ-মাধ্যমটি যে কতদিনের প্রাচীন, তা এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। প্রাগৈতিহাসিক কালে তৈরী পোড়মাটির বিবিধ শিল্পসম্ভার বহু জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সে পুরাতন ঐতিহ্যের ধারাটি অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে আধুনিক কাল অবধি। এই দীর্ঘ দিনের বিবর্তনে উপাদান, বিষয়বস্তু, কারিগরী দক্ষতা সবই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে, সাবেক পোড়ামাটির পাশাপাশি কাঠ, ধাতু, গালা, ন্যাকড়া, কাগজের মণ্ড প্রভৃতির

সূচিত হতে পারে।”

বলা বাহুল্য, এই আদর্শ পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহ-শালায় শুধু নানাবিধ বস্তু-নিদর্শনের সমাবেশই হয়নি, কোথায় কোন শিল্পের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে, এ-প্রতিষ্ঠান তার হালফিল খবর রাখেন, উৎপাদিত পণ্যের দেশী ও বিদেশী বাজারে কাটতির সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞাসু সবাইকে জানান ও সাধারণভাবে দেশবাসীকে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে সচেতন করবার চেষ্টা করেন। এজন্য, আর পাঁচটা মিউজিয়মের মতো, এখানে যেমন প্রদর্শনী-কক্ষ আছে, তেমনই আছে এক তথ্য-প্রচার বিভাগ। পাঠগৃহ সমেত এক গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর এক পৃথক শাখা।

উত্তর বাংলার লোক-সংস্কৃতিবিষয়ক নিদর্শনগুলিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]— [illegible] উল্লেখ করা [illegible] [illegible] বিষয়ে ফিরে যেতে চাই। তথ্য-প্রচার বিভাগ [illegible] যাবতীয় শিল্প-বাণিজ্য [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রশ্ন করুক না কেন, তার যথাযথ উত্তরও দিয়ে থাকেন। লাইব্রেরীটি খুব বড় না হলেও, [illegible] [illegible] বই-এর কোন অভাব নেই। [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সেগুলি বিনামূল্যে পড়তে পারেন। ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী শাখাটির কাজ গ্রাম-গ্রামান্তরে কুটিরশিল্প ও চারুশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করা, যাতে গ্রামীণ কারিগররা বিভিন্ন দিকে আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেদের উন্নতি

[illegible]

অজস্র মডেলের আবির্ভাব ঘটেছে বিভিন্ন কেন্দ্রে। সে-সব কেন্দ্রের ইতিহাস ও কারিগরির অজানা ইতিবৃত্ত যে-কোন গবেষকের পক্ষে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নানান উপকরণে তৈরী যে-সব খেলনা-পুতুল এ-মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে, তার তুল্য বৃহৎ সংগ্রহ অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ, সরকারী সংগ্রাহকরা সব জেলাতেই ছড়ানো রয়েছেন। সরকারী প্রচেষ্টার মাঝে-মধ্যেই যে-সব প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতা হয়, সেখান থেকেও নানারকম জিনিস ঘরে বসেই কিনতে পারা যায়। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তাঁদের অর্থবলও বেশী। এ-প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা আমাকে যে ছাপানো তথ্য-পুস্তিকাটি দিয়েছেন, কিছুদিনের পুরনো হলেও তা থেকে দেখতে পাচ্ছি—মেদিনীপুর জেলার মাজুরোল, ২৪-পরগনার জয়নগর, বীরভূম জেলার রাজনগর, বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁঠালিয়া, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, হুগলি জেলার উত্তরপাড়া ও মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নানারকম মাটির পুতুল এখানে সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া, শান্তিনিকেতন ও কলকাতার ন্যাকড়ার পুতুল; পুরুলিয়া ও শ্রীরামপুরের কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী একজাতীয় শিল্পসম্ভার; বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল এবং শান্তিনিকেতন ও অন্যান্য কেন্দ্রের গালার পুতুল ও কারুকলার এ-মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, লোকায়ত বা আধুনিক চরিত্রের নিদর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যে-কেন্দ্রের যেটি বৈশিষ্ট্য, তা প্রতিফলিত করবার জন্য সবরকম খেলনা-পুতুলই সংগ্রহ করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত 'রেল-পুতুলের' ছবিটির উল্লেখ করতে পারি। কারিগরির সারল্য ও বলিষ্ঠতায় এটি যে লোকশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, তাতে সন্দেহ নেই। সাবেক ধরনের এহেন বহু নিদর্শনও যেমন আছে, তেমনি আছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিল্পধারার নানান নমুনা। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প অধিকারের প্রযত্নে আমাদের কুটিরশিল্পগুলির উন্নতির কাজ কিভাবে চলছে, সেকথা বারুইপুর হস্তশিল্প কেন্দ্র প্রবন্ধে কিছু বলেছি। সে প্রকল্প অনুযায়ী গ্রামীণ শিল্পীরা বহু কেন্দ্রে নতুন উপাদান ও নমুনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। উদ্দেশ্য, আধুনিক রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কুটিরশিল্পগুলিকে বাঁচানো। এভাবে যেসব শিল্পসম্ভারের সৃষ্টি হচ্ছে, তার দুটি ভাল দৃষ্টান্ত দেখা যাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিতে। ঠিক খেলনা-পুতুল না হলেও এগুলিকে একই গোত্রের বলতে বাধা নেই। কাগজের মণ্ড বা ওই জাতীয় হালকা উপাদানে তৈরী দুর্গার 'মুখোশটি' অনেকেরই ভাল লাগবার কথা, কেননা এখানে সাবেক ও আধুনিক রীতির অতি সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই বিশেষ ধরনের কারুকৃতিটি বহু ভদ্র পরিবারের ড্রয়িং-রুমে দেওয়াল-সজ্জা হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। আধুনিক রুচির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারলে গ্রামীণ শিল্পীরা যে সহজে বিক্রয়যোগ্য নানা সম্ভার প্রস্তুত করতে পারেন, এটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তৃতীয় ছবিটির উপাদান ঝিনুক। এই সহজলভ্য উপকরণটি আমাদের কুটিরশিল্পীরা বড় একটা ব্যবহার করেননি। কিন্তু কারুকর্মে সনাতন দক্ষতার সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গির মেলবন্ধন হলে এহেন নবতর শিল্পসৃষ্টি একটুও কষ্টসাধ্য নয়। সরকারী শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহশালার

সূচিশিল্পে দেশবন্ধু ঃ আতর হস্তশিল্প

অন্যতম কাজই হল দুঃস্থ কুটিরশিল্পীদের কাছে এভাবে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া। সে কাজের দায়িত্ব তাঁরা যে ভালভাবেই পালন করছেন তা প্রমাণ করবার জন্য আরও কয়েক প্রকারের ছবি ব্যবহার করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব নয় বলে পাঠকদের অনুরোধ করব, এহেন নবসৃষ্টির আরও নানাবিধ নিদর্শন তাঁরা যেন স্বচক্ষে গিয়ে দেখে আসেন।

এ প্রসঙ্গে ঢোকরা-কামারদের তৈরী শিল্পসম্ভার সম্বন্ধেও দু-কথা বলা যেতে পারে। তাঁদের কারিগরি পদ্ধতি গতানুগতিকতার নিগড়ে যে কতদূর আবদ্ধ, সেকথা সকলেই জানেন। তবু, সেখানেও, কিছু কিছু আধুনিক কলাকৌশলের অনুপ্রবেশ ঘটানো গেছে। সাবেক রীতি-পদ্ধতির কোন ক্ষতি করেনি বলে তাতে লোকসান হয়নি, লাভই হয়েছে। এ মিউজিয়মে ঢোকরাশিল্পের সংগ্রহটি বেশ সমৃদ্ধ। তাতে প্রাচীন ও নবীন দুই রীতির সম্ভারই স্থান পেয়েছে।

এতদিন মহিষের শিং থেকে প্রধানত চিরুনিই তৈরি হত। ঘর সাজাবার জন্য ছোট ছোট সারস পাখি প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়েছে কোন কোন কেন্দ্রে। কিন্তু আধুনিক ধ্যানধারণা ও মোটিফ প্রসঙ্গে হলে এই প্রাচীন কুটিরশিল্পটির পরিসর যে কতদূর বিস্তৃত হতে পারে তা এ মিউজিয়মে রক্ষিত রাশি রাশি নিদর্শন দেখলে বেশ বোঝা যায়।

এই পর্যায়ে শোলা, কাঠ, গালা প্রভৃতি উপাদানে নির্মিত নানারকম সজ্জা-দ্রব্যেরও উল্লেখ করা যেতে পারে যার সংগ্রহও রীতিমতো সমৃদ্ধ।

শঙ্খ ও হাতির দাঁতের কাজ আমাদের লোকশিল্পগুলির অন্তর্গত। প্রথমটি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, হাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ও দ্বিতীয়টি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে প্রধানত কেন্দ্রীভূত। সে-সব জায়গার কারিগরি নৈপুণ্যের বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন এ মিউজিয়মে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের প্রতিভা যে কত অসংখ্য দিকে নিয়োজিত তা এ সংগ্রহশালায় এসে যেমন বোঝা যায় তেমন অন্যত্র যায় কিনা সন্দেহ। হস্তশিল্প বিভাগে রঙিন ঘাসের চিত্রকর্ম থেকে শুরু করে, বাঁশ, বেত, নারকেল-পাতা ও নারকেল-খোলার নানারকম জিনিস, পোড়ামাটির পুতুলশিল্প, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মুখোশ, কাঁসা-পিতলের বহুতর সম্ভার প্রভৃতি অগণিত শিল্পকৃতি স্থান পেয়েছে। আগের অনুচ্ছেদগুলিতে যেসব কুটিরশিল্পের উল্লেখ করেছি সেগুলিও এই বিভাগেই পড়ে। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্পের এত বিস্তৃত সংগ্রহ অন্য মিউজিয়মে বড় একটা দেখা যায় না।

হস্তশিল্পের অন্তর্গত হলেও যে বিভাগগুলির পৃথক আলোচনা প্রয়োজন তা হল তাঁত ও সূচীশিল্প, লোক-চিত্রাঙ্কন-শিল্প, অলংকার শিল্প ও খেলার সরঞ্জাম। আগেই বলেছি, দেশ বিভাগের বেশ কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হবার দরুন এ মিউজিয়মে পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু নিদর্শন

পুরোনো আমলের লক্ষ্মী-সরা

সংগৃহীত হয়েছে। সম্ভবত, তাঁতবস্ত্র নিদর্শনই তাদের সংখ্যা সর্বাধিক। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত কেন্দ্রগুলি থেকে আহৃত অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এখানে আছে একাধিক প্রাচীন মসলিন, সোনার সুতোর কাজ তিন শ' বছরেরও বেশী পুরনো দুর্লভ একটি শাড়ি; বালুচর, নীলাম্বরী, ঢাকাই, জামদানী প্রভৃতি শাড়ি অনেকগুলি। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বালুচর শাড়ি পুনরায় প্রস্তুত হচ্ছে তার নমুনা রয়েছে কয়েকটি। এছাড়া, টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, ধনেখালি প্রভৃতি বিখ্যাত কেন্দ্রে উৎপন্ন নানান অপূর্ব নিদর্শনের তো কথাই নেই। এই বিরাট সংগ্রহের মাত্র একটির বেশি ছবি ব্যবহার করা গেল না বলে আমি দুঃখিত। পাঠিকারা আশা করি এ অক্ষমতা মার্জনা করবেন। এ বিভাগের সংগে সম্পর্কিত নক্‌শী-কাঁথাগুলি সংখ্যায় বেশি না হলেও তাদের মধ্যে কয়েকটি শিল্প-নৈপুণ্যে হীন নয়। এমব্রয়ডারির নিদর্শন-গুলিও অভিনব কেননা এ জাতীয় শিল্প-কর্ম খুব কম মিউজিয়মেই সংগৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধের সংগে ব্যবহৃত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিকৃতিটি থেকে সেগুলির উৎকর্ষ বোঝা যাবে।

পটচিত্র ও একই আঙ্গিকে আঁকা লক্ষ্মী-সরার সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ। বীরভূম, ২৪-পরগনা, কলকাতা প্রভৃতি এলাকা থেকে আহৃত এ নিদর্শনগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সংগে সম্পর্কিত ও নানাবর্ণে চিত্রিত ঘট, কুলো, পিঁড়ি প্রভৃতি সংগ্রহটিও দর্শনীয়।

খেলার সরঞ্জাম ও উত্তর বাংলায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের নমুনাগুলিও চিত্তাকর্ষক। অবসর বিনোদনের এসব উপকরণ বাঙালীর জীবনযাপন প্রণালীর একটি বিশেষ দিকে আলোকপাত করে। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস থেকে শুরু করে হাওড়া জেলার দেউলপুর গ্রামে প্রস্তুত পোলো-বল (এ বিষয়ে ইতিপূর্বে লিখেছি) ও অপ্রচলিত নিদর্শন থেকে আরম্ভ করে অদ্যাপি ব্যবহৃত নানারকম বাদ্যযন্ত্র এই বিভাগে স্থান পেয়েছে। অভিনবত্বের জন্য এ শাখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ মিউজিয়মের বিশাল সংগ্রহের পিছনে আছে সরকারী অর্থবল ও জনবল। লোক-সংস্কৃতির বেসরকারী মিউজিয়মগুলি থেকে তাঁদের সংগ্রহ যে বেশি ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু শেষোক্ত সংগ্রহশালায় কর্মীদের যে জিনিসটির অভাব কোথাও দেখিনি তা হল তাঁদের উদ্যম ও নিষ্ঠা। সরকার নিশ্চয়ই চান বঙ্গ সংস্কৃতির উপকরণগুলি কোথাও না কোথাও সংগৃহীত হোক। তা না হলে তাঁদের নিজস্ব মিউজিয়মটির কোন মানে হয় না। সেজন্য বেসরকারী সংগ্রহশালাগুলির জন্য সরকারী অনুদান যে আরও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো উচিত তাতে সন্দেহ নেই। এ বাড়তি খরচ যে অপাত্রে ন্যস্ত হবে না, আমার অভিজ্ঞতা থেকে সেকথা বেশ জোরের সংগেই বলতে পারি।

(ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

॥ দশ ॥

বন-এ নেতাজী সম্মেলনের প্রাণপুরুষ হলেন ডাঃ আলেকজান্ডার ওয়ার্থ। সত্যি কথা বলতে কি এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা হিসেবে ওয়ার্থের চাইতে যোগ্যতর কাউকে ভাবাই যায় না। ১৯৪১-এর এপ্রিল মাসে "অরল্যান্ডো মাৎসোটা"-বেশী সুভাষচন্দ্র যেদিন বার্লিনে পা দিলেন সেদিন থেকে শুরু করে ১৯৪৩ এর ফেব্রুয়ারিতে সাবমেরিনে জাপান-যাত্রা করার দিন পর্যন্ত ওয়ার্থ নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এছাড়া এই সম্মেলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত Deutsche - Indien Gesellschaft বা জার্মান-ভারত অ্যাসোসিয়েশনের বন এলাকার ওয়ার্থই হলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান।

১৯৪১—৪৪ সাল যুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি আলেকজান্ডার ওয়ার্থ জার্মান ফরেন অফিসের স্পেশ্যাল ইণ্ডিয়া ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আগে কিছুদিন ছিলেন ব্রিটিশ-আমেরিকান বিভাগে। তখনো ব্রিটিশ এলাকা হিসেবে ভারতবর্ষ ও'র কাজের এক্তিয়ারেই ছিল।

নেতাজীকে তখনো ওয়ার্থ চোখে দেখেননি। কিন্তু যেদিন কাবুলের জার্মান ও ইটালিয়ান দূতাবাসের কাছ থেকে বার্লিনের ফরেন অফিসে নেতাজীর কাবুলে উপস্থিতির খবর এল সেদিন থেকেই ওয়ার্থ য়ুরোপে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। জার্মান ও ইটালিয়ান ফরেন অফিস তখন একযোগে "অরল্যান্ডো মাৎসোটা পরিকল্পনা" রচনায় হাত লাগিয়েছেন। টপ সিক্রেট এই পরিকল্পনার রূপায়ণে জার্মান ফরেন অফিসের অল্প যে ক'জন অফিসার ছিলেন ওয়ার্থ তাদের মধ্যে অন্যতম।

অ্যাডাম ফন ট্রট্ ছিলেন স্পেশ্যাল ইণ্ডিয়া ডিভিশনের প্রধান, আলেকজান্ডার ওয়ার্থ তাঁর সহকারী। ট্রটের কথা বলতে আলেকজান্ডার ওয়ার্থের কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধা ও বেদনায় আপ্লুত হয়ে যায়। অ্যাডাম ফন ট্রট ও নেতাজীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। নাৎসি জার্মানীতে নেতাজীকে প্রতি পদক্ষেপে অনেক বাধা ঠেলে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কিন্তু নেতাজীর ভাগ্য ভাল যে অ্যাডাম ফন ট্রটের মত উদারচেতা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অফিসার স্পেশ্যাল ইণ্ডিয়া ডিভিশনের প্রধান ছিলেন।

অপরদিকে নেতাজী যখন বার্লিনে এসে পৌঁছলেন এবং ঘন ঘন ওদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল, তখন ট্রট ও ওয়ার্থ নেতাজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও দেশের জন্য আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। যত দিন যায় ফরেন অফিসের আরো অনেকে ট্রট ও ওয়ার্থের মত নেতাজীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পড়ে তাঁর মতামত ও কার্যধারার পূর্ণ সমর্থক হয়ে পড়লেন। একজনকেই নেতাজী বিশেষ টলাতে পারেননি বা-বলা যায় তার সুযোগ পাননি। তিনি চ্যান্সেলর হিটলার।

হিটলারের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ট্রট্ গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৪-এর ২৬শে আগস্ট তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। দুঃস্বপ্নের মত সেই দিনগুলিতে আলেকজান্ডার ওয়ার্থ ট্রটের স্ত্রী ক্লারিটা ফন ট্রট ও তাদের দুটি শিশুকন্যার পাশে পাশে ছিলেন। অবশ্য

ওয়ার্থ যখন বার্লিনে ক্লারিটার সঙ্গে ট্রটের অন্তত একটা শেষ সাক্ষাতের চেষ্টা করছেন সে সময় ওদের ইমগাহাউসেনের বাড়ি থেকে নাৎসিরা শিশুদুটিকে নিয়ে চলে যায়। হিটলার সে সময় 'Sippenhalt' নামে এক নীতি চালু করেন তাতে ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট-আত্মীয়দের ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হত। শিশুদুটির বয়স তখন একজনের আড়াই বছর আর একজনের ন' মাস, ভাবা যায়? ক্লারিটাও বন্দী হলেন। শিশুদুটি অবশ্য প্রাণে বেঁচে যায়। ওয়ার্থ যখন 'নেতাজী অরেশন'-এর বক্তা হিসেবে কলকাতায় আসেন তখন তিনি বলেছিলেন আজ ফন্ ট্রট্ বেঁচে থাকলে এই বক্তৃতা তারই দেবার কথা। ট্রটের অবর্তমানে য়ুরোপে আজাদ হিন্দ আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মধ্যে ওয়ার্থ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলছিলাম পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন শহরে নেতাজী সম্মেলনের উদ্যোক্তার পদ ওয়ার্থ ছাড়া আর কে নিতে পারত?

বন বাড গোডেসবার্গে যেদিন পৌঁছলাম সেদিন রাত্রেই ওয়ার্থের বাড়িতে এক ডিনারে সবাই মিলিত হলাম। ওয়ার্থের বাড়ি দেখে

আমি মুগ্ধ। বাডগোডেসবার্গ এমনিতেই অভিজাত ও ফ্যাসনেবল্ এলাকা। কিন্তু তার মধ্যেও ওয়ার্থের বাড়িটি দর্শনীয়। রাইন নদীর দু'ধারে অনেক পুরোন কাসল্ দেখতে দেখতে এসেছিলাম — ওয়ার্থের বাড়ি বলা যায় একটি মডার্ন কাসল্। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে ওয়ার্থ জীবন কাটিয়েছেন, '৪৫ থেকে '৪৮ সাল রাশিয়ান যুদ্ধবন্দী হিসেবেও জীবন কেটেছে। কিন্তু ভাগ্যদেবী পরবর্তীকালে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হাসি হেসেছেন। নিজের কর্মজীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। মিসেস ওয়ার্থ ও তিনটি সুন্দরী কিশোরী কন্যা নিয়ে তাঁর সংসার। মিসেস ওয়ার্থ একটি লাল টুকটুকে বেনারসী শাড়ি কেটেকুটে ইভনিং ড্রেস বানিয়েছেন—তাই পরে ডিনারের তদারক করছেন। এ আমাদের ওয়েডিং ড্রেস, 'বিয়ের শাড়ি শুনে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হলেন। ওদের বাড়ির পিছনে বিরাট লন্, তার একপাশে সুইমিং পুল, অন্যদিকে সামার গার্ডেন। এই বিরাট বাড়ি ও সবকিছু দেখাশুনো করার জন্য আধডজন পরিচারক-পরিচারিকা চোখে পড়ল—যা কিনা য়ুরোপে অভাবনীয়। ওদের ড্রাইভার হের আলবার্ট একজন পিংপং চ্যাম্পিয়ন। সকলেই রসিকতা করছে ওকে এবার চীনে পাঠিয়ে দেবে।

খাওয়ার সময় মেয়েরাই পরিবেশন করল। টেবিলে বসে ফর্মাল ডিনার খাওয়া হল, প্রত্যেকের জন্য আলাদা ছবি আঁকা মেনু কার্ড। ডাঃ ওয়ার্থ হাতের শ্যাম্পেনের গেলাসে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছেন আর পরের কয়েকদিনের কর্মসূচী নিয়ে অনর্গল আলোচনা করে চলেছেন। ডাঃ বসুর দিকে ফিরে বললেন, 'প্রেস কনফারেন্সের সময় একটু সামলে নিও। যদিও আমাদের সম্মেলন কিভাবে নেতাজী সম্পর্কে তবুও তুমি কলকাতা থেকে আসছ, তোমাকে রিপোর্টাররা ঠিক বাংলাদেশের কথা নিয়ে চেপে ধরবে।'

তখন সেপ্টেম্বরের শেষ, বাংলাদেশ তখন সকলের মুখে মুখে। বিদেশে সবাই প্রশ্ন করছে, তোমাদের যুদ্ধটা কবে বাঁধবে? মনে মনে আমরাও শংকিত হচ্ছি দেশে ফিরবার আগেই হঠাৎ যুদ্ধ বেঁধে যাবে না তো।

আমাকে ওয়ার্থ উপদেশ দিচ্ছিলেন কিকার একটি প্রধানত মহিলা সভা যদিও পুরুষ শ্রোতাও কিছু কিছু থাকবেন—সামলে নিতে হবে। সেখানে আমাকে সাধারণভাবে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ভারতীয় মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে এবং প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে হবে। সেদিনকার ডিনার পর্ব শেষ হয়েছিল ফ্রাংকের শীর্ষাসন দিয়ে। উপস্থিত অভ্যাগতদের সামনে ওয়ার্থের বসবার ঘরে কার্পেটের ওপর মাথা রেখে ফ্রাংক শীর্ষাসনের একটা ডেমনস্ট্রেশন্ দিয়ে দিলে।

য়ুরোপে নেতাজীর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে নাম্বিয়ার, শর্মা বা ফ্রাংকের সঙ্গে যেমন দীর্ঘ, নিভৃত আলোচনার অবকাশ হয়েছিল —বন-এ এসে ডাঃ ওয়ার্থের সঙ্গে দিনের প্রায় চব্বিশঘণ্টাই একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও সে অবসর কিছুতেই হল না। ওয়ার্থের সঙ্গে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সেই দিনগুলির কথা সবই হত মোটরগাড়িতে বসে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে যেতে। অবশ্য মস্ত সম্মেলনের দিনে বক্তৃতায় ডাঃ ওয়ার্থ তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। খাবার টেবিলে খেতে খেতেও যে কথা হবে তারও বিশেষ উপায় ছিল না, কারণ বেশীর ভাগ জায়গায় অনেক নিমন্ত্রিত উপস্থিত থাকছিলেন। বন-এ বাংলাদেশও আমাদের যথেষ্ট সময় নিচ্ছিল। যেমন আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে যেদিন লাঞ্চ দেওয়া হল সেদিন দূতাবাসের অফিসাররা ও অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা মিলে বাংলাদেশের সমস্যার আলোচনায় অনেক সময় কাটল। আমরাও দেশের খবরের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। দূতাবাস থেকেই টাটকা খবর পেতাম, দেশের খবরের কাগজ দেখতে পেতাম।

এর মধ্যে একদিন বন রেডিও স্টেশন থেকে আমাদের নিতে এল। যে জর্নালিস্ট বন্ধুটি এলেন তাঁর গাড়িটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। খুব ছোট্ট একটি মিনি গাড়ি, বোধ হয় ফরাসী। তার অবস্থা আবার খুব জরাজীর্ণ। হোটেল ড্রেজেন থেকে আমাদের গাড়িতে তুলতে তুলতে জার্নালিস্ট বন্ধুটি বললেন,

ডাঃ আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ (স্পেশ্যাল ইণ্ডিয়া ডিভিশন, বার্লিন)

যে নদী সাগর সঙ্গমের কাছাকাছি অথবা সঙ্গমে উপনীত, তাকে বাঁচান

কারণ ওই ধরনের পরিবেশেই আজ ছোট বড় বহু শহর গড়ে উঠেছে। গড়েছে নানারকম শিল্প-প্রতিষ্ঠান। দূরদৃষ্টিহীন পরিকল্পনা এবং অব্যবস্থার দরুন ওই সমস্ত শহর এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ক্লেদযুক্ত জল, জঞ্জাল, অত্যন্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক অপদ্রব্য গিয়ে মিশছে নদীর জলে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি জনস্বাস্থ্যের বিপর্যয়। এবং অদূর ভবিষ্যতে ওই সমস্ত নদীপথে জাহাজ চালান ব্যাহত হবে, মাছের ঝাঁক নির্মূল হবে। যার চাপ আমাদের অর্থ-নৈতিক উদ্যোগের উপরও বর্তাবে। একটি তথ্যে বলা হয়েছে, ১৯৬১ সালে শুধু কলকাতা শহর এলাকা থেকেই হুগলী নদীর জলে গিয়ে পড়েছিল দৈনিক ৫৬৮৪ টনের মত আবর্জনা। তুলনায় আজকের হিসেব আরও নৈরাশ্যজনক।

মার্চ ১ এবং ১০ কলকাতায় বিড়লা শিল্প-প্রযুক্তি বিষয়ক সংগ্রহশালায় সাগর সান্নিহিত নদী দূষিতকরণ-এর উপর একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উদ্যোক্তা কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কলকাতা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। উদ্বোধন করলেন ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রীপীতাম্বর পন্থ। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি যথাক্রমে সি এম ডি এ-র সহ-সভাপতি শ্রী বি সি গাঙ্গুলী এবং সচিব শ্রী কে সি শিবরামকৃষ্ণন। উপস্থিতমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা জানান ডঃ জি কে মোহনরাও। আলোচনা চক্রে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বক্তা বিশেষ করে হুগলী নদীর ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মা, নদী দূষিতকরণ এমন কোন নতুন সমস্যা নয়। অনন্তকাল থেকে প্রতিটি নদীই কোন না কোনভাবে দূষিত হয়ে

শ্রীপীতাম্বর পন্থ বলেন :

পরিবেশ দূষিতকরণ সমস্যার কারণ এবং নিরাময়ের উপায় অনুসন্ধানের জন্যে সম্প্রতি ভারত সরকার একটি জাতীয় কমিটি তৈরি করেছেন। যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৪। বিজ্ঞান এবং কারিগরী দপ্তরের অধীনে এই কমিটি কাজ করবে। উদ্দেশ্য, (১) দেশের মনুষ্যবাসোপযোগী পরিবেশকে যতদূর সম্ভব দূষিত করণের হাত থেকে রক্ষা করা। (২) এ ব্যাপারে বর্তমানে যে সমস্ত নীতি এবং পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তাদের পর্যালোচনা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সরকারী, বেসরকারী এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথাযথ অবহিত করা। (৩) প্রচলিত আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলি খতিয়ে দেখা, প্রয়োজনে সংস্কার সাধন। (৪) পরিবেশ দূষিতকরণের সমাধান সম্পর্কে উপদেশ সরবরাহ। (৫) পরিবেশ দূষিতকরণের ব্যাপারে মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণার ব্যাপক ব্যবস্থা করা। (৬) পরিবেশ সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। (৭) নিয়মিত আলোচনাচক্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার। (৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র কী ভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তার সমাধানে কোথায় কী ভাবে কাজ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে নিয়মিত ওয়াকিবহাল হওয়া।

'দেশ' পত্রিকার জন্যে আয়োজিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের প্রবীণ সদস্য শ্রী পন্থ মন্তব্য করেন: আমাদের পরিবেশ দূষিতকরণের সমস্যাটিকে স্থানিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। শিল্প এবং বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতির দরুন ইতিমধ্যে এই সমস্যা পাশ্চাত্ত্যের কোন কোন দেশে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সুখের কথা, আমাদের মত উন্নতশীল দেশে এই সমস্যাটি অত বেশি প্রকট নয়। আমাদের দেখা দরকার, যে সমস্ত শিল্প, নগর প্রভৃতি পরিকল্পনা আমরা রূপায়িত করতে চলেছি, পরিবেশ দূষিতকরণের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা যেন ন্যূনতম হয়। হুগলী নদীর সমস্যা নিয়ে যখন ভাবছেন, তখন তার চারপাশের পরিবেশের কথাই ভাবুন। এবং দূষিতকরণের সমাধানের চিন্তা করুন। পাশ্চাত্ত্যের সমস্যার কথা মনে রেখে আমাদের কাজ করার কারণ নেই। কারণ উভয়ের সমস্যা ভিন্নতর।

শ্রীপন্থের আবেদন : পরিবেশ দূষিতকরণের ব্যাপারে জনসাধারণের যথেষ্ট সজাগ হওয়া দরকার। সমস্যাটিকে তাঁরা ব্যাপক দৃষ্টি নিয়ে বুঝুন। যারা সমস্যার সৃষ্টি করছে, তাদের সমালোচনা করুন। প্রচলিত আইনগুলি প্রয়োগ করা প্রশাসনের পক্ষে তখনই সহজতর হবে।

আসছে। যতক্ষণ তা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ না ভাবলেও চলে। কিন্তু সীমার বাইরে গেলেই বিপত্তি।

ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করুন। আমাদের নদী, তার কোনটির জন্ম হিমালয়ের হিমবাহ গলা জলে। পাহাড় পর্বতে সঞ্চিত জল থেকে, অন্য কোন নদী অথবা হ্রদে। অতঃপর উৎস থেকে তাদের যাত্রা শুরু। যাত্রার পর নানারকম ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ অতিক্রম করে তারা অগ্রসর হয়। সঙ্গে করে নিয়ে চলে দু পাশের পাড়ভাঙার মাটির স্তূপ। যার মধ্যে মিশে থাকে নানা রকম রাসায়নিক সামগ্রী। জৈব এবং অজৈব। জলপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তারাও এগিয়ে চলে সাগরের উদ্দেশে। যতক্ষণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়, তাদের গতিমুখ অপরিবর্তিত থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্রোত একদিকে বয়ে চলে। অবশেষে যখন সমুদ্র মোহানায় জলপ্রবাহ উপস্থিত হয়, তখনই জটিলতা। এবং নিয়মিত জোয়ার ভাটার ফলে নদীর মিষ্টি জলের সঙ্গে তখন সমুদ্রের নোনা জলের মিশ্রণ ঘটে। জোয়ারের সময় নদীর নিয়মিত প্রবাহের বিপরীত দিক থেকে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ভূভাগের অভ্যন্তর পর্যন্ত এগিয়ে আসে। পরে ভাটার সময় লবণাক্ত জল মিষ্টি জলের থেকে ভারি হওয়ায় নিচের স্তরে নেমে যায়। এবং ক্রমে সমুদ্রের দিকে এগোতে থাকে। দুই, জাহাজ চলাচলের পক্ষে জোয়ার-ভাটা বড় রকমের একটি সুবিধে। ফলে এই ধরনের নদী অঞ্চলের পাশে গড়ে ওঠে বড় বড় জাহাজ ঘাটা এবং বন্দর। তিন, ওই একই সুবিধের জন্যে সেখানে ছোট বড় শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়। যেমন, কলকাতায় এবং তার আশপাশের অঞ্চলে হয়েছে। চার, শিল্প, বন্দর প্রভৃতি গড়ে ওঠার ফলে অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধের পথ দিন দিন প্রসারিত হয় বলেই শিল্পকেন্দ্রিক ওই সমস্ত শহর দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। জনসংখ্যার ভীড় বাড়ে, নতুন উপনগরী স্থাপিত হয়। বাস্তব প্রয়োজনে তারা নদীর দুপাশে গড়ে ওঠে। বনজঙ্গল বা অরণ্য মুক্ত করে শুরু হয় মানুষের জীবনযাত্রা।

ফলে, নিয়মিত জাহাজঘাটায় জাহাজ থেকে তেল, জাহাজ পরিষ্কার করার সময় যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ধুয়ে মুছে সরিয়ে ফেলা দরকার তারা, প্রভৃতি নদীর জলে এসে পড়ে। নতুন করে জাহাজ রঙ করার সময় পুরনো রঙ তুলে ফেলতে হয়। সেই পুরনো রঙও পড়ে নদীতে। এই সঙ্গে বন্দরের নানারকম ময়লাও। নদীর দুপাশের কলকারখানা থেকে কত রকমের জৈব এবং অজৈব রাসায়নিক সামগ্রীই না জলে এসে পড়ছে। যেমন ধরুন হুগলী নদীর যে অঞ্চল জুড়ে জোয়ার ভাটা খেলে শুধু সেখানেই মোট উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানার সংখ্যা ১৫৯। এদের মধ্যে আছে কাগজ এবং কাগজের মণ্ড তৈরির কারখানা, সুতো এবং পাটকল, অ্যালকোহল তৈরির কারখানা, চামড়ার কারখানা প্রভৃতি। এদের সঙ্গে রয়েছে, রঙ, ইলেকট্রোপ্লেটিং, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশক সামগ্রী প্রভৃতির কারখানাও। এই সমস্ত কারখানা থেকে নানা রকম রাসায়নিক যোগ এসে মিশছে হুগলী নদীর জলে। এর পর আছে শহর কলকাতা, হাওড়া এবং শহরতলি অঞ্চলের নালা নর্দমার জঞ্জাল। যার মধ্যে আছে নানা রকম রাসায়নিক যোগ, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি। তারপর ভাবুন নদীর দুকূলে গড়ে ওঠা উপনগরীর কথা। বনজঙ্গল সরিয়ে ওই সমস্ত উপনগরী গড়ে তোলার ফলে, বর্ষার সময় সেখানকার নরম মাটি পরিবাহিত হয়ে পলির মত এসে পড়ছে হুগলী নদীর জলে।

নাগপুরের কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য প্রযুক্তি গবেষণাগারের ডঃ পি ভি আর সুব্রহ্মণ্যম এবং ডঃ জি জে মোহনরাও-এর মতে কূলটির কাছাকাছি কলকাতার সিউয়ারেজ থেকে যে নোংরা জঞ্জাল গিয়ে ভাগিরথীতে পড়ছে, ভাগিরথীর প্রায় ৪৮ কিলোমিটার অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ে। মুশকিল হল, জোয়ারের সময় স্রোতের তোড়ে ওই সমস্ত সামগ্রী উজিয়ে আসে। ভাটার টানে এগিয়ে যায়। জলের গভীরে পেণ্ডুলামের মত তারা শুধু এদিক সেদিক করে। কিন্তু সহজে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। ঠিক একই অবস্থা কেরালার কালিকটেও। যেমন ধরুন, মাভুর-এ অবস্থিত গোয়ালিয়র রেওয়ন কারখানা নদীর জলে প্রতিদিন দশ মিলিয়ন গ্রামের মত অত্যন্ত ক্ষতিকর সামগ্রী নদীর জলে নিক্ষেপ করছে। এবং ইত্যাদি।

কলকাতার কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য প্রযুক্তি গবেষণাগারের আঞ্চলিক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ এ কে বসু হুগলী নদীর একটি বিশদ চিত্র তুলে ধরেছেন। তাতে দেখা যায় শুধু কলকাতা এবং হাওড়া মিলিয়েই এই নদীর মধ্যে এসে পড়ছে পয়ঃপ্রণালীর

ক্লেদাক্ত জল, মল-মূত্র, ধুলোমাটি, রাসায়নিক অপদ্রব্য প্রভৃতি।

ফলে একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আগেই বলেছি, সমুদ্রের কাছাকাছি এই সমস্ত নদীতে নিয়মিত জোয়ার-ভাঁটা চলায় দরুন, যে সমস্ত বস্তুসমগ্রী নদীতে গিয়ে পড়ে তারা জলের স্রোতে একবার সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়, আবার পিছিয়ে আসে। এবং এইভাবে আগুপিছু করতে করতে সমুদ্রে গিয়ে মিশতে সময় লাগে প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ দিন। ভারী অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য নদীর বুকে জমতে শুরু করে, পলিমাটির স্তূপ বাড়তে বাড়তে নদীর প্রবাহকে ব্যাহত করে, ফলে জাহাজ চলাচলে অসুবিধে হয়।

এবং তার চাইতেও বড় কথা, নদীর এই ধরনের অঞ্চলগুলিতে মাছের চাষ দারুণভাবে বাধা পায়। কারণ উপকূলের বহু আবর্জনা এই জায়গাগুলিতে জমে থাকার দরুন ইলিশ, চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতির পক্ষে এরা স্বর্গভূমি। ডিম পাড়ার সময় তারা এখানে আসে, ডিম ফুটে এখানেই তাদের বাচ্চা হয়। কিন্তু জলে দ্রবীভূত বিষাক্ত রাসায়নিক সামগ্রী মাছের চারা হত্যা করার ব্যাপারে তখন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয়। বিশেষ করে জৈব রাসায়নিক পদার্থ জলে মিশে থাকা অক্সিজেনের সঙ্গে সমানে রাসায়নিক বিক্রিয়া চালানর দরুন ক্রমে জলের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এ ছাড়া কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়াও প্রথম দিকে নিজেদের জৈবিক প্রয়োজনে বেশ কিছুটা অক্সিজেন কাজে লাগায়। আবার এমন ব্যাকটেরিয়াও থাকে যারা সরাসরি জল থেকে অক্সিজেন না পেলে অন্যান্য জটিল রাসায়নিক যৌগ থেকেই অক্সিজেন সংগ্রহ করে। যেমন ধরুন, কেউ কেউ সালফেটকে এ ব্যাপারে কাজে লাগায়। তারা সালফেটের অক্সিজেন গ্রহণ করে। পরিবর্তে তৈরি হয় হাইড্রোজেন সালফাইড। শেষোক্ত এই বস্তুটি শুধু মাছের চারাদের পক্ষেই বিপজ্জনক নয়, জলে মিশে থেকে এটি যখন কোন ধাতুর সংস্পর্শে আসে তখন ক্ষতিকর রাসায়নিক বিক্রিয়াও ঘটিয়ে থাকে, ফলে জাহাজের ধাতব অংশ ক্ষয় পায়। এমনকি এই জল ব্যবহার করার দরুন কলকারখানার ক্ষতিসাধন হয়।

কলকাতা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তি বিজ্ঞানী পি কে সাহা এবং পি কে চট্টোপাধ্যায়ের মতে হুগলী নদীতে এখন বছরে নব্বই মিলিয়ন ঘন ফুটের মত আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আর এই আবর্জনার দুই তৃতীয়াংশ এসে জমছে কলকাতা নগর অঞ্চলের নদী-সীমানার মধ্যে। কী কী ধরনের বস্তু জলে এসে মিশছে এবং কী ভাবে, তাদের দৈনিক পরিমাণ কত এবং মাছের ব্যাপারে তারা কতটা ক্ষতি করছে,

নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে কতটা বাধা দিচ্ছে, জলযানের ব্যবহার উপযোগী করার পক্ষে কী কী ব্যবস্থা উপায় অবলম্বন করা সম্ভব, সি এম ডি এ এবং কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগ [illegible] প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা দু'বছর [illegible] পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন।

মার্চ ৯ এবং ১০ এর আলোচনা সভার মধ্যে বিষয়বস্তু ছিল এটাই। আলোচনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে [illegible] সি এম ডি এ-র সহ সভাপতি শ্রী বি সি গাঙ্গুলী বিশেষ এই সমস্যার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, সুন্দরবন এলাকাতেই শুধু প্রায় ১২০ রকমের মাছ ধরা হয়ে থাকে। দুশ্চিন্তা হল, বড় বড় শহর সমুদ্র সংলগ্ন নদীর দু'পাশে গড়ে ওঠায়, তাদের পরিমাণ দিন দিন কমে যাওয়ার পথে। সি এম ডি এ হুগলী নদীর ব্যাপক দূষিতকরণ সম্পর্কে সজাগ রয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন করে বলেন, জটিল এই সমস্যার নিরাময়ের জন্যে যে কোন মূল্যে, কলকাতার জন্যে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য দেবার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত। সি এম ডি এ-র সচিব শ্রী কে সি শিবরামকৃষ্ণণ মন্তব্য করেন, কলকাতার অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ও নদী কলুষিতকরণের মত এত বড় একটি সমস্যার ব্যাপারে এখনও তেমন সজাগ নন। অথচ এই শহরেরই পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যে নদী তার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করছে এ শহরের স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মত গুরুত্বপূর্ণ দুটি ব্যাপার।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ বি বি ভালেরাও, ডঃ এস আর আলগারস্বামী, ডঃ এইচ আর প্রামানিক, ডঃ পি বি রায়, শ্রী পি কে সাহা, শ্রী পি কে চট্টোপাধ্যায়, ডঃ এ কে বসু, ডঃ এম এন রাও, ডঃ ভি গোপালকৃষ্ণণ, ডঃ পি আর কামাথ, ডঃ ভি রামন, ডঃ আর জয়রামন, অধ্যাপক এন মজুমদার, অধ্যাপক এন চৌধুরী, শ্রী পি সি বসু, অধ্যাপক এম এ সম্পথকুমারণ, ডঃ এ পি কাপুর, ডঃ ইউ জি ঝিঙ্গারাম, শ্রী জে এম দাবে, ডঃ পি ভি সুব্রহ্মণ্যম এবং ডঃ জি কে মোহনরাও। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিতবর্গকে ধন্যবাদ জানান শ্রী পি কে চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষজ্ঞরা আলোচনা সভায় ভারতের বিভিন্ন সমুদ্র-সংলগ্ন নদীর গতিপ্রকৃতি এবং কী ভাবে তারা দূষিত হচ্ছে, তার উপর বিভিন্ন বক্তা তাঁদের নিজস্ব গবেষণা সম্পর্কে বিশদ তথ্যাবলী পরিবেশন করেন। তার বেশির ভাগই তত্ত্ব এবং প্রযুক্তিগত দিক। অর্থাৎ কীভাবে নদীগুলি কলুষিত হচ্ছে, তার সম্ভাব্য ফলাফল ইত্যাদি।

তবে এই সঙ্গে প্রশাসনগত ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু মতামত বিনিময় করলে হয়ত ভাল হত। কারণ, মূল পদ্ধতি সম্পর্কে অনবহিত থাকলেও জনসাধারণ পরিবেশ কলুষিতকরণের ব্যাপারে আগের চেয়েও অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছেন। ধোঁয়া, রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি যাতে অবাধে নদী-নালা বা চারপাশে নিক্ষেপ করা না হয়, তার উপর কিছু আইনও আছে। হয়ত ওই সমস্ত আইনের কিছুটা সংস্কার করা দরকার। তাদের প্রয়োগ পদ্ধতির উপর নতুনভাবে বিবেচনা করারও প্রয়োজন আছে। যাঁরা আইন ভাঙছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া দরকার এবং কীভাবে, মনে হয় এমন একটি আলোচনাচক্রে এই মূল্যবান দিকটির উপর বিশদ আলোচনার দরকার ছিল। বিশেষ করে কয়েকজন বিশিষ্ট প্রশাসক যখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যথায় এ ধরনের আলোচনা চক্রের তাত্ত্বিক মূল্য যতই থাক না কেন, তার বাস্তব প্রয়াস বিলম্বিত হয়ে থাকে। অনেক সময় তাদের পক্ষে অনাচারের রাস্তা ত্যাগ করাও দুঃসাধ্য হয়।

সমরজিৎ কর

প্রায় সমসাময়িক চারজন তরুণ ভাস্কর উচ্চ শিক্ষার জন্য একই পরিবেশে থেকে কিভাবে ভাস্কর্য শিল্পে আপন আপন চিন্তাধারা ও গঠন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেন তার পরিচয় মেলে ক্যানভাস আর্টিস্টস্ সার্কল-এর উদ্যোগে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে। ঈশ্বর গুপ্ত, অতুল বড়ুয়া, পি চন্দ্রবিনোদ ও মানিক তালুকদার—চারজনই ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করে শান্তিনিকেতন কলাভবনে উচ্চ শিক্ষালাভ করছেন। প্রথমজন অধ্যক্ষ দিনকর কৌশিক, দ্বিতীয়জন প্রশ্রেয় রামকিঙ্কর ও শেষোক্ত দুজন অধ্যাপক শর্বরী রায়চৌধুরীর অধীনে কাজ করছেন। অধ্যাপকদের সামান্য প্রভাব থাকলেও চারজনের ভাস্কর্য শিল্পে

ডন ফ্রম অ্যান ওভ্যাল

—অতুল বড়ুয়া

স্বাধীন চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা লক্ষণীয়। শুধু তাই নয় চারজনের মাধ্যমও পৃথক। বাঁশ, কোলাজ, সিরামিক ও ব্রোঞ্জ মাধ্যমে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পূর্ণ নতুন শিল্প সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন—এগুলির মধ্য দিয়ে সাবলীল একটি দেশীয় রূপ ফুটে উঠেছে, যেমন ফিগার এ। বাঁশ, হুঁকা, ছাগলের শিং ব্যবহার করে শিল্পী একটি বিচিত্র জীবের অবতারণা করেছেন, যেটিকে লোকশিল্প নিদর্শন বলা যায়। অথবা ফিগার বি। রেখাভিত্তিক, পাট ও কড়ি মাধ্যমে রচিত মূর্তিটি দেখেই চিরশ্যাম শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট রূপটি মনে পড়ে যায়। সিরামিকসের প্রদীপদানও উল্লেখ্য (ফিগার সি)। অতুল বড়ুয়া চিরাচরিত কাঠই নানাভাবে খোদাই করে পজিটিভ ও নেগেটিভ কর্মের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছেন—বিশেষ করে একটি কাঠখণ্ডকে ডিম্বাকারে খোদাই করে মধ্যস্থলটুকু স্তূপ করে তিনি সুন্দর আকার সৃষ্টি করেছেন (ডন ফ্রম অ্যান ওভ্যাল)। দুটি বৃত্তকে কেন্দ্র করে, ভিন্ন সহযোগে একটি বলের ওপর, ও অন্যটি দুটি রডের ওপর স্থাপন করে, কমপোজিশনে, শিল্পী নতুন রূপ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। পি চন্দ্রবিনোদ লোহার রড নানাভাবে জুড়ে (welding) প্রতীকমূলক নানা আকার তৈরি করেছেন। এই প্রসঙ্গে বার্থ অব কৃষ্ণ-র নাম করা যায়। বিমূর্ত রচনার নিদর্শন হিসাবে সীতাহরণ অনেকের চোখে পড়ে। ইঙ্গিতমূলক ম্যাজিসিয়ানও দ্রষ্টব্য। সুপরিকল্পিত ছিদ্র বিশিষ্ট বার্ড আর একটি উল্লেখ্য নিদর্শন। মানিক তালুকদার মাধ্যম হিসাবে কাঠই ব্যবহার করেছেন, তবে তাঁর নিদর্শনগুলি রেখাভিত্তিক ও কাব্যধর্মী। লম্বমান কাঠখণ্ডকে বিশেষভাবে খোদাই করে একদিকে নীল রঙ ও বহিরাকারের চারিদিকে ছোট ছোট পেরেক বসিয়ে শিল্পী সাবলীল একটি নতুন আকার সৃষ্টি করেছেন (ইমেজ অব এম)। এই প্রসঙ্গে প্রতীকমূলক টর্সো Z ও ফিগার-১ উল্লেখ্য। পরীক্ষামূলক হলেও এই তরুণ ভাস্করদের, বিশেষ করে মানিক তালুকদার ও অতুল বড়ুয়ার কাজে প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে।

*

কয়েকজন শিল্পী আছেন যাঁরা বিশেষভাবে প্রস্তুত না হয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন না। বলাই বাহুল্য, কালেভদ্রে তাঁদের শিল্পকলার আসরে দেখা যায়। কুমকুম মুন্সী এই শ্রেণীর শিল্পী। যতদূর মনে পড়ে, বছর দুই আগে সম্ভবত এই শিল্পী ম্যাক্সমুলার ভবনে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিড়লা অ্যাকাডেমিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তাঁর প্রদর্শনী যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে এই শিল্পী সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রের। কুমকুম মুন্সীর শিল্পকর্ম অ্যাকশন পেন্টিং-এর অন্তর্গত, তাঁর কাজে রঙ ব্যবহার রীতি ও বিভিন্ন প্রলেপ পদ্ধতি লক্ষণীয়। শিল্পী মসৃণ আইভরি বোর্ডের ওপর রবার সলিউসন ব্যবহার করে তার ওপর লাল, নীল ও বিশেষ করে বেগুনী রঙ নানা প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেছেন, কয়েক স্থলে ঘষে ঘষে কাগজের সাবেক সাদা রঙ ফিরিয়ে এনে নানা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ইমেজারির সৃষ্টি করেছেন। শিল্পী যে নানা রঙ সাহায্যে পরীক্ষা করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবুও কয়েকটি দেখে বোঝা যায় যে শিল্পীর দূরদৃষ্টি আছে—অর্থাৎ প্রয়োজনমত কোন্ রঙ নির্বাচিত করে কিভাবে ব্যবহার করলে বিশেষ একটি ইমেজারির সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে তিনি সচেতন। কয়েকটি নিদর্শন অনবদ্য—বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে গভীর নীল রঙের বিভিন্ন স্তরভেদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বেগুনী

শিল্পী : কুমকুম মুন্সী

রঙের পরিমিত ব্যবহার করেছেন, অথবা যে স্থলে তিনি হলুদ রঙের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর লাল রঙ পরিমিতভাবে অস্তগামী সূর্যকিরণের মত সারা কাগজে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ শিল্পী রঙের যাদুকর, মনে হয় যেন অবলীলাক্রমে রঙের পর রঙের ফুলঝুরি জ্বালিয়েছেন। কয়েকক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত কাগজের সাদা রঙ ফুটিয়ে তোলার ফলে স্বাভাবিক ও সুন্দর কারুকার্যের সৃষ্টি হয়েছে। ছবির কোনও পরিচয়লিপি না দিয়ে শিল্পী ভালই করেছেন, কারণ মিথ্যা নামকরণের মধ্য দিয়ে এ শ্রেণীর ছবির কোন পরিচয় দেওয়া যায় না—কারণ এগুলি একান্তভাবে অনুভূতি সাপেক্ষ। তবে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। পূর্বোক্ত এ জাতীয় ছবি পরীক্ষামূলক। সুতরাং নির্বাচন বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। এ জাতীয় রচনা ১০।১২টিই দর্শক তথা রসিকবর্গের পক্ষে যথেষ্ট—এর অধিক হলে দর্শক-দৃষ্টি ব্যাহত হয়।

*

ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে অ্যাকাডেমীর গ্যালারীতে শিল্পী কে লক্ষ্মা গৌড়, ডি দেবরাজ ও সূর্য প্রকাশের একটি যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শিত

প্রথম দু জনের গ্রাফিক ও শেষোক্তর তেল-রঙে আঁকা ছবির নিদর্শন দেখা যায়। তিনজনই অন্ধ্র প্রদেশের শিল্পী এবং ইতিপূর্বে বহু স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন করে শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লক্ষ্মা গৌড়ের এচিং ও লিথোগ্রাফের নিদর্শনগুলিতে আকারের ওপর প্রাধান্যদান প্রথমেই চোখে পড়ে। অর্থাৎ আকারকে বজায় রেখেই তিনি খোদাই কাজ করেছেন—কারুকার্য অবশ্যই আছে তবে সেটা গৌণ। শিল্পীর এচিং-এ যে হাত আছে তা কয়েকটি প্রিন্ট দেখেই বোঝা যায়, যেমন, ১১, ৩ ও ২নং। লিথোগ্রাফের মধ্যে পাখি ও মানুষের আকার প্রধান ২৩নং উল্লেখ্য। এই প্রসঙ্গে ২০ ও ২১-এরও নাম করা চলে। দেবরাজের গ্রাফিক শিল্প কাব্য-ধর্মী। এ শিল্পী আকার ও কারুকার্য উভয়ের ওপরই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কারুকার্যের দিক থেকে এঁর দু একটি প্রিন্ট বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংকল্পিত রঙ ব্যবহারের জন্য। যেমন, ৬ ও ৭ নং প্রিন্ট। তবে এ শিল্পীর রঙীন লিথো প্রিন্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনা ও রঙ ব্যবহার গুণে কয়েকটি প্রিন্টে স্ফটিকের স্বচ্ছতা ফুটে উঠেছে—যেমন লাল ও বেগুনী রঙ প্রধান ২১নং প্রিন্ট। সূর্য প্রকাশ বিমূর্ত শিল্পী। রচনাক্ষেত্রটি কয়েক স্থলে শূন্য রেখে কেবল নির্বাচিত কয়েকটি রঙের মধ্য দিয়ে তিনি বিমূর্ত শিল্প রচনা করেছেন। রঙ ও শূন্য স্থানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলেও মূলত শিল্পীর রচনাবলী রঙাশ্রয়ী—বিশেষ করে সোচ্চার নীল, হলুদ ও সবুজ রঙ সাহায্যে শিল্পী বক্তব্যটুকু প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে গভীর নীল ও সবুজ রঙের স্তরভেদ প্রধান ক্যানভাস ওয়ান-এর নাম করা চলে। কম্পোজিশনের দিক থেকে ক্যানভাস টেনও উল্লেখ্য।

✻

সোভিয়েট কনস্যুলেট, ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি ও ভারতীয় মিউজিয়মের উদ্যোগে মিউজিয়ম ভবনে লিথুয়ানিয়ার শিল্পীদের একটি গ্রাফিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে লিনো কাট, উড কাট ও এচিং-এর বহু নিদর্শন দেখা যায়। লিথুয়ানিয়ার গ্রাফিক শিল্পের পথিকৃৎ হিসাবে কুজমিনস্কিস ও উরকুনাস-এর নাম উল্লেখযোগ্য। সম-কালীন গ্রাফিক শিল্পীদের মধ্যে ক্রাসান-স্কর ও ম্যাকুনায়তে অধিক পরিচিত। বাস্তবধর্মী প্রিন্টগুলি দেখে বোঝা যায় যে লিথুয়ানিয়ার শিল্পিবৃন্দ ড্রয়িং ও সূক্ষ্ম খোদাই কাজে সিদ্ধহস্ত—বিশেষ করে সূক্ষ্মতম ডিটেলের প্রতিও তাঁদের সজাগ দৃষ্টি। বলিষ্ঠ ড্রয়িং ও অপূর্ব রেখা-চাতুর্যের জন্য কুজমিনস্কিস-এর স্কর ফিডজম, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ব্রাদারহুড চোখে পড়ে। পুস্তক অলঙ্করণের নিদর্শন হিসাবে ক্রাসানস্কর (২৮, ২৯) ও বিশেষ করে বাক্সারাসাইতে-র লিনোকাট প্রিন্ট (৩২) ও রওদুভের "দি প্যানিকস্যাল গ্রোভ" পুস্তকের চিত্রাবলী (প্রিন্ট ১৩, ১৪, ১৯) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু একজনের কাজে সূচিশিল্পের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেমন স্কিরুতাইতে-র "পিলাবিস" রঙীন লিনোকাট, রঙীন উডকাটের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে মাকুনায়তে-র "টেল অব দি গ্রাস স্নেক"-এর অলংকারিক ছবিটির নাম করা যায়—কম্পোজিশন ও সবুজ ও বেগুনী রঙ ব্যবহার প্রণালী চোখে পড়ে। নিছক সরলতার দিক থেকে ১০নং প্রিন্টও উল্লেখযোগ্য।

✻

২৪ ডায়মণ্ডহারবার রোডে (রেক "স" নিউ আলিপুরে) সম্প্রতি একটি নতুন আর্ট গ্যালারী স্থাপিত হয়েছে নাম নিউ আলিপুর আর্ট গ্যালারী। উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান আচার্য শ্রীসত্যেন বসু, উদ্বোধন উপলক্ষে শিল্পী সুকুমার সেনের একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। আইনবিদ হওয়া সত্ত্বেও শ্রী এস এম শেঠ নিজবাড়িতে এই গ্যালারী স্থাপন করে শিল্পী তথা স্থানীয় অধিবাসীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন। আর্ট গ্যালারীকে বাঁচিয়ে রাখা দুরূহ ব্যাপার। আশা করি, উদ্যোক্তা, শিল্পিবৃন্দ ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এই গ্যালারীটি অচিরে জনপ্রিয়তা লাভ করবে। সুকুমার সেন খ্যাতনামা শিল্পী অসিত হালদারের ছাত্র, বহুকাল পূর্বে তিনি লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে শিক্ষা শেষ করেন। তাঁর শিল্পকর্মে ভারতীয় রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। তেল ও জলরঙে আঁকা ছবির মধ্যে কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য, বিশেষ করে স্কেটিং সং, শিপ্রং, সমুদ্র, হিমালয়-এর রঙের স্তরভেদ অনেকের চোখে পড়ে। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিকৃতিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

চিত্রপ্রিয়

গান-তত্ত্ব

গান বা গীত—এই দুটি শব্দ বহু প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে এ দুটি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, লৌকিক সাহিত্যে তো বটেই। সামগান তথা বৈদিক গান শুধু এক একটি মন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের সমষ্টি, তথাপি তাও গান বা গীত। আবার বহু পদযুক্ত সাহিত্যের লিরিক—তাও একই পর্যায়ের গান বা গীত যাই বলা যাক না কেন। একজন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রকার বলেছেন—ছন্দ এবং অক্ষরে নির্মিত বস্তু, যা সুর করে গাওয়া যায়, তাই গীত। বৈদিক গানও একই সংজ্ঞায় বোঝানো যায়—তাও ছন্দে এবং অক্ষরে রচিত। প্রথমে ঋক্-বেদের মন্ত্রগুলি মাত্র তিনটি স্বরে গাওয়া হত, কিন্তু এর একটি চমৎকার মেলোডি ছিল, যেটি বিশেষভাবে মধু-গদ্য অক্ষরে একটা বিশিষ্ট ছন্দের দোলানে আত্মপ্রকাশ করত। এর পরে এলো ছয়টি স্বর, যুক্ত হল কিছু কিঞ্চিৎ অলংকার; যাকে গ্রামগেয় এবং আরণ্যগেয় গান বলা হয়। গোড়ায় একটি মন্ত্রকেই ফিরে ফিরে আবৃত্তি করা হত। পরবর্তীকালে মূল মন্ত্রটির সঙ্গে আরও দুটি মন্ত্র মিশিয়ে তিনটি মন্ত্রের সংযোগে ত্রিপদী গান করা হত, যাকে বলা হত প্রগাথ। এই পদ্ধতিতে আরও বৃহত্তর বেদগানের রীতিও গড়ে উঠেছিল বৈদিক যুগেই। বহু স্তোত্রের সংযোগে এই গানই হচ্ছে স্তোম।

প্রগাথ সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। দেবতারা যজ্ঞে যে রীতিই প্রবর্তিত করেন না কেন, দেখা গেল অসুরগণ তারই অনুকরণ করছে। দেবতারা অবশেষে একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তাঁরা পরিকল্পনা করলেন যে, তিনটি বেদের মন্ত্রেই তাঁরা গান রচনা করবেন। করলেনও তাই। তখন অসুরেরা ভাবল এরকম একটা কিছু নিয়মসঙ্গত নয়। তারা এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করল না। দেবতারা কিন্তু এই প্রকার গানেই রস পেলেন। এই রসযুক্ত গানই হচ্ছে প্রগাথ। জৈমিনী ব্রাহ্মণ বলছেন—তদ্ যদ্ গাথায়ৈ রসং প্রাবৃহত। তদ্ ব এব প্রগাথস্য প্রগাথত্বম্। স এব রস এব প্রবৃদ্ধঃ রসেন হ অস্য স্তুতং ভবতি য এবং বিদ্বান্ প্রগাথেন স্তুতে। অতএব দেখা যাচ্ছে, বেদগানেও রসকে উপেক্ষা করা হয়নি। লৌকিক না হলেও বেদগানকেও রসযুক্ত করে রূপায়িত করা হত।

আমরা যা পাই, তা কিন্তু তিনটি বেদমন্ত্রের মেশানো গান নয়, তিনটি ঋক্মন্ত্রের সমষ্টি, যাকে ত্রি-ঋচ্ বলা হয়। সামবেদের উত্তরার্চিকে যে ত্রিমন্ত্রের গান পাওয়া যায় সেগুলিকেই সাধারণভাবে প্রগাথ বলা হয়।

প্রগাথ সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ সংজ্ঞা আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রগাথ আসলে একটি বৃহতী ছন্দের পদ ও আর একটি সতো বৃহতী ছন্দের পদে রচিত। ককুভ ছন্দ ও সতো বৃহতী ছন্দের দুটি পদেও এই গান রচিত হতে পারত। আবৃত্তি সহযোগে আর একটি পদ এনে এটিকে ত্রিপদী করা হত।

যাক, এ হচ্ছে একটি অতিপ্রাচীন ধারার গানের তাৎপর্য। এর পরেও গানের আরও প্রকারভেদ এই বৈদিক সঙ্গীতেই পাওয়া যায়। এর একটি হচ্ছে 'আগা' বা 'আগান'। ক্যালাণ্ড সাহেব এই শব্দে কি বোঝাচ্ছে, সেটা ঠিক অনুমান করতে পারেননি। তিনি বলছেন—

—probably aga refers to the strength of tone or to the pitch of tone in chanting!

আচার্য সায়ণ এই শব্দের এইরূপ অর্থই করেছেন। তিনি বলছেন—যেমন লোকে অল্প প্রযত্ন দ্বারা নিষ্পন্ন স্নিগ্ধ স্বরে লৌকিক গান করে থাকে উদ্গাতা এইভাবেই গাইবেন (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ)। আর একটি ব্রাহ্মণ বহিষ্পবমান স্তোত্রগুলিকে 'আগান' বলেছেন। মনে হয় স্তোত্রগানকেই সাধারণভাবে আগান বলা হত। গান অর্থে বিধিবদ্ধ নিয়মে গাওয়া বোঝায়, কিন্তু 'আগান' শব্দে একটা কঠিনভাবে আচরণ না করে একটু সুললিতভাবে গেয়ে গানের সামিল হওয়ার ইঙ্গিত করে। এই রকম আর একটি শব্দ আছে 'উপগান'। প্রায়ই 'উপগায়ন্তি'—এই ক্রিয়াটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এইটিতেও সুললিতভাবে গান করা বোঝায়। আবার 'অভিগান' বা 'অভিগীত' বলেও একটি শব্দ আছে। এতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বর থেকে উচ্চতর স্বরে গাওয়া বোঝায়। এরকম গাওয়াকে 'উদ্গান'ও বলা হত। উদ্গাতারা উচ্চকণ্ঠে গান করতেন বলে তাঁদের এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে 'উদাস' কণ্ঠে গাওয়া মানে উচ্চকণ্ঠে গাওয়া। এই শব্দটিও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।

অতঃপর আর একটি উল্লেখযোগ্য শব্দ হচ্ছে—'বিগান'। একটি আধুনিক বাংলা অভিধানে দেখছি এই শব্দটির মানে দেওয়া রয়েছে—ভর্ৎসনা, নিন্দা, অপযশ। কিন্তু সঙ্গীতের দিক থেকে এর অর্থ হচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে গাওয়া। সামগান প্রায়ই সমকণ্ঠে আচরণ করা হত; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে এককভাবে বা ঠিক এক আসনে না বসে ভিন্নভাবে গাওয়া হত। অথবা কতকগুলি স্তোত্র একভাবে কতকগুলি অন্যভাবে, অর্থাৎ ভিন্ন প্রয়োগ যোগ করে গাওয়া হত। যেভাবেই হোক, বিচ্ছিন্নভাবে আচরিত হলেই তাকে বলা হত বিগান বা বিগীত। বর্তমানেও যখন কোরাসে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয় তখন গানের কোনও কোনও অংশ বিগীত হয়ে থাকে। এই শব্দটির টেকনিক্যাল অর্থ না জানা থাকলেই বুঝতে ভুল হবার সম্ভাবনা, কারণ বিগীত শব্দের অর্থ যদি কেউ 'বিকৃতভাবে গীত' করেন তা হলেও তাঁর অনুমান অসঙ্গত হবে না। বহিষ্পবমান স্তোত্রগুলিতে কোনও কোনও পদ বিচ্ছিন্নভাবে গাওয়া হত—তখন শাস্ত্রকার বলেছেন—"এতে পংক্তিং বিগায়ন্তি।"

বিগান শব্দের উল্টোটাই হল—'সংগান' বা 'সংগীত'। একসঙ্গে গান করাকেই 'সংগান' বলা হয়। অনেকেই দেখছি এই মত প্রকাশ করেন যে সংগীত শব্দটি খুব প্রাচীন নয়, এই শব্দ নাকি নাট্যশাস্ত্রেও দুর্লভ। কিন্তু তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কেননা একাধিক বৈদিক শাস্ত্রে এই শব্দের উল্লেখ আছে এবং কোন মন্ত্রটি বিগীত হবে আর কোনটি সংগীত হবে তাও বলা হয়েছে। সংগীত শব্দের একটি অর্থে বলা হয়েছে—সংগাতব্যাঃ গাতব্যাঃ। সংগীতরত্নাকর বলেছেন—গীত, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিনটিকে সঙ্গীত বলা হয়। এইটি বরং ভাবার্থ, কিন্তু আসল অর্থ হল সম্মিলিত কণ্ঠের গান। দুঃখের বিষয়, আমাদের তথাকথিত সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রগুলি এসব কিছুই বিচার বিশ্লেষণ করেননি, পরন্তু কয়েকটি টার্মিনলজির এমন অপব্যাখ্যা বা ভ্রান্ত প্রয়োগ করেছেন যে বিশেষজ্ঞ না হলে তাতে বহুলভাবে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হবে।

এ ছাড়া গাইবার বহু প্রকার টেকনিকের উল্লেখ ব্রাহ্মণ বা সূত্রগুলিতে আছে। এইগুলি একত্র করলে বৈদিক সঙ্গীত সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। পৃথিবীতে প্রাচীনতম স্বরলিপিসহ লিপিবদ্ধ গানের একটি প্রধান উদাহরণ হচ্ছে সামবেদ। স্বরলিপি এমনভাবে করা হয়েছে যে গাইতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই স্বল্প। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ এবং সূত্রগ্রন্থগুলিতে স্বরের টেকনিকের, কোনটা চড়া সুরে, কোনটা খাদ কোমল

ধীত সহযোগে, কোনটির স্থায়িত্ব কতটুকু, কোথায় কেমন অক্ষর যোজনা করতে হবে কিভাবে শেষ করতে হবে—সে সবই বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ দুঃখের বিষয় এটাই যে আমাদের সংগীত সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্বত্র আজও বলে বেড়ানো হচ্ছে যে নোটেশন নাকি আমাদের সংগীতে ছিল না। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের উক্তিই মনে আসে—"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া..." এ ছাড়া আর কি বলব।

রজনীকান্ত সেনের গানের স্বরলিপি

বর্তমানে বাংলা গান রচনায় যাঁরা চিরায়ত শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন তাঁদের গানের স্বরলিপি প্রণয়নের একটা উত্তম প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। রজনীকান্তের বহু গান মুখে মুখে প্রচলিত আছে অথচ সেইসব গানের মুদ্রিত স্বরলিপি খুব বেশী পাওয়া যায় না। সম্প্রতি কবির দৌহিত্র খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী শ্রীদিলীপকুমার রায় "কান্ত-গীতলিপি" নামক গ্রন্থে রজনীকান্তের পঁচিশটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন। প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা। স্বরলিপিগুলির সম্পাদনা করেছেন শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। গ্রন্থের মুখবন্ধে দিলীপবাবু জানিয়েছেন যে কবির জীবিত অবস্থাতেই তাঁর অনেক গান ভিন্ন সুরে এবং ভিন্ন ঢংএ তৎকালীন সংগীতজ্ঞ ও সংগীতশিল্পিগণ প্রচার করেছেন। ফলে তদীয় পরিবারের সংরক্ষিত সুরগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত সুর থেকে পৃথক। দিলীপবাবু তাঁর পরিবারে সুরক্ষিত এই গানগুলির সুর প্রকাশ করে একটি পবিত্র কর্তব্য পালন করেছেন এবং ভরসা দিয়েছেন যে খণ্ডে খণ্ডে কবির আরও বহু গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা তাঁর কল্পনায় আছে।

আর একটি বই হাতে এসেছে—"রজনী-কান্তের গান"—স্বরলিপিকার শ্রীমনোরঞ্জন সেন। প্রকাশক—হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা। এতে কুড়িটি গানের স্বরলিপি আছে। সেন মহাশয় বলছেন তিনি রজনীকান্ত প্রবর্তিত গায়কী বজায় রাখবার সবিশেষ চেষ্টা করেছেন এবং গায়কীপুষ্ট স্বরলিপিই তাঁর কাম্য।

আমরা দুটি বই-এরই প্রচার কামনা করি। আর একটি বক্তব্য আমাদের আছে। বহু বৎসর পূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রজনী-কান্তের বেশ কিছু গানের স্বরলিপি বেরিয়েছিল। এগুলিরও বিশেষ মূল্য আছে। কেউ যদি এইসব স্বরলিপির সংকলনে মনোযোগী হন তাহলেও অনেক প্রামাণিক সুরের উদ্ধার হতে পারে।

শার্ঙ্গদেব

যাবনা যাবনা যাবনা ঘরে

মহাশয়,

শার্ঙ্গদেব দেশ ৩৯বর্ষ নবম সংখ্যায় (১৬ই পৌষ) অতুলপ্রসাদের "যাবনা যাব-না যাবনা ঘরে" গানটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তিনি শুনেছেন গানটি রাগাশ্রী বন্দেশী ঠুংরী "পিয়াসে সন্দেশ মোরা কহিও যায়"-এর ভিত্তিতে নাকি অতুলপ্রসাদ রচনা করেছিলেন। কিন্তু শার্ঙ্গদেব এই অভিমত সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করবার জন্য দেশের পাঠকবর্গের কাছে অনুরোধ রেখেছিলেন।

গত ২২শে জানুয়ারী পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে অতুলপ্রসাদ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শ্রীযুত পাহাড়ী সান্যাল মহাশয় অতুলপ্রসাদের গানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি লখনউ-এর ছোটীঠুংরী (মধ্যলয়ে গীত)

'সজনী বহকাউ মা মোহে বহকাউ না
মোরি বারি যোবনোয়া ফুল ঝাউ না'

এই গানটির ভিত্তিতে "যাবনা যাবনা যাব-না ঘরে' গানটি রচনা করেন। তিনি পাশাপাশি ছোটী ঠুংরী এবং "যাবনা যাব-না যাবনা ঘরে"—এই দুটি গান গেয়ে শোনান। পাহাড়ীবাবু অতুলপ্রসাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই তিনি অনেক গান শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর অভিমতটি গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়।

দুর্গাশঙ্কর মল্লিক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
পুরুলিয়া

উৎসাহের অন্ত নেই

ভোটরঙ্গ

এবারের মত ভোটরঙ্গের পালা শেষ। অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটেছে। কিছু জানা গেছে, কিছু জানা যায় নি। খবরের কাগজে পড়লাম আসন্নপ্রসবা যুবতী ভোট-বাক্সে কাগজখানা দিয়েই ভোট কেন্দ্র থেকে ফিরতে পারেন নি। সেই কেন্দ্রেই সন্তানের জন্ম হয়েছে। সর্বভারতীয় হিসাবেই মেয়েদের উৎসাহ বেশী দেখা গেছে। পল্লী অঞ্চলে সারা রাত্রির পর খাওয়া আর খাওয়ার পর এসে এই ... থেকে মেয়েরা মুক্তি পাবার এই আনন্দে বেশ খুশী মনে কাজে লেগেছে। [illegible] পোলিং সেণ্টারে যাওয়া তো তাদের পক্ষে দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনে একটু চাটনির মত। বৃদ্ধা, অতিবৃদ্ধা, অশক্ত, অসুস্থ মেয়েরা ... কষ্ট করে ভোট দিতে যাচ্ছে তার ছবি বার হয়েছে ইয়ত্তা নেই। মনে হয় যেন এবার ভোট দেওয়া পর্বে মেয়েরাই মেতেছে।

সব মাতামাতিতে কত অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। এখন কাল পাত চেপে লেখা এবারকার একটি ভোট যাচ্ঞা করার কাহিনী বলছি। ভদ্রমহিলার নাম ধরুন কামিনী। তিনি ধনী ঘরের মানী মহিলা। কোন একটি রাজনৈতিক দলের পাণ্ডারা বললেন, "তোমার স্বামীর দপ্তর সংলগ্ন যে বিরাট বাগানখানা তাতে আমরা মিটিং করবো।" "সে কি? সে তো আমার স্বামীর অফিস। তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"জানি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি তিনি মত দেন নি। আমরা আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি। আপনি তাঁর মত পরিবর্তন করে দিন।"

কামিনী কেমন করে তা করেন? বিফলমনোরথ দলপতির দল ফিরে গেলেন।

ওমা, পরদিন ভোরে দেখা গেল কামিনীর গৃহসংলগ্ন খোলা জায়গাটুকু লোকে লোকারণ্য। শহরের গণ্যমান্য সবাই সেখানে। চারদিকে পোস্টার সাঁটা হয়েছে, "কাল রাতে কামিনী দেবী হঠাৎ পরলোকগমন করেছেন, খবর দেবার সময় কম। অন্ত্যেষ্টিতে আপন জন উপস্থিত হবেন বলে এই ব্যবস্থা করেছেন!"

মুখে মুখে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে গেল। কামিনীর অসুস্থ কাকা হন্তদন্ত হ'য়ে ফোন করছেন। কামিনী কেমন আছে? কামিনীর স্বামী যতই বলেন কামিনীর তো কিছু হয়নি ততই অধীর হয়ে কাঁদেন কাকামশাই। "আমার কাছ থেকে চেপে যাচ্ছ কেন? সত্য করে বল..." বেলা পড়তে লাগলো আর মানুষ জমা হ'তে লাগলো। দলপতিদের দুচারজন ততক্ষণে দল সম্বন্ধে পরিচয়ে দুচার কথা বলা আরম্ভ করেছেন। হতবুদ্ধি কামিনী আর তার স্বামী ন যযৌ ন তস্থৌ। ব্যাপার কি? দলপতিরা স্মিতহাস্যে হাত কচলে বললেন কিছু নয়, জিন্দাবাদ মুর্দাবাদের পালা মাত্র!

কামিনীর ব্যাপারটি নিছক সত্য ঘটনা। এবার নির্বাচনে হয়তো আরও কত কিছু হ'য়েছে। কিন্তু যা সবচেয়ে বেশী নজরে ঠেকেছে তা' হ'চ্ছে রাতারাতি সাধারণ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি। তার চেয়ে আর একটু আগে যান, দেখুন যে মেয়ে হলুদ ছোপ মাখা ছেঁড়া শাড়ি সামলে শীতের বাতাসে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে সেও আজ অন্নপূর্ণার ভূমিকায় নেমে যেতে পারে ভোট ভিখারীর কাছে। বাজার দরে বিপর্যস্ত অসহায় বস্তিবাসীকেও বিরাট ব্যাপারীর দল যুক্তকরে ভজাচ্ছে দিন রাত। কুলি-কামিনী থেকে জমাদারনী সবাই আজ দাতা। Greatest good of the greatest number অর্থাৎ অধিকসংখ্যক মানুষের মঙ্গল যদি গণতন্ত্রের আদর্শ হয় তবে সবার আগে ভোটদাতাকে জানতে হবে মঙ্গল কি? সে ভূমিকাতেও মেয়েরা জানে কোথায় তাদের ব্যথা, কোথায় সমাজের গলদ। নিয়ম পরিবারের জননী দুনিয়ায় সবসেরা অর্থনীতি-বিদ্ বা economist। তার পক্ষে সামাজিক পরিপক্কতা সহজে হৃদয়ঙ্গম করার সম্ভাবনা বেশী। জাতীর জীবনে যে কটা বছর কেটেছে বা যে কটা নির্বাচন ঘটেছে তার মূল্য তত নয় যত অগ্রগতিতে অংশগ্রহণের মূল্য। আরও পরীক্ষা আসবে, আরও সুচিন্তিত মতামতের যোগ্য হবে নাগরিক এই আশা আমরা রাখি। সেই ক্ষেত্রে নারীও যাবে এগিয়ে সমাজতন্ত্রবাদকে সামনে রেখে। সমাজতন্ত্রবাদের বিশেষ একটি দিক নারী-প্রগতি। আমাদের দেশে Lib-এর ছন্নছাড়া প্রকাশ নেই কারণ আমাদের নারী আত্মস্থ। কিন্তু সেই আত্মস্থ, স্থির ও শান্ত নারী সমাজ যদি চুপ করে চেয়ে থাকে যাদের ভোট দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছে তাদের কার্যকলাপের দিকে তবে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ জ্ঞান করবো। প্রতিষ্ঠিত মানুষগুলি জটলা করবে, আপন আপন সুবিধার পথ খুঁজবে আর যারা প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের তারা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে এমন কখনও হতে দেওয়া উচিত নয়। ভোটরঙ্গের অনেক ভাঁওতা সাধারণকে কাবু করে কিন্তু পরের অধ্যায়ে সে সচেতন থাকলে ভাঁওতার জোর কম হতে বাধ্য।

শেষ সতী

কাহিনীটি শুনেছিলাম শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর মুখে। তিনি শুনেছিলেন তাঁর মা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কাছে। কাহিনীর কতটা সত্য আজ বলা কঠিন। কিন্তু সে যুগের জনজীবন, সমাজ ও বিশ্বাসের সামান্য একটি ঝলক তাতে মেলে।

সরোজিনীর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণাতে। গ্রামের নাম পদ্মজা খুব পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারেন নি। যতদূর বুঝলাম ব্রাহ্মণগাঁও ছিল গ্রামের নাম। নাম যাই হক, পরম প্রতাপশালী চট্টরাজ পরিবার গাঁয়ের সেরা, সমাজের মাথা। দীর্ঘকাল অভিজাত বনেদী বংশ।

এহেন পরিবারে অঘোরনাথের জন্ম। তিনি অতি অল্প বয়সে বাংলার বাইরে বসতি করেন। অঘোরনাথের প্রপিতামহী নাকি বাংলার শেষ সতী হয়েছিলেন। জানি না, এভাবে খবর সংগ্রহ করা ও কে শেষ সতী তা সঠিকভাবে বলা সে সময় আদৌই সম্ভব ছিল কিনা। পদ্মজার কাছেই শুনেছিলাম শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বামী শ্রীযুক্ত আর এস পণ্ডিতের প্রপিতামহীও নাকি তাঁর গাঁয়ের শেষ সতী। আজও তাঁর সমাধিমন্দির-এর সামনের

নববধূও বাদ নেই

রাস্তায় চলতে গ্রামবাসী ছোট বড়, মেয়ে-পুরুষ প্রণাম না করে পথ চলে না। এমন যে দেবত্বলাভ হয়তো বা তা' ঐ প্রথার সহায়ক ছিল।

অঘোরনাথের প্রপিতামহী অতীব দুলালী এবং অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। সব যুগের সব রূপসী যেমন দেমাকে মট্‌মট্ করতেন তিনিও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। গল্পে মজা এখানেই। সারাদিন স্বামীর সঙ্গে কথা বলা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। সুন্দরী তরুণীরা সন্ধেয়ে, কম্প্রবক্ষে সাঁঝের সব কাজের শেষে ঢুকতেন স্বামীর কক্ষে রজনীযাপনে। এমন যে রোমাঞ্চকর মিলনমুহূর্ত তার সঙ্গী ছিল তাম্বুল। পান নিয়ে পৌঁছতেন মানিনী প্রিয়মিলন মন্দিরে। অঘোরনাথের প্রপিতামহী গর্বিত পদক্ষেপে পৌঁছে বসে আছেন। স্বামীর দেখা নেই। কিছু পরে তিনি প্রবেশ করে চাইলেন পান। প্রতীক্ষমানা মানিনী কেদারায় বসে পা দোলাচ্ছিলেন উদ্ধত-ভঙ্গীতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে পানদান দেখিয়ে দিলেন, খেতে হয় নিয়ে খাও।

স্বামীর মর্যাদায় আঘাত লাগলো। বললেন, 'যখন তুমি সতী হবে, তোমার ঐ দর্পভরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বাদ থেকে যাবে।" কথিত আছে স্বামীর চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল অমন রূপরাশি কিন্তু ঐ বুড়ো আঙ্গুল বাদ রয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমতী

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্মের দ্বিশত বৎসর ১৯৭০ সনে শেষ হয়ে গেল। ভারতবর্ষে এ নিয়ে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা কানে আসেনি। ইংলণ্ডে নিশ্চয়ই উৎসব প্রতিপালিত হয়েছে। অন্তত একটি স্মারক ডাক-টিকিট প্রকাশিত হয়েছিল। একদা কবি হিসেবে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের যে খ্যাতি ছিল তাতে ভাঁটা পড়েছে সন্দেহ নেই। আধুনিক কাব্যবিচারে তিনি সেকেলে বলে প্রতিপন্ন হবেন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা চিরন্তনতার অধিকারী। ভারতবর্ষে তিনি ইংরেজ কবিকুলের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় বলে আজও শ্রদ্ধেয় হয়ে আছেন। তার কারণ হয়তো তাঁর চিন্তায় কিছু পরিমাণে প্রাচ্য রীতি সংশিলষ্ট হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওয়ার্ডসওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকমে বেঁচে আছেন।" (শেষের কবিতা)। ব্যঙ্গের আকারে প্রকাশিত হলেও এ মন্তব্যে স্বীকরণ আছে। এ-সব সত্ত্বেও ভারতবর্ষে কবির জন্মের দ্বিশত বর্ষ পূর্তি উৎসব তেমন করে প্রতিপালিত হয়নি দেখে আশ্চর্য লেগেছিল।

মনে পড়ছিল ১৯৫২ খৃীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের একটি আতপ্ত সকালে তাঁর গ্রাসমিয়ারের বাড়িতে তীর্থযাত্রী হিসেবে ভারতবর্ষের হয়ে একটি প্রণাম নিবেদন করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সেদিনের সকালটি আজও স্মৃতিতে সেদিনের মতোই উজ্জ্বল হয়ে আছে।

উইন্ডারমিয়ার স্টেশনে আমরা যখন নামলাম তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। গাছের তলায় তলায়, স্টেশনের শেডের নীচে, সাইডিং-এর মালগাড়ির জটলার মধ্যে থোকা থোকা অন্ধকার জমে আছে। গুটিকয় যাত্রী গাড়ির থেকে নেমে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যেতেই স্টেশনটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। লেফট-লাগেজ ঘরে যে অমায়িক ইংরেজ-নন্দনটির সঙ্গে দেখা হল, তাঁর কাছ থেকে মালের রসিদ আর গ্রাসমিয়ার যাবার হদিস নিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম তখন অন্ধকারটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, লেক-অঞ্চলের এক ঝাপটা ঠান্ডা বাতাস মুখে-চোখে লাগতেই রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়ে গেল। দু হাত দিয়ে মুখের উপরের অন্ধকারের আবরণটা সরিয়ে দিয়ে লেক-অঞ্চলের পটভূমি ধীরে ধীরে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। অস্ফুট গুঞ্জনে যেন বলল, "দেখ ত চেয়ে, চিনিতে পার কিনা।" মনে মনে বললাম, চিনি।

শুধু আমরা নই, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের ইংরেজী কাব্যরসিক এখানে এসে দাঁড়ালেই এ অঞ্চল চিরপরিচিতের মতো তাকে আত্মবশ করে নেবে। জগতে এমন অনেক বড়ো কবি জন্মেছেন, যাঁদের কাব্যের পরিবেশ সামান্যধর্মী, কোনো বিশেষ অঞ্চলের বলে তাকে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের জাত ছিল আলাদা। তাঁর কাব্যের পরিবেশটি, তাঁর কাব্যের তত্ত্বের মতোই সাহিত্যের চিরন্তন ভাণ্ডারে গিয়ে জমা হয়েছে। এ বিষয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের জুড়ী আর একটি লেখক আছেন ও-দেশে। তিনি ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি। ইংলণ্ডের ওয়েসেক্স্ অঞ্চল তাঁর লেখায় চিরকালীন মর্যাদা পেয়েছে। আরও অনেক ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের তুলনা নেই। পূর্বজীবনে পদ্মাতীর এবং উত্তরজীবনে বীরভূমের খোয়াই অঞ্চল—এই দুই মিলিয়ে বাঙলাদেশের একটি পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গ রূপ চিরকালের জন্য ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাহিত্যেও তেমনি বিধৃত হয়ে আছে হ্রদ এবং পাহাড়ের সমাবেশে অপরূপ লেক অঞ্চল। কবিসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, ধরণীর তলে গগনের গায়, সাগরের জলে অরণ্যছায়, আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙিন করিয়া দিব।' এ উক্তি বুঝি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মুখেও এমনি মানাত। তাঁর দৃষ্টির মন্দাকিনীতে স্নান করে লেক অঞ্চলের সৌন্দর্য নূতন সুষমামণ্ডিত হয়েছে। পাহাড়ের সীমারেখা আঁকা এ অঞ্চলের সুনীল আকাশে, সূর্যকিরণে ঝলসিত অগণিত হ্রদের বীচিমালায়, বন্ধুর পাহাড়ী রাস্তার বাঁকে বাঁকে, অগভীর ঝিলের আদিগন্ত প্রসারের মধ্যে, নিঃসঙ্গ কুয়াশার গুঞ্জনে মুখরিত শস্যক্ষেত্রের সোনালী

কবি-গৃহ "ডাভ-কটেজ"

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও তাঁর পত্নীর সমাধি

হিল্লোলে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের দৃষ্টির রেণুগুলি ছড়িয়ে আছে। আমাদের আজকের দেখা দুই শতাব্দী আগের প্রথম দেখার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে।

বেশভূষা সমাপ্ত করে পত্নী নীলিমা যখন মেয়েদের বিশ্রামাগার থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন স্টেশনে এবং আশেপাশে দিনের কর্মব্যস্ততা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মালগাড়িগুলো এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চালান হবার খটাং খটাং আর এঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি মিলে প্ল্যাটফর্মে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দূরের রাস্তা দিয়ে পাউরুটি আর দুধ বিক্রির কয়েকটা ভ্যান চলে গেল। আমাদের বাস আটটায়। প্রাতরাশ সেরে নেবার জন্য একটা রেস্তরাঁর খোঁজে বেরুলাম। কাছাকাছিই একটি রেস্তরাঁ পাওয়া গেল। রাস্তাটা স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঢালু হয়ে উইন্ডারমিয়ার লেকের দিকে নেমে গিয়েছে, লেকে পৌঁছবার আগেই রাস্তার মাঝামাঝি একটি সুন্দর ছোটো বাড়ি। দোতলায় যাঁরা থাকেন, নীচের তলায় তাঁদেরই রেস্তরাঁ। এত সকালে অন্য খদ্দের তখনও জোটেনি। আমরাই প্রথম। তাই খাবার তৈরি হয়ে আসতে একটু দেরি হল। বসে বসে জানলা দিয়ে লেকের হাতছানি চোখে পড়তে লাগল। মৃদু বাতাসে লেকের জলে ঢেউ উঠেছে, এত দূর থেকে তার "কুলুকুলু কলতান" ভেসে আসে না। তবু জলের আহ্বান মনের মধ্যে বাজতে থাকে, "এসো ওগো এসো মোর হৃদয়নীরে।"

লেক-অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য নানা-রকম ব্যবস্থা আছে। স্টিমারে এ-লেক ও-লেক করে পুরো অঞ্চলটা দেখে আসা যায়। তা ছাড়া বাসের রাউন্ড-ট্রিপ তো আছেই। কিন্তু আমরা এক দিনের যাত্রী। পরদিনই গ্লাসগোতে জাহাজ ধরতে হবে। সুতরাং গ্রাসমিয়রের ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাড়িটিই শুধু আমাদের লক্ষ্যস্থল। জীবনে হয়তো আর আসা হবে না। তাই অগণিত লেক আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজের স্মৃতি-বিজড়িত ছোটো ছোটো গ্রামের মালা দিয়ে গাঁথা লেক অঞ্চলের মধ্যমণিটিই শুধু দেখে যাই।

বাস এল যথাসময়ে। লোকালয়ের সীমা ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়েই রাস্তাটা দাঁড়িয়ে পড়েছে হ্রদের বেলাভূমিতে, মালার মতো লেকের অনন্ত জলরাশিকে ঘিরে রেখেছে। তার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের বাস। মাঝে মাঝে বাঁক ঘুরতেই হ্রদের জল পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার পাতার জালের মধ্য দিয়ে ঝিকমিক করে উঠছে।

তখন গ্রীষ্মকাল। সমস্ত দেশ জুড়ে ছুটির উৎসব চলেছে। দূরে থেকে দেখতে পাচ্ছি অনেক বেলাভূমিতে বিরল-বসন তরুণীরা ছড়িয়ে বসে আছে। শিশুরা জলে ঢেউ দিয়ে সাঁতার কাটছে। তাদের দূরাগত হর্ষধ্বনি কানে পৌঁছবার আগেই বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছোটো ছোটো গ্রামের সীমানায় এসে বাসের গতি মন্থর হচ্ছে। গ্রামের মধ্যে ঘন ঘন হর্ন বাজাতে হচ্ছে, গ্রাম ছাড়িয়ে এলেই আবার বিস্তীর্ণ চড়াই-উৎরাই। পাহাড়ের গায়ে সবুজ সবুজ ঘাসের জমিতে দু-একটি মেষপালকের খবরদারিতে অগণ্য মেষের পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরকম পাহাড়ী রাস্তায় চলতে চলতে অসাবধানির মতো চকিত মেষের ঝাঁকে

ওয়ার্ডসওয়ার্থের চোখে একদিন মানব-জীবনের অন্তরের গভীর চেতনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সত্যদ্রষ্টার সে চোখ দুটি বহু দিন পূর্বেই মৃত্যুর মহাশান্তিতে নিদ্রিত হয়েছে। তবু তাঁর সেই দৃষ্টি আমাদের সকলের দৃষ্টিকে অনুরঞ্জিত করে চিরজাগ্রত হয়ে রয়েছে।

লেকল্যাণ্ড বা লেক-অঞ্চলে একশো আশিটি পাহাড় আছে। উচ্চতা গড়ে দু হাজার ফুট, কোনো কোনো পাহাড়ের চূড়া তিন হাজার ফুট ডিঙিয়েছে। পাহাড়ের কোলে কোলে শান্ত গ্রামগুলির পদপ্রান্ত চুম্বন করে জড়িয়ে আছে পনেরটি বড়ো এবং উনচল্লিশটি ছোটো ছোটো হ্রদ। পরি-বেশটি এত শান্ত যে, কবি বলেছিলেন, "এ শান্তি মানুষ কোনো দিন সৃষ্টিও করেনি, মানুষের সাধ্যও নেই এ শান্তি ভঙ্গ করে।" "(. . . peace man did not make and cannot mar).

গ্রাসমিয়ার লেক

লেক-অঞ্চল কোলরিজ, সাউথে, আর-নল্ড, রাসকিন প্রভৃতি ইংরেজ লেখকদের সংস্মৃতিবিজড়িত। তবে লেক-অঞ্চলের সাধারণীকৃতি ঘটেছে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে অবলম্বন করে। পৃথিবীর মানুষের কাছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর লেক-অঞ্চল প্রায় অভিন্ন।

প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ গ্রাসমিয়ারে পৌঁছে গেলাম। পরিচ্ছন্ন নীরব গ্রাম। দু' শতাব্দী আগের থেকে চেহারা নিশ্চয়ই পালটেছে কিন্তু তবু বাইরের এত বিক্ষোভ, এত হানাহানি, এত মতবাদের সংঘাত এখনও গ্রামটির শান্তিকে পুরোপুরি ব্যাহত করেনি। বাস থেকে নেমে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। মাঝে মাঝে গ্রাস-মিয়ার লেকের প্রশান্ত জলরাশি চোখে পড়ে, আবার পথের বাঁকে অন্তরালে পড়ে যায়।

১৭৯৯ খৃস্টাব্দে কবি গ্রাসমিয়ারে "ডাভ-কটেজ" নামে একটি বাড়ি কিনে এখানে এসে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর কৈশোর এবং পূর্ববর্তী যৌবন খুব সুখে কাটেনি কিন্তু শৈশব গ্রামীণ পরিবেশে খুব আনন্দে কেটেছিল। এবার ভগ্নী ডরোথির সঙ্গে কপোতকুটিরে আসার পর শুধু তাঁর জীবনের অনিশ্চয়তা কেটে গেল তাই নয়, জীবন পত্রপুষ্পে ভরে উঠল। পরের বছর কবিবন্ধু কোলরিজও এই অঞ্চলে এসে বসবাস আরম্ভ করলেন। ডাভ-কটেজ কবির "শেষ বেলাকার ঘর নয়", কিন্তু এ ঘর তাঁকে যা দিয়েছে "তুলনা তার নাই।" জীবনের শেষ বেলায় আবার তাই তিনি এ ঘরেই ফিরে এসেছিলেন। ভগ্নী ডরোথি তো সঙ্গে ছিলই, পরের বছর ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনে বিয়ের ফুল ফুটল। এলেন মেরী হাচিংসন। তিনজনের মিলিত জীবনে যে শান্তিময় পরিবেশ গড়ে উঠল, কোনো বিখ্যাত কবির জীবনে তার তুলনা নেই। "ডাভ-কটেজ" কবির সুখ-দুঃখের সাথী, তাঁর চিন্তার আধার, তাঁর লেখনীর গঙ্গোত্রী। ব্যক্তিগত শোকতাপ তিনি এ গৃহে পাননি এমন নয়, তবু এখানে এসেই তাঁর খ্যাতির সিংহদ্বার খুলে গেল। অবিস্মরণীয় কবিসমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা হল।
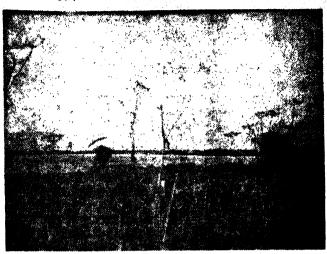
সরস্বতীর সাধনায় লক্ষ্মীলাভের পর তিনি অবশ্য "রাইডেল মাউণ্ট" নামে লেক-অঞ্চলের অন্য বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু ডাভ-কটেজই প্রথম তাঁকে দু' হাত ভরে দিয়েছে।

আর দিয়েছে দুই নারী। সহোদরা ডরোথি আর সহধর্মিণী মেরী। ডরোথির সেবা পূজারিনীর মতো ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনকে পূর্ণ করেছে। তাঁকে নইলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখনী অনেকাংশে মিছে হয়ে যেত। আর মেরী প্রেয়সী নারী। পূজার নৈবেদ্য পেয়েও মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে যে তৃষ্ণা থেকে যায় মেরী তার শান্তির মতো। ওয়ার্ডসওয়ার্থের তৃষিত জীবনে চণ্ডালিকা প্রকৃতিরূপিণী এই নারী।

ডরোথির রোজনামচা থেকে কবির অন্তরঙ্গ জীবনের অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি হয়তো সাহিত্য নয়, কিন্তু সাহিত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধির সোপান। আর মেরী ওয়ার্ডসওয়ার্থকে শুধু উদ্বুদ্ধ করেননি, যখন অন্তরের গভীর ভাবটি প্রকাশের আকুলতায় বাণী-হারা, তখন তাঁকে কথাও যুগিয়েছেন। বিখ্যাত "ড্যাফোডিলস" কবিতার শেষ দুটি অনবদ্য পঙ্‌ক্তিতে, মেরীর হাতের স্পর্শ আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের অন্তর্মুখী দৃষ্টি আর নির্জনতার আশীর্বাদের সন্ধান মেরী ভালোবাসার আলোতে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই দুটি নারী কবির জীবনকে সুধায় ভরে দিয়েছিলেন, তাই সমালোচকেরা বলেছেন, নারী সম্বন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিশেষভাবেই ভাগ্যবান।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের গৃহগুলিতে পূজারীর মতো সন্তর্পণে প্রবেশ করতে হয়। আশঙ্কা হয় আমাদের বিন্দুমাত্র চপলতায় দু' শো বছরের সেই চিন্তার ঝাঁকগুলো ভীত কপোতের মতো বুঝি ডানা মেলে উড়ে যাবে। চারদিকের নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা সে চিন্তার প্রহরায় অতন্দ্র সময় যাপন করছে। কবির দৈনন্দিন ব্যবহারের ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখা হল। "ডাভ-

[illegible] কবির লেখার [illegible] দারিদ্র্যের সঙ্কেত, সে দারিদ্র্য কাব্যের [illegible] ব্যাহত করেনি।

বাড়িগুলো দেখা হলে গ্রাসমিয়ারের গির্জাটির দিকে গেলাম। কবিকে যাঁরা এ গ্রামে দেখেছেন, তাঁরা কেউ আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু কবি সম্বন্ধে কিংবদন্তী পুরুষ-পরম্পরায় বেঁচে আছে। এই রাস্তা দিয়ে কবি প্রতি রবিবার সকালে মাথা নীচু করে গির্জার দিকে হেঁটে যেতেন। গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁর বেশী অন্তরঙ্গতা ছিল না, কিন্তু তাঁর অপসারী মূর্তিটি সকলের অন্তরঙ্গ ছিল। যখন পথ দিয়ে হাঁটছেন তখনও তাঁর মনে মনে যেন কাব্যসৃষ্টি চলত, লোকেরা সম্ভ্রমে সে সৃষ্টির ধ্যান কখনও ভঙ্গ করেনি। কিন্তু জনজীবনের প্রতিটি তরঙ্গ কবির মানসপটে চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে যেত। হাইল্যাণ্ডের সেই নিঃসঙ্গ তরুণী শস্য-আহারিণীর মতো অনেকেই কবির কাব্যের পথ ধরে অমরত্বে উপনীত হয়েছেন।

গির্জাটি দেখে অনতিদূরের সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম। এখানেই ডরোথি, মেরী এবং কবির সমাধি আছে। হঠাৎ কানে ভেসে এল একটি কিশোরী কণ্ঠে গভীর প্রত্যয়ের সুন্দর প্রতিবাদ—আমরা সাত ভাই-বোন, সাতজনই। কবির কপট অবিশ্বাসের ধমকে সে প্রত্যয় মুছে যাবার নয়। ছোট চম্পা আর পারুল নিয়ে সাতজনের একটি চাঁপা অকালে শুকিয়ে ঝরে পড়েছিল। সমাধিক্ষেত্রের কোনো অখ্যাত স্থানে হয়তো সে আজও শায়িত। কিন্তু পারুল বোনের গভীর প্রত্যয়ে সকলের কাছে সে অমরত্ব লাভ করেছে। কোনো উপায় ছিল না, তা না হলে চম্পা ভাইয়ের সেই সমাধিতে এক গুচ্ছ ফুল ছড়িয়ে দিতাম।

সমাধিক্ষেত্রের নির্জন পরিবেশটি দেখে স্যার উইলিয়ম ওয়াটসনের সে কবিতাটি মনে পড়ে গেল। আকাশপটে পুরনো গির্জার অনলংকৃত চূড়াটি আঁকা হয়ে আছে, আর পাশ দিয়ে রোথা-নাম্নী ঝোরাটি কুলুকুলু স্বরে ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে যেন অতি সন্তর্পণে বয়ে চলেছে, নিঃসঙ্গ শান্তির স্বল্পবাক্ কবির চির-নিদ্রাটি পাছে ভেঙে যায়। চারদিকের দিগন্ত নীরব ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে, আর ক্ষণে ক্ষণে ঠাণ্ডা বাতাস মৃদু মর্মরে স্নেহবীজন করে যাচ্ছে।

দুপুরের একটু পরে আমরা তীর্থযাত্রা শেষ করে আবার এসে বাসে উঠলাম। ঘন পাতায় বোনা গাছের আড়াল থেকে শেষ-বারের মতো প্রাচীন গির্জার চূড়াটি দেখতে পেলাম। বাস কিছু দূর আসতেই হ্রদের কণ্ঠলগ্না গ্রাসমিয়ার গ্রাম তীরভূমির নীলাভ সবুজ গাছের সারির মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তবু যে-সংগীত হৃদয়ে ভরে নিয়ে এলাম, শেষ হয়ে যাবার দু' দশক পরেও সে সংগীতের রেশ নিয়তই মনকে সুধায় ভরে রেখেছে।

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৮ ॥

সূর্যকুমার বছরে একবার কলকাতায় আসে। হাজারীবাগের সাহেবী স্কুলে সে পড়ে, সেখানে বছরে দু'বার লম্বা ছুটি। গ্রীষ্মের ছুটিতে সূর্যকুমার স্কুলের ছেলেদের সঙ্গেই পাহাড়ী জায়গায় এক্সকারশানে যায়, বড়দিনের ছুটি কাটায় কলকাতায়—সে আমলে বড়দিনের সময় চার-পাঁচ সপ্তাহ ছুটি থাকতো।

সূর্যকুমারের কলকাতায় আসবার সময় হলে আমি ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজনা ও চাপা আনন্দ বোধ করতাম। এই সময় সারা বাড়িতেই বেশ একটা উৎসাহের সঞ্চার হতো। এ বাড়িতে আমিই একমাত্র ছেলে, আর একজন ছেলে এলে আমি তবু একজন সঙ্গী পেতাম — আমার দিদিরাও খুশী হতো। আমার দিদিরা তো আমাকে পুরুষ মানুষ হিসেবে গ্রাহ্যই করতো না—একমাত্র মা-জ্যাঠাইমার সঙ্গে হাসাহাসির গল্পের সময় আমাকে তাড়া দিত, এই তুই এখানে কেন রে? তুই তো ছেলে—তোর এসব গল্প শুনতে নেই! আমাদের পাশের বাড়িতে একটা নতুন বাচ্চা হওয়ায় হিজড়েরা এসে নেচেছিল—সেটাও আমাকে দেখতে দেওয়া হয়নি কারণ ছেলেদের নাকি ওসব দেখতে নেই।

সূর্যকুমার বয়েসে আমার থেকে ছ' বছরের বড়, আমি দাদা বলতাম, কিন্তু বন্ধুর মতন সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে সূর্যকুমারের একটা ঘর রাখা ছিল আলাদা, বছরের অন্য সময় আমার দুই দিদি রাত্তিরে শুতো ঐ ঘরে, কিন্তু বড়দিনের সময় তাদের আবার চলে আসতে হতো মায়ের ঘরে। বড়দিন যত কাছে এগিয়ে আসতো, আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করতাম। তারপর একদিন বড়বাবু স্কুল কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়ে আমাদের জানাতেন, পরশুদিন সূর্য আসছে, তোমরা যাবে নাকি হাওড়া স্টেশনে?

প্রথমবার সূর্যকুমারকে দেখে আমরা অবশ্য খুব নিরাশ হয়েছিলাম। যদিও তাকে আনতে গিয়েছিলাম কত উৎসাহের সঙ্গে। তখন আমরা নতুন কলকাতায় এসেছি, কলকাতার সব কিছুই বিস্ময়কর লাগে। বাড়ির সব ছেলেমেয়ে বড়বাবুর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি চেপে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে গিয়েছিলাম চাঁদপাল ঘাটে। যাবার পথে মাঝ রাস্তায় দুটো ষাঁড় মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল সব গাড়ি, আমাদের গাড়ির ঘোড়া দুটোও ভয় পেয়ে পা তুলে চিঁহিঁহি করে চাঁচাচ্ছিল। আমি জানলার ধারে বসতে পাইনি বলে ভালো করে দেখতে পাইনি অবশ্য। চাঁদপাল ঘাটে আমরা বেশ খানিকক্ষণ আগেই এসেছিলাম, তখন জাহাজ চলাচল করছে বলে ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে। জাহাজগুলো অবিকল ছবির বইতে দেখা জাহাজের মতন। জাহাজের ভোঁ শুনলে সব সময়ই আমার মন খারাপ লাগে।

হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমরা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছি, ট্রেন আর আসে না। সওয়া ঘণ্টা লেট। মা আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিলেন, হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে একটু এদিক ওদিক গেলেই আমি হারিয়ে যাবো, আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড়দি আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে শ্রীলেখা আমাদের সবার বড়দি। আমাদের কাছেই কয়েকজন চীনেম্যান দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দেখে দেখেই সময় কেটে যাচ্ছিল বেশ। তখন আমরা পথেঘাটে কোনো চীনেকে দেখলেই বলতাম, চীনেম্যান চ্যাং চুং

মালাই কা ভ্যাট। অবশ্য একজন মাত্র চীনেম্যানকেই আমরা দেখেছি তখন, যে একসঙ্গে ছটা বল নিয়ে লোফালুফির খেলা দেখাতো পাড়ায় পাড়ায়।

শেষ পর্যন্ত ট্রেন এলো, অনেক লোকজন নামলো, কিন্তু সূর্যকুমারের দেখা নেই। বড়বাবু সস্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখন পর্যন্ত সূর্যদাদাকে দেখিইনি, সুতরাং যে কোনো কিশোরের দিকে উৎসুকভাবে তাকাচ্ছি। বেশ খানিকটা বাদে দেখলাম, একজন আলখাল্লা পরা বুড়ো সাহেব তিন চারটি ছেলেকে নিয়ে দূরে থেকে আসছেন। বড়বাবুর সামনে এসে থেমে গিয়ে হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, হ্যালো, মিঃ ভাদুড়ি। গড ব্লেস ইউ।

সাহেবটি একটি ছেলের কাঁধে হাত রেখে বড়বাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কি সব যেন বললেন ইংরেজিতে। আমরা ভেবেছিলাম, সে ঐ সাহেবেরই ছেলে। আমাদের চমকে দিয়ে বড়বাবু তাকেই বললেন, এই যে সূর্য, মিট ইওর কাজিনস। ছেলেটি আমাদের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হেসে শুধু মাথা নোয়ালো।

নাবিকদের মতন নীল রঙের প্যান্ট ও কোট পরে আছে সূর্য, কোটের বুকের কাছে সোনালি সুতোয় কি যেন আঁকা। গলায় টাই, বুট জুতোয় ঝকঝকে পালিশ। তার গায়ের রং সাহেবদের মতন ফর্সা, চোখের তারা দুটোও খয়েরি। এ সবের জন্যও কিছু না, কিন্তু সে আমাদের নিরাশ করে দিল একটা ব্যাপারে। সূর্য এক বর্ণও বাংলা জানে না। আমি তখন প্যারি সরকারের ফার্স্ট বুক পর্যন্ত পেরিয়েছি, ওয়ান মর্নিং আই মেট অ লেম ম্যান-এর পাতা পড়তে পারি। আমি হাঁ করে আমার এই নতুন দাদার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বড়দি ক্লাস এইটে পড়ে, তিনখানা ইংরেজি বই—কিন্তু নিজের মন থেকে এক লাইনও বানিয়ে বলতে গেলে কান লাল হয়ে যায়।

সূর্যকুমারের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—তার মুখখানা অদ্ভুত ধরনের বিষণ্ণ আর ম্লান। প্রথম যখন তাকে দেখি, তখন তার বয়েস তেরো বছর,—অথচ তার মুখে হাসি দেখা যেত কদাচিৎ। কারুর সঙ্গে কথা বলার সময় চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো, সেই খয়েরি রঙের অচেনা চোখ।

সূর্যকে মনে হতো আমাদের মধ্যে যেন একটা অন্য জগতের মানুষ। ভুল করে এখানে এসে পড়েছে। তার চেহারা, ব্যবহার সবই আলাদা। সে প্রত্যেক রাত্তিরে শুতে যাবার আগে মোজা আর গেঞ্জি নিজের হাতে কেচে নেয়। বাড়িতেও কক্ষনো সে খালি গায়ে থাকে না। প্রথম

দু'একদিন সে চামচে দিয়ে ভাত খেয়েছিল, তারপর যখন হাত দিয়ে খেতে শুরু করলো, তখনও সব কটা আঙুল উঁচু করে এমনভাবে ভাত তোলে যে দেখলেই হাসি পায়। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, সে খেতে বসেও বাঁ হাত দিয়ে জলের গেলাস ধরে এবং সেই হাত আবার জামায় লাগায়। দু' হাত দিয়ে মাংসের কাঁটা বাছে। কেউ তার এসব দেখে হাসলে সে স্থির চোখ তুলে তাকায়, হাসে না, কথা বলে না।

সূর্যদাদার দেখা পাবার জন্য আমি এত উদগ্রীব হয়েছিলাম, কিন্তু সে আসার পর আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম, তার সামনেই যেতাম না। একদিন আমি ছেলেমানুষী অভিমান নিয়ে বড়বাবুর কাছে নালিশ করেছিলাম, বড়বাবু, সূর্যদাদা কেন বাংলায় কথা বলে না? আমরা কিছু বুঝতে পারি না।

বড়বাবু হেসে বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ওকে শেখাও! ও তো বিলেতের স্কুলে পড়ে, সেখানে কেউ বাংলা জানে না —তাই সব ভুলে গেছে। খুব ছোটবেলায় কিন্তু বাংলা শিখেছিল তোমার পিসীর কাছে।

আমি অবশ্য পরে সূর্যদার কাছে জেনেছিলাম, ওদের স্কুলে বেশ কিছু বাঙালী ছেলে আছে, কিন্তু তারাও বাংলা বলে না। শিক্ষকদের কড়া নির্দেশ ছিল হস্টেলেও পরস্পরের সঙ্গে সব সময় ইংরেজীতে কথা বলতে হবে।

শুরু হয়ে গেল সূর্যকুমারকে বাংলা শেখানো। শ্রীলেখা আর সান্ত্বনা—বড়দি আর মেজদি পাখি পড়ানোর মতন সূর্য-কুমারকে বাংলা শব্দ মুখস্থ করাতে লাগলো। কিন্তু উচ্চারণ কিছুতেই শুধরোয় না—সূর্যদা মাছের ঝোলকে বলে মাচ্ছের জোল, পোকাকে বলে পকা। আমাদের রান্নার ঠাকুর মহাজনকে বলবে মৌজন। গেলাস কিংবা টেবিল কিছুতেই বলবে না, বলবে গ্লাস আর টেবল্। সেবারে ছুটির শেষে ফিরে যাবার সময় সূর্যদা এই রকম বাংলা শিখেছিল, বড় মামীমা, তোমার আচার খুব বিউটিফুল, বাট এত জাল না দাও (এত ঝাল দিও না), আমি সুটকেস ভর্তি আচার নিয়ে যাবো এক শিশি!...মৌজন খুব ডার্টি, নুনের ভেতরে পকার পা, নট ওনলি ওয়ান বাট টু! একবার নুনের ভেতরে আরশোলার ঠ্যাং বেরিয়েছিল ঠিকই। সূর্যদার মুখে এরকম আধো আধো বাংলা খুব মিষ্টি শোনাতো।

সূর্যকুমার এলে আমাদের অনেক জায়গায় বেড়ানো হতো। শীতের কলকাতায় অনেক রকম উৎসব আর আকর্ষণ। বড়বাবু কিংবা বাবার সঙ্গে আমরা যেতাম ইডেন গার্ডেনস-এ ব্যাণ্ড শুনতে। গার্ডেনস-এর গোল উঁচু জায়গাটায় ঝলমলে পোশাক পরা সাহেব সিপাহীরা ব্যাণ্ড বাজাতো। আমরা প্যাগোডার নিচে বসে কমলালেবু আর চীনেবাদাম খেতে খেতে বিভোর হয়ে সেই বাজনা শুনতাম। ক্রীসমাস উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনেও এই রকম বাজনা শুনেছি—সবাই সেটাকে বলতো গড়ের বাদ্যি।

কিংবা আমরা গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়া যেতাম সার্কাস দেখতে। সার্কাসের খেলোয়াড়রা অধিকাংশই মাদ্রাজী, কয়েক জন সাহেব এবং জাপানী। বিরাট উঁচু উঁচু ট্রাপিজে ফ্রক পরা মেয়েরা একটা থেকে লাফিয়ে চলে যেত অন্য একটায়—নিচে জাল পাতা থাকতো না তখন। বাঘ আর হাতির খেলাতেই সবচেয়ে বেশী রোমাঞ্চিত হতাম —আগাগোড়া সোনালি পোশাক পরা একজন বেঁটে লোক মস্ত লম্বা চাবুক নিয়ে বাঘদের হুকুম করতো। অদ্ভুত ধরনের সট্ সট্ শব্দ হতো সেই চাবুক থেকে—সবাই বলতো ইলেকট্রিকের চাবুক।

একটা সিনেমাও দেখেছিলাম সূর্যদার

দোলতে। তখন ছোটদের সিনেমা দেখা মহাপাপ। ইস্কুলের ছেলেদের পক্ষে সিনেমা দেখা মানেই চড়ান্ত বখে যাওয়া। সূর্য-কুমারের বায়নাতেই আমাদের একবার একটি মাত্র ছবি দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিনেমাকে আমরা বলতাম বাইসকোপ, সূর্যদা বলতো মুভি। মনে আছে বাইস-কোপটার নাম, মার্ক অব জোরো—তরোয়াল হাতে মুখোস পরা একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সব জায়গায় ক্রস এ'কে দিয়ে যেত। সেই সঙ্গে ছিল আর একটা ছোট ছবি, সেটাই বেশী ভালো লেগেছিল। ছে'ড়া জুতো, ছে'ড়া টুপি, হাতে ছড়ি ও ছোট গোঁপওয়ালা চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সূর্যকুমার এইসব নানা জায়গায় বেড়ানো উপভোগ করতো ঠিকই কিন্তু কথা খুব কম বলতো। তাছাড়া তার মুখে একটা বিষন্ন ভাব লেগে থাকতো সব সময়। সূর্যদার ছেলেবেলার চেহারাটা আমি যখনই ভাবি—তার সেই বিমর্ষ মুখের ছবিটাই চোখে ভেসে ওঠে। ঐটুকু বয়েসে অতখানি গাম্ভীর্য আমি আর কোনো ছেলের দেখিনি।

তখন আমরা মনে মনে ভাবতাম, সূর্যদা'র মা নেই তো তাই অত কষ্ট। মা না থাকার ব্যাপারটা ভাবাই যায় না। মা থাকা তো একটা অবধারিত সত্যের মতন, আর সবারই মা আছে, শুধু সূর্যদার নেই। সূর্যদার মুখে ছেলেবেলায় কখনো তার মায়ের নাম শুনিনি।

সূর্যদা বদলে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। পরের বছর ছুটিতে এসে আমাদের সঙ্গে অনেক খোলামেলাভাবে মিশেছিল, বাংলাও শিখে গিয়েছিল বেশ ভালোই কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়া কিংবা মুখের সেই বিষন্ন ভাবটি যায় নি অনেক দিন।

দু'তিন বছরের মধ্যেই আমি সূর্যদার ভক্ত চ্যালা হয়ে উঠলাম। যেদিন সূর্যদা কলকাতায় থাকতো, আমি সব সময় ছায়ার মতন ওর পেছন পেছন ঘুরতাম, ওর হুকুম তামিল করার জন্য আগে থেকেই তৈরী। সূর্যদা অবশ্য কোনো হুকুমই করতো না—সাহেবী কায়দায় রপ্ত হলেও হোস্টেলে থাকার জন্য কয়েকটি অন্যরকম গুণও ছিল। নিজের কাজ অন্যকে করতে দিত না কক্ষনো—এমন কি খাওয়ার পর নিজের এ'টো থালাও নিজেই তুলে নিয়ে যেত। মা জ্যাঠাইমার আপত্তি কিছুতেই মানেনি। নিজের জামা কাপড় তো নিজে কাচতোই। কখনো এক গেলাস জলও অন্যকে দিতে বলেনি। আমরা তো কিছুতেই নিজে জল গড়িয়ে খেতাম না—মনে হতো, ওটা বিশুদ্ধ মেয়েদের কাজ, দিদিরা কখনো জল আনতে আপত্তি করলে নালিশ করতাম মায়ের কাছে। সূর্যকুমারের দেখাদেখি আমি নিজের এ'টো থালা তুলতে শুরু করলেও জল খাওয়ার ব্যাপারে দিদিদের হুকুম করতে ছাড়িনি।

ভাগ্যিস, আমার ঘরে রয়েছে— কয়ারের পাপোশ

ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এমনি মজবুত ও টিকসই পাপোশ না থাকলে চলে না। কয়ারের পাপোশ ধুলোময়লা সুন্দরভাবে সাফ করে দেয় আর দীর্ঘদিন ব্যবহারেও নতুনের মত টিকসই থাকে।

কয়ারের পাপোশ খুব টেকসই তার সবরকম ব্যব-হারজনিত ধকল সইতে পারে। সব চেয়ে বড়ো কথা, ধুলোময়লা পায়ে লেগে থাকে না—ধুলো গলে যায় পাপোশের ভেতর দিয়ে আর কাদা দূর হয় ঘষা খেয়ে। নানা সাইজে, রঙে আর ডিজাইনে এবং কমবেশী পুরু তার রকমারি দামে পাওয়া যায়। আপনার সুবিধামত দামে বেছে নিন।

কয়ারের পাপোশ নিন—পরিচ্ছন্নতা আপনার পায়ে লুটিয়ে থাকবে।

কয়ার বোর্ড, কোচিন ১৬, দক্ষিণ ভারত

রোজ সকালবেলা সূর্যদা নিজেই বিছানা ছেড়ে ছাদে চলে যেত। শীতের মধ্যেও হাফপ্যান্ট হাফসার্ট পরে ব্যায়াম করতো একা একা। আবার রাত্তিরে ঘুমোতে যাবার আগে বাইবেল খুলে প্রেয়ার করতো কয়েক মিনিট। অত কম বয়েসী একটি ছেলের এরকম নিয়ম-শৃঙ্খলা বোধ দেখে আমাদের খুব চমক লাগতো। আমি তো অন্ধের মতন নকল করতে শুরু করলাম সূর্যদাকে, দিদিরা তাই নিয়ে আমাকে ক্ষ্যাপাতো। সূর্যদা অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যেই বাইবেল পড়া ছেড়ে দিয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে ঘোরতর ইংরেজবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল।

সূর্যদা ছিল বাড়ির সকলের নয়নের মণি। সবাই সূর্যদাকে খাতির করার জন্য শশব্যস্ত। একে তো তার অমন সুন্দর চেহারা, সেই সঙ্গে ভদ্র বিনীত ব্যবহার, পড়াশুনোতেও ভালো। তাছাড়া

যে ছেলে সাহেবদের মতন ইংরেজিতে কথা বলতে পারে—তার প্রতি বিশেষত বাড়ির মেয়েদের একটা সমীহের ভাব থাকবেই। একমাত্র জ্যাঠামশাই মনে মনে পছন্দ করতেন না সূর্যদাকে—গোড়া থেকেই একটা বিরূপ ভাব নিয়েছিলেন। সূর্যদার সঙ্গে কথা বলার সময় জ্যাঠামশাই এমন একটা কাষ্ঠহাসি ও শুকনো স্নেহের ভাব দেখাতেন—যা আমাদের ছেলেমানুষী চোখেও ধরা পড়তো।

জ্যাঠামশাইয়ের স্নেহের অভাব পুষিয়ে দিয়েছিলেন জ্যাঠাইমা। জ্যাঠাইমার পর পর চার মেয়ে হবার পর একটি ছেলে জন্মেও কয়েক মাস বাদে মারা যায়। জ্যাঠাইমা আমাকেও খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু সূর্যদাকে ভালোবাসতেন অনেক অনেক বেশী। সেজন্য আমার কোনোদিন হিংসে হয়নি। আমি সবদিক থেকেই সূর্যদাকে আমার চেয়ে অনেক বড় মনে করতাম এবং মনে হতো এ সব কিছুই সূর্যদার প্রাপ্য। কিন্তু যারা যারা ওকে ভালোবেসেছে, তাদের প্রত্যেকের মনে একটা করে গভীর আঘাত দেবার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল সূর্যকুমারের।

স্কুল জীবনের শেষ দিকে সূর্যদা বছরে দুবার করে কলকাতায় আসতে লাগলো। তখন সূর্যদা বেশ বড় হয়েছে বলে ওর একাই রাস্তায় বেরুবার অনুমতি মিলেছিল, আমি অনেক সময় থাকতাম সঙ্গে। সূর্যদাকে আমি গ্রে স্ট্রীটে রেণুদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। বিষ্ণু কিংবা জীমূত ওরা অবিলম্বেই সূর্যদার ভক্ত হয়ে গেল। এমন কি সুপ্রকাশদা পর্যন্ত একদিন সূর্যকুমারের ইংরেজি জ্ঞান পরীক্ষা করে মুগ্ধ হলেন, তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এই প্রতিভাবান কিশোরের।

রেণুদের বাড়ির কাছেই একদিন একটা ঘটনা ঘটলো। আমি আর সূর্যদা দাঁড়িয়ে-ছিলাম হাতিবাগানের বাজারের সামনে, ট্রামে ওঠবার জন্য। শ্যামবাজারের দিক থেকে কিসের যেন একটা মিছিল আসছিল, তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে একদল লোক খুব চিৎকার করছে। আমরা সেদিকেই তাকিয়েছিলাম। মিছিলটা যখন আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে, তখন দুটো পুলিসের গাড়ি এসে থামলো—টপাটপ পুলিসরা নেমেই তাড়া করে গেল মিছিলকে। মুহূর্তে সব ছত্রভঙ্গ—রাস্তার সব লোকজন যে দৌড়োচ্ছে আর পালাচ্ছে আমরা সেটা খেয়ালই করিনি। তাছাড়া পালাবার কথা আমরা জানতামই না—তখনকার কলকাতার ছেলেরা পুলিসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় এখনকার মতন দক্ষ ছিল না। আচমকা একটি গোরা পুলিস আমাদের দিকে তেড়ে এলো—আমাকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিল রাস্তায়—সূর্যদার মাথায় ব্যাটন দিয়ে মারলো। সেই প্রথম আমি বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেলাম।

পুলিস আমাদের ছোট ছেলে বলে বুঝতে পারেনি—এলোপাথাড়ি মারতে মারতে আমাদের গায়ে লেগেছে—তা কিন্তু মোটেই নয়। স্পষ্ট মনে আছে সেই ঘটনা। একজন পুলিস সার্জেন প্রথমে তাকালো আমাদের দিকে, তার প্রকাণ্ড মুখখানা তখন লালচে রঙের, আমাদের দেখে তার চোখে যেন বেশী করে রাগ জ্বলে উঠলো—এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আমার মুখের দিকে। হাত না বলে থাবাই বলা যায়—পাঁচটা আঙুলের বিস্তারে ঢেকে যায় আমার গোটা মুখ—সেই আঙুলগুলো আমার মুখখানা চেপে ধরে একটা ধাক্কা মারলো। একটি ছোট ছেলেকে মারার জনাই মারা।

মাথায় ব্যাটনের ঘা খেয়ে সূর্যদা প্রথমে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপর ইংরেজিতে অনর্গল বকতে বকতে ছুটে গেল সেই পুলিস সার্জেনেরই দিকে। তার বিষণ্ণ ধরনের মুখখানায় তখন অসম্ভব রাগ। সার্জেনের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে লাগলো। সার্জেনটি সূর্যদার ঘাড়ে আর এক ঘা মেরে উঠে গেল গাড়িতে।

আমি ধুলো ঝেড়ে উঠে এসে দেখলাম সূর্যদার মাথা থেকে রক্ত পড়ছে।

সূর্যদাকে নিয়ে আবার রেণুদের বাড়িতে চলে এলাম। রেণু আর দীপ্তি নিচের তলাতেই ছিল, আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, রেণু, শিগগির যা, সুপ্রকাশদাকে ডাক, ওর মাথা ফেটে গেছে।

রেণু বললো, মাথা ফেটেছে? কই? কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো!

—এই যে রক্ত দেখতে পাচ্ছিস না!

রেণু কাছে এসে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে সূর্যদার মাথাটা দেখে বললো, একটু তো মোটে রক্ত বেরিয়েছে, মাথা তো ফাটে নি!

রেণু তখন খুব ছোট, ও ভেবেছিল মাথা ফেটে যাওয়া মানে নারকোলের মালার মতন মাথার খুলিটা ফাঁক হয়ে যাওয়া।

দীপ্তি গিয়ে সুপ্রকাশদাকে ডেকে আনলো। সুপ্রকাশ বললেন, একি সাংঘাতিক ব্যাপার! তোমরা মিছিলে গিয়েছিলে! যাও নি! এমনি এমনি মারলো? যাক গে মেরেছে মেরেছে—ভাগিস ধরে নিয়ে যায়নি—তাহলে আর জীবনে কখনো গভর্নমেন্টের চাকরি পেতে না। সূর্য নিশ্চয়ই আই সি এস হবে—।

সুপ্রকাশদা যত্ন করে বেঞ্জিন আর তুলো দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। তারপর আমরা রিক্সা করে চলে এলাম বাড়িতে।

এরপর দু'তিন দিন সূর্যদা খুবই বিমর্ষ হয়ে রইলো। কারুর সঙ্গেই প্রায় কথা বলেনি। ওর মনে নিশ্চয়ই একটা আঘাত লেগেছিল। স্কুলের সাহেব শিক্ষকরা কত ভালো, কি চমৎকার তাদের ব্যবহার—ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে কতটা উন্নত সে কথাও সূর্যদাকে পড়ানো হয়েছে—তার সঙ্গে এই ঘটনাটা যে একদম মেলে না।

বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদার চরিত্রে দুটি ব্যাপার খুব প্রকট হয়ে ওঠে। একটি হচ্ছে, ইচ্ছে করে বিপদে পড়ার ঝোঁক, অন্যটিকে বলা যায় বেশী রকমের নারী-প্রীতি। পৃথিবীতে যে কয়েকজন বিখ্যাত প্রেমিক তাদের অসম্ভব নারী-লিপ্সার জন্য অমর হয়ে আছেন, সূর্যকুমারের নাম তাদের পাশে অনায়াসে লিখে রাখা যায়। আমরা সব মিলিয়ে যাকে প্রেম বলি, এটা ঠিক তাও নয়, সম্ভোগ বাসনাই বলা উচিত। যৌবনে একমাত্র নারীদের সান্নিধ্যেই সূর্য-দার বিষণ্ণ ভাবটা খানিকটা কেটে যেত।

সূর্যদার প্রথম এই ধরনের প্রেম হয় আমার বড়দির সঙ্গে।

বিপদে পড়ার ঝোঁক কি রকম ছিল তার একটা উদাহরণ দিই। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দেবার পর সূর্যদা যখন কলকাতায় এসে রয়েছে, তখন আমরা কয়েকজন মিলে ইডেন গার্ডেনস-এ একদিন বেড়াতে এসে-ছিলাম। বড়রা কেউ সঙ্গে আসেননি, সূর্যদাই আমাদের গার্জেন। ওখানকার ঝিলে কয়েকটি নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়—তাতে চড়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে-মেয়েরা খুব হৈ হল্লা করছিল।

আমার মেজদি সান্ত্বনা হঠাৎ বললো, আঃ, আমরাও যদি নৌকো চড়ে বেড়াতে পারতাম, কি মজাই না হতো!

সূর্যদা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললো, চলো, নৌকোতেই চড়বো। আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী। বড়দি সূর্যদাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি নৌকো চালাতে জানো? সূর্যদা এবারও গম্ভীরভাবে বললো, জানি না। তবে শিখে নিতে কতক্ষণ?

প্রথম তো নৌকো পাওয়ার ব্যাপারেই অসুবিধে দেখা দিল। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেদেরই প্রতাপ বেশী—তারা তখন নিজেদের শাসক সমাজের প্রতিচ্ছায়া মনে করে খুব ডেঁট দেখাতো। তারা দু'ঘণ্টার আগে কোনো নৌকো ছাড়বে না। সূর্যদা নেবেই। শেষ পর্যন্ত সূর্যদার তোড়ো ইংরেজি শুনে অ্যাংলো ছোঁড়ারা পিছু হটলো।

নৌকো ঝিলের মাঝামাঝি যেতেই ভীষণ দুলতে লাগল, আর ঘুরতে লাগলো এদিক ওদিক। সূর্যদা একদম চালাতে জানে না, আনাড়ির মতন বৈঠা চালাতে গিয়ে আরও মুশকিল। দিদিরা ভয় পেয়ে চাঁচামেচি করতে লাগলো, পাড় থেকে লোকেরা দেখে হাসছে। আমরা অবশ্য সাঁতার জানতাম, আমি ছেলেবেলাতে দিদিদের সঙ্গে চান করতে করতে সাঁতার শিখে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত এমন হলো, নৌকো আর পাড়ে এনে ভেড়ানোও যায় না, অ্যাংলো ছেলেদের অসভ্য টিটকিরিতে কান পাতা যায় না, কিন্তু সূর্যদার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ভয় পেয়ে দিদিরা উঠে দাঁড়াতেই কাণ্ডটা ঘটলো, নৌকো উল্টে গেল। আমরা সাঁতরে পারে পৌঁছে দেখলাম সূর্যদা ডুবে যাচ্ছে। বাগানের দুজন মালি তক্ষুনি জলে ঝাঁপিয়ে না পড়লে সূর্যদার কপালে কি ছিল সেদিন কে জানে। তখন আমরা টের পেলাম, সূর্যদা সাঁতারই জানে না।

সাঁতার না জেনে নৌকো চালাতে না জেনে আর কে ঝিলের মাঝখানে নৌকো নিয়ে যায়, সূর্যদা ছাড়া?

(ক্রমশঃ)

ব্যালটে বিপ্লব : পশ্চিমবঙ্গে এবং সারাভারতে

মার্চ মাসের গোড়ায়, মাত্র ক'দিন আগে, পশ্চিমবঙ্গ সমেত ভারতের ষোলটি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজ্য বিধানসভাগুলিতে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। ফলাফলও ইতিমধ্যে সব বেরিয়ে গিয়েছে। গত বছরের সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেস দল যে রকম অচিন্ত্যপূর্ব ফল দেখিয়েছিল, এবারের বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে তার চেয়েও অনেক ভালো ফল করেছে। যেখানে যেখানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেখানে সেখানে তাদের সেই গরিষ্ঠতা তো বেড়েছেই ; যে সব রাজ্যে তাদের গরিষ্ঠতা ছিল না, সেখানেও শুধু গরিষ্ঠতা নয়, উল্লেখযোগ্য গরিষ্ঠতা নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। ফলে বিরোধী দলগুলির গত সংসদীয় নির্বাচনে কেন্দ্রে যে শোচনীয় হাল হয়েছিল, এখন রাজ্য বিধানসভাগুলিতেও তাদের অবস্থা অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশির ভাগ বিধানসভাগুলিই আগামী পাঁচ বছরের জন্য সংসদের মত 'বিরোধী দল'-শূন্য হয়ে থাকবে।

কংগ্রেস বাদে বাকি ছ'টি সর্বভারতীয় দলের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সংগঠন কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব এখন মাত্র বিহার, গুজরাট, হরিয়ানা এবং মহীশূরে—এই চারটি রাজ্যের মধ্যেই সীমায়িত—তাও অত্যন্ত ক্ষীণ। অন্যত্র সে প্রায় বিলুপ্ত। বিলুপ্তপ্রায় অন্যান্য দলগুলিও। স্বতন্ত্র দল একমাত্র রাজস্থানে কোন রকমে তার অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রেখেছে। সি পি এম ত্রিপুরায় কিছুটা ভালো করলেও তাদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গে একেবারে বিধ্বস্ত। অন্য রাজ্যে তাদের খুঁজতে হলে অণুবীক্ষণযন্ত্র লাগে। একমাত্র মধ্যপ্রদেশে জনসঙ্ঘের পায়ের নীচে কিছুটা মাটি আছে—বিহারেও কিছুটা। যদিও তা আরও দুর্বল। সোস্যালিস্ট দলকে বিহার ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সি পি আই যে ক'টি রাজ্যে কংগ্রেস দলের সঙ্গে নির্বাচনী মৈত্রী করেছিল,—যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং পাঞ্জাবে,—সেখানে মোটামুটি ভালো করলেও অন্যত্র তার অবস্থা অন্যান্য সর্বভারতীয় দলগুলির মতই করুণ।
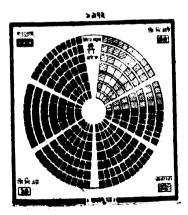
রাজ্য দলগুলির অবস্থাও তথৈবচ। কেবলমাত্র মেঘালয়ে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন, গোয়া-দমন-দিউয়ে মহারাষ্ট্র গোমন্তকবাদী পার্টি ও ইউনাইটেড গোয়ান পার্টি, মণিপুরে মণিপুর পিপলস পার্টি এবং পাঞ্জাবে সন্ত আকালি দল তার ব্যতিক্রম। এদের মধ্যে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন এবং মহারাষ্ট্র গোমন্তকবাদী পার্টি তাদের নিজ নিজ রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

১৯৭২

*

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের নির্বাচনী সাফল্য এক কথায় বিস্ময়কর। এবং অভূতপূর্ব। ১৯৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত আরও ছ'টি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন এখানে হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস দল আর কখনও এত বেশী আসন লাভ করতে পারেনি। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে তারা আসন পায় ১৪৯টি (তখন রাজ্য বিধানসভার মোট আসনসংখ্যা ছিল ২৩৮), ১৯৫৭ সালে ১৫২টি, ১৯৬২ সালে ১৫৭টি (১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে বিধানসভার মোট আসনসংখ্যা ছিল ২৫২), ১৯৬৭ সালে ১২৭টি, ১৯৬৯ সালে ৫৫টি এবং ১৯৭১ সালে ১০৫টি (১৯৬৭ সাল থেকে বিধানসভার মোট আসনসংখ্যা হয়েছে ২৮০)। এবার তারা পেয়েছে ২১৬টি আসন—মোট আসনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি—একা। এই সাফল্য যেমন অতুলনীয় কৃতিত্বপূর্ণ, তেমনই দৃষ্টি-আকর্ষক সি পি এম দলের শোচনীয় ব্যর্থতা। এই দল প্রথম ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাভ করে ৪৩টি আসন, ১৯৬৯-এ ৮০টি, ১৯৭১-এ ১১৫টি, এবং এবারে মাত্র ১৪টি। এদের এই বিপুল পরাজয়ের কারণ হয়তো 'ইন্দিরা তরঙ্গ' (যে তরঙ্গের ধাক্কায় এখন ভারতের সর্বত্রই সব দল কুপোকাত), অথবা পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাস ও অরাজকতা (যার জন্য মূলত দায়ী এই দলটি) কিংবা এই দলটির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা (যা এদের এবারের নির্বাচনী 'ইস্যু'র মধ্যে অতিপ্রকট), বা এমনও হতে পারে—এক সঙ্গে এই তিনটিই।

এই দলটির সঙ্গে অন্যান্য যে দলগুলি মিলে 'বাম ফ্রন্ট' গঠন করেছিল, তারা সকলেই নিশ্চিহ্ন। এমন কি, ফরোয়ার্ড ব্লকও—যে ফরোয়ার্ড ব্লক ১৯৫২ সাল

পশ্চিমবঙ্গ : মোট আসন ২৮০

১৯৭১ ॥ সি পি এম ১১৩, কংগ্রেস ১০৫, সি পি আই ১৩, এস ইউ সি ৭, মুসলিম লীগ ৭, বাংলা কংগ্রেস ৫, আর এস পি ৩, ফরোয়ার্ড ব্লক ৩, আর সি পি আই ৩, পি এস পি ৩, ওয়ার্কার্স পার্টি ২, সংগঠন কংগ্রেস ২, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ২, গোর্খা লীগ ২, ঝাড়খণ্ড ২, জনসংঘ ১, এস এস পি ১, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ১, নির্দল ৪, নির্বাচন স্থগিত ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ২১৬, সি পি আই ৩৫, সি পি এম ১৪, আর এস পি ৩, গোর্খা লীগ ২, সংগঠন কংগ্রেস ২, এস ইউ সি ১, ওয়ার্কার্স পার্টি ১, মুসলিম লীগ ১, নির্দল ৫।
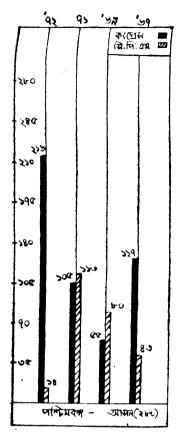
থেকেই রাজ্যে একটি শক্তিশালী দল বলে গণ্য। এবার তারা একটি আসনও পায়নি।

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার অপর শরিক সি পি আই দলও কংগ্রেসের মত বিরাট লাভবান হয়েছে। তারা পেয়েছে মোট ৩৫টি আসন। বিভক্ত হওয়ার পর সি পি আইও পশ্চিমবঙ্গে আর কখনও এত আসন লাভ করতে পারেনি।

*

সমগ্র ভারতের রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনী ফলাফলকে অনায়াসেই 'ব্যালট বিপ্লব' বলে অভিহিত করা যায়। মাত্র ক' বছর আগে, ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর, যখন অধিকাংশ রাজ্য, এবং এমন কি কেন্দ্রও, রাজনৈতিক অস্থিরতার আবর্তের মধ্যে পড়ে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছিল, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেননি যে, সেই দারুণ অনিশ্চয়তার হাত থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি এত শীগগির এবং এমন অকল্পনীয়ভাবে উদ্ধার পাবে ব্যালটের মাধ্যমে। সুতরাং, এ নির্বাচন 'ব্যালট বিপ্লব' বই কি—অবশ্যই 'ব্যালট বিপ্লব'!

সেই যুগান্তকারী ব্যালট বিপ্লবের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচিত্র—পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে এবং ডায়াগ্রামসহ—এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম ডায়াগ্রামে ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় কোন্ দল কত আসন পেয়েছে তা দেখানো হয়েছে। অপর ডায়াগ্রামগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটি দল কংগ্রেস ও সি পি এম গত ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ অবধি অনুষ্ঠিত চারটি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে এবং জেলাগুলিতে কোন্‌বার কতগুলি আসন পেয়েছে, তার তুলনামূলক হ্রাসবৃদ্ধি প্রদর্শিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ফলাফল

কোচবিহার

মেখলিগঞ্জ ॥ বিজয়ী মধুসূদন রায় (কংগ্রেস) ২৫,৮১৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৮,২৩৩ ভোট।

গত নির্বাচনে মিহিরকুমার রায় (ফরোয়ার্ড ব্লক) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মাথাভাঙা ॥ বিজয়ী বীরেন্দ্রনাথ রায় (কংগ্রেস) ২৭,৪৯৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া (সি পি এম) ১৮,৯৭৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও বীরেন্দ্রনাথ রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কোচবিহার (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী রজনী দাস (কংগ্রেস) ৩০,৮০৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অজিতকুমার বাসুনিয়া (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৪,১২০ ভোট।

কোচবিহার : মোট আসন ৮

১৯৭১ ॥ কংগ্রেস ৭, ফরোয়ার্ড ব্লক ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ৮।

গত নির্বাচনেও রজনী দাস (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সিতাই ॥ বিজয়ী মহম্মদ ফজলে হক (কংগ্রেস) ২৮,৫৯২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দীপক সেনগুপ্ত (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৫,৩৪৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও মহম্মদ ফজলে হক (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

দিনহাটা ॥ বিজয়ী যোগেশচন্দ্র সরকার (কংগ্রেস) ৩০,৪০৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কমল গুহ (ফরোয়ার্ড ব্লক) ২০,৭১২ ভোট।

গত নির্বাচনেও যোগেশচন্দ্র সরকার (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।
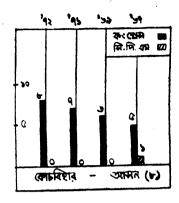
কোচবিহার (উত্তর) ॥ বিজয়ী সুনীল কর (কংগ্রেস) ২৯,১৪২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অপরাজিতা গোপ্পী (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৯,৮৪৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও সুনীল কর (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কোচবিহার (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী সন্তোষকুমার রায় (কংগ্রেস) ২৯,৬০০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (সি পি এম) ১৭,১৯৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও সন্তোষকুমার রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

তুফানগঞ্জ ॥ বিজয়ী শিশিরকুমার ঈশোর (কংগ্রেস) ৩৪,৩৬৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মণীন্দ্রনাথ বর্মন (সি পি এম) ১৬,৬৯৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও শিশিরকুমার ঈশোর (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জলপাইগুড়ি

কুমারগ্রাম ॥ বিজয়ী দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২৫,৫১৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিতাইচন্দ্র দাস (সি পি এম) ১২,০৬১ ভোট।

গত নির্বাচনে পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কালচিনি ॥ বিজয়ী ডেনিস লাকরা (কংগ্রেস) ১৫,২২৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন আর্থার বাক্সলা ওরাঁও (আর এস পি) ১১,৩৫৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও ডেনিস লাকরা (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

আলিপুরদুয়ার ॥ বিজয়ী নারায়ণ ভট্টাচার্য (কংগ্রেস) ২৭,৩৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ননী ভট্টাচার্য (আর এস পি) ২০,৯২৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও নারায়ণ ভট্টাচার্য (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ফালাকাটা ॥ বিজয়ী জগদানন্দ রায় (কংগ্রেস) ২৫,২০৩ ভোট। নিকটতম প্রতি-

দ্বন্দ্বী পুষ্পজিৎ বর্মন (এস পি) ১৪,০৭৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও জগদানন্দ রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মাদারিহাট ॥ বিজয়ী এ এইচ বেস্টারউইচ (আর এস পি) ১৬,৭৮৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অশ্বঘোষ কুজুর (কংগ্রেস) ১৩,৬৬৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও এ এইচ বেস্টারউইচ (আর এস পি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ধূপগুড়ি ॥ বিজয়ী ভবানী পাল (কংগ্রেস) ২২,৬৭০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিশীথনাথ ভৌমিক (এস পি) ১৩,৮১০ ভোট।

গত নির্বাচনেও ভবানী পাল (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নাগরাকাটা ॥ বিজয়ী প্রেম ওরাঁও (সি পি আই) ২১,৫২৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পুনাই ওরাঁও (সি পি এম) ১৪,৪৬৩ ভোট।

গত নির্বাচনে পুনাই ওরাঁও (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ময়নাগুড়ি ॥ বিজয়ী বিজয়কৃষ্ণ মোহান্ত (কংগ্রেস) ১৯,৭১৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যতীন্দ্রনাথ বসুনিয়া (আর এস পি) ৮,৩১৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও বিজয়কৃষ্ণ মোহান্ত (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মাল ॥ বিজয়ী অ্যান্টনি টপনো (কংগ্রেস) ২৫,৯৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগন্নাথ ওরাঁও (সি পি এম) ১৬,০৩০ ভোট।

গত নির্বাচনেও অ্যান্টনি টপনো (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জলপাইগুড়ি ॥ বিজয়ী অনুপম সেন (কংগ্রেস) ৩৪,২৩১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুবোধ সেন (সি পি এম) ১৯,০৬৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও অনুপম সেন (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রাজগঞ্জ ॥ বিজয়ী মৃগেন্দ্রনারায়ণ রায় (কংগ্রেস) ২১,৮৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধীরেন্দ্রনাথ রায় (সি পি এম) ১১,৫০৩ ভোট।

গত নির্বাচনে ভগবান সিংহ রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জলপাইগুড়ি : মোট আসন ১১

১৯৭১ ॥ কংগ্রেস ৯, সি পি এম ১, আর এস পি ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ৯, সি পি আই ১, আর এস পি ১।

পশ্চিম দিনাজপুর

চোপরা ॥ বিজয়ী আবদুল করিম চৌধুরী (কংগ্রেস) ২৩,৬১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাচ্চা মুনশী (সি পি এম) ১৩,৫৪০ ভোট।

গত নির্বাচনেও আবদুল করিম চৌধুরী (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গোয়ালপোখর ॥ বিজয়ী শেখ শরাফত হোসেন (কংগ্রেস) ১৫,৫২৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিজামুদ্দিন (মুসলিম লীগ) ১০,৪৮৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও শেখ শরাফত হোসেন (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

করণদীঘি ॥ বিজয়ী হাজি সাজ্জাদ হোসেন (কংগ্রেস) ১৯,৫০০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুরেশচন্দ্র সিংহ (নির্দল) ১৭,৬৮৯ ভোট।

গত নির্বাচনেও হাজি সাজ্জাদ হোসেন (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রায়গঞ্জ ॥ বিজয়ী রমেন্দ্রনাথ দত্ত (কংগ্রেস) ২৮,৭২৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মানস রায় (সি পি এম) ১৩,৬১০ ভোট।

গত নির্বাচনেও রমেন্দ্রনাথ দত্ত (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কালিয়াগঞ্জ ॥ বিজয়ী দেবেন্দ্রনাথ রায় (কংগ্রেস) ২৪,২৪৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ননীগোপাল রায় (সি পি এম) ৯,৬৮১ ভোট।

পশ্চিম দিনাজপুর : মোট আসন ১১

১৯৭১ ॥ কংগ্রেস ১১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ১১।

গত নির্বাচনেও দেবেন্দ্রনাথ রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ইটাহার ॥ বিজয়ী জয়নাল আবেদিন (কংগ্রেস) ৩৭,৮১০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শান্তি সরকার (সি পি এম) ১০,৫৪৫ ভোট।
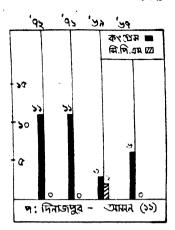
গত নির্বাচনেও জয়নাল আবেদিন (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কুশমুণ্ডি ॥ বিজয়ী যতীন্দ্রমোহন রায় (কংগ্রেস) ২৪,৪০৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যোগেন্দ্রনাথ রায় (আর এস পি) ৭,৪৭৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও যতীন্দ্রমোহন রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গঙ্গারামপুর ॥ বিজয়ী মোসলেহউদ্দিন আহমেদ (কংগ্রেস) ৩০,৫৫৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অহীন্দ্র সরকার (সি পি এম) ১২,২৬৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও মোসলেহউদ্দিন আহমেদ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কুমারগঞ্জ ॥ বিজয়ী প্রবোধকুমার সিংহ রায় (কংগ্রেস) ২৭,৭৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যামিনীকিশোর মজুমদার (সি পি এম) ১৮,৮৫৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও প্রবোধকুমার সিংহ রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বালুরঘাট ॥ বিজয়ী বীরেশ্বর রায় (কংগ্রেস) ২৮,৮৯৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুকুল বসু (আর এস পি) ২৩,৫২৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও বীরেশ্বর রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

তপন ॥ বিজয়ী পত্রাস হেমরম (কংগ্রেস) ২৮,৯৬৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নথানিয়েল মুর্মু (আর এস পি) ২০,০৩৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও পত্রাস হেমরম (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

দার্জিলিং

কালিম্পং ॥ বিজয়ী গজেন্দ্র গুরুং (কংগ্রেস) ১০,১৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীনাথ দীক্ষিত (গোর্খা লীগ) ৮,৮০৬ ভোট।

গত নির্বাচনে মদনকুমার প্রধান (গোর্খা লীগ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

দার্জিলিং ঃ মোট আসন ৫

১৯৭১ ॥ কংগ্রেস ২, গোর্খা লীগ ২, সি পি এম ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ৩, গোর্খা লীগ ২।

দার্জিলিং ॥ বিজয়ী দেওপ্রকাশ রাই (গোর্খা লীগ) ১৪,৯৩৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জি এস গুরুং (বিদ্রোহী গোর্খা লীগ) ৯,৪৭৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও দেওপ্রকাশ রাই (গোর্খা লীগ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।
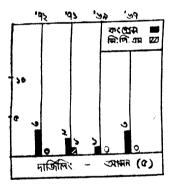
জোড়বাংলো ॥ বিজয়ী নন্দলাল গুরুং (গোর্খা লীগ) ১২,০৬৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাওয়া বনজান (কংগ্রেস) ১১,৫৯৭ ভোট।

গত নির্বাচনে আনন্দপ্রসাদ পাঠক (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

শিলিগুড়ি ॥ বিজয়ী অরুণকুমার মৈত্র (কংগ্রেস) ২৬,৭২৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন বসু (সি পি এম) ১২,২২৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও অরুণকুমার মৈত্র (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ফাঁসিদেওয়া ॥ বিজয়ী ঈশ্বরচন্দ্র টিরকি (কংগ্রেস) ২৭,৮৯৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রস মিনজ (সি পি এম) ১৬,৯১২ ভোট।

গত নির্বাচনেও ঈশ্বরচন্দ্র টিরকি (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মালদহ

হবিবপুর ॥ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ মুর্মু (সি পি আই) ২৭,০২৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার মুর্মু (সি পি এম) ১৩,২০৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও সরকার মুর্মু (নির্দল) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গাজোল ॥ বিজয়ী বেনজামিন হেমব্রম (কংগ্রেস) ২৬,০৭০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুফল মুর্মু (সি পি এম) ১৪,৫৬১ ভোট।

গত নির্বাচনে সুফল মুর্মু (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

খরবা ॥ বিজয়ী মহবুবুল হক (কংগ্রেস) ২৫,৫১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নাজিমুল হক (সি পি এম) ২৪,৮৪৩ ভোট।

গত নির্বাচনে গোলাম ইয়াজদানি (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হরিশচন্দ্রপুর ॥ বিজয়ী গৌতম চক্রবর্তী (কংগ্রেস) ২৩,৪৩৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ ইলিয়াস রাজি (ওয়ার্কার্স পার্টি) ২১,৪১৮ ভোট।

গত নির্বাচনে মহম্মদ ইলিয়াস রাজি (ওয়ার্কার্স পার্টি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রতুয়া ॥ বিজয়ী নীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (কংগ্রেস) ২১,৭৫৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ আলি (সি পি এম) ১৮,৬৬৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও নীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মালদহ ॥ বিজয়ী মহম্মদ গফফর রহমান (কংগ্রেস) ২৭,৯২০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ ইলিয়াস (সি পি এম) ১৬,২৮৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও মহম্মদ গফফর রহমান (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ইংলিশবাজার ॥ বিজয়ী বিমলকান্তি দাস

মালদহ ঃ মোট আসন ১০

১৯৭১ ॥ কংগ্রেস ৫, সি পি এম ২, সি পি আই ১, ওয়ার্কার্স পার্টি ১, নির্দল ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ৮, সি পি আই ২।

(সি পি আই) ২৫,১১৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শৈলেন্দ্র সরকার (সি পি এম) ১৪,২৮১ ভোট।

গত নির্বাচনেও বিমলকান্তি দাস (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মানিকচক ॥ বিজয়ী যোগেন্দ্রলাল মণ্ডল (কংগ্রেস) ২৫,৪৬০ ভোট। নিকটতম প্রতি-

দ্বন্দ্বী মানিক ঝা (সি পি এম) ১৮,০৩৬ ভোট।
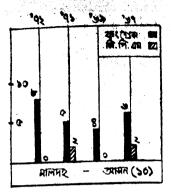
গত নির্বাচনেও যোগেন্দ্রলাল মণ্ডল (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সুজাপুর ॥ বিজয়ী আবুল বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী (কংগ্রেস) ৩২,৯১১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মান্নান শেখ (নির্দল) ৯,৪১৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও আবুল বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কালিয়াচক ॥ বিজয়ী সামসুদ্দিন আহমেদ (কংগ্রেস) ২৩,৯৩৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমোদরঞ্জন বসু (নির্দল) ২৩,৭৪০ ভোট।

গত নির্বাচনেও সামসুদ্দিন আহমেদ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদ

ফরাক্কা ॥ বিজয়ী জেরাত আলি (সি পি এম) ২০,৭৮৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ ওয়াজেদ আলি (কংগ্রেস) ১৯,৯১২ ভোট।

গত নির্বাচনেও জেরাত আলি (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সুতী ॥ বিজয়ী শিস মহম্মদ (আর এস পি) ২৭,০৮৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ সোহরাব (কংগ্রেস) ২৫,৫৬৫ ভোট।

গত নির্বাচনে মহম্মদ সোহরাব আলি (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জঙ্গীপুর ॥ বিজয়ী হাবিবুর রহমান (কংগ্রেস) ১৭,০৩৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অচিন্ত্য সিংহ (এস ইউ সি) ১৪,২৯২ ভোট।

গত নির্বাচনে কমরুদ্দিন আহমদ (মুসলিম লীগ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সাগরদীঘি ॥ বিজয়ী নৃসিংহকুমার মণ্ডল (কংগ্রেস) ১৭,৮২৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জয়চাঁদ দাস (আর এস পি) ১১,৫৬৬ ভোট।

গত নির্বাচনে অতুলচন্দ্র সরকার

(কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

লালগোলা ॥ বিজয়ী আবদুস সাত্তার (কংগ্রেস) ২৪,৪০৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ মুজিবুর রহমান (সি পি এম) ১৩,০১৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও আবদুস সাত্তার (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ভগবানগোলা ॥ বিজয়ী মহম্মদ দাদর বক্স (কংগ্রেস) ২২,০১৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী (এস পি) ৫,৩১২ ভোট।

গত নির্বাচনে মহম্মদ সামাউন বিশ্বাস (মুসলিম লীগ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নবগ্রাম ॥ বিজয়ী আদ্যাচরণ দত্ত (কংগ্রেস) ২২,১৫৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (নির্দল) ১৯,৬৬০ ভোট।

গত নির্বাচনে বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (নির্দল) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদ ॥ বিজয়ী মহম্মদ ইদ্রিস

মুর্শিদাবাদ : মোট আসন ১৮

১৯৭১ ॥ কংগ্রেস ৮, মুসলিম লীগ ৪, সি পি এম ৩, আর এস পি ১, জনসংঘ ১, নির্দল ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ১৩ আর এস পি ২, সি পি এম ১, মুসলিম লীগ ১, এস ইউ সি ১।

আলি (কংগ্রেস) ২১,৮৭১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাজিম হোসেন সরকার (সি পি এম) ১৬,৯৭৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও মহম্মদ ইদ্রিস আলি (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জলংগী ॥ বিজয়ী আবদুল বারি বিশ্বাস (কংগ্রেস) ১৪,৪৬৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আতাহার রহমান (সি পি এম) ১৩,৬৭৬ ভোট।

গত নির্বাচনে প্রফুল্লকুমার সরকার (জনসংঘ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ডোমকল ॥ বিজয়ী সরামুল হক বিশ্বাস (কংগ্রেস) ২২,২৯৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ আবদুল বারি (সি পি এম) ২১,৬৬৮ ভোট।

গত নির্বাচনে মহম্মদ আবদুল বারি (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নওদা ॥ বিজয়ী নাসিরুদ্দিন খান (মুসলিম লীগ) ১৫,৭৯২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস (আর এস পি) ১৪,৯৯৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও নাসিরুদ্দিন খান (মুসলিম লীগ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হরিহরপাড়া ॥ বিজয়ী আবু রয়হান বিশ্বাস (এস ইউ সি) ২১,৩১৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মইনুল ইসলাম বিশ্বাস
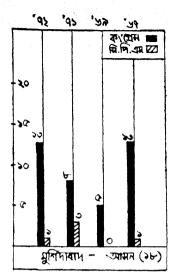
(কংগ্রেস) ১৮,৫৩৫ ভোট।

গত নির্বাচনে আফতাবউদ্দিন আহমেদ (মুসলিম লীগ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বহরমপুর ॥ বিজয়ী শংকরদাস পাল (কংগ্রেস) ৩১,৪৪৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (আর এস পি) ১৪,৬৬১ ভোট।

গত নির্বাচনেও শংকরদাস পাল (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বেলডাঙা ॥ বিজয়ী তিমিরবরন ভাদুড়ী (আর এস পি) ১৮,০৮৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল লতিফ (কংগ্রেস) ১৬,৫৮১ ভোট।

গত নির্বাচনেও তিমিরবরন ভাদুড়ী (আর এস পি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কান্দী ॥ বিজয়ী অতীশচন্দ্র সিংহ (কংগ্রেস) ৩৩,৯০০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দামোদরদাস চট্টোপাধ্যায় (সি পি এম) ১৪,১৪৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও অতীশচন্দ্র সিংহ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

খড়গ্রাম ॥ বিজয়ী হরেন্দ্রনাথ হালদার (কংগ্রেস) ৩০,৭৮০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দীনবন্ধু মাঝি (সি পি এম) ১৭,২৮০ ভোট।

গত নির্বাচনেও হরেন্দ্রনাথ হালদার (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বড়ঞা ॥ বিজয়ী সুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক (কংগ্রেস) ২৩,৪৯৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমরেন্দ্রলাল রায় (আর এস পি) ১৬,২৮৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও সুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ভরতপুর ॥ বিজয়ী কুমার দীপ্তি সেনগুপ্ত (কংগ্রেস) ২৩,৩২০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কে এম নুরে আহসান (সি পি এম) ১৭,৭২৪ ভোট।

গত নির্বাচনে কে এম নুরে আহসান (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নদীয়া

করিমপুর ॥ বিজয়ী অরবিন্দ মণ্ডল (কংগ্রেস) ২৭,৫৫৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল (সি পি এম) ১৬,০১৯ ভোট।

গত নির্বাচনে সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

তেহট্ট ॥ বিজয়ী কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস (কংগ্রেস) ২৭,১৫৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাধবেন্দু মোহান্ত (সি পি এম) ১৮,৮৩৫ ভোট।

গত নির্বাচনে মাধবেন্দু মোহান্ত (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কালীগঞ্জ ॥ বিজয়ী শিবশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ১৯,০৭৭ ভোট। নিকট-

নদীয়া : মোট আসন ১৪

১৯৭১ ॥ সি পি এম ৯, কংগ্রেস ১, এস এস পি ১, আর সি পি আই ১, মুসলিম লীগ ১, নির্দল ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ১২, সি পি আই ২।

তম প্রতিদ্বন্দ্বী মীর ফকির মহম্মদ (সি পি এম) ১৫,৭৫৭ ভোট।

গত নির্বাচনে মীর ফকির মহম্মদ (নির্দল) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নাকাশিপাড়া ॥ বিজয়ী নীলকমল সরকার (কংগ্রেস) ২০,৭৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিনয়ভূষণ মজুমদার (সি পি এম) ১৩,৮০৮ ভোট।

গত নির্বাচনে গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল (মুসলিম লীগ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

চাপড়া ॥ বিজয়ী গিয়াসুদ্দিন আমেদ (কংগ্রেস) ২৭,৫১৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাহাবুদ্দিন মণ্ডল (সি পি এম) ১৬,২২৮ ভোট।

গত নির্বাচনে সাহাবুদ্দিন মণ্ডল (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নবদ্বীপ ॥ বিজয়ী রাধারমণ সাহা (কংগ্রেস) ৩১,৭১৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেবীপ্রসাদ বসু (সি পি এম) ১৩,৫০৪ ভোট।

গত নির্বাচনে দেবীপ্রসাদ বসু (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কৃষ্ণনগর (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী শিবদাস মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২৫,৫৫২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়

(সি পি এম) ১৪,৯৮২ ভোট।

গত নির্বাচনে অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কৃষ্ণনগর (পূর্ব) ॥ বিজয়ী কাশীকান্ত মৈত্র (কংগ্রেস) ৩৩,৪৮৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নৃসিংহমোহন দত্ত (সি পি এম) ১০,৩৩২ ভোট।

গত নির্বাচনেও কাশীকান্ত মৈত্র (এস এস পি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাঁসখালি ॥ বিজয়ী আনন্দমোহন বিশ্বাস (কংগ্রেস) ৩৩,৮২৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুকুন্দ বিশ্বাস (সি পি এম) ১৫,৫৬৯ ভোট।

গত নির্বাচনেও আনন্দমোহন বিশ্বাস (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।
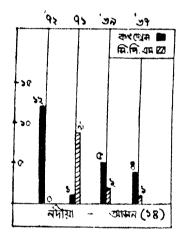
শান্তিপুর ॥ বিজয়ী অসমঞ্জ দে (কংগ্রেস) ২৭,২৭২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় (আর সি পি আই) ১৮,৬২৬ ভোট।

গত নির্বাচনে বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় (আর সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রানাঘাট (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী নরেশচন্দ্র চাকী (কংগ্রেস) ৩৭,৮৯২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরচন্দ্র কুণ্ডু (সি পি এম) ২৫,৭১৫ ভোট।

গত নির্বাচনে গৌরচন্দ্র কুণ্ডু (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রানাঘাট (পূর্ব) ॥ বিজয়ী নিতাইপদ সরকার (সি পি আই) ৩০,১০৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নরেশচন্দ্র বিশ্বাস (সি পি এম) ১৪,৭৯৯ ভোট।

গত নির্বাচনে নরেশচন্দ্র বিশ্বাস (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

চাকদহ ॥ বিজয়ী হরিদাস মিত্র (কংগ্রেস) ৩৩,১৪৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুভাষচন্দ্র বসু (সি পি এম) ২৪,৫৭৬ ভোট।

গত নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র বসু (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হরিণঘাটা ॥ বিজয়ী শক্তিকুমার ভট্টাচার্য (সি পি আই) ৩০,৩২৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ননীগোপাল মালাকার (সি পি এম) ২২,৬৬৩ ভোট।

গত নির্বাচনে ননীগোপাল মালাকার (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

চব্বিশ পরগণা

বাগদা ॥ বিজয়ী অপূর্বলাল মজুমদার (কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল) ২৪,৭৬৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কান্তিচন্দ্র বিশ্বাস (সি পি এম) ১৪,৩৪৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও অপূর্বলাল মজুমদার (ফরোয়ার্ড ব্লক) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বনগাঁ ॥ বিজয়ী অজিতকুমার গাঙ্গোপাধ্যায় (সি পি আই) ২৮,৩১০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রণজিৎ মিত্র (সি পি এম) ১৫,৪৪৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও অজিতকুমার গাঙ্গোপাধ্যায় (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গাইঘাটা ॥ বিজয়ী চণ্ডীপদ মিত্র (কংগ্রেস) ৩০,২১৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কেশবলাল বিশ্বাস (সি পি এম) ১৫,৩৩১ ভোট।

গত নির্বাচনেও চণ্ডীপদ মিত্র (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

অশোকনগর ॥ বিজয়ী কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য (নির্দল) ২৩,৮৬৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ননী কর (সি পি এম) ১৯,৭৩৭ ভোট।

গত নির্বাচনে ননী কর (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বারাসত ॥ বিজয়ী কান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৩২,৯৮৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সরল দেব (ফরোয়ার্ড ব্লক) ২২,৮৩৫ ভোট।

গত নির্বাচনে সরল দেব (ফরোয়ার্ড ব্লক) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রাজারহাট ॥ বিজয়ী খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (কংগ্রেস) ৩১,২৮৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল (সি পি এম) ২৬,০৩৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

দেগঙ্গা ॥ বিজয়ী মহম্মদ শওকত আলি (কংগ্রেস) ১৯,৩১৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এ কে এম হাসানুজ্জামান (মুসলিম লীগ) ১৮,৯৬৯ ভোট।

গত নির্বাচনে মহম্মদ হারুন উর রশিদ (মুসলিম লীগ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাবড়া ॥ বিজয়ী তরুণকান্তি ঘোষ (কংগ্রেস) ৩৭,৬১৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আনোয়ার মণ্ডল (সি পি এম) ১৭,৩৭৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও তরুণকান্তি ঘোষ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

স্বরূপনগর ॥ বিজয়ী চন্দ্রনাথ মিশ্র (কংগ্রেস) ৩৩,৬৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আনিসুর রহমান (সি পি এম) ১৩,২৩২ ভোট।

গত নির্বাচনেও চন্দ্রনাথ মিশ্র (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বাদুড়িয়া ॥ বিজয়ী কাজি আবদুল গফফার (কংগ্রেস) ৩১,৩২০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মীর আবদুল সৈয়দ (সি পি এম) ১৭,৩৯৯ ভোট।

গত নির্বাচনেও কাজি আবদুল গফফার (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বসিরহাট ॥ বিজয়ী ললিতকুমার ঘোষ (কংগ্রেস) ২৯,৮৯৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ১৭,৬১০ ভোট।

চব্বিশ পরগনা : মোট আসন ৫৩

১৯৭১ ॥ সি পি এম ২৫, কংগ্রেস ১৪, এস ইউ সি ৪, ফরোয়ার্ড ব্লক ২, মুসলিম লীগ ২, বাংলা কংগ্রেস ১, সি পি আই ১, আর এস পি ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ৩৬, সি পি আই ৬, সি পি এম ৬, নির্দল ২।

গত নির্বাচনেও ললিতকুমার ঘোষ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাসনাবাদ ॥ বিজয়ী মোল্লা তাসমাতুল্লা (কংগ্রেস) ২৫,২৭৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খালেক কিং আশরাফ (সি পি এম) ১২,৮৯৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও মোল্লা তাসমাতুল্লা (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হিঙ্গলগঞ্জ ॥ বিজয়ী অনিলকৃষ্ণ মণ্ডল (সি পি আই) ১৫,৪৩৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোপালচন্দ্র গায়েন (সি পি এম) ১৫,০৩৩ ভোট।

গত নির্বাচনে গোপালচন্দ্র গায়েন (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গোসাবা ॥ বিজয়ী পরেশ বৈদ্য (কংগ্রেস) ২৬,৮৬৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণেশচন্দ্র মণ্ডল (আর এস পি) ২১,৮৮৮ ভোট।

গত নির্বাচনে গণেশচন্দ্র মণ্ডল (আর এস পি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সন্দেশখালি ॥ বিজয়ী দেবেন্দ্রনাথ সিংহ (কংগ্রেস) ২৪,৭৬৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শরৎ সর্দার (সি পি এম) ২১,৯০৫ ভোট।

গত নির্বাচনে শরৎ সর্দার (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাড়োয়া ॥ বিজয়ী গঙ্গাধর প্রামাণিক (কংগ্রেস) ২১,২৩৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগন্নাথ সর্দার (সি পি এম) ১৭,৯০২ ভোট।

গত নির্বাচনেও গঙ্গাধর প্রামাণিক (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বাসন্তী ॥ বিজয়ী পঞ্চানন সিংহ (কংগ্রেস) ২৬,৮৭৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অশোক চৌধুরী (আর এস পি) ২৩,৬৫০ ভোট।

গত নির্বাচনেও পঞ্চানন সিংহ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ক্যানিং ॥ বিজয়ী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর (কংগ্রেস) ৩০,৬৭৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মলকুমার সিংহ (সি পি এম) ২২,৪১৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও গোবিন্দচন্দ্র নস্কর (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কুলতলি ॥ বিজয়ী অরবিন্দ নস্কর (কংগ্রেস) ৩২,৯৬৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবোধ পুরকায়েত (এস ইউ সি) ২৭,২১৫ ভোট।

গত নির্বাচনে প্রবোধ পুরকায়েত (এস ইউ সি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জয়নগর ॥ বিজয়ী প্রসূনকুমার শাস (কংগ্রেস) ২৯,৬৭৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (এস ইউ সি) ২৭,৮৪০ ভোট।

গত নির্বাচনে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (এস ইউ সি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বারুইপুর ॥ বিজয়ী ললিত গায়েন (কংগ্রেস) ৩০,৫৭৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিমল মিস্ত্রী (সি পি এম) ২২,৮৭৮ ভোট।

গত নির্বাচনে বিমল মিস্ত্রী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সোনারপুর ॥ বিজয়ী কংসারি হালদার (সি পি আই) ৩০,৭০০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গঙ্গাধর নস্কর (সি পি এম) ২৩,৩২৮ ভোট।

গত নির্বাচনে গঙ্গাধর নস্কর (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ভাঙ্গড় ॥ বিজয়ী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা (সি পি এম) ১৩,৪৫৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ নুরুজ্জামান (কংগ্রেস) ১১,৫৯৩ ভোট।

গত নির্বাচনে এ কে এম হাসানুজ্জামান (মুসলিম লীগ) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

যাদবপুর ॥ বিজয়ী দীনেশ মজুমদার (সি পি এম) ৪০,৯৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (কংগ্রেস) ৩১,২৯৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও দীনেশ মজুমদার (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বেহালা (পূর্ব) ॥ বিজয়ী ইন্দুভূষণ মজুমদার (কংগ্রেস) ২৮,৯৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ১৮,৭৩৩ ভোট।

গত নির্বাচনে নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বেহালা (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (সি পি আই) ৩১,৯৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ৩০,০২৪ ভোট।

গত নির্বাচনে রবীন মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গার্ডেনরিচ ॥ বিজয়ী ছেদিলাল সিংহ (সি পি এম) ২৫,৬২৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এস এম আবদুল্লাহ (কংগ্রেস) ২৪,২৪৫ ভোট।

গত নির্বাচনে এস এম আবদুল্লাহ (কংগ্রেস)) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মহেশতলা ॥ বিজয়ী ভূপেন বিজলী (কংগ্রেস ৩৩,৪১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুধীর ভাণ্ডারী (সি পি এম) ২৫,৫৮১ ভোট।

গত নির্বাচনে সুধীর ভাণ্ডারী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বজবজ ॥ বিজয়ী ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মণ (সি পি এম) ৩৪,৮৭৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভবানী রায় চৌধুরী (সি পি আই) ২১,৭৮৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মণ (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুর (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী প্রভাসচন্দ্র রায় (সি পি এম) ২৮,৫৪০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ মকবুল হক (কংগ্রেস) ২৭,৯৪৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও প্রভাসচন্দ্র রায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুর (পূর্ব) ॥ বিজয়ী রামকৃষ্ণ বর (কংগ্রেস) ২৯,৩৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্দরকুমার নস্কর (সি পি এম) ২০,৭৪৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও রামকৃষ্ণ বর (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ফলতা ॥ বিজয়ী মোহিনীমোহন রায়ই (কংগ্রেস) ২৯,২৭৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ রায় (সি পি এম) ২৪,৭৪৭ ভোট।

গত নির্বাচনে জ্যোতিষ রায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ডায়মণ্ডহারবার ॥ বিজয়ী সৌলত আলি শেখ (কংগ্রেস) ৩৫,৪৫৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল কোয়ায়ুম মোল্লা (সি পি এম) ২৬,৮৬১ ভোট।

গত নির্বাচনে আবদুল কোয়ায়ুম মোল্লা (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মগরাহাট (পূর্ব) ॥ বিজয়ী মানারঞ্জন হালদার (কংগ্রেস) ৩৪,৫৩৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক (সি পি এম) ২৫,৯০২ ভোট।

গত নির্বাচনে রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মগরাহাট (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী সুধেন্দু মণ্ডল (কংগ্রেস) ২৯,৪৭৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুস সোভান গাজী (সি পি এম) ২৬,১৪৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও সুধেন্দু মণ্ডল (বাংলা কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কুলপি ॥ বিজয়ী সন্তোষকুমার মণ্ডল (কংগ্রেস) ৩১,০৬৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শশাঙ্কশেখর নইয়া (এস ইউ সি) ১৫,৫৫৫ ভোট।

গত নির্বাচনে মুকুন্দরাম মণ্ডল (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মথুরাপুর ॥ বিজয়ী বীরেন্দ্রনাথ হালদার (কংগ্রেস) ৩২,৫৬২ ভোট। নিকট-

ত্তম প্রতিদ্বন্দ্বী রেণুপদ হালদার (এস ইউ সি) ২৩,৫৬৪ ভোট।

গত নির্বাচনে রেণুপদ হালদার (এস ইউ সি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পাথরপ্রতিমা ॥ বিজয়ী সত্যরঞ্জন বাপুলি (কংগ্রেস) ৩০,২১৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন মণ্ডল (এস ইউ সি) ২৯,৬৫৭ ভোট।

গত নির্বাচনে রবীন মণ্ডল (এস ইউ সি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কাকদ্বীপ ॥ বিজয়ী বাসুদেব সাউটা (কংগ্রেস) ৩৬,৮১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হৃষীকেশ মাইতি (সি পি এম) ২৫,০৬৭ ভোট।

গত নির্বাচনে হৃষীকেশ মাইতি (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সাগর ॥ বিজয়ী প্রভঞ্জনকুমার মণ্ডল (সি পি এম) ২৪,৯৪২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রিলোকেশ মিশ্র (নির্দল) ১৯,২৯৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও প্রভঞ্জনকুমার মণ্ডল (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বীজপুর ॥ বিজয়ী জগদীশচন্দ্র দাস (কংগ্রেস) ৪০,০১৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগদীশচন্দ্র দাস (সি পি এম) ২৫,৩৩৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও জগদীশচন্দ্র দাস (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নৈহাটি ॥ বিজয়ী তারাপদ মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৩৭,৫১১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোপাল বসু (সি পি এম) ৩৩,৮৬৬ ভোট।

গত নির্বাচনে গোপাল বসু (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ভাটপাড়া ॥ বিজয়ী সত্যনারায়ণ সিংহ (কংগ্রেস) ৫৯,২৮৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সীতারাম গুপ্ত (সি পি এম) ৩৬,৬৮০ ভোট।

গত নির্বাচনেও সত্যনারায়ণ সিংহ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নোয়াপাড়া ॥ বিজয়ী শুভেন্দু রায় (কংগ্রেস) ৪৪,১১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যামিনীভূষণ সাহা (সি পি এম) ২২,৫৯৯ ভোট।

গত নির্বাচনে যামিনীভূষণ সাহা (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

টিটাগড় ॥ বিজয়ী কৃষ্ণকুমার শুক্লা (কংগ্রেস) ৫০,৬৫৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ আমিন (সি পি এম) ২৩,১৫৮ ভোট।

গত নির্বাচনে মহম্মদ আমিন (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

খড়দহ ॥ বিজয়ী শিশিরকুমার ঘোষ (সি পি আই) ৬২,৪৬০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাধনকুমার চক্রবর্তী (সি পি এম) ২১,৮২৩ ভোট।

গত নির্বাচনে সাধনকুমার চক্রবর্তী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পানিহাটি ॥ বিজয়ী তপন চট্টোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৭৪,৭৬৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (সি পি এম) ২৭,৫৪০ ভোট।

গত নির্বাচনে গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কামারহাটি ॥ বিজয়ী প্রদীপকুমার পালিত (কংগ্রেস) ২৮,৬৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রাধিকারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সি পি এম) ২২,৫২৪ ভোট।

গত নির্বাচনে রাধিকারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বরাহনগর ॥ বিজয়ী শিবপদ ভট্টাচার্য (সি পি আই) ৬৯,১৪৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতি বসু (সি পি এম) ৩০,১৫৮ ভোট।

গত নির্বাচনে জ্যোতি বসু (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

দমদম ॥ বিজয়ী লালবাহাদুর সিং (কংগ্রেস) ৯১,৪২৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণকুমার সেনগুপ্ত (সি পি এম) ১৫,০২৩ ভোট।

গত নির্বাচনে (উপ) তরুণকুমার সেনগুপ্ত (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কলিকাতা

কাশীপুর ॥ বিজয়ী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (কংগ্রেস) ৩৮,২৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পরেশনাথ ব্যানার্জি (সি পি এম) ১৫,০৭৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

শ্যামপুকুর ॥ বিজয়ী হরিনারায়ণ দাস (কংগ্রেস) ৩০,৪৬৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব (সি পি এম) ১৬,৬৬৭ ভোট।

গতবারে এই কেন্দ্রে প্রথমে হেমন্তকুমার বসু (ফরোয়ার্ড ব্লক) ও পরে অজিতকুমার বিশ্বাস (ফরোয়ার্ড ব্লক) নিহত হওয়ায় নির্বাচন হয়নি।

জোড়াবাগান ॥ বিজয়ী ইলা রায় (কংগ্রেস) ৪২,৬৩১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সি পি এম) ১৩,০৬৪ ভোট।

গত নির্বাচনে নেপালচন্দ্র রায় (কংগ্রেস) এবং তিনি নিহত হবার পর উপনির্বাচনে ইলা রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।
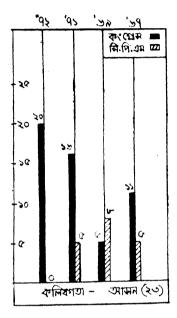
জোড়াসাঁকো ॥ বিজয়ী দেওকীনন্দন পোদ্দার (কংগ্রেস) ২৭,৮৮৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যনারায়ণ লাল (সি এম) ১০,৭৭৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও দেওকীনন্দন পোদ্দার (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বড়বাজার ॥ বিজয়ী রামকৃষ্ণ সারোগি (কংগ্রেস) ২৭,৬০৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুরলীধর সাংথালিয়া (সি পি এম) ৭,৬৮২ ভোট।

গত নির্বাচনেও রামকৃষ্ণ সারোগি (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বউবাজার ॥ বিজয়ী বিজয়সিংহ নাহার (কংগ্রেস) ২৫,২৯২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাসিম আবদুল হালিম (সি পি এম) ১৩,৪৩৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও বিজয়সিংহ নাহার (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

চৌরঙ্গী ॥ বিজয়ী শংকর ঘোষ (কংগ্রেস) ২৩,৬৫৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমল দত্ত (সি পি এম) ৯,৮৫১ ভোট।

গত নির্বাচনেও শংকর ঘোষ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কবিতীর্থ ॥ বিজয়ী রামপিয়ারী রাম (কংগ্রেস) ২৮,৫৬৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কলিমুদ্দিন সামস (ফরোয়ার্ড ব্লক) ২৭,৬৮৫ ভোট।

কলিকাতা : মোট আসন ২৩

১৯৭১ ॥ কংগ্রেস ১৬, সি পি এম ৫, সি পি আই ১, নির্বাচন স্থগিত ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ২০, সি পি আই ৩।

গত নির্বাচনেও রামপিয়ারী রায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

আলিপুর ॥ বিজয়ী কানাইলাল সরকার (কংগ্রেস) ৩১,২৭৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পি ঝা (সি পি এম) ১৩,২২৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও কানাইলাল সরকার (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কালীঘাট ॥ বিজয়ী রথীন তালুকদার (কংগ্রেস) ৩১,৮৩৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অলোককুমার বসু (সি পি এম) ১৬,৫১১ ভোট।

গত নির্বাচনেও রথীন তালুকদার (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রাসবিহারী ॥ বিজয়ী লক্ষ্মীকান্ত বসু (কংগ্রেস) ৩১,৫৪৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শচীন সেন (সি পি এম) ১১,৪২২ ভোট।

গত নির্বাচনেও লক্ষ্মীকান্ত বসু (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

টালিগঞ্জ ॥ বিজয়ী পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৪১,০৯৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রশান্তকুমার সুর (সি পি এম) ২৪,৩৭২ ভোট।

গত নির্বাচনে সত্যপ্রিয় রায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ঢাকুরিয়া ॥ বিজয়ী সোমনাথ লাহিড়ী (সি পি আই) ৩২,৬৪১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যতীন চক্রবর্তী (আর এস পি) ২০,৫৫০ ভোট।

গত নির্বাচনেও সোমনাথ লাহিড়ী (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বালিগঞ্জ ॥ বিজয়ী সুব্রত মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৩২,৪৪৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য (ওয়ার্কার্স পার্টি) ১৮,১৮১ ভোট।

গত নির্বাচনেও সুব্রত মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বেলেঘাটা (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী অর্ধেন্দুশেখর নস্কর (কংগ্রেস) ৩৭,২২২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুমন্ত হীরা (সি পি এম) ১০,৯৬৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও অর্ধেন্দুশেখর নস্কর (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

এন্টালি ॥ বিজয়ী এ এম ও গনি (সি পি আই) ২৭,৩৭১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ নিজামুদ্দিন (সি পি এম) ২০,৩০৩ ভোট।

গত নির্বাচনে মহম্মদ নিজামুদ্দিন (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

তালতলা ॥ বিজয়ী আবদুর রউফ আনসারি (কংগ্রেস) ২০,৬৬৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবুল হাসান (সি পি এম) ১৭,৩২২ ভোট।

গত নির্বাচনেও আবদুর রউফ আনসারি (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

শিয়ালদহ ॥ বিজয়ী সোমেন্দ্রনাথ মিত্র (কংগ্রেস) ৩৭,০২৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্যামসুন্দর গুপ্ত (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৬,০৯৪ ভোট।

গত নির্বাচনে বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর ॥ বিজয়ী মহম্মদ সামসুজ্জোহা (কংগ্রেস) ২৫,৮৮৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সমরকুমার রুদ্র (সি পি এম) ১৫,৬৩১ ভোট।

গত নির্বাচনেও মহম্মদ সামসুজ্জোহা (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বেলিয়াঘাটা (উত্তর) ॥ বিজয়ী অনন্তকুমার ভারতী (কংগ্রেস) ৫৩,৮৭৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণপদ ঘোষ (সি পি এম) ১৪,৮৩৯ ভোট।

গত নির্বাচনে কৃষ্ণপদ ঘোষ (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মানিকতলা ॥ বিজয়ী ইলা মিত্র (সি পি আই) ৪৩,২০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অনিলা দেবী (সি পি এম) ২১,৬২২ ভোট।

গত নির্বাচনে অনিলা দেবী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বড়তলা ॥ বিজয়ী অজিতকুমার পাঁজা (কংগ্রেস) ৩০,৭৭৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মীকান্ত দে (সি পি এম) ১২,৭৪১ ভোট।

গত নির্বাচনেও অজিতকুমার পাঁজা (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বেলগাছিয়া ॥ বিজয়ী গণপতি সুর (কংগ্রেস) ৩৭,৭৩৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মীচরণ সেন (সি পি এম) ২৪,৬৬০ ভোট।

গত নির্বাচনে লক্ষ্মীচরণ সেন (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাওড়া

বালী ॥ বিজয়ী ভবানীশংকর মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২৮,৮৫৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পতিতপাবন পাঠক (সি পি এম) ২২,৫২২ ভোট।

গত নির্বাচনে পতিতপাবন পাঠক (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাওড়া (উত্তর) ॥ বিজয়ী শংকরলাল মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২৬,৭৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্তব্রত মজুমদার (সি পি এম) ১৮,৪৬৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও শংকরলাল মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাওড়া (মধ্য) ॥ বিজয়ী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২৫,৩২৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুধীন কুমার (আর সি পি আই) ১৫,৮৭০ ভোট।

গত নির্বাচনে সুধীন কুমার (আর সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাওড়া (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী শান্তিকুমার দাশগুপ্ত (কংগ্রেস) ২৮,৬৫১ ভোট।

হাওড়া : মোট আসন ১৬

১৯৭১ ॥ সি পি এম ১২, কংগ্রেস ৩, আর সি পি আই ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ১১, সি পি এম ৩, সি পি আই ১, নির্দল ১।

নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রলয় তালুকদার (সি পি এম) ২০,৬৫৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও শান্তিকুমার দাশগুপ্ত (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

শিবপুর ॥ বিজয়ী মৃগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৩১,২০৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কানাইলাল ভট্টাচার্য (ফরোয়ার্ড ব্লক) ২৪,৯৪১ ভোট।

গত নির্বাচনে হরিসাধন মিত্র (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ডোমজুড় ॥ বিজয়ী কৃষ্ণপদ রায় (কংগ্রেস) ৩০,৫৫০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জয়কেশ মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ২৯,৬৭৫ ভোট।

গত নির্বাচনে জয়কেশ মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জগৎবল্লভপুর ॥ বিজয়ী তারাপদ দে (সি পি এম) ২৪,০৬৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ ইলিয়াস (সি পি আই) ২২,৪৩৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও তারাপদ দে (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পাঁচলা ॥ বিজয়ী শেখ আনোয়ার আলি (কংগ্রেস) ২৯,৯০০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অশোককুমার ঘোষ (সি পি এম) ২১,৯৪৪ ভোট।
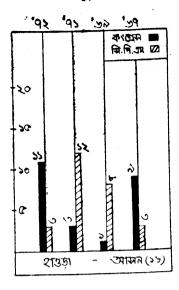
গত নির্বাচনে অশোককুমার ঘোষ (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সাঁকরাইল ॥ বিজয়ী হারানচন্দ্র হাজরা (সি পি এম) ২৬,৭১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অরবিন্দ নস্কর (কংগ্রেস) ২৩,৫৮৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও হারানচন্দ্র হাজরা (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

উলুবেড়িয়া (উত্তর) ॥ বিজয়ী রাজকুমার মণ্ডল (সি পি এম) ৩১,৮৮৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সন্তোষকুমার ভৌমিক (বিদ্রোহী ফরোয়ার্ড ব্লক) ২৪,৩৮৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও রাজকুমার মণ্ডল (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

উলুবেড়িয়া (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী রবীন্দ্র ঘোষ (বিদ্রোহী ফরোয়ার্ড ব্লক) ২৩,৩১৬ ভোট। নিকটতম প্রার্থী বটকৃষ্ণ দাস (সি পি এম) ২৩,০৩৪ ভোট।

গত নির্বাচনে বটকৃষ্ণ দাস (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

শ্যামপুর ॥ বিজয়ী শিশিরকুমার সেন (কংগ্রেস) ৩০,২৯৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শশবিন্দু বেরা (ফরোয়ার্ড ব্লক) ২৯,৬০১ ভোট।

গত নির্বাচনেও শিশিরকুমার সেন (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বাগনান ॥ বিজয়ী সুশান্ত ভট্টাচার্য (কংগ্রেস) ২৬,০৩০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় (সি পি এম) ২৪,৮০২ ভোট।

গত নির্বাচনে নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কল্যাণপুর ॥ বিজয়ী অনসার আলি (সি পি আই) ৩২,১৩৮ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিতাইচন্দ্র আদক (সি পি এম) ১৯,৬৬২ ভোট।

গত নির্বাচনে নিতাইচন্দ্র আদক (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

আমতা ॥ বিজয়ী আফতাবউদ্দিন মণ্ডল (কংগ্রেস) ২৬,৩২২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বারীন্দ্র কোলে (সি পি এম) ২৪,৭১০ ভোট।

গত নির্বাচনে বারীন্দ্র কোলে (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

উদয়নারায়ণপুর ॥ বিজয়ী সরোজ কাঁড়ার (কংগ্রেস) ৩০,৯১৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পান্নালাল মাঝি (সি পি এম) ২৩,৯৫৫ ভোট।

গত নির্বাচনে পান্নালাল মাঝি (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হুগলী

জাঙ্গীপাড়া ॥ বিজয়ী গণেশচন্দ্র হাটুই (কংগ্রেস) ২৩,৯৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মণীন্দ্রনাথ জানা (সি পি এম) ২২,৪৮৫ ভোট।

গত নির্বাচনে মণীন্দ্রনাথ জানা (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হুগলী : মোট আসন ১৮

১৯৭১ ॥ সি পি এম ১০, কংগ্রেস ২, সংগঠন কংগ্রেস ১, সি পি আই ১, ওয়ার্কার্স পার্টি ১, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ১২, সি পি আই ২, সি পি এম ২, সংগঠন কংগ্রেস ১, ওয়ার্কার্স পার্টি ১।

চণ্ডীতলা ॥ বিজয়ী মহম্মদ সফিউল্লা (কংগ্রেস) ২১,৯৭৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী সফিউল্লা (সি পি এম) ১৮,৫৬১ ভোট।

গত নির্বাচনে কাজী সফিউল্লা (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

উত্তরপাড়া ॥ বিজয়ী শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় (সি পি এম) ২৭,০৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (সি পি আই) ২৭,০৪৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

শ্রীরামপুর ॥ বিজয়ী গোপালদাস নাগ (কংগ্রেস) ৩৭,১৫২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (সি পি এম) ২২,৯৮৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও গোপালদাস নাগ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

চাঁপদানি ॥ বিজয়ী গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় (সি পি আই) ২৬,০২৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হরিপদ মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ২৩,৫০৯ ভোট।

গত নির্বাচনে হরিপদ মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

চন্দননগর ॥ বিজয়ী ভবানী মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ২৪,৩৬৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিপিনবিহারী সাউ (কংগ্রেস) ২৪,৩২৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও ভবানী মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সিঙ্গুর ॥ বিজয়ী অজিতকুমার বসু (সি পি আই) ৩০,২১৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সি পি এম) ২১,১৫৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও অজিতকুমার বসু (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হরিপাল ॥ বিজয়ী চিত্তরঞ্জন বসু (ওয়ার্কার্স পার্টি) ২৪,০৭৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রশেখর বণিক (কংগ্রেস) ২৩,১৩১ ভোট।

গত নির্বাচনেও চিত্তরঞ্জন বসু (ওয়ার্কার্স পার্টি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

চুঁচুড়া ॥ বিজয়ী ভূপতি মজুমদার (কংগ্রেস) ২৯,৬৩৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শম্ভুচরণ ঘোষ (ফরোয়ার্ড ব্লক) ২৪,৮৬৯ ভোট।

গত নির্বাচনেও ভূপতি মজুমদার (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পোলবা ॥ বিজয়ী ভবানীপ্রসাদ সিংহ রায় (কংগ্রেস) ২৯,৭৮৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রজগোপাল নিয়োগী (সি পি এম) ২৩,৫৪৫ ভোট।

গত নির্বাচনে ব্রজগোপাল নিয়োগী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বলাগড় ॥ বিজয়ী বীরেন সরকার (কংগ্রেস) ২৬,৬৮০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অবিনাশ প্রামাণিক (সি পি এম) ২১,৮৮০ ভোট।

গত নির্বাচনে অবিনাশ প্রামাণিক (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পাণ্ডুয়া ॥ বিজয়ী শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২৯,২১১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী (সি পি এম) ২০,৩২৯ ভোট।

গত নির্বাচনে দেবনারায়ণ চক্রবর্তী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ধনিয়াখালি ॥ বিজয়ী কাশীনাথ পাত্র (কংগ্রেস) ২৮,৮৬৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাশীনাথ রায় (সি পি এম) ২২,৭৩৪ ভোট।

গত নির্বাচনে কাশীনাথ রায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

তারকেশ্বর ॥ বিজয়ী বলাইলাল শেঠ (কংগ্রেস) ২৮,২২৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রাম চট্টোপাধ্যায় (ফরোয়ার্ড ব্লক—মার্কসবাদী) ২৩,৭৫৮ ভোট।
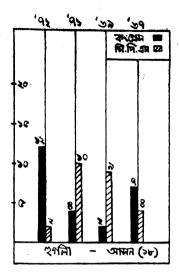
গত নির্বাচনে রাম চট্টোপাধ্যায় (ফরোয়ার্ড ব্লক—মার্কসবাদী) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পড়শুড়া ॥ বিজয়ী মহাদেব মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৩২,৩২৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মৃণালকান্তি মজুমদার (ফরোয়ার্ড ব্লক—মার্কসবাদী) ১৫,৫৯৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও মহাদেব মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

খানাকুল ॥ বিজয়ী বাসুদেব হাজরা (কংগ্রেস) ১৭,১০০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মদনমোহন সাহা (সি পি এম) ১৬,০২৩ ভোট।

গত নির্বাচনে মদনমোহন সাহা (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

আরামবাগ ॥ বিজয়ী প্রফুল্লচন্দ্র সেন (কংগ্রেস—সংগঠন) ২৮,৮৮৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শান্তিমোহন রায় (কংগ্রেস) ১৩,৯৫৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও প্রফুল্লচন্দ্র সেন (কংগ্রেস—সংগঠন) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গোঘাট ॥ বিজয়ী মদনমোহন মিন্দা (কংগ্রেস) ১৪,৭০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আরতি বিশ্বাস (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৫,৫১৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও মদনমোহন মিন্দা (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মেদিনীপুর

চন্দ্রকোনা ॥ বিজয়ী সত্য ঘোষাল (সি পি আই) ২৬,৩৮২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ষোড়শী চৌধুরী (সি পি এম) ২১,৩৪৩ ভোট।

গত নির্বাচনে ষোড়শী চৌধুরী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ঘাটাল ॥ বিজয়ী হরিসাধন দলুই (কংগ্রেস) ২৪,৮৪৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নন্দরানী দল (সি পি এম) ২২,৫৫৫ ভোট।

গত নির্বাচনে নন্দরানী দল (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

দাসপুর ॥ বিজয়ী সুধীরচন্দ্র বেরা (কংগ্রেস) ৩১,৮৬৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাসচন্দ্র ফোদিকর (সি পি এম) ২১,০২১ ভোট।

গত নির্বাচনেও সুধীরচন্দ্র বেরা (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পাঁশকুড়া (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী শেখ ওমর আলি (সি পি আই) ২৪,০৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনোরঞ্জন রায় (সি পি এম) ৯,২০৯ ভোট।

গত নির্বাচনেও শেখ ওমর আলি (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পাঁশকুড়া (পূর্ব) ॥ বিজয়ী গীতা মুখোপাধ্যায় (সি পি আই) ২৯,৩৫৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১১,৩১৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও গীতা মুখোপাধ্যায় (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ময়না ॥ বিজয়ী কানাই ভৌমিক (সি পি আই) ২৪,৪১৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পুলক বেরা (সি পি এম) ১৪,৯২৯ ভোট।

> মেদিনীপুর : মোট আসন ৩৫
>
> ১৯৭১ ॥ কংগ্রেস ১২, সি পি আই ৮, সি পি এম ৬, বাংলা কংগ্রেস ৪, পি এস পি ৩, সংগঠন কংগ্রেস ...১, ঝাড়খণ্ড ১।
>
> ১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ২১, সি পি আই ১২, সংগঠন কংগ্রেস ১, নির্দল ১।

গত নির্বাচনেও কানাই ভৌমিক (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

তমলুক ॥ বিজয়ী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৩৩,৯২৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেবপ্রসাদ ভৌমিক (সি পি এম) ১১,০৪০ ভোট।

গত নির্বাচনেও অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (বাংলা কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মহিষাদল ॥ বিজয়ী অহীন্দ্র মিশ্র (কংগ্রেস) ৩৩,৯০৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুশীলকুমার ধাড়া (বাংলা কংগ্রেস) ১০,৮৯৬ ভোট।

গত নির্বাচনে সুশীলকুমার ধাড়া (বাংলা কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সুতাহাটা ॥ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ করণ (সি পি আই) ২৫,৬৪১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ (সি পি এম) ১৩,১৮২ ভোট।

গত নির্বাচনে বাণেশ্বর পাত্র (বাংলা কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নন্দীগ্রাম ॥ বিজয়ী ভূপালচন্দ্র পাণ্ডা (সি পি আই) ২৭,৬১০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অভা মাইতি (কংগ্রেস—সংগঠন) ২৩,৪৬১ ভোট।

গত নির্বাচনেও ভূপালচন্দ্র পাণ্ডা (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নরঘাট ॥ বিজয়ী শরদিন্দু সামন্ত (কংগ্রেস) ৩০,৯৭৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বদেশকুমার মান্না (সি পি এম) ১৩,৪৩৯ ভোট।

গত নির্বাচনে বঙ্কিম মাইতি (বাংলা কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ভগবানপুর ॥ বিজয়ী অমলেশ জানা (কংগ্রেস) ২১,৮১৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রশান্তকুমার প্রধান (সি পি এম) ১৬.২৭৪ ভোট।

গত নির্বাচনে প্রশান্তকুমার প্রধান (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

খেজুরি ॥ বিজয়ী বিমল পাইক (কংগ্রেস) ২৮,০০৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগদীশচন্দ্র দাস (সি পি এম) ১১,৭৫৩ ভোট।

গত নির্বাচনে জগদীশচন্দ্র দাস (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কাঁথি (উত্তর) ॥ বিজয়ী রামধ্যানন্দন দাস মহাপাত্র (সি পি আই) ২৫,৯২২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অনুরূপ পাণ্ডা (সি পি এম) ১২,৩৭৬ ভোট।

গত নির্বাচনে অনিলকুমার মান্না (পি এস পি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কাঁথি (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী সুধীরচন্দ্র দাস (কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল) ২০,০০১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যব্রত মাইতি (কংগ্রেস—সংগঠন) ১৯,৮৩৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও সুধীরচন্দ্র দাস (পি এস পি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রামনগর ॥ বিজয়ী হেমন্ত দত্ত (কংগ্রেস) ২৮,৭৬৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রোহিণী করণ (সি পি এম) ৮,৮২১ ভোট।

গত নির্বাচনে রাধাগোবিন্দ বিশাল (কংগ্রেস—সংগঠন) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

এগরা ॥ বিজয়ী সামসুল আলম খান (কংগ্রেস) ২১,৬২৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবোধচন্দ্র সিংহ (এস পি) ২১,১৯৭ ভোট।

গত নির্বাচনে প্রবোধচন্দ্র সিংহ (পি এস পি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মুগবেড়িয়া ॥ বিজয়ী প্রশান্তকুমার সাহু (কংগ্রেস) ২৪,০৭০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী (সি পি এম) ১৩,৯৩৬ ভোট।

গত নির্বাচনে অমরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পটাশপুর ॥ বিজয়ী প্রফুল্ল মাইতি (কংগ্রেস) ৩৩,৮৪৪ ভোট। নিকটতম
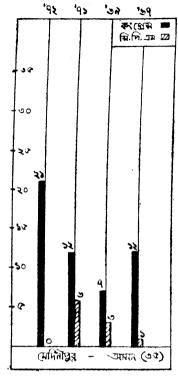
প্রতিদ্বন্দ্বী জগদীশ দাস (সি পি এম) ১৩,০৮৭ ভোট।

গত নির্বাচনেও প্রফুল্ল মাইতি (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পিংলা ॥ বিজয়ী বিজয় দাস (কংগ্রেস) ২৯,৪৬০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরাঙ্গ সামন্ত (বিদ্রোহী বাংলা কংগ্রেস) ২০,৩৩৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও বিজয় দাস (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ডেবরা ॥ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ বেরা (কংগ্রেস) ২৭,৯২১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবরাম বসু (সি পি এম) ১৭,৩৯৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও রবীন্দ্রনাথ বেরা (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কেশপুর ॥ বিজয়ী রজনীকান্ত দলুই (কংগ্রেস) ২৯,০৩৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিমাংশু কোঙার (সি পি এম) ১৯,৯৩৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও রজনীকান্ত দলুই (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গড়বেতা (পূর্ব) ॥ বিজয়ী কৃষ্ণপ্রসাদ দুলে (সি পি আই) ২৩,২৭৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভুতু দলুই (সি পি এম) ১৪,৮৯১ ভোট।

গত নির্বাচনেও কৃষ্ণপ্রসাদ দুলে (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গড়বেতা (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী সরোজ রায় (সি পি আই) ২৩,০৭৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনোহর মাহাতো (সি পি এম) ১৪,৬৫০ ভোট।

গত নির্বাচনেও সরোজ রায় (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

শালবনী ॥ বিজয়ী ঠাকুরদাস মাহাতো (সি পি আই) ২১,২৮১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্দর হাজরা (সি পি এম) ১৬,১৯৯ ভোট।

গত নির্বাচনে সুন্দর হাজরা (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মেদিনীপুর ॥ বিজয়ী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সি পি আই) ৩২,০০৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অণিমা ঘোষ রায় (সি পি এম) ৭,৮৮২ ভোট।

গত নির্বাচনেও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

খড়্গপুর ॥ বিজয়ী জ্ঞানসিং সোহনপাল (কংগ্রেস) ২৬,৭৩২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যতীন্দ্রনাথ মিত্র (সি পি এম) ৭,০৯৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও জ্ঞানসিং সোহনপাল (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

খড়্গপুর (স্থানীয়) ॥ বিজয়ী অজিতকুমার বসু (কংগ্রেস) ২৬,৪৮১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ সিরাজ আলি (সি পি এম) ১৫,০৭৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও অজিতকুমার বসু (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নারায়ণগড় ॥ বিজয়ী ব্রজকিশোর মাইতি (কংগ্রেস) ৩৩,৩৯১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অজিতদাস মহাপাত্র (সি পি এম) ১১,০১৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও ব্রজকিশোর মাইতি (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

দাঁতন ॥ বিজয়ী প্রদ্যোৎকুমার মহান্তি (কংগ্রেস—সংগঠন) ২১,৫০৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ দ্বিবেদী (সি পি আই) ১৭,৩৭১ ভোট।

গত নির্বাচনে পুলিনবিহারী ত্রিপাঠী (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কেশিয়াড়ি ॥ বিজয়ী বুধনচন্দ্র টুডু (কংগ্রেস) ২২,৬৯৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যদুনাথ কিসকু (সি পি এম) ১৭,৪৪৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও বুধনচন্দ্র টুডু (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নয়াগ্রাম ॥ বিজয়ী দাশরথি সরেন (কংগ্রেস) ১৮,৯৩৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন্দ্রনাথ মুর্মু (এস পি) ১২,৫২৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও দাশরথি সরেন (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গোপীবল্লভপুর ॥ বিজয়ী হরিশচন্দ্র

মহাপাত্র (কংগ্রেস) ২৮,৩৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনোরঞ্জন মহাপাত্র (সি পি এম) ১৮,৩৩৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও হরিশচন্দ্র মহাপাত্র (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ঝাড়গ্রাম ॥ বিজয়ী বীরেন্দ্রবিজয় মল্লদেব (কংগ্রেস) ২৫,৯৫১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডহরেশ্বর সেন (সি পি এম) ১৪,৬২৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও বীরেন্দ্রবিজয় মল্লদেব (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বীণপুর ॥ বিজয়ী জয়রাম সরেন (সি পি আই) ২৪,৭০৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্যামচরণ মুর্মু (ঝাড়খণ্ড) ১৫,৪৯৬ ভোট।

গত নির্বাচনে শ্যামচরণ মুর্মু (ঝাড়খণ্ড) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পুরুলিয়া

বান্দোয়ান ॥ বিজয়ী শীতলচন্দ্র হেমব্রম (কংগ্রেস) ১৪,৬০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রমেশ মাঝি (সি পি এম) ৯,০৬১ ভোট।

গত নির্বাচনেও শীতলচন্দ্র হেমব্রম (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মানবাজার ॥ বিজয়ী সীতারাম মাহাতো (কংগ্রেস) ১৯,৯২০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নকুলচন্দ্র মাহাতো (সি পি এম) ১৮,৪৮৭ ভোট।

পুরুলিয়া : মোট আসন ১১।

১৯৭১ ॥ কংগ্রেস ৯, সি পি এম ১, এস ইউ সি ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ১১।

গত নির্বাচনেও সীতারাম মাহাতো (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বলরামপুর ॥ বিজয়ী রূপসিং মাঝি (কংগ্রেস) ১৬,৩৩০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রম টুডু (সি পি এম) ১৩,৮১৩ ভোট।

গত নির্বাচনে বিক্রম টুডু (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

আরষা ॥ বিজয়ী নিতাইচাঁদ দেশমুখ (কংগ্রেস) ১৩,৫৩২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দমনচন্দ্র কুইরি (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৩,৩১৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও নিতাইচাঁদ দেশমুখ (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ঝালদা ॥ বিজয়ী কিঙ্কর মাহাতো (কংগ্রেস) ১৮৮৩১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্তরঞ্জন মাহাতো (ফরোয়াড ব্লক) ১৭,৪২১ ভোট।
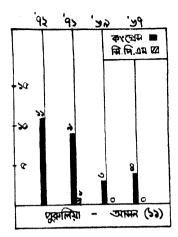
গত নির্বাচনেও কিঙ্কর মাহাতো (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জয়পুর ॥ বিজয়ী রামকৃষ্ণ মাহাতো (কংগ্রেস) ১৫,৬৫০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুরলী সাহা বাবু (ফরোয়ার্ড ব্লক) ৪,০৬০ ভোট।

গত নির্বাচনেও রামকৃষ্ণ মাহাতো (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পুরুলিয়া ॥ বিজয়ী সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২৩,০১৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহাদেব মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ১১,৯৭৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পাড়া ॥ বিজয়ী শরৎচন্দ্র দাস (কংগ্রেস) ১৩,২৪৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শৈলেন বাউড়ি (এস ইউ সি) ১০,৭২৩ ভোট।

গত নির্বাচনেও শরৎচন্দ্র দাস (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রঘুনাথপুর ॥ বিজয়ী দুর্গাদাস বাউড়ি (কংগ্রেস) ১৩,৮৪১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হরিপদ বাউড়ি (এস ইউ সি) ১৩,৪৮১ ভোট।

গত নির্বাচনে হরিপদ বাউড়ি (এস ইউ সি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কাশীপুর ॥ বিজয়ী মদনমোহন মাহাতো (কংগ্রেস) ১৪,২২০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাসুদেব আচার্য (সি পি এম) ৯,৯৪৯ ভোট।

গত নির্বাচনেও মদনমোহন মাহাতো (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হুড়া ॥ বিজয়ী শতদল মাহাতো (কংগ্রেস) ১৫১২৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দুলাল হেমব্রম (এস ইউ সি) ১১,৫৬০ ভোট।

গত নির্বাচনেও শতদল মাহাতো (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বাঁকুড়া

তালডাংরা ॥ বিজয়ী ফণিভূষণ সিংহবাবু (কংগ্রেস) ২৭,৬৪৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহিনীমোহন পাণ্ডা (সি পি এম) ২০,৬৬০ ভোট।

গত নির্বাচনে মোহিনীমোহন পাণ্ডা (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রায়পুর ॥ বিজয়ী মানিকলাল বেসরা (সি পি আই) ২৪,৯১৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাবুলাল সরেন (ঝাড়খণ্ড) ১২,১৪০ ভোট।

গত নির্বাচনে বাবুলাল সরেন (ঝাড়খণ্ড) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রানীবাঁধ ॥ বিজয়ী অমলা সরেন (কংগ্রেস) ১৯,০৮১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুচাঁদ সরেন (সি পি এম) ১৭,৬৭৮ ভোট।

গত নির্বাচনে সুচাঁদ সরেন (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ইন্দপুর ॥ বিজয়ী গৌরচন্দ্র লোহার (কংগ্রেস) ১৯,৫২৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরহরি মণ্ডল (বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস) ১৩,৪০৭ ভোট।

গত নির্বাচনে প্রয়াগ মণ্ডল (বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ছাতনা ॥ বিজয়ী কমলাকান্ত হেমব্রম (কংগ্রেস) ১৪,৮৯৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণকিরণ বরাট (এস ইউ সি) ১০,৫৪৭ ভোট।

বাঁকুড়া : মোট আসন ১৩

১৯৭১ ॥ সি পি এম ৮, কংগ্রেস ৩, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ১, ঝাড়খণ্ড ১।

১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ১২, সি পি আই ১।

গত নির্বাচনেও কমলাকান্ত হেমব্রম (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গঙ্গাজলঘাটি ॥ বিজয়ী শক্তিপদ মাঝি (কংগ্রেস) ২০,২৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কালীপদ বাউড়ি (সি পি এম) ১৫,০৫৬ ভোট।

গত নির্বাচনে কালীপদ বাউড়ি (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বড়জোড়া ॥ বিজয়ী সুধাংশুশেখর তেওয়ারি (কংগ্রেস) ২৭,১৯৬ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অশ্বিনীকুমার রাজ (সি পি এম) ২১,১৩০ ভোট।

গত নির্বাচনে অশ্বিনীকুমার রাজ (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বাঁকুড়া ॥ বিজয়ী কাশীনাথ মিশ্র (কংগ্রেস) ২৮,০৮২ ভোট। নিকটতম
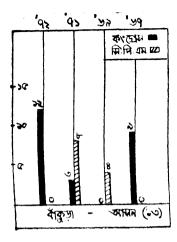
প্রতিদ্বন্দ্বী সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায় (সি পি এম) ১৬,৩১৫ ভোট।

গত নির্বাচনেও কাশীনাথ মিশ্র (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ওন্দা ॥ বিজয়ী শম্ভুনারায়ণ গোস্বামী (কংগ্রেস) ১৯,৬৭৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মানিক দত্ত (সি পি এম) ১৪,৩৬৩ ভোট।

গত নির্বাচনে মানিক দত্ত (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুর ॥ বিজয়ী ভবতারণ চক্রবর্তী (কংগ্রেস) ২০,৪৫৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী করুণাময় গোস্বামী (সি পি এম) ১২,৩৫৪ ভোট।

গত নির্বাচনেও ভবতারণ চক্রবর্তী (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কোতুলপুর ॥ বিজয়ী অক্ষয়কুমার কোলে (কংগ্রেস) ২৯,০৫৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জটাধারী মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ১১,৬৭৩ ভোট।

গত নির্বাচনে জটাধারী মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ইন্দাস ॥ বিজয়ী সনাতন সাঁতরা (কংগ্রেস) ২৪,১৫৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বদন বেরা (সি পি এম) ১৬,৩৮০ ভোট।

গত নির্বাচনে বদন বেরা (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সোনামুখী ॥ বিজয়ী গুরুপদ খাঁ (কংগ্রেস) ২৪,৪০৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুখেন্দু খাঁ (সি পি এম) ১৫,৩১৭ ভোট।

গত নির্বাচনে সুখেন্দু খাঁ (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বর্ধমান

হীরাপুর ॥ বিজয়ী তৃপ্তিময় আইচ (কংগ্রেস) ১৯,০৬৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামাপদ মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ১৮,০৬৮ ভোট।

গত নির্বাচনে বামাপদ মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কুলটি ॥ বিজয়ী রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ১৬,৬৮৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ৮,৫৪১ ভোট।

গত নির্বাচনেও রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বরাবনী ॥ বিজয়ী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২৯,২১৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুনীল বসু রায় (সি পি এম) ১১,৯৫০ ভোট।

গত নির্বাচনে সুনীল বসু রায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

আসানসোল ॥ বিজয়ী নিরঞ্জন ডিহিদার (সি পি আই) ২৪,০২১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয় পাল (সি পি এম) ১৫,৯৫০ ভোট।

> বর্ধমান : মোট আসন ২৫
>
> ১৯৭১ ॥ সি পি এম ২৩, কংগ্রেস ১, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ১।
>
> ১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ২১, সি পি আই ২, সি পি এম ২।

গত নির্বাচনে লোকেশ ঘোষ (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রানীগঞ্জ ॥ বিজয়ী হারাধন রায় (সি পি এম) ২১,৮৪০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] (কংগ্রেস) ১৩,৫৯৮ ভোট।

গত নির্বাচনেও হারাধন রায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জামুরিয়া ॥ বিজয়ী [illegible] মণ্ডল (কংগ্রেস) ১৪,৫০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গাদাস মণ্ডল (সি পি এম) ১০,৩৯১ ভোট।

গত নির্বাচনে দুর্গাদাস মণ্ডল (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

উখরা ॥ বিজয়ী গোপাল মণ্ডল (কংগ্রেস) ২১,৩২৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মণ বাগদী (সি পি এম) ১৩,৪৯০ ভোট।

গত নির্বাচনে (উপ) লক্ষ্মণ বাগদী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

দুর্গাপুর ॥ বিজয়ী আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৪৭,৩৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দিলীপকুমার মজুমদার

(সি পি এম) ৩৭,৩৫৮ ভোট।

গত নির্বাচনে দিলীপকুমার মজুমদার (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ফরিদপুর ॥ বিজয়ী অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২১,২৭৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (সি পি এম) ১৮,৮৩০ ভোট।

গত নির্বাচনে সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

আউশগ্রাম ॥ বিজয়ী শ্রীধর মল্লিক (সি পি এম) ২৪,০২১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বংশীধর সাহা (কংগ্রেস) ২৩,৬৯২ ভোট।

গত নির্বাচনেও শ্রীধর মল্লিক (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ভাতার ॥ বিজয়ী ভোলানাথ সেন (কংগ্রেস) ৩১,৮২২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অনাথবন্ধু ঘোষ (সি পি এম) ১১,৯৭৪ ভোট।

গত নির্বাচনে অনাথবন্ধু ঘোষ (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গলসী ॥ বিজয়ী অশ্বিনী রায় (সি পি আই) ২২,৪৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অনিল রায় (সি পি এম) ১৮,১৪৫ ভোট।

গত নির্বাচনে অনিল রায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বর্ধমান (উত্তর) ॥ বিজয়ী কাশীনাথ দা (কংগ্রেস) ৩৬,৮০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেবব্রত দত্ত (সি পি এম) ১৭,৫৯৫ ভোট।

গত নির্বাচনে দেবব্রত দত্ত (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বর্ধমান (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী প্রদীপ ভট্টাচার্য (কংগ্রেস) ৪৭,০৯২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী (সি পি এম) ১৮,৫৪৪ ভোট।

গত নির্বাচনে বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

খণ্ডঘোষ ॥ বিজয়ী মনোরঞ্জন প্রামাণিক (কংগ্রেস) ২৯,৪৬৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ণচন্দ্র মল্লিক (সি পি এম) ৯৭,৪৫১ ভোট।

গত নির্বাচনে পূর্ণচন্দ্র মল্লিক (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রায়না ॥ বিজয়ী সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ২৯,২৯৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোকুলানন্দ রায় (সি পি এম) ২২,৮৭১ ভোট।

গত নির্বাচনে গোকুলানন্দ রায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

জামালপুর ॥ বিজয়ী পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস) ৩০,৮২৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নরেন্দ্রনাথ সরকার (ফরোয়ার্ড ব্লক—মার্কসবাদী) ১৫,৯৩৫ ভোট।

গত নির্বাচনে কালীপদ দাস (ফরোয়ার্ড ব্লক—মার্কসবাদী) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মেমারি ॥ বিজয়ী নবকুমার চট্টোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৫৩,১১৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিনয়কৃষ্ণ কোঙার (সি পি এম) ১১,২২৯ ভোট।

গত নির্বাচনে বিনয়কৃষ্ণ কোঙার (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কালনা ॥ বিজয়ী নুরুল ইসলাম মোল্লা (কংগ্রেস) ৬২,৩৩৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দিলীপকুমার দুবে (সি পি এম) ৯২৯ ভোট।

গত নির্বাচনে হরেকৃষ্ণ কোঙার (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নাদনঘাট ॥ বিজয়ী পরেশচন্দ্র গোস্বামী (কংগ্রেস) ৬১,৬১৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সৈয়দ আবদুল মনসুর হবিবুল্লাহ (সি পি এম) ২,৬২১ ভোট।

গত নির্বাচনে সৈয়দ আবদুল মনসুর হবিবুল্লাহ (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মন্তেশ্বর ॥ বিজয়ী তুহিনকুমার সামন্ত (কংগ্রেস) ৫৩,৭৬৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাশীনাথ হাজরা চৌধুরী (সি পি এম) ৫,১৫৯ ভোট।

গত নির্বাচনে কাশীনাথ হাজরা চৌধুরী (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

পূর্বস্থলী ॥ বিজয়ী নুরুন্নেসা সাত্তার (কংগ্রেস) ৩২,৪৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোল্লা হুমায়ুন কবির (সি পি এম) ১৪,৭৪৬ ভোট।

গত নির্বাচনে মোল্লা হুমায়ুন কবির (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কাটোয়া ॥ বিজয়ী সুব্রত মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৩৩,০৬১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হরমোহন সিংহ (সি পি এম) ২১,৭০৩ ভোট।

গত নির্বাচনে হরমোহন সিংহ (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মঙ্গলকোট ॥ বিজয়ী জ্যোতির্ময় মজুমদার (কংগ্রেস) ২৫,৩৭৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিখিলানন্দ সর (সি পি এম) ১৮,১১৮ ভোট।

গত নির্বাচনে নিখিলানন্দ সর (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

কেতুগ্রাম ॥ বিজয়ী প্রভাকর মণ্ডল (কংগ্রেস) ৩০,০৪৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দীনবন্ধু মাঝি (সি পি এম) ১৭,৪৮৩ ভোট।

গত নির্বাচনে নিমাই মণ্ডল (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বীরভূম

নানুর ॥ বিজয়ী দুলাল সাহা (কংগ্রেস) ২৫,০১৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বনমালী দাস (সি পি এম) ১৭,৭৪৩ ভোট।

> বীরভূম ঃ মোট আসন ১২
>
> ১৯৭১ ॥ সি পি এম ৭, এস ইউ সি ২, সি পি আই ১, আর সি পি আই ১, নির্দল ১।
>
> ১৯৭২ ॥ কংগ্রেস ৮, সি পি আই ৩, নির্দল ১।

গত নির্বাচনে বনমালী দাস (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বোলপুর ॥ বিজয়ী হরশংকর ভট্টাচার্য

(সি পি আই) ১৭,৭৩২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ১৩,৯০৬ ভোট।

গত নির্বাচনে প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

লাভপুর ॥ বিজয়ী নির্মলকৃষ্ণ সিংহ (সি পি আই) ১৫,৩০৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুনীলকুমার মজুমদার (সি পি এম) ১৪,৯৭৬ ভোট।

গত নির্বাচনে সুনীলকুমার মজুমদার (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

দুবরাজপুর ॥ বিজয়ী শচীনন্দন সাউ (কংগ্রেস) ১৯,৯৭৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভক্তিভূষণ মণ্ডল (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৭,০৬৬ ভোট।

গত নির্বাচনে শেখ মজহরুল ইসলাম (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

[illegible] ॥ বিজয়ী [illegible] (কংগ্রেস) [illegible] ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] (ফরোয়ার্ড ব্লক) [illegible] ভোট।

গত নির্বাচনে [illegible] (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সিউড়ি ॥ বিজয়ী সুনীতি চট্টরাজ (কংগ্রেস) ২৬,৫৭৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় (এস ইউ সি) ২০,৮৯৪ ভোট।

গত নির্বাচনে প্রতিভা মুখোপাধ্যায় (এস ইউ সি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মহম্মদবাজার ॥ বিজয়ী নিতাইপদ ঘোষ (কংগ্রেস) ১৯,৫৫২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সি পি এম) ১৬,১৮০ ভোট।

গত নির্বাচনে [illegible] সেন (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

ময়ূরেশ্বর ॥ বিজয়ী [illegible] (সি পি আই) [illegible] ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] (সি পি এম) ১৩,১০৬ ভোট।

গত নির্বাচনেও [illegible] (সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

রামপুরহাট ॥ বিজয়ী আনন্দগোপাল রায় (কংগ্রেস) ২১,১৫২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) ১৭,০৬১ ভোট।

গত নির্বাচনে ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় (সি পি এম) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

হাসন ॥ বিজয়ী ধনপতি মাল (কংগ্রেস) ১৭,০৭৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রিলোচন মাল (আর সি পি আই) ১২,০৪২ ভোট।

গত নির্বাচনে ত্রিলোচন মাল (আর সি পি আই) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নলহাটি ॥ বিজয়ী গোলাম মহীউদ্দিন (নির্দল) ১২,১০২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সৈয়দ [illegible] (কংগ্রেস) ৯,৯০২ ভোট।

গত নির্বাচনেও গোলাম মহীউদ্দিন (নির্দল) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মুরারই ॥ বিজয়ী মোতাহার হোসেন (কংগ্রেস) ২৫,৮৮৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বজলে আহমেদ (এস ইউ সি) ১১,৬২৭ ভোট।

গত নির্বাচনে বজলে আহমেদ (এস ইউ সি) এই কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছিলেন।

*

পশ্চিমবঙ্গে গত চারটি নির্বাচনে প্রধান দলত্রয়

দল	১৯৬৭ প্রাপ্ত ভোট	১৯৬৭ শতকরা হার	১৯৬৯ প্রাপ্ত ভোট	১৯৬৯ শতকরা হার	১৯৭১ প্রাপ্ত ভোট	১৯৭১ শতকরা হার	১৯৭২ প্রাপ্ত ভোট	১৯৭২ শতকরা হার
কংগ্রেস	৫২,০৭,৯৩০	৪১.১৩	৫৫,৭৮,৬২২	৪১.৩২	৩৭,৩২,৫৮২	২৮.২০	৬৩,৪২,৬৯০	৪৭.৫২
সি পি এম	২২,৯৩,০২৬	১৮.১১	২৬,৭৬,৯৮১	১৯.৯৭	৪২,৩৩,৬৭০	৩১.৯৮	৩৬,২২,৫৭২	২৭.১৪
সি পি আই	৮,২৭,১৯৬	৬.৫৩	৯,৩৮,৪৭২	৭.০০	১০,৭৫,৯৩৬	৮.১৩	১০,৩০,২৮২	৭.৭২

*

১৯৭২ সালের রাজ্য বিধানসভাসমূহের নির্বাচনী ফলাফল

রাজ্য	মোট আসন	কংগ্রেস	কং (সং)	স্বতন্ত্র	সি পি আই	সি পি এম	জনসংঘ	এস পি	অন্যান্য দল	নির্দল	যোগফল
অন্ধ্র প্রদেশ	২৮৭	২১৯	×	২	৭	১	×	×	৫	৫৩	২৮৭
আসাম	১১৪	৯৫	×	১	৩	×	×	৪	৬	৫	১১৪
বিহার	৩১৮	১৬৭	৩০	২	৩৫	×	২৫	৩৩	১৩	১৩	৩১৮
গুজরাট	১৬৮	১৩৯	১৬	×	১	×	৩	×	×	৮	১৬৭*
হরিয়ানা	৮১	৫২	১২	×	×	×	২	×	৪	১১	৮১
হিমাচল প্রদেশ	৬৮	৫১	×	×	×	১	৫	×	১	৭	৬৫*
জম্মু ও কাশ্মীর	৭৫	৫৭	×	×	×	×	৩	×	৫	৯	৭৪*
মহারাষ্ট্র	২৭০	২২২	×	×	২	১	৫	৩	১২	২৫	২৭০
মধ্যপ্রদেশ	২৯৬	২২০	×	×	৩	×	৪৮	৭	×	১৮	২৯৬
মেঘালয়	৬০	৯	×	×	×	×	×	×	৩২	১৯	৬০
মহীশূর	২১৬	১৬৫	২৪	×	৩	×	×	৩	৬	১৫	২১৬
মণিপুর	৬০	১৭	১	×	৫	×	×	৩	১৮	১৬	৬০
পাঞ্জাব	১০৪	৬৬	×	×	১০	১	×	×	২৪	৩	১০৪
রাজস্থান	১৮৪	১৪৫	১	১১	৪	×	৮	৪	×	১১	১৮৪
ত্রিপুরা	৬০	৪১	×	×	১	১৬	×	×	×	২	৬০
পশ্চিমবঙ্গ	২৮০	২১৬	২	×	৩৫	১৪	×	×	৮	৫	২৮০
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল :											
দিল্লী	৫৬	৪৪	২	×	৩	×	৫	×	১	১	৫৬
গোয়া, দমন ও দিউ	৩০	১	×	×	×	×	×	×	২৮	১	৩০

* গুজরাটে ১টি কেন্দ্র, হিমাচল প্রদেশে ৩টি কেন্দ্র, এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ১টি কেন্দ্রে পরে নির্বাচন হবে।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট

ভারতের চলতি আর্থিক বছরে এমন অনেক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে যার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে। ১৯৭১-৭২ সালের আর্থিক বছর শুরু হয়েছে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আসতে শুরু করে; সব ব্যয় পৌঁছিয়ে যাবার পর ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর্থিক সাহায্য আসাও বন্ধ হল। সব কিছু মিলিয়ে চলতি আর্থিক বছরে ভারত সরকারকে একটি দুরূহ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি বাজেট তৈরী করা যে বাজেটে একদিকে প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন খাতে বেশী বরাদ্দ থাকা চাই এবং অপর দিকে বাংলাদেশের জন্যও আর্থিক সাহায্যের বরাদ্দ থাকা চাই, খুবই কঠিন কাজ। অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই ভি চবন ১৯৭২-৭৩ সালের যে বাজেট গত ১৬ই মার্চ লোকসভায় পেশ করেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে তার চেয়ে আরও গ্রহণযোগ্য বাজেট তৈরী করা খুবই কঠিন ছিল।

১৯৭১-৭২ সালের বাজেটে ২২০ কোটি টাকার নতুন কর ধার্য করা হয়েছিল; বাজেট ঘাটতির পরিমাণও ধরা হয়েছিল ২২০ কোটি টাকা। কিন্তু চলতি বছরে খরা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শরণার্থী পুনর্বাসন, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছে ৪৩৭ কোটি টাকা; এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য নতুন লেভি ধার্য করার পরেও বাজেট ঘাটতির পরিমাণ হয়েছে ৩৮৫ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে নতুন কর ধার্যের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৮৩ কোটি টাকা; এই টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকা দেওয়া হবে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলিকে। ১৯৭২-৭৩ সালে ৩৭৫ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি হবে বলে অনুমিত হয়েছে; এই ঘাটতির মধ্যে ১৮৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য করে পূরণ করা হবে এবং অবশিষ্ট ২৪২ কোটি টাকা পূরণ করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যেতে পারে এই ২৪২ কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ করা হবে নতুন মুদ্রা ছেপে। চলতি বছরে প্রতিরক্ষা খাতে ১৭০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১২৪১ কোটি টাকা; চূড়ান্ত পর্যায়ে তার পরিমাণ হয়েছে ১৪১১ কোটি টাকা। ১৯৭২-৭৩ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে ব্যক্তিগত আয়করের কোন পরিবর্তন হয়নি। আয়কর প্রদানকারিগণ আশঙ্কা করেছিলেন, হয়ত বেশী আয়ের ক্ষেত্রে করের হার এ বছর আরও বাড়বে; সর্বিপুল আর্থিক চাপের মধ্যে বাজেট তৈরী করা সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী যে আয়করে হাত দেননি, সেজন্য তিনি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। বিগত বহু বছর ধরে সব বাজেটেই আয়করের ক্ষেত্রে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কোম্পানী আয়ের ক্ষেত্রে গত বাজেটে যে অতিরিক্ত আড়াই শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল, তার পরিমাণ বর্তমান বাজেটে করা হয়েছে পাঁচ শতাংশ। শব্দগঠন প্রতিযোগিতা (crossword puzzles) এবং লটারি থেকে পাওয়া টাকার উপর ৩৪·৫ শতাংশ কর ধার্য করা হয়েছে। অলঙ্কার বদলের দরুন যে মুনাফা হবে, তার উপর মূলধন-মুনাফা কর (capital gains tax) প্রয়োগ করা হবে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত কর ধার্যের ফলে যে ১৮০ কোটি টাকা [illegible] আদায় হবে [illegible] তার অধিকাংশই আসবে পরোক্ষ কর থেকে। [illegible] উপর কর ধার্য করা হয়েছে; প্রতি সিগারেটে কর [illegible] পয়সা বেড়েছে। ইস্পাতজাত জিনিসের উপর আবগারী শুল্ক ৩০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে; অ্যালুমিনিয়ামের জিনিসের উপর শুল্ক এক-তৃতীয়াংশ বাড়ানো হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই এই জিনিসগুলির উপর ধার্য করা আগেকার মূল শুল্কে নতুন হারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্র থেকে যে আয় সৃষ্ট হয় তার উপর কর ধার্য করা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতার বাইরে। একমাত্র রাজ্য সরকারই কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য করতে পারেন। অথচ কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্ট আয় থেকে যতটা রাজস্ব পাওয়া উচিত ভারত সরকার ততটা পাচ্ছেন না এবং গ্রামীণ সঞ্চয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদনাত্মক প্রকল্পে বিনিয়োগ করারও সুযোগ কেন্দ্রীয় সরকার পাচ্ছেন না। ১৯৭১-৭২ সালের সরকারী অর্থনৈতিক সমীক্ষায়ও একথা স্বীকৃত হয়েছে। তবে অর্থমন্ত্রী শ্রীচবন ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত শক্তিচালিত পাম্পসেট এবং সারের উপর যথাক্রমে দশ শতাংশ এবং ১৫ শতাংশ (পূর্বতন ১০ শতাংশের পরিবর্তে) কর ধার্যের প্রস্তাব করেছেন। এই কর ধার্যের পক্ষে যুক্তি হল, তার মাধ্যমে গ্রামীণ সঞ্চয়ের কিছু অংশ সরকারের পক্ষে

আদায় করা সম্ভব হবে। কৃত্রিম রেশম, শীতল পানীয়, মৌজিও এবং তন্তুর উপরেও কর ধার্য করা হয়েছে; তেমনি কর ধার্য করা হয়েছে বার্নিশ, রং, দামী কাগজ ও বোর্ডের উপর। এগুলির ক্ষেত্রে মূল শুল্কের সঙ্গে অতিরিক্ত বিশেষ শুল্ক একত্র করে দেওয়া হয়েছে। তামাক, সিমেণ্ট, মোটর-গাড়ির টায়ার, পেট্রোলিয়ম, ল্যাটেক্স ফোম, স্পঞ্জ, ফোমের তৈরী জিনিস প্রভৃতির ক্ষেত্রেও মূল শুল্ক (basic duty) এবং বিশেষ শুল্ক (special duty) একত্র করা হয়েছে; এই সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত ১০·৭০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। যে জিনিসগুলির মূল শুল্ক ছিল ১৫ শতাংশ এবং বিশেষ শুল্ক ছিল ৩ শতাংশ—সেগুলিকে এখন ২০ শতাংশ শুল্কের আওতায় আনা হয়েছে। আবগারী শুল্ক থেকে আগামী আর্থিক বছরে ১৪৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে অনুমিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের উপর এই অতিরিক্ত করের বোঝা নিশ্চয়ই অনুভূত হবে; কারণ পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় সুসম্বদ্ধ সংস্কারের (rationalization) ফলে গরীবদের উপর নতুন বোঝার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে সবচেয়ে ভাল দিক হল, পরিকল্পনা খাতে বিনিয়োগ-বরাদ্দের বৃদ্ধি। আগামী আর্থিক বছরে পরিকল্পনা খাতে ৩৯৭৩ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে; চলতি বছরের পরিকল্পনা-বরাদ্দের চেয়ে তার পরিমাণ ৭১০ কোটি টাকা বেশি। রাজ্যগুলিকে আগামী আর্থিক বছরে ৭৮৯ কোটি টাকা পরিকল্পনা খাতে সাহায্য দেওয়া হবে। রাজ্যগুলির আর্থিক দুরবস্থার কথা, বিশেষ করে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে রাজ্য সরকারগুলির ওভারড্রাফট নেওয়ার কথাও অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। সমাজ কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক এ-জাতীয় বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ ১৯৭১-৭২ সালের বাজেটে ছিল ১৩০ কোটি টাকা; ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে এই বরাদ্দের পরিমাণ হয়েছে ২৪০ কোটি টাকা। গ্রামাঞ্চলে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য জরুরী কর্মসূচী বাবদ ৭২ কোটি টাকা রাখা হয়েছে; খরা অঞ্চলে সাহায্য এবং পশু-খামার প্রভৃতির উন্নয়নেও এই বরাদ্দ থেকে খরচ করা হবে; তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণ সমাজ কল্যাণ এবং শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য থোক টাকা হিসাবে ১০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিশুদের খাদ্যে আরও পুষ্টিকর উপাদান প্রয়োগ এবং এ-বিষয়ে খয়রাতি দেওয়ার জন্যও ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বর্তমান বাজেটে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য কোন বিস্তৃত কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়নি। তবে অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন এই বছরের শেষভাগে দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের একটি বিস্তৃত কর্মসূচী ঘোষিত হবে।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে বাংলাদেশকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; চলতি বছরেই ৮২ কোটি টাকা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১৯৭৩ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়ে যাবে। ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেও যেভাবে বর্তমান বাজেটটি তৈরি হয়েছে তা খুব নিন্দনীয় নয়। অনেকে হয়ত বাজেটটিকে গতানুগতিক বলবেন; আবার অনেকে হয়ত বলবেন, গরিবী হটাবার ব্যবস্থা বাজেটে নেই। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে, পরিকল্পনার জন্য যে অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে তার যদি সদ্ব্যবহার হয় এবং সমাজ কল্যাণ কর্মসূচী যদি বাজেট-বরাদ্দ অনুযায়ী ঠিকভাবে রূপায়িত হয়, তবে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে ভারত এখন দৃঢ় পদক্ষেপে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারবে, এটাই আমরা আশা করব। ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট একক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য।

সুব্রত গুপ্ত

রোগা চেহারা, পায়জামা ও পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ। চুল উস্কখুস্ক না হতেও পারে, তবে গালে দু'তিন দিনের দাড়ি, বয়েস বাইশ কি তেইশ। চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল। ইনি একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদক কিংবা সহ-সম্পাদক। এঁর পত্রিকার দুটি সংখ্যা বেরিয়েছে, তৃতীয় সংখ্যার উদ্যোগ চলছে—তবে চতুর্থ সংখ্যাটি কবে বেরবে কিংবা আদৌ বেরবে কিনা সে সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

ইনি কলেজে কিংবা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, বেশী গরীব হওয়ারই সম্ভাবনা। খুব সম্ভবত ইনি টিউশানি করে হাত খরচ সংগ্রহ করেন। এঁর কোনো বন্ধুর বোন কিংবা সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেম থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু তাও অনেক শংকা-দ্বিধা জড়িত, সাধারণভাবে মেয়েরা এঁকে খুব একটা পাত্তা দেন না। মেয়েদের কাছ থেকে দুঃখ পাওয়াই এঁর নিয়তি। কারণ, ইনি কবিতা লেখেন।

এই রকম বেশ কয়েকশো যুবককে দেখা যাবে পশ্চিম বাংলায় এবং বাংলাদেশে। পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে পদ্মা ও গঙ্গার উভয় পারে অন্তত শ'পাঁচেক লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেরবে, তার তোড়জোড় চলছে।

এই যুবকটির প্রধান পরিচয় ইনি বাংলাভাষাকে ভালোবাসেন। তার বিনিময়ে ইনি আমাদের সমাজ থেকে পান ঔদাসীন্য। তাতে এঁর কিছু যায় আসে না। বাংলা-ভাষাকে ভালোবাসেন বলেই ইনি অন্যান্য অনেক পার্থিব সুখের সন্ধানে ছোটাছুটি না করে শব্দের পবিত্রতার স্বাদ পেতে চাইছেন। বহু কষ্টে জোগাড় করা অর্থে প্রকাশ করছেন একটি কৃশকায় পত্রিকা। এঁর বিলাসিতার মধ্যে চা ও সিগারেট-এর প্রতি একটু বেশী আসক্তি। এবং বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তর্ক করা। বয়স্ক ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের গালমন্দ করাও একটি নির্দোষ বিলাসিতা বলা যায়। ইনি একজন স্বপ্নে পাওয়া মানুষ। যৌবনধর্ম অনুযায়ীও রাজনীতি বা গুণ্ডাবাজির দিকে এঁর ঝোঁক নেই—ইনি স্বপ্নের মধ্যে এই পৃথিবীটা বদলে দিতে চান যে-পৃথিবী শুধু মেষপালক ও কবিতে সমৃদ্ধ।

অভিভাবকরা বুঝতে পারেন না এঁকে। এঁর কথাবার্তা, হাবভাব, জীবনযাত্রা প্রণালী—কেজো, সংসারী মানুষের কাছে অচেনা। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, কবিতা লিখে কি হয়? এ কথার কোনো উত্তর দেন না। এ কথার একটাই উত্তর হতে পারে, কবিতা লিখলে অন্য কারুর কোনো ক্ষতি হয় না।

এঁর কবিতা কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। হঠাৎ উৎসাহী অন্য কেউ দু'চার লাইন পড়ে বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাস করেন, এর মানে কি? এসব লিখে কি লাভ হয়?

ইনি সহজে এ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে চাইবেন না। ইনি অন্য সব ব্যাপারে বেশ লাজুক বা খানিকটা মিনমিনে স্বভাবের হলেও কবিতার সীমানায় অত্যন্ত অহংকারী। এঁর অহংকার এঁর কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে চাইবে না কক্ষণো। আর লাভ? প্রশ্নকারী একটু দূরে চলে গেলে ইনি দাঁতে দাঁত চেপে বলবেন, শালা! লাভ খুঁজছিস তো পেঁয়াজের চাষ কর না গিয়ে।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় এঁর মুখে কিছু খিস্তি খেউড় শুনলে অবাক হবার কিছু নেই। রকবাজ বেকারদের খিস্তির সঙ্গে এঁর অনেকখানি তফাৎ আছে।

অধিকাংশ সাহিত্যিকই শিল্পির ছবি গোপনে ভালোবাসে—একটি বিশেষ কারণে। একথা ভোলা উচিত নয়, শিল্পিত খেউড়গুলো শব্দ হিসেবে খুব বিশুদ্ধ, কেননা—এগুলো ছাপার অক্ষরে ব্যবহৃত হয়নি এবং এই শব্দগুলি নতুন তৈরী হওয়া বলে নতুন তৈরী মুদ্রার মতন একটা আকর্ষণ আছে শব্দ ব্যবহারকারীর কাছে।

যে-পত্রিকাটির ইনি সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক, সেই পত্রিকাটিকে ইনি প্রেমিকার চেয়েও বেশী ভালোবাসেন। একটা ছাপার ভুল বেরুলেই এঁর কষ্ট হয়। দুপুর রোদ্দুরে পাঁচবার প্রেস ও কাগজের দোকানে ঘোরাঘুরি করতে একটুও কষ্ট হয় না। এঁর ধারণা, এ পত্রিকাটিই বাংলা সাহিত্যের চরিত্র বদলে দেবে।

এই রকম একটি যুবককে দেখে হঠাৎ আমার মনে হলো, এ যেন আমারই প্রথম যৌবনের প্রতিচ্ছবি। হুবহু আমার সেই বয়সের চেহারা, সেই রকম মুখের ভাব। আমিও ঐ বয়েসে একটি ছোট পত্রিকা প্রকাশ করতুম—রাতের পর রাত সেই ক্ষুদ্র পত্রিকাকে মহীরুহে পরিণত করার স্বপ্ন লালন করেছি। টিউশানির টাকা পেলেই ছুটে যেতাম প্রেসের ধার শোধ করতে।

আমি যুবকটির দিকে দু'এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকেই লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম, কাজের কথা সেরে নিলাম দু'এক মিনিটে। আমি একে আমার সহোদর বলে আলিঙ্গন করতে পারি না, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সময়। যেমন পারে না ছায়াকে আলিঙ্গন করতে। আমি একে বলতে পারি না, আমি তোমার সব কথা জানি, এ বিশ্বাস করবে না। বস্তুত, আমাদের দুজনের কথাগুলোর বিষয়বস্তুই খুব কম। এ আমার সম্পর্কে খোলাখুলি কথা বলতে লজ্জা পাবে। এবং ও যেটা ভাববে আমার বাক্যভঙ্গি বা রূঢ়তা—আসলে সেটাও এক ধরনের লজ্জাবোধ।

ছেলেটি চলে যাবার পর আমার মনে হয়, আমি ব্যর্থ হয়েছি, আমার অনেক স্বপ্ন মেলেনি, আমি জীবনে অনেক কিছুই পারিনি। ঐ ছেলেটি কি পারবে? পারুক না। ও সার্থক হবে—এরকম একটা আশা পোষণ করতেও ভালো লাগে।

সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

লালবিহারী দে

এককালের বিখ্যাত ব্যক্তি ও লেখক রেভাঃ লালবিহারী দের নাম আজকাল আর শোনা যায় না। তাঁর বিখ্যাত বইগুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, কোন বইয়ের পুনর্মুদ্রণের চেষ্টাও দেখি না।

রেভাঃ লালবিহারী দে প্রথম বাঙালী লেখক যিনি ইংরাজীতে তাঁর বিখ্যাত নভেল, 'Govinda Samanta' (১৮৭৪) লিখেছিলেন, ১৮৭৮ সালে নতুন সংস্করণে বইটির 'Govinda Samanta' নামের বদলে 'Bengal Peasant Life' নামাকরণ করা হয়। ১৮৭৯, ১৮৮০, ১৮৮৪, ১৮৮৮, ১৮৯২, ১৮৯৮, ১৯০২, ১৯০৬, ফেব্রুয়ারী ও এপ্রিল ১৯০৮, জানুয়ারী ১৯০৯ (৩ বার) এবং ১৯১৩ সালে বইটির পুনর্মুদ্রণ হয়। বইটি শ্রেষ্ঠতার বিচারে ৫০ পাউন্ড পুরস্কার পায়। বইটি তৎকালীন সমাজের শ্রেষ্ঠ পাঁচালী, তৎকালীন সমাজের বহু নিখুঁত চিত্র এই বইটিতে পাওয়া যায়। ৩৭৬ পৃষ্ঠার বইটি ৬১ পরিচ্ছেদ-এ বিভক্ত। ১৮৭৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বছরে কাহিনীর সমাপ্তি। বইটির প্রকাশক, ম্যাক-মিলান অ্যান্ড কোং।

এই লেখকের আর একটি বিখ্যাত ইংরেজী বই, 'Folk-Tales of Bengal' এই বইটি প্রথম প্রকাশ করা হয় ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ সালে, ইংরাজীতে 'নটে গাছটি মুড়োল' ছড়াটিও এতে আছে।

এই বইগুলির পুনর্মুদ্রণ কি সম্ভব নয়?

—ডাঃ সুশীল সামন্ত
পাটনা—৬

প্রবন্ধ

নিঃশব্দের তর্জনী। শঙ্খ ঘোষ। অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ, কলকাতা-১২। চার টাকা।

'একটি লেখা কেন কবিতা হয়ে ওঠে, আরেকটি কেন হয় না, এই প্রশ্নের উত্তর বলা সহজ নয়'—বলেছেন শঙ্খ ঘোষ, এই গ্রন্থের ভূমিকায়। কিন্তু এর থেকেও কঠিন বোধ হয়, একটি হয়ে-ওঠা কবিতা কেন কবিতা, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। কঠিন বলেই, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিষয় ও রূপ-বদল সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই অনেক পাঠকের এবং এমন কি কবির মনেও। নেই, তাই প্রবীণরা অসহিষ্ণু অভিযোগ তোলেন যুবকদের বিরুদ্ধে খামখেয়ালীপনার জন্যে; সদ্য তরুণরা তর্জনী তুলে ধরেন অব্যবহিত পূর্ববর্তীদের দিকে। এমনতর ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল এক সৎ সমালোচকের যিনি এই দুরতিক্রম্য বাধায় ঘটাবেন সেতুবন্ধন। ভুল বোঝাবুঝিকে কমিয়ে দেবেন কবিতার প্রকৃত প্রবাহটিকে অনুধাবন করে। শঙ্খ ঘোষকে ধন্যবাদ, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তিনি বহু জরুরী প্রশ্নের মীমাংসা করতে পেরেছেন।

পেরেছেন, তার কারণ শঙ্খ ঘোষ নিজে এই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সং পাঠকের অগোচর নয়। কী অভিধায় চিহ্নিত হবে তাঁর এই আশ্চর্য গদ্যগ্রন্থটি? তিনি নিজে যা বলেছেন তা হল—'নতুন দিনের বাঙলা কবিতায় রূপ বা ব্যক্তিত্বের সমস্যা কীভাবে আসে, কখনো কখনো তা ভাবতে হয়েছে আমাদের। সেই সব ছোটো ছোটো বিক্ষিপ্ত সাময়িক ভাবনা এখানে-ওখানে ছাপা হয়েছিল এই দশ বছর জুড়ে, তার থেকে কয়েকটি লেখা সংকলিত করে তৈরি হলো এই বই।' কিন্তু এ পরিচয় আংশিক, 'বিক্ষিপ্ত সাময়িক ভাবনা' শুধু বাইরে থেকে আসে নি, অন্তর্গত সত্তার একজন সদস্য বলেই, কবিতা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা শিল্পীর নিজস্ব সমস্যা ও তার মুক্তির দিক-নির্দেশ হয়েও উঠেছে। এখানেই তাঁর সার্থকতা।

সাম্প্রতিক কবিতার অবয়ব, তিনি লক্ষ করেছেন, হয়ে উঠেছে 'কলরোলময়, বার্তাবিহীন, অভ্যাসতাড়িত।' 'অল্পে-অল্পে তার পরিবহণ গেছে নষ্ট হয়ে।' কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি কবি হিসেবেই তার মুক্তি খোঁজেন : 'নিঃশব্দ মানে শব্দ থেকে পালানো নয়, শব্দকে ঈথারমণ্ডিত করে তোলা মাত্র, অভ্যস্ত শব্দ সম্পর্কের আলস্য ভেঙে দিয়ে তার মধ্যে সত্যের প্রবাহ নিয়ে আসা। কবিরই সেই কাজ।' কবিতায় শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে তাই তিনি সহজে প্রমাণ করতে পারেন, নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায়।' 'ছন্দহীন সাম্প্রতিক' প্রবন্ধে তিনিই পারেন তরুণ কবিদের ছন্দ-ব্যবহারের যথার্থ ঝোঁকটিকে সংবেদনশীল বিশ্লেষণের সাহায্যে সপ্রমাণ হাজির করতে। কবিতা-পাঠ ও আবৃত্তির মধ্যেকার সত্যিকারের পথটিকেও নির্দেশ করেন তিনি। কবিতার 'তুমি' সর্বনামকে নতুন ভাবে সনাক্ত করাও তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। কবি ও তাঁর পাঠকের দায়িত্ব সম্পর্কেও তাঁর ভাবনা নতুন পথে ধাবিত। এই কারণেই, সাম্প্রতিক কবিতায় যাঁরা পাঠক এবং কবি উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে অপরিহার্য শঙ্খ ঘোষের এই নিবন্ধগ্রন্থটি।

গ্রন্থটির আরেকটি পর্বে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার (প্রথম দিনের সূর্য ও নব জাতকের 'প্রশ্ন') বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। এই আলোচনা দুটি পড়ে মান্য সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রতিবাদ করেছিলেন' সেই বিচার ও উত্তর-প্রত্যুত্তর পুরোপুরি ছাপা হয়েছে এই গ্রন্থে। ফলে এই অংশটি অন্যদিক থেকেও সজীব এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বলা নিষ্প্রয়োজন।

অনুবাদ

আষাঢ়ে বই। ছবি ও ছড়া : এডওয়ার্ড লিয়র। অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক : সিগনেট বুকসপ, **কলকাতা-১২।** ৩·৫০ টাকা।

পাঁচ চরণের পদাবলী 'লিমেরিক' শব্দটির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় ইতিপূর্বেই আমাদের ঘটেছে। কিন্তু অনেকেই ঠিক হয়তো জানি না, লিমেরিকের এই আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যাঁর নাম জড়িত, তিনি এডওয়ার্ড লিয়র। বলা ভাল, লিয়র কিন্তু লিমেরিকের জনক নন। তবু তাঁর ছড়ার বই বেরুবার পরই এই পঞ্চপদাবলীর অকল্পনীয় দ্রুত প্রসার ও বিকাশ ঘটেছে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সাড়া জাগানো ছড়ার বইটিরই বাংলা রূপান্তর করেছেন।

গদ্য অনুবাদে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি সুবিদিত। দেখা গেল, কবিতার তরজমাতেও তাঁর দখল অসামান্য। দুর্ধর্ষ ছন্দের ব্যবহার, চমক লাগানো মিলের পর মিল জুগিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি। তেমনি জবরদস্ত এই বইয়ের প্রকাশনা। পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্চর্য পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে প্রকাশকের দিক থেকে কোনো কার্পণ্যই ঘটেনি। ফলে শুধু ছোটরা নয়, বড়োরাও ব্যক্তিগত সংগ্রহে এ-বই এক কপি যোগাড় করে রাখবেন এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সংকলন

মানিক বিচিত্রা। বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত সাহিত্যম্, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছ টাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইতস্তত পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে বহু আলোচনা, স্মৃতি-কথা, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিস্মৃতপ্রায় রচনা ও কিছু নতুন লেখার সংকলন মানিক-বিচিত্রা। টুকরো আলোচনা হলেও এই রচনাগুলির সাহিত্যমূল্য কোনো অংশে কম নয়। বরং নানান দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত বলেই স্বল্প পরিসরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ উপভোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সজনীকান্ত দাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিমল কর, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল হালদার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিকথা কবিতার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

ব্যাডমিণ্টন খেলায় হঠাৎ চমক

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন আসরে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেল? না, ঘটনাচক্রে এবং অধ্যবসায়ের ফলে?

বি ই কলেজ থেকে সিভিল এঞ্জিনিয়ারের ডিগ্রি নেবার মুখে ও নাম দিল সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপে। জীবনের প্রথম ওপেন টুর্নামেণ্ট। সিঙ্গলস-এর চেয়ে ডাবলস-এর খেলোয়াড় হিসাবে বেশী দক্ষ অখিল খেলছিল নীহার চৌধুরীকে পার্টনার নিয়ে। বেশ ভাল খেলতে খেলতে অভিজ্ঞতার অভাবে হেরে গেল। বাংলার প্রাক্তন খেলোয়াড় হরিপদ গুহ এতক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে ওর খেলা দেখছিলেন। পরাজয়ের পর ওকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি হারলে কেন? তোমার তো

অখিল ব্যানার্জী

স্কুল কলেজে অনেকেই অনেক রকমের খেলাধুলো করে। হয়তো কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপও পায়। কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিযোগিতায় খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু সেখান থেকে রাজ্যের নামকরা অনেক খেলোয়াড়কে টপকে একলাফে জাতীয় আসরে গিয়ে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ মেলে ক'জনের? এবার কিন্তু মিলেছে একজনের। মফঃস্বলের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় অখিল ব্যানার্জীর।

ব্যাডমিণ্টন মহলের নিশ্চয়ই পরিচিত নাম নয়। কিন্তু পরিচয়ের পথ প্রশস্ত করার ব্যাপারে ওর প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়।

আগেই বলেছি মফঃস্বলের ছেলে। বাড়ি শ্যামনগরে। বাড়িতে খেলাধুলোর চর্চা ছিল না। কোনদিন রাজ্যের জুনিয়র বা সিনিয়র ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় খেলেনি। ১৯৬৪ সালে ইছাপুর নর্থল্যাণ্ড স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার আগে ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেটও বড় একটা হাতে ওঠেনি। ওই বছর শিবপুরে বি ই কলেজে ভরতি হবার পর খেলা শুরু করে। বলা যেতে পারে বেশ একটু বেশী বয়সেই ব্যাডমিণ্টনের চর্চা আরম্ভ হয়।

বাংলার প্রাক্তন খেলোয়াড় বিশু ব্যানার্জী ছিলেন বি ই কলেজের ব্যাডমিণ্টন কোচ। তাঁর কাছেই প্রথম তালিম এবং ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত আন্তঃ কলেজ ব্যাডমিণ্টনে অখিলের চ্যাম্পিয়নশিপ। বি ই কলেজের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ চার বছর। ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১-এর ইউনিভার্সিটি ব্লু।

কলেজ জীবনের এই সব সাফল্য অখিলের কাছে 'এমন কিছু নয়'। ও বলে তখন কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ভাল খেলোয়াড় ছিল না। প্রথমে বিশু ব্যানার্জী এবং পরে প্রণব বসুর কাছ থেকে কিছু শিখেছিলাম বলেই কোনভাবে জিতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ওই সময়ে ব্যাডমিণ্টন খেলায় আমাকে ভীষণভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন আমাদের কলেজের দু'জন অধ্যাপক ডঃ পি পি দাস এবং যাদবলাল চক্রবর্তী। তাঁদের উৎসাহে খুবই রেওয়াজ করতাম। তবু দেখুন ১৯৬৭-৭০-এ গোরক্ষপুরে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিণ্টনের সেমি-ফাইনালে আমরা হেরে গেছি গোহাটির কাছে, পরের বছর শিলিগুড়িতে ফাইনালে হেরেছি রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। অথচ গোহাটি ও রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন নামকরা খেলোয়াড় ছিল না।

অখিলের এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত ব্যাডমিণ্টনে ওর দক্ষতা ছিল নিতান্ত মাঝারিয়ানার মধ্যে বাঁধা। সেখান থেকে ও রাজ্যের প্রথম সারিতে উঠে এল কিভাবে? কিভাবেই বা মাদ্রাজের

হারার কথা নয়।' তারপর হরিপদ গুহ কণ্ঠে অনেকখানি দরদ মিশিয়ে বললেন, 'তুমি কি মডার্ন স্কুলের কোর্টে প্র্যাক্টিস করতে আসতে পারবে?' অখিল তখনই প্রায় রাজি। আরম্ভ হল প্র্যাক্টিস। রোজ শ্যামনগর থেকে আসে মডার্ন স্কুলে প্র্যাক্টিস করতে। হরিপদ ভুলত্রুটি শুধরে দেন। গত বছর মার্চ মাসে ওয়াই এম সি এ হলে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় অখিল ব্যানার্জী নামে এক নতুন প্রতিযোগীকে দেখা গেল। অনেককে অবাক করে দিয়ে অখিল সিঙ্গলস-এর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে নামী খেলোয়াড় পশুপতি দাসের কাছে হেরে গেল। ডাবলসের পার্টনার ছিল অমিতাভ ঘোষ। ফাইনালে উঠে হেরে গেল বাংলার এক নম্বর পেয়ার অনিল সোন্ধী ও প্রেম পটনের কাছে। স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম খেলতে নেমে কেউ এমন চমক সৃষ্টি করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

ওই হঠাৎ চমকের ফলেই জাতীয় প্রতিযোগিতার সিলেকশন ট্রায়ালে অখিলের ডাক পড়ল। ওই ট্রায়ালে অরুণ ব্যানার্জী ও রঞ্জিত ব্যানার্জীকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে অখিল জাতীয় প্রতিযোগিতার ডাবলসের জন্য নির্বাচিত হল। অখিলের পার্টনার ছিল ওই অমিতাভ। কিন্তু নতুন পার্টনার মদন চক্রবর্তীর সঙ্গে খেলে ডিব্রুগড়ে জোনাল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল। তার পর মাদ্রাজে জাতীয় প্রতিযোগিতার খেলা। ওখানে সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউণ্ডে অখিল হেরেছে তিন নম্বর বাছাই এবং বর্তমানে এক নম্বর খেলোয়াড় রমেন ঘোষের কাছে। ডাবলসে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে দুই নম্বর বাছাই জুড়ি রমেন ঘোষ ও সতীশ ভাটিয়ার কাছে। জাতীয় এবং রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে অখিল এখন পর্যন্ত কোন পুরস্কার না পেলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা ডাবলসের খেলোয়াড় হিসাবে ওর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অনুশীলনে ফাঁকি নেই, কোর্টে নিয়মিত অনুশীলন করা ছাড়াও ছবি দেখে শ্যাডো প্র্যাক্টিস করে যাতে স্ট্যামিনা বাড়ে, স্পিড বাড়ে এবং কব্জির পেলবতা আসে।

অখিল মাথায় উঁচু ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। স্ম্যাশিংয়ে ওর বাড়তি সুবিধা পাবার কথা। কিন্তু স্ম্যাশিংয়ে এখনো পুরোপুরি পোক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। সাধারণত প্লেসিং-এর উপরই ওর বেশী ভরসা। আর সহ খেলোয়াড়ের সঙ্গে চমৎকার যোগাযোগ ডাবলসে যেটা অপরিহার্য। তরুণ এঞ্জিনিয়ারের খেলার মধ্যে বুদ্ধিরও ছাপ আছে।

আগেই বলেছি, বাড়িতে খেলাধুলোর চর্চা ছিল না। সঙ্গীত ও সুরের বাড়ি হিসাবে ওদের শ্যামনগরের বাড়ির কিছু খ্যাতি আছে। মা শ্রীযুক্তা বেলা ব্যানার্জী

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বেতার শিল্পী। ছোট ভাই শ্রীকুমার সরোদ শেখে আলি আকবর খাঁ সাহেবের কাছে। বড় ভাই অসীম ব্যানার্জী পিয়ানোর সুরের মধ্যে অনেক সময় ডুবে থাকেন। তবলা শেখার জন্য অখিলও নাড়া বেঁধেছে রাধাকান্ত নন্দীর কাছে। যে হাতে তবলা বাজায় সেই হাতেই ব্যাডমিণ্টন। তবলার তাল-লয় ও আনতে চায় ব্যাডমিণ্টনের মধ্যে। মাসতুতো বোন মন্দিরা ব্যানার্জী বিলেতে বেড়াতে গিয়েছিলেন কয়েক মাসের জন্য। ব্যাডমিণ্টনে অখিলের আগ্রহ দেখে ওখান থেকে ওর জন্য নিয়ে এসেছেন একখানি 'কার্লটন' র‍্যাকেট, যা এখানে পাওয়া যায় না। ওই র‍্যাকেট পাবার পর ওর আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে। বেকার এঞ্জিনিয়ার এখন ব্যাডমিণ্টনের মধ্যেই ডুবে আছে।

মুকুল

সাধারণ নির্বাচন এবং খেলাধুলা

যদিও পশ্চিমবাংলার সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে খেলাধুলার বিশেষ সম্পর্ক নেই তবু রাজ্যের সার্বিক উন্নতির কর্মোদ্যোগ থেকে খেলাধুলোকে বাদ দেওয়া যায় না।

অস্বীকার করবার উপায় নেই বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ অস্পষ্ট, পরিবেশ অসুস্থ। খেলাধুলোর সুযোগ সুবিধার অভাবে, মাঠ ময়দানের অভাবে বহু যুবক বিপথে পরিচালিত। ছাত্রজীবনে উচ্ছৃংখলতা এবং সমাজজীবনে অশান্তি সৃষ্টির অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ছাত্র ও যুবকদের খোলামাঠে খেলাধুলো করার পথ রুদ্ধ হওয়া উচ্ছৃংখলতা ও অশান্তির অন্যতম কারণ কিনা সেটা ভেবে দেখার সময়

এসেছে। আশা করব রাজ্যের নতুন সরকার এ বিষয়ে চিন্তা করবেন।

জননেতাদের মধ্যে অনেকেই খেলাধুলোর আগ্রহী, ক্রীড়ামোদিও। অনেকেই সংঘ-সমিতি এবং ক্লাবের সঙ্গে জড়িত। সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কেউ কেউ হেরে গেছেন, কেউ কেউ বিজয়ী হয়েছেন। পরাজিতের দলে আছেন প্রাক্তন ক্রীড়া-উপমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জী, যতীন চক্রবর্তী এবং হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী। বিজয়ী হয়েছেন প্রফুল্লকান্তি ঘোষ এবং ভবানীশংকর মুখার্জী। দুজনই প্রাক্তন ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় এবং খেলাধুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রফুল্লকান্তি ঘোষ অর্থাৎ ক্রীড়া মহলের 'খতেদা' ব্যাডমিণ্টন প্রশাসনে এবং এরিয়ান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিজ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। রাজ্য ব্যাডমিণ্টন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বাপির ভবানীশংকর মুখার্জীর অবদানও সর্বজনস্বীকৃত। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ আনোয়ার আলীও বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। আর নতুন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় তো অতীতের কৃতী ক্রিকেট ও ফুটবল খেলোয়াড়।

নতুন মন্ত্রী পরিষদে সিদ্ধার্থবাবু খেলাধুলোর জন্য পৃথক কোন দফতর সৃষ্টি করেননি। পৌর প্রশাসন এবং পঞ্চায়েৎ দফতরের সঙ্গে খেলাধুলো জুড়ে দিয়েছেন। ভার দিয়েছেন প্রফুল্লকান্তি ঘোষের উপর।

অবিভক্ত বাংলার লীগ সরকার থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের কংগ্রেস, কোয়ালিশন, পি ডি এফ, যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে রাজ্যের খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদির কাছে। সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি ভারতের প্রধান শহর কলকাতায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের। অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পরিকল্পনার পর এক একবার কাজ কিছুটা এগিয়েছে। আবার পরিকল্পনার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে নতুন সরকার যখন কায়েমীভাবে রাজ্যপাটে বসেছেন তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করতে পারি এবার স্টেডিয়াম পরিকল্পনা পাকাপাকিভাবেই রূপায়িত হবে। পৃথিবীর ছোট ছোট শহরেও দুটি তিনটি করে স্টেডিয়াম আছে আর কলকাতার মত বড় শহর, ভারতের শ্রেষ্ঠ শহরে একটা স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি, বাঙালীর পক্ষে এটা লজ্জার কথা। তবে স্টেডিয়ামের চেয়েও বোধহয়

বড় দরকার বেশী সংখ্যায় খেলার মাঠ ময়দানের ব্যবস্থা করা, স্কুল কলেজে খেলাধূলো বাধ্যতামূলক করা। করণীয় অনেক কিছুই আছে। ক্রীড়া প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার দুরূহ দায়িত্ব আছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে যে ক্রীড়ামন্ত্রী ক্রীড়া প্রশাসন থেকে 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন পরবর্তীকালে তিনিই বাসার মধ্যে ঢুকে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন, নিজেও জড়িয়ে, পড়েছেন। সুতরাং নতুন সরকারের কাছে আমাদের বড় বুলি, অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির প্রত্যাশা নয়। কিছু কাজের প্রত্যাশা।

পরলোকগত রমেশ গাঙ্গুলী

প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার প্রাক্তন ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীরমেশ গাঙ্গুলী গত ১৩ মার্চ তারিখে ৭৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

বহুকাল যাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি, যাঁর আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি, পেয়েছি উপদেশ নির্দেশ, তাঁর এই মৃত্যু আমাদের কাছে গভীর দুঃখের। ভারতে খেলাধুলো যখন প্রায় উপেক্ষিত, শুধু বিলাস ব্যসনের মত, তখন যে দু'চারজন ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবে জীবনের বৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন রমেশদা তাঁদের অন্যতম। খেলাধুলোকে জনপ্রিয় করার মূলে তাঁর লেখনীর অবদানও অনস্বীকার্য। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় (শুরু থেকে) ক্রীড়া সম্পাদক হিসাবে যোগ দেবার আগে তিনি 'ফরোয়ার্ড', 'লিবার্টি', 'বেঙ্গলী' এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় কাজ করেছেন। কিছুদিন আনন্দবাজারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তবে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডেই তাঁর পরিণত প্রজ্ঞার পরিচয়। ক্রীড়া প্রশাসনের দুর্নীতি, গোষ্ঠীচক্র এবং কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে রমেশদাই প্রথমে লেখনী ধরেছিলেন। ডোরিলক্ট ছদ্মনামের আড়ালে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লেখাগুলির মধ্যে যেমন ছিল যুক্তির প্রাবল্য, তেমন ছিল ভাষার যাদু। ইংরাজী এবং বাংলা দুই ভাষাতেই তাঁর সমান দখল ছিল। এই 'দেশ' পত্রিকাতেই ক্রীড়া বিষয়ে তিনি বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে তুলনায় বাংলার চেয়ে ইংরাজীর উপরই তাঁর দখল ছিল বেশী।

আজ মনে পড়ছে রাইটার্স বিল্ডিং-এ স্টেডিয়ামের আলোচনা সভায় রমেশদার লেখা সম্পর্কে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা। ফরোয়ার্ডে কাজ করার সময়ে ডাঃ রায়ের স্নেহভাজন ছিলেন রমেশদা। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে উপস্থিত হতেই ডাঃ রায় বললেন, 'তা গাঙ্গুলী, ইংরেজিটা তুমি ভালই শিখেছিলে।' আমি লজ্জা পড়েছি। ওসব ভাষার প্যাঁচ ছেড়ে

ক্রীড়া-সাংবাদিক রমেশ গাঙ্গুলী

এখন বলতো, কিভাবে স্টেডিয়ামটা হতে পারে'। রমেশদা একটু মুচকি হেসে শুধু বলেছিলেন, 'আপনি একটু নেক নজর দিলেই হতে পারে'।

বড় রসিক লোক ছিলেন। কথা ও লেখার মধ্যে ছিল রসের প্রস্রবণ। তাই আমাদের এই আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সবার কাছেই তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয় 'রমেশদা'। একবার আমাদের এক সহকর্মীর বাড়িতে ভোজের নিমন্ত্রণ। ভোজের আগে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সহকর্মী সাংবাদিক তাঁর সহধর্মিনীকে সামনে এনে বললেন, এই যে এঁকে চেনেন? রমেশদা টেনে টেনে বললেন, আপনি কি ভা-লো-ক-রে চি-নে-ছে-ন ওঁকে? সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

কত কথাই মনে পড়ছে। 'ডোরিলক্ট'-এর এক শ্লেষাত্মক ও রসাত্মক প্রবন্ধে রাগে প্রায় পাগল ক্রীড়া প্রশাসনের এক কেউকেটা রমেশদাকে ফোন করলেন। উত্তেজিত কণ্ঠ। টেবিলে বসেই সেটা বুঝতে পারছিলাম। রমেশদার শান্ত কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম, ওপারের কথা আন্দাজে। পরে জেনেছিলাম, উনি বলছেন যত সব রাবিশ এবং মিথ্যে কথা লেখা হয়েছে। রমেশদা বললেন, কত পারসেন্ট মিথ্যে আর কত পারসেন্ট সত্যি? ওপারের উত্তরঃ ফিফটি-ফিফটি। এপার থেকে রমেশদার প্রতি-উত্তরঃ তাহলেই তো ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ।

এই রকম মানুষ ছিলেন রমেশদা। খেলার লিখিয়ে ইচ্ছেমত কলম ও কথা নিয়ে খেলা করতেন। সদালাপী এবং বন্ধুবৎসল রমেশদা যাঁদের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন তাঁদের কারো সঙ্গে কোনদিন তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। দুই বন্ধু পঙ্কজ গুপ্ত এবং রমেশ গাঙ্গুলীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিকতার একটি পুরনো অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

মধ্যাঞ্চলের দলীপ ট্রফি

পশ্চিমাঞ্চলকে দুই উইকেটে হারিয়ে মধ্যাঞ্চল সর্বপ্রথম দলীপ ট্রফি জয় করেছে।

কথায় বলে একা রামে রক্ষে নেই

সংগ্রীব দোসর। বোম্বাই একাই পরম শক্তিশালী। সেই বোম্বাইয়ের কৃতী খেলোয়াড় এবং আঞ্চলিক নামকরা খেলোয়াড়দের নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল দল। এ হেন শক্তিশালী দলকে মধ্যাঞ্চল হারিয়ে দেবে এ কথা কি কেউ আগে ভাবতে পেরেছিল? বরং উল্টোটাই ভেবেছিল সবাই। যেদিন সেমিফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে মধ্যাঞ্চল ফাইনালে উঠেছিল সেদিনই সকলে বলেছিল ফাইনাল খেলাটা বেলে খেলা হয়ে গেল। দক্ষিণাঞ্চল ফাইনালে উঠলে যদিও বা পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে কিছুটা লড়তে পারত, মধ্যাঞ্চল কিছুই করতে পারবে না, ইনিংসে হারবে। কিন্তু ক্রিকেট ভাগ্য কথাটি যে দুর্ভাগ্যের মতই সমার্থক শব্দ তা আবার প্রমাণিত হল মধ্যাঞ্চলের জয়ের মাধ্যমে।

ওয়াড়েকার, গাভাসকার, সোলকার, পারকার, কানিতকার, শিভলকার—ক্রিকেটের 'কার' নামান্ত এই কৃতী ছয়জনের সঙ্গে আরও ছিলেন সারদেশাই, রেগে, অজিত নায়ক, হাজারে ও ইসমাইল। তারকা খচিত পশ্চিমাঞ্চল দল। আরও বলবার কথা, পশ্চিমাঞ্চল ব্যাঙ্গালোরে ফাইনাল খেলায় প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিল এবং প্রথম ইনিংসের খেলায় এগিয়েও ছিল ৭৯ রানে। তবু তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছে এমন একটি দলের কাছে যে দলে সাম্প্রতিককালের একজনও টেস্ট খেলোয়াড় নেই। কয়েকজন তরুণ ও প্রবীণের দৃঢ়তা এবং আত্ম-বিশ্বাসই মধ্যাঞ্চলের জয়ের কারণ। জয়ের প্রধান হোতা বহু ক্রিকেট যুদ্ধে বিপদের কাণ্ডারী সেলিম দুরানি। বলা যেতে পারে দুরানির একক কৃতিত্বেই মধ্যাঞ্চল বিজয়ী হয়েছে। তিনি দুই ইনিংসে ৮৭ রানে দখল করেছেন ৯টি উইকেট। প্রথম ইনিংসে করেছেন ২০ রান দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট ৮৩। উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় পার্থসারথী শর্মার অবদানও কম নয়। এ বছর প্রতি খেলাতেই পার্থ তার যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন।

সদীপ ট্রফির ফাইনাল চরম উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়েছে। চারদিনব্যাপী খেলার শেষ দিন ২৩৩ রানের মধ্যে যখন মধ্যাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টি উইকেট পড়ে গিয়েছিল তখনও জয়ের জন্য দরকার ছিল ৬২ রান। পশ্চিমাঞ্চলের ক্রিকেটরসিকেরা ব্যাটসম্যানদের ঘিরে ধরে-ছিলেন তখন ইনিংস শেষ করে সংবাদদাতার সদীপ ট্রফি জয়ের আশায়। কিন্তু সেলিম দুরানি ছিলেন আত্মবিশ্বাসে অটল। সংকটের মুহূর্তে দায়িত্বশীল থেকে দলকে জয়ের পথে পরিচালিত করার এক উজ্জ্বল উদাহরণ রাখলেন সেলিম দুরানি। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংস—২৭৯ (কানিতকার—৫৭, সোলকার—৫৪, রেগে—৫২, দুরানি—৪৪ রানে ৬ উইকেট, জগদলে—৮৬ রানে ২ উইকেট)।

মধ্যাঞ্চল — প্রথম ইনিংস — ২০০ (জগদলে নট আউট—৫৯, পার্থসারথী শর্মা—২৫, সোলকার—৬৯ রানে ৬ উইকেট)।

পশ্চিমাঞ্চল—দ্বিতীয় ইনিংস—১৯৫ (কানিতকার — ৪৭, সারদেশাই — ৪০, সোলকার—৩২, পার্থসারথী শর্মা — ৩৮ রানে ৪ উইকেট, দুরানি—৪৩ রানে ৩ উইকেট)।

মধ্যাঞ্চল—দ্বিতীয় ইনিংস (৮ উইঃ) ২৭৭ (দুরানি নট আউট—৮৩, পার্থসারথী শর্মা—৭৫, সোলকার—৬৩ রানে ৩ উইকেট, শিভলকার ৫৬ রানে ২ উইকেট)।

একলব্য

"আলো আমার আলো" ছবিতে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

আলো আমার আলো

চন্দ্রগুপ্ত

মস্তিষ্কে প্রচণ্ড আঘাতের পর নায়ক কিংবা নায়িকার আত্মবিস্মৃতি বা স্মৃতি-লোপ বাংলা ছবিতে নতুন কিছু ব্যাপার নয়। বড়লোকের লাম্পট্যও হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু "আলো আমার আলো" (কাহিনী প্রতিভা বসু) ছবিতে এই দুই অতিপরিচিত উপকরণের ভিত্তিতে যে নাট্য-চমক গড়ে তোলা হয়েছে তাতে দর্শকরা আমোদ উপভোগের নতুন পরিস্থিতি দেখতে পাবেন। বিশেষত এই নাট্যপর্বের দুই প্রধান শিল্পী যখন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন তখন নাটকীয় মুহূর্তগুলি যে আরও বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য।

শিল্পপতি উত্তমকুমার ছবিতে এসেছেন একটু দেরিতে। তার আগে চিত্রনাট্যটি নবজীবন উদ্বাস্তু-কলোনীতে সুচিত্রা সেনের বাড়ির ঘটনায় কিছুটা বিস্তৃত। এই অংশ মাঝে-মাঝে একটু ক্লান্তিকরও লেগেছে। যাই হোক, নবজীবন কলোনীতে শিল্পপতি নীলেন্দু মিত্র তথা উত্তমকুমারের পদার্পণ ঘটার পরই ছবি নাটকের দিকে মোড় নিয়েছে। দর্শকের কৌতূহলও এই মুহূর্ত থেকেই উজ্জীবিত। ছবিতে উত্তমকুমারকে দেখামাত্র দর্শক সোল্লাসে হাততালি দিয়ে ওঠেন। উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তাই বড় কথা নয়, অভিনয়শক্তি যে তাঁর কত প্রচণ্ড এই ছবিতে আবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কী লম্পট বড়লোকরূপে, কী রূপান্তরিত প্রেমিকের ভূমিকায় উত্তমকুমার চরিত্রের অবাস্তবতা সত্ত্বেও অসামান্য অভিনয় করে গেছেন।

নবজীবন কলোনীতে অতসীর (সুচিত্রা সেন) দিকে নীলেন্দুর দৃষ্টি পড়ে। নীলেন্দুর অ্যাপার্টমেন্টে প্রতি রাতে নতুন নতুন মেয়ে ধরে আনার জন্য দালালরা নিযুক্ত। অতসীকে ধরে আনার জন্যও এক-জনের উপর ভার পড়ে। যে-রকম নৃশংস-ভাবে কলোনী থেকে অতসীকে আহত অবস্থায় নীলেন্দুর বাড়িতে নিয়ে আসা হয় সেটা আমরা কেবল বিগতকালের সামন্ত বা জমিদারির পটভূমিতেই কল্পনা করতে পারি। তা ছাড়া নীলেন্দু যেভাবে মেয়ে ধরে আনার ব্যাপারে দালালদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে তাতে তাকে বোম্বাই হিন্দীচিত্রের শিল্পপতি—ভিলেনই মনে হয়। কিডন্যাপড হওয়ার সময় গাড়িতে অতসী নীলেন্দুর অনুচরের (বঙ্কিম ঘোষ) কাছে বেদম মার খেয়েছে। তাতেই সে সংজ্ঞা হারায়। নীলেন্দুর ওই অনুচরের ভূমিকায় বঙ্কিম ঘোষ একটি শয়তানের টাইপ-চরিত্র কৃতিত্বের সঙ্গে তৈরি করেছেন।

চিকিৎসার পর অতসীর জ্ঞান ফিরে এসেছে নীলেন্দুর বাড়িতে। তখন থেকেই তার আত্মবিস্মৃতি ও কিছুটা মনোবৈকল্য। তখন সে নীলেন্দুকে ডাক্তারবাবু বলেই জানে এবং শিশুর মত তার উপর নির্ভর-শীল। একরাত্রির লালসা মেটাবার জন্য যাকে ধরে আনা হয়েছিল তার অসহায়তা ও সরলতা দেখে নীলেন্দু তলে তলে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। অতসীর এই মানসিক অবস্থার অভিনয় খুব সহজ কাজ নয়। সুচিত্রা সেন তা অনায়াসেই বিশ্বাস-যোগ্য করেছেন। তাঁর অভিনয়ের দক্ষতা পরেও দেখা গেছে, যখন অতসী পূর্ব-স্মৃতি ফিরে পেয়ে নীলেন্দুকে চার্জ করেছে ও পরে অনুরাগের মন্ত্রবলে নীলেন্দুর বুকে মাথা রেখে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

ছবির প্রথম ভাগে অতসী গরীব ঘরের মেয়ে। এই অংশটা আরও ছোট করা যেত, কারণ নায়িকার জীবনের আসল নাটক তো শুরু হয়েছে তার উপর নীলেন্দুর লোভ দৃষ্টি পড়ার পর। প্রথম অংশে হয়ত পরি-চালক-চিত্রনাট্যকার পিনাকী মুখোপাধ্যায় একটি উদ্বাস্তু পরিবারের ট্র্যাজেডিই দেখাতে চেয়েছেন। এই ট্র্যাজেডি সিনেমায় এত চালু যে অনেকটা জোলো মনে হয়েছে। অবশ্য এই সংসার-নাটকে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারতী দেবী (নায়িকার বাবা-মা) এবং নায়িকার ভাই-বোনের চরিত্রে ভাস্কর চৌধুরী ও কল্যাণী মণ্ডল সুঅভিনয়ই করেছেন। কিন্তু তাদের জীবনের ঘটনা মামুলি বলে মনে তেমন রেখাপাত করে না। কল্যাণী মণ্ডলকে কিন্তু উদ্বাস্তু-ঘরের সাধারণ মেয়ে মনে হয়েছে। তাদের পাতানো কাকা হিসেবে সুব্রত সেনের অভিনয়ও মার্জিত। তবে এই চরিত্র উপলক্ষে ছবিতে কিছুটা রাজনৈতিক ভাবধারা এসেছে। অন্যত্রও সমাজতান্ত্রিক বক্তব্যের সস্তা বুলি শোনা যায়। মূলত নাট্যধর্মী কাহিনীতে এই রাজনৈতিক চেতনা প্রক্ষিপ্ত ও অবান্তর।

তবে নীলেন্দু ও অতসীর সাক্ষাতের পর পরিচালক নাটক রচনার কাজটি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পাদন করেছেন। রমণী যার কাছে ভোগের সামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু নয় সেই নীলেন্দুর অন্ধকার জীবনে অতসীর আলো হয়ে আসার এই নাটকে কী স্বাভাবিক আর কী অস্বাভাবিক সেদিকে নজর না দিলেই পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করা যায়। অসহায়, নিষ্পাপ ও অসুস্থ অতসীর প্রতি নীলেন্দুর মমতা লক্ষ্য করেছেন তার ডাক্তার-অভিভাবক সুধীনদা (বিকাশ রায়), সেই সঙ্গে দর্শকও। ডাঃ সুধীনের চরিত্রে বিকাশ রায়ের অভিনয়ও মনোগ্রাহী। নীলেন্দুর মানসিক রূপান্তরের সাক্ষী সুধীনদা। নীলেন্দুর নবজন্মের কাহিনীর ক্লাইম্যাক্সটি একেবারেই

প্রত্যাশিত। উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত ছবির শেষে এই দুই শিল্পীর আলিঙ্গন দৃশ্য দেখাতেই হয়। পরিচালক এই গতানুগতিক নিয়মটি বর্জন করতে পারেননি।

নীলেন্দু-অতসীর সাক্ষাতের পর থেকে চিত্রনাট্যটি খুবই গতিসম্পন্ন মনে হয়েছে। পরিচালক ছবির গতি অব্যাহত রাখার জন্য এডিটিংয়ের সদ্ব্যবহার করেছেন। পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের প্রয়োগ-কর্ম জায়গায় জায়গায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অতসীর মনে অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি জাগার সময় অপটিক্যাল প্রিন্টের ব্যবহার খুবই কার্যকর হয়েছে। তা ছাড়া, নীলেন্দুর চিন্তা ও যন্ত্রণার সূত্র ধরে তার ছোটবেলার টুকরো টুকরো ঘটনায় ফ্ল্যাশব্যাকও সুকল্পিত। টেকনিক্যাল কাজের দিক থেকেও ছবিটি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়, এই প্রশংসার একটা বড় ভাগ ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্ত ও এডিটর রবীন দাসের প্রাপ্য।

কাহিনীর একটি দিকের নাট্যসম্ভাবনা চিত্রনাট্যে উপেক্ষিত। অতসীর বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর তাকে নিয়ে নানাজনের প্রতিক্রিয়ায় নাটক গড়ে তোলা যেত। পরিচালক তার আভাসই মাত্র দিয়েছেন। অথচ ছবির প্রথম দিকে অতসীর বাড়ির ঘটনা বা বাড়ির শেষের দিকে পরিচালক এই অনিবার্য নাটকের জন্য কিছুটা সময় দিতে পারতেন। অতসীর বাড়ির লোকজনদের রূপকরা তখনই হয়ত বিশেষভাবে ফুটিয়েছেন। চিত্রনাট্য রচনার কিছু কিছু ত্রুটি পরিচালক পুষিয়ে দিয়েছেন আবেগ সঞ্চার করেকটি কাজে। রবীন্দ্রনাথের "বিপদে মোরে রক্ষা করো" গানটির প্রয়োগ প্রশংসনীয়। পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত-পরিচালনা ছবির একটা বিশেষ গুণের দিক। আবহসংগীত নাট্য-মর্মানুসারী। একটি আধুনিক গানের সুর বেশ ভাল, নতুন ধরনের (মান্না দে গীত)। গাড়ি চালাবার সময় নায়কের গান গাওয়ার সময়কার দৃশ্যটা যদিও নতুন নয়, তবু এই সময়ে নায়ক-নায়িকা তথাকথিত রোমান্টিক জুটিও নয়। নায়ক তখনও স্মৃতিভ্রষ্ট। নায়ককে অপ্রকৃতিস্থ নায়িকার 'ডাক্তারবাবু' বলে ডাকা এবং আর কাউকে আমল না দিয়ে "ডাক্তারবাবু"-র উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করে থাকাটা নতুন বৈকি। "শেষ উত্তর" তো অনেক দিন আগের ছবি, যাতে নায়িকাকে অপ্রকৃতিস্থ নায়কের "মাস্টারমশাই" বলে ডেকে তার কাছে নিজেকে শিশুর মত সঁপে দিতে দেখা গেছে। শেষ উত্তর-এর পরিবেশ ও ঘটনাবর্তও হয়ত ভিন্ন। কিন্তু মূল নাট্য-চমকটি একই। "আলো আমার আলো"-র এই একই উপকরণ একালের দর্শকের কাছে নিশ্চয়ই নতুন।

"সংযোগ" ছবির নায়িকা মালা সিনহা

সংযোগ

জোর্মান

বড় অদ্ভুত সংযোগ—জেলা কালেক্টর আশা কাজে যোগ দিয়ে দেখে তারই অফিসে হেড ক্লার্কের পদে আসীন তারই স্বামী মোহন। দশ বছর আগে বিয়ের পর দিনই আশা স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। "সংযোগ" চিত্রে জেলা কালেক্টর হয়েছেন মালা সিংহ, তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী মোহন হয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। জেলা কালেক্টর হবার মত বয়স আশার হয়েছে সেটা মালা সিংহকে দেখে অবশ্যই মনে হয় না। হয়ত এই বয়সে আশার কালেক্টর হওয়াটাও একটা সংযোগ। ওই কালেক্টর হওয়া পর্যন্তই, নচেৎ অফিসে তার যা প্রধান কাজ সে তো আর এক প্রেম-পর্ব। প্রথমদিন অফিসে মোহনকে দেখেই কালেক্টরের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তারপর কী অফিসে নিজের ঘরে কী বাইরে আশা কখনই মোহনকে তার অধীনস্থ কর্মচারী ভাবতে পারেনি। পরিচালক এস এম বকেন এখানে মোহন-আশাকে দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের রোমান্টিক প্রেমপর্ব অবতারণা করেছেন।

এদিকে যেহেতু অফিসের লোকেরা মোহন-আশার আসল সম্পর্ক জানে না তা-ই কালেক্টর সাহেবার সঙ্গে হেড কেরানীর কিছুটা ঘনিষ্ঠতা দেখে তারা কৌতুক বোধ করেছে এবং গুজব ছড়িয়েছে। এই ক্ষেত্রে কিছু মামুলি কৌতুককর পরিস্থিতি দেখা যায়। এবং এই পর্বের নায়ক হলেন কৌতুকাভিনেতা জনি ওয়াকার—ওই অফিসেরই এক কর্মচারী।

শয়তানি বা ভিলেনির দিকটাও ছবি থেকে একেবারে বাদ যায়নি। বিয়ের পরের দিন মোহন আশার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন মোহনেরই জননী। অর্থাৎ ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত তিনিই সম্পূর্ণ করেছেন, কারণ আশা কলেজের চাপরাশির মেয়ে। কলেজে পড়ার সময় মোহন-আশার প্রেমের খবর তিনি রাখতেন না, ওদের বিয়ের সময়েও উপস্থিত ছিলেন না। পরের দিকে খলনায়কের কাজ কিছুটা সম্পাদন করেছেন আশার বাবা। অপমানের বদলা নেবার জন্যই তিনি মেয়েকে বিয়ের পর কালেক্টর বানিয়েছেন। কালেক্টরের পিতা হিসাবে তিনি হেড ক্লার্ক মোহনের যে ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেছেন সেটা ভিলেনিরই নামান্তর। একদা-অপমানিত পিতার ব্যথা-যন্ত্রণা পরবর্তীকালে এই ভদ্রলোকের মধ্যে আদৌ দেখা গেল না।

"সংযোগ"-এ নাটকীয় ঘটনার যোগা-

[illegible] এখানেই শেষ নয়। আশা এখন [illegible] [illegible] হয় [illegible] দ্বিতীয় স্ত্রী সীমা ([illegible]) ও দুই ছেলেকে নিয়ে রীতিমত সংসারী।

আশারও ছেলে হয়েছে। আশার ছেলে মোহনেরই ছেলে। আশা যে গর্ভবতী ছিল এই তথ্য মোহনের জানা ছিল না। এত বড় অন্যায়ের পরেও আশা কিন্তু অতি সহজেই মোহনকে ক্ষমা করেছে। মোহনের কাছে তার তখনকার অক্ষমতার কথা শুনেই আশা সন্তুষ্ট। দর্শকের পক্ষে কিন্তু মোহনের কৈফিয়ৎ শুনে এত সহজে সন্তুষ্ট হওয়া কঠিন। যাই হোক, আশাকে আত্মত্যাগের জন্যই পরিচালক তৈরি করেছেন। ছবির শেষে আশা মারা যায়। এই ক্লাইম্যাক্সের মূলে আর এক মেলোড্রামা। মোহন ও আশার ব্যাপারে সীমার দুঃখ, সংশয় ও জ্বালা নিয়েই এই নাটকের সূত্রপাত। শেষ পর্যন্ত একজনকে সরতেই হবে, অতএব আশাকেই পরিচালক সরিয়ে দিয়েছেন। সীমা যখন বাড়ি ছেড়ে আত্মহত্যার জন্য পাহাড়ের উপর উঠতে থাকে তখন আশাই তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিপদবরণ করে এবং মারা যায়।

নানাবিধ সংযোগের পরিসমাপ্তির পর দর্শকের মন আশার জন্য বিষণ্ণ। পরিচালক করুণ সুরের নাটকে দর্শকের মন ভরাতে চেয়েছেন। শিল্পীদের অভিনয়ও মন্দ নয়। তাছাড়া প্রমোদের দিক থেকে রয়েছে রাহুল দেববর্মণ সুরারোপিত কয়েকটি গান।

“কহতে হ্যায় মুঝকো রাজা” (পরিচালনা: মনমোহন দেশাই) হিন্দী ছবির দৃশ্যে ...রেখা, বিশ্বজিৎ ও হেমা মালিনী

বোম্বাই বিচিত্রা

এখন থেকে প্রায় আড়াই যুগ আগে কোলকাতায় একটি ছবি হয়েছিল, ছবিটির নাম ছিল 'উদয়ের পথে'। ছবিটির পরিচালক ছিলেন বিমল রায় (বর্তমানে স্বর্গবাসী) লেখক ছিলেন জ্যোতির্ময় রায় (তিনিও ইহলোকে নেই)।

'উদয়ের পথে' নানা কারণে যুগান্তকারী ছবি। সেদিন কোনো এক ঘরোয়া বৈঠকে এক ভদ্রলোক বলছিলেন, 'ভারতবর্ষে এ যাবৎ মাত্র তিনটি ছবি প্রভাব বিস্তার করেছে। এই তিনটির প্রথমটি প্রমথেশের 'দেবদাস', দ্বিতীয়টি বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে', আর তৃতীয়টি রাজকাপুরের 'আওয়ারা'!' ভদ্রলোক প্রবীণ সুতরাং তর্ক করলাম না, তবু প্রশ্ন করলাম, 'আপনার বক্তব্য ঠিক পরিষ্কার হল না'। ভদ্রলোক পরিষ্কার করার প্রয়াস পেলেন, 'দেবদাস ছবির পর প্রচুর যুবক দেবদাস হয়ে গিয়েছিল, উদয়ের পথের পর দেখেছি ঘরে ঘরে 'অনুপ' আর আওয়ারার পর পথেঘাটে 'আওয়ারা'। এই ধরনের প্রভাব অন্য কোনো ছবির হয়নি। পরিষ্কার হোলো, মন্তব্যের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক চলে না। যাই হোক কাজের কথায় ফিরে আসি। সেই উদয়ের পথের কথা। যে 'উদয়ের পথে' এককালে ভারতময় বন্দিত হয়েছিল সেই উদয়ের পথে-ই আজকের দর্শকদের স্মৃতিতে একেবারেই অন্তর্হিত। এ বছর ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বছরের সেরা গল্প থেকে হৃষিকেশ মুখার্জির 'আনন্দ'। এ খবর আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু যে খবর জানেন না, সেই নেপথ্যের খবর দিই আপনাদের, সেটা হচ্ছে আর একটু হলে "নয়া জমানা" এ বছরের সেরা গল্প হয়ে গিয়েছিল আর কি। আনন্দ-এর সঙ্গে একেবারে নেক টু নেক ফাইট। 'নয়া জমানা' আপনারা অনেকেই দেখেছেন, কারণ 'নয়া জমানা' প্রমোদ চক্রবর্তীর হিট ছবি। যাঁদের দেখার ফলে 'নয়া জমানা' হিট হয়েছে তাঁরা এ জমানার লোক, সম্ভবত তাঁরা উদয়ের পথে দেখেন নি, তাই তাঁদের জ্ঞাতার্থে, জানিয়ে রাখি যে উদয়ের

“[illegible] জয়” (পরিচালনা: অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়) ছবিতে কাজরী রায়

বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা গ্রেগরি পেক ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার ক্যাপিটল ইনডাস্ট্রিজ ইনক্-এর ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ছবিতে উক্ত সংস্থার প্রেসিডেন্ট শ্রীভাস্কর মেনন (যিনি গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডেরও চেয়ারম্যান) শ্রী পেককে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাঁর নির্বাচনে খুশি হয়ে। প্রসংগত উল্লেখ্য, ক্যাপিটল ইনডাস্ট্রিজ দি গ্রামোফোন কোম্পানির সহযোগী সংস্থা।

ইমপেক-নীতির প্রতিবাদে ই-আই-এম-পি-এ

বাংলাদেশে ছবি রফতানির ব্যাপারে ইনডিয়ান মোশান পিকচারস এক্সপোরট করপোরেশনের নীতির প্রতিবাদে ই-আই-এম-পি-এর (ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন) সভাপতি শ্রীশ্যামলাল জালান বলেন, বাংলাদেশে যদি ছবি পাঠানোই হয় তবে সে ক্ষেত্রে বাংলা ছবিরই অগ্রাধিকার থাকা উচিত। গত ১৫ মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রী জালান এই মন্তব্য করেন।

ইমপেক-এর (ইনডিয়ান মোশান পিকচারস এক্সপোরট করপোরেশন) বাংলা ছবির প্রতি ঔদাসীন্যের কথাও সাংবাদিক বৈঠকে আলোচিত হয়। ই-আই-এম-পি-এ-এর সম্পাদক শ্রীদীপেন্দ্র প্রামানিক জানান, গত তিন বছরে 'ইমপেক' মাত্র দুটি বাংলা ছবি রফতানি করেছেন। অথচ লনডনে বাংলা ছবির ভাল বাজার রয়েছে। সেদিকে ইমপেক-এর খেয়াল নেই।

একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে ই-আই-এম-পি-এ সভাপতি জানতে পারেন যে, বাংলাদেশে ছবি রফতানির ব্যাপারে ইমপেক তৎপর হয়েছেন। এ খবরও জানা যায় যে, দিল্লির বাংলাদেশ মিশনের প্রধানকে রফতানির জন্য মোট ২৬টি ছবি দেখানো হয়। তার মধ্যে বাংলা ছবি মাত্র ২টি, বাকিগুলি হিন্দী। শ্রী জালান সাংবাদিকদের বলেন, তিনি এই খবর প্রকাশের পর ইমপেক-এর সভাপতি শ্রী তারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। শ্রী তারিকের পত্রে ই-আই-এম-পি-এ-এর দাবি মেনে নেওয়ার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। শ্রী জালান বলেন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয়েছে তাতে এটাই স্পষ্ট যে তাঁরা বাংলা ছবিই চান। ইমপেক-এর রফতানি তালিকায় ভারতের অন্য অঞ্চলের ছবি দুএকটি থাকলে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলাদেশে বাংলা ছবিই বেশী পরিমাণে পাঠানো কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। এবং এ বিষয়ে ইমপেক-এর উচিত ই-আই-এম-পি-এ-এর সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়া।

ইমপেক যদি এই দাবি মেনে না নেন তবে ই-আই-এম-পি-এ সরাসরি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং তাঁকে বাংলা ছবি দেখাবেন। অবশ্য রফতানি বিষয়ে পাকাপাকি কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি না তা জানবার জন্য ই-আই-এম-পি-এ সভাপতি বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী এল এন মিশ্রকে এক জরুরী তারবার্তা পাঠিয়েছেন। শ্রী জালান জানান, এ-ক্ষেত্রে যদি কোন সুরাহা না হয় তবে তাঁরা অন্য পরিকল্পনার কথাও বিবেচনা করবেন। বাংলা ছবির প্রতি ঔদাসীন্য তাঁরা কোন রকমেই সহ্য করবেন না।

চিৎপুর-চিত্র

ভাঙাগড়ার প্রথম পর্ব

ঠিক এই সময়টিতে চিৎপুরী ভাঙা-গড়ার আসর যেমন জমজমাট হয়ে ওঠে, নানা সমস্যায় বিব্রত যাত্রাপাড়ার এবার আর সেই প্রাণবন্যা নেই। কয়েক সপ্তাহ আগে বলেছিলাম পাঁচহাজারী মনসবদারদের মতন টপ-স্টারদের খাম-খেয়ালীর মাশুল গুণতেই চিৎপুর প্রায় দেউলে। ওই প্রসঙ্গ ধরেই এবার বলি চিৎপুরপাড়ার এবারের ডাক উঠবে এক কি দেড়হাজারী মাইনের শিল্পীদের নিয়ে। তার চেয়েও বেশি লাভবান হবেন আরও কমদামী শিল্পীরা। এ থেকেই বোঝা যায় উনিশ শ বাহাত্তরের মরসুমে কালচক্র উল্টো দিকে বইতে শুরু করছে। দল-মালিকেরা অতি-খরচার ঝুঁকি বইতে নারাজ। ফলে ভাঙাগড়ার প্রবল জোয়ার চিৎপুরের দু-কূল প্লাবিত করে আর বইবে না। বরং এবার সেখানে নিরঙ্কুশ ভাঁটির টানই প্রত্যক্ষ করবেন সকলে।

তিন ভাঁটার থাকলেও গুজব কিন্তু প্রবল জোয়ারের মতনই বইতে শুরু করেছে। এবং সব গুজবকে কেবল গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়াটাও বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ধরা যাক বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই। শোনা যাচ্ছে তরুণ অপেরার এই শিল্পী নাকি আসন্ন মরসুমে দল বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। না একা নন, ওই সঙ্গে এ দলের অন্যতম শিল্পী অনুপকুমারও। রটনা: ওঁরা নাকি লোকনাট্যে জয়েন করছেন। খবর নিয়ে জানা গেছে গুজব আদৌ মিথ্যা নয়। বর্ণালী আর অনুপকুমার নাকি চুক্তিপত্রও স্বাক্ষর করে ফেলেছেন। শান্তিগোপাল অবশ্য তার জন্য চিন্তিত নয়। এক প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে: তরুণ অপেরা আগামী মরসুমে নায়িকার দিক থেকেও এক নতুন চমক সৃষ্টি করবে। ওই দলের শিবদাস বলেছেন: নতুন শিল্পী সৃষ্টি করাই তরুণ অপেরার কাজ। আর এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে কখনও পিছপা হবে না।

লোকনাট্যকে প্রশ্ন করলে সে নিশ্চয় জবাব দেবে মরসুমের মাঝেই হঠাৎ আহত হওয়ার জন্যেই তার এই অগ্রিম সতর্কতা। হঠাৎ খবর রটেছিল লোকনাট্যের বীণা দত্ত আর সুদেশকুমার নাকি হঠাৎ অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছেন। নীলমণিবাবুকে শুধোলাম। ভদ্রলোক সত্য গোপন করেন নি। বললেন, ওঁরা দুজন হঠাৎ দলত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি যখন শ্রীদে মশাইয়ের কাছে আসে তখন তিনি অনুপায় হয়ে সম্মতি জানান। অবশ্য তৎক্ষণাৎ শূন্যস্থান পূরণের ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু ব্যবসায়ের দিক থেকে যে ক্ষত সৃষ্টি হল তা কি অত সহজে মোছবার? কেউ বলছেন বীণা দত্তর স্বামী নিমাইবাবুও নাকি লোকনাট্য ছেড়েছেন এবং ওঁরা অভিনয় করছেন নিউ প্রভাসে। রমেন বসু মল্লিককে জিজ্ঞেস করলে তিনি স্বভাবসুলভ হেসে জানালেন, এ নেহাৎই গুজব। তবে সুদেশকুমার মধ্যবীতে দু-এক রাত্রি অভিনয় করেছেন এমন প্রমাণ সংগ্রহ করা গেছে। আগামী মরসুমে ওরা তিনজনই কি তা হলে নিউ প্রভাসে জয়েন করছেন? খবর পরের সপ্তাহে।

আর এক গুজবের কথাও বলি। বাহাত্তরের মরসুমে নাকি লোকনাট্যের দলে থাকছেন না শর্মিলা আর রাখাল সিংহ। ওঁরা তা হলে কোন দলে যাচ্ছেন? সত্যম্বর? অনেকে বলছেন রাখাল সত্যম্বরের পুরনো শিল্পী; সেখানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটাকে অবাস্তব বলা যায় না। কিন্তু শর্মিলাও কি? জনমত: জয়শ্রী বড়াল এবার যদি সত্যম্বর ছাড়েন তবে শর্মিলা সেখানে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। শৈলেন মোহান্ত মশাই অবশ্য গুজবকে একেবারেই আমল দেননি। তিনি বলেছেন দল গঠনের কথা ভাবার অবকাশই তিনি পান নি। ভদ্রলোক পা মচকে পড়ে আছেন বাড়িতে। শোনা যাচ্ছে জয়শ্রী বড়াল সত্যিই নাকি নিউ প্রভাসের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে ফেলেছেন সপ্তাহ দুয়েক আগে।

—সূত্রধার

"সোনার খাঁচা" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে অপর্ণা সেন ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

রাধিকামোহন মৈত্রের সম্বর্ধনা

ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর শ্রদ্ধাস্পদ সমিতিতে এবারের নির্বাচিত শিল্পী প্রতিষ্ঠিত সরোদবাদক শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র। শিল্পীর এই সম্মানে সমগ্র সংগীতকুল সম্মানিত। তাই ১৩ ফেব্রুয়ারী, রবিবার, বিড়লা আকাদমী হলে 'সৌরভ' গোষ্ঠী আয়োজিত এক আসরে এ দেশের খ্যাতনামা শিল্পী ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ শ্রীমৈত্রকে একটি সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন। আসরের সভাপতিত্ব করেন বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের অধিকর্তা শ্রীধ্রুবতারা যোশী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরোদশিল্পী শ্রীতিমিরবরণ।

আসরের মুখ্য উপচার ছিল অবশ্য, শ্রীমৈত্রের সরোদবাদন। কিন্তু সম্বর্ধনার প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিল্পিগণ রাধিকাবাবুর সংগীত জীবনের বিভিন্ন দিক, তাৎপর্য, পর্যায় ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করেন। রাধিকাবাবু শুধু শিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত নন শিক্ষক হিসেবেও উত্তীর্ণ। এক কথায় তিনি একটি ইনস্টিটিউশন। আসরের বক্তাদের সেটাই বক্তব্য।

কথার পর বাজনা। শ্রীমৈত্র ধরলেন সরোদ, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তবলা। প্রথম সপ্তরাগ শিল্পী দরবারী কানাড়া রাগে আলাপ, জোড় ও ঝালা বাজালেন। এরপর ছায়া বেহাগ রাগে গৎ-তোড়া ও ঝালা। তবলার সাথসংগত ও জবাবীতে জ্ঞানবাবুর হাতও খুলে গেল। আসরের পরিসমাপ্তি হল জিলা কাফিতে গড়া এক অনুপম ঠুংরীতে।

—সংগীত সমালোচক

"বসন্ত বিলাপ" (পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত) ছবিতে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়
ফটো—দেশ

কল্মাষপাদ নাটক

পাভলভ ইনস্টিটিউটের নাট্যসংঘ সম্প্রতি রঙ্গনা থিয়েটারে অভিনয় করলেন 'কল্মাষপাদ নাটক'। মহাভারতের এই চরিত্রটিকে এখানে প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করে নাট্যকার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কিছু সমকালীন ছবি এবং বক্তব্য তাঁর নাটকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নাট্যকারের এই চাওয়া আন্তরিক, কিন্তু ফর্মের জটিলতা এই নাটকে এত বেশি যা নাটকের বক্তব্যকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শুধুমাত্র ফর্মের দিক থেকে বিচার করলে এই নাটক অসাধারণ আখ্যা পেতে পারে। কিন্তু নাটকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে ফর্মের সমীকরণ সর্বত্র সহজবোধ্য হয়ে ওঠেনি বলে দর্শকরা ঈষৎ বিচলিত বোধ করবেন।

নাটকের প্রযোজনার অংশটি সুন্দর। শিল্পীদের অভিনয়, মঞ্চসজ্জা এবং নাটকের পরিস্থিতি অনুযায়ী আবহসংগীতের ব্যবহার দর্শকদের মুগ্ধ করবে। নাট্য-নির্দেশক নির্মল ঘোষ এবং সুব্রত নন্দীর পরিশ্রম সার্থক। শিল্পীদের মধ্যে আলাদা করে কারো নাম করা যাবে না। নাটকের প্রয়োজনে প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে আপন আপন দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শিল্পী-দের মধ্যে ছিলেন সুব্রত নন্দী, সুনন্দা চক্রবর্তী শ্যামল ব্যানার্জী গৌতম গোস্বামী রেবা চক্রবর্তী ঊর্মি গঙ্গোপাধ্যায়, ঊষ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, ধূর্জটী দত্ত সুনীল বিশ্বাস, তন্ময় ব্যানার্জী ও সরিৎ রায়। নাট্যা-নুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল 'পাভলভ দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে।

নাট্য-সমালোচক

স্মৃতি-কমল নিবেদিত তাসের দেশ

স্মৃতি-কমল নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' কিছু কিছু অপূর্ণতা সত্ত্বেও যে আমাদের শেষ পর্যন্ত দেখতে বাধ্য করে তার কারণ অবশ্যই তাসের দেশের সংগীতাংশ। প্রায় প্রত্যেকটি গান শিল্পীরা দরদ দিয়ে গেয়েছেন, ফলে গানের বাণী অর্থময় হয়ে আমাদের আবেগকে নাড়া দিয়েছে। সেদিক থেকে 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্য দেখার চেয়ে শোনার আনন্দই বেশি উপভোগ করা গেছে। নৃত্যনাট্যের প্রথম প্রতিশ্রুতি 'নৃত্য' আরো ভালো হলে শোনার সঙ্গে দেখার আনন্দও বাড়তো। কিন্তু দুঃখের কথা তা হয়ে ওঠেনি। সোমেন্দ্র ঘোষের 'রাজপুত্র', মঞ্জু বসুর 'পত্রলেখা' ও 'টেক্কানী' এবং মিতা রায়-চৌধুরীর 'হরতনী' ছাড়া আর কারো মধ্যে যথার্থ নাচ দেখা গেল না। নৃত্য পরি-কল্পনা সোমেন্দ্র ঘোষের। সংগীত পরি-চালনায় সৌরেন রায়। সঙ্গীতে ছিলেন বিভাস ঘোষ, গৌতম ভৌমিক, মনোজ বসু, মিত্রা দে, জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, দীপিকা রায়, সোগত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবযানী বিশ্বাস। নৃত্যাংশে অন্যান্য প্রধান কয়েকটি চরিত্রের শিল্পীরা হলেন অমর বোস, চন্দন মুখো-পাধ্যায়, শিখা দত্তরায়, জয়ন্ত ঘোষ, সুস্মিতা ঘোষ ও দেবযানী বিশ্বাস। শ্রীমতী শীলা রায়চৌধুরীর প্রযোজনায় অনুষ্ঠান পরিবেশিত হল রবীন্দ্রসদনে।

বিশেষ প্রতিনিধি

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ভবানী-পুর শাখা) রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর কর্মীদের বার্ষিক নাট্যোপহার "ভাংগা গড়া খেলা" (রচনা : বীরু মুখোপাধ্যায়) সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে।

আজকের এই পঙ্গু, ক্ষতবিক্ষত সমাজ জীবনে আমরা সবাই একটুখানি খোলা আকাশ আর একটু বাতাসের জন্য অবিরাম হেঁটে চলেছি। এ-হাঁটার বুঝি শেষ নেই। "ভাংগাগড়া খেলা" নাটকের মূল বক্তব্য এই।

সারাদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকার পর "ভাংগাগড়া খেলা"র মত কঠিন নাটককে মঞ্চে সুন্দরভাবে পরিবেশন করার জন্য অভিনেতাদের ধন্যবাদ। অভিনয় করেছেন : অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা চট্টোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ সত্যেন সান্যাল, প্রণব চক্রবর্তী, দীপক দাশগুপ্ত, সলিল মুখোপাধ্যায় ও গীতা ভট্টাচার্য। অভিনয় সকলেরই ভাল হয়েছে। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আবিরে রাঙানো" (পরিচালনা : অমল দত্ত) ছবির একটি দৃশ্য

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

অরণ্যদেব আর তিন ট্রফি-চোর!
!
!
!

কোথায় পালাবে?
উঃ!

অরণ্যদেবের মুষ্টির আঘাতে জর্জর তিন তস্কর!

খুব শিগগির এদের জ্ঞান ফিরছে না। সীমান্ত-প্রহরীরা এসে এদের গ্রেফতার করবে। আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই।

খানিক বাদে, ডঃ অ্যাক্সেলের হাসপাতালে
ওবিজু আর একটু বিশ্রাম নিলে ভাল করত।
না, না, আমি যাব। আমি এই ট্রফি হাতে নিয়ে অলিম্পিক-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে চাই!

অলিম্পিক অনুষ্ঠানের শেষ খেলা. আগুনের উপরে পোল ভল্ট!
ওয়াম্বেসি!
আমরা ওয়াম্বেসি-দল জিতেছি। ট্রফি কোথায়?
ওয়াম্বেসি ওয়াম্বেসি জয়ী!

আমরা জিতেছি! আমাদের ট্রফি দাও!
চোর! ঠগ!
ট্রফি এখনও এসে পৌঁছায়নি! অরণ্যদেব নিয়ে আসবেন।
ওই দ্যাখো!

অরণ্যদেব আসছেন! তাঁর পিছনে ট্রফি-হাতে ওবিজু!
ওবিজু! ওবিজু!
আগামী সপ্তাহে নতুন কাহিনী

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি বর্তমান সপ্তাহের সাবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পারস্পরিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক সংহতির প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে ১৯ মারচ প্রাতে দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী, শান্তি ও সহযোগিতার এক চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন। বারটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত ভারত-সোভিয়েট চুক্তির অনুরূপ এই ঐতিহাসিক চুক্তির মেয়াদ পঁচিশ বছর। তবে উভয়ের সম্মতি থাকলে এই চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যাবে। চুক্তিতে বলা হয়েছেঃ একে অপরের আঞ্চলিক সংহতি রক্ষায় আগ্রহী। যে-কোন একটি দেশের নিরাপত্তা বা সংহতি বিপন্ন হলে কার্যকর উপায় উদ্ভাবনের জন্য দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হবে। চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে—ভারত ও বাংলাদেশ, এই উভয় দেশের বিরুদ্ধাচারী কোন সামরিক জোটে যোগ দেবে না। শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এই উভয় দেশ।

দেশী সংবাদ

১৩ **মারচ**—গত শনিবার বিভিন্ন রাজ্যে ভোট গণনা আরম্ভ হওয়ার পর কংগ্রেসের যে জয়যাত্রা শুরু হয় তা অব্যাহত রয়েছে। আজ বিভিন্ন রাজ্য থেকে যেসব ফল ঘোষিত হয়েছে তাতে দেখা যায় কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ, পানজাব হরিয়ানা ও রাজস্থানে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ ঘোষণা করেন ঃ পাকিস্তান বা অন্য দেশের কোন অঞ্চল ভারত দখল করতে চায় না। তবে এই উপমহাদেশ এবং সমগ্র দক্ষিণ-এশিয়া যাতে শান্তির এলাকা হয়ে থাকে, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকে সেজন্য প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হতেই হবে।

১৪ **মারচ**—কংগ্রেস মোরচার নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করার অব্যবহিত পরে শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় এক বিবৃতিতে বাংলার জনসাধারণের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন যে, পাঁচ বছর পর বাংলার জনগণ কংগ্রেসকে আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

পাঁচ বছরে এবার রেলের উদ্বৃত্ত বাজেট। এটা সম্ভব হয়েছে যাত্রী ভাড়া ও মাশুলের 'রেশনালাইজেশনে'র ফলে। রেলের যাত্রী ভাড়া বাড়ছে কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া নয়। আর মালের মাশুল পরিবর্তিত হলেও কয়লা, কোক জয়লা খাদ্যশস্য ও ডাকের মাশুল এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৫ **মারচ**—রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা ইতিমধ্যেই কতকগুলি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন: (১) মন্ত্রিসভায় শুধু পূর্ণ মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী থাকবে—উপমন্ত্রী থাকবে না। (২) বয়োবৃদ্ধদের উপদেশ নেওয়া হবে—কিন্তু মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে না। (৩) যাঁরা এর আগে অনেকদিন মন্ত্রিত্ব করেছেন তাঁরা মন্ত্রি-সভায় থাকবেন না।

১৬ **মারচ**—স্পীকার শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার আজ বলেন, এবার বিধানসভায় বিরোধীপক্ষ কোন অনাস্থা প্রস্তাব তুলতে পারবেন না। তুললেও তা স্পীকারের অনুমোদন পাবে না। কারণ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ৪৮ জন সদস্য তাদের নেই। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এখানে কোন সরকারী বিরোধীদল থাকছে না।

আজ লোকসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চবন ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট পেশ করে বলেন:— এবারকার বাজেটে নতুন করের বোঝা যতটা বাড়বে আশংকা ছিল ততটা বাড়ছে না। বাজেট প্রস্তাবে নতুন করের বোঝা ১৮৩ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর মিলিয়ে এই হিসাব। এর মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ ১৩৩ কোটি টাকা,

আর রাজ্যের পাওনা ৫৫০ কোটি টাকা।

১৭ **মারচ**—গত পঁচিশ বছরের পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে একজন মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন যিনি বিবাহিত। শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের পত্নী শ্রীমতী মায়া রাও কলকাতা হাইকোরট-এর ব্যারিস্টার। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং শ্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায়—চারজনই ছিলেন অবিবাহিত মুখ্যমন্ত্রী।

বিমান কোম্পানীর গাড়িতে শহর থেকে বিমান বন্দরে যাওয়ার ও সেখান থেকে আসার একটা সুবিধা যাত্রীরা এতদিন পেয়ে আসছিলেন, কিন্তু আগামী ১ এপরিল থেকে যাত্রীরা আর এ সুবিধা পাবেন না। এবার থেকে বিমান বন্দরের গাড়িতে যাওয়া আসার জন্য যাত্রীদের মাশুল দিতে হবে বলে বিমান কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন।

১৮ **মারচ**—বাংলাদেশের ওপর বহিরাক্রমণের কোন রকম আশংকা দেখা দিলে ভারত বাংলা-দেশের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তার আগে অবশ্য তারা শলাপরামর্শ করবে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তির সম্ভাবনা আছে কিনা জনৈক বিদেশী সাংবাদিক জানতে চাইলে সরকারী মুখপাত্র বলেন : না—এমন কোন চুক্তি এখন হবে না।

চলতি আর্থিক বছরে পণ্যপ্রবেশ কর বাবদ রাজ্য সকরারের নয় কোটি টাকার মত রাজস্ব আদায় হয়েছে। আগামী আর্থিক বছর অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকে এ সংক্রান্ত আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে। তারপর সংশোধনী বিলটি রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা যাবে।

১৯ **মারচ**—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ দমদম বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কংগ্রেসের এই বিপুল সাফল্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখন এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণ ও নানা সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

বিদেশী সংবাদ

১৩ **মারচ**—সুইজারল্যানড আজ বাংলা-দেশকে স্বীকৃতি দিল। এই নিয়ে নবজাত রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিল ৫০টি দেশ। পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সুইজারল্যানড ভারতে পাকিস্তানের স্বার্থ দেখছে। এই স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্তের কথা দিল্লির বাংলাদেশ মিশনকে জানানো হয়েছে।

১৪ **মারচ**—সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে। রাশিয়া সফররত আফগান প্রধান-মন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন এই প্রস্তাব দেন।

১৫ **মারচ**—পাকিস্তানের নতুন শিক্ষা-নীতির অঙ্গ হিসাবে প্রেসিডেনট ভুট্টো দেশের বেসরকারী স্কুল ও কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা ঘোষণা করেন। জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে ভুট্টো বলেন, আজকের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিক্ষাকে গণতন্ত্রসম্মত করাই এর লক্ষ্য।

১৬ **মারচ**—আনন্দবাজার পত্রিকার ঢাকা অফিস জানাচ্ছেন, শুক্রবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মারকিন কূটনৈতিক সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থাকছেন না। জানা গিয়েছে, বাংলা-দেশ সরকার কনসুলেট সদস্যদের আমন্ত্রণ না জানানোর কারণ হলো মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।

১৭ **মারচ**—বাংলাদেশ আজ তার মাতৃরূপী (মুজিবের ভাষায়) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সাদর স্বাগত ও বিপুল সংবর্ধনা জানায় বিমান বন্দরে ও সারওয়ারদি ময়দানে। বাংলাদেশের জনগণের দুঃখের দিনের বন্ধু এবং সংগ্রামের সাথী ভারতের নেতা অভূতপূর্ব অভিনন্দন ও প্রীতি লাভ করেন। ময়দানে ইন্দিরাজী ভাষণ শুরু করেন বাংলায়। উপস্থিত বিশ লক্ষ মানুষ আনন্দে ও জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়েন। শ্রীমতী গান্ধীকে মাল্যভূষিত করেন বেগম মুজিব।

১৮ **মারচ**—বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানীদের বিনিময়ে তিন হাজার বাঙ্গালীকে ফেরত দিতে পাকিস্তান সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের জনৈক মুখপাত্র এই তথ্য জানিয়েছেন। তিন হাজার পাকিস্তানীর একটি তালিকা বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এদের কারুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীর অভিযোগ আছে কিনা তা খুঁটিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

১৯ **মারচ**—মসকো থেকে ফিরে প্রেসিডেনট ভুট্টো হুমকি দিয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমান যদি বাংলাদেশে বিহারী মুসলমানদের হত্যা করা' এখনই বন্ধ না করেন তবে পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের তিনি জামিন হিসাবে আটক করে রাখবেন, এই সঙ্গে তিনি ভারতের উদ্দেশেও বলেছেন, ভারত যদি তার বন্ধু মনোভাবের প্রমাণ দিতে চায় তবে তার অবিলম্বে পাক যুদ্ধবন্দীদের ফেরত পাঠানো উচিত।

সূচীপত্র

হজমের সহায় হিউলেট্‌স্‌ মিক্‌শ্চার

হজমের কাজ ভালো না হলে সব সময়ে একটা অস্বস্তি থাকে আর পেটে যন্ত্রণা হয়। কোনো কাজে আপনি মন বসাতে পারেন না, আর আপনার মেজাজ হয়ে যায় খিটখিটে।

এ অবস্থায় চাই হিউলেট্‌স্‌ মিক্‌শ্চার। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার কাজ হবে, অস্বস্তি আর যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবেন। হিউলেট্‌স্‌ মিক্‌শ্চার পাকস্থলীর গায়ে একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ তৈরী ক'রে পাকস্থলীকে বাঁচায়। অম্লরসকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দিয়ে হজমের সহায়তা করে।

হিউলেট্‌স মিক্‌শ্চার ছোটদের পেটের গোলমালেও বেশ উপকারী।

উদরাময়ে কালো ছিপিলাগানো হিউলেট্‌স্‌ মিক্‌শ্চার খাবেন।

সি, জে, হিউলেট্‌ অ্যাণ্ড সন্‌ (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ,
১৫০-এ/২, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-২,

CJH 6098A

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—শ্রীদিলীপ দাশ

রূপালী বাতাস

দাম ৫·০০

প্রকাশিত হল

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে মুজিবনগর থেকে সম্প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রর একটি অনুষ্ঠানের জন্যে উভয় বাংলার মানুষ উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন। সে অনুষ্ঠানটির নাম 'চরমপত্র', পরিচালক—'মুকুল'। এম. আর আখতারই হচ্ছেন সেই বিখ্যাত 'মুকুল'। তাঁর আরও একটি পরিচয় আছে। তিনি একজন খ্যাতনামা সাংবাদিকও। বর্তমানে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজন দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আখতার সাহেবের বাবা একজন পুলিস কর্মচারী ছিলেন। ফলে বাবার বদলির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও তাঁর প্রথম জীবনে প্রায় সারা বাংলাদেশেই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। উপরন্তু ছাত্র-জীবনে ও পরবর্তী কালে তিনি রাজনীতির সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করে-ছিলেন। এই দুটি কারণে অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও সংঘাতগুলির তরঙ্গস্পর্শ তাঁকে ভালভাবেই ছুঁয়ে গিয়েছিল। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৯৪০ সালে অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র পাকিস্তান দাবির কাল থেকে ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে কিভাবে অগ্রসর হয়েছে, আত্মজীবনীমূলক এই গ্রন্থের মাধ্যমে তার একটি যথার্থ চিত্র আঁকবার চেষ্টা লেখক করেছেন।

কয়েকখানি নতুন বই

ভয়ংকর সুন্দর ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
অ্যাডভেঞ্চার রহস্য-উপন্যাস ॥ দাম ৪·০০

একা একা ॥ বিমল কর
উপন্যাস ॥ দাম ৫·০০

ছেলে গেছে বনে ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
কবিতা-সংকলন ॥ দাম ৩·০০

গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দু'জনে ॥ গৌরকিশোর ঘোষ
উপন্যাস ॥ দাম ৪·০০

ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
হাসির গল্প ॥ দাম ৩·০০

একটি অস্পষ্ট স্বর ॥ সমরেশ বসু
গোয়েন্দা-উপন্যাস ॥ দাম ৫·০০

সোনার কেল্লা ॥ সত্যজিৎ রায়
গোয়েন্দা-উপন্যাস ॥ দাম ৫·০০

উপল-ব্যথিত গতি ॥ বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ স্মৃতিচারণ ॥ দাম ৫·০০

পরস্ত্রী ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
উপন্যাস ॥ দাম ৫·০০

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা ॥ কাদার ম্যাকিয়েন
রম্যরচনা ॥ দাম ৬·০০

ছড়া ও ছবি

ইকড়ি মিকড়ি ৩·০০

কবিতা

অর্ঘ্য ৩·০০

কিশোর উপন্যাস

পিন্টুর ডাইরি ২·০০

কিশোর উপন্যাস

দেবতার পাহাড় ৩·০০

উপন্যাস

মানুষ দেবতা হবে না ৩·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলি: ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯ ॥

রাজ্যপালের ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেবার পর তাঁদের কর্মভার গ্রহণ করেছেন। বিধানসভার উদ্বোধনও হয়ে গেছে। শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার স্পীকার ও শ্রীহরিদাস মিত্র ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়েছেন। অনেকদিন পরে বিধানসভা আবার মুখর হল—এটা বড় কথা নয়, কেননা গত পাঁচ বছরে তিনবার বিধানসভার দরজা খুলেছে, কলরবও কিছু কম হয়নি, কিন্তু সেই মুখরতার মধ্যে এই রাজ্যের নিশ্চিত ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত ছিল না। এবারে সম্পূর্ণ অন্য অবস্থা; মন্ত্রিসভার পতনের কোনো কারণ কোথাও নেই। ভবিষ্যতের ওপর আমরা সেকারণে আশাও রাখতে পারি।

এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ-ভাবনার একটি মোটামুটি ছবি আমরা রাজ্যপালের ভাষণে খুঁজে পাই। রাজ্য বিধানসভার উদ্বোধন করে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস বলেছেন, তাঁর সরকার এই রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্যে একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে চান। এই পুনরুজ্জীবন হবে প্রধানত অর্থনৈতিক। তাছাড়া সরকার এই রাজ্যের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, আইন-শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনের কাজে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কাজটিই যে প্রথম ও প্রধান এ-বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না। রাজ্যপালের ভাষণে এই প্রয়োজনীয় কর্মটির যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তাতে আমরা আশান্বিত হতে পারি। তিনি এই রাজ্যের বেকার-সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, নতুন কর্মসংস্থানের জন্যে সবরকম উদ্যোগ করা হবে। যেসব কলকারখানা বন্ধ আছে তার কিছু কিছু খোলানো হয়েছে, বাকি কলকারখানা খোলানোও সরকারের ইচ্ছে। তিনি একথাও বলেছেন, শ্রমিক ও মালিককে সব দিক দিয়েই উদ্যোগী হতে হবে। আপাতত কিছু-দিনের জন্যে সব ধর্মঘট ও লকআউট বন্ধ রাখার আবেদনও শ্রীডায়াস জানিয়েছেন।

এরপর আসে কৃষির কথা। পশ্চিমবঙ্গে কৃষির দুর্গতি নতুন করে কিছু বলার নয়, তবে সম্প্রতি সেই কৃষি তুলনামূলকভাবে কিছুটা উন্নতি করেছে। রাজ্যপাল ডায়াস তাঁর ভাষণে জানিয়েছেন, ভূমি সংস্কারের কাজ দ্রুত করা হবে, ইতিমধ্যেই যেসব আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁর মন্ত্রিসভা দৃষ্টি দেবেন এবং অনতিবিলম্বে তা কার্যকর করা হবে। ভূমিহীন কৃষকদের ভূমি দেবার প্রস্তাবটিও তাঁরা পালন করবেন। যেসব ক্ষেত্রে অন্যায় করে দরিদ্র কৃষকদের জমি নেবার চেষ্টা চলেছে তা বন্ধ করা হবে, জোতদাররা বেনামা করে যেসব জমি রেখেছে তা উদ্ধার করা হবে।

এ ছাড়া শ্রীডায়াসের ভাষণে এই রাজ্যের অন্যান্য সমস্যার কথাও বলা হয়েছে। একটি রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষৎ, রাজ্য শিক্ষা পর্ষৎ, উত্তরবঙ্গের জন্যে উন্নয়ন পরিষদ গঠনের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা সমস্যার প্রতিও

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২২
শনিবার ১৮ চৈত্র ১৩৭৮
Saturday 1 April 1972

তাঁর সরকার নজর দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি বরাদ্দ কমিটি গঠনের কথাও তিনি জানিয়েছেন।

রাজ্যপালের ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের পুনরুজ্জীবনের যে প্রাথমিক খসড়াটি আমরা পাই তা উৎসাহব্যঞ্জক। আশা করি নতুন সরকার এই কাজ এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজে অনতিবিলম্বে হাত দেবেন। আগামী পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি চমকপ্রদ হয়ে দেখা দেবে এমন আশা আমরা করি না, কিন্তু যদি মোটামুটি উল্লেখ করার মতোও হয় তবে জনসাধারণ এই সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
অন্তঃশুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টা ৩৩.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক — টা ৮.২৬

ভারতে
(অতিরিক্ত ডাকে)
বার্ষিক — টা ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৮.৫২
ত্রৈমাসিক — টা ৯.৭৬

বাংলাদেশে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৫৫.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৮.০২
ত্রৈমাসিক — টা ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক — টা ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টা ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৯.০২
ত্রৈমাসিক — টা ১৪.৭৬

বিমান ডাকে বাৎসর
বার্ষিক — টা ১৫৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৩৮.৭৬

পোষা বাঘ!

সিদ্ধার্থশংকর রায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, বিরোধীদল যাতে পূর্ণ মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকারের সঙ্গে বিধানসভায় কাজ করতে পারেন তার সব সুযোগ তিনি দেবেন।

বাদশার সংবাদভাষ্য

একটি মৌলিক গবেষণা

আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, এই দুনিয়ায় দুর্ধর্ষ একটা জাতি আছে। তার নাম "আমরা বাঙালী" জাতি। এই সমরপটু জাতি যে এতদিন কোথায় ছিল, তা ঠিক জানা যায় না। তবে ১৯৭১ সালের মারচ মাসের শেষ দিকে পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় যে প্রথম এই জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটে, সে সম্পর্কে অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই সম্পর্কে নানাস্থান অনুসন্ধান করে নৃতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকেরা যে-সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যায়, এদের রণধ্বনি ছিল, "আমরা বাঙালী, আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না।" এর থেকেই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকাই "আমরা বাঙালী" জাতির উৎপত্তি স্থান।

অবশ্য কেউ কেউ গঙ্গা-দামোদর-রূপনারায়ণ-কংসাবতীর অববাহিকাতেই "আমরা বাঙালী" জাতির উন্মেষ প্রথম ঘটেছিল বলে একটা মত খাড়া করে তার অনুকূলে প্রমাণাদি দাখিলের চেষ্টা করেছেন বটে, এবং একথাও অনস্বীকার্য যে, এক সময় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন সাহেবও এই মত সমর্থন করেছিলেন, তবু ও পরবর্তীকালের গবেষকদের নানা মূল্যবান আবিষ্কার এই মতের অসারতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত পণ্ডিতমণ্ডল নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা করে উঠতে পারেন নি। যথাঃ

(ক) পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে বসবাসকারী "আমরা বাঙালী" এবং গঙ্গা-দামোদর-রূপনারায়ণ-কংসাবতী অববাহিকা নিবাসী "আমরা বেংগলি" (মতান্তরে "আমরাও বাঙালী") এক জাতি কিনা, অথবা

(খ) পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার "আমরা বাঙালী" এবং গঙ্গা-দামোদর-রূপনারায়ণ-কংসাবতী অববাহিকার "আমরা বেংগলি" (মতান্তরে "আমরাও বাঙালী") দুই পৃথক জাতি কিনা?

(গ) এরা উভয়েই এক জাতি এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রমাণঃ উভয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি আধুনিক গান এবং বিলাতে যেতে ভালবাসে।

(ঘ) এরা উভয়ে পৃথক জাতি, এর অনুকূলে প্রমাণঃ পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার "আমরা বাঙালী"-দের জনপ্রিয় নির্বাচনী প্রতীক নৌকা এবং রাষ্ট্রনায়কের অভিধা প্রধানমন্ত্রী আর গঙ্গা-দামোদর-রূপনারায়ণ-কংসাবতী অববাহিকার "আমরা বেংগলি"দের জনপ্রিয় নির্বাচনী প্রতীক গাই-বাছুর এবং রাষ্ট্রনায়কের অভিধা মুখ্যমন্ত্রী।

পক্ষে এবং বিপক্ষে দুদিকেই সমান জোরালো প্রমাণ থাকায় পণ্ডিতগণ অনেক দিন পর্যন্ত কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। তবে অনেক গবেষণা এবং নানা নব নব আবিষ্কারের ফলশ্রুতি স্বরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যে সকল বিষয়ে একমত হতে পেরেছেন তা হচ্ছে এইঃ

(এক) পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার "আমরা বাঙালী" জাতির অভ্যুদয়ের কাল ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের মারচ মাস। কারণ এই সময়েই "আমরা বাঙালী" রণধ্বনি ক্রমাগত আকাশে বাতাসে ওঠে শোনা। "বাঙলাদেশ, আমার বাঙলাদেশ"। এর আগে আর কখনও বাঙলাদেশ নামে কোনও দেশ ছিল, কেউ তা প্রমাণ করতে পারেন নি।

(দুই) পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার "আমরা বাঙালী"রা যে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, সম্প্রতি তাঁদের এক ছিন্ন পতাকা মাটির নিচ থেকে পাওয়া গিয়েছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গিয়েছে, পতাকার রঙ সবুজ এবং তাতে কাস্তের মত চাঁদ আর হাতলবিহীন কাস্তে এবং তার মাথায় তারা, এই চিহ্ন আঁকা ছিল।

(তিন) এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী।

(চার) এদের পুরাণ এবং লোকগাথা বিশ্লেষণ করে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে এ অনুমান করা নিতান্ত অসংগত হবে না যে, দিল্লি নামক মহাপরাক্রমশালী কোনও দেশ থেকে আগত মিত্রবাহিনীর সহায়তা "আমরা বাঙালী" জাতির মুক্তিযোদ্ধারা তাদের শত্রুর মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সমর্থ হয়েছিল।

(পাঁচ) বঙ্গভবনে বিজয় উৎসব করতে নয় মাস সময় লেগেছিল।

আবার এদিকে, গঙ্গা-দামোদর-রূপনারায়ণ-কংসাবতী অববাহিকার "আমরা বেংগলি" (মতান্তরে "আমরাও বাঙালী") জাতির অভ্যুদয়ের যে সময়কাল নির্ণয় করা গিয়েছে, তাতে জানা গিয়েছে, এখানেও মারচ মাসকে উত্থানের মাস বলা হয়। সাল ১৯৭২। এই মাসেই এদিকের অধিবাসীদের মুখে প্রথম শোনা যায়, এই দেশটার ইংরাজী নাম বেংগল এবং তার বাংলা তর্জমা বাঙলা। সেই কারণে কোনও কোনও ইতিহাসবেত্তা এই জাতিকে ঠিক "আমরা বাঙালী" না বলে "আমরা বেংগলি" বা "আমরাও বাঙালী" এই নামে চিহ্নিত করতে চান। এদিকের "আমরাও বাঙালীরা" যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তাদের যে-পতাকা এবং প্রতীক চিহ্ন খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়েছে, তাতেও কাস্তে এবং তারা (হাতুড়ি সহ) আঁকা, তবে পতাকার রঙ গাঢ় লাল। এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এদের পুরাণ এবং লোকগাথা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে জানা গিয়েছে, "আমরা বেংগলি" বা "আমরাও বাঙালী" জাতির মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার ব্যাপারেও দিল্লির কাছ থেকে প্রভূত সহায়তা পেয়েছিলেন। এবং এরাও ঠিক নয় মাস পরে বিধানসভা ভবনে বিজয়োৎসব পালন করে।

এটাও অনেক পণ্ডিতের নজরে পড়েছে, এবং দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন যে "আমরা বাঙালী" এবং "আমরা বেংগলি" বা "আমরাও বাঙালী" এই উভয় জাতির নব অধিনায়কই দীর্ঘ দেহী এবং গলাবাজিতে উভয়ের দক্ষতাই অসাধারণ।

এই সব আপাতত সাদৃশ্যের কারণে বিদেশী পণ্ডিতেরা অনেক সময় ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেন। সেই কারণেই তাঁদের অনেকে মনে করেন, আসলে "আমরা বাঙালী" বলে একটা জাতিই ছিল। "আমরা বেংগলি" (মতান্তরে "আমরাও বাঙালী") সাহেবদের মতে, ইজ্ নাথিং বাট এ রিফ্লেকশন অব দি ফেডারেশন। ১৯৭১ অথবা ১৯৭২ সালের মারচ মাসে এদের অভ্যুত্থান হয়। এই জাতির উঠে দাঁড়াতে নয় মাস সময় লাগে। এবং এরা যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তাদের পতাকার রঙ লাল অথবা সবুজ যাই হোক, কাস্তে এবং তারা হচ্ছে কমন ফ্যাক্টর। এদের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন যাঁর কমন নাম ইন্দিরা। দিল্লি থেকে মদত পেয়ে এরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-ব্রহ্মপুত্র আর গঙ্গা-দামোদর-রূপনারায়ণ-কংসাবতী আলাদা কোনও নদী নয়, এক নদীরই আলাদা নাম। এমন কি "আমরা বাঙালী" জাতির জনগণমন অধিনায়ক শ্রীমুজিবশংকর রায় আর "আমরাও বাঙালী" জাতির মুকুটহীন সম্রাট শেখ সিদ্ধার্থ রহমান দুজন আলাদা ব্যক্তি কিনা আমেরিকান পণ্ডিতেরা সে সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সি পি এম কী করবে?

সি পি এম এখন কী করবে? নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এইটি একটা বড় প্রশ্ন। এ রাজ্যের রাজনীতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা এখন এই প্রশ্নটা নিয়ে নানাভাবে জল্পনা-কল্পনা করছেন। তাঁরা সবাই জানতে এবং বুঝতে আগ্রহী, সি পি এম এখন কী করবে, কোন্ পথে যাবে বা কোন্ লাইন নেবে।

সি পি এম সম্পর্কে এই আগ্রহ অস্বাভাবিকও নয়। সি পি এম এই রাজ্যের সবচেয়ে বড় কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি। সি পি এম এই রাজ্যের সবচেয়ে সুসংগঠিত পার্টি। গত পাঁচ বছরে এই রাজ্যের রাজনীতিতে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর উত্থানও ঘটেছে সি পি এমেরই। এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সম্প্রতি যত ওলটপালট ঘটেছে তাও প্রধানত সি পি এম রাজনীতিকে লক্ষ্য করেই। পর পর দুটো যুক্তফ্রন্ট সরকারের যে পতন ঘটল সেটাও মূলত সি পি এমকে কেন্দ্র করেই। যুক্তফ্রন্টের পতনের পর ১৯৭১ সনে এখানে যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হল তাও মূলত সি পি এমকে আটকাবার জন্যই। এবার পশ্চিমবঙ্গে যে নির্বাচন হয়ে গেল তারও মূল সুর ছিল, সি পি এমকে

কিছুতেই ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না—যে কোনও ভাবে সি পি এমকে হারাতেই হবে।

নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। সি পি এম সামান্য কয়েকটি মাত্র আসনে জিতেছে। এবং, সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, পার্টির কোনও নব নির্বাচিত এম-এল-এ এই বিধানসভায় যোগ দেবেন না—কারণ গোটা নির্বাচনটাই জালিয়াতি করে বানচাল করে দেওয়া হয়েছে।

সকলের মনেই তাই প্রশ্ন উঠেছে, সি পি এম অতঃপর কী করবে, কোন্ পথে যাবে, কোন্ লাইন নেবে?

যদি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে জনসঙ্ঘ বা সোস্যালিস্ট পার্টি বা আদি কংগ্রেস এইরকম আকস্মিকভাবে বিপর্যস্ত হত এবং যদি তারা তারপর বিধানসভা বয়কট করত তাহলে কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে এইরকম কোনও কৌতূহল সৃষ্টি হত না যেমনটা হয়েছে সি পি এম সম্পর্কে। কারণ, ওরা কেউ মারকসবাদী পার্টি নয়। ওরা কেউ আদর্শগতভাবে মনে করে না, সংসদীয় গণতন্ত্র একটা ধাপ্পা। ওরা কেউ মনে করে না, বুর্জোয়া নির্বাচন মানেই ভাওতা। সি পি এম মারকসবাদী পার্টি। বুর্জোয়া নির্বাচন, সংসদীয় গণতন্ত্র—এসবই তার দৃষ্টিতে ভাওতা। গণতন্ত্র কথাটাই মারকসবাদীদের দৃষ্টিতে একটা বড় ধাপ্পা। মারকসবাদীরা বুর্জোয়া নির্বাচনে অংশ নেয় সাময়িকভাবে—একটা কৌশল হিসাবে। তাঁদের তাত্ত্বিক নির্দেশ, যখন আর প্রয়োজন থাকবে না তখনই ভিন্ন পথ নিতে হবে—বুর্জোয়া নির্বাচন বর্জন করতে হবে। বিপ্লব করে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে এগোবার জন্য সাময়িকভাবে মারকসবাদীরা বুর্জোয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল সম্ভব বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা আরও মনে করেন, বুর্জোয়া নির্বাচন এবং সংসদীয় গণতন্ত্র যে ভাওতা সেটা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যও এই নির্বাচন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া প্রয়োজন।

এই জন্যই পশ্চিমবঙ্গের এবারকার নির্বাচনের পরে যখন সি পি এম ঘোষণা করল যে, এই নির্বাচনে পুরোপুরি জালিয়াতি চলেছে এবং এই নির্বাচনের ফলে গঠিত নির্বাচনসভায়ও তাই আমরা যোগ দেব না, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, সি পি এম কী করবে, সি পি এম কোন্ পথে যাবে, সি পি এম কোন্ লাইন নেবে?

*

সি পি এম এখনই যা করবে তা দলের নেতৃত্ব ইতিমধ্যে পরিষ্কার করে জানিয়েও দিয়েছেন। প্রথমত, সি পি এম আপাতত তাদের বিধানসভা বয়কটের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবে। দ্বিতীয়ত, সি পি এম এখন সব শক্তি দিয়ে প্রচার করে যাবে যে রাজ্যের গোটা নির্বাচনটাতেই জালিয়াতি চলেছে। তৃতীয়ত, সি পি এম আস্তে আস্তে তার কর্মীদের আবার সংগঠিত করার চেষ্টা করবে এবং নানা রকমের প্রকাশ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁদের ভয় বা আতংকটা কাটিয়ে তোলার পথ নেবে।

সিদ্ধার্থবাবু নানাভাবে আবেদন-নিবেদন জানাচ্ছেন সি পি এমের কাছে—যেন তাঁরা বিধানসভায় যোগ দেন। কিন্তু এই সব আবেদন-নিবেদনে আপাতত কোনও

[illegible]

তাতে ধরং প্রচারের সুবিধা হত। কিন্তু সি পি এম নেতারা নিশ্চয়ই তা মনে করেন না। যদি করতেন তা হলে তো তাঁরা বিধানসভায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তই নিতেন।

কারু কারু মত, সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ পারটি পুরোপুরিভাবে বর্জন করবে কিনা সেইটা ঠিক হওয়ার আগে পর্যন্ত এই বিধানসভা বয়কটের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। সি পি এমের পারটি কংগ্রেস হওয়ার কথা জুন মাসে। নির্বাচনী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে পারটি কংগ্রেস আরও কিছুটা পিছিয়েও যেতে পারে। পারটি নির্বাচনের আগে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব তৈরী করেছিল এবং তারই পটভূমিতে যে দলীয় কর্মকৌশল স্থির হয়েছিল নির্বাচনের পর তা কিছুটা পাল্টাতেই হবে। তাই রাজনৈতিক প্রস্তাব তৈরী করার ব্যাপারে দলের নেতৃত্বের আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতিটাও আরও পরিস্কার হয়ে উঠবে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন কংগ্রেস সরকার কেমন আচরণ করে তাও দেখা যাবে। দলের ভেতরে যে মতভেদ আছে তাও কিছুটা সহজ হয়ে আসতে পারে। তাই পারটি কংগ্রেস জুনে না হয়ে কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে।

পারটি কংগ্রেসে যদি স্থির হয় যে, না, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় যোগ দেওয়াই উচিত হবে, তাহলে তখন তা করা যেতে পারে। নব নির্বাচিত সদস্যরা বিধানসভায় যোগ দিলেন না বলেই যে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাচ্ছে তাও নয়। বিধিমত যদি তাঁরা পর পর ষাট দিন বিধানসভার অধিবেশনে যোগ না দেন তাহলে একটা প্রস্তাব নিয়ে সভা তাঁদের সদস্যপদ বা প্রতিনিধিত্বের অধিকার বাতিল করতে পারেন। কিন্তু আপাতত তা হচ্ছে না। পারটি কংগ্রেস পর্যন্ত সময় পাওয়া যাচ্ছেই।

এদিকে কিন্তু সি পি এম দেশে এবং বিদেশে নির্বাচনে কারচুপি নিয়ে প্রচার চালিয়ে যাবেই। এইবার তারা বিদেশে প্রচারের উপরও জোর দেবে। তারা আঘাতটা হানছে প্রায় সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর উপর। সি পি এম নেতারা জানেন, যদি তাঁরা

[illegible]

একনায়ক হওয়ার অভিযোগ আনবে।

সি পি এম সংসদীয় পথ পরিত্যাগ করুক আর নাই করুক, এখনই মারদাঙ্গার পথে যাওয়ার মত বোকা সি পি এম নেতৃত্ব নয়। তাঁরা আর সকলের চেয়ে ভাল করে জানেন, দলের শক্তি এখন কতটা, কংগ্রেসের মারদাঙ্গা করার ক্ষমতা আজ কত বেশি এবং পুলিস কতটা সংগঠিত। সাধারণ মানুষও যে এখনই চট করে কোনও সরকার বিরোধী বড় সংগ্রামকে সাদরে গ্রহণ করবে না সি পি এম নেতারা নিশ্চয়ই তাও বোঝেন।

তাই তাঁরা এখনই কিছুতেই বড় সংগ্রামের ডাক দেবেন না। বরং, সুযোগের অপেক্ষায় থাকবেন। ইতিমধ্যে দলের সংগঠনকে আবার মজবুত করার চেষ্টা করবেন। এবং, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন।

সি পি এম অ্যাকসন স্কোয়াডের ছেলেরা কী করবে সেটা সি পি এম নেতৃত্বের

[illegible]

পুরো করবেই। যেকোনও ভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা তাদের মধ্যে জাগবেই। এবং যখন যেভাবে বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা লড়াইয়ের পাচ্ছে না, তখন চোরাগোপ্তা খুনের পথে যাবেই। যে পথে নকশালরা গিয়েছিল। তখন পারটির নেতারা কোনমতেই তাদের সে পথ থেকে ফেরাতে পারবে না।

আর যদি তারা দেখে যে, কংগ্রেসের ছেলেরা বা পুলিস প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়, তাদের কেউ তাড়া করে বেড়াচ্ছে না, তারা স্বাভাবিক সমাজে বসবাস করতে পারছে, তাহলে পারটির নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েও তাদের মারদাঙ্গার পথে নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ, তারা হার্মাদ নকশাল ছেলেদের পরিণতি দেখেছে।

২৬-৩-৭২

নবারুণ গা[illegible]

দেবরাজ

ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন

আইরিশ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে হিমসিম খেয়েছেন অতীতে বাঘা বাঘা বিলিতী রাজনীতিক। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড আর ওয়েলসের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডকে এক সংবিধানের গাঁটছড়ায় বেঁধে রাখতে চেষ্টার কসুর তাঁরা করেননি। কিন্তু আইরিশদের পোষ মানাতে না পেরে তাঁদের মেনে নিতে হয়েছে আইরিশদের স্বাধীনতার দাবি ১৯২০ সনে। কিন্তু আয়ার্লাণ্ড ছেড়ে আসার আগে তাঁরা চেলেছিলেন এক মোক্ষম চাল। আয়ার্লাণ্ডে কাউন্টি অর্থাৎ জেলা ৩২টা। তাদের মধ্যে ২৬টার ওপর স্বত্বস্বামিত্ব ছেড়ে দিলেন বিলিতী সরকার, ছাড়লেন না বাদবাকী ৬টার ওপর। তাঁদের অজুহাত: দক্ষিণী জেলাগুলো স্বাধীনতা চাইলে কী হবে উত্তরের জেলা ছটা তা চায় না; তারা চায় বিলেতের দেশটার মধ্যে থাকতে। ওই ছাব্বিশটা দক্ষিণী জেলা নিয়ে গড়া আইরিশ সাধারণতন্ত্রকে তাঁরা আলাদা স্বাধীন দেশ বলে মেনে নিলেন, কিন্তু ব্রিটেনের টুকরো হিসেবে রেখে দিলেন, ছটা উত্তুরে জেলাকে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড নাম দিয়ে।

ইউনাইটেড কিংডম অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের চার শরিকের এক শরিক উত্তর আয়ার্লাণ্ড হলেও তার কিন্তু একটু আলাদা খাতির আছে। গোটা যুক্তরাজ্যের এক সরকার—এক রাজা বা রাণী, এক মন্ত্রিসভা, এক পার্লামেণ্ট। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস্—কারুরই আলাদা রাজ্যপাল কী প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা, কী পার্লামেণ্ট নেই। উত্তর আয়ার্লাণ্ডের কিন্তু আছে। ১৯২০ সনে আয়ার্লাণ্ড স্বাধীন হবার পর বিলিতী পার্লামেণ্টে আইন পাস করে আয়ার্লাণ্ডের জন্যে দুটো আলাদা পার্লামেণ্ট খাড়া করা হয়েছিল, একটা দক্ষিণের জন্যে আর একটা উত্তরের। সংযুক্তিবাদীরা তা মানলেও মুক্তিকামীরা তাকে আমল দেয়নি। শেষে ১৯২১ সানের ডিসেম্বরে এক চুক্তি হলো ব্রিটেন আর আয়ার্লাণ্ডের মধ্যে ওই ভাগাভাগি মেনে নিয়ে। আয়ার্ল্যাণ্ড স্বীকার করলে ইচ্ছে হলে আলাদা হয়ে যাবার অধিকার উত্তর এলাকার আছে। সে অধিকার খাটিয়ে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ভিন্ন হয়ে এসে যুক্তরাজ্যের শরিক হয়েছে। তার জন্যে আলাদা যে পার্লামেণ্ট গড়া হয়েছিল ১৯২০ সনে তা আর ভেঙে দেওয়া হয়নি। আজও তার নিজস্ব পার্লামেণ্ট, নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী, নিজস্ব মন্ত্রিসভা রয়েছে।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের নিজস্ব অধিকার কিছু থাকলেও সে তো আর স্বাধীন দেশ নয়, বিলেতেরই অঙ্গরাজ্য। পার্লামেণ্টেও জনা বারো প্রতিনিধি নির্বাচিত হন ও এলাকা থেকে, বিলেতের সব আইনকানুনই ও অঞ্চলে খাটে। তবে কতকগুলো সে এলাকার স্বার্থঘটিত ব্যাপারে আইন তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে তার আলাদা পার্লামেণ্ট যাকে বলা হয় স্টরমণ্ট, আঞ্চলিক শাসন চালাবার জন্যে রয়েছে সে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের নিয়ে গড়া মন্ত্রিসভা। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আটপৌরে নাম হচ্ছে আলস্টার। তার সঙ্গে ব্রিটেনের যোগ যারা রাখতে চায় সেই আলস্টার সংযুক্তিবাদী দল শাসন করছে সে এলাকা। আলাদা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের পত্তনের পর থেকে নির্বাচনে তারাই জিতেছে ফি বার। এখন যিনি প্রধানমন্ত্রী সেই ব্রায়ান ফকনারও ওই দলেরই। সাংবিধানিক প্রধান হচ্ছেন লণ্ডন থেকে পাঠানো গভর্নর।

আয়ার্লাণ্ড দুটো ভাগ হয়েছে রাজনীতির ভিত্তিতে নয় ধর্মের ভিত্তিতে। খাস আইরিশ প্রজাতন্ত্রে প্রাধান্য রয়েছে রোমান ক্যাথলিকদের, উত্তর এলাকায় প্রোটেস্ট্যাণ্টদের। বিলেতের লোকরাও বেশীর ভাগই প্রোটেস্ট্যাণ্ট। ঝাঁকের কই তাই ঝাঁকে মিশতে চেয়ে দুটুকরো করেছে আয়ার্ল্যাণ্ডকে। এই ভাগাভাগি কোনও দিনই মেনে নিতে পারেনি আইরিশ প্রজাতন্ত্রের বাসিন্দারা, উত্তর আয়ার্লাণ্ডের ক্যাথলিকরা। প্রোটেস্ট্যাণ্টরা সে অঞ্চলের অবশ্য এই চেয়েছিল। কিন্তু খাঁটি আইরিশ তাদের বলা যায় কিনা সন্দেহ। তাদের বেশীর ভাগেরই পূর্বপুরুষ প্রায় তিন শো বছর আগে স্কটল্যাণ্ড আর ইংল্যাণ্ড থেকে এসে আস্তানা গেড়েছিল আয়ার্লাণ্ডে। আইরিশদের সঙ্গে তাদের ধর্মের মিল তো নেইই, নেই নাড়ির যোগও। ক্যাথলিকদের ওপর তারা চিরকালই অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে আসছে। আজও তা চলছে। আবেদননিবেদন ক্যাথলিকরা বিস্তর করেছে। তাতে কোনও ফল হয়নি দেখে তারা বেছে নিয়েছে হিংসার পথ। খুনোখুনি সেখানে চলছে গোপনেও, খোলাখুলিও। বেগতিক দেখে বিলিতী ফৌজের শরণ নিয়েছেন আলস্টার সরকার। শান্তি তাতে ফিরে আসেনি, অশান্তি বেড়েছে বরং।

মারামারি হানাহানি এমন বীভৎস রূপ নিয়েছে উত্তর আয়ার্লাণ্ডে। যেন দিন নেই যেদিন খুনখারাপি কী বোমাবাজি হচ্ছে না। বিলিতী ছত্রীসেনার গুলিতে ৩০ জানুয়ারি লণ্ডনডেরিতে ১৩ জন নিরীহ ক্যাথলিক প্রাণ হারাবার পর সন্ত্রাসবাদীরা বদলা নিয়েছে খাস ইংল্যাণ্ডে অলডারশটে বোমাবাজি করে। তাতেও নিরীহ লোকেরই প্রাণ গিয়েছে। তাদের বেশীর ভাগই মেয়ে। ২২ মার্চও তারা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে বেলফাস্টের রেল স্টেশন। এ সব কাণ্ড করছে অস্থায়ী আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি। তারা চায় সংবিধানের বেড়াটা ভেঙে দিয়ে আয়ার্লাণ্ডের ৩২টা কাউন্টিকে এক করে মেলাতে। আইরিশ সরকারেরও টনক নড়েছে এই হত্যারাজ কাণ্ড দেখে। দুই আয়ার্লাণ্ডকে এক করে নিতে তাঁদেরও আপত্তি নেই। আপত্তি উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রোটেস্টাণ্টদের। বিলিতী পার্লামেণ্টে তাদের শক্ত খুঁটি রয়েছে। মিটমাট করতে তারা কিছুতেই রাজী নয়।

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পথে আনতে চেয়েছিলেন ব্রায়ান ফকনারকে প্রধানমন্ত্রী হীথ। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে দুবার ফকনার ছুটে এসেছেন লণ্ডনে কিন্তু হীথের আপসের শর্ত মেনে নেননি। বাধ্য হয়েই হীথ চরম পথ নিয়েছেন—ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন দিয়েছেন আলস্টারে। ২৪ মার্চ থেকে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসনের ভার সরাসরি তুলে নিয়েছেন নিজেদের হাতে বিলিতী সরকার, এক বছরের জন্যে সেখানকার সংবিধান মুলতুবি রেখে। এর পর উত্তর আয়ার্লাণ্ডের মন্ত্রিসভা কী পার্লামেণ্টের কিছু করবার ক্ষমতা আর রইল না যদ্দিন না হীথ সরকারের ঘোষণা বাতিল হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী হীথ জানিয়েছেন তাঁর পার্লামেণ্টকে উত্তর আয়ার্লাণ্ডের শাসন চালাবে এখন থেকে একটা কমিশন তাতে থাকবে সেখানকার সব দলের প্রতিনিধি, প্রোটেস্টাণ্টদের তো বটেই, ক্যাথলিকদেরও। হাউস অব কমন্সের নেতা উইলিয়াম হোয়াইটল তার প্রধান হবেন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সচিব হিসেবে। হীথ কথা দিয়েছেন ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে ঝগড়া মিটিয়ে আলস্টারে তিনি শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। সেখানকার বৈষয়িক জীবন নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে দেবেন আর্থিক অনুদান। গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে মাঝে মাঝে লোকের মন জানবার জন্যে। কিন্তু এত করেও উত্তর আয়ার্লাণ্ডকে তিনি টিঁকিয়ে রাখতে পারবেন কী? গৃহযুদ্ধ বাধাবার ভয় দেখিয়েছে প্রোটেস্টাণ্টরা। তারা আসরে নামলে অস্থায়ী রিপাবলিকান আর্মি কী আর চুপ করে থাকবে? দুই আয়ার্ল্যাণ্ড এক না হলে কী গোল মিটবে?

[illegible]

[illegible] এ একটা [illegible] আনন্দবাজার মধ্যে কিছু এর আবেদন [illegible] ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার বিক্রীত নিশ্চয়ই ছিল; তবে সংবাদের [illegible] প্রতিবেদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে আনন্দবাজার পত্রিকা কদাচ কর্তব্য-

[illegible] অবশ্যই শিক্ষিত। কিন্তু [illegible] এর সম্পূর্ণ সম্পদ।

❋

সেই তাৎক্ষণিক সহজবোধ্য কারণেই আনন্দবাজার প্রথমত রাজনৈতিক পত্রিকা। পলিটিক্স না এলে কাগজ চলবে কোন চাকায়? কিন্তু

[illegible] খুঁড়িয়ে আছে [illegible] জাপান কর্তৃক চীনপীড়নের [illegible] প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের খবর প্রথম কে কে করেছিল? গোটা ভারতের সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে। সেই বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পর্কে অতিভাষণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এখন স্বাধিকারসম্পন্ন। এবার সে স্বাধীন হোক। এই স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে। এই স্বাধীনতা শুধু একটা বিদেশী সরকার থেকে নয় বা কোনো স্বদেশী সংস্থা থেকে নয়। একে আহরণ করতে হবে আত্মনিঃসৃত কোনো শক্তিসম্ভার থেকে। রবীন্দ্রনাথ এই শক্তি পরিগ্রহ করেছিলেন তাঁর স্বদেশের হাওয়া আর মাটিতে। আনন্দবাজার পত্রিকাও প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছিল এই বাঙলার মাটিতে ও জলে। আর সবই মিছে কথা। আনন্দবাজার পত্রিকা পুরোপুরিই বাঙালী পত্রিকা, তা নইলে সে কিছুই নয়।

এই বাঙালীত্ব নিয়ে আমার নিজের মনে নানা সন্দেহ আছে। বাঙালীয়ানা বড়ো অশান্ত বস্তু হতে পারে। ইতস্তত আনন্দবাজার পত্রিকা তারও সহায়ক হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার সাম্প্রতিক সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা স্বভাবতই আত্মবিশ্লেষণে অভিনিবেশ আত্মনিয়োগ করেনি। বিজ্ঞাপনপত্রে এমন বিশেষ সংখ্যায় বিচারের চাইতে প্রচারের স্থান নিশ্চয়ই প্রধান। তবে একটি কাগজের সুবর্ণজয়ন্তী সামান্য ঘটনা নয়। কঠোর বিদেশী শাসন প্রতিবাদের একমাত্র উপায় ছিল কাগজী অভিযোগ। আর তার বাহন ছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। তখন এ একটা কাগজ মাত্র ছিল না। ছিল একটা অনির্বচনীয় আশা।

❋

আমার সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার আত্মীয়তার সূত্র বহুকাল পরে কর্মসূত্রে বাঁধিত হয়। তারও বহুবর্ষ আগে আগে রহস্যকাহিনী। আমাদের বাড়িতে ছিল এক চট্টগ্রামী পাচক। সেই তারক ঠাকুরকে একদিন সকালে দেখা গেল খদ্দরের ধুতিতে শোভমান। আগে কাঁথিতে গায়ে কাপড়াবরণ করেছিলেন। কিন্তু তার আগের রাত্রিতে ও রকদাদা চাঁদপুরের সেই স্টুডেন্ট লাইব্রেরিতে বসে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে দীনেশ গুপ্ত, বিনয়, বাদল এদের সবাইয়ের চিঠির নকল করছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে।

এমন আত্মীয়তায় আরম্ভ কোথায়? শেষ কোথায়?

মহা-ভারতের কথা

বুদ্ধদেব বসু

প্রথম খণ্ড

সংকেত

অনু—অনুবাদ
ঈশান—ঈশানচন্দ্র ঘোষ
কঠ—কঠোপনিষৎ
কালী—কালীপ্রসন্ন সিংহ
গী—ভগবদ্গীতা
দ্র—দ্রষ্টব্য
প-ব—পশ্চিম বঙ্গ
বেদান্তবাগীশ—হরিদাস বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য
র-র—রবীন্দ্র-রচনাবলী
রা-ব—রাজশেখর বসু
সং—সংস্করণ

[মহাভারতের অধ্যায়সংখ্যায় সাধারণত কালীপ্রসন্নকে অনুসরণ করেছি, ব্যতিক্রমস্থলে উৎস উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারত ও রামায়ণের শ্লোকনির্দেশ ও মূল সংস্কৃত উদ্ধৃতি অর্থশাস্ত্র (কলকাতা) সংস্করণ অনুসারে। গীতা ও উপনিষদের উদ্ধৃতি উদ্বোধন সংস্করণ থেকে। যেখানে অনুবাদকের নাম উল্লিখিত নেই, সেখানে অনুবাদ আমার।]

১ : বনবাসের শেষ দিন

বনবাসের বারো বছর শেষ হ'য়ে এলো। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে দ্বৈতবনে আছেন—খুব সুখে আছেন বলা যায় না। রাজ্য হারিয়ে দীর্ঘকাল বনে-বনে ঘুরছেন, সেই স্থায়ী পরিতাপের উপর সম্প্রতি একটি নতুন মনোকষ্ট যুক্ত হয়েছে: এই সেদিন জয়দ্রথ হঠাৎ দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন। সত্য, দ্রৌপদীর উদ্ধার বিদ্যুৎবেগে সাধিত হয়েছিলো, আর ভীমের হাতে প'ড়ে সিন্ধুরাজের নিগ্রহও কিছু কম হয়নি—তবু পঞ্চস্বামীরক্ষিত পাঞ্চালীর এই আকস্মিক অপহরণ যে আদৌ ঘটতে পেরেছিলো, সে-কথা ভেবে যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা পাচ্ছেন না। কিন্তু এরও পরে, এমন একটি দিক থেকে পাণ্ডবেরা আক্রান্ত ও পরাস্ত হলেন, যা আমাদের পক্ষে চমকপ্রদ ও তাঁদের পক্ষে প্রায় চূড়ান্ত অপমান।

একদিন এক হরিণ এসে এক ব্রাহ্মণের অরণিকাষ্ঠ নিয়ে পালিয়ে গেলো। সেই মৃগকে নির্জিত ক'রে অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠ-দণ্ডটি ফিরিয়ে আনা—এর চেয়ে সহজ কাজ পাণ্ডবদের পক্ষে আর কী হ'তে পারে? ধ'রে নেয়া যায় তাঁদের যে-কোনো একজনের দ্বারা—এমনকি নকুল বা সহদেবের দ্বারাও—এই কর্মটি অনায়াসে সম্পাদিত হ'তে পারতো, কিন্তু পঞ্চভ্রাতাই একসঙ্গে যাত্রা করলেন, এবং—আশ্চর্যের বিষয়—বহু অস্ত্রক্ষেপ ক'রেও তাঁদের নিত্যভক্ষ্য একটি তৃণভোজী পশুকে বিদ্ধ করতে পারলেন না। আমাদের অস্পষ্টভাবে রামায়ণের মায়ামৃগকে মনে পড়ে, কিন্তু রাম তাকে শেষ পর্যন্ত বধ করতে পেরেছিলেন, যদিও তার ফলাফল মর্মান্তিক হয়েছিলো। এখানে ঘটনাটি অনেক বেশি মৃদু, এবং কিছুটা রহস্যময়—তস্কর-মৃগ নিজেকে রাক্ষসরূপে আত্মপ্রকাশ করলো না, অনুধাবনকারী বীরবৃন্দকে প্রতারিত ক'রে অরণ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। পাণ্ডবেরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে এক বটগাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য উপবিষ্ট হলেন।

মনে রাখতে হবে, এর আগে সার্থকনামা ভীম বহুবার তাঁর দুর্দান্ত পেশীবলের পরিচয় দিয়েছিলেন : আদিপর্বে হিড়িম্ব ও বকরাক্ষসবধ এবং বনবাসের পঞ্চম বৎসরে কুবেরভবনে যক্ষসংহার তার কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। আর ইতিমধ্যে দেব-দুলাল অর্জুনও এমন বহু অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, যা দৈবশক্তিসম্পন্ন ও দুর্বার। অবশ্য এমন নয় যে, এর আগেও তাঁদের কখনো পরাভব ঘটেনি—পাঠকের মনে পড়বে গাণ্ডীবধন্বা একবার এক বনচর কিরাতের বিক্রম সইতে না-পেরে মূর্ছিত হয়েছিলেন, এবং বলবান ভীমসেনকেও এক মহান অজগর বশীভূত করেছিলো। কিন্তু কিরাত ছিলেন ছদ্মবেশী বরদাতা শিব, এবং মহাসর্পটিও শাপভ্রষ্ট নহুষ—পাণ্ডবদেরই এক দূর পূর্বপুরুষ তিনি। দেবতা বা দেবতুল্যের কাছে পরাজয়ে পরাজিতেরও কিছু গৌরব ঘোষিত হয় (কেননা দেবতা যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে স্বীকার করেন সেই মানুষও ধন্য), কিন্তু তুচ্ছ এক মৃগের কাছে নতিস্বীকার, অতি সাধারণ একটি অরণিকাষ্ঠের পুনরুদ্ধার চেষ্টায় ব্যর্থতা—এ যে পাণ্ডবদের পক্ষে কত বড়ো গ্লানিকর ও সন্তাপজনক ঘটনা, তা তাঁদের পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করামাত্র প্রতিভাত হয়। এবং তাঁরা যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে পড়লেন, তাতেও আমরা অস্বস্তি অনুভব করি, মনে হয় এই দেবপুত্র ভ্রাতৃপঞ্চক তাঁদের

বলবীর্য অসামান্যতা হারিয়ে জীবনের প্রাকৃত স্তরে অধঃপতিত হলেন।

কিন্তু একটু পরেই আমরা জানতে পারবো যে তাঁদের এই পরাভবও এক দেবতার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো; সে-দেবতা পেশীবলে বা অস্ত্রবলে নিজেকে প্রকাশ করেন না, তাঁর শক্তির উৎস অন্যত্র।

বৃক্ষছায়ায় ব'সে পান্ডবেরা দু-চারবার বিলাপোক্তি করলেন, তারপর তাঁদের জলতৃষ্ণা অদম্য হ'য়ে উঠলো। নকুল গাছে উঠে অদূরবর্তী জলাশয়ের লক্ষণ দেখতে পেয়ে, যুধিষ্ঠিরের আদেশে জল আনতে গেলেন। বহুক্ষণ কেটে গেলো, নকুল ফিরলেন না। তারপর যা হ'লো, আশা করি কোনো পাঠককে তা মনে করিয়ে দিতে হবে না—যথাক্রমে সহদেব, অর্জুন ও ভীম নারীজনোচিত জলাহরণকর্মে এগিয়ে গেলেন, কেউ ফিরলেন না। অগত্যা উৎকণ্ঠিত যুধিষ্ঠিরকেই ভাইয়েদের খোঁজে বেরোতে হ'লো। অতি রমণীয় এক সরোবরতীরে উপস্থিত হ'য়ে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর 'ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ যুগান্তকালীন লোকপালের ন্যায়' (১) মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ভূমিতে প'ড়ে আছেন। যথোচিত-ভাবে দীর্ঘায়িত শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশের পর যুধিষ্ঠির নিজে যখন সরোবরে নামলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে অন্তরীক্ষ থেকে এক নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হ'লো ;—

> আমি মৎস্যশৈবালভোজী বক, আমিই তোমার অনুজদের প্রেতলোকে পাঠিয়েছি; রাজপুত্র, তোমাকে তাদের অনুগামী পঞ্চম হ'তে হবে, যদি না আমার প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও।
>
> তাত কৌন্তেয়, সাহস কোরো না, এই সরোবর আমার পূর্ব-অধিকৃত; আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পান করো বা জল নিয়ে যাও। (বন : ৩১২)

নেপথ্য-কণ্ঠ শুনে যুধিষ্ঠিরের মনে যেমন মহৎ কৌতূহল জাগলো, তেমনি হৃদয় কেঁপে উঠলো আতঙ্কে; এই দুই ভাবের যুগপৎ সংক্রমণে তিনি এমনকি মাথা-ধরায় পীড়িত হ'য়ে পড়লেন ('সমুৎপন্নশিরোজ্বরঃ)। তবু ধীর ও যোগ্য ভাষায় আজ্ঞাকারীকে বন্দনা ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবন, আপনি কে?' উত্তর হ'লো : (২) 'ভদ্র, আমি যক্ষ, জলচর পক্ষী নই।' আমিই তোমার তেজস্বী ভ্রাতৃবৃন্দকে নিধন করেছি......কেননা তারা আমার বাক্য উপেক্ষা ক'রে জলপানে উদ্যত হয়েছিলো।.....পার্থ, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তাহলে আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপর পান করো বা জল নিয়ে যাও।'

যুধিষ্ঠির সম্মত হ'য়ে সরোবর থেকে তীরে উঠে দাঁড়ালেন; কূটবক্তা যক্ষের চৌত্রিশটি (৩) প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভাইয়েদের জীবন ফিরে পেলেন, আনুষঙ্গিক দু-একটা বরপ্রাপ্তিও ঘটলো। এর পরে বনপর্বের আর একটিমাত্র ক্ষুদ্রাকার অধ্যায় আছে, তাতে পান্ডবেরা পরদিন থেকে অজ্ঞাতবাস উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এ থেকে বোঝা যায়, পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তর-পর্ব বনবাসের অন্তিম বা উপান্ত্য দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো (৪)।

এই ঘটনাটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে মহাভারতের একটি মূল রহস্য বেরিয়ে পড়বে।

২ : 'এক অন্তহীন অরণ্য'

> ......[মহাভারত] এক ভারতবর্ষীয় অরণ্যের মতো বিস্তীর্ণ; তাতে বৃক্ষসমূহ পরস্পরে বিজড়িত ও স্থূলোপ লতাগুল্মে জটিল; বহুবিচিত্র পুষ্পমঞ্জরীতে তা বর্ণিল ও সুগন্ধি, সর্বপ্রকার জীবের তা বাসস্থান। আমরা শুনতে পাই মনোমুগ্ধকর বিহঙ্গধ্বনি, আর সেই সঙ্গে বন্য শ্বাপদের ভীষণ হুংকার; বিষাক্ত সাপ নম্র কপোতের পাশেই কুন্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে থাকে; সেখানে বাস করে দস্যু—বিধিবিধান থেকে মুক্ত, কিন্তু অবিশ্বাস্য কুসংস্কারের দাস; আর সেই সঙ্গে থাকেন ত্যাগপরায়ণ মনস্বী, যাঁর দৃষ্টি জগৎসীমান্তের ঊর্ধ্বলোকে সংহত, এবং যাঁর ভাবনা বহির্বিশ্বের ও তাঁর নিজের অন্তরাত্মার গভীরতম স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। অন্য যে-কোনো ক্ষমতাকে বা ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম ক'রে যায়, এমনি এক অফুরান প্রাণের ঐশ্বর্য এখানে বদ্ধমূল; আর তারই পাশে পাওয়া যায় বহু-সহস্রাব্দ-সঞ্চিত এক গুরুভার ও নিষ্প্রাণ নিদ্রা, স্বপ্নের অতিগভীর সেই তলদেশ, যার মধ্যে আমরাও হয়তো মগ্ন হ'য়ে যেতাম, যদি না দংশনকারী অসংখ্য মক্ষিকাও থাকতো। আর এমনি ক'রে দীর্ঘকাল ধ'রে চলতে পারতাম আমরা, বিস্ময়ের পর বিস্ময় অনুধাবন ক'রে, কিন্তু যাত্রাশেষে কখনোই উত্তীর্ণ হতাম কিনা সন্দেহ (৫)।

জর্মান পন্ডিতের এই বর্ণনায় সম্মতি জানাতে কারোরই আপত্তি হবার কথা নয়। আমরা অনেকেই, কোনো-না-কোনো সময়ে, এই অরণ্যের মধ্যে দিকভ্রান্ত হয়েছি; হারিয়ে ফেলেছি ক্ষীণবঙ্কিম পথরেখার চিহ্ন; কোথায় আছি—কোন দেশে, কোন কালে, কোন লৌকিক বা অলৌকিক সংসর্গে, আমাদের সেই চেতনাটুকুও অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে। অতিপ্রজ, অসংলগ্ন পুনরুক্তিবহুল, নির্বাচনহীন, ভয়াবহভাবে বৃহদায়তন—এগুলোই মহাভারতের প্রাথমিক ও সবচেয়ে প্রতীয়মান চরিত্রলক্ষণ। এর দ্বারা বাঙালি বুধবৃন্দের মধ্যে যিনি সবচেয়ে তীব্রভাবে ও সোচ্চারভাবে প্রতিহত হয়েছিলেন, তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র'-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র; আর পাশ্চাত্ত্য পন্ডিতেরা, গ্রন্থটির মৌলিক বা আংশিক মহত্ত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েও, এই অতি-বিস্তারদোষে কতদূর পর্যন্ত উত্ত্যক্ত উপরোক্ত মন্তব্যের 'দংশনকারী মক্ষিকারাই' তার প্রমাণ দিচ্ছে। সমভাবাপন্ন মৃদু বা রূঢ় ভর্ৎসনার অভাব নেই, কিন্তু আমি আমার স্বীয় বক্তব্যে সত্বর চ'লে আসতে চাই, তাই শুধু একটি কাব্যস্তবক তুলে দিচ্ছি, যার মধ্যে নিখিলপ্রতীচীর মর্মানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। স্তবকটির রচয়িতা ফ্রীডরিখ রুকের্ট, উনিশ-শতকী ভারত-ভক্ত জর্মান কবি, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদক ও প্রচারক। রামায়ণ বিষয়ে তাঁর অভিমত তিনি পদ্যাকারে নিবন্ধ করেছিলেন, আমি গদ্য ভাষায় অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি :

> রামায়ণে যা প্রাপণীয়, সেই সব অস্বাভাবিক বিকৃত মুখভঙ্গি ও ফেনোচ্ছল বাগাড়ম্বরকে অবজ্ঞা করতে হোমার তোমাকে শিখিয়েছিলেন; কিন্তু অমন গভীর অনুভূতি ও উন্নত চিন্তাপর্যায় ইলিয়াড-এ দ্রষ্টব্য নয়।

এই কথা মহাভারত বিষয়ে আরো কত গভীরভাবে প্রয়োজ্য, তা না-বললেও চলে।

মহাভারতকে 'দোষমুক্ত' করার জন্য য়োরোপীয় পন্ডিতেরা দেড়শো বছর ধ'রে সচেষ্ট আছেন, আজ পর্যন্ত সেই প্রয়াসের নিবৃত্তি হয়নি। তাঁদের বহুশ্রমসাপেক্ষ গবেষণার ফলে আজকের দিনে এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত যে মহাভারত (এবং রামায়ণও) আদিতে ছিলো শুধু সূত-কীর্তিত রণকাহিনী, আকারে অনেক ঊনদীর্ঘ, ঘটনাবিন্যাসে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল। পরবর্তী কালে যুগে-যুগে তাতে বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, এবং ব্রাহ্মণেরা—তাঁদের স্ববর্ণ ও

স্বধর্মের গৌরবঘোষণার জন্য—প্রগাঢ় হস্তাবলেপনে মূল চিত্রটিকে কখনো বিকৃত, কখনো অসমঞ্জস, ও কখনো বা মিথ্যার দ্বারা আবৃত করেছেন। এ-কথা অবশ্য অস্বীকৃত হয়নি যে রুকার্ট-কথিত 'মহৎ চিন্তা'গুলিও ব্রাহ্মণেরই অবদান; তবু আধুনিক যুগের খাঁটি ক্ষত্রিয়েরা, অর্থাৎ উত্তরদেশীয়গণ এই ব্রাহ্মণীকরণকে অবিমিশ্র প্রীতির চোখে দেখতে পারেননি। আর সেটাও একটা কারণ, যেজন্যে সংযোজনের আচ্ছাদন সরিয়ে আদিম ক্ষাত্র কাব্যটির পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় তাঁরা অনবরত যত্নশীল। কোন-কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বা নয়, তা নিয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে স্বভাবতই বিতর্ক আছে, কিন্ত মহাভারতের বহু অংশ—এমনকি অধিকাংশই—যে অমৌলিক সে-বিষয়ে কোনো মতান্তর নেই। বঙ্কিমও তাঁর 'আদর্শ মনুষ্য' কৃষ্ণের চরিত্র আঁকতে গিয়ে বার-বার মহাভারতের আদিম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উল্লেখ করেছেন—যেখানেই তাঁর অভিপ্রেত আদর্শের মধ্যে চতুর কৃষ্ণ কোনোমতেই ধরা দিচ্ছেন না সেখানেই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে ধরে নিয়ে সমস্যা চুকিয়ে দিচ্ছেন অতি সহজে, এবং সব সময় বিশ্বাস্যভাবেও নয়।

মহাভারতের স্তরভেদ আমি অস্বীকার করতে চাচ্ছি না, তা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়; বরং আমি বলি শুধু তিনটি কেন, আটটি বা দশটি স্তরপর্যায় থাকাও অসম্ভব নয়, এ-বিষয়ে যথার্থ ও অভ্রান্ত জ্ঞান কখনো লব্ধ হবে এমন দুরাশা না-করাই ভালো। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে গ্রন্থটি এমন বহু কবির সমবায়কর্ম যাঁদের রচনাশক্তি দুস্তরভাবে অসমান, উপাস্য দেবতা ও ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন, এবং জীবৎকাল বহু শতাব্দীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। নইলে কেন এখানে মহনীয় ও তুচ্ছ বিষয় একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের মতো সহবাসী, কেন কবিত্বের তুঙ্গ চূড়া থেকে বার-বার আমরা ধর্মাচ্ছন্ন নিম্নভূমিতে পতিত হচ্ছি, কেন অনুশাসনপর্বে গো-ব্রাহ্মণভক্তি এমন দুঃসহভাবে পুনরাবৃত্ত, আর কেনই বা সৌপ্তিকপর্বের শেষ দুই অধ্যায় জুড়ে স্বয়ং কৃষ্ণ শূলপাণির মাহাত্ম্য বর্ণনা করবেন, আবার শঙ্করের মুখ দিয়েই বা বিষ্ণুমহিমা কীর্তিত হবে কেন (অনুশাসন : ১৪৬)? শুধু তা-ই নয়, অনার্য পশুপতি শিবকে আমরা একবার গো-বন্দনায় ভাবাপ্লুত হতে দেখি (অনুশাসন : ১৩৩), এমনকি কঠোপনিষদের জ্যোতির্ময় যম-নচিকেতাও গোদানের পুণ্যপ্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছেন (অনুশাসন : ৭১)! সমগ্র গ্রন্থটির দিকে বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেও এই বৈষম্য ও বিমিশ্রতা অনুভূত হয়, প্রমাণের জন্য গবেষকের দ্বারস্থ হতে হয় না অথবা সে-প্রয়োজন আছে শুধু অন্যান্য গবেষকদের, আমরা যারা পাঠক ও ভোক্তা আমাদের নয়। মহাভারতের উৎপত্তিকথা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা মেনে নেবার কোনো বাধা আমি দেখতে পাই না (৬)। এ-কথা খুবই বিশ্বাসযোগ্য যে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও প্রসারের পরে এমন একটা সময় এসেছিলো, যখন ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা তাঁদের সুদীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের সংরক্ষণকার্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন—স্মৃতির উপরে আর নির্ভর না ক'রে সুনির্দিষ্ট ও লিপিবদ্ধভাবে। সেই প্রেরণা থেকেই কোনো-একটি অস্পষ্ট-স্মৃত ইতিহাসবিন্দুকে ঘিরে-ঘিরে যুগ-যুগ ধরে সেই গ্রন্থ রচিত বা নির্মিত বা সম্পাদিত হয়েছিলো, প্রাচীনেরা যার নাম দিয়েছিলেন ভারতসংহিতা। এখানে 'ভারত' শব্দে যুগপৎ ভরতবংশ ও ভৌগোলিক ভারতবর্ষ সূচিত হচ্ছে, এবং 'সংহিতা'রও আক্ষরিক অর্থ সংগ্রহ। আত্মরক্ষার তাড়নায় ব্রাহ্মণেরা 'সংহিতা'কে এক সর্বগ্রাহী নির্বিচার ভাণ্ডার ক'রে তুলেছিলেন, সেইজন্যেই আধুনিক দৃষ্টিতে তা এত সমস্যাকীর্ণ ও বিভ্রান্তিজনক।

(ক্রমশ)

১। অনু : কালী।

২। যক্ষ তাঁর প্রথম উক্তিতেই বলছেন : 'আমি মৎস্যশৈবাল-ভোজী বক' এবং যুধিষ্ঠিরও প্রশ্নোত্তরকালে তাঁকে একবার 'বারিচর' ও পরে আর-একবার এক-পায়ে-দাঁড়ানো ('একেন পাদেন তিষ্ঠন্তম্') ব'লে অভিহিত করছেন। কিন্তু যে-রূপে তিনি যুধিষ্ঠির দ্বারা—এবং আমাদের দ্বারা—দৃষ্ট হলেন, তা এক নিদারুণমূর্তি যক্ষের—কালীপ্রসন্নর ভাষায় 'বিরূপাক্ষ মহাকায়, তালসমুন্নত, সূর্যাগ্নিসদৃশ ও পর্বতোপম'। বকরূপী ধর্মের বর্ণনা কোথাও নেই। উপরন্তু প্রশ্নকর্তা সর্বদাই যক্ষ ব'লে উল্লিখিত হয়েছেন ('যক্ষ উবাচ') বকপক্ষীরূপে, একবারও নয়। তবু সংলাপের ভাষা থেকে আমরা ধ'রে নিতে পারি যে, ধর্ম অধিশুধু প্রথম সাক্ষাতের পর একবার বিশালকায় যক্ষরূপে দেখা দিয়ে-কাংশ সময় (এবং প্রশ্নোত্তর-কালেও) বকপক্ষীরূপে স্থিত ছিলেন, ছিলেন সম্ভবত পাত্রের হৃদয়ে অধিকতর ভীতিসঞ্চারের জন্য। এবং নিজেকে ধর্মরূপে ঘোষণা করার পরেও তাঁর যে কোনো রূপান্তর ঘটেছিলো, এমন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না।

এই কাহিনী থেকেই আমাদের 'বকধার্মিক' উদ্ভূত হয়েছে কি? এর কোনো সঠিক উত্তর আমার জানা নেই; শুধু মনে হয় এ-দুয়ে কোনো সম্বন্ধ নেই তা হ'তে পারে না—আর নিশ্চয়ই মনে হয় বনপর্বের ধর্মবকই প্রাকৃত ভাষায় 'বকধার্মিকে' রূপান্তরিত হয়েছে—এ-রকম অর্থবিপর্যয় ভাষায় স্বভাবতই অনেক ঘটে থাকে। কিন্তু মনিয়র-উইলিয়মস-এর সংস্কৃত অভিধানে 'কপটতা' অর্থে বকবৃত্তি ও বকব্রত শব্দ দুটি পাওয়া যায়; তাই ধরণটিকে একেবারে অর্বাচীনও বলা যায় না। আমার মনে হয়, জলের ধারে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে-থাকা বকপক্ষীর মূর্তিতে পুণ্যাত্মা কবি শুধু ধ্যানীর প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু সংসারী লোকেরা কখনো ভুলতে পারেনি যে বক আসলে মৎস্যশিকারে মনোযোগী।

৩। আসলে অনেক বেশি, কেননা শুধু ৭, ২৯, ৩০ ও ৩১ নম্বরে একটি ক'রে প্রশ্ন আছে; অন্যগুলিতে দুই থেকে পাঁচ, আর অধিকাংশে চারটি ক'রে গ্রথিত। আমি কালীপ্রসন্ন থেকে গণনা ক'রে সাকুল্যে একশো-ছাব্বিশটি পেয়েছি। (এই সংখ্যা আর্যশাস্ত্র সংস্করণের অনুরূপ, কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণে প্রশ্নসংবলিত শ্লোকের সংখ্যা তেইশ, ও মোট প্রশ্ন সাতাশিটি।)

৪। এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই, কেননা যুধিষ্ঠির তা প্রাঞ্জলভাবেই যক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছেন। ('বর্ষাণি দ্বাদশারণ্যে ত্রয়োদশমুপস্থিতম্।') বনপর্বের শেষ অধ্যায়ে এবং আরো একবার বিরাটপর্বের আরম্ভে বলা হচ্ছে যে অজ্ঞাতবাসের সময় আগত হ'লো। ('অজ্ঞাতবাসসময়ং শেষং বর্ষং ত্রয়োদশম্'। দ্বাদশেমানি বর্ষাণি রাজ্যবিপ্রোষিতা বয়ম্। ত্রয়োদশোঽয়ং সম্প্রাপ্ত[illegible]।)

৫। **Sexual Life in Ancient India :** Johann Jakob Meyer Routledge and Kegan Paul, London সং ১৯৫২, পৃ. ১। (ইংরেজ অনুবাদকের নাম উল্লিখিত নেই।)

৬। 'পরিচয়', "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা"। যাঁরা রামায়ণ মহাভারত বিষয়ে কৌতূহলী, তাঁদের পক্ষে পুরো প্রবন্ধটি অনুধাবনযোগ্য; বৌদ্ধযুগ ও মহাভারত বিষয়ে র-র, প-ব-সং খণ্ড ১৩, পৃঃ ১৫৩—৫৮ দ্র। রবীন্দ্রনাথের মতে বৌদ্ধ বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন সমাজকে আবার সংবদ্ধ করার জন্যই হিন্দুরা সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর কালনির্দেশ এই কারণেও মান্য যে মহাভারতে জৈন-বৌদ্ধ উল্লেখ [illegible] দু-একবার স্পষ্টভাবেও পাওয়া যায়।

বাংলার ডায়েরি

অমিয় চক্রবর্তী

(এক)

অবিভক্ত বাংলার মাটিতে
জেনেছি প্রাণের দান কত পূর্বপুরুষানুক্রমে
অপূর্ব সংক্রান্তি সেই,
নদীচর কাঁচধান নয়নসবুজে দেখা তীর
ডুবে আছে চেতনায়, উলু-দেয়া বিয়ে, শাঁখ ধূপ
ময়নামতীর গান, গাঁথা সূক্ষ্ম রঙিন সুতোয়
নকশী কাঁথার মঠ, গুরু-মুর্শিদ্যার ভক্ত দোহা,
নমাজ ভজন গাঁয়ে, চৈত্রের চড়কে
চিত্রার্পিত ছায়াতটে মেলা বসে, হাটে হাটে
কদমা বাতাসা স্তূপ, ঢাকাই শাড়ির শিল্পশোভা,
মহরমে দশমীতে দামামা উৎসব, বারোয়ারি।
ইছামতী
কাব্যে বয় রবীন্দ্রের করুণার সৃজনমহিমা,
ঝলমল পদ্মাজলে তাঁরি গানে ভাসা
সোনার তরণী:
গঞ্জঘাটে শস্যপাট চাঁদপুরে
ব্যস্ত পরিতৃপ্ত ছবি-ভরা;
প্রবাসে আমার
স্বপ্নাঞ্জন মাখা সেই ছবি আজো শুভ সত্যতম॥

(দুই)

মধ্যে এসেছিল ঝড়, গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালি
দেখেছি আগুন জ্বালা,
স্বাধীন ভারতে ঐক্য ভাঙা
অলীক ধর্মের ঝাণ্ডা দ্বিভঙ্গ দেশের মর্মে ওড়ে
জিন্না-বুদ্ধি ঘেরা অন্ধকারে;
সেদিন দুঃসহ, তবু, সারা পূর্ব বাংলা গ্রামে গ্রামে
সহস্র শিরায় এক বাংলা ভাষা, হিন্দুমুসলমান
মেঘনীল মেঘনায় তীরহীন একান্ত মাতৃক
বৃহৎ সন্ধান পাবে আপন নিভৃত পরিবেশে—
ছিল সে প্রত্যাশা বুকে, ধনে ধান্যে চাষে ব্যবসায়ে
আহরণে শ্রমে জাগবে বিশ্বজোড়া জাগরণ-দিনে
সমগ্র বঙালী—হায়, সে-ভরসা ছিন্ন বারবার;
পররাষ্ট্র কলোনির প্রভুত্ব প্রত্যহ সয় যারা
তাদের সহায় কে বা, দস্যুর বিদেশী বন্ধুদল
যোগালো মারণ-যন্ত্র, কুবের সোনার থলি খুলে
অবাঙালী দুর্গ গড়ে বাংলার ঐতিহ্যবিরোধী
পাকিস্তানী মন্ত্রণায়;
গুঞ্জরিত
প্রাণের বসন্তদিনে বাংলার মৌ-বনে দিঘিতে
করাল ভয়ার্ত ছায়া,
চতুর্দিকে পশ্চিমী সৈনিক;

কোথায় পীরের সিন্নি, হিন্দু পুজোব্রতে
বাধা পড়ে, তবু ত্রস্ত পদে
তুলসীতলায় চলে গৃহবধূ শান্ত স্নেহময়ী,
দীপ হাতে;
পুরোনো মসজিদে
ক্ষীণধ্বনি মুয়েজ্জিন:
পূর্ববঙ্গ জুড়ে
সবই যেন মূর্ছা ঢাকা: জেল ভর্তি, কণ্ঠরোধ;
আতঙ্কের তলে তলে কারা
আশ্চর্য নেতার নামে জড়ো হয়, আয়ামির দল
মুজিবের মুখে চেয়ে সারা পাকিস্তানে ভোটে জেতে;
সংঘশক্তি মুক্তির নিশানী,
রদ করবে সাধ্য কার?
কাপুরুষ রাষ্ট্র ভেঙে পড়ে।
যুগান্ত জেনেও শেষ বাঙালী-বধের হনাতায়
নরজন্তু ছুটে আসে রাতে—
ঝঞ্ঝা নামে,
এল ঐ
মার্চের পঁচিশে লগ্নবেলা॥

(তিন)

মৃত্যুর তাঞ্জামে চড়ে মরিয়া সঙের আক্রমণ,
প্রমত্তের উল্লম্ফন— শুধু হ'ত পৈশাচিক হাসি
(করাচির ব্যঙ্গযাত্রা), কিন্তু তারা
যতই ইতর হোক, ইমান ইজ্জতহারা তারা
টিক্কা-ইয়াহিয়া দলে হুক্কাহুয়া ওরা শত শত
গ্রাম বন, বসতির নগর দোকান, খেত মাঠ
জ্বালিয়েছে বাংলাদেশে, কোটি নির্বাসিত, হত,-
ভয়ঙ্কর রঙ্গ শেষে হার মানে ওরা পশুপাল
কিন্তু কী দারুণ মূল্য দিতে হল মানুষের দামে
(মহার্ঘ জল্লাদপর্ব ওদেরো ক্ষতির তহবিলে)
ইতিহাসে এ ঘটনা কোনোদিনই হবে সহনীয়?

সমুদ্রপারের ব্যথা বুকে নিয়ে বাঙালী—ভারতী
গিয়েছি ঢাকায়, দুদিনেই
যা জেনেছি, দেখি চোখে, শুনেছি যা সর্বজন কাছে
কথায় বলার সাধ্য নেই—
ভাগ্য তবু খুলে গেল স্বর্ণদ্বার অন্ধকারে
যখন মুজিব মুক্তি পেয়ে
এসেছেন ফিরে, জয়ী নিজ বাংলাদেশে:
নারদ নারদ ব'লে যারা যুদ্ধে যোগালো ইন্ধন
আগ্নেয় রসদ আর রণতরী মূঢ়ের বিক্রমে
প্রচুর মিথ্যার যোগে—
তাদের মুখেতে কালি, কিন্তু তাতে শান্তি নেই
এ তো জয়-পরাজয় মান আর অপমান নয়
এ যে সাক্ষী বাঙলাদেশে চরম পরীক্ষা সন্ধিক্ষণে—
সমস্ত মানবজাতি দেখেছে বিপদ, ক-টি দেশ
মেনেছে মিত্রের ধর্ম? (মুষ্টিমেয়) আজ তাই
শুধু বাঙালীকে নয়, ভারতী চরম সভ্যতাকে—
তারো চেয়ে বেশী আজ সমস্ত মানবসভ্যতাকে
বলা চাই: সাড়া দাও, কার কবে পালা শুরু হবে:
প্রতিকার আনো প্রস্তুতির;
স্বাধীন দেশকে নতি দিয়ো,
ইন্দিরা গান্ধীকে আর ভারতের বীর ত্যাগীদের।
নতুন যুগের ধর্মী পাকিস্তানী তোমরা এসো কাছে,
প্রকাণ্ড উৎসবে আজ সবে মিলে জানাবো স্বীকৃতি।
গড়ে তুলব ভাঙা ঘর, সর্বহারা জনতাজীবন,
পৃথিবীর বায়ু আয়ু রঞ্জিত প্রাণের মহাবলে
বাজাবো মুক্তির শাঁখ।
ক্ষমা চাই, সেরা পাপীদের শাস্তি চাই
মহাজাতি বিচার-সভায়,
করুণার বীর্যে যেন মাতৃভাষা অমৃত বন্ধনে
বাঁধা পড়ি আনন্দে গৌরবে—
রবীন্দ্রনাথের বাংলা যেন জেগে ওঠে, জেগে থাকে॥

ন্যুপলচু
১৬ মার্চ, ১৯৭২

সমুদ্রের কাছে

নিখিল চন্দ্র সরকার

[পরিকল্পনাটা গণেশের। ওরা তিনজনই, গণেশ কেষ্ট আর মদন একদিন স্কুলের সহপাঠী ছিল। ওখান থেকেই ওদের বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা। গণেশ ওর মামার বাড়ি থেকে পড়াশুনো করেছে। মামার অবস্থা খুবই ভাল। গণেশের সঙ্গে ওরাও কখনো-সখনো ওই বাড়ির ভেতরে গেছে। ওর মামার ওষুধের বিরাট দোকান বাগরী মার্কেটে, ওতেই এত পয়সা। পাস করে কলেজেও ভর্তি হয়েছিল গণেশ, কদিন যেতে না-যেতেই আবার ছেড়ে দিয়েছে। ওর যুক্তি হলো, "পড়াশুনো করে আর কি হয়, মামার বিজনেসেই ঢুকে পড়বো এবার।" এর পর সত্যিসত্যিই একদিন ওষুধের ব্যবসায় লেগে গেল ও। তারপরও ওর সঙ্গে মদনের কেষ্টর দেখা হয়েছে। এতে অন্তরঙ্গতা, যা সচরাচর দেখা যায় না, আরো বেড়েছে, কমেনি। গণেশ এখন প্রচুর পয়সা করেছে, মামা গত হয়েছে, বলতে গেলে সে-ই এখন আসল মালিক। তবে ওর চেহারায়, চোখের কোলে কিছুটা সাংসারিক জটিলতার ছাপ ফুটে উঠেছে, বিষয়ী মানুষ হলে সাধারণত যা হয়; মনের সুখ যেন এতে কমেছে, দুশ্চিন্তা বেড়েছে।

আই এ পাস করে মদনও একদিন পড়াশুনো ছেড়ে দিল। ওর বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য, কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিল না তখন। বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়েছিল। পাঁচ ছ' বছর পর আবার একদিন, একেবারে আচমকাই এসে হাজির হয়েছে। ততদিনে তার বাবাও মারা গেছে। শেষের দিকে পারিবারিক অনেক অশান্তি কষ্ট নিয়ে নাকি তার বাবা একটু তাড়াতাড়িই চলে গেল। মদন তখন একটা অফিসে কাজ করে।

কেষ্টই শেষ পর্যন্ত পড়াশুনোটা চালিয়ে গেছে, বি এ পাস করেছে। ওর মুখটা সব সময়ই কেমন বেজার হয়ে থাকত। জিজ্ঞেস করলে বলত, "বাড়িতে অসুখ।" ওর দেশ ছিল বাঁকুড়ায়। কেষ্ট কলকাতায় ওর দাদার কাছে থেকে পড়াশুনো করেছে। পাস করে গ্রামেই ফিরে গেছে সে, একটা স্কুলে কাজ করে এখন। মনের দিক থেকে দিন দিনই কেমন যেন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ছিল ও। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে, এলে অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়। কেষ্ট কি এক কাজে তখন কলকাতায় এসেছে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো, কথায় কথায় এক সময় সমুদ্র দেখার কথাও উঠল। গণেশই কপিলাশ্রমের কথা বলেছে। সকলেই তাতে রাজী হয়ে গেল। আসলে ওরাও অনুভব করছিল, ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে মনের ওপর যেন কেমন মরচে পড়ে যাচ্ছে ওদের। সংসারের একঘেয়েমি আর ভাল লাগছিল না। মোটের ওপর তিন বন্ধুতে মিলে অনেক দিন পর একটু ফূর্তি করা।]

ওরা যখন এসে পৌঁছলো এখানে, সূর্য তখন আরো ঢলে পড়েছে। পথে আসতে আসতে সারাক্ষণ এলোমেলো বাতাস আর রোদ্দুর খেয়েছে ওরা, সঙ্গে প্রচুর ধুলো-বালি খড়কুটো। মাথায় শরীরে সেই বালি ময়লা ঘামের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে ছিল অনেকক্ষণ, একটা অস্বস্তি, বালির দানাগুলো কিরকির করছিল।

সময়টা চৈত্রের শেষ। এলোমেলো বাতাস, শুকনো পাতা, ঝরা মুকুল, বালি-টালি মিলে মিশে ছোট ছোট বৃত্ত রচনা করে

বিবর্ণ ক্লান্ত রোদ্দুরের মধ্যে বাতাসের সঙ্গে উড়ছিল। কী এক নেশা যেন সর্বত্র ছড়ানো। এর মধ্যেই ওরা জিরিয়ে নিল। হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করেছে। আকাশে রঙের সমারোহ দেখল, যেন সদ্য কেউ আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে সেখানে। পাখিদের দল বেঁধে ঘরের পথ ধরা, কূজন, আমের মুকুলে মৌমাছিদের ভিড়—সব কিছুই কেমন আবেশ-মাখা চোখ দিয়ে দেখেছে। সূর্য ডুবল, আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে এক সময় ওরা সমুদ্রের খুব কাছাকাছি বালির ওপর শতরঞ্চ বিছিয়ে হাত পা ছড়িয়ে গোল হয়ে বসল। ঢিলেঢালা ভঙ্গি। সামান্য পরে সমুদ্রের ভেতর থেকে চাঁদটা উঠে এলো। দেখতে দেখতে অন্ধকার মরে গেল, নরম আলোয় সব ভরে উঠেছে। সেই জ্যোৎস্না ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে ফুটেছে। মাঝের ছায়াটা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছিল। ফুটফুটে আলোয় জায়গাটা এখন ভেসে যাচ্ছে। ঢেউগুলোও আলোয় মাখামাখি হওয়ার জন্যে এখন খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বিস্তৃত বেলাভূমিকে জ্যোৎস্নামাখা সমুদ্র বলে ভুল হয়। বাতাস এখন আরো জোর হয়েছে, বালি উড়ছে, সমুদ্রের গর্জন ক্রমশই বাড়ছে, ঝাউবনের চেহারাটা এখান থেকে কেমন যেন এক অস্পষ্ট ধূসর মায়ালোক বলে মনে হচ্ছিল।

ওরা সিগারেট ধরাতে গিয়ে পর পর কয়েকটা কাঠি নষ্ট করল। তারপর নীচু হয়ে উল্টো দিকে মুখ নিয়ে প্রথমে গণেশই সিগারেট ধরিয়েছে। পরে ওরাও একে একে ধরাল।

সিগারেট টানতে টানতে মদন এক ফাঁকে বলল, "আজ তা হলে এখানেই রাত্রিবাস?"

"কেন, তোর ভয় করছে নাকি?"

"মোটেই না।" সিগারেটে জোরে জোরে কটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বলল, "তোর ওই বিলিতীটা একবার সামনে রাখ না দোস্ত, রাখলেই দেখবি ওসব ভয়-ফয়, ম্যাজ-ম্যাজ ভাব কোথায় পালিয়েছে।"

"রাখবার জন্যেই তো আনা।" গণেশও ধোঁয়া গিলতে গিলতে গভীর আবেগ নিয়ে সামনের দিকে তাকায় একটু সময়, পরে বলল, "মাইরি দেখ, সমুদ্রের বাহারটা একবার দেখ শুধু।" একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে বলে, "বুঝলি, এমন সমুদ্র, চাঁদের আলো হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু এই নির্জনতা? এর টানটাই আমার কাছে বেশী ছিল।"

"এর আর তুলনা নেই মাইরি তুলনা নেই।"

"এমন চাঁদের আলোয় মরি যদি সেও ভাল।"

"আমার যে ভাই মরে যেতে ইচ্ছে করছে!"

"ঠিক আছে, পরে মরিস, আগে চোখে-চোখে দে, এসব তো ভুলেই গেছি।"

"আমার তো শালা এখনই মা কালী হয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে রে।"

"নাচ না, কে বারণ করছে তোকে মা কালীই হ, আর বাবা ভোলানাথই হ, কেউ দেখতে আসছে না।"

মুহূর্তের মধ্যে মদন উঠে দাঁড়িয়েছে, বোঁ করে এক চক্কর পাক খেয়ে নাচের ঢঙে ঠোঁট কামড়ে কামড়ে অঙ্গ দুলিয়ে হাত-মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে সুর করে গাইল, 'কে বিদেশী, মন উদাসী।' আবার বসে পড়েছে মদন।

ওরা তিনজনাই হাসিতে ফেটে পড়ল। কি আশ্চর্য, সমুদ্রের দামাল বাতাস এসে মুহূর্তের মধ্যে শব্দগুলো কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

কেষ্টর মুখে তখনো সামান্য হাসি লেগে রয়েছে, বলল "যা একখানা দেখালি না মাইরি, উর্বশী মেনকাও হার মানে।"

"সবই জায়গার গুণ।"

"পেটে না পড়তেই এই, পড়লে দেখছি মা কালীই হতে হবে আজ।"

"তাই হবো, নাচবো, চেঁচাবো, আমাদের যা খুশি আজ করতে পারি, কেউ বলনেঅলা নেই; আমরাই এখানকার অল ইন অল।"

কেষ্ট যেন কি ভাবছিল, পরে মুখ তুলে বলল, "অনেক দিন পর আবার সব ভাল লাগছে: সংসারটা যেন আমায় একটু একটু করে মেরে ফেলছিল। খুব ফাঁকা, ফ্রি লাগছে এখন।"

"ক'দিন ধরে আমারও আর কিছু ভাল লাগছিল না, মন বসাতে পারছিলাম না; আমার মামাকে খালি স্বপ্ন দেখছি।" গণেশ যেন মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

"ওসব স্বপ্ন-টপ্ন বড় বাজে জিনিস রে, কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। এক সময় আমাকেও পাগল করার দশা করেছিল।" সামান্য সময় চুপ করে থেকে মদন কি ভেবে নিল যেন; আবার বলল, "এখানে এসে আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা যেন হঠাৎ কমে গেছে।"

গণেশ এবার মুচকি হাসল, "জায়গাটা তাহলে কিরকম একবার বেছেছি বল!"

"সে আর বলতে, সিম্পলি ওয়ান্ডার-ফুল।"

"তুই না বললে তো আমরা এখানে আসতুমই না।"

"দেখেছিস, লোকের ফালতু হ্যাংলামিটা এখানে নেই।"

"সেজন্যেই তো আসা রে; লোকজনের ভিড় আর আমার একদম ভাল লাগছিল না।" গণেশ আরো কি যেন ভাবছিল তখন।

মদন আবার একটা সিগারেট ধরাল, খানিকটা ধোঁয়া গিলে নিয়ে বাকিটা নাক মুখ দিয়ে বের করে দিতে দিতে হাসল একটু, হেসে বলল, "এর আর একটা দিকও আছে।"

ওরা একদৃষ্টে মদনের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মদন সিগারেটের টুকরোটা ঠোঁটের ডগায় ছুঁইয়ে রেখেছে ছোট করে একটা চোকুর তুলল, ওদের চোখের দিকে চাইতে চাইতে শেষে বলল, "সমুদ্রকে সমুদ্র, তার সঙ্গে আবার ফাউ, ফিফটিফোর্টি পুণ্যি; এটা কিন্তু আমাদের এক্সট্রা লাভ।" মদন এবার জোরে জোরে হাসল।

"কি আমার পুণ্যিঅলারে! আমাদের পুণ্যি ওই যে গণশার ব্যাগটা দেখছিস, ওখানে।"

"তুই কী রে মাইরি! জানিস না তো, এখানে এলে সব তীর্থের ফল হয়, এর জলে একবার ডুব দিলে নাকি সব পাপ-টাপ ধুয়ে-মুছে যায়!" বোঝা গেল না মদনের গলায় কোন রহস্য ছিল কিনা।

"আমরা তো তাহলে ঠিক জায়গায়ই এসে পড়েছি।"

"ঠিক জায়গায়ই বটে!" কেষ্ট হাসল, কি ভেবে পরক্ষণেই শুধোলো, "আমরা এখন কোথায় আছি বল তো?"

"কোথায় আবার, কপিলাশ্রমে, একেবারে সমুদ্রের মুখোমুখি!"

"ছাই, এটা আসলে পাতাল।"

"পাতাল?" গণেশ অবাক চোখে চেয়ে থাকে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই পাতাল।" একটু চুপ করে থেকে আবার কেষ্ট বলে, "দেখলি না, মন্দিরে কপিলমুনি, ভগীরথ, গঙ্গা, অশ্বমেধ যজ্ঞের সেই অশ্ব; এগুলোরই মূর্তি।"

"এখানেই তো সগররাজার ছেলেগুলো মরে ছাই হয়ে গিয়েছিল, তাই না?" মদন চোখ তুলে চাইল একবার।

"সোজা কথা, ষাট হাজার ছেলে!"

"ওই ইন্দ্রটা মাইরি পয়লা নম্বরের হারামি, ও-ই তো যজ্ঞের ঘোড়াটা চুরি করে এনে এখানে রেখে দিয়েছিল! মাঝখান থেকে বেঘোরে এতগুলো ছেলের প্রাণ গেল।"

"একটা জিনিস ভুল করছিস, আসল গল্পটা কিন্তু এখানে নয়; তুই যা বলছিস, ওটা গল্পের ওপরের অংশ, ভেতরটা অন্য-রকম।" কেষ্ট ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে কি ভাবল নীরবে।

"সেরেফ গ্যাঁজা।" গণেশ হাসল।

"প্রথমে অবিশ্যি তাই মনে হয়।" কেষ্ট ওদের মুখের দিকে চেয়ে সামান্য হাসে, একটু পরে বলল, "একটা কথা তুই ভাব, ষাট হাজার ছেলে, কখনো তা সম্ভব? শুধু তাই নয়, ওরা ঘুরতে ঘুরতে কিনা শেষে এই পাতালে এসে হাজির!" কেষ্ট একটা সিগারেট ধরাল আবার, জোরে জোরে করেকটা টান মেরে হাসল, বলল, "বুঝলি, ওই ঘোড়াটাই সব কিছুর মূল। গল্পের খুঁতিরেই ওটা এসেছে। আমারও প্রথমটায় মনে হয়েছে, একটা ঘোড়াকে নিয়ে এত বড় একটা কাণ্ড, কিরকম ঘোড়া! পরে ভেবে ভেবে আমার মনে হলো, আসলে ওটা আমাদের কাছে বাবতীয় স্থূল লোভের, ভোগের বস্তু, ওর জন্যেই শেষ পর্যন্ত আমাদের নরকে যেতে হয়, নরক মানেই তো পাতাল: আর এখানেই আমাদের মৃত্যু। এই চাওয়ার কখনো শেষ নেই। এমনি করেই আমরা এক বড় পাপের মধ্যে ডুবে যাই, হয়ত আর ফেরা যায় না এখান থেকে।" একটু চুপ করে থেকে ও বলল, "আমার তো মনে হয়, গল্পটা আমাদেরই গল্প, ইন্দ্র বেচারীর আর দোষ
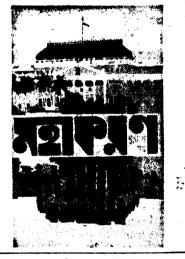
কি, ও একটু মজা করতে চেয়েছিল।" কেষ্ট এবার হাসল।

ওর কথা শুনে মদন হো হো করে হেসে উঠেছে। গণেশ হাসতে গিয়েও হাসল না। বলল, "দারুণ একখানা দিয়েছিস তো।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বলল, "আমার ভাবতেই এখন গা কেমন ছমছম করছে রে, আমরা তাহলে পাতালে!"

মদন রগুড়ে গলায় বলল, "পাতালটা তাহলে এখানে ছিল না ভাই।"

"পাতালই দেখছি আমাদের আসল জায়গা!" গণেশ কি ভেবে যেন হাসল, ওর গলায় মনে হলো আরো কী রহস্য ছিল। আবার সিগারেট ধরায় সে, ধোঁয়া ছেড়ে একটু লঘুভাবে বলল, "জানিস তো, এখানে এলে কিছু একটা দিতে হয়!"

"সে তো মেলার সময়।"

"তার কোন মানে নেই।"

মদন কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে, হাতের মুঠোয় বালি নিয়ে সামনের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করছিল। একটু পরে উঠে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে এবার চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, "ওসব দেওয়া-ফেওয়ার মধ্যে নেই, সব জায়গায়ই মাইরি ঘুষের কারবার।"

কেষ্ট যেন তখন গভীরভাবে কি ভাবছিল, বলল, "কি দেবো, দেওয়ার মতন তো আনিনি কিছু।" তার কণ্ঠস্বর কেমন ক্ষীণ শোনাল।

মদন সোজা হয়ে উঠে বসেছে, গণেশের মুখের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলল, "ওসব আজেবাজে কথা ছাড় তো, তোর ওই বোতল বের করবি কিনা আগে বল।"

"সবে তো সন্ধ্যে, আর একটু রাত হোক!"

"ধ্যাৎ—!" মদন সটান উঠে এসে ব্যাগ থেকে বোতলটা বের করে নিয়ে এসে সামনে রাখল, "পেটে না পড়লে কি আর রসের কথা বেরোয়!"

হাত বাড়িয়ে গ্লাসগুলোও বের করে আনে গণেশ। বোতলের মুখটা খুলে ফেলেছে সে, তিনটে গ্লাসেই সেই হুইস্কি ঢালল, জল মিশিয়ে নিল খানিকটা করে। তিনজনই এবার সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসেছে। ভয়ংকর এই সমুদ্র, গর্জন, বাতাস; জ্যোৎস্না ওদের মনের ভেতরে একটু একটু করে তখন নতুন এক নেশা বিস্তার করছে। ওরা চুপচাপ নেশা করছিল।

একটু পরে খেয়াল হলো যে, ওরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলেনি। সামান্য নড়ে-চড়ে বসল, পরে গণেশই সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, "নাঃ, এভাবে চুপচাপ থাকতে ভাল লাগছে না, কিছু কথা-টথা বল তোরা!"

"কথাগুলোরও তো ক্লান্তি-টান্তি আছে, তখন থেকে তো সমানে বকবক করেই চলেছি।"

"সবে তো সন্ধ্যে সাতটা, মনে আছে, সারা রাত্তির এখানে কাটাতে হবে!"

"এক কাজ করলে তো হয়!"

"কেমন?"

"যেমন এসব কথায়-কথায় কিছু হবে না; তার চেয়ে আমাদের তিনজনকেই একটা একটা করে গল্প বলতে হবে, এই করতে করতেই রাত কাবার হয়ে যাবে।"

"ঠিক বলেছিস তো।"

"কে আগে শুরু করবে শুনি?"

"করলেই হয় একজনকে সবাইকেই তো বলতে হবে।"

"তা হলে গণেশই আগে শুরু কর।"

ওরা আবার কিছু সময় নীরব থাকল। যেখানটায় ওরা বসেছে তার কা হাত দূরেই সমুদ্র। কিছুক্ষণ অনিমেষে এই অশান্ত সমুদ্রকে দেখল। মনে হচ্ছিল, এখানেই যেন ওরা বহু বছর ধরে বসে আছে, আরো অনেককাল এইভাবেই বসে থাকবে। সমুদ্র যেন ওদের আর উঠতে দেবে না এখান থেকে। একটু অবাধ্য হয়েছে কি, অমনি হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে ভেতরে। সারাক্ষণ ওদের ওপর সমুদ্রের সতর্ক দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে। কখনো মনে হয়েছে, কোন এক শক্তিমান জাদুকরের সামনে এসে পড়েছে ওরা, ফেরার আর উপায় নেই। নিজেদের ক্ষমতা, মর্যাদাবোধ সব যেন একটু একটু করে কেমন হারিয়ে ফেলছে, কেমন অবশ আলগা হয়ে আসছে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বুকের ভেতরটা গুরুগুরু করে উঠল গণেশের। এ কি! ভীষণভাবে চমকে উঠল

"অন্যায় হয়ে গেছে, আর হবে না" ইত্যাদি কাকুতি-মিনতি যা হয় আর কি। মামা আমার বাবার নাম ধরে গালিগালাজ করল, তাও আমি হজম করে নিয়েছিলাম যাই হোক, মামা আমাকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেছিল, কিন্তু আমি এ অপমান ভুলতে পারিনি, আর তখন থেকেই আমিও একটু আধটু নেশা ধরেছি।" এ পর্যন্ত বলে গণেশ থামল, গ্লাস শূন্য, আবার মদে তা ভরিয়ে নিয়েছে। কথাগুলো ধীরে ধীরে সে বলে গেছে। একবার ওদের মুখের দিকে তাকাল ও, ওরাও কিছু বলছে না, কেমন যেন অবাক আচ্ছন্ন চোখে সামনের দিকে চেয়ে আছে। এই ভরা নেশা-নেশা জ্যোৎস্নায় ওদেরও এখন অন্যরকম লাগছে। সমুদ্রের এই একটানা শব্দ যেন ওদের কেমন অচৈতন্য স্তব্ধ করে রেখেছে। গণেশ চোখ সরিয়ে আনল কি ভেবে, গভীরভাবে পরের কথাগুলো ভেবে নিল আর একবার। সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছে ও পরে আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করল, "আমার মামাও নেশা করত, নাম-করা খাইয়ে। ছোটখাটো অসুখ-বিসুখ তার প্রায়ই হতো। মামার চেহারাটাও শেষের দিকে ভেঙে পড়েছিল। এমন সময় একদিন বড় রকমের অসুখে পড়ল মামা, মদ খাওয়া একদম বারণ। মামা ছটফট করত, একটু ভাল থাকলেই লুকিয়ে-টুকিয়ে এনে দেওয়ার জন্যে আমায় কাকুতিমিনতি করত। আমিও এনে দিতাম। আমার লোভ তখন অন্য জায়গায়।" গলাটা কাঁপল গণেশের। কপালে চুলের গোড়ায় বুকের ওপরে গুঁড়ো গুঁড়ো ঘাম জমেছে, চোখ দুটো কেমন ঘোলা-ঘোলা দেখাচ্ছে, সিগারেট ধরার আবার, বুকের ভেতরটা ধকধক করছে, সিগারেটের আগুনটা কাঁপছিল একটু একটু। সামান্য ধোঁয়া গিলতে গিলতে আবার মুখ তুলল গণেশ, বলল, "আমার মাথায় তখন বদ চিন্তা ঢুকেছে, মামার বাড়িতে আমাদের কোন সম্মান ছিল না; আমি ঘুমোতে পারিনি ক' রাত্রি; এসব আমায় কি পেয়েছে! মামার সামনে দাঁড়াতে আমার ভয় করত, গলা শুকিয়ে আসত কথা বলতে গিয়ে, আমার মাথা ঘুরত। একদিন—বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি, অন্ধকার, রাত একটু গভীর হয়েছে, মদের সঙ্গে বেশী মাত্রায় ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। মামার সেই ঘুম আর ভাঙল না, আমিও তা জানতাম। এর পর আমায় মাথা ঠাণ্ডা করে একটার পর একটা কাজ করে যেতে হলো। আমার মামীমা কিছুটা টের পেয়েছিল অমিতকে নিয়ে তাই একদিন নবদ্বীপ চলে গেল, মামার সেখানেও একটা বাড়ি ছিল। পুরো বিজনেসটাই আমার হাতে চলে এলো একদিন। আরো অনেক টাকাকড়ি আমি ইতিমধ্যে করেছি। ইদানীং একটা কথা কেবলই আমার মনে হয়েছে, এজন্যেই কি মামাকে আমি খুন করেছিলাম, না আরো কিছু ছিল? আজ কিছু দিন ধরেই মামার মুখটা খালি ভেসে ভেসে উঠছে। কোন কোন মুহূর্তে আমি কথাগুলো বিশ্বাসী কাউকে বলে হালকা হতে চেয়েছি, পারিনি, পারিনি বলতে ভয় হয়েছে, বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে উঠেছে। আমি অকৃতজ্ঞ, খুনী। আজ এতদিনের সেই বোঝাটা আমি সরাতে পেরেছি, পেরেছি।" সিগারেটের টুকরোটা পড়ে গেল হাত থেকে। [illegible] এই মুহূর্তে ঢেউগুলো আরো [illegible] ছড়িয়ে গেল। অপলকে সেদিকে চেয়ে থাকল ও। এক সময় সমুদ্রকে উদ্দেশ করে বিনীত ভঙ্গিতে মনে মনে বলেছে : অনেক দিন ধরে এই পাপ আমি একা একা বয়ে বেড়িয়েছি, আর নয়। তোমার কাছে নতজানু হয়ে আজ আমার এই গোপন অপরাধ রেখে যাচ্ছি, গ্রহণ করে আমাকে শাস্তি দাও, শাস্তি দাও। বিমূঢ় অভিভূত ভঙ্গিতে বসে থাকল গণেশ।

কেউ আর কোন কথা বলল না কিছুক্ষণ। যেন হাতড়ে হাতড়ে মনের অতল থেকে ওরাও কিছু তুলতে চাইছে। ভরা পাত্র কখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। আবার তা পূর্ণ করে নিল। রাত্রির নিঃসঙ্গতা যেন এখন আরো বেড়েছে, জ্যোৎস্নার রঙ ধবধবে, সমুদ্রও আরো মাতাল, অশান্ত, আরো যেন কি চায়, শব্দের তরঙ্গ বুঝি সমস্ত চরাচরকে গ্রাস করেছে।

কেষ্ট কি ভাবতে ভাবতে ডুবে গিয়েছিল। এই পরিবেশ আজ ওদের অনেক দূরে টেনে নিয়ে চলেছে, এই মুহূর্তে ফিরে যাওয়ার আর কোন শক্তি নেই ওদের। ওরা যেন আর কোনকালেও এখান থেকে ফিরতে পারবে না। এ সেই ভয়ংকর পাতাল, লোভের বস্তুটা খুঁজতে খুঁজতে আজ এখানে এসে পড়েছে। বুকের ভেতরে কী এক ভয় যেন নড়ে উঠল। এখানে যেন কারা ঘোরাফেরা করছে, তাদের অতন্দ্র দৃষ্টি! দূরে কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠল, বুকটা ধক করে উঠেছে। বুকের ভেতরে কেমন এক কষ্ট হচ্ছে কেষ্টর। মগজের ভেতরও এখন এক ঝিমঝিম ভাব। একটু পরে মুখ তুলল ও, গ্লাসে চুমুক দিল, পরে আস্তে আস্তে বলল, "আমি, আমিও অনেক দিন ধরে নিদারুণ এক কষ্টকে বয়ে বেড়াচ্ছি, কাউকেই তা বলতে পারিনি। যখনই এসব কথা মনে হয়, বুকের ভেতরটা আমার জ্বলে যায়। এ কেন করতে গেলাম, আমারই জন্যে আর

একজনকে তিল তিল করে মরতে হচ্ছে, আমার চোখের সামনেই; আমি আর এই দৃশ্য দেখতে পারি না। অথচ এ আমি চাইনি, বিশ্বাস কর তোরা, এ আমি কখনই চাইনি।" কেষ্টর গলা ভাঙা-ভাঙা শোনাল, শেষের কথাগুলো যেন কেমন আর্তনাদের মতন মনে হয়েছে। চোখে মুখে গাঢ় বেদনার ছায়া, চুপ করে থেকে আবেগটাও সামলে নিল ধীরে ধীরে। আরো কিছু সময় নীরব থাকল। পরে আস্তে আস্তে আবার বলতে লাগল, "মাধু আমার বউ। বিয়ের আগে থেকেই আমাদের পরিচয়। মাধু আমাকে ভালবাসল, আমিও মাধুকে। আমাদের বিয়েটা খুব সুখের মধ্যে হয়নি, ওর মা বাবা আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়নি, প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল। এমন কি, শুনলে অবাক হবি, গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে একেবারে খতমও করে দিতে চেয়েছিল। অবিশ্যি মাধুর জন্যেই আমি বেঁচে গিয়েছি। আমার জন্যে ও সব ছেড়েছুড়ে এসেছে। ওই সময়টায় আমার ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে।" কেষ্ট থামল একটু সময়, একটা সিগারেট ধরাল, সামান্য সময় নিয়ে আবার বলতে শুরু করে, "আজ পর্যন্তও একদিনের জন্যে মাধু ওর বাপের বাড়ি যায়নি, ওরা নিতে এসেছিল। মাধুকে আমি অনেক সময় বলেছি, 'আমার জন্যেই তোমাকে সব ছাড়তে হলো, এটা আমার কাছে মস্ত বড় এক দুঃখ; ওরা যখন নিতে চায়, গেলেই তো পার একদিন।' মাধু কি বলে জানিস, 'না, এ আর হয় না; তা ছাড়া, সব ছেড়েছি বলেই তো তোমায় পেয়েছি।' মাধু হাসে আর হাসে। অথচ আমার বুকের ভেতরটা খচখচ করতে থাকে। কি করে বোঝাই বল, এখানেই যে আমার কষ্টটা আরো বেশী রে। আমি অনেক ছোট হয়ে গেছি ওর কাছে, অনেক ছোট। আমি স্বার্থপর, ভোংরা, নিজেরটাই শুধু বড় করে দেখেছি। আমি যে অনেক কিছু সেদিন গোপন করে গিয়েছিলাম ওর কাছে, অথচ পরে তা জেনেছে মাধু। একদিনও আমার বিরুদ্ধে ওর কোন ক্ষোভ বা অভিযোগ ছিল না। কিন্তু ও যদি আমায় কিছু শোনাত, বলত, তবু শান্তি পেতাম, স্বস্তি বোধ করতাম। আমি তো বুঝতে পারতাম, আমি ওকে ঠকিয়েছি, ওর এই এত বড় ত্যাগের দাম আমি দিতে পারিনি, পারিনি।" কেষ্ট চুপ করল, তার মুখ ম্লান দেখাচ্ছে, সিগারেটটা খেতে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না, বিরক্তিতে টুকরোটা ফেলে দিল। একটু পরে গ্লাসে চুমুক দিল, সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।

সমুদ্রকে এখন আরো রহস্যময় লাগছে। নরম নরম জ্যোৎস্নায় যেন সব ভিজে গেছে। পা টিপে টিপে কারা যেন ছায়া-ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই নিঃসঙ্গ শূন্য দিগন্ত-হারা চরাচরে। বাতাসের মধ্যে যেন কারা ডিমিডিমি মাদলের তাল তুলেছে। কেষ্ট আরো কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকে। পরে ধীরে ধীরে বলল, "আগে যদি কখনো বলতে পারতাম, আজ অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম। অনেকবারই মনে মনে ঠিক করেছি, বলবো, পারিনি বলতে, ভয় হয়েছে; যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায়! অথচ শেষ পর্যন্ত ওকে আর রাখতে পারলাম না আমি।" কেষ্ট আবার চুপ, মাথা নীচু করে বালির ওপর হিজিবিজি আঁক কাটছিল অস্থিরভাবে। আবার গ্লাসে চুমুক দেয়, অশরীরী কারা যেন আশপাশে ঘোরা-ঘুরি করছে। বুকের ব্যথাটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্রের চেহারা এই মুহূর্তে আরো ভয়াল দেখাচ্ছে, তাকাতে ভয় করছিল কেষ্টর। বুকের ভেতরে যে কী কষ্ট! না বললে স্বস্তি নেই, আস্তে আস্তে বলল, "আমার হাতে যে ব্যাণ্ডেজটা দেখছিস, ওটা আমার দু' তিন পুরুষের রোগ। আমার বাবা এই রোগে মরেছে, শুনেছি বাবার জ্যাঠামশাই এবং আমাদের বংশের আরো অনেকেই এতে মারা গেছে।" কেষ্ট এবার মাথা উঁচু করল, সোজাসুজি সমুদ্রের দিকে তাকাল, ভেতরের অস্থিরতা যেন খানিকটা কমেছে এবার, হাতপাগুলো কেমন অবশ-অবশ

লাগছে, মনে হচ্ছিল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলো যেন কে খুলে খুলে নিচ্ছে: কোন দ্বিধা না রেখে এবার বলল, "আমাদের রক্তের মধ্যে দোষ ছিল। তখন আমি বুঝিনি যে, আমাদের স্পর্শের মধ্যেও এত বিষ, কাউকেই তা বাঁচতে দেবে না। মাধুর ভালবাসা আমাকে পাগল করে দিয়েছিল, ও আমার স্বপ্ন, আমার সব, সব। অথচ একেই আমি হত্যা করেছি। আমি জানি, আমার জন্যেই ও মরছে।" থামল কেষ্ট, কি ভেবে নিল, বলল, "রোগটা কুষ্ঠ, মারাত্মক ধরনের কুষ্ঠ; কয় পুরুষ ধরেই আমরা এর বলি হয়েছি, মাধুর কাছে এটাই আমি গোপন করে গিয়েছিলাম। ওকে আমিই এমন করেছি রে। আজ ওকেও এই রোগে ধরেছে; ও আর বাঁচবে না, আমি জানি বাঁচবে না। ওর দিকে আমি আর এখন চাইতে পারি না, বুক ফেটে যায়, এ দৃশ্য আর দেখা যায় না চোখের সামনে। আমার পাপ ওকে বাঁচতে দিল না। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, ছি ছি, এ কি করেছি আমি; শান্তি পাইনি। আমার চোখের ওপর একটু একটু করে ও শেষ হয়ে যাচ্ছে, অথচ কিছু করতে পারছি না। বারবার মনে হয়েছে, আমিই ওকে হাতে ধরে এমনভাবে মেরেছি। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর তোরা, এমন যে হবে আমি জানতাম না, জানতাম না, এ আমি কি করলাম, কেন করতে গেলাম! আচ্ছা, তোরাই বল না, আমি, আমি ওকে মেরে ফেলিনি, হ্যাঁ আমি?" কেষ্টর গলা ধরে এলো, আর কোন কথা বলতে পারছে না ও, ঢেউ এসে কথাগুলো যেন লুফে নিল। বাতাসে এখন ওর এই চাপা কান্নাই ঘুরতে লাগল, কখনো সমুদ্রের ওপরে, কখনো বা জ্যোৎস্নাভরা নির্জন বালুচরের ওপর দিয়ে ক্রমশ তা মিলিয়ে যাচ্ছে। কেষ্ট অভিভূতের মতন বসে থাকল, আরো গভীরে যেন সে তখন তলিয়ে যাচ্ছে। ওর চোখের পাতা কেমন ভেজা-ভেজা দেখাচ্ছে। চোখের কোলে কি যেন চিকচিক করছিল।

মদন ওর শেষের কথাগুলো আর শুনছিল না, এলোমেলো, অস্থিরভাবে সেও তখন কিছু খুঁজছে মনের গভীরে। মনে হচ্ছিল সমুদ্র যেন আরো কাছে সরে এসেছে, ঢেউগুলো চোখের ওপর ঝিলমিল করছে। একটু শীত-শীত করছে। সামান্য অন্য-মনস্ক হয়ে সে হাতের মুঠোয় বালি তুলছে, ফেলছে। হঠাৎ খেয়াল হলো ওরা সবাই চুপচাপ, সামনে সমুদ্রের ওপর ওদের দৃষ্টি স্থির। বুকের মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা হচ্ছে ওর, এবার তার পালা। আরো কিছু সময় নিল। সমুদ্রের জল যেন একটি একটি করে ফুলছে। বাতাসের ঝাপটা এসে মুখে লাগছে। হাঁটু মুড়ে বসেছে মদন, আস্তে আস্তে বলল, "আমার পাপ আরো বেশী, আমি যা করেছি এ মুখ ফুটে বলা যায় না, নরকেও আমার জায়গা হবে না রে। আমি পাপী, ঘোর পাপী।" বলতে বলতে চুপ করে গেল মদন, মনে মনে কি ভাবল যেন, আবার শুরু করল, "তোদের মনে আছে, মাঝপথেই পড়াশুনো ছেড়েছুড়ে দিয়ে বাড়ি থেকে আমি উধাও হয়েছিলাম! সেদিন এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না আমার সামনে। বাবার ওপর আমার ভীষণ রাগ হলো, বুড়ো বয়েসে বাবার এ কি ভীমরতি! আমার মা লক্ষ্মীর জন্মের সময়ই মারা গেছে, সেও অনেক বছর হয়ে গেল। আমার বাবা তখন আবার বিয়ের জন্যে খেপে

উঠেছে, লক্ষ্মী একটা সামান্য হতো মাত্র। আমি বাধা দিলুম, বলেছি, 'ঘরে বড় বড় ছেলেমেয়ে থাকতে আপনি এ আবার কি করতে যাচ্ছেন?' বাবা আমার ওপর ভীষণ রেগে গেল, রেগে যাওয়ারই কথা। বাবা আমাকে মারতে এলো, তোরা বিশ্বাস কর, ওই সময়ে আমার মাথার ঠিক ছিল না, ঠিক রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি বাবাকে জাপটে ধরেছিলাম, যা বলা উচিত নয়, তাই বলেছি। তবু বাবা শোনেনি, আবার বিয়ে করে বসল। যে আমাদের ঘরে এলো, আমি তাকে দেখে চমকে উঠলাম, ওর বয়েস আমারই সমান, ছোটও হতে পারে, দেখতে সত্যই সুন্দরী। ওর জন্যে আমার কষ্ট হলো। এর পর বাবা আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করল, আরো যেন কি রকম সন্দেহ করত; বাড়িটা আমার কাছে দিন দিনই অসহ্য হয়ে উঠল। ওদের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। আমি থাকলে অশান্তি আরো বাড়ত তখন।" থামল মদন। সমুদ্রকে এক-দৃষ্টে দেখল খানিকক্ষণ, কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে এই মুহূর্তে। আরো কিছু সময় চুপ করে থেকে কি ভাবল। আবার দৃষ্টি প্রসারিত করতে করতে বলল, "ক' বছর পর ফিরে এলাম আমি, বাবা মারা গেছে ততদিন। বাবার এই দ্বিতীয় পক্ষকে আমার কেন জানি কখনো মা বলতে ইচ্ছে হয়নি, বলিও নি আমি। আমি তখন পুরোপুরি যুবক। এই প্রথম ভাল করে ওর রূপ দেখলাম আমি। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল, বাবার ওপর আমার ঘেন্না যেন আরো বেড়ে গেল। এমন একটা মেয়েকে আমার বাবা মেরে গেছে, জল্লাদ। আর ওর মা-বাবাই বা কেমন, টাকার লোভে মেয়ের এত বড় সর্বনাশটা করল! আমি বুঝতে পারতাম, আমি ফিরে আসায় ও যে খুশী হয়েছে, মুখে আবার সেই হাসি ফিরেছে।

প্রথম থেকেই একটা ব্যাপারে আমার খটকা লেগেছে, ওর চলায় ফেরায় কথাবার্তায় আমার বাবার জন্যে কোন দুঃখ ছিল না; ধীরে ধীরে আমার সন্দেহ বাড়তে থাকে, আমার ওপর যেন টানটা সবচেয়ে বেশী, চোখের ভাষায় যেন অন্য কোন ইঙ্গিত ফুটে থাকত। আমিও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিলাম, মনে মনে ভয় পেলাম। ওর চোখে তো অন্য ভাষা! আমি ভেবেছি, হয়তো আমারই ভুল হচ্ছে। কিন্তু মেলাতে পারছি না কিছু। একদিন সুযোগ বুঝে চা দিতে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল; চোখে-মুখে রহস্যের ভাব, ওর সমস্ত চেহারায় আগুনের আঁচ, আমাকে ও যেন পুড়িয়ে ফেলবে। আমি তাকাতে ভয় পাচ্ছিলাম, আমার আরো কাছে সরে এলো, পরে সোজাসুজি বলল, 'এভাবে জীবনভর এই দুঃখ আমি কেন সইবো বলতে পার!' দীর্ঘশ্বাসে যেন আরো কিছু বলতে চায়, আমার হাতটা কাঁপছিল, গলাটা কেমন আঠা-আঠা লাগছিল, পর-মুহূর্তেই ও খিলখিল করে হেসে উঠে আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলেছে, 'আমি বাঘ-ভালুক নই, ভয় নেই ভীতুরাম।' ও চলে গেলেও আমার অস্বস্তি কমল না, আরো বাড়ল সেটা। আমি চোখে চোখে তাকাতে লজ্জা পেতাম তখন, বুকের ভেতরটা যেন কেমন করতে থাকত। এরকম লুকোচুরি চলল বেশ কিছু দিন। আমিও তখন এক নেশায় জড়িয়ে পড়ছি, কিছুতেই ঠেকাতে পারছি না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসি, খুব একটা বেরোই না ঘর থেকে, বাইরের আড্ডা কমে গেছে। আমার সামনে ওর কোন সংকোচ ছিল না, তোদের বললেই বুঝতে পারবি। যেমন রূপ, শরীর থেকে

শাড়ি পড়ে গেছে, আমার চোখের সামনে ওর দেহের অনেকখানি খোলা, ওর সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই; এটা ইচ্ছে করেই করত। অথচ এ সময় অন্য কেউ এলে ঠিকঠাক হয়ে বসত। আমার সামনে সায়া ব্লাউজ ছেড়েছে বহু দিন। রাত্তিরে মশারি টাঙাতে এসে অনেকক্ষণ এটা ওটা গল্প করে সময় কাটাত, আমার শরীর খারাপ হলে, সুইচ অফ্ করে আমার মাথা-টাথা টিপে-টুপে দিত, ওর শরীরের তাপ বাড়ত, আমি তা বুঝতে পারতাম, ওর অনেকখানি শরীর যে তখন আমাকে ছুঁয়ে থাকত! কোন কোন দিন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়ি পাড়া নিঝুম হয়ে আসত, তারপরও আমার এখানে থাকত। আমার অবস্থাটা তোরা বোঝ, ছোট ভাই-বোনগুলোও যেন আমাকে তখন অন্য-রকম চোখে দেখতে শুরু করেছে। আজ স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই আমার, ও বয়েসে বাবার দেওয়া সম্পর্কটা আমরা কেউই মানতে পারছিলাম না।" আবার চুপ, কপালে ওর রেণু রেণু ঘাম, কেমন যেন অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে, হাতটা কাঁপছে সামান্য, একটু পরে ফের বলল, "আমরা তখন ধীরে ধীরে পাতালে তলিয়ে যাচ্ছিলাম, অনেক ভেবেছি, আর পারছিলাম না, কিন্তু ভাবলেই মাথা টনটন করে, চোখ জ্বালা করে।" আবার ইতস্তত করল মদন, সংকোচভাবটা কাটিয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে, মৃদু গলায় বলল, "এক বর্ষার দিনে আমরা দৈহিক সম্পর্কে এলাম, এভাবে আরো ক' মাস কেটেছে। এর মধ্যে তখন আর এক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমি আমার এক নতুন ভাবনায় জড়িয়ে পড়লাম; আমার ঘুম হতো না, শুকিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি যেন একটা পশু হয়ে গিয়েছি, যেটুকু মনুষ্যমর্যাদা আছে সে-টুকুও বুঝি গেল। আমি চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারতাম না। শেষে তীর্থ যাওয়ার নাম করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম, অনেক জায়গা ঘুরলাম, এক সময়..." মদনের গলা আড়ষ্ট হয়ে এলো, চোখ দুটো এই মুহূর্তে কেমন ঘোলা, মগজে কি যেন একটা পাক খাচ্ছে, বিড়বিড় করে বলল, "শেষে আমাদের এই পাপ ঢাকবার জন্য বাবার দ্বিতীয় পক্ষ আত্মহত্যা করল। আচ্ছা, তোরাই বল তো, এই পাপ কি সত্যি সত্যিই ঢাকা পড়েছে আমার?" মদন পলকহীন চোখে চেয়ে থাকল সমুদ্রের দিকে।

এবার রীতিমত শীত করছিল ওদের। বাতাসে কিসের গোঙানির শব্দ। সমুদ্রের জল যেন ফুলছে, কেবলই ফুলছে। মনে হলো, ঢেউগুলো এগিয়ে আসছে, ওদের কেমন ভয় হলো, জোৎস্নার গাঢ় নেশায় সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন, বেহুঁশ। হঠাৎ গণেশ চেঁচিয়ে উঠল, "উঠে পড়, জোয়ার শুরু হয়েছে, জল বাড়ছে।"

এক সময় ওরা উঠে পড়েছে। পূবের আকাশে তখন টকটকে লাল আলোর ছিট-ছিট দাগ। কাল সারা রাত ধরে সগর রাজার ছেলেরা ছায়া ছায়া হয়ে ওদের সঙ্গে ছিল। কী ভয়ই না করেছে! এখন ওসব কোন ভয় নেই। দূরে এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কারা যেন স্নানে নেমেছে, বাতাসে সূর্যস্তব ভেসে ভেসে আসছে। ওরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল, বাতাসের বেগ যেন বাড়ছে, জোয়ার বাড়ছে, পূব আকাশ আরো লাল হয়ে উঠছে, গাঙচিল উড়ছে, সমুদ্রের জলে নেমে খেলায় মেতেছে, পাখিরা কিচির-মিচির শব্দের জোয়ারে ডুবে আছে। সব যেন আবার কেমন স্বচ্ছ, পরিষ্কার হয়ে উঠছে। সকালের এই আলোয় ওরা কেমন সংকোচ, লজ্জা বোধ করছিল। কেউ কারো মুখের দিকে যেন এখন তাকাতে পারছে না। শেষবারের মতন পেছনের দিকে ফিরে তাকাল ওরা, দেখল, সমুদ্র এতক্ষণে ওদের গত রাতের প্লাস বোতল, পড়ে থাকা যাবতীয় জিনিসপত্তর সব কিছুই নিয়ে নিয়েছে। নিঃশব্দে মাথা নীচু করে হাঁটতে থাকে, ওরা এখন আবার নিজেদের সংসারে ফিরে চলেছে। যেতে যেতে এখানকার কিংবদন্তীটা হঠাৎ মনে পড়ল, ওটা তা হলে মিথ্যে ছিল না।

শান্তিনিকেতনে জাপানী রবীন্দ্রানুরাগীদের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গত বসন্তোৎসবের সময় একদল জাপানী অতিথি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁরা টোকিয়োর ভারত-জাপান রবীন্দ্র-সমিতির সদস্য-সদস্যা। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন কুড়িজন। এই বিদেশী রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে জনাদশেক ছাত্রছাত্রী—বাকিদের কেউ অধ্যাপক, কেউ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক কিংবা রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশক। প্রতিনিধি দলটি এসেছিলেন ভারত-পর্যটনে—সর্বপ্রথমেই ঘুরে গেলেন শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন জাপানী অধ্যাপক শ্রীকাজুও আজুমা ছিলেন ওই দলে—প্রকৃতপক্ষে তিনিই দলনেতা। শ্রীআজুমার নামের সঙ্গে 'দেশ' পাঠক-পাঠিকার পরিচয় আছে—কিছুকাল আগে এই পত্রিকায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জাপানী ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতার যে উপন্যাস (ইন্দ্রধনু) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, শ্রীআজুমা ছিলেন তার যুগ্ম অনুবাদক।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীআজুমা স্বদেশে ফিরেও শান্তি-নিকেতনকে ভুলতে পারেন নি। এখানকার ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে চিঠিপত্র মারফৎ তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে। এখন তিনি মূল বাংলা থেকে জাপানী ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, জাপানের রবীন্দ্রানুরাগীরা শান্তিনিকেতনে চীন ভবনের ধাঁচে একটি "নিপ্পন ভবন" স্থাপন করতে আগ্রহী। এ-বিষয়ে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে লিখেছেন। ভারত সরকার ও বিশ্বভারতীর অনুমোদন পেলে ভারত-জাপান রবীন্দ্র সমিতি এবং শান্তিনিকেতন বন্ধব সমিতি একযোগে নিপ্পন ভবনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করবেন। শ্রীআজুমার স্থির বিশ্বাস তাঁরা ওই টাকা জাপান থেকে তুলে দিতে সক্ষম হবেন।

জাপানী-অতিথিরা শান্তিনিকেতনে ছিলেন দিন পাঁচেক। সে সময়ে তাঁরা বসন্তোৎসবে যোগ দিয়ে সোৎসাহে দোল খেলেছেন—"আরিগাতো" শুনে খুশি হয়ে অপরিচিত জনকেও আবীর মাখিয়েছেন, "নাগাসিকি বাড়ি তার এক ছিল জাপানী,/ আয়েশে চুমুক দিয়ে খেতেছিল চা-পানি।" —পাঁচ বছরের শিশুর মুখে অপরিচিত ভাষায় ওই ছড়া শুনে তাকে আদর করেছেন, রাত্রে চাঁদের আলোয় বসে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনেছেন। ঘুরে ঘুরে দেখেছেন চীন ভবন, হিন্দী ভবন আর কলা ভবন। তাঁরা সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন রবীন্দ্র-ভবনে। তাঁদের আগমন উপলক্ষে সেখানে 'রবীন্দ্রনাথ ও জাপান' সম্বন্ধে

'রবীন্দ্রনাথ ও জাপান'-প্রদর্শনীতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিবারের সঙ্গে তোলা রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখছেন রাসবিহারী বসুর শ্যালিকা শ্রীমতী মাকিকো হাসিমতো। সম্প্রতি টোকিয়োর ভারত-জাপান রবীন্দ্র সমিতির যে প্রতিনিধি দল শান্তি-নিকেতনে আসেন—শ্রীমতী মাকিকো সেই দলে ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনে কিছুকালের জন্য অধ্যাপিকা ছিলেন। ফটো—অজিত ঘোষাল

একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। তাতে ছিল আলোকচিত্র, চিঠিপত্র ও রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া জাপানের বিবিধ বিচিত্র উপহার। রবীন্দ্রনাথের জাপান পৌঁছানোর সংবাদ ছবি সহ যে জাপানী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। তা ছাড়া সেখানে ছিল ওকাকুরা কাকুজোর পরিবার ও প্রখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিবারের সঙ্গে তোলা রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র।

ওই প্রদর্শনী দেখার সময়েই আলাপ হল শ্রীমতী মাকিকো হাসিমতোর সঙ্গে। রাসবিহারী বসুর স্ত্রীর মাসতুতো বোন শ্রীমতী মাকিকো তিরিশের দশকে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি, বাঙালি মেয়ের মতোই শাড়ি পরে সুগভীর ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সহ রাসবিহারী বসুর পরিবারের আলোকচিত্রটির দিকে। শ্রীআজুমা পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে এবং আজুমার সাহায্যেই আমাদের কথাবার্তা হল। প্রদর্শনশালায় ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে নজরে পড়লো গুরুদেবকে লেখা রাসবিহারী বসুর একখানি চিঠি। শ্রীমতী মাকিকো হাসিমতোকে দেখানো হলো তাঁকে শান্তিনিকেতনে পাঠাবার প্রস্তাব করে রাসবিহারী বসু ওই চিঠিখানি লিখেছিলেন গুরুদেবকে ১৯৩০-এর ১০ জুলাই। রাসবিহারীবাবু লিখছেন : আমার স্ত্রীর বোন শ্রীমতী মাকিকো হোসি (বিবাহপূর্ব নাম) টোকিয়োর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের স্নাতক, সে ফুলসজ্জা-নীতি (ইকাবেনা), সূচীশিল্প এবং বিখ্যাত জাপানী চা-উৎসব শেখাবার পদ্ধতি জানে। শান্তিনিকেতনে সে কিছু কাজ করতে চায়। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ও ভারতীয়-দর্শন নিয়ে পড়াশুনার বাসনা তার আছে। বেতন ও যাতায়াত খরচ ওকে দিতে হবে না—আপনারা কেবল থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সম্মতি জানিয়ে যে-চিঠি লিখেছেন তা-ও দেখলেন শ্রীমতী মাকিকো। প্রদর্শনী দেখা শেষ করে রবীন্দ্র ভবনের এক ঘরে বসে আজুমার সাহায্যে তাঁর শান্তিনিকেতন-জীবনের স্মৃতিকথা শোনার সৌভাগ্য সেদিন আমার হয়েছিল।

শ্রীমতী মাকিকো জানালেন রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি প্রথম শুনেছিলেন ১৯২৪ সালে, তখন তিনি সতের বছরের তরুণী। 'গীতাঞ্জলি', 'ক্রেসেন্ট মুন' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই ভারতীয় কবিকে চেনার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বারের জন্য জাপান ভ্রমণে যান। তখনই একদিন রাসবিহারী বসুর সঙ্গে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। তার পরের বছরই রাসবিহারী বসুকে চিঠি লিখে তাঁর

এখানে যেটুকু শেখার ও শেখাবার সুযোগ পাবে তার সদ্ব্যবহার করো—তাহলেই আনন্দ পাবে।

গুরুদেবের সেই প্রথম দিনের নির্দেশ মাথায় তুলে নিয়েছিলেন শ্রীমতী মাকিকো। প্রথমে ছিলেন রতনকুঠিতে। আশ্রমবাসীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের আশায় চলে এলেন শ্রীসদনে। কলাভবনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন তিনি—জাপানী সূচীশিল্প ও ইকাবেনা শেখাতেন ছাত্রীদের। তাঁর সেই সব ছাত্রী-দের মধ্যে এখনও রয়েছেন শিল্পাচার্য নন্দলালের দুই কন্যা শ্রীমতী গৌরী দেবী, শ্রীমতী যমুনা দেবী, পুত্রবধূ শ্রীমতী নিবেদিতা দেবী, আর শ্রীমতী গতী রায় ও শ্রীমতী সাবিত্রী কৃষ্ণান। শেষজন ছাড়া বাকি সকলেরই এবার দেখা পেয়েছেন শ্রীমতী মাকিকো। ওঁদের সান্নিধ্যে খুশি হয়েছেন—পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করেছেন। মনে পড়েছে—শ্রীনিকেতনে শিক্ষানিকের কথা, আশা আর্যনায়কমের কাছে বাংলা আর আচার্য ক্ষিতিমোহনের কাছে সংস্কৃত শেখার কথা। তাগাগাকির নেতৃত্বে সে সময়ে তিনি একবার গীতা-যমুনা-নিবেদিতা ও অমিতা সেন (ক্ষিতিমোহন কন্যা)দের নিয়ে কাশীতে যুযুৎসু-প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিলেন—সে কথাও স্মরণে আছে। মনে আছে—মাঝে মাঝে জাপানী প্রথায় সবুজ-চা (গ্রীন-টি) তৈরি করে খাওয়াতেন গুরুদেবকে—সেই চায়ের আসরে উপস্থিত থাকতেন নন্দবাবু, ক্ষিতিবাবু, রথীবাবু প্রমুখ। বিদেশে এসে যাঁদের সস্নেহ সাহচর্যে সেদিন শ্রীমতী মাকিকোর জীবন অভিষিক্ত হয়েছিল তাঁদের স্মৃতি এখনও তাঁর কাছে অম্লান। তাঁদের মধ্যে প্রতিমা দেবী, কমল বৌঠান (দিনেন্দ্র-নাথের পত্নী), মীরা দেবী ও নন্দিতার (কৃপালনী) কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। মনে পড়েছে রথীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্র-নাথের কথা। প্রায় চার দশক পরে এখানে এসে ওঁদের প্রত্যেকের অভাব তিনি বেশি করে অনুভব করেছেন। একবার প্রতিমা দেবী-রথীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন দার্জিলিং-কালিম্পঙ। সারা ভারত ঘুরে-ছেন সে সময়—সিংহলও বাদ যায় নি। গেছেন রাজগীরে—মাদ্রাজে। কাশীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে জাপানের প্রতি-নিধিত্ব করেছেন। এমনিভাবেই এখানকার দিনগুলো কেটে গেছে—প্রায় সাড়ে তিন বছর থাকার পর স্বদেশে ফেরার জন্যে বাবার নির্দেশ এসেছে—তাঁকে ফিরতে হয়েছে জাপানে। ক্রমশ শান্তিনিকেতনের জীবন শ্রীমতী মাকিকোর কাছে স্মৃতিপটে আঁকা ছবিতে পরিণত হয়েছে। জীবনের এই অপরাহ্ণ বেলায় আবার এসেছেন এখানে—স্বদেশের বাইরে তিনি যাঁকে পূজনীয় মহামানব বলে মনে করেন তাঁরই উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করবেন বলে।

*

সেদিন রবীন্দ্রসদনেই আলাপ হল আর একজন রবীন্দ্রানুরাগীর সঙ্গে—টেগোর সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য এবং জাপানের আপুজন প্রকাশনীর অধিকর্তা তিনি। তাঁর নাম শ্রীসোজিরো কাসে। জাপানী ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৫৮ সালে শত-বার্ষিকীর তিন বছর আগে প্রথম খণ্ড রচনাবলী প্রকাশ করেন—তাতে ছিল ক্রেসেন্ট মুন, গারডেনার, পোস্ট অফিস, স্যাক্রিফাইস প্রভৃতির অনুবাদ।

রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপাতে কেন উদ্যোগী হলেন—এ-প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকাসে জানালেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই রবীন্দ্র-নাথের ভক্ত পাঠক তিনি। তখন তাঁর বয়স হবে বছর কুড়ি। সবেমাত্র জাপানী সাহিত্যের স্নাতক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

বেরিয়েছেন। এমন সময় মিকুমানো সেংগে নামে এক কবি তাঁকে জাপানী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংকলন উপহার দেন। এভাবেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। যুদ্ধের পর বছর আটেক তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে কাটাতে হয়। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ছিল তাঁর দিবারাত্রির সহচর। হাসপাতালে থাকাকালীন শ্রীকাসে অনুবাদ করেন সেঁজুতির কবিতা। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রানুরাগী জাপানী কবি চিত্রকর শ্রীথোসিহিকো খাতায়ামার সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। জার্মেন-ফরাসী সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক খাতায়ামা ছিলেন রোমাঁ রোলাঁর পরিচিত। রোলাঁই তাঁকে রবীন্দ্রানুরাগী করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। এই খাতায়ামাই শ্রীকাসেকে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পরামর্শ দেন। আসন্ন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে কবির রচনাবলী প্রকাশের প্রকল্প তাঁকে আকৃষ্ট করে। তারই ফলে ১৯৫৮ সালে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। শ্রীকাসের আপ্রাণ-প্রকাশনের প্রচেষ্টায় সেখানে একটি রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যাঁদের মধ্যে আছেন টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শনের প্রধান অধ্যাপক হাজিমে নাকামুরা, পূর্বোক্ত কবি থোসিহিকো খাতায়ামা, জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিকুকা ইয়ামানুরো, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন দুই অধ্যাপক খোসু ও মরিয়োতো আর কাজুও আজুমা। শ্রীকাসে জানালেন প্রত্যেক খণ্ড তিনি আড়াই হাজার কপি করে ছাপেন—এবং তারাই হল এই রচনাবলীর প্রধান ক্রেতা—কারণ তাঁরা সব সময়েই নতুনের ভক্ত। রচনাবলী প্রকাশের আগে তিনি কৃষ্ণ কৃপালনীর গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-জওহরলাল বিষয়ক বইটির অনুবাদ ছেপেছিলেন। তা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী, ঋষি অরবিন্দ, রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখের রচনা তিনি প্রকাশ করেছেন। শ্রীকাসে জাপানী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের প্রকাশক। বইটির নাম—"প্রাচ্য মানুষের চিন্তা", লেখক হাজিমে নাকামুরা। বিখ্যাত বইটিতে লেখক এশিয়ার ধর্মগুরুদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তবু ভারতীয় ধর্মগুরুদের প্রাধান্য সেখানে বেশি। বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের চিন্তাধারা লেখককে সবিশেষ প্রভাবিত করেছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকাসে জানালেন, ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বই-ই জাপানী ভাষায় বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়—আর প্রেমচাঁদের একখানি বই অনূদিত হয়েছে। একমাত্র সোকা শুধু রবীন্দ্রনাথের অনূদিত গীতাঞ্জলি মূল বাংলা থেকে—বাকি সবই ইংরেজী থেকে অনূদিত। শ্রীকাসে মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্র রচনাবলী অনুবাদ করে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। ক্যাজুও আজুমার উপরেই এ কাজের ভার দিয়েছেন তিনি। তাঁর আর একটি বাসনা—রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির একটি এলবাম ছাপিয়ে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় জাপানীদের কাছে তুলে ধরা। এ-সব ব্যাপারে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সহায়তা ও সহযোগিতা তিনি বিশেষ ভাবে কামনা করেন।

॥ ২০ ॥

চৌধুরীমশাই ভেতর-বাড়িতে গিয়ে একেবারে সোজা গৃহিণীর সঙ্গে দেখা করলেন। বাবাজী যে আহার করেন না, শুধু সেবা করেন সেটা বুঝিয়ে বললেন।

প্রীতি বললে—আর কী বললেন উনি?

চৌধুরী মশাই বললেন—বললেন তো অনেক ভালো ভালো কথা। এত ভালো ভালো কথা বললেন যে সে-সব বিশ্বাস করতেও ভয় হয়।

—কী রকম?

বললেন—খোকা নাকি আগের জন্মে ভৃগু ঋষি ছিলেন, এ-জন্মে তোমার ছেলে হয়ে এসেছে। ওকে বকাবকি করতে বারণ করলেন।

প্রীতি কথাগুলো শুনে খানিকক্ষণ চৌধুরী মশাই-এর মুখের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল।

তারপর বললে—সত্যি?

চৌধুরী মশাই বললেন—সত্যি 'মিথ্যে বুঝি না। উনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলেই ভালো। ওঁর কথা শুনে মনটা একটু ভালো হলো। কিন্তু তোমার ছেলে যে-রকম বেয়াড়া, বললাম যে বাবাজীকে একবার প্রণাম করো, তা কিছুতেই করলে না। বললে কী জানো? বললে বুজরুক!

—বুজরুক বললে?

—হ্যাঁ, মুখের ওপর ওঁকে বুজরুক বলে উঠলো। তা আমি আর কী করবো। ছেলের হয়ে আমিই ক্ষমা চেয়ে নিলুম। এখন ভালো করে ওঁর সেবার ব্যবস্থা করে দাও। ছানা, দুধ, ফল, মিষ্টি যা আছে তাই দিয়ে সেবা করো—

তা সেই রকম ব্যবস্থাই হলো। বাবাজী সেদিন থেকেই বাড়িতে রয়ে গেলেন। খুব মিতভাষী পুরুষ। নিজের কথা বেশি বলতে চান না। যত না কথা বলেন তার চেয়ে বেশি ভাবেন। যত না ভাবেন তার চেয়ে বেশি অনুভব করেন। চৌধুরীমশাই বাবাজীর ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চৌধুরীমশাই-এর গৃহিণীও এল। এসে প্রণাম করলে।

বাবাজী আশীর্বাদ করলেন।

বললেন—তোর ভালো হবে মা, আমি সব জানি। তোর কিছু ভয় নেই। এবার তো আমি এসে পড়েছি।

প্রীতি বললে—আমার ওই ছেলেকে নিয়েই যত ভাবনা। ও সংসারী হবে তো?

বাবাজী বললেন—আমি তো আছি রে, আমাকে তুই বকলমা দিয়ে দে, তোর ভাবনাটা আমি ভাববো!

এ রকম করে আগে কখনও ভরসা দেয়নি কেউ। প্রীতি গলে গেল। তার মনে হলো এত কিছু ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সব বুঝি তার দূরে হয়ে গেল। বললে—আমার ওই ছেলেই আমার সব চেয়ে বড় ঝামেলা বাবা। লোকের মেয়ে নিয়ে ঝঞ্ঝাট হয়, আমার ঝঞ্ঝাট হয়েছে ছেলে নিয়ে।

একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে মেয়েদের পেটে আর কোনও কথা বাকি থাকে না। সমস্ত কথা বলে যেন প্রীতি তৃপ্তি পেলে।

হঠাৎ প্রকাশ ঘরে ঢুকলো। বাবাজী তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কে?

প্রীতি বললে—সম্পর্কে আমার ভাই হয় বাবা—

বাবাজী এবার আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চাইলেন তার দিকে।

চৌধুরীমশাই বললেন—প্রকাশ, তুমি এঁকে প্রণাম করো—

প্রকাশমামা শুধু প্রণামই করলে না। একেবারে বাবাজীর পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকালে। তারপর হাত-জোড় করে সামনে বসলো। ততক্ষণে বাবাজীর সেবা হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িতে তখন আর কোনও কাজ নেই, কোনও সমস্যাও নেই। সমস্ত শক্তি সমস্ত সামর্থ্য যেন বাবাজীর সেবায় ন্যস্ত করেই এ বংশের কর্তা-গিন্নী পরিত্রাণ পেতে চাইছে। বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সবাই যেন এই বাবাজীকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকতে চাইছে। বলছে—আমাদের সব দুঃখ দূর করো বাবা, আমাদের শান্তি দাও, সুখ দাও, ঐশ্বর্য দাও, সমৃদ্ধি দাও। আমাদের একমাত্র সন্তানকে সুমতি দাও। সে যেন সংসারী হয়, সহজ হয়, স্বাভাবিক হয়, সাধারণ হয়। আর কিছু আমরা চাই না—

কিন্তু সুখ, শান্তি, সৌভাগ্য দেবার বিধাতা বোধহয় মনে মনে হাসলেন।

হাসলেন কিংবা হয়ত কটাক্ষ করলেন। সদানন্দ সবই শুনলো। সব কথাই কানে গেল তার। সে বুঝতে পারলে এর জন্যেই এত আয়োজন, এত সেবা, এত পরিশ্রম

পরিশ্রমও কি কম। সেদিন থেকেই বাড়ির অন্য চেহারা। প্রকাশমামা আবার একটা কাজ পেয়ে গেল। কর্তাবাবু ওপারের ঘরে একলা পড়ে থাকেন। কৈলাশ গোমস্তা খাতা নিয়ে হিসেব লেখে। আদায়-পত্রের খবরাখবর দেয়। তার ওপর দান আছে।

কাজ করতে করতে হঠাৎ কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করেন—নিচে শাঁখ বাজাচ্ছে কে কৈলাশ?

কৈলাশ সব জেনেও বলে—আজ্ঞে ও শাঁখ তো আমাদের বাড়িতে বাজছে না, পাশের বাড়িতে বাজছে—

—এমন অসময়ে শাঁখ বাজাচ্ছে কেন?

কৈলাশ গোমস্তা বলে—কোনও পুজো-টুজো হচ্ছে বোধ হয়। বেহারি পাল তো খুব ভক্ত মানুষ।

তা হবে। এর পরে আর কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু পরের দিনও তেমনি।

কর্তাবাবু বলেন—বেহারি পালের পয়সা হয়েছে, বুঝলে কৈলাশ? তেল-মশলার দোকান করে দু'টো পয়সা হয়েছে বলে দেব-দ্বিজে ভক্তি বেড়ে গেছে। ও সব ভড়ং আমার বুঝি

কৈলাশ বলে—আজ্ঞে ভক্তি-টক্তি সব বাজে কথা, আসল হচ্ছে টাকা—

কর্তাবাবু বলেন—বেহারি পাল টাকা ছাড়া আর কিছুকেই পুজো করে না, বুঝলে কৈলাশ। টাকাই ওর কাছে ঠাকুর দেবতা যা-কিছু সব—

কামনা ধরে থাকেই কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ আসতে লাগল কর্তাবাবুর কানে। অসহ্য। কর্তাবাবুর তাতে আর কোনও ক্ষোভ নেই। হোক, সকলেরই টাকা হোক। আমার আর কোনও ভয় নেই। আমার এত সম্পত্তি, এত ঐশ্বর্য, এতখানি কারো না হলেই হলো।

—আচ্ছা, কৈলাশ তুমি তো অনেক বাড়ির বউ দেখেছ, এমন রূপে গুণে আলো করা বউ আর কারো দেখেছ? বলো তুমি, দেখেছ কখনও?

কৈলাশ বললে—আজ্ঞে, আপনার বউমার সঙ্গে কার তুলনা! এ কলকাতায় একটি হয়!

—আর আমার নাতি? সদানন্দ? অমন নাতি কারো আছে? পাড়ায় তো কত ছেলেই হয়েছে, এমন ছেলে কজনের আছে শুনি? ও বেহারী পাল যতই পুজো করুক আর কাঁসর-ঘণ্টা বাজাক আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে?

কৈলাশ বলে—কী যে বলেন! আপনি হাসালেন কর্তাবাবু। আপনার সঙ্গে বেহারি পালের তুলনা।

কর্তাবাবু বলেন—না না আমি কথার কথা বলছি। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ কানে আসে কিনা তোমার, তাই কথাটা বললাম—

কৈলাশ বলে—আজ্ঞে বেহারি পাল কি মানুষ? বেহারি পাল সুদে টাকা খাটায়। সুদখোর। সুদখোরকে কখনও কেউ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে? অথচ আপনাকে? আপনাকে তো সবাই ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে।

কর্তাবাবুর জানতে আগ্রহ হয়। জিজ্ঞেস করেন—ভক্তি শ্রদ্ধা করে নাকি আমাকে?

—তা করে না? আপনার সামনে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি আবার আড়ালেও করে। তা করবে নাই বা কেন? আপনার মত মানুষ তো হয় না।

—লোকে তা-ও বলে নাকি?

কৈলাশ বলে—বলে বইকি!

—কী বলে?

কৈলাশ বলে—বলে কর্তাবাবুর মত মানুষ হয় না।

কথাটা শুনে কর্তাবাবুর মনটা খুশী হয়। কর্তাবাবু খুশী হলে তা সবাই বুঝতে পারে। তখন তাঁর গোঁফ-জোড়া একটু কাঁপতে থাকে। চোখ দুটো একটু কুঁচকে যায়। সবাই বুঝতে পারে। কর্তাবাবুর কাছে তখন যদি কিছু আর্জি করা যায় তো তা চটপট মঞ্জুর হয়ে যাবে। তখনই সবাই যা চাইবার তা চেয়ে নেয়। কেউ জমি জমা চায়, কেউ টাকা হাওলাত চায়। কেউ বা ঝাড় থেকে দু'খানা বাঁশ। আবার কেউ বা নগদ টাকা পয়সা।

নাতবউ আসার পর থেকেই কর্তাবাবুর মেজাজটার মধ্যে যেন বেশ একটা খুশী-খুশী ভাব ছিল। তারপরই যেদিন তিনি শুনলেন যে তাঁর নাতি বউ-এর সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় রাতে কাটাচ্ছে, তখন থেকেই একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁর আশা পূর্ণ হল কালীগঞ্জের বউ। তাঁর জীবনের সাধ। সেই সাধই

যখন চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে তখন আর কাকে পরোয়া। যখন মানুষের শত্রু থাকে না তখনই কেবল মানুষ উদার হতে পারে। তখনই তার মুখে হাসি ফোটে। তখন সবাই তার উদারতার প্রশংসা করে। কিন্তু উদার যে হবো তার উপাদান কে দেবে? কে আমার অভাব ঘোচাবে, কে আমার শত্রু নিপাত করবে, কে আমার মাথা উঁচু করে দেবে? তুমি আমার অভাব ঘোচাও, তুমি আমার শত্রু নিপাত করো, তুমি আমার মাথা উঁচু করো, আমি তখন সৎ হবো, সাধু হবো, মহৎ হবো, দাতা হবো। আরো কত কী হবো! বেল বাজারের দারোগা টাকা নিয়েছে বটে, তা নিক। ন্যায্য পাওনা নিলে কর্তাবাবুর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বংশী ঢালীরা বড্ড বেশি টাকা নিয়ে ফেলেছে! তা নিক। বৃহৎ কাজে অমন অপব্যয় একটু হয়েই থাকে। তার জন্যে মেজাজ খারাপ করলে কি চলে!

তারপর হঠাৎ যেন কাজের কথা মনে পড়ে যেত কর্তাবাবুর। বলতেন—তারপর কী হলো কৈলাশ, তারপর পড়ে যাও—

একটা অর্ধ সাপ্তাহিক বাংলা খবরের কাগজ কিনতেন কর্তাবাবু। কৈলাশ গোমস্তা সেটা অবসর মত পড়ে পড়ে শোনাতো।

—কই, থামলে কেন? পড়ে যাও?

কৈলাশ গোমস্তা ভালো করে পড়তে পারতো না। হোঁচট খেতে খেতে পড়তো—বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড় আজ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইতেছেন......

কোথাকার কোন্ গাইকোয়াড়, সে কোন্ দেশ, কে তার মহারাজা, কেনই বা তার নাম গাইকোয়াড় তা কৈলাশও যেমন জানতো না, কর্তাবাবুও তেমনি জানতেন না। তবু খবরের কাগজে যখন খবরটা বেরিয়েছে তখন তিনি নিশ্চয়ই কেষ্ট-বিষ্টু কেউ হবেন। আর মহারাজা মানুষ যখন তখন নিশ্চয়ই তিনি অনেক টাকার মালিক। অনেক টাকার মালিকদের ওপর কর্তাবাবুর খুব শ্রদ্ধা ছিল বরাবর।

কর্তাবাবু বলতেন—আচ্ছা, কৈলাশ, মহারাজাদের অনেক টাকা আছে, কী বলো?

কৈলাশ বলতো—আজ্ঞে, তা তো আছেই—

—তা কত টাকা থাকতে পারে মহারাজাদের?

মহারাজাদের কত টাকা থাকতে পারে তার কোনও আন্দাজ জানা ছিল না কৈলাশের। তবু আন্দাজ করে বলতো—আজ্ঞে, দশ বারো লাখ টাকা নিশ্চয়ই—

কর্তাবাবু বলতেন—আরে দূর, দশ-বারো লাখ একটা টাকা! তোমার যেমন বুদ্ধি! আমারই তো দশ বারো লাখ টাকার সম্পত্তি আছে। তুমি তো হিসেব জানো, হিসেব করো না—

হিসেব অবশ্য শেষ পর্যন্ত করতে হতো না। কৈলাশ জানতো কর্তাবাবু কত টাকার সম্পত্তির মালিক। কিন্তু মহারাজাদের কাছে কখনও গোমস্তাগিরি করেনি বলে তাদের টাকার অঙ্কটাও আন্দাজ করতে পারতো না কৈলাশ গোমস্তা।

ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত যখন কোনও ফয়সালা হতো না তখন অন্য প্রসঙ্গ উঠতো। কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করতেন—তা সে যাকগে, গাইকোয়াড়ের মহারাজা কলকাতায় আসছেই বা কেন বলো তো? তোমার কী মনে হয় কৈলাশ?

কৈলাশ বলতো—আজ্ঞে, আমি সামান্য লোক, আমি কী করে তা জানবো?

—তা সামান্য লোক হলেই বা, একটু মাথা খাটিয়ে ভাবো না, কেন আসছে মহারাজা? কাগজে কিছু লিখেছে সে-সম্বন্ধে?

কৈলাশ পাতিপাতি করে খুঁজেও মহারাজার কলকাতায় আসার কোনও হদিশ পেলে না। শুধু মহারাজার আসার খবরটাই ছাপা হয়েছে, কোনও কারণের উল্লেখ নেই কোথাও।

কর্তাবাবু খুঁজে খুঁজে অনেক কষ্টে একটা কারণ বার করলেন। বললেন—বুঝলে কৈলাশ, আমার মনে হয় শিকার করতে আসছে মহারাজা—

—শিকার?

—হ্যাঁ, বাঘ শিকার করতে আসছে, বুঝলে? কলকাতার কাছেই তো সুন্দরবন। সুন্দরবনে অনেক রয়াল বেঙ্গল টাইগার আছে, তা-ই শিকার করতে আসছে, বুঝতে পেরেছি। নইলে সেই বরোদা থেকে মহারাজা কলকাতায় আসবেই বা কেন? ...তারপর অন্য কী খবর আছে, পড়ো—

এই রকম করেই দিন কাটতো কর্তাবাবুর। সদানন্দর বিয়ের পর থেকেই কর্তাবাবুর মনটা বেশ সরেস ছিল তাই খবরের কাগজের খবরে বেশি মন দিতেন। কখনও বরোদার গাইকোয়াড়ের কলকাতায় আসার খবর, কখনও ধান-চাল-পাটের দর, আবার কখনও বা বেহারি পালের টাকার গরমের কথা। সব কথাই হতো।

হঠাৎ একদিন কৈলাশ বললে—কেষ্টনগরের চিঠি এসেছে কর্তাবাবু—

—চিঠি? কে লিখেছে? বউমার বাবা? বউমা আসছে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেছে তো, এবার আসছেন বউমা।

লাগলো। বললে—নাতি হয়নি, কিন্তু হবে তো একদিন।

কাঞ্চন অবাক হয়ে গেল। যে-নাতি হয়নি তারই জন্যে কর্তাবাবুর এত হাঁক-ডাক। একেবারে এই মাসে তো সেই মাসে। যেন নাতির অন্নপ্রাশন আটকে যাচ্ছে টাকার জন্যে।

কৈলাশ গোমস্তা বললে—পাগল হে কাঞ্চন, আস্ত পাগল। নেহাৎ চাকরি করতে হয় তাই এত কথা শুনি, নইলে আমাকেও তো দুবেলা যাচ্ছেতাই করে বকে। তুমি ভেবেছ চৌধুরীমশাই-এর নাতি হবে? হবে না। তুমি দেখে নিও, হবে না—

—হবে না? হবে না মানে?

কৈলাশ বললে—সে সব পরে তোমাকে বলবো। তুমি এখন যাও—

কাঞ্চন বললে—কিন্তু শেষকালে মারে নেবেন-তো কর্তাবাবু? নইলে আমার মেহনতই যে সার হবে গোমস্তা মশাই?

কৈলাশ বললে—আরে তোমার কী? তুমি মাল দেবে পয়সা নেবে। চৌধুরী মশাই-এর নাতি হোক না-হোক তাতে তোমার কী? তুমি তো মজুরি পেলেই খুশি।

—কিন্তু কেন নাতি হবে না গোমস্তা মশাই?

কৈলাশ গোমস্তা তখন বাড়িতে যেতে যাচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে দেখেছিল। বললে—আরে, তোমার কেবল ওই এক কথা! বলছি তো সে তোমাকে পরে বলবোখন। আমি আসি—

বলে কৈলাশ তার নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল।

কালিগঞ্জের বউ যে একদিন কর্তাবাবুকে নির্বংশ হবার অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিল সে কথাটা এখন কাউকে না বলাই ভালো। ওটা চাপা থাক। ওটা আর কারো মনে না থাকলেও, একলা শুধু কৈলাশ গোমস্তারই মনে থাকুক। যে-কথাটা মনে করলেও বুকটা কেঁপে ওঠে সেটা তোমাদের কাছে জানবার দরকার নেই। দশ হাজার টাকা! মাত্র দশ হাজার টাকার খেসারত দেবে কর্তাবাবুর নাতি! সেই খেসারতের বৃত্তান্ত কাঞ্চন স্যাকরা না-ই বা জানলো!

❦

তা সত্যিই, কেষ্টনগর থেকে একদিন বেয়াই মশাই-এর চিঠি এসেছিল। শ্রাদ্ধ-শান্তি নির্বিঘ্নে চুকে গেছে। তিনি নিজেই নয়নতারাকে নিয়ে নবাবগঞ্জে আসছেন।

কিন্তু এ আসা মর্মান্তিক আসা। নিয়ম ছিল মেয়ের সন্তান না হলে বাবা-মা কাউকেই বেয়াই বাড়িতে আসতে নেই। কিন্তু কী করা যাবে। আর কে আছে তাঁর? কার সঙ্গে পাঠাবেন মেয়েকে?

নয়নতারা বলেছিল—বাবা, এত তাড়াতাড়ি কেন আমাকে পাঠাচ্ছো। আরো কিছু দিন না-হয় তোমার কাছে থাকি।

আমি চলে গেলে কে তোমার দেখাশোনা করবে?

কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই-এর কিন্তু অনেক সহ্য-ক্ষমতা। পাছে মেয়ের কান্না পায় তাই স্ত্রী-বিয়োগের শোকে মেয়ের সামনে নিজেও কোনোদিন কাঁদেন নি। মেয়ের সামনে বলেছেন—তাতে কী হয়েছে মা, মানুষ কি চিরকাল বাঁচে? এক দিন-না-একদিন তো তাকে যেতেই হয়। তোমার মা-ও তাই চলে গেছেন—

এও এক অদ্ভুত পরিস্থিতি! কে কাকে সান্ত্বনা দেবে তার ঠিক নেই। মেয়ে বাবার দুঃখের দিকে চায়, আর বাবা চায় মেয়ের দুঃখের দিকে।—শুধু যে তিনি যাবার আগে মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন এইটেই তো সান্ত্বনা। নইলে কী হতো বলো তো মা।

ভট্টাচার্য মশাই বলেন—তুমি আমার জন্যে কিছু ভেবো না মা। আমার জাতরা রয়েছে, তারাই আমাকে দেখবে।

মেয়ে বলে—তুমি তোমার শরীরের দিকে একটু দেখো বাবা। তুমি নিজেকে না দেখলে কেউ তোমাকে দেখবে না।

—সে তোকে বলতে হবে না রে। আমি দেখিস ঠিক চালিয়ে যাবো। আমার তো কোনও অসুখ নেই—

—অসুখ না-ই বা থাকলো, অসুখ হতে কতক্ষণ। এতদিন মা ছিল তাই তোমাকে দেখেছে, এখন তো আর মা নেই! আর আমাকেও তো তুমি আবার নবাবগঞ্জে পাঠিয়ে দিচ্ছ। আমি আর কিছুদিন থাকলে কী এমন ক্ষতি হতো!

ভট্টাচার্য মশাই বললেন—আমার কিছু ক্ষতি হতো না মা, কিন্তু তোর?

—না রে, আমার আবার কী ক্ষতি?

ভট্টাচার্য মশাই বললেন—না মা, তোর শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী, তারা কী ভাববে বল দিকিনি—

মেয়ে বললে—হ্যাঁ, আমার জন্যে তাদের ভাবতে বয়ে গেছে! আমার কথা যদি তারা একটু ভাবতো তো এতদিনের মধ্যে তারা অন্তত একবার একখানা চিঠি দিত। কই, মা'র শ্রাদ্ধে তো খবর দিয়েছিলে, তা তারা কেউ এল?

কথাটার মানে আছে? সত্যিই তো, তারা তো কেউই আসেনি। শুধু মেয়ের শাশুড়ী-শ্বশুরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল একবার নাম-মাত্র। তাও তো আবার নিজের মামা-শ্বশুর নয়।

বললেন—তাই তো মা, সদানন্দও তো একবার আসতে পারতো?

মেয়ে বললে—কেন আসবে? কেন আসতে যাবে তারা?

ভট্টাচার্য মশাই বললেন—সে কি কথা, আসবে না? আত্মীয়-কুটুম্বর বিপদে-আপদে আসবে না?

মেয়ে বললে—না, তারা আসবে না। বড়লোক কেন গরীব লোকের বাড়ি আসবে? তুমি তো বড়লোক বলেই তাদের বাড়িতে আমার বিয়ে দিয়েছিলে! আমি যেন পরে সুখে থাকবো বলে তোমার টাকা লেগেছিল। এখন? এখন দেখলে তো?

এসব কথা শুনে ভট্টাচার্য মশাই মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন। পাড়ার লোকেরাও কেউ-কেউ মন্তব্য করলো। বললে—এত বড় একটা কাণ্ড হলো অথচ জামাই তো কই এল না—

ভট্টাচার্য মশাই বললেন—আরে বাপু, জামাই কি আমার বেকার মানুষ যে বললেই হুট্ করে চলে আসবে। জমিদার মানুষ, কাজ-কর্ম থাকতে নেই? হয়ত কোর্ট-কাছারির দিন পড়েছে। তা জামাই না এলেও মামাকে তো পাঠিয়ে দিয়েছে—

—কিন্তু বেয়াইমশাই? বেয়াইমশাই একবার আসতে পারতেন না?

—তোমরা নিন্দানিন্দুক। সবাই তোমরা

বিমলানন্দকে না! বেহাইমশাইদের কত বড় জমিদারি কত বড় তালুক তা জানো? না যদি জানো তো এই বিপিন দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিপিনকেই জিজ্ঞেস করো না। বিপিন ভুবনবাবার তত্ত্ব নিয়ে গিয়েছিল। ও দেখে এসেছে। এক হাজার লোক পাত পেড়ে কালিয়া-পোলাও খেয়ে গিয়েছে। আর নয়নতারাও তো ছিল, ওকেও জিজ্ঞেস করো। ও-ও দেখেছে। ওর শাশুড়ি কত বড় সীতাহার দিয়েছে দেখেছ? ওজন করলে অন্তত পঞ্চাশ ভরি হবে...

প্রশ্নকর্তারা পঞ্চাশ ভরি ওজনের কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। বলে—না না কী যে বলেন আপনি পণ্ডিতমশাই, পঞ্চাশ ভরি হার কখনও নয়—

—কখনও নয়? আচ্ছা এখখুনি প্রমাণ করে দিচ্ছি—ও নয়ন, নয়ন—

বলে তখনি পাশের ঘরে চলে যান। একেবারে নয়নতারার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বলেন—হ্যাঁরে, তোর শাশুড়ি যে হারটা তোকে গায়ে-হলুদে দিয়েছিল সেটার ওজন কত রে? পঞ্চাশ ভরি নয়? নিখিলেশ বলে কি না পঞ্চাশ ভরি কখনও হতে পারে না—

নয়নতারা বলে—আমি জানি না—

ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি! কেমন ক'রে বলবো ওকে?
এক মাস আগেও রাধা মোটেই চাইতো না, রমেশ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়...এমনকি কাজেও। এখন সে রমেশের কাছেই যেতে চায় না। রমেশের মুখে দুর্গন্ধ,তাই।

নূতন দিনের আশা

কংগ্রেস-সি পি আই সহযোগে বাংলাদেশে সরকার স্থাপনা করলে, সাধারণ বাঙালী শান্তিতে জীবন-যাপন করবে এই আমরা আশা করি। সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব বিজয়কে অভিনন্দন জানানোর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরকালকে শুভসূচনায় সম্পূর্ণ করার ভরসা পেলে আমাদের নিজস্বটুকু সার্থক হবে।

পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটেছে তা বাঙালী মনের প্রতিচ্ছবি। বাংলার মা বোন এখন বোধন করতে চায় উন্নতি বা প্রগতি কিন্তু সবার আগে দরকার শৃঙ্খলাময় দৈনন্দিন জীবন। মেয়েরা চায় আরও বেশী। তারাই সব দুঃখের সেরা জামিন। মাওবাদ বা নকশালপন্থা যেন তাদের কোথায় ভুলের পথে ঠেলে দিচ্ছিল। তাই এবার নির্বাচনে যুব সমাজ ঢেলেছে মনপ্রাণ কংগ্রেসের জয়ের সীমানায়। ছাত্র পরিষদ বলুন বা যুবক কংগ্রেস বলুন তারাই বেঁধেছে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ।

কিন্তু বাঙালীর ঘরের ঘরনী যে আশা করছে বাঙালীর দুঃখ দৈন্যভরা জীবন নূতন ভরসায় ভরবে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি তাদেরই রাখতে হবে পদে পদে। ক্ষমতা কখনও বা মঙ্গল করে, কখনও বা কলুষিত করে, দূষিত করে। প্রহরীর মত সদাসচেতন যদি সাধারণ মানুষ থাকে, তবে বিপথে কখনও যাবে না ক্ষমতার অস্ত্র। আপনার আমার কাজ তাই ভোটদানে শেষ হয়নি, শুরু হয়েছে। ভবিতব্যতার গতিতে তার স্বাক্ষর থাকবে এমন মনে করা অন্যায় কি? ভোটদাতার রাজনীতিতে উন্নততর বিকাশের চাই হবে পরীক্ষা।

ইতিহাসের পাতা থেকে

তুত-আনখামেনের সমাধিকক্ষে অতি সুন্দর একটি বয়ম পাওয়া গেলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা গবেষণা করে ঠিক করলেন ওটি প্রসাধনী ক্রীমের আধার। ক্রীমটিতে একটু নারকেল তেলের গন্ধ। কিন্তু পরীক্ষা করে নারকেল তেলের কিছু গুণই পরিলক্ষিত হলো না। কোন জন্তুর চর্বির মত মনে হলো। হতেও পারে। শুকরের বসা নাকি সেকালে প্রশস্ত প্রসাধনী বলে পরিগণিত হতো। তবে ক্রীমটি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় রাজা বা অভিজাত মহলে রূপসীরাই যে অঙ্গরাগের ব্যবহার করতেন এমন নয়, পুরুষের প্রসাধনীপ্রিয়তা কম কিছুমাত্র ছিল না। আজকের যুগের মতই পুরুষ সমান আগ্রহশীল ছিলেন প্রসাধন, অঙ্গরাগ বা পোশাক পরিচ্ছদে।

আমাদের ইতিহাস ও পুরাণে পুরুষের অলংকার, সুগন্ধ চন্দনচর্চা ইত্যাদির পর্ব মহিলাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। পশ্চিম দেশেই বসনভূষণ যেন মেয়েলী ব্যাপার এমন একটা ধারণা কখনও কখনও সমাজে প্রচলিত ছিল। অথচ রোমের সেই জুলিয়াস সিজার পর্যন্ত মুখে রং মাখার উল্লেখ করেছেন।

পারস্য তো পুরুষের পুষ্পসারপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। যুদ্ধে বা রাজপ্রাসাদের আরাম বিলাসে, জয়ে অথবা পরাজয়ে পুষ্পসার অর্থাৎ ইত্বর ছিল অভিজাত পুরুষের সাথী।

পোশাকের বাহারেও পুরুষ ছুটেছে অভিনবত্বের পানে চিরকাল। দর্জির একটি বিল পাওয়া গেছে হাজার চারেক বছর আগের সুমের সভ্যতার অবশেষের সঙ্গে। চাকের উপর খোদাই করা হিসাব। ১২টি পোশাকের সেলাই মজুরী বাকি আছে। ১৪টি তার মধ্যে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে মিশিয়ে নানা সুগন্ধ, বহুমূল্য দূর প্রান্তের মসলাদির বাস!

নূতন ভারত গড়বে যারা (কলকাতার একটি পোলিং কেন্দ্র, ১১ই মার্চ)

দত্তক

দত্তক নেওয়া আমাদের দেশে যেমনই সামাজিক প্রথা হিসেবে চিরকালের বিধি তেমনই আইনের প্যাঁচ নিষেধে ভরা। বহু শিশুর বাঞ্ছিত ভাগ্যের সুরাহা হবার সম্ভাবনাকে এ ভাবে জটিলতায় ফেলা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন আইনের এক বিচিত্র ব্যবস্থা। অথচ সমৃদ্ধদেশে দত্তক বা যথাবিধি গৃহীত পোষ্য পুত্রকন্যার সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে।

সুইডেনের পত্রিকা "Now" একটি বিশেষ প্রবন্ধে নূতন সুইডেনের দত্তকবহুল সমাজের সুন্দর এক চিত্র দিয়েছেন। তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়ের ছবি রয়েছে। তারা সুইডেনের নানা ধরনের পিতামাতার স্নেহাশিসপুত জীবন-যাপন করছেন। কত দেশের শিশু এসেছে তার,

ঠিকানা নেই। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ইরান, ইথিওপিয়া, থাইল্যাণ্ড তো আছেই; মার্কিন, যুগোস্লাভ ইত্যাদির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। সুইডেনের বাচ্চাও নূতন আশ্রয়ে পালিত হচ্ছে অনেক।

১৯৭০ সালে ৪৫০টি বিদেশী বাচ্চা দত্তক হিসাবে প্রবেশ করেছে সুইডেনে। বিদেশের শিশু দত্তক গ্রহণের খবরাখবর সংগ্রহ ও সাহায্যের জন্য adoption centre বা দত্তক গ্রহণ কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে। শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান সম্মতি দিলে তবেই পালক পিতামাতা দত্তক নিতে পারেন। সন্তানের জন্মের উপর নিয়ম কানুন থাটে না। সে যে কোন পিতা-মাতার ঘরে আসতে পারে কিন্তু দত্তকের বেলায় জানাতে হবে ঘরের হাল কি।

বিদেশ থেকে বাচ্চা এনে লালন-পালন করার একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে সুইডেনে জন্মহার এত কমে গেছে যে দত্তক দেবার মত বাচ্চা মেলা ভার। জন্মনিয়ন্ত্রণ পর্ব বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। মা-বাপ নিজের শিশু না পেয়ে দূরদেশ থেকে আসা শিশুর আশায় বসে থাকেন। প্রাচুর্যের পরাকাষ্ঠা সুইডেনে। জনহিতকর কাজের আর কোন প্রসারের এলাকাই নেই। সব পরিপূর্ণ। রোগীর চেয়ে ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল বেশী। অভাবের অভাব আর একদিক দিয়ে অভাব সৃষ্টি করছে। মানসিক পরিতোষের সম্পূর্ণতায় লেগেছে টান। স্বল্পবিত্ত দেশের শিশু নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাবে আনন্দের কথা কিন্তু বিত্তহীন পিতা-মাতার নিরন্ন সংসারে সন্তান ও মাবাপের যে সম্বন্ধ সেটুকু বোঝার ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের চোখধাঁধানো বিলাসে পাওয় যায় কিনা জানি না।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়লো। এয়ার মার্শাল এঞ্জিনিয়ারের পত্নী গল এঞ্জিনিয়ার বলছেন। অভিজ্ঞতা তার নিজস্ব। তিনি নিজে একটি বড় বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট পদে আছেন। নানা জায়গায় কাজে ঘুরতে হয়। একবার হায়দ্রাবাদ থেকে বোম্বাই ফিরছিলেন। বিমানে পাশের আসনে বসেছিলেন এক মার্কিন সুধী। বয়স হয়েছে। মুখে কোথায় যেন সর্বহারার অসহায় ভাব। কথায় বার্তায় গল জানলেন পণ্ডিত মানুষটির পয়সার অভাব নেই। কিন্তু সন্তানের ছন্নছাড়া বেপরোয়া স্নেহহীনতা তাঁকে বার্ধক্যে এমন দিশেহারা করেছে। গল এঞ্জিনিয়ার তাঁকে বোম্বাইতে তাঁর বাড়িতে অতিথি হতে আহ্বান করলেন। বাড়ির পাচক এসে পয়সা চাইল। তার নিজের উপার্জনেরই এক অংশ। ভাই তার মারা গেছে কমাস আগে। দেশের বাড়িতে ভাই-এর ছেলেমেয়ে উপোসে তো থাকতে পারে না। তার অন্ন দু অন্ন হোক, ভাগ করে খেতেই হবে। মার্কিন মানুষটি অবাক। মৃত ভাই-এর ছেলেমেয়ের দায়িত্ব এ কেন নেবে? দু' চারদিন থেকেই তিনি বুঝলেন ভারতীয়তার এইখানেই বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক বন্ধন, আর্য সভ্যতার অবদান, আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে সমাজের শিরায় শিরায়। অনুকরণপটু বিত্তবানের মাঝে না থাকলেও গরীবের ঘরে মেলে। মার্কিন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এর দাম যে কোটি টাকারও বেশী। দত্তকের কথা বলতে গিয়ে এ গল্প উল্লেখ করলাম কেন জানি না তবে একথা ঠিকই যে প্রাচুর্য বা আরামই শিশুর বিকাশে সব নয়। স্নেহ ভালবাসা আমাদের সমাজে বেশী ছিল বলেই আমাদের জীবনে তার অভাবের রূপ ধরা পড়েনি। দত্তককেও তো সন্তানের স্থানেই প্রতিষ্ঠিত করবার কথা।

নূতন খবর

গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া এককালে সময়সাপেক্ষ তো ছিলই, তা ছাড়াও ভুলভ্রান্তি থেকে মানসিক অশান্তি, অকারণ সংশয়, নানা আশংকা মেয়েদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। আবিষ্কারের নূতন অধ্যায় দিয়েছে এখন অব্যাহত সাবলীল স্বচ্ছন্দতা। অচিরে অবস্থা নির্ণয় করার নূতন উপায় এখন ভারতীয় মহিলা সমাজকে দিতে পারে "প্রেগনস্টিকন অল্ ইন্"—Pregnosticon All-In। সংক্ষেপে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য এ পরীক্ষা প্রায় হাসপাতালের লেবরেটরিতে রাসায়নিক নির্ণয়ের সমকক্ষ। আর কোনও পদ্ধতিই এত নিখুঁত হয়নি। মাসিক রক্তস্রাব ব্যাহত হওয়ার আট দিন পরেই পরীক্ষা করা চলে। মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যে ফল জানা যাবে। গর্ভসঞ্চার মাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছোবারও এমন পথ আর কই?

প্রেগনস্টিকন অল্-ইন পরীক্ষা জিনিসটি কি? সরঞ্জাম সামান্য ও সাধারণ। ওষুধটি থাকে ক্ষুদ্র কাঁচের শিশি বা ampoule-এর ভিতরে। সেই ampoule-টিই টেস্ট টিউব হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ছোট্ট তাকে আরশি রাখা থাকবে ও মাপ করা যায় এমন একটি বিন্দু ফেলার ড্রপার দরকার। ব্যবহারবিধি প্রত্যেক মোড়কে থাকে।

গর্ভসূচনায় নিশ্চিত পরীক্ষা সম্ভব হলে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী স্থির করা কত সহজ হবে। ভেবে দেখুন, ঘরবাড়ি বদল বা হাওয়া বদলাতে বাইরে যাবার ব্যবস্থা ইত্যাদি কত

মাহিষাদল থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তি

বাগনানের শ্রীঅমল গাঙ্গুলীর সঙ্গে। আদর্শ-বাদ ও পাগলামি দুই-ই তাঁর চরিত্রে বেশ বেশি পরিমাণে আছে একথা বলে আমি আমার অকপট ধারণা ব্যক্ত করছি মাত্র। আমার সঙ্গে ভিন্নমত হলেও এ উক্তিতে রুষ্ট না হবার মতো পরিণত বুদ্ধি যে তাঁর আছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। রাজ-নীতির কলুষের দিকটাই তাঁকে পীড়িত করেছিল বেশি। সেজন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে, গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার আইডিয়াটা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। প্রধানত তাঁরই প্রেরণা ও সংগঠনে এক কালের এই শ্মশান-ভাগাড়ে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর ছোট একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারো-দ্ঘাটন করে যে সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, আজ প্রায় বারো বছর পরে, তা নানা দিকে প্রসারিত হয়েছে। সাবেক ডিসপেনসারিটি এখন আরও বড় হয়েছে। আর আছে, একটি হাই-স্কুল, ছাত্র-নিবাস, সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, সমাজ-শিক্ষা সংস্থা ও মুরগী পালন কেন্দ্র। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির নাম "আনন্দ-নিকেতন"। হাওড়া জেলায় থানা-শহর বাগনানের দেড় মাইল পশ্চিমে, নবাসন গ্রামে, জাতীয় সড়কের সংলগ্ন এ প্রতিষ্ঠানে পৌঁছতে হলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া-খড়্গপুর লাইনে হাওড়া থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরের বাগনান স্টেশনে নেমে বাস বা সাইকেল রিকশায় যাওয়া যায়।

নবাসন প্রধানত নমঃশূদ্রদের গ্রাম। কাছাকাছি পল্লীগুলিতেও তপশীলী সম্প্র-দায়ের বহু লোক বাস করেন। আমাদের সমাজে এঁরাই অবহেলিত হয়েছেন, পিছনে পড়ে থেকেছেন চিরকাল। আলোকবর্তিকা যদি কোথাও জ্বালাতে হয় তবে তাঁদের মধ্যেই সর্বাগ্রে জ্বালানো দরকার। যাঁদের মানুষ বলে এতদিন কেউ মনেই করেনি, মনুষ্যত্বের শুভ্র আসনে তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সাধনাই 'আনন্দ-নিকেতনের' লক্ষ্য। স্থান নির্বাচনে সেজন্য কোন ভুল হয়নি। সাধারণভাবে যাবতীয় পল্লীবাসীর ও বিশেষ
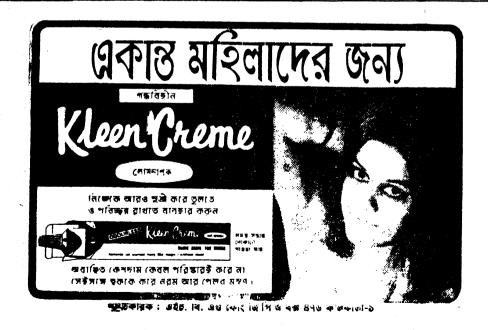
করে এই অনুন্নতদের মধ্যে কাজ করবার আদর্শ, এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী উৎসবে পঠিত সভাপতি ও সম্পাদকের ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে আরও পরিস্ফুট হবে। সভাপতি মহাশয় বলেছিলেন—"রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি বৎসরে ইহার শুভ আরম্ভ এবং মূলত রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের চিন্তাধারাই ইহার প্রকৃষ্ট ভিত্তিভূমি। অবশ্য মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীও আমাদিগকে প্রভূত প্রেরণা দান করিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, গ্রামীণ মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণেই দেশের সামগ্রিক কল্যাণ এবং এই কল্যাণ তখনই সম্ভবপর যখন প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণভাবে আত্মসচেতন হইয়া উঠিবে। এই গ্রামোন্নয়ন ও সমাজ-অনুশীলন কেন্দ্র প্রতিটি মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ, মনুষ্যত্ববোধ এবং কল্যাণবোধ জাগাইবার সম্মিলিত পদক্ষেপ।" সম্পাদক শ্রীঅমল গাঙ্গুলী মহাশয় বলেছিলেন—"গ্রামের মানুষ নিজেদের কর্মশক্তির উপর বিশ্বাস অর্জন করুক, নিজেদের অর্থনীতি ও সমাজজীবনকে গড়ে তোলবার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক এবং গণতন্ত্রের মূলকথা, নীচু থেকে নেতৃত্ব সৃষ্টি হোক—এই কাজে সাহায্য করার ভূমিকাই হচ্ছে আনন্দ-নিকেতনের ভূমিকা।"

শুধু রোগ নিরাময় বা শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি জনকল্যাণের মামুলি নিকপাটের (যদিও তাদের গুরুত্ব কম নয়) দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, এ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা একটি গ্রামীণ সংগ্রহশালাকেও যে তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্গত করেছেন, তা তাঁদের সর্বাঙ্গীণ জনসেবার আদর্শেরই পরিচায়ক। আমার বিবেচনায় এরকম একটি সাজানো ও পরিচ্ছন্ন মিউজিয়ম গ্রাম-বাংলায় আর আছে কিনা সন্দেহ। ভাবতে ভাল লাগে যে, প্রধানত একজন সৎ, নিরভিমান ও কঠোর পরিশ্রমী কর্মী শ্রীতারাপদ সাঁতরার দীর্ঘ-কালব্যাপী একাগ্র সাধনায় বহুমুখী পল্লী-সংস্কৃতির পরিচয়জ্ঞাপক এ প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। শ্রী সাঁতরা নবাসন গ্রামের এক তপশিলী পরিবারের সন্তান। তাঁর সম্প্রদায়গত পরিচয় আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই এই জন্য যে, তথাকথিত তপশিলী জাতিগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা, বর্ণহিন্দুরা, সমাজে আমাদের শত শত বৎসরের প্রতিপত্তি ও অগ্রাধিকার এবং তাঁদের নির্বাসনের কথাটা তুলনামূলকভাবে ভেবে দেখি না। সমাজ-আরোপিত অজস্র বাধা অতিক্রম করে তাঁদের কেউ যখন শিক্ষাগত ও মানসিক দিক থেকে বর্ণ-হিন্দু গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীদের সমকক্ষ হন তখন তাঁর কৃতিত্ব বহুগুণে বেশি। অপরি-সীম দারিদ্র্যের ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে নিটিওরলজীর প্রথম শ্রেণীর এম-এ ডিগ্রীটা শ্রী সাঁতরার ক্ষেত্রে গৌরবের হলেও আমার

আমসত্ত্বের ছাঁচ

পোড়ামাটির ফলকে কর্মকারের মূর্তি

দ্বাদশ শতকের দুর্গামূর্তি : হরিনারায়ণপুর (হাওড়া)

আছে তাঁর বড় পরিচয় তিনি প্রকৃত বঙ্গ-সংস্কৃতিপ্রেমী। সে প্রেম তাঁকে লাইব্রেরীর আরাম-কেদারায় বসে ডক্টরেট হবার সহজ রাস্তায় নিয়ে যায়নি; নিয়ে গিয়েছে গ্রাম-গ্রামান্তরের রুক্ষ ধুলার পথে যেখানে অর্থাভাবে নিছক পায়ে হেঁটে তিনি শত শত মাইল পরিভ্রমণ করেছেন তাঁর জন্মভূমিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখবার ও চিনবার জন্য এবং তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় এ মিউজিয়মটির জন্য নানা জিনিস সংগ্রহ করবার কাজে। তাঁর মতো অথবা বিষ্ণুপুরের মানিকলাল সিংহ বা রাজবলহাটের ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের মতো কর্মীরা খবরকাগজ বা পত্র-পত্রিকায় কীর্তিত হন না। যাঁরা হন, তাঁদের কথা সকলেই জানেন। তবু আমার স্থির বিশ্বাস, মুষ্টিমেয় হলেও, আজকের এসব সংগ্রাহকরাই খ্যাতির মোহে না পড়ে অশেষ পরিশ্রমে বঙ্গ-সংস্কৃতির অমূল্য উপাদানগুলি সংগ্রহ করে রাখছেন যার ভিত্তিতে কোন-না-কোন দিন বাঙালীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে। 'দেশ'-এর মত বিখ্যাত পত্রিকা যে এসব অখ্যাতনামাদের কথা বহুল-প্রচারিত হবার সুযোগ দিচ্ছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি বড় আশাবাদী মানুষ। আজকের এসব সামান্য মানুষের প্রকৃত মূল্য নিরূপণের জন্য যে স্তরে পৌঁছনো দরকার, বঙ্গসমাজ যে নিশ্চয়ই একদিন সে পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। এই সব আদর্শবাদী পুরোধাদের কথা আমি শুধু কিছুদিন আগে বলে গেলাম।

আনন্দ-নিকেতন মিউজিয়মের 'কীর্তিশালা' নামটি প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর দেওয়া। অতীত ও বর্তমানের মানুষ এবং তাদের বহুমুখী জীবনযাত্রার কীর্তিচিহ্নগুলি যেখানে সংরক্ষিত থাকবে সে ভবনের নাম কীর্তিশালা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আনন্দ-নিকেতনের উদ্বোধনের সময় প্রকাশিত স্মারক-পুস্তিকায় এ বিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"আমাদের দেশের পুরানো ইতিহাস ও পুরাবস্তু এবং বর্তমান লোক-শিল্পের সঙ্গে পরিচিত করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলাই এই বিভাগটির লক্ষ্য।" অন্যত্র বলা হয়েছে—"দেশগঠনের ক্ষেত্রে যদি

আমাদের দেশের অতীত সমাজব্যবস্থার মৌলিকত্ব ভুলে যাই, আমাদের দেশের বহু-যুগব্যাপী প্রবহমান অর্থনীতির ধারা উপেক্ষা করি, গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা কাঠামো লক্ষ্য না করি, ভারতবর্ষের অনুসৃত শাসন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা না করি, তা হলে ভারতবর্ষকে প্রগতি ও উন্নয়নের পথে পরিচালিত করা অসম্ভব।" অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে ভবিষ্যৎকে ঠিক পথে নিয়ে যাবার যে দেশব্যাপী আয়োজন এখন চলছে, আমাদের গ্রামীণ মিউজিয়মগুলি সে কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীন সভ্যতায় মহান অথচ অধুনা অনগ্রসর ভারত-বর্ষের জনশিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত প্রসারের ক্ষেত্রে এই সংগ্রহশালাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেজন্য এ-জাতীয় প্রতি-ষ্ঠানের উত্তরোত্তর পোষণ ও পরিবর্ধন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

আনন্দ-নিকেতন কীর্তিশালার সংগ্রহের বিবরণ দেবার আগে এ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বলে নিই। পশ্চিম বাংলার অসংখ্য মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য পুরাকীর্তি অনাদরে অবহেলায় ইতিপূর্বেই লুপ্ত হয়েছে, বাকিগুলিও ধ্বংসের পথে। এদের সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাই যখন নেই, তখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হবার আগে মন্দিরগুলির ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায় ততই ভাল। পোড়ামাটির কারুকার্যখচিত ইমারতগুলির ক্ষেত্রে এ-কাজটি খুবই জরুরী, কেননা শেষ মধ্যযুগে এই বিশেষ অলঙ্করণ পদ্ধতিটি কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই ব্যবহৃত হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোথাও হয়নি। আনন্দ-নিকেতন কীর্তি-শালার কিউরেটর শ্রীতারাপদ সাঁতরা এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়ে বহু দূরে অগ্রসর হয়েছেন। কার্ড-ক্যাটালগ পদ্ধতিতে পশ্চিম-বঙ্গের পনেরটি জেলার প্রতিটি পুরাকীর্তি সম্পর্কে পৃথক কার্ডে সংক্ষেপে যাবতীয় তথ্য ও একটি ছোট আলোকচিত্র রাখা হচ্ছে। এ বিষয়ে তারাপদবাবু পরলোকগত ডেভিড ম্যাককাচ্চনের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন; আমিও এ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত আছি। কাজটি বিরাট। তবু, পশ্চিম বাংলার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির অর্ধেকের বেশি এভাবে ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত হয়েছে। সমস্ত প্রকল্পটি শেষ হতে আরও দু-তিন বছর লাগতে পারে। আনন্দ-নিকেতন কীর্তিশালার এই বিশদ তথ্যপঞ্জীটি পুরা-তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন সরকারী অথবা বেসরকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের ঈর্ষার বস্তু হবার যোগ্য। অশেষ পরিশ্রমে আহৃত এ জ্ঞানভাণ্ডার যে ভবিষ্যৎ গবেষক-দের কাছে মহামূল্য বলে বিবেচিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

দশম শতকের বুদ্ধমূর্তি : বিহার

এ মিউজিয়ম গত দশ-এগারো বছরে প্রায় আট হাজার পুরাবস্তু ও লোক-শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। তার অধিকাংশই যে দান হিসাবে প্রাপ্ত তা থেকে প্রমাণ হয় জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি থেকে তাঁরা কখনো বঞ্চিত হননি। আমার মতে, বেসরকারী সংগ্রহশালাগুলির এটিই শ্রেষ্ঠ মূলধন। সরকারী সাহায্য যে একেবারে পাওয়া যায়নি—তা নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৮-৬৯ সালে আসবাবপত্র কিনবার জন্য ৩০০০ টাকা ও ১৯৬৯-৭০ সালে গৃহ-নির্মাণ বাবদ ২৩,৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। সম্প্রতি, প্রায় ৩২,০০০ টাকা ব্যয়ে যে মিউজিয়ম ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার দ্বারোদ্ঘাটন করতে সম্মত হয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই হয়ত সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

সরকারী অনুদানের অপেক্ষা না রেখে আরও নানাবিধ কাজ যে তারাপদবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা নিজেরাই করে নিয়েছেন, এ সংগ্রহশালার এলে পদে পদে তার পরিচয়

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাঠের বুদ্ধমূর্তি

পাওয়া যায়। পোস্টার, লেবেল, ডিসপ্লে-কার্ড, মাউন্ট প্রভৃতি তৈরি করা থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রদর্শিত সামগ্রী অতি সুশৃংখলভাবে সাজানো ও তাদের ঝাড়-পোঁছ করা সবই তাঁরা বরাবর করে এসেছেন বিনা পারিশ্রমিকে, হাসিমুখে। তাঁদের এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বসাধারণের কাছে জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরাই তাঁদের অভিপ্রায়। সেজন্য গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কৃষক বা গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝিরা বহু সংখ্যায় এখানে এসে অসুবিধা বোধ করেন না। আবার, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এঁরা সাধ্যমত সাহায্যও করে থাকেন। বহু প্রত্ন-বস্তুর আলোকচিত্র পাঠিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা, গৌহাটি, পাঞ্জাব, চণ্ডীগড় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে ও কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে তাঁরা সাহায্য করেছেন।

লোকশিল্প সংগ্রহের দিকেই আনন্দ-নিকেতন কীর্তিশালার ঝোঁক বেশি। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার মাটি বা কাঠের তৈরি রাশি রাশি খেলনা-পুতুল, পিতল ও কাঁসার কাজ, ঢোকরা-শিল্পের বহু নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয়েছে। এই পর্যায়ে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন যা অন্য মিউজিয়মে দেখা যায় না। সন্দেশ ও আমসত্ত্বের ছাঁচের সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ। এগুলির নকশায় আলপনা ও বালুচর-শাড়িতে ব্যবহৃত মোটিফের বেশ প্রভাব লক্ষ করা যায়। লোকশিল্পের অন্য নিদর্শন—যশোহর, খুলনা এবং হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি উৎকৃষ্ট নকশী কাঁথা।

চিত্রকর-পটুয়াদের অংকিত পটচিত্রের সংখ্যা কম নয়; মেদিনীপুর, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আনীত ১৪।১৫টি পটচিত্র এ সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। এই পর্যায়ে আঠারো শতকের বেশ কয়েকটি চিত্রিত পুঁথির পাটাও পড়ে। বাংলা পুঁথির সংখ্যা দেড় শ'র কিছু বেশি; সেগুলির পাঠোদ্ধারের কাজ চলছে।

পুরাতাত্ত্বিক বস্তু সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ মিউজিয়মের কর্মীরা নিজেরাই অনুসন্ধান চালিয়ে হাওড়া জেলার হরিনারায়ণপুর থেকে পাল-সেন যুগের যে সব প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তা ছাড়া মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত নানাবিধ মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তিকা ও ফলকও এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এই পর্যায়ে টেরাকোটা মন্দিরের অলংকৃত ইঁটের বিস্তৃত সংগ্রহটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত কামানের ছবিটি থেকে এ বিভাগের উৎকর্ষ কিছুটা প্রমাণিত হবে। সংখ্যায় বেশি না হলেও, মৌর্য, শুঙ্গ যুগের ও পরবর্তী-কালীন মুঘল ও ব্রিটিশ আমলের অনেকগুলি মুদ্রা এ মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে।

পাথরের মূর্তি-সংগ্রহের মধ্যে আছে, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে আহৃত দশম শতকের ক্ষুদ্র বিষ্ণুমূর্তি, ত্রৈলোক্যমূর্তি ও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মহিষমর্দিনী, উমা-মহেশ্বর ও তিন-চারটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি এবং বিষ্ণুপট্ট ও বিহার থেকে সংগৃহীত তিনটি বুদ্ধমূর্তি। এই পর্যায়ে হাওড়া জেলার দেউলপুর গ্রাম থেকে আনীত কাঠের বুদ্ধমূর্তিটি খুবই উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্যের ধরন ও রং প্রয়োগের রীতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এটির উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন দেশ। কিন্তু কি করে সেটি যে দেউলপুরে এল তা অজ্ঞাত। এই দুষ্প্রাপ্য মূর্তিটি সংগ্রহ করে আনন্দ-নিকেতন কীর্তিশালায় একদা দান করতে পেরেছিলাম বলে আমি কৃতার্থ।

ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—"দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীট-দষ্ট পুঁথির জীর্ণ পাতে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রত-কথায়, পল্লীর কৃষি-কুটিরে ... স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য ... দিনের পর দিন, বেতন, বিনা পুরস্কারে, খ্যাতিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।" কবি-গুরুর এই আহ্বানে আনন্দ-নিকেতন কীর্তিশালার কর্মীদের মতো সত্যকার সাড়া খুব কম বাঙালীই আজ অবধি সাড়া দিয়েছেন। (ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

শিশুর স্কুল পালান কি এক ধরনের রোগ ?

কোন কোন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইদানীং এ কথাই বলছেন। ও'দের মতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিহাসে হাল আমল পর্যন্ত অনেক রকম ভাইরাসের কথাই বলা হয়েছে। বিচিত্র তাদের গঠন, অদ্ভুত তাদের কার্যপ্রণালী। অনেক সময় কোন কোনটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের হিমসিম খেতে হয়েছে। কখনও জয়ী হয়েছেন, কখনও পরাজিত। তবু, তাঁদের অনেকেই এক বাক্যে স্বীকার করছেন, কোন ভাইরাসই স্কলাস্টিক অ্যাডোলেসাম (adolescum)-এর মত অত বেশি তাঁদের কাবু করতে পারে নি। এটা যেন এক ধরনের রোগ। সাদা বাংলায় যাকে বলা চলে, স্কুল পালান রোগ বা স্কুলের ব্যাপারে অনীহা।

এবং সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার এ রোগের গতি সর্বত্র। যে কোন বয়সের শিশুই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সে শিশু বড়লোকেরই হোক অথবা গরীবের। শিক্ষিত এবং কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারের হোক অথবা অশিক্ষিত এবং অকৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারের। পৃথিবীর যে কোন দেশ, জাতি, ধর্ম এবং সম্প্রদায় যেখানকারই হোক, তুলনামূলকভাবে এ রোগের অনুপ্রবেশ সর্বত্র সমান। বিশেষ কোন শ্রেণী বা সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এবং রোগের লক্ষণগুলিও প্রায় এক ধরনের। অর্থাৎ ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর শিশুকে যেই পড়তে বলা হল, অথবা স্কুলে যাওয়ার কথা, সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর: 'বড্ড পেট ব্যথা করছে', 'মাথা ধরেছে' অথবা গলা খুস খুস করছে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, মা! ইত্যাদি। কেউ কেউ সরাসরি হয়ত বলে উঠল, 'ইস্কুলে যেতে ভাল লাগছে না, মা।' বাবার চেয়ে মায়ের কাছে এ ধরনের কথাবার্তা বলায় বিপদ কম। অতএব স্কুল পালানর ব্যাপারে যত সব বায়না তাঁর কাছেই চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, স্কুলে যাওয়ার কথা কানে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দেহের তাপমাত্রা খানিকটা বেড়ে গেছে। কেমন যেন জ্বর জ্বর ভাব।

কিন্তু এহ বাহ্য। যে ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের সব চাইতে বেশি বিস্মিত করেছে, সেটা হল, স্কলাস্টিক অ্যাডোলেসামের আক্রমণ কি দেখে শুনে শুধু সোম, মঙ্গল প্রভৃতি বারেই হবে? কারণ দেখা যাচ্ছে সোম থেকে শনি, অর্থাৎ যে কয়দিন স্কুল, এ রোগের প্রাবল্য যেন সেই দিনগুলিতেই বেশি। অথচ দেখুন, রবিবার, গ্রীষ্ম বা পুজোর ছুটি বা অন্য কোন ছুটির দিনে অমন কোন উপসর্গই আপনার শিশুর মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, একবার এই উপসর্গগুলি দেখা দেওয়ার পর এগুলি এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টার মত বেশ জাগ্রত অবস্থায় থাকে। পরোক্ষভাবে অন্য কোন উপসর্গও দানা বাঁধে না। ছুটির পর আবার যখন স্কুল শুরু হয় উপসর্গগুলি আবার দেখা দিতে শুরু করে এবং
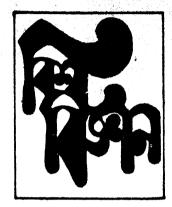
ক্রমে দিনগুলি যতই পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, প্রবলতর হয়।

কস্তুত স্কলাস্টিক অ্যাডোলেসাম সম্পর্কে কিছুদিন আগেও বিজ্ঞানীরা বলতে গেলে অজ্ঞই ছিলেন। সম্প্রতি এর উপর আলোকপাত করেছেন ড্রপআউট ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিশিষ্ট ভাইরাস-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হাইয়েনরিশ অ্যাপলবাম। শুধু আলোকপাতই নয়, রীতিমত গবেষণাগারের পরীক্ষায় চাঞ্চল্যকর এক ইতিহাস সৃষ্টি করে বসেছেন।

পরীক্ষার জন্যে অধ্যাপক অ্যাপলবাম কয়েকটি সাদা ইঁদুর বেছে নেন। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এদের শিক্ষিত করে তোলেন। অবশেষে এরা ছাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। একটি বড় খাঁচা তৈরি করলেন অধ্যাপক অ্যাপলবাম। খাঁচার মধ্যে বসান হল খুদে একটি স্কুল। স্কুলে খুদে খুদে ক্লাস ঘর। স্কুলের পেছনে তৈরি করা হল ছোট্ট খেলার মাঠ। সেখানে দোলনা, দড়ি বা রঙিন নল এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হল যাতে ওই ইঁদুর-ছাত্ররা সেখানে দরকার মত খেলাধুলো চালাতে পারে। স্কুলের ছাদে রইল একটি ঘণ্টা। ব্যাপারটা এই, অধ্যাপক অ্যাপলবাম যখন একবার ঘণ্টা বাজাবেন, ইঁদুরগুলি তখন ক্লাসে গিয়ে ঢুকবে। দুটি ঘণ্টা বাজালেই ছুটি। তখন ইচ্ছে করলে তারা মাঠে গিয়ে খেলতে পারে।

পরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে অধ্যাপক অ্যাপলবাম স্কুলের মাঠে ইঁদুরগুলিকে খেলতে দিলেন। দেখা গেল, কুচ কুচ করে তারা জিনিসপত্র দাঁত দিয়ে কাটা শুরু করল, এলোপাথারি ছুটোছুটি এবং কখনও বা একটি অপরটির গায়ের উপর উঠে দাপাদাপি করতে লাগল।

এর পরই তিনি ক্লাসে যাওয়ার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। আর যেই ক্লাসে যাওয়ার ঘণ্টা পড়ল, ব্যাস! সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ভাইরাসের আক্রমণ। ইঁদুরগুলির মধ্যে উচ্ছলতা কমে এল। তাদের মন মেজাজও গেল বিগড়ে। অনিচ্ছার সঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে করতে তারা একে একে ক্লাস ঘরে ঢুকতে শুরু করল। কেউ কেউ আবার

সোম, মঙ্গল, বুধ...

হাত দিয়ে পেট চেপে ধরতে লাগল। ভাবটা, যেন পেট ব্যথা করছে। স্কুলে যেতে ভাল লাগছে না। কেউ কেউ প্রচণ্ড কাশতে শুরু করল। এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যায়। কেউ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ভাবটা, হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্ছে।

দু ঘণ্টা পর অধ্যাপক আপলবাম ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। ব্যাস। সমস্ত রকমের রোগ-ভোগ মুহূর্তে উধাও। অসুস্থ সব ইঁদুর তার নিজস্ব জীবন ফিরে পেল। শুরু হয়ে গেল দাপাদাপি।

পরীক্ষাটি বার কয়েক করার পর অধ্যাপক আপলবাম বেশ খানিকটা আশান্বিত হলেন। শুরু হল তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার পালা।

এবার স্কুলে যাওয়া ছাড়াও, বাড়ির কাজের ব্যবস্থা করা হল। যেমন ছোট ছোট কাগজের টুকরো নিয়ে গিয়ে বাক্সের মধ্যে ফেলা। অথবা কাগজের টুকরো পর পর সার করে সাজাও, ইত্যাদি। কিন্তু দেখা গেল, এ সমস্ত কাজের নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের ভাইরাস আক্রমণ করছে। ইঁদুরগুলি কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়ল। কারোর মাথা ধরা, কারোর বমি বমি ভাব, কয়েকজনের আবার দাঁত ব্যথা শুরু হয়ে গেল।

অধ্যাপক আপলবাম এবার তাদের একটি টেলিভিশন সেট রাখলেন। ইঁদুর-গুলি তার সামনে ভিড় করতেই সেটটি চালিয়ে দেওয়া হল। ইঁদুরগুলির সঙ্গে সঙ্গে তার পর্দার আড়ালে এসে [illegible] নাচানাচি শুরু করে দিল। পেট ব্যথা, মাথা ধরা সব ভুলে টেলিভিশন পর্দায় ছবি দেখতে লাগল। সমস্ত ক্লান্তি কোথায় চলে গেছে। ঘুমোনোর সময় পেরিয়ে গেলেও সেখান থেকে কেউ তারা নড়ল না। অথচ কিছুক্ষণ আগেই বাড়ির কাজ করার সময় অনেকেরই এক [illegible] ঘুম পেয়ে গিয়েছিল, এই বুঝি ঘুমের ঘোরে পড়ে যায়।

শেষ পর্যায়ের পরীক্ষায় অধ্যাপক আপলবাম ঠিক করলেন, এবার দ্বিতীয় ধরনের পরীক্ষা দেবেন। শিক্ষক ইঁদুরদের কথাটি জানিয়ে দেওয়া হল।

পর দিন সকালে পাঠশালায় ঢুকে অধ্যাপক [illegible]। হাঁ। ইঁদুর ছানারা ঠিকমতই সেখানে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সকলেই মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মাটির ওপর সব চিৎ হয়ে শুয়ে। এবং [illegible]। অর্থাৎ আবার ভাইরাসের আক্রমণ।

সাথে সাথে পরীক্ষা নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। ছাত্রদের জানালেন, আজকের আর পরীক্ষা দিতে হবে না। যেই বলা, মুহূর্তে সমস্ত ইঁদুর লাফিয়ে উঠল। শুরু হল দাপাদাপি, হুড়োহুড়ি। সকলেই খেলায় মত্ত হয়ে উঠল।

অধ্যাপক আপলবামের সিদ্ধান্ত, 'স্কলাস্টিক অ্যাডোলেসেন্স'-এর সঙ্গে স্নায়ু-তন্ত্রের নিশ্চয় কোন যোগ আছে। এবং যখনই ইঁদুরদের স্কুলে যেতে বলা হয়, অথবা তাদের ওপর বাড়ির কাজ বা পরীক্ষা চাপান হয় 'স্কলাস্টিক অ্যাডোলেসেন্স' তাদের আক্রমণ করে। আবার যে মুহূর্তে ইঁদুররা বোঝে, এবার তারা খেলতে বা টেলিভিশনের ছবি দেখার সুযোগ পাবে, এই ভাইরাসের আক্রমণ অদৃশ্য হয়।

বলা হয়েছে, অধ্যাপক আপলবামের এই শিক্ষিত ইঁদুরদের ইতিমধ্যে অনেক-গুলি বাচ্চা হয়েছে। নির্দিষ্ট অনুশীলন চালানোর পর ওদের ওপরও তিনি আগের পরীক্ষাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন। দেখা গেল, বাপ মায়েদের মত এরাও 'স্কলাস্টিক অ্যাডোলেসেন্স'-এ ভুগছে। অতএব অধ্যাপক আপলবামের আরও একটি সিদ্ধান্ত: স্কুল পালানোর ব্যাপারটা বংশগত ব্যাধি। এবং

শনিবারের বিকেল থেকে পুরো রবিবার

বাবা মার কাছ থেকে শিশুরাও জন্মসূত্রে এ রোগ লাভ করতে পারে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অধ্যাপক অ্যাপেল-বামের এই আবিষ্কার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন। মানবশিশুর ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা কতখানি বাস্তবসম্মত সেটা যাচাই করাই আপাতত তাঁর উদ্দেশ্য। অবশেষে বংশানুক্রমিক অ্যাক্রোডেসমায়ের হাত থেকে সাফাই যদি নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন পদ্ধতি বের করা সম্ভব হয়, শিশুদের পড়াশুনার সমীহা হয়ত অনেকটা দূর করা সম্ভব হবে। এই সঙ্গে সামাজিক স্বাস্থ্যকে অপূরণীয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করাও।

ব্যায়াম এবং বহুমূত্র রোগ

ব্যায়াম কোন কোন ক্ষেত্রে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিক রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। অবশ্য যদি তা নিয়মিত এবং রুটিন মাফিক হয়। সম্প্রতি এ কথা বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার জনৈক চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ডঃ এফ জে বাইস। কয়েকজন বহুমূত্র রোগীকে তিনি কয়েক মাস আগে নির্দিষ্ট সময় ধরে দিনে একবার ব্যায়াম করার উপদেশ দিয়েছিলেন। দেখা যায়, এর পর থেকেই ক্রমে বহুমূত্র রোগের উপসর্গগুলি তাদের মধ্যে হ্রাস পেতে শুরু করে। এবং আতিরিক্ত পাওনা, ব্যায়াম করার সময় খাবারের পরিমাণ বাড়ানোর পরও তাঁরা দৈহিক ওজন কমাতে সক্ষম হন।

ডায়াবেটিজ মেলিটাস নামে এক ধরনের বহুমূত্র রোগ আছে। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিরাই সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত হন। ডঃ বাইস এমন কয়েকজন রোগীকে প্রত্যেকবার আধ ঘণ্টা ধরে দিনে চারবার ব্যায়াম করার নির্দেশ দেন। অতিরিক্ত ব্যায়াম যাতে ওই সমস্ত রোগীর হৃদপিণ্ড এবং শরীরের রক্তসংবহনের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে তার ওপর তিনি দৃষ্টি রাখতে থাকেন। অর্থাৎ এক নাগাড়ে আধ ঘণ্টা করে দৈহিক পরিশ্রম করার মত যাঁদের ক্ষমতা ছিল না, তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি তিনি সংক্ষিপ্ত করে দেন। তিনি যতটুকু সইতে পারেন তাঁকে ততটুকু সময় ধরেই ব্যায়াম করতে বলা হয়। এই সঙ্গে দৈনিক কে কতটা খাবার খাচ্ছেন, কতটা গ্লুকোজ তিনি সহ্য করতে পারছেন তার ওপর লক্ষ রাখতে লাগলেন। মাসে একবার করে ইনসুলিনের কার্যকারিতাও পরীক্ষা করে দেখা হয়। উল্লেখ্য, বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিন ব্যবহার করা হয়। আট মাস পরে দেখা গেল, একজন ছাড়া তাঁর সমস্ত রোগীই বহুমূত্র রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। দুজনের ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেল, বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণ করার ওষুধ না খাইয়ে শুধু ব্যায়ামের সাহায্যেই তাঁদের নিরাময় করা যায়।

ডঃ বাইসের মন্তব্য : সব রকম বহুমূত্র রোগই যে ব্যায়ামের সাহায্যে সারিয়ে তোলা যাবে সেটা অবশ্য হলফ করে বলা সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে রোগের

প্রাবল্য যদি কম থাকে, চিকিৎসার ব্যাপারে এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

ফলমূল শিশু দেহে রক্ত সংবহনে সাহায্য করে

সেলুলোজ নামক জটিল রাসায়নিক যৌগটিকে এ পর্যন্ত ফলমূল, শাকসব্জী এবং দানা জাতীয় কোন কোন শস্যের আবর্জনা হিসেবেই অনেকে জেনে এসেছেন। যদিও খাদ্যমূল্যের দিক দিয়ে বস্তুটি অকিঞ্চিৎকর। এর প্রধানতম কাজ, প্রাকৃতিক জোলাপ হিসেবে আমাদের সাহায্য করা।

কিন্তু সম্প্রতি সেলুলোজের আরও একটি মূল্যবান ভূমিকার কথা জানা গেল। মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য-প্রযুক্তিগত গবেষণাগারের কয়েকজন গবেষকের বক্তব্য, শুধু জোলাপই নয়, শিশুদেহে স্বাভাবিক রক্তসঞ্চালন অব্যাহত রাখার ব্যাপারেও সেলুলোজ যথেষ্ট সাহায্য করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, রক্তবহনকারী নলের মধ্যে অতিরিক্ত কোলেসটারোল এবং কোন কোন চর্বিজাতীয় সামগ্রী পলির মত জমে গিয়ে শরীরের রক্তপ্রবাহকে বাধা দেয়। ওই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেলুলোজ শিশু দেহে ওই সমস্ত সামগ্রীর পরিমাণ হ্রাস করতে সাহায্য করে।

পরীক্ষার জন্যে ওঁরা দশজন মেয়েকে বেছে নেন। বয়েস দশ থেকে বারো বছরের মধ্যে। দশদিন ধরে তাদের রুটিন মাফিক খেতে দেওয়া হয় এবং দৈনিক খাবারের মধ্যে মিশিয়ে দেয়া হয় মাথা পিছু চারগ্রাম কোলেসটারোল। দশদিন পর দেখা গেল তাদের রক্তে কোলেসটারোলের মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

এর পর কোলেসটারোলের পরিবর্তে তাদের খাবারে মাথা পিছু দৈনিক একশ গ্রাম সেলুলোজ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হল। তাদের খেতে দেওয়া হয় গম এবং ভুট্টার আটা। এবার দেখা গেল কোলেস-টারোলের মাত্রা আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। অতিরিক্ত সেলুলোজ খাওয়ার পর কেন তাদের রক্তের অতিরিক্ত কোলেসটারোল সরে পড়ল, মহীশূরের বিজ্ঞানীরা তার যথাযথ ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত দিয়ে উঠতে পারেন নি। ওঁদের অনুমান, সম্ভবত অতিরিক্ত সেলুলোজ খাওয়ার ফলে শরীরে বেশি মাত্রায় পাচক রস নির্গত হয় এবং ওই রসই এ ব্যাপারে সাহায্য করে। ওঁরা মনে করেন, নিয়মিত খাদ্যের মধ্যে সেলুলোজের মাত্রা কিছুটা বেশি থাকা ভাল। এতে করে শুধু শিশুই নয়, বড়দের শরীরের রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। উল্লেখ্য, অধিক সেলুলোজ-ঘটিত খাবারের মধ্যে পড়ে ডুমুর, খেজুর, আপেল, লেটুস, বাদাম, রান্না না করা টমেটো, ফুটি, তরমুজ প্রভৃতি।

ভূগর্ভস্থ জলীয় বাষ্প। স্যানফ্রান্সিসকো থেকে ১০০ মাইল দূরে উত্তর ক্যালি-ফোর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের সছিদ্র পাথরের গহ্বর থেকে অবিরত গতিতে এই বাষ্প বেরিয়ে আসছে। আবিষ্কার করেছিলেন উইলিয়াম বেল ইলিয়ট ১৮৪৭ সালে। এর প্রচণ্ড শব্দ এবং অভাবিত দৃশ্য দেখে ইলিয়ট জায়গাটার নাম রেখেছিলেন 'গেট অফ হেল' অর্থাৎ নরকের দ্বার। পরে অনুসন্ধানে ধরা পড়ল সেখানকার পাথরের নীচে আছে গলন্ত লাভা। তার উত্তাপই জলকে বাষ্পে পরিণত করে এবং সেই বাষ্প ফাটলের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। পৃথিবীর বুকে সাধারণ চাপে আমরা যে জলীয় বাষ্প তৈরি করি, তুলনায় এই বাষ্পের চাপ তার চেয়ে অনেক কম। তাপমাত্রাও অত বেশি নয়। এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে যে পরিমাণ মানুষের তৈরি বাষ্পের প্রয়োজন ততটা শক্তি উৎপাদন করতে এই বাষ্পের পরিমান গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় তিন গুণে। সম্প্রতি জিওথার্মাল বা ভূ-উত্তাপে উক্ত এই বাষ্পের সাহায্যে ৫৫ মেগাওয়াট-এর একটি একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার ওই বাষ্পের নল পরীক্ষা করে দেখছেন

ভিটামিন-এ এবং রোদে পোড়া

গ্রীষ্ম এসে গেছে। রোদের তেজ বাড়ছে। এবং বেশি রোদে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আপনার গায়ের চামড়া ঝলসে যায়, তাহলে—হ্যাঁ বৃটিশ এয়ার কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন : অন্তত এই সময়ে কিছুটা অধিকমাত্রায় ভিটামিন-এ এবং তৎসহ ক্যালসিয়াম সেবন করুন। এতে করে এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ রোদে থাকলেও আপনার গাত্রত্বকের অস্বস্তিতে আপনি ভুগবেন না। ত্বকের কমনীয়তাও বজায় থাকবে।

পরীক্ষাটি করা হয়েছিল বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজের তিন হাজার কর্মীর ওপর। ছুটি উপভোগ করার জন্য ওরা দল বেঁধে উন্মুক্ত সমুদ্রবেলায় বিচরণ করছিলেন। ডাক্তাররা ওদের দৈনিক ভিটামিন-এ ট্যাবলেট খেতে দেন। যার পরিমাণ ২৫০০০ আন্তর্জাতিক একক। আর সেই সঙ্গে দেওয়া হয় ১২০ মিলিগ্রাম করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। বড়িগুলি শরীরের চামড়াকে যে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে সে ব্যাপারে চিকিৎসকরা এক প্রকার নিশ্চিতই বলা চলে। কারণ বড়ি-গুলি খাওয়ার আগে ১৬৩ জন রোদে পুড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নিয়মিত বড়ি সেবনের পর পনেরজন ছাড়া সকলেই উপকৃত হয়েছে বলে স্বীকার করছে। ভিটামিন-এ-ক্যালসিয়াম বড়ি খেয়ে ৩২৫ জন পুরোপুরি রোদের ঝলসানি থেকে রক্ষা পায়। অবশিষ্টে কেউ কেউ যৎসামান্য অসুবিধে ভোগ করে।

যাই হোক, ফলাফল দেখে বৃটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কিন্তু বেশ কিছুটা চমকে গেছেন। বস্তু দুটির কার্যকারিতা কতখানি অনুকূল এবার তাঁরা যাচাই করে দেখছেন।

সমরজিৎ কর

॥ এগার ॥

নেতাজী চাইছিলেন জার্মানী, ইটালী ও জাপান একটি যুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী এই ধরনের একটি ঘোষণা আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সম্পর্কে করেছিল। ইটালিয়ান গভর্ণমেণ্ট নেতাজীর এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন, কারণ মুসোলিনি ছিলেন বরাবরই নেতাজীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। জাপানকে নিয়েও কোন অসুবিধা হল না। জার্মানীতে সে সময় জাপানের অ্যাম্বাসেডর ছিলেন ওসীমা ও মিলিটারি এটাচে ইয়ামামোটো। এরা দুজনেই নেতাজীর গভীর দেশপ্রেম ও অসাধারণ কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ ছিলেন। এদের সঙ্গে নেতাজী সরাসরি আলোচনা চালাবার পর জাপান গভর্ণমেণ্ট যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতে স্বীকৃত হল।

এই ঘোষণার ড্রাফট্ ১৯৪২-এর ১০ই জানুয়ারী লেখা হয়েছিল। জার্মান আর্কাইভস্-এর কাগজপত্র দেখলে বোঝা যায় এমনভাবে ঘোষণাটি তৈরি করা হচ্ছিল যাতে ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবসে এই বিবৃতি প্রচার করা যায়।

ওয়ারমান নোট তৈরি করেছেন হিটলারের জন্য, তাতে লিখেছেন নেতাজীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই ড্রাফট্ তৈরি হয়েছে, অবশ্য ওঁর সব সাজেশন্‌ই যে গ্রহণ করা হয়েছে তা নয়। যেমন উনি বলেছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে [illegible] ও [illegible]-ধর্ম ও শ্রেণীর বৈষম্য থাকবে না এমনি কথা এখনো থাকুক। কিন্তু ওসব কথা এখানে তোলা হয়নি।

ইটালিয়ান ও জার্মান গভর্নমেণ্ট স্বীকার করলে কি হবে, স্বীকৃত হলেন না হিটলার। একাধিক ড্রাফট্ লেখা হয়েছিল। তারা একটির তারিখ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২। কিন্তু হিটলারের আপত্তির জন্য কিছু করা সম্ভব হল না। ঠিক কি কারণে তার আপত্তি জানা যায় না—তবে কৈফিয়ৎ ছিল এই যে—এ-ধরণের ঘোষণার এখনো সময় আসে নি। অতএব অনেক চেষ্টা করেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংক্রান্ত একটি যুক্ত ঘোষণা প্রকাশ সম্ভব হল না। নেতাজীকে নিরাশ হতে হল।

অবশ্য পূর্ব এশিয়ায় যখন আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়, তখন সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিতে জার্মানী ইতস্তত করে নি একটুও।

নেতাজী ও হিটলারের একমাত্র সাক্ষাৎকারটি সম্ভব হল ১৯৪২-এর ২৮শে মে। ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগই হয় নি। মুসোলিনির সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্ক কিন্তু হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। মুসোলিনি সহজে দেখা করতেন, হিটলারের দেখা পাওয়া কঠিন ছিল। নেতাজী সাধারণত কাজের সূত্রে সব প্রয়োজনে দেখা করতেন ফরেন মিনিস্টার রিবেনট্রপের সঙ্গে। সরাসরি দেখা করার প্রয়োজন না থাকলে আডাম ফন্ ট্রট বা পলিটিকাল ডিভিশনের ডাঃ উর্লারিশ বা ডাঃ মেলচারস, (ইনি পরে স্বাধীন ভারতবর্ষে জার্মান রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন) এঁরা কাজ চালিয়ে দিতেন।

18.1.42

Entwurf
einer Erklärung über ein Freies Indien.

Am 26. Januar feiert ganz Indien die Wiederkehr des Tages, an dem im Jahre 1930 der Wille [illegible] der indischen Unabhängigkeit beschlossen wurde.

Die Deutsche, die Italienische und die Japanische Regierung halten die Stunde für gekommen, zu erklären, daß das Recht des indischen Volkes auf eine freie Heimat und die Gestaltung des politischen und wirtschaftlichen Geschickes seines Landes nach eigener, freier Willensbildung unbeschränkt und unangreifbar ist. Auch der Mißbrauch dieses Rechtes für eigennützige Zwecke der Englischen Regierung kann dieses Recht weder jetzt noch in aller Zukunft auslöschen oder beseitigen.

Die Deutsche, die Italienische und die Japanische Regierung erkennen daher hiermit feierlich das unabänderliche Recht des indischen Volkes auf vollkommene und unbeschränkte Unabhängigkeit an.

Deutschland, Italien und Japan sind sicher, daß das indische Volk sich von der politischen Beherrschung und wirtschaftlichen Ausbeutung durch den britischen Imperialismus frei machen wird und dann als Herr seines eigenen Geschickes nach eigenem Willen einen durchgreifenden Neuaufbau seines nationalen und staatlichen Lebens durchführen wird zum Segen des eigenen Volkes und als Beitrag für das Wohlergehen und den Frieden der Welt.

England

28283

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে অপ্রচারিত ঘোষণাপত্র

হিটলারের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার বিশেষ সফল হয় নি বলেই সকলে বলে। এই সাক্ষাৎকারের সময় হিটলারের সঙ্গে ফরেন মিনিস্টার রিবেনট্রপ এবং হিমলার ছিলেন এবং নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন স্পেশাল ইণ্ডিয়া ডিভিশনের অ্যাডাম ফন্ ট্রট ও স্টেট সেক্রেটারি কেপলার। হিটলারের দোভাষী স্মিডথ্ তো ছিলেনই।

ওয়ার্থ এই সাক্ষাৎকারের একটি গল্প বললেন, খুব সম্ভবত ট্রটের কাছে শুনেছিলেন। 'রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা' বলতে তিনি কি বোঝেন—এই রকম কি একটা প্রশ্ন হিটলার করার পর নেতাজী বিরক্ত হয়ে ট্রটের দিকে ফিরে বলেন—'হিজ একসেলেন্সিকে বলুন আমি সারাজীবন রাজনীতি করে আসছি এ সম্বন্ধে আমার অন্য লোকের পরামর্শের দরকার নেই।' ট্রট এই মন্তব্য যথাসাধ্য নরম করে জর্মান ভাষায় অনুবাদ করে হিটলারকে বলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ নেতাজীর মুখ থেকে শোনেন নাম্বিয়ার। তিনি অবশ্য এই ধরনের মন্তব্যের কথা স্মরণ করতে পারলেন না। নাম্বিয়ারের ধারণা যত বিরক্তই হন নেতাজী আনডিপ্লোমেটিক কোন কাজ সহজে করবেন না। সে জায়গায় হিটলারের প্রতি অত রূঢ় হওয়া বেশ একটু আশ্চর্য।

হিটলার ও নেতাজীর এই সংক্ষিপ্ত মিটিং-এ কেন উল্লেখযোগ্য সাফল্য না হলেও প্রকৃতপক্ষে নেতাজী ১৯৪১-এর মে মাস থেকেই অর্থাৎ এই সাক্ষাৎকারের এক বছর আগে থেকেই কাজ শুরু করতে পেরেছিলেন। ১৯৪১-এ নভেম্বরে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার বার্লিনে রীতিমত কাজ শুরু করে দিয়েছিল। বার্লিনের টিয়েরগার্টেন এলাকায় লিখটেনস্টাইন অ্যালেতে এদের দপ্তর হল, জন পঁয়ত্রিশ ভারতীয়কে নিয়ে কাজ শুরু হল। রেডিওর কাজ চালু রাখা, "আজাদ হিন্দ" পত্রিকা সম্পাদনা, তাছাড়া স্বাধীন ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের জন্য প্ল্যানিং কমিটির কাজ চালানো—কাজের অন্ত ছিল না। নেতাজী তাঁর ডেপুটি হিসেবে নাম্বিয়ারকে মনোনয়ন করেন।

নেতাজীর মোটের উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল। যুদ্ধের সময়ের একটি স্পেশাল ফানড থেকে ওকে টাকা দেওয়া হত ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের জন্য। ধার হিসেবেই উনি তা নিতেন এবং ধার শোধ শুরুও হয়েছিল। উনি ডিপ্লোমেটিক স্টেটাসও পেয়েছিলেন, অন্যান্য ডিপ্লোমেটিক মিশন যেমন জাপান ও ইটালীর মিশনগুলির সঙ্গে উনি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতেন। ওঁর সোফিয়েনস্ট্রেসের বাড়ি সর্বদা কর্মচঞ্চল হয়ে থাকত।

নেতাজী ক্যাম্প আনাবুরেগ-এ ইণ্ডিয়ান লিজিয়নকে দেখতে গিয়েছিলেন '৪১-এর ডিসেম্বরে। যদিও অন্যান্য সব যুদ্ধবন্দীদের জার্মানরা জেবার ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল। কিন্তু যেসব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান যুদ্ধবন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়নি তাদের কিন্তু কখনো লেবার ক্যাম্পে যেতে হয়নি। ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের ছত্রছায়ায় এরা ছিলই ছিল।

আজাদ হিন্দ রেডিওর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল অক্টোবর মাসেই। জন কুড়ি অত্যন্ত সুদক্ষ ভারতীয় কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই রেডিও চালু করা হয়। জার্মানরা শুধু টেকনিকাল সাহায্য করত। '৪৩ সালের গ্রীষ্মে ইংরেজ আমেরিকা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ শুরু করলে পর বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ রেডিও সরিয়ে হল্যাণ্ডের হিলভারসাম নিয়ে যাওয়া হল। '৪৪ সালে আইসেনহাওয়ার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফ্রান্সে নামলেন। তখন আবার আজাদ হিন্দ রেডিও জার্মানীতে ফিরে এল। এবার এল হেলমস্টেড শহরে আর '৪৫ সালের গোড়ার দিকেও এখান থেকে কাজ চালিয়ে গেছে। হেলমস্টেড এখন হল পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সীমানায়। যুদ্ধ যখন সেখানেও পৌঁছে গেল তখন এই কুড়িজনের রেডিও টীম যা ঐকান্তিক ভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছে—সেই টীম দল ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হল।

শেষ পর্যন্ত স্পেশাল ইণ্ডিয়া ডিভিশনের একমাত্র ওয়ার্থ-ই ছিলেন বার্লিনে। ১৯৪৫-এর এপ্রিলে ওয়ার্থ ও জার্মান

পলিটিক্যাল আর্কাইভস-এর প্রধান ডাঃ উলরিখ রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হলেন।

ডাঃ ওয়ার্থের সঙ্গে আমরা বন-এর জার্মান ফরেন অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে যাকে বলে কল অন করলাম বা সাক্ষাৎ করলাম। এখন সাউথ এশিয়া ডিপার্টমেন্টের যিনি প্রধান হের বেরেনডংক তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ফরেন অফিসের বিরাট বাড়ির এক তলায় গিয়ে যখন রিপোর্ট করলাম তখন মনে হল বার্লিনের সেদিনকার ফরেন অফিস ও আজ বন-এর ফরেন অফিস চেহারা, চরিত্র সবেতেই অনেক তফাৎ। তবুও এই ফরেন অফিসেরই পূর্বসূরী একদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অনেক করেছিল, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল নেতাজীর প্রতি।

ওয়ার্থ বলছিলেন নেতাজী খুব স্পষ্ট-ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এই যুদ্ধে তিনি জার্মানীর সাহায্য প্রার্থী কেন না জার্মানী আজ গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত। জার্মানীর নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ বা য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে জার্মানীর বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কোন কিছুতে নেতাজীর ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার জড়িত হবে না। ফরেন অফিস নেতাজীর এই মূল বক্তব্য মেনে নিয়েছিল।

বেরেনডংকের সেক্রেটারি একটি মহিলা আমাদের অভ্যর্থনা করতে নীচে নেমে এলেন। একপাশে এক লাইন সুইডিং লিফট উঠছে-নামছে। আমার দাড়ির দিকে এক নজর চেয়ে উনি বললেন—না, তুমি ওটাতে উঠতে পারবে না। অতএব ট্রাডিশনাল লিফটে চড়ে বেরেনডংকের ঘরে হাজির হলাম। কফির সরঞ্জাম টেবিলে সাজিয়ে বেরেনডংক বসে আছেন। আমরা ঢুকতে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে ডাঃ বসুকে বললেন—আপনার অল্প বয়সের ছবি আমাদের দপ্তরে রয়েছে। একটু মুচকে হেসে বললেন—মনে পড়ে? ১৯৪১-এর ১৬-১৭ই জানুয়ারী রাত্রি? একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা তাই নয়?

[illegible] Declaration of India.

In this defensive war which has been forced upon them, Germany, Italy and Japan are fighting against the Powers that have dominated the world up to now by means of the subjugation and exploitation of other peoples. Their struggle serves [illegible] purposes. Germany, Italy and Japan are fighting at the same time for the freeing of all the [illegible] have been oppressed by British imperialism. It is their earnest desire to see these peoples, [illegible] again free from the British yoke and in a position to shape unhampered their political and economic life according to their own demands.

Amongst those nations which have had to suffer longest and most cruelly under British domination is numbered the ancient Indian people, a nation which during its great past has conferred such rich cultural benefits on humanity.

In the endeavour to open the gate of freedom to the Indian people also, at this historical [illegible] when the British empire is beginning to reel [illegible]

135415

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সপক্ষে একটি ঘোষণাপত্র

হিমলারের সঙ্গে মিলিটারি সদর দপ্তরে নেতাজী

শিল্পী হিসাবে যাঁরা বিভিন্ন প্রচার সংস্থায় নিযুক্ত থাকেন তাঁরা সাধারণত কমার্সিয়াল কাজ করেন, অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ কোনও বস্তুর চাহিদা ও জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য তাঁরা ছবি ও বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বক্তব্য বা স্লোগান প্রকাশ করেন, শিল্পকর্ম বিষয়ে ঠিক নিজস্ব স্বাধীনতা তাঁদের থাকে না। কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য এ-জাতীয় কাজ করা সত্ত্বেও অবসর সময়ে যে অনেকে সুকুমার শিল্পচর্চা করে থাকেন তার প্রমাণ মেলে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে আয়োজিত আই এ এম রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্য শিল্পী-দের একটি প্রদর্শনীতে। অসাধারণ কোনও ছবি না দেখা গেলেও প্রদর্শনীটি দেখে সকলের মনেই একটি কথা জেগেছিল : ইতিপূর্বে এঁরা কোনও প্রদর্শনীর আয়োজন করেননি কেন? প্রদর্শনীতে ১৩ জন শিল্পীর ৪৬টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়, কাজ মিশ্র শ্রেণীর। দু-একটি দুর্বল রচনা থাকলেও প্রদর্শনীটি সুনির্বাচিত, বিশেষ করে কয়েকজন শিল্পীর রচনায় সমকালীন চিন্তা ও রচনাধারার পরিচয় মেলে। নীল, লাল ও ছাই রঙ-প্রধান কয়েকটি রচনাতে শিশির দত্ত রঙ ব্যবহার চাতুর্যে অ্যাকশন পেন্টিং নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন; যেমন, দি কল ও গোল্ডেন লাইট আই স। কুণাল করের দু-একটি ছবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে রিয়ালিটি-র নাম করা যায়। গভীর লাল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে রেখা-ভিত্তিক এই রচনাটিতে সম্ভবত শিল্পী বন্যার তাণ্ডবলীলা প্রকাশ করেছেন। গ্রাফিক জাতীয় আনটাইটল্‌ড্‌ও উল্লেখ্য। আবদুল কুদ্দুস মণ্ডলের ওয়েটিং উওম্যান ইম-প্রেসানিস্টিক নিদর্শন হিসাবে প্রশংসা দাবি করে। এই প্রসঙ্গে বলাই কর্মকারের ব্লাক-আউট ক্যালকাটারও নাম করা যায়। কমল মুখার্জীর কাজে রঙীন কাচের (stained glass) কারুকার্য লক্ষ্যণীয়; যেমন, হোম-ওয়ার্ড অ্যাট ডাস্ক ও দি ল্যাডস্ক ওয়ান। লক্ষ্মণ রায়ের রচনা রবীন্দ্রনাথের। ডাস্ক কেয়ার ও লাস্ত সকলের চোখে পড়ে। রথীন দত্তর রচনায় স্যুররিয়ালিজমের আভাস মেলে; যেমন, দি ইভিল। প্রতীকমূলক বলিষ্ঠ ড্রয়িং নিদর্শন হিসাবে দি অপোজড্‌ ইউথ, বিশেষ করে পিছনে রাখা শৃঙ্খলাবদ্ধ দুই বৃহৎ হাতের মধ্য দিয়ে শিল্পী যুবোচিত শক্তি চেপে রাখার মিথ্যা প্রয়াসকে প্রাধান্য দিয়ে-ছেন। কমল সেনের ভারতীয় রীতির নিদর্শনগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তবে সরলতার দিক থেকে বার্ড সেলার মন্দ লাগেনি। নিতাই অধিকারীর কাজ মিনিয়ে-চার-জাতীয়, বর্ষাবিহার কয়েকজনের চোখে পড়ে। সমর দাশগুপ্তের কাজ সাধারণ। কিশোর চাটার্জীর বিশাল অ্যাগনিস্টেস-এর দুটি চোখের আবেদনে অনেকেই সাড়া দেন। দুরশের কয়েকটি বলিষ্ঠ টান ও প্রতীক-মূলক পরিমিত রঙ ব্যবহার করে সৌরেন সেন ইঙ্গিতে স্যাংটিটিতে দেবীমূর্তির অবতারণা করেছেন।

*

ক্যালকাটা পেণ্টারস গোষ্ঠীর ১১ জন সভ্যশিল্পীর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। শিল্পী গোষ্ঠী হিসাবে ক্যালকাটা পেণ্টারস-এর সকলেই পরিচিত। অনেকেই শিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। চিন্তাধারা ও অঙ্কনরীতিতে সমকালীন ধারারই প্রাধান্য

ওয়েটিং উওম্যান
—আবদুল কুদ্দুস মণ্ডল

দেখা যায়। তবে অমল চাকলাদারের শিল্প-কর্মে ব্যতিক্রম দেখা যায়। গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও এই শিল্পী বিশেষ একটি রীতিতে কাজ করে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। প্রদর্শনীতে প্রথমেই প্রকাশ কর্মকারের রচনাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্পূর্ণ আকারকে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করে রচনাক্ষেত্রের নানা স্থানে স্থাপন করে খণ্ডের মধ্য দিয়েই অখণ্ড রূপে প্রকাশ করাই এই শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। প্রতীকপ্রধান শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি সমকালীন সমাজের অনিশ্চয়তা

ছবির পরিচয়লিপি (ক্যাপশন) দেওয়া ছিল "খোবাবর"। ৪। মুদ্রণপ্রমাদে সিক্কি 'ঘাস'-এর স্থলে 'ধুলি' ছাপা হয়েছে। বিহারের সিক্কি ঘাসের মত উত্তর প্রদেশেও একশ্রেণীর ঘাস দেখা যায়, যার নাম 'মুঞ্জ'। সেই ঘাসের তৈরী রঙীন ঝাঁপি, বাক্স ইত্যাদিও দেখার মত।

মধুবাণী চিত্র যে কেবল মধুবাণীতে পাওয়া যায় আমি তা বলিনি। আমি লিখেছিলাম : "মিথিলার লোকচিত্রাবলী আজ মধুবাণী চিত্র হিসাবে অধিক পরিচিত... প্রাচীনকাল থেকেই মিথিলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবাণীতে..." ইত্যাদি। পত্র-লেখিকার শেষ অনুচ্ছেদের যুক্তিটুকু মানতে পারলাম না। ভারতীয় লোক ও হস্ত-শিল্পের নানা নিদর্শন আজ পৃথিবীর বহু দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, ফলে রপ্তানির মধ্য দিয়ে বিপুল বিদেশী মুদ্রাও আমরা অর্জন করছি। সুতরাং আমি মনে করি, দেশীয় শিল্পকলা-নিদর্শন হিসাবে মধুবাণী চিত্রাবলীর বিদেশে সমাদর ও স্বীকৃতি-লাভের গুরুত্ব বিষয়ে দেশবাসী সকলেরই জানা উচিত।

॥ [illegible] ॥

এক চত্বও জানে মেয়েরা। যদিও তখন আজ রিনিই আমার কাছে অদ্বিতীয়, তার বাইরে দ্বিতীয় কোনো মেয়ের দেখা আমি তখনো পাইনি তবুও এই উকিঝুঁকির মধ্যেই চরাচরের তাবৎ মেয়ের সাক্ষাৎ আমি পেয়ে যাই। এই রিনির এই চাল থেকেই দুনিয়ার সব মেয়ের হাঁড়ির খবর মিলে যায় আমার। তাদের সহজাত স্বতঃস্ফূর্তির সংবাদটাও অবিদিত থাকে না।

রিনির যে কাণ্ডে আমি থ, থই পাচ্ছিনে, সেই দৃশ্য দেখেও গুরুস্থানীয় ঐ দাদাটি কিন্তু অবিচলিত। তাঁর মুখে কোনো বিকার দেখলাম না। আশপাশের কেউ কোনো ভ্রূক্ষেপ করেছে তা আমি দেখতে পেলাম না। সেদিকে আমার চোখই ছিল না আদপে। দাদাটি আমার কপালে হাত ঠেকালেন—হাঁ, একটুখানি গা গরম হয়েছে বটে। এমন কিছু নয়। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছে—সর্দির জন্যই এটা হবে। ...নাক টানো তো।'

'কার নাক?' আমি জিগ্যেস করি।

হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নিতে হয়।

'ওর নাকটা ধরে টানতে বলছেন আমাকে?'

'ওর কেন, তোমার নিজের নাক নেই?'

'তাতো আছে।' বলে আমি চুপ মেরে যাই। নিজের নাক কান কাঁহা থাযোথা টানাটানি করতে যাব কেন আমি ভেবে পাই না। তাছাড়া, ব্যাপারটা পছন্দসই বলেও বোধ হয় না আমার। নিজের কান কিম্বা ঐ নাকই হোলো—টেনে কি কেউ কখনো আরাম পায়?

'কি করে নাক টানতে হয় জানো না বুঝি?' গলাখাঁকারির মত তিনি নাক খাঁকারি করে দেখান—'এমনি করে টানতে হয়।'

'বুঝেচি। আপনি নাক ঝাড়তে বলছেন।'

ও'র অনুকরণের প্রয়াস পাই কিন্তু নাক আমার তাকে সাড়া দেয় না।—'কাড়া যাচ্ছে না যে, কী করব?' নিরুপায় হয়ে কই—'নিশ্বাসই ফেলতে পারছি না, ঝাড়ব কি করে?'

'নিশ্বাস নিতে পারছ না, বলছ কী হে?' তিনি বিস্মিত হন—'বেঁচে আছো কী করে?'

এখন ধরতে পারলাম। ঐটেই হচ্ছে তোমার ব্যারাম

'হাঁ করে।' আমি জানাই—'নাক বোজা আমার, সর্দিতে বোজাই। মুখ দিয়ে তাই নিতে হচ্ছে নিশ্বাস—বাধ্য হয়েই। হাওয়া খাচ্ছি একরকম—বলতে পারেন!'

'এখন ধরতে পারলাম। ঐটেই হচ্ছে তোমার ব্যারাম। ওই হাঁ করে থাকাটা। মুখ বুজে থাকতে হয় সব সময়—বুঝেচ? মুখ হচ্ছে খাবার জন্যে—খাবার খাবারই শুধু যা ঐ হাঁ করবে, তা ছাড়া নয়।' (তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বলার ইচ্ছে হয়েছিল বহুৎ খানা আবার মুখ বুজেও খেতে হয় মশাই। কিন্তু গুরুজন না হলেও লোকটা দাদস্থানীয় আর বেশ গুরুগম্ভীর তাই কোনো উচ্চবাচ্য করি না।) মুক্ত কণ্ঠে তিনি কন—'আর নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে রয়েছে নাক—বিধাতার ব্যবস্থায়। নিয়মটাই ওলোট তার প্রকৃতিই কও, তার অন্যথা করলে অসুখে পড়তে হবে বই কি।'

আমি কোনো জবাব দিই না, চুপ করে থাকি। সর্দির জন্যই নাক বোজা না নাক বোজার হেতুই এই সর্দি—বোঝা আমার পক্ষে সহজ হয় না।

তিনি কিন্তু বোঝাই করে যান—'নাক দিয়ে নিশ্বাস নিলে হয় কী জানো? বাতাসটা নাকের গোড়ার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ভেতর দিয়ে যাবার কালে পরিশোধিত হয়ে লাংসে গিয়ে পৌঁছয়—ফুসফুসে যাবার জন্যে একটু গরমও হয়ে যায় আবার। কিন্তু হাঁ করে নিলে, বিশেষ করে এই শীতকালটায়, বাতাস গরম হতে পায় না ত, সোজাসুজি বুকে গিয়ে সেঁধোয়—সরাসরি ঠাণ্ডা লাগিয়ে দেয়। ফলে এই সর্দি। তার ফলে এই নাক বোজা। তস্মরুণ ঐ হাঁ করে থাকাটা। প্রতিফলে ফের আবার বুকে ওই ঠাণ্ডা লাগাটা—তার ফলে বুকে শ্লেষ্মা জমা হওয়া, তাই আবার নাকে এসে জমাট বাঁধা, তস্য ফল তোমার নাক বোজাই, তার দরুণ তোমার ঐ হাঁ করে থাকা, পরিণামে ফের আবার ঠাণ্ডা লাগা—ফের আবার......সর্দি নাক বোজাই, হাঁ করে থাকা, তার ফলে ফের—' তিনি হাঁফড়ে যান এক নাগাড়ে।—'ফের আবার ঐ সর্দি লাগা...আবার ফের...' বারম্বার সর্দির ফেরেববাজির তিনি ফিরিস্তি দান।

'ফলত এই পাকচক্র বা পাপচক্র—যা আপনি বলতে চাইছেন! আমি বুঝতে পেরেছি।'

তাঁর এই কমপ্লেক্স সেনটেন্স, যা ফেটাঘাটি আমার ভেথ পর্যন্ত গড়াতে পারত, এক কথায় সেরে দিয়ে তাঁর সেই ভেথ সেনটেন্সের হাত থেকে অব্যাহতি পাই। সেই বাকচাক্রর বাহ ভেদ করে বেরুতে পারি।

'যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন ওষুধ খেতে হবে, যাতে আর না বাড়তে পারে।

খোকা, তুমি আমার সঙ্গে এসো। জেলের ডাক্তারখানাটা কোথায় জানো না বোধ হয়। দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। ডাক্তারবাবুকে রোগের ব্যাপার খুলে বলবে। দাঁতটাও সব বুঝিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতে পারবে তো? মিকচার ট্যাবলেট যা উনি দেন। আনলেই হবে না। নিয়মমত খাওয়াতে হবে। ন্যাসাল ড্রপের মতন কিছু পাওয়া যায় কি না খোঁজ কোরো, তাই এ-নাকে এক ফোঁটা ও-নাকে এক ফোঁটা দিলে এক্ষুনি সাফ হয়ে যায় নাক। শুধিয়ো সেটা ডাক্তারবাবুকে, কেমন?'

নম্র খোকাটির মত তাঁর কথায় সায় দিয়ে রিনি তাঁর সঙ্গে যায়-যায় এমন সময় জেলের সদর থেকে চনৎকারের আওয়াজ এলো। সব এলোমেলো হয়ে গেল সেই আওয়াজে।

রিনির ঢঙ দেখে হাঁ হয়েছিলাম, তার পরে এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোকের মুখে বাতাসের নাসিক পথের গতিবিধির 'পর্যটন' কাহিনী শুনছিলাম হাঁ করে, কিন্তু সদরের এই চঙচঙানি শোনার পর মনে হল আমার ওই হাঁ করে থাকাটা রিনির ঢঙ দেখে নয় ঠিক, বা এই নাসিক অবরোধের দরুণ হাওয়া খাওয়ার হেতুও না, আসলে সকল বেলাকার

প্রাত্যরাশের প্রত্যাশ্যাতেই।

কারণ নিজের গজগজেও ঐ ঘণ্টার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল।

রিনিকে ডেকে বললাম, খাচ্ছিস যখন, জেলার স্লেটগংলোও নিয়ে যা। ওষুধ নিয়ে ফেরার পথে তখন তোর-আমার খাবারটাও নিয়ে আসবি ঐ সঙ্গে।'

'জ্বরের ওপর জেলের খাবার খাবে ও?' রিনি ওকে শুধোয়।

'এখানে সাবু বার্লি কোথায় পাবে। ঐ লপ্‌সিই খেতে হবে বাধ্য হয়ে। দ্যাখো, যদি পাঁউরুটি-টুটি পাও কিছু—খোঁজ নিয়ো হাসপাতালে।'

'তাতো আনবিই' আমি বলে দিই : কিন্তু ঐ সঙ্গে খিচুড়িটাও চাই আমার। খিচুড়ি দিয়ে আমি পাঁউরুটি খাবো।'

'তোমার খালি খাই খাই। খাওয়া ছাড়া আর কিছু শেখোনি তো!' রিনি বলে—তার কথার ভেতর কোনো গূঢ় কথার কিছু কি উহ্য থাকে? 'বুঝলেন মশাই, আমার দাদাটি বিদ্যাসাগর মশায়ের আদর্শ একটি সুবোধ বালক—যাহা পায় তাহাই খায়। তার ওপর যাহা খাওয়া ওর উচিত নয় পেলে পরে তাহাও ছাড়ে না।'

ভদ্রলোক তার জবাব শুনে হাসেন।—'তাই বটে! জেলের লপসিকে বলছে কিনা খিচুড়ি! অখাদ্যও ওর কাছে খাদ্য।'

'না না! পাঁউরুটি পাই আর না পাই—খিচুড়ি আমার চাই। চাই-ই চাই।'

'আচ্ছা আচ্ছা! তাই হবে গো!' মাথা হেলিয়ে হেসে চলে যায় সে।

রিনি যাবার পর আমি ভাবনায় পড়লাম আবার। ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন ওর? জেলের গেট আর আপিস তো সামনেই, ডিসপেনসারিটা আর কদ্দূর হবে? এই-টুকুন তো পথ! সামান্য ওষুধপথ্য নিয়ে ফিরে আসতে এত দেরি হয়?

দেবেনের খর্পরে পড়ল না তো?

যাবার পথে ভাবার কিছু ছিল না। দাদুজনোচিত দায়িত্ব নিয়ে জাঁদরেল গোছের যে কজনা দাদা জেলের মধ্যেকার ছেলেদের ওপর অযাচিত মোড়লী করতেন তাঁদের একজনার সঙ্গেই গেছে সে। কাজেই মাঝখানে পড়ে হামলা করার সাহস হবে না দেবেনের।

কিন্তু সেখান থেকে একা ফেরার পথে রেহাই কোথায় তার? পাকড়াবেই তাকে সে—যে করেই হোক। নির্ঘাত।

সকাল থেকেই ওর রিনিদির ভাই রিনটুর জন্যে ও যে বাইরে ওৎ পেতে ছিল সেকথা আমি হলপ করেই বলতে পারি। কিন্তু অভাবিত এক দাদার সাথে ওকে বেরুতে দেখে আগ বাড়িয়ে গা-পড়া হয়ে তখন না এলেও তাদের পিছু পিছু ফলো করেছে সে নিশ্চয়। (ছেলেদের কোনো মেয়ে বা মনের মত কাউকে এই ফলো করে যাওয়ার রহস্য আমার অজানা নয়, কলকাতার

এই ফলো করে যাওয়ার রহস্য আমার অজানা নয়

পথে আমিও কিছু কম যাইনি—যদিও ফলোদয় আমার ভাগ্যে কাঁচ কলাই!) কিন্তু দেবেনের বরাতে অন্য রকম ফলার জুটতে পারে। কী সুন্দর তার চেহারা! অমন ফলোয়ার পেলে কোন অগ্রণী নায়িকাই না ফিরে তাকাবে, থমকে দাঁড়াবে ওর জন্যে? আঙুলের স্পর্শ থেকে আঙুরের অভ্যর্থনা নিয়ে তৈরি থাকবে না?

আর, যদি থমকি থেমে যাও পথ মাঝে/ আমি চমকি চলে যাব আন কাজে/—বলে সরে পড়ার পাত্রই নয় সে। রবিবাবুর নায়কের ন্যায় অমন লজ্জাকাতর নয় আদৌ।

আর কী খেলোয়াড় ছেলে সে, টের পেয়েছি প্রথম রাত্রেই। তাকের ওপর বাগে পেয়ে যা ফাউল খেলছিল না! তার পটের মোটা পদাহত বলের মতন ফিল্ডের থেকে প্রায় পাস আউট হয়ে যাই আর কি! পড়তে পড়তে কোনোমতে আপনাকে সামলেছি!

আমার জায়গায় অসহায় রিনিকে আজ যদি পায় সে। অফসাইড থেকেই ওকে কর্নার করবে। আর সেই পাল্লায় এই আমাকেও কোণঠাসা করবে নির্ঘাৎ। রিনিকে নিয়ে একটা গোল না বাধিয়ে ছাড়বে না সে।

খিচুড়ি পাঁউরুটি মিকচারের শিশি হাতে হাসতে হাসতে ফিরল রিনি।

'ওঃ বাবা! বাঁচলাম।' হাঁফ ছাড়লাম আমি—'কী ভাবনায় পড়েছিলাম না!'

'এই খ্যাঁখিচুড়ির জন্য এত ভাবনা!' সে প্লেটটা আমার সামনে রাখে—নাও, ধরো, খাও। এখন গাঁদাও তো!'

'খিচুড়ির জন্যে ভাবছিলাম বুঝি! হা কপাল! জানতাম যে মেয়েরা বেশ বুদ্ধিমান হয়! কিন্তু তুই দেখছি তার অন্যথাই।'

'কী তাহলে ভাবছিলে এত শুনি?'

'ভাবছিলাম যে দেবেনটা তোকে অফসাইডে পেয়ে সেখান থেকে পাসিয়ে ক্যারি করে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে কে জানে! সেন্টার ফরোয়ার্ড-এর খেলোয়াড় সে, বলছিল আমায়। যা ভাবনা হচ্ছিল আমার না!'

'জেবেন কোথায়? দেখতেই পেলাম না তাকে। সে এই ইন্দ্রলোকের ছদ্মবেশী কোনো দেবীকে নিয়ে কোন নন্দনবনে বিহার করছে এখন কে জানে!'

'বাঁচি তাহলে! আহা, তাই যেন হয়। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কোনো দেবীর সঙ্গে যদি তার একটা বিয়ে হয়ে যায়, মনের মত মেয়ে নিয়ে ঘর বেঁধে সুখে ঘরকন্না করে—তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হয় না। তারও, আমারও।'

'তা আমার জন্য তোমার এত ভাবনা কিসের গো!'

'ভাবনা নেই? তুই বলিস কী রে! তুই-ই তো আমার একমাত্র ভাব আর একটি-মাত্র ভাবনা।'

'ভাব হতে পারি, কিন্তু ভাবনা নয়। বোনের জন্য কেউ ভাবে কখনো? বোন আর কদ্দিন? কদ্দিন আর থাকবে তার সঙ্গে? সে তো পরের জন্যই, পরের বাড়ি যাবে, পর হয়ে যাবে—একদিন না একদিন। তার জন্যে কেউ ভাবে নাকি? পরের জন্যেই জন্মেছে সে—পরই তো। এক কথায় আমায় সে ভাবনামুক্ত করতে চায়।'

'হ্যাঁ, মানি সে কথা। মায়ের পেটের বোন হলে তাই হয় বটে, কিন্তু পেটের না হয়ে প্রাণের বোন হয় যদি? তার জন্যে প্রাণ আইঢাই করে না? যখন পর হবে, যখন হবে তখন, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সে তো আর পর নয়—পরিই বটে...প্রাণের বোন, বুঝলি কি না, প্রাণের মতই—প্রাণ যখন যাবে তখন যাবে, কিন্তু তার আগে অবধি যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!'

'আমার আশা রাখা কি আশায় থাকা তো উচিত নয় তোমার'—সে কয়—'তুমি আমায় কোনোদিন বোনের চোখে দেখতে পারবে না দেখছি। ঠিক ঠিক বোনের মতন ভাবতে পারবে না।' তাকে বেশ ভাবিত দেখা যায়। —'এমন কি, বন্ধুর মত ভাবতে পারলেও বাঁচতাম।'

'বোন আর বন্ধুর মধ্যে তফাতটা কী? কোনো তারতম্য আছে কিছু?'

'নেই? সব ভালোবাসাই কি এক নাকি?'

'এক নয়? একই রকমের তো সব। আমার তো তাই মনে হয়। যেমন কি না মায়ের প্রীতি টান তেমনিই এই ছেলেমেয়ের ওপর, যেমন বন্ধুর জন্যে মন কাঁদে বোনের জন্যও তেমনটাই। মন কেমন করা থেকে আদর করা পর্যন্ত—সবই তো প্রায় এক ধারার...এর ভেতর তারতম্যটা কোথায়? কেবল ওই বউয়ের বেলাতেই যা একটু ইতরবিশেষ। সেই ইতরতম পর্বটা বাদ দিলে তো একই পার্বণ ভাই—একই মহোৎসব সব।...এমন কি, ওই ভগবানকেও যদি একান্ত আপনার করে পেতে চাই, কান্তভাবে ভজনা করি যদি...'

'কথা হচ্ছে দাদা বোনের সম্পর্ক নিয়ে, তার মধ্যে এই সব গভীর তত্ত্ব আসছে কোত্থেকে? আমি বলি কি, বলছিলাম যে—দাদার অধিকারের সীমানাটা কোনখানে? তুমি তা জানো না ঠিক। দাদার দৌড় কদ্দূর?'

'আমি কী জানি তার! আমার কি নিজের বোন আছে যে জানব। আমার তো পরের বোন সব—পরির মত হলেও তারা বোনের মতন...দূরের মাঠ যেমন আরও সবুজ, পরের বোন তেমনি আরো মধুর, আরো গভীর, আরো মায়াময়—সেই বোনান্তরালে কতো কী রহস্য অরো—কতো না আলো আঁধারি—তার কিছু জানি, কিছু জানিনে!'

'এ তো গেল তোমার কাব্যকথা, আমার কথার ঠিক জবাব হোলো না তো!'

'মোল্লার দৌড় জানি মসজিদ পর্যন্ত,

কিন্তু দাদার দৌড় কদ্দূর তার আমি কী বলব! দিদিরাই জানেন। তুই-ই বলবি তো?'

'দাদার দৌড় বোনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত—(যতদিন সে পরের না হয়—ততদিনই তার বোনের ওপর অধিকার) তার পর আর না।'

'বললেই হোলো!' আমি ফোঁস করে উঠি : 'তার পর আমার বার্থরাইটটা চলে যাবে বুঝি? গেলেই হোলো?'

'যাবে না? তোমার কি আমার নিজের দাদাদেরই কি—আমার ওপর ওই বার্থ-রাইটটুকুই তো খালি। তার পরে বিয়ের পর আমার কপিরাইট অন্য লোকের হয়ে গেল না? যার কপিরাইট তারই অধিকার তখন।...কপিরাইটের মানে জানো?'

'কেন জানব না? সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। সে তো শুধু বইয়ের বেলাতেই রে।'

'বউয়ের বেলাতেও তাই। যার সেই রাইট আছে, বইয়ের মত, বউয়েরও মুদ্রণের প্রকাশের যন্ত্রস্থ করার তারই অধিকার। সে যেমন খুশি ছাপাবে, বাঁধাবে, যেমন করে ইচ্ছে তার শোকেসে সাজিয়ে রাখবে। অন্য কারো কিছুটি বলা কওয়ার নেই।'

'না থাকে নাই থাকলো! সর্বসত্ত্ব চাইছে কে! আমসত্ত্ব আমার থাকলেই ঢের। মিষ্টি জিনিস পেলেই খুশী—চাইলেই যেন আমি তা পাই—তাই হলেও হোলো। নিজের বোনকে আদর করার সেই আমার বার্থ-রাইট আমি ছাড়ছিনে ভাই!'

'তা অবশ্যি থাকবে তোমার। বছরে দু দিন মাত্র ভাইফোঁটার দিনটিতে আর আমার জন্মদিনে। আমার আর সব ভাইয়ের সঙ্গে তোমারও বাঁধা বরাদ্দ।...হ্যাঁ, আরেক দিনও হতে পারে, তোমার জন্মতিথিতে। ভালো কথা, তোমার জন্মদিনটা কবে গো?'

'জানিনে।' আমার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে—'এবার আমি জন্মেছি কোথায়, জন্মালাম কবে। সত্যি বলতে আমি জন্মাইনি এখনো। এ জন্মে আর জন্মলাভ হল না আমার।'

এমনকি আমি যথার্থই জীবিত কি না আমার সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে।

'তবে আর কী হবে!' নিশ্বাস ফ্যালে রিনিও—'তা হলে আরেক দিন হত আবার! কিন্তু জন্ম দিন না থাকলে আর...'

'মৃত্যু দিনটা আছে ঠিকই। সেই দিনটি পেছোনোর জন্য যমের দুয়ারে কাঁটা দিতে ভাইফোঁটায় ভাইফোঁটায় তোদের বাড়ি যেতেই হবে আমায়।'

'তা ছাড়া যাবে না আর?'

'কীসের জন্যে আবার? বোন যদি সংসারের গর্ভারে হারিয়েই গেল—তা সে যাহোক যোন হোক আর অপ্রেত্যিক উপলক্ষই হোক— সে তো তখন বোনও নয় বন্ধুও নয় আর? তার জন্যে বনো হয়ে উপ্রেশেলে গিয়ে লাভ? সেই কণ্টকিত বন্ধুর পথে শ্বাপদসঙ্কুল বনস্পতিদের আওতায় সেই মহারণ্যে রোদন করতে যায় কে? তবে হ্যাঁ, তোর জন্মদিনগুলোয় যাব আমি নিশ্চয়ই, দেদিনটাই আমার মনে গাঁথা রয়েছে, আমার মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত যাব, তুই নিশ্চিন্ত থাক। খুব ভালো হয় যদি তোর জন্মদিন আর আমার মৃত্যুদিন একদিনেই আসে। তার চেয়ে ভালো বুঝি আর হয় না। আমার শেষ খাওয়াটা খেয়ে চলে যেতে পারি বেশ। বেশ খাওয়াটা খেয়ে চলে যাই শেষটায়!'

ক্রমশ

আসুন..বসন্ত মেলায়
এই তো বসন্ত। প্রকৃতিতে সমারোহ। বাতাসে তারই আমেজ। এ আমেজ সকলের মনেও। এসময় হেঁটে বেড়ানোর চেয়ে উপভোগ্য আর কি আছে? শুধু বাইরে পা বাড়াবার আগে দেখে নিন, সব কিছুর সঙ্গে মিল রেখে আপনার জুতো জোড়াও ঠিক আছে কি-না। মৌসুমী নকশার বিচিত্র সমাবেশ এখন বাটার দোকানে। আপনাকে মানাবে, এমন জুতো জোড়া আজই এসে বেছে নিন।
ফ্যানফেয়ার ০৭
সাইজ ২-৭
১৭.৯৫
কুমকুম ১৭
সাইজ ২-৭
১৩.৯৫
সিতারা ৭২
সাইজ ২-৭
১২.৯৫
সিতারা ৬০
সাইজ ২-৭
১২.৯৫
Bata

কালো টাকা সাদা করার উপায় প্রসঙ্গে ওয়ানচু কমিটি

সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীওয়ানচুর সভাপতিত্বে প্রত্যক্ষ কর তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংসদে পেশ করা হয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসের শেষে কমিটি একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন; চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কমিটির বক্তব্য বিষয় আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। কালো টাকার পরিমাণ কেন বাড়ছে, এবং কিভাবে কালো টাকার কালিমা দূর করা যায় সে সম্পর্কে ওয়ানচু কমিটির সমীক্ষা ও সুপারিশগুলি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য না হলেও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

প্রত্যক্ষ কর তদন্ত কমিটি হিসাব করে দেখেছেন ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৪০০ কোটি টাকার আয়ের উপর কর ফাঁকি দিয়েছে। এই আয়ের এক-তৃতীয়াংশ হল আয়কর এবং যার পরিমাণ ৪৭০ কোটি টাকা—সরকার এই পরিমাণ রাজস্ব আয়করের ক্ষেত্রে আদায় করতে পারেননি। কমিটির মতে ১৯৬৮-৬৯ সালে কালো টাকার লেনদেন বা কারবারের পরিমাণ হয়েছে প্রায় সাত হাজার কোটি টাকার। তবে কমিটির মতে, এটি সম্পূর্ণভাবে অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। উপযুক্ত তথ্য না থাকায় কমিটির সদস্যদের মধ্যে এই অনুমান নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। শ্রী ডি কে রংগনেকার মনে করেন, কালো টাকার কারবার আরও বেশী পরিমাণে হচ্ছে। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সালে কালো টাকার পরিমাণ ছিল ১২১৫ কোটি টাকা; শ্রী রংগনেকারের মতে, সে বছর কালো টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৫০ কোটি টাকা।

কিভাবে কালো টাকার সৃষ্টি হয়? এ বিষয়ে কমিটির বক্তব্য হল: গোপন ব্যবসায়ে লেনদেন, সোনা ও বিলাস সামগ্রীর চোরাচালান, কোটা ও লাইসেন্স ক্রয়, রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলে চাঁদা প্রদান এবং বেনামীতে সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যাপকভাবে কালো টাকার ব্যবহার চলছে। বিবাহ, সামাজিক উৎসব ইত্যাদিতে কুৎসিতভাবে টাকার গরম দেখানোর জন্যই কালো টাকা ব্যবহার হচ্ছে। কালো টাকা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ হল, আয়করে অত্যন্ত উঁচু হারে কর ধার্য করার আইন। সারচার্জ সমেত আয়করের সর্বোচ্চ হার হল ৯৭.৭৫ শতাংশ। এটা খুবই অস্বাভাবিক, সাধারণ মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ এখনও এমন পর্যায়ে আসেনি যে এই উঁচু হারে প্রকৃত আয়ের উপর সবটুকু কর দেবেন। সরকারের আয়কর বিভাগ থেকেও ছোটখাটো ব্যাপারে আয়কর প্রদানকারীদের এমনভাবে বিব্রত করা হয় যে, আয়কর বিভাগ বর্তমানে সাধারণ

মানুষের কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের অধিবাসীদের কর প্রদান করার ক্ষমতা খুবই কম; কিন্তু ভারতে আয়করের সর্বোচ্চ হার বিশ্বের বহু ধনী দেশের চেয়ে বেশি। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতি রয়ে গেছে এবং এজন্য কণ্ট্রোল ও লাইসেন্স ব্যবস্থায় যথেষ্ট কালো টাকার কারবার চলে। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীর সংখ্যাও আমাদের দেশে কম নয়,—কালো টাকার পরিমাণ বেড়ে যাবার কারণ হিসাবে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উঁচু হারে বিক্রয়-কর এবং নীতিবোধের অবনতিও কালো টাকার জন্য দায়ী।

কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্য ওয়ানচু কমিটি আয়কর ব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। কমিটির মতে মধ্য ও নিম্ন আয়ের উপর করের হার কমানো দরকার। সারচার্জ সমেত আয়করের সর্বোচ্চ হার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা উচিত। সমগ্র দেশে আয়কর আদায়ের পদ্ধতি এবং আয়কর প্রদানের আর্থিক বৎসর এক ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে কমিটি মনে করেন। ১৫ হাজার টাকা আয়ের উপর সারচার্জ বসানো উচিত। কমিটি মনে করেন যে, করদাতারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গোপন আয় প্রকাশ করবে, এ ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কমিটির মতে, আয়করের প্রশাসন বিভাগকে আয়কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্য আরও সতর্ক থাকতে হবে; কোটা, লাইসেন্স ও পারমিট ব্যবস্থায় যে চোরা-কারবার চলছে তা বন্ধ করার জন্য এই ব্যবস্থাগুলির সঠিক মূল্যায়ন করা দরকার। যারা আয়কর ফাঁকি দেন তাঁদের শাস্তি দেওয়ার সময়ে জরিমানার পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত কতটা আয়কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তার উপর, সম্পূর্ণ আয়ের উপর নয়। যাঁরা আয়কর ফাঁকি সম্পর্কে গোপন তথ্যাদি

সংগ্রহ করেন তাঁদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা বজায় রাখা উচিত বলে কমিটি মনে করেন। কমিটি কালো টাকা সন্ধানে তল্লাসি ও আটক করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগকে আরও ব্যাপক ক্ষমতা দানের সুপারিশ করেছেন। কর ফাঁকি দিয়েছে বলে পরিচিত এমন কারও কোন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও সরকারী অফিসাররা যেন যোগ না দেন—কমিটি এই সুপারিশ করেছেন।

রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দান করা সম্পর্কে কমিটি যে সুপারিশ করেছেন সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। জাপান এবং পশ্চিম জার্মানীতে নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ভারতে তা চালু করার জন্য কমিটি অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বহু রাজনৈতিক দলের সমাবেশ ঘটায় ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কয়েকটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার অধীনে রাজনৈতিক দলগুলিকে করদাতাদের চাঁদা প্রদান আয়কর ধার্যের ক্ষেত্রে মোট আয় থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে; অবশ্য এক্ষেত্রে দশ হাজার টাকার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। তা ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলিকেও দুর্নীতিমুক্ত করা দরকার। কমিটির সদস্য শ্রী পি সি পালিত রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দেওয়া আয়কর-বহির্ভূত করায় তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

ওয়াঞ্চু কমিটির একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হল জাতীয় উন্নয়ন তহবিল খোলা। এই তহবিলের টাকা উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খরচ করা হবে। কুড়ি হাজার টাকা অথবা মোট আয়ের দশ শতাংশের মধ্যে যেটা কম, সেই পরিমাণ টাকা এই তহবিলে যে কোন করদাতা রাখতে পারবেন। এই তহবিলে প্রদত্ত টাকা সাত বছরের জন্য জমা থাকবে এবং তার উপর সাড়ে চার শতাংশ সুদ দেওয়া হবে; এই টাকার একটি অংশ আয়করমুক্ত থাকবে। কমিটির আরেকটি সুপারিশ হল, বই কেনার ক্ষেত্রে ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১০০০ টাকা কর ধার্যের যোগ্য আয় থেকে বাদ দেওয়া; যাঁদের মোটরগাড়ি আছে তাঁদের যাতায়াতের খরচ মাসিক ২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা করমুক্ত রাখারও প্রস্তাব করা হয়েছে।

কমিটি মনে করেন, কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্ট আয়ের উপর এমনভাবে কর ধার্য করা উচিত যেন অন্যান্য আয়ের উপর আরোপিত করের সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকে। এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্ট আয়ের উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করা উচিত।

সুব্রত গুপ্ত

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৯ ॥
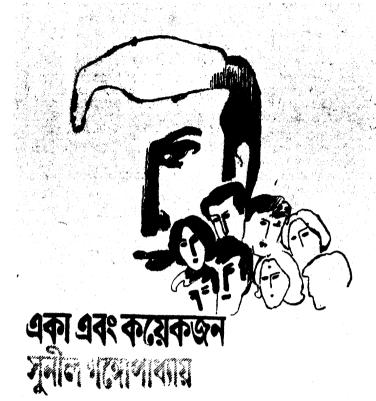
সূর্য পড়াশুনোতে ভালোই ছিল। কিন্তু পাদ্রী স্কুলের কড়া শাসন সত্ত্বেও সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার আগের দু বছর সে বেশ অমনোযোগী হয়ে ওঠে। স্কুল থেকে বড়বাবুর কাছে মাঝে মাঝে অভিযোগের চিঠি আসতে লাগলো। যে বুড়ো পাদ্রী বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর ছেলের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন, তিনিই চিঠি লিখে জানালেন যে, সূর্য এমন অবাধ্য হয়ে উঠেছে যে তাকে আর স্কুলে রাখা সম্ভব হবে না। সূর্যর মতন শান্ত, ভদ্র ছেলের নামে অবাধ্যপনার অভিযোগ কল্পনাই করা যায় না। চিঠি পেয়ে বড়বাবু অবিলম্বে চলে গেলেন হাজারীবাগে। কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন। সূর্যর পরীক্ষার তখন আট মাস বাকি।

ফিরে আসার পর বড়বাবুকে বেশ চিন্তিত দেখা গেল। তাঁর প্রশান্ত সুন্দর কপালে প্রায়ই সিঁড়ি দেখা যায়। স্থির চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়েন। এতখানি বয়েস হলেও বড়বাবুর চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই, শরীরে নেই এক ছিটে মেদ, টকটকে গায়ের রং, কয়েকগাছি পাকা চুল এমনভাবে লুকিয়ে আছে যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বড়বাবু একদিন চিররঞ্জনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, চিরু ছেলেটাকে নিয়ে কি করা যায় বলো তো?

চিররঞ্জন কিছুই খবর রাখতেন না। বললেন, সমস্যা? কেন, তাকে নিয়ে চিন্তার কি হলো?

বড়বাবু বললেন, এই ছেলেটাই আমার বন্ধন। ও যদি না থাকতো, আমি যেমন খুশি জীবন কাটাতে পারতাম। যা টাকাকড়ি আছে তা নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম দেশ বিদেশ। কিংবা কোনো যাত্রাদলে ভিড়ে গিয়ে ক্লারিওনেট বাজাতাম। কিন্তু এই ছেলেটার কথা ভেবে কিছুই পারি না। ছেলেটা ওর মায়ের সঙ্গ পায়নি, আমার কাছেই বা কতটুকু থেকেছে! অথচ ওরও তো জীবনে কিছু পাওয়া দরকার!

—ছেলেটাকে কোনো একটা লাইনে দিয়ে দিন, তারপর নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াবে। কি পড়াবেন ঠিক করেছেন?

—সেইটাই তো ঠিক করতে পারছি না। দ্যাখো, এ দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের কোনো রকম শিক্ষা দেবারই সুযোগ পায় না। আমার সব রকম সুযোগ আছে। আমি ওকে ডাক্তারি পড়াতে পারি, এঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে পারি, ব্যারিস্টারি পড়াবার জন্য বিলেতে পাঠাতে পারি, কিংবা আই সি এস—কিন্তু বুঝতে পারি না কোন্ শিক্ষায় ও সত্যিকারের মানুষের মতন মানুষ হবে। দ্যাখো চিরু, আমার এতখানি জীবনে আমি ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরেছি—এমন কয়েকজন মানুষ দেখেছি—যারা একবর্ণ লেখাপড়া শেখেননি, কিন্তু তাঁরা দেবতুল্য মানুষ। তাদের মত উদারতা, তাঁদের মত চরিত্রবল তো বহু শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও দেখি না। বিহারে রামপ্রসাদ পাণ্ডে, লক্ষ্ণৌ-এ হরীশ মজুমদার, হিমায় বন্ধু হরিদ্বারে স্বামী-আত্মানন্দ।

—শিক্ষিত লোকের মধ্যেও মহৎ মানুষের অভাব নেই। যেমন আপনি মুখস্থের কথাই ধরুন না।

—তুমি তো দেখছি খুব আশু মুখুজ্জের ভক্ত। ভদ্রলোক কি তোমায় জামাই করতে চেয়েছিলেন নাকি?

—আমাকে? আর লোক খুঁজে পেলেন না?

—একবার ভেবেছিলাম, ছেলেটাকে আই এ এস পড়াবো। কিন্তু মনস্থির করতে পারি না। আই সি এস হয়ে তো ইংরেজদের গোলামি করবে! আজ না হোক, দশ পনেরো কি কুড়ি বছর বাদে তো এ দেশ স্বাধীন হবেই। তখন কি দেশের মানুষ ইংরেজদের এই গোলামগুলোকে সহ্য করবে? এই সব আই এ এস-দের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না? দ্যাখো অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষবাবু এঁরা আই সি এস পাশ করেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন।

—কুড়ি বছরের মধ্যে এ দেশ স্বাধীন হবে? বড়বাবু, আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন? দেশ স্বাধীন করবে কে, ঐ গান্ধী? না বোমা-ছোঁড়া ছেলেগুলো? সূর্য সেন-টেনকে যেমন ফাঁসিতে ঝোলালো, তেমনি গান্ধী

সুভাষ বোসকেও ইংরেজ যে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেনি, সেটা ইংরেজের দয়া। জালা লাজপত রায়ের মতন অনায়াসে লাঠিপেটা করে মেরে ফেললো, কি হলো তাতে?

—সারা পৃথিবীতেই একটা ওলট-পালট আসছে। আমাদের দেশটাও বাদ পড়বে না। জার্মানিতে দেখছো হিটলার কি রকম শক্তিশালী হয়ে উঠেছে? একটা সামান্য কর্পোরাল আজ সে দেশের সর্বময় কর্তা। অস্ট্রিয়াকে গ্রাস করেছে এবার অন্য দিকে হাত বাড়াবে। তোমার মনে আছে নাইনটিন ফোরটিনের কথা? যতীন মুখুজ্যে আর তার দলবল জার্মানি থেকে অস্ত্র আনিয়ে দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার তাল করেছিল। সেবার পারেনি, পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। আবার কি কেউ সে রকম চেষ্টা করবে না ভাবছো? জার্মানরা ইংরেজদের ল্যাজে আগুন লাগাবার জন্য ভারতে গণ্ডগোল পাকাবার সুযোগ ছাড়বে না। রাশিয়ার লেনিন সাহেবও তো প্রথমে জার্মানির সাহায্য নিয়েছিলেন। তারপর ধাঁ ধাঁ করে দেশটাকে কি করে ফেললেন!

—বড়বাবু, আপনি সুষিকে ডাক্তারি পড়ান! আমার বাবার খুব শখ ছিল, আমার ভাইদের মধ্যে কেউ ডাক্তার হোক। তা তো আর হলো না। সুষিকে ডাক্তারি পড়ান, সেটাই সব দিক থেকে ভালো হবে। বুড়ো বয়েসে আপনাকে দেখতে পারবে।

—বুড়ো বয়েসে আমার ছেলে আমাকে দেখবে, সে প্রত্যাশা আমি করি না। বুনো জন্তুরা কি করে জানো তো, তারা যখন মৃত্যুর সময়টা টের পায়—তখন সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়ে নির্জন কোনো জায়গায় গিয়ে মরে। আমিও সবার চোখের আড়ালে গিয়ে মরবো। দ্যাখো, আমার জন্মরাত্রে আমার মা মারা যান, আমার বাবা আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আমার কোনো মাতৃ-ঋণ কিংবা পিতৃঋণ নেই। সুষির কপাল ভালো যে আমি ওকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিইনি কিংবা অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দিইনি। জীবনে যাদের কাছ থেকে আমি স্নেহমমতা পেয়েছি—তাদের ঋণ শোধ করার জন্যই আমি সুষিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। অবশ্য সুষির কিছু টাকাকড়ি আছে আমার কাছে—ওর মায়ের অনেক মোহর ছিল—যেদিন চাইবে, সেদিনই দিয়ে দেবো।

—বড়বাবু, আপনি আবার একটা বিয়ে করুন।

চিররঞ্জনের এই কথা শুনে বড়বাবু একটু চমকে উঠলেন। তারপর বললেন, হঠাৎ এই বদবুদ্ধি দিচ্ছো কেন আমাকে?

—আপনার কথাবার্তা একটু যেন কেমন কেমন শোনাচ্ছে। আপনার একটা কিছু টান থাকা দরকার। আপনার বয়েসে তো কত লোক আবার বিয়ে করছে।

—পাত্রী টাত্রী আছে নাকি তোমার হাতে?

—একবার খবর ছড়িয়ে দিলে দেখবেন কত ঘটক এসে চিল্লাবিল্লু করবে আপনাকে নিয়ে।

—তাই বলো। আমি ভাবলাম, তুমি নিজেই বুঝি ঘটকালির পেশা ধরলে। একটা বয়েস এসে গেলে সব কিছু সম্পর্কেই টান কমে যায়। লালসা যাদের বেশী তারা বুড়ো বয়েসেও মেয়েদের নিয়ে মজে থাকে। যেমন পেটুকরা বুড়ো বয়েসেও বেশী খায়। এই বয়েসে ধর্মকর্ম নিয়েও অনেকে মেতে থাকে, আমি তো সে-দিকেও তেমন মন বসাতে পারলাম না। কেউ কেউ দেশ উদ্ধার করার জন্যও মাতে। আমার ইচ্ছে করে কি জানো, সারাদিন চুপ করে বসে থাকি—সারা জীবনের সব ঘটনার কথা ভাবি—খুঁজে দেখি, কোথায় আমার ভুল হলো। প্রবৃত্তি-

বেশ মানুষকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই সে যাবেই। মেয়েদের নিয়ে এক সময় খুব মেতেছিলুম, শরীরের রক্তখানি আগুনে জ্বলে সব জ্বালিয়েছি—তবে এখনও মোটেই প্রবৃত্তিবেগ তেমন প্রবল নয় বলে বিয়ে করতে চাই না বা রক্ষিতা রাখতে চাই না। যৌবনবতী রূপসী মেয়েছেলে দেখলে চোখ জুড়োয়—কিন্তু মনে মনে ভাবি, এরা আর আমার নয়, এদের জন্য আমার ছেলের বয়েসী ছেলেরা বড় হচ্ছে। আমি পয়সা দিয়ে ও-রকম দুটো একটা মেয়েকে কিনতে পারি, কিন্তু ওরা আর আমার হবে না। বুড়োর জন্য একটা বুড়ি দরকার—তা বলে কি আমি বুড়ি বিয়ে করবো?

—আপনি বুড়ো হননি। তা হলে আমরা তো থুত্থুড়ে—

—ও-সব কথা বাদ দাও! তুমি তোমার ছেলেকে কি পড়াচ্ছো?

—বাদল? ও তো মাত্তর ক্লাস ফাইভে পড়ে। এখন কি ভাববো?

—এখন থেকেই ভেবে রাখা ভালো। কম বয়েস থেকেই ছেলেদের মাথায় একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঢুকিয়ে দিতে হয়।

—আমি ওকে কিছুই পড়াবো না। ম্যাট্রিক পর্যন্ত চালাবো—তখন যদি ওর কিছু জ্ঞানগম্যি হয়, তা হলে নিজেই নিজের লাইন বেছে নেবে। আমার ছোট ভাই রঞ্জুর খুব শখ ছিল আর্ট স্কুলে পড়ার—আমার বাবা তাতে রাজী হননি—ছেলেটা সেই রাগে অভিমানে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আমি আমার ছেলেকে বাধা দেবো না, তার যা খুশি পড়বে। পড়ার খরচও নিজেকেই চালাতে হবে—আমি ততদিন বাঁচবো কিনা ঠিক নেই।

—কেন, তোমার ছেলেকেই ডাক্তারি পড়িয়ো।

—ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে হলে আমাকে টাকা-পয়সা রোজগার করা শুরু করতে হবে। তা কি আর আমি পারবো?

স্বল্পভাষী সূর্যকুমার স্কুলের ছেলেদের সঙ্গেও বেশী মিশতো না। নিঃশব্দে স্বাবলম্বী জীবন যাপন করাই ছিল তার স্বভাব। কিন্তু স্কুল জীবনের শেষ দিকে সে কিছু বখাটে ছেলের পাল্লায় পড়ে।

তার স্কুলে উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই বেশী পড়তে আসতো। যে-সব সরকারী অফিসারের বদলির চাকরি, তাদের ছেলেরাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিহারের নানা ছোটখাটো জমিদারের ছেলেরা। এদের মধ্যে অনেকের বংশেই প্রথম লেখাপড়ার প্রচলন। বংশের প্রথম কেউ স্কুলে পড়তে এলে দু'রকম ফল দেখা যায়। হয় সে ছাত্র তাদের পরিবারের সকলের যুগে যুগে ধরে সঞ্চিত মেধা একা তার মাথায় নিয়ে পড়তে এসে দারুণ ব্রিলিয়ান্ট হয়, অথবা তার মাথায় সমস্ত জ্ঞানের কথাই ধাক্কা খেয়ে

ফিরে আসে। যেমন, ক্রিশ্চান মিশন বা অনাথ আশ্রমের কয়েকটি ছেলে, তাদের মধ্যে দু'তিনজন সাঁওতাল—পড়াশুনোয় চমকপ্রদ ফল করেছে—আবার কয়েকটি জমিদারের ছেলে একেবারে মগজে কিছু ঢোকায় নি—কোনোক্রমে ইংরেজিতে কথা বলতে শেখাই তাদের একমাত্র লাভ।

সেইরকম কয়েকটি ছেলে কড়া নিষেধ সত্ত্বেও হস্টেল থেকে রাত্তিরবেলা বাইরে বেরিয়ে যেত। তারা সূর্যকুমারকেও প্রলুব্ধ করে। সূর্যকুমার শুধুমাত্র আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের দুঃসাহসিকতায়। হস্টেলের প্রধান দরজা দিয়ে সন্ধেবেলা বেরুবার কোনো উপায় নেই। কম্পাউন্ডের চার পাশে উঁচু দেয়াল। তিনটি ছেলে অন্ধকার হয়ে গেলে উঠে পড়তো পাঁচিলের পাশে একটা আমগাছে। সেই গাছের একটি ডাল ধরে ঝুলে পড়লে পাঁচিলের ওপর পা রাখা যায়। পাঁচিলের ওপর থেকে লাফ দিলে পা ভাঙা সুনিশ্চিত। সেই পাঁচিল ধরে বাইরের দিকে ঝুলে পড়ে শেষ পর্যন্ত ধুপ করে নেমে পড়া। তারপরই ছুট। ফেরার সময় ব্যাপারটা আরও কঠিন। তখন একজনের কাঁধে একজনকে উঠে দাঁড়াতে হয়—শেষ জনকে তুলতে হয় হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে প্রথম প্রথম এই নৈশ অভিযানের লক্ষ্য ছিল বাজারের দোকানগুলোতে গিয়ে পুরী-মেঠাই খাওয়া আর সিনেমা হলে গিয়ে চ্যাচামেচি করা। ক্রমে ক্রমে অন্য ব্যাপারও এসে যায়।

অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই সূর্যকুমার ওদের দলে ভিড়ে গেল। পাঁচিল টপকে নেমেই ছুটতে ছুটতে ওরা এলো বড় রাস্তায়। কাচারি পেরিয়ে, ডাক বাংলোর পাশ দিয়ে গিয়ে ওরা হাজির হতো একটা এক তলা বাড়িতে। সে বাড়ির ভেতরের ঘরে হ্যারিকেন জেলে কয়েকটি লোক জুয়া খেলে। হরতন-চিড়িতন-রুহিতন-ইস্কাবন আঁকা একটা বোর্ডের ওপর মস্ত বড় একটা ছক্কা উল্টে ফেলে জুয়া।

সূর্যকুমারের কিশোর মন এই অনিশ্চিত খেলাটায় বেশ আকর্ষণ পেয়ে গেল। বড়বাবু তাঁর ছেলেকে টাকা পাঠাবার ব্যাপারে অনুদার ছিলেন না—সূর্যকুমারের হাতে যথেষ্ট টাকা থাকতো। গম্ভীর মনোযোগে সে বসে যেত জুয়া খেলাতে। প্রতি রাত্রে সব টাকা হারতো।

জুয়ার পরবর্তী ধাপ নারী। সূর্য-কুমারের দুর্দান্ত প্রকৃতির বন্ধুরা মেয়েদের অংগপ্রত্যংগের যতরকম নাম আছে এবং নারী পুরুষের যতরকম ক্রিয়াকলাপ আছে সে সব আলোচনায় খুবই আনন্দ পেত। 'পেডবার্টি' আসার পর পরই এই ঝোঁকটা বেশী থাকে। এই সব আলোচনা হিন্দীতেই বেশী হতো—সূর্যকুমারের বুঝতে অসুবিধে হতো না। কারণ ছেলেবেলা থেকেই সে উর্দু জানে। অমাদের তুলনায় এই সব আলোচনায় সূর্যকুমারের ওপর প্রতিক্রিয়া হতো অন্যরকম। শৈশব থেকেই তার কোনো পারিবারিক জীবন নেই, মা-কে মনে নেই, কোনো নারীকেই কাছাকাছি দেখেনি কখনো, সুতরাং এই বিষয়টি তার অচেনা। শিশু যেমন আগুন, জল, খাদ্য এবং লাল নীল প্রভৃতি রং ক্রমশ আলাদা আলাদা করে চেনে—সূর্যকুমারও তেমনি ভাবে মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কথা শুনতে লাগলো ঘোর বিস্ময় নিয়ে।

সহপাঠীদের এই সব কথাবার্তা সূর্য-কুমারের মনের মধ্যে ছাপ ফেলেছিল। কেন না, সেবারই কলকাতায় এসে সে শ্রীলেখার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখনও সেই গম্ভীর স্বভাব থাকলেও মাঝে মাঝে সে শ্রীলেখার বুকের দিকে চেয়ে থাকতো এক দৃষ্টে। যেন একটা চুম্বক তাকে টানছে। বাদল একদিন দেখেছিল, সূর্য-কুমার তার বড়দির কোমর ধরে উঁচু করে তুলেছে। শ্রীলেখা ছটফট করতে করতে বলছে, এই কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মা এসে পড়বে। সূর্যকুমার শ্রীলেখাকে মাটিতে নামিয়ে জোর করে তার ঠোঁট চুষতে শুরু করে। শ্রীলেখা তখন ধরা পড়া পাখির মতন ছটফট করছিল। শ্রীলেখা তখন ক্লাশ নাইনে পড়ে—তার বিয়ের জন্য পাত্র দেখা চলছিল। পরে অবশ্য ব্যাপারটা আরও অনেক দূরে গড়ায়।

জুয়া খেলার দলবল একদিন একটি মেয়েকে এনে হাজির করে। জরির চুমকি বসানো কাঁচুলি ও ঘাঘরা পরা সেই মেয়েটি যারপর নাই নির্লজ্জা। তার পেশা নাচ দেখানো, আসল উদ্দেশ্য হোস্টেলে-থাকা এই সব বড়লোকের ছেলেদের কাছ থেকে যত দূর সম্ভব টাকা-পয়সা খিঁচে নেওয়া। সূর্যকুমারের সহপাঠীদের মধ্যে দু'একজন বেশ বয়স্ক দামড়া ধরনের ছেলে, আদি রসে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, নাচনেওয়ালির সংগে

সাক্ষাতের দিন কানে আতর মাখা তুলো গংজে আসতেও জানে।

হ্যারিকেনের বদলে সেদিন হ্যাজাক জবালানো হয়েছিল। নাচ শংরং করার আগে মেয়েটি পায়ের ঘংঙংর ঠংকে ঠংকে পরীক্ষা করে আর টিয়াপাখির ঠোঁটের মতও তীক্ষ্ম চোখে সকলের দিকে তাকায়। একজন লোক একটা বোতল থেকে মাঝে মাঝে চুমংক দিচ্ছে, আর হাতুড়ি দিয়ে ঠংকে তবলা বাঁধছে। তারপর 'বানাওরে বাতিয়াঁ বলো কাঁহেকো ঝংঁটি' ধরনের গানের সংগে নাচ শংরং হয়।

অনিন্দ্যকান্তি কিশোর সংর্যকুমার উদগ্র কৌতংহল নিয়ে বসে থাকে। নাচের গতি বাড়ার সংগে সংগে ঘাঘড়া উড়তে থাকে, হাঁটং থেকে উরং পর্যন্ত দংশ্যমান হয়—ফর্সা মেয়েটির পা দংখানি পারস্য দেশের বাঁকা ছংরির মতন ঝলসায়। মেয়েটি তার দংষ্টিতে চর্তুর্দিকে আগংন ছড়িয়ে দিচ্ছে। সংর্যকুমারের বংক কাঁপছে, রক্ত চলাচল অসম্ভব দ্রংত, শরীরের মধ্যে কি যেন একটা ছটফট করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মেয়েটির ঘাঘড়াকে মনে হচ্ছে একটা রহস্যের যবনিকা—আরও অনকে অনেক রহস্য চাপা রয়েছে, সময় দংলছে, ঘর দংলছে, যেন পরের মংহংর্তেই পংথিবীতে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। সংর্যকুমারের মংখখানা সাদা কাগজের মতন ফ্যাকাসে। যেন সমস্ত অন্তরীক্ষ সাগ্রহে লক্ষ্য করছে এই কিশোরের সংশিক্ষার দংশ্য।

সেদিন ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই ধরা পড়লো সংর্যকুমার। অন্য সংগীরা পালাতে পেরেছিল, কিন্তু সংর্যকুমার সেদিন এক গেলাস সিদ্ধি পান করার ফলে সংস্থ ছিল না।

তিনজন ফাদার সারা রাত ধরে সংর্যকুমারকে জেরা করেন। কে কে তার সংগে গিয়েছিল? কোথায় গিয়েছিল? সংর্যকুমার একটিও কথা খংলে বলে নি। প্রত্যেকবার বলেছিল, যে একা দোষী, সে যেখানে গিয়েছিল সেখানকার ঠিকানা বলবে না।

পাদ্রীরা মারধোর করেন না। মিষ্টি কথায় অনেক শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, পাপের ভয় দেখিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সংর্যকুমারের আত্মা পরিশংদ্ধ করার জন্য পংরো একদিন অনাহার এবং তিন দিন তিন রাত একতলার একটি নির্জন ঘরে যীশংর মংর্তির সামনে প্রার্থনা করতে হয়। তারপর প্রধান পাদ্রী সংর্যকুমারকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এরকম কাজ আর কখনো করবে?

সংর্যকুমার মাথা হেলিয়ে বলেছিল না।

পাদ্রীদের নজর একটং শিথিল হতেই প্রথম রাত্তিরে সংযোগ পেয়েই সংর্যকুমার পাঁচিল টপকে আবার সেখানে চলে যায়।

ঐ স্কুলে থাকার সংগীদের মধ্যে খেলার সময়েই এমন একটা ঘটনা ঘটে যাতে

ধানমণ্ডীর সাত নং রাস্তার রাষ্ট্রসংঘের অফিসগুলির ঠিক উল্টো দিকে কোনদিন গেলেই নজর পড়বে আপনি বেশ কিছু তরুণের ভিড় দেখতে পাবেন। বাড়িটির সামনে বাংলায় লেখা জাতীয় মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড। বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসের ওপর বসে দুটি লোক খসখস করে সমানে দরখাস্ত লিখে যাচ্ছে। তাঁদের ঘিরে ছোটখাটো ভিড়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বুঝি চাকুরিপ্রার্থীর ভিড়। কিন্তু তাঁরা কেউ চাকুরিপ্রার্থী নন। তাঁরা বিবাহেচ্ছু তরুণ। পাক সেনাদের দ্বারা অত্যাচারিত মহিলাদের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য তাঁদের বিবাহ করার যে ডাক কিছুদিন আগে বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন তাতে সাড়া দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য তরুণ আসছেন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। প্রথম প্রথম ভিড় সামলাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে।

এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার তরুণ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রী করে গেছেন। তাঁদের দরখাস্ত লিখে দেওয়ার জন্য জনদুয়েক দরখাস্ত লেখক সারাদিন বসে আছেন ধানমণ্ডী রোডে।

বাংলাদেশের এই হাজার হাজার মানহারা মানবীর সামাজিক পুনর্বাসনের সমস্যাই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ নয় মাসে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁরা কোনদিনই ফিরবেন না। কিন্তু বেঁচে থেকে যে দু লক্ষের মত হতভাগিনী এক অপরিসীম বর্বরতার কলঙ্ক বহন করে বেঁচে রইলেন তাঁদের এই বেঁচে থাকাটা মৃত্যুরও অধিক যদি সমাজ তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য এগিয়ে না আসেন।

বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ডের কাজ মাত্র মাস খানেক হল শুরু হয়েছে। এক বিরাট ও মহৎ সামাজিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন বোর্ড। বোর্ডের চেয়ারম্যান ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এম সোভানের সাথে সেদিন কথা হচ্ছিল। সোভান সাহেব বলছিলেন, পরিষদের প্রধান কর্তব্য এখন নির্যাতিতা নারীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। চিকিৎসা প্রধানত দু রকমের হবে। পাকিস্তানী নির্যাতনের শিকার যে সব মহিলা তাঁরা অধিকাংশই সন্তানসম্ভবা। কিছু কিছু সন্তান ইতিমধ্যেই ভূমিষ্ঠ হতে শুরু করেছে। তবে বহুক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের গর্ভপাত এখনও সম্ভব। তাঁদের জন্য ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্লিনিক। জেলাগুলিতে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকগুলির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। জনাব সোভান সাহেব বললেন, এখন সবচেয়ে বড় যে সমস্যা সেটা হচ্ছে বহুক্ষেত্রেই গর্ভপাতের সময় পেরিয়ে গেছে। একেত্রে

সন্তান জন্ম নেবেই। এই অবাঞ্ছিত সন্তানদের মানুষ করার দায়িত্ব সমাজেরই। পুনর্বাসন পরিষদ এ ব্যাপারে কিছু কিছু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাচ্ছেন যাঁদের সাহায্যে বিশেষ কোন হোমে এইসব সন্তানদের মানুষ করা হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন আসছে সামাজিক পুনর্বাসনের, এই সমস্ত মহিলাদের মন থেকে এক অন্ধকার বীভৎস অতীতের স্মৃতিকে মুছে ফেলা বেশ কঠিন। এর জন্য চাই মনস্তাত্ত্বিকদের সাহায্য। কিন্তু পরিষদের হাতে কোন মনস্তত্ত্ববিদ নেই।

সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য হতে হবার পর এইসব মহিলাদের স্বয়ংনির্ভর করে তোলার জন্য বৃত্তিমূলক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে পরিষদের।

এরপর স্বভাবতই আসে তাদের বিবাহের প্রশ্ন। আমাদের বাঙ্গালী সমাজের সংস্কার ও রক্ষণশীলতার বেড়া ডিঙিয়ে এই সব মহিলাদের সামাজিক পুনর্বাসন লাভ যে কত কঠিন তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এমন কি যদিও বিভিন্ন জেলার সরকারী সমাজকর্মী ও পরিবার পরিকল্পনা ইউনিটের কর্মীরা যতখানি সম্ভব নির্যাতিতা মহিলাদের পরিসংখ্যান নেওয়া শুরু করেছেন, তবু সঠিক পরিসংখ্যান এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। সমাজ ভীতির প্রাবল্যে বহু পরিবারই চাইছেন এইসব ঘটনা যত সম্ভব গোপনে রাখতে। এটি আরও বিপদজনক। কারণ গোপন গর্ভপাত সর্বদাই থেকেই বিপদজনক।

বাংলাদেশ সরকার এইসব নির্যাতিতাদের অভিহিত করেছেন বীরাঙ্গণা বলে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সমুদ্র মন্থনের গরল ধারণ করে এঁরা নীলকণ্ঠ। এঁরা অশুচি যে কোনমতেই হতে পারেন না এই মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য এক বিরাট

সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। এখানকার সংবাদপত্রগুলি মোটামুটি এই মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান তরুণ মানসে যে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ তা না হলে এত দ্রুত এত বেশী সংখ্যক তরুণ এভাবে বীরাঙ্গণা বিবাহে এগিয়ে আসতেন না।

বিচারপতি শোভান জানালেন, তাঁদের তত্ত্বাবধানে এখন পর্যন্ত একটিও বিবাহ হয়নি। কারণ এ ব্যাপারটি তাঁরা তাড়াহুড়ো করতে চান না। এ ব্যাপারে যথেষ্ট খোঁজখবর করারও প্রয়োজন আছে। কারণ সকলের কাছেই যে মানবতার দাবি সবার উর্ধ্বে তাও না হতে পারে. আর তা ছাড়া এই মুহূর্তে বিবাহের চেয়ে বড় সমস্যা হল নির্যাতিত মহিলা-দের খুঁজে- বার করে ক্লিনিকে নিয়ে আসা। যদি গর্ভপাতের সময় থাকে তো ভাল, যদি না থাকে, তা হলে অনিবার্য বাস্তব পরিণতির জন্য তৈরি থাকা।

কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে গেছে। জানুয়ারি থেকে যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতা নিয়ে এ ব্যাপারে এগুলে অনেক সমস্যার হাত এড়ান যেত। বললেন বিচারপতি শোভান। এখনও সামর্থ্য পরিমিত। তাঁদের অ্যাম্বু-লেনস নেই। পর্যাপ্ত ফান্ড নেই। দরকার আরও চিকিৎসকের। আটজন বিদেশী ও দশজন স্থানীয় ডাক্তার দিয়ে কাজ চলছে

আপাততঃ। কিন্তু বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ পাক বর্বরতার গভীর ক্ষতচিহ্ন হয়ে শুধু যে পোড়া গ্রাম, ভগ্ন দেউল আর বিধ্বস্ত সেতুগুলোই সে বর্বরতার সাক্ষী তা নয়—হাজার হাজার বঙ্গললনা আজ এক বর্বর যুগের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন রাত্রির কলংক বহন করে সেখানে বিনিদ্র প্রহর যাপন করছেন। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে করুণতম এই দিকটি সম্পর্কে আজ গোটা পৃথিবীর মানব সমাজের সচেতন হয়ে এগিয়ে আসা উচিত। এই মানহারা মানবীর দলকে আবার সেই সূর্যকরা সোনালী দিনগুলিকে ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব যে আজ বিশ্বমানবতার।

*

ইন্দিরা গান্ধী চলে গেলেন কিন্তু তাঁর স্মৃতি বহন করে পাড়ে রইল রমনা রেস কোর্সে 'ইন্দিরা মঞ্চ'। গত ডিসেম্বর থেকে দেখছি রমনা রেসকোর্স এলাকাটিতে সন্ধ্যার সাথে সাথেই নেমে আসত নিস্তব্ধতা। সন্ধ্যার পর দু'একটি ছিনতাই-এর ঘটনাও ঘটত। শ্রীমতী গান্ধীর ঢাকা সফর উপলক্ষে রমনা রেসকোর্সকে নতুন করে সাজানো হল। তৈরি হল নৌকাকৃতি সুদৃশ্য মঞ্চ নাম যার ইন্দিরা মঞ্চ। রাজপথ থেকে মঞ্চ পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরি করা হল। মাঠে আলো দেওয়ার ব্যবস্থা হল। রোজ রাতে এখন আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ইন্দিরা মঞ্চ। প্রতিদিন দেখছি বিকেল হলেই গাড়ি এসে থামছে এখানে। ধীরে ধীরে এটি এখন বেড়াবার জায়গা হয়ে উঠছে। কয়েকটি ছোটখাটো দোকানও বসছে বিকেলের দিকে।

রমনা রেসকোর্সে এখনও শ্রীমতী গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট দু'টি ছবি টাঙানো রয়েছে। আর কিছুদিন পরে বড়বৃষ্টি নামলে হয়ত এই ছবি দু'টি ম্লান হয়ে যাবে কিন্তু ঢাকাবাসীর মনে শ্রীমতী গান্ধী দীর্ঘকাল মধুর স্মৃতি হয়ে রইবেন। বাস্তবিকই যে আন্তরিক অভিনন্দন শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশে পেয়েছেন তা অতুলনীয়। শ্রীমতী গান্ধীর ঢাকা সফরের আর একটি বৈশিষ্ট্য আমলাতান্ত্রিক প্রোটোকলের বেড়া বহু ক্ষেত্রে চূর্ণ করে শ্রীমতী গান্ধী এখানে স্বচ্ছন্দ হতে চেয়েছেন। জনসভার কথা বলিঃ যখন সভা ভাঙল তখন বিরাট জনতা পাগলের মত বেড়া ডিঙিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। শ্রীমতী গান্ধী ও শেখ মুজিবুর তখন ইন্দিরামঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছেন। দুজনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর কী মনে ভেবে শ্রীমতী গান্ধী বললেন, আমরা ভিড়ের ভেতর দিয়েই যাব। ওঁরা সেই ভিড় ঠেলেই গাড়িতে উঠলেন।

বঙ্গভবনে নাগরিক সম্বর্ধনার শেষে একের পর এক অটোগ্রাফের খাতায় সই করেছেন শ্রীমতী গান্ধী। শেষকালে প্রোগ্রামের পাতা, নোট বই, টুকরো কাগজ—কোনটাতেই না বলেন নি। বুদ্ধিজীবীদের সভায় গল্পগুজবে মেতে উঠেছেন।

শেখ সাহেবের বাড়িতে সেদিন বেগম মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শেখ সাহেবের দোতলায় ঢাকা দালানে শ্রীমতী গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী ও নেহরুর ছবি। মহূরালের কাজ করা। বেগমসাহেবা বলছিলেন, তাঁর শরীর অসুস্থ শুনে শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে দিল্লি যেতে। সেখানে গিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করতে। বেগমসাহেবা এখন যেতে রাজি হননি। তবে দিল্লি তিনি যাবেন কয়েক মাস পরে।

শ্রীমতী গান্ধী ঢাকায় বহু লোকের জন্য উপহার নিয়ে এসেছেন। শেখ সাহেবের ছোট ছেলে রাসেলের কথাও তিনি ভোলেন নি। তার জন্য সঙ্গে করে এনেছেন সাইকেল। বাড়ির লনে রাসেল এখন দু বেলা সাইকেল চালায়। খুব খুশী সে।

যাবার আগে বেগম মুজিবকে ডেকে শ্রীমতী গান্ধী বলে গেছেন, শেখ সাহেবকে বলবেন দিল্লি পাঁড়রে যেন রোজ অবেলায় খাওয়া-দাওয়া না করেন। নয় মাস দুঃসহ কারাযন্ত্রণার পর প্রচণ্ড খাটুনিতে শেখ সাহেবও ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। সেদিন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের সভায় তাঁকে বলতে শুনলাম, আমার শরীর ভেঙে যাচ্ছে। আমি আর পারছি না। আমি আর সেই মুজিবুর রহমান নেই। বাংলাদেশে সমস্যার অন্ত নেই। আর শেখ মুজিবুরেরও বিশ্রাম নেই। ভোর চারটে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নীরেট নিরবকাশ গার্তের পতংগ তিনি। ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকতে হয় তাঁকে। বাংলাদেশে এখন ব্যক্তিগত সালিশী নিষ্পত্তির জন্যও প্রধান-

মন্ত্রীর কাছে লোকেরা আসে। অসংখ্য সমস্যা নিয়ে নিয়মিত তাঁর কাছে আসে মানুষ। এই সপ্তাহ থেকে তিনি সপ্তাহে পুরো দেড় দিন জনসাধারণের সংগে দেখা করবেন ঠিক করেছেন। সপ্তাহে একটি ছুটির দিন রবিবার। তাও তিনি রেখেছেন পুরো দিনটা জনসাধারণের সংগে দেখা করার জন্য।

বাংলাদেশের তামাম মানুষের ধারণা শেখ সাহেবের সংগে দেখা করতে পারলেই তার ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শেখের সরকারী বাসভবনের সামনে প্রায়ই সাধারণ মানুষ বসে থাকে দাবির ফিরিস্তি নিয়ে।

গত ২৪ মার্চের একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। আনন্দবাজারের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য শেখ সাহেব আসছেন। পথের মাঝে দুটি অসুস্থ বাচ্চা নিয়ে একটি দুঃস্থা রমণী প্রায় পথারোধ করে দাঁড়ান। শেখ গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি থামল। দুঃস্থা রমণী এগিয়ে এসে বলল, 'শেখ সাহেব, আমরা রিলিফ পাইতেছি না।' শেখ তাড়াতাড়ি তাঁর পাশের একজনকে বললেন, ওকে কিছু টাকা দাও। আর এখনি ওর ছেলে দুটোকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। কিছুক্ষণ পরে আবার শেখ ড্রাইভারকে চালাতে বললেন। মানুষের দুঃখে তাঁর চোখের কোণা ভিজে উঠেছে।

*

শেখ সাহেবের উপস্থিতিতে গত ২৪ মার্চ ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে আনন্দ-বাজারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব মনোরম হয়ে উঠেছিল। আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার এই অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমানকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে অভিহিত করলেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে দুই বাংলার জনগণের মধ্যে যখন বিধিনিষেধের বেড়াজাল এতকাল উঁচু হয়ে উঠেছিল তখন আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকাই ছিল দুই দেশের জনগণের সেতু-বন্ধ। বাংলাদেশে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই যেভাবে হোক একটি পুজো সংখ্যা দেশ সংগ্রহ করতেন। এক একটি কপির দাম পড়ত ৩৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা। সেই আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী মুক্ত বাংলার মাটিতে এভাবে হতে পারবে তা কে জানত। এই প্রীতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার একটি চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন। শেখ সাহেব প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। এসেছিলেন বাংলাদেশের আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। মন্ত্রীদের মধ্যে এসেছিলেন জনাব তাজুদ্দিন, নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ইয়ুসুফ আলি, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, ফণী মজুমদার, মতিয়ুর রহমান। এসে-ছিলেন ন্যাপের অধ্যাপক মোজফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীমণি সিং বাংলা আকাদমির কবীর চৌধুরী প্রমুখেরা। হাইকোর্টের বিচারপতি, বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধি, সরকারী অফিসার ও স্থানীয় সংবাদিকরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে।

এখানকার সমস্ত কাগজ পরের দিন এই অনুষ্ঠানের বিরাট কভারেজ দেয়। আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার এই উপলক্ষে ঢাকায় এসেছিলেন। ক'দিন ধরে ঢাকার সরকারী ও বেসরকারী মহলে তিনি যে আন্তরিক সম্বর্ধনা পেয়ে গেলেন তা অভিভূত হবার মত।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়
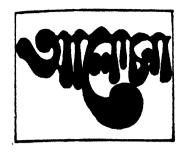
এ দুর্লভ প্রেম

শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'এ দুর্লভ প্রেম' প্রবন্ধে যে পাপ-পুণ্যের বিচার করেছেন তার দু-একটি উদাহরণ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। তিনি বলেছেন, খান সেনাদের অমানুষ মনে করবার কোন কারণ নেই, তারা মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে নেমেছিল বাংলাদেশের মাটিতে। সামরিক দখলদারেরা বিদেশে নারীধর্ষণ কিভাবে করে তার পর্যাপ্ত উদাহরণ রয়েছে মধ্যযুগের ও বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে। যাঁরা এর কাল্পনিক চিত্র সাধারণ পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কয়েকটি নাম ও গ্রন্থ, যথা voltaire (candidate) somorset Mangham (creature of circumstance) Stefan Zweig (Kaledoscope) বা অন্য কোন গল্প সংগ্রহ। অত্যাচারী সৈনিকেরা যে অমানুষ নয়, শুধু মনুষ্যত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, এ-সংবাদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গল্প-লেখকেরা পরিবেশন করেননি। কাজটি অমানুষিক ও আইনত গুরুদণ্ডের যোগ্য এই সর্বজনগ্রাহ্য বিচারই যথেষ্ট। অপরাধীর কোন চরিত্রের সাফাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না, যেমন হয় কোন কোন খুনের ব্যাপারে, যথা murder on grave and sudden provocation কোন শিশুকে দিয়ে বন্দুক চালনা করিয়ে শত্রুনিধন ইত্যাদি। অপরাধী মেজরটির হাতের বর্ণনায় বলেছেন, 'তার পাঞ্জাবী মুঠোয় চেপে ধরে' ইত্যাদি। আমি ভারতীয় হয়েও 'পাঞ্জাবী মুঠো' বুঝতে পারলাম না। একি ব্রিটিশ আমলের martial race-এর প্রতিধ্বনি? প্রশংসা না নিন্দা? বাহুবলের প্রতিযোগিতায় ত বাঙালীরও যথেষ্ট কৃতিত্ব শোনা যায়। সবশেষে বলতে চাই উত্তীয় এবং বাঙালী মুসলমান যুবকটির মৃত্যুর মধ্যে তুলনীয় কিছু দেখতে পাই না। একজন তার প্রিয়াকে খুশী করবার জন্য মিথ্যা চুরির অপবাদ স্বীকার করে মৃত্যুদণ্ড বরণ করলেন। এটি একপ্রকার উদ্দেশ্যমূলক আত্মহত্যা। স্বার্থত্যাগেরও যেটুকু স্বার্থ অবশিষ্ট থাকল, তা হচ্ছে শ্যামা সুখের মধ্যেও যেন মৃতকে স্মরণ করেন। অন্যজন যা করেছেন, তা প্রত্যেক সাহসী যুবকের করণীয় নিজের জীবন বিপন্ন করেও। তিনি শুধু তাঁর জীবনকে বিপন্ন করেছেন দেশের মেয়ের মানরক্ষার জন্য—তাঁর মৃত্যু উত্তীয়ের মৃত্যুর মত সুনিশ্চিত ছিল না। পাঞ্জাবী মেজরটি গুলি নাও করতে পারতেন, যুবকটি পিস্তল ছিনিয়েও নিতে পারতেন, গুলি যথাস্থানে নাও লাগতে পারত, লাগলেও মারাত্মক নাও হতে পারত ইত্যাদি। বেল্টে-ঝোলানো অস্ত্র নিরস্ত্র লোকে কেড়ে নিয়েছে, এ পরিস্থিতি হাল আমলে খুব পরিচিত।

অবনীমোহন কুশারী
কলকাতা-৫৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত

'বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত' সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত সম্পাদকীয় (দেশ, ৩৯ বর্ষ, সংখ্যা ১৬, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৭৮) প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আশা করি আপনাদের আলোচনা বিভাগে অনুগ্রহ করে প্রকাশ করবেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণ ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া দরকার।

গণটোকাটুকি বন্ধ করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকটি কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করে দিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে করি না। যে সব কেন্দ্রে পরীক্ষা বাতিল হয়নি সেখানে নির্বিঘ্ন-সম্মতভাবে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া ভুল। সেখানেও গণটোকাটুকি যথারীতিই হয়েছে। সুতরাং একই অপরাধে একদল পরীক্ষার্থী শাস্তি পেল এবং অপরদল রেহাই পেয়ে গেল বলা চলে। এই পর্যন্ত আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কিত প্রস্তাবটি অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট বলে মনে করি। আপনি লিখেছেন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিলেই এই অনাচার দূর হবে। কলেজী পঠন, পাঠন ও পরীক্ষার সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত আছি বলে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, দুষ্কৃতকারীর সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় নয় এবং তাদের শাস্তি দিতে হলে যে নৈতিক বলের প্রয়োজন আমাদের সমাজে বর্তমানে তা নেই। এমন সর্বনাশা বিকৃত বুদ্ধি কোন কালে কোন জাতিকে আমাদের মত এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে কিনা আমার জানা নেই। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে দুষ্কৃতকারীরাই অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাম, দক্ষিণ, বিপ্লবী, প্রতিবিপ্লবী সব রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন সমাজপতিরা এদের সাহায্য ও সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এদের শাস্তি দেবে কে? সাধারণ ছাত্রছাত্রী এ অবস্থায় যা অবশ্যম্ভাবী সে দিকেই যাচ্ছে। দুষ্কৃতকারীরাই হয়ে উঠছে এদের চোখে আদর্শ। টোকাটুকি যে অন্যায় সে ধারনাটাই লোপ পেয়ে গেছে। দু' হাজার পরীক্ষার্থীর একটি কেন্দ্রে আমি একজনকেও না টুকে পরীক্ষা দিতে দেখিনি। আমরা নরম গরম যে বুলিই আওড়াই না কেন, সত্যের কিঞ্চিৎমাত্র করার চেষ্টা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সকলেরই মনের কথা—এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই। বয়স্কদের আচার-আচরণে এই অভ্যাস স্বাধীনতা উত্তরকালে এতই উৎকটভাবে ফুটে উঠেছে যে, ছাত্রছাত্রীরা চোখের সামনে কোন আদর্শই খুঁজে পাচ্ছে না। তারই ফলস্বরূপ ক্যানসারের মত সার্বজনীন চরিত্রভ্রষ্টতা। এই রোগ সারানো এখন শিবেরও অসাধ্য।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত

অবাস্তব পরিকল্পনায় না গিয়ে একটি উপায়ে ক্রমবর্ধমান বিপর্যয় হয়ত রোধ করা সম্ভব। সেটি হচ্ছে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কিছুকালের মত পরীক্ষার পাট সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া। পাঠসমাপনান্তে একটি সার্টিফিকেট থাকবে যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী নির্দিষ্ট সময় কোন বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে পড়েছে। তারপর পাঠ্যবিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান জন্মেছে কিনা তা নিয়োগ-কর্তারাই যাচাই করে দেখবেন। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়বে। শিক্ষা জগতের কেষ্টবিষ্টু যাঁরা স্বনামে বেনামে পরীক্ষা পাশের দাওয়াই নোটবই লিখে পয়সা কামান, পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা, মডারেটর, টেবুলেটর হ'য়ে বাড়তি রোজগার করেন তাঁরা এই পরিবর্তন হ'তে দেবেন কি? এমনিতেই ত মেকী ডিগ্রী নিয়ে হাজারে হাজারে ছেলেমেয়ে বেকার। ডিগ্রী না দিলে ডিগ্রীর মোহও দূরে হবে। উচ্চ-শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান ভীড়ও হ্রাস পেতে পারে। সেই সঙ্গে এও চাই, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ, নিয়মিত পঠনপাঠনের পুনঃ প্রবর্তন। গোড়া থেকে সংস্কার করলে কিছু সুফল হবেই। অবশ্য সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য ফিরে না এলে সবই অলীক, আকাশকুসুম।

বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর

অঙ্গনমঞ্চ

'দেশ' পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায় (১৩৭৮) প্রকাশিত বাদল সরকারের 'থিয়েটারী থিয়েটার : অঙ্গনমঞ্চ' আলোচনায় theatre-in-the round (অঙ্গন মঞ্চ) অর্থাৎ চারিদিকে দর্শকদের বসিয়ে মাঝখানে নাটকাভিনয় প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে ২টি বিষয়ে তিনি থিয়েটারওয়ালাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন—এক। থিয়েটার যেন সিনেমা না হয়ে পড়ে, দুই। জীবন্ত মানুষ এবং বস্তুর বাস্তবতা থেকে মুক্তি—এই দুটি বৈশিষ্ট্য যতো বেশি ব্যবহার করা যাবে, ততো বেশি থিয়েটারের স্বকীয়তা স্পষ্ট হবে।

উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমস্যাটির তিনটি দিক—অর্থাৎ, দর্শক, নাট্য রচনা, অভিনেতা-পরিচালক প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। দর্শকদের কল্পনাশক্তির কথা মনে রেখে স্পষ্ট করেই বলেছেন—'যাত্রা সার্কাস এই পদ্ধতিতেই (অঙ্গনমঞ্চে অভিনয়) করা হয়, থিয়েটারেও করা সম্ভব।' রবীন্দ্রনাথও এই মতটি পোষণ করতেন একটু অন্যভাবে এবং অঙ্গন মঞ্চ বিষয়ে তিনি সচেতন না থাকলেও দেখা যাবে এর সপক্ষেই তিনি বক্তব্য রেখে-ছিলেন : '...নাট্যকাব্য দর্শকদের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবীকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকদেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক মূঢ় স্থাণু; দর্শকদের চিত্ত-দৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালা গানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।' (ভূমিকা-তপতী-১৩৩৬)।

নাট্য রচনা প্রসঙ্গে বক্তব্য হচ্ছে অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় উপযোগী নাটক মোটামুটি নতুন করে লেখার দরকার হবে। বাদলবাবুর এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর যে ত্বরিত গমন ও প্রস্থান, চরিত্রের পরিবর্তন, ত্রিংশ শতাব্দীর আলো নিবলে চরিত্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, ফ্রিজ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর 'আমি ক্রীতদাস' নাটকের দোতলা ঘর, দৃশ্য পরিবর্তন, ফ্রিজ এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারদের দৃশ্যপট সমন্বিত নাটক অঙ্গন মঞ্চের ঠিক উপযোগী হবে না। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের কথা এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে পথ, জনতা, মুক্ত প্রকৃতি আছে; এদিক থেকে তাঁর রক্তকরবী, প্রকৃতির প্রতিশোধ, কালের যাত্রা, রথের রশি, ডাকঘর, মুক্তধারা বিশেষ উপযোগী বলে মনে করি। এবং উপযোগী নাটক পাওয়া গেলে পরিচালনার দিক থেকে আবহ সংগীত প্রয়োগ, আলোকসম্পাত, প্রতীক ব্যবহার, দৃশ্য পরিবর্তন, নেপথ্য কণ্ঠ প্রভৃতি ব্যাপারে খুব অসুবিধা দেখা দেবে না।

পরিশেষে অঙ্গন মঞ্চে দর্শক ও অভিনয়ের দূরত্ব ঘুচিয়ে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগটা বাড়লে বস্তুর বাস্তবতা থেকে মুক্তি আসবে কি? এতে দর্শকের কল্পনাশক্তি সংকুচিত হয়ে পড়বে না কি? অসবোর্ন মিউজিক হলের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি না করেও The Entertainer প্রসঙ্গে বলতে পেরেছিলেন,—It's contact is immediate, vital and direct কারণ সেখানে দর্শকের কল্পনার অবকাশ ছিল অথচ দর্শক ও অভিনয়ের ব্যবধান নাট্য রসসৃষ্টির অন্তরায় ছিল না।

জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল
অধ্যাপক মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

সাহিত্য সাধক যোগেশচন্দ্র

গত শতকের বাঙলার সংস্কৃতি ও সাধনার গবেষণার পুরোধা যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের লোকান্তর গমনে আমরা এক আদর্শনিষ্ঠ গবেষককে হারাইলাম। সুদীর্ঘকাল একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচারবিমুখ এই সাহিত্যসাধক আপন সাধনার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বাঙলার সংস্কৃতির বহু মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অদম্য জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তাঁহাকে জাতীয় গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে প্রায়ই দেখা গিয়াছে। জীবনের শেষ কয়েকদিন পূর্বেও তাঁহাকে গবেষণার বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ হইতে তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। অসুস্থ যোগেশচন্দ্র সে দায়িত্ব কীরূপে পালন করিবেন [illegible] কোনদিন করিয়াও সে কথা তিনি ভাবিয়াছেন। এরূপ কিছু কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয় যোগেশচন্দ্রের 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' বইখানির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানির পরিশিষ্টে যোগেশচন্দ্রের রচনাবলীর প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের একটি তালিকা আছে। এই তালিকাটির উল্লিখিত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলির (সংখ্যা প্রায় ২৮০) একটি সুনির্বাচিত সংকলন প্রকাশের মাধ্যমেই যোগেশচন্দ্রের অসংখ্য দেশবাসী তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনা ও নিষ্ঠার কথা স্মরণ রাখিতে পারিবেন ও ইহাতেই তাঁহার যথার্থ স্মৃতিতর্পণ হইবে বলিয়া মনে করি।

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য
কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়, হরিয়ানা।

এস্টাব্লিশমেন্ট

ছোটখাটো পত্র-পত্রিকায় এস্টাব্লিশমেন্ট শব্দটির ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি, তবে বিভিন্ন বিবরের মধ্যেই শব্দটির উল্লেখ থাকে এবং ক্রমশ ছড়াচ্ছে। তবে এই ব্যাপারটি সম্পর্কে সকলের স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয় না। আমারও নেই।

ব্যাপারটা একটু ধোঁয়াটে। প্রকৃতপক্ষে এস্টাব্লিশমেন্টের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তবে ক্রিয়াকলাপ আছে। এই ধারণাটি বিলেত থেকে আমদানি করা এবং শব্দটির আগে একটি দি বসানো দরকার। এই দি এস্টাব্লিশমেন্ট হচ্ছে এমন একটা শক্তি যা একটি রাষ্ট্র ও সরকারের গতি নিয়ন্ত্রণ করে—এমনকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও। একদা ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে চার্চ যেভাবে রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতো। এখন চার্চের শক্তি কমে যাওয়ায় সেই স্থান নিয়েছে দেশের কয়েকটি পরিবার এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান। যেমন, ধরা যাক ইংলন্ডের ক্ষেত্রে—শ্রমিক বা রক্ষণশীল যে দলের হাতেই ক্ষমতা থাকুক—অপ্রত্যক্ষভাবে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে বি বি সি, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, টাইম পত্রিকা, অক্সফোর্ড ইত্যাদি।

শুধু অর্থনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই এস্টাব্লিশমেন্টের বিরাট ভূমিকা। একটি

দেশের ওপরমহলের মানুষের জীবনযাত্রা বা আচারব্যবহার কিরকম হবে তা সরকার ঠিক করতে পারে না কোনোদিনই, এস্টাব্লিশমেন্ট সেটা ঠিক করে। এক সময় গির্জার হাতেই এর ভার ছিল—পরে ফিউডাল শ্রেণীই এর আদর্শ হয়। ব্রিটিশ ভদ্রতা বা ব্রিটিশ কালচার বলতে যা বোঝায়—তা আসলে অভিজাত শ্রেণী বা অভিজাত-হতে-চাওয়া মানুষদের ব্যবহারিক প্রতিচ্ছবি। প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলিরও এরকম ভূমিকা থাকতে পারে।

ব্যাপারটাকে ধোঁয়াটে বলা হচ্ছে এইজন্য যে, এই যে সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা শক্তি—এরা কখনো মিলে-মিশে বা মিটিং করে কোনো প্রকার নির্দিষ্ট ব্যবহারিক মান ঠিক করে না। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ছাড়াই সমস্বার্থের প্রশ্নে মিলন ঘটে যায়। যেমন, বিভিন্ন সংবাদপত্র পরস্পরের প্রতিযোগী, তবু কয়েকটি মূল ব্যাপারে তারা একতাবদ্ধ।

আমেরিকায় যেমন, সামাজিক জীবনে যাদের আধিপত্য, তাদের সংক্ষেপে বলা যায়, হোয়াইট প্রোটেস্টান্ট। বা একটু বিশদ করলে যাদের বলা হয় ওয়াসপ্, অর্থাৎ হোয়াইট অ্যাংলো স্যাক্সন প্রোটেস্টান্ট—নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে যাদের বসতি, যথেষ্ট শিক্ষিত ও ধনাঢ্য। আমেরিকার উঁচু সমাজ-জীবনে এঁরা আদর্শস্বরূপ হলেও সরকারের ওপর এঁদের প্রভাব খুব বেশী নেই এখন—সেখানে ক্ষমতা ধরে আছে দেশ-জোড়া এক গুন্ডা বাহিনী এবং তেল ও অস্ত্রের ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা কখনো কখনো এস্টাব্লিশমেন্টের সমর্থক হলেও বৃহৎ ব্যবসায়ী মাত্রেই এস্টাব্লিশমেন্ট নয়—কারণ তারা সাংস্কৃতিক জগতে অনুপস্থিত। ফরাসী দেশে এক সময় ডজন দুএক পরিবারকেই এস্টাব্লিশমেন্ট বলে গণ্য করা হতো।

আমাদের দেশে এস্টাব্লিশমেন্টের এরকম শক্তি আছে কিনা সেটা গবেষণার বিষয়। বিদেশী শাসনে দুশো বছর প্রতিচ্ছবি যে নেই

—এটা বলা যেতে পারে। গির্জার মতন একটি প্রতিষ্ঠান হিন্দু বা ইসলামে নেই। হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্মে ঐ রকম কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না—যা সমস্ত সমাজ-জীবনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। পুরুত এবং মোল্লারা স্থানীয়ভাবে ফতোয়া দিয়েছে বটে কিন্তু তা অত্যন্ত বেশী স্বার্থগন্ধী, ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে নেই—তাদের প্রতাপ সাধারণ গরীব দুঃখী মানুষকে ভয় পাইয়েছে বটে, কিন্তু দেশের উঁচুস্তরের মানুষের জীবনযাত্রা নিরূপণে অক্ষম। এ ছাড়া, এই বিরাট ও জটিল দেশে কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের পক্ষে আধিপত্য করাও প্রায় অসম্ভব। প্রাদেশিক ভিত্তিতে সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে। যেমন, বলা যায় এক সময় ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বাংলাদেশের

[illegible] মানুষদের জীবন কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। রাজরা গোষ্ঠীগতভাবেই [illegible] এক সময় অনেক উঁচুতে উঠেছিল এবং শাসক সম্প্রদায়ের সংগে তাঁদের ব্যবহারিক দূরত্ব কমে যাওয়ায়—অনেক ক্ষমতাই তাঁদের হাতে এসেছিল এবং আমাদের সামাজিক জীবনে তাঁদের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। বর্তমানে সে প্রভাব কিছুটা কম অনুভব করা যায়। সামগ্রিকভাবে, আমাদের দেশে কিছু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকটি পরিবার অত্যন্ত প্রভাবশালী, সরকারের ওপরেও এদের প্রভাব আছে, কিন্তু তাদের এস্টাব্লিশমেণ্ট আখ্যা পাবার যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ।

প্রত্যেক যুগেই এস্টাব্লিশমেণ্টের ওপর আঘাত হানা হয়েছে। যদিও এস্টাব্লিশমেণ্ট আগাগোড়াই খারাপ বা স্বার্থের কারবার—এ ধারণাটাও ভুল। এস্টাব্লিশমেণ্ট অনেক কিছু দেয়, তার বদলে নেয় বেশী, এই যা। আমেরিকার সমাজজীবনে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে হিপি এবং তাদের অব্যবহিত পূর্বসূরী বিট বা বিটনিকরা। এতে সবচেয়ে বেশী চেঁচামেচি করেছে এস্টাব্লিশ—মেণ্ট—ঠিক যে কারণে এস্টাব্লিশমেণ্ট কম্যুনিজম-বিরোধী। কম্যুনিজমে ধনের সমবণ্টন ছাড়াও সামাজিক জীবনরীতি রূপান্তর প্রশ্ন আছে, হিপিরাও সামাজিক জীবনযাত্রা রীতিটাই বদলাতে চেয়েছে। আমরা সকলেই শুনেছি যে, মার্কিন হিপিরা অনেকেই বড়লোকের ছেলেমেয়ে। কথাটা প্রায় সত্যি, শুধু বড়লোক নয়—ওদের পিতামাতা বেশীর ভাগই ঐ এস্টাব্লিশমেণ্ট-এর অন্তর্গত। নিগ্রো বা গরীবের ছেলেরা হিপি হয় না—যেমন আমাদের ফুটপাথের ভিখিরিরা জন্ম-হিপি। হিপি এবং বিটনিকরা অনেকে আদি পুরুষ হিসেবে যাঁদের নাম করে—তাঁদের মধ্যে আছেন মার্টিন লুথার এবং যীশু খ্রীষ্ট। যীশু আঘাত হেনেছিলেন ইহুদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে, মার্টিন লুথার গির্জার—যাঁর যাঁর সমসাময়িক এস্টাব্লিশমেণ্টের বিরুদ্ধে।

এই সব আঘাতেও এস্টাব্লিশমেণ্ট হারে না বা ভেঙে পড়ে না। খানিকটা চুপসে গিয়ে আবার ফুলে ওঠে। খুব কৌশলের সঙ্গে এই সব বিদ্রোহীদেরও গ্রাস করে দলভুক্ত করে নেয়। প্রোটেস্টাণ্টরাও হয়ে যায় অতি মাত্রায় রক্ষণশীল, বড়লোকরাও বড়লোক থেকে গিয়েই ফ্যাশান হিসেবে কম্যুনিস্ট বা হিপি হয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এস্টাব্লিশমেণ্ট শব্দটা একটু আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয়: এরকম কোনো কোনো দেশে দেখা যায় যে, কয়েকটি পত্রপত্রিকা এবং [illegible] সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান [illegible] করার অর্থ নয়, সাহিত্যিকেরা [illegible] ইচ্ছেমতন লেখাতেন। সেটা [illegible] পৃথিবীতে সম্ভব হতো না। ফলে, ব্যাপারটা এমন হয়ে ওঠে যে, সাহিত্যিকেরা তার বাইরে যেতে পারেন না। সাহিত্যিকদের উপার্জনের লভ্যাংশের যে একটা বড় ভাগ এদের পকেটে যায়—তা তো বলাই বাহুল্য। সাহিত্যিকেরা তার বদলে পান ঝঞ্ঝাট-এড়ানোর আবহাওয়া। একজন জনপ্রিয় লেখক নিজের বই নিজেই ছেপে বার করলে অনেক বেশী লাভ করতে পারবেন—কিন্তু নিজে ঐ সব করতে গেলে যে ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়বেন, তাতে তাঁর লেখার ক্ষমতার বারোটা বেজে যাবে। যারা যখন এই সব ছাপার দায়িত্ব নেয়—তখন সেই বণিক আবার লেখকদের ধমকায় বা পোষ মানিয়ে নেয়। এস্টাব্লিশমেণ্ট ধমকায় না, কোনো নির্দেশও দেয় না—কিন্তু একটা অদৃশ্য জাল চতুর্দিকে ছড়ানো থাকে। এর ক্রিয়াকলাপ সূক্ষ্ম বলেই দীর্ঘজীবী।

"অ্যাণ্টি এস্টাব্লিশমেণ্ট" সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশুদ্ধ ও পবিত্র অভিব্যক্তি। বারবার, যেখানে-সেখানে উচ্চারণ করে এর বিশুদ্ধতা নষ্ট করার মানে হয় না। এই মনোভাবটি থাকার ফলেই যুগে যুগে নতুন সাহিত্য রচিত হয়। এইজন্যই সাহিত্য আজও দুঃসাহসী। অ্যাণ্টি এস্টাব্লিশমেণ্ট মানে এস্টাব্লিশমেণ্টকে গালাগাল দেওয়া নয়। মানে হলো, এস্টাব্লিশমেণ্টের আওতায় পড়ে যাওয়া লেখকরা যা রচনা করতে পারছেন না, সেইরকম বিষয় নিয়ে সার্থক রচনা। এস্টাব্লিশমেণ্টকে শুধু গালাগাল দিলে তার কিছু যায় আসে না—তখন মানেটা এই দাঁড়ায় যে, যারা যারা এস্টাব্লিশ-মেণ্টের মধ্যে জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করেও জায়গা পায়নি, তারাই এরকম বলছে। এস্টাব্লিশমেণ্ট তখনই নড়ে-চড়ে ওঠে, যখন শিল্পব্যবস্থার সঙ্কট হয়—যখন কোনো একজন লেখক বা একদল লেখক আলাদা একটা প্রতিস্পর্ধী সাহিত্যরূপ গড়ে তোলে এবং সেটাই রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার উপক্রম হয়। এস্টাব্লিশমেণ্ট তখন গোড়ার দিকে তাকে দমন করার চেষ্টা করে এবং পরে নিজেই উদ্যোগী হয়ে তার দিকে এগিয়ে যায় এবং তাকে অঙ্গীভূত করার জন্য হাত বাড়ায়। এস্টাব্লিশমেণ্টের হাতে সব রকম প্রচারক্ষমতা—তাই এক যুগের বিদ্রোহী লেখক পরবর্তী যুগে এস্টাব্লিশ-মেণ্টের অন্তর্গত হয় শুধু এই কারণে যে, সে তার রচনার ব্যাপক প্রচার চাইবে। এটা আবার প্রত্যেক লেখকের দুর্বলতা। এই-রকম দুর্বল মানুষ বলেই সে কালি ও কাগজ নিয়ে লেখে, নইলে ধ্যানী কিংবা রাজনৈতিক বক্তা হতো।

সনাতন পাঠক

গান্ধী শতবার্ষিকী পুস্তকমালা

গান্ধীজীর শিক্ষা। শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী প্রকাশন উপসমিতি ঃ—মহাজাতি সদন, ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য ০·৫০ পয়সা।

আলোচ্য পুস্তকটি গান্ধী শতাব্দী পুস্তকমালার আবার অন্যতম পুস্তক। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণ করে এই পুস্তকখানি রচিত হয়েছে। গান্ধী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাই যে আমাদের জাতীয় শিক্ষা, গান্ধীজীর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরই কথায় এই অপূর্ব শিক্ষার কথা লেখক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। গান্ধী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের জাতীয় শিক্ষা। স্বদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাত্র এই শিক্ষাই পূর্ণ করতে পারবে। এজন্যই নয়ী তালিম বা এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে লেখক সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এই পুস্তকে।

খাদি ও চরখার কথা। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী প্রকাশন উপসমিতি ঃ—মহাজাতি সদন, ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য ০·৫০ পয়সা।

এই পুস্তকটি গান্ধী শতাব্দী পুস্তকমালার ত্রয়োদশ পুস্তক। লেখক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান্ধীবাদী নেতা। গান্ধীর ভাবধারা এবং গান্ধী-সাহিত্য প্রচারের তিনি আদি প্রবর্তক ও সর্বপ্রধান উদ্যোক্তা। মৃতকল্প গ্রাম-শিল্প পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণা অনুসরণ করে খাদি এবং অন্যান্য গ্রাম-শিল্পই যে আজ মানুষের রক্ষাকবচ এবং অহিংসার আশ্রয় তা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এই পুস্তকে। 'খাদি ও চরখার কথা' পুস্তকে লেখক গান্ধীজীর উক্তি বহু স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। খাদি এবং বিকেন্দ্রিত গ্রাম-শিল্পই আজ মানুষের রক্ষাকবচ—অহিংসার আশ্রয়—এসব কথা এ পুস্তকে বুঝানো হয়েছে।

গল্পগ্রন্থ

স্বরচিত প্রতিবিম্ব ঃ সুনীল দাশ। শুকসারী প্রকাশক। ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-১৪। চার টাকা।

মানুষের জীবনের আদি অন্তের কেউ যদি হিসেব কষতে বসেন, তিনি নিশ্চয় ভুল করবেন। কারণ, সম্ভবত মানুষই জীব-জগতের একমাত্র প্রাণী যার জীবনে কোন ধারাবাহিকতা নেই। কারণ তার জীবন কতকগুলি টুকরো টুকরো ঘটনার সমষ্টি দিয়ে গড়া। প্রতিবিম্বিত ওই সমস্ত ঘটনাই মানুষের জীবন-আলেখ্য। জীবন-চিত্র।

যদি এই আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে স্বীকার করতেই হবে সুনীল দাশের **স্বরচিত প্রতিবিম্ব** একটি সার্থক উত্তরণ। মোট দশটি ছোটগল্পের এই সংকলনে লেখক যে সমস্ত চরিত্র চয়ন করেছেন তারা হয়ত অনেকেই আমাদের পরিচিত। নাচিয়ে দ্বিজপদ, সহদেবের নীলকমল, 'সনকার স্বেদ ও শোণিত'-এর সনকা হঠাৎ থেমে পড়া পেণ্ডুলামের মতই পাঠক-মনে রেখাপাত করে। লেখক-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষ করে সুনীলের গল্প বলার বলিষ্ঠ ভঙ্গী, কাহিনীর্ণিত আঙ্গিক এবং চরিত্র বিশ্লেষণের মুন্সীয়ানা এই সংকলনের প্রতিটি গল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে। যা সহজে হৃদয়ে গেঁথে যায়, যার মধ্যে প্রতিটি পাঠকও হবেন বিস্মিত হন।

টেনিসের 'গৌরব'

টেনিস খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল হামেশাই ঘটে থাকে। বাছাই তালিকার বাইরে থেকে শীর্ষ বাছাইদের পরাজিত করার ঘটনাও ভূরি-ভূরি।

এবারকার জাতীয় টেনিসে বাছাই তালিকার ৭ নম্বরে স্থান পেয়ে গৌরব মিশ্রের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভও নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পর্যায়ে পড়ে। বিশেষ করে জয় রয়াপ্পা, মদনামোহনা প্রেমজিতলাল, শ্যাম মিনোত্রা এবং টেনিসে বহু গৌরবের অধিকারী অভিজ্ঞ রামনাথন কৃষ্ণণকে পর পর পরাজিত করে গৌরব মিশ্র যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মার্চের ৫ তারিখে ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের ঐতিহাসিক কোর্টে কৃষ্ণণকে হারিয়ে গৌরব মিশ্র যখন ভারতীয় টেনিসের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করলেন সেদিন সাংবাদিকদের অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন, 'ভাগ্য আমার সহায়ক ছিল বলেই জিতেছি।'

সত্যিই কি তাই? জাতীয় টেনিসের প্রতিটি খেলার গুণাগুণ বিচারে গৌরব মিশ্রের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ কিন্তু যোগ্যের যোগ্য সম্মান। প্রতিটি ম্যাচেই ভাল খেলেছেন, কোয়ার্টার-ফাইনাল, সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালে প্রথম সারির প্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়েছেন।

কথায় বলে ঘটনা ও ইতিহাস বার বার ঘুরে-ফিরে আসে। উত্তরসূরীদের দ্বারা ঘরানার ঐতিহ্যে নতুন কীর্তির সংযোজন ঘটে। গৌরব মিশ্র টেনিসের পরম অনুরাগী স্যার লক্ষ্মীপৎ মিশ্রের পৌত্র, দুবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং ডেভিস কাপে

গৌরব মিশ্র

ভারতের যশস্বী খেলোয়াড় সমন্ত মিশ্রের পুত্র। ১৯৪৫ সালে ভারতের দুই নম্বর খেলোয়াড় ইফতিকার আমেদকে হারিয়ে সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র সমন্ত মিশ্র টেনিসে প্রথম আলোড়ন তুলেছিলেন। পরের বছর জাতীয় টেনিসের বাছাই তালিকায় সমন্ত ১০ নম্বরে স্থান পেলেও ভারতীয় টেনিসে তখনকার একচ্ছত্র সম্রাট গাউস মহম্মদকে কোয়ার্টার ফাইনালে, দিলীপ বসুকে সেমিফাইনালে এবং মনমোহনকে ফাইনালে হারিয়ে পেয়েছিলেন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের ২২ বছর বয়সী ছাত্র সমন্ত পুত্র গৌরবের বেলায় প্রায় একই ইতিহাস।

সেদিন খবরের কাগজে একটি চমৎকার ছবি চোখে পড়ল। ১৯৫২ সালের তোলা মিশ্র পরিবারের এক ছবি। সমন্ত মিশ্রের জয়-করা জাতীয় টেনিসের বিজয়ীর ট্রফিটির মধ্যে বসে আছে দু বছরের একটি ছেলে। সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল যে ট্রফিটি ছেলেটির কাছে খেলনা সামগ্রী সেই ট্রফিটিই সে একদিন জয় করে মিশ্র পরিবারের টেনিস ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবে।

ওই ১৯৫২ সালেই সাউথ ক্লাবে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সমন্ত মিশ্রকে সিংহাসনচ্যুত করে ভারতের টেনিস সিংহাসন দখল করেছিল ১৬ বছরের একটি ছেলে যার নাম রামনাথন কৃষ্ণণ। দীর্ঘ কুড়ি বছর পার সেই সাউথ ক্লাবের লনেই ৮ বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণণকে হারিয়ে গৌরব মিশ্র নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। সমন্ত মিশ্র যেদিন প্রথম জাতীয় টেনিস জয় করেছিলেন সেদিন স্যার লক্ষ্মীপৎ বলেছিলেন, 'সমন্ত তোমার দায়িত্ব বেড়ে গেল'। ঠিক একইভাবে গৌরবের জয়ের খবর পেয়ে দিল্লির কর্মস্থান থেকে টেলিফোনে সমন্ত মিশ্র পুত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'কান্তু' তোমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

পরিবারের পরিবেশেই মাত্র ৫ বছর বয়সে কান্তুর হাতে টেনিস র‍্যাকেট উঠেছিল। দু বছর পরে অর্থাৎ ৭ বছর বয়সে আরম্ভ হয় টেনিসের টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রথম এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন দিলীপ বসুর কাছে। বেঙ্গল লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন যে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ

করেছিলেন তারই মাধ্যমে দিলীপ বসু সম্ভাবনাময় কয়েকটি ছেলের শিক্ষার ভার হাতে নেন। পরবর্তী সময়ে গৌরবের টেনিস শিক্ষার ভার পড়ে আকতার আলির উপরে। উদীয়মানদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ১৯৬৬ সালে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের বিদেশে পাঠান হয়। বলরাম সিং এবং ভূপতির সঙ্গে গৌরব মিশ্রও দলভুক্ত হন। গৌরবের বয়স তখন ১৬ বছর। পরের বছর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডে গৌরব অস্ট্রেলিয়ার বব্ কারমাইকেলের কাছে হেরে গেলেও কারমাইকেলকে ৫ সেট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যে সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সেই শক্তিরই পরিচয় দেন অমৃতশহরে জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করে। ১৯৬৮ সালে জন্ডিজ রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৬ মাস টেনিস কোর্ট থেকে দূরে সরে থাকলেও এ শি য়া ন চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠে গৌরব প্রেমজিতলালের কাছে হেরে যান। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেরও কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠে হেরে যান মার্কিন খেলোয়াড় বিল টিমের কাছে।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয়বার গৌরবের বিদেশ সফরের সুযোগ আসে। নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ওই বছরই জাতীয় টেনিসের সেমিফাইন্যালে উঠে গৌরব আবার হারেন প্রেমজিতের কাছে। এবার চার সেটের খেলায়। ফলে ডেভিস কাপে খেলার জন্য তাঁর ডাক পড়ে। সিংহলের বিরুদ্ধে ডাবলস এবং মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সিঙ্গলস খেলায় তিনি অংশ নেন।

১৯৭০-৭১-এ গৌরব লাভ করেন হার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। অবশ্য জয়দীপ ও প্রেমজিত হার্ডকোর্টে অংশ নেননি। এই বছর জাতীয় টেনিসের কোয়ার্টার ফাইন্যালে আবার প্রেমজিতের কাছে হার পরাজয়। মধ্যপ্রদেশ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালেও পরাজয় প্রেমজিতের কাছে। অর্থাৎ একবারও জাতীয় টেনিসের আগে প্রেমজিতলালকে গৌরব কোনদিন হারাতে পারেননি। এবার হারিয়েছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে, টেনিসের উন্নত কলা-চাতুর্যের পরিচয়ে।

ছ' ফুটের উপর মাথায় উঁচু দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়, যার হাতে আছে বাবার মতই মাটি কাঁপানো সার্ভিস এবং জোরালো গ্রাউন্ড শট, এতদিন তাঁর বড় প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার কারণ কি? না, গৌরবের হাতের নিশানা নির্ভুল নয়, গৌরব কিছুটা খেয়ালী এবং অমনোযোগী। খেলায় ভুল হলে বার বার ভুল করতে থাকেন। তা ছাড়া গৌরব কোর্টের মধ্যে বেশ কিছুটা অস্বচ্ছন্দ; তেমন চটপটে নন। দেহও নয় অ্যাথলেটিকসুলভ নমনীয়। গৌরব যদি এই ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পারেন তা হলেই তিনি আন্তর্জাতিক টেনিসে ভারতের সুনাম বাড়াতে পারবেন। অন্যথায় তাঁকে মাঝারিয়ানার মধ্যেই বাঁধা পড়ে থাকতে হবে।

বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সেদিন প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে ফুটবল স্টেডিয়াম সম্পর্কে আবার আশার বাণী শুনিয়েছেন। অনেক পরিকল্পনা, জরিপ, পরীক্ষা, নকশা তৈরি, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন—এমনকি বাজেটে অর্থ বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও যে শহরে স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি সে শহরে অচিরে স্টেডিয়াম হবে এই আশা-বাণীতে আপাতত আনন্দিত হবার মত কিছু দেখছি না। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী স্টেডিয়ামের স্থান সম্পর্কে যখন ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠের উল্লেখ করেছেন।

ময়দানের যেখানে ক্যালকাটা, কাস্টমস ও পুলিস অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠ ওই অঞ্চলে ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা অবশ্য নতুন নয়। প্রথম এই পরিকল্পনা করেছিলেন ক্যালকাটা ক্লাবের গ্রাউন্ড সেক্রেটারি রোচ সাহেব। পরে মন্ত্রিসভাতেও ওই স্থান নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু জনবহুল শহর, যেখানে যানবাহনের সমস্যা গুরুতর সেই শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাটকায় ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি হলে যানবাহনের সমস্যা আরও বেড়ে যাবে বলেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছিল। নানা পরিকল্পনার পর ঠিক হয়েছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠের বিপরীত দিকে এলেনবরা কোর্সে ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি হবে। ওর জন্যে দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজ তৈরি হলে যানবাহনের একটা অসুবিধা হবে বিধায় এলেনবরার পরিকল্পনা ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল ইডেনেই ফুটবল ও ক্রিকেটের কম্পোজিট স্টেডিয়াম করা হবে।

ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলা যে একই স্টেডিয়ামে হতে পারে না এ কথা আমরা বহুবার বলেছি। ক্রিকেট মহল থেকেও বহুবার আপত্তি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় যদিও আগে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির সমর্থক ছিলেন এখন মত বদলেছেন। বলেছেন, জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য আয়োজিত প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার সময় ইডেনের পিচের শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে, ওখানে ফুটবল খেলা হলে পিচ তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটবে, ক্রিকেট খেলা হতে পারবে না।

ওই অসুবিধা ছাড়াও কম্পোজিট স্টেডিয়ামের আরও একটি অসুবিধা, যদি ক্রিকেট মরসুমেই ফুটবল খেলার প্রয়োজন হয়, যদি তখন কোন বিদেশী ফুটবল দল কলকাতায় খেলতে আসে তবে কম্পোজিট স্টেডিয়ামে খেলার ব্যবস্থা করা যাবে না।

যাই হোক, দেরিতে হলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবার পর অতীত দিনের চৌকস ক্রীড়াবিদ যখন সমস্যাটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন তখন আশা করা যায় কম্পোজিট পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হবে।

এখন প্রশ্ন, ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরির স্থান নিয়ে। ক্রিকেটের চেয়েও ফুটবল স্টেডিয়ামের বেশী প্রয়োজন এবং একটি বড় আকারের স্টেডিয়ামেরই প্রয়োজন। যানবাহনের সমস্যা সত্ত্বেও ইডেনে যখন কম্পোজিট স্টেডিয়ামের জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন ক্যালকাটা মোহনবাগান মাঠ অঞ্চলে পৃথক ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরিতেই আপত্তি ওঠা উচিত নয়। অন্যত্র যদি ভাল স্থান পাওয়া যায় পৃথক কথা। না হলে ওই অঞ্চলেই ফুটবল স্টেডিয়ামের জন্য উদ্যোগ আরম্ভ হওয়া উচিত। জানি, নানা মহল থেকে আপত্তি উঠবে। কিন্তু রাজ্য সরকার যদি সে আপত্তিতে কান দেন তবে 'অভিশপ্ত' কলকাতায় কোনদিনই স্টেডিয়াম গড়ে উঠবে না।

রবীন্দ্র সরোবরে ইনডোর সাঁতার পুল তৈরি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় আর এক নতুন কথা শুনিয়েছেন। সাঁতারের পর পুলের উপর কাঠের পাটাতন পেতে সেখানে ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস ইত্যাদি খেলাধুলাও করা যাবে। দর্শক আসন থাকবে দশ হাজারের মত। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালেই নাকি শ্রীরায় এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করে এসেছেন। নিঃসন্দেহে শুভ সংবাদ। কিন্তু পরিকল্পনা মঞ্জুর এক কথা আর তার রূপায়ণ পৃথক কথা। কাজ কিছুই আরম্ভ হয়নি। ইনডোর পুল তৈরি হলে সাঁতারু এবং ব্যাডমিন্টন ও টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের বহুদিনের অভাব মিটবে। তবে কলকাতার মত শহরে এ ধরনের একটি পুল প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। উত্তর এবং মধ্য কলকাতায়ও এ ধরনের পুল তৈরি হওয়া প্রয়োজন।

উপেক্ষিতের অবদান

ইডেনে রণজি প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইন্যালে বাংলা ৮ উইকেটে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে সেমিফাইন্যালে উঠেছে। ৭ এপ্রিল থেকে ইডেনেই বাংলার সেমিফাইন্যাল খেলা আরম্ভ হবে হায়দরাবাদ ও পাঞ্জাবের কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলার বিজয়ীর সঙ্গে। ক্রিকেট খেলার জন্য যে আবহাওয়া প্রয়োজন অনেক দিন আগেই তা অতিক্রান্ত। প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপ মোটেই ক্রিকেটের পরিবেশ নয়। এই পরিবেশে খেলার ফলাফল কী হবে, বাংলা অষ্টমবার রণজি ফাইন্যালে উঠতে পারবে কিনা সে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়। তবে পশ্চিমাঞ্চলের রানার্স শক্তিশালী মহারাষ্ট্রকে বাংলা যেভাবে হারিয়েছে তাতে খেলোয়াড়রা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

মহারাষ্ট্র ক্রিকেটের বেশ শক্তিশালী দল। তাদের বিরুদ্ধে চার দিনব্যাপী কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় বাংলার পর্যাপ্ত প্রাধান্যের প্রথম কারণ উপেক্ষিত বোলার সমর চক্রবর্তীর মারাত্মক বোলিং। কোন জয়ে দলের প্রায় সকলেরই কম-বেশী অবদান থাকে। কিন্তু সমরের অবদান যে সবচেয়ে বেশী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমর প্রথম ইনিংসে ১৬ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে।

১৬ রানে ৪টি উইকেট পাওয়া বড় কথা নয়, বড় কথা মাত্র ১০ রানের মধ্যে মহারাষ্ট্রের চারটি উইকেট ফেলে দেওয়া। চারজনের মধ্যে সমর অবশ্য আউট করেছে তিনজনকে। কিন্তু দুই নির্ভরযোগ্য ওপেনার চেতন চৌহান, মধু গুপ্তে এবং অধিনায়ক চান্দ বোরদের উইকেট নিয়ে সমরই মহারাষ্ট্রের মাজা ভেঙে দিয়েছে যার ফলে মহারাষ্ট্রের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেছে মাত্র ১০৬ রানের মধ্যে।

তথাপি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এবং প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের কষ্ঠিপাথরে যাচাই হওয়া সত্ত্বেও বাংলার নির্বাচকরা সমরকে উপেক্ষা

বিশ্ব ফুটবলের প্রথম পুরুষ ব্রাজিলের পেলে কিছুদিন আগে স্যান্টোস ক্লাবের সঙ্গে ইংলন্ড সফর করেন। বার্মিংহাম সিটি ক্লাবের জনপ্রিয় উঠতি খেলোয়াড় ট্রেভর ফ্রান্সিসের লম্বা চুল টেনে পেলে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

করেছেন বার বার। সার্ভিসেস দলের এই প্রাক্তন পেস বোলার ২ বছর আগে মাদ্রাজে দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে ৯ জন টেস্ট খেলোয়াড়ে গড়া দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬টি উইকেট দখল করেছিল ৯৮ রানে। প্রধানত সমরের বোলিং নৈপুণ্যেই উত্তরাঞ্চল ওই খেলায় বিজয়ী হয়েছিল। সেই সমর চক্রবর্তী বাংলায় আসা সত্ত্বেও নির্বাচকরা রণজির খেলায় বার বার তাকে উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সুযোগ দিয়েছেন।

বাংলার জয়ের মূলে গোপাল বসুর বড় অবদানও অনস্বীকার্য। বাংলার প্রথম ইনিংসে ৩২৮ রানের মধ্যে ওপেনিং ব্যাটসম্যান গোপাল বসুই করেছে ১৪১ রান। ক্রিকেট খেলায় জয় বা সেঞ্চুরি করায় ভাগ্যের কিছুটা হস্তক্ষেপ থাকেই। গোপাল যখন ৪৫ রানে পৌঁছয় তখন মালগাঁওকারের একটি বল ওকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে উইকেট ছুঁয়ে চলে যায়। কিন্তু স্টাম্পের উপর থেকে বেল পড়ে না। ফলে গোপালও আউট হওয়া থেকে বেঁচে যায়। যদি বেল পড়ত এবং গোপাল আউট হত তবে খেলার ফলাফল হয়তো মহারাষ্ট্রের অনুকূলে যেত না কিন্তু লড়াইটা জমত ভাল। মাঠের উপর প্রধানত সমর চক্রবর্তী ও সুব্রত গুহের বোলিং এবং গোপাল বসুর ব্যাটিং কৃতিত্বেই পুনের মাটির মহারাষ্ট্রীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের পুনের মাটিতে আছাড় খেয়েছে।

নিখিল ভারত গ্রামীণ খেলাধুলা

জয়পুরের নিখিল ভারত গ্রামীণ খেলাধুলার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে রাজস্থান, পাঞ্জাব ও দিল্লির ছেলেমেয়েরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে। বাংলার ছেলেমেয়েরা মোট ১২ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থান দখল করেছে।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রামীণ খেলাধুলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গ্রামীণ খেলাধুলা অর্থে গোল্লাছুট, দড়িয়া বাঁধা বা ডাংগুলি খেলা নয়, গ্রামের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা যার মধ্যে আছে ফুটবল, যার মধ্যে আছে কবাডি, খো-খো, ভলিবল, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস প্রভৃতি। শহরের ছেলেমেয়েদের এ খেলাধুলায় অংশ গ্রহণের অধিকার নেই। যারা গ্রামে বাস করে তাদেরই অংশ গ্রহণের অধিকার।

গ্রামের উপেক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যেও যে ভবিষ্যতের বড় খেলোয়াড় বা বড় অ্যাথলীট হবার সম্ভাবনা রয়েছে তারই ইঙ্গিত মেলে এই গ্রামীণ খেলাধুলায়। এবারও মিলেছে। সদ্য সমাপ্ত অনুষ্ঠানের সব ফলাফলের সমীক্ষা করা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অ্যাথলেটিকসের কয়েকটি ফলাফল রীতিমত উৎসাহব্যঞ্জক। সবচেয়ে উল্লেখ করবার মত ফল ১০০ মিটার দৌড় ১১·২ সেকেন্ড সময়। করেছে পাঞ্জাবের একটি ছেলে, নাম সাম্পারা সিং। গ্রামীণ খেলাধুলার সঙ্গে মাদ্রাজে একই দিনে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ওপেন মিটে দিল্লী ক্লথ মিলের রামস্বামী ১০০ মিটার দৌড়েছে ১১·১ সেকেন্ডে, ১১·২ সেকেন্ডে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে রেলের নটরাজন। মিউনিখ অলিম্পিকের জন্য অ্যাথলীট নির্বাচনের এই গুরুত্বপূর্ণ মিটে গাঁয়ের ছেলে সাম্পারা যোগ দিলে নিশ্চয়ই আরও ভাল সময় করতে পারত। গ্রামের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহ এবং এমন সব [illegible] ছেলেদের আবিষ্কার করাই গ্রামীণ খেলাধুলার অন্যতম উদ্দেশ্য।

একলব্য
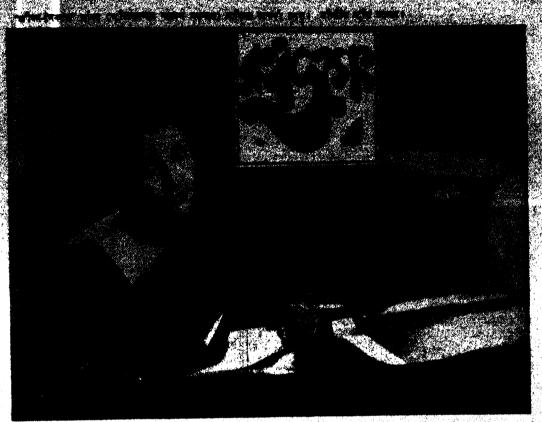
বাংলাদেশে ছবি রফতানি প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব এম আর সিদ্দিকি বলেছেন, ভারতীয় ছবি আমদানির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার এখনো কোন চূড়ান্ত নীতি গ্রহণ করেননি। নতুন দিল্লিতে ২৮ মারচ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পরই এ-বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করবেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে ছবি আমদানির ব্যাপারে কথা বলার জন্য কাউকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, যখন ছবি আমদানির ব্যবস্থা হবে তখন বাংলাদেশ সরকার হিন্দীর তুলনায় বেশী সংখ্যক বাংলা ছবিই আমদানি করবেন।

ইসটারন ইনডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন-এর সহ-সভাপতি শ্রী পি কে সরকার এবং সম্পাদক শ্রীদীপেন্দু প্রামাণিকের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে জনাব সিদ্দিকি উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে রফতানির জন্য চারশটি হিন্দী ও দুটি বাংলা ছবি নির্বাচিত হয়েছে বলে ইনডিয়ান মোশান পিকচারস এক্সপোরট করপোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীতারিক যে তথ্য পেশ করেছেন তা ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। ই আই এম পি এ বিদেশে বাংলা ছবি রফতানির ব্যাপারে এক্সপোরট করপোরেশনের অনুরোধের কোন জবাব দেননি বলে শ্রীতারিক যে অভিযোগ করেছেন, ই আই এম পি এ তা অস্বীকার করেন।

নতুন বাংলা ছবি : আউটডোরে, ইনডোরে

মৃণাল সেনের নতুন ছবি 'কলকাতা-৭১'-এর কাজ শেষ। এই ছবির পটভূমি কলকাতা এবং তার নানাবিধ যন্ত্রণা ও সমস্যা। ছবিটির মধ্যে মোট পাঁচটি অংশ। ছবির কাহিনী নেওয়া হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, সমরেশ বসু, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালক শ্রীসেনের নিজের লেখা থেকে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী চক্রবর্তী, গীতা সেন, উৎপল দত্ত, সাধনা রায়চৌধুরী, ধিনতা রায়, সুচেতা রায়, রঞ্জিত মল্লিক, হারাধন ব্যানার্জী ও সুহাসিনী মুলে। সুরারোপ আনন্দ-শংকরের।

এস বি এণ্টারপ্রাইজ নিবেদিত দুই বোন ছবির কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। শচীন অধিকারী পরিচালিত এই ছবির সমস্ত দৃশ্যই আউটডোরে গৃহীত। ছবির সংগীত পরিচালনায় আছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীরা হলেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, প্রণব চৌধুরী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী ও তরুণকুমার।

সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী চিত্রমের সৌমিত্র অভিনীত 'আলো' ছবির জন্য রাজেন সরকারের সুরে মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দুটি গান রেকর্ড করা হল। ইন্দ্রপুরী এই ছবির আরো দুটি গান গৃহীত হয়েছে; শিল্পী ছিলেন চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

ভূপেন রায় প্রযোজিত জ্যোতি চিত্রের রঙীন বাংলা শিশুচিত্র 'বকবকম'-এর জন্য কয়েকদিন আগে দুটি গান ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে গৃহীত হয়েছে। তরুণ সংগীত পরিচালক সুকুমার মিত্রের সুরে গান দুটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন একদল নবীন শিল্পী। মার্চের শেষ ভাগ থেকে দার্জিলিং-এ ছবিটির একটানা চিত্রগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা।

দুই বাংলার শিল্পী সমন্বয়ে সুকুমার প্রথম চিত্রপ্রয়াস 'সুপর্ণা'-বাংলা'র শুভ মহরত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল ইন্দ্রপুরী

সঙ্গীতপরিচালক। ছবিটির পরিচালক সরোজ রায় এবং সঙ্গীত পরিচালক পশুপতি বাউল।

অরুণিমা প্রোডাকশন্স প্রযোজিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত 'অমরাবতী' ছবির শিল্পাকী মুখার্জীর পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি এই ছবির সপ্তাহব্যাপী একটানা চিত্রগ্রহণ হয়ে গেল দিল্লিতে। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, বিকাশ রায়, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, মধ্যাগতা মধুছন্দা রায় প্রভৃতি।

সীতেশ চিত্রের 'বহুরূপী' ছবির চিত্র গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। ছবিটি এখন সম্পাদকের টেবিলে। ছবিতে সুর দিয়েছেন অজয় দাস। পরিচালক মিঠু চট্টোপাধ্যায়। শিল্পীদের মধ্যে আছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মধুছন্দা, অমিতা চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

ভাইপ্রেক্স প্রোডাকশন্স নিবেদিত ছবির নাম আক্রমণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবি পরিচালনা করছেন অজিত লাহিড়ী। উড়িষ্যার সারান্ডা জঙ্গলে দীর্ঘ পনেরো দিন বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ করে পরিচালক সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেবেন সমিত ভঞ্জ, মাধবী চক্রবর্তী, রবি ঘোষ এবং বোম্বের সোনিয়া সাহনী। কালীপদ সেন সংগীত পরিচালক।

পিয়ালী পিকচার্স-এর মর্জিনা আবদাল্লা-র মহরত গত রবিবার সম্পন্ন হয়েছে। দীনেন গুপ্ত ছবিটির পরিচালক। নামভূমিকায় রূপায়ণে অভিনয় করছেন মিঠু মুখোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। সলিল চৌধুরী সংগীত পরিচালক।

নাট্য-সমালোচনা

অনুভব-এর সওয়াল

অনুভব গোষ্ঠীর নতুন নাটক 'সওয়াল' শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সম্প্রতি এই নাটকের অভিনয় পরিবেশিত হল মুক্ত অঙ্গনে। কয়েক বছর আগের খাদ্য আন্দোলনের পটভূমিতে এই গল্পের বিস্তার। খাদ্য আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে রিকশাচালক লখাই দাস। লখাই-এর মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে নাটকের সূচনা এবং শেষ লখাই-এর অর্ধপাগল বাবা গুরুপদর একটি প্রশ্নে।

গল্পের মূল আবেদন অবশ্যই মানবিক। যদিও তার চারপাশে একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের আবরণ দেওয়া হয়েছে। গরীব এবং বড়লোক এই দুই পক্ষের বাঁচার লড়াইতে দেখা গেল পুলিস এবং সরকারী সমর্থন বড়লোকদের পক্ষেই বেশী। ফলে

গুরুপদর চরিত্রে (এঁরা রাজনীতি করেন) অভ্যবন্ধ আন্দোলনের ডাক দিলেন আর সেই আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচী রূপায়ণ করতে গিয়ে পুলিসের গুলিতে শহীদ হল রিকশাচালক লখাই। কিন্তু শেষে দেখা গেল, নেতাদের আন্দোলন অংশত সফল। যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা নিয়ে আন্দোলন সেই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। তখন লখাই-এর বাবা গুরুপদর জিজ্ঞাসা, তার ছেলের প্রাণের বিনিময়ে যে সুবিধা আদায় হল তার সুযোগ পুলিস এবং জোতদার গোলকদাস কেন পাবে?

নাট্যরূপ দিয়েছেন দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। লখাই-এর মৃত্যু থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত নাট্যকার সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়েছেন। বিশেষত লখাই-এর স্ত্রী ময়নার অতীত চিন্তার দৃশ্যগুলি একের পর এক যেভাবে মঞ্চে এসেছে তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সেদিক থেকে নাট্য উপস্থাপনা ও প্রয়োগভাবনার ক্ষেত্রে 'সুস্বাদ' প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু 'সওয়াল' আলোচনান্ত দেখার পর আমাদেরও সওয়াল থেকে যায়। তা হচ্ছে গুরুপদর মত মানুষে, যার নাকি রাজনীতি বা গণ-আন্দোলন সম্পর্কে কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, সে কেন পুলিস, গোলকদাস এঁদের মতো লখাই-এর মৃত্যুর জন্য নেতাদেরও অভিযুক্ত করল না? বাস্তবের পুত্রশোকাতুর গুরুপদরা কি এত সহজেই এগুলি মেনে নেয়?

নাটকটির প্রযোজনা ভাল লাগবার মত। প্রায় প্রত্যেকেই সুঅভিনয় করেছেন। 'গুরুপদ' ও 'লখাই' রূপে নাট্যনির্দেশক দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত ও অপস দত্তগুপ্ত সহজেই আমাদের সাধুবাদ পাবেন। মঞ্জুশ্রী দত্তর 'ময়না' উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টি। অন্যান্য চরিত্রে অসীম ভাদুড়ী, অরূপ ভাদুড়ী, অনিন্দ্য নন্দী, সুরজ বসু চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। মঞ্চ আলোর জন্যে দিপেন্দু বসু ধন্যবাদ পাবেন।

নাট্যসমালোচক

লোকায়ন-এর মালিনী

লোকায়ন প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের সাম্প্রতিক অভিনয় পরিবেশিত হল মুক্ত অঙ্গনে। তথাকথিত নাটকীয়তা 'মালিনী'তে নেই। কাহিনীতে একটা ভাবগত সংঘাত স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। সংলাপের মাধুর্যই 'মালিনী' নাটকের প্রাণ। সুখের কথা, লোকায়নগোষ্ঠী সে কথা মনে রেখেছেন। প্রযোজনাটি গভীর দুটি বিপরীতমুখী আদর্শের সংঘর্ষ দর্শকের মন স্পর্শ করে। মানবতার যে দীপশিখাটি গোঁড়ামির অন্ধকার সমাজে মালিনী জ্বালাতে চেয়েছিল এবং মনুষ্যত্বের প্রতি অতল বিশ্বাস যেভাবে তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল সকল কর্মে, আজকের

"নতুন দিনের আলো" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

দিনের, নাট্যপ্রযোজনায় সেই মূল সুরটি আগাগোড়া সযত্নে রক্ষিত। অভিনয়ের রূপ হিসেবে নাটকে গোড়ার দিকে পর্দায় ছায়া-মূর্তি দিয়ে খণ্ড খণ্ডভাবে যে দুটি দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়েছে, প্রয়োগ পরিকল্পনার দিক থেকে তা প্রশংসনীয়। যদিও, নাটকের প্রথমাংশের অভিনয় আরো উন্নত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। দ্বিতীয়াংশ যেমন অভিনয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে, প্রথমাংশ সে তুলনায় কিছু হালকা মনে হচ্ছে।

অভিনয়ে গীতা ভট্টাচার্য (মালিনী) এবং অরূপ রায় (ক্ষেমংকর) আমাদের নজর কেড়েছেন সবচেয়ে বেশী। দুটি চরিত্রই সুঅভিনীত। সুঅভিনয়ের তালিকায় তৃতীয় নাম অতুল রায় (সুপ্রিয়)। অন্যান্য চরিত্রে কাজ চালিয়েছেন সীমা দাশ, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন সিনহা, রতন মুখোপাধ্যায়, তুষার মিত্র, দেবনাথ অধিকারী, সমীর দত্ত, বাদল সেন ও দিলীপ ভট্টাচার্য। সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া দুটি গান ছিল। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যই প্রথমটি ভালো করে শোনাই যায়নি। দ্বিতীয়টি ভালো লেগেছে।

নাট্যসমালোচক

রোশেনারা

(নাটকলোক সংস্থা)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে এপার বাংলায় অনেক নাটক হয়ে গিয়েছে—এখনও হচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার অবসরপ্রাপ্ত নবগঠিত নাট্যলোক সংস্থা নিয়মিতভাবে প্রতি রবিবার মঞ্চস্থ করছেন "রোশেনারা" ও "স্বাধীন বাংলা" নামে দুটি নাটক। বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে রোশেনারার আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে "রোশেনারা" নাটক। সহজ সরল ধারায় নাটকটি অভিনীত। দলগত অভিনয় মোটামুটি ভাল।

"নটরাজ" নৃত্যনাট্য

দেশপ্রাণ স্মৃতিরক্ষা সমিতি একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রস্তাবিত ছাত্রাবাসটির নির্মাণকল্পে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে কবিগুরুর 'নটরাজ' নৃত্যনাট্যের আয়োজন। নটরাজ মূলত ঋতু বিচিত্রা, ঋতুভিত্তিক গানের সুন্দর সংকলন। বছরের ছটি ঋতুকে সুরে আর ছন্দে প্রকাশ করা হয়েছে আপন আপন বিশিষ্টতা সহ। তাই বিবিধ সুর আর বাণীর বিচিত্র ঐকতান এবং শিল্পীদের নৃত্য অনুষ্ঠানটি আগাগোড়াই হৃদয়গ্রাহী। বিভিন্ন ঋতুকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে গানে, তার আবির্ভাবকে প্রকাশ করা হয়েছে নৃত্যের তালে তালে।

অনুষ্ঠানের গানগুলি সবই সুগীত, নাচগুলিও মনে রাখবার মতো। নৃত্যনাট্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠার গান ও নাচ তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন মায়া সেন এবং নৃত্য পরিচালনা বালকৃষ্ণ মেননের। অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি গানই যে ভাল লাগবার মতো সে কথা আগেই বলেছি, তবুও আলাদা করে বলতে হয় কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া সেন ও সুমিত্রা সেনের নাম উল্লেখ করতে হয়। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বাণী ঠাকুর, পূর্ণিমা সিংহ, গীতা ঘটক, বলেন্দ্র সেনগুপ্ত, অর্ঘ্য সেন, সুভাষিণী

বোম্বাই বিচিত্রা

এদিন ছিল যখন ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের করুণাকটাক্ষেও দেখতেন না বোম্বাই-এর ফিল্মিওয়ালারা। কিন্তু সে কোনো একদিনের কথা। ইদানীংকালের কথা একেবারেই আলাদা। বছর দেড় দুই আগে শত্রুঘ্ন সিনহা নামে একজন যুবক (ইনস্টিটিউটের ছাত্র) বোম্বাই-এর চিত্র-জগতে সামান্য স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিলেন, এখন সেই স্পন্দন তরঙ্গে পরিণত আর আজকাল তরঙ্গের পর তরঙ্গ। বোম্বাই-এর চিত্রজগতে ফিল্ম ইনস্টিটিউট একেবারে হিট—শত্রুঘ্ন সিনহা, নবীন নিশ্চল, রেহানা সুলতানা, অনিল ধাবন, রাধা জালাল আগা, জয়া ভাদুড়ি। এত সামান্য সময়ের মধ্যে এতজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতিষ্ঠালাভ এ রাজ্যের ঘরকাঁপানো ঘটনা। শুধু অভিনয়ের জগতেই নয়, কলাকুশলীদের বাজারেও ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা বেশ জমিয়ে বসেছেন। ইনস্টিটিউটের ছাত্র কে কে মহাজন ইতিমধ্যে দু/দু'বার চিত্র গ্রহণের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। ইনস্টিটিউটের ছাত্র মণি কাউল 'উসকি রোটি' এবং 'আষাঢ় কা একদিন'-এর পরিচালক এবার নিয়ে দু'বার ফিল্ম ফেয়ারের ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড পেলেন। ফিল্ম ফেয়ার প্রসঙ্গে ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশানের কথাও মনে পড়ে গেল। ফিল্ম ফিনান্সও প্রায় বছর দুয়েক যাবৎ নিরবিচ্ছিন্ন নিউজে। এই নিউজের শুরু হয় ভুবন সোম-এর মাধ্যমে। তারপর 'সারা আকাশ', 'উসকি রোটি', 'বদনাম বস্তি', "দস্তক", "অনুভব" ইত্যাদির কাহিনী। কেউ কেউ বলেন, এদেরও অনেক আগে সত্যজিৎ রায়ের "চারুলতা"র মত ছবিও সম্ভবত করেছে এফ এফ সি, কিন্তু তখন যাঁরা এফ এফ সি'র কর্তা ছিলেন তাঁরা কাগজের লোক ছিলেননা, সেই জন্য এফ এফ সি'র তৎকালীন সাফল্যের কথা লোকে জানে না। থাক সে কথা। দুষ্টু লোকের কথায় কান দিয়ে লাভ নেই। একজন প্র্যাকটিক্যাল ব্যবসাদার লোক বললেন, "আসল কথা কি জানো, সবই কপাল।" সঙ্গে চলেছে নিউ ওয়েভ। আবার দুষ্টু লোকের আবির্ভাব। সে বললে, 'নিউ ওয়েভ, না নিউজ ওয়েভ'? এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, নিউ ওয়েভই হোক আর নিউজ ওয়েভই হোক ওয়েভ যখন তখন তার প্রবাহ বন্ধ করার কোনো উপায় নেই।

সরল শর্মা

"নায়িকার ভূমিকায়" (পরিচালনা অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন

চিৎপুর-চিত্র

ভাঙাগড়ার দ্বিতীয় পর্ব

চিৎপুরে যে দু-নম্বরী রেওয়াজ চালু হয়েছিল, সত্যি এবার বুঝি তা চুরচুর হতে বসল। বহু অতীতের কথা ছেড়ে দিয়ে গত এক দশকের কথাই বলা যাক। দেখা যাবে অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর মালিকপক্ষ এই প্রোডশন চালু করেছিলেন। যদি বলা হয় কেন? তার উত্তরে একটা কথাই বলা যায় যে, কোনো একটি বিশেষ কোম্পানী যখন প্রচুর লাভের কড়ি গুছোতে গুছোতে হয়রান, ঠিক তখনই দু-নম্বর দল খোলার চিন্তা আসে। ঠিক বলা যায় না এই কারণেই শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানীর জন্ম হয়েছিল কিনা। হ্যাঁ, সেই যে শ্রীরাধা পথ দেখালো, অমনি রঞ্জন অপেরার জীবনবাবু খুললেন জনতা অপেরা। আরও পরে দেখি নট্ট কোম্পানীও দ্বিতীয় দল খুলে বসল।

সঠিক লাভের আশাতেই দু-নম্বরী রেওয়াজের পত্তন বলে যাঁরা মনে করেন, আমি অন্তত সে দলে নেই। ব্যক্তিগতভাবে অমিয় বসুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। জনতা প্রতিষ্ঠিত হবার আগে জীবনবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এদিকে বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ দলটির পত্তনের কারণ বোধ হয় আমার চেয়ে ভাল করে আর কেউ জানেন না। পাঠকরা নিশ্চয় জানেন নট্ট কোম্পানী তার পুরনো প্রোডশনটি ১৯৭০ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। ওই সময় সুর্যবাবু, মাখন নট্ট, অরুণ দাশগুপ্ত মিলে দু-নম্বর দলের পরিকল্পনা করেন। ঠিক হয়, যেহেতু নট্ট তার পুরনো প্রোডশন ভেঙে মহিলা শিল্পী দলে নিতে পারবেন না, সেহেতু নট্টর একটি এমন দল থাকা দরকার, যাতে মহিলা চরিত্রের অভিনয় মহিলা শিল্পীরাই করবেন। মোটামুটি এরকম প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু আমি জানি বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ কেবল এই লক্ষ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠিত নয়। মাখনলাল নট্টর অনুগত শিল্পীর সংখ্যা ছিল অনেক। তাঁদের কাছাকাছি একেবারে নিজের হাতে রাখার ব্যাপারটাও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মালিকদের খেয়ালও যে অনেক সময় কারণ হয়ে দাঁড়ায় না তাই বা কে বলবে।

নবরঞ্জন অপেরার শম্ভুবাবু বললেন, এবার সবগুলো শাখা দলই ভেঙে পড়তে বাধ্য। কেন? কারণ ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা। তার মানে চিৎপুরের তালিকা থেকে আরও দুটি দল খসতে বসেছে। কিন্তু সত্যি কি? খবর নিয়ে জানলাম বৈকুণ্ঠ এখনই উঠে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যদি নাই ওঠে তবে কি অরুণ দাশগুপ্ত এ-দলে থাকবেন? খবরে প্রকাশ অরুণবাবু এবার নট্টতে যাচ্ছেন। দু' নম্বর অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ যদি থাকে তো তাতে খুব সম্ভব জয়েন করছেন এ-কালের শ্রেষ্ঠ জুটি জ্যোৎস্না-গুরুদাস। কিন্তু কথাটা কি সত্যি? যত দূর জানা গিয়েছিল নাট্য-ভারতীর কিষাণ দাশগুপ্ত মশাই মাঘের শেষে শিলিগুড়িতে গিয়ে নাকি জ্যোৎস্না দত্তর সঙ্গে কথা বলে এসেছিলেন। তবে কি জ্যোৎস্না দত্ত সত্যিই নাট্যভারতীতে যাচ্ছেন গুরুদাস ধাড়াকে নিয়ে। তা যদি হয়—তবে বোধ হয় দু' নম্বর নট্টর দরজা বন্ধ হবার সম্ভাবনাই বেশি।

—সূত্রধার

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

'হায়, তার এই দশা আজ, যাকে আমি জানিতাম'
এবারে হবে শেকসপীয়রের নাটক। ছেলেদের খুব উৎসাহ।
শুনে ভাল লাগল, মিস টোগাম্।
গভীর অরণ্যে চলেছে নাটকের মহড়া!

'হবে, নাকি হবে না, এখন ... এখন ...
'... এই একমাত্র প্রশ্ন।'

আগের কথা যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্যে
৪/৪
চার শো বছর আগে আফ্রিকার উপকূলে জলদস্যুরা একটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। বেঁচেছিলেন মাত্র একজন .....

তিনিই প্রথম অরণ্যদেব। তিনি প্রতিজ্ঞা নিলেন...
জলদস্যুদের আমি উচ্ছেদ করব। দুর্বলকে আমি রক্ষা করব। আমার উত্তরপুরুষরাও এই সঙ্কল্পে আবদ্ধ থাকবে ...
বান্দার-উপজাতির মানুষরা তাঁকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলে। পিতার হত্যাকারীর খুলি ছুঁয়ে তিনি শপথ নেন।

পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র পরম্পরায় অরণ্যদেবের বংশ আজও বেঁচে রয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, সেই প্রথম অরণ্যদেবই অদ্যাবধি জীবিত।
অরণ্যদেব অমর, তাঁর মৃত্যু নেই...

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অরণ্যদেবরা দুর্বলকে রক্ষা করছেন, অত্যাচারীকে দিচ্ছেন শাস্তি -----

গভীর অরণ্যে খুলি-গুহা... তার মধ্যে অনেক ঐশ্বর্য, অনেক রহস্য- ----
এই পরচুলাটা কার?

এ এক মস্ত রহস্য!
মেয়েদের এই পরচুলা, আমার কোন্ পূর্বপুরুষ এটি সংগ্রহ করেছিলেন? কেনই বা করে ছিলেন? উত্তরটা জানতে হবে —
১

কলকাতা করপোরেশন বাতিল এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২২ মারচ বুধবার এক অরডিন্যান্স জারি করে রাজ্য সরকার করপোরেশনের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীশরদিন্দু দত্তমজুমদার। আপাতত এক বছরের জন্য কলকাতা করপোরেশন বাতিল হলো। কর্তব্য- কর্মে 'গাফিলতির' অভিযোগে এবং কলকাতা পৌর আইনের ৪৭সি ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা নেন। পৌরভবনে রাষ্ট্র-মন্ত্রীরও একটি অফিস থাকবে। উদ্দেশ্য: দৈনন্দিন কাজকর্মে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা। কলকাতা করপোরেশন যতদিন বাতিল হয়ে থাকবে ততদিন শ্রী এস দত্তমজুমদার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকবেন। এ ছাড়া নতুন কমিশনার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের কাজও চালিয়ে যাবেন। ১৯৭৩ সালের মারচ মাস পর্যন্ত যদি করপোরেশন বাতিল থাকে—তারপর পৌর নির্বাচন হতে পারে। কোন কোন রাজনৈতিক মহলের ধারণা শীঘ্রই পৌর নির্বাচন হবে। রাজ্য সরকার প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা করপোরেশনের বিরুদ্ধে মোট দশ দফা অভিযোগ আনয়ন করেছেন। পৌর আইন মোতাবেক ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলেই করপোরেশনকে বাতিল করা হয়েছে।

দেশী সংবাদ

২০ মারচ—শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা আজ দুপুরে কলকাতায় শপথ গ্রহণ করেন। রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস রাজভবন চত্বরে এক অনুষ্ঠানে মোট ২৮ জন মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ বাক্য পাঠ করান।

বার্ষিক ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কোন আয়কর থাকা উচিত নয়। মধ্য ও নিম্ন আয়ের উপর করের হার কিছুটা কমানো দরকার। সারচার্জ সমেত সর্বোচ্চ আয়করের হার বর্তমানে ৯৭.৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭৫ শতাংশ করা উচিত। প্রত্যক্ষ কর তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট এই সব সুপারিশ সমেত আজ সংসদে পেশ করা হয়।

২১ মারচ—ভারতের ভিতরে যাতায়াতের জন্য কোন দূতাবাস নিজস্ব বিমান ব্যবহার করতে পারবেন না। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর বিমানে বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাস কর্মীদের যাতায়াত করতে হবে। ভারত সরকার এই মর্মে একটি বার্তা দূতাবাসগুলিকে জানিয়ে দিয়েছেন। মার্কিন দূতাবাসের বিমানগুলি আসলে গোয়েন্দা বিমান।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার শহরাঞ্চলে সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করবেন। এই বাজেট অধিবেশনেই এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে এবং তা কেন্দ্রকে পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় একথা জানান।

২২ মারচ—জমি নিয়ে যাঁরা বে-আইনী লেনদেন করেন এবং যেসব শিল্প সংস্থার মালিক শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ই এস আই-এর টাকা জমা দেন না তাঁদের মিশায় আটক করা হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২৩ মারচ—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জবর দখল কলোনিতে বসবাসকারী সব উদ্বাস্তু পরিবারকে নিজ নিজ জমির স্বত্ব দেওয়ার প্রস্তাবটি প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে। ফলে এই রাজ্যের পনের লক্ষ উদ্বাস্তু উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

কলকাতা পুলিস শহরের ফুটপাত পরিষ্কার করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। আজ চৌরঙ্গী এলাকায় ফুটপাতগুলি ছিল সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। ফুটপাথ আছে কিন্তু হকার নেই। কয়েকটি গাড়ি করে কিছু মালপত্র থানায় আটক করার পর আর কোন হকার এসে ফুটপাথে তাদের পসরা সাজিয়ে বসেনি।

২৪ মারচ—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কলকাতার জন্য ১৪০ কোটি টাকার চক্র-রেল প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রকল্প অনুসারে দমদমকে টালিগঞ্জের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত করা হবে। ১৯৭৯ সাল নাগাদ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

আজ নব গঠিত রাজ্য বিধানসভার উদ্বোধন করে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস বলেন, "বর্তমানে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছেন তাঁরা রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি বড় ও সুদূর প্রসারী কর্মসূচী রূপায়নে আগ্রহী। আইন ও শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ এবং প্রতিটি নাগরিকের শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকার যথাসাধ্য প্রয়াস করবেন।

২৫ মারচ—পশ্চিমবাংলা এবার কোন নতুন কর বসছে না। আজ রাজ্য বিধানসভায় ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট পেশ করা হয়। এই বাজেটে রাজস্ব খাতে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমিত হয়েছে। হিসাব, রাজস্ব-খাতের বাইরে মূলধনী খাতে উদ্বৃত্ত হবে ১৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। ফলে ঘাটতি কমে দাঁড়াবে ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ নয়াদিল্লীতে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের এক সভায় বলেন: "যারা অতি দরিদ্র তাদের সম্পর্কেই আমাদের প্রথম চিন্তা করতে হবে।" তিনি আরও বলেন—জনগণকে উন্নত জীবন-যাত্রার অধিকারী করতে হবে। এই লক্ষ্য যুদ্ধে অন্য কোন পক্ষ জয় করার [illegible]।

২৬ মারচ—কংগ্রেস হাইকমানড রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা বলবৎ করার জন্য জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। কংগ্রেস সূত্রে জানা যায়, ৫ জন লোকের একটি পরিবারের জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০ থেকে ১৮ একর (দুই ফসলী) পর্যন্ত হতে পারে।

হাউসিং অ্যানড আরবান ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (গৃহ নির্মাণ ও শহর উন্নয়ন করপোরেশন) কলকাতার মানিকতলায় স্বল্প ও মধ্য আয়ের লোকজনের জন্য ২৫০টি বাড়ি তৈরির প্রস্তাব নিয়েছেন। এই দিয়েই তারা কাজ শুরু করতে চান। সংস্থাটি গঠন করেছেন ভারত সরকার।

বিদেশী সংবাদ

২০ মারচ—সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীব্রেজনেভ আজ পঞ্চদশ সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বড় রকমের এক ঘোষণায় বলেন, চীন ও আমেরিকার কাজকর্ম যাচাই করে ওই দুই দেশের নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক আলোচনার গুরুত্ব খতিয়ে দেখা হবে।

২১ মারচ—পাক প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোর প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট বলে দিয়েছেন: না ওঁর সঙ্গে আমরা কথা বলছি না। শেখসাহেব তাঁর দাবিটি আর একবার জানিয়ে দিয়েছেন, আলোচনায় বসার আগে পাকিস্তান থেকে স্বীকৃতি আসা চাই-ই।

২২ মারচ—এপ্রিল মাস থেকে বাংলাদেশের মাছ পশ্চিম বাংলার বাজারগুলিতে পৌঁছাতে শুরু করবে। আজ এই সংবাদটি দিয়েছেন বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী এম আর সিদ্দিকি। আগামী অর্থ বর্ষে এই বাংলা থেকে ওই বাংলায় দশ কোটি টাকার মাছ রপ্তানি হবে।

২৪ মারচ—ভারত ও বাংলাদেশ যৌথভাবে পাক-সামরিকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনার পরিকল্পনা করেছে। ওয়াশিংটনে রাষ্ট্র দপ্তরের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ অফিসার এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফিলিপস টালবট একথা বলেছেন।

২৭ মারচ—আজ ঢাকায় [illegible] পরিবারের স্মরণে [illegible] উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ভারতবর্ষের মানুষ হাজার বছর ধরে এমনি করে এগিয়ে চলুক। তিনি বলেন: "মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিপদের দিনে যে সাহায্য করেছেন, সেজন্য ভারতবাসীর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।"

২৫ মারচ—ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রকেট ব্যবহারের কথা ভাবছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন সিলভার আয়োডাইড ভর্তি ছোট ছোট রকেটগুলি বিমান থেকে ছোড়া হবে, যাতে আকাশে ঝড় কেন্দ্রীভূত হতে না পারে। ঝড়ঝঞ্ঝায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ৩১ কোটি ডলার মূল্যের শস্য এবং সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২৬ মারচ—বাংলা দেশের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এক ঘোষণায় বলেছেন: বিদেশী ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানী ছাড়া সমস্ত ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সমস্ত পাটকল, সুতাকল, চিনিকল, জল পরিবহনের প্রধান অংশ, পনের লক্ষ বা তদূর্ধ্ব টাকা মূল্যের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, বিমান ও জাহাজ সংস্থাগুলি বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হচ্ছে।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

আপনার
মুখের শোভায়
লাবণ্যের আভা
এনে দেয়!
POND'S
VANISHING CREAM
V
ত্বকের নিজস্ব স্নিগ্ধতাটুকু ধ'রে রাখে, ধুলোবালি আর
আবহাওয়ার আঁচ থেকে বাঁচায়। তুষারের মত হালকা
সাদা পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম এখনই মাখুন—মুখখানি
মনোরম দেখাবে, আবার পাউডার বেস হিসেবে লাগান
—মেক-আপ অনেকক্ষণ ধ'রে রাখবে। একমাত্র এই
ভ্যানিশিং ক্রীমই ৪ রকম সাইজে পাওয়া যায়: ইকনমি
—বড়—মাঝারি—ছোট।
পণ্ড্স
ভ্যানিশিং ক্রীম
নিখুঁত
পাউডার বেস
চীজব্রো-পণ্ড্স ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

সূচীপত্র

ফ্লিট ছড়ান!

ফ্লিটের হাত থেকে মশা আর আরশোলাদের আর নিস্তার নেই! ফ্লিট এখন দ্বিগুণ মারাত্মক: আধুনিকতম কীটনাশকের মিলিত তেজ এক করে তুলেছে দ্বিগুণ কার্যকরী। উড়ন্ত আর বুকেহাঁটা দু'রকমের পোকামাকড়কেই এ শেষ করে। কাজেই, পোকামাকড়ের উৎপাত আর সহ্য করবেন না। ফ্লিট আনুন—লাল টিনে অথবা সুবিধেজনক অ্যারোসল প্যাকে।

১. ফ্লিট—লাল টিনে
২. ফ্লিট পাম্প
৩. ফ্লিট—সুবিধেজনক অ্যারোসল প্যাকে

ফ্লিট ছড়ান, ধ্বংস করুন!

(সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক যা করেন!)

সূচী

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন মণ্ডল

কলকাতার চেহারা

কলকাতার কৃচ্ছ্রসাধনার কাল হয়ত এবার ঘুচবে। দীর্ঘ বছরের জীর্ণদশা ঘুচিয়ে দিয়ে এই মহানগরীকে নতুন সাজে সাজাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। রূপসী কলকাতা আর স্বপ্নকথা নয়, কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা শহরের চেহারা পালটাবার পরিকল্পনা প্রস্তুত। রূপায়ণের কাজ শুরু হতেও আর বিলম্ব নেই। কলকাতাকে ঢেলে সাজাবার জন্য সরকার একশো পঁচিশ কোটি টাকা খরচ করতে চলেছেন। সি এম পি ও ইতিমধ্যেই কাজে হাত দিয়েছেন। প্রায় পঞ্চাশটি প্রোজেকটের মধ্য দিয়ে কলকাতার এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সাধিত হবে। আশা করা যায়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ যোজনাকালের ভিতরেই কলকাতার রূপান্তর সাধনের লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে।

কলকাতা যে আর উপেক্ষিত নয় এই সংবাদে শহরবাসী মাত্রেই খুশি হবেন। কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায় থেকে যাঁরা হাঁপিয়ে উঠছেন তাঁরা অচিরেই আলো-বাতাসের স্পর্শ পাবেন। শহরকে শুধু সুন্দর করে তোলাই কর্মসূচীর একমাত্র লক্ষ্য নয়, জনস্বাস্থ্যের উন্নতির দিকেও পরিকল্পকরা বিশেষ নজর রেখেছেন। শহরটিকে সব দিক থেকে পরিচ্ছন্ন করে তোলাই হবে পরিকল্পনার প্রধান কাজ। কলকাতার কোন কোন অংশ এমন অপরিচ্ছন্ন যে তা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে রীতিমত বিপজ্জনক। অতএব শহর-পরিমার্জনের ব্যাপারেই যে বিশেষ প্রকল্প নিয়োজিত হবে তা সহজেই আশা করা যায়। শহরের পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ ও রাস্তা তৈরীর কাজে সি এম ডি এ আগেই হাত দিয়েছেন। আগামী বছরের মধ্যে যদি সি এম ডি এ'র কাজ সম্পূর্ণ হয় তবে তাঁরাও নতুন কলকাতা গড়ে তোলার কাজে সি এম পি ও'র সঙ্গে হাত মেলাতে পারবেন।

কলকাতা প্রথমে হবে পরিচ্ছন্ন, তারপর সুন্দর — নতুন পরিকল্পনায় এই দুই প্রতিশ্রুতিই রয়েছে। বস্তুত পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য আলাদা বস্তু নয়। একটি অপরটির পরিপূরক। কলকাতাকে সুন্দর করার জন্য ঘনবসতি বা ঘিঞ্জি এলাকায় ছোট ছোট বাড়ি ভেঙে দিয়ে বহুতল বাড়ি তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। এইভাবে ওই সব এলাকা একই সঙ্গে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করে তোলা হবে। তা-ছাড়া কলকাতাকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলবার জন্য আরও কয়েকটি ব্যবস্থার কথাও জানা গেছে। শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকতে ভিড়ের জন্য যে প্রাণান্তকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় এবং যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড সমস্যা দেখা যায় সে-সব দূর করার জন্য প্রশস্ত রাস্তা তৈরিও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। কলকাতার চেহারা স্মরণীয় করার জন্য কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও প্রবেশপথ ঢেলে সাজাবার কর্মসূচীও নেওয়া হয়েছে। কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী ও যাদবপুর এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় যেন শহরের বুকে কোণঠাসা হয়ে পড়ে আছে। কলকাতা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে আর যাই মনে হোক সরস্বতীর পীঠস্থান মনে হয় না।

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৩
শনিবার ২৫ চৈত্র ১৩৭৮
Saturday 8 April 1972

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথেও ছাত্র-ছাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ ভুগতে হয়। কলকাতার সংস্কার সাধনের কর্মোদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও রয়েছে। এ-ছাড়া কলকাতার বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ সংস্থার চারদিক আরও সুন্দর করে তোলার ব্যবস্থাও হচ্ছে। কলকাতাকে সুন্দর করে তোলার এই সর্বাত্মক পরিকল্পনা, এক কথায়, অভিনন্দনযোগ্য। এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা বিশেষ দরকার। শহর সুন্দর হবে, পরিমার্জিত হবে — এই আকাঙ্ক্ষা সকল শহরবাসীর। তাই আশা করি নাগরিকদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে নতুন কলকাতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-১ থেকে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২৯৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ৮ পয়সা হারে
অতিরিক্ত শুল্কসমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টা ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৬.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৮.২৬

ভারতে
সাধারণ ডাকে
বার্ষিক — টা ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৪৬.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৩.০২
ত্রৈমাসিক — টা ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টা ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৪২.০২
ত্রৈমাসিক — টা ২১.৭৬

বিদেশে
সাধারণ ডাকে
বার্ষিক — টা ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ২৯.০২
ত্রৈমাসিক — টা ১৪.৭৬

[illegible] বিমান ডাকে
বার্ষিক — টা ১৫৫.০৪
ষাণ্মাসিক — টা ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টা ৩৮.৭৬

প্রকাশিত হল

একালের খ্যাতনামা সাংবাদিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় একটি নিপীড়িত জাতির মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি মুহূর্তের এক অন্তরঙ্গ দলিল। বহু অজ্ঞাত তথ্যে সমৃদ্ধ।

বাংলা নামে দেশ

এই বইয়ের শুরু সেই পটভূমিকায়, ভাষা ও সংস্কৃতির দাবিতে 'পূর্ব পাকিস্তানের' ছাত্র সমাজ যাকে রাঙিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের প্রথম অগ্নিপ্রভায়। মুজিবের মুক্তি, ঢাকায় ফেরা, রমনার ময়দানে মুক্তি-পাগল জনতার সমুদ্রে এসে শেষ। মাঝখানে রয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম ন'টি মাসের ইতিবৃত্ত। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা, ২৫শে মার্চের মধ্য রাতে পাক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ, ভারতের মাটিতে আছড়ে পড়া সর্বস্বহীন লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ঢল, মুক্তিফৌজের জন্ম, বিশ্বের দেশে দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে ভারতবর্ষের দৌত্যিয়ালী এবং সর্বশেষে ভারত-পাক যুদ্ধ।

বাংলা নামে দেশ

মোট আটটি পর্ব। এরই পাশে পাশে সংযোজিত হয়েছে বহু পার্শ্ব উপাখ্যান। কাদের বাহিনী, মুজিব বাহিনী, মুজিব নগরের আম্রকুঞ্জে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা, বুদ্ধিজীবী হত্যার চক্রান্ত, পাক দূতাবাসে পদত্যাগ, মুক্তি লগ্নে মুজিবের পরিবার ইত্যাদি।

সবার উপরে এই বইটি সম্মানিত হয়েছে দুই রাষ্ট্রের দুই প্রধান-মন্ত্রীর ভূমিকায়। এটিও এক দুর্লভ সংযোজন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবর রহমান একদিকে দুরূহ অন্য দিকে দুঃসাহসী এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছেন।

বড় আকারের বই। আগাগোড়া অফসেটে ছাপা। পাতায় পাতায় ছড়ানো দুই শতাধিক ছবি ও মানচিত্র। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এ জাতীয় বইয়ের পরিকল্পনা এই প্রথম। দাম দশ টাকা।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলি: ৯ ॥ ফোন ৩৪-৬৩৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

গোয়েন্দা কাহিনী

(সত্যের চেয়েও রোমাঞ্চকর)

দুর্ধর্ষ মারকিন গোয়েন্দা সংস্থা সি-আই-এর নাম আজকাল আমাদের দেশের গর্ভস্থ সন্তানেরাও জানে এবং ধীরে ধীরে আমরা একথাও জানতে পারছি যে রুশী গোয়েন্দা সংস্থা কে-জি-বিও বর্তমানে আমাদের দেশে সক্রিয় এবং কে জি বির কর্মকলাপ রোমহর্ষকতা, নৃশংসতা এবং রোমান্টিকতায় সি আই এ-র থেকে কোনও অংশে হীন নয়।

একজন জাতীয়তাবাদী ভারতীয় হিসাবে আমি এবং নিশ্চয়ই আমার মত আরও অনেকে এই কথা ভেবে এতদিন হীনম্মন্যতায় ভুগেছি যে, বৃটিশ, ফরাসী, জারমান, চীন, এদেরও সব দুর্ধর্ষ দুর্ধর্ষ পোষা গোয়েন্দা আছে, সিক্রেট সার্ভিস আছে, আর হায়, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। যে স্বাধীন সরকারের সিক্রেট সার্ভিস নেই, তার স্বাধীনতা থাকা বা না থাকা সমান কথা। কেননা হিটলার অথবা স্টালিন অথবা মাও, এ যুগের তিন-জন শ্রেষ্ঠ জাতির জনকের কোনও একজন কবে এবং কোথায় যেন বলেছিলেন "এ স্টেট ইজ নোন বাই দি সিক্রেট সার্ভিস ইট কিপ্স।"

এবং আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্তও কোনও সিক্রেট সার্ভিসের অস্তিত্ব ছিল না বলেই দেশপ্রেমিক কমিউ-নিস্টগণ, লক্ষ্য করে দেখবেন, অনেকেই গেয়ে এসেছেন, "এ আজাদী ঝুটা হায় ভুলো মৎ, ভুলো মৎ।" তারপর হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন এক সময় এই শ্লোগানটা অনেকটা আকস্মিক ভাবেই বন্ধ হয়ে গেল। এবং আমরা উন্নত দেশগুলির সচেতন নাগরিকদের মত যথেষ্ট পরিমাণে সিক্রেট সার্ভিস মাইনডেড নই বলেই, কেন যে দেশপ্রেমিক কমিউনিস্ট ভ্রাতৃবৃন্দ এ আজাদী ঝুটা হায় শ্লোগানটি হঠাৎ বর্জন করলেন, তা জানার জন্য কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করলাম না।

সম্প্রতি আমি দুর্ধর্ষ মারকিন সাংবাদিক জ্যাক অ্যানডারসনের কৌশল অবলম্বন করে ভারতের সিক্রেট সার্ভিস ও তার কার্য-কলাপ সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে বহু গোপন দলিল ও নথিপত্রের ফটোস্টাট কপি সংগ্রহ করেছি এবং তার ফলে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য জানতে পেরেছি। আর এর জন্য সকলের আগে আমি ধন্যবাদ জানাই, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বিরোধী নেতা অল ইনডিয়া ডালহৌসী স্কোয়ার (মারকসবাদী) পার্টির ওরফে সি পি এমের নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপ-মুখ্য ও স্বরাষ্ট্র (পুলিস) মন্ত্রী কমরেড জ্যোতি

রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য

বসুকে। পাবলিকের স্বার্থে কমরেড বসু যদি ২৮ মার্চ শহীদ মিনারে আয়োজিত জনসভায় নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন করেও ইন্দিরা গান্ধীর নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা রিসারচ অ্যানড অ্যানালিটিক্যাল ডিভিশন বা সংক্ষেপে 'রাড' (RAAD)-এর নাম ফাঁস করে না দিতেন, তাহলে সত্য বলতে কি, আমি এর রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হতাম না এবং দেশের লোকও এ বিষয়ে চিরকাল অন্ধকারে থেকে হীনম্মন্যতার জোয়াল বাধিয়ে ভুগতেই থাকতেন।

আমি সুদীর্ঘ অনুসন্ধান চালাবার যা জানতে পেরেছি তা এই, বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা মহলে এই দুর্ধর্ষ ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিস 'রুথলেস রাড' নামে খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জন করেছে।

১৯৭২ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে মারকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অথবা অল ইনডিয়া ডালহৌসী স্কোয়ার (মারকসবাদী) পার্টির নাম মুছে ফেলার জন্য রুথলেস রাড ১৯৬৫ সালে এক জঘন্য চক্রান্তের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য দিল্লীতে এবং কলকাতায় কয়েকটি গোপন বৈঠক বসে। ঐ সকল বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হয়: (এক) প্রফুল্ল সেনের মন্ত্রিসভার পতন তথা কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটাতে হবে, না হলে যুক্ত ফ্রন্টকে ক্ষমতায় আনা যাবে না, (দুই) যুক্ত ফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটাতে হবে, নাহলে নব কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনা যাবে না।

রুথলেস রাডের পরিকল্পনা অনু-সারেই ১৯৬৬ সালে ভারত সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ কমরেড জ্যোতি বসুকে প্রফুল্ল সেনের কারাগার থেকে মুক্ত করে দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে, তারপর থেকে ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জ্যোতিবাবুর ভাবমূর্তি একদিকে যত উজ্জ্বল হতে থাকে, অপরদিকে প্রফুল্ল সেনের এবং তৎসহ কংগ্রেসের ইমেজ তত মলিনতর হয়ে ওঠে। এই সময় থেকে ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাস অর্থাৎ রাষ্ট্র-পতি পদে শ্রী ভি ভি গিরির নির্বাচনের আগে পর্যন্ত রুথলেস র‍্যাডের টপ লেভেলে যে-কটা বৈঠক হয়েছে তাতে কমরেড জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার সব থেকে "ফ্যাভারিট বিরোধী নেতা", "ম্যান ম্যাক্সেসটিক্স ওন অপারেশন", "ব্লু আইড বয় অব রেভলিউশন" এবং "পশ্চিমবঙ্গ সিনডিকেটের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর সব থেকে আন্তরিক ও বিশ্বস্ত মিত্র" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতিপদে শ্রীগিরির জয়লাভে আহ্লাদ প্রকাশ করে কমরেড বসু "প্রধানমন্ত্রীর প্রগতিশীল নেতৃত্বের প্রতি আস্থা" জানিয়ে যে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সেটি টপ সিক্রেট ফাইলে (রেফারেন্স টি এস/আর এ এ ডি/১৭১৩/৯/৬৯) এখনও রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা রুথলেস র‍্যাডের টপ সিক্রেট ফাইলে (টি এস/আর এ এ ডি/৭১৫) কমরেড জ্যোতি বসুকে "চির অনুগত বন্ধু", "রুথলেস (বা ঢোঁড়া সাপ) অপারেশন", "জেসনকার দর" ইত্যাদি কোড নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

টপ সিক্রেট ফাইলে (ও টি এস/আর এ এ ডি/৯৭৩/০ এফ), ১৯৭২ সালে অল ইনডিয়া ডালহৌসী স্কোয়ার (মারকসবাদী) পার্টি ওরফে সি পি এমকে কুপোকাৎ করার যে ষড়যন্ত্র হয় তা "স্কোয়ার দি রাড, স্কোয়ার দি ইলেকশন" বা "অপারেশন স্যাস বেলুন" নামে অভিহিত।

এই গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের তথ্যাদি থেকে জানা যায়, ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ব্যাপক জালিয়াতি করার জন্য রুথলেস রাড নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করে, যথা: (১) ইয়াহিয়া খাঁকে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পূর্ব পাকি-স্তানে লুণ্ঠন, গণহত্যা ও পাইকারিভাবে নারী ধর্ষণ করতে বাধ্য করে, (২) শেখ মুজিবকে দিয়ে বাঙলাদেশ মুক্তির সংগ্রাম বাধিয়ে দেয়, (৩) এক কোটি শরণার্থী ভারতে নিয়ে আসে, আবার যথাকালে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়, (৪) বাঙলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেয়, (৫) রুথলেস র‍্যাডের অন্যতম এজেন্ট ভুট্টোকে দিয়ে শেখ মুজিবকে মুক্ত করিয়ে দেয়, (৬) সি পি এমকে দিয়ে এই রাজ্যে অবিলম্বে নির্বাচন হোক, এমন দাবী তুলিয়ে দেয় এবং অবশেষে (৭) ভোটপত্র, ভোট বাক্স ইত্যাদি নব কংগ্রেসের প্রার্থী বা তার বাছুরদের অনু-কূলে ভোটের ঘটিয়ে দেবার জন্য পি সি সরকার (জুনিয়ার) নামক দুর্ধর্ষ এক স্পেশাল এজেন্ট নিযুক্ত করে। এবং জাদু-কর ম্যানড্রেকের তুল্য দক্ষতাসম্পন্ন ঐ তরুণ বাঙালী জাদুকর স্পেশাল এজেন্ট ইন্দ্রজাল নামক এক সর্বাধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা সি পি এমকে নিদারুণভাবে পরাভূত করেন। সি পি এম-এর পরাজয়ের পেছনে রুথলেস র‍্যাডের ভূমিকা যে প্রত্যক্ষ, আশা করি এর পর সে সম্পর্কে কেউ আর সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।

চাই পরিকল্পনামত কাজ

সব দিক ভেবেচিন্তে যদি পরিকল্পনা না করা হয় বা একটা পরিকল্পনার যদি কোনও এক দিকে ত্রুটি থাকে তাহলে তার ফল কী হতে পারে আমরা নিশ্চয় এবার তা কিছুটা কিছুটা বুঝেছি।

যেমন ধরুন পশ্চিমবঙ্গের এবারের বিদ্যুৎ সংকটের ব্যাপারটা। যে মুহূর্তে কলকারখানায় কিছুটা কাজকর্ম বেড়েছে, সে মুহূর্তে বর্ধিত বিদ্যুতের চাহিদা দেখা দিয়েছে আর অমনি শুরু হয়ে গিয়েছে বিদ্যুৎ সংকট। প্রায় প্রত্যেক দিনই কলকাতা মহানগরীর কোনও না কোনও অঞ্চল কখনও না কখনও অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে কোথাও না কোথাও প্রায় প্রতিদিনই কলকারখানার কাজকর্ম বন্ধ হতে বাধ্য হচ্ছে। সর্বত্র একটা হৈচৈ পড়ে গিয়েছে। সবাই বুঝেছেন, এটা একটা বড় রকমের সংকট। এবং সাধারণত বড় রকমের সংকট পড়লে আমাদের দেশে কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা যা করেন এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। একে অপরকে দোষ দিচ্ছেন। কলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন দোষ দিচ্ছেন বিদ্যুৎ পর্ষদকে। বলছেন, ওরা আমাদের প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ দিচ্ছেন না। বিদ্যুৎ পর্ষদ আবার বলছেন, আমাদের কী দোষ, আমরা তো প্রতিশ্রুতিমত বিদ্যুৎ ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনকে দিয়েই যাচ্ছি।

দোষ কারো নিশ্চয়ই আছে। ত্রুটি কোথাও হয়েছেই। না হলে এই সংকট এল কেন? হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল। অর্থাৎ বিদ্যুতের চাহিদাটা ঠিকমত অনুমান করে সেইমত উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় নি। না হলে এমনও হতে পারে যে, অনুমানটা ঠিকই ছিল, পরিকল্পনাটা যথাযথই হয়েছিল, কিন্তু সেইমত কাজ হয় নি।

যে জন্যই আজকের বিদ্যুৎ সংকটটা দেখা দিক তার ফল কিন্তু মারাত্মক হচ্ছে। নাগরিকদের অসুবিধার ব্যাপারটা না হয় ছেড়েই দিলাম। তাদের তো কত শত অসুবিধা আছে, এর ফলে শিল্পেও সংকট দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন চেম্বার ইতিমধ্যেই প্রকাশ্য ঘোষণা করেছেন যে এই রকম লোড শেডিং বা বিদ্যুৎ সরবরাহ হ্রাস চলতে থাকলে তাঁরা ছাঁটাই করতে বাধ্য হবেন।

এই লোড শেডিং-এর ফলে আবার বিশেষ অসুবিধা হয়েছে ছোট ছোট কলকারখানার। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন, বড় বড় কলকারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে। তাদের ক্ষেত্রে লোড শেডিং করতে হলে আগাম পাকাপোক্ত নোটিসও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ছোটদের ক্ষেত্রে তেমন বিশেষ দৃষ্টি কারুরই নেই। হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুতের অভাবে তাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং মাঝপথে কাজ বন্ধ হওয়ায় বিশেষ ক্ষতিও হচ্ছে।

*

এ তো গেল একটা দিক।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা মত সব কাজ না হওয়ায় বা কাজ শুরু করার আগে একটা সার্বিক পরিকল্পনা না করে নেওয়ায় বৃহত্তর কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গে আর একটা যে বড় সংকট আসছে আমি সে বিষয়েও আজ সামান্য আলোচনা করতে চাই।

আপনারা সবাই দেখছেন এবং শুনছেন যে কলকাতায় সি এম ডি এর কী বিরাট একটা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। আরও বহু কোটি টাকার কাজ হবে। এর অধিকাংশটাই হল কনসট্রাকশানের কাজ, অর্থাৎ রাস্তাঘাট, পুল ব্রিজ, বাড়িঘর তৈরীর কাজ। এই রকম কাজ দিন দিনই বাড়বে। সি এম ডি এ হাতে যা কাজ নিয়েছে তা-ই বিরাট। তার উপর আসছে দ্বিতীয় গঙ্গা ব্রিজ। এবং প্রায় সেই সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে পাতাল রেলের কাজ।

রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিরতা আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বাড়িঘর তৈরীর কাজ শুরু হচ্ছে। গত তিন চার বছর মানুষ কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের

[illegible] যারা এইসব জিনিস বেশি [illegible] এদিক আমাদের [illegible] হয়েছে।

এইসব [illegible] ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে এখন বিরাট প্রয়োজন অর্থাৎ স্টীল, সিমেন্ট, পাথরকুচি ইত্যাদির বিরাট চাহিদা। হঠাৎ চাহিদাটা বেড়ে গিয়েছে এবং আরও দ্রুতগতিতে চাহিদা বাড়ছে। ফলে বাজারে এইসব জিনিসের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকটা জিনিসের দাম শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। এবং অনেক সময় দাম দিয়েও মাল পাওয়া যাচ্ছে না।

সব মিলিয়ে বিল্ডিং মেটিরিয়ালের এত অভাব দেখা দিয়েছে যে খুব দ্রুত একটা বিরাট সরবরাহের ব্যবস্থা না করা গেলে বহু কাজই বন্ধ হয়ে যাবে। টাকা থাকলেও এবং মানুষের ও সরকারের ইচ্ছা থাকলেও কাজ হবে না।

এর কারণ কী? এরও মূল কারণ একটা সার্বিক পরিকল্পনার অভাব। অর্থাৎ কলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গে একটা বিরাট কনস্ট্রাকশনযজ্ঞ শুরু হলে কত স্টীল, সিমেন্ট, কুচি পাথর, ইঁট ইত্যাদি লাগতে পারে এবং সেগুলি কীভাবে কোথা থেকে আসবে তার আগাম কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা হয় নি। তাই কাজ যেমন যেমন এগোচ্ছে, অসুবিধাগুলি তেমন তেমন ধরা পড়ছে।

কিন্তু আগাম সার্বিক পরিকল্পনা না হলে বড় কাজে যেমন যেমন ত্রুটি ধরা পড়বে তেমন তেমন সংশোধন সম্ভব নয়। রাতারাতি বাড়ি তৈরীর বা কনস্ট্রাকশনের কাজে প্রয়োজনীয় স্টীল উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। রাতারাতি সিমেন্ট বা পাথর কুচি বা ইঁটের যোগান বৃদ্ধিও অসম্ভব। রাতারাতি ওয়াগনও বাড়ানো যায় না।

এর সব কিছুর জনাই একটা আগাম পরিকল্পনা চাই। এবং সেই পরিকল্পনা মত যদি সব কাজ অগ্রসর না হয় তাহলে মাঝপথে কাজে বিঘ্ন ঘটতে বাধ্য।

*

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার বলছেন, তাঁরা শহর ও গ্রামে একটা কর্মযজ্ঞ শুরু করতে চান। এই কর্মযজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য গরীবী দূর করা এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্যটা মহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু যেটা সরকারের সবচেয়ে আগে স্মরণ রাখা প্রয়োজন সেটা হল যে শুধু মহৎ উদ্দেশ্য থাকলে এবং টাকা খরচা করলেই সব সময় লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। এর সঙ্গে আরও যেটা প্রয়োজন তা হল একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা মত অগ্রসর হওয়া। ছোট কোনও কাজে ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে তা ছোট মধ্যেই সমাধান [illegible] সেই [illegible] কাজে [illegible] যায় [illegible] সংশোধন করে সেই কাজে [illegible] করতে হয়।

পরিকল্পনা মত কাজ অগ্রসর হওয়া যায় আগে কিন্তু মাঝপথে অসুবিধায় পড়তে হয় না। আকস্মিক বা অভাবনীয় কোনও সংকট না দেখা দিলে। তাছাড়া পরিকল্পনা মত বা আগে হিসেব নিকেশ করে না এগোলে আজকের জটিল এবং ব্যাপকতর অর্থনীতির পটভূমিকায় এটা বোঝাও মুশকিল যে কোন্ ক্ষেত্রে কী ফল হতে পারে।

আমি শুধু একটা সামান্য জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সিদ্ধার্থবাবু বলছেন, এক বছরের মধ্যে তাঁর সরকার পশ্চিমবঙ্গের অন্তত দশ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবেন। তাঁর আশা, তাতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে শক্তি বাড়বে—কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কৃষি-শ্রমিক বা ক্ষেতমজুরের কাজ বাড়বে, ছোট ছোট শিল্প হবে, তাতে কিছু শিক্ষিত লোকও কাজ পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবই সত্য। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে শুধু গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিলেই চট করে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে না এবং বেকারী ঘুচতে পারে না। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু জিনিস চাই। যেমন, যদি জল পেয়ে জমিতে তিনটে ফসল করা সম্ভব হয়, তাহলে সেই সঙ্গে সঙ্গে চাই সেই পরিমাণ বীজ সার এবং বাজার। সার ও বীজের অভাবে এখনও নানা অঞ্চলের চাষী অসুবিধায় পড়েন। তার উপর যদি বীজ ও সারের তিন গুণ চাহিদা বাড়ে তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াতে পারে সেটাও আগাম ভাবতে হবে। এবং আগাম সেই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।

এ ছাড়া আছে বাজারেরও প্রশ্ন। বাজার না থাকলে এবং বাজারে ঠিক সময় মালটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে চাষী উৎপাদন বাড়িয়ে কি মার খাবে? বাজারে মাল পৌঁছে দেওয়া একটা বিরাট ব্যাপার। ধরুন দশ হাজার গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছল। তাতে এক হাজার ডিপ টিউবওয়েল চলল। এক হাজার ডিপ টিউবওয়েল কম করেও বছরে ৫০ লক্ষ মণ বাড়তি ফসল ফলাতে পারে। এই ৫০ লক্ষ মণ মাল গ্রাম থেকে বাজারে পৌঁছাতে কত বাড়তি ট্রাক ও ওয়াগন প্রয়োজন হবে? এগুলি আসবে কোথা থেকে?

তার ওপর আছে এর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া। নিবিড় চাষ বা তিনটে ফসল মানেই হল বেশি টাকার [illegible] বা [illegible] করে নিবিড় চাষ বা তিনটে ফসল [illegible] সম্ভব নয়। আবার যারা এইভাবে চাষ করবে আবার তাদের লাভও হবে বেশ ভাল। অর্থাৎ নিবিড় চাষ বা তিনটে চাষ হলে গ্রামে অর্থনৈতিক বৈষম্যও বাড়তে বাধ্য। ধনী বা সম্পত্তিসম্পন্ন চাষীর অবস্থা অনেক ভাল হবে এবং গরীব চাষীর অবস্থা কিছুটা ভাল হলেও বড় চাষীর তুলনায় তার আর্থিক অবস্থা অনেক খারাপ দাঁড়াবে।

এই পরিস্থিতিটা দেশের এবং দেশের মানুষের পক্ষে ভাল নয়। এই জিনিস বন্ধ করার জন্য আসরে নামতে হবে সরকারকে। ছোট এবং গরীব চাষীও যাতে নিয়মিত জল সরবরাহের সুযোগ নিতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

এইসব কিছুর জনাই চাই পরিকল্পনা। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে সব দিক ভেবে যদি কাজে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে মাঝখানে বাধা সৃষ্টিরও ভয় থাকে না এবং কোনও কাজের কুফলও দেখা দিতে পারে না। আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখা যায়। আগে থেকেই সংশোধনী ব্যবস্থাগুলও নেওয়া যায়।

সরকার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে আসরে নামছেন খুব ভাল কথা। কিন্তু সরকার যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরী করে কাজে অগ্রসর না হন তাহলে ভবিষ্যতে নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

২-৪-৭২।

নবারুণ গুপ্ত

[illegible] ব্রিটেনের উপনিবেশ। ভূমধ্যসাগরে চমৎকার একটি বন্দর আর নৌবহরের একটি বিরাট ঘাঁটি। লোকে বলতো, ওটা ব্রিটেনের এমন একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার অর্থাৎ বিমানবাহী জাহাজ যা কিছুতেই ডোবানো যাবে না। মালটার ঘাঁটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের এতই কাজে লেগেছিল যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ গোটা দ্বীপটাকেই জর্জ ক্রস পুরস্কার দিয়েছিলেন। মালটা স্বাধীন হলে তার সঙ্গে ব্রিটেনের দশ বছরের একটা প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়েছিল ১৯৬৪ সনে। সালিয়ানা পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড সে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্রিটেন থেকে পাওনা মালটার।

স্বাধীন হবার পরও মালটার আর্থিক ভাগ্য ব্রিটেনের সঙ্গে জড়ানো। ব্রিটিশ নৌঘাঁটি তার বিমানঘাঁটি তো আছেই, আছে ফৌজী ছাউনিও। সব মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার ব্রিটিশ সামরিক কর্মীর আস্তানা ওই দ্বীপে। তাদের থাকার ফলে পাঁচ হাজার মালটার লোক কাজ পেয়েছে সরাসরি, আরও হাজার দেড়েক লোকেরও চাকরি এদেরই দৌলতে। এ ছাড়া, সামরিক উর্দিপরা ওদেশী চাকুরেও হবে এগারো শোর মতো। যে দেশে বাস করে তিন লাখের কিছু বেশী লোক সে দেশের পক্ষে সংখ্যাটা হেলাফেলা করার মতো নয়। দোকানপাট, ব্যবসাপত্তর, হোটেল রেস্তোরাঁ, সিনেমা, নাচঘর এ সবেরই বেশীর ভাগ খদ্দের বিলিতী সামরিক ঘাঁটির লোকজন আর তাদের পরিবার। ব্রিটেন থেকে এসে মালটাতে বাসাও বেঁধেছে বেশ কিছু লোক। তারা সবাই অবশ্য নিছক বাস করতে আসেনি, এসেছে দেশে কর ফাঁকি দিতে কিংবা মালটার কম করের সুযোগ নিতে।

মালটা দ্বীপটা আদৌ সম্পত্তিসম্পন্ন নয়। শিল্পটিল্প সেখানে তেমন কিছু নেই। অন্য গরীব দেশগুলোর দেখাদেখি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যবস্থাও সেখানে হয়েছে ১৯৫৯ সন থেকে। দুটো প্ল্যান কাবার করে তারা এখন তিন নম্বরটা ধরেছে। নতুন কিছু কিছু শিল্পের পত্তন হয়েছে সেখানে। বিদেশ থেকে মূলধন নিয়ে শিল্পপতিরাও আসছেন। পর্যটকদের ওখানে টেনে আনার চেষ্টাও চলছে। হিলটন আর শেরাটন দুই বিরাট মার্কিন হোটেল কোম্পানি ওখানেও পাততাড়ি গুটিয়েছে। মালটাতে ইদানীং তৈরি হচ্ছে বিস্তর বাড়ি। পর্যটন শিল্প বেশ জেঁপে উঠেছে। এমন ধারা আরও দিন কতক চলে তো তাতে স্বনির্ভরতার পথে মালটা অনেকখানি এগোতে পারবে। ব্রিটেন আর তার ফৌজী

দেবরাজ

ঘাঁটির অনুগ্রহের ওপর তাকে আর নির্ভর করতে হবে না। সে কিন্তু ভবিষ্যতের কথা। আপাতত ব্রিটেনই তাদের রুজিরোজগারের বন্দোবস্ত করছে। সে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেলে বেশ মুশকিলে পড়বে মালটা।

সব পালটে গিয়েছে গেল বছর মালটাতে নির্বাচনের পর। দ্বীপটার প্রধান দল দুটো—ন্যাশনালিস্ট অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী দল আর লেবার অর্থাৎ শ্রমিক দল। তেরো বছর সরকার চালাবার পর নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিদেয় নিয়েছেন জাতীয়তাবাদীরা, তাঁদের জায়গায় এসেছেন শ্রমিকরা। নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ডোমিনিক মিন্টফ, লোকে তাঁকে ডম মিন্টফ বলে। আইনসভায় দু' দলের তফাৎ নামমাত্র। শ্রমিকরা পেয়েছেন ২৮টা আসন, জাতীয়তাবাদীরা ২৭টা। কিন্তু ওই এক ভোটের গরিষ্ঠতার জোরেই মিন্টফ কেবল মন্ত্রিসভা গড়েন নি, এতদিনের রেওয়াজ উলটে দিয়ে নতুন যুগের পত্তন করেছেন মালটায়। ন মাসেই তিনি ব্রিটেন আর তার নাটোর স্যাঙাতদের সঙ্গে ঝুল দেখার ছেড়েছেন। নির্বাচনের সময় তাঁর দল তাদের ইস্তাহারে বলেছিল, জিতলে তারা বৈদেশিক নীতি পালটে দেশকে ব্রিটেনের আওতার বাইরে নিয়ে এসে সত্যিকারের স্বাধীন করে তুলবে। দলের কথা রেখেছেন মিন্টফ। বিলিতী সরকারকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেই তিনি জানিয়েছেন, ১৯৬৪ সনের চুক্তি ইংরেজদের কথা খেলাপ করার দরুন আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছে, এখন হয় নতুন চুক্তি করতে হবে নয়তো, ঘাঁটিফাটি গুটিয়ে তাদের মালটা থেকে দেশে ফিরতে হবে।

ইংরেজরা তো আকাশ থেকে পড়লো। তারা জোর দিয়ে বললো ও চুক্তি আজও চালু আছে, জাতীয়তাবাদীরা তো নাকচ করেন নি। জাতীয়তাবাদী দলের তরফ থেকে তাতে সায় দিলেও মিন্টফের যে কথা সেই কাজ—হয় চুক্তি পালটাও নয় মালটা ছাড়ো। শুরু হলো এক দীর্ঘমেয়াদী নাটক। আলাপ আলোচনা চললো ব্রিটেন আর মালটার মধ্যে। একাধিকবার ব্রিটিশ প্রতি-

[illegible] নেই, কিন্তু তার বদলে [illegible]। তিন কোটি পাউন্ড [illegible] দিলে তিনি ইংরেজদের যে সব সুবিধে তারা ভোগ করছে তা ভোগ করতে দেবেন, নইলে অন্য খরিদ্দার খুঁজবেন এই ঘাঁটি-মাটি সব। অত টাকা দিতে ব্রিটেন রাজী ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন আর নেই, অন্যের কায়দাও পালটে গিয়েছে পারমাণবিক যুগে। মালটার ঘাঁটি তুলে দিলেও তাদের কিছু এসে যাবে না। মিন্টফ যখন হুমকি দিলেন তাঁর মত না মানলে বিলিতী ফৌজ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে তাতেই রাজী হয়ে তাদের ফিরিয়ে আনালেন বিলিতী সরকার।

মিন্টফ তখন আভাস দিলেন ব্রিটেন রাজী না হলে তিনি যাবেন রুশিয়ার কাছে, ভূমধ্যসাগরে অমন একটি ঘাঁটি পেলে সে বর্তে যাবে। ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোও আসবে তার পিছু পিছু। এতে টনক নড়লো আমেরিকার আর ইটালির। ঘরের কাছে রুশিয়ার ঘাঁটি হবে শুনে আক্কেল গুড়ুম হলো ইটালি সরকারের। ও খবরে আমেরিকাও প্রমাদ গনলো—মালটায় ভিৎ গেড়ে বসলে ভূমধ্যসাগর তো হবে রুশী জমিদারী। তারা চাপ দিল ব্রিটেনের ওপর একটা রফা করে ফেলবার জন্যে। মিন্টফও বসে ছিলেন না। টাকার অভাব মেটাবার জন্যে তিনি দ্বারস্থ হলেন লিবিয়ার গাদ্দাফির। খালি হাতে সেখান থেকে তাঁকে ফিরতে হলো না। পায়ের ওপর পা দিয়ে তিনি বসে রইলেন। ইতিমধ্যে শলাপরামর্শ চললো ব্রিটেন, আমেরিকা, ইটালি আর ন্যাটোর অন্য সব সদস্যদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত আপস একটা হয়েছে ২৬ মার্চ। নতুন চুক্তি সই করেছেন মিন্টফ আর লর্ড ক্যারিংটন লন্ডনে। তার মেয়াদ সাত বছর। এখন থেকে ব্রিটেন বছরে মালটাকে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড দেবে ভাড়া বাবদ। তবে সব টাকাই তাকে ঘর থেকে বের করতে হবে না। সে দেবে সওয়া পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড, বাকীটা যোগাবে ন্যাটোর অন্য সদস্যরা। এ ছাড়া, ইটালি দেবে পঁচিশ লক্ষ পাউন্ড খয়রাতি দান আর ৭০ লক্ষ পাউন্ড সাহায্য দেবে ন্যাটোর আর সব সদস্য। আমেরিকাও কিছু সাহায্য দেবার জন্যে তৈরি। এর ফলে মালটা রয়ে গেল ব্রিটেন আর তার স্যাঙাতদের হাতেই। তবে মিন্টফ বলেছেন, এই শেষ। এ চুক্তির মেয়াদ ফুরুলে আর নতুন চুক্তি তিনি করবেন না।

স্বপ্নময় গাথা ও জলের আন্দোলন

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

গন্ধময় গোলাপ ভিন্ন আর কাকে হাত-ধ'রে লুকোনো
এই যাতায়াত
নিঃস্ব করেছে! বলো, কে দ্বিধাবিভক্ত? যেন এইভাবে
উন্মীলন ক্রমশ জেনেছে
হাতে-হাতে কঠিন তুলনা। বাইরে—
ঘরবাড়ি ভাঙার
শব্দ—নৈঃশব্দ্যেরও ছিলো সে-ক্ষমতা, যাকে তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ
চাড়া করে: ত্রস্ত যে, তাকেও ঠিক এক মুঠো ফুলের ছোঁয়া
ছেড়ে দিতে হয়,
শুধু এই ভেবে, ফুলে—কাঁটাও রয়েছে।

কে দ্বিধাবিভক্ত? তার শিথিলতা মৃদু ও গরম,
নাকি ঠাণ্ডা করাতে
কেটে যায় ঝঙ্কৃত নিশ্বাস, দূরে
অন্তর্বিন্যাস থেকে ছিঁড়ে-যাওয়া সুখের বাতাস
ফিরে বা উড়বে, তারই
স্বপ্নময় গাথা ও জলের আন্দোলন
আর ভুল হবে না, গোলাপ।

তোমার ভোরের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন

কবিরুল ইসলাম

তোমার দিনের শুরু খুব ভোরে
মোরগ ডেকেছে কিংবা তখনও ডাকেনি
তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার দিনের শুরু
খুব ভোরে। ফীডিং বটলে, স্টোভে, থার্মোফ্লাস্কে
তুমি খুব ব্যস্ত হলে
তখন তোমাকে খুব দূরের মানুষ বলে মনে হয়
বাইরের আবছা অন্ধকারে
আমি তোমার মুখের আদল খুঁজি।

তোমার সন্তানে আর সফল সংসারে
তোমাকে স্বয়ম্পূর্ণ দেখে হিংসা হয়
এই যে দেয়াল তুমি গেঁথে তোলো
দিনে দিনে
যেখানে আমার কোনো প্রবেশাধিকার নাই
— আমি মাত্র দূরের দর্শক।

অথচ 'আমার আমার' বলে সারাবেলা বেলা যায়
'আমার আমার' শব্দে খুলে যায় দরজা জানালা—
তোমার অশেষ মুখে আকাশে হঠাৎ ধ্রুবতারা জ্বলে
আর আমি হেঁটে যাই কাছের দুপুরে

তোমার ভোরের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ॥

দুঃশ্চিন্তা ছেড়ে, আমি এবার

দেবী রায়

ভালোবাসার পদপ্রান্তে, মানুষের হাতে-গড়া সংসার
পিছনে তার ভ্রান্ত, মূঢ় সমাজ!
সম্রাজ্ঞীর মতো সে, অর্থাৎ ভালোবাসা—
ও তার অহংকার, সুঠাম-ঠাসা-শরীরে
ভালোবাসার সঙ্গে আরো একবার বেঁচে উঠতে চাই
আমি মাথা উঁচু করে—
বিমূঢ়তা নয়, সুস্নিগ্ধ ভালোবাসার ছিটেফোঁটা
পেলে—মানুষের করুণাযোগ্য হয়ে ওঠে
পলায়নপরা, বিপর্যস্ত এ পৃথিবী!
দুশ্চিন্তা ছেড়ে, আমি এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যাবো—
ভালোবাসার কোমর জড়িয়ে, অর্থাৎ জেগে উঠবে
আমার ফোলা মুখ, পরদিন উজ্জ্বল-সকালে !!

পরাক্রান্ত

রঞ্জিত সরকার

ক্রমাগত ক্ষমা পায় দিনানুদিনের যত পাপ,
বৃষ্টি যদি না-ই আসে—মধ্যাহ্নই তবে খুব দামী,
তেসরা ফাল্গুনে দেখি পাতাগুলো হলুদ বাদামী,
স্বচ্ছ হেসে ভেঙে দিই বিমূর্ত বাচাল এপিটাফ।
ক্রমশ প্রশ্রয় পায় তিনজন সন্নিহিত বুড়ী—
বরং তারাই খুব ভীত চোখে আমার কাফনে
আরেক প্রেতাত্মা দেখে চমকে উঠে ভীষণ জরুরী
পরামর্শ-ছলে ফেরে বিপ্রতীপ অগ্নিপ্রদক্ষিণে।
অদ্ভুত দুর্বোধ্য হেসে মাঝরাতে ক্ষিপ্র খোলে দোর
আমারই একান্ত কোনো দুর্বিনীত মায়াবী চাকর।

মহাভারতের কথা

বুদ্ধদেব বসু

৩ : গোত্রবিচার

মহাভারত বিষয়ে আমাদের আর-একটি অস্বস্তিবোধ এই যে আজকের দিনে আমরা সাহিত্য বলতে যা বুঝি—অথবা প্রাচীনেরা যা বুঝতেন—তার সব সীমানা ও সংজ্ঞার্থ তা দুর্ধর্ষভাবে লঙ্ঘন ক'রে যায়। আদিপর্বের অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে, প্রথম ছিয়াশিটি শ্লোকের মধ্যেই এই ভারত-কথা নানা নামে চিহ্নিত হয়েছে : সৌতি ও শ্রবণেচ্ছু ঋষিরা প্রথমে বললেন 'ইতিহাস', ব্যাসদেব নাম দিলেন 'কাব্য', স্বয়ং ব্রহ্মা সেই আখ্যা সমর্থন করলেন—কিন্তু পরে আবার একে বলা হ'লো 'পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র', যা থেকে 'শ্রুতিরূপ জ্যোৎস্না' বিকীর্ণ হচ্ছে। প্রতিটি অভিধাই প্রযোজ্য, কিন্তু কোনো-একটির মধ্যে এই মহাগ্রন্থকে আটকে ফেলার কোনো উপায় নেই। য়োরোপীয় পরিভাষা অনুসারে এটি (বা এর মৌলিক অংশটি) পৃথিবীর অল্প কয়েকটি আদিম এপিকের অন্যতম; কিন্তু যে-মানদণ্ডে আমরা অন্যান্য আদিকাব্যের—ধরা যাক ইলিয়াড বা অডেসি বা এমনকি আমাদের নিজস্ব রামায়ণের বিচার করতে পারি, মহাভারতের সমগ্রতায় তা তোড়েই চূর্ণ হ'য়ে যায়। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতকের রোম-নিবাসী গ্রীক কবি ডিয়ন ক্রিসোস্টোম এমন একটি হিন্দু কাব্যের অস্তিত্ব জানতেন যা হোমার থেকে 'অপহৃত' বা অনূদিত—এটি কোন কাব্য তা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে রামায়ণ ব'লেই মনে হয়। রামায়ণ ও ইলিয়াডের তুলনামূলক আলোচনা—গল্পাংশের অগভীর ও আংশিক সাদৃশ্যের জন্য—পাশ্চাত্ত্য জগতে এখনো প্রচলিত আছে; কিন্তু আবহমান বিশ্বসাহিত্যে মহাভারত এক তুলনাহীন নিঃসঙ্গতা নিয়ে বিরাজমান। 'তুলনাহীন' বিশেষণটা এখানে প্রশংসাসূচক নয়; আমি বলতে চাচ্ছি যে অন্যান্য এপিকের তুলনায়—ইলিয়াডের মতো আদিম বা ঈনিডের মতো 'সাহিত্যিক' যা-ই হোক না—অন্য সব এপিকের তুলনায় মহাভারত অভিপ্রায়ে ভিন্ন, পদ্ধতিতে বা পদ্ধতির অভাবেও স্বতন্ত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে রামায়ণকে কাব্য বললে ভুল হয় না, এবং তা বলাও হয়েছে অনেকবার; পরবর্তী অলংকারবহুল কাব্য-রীতির উৎসই হ'লো রামায়ণ; কিন্তু মহাভারতকে ঐ আখ্যা দিতে গেলে 'কাব্য' কথাটার অর্থ অন্যায়ভাবে সম্প্রসারিত হ'য়ে পড়ে। এমন নয় যে মহাভারত কাব্যগুণে দরিদ্র—তার কোনো-কোনো অংশে কবিতার বিভা নক্ষত্রের মতো অনির্বাণ; কিন্তু অনেক স্থলে দেখি রসাত্মক বাক্যরচনার চেষ্টামাত্র নেই, ছন্দোবন্ধের ন্যূনতম দাবিটুকুও স্বীকৃত হয়নি সর্বত্র—কোনো-কোনো চরণ শ্লোক-চ্যুত ও একক, এবং আদিপর্বের তৃতীয় অধ্যায়টির অধিকাংশ একেবারে পদাতিক গদ্যে লিপিবদ্ধ আছে, সাংবাদিক ধরনে তথ্যজ্ঞাপন ছাড়া লেখকের যেন আর কোনো উদ্দেশ্য নেই সেখানে। সৌতির অনুসরণে আলংকারিকেরা একে 'ইতিহাস' আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস অর্থ ছিলো—'হিস্ট্রি' নয়, কিংবদন্তী, ইতি-হ-আস, 'এমনি ছিলো, এমনি হয়েছিলো' ব'লে শোনা যায় (৭)। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মহাভারত আধুনিক অর্থে (বা অলীকবিশ্বাসী হেরোডোটাসের অর্থেও) ইতিহাস নয়—ইতিহাসের এক বিশাল ও অস্পষ্ট আকরভাণ্ডার, যাতে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তথ্য ও উদ্ভাবনা, ধূসর ও ধূসরতর স্মৃতিসমূহ কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। এরই অন্তর্ভূত ভগবদ্গীতা ধর্মগ্রন্থ হিশেবে যে-মর্যাদা পেয়েছে, তা সমগ্রটির প্রতি অর্পিত হয়নি কখনো, এবং হ'তেও পারে না। পক্ষান্তরে, আকারে তুলনীয় কথাসরিৎসাগরের মতো একে য়োরোপীয় ভাষায় 'রোমান্টিক' কাহিনীসম্ভারও বলা যায় না, কেননা এতে গল্পের ফাঁকে-ফাঁকে উপদেশের স্রোত প্রবহমান; আবার সেই উপদেশে পঞ্চতন্ত্রের স্পষ্টতা ও এক-মুখিতাও নেই যে আমরা একে নীতিশাস্ত্র নামে অভিহিত করবো। অথচ এতে সবই আছে; শান্তিপর্বে পঞ্চতন্ত্র ধরনের অনেক পশু-কথিকা; এক যুবতী-বন্ধ্যা মায়াবিনীর কাহিনী (অনুশাসন : ১৯-২১) যা অংশত চমকপ্রদভাবে রোমান্টিক; আছে য়োরোপীয় বীরগাথাশোভন বিদুলা-সংবাদ (উদ্যোগ : ১৩১-১৩৪), আর গীতার বাইরেও উন্নত ধর্মচিন্তার কোনো অভাব নেই। আর জরাসন্ধবধ, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষ, দ্রোণ-দ্রুপদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এই ধরনের ঘটনার সূত্রে ভূগর্ভপ্রোথিত ঐতিহাসিক ভিত্তিশিলাও আমাদের অনুমেয় হ'য়ে ওঠে। 'সাহিত্য' শব্দের যে-মিলনধর্মী ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ একবার দিয়েছিলেন (৮), সে-অনুসারে সাহিত্য-পদবিতে মহাভারতের অধিকার সর্বাগ্রগণ্য—কিন্তু কোনো-একটি 'বই', কোনো-একটি সুনির্দিষ্ট পুস্তক বা সাহিত্যসংকলন হিশেবে একে যেন ঠিক ধারণা করা যায় না, কেবলই মনে হয় এটি একটি বিপুলবিস্তৃত বিশ্বকোষ।

বিশ্বকোষ? এক অর্থে নিশ্চয়ই তা-ই, কেননা এতে প্রবিষ্ট হয়েছে তৎকালীন ভারতভূমিতে প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান ও

বিজ্ঞান; সব ভাবনা ও সাধনা; ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, বিধিবিধান; সব উপাখ্যান ও উপকথা; লোকাচার, লোকবিদ্যা ও প্রবচন; সব সৌন্দর্য ও আনন্দবোধ; সাংসারিক অভিলাষ ও আধ্যাত্মিক অভীপ্সা; সব জ্যোৎস্না ও সূর্যকিরণ; সব দ্বন্দ্ব ও সংশয় ও সম্ভবপর সমাধান। হ্যাঁ, কুসংস্কারও আছে, কেননা কুসংস্কার উচ্ছিন্ন করলে তার অন্তর্লীন বিশ্বাসটিও হারিয়ে যায়; আছে দুঃস্বপ্ন ও আতঙ্ক ও তমিস্রা, কেননা সেগুলিও জীবনের অঙ্গ, আমাদের মানুষিক উত্তরাধিকার। এই সবই সত্য, কিন্তু আজকাল আমরা বিশ্বকোষ বলতে যা বুঝি, যাতে তথ্যনির্ভর নিখিলবিদ্যা বিশুদ্ধভাবে বিবৃত হয়, এবং যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সংযোগসাধনের একমাত্র উপায় বর্ণানুক্রম, তার সঙ্গে মহাভারতের যে কোনো সাদৃশ্য নেই তা অবশ্য না-বললেও চলে। আমরা দেখতে পাই এমন অনেক অংশ যা নিছক তথ্যসেবনে পর্যবসিত; যেমন সঞ্জয়কথিত ভূবৃত্তান্ত (ভীষ্ম: ৬-৯), বা মার্কণ্ডেয় মুনির সৃষ্টিবর্ণনা (বন: ১৮৮)। বিষ্ণুর সহস্র ও শিবের অষ্টোত্তর-সহস্র নামের তালিকা বিষয়ে (অনুশাসন: ১৪৯, ১৭) কিছু না-বললেও চলে, কিন্তু বনপর্বের সারবান তীর্থপ্রশস্তিটিও (অধ্যায় ৮২-৮৫) আধুনিক ভ্রমণনির্দেশিকার শৈলীতে লেখা বিবরণমাত্র। এমনকি মহামতি ভীষ্মের উপদেশও কখনো-কখনো অধ্যাপকীয় ধরনে নিতান্তই তাত্ত্বিক হ'য়ে পড়ে; উদাহরণত, তাঁর রাজধর্মবিষয়ক ভাষণটি উল্লেখ্য (শান্তি: ৫৬-৫৮)। এবং এই আক্ষরিকভাবে শিক্ষাপ্রদ অংশগুলি পরিমাণেও প্রচুর। কিন্তু অনেক স্থলেই—অধিকাংশ স্থলেই—তথ্য ও তত্ত্বসমূহ উপাখ্যানে আশ্রিত; সেগুলি সবই সমানভাবে তেজস্ক্রিয় নয়, কিন্তু এমন উদাহরণ অবিরল ও অজস্র পাওয়া যায়, যেখানে উপাখ্যানের অন্তঃস্থল থেকে—সপ্রাণভাবে, সাংকেতিকভাবে, আমাদের কল্পনাবৃত্তির পক্ষে উত্তেজকভাবে—মেঘচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির মতো বেরিয়ে আসছে এক-একটি দ্যুতিময় চিত্রকল্প—সেই সব সগর্ভ ও অনিঃশেষ-রহস্যপূর্ণ চিত্রকল্প, যাকে য়োরোপীয় ভাষায় 'মিথ' বলা হয়, আর হিন্দুরা আরো দৃষ্টিবানভাবে যার নাম দিয়েছিলেন পুরাণ (৯)—একাধারে আদিম ও চিরন্তন, চিরপুরাতন ও চিরনূতন সেই সামগ্রী। আর সেটাই কারণ, যেজন্য আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দী ধ'রে, শিক্ষিত-নিরক্ষর-নির্বিশেষে, ভারতবাসীরা মহাভারতে মুগ্ধ হ'য়ে আছে। একদিকে এই পৌরাণিক ঐশ্বর্য, অন্যদিকে এক বদ্ধমূল ধর্মবোধ, ভালো-মন্দের বিচারে ক্লান্তিহীন ও বিচিত্র অধ্যবসায়—এই দুটো দিক মিলিয়ে দেখলে মহাভারত একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিভাত হয়। তখন দেখতে পাই, হোমার ও হেসিয়ড থেকে আরম্ভ ক'রে, আথেনীয় নাট্যকারদের পেরিয়ে, অভিড ও ভার্জিলকে স্মরণে রেখে, দান্তে পর্যন্ত পৌঁছলে আমাদের মানসপটে যা অঙ্কিত হয়, মহাভারত সেই সুদীর্ঘ ভাবরেখারই সমান্তর (১০)। সমান্তর মানে সমধর্মী নয়, য়োরোপীয় ও ভারতীয় চিৎপ্রকৃতির বৈষম্য বিষয়ে আমরা সকলেই অবহিত আছি, এবং এও আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে শিল্প-গুণে সফোক্লিসের নাটক বা দান্তের কাব্যের সঙ্গে মহাভারতের তুলনার কোনো প্রশ্ন ওঠে না—এই সংহিতাটিকে একটি 'শিল্পকর্ম' হিশেবে বিবেচনা করাই বাতুলতা। এখানে আমার বক্তব্য শুধু এই যে য়োরোপীয় পুরাসাহিত্য যে-পরিমাণ বস্তু ও মনীষিতা বহু বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, ভারতবর্ষ যেন স্পর্ধিতভাবে, বা উপায়ান্তর না-দেখে, তার নিজের ধরনে ঠিক ততটাই সন্নিবিষ্ট করেছিলো—একটিমাত্র গ্রন্থনের মধ্যে, একটিমাত্র শিরোনামার তলায়।

এইজন্যে আমি মহাভারতের অসংখ্য ত্রুটি লক্ষ ক'রেও সে-বিষয়ে অসহিষ্ণু হ'তে পারি না। সম্প্রতি আমি প্রবলভাবে অনুভব করছি যে মহাভারত কোনো নান্দনিক সূত্রে বিচার্য নয়; তা থেকে নিজেদের মনোমতো অংশগুলিকে ছেঁকে নিয়ে শুধু সেটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকার অধিকার আমাদের কারোরই নেই, আর তা থাকতে গেলে আখেরে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো। মেঘদূতের

কোনো-একটি শ্লোক কাব্যগুণে মলিন মনে হ'লে সেটিকে প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ অন্য হাতের রচনা ব'লে সন্দেহ করা বিধেয়, কিন্তু যাতে কালান্তরবর্তী বহু স্বাক্ষর অদৃশ্যভাবে কিন্তু বোধগম্যভাবে অঙ্কিত হ'য়ে আছে, তার অংশবিশেষকে 'প্রক্ষিপ্ত' ব'লে আমরা শুধু এই অভিমতটি জানাতে পারি যে মহাভারত আরো ছোটো হ'লে অনেক বেশি 'ভালো বই' হ'তো। যে-সব অংশ প্রাসঙ্গিকভাবে বা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিকভাবেও আবির্ভূত হচ্ছে, সেগুলি আসলে সংযোজন বা পরিবর্ধন; কখনো-কখনো হতশ্রী বা অনর্থক মনে হ'লেও আমরা তাদের আঙুলের টোকায় উড়িয়ে দিতে পারি না। আর অসংগতি? সেই সব জাজ্বল্যমান স্ববিরোধ, যা সর্বদেশীয় সমালোচকের সর্বপ্রধান আক্রমণস্থল, আর যা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও বহু বিক্ষোভ প্রকাশ ক'রে গেছেন—সেগুলির বাহুল্য এমন একটি সনাতন ও স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে যে 'অসংগতি' কথাটাই এখানে অসংগত। গ্রীক জাতি সামঞ্জস্যবোধের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু তাদের পুরাণেও আমরা সুসংবদ্ধতা পাই না। ধরা যাক হেরাক্লিস-এর দ্বাদশ কীর্তি—সেগুলি ঠিক কোন উপায়ে সাধিত হয়েছিলো তার নানারকম ব্যাখ্যা আমরা শুনেছি। অডিসিয়ুসের পিতা কে ছিলেন তা নিয়েও আমাদের সংশয় জাগে যখন দেখি হোমারে তিনি ইথাকাপতি লায়ের্টেস-এর পুত্র ব'লে ঘোষিত, কিন্তু ইউরিপিডিস তাঁকে নরকভোগী ধূর্ত সিসিফাসের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং দেবরাজ জেয়ুস ক্রনস-এর জ্যেষ্ঠ না কনিষ্ঠ পুত্র, তা নিয়েও মতভেদ আছে। আর আগামেম্নন-কন্যা ইলেকট্রা—যার নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা হয়েছে 'অপরিণীতা'—ঈস্কিলাসের সেই হত্যাপণকারিণী অবিস্মরণীয় কুমারী—তাকে আমরা ইউরিপিডিসে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ দেখতে পাই, একবার এক দীন কৃষকের, আর-একবার অরেস্টেস-সুহৃদ পিলাডিস-এর সঙ্গে। আগামেম্নন-এর আর-এক কন্যাকেও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়: ইফিজেনিয়া, এক অশ্রুমতী তরুণী, যার পিতা তাকে আউলিস-তটে দেবনির্দেশে বলি দিয়েছেন। কিন্তু এই কন্যাবধের ব্যাপারটাও অনিশ্চিত, কেননা অন্য এক উপাখ্যান অনুসারে ইফিজেনিয়া এক দেবীর দয়ায় রক্ষা পেয়েছিলো—ছুরিকাঘাতের পূর্বমুহূর্তে আর্টেমিস তাকে আকাশ-পথে দূর বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি দেবরাজদুহিতা মেনেলাউস-পত্নী পারিসপ্রেমিকা হেলেন—যার মুখশ্রীর জন্য ট্রয় নগরী বিধ্বস্ত হ'লো—তিনিও, শোনা যায়, সতীত্ব থেকে ভ্রষ্ট হননি, পারিস যাকে নিয়ে পালিয়েছিলো সে হেলেনের এক ছায়ামূর্তি মাত্র (১১)। উদাহরণ পুঞ্জিত করা নিষ্প্রয়োজন; কেননা পুরাণ-কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে, বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে। এখন কথাটা এই যে মহাভারতের মতো একটি সৃষ্টিছাড়া গ্রন্থে, যাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ভারতপুরাণ সঞ্চিত আছে—সেই দূরবৈদিক অগ্নিদেব থেকে নবীনাভীষণা দুর্গা-কালিকার রূপায়ণ পর্যন্ত (আদি: ৫-৭, বিরাট: ৬)—তাতে অসংগতির এই যে প্রাচুর্য ও নিষ্কণ্ঠ সংস্থাপন আমরা দেখতে পাই, সেটাই কি তার বৈভবের অভিজ্ঞান নয়? যুদ্ধ হয়েছিলো কুরুপাণ্ডবে না কুরুপাঞ্চালে; কৃষ্ণের পত্নীর সংখ্যা দুই না চার না আট, না সাকল্যে ষোলো-শো-আটটি; বিরাটপর্বে অত সহজে জয়লাভ করার পরেও পাণ্ডবদের কেন আঠারো দিন ধ'রে ঘোর যুদ্ধ করতে হয়েছিলো; অথবা শিবিরাজার উপাখ্যানটি কেন তিনবার ভিন্ন-ভিন্ন ধরনে বলা হয়েছে (বন: ১৩১, ১৯৬ ও অনুশাসন: ৩২), এবং তার একটি প্রকরণে আত্মমাংসদাতা ব্যক্তিটি কেন শিবিও নন, তাঁরই পিতা উশীনর—এ-সব প্রশ্ন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ও চিন্তাকুল হ'য়ে পড়লে আমরা মহাভারতকে তার সত্য রূপে দেখতে পাবো না। আমরা কে কী চাই, কোন প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহাভারতে পর্যটক হয়েছি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তারই উপর নির্ভর করছে। যদি বেরিয়ে থাকি নগণ্য বা সারবান কোনো ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে, অথবা কঠোর-হস্তে অরণ্যকে উদ্যানে পরিণত করার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে, তাহ'লে অবশ্য খণ্ডীকরণ ও ব্যবচ্ছেদই আমাদের ব্যবহার্য উপায়। কিন্তু যদি চাই এক বিশাল তরঙ্গোচ্ছল পুরাণস্রোতে অবগাহন করতে, আর সেই জলের তলা থেকে মাঝে-মাঝে যে-সব সুন্দর, ভীষণ, অদ্ভুত ও মনোমুগ্ধকর ভাবমূর্তি মুহূর্তের জন্য উত্থিত হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, তাদের দূরপ্রসারী তাৎপর্য কিয়দংশেও উপলব্ধি করতে চাই, তাহ'লে, যা-কিছু আমাদের হিশেবে বিসদৃশ বা অসংগত বা বিভ্রান্তিজনক, সেই সবই আমাদের যথাযথ ব'লে মেনে নিতে হবে। মেনে নিতে হবে, হরিবংশবর্জিত আঠারো-সর্গের যে-গ্রন্থটির সঙ্গে আমরা বহুকাল ধ'রে পরিচিত আছি, কথা-কথিত ব্যাসদেব যার রচয়িতা, আর বাংলা ভাষায় যার প্রথম (১২) সমগ্রিক অনুবাদ সম্পাদনা ক'রে কলকাতার এক আলালের ঘরের দুলাল, এক বিলাসপরায়ণ বিদ্যোৎসাহী অমিতব্যয়ী যুবক প্রাতঃস্মরণীয় হ'য়ে আছেন, সেইটেই প্রামাণিক ও সর্বজনীন মহাভারত। এও মনে রাখা চাই যে মহাভারতে—এবং একমাত্র মহাভারতেই—ভারতভূমিতে উদ্ভূত সবগুলি চিন্তাধারার পদচিহ্ন প্রতীয়মান, এবং এটি কোনো গোষ্ঠীগত গুহ্যবদ্ধ ধর্মপুস্তক নয়—স্ত্রীশূদ্রাদিনির্বিশেষে যে-কোনো 'পুণ্যবান'কে এর স্বাদগ্রহণের অধিকার ব্রাহ্মণেরাই দিয়েছিলেন। এই 'পঞ্চম বেদ'টির স্বরূপ ঠিক বুঝতে হ'লে, একে খণ্ডিতভাবে দেখা চলবে না।

৭। বন্ধনীভুক্ত শব্দ তিনটি আমি জুড়ে দিয়েছি; এবং সেটা যে অনাচার নয়, মহাভারতেই তার নির্দেশ আছে। শান্তি ও অনুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীষ্ম প্রায়ই 'পুরাতন ইতিহাস' বলছেন, যার অনেকগুলো আবার তিনি শুনেছিলেন কোনো-না-কোনো মুনিঋষির মুখে। তাছাড়া আদিপর্বের অনুক্রমণিকা অংশে, গ্রন্থটি আরম্ভ হওয়ামাত্র, স্পষ্টই ব'লে দেয়া হয়েছে যে সমগ্র ভারতসংহিতাই শোনা কথা।

৮। 'সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারা সম্ভবপর নহে।'—'সাহিত্য', "বাংলা জাতীয় সাহিত্য", র.র. প-ব-সং খণ্ড ১০, পৃ. ৭৯৩।

৯। একাধারে পুরাতন, চিরন্তন ও আদিম—প্রাচীন ব্যবহারে 'পুরাণ' শব্দের অর্থ ছিলো এই; সেই অর্থে 'পুরাণপুরুষ' কথাটা আমরা এখনো ব্যবহার ক'রে থাকি। 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো'—উপনিষদ ও গীতায় উক্ত এই পঙক্তির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছেন (কঠ: ১: ২: ১৮, গী: ২: ২০); কিন্তু হরিচরণ তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' ঋগ্বেদের যে-উল্লেখ দিয়েছেন আমাদের পক্ষে সেটা আরো ইঙ্গিতময়। 'পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী'—এখানে বিশেষণটির লক্ষ্য হলেন উষাদেবী, কিন্তু পুরাণ-কথা [illegible]

মিথলজিও যে বার-বার নতুন ক'রে জন্মায় তা আমাদের কারোরই অবিদিত নেই।

১০। আমি কি বড্ড বেশি দাবি করছি? অন্ততপক্ষে পুরা-কালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা আমার উচিত ছিলো না কি? কিন্তু খৃষ্টপূর্ব য়োরোপীয় সভ্যতায় আমাদের অর্থে ধর্মবোধ ছিলো না; তাই প্রথম খ্রীশুভক্ত কবি পর্যন্ত রেখা টানতে হ'লো।

১১। এই উপাখ্যানের উৎস খৃ-পূ ৭-৬ শতকের গ্রীক লেখক স্টেসিকোরাস। কথিত আছে, একটি কাব্যে স্বামীত্যাগিনী হেলেনকে নিন্দা করার অপরাধে তিনি অন্ধ হ'য়ে যান। পরে নিজের কথা ফিরিয়ে নিয়ে বলেন যে হেলেন কখনো ট্রয়নগরে পদার্পণ করেননি, ট্রজান যুদ্ধের দশ বছর ধ'রে মিশরদেশে স্বামীর অপেক্ষায় বাসে ছিলেন। এই ক্ষমাপ্রার্থনার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে। এই উপাখ্যান অবলম্বনে ইউরিপিডিস তাঁর 'হেলেন' নাটক লিখেছিলেন।

১২। প্রথম, কেননা সম্ভয় বা জনপ্রিয় কাশীরাম দাসের পদ্য-প্রকরণ অনেকাংশে তাঁদের স্বাধীন রচনা—এবং মানসতায় সম্পূর্ণ বঙ্গীকৃত ও মধ্যযুগাবলম্বী। বৈয়াসিক আস্বাদযুক্ত সামগ্রিক অনুবাদ বাংলাভাষায় কালীপ্রসন্নই প্রথম প্রকাশ করেন, এবং বর্তমানে সেটি একমাত্র প্রচলিত সামগ্রিক বঙ্গানুবাদ।

(ক্রমশ)

গাঁ বুড়ো

সত্যেন্দ্র আচার্য

মেষপালকের দল যেই সবে মাঠে নামবে অমনি ঢোল-শোহরত। শ্যামল মাঠের ওপর বৃদ্ধ উটের মত ঘাড় উঁচু পাহাড়, আর তারই পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে পথটা ঝর্নায় গিয়ে শেষ। ওরা তিন মরদ এই পথে হাঁটছিল। ঢোল পেটাচ্ছিল।

রোদ্দুর ওঠে যখন এই পথে, পাহাড়ের সবুজ যখন রোদ্দুরের রঙে ভিজে যায়, ওরা জানে তখন এই পথে মাঠে নামবে পালকেরা। সকালের অমল আলোয় ঝর্নার জল চিকচিক করবে এখন, ঝরনায় ভিড় করবে মেয়েরা। যুবকেরা এখন ফসল বুনবে, আপেলের বনে কি আঙুরের সবুজ খেতে ওরা ব্যস্ত থাকবে। আর ঠিক এখনি একরাশ সবুজ পাখির পালক মাথায় গুঁজে, জলে রোদ্দুরে পোড়া গাঁ বুড়ো দু-হাত তুলে হাঁকবে, বালিহাঁস হো-ও-ও।

হো-ও-ও। মাঠ থেকে প্রত্যুত্তর দেবে মেষপালকের দল। বুড়ো তখন নিজের সঙ্গে কথা বলবে, বড় লক্ষণযুক্ত এই বালিহাঁস, বুঝলি? ওরা এলেই বুঝবি বর্ষা আসবে। তখন তৃষ্ণায় ছাতিফাটা এই মাঠ, শস্যের বুকে দুধ না জমার দুঃখ, সব, সব তখন মুছে যাবে। তৃষ্ণার জল পাবে সকলে। যেন বালিহাঁসের পিছু পিছু এই পথ ধরে গাঁ বুড়ো ছোটে। বালিহাঁস হো-ও-ও

খোলা মাঠের ওপর গাঁ বুড়োর কণ্ঠে তোলা প্রতিধ্বনি যখন মিলিয়ে যায় তখন বাঁশি বাজায় শিমুল। টিয়াকে ডাকে। টিয়ার মার তাই বড় দায়। কাল টিয়াকে কান বিঁধিয়ে দিয়েছে। ভীষণ বকুনি দিয়ে মাঠ থেকে ধরে এনে বলেছে, তেরোয় পা দিলি আর কবে কান বিঁধোবি? কান ফুঁড়ে হলুদ সুতো পরিয়ে দিয়ে বলেছে, এখন সব হয়ে গেছে তোর। মাঠে যাবি না। রোদ লাগাবি না। উড়ন্ত কাচপোকা মেরে আর টিপ পরবি না। তেরোয় পা দিলি উড়ো পোকা মারতে নেই। কারো মনে দুঃখ দিতে নেই। বুঝলি?

ঢোলের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। বুড়োর গলা। তবু শিমুলের বাঁশি থামল না দেখে কাচপোকা ধরার অছিলায় টিয়া উঠোনে নামল। রোদ্দুর দেখল। ঝুমকো লতার ফুলে হাত দিল। আঙুলে হলুদ রঙের পরাগ লাগতেই তা মাথায় মুছে নিয়ে লুটোনো আঁচল বুকে তুলল। তুলে বলল, বাব্বা বাবা, বাড়িতে থাকতে দেবে না। কী দস্যি ছেলে বাবা, ঠিক সাপে কাটবে।

পরক্ষণেই জিভ কাটল টিয়া। ইস্! দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করল টিয়া। মাগো না, আমার কথা শুনো না। সাপ গো সাপ, কেটো না।

শিমুল এবার গান ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঢোল-শোহরত। না গান, না বাঁশি কোনটাতেই মনোযোগ দিল না শিমুল। শিমুল তাকাল। দূর পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনা নেমেছে। এখন বর্ষা নয়, তাই ক্ষীণ স্রোতধারা বড় ম্রিয়মাণ। নাবালিকার মত ভীরু পায়ে যেন অই জলাধারে গিয়ে মিশেছে। অথচ এই জলাশয় বর্ষায় কূলপ্লাবী হয়। তখন এই প্লাবিত মাঠের মায়া ছেড়ে মেষের দল নিয়ে ওরা পাহাড়ে ওঠে। তখন পাহাড়ের চূড়ো থেকে টিয়াদের ঘর চোখে পড়ে শিমুলের। কখনো কখনো টিয়াকে চোখে পড়ে।

অবাক হয়ে শিমুল দেখছিল প্রতিবেশীদের। বনো নাদা মাঠের যেখানে গোলাকার

কেন? টিয়া চোখে চোখ রাখে। হাঁকলেই যা।

ঝড় উঠবে। বান ডাকবে। আকাশ কেমন অন্ধকার দেখছিস না? পিপড়ে পোকা উড়ছে।

তুই? টিয়ারও কেমন ভয় করে। হাত ধরে টিয়া। যাবি না?

না।

তাহলে আমিও না। অভিমান গলায় টিয়া কাদার ওপর শুয়ে পড়ে।

হাত ধরে টেনে তোলে শিমুল। পিঠময় নরম কাদা। চুলের ভেতর হাত চালিয়ে খানিকটা মুছে নেয়। পিঠময় কাদার খানিকটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে, আচ্ছা, চল।

হাত ধরাধরি করে এবার ওরা ঘরে ফেরে। শিমুল পাহাড়ের অনেক দূরে তাকিয়ে থেকে বলে, হাওয়া হেঁকেছে। দেখেছিস, বুড়ো ঠিক বলেছে।

থমকে দাঁড়ায় টিয়া। বলে, তুইও গাঁ বুড়ো হয়ে যাবি একদিন।

হা হা করে গলা ছেড়ে নাটকে হাসে শিমুল। তারপর সোহাগ গলায় বলে, তুইও তো।

না।

কেন?

কয়েকটা চুল মুখের ভেতর পুরে দাঁতে আলতো চিবোতে চিবোতে অস্পষ্ট গলায় বলল, জানি না।

কেন না। ওর হাত ছুঁয়ে শিমুল এবার থমকে দাঁড়ায়। কেন না, বয়েস হবে না তোর?

হলেই বা, তোর কি? পায়ের আঙুলে কাদা তোলে টিয়া। আমার বয়সটাই শুধু চোখে পড়ে। ঠোঁট থেকে চুলগুলো খুলে যেন হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল। আমাকে না?

পড়ে।

ধেৎ। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টিয়া আবার ছোটে।

জলের কলসী কাঁখে তুলে টিয়া দেখল কাটকাটা রোদ্দুরে মেষগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। টিয়া বাড়ি ঢুকল না। রাণীর পেটের বাহার দেখিয়ে নিজের কীর্তির জন্য খানিক গর্ব হয়েছিল। তেমনি গর্বভরে পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল। এই শুনেছিস?

চোখ তুলে তাকাল শিমুল। আরো কাছে এসে বলল, কী?

রাজার হুকুম?

যেন শোনেনি, চোখে মুখে এমন ভাব আনল শিমুল। কী হুকুম?

পানি পাবি না।

শিমুল খপ করে হাত ধরে টিয়ার। এই, তুই বুঝি কান পেতেছিস?

হুঁ। তেমনি গর্বভরে টিয়া বলল।

তা সত্যি কেন? শিমুল আঙুলে চাপ দিল। আর নীল ফুলের কাঠি পরিয়ে দিই।

হাত ছাড়িয়ে নিল টিয়া। ভীষণ ও তুই। লাগবে।

অর্থপূর্ণ হাসল শিমুল। ধেৎ, লাগবে না ছাই। অত বড় হয়েছিস না?

বাতাসে টিয়ার ঘাড়ছুঁই চুল উড়ছিল। কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থেকে শিমুল বলল, আর তুই বাঁশী শুনলে আসিস না কেন?

কেন? টিয়া চোখ নিচু করল এবার। কেন আসব?

শিমুলের ভয় হল। তোরা বুঝি ভিন দেশে চলে যাবি?

কী জানি। লম্বা করে উচ্চারণ করল টিয়া।

কী অত ভয়? শিমুল গম্ভীর হল এবার। জানিস, গাঁ বুড়োকে ধরে নিয়ে গেছে। চারদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, রাজার সংগে আমাদের যুদ্ধ হবে রে টিয়া।

ঝুঁকে পড়ে একটা মেষশাবকের পিঠের ওপর হাত রেখে নিচু হয়ে আদর করল টিয়া। তুই যাবি?

না।

কেন?

যুদ্ধ করব। গাঁ ছেড়ে কোথায় যাব? প্রথমে কপাল কুঁচকোল, তারপর ভুরু দুটো অনেকখানি ওপরে তুলে বলল, গাঁ বুড়ো বলে গেছে, আমাদের অনেক দায়। সে বুঝবি না তুই।

টিয়া ও কথায় কান না দিয়ে ভয় গলায় বলল, আর বাঁশী বাজাস না তুই। রাজার কানে গেলে তোকে ধরে নিয়ে যাবে। শুনেছি বাঁশী-টাঁশি ভাল লাগে না রাজার। ওর হাত ধরল টিয়া।

শিমুল আকাশে তাকাল। কিন্তু অভিমান আনল গলায়। গেলেই বা, তোর কি? এইবার চোখ ফেরাল শিমুল। ভয় হয় তোর।

হয়। শূন্য কলসী কাঁখে তুলে রোদ্দুরের ভেতর ডুবে যেতে যেতে বলল, হয় গো, হয়। খানিক দূরে ছুটে গিয়ে কলসীটা নামাল কাদা লাগা ঘাসের ওপর। কাপড়টা গোছাল করে বুকে তুলল। তারপর হাঁকল, শি-মু-ল।

তাকাল শিমুল।

হয় না—আ-আ।

পল্টন জাহাজ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মুখ লুকিয়ে চলে গেছে কাল। অন্ধকারে চার দেওয়ালের ভেতর চর্বচোষ্য খাদ্য সাজিয়ে চন্দন দিয়ে চাঁদ কপালে এঁকে
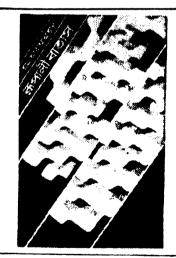
হাতে গোলাপ নিয়ে দীর্ঘ দন্টো বসন্ত এই প্রবাসে রাজা বসেছিল। কাল ফিরে গেছে চন্দন মন্ছে, গোলাপ ফেলে একটা বিরাট রক্তের তিলক এ'কে কপালের ওপর।

এই মাটির ওপর যদিও এখন বারুদের গন্ধ নেই কিন্তু পোড়া মাটির গন্ধ রক্তের গন্ধ বাতাসে সাঁতার কাটছে। আর্তনাদ, মৃত্যু, হাহাকার, ধর্ষণ, সব মিলিয়ে একটা আশ্চর্য দৃশ্য যেন গাঁ বুড়ো চোখ বুজোলেই দেখতে পায়।

তাই ঘুমোতে চায় না গাঁ বুড়ো। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ নিয়ে বুড়ো সারা রাত মাঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। নরকঙ্কালের গায়ে হাত বুলিয়ে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর নিজের বুকে হাত রাখে গাঁ বুড়ো। দেখ, আমি কিন্তু বেঁচে আছি। গাঁ বুড়ো মাথা থেকে পালকের টুপি তুলে নেয়। আকাশে তাকায়। তারা-জ্বলা আকাশ। অজস্র নক্ষত্রের নিরুপম আলো সদ্য মুক্ত মাঠের ওপর, ঝর্নায়, পাহাড়ের চূড়োয় মিশে আছে। গাঁ বুড়ো হাঁটতে হাঁটতে আর একটা কঙ্কাল স্পর্শ করে। চুপি চুপি বলে, কী শুনেছো, কান্না? পুত্রহারা মায়ের কান্না? ওদিকে দেখ, ওটা শিশুর কঙ্কাল। ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বর্শায় লুফে নিয়েছিল। ওটা চেনালে না, ধর্ষিতা রমণীর শব। ওরা জল চেয়েছিল। তৃষ্ণার জল। দেখ, শত্রু কি মিত্র ঘরে কঙ্কাল হও তুমি, দেখ, কত গলিত শব, কত রক্ত, কত কঙ্কাল।

ভোর হতে আর দেরি নেই। গাঁ বুড়ো অবসন্ন দেহ নিয়ে ঘরে ফেরে। আলপথের ওপর দিয়ে, আঙুরখেতের ভেতর দিয়ে, আপেলের বাগান পার হয়ে টিয়াদের উঠানে এসে দাঁড়াল। কেউ নেই। টিয়ার মায়ের কাতর আর্তনাদে গাঁ বুড়ো উঠোনের এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। তিনটে রাজসেনা ওকে উলঙ্গ করে উঠানে নামিয়েছিল তখন। তারপর আনল টিয়াকে। ওদের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল টিয়ার মা। কালো কালো দাঁত বের করে হি হি করে হেসেছিল ওরা তিনজনে। ধর্ষণ করল বুড়োর চোখের ওপর। টিয়া কাঁদছিল। চোখে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে কাঁদছিল। বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে কুয়োয় ঝাঁপ দিতে গেল। আর দিয়েই তবেক।

কুয়োটা কেমন পাকা করে গেঁথে তুলেছে রাজসেনারা। রাস্তার দিকে মুখ করা তিনটে বড় বড় গর্ত। সেই গর্তের মুখে তিনটে কামানের মুখ। ভেতরে কয়েকটা খাত বাঁধ বাবরী ফেরে।

চোখ বুজে বুড়ো মাঠের দিকে চলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখেছে গর্তের মুখে টিয়ার রক্তাক্ত দেহটা। দুটো হাঁটুর পাশ দিয়ে জবজবে রক্ত কাপড়ের কিছুটা আর কিছুটা ধুলোকণাকে ভিজিয়েছে।

বুড়ো এখন আলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এ সব ভাবছিল। বুড়োর কাঁধে ঝোলানো ঝোলাটায় টিয়ার সেই রক্তাক্ত কাপড়টা। কাঁধের ঝোলাটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরে জোরে জোরে চলিল। বেলা বড় হচ্ছে। রোদ আবার আগের মত শ্যামল তৃণভূমি, আপেল গাছ, আঙুরের ফল স্পর্শ করেছে। বুড়ো এখন জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে সজোরে হাঁকল—শকুন, শকুন।

কেউ নেই মাঠে। প্রত্যুত্তর নিয়ে প্রতিধ্বনি বাতাসে ভাসল না দেখে বুড়ো কেমন বিমর্ষ হল। বিমর্ষ চোখ তুলে মাঠে তাকাল। কেউ নেই মাঠে। জেরে মরদ কেউ নেই ঝর্নায়।

অথচ কতদিন দেখেছে এই মাঠের ওপর টিয়াকে। শিমুলকে। এই মাঠ থেকে কতদিন বুড়ো শুনেছে শিমুল বাঁশী বাজিয়ে টিয়াকে ডাকছে। চার দুপুরে মেষের মত মেষের দলের ভেতর লুকিয়ে থেকে কতদিন শুনেছে—

বাঁশী বাজাস কেন?

তোকে ডাকছ।

টিয়ার আঁচলে হাওয়া এসে বেয়াদবের মত মাটিতে লুটিয়ে দিলে কাঁধে তোলে। ডাকবি না।

কেন?

মুখ ভ্যাঙায় টিয়া। মিথ্যুক। বড় হলে গাঁ ছেড়ে তুই তো শহরে চলে যাবি। আপেলের সওদা নিবি।

কখনো না। শিমুল বলে, এই মাঠ, তুই, এ সব ছেড়ে কোথায় যাব। যাব না। এই মাঠ আমার। তোর। এই মাঠে আমাদের ছেলেরা মেষ চরাবে। মেয়েরা যাবে ঝর্নায়। তুই আমি দেখব। দেখবি না?

টিয়া হাসে। যা!

গাঁ বুড়ো হাত তুলে এবার মেষের ভঙ্গি ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে, সব কিন্তু শুনে ফেলেছি।

শিমুল লজ্জা লজ্জা চোখ করে মাটির দিকে তাকায়। কী শুনেছ বল তো?

তবে বাঁশী বাজা, বলব।

না। টিয়া সলজ্জ চোখ তুলে আপত্তি করে।

কেন? শিমুল তাকায়।

গাঁ বুড়ো যে বলবে।

তাতে কি?

টিয়া আরো লজ্জা পায়। হাত ধরে শিমুলের। শরম লাগে।

এ সব ভাবতে গেলে গাঁ বুড়োর চোখ কেমন জ্বালা করে। চোখে হাত চাপে নিল বুড়ো। একটু জোরে জোরে এই খোলা মাঠে হাঁটলে মাথার লম্বা লম্বা পাকাকশগুলোয় হাওয়া কাটা কেমন সিরসির শব্দ ওঠে। এই অস্তিত্বটার বেহালা কেমন তখন কঠিন, কেমন দৃঢ় বলে মনে হয়।

ভীষণ তেষ্টা পেলে এখন বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে ঝর্নার সামনে এসে দাঁড়াল। আঁচলা ভরে জল খেল। কিন্তু জ্বালা তবু জুড়োল না। অবগাহন স্নান করতে ইচ্ছা হল বুড়োর। কেউ নেই মাঠে। সবুজের ওপর, ঝর্নার ওপর মেলা

রোদ্দুরের ছায়া। কোমর থেকে জীর্ণ বাস খুলল বুড়ো। কাঁধের ঝুলি নামাল। মাথা থেকে পালক খুলে সযত্নে সাজিয়ে রাখল একটা পাথরের ওপর। তারপর জলে নামল। শিশুর মত উলঙ্গ শরীরে জল ছুঁড়ল। সাঁতার কাটল পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে। কাঁধডোবা পাথরগুলোর ওপর উঠল। শিশুর মত এ পাথর থেকে ও পাথরে গেল। শেষ পাথরের ওপর পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল। সযত্নে হেঁট হয়ে বাঁশীটা তুলল। বুড়ো বাজাতে চাইল। কিন্তু চোখের জলধারা কেমন সব রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। না বাজিয়ে চোখের জল মুছে আবার জলে নামল।

কতদিন দেখেছে এমনি খেলা করছে বালকেরা। জল ছুঁড়ছে। পাথর ডিঙোচ্ছে। মেঘগুলো ভরপেট জল খেয়ে নিথর দাঁড়িয়ে আছে মুখ তুলে। না মেঘ, না রোদ্দুর আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে টিয়া হয়তো জলে বুক ডুবিয়ে বকছে, এই জল দিবি না গায়। বোকার মত তাকাবি না।

দেব। শিমুল জল ছুঁড়েছে। বেশ করব তাকাব।

ভেজা বুক জলের ভেতর তুলে টিয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লোলুপ দৃষ্টি তুলে শিমুল হকচকিয়ে তাকিয়ে থেকে বলেছে, এই জলের ভেতর একটা ঘর গড়ব টিয়া। তোকে লুকিয়ে রাখব।

টিয়া আবার বুক ডুবিয়েছে জলের ভেতর। নিজের ঘরে রাখতে পারবি না, তাই বল। টিয়া এবার ডুব দিয়েছে। জলের ভেতর নিশ্বাস ছেড়ে জলের ভেতর বুড়বুড়ি তুলেছে। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বলেছে, চোর কোথাকার।

যাবি আমার ঘরে?

তোর মুরোদ বড় আমার জানা আছে। তারপর উদাস গলায় বলেছে, এই ঝর্না যেখান থেকে এসেছে, আমাকে দেখাতে নিয়ে যাবি একদিন?

যাবি? শিমুল ছোট্ট ভিজে কাপড়ে লেপ্টে থাকা শরীর দেখতে দেখতে হাত ধরেছে, চল।

বুড়োর কেমন আনন্দ হয়েছে তখন। চারণকবিদের মত পাহাড়ের ওপর উঠে গান গেয়েছে আর নিজের ছায়া দেখেছে ঝর্নার জলে। এই সবুজ মাঠের গান, তৃষ্ণার জল তার গান, রূপবতী কন্যার গান, সে ত্রিকালদর্শী তার গান। এক সময়ে গান থামিয়ে চুপিচুপি ঢুকে গেছে বনের ভেতর।

গাঁ বুড়োর এখন নতুন করে সব মনে পড়ল। ঝর্না, মাঠের সবুজ, রোদ্দুর, পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সবুজের মেলা, আপেল বাগান আঙুরের খেত আর তার এই বাঁশীটা। শুকনো পাথরের ওপর দু' ফোটা চোখের জল পড়তেই নিজে হাতে জল তুলে তা মুছে দিল। দিয়ে বাঁশীটা হাতে নিয়ে আবার উঠে এল। ভিজে শরীরের ওপর নিজের জীর্ণ বাস পরল। মাথায় পালক তুলল, ঝোলাটা কাঁধে নিল।

নিয়ে দেখল, ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ বিজয়পতাকা হাতে নিয়ে ছুটেছে। উৎসবে যোগ দিতে। শ্বেত আর রক্তবর্ণ পতাকা। মুখে গৌরবের হাসি, বিজয়ের চিহ্ন। রক্তের ছোপ লাগা টিয়ার কাপড়টা বের করল বুড়ো। সযত্নে চার ভাঁজ করে বাঁশীতে বাঁধল দুটো প্রান্তভাগ। তারপর ওদের সঙ্গে বিজয়মিছিলে মিশে যাবে বলে শীর্ণ হাতে উৎসবের পতাকা নিয়ে ঝর্নার জলে নিজের ছায়া দেখল গাঁ বুড়ো।

মুক্তিসংগ্রামে টাঙ্গাইল

রেবতীমোহন সাহা

২৫শে মার্চের কালরাত্রির পর তিনজন সহপাঠীর সঙ্গে রাজধানী ছেড়ে কাদের সিদ্দিকী চলে আসেন তাঁর জন্মস্থান টাঙ্গাইলে। ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত টাঙ্গাইলের জনজীবন মোটামুটি শান্তই ছিল। সেখানে পাকবাহিনী যায় নি, কোনো অত্যাচারও করেনি। কিন্তু সিদ্দিকী তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এদের বর্বরতার পূর্ণ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন তাই E P R-এর একটি বিচ্ছিন্ন দলের সঙ্গে নিজের অন্তরঙ্গ কজন বন্ধুকে নিয়ে গোপনে আলোচনা করেন এবং তাঁদের সহায়তায় মোটামুটি অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেন।

৩রা এপ্রিল তারিখের ভোর বেলাতেই খবর এলো—পাক ফৌজ আসছে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের দিকে। E P R-এর পরিচালনায় শুধুমাত্র রাইফেল্স সঙ্গী করে ২৫।২৬ জনের একটি দল টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ সড়কের উপর কালিহাতীর কাছে পাক-সেনার গতিরোধ করে কিন্তু সংখ্যা, নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার অভাবে এ আক্রমণ বিশেষ সফলতা হয়নি। আধঘণ্টার গুলি বিনিময়ের পর এই মুক্তিবাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ আক্রমণে কোনো পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হয় নি।

এর পর কাদের সিদ্দিকী গ্রামে গ্রাম ঘুরে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করতে থাকেন এবং নির্জনে তাদের সামান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এ সময়েও E P R প্রদত্ত সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্রই ছিল তাদের সম্বল।

এর পর ১৯শে এপ্রিল ময়মনসিংহ-গামী আর একদল পাক-সেনার গতিরোধ করেন কাদের সিদ্দিকী তার দলবল নিয়ে। আগের আক্রমণের স্থানের নিকটেই কালিহাতী সেতুর পাশে ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। সন্ধ্যে আমন্ত্রে থেকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তি ফৌজ ৩০১ জন [illegible] করেন এবং [illegible] বহু ২৫।২৬ হয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যায়। তবে এই যুদ্ধে সিদ্দিকীর দলের হাতে আসে ১৫৫টি রাইফেল, দুটি এল এম জি, কিছু মর্টার ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সহ প্রচুর গোলাবারুদ।

সিদ্দিকী জানতেন এর পরই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর আরম্ভ হবে অকথ্য

'কাদের বাহিনী'-র সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী

নির্যাতন, তাই তিনি তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পাকা রাস্তা থেকে দূরে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। উদ্ধার করা সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি শুনেছিলেন সেই অঞ্চলে E P R একটি গোপন ঘাঁটি তৈরি করেছে। কালিহাতী থেকে ৪১ মাইল পথে ছোট এক মসজিদে তারা রাতের মত আশ্রয় নেন এবং বহু চেষ্টা করে সেই দলটির সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হন। পরে পাহাড়ের এই নির্জন স্থানে [illegible] ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। [illegible] ইচ্ছানুসারে তিনি দলের সর্বাধিনায়ক মনোনীত হন এবং এর নামকরণ করা হয় 'কাদের বাহিনী'। এর পর সিদ্দিকীর অক্লান্ত চেষ্টায় শতাধিক যুবক এই দলে যোগদান করেন।

২০শে এপ্রিল থেকে ১৪ মে পর্যন্ত তিনি প্রায় সমগ্র টাঙ্গাইল জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান এবং জেলার সর্বত্র বিশ্বস্ত বন্ধুদের সহায়তায় যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং আওয়ামি লীগ ও স্কুল-কলেজের যুবকদের সংগঠিত করে একটি বিরাট মুক্তিবাহিনী গঠন করেন।

এই ১৪ই মে তারিখে বহেরাটৈল ঘাঁটিতে এক হাজার মুক্তিযোদ্ধার এক বিরাট দলকে মাতৃভূমি থেকে শেষতম হানাদার বাহিনীকে খতম না করা পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে যাবার শপথ গ্রহণ করান। পবিত্র কোরান ও গীতা স্পর্শ করে প্রত্যেকটি যুবক এই শপথ গ্রহণ করেন। এর পর থানাভিত্তিক ভাগ করে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে পাঠান এবং সংগঠনের আয়তন ও কর্মপদ্ধতি যাতে ব্যাপকতর হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। সিদ্দিকীর সংগঠন ও নেতৃত্বদানের অপূর্ব ক্ষমতায় অল্প দিনের মধ্যেই ১৬ হাজার মুক্তি ফৌজ সংগৃহীত হয় এবং তারা সর্বস্ব পণ করে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য কঠোর ক্লেশ ও শ্রমস্বীকার করে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন।

এর পর ২২শে মে কালিহাতীর নিকটে চারাণ নামক স্থানে সিদ্দিকীর একক নেতৃত্বে খানসেনাদের একটি ছোট ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালান এবং শত্রু ঘাঁটি ধ্বংস করে তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেন।

এমনিভাবে অগাস্ট মাস পর্যন্ত ছোটো ছোটো আক্রমণ চালিয়ে কাদের বাহিনী টাঙ্গাইলের বিভিন্ন স্থানে বহু খানসেনা হত্যা করে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে আসে। ইতিমধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক জোয়ানকে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠানো হয়, শিক্ষা শেষে তারা আবার ফিরে আসেন। এই নবশিক্ষিত ও অতি উৎসাহী মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনায় বহু স্থানে আক্রমণ সংঘটিত হয় এবং প্রত্যেকটি আক্রমণে মুক্তিবাহিনী কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র লাভ করতে থাকেন। সিদ্দিকীর অপূর্ব নেতৃত্ব ও ব্যবহারে জনসাধারণ মুগ্ধ হন, এবং এই বিরাট বাহিনীর খাদ্য ও আশ্রয়ের সমস্ত ব্যবস্থা তারাই করে দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে আগস্টের শুরুতেই এই বাহিনী মুজিবনগর এবং ভারত থেকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য লাভ করতে থাকেন।

[illegible] এই সংক্ষিপ্ত [illegible] টাঙ্গাইলের সমস্ত যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ

দেওয়া সম্ভব নয় শুধু উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণই বর্ণনা করবো।'

'কাদের বাহিনীর' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয় অভিযান হলো ভূয়াপুরের নিকটে মাটিকাটা নামক স্থানে একটি অস্ত্রবোঝাই আমেরিকান জাহাজ আক্রমণ এবং ২১ কোটি টাকার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার। এই ঘটনাটি ঘটে ১১ই আগস্ট। ভূয়াপুরে কাদের বাহিনীর যে ঘাঁটি ছিল, তাতে ছিল এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা। কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন মেজর হাবিব। ২৩-২৪ বছরের এই যুবকটিকে দেখে কিন্তু তেমন কিছু মনে হয় না, অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের শান্ত ও ভদ্র একজন যুবক, খুব কম কথা বলেন কিন্তু কাজ করেন নীরবে, সকলের অগোচরে। মেজর হাবিবের নাম অনুসারে এই কোম্পানির নাম ছিল হাবিব কোম্পানি।

৯ই আগস্ট টাঙ্গাইলের ঘাঁটি থেকে খবর এল ধলেশ্বরী নদীপথে সাতটি পাক জাহাজ যাচ্ছে। টাঙ্গাইল থেকে ১৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ভূয়াপুরে। এখানে আছে একটি কলেজ আর একটি বাজার।

জাহাজের বিস্তারিত খবর কিছুই

জানা যায়নি, তাই ১০ই আগস্ট ভোরবেলায় অধিনায়ক হাবিব তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী জমশেদকে সঙ্গে করে নদীর ধারে ধারে ঘাঁটির দিকে পথ ধরলেন। হাবিব ধরেছেন একজন সাধারণ কৃষকের ছদ্মবেশ, হাতে কাস্তে, পরনে ময়লা লুঙ্গি, মাথায় গামছা। আর জমশেদ ধরেছেন জেলের ছদ্মবেশ—হাতে মাছধরার জাল ও খলুই। হাঁটতে হাঁটতে মাইল আটেক এসে তারা দেখতে পেলেন সাতটি জাহাজ মাঝ নদীতে নোঙর করে বিশ্রাম নিচ্ছে। অনেকক্ষণ দুজন অপেক্ষা করলেন নদীতীরে। শেষে প্রায় দুপুরবেলায় ছোট একটি স্পীডবোটে করে নেমে এলো চারজন খানসেনা আর একজন বাঙালী দালাল। দালালটিই ওদের কাছে জানতে চাইল পোড়াবাড়ির চমচম আর হাঁস মুরগী-আণ্ডা পাওয়া যাবে কোথায়, তার নির্দেশ। ওরা পাশের মাটিকাটা, মাকেশ্বর ও সাঁইলা গ্রামের দিকে দেখিয়ে দিল হাল পোড়াবাড়ি সেখান থেকে ১০।১২ মাইল দূরে। শুধু সংবাদ দিলই না সংগ্রহও করলো—জাহাজগুলো অসছে ঢাকা থেকে, যাচ্ছে রংপুরের সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে। ছোটো ছোটো ৬ খানা স্টীমারে রয়েছে সৈন্যদের খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আর বড়ো জাহাজে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র। আর সঙ্গে যে লঞ্চটি রয়েছে তার মালিক পাবনার কুখ্যাত দালাল ঢোরা মতিন।

যথাসময়ে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে ওরা ফিরে এলো নিজেদের ঘাঁটিতে। তারপর কিভাবে কোন জায়গা থেকে আক্রমণ করবে তার পরিকল্পনা করতে আরম্ভ করলো।

ভুয়াপুরের ৫ মাইল উত্তর-পূর্বে মাটিকাটা গ্রামের কাছেই বিরাট মাটিকাটা চর, তার পাশে নদীর ধার ঘেঁষে দু খানা ছোটো বাড়ি। চারদিকে ধনপাটের আবাদ। বাড়ের আঁধারেই বাড়ি দুটোতে তৈরী হলো সুদৃঢ় আমবুশ। আগেই ওরা খবর নিয়ে এসেছিল পরদিন জাহাজগুলো ছাড়বে; স্রোতের বিপরীত দিকে আসবে তাই হয়তো একটু বেশি সময় লাগবে।

এদিকে এক কোম্পানী দুর্ধর্ষ জোয়ানকে দুটি ভাগে ভাগ করে দুটি বাড়িতে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন অধিনায়ক হাবিব। তিনি নিজে একটি স্টেনগান নিয়ে জাহাজগুলোর আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। পাশে অন্যান্য মুক্তি-যোদ্ধাদের হাতে রয়েছে এল এম জি ও দু ইঞ্চি মর্টার। আগেই সবাইকে বলে দেওয়া ছিল—হাবিব নিজে প্রথমে গুলি ছুড়বেন আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হবে তীব্র আক্রমণ, যাতে শত্রুদের দিশেহারা করে দেওয়া যায়। আর গেরিলা আক্রমণের সাফল্য নির্ভর করে এই আকস্মিক আক্রমণ শত্রুকে বিভ্রান্ত করার উপর।

নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু জাহাজের দেখা নেই, এক কোম্পানী মুক্তিপাগল যোদ্ধা অস্থির হয়ে উঠছে প্রতীক্ষা করে করে। শেষ পর্যন্ত একটি দুটি করে চারটি জাহাজ ওদের অতিক্রম করে চলে গেল তবুও অধিনায়কের কোন নির্দেশ নেই। গেরিলা বাহিনীর জোয়ানরা মৃদু গুঞ্জন তুলল। পজিশন নিয়ে ট্রিগারে হাত দিয়ে বসে আছে সবাই, সময় বয়ে যাচ্ছে, সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে জাহাজ অথচ কোনো নির্দেশ আসছে না অধিনায়কের; ওদের ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে যাবার উপক্রম তবুও মানতেই হবে নেতার নির্দেশ। তাঁর নির্দেশ ছাড়া একটি গুলি ছুঁড়লেই এত বড়ো একটা পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তাই হাত নিসপিস করলেও তারা সবাই চুপচাপ বসে আছেন। তবুও মেজর হাবিবের মনে কোন চাঞ্চল্য নেই। দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে তিনি দেখছেন জাহাজগুলো। একটু পরেই তাঁর দৃষ্টিতে পড়লো পঞ্চম জাহাজটি, তার গায়ে স্পষ্ট করে লেখা R S U Engineers L C-3 জাহাজটির দু দিকে দুটি মেশিন গান বসানো, জাহাজরক্ষী খানসেনারা দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন পরম নিশ্চিন্তে। তখন বাংলাদেশ সময় ২-৩০মিঃ, মুহূর্তে গর্জে উঠলো অধিনায়ক হাবিবের স্টেনগান। সঙ্গে সঙ্গে যেন হাজার অগ্নিপিণ্ড বিদ্যুৎ ছুটে চললো জাহাজের দিকে। মিনিট দশেকের মধ্যেই জাহাজের কামান দুটি স্তব্ধ হয়ে গেলো। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জাহাজের সারেং-এর কামরা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো মর্টারের শেলে। জাহাজ গতিভ্রষ্ট হয়ে মাটিকাটার চরে আটকে গেল। ইতিমধ্যে প্রায় ১৫।১৬ জন খান সেনা প্রাণভয়ে নদীতে নেমে পড়েছে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের অব্যর্থ লক্ষ্য থেকে তারাও রেহাই পেলো না। এই মাটিকাটায় বাসন্তী অষ্টমীতে স্নানযাত্রার বিরাট মেলা বসে, হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে স্নান করেন আর মানত করেন কিন্তু প্রাণরক্ষার তাগিদে খানসেনারা সেই পুণ্য স্থানে ডুব-সাঁতার দিয়েও প্রাণে বাঁচতে পারলো না। এই সঙ্গে দালাল মতিনের সাধের লঞ্চ S T Rajen-ও মুক্তিবাহিনীর শেলের আঘাতে সলিল সমাধি লাভ করলো।

মাত্র ১ ঘণ্টার যুদ্ধ কিন্তু সে যেন মহাপ্রলয়। বাংলার স্নিগ্ধ-নিভৃত পল্লীর বুকে হঠাৎ যেন কালবৈশাখীর ঝড় এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল, আবার মুহূর্তে সব শান্ত। বাকি জাহাজগুলো সব দ্রুতবেগে পালাবার দিকে পালিয়ে গেছে। এমন সময় সাদা পতাকা হাতে

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিবের ডাকে অস্ত্রসমর্পণ করছেন কাদের সিদ্দিকী

লাইফ-বোটে করে দু'জন বাঙ্গালী নাবিক জাহাজ থেকে নেমে এলো। তাদের দু'জনকে হাজির করা হলো অধিনায়ক হাবিবের কাছে। তারা জানালো—জাহাজরক্ষী এক প্লাটুন খানসেনা সম্পূর্ণ খতম হয়েছে. জাহাজে রয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ যা শীঘ্র নামিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। মেজর হাবিবও ওদের সঙ্গে একমত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় তাড়াতাড়ি সব অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ফেলতে। মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রামবাসী মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সম্মিলিত চেষ্টায় আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাই কাজে লেগে গেল। রাত প্রায় ১১-৩০ মিঃ মধ্যে জাহাজের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ফেলা হল। কামান, মর্টার, এল এম জি, স্টেনগান, রাইফেল, গোলা-বারুদ নৌকায় বোঝাই করে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। অস্ত্র নামানো শেষ হতে হতেই সার্চ লাইটের আলোতে সবাইকে চমকে দিয়ে দুরপাল্লার কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হল। অধিনায়ক নির্দেশ দিলেন সমস্ত পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের দূরে চলে যেতে। আর গেরিলা-

গণও জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যে যার মতো সরে পড়লো।

পরদিন ১২ আগস্ট হারানো অস্ত্রশস্ত্র পুনরুদ্ধারের আশায় পাক্ বাহিনী ভুয়াপুরে আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন—এই খবর এসে পৌঁছালো মেজর হাবিবের কাছে। এদিকে তখন সর্বাধিনায়ক সিদ্দিকী দু' কোম্পানী দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে দ্রুত এগিয়ে এলেন। এ খবর পাওয়া মাত্র হাবিব ও তাঁর দলের জোয়ানদের মনে দ্বিগুণ উৎসাহের সৃষ্টি হলো এবং নব-উদ্যমে তারা কাজ আরম্ভ করলেন।

দু'টি গেরিলা বাহিনী কেবল একত্র হয়েছেন মাটিকাটা গ্রামের কাছে, সিদ্দিকী ও হাবিবের মধ্যে কেবল আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, এমন সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা খবর নিয়ে এলো—এক ব্যাটেলিয়ন পাক-ফৌজ মাটিকাটার চরে অবতরণের চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাধিনায়ক নির্দেশ দিলেন সবাইকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পজিশন নিতে। এবং সর্ব শক্তি দিয়ে ওদের হটিয়ে দিতে। সিদ্দিকীর উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাগণ তখন দ্বিগুণ শক্তিতে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন এবং সদ্য লুণ্ঠিত সর্বাধুনিক আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে অনায়াসেই তারা তাদের নেতার সে নির্দেশ পালন করতে সক্ষম হলেন। খানসেনারা বাধ্য হয়ে যমুনা নদীতে হটে গেলো কিন্তু একেবারে চলে গেলো না।

সর্বাধিনায়ক সিদ্দিকী তখন লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র পাহাড়ের মূল ঘাঁটিতে পাঠাতে থাকেন। নৌকা ভর্তি করে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র চলেছে মাঠের উপর দিয়ে, কোথাও বা পাট ক্ষেতের আড়াল দিয়ে, কোথাও গ্রামের পাশ ঘেঁষে বা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।

এদিকে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, আঁধার নেমে এলো সারা পল্লীর বুকে। চর পাশের অবস্থা শান্ত। খবর এলো রাতের মধ্যে আর আক্রমণের সম্ভাবনা নেই।

পরদিন ১৩ই আগস্ট। ভোর হতে না হতেই নদীপথে পাক্ বাহিনী মরীয়া হয়ে আবার আক্রমণ চালালো। কিন্তু সদা জাগ্রত মুক্তি বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আবার তারা যমুনা নদীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

তখন মুক্তিবাহিনীর দু'টি কোম্পানীর অধিনায়ক এগিয়ে গিয়ে ওদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছেন কিন্তু ইতিমধ্যে সর্বাধিনায়ক সিদ্দিকী সংকেতে নির্দেশ পাঠালেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবস্থান পিছিয়ে নিতে; কারণ এর পর চারদিক থেকে আক্রমণের আশংকা আছে, বিশেষ করে বিমান আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী।

২৪ বছরের একজন যুবক, এই কমাস আগেও যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছিলেন, তাই আজ তিনি বিশ্বের বিস্ময়; যিনি নামমাত্র সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের দক্ষতায় ১৬ হাজার দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধার সর্বাধিনায়ক রূপে তাদের পরিচালনা করছেন—তিনি যে ভবিষ্যৎবাণী করলেন মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হলো। দু'টি জঙ্গী বিমান এসে মাটিকাটায় তাদের পূর্ব-অবস্থানের উপর আরম্ভ করলো বিমান আক্রমণ। গ্রামবাসিগণ আগেই এ অঞ্চল ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিলেন তাই বিমান আক্রমণে নিরীহ মানুষ তেমন মারা পড়লো না কিন্তু বোমা ও কামানের আঘাতে ৪।৫টি গ্রাম পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে 'সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে', কাজেই বিভিন্ন দিক থেকে পাক্ সৈন্য এগিয়ে এলো ভুয়াপুরের দিকে। দক্ষিণের এলাশিন, নারাইন্দার পথ ধরে আসছে একদল আর একদল আসছে পূবের কালিহাতীর পথ ধরে। অবশ্য ইতিমধ্যে পাহাড়ের মূল ঘাঁটি এবং জেলার সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রে খবর পাঠানো হয়েছিল, তাই বিভিন্ন স্থান থেকে ৫।৬টি কোম্পানী ভুয়াপুরে এসে পৌঁছেছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে তখন আসছে।

দু'দিক থেকে পাক্ সৈন্যের আগমনের

বার্তা আসার দুদিকে তাদের বাধা দিতে এগিয়ে গেলো মুক্তিবাহিনী। তারা পথে অবরোধ সৃষ্টি করে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করতে থাকলো। এদিকে সিরাজগঞ্জ থেকেও নদীপথে আক্রমণ অব্যাহত থাকলো। সারা দিন ধরে তিন দিকে যুদ্ধ চললো. এর মাঝেও দু' তিন বার বিমান আক্রমণ ঘটলো কিন্তু কাদামাটি আর থইথই জলের রাজ্যে সে আক্রমণ বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না।

সেইদিন অর্থাৎ ১৩ আগস্ট বিকেল ৪-১০মিঃ সর্বাধিনায়ক সংকেত বার্তায় জানালেন রাত ১২টা পর্যন্ত খানসেনাদের বাধা দিয়ে রাখতেই হবে, আর ইতিমধ্যে সমস্ত লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র গারো পাহাড়ের হেড্ কোয়ার্টারে পৌঁছে যাবে। কাজেও ঠিক তাই হলো, রাত ১২টার মধ্যেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে গেল নিরাপদ ঘাটিতে। আর মুক্তি যোদ্ধারাও ১২টার পর আস্তে আস্তে যুদ্ধ বন্ধ করে সরে এলো শত্রু-সেনাদের আওতা থেকে।

এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর লেফটানেণ্ট আতাউল্লাহ ও সুবেদার রহিম খান সহ ১৫৭ জন নিহত হন, ২০।২১ জন জলে ডুবে মারা যান, আর আহত হন শতাধিক। আশ্চর্যের বিষয় মেজর হাবিবের ভাষায়—জাহাজ ছাতার নীচে থেকে তারা যুদ্ধ করেছে ওই তাদের দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনীর একজন মাত্র শহীদ হয়েছেন—তিনি হলেন আব্দুল খুদ্দুস; আর অন্য তিনজন আহত হয়েছিলেন তাঁরা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয় ১৭ই আগস্ট ধলাপাড়ায়। পাক-দালাল ও রাজাকারদের সহায়তায় পাকবাহিনী ধলাপাড়ায় সর্বাধিনায়ক সিদ্দিকী ও তার দলের অবস্থানের কথা জানতে পেরে তিন-দিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে সিদ্দিকী খুব অসুবিধায় সম্মুখীন হন। সিদ্দিকী নিজেই তাঁর জীবনে ধলাপাড়ার যুদ্ধকেই সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। তিন-দিক থেকে যখন শত্রুসৈন্য তাদের অবস্থান ঘাঁটি ঘিরে ফেলে তখন চতুর্থদিকে ছিল জলাভূমি কাজেই পালানোর কোনো পথই ছিল না। তার মধ্যে একটি ছদ্মবেশী শত্রু দলকে ভুল করে নিজের দলের জোয়ান মনে করেন এবং প্রায় ৪০ গজ পর্যন্ত সামনে এগিয়ে আসতে দেন, কিন্তু যখন বুঝতে পারেন আসলে তারা ছদ্মবেশী শত্রুসৈন্য তখন বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়ে শত্রুব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে সেখান থেকে এক কোম্পানী মুক্তিসেনা সহ বেরিয়ে আসতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধে ১৭ জন খানসেনা নিহত হয় কিন্তু মুক্তিবাহিনীর পক্ষে একমাত্র সিদ্দিকী সামান্য আহত হন। বাংলাদেশের একটি পত্রিকায় দেখেছি একটি সাক্ষাৎকারে সিদ্দিকী বলেছেন—"আমি কাদের সিদ্দিকী নই, কাদের সিদ্দিকী ধলাপাড়ার যুদ্ধেই মারা গেছে। এখন আমি শুধু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ—তাঁর নির্দেশ।" সিদ্দিকীর ধারণা ছিল যারা দেশের জন্য প্রথম মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ করেন তাঁরা কখনো বাঁচেন না এবং তিনিও বাঁচবেন না, কোন না কোন যুদ্ধে তিনি মারা যাবেনই, কাজেই মৃত্যুর জন্য তিনি সর্বদাই প্রস্তুত হয়েই থাকতেন।

এরপরও টাঙ্গাইলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১৫০ বার খান সেনাদের সঙ্গে কাদের বাহিনীর যুদ্ধ বাধে এবং প্রায় সবগুলোতেই খান সেনাদের ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। সেই তুলনায় মুক্তিফৌজদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অতি সামান্য।

স্বয়ং সিদ্দিকীর কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছি—"আমরা ছিলেম ন্যায়ের পক্ষে তাই আল্লা আমাদের রক্ষা করেছেন, মেশিনগানের গুলি এ পাশ ও পাশ দিয়ে চলে গেছে কিন্তু আমাদের গায়ে লাগেনি। তা ছাড়া খান সেনাদের বিরাট বিরাট শরীরই ওদের কাল হয়েছে, আমাদের লক্ষ্য প্রায়ই নির্ভুল হয়েছে আর আমাদের দেশের ছোটো খাটো ছেলেগুলো সামান্য গাছ বা ক্ষেতের আলের আড়ালে

DCM
TEXTILES

থেকেও আক্রোশে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং ওদের তুলনায় আমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অতি সামান্য।"

সমগ্র বাংলাদেশ আজ ধ্বংসের মহা-শ্মশানের রূপ ধারণ করেছে। খান সেনাদের অত্যাচারের চিহ্ন আজ বাংলার ঘরে ঘরে। কোথাও তারা একই স্থানে লক্ষাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, কোথাও অজস্র রমণীকে ধর্ষণ করেছে, লুঠ করেছে গ্রাম শহর গঞ্জ, কিন্তু টাঙ্গাইলের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস তার ব্যতিক্রম; এখানে বাঙ্গালী মার খেয়েছে খুব কম, কিন্তু মার দিয়েছে বেদম। মাত্র ৭৩ জন মুক্তিযোদ্ধার প্রাণের বিনিময়ে ১২৫৩ জন পাক-সৈন্যকে খতম করেছে টাঙ্গাইলের মাটিতে। তিনশটি খণ্ড ও পূর্ণ যুদ্ধের প্রায় সবগুলোতেই খানসেনা নিদারুণভাবে পরাজিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কাদের সিদ্দিকীর মাথার মূল্য ঘোষণা করেছে ১০ হাজার টাকা; আর যে কোন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে দেবার বিনিময়ে ১ হাজার টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করা হয়, কিন্তু কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি, কারণ টাঙ্গাইলে দালাল শ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুবই কম; তাই পাকবাহিনী এখানে এতো বেশি করে মার খেয়েছে। সমগ্র জেলার অধিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে সর্বতোভাবে; তারা তাদের খাদ্য দিয়েছে, বাসস্থান দিয়েছে এবং টাকা পয়সা সোনা গয়না দিয়ে সাহায্য করেছে এবং শেষ পর্যন্ত টাঙ্গাইলের অধিবাসী সিদ্দিকীকে এক লক্ষ মণ পাট দান করেছে। টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের মূলে রয়েছে তাই টাঙ্গাইলের জনসাধারণের সর্বাত্মক সহযোগিতা।

এভাবে ডিসেম্বরের তিন তারিখ পর্যন্ত নানা স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে সময় কাটে আর কাদের বাহিনী সর্বাঙ্গীনভাবে সুগঠিত হয়ে উঠে। ৩রা ডিসেম্বর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় এবং দেশের ঘটনাবলীরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

১০ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের কাছে ভারতীয় ছত্রীবাহিনী অবতরণ করে। তারা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এমন কি কামান ও ছোটো জীপ গাড়ি নিয়ে অবতরণ করতে সক্ষম হয়। পুরো এক ব্রিগেড সৈন্য অবতরণ করে এভাবে বিমান থেকে। তারপর অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুক্তি-বাহিনীর সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ আরম্ভ করে এবং পরবর্তী আক্রমণের পরিকল্পনা করতে থাকে। ইতিমধ্যে জামালপুরের পতন ঘটে ১১ই ডিসেম্বর। সেখানকার পাকফৌজের একটি দল ঢাকার উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইলের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ঐ একই দিনে ভারতীয় বাহিনীর ভয়ে ময়মনসিংহ থেকেও সমস্ত পাকফৌজ

ঢাকার দিকে পালাতে থাকে। উত্তর দিক থেকে মোট ১৫৭টি মিলিটারী গাড়ীতে করে মধুপুরে এসে একত্র হয়। ওদিকে মেজর জেনারেল নাগরা ১১ই ডিসেম্বর জামালপুর অধিকার করে টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হন। ওদিকে হালুয়াঘাট সীমান্ত অতিক্রম করে এক ব্রিগেড ভারতীয় সৈন্য নিয়ে ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং তখন শম্ভুগঞ্জে এসে পৌঁছান। নদী পার হতে একদিন কেটে যায়। ১২ই ডিসেম্বর তিনি ময়মনসিংহে প্রবেশ করেন এবং আক্রোশ ময়মনসিংহ দখল করে টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

এদিকে ছত্রী বাহিনীর নেতা মেজর ক্লে ও মুক্তিবাহিনীর নেতা সিদ্দিকীর নির্দেশে ঘাটাইলের কাছে একটি সড়ক সেতু ধ্বংস করে প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি করা হয়। প্রাণভয়ে ভীত পাকসৈন্যদল মধুপুর থেকে বিকেলের দিকে টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে কিন্তু ঘাটাইলের কাছে এসে পথে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয় আর সঙ্গে সঙ্গে ... থেকে ১০।১২ হাজার ফুট থেকে তাদের উপর অগ্নিবাণ বর্ষণ হতে থাকে। মাঝে মাঝে এল এম জি ও স্টেনগানের গুলি চলতে থাকে। এমনিতেই সরবরাহের অসুবিধের জন্য এ অঞ্চলের পাকফৌজ শক্তিহীন হয়ে প্রাণভয়ে পালাতে যাচ্ছিল তার উপর এই হঠাৎ বিপদের সম্মুখীন হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং দেখতে দেখতে হাজারখানেক খানসেনার রক্তে বাংলার মাটি ভিজে যায়। বাদবাকী সবাই ব্রিগেডিয়ার ক্লের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে ভয় পেত, পাছে তাদের হত্যা করা হয়। কিন্তু স্বেচ্ছায় এসে ভারতীয় সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এতোদিন 'কাদের বাহিনী' গ্রামাঞ্চল ও ছোটখাটো শহরাঞ্চলে আক্রমণ চালালেও টাঙ্গাইলের উপরে এক 'রূপবাণী' সিনেমা হলে কাটা গ্রেনেড চার্জ করা ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আক্রমণ করেনি। কিন্তু ১২ই ডিসেম্বর সম্মিলিত ভারতীয় ছত্রী-বাহিনী ও কাদের বাহিনী পাক-ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণের আয়োজন করেন। কিন্তু সামান্য যুদ্ধের পরই পাক-ফৌজ নিজেদের অবস্থা অনুধাবন করে প্রায় দুই হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে

প্রায় বিনা রক্তপাতে টাঙ্গাইল মুক্ত হয় ১২ই ডিসেম্বর বিকেলবেলায়।

১৩ই ডিসেম্বর শেষ রাতে মেজর জেনারেল নাগরা সসৈন্যে টাঙ্গাইল এসে উপস্থিত হন, তাকে এখানে বিরাট অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেইদিনই ব্রিগেডিয়ার ক্লে ও জেঃ নাগরার সঙ্গে সিদ্দিকী আলোচনায় বসেন এবং ঢাকা বিজয়ের পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৪ই ডিসেম্বর রাতে ব্রিগেডিয়ার সনৎ সিং ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইলে পৌছান। ভারতীয় তিনটি ব্রিগেডের সঙ্গে কাদের বাহিনীর সেরা সেরা ৫ কোম্পানী সুসজ্জিত মুক্তিযোদ্ধা তাদের সর্বাধিনায়কের নেতৃত্বে ঢাকা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ঈদের দিন টাঙ্গাইল-ঢাকা সড়ক পথের ১৭টি সেতু মুক্তিবাহিনী ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। আবার এই যাত্রারম্ভের পূর্বে মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরাই সেই সব সেতুর পাশ দিয়ে কাজ চালানোর মতো বিকল্প পথ তৈরি করে দেন। সম্মিলিত এই বিরাট বাহিনী যত দ্রুত সম্ভব ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঢাকার উপকণ্ঠে মীরপুরের মৌচাকে তাদের অবস্থান গ্রহণ করেন। এদিকে তখন বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌবহর এসে পড়ালো প্রায়। সারা বিশ্বের একতৃতীয়াংশ মানুষ প্রতি মুহূর্তে ঢাকার খবরের জন্য ব্যস্ত।

কুমিল্লা ও ফেনীর দিক থেকেও দুটি সম্মিলিত বাহিনী বিপরীত দিক থেকে আসছে ঢাকার দিকে। এদিকে পাক-ফৌজের অবশিষ্ট ৪।৫ খানা বিমানও ভারতীয় বিমানের আক্রমণে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে আর ভারতীয় বিমান তখন সারা বাংলাদেশের আকাশে একাধিপত্য লাভ করেছে। তিন দিক থেকে যখন ভারতীয় সৈন্য ঢাকার উপকণ্ঠে, তখন বাধ্য হয়ে ১৫ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর লেঃ জেঃ নিয়াজী ভারতের মার্কিন দূতাবাসের মারফতে আত্মসমর্পণ করবেন বলে লেঃ জেঃ মানেকশ-এর কাছে আবেদন করলেন। তবুও ঢাকার উপকণ্ঠে বসে চরম বিজয়ের জন্য ভারতীয় বাহিনী পরিকল্পনা করে চলল। তা ছাড়া পাকবাহিনীর কিছু সময় কাটিয়ে দেবার এটা একটা ছলনাও হতে পারে বলে আমাদের আলোচ্য বাহিনীর প্রধানদের ধারণা হলো।

১৬ই ডিসেম্বর ভোরের দিকেই খবর এলো বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য পাক্ জেনারেল জামশেদ মীরপুর সেতুর অপর পার্শ্বে অপেক্ষা করছেন। সেখানে কোনো ডিফেন্স নেই তবুও সংশয়, পাকবাহিনীর এটাও একটা ছলনা হতে পারে। এভাবে আত্মসমর্পণ করবে বলে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে। যাক, শেষ পর্যন্ত সমস্ত সংশয় দূর করে মেঃ জেঃ নাগরা, ব্রিগেডিয়ার ক্লে, ব্রিগেডিয়ার সনৎ সিং এবং কাদের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী ভারতীয় সামরিক হেলিকপ্টারে করে উড়ে চলে গেলেন ঢাকা নগরীতে। জেঃ জামশেদ তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন লেঃ জেঃ নিয়াজীর সদর দপ্তরে। সকলের সঙ্গে করমর্দন করে পরিচয় দিলেন নিয়াজী। শেষে লেঃ জেঃ নাগরা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে নিয়াজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন; নাম শুনে একটু যেন চমকে উঠলেন লেঃ জেঃ নিয়াজী, তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য।

বিকেল ৪টায় ঢাকায় এলেন ভারতীয় বাহিনীর ইস্টার্ন কমাণ্ডের অধিনায়ক জেনারেল অরোরা। তাঁর কাছে ঐতিহাসিক ঘোড়দৌড়ের মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্ম-সমর্পণ করলেন লেঃ জেঃ নিয়াজী, জেঃ ফরমান আলী ও লেঃ জেঃ জামশেদ।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের জনসাধারণ ভারতীয় বাহিনীর নাম দিয়েছে "মিত্র-বাহিনী" বলে, আর সিদ্দিকীকে দিয়েছে 'বঙ্গবীর' উপাধি।

দেখা হয় নাই

॥ ৪১ ॥

বাণেশ্বর

সমবেত কণ্ঠে "বা—বা তারকনাথে-র চরণে—এ সেবা লাগে; মহাদে—ব" ধ্বনি তুলে এইমাত্র একদল গাজন-সন্ন্যাসী আমার বাড়ির সামনের পথটুকু অতিক্রম ক'রে গেল। কলকাতায় যেখানে আমার বাস সেখান থেকে তারকেশ্বরের দূরত্ব চল্লিশ মাইলের কম নয়। সমস্ত চৈত্র মাসটা কঠিন আচার-নিয়ম পালন ক'রে এই সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই প্রথমে যাবে বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাটে। সেখান থেকে বাঁকে ক'রে

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গাজল নিয়ে পায়ে হেঁটে যাবে প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে তারকনাথের মন্দিরে "বাবা"র মাথায় ঢালতে। পদযাত্রীরা শুধু পুরুষই নন; বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়ারাও থাকেন তবে তাঁরা সংখ্যায় কম। অধিকাংশ পুণ্যার্থীই একদিনে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেন না। পথপ্রান্তের ধর্মশালায় তাঁদের রাত্রিবাস করতে হয়। কিছু দূরে দূরে অন্তর যেসব বিশ্রামস্থান আছে সেখানে যাত্রাবিরতি করতে হয় অনেককেই। শ্রান্তি অপনোদনের জন্য সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থা থাকে। আর থাকে ক্লান্ত পা দুটিকে চাঙ্গা করবার জন্য উষ্ণ জলের গামলা। তাতে এক-একবার পা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলে আবার কয়েক মাইল হাঁটা যায়। এসব পরিশ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষ অবশেষে যখন তারকেশ্বরে এসে পৌঁছন তখন এক উদ্বেল তীর্থকামী জনতা গ্রাস করে তাঁদের। চৈত্র শেষের প্রচণ্ড গরমে, সেই চাপাচাপি ভীড়ে, প্রাণপণ চেষ্টায় গঙ্গাজলের কলসী সামলে, তাঁরা যখন "বাবা"র মন্দিরে ঢুকতে পান ততক্ষণ অবধি কোন্ জীবনীশক্তি যে

তাঁদের সচল রাখে তা আমার ধারণার বাইরে। অনেকে অজ্ঞান হয়ে যান। কিন্তু অধিকাংশই উচ্চানন্দে তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে পারেন শেষ অবধি। সুদূর অতীতে, তারকেশ্বর শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে।

শুধু যে গাজন-সন্ন্যাসীরাই তারকেশ্বরে আসেন তা নয়। মনস্কামনা পূর্ণ হবার আশায়, আগের বছরের অভিলাষ পূর্ণ হবার আনন্দে হাজার হাজার সাধারণ নরনারীও একই কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেন। কলকাতা অঞ্চলের মতো অল্প দূরত্বের স্থান থেকেও তাঁরা যেমন আসেন, তেমনি আসেন নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া মেদিনীপুর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দূরের জেলাগুলি থেকেও। ধর্মীয় উন্মাদনা মানুষকে যে কতদূর আত্মবিস্মৃত ও কষ্ট-সহিষ্ণু করতে পারে, তারকেশ্বরের গাজন বা শিবরাত্রি উৎসবে সমবেত জনতার আচরণ দেখলে তা কিছু বোঝা যায়। এর মূলে আছে বাবা তারকনাথের অসীম মাহাত্ম্য। বস্তুত, গঙ্গার দক্ষিণে পশ্চিম-বঙ্গের যে অংশ, সেখানে শৈবতীর্থের তালিকায় তারকেশ্বরের নাম সর্বাগ্রে। চব্বিশ পরগণা জেলার মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর; কলকাতা-কালীঘাটের নকুলেশ্বর; নদীয়া জেলার শিবনিবাসের বুড়ো শিব; মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরের ভবানীশ্বর; বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর; বর্ধমান জেলার জামালপুরের বুড়োরাজ অথবা কুড়মুনের ঈশানেশ্বর; বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বর; হাওড়া জেলার বালীর কল্যাণেশ্বর এবং মেদিনীপুর জেলার এগরার হটনাগর প্রভৃতি শিব অল্পাধিক বিখ্যাত। কিন্তু

মোহনদীঘির তীরে বাণেশ্বর শিব-মন্দির

...নাথের খ্যাতি-প্রতিপত্তির সঙ্গে তাঁদের কারও তুলনাই হয় না।

দক্ষিণবঙ্গে আঞ্চলিকভাবে প্রসিদ্ধ আরও অজস্র শিবের পূর্ণ তালিকা তো দূরের কথা, আংশিক তালিকা দেওয়াও আমার অভিপ্রায় নয়। তবে এ কথা অনায়াসেই বলা যায়, গ্রাম-বাংলায় শিবই সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা। তাঁর মন্দিরের সংখ্যাও সর্বাধিক। শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয় উত্তরবঙ্গেও। উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধতম দুই শিবঠাকুর হলেন কোচবিহার জেলার বাণেশ্বর ও জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ্বর। সেখানেও গ্রাম-গ্রামান্তরে অল্প-খ্যাত আরও অনেক শিব আছেন। তাঁদের সকলের কথা যেহেতু বলা সম্ভব নয় সেজন্য খ্যাতির শীর্ষে যে দু'জন, আজ শুধু তাঁদের একজনেরই বিবরণ দেব।

কোচবিহার শহরের ছ'-সাত মাইল উত্তরে বাণেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দিরটি অবস্থিত। শিবের নাম থেকেই গ্রামের নাম। বাণেশ্বর ও কোচবিহার শহর রেলপথ ও পিচের রাস্তা দ্বারা সরাসরি সংযুক্ত। পশ্চিমমুখী মন্দির—ভিতরে ও বাইরে চতুষ্কোণ। বাইরের মাপ, প্রতি দিকে ৩১ ফুট; উচ্চতা আনুমানিক ৩৫ ফুট। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কোচবিহার-অধিপতি মহারাজা প্রাণনারায়ণ এটি নির্মাণ করেন। গর্ভগৃহের মেঝে যে বাইরের সমতল থেকে প্রায় ১০ ফুট নীচু তা থেকেও ইমারতটির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। সেই সূত্রে স্থানীয় ভক্তজনের বিশ্বাস, আদি মন্দিরটি নাকি ছিল পাথরের এবং অলৌকিকভাবে বিশ্বকর্মার তৈরি; প্রাণ-নারায়ণ ইটের দেওয়াল দিয়ে পাথরের গাঁথনি ঢেকে এটির সংস্কার করেন মাত্র। বলা বাহুল্য, এ ধারণা সত্য নয়। কেননা, পাথরের সৌধ কখনই এভাবে মেরামত হয় না। তা ছাড়া এখনকার ইটের দেওয়ালের ভিতরে পাথরের কোন অংশও নেই। এ শিবলিঙ্গকে ঘিরে তার এক কিংবদন্তী প্রায় সব অনাদিলিঙ্গ সম্বন্ধেই প্রচলিত। গ্রামের কোন গরু মনুষ্যাতিক্রান্তের মত গভীর অরণ্যের এক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সকলের অজান্তে রোজ দুধ বর্ষণ করে আসে; পরে কৌতূহলী গ্রামবাসী সেখানকার মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করে অনাদিলিঙ্গ। তখন কোন ধনী ভক্ত শিবের আচ্ছাদনের জন্য মন্দির নির্মাণ ক'রে দেন। এ কাহিনী এত অজস্র শিবতীর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, তাকে লোককল্পনার বেশী মূল্য দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক, স্থাপত্যের দিক থেকে এ দেবালয়ের অনুপম বৈশিষ্ট্য এর গম্বুজশীর্ষ ছাদ। মুসলমান আমলে, বহু হিন্দু মন্দিরের চালের নীচের পিঠ গম্বুজের আকারে নির্মিত হলেও বাইরের আকৃতি হয়েছে চালা বা রত্নশৈলী অনুযায়ী। কিন্তু কোচবিহারের অধিকাংশ মন্দিরে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে ছাদের ভিতর ও বাহির দু'দিকই গম্বুজের আকারে তৈরি করাই ছিল রীতি। সেখানে এক-গম্বুজ মসজিদের ছাদের থেকে হিন্দু দেবালয়ের ছাদের আকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। মন্দিরের সামনে সরুবাঁধানো প্রশস্ত চত্বর। তার দুই প্রান্তে, মন্দিরের গা ঘেঁষে, চণ্ডী ও ভুবনেশ্বরীর স্থান। প্রথমটি উত্তর দিকে অবস্থিত ও আসলে ৬"×৬" মাপের এক বিষ্ণুপট্ট যাতে লক্ষ্মী-সরস্বতী ছাড়া গঙ্গা-যমুনার মূর্তিও খোদিত আছে। প্রথাগতভাবে, শিবলিঙ্গটির বিপরীত দিকে নিশ্চয়ই বৃষবাহনের মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল।

কিন্তু পিছনের দেওয়ালের চুনবালির মধ্যে নিবদ্ধ হওয়ার সেদিক এখন অদৃশ্য। দক্ষিণ দিকে ভুবনেশ্বরীর স্থানে কি মূর্তি ছিল জানা যায় না; সেটি নাকি অনেক দিন আগে চুরি হয়ে গিয়েছে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরের সমস্তা কিছুটা নষ্ট হওয়ায় শিবলিঙ্গটি এখন পূব দিকে অনেকখানি হেলানো।

উত্তরবঙ্গে বাণেশ্বর-শিব যে জল্পেশ্বর-শিবের মতই প্রসিদ্ধ সে কথা আগেই বলেছি। এই দুই বিখ্যাত দেবতাকে ঘিরে সেজন্য জনশ্রুতির অন্ত নেই। বাণেশ্বর সম্বন্ধে আর একটি কিংবদন্তী—দৈত্যরাজ বাণাসুর এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন বলেই তিনি বাণেশ্বর নামে পরিচিত। "জল্পেশ্বর কাহিনী ও শ্রীশ্রীবাণেশ্বর দেবের মহাত্ম্য কথা" নামের পদ্যে-লেখা এক পুস্তিকায় (লেখক শ্রীপ্রমথপতি চক্রবর্তী) বাণাসুরের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। দ্বাপর যুগের শেষে, উত্তরবঙ্গের উজানীনগরে দৈত্যরাজ বলীর পুত্র মহাবলীর বাণাসুর রাজত্ব করতেন। বৃত্রাসুরের মত তিনিও স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন কিন্তু ইষ্টদেব শিবের আদেশে তা আবার ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দেন। পরে তাঁর অনুশোচনা হয় যে তাঁর মৃত্যুর পরে অমর দেবতারা নিশ্চয়ই অরক্ষিত উজানীনগর জয় করে নেবে। তাই তিনি কঠিন তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট করে বর চাইলেন যে স্বয়ং মহাদেবকে তিনি কৈলাস থেকে এনে তাঁর রাজ্যের জল্পেশ্বরে প্রতিষ্ঠা করবেন যাতে তাঁর রাজ্যের মাহাত্ম্য হয় কাশীর সমান, যেখানে সবাই হবে অমর। মহাদেব রাজী হলেন এই শর্তে যে, তাঁকে মাত্র এক রাত্রির মধ্যে কৈলাস থেকে জল্পেশ্বরে স্থানান্তরিত করতে হবে। ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে কৈলাস থেকে যাত্রা করে রাত্রি শেষ হবার আগেই বাণাসুর গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হলেন। অর তখনই শুরু হল দেবকুলের লীলাখেলা। প্রবল প্রস্রাবের বেগে বাণাসুর যখন আর অগ্রসর হতে পারলেন না তখন তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন ব্রাহ্মণবেশী নারদ। মহাদেবকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে বাণাসুর মলত্যাগ আরম্ভ করলেন। কিন্তু দেবতাদের ছলনায় তা নাকি এতই দীর্ঘস্থায়ী হল যে, এদিকে রাত্রি ভোর হয়ে গেল। অতএব মহাদেবকে আর জল্পেশ্বরে নিয়ে যাওয়া গেল না। শিব তখন দয়াপরবশ হয়ে বাণাসুরকে বর দিলেন:—

"আজি হতে তব রাজ্য মম মহিমাতে।
শিবরাজ্য নামে খ্যাত হইবে জগতে॥
বসেছি যেথায় এই মাটির উপর।
হবে মম লিঙ্গ-পীঠ অর্ধকুম্ভীশ্বর॥"

সেই থেকে এখানে যে স্বয়ং মহাদেবের বাস

বাণেশ্বর শিব-লিঙ্গ

সে বিষয়ে ভক্তজনের মনে কোন সন্দেহ নেই।

মূল মন্দিরের উত্তরে, এক টিনের চালাঘরে সিংহাসনশীর্ষ পদ্মের উপর বাণেশ্বরের উপবিষ্ট বিগ্রহ ও বাণেশ্বরের আর এক অর্ধনারীশ্বর মূর্তি উপাসিত। দুটিই পিতলের এবং উচ্চতায় যথাক্রমে, পাঁচ ইঞ্চি ও এগারো ইঞ্চি। অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটিকে ফাল্গুন পূর্ণিমার দোল ও মদনচতুর্দশী উৎসব উপলক্ষে কোচবিহার শহরের মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে সাময়িক-ভাবে নিয়ে যাওয়া হয় বলে সেটি "চলন্ত বাণেশ্বর" নামেও খ্যাত।

মূল বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রধান উৎসব শিবরাত্রি। শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত "পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ অনুষ্ঠানের নিম্নরূপ বিবরণ দেওয়া হয়েছে—"উৎসবটি বহু-কালের প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, প্রায় চারি শত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবটি দুই দিনব্যাপী চলে। শিবচতুর্দশীর দিন চারি প্রহরে চারিবার সাড়ম্বরে আনুষ্ঠানিক শিব পূজা, হোম ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রায় কুড়ি হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। এই সকল যাত্রীরা প্রধানত কোচবিহার জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং জলপাইগুড়ি, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে ট্রেনে, গরুর গাড়িতে ও পদব্রজে আসিয়া থাকেন। সমবেত যাত্রীরা মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসবের দুই দিন দলে দলে বিভক্ত হইয়া নামগান করেন এবং শিবের নিকট সাধারণ পূজা ও মানত পূজাদি দিয়া থাকেন। মানত হিসাবে নানা উপাচারে নৈবেদ্য, কলা, পাঁঠা, কবুতর ও বৃষ উৎসর্গ করা হয়। শিবের নিকট কেহ কেহ অন্নভোগও নিবেদন করেন। অন্নভোগ নিবেদনের জন্য পূজারম্ভের পূর্বেই পূজারীর নিকট মূল্য জমা দিতে হয়। এখানে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শিবের নিকট নিবেদিত পশু-পক্ষী-গুলির মধ্যে কোন-কোনটি বলি দিয়া, কোন কোনটিকে কণ্ঠে ফাঁস লাগাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, কোন কোনটিকে পাথরে আছড়াইয়া মারা হয়, আবার কতকগুলিকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া

পিতলের বাণেশ্বর (বামে) ও অর্ধনারীশ্বর (দক্ষিণে) মূর্তি

দেওয়া হয়। উৎসবের দুই দিন এইরূপ পশুপক্ষী মানত অনেকগুলি হইয়া থাকে। পূজায় ও উৎসবে শিবের নিকট ভাঙ ও গাঁজিকা নিবেদন করা প্রয়োজনীয় ধর্মাচার বলিয়া গণ্য করা হয়। উৎসবকালে অঘোর-পন্থী বৈষ্ণব ও নাগা সাধুর সমাগম হয়। উৎসবে অহিন্দুরাও যোগ দেন; তবে সংখ্যায় খুব অল্প।"

অঘোরপন্থীরা বীভৎসাচারী শৈব সম্প্রদায় হিসাবেই সাধারণত পরিচিত। বাণেশ্বরের মত প্রখ্যাত শৈবতীর্থে তাঁরা আসবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বৈষ্ণব, নাগা সাধু এমন কি অহিন্দুদের উপস্থিতি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। দক্ষিণ-বঙ্গের তারকেশ্বর বা অন্যান্য শৈবতীর্থে সচরাচর এরকমটি ঘটে না। উত্তরবঙ্গের বাণেশ্বর যে শুধু শৈব দেবতা নন তার আর এক প্রমাণ, ফাল্গুন মাসে "চলন্ত বাণেশ্বরের" দোল ও ফুলদোল উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়, যা পুরোপুরি বৈষ্ণব অনুষ্ঠান। বস্তুত, এরকম আপাতবিরোধী পার্বণ দক্ষিণবঙ্গে কল্পনাও করা যায় না। কোচবিহার অঞ্চল একদা যে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল, সে কথা ইতিহাস-স্বীকৃত। সেই প্লাবনের স্রোতগুলিকে বিশ্লেষণ করে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের এহেন মিশ্রণের মর্মোদ্ঘাটন বেশ চিত্তাকর্ষক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

গলায় ফাঁস দিয়ে বা পাথরে মাথা আছড়িয়ে বলির পশুপক্ষী হত্যা করার রীতিটিও অভিনব। "পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা" গ্রন্থটিতে শুধু শ্বাস-রোধের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাণেশ্বর মন্দিরের পান্ডা-পুরোহিতদের কাছে আমরা যা শুনেছি তা আরও ভয়াবহ। সাধারণত পাঁঠা বা খাসি এভাবে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। ছোট ছোট গোল-পোস্টের মত ফ্রেমের ওপরের দণ্ডটি থেকে ফাঁসের রশি ঝোলানো থাকে। বধ্য পশুর অন্তিম আর্তনাদ থামিয়ে অল্প সময়ে কাজ শেষ করবার জন্য ঘাতকেরা এক হাতে তার মুখ চেপে ধরে আর এক হাতে পাথরের নোড়া দিয়ে খুব জোরে মাথায় কয়েকবার আঘাত করে। দমবন্ধ হবার সঙ্গে এভাবে মাথার খুলিও থেঁতো হয়ে যায়। পায়রা, হাঁস প্রভৃতিকে প্রথমে "চলন্ত বাণেশ্বরের" কাছে উৎসর্গ করে তাঁর মন্দিরের আশপাশের পাথর বা সিমেন্টের মেঝের ওপর আছাড় মেরে বধ করা হয়। হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে কোন্ অনার্য রীতি আজও যে এভাবে বেঁচে আছে তা কে বলবে! অন্য দিকে উৎসর্গীত কিছু কিছু পশুপক্ষীকে পূর্ণ স্বাধীনতায় মুক্তি দেওয়ার রীতিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতি বর্বর ও অতি উদার এই দুই প্রথার সহাবস্থান এক আশ্চর্য ব্যাপার। এ নিয়েও চিত্তাকর্ষক গবেষণা হতে পারে।

সত্তা রীতির আর এক দৃষ্টান্ত দেখা যায় বাণেশ্বর মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে "মোহন দীঘি"তে। স্মরণাতীত কাল থেকে সেখানে বহু কচ্ছপের বাস। তাদের আ "পুরুষের" নাম নাকি ছিল 'মোহন'। সে সূত্রেই দীঘির নাম। এরা সকলে বাণেশ্বরের আশ্রিত জীব। তীর্থযাত্রি সেজন্য তাদের ক্ষতি করা দূরে থাকু পরম সমাদরে মুড়ি প্রভৃতি খাইয়ে থাকেন

উত্তরবঙ্গের শিবঠাকুরদের চৈ সংক্রান্তির গাজন-উৎসব যে একেবারেই ন বা নামে মাত্র হয় সে কথাও উল্লে যোগ্য। দক্ষিণবঙ্গে অনুরূপ কিছু ভা যায় না। কেননা, শিবরাত্রি উৎসব সেখা অল্পাধিক আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলে গাজনই প্রধান ও সবচেয়ে জনপ্রিয় শৈ উৎসব। আমাদের দেবপূজার ক্ষেত্রে এ আঞ্চলিক পার্থক্যও অনুসন্ধানের যোগ্য।

(ক্রমশ

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

অতিকায় নক্ষত্রের অবশেষ ভেলা এক্স। এটি গাম নীহারিকার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ছবিটি তুলেছেন চিলির সেরো তোলোলো মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

আমরা যে নক্ষত্র-জগতের অধিবাসী, বিচিত্র এই নীহারিকা তারই অন্যতম সদস্য। এই নক্ষত্র-জগতের এটিই বৃহত্তম নীহারিকা। এর মূল উপাদান আয়নিত হাইড্রোজেন গ্যাস। কোটি কোটি মাইল বিস্তৃত অচ্ছিন্ন মেঘের মত ওই গ্যাস সতীর্থ নক্ষত্রের সঙ্গে অবিরাম বিচরণ করে চলেছে। আবিষ্কার ১৯৩৯-এ। কিন্তু প্রথম আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে যে প্রত্যয় সৃষ্টি করেছিল, ১৯৫০-এর পর থেকে এখনও পর্যন্ত তা একের পর এক বিতর্কের জাল বুনে চলেছে।...

গাম নীহারিকা

মিল্কি ওয়ে সিসটেম। বাংলায় ছায়াপথ নক্ষত্র জগৎ। অন্ধকার আকাশে শুভ্র মেঘের মত বিস্তৃত যে অঞ্চলটি লক্ষ কোটি নক্ষত্রের মাঝেও চিরভাস্বর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার নাম রেখেছেন ছায়াপথ। পৃথিবী থেকে মনে হয় যেন পেঁজা তুলোর নদী। দূরাকাশে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে মহাকালের কোন অমোঘ নিয়মে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল। আমাদের এই নক্ষত্র জগতের শেষ প্রান্তে তার অবস্থান। একটি সংক্ষিপ্ত হিসাবঃ এই নক্ষত্র জগতের ব্যাস এক লক্ষ আলোক বৎসর। কেন্দ্রীয় অঞ্চল কুড়ি হাজার আলোক বৎসর পুরু। চাকতির মত অবশিষ্ট অংশ পুরু তিন হাজার আলোক বৎসর। এর কেন্দ্র থেকে আমাদের সূর্যের দূরত্ব তিরিশ হাজার আলোক বৎসর। আর যে অঞ্চলে সূর্যের অবস্থান সেখানকার আবর্তন-বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৫০ কিলোমিটার। এবং এই গতিতে নক্ষত্র জগতের চারদিক প্রদক্ষিণ করতে তার সময় লাগে বাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর। পুরো নক্ষত্র-জগতটির ভর আমাদের সূর্যের ভরের দশ হাজার কোটি গুণ।

দক্ষিণ-পশ্চিম টেকসাসের মাউণ্ট লেকে-এ অবস্থিত ম্যাকডোনাল্ড মানমন্দির থেকে প্রথম অনুসন্ধানের কাজ অটো স্ট্রুভ যখন শুরু করেছিলেন সেটা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। কাজে লাগানো হয়, নতুন তৈরি
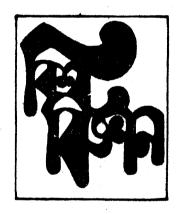
নতুন একটি স্পেকট্রোগ্রাফ বা বর্ণালীলিখন যন্ত্র। অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সংবেদনশীল এই যন্ত্রটির কার্যকারী দৈর্ঘ ১৫০ ফুট। পুরো এক বছর মহাকাশের পঞ্চাশটি অঞ্চলের বর্ণালী চিত্র সংগ্রহ করলেন ডঃ স্ট্রুভ। অতঃপর ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯ তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সতীর্থ অত্যন্ত ক্ষীণ অজ্ঞাত একটি নীহারিকার সন্ধান পেলেন। সন্ধান পেলেন দক্ষিণ আকাশে ভেলা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র গামা-২ ভেলোরিয়ামের কাছ বরাবর।

এর কয়েক দিন পর গামা-২ ভেলোরিয়ামের ৭.৫ ডিগ্রি উত্তরে জিটা পিউপিস নামে আরও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নীহারিকা বেষ্টিত অঞ্চলে ওঁরা পর্যবেক্ষণ চালান। কিন্তু ঊর্ধাকাশে বায়ু-প্রভার বিকিরণের দরুন তখন সঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছন সম্ভব হল না। যদিও ডঃ স্ট্রুভের মন্তব্যঃ যে নীহারিকা অঞ্চলের তিনি খোঁজ করছিলেন, সম্ভবত সেখান থেকে কোন বিকিরণই হয় নি।

১৯৩৯-এর পর সাধারণ আলো, বেতার তরঙ্গগ্রাহী যন্ত্র, এক্স রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি মাপক যন্ত্রের সাহায্যে নানাভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার কাজ শুরু হয়ে গেল। এবং অবশেষে দেখা গেল স্ট্রুভ যে দুটি নক্ষত্রের কথা উল্লেখ করেন ওরা উভয়েই আয়নিত হাইড্রোজেনের একটি ব্যাপক এবং সুবিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আয়নিত এই গ্যাস পালসার থেকে নিক্ষিপ্ত বেতার সংকেতের গতিকে মন্থর করে, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়াও আমাদের নক্ষত্র জগতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধেয়ে আসা বেতার তরঙ্গের বেশ কিছু অংশ শুষে নেয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক নক্ষত্রকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এক সময় কেউ কেউ এ কথাও বলেছিলেন, হাইড্রোজেনের ওই বিস্তৃত মেঘ হয়ত বা আমাদের সৌরমণ্ডলকেও ঘিরে রেখেছে। যদিও উত্তরকালে এমন একটি সিদ্ধান্ত কেউই গ্রহণ করতে পারেন নি। আয়নিত হাইড্রোজেনের ওই মেঘজগত দুটি নয়, আসলে একটি নীহারিকা। অস্ট্রেলিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী কলিন এস গাম-এর সম্মানে এর নাম রাখা হয় গাম নীহারিকা। কারণ ১৯৫০ সালে ক্যানবেরার কাছাকাছি মাউণ্ট স্ট্রোমলোর মানমন্দির থেকে

ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তিনিই এই নীহারিকাটির যথাযথ স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজটি ত্বরান্বিত করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নীহারিকা বা নেবুলা বলতে এক সময়ে দূরে মহাকাশে অগণিত অস্পষ্ট নক্ষত্রের সমাবেশকেই বোঝান হত। পরবর্তীকালে এই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়। যেমন ধরুন অ্যান্ড্রোমেডার সেই বিরাট নীহারিকা। দেখা গেল এটা আসলে একটি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগৎ। যেখানে নিয়মিত শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্যাস এবং মহাজাগতিক ভস্ম। এবং শেষ পর্যন্ত তার চেহারাটি দাঁড়িয়েছে আমাদের ছায়াপথের মত। নীহারিকা অর্থে এখন মহাজাগতিক গ্যাস এবং ভস্মকেই বোঝান হয়ে থাকে। ভৌতিক ধর্মের ভিন্নতা এবং ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ওদেরকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন ধরুন, প্ল্যানেটারি নেবুলা বা গ্রহজনিত নীহারিকা। উত্তর আকাশের লাইরা নক্ষত্র-পুঞ্জের অন্তর্গত রিং নীহারিকা। একটিমাত্র নক্ষত্রকে ঘিরে এর অবস্থান। কেউ কেউ মনে করেন ওই নক্ষত্র থেকেই ওর জন্ম। নক্ষত্রটি থেকে বিকীর্ণ অতিবেগুনী রশ্মি নীহারিকার পরমাণুগুলি উদ্দীপিত করে এবং অবশেষে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে দৃশ্যমান আলোক রশ্মি। ক্র্যাব আর এক ধরনের নীহারিকা। অতিকায় কোন নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফলে যে ভস্ম বা গ্যাসের

প্লাইয়েডসের প্রতিফলন নীহারিকার এই ছবিটি তোলা হয় ক্রিমিয়ার মানমন্দিরে

উৎপত্তি তারাই এই নীহারিকাটি সৃষ্টি করেছে। এর গ্যাস এবং ধূলিকণার মেঘ সেকেণ্ডে প্রায় ১০০০০ কিলোমিটার বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্লাইয়েডস নক্ষত্র-পুঞ্জে রয়েছে প্রতিফলক নীহারিকা। নিকটবর্তী নক্ষত্রের আলো এর ধূলিকণার গায়ে প্রতিফলিত হয় বলেই এটিকে অত্যন্ত স্পষ্ট মেঘের মত দেখায়। হর্স হেড বা অশ্বমুণ্ড নীহারিকা কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কারণ এটিকে দীপ্ত করার মত কাছাকাছি কোন নক্ষত্র নেই। আবার ওরিয়ন নীহারিকার দিকে তাকান। এর প্রধান অংশ আয়নিত হাইড্রোজেন। কাছের নক্ষত্রগুলি থেকে তীব্র অতিবেগুনী রশ্মির বর্ষণ তার হাইড্রোজেন গ্যাসকে আয়নিত করেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, অতিকায় কোন নক্ষত্রের বিস্ফোরণজনিত ভস্ম বা গ্যাস অথবা অন্য কোন নক্ষত্র থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা অনুরূপ সামগ্রী দিয়ে কখনই এ ধরনের নীহারিকা তৈরি হতে পারে না।

গামের বক্তব্য, তাঁর নীহারিকাটির স্বরূপ গ্রেট নেবুলারই মত। গামা-২ ভেলোরিয়াম এবং জিটা পিউপিস এই দুটি নক্ষত্র থেকে নিয়ত অতিবেগুনী রশ্মির জোরালো বিকিরণ ঠিকরে গিয়ে পড়ে গাম নীহারিকার হাইড্রোজেন গ্যাসের ওপর। ফলে সেখানকার হাইড্রোজেন আয়নিত অবস্থায় বিরাজ করে। গামের এই ব্যাখ্যা একবার মাত্র বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা ধোপে টেকে নি। এবং কিছুদিন আগ পর্যন্তও সাধারণভাবে সকলের স্বীকৃতি অর্জন করেছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে গামা-২ ভেলোরাম-এর মোটামুটি একটি দূরত্ব বের করা গেল। দেখা গেল, ওই দূরত্ব ১৭০ পারসেকস এর সমান। উল্লেখ্য এক পারসেক সমান ৩.২৬ আলোক বৎসর। এবং এ কথা সকলেই জানেন সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে

বলা হয় এক আলোক বৎসর। গামা-২ ভেলোরামের দূরত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে গাম নীহারিকার ব্যাস মাপা হল। দেখা গেল, ব্যাসের দৈর্ঘ্য ৬০ পারসেকস। পৃথিবীর যে কোন বিন্দুর সঙ্গে ওই ব্যাস ২০ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে। অবশ্য পর্যবেক্ষকদের কাছে এই পরিমাপ এমন কিছু আহামরির মত বড় বলে মনে হল না।

ঊর্ধাকাশের বায়ুপ্রভার জন্যে পর্যবেক্ষণে অসুবিধে হচ্ছিল। এ ছাড়াও ওই নীহারিকার পেছন দিককার উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোও নীহারিকাটির কোন কোন অংশ অস্পষ্ট করে তুলছিল। প্রথম ত্রুটি দূর করার জন্যে গাম তাঁর ফটোগ্রাফিক প্লেটের জন্য বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক প্রলেপ তৈরি করলেন। বিশেষ ধরনের একটি ফিলটারও। ওই ফিলটার বায়ুপ্রভাজনিত ত্রুটি বহুলাংশে হ্রাস করে। এ ছাড়াও নতুন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে পশ্চাৎভূমির উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোর তীব্রতাও কমিয়ে আনেন। অতঃপর আরও কিছু কিছু যান্ত্রিক সংস্কার ঘটিয়ে ভেলা পিউপিসের কাছাকাছি নীহারিকাটির অনুজ্জ্বল অংশটির ছবি তুলতে তিনি সমর্থ হন। এবারকার পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে ১৯৫৫ সালে গাম ঘোষণা করলেন, পৃথিবী থেকে ওই নীহারিকার এক পাশের ব্যাসের কৌণিক দূরত্ব চল্লিশ ডিগ্রি, এবং অপর এক পাশের কৌণিক দূরত্ব তিরিশ ডিগ্রি।

১৯৫৫ সালে গাম নীহারিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের জন্যে দায়ী ছিলেন এক দিকে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা, আর এক দিকে বার্ট জে বক এবং তাঁর সহযোগী-বৃন্দ। শেষোক্ত এই দলটি দক্ষিণ আফ্রিকার রেয়মফনটেইনে অবস্থিত হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। ওই বছর ক্যানাবেরার ইয়েল কলাম্বিয়া সাদার্ন স্টেশন থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গেরার্ড দ্য ভাউকুলিওর ঘোষণা করলেন, সাউথ সিলেস্টিয়াল পোল বা মহাবিশ্বের দক্ষিণ মেরুতে তিনি একটি অনুজ্জ্বল নীহারিকা আবিষ্কার করেছেন। যার বায়ুমণ্ডলকে উদ্দীপ্ত করার মত কাছাকাছি কোন নক্ষত্র নেই। ১৯৫৬ সালে গাম এই আবিষ্কারটি সমর্থন করেন। তবে এই সঙ্গে মন্তব্য করলেন, নক্ষত্র নেই, এ কথা ঠিক নয়। প্রায় ৩৫ ডিগ্রি দূরে জিটা পিউপিস এবং গামা-২ ভেলোরাম এই দুটি নক্ষত্রই তাকে উদ্দীপ্ত করছে। অর্থাৎ সোজা কথা, গাম যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল ভাউকুলিওর যা আবিষ্কার করেছেন সেটা আসলে তাঁর নীহারিকারই একটি অংশ। পরে দু জন [illegible] এই নীহারিকাটির উত্তরাঞ্চল এবং মাঝামাঝি এমন কোন অন্যান্য অনুজ্জ্বল অংশগুলিও লক্ষ করলেন। এই সমস্ত আবিষ্কারের পর গাম
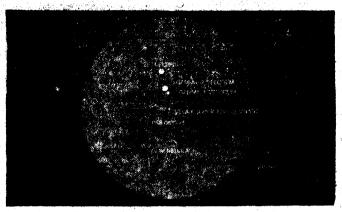
পৃথিবী থেকে গাম নীহারিকার তুলনামূলক দূরত্ব দেখান হল। সেই সঙ্গে গামা-২ ভেলোরাম, তার সঙ্গী গামা-১ ভেলোরাম এবং জিটা পিউপিসকে লক্ষ করুন

তাঁর পুরনো হিসেবটি শুধরে নিয়ে এবার বললেন, আগে যেমনটি ভেবেছিলেন তেমন নয়। তাঁর ওই নীহারিকা আয়তনে আরও বড়। দৈর্ঘ্য ৬০ ডিগ্রি, বিস্তার ৩০ ডিগ্রি। ক্রমে যতবার পর্যবেক্ষণ করা হল, প্রত্যেকবার মনে হতে লাগল এটা যেন আরও, আরও বড়। ক্রমেই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বলে মনে হতে লাগল। আর এ থেকে গামের মনে হয়, সম্ভবত আমাদের এই সৌরমণ্ডল এই নীহারিকাটির কাছাকাছি, অথবা তার সীমার মধ্যেও অবস্থান করতে পারে।

দুর্ভাগ্য, ১৯৬০ সালে সুইট-জারল্যান্ডের আল্পস অঞ্চলে স্কি খেলার সময় গাম মারাত্মক দুর্ঘটনায় পরলোকে গমন করলেন। অতএব এই নীহারিকার উপর তাঁর গবেষণার এখানেই ছেদ পড়ল। এর পর এর উপর উল্লেখযোগ্য কাজ করেন হ্যাম এম জনসন মাউন্ট স্ট্রমলোতে। এঁর গবেষণারও মূল লক্ষ ছিল ভেলা পিউপিস অঞ্চলের রহস্য উদঘাটন। ১৯৭০এ থিয়োডর পি স্টেচার, স্টিফেন পি মারান, এঁরা দুজনই গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের সঙ্গে জড়িত এবং কিট পিক ন্যাশনাল অবজারভেটারির ডেভিড এল ক্রওফোর্ড তাঁদের পূর্বসূরীদের যাবতীয় তথ্য খতিয়ে পরীক্ষা করলেন। জনসনের মনে হল, অতিকায় কোন নক্ষত্রের বিস্ফোরণজনিত দেহাবশেষই গাম নীহারিকার জীবন-উৎস। অবশ্য তাঁর এই মতবাদের সপক্ষে জোরাল কোন প্রমাণাদি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। স্টিফেন পি মারান মনে করেন, হয়ত বা সত্যিকারের বাস্তবতা জনসন এবং গামের ব্যাখ্যার মাঝামাঝি কোন জায়গায় বিরাজ করছে। আগেই বলেছি, গামের মতে হয়েছিল অন্তর্নাক্ষত্রিক ধূলিকণা এবং গ্যাস দিয়েই এই নীহারিকাটির উৎপত্তি। এবং কাছাকাছি কোন কোন নক্ষত্রের থেকে বেরিয়ে আসা শক্তিশালী অতিবেগুনী রশ্মির সঙ্গে সেই ধূলিকণা এবং গ্যাসের সংঘর্ষই তাকে দৃশ্যমান করে তুলেছে।

অদ্ভুত রহস্যই বলা চলে। স্টেচার এবং মারানের মনে হল, এর আগে যতটা বড় বলে মনে হয়েছিল, সে তুলনায় নীহারিকাটি অনেক, অনেক বেশি বড়। তবে তার বিস্তৃতি কখনই আমাদের এই সৌর মণ্ডলকে গ্রাস করতে পারে না। নেভাল রিসার্চ গবেষণাগারের জর্জ আর কারুথারস, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডোনাল্ড সি মর্টন, এডওয়ার্ড বি জেনকিনস, নিল এইচ ব্রকস এবং গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের অ্যান্ড্রু স্মিথ এবং স্টেচার আবহাওয়া বিষয়ক রকেটের সাহায্যে অনুসন্ধান চালান। ওই সময় তাঁরা গামা-২ ভেলোরাম এবং জিটা পিউপিস বরাবর দৃষ্টি পথে অঞ্চলে আয়নিত হাইড্রোজেনের উপস্থিতি লক্ষ করেন। অথচ হিসেব মত ওই দুটি নক্ষত্রের তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩০২৭৩ এবং ৪০২৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এর অর্থ, বহু আলোক বৎসর দূরত্ব পর্যন্ত তারা আন্তঃনক্ষত্রগত গ্যাসকে আয়নিত করতে পারে। অর্থাৎ গাম যা বলেছিলেন সেটাই ঠিক। ওই নক্ষত্র দুটির কাছাকাছি অঞ্চলে আয়নিত হাইড্রোজেন গ্যাস থাকা সম্ভব নয়। আয়নিত যে গ্যাস তাঁরা দেখেছিলেন সেটি পৃথিবীর এবং বৃহৎ সৌর মণ্ডলের নিকটবর্তী অঞ্চলেই থাকা সম্ভব। অতএব তাঁদের সিদ্ধান্ত, গাম নীহারিকার বিস্তৃতি পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি।

এবার দূরত্ব মাপার পালা। এর জন্যে যে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়, সেটা এই রকম: মনে করুন পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে নীহারিকাটির দিকে তাকিয়ে আপনি চাইলেন। নীহারিকার যে অংশটি আপনি

দেখতে পেলেম সেই অঞ্চল এবং আপনার অবস্থান বিন্দুর সংযোগ রেখার দৃষ্টি রেখা যা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় লাইন অভ্ সাইট। ধরুন রেখাটি যেন একটি স্তম্ভ। যার প্রস্থচ্ছেদ এক বর্গ সেণ্টি-মিটার। ওই স্তম্ভের প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার স্থানে যে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তার সঠিক সংখ্যা যদি বের করা যায়, তা হলে রেখাটির দৈর্ঘ কত বলে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ দূরত্বটি জানা গেল। এই ভাবে গণনা করে দেখা গেছে, পৃথিবী থেকে এর প্রান্তিক দূরত্ব ১০০ পারসেকস বা ১০০× ৩·২৬ আলোক বৎসর। পদ্ধতিটির নাম 'কলাম ডেনসিটি' অভ্ হাইড্রোজেন।

পৃথিবী থেকে গাম নীহারিকার কেন্দ্রের দূরত্ব কত? বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী নানা-ভাবে জটিল এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। গামের মতে গামা-২ ভেলোরয়স এবং তার অনুজ্জ্বল সঙ্গী গামা-১ ভেলোরম সহ জিটা পিউপিস এর কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থান করছে। অতএব ওদের দূরত্ব মাপতে পারলেই নীহারিকাটির দূরত্ব জানা হয়ে গেল? গামের হিসেব মত এই দূরত্ব ১৭০ পারসেক। তবে ১৯৬৮ সালে মাউণ্ট স্ট্রমলো থেকে লিনডসে এক স্মিথ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে প্রমাণ করেছেন ১৭০ নয়, আসল দূরত্ব ৪৬০ পারসেক।

ব্যাস ৩৬০ পারসেক। অর্থাৎ আমাদের নক্ষত্র জগতে এর চেয়ে বড় নীহারিকার সাক্ষাৎ এখনও পর্যন্ত মেলে নি। দৃশ্যমান আলোর এর বিস্তৃত শাখা প্রশাখা অদ্ভুত অনৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। আরও অদ্ভুত কাণ্ড, ক্র্যাব নীহারিকার মত এই নীহারিকাটিও সিনক্রোট্রন পদ্ধতিতে বেতার তরঙ্গ বিকিরণ করে। উল্লেখ্য, চৌম্বক বলরেখা বরাবর পাক খেতে খেতে যখন ইলেকট্রন কণা বেরিয়ে আসতে থাকে তখন ওই ইলেকট্রন থেকে বেতার তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়। এরই নাম সিনক্রোট্রন বিকিরণ।

বিতর্কের শেষ নেই। পুরনো উদ্ধৃতি তুলে ধরে কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবার প্রশ্ন তুলেছেন। ওঁদের প্রথম বক্তব্য, অতবড় একটি নীহারিকার সমস্ত হাই-ড্রোজেন পরমাণুকে অয়নিত করার জন্যে প্রথম দিকে যতটা শক্তির প্রয়োজন, তার পরিমাণ কোন নক্ষত্র তার সারা জীবনে যে পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ করে শুধু তার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। অতএব একটি কেন, একাধিক নক্ষত্রের পক্ষে সংক্ষিপ্ত সময়ে অত প্রচণ্ড শক্তি ওই নীহারিকাকে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করেছেন। গাম নীহারিকার কেন্দ্রস্থলে পাওয়া গেছে ভেলা-এক্স। এটি অতীতে বিস্ফোরিত কোন অতিকায় নক্ষত্রের অব-শেষ। একথা আমরা জানি এই ধরনের বিস্ফোরণের সময় যতটা শক্তি নির্গত হয় তার পরিমাণ টেন টু দি পাওয়ার ফিফটি টু আর্গ। এবং এই শক্তি অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ থেকে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন, হয়ত বা ভেলা-এক্সেরই আদি পিতা দৈত্যাকার কোন নক্ষত্রের দেহ ভস্ম দিয়েই গাম নীহারিকার সৃষ্টি। তারই পরিত্যক্ত শক্তিতে অবগাহন করে ওই নীহারিকার হাইড্রোজেন গ্যাস অয়নিত হয়ে উঠেছে। এটি একটি নতুন ধরনের নীহারিকা। যার বয়েস অনেক খুদে নীহারিকার চেয়ে অনেক কম। প্রায় তিরিশ হাজার বছর। এবং অতি দ্রুত অয়নকারী শক্তি হারিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই এটি অঅয়নিত সাধারণ গ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, প্রশ্ন আরও আছে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, পালসার PSR083-45-এর থেপেথেপে স্পন্দিত বেতার সংকেত গাম নীহারিকার প্রায় অর্ধেকটা জায়গার মধ্যে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে। আরও কয়েকটি পালসারের সংকেতও এর মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে দেখা গেছে এবং সব সময়ই চারটে ব্যাপার তাঁদের চোখে পড়েছে। এক, নীহারিকার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় তাদের পাঠান সংকেত বা বেতার তরঙ্গ কেমন যেন বিস্তৃত হয়ে যায়। দুই, পোলারাইজেশনের তল আবর্তিত হয়। তিন, সংকেতের গতি কিছুটা মন্থর হয় এবং চার, সংকেতের কম্পাঙ্কে গরমিল দেখা যায়। নীহারিকার বিভিন্ন অঞ্চলের গঠনের মধ্যে ব্যতিক্রম থাকার দরুনই এগুলি ঘটে থাকে। কিন্তু কী এই ব্যতিক্রম বিজ্ঞানীদের কাছে সেটাই আজ বড় রকমের রহস্য। উল্লেখ্য, নীহারিকাটির বয়েস সম্পর্কে অনুমান করা হয়েছে পালসার সংকেতের গতিবিধির উপর নির্ভর করে।

কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন, বিস্ফোরণের সময় অতিকায় কোন নক্ষত্রের পক্ষে টেন টু দি পাওয়ার ফিফটি টু এত বেশি শক্তি নির্গত করা কি সত্যিই সম্ভব? কেউ কেউ সন্দেহ করছেন, বিস্ফোরণজনিত বর্হিমুখী শক্তির পক্ষে গ্যাসকে ওইভাবে অয়নিত করা আদৌ সম্ভব কী না? এমনও হতে পারে, বিস্ফোরণের সময় বস্তু কণা বা পরমাণুদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে যে প্রচণ্ড তাপশক্তির সৃষ্টি হয়, হয়ত এই তাপই অয়নয়নের কাজটি সেরে ফেলেছিল। গাম নীহারিকা নিয়ে এখন তাত্ত্বিক মহলে এই ভাবেই একের পর এক বিতর্কের জাল গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণাগার থেকে পর্য-বেক্ষণ চালিয়ে হয়ত এ সমস্ত প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে জানা যাবে বিশ্ব সৃষ্টি রহস্যের আরও কিছু কিছু সন্ধান।
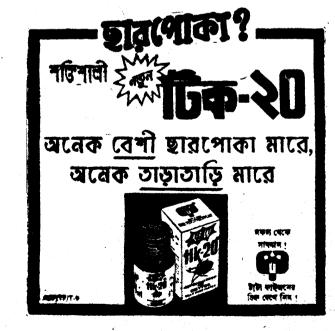
আপাতত প্রতীক্ষা।

সমরজিৎ কর

॥ ২১ ॥
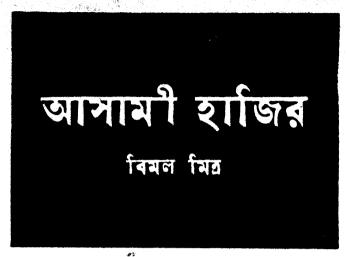
এই-ই প্রথম কালিকান্ত ভট্টাচার্য মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি এলেন। মেয়ের বিয়ের আগে একবার এসেছিলেন, কিন্তু সে আসা বেয়াই হিসেবে আসা নয়। এ বাড়ির কুটুম হিসেবে এই-ই তাঁর প্রথম আসা। কিন্তু বেশিদিন যে থাকতে পারবেন না সেটা প্রথমেই জানিয়ে দিলেন। দুপুরে এলেন আবার বিকেলের গাড়িতেই চলে যাওয়া।

বললেন—থাকলে কি আমার চলে বেয়াই মশাই, ওদিকের কাজ-কর্ম তো সবই ফেলে রেখে এসেছি—আর বাড়িতেও তো কেউ নেই। বাড়িও একেবারে ফাঁকা।

তারপর বউমার মায়ের কথা উঠলো। শেষকালে কী হয়েছিল, ডাক্তার দেখে কী বললে, আগে থেকে কোনও অসুখ-বিসুখ ছিল কি না। জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে যে-সব বাঁধা বুলি সবাই-ই বলে থাকে সেই সব কথাও হলো। জীবনকে যারা বেশি আঁকড়ে ধরে থাকে তারাই জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে বেশি মুখর। তাই কর্তাবাবুই বেশি করে জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে বক্তৃতা করতে লাগলেন।

কালিকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—আমাদের শাস্ত্রে আছে ফল যখন পাকবে তখন তার বোঁটা আলগা হবেই, তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু অকালমৃত্যুটাই দুঃখের কারণ! আমার গৃহিণীর বয়েস হয়েছিল তাই তিনি গেছেন। তাই আমি তার জন্যে কোনও দুঃখ করিনে কর্তাবাবু। আর তিনি তো নিজের হাতেই নয়নতারার বিয়ে দিয়ে গেছেন। দেখে যেতে পেরেছেন কন্যা তাঁর সৎ পাত্রেই পড়েছে—

প্রকাশমামা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—সৎ পাত্র যে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই, সদানন্দ আমার ভাগ্নে বলে বলছি না, অমন সৎ পাত্র এ-যুগে জন্মায় না বেয়াই মশাই। আমি নিজে সে-সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিচ্ছি—

ভট্টাচার্য মশাই হঠাৎ বললেন—কই, আমার বাবাজীকে তো দেখছি নে? কোথাও কাজে গেছে বুঝি?

চৌধুরী মশাই বললেন—হ্যাঁ, একটু বেরিয়েছে—

প্রকাশমামা বাকিটা পূরণ করে দিলে। বললে—সদার কাজের কি অন্ত আছে বেয়াই মশাই। এই এত বড় জমিদারি সবই বলতে গেলে একলা ওই সদাই দেখছে। জামাইবাবু বুড়ো হয়ে গেছে তো, তাই সদা বাবাকে বলেছে—তোমাকে কিছুছু দেখতে হবে না বাবা, এবার থেকে আমি নিজেই সব দেখবো—

ভট্টাচার্য মশাই বললেন—উপযুক্ত ছেলের মতই কথা বলেছে—

প্রকাশমামা বললে—উপযুক্ত ছেলে মানে? সদা কি ভাবছেন উপযুক্ত ছাড়া অনুপযুক্ত কথা বলবে? বাপ-ঠাকুর্দার তেমন শিক্ষাই নয় বেয়াই মশাই। এই যে আমার জামাই-বাবুকে দেখছেন, ইনিও বাপের উপযুক্ত ছেলে। এই এখনও এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত জামাইবাবু বাপ বলতে অজ্ঞান—। আপনার মেয়ের অনেক পুণ্যবল তাই এমন বংশে পড়েছে—

প্রকাশ মামা আবার বলে উঠলো—আর তা ছাড়া এই আমার কথাই ধরুন না, আমি তো এ-বংশের কেউ নই, কিন্তু সদা আমার ক্যারেক্টারের ধাঁচা পেয়েছে। আমি পিতৃ-মাতৃ ভক্ত, সদাও পিতৃ-মাতৃ ভক্ত। আপনাদের সংস্কৃতে যে শ্লোক আছে না, নরনাং মাতুলঃ ক্রমঃ, সদা একেবারে হুবহু তাই...

কথাটা বলে প্রকাশমামা চৌধুরী মশাই-এর দিকে চাইলে। বললে—কী বলেন জামাইবাবু, ঠিক বলিনি?

কেউ তার কথায় সায় দিলে না দেখে প্রকাশমামা তখন অন্য প্রসঙ্গ ওঠালো। বললে—কিন্তু আপনি বেয়ানের শ্রাদ্ধে খাইয়েছিলেন বটে! বুঝলেন জামাইবাবু, অমন খাওয়া আমি বহুদিন খাইনি। আমি বোধ হয় দু' ডজন সরভাজা খেয়েছি। আঃ কী সোয়াদ—

কিন্তু এ কথাটাও কারো মনে গিয়ে দাগ কাটলো না। ওদিকে ভট্টাচার্য মশাই-এরও যাবার সময় হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন—

এবার আমাকে উঠতে হয় বেয়াই মশাই—

যাবার আগে একবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। প্রকাশ মামা সে ব্যবস্থা করে দিলে। বেয়াই মশাইকে একেবারে, অন্দর-মহলে নিয়ে গেল। ভট্টাচার্যি মশাই ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। বেশ সাজানো ঘর। আসবাবপত্রে মোড়া, দামী আয়না, দামী আলমারি, দামী চাদরে ঢাকা বালিশ বিছানা। তিনি নিজে ফুলশয্যার তত্ত্বের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন তা ছাড়াও আরো অনেক আসবাব দিয়েছে মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ি। ভট্টাচার্যি মশাই-এর মনটা ভারি হয়ে উঠলো। এসব কিছুই দেখে যেতে পারলে না নয়নতারার মা। মেয়ের এই সুখ এই ঐশ্বর্য চোখে দেখতে পেলে তিনিও খুশী হতেন।

বাবাকে দেখে নয়নতারা বিছানা থেকে নেমে এসে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

ভট্টাচার্য মশাই আশীর্বাদ করলেন—সুখে থাকো মা, স্বামীর সংসারে লক্ষ্মী হয়ে থাকো, মনে প্রাণে স্বামীর সেবা কোর, মেয়েমানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর নেই—

নয়নতারার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—কাঁদতে নেই মা, ছিঃ, বাপ-মা কারো চিরকাল থাকে না। তোমাকে সুখী দেখতে পেলেই আমাদের সুখ। তুমি মনে প্রাণে স্বামীর সংসার করো, তাই দেখেই তাঁর স্বর্গত আত্মা সুখী হবে—তোমার দুঃখ কী মা, তোমার মতন স্বামী ক'জন পায় বলো তো। তা এবার চলি, সদানন্দর সঙ্গে দেখা হলো না, শুনলাম সে নাকি মামলার কাজে রাণাঘাটে গেছে। বাড়ি এলে তাকে বলে দিও মা যে আমি এসেছিলুম, তাকেও আশীর্বাদ করে গেছি—

নয়নতারা আর একবার বাবার পায়ে প্রণাম করলে। ভট্টাচার্যি মশাই আর দাঁড়ালেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মায়া জিনিসটা এমন যে তা যত বাড়াও ততই বেড়ে যায়। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

চৌধুরী মশাই বললেন—আবার আসবেন বেয়াই মশাই—

প্রকাশমামা বলে উঠলো—এবারের আসা ঠিক মনের মত আসা হলো না বেয়াই মশাই, এবার এসে জামাইএর বাড়িতে রাত কাটিয়ে যেতে হবে কিন্তু—

ভট্টাচার্যি মশাইও ভদ্রতা করে বললেন—ওদিক পানে গেলে আপনারাও কিন্তু যাবেন, একবার পায়ের ধুলো দেবেন।

প্রকাশমামা বললে—আমাকে সে আর বলতে হবে না, নিশ্চয়ই যাবো, নিশ্চয়ই যাবো, গিয়ে আবার সরপুরিয়া সরভাজা খেয়ে আসবো—

আর তারপর 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে যাত্রা। গাড়ি ছেড়ে দিলে রজব আলি।

*

আবার সেই রাত। ফুলশয্যার সেই অমোঘ রাতটার পর এই দ্বিতীয়বার নয়নতারা আবার একবার রাত কাটাবে এই ঘরে। এই রাতটার কথা ভাবতেই কেমন যেন তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। একদিন মা ছিল, তত ভয় করেনি কিন্তু এবার কেউ নেই তার। অভিযোগ করবার, আবদার করবার, আত্মসমর্পণ করবারও যেন কোনও লোক তার নেই। তবে এবার থেকে তাকে তার অদৃশ্য ভাগ্যের কাছেই অভিযোগ আবদার আত্মসমর্পণ যা-কিছু সব করতে হবে। নিজেকে তার নিজের কাছেই বড় অসহায় মনে হলো।

শাশুড়ি সামনে বসিয়ে খাওয়ালো। বললে—তোমার মা নেই বউমা, কিন্তু আমি তো আছি, তোমার কোনও কষ্ট হলে তুমি আমাকে বলবে। বলতে যেন কোনও লজ্জা কোর না—

খাওয়ার পর বউমা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে।

শাশুড়ি বললে—তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন বউমা, তুমি তোমার ঘরে যাও—

নয়নতারা বললে—আপনাদের কারো যে খাওয়া হয়নি মা—

স্বাদে বাজীমাৎ করতে—মোনেকো

বিস্কুট একটি—মজা ক'রে খান দু'ভাবে

এমনি খেলে— অতুলনীয়

এর ওপর মনের মত কিছু লাগিয়ে খেলে তো আরও মজা

মোনেকো—মুচমুচে নোনতা বিস্কুট···
সবার ওপর টেক্কা দিতে···
এমনিই বা মনের মত কিছু এর ওপর
লাগিয়ে খান। প্রত্যেকবার মোনেকো
চেয়ে নিন আর বাজীমাৎ করুন।

মোনেকো

ভারতে সবচেয়ে বেশী কাটতির নোনতা বিস্কুট

everest/256b/PP Be

—আমাদের খাওয়া হোক না-হোক, তুমি বাজা মেয়ে বসে থাকবে কেন? তুমি এতদূর থেকে এলে, এত ধকল গেল তোমার শরীরে, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো গে—যাও—

নয়নতারা আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঢুকে চার পাশের জানালার পাল্লা বন্ধ করে দিলে। বিছানার ওপর দুটো মাথার বালিশ, দুটো পাশ-বালিশ পাশাপাশি সাজানো। বাবা এতক্ষণ কেন্ট-নগরের পথে ট্রেনে চড়ে চলেছে হয়ত। হয়ত নয়নতারার কথা ভুলেও গেছে বাবা। কেন্ট-নগরে গিয়ে বাবা আবার হয়ত তার কাজের মধ্যে ডুবে যাবে। বাবার কি সময় কাটাবার কাজের অভাব? সকাল-সন্ধ্যের ছাত্ররা আসবে পড়া জানতে। তাদের সঙ্গে আলো-চনা করতে করতেই কোথা দিয়ে বেলা পুইয়ে যাবে বাবা তা টেরও পাবে না, তখন খাওয়ার জন্যে তাগাদা দিতে হবে। বাবা খেয়ে নিলে তবে তো মায়ের খোওয়া এঁটো বাসন মাজা শেষ হবে। বাবা খেয়ে নিতে যত দেরি করবে সংসারের কাজ শেষ হতে ততই দেরি হবে। বাবা কখনও নিজে সংসার দেখেনি। সব দেখতো মা-ই। নিজের হাতে সংসার করলেই তবে সংসারের জ্বালা মানুষ বুঝতে পারে। নইলে দূরে থেকে হুকুম দিতে সবাই পারে।

কাপড় ব্লাউজ বদলে নয়নতারা শুতে গিয়েও কেমন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলো। দরজায় খিল দিয়ে শোবে নাকি সে?

কী করবে বুঝতে পারলে না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এখনই বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

হঠাৎ বাইরে থেকে শাশুড়ির গলা শোনা গেল—বউমা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

নয়নতারা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে বললে—না মা—

শাশুড়ি বললে—হ্যাঁ, তোমাকে তাই বলতে এলাম, তুমি এতদূরে থেকে এসেছ, জেগে থাকবার দরকার নেই, কিন্তু দরজায় যেন খিল দিও না, কিছু ভয়-ডর নেই এখানে। খোকা খেয়ে দেয়ে এই ঘরেই শুতে আসবে—

কথাটা শুনেই নয়নতারার বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। শাশুড়ি কথাটা বলে আবার তার নিজের কাজে চলে গেল। কিন্তু নয়নতারার মনের মধ্যে তার জের চলতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে।

প্রকাশমামা দিদির কাছে এসেছিল। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো দিদি? বউমা দরজা খুলে শুয়েছে?

দিদি বললে—হ্যাঁ, পাছে দরজায় খিল দিয়ে দেয় তাই বলে এলাম—

তারপর যেন মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলে—খোকাকে পেলি?

প্রকাশমামা বললে—সেই তাকে খুঁজতেই তো গিয়েছিলুম। কোথাও নেই। বারোয়ারি-তলার গোপাল কেদার ওদের সঙ্গে দেখা হলো। সবাই তাস খেলছে। ওরা বললে সদা ছিল ওখানে অনেকক্ষণ। বসে বসে তাস খেলা দেখছিল, তারপর কখন কোথায় চলে গেছে কেউ টের পায়নি—

—তাহলে কোথায় গেল?

প্রকাশমামা বললে—তারপর বারোয়ারি-তলা থেকে আমি ওদের যাত্রা পার্টির ক্লাবে গিয়েছিলুম, সেখানে দেখি ওদের 'পাষাণী'র রিহার্সাল চলছে। পুজোর সময় 'পাষাণী' প্লে হবে। সেখানে গিয়েও জিজ্ঞেস করলুম, তারা বললে বাড়ির দিকে গেছে সে। তাই ভাবলুম হয়ত বাড়ির দিকেই এসেছে সে, বাড়িতে এসে দেখি সে আসেনি—এখন কী করা যায় বলো দিকিনি। আমি তো ভাবনায় পড়লুম—

প্রীতি বললে—বউমা বাড়িতে এসেছে সে খবরটা সে পেয়েছে নাকি?

—সে খবর সে পাবে কী করে?

—যদি রাস্তায় কেউ গাড়ি দেখে থাকে তো সে হয়ত বলে দিয়েছে খোকাকে।

প্রকাশমামা কথাটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—তাহলে আমাদের বাবাজী কী করছে? বখন বলেছে সব ঠিক হয়ে যাবে তখন নিশ্চয়ই হবে। আমি তো ওই ভরসাতেই আছি—

—যজ্ঞ কবে হবে?

—সে আমি কী করে বলবো? যেদিন বাবাজীর আদেশ হবে।

—এই বাড়িতেই হবে তো?

—সেই রকমই তো কথা আছে।

বাবাজী ততদিনে বেশ বহাল-তবিয়তেই আছেন। সারা বাড়িতেই বাবাজীর জন্যে তোড়জোড় চলে সারা দিন। রেলবাজার থেকে ফল-ফুলুরি-মিষ্টি আসে। বাড়িতে দুধ আছে, তার বেশির ভাগটাই ছানা তৈরি হয় বাবাজীর জন্যে। বাবাজী চাল-আটা-মাংস-ডিম কিছুই স্পর্শ করেন না। বাবাজীর কাছে শালগ্রাম-শিলা আছে। তিনি সকালে

সন্ধ্যায় সেই শালগ্রাম-শিলার সামনে আরতি করেন। সেই আরতির জন্যে গব্যঘৃত, চন্দন, দুধ, তুলসীপত্র, ফুল বেলপাতা যোগাড় করতে হয়। গোরী পিসী সারাদিন সেই সব তদারকিতেই থাকে। কর্তাবাবুর বাড়িতেই অনেক বিগ্রহ। সে বিগ্রহ সামে মাত্র। প্রত্যেক বিগ্রহের মাথা পিছু পঁচাত্তর বিঘে জমি জমা বরাদ্দ। পুজোরী ঠাকুর রোজ ফুল-বেলপাতা চড়িয়ে নিয়ম করে পুজো করে যায়। তার জন্যে কোনওদিন কোনও ঘটাও হয়নি, উৎসবও হয়নি। সে পুজো কখন হলো তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। তার জন্যে বরাদ্দ ব্যবস্থা আছে। পুজোরীঠাকুর তার জন্যে জমি পেয়েছে। পুরোপুরি সে পুজোর জিম্মেদারি তারই।

কিন্তু এ আলাদা পুজো।

বেহারী পালের বউ এসেও খানিকটা হাত চালায়। কখনও ফল কেটে দেয়, কখনও আরতির সময়ে গিয়ে হাজির থাকে। তারপর যখন আরতি হয়ে যায় তখন গলবস্ত্র হয়ে আর সকলের সঙ্গে প্রণাম করে।

বাড়িতে যেতেই বেহারী পাল গিন্নীকে জিজ্ঞেস করে—আজকে কী হলো গো ওদের বাড়িতে?

গিন্নী বলে—কী আবার হবে, ওই পুজো—

বেনে-মশলার দোকান করেই বেহারী পালের অনেক বাড়তি পয়সা। সেই বাড়তি পয়সাতেই আবার মহাজনি কারবার চলে। ধান-পাট-তিসি-সরষের বদলে টাকা ধার দেয়। তবে মালের দরটা বাজারের থেকে কম। কিন্তু দর কম হলে কী হবে, অমন নগদ টাকা কে দেবে হাতে তুলে। কর্তাবাবুও এককালে ওই কারবার করেছিলেন। তারপর যখন অনেক টাকা হয়ে গিয়েছিল তখন জমি কিনে ফেললেন সেই টাকায়। সুদের কারবারে ইজ্জৎ নেই তেমন। কর্তাবাবু তখন একটু ইজ্জতের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

বেহারী পাল জিজ্ঞেস করে—তা হঠাৎ বাবাজীকে কোথেকে আমদানি করলে?

—হিমালয়ের সাধু। রাণাঘাটে এসেছিলেন কোন শিষ্যের বাড়িতে। সেখান থেকে চৌধুরী মশাই নিজের বাড়িতে এনে তুলেছেন। এবার যজ্ঞ হবে, তারপর সাধু আবার চলে যাবেন হিমালয়ে।

—তা সাধুবাবাজী কী করে সারাদিন?

গিন্নী বলে—সাধু-সন্নিসীদের ব্যাপারে তুমি অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কোর না, কার মনে কী আছে কে বলতে পারে! ভাল না করুক মন্দও তো করতে পারে। তখন? আর আমার তো এতে পয়সা খরচ হচ্ছে না—

বেহারী পাল বলে—ওসব কর্তাবাবুর বুজরুকি। বুঝলে? যাকে বলে ভড়ং—ভেতরে ভেতরে কালিগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তীর সব সম্পত্তি গ্রাস করে এখন বোধহয় পরকালের ভয় ঢুকেছে মনে। যাবে এক দুন

সব এই তোমায় বলে রাখলুম, সব যাবে। ওই নাতিই ওদের বংশে পেল্লাদ হয়ে জন্মেছে—দৈত্যকুলে পেল্লাদ—। কাঁপল্ল পায়রাপোড়া, ফটিক ঘোষ, মাখন প্রামাণিক কি মিছিমিছি মরেছে বলতে চাও?

তা বেহারী পাল যা-ই বলুক তাতে কারোর কিছুই আসে যায় না। টাকা হলেই ও পরস্পর হিংসে-ঈর্ষা-দ্বেষ-বিদ্বেষ থাকেই। তা নিয়ে মাথা ঘামালে সংসার চলে না। নইলে বাবাজীদেরই বা চলবে কেমন করে? তাদেরও তো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা চাই। চৌধুরী মশাই-এর সংসারে যদি শান্তিই থাকবে তো তাহলে কি আর বাবাজীকে বাড়িতে এনে এত খাতির করতো কেউ? না, দিনরাত তার সেবার জন্যে এত খরচান্তের আয়োজন-অনুষ্ঠান হতে।

বাবাজী এক-একদিন এক-এক ব্রত করেন।

বলেন—আজ ভূতাপসারণ দিগ্বন্ধন করবে—

—সেটা কী?

বাবাজী বলেন—তার অর্থ এই বাড়ির চৌহদ্দি থেকে ভূত-প্রেত দূর করবো। তাদের দৃষ্টি পড়েছে এ বাড়িতে—

—তাতে কী কী উপচার চাই?

বাবাজী ফর্দ দেন—গঙ্গাজল, পুষ্প আর শ্বেত সর্ষপ। বেশি কিছু নয়।

তা তারই ব্যবস্থা হলো। সবই এসে জুটলো। সত্যিই যদি বাড়ির ওপর ভূত-প্রেতের নজর পড়ে থাকে তো তা আগে দূর করতে হবে।

যখন সব জোগাড় হলো তিনি দিগ্বন্ধন করতে করতে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। ধূপ-ধুনোর গন্ধে তখন চোখে অন্ধকার দেখছে সবাই।

বাবাজী বললেন—কাঁসর ঘণ্টা কই?

প্রজ্ঞানমামা কাঁসর নিয়ে ঝাঁই-ঝাঁই করে বাজাতে লাগলো। আর একজন ঘণ্ট।

বাবাজী চিৎকার করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন—ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ...

আরো কী সব অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন তার মানে কেউ বুঝতে পারলো না। তা না পারুক, শব্দ যত দুর্বোধ্য হয় সকলের ভক্তি ততই বাড়ে। শেষকালে হাতে তুড়ি দিতে লাগলেন বাবাজী। ওঁ হং লিঙ্গ শরীরং শোধয় শোধয় স্বাহাঃ...

যখন পুজো শেষ হয়ে আসছিল তখন হঠাৎ বাবাজী চিৎকার করে বলতে লাগলেন—ফট্...ফট...ফট...ফট স্বাহাঃ...

শেষ পর্যন্ত দিগ্বন্ধন হলো, ভূতাপসরণও হলো। পরের দিন চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ বাবা ভূত কি ছিল বাড়িতে?

বাবাজী বললেন—ছিল বৈকি। অনেকগুলো ভূত ছিল। তার মধ্যে আবার একটা ছিল প্রেতিনী—

কথাটা শুনেই চৌধুরী মশাই-এর বুকটা যেন ছাঁৎ করে উঠলো। কালিগঞ্জের বউ কি তাহলে অশরীরী হয়ে এই বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল নাকি?

—তা এখন সবাই দূর হয়েছে তো?

—দূর হবে না মানে? চোখের জল ফেলতে ফেলতে সবাই পালিয়েছে।

—কিন্তু যজ্ঞ করবেন কবে? আপনি যে বলেছিলেন যজ্ঞ করলে অমঙ্গল কেটে যাবে?

—আরে আগে-ভাগে যজ্ঞ করলেই হলো? ভূগুর বড় কষ্ট হচ্ছিল ভূত-প্রেতের উপদ্রবের জন্যে। এবার তারা দূর হলো, এখন ভূগু সুস্থ হলেন।

ঠিক এই সময়েই কেষ্টনগর থেকে বেয়াই মশাই তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসে হাজির হলেন। বেয়াই মশাই কিম্বা তাঁর মেয়ে কেউই জানতে পারলে না তাদের অজ্ঞাতে এই বাড়ি এই বংশ ভূতের উপদ্রব থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

কর্তাবাবুও জানতে পারলেন না ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড চলেছে। তাঁর নাকে তখনও ধূপ-ধুনোর গন্ধ যায় আর কানে যায় কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ। বলেন—বেহারী পালের দেব-দ্বিজে ভক্তি-টক্তি ওসব ভড়ং, বুঝলে কৈলাশ। সব ভড়ং। ও হলো আসলে টাকার গরম! সুদে টাকা খাটিয়ে খাটিয়ে টাকা করে এখন লোককে দেখাচ্ছে—ওগো তোমরা দ্যাখো, আমার কত টাকা হয়েছে—

সেদিন বাবাজীর কাছে গিয়ে চৌধুরী মশাই বললেন—বাবাজী, আজ আমার বউমা এসেছে—

—এসে গেছে? তা ভালোই হয়েছে।

—এবার আমার ছেলেকে বউমার কাছে শুতে পাঠাবো তো?

—নিশ্চয় পাঠাবি।

—কিন্তু ছেলে যদি আবার বিগড়ে বসে?

বাবাজী হাসলেন। বললেন—না রে না, সে ভয় তোর নেই। আমি তো দিগ্বন্ধন করে দিয়েছি, এর পর আমি একটু পাদোদক দিয়ে দেব, সেইটে খাইয়ে দিস। এখন এই পর্যন্তই চলুক তার পর তো আমি আছিই—তোর কিছু ভয় নেই—

*

অনেক রাত্রে কখন নিঃশব্দে সদানন্দ বাড়িতে ঢুকলো। রোজ এমনি করে নিঃশব্দেই সে ঢোকে। কখন কোথায় থাকে, কার সঙ্গে মেশে তাও যেন কেউ জানে না। কখনও দেখা যায় বারো য়ারিতলায় গিয়ে বসেছে। তারপর আবার কখন সেখান থেকেও সে উঠে যায় কেউ টের পায় না। তারপর একে একে যখন রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা পাতলা হয়ে আসে তখন দিশে পেয়ে যায়। নদীর ধারে বিরাট চড়া পড়ে থাকে। সেখানেই হয়ত শুয়ে পড়লো। এপারে নবাবগঞ্জ ওপারে কালিগঞ্জ। নদীটা পেরিয়ে ওপারে খানিকটা হেঁটে গেলেই হর্নাথ চক্রবর্তীর ভাঙা দোতলা বাড়িটা। সেই বাড়ির সামনে গিয়েও খানিক দাঁড়ায়। সেই বাড়ির রাস্তায় চলতি কোনও লোক দেখতে পেলে ভালো করে ঠাহর করতে পারে না।

জিজ্ঞেস করে—কে?

সদানন্দ বলে—আমি?

বুড়ো লোকটা জিজ্ঞেস করে—তুমি কাদের বাড়ির?

সদানন্দ বলে—আমি নবাবগঞ্জের চৌধুরী মশাই-এর ছেলে,—

—ও, তুমি গোমস্তা মশাই-এর নাতি? তা এত রাত্তিরে এখানে কেন? কী [illegible]

সদানন্দ বললে—না, কিছু দেখছি না, এমনি।
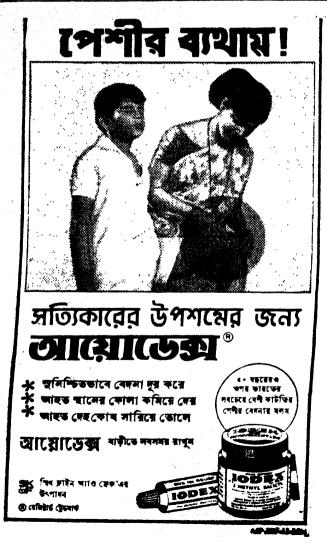
—এ বাড়ি কার জানো? হর্ষনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি। তোমার ঠাকুরদাদা এই চক্রবর্তী মশাই-এর গোমস্তা ছিলেন। এ কী বাড়িই ছিল এককালে বাবা, আর এখন কী বাড়িই হলো। একেবারে ভূতের বাড়ি হয়ে গেল রাতারাতি।

সদানন্দ আর বেশি দাঁড়ালো না সেখানে। ক'দিন আগেও সে এখানে এসেছিল। এই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল। এরই মধ্যে যেন জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেছে জায়গাটা। দু-চারটে গাছ ভাঙা ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে শুরু করেছে। লোকজন কেউ নেই কোথাও। ভেতরে কোথাও একটা আলোও জ্বলছে না। সত্যিই ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে দেখছি।

আবার হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে ফেরে। মনে হয় যেন পেছন পেছন কে আসছে। পেছন ফিরে দেখে একবার। কেউ কোথাও নেই। আবার যেন কার গলা শোনা যায়! সদানন্দ আবার পেছন ফেরে। কাউকে দেখতে পায় না।

হঠাৎ যেন কে বলে ওঠে—আমার দিকে চেয়ে দেখ, এই যে আমি—

আবার পেছন ফেরে সদানন্দ। একেবারে ঠিক কালিগঞ্জের বউ-এর গলা।

—তুমি বাবা আমার জন্যে কেন কষ্ট পাচ্ছো? আমি তো মরে গিয়েছি।

সদানন্দ সামনের ধু-ধু নিঃসীম অন্ধকারের দিকে চেয়ে অশরীরী শব্দটার মধ্যে একটা অবয়ব খুঁজতে চেষ্টা করলে।

—তুমি নতুন বিয়ে করেছ, তোমার সামনে অনেক ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে বাবা, তুমি আমার কথা আর ভেবো না। বুঝলে? ভাবলে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি বাড়ি ফিরে যাও—

সদানন্দ কাঁদো কাঁদো গলায় একবার ক্ষীণ প্রশ্ন করলে—তুমি কই কালিগঞ্জের বউ? তুমি কই?

—আমি? আমি তো আর নেই বাবা?

—তুমি নেই তো কথা বলছো কী করে? তুমি কোথায়?

—আমি? আমি কোথায়? আমাকে যে তোমার গোমস্তা মশাই শেষ করে দিয়েছে। আমি যে হারিয়ে গিয়েছি বাবা।

বলতে বলতে একটা কাতর্যকাতর আর্তনাদে হঠাৎ বাতাসটা চৌচির হয়ে গেল আর সদানন্দর সমস্ত শরীরটা সেই শব্দে থর থর করে কেঁপে উঠলো। হঠাৎ নজরে পড়লো তার সামনেই একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর অচেনা মানুষ দেখে তার দিকে চেয়ে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে।

সদানন্দ চিৎকার করে বলে উঠলো—আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো কালিগঞ্জের বউ, তুমি দেখে নিও, আমি আমার দাদুর সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো একদিন—

আশ্চর্য! একটা তুচ্ছ কুকুরও তাকে আজ পর মনে করছে। তাকে অবিশ্বাস করছে। তাকে অশ্রদ্ধা করছে। সে যে এক নিষ্ঠুর হত্যাকারী পরস্বাপহারীর বংশধর তা এই রাস্তার কুকুরটাও যেন কেমন করে বুঝতে পেরেছে।

লজ্জায় মাথা নিচু করে সদানন্দ আবার তার বাড়ির পথ ধরলে। অন্য দিন হলে সে কুকুরটাকে তাড়া করতো। কিম্বা তাকে লক্ষ্য করে একটা ঢিলও ছুঁড়তো। কিন্তু আজ তার মনে হলো কুকুরটার কোনও অপরাধ নেই। সে কোনও অন্যায় করেনি। নবাবগঞ্জের মানুষও যে তাকে এতদিন এমনি করে কামড়াতে আসেনি এই-ই যেন তার সৌভাগ্য!

প্রকাশমামাই প্রথমে তাকে দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠেছে—ও দিদি, এই যে এতক্ষণে তোমার খোকা এসে গেছে—

গৌরী পিসীও রান্নাবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সকলকেই বলা ছিল বউমা যে বাড়িতে এসেছে এ কথা কেউ যেন খোকাকে না জানায়। সদানন্দ সকলের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এমন করে তো অন্যদিন কেউ চায় না তার দিকে। অন্তত কেউ এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখে না।

মা বললে—আয় খেতে বোস—

সদানন্দ কুয়োতলা থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে যথারীতি খেতে বসলে। প্রাত্যহিকের নিয়ম-বাঁধা কাজ। এই সকালবেলা খেয়ে দেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া আর রাত্রে এসে খেয়ে নিজের ঘরটাতে শুয়ে পড়া। আর তাও খাওয়া না খাওয়া। কোনও রকমে গলা দিয়ে ভাত সেঁধিয়ে দেওয়া।

মা বললে—হ্যাঁ রে, সারাদিন কোথায় থাকিস? তোর কি ক্ষিধেও পেতে নেই রে? না কারো বাড়িতে খেয়ে নিস?

এ অভিযোগ নিত্য-নৈমিত্তিক। এতে কান দেওয়ার মত ছেলে সদানন্দ নয়।

গৌরী পিসী এসে ভাতের থালা রেখে দিয়ে গেল সামনে।

মা বললে—ওরে, খাবার আগে এইটে চুমুক দিয়ে খেয়ে নে বাবা—যেন পারে না ঠেকে—বলে ছোট পাথরের একটা বাটি সামনে এগিয়ে দিলে।

—কী এটা?

—পঞ্চের চরণামৃত। পঞ্চো হয়েছিল তারই পেসাদ!

সদানন্দ বললে—এ আমি খাবো না—

—কেন, খাবিনে কেন? পেসাদ খেতে দোষ কী তোর?

সদানন্দ বললে—এ খেয়ে কী হবে?

মা বললে—খেলে তোর ভালো হবে। তোর মতি-গতি ফিরবে—

সদানন্দ বললে—আমার মতি-গতি কি খারাপ যে ফেরাতে হবে?

মা বললে—অত তক্কো করিস নে তুই, আমি বলছি খেয়ে নে, মার কথা শুনতে হয়, খা, খেয়ে নে—

সদানন্দ হাত দিয়ে বাটিটা ঠেলে দিতেই বাটিটা উল্টে জল পড়ে গেল।

মা বললে—ও কী করলি? ঠাকুরের

[illegible], কেন দিলি? ওতে যে পাপ হয় রে—

—হোক পাপ। পাপ হলে আমার [illegible]। আমার পাপ হলে তোমাদের কী? [illegible] আমার কথা কেউ ভাবো?

[illegible] সদানন্দর [illegible] থেকে হাত তুলে [illegible] পড়তে লাগলো। যেন কোনও রকমে [illegible] দিয়ে তার সামনে থেকে উঠে যেতে পারলে সে বাঁচে। তারপর যা পারলে খেয়ে নিয়ে কুয়োতলায় গিয়ে মুখ-ধুয়ে তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

প্রকাশমামা এই সুযোগের অপেক্ষাতেই [illegible] আড়ালে ওৎ পেতে ছিল। সদানন্দ ঘরে গিয়ে ঢুকতেই বাইরে থেকে দরজার শেকল তুলে দিয়েছে।

সদানন্দর তখন আর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা খুলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সাপের ছোবল খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পড়লো। মনে হলো পাশে যেন কে শুয়ে রয়েছে। একটা কী যেন সন্দেহ হলো তার। তারপর জানালাটা খুলে দিলে। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে চাঁদের আলো এসে বিছানাতে পড়তেই দেখলে নয়নতারা। নয়নতারা বিছানার একপাশে সরে গিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে।

কিন্তু এমন করে তার বউ যে হঠাৎ এসে পড়বে তা সদানন্দ কল্পনা করতে পারেনি। নয়নতারার মা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে সে সেখানে চলে গিয়েছিল এই খবরটাই সে জানতো। কিন্তু ফিরে আসার খবরটা তো তাকে কেউই দেয়নি।

কী করবে সে বুঝতে পারলে না। ঘটনার আকস্মিকতায় একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তার পরে সোজা ঘর থেকে বাইরে যেতে গিয়েই বুঝলে বাইরে থেকে শেকল বন্ধ।

সদানন্দ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো—মা, মা, দরজা খোল, দরজা বন্ধ করে দিলে কেন? দরজা খোল, মা—

প্রকাশমামা বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল মজা দেখাবার জন্যে। দিদির দিকে চেয়ে বললে—খবরদার, দরজা খুলে দিও না যেন—ওই রকম বন্ধ থাকুক—

প্রীতির তখনও সন্দেহ হচ্ছিল। বললে—কিন্তু শেষে যদি খোকা কিছু করে বসে?

—কী করে বসবে? করলে তখন তো আমি আছি। আমার কাছে তো তারও ওষুধ আছে।

সদানন্দ ভেতর থেকে তখনও দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে—মা, দরজা খোল, মা—

চৌধুরী মশাইও কবাজীকে রেখে দেখতে এসেছিলেন। বললেন—সেই চন্নোমেত্তটা খাইয়েছ তো?

প্রীতি বললে—খোকা কি তোমার সেই ছেলে যে খাবে? আমি পাথর বাটিটা দিতেই সে ঠেলে ফেলে দিলে।

চৌধুরী মশাই রেগে গেলেন। বললেন—তা এই সামান্য কাজটুকুও তোমাদের দিয়ে হবে না? এখন [illegible] আমি কী বলি বলো তো?

প্রীতি বললে—তুমি [illegible] বোলো না। এতই যদি তোমার [illegible] তুমি নিজেই খাওয়াবার [illegible] তোমার ছেলে কী [illegible] আমি কি মনে [illegible] চেষ্টা করিনি?

প্রকাশমামা চৌধুরী [illegible] সেখান থেকে সরিয়ে [illegible]— আপনি যান তো জামাইবাবু এখান থেকে, আপনি যান। আপনি গিয়ে বাবাজীকে দেখুন গে। আমরা এ-দিকটা [illegible] আপনি যান—

চৌধুরী মশাই আর দাঁড়ালেন না। কিন্তু মন থেকে আর দুর্ভাবনাও গেল না। এত সাধ্য-সাধনা, এত হোম-যজ্ঞ, এত পুজো-আচ্চা, এত টাকা খরচান্ত, সবই কি তাহলে ব্যর্থ হলো? তাহলে কি ভগবান বলে কেউ নেই?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ রে প্রকাশ, শেষকালে হিতে বিপরীত হবে না তো?

প্রকাশমামা নির্ভয় দিলে। বললে—হিতে-বিপরীত কী হবেটা শুনি? হবেটা কী?

প্রীতি বললে—যদি খোকা বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যায়? এখন তো তবু বাড়িতে আসছিল রাত্তিরবেলাটা, এর পর যদি বাড়ি আসাও ছেড়ে দেয়?

—পাগল হয়েছ? বাড়িতে না এলে খাবে কোথায় শুনি? ঘুমোন যেখানে-সেখানে চলতে পারে, কিন্তু খাওয়া? সেটা কে দেবে ওকে? তোমার ছেলের তো সে ক্ষমতাও নেই যে নিজে রোজগার করে খাবে? তাহলে বাড়ি আসবে না তো যাবে কোথায়? তুমি অত ভাবছো কেন দিদি, আমি তো আছি। এতে ফয়শালা না হয় তো অন্য পথও তো আছে—

—অন্য কী পথ?

প্রকাশমামা বললে—সে এক রকম মাদুলি আছে, সে একেবারে অব্যর্থ—

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, মাদুলি পরতে বয়ে গেছে তোর ভাগ্নের! বলে চন্নোমেত্তোরই ফেলে দিলে, সে আবার পরবে মাদুলি!

প্রকাশমামা বললে—আরে সদা মাদুলি পরবে কেন? মাদুলি পরিয়ে দেব বউমাকে। দেখবে সেই মাদুলি পরিয়ে দিলে সদা একেবারে বউমার পা চাটতে চাটতে পায়ের চামড়া ক্ষইয়ে ফেলবে তবে ছাড়বে—তুমি যদি ফুলশয্যের দিনের ব্যাপারটা আগে বলতে তাহলে আমি তো সেই ব্যবস্থাই করতুম। তাহলে এই কবাজীর পেছনে এত খরচান্ত করতেও হতো না—

ভেতর থেকে সদা তখনও দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর বলছে—মা, দরজা খুলে দাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, দরজা খোল মা...

(ক্রমশ)

॥ বারো ॥

সেদিন বিকেল চারটা থেকে শুরু করে রাত বারোটা পর্যন্ত নেতাজী সম্মেলনের মূল আলোচনা সভা বসেছিল। আলোচনা, বক্তৃতা, খানা-পিনা, ফিল্‌ম-শো, সাংবাদিক সম্মেলন সব কিছু মিলে জমজমাট ব্যাপার। হোটেল স্টেজেনের ব্যাংকয়েট হল-এ প্রধান আলোচনার আসর বসল। বিকেলে ব্যাংকোয়েট হল-এর লাগোয়া বারান্দায় একটা tea-meeting দিয়ে কাজ শুরু হল। এই সেই মিটিং যা সামলাবার ভার ডাঃ ওয়ার্থ আমার ওপর দিয়েছিলেন।

এই ছোট মিটিং-এ সকলেই খুব উৎসাহ নিয়ে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিল। কথায় কথায় আমি বলেছিলাম, ভারতীয় মেয়েরা সাধারণভাবে রাজনীতি সচেতন। আমার শ্রোতাদের এ মন্তব্যে কারো কারো আপত্তি হল। তারা বললে—তা কি করে হবে? তোমাদের দেশের মেয়েরা বেশীর ভাগই হল আনএডুকেটেড, ইললিটারেট—অশিক্ষিত, অক্ষর পরিচয়হীন। মানছি তোমাদের ইন্দিরা গান্ধী আছেন, প্রধানমন্ত্রী হলেন মহিলা এবং বিচক্ষণ রাজনীতিক। কিন্তু তারপরেই তো অন্ধকার, একটা বিরাট গ্যাপ, যার অপরদিকে লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর ভারতীয় নারী। এ সব কথা বিদেশে বসে শুনতে কার ভাল লাগে?

অতএব আমিও আমার পয়েন্ট কিছুতেই ছাড়ি না। শুধু অক্ষর পরিচয় থাকলেই কি শিক্ষিত বলা চলে? আমাদের অনেক নিরক্ষর ঠাকুমা-দিদিমাদের কাণ্ডজ্ঞান আমাদের চাইতে ঢের বেশী ছিল না কি? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাদের রাজনৈতিক চেতনার মূলে হয়ত আছে সেইসব দিনগুলি। আর কিছু নয়, শ্রোতাদের কাছে অন্তত সাম্প্রতিক দুটো নির্বাচনের অভিজ্ঞতার গল্প করি। ১৯৬৭ সালে গ্রাম বাংলায় নির্বাচন দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সাধারণ, গ্রাম্য চাষী বউ-ঝিরা সকাল সকাল রান্না-বান্না শেষ করে ভোট দিতে এসেছে। সেবারের নির্বাচনে একটা বড় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছিল। মেয়েরা তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ এবং এই অধিকার প্রয়োগ করে যে তারা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তারা সেটা বেশ ভালই বোঝে দেখা গেল। ১৯৭১-এ কলকাতায় যখন সন্ত্রাসের রাজত্ব তখন আর একটা নির্বাচন হল। লোকে ভেবেছিল ভয়ে কেউ ভোট দিতে যাবে না, প্রচণ্ড গোলমালের আশংকা ছিল। ভোটের দিন ভোরবেলা হতে-না-হতে দেখা গেল শহরের মেয়েরা লাইনে দাঁড়িয়ে গেছেন সকলের আগে।

আমাদের মিটিং চলতে চলতেই অন্য ঘরে ডাঃ বসুর সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হল। য়ুরোপে নেতাজী গবেষণা এবং বাংলাদেশ এই দুই বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। মিটিং শেষ করে লাউঞ্জে এসে দেখি অতিথি অভ্যাগত সমাগমে ঘর ভরে গেছে। আরো সকলে একে একে আসছেন।

ডাঃ ওয়ার্থ সমবেত সকলকে রিসেপশন দিচ্ছিলেন। ডাঃ ওয়ার্থের রিসেপশন শ্যাম্পেন ছাড়া অকল্পনীয়। অতএব অরেঞ্জ অ্যান্ড শ্যাম্পেন সার্ভ করা হচ্ছে। বন-এ ভারতীয় দূতাবাসের প্রায় সকলে উপস্থিত মনে হল। কিন্তু রাষ্ট্রদূত কেবল সিংকে অকস্মাৎ ফ্রাংকফুর্ট চলে যেতে হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং নিউ ইয়র্কে ইউ এন ও-তে যোগ দিতে যাবার পথে ফ্রাংকফুর্ট বিমানবন্দরে কয়েক ঘণ্টা থাকবেন—জরুরী ডাক এসেছে তাই। কেবল সিং পরদিনই ফিরবেন। ওঁর সঙ্গে আজ দেখা হল না বলে কাল চা খেতে ডেকেছেন এবং তখনি কথাবার্তা হবে বলেছেন।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ট্রেনিং-এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার ওয়ালটার হার্বিশ

জার্মান ফরেন অফিসের অনেকে রয়েছেন, বেরেনডংক ছাড়া ইনফর্মেশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডঃ ওয়াইস (weiss) রয়েছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল মিঃ ও মিসেস পাবশ ঘরে ঢুকছেন। পাবশ-দম্পতি কলকাতায় সুপরিচিত। কলকাতায় জার্মান কনসাল থাকার সময় তাঁদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন নি এমন লোক কলকাতার সাহিত্যিক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ সমাজে কমই আছেন। পাবশ এখন বন-এ ফরেন অফিসে রয়েছেন। ডাঃ ওয়ার্থের ঠাসা প্রোগ্রামে আগেই দেখেছিলাম বন-এ পাবশদের গৃহে আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ রয়েছে কোন এক রাত্রে। এখন সম্মেলনে ওঁদের উপস্থিত হতে দেখে বিশেষ আনন্দ হল।

একটু পরে সমবেত অতিথিরা লাউঞ্জ থেকে ব্যাংকোয়েট হল-এ এসে জড়ো হলেন। সেখানে ছোট, ছোট টেবিল ঘিরে চেয়ার পাতা। সকলে সেইভাবেই ছড়িয়ে বসলেন, বেশ যেন ইনফর্মাল পরিবেশ। হলের এক পাশে ডাঃ ওয়ার্থ, ডঃ বসু প্রভৃতি বক্তারা। আর তাদের ঠিক উল্টো দিকে দেয়ালে স্ক্রীন—ফিলম্ ও বক্তৃতার সময় স্লাইড ব্যবহারের জন্য।

আমার এই নূতন ধরনের সম্মেলন বেশ ভাল লাগছিল। সবই ছোট, ছোট দলে টেবিল ঘিরে বসে আছে যেন পার্টি হচ্ছে। যেন হচ্ছে বাঁদিকেন—শুরু হই একটু পর পর টেবিলে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজবের মধ্যেই সিরিয়াস আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বক্তারা উঠে দাঁড়িয়ে একের পর এক বক্তৃতা শুরু করলেন। হোটেল ড্রেজেনের বিখ্যাত ব্যাংকোয়েট হল এতক্ষণ দেয়াল-জোড়া ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করছিল। এবার একে একে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকার হলে বক্তৃতার সঙ্গে স্লাইড প্রোজেক্ট করা শুরু হল। ডাঃ ওয়ার্থ জার্মান ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। ডাঃ বসুর বক্তৃতার ঠিক আগে নেতাজীর ওপর ফিলমটি প্রদর্শিত হল। য়ুরোপের যেখানে গিয়েছি সেখানেই এই নেতাজী ফিলম্‌টি সকলের চিত্ত জয় করেছে। ওয়ার্থের মত ছিল, আগে ছবিটি দেখে উপস্থিত সকলে বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে খানিক প্রত্যক্ষ ধারণা করে নিক, তারপর ডাঃ বসুর বক্তৃতা বুঝতে ও আলোচনায় অংশ নিতে ওদের সুবিধা হবে। তাই প্রাগ-এর কনফারেন্সের মত সব শেষে ফিলম্ না করে আলোচনার মধ্য পথে ফিলম্ প্রদর্শিত হল। ওয়ার্থের আইডিয়া বোধহয় ভালই ছিল। ডাঃ বসুর বক্তৃতার সময় সকলে যেন একটা নূতন আগ্রহ নিয়ে শুনেছিল। হয়ে যাবার পর বেরেনডংক ও ফরেন অফিসের অন্যান্যরা উঠে এসে করমর্দন করলেন।

এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে বেরেনডংক বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলেন মনে হল। পরদিন আমাদের রাষ্ট্রদূত কেবল সিং-এর সঙ্গে দেখা হতে উনিও সেই কথা বললেন—'গতকাল সম্মেলন খুব ভাল ভাবে হয়ে গেছে আমি খবর পেয়েছি, আমার অ্যামবাসির অফিসাররা তো বলেছেনই, তাছাড়া বেরেনডংক নিজে আমাকে টেলিফোন করে জানিয়েছেন উনি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছেন।' সেদিন সন্ধ্যায় বেরেনডংক এবং ফরেন অফিসের যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই বললেন 'পলিটিকাল আর্কাইভস-এর কাগজপত্রের ব্যাপারে আমরা তো পূর্ণ সহযোগিতা করবই, দেখুন যদি ফিলম্ মেটিরিয়াল আরো থাকে। নেতাজীর এই ছবিতে জার্মান সাইডটা আরো বড় হতে পারে, নেতাজীর জীবন ডকুমেন্টারি হল ইস্ট এশিয়ার। তথ্যচিত্রটি আরো বড় করুন খুব ইমপ্রেসিভ ছবি।'

রাত বারোটায় সভা ভঙ্গ হলে সকলে একে একে বিদায় নিলেন। লক্ষ্য করলাম হোটেল ড্রেজেনের কর্মচারীরা এক কোণে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সভার কাজকর্ম দেখছে।

পরদিনও সকাল থেকেই নানান কাজ। ডাঃ ওয়ার্থের প্রোগ্রামে বিশ্রামের অবকাশ নেই। সকাল সকাল ডাইনিং হল-এ নেমে এসে জানলার ধারে বসে রাইন নদীর দৃশ্য দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলাম। হেড্ ওয়েটার মনে হল যেন আমাদের প্রতি একটু বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। টেবিল ক্লথটা পরিষ্কারই ছিল, তবু আর একটা তার ওপর পেতে দিলে, ফুলদানিটা বদলে তাড়াতাড়ি আর একটা আরো ভাল এনে বসিয়ে দিলে। ভাবছি ব্যাপার কি! তারপর আমি যখন পট থেকে কফি ঢালছি তখন আস্তে আস্তে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললে, 'উড্ ইট্ বি ট্ মাচ্—যদি আমি একটা অনুরোধ করি?' আমরা চেয়ে দেখি ওর হাতে নেতাজীর জার্মান

ধবধবে সাদা
ফিকে কালো
সম্পূর্ণ জীবন্ত
বিরাট এক্সপোজার
ল্যাটিটিউড
কুয়াশা বর্জিত

আপনার ছবির প্রিন্ট আর এনলার্জমেন্টের জন্যে সবসময় চেয়ে নেবেন আগ্‌ফা-গ্যাভার্ট পেপার। মনে রাখবেন, নিকৃষ্ট কাগজ ব্যবহার করলে অতি উৎকৃষ্ট ছবিও প্রাণহীন, ম্লান হয়ে যেতে পারে। প্রাণবন্ত ছবির জন্যে আগ্‌ফা গ্যাভার্ট ফোটো পেপারের ওপর নির্ভর করুন। ছবির উজ্জ্বলতা আর স্পষ্টতার জন্যে এ কাগজ অতুলনীয়।

লুপেক্স—যে কোনো নেগেটিভ থেকে নিখুঁত প্রিন্টের জন্যে কন্টাক্ট পেপার।

ব্রোভিরা—এনলার্জিং পেপার—ছোট সাইজের ছবির লুকোনো সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে।

আগ্‌ফা-গ্যাভার্টের সমস্ত অনুমোদিত ডীলারের কাছে পাওয়া যায়।

আগ্‌ফা-গ্যাভার্টের সহযোগিতায় তৈরী করেন: দি নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ, বম্বে।

একমাত্র বিতরক:
আগ্‌ফা-গ্যাভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড
বম্বে • নিউ দিল্লী • কলকাতা • মাদ্রাজ
ফোটোগ্রাফীর সরঞ্জামের নির্মাতা—
® আগ্‌ফা-গ্যাভার্ট, অ্যান্টওয়ার্প-লেভারকুসেনের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

SIMOES/AG/5 Ben

জীবনী Der Tiger Indiens—ডাঃ ওয়ার্থ এই জীবনীর সম্পাদনা করেছেন। বইটি খুললে ডাঃ বসুর দিকে ধরলে একটি নাম নই চাই। সে বললে, যুদ্ধের সময় আমি চন্দ্র বোস্‌কে দেখেছি, যদিও আমার বয়স তখন অল্প ছিল।

বন-এর ইন্সটিটিউট ফর ফরেন পলিটিকস-এ যাওয়া হল একদিন। সেখানকার প্রবীণ ডিরেক্টর নেতাজীকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন বললেন। পলিটিক্যাল ডিভিসনের ডাঃ মেলচার্স নেতাজীর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেন। নেতাজী সম্বন্ধে আরো ফিলম্ পাওয়া সম্ভব কি না তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। উনি বললেন,

ফিলম্ পাওয়া খুবই কঠিন হবে মনে হয়। কোবলেনজ শহরের কাছে উফা বলে জার্মান যে ফিলম্ সংস্থা আছে তাদের বিরাট ফিলম্ সংগ্রহালয় ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় সব ধ্বংস হয়ে যায়। কথাটা ঠিক। কারণ যা কিছু জার্মান ডকুমেণ্টারি পাওয়া গেছে তা এই উফার সূত্রেই পাওয়া।

সারাদিন নানা কাজের মধ্যে এক ফাঁকে বিঠোফেন হাউস ঘুরিয়ে দিলেন ওয়ার্থ। বাড়ির পিছন দিকে সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ছোট একখানা ঘর, বিঠোফেন এ ঘরে জন্মেছিলেন। সামনের দিকে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ঘরগুলি জুড়ে মিউজিয়াম। প্রথম কয়েকটি ঘরে সেকালের বন শহরের ছবি, বিঠোফেনের ছেলেবেলার ও পরিবার পরিজনের ছবি। পরের ঘরগুলির নাম অর্গ্যান রুম, ম্যানাস্ক্রিপ্ট রুম, ভিয়েনিজ রুম ইত্যাদি। ভিয়েনিজ কক্ষটিতে রয়েছে বিঠোফেনের শেষ ব্যবহৃত পিয়ানো।

সেদিন কেবল সিং-এর সঙ্গে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা ও পাবশদের সঙ্গে ডিনার এই করতে আবার রাত বারোটা হল। রাষ্ট্রদূত হিসেবে কেবল সিংকে বেশ ভালই লাগল। ধীর, স্থির গম্ভীর প্রকৃতির, আমার মনে হচ্ছিল একটু যেন বিষণ্ণ। তখন জানতাম না, পরে শুনলাম মাত্র অল্পদিন আগে সন্তানের মৃত্যুশোক গেছে এদের ওপর দিয়ে। সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য কেবল সিং দুঃখ প্রকাশ করলেন। মাত্র দু' ঘণ্টা হল ফ্রাংকফুর্ট থেকে ফিরেছেন। উনি বললেন, জার্মানীতে নেতাজীর কর্মজীবনের যা কিছু বিবরণ ও তথ্য পাওয়া যাবে তা সংগ্রহ করা জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি। আমার সব কনসালদের নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি যেখানে নেতাজী সম্বন্ধে যা কিছু কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। পূর্ব বার্লিনে তো আজমানী রয়েছেনই, পশ্চিম বার্লিনে আছে জহুরী, সেও খুব কর্মদক্ষ। হামবুর্গের মতীন্দর সিং আছে তাকে খবর দিয়ে রাখছি তোমরা, হামবুর্গে তার সঙ্গে যোগাযোগ করো।

পাবশদের সঙ্গে একটা সন্ধ্যা চমৎকার কাটল। ওরা কলকাতা প্রেমিক, কলকাতা ওদের মন হরণ করেছে। পারলে আবার ফিরে যেতে চান। বিদেশীর এই কলকাতা প্রীতি দেখলে আমাদের ভাল লাগে। কলকাতাকে ভালবাসা মানে বাঙালী সংস্কৃতিকে ভালবাসা। পূর্ব বাংলার বাঙালীদের জন্যও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন ওঁরা। পাবশদের বাচ্চা মেয়েরা স্লিপিং স্যুট পরে বিছানা থেকে বেরিয়ে এল। 'কিছুতে আর ঘুমাতে যাবে না—বেজায় উত্তেজিত।' ক্যালকাটা থেকে লোক এসেছে যে'

(ক্রমশ)

চিত্রশিল্পী শশিকুমার হেস

কমল সরকার

উনিশ শতকে ইউরোপে শিক্ষায়তনের পরিবেশে বাঙ্গালী শিল্পীদের ললিতকলা চর্চার যে সূচনা সে অধ্যায়ের পথিকৃৎ রোহিণীকান্ত নাগ। চিত্রশিল্পী রূপে রোহিণীকান্তর জীবন শুরু হলেও শেষে তিনি হয়েছিলেন ভাস্কর। দারিদ্র্য আর অনাহারে রোমে রোহিণীকান্তের পরলোকগমন।

রোহিণীকান্তের পরে যে বাঙ্গালী শিল্পী ইউরোপে চারুকলা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন তিনি শশিকুমার হেস। রোহিণীকান্ত নাগের উত্তরসাধক শশিকুমার উনিশ শতকের আলোকে এক অবিস্মরণীয় নাম।

বহু পথ ঘুরে, বহুদিন পরে রোমের 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'র দরজায় যেদিন শশিকুমারের করাঘাত, সেদিন রোম সম্রাটের রাজকীয় চারুকলা-শিক্ষায়তনে স্থান ছিল না। অতএব সুদূর প্রাচ্য থেকে আগত আশাবাদী শশিকুমারকে কোনো সাহায্যই 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'র কর্তৃপক্ষ করতে পারলেন না। ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে শশিকুমার কলকাতার ইতালিয়ান কনসাল-জেনারেলের দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন সম্রাট প্রথম হামবার্টের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

"স্থান চাই 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'তে, ব্যবস্থা করে দিন আপনি। ফিরে যাওয়ার অর্থও নেই আমার।"—বিপন্ন শশিকুমারের নিবেদনের পুনরাবৃত্তি করেন সঙ্গের দোভাষী।

সৌম্যদর্শন শিল্পীর দৃপ্ত ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হলেন শিক্ষাসচিব। অকপট-অন্তর শশিকুমারের আকুল আবেদনে সাড়া দিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ।—তবে সম্পূর্ণ নিঃশর্তভাবে নয়।

"আগামী তিন মাসের মধ্যে ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে। যদি এই শর্তে রাজী থাকো তবেই বিশেষ ছাত্র হিসেবে 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'তে প্রবেশাধিকার পাবে তুমি।"

তিন মাস পরে শর্তাধীন সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন শশিকুমার। মাত্র ছ' শ টাকা সম্বল করে তাঁর ইটালি যাত্রা। রোমে উপনীত শশিকুমারের হাতে তখন নব্বইটি মুদ্রা। উনবিংশ শতকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শশিকুমার হেস

এক ভারতীয় চিত্রশিল্পীর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার এক কাহিনী।

বিগত যুগে ললিতকলাকে অবলম্বন করে যে কয়জন মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী চিত্রশিল্পী খ্যাতির চরম শীর্ষে পৌঁছেছিলেন তাঁদের অন্যতম শশিকুমার। চারুকলার এক বিশেষ শাখায় অর্থাৎ 'পোর্ট্রেট' বা প্রতিকৃতি চিত্রে তাঁর কৃতিত্ব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে সুপরিচিত করে তোলে এবং তাঁর এই পরিচিতি ক্রমশ কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছায়।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন ঘটে, শশিকুমারের ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটেছে। তাঁকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা নানা কিংবদন্তীর অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছে চিত্রশিল্পী শশিকুমারের প্রকৃত পরিচয়। ফলে, কলারসিকদের শশিকুমার প্রসঙ্গে নিস্তব্ধতা অবলম্বন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার সাজিউড়া গ্রামে শশিকুমারের জন্ম। তাঁর জীবনপ্রভাত চরম অনটন আর অভাবের ক্রন্দনরোলে সোচ্চার। তাই বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার অকিঞ্চিৎকর গণ্ডীর মধ্যেই সীমিত ছিল তাঁর জীবন। জনৈক হৃদয়বান ভদ্রলোকের চেষ্টায় সংগ্রহ করেছিলেন পাঠশালার পণ্ডিতি। পণ্ডিতির সঙ্গে গোপনে ছবিও আঁকতেন শশী। কিন্তু কঠোর বাস্তব ছিন্ন-ভিন্ন করে দিত তাঁর সৃষ্টি। ছবি আঁকারও বিজ্ঞান আছে, আছে তার বিবিধ রীতি-নীতি। ছবি আঁকতে প্রয়োজন হয় নানা উপকরণের। মাথা খুঁড়লেও তা পাওয়া যায় না সাজিউড়া গ্রামে। তাই যেতে চায় সে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে।

শশিকুমার খবর পেয়েছিলেন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে লেখা-পড়ার জন্যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের স্কলারশিপ পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টায় ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের সে বৃত্তি নিয়ে কলকাতার কালাপুকুর লেনে এসে বাসা বাঁধলেন শশিকুমার। কয়েক মাসের মধ্যে নিজের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করে আর্ট স্কুলে পেয়েছিলেন আরও এক বৃত্তি।

আর্ট স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট (প্রিন্সিপাল) উইলিয়াম হের্বার জবিন্স এবং তাঁর সহকর্মী সেভ্যালিয়র ও-গিলার্ডি বিপুল এক সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন শশীর চিত্রকলার মধ্যে। অতএব তাঁরা উপদেশ দিলেন : ইটালি যাও। যুরোপের ললিতকলার স্বর্গ ইটালি তোমার উপযুক্ত স্থান। ছাত্রবন্ধু ও-গিলার্ডি রোমের 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'র প্রসপেক্টাস আনিয়ে দিলেন। নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন কলকাতার ইতালিয়ান কনসাল-জেনারেলের সঙ্গে। উদ্দীপিত শশী অপরিসীম আনন্দে অর্থের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ইউরোপ যাবার টাকা চাই।

এমন সময়ে পরিচয় হয় তাঁর মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে। ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের মাধ্যমে পরিচিত হলেন তিনি ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে। মহারাজা

শশিকুমারের তুলিতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

সূর্যকান্ত শশিকুমারকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এই সময়ে ময়মনসিংহের দানশীলা ভূম্যধিকারী জাহ্নবী দেবী চৌধুরীর পরিবারের কয়েকটি পারিবারিক প্রতিকৃতি আঁকার সুযোগ পেয়ে গেলেন শশিকুমার। সে বাবদ পারিশ্রমিক পেলেন ছ'শ টাকা। এই ছ'শ টাকাই হলো তাঁর ইউরোপ যাবার পাথেয়। তারপর ভেসে পড়লেন সমুদ্রে। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৪।

রোমের 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'তে শশিকুমার তিন বছর পেন্টিং-এর ছাত্র ছিলেন। এরপর জার্মানীর মিউনিক 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি'তে স্পেসাল পেন্টিং ক্লাস-এর ছাত্ররূপে যোগদান। মিউনিকে শশিকুমারের শিক্ষাকাল ছয়মাস।

মিউনিকের শিক্ষা শেষে তিনি প্যারিসে উপনীত হন এবং প্যারিসেই প্রথম স্বাধীনভাবে তাঁর জীবিকা অর্জনের চেষ্টা। ইউরোপ প্রবাসী ছাত্র শশিকুমারের লেখাপড়ার খরচের বৃহত্তর অংশের সাহায্যকারী মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী।

প্রায় পাঁচ বছর পর যখন শশিকুমারের লণ্ডন যাত্রা তখন সেখানে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের অভাব নেই। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ডাব্লিউ সি বোনারজি, দাদাভাই নৌরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, রাজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ মানুষ।

শশিকুমারের প্রবল ইচ্ছা ব্রিটিশ রয়্যাল অ্যাকাডেমি'র শীতকালীন প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। কিন্তু তা হলো না। দেরি করে লণ্ডনে আসায় তাঁর সে বাসনা চরিতার্থ হয়নি।

কিন্তু শশীর গুণগ্রাহীরা ছাড়লেন না। তাঁদের উদ্যোগেই আয়োজিত হয় শশিকুমারের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে আয়োজিত সে অনুষ্ঠানের সংবাদ ধরে রেখেছে লণ্ডনের 'টাইমস'। "হিন্দু আর্টিস্টিক এক্সপিরিয়েন্সএস" শিরোনামের সে সংবাদে বলা হয়েছে :

"Under the auspices of the National Indian Association a paper by Mr. Sasi Kumar Hesh, an Indian Artist, describing his artistic experiences on the continent and in England, was read by Dr. Mullick yesterday at the Imperial Institute."

লণ্ডনের 'ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট'-এ অনুষ্ঠিত সে সভায় শশিকুমারকে পেশ করতে হয়েছিল তাঁর ইউরোপবাসের অভিজ্ঞতা। প্রখ্যাত কলাসমালোচক স্যার জর্জ বার্ডউড-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সে সভায় শশিকুমারের অভিজ্ঞতা পাঠ করেন ডক্টর শরৎচন্দ্র মল্লিক।

রোম, ফ্লোরেন্স, প্যারিসের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত ইউরোপীয় ধ্রুপদী চিত্রকলা তাঁর মনে যে ছায়াপাত করেছিল তিনি তা অকপটে ব্যক্ত করেন। প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রকলার বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে সমকালীন ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান চিত্রকলায় ক্রমবিবর্তনও তিনি নিপুণ সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেন।

সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পীদের শিল্পকর্মেরও আলোচনা তাঁকে করতে হয়েছিল এ বক্তৃতায়। সে আলোচনায় সার্জেণ্ট, হারকোমার, অর্কার্ডসন, কোলিয়ার প্রমুখ শিল্পীদের প্রতিকৃতিকলা চর্চা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন

যে, সার্জেণ্ট ছাড়া অন্য কোনো চিত্রশিল্পীর কাজ তাঁর মনে ছায়াপাত করতে পারেনি।

লণ্ডনের এই অনুষ্ঠানের কিছু পরে শশিকুমারের ভারতে প্রত্যাবর্তন (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

প্রত্যাবর্তনের পর কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আচার্য ও অবলা বসু দুজনেই ছিলেন তাঁর শুভকাঙ্ক্ষী। স্বভাবতই বয়ঃজ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহেই শশিকুমার এবং তাঁর ভাবী বধূর ব্রাহ্ম মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ।

শশিকুমারের পারিবারিক জীবনকে উপলক্ষ করে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আছে ভিত্তিহীন কিছু অসম্ভব এবং কাল্পনিক গাল-গল্পের প্রচলন। তাঁর সমসাময়িককালে শশিকুমার-সম্পর্কিত নানা সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এই ভিত্তিহীন কিংবদন্তীর অবসান আজও হয়নি।

প্যারিসে থাকার সময়ে আতালি ফ্রামী নাম্নী জনৈকা ফরাসী বিদুষীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন শশিকুমার। পরিচয়ের অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁর ও ফ্রামীর সম্পর্ক নিবিড় প্রণয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। পরিণামে বিবাহের জন্য উদ্যোগী হন দুজনে।

ফ্রামী শশিকুমারের সঙ্গে প্যারিস থেকে লণ্ডনে আসেন এবং লণ্ডনে অবস্থানকালে পাশ্চাত্য প্রথায় অনুষ্ঠিত হয় তাঁদের প্রাক্-বিবাহ বাগ্দান। রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং বিপিনচন্দ্র পাল তখন লণ্ডনে। এঁদের সঙ্গে শশিকুমারের সৌহার্দ্য ছিল। তাই এই তিন বরণীয় বাঙালী শশিকুমার-আতালির প্রাক্-বিবাহ বাগ্দান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের অপর দুই পরিদর্শক—ফ্রামীর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ। ঘটনাকাল ১৮৯৯।

বাগ্দান অনুষ্ঠানের পর শিল্পী ও তাঁর ভাবী বধূর ভারতে আগমন। কিন্তু শশিকুমারের পরিবার ও সমাজ এই বিবাহের বিরোধিতা করায় তিনি মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ভেঙে যায় তাঁর বাসা বাঁধার স্বপ্ন। এগিয়ে এলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ভেঙে পড়া শিল্পীকে অভয় দিলেন তিনি। মুহূর্তে সব ঠিক হয়ে গেল। —আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহেই ব্রাহ্ম মতাদর্শে দীক্ষিত হলেন শশিকুমার আর তাঁর ভাবী বধূ আতালি ফ্রামী। মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির এই অনুষ্ঠান সেদিনের পত্র-পত্রিকায় এক বিশেষ সংবাদ। সংবাদে বলা হয়েছিল:

"On the morning of Tuesday, the 6th February, an interesting ceremony of initiation was held by Pandit Sivanath Sastri, in the house of Dr. J. C. Bose, when Mr. S. K. Hesh, the celebrated painter who recently returned from Italy and Miss Flamant, Athalie, French lady were formally admitted into the Church after special services held in the presence of a number of friends."

শশিকুমারের তুলিতে রবীন্দ্রনাথ

লণ্ডনে থাকার সময়ে বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গায়কোয়াড়ের কাজ নিয়েছিলেন তিনি। তাই দেশে ফিরেও শশিকুমার তিন সপ্তাহের বেশি কলকাতায় থাকতে পারলেন না—চলে যেতে হলো তাঁকে বরোদায়। আতালি রয়ে গেলেন জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে। প্রায় দুই মাস পরে বরোদার মহারাজার পারিবারিক ছবি এঁকে শশিকুমার ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয় শশিকুমারের বিবাহ। জগদীশচন্দ্রের নির্দেশে পাত্রী রয়ে গেলেন বৈজ্ঞানিকের বাড়িতে—পাত্র গেলেন শিল্পীবন্ধু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুকিয়া স্ট্রীটের আস্তানায়। তারপর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল বেনেটোলা লেনের সিটি স্কুলে হলো শশিকুমার ও আতালির মিলন। বিবাহের আচার্য ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। বিবাহবাসরে ইউরোপীয় সমাজের অনেকে উপস্থিত

আকার পণ্ডিত শিবনাথ বিবাহের কাজ ইংরেজি ভাষায় সম্পন্ন করেন।

তৎকালীন এক সংবাদপত্রে ধরে রাখা হয়েছে শশিকুমারের জীবনের সেই স্মরণীয় অনুষ্ঠান। সে সংবাদে বলা হয়েছে :

"An interesting ceremony of marriage was held last evening in the Hall of 45, Beniatolah Lane . . . between Mr. S. K. Hesh, the celebrated painter . . . and Mademoiselle Flamant, a French lady, who has come out to this country . . . They made each other's acquaintance some two years back at Paris, and their attachment led to a formal engagement in London.

Mademoiselle Flamant . . . was a guest of Dr. J. C. Bose for several months. More than two months ago she was initiated into Brahmoism by Pandit Sivanath Sastri who has now joined them in holy wedlock. The Hall was filled with a large crowd of guests, with a sprikling of European visitors. The service and sermon were in English."

বিবাহের পরে নবদম্পতী বাসা বেঁধেছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে। পরে উপেন্দ্রকিশোরই সুকিয়া স্ট্রীটে ঠিক করে দিয়েছিলেন ও'দের নতুন বাসা।

বিবাহোত্তর জীবনে শশীর প্রথম ডাক আসে জোড়াসাঁকো থেকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখনও জীবিত—তাঁর ছবিও আঁকতে হবে তাঁকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শশীর বিশেষ গুণগ্রাহী, তাঁরই নির্দেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে চিরকালের জন্যে তৈলচিত্রে ধরে রাখলেন শশিকুমার (জুন, ১৯০০)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন এক সুযোগ। ছবি আঁকার অভ্যাস আছে তাঁরও, তাই শশিকুমারকেও এ'কে ফেললেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আঁকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'শশিকুমার' এখন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে শশিকুমারের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে 'দ্বিজেন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্রনাথ'-এর পোর্ট্রেটে। শশিকুমারের আঁকা দ্বিজেন্দ্রনাথের সে তৈলচিত্র দিনেন্দ্রনাথ দান করে গিয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে। শশীর আঁকা 'রবীন্দ্রনাথ' এখন বিশ্বভারতীর সংগ্রহে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডি অবলা বসুও বাঙ্ময় হয়ে আছেন শশিকুমারের তুলিতে। হেমেন্দ্রমোহন বসুর প্যাস্টেল প্রতিকৃতি শশিকুমারের বৈচিত্র্যময় ললিতকলা চর্চার এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ডবলিউ সি বোনারজির পোর্ট্রেটও এ'কেছিলেন তিনি। শশিকুমারের আঁকা 'ডাবলিউ সি বোনারজি' সংগৃহীত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর 'শিবনাথ শাস্ত্রী' এখন আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। আচার্য শিবনাথের এ-পোর্ট্রেটে এক অপরিণামদর্শী চিত্রশিল্পীর রঙ প্রয়োগের স্বাক্ষর বর্তমান। শশিকুমারের তুলির কাজ সেই অপরিণামদর্শী শিল্পীর রঙের নীচে বিলুপ্ত।

ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তিনি এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রথারও প্রবর্তক। বেশি পরিমাণে রঙ ব্যবহারের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ক্যানভাসের বিপরীত দিকে ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল তাঁর। আচার্য শিবনাথের তৈলচিত্র এ পদ্ধতির নিদর্শন।

মুখমণ্ডলের সঙ্গে নারী ও পুরুষের দেহের রূপলাবণ্যের প্রতিও শশিকুমারের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এক্ষেত্রে তিনি রুবেন্স-এর অনুরক্ত।

কলকাতার মার্বেল প্যালেস-এ শশীর সর্বাধিক চিত্র সংগ্রহ বর্তমান। রোম ও মিউনিকে আঁকা দুটি অনিন্দ্যসুন্দর পূর্ণাবয়ব বিবস্ত্র 'নারী' ও 'পুরুষ'-এর চিত্র মার্বেল প্যালেস-এর বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া এখানে আছে তাঁর আঁকা 'রাশিয়ান নোবলম্যান' আর 'স্যার জর্জ বাউটিজ।'

লণ্ডন, বোম্বাই ও কলকাতায় আঁকা তাঁর চিত্রসূচীর অন্তর্গত আরও অনেকে। এ তালিকায় আছেন ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক (মৃত্যু ১৯০৪), বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড রে, স্যার স্টুয়ার্ট বেইলি, স্যার উইলিয়াম হান্টার, স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, দাদাভাই নৌরজি, অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম প্রমুখ মানুষ।

শশিকুমারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর পোর্ট্রেট ও ত্রিপুরার রাজপরিবারের একাধিক চিত্রও এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে শশিকুমার বাসা বেঁধেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার ঝাউতলা রোডে। তাঁর দুটি সন্তানেরও জন্ম হয় কলকাতায়।

তারপর শশিকুমারের কথা কেউ জানে না, অথবা জানলেও কেউ বলে না। হারিয়ে গেলেন তিনি অকস্মাৎ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মার্বেল প্যালেস, ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদ, আলেকজান্দ্রা কাসেল-এর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ছড়িয়ে রেখে বিপুল চিত্র-সম্ভারের স্রষ্টা শশিকুমার নিঃশব্দে সরে দাঁড়ালেন সচল পৃথিবীর সরব সংসার থেকে। কোন্ যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করলেন তার খবর কেউ রাখে না। কেউ বলেন আমেরিকায়, কেউ বলেন ফ্রান্সে। কিন্তু কোনো কথারই সঠিক প্রমাণ নেই কোথায় গেলেন শশিকুমার আর অজ্ঞাতি। দিন যায়, যায় বছর—বাংলা দেশের মানুষ ভুলে যায় শশিকুমারকে। অনুসন্ধানী কিন্তু এখনও খুঁজে চলেছে শশিকুমারের আত্মনির্বাসন কোথায় এবং কেন?

(শশিকুমারের ফটোটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

বেতারিক লোকগীতি

সম্প্রতি আকাশবাণীতে "লোকগীতি" নামক এক শ্রেণীর গান শোনা যাচ্ছে যার কোনও যথাযথ ডেফিনিশন নির্ণয় করা শক্ত। লোকগীতি বলতে আমরা সেই শ্রেণীর গান বুঝি যাকে ইংরেজিতে বলে "ফোক্ সং",—যা শহরে প্রচলিত নয় এবং যার মধ্যে নাগরিক পরিমার্জনা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আকাশবাণীতে যে সব লোকগীতি শোনা যাচ্ছে তাতে অনেকক্ষেত্রেই নাগরিক বর্ণচ্ছটার ঝিলিক পাওয়া যাচ্ছে এবং তার আকার, প্রকার, বিন্যাস এমনতর যে তাকে এক পর্যায়ের আধুনিক গান বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ক্রাইটেরিয়নকেই যদি মেনে নিতে হয় তা হলে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল এবং আরও অনেক গীতিকারের লোকসঙ্গীতের ধারায় রচিত গানকে এই পর্যায়েই প্রচার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা রাগসঙ্গীত যেমন "রাগপ্রধান" আখ্যা লাভ করেছে তেমনি বর্তমান লোকগীতিকেও এই রকম একটা বিশেষ আখ্যায় চিহ্নিত করতে হয় কেননা এ যতটা আধুনিক ততটা লোক-ভিত্তিক নয়।

আমাদের নিশ্চিত ধারণা লোকগীতির এই বিবর্তিত রূপকে স্বীকার করে নেওয়া বা প্রশ্রয় প্রদান করা আকাশবাণীর অভিপ্রেত নয়। তাঁরা সদুদ্দেশ্যেই আর্টিস্ট-দের সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরাই যে এর সুবিধা নিয়ে নানারকম স্বৈরতান্ত্রিক লোকগীতির অপপ্রচারে অগ্রণী হবেন এটা তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল। দুঃখের বিষয় বেশ কিছুসংখ্যক শিল্পী বেতারে প্রবেশ করে লোকগীতির ট্রাডিশনকে পরিম্লান করে চলেছেন। আকাশবাণীকে কারা গৌরবান্বিত করবেন? তাঁদের কর্তৃপক্ষ নয়, তাঁদের শিল্পীরা। তাঁরাই যদি নীতিভ্রষ্ট হন তবে আকাশবাণীর নির্ভরতা থাকবে কোথায়?

এই ব্যাপারে আসলে কারা দায়ী সেটা বোঝা খুব শক্ত নয়। পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখলে বোঝা যায় কিভাবে পাড়ায় পাড়ায় গানের ইস্কুল বা নানারকম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গজিয়ে উঠছে। সপ্তাহে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পল্লীসঙ্গীত শেখাবার লোকেরও অভাব নেই। শুধু লোকগীতিই নয়, বাংলার সঙ্গীতের সব রকম অধঃপতনের মূলে হচ্ছে এই শ্রেণীর সংস্থা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা। এদের কবল থেকে মুক্ত করতে না পারলে কোনও পর্যায়ের সঙ্গীতেরই মান-মর্যাদা রক্ষা করা যাবে না। এঁরা কোনও না কোনওভাবে ছাত্রছাত্রী বা মেম্বরদের আশ্বাস প্রদান করেন যে, তাঁদের রেডিও আর্টিস্ট করে দেবেন এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কত গভীর এবং গোপন উপায় অবলম্বন করেন তা কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন। এই সব দুষ্টচক্র যাঁরা সংগঠন করেন তাঁদের অধিকাংশই সঙ্গীতে সুশিক্ষিত নন কিন্তু তাঁরা যে বহু ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করেন তার কারণ আশা-আশ্বাসে তাঁরা নিরতিশয় তৎপর এবং এই আশ্বাসকে যথার্থ প্রতিপন্ন করতে তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশেই এমন শিল্পীর আধিক্য দেখা যায় যারা শিল্পীর গৌরব চায় অথচ শিল্পে দক্ষতা অর্জনের পরিশ্রমকে অস্বীকার করে। আমাদের দেশেই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী দেখা যায় যারা পাস করতে চায় অথচ পড়াশোনা করতে চায় না। এই অশিক্ষার একমাত্র ফল অশিক্ষিত-পটুত্ব নয়, অশিক্ষিতের অকিঞ্চিৎকরত্ব যার প্রত্যক্ষ ফল এই পর্যায়ের সঙ্গীতেও দেখা যাচ্ছে।

আধুনিক বা অন্য ধরনের গানে এক্সপেরিমেন্টকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু, লোকসঙ্গীত সংরক্ষণের বস্তু। বহু লোকগীতি হারিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে নিতান্ত স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মে। সেগুলিকে আর্ট হিসাবে উজ্জীবিত রাখা প্রয়োজন সঙ্গীতের ইতিহাসের স্বার্থে, কিন্তু এর জন্য লোক-গীতির শিল্পীরা কিছুমাত্র সতর্ক এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এঁদের একটি বিরাট অংশ কলকাতার অধিবাসী। খোঁজ নিলে দেখা যাবে নিতান্ত আয়াসে এবং সহজে এই মহানগরীতে রীতিমত সফিস্টিকেটেড পরিবেশে এঁদের সঙ্গীত-শিক্ষা। বাংলাদেশের কোন জেলায় কোথায় কোন্ কোন প্রকার লোকসঙ্গীত বর্তমান পরিশ্রম করে সেই সব জায়গায় গিয়ে সেই সব গান সংগ্রহ করবার আগ্রহ এঁদের মধ্যে

আসলী দেখা যায় না। তার চেয়ে সুলভে শৌখীন পরিবেশে মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে তথাকথিত লোকগীতি শিখে তাঁদেরই সহায়তায় বেতারশিল্পীর গৌরব অর্জন করাটা অনেক বেশী কাম্য। এর জন্য প্রয়োজন কতকগুলি লোক-দেখানো ম্যানারিজম (যথা—যেখানে সেখানে হ-ধ্বনির প্রয়োগ, ক-এর গ্রাম্য উচ্চারণ, জ্-এর উচ্চারণ, চ-এরও স-কারাত্মক বিকৃতি, যখন তখন চিৎকার করে ওঠা বা গলা ভেঙে দেওয়া, হৈ, হো, হেইয়া প্রভৃতির শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি) সেগুলি আয়ত্ত হলেই হল। কিন্তু এ ছাড়া লোকসংগীতে আরও যে অনেক ফাইন আর্ট আছে সেটা জানতে গেলে, শিখতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়, প্রকৃত অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যেতে হয়—এই সব ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার কি কোনও সার্থকতা আছে? লোকসংগীতে যে পলিউশন এসেছে এবং বেড়ে চলেছে তার জন্য মুখ্যত দায়ী কলকাতার শিল্পী সম্প্রদায়; কেননা, অপরাপর অঞ্চল এ'দেরই অনুসরণ করে থাকে। কলকাতার শিল্পী যদি অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই ভাটিয়ালী গাইতে পারে তা হলে বাঁকুড়া বা বীরভূমের শিল্পীরাই বা পারবে না কেন? টেকনিক বা তত্ত্ব জানবার তো দরকার নেই কতকগুলি ভঙ্গী বা ভড়ং জানলেই হল। অতএব তারাই বা সেটুকু জেনে নিয়ে কাজ হাসিল করবে না কেন?

আজকাল যাঁরা লোকগীতি শোনাচ্ছেন তাঁদের অনেকেই তাঁদের গান লিখিয়ে নিচ্ছেন এবং তাতে পঁচাত্তর ভাগ আধুনিক এবং পঁচিশ ভাগ বা তার চেয়েও কম লোকগীতির ছায়া মিশিয়ে একটি বৈতারিক লোকগীতি রচনা করা হচ্ছে। প্রশ্ন করলে তাঁরা অবশ্যই বলবেন, এ সব ট্র্যাডিশনাল গান, রচয়িতার পরিচয় তাঁরা জানেন না। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার সময় বোধকরি কর্তৃপক্ষের নেই। কিন্তু যদি আকাশবাণী লোকগীতির জন্য গীতিকারদের নিয়োগ গ্রহণ করে থাকেন তা হলে তার উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন রইল। এই ধরনের গান প্রচারিত হলে কৃত্রিম লোকগীতির সৃষ্টি হবে—যা হয়ে চলেছে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, একেবারে প্রাক্তন স্তরের লোকগীতি প্রচার করা সম্ভব নাও হতে পারে কারণ আর্ট হিসাবে যে গানকে প্রচার করা হচ্ছে তার একটা মাধুর্য থাকা দরকার। সেটুকু স্বাধীনতা বুদ্ধিমান শিল্পীকে দিতেই হবে। কিন্তু এই অধিকার তাঁরা সীমিতভাবে প্রয়োগ করবেন এটাই বাঞ্ছনীয়। আবার অবিরাজিনাল লোকগীতি প্রচার করাটাও প্রয়োজন কারণ তারও বিশেষ অ্যাকাডেমিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। উপযুক্ত স্থান থেকে টেপ করে নিয়ে এসে এই সব গান বিশেষ প্রোগ্রামে প্রচার করাও অত্যাবশ্যক। বেতার কর্তৃপক্ষ

এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন। বর্তমানে বাংলাদেশের আনুকূল্যে ওখানকার বিভিন্ন পর্যায়ের খাঁটি পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ করে প্রচার করাও বোধ হয় কঠিন হবে না।

যাই হোক, বর্তমানে যেভাবে লোক-সঙ্গীতের বিকৃতি ঘটে চলেছে তার প্রশ্রয় দিলে বাঙালী জাতির সঙ্গীতসংস্কৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। লোকগীতি গাইবার জন্য যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের দায়িত্ব অনেক। তাঁরা এই দায়িত্বকে স্বীকার করে যথার্থ লোকসঙ্গীতের প্রচারে যত্নবান হবেন এইটাই অভিপ্রেত নতুবা আমাদের মনে হয় তাঁদের প্রতি বেতার প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য প্রত্যাহার করে নেওয়াটাই উপযুক্ত কর্তব্য হবে।

শাঙর্গদেব

কলামন্দিরে ঠুংরী উৎসব

কলামন্দিরে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল আয়োজিত ঠুংরী উৎসব বহুদিন মনে থাকবে। নানান স্টাইলের শিল্পী-সমাগমে ঠুংরী উৎসবের চেহারা খুবই চটকদার হয়েছিল। সবাই যে খুব ভাল গেয়েছেন তা ও নয়। তবে সমস্ত কিছু মিলে-মিশে ঠুংরী আসরের মেজাজটা-অটুট রেখেছিল।

প্রথম দিনের প্রথম শিল্পী শোভা গুর্টুকে উৎসবের আবিষ্কার বলে ধরে নেওয়া যায়। তাঁর প্রতিটি ঠুংরীতে কায়দা-কানুনের বৈশিষ্ট্য ছিল। ওঁর সুরজ্ঞান প্রশংসনীয়। ওঁর ঠুংরীর চলনে আবেগ, করুণা ও সৌন্দর্য আছে। বিশেষত মিশ্র খাম্বাজ ঠুংরীটিতে কয়েকটি পুকার ও বোলের নিবেদন খুব সাড়া দিল মনে। পরে দেখলাম গজলেও ওঁর ভাল দখল আছে।

আসরের দ্বিতীয় শিল্পী হাফেজ আহমেদ খাঁ মোটেই সুবিধে করতে পারলেন না ওঁর ঠুংরী দিয়ে। মিশ্র মিশ্র রাগের ঠুংরী গাইলেন বটে শিল্পী, কিন্তু গলা ঠিক সুরে বসল না। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগল, এটা কি ঠিক ঠুংরী হচ্ছে? ওঁর কাফী বন্দীশের ঠুংরীও ভীষণ একঘেয়ে লাগল। স্থানে স্থানে পুরো খেয়ালের কাজ করলেন শিল্পী। এটা ঠিক, অনেক উচুদরের শিল্পীই ঠুংরীতে খেয়ালী অংশের কিছু কিছু কাজ করেন। কিন্তু সেটা ঠুংরী পরিবেশনার একটা স্বতন্ত্র স্টাইল। সেই আঙ্গিকে ঠুংরী গাইলে তার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই, যদিও অধিকাংশ ঠুংরীরসিকই ঠুংরীকে ঠুংরীর কায়দায় পেতে চান। কিন্তু আলোচ্য শিল্পীর স্টাইল যে ঠিক গীতের স্টাইল নয় তা বোঝা যাচ্ছিল। কাজেই তাঁর তান, বাটের সমন্বয়ে কিছু বলবার নেই।

আসল ঠুংরী পেলাম দিনের শেষ শিল্পী গিরিজা দেবীর কণ্ঠে। ঠুংরীর মত ঠুংরী। মেজাজের পরিণতি হল হোরি ঠুংরী, চৈতী ইত্যাদি দিয়ে। রাগ উল্লেখ করে গিরিজা দেবীর ঠুংরীর কথা বলা যায় না। এক একটি ঠুংরীতে একটি বিশেষ রাগের প্রাধান্য রেখে ঠুংরীর পক্ষে ব্যবহার্য বিভিন্ন রাগের আলো-আঁধারিতে (chiaroscuro) শিল্পী তাঁর ঠুংরীগুলিকে এক এক ধরনের নিটোল প্রতিমা দিয়েছিলেন। এবং এই রূপায়ণ সম্ভব হয়ে উঠেছিল গিরিজা দেবীর অনন্যসাধারণ কণ্ঠগুণে। গলার এত সুন্দর কাজ ভোলার নয়। ও'র প্রতিটি সুরের প্রয়োগের পিছনে স্বতন্ত্র বক্তব্য আছে। অর্থাৎ ঠুংরীর আন্দাজে বলা যেতে পারে যে, একই কথার একাধিক অর্থ কিভাবে সুরের তারতম্যে মূর্ত হতে পারে তা গিরিজা দেবী সাক্ষাৎ প্রমাণ করে দেখালেন। হোরি ঠুংরীর আঙ্গিকে দুরূহ তাল ও লয়ের খেলাও দেখলাম শিল্পীর কণ্ঠে। হোলির মতন রঙীন হয়ে উঠেছিল ও'র গান। ছন্দের আয়োজনে আনন্দের সম্ভারটুকুও অটুট ছিল। বন্দেশী ঠুংরীতে শিল্পী প্রমাণ করলেন যে, মোটামুটি সম্প্রসারণশীল হলেও ঠুংরীরও একটা নিজস্ব ব্যাকরণ আছে, যা সুবিধার প্রয়োজনে বিস্মৃত হওয়া অবশ্যই অনৈচ্ছিক। একটি ঠুংরীতে আমার মনে পড়ছে গিরিজা দেবী কিছুটা নটভৈরব এবং কিছুটা ভৈরবীর সুর নিয়ে কি সুন্দর একটি বাণীপ্রতিমার আন্দোলন দেখালেন। এ জিনিস হামেশা দেখা যায় না।

ঠুংরী উৎসবের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হল প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান দিয়ে। যথেষ্ট অনুরাগের সঙ্গে গাইলেন প্রসূনবাবু। ও'র 'অব কিয়া করু' বাইয়া' অনেক মেহনতে পরিবেশিত, কিন্তু ঠুংরী-মানে ততটা উত্তীর্ণ নয়। বরং খাম্বাজ-মিশ্র প্রভৃতি জড়ান 'শাওন আই রে' সুর, ভাব ও আঙ্গিকে অনেক পরিণত। এই গানের পরিবেশনাকে অনেকখানি সাহায্য করেছে শ্যামল বসুর তবলা এবং উপস্থিত শিল্পীর সারেঙ্গী। প্রসূনবাবুর শেষের গান ছিল কাফী বন্দীশে। গানটিতে পুনরাবৃত্তির দোষ থাকায় এক ধরনের অসংবদ্ধতা দেখা দিয়েছিল।

এই দিন সবচেয়ে ভাল গান শুনলাম নির্মলা অরুণের কণ্ঠে। শিল্পীর প্রথম নিবেদন "সইয়া কৈসে কহুঁগি/সারি উমর বিতী যায়" ঠুংরীটিতে খুবই পরিশীলিত টুকরোর কাজ দেখেছি। কতকগুলি সুরের মোচড় মনে গভীর দাগ কাটে। ঠুংরীর অলঙ্কারগুলি খুব মনোগ্রাহী হল, কারণ নির্মলার গলা প্রতিটি সপ্তকেই বেশ খোলে। শিল্পীর দ্বিতীয় ঠুংরী মিশ্র খাম্বাজের উপর তৈরী। এই গানটির আলোচনায় একটা কথা বলে নিই। কথা ও সুরের নিপুণ বুনোনিতে উৎপন্ন এক ধরনের সাসপেন্সের গুণে চোখের জল কপোল বেয়ে পড়ল কি পড়ল না এই রকম একটা জিজ্ঞাসা মনে জাগছিল। ঠুংরীর নন্দনতত্ত্বে এ ধরনের জিনিসের দাম অনেক।

নির্মলা অরুণের গজল ক'টিও চমৎকার হয়েছিল। প্রথম গজল 'ইয়ে কিয়া সিতম'-এ ছিল সুন্দর কথা এবং মেজাজ। গজলের প্রতি শিল্পীর পুরো অ্যাপ্রোচটাই কিরকম নিরুদ্ধ অথচ অভিজাত দেখলাম। দ্বিতীয় গজল "মগর এ গম সো রহেগা/জিন্দগী কম হ্যায়" প্রথমটির থেকে কোন অংশে মন্দ ছিল না। অথচ এত ভাল লাগবার পরও দেখলাম শিল্পী অবসাদগ্রস্ত নন। শ্রোতৃবর্গের দাবিতে তিনি যে গজল শেষে ধরলেন—"অপনি শোঁয় হুয়ি দুনিয়া কো জগা লু তো চলু" ইদানীংকালে আমার শোনা সর্বশ্রেষ্ঠ গজল। এত বড় বেদনার কথা যে এত সুন্দর করে বলা যায় তা না শুনলে বিশ্বাস হয় না।

দিনের শেষ শিল্পী জফর হুসেন খাঁ শোনালেন বিভিন্ন মেজাজের রাগাশ্রয়ী কাওয়ালী। কাওয়ালী যদিও বলা হয় জফর হুসেনের গানকে, একে একটি স্বতন্ত্র আন্দাজের গজল বলেও বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথম কাওয়ালী উপচার "ম্যায় তেরে গমমে ডুব যাতি হু" বেশ লাগল। কিন্তু আসর জমল দ্বিতীয় আইটেমটিতে। বয় প্রাণখোলা স্ফূর্তি ও আসরী মেজাজ প্রশংসনীয়। শিল্পীর খাম্বাজ কাওয়ালী "বীত গয়া শাওন" ঠুংরী অঙ্গের বেশ কিছু কাজ দেখলাম। গানটিও ভারী করুণ এবং সুন্দর। জফরের চতুর্থ কাওয়ালীতে লয়ের চলন, মাত্রার বেষ্টন এবং সুরের পরিক্রমণের হিসেবী চাতুর্য দেখলাম। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাওয়ালীর পুরো আসরটিতে একটা অতিনাটকীয়তার ফল্গুধারা প্রবহমান ছিল। ও'টি না থাকলেই পারত।

—সংগীত সমালোচক

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী সমর ভৌমিক তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তারও কিছুকাল পূর্বে শিল্পী-পূর্ণ পাল ও রণজিত সরকার একটি মৃৎশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সমর ভৌমিক শিল্পী হিসাবে পরিচিত, ইতিপূর্বে এই তরুণ শিল্পীর শিল্পকর্ম দেখার সুযোগ অনেকেরই হয়েছে। প্রদর্শনীতে এই শিল্পীর ১৫টি শিল্পকর্ম নিদর্শন দেখা যায়। প্রথমেই তাঁর বিচারবোধের প্রশংসা করি। সাম্প্রতিক কাজের সুনির্বাচিত নিদর্শন পেশ করে তিনি রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। জল, তেল রঙ ও চারকোলের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর কাজ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মে ভারতীয় রীতিই প্রধান, যদিও তিনি সেই রীতিই আধুনিক অংকনধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—এক কথায় উভয়ের সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কয়েকটি ছবি প্রাচীরচিত্র জাতীয়, কয়েকটি অজন্তার আদর্শে রচিত, আবার দু'চারটি চারকোল রেখা ও পরিমিত তেলরঙ

ইমেজ—৬ —সমর ভৌমিক

সহকারে আঁকা হয়েছে। প্রাচীরচিত্র হিসাবে ডেভেলপমেন্ট অব এক্সচেঞ্জ মিডিয়া ইন ইণ্ডিয়া অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বৃহৎ চিত্রটির মধ্যে গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে কিভাবে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে মুদ্রা বিনিময় প্রথা গড়ে উঠল, মুখ্যত বিভিন্ন প্যানেলের মধ্য দিয়ে সুসম্বদ্ধভাবে শিল্পী তাই ব্যাখ্যা করেছেন। মিশরীয় প্রভাব ধরা পড়লেও এটি ইতিহাসভিত্তিক, পরিমিত ও প্রয়োজন মত গভীর রঙ ব্যবহার করে শিল্পী বক্তব্যটুকু সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পীর চারকোল ড্রয়িং প্রধান রচনাগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢেউ খেলানো প্যাকিং কাগজে চারকোলের সুললিত রেখা অবলম্বনে রচিত ছবিগুলি মুখ্যত পরীক্ষামূলক সন্দেহ নেই। তাহলেও মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মত দু'এক স্থলে তেল রঙের ছোঁয়াচ দিয়ে শিল্পী অপরূপ কারুকার্যের সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে লাল ও সবুজ রঙের ইঙ্গিতপ্রধান ফিশারমেন্স্ কলোনি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। কমপোজিশন হিসাবে এটি উল্লেখ্য। এ জাতীয় ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিজস্ব দেশীয় রূপ ও নিছক সরলতা। এই সঙ্গে ইমেজ ৮-এরও নাম করা যায়। যদিও প্রাচীন লোকচিত্রশিল্পের প্রভাব এটিতে ধরা পড়ে। আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন—ল্যাণ্ডস্কেপ। গভীর সবুজ ও নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে, স্থলবিশেষে কাগজের সাদা রঙ ছেড়ে দিয়ে অথবা সাদা রঙের সুকৌশল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিল্পী এটির মধ্যে স্ফটিকের স্বচ্ছতা ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে ইনমেটস্ অব ওল্ড এজ এবং কাপ্‌ল্‌-এর নাম করা চলে।

পূর্ণ পাল ও রণজিত সরকারের মৃৎশিল্প নিদর্শন সমকালীন বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ভিত্তিতে রচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তানীর বর্বর সেনাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার ইত্যাদিই নানা পোড়ামাটির একক ও গ্রুপ কমপোজিশনের মধ্য দিয়ে শিল্পীদ্বয় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। শিল্পীদের উদ্যম প্রশংসনীয়, তবে শ্লাক নিদর্শন হিসাবে এগুলি দুর্বল। দুই শিল্পীই তরুণ ও উৎসাহী—তাঁরা যদি নিষ্ঠাসহকারে মৃৎশিল্প চর্চা করেন তাহলে তাঁরা যে ভবিষ্যতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

*

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে শিল্পী বরেন বসু ও শিল্পী সুনীল দাসের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বরেন বসুর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ক্যানভাস শিল্পীগোষ্ঠী। যাঁরা নিয়মিতভাবে প্রদর্শনীতে যাতায়াত করে থাকেন তাঁদের কাছে বরেন বসুর পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ বিভিন্ন প্রদর্শনীতেই তাঁর ছবি চোখে পড়ে। তাছাড়া ইতিপূর্বে তিনি একক প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ১৮টি নিদর্শন দেখা যায়। রচনাক্ষেত্র শূন্য রেখে, মধ্যে বা পাশে স্থূল রেখায় কয়েকটি আকারের অবতারণা করে নীল, কালো ও সবুজ রঙে সেগুলি ভরিয়ে ফেলাই এ শিল্পীর বিশিষ্টতা। বিভিন্ন রঙের স্তরভেদ সৃষ্টি করার ফলে শিল্পীর ছবিতে একটি স্বাভাবিক কারুকার্য ফুটে ওঠে। কয়েকটি নিদর্শনে স্বাধীনতা আন্দোলনপূর্ব বাংলাদেশের নিপীড়িত ও বিধ্বস্ত রূপের আভাস মেলে। এই প্রসঙ্গে দি ইভাকুইজ, অপ্রেস্‌ড্‌ সিন ইন বাংলাদেশ ও কনসিকোয়েন্স অব টর্চার-এর নাম

ফিশ মংগার —বরেন বসু

করা চলে। প্রথমটি বিন্দুপ্রধান রীতিতে আঁকা হলেও আলংকারিক জাতীয়। দ্বিতীয়টি কমপোজিশন হিসাবে উল্লেখ্য—গভীর বেগুনী রঙের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীকমূলক ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবতারণা অর্থবহ। তৃতীয়টিও প্রতীকমূলক, তবে রঙীন কাচের মত কারুকার্যের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফিশমঙ্গার ছবি ভিন্ন শ্রেণীর। গভীর নীল ও সাদা রঙ সুকৌশলে ব্যবহার করে চারটি ইমপ্রেশনিস্টিক মূর্তি স্থাপনা করে শিল্পী এটিতে স্থিরচিত্রের পজিটিভ ও নেগেটিভ বৈশিষ্ট্য ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে পৃষ্ঠভূমিতে বেগুনী রঙের কয়েকটি অর্ধ প্রতীক মাধ্যমে শিল্পী বক্তব্যটুকু প্রকাশ করেছেন। ছবিখানি পরীক্ষামূলক সন্দে

ড্রয়িং —সুনীল দাস

নেই, তবে এ জাতীয় রচনায় রসসৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অপরাপর ছবির মধ্যে নানা প্রাচীন প্রতীকভিত্তিক সিঁদুরে রঙ প্রধান এনসিয়েন্ট কালচার উল্লেখ্য।

শিল্পী সুনীল দাসের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন হাওড়ার মুসাফির সংস্থা। প্রদর্শনীতে শিল্পীর প্রথম দিক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক শিল্পকর্মের নির্বাচিত নিদর্শন দেখা যায়। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সুনীল দাস অন্যতম। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে বহুবার এই স্তম্ভে এই শিল্পীর রচনাবৈচিত্র্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং নতুন করে তাঁর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে যে অতি অল্প বয়সেই এই শিল্পী একই বছরে দেশের আটটি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এক সঙ্গে আটটি পুরস্কার লাভ করেন, এদেশে আর কোনও শিল্পী এ জাতীয় নজির সৃষ্টি করেছেন কিনা ত আমার অন্তত জানা নেই। এক কথায় শিল্পী হিসাবে সুনীল দাস আজ খ্যাতির অধিকারী। প্রদর্শনীটি পূর্বানুক্রম, অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর নিদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রদর্শনীতে শিল্পীমানসের ক্রমবিকাশের পরিচয় মেলে। সকলেই জানেন যে, প্রথম দিকে এই শিল্পী ঘোড়ার বিভিন্ন বলিষ্ঠ রূপ এঁকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুতরাং যাঁরা ইতঃপূর্বে শিল্পীর এই শ্রেণীর ছবি দেখেন নি, তাঁরা প্রদর্শনী দেখে খুশী হয়েছেন। কয়েকটি ঘোড়ার স্টাডি, বিশেষ করে রেখাচাতুর্যে খুবই সুন্দর। এই প্রসঙ্গে বলীবর্দের স্টাডিটিও উল্লেখ্য। পরে শিল্পী বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত রীতি অবলম্বনে কাজ শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বলিষ্ঠ ড্রয়িংয়ের নাম করা যায়—যেমন ১৮, ২৩ ও বিশেষ করে বৃত্তাবলম্বনে রচিত ৫২ নং ড্রয়িং। ক্রমে শিল্পী রচনাক্ষেত্রটি শূন্য রেখে চাপা ও ক্ষেত্রবিশেষে গভীর নির্বাচিত রঙ ও নানা উপাদান সহযোগে অন্য জাতীয় শিল্পকর্মের পরিচয় দেন। তারও পরে সংবাদপত্রের স্তূপের ওপর ছবি আঁকেন, যেগুলি পপ আর্টের অন্তর্গত। সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলা ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন ভারতের লোকচিত্র ও বিশেষ করে তন্ত্রশাস্ত্রের ওপর প্রাধান্যদান—এই প্রসঙ্গে শিল্পী কে জি সুব্রহ্মণ্যন, সন্তোষ, ঈশ্বর সারারা ও আরও অনেকেরই নাম করা যেতে পারে। সমকালীন চিত্রকর হিসাবে সুনীল দাসও এই সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্র অবলম্বনে কাজ শুরু করেন। এগুলি প্রধানত প্রতীক প্রধান—ত্রিশূল, স্বস্তিকা, সাপ, হস্তরেখা ইত্যাদি নানা প্রতীক সুকৌশলে শূন্য রচনাক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত করে সমগ্র রচনায় একটি সুসম্বন্ধ রূপ ফোটাবার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে সিঁদুরে রঙ নানাভাবে ব্যবহার করার ফলে এই শিল্পীর ছবিতে একটি বিশিষ্ট আবেদন ফুটে ওঠে (২৭, ৪৩ নং)। নিত্য নতুন পরীক্ষা করাই এই শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সে হিসাবে কাঁথার ওপর কোলাজ রচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শিল্পী জীবনের ক্রমবিকাশের দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় এই শিল্পী অতি অল্প সময়েই খ্যাতির সোপানের প্রায় সব ধাপই যেন অতিক্রম করে ফেলেছেন। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে: এর পরে তাঁর গন্তব্য স্থান কোথায়? অবশ্য এই প্রশ্নের জবাব শিল্পীই দিতে পারেন—তাঁর পরবর্তী শিল্পরচনা ধারার মধ্য দিয়ে। ভারতীয় ঐতিহ্যপ্রধান চলাও, সমকালীন চিত্রকলাধারাই কি এদেশের শিল্পকলারীতির শেষ অবদান? অবশ্য, আগেই বলেছি, এর উত্তর নির্ভর করে সমকালীন শিল্পীদের ওপরেই।

চিত্রাঙ্গদ

॥ ছেচল্লিশ ॥

পরদিন সকালে চোখ মেলতেই কানে এল আমার। প্রথম প্রশ্নেই তার কুশল জিজ্ঞাসা।

'কেমন আছো গো? ভালো তো? সর্দিটা কমলো?' শুধালো রিনি।

'কমবে কিরে? আরো জমলো বরং। বুকটা কেমন ভার ভার ঠেকছে।' আমি বলি—'তার ওপর কাশি হয়েছে আবার। ভারী কেশেছি কাল সারা রাত। জানিস?'

'তাই নাকি?'

'এত কাসি বাজালাম তোর কানে গেল না? আচ্ছা ঘুম তো তোর!...এরপর যখন সানাই শুনবি টের পাবি তখন।'

'কিসের সানাই? বিয়ের?'

'বিয়ের নয়, হাঁপানির। বুকে সর্দি জমলে, কাশি হলে, ব্রংকাইটিস হয়ে গোড়ার সেই সর্দি হাঁপানি হয়ে দাঁড়ায় শেষটায়। জানিস নে?'

'না তো।'

'জানবি কি করে, তোর মা তো হাঁপায় না আর। হাঁপানি আছে আমার মার। আমি জানি। যখন তা হয় না, এমন সাঁই সাঁই আওয়াজ বেরোয়—ঠিক যেন সানাইয়ের মতই।' আমি জানাই : 'সারা বাড়ি গম গম করে আওয়াজে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তিন চারদিন এমন ভোগায় যে, সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না রে! যার হয় তার যে কী করে কে জানে!'

'সারায় না কেন তোমার মা? ওষুধ নেই হাঁপানির?'

'এখন অব্দি বার হয়নি। ওষুধ খেয়ে একটু কমানো যায় কেবল। একবার হলে তিন চারদিন ভোগাবেই। ডাক্তার নলিনী সেনগুপ্তর একটা মিকচার খেয়ে মা খুব উপকার পান। আর ডাক্তার বিধান রায় একবার আমার চিঠির জবাবে প্যালজ বলে একটা ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন, হাঁপানি থেকে সেরে ওঠার পর সেটা খেলে, নিয়মিত খেয়ে গেলে অনেকদিন ধরে তিনি ভালো থাকেন বেশ।'

'খেলেই হয় তাহলে।'

'তা তো হয়। খায়ও তো মা। কিন্তু হাঁপানি যখন হবার ঠিক হবেই। কিছুতেই আটকানো যাবে না। দিন কয়েক হুদ্দমুদ্দ ভোগাবেই তোমাকে। আর তাতে যে ভোগে তারই শুধু কষ্ট না, যাদের সেই ভোগান্তি দেখতে হয় তাদের কষ্টও কিছু কম নয়। অন্য ব্যারামের সঙ্গে হাঁপানির কী পার্থক্য তা জানিস?'

'কী?'

'আর সব রোগ হলে একেবারে শুইয়ে ফ্যালে, শুয়ে থাকা যায় মজা করে বেশ, কিন্তু হাঁপানির বেলায় সেটি হবার নয়। হাঁপানি এসেই তোকে বসিয়ে দেবে।'

'বসিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ, শোবার নামটি এই। বসে বসে হাঁপাও দিন রাত। কী কষ্ট, কী কষ্ট! একটুও শুতে দেয় না রে—আগাগোড়া ঠায় বসিয়ে রাখে।'

'ভারী খারাপ তো!'

'খারাপ বলে'! শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে যা কষ্ট হয় না—যেন প্রতি মুহূর্তে দম আটকে আসে—দমকে দমকে আসে হাঁপটা—হাঁপানির ধমকটা।'

'কখন আসিবে হাঁপানির ঐ ধমক আগের থেকে কি তা টের পাওয়া যায় না একদম?'

'যায় বইকি। প্রথমে একটু সর্দি হয়, সবারই যেমন হয়ে থাকে। হয়ে থাকে ফের সেরে যায়—কিন্তু হাঁপানি রুগীর বেলায় সেটি হয় না। সেই সর্দি শুকিয়ে গিয়ে বুকে বসে হাঁপানির সূত্রপাত হয়ে দাঁড়ায় শেষটায়।'

'সর্দি না হতে দিলেই তো হয় বাপু!'

'তা তো হয়। ডাক্তার রায়ের প্যালজটা বোধহয় সেইজন্যই দেওয়া। লাংস-এর প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে সর্দিটাকে আটকায় গোড়াতেই—'

'তুমি বাপু সাবধান হও তো! বাবার মুখে শুনেছি কতগুলো ব্যারাম আছে বাপ-মা-র থেকে ছেলে মেয়েতে এসে বর্তায়—ঐ

হাঁপানি তার ভেতর একটা—উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির মতই।'

'জানি তো। মা-ই বলেছে আমায় যে আমারও হতে পারে। হবে হয়ত না। তবে একটা তার সান্ত্বনার দিকও আছে জানিস? হেঁপোরুগীরা অনেকদিন বাঁচে, দীর্ঘজীবী হয় নাকি!'

'কাজ নেই ছাই অমন দীর্ঘজীবী হয়ে—কষ্ট পেয়ে কষ্ট দিয়ে ওরকম বেঁচে সুখ?'

'মার ধারণায় ওটা একটা আধ্যাত্মিক অসুখ। যাদের কিনা আত্মার আকুতি থাকে না...আকুতির মানে জানিস?'

'উঁহু!'...আকুতি আবার কী?' তুমি জানো?

'জানি না ঠিক। আঁকু পাঁকু গোছের কিছু একটা হবে বোধহয়। ইঁদুর কলে পড়লে যেমনটা হয়, কিম্বা তোর জন্যে মাঝে মাঝে যেমনটা আমার হয় না?...'

'আত্মারই বলে কোনো পাত্তা নেই! তার আবার আঁকু পাঁকু।'

'মানুষ যা মনের থেকে চায় না? যখন পায় না, যারা নাকি তা পায় না—অনেকে না পেলে কিছু মনে করে না, ভুলে যায় এক সময়, কিন্তু যাদের নাকি মনের ভেতর তা চাপা থাকে—যারা কিনা সেই না-পাওয়াটা অন্তরে অন্তরে ফীল করে তাদেরই নাকি ঐ হাঁপানিতে ধরে ভাই! প্রতিভাবান আর সাধক মানুষদেরই বেশি হয় এই ব্যারামটা।'

'চাইনে আমার প্রতিভাবান হয়ে।' প্রতিভা আর হাঁপানিকে সে এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে চায়।

'আমি কিন্তু চাই যে আমার হোক। মাঝে মাঝে এক আধটু হোক আমার... প্রতিভাবান না হতে পারি ওই হাঁপানিবান তো হতে পারব। বিবেকানন্দর ছিল নাকি ওই হাঁপানি, আর রবি ঠাকুরেরও নাকি রয়েছে...'

'হোক গে থাকুক গে, তোমার হয়ে কক্ষ নেইকো...'

'আমিও সেটা ভাবি একেক সময়। কাল রাত্তিরে যখন কাশির ধমকটা আসছিল না, ভাবলাম ধরল বুঝি হাঁপানিতে আমাকেও, মার মতন আমিও গেলাম বুঝি! সন্তবনাটায় একটুখানি সুখ হলেও ঘাবড়ে গেছলাম বেজায়। কাশির ধমকের ওপর আবার যদি আমায় হাঁপানির ধমকানি খেতে হয় তাহলেই আমার হয়েছে। অার দেখতে হবে না! বারোটা বেজে যাবে আমার।'

'সর্দিটা সারাও দেখি বাপু দয়া করে।'

'সর্দি কোথায়? সেরে গেছে তো। তার বদলে কাশিই আমার এখন।'

'মোটেই সারেনি তোমার সর্দি। বসে গেছে বুকে। কাশি হচ্ছে সেই জমাট সর্দিকে তোলবার জন্যে শরীরের স্বাভাবিক প্রয়াস। বুঝেচ? বাবার মুখে শোনা আমার। জানো?'

'ডাক্তারের মেয়ে হয়ে শোনা কথায় বিদ্যে ফলাচ্ছিস যে ভারী!'

আমি ঠাট্টা করি—'লেডি ডাক্তার হবার আগেই তোর এই ডাক্তারি!'

'ঐ হাঁ করে থাকাটা বন্ধ করো দেখি। হাঁ করে ঘুমোনোটা বন্ধ করো তো তোমার...জেলের দাদাটি কী বলে গেলেন কালকে? শুনলে না? কানে তুলেছ সে কথাটা?'

'কানেই তোলা রয়েছে, নাকে নামানো যায়নি। নাক বোজা থাকলে বোজাই থাকলে আমি তার কী করব? নাক কি আমার বাধ্য নাকি? মুখও অবাধ্য! নিতান্তই অবুঝ আমার মুখ, কিন্তু নাক আমার বেশ বুঝদার। বুঝেছিস?'

'সারারাতই কাল বুঝতে হয়েছে আমাকে। বুঝতে হয়েছে। যতবারই হাত দিয়ে তোমার মুখ বুজিয়ে দিয়েছি না, পরমুহূর্তেই দেখি তুমি ফের হাঁ করে বসে রয়েছ।'

'কী বললি? আমার মুখে হাত চাপা দিচ্ছিলিস তুই?' আমি ফোঁস করে উঠি।

'একবার নাকি? যখনই আমার ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখেছি তুমি বদন ব্যাদান করে শুয়ে তখন তখনই আমি...কেন, টের পাওনি তুমি?'

'টের পেলে কি রক্ষে রাখতুম তোর? তোকে এই অযথা হস্তক্ষেপ করতে দিতুম নাকি?'

'অযথা?'

'অযথা নয়? দস্তুর মতন অনধিকার চর্চা, আমি বলব। হাত হচ্ছে হস্তগত করার জন্য—পরের কিম্বা পরির পাণি-গ্রহণের হেতু। কারো মুখ চাপবার জন্য হয় নাকো। আর, ঐ মুখের সঙ্গে সব সময়ই মুখোমুখি হতে হয়।'

'হাসালেই বা কী! তুমি তো তখন ঘুমোচ্ছিলে গো! টের পেতে কী করে? বাজে বরবাদ যেত কেবল।'

'হত যেত আমার যেত—তোর কী! সে আমি বুঝতুম।' আমি বলি—'তুই যে

ভারী কেপ্পন রে! আমি যে কতো ঘুম ভেঙে উঠে তুই অঘোরে ঘুমোচ্ছিস দেখে অকাতরে, অপব্যয়ের কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে...না, মেয়েরা ভারী হিসেবী হয় বলে যে, তা মিথ্যে নয়!'

'এখন বুঝলে তো! এখন দয়া করে তোমার ওই মুখটিকেও বোঝাও। বোঝাও এবং বোজাও।'

'বুঝেচি। এখন আমার খেসারৎ চাই। আমার ওপর তোর ওই অনধিকার হস্তক্ষেপের...'

'তুমি যে শেষ মেস এদিকেই ঠেলে আনচো তোমার কথার ধরনে আগেই তা টের পেয়েছি। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! তুমি হাঁ করলেই আমি তার আঁচ পাই! তা জানো? তা খেসারত তুমি পাবে কিন্তু তার আগে তোমাকে মুখ বুজে থাকতে হবে, নাক দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হবে পাঁচ ঘণ্টা!'

'আমার ঘণ্টা!' পাঁচন খাওয়ার মত মুখখানা করে জানাই—'প্রাণায়াম আমার ধাতে পোষায় না—অঙ্কের মতই অবিকল। বাবা আমায় ছোটবেলায় অনেক শিখিয়েছিল জানিস? অষ্টাঙ্গ যোগের নাম শুনেছিস কখনো?'

'যাদব চক্কোত্তির পাটিগণিত? পাটিগণিতের যোগ আর জানিনে!'

'শিব্রাম্ চকর্বর্তির খাঁটি অ-গণিত। যোগফোগ সব অঙ্কের ব্যাপার, আতঙ্কের ব্যাপার আমার কাছে। পাটিগণিতের যোগের মতই বাবার ওই প্রাণায়ামযোগ করা সহজ নয়, দারুণ কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধনা। আমার দ্বারা হবার নয়। আমি অমনি পেলাম তো পেলাম, ঐ উঁসিতরসে...যা বলেছিলাম। উঁসিতরসে পেলাম—তর হয়ে গেলাম। নইলে অত কষ্ট করে যোগের অঙ্ক কষে আমার অঙ্কশায়িনীকে যদি পেতে হয় তো আমার তা চাইনে।'

'তোমার ভালোর জন্যেই বলছিলাম। হাঁ-করা ছেলেদের কোনো মেয়েরা পছন্দ করে না তা জানো?'

'কোনো মেয়েদের চাইছে কে? আমি সেই মেয়েটির অপেক্ষায় থাকব, যে নাকি বেশ সমঝদার, যা বোজাবার—যা যা বোঝাবার—মুখে মুখে বোঝাতে পারবে আমায়। তোর মতই যে কিনা আমি...হাঁ করলেই তার আঁচ পাবে, আর আঁচ পেলেই আঁচাতে দেবে আমাকেও। খাবার পরেই না আঁচাবার কথা!'

'আঁচিয়ে কাজ নেই তাহলে। তুমি ওই হাঁ-করাটাই প্র্যাকটিশ করে যাও। ওর একটা ভালো দিকও আছে ভেবে দেখলে। নাকডাকা বরকে নিয়ে ঘর করা যায় না। হাঁ করে থাকলে তোমার নাক ডাকবে না। সেটা মন্দের ভালো। কানের পাশে সারা রাত নাক ডাকলে ঘুমোনোর দফা রফা!'

'হ্যাঁ, কথাটা তোর খাঁটি। কানের গোড়ায়

নাকের ডাকাতি হ্রাস ঘুমটাই মাটি। কান পাতাই দায় হবে, চোখের পাতা বুজবি কি, তবে সে ভাবনা তোর কিসের। তুই তো আমায় বিয়ে করতে যাচ্ছিস নে...'

'আহা, নিজের কথাই ভাবছি নাকি আমি। যে তোমার বউ হবে গো তার কথাটাই ভাবছিলাম...তোমার নাক ডাকলে তাকে নাকাল হতে হবে না?'

'তার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। সে কোনোদিন হবার নয়...এসব আলতু ফালতু কথার আগড়ুম বাগড়ুম আউড়ে আসল কথা তুই ভুলিয়ে দিতে পারবি নে। খেয়াল আছে আমার—খেসারৎ চাই। চাই-ই। নইলে ছাড়ছি না।'

'আচ্ছা নাছোড়বান্দা তুমি!' সে তার গালটা এনে আমার হাঁ-য়ের ওপর রাখে। একটুক্ষণ।—'হোলো তো? এখন যাই, তোমার ওষুধটা নিয়ে আসি গে চট করে। পাঁচ দাগ তো ফাঁক করেছো, দুদিনের ওষুধ একদিনেই খেয়ে বসে আছো দেখছি...'

'দুদিনের ওষুধ ছিল বুঝি? বলিস নি তো আমায়?'

'প্রত্যহ তিন দাগ—তিন ঘণ্টা বাদ বাদ। লিখে দেয়নি শিশির গায়?'

'শিশির দিকে নজর দিলাম কখন? শিশির-সম্পাতে কি নজর দেওয়া যায়—চোখের সামনে সমুদ্র উথলালে?'

'যাক, খেয়ে ভালোই করেছ বোধ হচ্ছে। জ্বরটা ছেড়ে গেছে তোমার ওই জন্যেই মনে হয়।'

'জ্বর নেই যে কি করে টের পেলি? তুই কি থার্মোমিটার?'

'বাঃ, এক্ষুনি আঁচ পেলাম না? গা তোমার গরম নয় গাল ঠেকিয়ে দেখলাম যে!'

'দেখলি তো! না আঁচালে বিশ্বাস হয় না। আঁচ নিজি বলেই না...কিন্তু বাপু যাই বল, কাজটা তোর ঠিক হোলো না। উচিত হয়নি। কাল রাত্তিরে আমার অজ্ঞাতে আমার প্রতি বিমুখতা করেছিস, আর আজ সকালে এমনি করে আমাকে তোর গাল দেওয়াটা...এই অপমান? যাক, এখনকার মত সয়ে গেলাম। দাবী আমার রয়েই গেল। পাওনা আমার মিটলো না কিন্তু।'

'যেতে দাও তো আমায়। ছাড়ো এখন লক্ষ্মীটি! ওষুধটা নিয়ে আসি গে। দেরি করলে ভারী ভিড় জমে যাবে ডিসপেনসারিতে। ফিরবার পথে ফের তোমার খাবারটা—খিচুড়িভোগ—নিয়ে আসতে হবে না আবার? কী বলবো ডাক্তারবাবুকে? জ্বরটা সেরেছে কিন্তু কাশি হয়েছে বেজায়? এই তো।'

'আমিও যাব তোর সঙ্গে আজ। আজ তো আমার জ্বর নেই আর। তবে যাবার বাধা কোথায়?

'এসো তাহলে চটপট।'

ডক-জেলখানাটার এক টেরে ডিসপেনসারি। ডাক্তারের হাঙ্গাম মোটে নেই এমন এক কম্পাউন্ডার মারফৎ ডাক্তার বসে ঘরটার এক ধারে। তাঁর সামনে জনা দশেক রুগী দাঁড়িয়ে আর পাশের টেবিলে প্রকাণ্ড এক কাঁচের জার-ভর্তি রঙচঙে কী এক মিকচার।

তিনি ব্যাজার মুখে রোগবৃত্তান্ত শুনেছেন, আর জার থেকে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছেন সবাইকে—আর বলছেন—'দুদিনের জন্য দেওয়া হল। প্রত্যহ তিন দাগ খাবে। তিন ঘণ্টা অন্তর। আসতে হবে দুদিন বাদ।'

কারো সর্দি, কারো সর্দিকাশি, কারো জ্বর, কারো আমাশা, কারো সেটা রক্তঘটিত, কারো বা পেটের অসুখ—কিন্তু সবার জন্যে সেই-এক দাবাই। কারো নাড়িদেখা কি বুকে নল ঠেকানোর কোনো বালাই নেই।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই ওষুধ খেয়েই জ্বর ছেড়েছে আমার। কাশিটাও আমার কমল। কিন্তু তার পরেই এসে হাজির হোলো গলা ব্যথা আর পেটের অসুখ।

'একি ওষুধ রে বাবা! একটা সারায় আরেকটা এসে পাকড়ায়।'

আমি তাজ্জব হই—'বুক সারালো তো এদিকে পেট ছাড়লো!'

'ওষুধে খেয়ে হয়নি। অসুখের উচিত পথ্য তুমি পাচ্ছো কৈ?—খিচুড়ি কি রুগীর পথ্যি নাকি? তাই খেয়েই তোমার এই পেটের অসুখটা। আমি বলি কি, এসব যা তা না খেয়ে এর চেয়ে বরং উপোস করে থাকো আজ দিনটা। শুধু উপোস করলেও অনেক রোগ সেরে যায় বাবা বলেন।'

'বারে! বলছিস মন্দ না! পেটেও কিছু পড়বে না, মুখেও কিছু পড়বে না—না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরি আর কি!'

সত্যি বলতে, উপোস দিয়ে রোগকে পোষ মানানোর পক্ষে আমি নই। আমার মতে না খেয়ে বাঁচার চেয়ে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে মরাটা ঢের ঢের ভালো—গণ্ডের খাদ্য আর খাদ্যপিণ্ড যদি একসঙ্গে মিলে যায়।

'তাহলে অমন পেট ঠেসে না খেয়ে কম কম করে খাও বরং।'

পরদিন আমার আমাশা, দেখা দিল-তারপরে সেটা দাঁড়ালো রক্তআমাশায়। তারপর দিন জ্বরটা ঘুরে এলো তার ওপর। আবার এলো কাশিবাসের ধকল।

রোজ ডিসপেনসারিতে যাই। সেই ডাক্তার-কাম কম্পাউণ্ডারকে সবিস্তার রোগ-বৃত্তান্ত জানাই। সেই একই জারের একমাত্র দাবাই কয়েক মাত্রা করে পাই। তাই খাই তিন ঘণ্টা বাদ বাদ। খেয়ে যাই—ঘণ্টায় ঘণ্টায়। দুদিনের দাবাই একদিনে সাবাড় করি। আবার যাই পরদিন।

'ওষুধ খেতেও তুমি কম ওস্তাদ নও বাপু!' দশদিনের দিন ডিসপেনসারি থেকে দশম শিশিটি এনে দিনি বললে—'ডাক্তারেরও তাক লেগে গেছে দাদা। বলছিলেন যে কোন রোগই সারছে না, এত ওষুধ যাচ্ছে কোথায়?'

সেদিন আমি ডিসপেনসারিতে যেতে পারিনি—কাহিল হয়ে শুয়েছিলাম নিজের বিছানায়। দশরকমের রোগ এসে আমায় শুইয়ে দিয়েছিল।

'এই দশ দিনেই এই দশা আমার! এত রোগ! কোনটাই সারছে না, সবগুলোই বাড়ছে। আর কদিন বাদ যখন তুই থাকবি নে আরো কী দুর্দশা হবে আমার কে জানে!'

'কেন, থাকবো না কেন আমি?'

'তুই তো এক মাসেই খালাস! আমার যে দু মাস রে! ছাড়া পেয়ে তুই চলে যাবি আমার চোখের ওপর দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে... আমি এখানে একলাটি পড়ে থাকব বেঘোরে।'

'তুমিও কেন সেই সময়ে চলে এসো না আমার সঙ্গে? শুনেছি আপিসে গিয়ে আণ্ডারটেকিং দিলেই ছেড়ে দেয়...ছেড়ে দিচ্ছেও...ছাড়াও পেয়েছে নাকি কেউ কেউ!'

'আমার আণ্ডারটেকার কে হবে? কে আছে এখানে আমার?'

আমার কথায় সে হাসল—'বালাই ষাট! আণ্ডারটেকার কী গো! আণ্ডারটেকার কাকে বলে তুমি জানো? ক্রীশ্চান ইস্কুলে পড়োনি তো, জানবে কি করে? আমি সেণ্ট মেরিতে পড়ি, আমি জানি...'

'তুই সেণ্ট মেরিতে পড়িস, বলিস নি তো আমায়? এদিকে আমি দিনের পর দিন বেথুন ইস্কুলের সামনে মাথা খুঁড়ে মরছি... আর ওদিকে তুই কিনা...হায় হায়, আমার এত খাটা খাটনি সব বৃথায় গেল!'

'আমিই তোমার হয়ে আণ্ডারটেকিং দেব না হয়। তুমি অসুস্থ তো, আমিই তোমার গার্জেন এখন। তোমার ভাই না আমি? খাতায় লিখে দিয়েছি তাই।'

'আচ্ছা, তাই হবে। তাই হবে না হয়। কিন্তু এই একটা মাসই কাটাই কি করে? এই মাসটাই কি কাটবে আর আমার? কাটাল হয়।'

কিন্তু আশ্চর্য, সারা মাসটা আমার এক

রাত্তিরেই কেটে গেল সেদিন...কি করে যে! অদ্ভুত! সেই রাত্তিরেই আমার তামাম রাত কাবার হোলো!

ঘুম আসছিল না কিছুতেই। শুয়ে শুয়ে ছটফট করছিলাম। জ্বরটা বেড়েছে। পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। বুকের ভেতরেও কেমন যেন করছিল। হার্টফেল করবো নাকি আমি?

রিনি প্রায় মার মতই সেবা করছিল আমার। জলপটি লাগিয়েছিল কপালে। রুমাল নেড়ে হাওয়া করছিল সে। হাত বুলাচ্ছিল গায়। আর মাঝে মাঝে আমার চুলে সারা মুখে মুখ বুলিয়ে দিচ্ছিল—বলছিল—উঃ! কী গরমই না হয়েছে গাটা তোমার। আজ রাতটা কাটলে হয়। কাল সকালেই আন্ডারটেকিং দিয়ে চলে যাব আমরা এখান থেকে। এখানে থাকে কেউ? এই নরকে... এমন নরকযন্ত্রণায়? এখানে থাকলে মারা পড়বে তুমি। কী ড্যাম্পো জায়গাটা বাবা!

ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই পথ্যি নেই কিচ্ছু নেই এখানে। আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফেললে আমার বাবা দুদিনে সারিয়ে দেবেন তোমায়—দেখো না!'

এমনি সব আবোল-তাবোল কতো কী যে বলছিল—যেমন করে ছেলে ভোলায়, তেমনি করে আদর দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল সে আমাকে।

আমার তো নেইই, তার দু' চোখেও ঘুম ছিল না! মাঝরাতে হঠাৎ সে উঠে বসলো—চুপটি করে শুয়ে থাকো, আমি একটু বাইরে থেকে আসি। এক্ষুণি আসব।'

'এত রাত্তিরে বাইরে কেন রে?'

'একটু বাইরে যেতে হবে যে। এক্ষুণি আসব।'

'জলবিয়োগে বুঝি? বুঝেছি। শীতের রাত্তিরে এত বেশী করে জল খায় নাকি কেউ?—খেলেই এই ঝঞ্ঝাট। যা তবে।'

গিয়েই তক্ষুণি সে ফিরে এল—'না, গেলুম না আর।'

'তার মানে?'

'দেবেনদা বাইরে দাঁড়িয়ে। দেখেই চলে এলাম।'

'আর কেউ নেই এখন বাইরে?'

'না, সেই একলাটি দাঁড়িয়ে...কেন কে জানে!'

'কী করছে সে ওখানে? চল দেখি তো। আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি, চ।'

বাইরে গিয়ে দেখি তাই বটে। চুপ করে একলাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেবেন। কেন কে জানে!

'দেবেন, তুমি? এত রাত্তিরে একলা দাঁড়িয়ে কী করছো এখানে?'

'পাহারা দিচ্ছি ভাই!'

'কিসের পাহারা?' শুনে আমার তাক লাগে। 'কাকে পাহারা দিচ্ছ আবার?'

'পাছে কেউ জেল থেকে না পালায়। আমাদেরকেই আগলাচ্ছি। পাহারা দিচ্ছি তোমাদের সবাইকেই।'

'কেন, জেলের পাহারা নেই? তারা সব গেল কোথায়?'

'কে জানে কোথায়! জেলের গেট খোলা, দেখছো না? সদর গেট খুলে রেখে পাহারোলারা ঘুমুতে চলে গেছে সবাই। কেউ কোথ্থাও নেই, দেখছ না?'

'দেখছি তো, কিন্তু কেন বলতো? জেলে তো পাহারার ভারী কড়াকড়ি থাকে শুনেছি—এখানে এমনটা কেন?'

'এখানকার সবই অদ্ভুত! ডিসপেনসারিতে ডাক্তার নেই, সদর দরজায় পাহারা নেই!' রিনির টিপ্পনি।

'কর্তারা ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছেন। জেল থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে সুবিধে করে দিচ্ছেন সবাইকে। পালাতে ওসকাচ্ছেন জেলের ছেলেদের। এত ছেলের ধাক্কা সামলাতে পারছেন না তাঁরা—জেলের এত খোরাক যোগাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে বোধ হয়। ফতুর হয়ে গেল সরকার। তাই এই ব্যবস্থা নিয়েছেন মনে হচ্ছে। যার খুশি সে না জানিয়ে চলে যাক না! কোথাও কোনো বাধা নেই।'

'দিনের বেলায় আন্ডারটেকিং দিয়েও তো চলে যাওয়া যায় শুনেছি। যেতে পারে না ছেলেরা?'

যায় বইকি কেউ কেউ। কিন্তু কারো কারো চক্ষুলজ্জায় বাধে না কেমন? তাই রাত্তিরে পালায় তারা, তাদের জন্যেই আমি ...আমরা...জেলের দাদারা পালা করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। ওরা গেট খুলে রাখলে কী হবে, আমরা কাউকে এই গেট পেরুতে দিচ্ছি না, পালাতে দেব না কারুকেই। এখন আমার পাহারা দেবার পালা কিনা।'

'তাই বুঝি! তা রিনির মানে—রিন্টুর যে একটু বাইরে যাবার দরকার পড়েছিল। দিনভোর ঢক ঢক জল গিলেছে তো...তার জলাঞ্জলি না দিলেই নয় এখন।'

'যাক না! গেট তো খোলাই আছে... সেরে আসুক গে চটপট। আমরা তো এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভয়টা কিসের।'

'না না, ভয় কিসের দেবেনদা! কোনো ভয় করছে না আমার।'

গেট পেরিয়ে সে বেরিয়ে যায়—বাইরের অন্ধ-আঁধারি দিকটায়।

খানিক বাদেই তার আর্তনাদ আসে—'শিবুমামা—শিবুমামা...শিবুমামা...চট করে এসো তো একবারটি!'

'দাঁড়াও, দেখে আসি তো কী হোলো আবার। সাপে কামড়ালো নাকি ছোঁড়াটাকে?'

'আশ্চর্য নয়! গঙ্গার এ-ধারটায় গর্তে গর্তে খানাখন্দে ভর্তি—সাপ-খোপ বেড়ায়। কিন্তু আমি তো ভাই এখান থেকে নড়তে পারবো না এখন!' সে বলে: 'দাদাদের কড়া হুকুম। তুমি গিয়ে দেখে এসো গে। যদি ধরে নিয়ে আসতে হয়, একলা না পারো তখন আমায় ডেকো। আমি যাবো।'

'আমি বাইরে বেরুতেই রিনি আমার হাত চেপে ধরে—'চলো, এখুনি পালাই এখান থেকে। কেউ কোথ্থাও নেই রাস্তায় একটা ছ্যাকরা গাড়িটাড়ি পাকড়ে বাড়ি চলে যাই সটান!'

'সাপে কামড়ায়নি তো তোকে?'

'না গো! তোমাকে বের করে আনার জন্যেই এই ফিকিরটা বার করলাম...আর দেরি করো না, এক মুহূর্তে নয়। দেবেনদার সন্দেহ হতে পারে।'

জেল ভেঙে নয়, পাঁচিল টপ্কে নয়, কোনো বীরোচিত ভাবের ধারকাছ দিয়ে নয়কো, নিতান্তই কাপুরুষের ন্যায় সে রাত্তিরেই জেলের থেকে পালালাম আমরা। বুক টান করে গিয়ে সেই আমাদের পিঠটান দেওয়া!

(ক্রমশ

গত সপ্তাহে দিন দশেকের জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঘুরে এলাম। উপলক্ষ ছিল শেখ সাহেবের চট্টগ্রাম সফর। এই চট্টগ্রামেই ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিংগ জ্বলে উঠেছিল। আর স্বাধীনতার পর শেখ সাহেব এই প্রথম চট্টগ্রাম গেলেন।

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। আমাদের পশ্চিম বাংলায় কলকাতাকে বাদ দিলে যেমন আর কোন গুরুত্বপূর্ণ বড় শহর থাকে না, বাংলাদেশে কিন্তু তা নয়। চট্টগ্রাম সমস্ত দিক থেকে ঢাকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। স্কাই স্ক্রেপার বিল্ডিং-এর যেমন অভাব নেই চট্টগ্রামে, তেমনি অভাব নেই চওড়া রাস্তার। এমনকি চট্টগ্রামের নিউমার্কেট ঢাকার নিউ মার্কেট থেকে অনেক বেশী 'পশ'। দোকান-পাটে থরে থরে জিনিসপত্র সাজানো। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ হোটেল ঢাকার ইন্টার কন্টিনেন্টালকেও হার মানিয়ে দেয়। এবং এটি অকল্পনীয় বাংলাদেশের একটি জেলা শহরে একটি হোটেলের রুমচার্জ ও কমফরট টোকিও কিংবা বার্লিনের যে কোন পয়লা নম্বরের হোটেলের সমান। আমাদের কাছে এটাও আশ্চর্য লাগে যে, এই চট্টগ্রাম শহর থেকে এক ডজনের ওপর ইংরাজী বাংলা দৈনিক খবরের কাগজ বার হয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম যে কোন দিক দিয়ে ঢাকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। বিশেষ করে শহরটি তো ছবির মত। এয়ারপোরট থেকে শহরে ঢুকতে অন্তত মাইল দুয়েক কর্ণফুলি নদীর ধার দিয়ে যেতে হয়। এই এসপ্ল্যানেড এলাকাটি অবহেলিত কিন্তু দারুণ সুন্দর।

ডান দিকে কর্ণফুলি নদী। ওপারে সবুজ গ্রাম। এপারে বন্দর। বাঁ দিকে কলকারখানা। পেট্রোলিয়ামের ইনস্টলেশন। ছবির মত বাংলো। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা পথ—যার নাম ডবল মুরিং।

এই কর্ণফুলি নদী যেখানে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে সেই এলাকাটির নৈসর্গিক দৃশ্যও অনবদ্য। এয়ারপোরটের রাস্তাকে ডাইনে ফেলে আরও দক্ষিণে মাইল দুয়েক গেলেই এই সংগম। বাংলাদেশের প্রচণ্ডতম নৌযুদ্ধ হয়েছিল এই সমুদ্র সৈকতে। এখনও সৈকতে বসানো রয়েছে গোটা দুয়েক পাকিস্তানী কামান। মুক্তি ও মিত্র নৌবাহিনীর নৌজাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে এগিয়ে আসা মাত্র এই কামান দুটি থেকে গোলা বর্ষণ শুরু হয়। সেই সময় ভারতীয় বিমানবাহিনী ওপর থেকে বোমা ফেলে কামানের বিবরঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। এখনও সেই ধ্বংসস্তূপ পড়ে রয়েছে। আমাকে স্থানীয় লোকজন বললেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা জোর করে গ্রামের লোকদের দিয়ে ওই বিবরঘাঁটি তৈরি করায়। এর জন্য এক পয়সাও মজুরি তারা গ্রামের লোকদের দেয়নি। শত্রুদের পরাজয়ের পর ভারতীয় সৈন্যদের এ কথা জানাতে তাঁরা বন্দী পাকিস্তানী অফিসারদের কাছ থেকে গ্রামের মানুষের মজুরির টাকা যোগাড় করে দিয়েছেন।

এমন সুন্দর একটি জায়গা অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে। নির্জন বিস্তীর্ণ সৈকত। সমুদ্র এখানে প্রশান্ত। গর্জনও কম। কিন্তু এমন একটি এলাকা পৃথিবীর যে কোন দেশে থাকলে এ অঞ্চলের রূপ যেত বদলে। তৈরি হত রেস্ট হাউস। স্ট্র্যান্ড। প্রতিটি সকাল সন্ধ্যা পর্যটকের ভিড়ে কলরবে মুখরিত হয়ে উঠত।

ফিরে আসছি এমন সময় নৌবাহিনীর একজন চৌকিদার একটি নোট বুক নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, কিছু লিখে দিন। পাতা উলটে দেখলাম, নিসর্গ সৌন্দর্যে অভিভূত বেশ কিছু মানুষের মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। অধিকাংশই ভারতীয় সেনা-বাহিনীর অফিসার। এর মধ্যে চোখে পড়ল, আগরতলা বীর বিক্রম কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা। তাঁরা এসেছিলেন কিছু দিন আগে। আমি লিখলাম, এই নির্জন সৈকতের নাম হোক—'মুক্তি সৈকত।' কারণ এর প্রতিটি বালুকণা শত্রুর রক্তে ভেজা।

চট্টগ্রাম শহরটির বৈশিষ্ট্য, এর এক একটি এলাকা এক একটি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। কোন ইউনিফর্মিটি নেই। মাইল সাতেক দূরে ফৌজদারহাট সমুদ্র সৈকতে যখন মনে হবে মেদিনীপুরের কোন গ্রামে এসে পৌঁছেছেন। অবার আগ্রাবাদ কমার্সিয়াল এলাকার সঙ্গে ঢাকার ভীষণ মিল। টাইগার পাস যেখানে পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা চলে গেছে সেখানে এলে মনে হবে বুঝি এলাম কোন শৈলাবাসে। সমুদ্র, নদী, পাহাড়, নারকেল গাছ, সমভূমি এ সব কিছু মিলিয়ে চট্টগ্রাম এক বৈচিত্র্যপূর্ণ শহর।

চট্টগ্রামের মানুষের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল পাকিস্তানী বাহিনী। চট্টগ্রামের মানুষ যে প্রথম অস্ত্র ধরেছিলেন, তা ওরা ভুলতে পারেনি। প্রতিশোধ তাই উঠেছিল তীব্র হয়ে। টাইগার পাসে যে সার্কিট হাউসে শেখ সাহেব উঠেছিলেন, সেটাই ছিল পাকিস্তানীদের বধ্যভূমি। ওখানে ছিল একটি ইলেকট্রিক চেয়ার। যার ওপর বসিয়ে নির্যাতিত লোকদের দিনের পর দিন হত্যা করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের ধনমণ্ডী হয়ে পাঁচলাশ রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া—মূল শহর থেকে বেশ উঁচুতে এই এলাকাটিতে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাস। এখানে এবং শহরের আরও নানান জায়গায় দিল্লি থেকে আগত মুসলমান ব্যবসায়ীরা থাকতেন। স্বভাবতই তাঁদের কাজকারবার বন্ধ।

শেখ সাহেবের চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে দিল্লিবাসীরা চট্টগ্রামের সমস্ত দৈনিক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন, আমরা দিল্লি সম্প্রদায়, আমরা কোন রাজনৈতিক কাজে কোন দিন অংশ গ্রহণ করিনি, আমরা বাংলাদেশের অনুগত প্রজা। আমাদের দোকানপাট খুলতে অনুমতি দেওয়া হোক ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলে নিই, চট্টগ্রামের বিহারী সম্প্রদায়—যাদের বিরুদ্ধে সকলের অভিযোগ যে, গণহত্যায় তাঁরাই ছিলেন বেশী সক্রিয় তাঁদের এখন সেনানিবাসের কাছে কয়েকটি বড় বাড়িতে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে। রেডক্রসের লোকজন তাঁদের খাওয়াচ্ছেন। বাংলাদেশে রেডক্রস অবাঙালীদের সুখ-সুবিধা ইত্যাদির ব্যাপারে এখন যেমন উৎসাহ দেখাচ্ছেন, গণহত্যার সময় তাঁরা এমনভাবে সক্রিয় হলে বহু মানুষ হয়তো বেঁচে যেত। বাংলাদেশে প্রায় পাঁচশ'র ওপর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের ডেলিগেট কাজ করছেন। প্রতিদিন তাঁদের প্লেন আসছে। যাচ্ছে। শহরের সবচেয়ে সেরা হোটেলগুলিতে তাঁদের কর্মকর্তারা থাকেন। ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে তাঁদের বিরাট অফিস। রেডক্রসের কর্মকর্তারাই স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের মত এত বড়
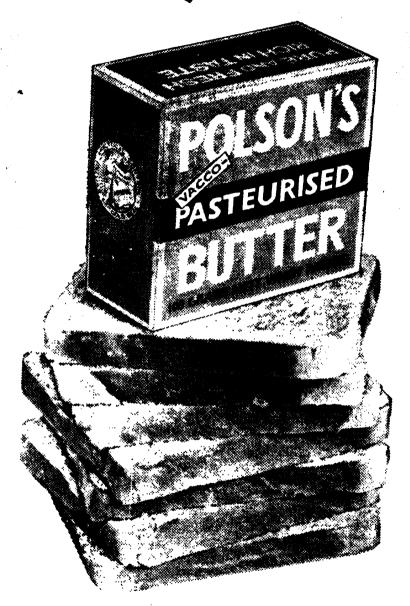
এলাহি কর্মকাণ্ডের দায়দায়িত্ব রেডক্রস পৃথিবীর আর কোথাও কোন দিন নেয়নি।

*

শেখ সাহেবের অসাধারণ জনপ্রিয়তার ফলে তিনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে ভিড় সামলানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। এবং দেখা যাচ্ছে, তিনি সব জায়গায় নিজেই জনতাকে শান্ত করছেন। আমি ঢাকার বাইরে তাঁর দুটি পাবলিক মিটিং দেখলাম। একটি নগরবাড়ি ও আর একটি এই চট্টগ্রামে। এই দু জায়গাতেই ভিড় সামলানোর এক ভীষণ সমস্যা।

চট্টগ্রামের সভাতে তো লাঠিচার্জ করতে হয়। এবং লাঠির বাড়ি খেয়ে বেশ কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে গেল। প্রায় লাখ দুয়েক লোক হয়েছিল এই সভায়। এবং জায়গা না পেয়ে জনতা পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পর্যন্ত বসেছিল।

এই দিনের সভা শেষে শেখ মঞ্চ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবেন, অমনি জনতা সিঁড়ির নীচে তাঁকে ঘিরে ধরল। শেখ আর নামতে পারেন না। তিনি সিঁড়িতে নাটকীয় ভঙ্গীতে বসে পড়ে জনতাকে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে কিল চড় ও ঘুঁসি দেখাতে লাগলেন। জনতার সে কী উল্লাস। শেখ বসে বসে কিছুক্ষণ মূকাভিনয় করে গেলেন ও তারপর নিশ্চিন্ত মনে পাইপ টানতে লাগলেন। তারপর এক সময় হঠাৎ তর তর করে নেমে ভিড় ঠেলে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

জনতার মধ্যে আবার হুড়োহুড়ি। সবাই চায় শেখের সঙ্গে করমর্দন করতে। তার মধ্যে থেকে কোন রকমে তাঁর গাড়ি বেরিয়ে গেল।

*

সেদিন রাত এগারটা নাগাদ আমাদের অফিসে চিত্রাভিনেতা বিশ্বজিৎ এসেছিলেন। "রক্তাক্ত বাংলা" বলে বাংলাদেশের একটি ছবিতে অভিনয় করার জন্য বিশ্বজিৎ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ২৮ মার্চ ছবিটির মহরৎ হয়ে গেল।

বিশ্বজিৎ জানিয়ে গেলেন, জুন মাস থেকে তিনি নিয়মিত শুটিং করতে ঢাকায় আসবেন। বিশ্বজিৎই প্রথম ওপার বাংলার শিল্পী যিনি বাংলাদেশের ছবিতে অভিনয় করছেন।

দুই বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের আদান-প্রদানের ব্যাপারটা নিয়ে এখনও যে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠছে তা মনে হল না। উভয় দেশেই কিছু লোক এ ব্যাপারে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশের ছবি ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে ভারতের কিছু প্রদর্শক নাকি বলছেন, আমাদের ছবি দেখাবার জন্য যেখানে চেন পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে বাংলাদেশের ছবি এলে কি সুবিধা হবে? আবার বাংলাদেশের চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকরা আতঙ্কিত যে ভারতীয় ছবি এলে তাঁদের ছবি মার খাবে। আমি শুনলাম, ভারতীয় কলাকুশলী ও অভিনেতাদের বাংলাদেশের ছবিতে কাজ করার ব্যাপারে এখানে কেউ কেউ আবার অখুশী। আবার অনেকেই এটিকে দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নতির পথে বিরাট পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। মুশকিল হচ্ছে, একালের সংস্কৃতি ও সাহিত্য পণ্যের ভিত্তিতেই এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়। এবং পণ্যের সঙ্গে দুই দেশের বণিক শ্রেণীর স্বার্থ জড়িত, যারা নিছক সাংস্কৃতিক বিকাশের চেয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থকেই বড় করে দেখেন। তাই আশংকা হয় আমরা দুই দেশের মানুষ এতদিন ধরে যে সাংস্কৃতিক পুনর্মিলনের স্বপ্ন দেখে এসেছি তা বাস্তবে রূপায়ণের পথে বাধা আসবে কিনা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১০ ॥

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরই বাংলার তরুণ সমাজের এক অংশ কংগ্রেসের সংস্রব ছেড়ে আবার বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কথা চিন্তা করে। উনিশশো কুড়ি-একুশ সালের পর থেকে বিপ্লববাদ একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। গান্ধীজীর আগমনের পরই ভারতীয় রাজনীতিতে একটা নতুন রূপ এসেছিল। গান্ধীজী অক্লান্তভাবে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়ে বোঝাচ্ছিলেন অহিংসার শক্তির কথা। দু' চারটে বোমা পিস্তলের চেয়ে দেশ জোড়া গণ-আন্দোলন যে শাসক শক্তিকে বেশী ভয় পাইয়ে দিতে পারে এটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। সমস্ত দেশকে তিনি করতে চেয়েছিলেন তাঁর সংগ্রামের সাথী।

গান্ধীজীকে বিপ্লবীরা বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখেছে। এই মানুষটির ব্যক্তিগত সততা সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে। এমন শান্ত ধরনের সাহসী মানুষ আগে কেউ দেখে নি। অথচ তিনি কি চান, তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি যুব সমাজ। তিনি কি চান ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা নামক বস্তুটা ভিক্ষে হিসেবে পেতে? তা কেউ দেয়? ভারতের বিশাল ধনভাণ্ডার ইংরেজ এমনি এমনি ছেড়ে যাবে? সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া সিংহ কখনো পশ্চাদপসরণ করে? এর উত্তরে গান্ধীজী একবার বলেছিলেন,

"Had India sword, I would have asked her to draw it. But she had no sword—I ask her to adopt non-violent non-cooperation".

অস্ত্র যখন নেই, তখন অহিংস সত্যাগ্রহই তো শ্রেষ্ঠ উপায়। বিপ্লবীদের তখন প্রধান সম্বল রডা কোম্পানির কাছ থেকে লুট করা পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল। গান্ধীজী বিপ্লববাদকে চাপা দিতে চেয়েছেন, নিন্দে করেছেন, কলকাতা করপোরেশনে নিহত শহীদের নামে শোক প্রস্তাব নিলে চটে গেছেন—অথচ জেলখানা থেকে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্ত করার জন্যও চেষ্টা করেছেন।

উনিশশো কুড়ি-একুশ সালে বিপ্লববাদ একটু গা ঢাকা দেয়। অনবরত জেলে যেতে যেতে বিপ্লবী নেতারা ক্লান্ত। পুলিসের কাছে সবাই পরিচিত, কোথাও একটা অ্যাকসান হলেই সব্বাইকে ধরে জেলে পুরে দেয়। এই সময় চিত্তরঞ্জন সবাইকে আহ্বান জানালেন কংগ্রেসের আশ্রয়ে এসে সংগঠন জোরদার করতে। প্রবীণ বিপ্লবী-দের কাছে মনে হলো, এ ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই তখন। পাঞ্জাব থেকে ভগৎ সিং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছে কয়েকটা বোমা ও পিস্তল চাইতে এলে তিনি বললেন, এখন মাথা গরম করো না। দলের সংগঠন শক্ত না করে এখানে সেখানে এক আধটা খুন জখম করলে পুলিসের অত্যাচারে আবার দল ভেঙে যাবে।

কিন্তু অতি তরুণরা এসব সাবধানী নীতি মানতে চায় নি। তারা ভেতরে ভেতরে ধুমায়িত হচ্ছিল। দেশের জন্য প্রাণ দেবার দুর্দান্ত নেশায় তারা চঞ্চল। ফাঁসীতে মৃত্যুর চেয়ে গর্বের আর কিছু নেই তাদের চোখে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের পর বিপ্লবীরা আবার কংগ্রেস সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এলো—সারা দেশে তারা আবার আগুন জ্বালালো।

অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, আত্মোন্নতি সমিতি, মুক্তি সংঘ (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি ভি নামে পরিচিত) প্রভৃতি দলের নবীন বিপ্লবীরা আবার অ্যাকসন শুরু করলো। চট্টগ্রামে সূর্য সেন স্থাপন করলেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি, লাহোরে শচীন সান্যালের নেতৃত্বে ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ,

বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাসেরা প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দুস্থান স্যোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি।

দিল্লি অ্যাসেম্বলি হলের মধ্যে বোমা পড়লো, চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত, রাইটার্স বিল্ডিং-এর বারান্দায় তিনটি ছেলে গুলির লড়াই চালিয়ে গেল। সারা দেশ এই সব সংবাদে সরগরম। উনিশশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এসে এই সব কর্মকাণ্ড আবার একটু চাপ পড়ে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভেঙে যাওয়ায় পুলিস আবার সবাইকে জেলে ভরেছে—বিপ্লবীদের ফাঁসী দিতে দেরী করে নি।

এই সব কাণ্ডে দেশের স্বাধীনতা কতটা ত্বরান্বিত হয়েছে সে প্রশ্ন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এই সব যুবা পুরুষদের অসম সাহসিকতা, নিষ্কলুষ আত্মত্যাগ ভারতবাসীর মনে একটা সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে দিয়েছিল ঠিকই। এরা দেশকে মা বলে জানতো, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে মৃত্যু জয় করার সাহস পেয়েছিল, পরজন্মে তীব্র বিশ্বাস ছিল। সবাই বিশ্বাস করতো যে, আবার ফিরে আসবো। অনেক ক্ষেত্রেই এরা ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছে, কারণ এদের ফাঁসীর ঘটনা এবং শেষ বার্তা প্রচারিত হয়ে যেত সারা দেশে—তাতে নতুন ছেলেরা প্রেরণা পেত।

এ সবই জানা ইতিহাস। তবু তখনকার ছেলেদের রোমান্টিক মনে এই সব মৃত্যুঞ্জিৎ যুবকদের জীবন ও কাজ কিরকম উদ্দীপনার সৃষ্টি করতো সেটা বোঝাবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করা দরকার।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছিল লাহোরের মানুষ—পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি পেটা করে হাত-পা ভেঙে দিল অসংখ্য মানুষের। লালা লাজপত রায় তো সেই মার খেয়ে মারাই গেলেন। এই অত্যাচারের নায়ক পুলিস কমিশনার স্কট। হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি সিদ্ধান্ত নিল স্কটকে খুন করার। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছ থেকে ভগৎ সিং শেষ পর্যন্ত কিছু পিস্তল ও বোমা আদায় করে ছিল। পুলিস দপ্তরের সামনের রাস্তায় উনিশশো আঠাশের ডিসেম্বরের এক বিকেলে দাঁড়িয়ে রইলো ভগৎ সিং, রাজগুরু। চন্দ্রশেখর আজাদ। সাহেব বেরিয়ে আসতেই তিনজন তিনদিক থেকে গুলি চালালো—রক্তাপ্লুত অত্যাচারীকে রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেল ওরা—কেউ ধরা পড়লো না। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল, ওরা স্কটের বদলে স্যাণ্ডার্স নামে আর একজন অফিসারকে মেরেছিল।

পরের বছর দিল্লির অ্যাসেম্বলিতে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটালো, তারপরই সমস্ত হল ঘর ভরে উড়তে লাগলো লাল ইস্তাহার। সেই ইস্তাহারের প্রথম বাক্য, 'বধিরকে শোনাবার জন্য এইরকম জোর আওয়াজের দরকার।' পুলিস ধরতে পারে নি, তবু ধরা দিলেন ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত। গান্ধীজীর প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও ফাঁসী হয়ে গেল ভগৎ সিং-এর, অন্যদের দ্বীপান্তর।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সময়েই সেখানকার জেলখানায় স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করলেন কলকাতার যতীন দাস। মানুষের প্রতি মানুষের যা ব্যবহার পাওয়া উচিত তা পাননি বলে তেষট্টি দিন না খেয়ে রইলেন। হাজার চেষ্টা করেও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাঙা যায় নি। যতীন দাসের চিতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বৃদ্ধ পিতা হাত তুলে বললেন, ও' নারায়ণ যে দেশদ্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে তুলে দিয়েছে, তাদের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার আদরের যতীনকে তোমার পায়ে দিলাম।

১৯৩০ সালে ইস্টারের ছুটির দিনে শীর্ণকায় প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক সূর্য সেনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী চট্টগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে লুঠ করলো অস্ত্রাগার। এই বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার হাতে পেয়েও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার এঁরা করতে পারলেন না দু' একটি সামান্য ভুলের জন্য।

অস্ত্রাগার আক্রমণের নিখুঁত পরিকল্পনা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা আগে থেকে খবর রাখেননি যে অস্ত্র আর গোলা বারুদ এক জায়গায় রাখা হয় না। সুতরাং অস্ত্র দখল করেও নষ্ট করে দিতে হলো, কারণ রসদ পাননি। তাঁরা আর একটি ভুল করেছিলেন তাঁরা জানতেন না যে ইস্টারের ছুটিতে সাহেবরা ক্লাবে যায় না—বাড়িতে উৎসব করে। তাই ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেও কারুকে পাওয়া গেল না।

তবু সূর্য সেন চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। জালালাবাদের যুদ্ধে অন্তত একবার পরাজিত করেছিলেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে। লোকনাথ বল,

নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিকে সবাই মনে করলো মহাকাব্যের বীর পুরুষদের মতন এবং সূর্য সেন প্রবাদ প্রসিদ্ধ নায়ক।

ঐ বছরই আগস্ট মাসে ঢাকার হাসপাতাল পরিদর্শনে গেছেন পুলিসের ইন্সপেক্টার লোম্যান এবং ঢাকা জেলার পুলিস সুপার হাডসন। মেডিক্যাল স্কুলের সুদর্শন ছাত্র বিনয় বসু একলা রিভলবার নিয়ে আক্রমণ করলো তাদের। চোখের নিমেষে সবাই দেখলো, সব প্রহরীদের তুচ্ছ করে বেরিয়ে যাচ্ছে এক তরুণ, যুবা। লোম্যান নিহত, হাডসন আহত, বিনয় পলাতক। চাষীর ছদ্মবেশে কলকাতায় পালিয়ে এলো সে। বিনয়ের এই চমকপ্রদ কীর্তিতে সারা দেশ স্তম্ভিত। বিনয়ের মাথার দাম তখন দশ হাজার টাকা। শরৎ বোস, আচার্য পি সি রায় গোপনে পরামর্শ দিলেন বিনয়কে স্মাগল করে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, না হলে তাকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু বিনয় বাঁচতে চায় নি। বাদল আর দীনেশকে সঙ্গে নিয়ে সে আবার গেল রাইটার্স বিল্ডিং-এ—ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্স ক র্ণে ল সিম্পসনকে হত্যা করলো। তারপর সারা রাইটার্স বিল্ডিং কাঁপিয়ে দিল বন্দেমাতরম ধ্বনিতে। বিনয়ের লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয়নি, একমাত্র সে ব্যর্থ হয়েছিল আত্মহত্যা করতে গিয়ে। একই সঙ্গে সায়েনাইড খেয়ে মাথায় গুলি চালিয়েছিল ওরা তিনজন—বাদল সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়—বিনয় এবং দীনেশ বিষ ও গুলির প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠেছিল। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর বিনয় মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে সেলাই ছিঁড়ে দেয়—সে জেলখানায় যাবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল, যায় নি।

ফাঁসীর আগে দীনেশ গুপ্ত তার বউদির কাছে চিঠিতে লিখেছিল, "আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারো নাই।" সে আবৃত্তি করতো,

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারী—
এ যে তোমারি তরবারি।

এই দেশেই সে আবার জন্মাবে, আবার সুখী স্বাধীন ভারতবর্ষে ফিরে আসবে—এ সম্পর্কে তার কোনো সন্দেহই ছিল না, তার কারণ পরজন্ম তত্ত্বে তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। বউদিকে সে লিখেছিল, "দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু, হিন্দু ধর্ম এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি। মুসলমান ধর্মও বলে, মানুষ যখন মরে, তখন খোদার ফেরেস্তা তার রূহ কবজ করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন, "আয় রূহ নিকাল ইস কালিবসে চল্ খুদাকা জানিবমে।" অর্থাৎ তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল্। তাহা হইলে বোঝা গেল মানুষ মরিলেই তার সব শেষ হইয়া যায় না; মুসলমান ধর্মের এই বিশ্বাস আছে। খৃস্টান ধর্ম বলে,
Very quickly there will be an end of thee here; consider what will become of thee in the next world".

বোঝা গেল খৃষ্ট ধর্মও বিশ্বাস করে মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না।...গীতা বলিয়াছেন, শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী।...এ তিন ধর্মের কোনো একটি মানিলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই।"

কলকাতা থেকে বি এ পাশ করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে চলে এলেন পলাতক সূর্য সেনের খোঁজে। এত বড় বৃটিশ শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে সূর্য সেন তখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং দল সংগঠন করে ছেলেদের অ্যাকসনে পাঠাচ্ছেন। প্রীতিলতা সূর্য সেনকে চোখে দেখার আগেই ব্রত নিয়েছিলেন, এই

মানুষটির নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দেশের জন্য কোনো একটা কাজ করে যাবেন। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে পাঠালেন পাহাড়তলির ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে—যে ইওরোপীয়ান ক্লাবের সদস্যরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরই চমকপ্রদ দ্রুত গতিতে এসে বিপ্লবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই কঠিন কাজে সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নেত্রী করে পাঠালেন একটি বিশেষ কারণে—যাতে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে যে বাঙালী মেয়েরাও বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যে-হেতু ধরা না পড়লে প্রীতিলতার অংশগ্রহণের কথা কেউ জানবে না—তাই ইওরোপীয়ান ক্লাবে সার্থক আক্রমণ চালিয়ে—বহুজনকে রিভলবারের গুলিতে হতাহত করে—পালাবার পথ খোলা থাকলেও প্রীতিলতা বিষ খেলেন। তাঁর শরীর তল্লাস করে পাওয়া গেল, তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী ঘোষণা পত্র। যার প্রথমেই আছে—"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। আমি একজন সৈনিক। আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি।"

এদিকে পর পর তিন বছরে মেদিনীপুরে তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট খুন হয়। ১৯৩১এ পেডি, ১৯৩২এ ডগলাস, ১৯৩৩এ বার্জ। ডগলাসকে খুন করে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল—প্রভাংশু পালিয়ে যেতে পেরেছিল কিন্তু *পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় প্রদ্যোৎ ধরা পড়ে। তার ফাঁসি হয়। এরা কেউই গুণ্ডা বা ডানপিটে ধরনের ছেলে ছিল না—এরা আদর্শব্রতী, স্বপ্ন দেখা যুবক। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জেলখানা থেকে তার মাকে* লিখেছিল :

"মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনো মরতে পারে? আজ চারিদিকে চেয়ে দেখ, লক্ষ লক্ষ 'প্রদ্যোত' তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয় অমর হয়ে—বন্দেমাতরম!"

বার্জ হত্যা মামলায় ফাঁসি হয় রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর এবং নির্মল জীবন ঘোষের। ফাঁসির আগে ব্রজকিশোর চক্রবর্তী তাঁর মাকে লিখেছিলেন, "এই সব-পেয়েছির দেশ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি, তথাপি আমি নিশ্চয় করে বলে যাচ্ছি, আপনার ঘর কখনো অন্ধকার হবে না।...মা, ফিরে আসবার যদি কোন পথ থাকে, তবে এই সব-পেয়েছির দেশে আবার ফিরে আসবো—তখন চরণে স্থান দেবেন।"

কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে মেরে এলো দুটি মেয়ে, শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী। তখন অনেক মেয়েই অংশ নিয়েছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার—এই সব বীরাঙ্গনার নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কেউ হারমোনিয়ামের মধ্যে রিভলবার লুকিয়ে নিয়ে যায়, কেউ কনভোকেশনের সময় সরাসরি গভর্নরকে গুলি করে।

১৯৩৪-এ দার্জিলিং-এর রেস কোর্সে কয়েকটি ছেলে আর মেয়ে গুলি ছুঁড়ে মারতে গেল গভর্ণর জন এণ্ডারসনকে। সেই *মামলায় ফাঁসি হয় ভবানী ভট্টাচার্যের। সদ্য ম্যাট্রিক পাশ এই নবীন যুবকটি মৃত্যুর আগে তার ছোট ভাইকে পোস্টকার্ডে লিখেছিল :*

"অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—সাধক সেখানে সিদ্ধি লাভ করে। আজ আমি বেশি কথা লিখবো না, শুধু ভাববো। মৃত্যু কত সুন্দর!"

সূর্য সেন ধরা পড়ার পর বিপ্লবীরা বেশ খানিকটা দমে গেল। এমন একটা প্রায় অলৌকিক বিশ্বাস লোকের মনে জন্মে যাচ্ছিল যে, সূর্য সেনকে ধরার ক্ষমতা কারুর নেই। কিন্তু সূর্য সেনেরও ফাঁসি হয়ে গেল ১৯৩৪ সালে। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট ও গভর্নর পর্যায়ে শারীরিক আক্রমণের ফলে পুলিস ক্ষেপে উঠে সব দেশ তছনছ করে ফেললো। গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল গুপ্তচর। বিপ্লবীরা অধিকাংশই জেলে—বাকীরা আত্মগোপন করলেন। সমগ্র দেশে নেমে এলো শ্মশানের শান্তি।

কিন্তু যুবকদের অদম্য প্রতিরোধ শক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়েছিল। ফাঁসির আগে কারাগার থেকে সূর্য সেন পাঠালেন তাঁর শেষ বাণী :

"আমার শেষ বাণী—আদর্শ ও একতা।

ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে।...এই আনন্দময় পবিত্র ও গৌরবপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্যে কি রেখে গেলাম? শুধু একটি মাত্র জিনিস, তা হলো আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহভরে সারা জীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম।...এগোও, ওঠো, জাগো, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।...

বিদায়!

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বন্দে *মাতরম।"*

সূর্য সেনের এই বাণী ব্যর্থ হয়নি। বস্তুত, প্রতিটি মৃত্যু, প্রতিটি আত্মদানই নতুন প্রেরণা দিয়েছে। কয়েক বছর একটা

সংগত থাকার পর সাম্রাজ্য বিরোধী লড়াইতে আবার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শোনা যায়। আবার বুলেট, বিস্ফোরণ, রক্তপাত—এরই পরিণতি বেয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন।

১৯৩৮ সালের শেষ দিকে কয়েকটি যুবক হাজারীবাগের জেল ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করার এক পরিকল্পনা নেয়। হাজারীবাগের দুটি বাগান বাড়িতে ছিল তাদের আস্তানা। তারা দিনের বেলা কক্ষণো বাইরে বেরুতো না, স্থানীয় লোকদের সঙ্গেও তারা বিশেষ যোগাযোগ রাখে নি।

সূর্যকুমার আর তার বন্ধু ছুটতে ছুটতে এদের গোপন আস্তানায় গিয়ে পড়ে হঠাৎ। ওই বাড়িতে ওঁদের উপস্থিতির কথা ফাঁস হয়ে যাবার আশংকায় ওঁরা ছেলে দুটিকে নামিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছিলেন। সাহেবী স্কুলে পড়া এই সব বড়লোকের বাচ্চাদের ওঁরা বিশ্বাস করবেনই বা কি করে? শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমারের বন্ধুটিকে ছেড়ে দিলেও সূর্যকুমারকে ওঁরা ভোর রাত্রি পর্যন্ত আটকে রেখে জেরা করলেন—সূর্যকুমারের চেহারায় ও কথাবার্তা শুনে ওঁদের সন্দেহ হয়েছিল।

(ক্রমশ)

পদপল্লবম্

পা দু'খানার পদমর্যাদা কেন যে কম জানি না। হাতে আপনি যাই করুন মুখে যাই বলুন পায়ে ঠেলে দেখুন একবার। নিতান্ত শিশুও মারমুখো হয়ে উঠবে। সাজের বেলায় মুখে শত প্রলেপ, এমন কি হাতে গায়ে সতর্ক পরিচর্যা সব সত্ত্বেও পা দু'খানা অবহেলায় মলিন হয়ে থাকবে। কেন?

ভেবে দেখুন, পা দুখানাই এ জগতে মাথা তুলে দাঁড়াবার একমাত্র উপায়। এবং পরিচ্ছন্ন চরণ আপনার মনে আনবে এমন প্রফুল্লতা যার আবেশে সকল যাত্রা সার্থক হয়ে উঠবে। হৃদ্‌যন্ত্র যেমন শরীরের সকল দায়িত্ব বহন করে ঠিক তেমনই পা দুটি বহন করে সমস্ত শরীরের ভার। আর আপনি হয়তো ভাবেন পা দুখানা আর কে দেখবে? বিশেষ করে যাঁরা শাড়ি পরেন, তাঁরা তো ধরেই নেন পায়ের কালি-ঝুলি শাড়ির লুটিয়ে পড়া বাহারে লুকিয়ে থাকবে কোন্ গহনে। একেবারে কিন্তু ভ্রান্ত ধারণা। পা দুখানা কখনও বা সবার আগে নজরে পড়ে। অসুন্দরের প্রথম ধাপ থেকে ফিরে যায় দর্শকের দৃষ্টি।

দুর্বল ক্লান্ত চরণ আপনার সমস্ত শরীরের প্রভাব বিস্তার করবে। পায়ে যদি স্বাচ্ছন্দতা না থাকে, তবে মুখে তার ছায়া পড়বে, মনে অস্বস্তি আসবে, গতিভঙ্গী হবে আড়ষ্ট।

পায়ের যত্নে প্রথম পর্ব ভাল করে পা পরিষ্কার করা। স্নানের সময় যেমন তেমন করে সামান্য সাবান বুলিয়ে ধুয়ে ফেলা যথেষ্ট নয়। আলাদা করে বিশেষ যত্ন সহকারে পদস্নান বা bath দরকার। নাপিতবউ যেমন ঝামা ঘষে পা ধুয়ে আলতা পরাতো, তেমন করে মাঝে মাঝে ঝামা ঘষে পা ধোবেন। একটি গামলায় ঈষদুষ্ণ জলে পা ডুবিয়ে রাখবার আয়োজনের সঙ্গে শক্ত একটি ব্রাশ এবং একটি পুরোনো দাঁতের ব্রাশ রাখবেন। পা ডুবিয়ে রাখলে পায়ের ত্বক নরম হয় এবং ঝামা ঘষে মরা চামড়া সহজে পরিষ্কার করা যায়। প্রথমে পায়ে ভাল করে সাবান মেখে ব্রাশ দিয়ে ঘষবেন। পুরোনো টুথ ব্রাশটি বেশ করে আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে ঘষবেন। এখানেই বহু চর্মরোগের জন্ম। ভাল করে পরিষ্কার করা এবং ভিজে না রাখা বেশ দরকার। যাদের পা ঘামে তাঁরা আরও সাবধান হবেন এবং ট্যালকাম পাউডার ব্যবহার করবেন। হাজা অর্থাৎ athlete's foot এখানেই বেশী হয়।

কোনও চর্মরোগ প্রবণতা থাকলে সাধারণ ট্যালকামের সঙ্গে শতকরা দশ অংশ বোরিক পাউডার ব্যবহার করবেন। যাঁদের পা ঘামে তাঁরা স্পিরিট বা অ্যালকোহল মালিশ করলে উপকার পাবেন। জুতো যাঁরা পরেন তাঁরা জুতোর ভিতরে বা মোজার ভিতরে ট্যালকাম ছিটিয়ে নেবেন।

দিনের শেষে ক্লান্ত পদযুগলকে যদি আরাম দিতে চান, নূতন যাত্রার উপযোগী করে তুলতে চান, তবে মালিশ, বিশ্রাম ও পা ঠাণ্ডা এবং গরম জলে ধুয়ে নেওয়া প্রশস্ত। গরম জলে একবার এবং ঠাণ্ডা জলে একবার এমনি করে পা ছোট গামলায় ডুবিয়ে নেবেন মিনিট পাঁচ-সাত। সম্ভব না হলে একটু খাবার সোডা মেশানো জলে পা ডুবিয়ে নেবেন। যেভাবেই পায়ের ক্লান্তি দূর করবেন সবার শেষে ঠাণ্ডা জলে ধুতেই হবে। গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা জলে দু-চার কুচি বরফ ফেলে পা ধুয়ে দেখুন, কত আরাম হবে। সময় হাতে থাকলে সামান্য কোল্ড ক্রীম দিয়ে পা মালিশ করুন। বাড়তি ক্রীম মুছে ফেলে পা দুখানা উঁচু করে রেখে শুয়ে থাকুন। সারাদিন পা আপনার ভারবাহী। রক্ত সঞ্চালনের পক্ষে পা উঁচু করে কিছুক্ষণ রাখায় উপকার পাবেন। যাঁদের পা ভারী হয়ে ওঠে অথবা সারাদিনে ফুলে। ভাব হয় তাঁদের পক্ষে বিশেষ করে পা তুলে দিলে কিছুক্ষণ অন্তত থাকা দরকার।

জুতো কেনা সম্বন্ধেও আমরা অনেক সময় সতর্ক হই না। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের জুতো ঠিক ভাবে পায়ে লাগা দরকার। না হলে সাময়িক কষ্ট ভিন্ন পায়ের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। পায়ের উপর সম্পূর্ণ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জুতো পরীক্ষা করা উচিত। বুড়ো আঙুল থেকে সামান্য এগিয়ে যাবে জুতো, পাশে চাপা ভাব হবে না, তবেই জানবেন মাপে ঠিক হয়েছে। সব সময়ই যে ছোট বা চাপা জুতোয় পায়ের ক্ষতি হয় তা নয়। ঢিলে জুতোতেও পায়ের অস্বস্তি কম হয় না। হাই হীল জুতো ফ্যাশনের সঙ্গে চলছে বটে কিন্তু হাই হীল পা এবং শরীরের জন্য প্রকৃষ্ট নয়।

আমাদের দেশে নখে তেল দেওয়ার প্রথা ছিল। শোনা যায় নখে তেল মালিশ করলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। পদযুগলের সৌন্দর্যের জন্যও নিয়মিত নখে তেল মালিশ করবেন। পা ফাটলে বা বিবর্ণ

হলে পায়ে বেশ করে তেল মালিশ করলে এবং পরে ধুয়ে ফেলে ট্যালকাম পাউডার লাগালে বিবর্ণতা কেটে যাবে। যাদের পা বেশী ফাটে তাদের জন্য সরষের তেলের চেয়ে নারকেল তেলের ব্যবহার বেশী উপকারী।

অল্পবিস্তর পায়ের ব্যায়াম দিনে মিনিট দুই চার করতে পারলে ভাল হয়। সব চেয়ে সহজ হচ্ছে পায়ের গোড়ালি তুলে সামনের আঙুলে একটুও না সরিয়ে আবার গোড়ালি মাটিতে রাখা। চেষ্টা করে যান পায়ের গঠনে পর্যন্ত সৌষ্ঠব আসবে।

মার্কিন মহিলা সমাজ

আধুনিক চিত্রকলাকে নানাভাবে ব্যঙ্গও করা হয়। দুর্বোধ্যতা তার বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা। সেদিন শুনলাম এক মন্তব্য। সাদা ক্যানভাস সুন্দর বাঁধিয়ে রাখা। তলায় লেখা The cow who ate the grass। অর্থাৎ যে গাভীটি ঘাস খেয়েছে। সেকি? গাভী কই আর ঘাসই বা কই? আহা, ঘাস তো গাভীর পেটে, আর গাভী? তার তো পেট ভরে গেছে, নিশ্চিন্ত আরামে চলে গেছে অন্য দিকে! মার্কিন বৈদেশিক নীতির মতই সাধারণের পক্ষে অসম্ভবরকম হেঁয়ালি ভরা আধুনিক চিত্রকলা। মার্কিন বৈদেশিক নীতি তো বটেই, মার্কিন মহিলা সমাজও হেঁয়ালি হয়ে উঠছেন। তাই বোধহয় টাইম পত্রিকার ২০শে মার্চ সংখ্যা একটি বিশেষ সংখ্যা — বিষয়বস্তু The Americal Woman বা মার্কিন মহিলা। যাঁরা টাইম-এর এই সংখ্যাটি পড়েছেন তাঁরা এবার ঘরে বাইরে বাদ দিয়েও যেতে পারেন।

আমাদের মহিলা প্রগতি নিয়ে কোন দিন হেডলাইন রচনা হয়নি। কারণ, সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যতায় ভরা ভারতীয় নারীর অগ্রগতি। সামঞ্জস্য আর সঙ্গতিতে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে সে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিল দিয়ে। মার্কিন মহিলা এখন গ্যাজেটের প্রশ্রয়ে পালিত মানিতা মানিনী। সেই প্রথম যুগের Pioneering পর্ব কবে চুকে গেছে। তখন বস্ত্রখণ্ডটুকু জুড়ে লেপ তৈরি হত। তাকে নকশার ছাঁদে Patch Work করে গৃহিণীরা শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন। এখন পয়সাকড়ির প্রাচুর্যের পরাকাষ্ঠা, চিত্ত-বিনোদনের নিত্য নূতন আবিষ্কার মার্কিন মহিলা সমাজকে জালে ফেলে ধরছে বিজ্ঞাপনের চটক দিয়ে। সমাজের সব আয়াসের তাঁরাই প্রবর্তক, সব উৎপাদনের মূল তাঁরা। এখন, মহিলা সমাজ তাই অন্য আন্দোলনে নেমেছেন। Lib অর্থাৎ Liberation। মুক্তি। কি থেকে মুক্তি, কিসের মুক্তি? কেউ বা বেপরোয়া হয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে চলেছেন সরকারের দরবারে। কেউ বা বিচিত্র পোশাকে প্রমাণ করতে চাইছেন পূর্ণ স্বাধীনতা।

যাই হোক, টাইম পত্রিকায় The New Woman 1972 পড়ে ভালই লাগলো। ১৮৭৯ সালে ইবসেনের নোরা হেলমার তার পুতুলের ঘর থেকে মুক্তি চেয়েছিল। তার পরে যুগে যুগে মহিলা সমাজ বিদ্রোহ করেছে, অবশ্য বেশীর ভাগই সাহিত্যিক বা নাট্যকারের সৃষ্টিতে। মেয়েরা ধূমপান করেছে ঠেসে, মদ্য পান করেছে ঠুসে, বিবাহবিচ্ছেদে আত্মনির্ভরতার পতাকা পেশ করেছে, পুরুষের মত প্যান্ট পরেছে, কত কিই না করে চুকেছে। আজকের মার্কিন মহিলা সমাজ আর

পুরুষের গড়া কল্পনা নয়। পুরো-পুরি রমণীর নিজস্ব নতুন রূপ। জীবনযাত্রার প্রশস্ত পটভূমিকায় একটি নতুন মনোভাব। ঘর-সংসার, শিশু, চাকরি, নারী-পুরুষের সম্বন্ধ সবই আলোড়িত হচ্ছে। কেউ বা মনে করেন ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার তরঙ্গ, কেউ বা ভাবছেন নতুন দিনের নতুন নারীর নানা দাবি তার প্রাপ্য।

চিরকালই মার্কিন মহিলা নাকি পরম প্রভুত্বপরায়ণ। এ কথা অনেক বিদেশী বলেছেন:

"Man meekly submits to be the hewer of wood, the drawer of water, the heart of burden for the superior sex."

পুরুষ নম্রভাবে আত্মসমর্পণ করে নারীর কাছে, সেধে হয় কাঠুরে, টেনে আনে জল, ভারবাহী পশুর মত বহন করে উন্নততর অংশের নির্দেশ। কিন্তু মার্কিন নারী আপত্তি জানায়। না, না, এসব মিছে কথা। তাই বিবাহকে আর ঘর বাঁধার বা সহবাসের নিয়ম বলে মানে না। মনে করে পুরুষ আর নারীর ভূমিকা হাত বদলে যাওয়া বিচিত্র নয়।

টাইম পত্রিকা মনে করেন, এত সত্ত্বেও ব্যাপারটি বোধাতীত ও রহস্যপূর্ণ। আমেরিকা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের নারী সংখ্যা ১,০৬০ লক্ষ। বিবাহিত জীবনের স্থিরতা কম। কাজেই সংসারের বহনভার ক্রমশ মেয়েদের হাতে বেশী এসে যাচ্ছে। প্রায় ২০,০০০,০০০ মেয়ে উপার্জন করে সংসার চালায়।

ক্লেয়ার বুথ লুস সম্বন্ধে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। এই গুণী মহিলা বলেছেন:

"Power, money and sex are the three great American values today, and women have almost no access to power except through their husbands. They can get money mostly through sex—either legitimate sex, in the form of marriage or non-married sex."

ক্ষমতা, পয়সা ও যৌন আবেদনের প্রভাব এই তিনটিই মার্কিন দেশের মূল্যবোধের মূল। বৈধ Sex অর্থাৎ বিবাহিত Sex বা অবিবাহিত Sex দুয়ের প্রভাবই হয় পরস্পর সাধারণ। কাজেই "What leads to money and power is education and the ability to make money apart from sex." পয়সা এবং ক্ষমতা Sex বাদ দিয়ে অর্জন করতে হলে মেয়েদের দরকার যথোপযুক্ত শিক্ষা ও শক্তি।

এক সময় ফ্রয়েডবাদীরা বলতেন, ভাগ্য দৈহিক গঠনে। মেয়েদের দেহ এবং সৃষ্টির সম্ভাবনাকে তার ভাগ্যজয়ে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না। চেষ্টায় বিভ্রান্তি সৃষ্টিই করে। আমাদের তাই একান্ত প্রার্থনা উগ্র পাশ্চাত্য স্বাধীনতাবাদ যেন আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ না করে নারীকে উন্মুক্ত বিশ্বের স্বাধীন সত্তার ভূমিকা দিতে পারে। স্বাধীনতা বিশৃঙ্খলতা নয়। মার্কিন মহিলা মনের দিক থেকে নিঃস্ব। সেখানে মাসি পিসি দিদিমা ঠাকুমা সমাজে অবান্তর। এমনকি বয়স্ক মাতা-পিতাকে পুত্র কন্যার জীবন থেকে সরে যেতে হয়। যৌবনের জয়গানে তুমুল তুফান উঠেছে। হয়তো বা সে তুফানেরই এক দিক মহিলা Lib-এর ঘটা।

টুকিটাকি

যাঁদের কনুইতে কালো দাগ হয় তাঁরা সহজেই এ কালো ছোপ তুলতে পারেন। মুগ এবং মসুর ডাল ভিজিয়ে পিষে নিন। তাতে সামান্য হলুদ ও দুধ মেশান। তাতে দু'চার ফোঁটা গ্লিসারিন এবং দু-চার ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে কনুইতে লাগান। প্রায় আধঘণ্টা রেখে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলবেন। সপ্তাহে একদিন টোম্যাটোর রস লাগাবেন।

মাথায় খুস্কি হলে লেবুর রস অতি প্রশস্ত। লেবুর রস চুলের গোড়ায় ঘষে নিয়ে কিছু পরে মাথা ধুয়ে ফেলবেন।

দোতলা বা তিনতলা স্যাণ্ডুইচ এখন খুব জনপ্রিয় পরিবেশন। স্কুলের টিফিন বলুন বা মধ্যাহ্ন ভোজনের বিকল্প বলুন রুটি ও মাখন প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র চলে। তাকে নানা বাহার ও রসনারঞ্জন সংযোগে দোতলা কি তিনতলা করলে তো কথাই নেই। খুব একটি সহজ পুর হচ্ছে পুদিনার চাটনি। পুদিনার চাটনি দিয়ে স্যাণ্ডুইচ হলে নিরামিষ যাঁরা খান তাঁদেরও নুতনত্ব হয়। এখন দোতলা যদি স্যাণ্ডুইচ্ করেন তবে প্রথমে চাটনি ও পরের তলায় টোম্যাটো সস্ দিন। দেখতে যেন মনে হবে জাতীয় পতাকার রং-এর বাহার।

এ বাহারে আরও রূপান্তর আনা যায় যদি লম্বালম্বি রুটি কেটে একটি স্লাইসে চাটনি ও মাখন লাগিয়ে মুড়ে গোল রোল করে ঠাণ্ডায় রাখা যায়। রোল বেশ জমে বসলে গোল চাকা করে কেটে পরি-বেশন করুন। ভারী সুন্দর দেখাবে।

স্যাণ্ডুইচ পর্ব অফুরন্ত। এ রুটি সাধারণ ও সহজ এবং ভারতীয়তার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায় বলে উল্লেখ করলাম।

শ্রীমতী

পরীক্ষায় গণ টোকাটুকি

২৭ ফাল্গুন—১৩৭৮ সংখ্যা দেশে প্রকাশিত শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন 'পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি' প্রবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যে সওয়াল করেছেন তাহা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু সবিনয়ে নিবেদন করব যে, কার্যকারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষকসমাজের প্রতি কিছু অবিচার করেছেন। পত্র-পত্রিকায় এই সমস্যা নিয়ে যে সব আলোচনা হয়ে থাকে তাতে গণ-টোকাটুকি নিন্দিত হলেও এজন্য দোষ চাপানো হয় শিক্ষা তথা পরীক্ষার কর্ণধারগণের ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের উপরে। এই দুর্নীতি দমনে অক্ষমতার জন্য একদিকে যেমন কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হয়, কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হলে তাও আবার বিরূপ সমালোচনার কোপে পড়ে। অথচ এই সব সমালোচকরা বিকল্প কোন পন্থার হদিশ দেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রীসেন এই জাতীয় সমালোচনার উত্তরদান প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সমর্থন করে বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য শিক্ষকদের অংশত দায়ী করেছেন। তাঁর কথায় এটা মনে হয় যে, শিক্ষকসমাজের কর্তব্য পালনে শৈথিল্যই যেন ছাত্রদের অসৎ পথে ঠেলে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কলেজগুলিতে ঠিকমত পড়াশুনা না হওয়া, বৎসরের মধ্যে কম দিনই ক্লাস হয়। আর শিক্ষকরাও অনেক সময় ঠিকমত পড়ান না, সমস্ত কোর্স শেষ করবার কোন চেষ্টা করেন না। কাজেই কিছু ছাত্র বাধ্য হয়ে নকলের পথে যায়।...তাঁরা যদি যত্ন নিয়ে পড়ান ও পরীক্ষার হলে সাহস করে নকলের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তবে দু'এক বছরের মধ্যে নকল বহু পরিমাণে কমে যাবে।' কলেজে পড়াশুনা হয় না বলে চালু এই অপবাদ পাইকারীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। আমি সুদীর্ঘকাল একটি বড় কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থেকে দেখেছি সেখানে কোর্স শেষ না হওয়ার বা শিক্ষকদের খুশি-মত ক্লাস না নেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই, পক্ষান্তরে সাম্প্রতিককালে দেখেছি ছাত্ররাই বিনা কারণে গণছুটি নিয়ে ক্লাসে গরহাজির থাকেন ও কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বর্জনের গণ আন্দোলনে নামেন, কারণ তাঁরা জানেন ক্লাসে বসে বিদ্যার্জন নিষ্প্রয়োজন, শেষ পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকিতে তাঁদের অভীষ্ট মিলবে। কিছু সংখ্যক কলেজে যথাপ্রয়োজন পড়াশুনা হয় না—বিতর্ক এড়াবার জন্য এ কথা মেনে নিলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের ব্যাপকতার কৈফিয়ত পাওয়া যাবে না। পরীক্ষায় নকল করবার কাজে

হাতেখড়ি হয় স্কুল পর্যায়েই। স্কুলের ছাত্রেরা অনুপযুক্ত জ্ঞান নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়, পরন্তু তারা চরম দুঃসাহসিকতা অর্জন করে সিদ্ধহস্ত হয় টোকাটুকিতে। কলেজীয় বিদ্যাগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা ও মানসিকতা বর্জিত ছাত্রদলকে শিক্ষকরা যত্ন নিয়ে পড়াবেন কি করে? এই ব্যাপারেও কিন্তু স্কুলের শিক্ষকরা কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ, এমন অপবাদ দিলে সত্যানুসন্ধানে ত্রুটি থাকবে। বর্তমান দুঃসহ অবস্থার মূল কারণ হচ্ছে, উচ্চ মাধ্যমিক ও তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন, ছাত্রসংখ্যা সাপেক্ষে শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা, অভিভাবকের ঔদাসীন্য এবং রাজনৈতিক দূষিত আবহাওয়া।

স্কুলে নতুন যে পাঠক্রম চালু হয়েছে তার বিস্তৃতি পরিমিত নহে, বিষয়বস্তু কিশোর শিক্ষার্থীর পক্ষে দুরূহ। পূর্বতন ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের প্রায় সবটুকুই উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমে ঢোকানো হয়েছে কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক কিন্তু কলেজের শিক্ষকের সমমানের নহেন। স্পেশাল অনার্স, শর্ট কোর্স ট্রেনিং জাতীয় গোঁজামিল ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন-মানের শিক্ষক দিয়ে চাহিদা মেটানো হয়েছে। ফলে স্কুলের পঠন-পাঠন ত্রুটি-পূর্ণ। অথচ এ জন্য শিক্ষকরা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নহেন। সর্বাংশে কর্মসচেতন হয়েও তারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা দেখাতে না পারলে অস্বাভাবিক কিছু হয় না। স্কুল পর্যায়ে টোকাটুকির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে শৈথিল্য এসেছে, প্রমোশনে কড়াকড়ির দিন গত হয়েছে। এ সবই হয়েছে অবস্থার চাপে অভিভাবকদের নির্বন্ধাতিশয্যে। অভিভাবক সারা বৎসর ছেলের পড়াশুনার খবর রাখেন না, বাড়ির আবহাওয়া বিদ্যাভ্যাসের অনুকূল থাকে না। বৎসরান্তে বিক্ষুব্ধ ও নানা সমস্যা প্রপীড়িত অভিভাবক ছেলের প্রমোশনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এ সব কথা না ভেবে শুধু শিক্ষকদের উপর দোষ চাপিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। স্কুল-কলেজে ছাত্রসংখ্যা এত বেশী যে, সেখানে বিদ্যা-চর্চার আবহাওয়া গড়ে উঠে না।

শিক্ষকরা সাহসী হয়ে নকল ধরেন না, এ কথা অনস্বীকার্য। যতদিন দুর্নীতিতে লিপ্ত ছাত্রদের পেছনে রাজনৈতিক প্রশ্রয় থাকবে ততদিন শিক্ষকদের পরীক্ষার হলে কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার উপদেশ দেওয়া অর্থহীন হবে।

শিক্ষকের চাহিদা রয়েছে বলে ভাল শিক্ষক হবার গুণবর্জিত অনেক ব্যক্তি শিক্ষকতায় নিযুক্ত হচ্ছেন। অবশ্য এ কথাও মানতে হবে যে, শিক্ষকদের কিছু অংশ সক্রিয় রাজনীতি যতটা করেন ততটা শিক্ষকের কর্তব্য করেন না, তাঁরা অর্থোপার্জনে যতটা সচেষ্ট, অধ্যাপনায় তত উৎসাহী নহেন, তাই একাধিক বাড়তি চাকুরি জুটিয়ে নেন। শিক্ষিত বেকার যেখানে দেশের সমস্যা সেখানে 'পার্ট টাইম' শিক্ষকের প্রচলন চালু রয়েছে এটাও বিস্ময়ের ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্কুল কলেজে পঠন-পাঠনের মান উন্নত করতে চাইলে এ সব অবাঞ্ছনীয় অবস্থার পরি-সমাপ্তির কথা ভাবতে হবে, শুধু শিক্ষক-দের উপর পাইকারিহারে দোষ চাপিয়ে কোন সুরাহা হবে না।

পরিশেষে শ্রীসেন পরীক্ষাগ্রহণের প্রথা বাতিল করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাঠক্রম শেষ করবার নিদর্শনপত্র দেবার যে প্রস্তাব করেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই একমাত্র সমাধান। কারণ, ঐরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলেই ছাত্রসমাজ গণ-টোকাটুকির কুফল উপলব্ধি করতে পারবেন।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বহরমপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

॥ ২ ॥

২৭ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক লিখিত 'পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি' প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বি এ, বি এস-সি পরীক্ষার কতকগুলি কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করেছেন। তার মধ্যে কলকাতার কতকগুলি কেন্দ্র আছে, মফস্বলের মাত্র কয়েকটি কেন্দ্র আছে। মনে রাখতে হবে যে, কোনও কেন্দ্রের একদিন কোনও কেন্দ্রের দু দিন, কোনও কোনও কেন্দ্রের তিন বা ততোধিক দিনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, এবং ঐ সব কেন্দ্রের বাতিল পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের আবার পরীক্ষা নেবার তারিখ ঘোষিত হয়েছে।

স্বভাবতই সকলে এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। ডঃ সেনের প্রবন্ধ দেখে মনে হয়েছিল যে, এবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত ব্যবস্থার যুক্তি সহ ব্যাখ্যা মিলবে। তাঁদের দৃষ্টিতে সামগ্রিক পরিস্থিতির নূতন চেহারা পরিলক্ষিত হবে; ক্ষয়ক্ষতির একটা বিশেষ রূপ পরিদর্শিত হবে। সর্বোপরি তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণে সমালোচকদের আর বলবার কিছুই থাকবে না। স্বীকার করতে বাধা নেই, ডঃ সেনের প্রবন্ধপাঠে সকল দিকেই নিরাশ হয়েছি।

প্রথমেই 'গণ-টোকাটুকি' কথাটায় আসা যাক। সম্ভবত কথাটা ইংরেজী Mass Copying-এর অনুবাদ। কিন্তু কথাটা দ্বারা ঠিক কি বোঝায়? ডঃ সেনের প্রবন্ধে দেখছি—"নকলের পরিমাণ large scale বা ব্যাপক হওয়া চাই।" এতে কিছুই পরিষ্কার হল না। শতকরা ৩০।৪০।৫০ জন নকল করলেও large scale বা ব্যাপক নকল করাই হয়। অন্যত্র ডঃ সেন যা লিখেছেন, তা থেকে মনে হয়, অধিকাংশ পরীক্ষার্থী যেখানে নকল করেছে, সেখানে পরীক্ষার্থীদের দোষী সাব্যস্ত করে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু এই 'অধিকাংশ' মানে কি? শতকরা ৫১।৮০।৯০।৯৫ জন? এ বিষয়ে কোনও আলোচনা বা আলোকপাত নেই।

তারপর, এই নকল করার কথা কি ভাবে কেন্দ্রে জানা গেছে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিদর্শক দল গঠন করে, কেন্দ্রে কোনও খবর না দিয়ে, পরীক্ষার সময় তাঁদের পাঠান এবং তাঁরা রিপোর্ট দেন। ডঃ সেন আরও জানিয়েছেন যে, সেনেট বা একাডেমিক কাউন্সিলের অধ্যাপক-সদস্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদস্থ কর্মচারী নিয়ে এই সব দল গঠিত হয়। এই অংশ পড়েই আমি সবচেয়ে কৌতুক বোধ করেছি। দেখতে পাচ্ছি যে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে যখন অধ্যক্ষ, পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং অধ্যাপকেরা পর্যবেক্ষক (invigilators), তখন তাদের উপর ডঃ সেনের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, কিন্তু আবার যখন তাঁরাই সেনেট বা একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হয়ে (পরিশোধিত হয়ে?) আসেন, তখন তাঁদের উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা থাকে। অবস্থাটা অদ্ভুত নয় কি? —যাক্‌ এ কথা।

সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন লোক নিয়ে গঠিত এই সব পর্যবেক্ষক দলের পর্যবেক্ষণের মাপকাঠি (standard of inspection) এক হতে পারে না। শুধু তাই নয়, তাঁদের দিব্যদৃষ্টি না থাকলে—তাঁদের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে 'গণ-টোকাটুকি'র মত একটা ব্যাপারে সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব নয়।

তারপর এ সব ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ কি দাঁড়াল? কোনও কেন্দ্রের এক দিনের পরীক্ষা বাতিল, কোনও কেন্দ্রের দু দিন, কোনও কোনও কেন্দ্রের তিন বা ততোধিক দিন। যতদূর জানি, কোনও কেন্দ্রেরই সব দিনের পরীক্ষা বাতিল হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়-অবলম্বিত ব্যবস্থার অর্থ এই দাঁড়ায় যে কোনও কেন্দ্রে মাত্র একদিনই গণ-টোকাটুকি হয়েছে, অন্য দিনগুলোতে হয় নি; কোনও কেন্দ্রে দু দিন, বা তিন দিন, বা চার দিন 'গণটোকাটুকি' হয়েছে, অপর দিনগুলোতে হয় নি, এবং কোনও কেন্দ্রেই সব দিন 'গণটোকাটুকি' হয় নি। এই ভিত্তিগ্রহণ কি বিশ্বাসযোগ্য, যুক্তি সহ, বা গ্রহণীয়? —তারপর মনে রাখতে হবে যে, মফস্বলের শতকরা ৮০।৯০টি কেন্দ্রে কোনও পর্যবেক্ষক দল পাঠান সম্ভব হয়নি। যেক্ষেত্রে অধিকাংশ কেন্দ্রেই পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় নি, সেক্ষেত্রে কতকগুলো কেন্দ্র সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, তা কেবলমাত্র অন্যায়ই নয়, যুক্তিহীন, পক্ষপাতদুষ্ট, এবং অক্ষম নেতৃত্বের পরিচায়ক মাত্র।

(একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। যে কেন্দ্রে পর্যবেক্ষকদল ব্যাপকভাবে টোকাটুকি হচ্ছে বলে রিপোর্ট দেন, সেখানেও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে 'ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী' ও পর্যবেক্ষকের দল (invigilators) পরিবর্তন করেন না)।

ডঃ সেন বলেন, "এই সব গণ-টোকাটুকির সংবাদ গোপন থাকে না। লোকমুখে, সংবাদপত্রের মারফতে সবত্রই ছড়িয়ে পড়ে।" এই তথাকথিত গণ-টোকাটুকির সংবাদ প্রথমত ও প্রধানত ছড়িয়ে পড়ে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মারফত, লোকমুখে ও সংবাদপত্রে প্রচার তার পরবর্তী অধ্যায়। কিন্তু এই অবস্থা প্রথম বা কেবলমাত্র বি এ ও বি এস-সি পার্ট টু-তে ধরা পড়ে নি বা জানা যায় নি। ডঃ সেনসমেত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিই জানেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, এম এস-সি থেকে আরম্ভ করে গৃহীত সকল পরীক্ষায়ই একই অবস্থার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পরীক্ষায় ঝুড়ি ঝুড়ি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া একই অবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। পরীক্ষা বাতিলের মত অপরূপ ও অদ্ভুত ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খুব সহজবোধ্য কারণেই এদের ক্ষেত্রে নিতে সাহস করেন নি।

এবার ডঃ সেনের মূল বক্তব্য ও বিচারে আসা যাক। আমি বিশ্বাস করতে পারি নি যে, এই রকম ভুলভ্রান্তির উপর নির্ভর করে তুলনা ও যুক্তির ফাঁকিবাজির উপরে তাঁদের অবলম্বিত ব্যবস্থার সপক্ষে এত দুর্বল ওকালতি তিনি উপস্থাপিত করবেন। ডঃ সেন পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে গণটোকাটুকির অপরাধে অপরাধী পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল করে 'শাস্তি' দিয়েছেন। পুনরায় পরীক্ষার দিনও ধার্য করেছেন। তিনি কোথাও এ কথা বলেন নি যে, কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীই টোকাটুকির অপরাধে অপরাধী। কেন না, সে কথা তিনি রিপোর্টের ভিত্তিতে বলতে পারেন না। তাদের মধ্যে নিরপরাধ আছে, এ কথা তিনি নিজেই বারবার স্বীকার করেছেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কতজন নিরপরাধ বা কতজন নিরপরাধ থাকতে পারে, সে প্রশ্নের ধারেকাছেও তিনি যান নি। শুধু তাই নয়, পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি যে কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন, তাদের তিনি তুলনা করেছেন, আগেকার দিনে যারা কেন্দ্রে নকল করার সময় পর্যবেক্ষক (invigilator) দ্বারা ধরা পড়ত, এবং তারপর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তি পেত, তাদের সঙ্গে। এই তুলনা নিতান্ত ছেলেমানুষী হয়েছে। সেখানে দোষী ব্যক্তিগতভাবে (individually) ধরা পড়ত এবং আইন ও নিয়ম অনুযায়ী শাস্তি পেত। সে 'শাস্তি' পুনরায় পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা

করে দিয়ে নয়, এমন কি দোষী, পরীক্ষার্থী কয়েক বৎসর পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারবে না, এইরূপ কঠোর নির্দেশ দিয়ে আইন ও নিয়মানুযায়ী শাস্তি দেওয়া হত।

কিন্তু এখন তিনি যাদের গণ-টোকাটুকির অপরাধে অপরাধী বলছেন, সেই কেন্দ্রের কোনও একজন পরীক্ষার্থীকেও দেখিয়ে তিনি বলতে পারবেন না যে, সেও অপরাধী। এমন কি, প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনের কাকেও তিনি বলতে পারবেন না যে, তারাও টোকাটুকি করেছে। বস্তুত সমগ্র কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে —'এখানে ব্যাপকভাবে টোকাটুকি হয়েছে' —এর বেশী কিছু তিনি বলতে পারবেন না। সেই জন্যই প্রকৃত শাস্তি দেবার ক্ষমতা বা সাহস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সব ক্ষেত্রে দেখাতে পারেন না; পারেন নিও। ওঁরা জানেন, এই সব রিপোর্টের ভিত্তিতে যদি তাঁরা একটি ছাত্রকেও এক বছরের জন্যও পরীক্ষায় উপস্থিত হতে না দেন, কোর্টে challenged হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ নিঃসন্দেহে খারিজ হয়ে যাবে।

এখন যেভাবে এই সব কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা অপরাধী সাব্যস্ত হচ্ছে, তাদের সঙ্গে পূর্বতন সাব্যস্ত অপরাধীদের তুলনা অর্থহীন, যুক্তিহীন ও নীতিহীন।

ডঃ সেন বহুসংখ্যক দোষী পরীক্ষার্থীর জন্য তাঁদের অবলম্বিত ব্যবস্থায় কিছু-সংখ্যক নিরপরাধ ছাত্রের শাস্তিভোগ করার বিষয় নিয়ে অযথা বাগ্‌বিস্তার করেছেন। সে বিচারের মধ্যে না গিয়েও প্রশ্ন করা চলে, কোথায় পেলেন তাঁরা কিছুসংখ্যক নিরপরাধ ছাত্র?' তাঁদের আরও প্রশ্ন করা চলে যে, যখন তাঁরা খুব ভালভাবেই জানেন শোনেন, বোঝেন যে, সব পরীক্ষাই সমান-ভাবে প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে, তখন বিভিন্ন পরীক্ষায় সমান অপরাধী লক্ষাধিক ছাত্রকে নিষ্কৃতি দিয়ে একটিমাত্র পরীক্ষায় কিছুসংখ্যক ছাত্রের ১।২।৩।৪ দিনের পরীক্ষা বাতিল করার যৌক্তিকতাই বা কি? অর্থাৎ, লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক সহস্র ছাত্রকে এ দুর্ভোগ ভোগ করান—কেন? এর ফলে তাঁরা আশাই বা কি করেন? *

এবারে ক্ষয়ক্ষতির কয়েকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যে সব কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করে, পুনরায় পরীক্ষা নেবার দিন ধার্য হয়েছে, সে সব কেন্দ্রের কোনও দোষী পরীক্ষার্থীই 'দোষী' বলে চিহ্নিত হচ্ছে না, বা প্রকৃত শাস্তি পাচ্ছে না। কেবল পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে, পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা ক্ষতি সহ্য করতে হচ্ছে।

এই পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া ব্যাপারটায় আমরা অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মত এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, এর ফলে পরীক্ষার্থীদের, তথা জাতির, বিরাট অপচয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি সহজে পড়ে না।

বিভিন্ন পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়াটা এমনই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যে ছাত্র বা ছাত্রী পূর্বে ২১ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে পারত, শুধু বার বার পরীক্ষা পিছনোর জন্যই এখন যদি তারা ২২ বৎসর বয়সের মধ্যেও পাঠ সমাপ্ত করে, তা হলে তাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়ের একটি বছর শুধু পরীক্ষা পিছানোর জন্যই নষ্ট করতে বাধ্য হয়। এবার তাদের তথা জাতির, বিরাট অপচয়ের পরিমাণ ধারণা করা কঠিন হবে না।

কারখানাতে ধর্মঘটের ফলে man-power কত হাজার ঘণ্টা নষ্ট হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যাপারের বেলায় কখনও ক্ষতির হিসাব করা হয় না। এইভাবে বারবার পরীক্ষা পিছানোর ফল কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের উপরও অত্যন্ত মন্দ হয়ে দেখা দেয়। পরীক্ষার ফল যথা সময়ে প্রকাশিত না হবার জন্য তাদের স্বাভাবিকভাবে যখন যত ক্লাস নেবার কথা, তাঁরা তার অনেক কম ক্লাস নেওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—১৯৭১-৭২ সালে এম এ, এম এস-সি প্রথম বর্ষের কোনও ক্লাসই অধ্যাপকদের নিতে হল না। কেন না, বি এ, বি এস-সির পরীক্ষার ফলই বার হল না। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এর মধ্যেই দেখা গেছে এমনিতেই ক্লাস হয় না, তারপর আবার অধ্যাপকরা ইচ্ছা করেই অনেক ক্লাস নেন না, কেননা, তাঁরা অল্প পরিশ্রমে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

পরিশেষে বারবার পরীক্ষা পিছানোর জন্য শেষ পর্যন্ত যে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শেষ করতে পারে না, তাদের সংখ্যাও কম নয়। এদের ক্ষতির কথাও মনে রাখা দরকার।

এ আলোচনা আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। পরীক্ষায় গণটোকাটুকি এভাবে বন্ধ হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত ব্যবস্থা কোনও দিক দিয়েই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
প্রাক্তন অধ্যক্ষ

॥ ৩ ॥

গত সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে উপাচার্য মহাশয় বহুবিধ তথ্য ও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, পরীক্ষায় 'গুণ-টোকাটুকি' বন্ধ করতে হলে বিশেষ কয়েকটি কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়াই বর্তমান কালে সহজতম উপায়। এর একমাত্র বিকল্প, পরীক্ষা পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া, যার ফলে বিদ্যার্থীদের বিদ্যার যাচাই হবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রারম্ভে, কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়।

উপাচার্য মহাশয়ের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। ইদানীং আন্দোলনপ্রেমী ছাত্র সংঘ, স্নেহান্ধ অভিভাবক এবং বিভ্রান্ত জনমতের এমন ত্রিবেণী-সংগম ঘটেছে যে, শিক্ষার কোনো ক্ষেত্রেই নিয়মশৃঙ্খলার অস্তিত্ব আর থাকছে না। আমাদের সাংবাদিকরাও যে প্রায়শ বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে গত ১৬।১১।৭৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই। নিবন্ধের উপসংহারে আপনারা লিখেছেন, "শুনেছি প্রত্যেকটি কলেজে নামমাত্র কিছু ছেলে থাকে যারা সমস্ত অন্যায় ও অপরাধের পাণ্ডা। এই ছেলেদের ওপর বিশেষ নজর থাকলে, তাদের দুষ্কর্মের উপযুক্ত শাস্তি হলে হয়তো সাধারণ ছাত্ররা অন্যায়ের সুযোগ নিতে সাহস করবে না।" আপনাদের এই ধারণা যে বর্তমান যুগে আদৌ বাস্তবানুগ নয়, মনে হয় প্রত্যেক ভুক্তভোগী তা স্বীকার করবেন। গত কয়েক বৎসরে যে-কোনো অন্যায় আচরণের সমর্থনে সংগঠন দাঁড় করাবার এমন ক্ষমতা ছাত্রসমাজ অধিগত করেছে যে, কর্তৃপক্ষের সাধ্য নেই কোনো অন্যায়ের জন্য শাস্তিবিধান করার। অন্যায়কারী ছাত্রের প্রতি যথাযোগ্য শাস্তি প্রয়োগ করতে গেলে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাধারণ নীতিপরায়ণ ছাত্র এবং সংবাদপত্র ও জনমতের যে সমর্থন থাকা দরকার, তার ভিত্তি নানা কারণে আজ নড়বড়ে হয়ে গেছে।

তবু মনে হয় উপাচার্য মহাশয় দোষারোপের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুল করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের দায়িত্বপালনে বিমুখতা ও অপারগতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা হয়তো আংশিক-ভাবে সত্য। কিন্তু ছাত্রসমাজ যেখানে কটুবাক্য থেকে বাহুবল, কোনো কিছুর আস্ফালন দেখাতেই আজ আর বিরত নয়, সেখানে কোনো ভদ্র উপায়েই কি তাদের প্রতিরোধ করা সুসাধ্য কিংবা নিরাপদ? এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের কথাও সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যে-সব কলেজের কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ছাত্রদের অসংগত আচরণকে সংযত করতে চেষ্টা করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা (বর্তমান উপাচার্য সমেত) কতটুকু সমর্থন তাঁদের দিতে পেরেছেন? একটি

উদাহরণ দিই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী সব শিক্ষার্থীকেই শতকরা অন্তত ষাটটি ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। উপস্থিতির এই নিয়ম না মানলে কাউকে পরীক্ষায় বসবার অনুমতি না দেবারই কথা। কিছু দিন আগে স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ এই নিয়মকে কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেন এবং অনুপস্থিত ছাত্রদের নাম যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেন। শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা তখন কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে আন্দোলন ও অস্ফালন শুরু করে দেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ যখন এই আন্দোলনের কাছে নতি-স্বীকার করার কথা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করছেন, তখনই কলেজের অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর এক চিত্তাকর্ষক পত্র পান, তাতে লেখা ছিল: "আপনি যেহেতু কলেজের অধ্যক্ষ, আপনি ছাত্রদের উপস্থিতি বিষয়ে যে-কোনো বিবৃতি পাঠান না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় তা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবে।" পত্রের ইঙ্গিতটি এত সুস্পষ্ট যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ আর প্রতিরোধের সংকল্প বজায় রাখতে পারলেন না এবং কলেজের অধ্যক্ষ লজ্জায় পদত্যাগ করলেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই ডাবল গেম-কে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? মাননীয় উপাচার্যের নিশ্চয়ই অজানা নেই যে, বর্তমানে দু' একটি কলেজের কথা ছেড়ে দিলে আর সব কলেজের অধ্যক্ষরাই এই অনুত-ভাষণে বাধ্য হচ্ছেন যে, কলেজের সব ছাত্রই নিয়ম-মাফিক সব ক্লাসে হাজিরা দিয়েছে এবং (কোনো পরীক্ষা না দিয়েই) 'টেস্ট' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যে ধরনের মিথ্যাভাষণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ নিতান্ত কার্যব্যাপার বলে মনে করেন, তারও প্রচারের জন্য কর্তৃপক্ষের এই নিশ্চেষ্টতা কি এই প্রমাণিত করে না যে, সমস্যাটাই আজকের দিনে প্রধান শক্তি, তার উদ্দেশ্য যতই কেন না বিগর্হিত হোক। সমাজের কোনো স্তরেরই এই শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যেন আর অবশিষ্ট নেই।

আচমকা কিছু পরীক্ষা বাতিল করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার যে Shock Treatment-এর ব্যবস্থা করেছেন তা কত দূর ন্যায়সঙ্গত হয়েছে এবং কিছু নির্দোষ ছাত্রের ক্ষতি করেও এই উপায়ে আশানুরূপ ফল লাভ করা যাবে কিনা, সে বিষয়ে স্বভাবতই মতভেদ রয়েছে। এর বিকল্প হিসাবে উপাচার্য মহাশয় পরীক্ষা-প্রথা একেবারে তুলে দেবার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাকেও কার্যকর করার সামর্থ্য কি কর্তৃপক্ষের রয়েছে? এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অতি স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রসমাজের দাবি উঠবে যে, পরীক্ষার সুযোগ লাভ করা ছাত্র হিসাবে তাদের মৌলিক অধিকার এবং পরীক্ষার নিয়ম-কানুন স্থির করার ব্যাপারেও পরামর্শ দিতে তারা বিশেষ আগ্রহ দেখাবে। তখন সঙ্ঘশক্তির চাপে অতিষ্ঠ হয়ে এবং শুভানু-ধ্যায়ী অভিভাবক, সমর্থনকামী রাজনৈতিক দল এবং তাদের স্নেহপুষ্ট সংবাদপত্রের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ কি সেই টোকিটিকেও গিলতে বাধ্য হবেন না?

জনৈক অধ্যাপক
কলকাতা-১৯।

॥ ৪ ॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন 'পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি' নিবন্ধে (দেশ, ১১ মার্চ, '৭২) পশ্চিমবঙ্গে গণ-টোকাটুকি সমস্যার সমাধান হিসাবে পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে তার বদলে প্রত্যেক কলেজ থেকে ছাত্ররা নিম্নলিখিত কোর্সগুলি পড়েছে বলে সার্টিফিকেট দেওয়া যেতে পারে লিখেছেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাসঙ্কট থেকে মুক্তি পেলেও চাকুরির বাজারের মালিকদের সমস্যা সৃষ্টি হবে। চাকুরির নিয়োগকর্তা রা এখন একটি বা দুটি উচ্চপদের জন্য সাধারণত ফার্স্ট ডিভিসন প্রাপ্ত বা অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন চাকুরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র চেয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে চাকুরি-প্রার্থীর সংখ্যা স্বভাবতই সীমাবদ্ধ থাকে। সার্টিফিকেট ব্যবস্থায় ডিভিসনের কোন উল্লেখ থাকবে না। সে ক্ষেত্রে একটি বা দুটি উচ্চপদের নিয়োগের জন্য বহু বিপুল সংখ্যায় সার্টিফিকেটধারীদের আবেদনপত্র গ্রহণ ও তাদের পরীক্ষা করতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। যে সব উন্নত দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে নিয়োগকর্তা-দের Personnel Department আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বড়। আমাদের মত অনুন্নত দেশে অনুরূপ Personnel Department রাখা অর্থনৈতিক দিক থেকে অসুবিধাজনক। কিছু উন্নত দেশে Agency মারফত নিয়োগ ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও ভারতে এর প্রচলন সর্বাধিক নয়।

গণ-টোকাটুকি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অনেক রাজ্যের সমস্যা হলেও সব রাজ্যেই যে সার্টিফিকেট ব্যবস্থা চালু হবে তার কোন গ্যারাণ্টি নেই। কেননা, শিক্ষা রাজ্যের নিজস্ব বিষয়। যে সব রাজ্যে গণ-টোকাটুকি নেই সেখানে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাই চালু থাকবে। সে ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাকে হয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে আবেদনকারী চাকুরি-প্রার্থীদের একই পর্যায়ে ফেলে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে বা বিভিন্ন রাজ্যের চাকুরিপ্রার্থীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা ব্যবস্থা করে তাদের পরীক্ষা-ফলগুলির তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে হবে। প্রথম ব্যবস্থা কিন্তু চাকুরিপ্রার্থীদের পক্ষে unjust হবে, দ্বিতীয় ব্যবস্থা নিয়োগ-কর্তাদের পক্ষে inexpedient হবে।

তা ছাড়া সার্টিফিকেট ব্যবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কোন ছাত্র সর্বনিম্নসংখ্যক ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তাকে কলেজ সার্টিফিকেট দেবে না। সে ক্ষেত্রে খারাপ ছাত্ররা অধ্যাপককে ভয় দেখিয়ে উপস্থিতির সংখ্যা হাজিরা খাতায় বাড়িয়ে দিতে বাধ্য করবে।

সুতরাং মনে হয় পরীক্ষাসঙ্কটের সমাধান সার্টিফিকেট ব্যবস্থায় নয়, আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতিতেই নিবদ্ধ।

শুভেন্দু মুখার্জী
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
পুরী, ওড়িশা।

দেখা হয় নাই

২০ ফাল্গুন ১৩৭৮ শনিবার তারিখের দেশ পত্রিকায় শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেখা হয় নাই' শীর্ষক প্রবন্ধের ১৬ সংখ্যক 'অখণ্ডপল্লি' আলোচনায় দেশ পত্রিকার ৪৬৩ পৃষ্ঠায় শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত অঙ্কিত মানচিত্রে কিছু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। দামোদর নদের স্থলে রূপনারায়ণ নদ এবং রূপনারায়ণ নদের স্থলে দামোদর নদ লিখা রহিয়াছে। উহা সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস
গণেশনগর,
২৪ পরগনা।

সরোজ রায়চৌধুরী

প্রবীণ কথাশিল্পী সরোজকুমার রায়চৌধুরী গত ২১শে মার্চ তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়েস হয়েছিল ৬৯ বছর।

ইদানীং সরোজকুমারের নতুন গল্প-উপন্যাস বিশেষ চোখে পড়তো না। তবে এককালে তাঁর "কালো ঘোড়া" উপন্যাস পাঠক চিত্তে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে "অনুষ্টুপ ছন্দ" আরও মাতিয়ে দেয়। তিনি ছিলেন শান্ত গভীর রসের লেখক। হৈ চৈ বা উত্তেজনা জাগানো সাহিত্যের ধার ধারেন নি। 'নতুন ফসল' ও 'হংস বলাকা' নামে তাঁর আরও দুটি গ্রন্থের কথা মনে পড়ে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর জন্ম ১৯০৩ সালে মুর্শিদাবাদে। প্রথম যৌবনেই তিনি কিরণশঙ্কর রায় এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতি সংক্রান্ত পত্রিকা সম্পাদনার কাজে ওঁদের সঙ্গে জড়িত থাকেন কিছুদিন। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেশ কিছুদিন যুক্ত ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে।

সম্প্রতি তিনি 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক স্মৃতিকথা লিখছিলেন। শেষ হলো না।

জল্লাদ দৈনিক

গত বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 'স্বাধীন বাংলা বেতার'-এর ভূমিকা কোনোদিন বিস্মৃত হবার নয়। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর সেখানকার সামরিক শক্তি খর্ব করতে পারে নি। বিভিন্ন স্থান থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার শুনিয়েছে প্রতিরোধের অগ্নিবাণী। পঁচিশে মার্চের অব্যবহিত পরেই চট্টগ্রাম থেকে শোনা গেছে মেজর জিয়ার ঘোষণা। তারপর মুজিব নগর থেকে এই বেতার অনুষ্ঠান আরও সুসংহত হয়েছে। আরও অনেকের মতন, আমিও ছিলাম ঐ বেতারের প্রতিটি অনুষ্ঠানের উৎকর্ণ শ্রোতা।

ঐ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কথিকাগুলি হারিয়ে যেতে দিলে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হতো। এগুলি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। সুখের বিষয়, সেইসব কথিকার কিছু কিছু সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন স্বাধীন বাংলা বেতারেরই অন্যতম কর্মী জনাব শহীদুল ইসলাম। গ্রন্থটি উভয় বাংলাতেই কিনতে পাওয়া যায়।

এতে আছে ৩১ মার্চ মেজর জিয়া ইংরেজীতে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার হস্তলিপির প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেছিলেন :

I once again request the United Nations and the Big Powers to intervene and physically come to our aid. Delay will mean massacre of additional millions.

স্বাধীন বাংলা বেতারের অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি অনুষ্ঠান, "চরমপত্র" ও "জল্লাদের দরবার"-এর কিছু অংশও এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে মোহম্মদ শাহ বাঙালী নামে যিনি পুঁথি পাঠ করতেন, তাঁর অনুষ্ঠানের কিছু উদ্ধৃতি দেখতে পেলেও ভালো লাগতো।

"চরমপত্র" থেকে খানিকটা পুনরুদ্ধার করার লোভ সম্বরণ করা যায় না :

ইয়াহিয়া খানের পরানের পরান জানের জান চাচা নিক্সন কড়া কিসিমের তিরস্কার করনের লাইগ্যা সপ্তম নৌবহরেরে সিঙ্গাপুরে আনছে। লগে লগে সোভিয়েট রাশিয়া একটুক হিসাব কইরা কাম করনের লাইগ্যা হোয়াইট হাউসরে অ্যাডভাইসিং করছে। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নী ক্রেমলিন থাইক্যা কইছে পাক ভারত উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলালেই ভালো হয়। ব্যাস, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর সিঙ্গাপুর আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া রইলো। অ্যাঃ অ্যাঃ এই দিককার কারবার হুনছেন নি? হারাধনের একটা ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ, ছেইটা গেলো খাথায় যাইন্দে রইলো না আর কেউ। জেনারেল নিয়াজী সরাসরি কইছে: 'দুরা গোসল কইরা ঢাকার ইন্টার কন্টিনেন্টালের মাইধ্যে হান্দাইয়া এখনও চা, চা করতাছে, আমার ফোর্স জেনারেরা কইছে কি হইবো, আমি ফাইট করছুম, ফাইট করছুম।"...

২৬শে জুলাই কবি সিকান্দার আবু জাফর যে ইশতাহার প্রকাশ করেন সেটিও প্রচারিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে। তাতে তিনি বলেছিলেন, "বাঙলার মাটির পদ্মা-গঙ্গা-যমুনা সঞ্জীবিত প্রাণ একটি বাঙালী বেঁচে থাকতে বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রাম শেষ হবে না।"

১৪ই অগাস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছিলেন, ১৯৪৭-এর পর এমন একটি বছর নেই, যে বছর বাংলাদেশে রক্ত ঝরে নি, মায়ের বুক খালি হয়নি, সন্তানহারা বাপের বুক ফাটা আর্তনাদে বাংলাদেশের আকাশ বিদীর্ণ হয়নি। বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারির তারিখ কি একটি? ১১ই মার্চ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ৭ই জুন, ২০শে জানুয়ারি। সর্বশেষের তারিখ এই ২৫শে মার্চ।...আমরা আবার ঢাকায় ফিরবো। আমাদের নতুন স্বাধীনতা দিবসের উৎসব হবে। প্রিয় পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই উৎসব দিবসটি পালনের জন্য আমি অপেক্ষা করছি। আমি জানি, আমার স্বপ্ন, আমার প্রতীক্ষা সফল হবেই।"

১০ই অক্টোবর তরুণ কবি মহাদেব সাহা বলেছিলেন, "আমরা বেঁচেও মরেছিলাম তাই আমরা যুদ্ধ করছি, আমরা মরেও বেঁচে থাকবো তাই আমরা রক্ত দিচ্ছি, আমরা রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের দুর্জয় স্বপ্নের ফসল। ফ্রন্টে আমাদের মুক্তিসেনারা অবিরাম যুদ্ধ করছে আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে; ঘরে আমাদের জায়া-জননী ভগ্নীরা যুদ্ধ করছে আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে, শরণার্থী শিবিরে আমাদের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষ প্রতিনিয়ত জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে বেঁচে থাকার জন্য।...হানাদার আক্রমণকারীর অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, তার যুদ্ধ সাময়িক, কিন্তু আমরা যারা বাঁচার জন্য যুদ্ধ করছি—এ যুদ্ধের শেষ নেই।"

"জল্লাদ দৈনিক" এই সংকলনটি এইসব মূল্যবান দলিলে ভূষিত।

সনাতন পাঠক

অনুবাদ

রস-সিদ্ধান্ত। ডঃ নগেন্দ্র ঃ অনুবাদক—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী। ভারতী ভবন, পাটনা-১। পঁচিশ টাকা।

সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত রসশাস্ত্র-বিষয়ক এই বিপুলপ্রসর গ্রন্থখানির রচয়িতা প্রখ্যাত অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদ ডঃ নগেন্দ্র। মূল বইটি হিন্দী ভাষায় লেখা। বঙ্গানুবাদ করেছেন ডঃ ইন্দ্রনাথ চৌধুরী। ছ'টি দীর্ঘ বিস্তৃত অধ্যায়ে বিন্যস্ত গ্রন্থখানিতে রস-বিষয়ক যাবতীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। 'রস' শব্দটির আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা, ভরতমুনি থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল ধরে 'রস'এর শাস্ত্রীয় অর্থের বিকাশ, রসের পরিভাষা এবং তার কাব্য-সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত আনন্দময় স্ফূর্তি, রসের নিষ্পত্তি, অবস্থান ইত্যাদি, আটটা স্থায়ী এবং তেত্রিশটি সঞ্চারীভাবের স্বরূপ বিবেচনা, রসভেদ—বিভিন্ন রসের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও রসাভাস-লক্ষণ বিচার, রসের পরিধি—আদর্শবাদ, ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম থেকে ইম্প্রেসনিজম ইত্যাদি কাব্যসাহিত্য-বিষয়ক প্রধান মতবাদগুলির দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করা হয়েছে।

তত্ত্ব ব্যাখ্যার দিক থেকে শুধু প্রাচীন রসশাস্ত্র-বিষয়ে ডঃ নগেন্দ্রর পাণ্ডিত্যই আলোচ্য গ্রন্থে সুপ্রকট হয়নি, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সেকাল-একালের শাস্ত্রবিদদের মতামত প্রসঙ্গক্রমে আলোচনাধারায় সংলগ্ন হওয়ায় গ্রন্থখানির বিষয়-আলোচনা ব্যাপক এবং গভীর হতে পেরেছে। এই সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশীয় আলঙ্কারিকদের সিদ্ধান্ত এবং দেশ-বিদেশের কালজয়ী সাহিত্যিকদের বিখ্যাত রচনাগুলির বিচার-ব্যাখ্যা আলোচনার প্রসঙ্গকে সুস্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করেছেন। সমালোচক ডঃ নগেন্দ্র'র আরো একটি উল্লেখনীয় কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি সাহিত্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় যাবতীয় সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে আধুনিক বিজ্ঞান-দৃষ্টি এবং মনন নিয়ে আলোচনা-সমগ্রকে স্বচ্ছ এবং প্রামাণ্য করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। পরন্তু রসের আলোচনায় যে বিশেষ গুণটি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন—অর্থাৎ রসবোধ এবং সহৃদয়তা—তা গ্রন্থটির অন্তরে পরিলক্ষিত। শুধু রস-ব্যাপারে বিভিন্ন শাস্ত্রবিদদের মতামত গ্রন্থে সংকলিত হয়নি—সেই সঙ্গে ডঃ নগেন্দ্র নিজস্ব সুচিন্তিত ধারণা এবং মতামতগুলি অত্যন্ত সুযোগ্যতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। অনুবাদকর্মেও ডঃ চৌধুরী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সব মিলিয়ে 'রস-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থখানি সাম্প্রতিক-কালে রচিত রসশাস্ত্র-বিষয়ক একখানি

দিকদর্শক পুস্তক হিসাবে সুধীসমাজে পাঠকের কাছে আদরণীয় বলে বিবেচিত হবে। ১৬৭/৭০
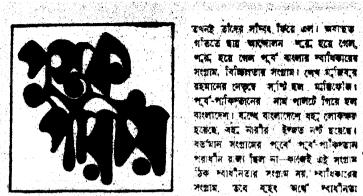
বাংলাদেশের সংগ্রাম

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। গাজীউল হক। পরিবেশক ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য আট টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে একদার পূর্ব-পাকিস্তানের সংগ্রাম। পূর্ব-পাকিস্তান গোটা পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ অঙ্গরাজ্য। বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করার প্রাক্কালে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি জানায়। এই দাবি আদায় করার জন্য মুসলিম সম্প্রদায় ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে পূর্ব বাংলার বহু হিন্দু অধিবাসীর হত্যালীলা সাঙ্গ করে তাদের অভীপ্সিত ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান সরকার লাভ করেছে। লেখকের মতে হিন্দু-মুসলমানের রক্তে পাকিস্তানের ভূমি রঞ্জিত হয়েছিল। গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা নিতান্তই অবান্তর। কেননা ওসব কোন আন্দোলনেই ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন ভূমিকা ছিল না।

পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু অধিবাসীরা ছলে বলে কৌশলে বিতাড়িত হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বহু মুসলমান এসে হিন্দু পরিত্যক্ত স্থানে কায়েম হয়ে বসল। লেখক তাও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নিজ সম্প্রদায়ের লোকের ইচ্ছায় এবং সাহায্যে যে সম্ভব হয়েছিল একপ্রকার ব্যবস্থা লেখক তা বেমালুম চেপে গিয়েছেন। খাল কেটে কুমির আনার কুফল যখন পূর্ব বাংলার এক শ্রেণীর লোক ছাত্রসমাজ, শিক্ষিত শ্রেণী হৃদয়ঙ্গম করল তখনই তাঁদের সম্বিৎ ফিরে এল। অব্যাহত গতিতে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, শুরু হয়ে গেল পূর্ব বাংলায় স্বাধিকারের সংগ্রাম, বিচ্ছিন্নতার সংগ্রাম। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সৃষ্টি হল মুক্তিফৌজ। পূর্ব-পাকিস্তানের নাম পালটে গিয়ে হল বাংলাদেশ। যুদ্ধে বাংলাদেশে বহু লোকক্ষয় হয়েছে, বহু নারীর ইজ্জত নষ্ট হয়েছে। বর্তমান সংগ্রামের পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান পরাধীন রাজ্য ছিল না—কাজেই এই সংগ্রাম ঠিক স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, স্বাধিকারের সংগ্রাম, তবে বৃহৎ অর্থে স্বাধীনতা সংগ্রামই।

প্রবন্ধ

বাংলা সাহিত্যে অতীন্দ্রিয়বাদের ভূমিকা। শ্রীযোগীলাল হালদার। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। বারো টাকা।

মিস্টিক অনুভূতি তথা অতীন্দ্রিয়-চেতনা যে কোন মহৎ শিল্প সৃষ্টিরই অন্বিষ্ট। এদিক থেকে ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের ঐতিহ্য গৌরবজনক। ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে যেমন, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি ভারতীয় চেতনায় অতিমর্ত্য-ভাবনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রাচীনকাল থেকে অবিচ্ছিন্নধারায় বহমান। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় ভাবধারার অঙ্গহিসাবে বাংলা সাহিত্যেও অতীন্দ্রিয় চেতনার উদ্ভাসন জন্মলগ্ন থেকে সূচিত। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীহালদার তাঁর দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের এই দুরূহ এবং রহস্যময় অতীন্দ্রিয়-ভাবনার স্পন্দনগুলিকে অনুধাবন করতে আগ্রহী হয়েছেন।

ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের স্বরূপ, চর্যাপদ-গীতগোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বৈষ্ণব-পদাবলী-শাক্তপদাবলী থেকে আধুনিক-কালের বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—বাংলাসাহিত্যে প্রতিবিম্বিত অতিমর্ত্য চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি এ গ্রন্থের আলোচনা-ধারায় সংযুক্ত হয়েছে। আলোচনার প্রতিটি স্তরে সমালোচক মূল গ্রন্থ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে বক্তব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করে তুলতে তৎপর হয়েছেন। এবং এ ব্যাপারে শ্রীহালদারের পাণ্ডিত্য এবং বিচারশক্তি প্রশংসাযোগ্য। তবে মধ্যযুগের আলোচনা সেই তুলনায় সংক্ষিপ্ত। তাছাড়া, অধ্যাত্ম-চেতনাকে গ্রন্থে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তত্তুলনায় সাহিত্যে প্রকটিত মিস্টিক-অনুভূতির বিচিত্র কাব্যিক অনুরণনগুলির শিল্পসৌন্দর্য আবিষ্কারে লেখক ততটা পরিশ্রমী হয়ে ওঠেন নি। তথাপি, এ জাতীয় প্রয়াস বাংলা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে দুর্লভ বলে গ্রন্থখানি সুধীজনের সোৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ২৯৪/৭১

ধর্ম : ভাগবত প্রসঙ্গ

গীতার বাস্তবসম্মত অর্থ ও ব্যাখ্যা। ডঃ শিবদাস ভট্টাচার্য। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দশ টাকা।

ভারতীয় ভাষাসমূহে 'গীতা'র টীকা-ভাষ্য-ব্যাখ্যাসম্বলিত গ্রন্থের সংখ্যা সুপ্রচুর। ডঃ শিবদাস ভট্টাচার্যের আলোচ্য গ্রন্থখানি এ ব্যাপারে একটি নতুন সংযোজনা মাত্র নয়, অভিনবও বটে। 'গীতা' বহু পুরাতন এবং জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। এতদ্দেশীয় প্রায় সব চিন্তাশীল মনীষী 'গীতা'য় ধৃত শ্লোকাবলীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাববাদী ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। ফলত, 'গীতা'র বাণীসমূহ তাঁদের ধারণায় অবাস্তব, অলৌকিক এবং আদর্শবাদী দর্শনের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শঙ্করাচার্য, আনন্দগিরি, নীলকণ্ঠ প্রমুখ পুরাকালের মনীষীগণ থেকে শুরু করে একালের শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক প্রভৃতি শ্রদ্ধেয়-পুরুষেরা সকলেই 'গীতা'র ভাববাদী আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এই মহা-গ্রন্থকে যে আধুনিক দৃষ্টিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-ব্যাখ্যা করা যায় এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত করা চলে—এটা সম্ভবত ডঃ ভট্টাচার্য সর্ব-প্রথম দেখাবার চেষ্টা করলেন। প্রত্যেক শ্লোকের অর্থগত টীকা, অন্বয়, মর্মার্থ এবং তাৎপর্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লেখক বিচার করেছেন। এবং যে যে অংশে অস্পষ্টতার অবকাশ রয়েছে সেইসব অংশ-গুলির বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বৈদগ্ধ্য এবং বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তবে লেখকের অতিচেতন বস্তুবুদ্ধি কোন কোন ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক হয়ে উঠলেও বিতর্কের অতীত হয়ে উঠতে পারেনি। সব মিলিয়ে ডঃ ভট্টাচার্যের প্রয়াস 'গীতা'র নতুনতর ভাষ্যরচনায় এক অভাবিত দিগন্তের সন্ধান দেবে। গ্রন্থের শুরুতে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের 'পূর্ব-পাঠিকা' অংশটি কৌতূহলী পাঠকের কাছে খুবই মূল্যবান বলে বোধ হবে।

মিনিগল্প

অল্প কথার গল্প। সম্পাদক গিরিধারী কুণ্ডু। পরিবেশক দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটারজি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম চার টাকা।

সাহিত্যের ব্যাপারে 'হুজুগ' শব্দটার বদলে 'ঢেউ' ভালো। সম্প্রতি কিছুকাল আগে যে ক্ষুদে সাহিত্যের ঢেউ দেখা গিয়েছিল, তা এখনও অল্পস্বল্প চালু আছে। যদ্দুর মনে পড়ে, প্রথম এটা চালু হয় ক্ষুদে পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে। ক্ষুদে পত্রিকা যখন, তখন লেখাগুলোও ক্ষুদে হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই ক্ষুদে সাহিত্যের প্রয়োজনে ক্ষুদে পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেনি। ঘটেছিল ক্ষুদে পত্রিকার প্রয়োজনেই ক্ষুদে লেখার। এবং এই ঢেউটা—আমাদের মনে আছে, 'পত্রাণু' প্রথম নিয়ে আসেন। পরে অজস্র এ ধরনের পত্রিকা 'মিনিস্কার্টে'র ধাঁচে মিনি আখ্যায় ভূষিত হয়ে হুড়মুড় করে বেরোতে থাকে ও দারুন জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। প্রবীণতম থেকে তরুণতম লেখক প্রায় সবাই যতটা না নিজের স্বতঃস্ফূর্ত লেখার তাগিদে, ততটা মিনি পত্রিকার উদ্যোক্তাদের (যাঁরা বেশির ভাগই বয়সে তরুণ) চাপে প্রচুর মিনি গদ্যপদ্য লিখতে বাধ্য হন। কিন্তু তাহলেও ওইসব অজস্র ক্ষুদে লেখার মধ্যে অনেকগুলোই যে খাঁটি শিল্পের শিরোপা পেয়েছিল এবং পাবে—তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শ্রীগিরিধারী কুণ্ডু অশেষ প্রযত্ন, নিষ্ঠা, শ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করে ক্ষুদে গল্পগুলোর একটি মালা গেঁথেছেন 'অল্প কথার গল্প'-এ। ছেচল্লিশজন (সম্পাদক সহ) প্রখ্যাত-খ্যাত-অখ্যাত লেখকের ছেচল্লিশটি লেখাই অবশ্য প্রাণের ঢেউয়ে ভেসে আসা মুক্তো নয়—তাহলেও এ সংকলনের দাম আছে। কিছু লেখা আছে—যা গল্প বলা যায় না। কিছু লেখা আয়তন ও থিমের বিস্তারে ঠিক মিনি বলাও যায় না। কিন্তু ঝকঝকে সাদা ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা এবং সুদৃশ্য কভার জ্যাকেটে মোড়া এই সংকলনটি হাতে নিতে যেমন আনন্দ, তেমন ঘরে রাখায় আছে আত্মপ্রসাদ। পরিবেশনায় নতুনত্ব আছে। পেল্লায় লেখা পড়ে যাঁদের ডিসপেপসিয়া আছে, তাঁদের মিনি ক্ষিদের পক্ষে 'অল্প কথার গল্প' উত্তম সুস্বাদু চুমুক।

ভ্রম সংশোধন

আমার 'মহাভারতের কথা'র প্রথম কিস্তির সংকেতের অংশে একটি ভুল প্রবেশ করেছে। যে-নামটি হরিদাস বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য বলে উল্লিখিত আছে, সেটি আসলে হবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য—সংক্ষেপে, সিদ্ধান্তবাগীশ। পাঠকেরা এই ভুলটি সংশোধন করে নিলে বাধিত হবো।

কলিকাতা ৪৭ **বুদ্ধদেব বসু**

ফুটবলে সেদিনের সূর্য

অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি ফুটবল খেলোয়াড় সূর্য চক্রবর্তী গত ২৯ মার্চ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কিছুকাল ধরে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। শেষ সময়ে তাঁকে মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। বয়স হয়েছিল ৭৪।

সূর্য চক্রবর্তী কত বড় খেলোয়াড় ছিলেন? খেলার ধারা অনেক বদলে গেছে। উন্নত মানের দক্ষতা অর্জনের জন্য বহুদিন থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে, টেকনিক-ট্যাকটিকস অর্থাৎ প্রথা-প্রকরণ নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার অন্ত নেই। সুতরাং বর্তমান কালের কৃতী খেলোয়াড়দের ক্রীড়াশৈলীর নিরিখে অতীত দিনের খেলোয়াড়দের ক্রীড়াদক্ষতার সঠিক মূল্যায়ন হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা ফুটবল মাঠের নিত্যযাত্রী, অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র, তাঁদের অনেকেরই অভিমত, কলকাতার মাঠের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাইট ইনসাইড খেলোয়াড় হচ্ছেন সূর্য চক্রবর্তী।

সূর্য চক্রবর্তী তাঁর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে ফুটবল খেলেছেন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে, যে ক্লাবের ইনসাইড হিসাবে পরবর্তী কালে লক্ষ্মীনারায়ণ, আপ্পারাও, আমেদ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবু ফুটবলের বিজ্ঞ সমালোচক এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাদের অভিমত, ওঁদের চেয়েও সূর্য চক্রবর্তী ছিলেন বড় খেলোয়াড়। কে শ্রেষ্ঠ এবং কে শ্রেষ্ঠতম সেই বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, যেকালে কলকাতার ফুটবলে ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়দের পর্যাপ্ত প্রাধান্য এবং ব্রিটিশ পল্টনী ফুটবলের আধিপত্য, সেকালে যে কজন বাঙালী বা ভারতীয় খেলোয়াড় প্রতিভার আলোকে ফুটবল মাঠকে আলোকিত করেছেন, সূর্য চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। সেদিনের সাদা-কালোর সংগ্রামী ফুটবলের শ্রুতি ও স্মৃতি হয়ে আছেন। চিরদিন থাকবেন।

ছোটখাটো মানুষ ছিলেন সূর্য চক্রবর্তী। দৃশ্যত তাঁকে দুর্বল বলেই মনে হত। কিন্তু খেলার মাঠে তাঁর সংগ্রামী শক্তি দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যেতেন। যেমন ছিল তাঁর পায়ের নৈপুণ্য তেমন ছিল শুটিং-ক্ষমতা। আবার তেমনই ছিলেন ক্ষিপ্র। নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় দলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খেলে প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যূহ তছনছ করা ছিল তাঁর প্রধান কাজ। প্রতিপক্ষের দুর্বলতা আবিষ্কারে ছিল প্রবল অনুমানশক্তি। ওই খাটো মানুষটির পায়ে বল পড়লেই বিপক্ষের দশাসই চেহারার বিরাট বিরাট খেলোয়াড়রা খেই হারিয়ে ফেলত, গোলরক্ষকের ত্রাস জাগত। ইউরোপীয় বনাম ভারতীয় দলের খেলা, লোকাল ভার্সেস ভিজিটর্স, লীগ চাম্পিয়ন ভার্সেস রেস্ট প্রভৃতি প্রদর্শনী খেলায় সূর্য চক্রবর্তীর স্থান ছিল বাঁধা। ১৯২১ সালে তখনকার তথাকথিত আন্তর্জাতিক খেলায় ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে সূর্য চক্রবর্তীর গোলেই ভারতীয় দলের প্রথম জয়। পরবর্তী কালের বহু খেলাতেও ওঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং গোল করার কৃতিত্ব। রাইট-ইন-এর খেলোয়াড় হিসাবে শ্রেষ্ঠ কীর্তির স্বাক্ষর রাখলেও সূর্যবাবু সব পজিশনেই খেলতে পারতেন। ১৯২১ এবং ১৯২২ দুই বছর এরিয়ানে খেলবার পর তিনি মোহনবাগানে যোগ দেন। যেহেতু মোহনবাগানে তখন রবি গাঙ্গুলীর মত যশস্বী রাইট-ইন ছিলেন সেহেতু তাঁকে রাইট-আউট খেলানো হয়। আবার এরিয়ানে ফিরে এসে ১৯২৫ সালে যোগ দেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। ইস্টবেঙ্গলেই তিনি পূর্ণ প্রভায় বিকশিত হয়ে ওঠেন।

সূর্য চক্রবর্তী

সূর্য চক্রবর্তীর আদি বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার কাইটল গ্রামে। বাবা ললিতমোহন চক্রবর্তী ছিলেন কুমিল্লার উকিল। কুমিল্লা শহরেই সূর্যবাবুর খেলা শুরু। পরের খেলা শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। স্নেহ পেয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। কবিগুরু তাঁর খেলা দেখে নাকি খুব আনন্দ পেয়েছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "তুই একদিন বড় খেলোয়াড় হবি।" সূর্যবাবু পরে বলেছিলেন, ওই বিরাট প্রতিভা আর মনস্বী মানুষের মধ্যেও যে খেলাধুলার কিছুটা অনুরাগ ছিল সেটাই তাঁকে পরোক্ষ প্রেরণা দিয়েছে। শুধু শান্তিনিকেতনে পড়াশোনাই নয়, সূর্যবাবু কিছু দিন ঠাকুরবাড়িতেও কাটিয়েছেন। কোন সূত্রে অবশ্য জানা নেই। হয়তো তাঁর ক্রীড়াগুণ এবং চারিত্রিক গুণাবলীতেই গুরুদেবের কাছে কাছে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন।

অতীত দিনের কীর্তিমান অনেক খেলোয়াড়ের মত সূর্য চক্রবর্তী ছিলেন সুন্দর ও নির্মল স্বভাবের মানুষ। সৌজন্য, শালীনতা এবং আচারব্যবহারে আদর্শ পুরুষ। প্রকৃত অর্থেই একজন স্পোর্টসম্যান। সেদিন তাঁর স্মরণসভায় ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন গ্রাউন্ড সেক্রেটারি পক্ককেশ শ্যামদা বলেছিলেন, "দীর্ঘ ৩০ বছর তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি, একদিনের জন্য তাঁর কোন উষ্মা দেখিনি—কোন কিছুতেই ক্ষোভ বা রাগ প্রকাশ করেননি।" অতীত দিনের নাম-করা খেলোয়াড় প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, সূর্যদার চারিত্রিক মাধুর্য ছিল অতুলনীয়।

ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের প্রথম প্রতিষ্ঠার মূলে সূর্য চক্রবর্তীর অবদান অনেকখানি। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ইস্ট বেঙ্গলই লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারত। একবার নয়, তিন তিনবার মাত্র এক পয়েন্টের জন্য তাদের চ্যাম্পিয়নের সম্মান হাতছাড়া হয়ে যায়। এবং দৃশ্যত দুর্বল

দলের কাছেই শেষ মুখে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের ফলে। একবার হারের পর ইস্ট বেঙ্গল খেলোয়াড়রা মাঠ থেকে ফিরে আসছে। আশাভঙ্গজনিত বেদনায় সমর্থকরা টিটকিরি দিচ্ছে। একটি অত্যুৎসাহী সমর্থক রাস্তার পাশে বসা এক ক্ষৌরকারের ছোট বাটিটি তুলে এনে সূর্য চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও লীগ জয়ের কাপ।' সূর্যবাবু ক্ষৌরকারের সেই বাটিটি মাথায় ঠেকিয়ে হেসে বললেন, 'এই আমাদের পুরস্কার।' একটুও রাগ করলেন না।

প্রকৃত অর্থেই খাঁটি অ্যামেচার খেলোয়াড় ছিলেন সূর্য চক্রবর্তী। শ্যামবাবু বললেন, তাঁর সঙ্গে মীর্জাপুর স্ট্রীটের মেসে থাকতেন। ওখান থেকেই তাঁরা মাঠে হেঁটে আসতেন, খেলার পর আবার হেঁটে মেসে যেতেন। ক্লাব থেকে একটি পয়সাও নিতেন না। শুধু তাই নয়, ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের শিলুয়া লোকো বিভাগে চাকরি পাওয়ায় সূর্য চক্রবর্তী ১৯২৮ সালে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। ইস্ট বেঙ্গল ওই বছর দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যায়। পরে খেলার অনুমতি পেয়ে আবার ১৯৩০এ যখন ইস্ট বেঙ্গলে ফিরে আসেন তখন ইস্ট বেঙ্গল দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলছে। অত বড় খেলোয়াড় কিন্তু দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলতে তাঁর এতটুকু আত্ম-মর্যাদায় বাধেনি। প্রধানত তাঁর পুনরাগমনে ১৯৩০ সালেই ইস্ট বেঙ্গল আবার প্রথম ডিভিসনে উঠতে পারত যদি অসহযোগ আন্দোলনের ফলে শেষ মুখে লীগ খেলা বন্ধ না হয়ে যেত। পরের বছর অবশ্য ইস্ট বেঙ্গল প্রথম ডিভিসনে উঠেছিল এবং উঠেছিল প্রধানত তাঁর এবং সমসাময়িক খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যে।

১৯২৫ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত কলকাতা ময়দানে সূর্য সমানভাবে দীপ্তি বিকিরণ করেছেন। প্রতিযোগিতামূলক খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৩৭ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ লীগ খেলায় এক রকম জোর করে তাঁকে মাঠে নামানো হয়েছিল। ওই খেলায় উপর্যুপরি তিনবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন দুর্ধর্ষ মহমেডান স্পোর্টিংকে ইস্টবেঙ্গল ৪—২ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল। কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা দেখেছিল 'সূর্যে'র শেষ রশ্মি।

খেলোয়াড়-জীবনে যেমন সহ-খেলোয়াড়দের উপদেশ-নির্দেশ দিয়েছেন কিভাবে খেলতে হবে, মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরে কেমন ব্যবহার করতে হবে, তেমন অবসর-জীবনেও সূর্য চক্রবর্তী ফুটবলের প্রশিক্ষণের মধ্যে সময় কাটিয়েছেন। কিছু কিছু খেলোয়াড়ের প্রতিষ্ঠার পথও তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু কোন অবস্থায় কারো উপর নিজের মত চাপিয়ে দেননি। উদার মত এবং মিষ্ট ব্যবহারে সকলকে কাছে টেনেছেন। অতীত দিনের দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় ছিলেন। অথচ মহৈশ্বর্যে নম্র, অহমিকাশূন্য ময়দানের শান্ত মহিমা ছিলেন সেদিনের ফুটবল-সূর্য।

মুকুল

ভারতকে এবারও অলিম্পিক ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার আশা ত্যাগ করতে হল। ১৯৪৮-এর লণ্ডন অলিম্পিক থেকে শুরু করে ১৯৬০ এর রোম অলিম্পিক পর্যন্ত পর পর চারবার অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার পর টোকিও অলিম্পিকেও ভারত খেলতে পারেনি, মেক্সিকো অলিম্পিকেও পারেনি। এবারও যে পারবে এমন আশা ছিল না। তবু 'হোপিং এগেনস্ট হোপ' বলে একটি কথা আছে। কিন্তু বরমায় এশিয়া অঞ্চলের প্রাক-অলিম্পিক খেলার পর সে আশাও শেষ হয়ে গেল।

বরমার প্রাক-অলিম্পিকে ভারতকে তিনটি ম্যাচ খেলতে হয়েছে। তিনটিতেই ভারত হেরে গেছে। বরমার সঙ্গে প্রথম খেলাটি অবশ্য ছিল গ্রুপ ভাগের খেলা। অর্থাৎ ৬টি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করতে হলে কোন্ গ্রুপে কাকে রাখা হবে তার জন্যই ওই খেলা। ওই খেলায় ৩—৪ গোলে হেরে গিয়ে ভারত বি গ্রুপে স্থান পায়। বি গ্রুপে ভারতকে খেলতে হয় ইন্দোনেশিয়া ও ইজরাইলের সঙ্গে। ইন্দোনেশিয়ার কাছে ভারত ২—৪ গোলে এবং ইজরাইলের কাছে ০—১ গোলে হেরে যায়। গ্রুপ ভাগের খেলায় বরমার বিরুদ্ধে ভারতের তিনটি গোলের একটি করে মগন সিং, দুটি করে সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার। ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে একটি এস চৌধুরী এবং একটি নটরাজন।

যদিও ভারতের বিরুদ্ধে পর পর তিনটি গোল করে বরমা ৩—০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল তবু তাদের সঙ্গে শেষ মুখে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩—৪ গোলে পরাজয় স্বীকার অবশ্যই সংগ্রামী ফুটবলের পরিচয়। বিশেষ করে যে বরমা মারডেকা ফুটবলে ভারতকে ৯—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল সেই বরমার সঙ্গে ভারত ভালই খেলেছে বলতে হবে। ইন্দোনেশিয়াও ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি গোল করে এগিয়েছিল। ভারত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শেষ পর্যন্ত ২—৪ গোলে হার স্বীকার করেছে। শক্তিশালী ইজরাইলের কাছে ১—০ গোলে হারও অগৌরবের নয়। মোটের উপর ভারত প্রি-অলিম্পিকে মোটামুটি মন্দ খেলেনি।

কিন্তু প্রশ্ন, প্রাক-অলিম্পিক ফুটবলে এই মোটামুটি মন্দ না খেলাতেই কি আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে? আমরা কি মূল অলিম্পিকে বা আন্তর্জাতিক ফুটবলে যেতে পারব না? ১৯৬০ পর্যন্ত যে ভারত মূল অলিম্পিকে খেলেছে এবং ভালই খেলেছে তাদের আজ এই হাল কেন? এশিয়ার ছোট ছোট দেশ ফুটবলে ভারতের উপর টেক্কা দিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই তাদের ফুটবলের কোন গুপ্ত মন্ত্র জানা নেই। যে মন্ত্র জানা আছে সেটা সবারই মন্ত্র। অর্থাৎ অধ্যবসায়, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, জাতীয় চেতনা এবং পরিকল্পনা। মনে হয় এই মন্ত্রেই আমরা মার খাচ্ছি। না হলে অন্তত এশিয়ার ফুটবল মানচিত্রে বিরাট দেশ ভারতের ছবি অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠত।

জাতীয় হকিতে অনন্য নজির

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা জয় করে পাঞ্জাব এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। অবশ্য জাতীয় হকির ৩৬ বছরের ইতিহাসে পাঞ্জাবই সবচেয়ে বেশিবার বিজয়ী হয়েছিল। মোট ১২ বার। এবার ৩৭তম প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতীয় রেল দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে ১৩ বার রঙ্গস্বামী কাপ জয় করেছে। উপর্যুপরি রঙ্গস্বামী কাপ জয় করেছে চারবার। যদিও এই শেষ চারবার জয়ের মধ্যে একবার রেলের সঙ্গে যুগ্ম জয়ের হিসাব আছে তবু কোনদল একটানা চারবার জাতীয় হকি জয় করতে পারেনি। পাঞ্জাবের এ বছরের আরও কৃতিত্ব গ্রুপ লীগের পাঁচটি এবং নক আউট পর্যায়ের তিনটি—মোট আটটি খেলার মধ্যে পাঞ্জাব একটিও গোল খায়নি; আটটি খেলায় ৩৬টি গোল করেছে।

তবে খেলার ফলাফলের রেকর্ড কলঙ্কশূন্য হলেও পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার সেমি-

সেজম্যান টেনিস পরিবার। ১৯৫২ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার ফ্রাঙ্ক সেজম্যান নিজেই তার চার মেয়ের টেনিস কোচ। সেজম্যানের সামনে বাঁদিক থেকে বসে আছে চার মেয়ে লিন্ড (৯), কেটি (১২), সোল (১৪) ও মার্শা (১৭)

ফাইনাল খেলা এবং রেল দলের ফাইনাল খেলার পরিচালনা কিন্তু কলঙ্কশূন্য নয়। সবাই জানেন এবার জাতীয় হকির আসর বসেছিল পাঞ্জাবেরই শহর জলন্ধরে। সেখানে বাবুরাম গুপ্ত নামীয় হকি বোর্ডের সভাপতির একজন স্নেহধন্য আম্পায়ার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলায় যেভাবে পাঞ্জাবের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাতে আম্পায়ারের নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয়নি বলেই খবর এসেছে। এমনকি ফাইনালে রেল দলের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের জয়সূচক গোলটিকে কেন্দ্র করেও যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। রেলের খেলোয়াড়রা তো প্রতিবাদ জানিয়েছিলই, অনেকেও বলেছেন খেলা শেষ হবার ৬ মিনিট আগে পাঞ্জাবের রাইট হাফ ব্যাক সুরিন্দর সিং যে বলটি ধরে গোল করেন সে বলটি ধরার সময় তার স্টিকস হয়েছিল। সম্ভবত কোন গুপ্ত কারণেই বাবুরাম গুপ্ত রেল দলের প্রতিবাদে কান দেন নি। এই কারণে রেল দল আর না খেলার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা খেলা শেষ করে।

বাবুরাম গুপ্তর পরিচালনায় বাংলাও শাস্তি হতে পারেনি। সেমিফাইনালে পরাজিত দুটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় বাংলা সম্ভবত ওই কারণেই সার্ভিসেস দলের সঙ্গে খেলেনি। ফলে ওয়াক ওভার পেয়ে সার্ভিসেস দল তৃতীয় স্থান দখল করেছে।

যাই হক, আম্পায়ারের বিরুদ্ধে পরাজিত পক্ষের কিছু অভিযোগ থাকা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। আম্পায়ার যদি নিরপেক্ষতার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েও থাকেন সেজন্য পাঞ্জাবের খেলোয়াড়দের দোষ দেওয়া চলে না। ক্রীড়াধারা অনুযায়ী তাদের জয় এবং অনন্য রেকর্ড সংযোগের যোগ্য পুরস্কার।

জলন্ধরের জাতীয় হকি আসরের এবার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ম্যানিখ অলিম্পিকের আর বেশী দেরি নেই। বিভিন্ন রাজ্য দল এবং রেলওয়েজ ও সার্ভিসেস সমেত মোট ২৫টি দলের প্রায় সাড়ে তিনশো খেলোয়াড় এতে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম সারির খেলোয়াড়দের গুণাগুণ পরখ করবার নির্বাচক সমিতি ম্যানিখের দল গড়ার জন্য ৩৬ জন খেলোয়াড়কে লখনোয়ের ট্রেনিং ক্যাম্পে ডেকেছেন। সেখানে তাঁরা অতীত দিনের কীর্তিমান খেলোয়াড় বাবুর কাছে ট্রেনিং নেবেন পরে ওদের মধ্য থেকে ১৮ জনকে ম্যানিখ অলিম্পিকের জন্য মনোনীত করা হবে।

বাংলার ভূমিকা

যদিও গ্রুপ লীগের প্রথম খেলায় রাজস্থানের বিরুদ্ধে ১১টি শর্ট কর্নার পেয়েও বাংলা কোন গোল করতে পারেনি, তবু জাতীয় হকিতে বাংলার খেলা প্রশংসার দাবি রাখে। ক্রমেই বাংলার খেলায় উন্নতির লক্ষণ দেখা গেছে এবং আক্রমণ ও রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রেখে বেশ ভাল খেলেছেন।

বাংলার দুজন খেলোয়াড়ের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একজন সাহিদ নূর, অপরজন নবাগত অজিত সিং। সাহিদ নূর অনুশীলন কেন্দ্রে উপস্থিত না থাকার জন্য শেষ মুহূর্তে তার নাম দল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু নূর ভূপাল থেকে সরাসরি জলন্ধর গিয়ে বাংলার খেলায় যথারীতি অংশ নেন। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের উদীয়মান খেলোয়াড় অজিত সিং পাঞ্জাব অধিনায়ক হরমিক সিং-এর ছোট ভাই। এ বছর বাংলার মোহনবাগানে খেলতে এসেছেন। এখনো খেলেননি। তার ছাড়পত্র সম্পর্কেও নাকি গোলমাল আছে। নূর এবং অজিত কিন্তু জলন্ধরে ভাল খেলেছেন। বিশেষ করে অজিত সিং যে ভারতীয় হকির আগামী দিনের আশা, জলন্ধরে তার প্রমাণ রেখেছেন। তাকে লখনো ক্যাম্পেও ডাকা হয়েছে। বাংলার আর যে চারজনকে লখনো ক্যাম্পে যোগ দিতে বলা হয়েছে তারা হচ্ছেন গোলকিপার সমর মুখার্জী, হাফব্যাক রাজকুমার, সেন্টার হাফ ভি পেজ এবং ইন অশোককুমার। প্রত্যেকেই ওখানে ভাল খেলেছেন।

জাতীয় হকিতে বাংলা ছিল বি গ্রুপে। বি গ্রুপের শুধু চ্যাম্পিয়নই হয়নি কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তর প্রদেশকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে পরম শক্তিশালী পাঞ্জাবের সঙ্গে প্রশংসনীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং সংগ্রামী শক্তির পরিচয় রেখে হেরে গেছে। নীচে বাংলার খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হচ্ছে।

গ্রুপ লীগ

বাংলা—০ রাজস্থান—০

বাংলা—৪ মহারাষ্ট্র—০

বাংলা—০ রাজস্থান—৫

বাংলা—৪ মহারাষ্ট্র—০

(অমিত দাশগুপ্ত—২, অজিত সিং—২)

বাংলা—১ ভূপাল—১

(অজিত সিং)

বাংলা—১ মহীশূর—০

(অজিত সিং)

বাংলা—৪ বিহার—০

(অশোককুমার)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

বাংলা—৩ উত্তর প্রদেশ—১

(অজিত সিং—২ ও সাহিদ নূর)

সেমি ফাইন্যাল

পাঞ্জাব—১ বাংলা—০

একলব্য

"অগ্নীশ্বর" (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে কৃষ্ণা বসু

বাংলাদেশে ছবি রফতানি

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির ফলে দুই দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র বিনিময়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব এম আর সিদ্দিকি এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ সরকার হিন্দীর তুলনায় বেশি সংখ্যক বাংলা ছবিই আমদানি করবেন। বলা বাহুল্য, পশ্চিম বাংলার প্রযোজকদের কাছে এটা খুবই আশার কথা। এই ব্যাপারে ইনডিয়ান মোশান পিকচারস একসপোর্ট কর্পোরেশনও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারেন। বাংলাদেশে ছবি রফতানির তালিকায় যে বাংলা ছবিরই প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য থাকা উচিত সে বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। হিন্দী ছবির প্রতি অহেতুক বিরূপতার কথা এটা নয়। এ বিষয়ে বাস্তববোধই বড় কথা।

বাংলাদেশের জনসাধারণ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করে সবে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। এই একই প্রেরণার বশে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ছবিও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই বাস্তব সত্যটি একসপোর্ট করপোরেশনের স্মরণ রাখা দরকার। অজকাল বলিষ্ঠ ও জীবনানুগ বিষয়বস্তু সংবলিত ভিন্নধর্মী হিন্দী ছবি অবশ্যই তৈরি হচ্ছে। গল্প ও শিল্পের গুণে ওই সব ছবি যথেষ্ট কৌলিন্যও অর্জন করেছে। এই ধরনের কয়েকটি হিন্দী চিত্র অবশ্যই বাংলাদেশে পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণ যে সর্বাগ্রে, সানুরাগে বাংলা ছবিকেই স্বাগত জানাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং রফতানির চিত্র নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যদি বাংলা ছবিকে অগ্রাধিকার দেন তবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভাবধারা এবং সেখানকার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই সম্মান করা হবে। তার বদলে সস্তা প্রমোদ-উপকরণ সংবলিত হিন্দী ছবি যদি অধিক পরিমাণে বাংলাদেশে পাঠানো হতে থাকে তবে কেন্দ্রীয় চিত্র রফতানি সংস্থা বাংলাদেশে হিন্দী চিত্রের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথটিই প্রশস্ত করে দেবেন। সেটা হবে আরো মর্মান্তিক।

তা ছাড়া পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের স্বার্থের প্রশ্নও এখানে জড়িত। বাংলাদেশের সিনেমা শিল্পের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে এই বাংলার ছবি সেখানে কীভাবে দেখানো যেতে পারে এবং উভয় বাংলার চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক স্বার্থও কী উপায়ে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে একটি গ্রহণযোগ্য ফরমূলা উদ্ভাবনের কাজও এখানে চলছিল। আশা করি এই ব্যাপারে এখন একটা সুরাহা হবে। বাংলাদেশের ছবিও যাতে এখানে নিয়মিত দেখানো হয় অর্থাৎ চিত্রপ্রদর্শনীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা যাতে হয় সে-বিষয়ে এখানকার সংশ্লিষ্ট মহলের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। চলচ্চিত্র বিনিময়ের ভিতর দিয়ে উভয় দেশের চিত্রশিল্পই যাতে লাভবান হয় সেদিকেই সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

লাল পাথর

ইগল ফিলমস

বাংলা ছবির হিন্দী রি-মেক "লাল পাথর"। নাম এক থাকলেও হিন্দী রূপান্তরে কিছু অতিরিক্ত উপকরণ আছে। পরিচালক সুশীল মজুমদার হিন্দী ছবিটিতে টেকনিকাল জৌলুষ দেখাবারও সুযোগ পেয়েছেন যথেষ্ট। তবে হিন্দী "লাল পাথর" গল্পাংশে (মূল রচনা : প্রশান্ত চৌধুরী) যে বেশি আকর্ষণ বিস্তার করেছে তা নয়। বরঞ্চ সন্দেহকাতর প্রেমিকের নির্বুদ্ধিতার ট্রাজেডি রাজকুমারের এত ভাল অভিনয় সত্ত্বেও মনে তেমন দাগ কাটে না। পরিচালক দ্বিতীয় বার "লাল পাথর" কাহিনীর রূপ দিতে গিয়ে ইসটম্যান কলারে ফতেপুর সিক্রি ও অন্যান্য বহির্দৃশ্যস্থল এবং জমকালো সেট সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন যতটা গল্পের নাটকীয় বিন্যাস কিন্তু ততটা চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারেননি। ছবিটি জায়গায় জায়গায় বেশ ক্লান্তিকর। তবু হিন্দীচিত্রের নিয়মিত দর্শকরা এই ছবিতে নতুন ধরনের নায়ক-নায়িকা দেখতে পাবেন। হেমা মালিনীর অভিনয়ও চমৎকার। নিঃসঙ্গ ও কিছুটা উদভ্রান্ত নায়ক হেমা মালিনীর মধ্যে তার বাঞ্ছিত জীবন-সঙ্গিনীকে পায়নি। তাই নায়ক জ্ঞানশঙ্কর বেশি বয়সে বিয়ে করেছে সুমিতাকে (রাখী)। সুমিতার প্রেমেও সে আস্থা রাখতে পারল না। সুমিতার মৃত্যুতেই ছবির পরিসমাপ্তি। সুমিতাকে নায়ক হত্যা করিয়েছে শেখরকে (বিনোদ মেহরা) দিয়ে। জ্ঞানশঙ্করের সন্দেহ, শেখর ও সুমিতা পরস্পরকে ভালবাসে। সুমিতার চরিত্রে রাখীর অভিনয় মার্জিত। তার বাবার ভূমিকায় সুশীল মজুমদার অভিনয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেছেন। তবু হিন্দীচিত্রে নতুন মুখ হিসাবে তাঁকে ভালই লাগে। ছবিটির প্রধান আকর্ষণ গান। শঙ্কর জয়কিষণ গানগুলির খুবই সুন্দর সুর দিয়েছেন।

ছবির খবর

রক্তাক্ত বাংলা — বাংলা দেশের ছবি

অভিনেতা বিশ্বজিৎ বাংলাদেশের একটি ছবিতে কাজ করছেন। ছবির নাম : "রক্তাক্ত বাংলা"। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের

...প্রদর্শন করবেন না।

...অনেক কোণায় পড়বে ...কদিন বাদে গুজবটাই ...সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। গত সালে ...যখন একটা পাকা খবর জানা গিয়েছিল যে, পঞ্চুবাবু নটীয় যাচ্ছেন জ্যোৎস্না-গুরুদাসকে নিয়ে, ঠিক তখন চিৎপুরী গুজব রটেছিল : না, পঞ্চুবাবু নাট্যভারতী ছেড়ে মাধবীতে আসছেন। শেষ পর্যন্ত পাকা খবর মিথ্যে হয়েছিল, সত্য বলে মেনে নিতে হল গুজবকেই। এখন প্রশ্ন, পঞ্চুবাবু সত্যি নাট্যভারতীতে যেতে পারেন কিনা বা যাচ্ছেন কিনা। গুজবের পক্ষের যুক্তি এই যে, জ্যোৎস্না দত্ত আর গুরুদাস ধাড়া যদি সত্যি নট্ট কোম্পানি থেকে নাট্যভারতীতে জয়েন করেন তবে পঞ্চুবাবুর ওই দলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে বোধ হয় আর প্রশ্ন ওঠে না। আর এক পক্ষ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য

বাংলাদেশের ছবি "রক্তাক্ত বাংলা"-র অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ। ২৮ মার্চ ছবির মহরতের পর বিশ্বজিৎ বঙ্গভবনে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছবিতে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের নেতা মন্টুভাইও রয়েছেন।

কথা বলছেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, এমনও তো হতে পারে পঞ্চুবাবু নিজেই একটা দল গড়নের কথা ভাবতে পারেন। মাধবী থেকে ভাণ্ডারী এবং তারপরে যে নতুন দলটির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তবে কি সেই দলের আসল কর্ণধার পঞ্চু সেন?

একান্ত যদি নতুন একটা দল খুলেই বসেন পঞ্চু সেন মশাই, অবাক হবার কী আছে? আমি আগের সূত্র ধরেই বলছি 'তাঁদের ব্যবস্থা তাঁরাই করছেন।' খুব ভাল করে সন্ধান নিলে দেখা যাবে টপ স্টারদের প্রায় প্রত্যেকে কোনো-না-কোনোভাবে বিশেষ এক একটি যাত্রাদলের সঙ্গে অজান্তেই জড়িয়ে পড়েছেন। এই জড়ানো নানাভাবেই হতে পারে। যেমন ধরা যাক আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক। হয় একটা বিরাট অঙ্ক বাকি পড়ে গেছে, নয়তো ধার দেওয়া অর্থের বেশির ভাগ অনাদায়। ধুরন্ধর পরিচালকরা বলেন, এ-বন্ধনেই নাকি বেশির ভাগ প্রধান-শিল্পীরা বাঁধা পড়ছেন। বাদবাকি যাঁরা আছেন, তাঁদের কজন দল ছাড়তে পারবেন না নেহাৎই মানবিক কারণে। তবু এরই মধ্যে কথা রটেছে ভারতী অপেরার সঙ্গে নাকি বিজন মুখার্জির কথা

"শপথ নিলাম" (পরিচালনা : শচীন অধিকারী) ছবিতে সামিত ভঞ্জ এবং অন্যান্য শিল্পী

পাকাপাকি। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই, লোকনাট্য থেকে বিজনবাবু চলে আসছেন। লোকনাট্যে তবে যাচ্ছেন কে? প্রবীণ এক পরিচালক বলেছেন, লোকনাট্য এবার তরুণ শিল্পীদের টেনে এনেছে তাঁর শিবিরের আশ্রয়। নট্ট থেকে এসেছে তরুণকুমার, নিউ প্রভাস থেকে অনাদি চক্রবর্তী। তা ছাড়া যে-সব গুজবেরা এমন কথা রটাচ্ছে যে, শেখর গাঙ্গুলী যদিও মাখনলাল নট্টর সঙ্গে বার কয়েক যোগাযোগ করেছেন, আসলে গেল সালের মতন সত্যিই তিনি নট্টতে নাকি যাচ্ছেন না। তবে কোথায়? সত্যাম্বরেই থাকছেন? নাকি লোকনাট্যে? খবর পাওয়া গেছে নীলমণি দে মশাইয়ের সংগে নাকি বার কয়েক কথা হয়েছে শেখরবাবুর। কিন্তু প্রশ্ন: ওখানে বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন পাকাই যদি হয়ে থাকে তবে নমিতা চক্রবর্তী কী করে ঠাঁই পাচ্ছেন ওখানে?

—সূত্রধার

"নয়া মিছিল" (পরিচালনা : পীযূষ গাঙ্গুলী) ছবিতে শাওলী মিত্র ও অনুপকুমার

গান্ধর্বী আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন ও আলোচনা সভা

গান্ধর্বীর ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি অবনমহলে অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন। শহরে এই ধরনের একটানা রবীন্দ্র গানের সম্মেলন কদাচিৎ ঘটনা—সেদিক থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগীদের কাছে গান্ধর্বী ধন্যবাদের যোগ্য।

প্রথম দিনে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটল বেদগান দিয়ে। তারপর সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণের পর শুরু হল মূল অনুষ্ঠান। আলোচ্য অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল হিন্দুস্থানীভাঙা গান, পাশ্চাত্যভাঙা গান, প্রাদেশিক ভাঙা গান এবং ভানুসিংহের গান। শিল্পীদের মধ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ বিশ্বাস, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবিনয় রায় গাইলেন তিনটি করে এবং গীতা ঘটক দুটি। এঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথের হিন্দুস্থানীভাঙা গান থেকে নির্বাচিত গানগুলি পরিবেশন করলেন। পাশ্চাত্যভাঙা গানের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হল সন্তোষ ঠাকুরের পরিচালনায় গান্ধর্বী শিল্পীগোষ্ঠীর কণ্ঠে। প্রাদেশিক ভাঙা গানের একক অনুষ্ঠান করলেন মায়া সেন এবং সমবেত অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন গীতবিতান প্রাক্তনী। নীলিমা সেন গাইলেন 'ভানুসিংহের গান'। এই পর্যায়ে সমবেত সঙ্গীত গাইলেন সুরঙ্গমার শিল্পীবৃন্দ। প্রথম অধিবেশনের শিল্পীদের মধ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশিত 'দুয়ারে নন্দন বনে' 'আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে' 'মন্দিরে মম কে' এবং গীতা ঘটকের 'চির সখা হে ছেড়ো না', অরবিন্দ বিশ্বাসের 'এ পরবাসে রবে কে' বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অধিবেশনে লোকসঙ্গীত পর্যায় থেকে গান করলেন মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্রলেখা চৌধুরী। এই দুজন শিল্পীর গানই ভালো লাগবার মত। ঋতু সঙ্গীতের আসরে সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছে সংঘমিত্রা গুপ্তের দুটি গান। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে মায়া সেন, সুশীল চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ও শ্রোতাদের মনযোগ কেড়ে নিয়েছেন। গান্ধর্বী ও বৈতানিক গোষ্ঠীর শিল্পীরা যথাক্রমে দুটি ঋতু সংগীত ও পাঁচটি স্বদেশী সংগীত পরিবেশন করেছেন। স্বদেশী সঙ্গীতে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটিমাত্র গান 'তোমারই তরে মা সঁপিনু এ দেহ' আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছে। এইদিন সন্ধ্যায় ছিল তৃতীয় অধিবেশন। অধিবেশনের সূচীতে ছিল কাব্যধর্মী সংগীত, নাটক, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গান। অনেকগুলি ভালো গানের জন্য এই আসরটি সুচিহ্নিত। শিল্পীদের মধ্যে অরবিন্দ বিশ্বাসের তিনটি গান ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি গান মনে রাখবার মত। এই পর্যায়ের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে কল্যাণী ঘোষ, সুবিনয় রায়, নীলিমা সেন, গীতা সেন ও গীতা ঘটকের অনুষ্ঠান অনেকেরই ভালো লেগেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলি গেয়েছেন গীতবিতান গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় চতুর্থ অধিবেশনটি ছিল আলোচনা সভা। আলোচ্য বিষয় ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশুদ্ধ গায়কী, যথাযথ শিক্ষা, চর্চা, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। প্রায় আড়াই ঘণ্টার এই আলোচনা সভায় সুখের বিষয় উদ্যোক্তাদের শ্রোতার অভাব হয়নি এবং শ্রোতাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ উৎসাহই দেখা গিয়েছে। আলোচনা সভার উদ্বোধন ঘটল সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের ভাষণ দিয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল—রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর মূল্যবান, তবে সুরই একমাত্র কথা নয়, একটি মাত্র কথা। অন্তত তাঁর গানের ক্ষেত্রে অবয়ব যতখানি, প্রাণও ততখানি। 'সুরাসুরের দ্বন্দ্বে আমি নেই, আমি অমৃতের সন্ধানী।' অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীসুবিনয় রায়, শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনীহারবিন্দু সেন। শ্রোতাদের পক্ষ থেকেও পাঁচজন এই আলোচনায় অংশ নেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

বৈশাখে কলকাতায় ভারত বাংলাদেশ সংস্কৃতি ও মৈত্রী মেলা

রবীন্দ্র সদনের সামনের মাঠ ঘিরে ১ বৈশাখ থেকে ৬ বৈশাখ পর্যন্ত এক সাংস্কৃতির মেলা বসছে। এ রকম মেলার সূচনা বেশ কয়েক বছর পূর্বে শান্তিনিকেতনে একবার হয়েছিল। তবে তার নাম 'সাহিত্যমেলা'। দুই বাংলা থেকে বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক তাতে যোগ দিয়েছিলেন সেদিন। আজকের ব্যবস্থা অনেক ব্যাপক, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ থেকে, অনুমান করা হচ্ছে, প্রায় শতাধিক কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী শিল্পীর দল এই মেলায় যোগ দিতে পারবেন। কবিতা গান ছবি নাটক আলোচনা—সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক। সর্বোপরি, মেলামেশা—ভাব ভালোবাসার আদান-প্রদানের জন্যেই মেলা।

গত শুক্রবার বাংলাদেশ মিশন অফিসে এক সান্ধ্য সাংবাদিক সম্মেলনে এই মৈত্রী মেলার কথা জানান শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সভাপতি অন্নদাশঙ্কর বলেন : অনেক দিন পর আমরা সাহিত্যিকেরা বলতে গেলে মেলার খোলা মাঠে বসে খোলা মন নিয়ে দুটো কথা পরস্পর বলতে বুঝতে পারবো। এর চেয়ে বড়ো কথা আর কিছুই হয় না, হয় না এর চেয়ে মূল্যবান কিছু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসতীকান্ত গুহ মেলা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানান। মেলার উদ্যোক্তা বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের সভাপতি শ্রীবাণীকান্ত গুহ সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মেলায় ছ দিনের জন্যে এককালীন সভ্য চাঁদা ধার্য হয়েছে পাঁচ টাকা। দৈনিক মাথাপিছু পঞ্চাশ পয়সা। প্রাপ্তিস্থান : মিনার বিজলী বসুশ্রী সিনেমা হল, মনীষা গ্রন্থালয় (৪।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট) এবং বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পরিষদের অফিস (১৫২, হরিশ মুখার্জি রোড)।

রবিরশ্মির 'বিশ্বজন মোহিছে'

রবীন্দ্র সংগীতের বিপুল ঐশ্বর্যের আভাস রবিরশ্মির "বিশ্বজন মোহিছে" প্রযোজনায়। রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টির চারটি অধ্যায়কে নিয়ে "বিশ্বজন মোহিছে"র পরিকল্পনা। রবিরশ্মি আগেও এই অনুষ্ঠান পরিবেষণ করেছেন। পরিবেষণে এবার কিছুটা পারিপাট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল।

"নমো নমো নমো" আবৃত্তি পাঠের সঙ্গে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর একের পর এক গান। অধিকাংশ গানই সমবেত কণ্ঠে গীত। তার মধ্যে "বসন্তে কি শুধু ফোটা ফুলের মেলা", "তোমার খোলা হাওয়ায়", "বাজে বাজে রম্যবীণা" উল্লেখযোগ্য। ওই দিন প্রধান শিল্পী ছিলেন সাগর সেন। তাঁর কণ্ঠে "ওহে জীবন-বল্লভ", "আরও কত দূরে", "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ" এবং আরও কয়েকটি গান শুনতে ভাল লেগেছে।

ব্যালে, অপেরা এবং লোকনৃত্যের অংশটুকু খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

বিনোদন সংখ্যায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ছবি

"দেশ" বিনোদন সংখ্যায় (১৩৭৮) "রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-শিশির প্রতিভা" নামক প্রবন্ধের সঙ্গে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ির যে ছবিটি বেরিয়েছে তার নীচে ভুলক্রমে ফটো-কালীশ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ আছে। ছবিটি নেওয়া হয়েছিল শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস" থেকে। ছবিটি তুলেছিলেন শ্রীপরিমল গোস্বামী। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় এক পত্রে জানিয়েছেন "দেশ পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায় দেখলাম শিশিরকুমারের একটি ছবি ছেপে আমার নাম দিয়েছেন—ওই সংখ্যার বহু ছবি আমার দ্বারা গৃহীত হলেও ওই ছবিটি আমার গৃহীত নয়। ছবিটি তুলেছিলেন পরিমল গোস্বামী। ছবিটি ছাপার কপিরাইট আমার হলেও অন্যের গৃহীত ছবি আমার নামে প্রকাশিত দেখতে চাই না।"

অরণ্যদেব লী ফক

অরণ্যে শেক্সপীয়র উৎসব –
এবারকের দৃশ্যে হ্যামলেট ও তাঁর নিহত পিতার প্রেতাত্মা ----
আমি প্রেতাত্মা হব।
না, আমি!

আমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল! তুমি প্রতিশোধ নাও!
হত্যা?
চমৎকার! এবারে হবে রোমিও-জুলিয়েটের দৃশ্যাভিনয়......
!??

খুলি-গুহার রত্নাগারের ঘরে ঘরে সাজানো রয়েছে অমূল্য সব ঐশ্বর্য। তোমাদের পীপা... ক্লিওপেট্রার সাপ... আলেকজান্ডারের পানপাত্র ...রাজা আর্থারের তরবারি......
৪/15

তারই মধ্যে রয়েছে এই পরচুলা!
আমারই কোনও এক পূর্বপুরুষ এই পরচুলা সংগ্রহ করেছিলেন। নারীর পরচুলা। কে এটি ব্যবহার করতেন?

পূর্বপুরুষদের লেখা ইতিহাসের পাতা ওলটাচ্ছেন অরণ্যদেব
উত্তর নিশ্চয় এরই মধ্যে পাওয়া যাবে!

একটু বাদেই উত্তর পাওয়া গেল —
'মেয়েদের পরচুলা'! দেখি কী লেখা আছে' আরে, এ কী!

তাজ্জব বনে গেছেন অরণ্যদেব!
আশ্চর্য! এমন কথা কে ভাবতে পেরেছিল! অবিশ্বাস্য! হো হো! হা হা!

অরণ্যদেবকে এমনভাবে কেউ কখনও হাসতে দেখেনি...ব্যাপার কী
হো হো – হা হা! হি হি!
?
?
??

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা কমিশনের কার্যকলাপ আলোচ্য সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বিষয়। সরকার এই রাজ্যে বাংলা ভাষা চালু করতে বদ্ধপরিকর হয়ে আট বছর আগে এই কমিশন সৃষ্টি করেন। এই আট বছর কমিশনকে পুষতে সরকারী তহবিল থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু কমিশন আজ পর্যন্ত পুস্তকাকারে একখানি সংকলনও প্রকাশ করতে পারেননি। ১৯৬৪ সনে এই কমিশনের জন্ম। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। উদ্দেশ্য ছিল এই রাজ্যের আইনসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে তা প্রকাশ করা। এ ছাড়া বিধানসভা, মহাকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারী ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চালু করার ব্যাপারে ভাষা কমিশনের পরামর্শ দেবার অধিকারও আছে। কমিশনের চেয়ারম্যানের মাসিক মূল বেতন সাড়ে তিন হাজার টাকা—এ ছাড়া আনুষঙ্গিক ভাতা তো আছেই। কমিশনের সদস্য সংখ্যা তিন। সদস্যসচিবের বেতন ২২৫০ টাকা। অপর দুজনের যথাক্রমে ১৮০০ ও ১০০০ টাকা। একজন রিসার্চ অফিসারের বেতন ১০০০ টাকা। একজন স্পেশ্যাল ও একজন সেকশন অফিসার আছেন। উভয়েরই বেতন ১০০০ টাকা করে। এ ছাড়া মোটা বেতনে আরও কয়েকজন কর্মচারী আছেন। তিনজন অনুবাদকের জন্য মাসিক ব্যয় হয় মাত্র ১৫০০ টাকার মত।

দেশী সংবাদ

২৭ মারচ—আগামী জানুয়ারিতে কলকাতায় পাতাল রেলের কাজ শুরু হবে। দমদম-বেলগাছিয়া অংশে প্রথম হাত পড়বে। ১৯৭৮ সালে দমদম টালিগঞ্জ পাতাল রেল চলবে বলে প্রজেকটের এডমিনিসট্রেটিভ অফিসার ঘোষণা করেন। ফরাক্কা ও দুর্গাপুরের পর পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের এটাই তৃতীয় বৃহৎ প্রকল্প।

রাজ্যপালের ভাষণে নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার যেসব আশ্বাস রয়েছে তাকে রূপ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া চাই। আর চাই আমলাতান্ত্রিক অচলায়তন ও দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিসী প্রশাসনকে নতুন সাজা। রাজ্যপালের ভাষণের ওপর আলোচনার প্রথম দিন এই ছিল তরুণ সদস্যদের প্রধান দাবি।

২৮ মারচ—আজ ভারত বাংলাদেশের মধ্যে এক বছরের জন্য বিস্তৃত একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এই চুক্তিকে দুই দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে বলা হচ্ছে। সম্ভবত ১০০ কোটি টাকার এক বছরের বাণিজ্য চুক্তিতে রয়েছে উভয় দিকে ৫০ কোটি টাকার সরাসরি পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা।

কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেইসব দেশের নাগরিকরা ভারতস্থ বাংলাদেশ মিশনের অনুমতি অথবা ভিসা ছাড়াই বাংলাদেশে যেতে পারবেন। কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে।

২৯ মারচ—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রশাসনে সর্বপ্রকার দুর্নীতি রোধের উপর জোর দেওয়া হয়। রাজ্য অর্থমন্ত্রী ডঃ শংকর ঘোষ, সরকার পরিচালনাধীন শিল্প দফতরের মন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিনও দুর্নীতিরোধে সংকল্প ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

নগর সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা দলের নীতি ও কর্মসূচীর রূপায়ণ ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, কংগ্রেস হাইকম্যানড এটাই চান। এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক প্রেরিত এক ইস্তাহারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে এতৎসংক্রান্ত নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছেন।

৩০ মারচ—আগামী কয়েক বছরে গোটা কলকাতার চেহারা পালটে দেওয়া হবে। এই পরিবর্তন বাবদ সরকার খরচ করতে চলেছেন ১২৫ কোটি টাকা। সি এম পি ও এ সম্পর্কে একটি ব্যাপক ও বিরাট পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই হাত দিয়েছেন।

৩১ মারচ—গয়ার কাছাকাছি বিহার উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার একটি কেন্দ্রে দুর্নীতি দমন বিভাগের লোকেরা একটি স্কুলের একজন কেরানীকে গ্রেফতার করেছেন। জানা গিয়েছে যে, এই কেরানীটি শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন অফিসারের সহযোগিতায় মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তৈরী উত্তরপত্র সরবরাহ করত। এভাবে এক চক্রটি ফলাও লাভের কারবার চালিয়েছিল। এই সব কাগজপত্র, প্রচুর নগদ অর্থ এবং এ সম্পর্কে একটি ডায়েরি পাওয়া গিয়েছে।

পয়লা বৈশাখ থেকে রবীন্দ্র সদনের কাছে ভারত-বাংলাদেশ সংস্কৃতি ও মৈত্রী মেলা বসছে। চলবে ৩ বৈশাখ পর্যন্ত। দুই দেশের প্রায় তিন শত সাহিত্যিক, শিল্পী কবি অভিনেতা পরিচালক এই মেলায় যোগ দেবেন।

১ এপরিল—কদিন আগেও ওড়িশার রাজ্যপাল শ্রীযোগেন্দ্র সিং-এর নাম পুলিসের খাতায় ছিল ক্রিমিনাল হিসাবে। রাজ্যপাল হওয়ার পর ওই খাতা থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়। রাজ্যপাল শ্রীসিং নিজেই আজ কটকে ওড়িশা পুলিসকে পুলিস-ফ্ল্যাগ প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ওই কথা কবুল করেন।

আট লক্ষাধিক টাকায় তৈরী বর্ধমানের গভর্নমেন্ট কলেজ অব এডুকেশনের নতুন বাড়ি আট বছরের মধ্যেই ধসে পড়ছে। আজ নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে : বাড়িটি বিপজ্জনক, সুতরাং কলেজের পাঠও আপাতত বন্ধ। রাজ্য সরকার এই বি টি কলেজটির নতুন বাড়ি তৈরির জন্য আরও ১৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

২ এপরিল—শিলিগুড়ি জংশনে একটি চিনি ভরতি ওয়াগন ভাঙার অভিযোগে রেল-রক্ষী বাহিনীর দুজনকে আজ পুলিসের হাতে অর্পণ করা হয়। পুলিসী সূত্রে জানা যায়, গ্রামরক্ষীদল পাহারা দেওয়ার সময় চারজন রেল-রক্ষী বাহিনীর লোককে ওয়াগন ভাঙতে দেখে ওরা দুজনকে হাতনাতে ধরে ফেলে। অন্য দুজন পালিয়ে যায়।

কাশীপুরের ফুড করপোরেশনের খাদ্য গুদামে গিয়ে আজ খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র শনিবার আরও প্রায় দেড় হাজার বস্তা চাল ও গম বাজারে সরবরাহ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। অভিযোগ এইসব চাল নাকি নিম্ন মানের। উল্লেখ্য ২৭ মারচ শ্রীমৈত্র আচমকা পরিদর্শনে গিয়ে কয়েকটি গুদাম তালা বন্ধ করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৭ মারচ—জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেটি শুক্র গ্রহ নামে পরিচিত, সেই সন্ধ্যা-তারা বা শুকতারা সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ সকালে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ মানমন্দিরকে সেদিকে পাঠিয়েছে। কোনরকম অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় না ঘটলে ১১৮০ কেজি ওজনের মানমন্দিরটি—ভেনাস ৮' জুলাই মাস নাগাদ শুক্র গ্রহের আকাশে পৌঁছবে।

২৮ মারচ—সংবিধান রচনার জন্য ১০ এপরিল বাংলাদেশ গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। ইংরাজিতে সংবিধানের খসড়া প্রায় তৈরী। বাংলায় এখন তার অনুবাদ চলছে। গণপরিষদে আওয়ামী লীগই একমাত্র দল থাকবে। গণ-পরিষদে ৪৬৯ জন সদস্যের ব্যবস্থা আছে।

২৯ মারচ—পূর্ব-জারমানি আজ সাত দিনের জন্য প্রাচীর উন্মুক্ত করে দেন। পশ্চিম বারলিনবাসীরা উপহারস্বরূপে পূর্ব জারমানিতে কফি, নাইলন শারট, প্যানট এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলবার জন্য প্রাচীর পার হন। গত ছ' বছরে এই প্রথম পশ্চিম বারলিনবাসীরা পূর্ব বারলিনে যেতে অনুমতি পেলেন। ৪ এপরিল মধ্যরাত্রে আবার প্রাচীর বন্ধ করা হবে।

৩০ মারচ—পিনডির এক সামরিক সূত্রে প্রকাশ, পাকিস্তান ভারতের হাতে গত ডিসেম্বরে পরাজিত হওয়ার পর চীন ও আমেরিকার এবং আমেরিকার লেফ্ট‌ড লিবিয়ার কাছ থেকে যা অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে তা দিয়ে নতুন দুটি প্যারো ডিভিসন গড়ে তুলছে।

৩১ মারচ—বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আজ খুলনায় এক জনসভায় বলেন যে, তিনি পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছেন : নাশকদের দেখামাত্রই যেন গুলি করা হয়। তিনি বলেন : নকশালরা নাশক ছাড়া আর কিছু নয়।

১ এপরিল—দক্ষিণ ভিয়েতনামের উত্তর অঞ্চলের সামরিক এলাকার অধ্যক্ষ আজ বলেন : গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় উত্তর ভিয়েত-নামের তিন ডিভিসন পদাতিক সৈন্য, সৈন্যমুক্ত এলাকার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম আক্রমণ করেছেন।

২ এপরিল—গতকাল সন্ধ্যায় এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে মৈমনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। নিহত কম করে সত্তরজন, আহত সাড়ে তিন শ'রও বেশী। ঝড় বয়ে যায় ঘণ্টায় দেড়শ মাইল বেগে। ফুলবাড়িয়া মৈমনসিংহ থেকে তেইশ কিলোমিটার দূরে।

রেক্স জেলি ক্রিস্ট্যালস্
ছ'টি মনোরম ফলের গন্ধে পাবেন। খুব দ্রুত আর সহজেই তৈরি করা যায়। ছোট বড় সবাকার ভাল লাগবে।
REX
JELLY CRYSTALS LEMON
বি এণ্ড পি কাস্টার্ড পাউডার
আরো মোলায়েম, আরো স্বাদের আরো ক্রীমে ভরা। ডিমের কোন অংশ নেই। এ দিয়ে চমৎকার ফিরনী, আইসক্রীম, ক্ষীর প্রভৃতি তৈরি করা যায়। জেলি, ফলের স্যালাডের সঙ্গে মিশিয়ে খেতেও খুব ভাল লাগবে।
Brown & Polson
Custard
রেক্স বেকিং পাউডার
কেক, বিস্কুট, পাকোড়া, পুরী, গোলাপজাম ইত্যাদিতে ব্যবহার করুন। অল্প একটু মেশালেই বেশ হাল্কা হয়ে উঠবে।
REX
BAKING POWDER
ব্যঞ্জনকে চমৎকার বানাবার উপযোগী পদার্থ
ব্রাউন এণ্ড পলসন
এবং
রেক্স
অনেক রকম উৎকৃষ্ট উৎপাদন
মিষ্টি খাবারের জন্য বি এণ্ড পি ফ্লেভার্ড কর্নফ্লাওয়ার
পাঁচটি গন্ধে। দুধের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশিয়ে লোভনীয় মিষ্টি খাবার ও হালুয়া তৈরি করা যায়।
Brown & Polson
Flavoured Cornflour For Blancmanges
বি এণ্ড পি ভ্যারাইটি কাস্টার্ড পাউডার
পাবেন ছয়রকম মনোরম গন্ধে। এ দিয়ে তৈরি করা যায় নানারকম পুডিং ও মিষ্টি খাবার।
Brown & Polson
VARIETY CUSTARD POWDERS
বি এণ্ড পি পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার
স্যুপ, ঝোল ঘন করে তুলবে। ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা যাবে— মচমচে পাতলা কাবাব, সিঙ্গাড়া আর প্যাটিস্। ছোটদের আর অসুস্থদের পক্ষেও ভাল।
Brown & Polson
Patent Cornflour
ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার
SHB/7353-BEN
খাসা জিনিসে খাসা হয় যে খাবার,
রান্না আপনার এই ত' সেরা সবার!
কর্ন প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
শ্রী নিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই-১ বি.আর।

সূচীপত্র

উনি সবচেয়ে রূপসী কেন?

মুক্তোর মত এক অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়ে তুলেছে ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম

ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকে মিলিয়ে যাবার সময় কি করে? পলকে আপনাকে রূপ-লাবণ্যে বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে। অল্প একটু মেখে দেখুন,—এর সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অপূর্ব্ব ক্রিয়া অবাঞ্ছিত মলিন রেখা ও তেল-তেলে ভাব দূর ক'রে আপনার মুখে কেমন মুক্তোর মত এক অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়ে তোলে!

এই হাল্কা বুনিয়াদের ওপর অল্প ক'রে ল্যাকমে ফেস্ পাউডার বুলিয়ে দিন। এবার আয়নায় নিজেকে দেখুন···নিজের রূপমাধুর্য্য দেখে আপনি নিজেই অবাক হবেন!

ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম

Lakmé

সূচীপত্র

অসাধারণ
পোদ্দার
স্যুটে
অনন্য পুরুষ
এ রকম পুরুষের প্রয়োজন শুধু
সুবিধাজনক আরামদায়ক পোদার
স্যুট—পাট ভাঙে না, কোঁচ পড়ে
না এমন টেরীন® ও 'টেরীন'-এর
মিশ্রণে তৈরী স্যুটিং।
বহু ধরণের শোভন চিরস্থায়ী
বর্ণে···নির্ভীক বিজয়ী ডিজাইন।
আর যেখানে আপনিই একমেব
পুরুষ সেখানে তো আপনার ঠিক
এই রকমটিই দরকার—সুদর্শন
পরিপাটি নির্ভরযোগ্য স্যুট···
পোদার স্যুট।
পোদার স্যুটিংস্
পোদার মিলস্ লিঃ
পোদার সিল্কস্ অ্যাণ্ড সিন্থেটিকস্ লিঃ
পোদার প্রোসেসার্স
পোদার স্পিনিং মিলস্
পোদার নিটিংস্ লিঃ
® Regd. T. M. of CAFI
PODAR
textiles
বিজয়ের পরওয়ানা
Interpub/PT/7 BN

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী জি সি সেনগুপ্ত

আপনার পরিবারের জন্য পুরাকালের
বিলাসদ্রব্য কে ফিরিয়ে আনলো?
Binaca
Talc
বিনাকা
নতুন স্যাণ্ডালউড ট্যাল্ক দিয়ে!
CIBA Cosmetics

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৪
শনিবার ২ বৈশাখ ১৩৭৯
Saturday, 15 April, 1972

প্রফুল্লকুমার স্মরণে

গত তিরিশে চৈত্র (তেরো এপ্রিল) প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের অষ্ট-বিংশ মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লকুমার বিশেষ ভাবেই আমাদের আপনজন, তবু এই পত্রিকা, এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি সেবার যে ভূমিকাটি ছিল তারও মূল্য রয়েছে। প্রফুল্লকুমার প্রধানত জাতীয়তাবাদী একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হলেও তাঁর কর্মক্ষেত্র শুধুই পত্রিকা সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সেকালের অন্যতম সুখ্যাত এবং শ্রদ্ধেয় সম্পাদক ছাড়াও চিন্তাশীল এবং পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাহিত্য সাধনায় তাঁর খ্যাতি ছিল, বিশেষত প্রবন্ধাদি রচনায়। প্রফুল্লকুমারের সমাজ-চিন্তার একটি বলিষ্ঠ দিক ছিল। হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের একটি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। প্রফুল্লকুমারের পরলোক গমনের দিনটি আমাদের নানা কারণেই বিষণ্ণ করে তোলে। বিশেষত, বর্তমান বছরে আনন্দবাজার পত্রিকার রজত জয়ন্তী উৎসবের দিনে ওই পত্রিকার সম্পাদক-প্রতিষ্ঠাতার অভাব আমরা আরও গভীরভাবে অনুভব করছি।

কর্পোরেশনের ওভারটাইম

কলকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কে অপবাদ অনেক। কোনো কোনো অপবাদ তো কাহিনীর পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই সাবেকী পৌরসভার কর্মচারীরা যে কত কর্মতৎপর তার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা মাঝে মাঝে পেয়ে যাই। যেমন সম্প্রতি জানা গেল, কর্পোরেশনের নানা বিভাগে কাজের চাপ এত বেশী যে এক একজন কর্মী সকাল দশটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত একনাগাড়ে গায়ের রক্ত জল করে কাজ করে গিয়েছেন। বিনিময়ে বিশেষ আর কি পেয়েছেন, মাত্র ওভারটাইম। পৌর ওয়ার্কশপে এই রকম একজন কর্মী নাকি মাসে ওভারটাইম বাবদ সাড়ে নশো টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। তাঁর মূল বেতন কত—তা অবশ্য জানা যায় না। অথচ দুষ্টজনে বলে, ওই ওয়ার্কশপে কোনো কাজ হয় না। কাজ যে কী পরিমাণে হয় তা এক একজন কর্মীর মাসবাবদ বাড়তি পাঁচশো সাতশো টাকা রোজগারের বহর থেকেই বোঝা যায়। তবে এ ব্যাপারে কর্পোরেশানের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টও কম দক্ষ নয়। এখানকার কর্মচারীরা বকেয়া বিল তৈরীর কাজবাবদ ওভরটাইম করে বছরে লাখ দুয়েক টাকা রোজগার করেন। বকেয়া বিল আদায় হোক না হোক, (কেনই বা বকেয়া থেকে যায় সেসব প্রশ্ন অবান্তর) বিল তৈরীর কাজে যে বছরে বছরে দু তিন লাখ টাকা খরচ হয় তা তো ঠিকই। অ্যাসেসমেণ্ট এবং কালেকসান বিভাগের দৌড় আরও বেশি, এই বিভাগের জন্যে বছরে সাত লাখ টাকার মতন ওভারটাইম দিতে হয়। বলা বাহুল্য, কর্মচারীরা ওভারটাইম নেন অথচ কলকাতার নাগরিক মাত্রেই জানেন এখানে কাজ কতটুকু হয়! ঠিক এই ধরনের কাজ চলছিল শহরের জঞ্জাল অপসারণের বেলায়। দিনের বেলায় যে ময়লা ফেলে গাড়ি, ড্রাইভার ও মজুর মাত্র দু ক্ষেপ জঞ্জাল অপসারণ করেছে—রাত্রে তারা কাজ করেছে দশ ক্ষেপের। এই দপ্তরের কর্মীরা দিনের চেয়ে রাতে চার পাঁচ গুণ বেশি কাজ করেছে ওভারটাইমের জন্যে। কাজ কতটা হয়েছে তা শহর কলকাতার জঞ্জালের স্তূপ দেখলেই আগে বোঝা যেত। গত এক বছরে এই বাবদ বারো তেরো লাখ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে বলে শোনা যায়। কর্পোরেশনের আর্থিক অনটন যে কত তা তো না জানার কথা নয়, কিন্তু গত এক বছরে পাঁচিশ লাখ টাকা ওভারটাইম এই প্রতিষ্ঠান হেসে খেলেই দিয়ে দিতে পেরেছে এ বড় তাজ্জব কথা।

কলকাতা কর্পোরেশানে কাজ হয় না বলে যাঁরা সোরগোল করেন তাঁরা বোধ হয় বুঝতেই পারছেন বছরে পাঁচিশ লাখ টাকা ওভারটাইম দিতে হয় বাড়তি কাজের জন্যে। কাজের এমন চাপ যেখানে রয়েছে এবং দিনে ঘুমিয়ে রাত্রে কাজ করার জন্যে কর্মীও রয়েছে প্রচুর—সেখানে কাজ হয় না এমন কথা বলা নিতান্তই অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কী! কর্পোরেশানের ওভারটাইম থেকে তার কাজের বহরটা নিশ্চয়ই অনুমান করা উচিত।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
শুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টাঃ ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪০.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২০.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১৪.৭৬

[illegible]
বার্ষিক — টাঃ ১৫৪.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৩৮.৭৬

আবার বলো—
নির্বাচনে কারচুপি.....
নির্বাচনে কারচুপি.....
কারচুপি.....

সি পি এম

এদের ফিরিয়ে দিন বাড়িতে, সুস্থতায়

জনৈক তরুণ বন্ধু আমাকে সম্প্রতি চারখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছেন। চিঠি চারখানি, আপনাদের গোচরে আনবার জন্য এখানে প্রকাশ করছি। কেননা এই চিঠিগুলি যে সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে, আমার মতে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমাদের সামাজিক জীব হিসাবে এর একটা সমাধান অবশ্যই বের করা উচিত।

প্রথম চিঠি। জনৈক অমরকে লেখা জনৈক বাবুর চিঠি। তারিখ ১৭।৩।৭২। মাই ডিয়ার অমর, আশা করি তোমরা সব ভালোই আছ। আমরা আর কী করে ভাল থাকব? আমরা আর কতদিন পাড়া ছাড়া হয়ে থাকব। একটা কিছু ব্যবস্থা কর।

তোমাদের সঙ্গে যা ঝগড়া হয়ে গিয়েছে, সবই রাজনীতিগতভাবে, কারণ তুমি জানো তোমার সঙ্গে আমার কোনও ব্যক্তিগত ঝগড়া কোনদিন ছিল না। এখন আমরা সি পি এম থেকে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পাড়ায় তোমাদের সঙ্গে মিলে মিশে ভাই ভাই-এর মত একসঙ্গে থাকতে চাই। তুমিই পাড়ায় স্বাধীনভাবে থাকবার আমাদের একটা ব্যবস্থা করতে পার। মণিমোহনদাকে আমাদের কথা বলো। ঝগড়া রাজনীতিগত-ভাবে, আর রাজনীতি যখন আমরা ছেড়ে দিচ্ছি তখন আর মিটমাট হবার কোনও অসুবিধা থাকতে পারে না। এটা মণি-মোহনদাকেও বুঝিয়ে বলো।

আমরা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সঙ্গেও কথা বলেছি, কীভাবে আবার একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায়। এই সব খবর তোমরা দুই তিন দিনের মধ্যে পাবে। তুমি এই ব্যাপারে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। আর কি, তোমরা আমার ভালবাসা নাও।

দ্বিতীয় চিঠি। উক্ত বাবুই কোনও এক মণিমোহনকে লিখেছে। তারিখ নেই। শ্রদ্ধেয় মণিমোহন কাকা, আমরা আর কত-দিন পাড়া ছাড়া হয়ে থাকব। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। আমরা পাড়ায় খেলাধুলো নিয়েই ছিলাম। কিন্তু এই বিমান বোস, দুলাল মিত্র প্রভৃতিরা এসে আমাদের কানে মন্ত্র দিয়ে আমাদের দলে নামিয়ে সব পালিয়ে গিয়েছে। এই জন্যই আজ আমাদের এই অবস্থা।

এই সব পার্টির নেতাদের কাণ্ড দেখে আমাদের চরম শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমরা আজ থেকে সি পি এম-এর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পাড়ায় সবাইকার সাথে মিলেমিশে থাকতে চাই। আমরা দাদুদাকে চিঠি দিয়েছি। ঝগড়া গণ্ডগোল যা হয়ে গিয়েছে, সবই রাজনীতিগতভাবে, ব্যক্তিগত-

বাদশার সংবাদভাষ্য

ভাবে কিছু নয়, তাই আমাদের মিটমাটের ব্যাপারে কেউ যেন ব্যক্তিগত রাগ না দেখায়। যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে আপনারা আমাদের পিতৃতুল্য হিসাবে আমাদের ক্ষমা করবেন। আর কি, আপনি আমার প্রণাম নেবেন।

তৃতীয় চিঠি। লুধিয়ানা থেকে জনৈক ঝেটনদা লিখছে কসবার কোনও এক মুকুলকে। তারিখ ২১।৩।৭২। ডিয়ার মুকুল, চিঠি পেয়ে হয়ত অবাক হয়ে যাবি যে এ আবার কে চিঠি দিয়েছে। অনেক দুঃখে চিঠিটা লিখছি। আজ এক বছর হয়ে গেল কিন্তু বাড়ির মুখ দেখতে পেলাম না। সেই জনাই তোকে চিঠি দিচ্ছি। তুই যদি এই উপকারটা করতে পারিস তা হলে আমার খুব উপকার হয়। হয়ত চেষ্টা করলে তুই পারবি। তুই আমার বন্ধু নয়, মিণ্টুর ভাই। মিণ্টু আমার বন্ধু। সেই জনাই তোকে ছোট ভাই-এর মত দেখতাম। জানিস তো আমার এসব পোষায় না, কাজ কারবার করে আর এসব ভাল লাগে না। দেখ আমি তোকে কথা দিচ্ছি যে আমি কিছু করব না, ভাল-ভাবে থাকতে চাই। আর কতদিন এইভাবে এদেশ ওদেশ করে কাটাব বল। আমাদেরও তো ইচ্ছে করে যে বাড়িতে থাকি, কিন্তু সে সুযোগ পাচ্ছি কোথায়, বল? দেখ আমায় এখান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হয়। যতদিন উত্তর পাড়ার ছিলাম, ততদিন নব কংগ্রেস করতাম, কেননা বন্ধু বান্ধব আর দাদারা নব কংগ্রেস করে এবং আমিও দেখলাম যে কংগ্রেস করাই ভাল। জীবনে কোনও দিন পার্টি করিনি, পার্টি কী জিনিস তা জানি না। কিন্তু এ রকম দিন আসবে তা ভাবিনি। তোরা হয়ত ভাববি যে ঝেটনদা মিথ্যে কথা বলছে, কিন্তু একটাও মিথ্যা কথা নয়। তোরা যদি বলিস তো আমি নব কংগ্রেস করতে রাজি আছি। আর দুঃখের কথা কি লিখব বল। তুই তো জানিস যে আমি কেমন ছেলে। মিটমাট ওরা করবে কিনা, তুই আমাকে চিঠি দিয়ে জানাবি। তুই আমার ভালোবাসা নিবি। এই উপকার করলে আমার খুব ভালো হয়।

চতুর্থ চিঠি। মুকুলকে লিখছে কোনও এক তপন। তারিখ ২২।৩।৭২। ডিয়ার মুকুল, আজ অনেকদিন পাড়া ছাড়া হয়ে আছি। বাড়ি যেতে সাহস পাচ্ছি নে। দ্যাখ, তোদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঝগড়া কোনও দিনই কিছু ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কতকগুলি লোকের কথায় ভুল বুঝে সি পি এম-এর দলে যোগ দিয়েছিলাম। তুই হয়ত জানিস না আমাকে বাধ্য হয়ে এদের দলে

[illegible] দেখে যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমরা কেমন আছি না আছি, এরা একবার খোঁজ নেবারও প্রয়োজন বোধ করে না। লিডারদের গায়ে আঁচড়টিও লাগে না, যত বিপদের মধ্যে থাকি আমরাই। তুই জানিস না, কী কষ্টের মধ্যে দিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সত্যি, এখন এসব একদম ভাল লাগে না। আবার আগের মত মিলে মিশে থাকতে চাই।

তুই যদি নব কংগ্রেসের ছেলেদের একটু বুঝিয়ে বলিস তাহলে হয়ত ওরা আমাকে ক্ষমা করতে পারে। আমার একান্ত অনুরোধ আমার জন্য এই উপকারটুকু তুই কর। আর সি পি এম-এর ছায়াও মাড়াব না।

আর বেশি কি লিখব, তুই আমার ভালবাসা নিস। ইতি

এই চারখানা চিঠিকে আমি আমাদের বর্তমান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলেই মনে করি। এবং এও মনে করি, এই সব চিঠির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আমরাই। আমাদের ঘরের যে-সব ছেলেরা, এবং তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার বলেই আমার ধারণা, এককালে ভ্রান্তবুদ্ধি বিপ্লবী নেতাদের কথায় ছোরা বোমা পাইপগান হাতে নিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে মেতে উঠেছিল, আজ তারা নিজেরাই সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ছন্নছাড়া, ঘর বাড়ি ছেড়ে পথে পথে ঘুরছে। এদের অবিলম্বে ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে। কেননা অনেকেই আজ ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত।

কিন্তু এদের শুধু ঘরে ফিরিয়ে আনাটাই যথেষ্ট নয়, এদের সুস্থও করে তুলতে হবে। অবিবেকী রাজনীতি কোন মন্ত্রে এবং কী কৌশলে এই সব সরল ও স্নেহ প্রেম সমন্বিত সাধারণ ছেলেদের সমাজ ও মানবতাবিরোধী রোবটে পরিণত করে তোলে, সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য আমাদের তা জানা দরকার। সমাজতত্ত্ববিদ ও মনস্তাত্ত্বিকেরা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে যাতে অনু-সন্ধান শুরু করেন, এমন ব্যবস্থা কি করা যায় না? এটা অত্যন্ত জরুরী।

পাকিস্তান আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে

পাকিস্তান আবার যুদ্ধ শুরু করতে পারে। পাক নেতারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। পাকিস্তান আবার মরিয়া হয়ে বিশ্বের সর্বত্র অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে। সম্প্রতি কূটনৈতিক মহলে এই রকম কতকগুলি কথা শোনা যাচ্ছে।

কবে নাগাদ পাকিস্তান আবার যুদ্ধ শুরু করতে পারে কূটনৈতিক মহলে তারও একটা মোটামুটি অনুমান শোনা যাচ্ছে। তাঁরা বলছেন, সম্ভবত সেপটেম্বরেই আবার পাক-ভারতে যুদ্ধ হবে। ইতিমধ্যে পাকিস্তান কাশ্মীরে একটা বড় রকমের হাঙ্গামা শুরু করিয়ে দেবে। এবং সেই হাঙ্গামার চূড়ান্ত পর্যায়ে পাক ফৌজ পশ্চিম ভারতে সজোরে আঘাত হানার চেষ্টা করবে। তাদের মূল লক্ষ্য হবে, গোটা কাশ্মীরটা বা কাশ্মীরের অধিকাংশটা দখল করে নেওয়া।

ভুট্টোর নেতৃত্বেই কি এবারের পাক আক্রমণ শুরু হবে? না, এবারও পাক-ভারত লড়াই শুরু করবে কোনও সামরিক পাক প্রেসিডেনট? এই প্রশ্নে কিন্তু সবাই একমত নয়। কারু কারু মত, ভুট্টোই এ লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেবে। কেউ কেউ আবার মনে করেন, না, আগে পাক সামরিক চক্র ভুট্টোকে গদি থেকে সরিয়ে দেবে, তারপর লড়াইয়ে নামবে।

আগামী সেপটেম্বরেই পাকিস্তান আবার ভারত আক্রমণ করতে সাহস পাবে কি পাবে না, সেটা নিয়ে নানা মত থাকতে পারে। কিন্তু এটা নিয়ে কোনোই দ্বিমতের অবকাশ নেই যে আর একটা পাক আক্রমণের আশংকা রয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের এক দল লোক, বিশেষ করে পাক সামরিক বাহিনীর একটা উগ্র গোষ্ঠী বদলা নেওয়ার জন্য পাগলা হয়ে রয়েছে।

এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা এই বদলা নিতে চায়। এজন্য যে কোনও মূল্যে তারা অস্ত্র সংগ্রহ করতে আগ্রহী। এজন্য যে কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে তারা আঁতাত করতে ইচ্ছুক। ভারত আক্রমণে যদি চীন বা আমেরিকা তাদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তাহলে এই উগ্রপন্থীরা বিনিময়ে ওই দুই রাষ্ট্রকে যে-কোনও সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজি।

পাকিস্তান যে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, পাকিস্তান যে আবার যে-কোনও সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, পাকিস্তানের উগ্রপন্থীরা যে বদলা নেওয়ার জন্য পাগলা হয়ে রয়েছে—এসব খবর ভারত সরকারও জানেন। তাই তাঁরা সদা সতর্ক। তাই পাক-ভারত সীমান্তে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখা হয়েছে। তাই অস্ত্র কারখানাগুলিতে উৎপাদন জরুরী অবস্থার মতই চলছে।

ক্ষেপা প্রতিবেশী হঠাৎ আক্রমণ করবে কি করবে না সেই বিতর্কে মেতে থেকে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিকে শিথিল করা যায় না। ভারত সরকার তা করেনও নি।

*

পাকিস্তান যে ভয়াবহ সংকটের মধ্যে পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটার পর একটা ভুল করতে করতে পাকিস্তানী নেতারা তাদের দেশকে এমন এক পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছেন যেখানে এগোলেও বিপদ, পিছুলেও বিপদ।

বাংলাদেশে যদি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ওই রকম পশুর মত আচরণ না করত তাহলে এত বড় বিপদে অজ্ঞ তারা পড়ত না। এখন বাংলাদেশ তো গিয়েছেই, ঢাকের দায়ে মনসাও বিক্রী হতে চলেছে। পাকিস্তানেরই টলমল অবস্থা।

পাকিস্তানের আজ নানা সংকট। এক নম্বর সংকট, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করা। বাংলাদেশ সরকার পরিষ্কার বলেছেন, পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের তাঁরা বিচার করতে চান। ভারত সরকারও মনে করেন, পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার পূর্ণ অধিকার বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনেও এতে কোনও বাধা নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যদি যুদ্ধাপরাধী জার্মান ও জাপানীদের বিচার ও শাস্তি হতে পারে তাহলে পাক যুদ্ধাপরাধীদেরই বা বিচার এবং শাস্তি হবে না কেন? জার্মান ও জাপানীরা যে অত্যাচার করেছিল তার চেয়ে বহু গুণে বেশি অত্যাচার করেছে পাক সামরিক নায়করা। বাংলাদেশে তারা নয় মাস ধরে সাধারণ মানুষের উপর অভূতপূর্ব অত্যাচার চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করেছে। প্রায় এক কোটি লোককে দেশ ছাড়া করেছে। আরও এক কোটিরও বেশি নরনারীকে গৃহছাড়া করেছে। আত্মসমর্পণের পূর্বমুহূর্তেও সুপরিকল্পিতভাবে কয়েক শ' বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে।

এই রকম অপরাধীদের হাতে পেয়েও যদি বিচার না করা হয় তাহলে আর কার বিচার হতে পারে?

কিন্তু পাক শাসকদের মুশকিল হল যে যুদ্ধবন্দীদের বিচার শুরু হলেই দেশের ভেতরে এত চাপ বাড়বে যে তখন আর চুপচাপ গদীতে বসে থাকা সম্ভব হবে না। হয় নিজের দেশের লোকের হাতে খতম হতে হবে, না হয় ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মরতে হবে।

তিরানব্বুই হাজার যুদ্ধবন্দী। এদের অনেকেই বেশ প্রভাবশালী পরিবারের লোক। সুতরাং, চাপ দেওয়ার এবং দেশের ভেতরে গণ্ডগোল করার ক্ষমতাও তাদের যথেষ্ট। যুদ্ধবন্দীদের যতদিন না মুক্ত করে আনা সম্ভব হচ্ছে ততদিন কোনও পাক শাসক শান্তিতে থাকতে পারবে না—নিজের দেশের লোকরাই থাকতে দেবে না।

পাকিস্তানের আর একটা বড় অসুবিধা হল ভারত অধিকৃত অঞ্চল। এবারের যুদ্ধের ফলে ভারতের হাতে পাকিস্তানের কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকা চলে এসেছে। ভারত যুদ্ধ থামিয়েছে, কিন্তু ওই এলাকাগুলি ছেড়ে আসেনি। ভারত সরকার এখন দাবি করেছেন যে, ভারত-পাক সীমান্ত নতুনভাবে ঠিক করতে হবে। এমন নয় যে ভারত পাকিস্তানের জমি চায়। ভারতের বক্তব্য, সীমান্তরেখা এমনভাবে রয়েছে যে তাতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় পাকিস্তানের বিরাট সুযোগ রয়েছে। কোথাও হয়ত একটা পাহাড়ের গা দিয়ে ভারতের একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক চলে গিয়েছে। পাহাড়ের পূর্ব দিকটা ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে। কিন্তু চূড়াটা পাকিস্তানের ভেতরে। পাকিস্তানের অধিকার রয়েছে সেই চূড়ায় কামান তাগ করে বসে থাকার। ফলে তারা যেকোনও সময় গুলিগোলা ছুঁড়ে ভারতীয় সড়কটি বন্ধ করে দিতে পারে।

ভারত সরকার বলছেন, এই ধরনের সীমান্ত রেখা চলবে না—নতুন করে সীমান্ত রেখা টানতে হবে। যাতে অতর্কিতে আক্রমণ করে ভারতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ক্ষমতা পাকিস্তানীদের না থাকে। ভারত বিনিময়ে পাকিস্তানকেও এই রকম কিছু সুবিধা দিতে রাজি। ভারত সরকার বলছেন : তাই

সীমান্ত রেখা নতুন করে টানার জন্য আলোচনা বসুক।

ভারত সরকার কথাটা এখনও প্রকাশ্যে বলেন নি, কিন্তু যতদূর জানা যায় প্রধানমন্ত্রী এই সুযোগে কাশ্মীর সমস্যারও একটা সমাধান চান। মোটামুটিভাবে বর্তমান যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ভিত্তিতে কাশ্মীর সমস্যার একটা পাকা সমাধানে আগ্রহী।

পাকিস্তান কিন্তু এর একটা প্রস্তাবও মানতে রাজি নয়। প্রথমত, সীমারেখা নতুন করে টানতেও তাদের ঘোরতর আপত্তি। দ্বিতীয়ত, গোটা কাশ্মীরের ওপর দাবি ছাড়তেও তারা ভীষণ অনিচ্ছুক। এই দুই ব্যপারেও পাক জনমত অত্যন্ত উগ্র। যে পাক শাসক ভারতের এই দুই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হবে তার নিস্তার নেই।

আর একটা বড় জিনিস হল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান। বাংলাদেশ এখন বাস্তব সত্য। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বাংলাদেশকে মানতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান এখনও বাংলাদেশকে মানতে রাজি নয়। এখনও পাক শাসকরা বলে, "পূর্ব পাকিস্তান"! অথচ বাংলাদেশকে মানতে রাজি না হলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কোনও মিটমাট সম্ভব নয়। সম্ভব নয় যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে নতুন কোনও বিচার বিবেচনাও।

এ ব্যাপারেও পাক শাসককুলের বিরাট বিপদ। বাংলাদেশ সম্পর্কে তারা দেশের সাধারণ লোককে এমন একটা ধারণা দিয়ে রেখেছে যে ওটা স্রেফ ভারতীয় দখলের একটা পাক এলাকা। ভারত জোর করে বাংলাদেশটা ছিনিয়ে নিয়েছে। আসলে ওখানে কোনও স্বাধীন সরকারই নেই। বাংলাদেশের মানুষও মোটেই স্বাধীনতা চায়নি। তারা এখনও মনেপ্রাণে পাকিস্তানী। হঠাৎ তাই এই বাংলাদেশকে মেনে নেওয়াও পাক শাসকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। বিপদটা তারা নিজেরাই সৃষ্টি করে রেখেছে। এখন যে পাক শাসক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে যাবে সে-ই তার দেশের লোকের বিশেষ বিরাগভাজন হবে।

এইভাবে নানা দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে পাক শাসকরাই এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে যেখানে এগোলেও বিপদ, পিছলেও বিপদ। তারা নিজেরাই পাকিস্তানকে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে, তারাই জনমতকে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে রেখেছে যে এখন দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনও সমাধানের পথ খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। যেটা ভারত ও বাংলাদেশ মানতে পারে সেটা পাকিস্তানী মানুষ গ্রহণ করতে রাজি হবে না—যেটা পাকিস্তানী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য সেটা ভারত ও বাংলাদেশ কিছুতেই মানতে পারে না।

এত গেল সমস্যার দিকটা। এর উপর রয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণতা। বার বার ভারত আক্রমণ করতে গিয়ে তারা পাকিস্তানকে এত অপদস্থ করেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশে ভারত-বিরোধী প্রচারটা এত তিক্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে বহু পাকিস্তানী আজ ভারতকে যেকোনও ভাবে জব্দ করতে চায়। সেজন্য তারা যে কোনও মূল্য দিতে রাজি।

তাই সব মিলিয়ে তারাই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে যে সম্পূর্ণ ধ্বংসের ঝুঁকি নিয়েও আবার একটা যুদ্ধের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়া পাকিস্তানীদের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

*

কিন্তু প্রশ্ন হল, পাকিস্তানের দুই বড় বন্ধু যদি মদত না দেয় তাহলেও কি পাকিস্তান যুদ্ধে নামতে সাহস পাবে? যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তানকে অস্ত্র না যোগায় তাহলেও কি পাক উগ্রপন্থীরা ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে?

আমার অন্তত তা মনে হয় না। এবারের যুদ্ধে মার খাওয়ার পর পাক সামরিক বাহিনী এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পড়েছে যে বড় রকমের বিদেশী অস্ত্র সাহায্য না পেলে তাদের পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়া অসম্ভব। পাক সামরিক বাহিনীর মোট শক্তিই এখন তিন লক্ষের বেশি নয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তি তার দ্বিগুণেরও বেশি। ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও আজ পাক নৌ ও বিমান বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী।

এই অবস্থায় চীন এবং আমেরিকা থেকে বিরাট বিপুল অস্ত্র সাহায্য না পেলে পাকিস্তানের পক্ষে কিছুতেই আজ যুদ্ধে নামা সম্ভব নয়। আর শুধু [illegible] পেলেই চলবে তা নয়। এমন সব অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন যা ভারতের নেই এবং যেসব অস্ত্রশস্ত্রের সামনে সংখ্যায় অনেক বেশি ভারতীয় বাহিনীও তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

এবারের যুদ্ধের পরে আমেরিকা বেনামে এবং চীন স্বনামেই পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া শুরু করেছে। তবে এই সাহায্য আরও কত বাড়ে সেইটাই দেখার। এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন নীতি অনেকটা নির্ভর করবে এবারের বড় রকমের ভিয়েৎনাম যুদ্ধের পরিণতির উপর। আর চীনের নীতি নির্ভর করবে অত্যন্ত গোপনে যে রুশ-চীন আলোচনা চলছে তার ফলাফলের উপর।

আপাতত রাশিয়া চেষ্টা করছে ভুট্টোকে বাঁচাতে। সেই জন্য রাশিয়া ভারতের উপর চাপও দিচ্ছে। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান এবং নতুন করে সীমারেখা টানার ব্যাপারে রাশিয়া ভুট্টোকে খুব বেশি বেকায়দায় ফেলতে চায় না। রাশিয়া চায় ভারত এবং বাংলাদেশ এই দুই ব্যাপারে এমন একটা নীতি অবলম্বন করুক যাতে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট থাকতে পারে এবং বর্তমান পাকিস্তান অটুট থাকে।

রাশিয়ার ধারণা, ভুট্টো বিদায় নিতে বাধ্য হলে সেখানে আসবে কোনও উগ্রপন্থী পাক সমরনায়ক—যে পুরোপুরিভাবে চীন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খপ্পরে গিয়ে পড়বে। এবং যার আর এক হঠকারিতার ফলে হয়ত বাদবাকী পাকিস্তানটুকুও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। রাশিয়া তার সীমান্তের কাছাকাছি এরকম পরিস্থিতি হতে দিতে চায় না।

৯-৪-৭২।

নবারুণ গুপ্ত
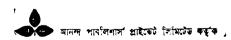
বেচারা নিক্সন

১৯৬৮ সনে টেট পরবের সময় যে প্রচণ্ড আক্রমণ উত্তর ভিয়েতনাম চালিয়েছিল দক্ষিণের ওপর তাতে দক্ষিণের ইমারতটা কেঁপে উঠলেও ভেঙে পড়েনি। মার্কিন ফৌজের সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামীরাও সামাল দিয়েছিল উত্তরের সে দক্ষিণে হানাকে। এর পর ভিয়েতনামে যে অবস্থা দেখা দিয়েছিল তা না লড়াই না সন্ধি। যুদ্ধ একেবারে থেমে গিয়েছিল বললে ভুল হবে, আবার চলছিল বললেও ঠিক হবে না। দুপক্ষই পাঁয়তাড়া কষছিল মোটের ওপর উত্তর-দক্ষিণের মাঝামাঝি নিরস্ত্র এলাকার আশেপাশে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভেতরে ভিয়েত কংদেরও দাবিয়ে রেখেছিল সেখানকার অকম্যুনিস্ট সরকার। দুচারটে ছাড়াছাড় চোরাগোপ্তা হানা ছাড়া ভিয়েতকং গেরিলারাও বিশেষ কিছু করছিল না। মনে হচ্ছিল লড়ায়ে বোধ হয় দুপক্ষেরই অরুচি ধরে গেছে। প্যারিসে যখন ভিয়েতনাম সমস্যা মেটাবার জন্যে উত্তর, দক্ষিণ, ভিয়েতকং আর আমেরিকার

দেবরাজ

প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক বসলো তখন মনে হলো তাহলে বুঝি ভিয়েতনামের এতদিনের গোলমালটা আপসেই মিটে যাবে—মার্কিনী সেপাইরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে, ভিয়েতনামীরা যে যার এলাকায় সুখে শান্তিতে থাকবে।

চার বছরে ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি বিস্তর পালটেছে নিকসনের আমলে। তার শুরু আগের রাষ্ট্রপতি জনসনের সময়েই। সেখানকার জলায় জঙ্গলে লড়াই করতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছে মার্কিন ফৌজ। বাধ্য হয়েই উত্তর ভিয়েতনামের ওপর বিমান আক্রমণ বন্ধ করেছিল আমেরিকানরা ১৯৬৮ সনে, রাজী হয়েছিল মিটমাটের জন্যে কথাবার্তা চালাতে, ঠিক করেছিল মার্কিন সেপাইদের আর অন্যান্য সামরিক কর্মীদের ওদেশ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। যুদ্ধ শেষ করার কিংবা উত্তরের জিম্মায় দক্ষিণকে সঁপে দেবার ইচ্ছে কিন্তু তাদের ছিল না। রাষ্ট্রপতি নিকসনের মতলব ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের শিখিয়ে পড়িয়ে তাদের মানুষ করে তুলে উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে লড়াই করার ভারটা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মানে মানে আমেরিকানরা সরে পড়বে। অস্ত্রশস্ত্রও তারা যুগিয়ে যাবে, টাকাকড়িও। কিন্তু লড়াই তারা নিজেরা করবে না। আস্তে আস্তে আমেরিকান ফৌজ দেশে ফিরে যাচ্ছেও। এখন নব্বই হাজারের মতো মার্কিনী সামরিক কর্মী আছে ভিয়েতনামে। তাদের মধ্যে লড়াই করনে-ওয়ালা সেপাই ছ হাজারের মতো হবে।

বছর চার বড় রকমের কোনও লড়াই খাস ভিয়েতনামে হয়নি। লাওস আর কাম্বোডিয়াতে অবশ্য তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। তাতে অংশ নিচ্ছে সেখানকার ফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে ভিয়েতনামীরাও। দক্ষিণীরা হাত মিলিয়েছে সরকারী ফৌজের সঙ্গে, উত্তুরে সেনা মদত দিচ্ছে কম্যুনিস্ট বাহিনীকে যারা দক্ষিণপন্থী সরকার উৎখাত করে কম্যুনিস্ট রাজত্ব গড়ে তুলতে চাইছে। সমানে বোমা ফেলে যাচ্ছে কম্যুনিস্টদের ওপর মার্কিন বোমারু বিমান। আমেরিকার ধারণা এই করেই তারা লাওস কাম্বোডিয়াতে কম্যুনিস্টদের ঘাটিগুলো ভেঙে দিয়ে তাদের কমজোর করে ফেলতে পারবে। ঠিক তা যে হচ্ছে না এ কথা মার্কিন সরকারও কবুল করছেন। কিন্তু তাঁরা বলতে চাইছেন, লাওস আর কাম্বোডিয়া হচ্ছে সদর, আসল হচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম। সদর কিছু মারা গেলেও আসল তাঁদের ঠিকই আছে। লড়াইয়ে দিব্যি পোক্ত হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা। দশ লাখ বাঘা ফৌজ তারা তৈরি করে ফেলেছে, তাদের কাবু করা উত্তুরে বাহিনীর পক্ষেও খুবই শক্ত হবে।

প্যারিস বৈঠকের বাইরেও তলে তলে আমেরিকা যে উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে কথা কইছিল তা ফাঁস করে দিয়েছেন হালে নিকসন নিজেই। একবার দুবার নয়, বারো বার তাঁর বিশ্বস্ত চর হেনরি কিসিংগার পাড়ি দিয়েছেন প্যারিসে

গোপনে। নিকসনের তরফ থেকে যে শান্তি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তার জবাবে পাল্টা প্রস্তাবও এসেছিল উত্তর ভিয়েতনামের কাছ থেকে। একতরফা সে গোপন আলোচনার খবর ফাঁস করে দিয়েছিলেন নিকসন, তার ফলে মাঝপথে সে আলোচনা ফেঁসে যেতে পারে জেনেও। তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন উত্তর ভিয়েতনাম চটে গেলেও বিশেষ কিছু এসে যাবে না—লড়াইয়ের নিবন্ত উনুনে নতুন করে আঁচ তারা আর দেবে না। গালাগালি কড়া ভাষাতেই তারা অবশ্য দেবে, কিন্তু তাতে তো তাঁর গায়ে ফোস্কা পড়বে না। দুটো কারণে এমন ধারণা বিস্ময়ের হয়ে থাকবে। এক, তিনি ধরে নিয়েছেন চীন মুখে তড়পালেও উত্তরকে সাহায্য করতে সেনা সামন্ত নিয়ে আসরে নেমে পড়বে না। দুই, দু-চারটে লড়াইয়ে দক্ষিণীরা মার্কিন সাহায্য ছাড়াই উত্তুরে সেনাদের এমন শিক্ষা দিয়েছে যে তারা আর দক্ষিণীদের সহজে ঘাঁটাবে না।

নিক্সনের মনের জোর হালে এতই বেড়েছে যে সাড়ে তিন বছর পরে প্যারিস বৈঠকও তিনি একরকম বাতিল করে দিয়েছেন। চার মাসে বার তিনেক এই বৈঠক মুলতুবি রাখার পর মার্চের শেষাশেষি মার্কিন প্রতিনিধি উইলিয়াম জে পোর্টার ওটা একরকম খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে, ১৪৭ বার বৈঠকের পরও যখন এক পাও এগুতে পারা যায় নি তখন আর ও তামাশা চালিয়ে লাভ কী? এতটা করতে নিক্সন সাহস পেয়েছেন এই ভেবে যে নতুন করে বড় রকমের অভিযান চালাবার মুরোদ উত্তর ভিয়েতনামের আর নেই, ভিয়েতকংদেরও কোমর ভেঙে গিয়েছে। তাঁর আরও ভরসা ছিল কিছু ক্ষতি কম্যুনিস্টরা করেও যদি তাহলেও তাদের মহড়া নেবার শক্তি দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের হয়েছে। এ বছরে টেট পরবের পর উত্তুরে বাহিনী নতুন করে দক্ষিণে হানা দেবে বলে যে শোনা যাচ্ছিল তা তিনি রটনা বলেই মনে করেছিলেন, কান তিনি সেসব কথায় দেননি। কিন্তু ২৯ মার্চ উত্তর ভিয়েতনাম তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে তাঁর হিসেবের ভুল। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে ওদিন থেকে ভিয়েতনামে। উত্তুরে বাহিনীকে রোখা দক্ষিণীদের পক্ষে সম্ভব হল না। ক্রমাগত তারা পিছু হটছে।

কী চায় কম্যুনিস্টরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে? প্যারিস বৈঠকে তাদের একজন প্রতিনিধি বলেছেন তারা সেখানে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান না—চান সত্যিকারের অকম্যুনিস্ট সরকার কায়েম করতে যা হবে স্বাধীন আর নিরপেক্ষ। প্রেসিডেন্ট থিউ গদিতে থাকলে তা সম্ভব নয়। অতএব তাঁকে যেতে হবে। আমেরিকাকে বেইজ্জত করার ফন্দীও তাদের নেই। তারা শুধু চায় জনবল নিয়ে মার্কিনীরা ভিয়েতনাম থেকে বিদেয় নিক। ভয় পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি থিউ। তাঁর কাছে এটা বাঁচার লড়াই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের কাছেও বটে। দক্ষিণীরা যদি হেরে যায় তা হলে ভিয়েতনামে তাঁর তাসের বাড়ি ভেঙে তো পড়বেই, দেশের রাষ্ট্রপতির গদিতে দুবার বসা তাঁর হবে কিনা সন্দেহ। পাগলের মতো বোমা ফেলে যাচ্ছে মার্কিন বিমান উত্তুরে বাহিনীর আস্তানায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। বোমা ফেলেই যদি উত্তর ভিয়েতনামকে কায়েস্তা করা যেত তা হলে কী আর এমন প্রচণ্ড আঘাত তারা হানতে পারতো? শোনা যাচ্ছে, আমেরিকা নাকি পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করার মতলব আঁটছে। কিন্তু তাতে কি তার নতুন বন্ধু চীন সায় দেবে? রাশিয়া কী এর পর ছেড়ে কথা কইবে? বেচারা নিক্সন! তাঁর দু কূল বুঝি যায়।

শিশুদের মুখ

বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

এ কটানা দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টির পর আকাশটা যেন গা পরিষ্কারে মন দিল। এ ক'দিন কী দুর্যোগই না গেছে। আস্ত বাতাসার মতো বৃষ্টির এক একটা ফোঁটা, আর বাতাসও ছিল জোর; ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাওয়ার অবস্থা। তাই আকাশের কালচে ভাবটা ক্রমশ ফিকে হয়ে গাছপালার ফাঁকে ছিট ছিট নীল রঙ প্রায় ফুটে উঠতে দেখে আমরা খুশিই হলাম। কয়েকদিনের ভেজোঁচটে ভুসোকালি কি একবারে যায়? আমরা এমন ভাবে তাকিয়ে ছিলাম যে দরকার হলেই যেন দু'চার টুকরো সাবান ছুঁড়ে দিতে পারি।

কেন না শুকনো শরীর বাতাস কাটে ভাল। পাকা রাস্তার ওপাশে ওই যে মাঠখানা তার ভয়াল একাকিত্ব নিয়ে দিগন্তের সীমারেখা ছুঁয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের তা পার হয়ে যেতে হবে। বসে বসে অপেক্ষায় থাকা যে কী বিরক্তিকর উদ্বেগ! বৃষ্টি সময়ও থেমে যায় কখনো কখনো। মাথার ওপর পাতার আড়ালে আবডালে বাদুড়েরা ঝুলন্ত শরীর নিয়ে ঝিম মেরে আছে। মশার বনবন শব্দ চুলকানির মতো অস্বস্তিকর।

কাল রাতে ঝড়ের দাপট ছিল খুব; ভাঙা [illegible] প্রশাখার মাথা [illegible]। সকালে এখানে আসার পথ [illegible] পাতে থাকা কয়েকটা পাখির ছানাকে আমরা [illegible]। দল-ছাড়া পাখিগুলো তখন উড়ে উড়ে চেঁচাচ্ছিল। দু' একটা তো এমনও চেষ্টায় ছিল যে ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাদের আবার জাগিয়ে তুলবে। শেষে হয়তো বা অভিমানেই দূরে সরে গিয়ে সারাটা দিন ধরে খড়কুটোর বাসা বাঁধতে ব্যস্ত থাকল। হায়, অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও যদি কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেত।

পাতার ঠাসবুননির নীচে দুপুরটা গড়িয়ে যাওয়ার পর থেকেই অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। যা আমাদের শিথিল শরীরের অসংখ্য ভাঁজে তার উৎস। কেননা আলো অন্ধকারের দুটো দরজাই মানুষের মনে পাশাপাশি—একটাকে বন্ধ করে আর একটা খুললে সেটাই পিছনে তার জগৎ ভাসায়। আমাদের অন্ধকার দরজাগুলো হাট হয়ে আছে। কখন যে বাদুড়গুলো উড়বে! ডানায় অন্ধকার তুলে নিয়ে ওরা মাঠ বরাবর উড়লে আমরা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে বাঁচি। বাদুড়ের পিছন পিছন শুকনো শরীর নিয়ে অন্ধকারে অন্ধকারে, অন্ধকার শেষ হওয়ার আগেই পৌঁছে যাব আমরা।

কিন্তু শেষ বিকেলে আর একখানা প্রকাণ্ড মেঘ দুশ্চিন্তা নিয়ে ভেসে এলো। সেই ছবিতে দেখা জীনের মতো দৃষ্টি-জোড়া দুই হাত, শকুন উড়লে তার গলাটা যেমন লম্বা হয়ে যায় তেমনি গলার ওপর বিদঘুটে এক মাথা, ভাঁটার মতো ঘোলাটে চোখ দুটো খলখলিয়ে হাসছে। যেন এক কাল-কেউটে দক্ষিণ থেকে সোজা ধেয়ে এসে ঠিক আমাদের মাথার ওপর বিশাল ফণা মেলে দুলাতে লাগল।

জালাল সাহেব—

কী।

মাসুদ বলল, জোর পানি আসছে।

মুখের ওপর থেকে পাতার আড়াল সরিয়ে দেখলেন জালাল সাহেব। দূরান্তেই চোখের কোণ বসে অন্ধকার [illegible]। কুঞ্চিত কপালে কয়েকটা [illegible] রেখা। সেই দূরদর্শী মানুষটা যে কোথায় গেল।

বললাম, কেমন বোঝেন?

জ্বরটা আরো বেড়েছে মনে হয়
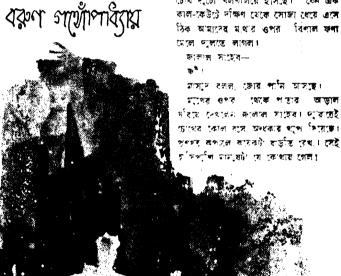
উঠতে পারবে না?

উত্তর দিলেন না জালাল সাহেব। বিপন্ন শরীর বিছিয়ে মেয়েটি নিশ্চুপ। চারপাশে একটা থমথমে ভাব। রসাল শিরা উপশিরায় কাঁচে-সবুজ পাতাগুলো কাঁপছে কি কাঁপছে না। এত যে পাখি ডাকছিল সব গেল কোথায়! মেয়েটির চোখ দুটো লাল। ফর্সা মুখখানা যেন এই মাত্র কাঠের আঁচ থেকে পাশ ফিরেছে। এক মাথা এলোচুল কাদায় মাখামাখি। দুর্বল শরীরটা থেকে থেকেই কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঠোঁটের ওপর কালশিটের দাগ ভয়ংকর তাণ্ডবের স্বাক্ষর যেন। গলার নীচে মসৃণ চামড়া জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে বাসি রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আমাদের কেবলই মনে হচ্ছিল, প্রাকৃতিক ঝড়-ঝাপটায় বনভূমি কি এর থেকেও বিপর্যস্ত, নিঃস্ব হয়?

কাল সারারাত খোলামেলা আকাশটা বুকে নিয়ে মেয়েটি কতক্ষণ পড়ে ছিল কে জানে। হয়তো আমাদেরই মতো অন্ধকার থাকতে থাকতে মাঠে নেমেছিল, বা তারও আগে, কিংবা ঝড়টা যখন ওঠে ঠিক তখনই।

কিন্তু সেটা যে সময়ই হোক না কেন একটা উদ্দাম রাত যে ওর মাথার ওপর দিয়ে গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর রাতটাও এমন কিছু আহা-মরি ছিল না। নদী-মালায় সিক্ত এই যে শ্যামল ভূখণ্ড, এখানেই রক্ত আর দুধের সম্পর্কে আমাদের শৈশব ধপধপিয়ে বেড়ে উঠেছে, পদ্মা-মেঘনা-আঁড়িয়ালের দুর্বার নাচন রক্তে নিয়ে একটা বয়েস,—দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মেজাজ আমাদের জানা। কিন্তু কাল যেন নদীতে কয়েকটা ইলিশ ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল। চারপাশে বাতাসের হিসহিসানি, ঝাঁকড়া খেজুরের সারে দুলছিল। দমকা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির এক একটা ফোঁটা মনে হচ্ছিল যেন তীক্ষ্ন ফলা হয়ে শরীরে চিরে চিরে বসছে। দানোয় পাওয়া পদ্মার বুকের ওপর বসলে জীবনের যে অনুভূতি-গুলো ক্রমশ চূর্ণ হতে হতে ফেনিল হয়ে সর্বাঙ্গ গ্রাস করে ঠিক তেমনি এক অনুভূতির শীর্ষে আমরা মাঠ ভাঙছিলাম। মেয়েটি যে কি করে এতটা পথ আসল! সেই অন্ধকার প্রসারিত চরাচরে আমরা তো ওকে নাও দেখতে পেতাম।

কতই বা বয়েস হবে মেয়েটির অমি ... তেইশ চব্বিশ বা তার দু'এক বছর এদিক ওদিক। নাকের নথটা জল-... মতো চিকচিক করছে। ওর নিশ্চয়ই ... ছিল। আর কে কে ছিল? শ্বশুর ... আত্মীয়স্বজন। হয়তো দেওরও ... একজন ভাইয়ের মতো। আচ্ছা ওর ... কোন ছোট্ট ভাই ছিল? শ্বশুরবাড়িতে ... ওর জন্য ও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। ... হয়তো বাড়ির বড় ছেলে; ... অনেকখানি দায়িত্ব মাথার ওপর। ... সেই হয়তো আবাদী জমি ছিল ... খরিফের ধান ঝরিয়ে সোনার ... বছর বছর। আর মেয়েটি সারাটা ... শ্বশুরবাড়ির দেয়ালের ফাঁকে ... আর গোয়াল ঘর, পুকুর ... কাচ—সবই কতো যেন হাত ... নিকোন উঠোনের কোথাও ... জমলে ওর দৃষ্টি এড়াত না। ... পান মুখে দিয়ে ঘরে যেত। সেই ... যে ওর ভালবাসার ঘর ছিল তা ... হয়। কেননা সেই উত্তাপে এখন ... গভীরে আর এক জীবনের ... মানুষে মানুষে যা নাকি সর্বাতীত সম্পর্ক সেই রক্ত আর দুধের সম্পর্ক ওর ... গভীরে লালিত হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটি কতদিন ধরে ঘর-ছাড়া? হায়, হায় রে আমার দেশ, মেয়েটির ঠোঁটের কালশিটে ... কতদিনের বাসি? তবু আমি না ভেবে পারলাম না, ওর কি আর কেউ ছিল না? ওর কোন সন্তান? হৃদয়ের পরম অনুভূতি দিয়ে যাকে ও লালন করেছে? ওর অভি-... সন্তান? ভালবাসার?

আমার কেবলই মনে হতে লাগল, ওর আর এক শিশু সন্তান ছিল। কেননা আমিও তো মায়ের দুধে ঠোঁট ভিজিয়েছি; দুধের রঙ চেনা। মায়ের বুক চিনতে কি ভুল হয়? ওর যদি আর এক সন্তানই ছিল তাহলে সে এখন কোথায়? হয়তো ছেলে। ছেলেটার কি হলো? সেই ছোট্ট ছেলেটা? হয়তো না ধরলে এখনো ভাল করে হাঁটতে পারে না। হাঁটার থেকে মায়ের কোলে ওঠাতেই ছেলেটার আনন্দ বেশি। তাই মাকে একটু দূরে দূরে থেকেই হাত বাড়াতে হয়। কিন্তু ভাবলে হাতের নাগালের বাইরে! সেই ছোট্ট ছেলেটি? আমি যেন পূর্বপুরুষদের অন্তিম আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সমস্ত গোরস্থান কাঁপিয়ে তাঁরা হায় হায় করছে, শিশুরা জন্ম দেবে, জন্ম দেবে বলে—।

তাল গাছের মাথায় একটা পাখি ডাকলে আমরা সতর্ক হয়ে বসলাম। ওখানে পাতার আড়ালে গা ঢেকে মাসুদ বসে আছে। কিছু একটা সন্দেহজনক দেখলেই মাসুদ পাখি ডাকে, যাতে অপর কেউ শুনলেও এখানে মানুষের উপস্থিতি জানতে না পারে। সকাল থেকে পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে মিলিটারি কনভয় গেছে কয়েকটা। আইছাড়া এমনও মানুষ আছে, হয়তো আমাদেরই আশপাশে ঘাপটি মেরে, যারা সুযোগ পেলেই দক্ষিণ রায় সেজে আমাদের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

পায়ের মাটি কাঁপিয়ে বাতাসে পোড়া তেলের গন্ধ ভাসল। আকাশে মেঘের পাল যেন আরো কুটিল। বৃষ্টি নামল বলে। মেয়েটিকে নিয়ে কি করে আমরা মাঠ ভাঙব ভাবছিলাম। এত জ্বর-শরীরে মাটিতে পা ফেলা সম্ভব নয়। আর কোনক্রমে যদি বা ফেলেও, আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারবে কি? ঝড়-জলের রাতে নির্ঘাত মাঠের ওপর মারা পড়বে। কিন্তু, আমরা ভাবলাম, এখানেই কি এমন আছে যে মেয়েটিকে আরোগ্য দেবে? এখন ওর একান্ত ভাবে যা দরকার তা হলো হাত তিনেক শুকনো জমি, মাথার ওপর একটু ছাউনি, কিছু উষ্ণ পরিমণ্ডল আর শুশ্রূষা। নিজেদের জীবনের বিনিময়ে ছাড়া এসব কি করেই বা আমরা ওকে দিতে পারি! সেই নিকট লোকালয় যে কেমন হবে আমাদের জানা নেই। প্রত্যেকের জন্যই এক একটা রক্ত মাখা ছুরির মুহূর্তে ঝলকে উঠতে পারে। মেয়েটিকেও কি বাদ দেবে ওরা? কিংবা যা আমাদের আরো নিরুৎসাহ করল, ওর কালশিটে মারা ঠোঁট দুটোই

যদি আরো ক্ষতবিক্ষত হয়। মৃত্যুর আগে কি বলে আমরা নিজেদের প্রবোধ দেব?

যখন আমরা মাঠে নামলাম তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আগের থলথলে কাদার ওপর যেন চটপটির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। বাতাস তেমন নেই। আমাদের সারাদিনের আবাস সেই জংলা জায়গটা পেছনের অন্ধকারে আর দেখা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ আগেই বাদুড়েরা অন্ধকার ডানায় নিয়ে উড়ে গেছে। আমরা খুব সাবধানে পা ফেলছিলাম। পিচ্ছিল মাটিতে মেয়েটি পড়ে যেতে পারে। জালাল সাহেব শক্ত মুঠোয় ওর একটা হাত ধরেছেন। পিছনে মাসুদ। আমি সামনের অন্ধকার পিছনে ঠেলে ঠেলে আরো অন্ধকারের গভীরে পথ হাতড়াচ্ছি। হায়, হায় রে আমার দেশ, কে যেন কাকে বলেছিল, মানুষই একমাত্র দিবালোকের সন্তান!

বৃষ্টির তোড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাঁপির টান শুরু হলো। বুকের ভেতরে ফুসফুস দুটো যেন চুপসে গেছে। পাগুলো কারা যেন পিছন থেকে টেনে টেনে ধরছে। জল-কাদা ভেঙে এক সরীসৃপ ছাড়া দ্রুত এগোন মুশকিল। অসমতল জমি, ভাঙা আলের আঘাতে পায়ে জড়িয়ে যাওয় টানাটানি নিয়ে আমাদের মাথাগুলো বুকের ওপর ঝুলে ঝুলে নামছে। জালাল সাহেব বারেই বারেই পিছিয়ে পড়ছেন। মেয়েটি বার কয়েক পড়ে গেলে মাসুদ ওকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে মাঠ ভাঙছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম, এ ভাবে আর বেশি দূরে যাওয়া যাবে না। হয়তো কাল সকালেই শকুনেরা এই মাঠকে ঘিরে চক্কর দেবে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটানা গোঙানির মতো শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা। বাতাস হু হু করছে। আরো কিছুটা এগিয়ে বুঝলাম বাঁশঝাড়। লম্বা লম্বা ছুঁচোলো পাতায় বাতাস দু ফাঁক হওয়ার শব্দ। তালগাছ-গুলোর ঝুপসি মাথায় বসে আজরাইল যেন বুক থাবড়াচ্ছে। সুপারির সারি আউল বাউল। অন্ধকারের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঈষৎ আলো দেখতে পেলাম যেন। উত্তাপ। ঝিমন্ত চোখ টানটান করে সেদিকেই তাকিয়ে থাকলাম আমরা।

অসময়ে দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে কিম্ভূত আমাদের দেখে ভয় পাওয়া দূরে থাক বুড়ী হেসে বললেন, তাহলে তোরা এলি! আমি তো ভাবছিলাম যে বৃষ্টি, মেয়েটির ওপর চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলেন, ও আবার কে?

এক মুখ কালো ধোঁয়া তুলে ঘরের কোণে যে কুপিটা জ্বলছিল আমাদের চোখ তখনো সেইদিকে। মাটির হলেও ঘরটা বেশ বড়সড়। খড়ের চালে ঝুল জমেছে বিস্তর। শিকের তিনটে হাঁড়ি ঝুলছে। একটা তক্তাপোশ আছে দেখছি! আঃ, কতদিন পরে যে এমন একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেলাম।। কোথায়, অন্ধকারের কোন অসীমে—, ফেলে আসা রেের কথা মনে পড়ল আমাদের।

মাসুদ তক্তাপোশের ওপর মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে বলল, শুকনো কাপড় আছে?

মেয়েটির গায় হাত দিয়ে বুড়ী চোখ কপালে তুললেন, ওমা, সব যে ঠাণ্ডা। মাসুদের দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, তোদের আক্কেল আর কিসে হবে। তারপর নিজের মনেই খানিকক্ষণ গজগজ করলেন, আর আকাশটার হয়েছে তেমনি, ছ্যা ছ্যা, সব ভাসিয়ে দিলো গো।

মুখ কাঁচুমাচু করে আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। পিছনের খোলা দরজা দিয়ে হু হু বাতাস, আলোর শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। দপ করে নিবে গেলেই চিত্তির।

কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে, আমরা ভাবলাম, বুড়ী কি আমাদেরই অপেক্ষায় ছিলেন? অথচ এটা নিশ্চিত যে বুড়ীকে আগে কখনো দেখিনি আমরা। এ তল্লাটেই আসি নি কখনো। তাহলে কি অন্য কারুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন? সব রকমের দুর্যোগ মাথায় নিয়েও যাদের আসবার কথা ছিল? হয়তো আমাদেরই মতো তারাও বুড়ীর অপরিচিত। আগে কখনো চোখে দেখেন নি। কিন্তু বুড়ীর সস্নেহ হাসির উষ্ণতায় বিশ্বাস করা কঠিন যে তিনি উটকো মানুষজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। চোখে না দেখলেও তাদের একটা পরিচয় নিশ্চয়ই বুড়ীর জানা আছে। সে পরিচয়টা কী? আমাদের পায়ের কাদা শুকনো মেঝেটা ভিজে উঠতে দেখে নিজেদেরই বিশ্রী লাগল।

জালাল সাহেবের চুলে পাক ধরেছে কিন্তু বুড়ী যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না। শুধু মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে বললেন, আ তোদেরই বা কি এমন ছিরি যেন এক একটা কাকতাড়ুয়া। তোবড়ানো গাল নাড়িয়ে হাসলেন, দুটো যখন আর দিতে পারি তোদের।

দুটো পুরোন থানই নয়, সঙ্গে একটা কাঁথার ওয়াড় পাওয়া গেল। দাওয়ার ওপর শুকনো কাপড়গুলো দিয়ে ঝেড়ে

ঝুপে বসলাম। বৃষ্টি যেন একটু কমেছে মনে হয়। চার পাশে অন্ধকার লেপটে আছে। মাঠ ভেঙে আসবার সময় আরো কয়েকটা ঘরের অবস্থিতি বুঝতে পেরেছি আমরা। কি নাম গ্রামটার? ক'ঘর বসতি? মানুষজনই যদি থাকে তাহলে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া বাইরেটা এত সুমসাম কেন! এটা ঠিক যে বৃদ্ধার ঘরে কোন পুরুষ নেই। আর কোন মানুষই নেই হয়তো। তাহলে কি বৃদ্ধা একাকী ঘর আগলাচ্ছেন?

দাওয়ার ওপাশে কাঠের উনোনটা নিবু নিবু হলে অন্ধকার আবার ফিরে এলো। এতক্ষণ বেশ তাপ পাচ্ছিলাম। জালাল সাহেবের তামাটে মুখ যেন জ্বলছিল। মাসুদ ঝিম মেরে আছে। মেয়েটির জ্ঞান নিশ্চই এখনো ফেরে নি। আমরা বারে বারে দরজার দিকে তাকাচ্ছিলাম। জোলো হাওয়ার জন্য দরজাটা ভেজানো। কিছুক্ষণ আগে বোতলে গরম জল ভরে নিয়ে বৃদ্ধা ভেতরে গেছেন।

আমরা ভোর হওয়ার কথা ভাবছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরেই রাত ফর্সা হবে। আকাশে আলো দেখা দিলে এখানে, এই নিরুদ্বেগ আবাসে, অন্ধকার পাবে কোথায়? বৃদ্ধার পক্ষে যা ভয়ের নয় তা আমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। মেয়েটিকে এখানে রেখেই চলে যাব আমরা। বৃদ্ধা নিশ্চয় মায়ের মতো বুকে নিয়ে আগলে আগলে মেয়েটিকে সুস্থ করে তুলবেন। কিন্তু বয়েসটা? মেয়েটির সব কিছু আগলে আগলে রাখলেও সোমত্থ শরীরটাকে কি করে আগলে রাখবেন বৃদ্ধা?

গোঙানির শব্দে আমরা উন্মুখ হলাম। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে এক চিলতে আলো দাওয়ার নীচু চাল ছুঁয়েছে। সামনের এক গুচ্ছ বৃষ্টি ইলিশের পিঠ যেন। চৌকাঠ পেরিয়ে বৃদ্ধা বাইরে এলেন।

এখন জ্বরটা ছাড়লে বাঁচি। বৃদ্ধা হাসলেন, ঘরে মুড়ি আছে দেব?

আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। জালাল সাহেব বাঁশপাতার মতো ঠোঁট কাঁপিয়ে কি বললেন বোঝা গেল না।

বৃদ্ধা বললেন, আয়, ঘরে আয়।

মাসুদ ইতস্তত করল, এখানেই তো বেশ।

অন্ধকারে খাবার দিতে আছে? বৃদ্ধা হাসলেন, আর লজ্জা করতে হবে না, আয়।

আমাদের থেকে একটু দূরে বৃদ্ধা বসলেন। এক সময় দেখতে সুন্দরই ছিলেন বলতে হবে। এখন মুখে বলি-রেখার চিহ্ন, গায়ের চামড়া শিথিল হয়ে তেলোতলো। মেয়েটির ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ভারী কাঁথার ওকে ঘিরে এখন অনেক উষ্ণতা। যদিও খিদে আমাদের প্রচুর

চলুন
রিচব্রুর
চালে
যেমন
সরেস
তেমনি
গাঢ়
তেমনি
কড়া
একমাত্র প্যাকেটের
চা-ই থাকে তরতাজা,
থাকে স্বাদেগন্ধে
ভরপুর।
LIPTON'S
RICHBRU
TOP QUALITY LEAF TEA
লিপটনের
রিচব্রু
LRC-10/72 BEN

তথাপি অশেষ কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধার দিকে না তাকিয়ে পারলাম না।

জালাল সাহেব একটা বাতাসা চিবিয়ে বললেন, এদিকে মিলিটারী আসেনি?

আসে নি আবার! বৃদ্ধা চোখ কপালে তুললেন, একদিন তো ওই উঠোনের ওপর বন্দুক বাগিয়ে ধরল। ইয়া গোঁফ, রঙ যেন ফেটে পড়ছে। মাগো, আর একটু হলে ভিরমি যেতাম।

মাসুদ খাওয়া ভুলে বলল, কি করলেন তখন?

একা মানুষ, কি আবার করব। সবাই তো তার আগেই পালিয়েছে। ওদিকে ওই যে হাতিমপুরের জঙ্গল—, সতর্ক দৃষ্টি তুলে বৃদ্ধা আমাদের দেখে বললেন, পোড়া কপাল আমার।

জালাল সাহেব মাথা নীচু করে মাটি খুঁটছিলেন। নিজেকে গাল দেওয়ার মতো করে বৃদ্ধা বললেন, আজকাল দেখছি কোন কিছু না থাকলেও ভয় পাই।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মাসুদ বলল, একা থাকতে আপনার ভয় করে না?

করে না আবার। বৃদ্ধা হাসলেন, ভাগ্যিস তোরা এলি।

মেয়েটি পাশ ফিরল। ওর গায়ের তাপ দেখে ফিরে এসে বৃদ্ধা আবার বসলেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমার বয়সী কেউ তো আর এই গাঁয় ছিল না, তাই ছেলে-মেয়েরা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে জঙ্গলে চলে গেলে আমি ওদের ঘর-দোর আগলাতে লাগলাম।

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম বৃদ্ধার মুখে এখনো দুষ্টুমির হাসি খেলে। আর তাছাড়া, বৃদ্ধা বললেন, বাচ্চাগুলোর পেছনটাও তো আগলান দরকার। তাই আমি থেকেই গেলাম।

তারপর?

বৃদ্ধা চোখ বড় বড় করে বললেন, প্রথমে তো আমি সত্যি সত্যি হাউ মাউ করে উঠলাম। ওদের মধ্যে একজনের কথা অল্পস্বল্প বুঝতে পারছিলাম, তার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম, বললাম পার আমার ছেলে কেমন আছে? পশ্চিমে যে যুদ্ধ করছে সে কবে ফিরবে? কন্মুহূর্তে দম নিয়ে বললেন, ডাকরাগুলো তো বিশ্বাসই করে না। ইকির মিকির করে কি যে ছাই বকছিল! শেষে হোসেনের একটা চিঠি দেখাবার পর বন্দুকের সামনে থেকে সরিয়ে নিল। চারদিকটা দেখিয়ে বললাম, দেখছ না আমাকে একা রেখে আর সকলেই হিন্দুস্থানের দিকে পালিয়েছে।

বৃদ্ধা হাসলেন, ওরা কিছুক্ষণ দাঁতে দাঁত ঠেকালো। তারপর ভুস করে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় আমি দুর থেকে আবার বললাম, হোসেনের সঙ্গে দেখা হলে আমার কথা বলো, ওর মায়ের কথা।

আপনাকে বিশ্বাস করল, বাঃ! মাসুদ বলল।

কেন করবে না?

তাহলে সত্যি সত্যি আপনার ছেলে আছে! চিঠি দিয়েছে!

ছেলেমানুষের মতো হেসে বৃদ্ধা বললেন, তোদেরই মতো হবে, চুল পাক ধরেছে। একটা বুক ভাঙা নিঃশ্বাস ফেললেন, শীতটা যাওয়ার মুখে শেষ চিঠিটা পেয়েছিলাম।

তবু আমাদের যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। বৃদ্ধার ছেলে মিলিটারিতে আছে! তার চেহারা কেমন? কতক্ষণ যে ঘাড় গুঁজে ছিলাম আমরা!

এমনও তো হতে পারে হোসেন এ সবের কিছুই জানে না; ওরা ওকে জানতে দিচ্ছে না। আমরা নিজেরাই কি জন্মে কখনো মেয়েদের পেটে লাথি মারতে

রেখেছি? কিংবা, বৃদ্ধার চোখ ছলছলিয়ে উঠল, হোসেনকে ওরা হয়তো আটকে রেখেছে। হয়তো বা মেরেই ফেলেছে।

বৃষ্টিটা যেন আবার চেপে নামল। জোড় হাওয়ায় দরজাটা হা হয়ে আমাদের দীর্ঘ ছায়াগুলো উলটে পালটে পাক খেয়ে খেয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। কুপির বুক থেকে ওঠা ভুসো কালির কটু গন্ধে নাক মুখে জ্বালা জ্বালা ভাব।

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও দিচ্ছে বেশ। সহজে থামবে বলে মনে হয় না। রাত কতটা গড়িয়েছে কে জানে। পুব আকাশে যেন গুটি কয়েক করমচায় পাক ধরেছে মনে হলো। মেঘলা আকাশে সিংহাসন পান আর না-পান সূর্য ঠাকুর সাজ-পোশাক শুরু করে দিয়েছেন। মেরেটে এবার আমাদের বেরিয়ে পড়া দরক ফর্সা হওয়ার আগে বাদুড়ের পিছু আর একটা অন্ধকার জায়গা খুঁ হবে।

ছ্যা ছ্যা, মিনসের কোন আ গো। মাঠ ঘাট সব ভাসিয়ে দিল গাছগুলো মারা পড়লো ছেলেরা ব

॥ সাতচল্লিশ ॥

ডক্ এরীয়া ছেড়ে খানিকটা এগুতেই একটা গলির টেরে খানকয়েক ছ্যাকরা গাড়িকে খাড়া দেখলাম। তারই একশো এগারো নম্বরের একখানাকে ভাড়া করে তিনি গিয়ে চেপে বসল আমায় নিয়ে।

'ভাড়া তো করলি, কিন্তু মেটাবি কি করে?' আমি বললাম : 'পকেট ফাঁকা, গড়ের মাঠ! একটাও টাকা নেই আমার।'

'তোমার তো খালি টাকাই নেই, আমার যে একটা পয়সাও নেই গো!'

'তাহলে?'

'বাড়ি তো গিয়ে পৌঁছুই আগে। বাবার কাছে চাইবো। তিনিই মিটিয়ে দেবেন তখন।'

'মার কাছে চাইলেও পারিস।'

'মা? বাব্বা! মার সামনে এখনি আমি এগুচ্ছি না সহজে। আমাকে দেখলে আর রক্ষে রাখবে না মা—কী যে আজ আছে আমার অদৃষ্টে ভগবানই জানেন!'

'রক্ষে রাখবে না? জেলে যাওয়ার জন্য বকবে বুঝি খুব?'

'শুধু জেল! কতো কী! সে তুমি কী বুঝবে তার!' সে গুমরায়।

'মাকে এড়িয়ে কতক্ষণ থাকবি? বাড়িতে মার সামনে না পড়ে থাকা যায় নাকি?'

'ঢাল দিয়ে যেমন তরোয়াল আটকায় না? তেমনি আমি বাবার আড়ালে আড়ালে থেকে মাকে ঠেকাবো।'

'আমার বরাতে ঠিক উলটোটাই। আমায় মার আড়াল দিয়ে বাবাকে ঠেকাতে হয়। বাবার মার এড়াতে মার আড়াল লাগে আমার।'

'বাবা খুব মারে বুঝি তোমায়?'

'বাঃ! মারে না? না মারলে তো বাবা কিসের। মারবার জন্যেই তো বাবারা জন্মেছে রে! বাবার এক এক চাপড়ে পাঁচ পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায় আমার গায়। মা তখন কতো আহা আহা করে হাত বুলিয়ে বুকে দেয় যায়গাটা—তখন ভারি আরাম। তাইতেই পুষিয়ে যায় আমার। মার-খাবার ইচ্ছে করে আবার।'

'আমরা যখন বেরুলোম না জেল থেকে? জেল-ফটকের ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটা দেখেছি। এতক্ষণে চারটে বেজেছে মনে হয়। এখান থেকে আহিরিটোলা তো কমখানি পথ নয়, বেতো ঘোড়ারা যেমন টিমে চলছে না, এমনি টিকিয়ে টিকিয়ে যেতে যেতে বাড়ি পৌঁছতে সাতটা বেজে যাবে নির্ঘাত। বাবা নীচে নেমে এসেছেন ততক্ষণে। তাঁর চেম্বারে রুগীপত্তর আসতে শুরু করেছে। বসে বসে তিনি রুগী দেখছেন তখন, দেখব গিয়ে আমরা।'

'বৈঠকখানার ঘরে বসে রুগী দেখেন? মা সেখানে আসেন না কখনো?'

'নেহাত দরকার পড়লে আসেন নইলে নয়।' তিনি কয় : 'বাবা ঘুম থেকে ওঠেন কাঁটায় কাঁটায় চারটেয়—শীত কী গ্রীষ্মে

কী! চানটান সেরে চা টা খেয়ে তৈরি হতে পাঁচটা বাজে তাঁর। সাড়ে পাঁচটায় তিনি নীচের চেম্বারে নেমে আসেন। হকার সেই ভোরেই স্টেটসম্যান দিয়ে যায়, পড়েন বসে বসে। তারপর রুগীরা সব আসতে থাকে একে একে। আশপাশেরই তো রুগী যতো, পাড়ারই বেশির ভাগ। তাদের দ্যাখেন। যে যা দেয় তাই নেন।'

'আর দুপুর বেলায় করেন কী? পড়ে পড়ে ঘুমোন বুঝি আমার বাবার মতন?'

'ঘুমুবেন বাবা? তাবেই হয়েছে। ও'র খালি কাজ আর কাজ। কাজ ছাড়া কথাটি নেই। এগারোটা না বাজতেই খেয়ে দেয়ে ফের তিনি বেরিয়ে পড়েন—শহরতলীর কোথায় কোন এক জুটমিলে চলে যান। সেখানকার বাঁধা ডাক্তার তিনি। মাস গেলে সেখান থেকেও হাজার আড়াই আসে তাঁর। সেই জুটমিলের থেকেই।'

'তার ওপর এখানে সেখানে উপরি কল তো রয়েছেই! নেই কি রে? ঘরে বসে রুগী দেখে তার থেকেও তা পান আবার? মোটামুটি জোটে তাঁর বেশ, কী বলিস?' আমার অনুযোগ।

'তা তো জোটেই। তবে বাবার বেশির ভাগ আর ঐ জুটের থেকেই।'

'আর ওই এধারে-ওধারে যা জুটে যায়! তাই বা কম কী রে?'

'ডাক্তারদের উপায় কি কম নাকি গো? সেইজন্যেই তো ডাক্তার হতে এত করে সাধছিলাম তোমায়!...এবার তুমি সেরে উঠে পড়াশুনায় মন দেবে তো, কেমন? দেশো-দ্ধার তো হয়ে গেল! দেখলে তো সব। এবারটি নিজেকে উদ্ধার করতে লাগো এখন।'

'বাঃ, এ কী হোলো! দেশের জন্যে প্রাণ দিতে হয় না? দিয়েছি কী?'

'দিতে বসেছিলে প্রায়। বুদ্ধি করে তোমায় বাঁচিয়ে আনলাম—তাই না? দেশের জন্য একবার করলেই হোলো, ছেলে মেয়ে তো কম নেই এদেশে। তারা করুক এবার। দেশোদ্ধারের কাজ তো ভাই একজনের নয় —সবাই মিলে করবার—তাই না? তাদের সবাইকে চান্স দাও এবার। দেশের কাজ করার সবাই সুযোগ পাক। নিজেই একলা দেশটাকে টেনে তুলবে, এমন স্বার্থপর হয়ো না গো!'

আহিরিটোলা পৌঁছুতে সাতটা বাজলো প্রায়। রিনির বাবা চেম্বারে এসে বসেছেন তখন। একজন রোগীকে দেখছিলেন খুব যত্ন করে। রিনি গিয়ে বলল, 'বাবা, গোটা কয়েক টাকা দাও তো, গাড়িভাড়া মেটাবো।'

রুগী দেখার ফাঁকে চোখ তুলে তাকালেন একবার, একটি কথাও না বলে টেবিলের ওপর থেকে ওকে তুলে নিতে বললেন ইশারায়।

রুগীদের ফীসের টাকা টেবিলের ওপরে ছড়ানো পড়েছিল, তার থেকে নিয়ে রিনি বেরিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপটি করে।

রিনি ফিরে আসার আগেই সে রুগীটিও ফী দিয়ে চলে গেছে! আমি আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছিল কেমন। সামনের সোফাটায় গিয়ে বসে পড়েছি।

রিনিও এলো, আমিও এলিয়ে পড়েছি সোফায়।

'বাবা, রামদাকে একটু দেখবে? কী

প্রকাশিত হল

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন
"বীর একটি জাতির বিজয়-সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ এই
গ্রন্থে বিধৃত। আমার আশা, বাংলাদেশের ভাগ্য ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে
আমাদের দেশের সংবাদপত্র এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরঙ্গ
যোগের একটি দলিল হিসাবেও এই বইটিকে দেখা হবে।"
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ
করেছেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সংগ্রামের আগের এবং
পরের ইতিহাস, ধারাবাহিক রচনা ও আলোকচিত্রমালায় চমৎকার
সাজানো হয়েছে। বইটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান দলিল।"

ভারতের পুস্তক প্রণয়নে

হ্যাঁ, মূল্যবান দলিল নিশ্চয়ই। কেননা এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের
পরিকল্পনা ও পরিশ্রম। একে সমৃদ্ধ করেছে খ্যাতনামা সাংবাদিকদের
তথ্যনিষ্ঠ সাবলীল রচনা আর ক্ষমতাবান আলোকচিত্রীদের
সুনির্বাচিত আলোকচিত্রমালা।

ঐতিহাসিক, তুলনাহীন

কিন্তু এই বইটি শুধুমাত্র লেখা ও ছবির যান্ত্রিক বা গতানুগতিক
যোগফল নয়। লেখার সঙ্গে ছবি, লেখা ও ছবির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-
ভাবে যুক্ত বিভিন্ন হরফের শিরোনাম ও বিবরণী বইটিতে মিলেছে
নিবিড় ঐক্যবন্ধনে। সব মিলিয়ে ভারতীয় পুস্তক প্রণয়নের
ইতিহাসে বইটি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, তুলনাহীন।

বাংলা নামে দেশ

বড় আকারের বই। আগাগোড়া অফসেটে ছাপা। আটটি পর্ব। অসংখ্য
পার্শ্ব উপাখ্যান। পাতায় পাতায় ছবি।

দাম দশ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯ ॥

হয়েছে ওর?' রিনি বলল, কদিন ধরেই ও ভুগছে বেজায়?'

শোনা মাত্রই ওর বাবা উঠে এসে আমাকে দেখতে বসলেন। রিনি তার চেয়ারটা সোফার কাছে টেনে এনে রাখলো।

বাবা প্রথমে আমার হাত নিয়ে নাড়িটা দেখলেন। তারপর বুকে স্টেথিস্কোপ বসালেন, তারপর পিঠের দিকে...ওরই ভেতর এক ফাঁকে রিনিকে বলেছেন—'ছোট সিরিঞ্জটা ধো তো বেশ করে। টেবিলের থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ায়।'

বেহুঁশের মত হলেও আমি হুঁশ হারাইনি তখনো। প্রায় আচ্ছন্নের ন্যায় হয়েও, টের পাচ্ছিলাম সব। শুনতে পাচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম বেশ।

উনি আমায় একটা ইনজেকসন দিলেন আর বললেন—'তোর মাকে ডাক তো। একবারটি। দুধ গরম করে আনতে বল চট করে।'

'মাকে এখন বিরক্ত করার দরকার কী বাবা? মোড়ের মেঠাইওলার দোকানে তো পাওয়া যায় গরম দুধ। আনব?'

'তাই আন না হয়। ভাঁড়ে করে আনবি তো? ভাঁড়টা গরম জলে ভালো করে ধুয়ে দিতে বলিস গোড়ায়।'

'গরম জল যদি না থাকে? ওদের তো চায়ের দোকান না।'

'বেশ ফুটন্ত দুধতো? তাহলে ওই গরম দুধ দিয়েই ভাঁড়টা ধুয়ে নিবি একটুখানি—বুঝেছিস?'

আমি কি বেহুঁশ হয়ে পড়ছি নাকি? এক্ষুনি কি অজ্ঞান হয়ে পড়ব? মারা যাব এবার? কী হয়েছে আমার যে!...

গলার থেকে বোল সরছে না আমার—মাথার ভেতর যতো আবোল তাবোল ভাবনা।

বাবার মতই হোলো নাকি আমার? বাবার যেমন মাঝে মাঝে হয়? দিন কয়েক অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন বিছানায়। তারপর একদিন আপনার থেকেই সেরে ওঠেন—জ্ঞান ফিরে পান আবার।

কী হোতো যে বাবার কে জানে! তখনকার কালে ওসব রোগের নাম ধাম চিকিৎসা কিছুই বেরয়নি নাকি।

চাঁচল রাজ হাসপাতালের ডাক্তার বিপ্রদাস বাবু আসতেন—দেখতেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাবাকে তাঁর যথাসাধ্য পরীক্ষা করতেন। দেখেশুনে শেষমেষ বলতেন—'কোমা হয়েছে তোমার বাবার। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এর কোনো দাবাই নেই। আমার জানা নেই অন্ততঃ।'

'সারবেন না বাবা?' কাচুমাচু হয়ে শুধাতাম। মারা যাবেন নাকি? সে কথা জিগেস করার সাহস হত না, মন যে কেমনটা করত তখন!

'সারলে আপনার থেকেই সারবেন। এখন কদিন এভাবে থাকেন কিছুই বলা যায় না। জল খাওয়াতে হবে খুব। আর ফলের রস টস। এই চলুক।'

'হাঁ করছেন না তো! খাবেন কি করে?'

'হাঁ করিয়ে খাওয়াতে হবে। ঐ জল আর ফলের রস। খুব একটু একটু করে। মাঝে মাঝেই।'

'ওষুধ দেবেন না?'

'এর কোনো ওষুধ নেই, বেরয়নি এখনো। কবরেজি শাস্ত্রে এই ব্যামোকে সন্ন্যাস রোগ বলে থাকে। আমরা বলি কোমা।'

'কোমাটা কী?'

'কোমা হচ্ছে কোমা—আবার কী? মরবার আগে হয়ে থাকে অনেকের, আচ্ছন্নের মতন এই পড়ে থাকা। আবার মরবেই যে তারও কোনো মানে নেই। ভালোও হয়ে উঠতে পারে ভগবানের ইচ্ছায়। সবই তাঁর হাত।'

'কিন্তু মা যে বলেন উনি এখন সমাধিতে রয়েছেন?'

'সেই কথাই বলেন। ঐ কোমাই। সংস্কৃত ভাষায় সমাধি। একেবারে খতম্ হবার আগে, মানে সমাধার আগে হয়ে থাকে।'

'না না, তা নয়। ঠাকুর পরমহংসদেব বলেন না...?

'সেই সমাধি তো? জানি। যে-সমাধি

হলে, উনি বলেন, লোকে আর ফেরে না, কদাচ দু এক জনা ফিরে আসেন লোক-শিক্ষা দেবার জনাই? সেই তো? সেই কথাই তো কইছি আমি।

মার কিন্তু ভিন্নমত ছিল। মা বলতেন, ছাই জানে ওই ডাক্তার। উনি এখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে রয়েছেন। দেবদেবীদের সঙ্গে মুলাকাত করছেন এখন।

একেবারে মূলে ধরে টানতেন মা। সিরিয়াসলি বলতেন, কি ঠাট্টাতামাশায়—তা মাই জানেন!

মুলাকাতের কাতর দশা কাটিয়ে ফেরার পর বাবাকে আমি শুধিয়েছি, বাবা, তুমি নাকি ইন্দ্রলোকে চন্দ্রলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে? দেখা হয়েছিল মহাদেবের সঙ্গে, মা দুর্গাকে দেখেচ? দশ হাত নিয়ে লটর পটর করছে মা? দশ দশটা হাত নিয়ে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ও'র? ঘুমোতে পারছেন? পাশ ফিরে শোন কি করে?

মা হাসতেন আমার কথায়—খোকা ছেলে কোথাকার। মার কি চোখ বুজবার ফুরসৎ আছে একদণ্ড? বিশ্বজোড়া এত ছেলেমেয়ের দায়ভাবনা ঘাড়ে নিয়ে......? এক মুহূর্তের জন্যে তিনি চোখ বুজলেই আমাদের চক্ষুস্থির! মায় মহাদেব সমেত সবার!

'বলো না বাবা, কী হয়েছিল তোমার ওই: সমাধি না কী?'

'আমার কী হুঁশ ছিলরে! আমি বাঁচাতে বসেছিলাম।'

তার মানে, তিনি মরতে বসেছিলেন তখন। বাবা বলতেন মন্দ কথা কখনো মুখে আনতে নেই। মুখের কথা ফলে যায় অনেক সময়। তাই মরতে বসেছি না বলে ঘুরিয়ে অমনি করে বলা ঐ কথাটা!

বাবার জবাবে ডাক্তারের জবানির সায় ছিল যেন...

অর্ধচ্ছন্ন অবস্থায় আমার মনে হতে লাগল, বাবার সেই রোগটাই ধরেছে বুঝি আজ আমায়। উত্তরাধিকার সূত্রে মার হাঁপানি যেমন নাকি আমার পাওনা হয়ে রয়েছে মা বলেছেন, তেমনি সেই জন্মসূত্রেই বাবার সন্ন্যাসের এই দায় আমার ঘাড়ে এসে চাপল এখন। বাবা সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে গিয়ে যে-পাহাড়ে ব্যাধিটা তাঁর জটাজুটে বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন, হিমালয়ে না গিয়েই ঘরে বসেই সেটা অমনি আমার জুটে গেল বোধহয়—নিখরচায় এই আমদানি!

সেই কোমাই ধরেছে, ধরতে যাচ্ছে বুঝি আমায়?

কোমা? কোমাটা কী? আধা বেহুঁশ অবস্থায় নিজেকেই আমি শুধাই।

কোমা মানে কোমা—আবার কী? আপনার থেকেই জবাব পাই। বাক্যরচনার গোড়ায়, প্রথম পদক্ষেপেই যিনি দেখা দেন—সেই কমা-ই একরকম আর কি? ডাক্তারি ব্যাকরণে ঐ কোমা। অর্থাৎ বাক্য সম্পূর্ণ হয়ে সমাপ্তির দাঁড়ি টানার আগে, স্থানে অস্থানে মাঝে মাঝেই যিনি দেখা দিয়ে থাকেন। লাইফ সেনটেন্সের মাঝ মধ্যের হলটিং স্টেশন—যার শেষে কিনা সেই ডেথ। অনিবার্য ডেথ সেনটেন্স?

আমি কি তাহলে দাঁড়ি টানার আগে সেই কমাতেই এখন দাঁড়িয়ে আছি?

রিনি গরম দুধের ভাঁড়টা রুমালে জড়িয়ে ধরে আনল, চোখের কোণে দেখতে পেলাম।

দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি যখন, তাহলে এখনো আমি হতজ্ঞান হইনি একেবারে।

কমার লক্ষণ নেই এখনো—এখনো আমি বাড়ার দিকেই রয়েছি। তবে? তাহলে?

'হাঁ করিয়ে চামচেটা দিয়ে একটু একটু করে খাইয়ে দে তো ওকে।' বললেন উনি, "কিন্তু বসাবি কোথায়? বসে খাওয়াতে হবে যে। সোফায় তোকে ধরবে না তো? কী করে খাওয়াবি তবে? তাহলে এই চেয়ারটায় বস না হয়। বসে বসে খাওয়া।'

চেয়ারে বসে রিনি দেখল আমার সম্মুখভাগ তখনো তার সুদূরপরাহত।

'চেয়ারে বসে অ্যাদ্দূর থেকে হাত বাড়িয়ে কি খাওয়ানো যায় বাবা?' বলে

রিনি চেয়ারটাকে হটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'তাই তো বলছিলাম রে! তাহলে?' তিনি কন: 'সেই জন্যেই তো তোর মাকে ডাকতে বলছিলাম।'

বাবার জবাবে সে সোফায় বসে আমার মাথাটাকে নিজের কোলের ওপর টেনে নিল। নিজেই মা হয়ে বসল যেন। তারপর কোলের ছেলেকে মা যেমন ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ায় না, তেমনি করে আগে ফুঁ দিয়ে গরম দুধটাকে একটু জুড়িয়ে নিয়ে খাওয়াতে লাগল আমায়। চামচের পর চামচ।

হাঁ করাতে হোলো না আমাকে। চির-কালের হাঁ-করা ছেলে হাঁ করেই ছিলাম, ঢক ঢক করে গিলতে লাগলাম বেশ।

এমন সময় রিনির মা দরজা ঠেলে ঘরে এলেন। —'একী? একে? চাঁচলের খাম না? এখানে অমন করে শুয়ে কেন গো? কী হয়েছে ওর?'

'ভারী শক্ত ব্যারাম গিন্নি। বুকে জল জমেছে।' বললেন রিনির বাবা: 'প্লুরিসি হয়েছে ছোঁড়াটার।'

(ক্রমশঃ)

মহাভারতের কথা

বুদ্ধদেব বসু

৪ : মূল কাহিনী

কিন্তু সত্যি কি আমরা আশা করতে পারি যে আজকের দিনের কোনো অপেশাদার পাঠক আস্ত, পুরো, অখণ্ড মহাভারতটি প'ড়ে উঠবেন? মূল সংস্কৃতের কথা না-তোলাই ভালো, কালীপ্রসন্নর বৃহদাকার তিন হাজার পৃষ্ঠার সম্মুখীন হ'লেও তিনি কি ত্রস্ত পায়ে পশ্চাদপসরণ করবেন না? এমন কথাও কি তাঁর মনে হবে না যে এ-রকম একটি ওজনহীন ভোজনের জন্য ভীমের তুল্য জঠরাগ্নি ও অগস্ত্যের মতো পরিপাকশক্তি প্রয়োজন? আর যদি বা কোনো আকস্মিক খেয়ালে তিনি ঋজুপৃষ্ঠভাবে পাঠারম্ভ করেন, তাহ'লেও, অভিভাষণের চাপ সইতে না-পেরে, তিনি যে অচিরেই নিবৃত্ত হবেন না তারই বা নিশ্চয়তা কী? এই সবই সম্ভবপর, এবং স্বাভাবিক; আমি এমন কোনো যুক্তিরহিত প্রস্তাব করছি না যে মহাভারতকে জানতে হ'লে তার প্রতিটি অক্ষর অবশ্যপাঠ্য। বরং অন্য অনেকের মতো আমারও বিশ্বাস যে সংক্ষেপীকরণের পক্ষে মহাভারত বিশেষভাবে উপযোগী; এবং, আমরা সকলেই জানি, বর্তমান যুগে তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সানন্দে ও কৃতজ্ঞ চিত্তে এও আমি ঘোষণা করবো যে রাজশেখর বসুর মনোজ্ঞ সারানুবাদে মূলের প্রতিভা প্রতিফলিত হয়েছে, বহুলাঙ্গতারও পরিলেখ পাওয়া যায়; তাঁরই জন্য এ-যুগের বাঙালি পাঠক বুঝতে পেরেছে ব্যাসের সঙ্গে কাশীরাম দাসের (এবং কৃত্তিবাসের সঙ্গে বাল্মীকির) ব্যবধান শুধু কালগত নয়, চারিত্রিক। কিন্তু কোনো সংক্ষেপীকরণ যতই না তৃপ্তিকর হোক, তা কখনো পর্যাপ্ত হ'তে পারে না; তা থেকে যা-কিছু বর্জিত হয়েছে তা-ই আমাদের পক্ষেও পরিত্যাজ্য নয়, এই কথাটি মনে রাখা চাই। আধুনিক যুগের ব্যস্ততাকে মেনে নিয়েও এ-কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে মহাভারতের সমগ্রটির সঙ্গে পরিচিত না-হ'লে—যার যেমন সাধ্য, যার যতটুকু অবকাশ, সেই অনুযায়ী অল্পবিস্তর পরিচিত না-হ'লে—মহাভারতের ঐশ্বর্য বিষয়ে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে যাবে; আর, সমগ্রটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে যেতে পারলে, আমরা সেই পরিমাণে আরো বেশি লাভবান হবো। লাভবান হবো—কোনো বিশেষজ্ঞের অর্থে নয়, মানবিক অর্থেই, জৈবনিক অর্থেই। 'আমরা' বলতে এখানে শুধু বিদগ্ধসমাজ ভাবছি না—তথাকথিত 'সাধারণ' পাঠক, চাকুরিজীবী, সিনেমাপ্রিয় মহিলা, ধনার্জনকারী ব্যস্ত ব্যবসায়ী, সকলেই এর অন্তর্ভূত। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত যে-সব আবিষ্কার পণ্ডিতেরা মহাভারত থেকে অনবরত ক'রে যাচ্ছেন, তাতে আমাদের আগ্রহ থাকতেও পারে, নাও পারে; কিন্তু যা হৃদয়গ্রাহী ও চিত্ররূপময়, যার অনুচিন্তনে আমরা আনন্দ পাই, তার জন্য কে না আমরা নিত্য পিপাসিত? আর এই ধরনের কত যে কল্পনা-মণি মহাভারতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, যে-সব স্থলে আমরা আপাতিকভাবে শুধু শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছি, সেখানেই লুকিয়ে আছে হয়তো, শুধু সংক্ষেপিত প্রকরণে আবদ্ধ থাকলে আমরা সেগুলোর সন্ধান হয়তো পাবো না। আর যে-সব অংশ আমাদের 'চিরকালের চিরচেনা' ব'লে আমরা ধ'রে নিয়েছি—যেমন সাবিত্রী-কথা বা দময়ন্তীর উপাখ্যান—তাদের অন্তর্নিহিত সব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিও আমরা শুনতে পাবো না, যতক্ষণ তাদের মৌলিক ও সম্পূর্ণ রূপকরণ আমাদের অজ্ঞাত থাকছে, এবং যতক্ষণ আমরা দেখতে না পাচ্ছি মহাভারতের মধ্যে এদের সংলগ্নতা ঠিক কোথায়।

উদহরণস্বরূপ, পূর্বোক্ত সৃষ্টিবিবরণটিকে নেয়া যেতে পারে (বন : ১৮৮)। রাজশেখর বসু এটিকে মাত্র কয়েকটি বাক্যে সীমিত ক'রে দিয়েছেন, তা না-ক'রে তাঁর উপায় ছিলো না; কিন্তু এর সানুপুঙ্খ বিস্তার পেরিয়ে এলে, আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি যে, আর যা-ই হোক, এটি মার্কণ্ডেয় মুনির 'গায়ে-পড়া' কোনো বক্তৃতা নয়, পৌর্বাপর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর অব্যবহিত আগে আমরা পাই ইহুদি পুরাণের নোহ-তুল্য বৈবস্বতমনুকে, যিনি একটি শৃঙ্গধারী পর্বতাকার মৎস্যের সাহায্যে, সর্বজীবের বীজসঞ্চয় নিয়ে প্রলয়-বন্যায় ভাসমান ছিলেন। এই কাহিনীর সূত্রেই, প্রলয়ের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে, মার্কণ্ডেয় তাঁর সৃষ্টিবর্ণনা শুরু করলেন, এবং সেই বাচস্পত্য বিবরণ শেষ করামাত্র, তারই জের টেনে, অন্য একটি উপাখ্যান বললেন, যা মনু-মৎস্য বৃত্তান্তেরই একটি ভিন্ন প্রকরণ, কিন্তু পুনরুক্তি নয়, এক নতুন সৃষ্টি। অনন্তজীবী মার্কণ্ডেয় একবার প্রলয়কালে বালকবেশী বিষ্ণুর উদরে প্রবিষ্ট হ'য়ে সেখানে নিখিলবিশ্ব দেখতে পেয়েছিলেন, শতবর্ষ সঞ্চরণ ক'রেও তার অন্ত পাননি—দ্বিতীয় কাহিনীর চুম্বক হ'লো এই (১৩)। দু-দিকে দুটি প্রাক্-পুরাণিক কাহিনী, মধ্যবর্তী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ—এই তিনটি

অংশকে মিলিয়ে দেখলে আমরা সমগ্রটির মধ্যে একটি ঐক্য ও এমনকি ঈষৎ নাটকীয়তা অনুভব করি; সৃষ্টিবর্ণনাটিকে অবান্তর বা নীরস ব'লে আর মনে হয় না; বরং তার সান্নিধ্যের জন্য উপাখ্যান দুটির অভিঘাত আরো প্রবল হ'য়ে ওঠে। এ-রকম স্থলে আমাদের মনে এ-চিন্তাটিও ধরা দিতে পারে যে মহাভারতকে আমরা যত অবিন্যস্ত ব'লে ভাবি আসলে হয়তো তা নয়; প্রথম দর্শনে আমাদের চোখে যা অসংলগ্ন, তাও—সর্বত্র না হোক—অনেক স্থলেই যথোচিতভাবে সংস্থাপিত।

কিন্তু শুধু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে নয়, সমগ্র মহাভারতেও একটি ঐক্য আমরা খুঁজে পাবো, যদি তার বহিরাশ্রয় বিশ্লেষণ করি। বহিরাশ্রয়—মানে গল্পাংশ, যাকে বলে 'প্লট' অথবা মূল কাহিনী। প্রশ্ন উঠতে পারে : সেটি কী, কতটুকু, কোন-কোন অংশ নিয়ে তার সংগঠন, আমরা তার সীমারেখা টানবো কোথায়? এ-বিষয়ে আমার যা ধারণা তা আশা করি এই আলোচনাক্রমে প্রকাশ পাবে; এখানে শুধু দু-একটি কথা ব'লে রাখতে চাই। প্রথমত, তা নিছক যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নয়—কোনোমতেই নয়;—কোনো রুধিরাক্ত নীবেলুঙেন-গাথার ছিন্দু প্রকরণরূপে মহাভারতকে কল্পনা করা অসম্ভব। যদি কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষই মূল কাহিনী ব'লে নির্দিষ্ট হয়, তাহ'লে তো আদিপর্বের শেষার্ধ, সভাপর্ব, উদ্যোগপর্ব আর গীতা-বর্জিত ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্যন্ত পাঁচটি পর্বকে সংক্ষেপিত ক'রে নিলেই আমরা 'বিশুদ্ধ' মহাভারতটিকে হাতে পেয়ে যাই, অন্য সবই অনাবশ্যক হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এ-ভাবে সম্পাদিত হ'লে, নির্ভয়ে বলা যায়, এই ভারত-কথাটি ভারতবর্ষীয় জীবনযাত্রার বাইরে প'ড়ে থাকতো, গ্রন্থাগারে সুখনিদ্রায় মগ্ন, যা থেকে শুধু শ্যামল বা অরুণবর্ণ পণ্ডিতেরা তাকে মাঝে-মাঝে টেনে তুলতেন। অথবা যদি ভরতবংশের বিবরণ ব'লে ভাবি তাহ'লে প্রথমেই বন ও মৌষলপর্বকে ছেঁটে ফেলতে হয়—যা আমার মতে বর্বরোচিত আচরণ। আমার কাছে এ-কথা অতি স্পষ্ট যে মহাভারতের মূল কাহিনী তার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত—অচ্ছেদ্যভাবে, যুক্তিসিদ্ধভাবে—মরুপ্রতিম শান্তি ও অনুশাসনটিও সর্বতোভাবে এর ব্যতিক্রম নয়। এবং এই মূল কাহিনীটিকে আদ্যন্ত অনুধাবন ক'রে আমি দেখতে পাই এক মহান পরিকল্পনা—যা বাধাগ্রস্ত হ'লেও অলঙ্ঘনীয় থেকে যায়; এক বদ্ধমূল অভিপ্রায় — যা মাঝে-মাঝে সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হ'লেও অবিরলভাবে সৃষ্টিশীল। কেমন ক'রে এই জটিলবন্ধুর বৃহদরণ্যে, লতাগুল্ম কণ্টকবনের ফাঁকে-ফাঁকে, গাত্রলগ্ন তৃণপল্লব পতঙ্গের বোঝা সঙ্গে টেনে নিয়ে — অপ্রতিহত, আত্মবিস্মৃতিহীন—অস্থির গতিতে এগিয়ে যায় এই কাহিনী বা পরিকল্পনা, এক বিরাট বিঘ্নবহুল দূরত্ব পেরিয়ে তার অমোঘ ও অবিস্মরণীয় পরিণামের দিকে, এক মণ্ডলাকার সম্পূর্ণতা নিয়ে সমাপ্ত হয়—মহাভারতের বহু বিস্ময়ের মধ্যে এইটি হ'লো মহত্তম। এখানেই মহাভারতের ঐক্য; এরই জন্য, সংগ্রহধর্মিতা সত্ত্বেও, তা শেষ পর্যন্ত একটি গ্রন্থ হ'তে পেরেছে। কিন্তু ঐক্য-সাধনও অবলম্বননির্ভর, আর আমার কাছে এ-কথাও স্পষ্ট যে সেই অবলম্বন বা উপায় হিশেবে ব্যাসদেব একটি চরিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন — একটি চরিত্র, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে অন্য সব বিষয় দিগ্বিদিকে বিকীর্ণ হ'তে পারে — অর্থাৎ, মহাভারতে আমি একজন নায়কের উপস্থিতি অনুভব করি। এবং সেই নায়ক বা কেন্দ্রিক চরিত্রটি—বহুযুদ্ধজয়ী বহু-নারীসেবিত শ্রুতকীর্তি অর্জুন নন, সর্বতোমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন লোকোত্তর বাসুদেবও নন — তিনি এক ধীর মৃদু লজ্জাশীল অস্থিরমতি মানুষ : তিনি যুধিষ্ঠির।

এই কথাটার ব্যাখ্যার জন্য পূর্বোল্লিখিত ধর্মবকের কাছে ফিরে যেতে হচ্ছে।

৫ : নায়কের সন্ধানে

আমি কোনো নতুন কথা বলছি না; রাজশেখর বসুও তাঁর সারানুবাদের ভূমিকায় মহাভারতের নায়ক ও কেন্দ্রস্থ পুরুষরূপে যুধিষ্ঠিরকেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর নায়কত্ব কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটা তলিয়ে দেখা দরকার। যাঁকে সাধারণত এক দুর্বল ও উদ্যমহীন পুরুষ ব'লে ভাবি আমরা, ভীমার্জুনের বাহুবল ও কৃষ্ণের বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল; কৃষ্ণ, বিদুর বা ভাইয়েদের পরামর্শ ছাড়া কোনো পদক্ষেপে যিনি অপারগ; যিনি প্রায় ধৃতরাষ্ট্রের মতোই অব্যবস্থিত, ধর্মভীরু হ'য়েও কখনো-কখনো অবিশ্বাস্যরূপে সদাচারভ্রষ্ট;—সেই যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব আমরা কোন যুক্তিতে মেনে নিতে পারি? তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ কত ক্ষীণ তা এতেও বোঝা যায় যে তাঁকে অবলম্বন ক'রে, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, কোনো কবি কোনো কাব্য বা নাটক রচনা করেননি; আধুনিক বঙ্গভূমিতে অর্জুন পার্থ সব্যসাচীদের ছড়াছড়ি থাকলেও কোনো উচ্চবর্ণ হিন্দুসন্তান এ-পর্যন্ত 'যুধিষ্ঠির' নাম প্রাপ্ত হননি, আর বাংলা ভাষায় 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' কথাটাও ব্যঙ্গার্থেই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। আমরা স্পষ্ট দেখছি, এপিক কাব্যের নায়কোচিত কোনো লক্ষণে তিনি ভূষিত নন, আর কাহিনীর মধ্যে তাঁর অগ্রসরণও অতি মন্থর। 'গাও, দেবী, আকিলিসের ক্রোধ,' বা 'কে আছেন এই জগতে একাধারে বিদ্বান, গুণবান ও বীর্যবান?'—এ-রকম কোনো উদাত্ত বাণীসহযোগে যুধিষ্ঠির প্রবর্তিত হননি; বরং কথারম্ভকালে তাঁর ভূমিকা খেদজনকভাবে নগণ্য। ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডুপুত্রেরা যখন কিশোর, তখন থেকেই ভীম, অর্জুন ও দুর্যোধন উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত; তখন থেকেই তাঁরা ব্যায়ামদক্ষ ও বিক্রমশালী—তাঁদের ভবিতব্য তখন থেকেই পরিস্ফুট। কিন্তু ঐ সব স্বাস্থ্যদায়ক ধাবন লম্ফন সন্তরণক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে কোনো অংশ নিতে দেখি না আমরা, বরং তাঁকে মাতার অঞ্চল-লগ্ন অন্তঃপুরচারী জীব ব'লে মনে হয়। শোনা যায়, দ্রোণের কাছে শিক্ষা পেয়ে তিনি রথচালনায় দক্ষ হয়েছিলেন, কিন্তু সারা মহাভারতে তার কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন নেই। আর অস্ত্রশিক্ষা? সে-কথা না-তোলাই ভালো — কেননা দ্রোণের ইস্কুলে ফেল-হওয়া ছাত্র যদি কেউ থাকেন, তিনি যুধিষ্ঠির। সেই যখন দ্রোণ-কর্তৃক শরসন্ধানে আহূত হ'য়ে, তিনি কৃত্রিম পাখিটির উপর তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে পারলেন না, পক্ষী বৃক্ষ ও উপস্থিত আচার্য ও ভ্রাতৃবৃন্দ সবই একসঙ্গে তাঁর চোখে পড়লো, তখন দ্রোণ তাঁকে সাফ কথা শুনিয়ে দিলেন (আদি :১৩৪) — 'তুমি চ'লে যাও, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।' কৈশোরজীবনে, ভীম ও অর্জুনের কীর্তির তলায় যুধিষ্ঠির প্রায় প্রচ্ছন্ন; আদিপর্বে তিনি প্রথম আমাদের লক্ষণীয় হন যখন বিদুর, দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে সাংকেতিক ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে ব'লে দিলেন কেমন ক'রে জতুগৃহ থেকে বাঁচতে হবে (অধ্যায় : ১৪৯)। সেই সাংকেতিক বা ম্লেচ্ছ ভাষা যুধিষ্ঠির যে বুঝতে পেরেছিলেন সেটুকুই তাঁর কৃতিত্ব; কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের আগে ও পরে যা-কিছু করণীয় ছিলো, সেই সবই—তাঁর দুই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়পৃষ্ঠ বাহু দিয়ে—একা ভীমসেন সম্পাদন করলেন। এর পর থেকে, আদিপর্বের সমাপ্তি পর্যন্ত ভীম আর অর্জুনই আমাদের দৃষ্টি জুড়ে থাকেন—বিশেষত অর্জুন, যিনি দ্রৌপদীজয়ে ক্ষান্ত না-থেকে আবার সুভদ্রাকে সংগ্রহ ক'রে নিলেন, ক্ষণকালীন সঙ্গিনীরূপে উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকেও

উপেক্ষা করলেন না। ভীমকে রমণীমোহন ব'লে কল্পনা করা শক্ত, কিন্তু তাঁরও একটি চলতি পথের প্রেমিকা জুটলো—কোনো রাজকন্যা নয়, এক রাক্ষসী, আর তাই হয়তো ভীমের পক্ষে প্রীতিকর। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে দেখি পঞ্চমাংশে বিভক্ত একটি-মাত্র নারী নিয়ে তৃপ্ত (১৪) —কিন্তু তাঁর সেই দাম্পত্যজীবনেও রতিমুগ্ধতার কোনো চিহ্ন নেই। যেমন তিনি কুরুবংশের ন্যূনতম যোদ্ধা, তেমনি প্রণয়ব্যাপারেও দুষ্যন্ত-শান্তনুর প্রতি অযোগ্য এক বংশধর।

এবং তিনি যে ইতিহাসের ন্যূনতম রাজা, সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। আশ্রমবাসিকপর্বে বলা হয়েছে যুধিষ্ঠির যুদ্ধবিরতির পর ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু তা যে নামে মাত্র, আসলে যে রাজকার্যের ভার বিদুরের উপরেই অর্পিত ছিলো, সে-কথাটাও গোপন রাখা হয়নি। তাছাড়া, আশ্রমবাসিকে রাজত্বচালনার কোনো বৃত্তান্ত নেই; সেই বিদায়লিপ্ত পর্বটি যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানেরই ভূমিকা-স্বরূপ। 'রাজা যুধিষ্ঠির'কে আমরা দেখতে পাই একবারমাত্র, সভাপর্বে, কিছুক্ষণের জন্য—কিন্তু কখনোই রাজোচিতভাবে নয়, দীপ্তিশালীভাবে নয়। বরং দেখি, সাক্ষাৎ নারদমুনির উপদেশ সত্ত্বেও (সভা : ৫), তিনি কাটাতে পারলেন না তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভীরুতা, মৃদুতা ও দীর্ঘসূত্রতা, কূটনীতিনির্ভর রাজধর্ম শিখে নিতে পারলেন না। 'মহারাজ, অর্থচিন্তায় নিরত থেকে ধর্মচিন্তা বিস্মৃত হচ্ছেন না তো?' —নারদের এই কথাটা আমাদের কানে প্রায় ঠাট্টার মতো শোনায়, কেননা যুধিষ্ঠির যে ধনের জন্য লালায়িত নন তা আমরা আদিপর্ব থেকেই অনুভব ক'রে আসছি। তাঁর রাজত্ব বিষয়ে প্রশংসাবাক্য অনেক আছে সভাপর্বে, কিন্তু এমন কথা কোথাও নেই যে প্রজাদের হিতসাধন ছাড়া অন্য কোনো উচ্চাশায় তিনি স্পৃষ্ট হয়েছিলেন। সেটা প্রজাদের পক্ষে সুখের কথা, কিন্তু তাঁর সুহৃৎবর্গের কাছে যথেষ্ট নয়: অর্জুনকে মুখ ফুটে বলতে হ'লো যে শুল্কের দ্বারা রাজত্ববিস্তার না-করলে রাজকৃত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় (সভা : ২৪)। যুধিষ্ঠির যে এই কথাটা মেনে নিলেন, তা—আমরা সহজেই বুঝি—সোৎসাহে নয়, দার্ঢ্যের সঙ্গে প্রতিবাদ করা তাঁর স্বভাব নয় ব'লে। অমাত্যরা তাঁকে জপালেন তিনি সম্রাট হবার যোগ্য, রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী (সভা : ১২): শুনে তিনি যে-রকম চিন্তাকুল হ'য়ে পড়লেন তাতেই তাঁর অবিশ্বাস সূচিত হচ্ছে—ঐ উক্তির উপর, নিজের সামর্থ্যের উপর অবিশ্বাস (১৫)। রাজাদের পক্ষে যথাযোগ্য মন্ত্রণা নিয়েই কাজ করা ভালো; কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন বড়ো বেশি পরামর্শলিপ্সু, নিজের দায়িত্বে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাই তাঁর নেই। পুরোহিত ধৌম্য, বহু মুনিঋষি, স্বয়ং ব্যাসদেব—এঁদের কাছে উৎসাহ পেয়েও তাঁর দ্বিধা কাটলো না; তাঁকে রাজি করাবার জন্য কৃষ্ণকে দ্বারকা থেকে চ'লে আসতে হ'লো। তারপর, রাজসূয় যজ্ঞের পুরো বৃত্তান্তটায়, যুধিষ্ঠির শুধু ভাববাচ্যে উপস্থিত — কোনো কাজের তিনি প্রয়োজক নয়, শুধু ভুক্তভোগী; অনুষ্ঠাতা নন, উপলক্ষমাত্র। তাঁর চার ভাই দিগ্বিজয়ে বেরোলেন, তিনি রইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে ব'সে; জরাসন্ধবধের সংকল্প শুনে তিনি ভয় পেলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করলেন না। এমনি ক'রে, অন্যদের বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে, তিনি প্রাপ্ত হলেন তাঁর রাজচক্রবর্তীপদ—যার জন্যে তিনি নিজে কখনো আগ্রহ দেখাননি সেই অভিধা; যেখানে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণ ও রণদক্ষ চার ভাই মিলে তাঁকে প্রায় ধরাধরি ক'রে বসিয়ে দিলেন, সেই সিংহাসন। আমরা প্রায় কৌতুক অনুভব করি, সেই সঙ্গে একটু করুণাও হয়তো, যখন যজ্ঞসভায় শিশুপালপন্থী ক্রুদ্ধ রাজাদের গর্জন শুনে এই সদ্যসম্রাট সন্ত্রস্তভাবে ভীষ্মের শরণার্থী হলেন। আর তখনই বোঝা গেলো ধৌম্য থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত সকলেই ভুল বলেছিলেন—মুকুটধারণের যোগ্য ব্যক্তি ভীম অর্জুন কর্ণ দুর্যোধন যে-কেউ হ'তে পারেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির নন, কখনোই যুধিষ্ঠির নন।

এ-পর্যন্ত, যা-ই হোক, আমাদের চোখে কিছুটা শ্রদ্ধেয় তিনি থেকে যান, অন্তত একটি 'নিরীহ ভালোমানুষ' ব'লে আমরা তাঁকে স্নেহের চোখে দেখতে পারি। হয়তো আমাদের মনে পড়ে যে ভীমের হাতে হিড়িম্বার ও অর্জুনের হাতে অঙ্গারপর্ণের মৃত্যু তিনি নিবারণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে, যদিও, তাঁর জ্ঞাতসারে কিছু নরহত্যা এবং একটি নারীহত্যাও (১৬) ঘটে গেছে, তবু ভীম অথবা অর্জুনের মতো নির্দয় যে তিনি নন, অন্তত সেটুকু আমরা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু এর

পরেই, এক মর্মান্তিক মুহূর্তে, এই নিষ্ক্রিয় নির্বিষ নির্বিরোধী মানুষ, যাঁকে আমরা এতদিন ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত ব'লে জেনেছি, অত্যন্ত বেশি শঙ্কাপরায়ণ ব'লে, তাঁকেই হঠাৎ এক উন্মত্ত জুয়াড়িতে রূপান্তরিত হ'তে দেখে আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে যাই। আর যখন দেখি, সর্বনাশের পরেও যুধিষ্ঠির নীরব, কৌরবদের তীক্ষ্ম বিদ্রূপে নিরুত্তর, অনুজদের উত্তেজনায় অবিচল, অশ্রুপ্লুত জননীর দুঃখেও নির্বিকার : যখন দেখি অল্প কথায় ভীষ্মাদি গুরুজনের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি অবিষণ্ণভাবে বনযাত্রায় নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন ভেবে পাই না তাঁকে কী বলবো, কী ভাববো তাঁর বিষয়ে—নির্বোধ না ধৈর্যশীল, হতচেতন না অনাসক্ত, অপ্রকৃতিস্থ না প্রাণশক্তিহীন। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : তিনি কি এই আঘাতে প্রস্তরীভূত হ'য়ে গিয়েছেন, না কি এই আঘাত তাঁকে স্পর্শ করেনি?

এই প্রশ্নের উত্তর, যতই আমরা অরণ্যে তাঁর অনুসরণ করি, যত দেখি তাঁকে শান্ত পায়ে ভ্রাম্যমাণ, যত শুনি তাঁর কথা, আর তিনি যা শুনছেন তাও শুনি, ততই আমাদের অনুমেয় হ'য়ে ওঠে—ধীরে-ধীরে, কিন্তু ক্রমশ আরো বিশ্বাস্যভাবে। তখন মনে হয়, তাঁর মনের কোনো-এক অংশে, কোনো অবচেতন গভীরে, হয়তো তিনি এ-ই চেয়েছিলেন—এই মুক্তি : ময়নির্মিত ইন্দ্রপুরী থেকে, শৃঙ্খলতুল্য আয়োজন ও আড়ম্বর থেকে, শ্বাসরোধকারী ধনবাহুল্য থেকে, আর সর্বোপরি—যার জন্য জরাসন্ধ ও শিশুপালবধ সাধিত হ'তে হ'লো, সেই রাজনীতির ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি। চেয়েছিলেন অনিবার্য মহাযুদ্ধের আগে কিছুক্ষণ সময় (১৭)—বাঁচার জন্য, মানুষিকভাবে বাঁচার জন্য। কিন্তু কেমন ক'রে তা পেতে পারেন তিনি—এত লোক তাঁকে ঘিরে আছে, এত চোখ তাঁর চারদিকে সারাক্ষণ! আর সেইজন্যেই কি জুয়োর দিকে এই অদম্য টান, তাঁর এই আকস্মিক, অভাবনীয় আত্মবিলোপ? এমনও কি হ'তে পারে না যে আমাদের পক্ষে যে-ঘটনা পীড়াদায়ক, তাঁর পক্ষে সেটা নিষ্কৃতিলাভের একটি উপায় বা অছিলামাত্র? কিন্তু ধরাধামে বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না; এই মুক্তির বিনিময়ে তাঁকেও মেনে নিতে হ'লো—এক দুঃখ, বনবাসকালে নিত্যসঙ্গী তাঁর—নিজের কারণে নয়, তাঁর অনুগামী আত্মীয়দের কারণে।

কিন্তু তাঁর জীবনে এই দুঃখেরও যে প্রয়োজন ছি[ল] আমরা তা বনপর্বে দেখতে পাবো। যুধিষ্ঠিরের সত্যি[কার] পরিচয় বনপর্ব থেকেই আরম্ভ।

১৩। এই উপাখ্যানের আরো চমকপ্রদ একটি বিবরণ হাইন[রিখ] ৎসিমার-এর *Myths and Symbols in Indian Art* [and] *Civilization* বইটিতে আমি পড়েছি। কিন্তু মহাভার[তের] প্রকরণটির বিশেষ মূল্য এইখানে যে তা গীতার একটি পূর্বর[ূপ] —অর্জুনের অনেক আগেই মার্কণ্ডেয় মুনির ভাগ্যে বিশ্বর[ূপ] দর্শন ঘটেছিলো।

১৪। পুরুবংশবর্ণন-প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের আর-একটি স্ত্রী তার গর্ভজাত এক পুত্রের উল্লেখ আছে (আর্যশাস্ত্র সং : আদি ৭৬), কিন্তু উল্লেখমাত্র—সেই পত্নী বা পুত্রকে কখনো চোখে দে[খা] যায় না।

১৫। শ্রুত্বা সুহৃদ্বচস্তচ্চ জানংশ্চাপ্যাত্মনঃ ক্ষমম্।
পুনঃ পুনর্মনো দধ্রে রাজসূয়ায় ভারত॥

(সভা : ২৩ : ৮)

—'সুহৃৎগণের সেই কথা শুনে, নিজের সামর্থ্য বুঝে যুধিষ্ঠি[র] রাজসূয় যজ্ঞের বিষয়ে বার-বার চিন্তা করতে লাগলেন।'

পরবর্তী অংশ থেকে বোঝা যায়, এখানে 'সামর্থ্য' মানে সামর্থ্যে[র] অভাব।

১৬। জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় পাণ্ডবেরা এক নিষাদী [ও] তার পাঁচ পুত্রকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। যুধিষ্ঠির এটা জানতে[ন] এমন কথা পুঁথিতে লেখা নেই, কিন্তু আমাদের তা-ই ধ'রে নি[তে] হবে। এমন অনাবশ্যকভাবে নিরপরাধহত্যার দ্বিতীয় উদাহ[রণ] মহাভারতে নেই।

১৭। রাজসূয় যজ্ঞের পরে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে অভিন[ন্দন] না-জানিয়ে এক বিষাদ-বার্তা শোনালেন (সভা : ৪৭) :

'শোনো, যুধিষ্ঠির, তোমাকে উপলক্ষ ক'রে ক্ষত্রিয় রাজারা কা[ল]ক্রমে বিনষ্ট হবেন। রাত্রিশেষে এক স্বপ্ন দেখবে তুমি : শূ[লপাণি] পিনাকধারী শঙ্কর পিতৃরাজাশ্রিত (যম-কর্তৃক অধিকৃত) দক্ষিণ [দিক] নিরীক্ষণ করছেন। বৎস, তুমি চিন্তিত হোয়ো না, তোমার মঙ[্গল] হোক।'

ব্যাসোক্ত স্বপ্ন যুধিষ্ঠির সত্যি দেখেছিলেন কিনা তা বলা [যায় না]

(ক্র[মশ])

॥ ২২ ॥
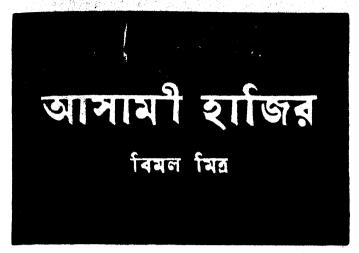
প্রকাশমামার মুখ দিয়ে তখন হাসি বেরোচ্ছে। জয়ের হাসি। বাহাদুরি দেখাবার এমন সুযোগ তার বহুদিন আসেনি। যেন সদানন্দের সব রোগের অব্যর্থ ওষুধ সে প্রয়োগ করেছে। এবার রোগী বাঁচবেই।

প্রকাশ দিদির মুখের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে—তুমি এবার নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোওগে। আর কোনও ভয় নেই। তোমার শরীর খারাপ, তুমি কেন আর কষ্ট করবে—

কিন্তু প্রীতি যেন তখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। বললে—শেষকালে উল্টো ফল হবে না তো রে? আমার বাপু ভয় করছে কিন্তু—

—ভয়? প্রকাশ অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি রয়েছি তবু তোমার ভয়? তুমি জানো আমি এর চেয়ে বড় বড় কেস মিটিয়ে দিয়েছি, আর তুমি এখনও সন্দেহ করছো?

প্রীতি বললে—আমি বউমার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি! হাজার হোক বেচারি তো নতুন এসেছে আজ। এই সবে মা মারা গিয়েছে। আর তা ছাড়া বউমাকে তো আগে থেকে সাবধান করে রাখা হয়নি।

প্রকাশ বললে—বর-বউ এক ঘরে শোবে তাতে আবার সাবধান করে দেওয়ার কী আছে? মেয়েমানুষের চরিত্র তুমি আমাকে শেখাচ্ছো? তুমি ভাবছো আমি মেয়েদের স্বভাব জানি না? সদা যদি একটু চালাক হয় তো আজকে এই চান্স আর ছাড়বে না। প্রথম দিন যা করেছে, আজকে যদি আবার এ চান্স হাত-ছাড়া করে তো ওর কপালে অনেক দুঃখু আছে; এই তোমাকে বলে রাখলুম—

প্রীতি বললে—আর কতক্ষণ দরজায় শেকল দিয়ে রাখবি?

প্রকাশ হাসলো। বললে—ঘি যখন গলে যাবে তখনই দরজা খুলে দেব—

—তার মানে?

—তার মানে বুঝলে না তুমি? আগুনের পাশে ঘি রাখলেই তো গলে যায়। আর একটু সবুর করো না, তখন ওই সদা নিজেই ভেতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ করে দেবে—আমাকে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না—

প্রীতি বললে—কী জানি বাপু, তোর কী মতলোব, তুই থাক, আমি যাই, আমার ঘুম পেয়ে গেছে, আমি আর পারছি নে—

বলে প্রীতি তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। চৌধুরীমশাই তার আগেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। তিনিও তখন হাঁ করে ছিলেন সব শোনবার জন্যে। গৃহিণীকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? ওদিকের কী খবর?

প্রীতি বললে—প্রকাশ রইলো, আমি চলে এলুম। আমার ঘুম পেয়ে গেছে—

চৌধুরীমশাই জিজ্ঞেস করলেন—তা এখনও কি প্রকাশ সেই রকম শেকল দিয়ে রেখেছে নাকি?

—রেখেছে।

—কখন খুলবে?

প্রীতি বললে—কে জানে কখন খুলবে। ছেলের যেমন কাণ্ড! এত ছেলের বিয়ে দেখেছি, এমন কাণ্ড বাপের জন্মে কখনও কারো দেখিনি—এও আমার কপাল!

চৌধুরীমশাই এ-কথার কিছু জবাব দিলেন না। আর, কী জবাবই বা তাঁর দেবার ছিল! এমন ধারা কাণ্ড তিনিও জীবনে দেখেন নি! লোকের বিয়ে হয়, বর-কনে ফুলশয্যার রাত থেকে এক বিছানায় শোয়, পরের দিন সারা রাত জাগার দরুণ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। তার পরদিন থেকে লোকে কখন রাত হবে কখন আবার বউএর সঙ্গে দেখা হবে সেই আশায় সারাদিন ছট্-ফট্ করে। তাঁর নিজেরও একদিন বিয়ে হয়েছিল। তিনিও বিয়ের পর তাই-ই করেছেন। এই-ই হলো নিয়ম। এইটেই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। সকলের জীবনে এই-ই তো ঘটে! তা নয়, এ কী অসম্ভব কাণ্ড! এ কথা লোক জানলে তারাই বা কী ভাববে!

বউমার বাবার কানে গেলে তিনিই বা কী ভাববেন! কোথাও কিছু নেই, ঠাকুর্দাদা কী দোষ করলো, বাবা কী অপরাধ করলো তাই নিয়ে কোনও ছেলে এমন পাগলামি করেছে এ-কথা কখনও কেউ শুনেছে?

চৌধুরীমশাই গৃহিণীর দিকে ফিরে বললেন—ওগো, শুনছো!

গৃহিণী জেগেই ছিলেন। বললেন—কী?

—বউমাকে বলে দিয়েছ তো যে এ-সব কথা যেন বেয়াইমশাইকে না বলে?

প্রীতি বললে—বলেছি তো। আগেই বলেছি, বার-বার এ-সব কথা বলতেও আমার লজ্জা করে! শাশুড়ি হয়ে এ-সব কথা বউকে বার বার বলতে ভালো লাগে?

চৌধুরীমশাই বললেন—তা আমারই কি বলতে ভালো লাগে মনে করো? কিন্তু কী করবো বলো? ছেলে যদি এমন বেয়াড়া ন হতো আমিই কি ভাবতো এ-সব নি আলোচনা করতুম?

প্রীতি বললে—তা তোমাদেরই তো ব দোষ!

—কেন? আমরা আবার কী দো করলুম? আমরা মানে কারা?

প্রীতি বললে—তুমি আর তোমার বাবা

তোমরা কাকে ঠকিয়ে টাকা-কড়ি জমি-জমা করবে, কাকে গুম্‌ খুন করবে তা ওর মনে লাগবে না? সত্যিই তো. কালিপদের বউ যেমন মানুষই হোক. জলজ্যান্ত মানুষটা যাবেই বা কোথায়? দারোগা পুলিস এল, তারাই বা কিছু কুল-কিনারা করতে পারলে না কেন? তাদেরও তোমরা টাকা খাইয়ে হাত করবে। তা এখন আমার কী, তোমরাই সামলাও—

চৌধুরী মশাই কথাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করতে গেলেন। বললেন—তুমি আর ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে যেও না।

প্রীতি বললে—কেন? মাথা ঘামাবো না কেন?

চৌধুরী মশাই বললেন—তোমরা মেয়ে-মানুষ, বাড়ির ভেতরে থাকো, বাড়ির বাইরের ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামাবার দরকারটা কী! জমিদারি-জোতদারির কথায় তোমাদের মেয়েমানুষদের না-থাকাই ভালো।

প্রীতি বললে—ওই মাথা ঘামাতে দাও না বলেই তো আজকে আমার বউমার এই হেনস্তা! মাথা ঘামাতে দিলে আর বাড়ির ভেতরে এই অবস্থা হতো না—

কথাটা চৌধুরীমশাইএর পছন্দ হলো না। বললেন—তা হলে বলো জমি-জমা বেচে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাই, সন্ন্যাসী হয়ে সংসার-ধর্ম ছেড়ে বনে চলে যাই। তাও তো পারবে না। তাতেও তো তোমার কষ্ট হবে।

প্রীতি বললে—তা সংসার-ধর্ম ছাড়বার কথা আমি একবারও বলিনি? রাত-দুপুরে কী যে তুমি সব আজে-বাজে কথা বলো—

চৌধুরীমশাই বললেন—এ-সব বাজে কথা হলো? তোমার সঙ্গে দেখছি এ-সব কথা বলাও পাপ—

প্রীতি বললে—তা বাজে কথা না তো কী? আমি তোমায় সংসার ছেড়ে বনে চলে যেতে একবারও বলেছি?

চৌধুরীমশাই বললেন—তা হলে কালি-পদর বউ-এর কথা তুমি তুললে কেন? কালিপদর বউকে কি আমরা খুন করেছি? আর যদি খুনই করতুম তো দারোগা-পুলিস কি আর কোনও কিনারা করতে পারতো না? তারা কি সবাই ঘাস খায়?

তারপর একটু থেমে আবার গলা চড়িয়ে বললেন—আর তা ছাড়া জমিদারির তুমি কী বোঝ শুনি? জমি-জমা করতে গেলে খুন-খারাবি না করলে চলে? তাহলে কাল থেকে তুমিই চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসলেও পারো, আমি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকি! দেখি কি-রকম জমিদারি চালাও তুমি।

প্রীতি বললে—যাও, তুমি আর কিছু তো পারো না, কেবল ঝগড়া করতেই পারো—

চৌধুরীমশাই বললেন—আমি ভালো কথাই বলছি আর এটা ঝগড়া করা হলো?

—ঝগড়া না তো কী! কোথায় আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলতে এলাম আর তুমি এলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে! তুমি ঘুমোও না। তোমার ঘুমও পায় না? তোমায় কে জেগে থাকতে বলেছে?

চৌধুরীমশাই বললেন—বাড়ির মধ্যে ছেলের এই কাণ্ড, এতে কারো ঘুম আসে?

—তা তুমি ঘুমোও আর না-ঘুমোও আমাকে ঘুমোতে দাও। সারা দিন সংসারে খেটে খেটে আমার হাড়-মাস কালো হয়ে গেছে, আমি একটু ঘুমোব, কাল সকালে উঠেই তো আবার আমাকে সংসারের পিণ্ডি রাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে! তখন দানা-পানি না পেলে তো আবার তোমরাই চেঁচাবে--

চৌধুরীমশাই বললেন—তোমার শরীর খারাপ, তুমি অত খাটোই বা কেন? তুমি ছাড়া কি আর লোক নেই? গৌরী সারা দিন কী করে? ও তো কেবল নেচে নেচে বেড়ায় দেখেছি। ওকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিতে পারো না? গৌরী রয়েছে, বিল্টুর মা রয়েছে, লোকের তো তোমার আমি কমতি রাখিনি। তাদের কি কেবল বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার জন্যে রেখেছি! তারা যদি কিছু কাজই না করে তো তাদের তাড়িয়ে দাও। আপদ বিদেয় হোক—

প্রীতি আর পারলে না। বললে—দেখ, যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। বাইরে থেকে ও-সব অনেক কথা বলা যায়, কথা বলতে তো কারো ট্যাক্স লাগে না, হাতে কলমে করলে তবে ঠেলা বুঝবে!

চৌধুরীমশাই বললেন—তো তুমি একদিন রান্নাঘরে না-গিয়েই দেখ না, কাজ ঠিক হয় কি না, কেউ খেতে পায় কি না—

প্রীতি বললে—সে আমি যখন মরে যাবো তখন তোমরাই দেখো। আমি তখন আর দেখতে আসছি নে—

—ওই তো! ওই তোমার এক কথা। যখন তর্কে হেরে যাবে তখন ওই মরার কথা বলা ছাড়া উপায় নেই—

—তুমি থামো দিকি! তুমি থামো।

বলে রেগে চেঁচিয়ে উঠলো প্রীতি। বললে—আমার সঙ্গে যদি কথা বলতে তোমার এতই খারাপ লাগে তো আমার ঘরে শুতে আসো কেন? এখানে না শুয়ে চণ্ডীমণ্ডপে শুলেই পারো। কাল থেকে আমি তোমার সেই ব্যবস্থাই করে দেব—

বলে উল্টো দিকে পাশ ফিরে শুলো। তারপর বললে—আমার এখন কিছু ভালো লাগছে না, আমার ঘুম পেয়ে গেছে, আমি ঘুমোব—

বলে প্রীতি পাশ-বালিশটা জড়িয়ে ধরে দু চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। চারদিকে নিঝুম। কোথাও কোন শব্দ
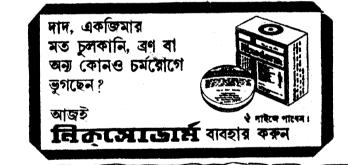
নেই। নবাবগঞ্জ এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই সব অন্ধকার রাত্রে বারোয়ারি-তলা থেকে মাঝে মাঝে যাত্রার গানের শব্দ আসে। এবার পুজোর সময় তাদের 'পাষাণী' পালা হবে। প্রকাশ বলে গেছে। নিশ্চয় অনেক রাত হয়েছে। প্রীতি দু চোখের পাতা জোর করে বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো। খানিক পরে এক সময়ে পাশ থেকে চৌধুরীমশাই এর নাক ডাকার শব্দ শুরু হলো। অদ্ভুত মানুষটা। বেশ চট্ করে কথা বলতে বলতে ঘুমোতে পারে। কাজের মধ্যেও মানুষ যে কেমন করে এমন নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারে সেইটেই আশ্চর্য। তার মানে মনে কোনও দাগ লাগে না মানুষটার। যেমন সারাদিন নাকে দড়ি দিয়ে খাটবে, তেমনি আবার রাত্রে বিছানায় পড়েই ভোঁস্-ভোঁস্ করে ঘুমো প্রীতিরও যদি ওই রকম হতো তো ভাল হতো। জীবনে কোনওদিন বিছানায় শো সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এলো না। এও এ রকমের রোগ! রোগ বই কি। নই সারাদিন তো ধকল কম যায়নি! যত রা বাড়বে তত হাই উঠবে। কিন্তু চোখ দু বোজার সঙ্গে সঙ্গে যত ঘুম সব কোথায় পালিয়ে যাবে ঠিক যাবে না।

তারপর আবার অন্য পাশ প্রীতি। আবার সেই চোখ বুজে সাধনা। আবার সেই হাজারটা এসে মাথায় ঢোকে। এতক্ষণ বউমা ঘরের মধ্যে কী করছে কে হয়ত দু'জনের ভাব হয়ে গেছে। এ হয়ত দুজনে কথা বলছে।

আর প্রকাশ?

প্রকাশের কথা মনে আসতেই ঘুমটা আসতে আসতে আরো দূরে পালিয়ে প্রীতি দু' চোখ খুলে অন্ধকারের চেয়ে দেখলে। পাশেই চৌধুরী ও-পাশ ফিরে ঘুমে অসাড়। পাশে এক মানুষ অমন করে অঘোরে ঘুমো কারো ভালো লাগে? অথচ কাল থেকেই আবার সংসারের চাকা আরম্ভ করবে। ভোরবেলা দেখা গৌরী ভাঁড়ারের চাবি চাইবে। কিষ্টর জিজ্ঞেস করবে কী রান্না হবে। সবাই-ই কিন্তু কী রান্না হবে তো ভা হবে একা প্রীতিকেই। যেন সংসার একলারই, আর কারো নয়।

কিন্তু না, প্রকাশের কথাটা মনে প প্রীতি বিছানা ছেড়ে উঠলো। জ্বর হয়েছে তার। সারা দিন হাড়ভাঙা খেটে রাত্তিরে যে একটু আরাম ঘুমোবে তারও উপায় নেই। গায়ের ভালো করে সামলে নিয়ে প্রীতি ঘর বেরোল।

রাত কত হয়েছে কে জানে। কোনও

থেকে কারো কোনও শব্দ আসছে না। প্রীতি আস্তে আস্তে খোকার ঘরের দিকে গেল।

কিন্তু খোকার ঘরের সামনে গিয়ে অবাক। দেখে প্রকাশ সেই ঘরের দরজার সামনে খালি মেঝের ওপর শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

প্রীতি ডাকলে—এই প্রকাশ, প্রকাশ—এই প্রকাশ—

প্রকাশের ঘুম নয় তো যেন হাতীর ঘুম। কেউ যদি তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়েও যায় তবু তার ঘুম ভাঙবে না।

—এই প্রকাশ, প্রকাশ—

এবার তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঠেলাতে হলো। মোষের মত ঘুমোচ্ছে। তার কাপড় খুলে নিলেও যেন সে টের পাবে না, এমন ঘুম।

ধাক্কা খেয়ে প্রকাশ ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে—কে? কে? কী হয়েছে?

একে ঘুমের জড়তা, তার ওপর মাঝরাত। তারপর একটু যেন জ্ঞান ফিরলো। প্রীতির মুখের দিকে চাইলে। বললে—কী হলো? আমি কোথায়?

প্রীতি বললে—আমি তোর দিদি রে। আমি তোর দিদি কথা বলছি—

দিদির কথা শুনে যেন ধাতস্থ হলো প্রকাশ। বললে—তাই বলো! তা অমন করে ঠেলছো কেন? আমি তো জেগেই ছিলুম। শুধু চোখ দুটো বুজিয়ে রেখেছিলুম আর কি। তা তুমি আবার কেন কষ্ট করে আসতে গেলে? আমি যখন ভার নিয়েছি তখন তুমি অত ভাবছো কেন?

সে সব কথায় কান না দিয়ে প্রীতি বললে—খোকা আর দরজা ঠেলেছিল? ধাক্কা দিয়েছিল ভেতর থেকে?

—খোকা? সদা? কই, না তো! ধাক্কা দিলে তো আমি শুনতে পেতুম। আমি তো জেগেই আছি—

প্রীতি যেন মনে মনে খুশী হলো।

—তাহলে এতক্ষণে খোকার ভাব হয়ে গেছে বউমার সঙ্গে, কী বল?

প্রকাশ বললে—আরে, তোমাকে তো আমি বলেই রেখেছি যে তোমার কিছু ভাবনা নেই। যতক্ষণ আমি আছি তুমি গ্যাঁট হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে চুপ করে বসে থাকো না। আমিই সদার বউ পছন্দ করে দিয়েছি, ওর দায়িত্ব আমারই—

প্রীতি বললে—সে তো আমি জানি রে। কিন্তু তোর জামাইবাবু যে ভেবে ভেবে ছটফট করছে। ও নিজেও ভাবছে, আমাকেও ভাবিয়ে মারছে।

প্রকাশ বললে—কেন যে জামাইবাবু এত ভাবছে তা বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাও আমি মেয়েমানুষ কখনও দেখিনি, না মেয়েমানুষকে কখনও বিয়ে করিনি? আমারও তো এককালে বিয়ে হয়েছে গো। আগুনের পাশে ঘি রাখলে কী হয় তা কি আমি জানি না বলতে চাও? তুমিই বলো আগুনের পাশে ঘি রাখলে কী হয়, তুমিই বলো? তোমারও তো বিয়ে হয়েছে—

প্রীতি কিছু বুঝতে পারলে না। প্রকাশ যে কথা বলছে সে তো সোজা হিসেব। কিন্তু সংসারে সব হিসেব যদি অত সোজা হতো তাহলে তো আর কোনও ভাবনাই থাকতো না। তাহলে কি আর প্রীতির এত ভাবনা না চৌধুরী-মশাইএরই এত খরচান্ত। চৌধুরী-মশাই যে কেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে তা বাইরের কেউ জানতে পারে না। কিন্তু প্রীতি তো মানুষটার যন্ত্রণার কথা আন্দাজ করতে পারে। কর্তাবাবুকে পর্যন্ত এসব ব্যাপার কিছু বলা হয়নি। কর্তাবাবু জানে তাঁর নাতি সকলে যেমন সংসার-ধর্ম করে তেমনি সংসার-ধর্ম করে যাচ্ছে। মেল বাজারের কাঞ্চন স্যাকরাকে গয়না গড়াতে দিয়েছে, বউমার ছেলে হলে তাই দিয়ে তার মুখ দেখবেন। কর্তাবাবুরই যেন সব চেয়ে আগ্রহটা বেশি। বউমার ছেলে হলে কর্তাবাবুই সব চেয়ে খুশী হবেন। কিন্তু বাড়িতে যে শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে তাঁকে সে-সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। তিনি ভাবছেন বেহারী পালের বাড়িতে পুজো

হচ্ছে। এখন যদি আসল খবরটা তার কানে যায় তখন কী হবে?

প্রকাশ বললে—তুমি ঘুমোতে যাও দিদি, তুমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট করবে? এই খুপরির মধ্যে—

প্রীতি বললে—আর তুই? তুই আর কতক্ষণ শেকল বন্ধ করে দরজা আগলে থাকবি?

প্রকাশ বললে—কিন্তু দরজার শেকল খুলে দিলে যদি সদা ঘর থেকে পালিয়ে যায়?

প্রীতি বললে—তুই আস্তে আস্তে শেকল খুলে দে না, আওয়াজ না হলেই তো হলো। ও তো আর টের পাচ্ছে না। আর তা ছাড়া খোকা আর বউমা দুজনেই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চই—

—কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই। এই বলতে গেলে প্রথম ওদের দেখা, আজ রাত্তিরে কখনও ঘুমোয়? আমি তো আমার ফুলশয্যের রাত্তিরে ঘুমোই নি। তুমি ঘুমিয়েছিলে?

প্রীতি সে কথার ধার দিয়ে গেল না। বললে—তাহলে তুই কী করবি? এখেনে সারা রাত বসে থাকবি এমনি করে?

প্রকাশ বললে—রাত তো আর বেশি নেই, ভোর তো হয়ে এল—

তারপর যেন কী ভাবলে। বললে—দাঁড়াও, একটা মতলোব বার করেছি। আমি একবার খিড়কির দরজা খুলে বাগানের দিকে যাই; ওখানে গিয়ে সদার ঘরের জানলা যদি খোলা থাকে তো উঁকি মেরে দেখি গে কী করছে তারা—তুমি এখেনে দাঁড়াও,—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না প্রকাশ। বারান্দা পেরিয়ে উঠোন। ভেতর বাড়ির ওঠোন। উঠোনে নেমে পশ্চিম দিক দিয়ে বাগানের বেড়ার দরজা। সেই দরজা খুলে ভেতরে বাগান। ভোর হয়-হয়। চাঁদটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। গাছ-পালা মাড়িয়ে প্রকাশ একেবারে সদার ঘরের উত্তর দিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সেদিকটা ঝোপ-ঝাড়। কলা-গাছ, নেবুগাছের ঝাড়। মাথায় কাঁটা ফুটে রক্তারক্তি হবার মত অবস্থা। গিয়ে দেখলে জানলার পাল্লা দুটো খোলা। টিপ-টিপ পায়ে প্রকাশ মাথা নিচু করে সেখানে গিয়ে উঁকি দিলে। উঁকি দিয়ে দেখে অবাক।

প্রকাশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখলে।

তারপর যে-পথ দিয়ে গিয়েছিল আবার সেই পথ দিয়ে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো। প্রীতি সেখানেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রকাশ আসতেই জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী দেখলি? দেখতে পেলি কিছু? কী করছে ওরা? ঘুমোচ্ছে? ঘুমিয়ে পড়েছে?

প্রকাশ বললে—তুমিও দেখবে এসো না—

—আমি? আমি আবার কী দেখবো?

প্রকাশ বললে—চলো না, তুমি তোমার ছেলের কাণ্ড নিজের চোখেই দেখবে চলো না।

প্রীতি বললে—তুই নিজেই বল না, আমি আবার কী দেখবো।

প্রকাশ না-ছোড়বান্দা। বললে—না, তোমার নিজের চোখেই দেখা উচিত, এসো, আমার সঙ্গে এসো। তোমার ছেলের কাণ্ড দেখবে এসো—

বলে প্রকাশ দিদির একটা হাত খপ করে ধরে ফেললে। ধরে টানতে লাগলো। বললে—এসো, এসো, দেখবে এসো—

প্রীতি বললে—ওরে না-না, হাত ছাড়, আমি মা হই, আমার দেখতে নেই, আমার দেখা ঠিক নয়—

কিন্তু প্রকাশ দিদির কথা শুনবে, এমন পাত্রই সে নয়। সে দিদির হাত ধরে টানতে লাগলো। টানতে টানতে একেবারে বাগানের ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর হাতটা ছেড়ে দিলে। বললে—এবার একটু আস্তে এসো। পা টিপে টিপে এসো। শুকনো পাতা যেন মাড়িয়ে ফেলো না, শব্দ হবে।

প্রীতি আবার একবার আপত্তি করতে যাচ্ছিল। প্রকাশ বললে—না, তোমার ছেলের কীর্তি তোমার নিজের চোখে দেখা ভালো। নইলে আমার মুখ থেকে শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না। এসো—

প্রীতিও প্রকাশের পেছন-পেছন পা টিপে টিপে চলতে লাগলো। উত্তর দিকের দেয়ালের জানালার কাছে এসে প্রকাশ গলা নিচু করে প্রীতির কানের কাছে ফিস্-ফিস্ করে বললে—এইখান দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখো—

প্রীতির যেন কেমন সঙ্কোচ হলো। বললে—আমি দেখবো?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ দেখ না, চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সব স্পষ্ট দেখতে পাবে—

প্রীতি বললে—কিন্তু আমি যে মা হই রে, আমাকে দেখতে নেই যে—

প্রকাশ বললে—একটু আস্তে কথা
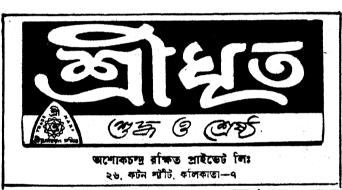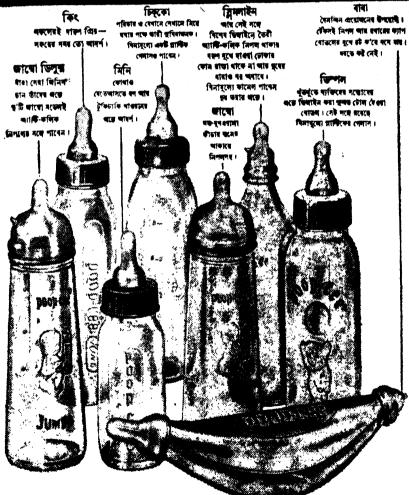
বলো না, শুনতে পাবে যে—দেখো এবার ভেতরে উঁকি মেরে দেখ, কিচ্ছু অন্যায় হবে না। আমি বলছি তোমার কিচ্ছু অন্যায় হবে না—

প্রীতি কী আর করবে। মাথাটা উঁচু করে জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিলে।

দেখে অবাক হয়ে গেল। দেখলে খোকা ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা চেয়ারের ওপর মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছে। মুখের চেহারাটা যেন মনে হলো গম্ভীর-গম্ভীর। যেন খুব কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে। আর খাটের দক্ষিণ দিকে বিছানার একটা কোণের ওপর পেছন ফিরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে বউমা। মাথায় এক গলা ঘোমটা। কারো মুখে কোনও সাড়া নেই শব্দ নেই। যেন দুজনেই বোবা!

তা হলে কি সারা রাতই ওরা ওইভাবে রাত কাটিয়েছে নাকি?

প্রীতির দু-চোখ ভরে জল এসে গিয়েছিল। আর দেখতে ভালো লাগলো না। তাড়াতাড়ি জানালা থেকে চোখ নামিয়ে নিলে।

প্রকাশ বললে—কী? কী দেখলে দিদি?

প্রীতি কিছু কথা বললে না। যে-রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়েই আবার ফিরে চলতে লাগলো। তারপর বাগান পেরিয়ে উঠোনে এসে পড়লো।

প্রকাশও পেছন-পেছন আসছিল। এতক্ষণ সেও কোনও কথা বলেনি। এবার উঠোনে পড়েই জিজ্ঞেস করলে—দেখলে তো? দেখলে তো তোমার ছেলের কাণ্ড?

শুধু প্রীতির মুখে কোনও কথা নেই। সে যেন খানিকক্ষণের জন্যে বোবা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠলো।

প্রকাশ বললে—কী হলো? তুমি কথা বলছো না যে?

প্রীতি বললে—আমি আর কী বলবো?

প্রকাশ বললে—কী অদ্ভুত ছেলেই পেটে ধরেছিলে তুমি দিদি। ধিক্ তোমার ছেলেকে, ধিক্! আমি এতদিন ধরে চেষ্টা করেও ওকে মানুষ করতে পারলুম না। আমারই লজ্জা হচ্ছে, বুঝলে দিদি। লজ্জা আমারই হচ্ছে, অথচ অত সুন্দরী দেখে ওর বউ এনে দিলুম। আমি জানতুম আগুনের পাশে ঘি রাখলে ঘি গলে জল হয়ে যায়, এ যে দেখছি একেবারে আইস্, একেবারে বরফ—

প্রীতি তখনও যেন নিজের মনেই কী ভাবছিল। বললে—আমার মনে হয় ওর বিয়ে না দিলেই ভালো হতো রে। ও তখন আপত্তি করেছিল। কেন যে তখন আমি অত জোর-জবরদস্তি করলুম। কী জানি, মা হয়ে ওর ভাল করলুম কি মন্দ করলুম—আর পরের বাড়ির একটা নিরপরাধ মেয়ের জীবনটাও মাঝখান থেকে বোধ হয় নষ্ট করে দিলুম—

প্রকাশ সান্ত্বনা দিলে। বললে—এসো, তুমি ও নিয়ে আর ভেবো না, তোমারও তো আবার কথায় কথায় বুক ধড়ফড় করে। আর ভেবো না তুমি। আমি সব ঠিক করে দেব, আমাকে দেখছি সেই মাদুলিই আনতে হবে—

সত্যিই প্রীতির বুকটার কাছে তখন কেমন ব্যথায় টন্-টন্ করছিল। এ রকম প্রায়ই হয় প্রীতির। একটু অনিয়ম হলেই এই রকম হয়। বিয়ের হাঙ্গামে কত দিন ধরে ভালো করে ঘুমই হয়নি। তার ওপর বিয়ের হাঙ্গাম চুকে যাবার পরও অনিয়ম চলছে। হার্টের আর দোষ কী?

প্রীতি বললে—ওরে, ভোর হয়ে এসেছে, এবার তুই শেকলটা খুলে দে—আর কষ্ট দিস নে খোকাকে—

প্রকাশও বুঝলো আর দরজায় শেকল দিয়ে রেখে লাভ নেই।

বললে—খুলে দিই তাহলে?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ, দে!

প্রকাশ বাইরে থেকে চেঁচিয়ে সদার নাম ধরে ডাকলে—সদা-সদা—

বলে শব্দ করে শেকলটা খুলে দিলে। আর খানিক পরেই ভেতর থেকে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল সদানন্দ।

প্রকাশমামা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সদানন্দ তার দিকে একবার চেয়ে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর প্রকাশমামাকে পাশ কাটিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রকাশমামা তাকে ঘিরে ধরলে। বললে—কী রে, এত সকালে উঠে পড়লি যে? তুই ঘুমোস নি নাকি?

তাকে দেখে মনে হলো সদানন্দ যেন রাগে ফুলছে। প্রকাশমামার কথায় কান না দিয়ে যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকেই চলতে লাগলো। প্রকাশমামা সদানন্দর সামনে গিয়ে তার রাস্তা আটকে দাঁড়ালো।

বললে—কী রে, তুই কি আমার সঙ্গে কথাই বলবি না নাকি? আমার ওপর রাগ করলি কেন? আমি তোর কী করলুম?

সদানন্দ বললে—তুমি ছাড়ো আমাকে—

প্রকাশমামা বললে—তা ছাড়বো না তো কি তোকে আমি ধরে রাখবো? কিন্তু তোর কী হলো তা আমাকে বলবি তো?

সদানন্দ বললে—তুমি কেন মিছিমিছি আমাকে বিরক্ত করছো প্রকাশমামা? আমার শরীর খারাপ, কিছু ভালো লাগছে না—

প্রকাশমামা সদানন্দর সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে বললে—কেন, শরীর খারাপ কেন? রাত্তিরে ঘুম হয়নি?

সদানন্দ রেগে উঠলো। বললে—তোমরা কি আমাকে পাগল করতে চাও প্রকাশমামা? আমাকে কি তোমরা মেরে ফেলতে চাও? তোমরা কী পেয়েছ আমাকে? আমি পাগল?

প্রকাশমামা বললে—দূর, তুই পাগল কেন হতে যাবি, তুই যে কাণ্ড করছিস তাতে আমাদেরই পাগল করে ছাড়বি—

সদানন্দ বললে—তার চেয়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও প্রকাশমামা, আমার যেদিকে দু' চোখ যায় সেই দিকেই চলে যাই। আমার কিছু ভালো লাগছে না—

প্রকাশমামা সদানন্দর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—না না অমন কাজ করিস নি তুই সদা, তুই লেখা-পড়া জানা ছেলে, পাগলামি করিস নি তুই। কী হয়েছে তাই তুই বল্ আমাকে—

সদানন্দ রেগে গেল। বললে—কাকে কী বলবো? কতবার বলবো? কেউ যদি আমার কথা না শোনে তো আমি কী করবো? কেন তুমি আমাকে বিয়ে করতে বললে প্রকাশমামা? কেন আমাকে তোমরা মিছিমিছি ধাপ্পা দিলে? কেন তোমরা আমার কথা রাখলে না? কেন তোমরা কালিগঞ্জের বউ-এর এমন সর্বনাশ করলে? কেন তোমরা তাকে তার দশ হাজার টাকা দিলে না? কেন? কেন দিলে না, কেন?

প্রকাশমামা বললে—কেন টাকা দিলে না তা তোর দাদু জানে, তোর বউ কী দোষ করলো? তোর দাদুর দোষের জন্যে তুই তা বলে তোর বউএর ওপর প্রতিশোধ নিবি?

ওদিকে প্রীতি তাড়াতাড়ি খোকার ঘরে ঢুকে পড়েছে। ভেতরে ঢুকেই ডাকলে—বউ মা—

(ক্রমশ)

॥ ৪২ ॥

গয়না-বড়ি

গৃহস্থালীর সর্বক্ষেত্রে, ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেটুকু দরকার শুধু সেটুকুতেই বাঙালীর মন ভরেনি কখনও। কিন্তু সেই অনাবশ্যক বাহুল্যের জন্য তাকে কদাচিৎ মহার্ঘ বিলাসিতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সামান্য শ্রম ও সামান্যতর ব্যয়ে গ্রামীণ বাঙালীর গৃহোপকরণ নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে রূপসন্ধানী চিত্তের স্পর্শে। ধানচাল মাপবার জন্য সাদাসিধা মাটির পাত্র বা নারকেলের মালা হলেই চলে যাবার কথা। কিন্তু এজন্য সূক্ষ্ম নকশায় অলংকৃত কাঁসা-পিতলের কুনকে ছাড়া বাঙালীর চলেনি। পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে প্রচলিত, ঢোকরা-কর্মকারদের তৈরি, "পাই" নামের যে ধাতু-পাত্রগুলি দেখা যায় তা ধানচাল মাপবার জন্যই নির্মিত কিন্তু তাদের গায়ে কারিগরির নকশা বিস্ময়কর। পরিচ্ছন্ন যে কোন

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পিঁড়িই বরের আসন হবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু তাকে নানা রঙে চিত্রিত না ক'রে বাঙালী কোনদিন সন্তুষ্ট হয়নি। ব্রত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র হিসাবে গোবর-নিকনো ভূমিখণ্ডই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু শুভ্র আলপনায় সে-ভূমি সজ্জিত না হলে বাঙালী পুরনারীর কাছে তা ব্যবহারের অযোগ্য মনে হয়েছে চিরকাল। ঘরে-তৈরি সন্দেশ, চন্দ্রপুলি বা আমসত্ত্ব সোজাসুজি অতিথিকে পরিবেশন করলে তার স্বাদের কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু ছাঁচে ফেলে তাদের সুদৃশ্য নকশায় মণ্ডিত করাটা বাঙালী গৃহিণীরা বরাবরই আবশ্যিক মনে ক'রেছেন। হাঁড়িতে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু ঝুলিয়ে রাখবার জন্য যেসব শিকা ব্যবহৃত হয় তার দড়ি অশোভন হোক ক্ষতি নেই, ছিঁড়ে না গেলেই হল। কিন্তু এই সামান্য গৃহোপ-করণও সূচীশিল্প ও রঙের প্রয়োগে অসামান্য রূপ নিয়েছে। সম্মানিত কুটুম্বকে বসতে দেবার জন্য বাজার-থেকে-কেনা পাটি বা মাদুর অনুপযোগী নয়। কিন্তু সেই একই কাজে লাগাবার জন্য বাঙালী বউ-ঝি'রা বহু বছরের পরিশ্রম নিয়োজিত

করেছেন এক-একটি আসন বা নকশি-কাঁথা তৈরি করতে। কুলুঙ্গীতে প্রদীপ রেখে গৃহতল আলোকিত করা সম্ভব হলেও অপরূপ কারুকার্যখচিত পিতলের পিলসুজ একদা বহুলপ্রচলিত ছিল বাঙালী সমাজে। দৃষ্টান্ত আর বাড়াব না। বাঙালীর অশন-বসনে, গৃহসজ্জায়, উৎসব-পার্বণে, লোক-শিল্পে, তার ধ্যানে, কল্পনায়, অস্থিমজ্জায় এক বিশিষ্ট সৌন্দর্যস্পৃহা সদা-প্রবাহিত। উভয় বাংলার পলিমাটির পেলবতায়, আন্দোলিত শস্যক্ষেত্রের দিগন্তবিস্তারে বঙ্গজননীর যে শ্যামলবরণ, কোমলমূর্তি আমাদের মর্মে গাঁথা, তারই শুভস্পর্শ বিধাতার আশীর্বাদের মত বর্ষিত হয়েছে বাঙালীর গৃহস্থালীতে, তার যাবতীয় সৃজনকর্মে।

কিন্তু প্রধানত শান্ত, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশই যে বাঙালী-চরিত্রে সৌন্দর্য-অনুসন্ধানের এই প্রেরণা জুগিয়েছে এমন নাও হতে পারে। তাই যদি হত তবে অভ্রান্ত লক্ষ্যে রাইফেল চালিয়ে যে আফ্রিদী শত্রুনিধনে সর্বোত্তম সুখ পায়, সে-ই আবার জরির-কাজ-করা কুর্তার শোভায় বিমোহিত হয় কেন? তাপদগ্ধ মরুভূমির সীমাহীন হাহাকারের মধ্যে অজন্মলালিত বেদুইন কেন পরায় তার প্রিয় উটের গলায় রঙিন পুঁতির মালা? ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যে আফ্রিকাবাসী অহর্নিশি সংগ্রামে লিপ্ত, আপাতবিরোধীভাবে তাকেই আবার দেখি পাখির পালকে বহুবর্ণ শিরোভূষণ প্রস্তুত ক'রে অবসর বিনোদন করতে। ঝাড়খণ্ড-কিঅনঝাড়ের নিরাভরণা সাঁওতাল যুবতীর নিবিড় কালো কেশে যখন একটি পলাশের কুঁড়ি শোভা পায়, কিংবা রাজপুতানীর চুমকি-বসানো বহুবর্ণ ঘাঘরা যখন পায়ে-চলার ছন্দে তরঙ্গভঙ্গে আকুল হয়ে ওঠে, অথবা বাস্তার-কালাহাণ্ডির আদিবাসী নাচের আসর যখন উজ্জ্বল হয় পশুর লোম ও শিঙের আভরণে তখন রূপানুভূতির সর্বব্যাপী প্রকাশই লক্ষ করি বারের কাছের পৃথক পরিবেশে। সৌন্দর্য সাধনার এই ভুবনজোড়া আসনখানি দুই বাংলার হৃদয়-মাঝেও বিস্তৃত। বাঙালীর ক্ষেত্রে সে সহজাত স্পৃহাকে আরও বিকশিত করতে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ হয়ত বা কিছু বেশি সাহায্য করে থাকবে।

*

অতিথি-কুটুম্বের পাতে সুদৃশ্য আকারে পরিবেশন করবার জন্য যে সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, আমসত্ত্ব প্রভৃতির নকশি ছাঁচ ব্যবহার করা হত সেকথা একটু আগেই বলেছি। আহার্য তালিকায় এসব সুখাদ্য কুলীন। তাদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যচর্চা হয়ত বা শোভা পায়। কিন্তু অতি সাধারণ যে বড়ি, যার বিজ্ঞপের
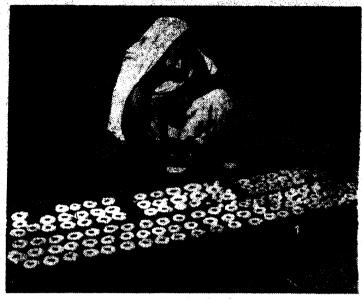
গয়না-বড়ি শিল্পী

পরিধি শুকতো, ডাল্না, ঘণ্ট, ঝোল ও অম্বলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার অংগেও বাঙালী পুরনারীরা যে রূপারোপের চেষ্টা করেছেন সেকথা হয়ত অনেকেই জানেন না। গ্রামীণ বাঙালীর অজস্র নন্দন-প্রয়াসের অন্য দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করা কঠিন ছিল না। কিন্তু আজকের আলোচনার জন্য বড়ির মতো এক অতি সুলভ ও সাধারণ ব্যঞ্জনকে নির্বাচিত করেছি এই কারণে যে, এটি সম্ভবত এক প্রান্তিক উদাহরণ। এ দৃষ্টান্ত থেকে চূড়ান্তভাবে বোঝা যাবে গৃহস্থালীতে বাঙালীর সুরুচি কতদূর অবধি প্রসারিত।

বাজারে যে বড়ি কিনতে পাওয়া যায় ও যার সংগে আমরা সকলে পরিচিত তা ছোট ছোট ছুঁচলো স্তূপের মত। অনেক রকম ডাল থেকেই তা তৈরি হতে পারে। ডাল বেটে, জল মিশিয়ে লেই করে নিয়ে, আঙুলে টিপে টিপে পরিষ্কার ন্যাকড়া, কুলো প্রভৃতির ওপর ফেলে, রোদ্দুরে শুকিয়ে নিলেই সেরকম বড়ি পাওয়া যায়। দক্ষতার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না বলে যে-কেউ বাজার-চলতি বড়ি তৈরি করতে পারে। কিন্তু গয়না-বড়ি বা জিলিপি-বড়ির ক্ষেত্রে যে নৈপুণ্যের দরকার তা মোটেই সুলভ নয়। বাংলাদেশের কথা ঠিক বলতে পারব না; তবে পশ্চিমবঙ্গে এক মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও আমি গয়না-বড়ি তৈরি হতে দেখিনি। আমার অনুসন্ধান অনুসারে, সে জেলার মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, ময়না, পাঁশকুড়া ও ঘাটাল প্রভৃতি থানাতেই এ শিল্পটি সীমাবদ্ধ। অন্যত্রও এ শিল্পের চর্চা থাকা খুবই সম্ভব। পাঠকদের সে বিষয়ে কিছু জানা থাকলে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মারফৎ আমায় জানাতে পারেন।

মেদিনীপুর জেলার এসব অংশে কারু-শিল্পটি কতদিন থেকে প্রচলিত তার সঠিক কোন হিসাব নেই। নক্সী-কাঁথার উৎপত্তি কাল নির্ণয় করা যেমন সম্ভব নয়, গয়না-বড়িও তেমনি সর্বপ্রথম কে কোথায় তৈরি করেছিলেন তা বলা যায় না। কারিগর মহিলাদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি। ছেলেবেলায় ঠাকুমা-দিদিমার কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল, এর বেশী তাঁরা কিছু বলতে পারেন না।

গয়না-বড়ি বা জিলিপি বড়ি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জিলিপি তৈরির সময় ফুটো পাত্র থেকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেভাবে লেই ফেলা হয় (সাধারণত আড়াই প্যাঁচ), গয়না বড়ির

ক্ষেত্রেও জোটাষ্টি তাই। নূতন পার্থক্য কিছু আছে। সেকথা পরে বলছি। জিলিপি, বা আর একটু বেশি "অলংকৃত" অমৃতি, তৈরির পদ্ধতিতেই বানানো হয় বলে গয়না-বড়ির আর এক নাম জিলিপি-বড়ি। কিন্তু গয়না-বড়ি নাম কেন? ইংরেজীতে "অর্নামেন্টেশন" বলতে যেমন গহনার অলংকরণ-কেই বোঝায় না, অন্যরকম সজ্জাকেও বোঝাতে পারে, তেমনি আলোচ্য বড়িগুলি নানান্ নকশায় হয় বলে তারা 'অর্নামেন্টেড' বড়ি বা গয়না-বড়ি। প্রচলিত নকশার মধ্যে বিবিধ ফলফলারি—আম, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি—নানারকম পশুপাখি—হাতি, ঘোড়া, বিড়াল, টিয়া, কাকাতুয়া, ময়ূর ইত্যাদি ছাড়াও বঙ্গনারীর গয়নার পুরো সেটও তৈরি হয়ে থাকে। যেমন, মুকুট, টায়রা, "কান", দুল, ঝাপটা, নেকলেস, বালা, রুলি, তাগা প্রভৃতি। কারিগর যেখানে পল্লীবধূ সেখানে শেষের "মোটিফ"গুলি যে অগ্রাধিকার পাবে তাতে সন্দেহ কি! সেজন্যই নাম গয়না বড়ি।

এ শিল্পে উপাদান প্রস্তুত করা কঠিন না হলেও বড়ি তৈরির কাজটি রীতিমত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসাপেক্ষ। কলাই বা বিউলী ডাল (অন্য ডাল ব্যবহৃত হয় না) খুব ভাল করে বেটে নিয়ে জল মিশিয়ে অনেকক্ষণ ফেটানো হয়। ফেটানো ঠিক হয়েছে কিনা জানবার জন্য অল্প পরিমাণ লেই জলে ভাসিয়ে দেখা হয়—ভাসে, না ডুবে যায়। যদি ভেসে থাকে তবে বুঝতে হবে লেই ঠিকমত তৈরি হয়েছে। ডুবে গেলে, ফেটানো চলে আরও কিছুক্ষণ। লেই-এর ঘনত্বের প্রশ্নটি জরুরী কিন্তু তার মীমাংসার জন্য বিশেষ কোন একসপেরিমেন্টের ব্যবস্থা নেই, কারিগরের দক্ষতাই একমাত্র নির্ভর।
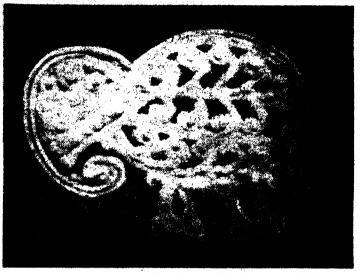
লেই ঢালবার জন্য লাগে শক্ত কাপড়ের একটি থলি বা পাঁটুলি, যার গায়ে ছোট ফুটোর মধ্য দিয়ে টিন, পিতল বা রুপোর এক ফাঁপা নলের ডগা বাইরে বার হয়ে থাকে। লেই-পোরা থলি মুঠো করে ধরে সামান্য চাপ দিতে থাকলে ফাঁপা নলের মধ্য দিয়ে তা বাইরে বার হতে থাকে। তখন দক্ষ শিল্পী হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই লেই নীচে ফেলে মনোমত নকশার সৃষ্টি করেন। নীচে পাতা কাপড় বা অন্য কিছুর ওপর সাধারণত পোস্তদানার এক মিহি আস্তরণ বিছানো থাকে। তাতে বড়িগুলি শুকোনোর পর সহজেই তুলে নেওয়া যায়। পাতার সঙ্গে জড়িয়ে যায় না; শুকোবার পর সহজেই তুলে নেওয়া যায়।

হাতী-বড়ি

প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যাবে একটুও না থেমে, একটানা হাত নাড়িয়ে এ-নকশাগুলি সৃষ্টি করা কত কঠিন কাজ। ড্রয়িং-এর বেশ ভাল জ্ঞান ও যথেষ্ট অভ্যাস না থাকলে এহেন সুষম মোটিফ তৈরি করা অসম্ভব। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর পরিধি-রেখা বা "আউট লাইন"টুকু রচনা করা ছাড়া ভিতরের অংশ নানা পরিপূরক অলংকরণ দিয়ে ভরাট করাও সহজ ব্যাপার নয়। তার থেকে বড় কথা, পল্লীবধূরা অন্যের আঁকা ড্রয়িং কদাচিৎ অনুসরণ করে থাকেন; যাঁর যেমন ক্ষমতা, সেইমতই তাঁদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা রূপায়িত হয় এই অভিনব কারুকর্মে। এসব বিবিধ কারণেই গয়না-বড়ির উৎকৃষ্ট শিল্পী বেশ বিরল।

গয়না-বড়ির ক্ষেত্রে কলাই ডাল ছাড়া

গয়না-বড়ি

জন্য ডাল ব্যবহার না করার সঙ্গত কারণ আছে। নকশাগুলি বেশ বড় আকারের (৬"×৬" বা তার থেকেও বড়) হয় বলে উপাদানের মধ্যে একটা আঠালো ভাব থাকলে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা কমে। বিউলী ডাল যে বেশ চটচটে, সেকথা সকলেই জানেন। শিল্পীদের কাছে শুনেছি, এ-ডাল নাকি শুকিয়েও ওঠে খুব তাড়াতাড়ি। তাতে অল্প সময়ে বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়। না ফেটে গিয়ে, অল্প সময়ে সমান-ভাবে শুকিয়ে ওঠাটা গয়না-বড়ির ক্ষেত্রে জরুরী বলে এ-শিল্পচর্চার জন্য বিশেষ দিনক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কার্তিক থেকে মাঘ অবধি সাধারণত প্রশস্ত সময় বলে বিবেচিত হয়। কেননা, শীতের এই ক'টা মাসে বাতাসের শুষ্কতার দরুন বড়ি শুকোয় সহজে ও সমানভাবে। কড়া রোদ্দুরে বড়ি ফেটে যেতে পারে বলে সকালের দিকেই তাদের রোদে দেওয়া হয় ও দুপুরের আগে তুলে এনে বাকিটা শুকোনো হয় শীতল ছায়ায়। কখনও কখনও পশু-পাখির চোখ করা হয় গোটা মসুর ডাল বসিয়ে। সম্মানিত কুটুম্বকে উপহার দেবার জন্য লেই-এর সঙ্গে রং মিশিয়ে রঙিন বড়ি তৈরি করবারও রীতি আছে। সেক্ষেত্র একাধিক রঙেরও প্রয়োগ হতে পারে। বড়ি শুকোলে তাদের মাটির হাঁড়ির মধ্যে সযত্নে সাজিয়ে তুলে রাখা হয় অনির্দিষ্ট-কাল। হাঁড়িশুদ্ধই তত্ত্ব যায় আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে। আবার জামাই-বেয়াই অতিথি হলে, শিকা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে সেরা-সেরা নকশা-বড়ি বার ক'রে সরষের তেলে ভাজার ধুম পড়ে যায়। বলা বাহুল্য, ঝোলে-অম্বলে-শুক্তোয় এ-বড়ির ব্যবহার সৌন্দর্য-হননেরই সামিল। কেননা, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে এত পরিশ্রমে তৈরি নকশার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গয়না-বড়ি সেজন্য শুধু ভেজে খাবার জন্য। তলায় পোস্তদানার আবরণ থাকায় খেতেও বেশ মুচমুচে হয়।
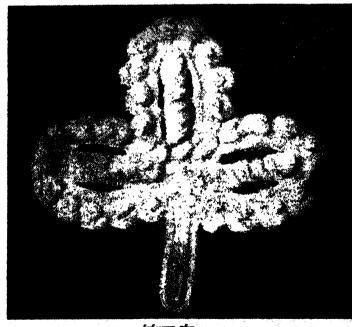
দুর্বোধ্য কারণে মেদিনীপুর জেলার মাহিষ্য সম্প্রদায়ের পুরনারীদের মধ্যেই এ-শিল্পটি প্রধানত সীমাবদ্ধ। গয়না-বড়ির উপকরণ বা কারিগরির মধ্যে এমন কিছু নেই, যা এই সীমাবদ্ধতার হেতু হতে পারে। নকশী-কাঁথার ক্ষেত্রে কিন্তু এর উলটোটাই বরং সত্য ছিল। সেখানে, পল্লীবালাদের সেবার পুষ্ট আর-একটি কারুকর্মে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। আঞ্চলিকভাবে কোথাও কোথাও হয়ত তার তারতম্য হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মহিলারা প্রায় একচেটিয়াভাবে সে শিল্প-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। গয়না-বড়ির ক্ষেত্রে এ ব্যতিক্রম সেজন্য অনুসন্ধানের যোগ্য।

মেদিনীপুর জেলার এক মাহিষ্য পরিবারের দৌলতে রবীন্দ্রনাথ যে একদা গয়না-বড়ির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সেকথা অল্প লোকেই জানেন। মহিষাদল-সুতাহাটা সড়কের পাশে, মহিষাদল থেকে মাইল চারেক দক্ষিণ-পূর্বে লক্ষ্যা গ্রাম থেকে শান্তিনিকেতনে ছাত্রী হয়ে এসে-ছিলেন শ্রীমতী সেবা মাইতি, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করে যিনি একদা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাইতিরা মাহিষ্য এবং এ পরিবারের মহিলা-দের মধ্যে গয়না-বড়ির উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন কয়েকজন। তাঁদের তৈরি নকশি-বড়ি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হয়ে-ছিলেন শুনেছি। চিঠি লিখে সে সন্তোষ রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেননি, এমন মনে হয় না। এ-পরিবারের কারও কাছে কবিগুরুর সেরকম চিঠি যদি থেকে থাকে, তবে আমার অনুরোধ 'দেশ'-এর আলোচনা বিভাগে প্রকাশের জন্য তিনি যেন সেটির কপি পাঠিয়ে দেন। (ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

চিড়িতন-বড়ি

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে এবার হৃদরোগ

৭ এপ্রিল, ১৯৭২ বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস পালন করা হল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এবারকার স্লোগান "আপনার হৃৎপিণ্ডই আপনার স্বাস্থ্য।"

কারণ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীর সব দেশেই এই রোগটির আক্রমণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিল্প সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবন যেখানে তথাকথিত আধুনিকতার টানা পোড়েনে শৃঙ্খলাবদ্ধ, সেখানে।

এ রোগ কেন হয়? এবং কোন বয়সে? বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন : যে

কোন বয়সেই এ রোগের সম্ভাবনা থাকে। রোগের কারণ এবং ধরন একাধিক। তবে সময়মত চিকিৎসা করালে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বলা হয়েছে, হৃৎপিণ্ড যখন তার নিজস্ব কর্মক্ষমতা হারায় অথবা শরীরের কোন অংশে যথাযথ রক্তবহন বাধা পায়, তখনই বিপত্তি ঘটে। কারণ, রক্তের মধ্যে দিয়েই অক্সিজেন ছড়িয়ে পড়ে শরীরের তিনটি প্রয়োজনীয় কোষে। কোষের সঞ্চিত জ্বালানি, যা খাদ্যরূপে আমরা গ্রহণ করে থাকি; ওই অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে শক্তি থেকে আমরা কার্যক্ষমতা পাই। বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করি। অতএব যখন আপনি দৈহিক পরিশ্রম কম করেন, অতিরিক্ত খাদ্য আপনার দেহের মধ্যে সঞ্চিত হয়। এবং ওই সঞ্চয় অবশেষে অনর্থ ঘটায়।

মুশকিল হল, নানা কারণে শরীরে রক্ত চলাচল বাধা পেতে পারে। এক, জন্মের আমৃত্যু পর্যন্ত, আপনার শরীরের যে হৃদযন্ত্রটির সমানে কাজ করার কথা, সেটা যদি কোন কারণে কমজোর হয়ে যায়, বিপত্তি নানা রকমের হতে পারে। যেমন ধরুন, হঠাৎ জীবরাসায়নিক কোন ত্রুটির দরুন আপনার শরীরে কোষের কাজকর্ম-উদ্দীপ্তকারী বিদ্যুৎ প্রবাহ অসংযত হয়ে পড়ল। এর ফলে হৃৎপিণ্ডের পেশীর যথাযথ সংকোচন এবং সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়ে রক্ত সঞ্চালন বাধা পেতে পারে। শ্লেষ্মা বা বাত জাতীয় রোগে, যেমন ধরুন ব্রনকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতির আক্রমণেও অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা বা পেশীর কোন কোন অংশ কমজোর হওয়া সম্ভব। তখন হৃৎপিণ্ডের পক্ষে ঠিকমত রক্ত পাম্প করা সম্ভব হয় না। কখনও কখনও ওই সমস্ত রোগে কপাটিকাটির আয়তন ছোট হয়ে যায়। ফলে যে পথ দিয়ে রক্ত চলাচল করে তাদের পুরোপুরি বন্ধ করে অথবা খুলে দিয়ে রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর হয় না। ফলে হৃৎপিণ্ডের যে অন্যতম দায়িত্ব, শরীরের দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করা অর্থাৎ বিপাকীয় কাজের অপদ্রব্য রূপে যে কার্বন ডাই-অকসাইডকে বয়ে নিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হয় তাকে সরিয়ে দেওয়া এবং পরিবর্তে রক্তে বিশুদ্ধ অকসিজেন মেশান, সেটা পালন করা আর সম্ভব হয় না। যার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকেও ডেকে আনতে পারে। দুই, জীবাণুর আক্রমণেও হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। তিন, কোন কারণে রক্তে গ্যাসের বুদবুদ এবং জমাট রক্তকণা মিশে গিয়ে রক্ত চলাচলকে অস্বাভাবিক করে তুলতে পারে। চার, ধমনীর সুড়ঙ্গ পথের ভেতরে পলির মত অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় পদার্থ জমে রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হওয়া সম্ভব। পাঁচ অতিরিক্ত রক্তচাপের দরুন ধমনী বা শিরা উপশিরার কোন অংশ ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হতে পারে। ছয়, কখনও কখনও শারীরবৃত্তীয় কারণে ধমনীর মধ্যে আঁশজাতীয় কোষের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ধমনী তার নমনীয়তা হারিয়ে ফেলে। শরীরে রক্তপ্রবাহ এর জন্যেও অস্বাভাবিক হয় এবং বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকে। সাত, অনেক বিকৃত হৃৎপিণ্ড নিয়ে জন্মান। কারোর হৃৎপিণ্ড অস্বাভাবিক বড়, কারোর অলিন্দ বা কপাটিকা প্রয়োজন মত কাজ করতে পারে না। ফলে রক্ত সংবহন বাধা পায়। প্রজননগত এই ত্রুটি কখনও কখনও বংশগত কারণে ঘটতে পারে।

সম্প্রতি হৃদরোগ এবং ধমনীর রক্ত পরিবহন জনিত রোগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডঃ আর মাসিরোনি আরও একটি ভয়ঙ্কর কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। ওঁর বক্তব্য, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ রোগের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, যে দেশ শিল্পসম্ভারে যত বেশি উন্নত হচ্ছে হৃদ বা ধমনীজনিত রোগের আক্রমণও সেখানে দারুণভাবে বেড়ে চলেছে। সবচাইতে বেশি উন্নত দেশে বছরে যতজন লোক মারা যায় তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হৃদরোগী। করোনারি রোগীর সংখ্যা দিন দিন আরও বেড়ে চলেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাঁরা শিল্প সভ্যতার আওতার বাইরে বাস করেন, তাঁদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ অনেক কম। উন্নতিশীল দেশের অবস্থা মাঝামাঝি পর্যায়ে। অবশ্য সেখানেও মৃত্যুহার বৃদ্ধির পথে। এবং উন্নততর দেশের মানুষ জীবনের দ্রুত পরিসমাপ্তির জন্যে এই রোগটিকেই যেন বেশি করে বেছে নিয়েছেন।

হৃদরোগ এবং শরীরে রক্ত সংবহনজনিত রোগের কারণ সম্পর্কে পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষজ্ঞরা নানাভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং চালাচ্ছেন। কেউ বলছেন, খাদ্য-অভ্যাসের ত্রুটির দরুন এ রোগ হচ্ছে

পারে। অতিরিক্ত তেল বা চর্বিজাতীয় খাদ্য, শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রভৃতি বিপত্তির কারণ। কখনও কখনও খাদ্যের তুলনায় পরিশ্রম কম করায় এ রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। এর সঙ্গে আছে প্রজননগত ত্রুটি, অতিরিক্ত ধূমপান, মানসিক চাঞ্চল্য প্রভৃতি।

বর্তমান শিল্প সভ্যতার যুগে এই শেষোক্ত কারণটি আরও মারাত্মক। কারণ, যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে সমান তালে চলতে গিয়ে আগের তুলনায় আজকের মানুষ মনের দিক দিয়ে অনেক বেশি বিপর্যস্ত। তার আশা আকাঙ্ক্ষা এখন স্থূল বস্তুজগতকে কেন্দ্র করে। সে সুখে থাকতে চায়, ভালভাবে বাঁচতে চায়, বড় বড় কারখানা করতে চায়—বড় বড়। আরও বড়। চাই। আরও চাই। অনেক সময় কী চায়, হয়ত সে নিজেই জানে না। কেন চায় তাও সে জানে না। বস্তুগত সম্ভার হয়ত তার বেড়েছে, কিন্তু আজকের মানুষ মনের দিক দিয়ে অনেক বেশি দরিদ্র। তার মানসিকতার মূল্যায়নে সে ব্যর্থ হয়েছে। এর পরিণতি জটিল মানসিক রোগ। আর একথা অনেকেই জানেন বিপর্যস্ত মন মানেই পঙ্গু স্নায়ুতন্ত্র, পঙ্গু স্নায়ুতন্ত্র মানে আপনার শারীরবৃত্তীয় কাজ-কর্মে ত্রুটি। এতে করে রক্তের চাপ বাড়তে পারে। অত্যধিক রক্তচাপে মস্তিষ্কের ধমনী ছিঁড়ে গিয়ে আপনার মস্তিষ্ক-কোষদের অকেজো করতে পারে। ফল পক্ষাঘাত।

আধুনিক শিল্পজগতের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগীর সংখ্যা কেন বাড়ে, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে গবেষকরা আরও একটি বিভ্রান্তিকর কারণ উদ্ঘাটন করেছেন। ওঁরা বলছেন, কোন কোন 'ট্রেস এলিমেন্ট'ও এই সমস্ত রোগের অন্যতম কারণ।

ট্রেস এলিমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করুন। আমাদের এই পৃথিবীর ভূস্তর, সমুদ্র এবং বাতাস অর্থাৎ ভূ-রাসায়নিক পরিবেশে মোট ৯০টিরও বেশি মৌলিক পদার্থ আছে। এদের মধ্যে মোট এগারটি পদার্থ আমাদের দৈহিক গঠনের মুখ্য নায়ক। এরা অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক, সোডিয়াম, ক্লোরিন এবং ম্যাগনেসিয়াম। এদের বলা হয় 'বাল্ক' বা প্রধান প্রধান মৌলিক পদার্থ। আমাদের শরীরে এদের প্রত্যেকের জৈবিক কাজকর্ম কী তাও আমাদের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু এগুলি ছাড়া আরও কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ আমাদের শরীরে পাওয়া যায়। পরিমাণে তারা খুবই নগণ্য। এই সমস্ত পদার্থকে বলা হয় 'ট্রেস এলিমেন্ট।' এদের মধ্যে কোনো

তামা, আইওডিন, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, দস্তা এবং সম্ভবত সেলে-নিয়াম, এই সাত-আটটি মৌলিক পদার্থ আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের কাজ এবং আরও নানারকম শারীরবৃত্তির কাজকর্মে সাহায্য করে।

আরও কিছু কিছু ট্রেস এলিমেণ্ট শরীরের মধ্যে দেখা গেছে। পরিবেশ থেকে আবর্জনার মতই ওরা হয়ত আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। শরীরের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরাফেরার পর হয় তারা এক সময়ে মলমূত্র বা ঘামের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। অথবা শরীরের কোন অংশে দীর্ঘ-স্থায়ী হয়ে বাস করে। শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে এদের অনেকের ভূমিকা এখনও পর্যন্ত জানা সম্ভব হয় নি। তবে দেখা গেছে, এদের মধ্যে কোন কোন পদার্থ যেমন, ক্যাডমিয়াম, রক্তের চাপ বাড়াতে সাহায্য করে এবং ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, প্রচুর কলকারখানা তৈরির ফলে পরিবেশের মধ্যে নানারকম ধাতুকণার পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ওই সমস্ত ধাতু জল, খাবার অথবা প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে এবং বিপত্তি ঘটাতে পারে। ইদানীং 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনে কৃষি জমিতে নানা রকম কীট-নাশক ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। ওই সমস্ত ওষুধের মধ্যে ট্রেস এলিমেণ্ট থাকতে পারে এবং তারা শস্য কণার মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে হৃদরোগ সৃষ্টি করতেও পারে।

১৯৫৭ সালে জাপানের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অদ্ভুত একটি ব্যাপার লক্ষ করলেন। ও'রা দেখলেন সেখানকার যে সমস্ত অঞ্চলের নদীর জল অত্যধিক অম্লসিক্ত বা অম্লযুক্ত সেখানকার অধি-বাসীরা সন্ন্যাস রোগে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। অথচ যেখানকার জল কম অম্লযুক্ত সেখানে এ রোগ অনেক কম। ও'দের এই আবিষ্কারের পর মার্কিন বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন, যারা নরম জল বা সফট ওয়াটার পান করে তাদের মধ্যে হৃদরোগ বেশি। কঠিন জল পানকারীদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ কম। উল্লেখ্য, নরম জলে ক্যাল-সিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ কম। পরে বৃটেন, ফিনল্যাণ্ড, কানাডা, সুইডেন, নেদারল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডেও এমনটি দেখা যায়। এতে করে কেউ কেউ মনে করছেন নরম করার ফলে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা কমে যায় বলেই হৃদরোগ বা রক্তসংবহনজনিত রোগ দানা বাঁধে। আবার এমনও দেখা গেছে, খাদ্যে ক্রোমিয়াম মিশে থাকলে, ধমনীতে চর্বি বা আঁশজাতীয় কোষের পরিমাণ জমতে পারে না।

ঠিক কোন কোন ট্রেস এলিমেণ্ট হৃদরোগ ঘটাতে পারে না, বিজ্ঞানীরা এখন পরীক্ষা করে দেখছেন। বলা প্রয়োজন, টিনে প্যাক করা দুধ, ফলের রস এবং নানা রকমের খাবারের সঙ্গেও ক্ষতিকর ট্রেস এলিমেণ্ট শরীরে ঢোকার সম্ভাবনা থাকে।

অতিরিক্ত মদ্যপান হৃদসংক্রান্ত রোগের আরও একটি কারণ। সুইডেনের গুটেবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ গুওসতা তিবলিন এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি একজন রোগীর কথা উল্লেখ করেছেন। ৫৮ বছরের এই রোগী পেশায় একজন মেকানিক। কম বয়েস থেকে সে প্রচণ্ড ধূমপান করত। সেই সঙ্গে সমানে মদ্যপান। কয়েক মাস আগে সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল, তার হৃৎপিণ্ডের আয়তন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। ফুসফুসের কর্মক্ষমতাও অনেক কম। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে ব্রংকাইটিস রোগেও

ভুগছিল। তার রক্তে বিশেষ ধরনের চর্বি জাতীয় পদার্থ এবং ট্রাইগ্লিসেরাইডের মাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।

সম্প্রতি ওর মত আরও দশ হাজার রোগীকে পরীক্ষা করা হয়। পরে কতকগুলি অভ্যেস ত্যাগ করায় ওদের অনেকেই উন্নতি লাভ করতে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধূমপান হৃদরোগের অন্যতম কারণ। ওই সমস্ত রোগীর শতকরা ৪০ জন ধূমপান ছেড়ে দেওয়ায় যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন। অভ্যেসটি যারা ছাড়তে পারেনি, তাদের দেওয়া হয়েছিল নিকোটিনের গন্ধওয়ালা চুয়িংগাম। এতেও কাজ হয়েছিল।

তবু বলা চলে হৃদরোগের যথাযথ কারণ নির্ণয়ে এবং তার সার্থক প্রতিকারের সূত্র নির্ধারণে বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রেই এখনও পর্যন্ত নিঃসংশয় হতে পারেন নি। বিশেষ করে ব্যক্তি বিশেষে কতখানি কী খেলে বা কোন অভ্যাসের দরুন তাৎক্ষণিকভাবে এ রোগ শরীরে দানা বাঁধতে পারে অথবা বিপত্তি ঘটাবে তার সুস্পষ্ট আভাস যোগান এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। আপাতত তাঁরা বলতে চান, যেটুকু জানা গেছে, তার ওপর আপনারা সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। চিকিৎসকদের উপদেশ মত কাজ করুন। এতে করে এর আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজতর হবে।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে হৃদরোগীদের পুনর্বাসনও বড় রকমের একটি সমস্যা। যারা এই রোগে ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন অথবা হতে চলেছেন তাঁদের উচিৎ অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সাহায্যে নিজেদের নিয়মিত পরীক্ষা করা এবং যা যা তিনি করতে বলেন সেগুলি অভ্যেসের মত মেনে চলা।

সংক্ষেপে কয়েকটি হৃদরোগের নাম এবং পরিচিতি এখানে উদ্ধৃত করছি : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সৌজন্যে এগুলি সংগৃহীত হয়েছে।

অ্যানুরিজম (Aneurysm) : এই রোগে ধমনীর কোন অংশ প্রসারিত হয়ে পড়ে। চর্বি জমে এবং আঁশ জাতীয় কোষের বৃদ্ধির ফলে মহাধমনীর ওপরে অথবা নিচের অংশে এই রোগ দানা বাঁধা সম্ভব। সিফিলিস রোগের দরুনও মহাধমনীর অ্যানুরিজম হতে পারে। অনেক সময় মহাধমনীর ভেতরকার কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে রক্তপ্রবাহ মহাধমনীর প্রাচীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লেও অ্যানুরিজম হয়। ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা দরকার। অন্যথায় মৃত্যুও ঘটতে পারে।

অ্যানজিনা পেক্টোরিস (Angina pectoris) : বুকের মাঝ বরাবর সামনের দিকে ব্যাথা। ব্যায়াম, অতিমাত্রায় আবেগে অভিভূত হওয়া, অতিভোজন, হিম লাগান প্রভৃতি এ রোগের কারণ। এর ফলে বুকে চাপা অথবা খিঁচুনির মত বেদনা, কখনও মনে হয় ব্যাথায় সমস্ত বুক যেন জ্বলে গেল, কখনও বা বাঁ পাশের বাহু বা দুটি বাহুই ব্যাথায় টন টন করতে শুরু করে। বুকের চার পাশ, চোয়াল এবং কাঁধেও অনুরূপ ব্যাথা ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। কয়েক মিনিট বিশ্রাম অথবা নাইট্রোগ্লিসারিনের একটি বড়ি খুব দ্রুত খানিকটা আরাম এনে দিতে পারে। করোনারিজনিত হৃদরোগের এটা অন্যতম লক্ষণ।

অ্যারিদমিয়া (Arrythmia) : অনিয়মিত হৃদস্পন্দন। কোন কোন ক্ষেত্রে এ রোগ মোটেই ক্ষতিকর নয়। তবে রক্তসংবহনে ত্রুটির দরুন যদি এই রোগ ঘটে এতটুকু দেরি না করে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিৎ।

আর্টারিওস্ক্লেরোসিস (Arterio-sclerosis) : এই রোগে অতিরিক্ত চর্বি

ক্রমে অথবা আশিক্ষাতীয় বোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ধমনীর প্রাচীর পুরু হতে শুরু করে, শক্ত হয় এবং নমনীয়তা হারায়। এর ফলে ধমনীর ভেতরে রক্তসংবহনের পথ সংকীর্ণ হয়। রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।

ব্র্যাডাইকারডিয়া (Bradycardia) : সাধারণত হৃদপিণ্ডের শ্রম কার্যক্ষমতাকে বোঝায়।

কারডিয়াক অ্যারেস্ট (Cardiac arrest) : হৃদপিণ্ডের সংকোচন রোধ। এই রোগে হৃদপিণ্ডের পেশীর সংকোচন এবং সম্প্রসারণ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অথবা তার বিশেষ বিশেষ কোষ নিজস্ব কায়দায় বিক্ষিপ্তভাবে স্পন্দিত হতে পারে। এ ধরনের রোগে কালবিলম্ব না করে কৃত্রিম পদ্ধতিতে রোগীর হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা দরকার।

কারডিয়াক নিউরোসিস (Cardiac neurosis) : হৃদপিণ্ডের কার্যকলাপে ত্রুটি। যদিও এ ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ড যন্ত্র হিসেবে রোগমুক্ত থাকে।

কারডিওমাইওপ্যাথিজ (Cardiomyopathies) : হৃদপিণ্ডের-পেশীর রোগ। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগটির কারণ জানা গেছে। যেমন ধরুন চাগাস রোগ। ব্রাজিলের চিকিৎসাবিজ্ঞানী কারলোস চাগাস রোগটির আবিষ্কর্তা। এক ধরনের পতঙ্গ এই রোগটির জীবাণু বহন করে। লক্ষণ : জ্বর, চোখের পাতা ফুলোফুলো, শোথ রোগ, হৃদপিণ্ড বেড়ে যাওয়া, প্রভৃতি। হৃদপিণ্ড কমজোর হয়ে পড়ে এবং অবশেষে যে কোন মুহূর্তে হৃদস্পন্দন থেমে যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু রোগটির সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি।

সেরিব্রল এমবলিজম (Cerebral embolism) : মস্তিষ্কের ধমনীতে রক্ত-সংবহনে অবরোধ সৃষ্টি। সাধারণত হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত থেকে জমাট রক্তপিণ্ড কোন কারণে ওই ধমনীর মধ্যে এসে পড়ায় রক্ত সংবহন বাধা পায়। ফল সন্ন্যাসরোগ বা পক্ষাঘাতে আক্রমণ।

সেরিব্রাল হেমারেজ (Cerebral haemorrage) : ধমনীর কোন অংশ ফেটে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। সাধারণ কারণ অতিরিক্ত রক্ত চাপ, বিশেষ করে ধমনীতে। বেশির ভাগ সময় রক্তে চাপ যাতে না বাড়ে সে ব্যাপারে নজর রাখলে এ রোগটি সহজেই এড়ান যায়।

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস (Cerebral thrombosis) : মস্তিষ্কের ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে এ রোগ সৃষ্টি করে। এর ফলে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং ওই সমস্ত জায়গায় অক্সিজেনও পৌঁছতে পারে না বলে মস্তিষ্ক-কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশির ভাগ পক্ষাঘাতই এর দরুন ঘটে থাকে।

জাগাসের রোগ : মেক্সিকোর গ্রামাঞ্চলে, মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এই রোগটির প্রকোপ সবচাইতে বেশি। পতঙ্গবাহী এক ধরনের পরজীবি রোগটির কারণ। কারোর শরীরে ওই পতঙ্গ দংশন করার সঙ্গে সঙ্গে দংশনের জায়গাটি অত্যন্ত চুলকোতে থাকে। চুলকোনোর সময় জায়গাটি ছড়ে গেলে সেখানে ওই পরজীবি সরাসরি রক্তের মধ্যে মিশে যায় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি করে। রোগটির প্রতিষেধক এখনও পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয় নি। প্রতি-রোধের ব্যাপারে বলা হয়েছে, আশপাশ পরিষ্কার রাখা এবং কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করলে এই রোগটির সম্ভাবনা কমে যেতে পারে।

মহাধমনীর [illegible] : এই রোগে মহা-ধমনীর ওপরের অংশ সরু হয়ে যাওয়ায় রক্ত চলাচল বাধা পায়। রোগটি প্রায়শঃ ঘটতে দেখা যায়। চিকিৎসা : অস্ত্রোপচার।

করোনারি হৃদরোগ : হৃৎপিণ্ড-পেশীতে প্রয়োজন মত রক্ত সঞ্চালনের অভাবে এই রোগ হয়ে থাকে। বেশির ভাগ সময় করোনারি ধমনীতে চর্বি জমে বা আঁশ

জাতীয় কোষ বেড়ে গিয়ে এমনটি ঘটে থাকে।

কর পালমোনেল (Cor Pulmonale): ফুসফুসে যথাযথ পরিমাণ রক্ত সঞ্চালনের অভাবে রোগটি ঘটে। ব্রনকাইটিস, হাঁপানী রোগে বেশিদিন ভোগার দরুণ ফুসফুসে নিয়মমাফিক রক্তচলাচল বাধা পায়।

এমবোলিজম (Eboiism): জমাট রক্ত কণা, অথবা অন্য কোন প্রকার বস্তু, যেমন চর্বি, বাতাস বা অন্য কোন ধরণের গ্যাসের বুদবুদ জমে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি।

এমবোলিজম (Embolism): জমাট রক্ত হৃৎপিণ্ডের ভেতরকার কোষ স্তরের রোগ। বিশেষ করে হৃৎপিণ্ডের ভাণ্ড বা কপাটিকার। শ্লেষ্মাজনিত জ্বর, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রভৃতির দরুণ কপাটিকা ছোট হয়ে বা কপাটিকা পথে ছিদ্র তৈরি হয়ে এই রোগ সৃষ্টি করে। ফলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।

এন্ডোমাইওকার্ডিয়াল ফাইবারোসিস: রোগটির প্রকোপ উষ্ণাঞ্চলেই বেশি। এই রোগে হৃৎপিণ্ডের ভেন্টিকল বা নিলয়ের ভেতরের অংশে অতিরিক্ত আঁশজাতীয় কোষ জমে নিলয়ের কক্ষটিকে বিকৃত করে। ফলে হৃৎপিণ্ডের পক্ষে রক্ত পাম্প করা অসুবিধে হয়।

এসেনসিয়াল হাইপারটেনশন: এ রোগ কেন হয় তার যথাযথ উত্তর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সাধারণত এই রোগে রক্তের চাপ সমান তালে বাড়তে থাকে। হৃৎপিণ্ড, কিডনি অথবা মস্তিষ্কের প্রচণ্ড ক্ষতি করে। তবে গোড়ায় চিকিৎসা শুরু করলে রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

হার্ট ব্লক: শরীরের কোন অংশে জীবরসায়ন গত বিদ্যুৎশক্তির চলাচল বিলম্বিত হওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ডের পেশীর তৎপরতা যখন ব্যাহত হয়, এই রোগের সূত্রপাত ঠিক তখনই ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

রেনাল হাইপারটেনশন: কিডনি বা মূত্রাশয়ের রোগে রক্ত চাপের আধিক্য। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রোগ যখন একটি কিডনিতে সংক্রামিত হয়, তখন উপযুক্ত অস্ত্রোপচারের সাহায্যে নিরাময় করা সম্ভব।

নিউরোসারকিউলেটরি অ্যাসথেনিয়া: এই রোগে হৃৎপিণ্ড, ধমনী অথবা শিরার কোন রকম জৈবিক ক্ষতি না হওয়া সত্ত্বেও তারা যথাযথ কাজকর্ম চালাতে পারে না। রোগীর শরীরে নানা রকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তার দৈহিক ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

ট্যাকাইকার্ডিয়া: হৃদস্পন্দনের [illegible] বৃদ্ধি। হঠাৎ স্বাভাবিকের চেয়ে [illegible] ক্রমেই বাড়তে থাকে। কখনও কখনও কয়েক সেকেন্ড মাত্র স্থায়ী হয়। কখনও বা কয়েকদিন। ট্যাকাইকারডিয়া নানা রকমের। এদের মধ্যে কয়েকটি তেমন ক্ষতিকর নয়। অবশিষ্টগুলি যথেষ্ট বিপদ ঘটাতে পারে।

থ্রম্বোসিস: রক্তসংবহনকারী নলের কোন অংশে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে এই রোগ হয়। এ রোগ অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সমরজিৎ কর

॥ তেরো ॥

বন-বাডগোডেসবার্গ ছেড়ে আসার আগে ওয়ার্থের বাড়ির ছাদে বসে আর একদিন দীর্ঘ সময় কথাবার্তা হল। সেদিন সকালে ফরেন অফিসের পলিটিকাল আর্কাইভস্-এ কাগজপত্র দেখে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েছিলাম। যুদ্ধের সময় বিশেষত যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর ইংরেজ, আমেরিকান রাশিয়ান কত হাতে এদের সব দলিলপত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল তার ঠিক নেই। ধীরে ধীরে আবার সব যোগাড় করে গুছিয়ে আনা হয়েছে। এখান থেকে প্রথম দফায় নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে যখন সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠানো হয় তখনো সৌভাগ্যক্রমে ডাঃ উর্লারিশ আর্কাইভস্-এ ছিলেন। যা কিছু প্রয়োজন সব উনি নিজে গুছিয়ে পাঠান। এর কিছুকাল পরে উর্লারিশ ক্যানসার হয়ে মারা যান। প্রায় দশ বছর সাইবেরিয়াতে বন্দীজীবন কাটাবার পর ও'র স্বাস্থ্য এমনিতেই একেবারে ভেঙে গিয়েছিল।

যে কোন আর্কাইভস্-এর কাগজপত্র দেখতে হলে দীর্ঘ সময় দরকার। বন-এ আমাদের হাতে সে সময় কই? অথচ মনে হয় এখানকার প্রতিটি টুকরো কাগজও প্রয়োজনীয় হওয়া সম্ভব। লোথার ফ্রাংক এখানে অনেকদিন কাগজপত্র দেখেছেন, সকলের কাছে সুপরিচিত। ওয়ার্থ আশ্বাস দিলেন ফ্রাংকের সহায়তায় উনি আমাদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবেন।

সেদিন ওয়ার্থের বাড়ির ছাদে চড়া রুদ্দুর, এরা বলে 'বিউটিফুল সান।' আমি তো চেয়ারটা ছায়াতে সরিয়ে নিয়ে বসলাম। পরিচারিকা এসে জাগ্ ভরতি ঠাণ্ডা ফলের রস রেখে গেল। ওয়ার্থের হাতে অবশ্য অবধারিত শ্যাম্পেনের গেলাস। আমি প্রশ্ন করছিলাম—আচ্ছা, নেতাজী যুদ্ধের সময় বার্লিন ও'র কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন—ও'র এই বেছে নেওয়াটা কি ভুল হয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাবে ওয়ার্থ বললেন, না, ইতিহাসের ঘটনাচক্র তখন যা ছিল তাতে বার্লিনে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে উনি ঠিকই করেছিলেন। আর কোথায় যেতে পারতেন? হ্যাঁ, রোমে যাওয়া যেত। মুসোলিনির প্রতি ও সাধারণ-ভাবে ইটালিয়ানদের প্রতি ও'র একটা দরদ ছিল। মস্কো যেতেও নেতাজী বিন্দুমাত্র আপত্তি করতেন না। বাস্তুত খুশিই হতেন। কাবুল থেকে উনি তো মস্কো হয়ে এলেন, যদি সেখানে একটুও সাড়া পেতেন তবে হয়ত মস্কোই ও'র কর্মক্ষেত্র হত। কিন্তু তা তো সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রবল আঘাত হানতে হবে এই ছিল নেতাজীর উদ্দেশ্য। জার্মানরাই তখন ইংরেজদের প্রবল প্রতিপক্ষ। যদি কেউ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আঘাত হানতে পারে জার্মানরাই পারবে—অন্তত তখন সেইরকমই মনে হয়েছিল।

তবে বার্লিনে নেতাজী কতদিন থাকতে পারতেন ওয়ার্থের সন্দেহ আছে। শুধু যদি পার্টির লোকদের সঙ্গে ও'কে কাজ করতে হত উনি হাঁপিয়ে যেতেন। যে সব লোকের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেরই নেতাজীর মত লোকের কদর বুঝতে পারার মত শিক্ষা-দীক্ষা দূরদৃষ্টি কিছুই ছিল না। অ্যাডাম ফন ট্রট ও নেতাজীর যোগাযোগ সেদিক দিয়ে একটা সৌভাগ্যজনক ঘটনা। ট্রট নেতাজীর মূল্য বুঝেছিলেন, আবার নেতাজীর চিন্তাধারা কাজে পরিণত করার জন্য যে ক্ষমতা ও প্রভাব দরকার তাও সে সময়ে ট্রটের ছিল। বিভিন্ন কারণে নেতাজী পূর্ব এশিয়া চলে যাবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওয়ার্থ

Albergo Quirinale
Rome
the 5th July, 1941.

[illegible]

[illegible] to have your letter of the [illegible] June, [illegible] on the [illegible] ultimo and I thank you for [illegible].

[illegible] after his return from [illegible], [illegible] by him. The talk was not encouraging [illegible] after that, the war in the East broke out. The [illegible] the realization of my plans looked gloomy in the altered circumstances and I was thinking that an early return to Berlin would not be of much use, till the situation in the East was clarified. I was therefore happy to receive your letter.

I have informed the Foreign Office that I intend to leave soon and I have arranged to start for Vienna on Tuesday the 8th inst. I shall be stopping at Grand Hotel in Vienna for a few days and shall be in Berlin on Monday, the 14th inst. at the latest. If you so desire, I could cut short my stay in Vienna and proceed straight to Berlin. If so, kindly send me a message at the Grand Hotel or to [illegible]

The public reaction in my country to the new situation in the East is unfavourable towards your Government. However, I am following the situation as closely as I can and I shall discuss the whole matter with you as soon as I arrive.

With kind regards,

Yours sincerely,
28434 (sgd.) O.Mazzotta.

ওয়ারম্যানকে লেখা নেতাজীর চিঠি— নাম সই করেছেন "ও মাৎসোটা"

বললেন—তবুও দু বছর আমরা নেতাজীকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ বেধে গেল ১৯৪১এর জুন-এ। এই ঘটনায় নেতাজী বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত বোধ করেছিলেন। কারণ উনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন এ যুদ্ধ যেন না-হয়। এ যুদ্ধ হলে ওঁর নিজের কাজের পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে ব্যাহত হবে। তা ছাড়া জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে এর প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষে মোটেই ভাল হবে না এ কথা উনি জানতেন। রোম থেকে জার্মান ফরেন অফিসের ওয়ারম্যানকে লেখা একটি চিঠিতে ওঁর মনের বিরক্তি ও হতাশার ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই চিঠিতে নেতাজী নাম সই করেছেন 'অরল্যাণ্ডো মাৎসোটা।'

এরপর নেতাজী পূর্ব এশিয়া যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। '৪২ সালের জানুয়ারীতেই নাম্বিয়ারকে বলেছিলেন জার্মানীতে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ছে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর নেতাজী নিঃসন্দেহ হলেন যে তাঁর পূর্ব এশিয়া যাওয়া নিতান্ত জরুরী, সেখানেই উনি কাজের সুযোগ বেশী পাবেন। বার্লিন ও রোমে জাপানী দূতাবাসের মাধ্যমে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ স্থাপিত হল। জার্মান আর্কাইভস-এর নথিপত্রে দেখছি প্রবীণ নেতা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে বার্তা বিনিময়, টেলিফোনে আলাপ ইত্যাদি চলছে। এই সময়ে বার্লিনে জাপানী রাষ্ট্রদূত ছিলেন ওসীমা। তিনি নেতাজীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সে আমলে ডিপ্লোম্যাট মহলে ওসীমার নাম-ডাক ছিল। শোনা যায় ওসীমা বলেছিলেন তাঁর সুদীর্ঘ ডিপ্লোম্যাট জীবনে উনি নানারকম লোক দেখেছেন কিন্তু নেতাজীর মত আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব আর একটা দেখেন নি। জাপান থেকে সরকারীভাবে নেতাজীর কাছে নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছল।

কিন্তু প্রশ্ন হল উনি যাবেন কি করে? এই ঘোরতর যুদ্ধের মধ্যে জার্মানী থেকে জাপান যাওয়া তো সহজ কথা নয়। একবার কথা হল ইটালিয়ান এরোপ্লেনে রোম থেকে সিঙ্গাপুরে বা [illegible] নন-স্টপ ফ্লাইটে যাবেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাব পরে বাতিল হল। নেতাজী সাধারণ জাহাজে চড়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে মনে হল। নেতাজীর জীবন নিয়ে এত বড় ঝুঁকি জার্মান গভরনমেণ্ট নিতে সাহস করলেন না। শেষ পর্যন্ত সাবমেরিনে যাওয়া স্থির হল।

শেষের দিকে সব কিছু ঠিক হয়ে-হয়েও হতে চায় না। নেতাজী অত্যন্ত ছটফট করছিলেন। ভারত মহাসাগরে জার্মান সাবমেরিন থেকে জাপানী সাবমেরিনে উঠতে হবে। দুদিক থেকে রওনা হবার সময়, মধ্য-সমুদ্রে দুই সাবমেরিনে মিলন সব প্ল্যান নিখুঁত হলে তবেই নেতাজীকে [illegible] সিগন্যাল [illegible] দেওয়া সম্ভব হবে। বাধার আর শেষ নেই। টোকিওর জার্মান রাষ্ট্রদূত টেলিগ্রাম করলেন, [illegible] মিলিটারির লোক না হলে জাপানী যুদ্ধের জাহাজে নিতে আইনগত বাধা আছে। [illegible] টেলিগ্রাম করলেন: নেতাজী তো সিভিলিয়ান বা অসামরিক লোক নন, উনি ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক।

তারপরেও দীর্ঘ প্রতীক্ষা। জাপানী সাবমেরিনের গতিবিধির খবর আর এসে পৌঁছয় না। এদিকে জার্মান সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন অধৈর্য হয়ে পড়ছে। শেষের এই যুদ্ধাবস্থার মধ্যে কতদিন সব কাজ ফেলে অপেক্ষা করতে হবে। এর পরের কাহিনী ওয়ার্থ ও নাম্বিয়ার দুজনের কাছেই শুনেছি। প্রকৃতপক্ষে ওয়ার্থ ও নাম্বিয়ারের কাছে একই ঘটনার অনেক কথা শুনেছি কারণ ওরা দুজনে সর্বদাই নেতাজীর সঙ্গে থাকতেন। এমন কি বাইরে গেলেও প্রাগ, রোম, প্যারিস—নেতাজীর সঙ্গে দুজনেই যেতেন।

জাপানী সাবমেরিনের খবর না পেয়ে নেতাজী একেবারে ভেঙে পড়লেন। ওঁকে এত মনমরা হতে কখনো ওঁরা দেখেননি। কতবার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে জাপানী দূতাবাসে। ওসীমা কেবলি বলেন, খবর আসবে, নিশ্চয় আসবে। এমন সময়

Message for Mr. Rash Bihari Bose.

(To be sent to Tokio and Bangkok)

I was very glad to be able to speak to you over the telephone, though I could hear only a small part of what you said. Please accept warmest greetings from myself and my comrades here and convey them to all our comrades there.

I am replying to what I could hear over the telephone. I shall be thankful if you could communicate to me through the diplomatic channel, the rest of the conversation which I could not hear.

We are in touch with the Indian prisoners of war and are trying our best to influence them. The difficulty is with the officers and the higher non-commissioned officers – who are more pro-British than the rank and file.

We are all glad to know that the Bangkok Conference was a great success.

রাসবিহারী বসুকে বার্লিনে বার্তা পাঠাচ্ছেন নেতাজী

একদিন জাপানী দূতাবাসের কাউন্সিলর কাওয়াহারা নেতাজী, ওয়ার্থ ও নাম্বিয়ারকে তাঁর সুন্দর ভিলায় লাঞ্চের নেমন্তন্ন করেছেন। টেবিলে বসে নেতাজী শুধু খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। মুখ দেখে বোঝা যায় কোন কিছুতে ও'র রুচি নেই। কথাবার্তাও ভাল করে বলছেন না। কাওয়াহারা খানিকক্ষণ নেতাজীর অবস্থা দেখলেন তারপর বললেন—'আজ আমি আমার জীবনে প্রথম ডিপ্লোম্যাটিক প্রথা ভঙ্গ করব। আপনাকে আমার বক্তার কথা নয়—আমাদের দূতাবাসের নাভাল (naval) অ্যাটাচে সরকারীভাবে আপনার মিশনকে জানাবে এই রকম কথা হয়েছে আর তাই রীতি—কিন্তু আমি আপনার অবস্থা আর দেখতে পারছি না। আপনাকে আমি বলছি, জাপানী সাবমেরিনের খবর এসে গিয়েছে, সব ঠিক আছে।' এক মুহূর্তে নেতাজীর চোখমুখের চেহারাই পালটে গেল।

ঠিক বার্লিন ছেড়ে যাবার আগে দুটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে নেতাজী যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য ২৩শে জানুয়ারী জন্মদিনের উৎসব যদি ধরি তবে বলা যায় নেতাজীকে ঘিরে তিনটি অনুষ্ঠান পর পর হয়েছিল। '৪৩-এর ২৬শে জানুয়ারী খুব ধুমধাম করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছিল। বার্লিনের এয়ারফোর্স হাউসে এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় নেতাজী জার্মান ভাষায় অপূর্ব বক্তৃতা করেছিলেন। আর ২৮শে জানুয়ারী কর্ণেলসমূহকে ইন্ডিয়ান লিজিয়নের অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

এয়ার ফোর্স হাউস-এ (Haus der Flieger) আয়োজিত ২৬শে জানুয়ারীর সভায় নেতাজী এক সময় বলেন যে আমাদের ভারতীয়দের কাছে জীবন হল ঈশ্বরের লীলা। "It is Leela—an eternal play of forces", এই লীলায় শুধু যে সূর্যের আলোক আছে তাই নয় অন্ধকারও আছে, শুধু যে আনন্দ আছে তাই নয় বেদনাও রয়েছে, উত্থান যেমন আছে তেমনি আছে পতন। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের ওপর বিশ্বাস না হারাই তবে এই অন্ধকার, বেদনা ও অপমানের

বার্লিনে এয়ার কোর্স ভবনে বক্তৃতারত নেতাজী (২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩)

পথ পার হয়ে সর্বোলোক আনন্দ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারব।

কেন এই দার্শনিক তত্ত্বকথার অবতারণা তা বুঝিয়ে দিয়ে বলছেন, ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে ভারত আত্মাকে চিনতে হবে। ব্রিটিশরা বুঝতে পারেনি কিন্তু জার্মানরা পারবে। কারণ জার্মানী হল কাণ্ট, হেগেল, গেটে, শোপেন-হাওয়ার, ম্যাকসমুলরের দেশ।

অবশ্য রাজনৈতিক ইতিহাসও অনেক বলেছেন। ১৮৫৭ সাল থেকে শুরু করেছেন। উনি বলেন, যদিও ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, "সিপাহী বিদ্রোহ" আমি কিন্তু এই বিপ্লবকে ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ মনে করি।

এই বক্তৃতায় নেতাজী গান্ধীজীর নেতৃত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। উনি বলছেন মহাত্মাজী আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে একটা নিরস্ত্র জাতি পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের সাহায্যে বিদেশী শাসনযন্ত্রকে সাময়িকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া যায় মাত্র, নির্মূল করা যায় না। তার জন্য চাই সশস্ত্র সংগ্রাম।

চূড়ান্ত জয় সম্পর্কে নেতাজীর কোন সংশয় নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক সঙ্গে থাকতে পারে না। "The one must die if the other has to live. And since Indian nationalism must live—British Imperialism must die."

কয়লিগস ব্রুক-এর শিবিরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার আজাদ হিন্দ সৈনিকের সমাবেশে ২৮শে জানুয়ারী নেতাজী বক্তৃতা করলেন। সৈনিকেরা জানত না নেতাজী তাদের ছেড়ে শীঘ্রই এক বিপদের পথে রওনা হবেন। কিন্তু নেতাজী জানতেন এদের কাছে এই তাঁর শেষ বক্তৃতা। যে পথে উনি যাবেন তাতে জীবন থাকতে পূর্ব এশিয়া পৌঁছতে পারবেন কিনা গভীর সন্দেহ। আসন্ন বিচ্ছেদ ও সম্ভাব্য মৃত্যুর পটভূমিকায় নেতাজী এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন। প্রচণ্ড শীতে খোলা মাঠে সমাবেশ হয়েছিল। নেতাজীর শরীরটাও ভাল ছিল না, কথা ছিল পনেরো-কুড়ি মিনিট বলবেন। কিন্তু বলতে শুরু করে দু ঘণ্টার ওপর বললেন, অভিবাদন গ্রহণ করলেন, ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের হাতে তুলে দিলেন তাদের ব্যাঘ্র-লাঞ্ছিত পতাকা।

আমাদের পরম ভাগ্য যে ২৬শে ও ২৮শের এই দুটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানেরই অংশ বিশেষ ডকুমেণ্টারি চিত্রে রয়ে গেছে।

সাবমেরিন যাত্রার আয়োজন প্রস্তুত। একজন মাত্র সঙ্গী নেওয়া চলবে, কে যাবে? নেতাজী বেছে নিলেন আবিদ হাসানকে। নাম্বিয়ারের ওপর রইল বার্লিনের ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের দায়িত্ব।

একদিন 'অরল্যাণ্ডো মাৎসোটা পরিকল্পনা' করতে হয়েছিল ফন ট্রট ও ওয়ার্থকে। আজ আবার টপ সিক্রেট প্ল্যান হল। ওয়ার্থ, স্টেট সেক্রেটারি উইলহেলম কেপলার, নাম্বিয়ার ও নেতাজী বার্লিন থেকে কীল বন্দরে যাবেন। সঙ্গে চলেছেন আবিদ হাসান। সিকিওরিটির কড়াকড়ির জন্য হাসানকে পর্যন্ত বলা হয়নি কোথায় যাওয়া হচ্ছে। হাসান সারা পথ ট্রেনে গ্রীক গ্রামার মুখস্থ করতে করতে চলেছেন—ও'র ধারণা কীল থেকে ও'রা গ্রীসে যাবেন। এক সময়ে ট্রেনে আবিদ হাসান নাম্বিয়ারকে বললেন—গ্রীক ভাষটা একটু ঝালিয়ে নিই, কি বলো?

নাম্বিয়ার হেসে বললেন, তা শীত আর একটু জমা থাকা মন্দ কি?

একদিন অরল্যান্ডো ম্যাজোটাকে বার্লিনে অভ্যর্থনা করেছিলেন ওয়ার্থ আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কীল থেকে সাবমেরিনে তুলে দিলেন ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩।

ওয়ার্থ বলছিলেন যতদিন যাবে নেতাজীর ওপর রিসার্চ তত দুরূহ হয়ে উঠবে কারণ প্রত্যক্ষদর্শীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। জার্মান দিকটার কথাই ভাবা যাক। যারা বিশেষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন আজ তাদের মধ্যে ক'জন আছেন? হিটলার নেই, রিবেনট্রপ নেই, অ্যাডাম ফন ট্রট তো আগেই গেছেন, উইলহেলম্ কেপলার মারা গেছেন, উর্সারিশও অল্পদিন আগে মারা গেছেন। ওয়ার্থ নিজের কথা বলছেন—আমারো বয়স হয়ে গেছে, মানুষ তো আর অমর নয়, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ করে নিতে হবে।

এসব কথা ভেবেই কিছুকাল আগে 'Der Tiger Indiens' নামে নেতাজীর জীবনী সম্পাদনা করেছেন ওয়ার্থ। বেশ অভিনব জীবনী—জাপানী, জার্মান ও ইংরেজী এই তিন ভাষায় বইটি পরিকল্পিত এবং ভিন্ন ভিন্ন লেখকেরা নেতাজীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের ওপর লিখেছেন।

বন এয়ারপোর্টে আমাদের তুলে দিতে চলেছেন ওয়ার্থ। পথে বললেন, খবর শুনেছ তো? কোয়ারনি মারা গেছেন রোমে। নেতাজী যখন কাবুলে কোয়ারনি তখন সেখানকার ইটালিয়ান দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত। কোয়ারনি আসবেন 'নেতাজী অরেশন' দিতে কলকাতায় সব ব্যবস্থা ঠিক ছিল। ও'র মৃত্যুতে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। ওয়ার্থ বললেন—এই জন্যেই বলছিলাম নেতাজীর আদর্শ আমাদের উত্তরপুরুষের জন্য লিপিবদ্ধ করে যেতে হবে।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আচ্ছা আলেকজান্ডার ওয়ার্থের কি স্বার্থ! নেতাজীর ভাবাদর্শ পৃথিবীর মানুষ মনে রাখল না ভুলে গেল তার জন্য এই জার্মান এত ব্যস্ত কেন? যেন আমার মনের কথা ধরতে পেরেই ওয়ার্থ বললেন—যে একবার নেতাজীর সংস্পর্শে এসেছে, তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছে তার সাধ্য কি নেতাজীর প্রভাবমুক্ত থাকবে। সে জীবনে কোনদিন তাকে ভুলতে পারবে না। ডাঃ ওয়ার্থ গভীর ভাবাবেগের সঙ্গেই বললেন—এরকম একজন দুর্লভ ব্যক্তিকে জানতে পেরেছিলাম, তার সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম—আমার জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্য বলে গণ্য করি।

(ক্রমশ)

কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন... সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পন্থায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায় নি। কারণ, কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়।

সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিণ্টের গন্ধ—তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালবাসে!

মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও উজ্জ্বল দাঁতের জন্য... **দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট!**

দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য ব্যবহার করুন
কলগেট টুথ ব্রাশ
১৫ রকমের—
প্রত্যেকের উপযুক্ত!

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১১ ॥

দলের নেতার নাম হরকুমার। মানুষটি অসম্ভব রোগা, গলার অ্যাডমস অ্যাপেল বা কণ্ঠমণিটি অনেকখানি বেরিয়ে আছে, কাঁধ দুটো এমন বেখাপ্পা ধরনের উঁচু যে মনে হয়, হাতের বদলে দুটি ডানা লাগানো আছে। কিন্তু হরকুমারের চোখের দৃষ্টি তীব্র, বেশীক্ষণ চোখাচোখি করে থাকা যায় না। হরকুমার কঠোর ভাষী নন, বরং কথা বলার মধ্যে একটা ক্লান্ত ভঙ্গি আছে। মাঝে মাঝেই কাশির দমক ওঠে, তখন জলের গেলাসে চুমুক না দিলে আর কথা বলতে পারেন না।

মেঝের ওপর ছেঁড়া সতরঞ্চি পাতা। হরকুমার সূর্যকে বললেন, বসো ওখানে।

এই দলের আর চারজনের নাম পরেশনাথ, বিষণ সিং, ব্রজগোপাল এবং আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিনকে সবাই মাস্টার সাহেব বলে ডাকে।

আলিমুদ্দিন সাহেব বললেন, হরদা, আপনার মনে আছে, এই রকম একটা ছোঁড়াই মজঃফরপুরে পুলিসের ইনফর্মার ছিল?

হরকুমার ক্লান্ত ভাবে বললেন, হুঁ। এই যে ছেলে, তোমার নাম কি?

—সূর্যকুমার ভাদুড়ী

—বাবার নাম কি? কি করেন তিনি? কোথায় থাকেন?

অনেকক্ষণ ধরে জেরা করা হলো সূর্যকুমারকে। সূর্যকুমারের উত্তরগুলো শুনে ওঁরা খুব একটা সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না। এ ছেলেটির ভাবভঙ্গিই একটু বিচিত্র। অনেক কথার উত্তর দেয়, অনেক কথার উত্তর দেয় না। সব কিছুই যেন তার পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করছে। এ রকম একটা পরিবেশের মধ্যে—হ্যারিকেনের টিম-টিমে আলোয় সতরঞ্চির ওপর বসা পাঁচজন অপরিচিত মানুষ—একজনের কোলের ওপর তখনও পিস্তল রাখা—কিন্তু সূর্যকুমার এতে ভয় পাবার বদলে আকৃষ্টই হয়েছিল বেশী। সে এক একবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলের মুখের দিকে দেখছিল।

হরকুমার বললেন, ছেলেটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। ও যখন পাদ্রীদের ইস্কুলে পড়ে, ওকে কেউ সন্দেহ করবে না। শোনো খোকা, ইংরেজের গোলামী করার জন্য তুমি জন্মাও নি। যদি দেশের স্বাধীনতার জন্য তোমাকে প্রাণও দিতে হয়—তবুও জানবে তোমার জীবনটা ধন্য। দরকার হলে সে-রকম প্রাণ দিতে পারবে?

সূর্যকুমার কোনো উত্তর দিল না।

ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দীনেশ গুপ্তর নাম শুনেছো? সূর্য সেনের নাম শুনেছো?

সূর্যকুমার ওসব নাম শোনে নি।

আলিমুদ্দিন মাস্টার বললেন, এ দেখছি সূর্য নামের কলঙ্ক! লোকনাথ বলের ছোট ভাই ট্যাগরা তো তোমারই বয়েসী ছিল। সে কি রকম ভাবে লড়াই করতে করতে জান দিয়েছিল জানো?

হরকুমার বললেন, মাস্টার সাহেব, ওকে একটু একটু তালিম দেবেন। এই রকম ভাবেই তো দেশের ছেলেদের তৈরী করতে হবে। বিষণ সিং, ছুরিটা দাও তো!

বিষণ সিং-এর কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে হরকুমার সেটা এগিয়ে দিলেন সূর্যকুমারের দিকে। তারপর বললেন, নিজের হাতে

তোমার একটা আঙুল চিরে একটু রক্ত বের করো তো! পারবে না?

সূর্যকুমার ছুরিটা নিয়ে ধরে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ ঘাঁচ করে বসিয়ে দিল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে। গলগল করে রক্ত পড়তে লাগলো। দু' তিন জন চমকে হা হা করে উঠলো, অত না, অত না!

হরকুমার শান্ত ভাবেই বললেন, ঠিক আছে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। একটু রক্ত পড়লে কিছু যায় আসে না। তুমি ঐ রক্তের ছাপ দাও নিজের কপালে, তারপর বলো, আমি দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করিলাম। এ শরীরের এক বিন্দু রক্ত থাকিতে পর্যন্ত আমি ইংরাজের দাসত্ব [illegible] পরাধীনতার শৃঙ্খল সহ্য করিব না! বন্দেমাতরম!

হরকুমার তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, না হে মাস্টার সাহেব, ছেলেটার মুরোদ আছে। দিন, এবার ছেলেটার হাতটা একটু ব্যান্ডেজ করে দিন!

এখানে একটা কথা বলা দরকার। সূর্যকুমারের তখনও তেমন বাংলা ভাষার জ্ঞান ছিল না যাতে দেশমাতৃকা, দাসত্ব শৃঙ্খল, সর্বস্ব পণ ইত্যাদি শব্দের ঠিক ঠিক মানে বুঝতে পারবে। তা ছাড়া, ঐ সব শব্দের অন্তর্নিহিত ভাবও তার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়—কারণ ছেলেবেলা থেকে সে সেরকম কোনো শিক্ষা পায় নি। মাতৃভূমির কোনো ভাবমূর্তি তার চোখে ছিল না। ঐ সব আঙুল কেটে প্রতিজ্ঞা টতিজ্ঞার ব্যাপারগুলো সে করেছিল নিছক নতুনের লোভে—তা ছাড়া নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক কাজ করার প্রতি তার সহজাত ঝোঁক ছিল। আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে ঐ রিভলবার ছুঁড়তে দেবেন?

হরকুমার বলেছিলেন, হ্যাঁ দেবো। দেশের মধ্যে যেদিন শত্রুকে আঘাত হানার আগুন সত্যিকারের জ্বলে উঠবে—সেদিন অস্ত্র ঠিক পেয়ে যাবে। একটু গালভারী ধরনের আদর্শবাদী বাক্য বলা স্বভাব হরকুমারের।

তারপর থেকে সূর্যকুমার সহপাঠীদের সঙ্গে জুয়ার আড্ডায় যাবার বদলে একা একা চলে আসতো এই বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায়। ব্রজগোপালের কাছে সে কুস্তির প্যাঁচ শিখতো। হরকুমার শোনাতেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বিষয়ক কবিতা। এ ছাড়া বিপ্লবীদের সম্পর্কে অসংখ্য গল্প। কার্ল মার্কস, ডি ভ্যালেরা, স্টালিন সম্পর্কেও আলোচনা হতো। একদিন হরকুমারের কাছে এমন একটা গল্প শুনলেন, তার আর তুলনা নেই।

হরকুমার প্রায়ই সূর্যকে দেখে বলতেন, ওই ছেলেটাকে দেখলেই আমার বৈকুণ্ঠ সুকুলের কথা মনে পড়ে। চেহারার খুব মিল আছে। প্রথম দিন ওকে দেখেই সে

এতে
সবসময়ে পাবেন-
ভিটামিন এ-ডি-বি১-বি২-
ক্যালসিয়াম-প্রোটীন,
দুধ, গম, চিনি,
গ্লুকোজ-

পার্লে গ্লুকো বাচ্চাদের হেসে-
খেলে বেড়ে ওঠার মজার সাথী

ভারতে সবচেয়ে বেশী কাটতির বিস্কুট পার্লে গ্লুকো

কথা মনে পড়েছিল বলে ছেলেটার ওপর আমার মায়া পড়ে যায়।

সূর্যকুমার জানতো না বৈকুণ্ঠ সুকুল কে। একদিন জানলো।

ঐ গোপন আস্তানায় প্রায়ই একজন পাগলা মতন লোক আসতো। একজন মাঝবয়েসী মুসলমান, মুখ ভর্তি দাড়ি, নোংরা ছেঁড়া খাকি জামা ও প্যান্ট। মাটিতে শুয়ে পড়ে সে হরকুমারের পা জড়িয়ে ধরতো আর কাঁদতো হাউ হাউ করে। পাগল হলেও খুব নিরীহ পাগল। হরকুমার খুব স্নেহের সঙ্গে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, তাকে জোর করে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন। তারপর দুজনে খুব নিকট আত্মীয়ের মতন কথা বলতেন কিছুক্ষণ।

একদিন সূর্যকুমার জিজ্ঞেস করেছিল হরদা, ঐ পাগলটা তোমার কাছে আসে কেন?

হরকুমার বলেছিলেন, শুনবি ওর কথা? পরেশ, তুমি বলে দাও তো ওর কাহিনীটা!

পরেশনাথ বললেন, না, হরদা, আপনিই বলুন। আপনার মতন কেউ বলতে পারবে না।

হরকুমারের সেদিন কাশি বেড়েছে। অনবরত কাশছেন আর মুখে রুমাল চাপা দিচ্ছেন। হরকুমারের শরীর যেভাবে ভেঙে পড়ছে—আর ক'দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন তার ঠিক নেই। কিন্তু হরকুমার কিছুতেই চিকিৎসা করাবেন না, নিজস্ব টোটকা ওষুধ খেয়েই থাকবেন।

একটু কাশি থামিয়ে হরকুমার বললেন, আমি যখন গয়া জেলে ছিলাম, তখন ঐ ওকে এখন পাগল দেখছিস, ও ছিল একজন হাবিলদার। ওর পুরো নাম আমি আজও জানি না, তবে সবাই ওকে বলতো হাবিলদার রেজা। ইউ পি-র লোক, উর্দুতে কথা বলে। প্রথম মহাযুদ্ধে ও ভাদুনে, মেসোপটেমিয়ায় লড়েছে। লেখাপড়া কিছু জানে না কিন্তু ঘুরেছে অনেক দেশ। তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে নানান ঘাটের জল খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত গয়া জেলে রক্ষীর কাজ পেয়েছিল। এটা বছর চারেক আগের কথা। হাবিলদার রেজাকে তখন ভালো করে চিনতাম না—চেনার দরকারও ছিল না। আমরা সব রাজবন্দী, ও একজন বিশাল চেহারার গার্ড, জুতো খটখটিয়ে সেলের বাইরে দিয়ে চলে যায়। ওকে চিনলাম এক রাত্তিরে।

তখন জেলখানা রাজবন্দীতে ভর্তি। গান গেয়ে, হইচই করে আমরা সব ভুলে আছি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, সাত ডিগ্রি কণ্ডেমড সেলের একজন আসামীর ফাঁসী হবে। আমরা তখন আছি পনেরো ডিগ্রিতে। কার ফাঁসী হবে নাম জানতে পারলাম না—ভীষণ কৌতূহল জেগে রইলো।

ফাঁসীর আগের দিন আসামীকে পনেরো ডিগ্রির এক নম্বর সেলে আনা হলো। সেদিন বিকেলে আমাদের জেনারেল লক আপ হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। আমাদের সবাইকে এনে ঢোকানো হলো যার যার নির্দিষ্ট ব্যারাকে আর সেলে। পাশাপাশি কয়েকটা সেলে আছি আমি, রঘুনাথ পাণ্ডে, ত্রিভুবন আজাদ আর বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। লোহার গরাদ ধরে উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছি, কখন আনা হবে ফাঁসীর আসামীকে।

সন্ধের সময় তাকে আনা হলো। অনেকগুলো বুটের শব্দ, জেলার, ডেপুটি জেলার, বড় জমাদার, সেপাই সান্ত্রী সবাই মিলে নিয়ে আসছে একজনকে—কে এমন মহাপুরুষ? দেখলাম হাত পায়ে শিকল বাঁধা ফুটফুটে চেহারার এক কিশোর। শিকল ঝনঝনিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে উৎফুল্ল মুখে, ঠিক যেন সিংহের বাচ্চা! ফাঁসীর আগে এক নম্বর সেলে ঢোকাবার সময় আসামীর হাত পায়ের শিকল বেড়ি খুলে দেওয়াই নিয়ম, হারামজাদারা ওর বেলায় তা-ও করেনি। পুলিসের চোখেও নাকি ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। অথচ কি বলবো তোমাদের, কি সরল নিষ্পাপ তার মুখ—এই আমাদের সূর্যর থেকে মাত্র দু'তিন বছরের বড় হবে—তাকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, সে নাকি বিপজ্জনক আসামী!

আমাদের সেলগুলোর পাশ দিয়ে যখন সে যাচ্ছে, তখন বিভূতিদা হঠাৎ অস্ফুটভাবে বলে উঠলেন, আরেঃ, এ যে বৈকুণ্ঠ সুকুল!

আসামীও বিভূতিদাকে চিনতে পেরে

মহা-উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠলো, দাদা, আ গ্যয়া! ফির মুলাকাত—

বিভূতিদা কম্পিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, বন্দে মাতরম্! তখন অন্য সব সেল থেকেও সবাই গর্জন করে বন্দে মাতরম বলে সেই আসামীকে সম্বর্ধনা জানালো!

আমি বিভূতিদাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা, বৈকুণ্ঠ সুকুল কে? আগে তো শুনিনি এর কথা!

বিভূতিদা বিষন্ন গলায় বললেন, ওকে বছর চারেক আগে একবার দেখেছিলাম পাটনা ক্যাম্প জেলে। একেবারে বাচ্চা! তার কাল ফাঁসী হবে?

পরে আমরা জেনেছিলাম, বৈকুণ্ঠ সুকুল অত্যন্ত দুঃসাহসী অ্যাকশান করেছে। ও মজঃফরপুরের ছেলে—ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকির যোগ্য উত্তরসাধক। ভগৎ সিংদের ফাঁসীর মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিল যে ফণী ঘোষ সে তখন ঐ জেলাতে এসে দোকান খুলেছে, দিন রাত তাকে পুলিসের লোক পাহারা দেয়। সেই অবস্থাতেই তাকে খতম করে দিয়েছে বৈকুণ্ঠ সুকুল। রাজসাক্ষীর প্রতি কোনো দয়া নেই। বৈকুণ্ঠ সুকুল তখন ধরাও পড়েনি, ছদ্মবেশে পালিয়ে ছিল বেশ কিছুদিন, তারপর ধরা পড়লো শোনপুরের মেলায়।

যাই হোক, সে রাত্রে আমাদের ঘুমোবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সবাই লোহার গরাদ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। সবাই মনে মনে প্রার্থনা করছি, এ রাত্রি যেন ভোর না হয়। সূর্য ওঠার পর সুকুল আর ইহ জগতে থাকবে না।

হঠাৎ এক নম্বর সেল থেকে সুকুলের ডাক শোনা গেল, বিভূতিদা—

বিভূতিদা সাড়া দিলেন। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দুজনে কথা হতে লাগলো। সুকুল বলছে, দাদা, আপনার পাটনা জেলের কথা মনে আছে? কত গান শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিলেন—সেই কবিতা, মরণ, হে মোর মরণ!

খট খট্ করে সেপাইয়ের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আমরা চুপ। বিভূতিদার সেলের সামনে এসে দাঁড়ালো হাবিলদার রেজা। চুপ করে একটুক্ষণ কি যেন ভেবে আবার চলে গেল। ফিরে এলো খানিকটা বাদে। এবার তার হাতে এক গোছা সাদা ফুল। আমরা অবাক। কোথা থেকে সে এই ফুল জোগাড় করে এনে দিয়েছিল সুকুলকে, সুকুল আবার তার খানিকটা পাঠিয়েছে বিভূতিদাকে।

বিভূতিদা হাত পেতে ফুলগুলো নিলেন, একটাও কথা বলতে পারলেন না, হাবিলদার তখনও দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে বিভূতিদাকে জিজ্ঞেস করলো, ক্যা সোচ রহা হ্যায়, বাবুজী।

বিভূতিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কি আর ভাববো!

ছাবিলদার গরাদ ধরে ঝুঁকে এলো বিভূতিদার দিকে। তারপর অদ্ভুত আর্ত গলায় ফিসফিসিয়ে বললো, বাবুজী, এই লেড়কাকে বাঁচানো যায় না? লাটের ওপরে লাট আছে তারও ওপরে আছে বিলেতের বাদশা—বাঁচানো যায় না! যে-কোনো উপায়ে সুকুলজীকে বাঁচানো যায় না!

সেই রুক্ষ, কঠিনহৃদয় সৈনিকের মুখে একথা শুনবো আমরা কেউ আশা করিনি। কেউ করিনি। কথা শুনেই টের পেলাম ওর হৃদয়ে কঠিন একটা ধাক্কা লেগেছে। ছাবিলদার রেজা আরও বললো, সে অনেক মানুষকে মরতে দেখেছে, নিজের হাতেও যুদ্ধের সময় মানুষ মেরেছে। এ জীবনে বাহাদুর সে কম দেখেনি—কিন্তু সুকুলজীর মতন দেখেনি কারুকে। বীরপুরুষের এরকম চেহারা সে কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিল, মরতে যার একটুও ভয় নেই। এরকম একটা মানুষ যদি দুনিয়া থেকে চলে যায়—তাহলে দুনিয়াটা কি শুধু ডরপুক-এর জন্য?

সুকুল এমনিতেই খুব রূপবান,

তারপরও হাবিলদার বললো, ফাঁসীর হুকুম পাকা হয়ে যাবার পর তার শরীরটা গোলাপের মতন হয়ে উঠছে! গুলাবে জ্যায়সা—গুল জ্যায়সা খিল রহা থা বাবুজী! আমার জীবন দিয়েও যদি ওকে বাঁচানো যেত, কিছু একটা হয় না!

প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতেই চ'লে গেল হাবিলদার। সেই সঙ্গে সে আমাদেরও রুদ্ধবাক করে দিয়ে গেল। রাত গভীর হয়ে উঠছে, কত রাত জানি না, জানি না ভোরের কত দেরী। হঠাৎ সুকুল আবার বলে উঠলো, বিভূতিদা, গান শুনবো! সেই যে, হাসি হাসি পরবো ফাঁসী?

ক্ষুদিরামের ফাঁসীর এই গান বাঙালী অবাঙালী সবারই প্রিয়। রাজবন্দীরা এ গান শোনে মন্ত্রমুগ্ধের মতন। বিভূতিদা উদাত্ত গলায় গান ধরলেন :

একবার বিদায় দে মা
ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি মা
দেখবে ভারতবাসী...
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেবো মাসির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস, মা,
চিনবি গলায় ফাঁসি—

বিভূতিদা একবার গানটা শেষ করছেন, আর বৈকুণ্ঠ সুকুল চেঁচিয়ে বলছেন, আবার আবার! কতক্ষণ সে গান চলেছিল খেয়াল নেই—আমরা সেই গানের মধ্যে মিশে গিয়েছিলাম।

খানিকক্ষণ বাদে সুকুল বললো, দাদা, বাঁশী শুনবো! আমরা অবাক। জেলখানার মধ্যে বাঁশী কোথা থেকে আসবে। বিভূতিদা মলিনভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, একটা দেশলাই যদি পেতুম—! হাবিলদার রেজা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, আমরা খেয়াল করিনি, সে সঙ্গে সঙ্গে এসে একটা দেশলাই বাড়িয়ে দিল। সেই দেশলাইয়ের খোলের মধ্যে এক টুকরো পাতলা কাগজ দিয়ে বিভূতিদা একটা জিনিস বানিয়ে ফেললেন, সেটা দিয়ে অনেকটা বাঁশীর মতনই আওয়াজ হয়। পাটনা জেলে বিভূতিদা এই রকম বাঁশী বানাতেন, সুকুলের ঠিক মনে আছে।

সেই বাঁশীতে একটা তীব্র করুণ সুর ভেসে উঠলো। জেলখানার সমস্ত কঠিন পাথরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সেই সুর। সুকুল বললো, দাদা, এটা কি গান বাজাচ্ছেন? সুরটা যেন চেনা চেনা—

বিভূতিদা বললেন, এটা বিসমিলের সর ফরোশী কি তমান্নার সুর!

সুকুল যেন লাফিয়ে উঠলো। চেঁচিয়ে বললো, দাদা, গানটার শক পদ মনে আছে? দাদা একবারটি গান!

তখন আমাদের মনে পড়লো কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার রামপ্রসাদ বিসমিল ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে নিজের লেখা এই উর্দু গান গেয়েছিল। অপূর্ব তার বাণী।

সর ফরোশী কি তমান্না অব্ হমারে
দিল মে' হ্যায়
দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজু এ
কাতিল মে' হ্যায়।

[মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা এখন আমার মনে। দেখতে চাই ঘাতকের বাহুতে কত বল আছে।]

এ গানটাও অনেকক্ষণ ধরে গাওয়া হলো। শেষ পংক্তিতে এসে সুকুল নিজেও গলা মেলালো। শেষ দিকে বিসমিল বলেছিল :

অব্ না অগলে ওয়লুলে হ্যায় আউর
না আর মানোকী ভীড়।
সিরফ্ মর্ মিটনেকি হসরৎ আপ্
দিলে এ বিসমিল মে' হ্যায়।

[এবার থেমে গেছে পূর্বেকার কলগুঞ্জন, মিটে গেছে সব বাসনা। এখন শুধু মৃত্যুকে বরণ করা বাসনা বিসমিলের হৃদয়ে।]

শেষ লাইনে বিসমিলের নাম বদলে 'দিলে সুকুল গাইতে লাগলো, দিলে এ সুকুল মে' হ্যায়', দিলে এ সুকুল মে' হ্যায়, দিলে এ সুকুল মে' হ্যায়—কতবার যে, তার ঠিক নেই। খানিকটা বাদে থেমে রইলো কিছুক্ষণ। আবার বললো, দাদা, আউর একটো গান—

বিভূতিদা সেদিন কত গান গেয়েছিলেন খেয়াল নেই। আমরা নিস্পন্দ হয়ে

শুনেছি। কাছেই ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে আছে হাবিলদার রেজা। সারা পৃথিবী তখন ঘুমন্ত শুধু জেলখানার কটি প্রাণীই জেগে আছে। তাদের মধ্যে একজন কয়েক ঘণ্টা পরেই অনন্ত ঘুমের মধ্যে চলে যাবে।

এক সময় বিভূতিদার গানের স্টক শেষ হয়ে গেল। হাবিলদারকে জিজ্ঞেস করলাম ক'টা বাজে? সে বললো, এক বাজ গয়া। —আর মাত্র চার ঘণ্টা।

বিভূতিদার গানের স্টক শেষ, সুকুল তবুও অনুরোধ করে যাচ্ছে। সে যেন তখন একটা সুর-পাগল মানুষ, পৃথিবীতে আর কিছু জানে না। শেষ পর্যন্ত সে বললো, দাদা, সেই গান এবার গাইতে হবে।

—কোন গান?

—রবীন্দ্রনাথের ঐ, মরণ, হে মোর মরণ।

—ওটা তো গান নয়, কবিতা!

—না, না, ওটাই গাইতে হবে।

—ওটা আমার মুখস্ত আছে, সুকুল, কিন্তু ওর তো কোনো সুর নেই?

—তা জানি না—ওটা গান গেয়ে শোনান!

সেই ভাবে বিভোর কিশোরকে কে তখন নিরস্ত করবে? ওর কোনো অনুরোধ তখন অগ্রাহ্য করা যায়? রবীন্দ্রনাথের মরণ-মিলন কবিতাটা সুকুলের খুব প্রিয় ছিল- বিভূতিদার কাছ থেকে শুনে শুনে হিন্দী অক্ষরে লিখে নিয়ে মুখস্ত করেছে। বিভূতি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি মানে বুঝতে পারো সব? সে বলেছিল, কেন পারবো না! এই তো, 'আমি কব না নীরবে তরণ' তরণ তো হিন্দিতে যাকে বলে ত্যায়রনা—মানে সাঁতার দেওয়া, তাই না?

সেই দীর্ঘ কবিতা সুকুল তখন গান হিসেবে শুনতে চাইছে। বিভূতিদা তাকে বিমুখ করতে পারলেন না। তিনি তখন দরবারী কানাড়ায় সুর লাগিয়ে গোটা কবিতাটা গেয়ে যেতে লাগলেন—অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

ওরকম গান কেউ কখনো গায়নি, ওরকমভাবে কেউ কখনো গান শোনেনি। শুধু তো সুর নয়, কথা নয়—সমস্ত মন প্রাণ ঐ গানের মধ্যে। বিভূতিদাও ওরকম গান জীবনে আর কখনো গাইতে পারেননি।

কখন চারটে বেজে গেছে খেয়ালও করিনি। চমকে উঠলাম জেলের পেটা ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো। অমনি জেগে উঠলো ভারী ভারী বুটের আওয়াজ। সুকুল তখন হেসে বললো, দাদা, এবার তো সময় হইল নিকট—এবার শেষ গান হোক! বন্দে মাতরম্? সমস্ত জেল কাঁপিয়ে, আকাশ বাতাস পৃথিবী কাঁপিয়ে আমরা সকলে মিলে গেয়ে উঠলাম, বন্দে মাতরম্—সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা—।

ঝনঝন করে শব্দ হতে লাগলো সেই খোলার। হাত পা বাঁধা সুকুলকে বাইরে আনা হলো। আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল জেলের দরজা ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে একবার ওকে ছুঁই। কিন্তু তার যে উপায় নেই। সুকুলের মুখখানা কিন্তু প্রফুল্ল—সেই অপরূপ চেহারার কিশোরের মুখে একটু ক্লান্তিরও ছাপ নেই। চেঁচিয়ে বললো, দাদা, তবু তো চলু না হ্যায়! আমাদের সকলের নাম করে বললো, চলি ভাই। আবার আমি আসবো, দেশ তো স্বাধীন হয় নি—আবার আসবো—বন্দে মাতরম্!

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল সুকুলকে। আমরা তখন...

সূর্যকুমার এতক্ষণ নিঃশব্দে শুনছিল। এবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। তার মুখখানা লাল হয়ে গেছে, সারা শরীর কাঁপছে।

হরদা কাশতে কাশতে বললেন, হাবিলদার রেজা তার পরদিনই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, সেই থেকে একটু পাগলাটে ধরনের হয়ে। আমরা জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ও আমাদের কাছেই ঘুরে ফিরে আসে—আর অনবরত সুকুলের কথা বলে। সুকুলের জন্য ও এমন আঘাত পেয়েছে যে মানুষ নিজের ছেলে মরলেও বোধ হয় এতটা পায় না।

একটুক্ষণ চুপ করে হরকুমার বললেন, ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি! শেষ সময়ে বৈকুণ্ঠ সুকুল একবার মাত্র একটা ক্ষণের জন্য নরম হয়েছিল। যাবার সময় বিভূতিদার সেলের সামনে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর মাথা [illegible] করে বলেছিল, দাদা, একটা অনুরোধ করে রইলো। আপনার এবার জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে [illegible] [illegible] চেষ্টা করবেন!—[illegible] ও [illegible] গেল [illegible] করে!

সূর্য আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কখনো ওর চোখে জল দেখা যায় না, আর কেঁদেও সে [illegible]—ওর ঐটুকু বয়সের মধ্যে কোনোদিন সে ওরকমভাবে কাঁদেনি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার সূর্যকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলেন—হরকুমার হাত তুলে নিষেধ করলেন ইশারায়। আস্তে আস্তে বললেন, কাঁদুক! কান্না ওর পক্ষে ভালোই!

(ক্রমশ)

ঋণ স্বীকার : ১৯৬৮ সালে শারদীয় [illegible] পত্রিকায় প্রকাশিত, পুরুলিয়ার প্রবীণ নেতা এবং কিছুদিনের জন্য পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিকথা থেকে বৈকুণ্ঠ সুকুলের ফাঁসীর রাতের বর্ণনার উপকরণ বহুল পরিমাণে গৃহীত হয়েছে। —লেখক।

ঢাকায় যার শৈশব কেটেছে অধুনা পশ্চিমবঙ্গবাসী এমন একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে সেদিন পুরনো ঢাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। কোন পুরান শহর যখন তার ধূলি ধূসরিত জীর্ণতাকে এক পাশে হেলায় ফেলে নিজেকে নতুন করে তৈরি নেয় তখন সেই নতুন ঝকঝকে শহরটা যেন পুরাতনের দৈন্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

নতুন ঢাকা নিউ দিল্লির মত সাজগোজ করা শহর। সেখানে রাস্তায় ঝাঁকে ঝাঁকে বিদেশী মোটর, বাড়িতে বাড়িতে টেলিভিশন। পথের দুধারে সবুজ গাছের সমারোহ। ঝকঝকে তকতকে পথের ধারে নতুন নতুন রেসিডেনসিয়াল এরিয়া। কিন্তু গুলিস্তান পেরিয়ে বুড়িগঙ্গার তীরে সংস্কৃতি ও শিল্পের কুলভূমি যে ঢাকা এতদিন ধরে কতশত মনীষীকে পালন করেছে বুকে ধরে, কত শিল্পীর কৈশোর চেতনাকে ভরে তুলেছে স্বপ্ন দিয়ে, কত বিপ্লবীর মন জাগিয়েছে মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, সেই ঢাকা আজ যেন অপরিচয়ের অন্ধকারে ঢাকা। পুরানো ঢাকার লালবাগ পথের ধারে জমে থাকে অবজ্ঞার স্তূপ, নবাবপুর, পাটুয়াটুলি, বংশাল বাজারে বেলা ডুবলে পাশে মিটমিটে দোকানগুলি পুরানো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। সাহিত্যিক এই পুরানো ঢাকাতেই তাঁর হারানো শৈশবের স্মৃতির হিসাব মেলাচ্ছিলেন। অনেক কিছুই আছে, আবার অনেক কিছুই নেই। এইতো এটা সেই ক্ষি ঘোষের তিন তলার বাড়ি—এটা এখন কেমন বেঢপ, আহা কত ছোট হয়ে গেছে

ভিক্টোরিয়া পার্ক। নর্থব্রুক রোডে কে এল জুবিলী ইস্কুল এখনও আছে দেখছি। কিন্তু কোথায় গেল দোলাইখাল—যার বুকে একদিন ডিঙি নিয়ে বেড়াতাম। আজ শুধু কতাচিহ্নর মত পড়ে আছে এক চিলতে নালা। কলতাবাজার পার হয়ে সেই নারিন্দার পুলটাই বা গেল কোথায়? বুড়িগঙ্গার তীরে সে সময় বেড়ানো যেত সকাল সন্ধ্যা। তখনও এমন কার ঘোড়া যানবাহন পথে ফেলেনি নবাবপুরে পাটুয়াটুলিকে। কোথায় গেল পুরানো রেল স্টেশন থেকে ধুলো উড়িয়ে চলা জোড়া ঘোড়ার সেই সব পালকি গাড়ি? ছোট ছেলেটাকে দেখে চাবুক শিস তুলে কোচম্যান চেঁচিয়ে উঠত, 'আরে মাকখন, সুন্দরকাইরা যা' কলস্রোতে কিছু কিছু ভাসে। অনেক কিছুই আবার ভাসে না। পুরানো ঢাকারও অনেক কিছু গেছে, কিন্তু যা আছে তা

দেখে আমার মনে হয়, নতুন ঢাকার চেয়ে পুরনো ঢাকা অনেক বেশী সজীব। প্রাণ আছে এখানে। বিচিত্র সাধারণ মানুষের ভিড়ে, রিকশার অনর্গল ভেঁপুর শব্দে, দোকানীদের হই হট্টগোলে পুরনো ঢাকা মনকে বেশী করে স্পর্শ করে। যদিও নতুনের তুলনায় তার দারিদ্র্য প্রকট, দৈন্য স্পষ্ট। কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যের সঙ্গে সম্পদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ।

এই পুরানো ঢাকারই কলেজ স্ট্রীট বাংলাবাজার। বই আর স্টেশনারি যা কিছু জিনিসপত্র তার সমস্ত কিছুরই প্রাপ্তি-

স্থান এই বাংলাবাজার।

বাংলাবাজার স্বাধীনতার পর আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু নতুন বইও প্রকাশ হতে শুরু করেছে। কিন্তু এখন যেটা মুশকিল প্রকাশন ব্যবসার সেটা হল কাগজ। দোকানে কাগজের স্টক নেই বললেই চলে। কথা বলছিলাম বাংলাবাজারের প্রকাশকদের সঙ্গে। কাগজ বাড়ন্ত। অথচ কাগজের অভাব ছিল না ঢাকায়। কর্ণফুলি পেপার মিল সে অভাব পূর্ণ করত। দামও ছিল সস্তা। ৩৬ পাউন্ড ডাবল ডিমাই রিমের দাম ৬৫,। ৪৪ পাউনড কার্টিজ কাগজের দাম ৭২ টাকা। নিউজপ্রিন্ট ১৫,। ঢাকাতে গল্পের বইয়ের প্রকাশকের সংখ্যা জন পঁচিশ। তার মধ্যে প্রথম সারির প্রকাশক চারপাঁচজনের বেশী হবে না। ছাপার খরচও মোটামুটি সস্তা ছিল। যেমন পাইকায় ছাপলে প্রথম হাজারের দাম পড়ত ৫০ টাকা। স্মল পাইকা ৬০,, লাইনো বা মনো ৭০ টাকা ফর্মা।

আর একটা মজার ব্যাপার হল, ঢাকার পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয় না। বইএর বিজ্ঞাপনের রেওয়াজ এখনও গড়ে ওঠেনি। আমাকে একজন পুস্তক প্রকাশক বললেন, ওরা ক্যাটলগ পাঠান সমস্ত গ্রন্থাগারে। তা থেকেই অর্ডার আসে। অনেক লেখক নিজের পয়সায় বই ছেপে প্রকাশকের মারফত্ বিক্রি করে থাকেন।

গল্প উপন্যাসের পাঠক এই বাংলাতেও ঠিক পশ্চিমবঙ্গের মতই। ছোট গল্প একদম চলে না। তবে কবিতা ও প্রবন্ধের বইয়ের বিক্রি বাড়ছে।

কলকাতার বই এখানে অনেক বিক্রি হতে আরম্ভ করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে এত বাংলা বই এখানে আসছে কলকাতা থেকে, এতে কি আপনারা আশঙ্কিত?

ওঁরা একবাক্যে বললেন, না। কলকাতার বই আসুক। কিন্তু যা আসবে তা যেন বাণিজ্যচুক্তির মারফত সোজা পথে আসে। চোরাকারবারীদের ওঁরা ঘৃণা

করেন। ওদের বক্তব্য বোঝা গেল, বইএর আদানপ্রদান হোক। কিন্তু হোক সোজা পথে। দুই বাংলার বই দুই বাংলাতেই যাক। কিন্তু তার যাওয়া আসা যেন হয় প্রথাসিদ্ধ পথে।

দুই বাঙলার প্রকাশকদের এখন একটা সমস্যা দাঁড়িয়েছে। বিনা অনুমতিতে দুই বাংলাতেই কিছু কিছু বই ছাপা হয়ে গিয়েছে। আগে না-হয় মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল, এখন এই সময় এই ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আমাকে শ্রীসমরেশ বসু বলছিলেন, তাঁর অনেক বই ঢাকাতে ছাপা হয়েছে। এমনকি তাঁর নাম জাল করে অনেকে বই ছাপিয়ে ফেলেছে। বিক্রি হচ্ছে। বদরুদ্দিন ওমরের কয়েক-খানি বই বেরিয়েছে কলকাতায়। বেরিয়েছে আরও কয়েকটি বাংলাদেশের বই কলকাতায় লেখকের বিনা অনুমতিতে ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতীয় লেখকদের লেখা অনেক বই ছাপা হয়ে আসত। সে সব বই এখনও ফুটপাথে ঢালাও বিক্রি হয়। অতি জঘন্য ছাপা, বাঁধাইও তথৈবচ। আজকাল ঢাকার প্রায় সর্বত্র স্টলগুলিতে কলকাতার পত্রপত্রিকা বিক্রি হচ্ছে। কিছুকাল আগে এসব ভাবাও যেত না। কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু ঘোলা জলও ঢুকে গেছে। এসেছে বেশ কিছু যৌন পত্রিকা। কলকাতায় পুলিসের তাড়া খেয়ে পত্রপত্রিকাগুলি এখন ঢাকায় পাচার হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঢাকার ছাত্রনেতারা বলছেন এই সব অশ্লীল পত্রপত্রিকা কারও স্টলে দেখলে ছাত্ররা গিয়ে প্রতিরোধ করবে। কিন্তু তাতে খুব ফল হয়েছে বলে মনে হল না।

*

গত সপ্তাহে পর পর দুদিন ঢাকায় হুড়মুড় করে কালবোশেখী এসে পড়ল। হোটেলের ন'তলা থেকে কাচের জানালা দিয়ে ঝড় দেখছি। টিনের চাল উড়ে যাচ্ছে। ধুলো উড়ছে কামানের ধোঁয়ার মত, গাছের ডাল ভাঙছে মড় মড় করে। ঝনঝন করে এই হোটেলের যে কত কাচ ভেঙে গেল।

এতবড় ঝড় কমই দেখেছি। ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে সেই ঝড়ে। আহতের সংখ্যা শতাধিক।

যে বৃক্ষরাজি ছায়া দেয়, ঝড়ের দিনে সেই ছায়াতরুই আবার সংকটের মূলে কারণ। নতুন ঢাকার পথঘাট ঝড় হলেই যে নিরাপদ নয় তার কারণ কখন যে ডাল ভেঙে মাথায় পড়বে তার ঠিক নেই। প্রথম দিনের ঝড়েই কোথায় ওভারহেড তার পড়ে শহরের বৈদ্যুতিক বাতি সেই যে নিবল তারপর জ্বলল দুদিন পরে। এই গোটা দুদিন ধরে ঢাকা ছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নগরী।

*

ব্যাংকের মত রসকসহীন ব্যাপারেও নামকরণে বাংলাদেশ সরকার কাব্যের ছোঁয়া নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশের পুরানো ব্যাংকগুলি ভেঙেচুরে এখন যে ছটি নতুন ব্যাংক জন্ম নিয়েছে তাদের নাম হল, উত্তরা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক।

এইসব ব্যাংকে এখন থেকে বাংলাতে কাজকর্ম শুরু হবে।

দোকানে দোকানে এখন বাংলাতেই কাজ চালু হয়ে গেছে। সেদিন স্টেডিয়ামে একটা দোকানে জিনিস কিনে দাম দিতেই মেমোতে স্ট্যাম্প পড়ল : পরিশোধিত অর্থাৎ Paid। টেলিফোনের বদলে দূর আলাপনী আগেই চালু হয়ে গিয়েছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গাব্দ শকাব্দ হিজরী ও সংবৎ

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

দিনের আলো মিলিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়ে প্রদীপ্ত সূর্য। নেমে আসে রাত্রি। কখনো তমসাচ্ছন্ন, কখনো বা জ্যোৎস্না পুলকিত। কোন অনাদিকাল থেকে শুরু হয়েছে দিন ও রাত্রির এই বিরামহীন পথচলা, তার হিসেব কেউ রাখে না। নেই কোন খাতিয়ান। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে শুরু হয়েছে, অবিরাম গতিতে আজও চলেছে রাত্রি ও দিনের নিরবচ্ছিন্ন মিছিল। ভেদ থাকলেও বিচ্ছেদ নেই। একটি থেকে অপরটিকে কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সীমারেখা নির্দেশ করা যায় না দিন ও রাত্রির চলার পথে। দিনের আলো তিলে তিলে মিলিয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারে। রাতের অন্ধকার তিলে তিলে আবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দিনের পদসঞ্চারে।

বিশ্বসৃষ্টি যখন হয়নি, তখন হয়তো ছিল শুধু এক নিরবচ্ছিন্ন বিরাট অন্ধকার, অথবা সীমাহীন অনন্ত আলো। সে যুগ কল্পনার অতীত। কিন্তু যখন থেকে সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহের সমাবেশ হলো মহাকাশে, উদ্ভূত হলো বস্তুপিন্ড। শুরু হলো আলো আর ছায়ার খেলা। সূর্যকে কেন্দ্র করে মহাকালের বুকে চললো রাত্রি ও দিনের মিছিল। শুরু হলো ক্রমবিকাশ।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে উঠলো কাল সম্পর্কে সচেতন। অখন্ড কালস্রোতকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানী মন সচেষ্ট হলো কালের পরিমাপ করবার জন্য। কালকে ধরে রাখা যায় না, তবে পরিমাপ ও অনুমিতির সাহায্যে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্রমিক পর্যায়ে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়। তাই করা হলো। অখন্ড কাল সীমিত হলো কাল্পনিক পরিমাপ রেখায়। সূর্যের অয়নাংশ অনুযায়ী দিন, আর চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুযায়ী তিথি নিরূপিত হলো। গণনা শুরু হলো দিন সপ্তাহ মাস ও বর্ষের। বর্ষশতকে হলো শতাব্দী। এই বর্ষ গণনা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তাও আজ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অপৌরুষেয় আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদেও দিন রাত্রির উপাখ্যান, বর্ষকল্প ও পর্জন্য তথা মেঘ এবং বর্ষার কথা, প্রাবৃট কালের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু বর্ষ ও ঋতুর কথা উল্লিখিত হলেও ধারাবাহিক কোন বর্ষ গণনা বা শতাব্দীর উল্লেখ নেই। পরবর্তী যে যুগ প্রাগৈতিহাসিক বা পৌরাণিক যুগ বলে খ্যাত, সে যুগেও কোন ধারাবাহিক বর্ষানুস্মৃতি দেখা যায় না। তবে পৌরাণিক যুগের শেষে যখন থেকে রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন থেকে নির্দিষ্ট দিনাঙ্ক অনুসরণে বর্ষ গণনা এবং ধারাবাহিক শতবর্ষ বা শতাব্দীর প্রচলন হয়েছে। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে এই সব বর্ষ খৃষ্টপূর্ব শতক হিসাবে পরিগণিত। খৃষ্টপূর্ব ৩৫০০ বৎসর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অতীত যুগকে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে উল্লেখ করেন।

যুগের কল্পনা পূর্বেও ছিল না, তা নয়। তবে সভ্যতার প্রথম প্রভাত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবহমান বিস্তীর্ণ কালস্রোতকে ঋষিরা চারটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি। এই কাল্পনিক যুগগুলির ব্যাপ্তিকাল মোটামুটি নির্দেশ করলেও, দিনাঙ্ক বা শতাব্দীগত নয়।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ধারা যেখানে গঙ্গা যমুনার স্রোতের মত পাশাপাশি মিলে প্রবাহিত হয়েছে, সেখান থেকে বর্ষ গণনার প্রচলন অনেকখানি সুস্পষ্ট। আদি কাব্য রামায়ণে রামের চতুর্দশ বর্ষকাল বনবাসের কথা থেকে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ধারাবাহিক বর্ষগণনার রীতি তখন

প্রচলিত ছিল। তবে শতাব্দী বা শতকের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কালের বিরাট ব্যবধান বুঝোবার জন্য 'ষাট হাজার বৎসরের' উল্লেখ আছে। ওই সময় বা তৎপরবর্তী কালে যদিও বা কোন ধারাবাহিক শতক বা শতাব্দী গণনার রীতি প্রবর্তিত হয়ে থাকে, পরবর্তী যুগে সেগুলি কালস্রোতে বিলীন হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা খৃষ্টাব্দের মাপকাঠিতে বিস্মৃত শতকের গভীরতাকে খৃষ্টপূর্ব সংজ্ঞায় নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন এবং এখনও করেন।

নির্দিষ্ট কোন বিশেষ ঘটনার দিনাঙ্ক, অবতারকল্প কোন মহাপুরুষের জন্ম কিংবা শ্রেষ্ঠ কোন নরপতির রাজ্যাভিষেক দিবস থেকে বর্ষগণনা শুরু হয়েছে; এখনও হয়। তবে সেই সব বর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রচলিত হয়নি। জনস্বীকৃতি না পাওয়ায় সেগুলি মধ্যপথে অবলুপ্ত হয়েছে। ব্যবহারিক স্বীকৃতির অভাবে এই ধরনের বহু বর্ষাঙ্ক বিরল ও অপ্রচলিত হয়েছে। কোন কোন শতাব্দীর পরিসংখ্যান মধ্যপথে বিলুপ্ত হয়েছে অনুসৃতির অভাবে।

যে সব বর্ষগণনা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে আজও প্রচলিত আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শকাব্দ, সংবৎ, রামনবমী, খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ও হিজরী ইত্যাদি।

যীশু খৃষ্টের জন্মের পর থেকে খৃষ্টীয় বর্ষগণনা প্রচলিত হয়েছে। খৃষ্টান ধর্মের অভ্যুত্থান এবং সারা পৃথিবীতে পাশ্চাত্ত্য খৃষ্টান জাতিগুলির প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তারের ফলে খৃষ্টীয় সন তারিখের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। য়ুরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের অধিবাসী জাতিগুলি প্রায় সবই খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী এবং খৃষ্টীয় সন তারিখ ব্যবহার করেন। কেবলমাত্র ইসলাম-ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলিতে হিজরী সন তারিখ ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীতে যতগুলি দিন তারিখ মাস ও বর্ষগণনা প্রচলিত আছে, তার সবগুলিই সৌরমাস অনুযায়ী। অর্থাৎ সূর্যের অয়নাংশ সংক্রমণ এবং উদয়াস্ত অনুযায়ী গণনা করা হয়। কিন্তু হিজরী সনের গণনা হয় চান্দ্রমাস অনুযায়ী। চান্দ্রমাস ৩০ দিনে হয় না; প্রায়ই কম হয়। সুতরাং সৌরবর্ষের দিন সংখ্যা চান্দ্র বর্ষের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় সন তারিখের ব্যবহার প্রবর্তিত হলেও ইংরেজ শাসনের পূর্বকাল থেকে দেশের জাতীয় বর্ষগণনা সমভাবে প্রচলিত আছে। বর্তমানে শকাব্দকে ভারতের রাষ্ট্রীয় বর্ষ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে পালনসূত্রে বর্ষপঞ্জী বাতিল হয়নি। রামনবমী, সংবৎ, হিজরী ও বঙ্গাব্দ প্রভৃতি বর্ষক্রমও এদেশে অবাধে অনুসৃত হয়।

গৌতমবুদ্ধের জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৫৬৬ সালে। সেই অনুসারে এদেশে বুদ্ধাব্দ প্রচলনের প্রচেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু গণস্বীকৃতির অভাবে তার ব্যাপক প্রচলন হয়নি। শকাব্দ সংবৎ বঙ্গাব্দ ও হিজরী সনের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক হয়েছে।

শকাব্দ সংবৎ ও বঙ্গাব্দ প্রভৃতি গণনা কোন কোন দিনাঙ্ক থেকে আরম্ভ হলো, তার সঠিক ঐতিহাসিক পরিচয় আমরা পাই না। তবে আনুমানিক কালের নির্দেশ পাওয়া যায়। যে সব দিন তারিখ ও বৎসর আমাদের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত, সেগুলির বিবদ পরিচয় আমাদের জানা উচিত।

মুসলমান শাসনকালে বঙ্গাব্দ শকাব্দ সংবৎ

ও অন্যান্য সৌরবর্ষগুলি হিন্দু প্রবর্তিত বলে, দরবার, আইন-আদালত এবং দলিল-দস্তাবেজে বর্জিত হয়েছিল। হিন্দুরা তাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহের দরবারে সে আপত্তি উপেক্ষিত হয়েছিল। সরকার একমাত্র হিজরী সনকেই বহাল রেখেছিলেন। অবশেষে ভারত সম্রাট আকবর শাহ সৌরবর্ষের উপযোগিতা উপলব্ধি করে সেগুলিকেও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বঙ্গাব্দকে তিনি রাষ্ট্রীয় সাল হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন, কিন্তু হিজরীর বনিয়াদ সাল নির্ণয় করে দিলেন বঙ্গাব্দের দশ বছর আগে।

হজরত মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। নবধর্ম প্রচারের জন্য তিনি যেদিন হেজারত করেন, অর্থাৎ কাফেরদের হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে মক্কা ছেড়ে মদিনায় যান, সেই দিন থেকে হিজরী সাল গণনা করা হয়। হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতের সময় থেকে এই সাল গণনা আরম্ভ হয়।

বঙ্গদেশে বঙ্গাব্দের প্রচলন মুসলমান রাজত্বের অনেক আগে থেকেই ছিল। ১২০২ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজী বিহার বিজয়ের পর বাংলার রাজধানী নদীয়া বা নবদ্বীপ অধিকার করেন। তারপর থেকে হিজরী সনের প্রচলন এখানেও শুরু হয়।

ভারতবর্ষের পূর্ব প্রচলিত সৌর-অব্দগুলির মধ্যে শকাব্দই সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তার ধারা মধ্যপথে অবলুপ্ত হয়েছিল। রাজশক্তির উত্থান-পতনই হয়তো ছিল তার কারণ। শকাব্দ গণনা প্রথম আরম্ভ হয় অযোধ্যার সূর্যবংশীয় নরপতি বাহুরাজের পুত্র মহারাজ সগরের রাজত্বকালে।

হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমস্থ পার্বত্য উপজাতি শকেরা বার বার ভারতভূমি আক্রমণ করে লুঠতরাজ করতো। শকেরা ছিল পরাক্রমশালী ও দুর্ধর্ষ। হিমালয়ের উত্তরে এবং চীন তিব্বতের পশ্চিমে কারাকোরাম পর্বতমালার সন্নিকটস্থ বিস্তীর্ণ অঞ্চল শক বা শাক নামে পরিচিত ছিল। অধিবাসী জাতির নামও ছিল শক. নৃপতিও শক বা শকাদিত্য নামে খ্যাত ছিলেন। শকঃ জাতিভেদঃ নৃপভেদঃ॥ ইতি মেদিনী॥ দেশভেদঃ। ইতি বিশ্বঃ॥ সচ নৃপঃ শকাদিত্য শালিবাহন নাম্না খ্যাতঃ॥ মাৎস্য। ২য় অধ্যায়॥

এই শকদের রাজধানী ছিল কাম্বোজ। তারা আচার বর্জিত ম্লেচ্ছ বা যবন জাতি বলে পরিচিত ছিল। নৃপ শকাদিত্য শালিবাহন এই শকদের পরিচালনা করতেন। তিনিই ছিলেন তাদের রাজা। মহারাজ সগর শকাদিত্যকে হত্যা করে, ভারতভূমি নিরাপদ করেন। 'তস্য মরণ দিনবধি বৎসর গণনাত্মক শকাব্দেতি লিখ্যতে। ততঃ শকান্ সযবনান্ কাম্বোজান্ পারদাংস্তথা। হ হসমান বীরেণ সগরেণ মহৌজসা।' ইতি পদ্মে স্বর্গখণ্ডে সগরোপাখ্যানং॥ ১৭ অঃ॥ সগরঃ অযোধ্যাধিপতি বাহুরাজ পুত্র॥ মাৎস্য॥ ২য় অধ্যায়॥

বর্তমানে শকাব্দ ১৮৯৩। সমকালীন বঙ্গাব্দ ১৩৭৮, খৃষ্টাব্দ ১৯৭২। কিন্তু মহারাজ সগর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন যীশু খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত শকাব্দ সগর প্রবর্তিত শকাব্দ নয়। সগরের বংশ পরিচয় থেকে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সগর রামচন্দ্রেরও অন্ততঃ ২০০ বৎসর পূর্বে রাজত্ব করেছিলেন। সগরের পুত্র অসমঞ্জ; অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান; অংশুমানের পুত্র মহারাজ দিলীপ ও ভগীরথ। দিলীপের পুত্র রঘু এবং রঘুর পুত্র দশরথ—রামচন্দ্রের পিতা। অর্থাৎ রামচন্দ্র ছিলেন সগরের অধস্তন ষষ্ঠ

পরেরূ। নিহতপ্রাপ্ত সগর বংশের উদ্ধারের জন্য, ভগীরথ অধ্যবসায়ের খনন করে গঙ্গার স্রোত কপিল মুনির আশ্রমে এনেছিলেন। সেই জন্য গঙ্গার এই শাখা প্রবাহের নাম ভাগীরথী। কাহিনীগুলি পৌরাণিক হলেও, তার কিছু কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

অধুনা প্রচলিত শকাব্দ কোন তারিখ থেকে আরম্ভ হলো, সেটাও এক সমস্যা। শালিবাহনের মৃত্যুতেও শকদের উপদ্রব বন্ধ হয়নি। উজ্জয়িনী-অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাদের ভারতভূমি থেকে উৎখাত করেন। সেই জন্য তাঁকে শকারি বিক্রমাদিত্য বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, তখন থেকে দ্বিতীয়বার শকাব্দ গণনা শুরু হয়। কিন্তু তার কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ, লিপি বা মুদ্রাগত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ছিল খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক। অথচ শকাব্দের গণনা আরম্ভ হয় ৭৮ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ শকারি বিক্রমাদিত্যের প্রায় একশো বছর পরে।

কেউ কেউ বলেন, গৌতমী-পুত্র শতকর্ণীর সময় থেকে এই বর্ষ গণনা শুরু হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মহারাজ কনিষ্কের সময় থেকে বর্তমান শকাব্দের আরম্ভ, পশ্চিম হিমাচল প্রদেশের কোন শকরাজের অভিষেক দিবস থেকে যে এই বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়, তার উল্লেখ আছে। তৎকালে উত্তর ভারতে শকরাজ কনিষ্কই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নরপতি। তিনি নিজনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করেছিলেন। উজ্জয়িনীরাজও তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং শকাব্দ গণনা তাঁর রাজত্বকালে প্রবর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক।

গান্ধার-বিজয়ী যবনরাজ অশিস ও দ্বিতীয় কদফিস প্রভৃতির মৃত্যুর পর কনিষ্ক সিংহাসন অধিকার করেন। যেমন মৃত্যু হয়েছিল কনিষ্কের রাজ্যাভিষেকের কিছুদিন পূর্বে। কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তখন থেকেই বর্তমান শকাব্দের আরম্ভ। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি কথা বলা দরকার। কেউ কেউ বলেন বর্তমান কাম্বোডিয়ার (Cambodia) নামান্তর ছিল কাম্বোজ। কিন্তু ব্রহ্ম পারের কাম্বোজ (Cambodia) অঞ্চল শক-জাতির (Scythians) আবাসভূমি কোন দিন ছিল না। শক-পহ্লবের (Scythians) হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম পার থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। আরাকানের পূর্বে ব্রহ্ম দেশের কোন কোন অঞ্চলে মগ জাতির আবাসভূমি ছিল। চীনের উপকণ্ঠে ছিল হূনদের আদিভূমি।

সংবৎ: সু-বৎ বৎসর: ॥ ইতি সংবৎ বিক্রমাদিত্য-রাজবৎসর: সংবৎ ইতি খ্যাত: বিক্রমাদিত্যরাজ: ‌। শৌর্যাতিশয়: তং-

পর্যায়ঃ] ধন্বন্তরিক্ষপণকামর সিংহ-শঙ্কু বেতালভট্টঘটকর্পর কালিদাসাঃ খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচিঃ নববিক্রমস্য ॥ ইতি নবরত্ন শ্লোকঃ। চরণঃ। শক্তিঃ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ॥

বিক্রমাদিত্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নৃপতি বিশেষের নাম ছিল না। পরাক্রমশালী শৌর্যবান্ একাধিক নরপতি বিক্রমাদিত্য নামে অভিহিত হয়েছেন। তবে সাধারণতঃ বিক্রমাদিত্য বলতে আমরা যাঁকে বুঝি, তিনি উজ্জয়িনী-অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য, যাঁর সভায় মহাকবি কালিদাস প্রমুখ নবরত্ন ছিলেন।

"বিক্রমাদিত্যঃ স্বনামখ্যাতো রাজা। সচ উজ্জয়িনী অধিপতিঃ। সংবৎকর্তা চ। তৎপর্যায়ঃ শৌর্যাতিশয়ঃ |১| সাহসাঙ্কঃ |২| শকারিঃ |৩| ইতি জটাধরঃ ॥ অস্য বিবরণং দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায়াং দ্রষ্টব্যম্ ॥ মহাকবি কালিদাসের দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকায় বিক্রমাদিত্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। মহাকবি কালিদাস যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে ছিলেন সেটা তাঁর শকুন্তলা নাটকের ভাষা থেকে স্পষ্টই প্রতীত হয়। শকুন্তলা নাটকের ভাষা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের ভাষা।

সুতরাং মহারাজ বিক্রমাদিত্য খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রাজত্ব করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'বিক্রমাদিত্যরাজবৎসরঃ সংবৎ ইতি খ্যাতঃ।' বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয় খৃষ্টপূর্ব ৫৮ সালে। এই বর্ষের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। প্রচলিত সংবৎ বা বিক্রমাব্দ বর্তমানে ২০২৯ (খৃষ্টীয় ১৯৭১।৭২)। সুতরাং বিক্রমাব্দ বা সংবৎ খৃষ্টপূর্ব ৫৮ সালেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমান প্রচলিত রামনবমীর ২০২৮ সাল। সংবৎ অপেক্ষা এক বৎসর কম। কিন্তু রামচন্দ্র বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন না। রামচন্দ্রের জন্ম চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে। বর্ষ বা সালের কোন উল্লেখ নেই। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, রামচন্দ্রের জন্ম বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের এক বৎসর পরে হতে পারে না। মহাকবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্য রঘুবংশ রচনা করলেন রামচন্দ্রের জীবন কথা অবলম্বনে। সে ঘটনা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, রামচন্দ্র উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের চেয়ে অনেক প্রাচীন কালের নরপতি। রঘুবংশ ছাড়াও, মহাকবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যে লিখেছেন—'বসতি রামগির্যাশ্রমেষু' ... 'জনকতনয়াস্নান-পুণ্যোদকেষু'। 'রামগিরি আশ্রম' এবং 'জনকতনয়ার স্নান পুণ্যোদক' উক্তি থেকেও প্রমাণ হয় যে, রামচন্দ্র ও জনকতনয়া সীতা বিক্রমাদিত্য-যুগের বহু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং সে যুগেও পুণ্যশ্লোক নরনারী রূপে পূজিত ছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব ৫৮ সালে উজ্জয়িনীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর, মহারাজ বিক্রমাদিত্য অযোধ্যায় যে রামনবমী উৎসব উদ্‌যাপন করেছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সময় (খৃঃ পূর্ব ৫৭) থেকে রামনবমী বর্ষ গণনা করা হচ্ছে। চান্দ্র তিথিতে আরম্ভ হলেও রামনবমী সৌরবর্ষ।

উজ্জয়িনীর সিংহাসনে প্রথম অভিষিক্ত হয়েছিলেন বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি। এই ভর্তৃহরি ছিলেন অসামান্য ধীমান্‌ ও প্রতিভাশালী কবি। তাঁর রচিত বাক্যপ্রদীপ, ভাট্টিকাব্য, শৃঙ্গারশতক, নীতি-শতক ও বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মহাকবি কালিদাস ও ভর্তৃহরির ভাষা যে সমকালীন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কালিদাসের 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালী বন-রাজিনীলা। আভাতি বেলা লবণাম্বু-রাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥' আর ভর্তৃহরির 'তরঙ্গসঙ্গাং চপলৈঃ পলাশৈঃ... জ্বলাশ্রিয়ং দধানাং তাম্রোৎপলানি-আকুল-ষট্‌পদানি রেজুঃ॥' একই ভাষা ও রঞ্জনার দ্যোতক। সুতরাং ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্য ও

কালিদাস যে সমকালীন এবং খৃষ্টপূর্ব শতকের লোক তা সপ্রমাণ। ভর্তৃহরির মন গার্হস্থ্য জীবনে বীতস্পৃহ হওয়ায় তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সাহিত্যসাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। সিংহাসনে অভিষিক্ত হন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবৎকর্তা বিক্রমাদিত্য।

অপর সৌরবর্ষটি বঙ্গাব্দ। বঙ্গদেশে বঙ্গাব্দের উৎপত্তি, এবং বৃহৎ বঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গ বঙ্গ মিথিলা ও কলিঙ্গে এই সন তারিখ অব্দের ব্যাপক ব্যবহার ছিল; কোথাও কোথাও এখনো আছে। বঙ্গাব্দের গণনা আরম্ভ হয়েছে ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে।

পূর্বে বঙ্গদেশ বলে কোন রাষ্ট্র ছিল না। ছিল গৌড়বঙ্গ অর্থাৎ গৌড়-মণ্ডলা ও রাঢ় বা রাষ্ট্র, সমতটী ও বঙ্গাল দেশ। সামগ্রিকভাবে এদেশকে বঙ্গ বলা হতো। এই বঙ্গ নাম বিক্রমাদিত্য যুগেও ছিল। মহাকবি কালিদাস বর্ষার রূপ বর্ণনায় প্রকৃতির সঙ্গে 'বঙ্গবধূঙ্গনার' তুলনা করেছেন। পরবর্তীকালে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাজ্যের নাম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অঙ্গ রাজ্য ছিল নিম্ন বিহার ও ভাগলপুর, বঙ্গ ছিল দ্বারবঙ্গ (বর্তমান দ্বারভাঙ্গা) থেকে আরম্ভ করে গৌড়বঙ্গ (রাঢ়), পূর্ববঙ্গ ও অসম দেশ অর্থাৎ আসাম ও কামরূপের সীমারেখা পর্যন্ত। আর কলিঙ্গ ছিল বর্তমান উড়িষ্যা বা ওড়িশা রাজ্য।

বর্তমান জনপদ গড়ে উঠবার আগে এ দেশ ছিল সাঁওতাল ভিল প্রভৃতি আদিবাসিদের আবাসভূমি। তারা 'বঙ্গা' বা 'বঙ্গাঈ' উপাসক ছিল বলে, এ অঞ্চলকে বঙ্গা বা বঙ্গাঈর দেশ বলা হতো। তাই থেকে হলো বঙ্গদেশ নামের উৎপত্তি।

পরবর্তীকালে আবুল ফজল এই দেশের নামকরণ করেছিলেন 'বাঙ্গালা'। তখন থেকে জাতির নাম হলো বাঙ্গালী।

এক সময় বিহার বঙ্গ আসাম এবং পূর্ব হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক বিস্তার হয়েছিল। গয়ার সন্নিকটবর্তী নৈরঞ্জনা নদীতীরে (উরুবিল্ব বা বিল্লোনী গ্রামে) মহাবোধি বৃক্ষতলে যেমন একটি বজ্রাসন ছিল তেমনি একটি বজ্রযোগাসন ও সঙ্ঘারাম স্থাপিত হয়েছিল বঙ্গাল অঞ্চলে পদ্মানদীর তীরে। পরবর্তী কালে এই স্থান 'বজ্রযোগিনী' নামে খ্যাত হয়েছে। বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রাম এখনো আছে। তীর্থংকরেরা এখান থেকে ধর্মপ্রচারের জন্য নানা দেশে প্রব্রজ্যা করেছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে গৌড়-বঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধদের ধর্মবোধ বেশ কিছুটা তমসাচ্ছন্ন হলো। ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে ভিক্ষুরা আচারসর্বস্ব ও হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে উঠলেন। দেশের ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিনষ্ট করবার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। হানাহানি ও নরহত্যা শুরু হলো। ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘর্ষ ব্যাপক হয়ে উঠলো। এবং সমগ্র দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো।

তখন গৌড়বঙ্গ মগধের অধীন ছিল। সম্রাট মহাসেন গুপ্ত পাটলিপুত্র থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শশাঙ্ককে পাঠালেন বিদ্রোহ দমনের জন্য। শশাঙ্ক ছিলেন যেমন সুপুরুষ, দীর্ঘায়তন ও বলিষ্ঠ যুবা, তেমনি নির্ভীক ও বুদ্ধিমান। গৌড়বঙ্গ সমতটী ও বঙ্গাল অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। ধীবর গৃহে আশ্রয় নিয়ে, শশাঙ্ক পূর্ববঙ্গে যে কৈবর্তবাহিনী গঠন করলেন, তারা জলে ও স্থলে সমান রণকুশল ও অজেয় হয়ে উঠলো। শশাঙ্কের বীরত্ব ও তাঁর কৈবর্তবাহিনীর অসামান্য রণনৈপুণ্যে থানেশ্বরের সম্রাট ও কনৌজের রাজা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। গৌড় থেকে কামরূপ সীমা পর্যন্ত এক অখণ্ড বঙ্গদেশ গড়ে উঠলো। শশাঙ্ক হলেন সেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজা।

মালবরাজ দেবগুপ্ত শশাঙ্কের সহায়তায় কনৌজরাজ গ্রহবর্মণকে পরাজিত ও হত্যা করে তাঁর পত্নী (হর্ষবর্ধনের ভগিনী) রাজশ্রীকে বন্দী করেন। হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন পূর্বেই মল্লযুদ্ধে শশাঙ্কের হাতে নিহত হয়েছিলেন। সুতরাং সম্রাট হর্ষবর্ধনের মনে শশাঙ্ক সম্পর্কে তীব্র বিষ ও আক্রোশ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। তিনি শশাঙ্ককে বিনাশ করবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশকে (৫৯২-৯৩ খৃঃ) গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঢ়দেশের কর্ণসুবর্ণ (কানসোনা) গ্রামে। বৈশাখ মাসের সেই শুভক্ষণ থেকে বঙ্গদেশের নতুন বর্ষগণনা শুরু হলো—বঙ্গাব্দ।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসলেন। গ্রহবর্মণের পুত্র ভাস্কর বর্মণকে কনৌজের সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তার অভিভাবক হলেন এবং পূর্বভারতের কয়েকটি রাজশক্তির সহযোগিতায় শশাঙ্কের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন।

৬১৯ খৃঃ পর্যন্ত গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করেছিলেন। পরে হর্ষবর্ধনের চক্রান্তে তাঁর রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হলো। হর্ষবর্ধন রাজশ্রীকে কামরূপ থেকে উদ্ধার করে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যু হয়।

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মহেঞ্জোদারো হরাপ্পা আবিষ্কারের পর, কর্ণসুবর্ণের ভূগর্ভ খনন করে প্রাচীন রাজধানীর ঐতিহাসিক অবশেষ আবিষ্কার করেন।

বাংলাদেশে পূর্ব জার্মানীর মহিলা ফেডারেশন

আজিমপুরা এস্টেট ঢাকা থেকে সালমা খানমের চিঠি পেলাম। পর পর দুখানা চিঠি। সালমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমার নেই। পত্রমিতালি মাত্র তাও সম্ভব হয়েছে রণেন আচার্য মহাশয়ের সৌজন্যে। তিনিই দিয়েছিলেন সালমা খানমের সন্দেশ। ঢাকা আর বাকী বাংলাদেশের মেয়েরা কেমন করে তাদের ভাঙ্গা ঘর গড়ে তুলবার কাজে লেগেছে জানবার ইচ্ছায় তাঁর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম কর্মী কোন মহিলার খবর

শ্রীমতী ইল্‌সে থিয়েল

দিতে। দুখানা চিঠিতেই সে সম্বন্ধে কিছু কিছু জানলাম। মাত্র চোদ্দ দিনের মধ্যে। সে তো কিছুই নয়। নয় মাস ধরে যে অমানুষিক অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলেছে তারই ফলে সোনার বাংলা আজও শ্মশান। সালমা খানমের চিঠি থেকে মাত্র দু' লাইন পড়লে আপনারাও বুঝবেন কি অবস্থা সেখানকার জায়া-জননীর। 'সিলেটে এক পাড়ায় রয়েছেন ২২টি বিধবা। এঁদের স্বামীদের মাথার খুলিও সেখানে রয়েছে। দেখে যান, এসে দেখে যান।' যুদ্ধোত্তর ইউরোপেও এমন হয়নি। সারা বিশ্ব এক হ'য়ে ধ্বংসাবশেষ থেকে পারিবারিক জীবনকে আবার চালু করতে চেয়েছিল। অনাথ বালকবালিকার জন্য জাতিসঙ্ঘের শাখা ইউনিসেফ এগিয়ে এসেছিল। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে হাহাকার তার জন্য সাড়া জাগা আরও অনেক বেশী দরকার। সহৃদয়তার ঢেউ ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মত উঠলে আর পড়লে এত বড় সমস্যার সমাধান কঠিন।

WIDF একটি জগৎজোড়া মহিলা প্রতিষ্ঠান। ভারতের ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান উইমেন তার সঙ্গে যুক্ত। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট। কিছু দিন আগে এঁদের আমন্ত্রণে বহু দেশের মহিলা প্রতিনিধি ভারতে এসেছিলেন। সেই সভায় মোস্তিয়া চৌধুরীর ভাষণ সম্বন্ধে আমরা লিখেছিলাম। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। বাংলাদেশের মহিলা পরিষদ WIDF-এর সভ্য হবার আবেদন করেছেন। তাদের জটিল অবস্থায় কর্তব্য নিরূপণে চাই সহানুভূতিশীল সকল নারীসমাজের সক্রিয় সাহায্য। সমবেদনা মাত্র নয়।

সেই উদ্দেশ্যে গত মার্চ মাসে ঢাকার মহিলা পরিষদ বিশ্বের বহু দেশের মহিলাদের ডেকে এনেছিলেন। সেখানে গিয়েছিলেন ভারতের ন্যাশনাল ফেডারেশন, GDR-এর মহিলা ফেডারেশন ইত্যাদি। ন্যাশনাল ফেডারেশন সম্বন্ধে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি। এবার GDR-এর মহিলা ফেডারেশন সম্বন্ধে কিছু শুনলাম শ্রীমতী ইলসে থিয়েলের মুখে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন চারজন। তিনজন জার্মানী থেকে এসেছিলেন এবং চতুর্থ ছিলেন শ্রীমতী ফিসার, ভারতস্থ পূর্ব জার্মান কনসাল জেনারেলের পত্নী। পূর্ব জার্মানীই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে মান্যতা দেয়।

সাত দিন ঢাকায় থেকে ফিরবার পথে সামান্য সময়ই কলকাতায় ছিলেন। সেই সময়টুকুর মধ্যেই কলকাতার অনেক মহিলা প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে যোগদান করেন। বাংলাদেশ ও তার মহিলাদের সমস্যা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে ওঁরা দেশে ফিরছেন। বহু উপহার ও টাকা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে ওঁরা দিয়েছেন। এবার ফিরে গিয়ে হয়তো বা সরকারের উপর তাঁদের প্রভাবের পরিচয় পাবে হতভাগ্য বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা।

শ্রীমতী থিয়েল বলছিলেন মহিলা সমাজ শুধু নিজেদের গড়ে তোলেনি, গড়ে তুলেছে সাম্যের নূতন ভূমিকা। পাঁচটি রাজনৈতিক দল যেমন Volkskammer অর্থাৎ people's chamber-এর নির্বাচন পায়, মহিলা সংস্থা Democratic Womens Federation of GDR। ঠিক তেমনই পায়। ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ ক'টা দেশে আছে?

তাই তাঁদের বাংলাদেশ যাওয়াটিও গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো ফিরে গিয়ে বাংলার বোনদের জন্য নানা নূতন উপায় তাঁরা ভাবতেও পারবেন। এই তো দেখুন সালমা চৌধুরী জানিয়েছেন মেয়েদের এখন দরকার দু' পয়সা উপার্জন করা, দরকার নষ্ট পশু

শরীর-মন আর পূর্ণ হওয়া বুক নতুন আশায় বাঁধা। হায়, তাতে কত বাধা! ব্লক ছাপা মেয়েদের শেখানো হবে, রং কই? রং কেনার পয়সা কই? অন্নাভাবের আশঙ্কায় আসন্ন আগামী দিনের চিন্তায় দুরুদুরু প্রাণ। শ্রীমতী থিয়েল মহিলা। তাই তিনি আর তাঁর প্রতিনিধিদল বুঝেছেন ব্যাপারটি।

শ্রীমতী থিয়েল জার্মান people's chamber-এর সদস্যা। ৫০০ সদস্য-বহুল সভায় ১২৭টি মহিলা। ২০ জন সভ্য আছে কাউন্সিল অব স্টেটে, তার নির্বাচন হয় people's chamber থেকে। তারও তিনি সদস্যা। বিশজন মেম্বরের পাঁচটিই মহিলা। মহিলা পুরুষে ভেদাভেদ পূর্ব জার্মানীতে আর সমস্যা বলে গণ্য হয় না। ক্লারা জেটকিন যেদিন মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, এবড়ো-খেবড়ো বন্ধুর পথ অনবকটে পাড়ি দিয়ে দূরে-দূরান্তরে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ঘুরে মেয়েদের দাবি ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করে তাদের সচেতন করে তুলতেন সেদিন তাঁদের পিছনে রয়ে গেছে। এখন সমাজের মনোভাবও বদলে গেছে। সমাজ নারীর অধিকার সম্পূর্ণভাবে মেনেছে। পল্লী অঞ্চলেও মেয়েরা যাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি সম্বন্ধীয় কাজ করতে পারেন তার চালাও ব্যবস্থা হয়েছে ১০ বছরে ৩,০০,০০০ মেয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষা পেয়েছে। দেশের শতকরা ৭৮টি শিক্ষক মেয়ে। কিছু দিন আগে family code বা পারিবারিক আইনের পরিবর্তন করে নারীকে সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদিতে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তবে কি অন্যান্য দু-একটি পাশ্চাত্ত্য দেশের মত পুরুষের সঙ্গে interchangable অর্থাৎ আপসে বদল করার যোগ্য ভূমিকা চেয়ে মেয়েরা বিক্ষোভ করছেন? "মোটেই নয়। অধিকার তাদের চাই ন্যায্যের বেপরোয়া বিড়ম্বিত নয়।" শ্রীমতী থিয়েল নিজে তিনটি সন্তানের জননী। ১৯৪৫ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতি করছেন। মহিলা প্রতিষ্ঠানও সেখানে রাজনীতিরই কর্মক্ষেত্র। কোনদিন পারিবারিক জীবনে গোল বেধেছে বলে তাঁর মনে নেই। এখন অবশ্য সন্তানেরা বড় হয়ে উঠেছে। ভাবনা নেই। কিন্তু যেদিন তারা ছোট ছিল, সেদিনও দেশে শিশুর জন্য সুবন্দোবস্ত থাকায় অনায়াসে তারা মানুষ হয়েছে। তাই শতকরা ৮১টি মেয়ে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, নয়তো উপজীবিকা গ্রহণ করে।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের সমস্যা তো সবই প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। মহিলা সংস্থার প্রয়োজন কি আর আছে?" "আছে বইকি। মহিলাসমাজ হচ্ছে জাতির বিবেক। তাদের সমাজ থাকবে সদা সচেতন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রয়োজন সব দেশে সব সময়ে থাকে।"

কথাটা আমার খুব পছন্দ হলো। প্রার্থনা করি তাই যেন আমাদের দেশের মেয়েরা পারেন। ভারতীয় ফেডারেশন ঢাকায় মিলিত হলেন জার্মান ফেডারেশনের সঙ্গে। যেন দুই বন্ধু মিললেন তৃতীয় বন্ধুর বাড়িতে। আজ তৃতীয় বন্ধু বিপন্ন। মুজিব সাহেব তো ২৫শে মার্চের ভাষণে ভরসা দিয়েছেন নারীজাতির উন্নত উন্মুক্ত প্রগতির। সরকারী ভরসা মাত্র না হয় যেন। সমাজ যেন তুলে নেয় ভরসার প্রতিটি অক্ষর। এ সংগ্রামে নারী দিয়েছে বেশী। আমরা প্রতিবেশী তাই অগ্রগতির ঠিকানা আমরা জানি। সেই ঠিকানায় মিলবো বলেই বিশ্বজোড়া নারীসমাজ এগিয়ে আসছে। হতাশ যেন কেউ না হয়। বিমুখ না হয় কোন সমাজ।

শ্রীমতী

সোলঝেনিৎসিন

প্রায় দশ বছর বাদে সোলঝেনিৎসিন মুখ খুললেন। স্বদেশে প্রায় গৃহবন্দী এই লেখক এতদিন পর একজন বিদেশী সাংবাদিককে ইণ্টারভিউ দিয়েছেন। সাংবাদিকটির নাম রবার্ট হাইজার।

সোলঝেনিৎসিন ১৯৭০ সালের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট সরকার তাঁকে পুরস্কার গ্রহণ করতে যাবার অনুমতি দেননি। পুরস্কার কমিটির একজন প্রতিনিধি মস্কোতে এসেই লেখকের হাতে পুরস্কারের অর্থ ও সম্মান-পদক তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেবেন বলেছিলেন—কিন্তু তাতেও এখন বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। যদিও ঐ পুরস্কারের অর্থ এবং বিদেশে প্রাপ্য টাকা সোলঝেনিৎসিন তাঁর দেশের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

সোলঝেনিৎসিন অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর বাড়ি ও তাঁর পরিবারকে ঘিরে একটা নিষিদ্ধ গণ্ডি টেনে রাখা হয়েছে। তিনি সামাজিকভাবে পরিত্যক্ত এবং ঘৃণ্য। তাঁর পরিচিত লোকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে সেই অপরাধে তাঁদের চাকরি যায়। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী একজন অঙ্কের শিক্ষিকা, কিন্তু তাঁর চাকরি যায় শুধু এই অপরাধে যে, তিনি সোলঝেনিৎসিনের স্ত্রী।

সোলঝেনিৎসিন এখন বিপ্লব পূর্ববর্তী এবং বিপ্লবের আরম্ভকালের পটভূমিকায় একটি বড় আকারের গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত। এর প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ পশ্চিম দেশগুলি থেকে অবিলম্বে প্রকাশিত হবে। সোলঝেনিৎসিনের নামে অন্যতম প্রধান অভিযোগ, তিনি স্বদেশে বই প্রকাশ না করে বেশী লাভের আশায় বিদেশে পাঠিয়ে দেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, তিনি এই নতুন

বইটির পাণ্ডুলিপি মস্কোর অন্তত সাতটি প্রকাশনালয়ে পাঠিয়েছিলেন—তাঁরা সেটি না পড়েই ফেরত দিয়েছেন।

সোলঝেনিৎসিন আরও অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর বাড়ির সামনে গুপ্তচররা সব সময় পাহারায় থাকে। কেউ দেখা করতে এলেই গুপ্তচররা পরে তাকে অনুসরণ করে এবং সেই ব্যক্তি আবার অন্য কার সঙ্গে দেখা করছে—তার সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতে শুরু করে। তাঁর টেলিফোনের সব কথাবার্তা পুলিস শোনে।

সোলঝেনিৎসিনের নিজের ভাষায়ঃ এটা যদি স্ট্যালিনের আমল হতো—তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হতো। আমি একদিন অদৃশ্য হয়ে যেতাম—কেউ আমার সম্পর্কে একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে সাহস পেত না। কিন্তু ২০ এবং ২২তম কংগ্রেসের পর ব্যাপারটা অনেক জটিল হয়ে গেছে।

এখন তারা প্রথমে ঠিক করেছে, আমাকে চুপ করিয়ে রাখবে। কোথাও আমার সম্পর্কে এক লাইনও আলোচনা বেরুবে না, কেউ আমার নাম উচ্চারণ করবে না—কয়েক বছরের মধ্যে সবাই আমাকে ভুলে যাবে—তারপর আমাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। নতুন জেনারেশন তৈরী হয়েছে—পাণ্ডুলিপি টাইপ করে গোপনে বিলি করা হয়—সারা দেশে আমার লেখা ছড়িয়েছে—বিদেশেও ছাপা হয়েছে। আমাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়নি।

১৯৬৬ সাল থেকে শুরু হলো আমার সম্পর্কে কথা বলা। বিভিন্ন বক্তারা আমার সম্পর্কে নিন্দে করে বেড়াতে লাগলো। সেই বক্তাদেরও আমার বই পড়তে দেওয়া হয় না—পাছে তারা মুগ্ধ হয়—তাদের যা বলতে বলা হবে, শুধু তাই বলবে।

কর্তৃপক্ষ এখন আমার জীবনের খুঁটি-নাটি ঘটনা পরীক্ষা করে দেখছেন—কোথাও কোনো খুঁত আছে কি না। আমার সৈনিক জীবন সম্পর্কে, এমন কি, ব্যক্তিগত জীবনও।

তবে, একটি গুরুতর অভিযোগ আছেই—যা লোকেও মন দিয়ে শোনে। সেটা হলো দেশদ্রোহিতা। এটা শুনলে আর মানুষ যুক্তি দিয়ে বিচার করে না—ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কুড়ির দশকে এইসব ক্ষেত্রে বলা হতো প্রতি-বিপ্লবী। তিরিশের দশকে জনগণের শত্রু। চল্লিশের দশকের পর থেকে চলছে দেশদ্রোহী।......

আমার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রচার চালাচ্ছেন—তাঁদের অগভীরতা ও নীচতা খুব স্পষ্ট। একটা ব্যাপার তাঁদের মাথাতেই আসে না যে,

যখন একজন লেখক সমাজের অধিকাংশের থেকে আলাদাভাবে চিন্তা করে—সে আসলে সেই সমাজের একটি সম্পদ—মোটেই সে সমাজের কলঙ্ক বা অপদার্থ নয়।

বাংলা নামে দেশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতাকে উপলক্ষ করে এরই মধ্যে ঠিক কতগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে আমি জানি না, তবে পঞ্চাশের কম নয়। এইসব বইয়ের কিছু কিছু আমি দেখেছি, ভালো মন্দ কোনো রকম মন্তব্য না করেই বলা যায়, সবগুলিই একদেশদর্শী। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাত্মক রূপটি তুলে ধরার বদলে—তাতে বিভিন্ন লেখক নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে এই বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটিকে দেখবার চেষ্টা করেছেন—কিছু কিছু বই অবশ্য নিছক রগরগে ঘটনার বর্ণনা মাত্র, সেগুলো আলোচনারও অযোগ্য।

বস্তুত এই অসাধারণ বিশাল ঘটনাটির সম্যক ইতিহাস একটু দেরিতেই প্রকাশিত হবার কথা—যখন টুকরো টুকরো দলিলের বদলে সমস্ত তথ্য পরিজ্ঞাত হবার সুযোগ আসে, সম্পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এই প্রথম সেই রকম একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলো—'বাংলা নামে দেশ'।

গ্রন্থটি হাতে নিলে বাঙালী পাঠক মাত্রই এক ঝলক বিস্মিত হবেন। এই জাতীয় প্রকাশন সাধারণত বিদেশী বই হিসেবেই দেখা আমাদের অভ্যাস। ছবি ও রচনার সামাঞ্জস্যে এমন সুপরিকল্পিত বাংলা বই আগে দেখা যায়নি। রচনাগুলি সংক্ষিপ্ত—অপ্রয়োজনীয় উচ্ছ্বাস বা ভাবাবেগ একটুও নেই। রচনাগুলি ছবি হয়ে উঠেছে এবং ছবিগুলি (অসংখ্য) অনেক কিছু বাণী বহন করে। বইটি শুরু হয়েছে ২৫শে মার্চের পটভূমিকা দিয়ে, শেষ হয়েছে কারাগার প্রত্যাগত মুজিব ঢাকায় নিজের বাড়িতে এসেছেন—তাঁর স্ত্রী আনন্দে মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান। উভয়েই বইটিকে মূল্যবান দলিল বলে অভিহিত করেছেন। বইটি চিরকালের সঙ্গী হয়ে থাকার মতন।

এই রুচিসম্মত গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন শ্রীঅভীক সরকার।

সনাতন পাঠক

কারুশিল্প

Batik-o-Tex-Print. By Manindra Kumar Chakraborty and Lalita Chatterjee. Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta-12. Price : Rs. 8-00.

এশিয়ার দেশগুলির পুরাতন ঐতিহ্যবাহী বহু কারুশিল্পের অপমৃত্যু ঘটেছে যথার্থ চালনার অভাবে। অনেক শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়নি। সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে বহু কারুশিল্প ভারত থেকে বিদেশে গিয়েছে। কিছু কিছু এসেছে ভারতেও। এই সব শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে দরকার ভাল বই এবং জনসাধারণের এ ব্যাপারে উৎসাহ। খুবই আনন্দের কথা এই উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীমণীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীমতী ললিতা চট্টোপাধ্যায় বইটি লিখেছেন। এই ব্যাপারে ইংরাজীতে লেখা এটিই ,একমাত্র বই। বাংলাতেও এমন বই আছে বলে জানা নেই। না থাকলে এ ব্যাপারে ওঁদেরই এগিয়ে আসা উচিত। বস্তুত বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরলভাবে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেটাই বড় লাভ। ছাপা, বাঁধাই ও বিশেষ করে প্রচ্ছদচিত্রটি নয়নাভিরাম।

উপন্যাস

প্রতিচ্ছায়া। হারাধন চক্রবর্তী। পরিবেশক: আধুনিক, ১১/বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম: তিন টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসের লেখক নবাগত। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য রচনার প্রথম প্রচেষ্টা এই উপন্যাস। সহজ সরল ঘটনা সহজতর ভঙ্গীতে বিবৃত। নায়ক সহজ ও সং জীবনযাপনে বিশ্বাসী। দুঃসাহসিক কিছু করার ঝুঁকি সে-ও যেমন নেয়নি, লেখকও তেমনি নেননি। নায়কের বিক্ষত অন্তঃকরণের অঙ্কণকরণে লেখকের আন্তরিকতা অনুভব করা যায়। সাদামাঠা সরল কাহিনী পাঠে যাঁদের আগ্রহ তাঁদের কাছে গ্রন্থটি সমাদর পাবে বলেই মনে হয়।

ধর্ম

আমার দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন: (১৫-১৬ অধ্যায়) অনুবাদক শম্ভুনাথ ভদ্র। প্রকাশক: চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, ১-১-১/এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম: ২.০০।

দি লাইফ ডিভাইন মূলে ইংরাজি গ্রন্থ ১৯১৪-১৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ রচনা করেন। মূল বেদের কথাগুলি কালের প্রবাহে নব ভাষা ও শব্দের মোড়কে শুধু আবৃত হতে পারে—মূল কথা পালটায় না। ইংরাজি ভাষাতেও পালটায়নি। শ্রীভদ্রের অনুবাদের বাহন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতির সরল বাক্য ছোট

ছোট সহজ শব্দের সারল্য ও সাহসিকতা। বেদের কথা মুখে বলা যায় না, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, বেদ উচ্ছিষ্ট করা যায় না। বেদ অনুভব অনুভূতির সামগ্রী। এ হেন সামগ্রীকে সামগ্রিক চেতনার মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সঞ্চারিত করার সাধু প্রয়াসের জন্য অনুবাদককে প্রশংসা করতে হয়।

বিবিধ

কুষ্ঠসেবা। শ্রীপার্বতীচরণ সেন। পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী প্রকাশন উপসমিতিঃ—মহাজাতি সদন, ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য ০·৫০ পয়সা।

কুষ্ঠসেবা মহাত্মা গান্ধী-নির্দিষ্ট বিখ্যাত গঠনকার্য-ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। গান্ধী শতাব্দী পালন উপলক্ষে স্বল্প মূল্যে যে সব পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তকখানা এই পর্যায়ের অষ্টম পুস্তক। এই পুস্তকের লেখক বিগত ৪৭ বৎসরকাল নানা প্রতিষ্ঠানে কুষ্ঠসেবা সংক্রান্ত বিবিধ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মহাত্মাজীর সংস্পর্শে এসেই প্রথম যৌবনে তাঁর কাছ থেকে তিনি কুষ্ঠসেবার প্রেরণা লাভ করেন। এই পুস্তকে মানবপ্রেমিক গান্ধীজীর জীবনদর্শন ও ভগবৎপ্রেমের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। মহাত্মাজীর প্রেমের স্পর্শে দেশে যে কুষ্ঠসেবার চেতনা জেগেছে ইহাই আলোচ্য পুস্তকের মূল বক্তব্য।

সাময়িকপত্র

গঙ্গোত্রী (৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)। সম্পাদকঃ শান্তনু দাস। ৪/১, আফতাব মসজিদ লেন, কলিকাতা-২৭। দামঃ এক টাকা।

ঝরঝরে ছাপা এবং চকচকে প্রচ্ছদের এই কবিতা-পত্রটি সম্পর্কে নানা কারণেই আগ্রহ সঞ্চিত থাকে। সাম্প্রতিক সংখ্যাটিতে নবীন-প্রবীণ, কবিদের শতাধিক কবিতা আছে। নেরুদা প্রসঙ্গে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আর একটু দীর্ঘ হলে ভাল লাগত। বাংলা কবিতার কথা প্রবন্ধে নারায়ণ চৌধুরীর মতামত বিতর্কের সূচনা করবে বলে মনে হয়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর "উলঙ্গ রাজা" কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে অমিতাভ দাশগুপ্তের কিছু মন্তব্য অনেকের কাছেই অস্বস্তির কারণ হবে।
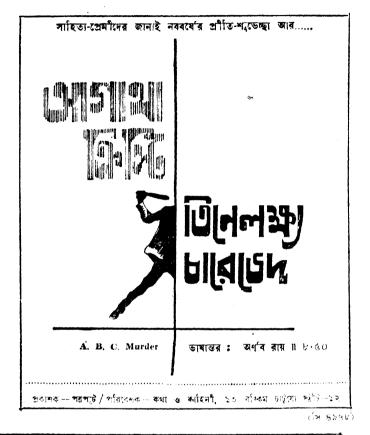
উঠতি ফুটবলার দিলীপ পালিত

পাড়া গড়নের ছেলেটিকে দেখলে আপনার মনেই হবে না ছেলেটি ফুটবল খেলোয়াড়। কথায় বলে ফুটবল 'ম্যানস গেম'—পুরুষের খেলা। খেলায় স্ট্যামিনার দরকার, বল ও শক্তির দরকার। যদিও ছেলেটি মাথায় উঁচু পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি, দেহের ওজন ৫৫ কিলোগ্রাম তবু দেখলে ওকে কিছুটা নির্জীব বলেই মনে হবে। কথায়বার্তায় চালচলনেও কেমন একটা শান্ত ভাব। এ ধরনের ছেলেরা যদিও ফরোয়ার্ডে মানিয়ে নিতে পারে ডিফেন্সে সাধারণত পারে না।

কিন্তু দিলীপ পালিত ডিফেন্সেরই খেলোয়াড়, সে স্কুল ফুটবলে জেলা থেকে শুরু করে রাজ্যের এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। জুনিয়র ফুটবলে রাজ্য দলে খেলেছে। এশিয়ান স্কুল ফুটবলে করেছে ভারতীয় স্কুল দলের অধিনায়কত্ব।

খেলার সূচনা বাগুরে অ্যাভিনিউ ক্লাবে। পাড়ার ছোট ছেলেদের সঙ্গে খেলতে খেলতেই স্কুলের মাস্টারমশাইদের চোখে পড়ল। পড়ত কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যালয়ে। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিবেকানন্দ শীল্ডের ফাইনাল খেলা আগড়পাড়া স্কুল এবং কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যালয়ের মধ্যে। কৃষ্ণপুর জিতে শীল্ড নিয়ে এল। ওইদিন কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনের গেম টিচার শ্রীহিরন্ময় মুখার্জি দিলীপের খেলা দেখে বললেন, 'তুমি আমাদের স্কুলে পড়বে? যদি পড় তোমার কোন মাইনে লাগবে না'। এটা ১৯৬৭ সালের কথা। দিলীপ তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। ওই বছর দিলীপ ভর্তি হল কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলা। প্রায় রোজ বিকেল তিনটেয় মাস্টারমশাই ওদের নিয়ে যেতেন টালা পার্কে প্র্যাক্টিসের জন্য। ভুলত্রুটি শুধরে দিতেন। উত্তর কলকাতা স্কুল লীগ এবং পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় দিলীপ বেশ নাম করল।

১৯৬৮ সালেই বাংলার একমাত্র স্কুল হিসাবে কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন সুব্রত মুখার্জি কাপে খেলার অধিকার পেল। দিল্লী থেকে কাপ নিয়েও ফিরে এল। প্রতিটি খেলায় দিলীপ চমৎকার খেলেছিল।

দিলীপ পালিত

ওই খেলার সুবাদেই ওই বছর ন্যাশনাল স্কুল গেমসে দিলীপ পালিত বাংলা দলে স্থান পেল। ওদের স্কুলের আরও দুটি ছেলে, কল্যাণ মুখার্জি এবং রতন ঘোষও দলে ছিল। কিন্তু ফাইনালে আসাম স্কুলের কাছে বাংলা হেরে গেল। ত্রিপুরা থেকে ফিরে আসার পরই দিলীপের ডাক পড়ল বাংলা দলে জুনিয়র ন্যাশনাল অর্থাৎ ডাঃ বি সি রায় কাপে খেলার জন্য। কটকে বি সি রায় কাপের সেমিফাইনালেও বাংলা হেরে গেল কেরলের কাছে। ১৯৬৮-র ফুটবল মরসুমও শেষ হয়ে গেল।

পরের বছর সতেরো বছর বয়সী স্কুল ছাত্র দিলীপ পালিত যোগ দিল প্রথম ডিভিসন ক্লাব স্পোর্টিং ইউনিয়নে। লীগের প্রায় প্রতি ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলেছে। ওই বছর দিলীপের অধিনায়কত্বেই ন্যাশনাল স্কুল গেমসে ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

১৯৭০ মরসুমে দুই একটি বড় ক্লাবের কাছ থেকেও এই সম্ভাবনাময় স্কুল খেলোয়াড়টির ডাক আসে। কিন্তু ওই মরসুমে স্পোরটিং ইউনিয়নেই নিয়মিত খেলে ১৯৭১-এ যোগ দেয় ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবে। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেবার বছর। ময়দান থেকে ফিরে এসেই খেলার কথা ভুলে গিয়ে দিলীপ বই নিয়ে বসে। কিন্তু প্রথম ডিভিসনের ফুটবল খেলোয়াড়, যার বেশ একটু নাম হয়েছে, তার পক্ষে পড়াশুনায় একাগ্রতা আনায় অনেক বাধা। প্রায়ই খেলার ডাক আসে। কিন্তু পরীক্ষার জন্যই সে ডাকে সাড়া দিতে পারে না। ওই বছর যখন তার কাছে বড় ডাক এল তখন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং মনে মনেই দিলীপ যোগ দিল এশিয়ান স্কুল ফুটবলে ভারতের দল গড়ার জন্য পাটনার কোচিং ক্যাম্পে। ক্যাম্প শেষ হবার পর দিলীপের উপরই পড়ল অধিনায়কের দায়িত্ব।

সিঙ্গাপুরে খেলা। বিদেশের মাটিতে ভারতের স্কুল ছাত্রদের প্রথম খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা আটটি। থাইল্যাণ্ড, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই, ফিলিপিনস ও ভারত। প্রথমে (গ্রুপ) লীগ প্রথায়, পরে নক আউটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিযোগিতার গুরুত্ব এবং পরিবেশের নতুনত্ব ভারতীয় ছাত্রদের উপর যথেষ্ট মানসিক চাপ ছিল। দিলীপ অবশ্য মোহন বাগান বা ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে লীগ ম্যাচে খেলবার সময় বহু দর্শকের সামনে খেলেছে। কিন্তু অনেক ছাত্রের কাছে মাঠের বিপুল দর্শকসংখ্যা বিস্ময়ের ব্যাপার। তারপর ফ্লাড লাইটে খেলা। দিলীপ বলল, মাঠের ৪ কোণে ৪৫টি করে হাই পাওয়ার বাল্ব। উপরের দিকে চোখ তুললেই চোখ ঝলসে যায়। হেড করতে বেশ অসুবিধা হয়।

এই অসুবিধা সত্ত্বেও ওরা এশিয়ান স্কুল ফুটবলে যুগ্ম-জয়ের সম্মান পেয়ে দেশে ফিরে আসে প্রধানত দিলীপের অধিনায়কোচিত ক্রীড়াগুণে। প্রথম খেলাতেই ওরা হংকংয়ের কাছে হেরে যাচ্ছিল। হংকং ২—০ গোলে এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু ভারত দুটি গোল শোধ করে দেয় এবং খেলা শেষ হবার একটু আগে দিলীপই পিছন থেকে এগিয়ে গিয়ে জয়সূচক গোলটি করে।

দিলীপ দুচেতা খেলোয়াড়। ওর দুই পা ও মাথা সমান চলে। তবে ডান পায়ের চেয়ে বাঁ পায়ে জোর একটু বেশী। তাই কখনো খেলে লেফট হাফে, কখনো লেফট ব্যাকে। আবার কখনো রক্ষণব্যূহের স্তম্ভ বাংলা স্কুল দল আগরতলায় আয়োজিত স্টপার। ডিফেন্সের খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করা ওর মূল দায়িত্ব, সে সম্পর্কে সজাগ থেকেও নিজ খেলোয়াড়দের পায়ে বল জুগিয়ে গোল করানোর জন্যও ও সদা-সচেতন।

দিলীপ পালিত এখন একাধারে খেলোয়াড়, ছাত্র এবং অফিসের চাকুরে। এ বছর উয়াড়ি ক্লাবে যোগ দিয়েছে। বি-কম পড়ছে রাত্রিতে বিদ্যাসাগর কলেজে। আর দিনের বেলায় চাকরি করছে ইস্টার্ন রেলে। শিয়ালদায় কমার্শিয়াল ক্লার্ক।

বাবা জিতেন্দ্রনাথ পালিত দাবা খেলতে ভালবাসেন। কাকা রবীন্দ্রনাথ পালিতের সাঁতার কাটার শখ আছে। জ্যাঠামশাই যৌবনে ফুটবল খেলেছেন বেনেটোলা ক্লাবে। বেনেটোলা অঞ্চল ছেড়ে ওরা বাগুইআটির কলোনিতে আসার পর দিলীপ যখন ফুটবল নিয়ে মেতে উঠল, তখন দিলীপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনারই কারণ হয়েছিল। কিন্তু খেলাধুলোও যে অর্থকরী বিদ্যা এবং পুঁথিগত লেখাপড়ার চেয়ে সে-বিদ্যা কম নয়, সেটা পালিত-বাড়ির সবাই ভালভাবেই এখন বুঝতে পেরেছেন।

বাগুইআটির অ্যাকাডেমিক ব্লক 'এ'তে হঠাৎ একদিন দিলীপের নামে দুর্গাপুর থেকে চিঠি এল। চিঠির মর্ম : 'তুমি কী চাকরি করবে? যদি করতে চাও চলে এস।" ওই সূত্রে দিলীপ কিছুদিন অ্যালয় স্টিলে চাকরি করেছে। আবার দুর্গাপুরের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে খেলার জন্য চাকরি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ প্রকল্পে। সে চাকরি ছেড়ে এখন চাকরি করছে রেলে। খেলার দৌলতে হয়তো আরও সুযোগ জুটে যেতে পারে।

দিলীপের উদাহরণ দিয়ে আমি বলতে চাই না, ছাত্র-খেলোয়াড়রা পড়াশুনা ছেড়ে খেলার উপরই বেশী জোর দিক। ছাত্র-জীবনে লেখাপড়াই তপস্যা। তবে তার সঙ্গে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে খেলাধুলোর চর্চার বিশেষ প্রয়োজন। বেকার সমস্যার দিনে এর অন্য প্রয়োজনও অনস্বীকার্য।

মুকুল

হকি লীগে মোহন বাগানের রেকর্ড

মোহনবাগান ক্লাবের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সঙ্গে সঙ্গে এ বছরের হকি লীগের উপর যবনিকা পড়ল। এবার আরম্ভ হবে বেটন কাপের খেলা। তারপরই সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল কলকাতার ময়দানে জেঁকে বসবে।

মোহনবাগান এবার নিয়ে ১২ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। তার মধ্যে শেষ ৪ বার একটানা লীগ বিজয়ীর সম্মান। এটা অবশ্য মোহনবাগানের নতুন সম্মান নয়। এর আগেও মোহনবাগান উপর্যুপরি (১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত) ৪ বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং ১৯৬৯ সালে উনিশটি খেলাতেই বিজয়ী হয়ে একটিও গোল না খেয়ে হকি লীগে এক নিষ্কলঙ্ক রেকর্ড করে রেখেছে। লীগ টেবলের উপরে সেবার মোহনবাগানের অবস্থাটা ছিল দেখবার মত। ১৯টি খেলা, ১৯টি জয়, স্বপক্ষে ৪৪টি গোল, ৩৮ পয়েন্ট! ড্র, পরাজয় এবং বিপক্ষে গোলের ঘরে তিনটি শূন্য। এই রেকর্ডকে হকি লীগের সুপার-রেকর্ড বলা যেতে পারে। এ রেকর্ডও ভাঙতে পারে যদি কোন দল ওই নিষ্কলঙ্ক ফলাফলের সঙ্গে আরও বেশী গোল করতে পারে। কিন্তু ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত একটানা ৭ বছর হকি লীগে মোহনবাগানের অপরাজিত থাকার রেকর্ড কোনদিন ভাঙবে কি না কে জানে। তিন বছর অপরাজিত থেকে রানার্স-আপ-এর সম্মান, চার বছর অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ। এক অনন্য রেকর্ড।

কিসের জন্য খেলা?

কিন্তু কথা হচ্ছে কিসের জন্য খেলা। শুধু কি লীগ শীল্ড জয়ের জন্য? যাকে বলে পট হান্টিং তার জন্য? নাকি খেলার জন্যই খেলা? ক্লাব জীবন এবং খেলোয়াড় জীবনের আনন্দের জন্য খেলা। কলকাতার খেলাধুলোয় ক্লাবগুলির ভাবসাব দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। কি ফুটবল, কি হকি, কি অন্যান্য খেলাধুলো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় লীগ বা শীল্ড জয়ের সম্ভাবনা যখন হাত থেকে একটু দূরে সরে যায় তখনই ক্লাবগুলি নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে অসহযোগীতা করে খেলা থেকেও দূরে সরে থাকে। এ ব্যাপারে বড় বড় ক্লাবই পথ দেখায়। গত বছর ফুটবল মরসুমে লীগের শেষ মুখে এবং আই এফ এ শীল্ডে মোহনবাগানকে সরে থাকতে দেখেছি। এ বছর দেখলাম হকি লীগে মহমেডান স্পোর্টিং, বি এন আর এবং ইস্টবেঙ্গলকে সরে থাকতে। অথচ খেলার জন্যই ক্লাব। খেলার জন্য তাঁরা প্রচুর পয়সা খরচ করে, বাইরের খেলোয়াড় আমদানি করেন।

হকি লীগের ১৯টি দলের মধ্যে শক্তিশালী দল বলতে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল,

ইস্টার্ন রেল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন, মহমেডান স্পোর্টিং ও বি এন আর। কিন্তু কত বড় দুঃখের কথা, লীগে এদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেল না। সারা লীগে একটিও প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হল না। এটা কি খেলাধুলোর উন্নতির সহায়ক।

সেদিন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সংবর্ধনার উত্তরে ক্রীড়াবিদ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বলেছেন, জনগণ গোল ও সেঞ্চুরি দেখতে চায়। কিন্তু ক্লাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ খেলা থেকেই যদি দূরে সরে থাকে তবে জনগণ গোল এবং সেঞ্চুরি দেখবে কিভাবে? খেলাধুলোর উন্নতিই বা কিভাবে হবে?

ক্রীড়া প্রশাসন সম্পর্কে সাধারণ ক্রীড়ামোদির অনেক অভিযোগ আছে। স্বীকার করি সব কিছু হয়তো সুষ্ঠুভাবে করা হয় না। কিন্তু খেলার ক্লাব বিশেষ করে বড় বড় ক্লাব খেলা থেকে দূরে সরে থাকে কোন্ যুক্তিতে?

'উইসডেন'-এর অষ্টম ভারতীয়

মহীশূরের লেগ স্পিন বোলার ভগবৎ চন্দ্রশেখর বছরের পাঁচ জন খেলোয়াড়ের

ভগবৎ চন্দ্রশেখর

একজন হিসাবে ১৯৭২-এর উইসডেন স্বীকৃতি পেয়েছেন। আর যে চার জন এই সম্মান পেয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিন বোলার ল্যান্স গিবস, পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান জাহির আব্বাস, ইংলন্ডের এসেক্স কাউন্টির অধিনায়ক ব্রায়ান টেলর এবং সারে কাউন্টির ফাস্ট বোলার জিওফ আর্নল্ড।

যদিও ইংলন্ডের মাঠে খেলার গুণাগুণের নিরিখে উইসডেনের প্রতি বছরের সংস্করণে ক্রিকেটার পঞ্চক বাছাই করা হয় তবু উইসডেনের এই স্বীকৃতি বিশ্ব ক্রিকেটের বিশেষ সম্মান হিসাবে পরিগণিত।

ক্রিকেটের বিরাটকায় বর্ষপঞ্জী উইসডেনকে বলা হয় ক্রিকেট বাইবেল—এ বছর যার ১০৯তম সংস্করণ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। বেশী ভারতীয় খেলোয়াড়ের ভাগ্যে উইসডেনের 'ফাইভ ক্রিকেটার্স অফ দি ইয়ার' হবার সম্মান জোটেনি। ভগবৎ চন্দ্রশেখরকে নিয়ে ৮জন ভারতীয় এই সম্মান পেলেন। তবে নিছক ভারতের খেলোয়াড় হিসাবে পেলেন ৫জন। কেননা কে এস রণজিৎ সিংজী, তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিংজী এবং পাতাউদির নবাব ইসরার আলি খাঁ এই সম্মান পেয়েছেন ইংলন্ডের খেলোয়াড় হিসাবে। ১৯৪৬ সালে ইসরার আলি ভারতের অধিনায়ক হিসাবে ইংলন্ড সফর করার আগেই উইসডেনের বিশেষ সম্মান পেয়েছিলেন। সুতরাং ভগবৎ চন্দ্রশেখর হচ্ছেন ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে পঞ্চকের পঞ্চম।

চন্দ্রশেখরের সম্মান যোগ্যের যোগ্য স্বীকৃতি। প্রধানত চন্দ্রশেখরের বোলিং কৃতিত্বে ভারত ইংলন্ডের মাঠে সর্বপ্রথম টেস্ট জিতেছে, ক্রিকেটের স্রষ্টা ইংলন্ডকে টেস্ট-যুদ্ধে হারিয়ে রাবার নিয়ে এসেছে। গত মরসুমে স্মরণীয় ওভাল টেস্টে চন্দ্রশেখর প্রথম ইনিংসে ৭৬ রানে ২টি উইকেট পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন মাত্র ৩৮ রানে ৬টি উইকেট। চন্দ্রশেখরের বলের যাদুতেই মাত্র ১০১ রানে ইংলন্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভারত জিতেছিল ৪ উইকেটে। তিনটি টেস্টে চন্দ্রশেখর পেয়েছিলেন ১৩টি উইকেট। চন্দ্রশেখর এ পর্যন্ত ১৯টি টেস্ট খেলে ৭৫টি উইকেট পেয়েছেন। গড় ৩০·৯।

যে আটজন ভারতীয় উইসডেন-এ পাঁচ জনের একজন হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন বছর হিসাবে তাঁরা হচ্ছেন ১৮৯৭—কে এস রণজিৎ সিংজী, ১৯৩০—কে এস দলীপ সিংজী, ১৯৩২—পাতাউদির নবাব ইসরার আলী খাঁ, ১৯৩৩ সি কে নাইডু, ১৯৩৭ বিজয় মার্চেন্ট, ১৯৪৭ বিনু মানকড়, ১৯৬৮ পাতাউদির নবাব মনসুর আলী খাঁ এবং ১৯৭২ ভগবৎ চন্দ্রশেখর।

একলব্য

অরণ্যদেব লী ফক

পূর্বপুরুষদের লেখা ইতিহাসের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে ধাঁধার উত্তর পেয়ে গেলেন অরণ্যদেব —
শকুন্তলা-দুষ্মন্তের এই আসরের উত্তর! আশ্চর্য! এ যে বিশ্বাসই হতে চায় না!

অরণ্যে শেকস্‌পীয়র-উৎসব!
এবারে হবে রোমিও-জুলিয়েটের দৃশ্যাভিনয়
আমি জুলিয়েট হব না। ও হোক...
না না, তুমিই জুলিয়েট!

এই নাও, এই পরচুলাটা পরলেই তোমাকে অনেকটা মেয়েদের মতো দেখাবে।
ধ্যেৎ!
হি-হি... হো-হো...
হো-হো-

তুমি কি রোমিও নও কাপ্তেন মহাশয়?
সুন্দরী, তোমার তাতে আপত্তি থাকলে ...হো হো, রাজাকে আমি সুন্দরী বললুম... হো হো
উঃ!

দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি!
হি হি!
কী হচ্ছে ছেলেরা!
ব্যাপার কী?

ওরা রোমিও-জুলিয়েটের একটা দৃশ্য অভিনয় করছিল.....
আমি জুলিয়েট হব না, কিছুতেই না!
আশ্চর্য! সত্যিই এ এক আশ্চর্য ব্যাপার!
?

কী বলছ তুমি?
আয়, তোদের একটা জিনিস দেখাই। চার শো বছর আগে ঠিক এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল!
?
?
8/22

ওই দ্যাখ!
কী ওটা
একটা পরচুলা।
তাতে অবাক হবার কী আছে?

"দাস্তান" ছবিতে শর্মিলা ও দিলীপকুমার

দাস্তান

(বি আর ফিল্মস)

সম্ভবত এমন একটি দাস্তান যা কাহিনীর প্রয়োজন হয়েছিল যাতে দিলীপকুমারের স্টার ইমেজ বা অভিনয়-দক্ষতার পুরোপুরির সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। "দাস্তান" দেখে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এতে দিলীপকুমারের দ্বৈত-ভূমিকা। সারা ছবি জুড়েই তিনি রয়েছেন—কখনো সুনীল তথা জজ সাহেব বিক্রম রূপে, কখনও বা থিয়েটারের মালিক অনিল রূপে। সুনীল যে বিক্রম হয়েছে সেখানেও আর এক দাস্তান। ছোটবেলায় সুনীল ও মীনা (ওদের মধ্যে বাল্যপ্রেম) মেলা দেখতে গিয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড় ওঠার পর সুনীল নিরুদ্দেশ। সেই থেকে মীনা সুনীলের পথ চেয়ে আছে—যুবতী হওয়া পর্যন্ত। আর কোন পুরুষকেই মীনা (শর্মিলা ঠাকুর) জীবনসঙ্গী রূপে ভাবতে পারেনি। সুনীলের যমজ ভাই অনিলকেও না। বাল্য প্রেমের অভিশাপ প্রযোজক-পরিচালক বি আর চোপড়া শেষ অবধিই দেখিয়েছেন। মীনার শাপমুক্তি ঘটেছে সুনীল তার কাছে ফিরে আসার পর।

মেলায় ঝড়ে মস্তিষ্কে আঘাত পাবার পর সুনীলের স্মৃতিভ্রংশ ও বিক্রম নামে বড় হয়ে জজ হওয়ার ঘটনাগুলি দেখানো নেই। তারপরেই দেখানো হয়েছে বিক্রম জজ সাহেব রূপে প্রতিষ্ঠিত ও বিবাহিত। গজাননের স্ত্রী বিচারিণী। স্বামীর বন্ধুর সংগে তার গোপন প্রণয় ছবির আর এক উপাখ্যান।

চিত্রনাট্যে উপাখ্যানের অন্ত নেই। শেষ পর্যন্ত দ্বৈত ভূমিকা অটুট রাখা মুশকিল বলেই পরিচালক মধ্যান্তরের আগেই দিলীপকুমারের একটি ভূমিকা ছাঁটাই করে দিয়েছেন। থিয়েটারের মালিক অনিল নিজেকে খুনী ভেবে পলাতক। পলাতক অবস্থায় অনিল এক হোটেলে ছদ্মবেশধারী গজাননের সাক্ষাত পেয়ে বাঁচবার পথ খুঁজে পেল। বিক্রম ঘুমের ওষুধ খাইয়ে তার দাড়ি কেটে দিয়ে নিজের গালে লাগিয়ে অনিল বিক্রম সেজে পালায়। পথে মোটর দুর্ঘটনায় অনিল নিহত। এদিকে গজাননকেই সকলে অনিল বলে ধরে নেয়।

দিলীপকুমারের দ্বৈত ভূমিকার একটি চলে গেলেও যে খুব একটা সুরাহা হয়েছে তা নয়। অনিলরূপী বিক্রমের সমস্যা তো রয়েই গেছে। অনিল পরিচয়ে বেঁচে থাকাকালীন স্ত্রীর কাছে যাওয়ার পথও তার নেই। অবশ্য বিশ্বাসঘাতিনীকে আবার গ্রহণ করার প্রবৃত্তিই কি বিক্রমের আছে? তবে ন্যায়-নীতিতে বিশ্বাসী বিক্রম বুঝি বিপথগামিনী স্ত্রী ও বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে শাস্তি না দিয়ে শান্তি পাচ্ছিল না। অন্যদিকে বিক্রম তো আসলে স্মৃতিভ্রষ্ট সুনীল। তার জন্য মীনা অপেক্ষা করে আছে। সুতরাং অনিলরূপী বিক্রমের মধ্যে মোট তিনটি সত্তা—অনিল, বিক্রম, সুনীল। আসল সত্তায় ফিরে যাওয়ার জন্য সুনীলের পূর্বস্মৃতি ফিরে পাওয়া প্রয়োজন। তাও পরিচালক তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুনীলের সব কথাই মনে পড়েছে, মীনার আত্মত্যাগ দেখে মুগ্ধও হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে যে ন্যায়নিষ্ঠ জজ সাহেব রয়েছে সে কি স্ত্রী বর্তমান থাকতে মীনাকে গ্রহণ করতে পারে? বিচারক যে তার নিজেরও শাস্তি চান। যাই হোক, কাহিনীতে সব সমস্যারই নিষ্পত্তি হয়েছে। দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী সুনীল-মীনা পরিশেষে মিলিত। তার আগে কাহিনীতে টানাবাহনা, সুনীলের মনে অনেক দ্বন্দ্ব ও বিচার। এর কোনটাই অবশ্য বাস্তবের সংগে সঙ্গতি রেখে গড়ে তোলা হয়নি। পুরো কাহিনীই একটা মনগড়া দাস্তান, ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগে তৈরি। এই দাস্তান গুটিয়ে আনার জন্য একজনের (সুনীল) দীর্ঘকালের অ্যামনেশিয়া, দুই জনের (অনিল ও বিক্রমের প্রবঞ্চক বন্ধু) দুর্ঘটনায় মৃত্যু, একজনের হার্ট ফেলে মৃত্যু (যে-কারণে অনিল খুনের দায় থেকে রেহাই পায় এবং বিক্রম অনিল হয়ে থিয়েটারে ফিরে আসতে পারে) এবং একজনের (গজাননের স্ত্রী) আত্মহত্যার প্রয়োজন হয়েছে। এই বানানো দাস্তানে দেখবার মত হল দিলীপকুমার ও শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয়, বিশেষ করে দিলীপকুমারের দারুণ অভিনয় ক্ষমতা, জমকালো সেট থিয়েটারের শো এবং শোনবার মত হল লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুর দেওয়া গান।

প্যাটন

শোম্যান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে এ পর্যন্ত যত ফিল্ম তোলা হয়েছে—যার সংখ্যা নিশ্চয়ই কয়েকশত হবে—টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের "প্যাটন" সেই পর্যায়ের ছবি হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে সমুজ্জ্বল।

জেনারেল প্যাটন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। তার রণদক্ষতা একদিকে যেমন যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল, অন্যদিকে

"প্যাটন" চিত্রের নামভূমিকায় জর্জ সি স্কট

তাঁর অপরিণামদর্শী আচরণ ও প্রগল্‌ভতা নানা সমস্যা সৃষ্টি করে মিত্রবাহিনীর—বিশেষ করে আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। তাই বিবিধ সামরিক সম্মানে ভূষিত হয়েও প্যাটনকে বারে বারে উপরওয়ালার তিরস্কার ও অপমান হজম করতে হয়েছে। একাধারে প্রশংসিত ও নিন্দিত এই বহু-বিতর্কিত রণনায়কের একটি বিশ্বস্ত জীবনালেখ্য ছবিটির মধ্যে পাওয়া যায়। নাম-ভূমিকায় জরজ সি স্কটের অপূর্ব অভিনয় তাতে একটি অতিরিক্ত মাত্রা সংযোজন করেছে। বস্তুত প্রায় তিন ঘণ্টার এই ছবিটি দেখতে ক্লান্তি আসে না তাঁরই অভিনয়ের গুণে।

ছবিটি তুলতে যে প্রচুর আয়োজন করা হয়েছিল তার ছাপ এর সর্বাঙ্গে। আমেরিকান পদাতিক বাহিনীর প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক ওমার এন ব্র্যাডলি, যিনি জেনারেল প্যাটনের অধীনে ও পরে তাঁর উপরওয়ালা হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এই ছবির প্রধান উপদেষ্টা। এর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে ব্র্যাডলির যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা-সম্বলিত "এ সোলজার্স স্টোরি" ও প্যাটনের জীবন-কাহিনী "প্যাটন—অরডিয়াল অ্যান্ড ট্রায়াম্ফ" এই দুটি বই থেকে। স্পেন, মরক্কো, ক্রিট, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এর অধিকাংশ বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

ফ্রাঙ্কলিন জে স্যাফনার ছবিটির পরিচালনায় উপযুক্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

নববর্ষে চিত্রমুক্তি

বাংলা নববর্ষে দুটি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে। একটি **অপর্ণা** (সরকার প্রোডাকশনস), অপরটি **অনিন্দিতা** (গীতাঞ্জলি পিকচার্স)।

সলিল সেন পরিচালিত "অপর্ণা" (কাহিনী : জরাসন্ধ) ছবির তিনটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তনুজা এবং শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় রয়েছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, তরুণকুমার প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চিত্রপরিচালক হিসাবে প্রথম এলেন "অনিন্দিতা" ছবিতে। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে তৈরি এ ছবির দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তা-ছাড়া মৃণাল মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, অনুভা ঘোষ ও দীপিত রায়কে কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে। সংগীতপরিচালনা করেছেন প্রযোজক-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

হিন্দী ছবি **'আপনা দেশ'** এই সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জাম্বু। সংগীত পরিচালক রাহুলদেব বর্মণ। ছবির বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী : রাজেশ খান্না, মমতাজ, জগদীপ ও ওমপ্রকাশ।

"অনিন্দিতা" (পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) ছবিতে মৌসুমী মুখোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

নাট্য-সমালোচনা

অপার্থিব

গান্ধার

অপার্থিব'-র অরুণ নাটকে ও মঞ্চে এসেছে যথাসময়ে। আরও কিছুকাল আগে কিংবা পরে এলে হয়ত তাকে আমরা চিনতে পারতাম না। অরুণকে এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি, নিঃসংকোচে নিজের দিকে তাকিয়ে। অরুণ ভয়ার্ত ও বিবেকসম্পন্ন নাগরিকদেরই একজন। ভয় ও বিবেক একত্রে থেকে কি কখনও ঠোকাঠুকি করে? যে নপুংসক ধুর্মের পাশে চেয়ে অন্যায়ের অন্যায় বলতে পারল না অক্ষমতার গ্লানিতে সেও কি প্রতিনিয়ত দগ্ধ? সন্তোষকুমার ঘোষের "অপার্থিব"-র নায়ক এই আত্মিক সংকটের প্রতিমূর্তি। আমরা প্রায় সকলেই হয়ত তাই ছিলাম কিছুদিন আগে পর্যন্ত। বেঁচে মরে থাকার ক্লীবত্বটা মাটির নীচে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। প্রেতাত্মার মত বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছি। সন্তোষকুমার ঘোষের নাটকের পটস্থল তাই গোরস্থান।

নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে আমরা নীরব থাকি, অরুণ কথা বলেছে। নিজের প্রেমিকাকে সে রক্ষা করতে পারেনি। সভ্যজগতের রাজপথে শয়তানরা অরুণের কাছ থেকেই তার প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বাধা দেবার সাহস অরুণের ছিল না। নিষ্ঠুর এক মারণযজ্ঞের সাক্ষী অরুণ। হত্যা দেখেছে চোখের সামনে, কৃতান্তের মত হত্যাকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি। ক্লীবের মত সরে গেছে। অরুণের একটাই দেহ, সেটাকে সে হারাতে চায়নি।

সমসাময়িক জীবনে ভয়ের যে বৃংস্পন্দন চলছিল কিছুদিন আগেও তারই পটভূমিতে "অপার্থিব" নাটক—এক ভীত, বিবেকবোধসম্পন্ন নাগরিকের সরল ও জটিল স্বীকারোক্তি। সম্ভবত কারণেই এই নাটকের ঘটনার চেয়ে কথা বেশি, নাটকীয় পরিস্থিতির চেয়ে বেশি রয়েছে আত্মপ্রতারক, শিক্ষিত, ভীত-সন্ত্রস্ত এক নাগরিক-গোষ্ঠীর মানসিক বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ নির্মমতা আছে অবশ্যই, সেই সঙ্গে মমতাও আছে। অরুণ তার অক্ষমতা ও অপরাধের কথা ব্যক্ত করেছে ঈশ্বরের কাছে কনফেশন এর মতো, সেই সঙ্গে কিছু দার্শনিক সত্যকে জানবার চেষ্টাও করেছে। দেহ চলে গেলেও একটা কিছু থাকে, এই সত্যের ইঙ্গিত অরুণ পায়নি বলেই হয়ত ভয় হতে অভয় মাঝে নতুন জন্ম তার হয়নি। তবু এই নবজন্মের গর্ভযাতনা অরুণের সত্তায় দেখা গেছে। মৃত্যুই জীবনের শেষ ব্যাখ্যা—এই কথা নিশ্চিত জেনেও অরুণ আগে বহু আর বলে ফেলেছে। মেলেনি উত্তর। তবু একটা বড় প্রশ্ন ও তার উত্তরের অপেক্ষা রয়ে গেছে ওই গোরস্থানে, "অপার্থিব" নাটকের পটস্থলে। এইখানেই নাটকের "অপার্থিব" নামের সার্থকতা।

অপার্থিব-তে অনুভূতির বস্তু বেশি, উপভোগের বস্তু কম—এই অভিযোগ উঠতে পারে। অভিযোগকারীরা নিশ্চয়ই তথাকথিত নাট্যামোদী। কিন্তু আজকের অপেশাদারী নাটকের বোহেসেবী দর্শকের কাছে যদি কোন সৎ নাট্যকারের আশা একটু বেশিই থাকে তাব সেটা দোষের নয়। আজকাল ভাল নাটক লেখা হয় না বলে বিলাপ শুনতে পাই। সাহিত্যিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ছাড়া একমাত্র সন্তোষকুমার ঘোষই বোধহয় প্রযোজনার বা মঞ্চ-প্রয়োগের সুবিধার দিক না ভেবে কিংবা টিকিট ঘরের আনুকূল্যের শর্তের দিকে না তাকিয়ে নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন। এ'দের নাটকে উপভোগের সস্তা উপকরণ অথবা বাজারসই শ্লোগান আশা করা অন্যায়। নাটকের আঙ্গিকে এক্সপেরিমেন্টও তাঁরা অবশ্যই করেছেন। 'অপার্থিব'-র এক্সপেরিমেন্ট বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায়। নাটকের নায়িকা শিপ্রা পরলোক থেকে নেমে এসে কথা বলেছে বলেই তার প্রতিটি বাক্য তীরের মত এসে বিদ্ধ করেছে নায়ককে। শিপ্রার ভূমিকা এখানে যেন ত্রিকালজ্ঞেরই মতো। শিপ্রা কি অরুণেরই এতদিনকার পাথরচাপা বিবেক? গোরস্থানে কফিন থেকে উঠে এসেছেন বুদ্ধ-বৃদ্ধা। তাদের ছিল অবৈধ সম্পর্ক। এই দুই চরিত্রের অতীতচারণের মধ্যে নর-নারীর সম্বন্ধ এবং মানুষের জীবনে প্রবৃত্তি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের অবতারণা

আছে। ওই পার্শ্ব-উপাখ্যান হয়ত আপাতদৃষ্টিতে নাটকে প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে। কিন্তু মানবের জীবনে প্রেম-ভালবাসা নিয়ে যে গভীরতর প্রশ্নগুলি নাটকে উচ্চারিত তার সঙ্গে এই উপাখ্যানের যোগ আছে। তবে এই গল্পাংশে দর্শক যে অনেকটা ক্লান্তি বোধ করেন তার কারণ হয়ত অতীত ঘটনাগুলি শুধুই সংলাপে বিবৃত, ঘটনাবিন্যাসে নয়। তার চেয়ে অরুণ ও তার পাতানো-প্রেমিকা শিপ্রার ঘটনার প্রতি দর্শকের উৎসাহ বেশি। কিন্তু এই যে কফিন থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধা উঠে এসে আত্মসমীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন এতে নাট্যরচনার আঙ্গিকগত চাতুর্য অবশ্যই আছে। তবে এখানে অভিনয় আরও জোরদার হতে পারত।

"অপার্থিব" অভিনয়ে আরও জ্বলন্ত হল না বলে দর্শকের অভিযোগ থাকতে পারে। গান্ধারের শিল্পীদের আন্তরিকতার অভাব নিশ্চয়ই ছিল না। কিন্তু অরুণকে আমরা নাট্যকারের সংলাপের মধ্য দিয়ে যতটুকু চিনেছি অভিনয়ে তার পরিচয় ততটা উজ্জ্বল হল না। শিল্পী অসিত মুখোপাধ্যায় যেভাবে দ্রুতলয়ে অরুণের কথাগুলি বলে গেছেন তাতে চরিত্রের অন্তর অনুভূতির লক্ষণ ছিল না। হয়ত সংলাপপ্রধান নাটকের গতিবেগ তিনি বাড়াতে চেয়েছিলেন। মননধর্মী নাটক গতিসম্পন্ন হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। অন্তর্মুখী নাটকের অভিনয়ে গতি বাদ সাধে। চিন্তা-ভাবনাগুলি মনে গেঁথে যাবার আগেই গতি এসে সেগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। পরিচালক অসিত মুখোপাধ্যায় হয়ত অরুণকে শুধুই একটি ফ্রাস্ট্রেটেড চরিত্র ভেবে নিয়েছেন। অভিনয়ে অরুণের আত্মিক সংশয়ের দিকটাও তিনি ফটিয়ে তুলতে পারতেন। সেদিক থেকে গীতা চক্রবর্তীকে বরং অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অনেক বেশি একাত্ম মনে হয়। শিপ্রার ভূমিকা শ্রীমতী চক্রবর্তী অনুভব করতে পেরেছেন বোঝা গেল। স্থবিরের চরিত্রে প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীকেও এই একই কারণে প্রশংসা করতে হয়।

"অপার্থিব" দেখার পর দর্শকের মনে যদি কোন অভাববোধ থেকে যায় তার কারণ খুঁজতে হবে প্রযোজনায়, পরিকল্পনায় এবং নাটক-নির্দেশনায় (অসিত মুখোপাধ্যায়-কৃত)। নাটকের যা আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য মঞ্চেও তা অনেকাংশে প্রতিফলিত। সেক্ষেত্রে নায়কের অতীত অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে মঞ্চ জোনাল লাইট ফেলে বিভিন্ন চরিত্রকে মঞ্চে উপস্থিত করানোর পরিকল্পনা পরিচালক অবশ্যই

সুন্দর দেখিয়েছেন। তাপস সেনের জ্যামিতিক আলোকপাত এক্ষেত্রে পরিচালককে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সুরেশ দত্তর মঞ্চ-সজ্জাও নাট্যপ্রযোজনাকে বহুলাংশে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ভাস্কর মিত্রও নাটকের জন্য যথাযথ সুররচনা করেছেন। কিন্তু নাটকটি কেবলই ধ্বনিসংযোজনা বা ভিস্যুয়াল চমকের জন্য নয়। অশান্ত যুগের পটভূমিতে অশান্ততর একটি মানুষের আত্মবিচার ও আত্মোপলব্ধির পর্বগুলি কি আরও সপ্রাণ হতে পারত না? সংলাপপ্রধান মননশীল নাটকের কথাগুলির অনুভূতিদীপ্ত স্পষ্ট উচ্চারণই নাটকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এই নাটকে প্রথম দিকে নায়িকা যখন নেপথ্যে তখন অনেক কথাই শোনা যায়নি। মাইকের সাহায্য নিলে ক্ষতি কি ছিল? যে-নাটকে জোনাল লাইটের এত সুচারু ব্যবহার সেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অতীত ঘটনা শুধুই মুখের বিবৃতির মারফৎ না জানিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে সরাসরি ঘটনা-বিন্যাসেরও আশ্রয় নেওয়া যেত। তাতে মেক-আপ পালটাবারও প্রয়োজন হত না. শুধু অভিনয়ের রূপান্তর হলেই চলত। ঘটনার চমক এই নাটকে নেই বললেই চলে কিন্তু কথা ও ভাবনার তপ্ত বিকিরণই বা ঘটল কোথায়। নাটকের শেষে নাট্যপ্রযোজিকা মঞ্চে এসে জানালেন, অন্ধকারে নায়ক আত্মঘাতী হয়েছে। বার বার তাঁরা আত্মঘাতী নায়ক পাবেন কোথায়। যদি পূর্ণালোকিত মঞ্চে এই নাটক অভিনয়ের সুযোগ ঘটে তবে আবার তাঁরা নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। তাঁর এই কথাগুলিও আমাদের মনে আত্ম-সমালোচনার আগুন কিংবা পরাভবের লজ্জা ছড়িয়ে দিল না। বিস্মিতও নয়। "অপার্থিব"-র কথার মধ্যে দিয়েই নাটকে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কৌশলটি গান্ধারকে আয়ত্ত করে নিতে হবে। এইখানেই "অপার্থিব" অভিনয়ের চরম পরীক্ষা।

চিৎপুর-চিত্র

যদি বলি চিৎপুরী ভাঙাগড়ার প্রথম পর্যায় এখানেই সমাপ্ত তবে কি সঠিক সত্য বলা হবে? না, আসলে এ এলাকায় ঘর বদলের রেওয়াজ সর্বসময়েই আইন মাফিক চলে এ-রকম বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। শিল্পীদের বেশির ভাগই দলের তুলনায় নিজের স্বার্থ বেশি করে দেখার ফলেই এ অবস্থার সৃষ্টি। ধরা যাক ক খ এবং গ দলের মধ্যে গ অতি আশায় আসামের বাজারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পৌঁছবার দিন কয়েকের মধ্যে দেখা গেল, চাহিদা আছে তো খরচা পোষাবার মতন বায়না নেই। আর বায়না আছে তো আদায় নেই। তার ওপর আসাম পরিচালক মশাই যদি হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে থাকেন তো কথাই নেই। ধরা যাক গ দলের অবস্থা প্রায় সে-রকম। সুতরাং দলের টপস্টার বিনা নোটিশে হঠাৎ দলছুট হবেন। এবং একদিন ঠিক এই কারণেই নায়ক-নায়িকা টিকিট কেটে রওনা হবেন কলকাতার দিকে। এর ফলে দল এবং বাদবাকি শিল্পীরা যে পথে এসে দাঁড়ালেন সে কথা ও'রা ভাববেন না। এবং এক সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা যাবে দলছুট তিন শিল্পী ক আর খ দলে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে গেছেন।

ধরা যাক এ-সবই হল গিয়ে বিশেষ অবস্থার ফল। এখনকার যে ঘর বদল আসলে সেটাই বিশেষ গুরুত্বের। তা হলে বলতে হয়, ভাঙাগড়ার শেষ পর্যায়ের খবর এরকম : ভোলা পাল মশাই নাকি শেষ পর্যন্ত জয়েন করে বসে আছেন নিউ গণেশ অপেরায়। কেউ কেউ রটিয়েছেন শ্রীপাল একা নন, মোহিত বিশ্বাসও নাকি একই দলের শিল্পী তালিকায় যুক্ত হয়েছেন। যদি হয়েই থাকে তা হলে নিউ গণেশের অতি প্রিয় শিল্পী গোপাল চাটুজ্জে কোথায় যাচ্ছেন। একজন ঝানু পরিচালককে জিজ্ঞেস করতে তিনি চিৎপুরী কায়দায় মুচকি হাসলেন। বললেন, অসম্ভব ভাববেন না। চিৎপুরে এখন অনেক অসম্ভবই সম্ভব হচ্ছে।

বললাম, কী রকম!

ভদ্রলোক জানালেন, নিউ গণেশে পরিচালক হিসাবে জয়েন করেছেন মধু বড়াল। হাঁ, গত বছর পর্যন্ত যিনি সত্যম্বরের গণনাকে সবসেরা বলে ঘোষণা করেছেন নায়কদের কাছে, সেই বড়াল মশাই সত্যম্বরে আর নেই। কথাটা কি বিশ্বাস যোগ্য? কিন্তু এ ঘটনা সত্যি ঘটেছে। মধুকে টেলিফোন করতে সে জানিয়েছে, খবর সত্য।

এ যদি সম্ভব হয় তবে আরও যে-সব আজগুবি রটনা রটছে তাও কি বিশ্বাস করে নিতে হবে? শোনা যাচ্ছে স্বপনকুমার নাকি স্বতন্ত্র যাত্রাদল খুলছেন। ভোলা পাল এবং দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ও নাকি একত্রে একটি নতুন দলের পত্তন করতে চলেছেন। এবং বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে সুজিত পাঠকের চিন্তাও নাকি এদিকেই। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে চিৎপুরে সত্যি এক বিরাট ভাঙাগড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই কি সব?

—সূত্রধার

প্রতিভা ক্রিয়েশান্স-এর 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন" ছবির মহরত ১লা বৈশাখ হচ্ছে। কাহিনী বিমল মিত্রের। পরিচালক সলিল দত্ত। নায়ক-নায়িকা সৌমিত্র ও অপর্ণা। সংগীত পরিচালক মান্না দে।

রবীন্দ্র মেলার উৎসব

রবীন্দ্র কাননে ২৫শে বৈশাখ থেকে পক্ষকালব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজন করেছেন রবীন্দ্রমেলা। এপার এবং ওপার বাংলার শিল্পীদের উপস্থিতিতে এবারকার উৎসব আরও চিত্তাকর্ষক হবে। মেলার প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই বাংলার লোক সংস্কৃতির নানা নিদর্শন অনুষ্ঠান থাকবে। কবিগান, তরজা, কবি লড়াই, পুতুল নাচ এবং যাত্রাগানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য রবীন্দ্র মেলার কার্যালয় ৯/৪, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা-৩ (ফোন ৫৫-৭৮০২) ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিক

সানি পার্কে ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিকের নবনির্মিত ভবনটির উদ্বোধন হল সম্প্রতি। উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস। প্রায় দু' লক্ষ টাকায় নির্মিত এই ভবনটির উদ্বোধন উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ডাঃ আনটিয়া সাংবাদিকদের জানান যে, অর্থাভাবে ভবনের তৃতীয় তলার কাজ স্থগিত আছে। কর্তৃপক্ষ ঠিক করে রেখেছেন পাশ্চাত্য সংগীতের ছাত্র-ছাত্রী ও বিদেশীদের জন্য ভারতীয় সংগীতের ক্লাস নেওয়া হবে এই তিন তলায়। এই ভবন নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে পাওয়া ৭৫০০০ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে জমিটি ইজারা নেওয়া হয়। সংগীত নাটক আকাদেমীও এই বাবদে কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছেন। ১৯৩৭ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী প্রায় দেড়শ, শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বারোজন। সাংবাদিকদের কাছে ডাঃ আনটিয়া আরো জানান যে, অর্থাভাবে ক্যালকাটা সিম্ফনী অর্কেস্ট্রার পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটছে, আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই স্কুলের দ্বারাই সিম্ফনী-অর্কেস্ট্রার প্রয়োজনা হতে পারবে। ভবিষ্যতে একটি সংগীত লাইব্রেরী গড়ে তোলার পরিকল্পনাও এ'দের আছে।

অসাধু মালিকদের নিরাপত্তা আইনে আটকের বিল পেশ বর্তমান সপ্তাহের মুখ্য উল্লেখযোগ্য বিষয়। ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা বিল উত্থাপন করে বেনামিতে যাঁরা জমি রেখেছেন এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে যাঁরা বঞ্চিত করছেন সেসব জোতদার ও শিল্প মালিকদের ওয়াগন ভঙ্গকারী, গুণ্ডা ও চোর-জোচ্চোরদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে ঘোষণা করলে সভাকক্ষ জুড়ে সকল সদস্য তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে টেবিল চাপড়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। সদস্যগণ একে-একটি 'ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক' বিল বলে অভিহিত করেন। সমাজতন্ত্রের পথে এ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলেও তাঁরা মন্তব্য করেন। সদস্যগণের হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীরায় বলেন, ভূমিহীন চাষীদের বঞ্চিত করে যেসব জোতদার জমি লুকিয়ে রেখেছেন, প্রভিডেনট ফানড, ই এস আই প্রভৃতি সংক্রান্ত ন্যায্য পাওনা থেকে যেসব শিল্প-মালিক শ্রমিকদের বঞ্চিত করছেন আমি মনে করি তাঁরাও গুণ্ডা। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রেও 'মিসা' প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে। সি পি আই সদস্য শ্রীবিশ্বনাথ মুখারজি 'মিসা' প্রয়োগ সম্পর্কে পুলিসের দুর্নীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

দেশী সংবাদ

৩ এপ্রিল—মে মাসের মধ্যে বাড়তি জমির খবর সরকারকে না জানালে সেই জমির মালিকের বিরুদ্ধে 'মিসা' প্রয়োগ হবে। বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনেই এই বিল আসছে। ওই বিলে কর্মচারী রাজ্যবীমা এবং কর্মচারী প্রভিডেনট ফানডের টাকা জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট মালিকের বিরুদ্ধেও 'মিসা' প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকবে।

গতকাল গুরুদাসপুর জেলার দিনানগরে সাড়ে তিন বছরের একটি শিশুকে বলি দেওয়া হয় বলে সরকারী সূত্রে জানা যায়। ধর্মের নামে এই নরবলি হয় এবং তা দেখার জন্য সেখানে বহুলোক ভিড় করে। পুলিস আসতে দেখে তারা পালায়। শিশুটির পিতা, ভাই, দুই বোনকে পুলিস হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে।

৪ এপ্রিল—গত ২৮ মারচ কলকাতা শহীদ মিনারে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে জুয়াচোর ও জালিয়াতদের অ্যাসেমবলি আখ্যা দেওয়ায় বিধানসভা, বিধানসভার সব সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নাগরিকের মর্যাদা হানি করা হয়েছে—এই অভিযোগ তুলে শ্রীবসুর বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানী মামলা আনা হয়েছে।

আজ কলকাতা পৌরভবনে পৌর বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী, পৌর প্রশাসক ও কমিশনারকে নিয়ে এক বৈঠকে শহরের শ্রীবৃদ্ধি, মশা মারা, বাস-বিরতির জন্য ছাউনি তৈরি প্রভৃতি নিয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এঁরা তিনজন আজই উত্তর দিকের সব পারক ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়েন।

৫ এপ্রিল—আজ লোকসভায় যোজনামন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম স্বীকার করেন, চতুর্থ যোজনার প্রথম তিনটি বছরে সমাজকল্যাণ খাতে যথোপযুক্ত সম্পদ বিনিয়োগ করা হয়নি। চতুর্থ যোজনার মধ্যবর্তী হিসাবনিকাশ করতে বসে লোকসভায় বিরোধী সদস্যরা এবং কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য যোজনার ত্রুটি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলে যোজনা মন্ত্রী তা স্বীকার করেছেন।

এখন থেকে সরকার দখল করা জমির জন্য মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যিক নয়। সরকারের সামর্থ্য অনুযায়ী একটা পরিমাণ টাকা ধরে দিলেই চলবে। এই হল ১৯৭১ সালের সংবিধান (পঞ্চবিংশতিতম সংশোধন) বিলের মর্মার্থ। আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এই বিল অনুমোদন প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

৬ এপ্রিল—দীর্ঘ দিন পরে কলকাতা পৌরসভা শহরের রাস্তা সকাল বিকাল দু'

বেলা জল দিয়ে ধোয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশ্য যেসব অঞ্চলে হাইড্রেনট-এ জলের যথেষ্ট চাপ আছে, আপাতত শুধু সেই সব এলাকাই এভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হবে বলে পৌর কমিশনার জানান।

৭ এপ্রিল—আজ নয়াদিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম এবং তার অনুগামী দলগুলির নেতারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, এই রাজ্যে এখন তাঁদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখাই প্রধান সমস্যা। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী জ্যোতি বসু (সি পি এম), জ্যোতি ভট্টাচার্য (ওয়ারকারস পারটি), ত্রিদিব চৌধুরী, মাখন পাল (আর এস পি), সুবোধ ব্যানারজি (এস ইউ সি) ও আরও কয়েকজন।

৮ এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা এখন থেকে নিজেরাই সব উন্নয়ন কাজের অগ্রগতির খোঁজখবর নেবেন। তদারক করবেন। আমলাদের ওপর অতি নির্ভরশীলতা ছাড়বেন তাঁরা। উল্লেখ্য, চলতি বছরে বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে ১১০ কোটি টাকার প্রায় ৪০০টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। ওই প্রকল্পগুলির কাজ যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়, সেজন্যই এই সজাগ ব্যবস্থা।

কোন দফতরে সরকারী ফাইল সাত দিনের বেশি আটকে রাখা হলে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে হবে। রাজ্য সরকার কয়েক দিনের মধ্যে এই মর্মে একটি আদেশ জারি করছেন। রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র জানান: সচিব থেকে সাধারণ করনিক পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই এই আদেশ কার্যকর হবে।

৯ এপ্রিল—বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের আড়াই লক্ষ চটকল মজদুরকে আগামী ৮ মে থেকে লাগাতার ধর্মঘট করার ডাক দেওয়া হয়েছে। **ওই ধর্মঘটের আবাহক : ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জুট ওয়ারকারস, ফেডারেশন অব চটকল ইউনিয়ন এবং জুট ওয়ারকারস ফেডারেশন।**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত জেলায় আর টি এ বা আঞ্চলিক পরিবহণ সংস্থাকে ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রচলিত আইন সংশোধন করে জেলাগুলিতে নতুন করে আর টি এ গড়ে তোলার তোড়জোড় চলছে। রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র এ কথা জানান।

বিদেশী সংবাদ

৩ এপ্রিল—আজ মারকিন রাষ্ট্র দফতর সৈন্যমুক্ত এলাকা পেরিয়ে উত্তর ভিয়েতনামের সামরিক তৎপরতাকে আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছে। দফতরের মুখপাত্র রবারট ম্যাকক্লসকি বলেছেন, ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি এবং আমেরিকা ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে ১৯৬৮ সালের বোঝাপড়াকে স্পষ্টতই লঙ্ঘন করা হয়েছে।

৪ **এপ্রিল**—মারকিন পররাষ্ট্র সচিব রজারস আজ বাংলাদেশকে আমেরিকার স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করে বলেন, এই নতুন দেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে আমেরিকা সাহায্য করবে। এই দেশের সঙ্গে আমরা সুসম্পর্ক চাই। আমেরিকাবাসীর তরফে বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

৫ এপ্রিল—চুয়ান্ন হাজার কম্যুনিসট সৈন্য চাইছে একেবারে উত্তরদিকের কোয়াং ত্রি ও থুয়া থিয়েন প্রদেশ দুটি দখল করে নিতে। সেখানে স্থাপিত হবে জাতীয় মুক্তিফ্রনটের রাজধানী। তাই এই যুদ্ধ দক্ষিণ ভিয়েতনামের মরা বাঁচার প্রশ্নের উত্তর দেবে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেনট জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে এ কথা কবুল করেছেন।

৬ এপ্রিল—অবিভক্ত বাংলার প্রখ্যাত পারলামেনটারিয়ান ও প্রাক্তন স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলি আজ ঢাকার ইনসটিটিউট অব পোসট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিনে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা বর্তমান। শ্রী আলি একজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানকে তিনি কখনও মেনে নেননি। দেশ বিভাগের পর তিনি ভারতে থাকেন এবং সংসদের সদস্য হন।

৭ এপ্রিল—ভারতে আটক পশ্চিম পাকিস্তানীদের যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বাংলাদেশে বিচারের উদ্যোগ রহিত করার উদ্দেশ্যে ভারতের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাকিস্তান আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে আবেদন জানিয়েছে।

৮ এপ্রিল—বাংলাদেশ ও আমেরিকা রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে লেখা চিঠিতে প্রেসিডেনট নিকসন রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। এ-ব্যাপারে ঢাকার মনোভাব জানতে চাওয়া হলে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আমরাও তাই করবো।

৯ এপ্রিল—ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করেছিলেন, প্রেসিডেনট জুলফিকার আলি ভুট্টো তাতে সম্মত হয়েছেন। দুই দেশের মধ্যে এই প্রাথমিক আলোচনা এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হতে পারে এবং দুই প্রধানের মধ্যে শীর্ষ বৈঠকটি আগামী মাসের গোড়ায় হবার সম্ভাবনা।

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

THIS WAY
110 ML
HEWLETT'S MIXTURE
WITHOUT OPIUM

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীঅলোক ধর

সন্তোষকুমার ঘোষের

হত্যা আর আতঙ্কের কালিমায় লিপ্ত সময়ের পটভূমিতে
আত্মজিজ্ঞাসার উপন্যাস

সময়, আমার সময়

দাম ৪·০০

সময় ঃ ১৯৭১ সনের আর্ত কলকাতা।
দিনে রাত্রে যত্র তত্র যখন হত্যা অবাধ। অবিশ্বাস আর ত্রাসে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত। রাজপথে অপরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই যখন ঘাতক বলে সন্দেহ হয়। মনুষ্যত্ব, সৎ সাহস, ন্যায়-অন্যায়—এইসব শব্দের অস্তিত্ব যখন শুধুই অভিধানের হেপাজতে।
এই সময়ের ভূমিতে স্থিত লেখক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর চিন্তাজাল বিস্তার করেছেন বইখানির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। গল্প? গল্প আছে। কিন্তু সে শুধু ঘটনার বিবরণ নয়। ভয়ংকর সময়ের কারাগারে বন্দী এ-কাহিনীর নায়ক। তার পলায়নের পথ রুদ্ধ। সবচেয়ে কঠিন যে নিজের কাছ থেকে পলানো! এক দল যুবক হিংসার রাজনীতির খেলায় মত্ত। বাকি যারা, তাদের গরিষ্ঠাংশ যেন মূক, বধির, জীবন্মৃত। কোনও ক্রমে মরা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট। আর কিছু বুদ্ধি-অভিমানী আপন জ্ঞান-চৈতন্যের সঙ্গে সন্ধি করে চলেছে। সেখানেও উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা। বুদ্ধি সেই কাজে পণ্যরূপে ব্যবহৃত। নায়ক কোন্ দলে? সে নিঃসঙ্গ। অসহায়। অসহায় কেন? কারণ, তার বিবেক তার সামনে তর্জনী তুলে রেখেছে। বিবেকের প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। পাপের, নপুংসক আচরণের, অক্ষমতার সাক্ষী হওয়া ছাড়া আর কী সে করেছে? সন্তোষবাবুর অনুসন্ধানী বিশ্লেষণে সমাজের নানা স্তরের অবস্থার করুণ রূপ উন্মোচিত। বইখানি পাঠককে গতকালের দুর্যোগের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। উপন্যাসের নায়কের সঙ্গলাভ করে পাঠকও প্রবৃত্ত হবেন আত্মজিজ্ঞাসায়।
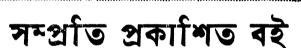
প্রকাশিত হল

এই লেখকের আর একটি উপন্যাস ঃ

জল দাও ৩·৫০

সত্যজিৎ রায়ের
সোনার কেল্লা
ফেলুদার নতুন গোয়েন্দা-উপন্যাস ॥ দাম ৫·০০

যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপলব্যথিত গতি
বিভূতিভূষণ স্মৃতিচারণ ॥ দাম ৫·০০

ফাদার দ্যতিয়েনের
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা
রমণীয় রচনার অনুপম সংকলন ॥ দাম ৬·০০

বুদ্ধদেব গুহর
বাতিঘর
এক সত্য উপলব্ধিতে ঋদ্ধ উপন্যাস ॥ দাম ৪·০০

শওকত ওসমানের
জাহান্নাম হইতে বিদায়
বাংলাদেশের শরণার্থীদের বেদনাগাথা ॥ দাম ৫·০০

দিব্যেন্দু পালিতের
সন্ধিক্ষণ
ইঙ্গিতময় কাহিনীর অসামান্য উপন্যাস ॥ দাম ৪·০০

সমরেশ বসুর
সওদাগর
এক উজ্জ্বল মানুষী কাহিনী ॥ দাম ৭·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
স্মরগরল
স্মৃতিভ্রংশতা অবলম্বনে রচিত উপন্যাস ॥ দাম ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস ঃ ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলি: ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র ঃ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯ ॥

[illegible]

মেটামুটি [illegible] পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছিলেন আর [illegible] বেকারদের কর্ম-সংস্থানের [illegible] কথা [illegible]। তাছাড়া, আমাদের এই রাজ্যের বেকার-সমস্যা যে কত তীব্র তা রাজ্যের যাঁরা হাল ধরেছেন তাঁদের কারও কাছে অবিদিত নয়। অন্ততঃকেও তিন লক্ষ বেকারের কাতর দৃষ্টি এ'দের দিকে। বেকারী দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি সব কংগ্রেস দলেরও রয়েছে। কাজেই এই রাজ্যের কর্মহীনদের জন্যে কর্ম-সংস্থানের সার্বিক চেষ্টা অনতিবিলম্বেই হওয়া উচিত। সে চেষ্টা যে হচ্ছে না তাও আমরা বলছি না—তবু আরও সুপরিকল্পিতভাবে এবং সর্বান্তঃকরণেই হওয়া দরকার।

এই রাজ্যের বেকার সমস্যার কথা ভাবলে দুই শ্রেণীর বেকারদের কথাই মনে পড়ে। একদা যাঁরা কলকারখানায় কাজ করতেন কিন্তু কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার জন্যে বেকার হয়ে পড়েছেন তাঁদের কথা বলছি না। কেননা এ'দের জন্যে সরকার চেষ্টা করছেন বন্ধ কল-কারখানা খোলাবার। অনেকগুলি কার-খানা ইতিমধ্যেই খুলেছে, হাজার পঞ্চাশের কাজও জুটেছে শুনি। এই ধরনের সাময়িক বেকারদের কথা বাদ দিয়েও বলা যায় অন্যান্য রাজ্যের মতন এখানেও স্বাভাবিকভাবেই দুই শ্রেণীর বেকার আছেন। এক শ্রেণীর বেকার হলেন [illegible]

[illegible] এক রকম হতে পারে [illegible] না—তবু উভয় শ্রেণীর জন্যে সরকারের সমান দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার।

রাজ্যের সন্তানদের কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে নরম-পন্থী। আজ বিহারে, আসামে, মহারাষ্ট্রে বা অন্য কোনো রাজ্যে স্থানীয় জন-সাধারণের যে দাবি সেখানকার শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে মেনে নিতে হয় এখানে তার যথেষ্ট অভাব। অন্য রাজ্য-গুলির মতন আমরা অযৌক্তিক কোনো কোনো দাবি না তুলতে পারি, কিন্তু এখানকার বেকারদের কাজ দিতে হলে এই ব্যবস্থার বাইরে আর কি থাকতে পারে? বিশেষ করে যেক্ষেত্রে শিক্ষিত কর্মীর দরকার নেই, প্রধানত শ্রমদানই একমাত্র যোগ্যতা সেখানে এই ব্যবস্থাটি খানিকটা বাধ্যতা-মূলক করা দরকার। সাধারণত দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নমূলক বহু কাজের শ্রমিক-চাহিদা বাংলাদেশের বাইরের লোক দিয়ে প্রধানত মিটিয়ে নেওয়া হয়। সরকার কি এদিকে চোখ দেবেন? কলকাতায় ইদানীং যত কাজ হচ্ছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং এখানে কর্মরত অন্য রাজ্যের বাসিন্দা কারা কতটা হারে কাজ করছে এবং আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে রাজ্য সরকার কি তার একটা মোটামুটি হিসেব দিতে পারেন?
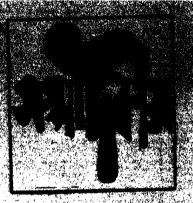
৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৫
শনিবার ৯ বৈশাখ ১৩৭৯
Saturday, 22 April, 1972

শিক্ষিত বেকারদের বেলায়ও আমাদের নিশ্চয় তৎপর হতে হবে। সম্প্রতি দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানায় যে একশো পঁচিশজন গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হয়েছেন তার মধ্যে বঙ্গসন্তানদের ঠাঁই কতটুকু? যোগ্য প্রার্থী না থাকলে নিশ্চয় প্রশ্ন উঠত না, কিন্তু আমাদের এখানে অসংখ্য বেকার ইঞ্জিনিয়ার থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁদের অনেকের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত হলেও কোন্ দোষে তাঁরা কাজ পান না সে সম্পর্কে কি সরকার হিন্দুস্তান স্টিল কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ করবেন? প্রয়োজন হলে এই প্রশ্নটি কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপন করা অসমীচীন হবে? রাজ্য সরকার যদি এই রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে দৃঢ় না হন তবে ঘরের যোগীরা ভিখ না পেতেও পারেন।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা
মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৪-৮৩৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে অন্তঃশুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টাঃ ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৫.০৪
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ [illegible]
ষাণ্মাসিক — টাঃ [illegible]
ত্রৈমাসিক — টাঃ [illegible]

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ [illegible]
ষাণ্মাসিক — টাঃ [illegible]
ত্রৈমাসিক — টাঃ [illegible]

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক — টাঃ [illegible]
ষাণ্মাসিক — টাঃ [illegible]
ত্রৈমাসিক — টাঃ [illegible]

একক ঐকতান -----

দেবগণের পলিটব্যুরো

কলিকাতা মহানগরীর পৌর এলাকার অধীন পথে ও ফুটপাথে অবৈধ-দখলকারী যেসব ঠাকুর-দেবতার যে সকল দেবস্থান আছে, [illegible] পলিটব্যুরোর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] বা [illegible], কালী, শীতলা, শনি, ওলাবিবি প্রভৃতি পলিটব্যুরোর সদস্যেরা এই বৈঠকে যোগ দেন। স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য ষষ্ঠীদেবীও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের শুরুতেই ট্রেকের ধাক্কায় পথ বা ফুটপাথের যে-সব মন্দির ১৯৭১ সালে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে সে সকলের তালিকা পেশ করা হয় এবং তৎসম্পর্কে এক শোকজ্ঞাপক প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বৈঠকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাবের উপর ঘোরতর বিতর্ক হয়। এবং এক সময় সদস্যদের মধ্যে প্রবল মতভেদ দেখা দেয়। প্রস্তাবের উপর কী আলোচনা হয় বা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে কোনও সদস্যই মুখ খুলতে রাজি হননি। তবে গোপন সূত্রে আমরা যে খবর পেয়েছি, তা এই: (এক) সিদ্ধার্থবাবুর মন্ত্রিসভা আগামী পাঁচ বছর স্থায়ী হবে, সে সম্পর্কে অধিকাংশ সদস্যই একমত হয়েছেন, (দুই) পশ্চিমবঙ্গে এই স্থায়ী সরকার রাজ্যে পাঁচ বছর ধরে আইন ও শৃঙ্খলা যদি বজায় রাখতে সমর্থ হন, এবং হবেন বলেই সদস্যরা আশংকা করছেন, তা হলে মহানগরীর ফুটপাথ দখলকারী প্রায় আড়াই শ' দেবস্থানের দেব-দেবীগণ উচ্ছেদের সম্মুখীন হবেন, এই বিষয়েও তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (তিন) পৌরসভা বাতিল এবং ফুটপথ থেকে হকার উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সরকারের যে গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের চেহারাটা ফুটে উঠেছে তা গণতন্ত্রবিরোধী বলেই পলিটব্যুরোর সদস্যরা রায় দিয়েছেন।

প্রকাশ, সমস্যার বিশ্লেষণের ব্যাপারে মতভেদ বিশেষ দেখা না দিলেও, সমাধানের ব্যাপারে মতবিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। এবং এই ব্যাপারে কালী এবং লিঙ্গ-মহেশ্বরের মতবিরোধ অত্যন্ত তিক্তকর এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। লিঙ্গ-মহেশ্বর এখনই গণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান। তাঁর থিসিস হচ্ছে, গণ-আন্দোলনের কাজ আগুনে এই সরকারকে পুড়িয়ে মারতে হবে। এখানে কালী গণ আন্দোলনের খুব একটা বিরোধী না হলেও, এখনই আন্দোলনের পক্ষপাতী নন।

এখনই আন্দোলনের পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁদের যুক্তি এই, এ সরকারকে নানাবিধ আন্দোলনের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত রাখতে না পারলে এরা ফুটপাথ থেকে মন্দির হটাবার মত জনবিরোধী কাজে হয়ত হঠাৎ হাত দিয়ে ফেলতে পারে।

এখনই আন্দোলন যাঁরা চাইছেন না, তাঁদের যুক্তি হচ্ছে এই, নব কংগ্রেসী সরকারে যাঁরা বর্তমানে আছেন, তাঁরাও এই দেশেরই মানুষ। ঠাকুর দেবতাকে উচ্ছেদ করে ফুটপাথ ক্লিয়ার সহজে তাঁরা করতে চাইবেন না। কারণ, এই সব জায়গায় তাঁদেরও তো মাথা ঠুকতে হবে। যদি দেখা যায়, ঠাকুর দেবতার চেয়ে ফুটপাথকেই ওরা বেশি দামী মনে করছে, তখন নাহয় গণ আন্দোলনে নামলেই হবে। আপাতত এখন বিধানসভায় অধিবেশনকেই তাঁরা ফুটপাথ থেকে মন্দির হটাবার মত জনবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করতে চান।

লিঙ্গ-মহেশ্বর এই যুক্তিতে ভয়ানক খেপে যান এবং প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু অ-নপারলামেন্টারি কথাও বলেন। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, কালী তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অপপ্রচার চালাচ্ছেন এবং বলে বেড়াচ্ছেন যে, লিঙ্গ-মহেশ্বর তাঁর ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই পলিটব্যুরোর প্ল্যাটফরমকে ব্যবহার করতে চাইছেন। এ হচ্ছে চরিত্রহনন।

কালীর পক্ষ থেকে বৈঠকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়, "বুড়োর ভীমরতি" ধরেছে এবং চরিত্র হননের কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়। কালী এও জানান যে, ফুটপাথ থেকে মন্দির উচ্ছেদের কথায় বুড়োর দলে যে রকম হাহাকার পড়ে গিয়েছে, তাতে বুড়োর শত্রুরা বলতে পারে যে, এ বিষয়ে তাঁর ভেসটেড ইনটারেস্ট আছে। সংখ্যাতত্ত্বও সেই কথা সমর্থন করে। ফুটপাথ আর রাস্তায় যত মন্দির রাতারাতি গজায় তার শতকরা আশি ভাগে ঐ বুড়োই তো পুজো খায়।

"খায় কি না, বলুক না অনামুখো।" কালী ফোঁস করলেন।

"এটা শ্বশুরবাড়ি নয়", শাকলের বাবা হুংকার ছাড়লেন, "পলিটব্যুরোর মিটিং, তাই খেতে দেখি, নয় তো তোকে সমঝিয়ে দিতাম, হুঁ।"

"হ্যা-হ্যা। তোর মত খুড়ো দেখে অনেছি।"

ওলাবিবি বললেন, [illegible]

"এই [illegible] বাবা! [illegible]" মনসা বললেন। "ফুটের ওপর মন্দির থাকলে আর ভাঙল, এর তো বড় ধুমেই গেল। কালীপুজোর ঘটায় সব পড়ুয়ারে মেতে তো। এখন যারা ফুট থেকে মন্দির ভাঙার কথা বলছে, তারাই তো দাবা ধরছে, পথ আটকে ওর জন্যে প্যান্ডেল বাঁধবে। এক দিনের পুজো, দেখিস সে, এক মাস ধরে তার ধুম চলে। আলো জ্বলবে, বাজনা বাজবে, মিছিল হবে। অমিত্যেরা কত। ও কী প্রাণ ধরে ওদের কিছু বলতে পারবে? না বলবে ভেবেছ।"

শনি বললেন, "দেখুন, এখন আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। এখন কি আমাদের কমন ইনটারেসটের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ঠিক নয়?"

ষষ্ঠী ঠাকরুণ বললেন, "আমাকে কাদাতে পড়ে থাকি। হঠাৎ ডাক পড়ায় তাই অবাক হয়েছিলাম। বলি, আমাকে স্মরণ হচ্ছে কেন? তা আমার তো বাপু, মন্দিরও নেই, সামিয়ানাও নেই।"

শনি ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, "আহা, আমারই বা কী আছে? ওলাদিদি মনসাদিদিরই বা কী আছে? কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে কমন ইনটারেসটের কথা—"

বাধা দিয়ে ওলাবিবি বললেন, "সেটা আবার কী?"

শনি বললেন, "যে স্বার্থ আমারও না, তোমারও না, আমাদের সেকর—তাই হল কমন ইনটারেসট। কাজেই সেই কমন ইনটারেসটের স্বার্থেই আমাদের নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ ধামাচাপা দিয়ে রাখা উচিত নয় কী?"

সকলেই বললেন, "হ্যাঁ, তা অবিশ্যি।"

শনি বললেন, "রাত তো পুইয়ে এল, তাহলে? পলিটব্যুরোর বৈঠক হল এতক্ষণ, তার একটা প্রস্তাব তো থাকা উচিত।"

সকলেই বললেন, "হ্যাঁ, তা অবিশ্যি।"

শনি বললেন, "পলিটব্যুরোর বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এবং কমন এনিমির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শপথ নেওয়া হয়—তা হলে প্রেসে এইটাই সরকারী প্রস্তাব বলে পাঠিয়ে দিই?"

সকলেই বললেন, "তথাস্তু।"

দুর্নীতি দমন

গত সপ্তাহের একটা বড় খবর হল দুর্নীতির অভিযোগে আর জি কর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর সাময়িক কর্মচ্যুতি। ১৫ এপ্রিল এক সরকারী নির্দেশবলে ডঃ চক্রবর্তীকে সাসপেনড করা হয়েছে। সাসপেনড করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার এ সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্তের জন্য একজন অফিসারকে নিযুক্ত করেছেন।

ডাঃ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তিনি তাঁর ছেলে এবং স্বাস্থ্য দফতরের এক বড় অফিসারের মেয়েকে অন্যায়ভাবে আর জি কর কলেজের প্রি-মেডিকেল কোরসে ভরতি করেছেন। ওই ছেলে ও মেয়েটিকে মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য সরকার নিযুক্ত বিশেষ কেন্দ্রীয় সিলেকসন কমিটি নির্বাচিত করে নি, দু ওদের দু'জনকে ভর্তি করার জন্য সরকার কোনও বিশেষ অনুমোদন দেন নি। [illegible]

এই তদন্তের আদেশের খবর সাংবাদিকদের জানাতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতকুমার পাঁজা বলেছেন, একটি উড়ো চিঠির ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং ডাঃ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলিতে কেস থাকা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন। ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ বলে সংশ্লিষ্ট ফাইলটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়। এবং কাগজপত্র দেখে মুখ্যমন্ত্রীও ডাঃ চক্রবর্তীকে সাসপেনড করার প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি জানান।

খবরটি নানা দিক দিয়েই চাঞ্চল্যকর।

প্রথমত, এই রকম দুর্নীতির অভিযোগে এর আগে কারুর সাসপেনসনের খবর শোনা যায় নি—যদিও অনেকেই জানেন যে মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির ব্যাপারে ধরাকওয়া এবং দুর্নীতি ব্যাপকভাবে চলে।

দ্বিতীয়ত, এই রকম একটা অপরাধে একজন অধ্যক্ষের মত উঁচু পদের অফিসার এর আগে কখনও বরখাস্ত হন নি—যদিও সবাই জানেন উঁচু পদের অফিসারেরা অনেকেই ছোট-বড় নানা ধরনের দুর্নীতিতে জড়িত।

দুর্নীতি দমনে যদি নতুন সরকার এই রকম দৃঢ়তা দেখাতে পারেন তা হলে সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই তাতে সন্তুষ্ট হবে এবং সরকারের সেই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসবে। এ ব্যাপারে সরকার জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাও পেতে পারেন। যে রকম উড়ো চিঠিতে সরকার ডাঃ চক্রবর্তীর দুর্নীতির কথা জানতে পেরেছেন তেমনি উড়ো চিঠি শত শত পাবেন।

যদি মানুষ দেখে সরকার দুর্নীতি দমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, তা হলে অনেকে স্বনামেও খবর জানাবে। এবং ওই খবরের ভিত্তিতে সরকার অনুসন্ধান করতে এগুলে সে ব্যাপারেও সাহায্য করবে।

দুর্নীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অভিযোগ বহু দিন থেকেই ব্যাপক। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের বদ্ধমূল ধারণা: প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত ভীষণ দুর্নীতি চলছে এবং যেহেতু দুর্নীতি সর্বস্তরেই ব্যাপক সুতরাং দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল পাওয়া যায় না।

কিন্তু এবার যদি মানুষ দেখে যে, না, দুর্নীতির ব্যাপারে অভিযোগ জানালে ফল পাওয়া যায় তা হলে যেমন একদিকে অন্যায় কাজ করতে সরকারী কর্তাব্যক্তি বা সাধারণ কর্মীরা ভয় পাবেন, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষও দুর্নীতি দমনে সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।

*

একবার সুপ্রীম কোর্টের এক প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, আমাদের দেশে দুর্নীতি যত ব্যাপক তার চেয়ে অনেক ব্যাপক হল দুর্নীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা। সব সরকারী কর্মচারীই যে ঘুষ খায়, সব মন্ত্রীই যে টাকা নেয়, সব অফিসেই যে অর্থের বিনিময়ে বে-আইনী কাজ করিয়ে নেওয়া যায় তেমন নয়। বরং, সরকারী অফিস কাছারিতে দুর্নীতিগ্রস্তদের চেয়ে সৎ কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি, মন্ত্রীরা খুব কমই উৎকোচ নেন এবং স্রেফ টাকার বিনিময়ে বেআইনী কাজকর্ম অল্পই হয়। তবে, সাধারণ মানুষ কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে করে আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং টাকা দিয়ে যে কোনও কাজ করানো যায়।

আমি এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। দুর্নীতি সত্যিই যতটা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্নীতি রয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমাদের দেশের বহু লোক মনে করে, পয়সা দিয়ে যে কোনও কাজ করানো যায়। আমাদের দেশের গরীব লোকদের একটা ব্যাপক ধারণা, যার পয়সা আছে সে পয়সার জোরে যে কোনও কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং পয়সারই জোরে যে কোনও অন্যায়কে ঢাকতে পারে। আমাদের দেশের বড়লোকদেরও অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা, পয়সা থাকলে আইনের যে কোনও লোকের সাহায্যকে কেনা যায়।

এই রকম ধারণা হওয়া অকারণও নয়। প্রথম কারণ, সত্যিই দুর্নীতি রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, দুর্নীতি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতারা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্তা বলেন। এবং তৃতীয় কারণ, লোকে দেখে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সরকার বহু ক্ষেত্রে তাকে আমলই দেন না—সরকার যেন সত্য উদ্‌ঘাটনের চেয়ে সত্যকে চাপা দিতেই বেশি উৎসাহী। এই রকম আরও কতকগুলি কারণে সাধারণ মানুষের দুর্নীতি সম্পর্কে একটা ফাঁপানো ধারণা রয়েছে—দুর্নীতি সত্যিই ঘটে। আছে তার চেয়ে তার ব্যাপকতা অনেক বেশি বলেই লোকে মনে করে।

এ সম্পর্কে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় প্রয়োজন। যেমন ধরুন, দুর্নীতি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্বজ্ঞান-হীন উক্তির প্রশ্নটা। এই রাজ্যেই তার বড় প্রমাণ আছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ১৯৬৭ সনে ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতারা কীভাবে কংগ্রেস মন্ত্রী ও নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতেন। যে কোনও সভাসমিতিতে তাঁরা অভিযোগ করতেন, ওরা সব চোর, সব ঘুষ খায়। বছর কুড়ি ধরে শুনতে শুনতে, সাধারণ মানুষেরও সেই ধারণা হয়ে গেল—কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রীদের চোর বলে গালিগালাজ দিতে কোনও প্রমাণ দিতে হত না।

কিন্তু ক্ষমতায় আসা মাত্র যুক্তফ্রন্ট সরকার এই নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়লেন। তাঁদের উপর চাপ পড়ল, কংগ্রেসী নেতা এবং মন্ত্রীদের দুর্নীতি ধরতে হবে। নির্বাচনের আগে তাঁরা প্রতিশ্রুতিও দিয়ে-ছিলেন ওই সব দুর্নীতি ধরবেন। প্রথম প্রথম তাঁদের দু'একজন একটু খোঁজ খবরও নিলেন। কিন্তু উৎসাহিত হওয়ার মত কিছুই পাওয়া গেল না।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, স্টীফেন হাউস নিয়ে। স্টীফেন হাউস কলকাতার একটা বিরাট অফিস বাড়ি। বামপন্থীরাই রটিয়েছিলেন, ওই বাড়িটা বেনামে কিনেছে অতুল্য ঘোষ আর প্রফুল্ল সেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই এ নিয়ে একটা ভাল রকমের তদন্ত হল অত্যন্ত গোপনে। এবং তদন্তের ফলা-ফল তাঁদের সম্পূর্ণ হতাশ করল। অতুল্য ঘোষ এবং প্রফুল্ল সেন ওই বাড়ির মালিক এমন কোনও প্রমাণ কেউ সংগ্রহ করতে পারলেন না। আর, বাড়ির আসল মালিক-দেরও খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না।

কিন্তু তার মানে কিন্তু এই নয় যে, কংগ্রেস রাজত্বে দুর্নীতি ছিল না। দুর্নীতি নিশ্চয়ই ছিল। তবে, যতটা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বলা হত। এবং, দায়িত্বজ্ঞান-হীনভাবেই বলা হত।

কেমন মজা দেখুন, এরই আবার শিকার হলেন বামপন্থীরা। পারক হোটেলের লাইসেনস দেওয়া, বাসের পারমিট বিতরণ, বড় বড় শিল্পপতির টাকা নেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে বামপন্থীদের জড়িয়ে কত কাহিনীই না রটলো! এর কতকগুলি সত্য, কিন্তু অনেকগুলিই আবার সম্পূর্ণ অসত্য। কিন্তু কি বিচিত্র দেখুন, সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশ মনে করে এর সব অভিযোগই পূর্ণ সত্য!

মানুষের এই রকমের ধারণা হওয়ার আর একটা বড় কারণ হল, সত্যকে চাপা বা সত্যকে চাপার চেষ্টা হচ্ছে এই রকম একটা ধারণা সৃষ্টি করা। যেমন ধরুন, দিল্লির কুখ্যাত নাগরওয়ালা কেসের ব্যাপারটা। স্টেট ব্যাংক থেকে ষাট লাখ টাকা হঠাৎ টেলিফোনে উধাও হয়ে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এই কেসে যা যা ঘটেছে প্রায় সবই রহস্যপূর্ণ। এমনভাবে গোটা ব্যাপারটা এগোচ্ছে যে, মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক খুব বড় লোকদের নাম চাপা দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা চলছে।

ঠিক এত বড় না হলেও এই ধরনের চাপা দেওয়ার ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। যেমন ধরুন, পশ্চিমবঙ্গে কয়েকজন বড় সিভিল সারভেনট ও পুলিস অফিসার সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগের ব্যাপারটা। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মানুষ শুনে আসছে এদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বেশ ভাল ভাল অভিযোগ রয়েছে। রয়েছে যে অভিযোগ তাও ঠিক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি? একজনারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা কেউ নিচ্ছেন না। একটার পর একটা সরকার আসছে আর একটু আধটু নাড়াচাড়ার পরই সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। এমনকি তাঁদের দু'একজন আবার প্রমোশনও পেয়েছেন।

এই রকম অবস্থায় সাধারণ মানুষেরই বা কি দোষ যদি তারা মনে করে যে, উঁচুর তলার দুর্নীতিতে কখনও হাত পড়ে না এবং প্রধানত ওপর তলার মানুষের দুর্নীতির সুযোগেই সর্বত্র দুর্নীতি চলে।

*

ডাঃ চক্রবর্তীর কেসের পর জনসাধারণ বুঝতে চাইবে সরকার এই রকম দৃঢ়তা অটুট রাখতে পারবেন কিনা। যদি তারা বোঝে যে, হ্যাঁ, নতুন সরকার এ ব্যাপারে খুবই দৃঢ়, তা হলে জনসাধারণ আপনা থেকেই সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে এবং দুর্নীতিবাজরাও ভয় পাবে। ফলে দুর্নীতি আস্তে আস্তে কমবেই।

দুর্নীতি আমাদের সমাজ থেকে চট করে কমতে পারে বা একেবারে বন্ধ হতে পারে এটা আমি বিশ্বাসই করি না। কোনও সমাজেই তা পারে কিনা সন্দেহ। কমিউ-নিস্ট রাষ্ট্রগুলিতেও বেশ দুর্নীতি রয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্যি যে, দুর্নীতি কমা প্রয়োজন। মানুষের ধারণাটা পাল্টানো প্রয়োজন। প্রশাসন যন্ত্র দুর্নীতিতে ভরা—এই রকম একটা ধারণা যদি দেশের সাধারণ মানুষের থাকে তা হলে সেই প্রশাসনের পক্ষে সত্যিকারের জনসহযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয়।

আর একটা জিনিস, দুর্নীতি যদি ওপর তলায় না প্রশ্রয় পায় তা হলে নীচুর তলায় ব্যাপকভাবে চলতে পারে না। দুর্নীতিগ্রস্তরা কঠোর সাজা পেতে শুরু করলে সমাজে দুর্নীতি কমতে বাধ্য।
১৬-৪-৭২।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

ঠাট

পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু সেখানকার নাগরিকরা গণতন্ত্র যে কী বস্তু তা আজও জানে না। পাকা সংবিধানও তার এখনও তৈরি হয়নি। কথাটা মাঝে মাঝে উঠেছে বটে, কখনও কখনও মনে হয়েছে সংবিধান তৈরির কাজ পাকিস্তানে এবার বোধ হয় এগুবে। এমনই হয়েছে ১৯৪৮য়ে, ১৯৫৬তে, ১৯৬২তে, শেষ ১৯৬৯য়ে। কিন্তু পাঁয়তাড়া কষাই সার হয়েছে! গণতান্ত্রিক নির্বাচন তো পরের কথা একটা পাকাপোক্ত সংবিধানই সে দেশে খাড়া করা যায়নি। গণতান্ত্রিক দুধের স্বাদ পাকিস্তানীদের মেটাতে হয়েছে কখনও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ঘোলে কখনও বা বেসিক ডেমোক্র্যাসির অর্থাৎ মৌল গণতন্ত্রের। এ সবই ফক্কিকারি। জিন্না-লিয়াকত আলি খাঁ মারা যাবার পর দিন কতক চলেছিল টালমাটাল। তারপর আসরে এলেন লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৫র আগস্টে। নিজমূর্তি ধরলেন তিনি ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে। বাতিল হলো সংবিধান, চালু হলো মার্শাল ল, অর্থাৎ সামরিক আইন। সেই থেকেই সে আইন কায়েম হয়ে বসেছিল পাকিস্তানে। আপদ বিদেয় হয়েছে ২১ এপ্রিল।

নিশ্চিন্ত হয়ে নবাবী করতে পারেননি ইস্কান্দার মির্জা। তাঁর এক রকম বোধনেই বিসর্জন হয়েছিল। গদিতে বসার তিন হপ্তার মধ্যেই তাঁকে সে গদি ছেড়ে দিতে হয়েছিল তাঁরই সাকরেদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁকে। দেশের লোককে বেসিক ডেমোক্র্যাসির সোনার পাথরবাটি দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। ১৯৬৫ সনে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুদ্ধে হারার পরই তাঁর নড়বড়ে বেসিক ডেমোক্র্যাসির ইমারত ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। যুদ্ধে যে তিনি হেরেছেন তা তিনি কবুল করেন নি। কিন্তু সত্যকে তো চিরকাল চেপে রাখা যায় না। থলের ভেতরে লুকিয়ে রাখা বেড়াল একদিন বেরিয়ে পড়লো। মুখ কালো করে বিদেয় নিতে হলো আয়ুব খাঁকে ১৯৬৯ সনে। ক্ষমতা দখল করলেন ইয়াহিয়া খাঁ আর তাঁর স্যাঙাত জঙ্গী নায়কেরা। গণতন্ত্রের টোপ তিনিও ফেলেছিলেন, পাকিস্তানে প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন হলো তাঁরই আমলে ১৯৭০এর ডিসেম্বরে। সেই প্রথম আর সেই শেষ।

ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের কবর খুঁড়লেন সে নির্বাচনের রায় না মেনে। তা যদি তিনি মানতেন, জাতীয় পরিষদে যে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল সেই আওয়ামি লীগের হাতে দেশশাসনের ভার তুলে দিতেন তা হলে পাকিস্তান টিঁকতো, হয়তো বা তিনিও টিঁকে যেতেন। ডাকবো বলেও তিনি জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকেন নি, দিনক্ষণ ঠিক করেও কথার খেলাপ করেছেন, রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের শ্যামলা মাটি, জেলে পুরেছেন শেখ মুজিবুর রহমানকে। তবুও দুনিয়ার মানচিত্র থেকে মুছে গেছে পূর্ব পাকিস্তান, তার জায়গা নিয়েছে গণতন্ত্রী বাংলাদেশ। পাকিস্তানের এখন সম্বল তার পশ্চিমী এলাকা। পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর বেলুচিস্তান। ফৌজী প্রশাসকরা আপাতত চলে গেছেন পর্দার আড়ালে, পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন আয়ুব-ইয়াহিয়ার এককালের দোস্ত জুলফিকার আলি ভুট্টো।

ভাঙা পাকিস্তানের তিনিই এখন চাঁই। সে ভাঙা জোড়ার কথা তিনি এখনও মুখে বললেও মনে মনে বিলক্ষণ জানেন সে গুড়ে বালি—পাকিস্তানের আগের চেহারা কখনই আর ফিরে আসবে না। সব জেনেও তিনি দেশের লোককে ধাপ্পা দিচ্ছেন নিজের গদি সামলাবার জন্যে। পশ্চিম পাকিস্তানে সত্তরের নির্বাচনে তাঁর দল পিপ্‌লস্ পার্টিই পেয়েছিল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। যদিও পূবের আওয়ামি লীগের জিতের তুলনায় তা কিছুই নয়, তবুও সেই সুবাদেই তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি বনেছেন। আবার লোককে ধোকা দেবার জন্যে উপরাষ্ট্রপতি করেছেন বাঙালী নুরুল আমিনকে। তাঁর নিজের ক্ষমতা যে কত তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না পাকিস্তানের ধোঁয়াটে রাজনৈতিক অবস্থার দরুন। তবে বাংলা-বেলুচিস্তানের কসাই টিক্কা খাঁকে দেশের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করাতে মালুম হচ্ছে আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে জঙ্গী প্রধানরাই।

আপাতত রাজাপাটে বসতে দিয়েছে তারা ভুট্টোকে, যে গণতন্ত্র গণতন্ত্র খেলতে চাইছেন রাজনীতিকরা তাতেও বাধা দিচ্ছে না। দেশের তরুণেরা চাইছে গণতন্ত্র মাফিক শাসন, তাদের সুরে সুর মিলিয়েছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভুট্টোর পিপ্‌লস্ পার্টি ছাড়া, ওয়ালি খাঁর জাতীয় আওয়ামি দল আর মুফতি মাহমুদের জামিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম। ভুট্টো বিরোধী দলের মধ্যে এরাই অগ্রগণ্য। এরা ছাড়া মুসলিম লীগের দু শরিকও আছে। তার যে টুকরোর নেতা কায়ুম খাঁ সেটা রফা করেছেন ভুট্টোর সঙ্গে। বিরোধীরা জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও ভুট্টোর ইচ্ছে ছিল না তার বৈঠক ডাকেন কিংবা উত্তর সীমান্ত প্রদেশ আর বেলুচিস্তান যেখানে প্রাদেশিক বিধানসভায় তারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ সেখানে তাদের মন্ত্রিসভা গড়তে দেন। কিন্তু তাঁর তো জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। গণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে মারলে তাঁর টুঁটি টিপে ধরবে ফৌজী প্রধানরা হয়তো বা এখনই, এই তাঁর ভয়। নিরুপায় হয়ে তিনি জাতীয় পরিষদের তিন দিনের বৈঠক ডেকেছিলেন ১৪ এপ্রিল। তাতে একটা অস্থায়ী সংবিধানের খসড়াও তিনি পেশ করেছিলেন। সে সংবিধান মঞ্জুর হলে ২১ এপ্রিল থেকে তিনি সামরিক আইন রদ করে দেবেন এই ছিল তাঁর শর্ত।

জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডেকে প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো চালে ভুল করেন নি। সে বৈঠকে অধিকাংশের ভোটে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, আস্থা ভোটও একটা তিনি পাস করিয়ে নিতে পেরেছেন। এতকাল তাঁর অবস্থা ছিল ত্রিশঙ্কুর মতো, পায়ের নিচে মাটি তাঁর ছিল না। গদি তিনি পেয়েছিলেন কোনও সাংবিধানিক নির্দেশ অনুযায়ী নয়, পেয়েছিলেন ইয়াহিয়া খাঁ আর ফৌজী প্রধানদের দৌলতে। গণতান্ত্রিক সমর্থন তার পেছনে ছিল না। জাতীয় পরিষদে আস্থা ভোট পাওয়াতে একটুখানি গণতন্ত্রের হাওয়া তাঁর গায়ে লেগেছে। তবে পাকাপাকি গণতন্ত্র পাকিস্তানে চালু হতে ঢের দেরি। যদি ফৌজী পাণ্ডারা আবার মাথা চাড়া না দেন তা হলেই তা হবে, নইলে অঙ্কুরেই আর একবার নষ্ট হবে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বীজ। ভুট্টোর মুশকিল হলো বাস্তবকে মেনে নিতে তিনি পারছেন না। আজও তাঁকে পূব-পশ্চিমের মিলে যাওয়ার কথা বলতে হচ্ছে, নইলে তাঁর দলের লোকেরাই বিগড়ে যাবে। তিনি বেশ জানেন তাঁকে বিরোধী দলগুলো রাষ্ট্রপতি বলে মেনে নিয়েছে, তাঁকে ভালবাসে বলে নয়, দ্বিতীয় লোক তাঁর তুল্য পাকিস্তানে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না বলে। এ ছাড়া ভারতবর্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া তো এখনও বাকী। তার জন্যে বাইরে অন্তত একটা ঠাট দরকার। ভুট্টো আর যাই হোন পাকিস্তানের মাথার মণি নন।

প্রকৃতির সঙ্গে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল
পরনে হাফ-শার্ট হাফ-প্যান্ট সাদা কেড্‌স্‌
হাতে ছোট ছড়ি, নির্ঝঞ্ঝাট,
প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছেন; মনে ছুটি।
চারদিক আলো হয়ে গেছে চমৎকার
ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে—
গরম চা, খবরের কাগজ;
আর-একটা দিন—বহুমূল্য, তাজা, সুগন্ধি
এবং, আমার পিঠের একটা অদ্ভুত ব্যথা ছাড়া, সবটাই নতুন।

ট্রাক্টর চালিয়ে চাষবাস করেন প্রেমকৃষ্ণ চৌহান
তাঁর স্ত্রী নন্দিতাও উঠেছেন,
আলগা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এ-ঘর ও-ঘর
আদুরে পুতুলের মতো।
পাশের ঘর থেকে মেয়েকে তুলবেন এবার
সাজাবেন, চুল আঁচড়ে দেবেন লাল রিবন দিয়ে,
তারপর স্কুলের বাস যখন তুলে নিয়ে যাবে,
তিনি হাত নাড়বেন।
আলগা পোশাকের ভেতর তাঁর মসৃণ সুপুষ্ট শরীর
একটু একটু দুলবে। বাতাসে সুগন্ধ। সকাল সাতটা।
আমারও হাত নাড়তে ইচ্ছে করবে এখান থেকে
কিন্তু না,
এই সব সুখের দৃশ্যে আমার দেখার ভূমিকা। আমার পিঠে
একটা অদ্ভুত ব্যথা, যা পুরোনো।

অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে কাকেদের শোরগোল।
উঁচু পাঁচিলগুলো টপকে এ-গাছ থেকে ও-গাছে
ঝোলানো ইলেকট্রিকের তারে বসে নাচছে ওরা
ঠোকরাচ্ছে প্রাতরাশ। আমার মনে হয়
মানুষের বেলা কেন অন্যরকম।
টাকা-পয়সার ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই
খাবার জিনিসগুলো কারো-কারো মুখের কাছে
ইয়ো-ইয়োর মতো নাচে;
এই সব সুখের আলু, পেঁয়াজ, ফুলকপি ও টম্যাটো
নিজেদের গরজে কেন উঠে আসবে মাঠ থেকে,
সাইকেলে, ঠেলাগাড়িতে, বাঁকের ওপর বসে
কেন চীৎকার করবে হাত তুলে:
আমাকে নাও, তাজা, সিদ্ধ করো, খাও
তোমাদের দোহাই।

বাজে সাতটা। সকালের রোদ বাড়ছে
চোখের সামনে খাবারগুলো ঘুরঘুর করতে দেখলেই
আমার টাকা-পয়সার কথা মনে পড়ে যায়
আর সমস্ত শরীর রী-রী করে ওঠে—
পিঠের ব্যথাটা বেড়ে যায় দশগুণ।
মনে পড়ে যায়, আমার সময় হয়েছে এবার।

আসল ব্যাপার কাউকে বুঝতে দেবো না—
চটপট পরে ফেলবো
মাজা পোশাক, পালিশ-করা জুতো,
চাঁচা গালের ওপর আফটার-শেভের পুরুষ গন্ধ; এক সময়
রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো ঢুকে পড়বো সেই অপূর্ব বন্দিশালায়
যার নাম জীবিকা,
জীবন ও বিকার শব্দ দুটির সমন্বয়ে যে-প্রতিষ্ঠানের নামকরণ,
যার অভাবে দেশের অসংখ্য যুবক
হা-হুতাশ করছে।
এক অদৃশ্য প্রভুর নির্দেশে আমরা
লড়াইয়ের ঘুঁটির মতো কামড়াকামড়ি করি সেখানে,
সেইটেই কাজ,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অক্লান্ত।
কেউ জিতবো না, কেউ হারবো না শেষ পর্যন্ত,
শুধু আমাদের ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে-পড়া রক্ত ও ক্ষয়
প্রকাণ্ড শিশিতে জমে উঠবে।
সেদিনের মতো খেলা শেষ হলে প্রভু স্বয়ং
মুখোশ পরে দাঁড়াবেন
আদেশ করবেন: সোজা হয়ে দাঁড়াও, প্রাণ খুলে হাসো।
তারপর প্রত্যেককে কিছু-কিছু পারিশ্রমিক দেবেন।
প্রাপ্তির আনন্দে ভুলে যাবো সব নির্যাতন।

সন্ধের পর কোনোদিন যানবাহন পাওয়া যায় না
এত ভিড় এত শব্দ এত ক্রুদ্ধ ও কৃতঘ্ন জনতার কোলাহল,
মাথার যন্ত্রণা।
যেদিকে তাকাও, পুঞ্জীভূত জঞ্জাল, নালিশ, থুতু ও অপমান।
মেরেমারখেয়ে মেরেমারখেয়ে মেরেমারখেয়ে একা
আমার মাথাকার ছোট ছোট তারগুলো সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে—
অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল বা নন্দিতা চৌহানকে তা
বোঝানো যাবে না।

এমন কেউ একবার হাজির হন না সামনে
যাঁর আদেশে
(আদেশ ছাড়া আমরা তো মানি না অন্য কিছু)
প্রথমেই তুলে দেওয়া হবে টাকা-পয়সার ব্যবহার,
যা অধর্ম শিখিয়েছে,
বাতিল করে দেওয়া হবে জীবিকা:
জীবন ও বিকার শব্দ-দুটির সমন্বয়ে যার নামকরণ।
যাঁর হুকুমে উদার আলু ও পেঁয়াজ
হৃদয়বান ফুলকপি ও টম্যাটোকে আর আত্মবিক্রয় করতে হবে না।
কান্না ভেঙে আমরা সকলে যাবো তাঁদের কাছে,
সেবা করবো, সমাদর করে ডেকে আনবো।
কামড়া-কামড়ি যদি করতেই হয়, করবো
বেচারা মানুষদের সঙ্গে না, বাইরে, বিমুখ ও উর্বর প্রকৃতির সঙ্গে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"মনে রেখো, বড়ো মাপে করা চাই আয়োজন"। ঠাট্টার ছলে রবীন্দ্রনাথ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটা আর-কেউ মনে না রাখুক, দিল্লি রেখেছে। সেখানে সবকিছুরই আয়োজন হয় বড়ো মাপে। খরচটা ধর্তব্য নয়; "না-হয় খরচা হবে," তাই বলে মাথা নিশ্চয় হেঁট হতে দেওয়া চলে না। বই-মেলার আয়োজনও তাই বড়ো মাপেই করা হয়েছে। মস্ত প্যাভিলিয়ন, বিস্তর আলো, সাজসজ্জায় অলংকরণে কোথাও কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি।

কনট সার্কাসের কফি হাউসের কাছে বাঁক নিয়ে জনপথ ধরে এগোতে থাকুন। দোকানপাটের এলাকা পার হয়ে, ইম্পিরিয়াল হোটেল ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে যান। উইনডসর প্লেস খুঁজে নিতে আপনার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না। ফাঁকা জমির উপরে রাতারাতি গড়ে তোলা হয়েছে চোখ-ধাঁধানো প্যাভিলিয়ন। সুরকি-ঢালা সুন্দর পথ; ইতস্তত ছড়িয়ে আছে মস্ত কয়েকটি নিষ্পত্র বৃক্ষ; তার শাখাপ্রশাখায়—ঢাউস আকারের জোনাকির মতো—হাজার হাজার বাতি জ্বলছে। লাউডস্পীকারের ঘোষণা, গাড়ির গাদি. দূর থেকে দেখলে বড়লোকের বিয়েবাড়ি কিংবা দুর্গাপুজোর প্যানডেল বলে ভ্রম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়: কাছে এগোলে বুঝতে পারা যায়, না, এই হচ্ছে বই-মেলা।

নিতান্ত বই-মেলা বললে অবশ্য অন্যায় হবে. দিল্লিতে আসলে বিশ্ব বই-মেলার আয়োজন হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পুস্তক-বর্ষের সূত্রে ইউনেসকো যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ তাতে সাড়া দিয়ে এই মেলা বসায়। উদ্যোক্তা আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক, অর সংগঠন, তত্ত্বাবধান ইত্যাদির ভার ছিল আমাদের ন্যাশনাল বুক ট্রাসটের উপরে। বিরাট দায়িত্ব; কিন্তু ট্রাস্ট যে সেই দায়িত্ব, যতটা সম্ভব, সন্তোষজনকভাবে পালন করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। বলাবাহুল্য, এ-সব কাজে অল্পবিস্তর ত্রুটি ঘটেই; তা ছাড়া ঠোঁট বাঁকিয়ে 'ভালো হত আরও ভালো হলে' বলবার লোকেরও অভাব ঘটে না। কিন্তু ভুলে না যাই যে, এমন মেলা এই প্রথম হল। পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই, তবু যে এই মেলাকে একটা মোটামুটি সন্তোষ-জনক চেহারা দেওয়া গেছে, এইটেই বড় কথা। সংগঠন আর তত্ত্বাবধানের কৃতিত্ব অবশ্য একা ট্রাস্টেরও নয়। 'ফেডারেশন অব পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স অ্যাসোসিয়েশনস'ও এ-ব্যাপারে ন্যাশনাল বুক ট্রাসটের সহযোগী ছিলেন। কৃতিত্ব অতএব, অংশত তাঁদেরও।

নিকট-দূর বিস্তর দেশ থেকে বই-মেলায় বই এসেছে। হরেক রকমের বই। সাহিত্য তো আছেই, সেই সঙ্গে একটু নজর করলেই বোঝা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনও শাখাই বাদ পড়েনি। পাঠ্যপুস্তকও বিস্তর দেখেছি। কোথাও ভিড় জমেছে পৃথিবীর সবচাইতে বড়-মাপের বই দেখবার জন্যে, কোথাও-বা অনেকে হুমড়ি খেয়ে চিত্তাকর্ষক নানা ছবির বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। মেলা-প্রাঙ্গণের সামনেই গড়ে তোলা হয়েছে মূল প্যাভিলিয়ন। সেখানে নানান দেশের মস্ত-মস্ত স্টল। তা ছাড়া

বই-মেলায় পশ্চিমবঙ্গের প্যাভিলিয়ন

আছে স্থানীয় কয়েকটি বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থার বিপণি। স্টলগুলিকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। বই রাখবার বিন্যাসও—অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে—বেশ চমকপ্রদ। মূল প্যাভিলিয়নের পিছনে আছে আরও কয়েকটি ছোট-ছোট প্যাভিলিয়ন। ওগুলি বিভিন্ন রাজ্যের। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ—যার যতটা সাধ্য প্যাভিলিয়নকে মনোরম

করে সাজিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্যাভিলিয়নের নির্মাণ-ব্যয় শুনলাম রাজ্য-সরকার বহন করছেন। আর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছেন এখানকার প্রকাশক-সমিতি। যাবতীয় বই নিয়ে যাওয়া, বিক্রিবাটার ব্যবস্থা করা, হিসেব রাখা, তারপর মেলার শেষে অবিক্রীত বই ফিরিয়ে আনা, দায়িত্ব বলা-বাহুল্য কম নয়। ঝক্কিও অনেক। কিন্তু প্যাভিলিয়নে যাঁদের দেখলুম, তাঁদের কাউকেই তার জন্য এতটুকু অপ্রসন্ন মনে হল না। দর্শকদের তাঁরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছেন; অবাঙালী দর্শকদের বলে দিচ্ছেন, কোনটা কিসের বই। দেখে ভাল লাগল। প্যাভিলিয়নটি সুদৃশ্য; তবে আরও সুন্দর যে হতে পারত, ওড়িশার প্যাভিলিয়নটি তার প্রমাণ। কোণা-রকের বিখ্যাত সেই চাকাকে এমন সুন্দরভাবে তার বহিরঙ্গ-সজ্জায় কাজে লাগানো হয়েছে যে, দূর থেকে দেখবামাত্র আকৃষ্ট হতে হয়। মনে হয়, ভিতরে গিয়ে ব্যাপারটা একবার দেখে আসি। ওড়িশার অন্যান্য প্যাভিলিয়নের ভিতরে কিন্তু জায়গা বড় কম।

বইয়ের বিন্যাসে, স্টলের বাহারে অবশ্য কয়েকটি দেশই টেক্কা দিয়েছে। অলংকরণের গুণেই তারা দর্শক টানে। বইয়ের প্রকারও তাদেরই বেশী। মুদ্রণ, কাগজ, বাঁধাইয়ের অনবদ্য রকম দেখে তাক লেগে যায়। আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয়। বিদেশী স্টলে শক্ত-মলাটের বইয়ের তুলনায় পেপার-ব্যাকেরই প্রাধান্য। সন্দেহ নেই যে, পেপারব্যাককে জনপ্রিয় করে তুলবার কাজে এখনও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। অথচ আমাদের জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা তো পশ্চিমী দেশগুলির মানুষদের তুলনায় বহু কম। সেই বিচারে, শক্ত-মলাটের বইয়ের তুলনায় পেপারব্যাক এদেশে আরও জনপ্রিয় হওয়া উচিত ছিল। কেন হয়নি? উত্তরটা এক বিশেষজ্ঞের কাছে পাওয়া গেল। তাঁর মতে, পেপারব্যাকের সাফল্য তিনটি ব্যাপারের উপরে নির্ভর-শীল। মুদ্রণ সংখ্যা বাড়াতে হবে, দাম কমাতে হবে এবং বণ্টনের ক্ষেত্র বাড়াতে হবে। মুশকিল এই যে, এই তিনটি ব্যাপার নিয়ে একটি বিষবৃত্ত রচিত হয়েছে। তা ছাড়া, আমাদের দেশে অনেকেই বই কেনেন উপহার দেবার জন্য। পেপার-ব্যাকে তাঁদের মন ওঠে না। বিশ্ব বই-মেলা উপলক্ষে 'বুকস ফর দি মিলিয়নস' নামে যে সেমিনারের আয়োজন হয়েছিল, পেপার-ব্যাকের সমর্থনে সেখানে অনেক অনেক কথা বলেছেন। 'আবার হার্ডকভার'-এর সমর্থনেও যে কেউ কিছু বলেননি, তা নয়। অন্ততঃ একজন বলেছেন যে, পেপারব্যাকের তুলনায় শক্ত-মলাটের বই প্রকাশে ঝুঁকি অনেক কম। কম-দামের বইয়ের বেলায় ... প্রকাশকদের আর-একটু কপি ছাপার চাইতে বেশী ... হবে। বইয়ের বিক্রি তা কম কপি ছাপালে, আর যাই হোক, আর্থিক ... নইলে ঝাড়বে না। উপহার দেবার জন্যে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে হয় না। যাঁরা বই কেনেন, শুধু তাঁদের কথা লোকসানের আশঙ্কাটা একটা বহনযোগ্য ভাবলে চলবে না। ভাবতে হবে তাঁদের সীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু সেটা তো কথাও, যাঁরা বই কেনেন নিজেদের জন্য। প্রকাশকের বক্তব্য। ক্রেতারাও কি সেই কথা তাঁদের সংখ্যা নিশ্চয় আগের তুলনায় বলবেন?

মস্কো প্যাভিলিয়নের ভিতরে একজন বিদেশী প্রতিনিধি

অনেক বেড়েছে। তাঁদের চাহিদা যদি মেটাতে হয়, এবং তাঁদের মধ্যে বইয়ের জনপ্রিয়তা যদি বাড়াতে হয়, পেপারব্যাক আর পকেটবুকের পথে পা না বাড়িয়ে তাহলে উপায় নেই।

সেই শৌখিন ভদ্রলোকের গল্প তো সবাই জানেন। দোকানে গিয়ে তিনি একখানা লাল-মলাটের বই চেয়েছিলেন। লাল-মলাটের বই কেন? না, অন্য রঙের মলাট হলে তাঁর ড্রইংরুমের বর্ণ-বিন্যাসের সঙ্গে খাপ খাবে না। কিন্তু সেই সব ভদ্রমহোদয় কিংবা মহোদয়ার জন্য বই ছাপিয়ে লাভ নেই। বই মূলত তাঁদের জন্য ছাপতে হবে, ঘর সাজাবার জন্যে নয়, পড়ার জন্য যাঁরা বই কেনেন। বই নামক বস্তুটিকে তাঁরাই সবচাইতে ভালবাসেন। সেই ভালবাসাকে সম্মান দিতে হবে। আরও বেশী সংখ্যক বই যাতে তাঁরা কিনতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। বইকে তাঁদের মধ্যে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

বই-মেলারও সেই একই উদ্দেশ্য। বইকে আরও জনপ্রিয় করা। কিন্তু রাজধানীর এক অভিজাত এলাকায় বিস্তর টাকা ঢেলে, বিস্তর আলো জ্বালিয়ে, বিস্তর ঢাক বাজিয়ে এই যে মেলা বসানো হল, এতে করে সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে কতটা এগোনো যাবে? খুব বেশী যে এগোনো যাবে, এমন আমার মনে হয় না। কিন্তু বই-মেলার লক্ষ্য সম্পর্কে আমি সন্দিহান নই, মেলার উদ্যোক্তা ও তত্ত্বাবধায়কদের আমিও সাধুবাদই জানাব। কিন্তু একই সঙ্গে বলব, রাজধানীতে আর নয়, এত বড় মাপেও আর নয়, দিল্লির শৌখিনতার চৌহদ্দী ছাড়িয়ে, আরও দূরে দূরে, আরও ছোট মাপে এই মেলাকে এবারে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। মেলা বসুক দূর মফস্বলের গ্রামে আর গঞ্জে। শহরের বই গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে যাক।

নয়নের ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় যতীনের কিরকম মনে হল নয়ন সম্ভবত বাড়ি নেই। কথাটা আচমকা তার মনে হল যেমন করে ভুলে-যাওয়া বিশেষ কোনো কথা মানুষের মনে পড়ে। চিন্তাটা মাথার ভেতরে খেলে যেতে সে কিছু সময় প্রেরণারহিতের মতন সিঁড়ির মাঝামাঝি অংশে থমকে দাঁড়িয়ে থাকল। সে বুঝতে পারল না কথাটা এমন করে কেন তার মনে হল। নয়ন বাড়ি আছে কি নেই এ সম্পর্কে এখনও সে নিশ্চিত করে কিছু জানতে পারেনি; তবু কেন এ ব্যাপারে অগ্রিম সংকেত পেলো, কিভাবেই বা পেলো। তখন সে একতলা পার হয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠে গেছে; আর কটা মাত্র ধাপ পার হয়ে সত্য-মিথ্যা জানা যাবে—তা সত্ত্বেও বাকি ধাপগুলি ভাঙতে কোনো রকম আগ্রহ বোধ করল না। এতক্ষণে খেয়াল হল যে সে দাঁড়িয়ে আছে নিরেট অন্ধকারের মুখোমুখি—তার বাঁ পাশ ঘেঁষে দেয়াল, ডান পাশে নিচু রেলিং, পায়ের নিচে সামনে যা পেছনের ধাপগুলি প্রায় চেনা যায় না এমন অবস্থা হয়ে আছে। সে এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সিঁড়ির মুখের বাতি জ্বালানো হয়নি, হয়ত সেইজন্যে দোতলার সিঁড়িতে পা দেওয়া মাত্র সংকেতটা ওভাবে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল—এর মধ্যে কোনো অলৌকিক ব্যাপার নেই। তবু, ঝোঁকের বশে না অন্য কিছুর টানে প্রায় অর্ধেক সিঁড়ি অন্ধকারে এভাবে পার হয়ে এসেও বুঝতে না পেরে রীতিমতন অবাক হয়ে গেল।

সামনের অনিশ্চিত ধাপগুলি আর না ভেঙে ওখানে দাঁড়িয়ে, 'নয়ন আছ, নয়ন—' বলে দুবার জোর গলায় ডাকার পর তার অনুমান সত্য প্রমাণ হল—কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সিঁড়ির যে অংশে সে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে নয়নের ঘরখানা এত সময়ে অস্পষ্ট নজরে এলো। দরজা বন্ধ, তবে তা ভেতর না বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। ডাক শুনে নয়ন কিংবা দীপমালা কেউ যখন বেরিয়ে এলো না তখন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকল না যে অসময়ে ঘর বন্ধ করে দুজনে কোথাও বেরিয়ে গেছে।

অপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে যতীন অন্যমনস্কের মতন নেমে আসছিল। দোতলার সিঁড়ি পার

আবরণ

সমীরণ দাশগুপ্ত

হয়ে একতলায় নেমে আসার পর কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না, সেও যেচে কারো কাছে নয়নের খবর জানতে চাইল না, যদিও লক্ষ করল একতলার প্যাসেজের মলিন আলোয় একজন বৃদ্ধ ঘাড় ফিরিয়ে একবার মাত্র তার দিকে তাকিয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ পেয়ে বৃদ্ধ বেরিয়ে এসেছিল কিনা সঠিক বোঝা গেল না। তবে তার তাকানোর ভঙ্গি এমন নিরুৎসুক সরলতায় আচ্ছন্ন ছিল যে তার বিশ্বাস হল না এই লোকটি নয়নের কোনো খবর জানে কিংবা তার নাম শুনে বেরিয়ে এসেছিল।

মণিমালা কিংবা নয়ন কেউ ঘরে নেই এর একমাত্র কারণ হতে পারে এমন কোনো কাজে ওরা বেরিয়ে গেছে যা আগে থেকে জানা ছিল না এবং যা ওদের কারো একার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। নইলে সে অসময়ে জেনেও দুজন এক সঙ্গে ঘর তালা-বন্ধ করে বেরিয়ে যাবার আর কি মানে হতে পারে। কাল সে যখন অফিস থেকে ফিরছিল সেই সময় নয়ন রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে কথাটা তাকে বলে। হঠাৎ দেখা, কেননা কদিন হয় সে ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি গিয়েছিল। কি একটা জমিজমা বিক্রি করে শহরতলিতে একটা বাড়ি করবার চেষ্টা করছিল সে। ছুটি নিয়ে দেশের জমি বিক্রির কবালা করে দিতে গিয়েছিল। সে সব কি হয়েছে না হয়েছে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায়নি। বাসে বসে নয়নকে ফার্নিচারের দোকান থেকে বেরোতে দেখে হাত নেড়ে ডেকেছিল। সে যে নয়ন, অন্য কেউ নয়—ভিড়ের ভেতরে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে যে সময়টুকু লেগেছিল তার মধ্যে নয়ন এক-পলক বাসের জানলায় চোখ তুলে তাকিয়ে-ছিল। তৎক্ষণাৎ নেমে যাবার কথা মনে হতে বাস ছেড়ে দিয়েছিল আর তার মুখখানা অন্ধকারে হারিয়ে যাবার আগে এই কথা কটি কানে ভেসে এসেছিল, 'কাল সন্ধে-বেলা একবার আসিস, জরুরী কথা আছে—।

ওই রকম তালাবন্ধ ঘরের দিকে তাকিয়ে ক্রমশ যেন সব যুক্তির ধার ভোঁতা হয়ে আসছিল যতীনের। বৃদ্ধের কৌতূহল-শূন্য চাউনি আর নয়নের কৈফিয়তহীন অনুপস্থিতির কথাই বার বার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। যতই কাজ থাকুক, সন্ধেবেলা তাকে আসতে বলেছে এ কথা ভুলে যাওয়া নয়নের উচিত হয়নি। এখানে আসতে তার তেমন দেরি হয়েছে মনে হল না। শীতের বেলা হলেও অফিসের পর সাড়ে পাঁচ ছটার আগে তাকে নিশ্চয়ই আশা করেনি সে। সম্ভবত নয়নের ছুটি এখনো চলছে, অফিসে গেলে তো এই রকমই সময় লাগত ফিরতে—তার অফিস সেই ডালহৌসিতে। তবে কি সে আসবে এ সম্পর্কে নয়নের মনে শেষ পর্যন্ত কোনো রকম সংশয় জেগেছিল। কিংবা হতে পারে কাল সে যাকে জরুরী মনে করেছিল তার চেয়েও জরুরী দরকার এসে পড়ায় কালকের কথা তার কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এ রকম হতেই পারে। তবে কাল কিংবা আজ কি ঘটেছে কিছু তার জানা নেই বলে গোটা ব্যাপারটা তার কাছে বিশ্রী অপমানজনক মনে হল। আরও মনে হল এই দুর্ব্যবহারের জন্য নয়নকে সে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবেনা, কোনোদিন না।

বাড়ি ফিরে যতীন অনেকক্ষণ নিজের ঘরে একা শুয়ে থাকল। তার চোখের ওপর সারাক্ষণের জন্য ভেসে থাকল তালাবন্ধ ওই দরজা। তুচ্ছ অপমানের চেয়ে অনেক বেশী পীড়াদায়ক মনে হল সেই কৌতূহল—যা নয়ন ওই দরজার ভেতরে বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেছে। কখনো আর কি সে সেই জরুরী কথাটা তাকে বলবে, বললেও এমন তীব্র কৌতূহল আর কী অনুভব করবে সে।

মনের মধ্যে চাপা অস্বস্তি নিয়ে তাড়া-তাড়ি শুয়ে পড়েছিল সে, হয়ত ঘুমও এসে গিয়েছিল। সহসা সদর দরজার কড়ানাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চোখে ঘোর নিয়ে উঠে যাবার আগে মাধুরী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে টের পেলো। রাত বেশী হয়নি, বড়জোর দশটা ছাড়িয়েছে। গলিতে লোক চলাচলের শব্দ শুনতে পেলো। তার মধ্যে উদ্বেগ আর উত্তেজনা ছিল বলে হয়ত তাড়াতাড়ি ঘুম এসে গিয়েছিল। মাধুরী একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে, যতীন ঘরে বসে শুনতে পেলো। গলা শুনে মনে হল তার মধ্যে কোনো কারণে অস্বাভাবিক উত্তেজনা রয়েছে, যদিও এতদূর থেকে তাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছিল না, কিংবা গলার স্বরে মেয়েটিকে চিনতেও পারছিল না। প্র

মুহূর্তে প্যাসেজে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। কৌতূহলে খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে উঠে বসা মাত্র পর্দা সরিয়ে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে যতীন ভীষণ অবাক হল। 'এ কি, মণিমালা, তুমি এত রাতে? না পাশার নয়ন আসেনি?'

মণিমালার চোখ মুখ অস্থির দেখাচ্ছিল। কোনো কিছু গুছিয়ে বলার মতন মনের অবস্থা বোধ হয় তার ছিল না।

মণিমালার পেছনে মাধুরী এসে ঘরে ঢুকেছিল। সে-ই বলল, 'ঠাকুরপোর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, হাসপাতালে রয়েছে। তুমি শীগ্‌গির যাও ওর সঙ্গে।'

'নয়নের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, সে কি'—সহসা যতীন শরীরের ভেতরে কি রকম অস্থিরতা অনুভব করল। আচমকা পক্ষাঘাতে যেমন কোনো অঙ্গ অবশ হয়ে যায়, বোধশক্তি রহিত হয়ে পড়ে, তেমনি অনুভব করল কোনো কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা তার ভেতরে যেন লোপ পেতে বসেছে।

ট্যাক্সিতে মণিমালার ছোট ভাই অপেক্ষা করছিল। তাদের হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে সে গাড়ি নিয়ে যাদবপুরে নয়নের বড়দাকে খবর দিতে যাবে।

যতীনের যেন চেতনা নেই এমন একটা ঘোরভাব নিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল।

যেতে যেতে নয়নের দুর্ঘটনার বিবরণ কিছুটা শুনতে পেলো মণিমালার মুখে। সে সন্ধ্যাবেলা অসময়ে এ খবর নয়ন আগে থেকে মণিমালাকে জানিয়ে রেখেছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে 'একবার ঘুরে আসছি' বলে বেরিয়ে যায়, আর ফেরেনি। তাদের ফেরার অপেক্ষা করতে করতে সাতটা নাগাদ পাশের বাড়ির টেলিফোনে দুর্ঘটনার খবর জানতে পারে।

কি বলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হবে যতীন ভেবে উঠতে পারছিল না। তাকে আসতে বলে নয়ন ভয়ে এই কাণ্ড করল—নির্বিবাদে হাসপাতালে গিয়ে শুয়ে থাকল। নয়ন কি নিশ্চিত জানত ওই মুহূর্তে রাস্তায় তার জন্য মৃত্যুর ফাঁদ পাতা রয়েছে। সে অসতর্কভাবে সেই ফাঁদে পা দিয়েছিল নাকি জেনে শুনে সেই অবধারিত পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। সত্যিই কি সে তার খোঁজে বেরিয়েছিল অথবা যার খোঁজে বেরিয়েছিল তার সঙ্গে তার ঠিকই দেখা হয়েছে, মাঝখান থেকে সে-ই কেবল বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

ভোরবেলা ট্যাক্সি থেকে নেমে যতীন কড়া নেড়ে মাধুরীকে ঘুম থেকে তুলল। সারা মুখে ঘাম ভেজার মতন এক রকম আঠালো ভাব জমে আছে। চোখ দেখে বোঝা যায় সারারাত ভাল ঘুম হয়নি। তার সঙ্গে নয়ন শেষ কয়েকবার এ বাড়িতে এসেছে। নয়নের সঙ্গে মাধুরীর গভীর আলাপ ছিল। মাধুরীর দিকে তাকিয়ে যতীনের মনে হল সারারাত নয়নের জন্য কেঁদে কেঁদে সে চোখ লাল করেছে।

অল্প সময়ের মধ্যে হাত মুখ ধোয়া, স্নান করা সব সেরে যতীন নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরে এলো। এসে টের পেলো ভেতরের অবসাদ এখনো কাটেনি—মাথার মধ্যে যেন কুয়াশার ঘোর জমে আছে। ওই অবস্থায় নয়নের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মুখের কাপড় সরে গিয়ে মুখটি বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তারার আলোয় মুখটি মনে হচ্ছিল কতদূরের। শেষবারের মতন কুয়াশা ভেদ করে তারার আলো নয়নের চোখের পাতা স্পর্শ করছিল, করে তার শরীরের পাশে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। যেন একটি অদৃশ্য পাথুরে দেয়ালে প্রতিহত হয়ে তা বার বার ফিরে আসছে।

মাধুরী চা নিয়ে ঘরে ঢুকে যতীনকে, অসময়ে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। মাধুরীর ডাকে চমক ভাঙার পর সে শুয়ে শুয়ে তাকে লক্ষ করছিল। চেতনার ভেতরে তার কি রকম অস্বচ্ছভাব জমে আছে যার ফলে সে প্রথমে ডাকটা খালি শুনতে পেলো, মাধুরীকে চোখে পড়ল একটু পরে।

'অমন করে শুয়ে আছ কেন, শরীর খারাপ করেছে?' মাধুরীর গলায় উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

'না, তেমন কিছু না, সামান্য মাথা ধরেছে।' বলতে বলতে যতীন চায়ের কাপ তুলে নিল।

'স্যারিডন খাবে, এনে দেবো? সারা রাত ঠাণ্ডা লাগিয়েছ, তার ওপর ঘুম হয়নি—'

যতীন অস্পষ্ট মাথা নেড়ে নিষেধ করল।

'মণিমালা খুব কান্নাকাটি করল, তাই না? ও মনে হয় বুঝতে পেরেছিল।'

এ কথার যতীন কোনো জবাব দিল না। এ রকম প্রশ্নের কী-ই বা জবাব দেবার আছে। নয়ন মারা যাবে এ কথা মণিমালা টের পেয়েছিল কিনা তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না। তাছাড়া এ কথা তার কখনো মনে হয়নি যে মণিমালা নয়নের মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত অনুমান করতে পেরেছিল। বরং উল্টো কথাই তার মনে হয়েছে। মণিমালা আগাগোড়া ধীর স্থির শান্ত আচরণ করছিল। সেটা এমনও হতে পারে নয়নের প্রাণের আশা তার কাছে আর ছিল না কিংবা সে আদৌ ওসব কিছু চিন্তা করছিল না, ফলে তার আচরণে অস্বাভাবিক স্থৈর্য এসেছিল।

'মণিমালা এখন কি করবে, থাকবে কার কাছে?'

এই মুহূর্তে এ রকম প্রশ্ন মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়, অসঙ্গতও নয়। তবু যতীন যেন এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মণিমালার মা বাবা আছেন, নয়নের বড়দার সংসারও খুব ছোট নয় বলে সে শুনেছে। একা মণিমালার পক্ষে থাকার জায়গার অভাব হবে বলে তো মনে হয় না। যতীন খানিকটা অনিচ্ছুক গলায় জবাব দিল, 'নয়নের বড়দাই সব করছিল, মনে হয় মণিমালা আপাতত তার ওখানে থাকবে।'

মাধুরী ফের জিজ্ঞেস করল, 'ঠাকুরপো কোথায় যেন জমি কিনেছিল, বাড়ি করার কিছুই বোধ হয় করে যেতে পারেনি?'

ঘুরে ফিরে কেবল একটা কথাই আসছে: মণিমালার জীবনের স্থিতি আর নিরাপত্তার প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব তার জানা আছে মনে হল না। সে কিংবা মাধুরী এখন এ নিয়ে বড়জোর দুশ্চিন্তাবোধ করতে পারে, আসলে এ প্রশ্নের মীমাংসা যার হাতে ছিল সে-ই তো সব মীমাংসা অসমাপ্ত রেখে চলে গেল। জমি কিনেছিল, সময় পেলে হয়ত বাড়িও করে যেতে পারত, কে জানে নয়ন তা পারল না, কিংবা আদৌ চাইল না। চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে নয়ন যদি বুঝতে পেরে থাকে সে যাই

করুক সব কিছু একদিন তার বিরুদ্ধে যাবে—তার তৈরি বাড়ি, তার সংসার, ওই মণিমালা সবাই একদিন তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয়—সব অক্ষমতা আর পঙ্গুতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বিদ্রূপই শুধু করবে না, হয়ত করুণাও করতে চাইবে, তাহলে তার দোষ দেওয়া যায় না। এবং কে বলতে পারে এই উপলব্ধি কাল তাকে হাত ধরে এই অন্ধকার রাস্তাটুকু পার করে দেয়নি।...

কয়েকদিন পর একদিন অফিস যাবার মুখে যতীন স্নান করে ঘরে এসে নিজের গেঞ্জিটা জায়গা মতন খুঁজে পেলো না। আলনার এক পাশে তার আন্ডারউইয়ার ধুতি পাঞ্জাবি সব রয়েছে, খালি গেঞ্জিটা নেই। মাধুরীকে ডেকে বলতে সে গেঞ্জিটা আলনা থেকে খুঁজে বের করে দিল। ঘটনাটা এত তুচ্ছ যে মাধুরী হয়ত কিছুই মনে করল না কিন্তু যতীন ব্যাপারটাকে সামান্য অন্যমনস্কতা বলে মেনে নিতে পারল না। তার মনে হল ব্যাপারটা এই মুহূর্তে আকস্মিক ভাবে ঘটলেও এর মূল আছে অনেক গভীরে। তখন গতকালের অদ্ভুত সেই অভিজ্ঞতার কথা তার মনে

পড়ল। আজ এ রকম একটা ব্যাপার না ঘটলে কালকের কথা সে হয়ত ভুলেই যেত। কিন্তু অন্ধকারে কোনো কিছু সংকেত আসার মতন হঠাৎ সব কিছু মনে পড়ে গেল।...কাল স্নান করতে ঢুকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করা মাত্র শরীরের ভেতরে কি রকম অস্থিরতা জেগে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত কোথায় কি আছে কিছু ঠাহর করতে পারছিল না। সহসা তার কেমন ভয় করতে লাগল : এখান থেকে চিৎকার করলেও বাইরে কেউ তার গলা আর কখনো শুনতে পাবে না। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় শরীর দিয়ে দর দর করে ঘাম ছুটছে, দরজার ঠিক কোন খানটায় শেকল তুলেছে বার বার চেষ্টা করেও জায়গাটা সে চিনতে পারছিল না। তখন সে এগিয়ে গিয়ে চৌবাচ্চার ঠান্ডা কালো জলে হাত রাখতে সমস্ত রোমকূপ বেয়ে এক রকম শীত-ভাব তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। খুব অস্পষ্ট মনে হল যেন কতকাল আগে এই রকম শীতল-তার মধ্যে সে নিরুদ্বেগে ঘুমিয়েছিল, তারপর কি এক অজানা আকর্ষণ তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। গভীর মমতা নিয়ে সে জলের মধ্যে গোটা হাতখানা ডুবিয়ে দিল। হাতের মৃদু নাড়া পেয়ে চৌবাচ্চার থাকের সবুজ শ্যাওলা দুলেছিল, দুলে দুলে ক্রমশ যেন জীবন্ত হয়ে তার জলে ডোবা হাতখানা স্পর্শ করতে চাইছিল। তখন চৌবাচ্চার পাড়ে শরীরটা ঝুঁকে পড়ে সে শ্যাওলার মধ্যে হাতখানা বার বার নাড়াচাড়া করতে লাগল। ওটা যেন তার হাত নয়, মনে হল আস্ত একটা মাছ ওই রকম অনন্তকাল ধরে শ্যাওলার মধ্যে স্বাধীনভাবে খেলা করে বেড়াচ্ছে। বাথরুমের শীতল আবহাওয়া, শ্যাওলার স্পর্শ আর কল্পিত মাছের সাবলীল বিচরণ সব মিলিয়ে এক মায়াবী জগতের আকর্ষণ তাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিল।...

কাল সারাদিনে আর একবারও একথা মনে পড়েনি। অফিসে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করেছে, অফিস থেকে ফিরেছে রোজকার মতন—কোথাও কোনো গোলমাল হয় নি। আজ হঠাৎ গেঞ্জি খুঁজে না পাওয়ার সূত্রে একে একে সব মনে পড়তে যতীন বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। এই মুহূর্তে তার মনে কেমন একটা সংশয় দেখা দিল। গেঞ্জি সে খুঁজে পায়নি, না পেতে চায়নি। কাল বাথরুমের দরজার শেকল তুলে বার বার ভুল জায়গায় হাত দিয়েছে—সে ভুল কী তবে তার ইচ্ছাকৃত ছিল। যেমন আজ গেঞ্জি খুঁজতে গিয়ে, তেমনি কাল বাথরুমে ঢুকবার পর কিছুক্ষণ তার মধ্যে বাইরের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, এই সুযোগে ভেতরে বসে কেউ যেন তার হাত দিয়ে পর পর এই ভুলগুলি

ফিরিয়ে নিয়েছে।

আগামীকাল ছুটির দিন বলে আজ প্রথম দিকটায় ঘণ্টা দুয়েক খুব ভিড় ছিল যতীনের কাউণ্টারের সামনে। কাজের চাপে সে প্রায় নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পাচ্ছিল না। তবু এক ফাঁকে যতীন লোকটিকে দেখতে পেয়েছিল। লোকটি তার কাউণ্টার ছাড়িয়ে পাশের রিসিভিং কাউণ্টারের দিকে যেতে যেতে তার দিকে তাকিয়ে একবার অদ্ভুত ভাবে হাসল। যতীন কোনো প্রত্যুত্তর না করে টোকন ফেরত নিয়ে মাথা নিচু করে টাকা গুনে যেতে লাগল।

টিফিনের সময় লোকটাকে সে লেজারের শ্যামের সঙ্গে বসে গল্প করতে দেখে বিরক্ত হল। কমাস ধরে লোকটা তার পেছনে লেগে আছে। একদিন সে বুঝি কথায় কথায় তার একটা তিন চার বছরের পলিসির বিষয়ে বলেছিল, ওটা ফের চালু

কথা যায় কিনা জানতে চেয়েছিল, তারপর থেকে লোকটা নানা অজুহাতে একবার করে এসে মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ খেয়ালে বলেছিল, তারপর আর কাগজপত্র খুঁজে দেখার আগ্রহ হয়নি। এখন মনে হল লোকটা অকারণ তাকে উত্যক্ত করে মারছে।

শ্যামের টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকটা কথা থামিয়ে তার দিকে হাসি মুখে নিয়ে তাকিয়ে বলল, 'ভাল আছেন, যতীনবাবু? ওটা খুঁজে দেখেছিলেন?'

যতীন অন্যমনস্কের ভান করে বলল, 'কোনটা...ও হ্যাঁ, না, দেখা হয়ে ওঠেনি, দেখি আজকালের মধ্যে যদি পারি।'

শ্যাম, যার টেবিলে লোকটি বসেছিল, তার বয়স নিতান্ত অল্প, চাকরিতে ঢুকেছে সবে, মাত্র বছর দুয়েক। এতক্ষণ সে প্যাডের ওপর কি একটা হিসেব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মাথা তুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'কী ভয়ঙ্কর সিচুয়েশান যতীনদা, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। আপনাদের ওদিকটা তবু তো অনেক শান্ত শুনি, আমাদের পাড়ায় কাল সকাল-বেলা দুটো ডেড্ বডি পাওয়া গেছে, সন্ধ্যেবেলা তাই নিয়ে দু' দলে এক চোট

'বোমাবাজি হয়ে গেছে, দু' পক্ষেরই দু'জন করে যায়েল হয়েছে, মাঝখানে একটা সাত-আট বছরের ইনোসেণ্ট ছেলের মাথায় রডের বাড়ি লেগেছে—বাঁচে কিনা ঠিক নেই। নাহ্, আমি তো কোনো ভরসা পাচ্ছি না। বছরখানেক হল পাঁচ হাজার টাকার একটা পলিসি করেছি, ভাবছি আরও পাঁচ হাজার করে ফেলব, ব্যস, তারপর যা হয় হোক।'

যতীন এবার হেসে ফেলল, 'যা হয় হোক মানে? তুমি ছেলেমানুষ, বিয়ে থা করোনি, তোমার ভয় কিসের?' বোধ হয় বলতে চেয়েছিল, মরতে অত ভয় কিসের।

বেশ একটু নার্ভাস হয়ে রঙীন পেন্সিলটা আঙুলে জড়ানোর খেলা খেলতে খেলতে শ্যাম জবাব দিল, 'না, ঠিক ভয়ের কথা নয়। কিন্তু এভাবে মরারই বা কি অর্থ হয়, আপনি বলুন। তবে যাই কেন ঘটুক আমার কম করে আরও অন্তত পঞ্চাশ বছর বাঁচতেই হবে, আমি হিসেব করে দেখেছি।'

'তাই বুঝি পলিসি করে যাচ্ছ? তোমার এ হিসেবটা মাথায় ঢুকছে না তো!'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্যাডে রঙীন নকশা কাটতে কাটতে শ্যাম জবাব দিল, 'এটা এক-রকম সান্ত্বনা হল আর কি। আমি বেঁচে থাকলে দশ হাজার টাকার অনেক বেশী রোজগার করব, জানি, তবে যদি মাঝখানে কিছু ঘটেই যায় তখন আমার বুড়ো মা-বাবার কি হবে, এইসব ভেবে চিন্তে—'

অফিস ছুটি হওয়ার কিছুক্ষণ আগে নিচে রাস্তায় একটা বড় রকমের গোলমাল শোনা গেল। যতীন ক্যাশিয়ারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে লক্ষ করল অফিসের ভেতরে কেমন চাপা উত্তেজনা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দোতলার কোলাপসিবল গেট টানার শব্দ শুনে মনে হল অফিসের ভেতরেই হয়ত বা কিছু ঘটেছে। পরক্ষণে বুঝতে পারল, যা ঘটেছে বাইরে, রাস্তায়। বাইরের ব্যালকনিতে কয়েকজন ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখছে, তাদের মধ্যে শ্যামও রয়েছে।

যতীন ব্যালকনিতে এসে চারদিকে তাকিয়ে বিশেষ কিছু বুঝতে পারল না। রাস্তার ডানদিকে ক্রসিংয়ের মোড়ে কিছু ভিড়, বাঁদিকেও একই দৃশ্য, উল্টোদিকের ফুটপাতে অর্ধবৃত্তাকারে ভিড় করে লোক দাঁড়িয়ে আছে। যতীন কিছু বুঝতে না পেরে শ্যামকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার শ্যাম, কি হয়েছে?'

শ্যাম উত্তেজিতভাবে বলল, 'একটা লোককে পুলিস তাড়া করেছে শুনলাম, আর তো দেখতে পাচ্ছি না।' তার কথা শেষ হবার আগে রাস্তার বাঁ দিকের গলি থেকে একটি ছেলেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে দেখা গেল, তার পেছনে কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিস। ছুটন্ত ছেলেটি [illegible] সাঁ করে বাঁদিকে ঘুরে [illegible] উল্টো দিকে ছুট লাগাল। কিন্তু [illegible] দরজা [illegible] খোলা না পেয়ে ফিরে [illegible] এলোমেলো-ভাবে দৌড়তে লাগল। [illegible] ব্যালকনির তলা দিয়ে চলে [illegible] হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'অভীক, ওতো আমাদের অভীক—।'

ভীষণ চমকে গিয়ে যতীন শ্যামের দিকে [illegible] ফেরাল। ত্রাসে শ্যামের মুখ পাংশু [illegible]; চোখের জ্যোতি যেন নিভু নিভু [illegible] আসছে। 'ছেলেটিকে তুমি চেন নাকি?' যতীন জিজ্ঞেস করল।

'চিনি না, ও তো অভীক। বড়দার, আমি

আমাদের নিয়ে যায়?

যতীন প্রায় ধমক দেবার মতন করে বলল, অপদার্থ হয়েছে। পুলিস যে ভাবে ঘিরে ফেলেছে, ওতো ধরা পড়ল বলে। এখন ওখানে অতগুলো কত রিস্ক বুঝতে পারছ?'

'হোক রিস্ক, তবু আমায় যেতে হবে। ও আমার বন্ধু অভীক না হলে আমি হয়ত যেতে ভয় পেতাম কিন্তু এখন আর আমার না গিয়ে উপায় নেই।'

কারো নিষেধ না শুনে শ্যাম নিচে নেমে গেল।

প্রায় ছটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর শ্যাম ফিরল না দেখে যতীন বেরিয়ে পড়ল। বন্ধুকে ছাড়াবার জন্য শ্যাম অত্যধিক সাহস দেখাতে গিয়ে হয়ত নতুন কোনো ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসেছে। শ্যামের চোখে তার বন্ধু নির্দোষ হতে পারে, পুলিস নিশ্চয়ই ভুল খবরের উপর ভরসা করে তাকে ধরতে আসে নি। আর তাছাড়া দোষ না থাকলে সে সাধারণ লোকের মত ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারত। আর লোকটার মত পুলিশের যে তাকেই ধরবার জন্য ফাঁদ পেতেছিল ছেলেটার ছুটোছুটি এটাই প্রমাণ করে। শ্যামের জন্য যতীনের মনে দুঃখ হল।

মণিমালা কয়েকদিনের মধ্যে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আপাতত মেজো ভাইয়ের বাড়ি উত্তরপাড়া গিয়ে উঠবে, সেখানে একটা মেয়ে স্কুলে মাস্টারী প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। ভাবছে বি-টিটা দিয়ে নিতে পারলে ওখানেই একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে, আশা রাখে। এই সব নানা আশার খবর শোনাবার পর মণিমালা বলল, 'আমাদের এই জমিটা বিক্রি করার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে, একেবারে নিঃসম্বল হয়ে আমি কোথাও যেতে চাই না।'

যতীনের মনে হল অন্তরে তাগিদ হয়ে থাকলেও এই কথা তাদের জমিটা তুলে নেবার আগ্রহ বোধ করছিল না কোনোরকম। তার হাতের সিগারেট মিছামিছি পুড়ে যাচ্ছিল।

অনেক পরে যতীন বলল, 'কিন্তু ও জমিটা এত তাড়াতাড়ি বিক্রি হবে মনে হয় না। দমদমের ওসব এলাকায় তো আজকাল খুবই গোলমাল শুনি।'

মণিমালা একটু রুদ্ধ গলায় অভিযোগ করার মতন সুরে বলল, 'যখন কেনার কথা হয়, দেখে এসে আমি বারণ করেছিলাম, উনি শুনলেন না সস্তা খুঁজতে গেলেন। ওখানে তো কোনোদিন আর বাড়ি তোলা হবে না, খালি পড়ে থাকলে কোনদিন রিফিউজিরা দখল করে নেবে। যে দাম পাওয়া যাক, তাই এখন লাভ। আপনি দেখবেন।'

'আচ্ছা' বলে যতীন উঠে পড়ল।

সিঁড়িতে বাতি জেলে যতীন নিচে না নেমে যাওয়া পর্যন্ত মণিমালা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়িতে আলো, ঘরের আলোর নির্মম প্রতিফলন মণিমালার শরীর ঘিরে পাহারার মতন দাঁড়িয়ে আছে তবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে যতীনের মনে হ'ল এক ফোঁটা আলো এতদিনেও যেন মণিমালাকে ভেতর থেকে স্পর্শ করতে পারেনি।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যতীন একতলার অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যেতে লাগল।

বাংলাদেশ ও বিশ্ববিবেক

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশে বিগত একবছরে যে সব ঘটনাবলী ঘটে গেল তাতে আমাদের দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও বুদ্ধিবৃত্তির লোকে বিভিন্ন রকমে সাড়া দিয়েছিলেন। একদিকে বেদনা, ক্রোধ, এবং ঘৃণা, ও অপরদিকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিজয়ে অদম্য আশা এবং উত্তেজনা—সম্ভবত এই ছিল অধিকাংশ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। এর ব্যতিক্রমও ছিল। কিছু বুদ্ধিজীবী বক্তঅলা বলেছিলেন যে বাংলাদেশ নিয়ে বড্ডো বাড়াবাড়ি করা হয়ে যাচ্ছে; কিছু লোককে মেরেছে, কিছু মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, আর কিছু বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে; দুঃখের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রদেশ যদি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে তো কিছুটা এরকম হতে বাধ্য; তাছাড়া সার্বভৌম পাকিস্তান সরকারের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলানোর কী অধিকার আমাদের আছে? আমাদের দেশে কি অন্নবস্ত্রের প্রকট সমস্যা নেই? বস্তুত তিরিশ লক্ষ লোককে সেনাবাহিনী হত্যা করুক, অথবা তারা অনাহারে মারা যাক, এ দুয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। আমরা যদি দ্বিতীয় ঘটনাটি বছরের পর বছর নির্বিকারে প্রত্যক্ষ ক'রে থাকতে পারি প্রথমটির ব্যাপারে হঠাৎ এত উন্মাদ কারণ কী? কিছু লোক এও বলেছিলেন, সাম্রাজ্যলোভী ভারত স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান সরকারের জমিতে অনুপ্রবেশ করে নির্লজ্জ আক্রমণাত্মক কাজ করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের অনেক মাতব্বর ব্যক্তি বিবেককে একইভাবে চোখ ঠেরে এসেছেন, এবং তাঁদের উপযুক্ত প্রতিভূ রাষ্ট্রসংঘ তা অনুমোদন করেছেন, কিন্তু আমাদের দেশও যে বিদ্যায় পশ্চাৎপদ নন তার প্রমাণ দাখিল করেছেন উপরিউক্ত উগ্র বুদ্ধিজীবীরা।

সুখের কথা বুদ্ধিজীবীদের আরেক-রকমের চেহারাও আমরা দেখতে পেয়েছি। এঁদের অনেকে পাকিস্তানের জন্মবৃত্তান্ত খতিয়ে দেখেছেন; পূর্ববাংলার সঙ্গে –

পাঞ্জাবী পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের সম্পর্কের কী কী দলিল আছে তা তাঁরা জানেন; এবং বিগত একবছরের ঘটনাবলী যে ঠিক কীভাবে মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করেছে, অত্যাচারিত দেশের প্রতি দায়িত্ব

বিচার [illegible] কেবল [illegible] [illegible] এবং [illegible] বিরুদ্ধে কী [illegible] পূর্ববঙ্গগোষ্ঠী মাসের পর মাস চালিয়ে গেছে, এবং তার চূড়ান্ত বিচার কোন আইনে হবে এবং কোথায় হবে — তা তাঁরা বলে দিতে পারেন। বেলসেন-বাগেন, বিকেনাউ, বুখেনওয়াল্ড এবং আউসউইৎজের মারাত্মক ঘটনাবলীর পরও যে হরিহরপাড়া সম্ভব হতে পারে একথা সভ্যজগৎ কোনোদিন ভাবে নি। কিন্তু এবিষয়ে যদি আন্তর্জাতিক বিবেক এখনও সচেতন না হয় তাহলে ১৯৭১ সালের হরিহরপাড়াও ম্লান হয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতের কোনো উন্মাদতর জল্লাদের সর্বনাশা পরিকল্পনার কাছে। পৃথিবীতে এখনো অন্তত কুড়িটি স্বৈরতন্ত্রী দেশ আছে যেখানে যে কোনো মুহূর্তে অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। অতএব এবিষয়ে অনবহিত অবিবেক মারাত্মক।

বিশ্ববিবেকের কাছে এই আবেদন উপস্থাপনা করেছেন বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মৃত, এক কোটি বাস্তুহারা, এবং আরো কুড়ি লক্ষ অত্যাচারিত ব্যক্তির কৌঁসুলি সুব্রত রায়চৌধুরী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের প্রথম জন্মবার্ষিকে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে।* কলকাতা হাইকোর্টের এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার আমাদের আর পাঁচ জনের মতোই পূর্ববাংলায় তাণ্ডবের সূচনার কথা জানতে পারেন রেডিওর খবর শুনে। এর প্রায় অব্যবহিত পরেই শরণার্থীর ভিড় জমে তাঁর বাড়িতে। কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যসমাপন সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। বইটির সূত্রপাত সেই সময়, কেননা লেখক উপলব্ধি করেছিলেন যে বৈষয়িক সহায়তার চেয়ে তখন অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল বিশ্ববিবেকের কাছে বাংলাদেশের প্রকৃত সওয়াল উপস্থিত করা। কেন বাংলাদেশ, কীভাবে বাংলাদেশ, এবং স্বাধীনতালাভের পর বিশ্বরাষ্ট্রমণ্ডলীতে বাংলাদেশের প্রাপ্য অধিকারের স্বীকৃতি কেন আশুপ্রতর্ক্য, এই বিষয়গুলির গুরুত্ব তিনি তখনই উপলব্ধি করেন। দীর্ঘ আট মাসকাল তিনি গ্রন্থরচনায় নিমগ্ন ছিলেন; ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে যেহেতু এই গ্রন্থরচনায় তিনি ব্যাপৃত হন নি, শিশতাধিক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। রয়্যাল আটপেজি বিয়াল্লিশ ফর্মার এই বই তিনি লিখেছেন জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত; গ্রন্থপ্রকাশের মাত্র দুমাস ঘটনাবলীর উল্লেখ ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিষয়ে একাধিক বই আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি। তার কয়েকটি ভালো, কয়েকটি না লেখা হলেও কিছু এসে যেতো না। কিন্তু কোনো বইয়ের আয়তনেই বাংলাদেশের যাবতীয় প্রশ্নের আলোচনা বিধৃত নেই। পাকিস্তানের বাংলাদেশ ধর্ষণ বিষয়ে বই লেখা হয়েছে, বাংলাদেশে যুদ্ধের সচিত্র বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ে পাওয়া যাবে, পুরোপুরি অর্থনীতি, অথবা সাংবিধানিক আইন, অথবা বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো পণ্ডিত বাংলাদেশের ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন, ভারত সরকারের 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস' নামক বৃহৎ গ্রন্থেও বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলদস্তাবেজের বিস্ময়কর সমাবেশ দেখা যাবে, কিন্তু এপর্যন্ত এমন একটিও গ্রন্থ লেখা হয় নি যাতে পাকিস্তানের জন্মপত্রিকা, পূর্ববাংলায় চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী শোষণের কলঙ্কময় ইতিহাস, মানব-ইতিহাসে অভূতপূর্ব গণহত্যার বিশ্লেষণ, মুক্তি-বাহিনীর আনুপূর্বিক ইতিহাস, বিশ্ব-বিবেকের অনীহা এবং অত্যাচারীর প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়, বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের স্বীকৃতিদান এবং সেই বিষয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পথনির্দেশ, এবং সর্বশেষে, স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রশাসনিক দায়িত্বপালনে বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা ও সাফল্যের ইতিহাস— এমন আর একটি বইও নেই যাতে একাধারে সব বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। যদি আমরা একথা মনে রাখি যে শত্রুকবলিত বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে সবেমাত্র তিন মাস, তাহলে বলতে হয় প্রায় অসাধ্য সাধিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

বাংলাদেশে নরহত্যাকারী এবং নারীধর্ষক পাপিষ্ঠদের অবশ্যই বিচার হবে, এবং তাদের উপযুক্ত দণ্ডবিধান সমাসন্ন। কিন্তু কোন্ আইনে বিচার হবে? বিচারক হবে কারা? অভিযোক্তাদের কি বিচারক হবার কোনো অধিকার আছে? বিচারের স্থান হবে কোথায়? বিশ্ববাসী এইসব প্রশ্নে সম্প্রতি মুখর হয়ে উঠেছেন। ইতি-মধ্যে এই নিয়ে কিছু কিছু পরস্পরবিরোধী অভিমতও প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাবৎ প্রশ্নের জবাব শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী দিয়েছেন। গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের পরিশিষ্টে দীর্ঘ কুড়ি দফা অভিযোগের ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন, এবং প্রতিটি দফা অভিযোগের পাশে উল্লেখ করেছেন আন্তর্জাতিক আইনতন্ত্রের কোন ধারা তার দ্বারা লঙ্ঘিত হয়েছে। যেদিন অপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে, সেদিন আইনজীবীর এই পরিশিষ্টে আন্তর্জাতিক আইনের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে, তার মূল্যায়ন হবে।

* * *

বাংলাদেশ সঙ্কটে আপনি-মোড়লী করার চেষ্টা অনেক রাষ্ট্রই করেছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে নির্লজ্জ চেষ্টা ছিল নিক্সন-কিসিঙ্গার পরিচালিত বিশ্বের সর্বশক্তিমান গণতন্ত্রের। চোখ-রাঙানো এবং মুখখিস্তি থেকে শুরু করে মালকোঁচা সেঁটে আসরে নেমে পড়ার উদ্যোগ পর্যন্ত কিছুই এই মহাত্মাদ্বয় বাকি রাখেন নি। দুঃখের বিষয়, হিলাল-ই-পাকিস্তান এবং হিলাল-ই-জুরাআতের পতন ও মূর্ছা এত শীঘ্র ঘটে গেল যে, তাঁদের জানা উৎকৃষ্ট প্যাঁচ-গুলি (যা ভিয়েতনামের যুদ্ধে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন) দোস্তের কোনো কাজে লাগাতে পারলেন না। আমেরিকার লক্ষ লক্ষ মানুষের মতকে উপেক্ষা করে নিক্সন-কিসিঙ্গার পাকিস্তানকে মদত দিয়েছেন; অধিকাংশ আমেরিকার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা যখন বাংলাদেশের সমর্থনে সোচ্চার, আমেরিকার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এই দুঃশাসনদ্বয় তখন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু আমেরিকা সম্বন্ধে, তার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণালাভের জন্য লেখক অধ্যয়ন করেছেন জেফারসনের রচনাবলী, লিঙ্কনের রচনাবলী; পর্যালোচনা করেছেন উইলসন-রুজভেল্ট-কেনেডির রাষ্ট্র-পরিচালনার ধ্রুব আদর্শাবলী। আমেরিকার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেছেন যে, বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের নজির পাওয়া যাবে ১৮৬১—৬৫ সালে ঘটিত আমেরিকার অন্তর্ঘাতী গৃহযুদ্ধে নয়, বরং ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিত তার স্বাধীনতা সংগ্রামে। যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে নিন্দাবাদ করে থাকেন, তাঁদের অবগতির জন্য লেখক দেখিয়েছেন, এক নয়, সাত-সাতটি সঙ্গত কারণে সেই তুলনা অর্থহীন। বাংলাদেশ ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানের উপনিবেশ মাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল; শেখ মুজিবের বিখ্যাত উক্তি 'স্বাধীন দেশে পরাধীন নাগরিক' এই হীন অবস্থারই বর্ণনা। কেবলমাত্র আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণার সুপ্রাচীন সনদ নয়, এমন কি ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নীতি নির্ধারণের দলিল অনু-যায়ীও বাংলাদেশের পরিপূর্ণ অধিকার ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণার। এই প্রচেষ্টায় তার স্পষ্ট অধিকার ছিল বিশ্ববাসীর সমর্থন লাভের। দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেই দলিলের উপযুক্ত মর্যাদা ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোনো দেশ দেয়নি। চীন এবং আমেরিকা অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীকে মদত যুগিয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ একাধারে সমর্থন করেছে পাকিস্তানকে, আর চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ভারতের

সহায়তা থেকে [illegible] করে [illegible] বিরত করতে। বিশ্ববিবেক এবং বিশ্বরাজনীতির এই অগ্নিপরীক্ষায় পৃথিবীর সমস্ত দেশই ঈষৎ দগ্ধ হয়েছিল, একমাত্র যে দেশ অস্পৃষ্ট ছিল সে হল ভারত। বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে দেন নি, জনমতের চাপেও নয়। স্বাধীনতাকামী দেশকে স্বীকৃতিদানের চিরাচরিত কতকগুলি নীতি ছিল, আবার জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কতকগুলি নীতি ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নির্ধারণ করে দেয়; এই দুই নীতির সমন্বয় সাধন প্রথম ঘটালেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের স্বীকৃতিদানের ঘোষণা-পত্র তাই অ-সাধারণ এক দলিল।

* * *

মূল গ্রন্থ তিনশো পাতার, বিশদ নির্ঘণ্ট কুড়ি পাতার, ভূমিকা চার পাতার, এবং গ্রন্থ পরিচিতি চোদ্দ পাতার; সব মিলিয়ে সুবৃহৎ কাণ্ড: পড়তে সময় লাগে। লেখকের কাছে বর্তমান পাঠকের একটিমাত্র অভিযোগ আছে : বক্তব্যের হানি না ঘটিয়ে বইটি কি কিছু সংক্ষিপ্ত করা যেত না? পুনরাবৃত্তি একাধিক স্থানে আছে; মনে হয় দীর্ঘ এক মামলার কৌঁসুলি সাহেব অনেকদিন ধরে সওয়াল করছেন, বিচারক অশীতিপর না হলেও প্রাচীন, এবং সম্ভবত নিদ্রাতুর। তাঁর স্মৃতিশক্তির ওপর কৌঁসুলির বিশেষ আস্থা নেই। কেসটা যেহেতু গুরুতর, ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে। স্পষ্টতই জজসাহেবকে একেবারে বোকা না ভাবলেও শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী যে তাঁকে খুব বেশি সমীহ করেন এমন মনে হয় না। তবে পেশার ছাপ প্রত্যেক রচনায় থাকা স্বাভাবিক, যদিও বর্তমান রচনা যে লেখকের ওকালতি পেশারই ফল এ কথা বলা সম্ভব নয়। আইন আদালতের অভিজ্ঞতা যাঁদের কিছুমাত্র আছে তাঁরা আবিষ্কার করে সুখী হবেন যে আমাদের দেশে এখনো এমন এক-আধজন আইন ব্যবসায়ী আছেন যাঁদের গবেষণায় অনুরাগ আছে, এবং অর্থকরী না হলেও দায়িত্ব গুরু হলে যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করতে বিমুখ নন। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও বিশ্বের দরবারে তার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হয় নি। এই বইটি তাতে বিশেষ সহায়তা করবে সন্দেহ নেই।

---

* **Subrata Roy Choudhury** : The Genesis of Bangladesh : A study in International Legal Norms and Permissive conscience. **Asia Publishing House : Rs. 36.00.**

মহাভারতের কথা

বুদ্ধদেব বসু

৬ : এক বিশ্ববিদ্যালয়

সম্মিলিত ইলিয়াড ও অডেসির চাইতে মহাভারত আটগুণ বেশি দীর্ঘাকার, আর তার মধ্যে বনপর্বটি একাই একটি ইলিয়াডের সমান। দৈর্ঘ্যে একে অতিক্রম করে শুধু উপদেশ-ধর্মী কথিকাকীর্ণ শান্তিপর্ব; কিন্তু ঘটনাবহুল বিরাটের সঙ্গে উদ্যোগ, আর উদ্যোগের সঙ্গে ভীষ্মপর্বকে জুড়ে দিলে যা যোগফল দাঁড়ায়, বনপর্বের ঠিক ততটাই ব্যাপ্তি। আরো লক্ষণীয়: ঠিক সেখানে ও সেই মুহূর্তে ঘটছে এমন ঘটনা বনপর্বে বিরল; এর আয়তনের বড়ো অংশটা জুড়ে আছে অতীতকাহিনী—উপাখ্যান। কেন, যখন সবেমাত্র প্লট জ'মে উঠছে, তখনই এত পুরাতন কথার অবতারণা, কৌতূহলজনক আসন্নকে ঠেকিয়ে রেখে অতীতের দিকে ফিরে-ফিরে তাকানো? মানছি, এই সুযোগে কয়েকটা মনোমুগ্ধকর কাহিনীকে স্থায়িত্ব দেয়া হ'লো, কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কি?

অনিবার্যভাবে মনে পড়ে অন্য এক পৌরাণিক পুরুষ, লোকমানসে কৃষ্ণের পরেই যাঁর স্থান—তিনিও ভ্রাতা-পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে চোদ্দ বছর বনবাসে কাটিয়েছিলেন। এই দুই বনবাসের মধ্যে চাক্ষুষ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এদের অন্তঃপ্রকৃতি যে কত ভিন্ন, তা রামের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের তুলনা করলেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। দুয়েরই মূল কথা হ'লো সত্যরক্ষা, কিন্তু এ-দুই সত্যের ধরন একেবারে আলাদা। যে-কারণে বনবাস, সেটা রামের অজান্তে ঘটেছিলো, আর যুধিষ্ঠির সেটা নিজেই ঘটিয়ে তুলেছিলেন। রাম যেখানে রাজ্যত্যাগী, যুধিষ্ঠির সেখানে রাজ্যহারা: রাম যেখানে বন-গামী, যুধিষ্ঠির সেখানে নির্বাসিত। দশরথ নিজে, এবং অযোধ্যায় অন্য অনেকেই রামকে বাধা দেবার চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বনযাত্রার বিষয়ে অনেক খেদোক্তি উচ্চারিত হ'য়ে থাকলেও কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি—করার কোনো উপায় ছিলো না। যুধিষ্ঠিরকে বনে যেতে হ'লো—কোনো ঈর্ষাতুর বিমাতার চক্রান্তে নয়, কোনো স্ত্রৈণ পিতার স্খলিত বাক্যে আবদ্ধ হ'য়ে নয়—স্বদোষে, এক স্বকৃত কর্মের ফলাফলস্বরূপ। দুর্যোধনের অসূয়া, শকুনির শাঠ্য—এ-সব কিছুই তাঁকে মার্জনীয় ক'রে তোলে না, কেননা তিনি ইচ্ছা করলেই দ্যূতসভায় না-গিয়ে পারতেন, আর ঐ দুষ্ট ক্রীড়া—একবার নয়, দু-বার অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এতদিনে যে-একটি কর্ম তিনি নিজের দায়িত্বে সাধন করলেন, তারই জন্য তাঁর ভাইয়েরা আজ ভিক্ষা-জীবী, দ্রৌপদীর মনে সুখ নেই। তিনি ভুলতে পারেন না তিনি অপরাধী, তাঁর প্রিয়জনেরাও মাঝে-মাঝে তাঁকে মনে করিয়ে দেন (১৮)। বনবাসকালে রামের সব দুঃখ এসেছিলো বাইরে থেকে, তাঁর চিত্তে অপ্রসাদ ছিলো না; আর যুধিষ্ঠিরকে দেখি বহিরাগত বিপদে ততটা বিব্রত নন, যতটা তাঁর নিজেরই মনে পরিতপ্ত। তাছাড়া, অরণ্যকান্ড প্রথম থেকেই সীতাহরণকে লক্ষ্য ক'রে চলেছে: দ্বিতীয় সর্গেই বিরাধরাক্ষসের ব্যাপারটায় তার ছায়াপাত হ'লো; আর তার পর থেকে শূর্পণখার আগমন পর্যন্ত আমরা দ্রুত সেই চরম ঘটনার নিকটতর হচ্ছি। কিন্তু বনপর্বে কোনো ঘটনামূলক অভিপ্রায় নেই (১৯)—বা যদি বা থাকে সেটা প্রকট নয়, আভ্যন্তরীণ, যান্ত্রিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। এবং সেটা যুধিষ্ঠিরেরই জীবনী-সংক্রান্ত, অন্য কারো নয়।

ভেবে দেখা যাক, অরণ্যকান্ডে রামের ক্রিয়াকর্ম কী, আর বনপর্বে যুধিষ্ঠিরই বা কী নিয়ে ব্যাপৃত। রামকে দেখছি অর্জুন-ভীমের যুগ্ম ভূমিকায় অবতীর্ণ, কিন্তু যুধিষ্ঠিরো-চিত কোনো আচরণ তাঁর নেই। লক্ষ্মণ-সহ বহু রাক্ষস তিনি বধ করলেন, সংগ্রহ করলেন অগস্ত্য মুনির কাছে দিব্যাস্ত্র; কিন্তু দশ বছর ধ'রে বনে-বনে ঘুরে (২০), অনেক মুনিঋষির সাক্ষাৎ পেয়েও, তিনি তাঁদের কাছে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলেন না, কিছু জানতে চাইলেন না—বসবাসের পক্ষে যোগ্য বন কোনটি হবে, এই তথ্যটি ছাড়া। চতুর্দশ সর্গে জটায়ু তাঁকে সংক্ষেপে একটি সৃষ্টিকাহিনী শোনালো; রাম তা থেকে ছেঁকে নিলেন তাঁর পিতার সঙ্গে জটায়ুর সৌহার্দ্যের অংশটুকু—সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। আর তারপর জটায়ুর কাছে সীতাকে রেখে, চ'লে গেলেন ঘর বাঁধার জন্য লক্ষ্মণসমেত পঞ্চবটী বনে। কোনো পাঠকের যদি মনে পড়ে পূর্বোক্ত অন্য একটি সৃষ্টিবর্ণনা (বন: ১৮৮), মনে পড়ে যুধিষ্ঠির সেখানে পরম্পর কেমন প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছেন—কোনো কার্যকর উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, শুধু কৌতূহলবশত—তাহ'লেই তিনি বুঝবেন এই দুই নায়ক কতদূর পর্যন্ত অসবর্ণ।

দু-জনেই ক্ষত্রকুলজাত, দু-জনেই বহুদুঃখভোগী, কিন্তু ভেবে দেখলে মনে হয় যুধিষ্ঠির যা-কিছু নন বা হ'তে পারেননি, রাম সহজাত ও সমন্বিতভাবে তা-ই। কর্মিষ্ঠ তিনি, বীরযোদ্ধা, দ্বিধাহীন ও ভয়চিহ্নহীন। তিনি রাজ-নীতি বোঝেন, সংকটকালে সিদ্ধান্ত নেন বিদ্যুৎবেগে;—উপায়নিপুণ, সংগঠনে দক্ষ, আত্মবিশ্বাসে অটল—সর্বতোভাবে

লোকনায়ক হবার যোগ্য তিনি। একদিকে তাঁর এই সব উজ্জ্বলতা, আবার অন্যদিকে তিনি প্রেমিক—অতি মহনীয় ও শ্লাঘনীয় এক প্রেমিক। সীতাহরণের পর থেকে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের শেষ পর্যন্ত, তাঁর প্রেমিক-সত্তা মুখর হ'য়ে উঠছে বার-বার—সেই বিরহদুঃখের সান্ত্বনাহীন বেদনায়, যার প্রতিধ্বনি মেঘদূতে ও রঘুবংশকাব্যে কতই না শুনতে পেয়েছি আমরা। কিন্তু এই শোকবেগ তাঁকে বিকল ক'রে দিচ্ছে না, সময়োচিত সব কাজ তিনি নির্ভুলভাবে ক'রে যাচ্ছেন। সামনে কোনো রাক্ষস দেখলে তখনই তিনি ধনুর্বাণে দারুণ; অপহৃতার উদ্ধারের জন্য তাঁর চেষ্টার বিরাম নেই;—তাঁর সঙ্গে চলতি পথে যাদের দেখা হচ্ছে (যেমন শাপমুক্ত কবন্ধ বা মুমূর্ষু জটায়ু) তাদের বার্তাও সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখী। তাঁর কুণ্ঠা হ'লো না কপট যুদ্ধে বালীকে বধ করতে, যেহেতু সুগ্রীবের মৈত্রী তাঁর পক্ষে এখন অপরিহার্য। আবার দেখি, 'চিত্রকাননা শুভদর্শনা' পম্পা-তীরে তিনি ইন্দ্রিয়পুলকে কম্পমান ('হর্ষাদিন্দ্রিয়াণি চকম্পিরে', কিষ্কিন্ধ্যা ১ : ২); আর যখন কিষ্কিন্ধ্যায় বর্ষা নামলো, আর বর্ষার পরে প্রস্ফুটিত হ'লো শারদশ্রী (কিষ্কিন্ধ্যা ২৮, ৩০), তখন তাঁর মুখে ঋতুবর্ণনা শুনে তাঁকে প্রায় মনে হয় রোমাণ্টিক অর্থে প্রকৃতিমুগ্ধ। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের শেষাংশেই যুদ্ধযাত্রা, আর তখন থেকে রাম আবার কর্ম-পরায়ণ। এই দুটি ধারা, সান্তরভাবে আর কখনো বা মিশ্রিত-ভাবে, বনবাসী রামের জীবনে প্রবহমান : একটি বীরোচিত, অন্যটি প্রেমিকোচিত—দুটোই গৌরবজনক।

আর যুধিষ্ঠির—তিনি? রাজ্য হারিয়ে তেমনি কি তিনি ব্যাকুল, যেমন কান্তাবিরহে রামচন্দ্র? না, তা তিনি নন, তাঁর কাছে সে-রকম কোনো প্রত্যাশাও নেই আমাদের। কিন্তু, যা যুদ্ধ নয়, রাজনীতি নয়, নির্মল এক আনন্দের উৎস সে-রকম একটি বিষয়েও তাঁর অনীহা দেখে আমরা ঈষৎ অবাক না-হ'য়ে পারি না। তিনিও তো, রামেরই মতো, ভ্রমণ করেছেন বন থেকে বনান্তরে, ষড়ঋতুর আবর্তন দেখেছেন বারোবার, অনেক দেখেছেন নদী পর্বত স্বচ্ছ সরোবর, আর তরুশ্রেণী, আর ফুল পল্লব পশুপক্ষী;—কিন্তু একবারও তিনি নিসর্গপ্রীতির কোনো পরিচয় দেন না, কোনো দৃশ্যের সামনে থমকে দাঁড়ান না কখনো, লক্ষ করেন না পৃথিবীতে এখন বর্ষা চলছে না বসন্ত;—মনে হয় তাঁর জগৎ যেন ঋতুরহিত, রূপগন্ধহীন (২১)। তাহলে, কী করছেন তিনি বনপর্বে, ঐ দীর্ঘ বারো বছর তিনি কেমন ক'রে কাটালেন?

সত্যি বলতে, আর-কিছুই করছেন না শুধু শুনছেন। কখনো কিছু বলছেন না তা নয়, কিন্তু শোনার অংশটা বহুগুণ বেশি। শোনা : এই তাঁর কাজ, তাঁর বৃত্তি; তিনি যে শুনছেন এটাই বনপর্বের 'ঘটনা'। তাঁকে শুনতে হচ্ছে রোষতপ্ত বিলাপ—তেজস্বিনী পাঞ্চালীর মুখে; আর রণোৎসাহী ভীমের মুখে অনেক ভর্ৎসনা ও কুতর্ক;—কিন্তু যা তিনি স্বপ্রণোদনায় শুনছেন—সাগ্রহে, সতৃষ্ণভাবে, অবিরল—তা হ'লো মুনিদের মুখে পুরাণ-কথা—ভরতবংশের ধূসর ইতিহাস নয়, নয় পূর্বপুরুষের গতানুগতিক গুণকীর্তন, কিন্তু সেই সব অজর ও অম্লান কাহিনী, যার স্বপ্নপথ দিয়ে আমরা যেন বিশ্বজীবনের অন্তঃপুরে চ'লে যাই দেখতে পাই অনির্ণেয় এক জ্যোতি—আমাদের সুপ্রিয় ও সুপরিচিত সব নীলিমা ও শ্যামলিমা থেকে বহুদূরবর্তী এক বিন্দুর মতো। পুঁথিতে লেখা আছে, কাহিনীগুলি যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছিলো কিন্তু আমরা জানি যে সান্ত্বনা ছাপিয়ে তাঁর দুঃখ-দৈনিক বেদনাকে অতিক্রম ক'রে, তাঁর মনে সঞ্চারিত হচ্ছে অন্য এক অনুভূতি, প্রায় আনন্দের মতো—কিন্তু রামচন্দ্রের ইন্দ্রিয়পুলক তা নয়, যুধিষ্ঠির প্রীত হচ্ছেন বলা যায় না—শুধু, ধীরে-ধীরে, একটি গোপন ও অব্যক্ত আনন্দের সঙ্গে, নিজেরই মধ্যে জেগে উঠছেন, যেন হ'য়ে উঠছেন—এবং শুধুই তিনি। পুঁথি অনুসারে, মুনিদের সামনে তাঁর সঙ্গীরাও উপস্থিত ছিলেন—ছিলেন তাঁর চার অথবা তিন ভাই (২২), কখনো-কখনো দ্রৌপদীও হয়তো; কিন্তু আমরা দেখছি যে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে, লোমশ ও বৃহদশ্ব ও মার্কণ্ডেয়র কাছে, জিজ্ঞাসু শুধু যুধিষ্ঠির, এবং শ্রোতাও শুধু তিনি, মুনিদের মুখে সম্বোধন শুধু তাঁরই উদ্দেশে। এটা যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্রাধিকারবশত ঘটেনি, অন্যেরা যে শুনেও শুনছেন না, অথবা সেখানে উপস্থিত থেকেও সেখানে নেই, তা অন্যদের ব্যবহার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আর যখন, বনবাসের অন্তিম দিনে, সেই রহস্যময় বকপক্ষীর সামনে যুধিষ্ঠিরকে আমরা দেখতে পাই, তখনই উপলব্ধি করি যে এই অরণ্য—যেখানে দ্রৌপদী মনোদুঃখী, আর ভীম-অর্জুন অবিশ্রান্ত সংগ্রামশীল—তা ছিলো যুধিষ্ঠিরের কাছে এক বিদ্যালয়, এক মহান বিশ্ব-বিদ্যালয়, যেখানে শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে বারো বছর ধ'রে শিক্ষা পেয়েছেন তিনি—অস্ত্রবিদ্যায় নয়, পুঁথিগত শাস্ত্রেও নয়—আত্মবিকাশে, আত্মসন্ধানে, বিশ্বচেতনায়। সেই বিশ্ব-বিদ্যালয় ছেড়ে যাবার আগে, সংসারজীবনে প্রত্যাবর্তনের পূর্বমুহূর্তে, এক ছদ্মবেশী দেবতার কাছে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হ'লো। এ-ই তাঁর শেষ পরীক্ষা নয়, প্রথমও নয়, কিন্তু কেন্দ্রিক ব'লে এটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

১৮। বনপর্বে দ্যূতের উল্লেখ চারবার আছে : একবার দ্রৌপদী মনোকষ্ট চাপতে না-পেরে যুধিষ্ঠিরকে বললেন (অধ্যায় ৩০) : 'মহারাজ, আপনার মতো ঋজু, মৃদু, লজ্জাশীল, বদান্য ও সত্যবাদী পুরুষ আর নেই; তবু দ্যূতব্যসনের দুর্মতি আপনার হ'লো কী ক'রে?' যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভীমের বাক্যশলাকায় বিদ্ধ হ'য়ে বললেন (অধ্যায় ৩৪) : 'আমি দুর্যোধনের রাজ্যহরণের আশায় পাশা খেলেছিলাম, কিন্তু শকুনি আমাকে কপট দ্যূতে জয় ক'রে নিলো।...দ্বিতীয় বার, ধূর্ত শকুনির প্রতি ক্রোধবশত আমি নিজেকে নিরস্ত করতে পারলাম না।' এটা, তাঁর নিজের মুখের কথা হ'লেও, আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য, হয়তো ভীমেরও তা-ই মনে হয়েছিলো। যুধিষ্ঠির কেমন আকস্মিকভাবে ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন তা পরে আমরা কয়েকবার দেখবো, কিন্তু দ্যূতসভায় তার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায়নি। আর রাজ্যহরণের আশা? তৃতীয় রিপু? যুধিষ্ঠিরের সমগ্র জীবন-চরিত তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলেও এমন একটি মুহূর্ত পাওয়া যায় না, যখন তাঁকে রাজ্যলোভী (বা কোনো অর্থেই লোভী) ব'লে সন্দেহ করা যায়। এখানে, স্পষ্টত, যুধিষ্ঠির তাঁর অপরাধবোধের তাড়নায় যে-কোনো একটা মন-গড়া সাফাই দিচ্ছেন।

অর্জুনের অস্ত্রাহরণ-যাত্রার পর আরো একবার জুয়োর কথা উঠলো (অধ্যায় ৫২)। এবার অগ্রজের প্রতি ভীমের বাক্য রূঢ় ও তীক্ষ্ণতর : 'আমরা পরাক্রান্ত হ'য়েও দুর্দশায় পড়েছি—তা আপনারই দোষে।...আপনার দ্যূতক্রীড়ার জন্যই আমরা, আজ বিনষ্টপ্রায়।' যুধিষ্ঠির আগেকার মতো কোনো খণ্ড জবাবদিহি দিলেন না, সদ্য-আগত মহর্ষি বৃহদশ্বকে তাঁর বেদনা জানালেন। 'আমার অক্ষবিদ্যায় দক্ষতা নেই, অক্ষচতুর ধূর্তেরা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। সেই দ্যূতবিষয়ক কঠোর কথা শুনে আমি বিষাদগ্রস্ত; তৎকালে (দ্যূতক্রীড়ার সময়) বন্ধুরা আমাকে যা-কিছু বলেছিলেন তার স্মৃতি আমাকে দিনে-রাত্রে ব্যথিত করে। ভগবান, আমার মতো ভাগ্যহীন রাজা আপনি কি পৃথিবীতে আর দেখেছেন, বা শুনেছেন কখনো?'—এর উত্তরেই নল-দময়ন্তীর গল্প বলা হ'লো।

অনেক পরে, বনবাসের সমাপ্তির কিছু আগে, যুধিষ্ঠির আরো একবার তাঁর দ্যূতক্রীড়ার উল্লেখ করেন (অধ্যায় ২৯২)।

১৯। বলা বাহুল্য, রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণের সঙ্গে জয়দ্রথ-কর্তৃক দ্রৌপদীহরণের কোনো তুলনা চলে না; দ্বিতীয় ঘটনাটি ক্ষুদ্রাকার ও ফলাফলহীন—দ্রোণপর্বে জয়দ্রথবধের সময় পাণ্ডবদের কারোরই সেটা মনে পড়েনি। বরং তুলনা চলে সীতাহরণের সঙ্গে দ্যূতসভায় কৌরব-কর্তৃক দ্রৌপদীনিগ্রহের: কিন্তু মহাভারতে যুদ্ধের কারণ নারী নয়, ভূমি।

২০। অরণ্যকাণ্ডের একাদশ সর্গে দশ বৎসরের উল্লেখ আছে (শ্লোক ১২); এর স্বল্পকাল পরেই শূর্পণখার অনুপ্রবেশ ঘটবে।

২১। বলা যেতে পারে, তফাৎটা আসলে বাল্মীকি ও ব্যাসের মধ্যে, কিন্তু এ-মুহূর্তে আমার আলোচ্য তাঁরা নন, তাঁদের দুই মানসপুত্র।

২২। বনবাসের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত অর্জুন অনুপস্থিত ছিলেন; তিনি ততদিন সুরলোকে অস্ত্রসংগ্রহে ব্যস্ত।

যুধিষ্ঠির যে বনপর্বের একমাত্র শ্রোতা, তা দুটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। অজগর-যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তরের সময় সদ্যমুক্ত ভীমসেন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখে একটিও মন্তব্য শোনা গেলো না, তিনি যে কথাগুলো শুনলেন তারও কোনো নিদর্শন নেই। তেমনি, হ্রদপ্রান্তিক পরীক্ষার পরে ধর্ম যখন আত্মপ্রকাশ করলেন তখন ভীমাদি চার ভ্রাতা পুনর্জীবিত ও সম্পূর্ণ সুস্থ—কিন্তু আমরা তাঁদের উপস্থিতির কোনো পরিচয় পেলাম না, মুহূর্তের জন্যও মনে হ'লো না তাঁরা কেউ ঘটনাটির তাৎপর্য অনুভব করেছেন।

৭ : পূর্বাভাস ও প্রতিরূপ

যুধিষ্ঠির কোনো প্রেরণাপ্রাপ্ত নচিকেতা নন, এক ঝাপটে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হবার মতো শক্তি তাঁর নেই; তাঁর অগ্রসরণ সর্বদাই ধীর, তাঁকে চলতে হয় ঘুরে-ফিরে, এঁকে-বেঁকে, মাঝে-মাঝে কোনো পথপ্রদর্শকের সাহায্য নিয়ে। নচিকেতা যেন তাঁর সংকল্পের বেগেই দেবসন্নিধানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের হ্রদপ্রান্তিক পরীক্ষায় সে-রকম কোনো আকস্মিকতা নেই—তার অন্তত তিনটি পূর্বলেখ বনপর্বে গ্রথিত হ'য়ে আছে। তিনটিরই মূল কথা হ'লো কোনো মৃত অথবা মৃতকল্পের উদ্ধারসাধন, আর তিনটিতেই সেই দুরূহ কর্ম যে-উপায়ে সম্পন্ন হ'লো তা বিদ্যাবত্তা, বাণীসিদ্ধি—কোনো হেরাক্লিস-তুল্য বাহুবল নয়। পাঠকের হয়তো মনে পড়বে সেই মুনিকুমারকে—যুধিষ্ঠির-শ্রুত অন্যতম কাহিনীর নায়ক—যিনি গর্ভবাসকালেই পিতার অধ্যয়নে ভুল ধ'রে, পিতৃদত্ত শাপে 'আট-বাঁকা' হ'য়ে জন্মেছিলেন—অথচ সেই অভিশাপদাতা পিতাকেই ত্রাণ করেছিলেন সিন্ধুতল থেকে, শুধু সারস্বত বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে, দৈহিক বিকৃতি সত্ত্বেও সম্পূর্ণ সপ্রতিভ, তাঁর বয়স যখন মাত্র দশ (বন : ১৩২-৩৪)। এই অসামান্য বালকটির সঙ্গে প্রথমে দ্বারপালের, তারপর জনকরাজার আর সর্বশেষে সভাপণ্ডিত বন্দীর যে-বাদানুবাদ হ'লো, সেটিকে বক-যুধিষ্ঠির-সংবাদের একটি প্রাথমিক খশড়া ব'লে ধ'রে নেয়া যায় (২৩)। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে সাদৃশ্য আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো; এখানে যুধিষ্ঠির নিজেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত, এবং এখানেও এক ভ্রাতার প্রাণরক্ষার চেষ্টায় তাঁকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লো (বন: ১৮০)। অবশ্য বকরূপী ধর্মের তুলনায় সর্পরূপী নহুষকে বড়ো মৃদু পরীক্ষক ব'লে মনে হয়, মাত্র তিনটি প্রশ্নের সদুত্তর পেয়েই তিনি ভীমকে তাঁর মর্মান্তিক আলিঙ্গন থেকে মুক্তি দিলেন। লক্ষণীয়, ভ্রাতার নিরাপত্তালাভে যুধিষ্ঠির সে-মুহূর্তে কোনো হর্ষ-প্রকাশ করলেন না: হ'য়ে উঠলেন আবার এক শিক্ষার্থী সেই বেদবেত্তা অজগর-আচার্যের ভাণ্ডার থেকে কুড়িয়ে নিলেন কিঞ্চিৎ জ্ঞান, একটি-দুটি পথনির্দেশক ইঙ্গিত (বন:

১৮১)। তারপর আরো দূরে, আরো অনেক উপাখ্যান পেরিয়ে এসে, বনবাসের অন্তিম সময়ে তিনি শুনলেন সেই আশ্চর্য সাবিত্রী-কথা, যেখানে এক সার্থকভাষিণী তরুণীর কাছে স্বয়ং যম নতিস্বীকার করলেন (বন: ২৯৬)। এরই স্বল্পকাল পরে ধর্মের কাছে যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা (২৪)।

না-বললেও চলে, প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতিটি অতি প্রাচীন: কেন, প্রশ্ন ও শ্বেতাশ্বতর এই তিনটি উপনিষৎ প্রধানত প্রশ্নোত্তরনির্ভর। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মহাভারতের উপজীব্য নয়, এখানকার অনেক প্রশ্নোত্তরে কোনো অর্থগৌরব খুঁজে পাই না আমরা, কিন্তু অষ্টাবক্রের বিতর্ক, অজগর-যুধিষ্ঠির-সংলাপ, আর সাবিত্রীর সুনির্বাচিত বাক্যযোজনা—এই তিনটির মধ্যে একটি ঊর্ধ্বারোহণরেখা সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমটিকে মনে হয় যেন মুখস্থ-বিদ্যার পরীক্ষামাত্র—এবং কিছুটা উপস্থিতবুদ্ধির: অষ্টাবক্রকে জনক, ও বন্দীকে অষ্টাবক্র যে-সব প্রশ্ন করলেন, তার কোনো-কোনোটি হেঁয়ালিগোছের, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'বর-ঠকানো প্রশ্ন' এবং অন্যগুলোকে আমাদের ছেলে-ভুলোনো ছড়ার 'চার কালো, চার ধলো'রই গুরুগম্ভীর প্রকরণ ব'লে মনে হয়। জনকের সভাপণ্ডিত 'তেরো' সংখ্যায় এসে দুটির বেশি উদাহরণ জোটাতে পারলেন না, আর সেজন্যেই তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'লো—এতে যেন উপাখ্যানটি হঠাৎ কৌতুকনাট্যের স্তরে নেমে আসে। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে যুধিষ্ঠিরের উক্তিসমূহে আমরা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাই; আর সাবিত্রী এমন কিছু বলছেন না যার উৎস নয় তাঁরই মেধা এবং তাঁরই হৃদয়বৃত্তি। তবু মনে হয় যে সর্প-রূপী নহুষের মতোই যমদেবতাও প্রার্থীর আবেদন সহজেই মঞ্জুর ক'রে দিলেন: কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা আরো সর্বাঙ্গীণ—তাঁকে প্রথমেই একটি নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হ'তে হ'লো।

এই নিষেধাজ্ঞাও আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। আদি-পর্বে, পাণ্ডবেরা যখন একচক্রা ছেড়ে পাঞ্চালের পথে: অর্জুনও একবার এমনি এক আদেশ শুনেছিলেন, অন্য এক জলের ধারে দাঁড়িয়ে (অধ্যায় ১৭০)। সন্ধ্যা তখন, মশাল হাতে এগিয়ে চলেছেন অর্জুন তাঁর পিছনে কুন্তী ও অন্য চার ভাই, তাঁর সামনে স্রোতস্বিনী গঙ্গা। হঠাৎ ধ্বনি উঠলো : 'কে তোমরা অবিমৃশ্যকারী পথিক, জানো না কি রাত্রিকাল যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্বের সময়, সন্ধ্যা থেকে প্রভাত পর্যন্ত মানুষের সঞ্চরণ নিষিদ্ধ? আমি গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ, এই নদী এখন আমার দ্বারা অধিকৃত—তোমরা ফিরে যাও।' অর্জুন যে উদ্ধতভাবে সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন, আর অবশেষে, অঙ্গারপর্ণকে যুদ্ধে হারিয়ে, তাঁরই কাছে বহু মূল্যবান উপঢৌকন পেলেন এখানেই অর্জুনের অর্জুনত্ব। আর যুধিষ্ঠিরের অনন্যতাও এইখানে যে তিনি বক-যক্ষের আজ্ঞা-পালনে মুহূর্তকাল দেরি করলেন না।

আরো একবার, বনবাসের প্রথম বছরে, আমরা অন্য এক নিষেধের সামনে অর্জুনকে দাঁড়াতে দেখি—যখন হিমালয়-প্রান্তিক অরণ্যে, এক বন্য বরাহকে উপলক্ষ ক'রে, তিনি নামলেন এক কিরাতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় (বন : ৩৯)। 'এই বরাহকে আমি আগে লক্ষ্য করেছি, তুমি নিবৃত্ত হও!'—কিরাতের এই দাবিকে স্পর্ধাপূর্বক অগ্রাহ্য করলেন অর্জুন: কিন্তু এবারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্গারপর্ণের চেয়ে কিছুটা বেশি সমর্থ—কিরাতের ভুজনিষ্পেষণ সইতে না-পেরে অর্জুন মৃতের মতো ভূলুণ্ঠিত হলেন। কিন্তু সেও ছিলো এক পরীক্ষা আর সেখানেও এক সুদক্ষিণ দেবতা ছিলেন পরীক্ষক; আর তাই অর্জুন আরো একবার জয়ী হ'তে পারলেন, যেন তাঁর অবাধ্যতার জন্যই দেবতার হ… পুরস্কার পেলেন দিব্যাস্ত্র।

কিন্তু অর্জুনের হ্রদপ্রান্তিক দ্বিতীয় 'মৃত্যু' যখন ঘট… তখন অর্জুন নিজে নিজেকে পুনর্জীবিত করতে পার… না, নাগপাশবদ্ধ ভীমের মতোই হ'য়ে পড়লেন চেষ্টাহীন… নিতান্ত অসহায়। উদ্ধারের জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন হ'লো…

প্রতিরূপ আরো পাওয়া যায়—মহাভারতের বাইরে জাত… গ্রন্থে, অত্যন্ত কৌতূহলজনক আকারে। দেবধর্মজা… কাহিনিটিকে মনে হয় যেন রামায়ণ-মহাভারতের সংমি… রচিত (২৫)—যদিও এ-ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে জানা যায় … কোনটি কার উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ। সুখের বিষয়, তা জান… কোনো প্রয়োজনও নেই আমাদের, কেননা আমাদের উদ্দে… শুধু তুলনা ও প্রতিতুলনা, আর এখানে তার অপর্যা… সুযোগ আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য কাহিনীটি সংক্ষে… উদ্ধৃত করছি।

বোধিসত্ত্ব সেবার—শ্রুতিকটু মহিংসাসকুমার নাম নিয়ে… বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র হ'য়ে জন্মেছিলেন। তাঁ… জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ভ্রাতা চন্দ্রকুমার তাঁর সহোদর, কনিষ্ঠ সূর্যকু… বৈমাত্রেয়। রাজাকে এক পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দি… পতিসোহাগিনী বিমাতা জেদ ধরলেন তাঁর গর্ভজাত পু… রাজ্য দিতে হবে। রাজা বদ্ধ হ'লেও দশরথের ম… বিহ্বল নন; তিনি জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রকে ডেকে বলল… 'এই তো অবস্থা—তোমরা এখন কিছুদিনের মতো অর… প্রচ্ছন্ন থাকো, আমার মৃত্যু হ'লে দু-ভাই এসে রাজ্য অধি… কোরো।' রাজকুমারদ্বয় যখন বনগমনের জন্য প্রস্তুত, ত… ঘটনাচক্র জানতে পেরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাও লক্ষ্মণের মতো তাঁ… সহযাত্রী হ'লো। —এই পর্যন্ত রামায়ণ, কিন্তু পরবর্… অংশে অন্য এক যুধিষ্ঠিরকে দেখা যাচ্ছে—আমাদের চে… অথচ প্রায় অচেনা।

এখানেও এক সরোবর, কুবেরসখা উদকরাক্ষস তার অ… কারী; এখানেও জলাহরণ ও প্রশ্নোত্তর, অপমৃত্যু ও উদ্ধা… কাঠামোটি প্রায় হুবহু এক, কিন্তু অনুপুঙ্খগুলি … করলেই বোঝা যায় যে রাম যেমন যুধিষ্ঠিরের অনাত্মীয়, তে… বোধিসত্ত্বের সঙ্গেও যুধিষ্ঠিরের কোনো সাদৃশ্য নেই : দু-জ… দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী।

প্রথমেই দেখি, বোধিসত্ত্ব এক রাজকীয় ও রাজোপ… সম্পন্ন পুরুষ, যুধিষ্ঠিরের তুলনায় অনেক বেশি প্রত্যুৎপ… মতি, এবং স্বভাবতই কর্তৃত্বসক্ষম। ঘটনাস্থলে ভাইদে… কাউকে দেখতে না-পেয়ে তিনি একটিও বিলাপবাক্য বলল… না; পদচিহ্ন দেখেই বুঝে নিলেন তারা সরোবরবাসী রা… কর্তৃক ধৃত হয়েছে। আর তক্ষুনি ধনুর্বাণ ও অসি নি… প্রস্তুত হলেন বোধিসত্ত্ব; বনচরবেশী রাক্ষসের প্ররো… সত্ত্বেও জলে নামলেন না। এদিকে যুধিষ্ঠির, যাঁর হাতে কো… অস্ত্র নেই, মনে নেই বিরোধ অথবা প্রতিরোধের চি… তাঁকে দেখি অনুরূপ অবস্থায় শোকার্ত এবং বিবেচনাহী… দুর্ঘটনার কারণ-নির্ধারণের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, তিনি নিজে… সেই সন্দেহজনক জলে অবতরণ করলেন। একটি ভ্রাত… পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে উভয়েই চাইলেন বৈমাত্রে… —এটাকে যদি বা বলা যায় যৌথপরিবারসম্মত লোকাচ… তবু মানতে হয় প্রণোদনায় এঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বোধি… ছিলেন লোকনিন্দা বিষয়ে সতর্ক (পাছে বিমাতাপুত্রের মৃ… জন্য তাঁকেই কেউ দায়ী ব'লে সন্দেহ করে!): আর যুধি… তাঁর নিজের হিতাহিত না-ভেবে, শুধু চেয়েছিলেন … জননীর যেমন তেমনি বিমাতারও একটি অন্তত পুত্র … থাক। উভয় ভ্রাতাকে ফিরে পেয়ে বোধিসত্ত্ব কিন্তু… কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন না, উল্টে তার পাপকর্মের জন্য…

স্কার করলেন রাজকন্যাকে, নরকবাস ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে তার ধর্মান্তর ঘটালেন। সত্যি বলতে, এই উদকরাক্ষসটির রাক্ষসত্ব আমরা দেখতে পাই একবার মাত্র—যখন জলাবতীর্ণ দুই ভ্রাতাকে সে গ্রেপ্তার করলো সবলে, তার প্রশ্নের ভুল উত্তর দেবার শাস্তিস্বরূপ তাদের টেনে নিয়ে গেলো জলের তলায়—খুব সম্ভব খাদ্যবস্তু হিশেবে মজুত রাখলো (২৬)। কিন্তু তারপর, যে-মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব এলেন, তিনি প্রশ্নের উত্তর দেবারও আগে থেকে, রাক্ষস হঠাৎ সুশীল বালকে পরিণত হ'য়ে গেলো; তাঁর সেবা করলো পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে ভৃত্যের মতো; তাঁকে পালঙ্কে বসিয়ে, নিজে পদতলে ব'সে শুনলো তাঁর মুখে দেবধর্মের ব্যাখ্যান। আর শেষ পর্যন্ত, তিনি বারেক বলামাত্র জন্মের মতো ছেড়ে দিলো তার রাক্ষস-বৃত্তি। এই সবই বোধিসত্ত্বের মাহাত্ম্যসূচক; রাক্ষস যেন অজান্তেই তাঁর প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিলো—আর বোধিসত্ত্ব নিজেও তাঁর শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সচেতন, তাঁর বচনে ও ব্যবহারে প্রথম থেকেই একটি দৃপ্তির ভাব আমরা দেখতে পাই। এই স্বগৌরববোধ তাঁর গুণরাশিরই অন্যতম, এবং এটিও রাজোচিত—যদিও শুধুই রাজোচিত নয়। ব্রাহ্মণবালক অষ্টাবক্রকে আর-একবার মনে আনা যাক: জনকসভায় তাঁর প্রতিটি কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে তিনি গর্বিত ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়ে অসহিষ্ণু—যেন বন্দীকে চোখে দেখার আগেই তিনি তাঁর নিজের জয় বিষয়ে নিঃসংশয়। এমনকি যুধিষ্ঠির—যিনি 'মৃদু ও লজ্জাশীল' ব'লে মাঝে-মাঝে প্রশংসিত ও প্রায়ই নিন্দিত হ'য়ে থাকেন, তিনিও অজগরের সম্মুখীন হ'য়ে প্রগল্ভতায় ঠিক বশংবদ ব্যবহার করেননি। 'সর্প, তুমি যেই হও, বলো তুমি ভীমসেনকে কেন গ্রাস করেছো! যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে—সত্য বলো তুমি কী জানতে চাও, কী খাদ্য চাও, কিসের বিনিময়ে তুমি ভীমকে মুক্তি দেবে!'—যাকে বলে ন্যায়সংগত দাবি, এ হ'লো তা-ই; আমরা বুঝতে পারি, ভীমের দুর্দশায় তিনি ব্যাকুল হয়েছেন; কিন্তু—'যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে!'—এই কথাটায় ধরা পড়লো যে তিনিও আত্মাভিমানবর্জিত মানুষ নন। তারপর: 'তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো, তবেই তোমার ভ্রাতাকে নিষ্কৃতি দেবো—' অজগরের এই উক্তির উত্তরে যুধিষ্ঠির আগে পরীক্ষককেই পরীক্ষা করতে চাইলেন: 'আপনি ব্রাহ্মণের বেদ্য বিষয় অবগত আছেন কিনা বলুন, তা না-জেনে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো না।' —আবার আমরা তাঁর চোখে দেখলাম গর্বের ঝিলিক—হঠাৎ মনে হ'লো বক্তা যেন যুধিষ্ঠির নন, অষ্টাবক্র।

কিন্তু যে-মানুষকে আমরা যুধিষ্ঠির ব'লে জানি, ভাবি, এবং অনুভব করি, যাঁকে দ্যূতসভার পরে বনযাত্রার প্রাক্কালে আমরা দেখেছিলাম, তিনি যেন বিলীয়মান অপরাহ্নের আলোয় কিছুক্ষণের জন্য উদ্ভাসিত হলেন—আমাদের আলোচ্য হ্রদপ্রান্তিক অধ্যায়ে, এক কিম্ভূত সত্তার দ্বারা আক্রান্ত বা অধিকৃত অবস্থায়। এখানে দেখি, ভ্রাতাদের নিপাতকারী বিষয়ে তাঁর কোনো অভিযোগ পর্যন্ত নেই; তিনি কোনো প্রতিবাদ করলেন না বা তর্ক তুললেন না; শুধু অনুভব করলেন অনির্ণেয় এক দেবতার উপস্থিতি। হয়তো সেইজন্যে—বা আসলে তাঁর নিজেরই মধ্যে পরিবর্তন ঘ'টে গেছে ব'লে—এখানে তাঁর ভঙ্গিটা প্রতিযোগীর নয়, সম্মতিদাতার—বোধিসত্ত্বের মতো প্রচারক ও সংস্কারকের নয়, তাঁর নিজস্ব-চিরাচরিতভাবে শিক্ষার্থীর। যক্ষ-বকের আহ্বানের উত্তরে তাঁর কণ্ঠস্বরও বিনম্র:

—'হে যক্ষ, আত্মপ্রশংসা কোনো সৎপুরুষের কর্ম নয়; আমি শুধু বলছি আমার সাধ্য অনুযায়ী উত্তর দেবার চেষ্টা করবো। আপনি প্রশ্ন করুন।'

যুধিষ্ঠিরের জীবনে এই এক সন্ধিক্ষণ: এই বারো বছর ধ'রে যে-শিক্ষা তাঁর লব্ধ হ'লো, এর পরে তা প্রয়োগ করতে হবে তাঁকে—অরণ্যের নির্জনতায় নয়, রাজসভায়, আবার সেই রাজনীতির আবর্তে, ভীষণ এক যুদ্ধ পেরিয়ে, আর যুদ্ধপরবর্তী দীর্ঘশ্বাসের বৃত্তে ঘুরে-ঘুরে—কতটা নিষ্ফল এবং কতটুকুই বা সফলভাবে, তা আমরা ক্রমশ দেখবো।

২৩। একটি প্রশ্নোত্তরে সাদৃশ্য একেবারে আক্ষরিক; মূল সংস্কৃতে ভাষা পর্যন্ত অভিন্ন (বন : ৩৪ : ২৮-২৯ ও ৩২৩ : ৬১-৬২)।

—'সুপ্ত হ'য়ে কে চক্ষু মুদ্রিত করে না? জন্মগ্রহণ ক'রেও কে স্পন্দিত হয় না? কার হৃদয় নেই? বেগ দ্বারা কে বৃদ্ধি পায়?'

—'মৎস্য নিদ্রাকালেও চক্ষু মুদ্রিত করে না, অণ্ড প্রসূত হ'য়েও স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নেই, নদী বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।'

(অনু : রা-ব)

এ-দুয়ের মধ্যে কোনটা মৌলিক আর কোনটা কুম্ভীলকর্ম, তা নিয়ে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক, কেননা এই ধরনের পুনরুক্তি বা ঋণগ্রহণ 'ক্লাসিক'-যুগ-পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের একটি প্রতিষ্ঠিত চরিত্রলক্ষণ। অনেকেই জানেন, বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে, উপনিষদ ও গীতার মধ্যে, আর মহাভারত ও রামায়ণের মধ্যেও অনেক সামান্য শ্লোক পাওয়া যায়;

অজগরের প্রশ্নগুলিও ধর্মবকের মুখে আবার আমরা শুনতে পাই—যদিও ভিন্ন ভাষায় এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে।

২৪। সাবিত্রী-কথা ও বক-যুধিষ্ঠির-সংবাদের এই সান্নিধ্য অতি সুষ্ঠু ব'লে আমার মনে হয়; কিন্তু ও-দুয়ের মধ্যে একটি কর্ণজীবনী প্রবিষ্ট করা হ'লো কেন (বন : ২৯৯-৩০৯), আমি অনেক ভেবেও তা বুঝে উঠতে পারিনি। অবশ্য, যুধিষ্ঠির এই কর্ণ-কথা শুনছেন না (শুনলে প্লটের পক্ষে মারাত্মক হ'তো), এটি সোজাসুজি বৈশম্পায়ন বলছেন জনমেজয়কে, এবং কর্ণের জীবন ও তাঁর কুমারী-মাতার মনস্তত্ত্ব বোঝার পক্ষে কাহিনীটি অত্যন্তই জরুরি। কিন্তু পৌর্বাপর্যের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না; এই একটি অংশে সংস্থাপনা অনুচিত হয়েছে, তা স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ণের জন্মকথা মহাভারতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তার প্রথম উল্লেখ পাই 'সংক্ষিপ্ত ক্ষত্রিয়বংশবর্ণনে' (আদি : ৬৩)—কঙ্কালের আকারে: 'কুন্তীর কন্যাকাবস্থায় তাঁর গর্ভে সূর্যের ঔরসে কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন'—এই একটির বেশি বাক্য সেখানে নেই। পাণ্ডববংশবর্ণনে (আদি : ৬৭) কর্ণজীবনীর চুম্বক কথিত হ'লো—জন্ম থেকে কুণ্ডলহরণের ব্যাপারটা পর্যন্ত। তারপর—বেশি পরেও নয়—কর্ণের জন্মকথার সবিস্তার বিবরণ পাই আদিপর্বের ১১১ অধ্যায়ে। এগুলি সবই বৈশম্পায়নের বিবৃতি' কিন্তু স্ত্রীপর্বে যখন যুদ্ধে নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধক্রিয়ার আয়োজন হচ্ছে (অধ্যায় ২৭), তখন কুন্তী আর শোকোচ্ছ্বাস সামলাতে না-পেরে নিজের মুখেই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করলেন, এবং পরে আরো একবার সেই কাহিনী শোনালেন ব্যাসদেবকে (আশ্রমবাসিক: ৩০)। কিন্তু এতগুলোর মধ্যে বনপর্বের বিবরণটি সবচেয়ে রসোজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী—এবং আধুনিক অর্থে সবচেয়ে বাস্তব।

২৫। জাতক : ঈশানচন্দ্র ঘোষ-কৃত বঙ্গানুবাদ, সং বঙ্গাব্দ ১৩২৩, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২-২৬ দ্রঃ।

২৬। কেননা কুবের রাক্ষসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'দেবধর্ম-জ্ঞান-হীন যে-ব্যক্তি ইহার জলে অবতরণ করিবে সে তোমার ভক্ষ্য হইবে।'

(অনু : ঈশান)

(ক্রমশ)

॥ ৪৩ ॥

ডাস্কুর

এ কথা প্রশ্ন প্রায়ই শুনি—পশ্চিমবঙ্গের দূরদূরান্তে যেসব জায়গায় আমি গিয়েছি সেখানে দর্শনীয় কিছু আছে কিনা সেকথা আগেভাগে জানতে পারি কি করে? আমার উত্তর—'দর্শনীয়' কথাটার কে কিরকম অর্থ করেন তার উপরই এ জাতীয় প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে। অনেককে জানি, যাঁরা মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য বা প্রাচীন ইমারতকেই একমাত্র দর্শনীয় বস্তু বলে মনে করেন। সে জন্য ছুটিছাটায় অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে তাঁরা যান পুরী, কাশ্মীর, উটিতে অথবা আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী, ভুবনেশ্বর, কোনারকে। অনুরূপ 'দর্শনীয়' জিনিস পশ্চিম বাংলার কম গ্রামেই আছে যদিও ভিন্ন স্বাদের নিসর্গ শোভা বিরল

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়। আমার অভিনিবেশের ক্ষেত্র যেহেতু সঙ্কীর্ণ নয় (বর্তমান সিরিজের পাঠক-পাঠিকারা হয়ত তার কিছু পরিচয় পেয়ে থাকবেন) সেজন্য একেবারে কিছুই দেখবার নেই এরকম গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আমি কমই দেখেছি। অতএব আগেভাগে খবর না পেলেও খুব বায় আসে না। যেখানেই যাই না কেন, চোখ আর মন দুই-ই খোলা রাখলে, কিছু-না-কিছু প্রায়ই জুটে যায়।

কোন কোন জায়গার খবরাখবর অবশ্য রওনা হবার আগেই পেয়ে থাকি। সেসব সংবাদের কিছু আসে বইপত্র থেকে, কিছুর যোগান দেন একই পথের পথিক সহকর্মীরা। বলা বাহুল্য, তুলনামূলকভাবে তাদের মূল্য কম। কেননা, নতুন নতুন স্থান বা বিষয়বস্তু আবিষ্কার করাই বেশি দরকার যা আগে এখনও দেখেননি বা সে বিষয়ে লেখেননি। চর্বিতচর্বণ সোজা ব্যাপার হওয়ার জন্যেই সেপথ বেছে নেন সত্য

অর্ধেন্দু দত্ত

কিন্তু, আমার কথা, এমন পরিশ্রমী গবেষকও কিছু কিছু আছেন যাঁরা লাইব্রেরীর বাইরে বহু বিচিত্র লোকসমাজ থেকেই তাঁদের অভিনিবেশের বস্তু খুঁজে বার করতে ভালবাসেন। নতুন বিষয়ের পরিবেশন তাঁদের দ্বারাই সম্ভব। পুরাতন জ্ঞান অবশ্যই পরিত্যাজ্য নয় এবং তার আহরণের জন্য গ্রন্থাগার অপরিহার্য। কিন্তু নতুন জ্ঞানের সংযোজনে সাবেক জ্ঞানভাণ্ডার যদি চক্রবৃদ্ধিহারে না বাড়ে তবে দেশের দুর্দিন বলতে হবে। প্রতি বছরই গোলায় যদি কিছু নতুন ধান না তোলা যায় তবে পুরানো সঞ্চয়—তা সে যত বিশালই হোক না কেন—কতদিন আর চলতে পারে? আমাদের ইতিহাস ও লোক-সংস্কৃতির জ্ঞানভাণ্ডারকে সতত সমৃদ্ধ রাখবার একমাত্র উপায় অনুসন্ধানীদের পথে নেমে পড়া। সে পথ বাঙালীর বিচিত্র জীবনচর্যার দিকে দিকে প্রসারিত। পথিকদের কেউ যে খালি হাতে ফিরবেন না সেকথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তারপর, তাঁদের নতুন আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে উত্তম অধম যেরকম আলোচনাই পত্রপত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হোক না কেন, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রচনার জন্য তারাই হবে বহুমূল্য উপকরণ। আজ হোক, কাল হোক, এসব ছড়ানো-ছিটানো উপাদান থেকেই ভবিষ্যতের গবেষকরা তাঁদের বৃহৎ কার্যের মালমশলা সংগ্রহ করতে পারবেন।

আগেভাগে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে কোন স্থান পরিদর্শন করাটা সাবধানীর কাজ হতে পারে, খাঁটি অনুসন্ধানীর কাজ নয়। এই সঙ্কীর্ণ নিয়ম মেনে চললে শুধু সেসব জায়গাতেই যাওয়া সম্ভব যেখানে আগে আর কেউ গিয়েছেন অথবা যেখানকার দর্শনীয় বস্তু সম্বন্ধে মুদ্রিত বিবরণ পাওয়া যায়। আমি শুধু ম্যাপ দেখে বহু জায়গায় গিয়েছি এবং ইতিপূর্বে অজ্ঞাত সেখানকার দর্শনীয় বস্তু দেখে বিস্মিত হয়েছি। অনেক সময় এক "চেনা" গ্রাম থেকে আর এক "চেনা" গ্রামে যাবার পথে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি অচেনা বিষয়বস্তুর গায়ে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এক বিষয়ের অনুসন্ধান

"টেরাকোটা" চেয়ার

করতে গিয়ে, একই স্থানে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ চিত্তাকর্ষক জিনিসের মুখোমুখি হয়েছি। 'দেশ'-এর গত সংখ্যায় প্রকাশিত গয়না-বড়ি এভাবে আবিষ্কার করি মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রামে যেখানে গিয়েছিলাম আসলে পুরাকীর্তির সন্ধানে। পুরাকীর্তি ছাড়াও সেখানে বাড়তি লাভ হয়েছিল এই গয়না-বড়ি। তারপরে, সেই প্রথম সূত্র ধরে আরও কিছু অনুসন্ধান চালিয়েছি। সে অনুসন্ধান এখনও অসম্পূর্ণ বলে গয়না-বড়ি প্রবন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। আশা করি, এ বিষয়ে মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ কভারেজ অদূর ভবিষ্যতে খাড়া করা যাবে। তখন অকস্মাৎ-আবিষ্কৃত এই অনুপম গৃহ-শিল্পটি সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধানের অংশীদার হবেন সেই সব আদর্শ গবেষক যাঁরা ভবিষ্যতে বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করবেন।

বিনা নোটিসে হঠাৎ পাওয়া আর একটি বিষয়ের অবতারণা করব আজকের প্রবন্ধে। হাওড়া থেকে মার্টিন কোম্পানীর যে রেল-লাইন গিয়েছে শিয়াখালায়, তার প্রায় পাশাপাশি এক পিচের রাস্তা আছে বাটিরার কাছ থেকে শিয়াখালা অবধি। বাটিরা, কোণা, ও একসারা স্টেশন ছাড়িয়ে বালুহাটি। সেখান থেকে বাঁহাতি এক শাখাপথ—সেটিও পিচের—গেছে ডোমজুড়ের দিকে। এ পথেই ৫৭-এ নম্বর বাস কলকাতার এসপ্লানেড থেকে ছেড়ে হাওড়া শহর হয়ে ডোমজুড় পর্যন্ত যাতায়াত করে। কিছুটা নিরুদ্দেশ ভ্রমণের মত এ রাস্তায় চলেছিলাম একদিন। গন্তব্যস্থল অবশ্য ছিল একটা—নার্না। ডোমজুড় থানার উত্তর সীমার এ গ্রামে অবস্থিত পঞ্চানন্দ ঠাকুরের খ্যাতি দূরবিস্তৃত। ম্যাপে দেখানো ছিল বালুহাটি-ডোমজুড় সড়কের কিছু উত্তরে সে গ্রাম, কিন্তু পথঘাটের কোন স্পষ্ট নিশানা ছিল না। নার্নার পঞ্চানন্দ এ অঞ্চলের এতই প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবতা যে পথঘাটের সঠিক খবর ছাড়াও আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম; ভরসা ছিল, পিচের রাস্তা থেকে যে কোন উপায়ে নার্নায় পৌঁছনো যাবে।

বালুহাটি থেকে চলেছি ডোমজুড়ের দিকে। মাঝে মধ্যে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করছি নার্নার কথা। এমন সময় এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম, প্রথম দর্শনে যাকে কুম্ভকারদের গ্রাম বলে মনে হল। রাস্তার দু' পাশে কুমোরদের বাড়ির আনাচে-কানাচে পোড়ামাটির রাশি রাশি কুয়োর পাট, গামলা, হাঁড়ি প্রভৃতি শুকোতে দেওয়া হয়েছে রোদ্দুরে। অভিনব কিছু নয়; পশ্চিমবঙ্গের অজস্র গ্রামে এরকম কুম্ভকার পল্লী দেখা যায়। অন্য পথের দু'দিকে চোখ রেখে চলেছিলাম। আর ঠিক তখনই সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল; হঠাৎ গিয়ে পড়লাম এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি। রাস্তার পাশে এক টালি-ছাওয়া বাড়ির দাওয়ায় এক প্রৌঢ় চেয়ারে বসে ছিলেন। একটু নজর করতেই বুঝলাম, কাঠের তৈরি চেয়ারের মত দেখতে হলেও চেয়ারটি আগাগোড়া পোড়ামাটির তৈরি। "টেরাকোটা" চেয়ার! জন্মে কখনো দেখিনি, শুনিওনি। কলকাতা থেকে সরাসরি বাসে যেখানে আসা যায় সেরকম হাতের কাছের গ্রামে এহেন তাজ্জব জিনিস কল্পনাতীত। বেশ অশোভন দ্রুততায় ধেয়ে গেলাম সেই প্রৌঢ়ের দিকে। তারপরে, তাঁর ও কুম্ভকার পল্লীর আরও কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করে "টেরাকোটা" চেয়ারের রহস্য উদ্ঘাটন করলাম কিছুক্ষণ বাদে।

গ্রামের নাম ভাস্কুর। ডোমজুড়-বালুহাটি সড়কে ডোমজুড় থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল ও বালুহাটি থেকে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা—আনুমানিক দুই হাজার। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ ও মাহিষ্যরাই প্রধান। গ্রামীণ নেতৃত্ব প্রথম সম্প্রদায় দুটির হাতে। কুম্ভকার পরিবার দশ-বারো ঘরের বেশি নয়। তাঁদের উপাধি—পাল; পেশা—প্রধানত কুয়োর পাট, হাঁড়ি ও গামলা তৈরি করা।

প্রৌঢ় তাঁর নাম বললেন কানাই পাল। এখানেই বহু পুরুষের বাস। কুয়োর পাট, হাঁড়ি, গামলা প্রভৃতি তৈরি করাই তাঁর পৈতৃক পেশা বটে তবে চেয়ারটি বানিয়েছেন নিছক ব্যক্তিগত শখের জন্য। মাটি নিয়েই তাঁদের কারবার, মাটি পুড়িয়েই তাঁদের দু' বেলা দু' মুঠো জোটে। মাঝে মাঝে খেয়াল যায় নতুন কিছু করতে। সে খেয়ালেরই ফসল এই চেয়ার। তাঁর গৃহস্থালীর প্রয়োজনে আরও দু' চারটি তৈরি করে নিয়েছেন। সেগুলি আছে বাড়ির অন্দরে। পোড়ামাটির চেয়ার বানাতে ছাঁচের ব্যবহার হয় না। হাতে দিয়েই পায়া, হাতল, বসবার আসন ও হেলান দেবার পাটাতন তৈরি করে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে ভাটিতে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। কুয়োর পাট পোড়াবার ভাটি খুব বড় আকারের হয়। তার মধ্যে চেয়ার তো দূরের কথা, গোটা একখানা "টেরাকোটা" খাটও ঢুকে যেতে পারে। খাট অবশ্য এ গ্রামের কেউ এখনও তৈরি করেননি তবে তাতে কোন বাধা আছে বলেও মনে হয় না। সে যাই হোক, শখের চেয়ারের রং যাতে সুন্দর ও উজ্জ্বল হয় সেজন্য পোড়াবার আগেই তাতে দু' প্রস্থ গোলা রং মাখিয়ে নেওয়া হয়। প্রথমটি তৈরি হয় "বেলে-বনক" নামের হলুদ রঙের এক বিশেষ জাতের মাটি গুলে যা এখানকার কারিগররা আমদানি করেন মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থেকে।

তাঁর প্রলেপের উপাদান কালো রঙের এক শ্রেণীর মাটি যা পাওয়া যায় হুগলী জেলার মশাট, জঙ্গলপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে। চাটিতে পুড়ে এই প্রলেপের আবরণ পরিণত হয় উজ্জ্বল, মসৃণ "টেরাকোটা"র রঙে। শুধু মনোরম রং হলেই হয় না। শখের জিনিস কিনা তাই কিছু কারিগরিরও প্রয়োগ হয়ে থাকে। কানাই পাল মশায়ের "টেরাকোটা" চেয়ারে হাতে-তৈরি দুটি ভারবাহী মানুষের মূর্তি সামনের পায়া দুটির স্থান অধিকার করেছে আর হাতল দুটির নীচে বসানো হয়েছে আর দুটি বেঁটেখাটো মানুষ যারা দু হাত তুলে হাতলের ভার বহন করছে। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় নকশি কাজের পরিধি অনায়াসেই আরও বহু দূরে বিস্তৃত করা সম্ভব। পায়ায় ব্যবহৃত চ্যাঙা মানুষগুলি অনায়াসেই রূপ-লাবণ্যবতী যুবতীতে পরিণত হতে পারে। হাতলের সামনের দিকে দুটি সিংহের মুখ থাকতেও বাধা নেই। আবার হেলান দেবার পাটাতনে যদি মন্দিরের ছড়ানো পেখম উৎকীর্ণ হয় তাতেই বা ক্ষতি কি। বসবার আসনের ঠিক নীচে চারদিকে যে ফ্রেন পটি থাকে তার গায়ে মন্দির "টেরাকোটা"র অনুকরণে কৃষ্ণলীলা বা বাবু-বিবি-বিলাসের দৃশ্যও দেখানো যেতে পারে। আর, ঠিক সেই সময়, যদি বঙ্গকৃষ্টিপ্রাণ ও বঙ্গ-কৃষ্টিপ্রাণাদের মধ্যে একটু প্রচার অভিযান চালানো যায় তাহলে বাঁকুড়ার ঘোড়ার মতোই এ "টেরাকোটা" চেয়ার চক্ষের নিমেষে "স্টাটাস সিম্বল"-এ পরিণত হয়ে অগণিত ড্রয়িংরুমের শোভাবর্ধন করবে। কানাই পাল মশায় বলেছিলেন, পোড়ামাটির কেদারা তিনি কখনো বিক্রি করবার চেষ্টা করেননি সেজন্য অতশত অলংকরণের কথা তাঁর মাথায় আসেনি। তবে পোড়ামাটির মোড়া কিছু কিছু বিক্রি হয়েছে। সেগুলিও সাদা-সিধে ভাবে তৈরি ও দেখতে অনেকটা বাঁশ-বেতের মোড়ার মতোই। তবে তুলনায় অনেক বেশি ভারী। (চেয়ারখানা প্রায় এক মণের মত ভারী মনে হয়েছিল।) এই ওজনের অসুবিধাটাই "টেরাকোটা" আসবাবের ঘোরতর বিপক্ষে। তবে সুবিধার দিকও আছে। কাঠের আসবাবে ঘুণ ধরে, ছারপোকা হয়, টেঁকেও কম। পক্ষান্তরে—ভেবে দেখুন —এক প্রস্থ পোড়ামাটির আসবাব বানাতে পারলে দু' চার পুরুষের মতো নিশ্চিন্দি। তাছাড়া ছিঁচকে চোরের সাধ্য নেই তা তুলে নিয়ে যায়।
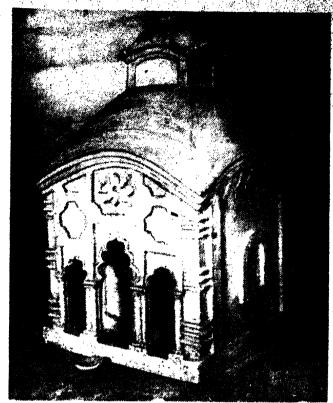
কানাই পাল মশায়ের কাছে বিদায় নিয়ে গেলাম কাছাকাছি শিবনারায়ণ পালের বাড়ি। তিনি বয়সে ছোট কিন্তু এ শিল্পে তাঁর অভিজ্ঞতা কম নয়। বললেন, তাঁর স্বর্গত পিতা উপেন্দ্রনাথ পাল প্রথম এ জাতীয় শিল্পকর্মের উদ্ভাবন করেন। তাঁর আমলের এক ফ্রেম "টেরাকোটা" চেয়ার এখনও এ পরিবারে রক্ষিত আছে। শিব-

পোড়ামাটির আটচালা মন্দির

নারায়ণবাবু পোড়ামাটির যে আটচালা মন্দিরটি দেখালেন তা উচ্চতায় প্রায় তিন ফুট ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে দেড় ফুটের মতো। ভিতরটা ফাঁপা হওয়াতে ওজন খুব বেশি নয়। কিন্তু গুনোগর্ভ এ শিল্পবস্তুটির নির্মাণে যে প্রচুর কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। শিবনারায়ণ-বাবুর ঝোঁকটা সূক্ষ্মতর শিল্পকর্মের দিকে। অনেক দিন আগে তিনি বুদ্ধগয়া মন্দিরের বেশ বড় একটি "টেরাকোটা" মডেল তৈরি করে কুমারটুলির এক প্রদর্শনীতে দিয়েছিলেন যেখান থেকে এক সাহেব সেটি কিনে নিয়ে যান চড়া দামে। এ ছাড়া দু' দিকে চাকাওয়ালা এক কামানও তিনি বানিয়েছিলেন। সেটিও বিক্রী হয়ে গিয়েছে। চেয়ার, গোল টেবিল, মোড়া প্রভৃতি "টেরাকোটা" আসবাব তৈরি করে থাকলেও সূক্ষ্ম মডেলই তাঁর বেশি প্রিয়। এ জন্য ছবি বা আলোকচিত্র দেখে কাজ করতে তাঁর কোনই অসুবিধা হয় না। বুদ্ধ-গয়ায় মন্দির বা কামান তিনি ছবি দেখেই তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পৈতৃক পেশা বছরের পর বছর রাশি রাশি কুয়োর পাট, হাঁড়ি ও গামলা উৎপাদন করা। তাতে তাঁর পেট ভরে কিন্তু মন ভরে না। অল্প অলাপেই বুঝলাম, বেশ ক্ষোভ জমে আছে তাঁর মনে। যে শিল্পকর্ম তাঁর আয়ত্ত তা তিনি অবলম্বন করতে পারেন না; যে দক্ষতা তাঁর অধিগত তার প্রয়োগের কোন উপায় নেই। পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য তাঁকে মামুলি জিনিস বানিয়ে মরতে হচ্ছে দীর্ঘকাল। এ মনস্তাপ শুধু তাঁর একার নয়। জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই একই বিফলতা কত যে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। প্রতিকূল অবস্থার চাপে একদিকে উজ্জ্বল সব প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর অন্য দিকে অনুকূল পৃষ্ঠপোষকতায় কতশত বুদ্ধি মান খ্যাতি প্রতিপত্তিতে সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করছে। একটু অপ্রাসঙ্গিক

হলেও, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে দীপ্তিমান, 'লিমেরিক' ধর্মী ছোট্ট একটি বাংলা কবিতার এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। 'বনফুল' না সজনী দাসের লেখা ঠিক মনে নেই। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে লেখা হলেও এখনো সে-কবিতা আমার মনে দাগ কেটে বসে আছে :

"ঘোড়া খায় হিমশিম
এ খবর সাচ্চা,
কিছুতে হয় না ডিম
হয় খালি বাচ্চা।
অথচ বাজারময়,
ঘোড়ার ডিমেরই জয়,
চিন্তিত ঘোড়া কয়—
এ আপদ আচ্ছা,
যতই চেষ্টা করি হয় খালি বাচ্চা।

'ঘোড়ার ডিমের' এই জয়জয়কারের যুগে 'ঘোড়ার বাচ্চাদের কোন গতি হয় না? অন্যান্য প্রসঙ্গের কথা পাঠকরা ভেবে দেখবেন; আলোচ্য প্রসঙ্গে, এসব "টেরাকোটা" শিল্পীদের কুয়োর পাট অথবা গামলা বানানোর দায় থেকে উদ্ধার করে তাঁদের প্রতিভাবিকাশের পথ খুলে দেওয়া যায় না?

যেসব নকাশি জিনিসের উল্লেখ করেছি তা তাঁদের দক্ষতা ও সম্ভাবনার সূচক মাত্র। তৈরি বাজার নেই বলে এ জাতীয় আর পাঁচ রকম মডেল তাঁরা তৈরি করতে ভরসা পান না। সমস্ত শিল্পকর্মটি এখনও তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত শখের পর্যায়েই রয়ে গেছে। একমাত্র সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের প্রতিভা আরও বিকশিত হতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে এহেন সমর্থন খুবই সম্ভব। দেশের সর্বত্র প্রতিদিনই যে অসংখ্য পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার অলংকরণের জন্য কিছু কিছু "টেরাকোটা" প্যানেল ব্যবহার করলে কেমন হয়? সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ সান্যাল মশায়ের (পেশায় তিনি বাস্তুকার) কলকাতার বাড়ির প্রবেশপথের দু'ধারে সাবেক ধাঁচের দুটি দ্বারপালমূর্তি নিবদ্ধ আছে। কংক্রিটের তৈরি হলেও উপযুক্ত রঙের প্রলেপের জন্য সেগুলিকে হুবহু "টেরাকোটা" মূর্তির মত দেখায়। এরা পোড়ামাটি দিয়েও তৈরি হতে পারত এবং রৌদ্রবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার সামান্য ব্যবস্থা করলে সাধারণ পাকা বাড়ির মতই আয়ু হত তাদের। কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের চক্রাকার দেওয়ালে কিছু দূর দূরে অন্তর অনেকগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মের "বা রিলিফ" উৎকীর্ণ আছে। "টেরাকোটা" পদ্মের অনুরূপ এই পরিচ্ছন্ন অলংকরণে ইমারতটির বহিরঙ্গের শোভা যে বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এহেন সজ্জা আরও নানা প্রকারের হতে পারে এবং গৃহস্থাপত্যে তাদের প্রয়োগ অভিনন্দিত হবার যোগ্য। ইঞ্জিনিয়ার ও গৃহস্বামীরা যদি এ বিষয়টি সহৃদয়তার সঙ্গে ভেবে দেখেন তবে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত "টেরাকোটা" শিল্পীদের হয়ত বা একটা গতি হতে পারে।

(ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

॥ ২৩ ॥
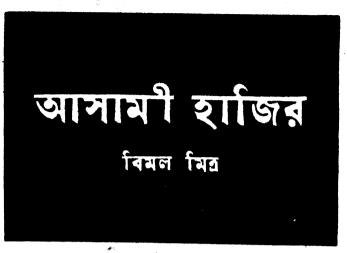
নয়নতারা তখনও খাটের কোণের দিকে ঠিক সেই একই ভাবে বসে ছিল। শাশুড়ির গলার শব্দে তার ঘোমটাটা যেন একটুখানি কেঁপে উঠলো। কিন্তু তখনই সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। শাশুড়ি যখন সামনে এসে দাঁড়ালো তখন চোখের জলে সব কিছু ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

শাশুড়ি সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী বউমা, কাঁদছো যে? কী হয়েছে?

নয়নতারা তার মাথাটা আরো নিচু করে নিলে। যেন পোড়ামুখ দেখাতেও তার লজ্জা হচ্ছিল।

শাশুড়ি আবার বউমাকে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? কথা বলছো না যে? আজ তো খোকা রাত্তিরে তোমার ঘরে ছিল। আজ তো আর পালিয়ে যায়নি?

তবু নয়নতারার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না। তার মাথাটা যেন আরো নিচু হয়ে গেল।

প্রীতি এবারে নয়নতারার চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরলে। নয়নতারা সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় ঘেন্নায় অপমানে চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলেছে। কিন্তু চোখ বুজোলেই কি আর চোখের জলকে আটকানো যায়! সেটা তখন অশ্রুর ধারায় গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

প্রীতি বললে—আমার কথার জবাব দাও বউমা, আমি জানতে চাইছি আজকে খোকা তোমাকে কী বললে? তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলেছে?

নয়নতারা মুখে কিছু বললে না। শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে—না—

—কোনও কথা বলেনি?

—না।

—তা হলে সমস্ত রাত ঘুমিয়ে কাটালে?

—না।

—সমস্ত রাত জেগে ছিলে? বলো, জবাব দাও? দুজনেই জেগে কাটালে অথচ দুজনের মধ্যে কোনও কথা হলো না মোটে? সেই জন্যে তোমার চোখ দুটো এত ফুলে উঠেছে! একে রাত জাগা তার ওপর সমস্ত রাত কেঁদেছ, চোখ তো ফুলবেই।

তারপরে এ সমস্যার কী সমাধান যে করবে তা ভেবে না পেয়ে প্রীতি বললে—তা হলে তুমি একটু এখন শুয়ে পড় বউমা, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, ভোর হয়ে এসেছে, আমি বাসি কাপড় বদলে তোমার জন্যে একটু দুধ গরম করে আনতে বলি—

বলে প্রীতি চলে যাচ্ছিল। নয়নতারা এবার কথা বলে উঠলো। বললে—মা—

—কী বউমা, আমাকে কিছু বলবে? কী বলতে যাচ্ছিলে, বলো?

নয়নতারা আধ-ফোটা গলায় বললে—আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিন—

প্রীতি স্তম্ভিত হয়ে গেল বউমার প্রস্তাব শুনে। বললে—ছি বউমা, অমন কথা বলতে নেই, লোকে বলবে কী? তাতে তোমারও নিন্দে হবে, তোমার শ্বশুর-বাড়িরও নিন্দে হবে। বলবে চৌধুরীমশাই এমন বউ করেছিল যে সে শ্বশুর-শাশুড়িকে মানিয়ে চলতে পারলে না। আর তোমার বাবার কথাটা একবার ভাবো তো। সবে তিনি এত বড় একটা শোক সামলে উঠেছেন, এর পরে যদি শোনেন যে তোমারও কপাল ভেঙেছে তা হলে কি আর তিনি বাঁচবেন?

নয়নতারা কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো। কিছু উত্তর দিলে না।

প্রীতি বললে—তার চেয়ে তুমি আর কটা দিন সহ্য করো বউমা, একটু কষ্ট করে সহ্য করো, দেখি আমি কী করতে পারি। আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও—

নয়নতারা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমি কী অন্যায় করেছি মা, কী এমন অন্যায় করেছি যে আমাকে এত শাস্তি পেতে হবে? আমাকে তো আপনারা দেখে শুনে পছন্দ করে বউ করে এনেছেন! আমি তো নিজে থেকে যেচে আপনাদের বাড়ি আসিনি যে এমন করে তার প্রতিশোধ নেবেন আমার ওপর—

বলতে বলতে নয়নতারা যেন ভেঙে পড়লো। মনের জ্বালায় হয়তো আরো অনেক কিছু সে বলতো কিন্তু বলতে গিয়ে তার গলাটা কথার মাঝখানেই বুজে এল।

প্রীতি নয়নতারার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললে—দোষ তুমি কেন করতে যাবে বউমা, সব দোষ আমার আর আমার ছেলের। আমরাই দোষ করেছি। আমার ছেলে বিয়েই করতে চায়নি। তবু তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা তুমি তার জন্যে ভেবো না বউমা, প্রথম প্রথম অনেক ছেলেই বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু শেষকালে তো সবই ঠিক হয়ে যায়। তখন আবার ছেলে-মেয়ে হয়ে ঘর একেবারে ভরে যায়। এরকম অনেক দেখেছি আমি। আমাদের ভাগলপুরেই আমি কত দেখেছি! কিন্তু তুমি যেন এ নিয়ে এখন সাত-কান কোর না। এখানে নবাবগঞ্জে যদি একবার পাড়ার লোকের কানে যায় তো আর রক্ষে থাকবে না। তখন গাঁয়ে এই নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে যাবে একেবারে—

হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক এলো—বউদি—

প্রীতি বললে—ওই গৌরী ডাকছে, এখনই বিন্টুর মা রান্না-ঘরে ঢুকবে, গৌরী ভাঁড়ারের চাবি চাইতে এসেছে। আমি এখনই আসছি, উনুনে আগুন দিলেই তোমার জন্যে এক বাটি গরম দুধ নিয়ে আসছি। সারা রাত জেগে আছো, শরীরটা একটু সুস্থ হবে—

বলে বাইরে চলে গেল প্রীতি।

*

কিন্তু সেই সেদিন থেকেই যেন শনির দৃষ্টি পড়লো চৌধুরী বংশের ওপর। সেই যেদিন কালিগঞ্জের বউ এসেছিল নতুন বউ-এর মুখ দেখতে। রাণাঘাট থেকে লোক এসে খবর দিয়ে গেল যে, উকিলবাবু খবর দিয়েছেন কোর্টে আর একটা মামলা উঠেছে। চৌধুরীমশাইকে একবার সেখানে যেতে হবে।

জমি-জমা থাকলেই মামলা-মোকর্দমা থাকবে। কথাটা তা নয়। কিন্তু এটা বড় জটিল মামলা। উকিলবাবুর চিঠিটা দুদিন আগেই এসেছিল। চৌধুরীমশাই ভেবে-ছিলেন বউমা কেষ্টনগর থেকে আসার পর ছেলের কী মতি-গতি হয় তা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে রাণাঘাটে যাবেন। বাবাজীকেও তাই বলেছিলেন। বাবাজী বলেছিলেন—তুই নিশ্চিন্ত থাক, আমি তো রইলুম—আমি সব ঠিক করে দেব—

চৌধুরীমশাই ব লে ছি লে ন—কিন্তু আপনার দিগ্‌বন্ধনের কিছু ফল দেখে না গেলে বড় ভয় করছে বাবাজী, জানেনই তো আমার ওই একমাত্র সন্তান, ওই এক ছেলে। যদি কিছু উল্টো ফল হয় তো তখন বড় মুশকিলে পড়বো। এখনও পর্যন্ত বাবাকে কিছুই বলা হয় নি।

—না বলেছিস ভালো করেছিস। গুহ্য কথা কাউকে বলতে নেই—

আগের দিনই এই সব কথা হয়ে গিয়েছে। পরের দিন যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন দেখলেন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। তিনি মস্ত বড় বিছানায় একলাই শুয়ে আছেন, পাশে কেউ নেই। ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। ঘরের বাইরে এসে দেখলেন ভেতর-বাড়িতে সেদিনকার কাজ-কর্ম সব শুরু হয়ে গিয়েছে। গৃহিণীর দেখা পাবার জন্যে একবার রান্না-বাড়ির দিকে উঁকি দিলেন। সেখানেও তিনি নেই।

কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। ফিরেই যাচ্ছিলেন। তারপর চলে গেলেন কুয়োতলার দিকে। ক'দিন আগেই বাড়িতে বিয়ে হয়ে গেছে। বড় বড় গর্ত খুঁড়ে ভিয়েনের উনুন তৈরি করা হয়েছিল। সে উনুন আর কাজে লাগবে না। পোড়ামাটির ভাঙা ঢ্যালাগুলো তখনও জমা হয়ে রয়েছে সেখানে। কুয়োতলার পাশে মুখ-হাত-পা ধোয়ার বড় বড় মাটির জালা রাখা ছিল। সেখান থেকে জল নিলেন। একটু পরেই রোজকার কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে। তখন আসবে কৃষাণ, কয়াল, প্রজা-পাঠক। তখন চৌধুরীদের বার-বাড়ি একেবারে গম্-গম্ করে উঠবে। বিধু কয়ালের ছেলে শশী
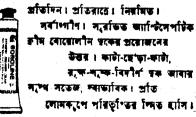
হলে সেই নিয়ম মত সরবে ঝাড়তে পারবে। মাঠ থেকে সরবে গাছগুলো এনে গোবর-দেওয়া উঠোনের ওপর ছড়িয়ে রেখেছে। গোছা-গোছা শুকনো সরবে গাছের আঁটি। সেগুলোকে ঝাড়তে হবে ঝাড়তে হবে। তারপর দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে মেপে মেপে মরাইতে তুলবে। রজব আলিও আসবে দামড়া দুটোর তদারক করতে। তাদের খাওয়ানো তাদের সেবা শুশ্রূষার ভারও তার ওপর। তারপর যেদিন চৌধুরী মশাই সদরে যাবেন সেদিন ভোর থেকেই গরুর গাড়ির চাকায় রেড়ির তেল মাখাবে। গাড়ির ছইটা ঝাড়বে মুছবে। শতবার শতরঞ্জিটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে কেচে রোদে শুকোতে দেবে। শুধু শশী কয়াল, রজব আলিই নয়, হাজারটা লোকের হাজার রকম কাজের ফরমাশ। সবাই কাজ করছে কিনা তার তদারক করার কাজ চৌধুরীমশাই-এর। এই এতগুলো লোক ঠিক মত কাজ করলেই তবে চৌধুরী-বংশের সংসার-যন্ত্রের চাকা নিয়ম করে ঘুরবে।

গৌরী তখন রান্নাবাড়ির দিক থেকে আসছিল। তারও সকাল বেলা থেকে ফুরসত নেই। চৌধুরীমশাইকে ভেতর-বাড়িতে আসতে দেখে একটু পাশ দিচ্ছিল। চৌধুরীমশাই তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, তোর বৌদি কোথায়?

প্রীতিও সেই সময়ে ছেলের ঘর থেকে দুধের বাটি হাতে নিয়েই আসছিল।

বললে—কী হলো, তুমি ঘুম থেকে উঠেছ?

চৌধুরীমশাই কাছে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বউমার কী খবর?

প্রীতি বললে—এই তো বউমার কাছ থেকে আসছি। একটু গরম দুধ খাইয়ে এলুম—

—আর খোকা? খোকা কোথায়?

প্রীতি বললে—সারা রাত নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে এখন তোমার খোকার কথা মনে পড়লো?

চৌধুরীমশাই বললেন—কী জানি কেন, কালকে খুব ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। কেন যে এত ঘুমিয়ে পড়লুম হঠাৎ কে জানে!

প্রীতি বললে—কবে তুমি ঘুমোও না বলো তো? তুমি তো চিরকাল বিছানায় শুলেই নাক ডাকাও। তোমার মতন অমন ঘুম হলে আমি বেঁচে যেতুম। সরো, আমার কাজ আছে—

প্রীতি বললে—এখন এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে অত কথা বলবার সময় নেই। বলছি যে আমার কাজ আছে—

চৌধুরীমশাই সরলেন না। বললেন—কাজ তো আমারও আছে, কালকে কী হলো তা তো কই বললে না। খোকাকে তো শেকল দিয়ে দিয়েছিলে বাইরে থেকে। শেষকালে প্রকাশ শেকল খুলে দিয়েছিল?

প্রীতি বললে—এখন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে অত কথা বলবার সময় নেই। বলছি যে আমার কাজ আছে—

চৌধুরীমশাই বললেন—কাজ কি আমারই নেই? আমাকে আবার একবার রাণাঘাটে যেতে হবে। উকিলবাবুর জরুরী চিঠি আছে। তা বলে আমার কথার জবাব দিতে আর কতক্ষণ সময় লাগে। জবাব দেবে না তাই-ই বলো!

প্রীতি বললে—তা তোমার কথার জবাব দিতে গেলে আমার সংসার চলবে? আর জবাব দিয়েই বা কী করবো। তোমাকে দিয়ে তো আমার কাজের কোনও সুরাহা হবে না—

—তার মানে? এ যেমন তোমার সংসার তেমনি আমার সংসার নয়? এ সংসারের ভালোমন্দ কি আমিও ভাবি না?

প্রীতি বললে—অত চেঁচিও না একে তো লক্ষ্মীস্বরূপ বউমার কাছে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে, এর ওপরে আমার মাথাটা আর হেঁট করে দিও না—। আমি বলে সারারাত ঘুমোইনি, এমনিতেই আমার বুক ধড়ফড় করছে, তার ওপরে তোমার বাক্যবাণ আমি আর সইতে পারছি না—

চৌধুরী মশাই বললেন—তোমার শরীরের কথা ভেবেই তো আমি জিজ্ঞেস করছি কাল রাত্তিরে কী হলো, তা তুমি অত মেজাজ গরম করবে তা জানলে আর ভেতর-বাড়িতে আসতুম না—

প্রীতি বললে—আমার শরীরের জন্যে যেন ভেবে ভেবে তোমার ঘুম হচ্ছে না—

—বেশ, আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমি নাচার, কিন্তু এখনই তো বাবাজীর কাছে যাবো, যখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তখন তো বলতে হবে কিছু—

প্রীতি বলে—তাঁর মন্তরে কোনও কাজ হয়নি—আর কাজ হবেও না—

—কেন? কাজ হয়নি কেন?
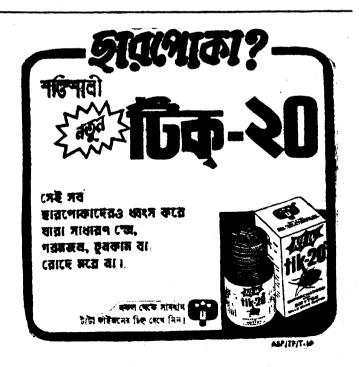
প্রীতি বললে—তা কাজ হলে আমার এই হেনস্তা? এই সকালবেলা বউমাকে গিয়ে গরম দুধ খাইয়ে আসি? কোথায় বউ আমার সেবা করবে, না, আমি বউ-এর সেবা করে কারে মরছি। আমারও যেমন কপাল—

চৌধুরীমশাই বললেন—তা প্রকাশ কি ঘরের শেকল খুলে দিয়েছিল রাত্তির বেলা? খোকা পালিয়ে গেল কী করে?

প্রীতি বললে—শেকল খুলে দেবে কেন? ঘরের মধ্যেই দু'জনে মুখ ফিরিয়ে বসে রাত কাটিয়েছে।

—সমস্ত রাত?

প্রীতি বললে—হ্যাঁ সমস্ত রাত! তাই জানতে পেরেই তো আমার এত হেনস্তা! এমন ছেলে আমি বাপের জন্মে কখনও দেখিনি! বউমা তো তাই বলছিল তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে—

—কেন?

প্রীতি বললে—তা বউমার দোষ কী? তোমার ছেলে অমন করে তাকে অপমান করবে, তার দিকে ফিরে তাকাবে না, তাকে দেখলেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে, একঘরে থাকলেও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে

থাকবে, তাতে তার কষ্ট হয় না? এতটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান থাকলে কোনও মেয়েমানুষ তা সহ্য করতে পারে? আমার তো ভয় হচ্ছে বউমা শেষকালে কোনও কাণ্ড না বাধিয়ে বসে।

—কী কাণ্ড বাধাবে?

—আরে, মেয়েদের মনের হিসেব তোমরা পুরুষ মানুষরা কী করে বুঝবে? শেষকালে আত্মঘাতী হয়? শেষকালে গলায় দড়ি-টড়ি দিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করে বসে?

এতক্ষণে যেন চৌধুরীমশাই-এর হুঁশ হলো।

বললেন—কেন? খুব কাঁদছে নাকি বউমা? কিছু বলছে?

—তা বলবে না? এই সবে দু'দিন আগে একটা শোক পেয়েছে, তারপর তোমার ছেলের এই কাণ্ড, এর পর যদি কিছু বলেই তো আমি তার মুখ বন্ধ করতে পারবো?

—তা বলো না, বউমা কী বলছিল বলো না?

—বলবে আবার কী! দুঃখের জ্বালায় বলছিল যে আমরা তাকে দেখে শুনে পছন্দ করে নিয়ে এসেছি, সে তো নিজে থেকে আসেনি, তাহলে কেন তার ওপর আমরা এর প্রতিশোধ নিচ্ছি—সে কী দোষ করেছে!

—তা তুমি কী বললে তার জবাবে?

প্রীতি বললে—এ কথায় আমার কী জবাব থাকতে পারে বলো দিকিনি! আমিও তো মেয়েমানুষ। আমি নিজে মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের দুঃখ যদি না বুঝি তো কি তুমি বুঝবে, না তোমার ছেলে বুঝবে?

—তারপর?

প্রীতি বললে—তারপর আর কী, তারপর কাঁদতে লাগলো হাউ-হাউ করে—। : আমি আর কী করবো, আমারও খুব কষ্ট হলো দেখে। আমিও খানিক কাঁদলুম। বেচারী সারা রাত ঠায় এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল কেঁদেছে আর জেগে কাটিয়েছে। তাই এখন একটু গরম দুধ খাইয়ে দিয়ে এলুম—

—আর খোকা? খোকা কোথায় গেল? সে..

হঠাৎ কানে এল বার-বাড়ি থেকে যেন একটা কী আওয়াজ এল। যেন গোলমালের আওয়াজ! কান খাড়া করলেন চৌধুরীমশাই। বললেন—ও কীসের গোলমাল?

অনেকক্ষণ শব্দটা শুনলেন তবু কিছু বুঝতে পারলেন না। প্রীতির তখন অত সব বাজে-কথা শোনবার সময় নেই। এত বড় সংসারের সব লোকের সমস্ত দাবি তার মুখের দিকেই হাঁ করে চেয়ে আছে। সারা রাত তার ঘুম হোক আর না হোক তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। সকলেরই এক কথা : আমার দাবি মেটাতে হবে। কোথা থেকে টাকা আসছে, কে উপার্জন করছে তা যাচাই করবার দায়িত্ব আমার নেই। আমি শুধু ঠিক সময়ে মাইনে পেলেই হলো আর খেতে পেলেই হলো। আমরা শুধু নেব, তোমার দেবার শক্তি-সামর্থ্য আছে কিনা সে তোমার বিবেচ্য। অথচ পান থেকে চুণ খসলেই আমি তোমাকে দায়ী করবো। নইলে তুমি এ-বাড়ির গিন্নী হয়েছিলে কেন?

চৌধুরীমশাই আর দাঁড়ালেন না সেখানে। তাড়াতাড়ি ভেতর-বাড়ি পেরিয়ে সোজা গিয়ে বার-বাড়িতে পড়লেন। ততক্ষণে আওয়াজটা স্পষ্ট কানে আসছে—

তারপর মনে হলো এ যেন খোকার গলার আওয়াজ—

বার-বাড়ির মধ্যেই একটা বড় ঘরে বাবাজীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই ঘরের ভেতরে বসেই বাবাজীর পুজো-আচ্চা-সেবা যা-কিছু সব হতো। আওয়াজটা সেই ঘরের দিক থেকেই আসছে। সেখানে যাবার পথেই দেখলেন চণ্ডীমণ্ডপ থেকে, উঠোন থেকে, নানা দিক থেকে কৌতূহলী লোকজন বাবাজীর ঘরের দিকে আসছে।

—এই শশী, কী হচ্ছে রে ওখানে?

শশী দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—কী জানি ছোটবাবু, আমি তো তাই জানতেই যাচ্ছি—

দীনু ভেতর-দিক থেকে দৌড়ে বাইরে আসছিল।

তাকেও জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরীমশাই —কী হচ্ছে রে ওখানে? কীসের গোলমাল?

—আজ্ঞে, আপনাকে ডাকতেই যাচ্ছিলুম, খোকাবাবু বাবাজীকে মারছে—

—খোকাবাবু?

যেন বজ্রাঘাত হলো চৌধুরীমশাই-এর মাথায়। বললেন—কেন? মারছে কেন?

দীনু বললে—আজ্ঞে আমি তো তা জানি নে, শব্দ শুনে দৌড়ে এসে কাণ্ড দেখলুম। দেখেই আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলুম—

সমস্ত জিনিসটা এতক্ষণে যেন চৌধুরী-মশাই অনুমান করতে পারলেন। তারপর বাবাজীর ঘরের দিকেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু যেতে গিয়েও থেমে গেলেন। পেছন ফিরে বললেন—হ্যাঁ রে, কর্তাবাবু কী করছে?

আপনার কথাই আমরা ভেবেছি ...

আর উৎসাহিত হয়েছি অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকারী ও মনভোলানো এই বস্ত্রসম্ভার তৈরী করতে

নয়ন ভুলানো বুনটে কি অপূর্ব্ব স্পর্শ সুখ। নব পরিকল্পনায় উদ্ভূত DCM বস্ত্রসম্ভার আপনার দিবারাত্রির কাব্য হয়ে উঠুক।

হাল্কা ছিটকা কবিতা ভরেল শাড়ীর উজ্জ্বল বর্ণালী আপনাকে করবে মহিমান্বিত।

DCM টেক্সটাইল ডিজাইনিং ইউনিট ফ্যাশানের নতুন প্রেরণা এনে দিচ্ছে

—আজ্ঞে তিনি তো ভোর বেলাই ঘুম থেকে উঠেছেন। এখন পুজোয় বসেছেন।

—এই গোলমাল কানে গেছে নাকি?

—তা জানি নে। আমি এখন গেলে জানতে পারবো। এখনও গোমস্তামশাই আসেন নি—

চৌধুরীমশাই বললেন—তা হলে তুই কর্তাবাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে সামলে রাখ। যদি জিজ্ঞেস করেন নিচের কীসের গোলমাল তাহলে যেন কিছু বলিস নে! বলবি বেহারী পালের বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে—

বলে আর দাঁড়ালেন না। দৌড়তে দৌড়তে এক নিমেষে গিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন। চৌধুরীমশাইকে দেখে রাস্তা করে দিলে সবাই। ঘরের ভিতরে তখন তুমুল কাণ্ড। চৌধুরীমশাই ঘরে ঢুকে দেখেন সদানন্দ এক হাতে বাবাজীর মোটা মোটা জটাগুলো পাকিয়ে ধরেছে আর এক হাতে বাবাজীর সিঁদুর মাখা ত্রিশূলটি ধরে তাঁর দিকে তাগ করে আছে।

বলছে—আর করবি তুই? আর এমন করবি কখনো?

বাবাজীও নাচার হয়ে বলছেন—আমাকে ছাড়ুন বাবা, আমাকে ছাড়ুন—

সদানন্দর শক্ত মুঠির তেজে অত বড় দশাসই বাবাজী যেন একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে গেছেন।

চৌধুরীমশাই আর থাকতে পারলেন না। ঘরে ঢুকেই বাবাজীর ত্রিশূলটা সদানন্দর হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন; কিন্তু সদানন্দর গায়েও যেন অসুরের শক্তি। সেও আটকে ধরেছে সেটা।

চৌধুরীমশাই বললেন—কী, হচ্ছে কী খোকা? ছাড়ো, এটা ছাড়ো—

—আমি ছাড়বো না। আপনি কেন বাধা দিচ্ছেন? ছেড়ে দিন—

চৌধুরীমশাইও ছাড়বেন না, সদানন্দও ধরে থাকবে।

—ছাড়ো, ছাড়ো—

সদানন্দ গলা চড়িয়ে বলে উঠলো—না ছাড়বো না—আমি বুজরুকটাকে খুন করে ফেলবো—

এতক্ষণে চৌধুরীমশাই-এর নজরে পড়লো একপাশে প্রকাশমামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। চৌধুরীমশাই তার দিকে চেয়ে তাকে ধমকে উঠলেন। বললেন—তুমি এখেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছো, খোকার হাত থেকে ত্রিশূলটা কেড়ে নিতে পারছো না—?

প্রকাশ বললে—আজ্ঞে জামাইবাবু, আমি তো তখন থেকে সদাকে তাই বলছি। বাবাজী কী দোষ করলেন? বাবাজীর তো কিছুই দোষ নেই। তা ও কিছুতেই আমার কথা শুনছে না, আমি কী করবো?

চৌধুরীমশাই বললেন—তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া। তোমার জন্যে তো যত পণ্ডগোল হয়েছে—

প্রকাশমামা যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—আমি? আমিই যত নষ্টের গোড়া? সদা দোষ করলো আর দোষ পড়লো আমার মাথায়?

—তা দেখছ ত্রিশূলটা নিয়ে খোকা মানুষ খুন করতে যাচ্ছে আর তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো? এতখানি বয়েস হলো আর তোমার একটুও আক্কেল হলো না?

তারপর সদানন্দর দিকে চেয়ে বললেন—এখনও ছাড়ছো না, ছাড়ো বলছি—

—আমি ছাড়বো না।

যেন পাথরের মত কঠোর হয়ে সদানন্দ বাবাজীর মাথার জটগুলো মুঠো করে ধরে রইল।

বাবাজী তখন মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। বলছেন—ছেড়ে দিন বাবা, ছেড়ে দিন, আমি তো আপনার ভালো করবার চেষ্টাই করেছি। আমি আপনার মঙ্গলই চাই—

সদানন্দ চিৎকার করে বলে উঠলো—দরকার নেই তোর মঙ্গল করে, তুই আগে এ-বাড়ি থেকে বিদেয় হ—

এর জবাব দিলেন চৌধুরীমশাই। বললেন—কেন, বিদেয় হবেন কেন? বাবাজীকে বিদেয় করবার তুমি কে শুনি? বাবাজীকে আমি এ-বাড়িতে ডেকে এনে তুলেছি, উনি তো নিজের থেকে আসেন নি, এ-বাড়ির মালিক আমি, ওকে বিদেয় করতে হয় তো আমি বিদেয় করবো, তুমি কে?

সদানন্দ বললে—কিন্তু ও কেন আমার ব্যাপারে নাক গলাতে আসে?

—কেন? উনি কী করেছেন তোমার? উনি তো আমাদের সকলের মঙ্গল-কামনাই করেন।

—না, আমি কী করি-না-করি তা দেখবার দরকার কী ওর? আমি রাত্তিরে

বাড়িতে শুয়েছিলুম কিনা তা জানবার কীসের দরকার পড়েছে?

—তা গুরুজনরা জিজ্ঞেস করেন না? জিজ্ঞেস করেছেন তো ভালো, কী জন্যে করেছেন?
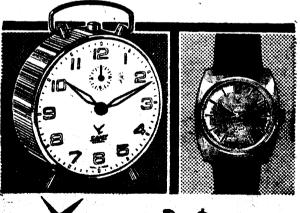
সদানন্দ বললে—ও কি আমার গুরুজন বলতে চান আপনি? একটা বুজরুক ঠগ জোচ্চোর হবে আমার গুরুজন আর ও যা বলবে আমি তাই মানবো?

—কেন মানবে না? তোমাকে মানতেই হবে ও'র কথা। উনি যখন আমার গুরুজন, তুমিও যখন আমার ছেলে তখন উনি তোমারও গুরুজন। ছাড়ো, ও'র জটা ছেড়ে দাও, ত্রিশূল ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিয়ে ও'কে প্রণাম করো—

সদানন্দ যেন চৌধুরীমশাই-এর কথার প্রতিবাদেই বাবাজীর জটা ধরে আরো জোরে টান দিলে। বললে—আমি ওকে আজ বাড়ি থেকে বিদেয় করবো তবে ছাড়বো—

—কী, এত বড় আস্পর্ধা তোমার? তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলো?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ, কথা বলবো, আলবৎ বলবো—

—খবরদার।

চৌধুরীমশাই রাগে গর-গর করতে লাগলেন। তাঁর গলার আওয়াজে সমস্ত ঘরখানা যেন থর-থর করে কেঁপে উঠলো।

প্রকাশ আর থাকতে পারলে না। এতক্ষণ জামাইবাবুর সামনে সে বেশি কথা বলেনি। এবার যখন দেখলে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে তখন সদানন্দর দিকে এগিয়ে গেল। বললে—এই সদা, করছিস কী? তোর কি জ্ঞান-গম্যি কিছু নেই? কার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তাও জানিস না?

—তুমি থামো প্রকাশমামা!

—পাগল না কী তুই?

চৌধুরীমশাই সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রকাশকে বললেন—তুমি সরো, আমি দেখছি—

বলে প্রকাশকে জোরে পাশে ঠেলে দিলেন। প্রকাশ ঘরের মেঝের ওপর গিয়ে ছিটকে পড়লো। কে একজন তাকে ধরে তুলতে এল। প্রকাশ রেগে গেল। বললে—যা, সরে যা, কে তুই? আমাকে তুলতে হবে না, আমি নিজেই উঠবো, যা—

কিন্তু উঠতে গিয়েই আবার পড়ে গেল। মাথায় খুবই লেগেছিল বোধহয়। মাথা দিয়ে তখন তার রক্ত পড়ছে।

কিন্তু সেদিকে তখন চৌধুরী মশাইএর খেয়াল নেই। তিনি তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সদানন্দর ওপর। সদানন্দর হাত থেকে বাবাজীকে ছাড়িয়ে নিয়ে ত্রিশূলটাও কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর সদানন্দকে দুই হাতে ধরে ফেলেছেন।

বললেন—চলো, চলো, ভেতরে চলো—

সদানন্দ তখন চেঁচিয়ে উঠেছে—আমি যাবো না, আমি কিছুতেই যাবো না—

চৌধুরীমশাই জোরে চিৎকার করে ডাকলেন—দীনু, দীনু—

দীনু কাছে দাঁড়িয়েই ভয়ে ভয়ে সব দেখছিল এতক্ষণ। ছোটবাবুর ডাক শুনেই দৌড়ে এল।

চৌধুরীমশাই বললেন— খোকাবাবুকে ধর তো—

খোকাবাবুকে ধরতে যেন সংকোচ করছিল তার। ধরতে গিয়েও যেন আড়ষ্ট হয়ে রইল সে।

চৌধুরীমশাই ধমক দিলেন। বললেন —হাঁ করে দেখছিস কী? ধর একে—ধরে টেনে নিয়ে আয়, আমি আজ একে আটকে রেখে দেব ঘরের ভেতরে। আমি জব্দ করবো একে, বড় বাড় বেড়েছে এ—

বলে আর কারো ভরসা না করে নিজেই সদানন্দকে টানতে টানতে ভেতর-বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। আশে-পাশে যারা কাণ্ড দেখতে এসেছিল তারা তখন আড়ালে লুকিয়েছে। আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে সব দেখছিল।

চৌধুরী মশাই তাদের দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—বেরো, সব এখান থেকে, বেরো, বেরিয়ে যা—

সবাই হুড়-মুড় করে যে-যেদিকে পারলে পালিয়ে বাঁচলো। সদানন্দ তখন ছটফট করছে ছাড়া পাবার জন্যে। বলছে—আমি যাবো না, আমাকে ছেড়ে দিন—

কিন্তু চৌধুরীমশাই-এর গায়ে যেন তখন অসুরের শক্তি নেমে এসেছে। তিনি সদানন্দকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একেবারে ভেতর-বাড়িতে একটা ঘরে পুরে দিলেন। তারপর ডাকলেন—গৌরী—গৌরী—

গৌরী আসবার আগে প্রীতি দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। বললে—কী করছো, খোকাকে ধরেছ কেন? খোকা কী করেছে?

—সে তোমাকে পরে বলবো, গৌরী কোথায়?

গৌরী পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে চেয়ে বললেন—একটা তালা-চাবি নিয়ে আয় তো—

গৌরী তালা-চাবি এনে দিতেই সদানন্দকে ঘরে পুরে দরজায় চাবি বন্ধ করে দিলেন চৌধুরীমশাই। বললেন—থাকুক এখানে পড়ে, যেমন ব্যবহার তেমনি জব্দ হোক—

প্রীতি তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললে—তুমি করছো কী? বাড়িতে নতুন বউ রয়েছে, তুমি এ কী করছো?

চৌধুরীমশাই সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন—সে তুমি বুঝবে না, ও দিকে উকিলবাবুর চিঠি এসেছে, আমার মামলার তারিখ পড়েছে, আর এদিকে ছেলের এই বেয়াড়াপনা, আমি কত সহ্য করবো? আমিও তো মানুষ, আমারও তো একটা সহ্যের ক্ষমতা আছে...

প্রীতি কী যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বাধা পড়লো। কৈলাশ গোমস্তা মশাই দৌড়তে দৌড়তে এলো।

—ছোটবাবু!

—কী?

চৌধুরী মশাই অবাক হয়ে গেছেন! এ-সময়ে আবার কৈলাশ এলো কেন?

কৈলাশ বললে—কর্তাবাবু কেমন করছেন! আপনাকে একবার ডাকছেন।

—কর্তাবাবু? কর্তাবাবু কি এই খবর পেয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—কে এ খবর দিলে কর্তাবাবুকে? আমি যে দীনুকে বলে দিলুম যেন কর্তাবাবুর কানে খবরটা না পৌঁছোয়, তবু কে তাঁর কানে দিলে?

—বেহারী পালমশাই?

চৌধুরীমশাই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বেহারী পালের আর সময় নেই, ঠিক এই সময়েই কিনা আসতে হয়!

চৌধুরীমশাই তখন চাবিটা নিজের ট্যাঁকে গুঁজে ফেলেছেন। বললেন—চলো কৈলাশ, চলো—

(ক্রমশ)

সংবাদ ভাষ্য

বজ্র বিদ্যুতের সময় উচ্চতর তাড়িৎ-বিভব সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে কীভাবে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়, ছবিতে লক্ষ করুন। এ ধরনের তাড়িৎ মোক্ষণ দূরপাল্লার বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে বড় রকমের একটি সমস্যা। ফেডারেল রিপাবলিক অভ্ জার্মানির মানহাইন-এ এর উপর পরীক্ষা- নিরীক্ষার কাজ চালান হচ্ছে। উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে নিরাপদ করা

অস্থির মানসিকতা?

পশ্চিম জার্মানির মোট অধিবাসীর প্রায় অর্ধেকই আজ কোন না কোন মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন। এই অর্ধেকের বেশির ভাগের বয়েস চোদ্দ থেকে সত্তরের মধ্যে। তথ্যটির মূল উৎস পশ্চিম জার্মানি সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর। পরিবেশক দি জর্মান ট্রিবিউন।

সংবাদে বলা হয়েছে, ওই জন সংখ্যার এক চতুর্থাংশ দৈনন্দিন জীবনের কোন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির বলী। এক তৃতীয়াংশ প্রায় সব সময়ই মনের অসুখে ভুগছেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে ওরা সকলেই স্বীকার করেন, নানা রকম ব্যাপারের সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাওয়াতে গিয়ে ওঁদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। এবং একান্ত অভাবিতভাবে প্রায় রোজই তাদের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে মনে হয় নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্যম যেন দায়ুসারাভাবে কমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে নিজেদের ওপর অনাস্থা ক্রমে প্রকট হয়ে উঠছে।

পরিস্থিতি বলতে ওঁরা কী বোঝাচ্ছেন?

খুবই মামুলী ব্যাপার। যেমন ধরুন, বেশির ভাগ সময় মনের ওপর হাতুড়ি পড়ার কাজটা শুরু হয়ে যায় খুব ভোরে, ঘুম ভাঙার পরেই। রাতের একটুকরো মিষ্টি ঘুমের পর ক্রমে যখন ভোরের আবাহন এগিয়ে আসতে থাকে, আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা এবং ফিরে পাওয়ার কানামাছি খেলা চলছে, ঠিক সেই সময় কর্কশ সুরে ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠল। ব্যাস। সেই প্রথম পড়ল আপনার মাথার ওপর হাতুড়ির ঘা। নিমেষে ঘুমের মিষ্টি রাজ্য কে যেন গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। বিরক্তি এবং অস্বস্তি চেপে বসল সারা মনে।

অথবা ঘুম হয়ত ভাঙল বেশ খোশ মেজাজেই। বরং কোন কারণে অন্য দিনের তুলনায় খুশী খুশী ভাব অনেক বেশি। খোশ মেজাজে সকালের আনুষঙ্গিক কাজকর্ম ঢিমেতালে চলতে লাগল। দাড়ি কামান, স্নান, অফিস কাছারি বা কারখানায় যাবার জামা কাপড়ের ব্যবস্থা এবং ইত্যাদি।... তারপরই, এই যা! এত বেলা হয়ে গেল? হ্যাঁ, হঠাৎ আপনার খেয়াল হল, হাতে একেবারে সময় নেই, যেটুকু আছে তার মধ্যে আপনাকে খেয়ে নিতে হবে, পোশাক পরতে হবে, ট্রেন বা বাস ধরার জন্যে ছুটতে হবে। আর এসব করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে আপনি ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততর হচ্ছেন। আপনার দৈহিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উত্তেজনা ক্রমে বাড়ছে। আর তার চাপ গিয়ে পড়ছে স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর, অবশেষে মস্তিষ্কে।

পরিস্থিতিটা বয়স্কদের তুলনায় তরুণদের ক্ষেত্রে আরও কিছুটা জটিল। জটিলতর বিশেষ করে অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে। কারণ শেষোক্ত এই দলটি ব্যক্তিগত রুচি এবং সাজসজ্জার বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। পোশাকের বেলায় ওদের মধ্যে সব সময় অদ্ভুত অদ্ভুত আইডিয়া কাজ করে, আর কেউ না দেখুক, নিজেদের দেখতে ওরা বড় বেশি ভালবাসে। এবং নানা সাজে। অন্য কার কী মনে হচ্ছে, সে ব্যাপারে বেশির ভাগ সময় ওরা নির্বিকল্প। উদাস। আকর্ণলম্বিত জুলফি, গোঁফের বিচিত্র কায়দা, থালার মত বড় বড় জামার বোতাম, হাজারো বেশভূষার কায়দা রপ্ত করতে করতে সব সময় ব্যস্ত।

কিছু হয়। সময় তো সে কথা শোনে না? বাস ট্রেন ওদের ধারও ধারে না। অতএব এই সমস্ত সাজসজ্জা করতে গিয়ে তাড়াহুড়োতে উত্তেজনা আরও খানিকটা বাড়ল। সেই সঙ্গে বাড়ল রক্তের চাপ। এমন সময়, আর শেষ মুহূর্তে হঠাৎ চোখে পড়ল জামার ক্লিপটা কেন মুচড়ে গেছে। অথবা জামার বুকের বোতামটা পট্ করে হাতের মুঠোয় চলে এল। তখন অবস্থা চরমে গিয়ে উঠল। আর এসব সেরে কোন রকমে দৌড়ে শেষ মুহূর্তে এসে গাড়ি ধরতে হল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন ধরনের ব্যাপার শহর এবং শহরতলির তরুণ-তরুণীদের মধ্যে রোজই চলে। চলে সকাল থেকে অফিস কারখানা স্কুল কলেজ ইত্যাদিতে পৌঁছতে। সকালের এই মানসিক উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত দিনের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত কোন না কোন ভাবে তাদের ধাওয়া করে।

মানসিক এই অস্থিরতা অন্যভাবেও তাদের মনে দানা বাঁধতে পারে। কারণ তরুণ মন যতটা না বুদ্ধিধারী, তার চেয়েও বেশি ভাবপ্রবণ। তাদের বয়েস কম, অভিজ্ঞতাও কম। বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে বাস্তব বুদ্ধিলব্ধ মন সহজে তাদের মধ্যে

গড়ে উঠতে পারে না। ছিয়ো ওয়ার্কারদের প্রবণতা তাদের গ্রাস করে। এর ফলে অনেক সময় তাদের পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে পাওয়া নিজস্ব মনে সংঘাত সৃষ্টি হয়। নিজস্ব ব্যক্তিত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম থাকলে এই সংঘাত তাদের মনে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এ সবের জন্যে ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনেও তারা প্রায়শই পিছিয়ে পড়ে। তখন শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। অবশেষে নানা রকম মানসিক উপসর্গ।

পশ্চিম জার্মানির স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব কারণে অনেক সময় দুপুরের দিকে সময় মত তারা খাবার খায় না। খাবারে পুরোপুরি অনীহাও দেখা যায়। এবং নিয়মিত না খাওয়ার দরুন স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

তরুণ-তরুণীদের মানসিক অস্থিরতার আরও একটি কারণ, জীবন সম্পর্কে সংশয়। জীবন বলতে অবশ্যই এখানে জীবনের স্থিতিশীলতার কথা বলছি। ওদের সব সময় ভয়, এই বুঝি সব পণ্ড হয়ে গেল, চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়, নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ অসম্ভব এবং ইত্যাদি। তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বোধের জন্যে অবশ্যই দায়ী প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা। শিক্ষা এবং সরকারী ব্যবস্থাপনা। বিশেষ করে সরকার যদি সমাজতান্ত্রিক হয়। তরুণদের জীবনে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এটা অত্যন্ত বেশি সক্রিয় থাকে। উপযুক্ত সমাধানের ব্যাপারে যত দেরি হয়, মনের দিক দিয়ে ততই তারা পর্যুদস্ত হতে থাকে। উত্তরকালে এরাই তাদের মধ্যে আনে জটিল মানসিক রোগ।

ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতির বলী যাঁরা বয়স্ক, তাঁরাও। নিয়মিত চাকরি অথবা নির্দিষ্ট কোন পেশায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার পর যখন অবসর নেন, সমস্যা শুরু হয় তখনই। মনের মধ্যে অদ্ভুত রিক্ততা, নিরাপত্তার অভাব তাঁদেরও অনেককে গ্রাস করে। মনের দিক দিয়ে কোন কোন সময় তাঁরা পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শূন্য একক জীবন নিয়ে একটা খাপছাড়া পরিস্থিতির মধ্যে পরিত্যক্ত হন। পৃথিবীর সব দেশেই এই সমস্যাটি দিন দিন বেড়ে চলেছে। ওদের মানসিক পুনর্বাসনের ব্যাপার নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের সমাজ বিজ্ঞানীরা নানা ভাবে ভাবছেন। নানা রকম পরিকল্পনাও রচনা করেছেন।

জানি না, ভারতের সমাজবিজ্ঞানীরা এই পরিস্থিতি নিয়ে কতটা ভাবছেন। শিল্প সভ্যতার প্রভাব ভারতের মত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে ইতিমধ্যে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোয় পুরোন পারিবারিক ব্যবস্থা এখন ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। নানা রকম ব্যক্তিগত সমস্যাও বাড়ছে। জনসাধারণও ব্যক্তিগত থেকে সমাজ জীবনেও জায়গামা হারিয়ে ফেলছে। এমন ক্ষেত্রে আমাদের সরকারী স্বাস্থ্য এবং সমাজ বিষয়ক মন্ত্রণালয় যদি এই ধরনের বিষয়গুলির উপর ব্যাপক সমীক্ষা চালান এবং প্রয়োজন মত ব্যবস্থা নেন, তাহলে অনেক সমস্যারই হয়ত সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপকরণ যে নয়, তার প্রমাণ পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই আমরা পেয়েছি। সেই সমৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের নিজস্ব আশা আকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্য থাকা দরকার। আর এটা আবিষ্কার করার দায়িত্ব আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানীদের।

কীটনাশক আলো

পৃথিবী থেকে কীটপতঙ্গ সাবাড় করা আদৌ কোনদিন সম্ভব হবে কী না বলা শক্ত। ইতিমধ্যে নানারকম কীটাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ বাজারে চলছে। কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসল বাঁচানর জন্যেই যথেষ্ট তাদের কাজে লাগান হয়। কিন্তু মুশকিল হল ওই সমস্ত রাসায়নিক যৌগের অনেকেই আবার মাটির সঙ্গে মিশে শস্য কণার মধ্যে ঠাঁই বেঁধে নেয় এবং অবশেষে খাবারের সঙ্গে পশুপাখি এবং আমাদের দেহে ঢুকে বিপত্তি ঘটায়। ইদানীং বিষে বিষক্ষয়ের মত ভিনদেশী কোন কীট-পতঙ্গ নিয়ে এসে ছড়িয়ে দেবার কাজও কোন কোন দেশের বিজ্ঞানীরা শুরু করেছেন। যাদের মধ্যে ভারতও আছে। ভিনদেশী ওই সমস্ত কীটপতঙ্গদের এমনভাবে নির্বাচিত করা হয় যাতে করে তারা অন্য দেশে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পতঙ্গদের সাবাড় করতে পারে। অথচ নিজেরাও বেশি দিন টিঁকে থাকতে না পারে। কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে এতেও

বাধা বড় কম নেই।

এর পর জল নির্বীজকরণের পালা। পতঙ্গ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে কীট-পতঙ্গের বংশবৃদ্ধি রোধ করার কাজে হাত দিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও ইতিমধ্যে এর উপর প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন পরীক্ষা চালিয়েছেন।

সম্প্রতি বার্লিন এবং ব্রুনসভুইক এর ফেডারেল বাইওলজিকেল ইনসটিটিউট ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ফরেসটারির বিজ্ঞানীরা লোহার ফিলটারের সাহায্যে বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর ঝলসানি সৃষ্টি করে বিভিন্ন বয়েসের শূককীট এবং পতঙ্গ বিনাশ করার একটি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। আলোর বৈশিষ্ট্য এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর ঠিক কী পরিমাণ কীটপতঙ্গ সাবাড় করা যাবে সেটা নির্ভর করে। কোয়ার্টজ অথবা অতিবেগনী রশ্মির ফিলটারের মধ্য দিয়ে আলোর ঝলসানি নিক্ষেপ করে শত্রুকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ পোকামাকড় মেরে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কীটের পাখার প্রচন্ড ক্ষতি হয়, শূককীটের দেহ পঙ্গু হয়ে পড়ে, কীটপতঙ্গের পায়ের ক্ষতি হয় এবং সেই সঙ্গে বংশবৃদ্ধি রোধ।

পদ্ধতিটি এই রকম। প্রথমে জোরাল আলোর একটি উৎস নেওয়া হয়। তারপর বিশেষ ফিলটারের মধ্যে দিয়ে তার ঝলসানি নিক্ষেপ করা হয় কীটপতঙ্গ বা শূককীটের দেহের ওপর। বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, ফিলটারের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসা ৪৫৫ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো অর্থাৎ নীল আলো এবং ৭৮০ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো, অর্থাৎ অবলোহিত আলোর কীটনাশের ক্ষমতা কম। কিন্তু যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ ৭১৫ মিলিমিটার অর্থাৎ সাধারণ দৃশ্যমান আলো এবং নিম্নমানের অবলোহিত আলোর সীমানা বরাবর, হত্যা করার ক্ষমতা তার সব চাইতে বেশি। ৬৩০ থেকে ৭৮০ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো অর্থাৎ লাল রঙের আলো দ্রুত শূককীট হত্যা করে।

অর্থাৎ গবেষকদের বক্তব্য, কীটনাশের ব্যাপারে আলোক রশ্মিকে একটি পদ্ধতি হিসেবে কাজে লাগান যেতে পারে। এবং এইভাবে শস্যহানির ব্যাপারটার একটা সুরাহা করা যায়। অবশ্য, এর সমস্তই এখনও পর্যন্ত পরীক্ষানিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। বাস্তব পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করার আগে আরও খতিয়ে দেখা দরকার। যদি ব্যাপকভাবে সত্যিই এই পদ্ধতি কাজে লাগান সম্ভব হয়, তা হলে রাসায়নিক যৌগ ব্যবহারের তুলনায় এর সমাদর বাড়বে। অন্তত রাসায়নিক পদার্থে শস্যকণা দূষিত হওয়ার যে ভয় থাকে তার হাত থেকে তখন রেহাই পাওয়া যাবে।

ডিম সংরক্ষণে ভারতীয় উদ্ভাবনা

পদ্ধতিটি এই রকম। পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি করা এক ধরনের তেল দিয়ে আপনার ডিমগুলি ধুয়ে নিন। তারপর সেগুলি একটি বিশেষ পাত্রের মধ্যে রেখে আঙটার সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত তেল ঝরে পড়বে। ওই তেল সংগ্রহ করে আবার আপনি কাজে লাগাতে পারেন। ডিমগুলির গা থেকে তেল শুকিয়ে গেলে উপযুক্ত বাক্সে পুরে রাখুন অথবা বাজারে সরবরাহের জন্যে যেখানে ইচ্ছে পাঠান। আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও ঘরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ৭৫ থেকে ৭৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটে ওই ডিমকে এইভাবে কম করেও চার সপ্তাহ পচনের হাত থেকে বাঁচান যাবে। অত্যন্ত সহজ এই পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণের ব্যাপারে ওই তেল দিয়ে ধোয়া থেকে শুরু করে বাক্সবন্দী করা পর্যন্ত সময় লাগে মাত্র দুই ঘণ্টা। খরচও কম। পদ্ধতিটির উদ্ভাবক মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা।

ওঁদের বক্তব্য, এর জন্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম খুব সহজেই তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। মূল সাজসরঞ্জাম : এক, একটি বড় আধার বা ড্রাম। এর ভেতর একটি বৈদ্যুতিক হিটার ডুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা থাকবে। দুই, কাঠ বা ধাতুর তৈরি একটি ফ্রেম। যার সঙ্গে ঝোলান থাকবে একটি বাক্স। ওই বাক্সের মধ্যে ডিমগুলি সাজিয়ে রাখা হবে। তারপর সেটি পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি এক ধরনের তেলে পূর্ণ করা হবে। ডিমগুলি কিছুক্ষণ তেলের মধ্যে চুবিয়ে রাখার পর গ্যালভানাইজ করা একটি লোহার প্যানে তেল ঝরিয়ে নেওয়া হয়।

মহীশূরের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা নিজেদের নকশা অনুযায়ী যে সব সরঞ্জাম তৈরি করেছেন তার সাহায্যে দৈনিক আট থেকে দশ হাজার ডিম ওইভাবে সংরক্ষণ করা যাবে। একটি হিসেবে বলা হয়েছে, প্রতি তিন হাজার ডিমের জন্যে দরকার হবে একটি হিটারের। প্রয়োজন একবার ধুয়ে নেওয়ার পর ওই তেল পুনরায় সংগ্রহ করে এবং জীবাণুমুক্ত করে-বারংবার কাজে লাগান যায়। খরচ প্রতিটি ডিমের জন্যে মোট কুড়ি পয়সা। যন্ত্রপাতির জন্যে আনুমানিক ব্যয় এক হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতিরিক্ত তাপ এবং জলীয় বাষ্পের জন্যে পাঁচ থেকে ছয় দিনের বেশি ডিম সংরক্ষণ করা খুবই শক্ত কাজ। ব্যবসায়ীদের পক্ষে এটা বড় রকমের একটি সমস্যা। আমাদের দেশে মোট উৎপাদিত ডিমের শতকরা কুড়ি ভাগই গরমের জন্যে নষ্ট হয়ে যায়। শতকরা পাঁচ থেকে ছয় ভাগ পরিবহণ করার সময় নষ্ট হয় জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে। অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রায় ডিমের খাদ্যগুণও অনেকাংশে কমে যায়। নতুন এই পদ্ধতি ওই সমস্ত অসুবিধে দূর করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। যাঁরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পদ্ধতিটির সাজসরঞ্জাম উৎপাদন করতে চান তাঁদের প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্যের জন্যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অব ইনডিয়া, ৬১ রিং রোড, লাজপত নগর-৩, নতুন দিল্লি-২৪ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিজ্ঞান-পত্রিকা

গবেষণা : খণ্ড ৩, সংখ্যা ৪, অক্টোবর ১৯৭১। সম্পাদক : আশিস সিংহ।

বিজ্ঞান সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-অনুরাগী মহলে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। বর্তমান সংখ্যার আকর্ষণ শহুরে ক্যান্সার, শরণার্থী শিবিরের স্বাস্থ্য, জীববিবর্তনে মহাকর্ষের ভূমিকা, বজ্রপাতে একমেরু চুম্বক। নিরঞ্জন হালদারের এবারের বন্যা শীর্ষক আলোচনাটি খুবই সময়োপযোগী রচনা। নিরঞ্জনবাবু কতকগুলি মৌলিক সমস্যা এবং তাদের সমাধানের ব্যাপারে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তার প্রত্যেকটিই তথ্যনির্ভর। এবারকার সংকলনটি দেখলেই বোঝা যায় বিজ্ঞানকে শুধু জনপ্রিয় করা নয়, বস্তুনির্ভর আঙ্গিকে প্রচার করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সংস্থার উদ্যোক্তারা অনেক বেশি সতর্ক এবং বাস্তবমুখী।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা : সম্পাদক : অশোক সেন। ৫৫ একজিবিশন বাগান রোড, গোরাবাজার। পোঃ বহরমপুর, জেঃ মুর্শিদাবাদ।

শহর কলকাতা থেকে দূরে আজ থেকে বছর তিনেক আগে নেহাৎ সংবাদপত্রের আঙ্গিকে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাটি দেখে চমকে উঠেছিলাম। রাজনৈতিক বা অন্য কিছু নয়, এর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম লাইন থেকে শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইন পর্যন্ত ঠাসা বিজ্ঞান সংবাদ। এবং সে বিজ্ঞান কচকচে তত্ত্ব নয়। একেবারে খবরের কাগজের মেজাজে এত সহজভাবে পরিবেশিত যে, যাঁরা বিজ্ঞান পড়েছেন তাঁরা ছাড়াও সর্ব-

সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মনকে তা সহজেই জয় করে নয়। একটা অভিযোগ, আমাদের দেশে নাকি বিজ্ঞান পাঠক নেই। কথাটা যে আংশিক সত্য, 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা'য় চোখ বোলালেই তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আসলে কীভাবে বিজ্ঞান জগৎকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা দরকার, গলদ সেখানে। 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' এ ক্ষেত্রে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সর্বভারতীয় ভাষার জগতেও এক অভিনব প্রয়াস এবং সম্ভবত প্রথম প্রচেষ্টা। এর প্রত্যেকটি লেখা সময়োপযোগী, সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রথিত। বিশেষ করে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সংখ্যা তো এই সাক্ষ্যই বহন করে। বেত্তি, আর্থার ক্লার্কের রচনা এবং সাময়িক বিজ্ঞানের উপর প্রত্যেকটি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল ধরে আমরা শুনে আসছি জনসাধারণ থেকে শুরু করে সরকার পর্যন্ত বিজ্ঞানের নাকি প্রসার চান। অথচ তিন বছর পরেও শুধু-মাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরই এঁরা কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতা পেলে এমন একটি উদ্যোগ হয়ত আরও সার্থক হতে পারত।

সমরজিৎ কর

(১৪)

হামবুর্গে আমাদের জন্য নানারকম অ্যাডভেঞ্চার অপেক্ষা করছিল। একদিন হামবুর্গের স্টাসেতে পথ হারিয়ে ফেললাম, আর একদিন হারালাম ক্যামেরা। হামবুর্গের মত একটি প্রচণ্ড জার্মান শহরে বসেও খেলাম আরব লাঞ্চ, চাইনিজ ডিনার, নাটক দেখলাম ব্রিটিশ—বার্নার্ড শ'র আর্মস অ্যাণ্ড দি ম্যান। আর বাস করলাম একটি নরওয়েজিয়ান ক্লাবে—ডেন নরসকে ক্লুব (Den norske klub) যেখানে আমাদের ঘরের নামও নরওয়ের একটি শহরের নামে ট্রনডহাইম (Trondheim) আর হামবুর্গে যে নেতাজী সন্ধ্যার আয়োজন হয়েছিল সেটি অনুষ্ঠিত হল ওখানকার আমেরিকা হাউসে।

হামবুর্গে অবস্থিত নর্থ জার্মান টেলিভিশন কেন্দ্র (N D R) অল্পদিন হল নেতাজীর ওপর একটি সুদীর্ঘ ডকুমেণ্টারি চিত্র জার্মান টেলিভিশন দেখিয়েছেন। যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ছবিটি তৈরী করা হয়েছে। এর জন্য একটি টেলিভিশন টীম য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ইণ্টারভিউ করে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে আনে। এই তথ্য সংগ্রহের সূত্রে কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে এদের যোগাযোগ। হামবুর্গে আসার একটি উদ্দেশ্য ছিল এই টেলিভিশন কর্মীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন। দেখে আনন্দ হল এই পুরোপুরি জার্মান টেলিভিশন টীমের একমাত্র ভারতীয় সদস্য হলেন টীমের পরিচালিকা শ্রীমতী নবীনা সুন্দরম্। ইনি বয়সেও নিতান্ত নবীনা। কিন্তু এঁর দক্ষ পরিচালনায় জার্মান টি ভি ডকুমেণ্টারিটি একটি তথ্য-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক চিত্র হয়ে উঠেছে।

হামবুর্গে পৌঁছেই আমরা কাজে লেগে গেলাম বলা চলে। এয়ারপোর্টে পা দেবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা রাটহাউসের অর্থাৎ পৌরসভার আর্কাইভস্-এ উপস্থিত। এয়ারপোর্টে মিস্ সুন্দরম্ ও হামবুর্গের ভারতীয় কলা কেন্দ্রের শাহ্ নওয়াজ শেখ্ উপস্থিত ছিলেন। শেখের হাতে গোলাপ ফুলের গুচ্ছ। হামবুর্গের নেতাজী সভার আয়োজনে টেলিভিশনের শ্রীমতী সুন্দরম্ ছাড়াও হামবুর্গের প্রবাসী ভারতীয়দের একটি গোষ্ঠী ভারতীয় কলা কেন্দ্র স্থা প নে উ দ্যো গী হয়েছিলেন। দেখলাম অনেকদিন জার্মানীতে কাটিয়ে জার্মান রীতিনীতি এঁরা বেশ রপ্ত করে নিয়েছেন। নামতে-না-নামতেই যে প্রোগ্রাম হাতে ধরিয়ে দিলেন তাতে মিনিট-টু-মিনিট যা কিছু করণীয় লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। আমাদের অ্যারাইভাল থেকে ডিপার্চার, রাটহাউসে দলিলপত্র দেখা, হামবুর্গের ইনস্টিটিউট ফর ফরেন পলিটিকস্-এ কাগজপত্র দেখতে যাওয়া, হামবুর্গ শহর ঘুরিয়ে দেখানো—সব কিছু পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে করা হয়েছে। যেমন হামবুর্গের খবর কাগজ আপিস ঘুরিয়ে দেখানোর ভার নিয়েছেন ব্লনড্ চুল, সুন্দরী জার্মান তরুণী শ্রীমতী উটে বাওয়েন। শহর ঘুরিয়ে দেখানো ও একটি ঘরোয়া ডিনার-বৈঠকের ভার নিয়েছেন মিঃ দীপংকর সিংহ রায়।

রাটহাউসে আমাদের সঙ্গী হলেন শেখ। দলিলপত্র দেখছি—দরকারী কাগজপত্র বাছাই করে দিচ্ছি, ঘরের একপাশে Xerox কপি করার যন্ত্র রয়েছে। শেখ হিসেব করে করে যন্ত্রের মধ্যে খুচরো ফেলছে আর কাগজ কপি করে নিচ্ছে। খুচরো ফুরিয়ে যাচ্ছে, বাইরে গিয়ে মার্ক ভাঙিয়ে নিয়ে এসে আবার কাজে লেগে যাচ্ছে।

হামবুর্গে নেতাজী (১৯৪২)

নেতাজী হামবুর্গে এসেছিলেন সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ। হামবুর্গে জার্মান-ভারত আসোসিয়েশন (Deutsche-Indische Gaselleschaft) প্রতিষ্ঠিত হলে তারই উদ্বোধন করতে নেতাজী হামবুর্গে এলেন। খুব ধুমধাম করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল। হামবুর্গ শহরে নেতাজীকে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে যে সাদর ও সসম্মান অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ ভিয়েনায় বসে শর্মার কাছে শুনে এসেছিলাম। প্রশস্ত রাজপথ নেতাজীকে নিয়ে মোটরকেড চলেছে, পথের দুধারে দুই রাষ্ট্রের পতাকা পাশাপাশি উড়ছে।

উদ্বোধনী সভায় হামবুর্গের গভর্নর বক্তৃতা করলেন, তারপর হামবুর্গের মেয়র ক্রগমান। ভারতের জাতীয় সংগীত জনগণমন অপূর্ব অর্কেস্ট্রেশন হয়েছিল। রাটহাউসের কাগজপত্রে দেখলাম অর্কেস্ট্রেশনের বিলটা রয়েছে, বিল হয়েছিল সাড়ে সাতশ' রাইখ্‌মার্ক।

নেতাজী এইসভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই সুদীর্ঘ ভাষণে ইন্দো-জার্মান সম্পর্ক বেশ একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। উনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সংকটজনক মুহূর্তে দেশ যখন আভ্যন্তরিন গোলযোগে বিপর্যস্ত, তখন য়ুরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র ভারতবর্ষে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। জার্মানী কিন্তু বরাবরই এই ধরণের হীন প্রচেষ্টা থেকে দূরে ছিল। জার্মানীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে উৎসাহ ও আগ্রহ তা সম্পূর্ণে অন্য ধরণের। ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য অনেক জার্মান জ্ঞানীগুণীকে আকৃষ্ট করেছিল। এই প্রসঙ্গে উনি গ্যেটে, শ্লেগেল, শোপেনহাওয়ার, ম্যাক্সমুলের প্রভৃতির নাম করেছেন। জার্মান-ভারত সম্পর্ক তাই সম্পূর্ণ অন্য ভিত্তিতে স্থাপিত হয়ে গেল। গ্যেটে শকুন্তলা সম্পর্কে কি বলেছেন কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করেছেন নেতাজী। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করে নেতাজী বলেছেন পরবর্তীকালে যখন আমাদের কবি জার্মানীতে এলেন, তখন দুই দেশের এই সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ়তর হল।

অন্তত দুটি ক্ষেত্রে হামবুর্গ শহরের বিশেষ অবদানের কথা উনিও উল্লেখ করলেন। এক, চিকিৎসা শাস্ত্রে, আর এক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। জার্মান-ভারত

হামবুর্গের জনসভায় শ্রোতার আসনে নেতাজী

বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও হামবুর্গ অগ্রণী হয়েছিল।

হামবুর্গে আমাদের কনসাল জেনারেল মহীন্দর সিং বলছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে আজো হামবুর্গ শহরে এক বিরাট সংখ্যক ভারতীয় বসবাস করছেন। রাট-হাউসের কাজের শেষে প্রথমদিনই আমরা মহীন্দর সিং-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। হামবুর্গের নেতাজী-সভার পৌরোহিত্য করবেন মহীন্দর সিং, সেই উপলক্ষে কাজের কথাবার্তা কিছু হল। সভাপতির ভাষণে কি ধরণের কথা উনি বলবেন যা বললে ভাল হয় এ সম্বন্ধে উনি একটু আলোচনা করে নিলেন।

রাটহাউসের দলিলে প্রধানত রয়েছে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিবরণ, বক্তৃতা ইত্যাদি, এ ছাড়া জার্মান-ভারত অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মাবলী, অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন রিপোর্ট, মেয়র ক্রগমানের সঙ্গে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টারের মিঃ ভট্টর চিঠিপত্র। কিন্তু ইনস্টিটিউট ফর ফরেন পলিটিকসের কাগজপত্র ছিল আরো বিচিত্র ধরণের।

ভেন নরসকে ক্লুবের বাসস্থানটি আমাদের খুব পছন্দ হয়েছিল। আমাদের দরকারী জায়গাগুলো মোটের উপর হাতের কাছেই। পাঁচ মিনিট হাঁটলেই আমেরিকা হাউস, মিনিট সাতেক হাঁটলেই আউস-ভার্তিগে পলিটিকের বাড়ি। এবার য়ুরোপে সর্বত্র সামার যাই-যাই করেও যেতে চাইছিল না। হামবুর্গে এসেই প্রথম টের পেলাম বাতাসে শীতের ছোঁয়া। য়ুরোপে শরৎকাল বা 'ফল' এসে গিয়েছে। হাইমহুডার স্ট্রাসে যে রাস্তায় আমরা ছিলাম তার দু' পাশের গাছের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে। টার্নিং অফ দি লিভস্ দেখতে শহর থেকে দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, রাস্তার দু' ধারে ঘন-ছায়া গাছের পাতায় হলুদ বিবর্ণ ছোপ। হামবুর্গ শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে হয়েও হাইমহুডার স্ট্রাসে রাস্তাটার কেমন একটা নির্জন, মায়াময় সৌন্দর্য ছিল। কদিন ধরে ভাবছিলাম একটা রঙীন ছবি ক্যামেরায় ধরে রাখতে হবে। প্রথম দিকে কাজের চাপে আর শেষের দিকে ক্যামেরা হারানোর বিভ্রাটে ছবি তোলা আর হয়ে ওঠে নি।

একদিন সকালে কাজে বেরিয়ে ট্যাক্সির পিছনে ক্যামেরা ফেলে ভুলে নেমে পড়েছিলাম। আমরা কলকাতার লোক, ফেরৎ পাবার আশা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলাম। কিন্তু হামবুর্গের বন্ধুরা খুব নিশ্চিন্তভাবে বলতে লাগলেন, ও ঠিক পাওয়া যাবে। কিন্তু চেষ্টা করেও কিছুতে ওয়্যারলেস সংযোগ করা গেল না ট্যাক্সির সঙ্গে। জার্মানীতে ট্যাক্সিতে ভাড়া দিলে রসিদ দেয়, দোকানে জিনিস কিনলে যেমন দেয়। দৈবাৎ রসিদটা কার যেন পকেটে ছিল, তাতে একটা ফোন নম্বর রয়েছে। সারাদিন ফোন করে করে সেই নম্বরে কোনো

Völkischer Beobachter

Ausg. v. [illegible]

Der Führer empfing Subhas Chandra Bose

dnb. Führerhauptquartier, 29. Mai.

Der Führer empfing in seinem Hauptquartier in Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen von Ribbentrop den Vorkämpfer der indischen Freiheitsbewegung, Subhas Chandra Bose, zu einer längeren Unterredung.

Vorher hatte der [illegible] mit Subhas Chandra Bose eine Besprechung.

Mit Überraschung und Freude [illegible] das deutsche Volk, das [illegible] seit langem mit [illegible] Anteilnahme verfolgt, daß der hervorragendste Kämpfer für seine Freiheit heute in unserer Mitte ist. Subhas Chandra Bose ist vom Führer in seinem Hauptquartier empfangen worden, nachdem er kürzlich schon mit dem Duce zusammengetroffen war. Er ist der erste große Revolutionär des indischen Vol-

[illegible]remdenblatt

খ্যাতনামা জার্মান পত্রিকা Volkischer Beobachter হিটলার ও নেতাজীর সাক্ষাৎকারের খবর দিচ্ছে।

"নো-বিস্তাহ" হল।

এদিকে আমাদের ট্যাক্সি চালক সারাদিন কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা শেষ-যাত্রী এক বৃদ্ধাকে ট্যাক্সি থেকে নামাবার সময় হঠাৎ দেখলে পিছনে একটা ক্যামেরা। সে হাঁক দিয়ে বললে—আপনার ক্যামেরাটা ফেলে যাচ্ছেন। বৃদ্ধা বললে—আমার তো নয়। ট্যাক্সিচালক মহা ফাঁপরে পড়ল। সারাদিনে এই অসংখ্য লোক ওঠা-নামা করেছে। কিছুতেই মনে পড়ে না কার হতে পারে। শেষে বাড়িতে ফিরে এসে ফিলমটা খুলে ফেললে। ভাবলে ফিলমটা ডেভলপ করতে দেওয়া যাক কোন চেনা লোকজনের চেহারা ছবিতে দেখলে হয়ত কিছু বুঝতে পারা যাবে। এমন সময় টেলিফোন বাজল। টেলিফোন পেয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। ট্যাক্সি চালিয়ে এসে ক্যামেরা পৌঁছে দিয়ে গেল।

ফরেন পলিটিকস্ ইনস্টিটিউটে যেদিন প্রথম গিয়ে হাজির হলাম, লাইব্রেরিয়ান মেমসাহেব বললে, কোন বোস ফাইল দেখতে চাও? আমাদের দুটো আছে বোস সুভাষচন্দ্র আর বোস শরৎচন্দ্র। বললাম, দুটো চাই। এদের কাছে রয়েছে প্রধানত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্র বা সংবাদ-সংস্থার খবরাখবরের রিপোর্টের বিরাট সংগ্রহ। জার্মান, ইটালিয়ান, জাপানী ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এক খবর বিভিন্ন ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছে বিশেষ করে ব্রিটিশ সংবাদপত্র টাইমস্, ডেইলি মেলের বিদ্বেষপ্রসূত খবরগুলো আমাদের খুব কৌতুকপ্রদ মনে হয়েছিল। ইনস্টিটিউটের কর্মী এক অম্বভাবিকর দীর্ঘাঙ্গী মহিলা আমাদের কাপি ক

India Quisling No. 1 Flees to Hitler

New Delhi, Monday.

THE Government announced to-day that Subhas Chandra Bose, the Indian political leader, "has gone over to the enemy," and is now believed to be in Rome or Berlin. The statement added that Bose had signed a pact with the Axis designed to lead to the invasion of India.

ব্রিটিশ পত্রিকা ডেইলি মেল নেতাজীর জার্মানী যাওয়ার খবর বিদ্বেষপ্রসূত ভঙ্গীতে ছাপছে

কাজে সাহায্য করছিলেন। এখানকার Xerox কপি করার যন্ত্রটি আরো উন্নত ধরণের ও আধুনিক। কিছু কিছু কাগজ-পত্র বাছাই করে কপি করে নেওয়া হল।

কথা ছিল কলাকেন্দ্রের সেক্রেটারী শ্রীমতী উটে বাওয়েন ওখানকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা Der Spiegel—অনেকটা আমেরিকার টাইম ম্যাগাজিনের মত—দেখাতে নিয়ে যাবেন। কি কারণে যেন অসুবিধা উপস্থিত হল। সপ্তাহের সেদিনটি Spiegel প্রকাশের দিন। ভাল করে কথা বলার ফুরসৎ অফিসের কর্মীদের হবে মনে হয় না। অতএব শ্রীমতী উটে আমাদের 'Bild-Zeitung' কাগজের অফিসে নিয়ে গেলেন। এটি একটি চাঞ্চল্যকর ও মুখ-রোচক সংবাদের জন্য খ্যাত। 'বিলড্ সাইটুং' ওখানকার সব চাইতে পপুলার কাগজ।

'বিলড্ সাইটুং' পত্রিকার পলিটিক্যাল ডেস্কের মিঃ এগন্ ফ্রাইহাইট আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ওদের কাগজের সংবাদ পরিবেশন ভঙ্গী উনি আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—একটা ঘটনা ঘটল, তৎক্ষণাৎ ঘটনার নেপথ্যে কি আছে রিপোর্টাররা তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। আমাদের দেশে লোকে প্রধানত খবরের কাগজ পড়ে রাজ-নৈতিক খবরাখবরের জন্য, সেনসেশন বা স্ক্যান্ডালের জন্য নয়—একথা বলাতে ফ্রাইহাইট বললেন, তা কি করব বলো। আমাদের কাগজের পক্ষে ঐ লাইন নেওয়া সম্ভব নয়। কাগজে-কাগজে প্রতিযোগিতা এখানে তীব্র। শুধু সংবাদ-পাঠের জন্য যে কাগজ তা লোকে সকালবেলা পড়ে নেয়। আমাদের সান্ধ্য পত্রিকা লোকে কাজের শেষে বাড়ি ফিরবার পথে বিলড সাইটুং নিয়ে যায়। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আমাদের বড় বড় হেডলাইন, নানা রকম উত্তেজনার খোরাক যোগাতে হয় বইকি। গল্প শুনেছিলাম এক ভারতীয় দম্পতি একদিন মোটরে করে হামবুর্গের রাজপথে চলেছেন, পথে ধাক্কা লাগল এক উটের সঙ্গে। হ্যাঁ, উট। হামবুর্গে সে সময় এক সার্কাস দল এসেছিল। বাড়িতে ফিরতে-না-ফিরতেই বিলড্-সাইটুং থেকে টেলিফোন পেলেন ওঁরা। 'ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল', উটের বেশী আঘাত লাগল না মোটরগাড়ির ক্ষতি হল বেশী?

ফ্রাইহাইটের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সামান্য দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকা হাউসে পৌঁছে দেখি নেতাজী সভার সকলে এসে গেছেন। পুরোন দিনের লোকেদের মধ্যে আছেন ধাওয়ান—ইনি ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর আছেন প্রফেসর অলস্ওয়ার্থ, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও একজন 'ইন্ডিয়া এক্সপার্ট' হিসেবে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফরেন অফিসের কাগজপত্রে দেখেছি ডাঃ অলস্-ওয়ার্থ ও ডাঃ মেলচার্সকে একটা ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হচ্ছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন কাউন্ট পডউইল, ফন্ স্মিডেন ও কনসাল জেনারেল ন্যাপ। এই কমিটিকে ভার দেওয়া হয়েছে চল্লিশ পাতা মত একটি রিপোর্ট ব্রিটিশদের ভারত শাসনের পদ্ধতির ওপর করতে হবে। কি কি বিষয় জানতে হবে তার দু'একটি উল্লেখ করছি।

এক, মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের পক্ষে কিভাবে এত বড় একটা বিরাট দেশ যার জনসংখ্যাও বিপুল তা শাসনাধীন রাখা সম্ভব হল। দুই, বলা হচ্ছে "Especially important would be the exploration of the British arts of divide et impera".
ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে জার্মানদের আগ্রহ জন্মেছে। এছাড়া অবশ্য গান্ধী, বোস ও কংগ্রেস সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হচ্ছে।

সব সময় যে এত গুরুত্ব বিষয়ের জন্যই 'ইন্ডিয়া এক্সপার্ট' দরকার হত তা নয়। নাম্বিয়ার বলছিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জার্মানদের অজ্ঞতা ছিল অসম্ভব। এই সব ইন্ডিয়া এক্স্-পার্টের কথা হতে হতে নাম্বিয়ার একটা মজার গল্প বললেন। আবিদ হাসান তখন ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে তরুণ কর্মী। লক্ষ্য করা গেল একটি বিশেষ জার্মান বান্ধবীর সঙ্গে হাসানকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। এমনিতে য়ুরোপে এ ধরনের মেলামেশায় অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। কিন্তু একই বান্ধবীর

সঙ্গে সর্বদা ঘুরলে তার অন্য রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। নাম্বিয়ার একদিন হাসানকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার আবিদ? এটা কি সিরিয়াস কোন অ্যাফেয়ার? হাসান প্রথমে কথাটা ধরতে পারেননি, তারপর হো-হো করে হেসে বললেন—আরে, না, না। এই মেয়েটিকে আমি একবার ভারতবর্ষের মহারাজা, ফকির, বাঘ, সাপ ইত্যাদি সব বুঝিয়ে দিয়েছি। বারে বারে বান্ধবী পাল্টানো মানেই আবার সেই গোড়া থেকে শুরু করা, আর এক প্রস্ত সাপ, বাঘ, ফকির, মহারাজা ইত্যাদি। আমি তাই ঠিক করেছি এই একজনের সঙ্গেই এখন অনেকদিন লেগে থাকব।

আমেরিকা হাউসের নেতাজী সন্ধ্যার বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ছবিটি ছাড়াও নূতন সংযোজন হল জার্মান টি ভি তথ্যচিত্রটি। এই টেলিভিশন ডকুমেণ্টারিতে ক্যারিটা ফন, ব্রট সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন মুসেনবার্গ অগেহানন্দ, ওয়ার্থ, নাম্বিয়ার, শ্রীমতী এমিলি, বালকৃষ্ণ শর্মা—সকলের সঙ্গে দীর্ঘ ইণ্ডারভিউ ছবিটিকে একাধারে তথ্যসমৃদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

এমন সুন্দর তথ্যচিত্রটির শেষ দৃশ্যটি শুধু আমাকে একটু পীড়া দিয়েছিল। টুকরো, টুকরো জীবন্ত ডকুমেণ্টারি সেখানে নেতাজী হাঁটছেন, চলছেন, কথা বলছেন তারপর এতজন নেতাজীর সহকর্মীর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, তারপর শেষ দৃশ্যে এল কি? দাক্ষিণাত্যের কোথায় যেন পূজোর শোভাযাত্রা চলেছে, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে চলেছে লোকজন। দেখা গেল শোভাযাত্রার পুরোভাগে এক গণেশ মূর্তি, আসলে সেটি সামরিক পরিচ্ছেদ পরিহিত নেতাজীর মূর্তি—কিন্তু সামনে গণেশের শুঁড়—যেন মুখোশের মত নেতাজীর মুখের ওপর সেঁটে দেওয়া। সেখানেই সহসা ছবি শেষ।

কিছুকাল আগে রূপদর্শী তাঁর সংবাদ-ভাষ্যে ১৯৯৭ সালের নেতাজী জন্মতিথি পালনের যে কাল্পনিক রিপোর্ট "১৯৯৭ সালে প্রকাশিতব্য সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পৃষ্ঠা থেকে" উদ্ধৃত করেছিলেন তাতে তিনি নেতাজী মূর্তির ভ্যারাইটির একটি দীর্ঘ লিস্ট দাখিল করেছিলেন। তাতে ছানার নেতাজী, ক্ষীরের নেতাজী, নেতাজী ঘোড়ার পিঠে, নেতাজী ট্যাংকের মাথায়—এমনকি নেতাজীর কোলে মুজিব, নেতাজীর কাঁধে জ্যোতিদা ইত্যাদির এক ভয়াবহ দীর্ঘ তালিকা ছিল। সেই লেখাটি পড়তে পড়তে টি ভি ডকুমেণ্টারির এই দৃশ্যটি আমার মনে পড়ছিল।

কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম অনেক য়ুরোপীয় দর্শকের দৃশ্যটি বেশ ভাল লাগল। আমার সমালোচনা শুনে তারা বললে—কেন এতো বেশ সিম্বলিক, উনি একটা লেজেনড, একটা রূপকথায় পরিণত হলেন, গড হয়ে গেলেন, আমাদের মত সাধারণ মানুষের পর্যায়ে আর রইলেন না।—এই ইঙ্গিতের ওপর ছবিটি শেষ হয়ে গেল, এতে দোষের কি আছে?

সভার শেষে সবাই একসঙ্গে একটা ডিনার হয়ে হামবুর্গের প্রোগ্রামের বেশ 'গ্র্যাণ্ড ফিনালে' হবে এই রকম কথা ছিল। আমেরিকা হাউস থেকে পরপর কতকগুলি গাড়ি একটা আর একটাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল—উদ্দেশ্য কোন এক চাইনিজ রেস্তোরাঁ। মিস সুন্দরম আমাকে তার গাড়িতে তুললেন—কিন্তু [illegible] এসে হঠাৎ আমরা [illegible] আমরা ভুল গাড়ি অনুসরণ করে [illegible] হয়ে গেছি। ঠিক কোথায় [illegible] দুজনের কেউ-ই জানি না। মিস সুন্দরম সভার কাজ, প্রোজেকশনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন। ডিনারের আয়োজনের ভার ছিল মিস উটে বাওয়েনের। আবছা মত যেন শুনেছিলাম হামবুর্গের স্ট্রাসেতে জায়গাটা কোথাও হবে। রাত এগারোটায় হামবুর্গের স্ট্রাসেতে এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে আমরা ভগ্নহৃদয়ে এবং ক্ষুধার্ত হয়ে আমাদের নরসকে ক্লুবে ফিরে এলাম।

ফিরে আসতেই টেলিফোন বেজে উঠল—সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ডিনার টেবিলে বসে আছে। কি হল আমাদের, কোন অ্যাকসিডেণ্ট হল নাকি? এবার ভাল মত পথনির্দেশ, জায়গাটার নাম "লণ্ড-ফণ্ড।" কি করে কথাটা বলি দ্বিতীয়বারও পথ হারালাম। পথের ধারের টেলিফোন বুথ থেকে 'লণ্ড-ফণ্ডে' খবর দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওই নামে কোন রেস্তোরাঁ টেলিফোন বইতে নেই। রাত বারোটার পর দুজনে গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ির পথ ধরেছি হঠাৎ চোখে পড়ল নিওন আলো ঝলমল করছে, জ্বলছে-নিভছে—বড় বড় করে লেখা "ফণ্ড-লণ্ড।" মিস সুন্দরম মাই গড বলে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলেন। এই লণ্ড-ফণ্ড—ফণ্ড-লণ্ড ঘটিত গোলমালের ফলে ডিনারটা একটু অ্যাণ্টি-ক্লাইমেক্স মত হল বটে তবে বেশ কিছুদিন প্রচণ্ড জার্মান এফিসিয়েন-সির মধ্যে কাটিয়ে এই একটুখানি গণ্ড-গোলে আমার তো বেশ আরাম বোধ হল।

(ক্রমশ)

—সলিল ভট্টাচার্য

শিল্পী সলিল ভট্টাচার্য বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পকর্মের ২২টি নিদর্শন দেখা যায়। রচনাক্ষেত্রের পশ্চাৎভূমি গভীর বা লঘু রঙে ভরে ফেলে প্রয়োজনমত নানা রঙের রেখার মধ্য দিয়ে শিল্পী আকার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নানা কারুকার্য ফুটে উঠেছে। চাপা রঙ ব্যবহার করলেও শিল্পী অধিকাংশ স্থলেই গম্ভীর রঙের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন। গাঢ় রঙের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট আকারগুলি অনেক স্থলে অস্পষ্ট হয়ে গেছে বা অযথা রচনাটিকে ভারাক্রান্ত করেছে। তা সত্ত্বেও, শিল্পীর অধিকাংশ ছবিই বলিষ্ঠ। বিশেষ করে কয়েক ক্ষেত্রে গভীর ও সুনির্বাচিত রঙ (নীল, হলুদ ও বেগুনী) ব্যবহার করে সমকালীন ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৬ ডিসেম্বর, '৭১-এর নাম করা চলে। কয়েকটি প্রতীক ও অসহায় মানবের প্রতীকমূলক আকারের মধ্য দিয়ে শিল্পী বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর অবতারণা করেছেন। রুইন-ও উল্লেখ্য, তবে মনে হয়, এটিতে ধ্বংসের বাস্তব ও বীভৎস রূপের স্থলে আলঙ্কারিক রূপই অধিক ফুটে উঠেছে। মাত্র স্বল্পের কয়েকটি টানের মধ্য দিয়ে তিনি কিভাবে বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন তার প্রমাণ মেলে ডেসপয়েলড-এ। ছবিটির বেগুনী রঙের পশ্চাৎভূমি ও কম্পোজিশন পদ্ধতি লক্ষণীয়। দু-একটি নিদর্শনে গতিশীল ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে—যেমন ফিউজিটিভস। আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি দি সলিটারি। পশ্চাৎভূমির লাল রঙের পটভূমিকায় হলুদ হলুদ রঙের নানা স্তরভেদ সৃষ্টি করার ফলে এটিতে স্থানে স্থানে স্ফটিকের রূপ ও স্বচ্ছতা ফুটে উঠেছে। বিমূর্ত নিদর্শন হিসাবে কমপোজিশন ২ ও কমপোজিশন ১-এর উল্লেখ করা যায়। ছাই রঙ প্রধান প্রথমটিতে সুকৌশল পরিমিত লাল ও কালো রঙের ছোঁয়াও ও দ্বিতীয়টির সবুজ রঙের স্তরভেদ সৃষ্টি অনেকের চোখে পড়ে।

*

শিল্পী পুলক গোগাই অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পী আসামের বাসিন্দা, বোম্বাই-এর বান্দ্রা আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন ও প্রথমে আসাম সরকারের শিল্পী হিসাবে কাজ করেন ও পরে আসামের ট্রিবিউন পত্রিকায় ব্যঙ্গ-শিল্পী হিসাবে কাজ করেন ও সেই সঙ্গে "কার্টুন" নামক পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। গত কয়েক বছরে অর্থাৎ ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে তিনি গৌহাটি, শিলং, দিল্লী ও বোম্বাইয়ে

স্বর্ণমৃগ (অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্)

স্মীতমুখর সিংহ, হলুদ ও নীল রঙের নানা ফুলের মোটিফ ও ম্যাজেন্টা রঙ ব্যবহারের ফলে ছবিটি অনবদ্য হয়েছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন স্বর্ণ-মৃগ। সরলতার প্রতীকরূপে এই ছবিটিতে প্রাচীন লোকচিত্র ও আলংকারিক ব্যঞ্জনার গুণ সুন্দরভাবে সুসম্বন্ধ হয়ে ফুটে উঠেছে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে পঞ্চমুখী কালী ও ব্যাঘ্রাসনে উপবিষ্ট শিবের দুটি ছবি উল্লেখযোগ্য। মধুবাণী চিত্র সম্বন্ধে একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। প্রাচীন লোকচিত্রভিত্তিক এই চিত্রাবলীর সরলতাই হল প্রধান আকর্ষণ। জনপ্রিয়তা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্রাবলীর অধিকতর প্রচলন যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং ভয় হয়, জনপ্রিয়তার চাপে ও চাহিদায় যেন এই চিত্রকলার নিজস্ব বৈশিষ্টটুকু শেষ পর্যন্ত না হারিয়ে যায়। এ বিষয়ে চিত্ররসিকদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

*

শ্রীমতী সুজাতা দাস অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর সিরামিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। কয়েক বছর পূর্বে সুপরিচিত জনৈক মহিলার সিরামিক শিল্পসম্ভার দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হন ও এই শিল্পচর্চা শুরু করেন এবং ইতিপূর্বে বোম্বাই ও কলকাতায়ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। এই প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য ও সিরামিকের কয়েকটি নিদর্শন দেখা যায়। অজন্তা প্রাচীর চিত্রাবলী অবলম্বনে শ্রীমতী দাস কয়েকটি মূর্তি তৈরি করেছেন। অজন্তা চিত্রাবলীর অনুকরণ হিসাবে দু'একটি চোখে পড়ে, যেমন কোর্ট ড্যান্সার, অমিতাভ ও দি ব্ল্যাক প্রিন্সেস। তবুও মনে হয় মূর্তি হিসাবে শেষোক্তটিতে অতিরিক্ত গ্লেজ না করলেই ভাল হত। তবে আকারের দিক থেকে এগুলি যে প্রামাণ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ সূক্ষ্ম ডিটেলের প্রতি শিল্পীর সজাগ দৃষ্টি ধরা পড়ে। তবে তৎকালীন

সিরামিক শিল্প নিদর্শন
—শ্রীমতী সুজাতা দাস

যুগের উপযোগী তিনি যে কয়েকটি সিরামিক পাত্র তৈরি করেছেন, সেগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিশেষ করে নানা মোটিফ আঁকা রঙীন পাত্র দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। বিভিন্ন নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে শ্রীমতী দাস সিরামিক শিল্প পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই সঙ্গে স্বাধীন চিন্তাধারা অনুযায়ী তিনি যদি সমকালীন যুগ ও রুচি অনুযায়ী কয়েকটি নিদর্শন দেখাতে পারতেন তাহলে সকলেই খুশী হতেন। প্রাচীন ঐতিহ্যধারার পুনঃপ্রচারকল্পে শ্রীমতী দাসের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। তবুও আশা করি অদূর ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে সিরামিক শিল্পের সমকালীন নিদর্শনও দেখার সুযোগ পাব।

চিত্রপ্রিয়

সম্প্রতি একটি চিঠি পাওয়া গেছে। সম্পূর্ণ চিঠিখানিই পেশ করছি :—

প্রিয় শার্ঙ্গদেব,

আকাশবাণীতে লোকগীতি সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য পাঠ করিলাম। কিন্তু ইহার সহিত অন্যান্য সঙ্গীতের বিষয় বাদ দিলেন কেন? যেমন ধরুন কীর্তন। এই যে যাত্রা, কথকতা, থিয়েটার, চণ্ডীপাঠ—এইগুলির সহিত খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পার বিচিত্র রসায়ন—এই বস্তুটির প্রসারও কি আকাশবাণীর আনুকূল্যেই ঘটিতেছে না? আধুনিক কীর্তনের এই ঘটিরাম উদ্ভাবকমণ্ডলীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার সমুচিত সে সম্বন্ধ আপনি নীরব রহিলেন কেন? পদাবলী কীর্তনের সহিত ক্রমেই যে অপদাবলী আসিয়া জুটিতেছে উহার প্রতিকার কি? তারপরে ধরুন শ্যামাসঙ্গীতের নিত্য নূতন আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাচীন প্রসিদ্ধ গানগুলির যে মুণ্ডপাত ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে আপনার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এবং প্রাচীন বাংলা গান (যাহাকে আজকাল পুরাতনী বলা হয়) একেবারেই চালিয়া সাজা হইতেছে এবং ট্রাডিশন বলিয়া কিছুই থাকিতেছে না। এই ট্রাডিশনটি যে কি তাহা জানিবার কোনও চেষ্টাও দেখা যায় না কারণ তাহা হইলে যত্ন করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হয়। যাহারা সিনেমার প্লে-ব্যাক করে তাহারা "প্লে-ব্যাক", বস্তুটি ভাল করিয়া আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদের কাছে সঙ্গীত ব্যাপারটিই "প্লে"-তে দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিকই তো আমরা থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদিকে প্লে-ই বলিয়া থাকি, আর্ট বলি না এবং সেইরূপ ভাবিও না। পুরাতন বাংলা গানের বহু বিশিষ্ট রূপ আছে তাহার একটিও গাহিতে শুনি না। উহা সবই বিলুপ্তির পথে কারণ উহাদের ডিম্যাণ্ড নাই। থাকিলেই বা কি ঘোড়ার ডিম হইত! উহাদের সেই একই আধুনিক প্যাটার্নে গাওয়া হইত এবং ট্রাডিশনের কর্ণধারগণ বোধ করি কানে কানে পরামর্শ করিয়া উহাদের সারবত্তা উপলব্ধি করিতেন। এইবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা ধরুন। বহু আয়াসে স্বরলিপির দড়ির উপর দিয়া সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত উত্তীর্ণ হইলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত হইল। বহু গায়ক গায়িকাই এই দড়িপথে ভ্রমণ করিবার সময় পড়িতে পড়িতে কিরূপে যে নিজেকে সামলাইতে থাকেন তাহা অনুভব করিলে তাঁহাদের প্রতি হৃদয় আর্দ্র না হইয়া পারে না। এই স্বরলিপি লইয়া আবার মেরামতি ও কেরামতির অন্ত নাই। কোনটাই ইহাকে

কোথাও ঢিলা কোথাও টান করা হইতেছে। বলুন দেখি এইরূপ করিলে কি পরিক্রমা সহজ হইতে পারে? রবীন্দ্রনাথ নিজে সুর মনে রাখিতে পারিতেন না বলিয়া স্বরলিপি করিয়া রাখিতে বলিতেন। তিনি তাঁহার সময়ে প্রচলিত উৎকৃষ্ট গীতিকলার সহিত গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন, উত্তম মার্গসঙ্গীতেও বহুশ্রুত ছিলেন। তাই তাঁহার কণ্ঠে বহু উত্তম টেকনিকের প্রতিফলন ঘটিত। কিন্তু আজকালকার গায়ক-গায়িকারা একরূপ যান্ত্রিক কায়দায় গলায় আন্দোলন ঘটাইয়া তাহাকে রাবীন্দ্রিক টপ্পা বলিয়া চালাইতেছেন এবং ইহার প্রয়োগের কোনরূপ মাত্রা নাই। রবীন্দ্রনাথ অথবা দিনেন্দ্রনাথের গাহিবার যে বলিষ্ঠ রীতি ছিল এবং তাহাতে যে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটিত তাহা ইঁহাদের কণ্ঠে অনুপস্থিত কারণ দরিদ্র কণ্ঠস্বর ভীরু ও সঙ্কুচিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। কলিকাতার উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথে সঙ্গীতের বহু দাক্ষিণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। সঙ্গীতের মনোহর বিতান উন্মুক্ত হইয়াছে। কোন কোনটি তীর্থ স্বরূপে বলিয়াও স্বীকৃত, সম্প্রতি গন্ধর্বলোকের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। সর্বত্রই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সামগানের মতই ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু সেকালে সামগায়কগণ দক্ষিণার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া যেমন যথার্থ সামগানে অবহেলা করিতেন একালেও অনুরূপ কারণেই রবীন্দ্রসঙ্গীত মৌখিক শ্রদ্ধায় গৌরবান্বিত হইতেছে মাত্র, আসলে যথার্থ রবীন্দ্রসঙ্গীত কমই শোনা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এ যুগে পুরাকালের মত অভিশাপ প্রদান করিয়া অর্থলোভীদের শাস্তিবিধান করা সম্ভব নহে। ইহারা অকুতোভয়েই কাজ গুছাইয়া লইতেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সহচররূপে অতুলপ্রসাদের গানও বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। উহাতে আরও একটা সুবিধা দেখা দিয়াছে। সেটা এই যে, ইহার সুরের উপর কোনরূপ শাসন নাই এবং যত্রতত্র সুবিধামত নিজস্ব সুর আরোপ করিলেও কেহ কিছু বলিতে আসে না। নজরুল ইসলাম সাহেব এই কিছুদিন পূর্বেও গান রচনা করিয়া নিজেই বহু ব্যক্তিকে শিখাইয়াছেন। এরই মধ্যে সেগুলির আকৃতি বহুলভাবে পরিবর্তিত হইতেছে। কোনও কিছুই আর মূল সংগঠন লইয়া নিজস্ব মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত নাই। শার্ঙ্গদেব মহাশয়, আপনিও আজকাল এই সমস্ত বিষয়ের সমালোচনা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে বৈদিক সঙ্গীতে আত্মগোপন করিয়াছেন। বুঝিতেছি অপ্রিয় কথা বলিয়া বন্ধুজনদের বা আকাশবাণীর বিরাগভাজন হইতে চান না। কিন্তু আপনি না বলিলেও আমাদেরই বলিতে হইবে, কারণ কর্তব্য একটা আছেই এবং যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইলেও তাহা কর্তব্যই। তবে ভয় হয়, চিঠিটা আদৌ ছাপাইবেন কিনা। না ছাপাইলেও "অন-অফিশিয়ালি" পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে চিঠিটা একটু সারকুলেট করিবেন। তাহাতেও কিছু কাজ হইবে।

বক্তব্য আরও কিছু আছে। আজকাল আবার একটা ফ্যাশন দেখা দিয়াছে—একক অনুষ্ঠান। কতিপয় গায়ক গায়িকার পিছনে এক একটি স্তাবকের দল জুটিয়া একেবারে চড়কের মেলার মত তাহাদের লইয়া উদ্দামভাবে নাচিতে শুরু করিয়াছে। শুধু কি তাহারাই নাচিতেছে? নাচিতেছে পত্রপত্রিকাগুলিও। মহাশয়, আজকালকার কাগজগুলির সমালোচনার তাৎপর্য বুঝি না। যাহার গান তৃতীয় শ্রেণীর, গলায় সুর নাই, যাহা গাহিবে বলিয়া আসিয়াছে তাহা যে কি বস্তু সে বিষয়েও ধারণা নাই—এমন গানও কাগজগুলির কোনও কোনও

[illegible] এমন ধারা করিয়াছেন। ইহার যে কি গূঢ় কারণ আমি তাহার আলোচনা করিব না, কিন্তু এই যে বেপরোয়া সার্টিফিকেট ইঁহারা প্রদান করিয়া চলিয়াছেন ইহাতে সঙ্গীতের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে তাহা কি তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন? স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও কাগজগুলিতে এইরূপ অতি প্রশংসা করা হইয়াছিল যাহার ফলে কয়েকজন চতুর শিল্পীর ভাগ্য আশাতীতভাবে খুলিয়া গিয়াছিল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান ভাল মানুষ শিল্পীর ভাগ্য সেই পরিমাণেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য আমি সোজা-সুজি কানাকে কানা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিয়া তাহাদের মনে কষ্ট দিতে বলি না, কিন্তু কানার পক্ষে পদ্মলোচন হইবার অভিপ্রায় বা খোঁড়ার পক্ষে গিরিশৃঙ্গ লঙ্ঘন করার কল্পনা যে সার্থক হইবার নহে এটুকু তো তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অ্যাপ্রিসিয়েশন নিশ্চয়ই থাকিবে কিন্তু তাহার একটি সংযত প্রকাশভঙ্গী থাকা আবশ্যক যাহাতে প্রাপ্যের বেশী এতটুকু বাহুল্য না থাকে।

অবশেষে বক্তব্য ইউনিভার্সিটিগুলির সহিত যুক্ত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা। ইহারা অনাথ আশ্রমের মত এক একটি ইউনিভার্সিটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কোনও কোনও ইউনিভার্সিটি ইহাদের ভালমন্দের প্রতি এতটুকু আগ্রহী নয়—শ্রীবৃদ্ধি করা তো দূরের কথা। অথচ কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের বি-এ ডিগ্রী জুটিতেছে। আপনারা সবাই জানেন কলিকাতার একটি ইউনিভার্সিটি সগৌরবে সঙ্গীতে এম-এ ডিগ্রী দিতেছে, ডকটরেট দিতেও আরম্ভ করিয়াছে। ব্যবস্থা খুবই ভাল কেননা এত সহজে এত মর্যাদা অন্তত অন্য কোনও ডিসিপ্লিনে সম্ভব হয় না। যাহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাস্থানে রহিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই বিদ্যা-দিগ্‌গজ কারণ তাঁহারা পপুলার আর্টিস্ট। তাঁহারা স্বরলিপি তুলিতে জানেন, অনেক গান মুখস্থ করিয়াছেন, রাগ-রাগিণীও শিখিতে হইয়াছে বইকি। বাজারে নামও হইয়াছে। এইসব রত্নদের উক্ত ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার অতি যত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আরও সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। একমাত্র রতনই রতন চিনিতে পারে। শুনিতে পাই ভিতরে ভিতরে কোনও সরকারের অনুগ্রহধন্য সাধু সন্ত বাবাজীও এ সব ব্যাপারে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। [illegible] ইঁহারা ইতিপূর্বে যাহা করিয়া আসিয়াছেন এখানে তাহাই করিতেছেন, অর্থাৎ ভক্তকবিদের গান মুখস্থ করাইয়া ভজিয়া সময়পাত করিতেছেন। [illegible] গৎ তুলিয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রেস্টিজ বাড়িয়াছে এবং তদনুযায়ী জ্যানিটিও স্ফীত হইয়াছে কারণ তাঁহারা এখন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বড় কেউ কেটা নহেন। এখনও তাঁহারা দরদস্তুর করিয়া বিজয়া সম্মিলনীতে বা অমুকপাড়া-তমুকপাড়ার পার্কে পার্কে গান বাজনা করেন কিনা জানি না তবে এপার বাংলা ওপার বাংলার মৈত্রী সাধনে তৎপর হইতেছেন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী-দের সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া নানারূপ বুদ্ধিতে পরিপক্ক হইবার মত সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। আর থিসিস লেখা তো আজকাল অতি সহজ ব্যাপার। এখান ওখান হইতে কতকগুলি উদ্ধৃতি একত্র জড় করিয়া একটি জড় পদার্থ হাজির করিতে পারিলেই হইল। তাহার পর?...কিঞ্চিৎ ইয়ে আর কি—তাহা হইলেই ডাক্তারির খেতাবটিও পাকা হইল। অতএব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার ভূমিকা অতি সহজ অন্তত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। আর এমন একটি ভাইস চ্যান্সেলার থাকিতে

কোনও একই প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাহিরে থাকিতে পারে না। তিনি নিজে প্রত্যহ নিয়মিত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছেন আর বক্তৃতা দিতেছেন। বক্তৃতারও মাথামুণ্ড কিছুই নাই। থাকিবে কি করিয়া, তিনি যেসব কিছুরই অনুশীলন করিয়া ছাড়িয়াছেন। এখন কথা হইতেছে এই জাতীয় ভাইস-চ্যান্সেলারের "প্রাইস"-এর প্রশ্রয় মাননীয় সরকার আর কতদিন দিতে থাকিবেন।

কেন যে এত প্রতিষ্ঠান এবং এত ইউনিভার্সিটি থাকিতেও সঙ্গীতে কোনও সার্থক কাজ হইতেছে না তাহা সবিস্তারে না হইলেও কিছু কিঞ্চিৎ জানাইলাম। যাহা কিছু হইতেছে তাহা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। এখনও দেখিতে পাই এমন গুরু আছেন যিনি ছাত্রছাত্রীকে মনপ্রাণ দিয়া শিক্ষা দিতেছেন এবং তাহারা যথার্থ শিল্পী হইয়া উঠিতেছে। এখনও এমন গবেষক আছেন যিনি বহু পরিশ্রমে সীমিত আয়ের বহুলাংশ ব্যয় করিয়া গবেষণায় অগ্রসর হইতেছেন। এখনও কোনও কোনও বাদক দেখিতেছি যাঁহারা যন্ত্রের উন্নতির জন্য নানা উদ্ভাবন-ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাহার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। ইঁহাদের মূল্য দিবে কে? অ্যাপ্রিশিয়েট করিবে কে? বোধ করি ইঁহারা তাহা প্রত্যাশাও করেন না।

পত্র দীর্ঘ হইল। খোলাখুলি অনেক কথা বলিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি আপনি যেহেতু আজকাল কোনও বিবাদ বিসম্বাদে যাইতে চান না, অপ্রিয় সত্য বলিতে দ্বিধা করেন সেই হেতু আমিই এগুলি বলিয়া দুঃখের বোঝা নামাইলাম। সব দায়িত্ব আমারই কিন্তু মহাশয় সঙ্গীত বিষয়ে সর্বত্র ধাপ্পাবাজী যে চরমে উঠিয়াছে--এর একটা বিহিত না করিলেই নয়। দয়া করিয়া আমার নামটা ছাপাইবেন না, ছাপাইলে অনেকেই চিনিবেন এবং তাহা হইলে আমাকে হিংসুক বা ফ্রাসট্রেটেড বলিয়া অভিহিত করিবেন। ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। ইতি—

জনৈক স্পষ্টবক্তা
কলিকাতা

পরলোকে সুকৃতি সেন

সুপ্রসিদ্ধ দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের গায়ক ও সুরকার শ্রীসুকৃতি সেন ৯ এপ্রিল রবিবার কলকাতার একটি নার্সিং হোমে পরলোকগমন করেছেন। আমরা তাঁকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কলকাতায় বহু অনুষ্ঠানে অভ্যুদয় গীতিনাট্য গান করতে শুনেছি। তিনিই এই নাটোর সুর দিয়েছিলেন। তাঁর গানে একটা মস্ত বড় প্রেরণা ছিল যা মুকুন্দদাসের গানে পাওয়া যেত। গানে তিনি বক্তব্যকে উজ্জীবিত করে তুলতেন। স্বদেশী সংগীত ছাড়াও তিনি সিনেমাতেও তিনি সুরারোপ করেছিলেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের প্রচারে তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। এক সময় পার্কে পার্কে গেয়ে বেড়িয়েছেন। মাস ছয়েক আগে আকাশবাণীতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বলেছিলেন—অনেক কথা আছে একদিন বলব। কিন্তু তার সুযোগ আর হল না। তাঁর তিরোধানে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। একজন যথার্থ শিল্পী আমাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন।

"ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে"

কিছুদিন পূর্বে বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত নজরুল গীতি সংগ্রহে এই গানটির সম্পর্কে বলেছিলুম যে এটি নজরুলের রচনা নয়। সম্প্রতি সুর সাগর হিমাংশু দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীসুধাংশু দত্ত বললেন যে গানটি কবি হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের রচনা ছিল। সুধাংশুবাবু এই রেকর্ডটি হবার সময় গায়ক পঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শার্ঙ্গদেব

এপ্রিলের সকালে সুন্দর সরোদ

এই সেদিন, ২ এপ্রিল, ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁয়ের আর একটি সুন্দর সরোদ আসর শুনলেন কলকাতার লোক। রবীন্দ্র সদনে এই আসরের উদ্যোগ করেছিলেন দক্ষিণ কলকাতা তরুণ সমিতির সভাবৃন্দ। এপ্রিলের কড়া রোদের পরিবেশে মিঠে বাজনার একটা আলাদা আমেজ আছে। মনে পড়ছিল বাজনা শুনতে শুনতে এলিয়টের কটা লাইন :

"April is the cruelest month
breeding lilacs out of the dead land
mixing memory with pain."

আমজাদের গুর্জরী তোড়ী এবং আলহৈয়া বিলাবল স্মৃতির সঙ্গে যন্ত্রণাকে এক করার মত দুটি পরিবেশনা। পরের গৌর সারেঙ্গ এবং ভৈরবী একটি অন্য ইঙ্গিতের সূচনা করে। কেন, সে কথা বলছি।

আমাদের গুর্জরী তোড়ীর বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে সেটির বেশ কিছুটা আলাপী অংশ গায়কী ঢঙে ঢালা হলেও তার গত্, ঝালা অংশের নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রী নকশাগুলি অনুপম। গুর্জরীর আলাপের সম্পূর্ণ রূপটি যে সমালোচনার আওতার বাইরে তা কখনই বলব না। বরং সঞ্চারী, আভোগ অংশে আরও বেশী কিছুর দাবি করব কারণ ঐ পর্যায়ের আরও ওস্তাদী ছবি আমি আমজাদকে আঁকতে দেখেছি পূর্বের একটি বাজনায়। তবে সেদিনের বাজনায় অ্যাপ্রোচের ভঙ্গীটা নতুন ছিল বলেই আমার ধারণা। পুরো আলাপ, জোড়, ঝালায় সুরের নৈপুণ্য মন কেড়ে নিচ্ছিল। তাছাড়া তারপরণ ঝালার এবং স্থানে স্থানে রুবাব অঙ্গের এবং সুরশৃঙ্গার স্টাইলের মিশ্রণ বাজনাকে অত্যন্ত কাব্যময় এবং গতিশীল করেছিল।

গুর্জরীর গত্-বাদনও মনে রাখার মত। পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবলা এই সময়ে টুকরো, রেলা, কায়দার সরোদকে ছন্দ, যতি, তালের একটা নতুন মহলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল। স্থানে স্থানে তবলার গতিগতি চলন ভারী সুরে বলছিল। আমজাদও গত-সুরে কল্পনা আনলেন পরিশীলিত ছুট এবং সপাট তানে। গুর্জরী গত্ জমে উঠল সওয়াল-জবাবের কাজে এবং সম্পূর্ণ পরিণতি পেল একটি রসসিক্ত ঝালায়। তবে নিশ্চয়ই বলব, আমজাদের শ্রোতৃবৃন্দের কথা মনে রেখে, শিল্পী আর খানিকটা ঝালা বাজালে পারতেন।

সেদিনের সরোদের শ্রেষ্ঠ উপচার আলহৈয়া বিলাবল। এত মিষ্টি রাগ মানুষের ভাল না লেগে পারে না। বিশেষ করে সেদিন আরও ভাল লাগল কারণ আমজাদ তাঁর পিতৃদেব ওস্তাদ হাফেজ আলী খাঁর গায়কী সুরে বিস্তৃত করেছিলেন রাগের রূপটি। পুরো রাগটিকেই একটি গান মনে হল। শিল্পীর পিতৃদেবের সুরেলা কল্পনা পুত্রের হাতে ভাব খুঁজে পাচ্ছিল। বিলাবলের আলাপ ছোট হলেও গুণের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর হয়েছিল। ঠিক এই সময়েই বাজনার মুড্ এবং টোন আরও মনোগ্রাহী হয়ে উঠল। মিষ্টি এই রাগটির ব্যবহার কচিৎ দেখা যায় কলকাতার ফাংশনগুলিতে। সুপরিচিত রাগটি ক্রমশ পরিত্যক্ত হয়ে চলছিল কলকাতার সংগীত আসরে। এবং ঠিক সেই কারণেই আমজাদ সাহেবের বিলাবল পরিবেশনা একটা মারাত্মক উইট-এর লক্ষণ। শ্রোতারাও তাই খুব মন দিয়ে শুনলেন বাজনাটি। শান্তাপ্রসাদও পরিবেশ আঁচ করে মিষ্টি ঠেকা দিয়ে চলছিলেন। তবে সেদিনের বিলাবল সম্বন্ধে কিছুই বলা হবে না যদি রাগ পরিবেশনার স্থানে স্থানে ভাটিয়ালীর এফেক্টগুলির কথা খেয়াল না করি। বস্তুত ভাটিয়ার, বিলাবল, মান্ড, পাহাড়ী রাগগুলির একটি বিশেষ আবেদন হল যে এগুলি আমাদের দেশের গ্রামীণ সংগীতের ভাবমাধুর্যকে মার্গ আঙ্গিকে গড়ে তোলে। আমজাদের বিলাবলের বেশ কিছুটা ভাটিয়ালী চেতনা শুধু বাজনার মৌলিক গুরুত্বের পরিচায়ক। বিলাবলের সঙ্গে শান্তাজীর তবলায় খোলের এফেক্ট ভারী ভাল লাগল।

সেদিনের তৃতীয় উপচার গৌর সারেঙ্গ গত্, ঝালাও ওস্তাদী বাজনার নমুনা। সারেঙ্গের বন্দিশী গত্টি বেশ নিটোল এবং পরিচ্ছন্ন। তার উপর লয়, তালের প্রসাধনে গত্টির মূর্তি বেশ প্রশংসনীয় হয়ে উঠছিল। সারেঙ্গের যে উচ্ছল, রৌদ্রদগ্ধ,

তার তার রূপ সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল তার বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন প্রাজ্ঞ সংগীত শাস্ত্রবিদ ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়কে যে, তিনি মানতে পারেন না যে সারেঙ্গা ঠিক দুপুরের রাগ। হয়ত সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের একটা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া, তবে সেটা যে স্থানে স্থানে কত সত্য হয়ে উঠতে পারে তা বুঝলাম আমজাদের রসাপ্লুত গৌর সারেঙ্গা শুনে। তবে সেখানেও সেই একই অভিযোগ রাখব। ঝালা আর একটু লয়ে চড়তে পারত।

শেষের রাগ ভৈরবীও খুব ভাল লাগল। আমি আমজাদের ভৈরবী আগেও শুনেছি। পূর্বস্মৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই বলতে পারি সেদিনের বাজনা ওঁর হাতে আমার শোনা সব চেয়ে ভাল ভৈরবী। ভাল লাগার মূল কারণ কল্পনার বৈচিত্র্য এবং অলংকরণের বিপুল সমারোহ। ভৈরবীর অনেক ভাল ভাল কাজ দেখলাম। ঠুংরী কায়দা এবং বন্দিশী বিবেচনা আমজাদের ভৈরবীকে একটি ভাল লাগা এবং ভালবাসার জিনিস করে তুলেছিল।

—সংগীত সমালোচক

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১২ ॥

গরমের ছুটিতে বিকু তার বাবা মায়ের সঙ্গে চলে গেল দার্জিলিং। বাদলকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবেই! বিকু তার বাবা মায়ের নয়নের মণি, তার কোনো ইচ্ছেই অপূর্ণ থাকে না। বিকু তার মাকে বললো, মা, বাদল কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাবে। না হলে আমি যাবো না!

বিকুর মা ঠাণ্ডা উৎসাহের সঙ্গে বললেন বেশ তো চলুক না! বাদল, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে?

বিকুর মা বাদলকে যে খুব অপছন্দ করেন, তা নয়। তবে কিছু কিছু রমণী থাকেন এরকম, যাঁরা নিজের সন্তানের ওপর এত বেশী স্নেহ দিয়ে ফেলেন যে অন্যদের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বেশী বয়েসের ঐ এক ছেলে বিকু ছাড়া অন্নপূর্ণার আর অন্য কোনো দিকে চোখ নেই। অন্নপূর্ণা বাদলকে বললেন, তুই তোর বাবা মাকে বলে রাখিস আমরা আসছে সোমবার যাবো। পনেরো দিন থাকবো কিন্তু। তোর মার জন্য মন কেমন করবে না তো?

বিকু আর বাদল তখন বসে গেল পরিকল্পনা আঁটতে। বাদল এ পর্যন্ত কোনো পাহাড় দেখেনি। সমুদ্রও দেখেনি। বড় বড় নদী দেখেছে তাও শৈশবে, মনে আছে অস্পষ্ট। যে-কখনো কোনো পাহাড় দেখেনি, তার কল্পনায় যে-কোনো পাহাড়ই হিমালয়ের চেয়েও বিশাল। সেই পাহাড়ের ওপর দার্জিলিং শহর, বাদলের চোখে তা স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। বিকু প্রত্যেক ছুটিতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়, এমন কি দার্জিলিং-এও আগে একবার গেছে, সেখানে ওদের একটা বাড়ি আছে। বিকুরা একাই যাবে, রেণুরা বা অন্য কাকা-কাকীমার ছেলেমেয়েরা যাবে না।

বিকু তাকে শোনাতে লাগলো পথের বর্ণনা। বড় ট্রেনের পর ছোট ট্রেন। সেই ছোট ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে বালি ছড়ায় অনবরত, ট্রেনটা খেলনার মতন এঁকেবেঁকে ওঠে পাহাড়ের গা দিয়ে, জানলা দিয়ে হাত বাড়ালেই পাহাড় ছোঁয়া যায়। দার্জিলিং-এ পৌঁছেই ওরা ঘোড়ায় চড়বে। বাদল ঘোড়ায় চড়তে জানে না তো! তাতে কি হয়েছে, একদিনেই শিখে যাবে। এবার দার্জিলিং-এ গিয়ে বিকু একটা কাজ করবেই, বাদলকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে যাবে দূরে কোনো একটা অচেনা পাহাড়ে। দুজনে মিলে তার চূড়ায় উঠবে। আগে কারুকে কিছু বলবে না—চূড়ায় পৌঁছে একটা ফ্ল্যাগ পুঁতে দিয়ে নেমে এসে সেই কীর্তির কথা বলে সবাইকে অবাক করে দেবে। বিকুর কল্পনাপ্রবণ মন এই সব চিন্তার মাধ্যমে আনন্দ পায়।

বাদলকে শীতের জামা কাপড় নিয়ে যেতে হবে অনেক। তার যদি কোট না থাকে সে জন্য কোনো চিন্তা নেই, বিকুর দুটো অলেস্টার আছে—একটা সে বাদলকে দিয়ে দেবে। বিকুর দস্তানাও আছে তিন জোড়া। পাহাড়ে উঠতে গেলে দস্তানা তো লাগবেই। বাদল তক্ষুনি বিকুর দস্তানা হাতে দিয়ে দেখলো তাকে ফিট করে কিনা।

শেষ পর্যন্ত বাদলের যাওয়া হলো না। বাড়িতে এসে মাকে বলতেই মা বললেন, তুই দার্জিলিং যাবি কি করে? সে তো অনেক দূরে! দাঁড়া, তোর বাবা আসুক, জিজ্ঞেস করে দ্যাখ—

বাদল আনুনাসিক আব্দারের সঙ্গে বললো, না, বাবাকে তুমি বলবে। আমি ঠিক যাবো—বিকু বলেছে কোনো অসুবিধে হবে না।

মা বললেন, তুই অতদিন ধরে ওদের সঙ্গে থাকতে পারবি? তুই কখনো কোথাও একা থেকেছিস?

বাদল অতি উৎসাহের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, থাকতে পারবো। খুব থাকতে পারবো!

—কিন্তু দার্জিলিং যেতে তো অনেক টাকা লাগে। অত টাকা আসবে কোত্থেকে?

ন' বছরের ছেলের পক্ষে টাকার ব্যাপারটা বোঝা অবশ্য কঠিন। সে অবাক হয়ে বললো, বাঃ, টাকা লাগবে কিসে, আমি তো বিকুদের সঙ্গেই যাবো!

—সঙ্গে গেলেই বা, ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে না? তাছাড়া অতদিন বাইরে থাকা—

বাবা বাড়ি না-ফেরা পর্যন্ত জেগে বসে রইলো বাদল। ঘুমে চোখ টেনে আসছে, তবু ঘুমোবে না। চিররঞ্জন খেতে বসার পর বাদল সামনে দাঁড়িয়ে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, বাবা, আমি দার্জিলিং যাবো।

চিররঞ্জন মুখ তুলে বললেন, ইস্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি?

—না বিকুদের সঙ্গে যাবো। বিকুর বাবা মা যাচ্ছেন

—বিকু কে?

মা বললেন, ঐ যে গো রেণু, সেই যে গঙ্গার ঘাটে হারিয়ে গিয়েছিল, তার খুড়তুতো ভাই। বেশ ভালো ছেলে!

চিররঞ্জন ভুরু কুঁচকে বললেন, ওদের সঙ্গে যাবে কি করে? ওদের সঙ্গে কি আমাদের খাপ খায়!

মা বললেন, এত করে যেতে চাইছে,

যাক্ না। কোথাও তো বেড়ানো হয় না! ওর বন্ধুরা যায়—

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিকেলবেলা যা বাদলকে দার্জিলিং যাওয়ার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিচ্ছিলেন, এখন তিনিই স্বামীর সামনে ছেলের পক্ষ নিয়ে নিলেন। বোঝাতে লাগলেন অনেক করে। কিন্তু চিররঞ্জন মানলেন না, বাদলকে বললেন, সময় তো অনেক পড়ে আছে। বড়ো হও, লেখাপড়া করে, তারপর নিজেই ওরকম অনেক জায়গায় বেড়াতে পারবে।

হিমানী রেগে উঠে বললেন, আমি যে এত করে বলছি, সেটা বুঝি তোমার কানে যাচ্ছে না? ছেলেটা এত করে বলছে—কি হয় গেলে? তোমার কোনো ক্ষতি হবে! এমনিতে তো সারাদিনে ছেলের একবার খোঁজও নাও না!

চিররঞ্জন ক্লান্তভাবে বললেন, কিন্তু আমি এখন ওকে পাঠাবো কি করে? আমার হাতে তো একদম টাকা নেই?

—ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে যাচ্ছে। ওরা কি আর টাকা নেবে?

—ওরা টাকা না নিলেও আমি টাকা না দিয়ে আমার ছেলেকে পাঠবো কি করে? আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

হিমানী তখন হাত থেকে দু' জোড়া সোনার চুড়ি খুলে মাটিতে ছুঁড়ে মেরে বললেন, তোমার হাতে তো কোনো সময়েই টাকা থাকে না! তা বলে আমার কোনো সাধ আহ্লাদ নেই? তুমি আমার গয়না বিক্রী করে টাকা নিয়ে এসো!

তখন ঝগড়া লেগে গেল স্বামী-স্ত্রীতে। বাদল আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো দরজার কাছে। চিররঞ্জন পুরোটা না খেয়েই উঠে পড়লেন। বাদলের কান্না পেতে লাগলো, তার জন্যই এই সব হচ্ছে। এর আগে সে তো কখনো বোঝে নি টাকা জিনিসটা এরকম জরুরি। বাবা আর মায়ের ঝগড়ার মধ্যে বেশ কয়েকবার টাকা কথাটার উচ্চারণে তার মাথার মধ্যে ঘা মারতে লাগলো। এতকাল তার ধারনা ছিল, টাকা জিনিসটা ছোটদের কাছে থাকে না, শুধু বয়স্কদের কাছে থাকে। তবে বাবাও তো বয়স্ক লোক, অথচ বাবার কাছে নেই কেন? ছোট ছেলেরা যেমন মার্বেল গুলি নিয়ে ঝগড়া করে, তেমনি তার বাবা-মা-ও ঐ সাহেবের মুণ্ডু-ছাপ দেওয়া রুপোর গোল গোল জিনিসগুলোর জন্য ঝগড়া করছে। সে একবার ভাবলো বড়বাবুর কাছে চাইলেই হয়, বড়বাবুর তো অনেক টাকা। আবার সে তীব্র অভিমানের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলো, বড় হয়ে সে অনেক অনেক টাকা রোজগার করবে—তখন সে প্রত্যেক বছর দার্জিলিং যাবে—তখন তো কেউ কিছু বলতে পারবে না!

এদিকে বিকু বেঁকে বসলো, বাদল না গেলে সে কিছুতেই যাবে না। [illegible]

[illegible]

এ বাড়িতে, বাদলের মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে। তাতেও কোনো ফল হলো না। হিমানী কৃত্রিম হেসে অন্নপূর্ণাকে বললেন, না, দিদি, বাদল না হয় অন্য কোনোবার তোমাদের সঙ্গে যাবে। এবার কি করে পাঠাই। বটঠাকুর বলছেন, এবার আমাদের সবাইকে নিয়ে কাশী যাবেন—এখনো ঠিক হয়নি অবশ্য, তবু যদি যাওয়া হয়, তাহলে বাদলকে না নিলে—

বাদলের সামনেই এই আলোচনা হচ্ছিল, অথচ বাদল জানে ও-কথা সত্যি নয়। প্রিয়রঞ্জনের দেশ ভ্রমণের বাতিক নেই—তাঁর মতে ওসব নেহাৎ বাজে খরচ। বড়বাবু মাঝে মাঝেই বেড়াতে যান, কিন্তু একা। একবার বেরুলে, কবে ফিরবেন তা-ও বলে যান না। আর চিররঞ্জন ট্রেনে চেপে কোথাও যাবার বদলে কলকাতার পথে পথে আনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতেই বেশী ভালোবাসেন। প্রিয়রঞ্জন তাঁর ব্যবসার কোনো সংকটের সময় কাশী বিশ্বনাথের কাছে কিছু একটা মানত করেছিলেন—সংকট কেটে যাওয়ায় এখন তিনি বিশ্বনাথকে পুজো দিতে যাবেন। প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে যাবার জন্য বাড়ির কেউ কেউ বায়না তুলেছে—কিন্তু প্রিয়রঞ্জন তাতে রাজী নন্।

বিষ্ণুরা চলে যাবার পর বাদল কিছুদিন মন-মরা হয়ে ঘুরে বেড়ালো। সবাই মিলে তার কাছ থেকে একটা স্বর্গ কেড়ে নিয়েছে। এতদিন তার কল্পনায় দার্জিলিং-এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না—কিন্তু বিষ্ণুর সঙ্গে সেখানে বেড়াতে যাবার সব পরিকল্পনা করে ফেলার পরও না-যাওয়া যে কি মর্মান্তিক, তা আর কেউ বুঝবে না। বালকের যুক্তিহীন মনের গহন অভ্যন্তরে যে বেদনা-অভিমানের আলোছায়া ঘোরে তার মর্ম বোঝার সাধ্য আর কারুর নেই। বাদল একা একা ছিলে কোঠায় গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে কথা বলে, টবের ফণীমনসার গাছের কাছে তার দুঃখ জানায়, ট্যাঙ্কের জলে হাত ডুবিয়ে খেলা করতে করতে সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কে বহুদিনের মাটি জমেছে এবং আশ্চর্যের বিষয়, দুটি ছোট ছোট কাঁকড়া সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। অন্য সময় বাদল লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে কাঁকড়া দুটোকে মারার চেষ্টা করে, কিন্তু এখন সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে—যেন ওরা ছাড়া তার আর বন্ধু নেই।

ছেলের মন-মরা ভাব দেখে চিররঞ্জন একদিন বললেন দেওঘর যাবি? ফ্রেস এয়ার ক্যাম্পের সঙ্গে? দেওঘর খুব সুন্দর জায়গা—বৈদ্যনাথের মন্দির, তপোবন, পাহাড়ও আছে ওখানে—। যদি যাস তো অসীমদাকে বলে দেখি—

চিলড্রেন্স ফ্রেস এয়ার অ্যাণ্ড এক্সকারশন সোসাইটি নামে একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠান ছিল তখন। ধনী ব্যক্তিদের দানে ধন্য এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর গরীব ছেলেদের বেড়াতে নিয়ে যেত কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায়। প্রত্যেকের খরচ হতো মাত্র পাঁচ টাকা—পড়শুনোয় যারা ভালো অথচ গরীব, শুধু তাদেরই জন্য। দরখাস্ত পড়তো অনেক, কিন্তু এই ক্যাম্পের যিনি ইন চার্জ থাকতেন সেই স্কাউট মাস্টার অসীম দত্তর সঙ্গে কি সূত্রে যেন চেনা ছিল চিররঞ্জনের।

চিররঞ্জন ছেলেকে দেওঘর পাঠাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু কি কারণে যেন সেটাও শেষ পর্যন্ত সার্থক হলো না। আসলে, চিররঞ্জন নিজেও চেষ্টা করেছিলেন ঐ দলের সঙ্গে কোনো ছুতোয় ভিড়ে পড়তে, সেটতেই অসুবিধে দেখা দেয়। দুর্বল ধরনের মানুষ চিররঞ্জন, ছেলেকে একলা কোথাও পাঠাবার মতন মনের জোর তাঁর নেই। দেওঘর যাওয়া হলো না, চিররঞ্জন বুঝতেও পারলেন না, ছেলের কাছ থেকে তিনি আর একটি স্বর্গ কেড়ে নিলেন। বাদল এর মধ্যেই দার্জিলিং-এর কথা অনেকখানি ভুলে মনে মনে দেওঘর নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। বিশেষত দেওঘরে তপোবন আছে শুনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিল সে। ঐ নাম শুনেই সে মানসচক্ষে দেখতে শুরু করেছিল বাল্মীকির তপোবন আহা, বিষ্ণু বেচারা দেখতে পাবে না! উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ' তখন বাদলের পুরো মুখস্ত সে একা একা আবৃত্তি করতো:

বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
ছায়া তার মধুময় বায়ু বহে ধীরে,
সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল, চলে কুল—কুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।..

দেওঘর যাওয়া হলো না, সেই তপোবন বাদলের কাছে আরও সুদূর—সুন্দর হয়ে রইলো।

রেণুদের বাড়িতে গেলেও আর বিশেষ খেলা জমে না। বিষ্ণু নেই, সেই কথাটা সব সময় খচ্ খচ্ করে। অন্য ছেলেমেয়েরাও অনেকেই এ বছর বেড়াতে গেছে তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে। রেণুর অসুখ বলে ওরা যেতে পারে নি, কিন্তু সুপ্রকাশদা বন্ধুদের সঙ্গে গেছেন উটকামণ্ড।

হৈমন্তী কাকীমার ঘরটা তালাবন্ধ হয়েই পড়ে থাকে। আগে হৈমন্তী কাকীমার সঙ্গে গল্প করতেও কত ভালো লাগতো। বিষ্ণু একদিন ফিসফিস করে বাদলকে বলেছিল, জানিস, হৈমন্তী কাকীমা হারিয়ে গেছে?

বাদল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় হারিয়ে গেছে?

বিষ্ণু বলেছিল, সেটাই তো কেউ জানে না। কাকীমা কারুকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গেছেন। বাপের বাড়িতেও নেই।

এই বিশাল পৃথিবীতে হারিয়ে যাবার কথা শুনলেই কি রকম যেন অসহায় লাগে। বাদলের খুব কষ্ট হয়েছিল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় হয়ে সে আর বিষ্ণু ঠিক হৈমন্তী কাকীমাকে খুঁজে বার করবে।

রেণু প্রায়ই অসুখে ভোগে, ঘরে ফিরেই তার জ্বর হয়। জ্বরে বিছানায় শুয়ে থাকে কয়েকদিন, একটু সেরে উঠলেই আবার দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দেয়। গত কয়েক মাসে বেশ রোগা হয়ে গেছে রেণু, শীর্ণ মুখে দুটি টলটলে চোখ, মাথায় সিল্কের মতন কোঁকড়া চুল।

এ বাড়িতে এখন ছেলেমেয়ে মাত্র তিনজন। রেণু, তার ওপরের ভাই অনিরুদ্ধ আর ওদের জ্যাঠতুতো বোন দীপ্তি। এর মধ্যে দীপ্তি বারো ছেড়ে তেরোয় পা দিয়েছে এবং ফ্রক ছেড়ে প্রায়ই শাড়ি পরে। শরীরেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে দীপ্তির। কিন্তু তার মনটা এখনও অপরিণত রয়ে গেছে। তার এই নতুন রকমের শরীর নিয়ে সে কি করবে বুঝতে পারে না। পড়াশুনোয় তার মন নেই বলে ইস্কুল ছেড়েই দিয়েছে প্রায়, তা ছাড়া সে 'আটকে' করা মেয়ে, অর্থাৎ শোভাবাজারের বোসদের বাড়ির একটি ছেলের সঙ্গে অতি শৈশব থেকেই তার বিয়ে ঠিক করা আছে। সেই ছেলে এখন বিলেতে, আগামী বছর বিলেত থেকে ফিরলেই দীপ্তির বিয়ে হয়ে যাবে। দীপ্তি এসব জানে বলেই তার ব্যবহারটা একটু পাকাপাকা। সে এখন বিকেলবেলা গা ধুয়ে ছাদে দাঁড়ায়, আকাশের দিকে তাকায় উদাস চোখে, পাড়ার ছেলেরা তার দিকে ইসারা ইঙ্গিত করে। গত বছর বিষ্ণুর জন্য যে মাস্টার মশাই রাখা হয়েছিল, সেই মাস্টারটি নাকি দীপ্তির প্রতি রসস্থ হয়ে কি একটা কাণ্ড করে ফেলেছিল, যে-জন্য অবিলম্বে তার চাকরি যায়।

আগে দশ বারোজন ছেলেমেয়ে মিলে যে খেলা খেলতো, তার অধিকাংশই ছিল ছুটোছুটির খেলা। এখন তিন চারজনে মিলে খেলার ধরনটা বদলে যায়। এখন হয় বসে বসে ক্যারম পেটা অথবা দোকান-দোকান খেলা। তারপরই এসে যায় বর-বউ খেলা। এই খেলাটা দীপ্তিই ওদের শেখায়। দীপ্তি বাদলের হাতটা টেনে ধরে বলে, তুই হবি বর, আমি হবো তোর বউ, তারপর বর-বউ কি করে জানিস তো? হি-হি-হি! দীপ্তি হেসে লুটোপুটি খায়, বাদল তার মানে বুঝতে পারে না। তার মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে থাকে, একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলে—এর মধ্যে কি

যেন একটা তফাৎ আছে। মেয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় না, ছেলের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হয় না—শুধু ছেলে আর মেয়েতেই বিয়ে হয়—এটা একটা ঘোর রহস্যময় ব্যাপার। চড়াক চড়াক করে তার মাথার মধ্যে কয়েকটা দৃশ্য ঘুরে যায়। সর্বদা একদিন বড়দির ঠোঁট কামড়ে দিয়েছিল অথচ বড়দি হাসছিল, এর মানে কি? তার বাবা একদিন তার মাকে—।

অনিরুদ্ধর সঙ্গে বাদলের কিছুতেই বনে না। বয়েসের তুলনায় বাদল একটু বেশী লম্বা হয়ে গেছে, তাকে অনিরুদ্ধর চেয়ে বড় দেখায়। অনিরুদ্ধ একটু স্বার্থপর ধরনের, আর সব সময় খালি নালিশ করে। খেলাতে খেলতেই চেঁচিয়ে ওঠে, মা দ্যাখো, বাদল আমার বই নিয়েছে! মা, বাদল আমার লেত্তি ছিঁড়ে দিল! নালিশ শুনে রত্নপ্রভা এসে ছেলেকেই বকুনি দেন, অনিরুদ্ধ তবু খেলার মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া করে উঠে চলে যায়। তখনই দীপ্তি বলে, ও যায় যাক! আয় রে আমরা বর-বউ খেলি! তুই আমার এই খানটায় হাত দে! হি-হি-হি-হি—।

বাদল একলা রাস্তায় বেরোয় না, এ বাড়িতে আসে সে চাকরের সঙ্গে। চাকরটি বড় ফাঁকিবাজ। অনেকদিন সে বেশ খানিকটা দূরে থেকেই বলে, এইবার দাদাবাবু, তুমি সোজা চলে যাও! যেতে পারবে তো? আমি দাঁড়িয়ে রইছি, আমাকে আবার বাজার যেতে হবে তো! সেই পথটুকু বাদল একা একা হেঁটে আসবার সময় খানিকটা স্বাধীনতার স্বাদ পায়। একদিন দুটো বয়স্ক ছেলে তাকে রেণুদের বাড়ির কাছেই দাঁড় করালো। তারপর বললো, এই খোকা, শোন, একটা কাজ করতে পারবি?

বাদলের কাঁধে হাত দিয়ে দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ওরা নানা কথা জিজ্ঞেস করলো। রেণুদের বাড়িতে এখন কে কে আছে, বাবা-কাকারা কে-কখন বাড়িতে থাকে ইত্যাদি। বাদলের কথায় এখনও একটু একটু বাঙাল টান আছে। ছেলে দুটি সেটা অবিলম্বে বুঝে গেল। একজন অপর একজনকে বললো, এ রে মাইরি, এ যে বাঙাল দেখছি! বাঙালের বুদ্ধি তো, সব কিছু না গুবলেট করে দেয়! আর একজন বললো, এই ছোঁড়া, তোকে যা বলবো, তাই করবি! এই গল্পের বইটা দীপ্তিকে দিবি, খবর্দার অন্য কেউ যেন দেখতে না পায়! কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও কিন্তু কিছু বলবি না! যদি না পারিস, তা হলে কিন্তু কান মুলে দেবো!

বাদল বইটা হাতে নিয়েই বুঝলো সেটা বড়দের বই। কেননা ছোট ছোট অক্ষর, আর ভেতরে কোনো ছবি নেই, দীপ্তি কি বড়দের বই পড়তে পারে? বইটার মধ্যে একটা আলাদা সাদা কাগজে কি সব হাতে লেখা, বোধহয় চিঠি, বাদল সেটা পড়ার সাহস পেল না। কিন্তু ছেলে দুটির ব্যবহার দেখেই সে বুঝেছিল, এর মধ্যে কিছু অন্যায় আছে। আর কোনোদিন সে চাকরকে না নিয়ে একলা আসবে না।

দীপ্তি বইখানা পেয়েই ঝট করে লুকিয়ে ফেললো। তারপর বাদলের কাছে তার হাজার প্রশ্ন। বাড়িতে ঢোকার পর বাদলকে কেউ দেখেছে কি না। বিশেষ করে ছোট কাকা। বইটা বাদলকে কে দিয়েছে, কল্যাণ না সত্যেন? বাদল কারুরই নাম জানে না। দুজন ছেলে এক সঙ্গে ছিল? কি রকম চেহারা বল্ তো?

যাই হোক, প্রশ্নের উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিল দীপ্তি। বাদলের ওপর খুব খুশী হয়ে সে বললো, কি ভালো ছেলে রে! তারপর ফটাস করে সে দিয়ে ফেললে বাদলের গালে একখানা চুমো। বাদল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গালে হাত দিয়ে দেখলো, সেখানে থুতু লেগে আছে। তার ঘেন্না করতে লাগলো! দীপ্তিটা একটা কিরকম যেন!

রেণু যখন বেশ কয়েকদিন টানা জ্বরে ভোগে, তখন বাদল গেলে রত্নপ্রভা বলেন, বাদল, লক্ষ্মী ছেলে আমার—আজ তোমরা এই ঘরেই বসে খেলো। তোমরা অন্য কোথাও গেলে রেণুও উঠে যেতে চাইবে! কিংবা রেণুকে তোমরা গল্প শোনাও না—ও বেচারী অ্যাদ্দিন ধরে বিছানায় শুয়ে আছে।

দীপ্তি কিংবা অনিরুদ্ধ বেশীক্ষণ বসে না, যে-যার ইচ্ছে মতন উঠে চলে যায়। বাদল রেণুর মাথার পাশে বসে বই পড়ে শোনায়। 'টম কাকার কুটির', রবিনহুড, হেমেন্দ্রকুমারের যখের ধন, সুকুমার রায়ের পাগলা দাশু অ্যান্ডারসনের রূপকথা।

রেণু তার জ্বর-ছলছল চোখ মেলে এক মনে গল্প শোনে। গোটা একখানা বই না শুনলে বাদলকে কিছুতেই যেতে দেয় না। কান্নাকাটি করে, ওষুধ খেতে চায় না। রত্নপ্রভা বাদলদের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়ে দুপুরে তাকে সেখানেই খাইয়ে দেন প্রায়ই।

রেণু সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে রামায়ণের গল্প শুনতে। বারবার শুনেও তার তৃপ্তি হয় না। বাদল তখন চোখ বুজে আবৃত্তি করে :

দুঃখিনী সীতার কথা শুনে তারপর
মায়ের চোখেতে জল ঝরে ঝরঝর
ময়লা কাপড়ে মাতা পড়িয়া ধুলায়
এমন সময় হনু আইল সেথায়।
হনু বলে, 'শুন মাগো, মরিল রাবণ
মুছ মা চোখের জল, উঠগো এখন।'
সুখেতে সীতার মুখে কথা নাহি সরে
পাবেন রামের দেখা এতদিন পরে!
হায় রে দুঃখের কথা কি কহিব আর—
সেই রাম না করিল আদর সীতার!
ভ্রূকুটি করিয়া তিনি কহিলেন তারে,
যেথা ইচ্ছা যাও সীতা, চাহি না তোমারে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রত্নপ্রভাও শোনেন। এই অনাত্মীয় বালকটির এক মনে কবিতা পাঠ শুনে তাঁর মনের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের মায়া এসে যায়। মনে মনে বলেন, আহা, এ ছেলেটির ভালো হোক, জীবনে উন্নতি হোক! (ক্রমশ)

কাপড় ধোয়ার কেক
ডিটারজেন্ট শক্তিতে ভরপুর

ডেট ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার কেক

সাবানের তুলনায় ৫০% বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা ক'রে ধোয়।

—তা সে যে ধরণের জলই হোক।

মহানগরীর উন্নয়ন পর্ব

কলকাতা মহানগরীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য যে-সব প্রকল্প গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল সি-এম-ডি-এ'র প্রকল্পগুলি। এ প্রকল্পগুলির প্রাথমিক লক্ষ্য হল কলকাতা ও তার সন্নিহিত এলাকার কম সুবিধাভোগী জনগণের জীবনযাত্রার পরিবেশ উন্নততর করা। পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রী তাঁর ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, সামগ্রিকভাবে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সি-এম-ডি-এ'র কার্যসূচী অনুযায়ী ৫২টি সংস্থার সাহায্যে ১১৬টি প্রকল্পের রূপদান করা হচ্ছে। এজন্য ব্যয়ের পরিমাণ হবে ১৫০ কোটি টাকা। বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী ভারতে গৃহীত বৃহত্তম বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচীগুলির অন্যতম। মাথা পিছু ১৪৫ টাকা ব্যয়ের হিসাবে এই উন্নয়ন কাজ চলছে। "গরিবী হঠাও" আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ হল বস্তি-উন্নয়ন। কলকাতার বস্তি-উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্য হল, খাটা পায়খানার পরিবর্তে স্যানিটারি পায়খানা নির্মাণ, প্রচুর পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। ছয়টি বস্তি নিয়ে গঠিত বস্তি-জোটের হিসাবে প্রথম পর্যায়ে এই কর্মসূচী ২৭৬টি বস্তিজোটে রূপায়িত করা হচ্ছে। কিছু না হওয়ার চেয়েও দেরিতে হওয়া ভালো, এই নীতির ভিত্তিতে বলা চলে, কলকাতায় সি-এম-ডি-এ যে প্রকল্পগুলিতে হাত দিয়েছে সেগুলি যদি সার্থকতার পথে দ্রুত এগিয়ে যায় তবে এই মহানগরীর জীবন-যাত্রা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে। আদি গঙ্গার উন্নয়ন, বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়ন, জল সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নয়ন, কলকাতা মহানগরীর সর্বত্র চলছে একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ, তবে দুঃখের কথা, কাজের গতি দ্রুত তালে এগোচ্ছে না। নাগরিকদের ধৈর্য প্রায় শেষ সীমায় এসেছে; সবাই এখন চান খুব তাড়াতাড়ি এই কর্মযজ্ঞের সার্থকতা দেখতে।

১৯৭০ সালে কলকাতা মহানাগরিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Calcutta Metropolitan Development Authority) গঠিত হয়েছিল। এই কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য হল বৃহত্তর কলকাতা এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির দ্রুত রূপায়ণ করা। ১৯৭০-৭১ সালে এই কর্তৃপক্ষ ১৯.৮৩ কোটি টাকা পেয়েছিলেন; তার মধ্যে ১৭.৪৬ কোটি টাকা বিভিন্ন কার্যকরী সংস্থার মধ্যে বণ্টিত হয়েছিল; কর্তৃপক্ষ সরাসরিভাবে ১.০৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছিলেন। কার্যকরী সংস্থাগুলি ১০.৫২ কোটি টাকা ১৯৭০-৭১ সালে কাজে লাগিয়েছিল এবং বাকি অর্থ পর বৎসরের দায়-দায়িত্ব মেটানোর জন্য রাখা হয়েছিল। ১৯৭১-৭২ সালে ৫০ কোটি টাকা সামগ্রিক বরাদ্দের মধ্যে ৪৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য সি-এম-ডি-এ'র কর্মসূচী রূপায়ণের খাতে ৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সি-এম-ডি-এ'র কর্মসূচী যে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে তাতে কলকাতার অধিবাসিগণ সুখী হবেন। অবশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে অনেকেই এটা ভালো চোখে দেখছেন না। তবে কাজ শুরু হওয়া উচিত ছিল আরও আগে, আর কাজের গতি হওয়া উচিত আরও দ্রুত। কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের নীতি ঘোষিত হয়েছে অনেক দেরিতে। একথা সবাই স্বীকার করবেন, কলকাতা মহানগরী নানাদিক দিয়ে এতদিন উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার পর এই মহানগরী নানাদিক থেকে উপেক্ষিত হতে থাকে। গত চার পাঁচ বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে পেরেছেন, এই মহানগরীর জন্য এমন কিছু করা দরকার যাতে পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি পঙ্গু না হয়ে পড়ে। কলকাতার উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি; শুধু তাই নয়, সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে কলকাতার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। এতদিন ভারত সরকারের দিক থেকে এই মহানগরীর উন্নয়নের জন্য যে কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা কেন দেখা যায়নি তা বিস্ময়কর। এই মহনগরীর জনসংখ্যা এখন ৭১ লক্ষ, বৃহত্তর বোম্বাই অপেক্ষা প্রায় ২০ লক্ষ বেশি। বোম্বাই শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়ন অনেক আগেই হয়েছে। ওই শহরের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত চক্ররেল সম্প্রসারিত হয়েছে। বহু টানাপোড়েনের পর কলকাতায় পাতাল রেল স্থাপন করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অবশ্য এই মহানগরীর অধিবাসীরা গর্ববোধ করতে পারেন, টোকিয়োর পর এশিয়ায় কলকাতাই হল দ্বিতীয় শহর যেখানে পাতাল রেল স্থাপিত হচ্ছে। ইউরোপের বহু ছোট ছোট শহরেও এ ধরনের যাতায়াত ব্যবস্থা চালু আছে। বড় বড় শহরগুলি, যেমন লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, রোম, বার্লিন প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও অপেক্ষাকৃত ছোট শহরেও, যেমন গ্লাসগো, নেপলস, মিলান প্রভৃতি

শহরেও পাতাল রেল ব্যবস্থা আছে; এমন কি বনের (Bonn) মত ছোট শহরেও সম্প্রতি পাতাল রেল তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু কলকাতা মহানগরী এতদিন উপেক্ষিত হল কেন? যদি কলকাতায় অন্তত আরও ২০ বছর আগে পাতাল-রেলের ব্যবস্থা হত, তবে কলকাতার অধিবাসীদের আজ মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের এত অসুবিধা হত না, রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম বন্ধ হত ও বহু দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। তাছাড়া বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত। ব্যবসায়িক স্বার্থেও এ ধরনের প্রকল্প ক্ষতিকর হত না। কিন্তু এই মহানগরীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই এমন কোন শক্তি এতদিন কাজ করেছে যার ফলে উন্নয়নমূলক কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা মহানগরীর সমস্যাগুলির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন এবং হয়তো এজন্যই শেষ পর্যন্ত কলকাতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। ১৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কর্মসূচী নিয়ে দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পাতাল-রেল স্থাপনের ব্যবস্থা হচ্ছে; তবে এই মহানগরীর অন্যান্য অঞ্চলেও এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, গড়িয়া, বেহালা এবং হাওড়া শহরেও যদি পাতাল রেল ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় তবে সরকারের ব্যবসায়িক স্বার্থও সুরক্ষিত থাকবে, জনসাধারণের অসুবিধাও দূর হবে। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হবে। পশ্চিম বাংলায় যে হারে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে এবং সেজন্য যেভাবে অর্থ-নৈতিক চাপের সৃষ্টি হচ্ছে, তার মোকাবিলা করার জন্য এমন বহু প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার যার ফলে নতুন কাজের সৃষ্টি হতে পারে। গঙ্গা নদীর উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ করা অনুরূপ একটি ব্যবস্থা। দ্বিতীয় ভাগীরথী সেতুর নির্মাণ কাজও শীঘ্রই শুরু হবে। তবে যেভাবে এই মহানগরীতে লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যোগসূত্র যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে, গঙ্গার উপর দুইটি প্রথম শ্রেণীর সেতু থাকলেও সমস্যার সমাধান হবে না; অন্তত এজন্য গঙ্গার উপর কম পক্ষে চারটি সেতু থাকা দরকার। সুতরাং বলা চলে এজন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা-ই যথেষ্ট নয়। রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে আরও সচেষ্ট হতে হবে। বর্তমান পশ্চিম বাংলা সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথমেই কলকাতা কর্পোরেশন বাতিল করেছেন। স্বীকার করতেই হবে কর্পোরেশন বাতিল করার ব্যবস্থা এক শ্রেণীর নাগরিক পছন্দ না করলেও সাধারণ মানুষ এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন। মহানগরীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের যে দায়িত্ব ছিল তা পালিত হয়নি। এমন কি সি-এম-ডি-এ'র কাছ থেকে পাওয়া টাকার সদ্ব্যবহারও কর্পোরেশন করতে পারেনি। মহানগরীর ফুটপাতগুলি এখন নাগরিকদের ব্যবহারের যোগ্য হয়েছে; অবশ্য ফুটপাতের হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা দরকার এবং রাজ্য সরকারও সে বিষয় কিছু করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কর্পোরেশন আয়-ব্যয় অবস্থায় বিরাট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও খারিজ করা পূর্বতন কর্পোরেশনের বাজেটে হিসাবের জোড়াতালি দিয়ে উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছিল; বহু পরিমাণ করের টাকা এখনও অনাদায়ী আছে। জন-গণের নির্বাচিত পৌরসভা কিন্তু জনগণের সেবায় ও স্বার্থে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারেননি। দেখা যাক, এবার সরকার কী করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় কলকাতা মহানগরীকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করতে চান। ইডেন উদ্যানে রঞ্জি স্টেডিয়াম ও রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম ছাড়াও কলকাতা মহানগরীতে আরও দুইটি বড় স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। সরকার যদি জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেন, তবে সবাই সরকারকে সাধুবাদ জানাবেন। তবে বহুকাল ধরে কলকাতার অধিবাসিগণ আশার বাণী শুনে অভ্যস্ত; এবার সবাই কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা দেখতে চান। এ প্রসঙ্গে দমদম বিমান-বন্দরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পালাম ও সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরের তুলনায় দমদম বিমানবন্দরের গুরুত্ব ক্রমেই কমে যাচ্ছে; এককালে অবিভক্ত ভারতে দমদম ছিল এ দেশের শ্রেষ্ঠ বিমানবন্দর। কেন্দ্রীয় পর্যটন বিভাগ আশ্বাস দিয়েছিলেন, দমদম বিমানবন্দর যাতে আবার একটি প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পরিণত হয় তার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু লক্ষ্য করার মত, কলকাতা হয়ে কোন জাম্বো জেট বিমান ঢাকায় যাচ্ছে না, এমন কি এয়ার ইন্ডিয়ার জাম্বো জেট বিমান দিল্লী ও বোম্বাই হয়ে ঢাকায় যায়, কলকাতা হয়ে যায় না। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের কি কিছুই করণীয় নেই?

কলকাতা মহানগরীর গৃহনির্মাণ সমস্যা, কলকাতা বন্দরের উন্নয়ন সমস্যা, শিশুদের খেলাধুলার ব্যবস্থার প্রাচুর্য, সর্বসাধারণের জন্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সাঁতার-পুলের অভাব, কোন সমস্যাই উপেক্ষণীয় নয়। সাধারণ মানুষ এগুলির জন্য রাজ্য-সরকারের মুখাপেক্ষী।

সুব্রত গুপ্ত

রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও জাতীয় স্বার্থে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে যেতে পারে—বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন তা প্রমাণ করেছেন। সেদিন রমনার মাঠে কয়েক হাজার ছাত্রের এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান দেখলাম। রাজনৈতিক দিক থেকে ছাত্র ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মতাদর্শে বিশ্বাসী নন। বরং ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ, যার অধুনা নামকরণ হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, তাঁদের সঙ্গেই ছাত্র ইউনিয়নের মতের ও পথের মিল। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্য তাঁরা আহ্বান জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শুধু তাই নয়, সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের নেতারা। শুধু তাই নয়, এই সম্মেলনে ছাত্র লীগ বাংলাদেশের চারটি রাজনৈতিক দলের চারজন নেতাকে জাতীয় নেতার মর্যাদা দিয়ে তাঁদের বিরাট বিরাট ছবি মণ্ডপে বসিয়েছিলেন। এঁরা হলেন, শেখ মুজিবুর রহমান, মৌলানা ভাসানী, শ্রীমণি সিং আর অধ্যাপক মুজফর আহমেদ।

ঢাকার যে কোন অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হল পোস্টার আর তোরণ। শিল্প এখানে গণমুখী। তাই প্রতিটি গণ-অনুষ্ঠানেই চোখে পড়ে শিল্পসম্মত তোরণ, সুন্দর পোস্টারিং, বিরাট বিরাট পেন্টিং। রমনার মাঠে ছাত্র ইউনিয়ন তোরণ করেছিলেন শুধু চট দিয়ে। তাদের মঞ্চও ছিল চটের, কিন্তু তা ছিল শিল্পসুষমামণ্ডিত।

অনুষ্ঠানের প্রথমে বঙ্গবন্ধু শ্বেত কপোত উড়িয়ে দিলেন। উড়নো হল রাশি রাশি বেলুন। একসঙ্গে ২১টি নীল পতাকা তোলা হল। পতাকার মাঝে চারটি তারকা। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক।

আওয়ামী লীগও তাঁদের পতাকায় এই চারটি তারকাচিহ্ন গ্রহণ করেছেন। ছাত্ররা এই সমাবেশে শ্লোগান দিলেন, 'জীবন মরণ পণ করি। এসো আমরা দেশ গড়ি।'

'এসো দেশ গড়ি'—এই পোস্টার এখন বাংলাদেশের সর্বত্র দেখা যায়। বঙ্গবন্ধু একদিন দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এখন তিনি প্রতিটি সভাতেই বলছেন, এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম। এই নতুন শ্লোগান ছাত্র সমাজ গ্রহণ করেছেন। 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়' বলে অন্ধ আক্রোশে সব কিছু ভাঙতে চাইছেন না, এটাই আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে। কারণ স্বাধীনতার পর আমাদের ঐতিহ্য অন্য রকমের। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই যে রাজনৈতিক সহনশীলতা গড়ে উঠছে এটি যদি বজায় থাকে তা হলে জাতি গঠনের পক্ষে তা হবে পরম শুভকর। যেমন আওয়ামী লীগের কাউনসিল অধিবেশনে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ন্যাপের মজঃফর আহমেদ, কম্যুনিস্ট পার্টির মণি সিং, কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর।

*

গত সপ্তাহে তেজগাঁওর বিধানসভা ভবনে বাংলাদেশের গণপরিষদের উদ্বোধন হয়ে গেল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তার কারণ এই গণপরিষদের অধিবেশন ডাকা নিয়েই যত বিপত্তির সূত্রপাত এবং পরিশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধ। গত বছর ৩ মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন ইয়াহিয়া খান। কিন্তু ১ মার্চ তারিখে তিনি তা আবার প্রত্যাহার করে নেন। বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। পরিণামে তা পরিণত হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। ৩ মার্চ যদি গণপরিষদের অধিবেশন বসত তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস নতুনভাবে লেখা হত।

তেজগাঁওর এই পরিষদ ভবনটি বড় ছোট। অনেকটা একটি বড় বাংলোর মত। তবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চেয়ে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা বেশ ভাল। যেমন পরিষদের মধ্যে একটি ব্যাঙ্ক রয়েছে। আছে পোস্ট অফিস এবং টেলিগ্রাফ অফিস। নামাজঘর এবং সংবাদ সংস্থারা যাতে পরিষদ ভবনে বসেই খবর পাঠাতে পারে সে-ব্যবস্থা। অবশ্য সে তুলনায় সাংবাদিক গ্যালারি খুবই ছোট।

বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'—জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অধিবেশনের মধ্যে স্পীকার নির্বাচন পর্বটি দেখান হল টেলিভিশনে। রেডিওতেও রিলে করা হল।

বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে একটি পোশাক এখন চালু হয়ে গেছে। সেটি হল পাজামা, পানজাবি ও মুজিব কোট। ১৯৪৭-এর পর ধুতি পরা এখানে উঠে গিয়েছে। শুধুমাত্র হিন্দুদের কেউ কেউ এখনও ধুতি পরেন।

সেদিন এখানে কথা হচ্ছিল স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁরা বলছিলেন, আমাদের বাবারাও ধুতি পরতেন। আমাদের আমলেই ধুতির চল উঠে গেছে। বাংলাদেশের হিন্দুরাও অনেকে পায়জামা পাঞ্জাবি পরেন। ঢাকার রাস্তায় এখন যে মাঝে মাঝে দু-একজন ধুতিপরা লোক দেখা যায় তাঁদের অধিকাংশই ভারতীয়।

তবে মেয়েদের মধ্যে শালোয়ার-পাঞ্জাবির চলন একদম উঠে গেছে। ধলেশ্বরী নদীতীরে পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর কোন তরুণীকে যদি দেখেন তা হলে তাকে শাশ্বতকালের বাঙালী তরুণী বলেই মনে হবে। এখানে প্রতিটি উৎসব, ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে।

অনুষ্ঠানে লালপাড় শাড়ি আর লাল সিঁদুরের টিপ পরা মেয়েদের এখন দেখতে পাচ্ছি। অথচ পাকিস্তানী আমলে মুসলমান মেয়েরা যদি লালপাড় শাড়ি পরতেন, কপালে সিঁদুরের টিপ দিতেন তা হলে রক্ষণশীলদের মধ্যে তা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেত। যুগযুগান্ত ধরে গ্রহণ বর্জনের ভেতর দিয়ে সকলের অগোচরে এক চিরন্তন বাঙ্গালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তা কিন্তু নিছক হিন্দু সংস্কৃতি বা নিছক মুসলমান সংস্কৃতি নয়। যেহেতু এই সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই একদিন হিন্দু লোকাচার গড়ে উঠেছিল সেহেতু পাকিস্তানী আমলে এই সংস্কৃতিকে হিন্দুয়ানী বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে প্রগতিশীল আন্দোলন বরাবর এই অচলায়তনকে ভাঙবার জন্য সংগ্রাম করেছে। সেদিন দেখলাম এখানকার এক বিখ্যাত কাগজে মুসলমানদের আরবী ফার্সি নামের বদলে বাঙ্গালা নাম রাখবার জন্য একজন লেখক এক জোরালো প্রবন্ধ লিখেছেন।

বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য এ পর্যন্ত যতটুকু উদ্যম হয়েছে আমার মতে চার মাসের একটি রাষ্ট্রের পক্ষে তা কম নয়। আইনসভায় গিয়ে দেখলাম সমস্ত কাজকর্ম চলছে বাংলায়। আমাদের বিধানসভায় যেমন লেখা আছে 'আইজ আর নোজ', এখানকার পরিষদে সে জায়গায় লেখা 'সপক্ষে' আর 'বিপক্ষে'। পরিষদের কার্যবিবরণী লেখা বাংলাতেই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এখনও ধ্বনি-ভোট গ্রহণ করার সময় স্পীকার সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেন ইয়েস অর নো? সেখানে বাংলাদেশ গণপরিষদে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হ্যাঁ কিংবা না?' সেদিন বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও দেখলাম শপথবাক্য পাঠ করা হচ্ছে বাংলায়।

সরকারী কাজকর্ম বাংলাতে পরিচালিত হওয়ার ফলে বিদেশী দূতাবাসগুলি ঢাকায় অন্তত একজন দুজন করে বাংলা জানা লোক পাঠাবার চেষ্টা করছেন। সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা ও পূর্ব জার্মানী বাংলা-নবীশ ব্যক্তিদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম আরও কয়টি দূতাবাস বাংলা জানা অফিসারের সন্ধান করছেন।

বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে কোন ইংরাজি মিডিয়াম স্কুল রাখবেন না ঠিক করেছেন। মিশনারি স্কুলসহ সমস্ত ইংরাজীর মাধ্যম স্কুলগুলিকে বাংলা মাধ্যম করা হচ্ছে। অবশ্যপাঠ্য সূচী থেকে ইংরাজী কোন স্তরেই তুলে দেওয়া হচ্ছে না। পাবলিক স্কুল প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত স্কুলের বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যানডার্ড আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নানাভাবে কলুষিত করছে বাংলাদেশে তা অনুপস্থিত হবে। এখানে বড়লোকের ছেলেরা বেশী মাইনে দিয়ে ভাল স্কুলে পড়বে, আর গরীবের জন্যে নিম্নমানের সাধারণ স্কুলগুলো পড়ে থাকবে এই বৈষম্য থেকে বাংলাদেশ মুক্তি পেতে চাইছে। সাধারণ মানুষ এতে খুশী হলেও এখানকার উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাঁরা ইংরাজী কেতায় অভ্যস্ত, তাঁরা সরকারী ব্যবস্থার ফলে বেশ মুশকিলে পড়েছেন। এঁরা ইতিমধ্যেই ছেলেমেয়েদের বিলেতে আমেরিকায় পাঠাবার চেষ্টা করছেন। অনেকে পাঠিয়েছেনও। নিদেনপক্ষে পাঠাচ্ছেন দার্জিলিং-এ অথবা কোন ভারতীয় কনভেনটে।

তবে এই ব্যবস্থার ফলে বিদেশী দূতাবাসের কর্মীরা বেশ অসুবিধায় পড়েছেন। বিশেষ করে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরা। তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তাঁদের ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই ইংরাজীর মাধ্যমে পড়ে। হঠাৎ বাংলা মাধ্যমে পড়লে এঁদের অসুবিধা হবে। ভারতীয় দূতাবাসের অধ্যক্ষ শ্রী জে এন দীক্ষিত সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়েছেন, অন্তত একটি স্কুল রাখা হবে যেখানে সিনিয়র কেমব্রিজই হবে স্ট্যানডার্ড। হোলি ফ্যামিলি স্কুলটি মনোনীত হয়েছে এই ব্যাপারে।

বাংলার মাধ্যমে সমস্ত সরকারী কাজ চালাতে গেলে অনুবাদ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। করা হচ্ছেও। গণপরিষদে বিদেশীদের জন্য কানে ইয়ারোফোন লাগিয়ে ইংরাজী অনুবাদ শোনার ব্যবস্থা আছে।

সেদিন দেখলাম, মৌলানা ভাসানি বাংলায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করলেন, ইংরাজী অনুবাদের ব্যবস্থা করা হল সঙ্গে সঙ্গে। ভাসানি ইংরাজী জানেন, কিন্তু বলেন না। কাদের সিদ্দিকিও দেখলাম ইংরাজী বলেন না। কিছুদিন আগে এক জাপানী সাংবাদিককে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জাপানী ইংরাজীতে বললেন। কাদের জবাব দিলেন বাংলাতে। আমাকেই দোভাষীর কাজ করতে হল।

বাইতুল মকারমের একটি দোকানে যেখানে পাথরের বুকে নামের ফলক লেখা হয় সেখানে এখন ছেনি কাটার বিরাম নেই। রাত-দিন তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন ফলক। সবই মৃতের সমাধির ওপর বসানোর জন্য। বাস্তবিকই বাঙ্গালীর ইতিহাসে এত সমাধি ফলকের আর কখনও প্রয়োজন হয়নি আগে। শত শত স্বাধীনতা যোদ্ধা বাংলার শ্যামল মাটিতে আজ ঘুমিয়ে আছেন। কেউ তাঁদের নাম জানে না। শুধু মাঝে মাঝে এক-একটি কবরে কারা যেন এসে বসিয়ে যায় স্মৃতির ফলক।

যেমন একটি ফলকে লেখা :

এখানে ঘুমিয়ে মাতা-সন্তান
জাগিয়ে দিও না
সমাধির পর
অশ্রু রেখে
ভুল তুমি কোর না।
এ মৃত্যু স্বাধীনতা, তুমি
চির অনির্বাণ
এ আত্মা চির শাশ্বত
সদা জাগ্রত প্রাণ।

আর একটি ফলকে লেখা হচ্ছে—

বন্ধু ক্ষণেক থামো এর পাশে
তারপরে নিও পথ
এ মাটির প্রেমে দিয়েছে যে প্রাণ
থেমেছে জীবনের রথ
—স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর
সৈনিক মুহম্মদ কাসেম।

আর একটি ফলকে উৎকীর্ণ সন্তানের বেদনা সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা—

তোমার মত লক্ষ বাবা
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
সোনার বাংলা স্বাধীন করে
রইল চির অমর হয়ে।

এমনি লেখা হচ্ছে অনেক অনেক স্মৃতি-ফলক। অশ্রু দিয়ে লেখা অনেক ভালবাসা প্রীতি উপহার। এই সব অসংখ্য মহান মৃত্যুর কফিনের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আজ একটি রাষ্ট্র, নাম যার বাংলাদেশ।

'কেরোসিন তেলের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য আমরা অতিথিদের আর পাঁওরুটি দিতে পারছি না।'—ঢাকা শহরে একটি অভিজাত হোটেলের নোটিশ বোর্ডে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। শহরে কেরোসিন নেই। দু-এক জায়গায় নাকি কেরোসিন দশ টাকা গ্যালন দরে বিক্রী হচ্ছে। পাঁওরুটির বদলে নান কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয়তাই আবিষ্কারের জননী।

১০।৪।৭২

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পান কি পর্ণ?

বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও মারাঠী ভাষায় পান শব্দ ব্যবহার হয়। অমরকোষে কিন্তু পানলতার নাম তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী অথবা নাগবল্লী। কাজেই মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় পর্ণ অথবা পাতা এই অর্থে চলতি ভাষায় তাম্বুল পান নামে অভিহিত হয়েছে। আরবি ও ফারসীতেও পানের পরিচয় "তাম্বুল"। সম্ভবত ভারতবর্ষ থেকেই পানের পরিচয় তাঁরা পেয়েছিলেন। তাই অমরকোষের তাম্বুল অপভ্রংশে "তাম্বল" হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ দেশে, সিংহলে, মালয়ে পানের নাম বেত্তিলাই। একদিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আর অন্যদিকে যবদ্বীপ, বালি ইত্যাদি, মধ্যস্থ সমগ্র ভূভাগ পানরসের রসিক। কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেত্তিলাই থেকেই ইংরাজী বিট্‌ল শব্দের উৎপত্তি।

খৃষ্টপূর্ব দুই শতাব্দীতে সুশ্রুত তাম্বুলপর্ণের গুণ বর্ণনা করেছেন। তারও আগের গৃহ্য সূত্রে তাম্বুলবল্লরী সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। তারপরে দেখা যায় কালিদাসের কাল। সেখানে তাম্বুল চর্বণে আরক্ত অধরোষ্ঠ বা দশনের বর্ণনা মেলে। নারী সমাজের খুব সম্ভব এই প্রথম লিপস্টিক। রঘুবংশেই দেখুন "তাম্বুলারক্ত দশনমসকৃদ্দর্শয়ন্তীহ চেটী।" অর্থাৎ চেটী তাম্বুলরক্ত দন্ত বার বার দেখাইতেছে। পান বা পর্ণ যে আরক্ত অধরেই শেষ তাও নয়। বহু গুণে সম্পন্ন এই পর্ণ।

তাম্বুলপত্রং তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপিত্ত প্রকোপনং।
সুগন্ধি বিশদং তিক্তং স্বর্যং বাত

কফাপহং॥

শ্রমণং কটুকং পাকে কষায়বহ্নিদীপনং।
বক্ত্রকণ্ডু মল ক্লেদ দৌর্গন্ধ্যাদি

বিশোধনং॥

—সুশ্রুত

তাম্বুলপত্র তীক্ষ্ণোষ্ণ, কটু ও পিত্ত প্রকোপকর, সুগন্ধি তিক্ত ও স্বরের হিতকর, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, শিথিলকর, কটুপাক, কষায়, অগ্নিকর, বক্ত্রকণ্ডু অর্থাৎ মুখের ঘা মলের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ শোধন করে। আয়ুর্বেদে পান একটি মূল্যবান অনুপান। পানের এত গুণ তবু নানা গন্ধদ্রব্য ইত্যাদিযুক্ত পান এক সময় মাদকদ্রব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত হয়েছিল। তাই যতি ও বিধবাদের জন্য পানের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে উঠলো।

তাম্বুলং বিধবা স্ত্রীণাং যতিনাং

ব্রহ্মচারিণাং।

তপস্বিনাঞ্চ বিপেন্দ্র গোমাংস সদৃশং ধ্রুবং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে পান কালচার বা তাম্বুল সংস্কৃতি এতই জনপ্রিয় হয়ে

উঠেছিল, এতই নানা উপাদান সংযোগে মদির বিলাসিতার মত মানুষকে টেনে নিয়ে চলছিল যে তাম্বুল ব্যবহারও নিষেধের ডোর এড়াতে পারেনি।

এলফিনস্টোন ভারতের ইতিহাসে লিখেছেন, কনৌজ বা একালের কান্যকুব্জ সমৃদ্ধ শহর ছিল। মহম্মদ ঘোরী কান্যকুব্জ বা কনৌজের জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজের সংঘর্ষের সুযোগে ভারত জয়ের ভূমিকায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই কনৌজও গৌরবময় অধ্যায় হারিয়ে ফেললো আত্মীয় বিরোধের বিষময় পরিণামে। পাঠান মুসলমান এক রসিক লেখক কিন্তু বর্ণনা দিয়েছেন মোহের মহানগর কনৌজের। সেই মায়ার বিশেষত্ব ছিল পণ্যবীথি। পানের দোকানে ওরা পণ্যবীথি। সেদিনের কনৌজিয়া প্রাণরসে ঢেলে দিতেন সুগন্ধ তাম্বুল বিহার। সেই পানের বৈশিষ্ট্য পরে গিয়ে পৌঁছেছিল সকল তীর্থের সার বারাণসীতে। আজও পান কনিসার বা রসবিচারকের রাজধানী বারাণসী—আধ্যাত্মিকতা মিলেছে লৌকিক বিলাসের সঙ্গে, যেন বরুণা বয়ে চলেছে গঙ্গায়। বারাঙ্গনা আর সভাসুন্দরীর আসরে মধুর মদির পান আর সুরা একদিকে, অপরদিকে হরিকথার জমায়েৎ জনসমাগম। আমার নিজেরই এক অভিজ্ঞতা আজও ভুলতে পারিনি। মগাই পান কি করে হয় জানবার ছিল পরম কৌতূহল। কলকাতায় বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মগাই শব্দটি এসেছে মগধ থেকে। বেনারসী পান আসে মগধ অথবা পাটনা, গয়া অঞ্চল থেকে। নানা প্রক্রিয়ায় সুচতুর ব্যবসায়ী তাকে কোমল নরম মুখরোচক করে তোলে। সেই প্রক্রিয়া কি জানবার উদ্দেশ্যে অনেক ঘোরাফেরা করেছি, অনেক মনমাতানো খিলিও খেয়েছি। প্রসিদ্ধ এক পানের দোকানে শুনলাম দশ টাকা খিলি বেনারসী পান। বন্ধুকে বললাম নিয়ে চলো। দেখি দশ টাকায় কোন্ বিভ্রান্তি রচনা করে। দশ টাকার খিলি-

তাম্বুলবল্লী

খানা মুখে মিনিটে মিলিয়ে গেল। দোকানী আমার মুখ চেয়ে দেখলো, ঝট করে দশ টাকার নোটখানা তুলে আমার হাতে দিয়ে নিজের কাজে মনোযোগ দিল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'পানের দাম ফিরিয়ে দিলে কেন?' মুখ না তুলেই গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, 'যে আমার পান মুহূর্তে গিলে ফেলে তাকে আমি পান বেচি না।' হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে এলাম।

আম্ররসিকের মত পানরসিকেরও কিন্তু পছন্দ অপছন্দ বিশেষভাবে আঞ্চলিক। বেনারসী ল্যাংড়া যেমন বোম্বাইবাসী অনাদরে ফেলে অ্যালফনজো আমের দিকে হাত বাড়াবেন, ঠিক তেমনই বেনারসী পানের মোহ আসামবাসীকে মুগ্ধ করবে না। সুপারি তাঁরা কাঁচা খান। বলেন, কোয়াই। কাঁচা সুপারি পেটে উঠলে সে আরও মোহ রচনা করে। মদিরার মতই তার মায়া। আপনি আমি খেলে মাথা ঘুরে যাবে। কিন্তু অসমিয়া রসিক বলবে, এ তো দেবভোগ্য! বাঙ্গালী ঘরে পানের অন্য রূপ। অভিজাত অন্দরে শত দাসদাসী সত্ত্বেও মানিনী রূপসী তার পরম কোমল আঙ্গুলে দিয়ে পান সেজে পরিবেশন করতেন প্রিয়জনকে। নববধূ সলজ্জ মৃদু গতিতে বাসর শয়নে যখন যেতেন হাতে থাকতো পানের ডিবে। প্রথম প্রত্যয়ের সেতু হতো পান। পানই বেঁধে দিত দুটি প্রাণকে এক মিলনের ডোরে। আজও হয়তো এমন বাসর রচনা হয় কিন্তু সেখানেও পরিবর্তন স্পর্শ করে থাকবে। অমন সলজ্জ বধূই বা মিলবে কোথায়? গরীব গৃহস্থ ঘরেও পান ছিল অতিথি আপ্যায়নের প্রথম পর্ব। যার ঘরে কিছু নেই, সেও এগিয়ে দিত একটি খিলি। নাইবা হলো সুগন্ধ মশলায় মৌ মৌ পরিবেশন। মোটা পান, মোটা ও বাকের টুকরো হাতে তুলে নিয়ে যে human relation বা মানুষের মন জয় করা যেতো তা আজকের কেতাবী বিজ্ঞাপনবিদরাও বুঝবেন না। চা ছিল না, কফি ছিল না এমন কি তাম্রকূটের জন্মকথা জানবার আগে ছিল পান। ধনীর প্রাসাদেও পান, পর্ণ-কুটিরেও পান।

আমাদের দেশের কৃষ্টি পুনরুদ্ধারের কত চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু পানকৃষ্টিকে কদর করার কথা সবার আগে। নেপালে যান, পাকিস্তানে যান, বাংলাদেশে যান পানের প্রভাব কোথায় নেই? মুসলিম ধনী সমাজেও পান এক বিচিত্র সমাদরের জিনিস। সেজনাই বাংলাদেশের সঙ্গে সংঘর্ষে পাকিস্তান হেদিয়ে উঠেছিল পানের অভাবে। জান যায় তাও স্বীকার, কিন্তু বাংলাদেশের ছাঁচি পান, মিঠে পান, বাংলা পান যে প্রাণের বার্তা। সাধারণ খিলিখানা পাঁচ টাকায় চড়েছিল। হোটেলে বা রেস্তোরায়, রাজকীয় ভোজে বিদেশী বড়লোকের জন্য সাজানো আসরে তবক দিয়ে ঢাকা খিলি আনতে পারে ভারতীয়-তার পরিবেশ। পান বেশী খেলে দাঁতের ক্ষতি অথবা নানা রোগের আশঙ্কা হতে পারে। কিন্তু পানের রসে সিক্ত স্নিগ্ধতাকে বাদ দিয়ে যাবার কোন কারণ তো দেখি না। মাত্রা রক্ষা করে পানখিলি খাওয়া অন্য গুণাগুণ আলোচনা করার আগে ভাবুন কতটা ভিটামিন ও ক্যালসিয়ম আপনি গ্রহণ করলেন। যে ভয়ঙ্কর স্কার্ভি-রোগে ঘাস খেয়ে উপশম হওয়াতে ভিটামিনের আবিষ্কার, সেই স্কার্ভি দুখিলি পান দৈনিক খেলে আপনার ধারে কাছেও আসবে না। আমি তো মনে করি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সৃষ্টি 'কারি' এখন ভোজনরসিকের কাছে ভারতীয়তা। কিন্তু খাঁটি ভারতীয়তা আছে পানে। সেখানে বিদেশীর স্পর্শটুকুও নেই।

শ্রীমতী

রবীন্দ্র পুরস্কার

এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং ইন্দ্রমিত্র। ইন্দ্রমিত্রের বইয়ের নাম 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের নাম 'এবার প্রিয়ংবদা'। অন্য বাবার বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কোনো উল্লেখযোগ্য বই পাওয়া যায়নি বলে এ বছর দুটি পুরস্কারই বাংলা বইকে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি পুরস্কারের অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা। এবারের পুরস্কার সকলের কাছেই সুসংবাদ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বাঙালী পাঠককে মাতিয়ে রেখেছেন। বহুকাল তিনি বিহারে প্রবাসী, অথচ বাঙালী ঘরোয়া জীবনের খুঁটিনাটি থেকেও মজা বার করতে পারেন। ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জার কিংবা রকে-বসা যুবকরাও তাঁর রচনায় জীবন্ত—অথচ তাঁর লেখার মধ্যে কোথাও কালিমা নেই—কুৎসিত বিষয়কে কখনো ওপরে তুলে আনেন নি, তাঁর হাস্যরস অত্যন্ত নির্মল—এমন কি ব্যঙ্গ বিদ্রূপও তিনি পরিহার করেন। বরযাত্রীর কাহিনী এবং গণশা ও তার দলবলকে চেনেন না—বাংলা সাহিত্যের এমন পাঠক নেই।

এই বাছা। হাস্যরসের অপূর্ব রচনাগুলি খুবই উপভোগ্য হলেও—এর ফলে বিভূতিভূষণের অনেক সার্থক রচনা একটু চাপা পড়ে গেছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির লেখক এবং পরিশুদ্ধ রোমান্টিকতা তাঁর চরিত্রলক্ষণ। অধুনাবিস্মৃত 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাস রবীন্দ্র পরবর্তীকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক উপন্যাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মিশনারীদের সংগ্রামের জীবন নিয়ে লেখা "কাঞ্চনমূল্য" চিরকালীন সাহিত্যের অন্তর্গত।

স্বর্গে প্রথম ভাগ ও স্বর্গে দ্বিতীয় ভাগের মতন বই যাঁরা পড়েন নি—তাঁরা করুণার যোগ্য। এমন মন ভরে ওঠার মতন বই কদাচিৎ লেখা হয়।

ভ্রমণ কাহিনী রচনায় সম্পূর্ণ নতুন রস উপহার দিয়েছেন তিনি। এই ব্যাপারে তিনি একক, আর কারুর সঙ্গে তুলনা চলে না। 'দুয়ার হইতে অদূরে' এবং 'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি' পড়লে বোঝা যায়, ভারতের ওপর কতখানি গভীর মমতা থাকলে একজন লেখক এমন অকিঞ্চিৎকর বিষয়কেও রসোত্তীর্ণ করতে পারেন। [illegible] রেল লাইন এখন আর নেই, কিন্তু ঐ লাইনকে অমর করে গেলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর [illegible] অন্তরে [illegible]।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত বর্তমান বাঙালী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। এতকাল যে তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়নি সেটা পুরস্কার-কর্তৃপক্ষেরই গ্লানির বিষয়।

স্বার্থ ও সংসার চিন্তা ভুলে গবেষণার নেশায় মগ্ন যে সব মানুষের কথা আমরা গল্পে বা প্রাচীন জীবনকাহিনীতে পড়ি ইন্দ্রমিত্র সেইরকমই একজন বাস্তব মানুষ। এই বিরল কেশ, অতি দীর্ঘ, সুরসিক মানুষটি তাঁর আয়ুর বেশীর ভাগই খরচ করেছেন গ্রন্থাগারে হলদে হয়ে যাওয়া বই-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে।

ইন্দ্রমিত্রের দুটি সত্তা। অপর সত্তাটির নাম অরবিন্দ গুহ। এই অরবিন্দ গুহ কবি। এই অরবিন্দ গুহ বন্ধুমহলের সম্মিলনে প্রধান আকর্ষণ। কবিতায় অরবিন্দ গুহ রোমান্টিক ও লাজুক, প্রকাশ্য আসরে তুখোড় রসিকতার খনি। অরবিন্দ গুহর প্রথম কবিতার বই 'দক্ষিণ নায়ক'-এর কবিতাগুলি এক সময়ের তরুণদের মুখে মুখে ঘুরতো। দ্বিতীয় কবিতার বই "নীলিমার নীলিমায় অলংকৃত"—শান্ত ও স্নিগ্ধ রসে সমুজ্জ্বল। তাঁর কবিতা বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

কবিরা অলস ও পরিশ্রমবিমুখ—এমন যে একটা বদনাম আছে অরবিন্দ গুহ তা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এই মানুষটি সব সময় উৎসাহে ভরপুর এবং কাজের ব্যাপারে আশ্চর্য সুশৃঙ্খল। বিজ্ঞানের ছাত্র, পেশায় সরকারী কর্মচারী এই মানুষটির গবেষণা করা নেশা, কোনো প্রয়োজনের ব্যাপার নয়। প্রথম তিনি আকৃষ্ট হন উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে। তার ফল [illegible] বই। উৎসাহী পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, [illegible] আসন থেকে বিদ্যাসাগরের প্রতি [illegible] তিনি যে অলীক [illegible]

তিনি কি রকম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রমাণ করে দেখেছেন।

'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থটি রচনা করতে তাঁর সময় লেগেছে বারো-তেরো বছরের মতন। এর উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি দিল্লী থেকে কটক, কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, নিজ খরচে। সামান্যতম সূত্র পেলেও তিনি শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়েন নি। বিদ্যাসাগর বিষয়ে আরও অনেক বই আছে—কিন্তু ইন্দ্রমিত্রের দাবি ছিল যে, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যতরকম তথ্য ছাপার অক্ষর থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব, তার সবই তিনি এই গ্রন্থে দিতে চান—এবং কোনো তথ্যই সত্যাসত্য যাচাই না হয়ে ছাড়া পাবে না। এই কাজে ব্যাপৃত থেকে তিনি বিদ্যাসাগরের বহু অপ্রকাশিত চিঠিপত্রও জনসমক্ষে এনেছেন। সর্বোপরি, বিদ্যাসাগরের বিশাল ব্যক্তিত্ব তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এই গ্রন্থে। তথ্যসমৃদ্ধ অথচ গল্পের মতন সাবলীল ভাষা—এমন গবেষণা-পুস্তক সচরাচর প্রকাশিত হয় না। ইন্দ্রমিত্রকে পুরস্কার দেওয়ায় একটি স্বার্থহীন নিষ্ঠাকেই সম্মান জানানো হলো।

সনাতন পাঠক

এবারের আনন্দ পুরস্কার

এবার 'আনন্দ পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীঅম্লান দত্ত ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এদের মধ্যে প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন অম্লান দত্ত এবং সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

যুগান্তর ও অমৃতবাজারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার ও মতিলাল স্মৃতি পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে শ্রী[illegible]কুমার রায় ও শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

'মৌচাক'-এর পক্ষ থেকে শিশুসাহিত্যের জন্য সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীঅখিল নিয়োগী, কবিতার জন্য 'উল্টোরথ' পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমণীশ ঘটক এবং বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে দেওয়া '[illegible]' পুরস্কারের প্রাপক বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবি আল মাহমুদ।

পরে একটি সাহিত্য আসরে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুরস্কারগুলি এক সঙ্গে দেওয়া হবে।

কুমকুম ৩১
সাইজ ২-৭
১৫·৯৫
গরমে চলুন
হালকা পায়ে
বাটার চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া খেলতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ। সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি...আসুন না, একবার প'রে দেখুন।
Bata
সিতারা ৩০
সাইজ ২-৭
১০·৯৫

তিন মাস অন্তর পেঙ্গুইন-এর আধুনিক গল্প সংগ্রহ বেরোয়। এটি তাদের ছয় নম্বর বই। পুরনো প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সঙ্গে নতুনদের নতুন গল্পও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এর আগে আইজাক বাচেল, বর্নার্ড ম্যালামাড, জন আপডাইক, সীন ও ফাওলেন ইত্যাদি অনেকের গল্প বেরিয়ে গেছে।

এই সংকলনে রয়েছে এলিজাবেথ টেলর, জ্যান জেকবসন, ম্যাগী রস এবং রবার্ট নাঈ-এর মোট দশটি গল্প। এঁদের মধ্যে এলিজাবেথ টেলর বয়সে সবচেয়ে বড়। তাঁর প্রায় এক ডজন উপন্যাস এবং অসংখ্য ছোট, বড়, মাঝারি গল্প রয়েছে। অনেকদিন ধরেই তিনি লিখছেন, অবশ্য ভার্জিনিয়া উলফ বা মেরী ম্যাকার্থীর সঙ্গে তিনি কদাচ তুলনীয় নন। সেরকম বৈদগ্ধ দেখাবার ইচ্ছাও তাঁর নেই। তাই বলে ভিক্টোরীয় যুগের মতো কেবল স্নিগ্ধ হৃদয়ের মুগ্ধ গল্পও তিনি লেখেন না। তাঁর যথেষ্ট সংবেদ্যতা আছে এবং সেই সংবেদ্যতাকে মোটেই সেন্টিমেন্ট বলে ভুল করা যাবে না। দৃষ্টি তাঁর বেশ পরিচ্ছন্ন এবং সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ। এই সংকলনে শ্রীমতী টেলার-এর দুটি গল্প রয়েছে। মেজাজের দিক থেকে তা বেশ আধুনিক।

প্রথম গল্প "সিসটার্স"—দুই বোনের গল্প। একদিন সকালে মিসেস ম্যাসন-এর কাছে একটি লোক এলো মেরিয়ান-এর কথা জানতে। মিসেস ম্যাসন-এর বোন মেরিয়ান; যুদ্ধের আগেই মারা গেছে। সে লিখত, তার বই আছে। এই লোকটি মেরিয়ান এবং তার সাহিত্যকর্ম নিয়ে একটি বই লিখতে চায়। মিসেস ম্যাসন এ-খবরে ভীষণ ধাক্কা খেলেন! তাঁর নিয়মিত জীবন; তাঁকে দেখে লোকে ঘড়ি মেলায়; তাঁর স্বামী এক সময় মেয়র ছিলেন। সমাজ তাঁকে শ্রদ্ধা করে। অথচ মেরিয়ান যা লিখেছে সব মিথ্যা। তাদের ছেলেবেলা, তাদের পরিবার সম্বন্ধে সে অশালীন বানানো গল্প ফেঁদেছে। সে নিজে সকলের মুখে কালি দিয়েছে এবং তার লেখাগুলোও প্রায় কলঙ্কের পর্যায়ে যায়। তার বাবা মেরিয়ান-এর বই পড়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই বোনের জন্যেই তার বাবা অকালে মারা যান, বলতে গেলে সে-ই তাঁকে মেরেছে। মিসেস ম্যাসন লোকটিকে একটি কথাও বলল না। বলল, মেরিয়ান ছিল আর-পাঁচটা মেয়ের মতো অত্যন্ত সাধারণ। বিশেষ কিছুই তার সম্বন্ধে বলবার নেই। লোকটি চলে গেল। মিসেস ম্যাসন-এর পৃথিবী পূর্বাপর অটল রইল। রইল কি? কেন কে জানে, তাঁর মনে হতে লাগল, ইতিমধ্যে সমাজে তাঁর সঙ্গে মেরিয়ান-এর নাম জড়িয়ে গভীর ফিসফাস শুরু হয়েছে। মিসেস ম্যাসন সেই সম্ভাবনায় শিউরে উঠল বারবার।

"দি এনকাম্বরেন্স টু দি সোল" আরেকটু বড় গল্প এবং আরো সাংঘাতিক গল্প। জীয়েন্দা পলি-র চেয়ে পনেরো বছরের বড়। তার স্বামী হ্যামন্ড তার জন্যে কিছুই বন্দোবস্ত করে রেখে যেতে পারেনি। সুতরাং পলির মা অপারেশনে মারা যাবার আগে তাকে পলির ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন। জীয়েন্দা পলির অভিভাবক হয়ে রইল; খুবই কঠিন অভিভাবক। নিজের ইচ্ছে-

---

Penguin Modern stories 6. Edited by: Judith Burnby. Price: 25 P.

অনিচ্ছে সে প্রবল কর্তৃত্বে পলির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। গল্পটা আরম্ভ হচ্ছে মধ্য ফ্রান্স-এর এক জায়গায়। ওরা সেখানে বেড়াতে গেছে গাড়িতে। এক খুপসী এঁদোপড়া হোটেলে গিয়ে তারা উঠল। মা আর ছেলে জাঁ মিলে এই হোটেল চালায়। মা-ই সর্বেসর্বা। ছেলে একটু চোখের আড়াল হলেই মা 'জাঁ জাঁ' বলে চেঁচায়। তবু কি আশ্চর্য পলির সঙ্গে জাঁ-র একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠল। জাঁ টেবিলে খাবার দেয়, গাড়ি থেকে জিনিসপত্তর নামায়, ঘর পরিষ্কার করে— কথা প্রায় বলেই না। পলি ওর ভাষা বোঝে না। কিন্তু বার্ড-এর বনে, ঝাঁক ঝাঁক নীল প্রজাপতিদের রাজ্যে নদীর ধারে সেই জাঁ-ই মুখর হয়ে ওঠে। অথবা বলে সে মূকাভিনয় করে, সমস্ত শরীর দিয়ে সে কথা বলে। পলিকে সে হঠাৎ একদিন চুমু খেল। পলির কাছে এ সবই নতুন। একদম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এ জীয়েন্দার মুখে থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শোনা নয়। জীয়েন্দা কেবল-ই তাকে হ্যামন্ড-র গল্প বলে। কিন্তু জাঁর সঙ্গে এই মেলামেশিতে জীয়েন্দা ভীষণ আপত্তি করল। কিন্তু উপায় নেই। গাড়ি গেছে খারাপ হয়ে। গাড়ি না সারা পর্যন্ত

গ্রন্থপ্রচ্ছদ

হোটেলে আটকে থাকতেই হবে। একদিন ওরা গেল কাছাকাছি পাহাড়ে। পলিকে ডেভানকোর্ট এবং জীয়েন্দা উঠল পাহাড়ের মাথায়। পলি কিছুতে উঠতে চাইল না। ওরা ওপর থেকে দেখল পলি যেন শিশুর মতো এ-ফুল থেকে ও-ফুলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। তখনি ঘটল দুর্ঘটনাটা। পাহাড়ের কিনারে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে পলি এক গুচ্ছ ফুল আর চকোলেটের একটা বাংলা নিতে গিয়েছিল। মনস্তত্ত্ব এবং মননশীলতা এই গল্পে পাশাপাশি কাজ করেছে। লেখিকার ভাষা, বর্ণনা, 'মিলয়ঁ' খুব সুন্দর।

কিন্তু জ্যান জেকবসন-এর গল্প আরো জরুরী। তাঁর লেখা আগে তেমন পড়িনি। কিন্তু 'থ্রু দি ওইলডারনেস' একটানা না পড়ে উপায় নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ ইতিহাস, পুরাকল্প তাঁর খুবই জানা। শুধু জানাই নয়, লেখকের অভিজ্ঞতায় সঞ্চারিত এবং সাহিত্যে কার্যকরী, গল্পের আরম্ভে লেখক বলছেন, কতরকম ভেবেছিলাম, সারা য়ুরোপ চষে বেড়াব, দুনিয়া দেখব। কিন্তু কুড়ি বছর বয়সে আমাকে আটকে পড়তে হল লিখটেনস্টি-এ। সেখানে তাঁর কাজ কি? অসুস্থ বাবাকে রোজ হাসপাতালে দেখতে যাওয়া, হপ্তায় তিন দিন হিব্রু শেখা আর হপ্তায় একদিন খামারে যাওয়া। এই খামারের মালিক তাঁর বাবা। সেখানে গিয়ে ভেড়া গুনতে হয়। এই ভেড়া গোনার ব্যাপারটি ভারি মজার। পিয়েত নামে যে লোকটি ভেড়া চরায় তার এক অদ্ভুত রহস্যময় হিসেব আছে। এইখানেই লেখকের

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

বাংলা নামে দেশ। সম্পাদনা : অভীক সরকার। আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম দশ টাকা।

আমাদের অনেকের কাছেই যে ইতিহাস একটা দূরের বস্তু ছিল—ছিল বড় ধূসর, বড় নিরুত্তাপ, বড় নৈর্ব্যক্তিক—বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম তাকে আবেগ এবং উদ্দীপনা-মণ্ডিত অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। আমরা, ভারতীয়রা, যেন অকস্মাৎ একটা পরম আবিষ্কারের মুখোমুখি হতে পেরেছি। পেরে অনেক গ্লানির হাত থেকে অব্যাহতিও পেয়ে গেছি। র‍্যাডক্লিফের ছুরির রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আসছিল, দেশ বিভাগের ক্ষত নতুন করে আর ভিজে উঠছিল না। খণ্ডিত দেশের সীমান্তে একটা অপরিচয় অবিশ্বাসের যবনিকা ঘনীভূত রূপ নিচ্ছিল। ভাষা-আন্দোলন করে পূর্ববঙ্গ প্রথম জানিয়ে দিল, শুধু জিভ আলোড়িত হচ্ছে না, প্রাণও সজাগ। এপার বাংলার ঔৎসুক্য বাড়িয়ে তারপর ওপার বাংলায় একে একে নানা ঘটনার স্রোত বয়ে গেছে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান রণাঙ্গন যে শান্ত ছিল, বুদ্ধিমান ভারতীয় সেজন্য শাস্ত্রীজীর দূরদর্শিতার প্রশংসাই করেছেন। পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে মুজিবর রহমানের আবির্ভাবে আমরা উদ্দীপিত হয়েছি। কিন্তু ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্সের মাঠে বিরাট জনসভায় মুজিবের কণ্ঠে সমগ্র বাংলা দেশ গর্জন করে ওঠার আগে আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনি ইতিহাসের পট কী ভাবে, কত দ্রুত পরিবর্তিত হতে চলেছে। তারপরের আলাপ আলোচনা, ব্যর্থতা, ষড়যন্ত্র, ২৫ মার্চ সন্ধ্যা থেকে পাক জঙ্গীশাহীর প্রলয় নৃত্য, সব মিলিয়ে যে বিরাট কাণ্ডটা ঘটল আমরা আস্তে আস্তে তার সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। প্রথমে সীমান্তের এপার থেকে সহানুভূতিশীল দর্শকের ভূমিকা ছিল আমাদের। তারপর মুক্তিযুদ্ধের শরিক হয়ে গেলাম। বাঙালীর হৃদয়ে যেখানে ব্যথা, সেখানেই তাকে নিবিড় করে ধরলাম। জাতি হিসাবে বাংলাদেশ জন্ম নিল, শক্তি হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর ভারতবর্ষ এক লহমায় ফুলে উঠে এল।

ভয় ছিল এইসব সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর সময়ের ধুলোবালি উড়ে পড়বে। স্মৃতি ক্রমেই তরতাজা ভাবটি হারিয়ে ফেলবে। সংবাদপত্র তার কর্তব্য সম্পাদনার প্রতিদিনের পাতা রচনা করে গেছে। কিন্তু চোখের সামনে সব ব্যাপারটা ধরে রাখতে গেলে পূর্ণাঙ্গ দলিল চাই।

সেই চাহিদা মেটাতেই হাতের কাছে আনন্দ পাবলিশার্স ধরে দিচ্ছেন একটা অনবদ্য গ্রন্থ; যার পরিকল্পনা, অঙ্গসজ্জা, সম্পাদনা, রচনার কুশলতা সমস্তই চমকপ্রদ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত-কথা' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বইয়ের পরিপাটি নামটি নেওয়া। শ্রীমতী গান্ধী ও বঙ্গবন্ধুর মুখবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য নিঃসন্দেহ। তারপর সুখপাঠ্য গদ্য এবং দৃষ্টিনন্দন সংবাদচিত্রে ঠাসা এই বই, পাতার পর পাতা উল্টে যেতে হয় রুদ্ধশ্বাসে। প্রতিটি পাতই সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে সাজানো, প্রতি পৃষ্ঠাই আকর্ষণের খনি। আটটি পর্বে রচিত এই নবমহাভারত এক নতুন জাতির জন্মবিবরণ হতে হতে রমণীয় সংবাদ-সাহিত্য হয়ে গেছে। সপ্তম পর্বটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিবরণী, প্রাথমিক এবং দিনওয়ারী। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বইয়ের অনেকখানি জুড়ে। প্রথম পর্ব, পূর্ববঙ্গে গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠার, দুই পাকিস্তানে ব্যবধান ক্রমে দুস্তর হয়ে পড়ার পটভূমি। দ্বিতীয় পর্ব পঁচিশে মার্চের আগে-পরের ব্যর্থ আলোচনা। তৃতীয়, মধ্যরাতের ঘাতক, ওই ঐতিহাসিক রাত্রির নাটকীয় বর্ণনা। চতুর্থ, শরণার্থী, ছবিতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণ। পাঁচ, মুক্তিযোদ্ধা, অসংবদ্ধ অগোছালো দেশপ্রেমিক সৈনিকদের সংঘ-শক্তিরূপে গড়ে ওঠা। ছয়, বিশ্ববিবেক জাগ্রত করার জন্য ভারতের কূটনৈতিক প্রয়াস। সর্বশেষ পর্ব, সোনার বাংলার মুজিবের প্রত্যাবর্তন। মর্মস্পর্শী এক জীবননাট্যের লক্ষ লক্ষ কুশীলব ত্যাগে, সাহসে, মৃত্যুতে, সংগ্রামে বিজয়ীর মুকুট পরেছে। আবার ফিরিয়ে এনেছে ভবিষ্যতের প্রতি নিপীড়িত মানুষের আস্থা আর আশ্বাস।

অকুণ্ঠচিত্তে একথা বলতে পারি প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের হাতে হাতে ঘোরবার উপ-যোগী গ্রন্থ 'বাংলা নামে দেশ'। যিনি সংবাদের পোকা, এই বইটিতে তিনিও বহু তথ্য খুঁজে পাবেন যা তিনি জানতেন না। পরবর্তী, আশা করি অদূরবর্তী, সংস্করণে দুটি ত্রুটি সংশোধন করে নেবার আবেদন জানাচ্ছি। পৃঃ ১৫৯, চিত্রপরিচিতিটি ভুল, মুজিব কোলে টেনে নিচ্ছেন নাতিকে নয়, ছোট ছেলে রাসেলকে। পৃঃ ১৪৩, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর দেহ পাওয়া যায়নি।

গত মহাযুদ্ধের কিছু কিছু বই পড়ে আপসোস হয়েছে, আরব-ইজরাইল লড়াইয়ের উপর কথা-ছবি প্রকাশনী দেখে ঈর্ষান্বিত বোধ করেছি, কেন বাংলায় এমন বই বেরয় না। 'বাংলা নামে দেশ' এই সব আক্ষেপের অবসান ঘটাল। সম্পাদক অভীক সরকার এবং অঙ্গসজ্জাকর পূর্ণেন্দু পত্রী বাংলা প্রকাশনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

স্মৃতি-জাগানো বিস্মৃত নাম তারা ব্যানার্জী

সর্বক্রীড়াবিশারদ চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে যাঁদের কীর্তিচিহ্ন এবং অবদান অনস্বীকার্য তারা ব্যানার্জী তাঁদের মধ্যে এক স্মরণীয় নাম। স্মৃতি-জাগানো বিস্মৃত নামও বটে।

কেন বিস্মৃত? যিনি প্রথম ডিভিশন ফুটবল ক্লাবে—মোহনবাগান, এরিয়ান ক্লাবে ফুটবল খেলেছেন দীপ্ত মহিমায়, হকি খেলেছেন, ক্রিকেট খেলেছেন, খেলেছেন টেনিস, টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন। যাঁর অধিনায়কত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে, যিনি ব্যাডমিন্টনে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। যাঁর মত স্টাইলিস ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় আজও বাংলায় জন্মগ্রহণ করেনি, অনেকের মন থেকে তাঁর স্মৃতি অনেকটা মুছে যাবার কারণ কি? না, চোখ ধাঁধানো ক্রীড়া আসরের জনারণ্যে তাঁর অনুপস্থিতি।

কি খেলোয়াড় জীবনে, কি পরবর্তী জীবনে, তারা ব্যানার্জী চিরদিন লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকতে চেয়েছেন। হাততালির মোহে কোনদিন মাতাল হন নি।

"খেলা আরম্ভের চার-পাঁচ মিনিট আগে তাঁবুতে গিয়ে পোশাক পরেই মাঠে নেমেছি। আবার খেলার পর প্যান্ট ইউনিফর্ম ছেড়েই বাড়ি ফিরেছি। আমরা তো বাড়ির ঢিলেঢালা শাসনের মধ্যে বেড়ে উঠতে পারি নি। শাসনের বন্ধন ছিল খুবই শক্ত। তাছাড়া খেলাটা ছিল আমার কাছে আনন্দের উপকরণ। ট্রফি জেতা বা প্রতিনিধিমূলক দলে স্থান পাবার প্রশ্নকে কোনদিন বড় করে দেখিনি।"

তারা ব্যানার্জীর এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় খেলাধুলোকে খেয়াল হিসাবেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তার জন্য সাধনা করেন নি। আবার খেলার মাঠে তাঁকে কেউ হেনস্থা করুক সেটাও বরদাস্ত করেন নি। এখানেই তারা ব্যানার্জীর সঙ্গে আর পাঁচজন খেলোয়াড়ের পার্থক্য। প্রকৃত অর্থেই একজন স্পোর্টসম্যান। গৌরবোজ্জ্বল ক্রীড়াজীবনের কোন কীর্তির চিহ্ন ওঁর কাছে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাগজের কোন কাটিং রাখেন নি। ক্রীড়াঙ্গন থেকে আহরিত রাশি রাশি কাপ মেডেলের মধ্যে কোথায় কোনটা গেছে তার হদিস নেই। এমন কি কোন্ বছরে কোন্ প্রতিযোগিতা জয় করেছেন তার স্মৃতিও ঝাপসা। অথচ প্রতিভার মহাদানে মূর্ত এই চৌকস খেলোয়াড়টি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে ছিলেন ক্রীড়ামহলের আলোচনার আধার।

সহজাত প্রতিভার স্পর্শ ছাড়া একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে কি পাঁচরকমের খেলাধুলোয় দক্ষ হওয়া সম্ভব? সে দক্ষতা অর্জন আবার ছাত্র জীবনের কঠিন দায়িত্বের মধ্যে। এতক্ষণ আমি তারাদাকে ক্রীড়ামহলের পরিচিত নাম তারা ব্যানার্জী বলেই উল্লেখ করেছি। বলা উচিত ছিল ডাক্তার তারা ব্যানার্জী কিংবা লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারা ব্যানার্জী। তারা ব্যানার্জী যখন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সেই সময়ই তিনি খেলার মাঠের, বিশেষ করে ব্যাডমিন্টনের হিরো। সুতরাং ডাক্তারী পড়া ও সব রকমের খেলাধুলো চলেছে এক সঙ্গে।

আগেই বলেছি তারা ব্যানার্জীর মত স্টাইলিশ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় আজও

অবসর সময়ে এখন গল্‌ফ্ খেলেন তারা ব্যানার্জী

বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নি। ব্যাডমিন্টনে ছিলেন সুনিপুণ শিল্পী। তুলনায় অন্যান্য খেলাধুলো কিছুটা নিষ্প্রভ। তবু ফুটবলে লেফট-ইন বা রাইট-ইন হিসাবে তখনকার মোহনবাগান ও এরিয়ানে ওঁর স্থান ছিল বাঁধা। কাদের সঙ্গে তখন মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড লাইনে খেলতেন?—মানা গুঁই, এ রায়চৌধুরী, ল্যাংচা মিত্র, সাতু চৌধুরী, প্রভৃতির সঙ্গে। এরিয়ানের ফরোয়ার্ড লাইনে খেলতেন বীরেন ঘোষ, ডি ব্যানার্জী, এস ব্যানার্জী, এস রায় ও 'মিকি মাউস' কে প্রসাদের সঙ্গে। পার্শ্ব খেলোয়াড়দের এই পরিচিতিই বলে দেবে ফুটবলে তারা ব্যানার্জীর দক্ষতা ছিল কতখানি।

হকিতেও প্রায় একই কথা। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত একটা নয়, ছয়-সাত বছর হকি খেলেছেন মোহনবাগান ক্লাবে। খেলেছেন কানু দেব, এম এ খাঁ, পি কে সেন, অধীপ মুখার্জী প্রভৃতির সঙ্গে। হকি ও ফুটবলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু তো ছিলেনই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলও তখন ছিল দুর্ধর্ষ। রাম ভট্টাচার্যের মত গোলকিপার, রাখাল মজুমদার, পরিতোষ চক্রবর্তী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মত ব্যাক, সোমানার মত সেন্টার ফরোয়ার্ড, দুই পাশে নির্মল চ্যাটার্জী, আব্বাস, সাজাহান, সুনীল ঘোষ, তারা ব্যানার্জীর মত সব নাম করা খেলোয়াড়।

কিন্তু যে খেলায় তারা ব্যানার্জী শিল্পী সেই ব্যাডমিন্টনের কথায় পরে আসছি। তার আগে বলে নি, টেবল টেনিসে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে না পারলেও ত্রিশ দশকের শেষের দিকে টেবল টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। আন্তঃকলেজ টেনিস প্রতিযোগিতায় তখনকার বিজয়ী মেডিকাল কলেজের তিনি অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন।

তারা ব্যানার্জীর জন্ম সিমলার শৈল শিবিরে। বাবা ছিলেন ওখানকার পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। ছোটবেলায় সিমলাতে বাড়ির কোর্টে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছিলেন। কলকাতায় আসার পর আর পাঁচ রকমের খেলার মধ্যে ব্যাডমিন্টনও খেলতেন খেয়ালের বশে। হঠাৎ দক্ষিণ কলকাতার ছোট্ট একটা প্রতিযোগিতায় জিতে যান। তার পর দুই একটি প্রতিযোগিতায় হেরে যান। আবার একটি প্রতিযোগিতা জয় করেন ফাইনালে 'ওয়াক ওভার' পেয়ে।

ওই 'ওয়াক ওভার'ই ব্যাডমিন্টন খেলায় তারা ব্যানার্জীর টার্নিং পয়েন্ট। বললেন, যেহেতু আমি অখ্যাত খেলোয়াড় ছিলাম এবং ফ্লুকে ফাইনালে উঠেছিলাম সেহেতু ফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী একজন নাম করা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড় খেলতেই এলেন না। ওই ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে এবং পরের আর একটি ঘটনায় ভীষণ অপমান বোধ করে সিরিয়াস ব্যাডমিন্টন খেলতে আরম্ভ করি'।

পরের ঘটনা যা বললেন তা হচ্ছে: জ্ঞানতোষ লাহা তখন বাংলার নামকরা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। লাহাদের লাল বাড়িতেই আয়োজিত সেন্ট্রাল ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে জ্ঞানতোষ কোর্টের মধ্যে নাচাতে আরম্ভ করলেন তারা ব্যানার্জীকে। অতি সহজেই প্রথম গেম নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় গেমে যখন জ্ঞানতোষ ১৩-২ কি ১৪-২ পয়েন্টে এগিয়ে তখন নিজে পয়েন্ট না করে তারা ব্যানার্জীকে কোর্টের মধ্যে হেনস্থা করার প্রয়াসে এগিয়ে পিছিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে এমনভাবে শটল মারতে আরম্ভ করলেন যে, জ্ঞানতোষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তারা ব্যানার্জী দর্শক-চোখে অনেক ছোট প্রমাণিত হলেন।

পরাজয়ের পর মুখ নীচু করেই বাড়ি ফিরলেন ব্যানার্জী। কিন্তু মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন যদি ছ' মাসের মধ্যে এই অপমানের শোধ তুলতে না পারি তবে ব্যাডমিণ্টন র্যাকেট আর হাতে ধরব না।'

"ছ'মাসের প্রয়োজন হয়নি। মাস তিনেকের মধ্যেই ওই অপমানের শোধ তুলেছিলাম পরের একটি প্রতিযোগিতায় একইভাবে জ্ঞানতোষকে নাচিয়ে। খেলাধুলো নিয়ে যদি কিছুটা সাধনা করে থাকি তবে এই সময়ই করেছিলাম।"

এই সাধনার ফলেই বাংলা পেয়েছিল তারা ব্যানার্জীর মত ব্যাডমিণ্টন তারকাকে, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী একজন খেলোয়াড়কে। ১৯৩৫-৩৬ সালে তারা ব্যানার্জী ব্যাডমিণ্টনে ভারত চ্যাম্পিয়ন হন। পরের বছর ফাইনালে জর্জ লুইসের কাছে হেরে গিয়ে রানার্স আপ। ১৯৩৯ সালের সেমিফাইনালে পরাজিত হন কর্তার সিংয়ের কাছে। কিন্তু পাঁচ ছয় বছর ধরে বাংলার ব্যাডমিণ্টনে ছিলেন একছত্র অধিপতি। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ, ইস্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ছোট বড় কোন প্রতিযোগিতায় হার স্বীকার করেননি। এমনকি ওঁর কাছে থেকে তখন কারো পক্ষে একটি গেম লাভ করা ছিল গর্বের বিষয়।

নামকরা ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় সুনীল বসু তাঁর গৌরবময় এবং অস্তগামী তারকা তারা ব্যানার্জীকে পরাজিত করতে পারলে জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার চাপে তারা তাঁর উন্নত কলাকৌশল বেশীদিন ধরে রাখতে পারেননি সত্য, কিন্তু সেটুকু খেলেছেন তা চিরকালের সম্পদ।

খেলার মধ্যে ছিল বুদ্ধি ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ। ব্যাক হ্যাণ্ড এবং ফোরহ্যাণ্ড দুটিই ছিল চমৎকার। কব্জির মোচড়ে এমনভাবে র্যাকেট চালাতেন যে প্রতিপক্ষের বিভ্রম সৃষ্টি হতে বাধ্য। যাকে বলে ডিসেপটিভ শট, তার রাজা ছিলেন। একই অ্যাকশানে কখনো শাটল চালিত করতেন প্রতিপক্ষের বাঁদিকে, কখনো ডানদিকে, কখনো পেছনে কখনো নেটের কোলে।

ডাঃ তারা ব্যানার্জী ১৯৪৩ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে আর্মি মেডিক্যাল কোরে যোগ দেন। ক্রমোন্নতির ধাপে উঠে লেফট্যানেণ্ট কর্নেল হয়ে কিছুকাল আগে তিনি অবসর নিয়েছেন। ১৯৫৮ সালে লণ্ডন গিয়ে দু' বছরের রেডিওলজির কোর্স সেরে এসেছেন।

সেদিন পার্ক নার্সিং হোমে উজ্জ্বল আলোর উপর রেখে উনি যখন এক্স-রের ছবি দেখাচ্ছিলেন তখন আমি ভাবছিলাম ওঁর আলোকোজ্জ্বল খেলোয়াড় জীবনের কথা। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, খেলাধুলো কি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন? বললেন, ছাড়াতে আর পারলাম কোথায়। আর্মিতে গলফ খেলেছি, টেনিস খেলেছি। এখনো একটু আধটু খেলছি।

শুনলে অনেকে অবাক হবে, এই সেদিনও তারা ব্যানার্জী গলফে জাপান কাপ জয় করেছেন।

মুকুল

এপ্রিলের একুশ তারিখ থেকে বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে বাংলা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে রনজি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার উপর এখন সারা ভারতের ক্রিকেটরসিকদের দৃষ্টি। শুধু রনজিরই শেষ খেলা নয়, এটা ১৯৭১-৭২ ক্রিকেট মরসুমেরও শেষ বড় খেলা। বাংলার লীগ ও নক আউট অবশ্য এখনো অসমাপ্ত।

রনজি প্রতিযোগিতার বিগত ৩৭ বছরের মধ্যে ২২ বারের বিজয়ী এবং শেষ ১৩ বার একটানা বিজয়ী পরম শক্তিশালী বোম্বাইয়ের সঙ্গে বাংলা কেমন খেলবে স্বভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে ২৩ বারের ফাইনালের মধ্যে একবার ছাড়া যে বোম্বাই হার স্বীকার করেনি, বাংলা কি তাদের হারিয়ে জয়ের ধারায় ছেদ টানতে পারবে? ১৯৫৮-৫৯ মরসুমের ফাইনালে বাংলাকে হারাবার পর বোম্বাইয়ের একটানা জয়জয়ন্তী। এর মধ্যে বাংলা আরও একবার ফাইনালে হেরেছে ১৯৬৮-৬৯ মরসুমে। এবার নিয়ে বাংলা ফাইনাল খেলছে ৮ বার। রনজি ট্রফি জিতেছে মাত্র একবার, ইডেনে ১৯৩৮-৩৯ সালের ফাইনালে দক্ষিণ পাঞ্জাবকে ১৭৮ রানে হারিয়ে। বাংলার সে দলকেও অবশ্য প্রকৃত বাংলা দল বলা চলে না, ইঙ্গ-বঙ্গ দল বলা যেতে পারে। সে দলে ছিল ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের আধিপত্য। বাঙালী খেলোয়াড় ছিলেন মাত্র চারজন। আজ যারা বাংলা দলে খেলছে তাদের মধ্যে এক অধিনায়ক চুনী গোস্বামী ছাড়া তখন কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। সুতরাং বাংলার এই তরুণ দল শক্তিশালী বোম্বাইকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার রনজি ট্রফি বাংলায় আনতে পারবে সে সম্পর্কে আগ্রহ স্বাভাবিক।

ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা। দলীপ ট্রফির সেমিফাইনাল খেলায় মধ্যাঞ্চলের কাছে শক্তিশালী দক্ষিণাঞ্চল যখন হেরে গেল তখন সকলেই বলেছিল ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের কাছে মধ্যাঞ্চল গো-হারা হেরে যাবে। দক্ষিণাঞ্চল ফাইনালে উঠলে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে কিছুটা লড়তে

চুনী গোস্বামী অম্বর রায় [illegible] সুব্রত গুহ

দিলীপ দোশি গোপাল বসু অশোক গণ্ডোত্রা সমর চক্রবর্তী

পারত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বোম্বাইয়ের কৃতী খেলোয়াড় ও ওই অঞ্চলের নাম-করা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া পশ্চিমাঞ্চলকে দুই উইকেটে হারিয়ে মধ্যাঞ্চল দলীপ ট্রফি জয় ক'রে নিল। বাংলা দল এবার যেভাবে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে ওড়িশা, আসাম ও বিহারকে হারিয়ে পূর্বাঞ্চল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং পরে কোয়ার্টার ফাইনালে মহারাষ্ট্রকে ৮ উইকেটে এবং সেমিফাইনালে ৬ জন টেস্ট খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ হায়দরাবাদকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে তাতে বাংলার জয়ের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

প্রতিটি খেলোয়াড় আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। দিনে দিনে দলের মধ্যে যে সংহতি গড়ে উঠেছে এমন সংহতি বোধ হয় বাংলার ক্রিকেট দলে কোনদিন দেখা যায়নি। অধিনায়ক চুনী গোস্বামী স্বীকার করেছেন সে কথা। বলেছেন, 'আমরা ১২ জনে খেলেছি'। অতিরিক্ত একজন কে? না, ওই দলগত সংহতি। ফাইনাল খেলায় মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক চাঁদু বোরদে এবং সেমিফাইনালে হায়দরাবাদের অধিনায়ক জয়সীমাও স্বীকার করেছেন তাঁরা এর আগে কোনবার বাংলাকে এত ভাল খেলতে দেখেননি। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সর্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখে বাংলা তাঁদের পরাজিত করেছে।

অস্বীকার করবার উপায় নেই ব্যাটে বোম্বাই অনেক শক্তিশালী। অনেক কেন দারুণ শক্তিশালী। গাভাসকার, পারকার, ওয়াড়েকর, সারদেশাই, মাঁকড়, সোলকার, রেগে, নায়ক, হাজারে সিভলকার ইসমাইল প্রমুখ ১১ জনের মধ্যে ৯ জনই ব্যাটসম্যান। চুনী গোস্বামী বলেছেন রান দিয়েই ম্যাচ জেতা হয়। রান সংগ্রহের ক্ষমতায় বোম্বাই বাংলার তুলনায় অনেক শক্তিশালী।

অস্বীকার করি না। কিন্তু রান দিয়ে সব সময় ম্যাচ জেতা যায় না যদি বিপক্ষ দলও বেশী রান করে। ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরের আগে অতীত দিনের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হেমু অধিকারী এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিলেন। বলেছিলেন এক দল বেশী রান করলে অপর দলও বেশী রান করতে পারে যদি পরিবেশ এবং উইকেট সহায়ক হয়। বোলাররাই ম্যাচ জেতায়। বোলারদের সাফল্যের উপরই ম্যাচ নির্ভর করে। আর নির্ভর করে ফিল্ডারদের উপর। ইংরাজী প্রবচন অনুযায়ী 'ক্যাচ ফসকায় যে, ম্যাচ ফসকায় সে'। বোলারই যে ম্যাচ জেতে তার প্রমাণও

কল্যাণ চৌধুরী

রেখে গেছেন ভগবৎ চন্দ্রশেখর ওভাল টেস্টে।

সে কথা যাক। হালফিল আমরা দেখেছি ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামেই বোম্বাই-মহারাষ্ট্র সেমিফাইনাল খেলায় প্রধানত চন্দ্রশেখর ও প্রসন্নর বলের যাদুতে বোম্বাইয়ের ব্যাটিং শক্তি মাত্র ২৫৭ রানে শেষ হয়ে গেছে। এর উত্তরে মহীশূর অবশ্যই ভাল রান করতে পারত যদি ব্যাটিং শক্তিতে তারা কিছুটা শক্তিমান হত। যেহেতু একমাত্র গুন্ডাপ্প বিশ্বনাথ ছাড়া মহীশূর দলে কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান ছিল না সেহেতু মহীশূরকে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হয়েছে। বোম্বাইয়ের জয়ের প্রধান কারণ হয়েছে কিন্তু নামী স্পিন বোলার পদ্মনাভ সিভলকার। মাত্র ১৯ রানে ৮টি উইকেট নিয়ে সিভলকার ৯০ রানের মধ্যে মহীশূরের প্রথম ইনিংস শেষ করে দিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছে ৩১ রানে ৫টি উইকেট।

এই সিভলকারই বাংলার পক্ষে ভয়ের কারণ। টার্নিং উইকেটে বাংলার স্পিন বোলার দিলীপ দোশি বোধ হয় এখন ভারতের সেরা। খারাপ উইকেটে ত্রাস সৃষ্টিকারী বোলার। কিন্তু সিভলকারের বড় গুণ উইকেটে স্পিন না নিলেও লেংথ, লক্ষ্য ও ফ্লাইটের দ্বারা সিভলকার ব্যাটসম্যানের মধ্যে ভীতি জাগাতে পারে। এবং যেহেতু ভীরুরা মরার আগেও বার বার মরে সেহেতু ভীতু ব্যাটসম্যানদের শেষ পর্যন্ত সিভলকারের হাতে মরতে হয়।

পেস বোলিংয়ে বাংলা বোম্বাইয়ের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। বরং সুধীর নায়ক ও মহম্মদ ইসমাইলের চেয়ে বাংলার সুব্রত গুহ ও সমর চক্রবর্তী ভাল পেস জুড়ি। এবং উইকেট কিপার হিসাবে বাংলার রুসি জিজিভয় খুবই নির্ভরযোগ্য। বোম্বাইয়ের সঙ্গে বাংলার ব্যাটিং শক্তির তুলনা করা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তবু গোপাল বসু, অম্বর রায়, অশোক গণ্ডোত্রা এবং চুনী গোস্বামীর উপর আস্থা রাখা যেতে পারে। বিশেষ করে গোপাল এবং অম্বর এ বছর খুবই ভাল খেলছে।

খেলাটা যদি ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে না হয়ে ইডেন গার্ডেনে হত তবে বাংলার মনোবল আরও বেড়ে যেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিজের মাঠে খেলার একটা বাড়তি সুবিধা থাকে, মাঠের চারপাশে থাকে উৎসাহদাতা সমর্থক। বোম্বাই একেই দারুণ শক্তিশালী, তারপর খেলছে নিজের মাঠে। সুতরাং বাংলার জয় আশা করি না। বাংলা ভাল খেলুক এটাই আশা করি।

একলব্য

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রযোজনা বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন সভানেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী ও শ্রীউত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে তাঁদের পাশে সংসদ সদস্য শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ও বিধানসভার সদস্য শ্রীপঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও উপস্থিত দেখা যাচ্ছে। ফটো—সেন

বাংলা ছবির সংকট প্রসঙ্গে

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প দীর্ঘকাল যাবৎ নানা সমস্যায় পীড়িত। ছবি তৈরী এবং ছবির মুক্তির সমস্যা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট। স্টুডিও ও ল্যাবরেটরিগুলিতে আধুনিক সরঞ্জামের অভাবও একটি বড় সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের ৩৪০টি চিত্রগৃহের মধ্যে মাত্র ৬৬টিতে বাংলা ছবি দেখানো হয়। ফলে একদা যেখানে এই রাজ্যে ১৪টি স্টুডিওতে কাজ হত এখন তার সংখ্যা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৬টিতে। এই সব সমস্যার প্রতিকারকল্পে অনেক আবেদন নিবেদন আন্দোলন ইত্যাদি হয়েছে, বহু বাদ-প্রতিবাদ তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু প্রতিকার তেমন কিছু হয় নি। এ সব ঘটনা বাংলা ছবির দর্শকদেরও অনেকেরই জানা।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজ্যে যে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছিল তার ফলে ছবি তৈরীর কাজ বহুলাংশে বিঘ্নিত হচ্ছিল। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ছবির কাজ আবার শুরু হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পুরাতন সব সমস্যাগুলি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। গত ৯ই বৈশাখ অপরাহ্নে টালিগঞ্জের ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে রাজ্যের নতুন মন্ত্রি-সভাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য বাংলা

ছবির প্রযোজক, শিল্পী ও কলাকুশলী গোষ্ঠী যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন সেখানে অভিনন্দনপত্রের সঙ্গে এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য একটি স্মারকলিপি মন্ত্রিসভার সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই স্মারকলিপিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি চিত্রগৃহে বাংলা ছবি দেখানো আবশ্যিক করার, এ রাজ্যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন বোর্ড গঠনের, স্থানীয় ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপনের, বাংলা ছবি থেকে সংগৃহীত প্রমোদকরের ৫০ শতাংশ প্রযোজকদের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করার এবং বেকার কলাকুশলী, শ্রমিক ও শিল্পীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী কানন দেবী। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীউত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। সংবর্ধনার জবাবে অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ, তথ্য ও জনসংযোগ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষণ দেন। সংসদ সদস্য শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ও বিধানসভার সদস্য শ্রীপঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই তাঁদের ভাষণে চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্যা দূরীকরণে সরকারকে সচেষ্ট হতে বলেন। শ্রীদাশমুন্সী কেবলমাত্র বাংলা ছবি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি চিত্রগৃহ স্থাপনের জন্য সরকারকে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানান।

পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীডেনিস লাকড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চলচ্চিত্র শিল্পের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিল্পী ও কলাকুশলী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

চিত্র-সমালোচনা

অনির্দিষ্টতা

শ্রীরুদ্রজিৎ

প্রথম চিত্রপরিচালনার কাজে হেমেন মুখোপাধ্যায় যে ছবিটি তৈরি করেছেন, যাকে "অনির্দিষ্টতা" বলা হয়েছে সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব রকম জটিলতা

জন্য [illegible] [illegible]
যারে এসে [illegible] [illegible] এই
সব চরিত্রে [illegible] [illegible] যেমন
মুখার্জি এবং [illegible] দর্শকদের
হাসিয়েছেন খুব, তবে এঁদের ভূমিকা
আরও সংক্ষিপ্ত হলে দর্শক একটা স্বস্তি
বোধ করতেন নাকি। নায়িকার বান্ধবীর চরিত্রটি
বরং খুব অসামঞ্জস্য মনে হয়নি। এই
চরিত্রে হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও
সুন্দর। নাট্যসংগীতের ক্ষেত্রে গীতা দে
এবং দীপ্তি রায়ের অভিনয়েরও প্রশংসা
করতে হয়। পরিচালকও নাটকের আস্বাদই
মুখ্যত দিতে চেয়েছেন দর্শকদের। তাঁর
প্রথম চিত্রপরিচালনার কাজে বিশেষ চমক
কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোথাও নেই। কিন্তু
দর্শকের চিত্তবিনোদন-সাধনের কাজে পরি-
চালক মোটামুটি সফল।

দেবেন্দ্র গোয়েলের হিন্দী "ধড়কন" ছবিতে সঞ্জয় ও মমতাজ

আপনা দেশ

অলিম্পিক পিকচার্স

মিউনিসিপ্যালিটির কেরানী আকাশ (রাজেশ খান্না) তার সততার জন্যে চাকরি হারিয়েছিল বলেই জনতার নেতা হতে পেরেছিল এবং ভোটে জিতে ওই মিউনিসিপ্যালিটিরই চেয়ারম্যান হয়েছিল। "আপনা দেশ" ছবির আসল চমক কিন্তু তারপর থেকেই শুরু। ওই শহরের ধনী ব্যবসায়ী এবং বহুবিধ পাপকর্মের নায়ক ধরমদাসের (ওমপ্রকাশ) সঙ্গে আকাশের বিরোধ এর পর ঘোরতর আকার নিয়েছে এবং ধরমদাসের চক্রান্তে তাকে চেয়ারম্যানের চেয়ারটি হারাতে হয়েছে। শয়তানের মুখোস খুলে দিতে আকাশকেও শয়তান সাজতে হয়েছে। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় (কার অর্থানুকূল্যে সেটা জানা যায় নি; কোটিখানেক টাকা নিশ্চয় খরচ হয়েছে ওই ফাঁদ পাততে) আকাশ সোনার স্মাগলার সেজে ধরমদাস এবং তার পাপকাণ্ডের সহযোগী সত্যনারায়ণ (মদন পুরী) ও শোভারামকে (কানাইয়ালাল) চোরাই সোনা ব্যবসার লোভ দেখিয়ে নিরস্ত্র করেছে এবং কৌশলে তাদের তাবৎ পাপকর্মের স্বীকারোক্তি আদায় করে নিয়েছে।

আপনা দেশ-এর মঙ্গলের জন্য দেশপ্রেমিক আকাশের এই রোমাঞ্চকর অভিযানের সাফল্য তার একার দ্বারা আসেনি। তার প্রণয়ী চন্দা (মমতাজ) এবং বন্ধু শম্ভুর (জগদীশ) অবদানও এর পিছনে অনেকখানি। দরিদ্রের মেয়ে চন্দা মিউনিসিপ্যালিটির সামনে ফল বিক্রি করত এবং একটি ঘটনায় তার চরিত্রের সততার পরিচয় পেয়ে আকাশ তার গুণমুগ্ধ। বিপরীতে চন্দাও আকাশের রূপমুগ্ধ।

ধরমদাস যে একটি শয়তানসদৃশ ব্যক্তি আকাশের এই অভিমত তার দাদা দীননাথ (মনমোহন কৃষ্ণ) বিশ্বাস করে নি। দেশের অনেক লোক ধরমদাসকে ধর্মপ্রাণ ও মহানুভব মনে করে। দীননাথেরও সেই ধারণা। ওই নিয়ে কথা কাটাকাটির সময় উত্তেজনার মুহূর্তে সে আকাশকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। পরে অবশ্য দীননাথের ভুল ভেঙেছে, এবং দেশের লোকের অর্থ আত্মসাতের চেষ্টায় বাধা দিয়ে ধরমদাসের পাতাল-গৃহে বন্দী হতে হয়েছে।

বাড়ি ছেড়ে আসার পর আকাশ আশ্রয় পেয়েছিল চন্দাদের বস্তিতে। তখন থেকেই তার নেতা-জীবন শুরু। চেয়ারম্যান হবার পরও আকাশ বস্তিতেই বসবাস করেছে এবং একই সঙ্গে পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজ এবং চন্দার সঙ্গে প্রেমপর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে গেছে।

দেশের সেবার কাজে আকাশকে যখন এক বিচিত্র চরিত্রের গোল্ড স্মাগলার সাজতে হয়েছে তখন চন্দাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। আকাশের সহকারিণী সাজতে তার অঙ্গে উঠেছে উগ্র আধুনিক বিদেশী পোশাক, মুখে শোনা গেছে খই-ফোটা ইংরাজি। কোন্ যাদুমন্ত্রে এটা সম্ভব হয়েছে তার হদিস ছবিতেও যেমন নেই তেমনি দর্শকরাও যে সেটা জানতে আগ্রহী তাও মনে হয় নি। তাঁরা শুধু রাজেশ-মমতাজকে নতুন সাজে এবং মহৎ কাজে দেখতে পেয়েই খুশি।

ছবির শেষে ধরমদাস ও তার সঙ্গীরা গ্রেপ্তার হয়েছে পুলিশের হাতে। সেটা সহজে ঘটেনি। আকাশকে রীতিমত লড়াই করে তা ঘটাতে হয়েছে। ধরমদাসের পাতাল-গৃহ থেকে দাদাকে উদ্ধারের জন্য আকাশ ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে, একাই একশ হয়ে ঘোরতর ফাইট দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দর্শকদের হাততালির মধ্যে দেশের শত্রুদের পুলিশের হাতে তুলে দিতে পেরেছে।

রঙীন ছবি, রঙদার প্রণয়পর্ব, নাচ-গানের রমরমা, আর তার সঙ্গে আবেগ আর দেশপ্রেমের মশলা, সব মিলিয়ে দর্শকের মন ঘণ্টা তিনেক মাতিয়ে রাখার মত আয়োজন। পরিচালক জাম্বু ঘটনাগুলি সাজিয়েছেন ভাল। ছবি জমে থাকে শিল্পীদের অভিনয় (যার মধ্যে রাজেশ, মমতাজ এবং ওমপ্রকাশের নামই সর্বাগ্রে উচ্চারণযোগ্য) এবং গানের গুণে। সুরকার রাহুল দেববর্মণ পুনর্বার বাজীমাৎ করেছেন। গান নিকে গান তো নিশ্চয় হিট। ছবির গতিবেগ দ্রুত। তার জন্য সম্পাদকের দান অনেকখানি। ফটোগ্রাফিও বেশ ভাল। তবে অত রঙ-চঙ সব কিছুরই আয়ু ওই তিন ঘণ্টা। মনে ধরে নিয়ে যাবার মত তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ডেটলাইন বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কিছু কিছু খণ্ডচিত্র আমরা আগেও দেখেছি। এবার দেখা গেল একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মকাহিনীর এক অখণ্ড চিত্র। নাম : "ডেটলাইন বাংলাদেশ"। অথচ খণ্ড খণ্ড চিত্রের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ-ইতিহাসের এই অখণ্ড বিবরণ পেলাম। বাংলাদেশের নয় মাসব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ঘটনা ও পর্বের অনেক ছবি তুলেছেন বিদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন সংস্থা এবং বহু সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার। সেগুলিকে চমৎকার এক সূত্রবন্ধনে যুক্ত করেছেন টি-ভি চিত্রসম্পাদক ব্রিয়াম টোগ। তাঁর অসাধারণ এডিটিংয়ের ফলে সংবাদ-চিত্রগুলি একটি কাহিনীর রূপ নিয়েছে।

ACCLAIMED BY PRESS THROUGHOUT INDIA

[illegible]

...with equal fury.

—AMRITA BAZAR PATRIKA

...musical score adds to the film's popular appeal.

—HINDUSTHAN STANDARD

Raaj Kumar plays the lead with skill & showmanship. Hema Malini has graduated herself into a down-to-earth, actress in depth in this picture. Music by Shankar Jaikishan adds with brilliant effect.

—CINE ADVANCE

The music score has a classical base given to it that proves quite helpful. Raaj Kumar gives a superb performance. Hema Malini looks attractive and works in a fairly effective manner apart from charming naivety. Rakhee looks quite suitable & charming. On the technical side the film again has a brilliant scoring. The colour photography is a commendable job.

—SCREEN

A film of considerable interest.

—TIMES OF INDIA (BOMBAY)

Hema Malini for the first time shows her flair for histrionic and does a fine job. Lavishly mounted and beautifully photographed.

—SUNDAY STANDARD (DELHI)

এফ. সি. মেহরার

লাল পাথর

JYOTI

2, 5-15 & 8-30
70 m.m. Air-Cond. Luxury Cinema
with deeply curved wide screen
& 24 Others

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিকায়, সংগ্রাম শুরু হবার পর সারা বিশ্বে এ নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া, দলে দলে শরণার্থীদের ভারতে আগমন, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের সমস্যা তুলে ধরার কাজে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক সাফল্য, বাংলাদেশে পাক জঙ্গীচক্রের বর্বর অত্যাচার, পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা, শেখ মুজিবরের মুক্তিলাভ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি আরও অনেক ঘটনার চিত্র এমনভাবে ছবিতে সাজানো হয়েছে যাতে আমরা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের ইতিহাস প্রায় পূর্ণ রূপেই পেয়ে যাই। শুধু ঘটনা সাজানোই নয়, প্রতি ঘটনার অনিবার্যতা অতি সুন্দর যুক্তিসম্মতভাবে ছবিতে দেখানো হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের সওয়াল, জুলফিকার আলি ভুট্টোর সভাকক্ষ ত্যাগ, বিদেশে শ্রীমতী গান্ধীর সাংবাদিক বৈঠক এবং ৩রা ডিসেম্বরের গুরুত্বপূর্ণ বেতার ভাষণ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি ঘটনাও ছবি থেকে বাদ যায়নি। ঘটনার ক্রমিক পর্যায়ে একটি দেশের সংগ্রাম ও পরিণতি ছবিতে এমন সুবিন্যস্ত যে ছবিটি দেখার সময় একটি কাহিনী-চিত্র দেখার স্বাদ পাওয়া যায়। তা-ছাড়া সারা পৃথিবীর লোক বাংলাদেশের রক্তক্ষরা সংগ্রামের যে যে চিত্রগুলি দেখেছেন আমরাও সেগুলি দেখবার সুযোগ পাই এ-ছবিতে। তবে ওঁদের দেখার চেয়ে আমাদের দেখার উত্তেজনা বেদনা ও আনন্দ হয়ত আরও বেশি। তাই ভারতীয় দর্শকের কাছে "ডেটলাইন বাংলাদেশ"-এর মূল্য অপরিসীম।

"মেমসাহেব" (পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়) ছবিতে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন

নাট্য-সমালোচনা

কারাগার

শৌভনিক

কংস-কাহিনী নিয়ে "কারাগার" (রচনা : মন্মথ রায়) নাটক। নাটকের নাম যে কারাগার তার একটা অর্থ আছে। কংসেরই কারাগারে কংসারির জন্ম। দুষ্টদমনকারীর আবির্ভাব ঘটে কারাগারেই—এটাই নাট্যকারের বক্তব্য। বৃটিশ রাজত্বে জাতীয় আন্দোলন দমনকালে এই নাটকের একটা বিশেষ তাৎপর্য বা আবেদন অবশ্যই ছিল, যে-কারণে নাটকটি রাজরোষও এড়াতে পারেনি। আজকের দিনে এই নাটক কতটুকুই বা প্রভাব বিস্তার করতে পারে? তবে বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির সময় এই পুরনো নাটক অভিনয়ের একটা মূল্য আছে। তা-ছাড়া "কারাগার"-এ কংসের অত্যাচার ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব নিয়ে যে নাটক সৃষ্টি হয়েছে তাতে একালের দর্শকও যথেষ্ট আমোদ পাবেন। নাট্যরসের জন্য নাট্যকার কংসের ভিতরেও এক প্রেমিক ও স্নেহময় ভ্রাতাকে আবিষ্কার করেছেন।

অল্পপরিসর মঞ্চে (মুক্ত-অঙ্গনে) এই নাটক প্রযোজনায় শৌভনিক-গোষ্ঠী অবশ্যই অস্বস্তি বোধ করেছেন। তবে মঞ্চসজ্জায় কারাগারটি তাঁরা ভালই দেখিয়েছেন। সুষ্ঠু আলোকসম্পাতের (স্বরূপ মুখোপাধ্যায়-কৃত) গুণে অগ্নিকাণ্ডও ভালভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কংসের দরবার বা প্রাচীন বৈভব দেখানো সম্ভব হয়নি। বাল্কিতে অ্যাটমসফিয়ারও গড়ে ওঠেনি, কংসের সামনে দর্শকের দিকে তাকিয়ে অপটু নৃত্যভঙ্গিমায় একজন শিল্পী সময় সময় নেচে গেছেন। পাত্র-পাত্রীদের বেশবাস অবশ্য মন্দ হয়নি।

'কারাগার' নাটকের একটি দৃশ্যে অমল মুখার্জি ও কাজল মুখার্জি

"কারাগার" নানা ত্রুটি সত্ত্বেও যদি উপভোগ্য হয়ে থাকে তবে সেটা অভিনয়ের জন্য। গোপেন মুখোপাধ্যায় (বসুদেব) অভিনয়ের জন্য সকলের আগে প্রশংসা পাবেন। কংস-চরিত্রে অমল মুখোপাধ্যায় এবং দেবকীর ভূমিকায় কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দ অভিনয় করেননি। কঙ্কা (অলকা পাল) ও চন্দনা (কাজল মুখোপাধ্যায়) চরিত্র দুটি আরও স্বাভাবিক ও সপ্রাণ হতে পারত। বরঞ্চ নরক (সুকুমার ঘোষ), বিদুরথ (শিবু মজুমদার) ও কঙ্কনকে (বীরেশ্বর মিত্র) সে-তুলনায় অনেক স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

নাট্যনির্দেশক কৃষ্ণ কুণ্ডুর সুসম্পাদনার জন্য নাটকটি গতি পেয়েছে। নাট্যরসও পরিচালক জায়গায় জায়গায় জমিয়ে দিয়েছেন। আবহসংগীত (ভাস্কর মিত্র) নাটকের বিশেষ মুহূর্তের সঙ্গে মানিয়ে গেছে।

চিৎপুর-চিত্র

গান এখনও হচ্ছে, তবু সেই শেষ-মাঘ থেকে যে যাত্রার দলের মালিকেরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছেন তো বসেছেনই। কী এমন ভাবনা? কী নয় বলুন। গোটা চিৎপুর জুড়ে রব উঠেছে ১৯৭১ সাল যাত্রাপাড়ার অভিশাপের বছর। বছর শেষের দিন সত্যম্বর অপেরার মালিক

শ্রীশৈলেন মোহান্তকে দেখতে গিয়েও সেই একই কথা শুনলাম। ডানলোপিলো গদির ওপর গোটা দশেক তাকিয়া-বালিশের ছড়াছড়ি। তার কয়েকটা বগলে নিয়ে প্লাস্টার-করা পা ছড়িয়ে ভদ্রলোক কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন। ঘরে ঢুকতেই মোহান্ত মশাই বললেন, এবার আর তিনি দল করছেন না।

সত্যাম্বর হবে না—খবরটা সত্যি খবরের মতনই। আমার সঙ্গের সঙ্গীরা কথাটা শুনে সত্যি চমকে উঠলেন। দেখলাম ভৈরবের (গাঙ্গুলী) মুখচোখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। ম্যানেজারের মুখের ওপর যেন হঠাৎ কেউ এক বালতি কালিগোলা জল ছুঁড়ে দিয়েছে। নাট্যকার তপন ঘোষাল, গবেষক জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় অবাক। সবচেয়ে অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল জ্যোতিষী অমিয় চট্টোপাধ্যায়কে। খানিক আগেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, ১৯৭২ সত্যাম্বরের সবচেয়ে ভাল ব্যবসায়ের বৎসর। সুতরাং কথা শুনে তাঁর চমকে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু না। কেবল অবাক হইনি আমি। বললাম, 'প্রেসার কত?' মোহান্তমশাই গম্ভীর গলায় বললেন 'অ্যাবনরমাল হাই।' সুতরাং বুঝতে কষ্ট হল না, রাজার ভাবনার বোঝার ওপর যাত্রাদল করার ভাবনা এখন ও'র কাছে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতন। শৈলেনবাবু কথা বন্ধ করেন নি। বললেন, 'সেই জন্যই তো বললাম, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে দল করব না।'
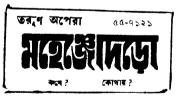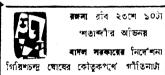
না হেসে পারলাম না। বললাম, 'অনিশ্চয়তা কিসের?' মোহান্ত সামান্য উত্তেজিত হল, 'কিসের নয় মশাই? ধরা যাক জীবনের কথা—এত প্রেসারে কখন কী হয় বলা যায় কিছু? তার ওপর যেচে কেন পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার ঝুঁকি মাথায় নেব?' এই কথা প্রসঙ্গেই উঠল ১৯৭১-এর প্রসঙ্গ। শৈলেনবাবু বললেন, 'অনেক দুর্যোগ, অনেক বিপর্যয় যাত্রার ওপর দিয়ে গেছে, কিন্তু এই মরসুমটা গেল সবচেয়ে সাংঘাতিক। দু'একটি দল ছাড়া প্রায় সকলেই লোকসানের দায়ে পড়েছেন।

উনিশ শো ষাট থেকে শুরু করে প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন সময়ে কোনো না কোনো বিপর্যয় দেখা গেছে। ভীষণ বর্ষা, অকাল বর্ষণ, রাজনৈতিক ডামাডোল, বন্যা, ঝড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের যে কোনো একটা সব বছরেই লেগে থাকে। তার ফল যে সকলেই ভোগ করে এমন নয়। সকল মরসুমেই কি লাভের কড়ি ঘরে তুলতে পারে সব দল? অতএব সব বছরেই, ঠিক শৈলেনবাবুর মতন কোনো না কোনো মালিক বলেন, 'নাঃ, দল আর করছি না মশাই।' কিন্তু গ্রীষ্মের শেষ দিনটি পার হলে, বর্ষার প্রথম বারিপাত ধরার বুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মালিকদের মন আনচান। এবং রথের দিন যথারীতি দেখা যাবে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। না, দল হচ্ছে। দল হবে।

অন্যান্য দলের কথা হচ্ছিল। কার কি অবস্থা, কোন্ শিল্পী কোথায় গেলেন ইত্যাদি। এই করে সময় কাটছিল। তারপর এলো নতুন শিল্পীদের কথা, যাত্রার ভবিষ্যতের কথা, টুকিটাকি আরও কত কী। রাত দশটায় যখন উঠব, তখন অনেক স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন মোহান্ত মশাই। ওই অবস্থাতেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজা পর্যন্ত এলেন বিদায় দিতে। ঠিক যাওয়ার আগে, আমাকে কাছে টেনে কানে কানে বললেন, 'ভাল দেখে একটা নতুন হিরো দেখবেন তো।' ঠিক তখন গোর-বাবুর কথা মনে এলো। হ্যাঁ গোর দাস। সত্যাম্বরের আগের মালিক, মোহান্তের শ্বশুর মশাই। প্রতি বছরই তিনি বলতেন, 'নাঃ, দল আর করছি না মশাই।'

হাসতে হাসতে নামছিলাম। জ্যোতিষী চাটুজ্জে মশাই বললেন, 'আমি বলেছিলাম, দল ও'কে করতেই হবে। মিথুন লগ্ন, লগ্নে রয়েছে...।'

—সূত্রধার

(সি ৪০৭৪)

(সি ৫০৮২)

মুখোপাধ্যায়ের সংলাপ পাঠও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৃত্যাংশে উমা সাহানী, মল্লিকা মিত্র, শর্মিলা ঘোষ, শুভ্রা ঘোষ, অনুরাধা বোস, স্বাগতা মুখার্জি, বাসব-দত্তা ঘোষ, কুমারী দত্ত, শিল্পী দাস ও কাবেরী ব্যানার্জী, সহজেই আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি কেড়েছেন। বিশেষ করে উমা সাহানীকে দর্শকদের মনে থাকবে। সঙ্গীতাংশে সবগুলি গানই সংগীত এবং এজন্য প্রশংসার দাবীদার সকলেই। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। প্রায় আঠারোজন কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী গানে অংশ নিয়েছিলেন। নৃত্য নির্দেশনায় ছিলেন বসন্ত সিং।

—বিশেষ প্রতিনিধি

রবীন্দ্রনাথের গানের আসর

এইচ এম ভি ও কলম্বিয়া রেকর্ড রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষ করে প্রতি বছরই রবীন্দ্র সঙ্গীতের অর্ঘ্য নিবেদিত হয়। এ বছরও হচ্ছে। প্রবীণ ও নবীন রবীন্দ্র-সঙ্গীতকারদের গাওয়া সেই গানগুলি একটি অনুষ্ঠানে শোনাবার ব্যবস্থা প্রতি বছরই করেন গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ। গত বছর এই অনুষ্ঠান হতে পারেনি। এ বছর হয়েছে, গত ৮ এপ্রিল, রবীন্দ্র সদনে।

সমবেত কণ্ঠে "বিশ্বজন মোহিছে" গানখানি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু। এর পর সুচিত্রা মিত্রের পরিচালনায় শিশু শিল্পীদের কয়েকটি গান পরিবেশিত হয়। তারপর এক এক প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের পালা। প্রবীন শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মায়া সেন, নীলিমা সেন, সুমিত্রা সেন, অর্ঘ্য সেন, শৈলেন দাস, বনানী ঘোষ, পূরবী মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা মুখো-পাধ্যায়, বানী ঠাকুর প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বাণীন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত, স্বপ্না ঘোষাল, মঞ্জরী লাল, নমিতা ঘোষাল, রামানুজ দাশগুপ্ত ও গৌতম মিত্র।

ঋতু বসন্ত

স্বর্ণপুরী নৃত্যকলা মন্দিরের উদ্যোগে সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে পরিবেশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'ঋতু বসন্ত'। রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নৃত্যনাট্য আমাদের বহুবার দেখা হলেও এই দিনের অনুষ্ঠানে শিল্পীদের আন্তরিকতা গোটা অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করে তুলতে বিশেষ সহায়তা করেছে। নাচ এবং গান নৃত্যনাট্যের এই দুটি মুখ্যবস্তু এখানে সুপরিবেশিত। 'রাজা' ও 'কবি' রূপে যথাক্রমে অরুণ বাগচী ও অরুণকুমার

মহরৎ

এম আর প্রোডাকসনসের **"আমি সিরাজের বেগম"** ছবির মহরত হয়ে গেছে গত পয়লা বৈশাখ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। শ্রীপারাবত রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন সুশীল মুখোপাধ্যায়। মহরত-দৃশ্যের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী কানন দেবী। শিল্পী ছিলেন বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। ও'রাই ছবির নায়ক-নায়িকা।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

অরণ্যদেবের খুলি-গুহায়...
পুরনো ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই পরচুলা রহস্যের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। উঃ, দারুণ মিল!
?
?

এদিকে এই পরচুলা, আর ওদিকে রাজা তুই জুলিয়েট হয়েছিলি! আশ্চর্য! অদ্ভুত!
মিস টাগাচা আমাকে জুলিয়েট হতে বললেন যে; আমার কী দোষ?
আঃ, রাজা!

মিস টাগাচা ভুল করেননি। শেকস্‌পীয়রের নাটকে ছেলেরাই তো এককালে মেয়েদের ভূমিকায় নামত।
তাই নাকি?
আগেই এ-কথা তোমাকে বলেছি, রাজা।

লেডি ম্যাকবেথ, পোর্সিয়া, ক্লিওপেট্রা, জুলিয়েট — সমস্ত ভূমিকাতেই এককালে ছেলেরা অভিনয় করেছে।
কেন?

মেয়েদের সেকালে থিয়েটারে অভিনয় করবার রেওয়াজ ছিল না। এই পরচুলা পরে একটি ছেলেই তাই প্রথম রজনীর অভিনয়ে জুলিয়েটের ভূমিকায় নেমেছিল।
সত্যি?
প্রথম রজনীর অভিনয়ে?

হ্যাঁ, শেকস্‌পীয়র নিজেই হয়তো এই পরচুলটি বেছে নিয়েছিলেন। সেদিন থেকে এটি অমূল্য!
নিশ্চয়ই! কিন্তু আপনি এ-কথা কী করে জানলেন?

আমার পূর্বপুরুষই এ-সব কথা লিখে রেখে গিয়েছেন। তিনি লিখে বলতার মানুষ নন।
কিন্তু এ-পরচুলা এখানে এল কী করে?

সে, কেননা জুলিয়েট হয়ে যিনি এটা পরেছিলেন, তিনি প্রথম অরণ্যদেবের পৌত্র। পরে তিনি নিজেও অরণ্যদেব হয়েছিলেন।
!
অরণ্যদেব নেমেছিলেন... মেয়ের ভূমিকায়?
8/29

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ভুট্টোর সায় এই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে লেখা পাক প্রেসিডেনট জুলফিকার আলি ভুট্টোর চিঠি ১২ এপরিল এসে পৌঁছেছে। এই চিঠিতে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর প্রস্তাবে সায় দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই মাসের গোড়ার দিকে লেখা তাঁর চিঠিতে তাঁর ও পাক প্রেসিডেনটের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনের পথ তৈরি করতে বিশেষ দূত পর্যায়ে বৈঠকের প্রস্তাব করছিলেন। চিঠিতে ঠিক কী রয়েছে তা এখনই জানা যায়নি। পাকিস্তান খুব সম্ভবত ভারতে আটক ৯৩ হাজার পাক যুদ্ধবন্দীদের দেশে ফেরার ব্যাপারটি নিয়েই বেশী পীড়াপীড়ি করবে। হয়ত পাকিস্তানে বসবাসকারী ৫ লক্ষ বাঙালীকে জামিন হিসাবে আটক রাখা হবে। এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দূত পর্যায়ে আলোচনা হতে পারে। ওই সময়ে প্রেসিডেনট ভুট্টো বাংলা দেশের সঙ্গেও আলোচনায় উদ্যোগী হতে পারেন। ভারতকে লেখা চিঠিতে পাকিস্তান ইতিমধ্যেই ওই ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বলে জানা যায়। শ্রীমতী গান্ধীকে পাঠানো শ্রীভুট্টোর জবাবে হয়তো ওই প্রস্তাব আছে। প্রেসিডেনট ভুট্টো পিনডিতে বলেছেন শীর্ষ সম্মেলন এই মাসের মধ্যেই হতে পারে। প্রাথমিক কথাবার্তা ৫ মে তারিখ ও জায়গা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তিনি শ্রীমতী গান্ধীর ওপর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর শর্ত মেনে নিয়ে পাক প্রেসিডেনট শ্রীভুট্টো যে চিঠি দিয়েছেন, তার জবাব সম্ভবত সোমবার দেওয়া হবে।

দেশী সংবাদ

১০ এপরিল—দুর্গাপুর ইসপাত কারখানায় হালে একশ পঁচিশজন গ্রাজুয়েট ইনজিনিয়ার নেওয়া হয়েছে। এঁদের বেতনহার হবে : ৫৫০—১৯০০ টাকা ও অন্যান্য ভাতা। নির্বাচন কমিটি নাকি চেয়েছিলেন যে এদের মধ্যে আরও কিছু যোগ্য বাঙালী নেওয়া হোক। কোন অজ্ঞাত কারণে হিন্দুস্থান স্টীল কর্তৃপক্ষ তা করেন নি। বঞ্চিত ওই সব বাঙালী যুবকদের মধ্যে আছেন প্রথম শ্রেণীর ইনজিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীরা।

১১ এপরিল—জেলায় এক মাসে কতটা কি কাজ হল প্রতি মাসে তার রিপোর্ট পাঠানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতি কাজের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে কাজ হয়, জেলা শাসকদের তা দেখতে হবে। আরও নির্দেশ দিয়েছেন ভূমি সংস্কার এবং লুকোনো জমি খুঁজে বের করার জন্য তৎপর হোন। এ সম্পর্কে সরকারী সার্কুলার শীঘ্রই যাচ্ছে।

১২ এপরিল—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কলকাতা পৌরসভা সংশোধনী বিলের (১৯৭২) আলোচনাকালে সি পি আই দলের একটি সংশোধনী প্রস্তাবের উপর 'ডিভিশন' চেয়ে ভোট গণনার দাবি করলে সভায় এক নতুন পরিস্থিতি দেখা দেয়। এবারের বিধানসভায় এই প্রথম ভোট গণনার দাবি। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার অন্যতম প্রধান শরিকপক্ষ থেকে দাবি রাখায় ভোটদানের সময় এই মোর্চা অর্থাৎ কংগ্রেস ও সি পি আই বিভক্ত হল।

পুরীর এস সি এম কলেজে সকালের পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে অসাধু ব্যবস্থা অবলম্বনের পর যখন এই সব বন্ধের জন্য কলেজের অফিসে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আলোচনা করছিলেন, তখন একদল পরীক্ষার্থী তাঁদের ওপর পটকা নিক্ষেপ করে। ৬ জন গুরুতর আহত হন। এখানে তখন প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা চলছিল।

১৩ এপরিল—আজ চৈত্র সংক্রান্তির আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের অর্ধাংশ মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হয়। স্মরণসভায় বক্তারা বলেন নির্ভীক সাংবাদিকতা, সাহিত্য প্রেম ও বাংলা-ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের যে আদর্শ প্রফুল্লকুমার রেখে গিয়েছেন তার অনুসরণই

হবে তাঁর সর্বোত্তম স্মৃতিরক্ষা।

১৪ এপরিল—কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফানডের অছি পর্ষদের সুপারিশ সরকার মেনে নিয়েছেন বলে আজ রাজ্যসভায় জানান হয়। পর্ষদের সুপারিশ : প্রভিডেন্ট ফানডের জমা টাকার উপর ১৯৭১-৭২ সালের সুদের হার (শতকরা ৬·৮ ভাগ) বাড়িয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে শতকরা ৬ ভাগ করা হবে।

নির্মম হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত চম্বলের মধ্যপ্রদেশী ডাকাত-নেতা মোহর সিং ও অপর ৮৫ জন ডাকাত আজ সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে। প্রত্যেকে পর পর মঞ্চে উঠে মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির সামনে তাদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে এবং অস্ত্রের পরিবর্তে একখানা করে রামায়ণ ও গীতা উপহার পায়।

১৫ এপরিল—আর জি কর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সুপারিনটেনডেনট ডাঃ প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের অভিযোগে আজ সাসপেনড করেছেন। এদিন মহাকরণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতকুমার পাঁজা এই কথা জানান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্তের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম সচিব শ্রী এ চৌধুরীর উপর।

১৬ এপরিল—শনিবার রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ বর্ধমান জেলার মেমারির কাছে রসুলপুরে চাষী কোলড স্টোরেজ নামে একটি হিমঘর সম্পূর্ণ পুড়ে বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই হিমঘরে লক্ষাধিক মণ আলু রক্ষিত ছিল। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ হিমঘরটি অনেকদিন থেকেই মেরামতের অভাবে জীর্ণ অবস্থায় ছিল। তাছাড়া এর যতটা ধারণক্ষমতা তার অনেক বেশী পরিমাণ আলু এখানে রক্ষিত ছিল।

আজ সোমবার থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল তা পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে গত ৭ এপরিল থেকে এক শ্রেণীর ছাত্রের পিকেটিংয়ের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার ডিপারটমেনটের কোন কাজ হতে পারছে না। আজ থেকে বার্ষিক [illegible] পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল।

বিদেশী সংবাদ

১০ এপরিল—আজ সকালে দক্ষিণ ইরানে ভূমিকম্প হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে ভূমিকম্পে নিহত ও আহতের সংখ্যা কম করেও দু' হাজার। আগের এক বে-সরকারী সংবাদে বলা হয়েছে নিহতের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ হাজার। তা ছাড়া হাজার হাজার লোক আহত ও গৃহহীন হয়েছে।

১১ এপরিল—ভিয়েতনাম যুদ্ধের নব পর্যায়ের আজ ত্রয়োদশ দিবস। এই দিনের নানা খবর ও দাবির মধ্যে দুটি জিনিস সুস্পষ্ট। (এক) থোদ সায়গন অঞ্চলে নিয়মবর্তীর লড়াই শুরু হয়েছে। (দুই) আমেরিকা তার নিজের বিমান হানার পুরনো সব রেকরড ভেঙেছে। মারকিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা ২৪ ঘণ্টায় ৫০৯ বার বিমান আক্রমণ চালিয়েছে।

১২ এপরিল—বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ চালু করেছিল তা দু'এক দিনের মধ্যেই তুলে নেওয়া হবে। বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রণালয় থেকে খবর : তাঁদের অজ্ঞাতেই বিধিনিষেধ চালু করা হয়েছিল।

১৩ এপরিল—ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবরুদ্ধ প্রাদেশিক রাজধানী আনলককে আজও উত্তর ভিয়েতনামীদের হাতে। (আনলক দূরত্ব সায়গন থেকে ৯৬ কিলোমিটার।) দখল করা দক্ষিণ ভিয়েতনামী ট্যাঙ্ক নিয়েই এরা ভোরের আলোয় রাজধানী দখলের লড়াইয়ে মেতে ওঠে।

১৪ এপরিল—ইসলামাবাদ থেকে এক [illegible] খবরে বলা হয়েছে, প্রেসিডেনট ভুট্টো ঘোষণা করেছেন, ১৭ এপরিলের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান গৃহীত হলে ২১ এপরিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। প্রেসিডেনট স্থির করেছেন, আগামী ২১ এপরিল চারটি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন শুরু হবে।

১৫ এপরিল—সায়গনের সংবাদ প্রকাশ : কম্যুনিস্ট সেনাদের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে আনলকের পতন ঘটেছে। আজ মায়াদুপ্পো এই প্রাদেশিক রাজধানীতে সরকারী বাহিনী পুরো-পুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দখল এসেছে মধ্য পার্বত্য অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ঘাঁটি।

১৬ এপরিল—আজ সকালে মারকিন বোমারু বিমানগুলি উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় ও তার উপকণ্ঠে বোমা বর্ষণ করে। মারকিন নৌ ও বিমান বহরের জেট বিমানগুলি ভিয়েতনামের প্রধান বন্দর হাইফংয়ের উপকণ্ঠে বোমা-বর্ষণ করে। ১৯৬৮ সালের পর এই প্রথম হাইফংয়ে বোমাবর্ষণ করা হল।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
জনজীবনে স্বাভাবিকতা—		...	১২৬৯
ব্যঙ্গচিত্র—		...	১২৭০
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—		...	১২৭১
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত		...	১২৭২
বৈদেশিকী—দেবরাজ		...	১২৭৪
এখানে দরজা ছিল (কবিতা)	—শ্রীশামসুর রাহমান	...	১২৭৬
গৃহস্থ হে (কবিতা)—শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়		..	১২৭৬

সূচীপত্র

১. **শতাব্দীর মৃত্যু** ১৫·০০
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

২. **প্যারীচাঁদ রচনাবলী** ১৮·০০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

৩. **বিক্ষুব্ধ রোডেসিয়া** ১৫·০০
ইন্দ্রজিৎ সেন

৪. **ফরিয়াদ** (২য় মুদ্রণ) ৫·০০
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. **পূর্বাভাস** ১২·০০
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

৬. **অশান্ত অরণ্যে** ৬·০০
বিশ্বনাথ বসু

৭. **নাচের পুতুল** ৮·০০
ত্রিলোচন কলমচী

৮. **মহানগর বাদশানগর** ১০·০০
সম্রাট সেন

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, এম. জি. রোড
কলকাতা—৯

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীনৃপেন সেন

genteel

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৬
শনিবার ১৬ বৈশাখ ১৩৭৯
Saturday 29 April 1972

জনজীবনে স্বাভাবিকতা

কিছুকাল আগে পশ্চিমবঙ্গে এক অস্বাভাবিক অবস্থা গিয়েছে; ব্যাপক অশান্তি, খুনোখুনি, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য—এই ছিল তার নিত্যদিনের পরিচয়। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তো প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। এই রাজ্যের কোনো কোনো জেলার অবস্থা বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। কলকাতা শহরের মতন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দিনদুপুরে নির্বিচার খুন-জখম হত, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রের নিস্তব্ধতা নেমে আসত পথে-ঘাটে। এ-রকম এক ভয়ংকর অবস্থার পরিবর্তন যে হয়েছে তা স্বীকার না করলে অসত্য ভাষণ হবে। কলকাতা আজ বারো আনা স্বাভাবিক, পশ্চিমবঙ্গের যেসব জেলায় একদা মানুষ আতঙ্কে গৃহবন্দী হয়ে থাকত সেখানেও জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবু একথা হয়ত বলা যায়, যে-রাহু পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছিল তা থেকে সে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি। এখনও খবরের কাগজের পাতায় প্রায় রোজই দু'চারটি করে অশান্তির খবর পাওয়া যায়। অনুমান করা যেতে পারে, প্রকাশিত খবরের বাইরেও কিছু অশান্তির ঘটনা ঘটছে। সম্ভবত এই কারণে সরকারের পক্ষ থেকে হালে কয়েক বারই সম্পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রায় এবং তাঁর সহকর্মীরাও বলছেন, সরকার সকল রকম গুণ্ডাবাজি দমনে বদ্ধপরিকর।

নির্বাচনের পর স্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে প্রায় এক মাস হল। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত গুণ্ডামি উঠে যাবে এমন আশা অবশ্য করা যায় না, কিন্তু গুণ্ডামি বন্ধ করার জন্যে সরকার সমস্ত দিক থেকে তৎপর এটা মানুষ দেখতে চায়। মনে রাখতে হবে, গুণ্ডামি এক দিক থেকে আজকাল একটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বেশ কিছু অপরাধী-শ্রেণীর ব্যক্তি এই পেশাটিকে জীবিকার অবলম্বন করে নিয়েছে। এরা প্রধানত সুযোগ সন্ধানী, যেদিকে সরকার হেলে এরাও সেদিকে হেলে পড়ে। আজ কংগ্রেসের মধ্যে এই ধরনের সমাজ-বিরোধী একটিও নেই এমন বলা যায় না। সিদ্ধার্থবাবু স্বীকার করেন কংগ্রেসের নাম করে গুণ্ডাবাজি করা হয়; শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন, নানা দল থেকে এবং সমাজ-বিরোধীদের একাংশ ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছে। এই ধরনের অনুপ্রবেশের সংখ্যা তাঁর হিসেবে আপাতত প্রায় চার শো। এরা ঢুকেছে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে। শ্রীমুখোপাধ্যায় হয়ত স্বীকার করবেন, তেমন করে খুঁজলে এই অনুপ্রবেশের সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। আমাদের মনে হয়, সমাজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর রাজনীতির পক্ষেও বিপজ্জনক সকল দুষ্কৃতকারী, সমাজ-বিরোধীদের এই মুহূর্তে যদি অকেজো করে না দেওয়া যায় তবে এরা ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। পেশাদারী গুণ্ডা, সমাজ-বিরোধী দলের [illegible] [illegible] পাড়ায় পাড়ায় [illegible] [illegible] কিছু [illegible] চোখে পড়ে। তার চেয়েও দুঃখের কথা, অসংখ্য ছেলে-ছোকরা আজকাল [illegible] [illegible] পাড়ায় পাড়ায় তাদের প্রতাপ জাহির করতে উন্মুখ। এটা হয়ত [illegible] দোষ, কিন্তু সবটাই এই দোষে ক্ষমাযোগ্য নয়। পুলিস দিয়ে এই শ্রেণীর ছেলেদের চরিত্র পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় না, উচিতও নয়। বরং প্রতিটি পাড়ায় বিশ্বস্ত, আদর্শ কর্মী হিসেবে যেসব যুবক খ্যাতি অর্জন করেছেন, প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করেও যেসব বয়স্ক ব্যক্তি নিজের পাড়ায় মান্য হয়ে উঠেছেন তাঁদের সমবেত উদ্যোগে এই ছেলেদের চরিত্র পরিবর্তন করা যেতে পারে। যদি এরা বোঝে যে, না পাড়ায় না রাজনৈতিক দলে না বা পুলিসের কাছে তাদের অপকর্মের প্রশ্রয় রয়েছে তবে এদের পক্ষে মার্জিত না হয়ে উপায় নেই। [illegible] অন্যায়, ক্ষতিকর কাজ করার অধিকার কারও নেই—এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তারা [illegible] প্রত্যেকটি [illegible] জন্য [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] কিছু ছেলে [illegible] [illegible] পার্টির কর্মীদের মাথা [illegible] সেই [illegible] তারা কোথা থেকে, কার কাছ থেকে পায়? নিজেদের সাহসে তারা এ কাজ কেমন একটা করতে পারে না। যদি না কোথাও প্রশ্রয় পাকে। এই প্রশ্রয় যেদিন থাকবে না সেদিন বাহুবলের দৌড় বোঝা যাবে।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
দ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
৩৩-৮০৫১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
শুল্কসমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক — টাঃ ৩২.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৭.০৭
ষান্মাসিক — টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৫.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৪.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৫৭.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১৪.৭৬

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক — টাঃ ১৫৪.০৪
ষান্মাসিক — টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৩৮.৭৬

পাগলা ষাঁড়ে
করলে তাড়া,
কেমন করে
রক্ষা পাই।
নির্বাচন কমিশনের
রিপোর্ট

ভারতে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা

প্রসঙ্গটা প্রথম ওঠে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায়। তুলেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পি সি শেঠি। শেঠির অভিযোগ : এবার মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনে মারকিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। মারকিন দূতাবাসের এক প্রতিনিধি মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে জনসংঘের লোকজনের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, জনসংঘকে সাহায্য করা এবং কংগ্রেসকে পরাজিত করা।

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার পর এই অভিযোগটা সংসদেও প্রবলভাবে উঠেছিল। স্বভাবতই সি পি আই সদস্যরা মারকিনীদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের এত বড় একটা সুযোগ কিছুতেই ছাড়তে পারেন না। শেষ পর্যন্ত খুব বেশি সুবিধা করতে না পারলেও তাঁরা প্রসঙ্গটা বেশ ভালভাবেই তুলেছিলেন এবং এ নিয়ে বেশ একচোট হইচইও করেছেন।

একজন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপারটা বিশেষভাবে তুললেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার কিন্তু প্রকাশ্যে এ অভিযোগকে খুব বেশি আমল দেননি। তাঁরা সাধারণত এ ধরনের ব্যাপারে যা করেন, এ ক্ষেত্রেও তাই করেছেন—মোটামুটি জিনিসটাকে অস্বীকার করে গিয়েছেন।

অস্বীকার করেছেন জনসংঘ এবং মারকিন দূতাবাসও। তাঁরা দু' পক্ষই বলেছেন, অভিযোগটা সম্পূর্ণ অসত্য। মার্কিন দূতাবাস থেকে বলা হয়েছে যে, "এই ধরনের অসত্য প্রচার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।" আরও কড়া কথা বলেছেন জনসংঘ নেতা। তিনি বলেছেন : কংগ্রেস সর্বদা যেভাবে কুৎসা রটনা করে বিরোধী দলগুলিকে শেষ করার চেষ্টা করছে এ ক্ষেত্রেও তাই করেছে। ওই মারকিন প্রতিনিধির সঙ্গে একজনও কোনও জনসংঘ নেতা বা কর্মী দেখা করেননি। তাঁর কর্মসূচীও তৈরী করে দিয়েছিলেন স্বয়ং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যসচিব।

সেক্ষেত্রে জনসংঘের বিরুদ্ধে এই রকমের মিথ্যা অভিযোগ তোলা জঘন্য অপরাধ।

*

যে যতই অস্বীকার করুন মারকিনীরা বা মারকিনী গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ যে ভারতে নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওই মারকিনী প্রতিনিধি সি আই এ-র লোক কিনা বা তিনি মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে গিয়েছিলেন কিনা, তা জানি না। তবে এটা সত্যি যে মারকিনী কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা নানা মারকিনী সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধি সেজে সি আই এ-র লোকজন আসেন। এরা থাকেন কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা বিশেষজ্ঞ সেজে, কিন্তু আসলে করেন সি আই এ-র কাজ।

এরা যে আমাদের দেশের রাজনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন তাতেও সন্দেহ নেই। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনের সময়ই সি আই এ এবং বিভিন্ন বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে টাকা বিলোবার অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর গোপনে একটা তদন্তও করেছিলেন। সংসদেও এ বিষয়ে বেশ হইচই হয়েছিল। কিন্তু গোপন সরকারী তদন্তের ফলাফল কখনও প্রকাশ করা হয়নি।

এ ধরনের অভিযোগ যে শুধু সি আই এ-র বিরুদ্ধে উঠেছে তাও নয়। অন্যান্য বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধেও বহু বার এই রকম অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে রুশ গোয়েন্দা সংস্থা কে জি বি-র বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা জি আই-সিক্সের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে, চীনাদের বিরুদ্ধে, পশ্চিম জারমানির বিরুদ্ধে, আরও অনেক বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

ওরাও বারংবার ওই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা অনেকেই জানেন যে ওরাও অনেকেই এদেশে নানা গোপন ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত। সি আই এ যেমন আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ওরাও তেমনি করে। যে যত বড়, যার স্বার্থ যত বেশি সে তত বেশি নাক গলাবার চেষ্টা করে।

সমস্ত বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাই তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। একটি উদ্দেশ্য, এ দেশের গোপন খবরা-খবর সংগ্রহের চেষ্টা করা। আর একটি উদ্দেশ্য, নিজ দেশের স্বার্থ মত এই দেশের ব্যাপার-স্যাপার পরিচালনার চেষ্টা করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য, অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এখানে কী কী করছে তার উপর নজর রাখা।

প্রত্যেকেরই ক্রিয়াকলাপের ধরণ-ধারণ মোটামুটি এক। প্রত্যেকেই গোপনে টাকা লেনদেন করে। প্রত্যেকেই কূটনৈতিক প্রতিনিধির নামে গোয়েন্দা আনে। নিজ দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সাহায্য সংস্থার মাধ্যমেও প্রত্যেকেই কিছু কিছু গোয়েন্দাকে এদেশে কাজ করার ব্যবস্থা করে দেয়। প্রত্যেকেই তাদের ক্রিয়াকলাপে এ দেশীয় কিছু ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানেরও সাহায্য নেয়।

কমিউনিস্ট দেশগুলির এ ব্যাপারে অবশ্য বিশেষ সুবিধা আছে। তাঁরা খুব সহজেই এক একটি দলকে পেয়ে যান তাঁদের হয়ে কাজ করার জন্য। যেমন ধরুন সি পি আই-এর কথা। সি পি আই এর নীতি বরাবর নির্ধারিত হয়েছে রুশ পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে। রাশিয়ার পক্ষে কথা বলতে সি পি আইয়ের লোকজন লজ্জিতও নয়। আদর্শগত বন্ধনে একের স্বার্থ আর একের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সি পি আইয়ের লোকজনরা রাশিয়ার গুণ কীর্তনের জন্য এখানে বহু পত্রপত্রিকাও চলান।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ মার্কিন, বৃটিশ বা জার্মানদের এ ব্যাপারে অসুবিধা আছে। তাঁদের কোনও আদর্শগত ভাই বা ভ্রাতৃপ্রতিম দল এখানে নেই। তাই তাঁদের কাজ করতে হয় মূলত টাকার জোরে। এবং টাকার জোরও তাঁদের যথেষ্টই রয়েছে। এর মধ্যে আবার মার্কিনদের টাকার জোর সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বে তাঁদের স্বার্থ ছড়িয়ে। গোটা বিশ্বের উপর তাই তাঁদের নজর রাখতে হয়। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গোটা বিশ্বে কাজ করতে হয়। বহুক্ষেত্রেই তাঁদের স্বার্থ অন্যান্য দেশের স্বার্থের বিরোধী।

*

আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল যে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলির উপর যথাযোগ্য নজর রাখার মত উপযুক্ত প্রতি-গোয়েন্দা সংস্থা বা কাউন্টার ইনটেলিজেনস ব্যবস্থা তাঁদের নেই। এজন্য ট্রেনড লোকজন চাই। চাই বহু বিশেষজ্ঞ। চাই প্রচুর টাকা। এ সব জিনিস না থাকলে

বিদেশী গোয়েন্দাচক্রগুলির ক্রিয়াকলাপের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা না হলে তাদের হাতে-নাতে ধরা সম্ভব নয়।

বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সবই প্রায় বিশেষভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকজনদের নিয়ে গঠিত। খেলার মাঠে নামাবার আগে তাঁদের নানাভাবে তৈরি করা হয়। তাঁদের কাজকর্মের প্রক্রিয়াও অত্যন্ত উন্নত ধরনের। তাঁরা খরচাও করে প্রচুর টাকা।

আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সবাই পুলিশের লোক নিয়ে গঠিত। আজ যিনি লালবাজারে ডি সি হেড কোয়ার্টারস, কাল তিনি হয়ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আঞ্চলিক অধিকর্তা, আবার পরশু হয়ত সেই ভদ্রলোককেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বর্ধমানে ডি আই জি করে। এখনও আমাদের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হন একজন প্রবীণ আই জি—সাধারণত ভারতের সব রাজ্যের আই জিদের মধ্যে যিনি প্রবীণতম তাঁকেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান করা হয়। এখন যিনি আমাদের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কয়েক মাস আগেও তিনি অন্ধ্রের আই জি ছিলেন।

কি রাজ্যে, কি কেন্দ্রে সর্বত্রই আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি পুলিস নিয়ে গঠিত। সর্বস্তরে। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যন্ত। এরা সবাই আবার বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যান। আজ যিনি এস বি তে ও সি নকশাল কাল তিনি হয়ত ডি ডি তে ও সি ব্যাংক। বিশেষ ভাবে ট্রেনিং পাওয়া প্রফেশনালদের নিয়ে আমাদের কোনও গোয়েন্দা দফতরই গঠিত নয়। ফলে আমাদের গোয়েন্দা দফতরগুলি কখনও বিশেষভাবে ট্রেনিং পাওয়া বিদেশী গোয়েন্দা চক্রগুলির ব্যূহ ভেদ করতে পারে না।

ট্রেনিং, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা ছাড়াও আমাদের গোয়েন্দা দফতরগুলির আর একটা বড় অভাব হল টাকার। বিদেশীরা এক একটা অপারেশনে যে টাকা খরচা করে আমাদের গোয়েন্দা দফতর নাকি তার দশ ভাগের এক ভাগ টাকাও খরচা করতে পারে না। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাজকর্মের পদ্ধতিও প্রাগৈতিহাসিক।

এর ফলে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি আজ পর্যন্ত পাকিস্তানী ছাড়া আর কোনও বিদেশী গোয়েন্দা চক্রের কাউকে হাতে নাতে ধরতে পারে নি। তাঁরা আঁচ পান ঠিকই, ভাসা ভাসা একটা জানতেও পারেন যে কে কীভাবে কাজ করছে—কিন্তু, হাতে নাতে কাউকে ধরতে পারে না।

তাই সরকারও কাউকে কিছুই বলতে পারে না। এবং বিদেশী গোয়েন্দাসংস্থাগুলিও মোটামুটি অবাধেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

২৩-৪-৭২।

নবারুণ গুপ্ত

দরিয়ায় তুফান

প্রণালীগুলো হচ্ছে জলপথের অলি-গলি। ডাঙাপথে যেমন দূরপথ এড়াতে গেলে অলিগলি দিয়ে পাড়ি দিতে হয় জলপথেও তাই। অনেক জায়গায় আবার এক সাগর থেকে আর এক সাগরে যেতে গেলে প্রণালী পেরোনো ছাড়া গতি নেই। আকারে ছোট হলে কী হয় প্রণালীগুলোর গুরুত্ব খুবই বেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে যেমন প্রতিরক্ষার দিক দিয়েও তেমন। এমন প্রণালী বিস্তর আছে যা বন্ধ করে দিলে তার আশেপাশের দেশগুলো ফাঁপরে তো পড়বেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধে চালানো শক্ত হবে। দুনিয়ার যে কোনও মহাসমুদ্র থেকে আর এক মহাসমুদ্রে পাড়ি অবশ্য দেওয়া যায়। তার পথও একটি মাত্র নয়। কিন্তু এমন গোটাকতক প্রণালী আছে যেগুলো এড়িয়ে যেতে গেলে সময়ও লাগবে বেশী, খরচও। বিরাট বিরাট জাহাজ—তা মালবাহীই হোক কী যাত্রী জাহাজই হোক কিংবা যুদ্ধ জাহাজই হোক ওই সব প্রণালী পেরিয়ে এক দরিয়া থেকে আর এক দরিয়াতে পাড়ি। তাদের বাধা না দেওয়াই রেওয়াজ।

সে রেওয়াজ মানতে চাইছে না অমনই এক প্রণালী মালাক্কার দু-পারের দু দেশ ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়া। ও প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগর থেকে সিঙ্গাপুর প্রণালী ডিঙিয়ে পড়া যায় দক্ষিণ চীন সমুদ্রে, সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল বিস্তারে। চোঙার মতো দেখতে প্রণালীটির উত্তর মুখটা তিন শ মাইল চওড়া হলেও দক্ষিণে তার নাকের মতো অংশটা কুল্লে চল্লিশ মাইল চওড়া, কোথাও কোথাও কুঁকড়ে তা চব্বিশ মাইলে দাঁড়িয়েছে। বিস্তর জাহাজ হামেশা চলাফেরা করে ওই শুঁড় সাগর পথ

দেবরাজ

দিয়ে। সে আনাগোনা আদৌ হালের ব্যাপার নয়। ও পথ দিয়েই ভারত থেকে অভিযাত্রীরা গিয়ে উপনিবেশের পত্তন করেছে মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে, ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়েছে চীন-জাপানের সঙ্গে। ওপথ ধরেই যাওয়া আসা করেছে আরব, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ আর ইংরেজ সদাগর। চীনারা এই প্রণালী বেয়ে এসেই আস্তানা গেড়েছে ইদানীংকালে সুমাত্রা আর মালয়ের উপকূলে। জাপানীদেরও দুনিয়ার সঙ্গে জলপথের যোগ এই প্রণালী।

গেল বছর মার্কিন সপ্তম নৌবহর পাক-ভারত যুদ্ধের সময় মালাক্কা প্রণালী পেরিয়ে এসে পৌঁছেছিল বঙ্গোপসাগরে ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিতে। তার পেছু পেছু রুশ নৌবহরও ধাওয়া করেছিল মালাক্কা প্রণালী দিয়েই। তারপর যে যার ঘাঁটিতে ফিরে গিয়েছে ওই সামুদ্রিক গলিপথেই। কাজটা দু দেশের কোনও দেশই বেআইনী বলে মনে করেনি।

কেন না আন্তর্জাতিক বিধি হচ্ছে দুটো সাগরকে যে জলপথ যুক্ত করেছে তা দিয়ে অবাধে যাতায়াত করার সব দেশের জাহাজেরই অধিকার আছে শান্তির সময়। আশেপাশের দেশগুলোর তাতে বাধা দেওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই, কোনও শর্তও তারা অপরের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। কী জাপান, কী চীন, কী রাশিয়া, কী আমেরিকা সকলেই প্রয়োজন মতো মালাক্কা প্রণালী ব্যবহার করতে পারে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া কিংবা সিঙ্গাপুর কাউকে না জানিয়ে, তাদের কাছ থেকে কোনও ছাড়পত্র না নিয়ে যদি মালাক্কা প্রণালী আন্তর্জাতিক দরিয়া বলে গণ্য হয়।

হালে মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়া দাবি তুলেছে মালাক্কা প্রণালী আন্তর্জাতিক প্রণালী মোটেই নয়। তা হচ্ছে তাদেরই এলাকা। তাতে সায় দিয়েছে সিঙ্গাপুরও, তবে খানিকটা দোনোমোনো হয়ে। এ দাবির যুক্তি হচ্ছে দু দেশের উপকূল থেকে বারো মাইলের মধ্যে পড়ে মালাক্কা প্রণালীর দক্ষিণের খানিকটা অংশ। তার ওপর স্বত্ব স্বামিত্ব তাদেরই, সে এলাকাটা আন্তর্জাতিক দরিয়ার মধ্যে পড়ে না। কাজেই তারা চাইছে তাদের না বলে কোনও বিদেশী জাহাজের এই প্রণালী দিয়ে যাওয়া আসা করা চলবে না। শুধু তাই নয়, ডুবো জাহাজগুলোকেও প্রণালী পেরুবার সময় ভেসে উঠতে হবে, ডুবসাঁতার জলের তলা দিয়ে আনাগোনা তাদের বারণ। ছোটখাটো জাহাজের চলাফেরায় উপকূলের দেশগুলোর আপত্তি নেই, কিন্তু বড় জাহাজগুলোকে সে সুবিধে দিতে তারা রাজী নয়। ইন্দোনেশিয়া তো জেদ ধরে বসেছে দু লাখ টনের বেশী ভারী বাণিজ্য জাহাজকে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে

যেতেই দেওয়া হবে না। বন্ধু জাহাজ অনুমতি নিয়ে অবশ্য যেতে পারে।

সমস্যাটা ক জটিল করে তুলেছে একটা দেশের উপকূলের দরিয়াতে কতটা পর্যন্ত তার এক্তিয়ার সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও বিধানের অভাব। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। এককালে ধরে নেওয়া হতো একটা দেশের উপকূলের দরিয়ার তিন মাইল পর্যন্ত তার সীমানা। ও নিয়ম মানতে কিন্তু অনেক দেশই আজ নারাজ। মাছ ধরা এখন একটা বিরাট ব্যবসা, তিন মাইল মাত্র দরিয়ার চৌহদ্দী হলে সে ব্যবসাতে বিস্তর অসুবিধে, বড়লোক প্রতিবেশী রাষ্ট্র জাহাজ ভরে মাছ ধরে নিয়ে যাবে, ফাঁকিতে পড়বে গরীব দেশগুলো যাদের লাগাও দরিয়ায় আছে মাছের আস্তানা। নানা সম্পদও এখন পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্র থেকে যা মাণিকের চেয়েও দামী। তাদের মধ্যে আছে তেল আর গ্যাস। কাজেই অনেক দেশই তাদের দরিয়ার সীমানা বাড়িয়ে করতে চাইছে অন্তত বারো মাইল। এতে বনেদী ধনী দেশগুলো রাজী নয়। ছ মাইল পর্যন্ত বাড়াতে তারা নিমরাজী, তার বেশী যেতে তারা নারাজ। এ ব্যাপার নিয়ে গোটা দুই আন্তর্জাতিক বৈঠক বসেছে কিন্তু কোনও ফয়শালা আজও হয়নি। আসছে বছর আর একটা বৈঠক বসার কথা আছে।

অন্য সব বৈঠকী বিধি মানতে ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়া রাজী নয়। তারা সাফ বলে দিয়েছে তাদের দরিয়ার সীমানা বারো মাইল। কাজেই মালাক্কা প্রণালীর ওপর এক্তিয়ার তাদেরই ষোলো আনা। যদি কোনও দেশ তাদের হুকুম তামিল করতে না চায় তা হলে [illegible]দ্বীপ ঘুরে সে যেতে পারে, সে পথ তো খোলাই আছে। যাওয়া অবশ্য সে দিক দিয়ে যায়ও কিন্তু তাতে ঝামেলা বাড়বে। জাপান বিশেষ করে ফাঁপরে পড়বে মালাক্কা প্রণালী বন্ধ হলে। তার তেল আর কাঁচা মাল আসে ও পথ দিয়ে, তৈরি মালও যায় বিদেশের বাজারে। ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার দাবি তারা নাকচ করে দিয়েছে। রাশিয়ারও ওই একই কথা। তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া কী মালয়েশিয়ার হুকুমের তোয়াক্কা না করে মালাক্কা প্রণালী দিয়েই তারা যাতায়াত করবে যেমন এতকাল ধরে এসেছে। আমেরিকারও ওই মত, তবে তারা জানান দিয়েই মালাক্কা প্রণালী ধরে আসা যাওয়া করে বারো মাইল দরিয়ার দাবি না মেনে নিয়েও। এই সুযোগে রুশীদের এক হাত নিয়েছে চীন। যদিও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তার বনিবনা নেই তবু দাবিই সে ন্যায্য বলে মেনে নিয়েছে, গাল দিয়েছে মস্কোকে পরের ওপর গায়ের জোরে নিজের মত খাটাচ্ছে বলে।

এখানে দরজা ছিল

শামসুর রাহমান

এখানে দরজা ছিলো, দরজার ওপর মাধবী-
লতার একান্ত শোভা। বারান্দায় টব, সাইকেল
ছিলো, তিন চাকা-অলা, সবুজ কথক একজন
দাঁড়বন্দী। রান্নাঘর থেকে উঠতো রেশমী ধোঁয়া।

মখমল পায়ে কেউ, এঁটোকাঁটাজীবী, অন্ধকারে
রাখতো কখনো জেবলে এক জোড়া চোখ। ভোরবেলা
খবর কাগজে মগ্ন কে নীরব বিশ্ব-পর্যটক
অকস্মাৎ তাকাতেন কাকময় দেয়ালের দিকে।

ভাবতেন শৈশবের মাঠ, বল-হারানোর খেদ
বাজতো নতুন হয়ে। মুহূর্তে মুহূর্তে শুধু বল
হারাতেই থাকে, কোনো হুইসিল পারে না রুখতে।
ক্ষতির খাতায় হিজিবিজি অঙ্কগুলি নৃত্যপর।

এখানে দরজা ছিলো, দরজার ওপর মাধবী-
লতার একান্ত শোভা। এখন এখানে কিছু নেই,
কিছু নেই। শুধু এক বেকুব দেয়াল, শেল-খাওয়া,
কেমন দাঁড়ানো, একা। কতিপয় কলঙ্কিত ইঁট
আছে পড়ে ইতস্তত। বাঁ দিকে তাকালে ভাঙাচোরা
একটি পুতুল পাবে, তা ছাড়া এখানে কিছু নেই।

ভগ্নস্তূপে স্থির আমি, ধ্বংসচিহ্ন নিজেই যেন বা;
ভস্ম নাড়ি জুতো দিয়ে, যদি ছাই থেকে অকস্মাৎ
জেগে ওঠে অবিনাশী কোনো পাখি, যদি দেখা যায়
কারুর হাসির ছটা, উন্মীলিত স্নেহ, ভালোবাসা।

গৃহস্থ হে

শংকর চট্টোপাধ্যায়

আর তো আমার কাজ বাকি নেই
গৃহস্থ হে।
আর তো আমার জীবন নদীর
ঘুরতে ফিরতে সপ্তপদীর
নেই প্রয়োজন—বিরাম এখন
যাচ্ছি এবার।
আর তো আমার নেই প্রয়োজন
বেলা যে যায়
বিন্দু বিন্দু রক্তকণায়
ফুটছি নিজে—আপন চিতায়—গৃহস্থ হে।

প্রেমিকের সবটুকু নেয়

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

ফুলেরা ভ্রমর ভালবাসে কুঁড়ি থেকে চিনে রাখে তাকে
অর্থাৎ দস্যুর কাছে লুণ্ঠিত হবার লোভ জাগিয়ে রেখে
পুষ্পের বিকাশ হয় গন্ধে পর্ণে হলুদ কৌমার্যে
তাদের বুকের মাঝে রাজপাট আছে
যেমন একটি নারী চাবির গোছাটি দিয়ে সংসারের
অনেক দরজা খোলে বাক্স আলমারি—এ সবই
মানুষেরই কাছ থেকে পাওয়া ফুলেরা যেমন ভ্রমরের থেকে
প্রত্যহ চুম্বন

প্রত্যেক নারীই তার গূঢ় মন্ত্রে প্রেমিকের সবটুকু নেয়

স্বপ্নের খেলাঘর

অজয় ভট্টাচার্য্য

এলগিন রোডের মুখে বাস থামতেই সহসা শ্যামলী দেখতে পেল, ফুটপাতে পরমেশ দাঁড়িয়ে আছে একা। অনেকদিন পর দেখা—তবু সে একনজরেই পরমেশকে ঠিক চিনতে পারে। সে তৎক্ষণাৎ বাস থেকে নেমে এগিয়ে এল। এ সময় হঠাৎ পরমেশের চোখ তার দিকে; সে অনুসন্ধিৎসু চোখে দু একবার শ্যামলীকে দেখে সামনে তাকাল।

আসলে ওর চোখে স্মৃতি-বিস্মৃতির দোলা. তোলপাড় স্মৃতিমন্থন—এই স্থির ভাবনার মাঝে শ্যামলী বলে ওঠে, 'চিনতে পার?'

'তুমি শ্যামলী! আশ্চর্য!' পরমেশ বিহ্বল নিচু গলায় উচ্চারণ করে।

শ্যামলী কাছে এসে কয়েক পলক পরমেশের দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রায় পনের বছর পর দেখা হল, কিন্তু পরমেশ এখনো তেমনি যুবক আছে; শরীরে বয়সের চিহ্ন তেমন কিছু পড়েনি। বলল, 'তোমাকে দেখেই বাস থেকে নেমে পড়লাম। অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল।'

পরমেশ বলল, 'আমি তো কাছেই পদ্মপুকুরে থাকি, প্রায় প্রতিদিন এই রাস্তায় হেঁটে যাই. অথচ একদিনও তোমাকে রাস্তায় দেখিনি।'

শ্যামলী বলল, 'তুমি তো আজও আমাকে দেখতে পাওনি, আমিই তোমাকে দেখতে পেয়ে বাস থেকে নেমে পড়লাম।

পরমেশ বলল, 'এমন ঘটনা হয়ত আগেও কতদিন ঘটেছে, আমরা কেউই টের পাইনি। দুজনেই আছি কলকাতায়, অথচ কতদিন পর—।'

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকার পর শ্যামলী বলল, 'তুমি ইচ্ছে করেই এতদিন আমার খোঁজ নাওনি।'

পরমেশ কোন উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরাল। শ্যামলী একথা বলল কেন? এই দীর্ঘ অসাক্ষাতে সে কি কোনদিন পরমেশের খোঁজ-খবর নিয়েছে! আসলে এটাই স্বাভাবিক, এভাবেই বিচ্ছিন্নতা আসে. দীর্ঘ অসাক্ষাতে পুরোনো উত্তাপ নিবে যায়। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে সে কি নিজেই আর আগেকার মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! আসলে সময়ের স্রোতে সব যায়, সব কিছুই ভেসে যায় সুদূর ভিন্নতায়। এবং কোন কিছুই আর ফিরে আসে না ঠিকঠাক, কোন কিছুই আর ফিরে পাওয়া যায় না অবিকল। এই তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে শ্যামলী একদিন দুজনের দেখা না হলে কী অসহ্য

কণ্ঠ সেই যুবকের! আজ কোথায় সেই উন্মাদনা! দীর্ঘ পনের বছর সে দিনগুলি কাটিয়ে দিয়েছে সাক্ষাতহীন।

এইসব দ্রুত চিন্তায় জেগে ওঠে স্মৃতি ও বিষাদ, কয়েক মুহূর্ত উদাস অন্বেষণ। অতঃপর পরমেশ স্থির চোখে লক্ষ করছিল শ্যামলীকে। শ্যামলী সামান্য অস্বস্তি অনুভব করল। সিঁথিতে সিঁদুর, শরীরে 'কণ্টিং' বয়সের চিহ্ন: এ সবের ভিতর পরমেশ কি পুরাতন শ্যামলীকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে! সে অস্ফুটে বলল, 'কেমন আছ?'

পরমেশ বলল, 'আমি আছি প্রায় আগের মতই, এলোমেলো, গতানুগতিক একা, কেমনভাবে দিনগুলো কেটে যায়। কিন্তু তোমার তো অনেক পরিবর্তন দেখছি স্বামী সংসার নিয়ে বেশ পরিপূর্ণ মেয়েলি জীবন।'

শ্যামলী এবার কোন উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকার পর অন্যমনে বলল, 'অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল।'

পরমেশ পুনর্বার একথা শুনে অন্য-মনস্ক হয়ে গেল। আজ শুক্রবার, [illegible] ছুটির দিন, ছুটির এই বিকেলে শ্যামলী দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। এই দীর্ঘ অসাক্ষাতে পরস্পরের ভিতরে জমে গেছে অজস্র কথা, অনেক ছোট-বড় ঘটনা, অজানা পরস্পরের কাছে, ঘটে গেছে এই দীর্ঘ সময়ে। শ্যামলী এখন কোথায় থাকে, কোথায় ওর স্বামীর ঘর। কেমন স্বামী! চাকরি করে! অধ্যাপনা! না-কি ব্যবসা! অনেক কৌতূহল এখন পরমেশের। ফুটপাথে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে শুধু বলল, 'কোথায় যাচ্ছিলে? কোথায় থাক আজকাল?'

শ্যামলী বলল, 'গড়িয়াহাটের দিকে, ওদিকেই থাকি আজকাল।'

শ্যামলীর কথা শুনে কিছুই পরিষ্কার হয় না। গড়িয়াহাটের দিকে ওদিকেই থাকি আজকাল—ওদিকেই অনেক [illegible] কোন রাস্তায়—কোনখানে কোন [illegible] থাকে শ্যামলী। গড়িয়াহাট রোডেই—না-কি আশপাশে কোনও রাস্তায় নিজেদের বাড়ি —না-কি ভাড়াটে! [illegible] আগে ও [illegible] নর্থ-বাগবাজারে। ওর [illegible] এখনো সেখানেই থাকে! এইসব [illegible] মধ্যে পরমেশ শুনল শ্যামলী [illegible], 'এখানে বড্ড ভিড়। চল কোথাও বসা যাক।'

ভিড় কাটিয়ে ওরা একটা চায়ের দোকানে এল। চায়ের দোকান শ্যামলীর পছন্দ [illegible] হাঁটিতে হাঁটিতে ওরা লোয়ার সারকুলার রোডের মোড় ছাড়িয়ে গেল, ময়দানের নির্জন ঘাসে বসল।

এখন বিকেল। বৈশাখের [illegible] সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছে প্রচুর। [illegible] হাওয়ায় শ্যামলী এলোমেলো [illegible] হাওয়ায় শ্যামলীর চুল উড়ছে [illegible] এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এই হাওয়ায় [illegible] অনেক কিছু উড়ে যায় ঝরে যায়, [illegible] থেকে ভেসে আসে পুরাতন [illegible] শ্যামলীর মুখোমুখি বসে আছে পরমেশ [illegible] কারো মুখেই কোন কথা নেই শুধু [illegible] তীব্র স্মৃতি রোমন্থন। এই [illegible] পনের বছরের ব্যবধান পার হয়ে ফিরে [illegible] দুটি উজ্জ্বল যুবক-যুবতী। [illegible] যায়, এখানে—এই ভিক্টোরিয়া [illegible] রিয়ালের উল্টোদিকে সমস্ত ভিড় [illegible] হয়ে ঘাসের নির্জনে ওরা বসেছে [illegible]

দিন। এমনি অনেক তুচ্ছ কথা, অনেক স্বপ্ন নিবিড় [illegible] ওদের ক্রমাগত মনে পড়ে।

এই সকরিয়িক স্তব্ধতা ও স্মৃতিচারণের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে ওদের মুখে দু-একটি কথা উচ্চারিত হচ্ছিল। পরমেশ বলল, 'শ্যামলী, একদিন তোমাদের বাসায় যাব, তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও।'

শ্যামলী বলল, 'যেও। কিন্তু উনি তো কোনদিন দেখেননি তোমায়, কি পরিচয় দেব তোমার?'

'সত্যি কথাই বলবে, এই যুবক তোমার প্রাক্তন প্রেমিক।'

'শুনে ভদ্রলোক বড়ই খুশী হবেন। তারপর তুমি চলে গেলে আমাকে বলতেই হবে সেই পুরাতন গল্প প্রেমের কথা। সেই প্রথম যৌবনে গোপন মন দেওয়া-নেওয়া—রোমান্স জাল করে দানা না বাঁধতেই সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি—বেশ সুন্দর একটা গল্প ভদ্রলোককে শোনানো যাবে।'

একথা শুনে পরমেশ হেসে উঠল। তরল গলায় বলল, 'রোমান্স দানা বাঁধেনি মানে! প্রায় দু বছর আমাদের প্রেম চলেছিল, তারপর তুমি এক রাজপুত্রের জন্যে মালা গাঁথতে বসে গিয়েছিলে; হায়, কবে তুমি চলে গেলে সেই রাজপুরীতে—আমি কিছুই জানতে পারিনি।'

শ্যামলী কপট ভ্রুভঙ্গি করে পরমেশের পিঠে কিল মারল। মৃদু গলায় বলল, 'খুব ফাজলামি হচ্ছে!'

পরমেশ বলল, 'তুমি চলে গেলে বহুদিন শুকিয়ে ছিল সব, আবার ফুলে ফলে ভরে উঠেছে সব বৃক্ষরাজি।'

শ্যামলী চাপা শাসনের স্বরে বলল 'বুড়ো বয়েসে নাটক হচ্ছে!'

'বুড়ো আর কোথায়, আমার সবে সাঁইত্রিশ চলছে; এখনই তো গনগনে যৌবন আমাদের।'

'গনগনে যৌবন আমাদের' অংশটি শ্যামলীর মনে কয়েক মুহূর্ত ভেসে থেকে পিছলে চলে যায় স্মৃতি-বিস্মৃতির গহনে। সে বলে ওঠে, 'যৌবন দ্রুত চলে যায়, বার্ধক্যের দিন এগিয়ে আসে।'

শ্যামলীর ভঙ্গিতে পুরোনো দিনের তরলতা থাকলেও উচ্চারণে বিষাদ ঝরে পড়ে। এই বিষণ্ণতা মানুষের সুখের সঙ্গেই ওতপ্রোত—এই ভাবনায় ধূসর পরমেশ শ্যামলীকে লক্ষ করল। এলোমেলো উড়ন্ত চুলে ঢাকা শ্যামলীর মুখের কিয়দংশ তার চোখে আসে। বহুদূরে থেকে পুরাতন শ্যামলী ফিরে আসে ফিরে যায়। যেন বহুদূরে থেকে উচ্চারিত হয়, 'শ্যামলী, তুমি খুব ভাল মেয়ে।'

শ্যামলী নতমুখে ঘাসের ডগা ছিঁড়ছিল। যেন সে অনেকদিন আগের কলেজ-পালানো এক ভীরু মেয়ে, সামনে বসে

আছে পরমেশ; তার চেয়ে দু বছরের সিনিয়র এই দামাল ছেলেটা তারই মত কলেজ পালিয়ে এসেছে ময়দানের এই নির্জনে। এই সব গোপন ভাবনায় পলককে মহিলার যেন ঈষৎ আত্মবিস্মরণ ঘটে যায়—যেন সে যথার্থই এক কলেজ-পালানো লাজুক মেয়ে, স্নিগ্ধ মধুর প্রণয় হচ্ছে এক যুবকের সঙ্গে। অস্ফুট এই অমল প্রণয় যেন স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসেছে এইখানে—এই ঘাসের নির্জনে, দুজনের বিমুগ্ধ চেতনায়—চকিতে এই অনুভব থেকে শ্যামলী জেগে উঠতেই এক অনাস্বাদিতপূর্ব ব্যথায় বুকের মধ্যে হুহু করে ওঠে, তার চেতনার সর্বত্র দ্রুত বিষাদ বয়ে যায়। ভাল লাগে না, এসব তার মোটেও ভাল লাগে না। কেন যে আবার পরমেশকে ফুটপাথে দেখে বাস থেকে নেমে পড়ল! সাধ করে কেন বাস থেকে নেমে পড়া—হায়, সাধ করে কেন—হায়, কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে—হায়, এ কোন প্লাবনে পলকে তার হৃদয় আপ্লুত হয়ে যায়।

পরমেশ লক্ষ করছিল শ্যামলীকে। সহসা সে বলল, 'কি ভাবছো?'

শ্যামলী ক্লান্ত শিথিল স্বরে বলল, 'এমন কিছুই নয়, এমনি এলোমেলো অনেক কথা মনে আসে, অর্থহীন তুচ্ছ অনেক কথা;—ওই যে দুটি ছেলেমেয়ে হেঁটে যাচ্ছে, কথা বলছে, আমি মনে মনে ভেবে নিচ্ছি... ও নিতান্তই ছেলেমানুষী, তাই না?'

যেন বহু দূর থেকে শ্যামলী এই সব কথা উচ্চারণ করছে—তার স্বরে এরূপ আত্মমগ্নতা জমে আসে। স্পষ্টতই সে অন্যমনা। কোনক্রমেই শ্যামলী তার উচ্চারিত শব্দসমূহে পুরোপুরি উপস্থিত থাকে না। পরমেশ অপার কৌতূহল বোধ করে বলে, 'মনে মনে ভেবে নেওয়া নিতান্তই সহজ, আমিও জানি, ওরা কি সব কথা বলছে; এভাবেই পনের বছর আগে আমরাও কথা বলেছি, পনের বছর পরেও একই কথা ওরা বলবে, বলে যাবে চিরকাল।'

শ্যামলী বলল, 'আজ ভারি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।'

এরকম হাওয়া এই বৈশাখে প্রতিদিন বিকেলে কলকাতায় আসে। তবু শ্যামলী বলে, আজ ভারি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। তার চোখ ভাবনাময়, সে আর তখন ওই যুবক-যুবতীকে দেখছে না, তার চোখ শূন্যে, অনির্দিষ্টে। কত দূরে তার চোখ যায়, স্মৃতি ও ভাবনাগুলি যায়! কোন ভাবনার অতলে ভেসে যায় শ্যামলী। এখন পুনর্বার পরমেশ প্রশ্ন করলে শোনা যাবে, এমন কিছুই নয়, এমনি অনেক তুচ্ছ কথা মনে আসে, ভেবে যাই—। পরমেশের মনে হল, শ্যামলী যেন তার কাছে কিছু লুকোচ্ছে। কি কথা ভাবছিল ও। সে দেখল, শ্যামলী এখন মৃদু গলায় একটা গানের সুর ভাঁজছে। অন্যমনে সে ওই গান ভাঁজছিল। এসময় তার কেবলি মনে হচ্ছিল, যেন শ্যামলী নয়, যেন এক অচেনা মহিলা তার সামনে বসে আছে। বস্তুত এই বিবাহিতা মহিলা তার কাছে অনেকখানি অচেনা। স্বামী সংসার ও দাম্পত্যের বহস্যঘেরা এই বর্তমানের শ্যামলীকে সে কতটুকু চেনে! তোমার দাম্পত্য জীবন কি সুখের! না কি দুঃখের! অভিজিত ঘোষ নামধারী লোকটি দেখতে কেমন? লম্বা কেমন? দুটি কেমন? কেমন চাকরি করে সে? তোমার গান আর স্নিগ্ধ ছেলেমানুষী তার কতখানি ভাল লাগে! সে কি যথার্থই তোমাকে ভালবাসে! শ্যামলী, তুমি কি সুখী! তুমি কি সুখী।

শ্যামলী দেখল, দূরে, ভিক্টোরিয়ার আশপাশে অনেক লোকের ভিড় প্রচুর নারী-পুরুষ ওইখানে ইতস্তত ভ্রমণশীল এবং রাস্তার দুদিক থেকে অসংখ্য গাড়ির ছুটে যাওয়া ও পার্ক করা; তার মনে হল যেন ওই ভিড়ের নর, সে যেন বহুদূর থেকে মুক্ত আলোয় মানুষের প্রফুল্ল-ভ্রমণ দেখছে। বহুদিন পর সে আজ এসেছে আলো হাওয়া আর সবুজের উৎসবে; যেন দূরে থেকে ছুঁয়ে দেখছে মানুষের আনন্দময় ভ্রমণ। এই সব চিন্তায় সে বড় ব্যথিত, এসময় অভিজিতের অনাকৃষ্ট মুখচ্ছবি বারবার তার চোখে ভেসে উঠছিল। অভিজিতের সঙ্গে সে কি কোনদিন এরকম মুক্ত ভ্রমণে এসেছে। মনে পড়ে না—এরকম কোন স্মৃতিই তার মনে আসে না। শুধু মনে পড়ে যায়, তারও খানিক পরে তাকে ফিরে যেতে হবে অভিজিতের সংসারে। সেখানে, সেই দুই কামরার ফ্ল্যাটে সংসারে ফিরে গিয়ে সে থাকবে প্রতিদিনের মত অভিজিতের প্রতীক্ষায়; প্রতিদিনের মত ঈষৎ মদ্যপ অভিজিত ফিরবে রাত্রি দশটার পর। তারপর প্রতিদিনের পৌনঃপুনিক দুটি শরীরের উষ্ণ আশ্লেষে ভালবাসা জাগরণ। শরীরের ভিতর দিয়েই অভিজিত ভালবাসার প্রকাশ, শুধু শরীর-সর্ব ছাড়া আর কিছুই সে জানে না, এ-ই ত

রীতি. এভাবেই তার প্রণয়ের প্রয়োজন মিটে যায়; আর যুবতীর মনে ক্রমাগত ঘৃণার পাহাড় জমে ওঠে, ক্রমে সে নিজের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, ক্রমে তার দীর্ঘ দিনের বছর কেটে যায়।

ওদের পাশ দিয়ে কয়েকটি যুবক হেঁটে যাচ্ছিল। যেতে যেতে ওরা দুজনকে কয়েকবার লক্ষ করল, কিন্তু কোন মন্তব্য না করে ওরা পার্ক স্ট্রীটের দিকে মুখ করে মাঠ পার হতে থাকল।

পরমেশ বলল, 'ছেলেগুলো তোমাকে দেখছিল। এখনো তুমি আগের মতই যুবকদের আকর্ষণ করতে পার!'

শ্যামলী বলল, 'তোমার খুব খারাপ লাগছিল, তাই না?'

'মোটেও না, আমার পাশে একটি সুন্দরী মহিলাকে দেখে সকলের ঈর্ষা হচ্ছে; আমি তো পরম সৌভাগ্যবান যুবক। এই ব্যাপারটা চুপচাপ উপভোগ করতে আমার বেশ মজা লাগে।'

'চুপ করো।'

পরমেশ কেন এখন এসব কথা বলে! ভাল লাগে না, এসব কথা এখন আর মোটেও ভাল লাগে না। তবু, অলক্ষ্য থেকে কী যে এক রহস্যময় ভাল লাগার অনুভব তার মর্মমূল কাঁপিয়ে দিয়ে যায়! ওই অনুভব নিমেষ-মধ্যে রক্তের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে. শ্যামলী বহুদূরে থেকে বলে, 'পরমেশ, তুমি তো আর ওই যুবকদলের নও।'

পরমেশ যেন আরো দূরে থেকে তখন বলছিল 'আমি ওই যুবকদলের নই, আমি দলছাড়া সেই একমাত্র যুবক, সে জানে, কোথায় আছে সেই পৃথিবীর মহার্ঘতম বস্তু।'

শ্যামলী কোন কথা না বলে শব্দ হাসল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। শেষ বিকেলের নরম আলোয় সব কিছুই অন্য রকম লাগে। আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে কয়েকটি পাখি উড়ে যায়। কোথায় ওরা যায়, এই আসন্ন সন্ধ্যার আগে ওরা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে—এই অকিঞ্চিৎকর জিজ্ঞাসায় পুরাতন শ্যামলীর চকিত-মুখচ্ছবি দেখা যায়; ওই চকিত উদ্ভাসে এক শুদ্ধ অমল জীবন, যেখানে মুক্ত আলোয় দুটি প্রাণ ভেসে যায়, অলৌকিক গান আর কবিতার দিগ্বিদিকে এক সহজ উৎসব জেগে ওঠে। কিন্তু সব কিছুই ওই পাখির ডানায়, অবেলায় বহু দূরে ভেসে যায়।

পরমেশ বলল, 'শ্যামলী, রবিবার সকালে তোমরা আমার বাসায় এসো, অভিজিত আর তোমার ছেলের সঙ্গে ওখানেই আলাপ-পরিচয় হবে। তারপর বেশ হইচই আনন্দ আর গানে সারা দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে।'

শ্যামলী বলল, 'ওর সময় কোথায়! ছুটির দিনেও সব সময় কাজ আর কাজ, কাজের ব্যস্ততায় সে আমাদের ছেলেমানুষী হইচই মোটেও বরদাস্ত করবে না।'

এই সব কথার ভিতরে সহস্রবায়ু ছুটে আসে ঝড়। যুবতীর হৃদয়ের গোপন গভীরে এক ঘর, যেখানে প্রথম যৌবনকালের সঞ্চিত অনেক মূল্যবান সামগ্রী, অনেক দিন তালাবন্ধ থাকায় সে ভুলেই গিয়েছিল ওই গোপন সম্পদের কথা; আজ প্রবল ঝড়ে দরজা খুলে যেতেই দেখে চতুর্দিকে শান্ত নরম আলোর বিচ্ছুরণ। শ্যামলীর মনে হয়, ওই ঘর সহস্র যোজন দূরে; কোনদিন ওখানে সঠিক পৌঁছনো যাবে কি! সে কিছুই ভেবে পায় না, শুধু তার চোখে বিভ্রান্তি ঘনিয়ে আসে।

আসলে কোথাও সঠিক পৌঁছনো যায় না। কোথায় সেই অব্যর্থ পৌঁছে যাওয়া? শুধু পথভ্রমে দীর্ঘ বেলা বয়ে যায়, ওই সব মূল্যবান সামগ্রী বিস্মৃতির অতলে ক্রমশ প্রোথিত হয়ে যেতে থাকে। শ্যামলী ভাবে, ওই সম্পদ সকলের নাগালের বাইরে এক গভীর গহনে অম্লান প্রচ্ছন্ন থেকে যাবে, শুধু মাঝে মাঝে চকিতে খুলে যাবে ওই দরজা, সে সশ্রদ্ধ চোখে পলকে জরিপ করে নেবে সব। সেসব সময়ে খুব নির্জনতা চাই, চাই অখণ্ড প্রখর মনোযোগ —সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিতে হবে তো! তখন জেগে উঠবে এক সদানুরক্তী, তখন আর অভীপ্সিতের সঙ্গে শরীরের খেলা নয়, সেই শারীরিক অভ্যাস থেকে বহু দূরে—চাই এক পবিত্র প্রেম, চাই আলোর নম্র জাগরণ...

চতুর্দিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল দ্রুত। ওদের আশপাশ ক্রমে ফাঁকা হয়ে আসতে থাকায় শ্যামলী মৃদু অস্বস্তি বোধ করছিল। এখানে আর বেশীক্ষণ বসে থাকা নিরাপদ নয়—ভাবল। কিন্তু দূরে ভিক্টোরিয়া, যেখানে এই বৈশাখের দিনে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের ভ্রমণ-বিলাস। 'ওইখানে চলো' শ্যামলী ভিক্টোরিয়ার দিকে আঙুল তুলে বলল।

পরমেশ সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'আমরা বেশী দূরে বসে নেই, এখানে আর ভয় কিসের!'

বস্তুত এই সন্ধ্যায় জনতার এত কাছে থেকেও কেন ভয়! শ্যামলী এই অমূলক ভয়ের কথা ভেবে হাসল। কলেজে পড়ার সময় সে পরমেশের সঙ্গে এসব জায়গায়

অনেক দিন এসেছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও কোন দিন সেরকম কিছুই ঘটেনি; পারস্পরিকও কোন দিন বিশেষ বাড়াবাড়ি করেনি। তবে আর ভয় কিসের, তবে কেন ওই ভিড় ও কোলাহলের মধ্যে যাওয়া! বরং এই নির্জনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ বসে থাকি। স্তব্ধতার ভিতর থেকে এক সময় উঠে আসবে স্নিগ্ধ মধুর গান, আর সেই গান আর স্তব্ধতার ভিতর দিয়ে এক সময় উদাসীন পরস্পর ফিরে যাব আপন আপন ঘরে।

আহ, কী ভালোই না লাগে এই স্তব্ধ বসে থাকা! ওই দূরের কোলাহল যেন সমুদ্রপারের, আর এখানে গভীর অতল জলস্রোত, অনির্বচনীয়তায় ভেসে যাই— ভেসে যাই—।

সহসা শ্যামলী আবেগে উদ্বেলিত হল যুবকের চকিত আলিঙ্গনে যেন সে অনন্ত কাল হতচকিত বিহ্বল। অতঃপর অভ্যাস-বশে টের পায় শরীরের সর্বত্র অগ্নিময় তীব্র লেহন, সেই কামপূর্ণ আশ্লেষ ও চুম্বনে বিপন্ন দগ্ধ। এসময় যুবকের সর্ব অবয়বে সে অভিজ্ঞতাকেই অসহায় প্রত্যক্ষ করছিল।

এবার পয়লা বোশেখের দিন সকালে রমনা গ্রীনে 'ছায়ানট'-এর বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুনলাম। গাছতলায় সবুজ ঘাসের ওপর শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে বসে বসে গান শুনতে শুনতে শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষের অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ও'রা গাইছিলেন, 'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে', 'পূর্বগগন ভাগে', 'আলোকের এই ঝরনাধারায়', 'আনন্দধ্বনি জাগাও'। সেই সঙ্গে ছিল নজরুলের 'উদার অম্বরে', 'মৃত্যু নাই নাই দুঃখ আছে শুধু প্রাণ'। একের পর এক গান। মাঝে মাঝে আবৃত্তি—রবীন্দ্রনাথ থেকে। কিছুটা নিজেদেরও কমপোজিশন।

পয়লা বোশেখের নববর্ষ অনুষ্ঠানে কোন বাহ্যাড়ম্বর চোখে পড়েনি। দিনটি ছিল সরকারী ছুটির। বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হয়েছিল মেলা। তার মধ্যে প্রধান আকর্ষণ রমনা গ্রীনের এই অনুষ্ঠান।

রমনা গ্রীনে বর্ষবরণ উৎসবের পত্তন করেন 'ছায়ানট'। ষাটের দশকের গোড়ায় এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। কিন্তু পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের দান অপরিসীম বলে আমি শুনেছি। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর লগ্নে নতুন করে রবীন্দ্রচর্চার ঢেউ গিয়ে পৌঁছয় পূর্ব বাংলায়। সে ঢেউ দোলা জাগায় বহু মানুষের প্রাণে। বললে অত্যুক্তি হবে না, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎস সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন এবং সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথ। মনে আছে গত বছর ২৫ বৈশাখের দিন আমি ছিলাম সীমান্তেরই কোন জায়গায়। সেখানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মী ও স্বাধীনতা যোদ্ধারা মিলে রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বলতে উঠে কুষ্টিয়ার এক তরুণ নেতা কেঁদে ফেললেন! ঘটনাটা এখনও ভুলতে পারিনি।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার কথা উঠলেই ছায়ানটের কথা এসে পড়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা মিসেস সন্জীদা খাতুন ছায়ানটের সঙ্গে জড়িত। ঢাকায় তাঁর অফিসে বসে শুনেছি 'ছায়ানট'-এর ইতিহাস।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বছরে ঢাকার কিছু রবীন্দ্র অনুরাগী সিদ্ধান্ত নেন কবির জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের। জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট [illegible] দের বাড়িতে তাঁরা এক বৈঠকে মিলিত হন। সভাপতি ছিলেন বিচারপতি মাহবুব। গোপীবাগের কিছু সংস্কৃতিমনা যুবক আর একটি কমিটিও গঠন করেন। শেষ পর্যন্ত দুই কমিটি মিলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর তিন দিনের প্রোগ্রাম হল। কিন্তু তার ফলে সরকারের রক্তচক্ষু গিয়ে পড়ল উদ্যোক্তাদের ওপর। উদ্যোক্তাদের মধ্যে জনাব আনোয়ার জাহিদ গ্রেফতার হন। বেগম সুফিয়া কামালকে চীফ সেক্রেটারির ধমকের পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংস্কৃতি কর্মীদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করল। সরকারী রক্তচক্ষু তাঁদের করল আরও সংহত। ও'রা একদিন জয়দেবপুরে পিকনিক করতে গিয়ে ঠিক করে ফেললেন, গড়তে হবে এক সাংস্কৃতিক সংগঠন—যাঁরা থাকবেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে। জয়দেবপুরের বাগানে জন্ম হল ছায়ানটের। সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল। সেক্রেটারি ফরিদা হাসান। কিছুদিন পরে ছায়ানটের প্রকাশ পুরনো গানের আসর দিয়ে। বিদ্যাপতি, অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের গান গাওয়া সে যুগে ছিল দুঃসাহসের পরিচয়।

সন্জীদা খাতুন বলে চলছিলেন, ছায়ানটের প্রথম যুগে উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন, মুখলেসুর রহমান ও তাঁর পত্নী সামসুন্নাহার রহমান, ওয়াহিদুল হক, সাইফুদ্দীন আহমেদ (মানিক), আহমেদুর রহমান (ভীমরুল), মীজানুর রহমান (ছানা)। সেক্রেটারি ছিলেন কামাল লোহানী।

ওয়াহিদুল হকের মুকুলেশ্বর রহমানের বাড়িতে ছায়ানটের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। ফরাসপাতা, নীচু ডায়াস, প্রায়ান্ধকারে প্রচুর ফুল। জ্বলছে মোম বাতি। সম্পূর্ণ বাঙ্গালী পরিবেশ। গান হয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ক্লাসিক্যাল। ছায়ানটের প্রথম যুগে শিল্পী ছিল কম। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, শিল্পী তৈরি করবেন। তৈরি করবেন স্কুল। প্রথম ক্লাস আরম্ভ হল বাংলা আকাদামিতে। কিন্তু সরকারী কোপানলে পড়ে ছায়ানটকে বহুবার বাড়ি বদল করতে হল।

১৯৬৭ সালে খাজা সাহাবুদ্দীন যখন পাকিস্তানের তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে তিনি ফতোয়া জারি করেন। ৪০ জন বুদ্ধিজীবী তাঁকে সমর্থন করে সরকারী করুণায় বিগলিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১১৭ জন বুদ্ধিজীবী আবার তার পালটা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ঢাকায় সাংস্কৃতিক জীবনে সেদিন প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছিল। শুরু হয়েছিল সংগ্রাম। ঢাকার সমস্ত সংগঠন মিলে তার প্রতিবাদে ইনজিনিয়ার্স ইনসটিটিউটে তিন দিনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

সঞ্জীদা বলছিলেন, '৬৭ সাল থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তীব্রতা এবং তা রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। ছায়ানট এর পরিপ্রেক্ষিতে লালিত হয়ে ওঠে। তাঁরা করতে থাকেন বসন্তোৎসব, শারদোৎসব, নববর্ষ উৎসব। বলধা গার্ডেনে কেয়াপুকুরে নৌকা ভাসিয়ে শারদোৎসবের অনুষ্ঠান করা হত। সেই সঙ্গে হত ২৫ বৈশাখ, ১১ জ্যৈষ্ঠ বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান। বাঙালী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে যাঁর দান সবচেয়ে বেশী সেই আহমেদুর রহমান (কলম লেখক ভীমরুল নামে খ্যাত) কারো [illegible] দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুদিন স্মরণে ছায়ানটের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ আর্মি ক্র্যাক ডাউনের পর ছায়ানটের কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। অধিকাংশ পালিয়ে যা ভারতে। ছায়ানটের ইকবাল আহমদ গ্রেফতার হন। আজ তিনি মুক্ত। তা অত্যাচারের ফলে শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন। ছায়ানটের কমল সিদ্দিকী লড়াই করেছেন। তিনি হারিয়েছেন একটি চোখ।

ঢাকায় এখন নামকরা সাংস্কৃতি সংগঠনের সংখ্যা অনেক। এদের ম বুলবুল ললিতকলা অকাদেমি ক্র আর্ট সেন্টার, নিক্কন ললিতকলা কে ক্রান্তি মিউজিক কলেজ, নজরুল অকাডেমি উদীচী, আলতাফ মাহমুদ সঙ্গীত শিক্ষা পীঠ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আ হয়ত আছে। কিন্তু যে নামগুলি প্রমা মিসেস সাজেদা খাতুন সংগ্রহ করে দিয়ে সেগুলির কথাই উল্লেখ করলাম। সবার

বুলবুল ললিতকলা আকাদামি তার মধ্যে প্রাচীন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার জনাব আতিকুল ইসলাম সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। সেই পাকিস্তানের আমলে আকাদামি কলকাতা থেকে শ্রীভক্তিময় দাশগুপ্তকে রবীন্দ্র সংগীত শেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। ভারতীয় নৃত্য শিক্ষক নিয়ে এসে মণিপুরি নাচ শেখাবারও চেষ্টা চলছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, ক্লাসিকাল নাচের চর্চা পূর্ব বাংলাতে খুব একটা গড়ে উঠতে পারেনি। অভাবটা ছিল শিক্ষকের। সংস্কৃতি কর্মীরা এখন সরকারী সহযোগিতায় ললিতকলা আকাদামি খুলতে যাচ্ছেন। তাঁদের আশা, এই আকাদামিতে শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে। শিল্পীর এখানে অভাব নেই। শিখবার মত মনও আছে চাই শুধু সুযোগ। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ অতি শীঘ্র যে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে তাতে এই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ আরও উন্মুক্ত হবে।

*

এখানে সেদিন খবরের কাগজে পড়লাম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের ব্যবস্থাপত্র লেখা হচ্ছে বাংলায়। যেমন:

মুখতার হোসেন : ২৭ বৎসর
২৮-৩-৭২
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ
রক্তচাপ : ১২০/৭০ মিঃ মিঃ পারদ
ধমনীর গতি : ৭৬ প্রতি মিঃ
তাপ : ৯৮.৭০ ফাঃ
রাতের নির্দেশ
ইনজেকশন লারগাকটিল ৫০ মিঃ গ্রাঃ মাংস পেশীতে
তরল প্যারাফিন
১ অাউন্স শোবার সময়

সর্বস্তরে বাংলা চালু করার জন্য এখানে যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চলেছে তাতে আর কিছু না হোক এটা প্রমাণিত হবে বাংলাকে সর্বস্তরে চালু করা যায় না বলে একদল যে প্রচার চালিয়ে আসছিল তা নিতান্তই

অসার। ইংরেজী বা উর্দু থেকে এই যে বাংলায় উত্তরণ এটি কিন্তু এসেছে স্বতস্ফূর্তভাবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সর্বস্তরে বাংলা প্রচারের কোন সুসংহত চেষ্টা এখনও পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে জনগণ গ্রহণ করেছেন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অপরিহার্য অংগ হিসাবেই।

অবশ্য প্রতিটি ক্রিয়ারই আছে প্রতিক্রিয়া। ব্রিটিশ ভারতের উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা যেমন পেয়েছি ইংগ ভারতীয় অপসংস্কৃতি, তেমনি এখানকার শহরের বিত্তবান সমাজের এক অংশ পাকিস্তানী আমলে ইংগ মার্কিন কালচারকেও সেভাবে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালীর সাংস্কৃতিক মুক্তির এত বড় আন্দোলন, জাতীয়তাবাদের এত বড় আহ্বান এখনও এই সমাজের কাঠামোকে পরিবর্তিত করতে পারেনি।

অবশ্য পেপ-কালচারের বিরুদ্ধে এখানকার ছাত্র নেতৃত্ব খুবই সোচ্চার। সংবাদপত্রগুলিও সরব। ছাত্রনেতারা বার বার বলেছেন, একমাত্র খাঁটি বাঙালী ছাড়া আর কোনো বিদেশী অপসংস্কৃতি বাংলার মাটিতে বরদাস্ত করা হবে না। বাংলার শ্যামল মাটিতে হিপি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে। যেমন বেসুরো লাগে দেশের অন্যদিকে অভাব অনটন দারিদ্র্য ও ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে এক শ্রেণীর অব্যাহত বিলাস বৈভব। বঙ্গবন্ধুর শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন যদি বাংলাদেশে ব্যর্থ হয় তা হলে সে ক্ষতি এশিয়ার নিপীড়িত মানুষেরই হবে।

*

বিদেশী প্রচারযন্ত্র ঢাকায় এখন খুবই সক্রিয়। স্বীকৃতি দেবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইউ এস আই এ পুরোদমে কাজ শুরু করেছেন। ব্রিটিশ তথ্য দফতর কাজ শুরু করে দিয়েছেন আগে থেকেই। রাশিয়ার তথ্য দফতরেরও একটি আলাদা বাড়ি আছে। কিন্তু ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়! একজন মোটা বেতনের অফিসার নিয়োগ ছাড়া ভারতীয় দূতাবাসের তথ্য দফতরই গঠন করা হয়নি। পাকিস্তানী আমলে যে বিরাট ভারতীয় গ্রন্থাগার ছিল তার বইপত্র গাদা করা পড়ে আছে। সে গ্রন্থাগার আজও খোলেনি। কোন ভারতীয় তথ্য পত্রিকা এখনও পরিবেশিত হয়নি। যে প্রেস রিলিজ কদাচিৎ বার হয়ে থাকে তার কাগজ, খাম দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। না আছে একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন, না আছে প্রেস রিলিজ ছাপবার লেটার হেড। এখানকার সংবাদপত্রগুলি ভারত সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করতে চান। কিন্তু তথ্য তাঁরা পান না।

কোন কোন সংবাদপত্রে তীব্র ভারত-বিরোধী প্রচার চলছে। জনগণ বিভ্রান্ত হতে পারেন ভেবে ভারতীয় দূতাবাসের তথ্য বিভাগের কি উচিত নয় অতি দ্রুত ভ্রান্তি নিরসনের? যে ক্ষিপ্রতা, আন্তরিকতা এবং কর্মদক্ষতার জন্য এতদিন ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের তথ্য বিভাগের সুনাম ছিল, তা যেন আজ অবলুপ্ত হতে চলেছে।

*

এপার বাংলার পাঠক শ্রেণীর বিশেষ অভিযোগ ওপার বাংলায় ইসলামী শব্দ ও নাম অশুদ্ধভাবে ছাপা হচ্ছে। এই অশুদ্ধি নিয়ে অনেকে বিশেষ ক্ষুব্ধ। আমার কাছে তাঁরা অনেকেই অনুযোগ করেছেন। তাঁদের অনুযোগ সঙ্গত। এ ব্যাপারে আমার নিজের বলার কোন অধিকার নেই, কারণ অজ্ঞতাপ্রসূত উচ্চারণবিকৃতির ফলে অশুদ্ধ কয়েকটি বানান আমি নিজেও লিখেছি। এজন্য লজ্জার আমার অন্ত নেই। নামের বানান লেখার ব্যাপারে বিদেশী সংবাদপত্রগুলো যেভাবে প্রযত্ন নেন আমরা সেভাবে নিই না। আরবি ফারসী শব্দের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেক আগেই ঘুচে গেছে, তার ফলে সঠিক বানান এখনও আমাদের অধিগত নয়। দ্বিতীয়ত, উচ্চারণের সুবিধার জন্য অথবা কিছুটা খেয়াল খুশির বশেই আমরা বহুদিন থেকে বিকৃতভাবে অনেক নাম উচ্চারণ করে আসছি। যেমন সুহরাওয়ার্দী চিরকালই সুরাবর্দী হয়ে থাকলেন। মুজিবুর রহমান হয়েছেন মুজিবর। (লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠে......) মুশররফকে লেখা হয় মোশারফ বা মোশারেফ। সাখাওয়াতকে সাখোয়াত, আহমদকে আমেদ। আমি জহির রায়হানকে জহির রয়হান লিখে বহু ব্যক্তির কোপানলে পড়েছিলাম। (অবশ্য জহির নামটি একটি এখানকার কবিতাপত্রেও চোখে পড়েছে।) আমি মোটামুটি একটি তালিকা করেছি যাতে দেখান যাবে ইসলামী নাম আমাদের দেশে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়ঃ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মোহম্মদ	মোহাম্মদ
সিরাজৌদ্দল্লা	সিরাজউদ্দৌলা
শাহেদুল্লা	শহীদুল্লা
আবদুল্লা	আবদুল্লাহ্
নূরে আলম্ সিদ্দিকি	নূর-এ-আলম সিদ্দিকী
সাহবুদ্দিন	শাহাবুদ্দিন
সামসুর	শামসুর
মোস্তাফা	মোস্তফা
মণিরুজ্জমান	মণিরুজামান
তোহা	তোয়াহা
ফতে গফফর	ফতেহ্ গাফ্ফর
লুৎফুর	লুৎফর
হাবিবুর	হাবিবুর

উচ্চারণ বিকৃতির ফলে নামের বিকৃতি বা নতুন নামকরণ ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে নতুন ঘটনা নয়। বিশেষ করে স্থানের নামের ক্ষেত্রে বিদেশী কঠিন নাম ছেটে ফেলে ইংরাজরা তো নতুন নামই আমদানি করেছে। যেমন, প্রাহা হয়েছে প্রাগ, মিউনিসেন—মিউনিখ, চট্টগ্রাম—চিটাগাং, কলিকাতা, ফরাসীদের কাছে ক্যালকুটা। পদবীর ক্ষেত্রে ভাট, বোস, চ্যাটার্জি, যে এই সব বিকৃত উচ্চারণ এখন সর্বজন স্বীকৃত।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা ভাষাতে যখন ধ্বনিগত উচ্চারণ লিখবার সুবিধা আছে তখন ইসলামি নাম লেখার ব্যাপারে শুদ্ধ বানান লেখা ও উচ্চারণের দিকে এখনই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বাংলা সংবাদপত্রগুলির সঠিক নামের তালিকা থাকা প্রয়োজন। বাংলা অভিধান প্রণেতাদের আমি অনুরোধ করব প্রচলিত ইসলামি নামের নির্ভুল উচ্চারণের একটি দীর্ঘ তালিকা তাঁরা যেন সংযোজিত করেন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণকল্পে রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবিত বিনিয়োগ কর্মসূচী

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতি অনুমোদন করে থাকেন। কিন্তু সেই নীতির খুঁটিনাটি দিক বিচার-বিবেচনা করে তা বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব হল সরকারের। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি সরকারের যে নীতি ঘোষণা করে থাকেন তা তৈরি করার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। আমাদের দেশে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি তৈরি করে থাকেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও যোজনা কমিশন এবং তা অনুমোদন করেন পার্লামেন্টের সদস্যগণ। কিন্তু সম্প্রতি এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম আমাদের চোখে পড়েছে। আমাদের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন। শ্রীগিরির কর্মসূচী একজন অভিজ্ঞ প্রশাসক, তথা শ্রমিকনেতা ও অর্থনীতিবিদের প্রস্তাবিত কর্মসূচী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে,—এটা ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবিত কর্মসূচী ঠিক-ই, কিন্তু শ্রীগিরি নিজেও একজন প্রৌঢ় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর লেখা "Our Labour Problems" এবং "Jobs For our Millions" বই দুটি দেশের শ্রমিক-সমস্যা ও বেকার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাছাড়া শ্রীগিরি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী থাকা কালে শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তি কিভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে যে নীতি প্রণয়ন করেছিলেন তা আজও কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতির মূল ভিত্তি। শ্রীগিরির সেই শ্রমনীতি "Giri Approach" নামে আজও বিখ্যাত। শ্রীগিরির অতীত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর কর্মসংস্থান নীতির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে, এবং সেই মনোভাবের ভিত্তিতেই আমরা এই নীতির মূল্যায়ন করব।

আগে শ্রীগিরি "Jobs for Our Millions" বইয়ে এই জিনিসটির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে সবার জন্য বিশেষ করে কৃষক ও কারিগরদের জন্য উৎপাদনাত্মক কর্মসংস্থান হতে পারে। সম্প্রতি বেকার সমস্যা ও কর্মসংস্থানের অবস্থা সম্পর্কে ভগবতী কমিটি যে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন দিয়েছেন তাতে এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কয়েকটি স্বল্পকালীন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে স্বল্পকালীন বিনিয়োগের পরিণতি হিসাবে ভবিষ্যতে বর্ধিত হারে কর্ম-সম্প্রসারণ হবে। বিশেষ করে দীর্ঘকালীন গ্রামীণ উন্নয়নের গোড়ায় কয়েকটি স্বল্পকালীন বিনিয়োগ প্রকল্পই ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। জমি উপনিবেশীকরণের মাধ্যমে লাভজনক কর্মপ্রচেষ্টা সৃষ্টির উপর রাষ্ট্রপতি গিরি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শ্রীগিরির মতে যেহেতু আমাদের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক এবং যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমিক কারিগরী শিক্ষায় সুদক্ষ

নয়, সেজন্য আমাদের ভেবে দেখা উচিত গ্রামীণ সমাজকে এমনভাবে সংগঠিত করা যায় কিনা যাতে স্ব-নিয়োজিত কর্ম-সংস্থানের সুযোগ আরও বাড়ে। গ্রামাঞ্চলে এজন্য যে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া উচিত সেগুলি যাতে স্ব-নির্ভরশীল ও স্বয়ম্ভর হতে পারে,—অর্থাৎ প্রতিটি বিনিয়োগ ইউনিট যাতে দীর্ঘকালে লাভ-জনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে দ্রুত অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে সেদিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে শ্রীগিরি মনে করেন। শ্রীগিরির মতে প্রতি পরিবারের জন্য ৫ একর জমি মোটামুটিভাবে ধরে নিয়ে ২০০ পরিবারের জন্য ১২০০ একর জমি একটি বিনিয়োগ ইউনিটের আওতায় আনা উচিত। এভাবে একটি সুসম্বন্ধ ব্লক তৈরি করতে হবে। একটি ব্লকের জন্য আরও ২০০ একর জমি সংরক্ষিত রাখা উচিত, গৃহ, স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণের জন্য। সরকার এই ইউনিটগুলির তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থসাহায্য করবেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিটই স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পারে। তবে শ্রীগিরি মনে করেন, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনগণের প্রয়োজন মেটাবার মূল দায়িত্ব থাকা উচিত সরকারের হাতে। প্রতিটি ব্লকে প্রথমেই জমি উদ্ধার, বাসস্থান নির্মাণ, জলসেচের সুবিধা সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যদি জমি উদ্ধারের জন্য অধিক পরিমাণ বিনিয়োগের ও মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, তবে এগুলির দায়িত্ব নেওয়া উচিত সরকারের। এই ইউনিটের জমিতে প্রথম ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধ সরবরাহ, বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং এমনকি প্রয়োজনবোধে বলদ সরবরাহে পর্যন্ত সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত; তবে এগুলি সরকার ঋণ হিসাবে সরবরাহ করতে পারেন এবং কৃষি পরিবারগুলির কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ বছরের সহজ কিস্তিতে এই ঋণের টাকা ফেরত নেওয়া যেতে পারে। প্রথম পাঁচ বছরে যখন কৃষি ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হবে এবং উদ্ধার করা পতিত জমি থেকে ফসল পাওয়া যাবে তখনই এই বিনিয়োগের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। তখন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন স্তরে আসবে যখন কৃষি-ভিত্তিক শিল্প অর্থনীতি গঠন করার জন্য দেশের উৎপাদনমূলক প্রচেষ্টাগুলিকে বিকেন্দ্রীত করা যায়। প্রতিটি ব্লক কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করলে গ্রামাঞ্চলে কল-কারখানা স্থাপন করা বা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। শিল্পক্ষেত্রেও বিনিয়োগের ধারা এমনভাবে প্রবাহিত হওয়া উচিত যাতে গ্রামীণ শিল্প-গুলি বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হয়। এক্ষেত্রে শ্রীগিরি কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্পের পরস্পরের পরিপূরক হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই বিনিয়োগের তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ জমি উপনিবেশীকরণের ও জমি উদ্ধারের দশ বছর পর উন্নয়ন হার যদি এমন স্তরে আসে যে নতুন কর্ম-সংস্থানের সম্প্রসারণ করা সম্ভব তাহলেই গ্রামীণ অর্থনীতিকে শিল্পমুখী করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ হল, প্রতিটি পর্যায়ে কর্মক্ষম লোকদের, কৃষকদের ও শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী বিদ্যায় সুশিক্ষিত করে তোলা।

রাষ্ট্রপতি গিরির মতে এই প্রকল্পের মূল নীতি হবে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপকরণগুলির উপর যৌথ মালিকানা; বিশেষ করে, নতুন যে জমি উদ্ধার করা হবে তার উপর যৌথ মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত করা। যদিও প্রতিটি পরিবারের হাতে পাঁচ একর জমি থাকবে এবং তারও উত্তরাধিকারী থাকবে তবুও এই নিয়ম চালু করতে হবে যে, কোন পরিবারই জমির মালিকানা হস্তান্তরিত করতে পারবে না, এবং সব পরিবারকে একই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জমির সদ্ব্যবহার করতে হবে। জনসাধারণের ইচ্ছার কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে হবে,—যাতে উন্নতি ব্যক্তি কেন্দ্রিক না হয়ে সমাজ কেন্দ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ হয়। প্রতিটি ব্লকের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তা দেখার দায়িত্ব থাকবে প্রশাসনিক পরিষদের হাতে। শ্রীগিরির প্রস্তাবিত প্রকল্প গৃহীত ও কার্যকর হলে প্রতিটি উন্নয়ন ব্লকে লাভজনক কর্মসংস্থান বাড়বে, সামাজিক মালিকানার নীতি আরও কার্যকর হবে, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সুফলগুলি ভোগ করা যাবে, স্ব-নির্ভরশীল উন্নয়নের পথ সুগম হবে, জনগণের সামাজিক মূল্যবোধ ও চেতনা বাড়বে এবং সর্বোপরি গরীবি হটাবার পথে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার পথে আরও এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে। যখন দেশে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে তখন জমি উপনিবেশীকরণের মাধ্যমে লাভজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রকৃতই বাঞ্ছনীয়। শ্রীগিরির প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান নীতি ও বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পর্কে এজন্য বিশেষভাবে অনুশীলন হওয়া দরকার। যদি সরকার প্রাথমিক বিনিয়োগ-ব্যয়ের ভার বহন করতে পারেন তবে এই ধরণের বিনিয়োগ প্রকল্প সফল না হওয়ার কোন কারণ নেই।

সুব্রত গুপ্ত

শ্রীমতী পিরোশ্‌কা সাবো

ওঁর সঙ্গেও দেখা হলো অল্পক্ষণের জন্য। যেমন দেখা হয়েছিল পূর্ব জার্মানীর শ্রীমতী থিয়েলের সঙ্গে। এক সঙ্গে গিয়েছিলেন অনেকেই বাংলাদেশের মহিলা পরিষদের আমন্ত্রণে। একথা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাংলার মহিলা পরিষদ এখন ছিন্নভিন্ন সমাজ আর সংসারের টুকরোগুলি জোড়া লাগিয়ে নূতন ভবিষ্যতের আশায় কাজে লেগেছেন। বিশ্ব নারী সমাজের সাহায্য চাই। তাই পরিষদের কর্ণধার বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ মহিলারা ডেকে নিয়েছিল এক বিরাট কনফারেন্স ভারতের ন্যাশনাল ফেডারেশন এবং অন্যান্য বহু দেশের মহিলা সংস্থার প্রতিনিধিদের। তার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাঙ্গেরীর মহিলা সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী পিরোশ্‌কা সাবো ও তাঁর প্রতিনিধিদল।

শ্রীমতী সাবো ভারী সুন্দর শান্ত শ্রীময়ী মহিলা। যৌবনের রূপ দেখেছেন তো, এ তেমন রূপ নয়। প্রবীণার প্রশান্ত স্থির সৌন্দর্য। কানায় কানায় ভরা জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর রেশমের মত নরম কোমল সাদা চুলে এনেছে নূতন দর্শন। মুখে এনেছে মায়ের মোহিনী মমতা। হাঙ্গেরির মহিলা সংস্থা একটিই। সারা দেশে, শহরে গ্রামে শাখা প্রশাখায় ভরা। সমগ্র নারীসমাজের মুখপত্র এক হওয়াতে বিশেষ প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান তাঁদের মহিলা সংস্থাটি। শ্রীমতী সাবো সেই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রভাবে lib-এর মারমুখী বিপর্যয়ের ঝড় নেই, আছে কর্তব্যের নিশ্চিন্ত ঠিকানা।

শ্রীমতী সাবোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একটি সান্ধ্য ভোজের আসরে। অবকাশ অল্প ছিল কথাবার্তা বলার। তবে তিনি বলে গেছেন, ফিরে গিয়ে আমাদের জন্য পাঠাবেন তাঁদের নারী প্রগতির ইতিহাস। কেমন করে মাত্র কয়েক বছরে রমণীর আপন জায়গা জয় করবার অধিকার সে জয় করে চলেছে। আজ তাঁর মন বাংলাদেশের বিপন্ন জনের, দুঃখিনী নারীসমাজের যে নারী সমাজের লক্ষ লক্ষ মেয়ে পাক বাহিনীর পাশবিক বলাৎকারে অন্তঃসত্ত্বা, সেই বিষম বিষময় পরিস্থিতির স্মৃতিতে ভরা। শ্রীমতী সাবোর সঙ্গে কথা বলছিলেন বেগম হবিবুল্লা। বেগম সাহেবার পরনে ঢাকাই শাড়ি, অন্তরে ঢাকার স্মরণ সব। কথা হচ্ছিল সেই স্মরণের। একটি বাঙালী মেয়ে এসে কেঁদে পড়েছিল। তার প্রিয় যে মুক্তিবাহিনীতে চলে গেল, বলে গেল ফিরে আসবে দেশের মুক্তির শেষে, সে তো কই এলো না। তাকে কেউ বা বলে পাকিস্তানী সৈন্য তাকে ধরে নিয়ে গেছে, কেউ বা বলে আর কিছু। সে বিশ্বাস করে না। নিশ্চয় সে অপ্রকৃতিস্থ। হয়তো ভারতের পথে পথে পাগল মানুষটি ঘুরে ফিরছে, ভুলে গেছে তার অতীত, ভুলেছে তার প্রতিশ্রুতি। বেগম সাহেবা উত্তরপ্রদেশের অভিজাত অন্দরের নারী, আজ টুরিজম ও সমাজ কল্যাণের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অতএব প্রভাবশালী মহিলা। "ওগো, খুঁজে দাও সেই খাপা মানুষটিকে!" জেনারেল হবিবুল্লার ঘরণী শক্ত অভিজ্ঞতায় শক্ত মজবুত মন, কাহিনীটি উল্লেখ করতে গিয়ে চোখের সীমানা ছাড়িয়ে ধারা নেমে এল। শ্রীমতী সাবোর ঘন নীল নয়ন দুটিও তৎক্ষণাৎ ভিজে উঠেছে। আমার মনে পড়ছিল নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র। যুদ্ধের পর সুভদ্রা বলছেন :

"আমরা নারী, বিশ্বজননীর ছবি, আমাদের শত্রু মিত্র নাই, বরিষার ধারা সম অজস্র জননী-প্রেম সর্বত্র ঢালিয়া চলি যাই।"

কথায় কথায় হাঙ্গেরির নানা খবর জানতে ইচ্ছে হলো। ইউরোপের রোমাঞ্চময়ী নদী

শ্রীমতী পিরোশ্‌কা সাবো

ড্যানিউব। তার তটে ঘটেছে কত ঘটনা, তাকে ঘিরে হয়েছে কত রটনা। সেই নদী হাঙ্গেরির হৃদয়, হাঙ্গেরির শত শত যুগের সুর বেসুরের সাক্ষী। রাজধানী বুদাপেস্তে। প্যারীর মতই নদীর এপার ওপার জুড়ে নগর। অনেকে বলেন, যেন দ্বিতীয় প্যারী। কিন্তু হাঙ্গেরীর শ্রীমতী রিবকা একদিন বলেছিলেন, হাঙ্গেরীর উপর ফ্রান্সের চেয়েও জার্মান প্রভাব বেশী। যেন অস্ট্রিয়া থেকে ড্যানিউব নদী বয়ে এনেছে তাদের কৃষ্টি। অস্ট্রিয়ার পর ড্যানিউব আরও অপরূপ হয়ে হাঙ্গেরির বুকে সকল শীতল করে গান গড়িয়ে রুমানিয়া যুগোশ্লাভিয়া বেয়ে কৃষ্ণসাগরে মিশেছে।

একদিন আমাদের জমায় মাগিয়ার

কাট্ খুব ফ্যাশন চলছিল। সেই ম্যাগিয়ার হচ্ছে এই হাঙ্গেরির নমুনা। হাঙ্গেরির এক কোটি মানুষ যে "ম্যাগিয়ার" নামে অভিহিত। তাদের ভাষা ম্যাগিয়ার। এখন অবশ্য ম্যাগিয়ার মানুষ অন্য ইউরোপীয় থেকে ভিন্ন বলে চেনা ভার। মাত্র ভাষাটাই ভিন্ন। ম্যাগিয়ার ছাঁটের ব্লাউজ আর তার বিশেষত্বপূর্ণ এম্ব্রয়ডারি সারা বিশ্ব জয় করেছিল। আজও ঐ অঞ্চলের ছুঁচের নকশা অপূর্ব। ড্যানিউবের তীরে তীরে গড়ে ওঠা সুরের মত শিল্পসৃষ্টির আবেগে ভরা।

হাঙ্গেরিয়ান রন্ধনশিল্পও রসিকের রসনায় রোমাঞ্চ জাগায়। পাপ্রিকা তার প্রধান অবদান। পাপ্রিকা আমাদের লঙ্কার সমগোত্রীয়। সবুজ পাপ্রিকা ব্যবহার হয়। তার চেয়েও বেশী হয় পেকে যাওয়া লাল টুকটুকে পাপ্রিকা। বিশ্বের সব বিশিষ্ট ভোজনবিলাসীর আসরে পাপ্রিকা পৌঁছেছে। যেমন পৌঁছেছে জাপানের সুকিয়াকি, চীনের ফ্রায়েড্ রাইস আর ভারতের কারি। পাপ্রিকা দিয়ে তৈরী পরিবেশন "গুলাস"ও বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। গুলাস খেয়েছি। রন্ধন প্রণালীটি রপ্ত করতে পারলেই আপনাদের কাছে পেশ করবো।

পাপ্রিকা আর গুলাসের রসে ভরা ম্যাগিয়ার মানুষ কিন্তু পরম অতিথিপরায়ণ। বুদাপেস্তে পৌঁছে রাস্তার মোড়ে একবার প্রশ্ন করুন, জিজ্ঞাসা করুন কোন পথ নির্দেশ, লোক জমে যাবে। কে কার আগে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে তার পাল্লায় আপনি হয়তো হতবাক হবেন। হয়তো বা সদ্য পরিচিত মানুষটি হাত ধরে নিয়ে যাবে গন্তব্যে। চাই কি পথিমধ্যে গুলাসের এক গ্রাস বা পাপ্রিকার কড়া স্বাদ কপালে থাকলে জুটে যাবে।

পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশের মতই হাঙ্গেরিতে মা হওয়াতে মানা নেই। সমগ্র দেশে জনসংখ্যা এক কোটি! কাজেই মা হওয়ার মস্ত মান। শিশুর তিন বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত মা পান প্রায় ১৫০ টাকার মত ফ্লোরিন। এই তিন বছরে যদি আর একটি সন্তান হয়, তবে তিনে তিনে ছয় হয়ে যাবে প্রাপ্তিযোগের মেয়াদ!

আর একটি খবর দিয়েই আজ শেষ করবো। এই যে মহিলা সংস্থা, তার একটি মহিলা পত্রিকা আছে। প্রতি সংখ্যা চার-পাঁচ টাকার মত দাম। কিন্তু যতই চেষ্টা করুন, পথের ধারে এমন কি কোন স্টলেও কিনতে পাবেন না। আগে থেকে পয়সা দিয়ে বুক করা আছে শেষ কপিটিও। অথচ সস্তা ফ্যাশন বা বিলাসিতার জন্য নয়। নারী জীবনের সব সমস্যা, কঠিন প্রশ্ন নিয়ে গড়া এই পত্রিকা।

শ্রীমতী

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা

অমিয়সূদন ভট্টাচার্য

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা
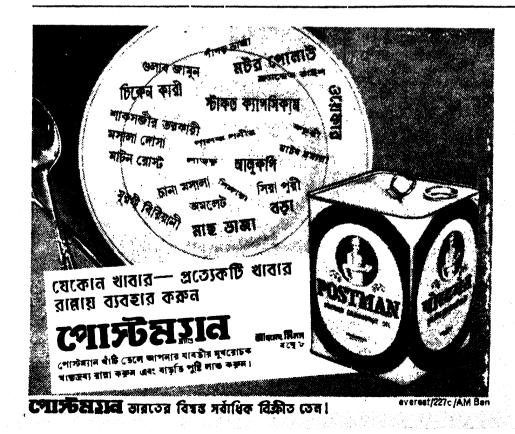
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাচ্য ঔপন্যাসিক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা সম্প্রতি জাপানে পরলোকগমন করেছেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির দীর্ঘ পঞ্চান্ন বৎসর পর কাওয়াবাতাই একমাত্র এশিয়াবাসী সাহিত্যিক যিনি সাহিত্য রচনায় এই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে শুধু জাপান নয়, সমগ্র এশিয়াবাসী বেদনাবোধ করবেন।

পুরস্কার প্রাপ্তির পর কাওয়াবাতার একটি উপন্যাসের অনুবাদ উপলক্ষে তাঁর সংগে সে সময় পত্র মাধ্যমে যোগাযোগের দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলাম। আমাদের চিঠি পেয়ে কাওয়াবাতা যে খুশী হয়েছিলেন তা শুধু তাঁর পত্রোত্তরে নয়, অন্য সূত্রে থেকেও জানতে পারি। বিখ্যাত ভারতীয় লেখক শ্রী আর আর কে নারায়ণ The Illustrated Weekly of India পত্রে (নভেম্বর ১৯৬৯) Tea with Kawabata শীর্ষক একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন :

"My next question. Have your novels been translated in the Indian languages? We have 14 major languages in India, you know. He rises and is gone again and fetches an airmail letter received a little time ago from Visva Bharati University of Santiniketan asking for permission to translate his novels into Bengali . . . Visva Bharati was founded by Tagore and is a reputable institution. He goes in to put the letter back, and I suddenly feel that I am putting him to a lot of work with my questions, but I also realise that this is his way of indicating his slender, tendril-like touch with India."

জাপানী ভাষায় কাওয়াবাতা এক দীর্ঘ পত্রে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীরাজও আজুমাকে লিখলেন, "আপনি ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য আমার রচনা অনুবাদ করবেন—এটা আমার পরম আনন্দের কথা।... আপনি ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য আমার লেখা নিজি উপন্যাসটিই প্রথমে অনুবাদ করুন সব দিক থেকে ভাল হবে মনে করি।' তাঁরই সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে দেশ পত্রিকায় শ্রীআজুমা ও আমি 'নিজি'র (ইন্দ্রধনু) অনুবাদ করি।

কাওয়াবাতা বলেছিলেন, নোবেল পুরস্কারটা বুকে নিয়ে ঝোলায় বেড়াবার মত এমন কোনো বস্তু নয়। বাইরের জাঁকজমকের ফলে লেখা অনেক সময় নষ্ট হয়। আমার রচনা পাঠ করে যদি সাহিত্যের পাঠকসমাজ খুশী হন—তবে সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

কাওয়াবাতার জন্ম ১৮৯৯ সালে। তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৯২৫-এ 'বুংগেইসুনজু' পত্রিকায়। রচনার নাম 'যুরোকুসাইনোনিক্কি', অর্থাৎ 'ষোল বছরের বালকের ডায়রি'। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ কালে কাওয়াবাতা পত্রিকা সম্পাদনে উৎসাহী হন। উদ্যোগ ব্যর্থ হয়নি, নূতন সাহিত্য পত্রিকা 'সিনসিচো' (নূতন ভাবস্রোত)

Hase 264, Kamakura
Japan

কাওয়াবাতার স্বহস্তলিখিত নাম ও ঠিকানা

প্রকাশিত হলো। সাহিত্য চর্চার মধ্যেই ১৯২৪এ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ এবং ওই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে নূতন সাহিত্য পত্র 'বুংগেইজিডাই' (শিল্প-সাহিত্য-সময়) সম্পাদন করেন। এই পত্রিকাতেই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ইজু-নো-ওদোরিকো' (ইজু এলাকার নর্তকী) প্রকাশিত হয়। কাওয়াবাতার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থটি হলো একটি গল্প সংগ্রহ। বইয়ের নাম 'কানজোশোসোকু' (অনুভূতির অলঙ্কার)। প্রকাশিত হয় লেখকের সাতাশ বৎসর বয়সে, ১৯২৬ সালের জুন মাসে। এর পর একে একে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গল্প উপন্যাস লেখা চলতে থাকে। শক্তিশালী গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসাবে ১৯৩০-এর মধ্যে কাওয়াবাতা জাপানের বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠী ও পরিচালক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং ওই বৎসরই তিনি জাপানের সম্মানিত ব্যক্তি রূপে জাপানের সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন।

কাওয়াবাতা যে-উপন্যাসটি রচনার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন তার নাম 'য়ুকিগুনি' (বরফের দেশ)। ১৯৩৫-এ সাময়িকপত্রে ও ১৯৩৭এ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখকের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

শুধু গল্প উপন্যাস নয়, সাহিত্য শিল্প সমালোচনার প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর। তাঁর রচিত চিন্তাপূর্ণ বহু মৌলিক নিবন্ধ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত আছে।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির বহু পূর্বেই তিনি বিশিষ্ট সম্মানসূচক নানা পুরস্কার লাভ করেছিলেন ১৯৪৪-এই জাপানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচয়িতা হিসাবে কাওয়াবাতা জাপানের বিখ্যাত সাহিত্য-পুরস্কার 'কানিকুচি পুরস্কার' অর্জন করেন। 'সেম্বাজুরু' (সহস্র বলাকা) ও 'ইয়ামানোওতো' (পাহাড়ের কথা) ১৯৪৯এ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৫২য় উপন্যাস দুটি গ্রন্থাকারে একত্রে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস দুটির জন্য লেখক জাপানের শিল্প সাহিত্য আকাদেমির কাছ থেকে সে দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৯এ জার্মানী থেকে তাঁকে 'গয়টে পুরস্কার' দিয়ে সম্মান জানান হয়। কাওয়াবাতা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৬৮ সালে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি কাওয়াবাতার ছাত্রাবস্তা থেকেই বিশেষ শ্রদ্ধা অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল—এ কথা আমরা জানতে পেরেছি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর ১৯৬৯ সালে কাওয়াবাতা সৌন্দর্যের অস্তিত্ব ও আবিষ্কার বিষয়ে যে বইটি লেখেন, তাতে এক স্থানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা-মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কাওয়াবাতার জীবনে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কি ভাবে ঘটেছে সে বিষয়ে তিনি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কাওয়াবাতার রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করি :-

"রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে keio বিশ্ববিদ্যালয় 'The Spirit of Japan' শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেছিলেন। সে সময় আমি পুরাতন-পদ্ধতি বিদ্যালয়ের মধ্যশ্রেণীর ছাত্র। তবে আমি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর একটি সুন্দর ছবি দেখেছিলাম। আমি এখনও সেই ঋষিসদৃশ কবির বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ করতে পারি। লম্বিত কেশগুচ্ছ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রু আবৃত, ঢিলেঢালা ভারতীয় পোশাকে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন, দৃষ্টি তাঁর গভীর এবং অন্তর্ভেদী। তাঁর শুভ্র কেশরাশি ললাটের দুই পার্শ্ব দিয়ে নীচে নেমেছে। আর ললাটপ্রান্তের কেশগুচ্ছগুলি যেন শ্মশ্রুরাশির মধ্যে এসে মিশেছে। সেই চিত্রদর্শনে আমার মত বালকের পক্ষে মনে হয়েছিল, ইনি বুঝি প্রাচ্য দেশের এক প্রাচীন যাদুকর। এ ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও কাব্য রচনাবলীর মধ্যে এমন কিছু কিছু সহজ অংশ আছে যা কোনো মধ্যশ্রেণীর স্কুলের ছাত্রের পক্ষেও পাঠযোগ্য।—আমিও নিজে তাঁর কিছু কিছু রচনা পাঠ করেছিলাম।"

কাওয়াবাতা জাপান থেকে শান্তিনিকেতনে আমাদের যে পত্র দিয়েছিলেন তাতেও কবির নাম বারবার উল্লেখ করেছেন। যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য রচনা করেছেন সে ভাষার প্রতি কাওয়াবাতার প্রীতি ও শ্রদ্ধা গভীর। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের রচনা দেখে তিনি খুশী হয়েছিলেন, আজ এ কথা সগর্বে ব্যক্ত করলে আশা করি কেউ অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

মহাভারতের কথা

বুদ্ধদেব বসু

৮ : বিভিন্ন কোরাস

উদকরাক্ষসের একটিমাত্র প্রশ্ন ছিলো: 'দেবধর্ম কী?', এবং বোধিসত্ত্ব যে-উত্তর দিয়েছিলেন, তাও যথাসম্ভব সরল।

> নিয়ত প্রশান্তচিত্ত, সত্যপরায়ণ;
> নির্মল অন্তরে করে ধর্মের ভজন;
> উদিলে কলুষভাব লাজ পায় মনে;
> দেবধর্মা বলি তুমি জানিবে সে-জনে।
>
> (অনু: ঈশান)

রাক্ষসের বুদ্ধি বেশি নেই, সে ওটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়েছিলো; কিন্তু ধর্মবক হয়তো জিজ্ঞাসা করতেন: 'সত্য কাকে বলছো? কোন-কোন ভাব কলুষিত? কোন উপায়ে প্রশান্তি লাভ করা যায়?' বস্তুত, তাঁর প্রশ্নের সংখ্যা একশো-ছাব্বিশে পৌঁছতে পারতো না, যদি না তিনি পুত্রের কাছে দাবি করতেন—শুধু নির্বস্তুক একটি ধর্মসূত্র নয়, একটি ব্যবহার্য ও সম্পূর্ণ জীবনদর্শন। আমরা লক্ষ করি যে প্রশ্নগুলি জ্ঞানের নানা বিভাগ থেকে সংকলিত হয়েছে—নীতি ও ধর্মের প্রসঙ্গ বেশি থাকলেও জীবিবদ্যা ও পদার্থবিদ্যাও বাদ পড়েনি। এমন নয় যে সব কথাই উচ্চভাবসম্পন্ন; এখানেও আছে বেদ-ব্রাহ্মণের গতানুগতিক প্রশস্তি, মাতা-পিতা দেবতা বিষয়ে প্রথাসম্মত সম্মানবাক্য;—তবু যুধিষ্ঠিরকে মনে হয় না আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রানুগামী, একান্তভাবে বেদের প্রতি আস্থাবান। নয়তো কেন তিনি প্রার্থনাকে 'বিষ' ব'লে আখ্যাত করবেন, আর কেনই বা একই নিশ্বাসে বেদকে বলবেন 'সর্বদা ফলবান' (২৭), আর আনৃশংস্যকে 'প্রধান' ধর্ম? তিনি কি জানতেন না ঐ দুই উক্তি পরস্পরবিরোধী, বেদে আনৃশংস্যের (অহিংসার) কোনো স্থান নেই? জানতেন না, বৈদিক ঋষিরা ধনজনের জন্য প্রার্থনায় কেমন উন্মুখর? মাঝে-মাঝে তাঁর উত্তর শুনে চমকে উঠি আমরা: যখন তিনি 'মনোমলত্যাগ'কে বলেন স্নান, প্রাণী-রক্ষাকে বলেন দান, আর সকলের সুখ ইচ্ছে করাকেই বলেন দয়া—তখন মনে হয় সব শাস্ত্র ছাপিয়ে তাঁর নিজের কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো; মনে হয় এ-সব তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা, তাঁরই অভিজ্ঞতাপ্রসূত উচ্চারণ। হয়তো, অরণ্যভূমি ছেড়ে যাবার আগে, তিনি তাঁর অতীতের দিকে তাকিয়েছিলেন একবার, যেখানে সঞ্চিত আছে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে মনোমল—কালীপ্রসন্নর ভাষায় 'মনোমালিন্য'—এবং একবার ভবিষ্যতের দিকেও, যেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে মহাযুদ্ধ;—আর তাই, স্নান, দান ও দয়ার এ-রকম অশাস্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এ-সবের মধ্য দিয়ে তাঁর গোপন মনের এই ইচ্ছেটাই ফুটে বেরোচ্ছে যেন যুদ্ধ নিবারিত হয়, যেন যুদ্ধরূপ ব্যাধির বীজ থেকে কুরুবংশ আরোগ্য লাভ করে।

কথাটাকে উল্টো দিক থেকেও বলা যায়। 'অস্ত্রশস্ত্রই ক্ষত্রিয়ের দেবভাব, বেদচর্চাতেই ব্রাহ্মণের দেবত্ব—' এই ধরনের শাস্ত্রবচন শুনে ধর্মবক তৃপ্ত হ'তে পারছেন না; খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে-ক'রে, যুধিষ্ঠিরের মর্মকথাটা টেনে বের করছেন। যে-গহনচারী মৎস্যের জন্য এই বকপক্ষীর অপেক্ষা, তা হ'লো যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি; ধর্ম যেন ঈষৎ সহাস্যে মনে-মনে বলছেন: 'ও-সব পুঁথির কথা থাক, তুমি সত্যি কী বিশ্বাস করো, তা-ই বলো!' আর সেই উদ্দেশ্যেই, পরীক্ষার প্রায় শেষ মুহূর্তে, তিনি চারটি গূঢ়ান্বেষী প্রশ্নে বিদ্ধ করলেন তাঁর পুত্রকে :—'সুখী কে? আশ্চর্য কী? পথ কী? বার্তাই বা কী?' যুধিষ্ঠিরের উত্তর ভাঙিয়ে কয়েকটি সিকি-দুয়ানি আজ লোকের হাতে-হাতে ঘুরছে, কিন্তু সম্পূর্ণটি এখানে স্মরণযোগ্য।

> —হে জলচর! অঋণী ও অপ্রবাসী হ'য়ে, দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে, যিনি স্বগৃহে শাকান্ন রন্ধন করেন, তিনিই সুখী (২৮)।

অঋণী? অপ্রবাসী? একবেলা শাকান্ন খেয়ে বাঁচা? আমাদের মন যেন কুঁকড়ে যায় কথাগুলো শুনে, আমরা যারা উচ্চাশাসম্পন্ন ও চেষ্টাপরায়ণ। কিন্তু আমাদের পক্ষে—বা অন্যান্য পাণ্ডবদের পক্ষে—গ্রাহ্য হোক বা না-ই হোক, যুধিষ্ঠিরের নিজের দিক থেকে এটা সত্য। কেননা পরবর্তী বৎসরটি তাঁকে সপরিবারে অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হবে, অতি শঙ্কিলভাবে প্রবাসী বা উদ্বাস্তু—কোথায়, তা এখনো জানেন না। এবং তাঁর পত্নী ও ভ্রাতাদের কাছে আকণ্ঠ ঋণে ডুবে আছেন তিনি, যেহেতু তাঁদের প্রাপ্য ও কাঙ্ক্ষিত রাজত্ব থেকে তিনিই তাঁদের বঞ্চিত করেছেন। আর শাকান্নভোজনে সেই মানুষের কেন আপত্তি থাকবে, পরে যিনি পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি মাত্র গ্রাম চাইবেন—যুদ্ধনিবারণের জন্য, বিরোধভঞ্জনের চেষ্টায়? এ-পর্যন্ত তাঁর উক্তিগুলিকে তাৎকালিক বলা যায়,

কিন্তু এর পরের উত্তর দুটি আরো দূরস্পর্শী।

'প্রত্যহই প্রাণীদের মৃত্যু হচ্ছে, তবু অবশিষ্টেরা চিরকাল বাঁচতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হ'তে পারে?'

'তর্ক অপ্রতিষ্ঠ (মীমাংসাহীন), শ্রুতি (বেদ) বিভিন্ন, এমন কোনো ঋষি নেই যাঁর মত প্রামাণিক, এবং ধর্মের তত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে লুক্কায়িত। অতএব মহাপুরুষেরা যে-পথে গিয়েছেন সেটাই পথ (২৯)।'

যুধিষ্ঠিরের মনের ছবিটি এবার আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। তিনি শাস্ত্রবিশ্বাসী নন, কোনো নির্দিষ্ট মতবাদে তাঁর আস্থা নেই। তিনি জানতে চান তাঁর নিজের মন দিয়ে সত্যকে, জ্ঞানকে তাঁর চেতনার দ্বারা অন্তরঙ্গ ক'রে নিতে চান। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও আমরা কেউ নিজের মৃত্যু ধারণা করতে পারি না—এই কথাটা অবশ্য খুবেই পুরোনো; কিন্তু যুধিষ্ঠির যে এটাকে সবচেয়ে আশ্চর্য ব'লে ভাবলেন সেটাই আশ্চর্য। কেননা, আমাদের কাছে এটা আশ্চর্য নয়, স্বাভাবিকমাত্র—আমরা যে বেঁচে আছি সে-বিষয়ে আমরা সচেতন হ'তেও পারি না, এতই আমরা ভালোবাসি জীবনকে। কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছেন সেই অনেক বড়ো জীবনকে, মৃত্যু যেখানে উপস্থিত ও স্বীকৃত, আর জীবনলিপ্সারই উল্টো পিঠে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি যেখানে দৃষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী, কোনো গুরু ধ্রুবসত্য জানেন না—অতএব? এখানে হঠাৎ থমকে যাই আমরা : মনে প্রশ্ন জাগে : মহাপুরুষও এক নন, অনেক, আর তাঁরাও ভিন্ন-ভিন্ন পথে যাত্রী হয়েছেন—কার পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করবো? এর উত্তর আমরা মহাভারতের পুঁথির মধ্যে পাই না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী সমস্ত জীবনই এর উত্তর। তিনি, অনবরত নির্দেশপ্রার্থী ও নির্দেশপ্রাপ্ত, বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছেন জীবন ভরে—তিনিও কোনো অমোঘ উপদেষ্টার সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিজের পথ নিজেকেই তৈরি ক'রে নিতে হয়েছে—বহু সংশয় পেরিয়ে, বহু ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে, অতি কষ্টে সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে একটি উপলব্ধির শিখর পর্যন্ত। তাঁর পরের উত্তরটিতে সেই উপলব্ধিরই আমরা আভাস পাই :

সূর্যের আগুনে, দিন-রাত্রির ইন্ধনে, মাস ও ঋতুর হাতা দিয়ে নেড়ে-নেড়ে কাল এই মহামোহময় কটাহে প্রাণীবৃন্দকে রন্ধন করছে : এ-ই বার্তা।

এক মুহূর্তে, বিদ্যুৎঝলকে উদ্ভাসিত কোনো বিশাল ভূদৃশ্যের মতো, আমরা দেখতে পেলাম জীবন-মৃত্যুর সম্পূর্ণ বৃত্তটিকে, বংশপরম্পর জনন ও জন্মের স্বরূপ, বৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের রূপচিত্র। দেখলাম এক দ্রষ্টার চোখে, আতঙ্কে ও আনন্দে কেঁপে উঠলাম। কে থাকতে পারেন এমন পরীক্ষক, যিনি এই উত্তর শুনে মুগ্ধ হবেন না?

দেবধর্মজাতকের সঙ্গে তুলনা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, সেখান থেকে দূরে চ'লে এসেছি। কিন্তু প্রসঙ্গটিতে মুহূর্তের জন্য ফিরে যেতে হবে : এই দুই কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো তফাৎটা এখনো বলা হয়নি।

২৭। মূলে আছে 'ত্রয়ীধর্মঃ সদাফলঃ'। ত্রয়ীধর্ম—ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই তিন বেদ।

২৮। আমার অনুবাদ আর্যশাস্ত্র সংস্করণ অনুযায়ী; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও রাজশেখর বসুতে পাঠান্তর আছে:

দিবসস্যাষ্টমভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥

দিনের অষ্টম ভাগ অর্থ—সন্ধ্যাবেলা। এই শ্লোকে 'স্বগৃহ' কথাটা নেই।

২৯। এখানেও আমার অনুবাদ আর্যশাস্ত্র অনুযায়ী, এবং এখানেও সিদ্ধান্তবাগীশ ও রাজশেখর বসু ভিন্ন পাঠ দিয়েছেন :

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

এই শ্লোকে কঠোপনিষদের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট : ১ : ২ : ১২ : ও ১ : ২ : ২০ দ্র। শাস্ত্রজ্ঞান নিষ্ফল—এই কথাটা সেখানে আরো জোরালোভাবে বলা হয়েছে (১ : ২ : ২৪)—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

প্রশ্নোত্তরের পারম্পর্য সব সংস্করণে এক নয়; আমি কালীপ্রসন্নকে অনুসরণ করেছি।

৯ : পিতৃপরিচয়

দেবধর্মজাতকের রাক্ষস কোনো জলার্থীকে সাবধান ক'রে দেয় না, জলে নামতে বারণ করে না কাউকে—চতুরভাবে শিকারের অপেক্ষায় ব'সে থাকে। কিন্তু পর-পর পাঁচ ভাইয়ের কাছে ধর্মবকের প্রথম ঘোষণাই নিষেধাজ্ঞা : 'সাহস কোরো না! —মা সাহসং কার্যীঃ।' চন্দ্রকুমার ও সূর্যকুমার নির্জিত হলেন শুধু এইজন্যে যে তাঁরা প্রশ্নের ঠিক উত্তর জানতেন না; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুজগণ প্রশ্ন শোনারও সুযোগ পেলেন না, নেপথ্যবাণী অমান্য করা মাত্র হতচেতন হ'য়ে পড়লেন। স্পষ্টত, তাঁদের 'মৃত্যু'র কারণ আদেশলঙ্ঘন—অবাধ্যতা—অন্য কিছু নয়; যে বাধ্য নয় সে জিজ্ঞাসিত হবারও যোগ্য নয়, ধর্মবকের মনের কথাটা হ'লো এই। উদকরাক্ষস দোষীদ্বয়কে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেলো, অজগররূপী মহাত্মা নহুষও দৈহিক বলেই পরাস্ত করলেন ভীমসেনকে; কিন্তু নিপাতিত চার ভাইয়ের কাছে বক-যক্ষের শারীরিক আবির্ভাবেরও প্রয়োজন হ'লো না—অবাধ্যতা নিজেই নিজের শাস্তি ডেকে আনলো। আমরা বুঝতে পারি, যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা শুধু জ্ঞানের নয়, বিদ্যাবত্তার নয় — তা প্রথমত ও প্রধানত চারিত্রিক। তিনি যে আদেশলঙ্ঘন করলেন না, বকের পূর্বাধিকার সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার ক'রে নিলেন, এতেই বোঝা গেলো তাঁর পিতার অযোগ্য পুত্র তিনি নন।

কিন্তু এই ছদ্মবেশী পিতা, এই স্নেহশীল অথচ কঠিন-বিচারক দেবতা : তিনি কে? এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা প্রয়োজন, কেননা তাঁর সঠিক কোনো পরিচয় আমাদের জানা নেই, ব্যাসদেব যেন ইচ্ছে ক'রেই তাঁকে নানাবিধ সংশয়ের ছায়ায় আবৃত রেখেছেন, মহাভারতের বিরাট কর্মকাণ্ডে তাঁকে প্রত্যক্ষ কোনো অংশ নিতেও আমরা দেখি না (৩০)। কুন্তী-কর্তৃক আহূত অন্য তিন দেবতা, এমনকি মাদ্রীর অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এঁরা বহুকাল ধ'রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু 'ধর্ম' নামক পুরুষটিকে তেমন উচ্চপদস্থ ব'লে মনে হয় না। লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠির যদিও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, তবু তাঁর জন্মকথা অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে (আদি : ১২৩) : মূল সংস্কৃতে ছ-টি মাত্র শ্লোকে তা সমাপ্ত, আর তা থেকে ধর্ম বিষয়ে শুধু এই তথ্যটি জানা যায় যে তিনি এক জ্যোতির্ময় বিমানে চ'ড়ে কুন্তীর কাছে এসেছিলেন। ভীমের জন্মদাতা বায়ু বিষয়েও বেশি উচ্চবাচ্য নেই; কিন্তু অর্জুনের জন্ম নিয়ে বেশ কিছু ঘটাপটা হ'লো—ইন্দ্রের তুষ্টিকামনায় পাণ্ডু-কুন্তী একবৎসরব্যাপী ব্রত করলেন; জাতকোৎসবে যোগ দিতে এলেন দেবতা নাগ গন্ধর্ব অপ্সরাদি ত্রিলোকবাসীরা, আর অবশ্য পুষ্পবৃষ্টি দুন্দুভিনাদ ইত্যাদি গতানু-

গাতিক মঙ্গলাচরণের কিছু বাদ পড়লো না। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সবই ইন্দ্রের কারণে। ততদিনে তাঁর বৈদিক মহিমা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাকলেও, অন্তত পাণ্ডুর কাছে তখনও তিনি প্রধান দেবতা (৩১), 'অমিতদ্যুতি ও অপ্রমেয় বলবীর্যসম্পন্ন'। তাঁর ঔরসজাত পুত্রের 'পিতা' হবার মতো সৌভাগ্য শাপগ্রস্ত পাণ্ডুর পক্ষে আর কী হ'তে পারে? এমনকি আমাদের চোখেও ইন্দ্র এখনো কথঞ্চিৎ উজ্জ্বলতা নিয়ে প্রতিভাত—এই যজ্ঞহীন যুগেও আমরা ভুলতে পারিনি তিনি বৃত্রঘ্ন ও বন্দী জলের মুক্তিদাতা। কিন্তু ধর্ম, যিনি কুন্তীকে তাঁর প্রথম 'বৈধ' পুত্র দান ক'রে গেলেন—তাঁর কোনো মূর্তি আমরা ভাবতে পারি না, কোনো ইতিহাস স্মরণে আসে না আমাদের। যে-'ধর্ম' দেবতা বুদ্ধের প্রচ্ছন্নরূপে মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর কোনো দূর পূর্বাভাসরূপে এঁকে কল্পনা করা অসম্ভব, কেননা বক-যক্ষ আর যা-ই হোন, শূন্যবাদী নন। অথচ কোনো প্রাচীন পুরাণে ধর্ম নামে কোনো পূর্ণাঙ্গ দেবতা নেই—বড়োজোর তিনি 'ভগবানের'র একটি ভগ বা অংশমাত্র, কখনো বা অষ্ট-বসুর পিতা, এবং কখনো বিস্ময়করভাবে স্বয়ম্ভূ কামদেবের জনক (৩২)। কিন্তু এই সব অস্পষ্ট ভগ্নাংশ থেকে আমাদের পুষ্করবর্তী বলীয়ান প্রশ্নকারীটি শতযোজন দূরে অবস্থিত।

কিন্তু অন্য এক দেবতা আছেন—তিনিও সুপ্রাচীন ও সোমপায়ী—যাঁকে বহুকাল ধ'রে কালান্তক ব'লে জেনে এসেছি আমরা, অথচ যিনি এক দুরযাত্রিণী তরুণীকে পতির প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন, জুগিয়েছেন এক অনিবারণীয় বালকের কানে পরাবিদ্যা :—সেই মহান ও মূর্ত দেবতাকে কি যুধিষ্ঠিরের জনক রূপে ধ'রে নিতে পারি না আমরা? পারি নিশ্চয়ই—অনেকে তা নিয়েও থাকেন, কেননা সংস্কৃতে 'ধর্ম' শব্দের এক অর্থ যম, এবং মানুষের মধ্যে যেমন যুধিষ্ঠিরকে, তেমনি দেবগণের মধ্যে একমাত্র যমকেই বলা হয়েছে ধর্মরাজ। কালীপ্রসন্নে দেখি, পাণ্ডবগণের জন্ম-দাতারা একবার 'যমরাজ প্রভৃতি দেবগণ' ব'লে উল্লিখিত হয়েছেন (উদ্যোগ : ৫৯); আর্যশাস্ত্র সংস্করণের বঙ্গানু-বাদেও বন্ধনীর মধ্যে 'যম' শব্দটি পাওয়া যায়—'আমি তোমার পিতা অমিতপরাক্রমী ধর্মরাজ (যম)।' ঈষৎ সংশয় জাগে, যখন মূল সংস্কৃতে উভয় স্থলেই পাই 'ধর্ম'—'যম' নয় - তবে ও-দুটি শব্দকে সমার্থক ব'লে ধ'রে নিলে সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায়। কিন্তু ব্যাকরণগত সমাধানে আমাদের কল্পনা সব সময় তৃপ্ত হ'তে পারে না : মনে প্রশ্ন জাগে : যাঁকে দেখেছি ঋগ্বেদে ও কঠোপনিষদে ও সাবিত্রী-উপাখ্যানে ভীষণ গম্ভীর সকরুণ এক দেবতা, আর এখন যাঁকে দেখছি এক-পায়ে-দাঁড়ানো মৎস্যভুক ছলনাপ্রিয় বকপক্ষী—এঁরা দু-জন কি অবিকল অভিন্ন হ'তে পারেন? যুধিষ্ঠির-পিতাকে আকারে-প্রকারে এত বিসদৃশ কেন হ'তে হ'লো? আত্মপরিচয়ে 'অমৃদুপরাক্রম' বিশেষণ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কৃতান্তের কোনো লক্ষণ কেন দেখি না?

> অহং তে জনকস্তাত ধর্মোঽহমৃদুপরাক্রম।
> ত্বাং দিদৃক্ষুরণুপ্রাপ্তো বিদ্ধি মাং ভরতর্ষভ ॥
>
> (আর্যশাস্ত্র—বন : ৩১৪ : ৬)

—'বৎস, আমি তোমার পিতা অমৃদুপরাক্রম ধর্ম। আমি তোমারই দর্শনেচ্ছায় এখানে এসেছি। ভরতশ্রেষ্ঠ, আমাকে জ্ঞাত হও।'

সিদ্ধান্তবাগীশ-সংস্করণে প্রথম চরণের পাঠান্তর পাই :

> অহং তে জনকস্তাত। ধর্মো বীর্য। সনাতনঃ'

—'বৎস [illegible] পিতা, আমি ধর্ম, আমি সনাতন।'

এখানে মনে [illegible] ধর্মবকের একটি স্বতন্ত্র সত্তা অনুভূত হচ্ছে; তাঁর সঙ্গে [illegible] ততটাই তফাৎ, যতটা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নচিকেতার। 'আমি ধর্ম, আমি সনাতন—' এখানেও কি 'ধর্ম' বলতে যমদেবতাকে বুঝতে হবে? কিন্তু সোজাসুজি 'যম' শব্দটি কেন প্রযুক্ত হ'লো না একবারও, সর্বদাই কেন 'ধর্ম' বলা হচ্ছে—আর এই প্রসঙ্গে ধর্মের অন্য ব্যাপকতর এবং যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় অর্থটিকে বর্জন করতেই বা বাধ্য হবো কেন আমরা? আরো প্রশ্ন : কুন্তীর প্রথম ও চতুর্থ পুত্রের জন্মদাতাকে তাঁদের আদিম মহিমায় প্রকাশিত ক'রে, তাঁদেরই সমকক্ষ দক্ষিণপতিকে কবি কেন প্রচ্ছন্ন রাখলেন; যমই যদি যুধিষ্ঠিরের জনক, তাহ'লে সেই মহৎ জন্ম অমন সংক্ষেপে ও অনুজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হ'লো কেন?

এ-সব প্রশ্নের ঔচিত্য অস্বীকার করা যায় না, তবু যমের সঙ্গে ধর্মবকের, এবং যুধিষ্ঠিরের, কোনো-এক ধরনের সম্বন্ধ আমরা দেখতে পাই না তাও নয়। অন্তত এটুকু : যে যম ও ধর্মবক দু-জনেই আলাপচারী, দু-জনেই পরীক্ষক ও বিচারক। আরো—আর এটা 'অন্তত'র চাইতে অনেকটা বেশি : যে যম ঠিক ধ্বংসের দেবতারূপে কল্পিত হননি, নটরাজ শিবের কোনো বিকল্প তিনি নন :—তিনি নিয়ামক ও ভারসাম্যসাধক, তিনি মানববংশকে সংযত করেন ও শান্ত হ'তে শেখান—তাঁর যম ও শমন নামের মধ্যেই তার পরিচয় আছে। আর সংযম ও শান্তি—তা-ই কি নয় যুধিষ্ঠিরের জীবনব্যাপী সন্ধান, আর তাঁর পিতার কাছে প্রদত্ত উত্তর-সমূহের মধ্যেও তাঁর সেই মর্মাভিলাষ কি বার-বার ব্যক্ত হচ্ছে না? সত্য, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সুদীর্ঘ সময় লেগেছিলো তাঁর : কিন্তু এখানে অন্তত তাঁর ব্যবহারে আমরা দেখতে পেয়েছি একটি বিশ্বাসপরায়ণ বিনয়—যে-গুণ তাঁর মধ্যে আগে ছিলো না, কিংবা ঠিক এইভাবে ছিলো না। সভাপর্বে আমরা তাঁকে দেখেছি কিছুটা দীনভাবাপন্ন, জরাসন্ধবধের প্রস্তাব শুনে তিনি ভীত হলেন পাছে ভীম অর্জুনের প্রাণহানি ঘটে; কিন্তু এখানে, এই হ্রদের প্রান্তে, ভ্রাতাদের মৃত ব'লে জেনেও তিনি যে সম্ভ্রমের সুরে ও মেধাবীভাবে প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারলেন, আমি এটাকেই বলতে চাই তাঁর বিনয়—ভীরুতা নয়, আত্মস্থতা, সেই বিশেষ চারিত্রশক্তি, যা নিয়মের বশ্যতা মেনে নিয়ে আনন্দ পায়, আর তাই অপর সব সত্তার অধিকার বিষয়ে যা শ্রদ্ধাপরায়ণ। এবং যমদেব এক অলঙ্ঘ্য নিয়মের প্রতিমূর্তি, তিনিই পারেন অতর্কিতভাবে দুঃসাহসীকে নিবৃত্ত করতে, এবং কিছুটা তাঁরই ধরনে হ্রদের প্রান্তে ধর্মবকও চার অবাধ্য পাণ্ডবকে সংযত করেছিলেন। এ-দিক থেকে ভেবে দেখলে মনে হ'তে পারে যে 'রাজ'-উপাধি-হীন যুধিষ্ঠিরজনক ধর্ম—যাঁকে আমরা অন্য কোনোভাবে শনাক্ত করতে পারছি না—তিনি সেই সনাতন বন্ধনকারী ও মুক্তিদাতারই একটি ভিন্নরূপধারী ভাবচ্ছবি (৩৩)।

মহারাষ্ট্রীয় লেখিকা ইরাবতী কার্ভে এ-বিষয়ে একটি বিকল্প প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, এখানে সেটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি (৩৪)। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত পিতা বিদুর—এ-ই হ'লো তাঁর অনুমান; এবং এটি শোনামাত্র আমাদেরও চমক লাগে, মনে হয় এটা সত্য হ'লেও হ'তে পারতো, কেননা বিদুর-যুধিষ্ঠিরের চরিত্রগত সাদৃশ্য বিষয়ে আমরা সকলেই অবহিত আছি, এবং এ-দুজনের মধ্যে একটি স্বল্পোচ্চারিত কিন্তু গভীর সংযোগ মহাভারতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

অনুসৃত হয়েছে। শ্রীমতী কার্ভের যুক্তিগুলিও ভেবে দেখবার মতো : প্রথম, বিদুর কুন্তীর দেবর, অতএব নিয়োগের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী ; দ্বিতীয়, অণীমাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্মরাজ (যম?) শূদ্রযোনিতে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন (আদি : ১০৮) ; তৃতীয় : মৃত্যুর পূর্বে বিদুর তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তি ও আত্মাকে যুধিষ্ঠিরের দেহে সঞ্চালিত ক'রে দেন (আশ্রমবাসিক : ২৮)—এবং এটা (শ্রীমতী কার্ভে আমাদের জানিয়েছেন) মুমূর্ষু পিতার পক্ষে পুত্রের প্রতি আচরণীয় একটি উপনিষদযুক্ত সংস্কার (কোন উপনিষদে, লেখিকা তা বলেননি) ; এবং চতুর্থ — আর এটাই লেখিকার সপক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি — বিদুরের তিরোধানের অব্যবহিত পরে ব্যাসদেব এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন যে বিদুর ধর্ম নামে 'কবিদের দ্বারা কীর্তিত,'......এবং 'ঐ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাত্মা ধর্মই যোগবলে' যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করে-ছিলেন। শ্রীমতী কার্ভের অনুমিতিটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই, আমাদের কল্পনা কিছুক্ষণ খেলা করতে পারে তা নিয়ে, এমনকি বিদুর-কুন্তীর গোপন প্রণয় অবলম্বন ক'রে একটি সুন্দর নাট্যরচনার সম্ভাবনাও আমাদের মনে প্রতিভাত হয় ; কিন্তু কল্পনাবিলাসের প্রথম কয়েকটি সুখকর মুহূর্ত কেটে যাবার পরেই বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি ঝাঁকে-ঝাঁকে আমাদের আক্রমণ করে। কুন্তীর অন্য তিন পুত্র দেববীজোদ্ভূত—নগণ্য মাদ্রীতনয়েরাও তা-ই—এই অবস্থায় যিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যুধিষ্ঠির যদি মনুষ্যপুত্র হতেন, তাহ'লে সেটা হ'তো সমগ্র মহাভারতের পক্ষে একটি দূরপ্রসারী-ইঙ্গিতপূর্ণ প্রধান ঘটনা—কাহিনীবিন্যাসের দিক থেকে সেটাকে গোপন রাখা কোনমতেই সম্ভব হ'তো না, ধ'রে নেয়া যায় কর্ণের জন্মকথার মতোই সেটা উল্লিখিত ও বর্ণিত হ'তো অনেকবার, একবার হয়তো কুন্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ শুনতাম। ব্যাসদেবের প্রতি অম্বিকা-অম্বালিকার তীব্র অরতির কথা মনে রাখলে এটাও অসম্ভব ব'লে মনে হয় যে শুদ্ধযোণিতা ক্ষত্ররমণী কুন্তী—যিনি চাইলেই যে-কোনো দেবতার অঙ্ক-শায়িনী হ'তে পারেন—তিনি পুত্রোৎপাদনের জন্য (এবং শুধুমাত্র সেই কারণে) আহ্বান করবেন তাঁর শূদ্রযোনিজাত 'ক্ষত্তা' দেবরকে, যিনি পদমর্যাদায় সূত সঞ্জয়ের মতোই অবনত। যুধিষ্ঠিরকে বিদুর 'যোগবলে' উৎপন্ন করে-ছিলেন—এই উক্তির পরেই ব্যাস আবার বললেন : 'যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর, যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির' ; এবং এই দুটো উক্তি মিলিয়ে দেখলে এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। পরাশর ও ব্যাসদেবের মতো মহর্ষিরা, এমনকি সূর্যাদি দেবগণও যখন প্রকৃতিসম্মত যৌন উপায়েই নারীর গর্ভে সন্তানের সঞ্চার করেছিলেন, তখন হঠাৎ বিদুর কেন যোগ-বল ব্যবহার করবেন তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, পিতা ও পুত্র এক ব্যক্তি হ'তে পারেন না, এ-কথাও স্পষ্ট। ব্যাসের এই কথাগুলো আমাদের কানে হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে ; কিন্তু আসলে তিনি হয়তো বিদুর-যুধিষ্ঠিরের মধ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধের ইঙ্গিত করেননি —শুধু বলতে চেয়েছেন যে উভয়েই ধর্মাত্মা, উভয়েই মূর্তিমান সাধুতা ও সদাচার — এবং এটা তথ্য হিশেবে আমরা অনেক আগে থেকেই জেনে আসছি। ধর্মাচরণই এ-দু'জনের মধ্যে সংযোগসূত্র ; স্বর্গারোহণপর্বে এ-কথাও

বলা আছে যে এঁরা দু-জনে — এবং সমস্ত কৌরব-পাণ্ডবের মধ্যে শুধু এঁরাই — ধর্মের শরীরে লীন হ'য়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে লৌকিক সম্পর্ক যদিও খুল্লতাত - ভ্রাতুষ্পুত্রের, আত্মিক অর্থে এঁদের দুই ভ্রাতা বললে ভুল হয় না।

কিন্তু পুঁথি খুঁড়ে-খুঁড়ে অনুপুঙ্খ-উদ্ধারের কোনো প্রয়োজন নেই, অন্য এক জাজ্বল্যমান কারণে বিদুর-যুধিষ্ঠিরকে পিতা-পুত্ররূপে গ্রহণ করতে আমরা কিছুতেই পারি না। কেননা যুধিষ্ঠিরের পিতৃপদ থেকে ধর্মকে বিচ্যুত করলে মহাভারতের একটি ভিত্তি-প্রস্তর সরিয়ে নেয়া হয়, ধ্বসে পড়ে সেই বিরাট অট্টালিকা, যা ধর্মবকের ঘটনা থেকে—সত্যি বলতে, নহুষ-যুধিষ্ঠির সংলাপ থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে-ধীরে গ'ড়ে তুলেছেন কবিরা, এবং যার উচ্চতম শিখরদেশে যুধিষ্ঠিরের কুক্কুরচিহ্নিত জয়ধ্বজাটি উড্ডীন। যুধিষ্ঠির বিদুরের পুত্র হ'লে সমগ্র মহাভারতকে হ'তে হ'তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গ্রন্থ—এমন বহু অংশ স্থান পেতে পারতো না যার উপর আমাদের পরিচিত মহাভারতের মহনীয়তা নির্ভর ক'রে আছে। আমাদের মেনে নিতে হবে যে যুধিষ্ঠিরের পিতা এক দেবতা, এবং তাঁর নাম ধর্ম—হ'তে পারে তিনি সংশয়াচ্ছন্ন ও রহস্যময়, যমদেব ও মানবিক ধর্মনীতির মিশ্রণে রচিত এক অনির্দেশ্য সত্তা—তবু দেবতা তাতে সন্দেহ নেই, পুত্র বিষয়ে সস্নেহ ও পরীক্ষণশীল, তাতে সন্দেহ নেই। 'অহং তে জনকস্তাত—' তাঁর মুখের এই কথাটি অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

এখানে মনে প'ড়ে যায় অন্য এক দেবতাও একবার তাঁর পুত্রকে পরীক্ষা করেছিলেন, অথবা বলা যাক পুত্রকে তাঁর অজ্ঞাত পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হয়েছিলো। ইন্দ্র অবিরল বারিবর্ষণ করলেন, তবু অর্জুনের বাণে দগ্ধ হ'লো খাণ্ডববন, এবং পুত্রের হাতে এই পরাজয়ে বজ্রদেবতা তুষ্ট হলেন। লক্ষণীয়, বনপর্বের শেষ ঘটনা যেমন বক-যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তর, তেমনি আদিপর্বেও খাণ্ডবদাহন অন্তিম। এই সংস্থাপনা আশ্চর্যভাবে যথোচিত, কেননা এই দুটি ঘটনার মায়াদর্পণে মহাভারতের পরবর্তী সব পরিণতি বিম্বিত হচ্ছে। খাণ্ডব-দাহন উপলক্ষেই অর্জুন প্রদত্ত হলেন তাঁর গাণ্ডীবধনু, ধর্মবকের সঙ্গে সংলাপকালে যুধিষ্ঠির প্রথম নিজেকে চিনতে পারলেন। বিভিন্নভাবে প্রণোদিত এই দুই ভ্রাতার মধ্যে মানুষের দুটি মৌলিক বৃত্তি বিধৃত হ'য়ে আছে : একদিকে সে জিগীষা-মত্ত আক্রমণকারী, অন্যদিকে সে মিলনপ্রয়াসী, স্বীকরণসাধক।

৩০। যদি না আমরা ধ'রে নিই যে সভাপর্বে ধর্মই স্নেহবশত পুত্রবধূকে দুঃশাসনের ব্যভিচার থেকে ত্রাণ করেছিলেন (অধ্যায়: ৬৬।) মূলে আছে : 'ততস্তু ধর্মোঽন্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোদ্ বৈ বিবিধৈঃ সুবস্ত্রৈঃ—মহাত্মা ধর্ম অন্তরাল থেকে [দ্রৌপদীকে] বহু প্রকার সুন্দর বসনে আবৃত করতে লাগলেন।' 'মহাত্মা' বিশেষণ দিয়ে বোঝানো হ'লো যে ধর্ম এখানে নির্বস্তুক সুনীতি নয়, কোনো রূপগ্রাহী দেবতা; কিন্তু দ্রৌপদী তখন স্মরণ করছেন কৃষ্ণকে, আর কৃষ্ণ মনে-মনে তাঁর কাতরোক্তি শুনতে পেয়ে চঞ্চল হয়েছেন—অতএব মহাত্মা ধর্ম বলতে এখানে কৃষ্ণকে বোঝাবারও বাধা নেই।

৩১। পাণ্ডু কুন্তীকে বলছেন: 'ইন্দ্রো হি রাজা দেবানাং প্রধান ইতি নঃ শ্রুতম—আমরা শুনেছি ইন্দ্রই দেবগণের রাজা ও তাঁদের মধ্যে প্রধান।' এই 'শুনেছি' থেকেই বোঝা যায় বেদ ততদিনে হিন্দুর জীবন থেকে কত দূরে স'রে গিয়েছে।

৩২। *Hindu Polytheism* : Alain Danielou Pantheon Books, Bollingen Series, New York, সং ১৯৬৪, পৃ ৩৮, ৮৬, ৩৩২।

৩৩। লক্ষণীয়, যম-সাবিত্রী সংলাপ ও বক-যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তরে কোনো-কোনো অংশে সাদৃশ্য আছে। বকের প্রথম প্রশ্নটি ধরা যাক :

—'কে সূর্যকে উন্নত করেন, তাঁর চারদিকে বিচরণশীল কারা, কে তাঁকে অস্তমিত করেন, এবং তাঁর প্রতিষ্ঠাই বা কোথায়?'

যুধিষ্ঠিরের উত্তর :

—'ব্রহ্ম সূর্যকে উদিত করেন, তাঁর চারদিকে দেবগণ বিচরণশীল, ধর্ম তাঁকে অস্তমিত করেন, সত্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা।'

অনুরূপ উক্তি সাবিত্রীর মুখেও শোনা গিয়েছিলো:

সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্যং
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।

—'সাধুজনেরাই সত্যের দ্বারা সূর্যকে চালিত করেন, সাধুজনেরাই তপস্যাদ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করেন।'

সূর্যের উদয়াস্তের মধ্যে যে-নিয়ম দৃষ্ট হয়, যুধিষ্ঠির তাকেই বলছেন ব্রহ্ম বা ধর্ম, কিন্তু শুধু সেটুকুই তাঁর বক্তব্য নয়—তাঁর 'সত্য' শব্দের ব্যবহারে ধ্বনিত হচ্ছে যে প্রাকৃতিক নিয়মকে মানুষের জীবনে প্রয়োগ করাও তাঁর অভিপ্রায়। এই কথাটাই সাবিত্রী আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন : তাঁর বিচারে যুধিষ্ঠির-কথিত 'সত্য' মানুষের সাধুতা ছাড়া আর-কিছু নয়। যদি সত্য বা সাধুতাই হয় মানবিক নিয়ম, আর মানবিক নিয়মের অধীশ্বর হন যমদেব—তাঁর 'ধর্মরাজ' অভিধায় সেটাই সূচিত হচ্ছে—তাহ'লে এখানেও সাবিত্রীর বরদাতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষকের একটি

সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাবিত্রী ও যুধিষ্ঠির দু-জনেই এখানে কঠোপনিষদের প্রতিধ্বনি করছেন :

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ॥ (২ : ১ : ৯)

—যাঁ থেকে সূর্য উদিত হন এবং যাঁর মধ্যে তিনি অস্ত যান, তাঁরই অন্তরে সব দেবতা প্রবিষ্ট আছেন। তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ইনিই তিনি (ব্রহ্ম)।

৩৪। *Yuganta : The End of an Epoch* : Iravati Karve, দেশমুখ প্রকাশন, পুনা, ১৯৬৯; পৃ ৯৮-১০৩ দ্র। বলা দরকার, যুধিষ্ঠির-বিদুর সম্পর্কে তাঁর আলোচনার জন্য শ্রীমতী কার্ভে কোনো প্রামাণিকতা দাবি করেননি; গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় যমদেবকেই বলেছেন যুধিষ্ঠিরজনক।

(ক্রমশ)

অ্যাপলো-১৬-র নভোচারী (বাঁদিক থেকে) : টমাস কে ম্যাটিংলি-২, কম্যান্ড মড্যুলের চালক, জন ডব্লু ইয়ং, অধিনায়ক, এবং চাঁদের ভেলার চালক চার্লস এম ডিউক।

অ্যাপলো-১৬

লক্ষ্য : ডেকার্তে অঞ্চল

মহাকাশ প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাপলো-১৬-র চন্দ্রাভিযান বলা চলে পূর্বসূরীদেরই পুনরাবৃত্তি, কিন্তু জীব-বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে এই যাত্রা এই প্রথম এক চমকপ্রদ ঘটনা। জৈবিক বিবর্তনের মূল উৎস সন্ধান করতে গিয়ে যে কথা ডারউইন, লামার্ক, মেনডেল প্রভৃতি দিকপাল প্রবক্তরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি অথবা পৃথিবীর পরিমণ্ডলের বাধা অতিক্রম করে যে কারণে বিশ্বের তাবৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এযাবৎ দূর ব্রহ্মাণ্ড জগতের রহস্য উদ্ঘাটনে বার বার বাধা পেয়ে এসেছেন এবারকার চন্দ্রাভিযান তাদেরই উত্তরণের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

মার্কিন মহাকাশ সংস্থার প্রতিবেদন : ফ্লোরিডার কেপ কেনেডির উৎক্ষেপন মঞ্চ কমপ্লেকস-৩৯ থেকে অ্যাপলো-১৬-র যাত্রাকাল রবিবার, ১৬ এপ্রিল, ভারতীয় সময় রাত ১১টা বেজে ২৪ মিনিট। চন্দ্রযানটি চাঁদের চারপাশে নির্দিষ্ট একটি কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছয় ২০ এপ্রিল, ভারতীয় সময় রাত ১টা বেজে ৫৩ মিনিটে। মূলযান বা কম্যান্ড মড্যুলটিকে নিয়ে চাঁদের চারপাশে ৩৬ বৎসর বয়স্ক টমাস কে ম্যাটিংলি-২ পরিক্রমণ করেন এপ্রিল ২৬ পর্যন্ত। এই অবসরে মূল অভিযানের অধিনায়ক জন ডব্লু ইয়ং (৩৬) এবং চাঁদের ভেলার চালক চার্লস এম ডিউক, জুনিয়র (৩৬)-এর ভেলায় চড়ে ২১ এপ্রিল ভারতীয় সময় রাত ২টা বেজে ১১ মিনিটে চাঁদে অবতরণ। অবতরণ স্থল ডেকার্তে অঞ্চল। অতঃপর শুক্র, শনি এবং রবিবার এই তিন দিন চাঁদের গাড়িতে চড়ে ইয়ং এবং ডিউকের মিলে সাত ঘণ্টা করে চাঁদের বুকে বিচরণ। মাঝে বিরতি এবং গবেষণার কাজ। অতঃপর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন এবং মহা প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ ২৯ এপ্রিল, শনিবার, ভারতীয় সময় রাত দুটোয়।

প্রসঙ্গত, ঝুনো বৈমানিক ইয়ং-এর মহাকাশ অভিযানের অভিজ্ঞতা যেমন দীর্ঘ দিনের, তেমনি বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মহাকাশ যাত্রা জেমিনি-৩ মহাকাশযানের বিশিষ্ট নভোচর হিসেবে। ১৯৬৬-র জুলাই মাসে জেমিনি-১০-এর অধিনায়ক। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই অভিযানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন

ঐতিহাসিক অ্যাপলো-১১-র কমান্ড মড্যুলের চালক মাইকেল কোলিনস। পরে মে, ১৯৬৯-এ অ্যাপলো-১০-কে চাঁদের সত্তর মাইল কাছাকাছি অঞ্চলে পাঠিয়ে চাঁদে অবতরণের শেষ ধাপটি যখন রচনা করা হয়, তখন এই ইয়ং-এরই ওপর ভার পড়ে কম্যান্ড মড্যুলটিকে চালিয়ে পরীক্ষা করার। এবার তিনি পুরো অভিযানটিরই অধিনায়ক। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ অথচ ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। মনে পড়ে ১৯৬২ সালে যখন নৌসেনা বিভাগের জেট পাইলট, এফ ৪ বি জেট চালিয়ে মাত্র ৩৪·৫ সেকেণ্ডে ১০,০০০ ফুট সরাসরি ঊর্ধ্বাকাশের দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করেছিলেন।

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে বলা চলে ম্যাটিংলির এবার ভাগ্য ফিরেছে। ১৯৭০-এর এপ্রিলে অ্যাপলো-১৩-র নভোচর হিসেবে তিনি প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু যাত্রার তিন দিন আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে শেষপর্যন্ত তাঁকে বিদায় নিতে হয়। দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত ব্যাটারি গোলযোগের দরুন চাঁদের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ওই চন্দ্রযানটিকে ফিরে আসতে হয়। আর ডিউক? অ্যাপলো-১১-র অভিযানের সময় তাঁর কাজ ছিল হিউসটনের মিশন কন্ট্রোলে বসে নভোচরদের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করা। এবার স্বয়ং নভোচর।

বলিষ্ঠ বলছি এই কারণে যে, এই প্রথম তিনজন মানুষ চাঁদের দেশে পাড়ি জমালেন প্রায় ছয় কোটি অমানবিক সহযাত্রীর সান্নিধ্যে বসে। এরা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাক। ওঁদের সঙ্গে এঁদেরও ২৯১ ঘণ্টা ধরে চাঁদ এবং দূর মহাকাশ পরিমণ্ডলে বিচরণ করার কথা। তারপর পৃথিবীতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে জীববিজ্ঞানীরা এদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। মহাকাশের তেজস্ক্রিয় পরিবেশ প্রাণী কোষের উপর সত্যিই কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, এবারকার এই পরীক্ষা হয়ত সে ব্যাপারে মৌলিক কোন চিন্তা-ভাবনার খোরাক যোগাতে সমর্থ হবে।

মহাকাশ পরিবেশে প্রাণী বা বিভিন্ন ধরনের জীবকোষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো অবশ্য এটাই প্রথম ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে মার্কিন এবং সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কুকুর, বানর প্রভৃতির উপর কিছু কিছু গবেষণা চালিয়েছেন। ১৯৬৬ সালে জেমিনি ৯ এবং ১২, ওই একই সময়ে সোভিয়েত ভোস্টক, সয়ুজ-স্যালুতে মহাকাশযানে নানারকমের জীবকোষ বহন করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত মহাকাশযানের কোনটিই দূর মহাকাশে বিচরণ করার সুযোগ পায়

নি। তবু ওই পরিবেশেই দেখা গেছে ভারহীনতা এবং মাধ্যাকর্ষণের টান কম থাকায় বেশির ভাগ জীবাণুর দৈহিক বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক কমে গেছে। অক্সিজেনের ঘাটতি এবং প্রায়-বায়ুশূন্য অবস্থা তাদের জৈবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া মহাকাশের নানা রকম বিকিরণ তাদের বংশগতিকে শুদ্ধ পাল্টে দিয়েছে।

আজকের প্রাণী বিজ্ঞানীদের কাছে এটাই বড় রকমের একটি রহস্য! এবং মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে বড় রকমের একটি সমস্যা। আজ নয়, প্রশ্ন উঠেছিল আজ থেকে অনেক বছর আগে: জৈবিক বিবর্তনের সত্যিকারের কারণ কী? ডারউইন উত্তর দিয়েছেন, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে প্রাণী-জগৎকে বার বার নতুনভাবে রূপ পরিগ্রহ করতে হয়েছে। লামার্কের ইউস অ্যান্ড ডিসইউস তত্ত্ব তারই পরিপূরক। তিনি বললেন, যে প্রত্যঙ্গকে আমরা বেশি ব্যবহার করি, তার সংস্কার ঘটে। যার ব্যবহার কম ক্রমে সেটা পরিত্যক্ত হয়, অথবা ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে। মেনডেলের 'জীন তত্ত্ব' বংশগতি বিশ্লেষণের এক নতুন দিগন্ত। তবু একথা স্বীকার্য, ওঁরা সকলেই যা কিছু

চিন্তা করেছেন তার গণ্ডী খুবই সীমিত।

উত্তরকালে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হল। জানা গেল তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব প্রাণী বা উদ্ভিদ কোষের উপর অপরিসীম। ওই বিকিরণ জীবকোষের মৌলিক চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'মিউটেসন'।

আর এ ব্যাপারটাই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে বড় রকমের একটা সমস্যা রূপে দেখা দিল। কারণ পৃথিবীর পরিমণ্ডলে বিকিরণ বলতে যা বোঝায় দূরে মহাকাশে তার স্বরূপটি ভিন্নতর। মেঘ, ধূলিকণা, বাতাসের স্তর অথবা ভ্যান অ্যালেন বেল্ট-এর মত সেখানে প্রতিরোধকারী কোন আচ্ছাদন না থাকায় অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির সেখানে অবাধ আনাগোনা। এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে, ওই রশ্মির কোন কোনটি চন্দ্রযানের পুরু আস্তরণ ভেদ করে নভোচরদের শরীরের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। মানুষের দূর মহাকাশ যাত্রায় এটা বড় রকমের একটা বাধা। চাঁদে পাড়ি এখন না হয় কয়েক দিনের ঘটনা। এর পর মানুষ যখন মাসের পর মাস, অথবা একাধিক বছর ধরে মহাকাশে বিচরণ করবে, তখন কী হবে? যেমন ধরুন, ১৯৭৩ সালেই মার্কিন মহাকাশ সংস্থা স্কাইল্যাব নামে একটি মহাকাশ স্টেশন পাঠাচ্ছেন। যার যাত্রী তিনজন। তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে মহাকাশে থেকে নানা রকম গবেষণা চালাবেন। তেমন ক্ষেত্রে মহাজাগতিক রশ্মি তাঁদের শারীরিক ক্ষয়ক্ষতিও ঘটাতে পারে।

আসলে জীবকোষের উপর মহাজাগতিক রশ্মির সত্যিকারের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনও পর্যন্ত খুবই অস্পষ্ট। ঠিক কোন ধরনের মহাজাগতিক রশ্মি কোষের উপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া করে, কোষে বিবর্তন ঘটায় তার উপর যথেষ্ট অনুসন্ধান চালানোর প্রয়োজন আছে।

তাই বলছিলাম, অ্যাপলো-১৬-র অভিযান জীববিজ্ঞানীদের ধ্যানধারণায় এক নতুন দিগন্ত তুলে ধরবে বলেই মনে হয়। এবারকার নভোচররা সঙ্গে নিলেন আট রকমের জীবাণু। এদের মধ্যে ছিল দু' রকমের ছত্রাক, পাঁচ রকমের ব্যাকটেরিয়া এবং কিছু ভাইরাস। তিনটি ট্রে-র উপর এদের রেখে দেওয়া হয়। চাঁদ থেকে ঘরে ফেরার সময় পৃথিবীর দূরত্ব যখন প্রায় এক লক্ষ মাইল, মার্টিংলি ট্রে তিনটি নিয়ে মহাকাশযানের বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং তাদের দশ মিনিট ধরে মহাকাশের উন্মুক্ত পরিবেশে নিরাবরণ অবস্থায় রেখে দেন। বলা বাহুল্য, এই দশ মিনিট ওই সমস্ত জীবাণুর উপর প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির অবারিত বর্ষণ ঝরে পড়েছে। হিউস্টনের মহাকাশ কেন্দ্রের অণুজীববিজ্ঞানী ডঃ

সহস্র জ্বালামুখ নিয়ে চাঁদের বুকে ডেকার্তে অঞ্চল। ছবিটি শিল্পীর তুলিতে আঁকা
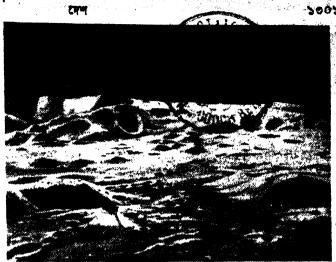
জেরাল্ড টেইলর বলেছেন, যে ছয় কোটি জীবাণু পাঠান হয়েছিল তার মধ্যে চার কোটি শুকনো অবস্থায় রাখা হয়, অবশিষ্ট দুই কোটি জলীয় দ্রবণে ভেজানো ছিল। অনুরূপ জীবাণু তাঁরা মহাকাশ কেন্দ্রেও পরীক্ষাধীন অবস্থায় রেখেছেন। চাঁদের দেশ থেকে ফিরিয়ে আনা জীবাণুর সঙ্গে এই সমস্ত জীবাণুর সত্যিকারের পার্থক্য শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল খুঁটিয়ে দেখা হবে।

আরও একটি গবেষণা করছেন এবারকার নভোচররা। যার নাম 'বাইওস্ট্যাক।' এটির উদ্ভাবক এবং নির্মাতা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হোর্স্ট বুকার। আসলে এটি একটি বাক্স। তার মধ্যে থাকে থাকে সাজান ছিল চার রকমের বস্তু। ব্যাসিলাস সাবটিলিস নামে এক ধরনের বীজগুটি, এক ধরনের পানি ফলের বীজ, সীমের ভ্রূণ এবং লোনা জলের চিংড়ির ডিম। চাঁদের পরিবেশে এদের উপরও পরীক্ষা চালানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চাঁদের পরিমণ্ডলে পৃথিবীর জীবকোষের গমনাগমন অবশ্য নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও যে সমস্ত মানব আরোহীহীন যানগুলি চাঁদে অবতরণ করে, অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও দেখা যায় পৃথিবীর জীবাণু চাঁদ পর্যন্ত তারা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। তার প্রমাণ, ১৯৬৭ সালে সার্ভেয়ার-৩ নামে একটি মার্কিন যান চাঁদের বুকে অবতরণ করে। পরে ১৯৬৯ সালে অ্যাপলো-১২র নভোচররা গিয়ে ওই যানের একটি টেলিভিশন ক্যামেরা উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। ওই ক্যামেরায় পর্যবেক্ষকরা এক ধরনের জীবাণুর সন্ধান পান। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ওই জীবাণু সার্ভেয়ারের যাওয়ার সময় অসাবধানতা বশত ক্যামেরার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। এবং সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপারে, প্রায় ৯৫০ দিনের মত সময় অমন প্রতিকূল পরিবেশে কাটিয়েও তারা তাদের জীবনীশক্তি অটুট রেখেছে। পৃথিবীতে ফিরে আসার পর অনুকূল অবস্থা ফিরে পাওয়া মাত্র সুপ্ত অবস্থা থেকে আবার তারা জাগ্রত প্রাণে পরিণত হয়।

অ্যাপলো-১৬র নভোচরদের এবার আরও একটি প্রথম, ওঁরা চাঁদের বুকে একটি অতিবেগুনী রশ্মিতে

ছবি তুলতে পারে, এমন একটি ক্যামেরা এবং তার সঙ্গে একটি বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র বসিয়ে আসা। এর কাজ হবেঃ চাঁদের বায়ুহীন পরিমণ্ডল থেকে দূরাকাশ, অতিবেগুনী রশ্মির উৎসের সন্ধান করা। যেটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, ধূলিকণার ছাউনির মধ্যে থেকে করা শক্ত। ক্যামেরা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মির ছবি তুলবে। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র সেই ছবি বিশ্লেষণ করে মূল তথ্য জানিয়ে দেবে। নভোচররা এ ধরনের কিছু ছবি নিয়ে এসেছেন মহাকাশ সম্পর্কীয় গবেষণার জন্যে।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে মহাজাগতিক মেঘ ছড়িয়ে রয়েছে এই ছবি সে সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য যোগাতে সাহায্য করবে। এ মেঘের মূল উপাদান হাইড্রোজেন। নক্ষত্র জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এই মেঘই পুঞ্জীভূত হয়ে সৃষ্টি করে নানারকম মৌলিক পদার্থের পরমাণু, যারা একত্রে মিলিত হয়ে তৈরি করে এক একটি নক্ষত্র, অথবা পৃথিবীর মত কোন গ্রহ।

এই ক্যামেরার সাহায্যে ইয়ং এবং ডিউকের চাঁদ থেকে পৃথিবীর উর্ধ্বাকাশেরও অতি-বেগুনী রশ্মির মাধ্যমে ছবি তোলার কথা। এই ছবি পৃথিবীর আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করবে সন্দেহ নেই। মহাকাশে ভিন্ন ভূ-গোলকের বুকে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ এই প্রথম।

চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে আরও একটি পরীক্ষা চালানর কথা ইয়ং এবং ডিউক-এর। জৈব-রসায়নে যাকে বলা হয় 'ইলেকট্রোফোরেসিস' বা 'ক্যাটাফোরেসিস'। এটা কোন দ্রবনের মিশ্র পদার্থগুলিকে পৃথক করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোন দ্রবনে মিশে থাকা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবে পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হয়, পরে পৃথক করা হয়। মুশকিল হল, উচ্চতর মাধ্যাকর্ষণের দরুন এই পৃথকীকরণ পৃথিবীতে পুরোপুরি সম্ভব নয়। চাঁদে মাধ্যাকর্ষণের টান। অতএব ওই পরিবেশে পদ্ধতির আরও কতটা নিখুঁত করা যায়, এবারকার প্রচেষ্টা সে ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা যোগাবে। উল্লেখ্য, এটা করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে রোগ প্রতিরোধক টিকে আরও বিশুদ্ধভাবে তৈরি করা সম্ভব হবে। টিকের অনাকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে পারলে টিকে দেবার পর জ্বর বা অন্যান্য যে সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয় তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ বলা চলে অ্যাপলো-১৬র চন্দ্রযাত্রা অন্যান্য বারের তুলনায় যে কারণে স্বতন্ত্র, সেটা হল পরিকল্পনাকারীরা এবার প্রযুক্তির দিকটাও যতটা ভেবেছেন, ঠিক ততটা ভেবেছেন মহাকাশ-বিজ্ঞান নামে বিশেষ এই অধ্যায়টিকে মানব কল্যাণে কাজে লাগানোর। এটা আশার কথা।

আর এর সমস্তই তাঁদের করার কথা যে অঞ্চলটিতে, নাম তার ডেকার্তে। প্রখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক রেনে ডেকার্তের নামেই নামকরণ। জন্ম ১৫৯৬। মৃত্যু ১৬৫০। তাঁর বিশ্বপরিচিতির মূলে তাঁর 'র‍্যাশনালিস্ট ফিলজফি'। যার মূল বক্তব্য, কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তের জন্য সত্যিকারের বস্তুব ঘটনার উপর নির্ভর কর। যিনি চেয়েছিলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সব সময় গণিতের সাহায্যে আরও স্বচ্ছন্দ থাক, পরিবর্তিত হোক।

হ্যাঁ, চাঁদের চাকতিটি কল্পনা করুন, এটি ঠিক যেন একটি ঘড়ির মুখ। ঘড়িতে যখন চারটে বাজে তখন তার ঘণ্টার কাঁটা কোথায় দাঁড়ায়? চাঁদের চাকতির ঠিক অমন
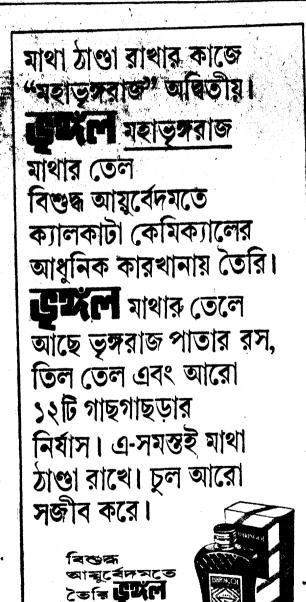
জায়গাতেই ডেকার্তের অঞ্চলের অবস্থান। চাঁদের ম্যাপে ভৌগোলিক অবস্থান নয় ডিগ্রি এক সেকেন্ড দক্ষিণ অক্ষাংশ। পনের ডিগ্রি তিরিশ মিনিট উনষাট সেকেন্ড পূর্ব দ্রাঘিমা। ছোট বড় হাজারো জ্বালামুখ চারদিকে ছড়িয়ে। সবচাইতে বড় জ্বালামুখটির নাম ডেকার্তে।

প্রশ্ন উঠছে, ওই সমস্ত জ্বালামুখ কি অতীতের জীবন্ত চাঁদের আগ্নেয়গিরির

পায়ের নিচে ডেকার্তে অঞ্চল। দূরাকাশে পৃথিবী। এই প্রথম চাঁদের দেশ থেকে অতিবেগুণী রশ্মির মাধ্যমে পৃথিবীর ছবি তুলছেন অ্যাপলো-১৬র জনৈক নভোচর।

পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ? হতেও বা পারে। কেউ বলছেন, এক সময়ে চাঁদের এই অঞ্চলটিতে প্রচুর উল্কাপাত ঘটে। তারই জ্বালামুখের মত ওই সমস্ত গহ্বর সৃষ্টি করেছে। কাদার উপর ঢিল ফেললে কাদার বুকে যেমন গর্ত হয় এবং কিছু কাদা আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে, ডেকার্তের অঞ্চলেও একদিন ওইভাবে গর্ত তৈরি হয়েছিল এবং তার সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানকার পাথর, ধুলোবালি, ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, অ্যাপলো-১১ এবং ১২-র নভোচররা যে যে অঞ্চল থেকে পাথর প্রভৃতি কুড়িয়ে এনেছিলেন ওই সমস্ত অঞ্চল থেকে ডেকার্তের পাথর, বালির বয়েস অনেক বেশি। তবে অ্যাপলো ১৪ এবং ১৫-র নভোচরদের আনা পাথরের চেয়ে অনেক কম। উল্লেখ্য, অ্যাপলো-১৫র নভোচররা চাঁদের প্রাচীনতম ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল অ্যাপেনাইন থেকে পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। অতএব ডেকার্তের পাথর চাঁদের গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন তথ্য যোগাতে সমর্থ হবে।

ওঁদের আর সমস্ত রুটিন মাফিক কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: এক, চাঁদের মানচিত্র তৈরির জন্যে জরিপ চালান। দুই, চাঁদের গাড়ির উন্নততর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা, তিন, সৌর-কোষ ছাড়াও, মহাকাশযানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে যে জ্বালানি-কোষ ব্যবহার করা হয় তাতে থাকে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। এই দুটি বস্তুর মিলন ঘটিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন যেমন চলে, তেমনি উদ্বৃত্ত লাভ জল। এই জল নভোচরদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মুশকিল হল, এক আগে দেখা গেছে এই জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বুদ বুদ ভেসে থাকে। যা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতিসাধন করে এবং অন্ত্রের রোগ ঘটায়। এবারকার অভিযানে এই বুদ বুদ পৃথক করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চার, চাঁদ থেকে কমান্ড মড্যুলে ফিরে আসার পর ভেলাটিকে সজোরে চাঁদের বুকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তার দরুন যে ভূকম্পন হয় সেই কম্পনের মাত্রা আগের এবং এবারকার অ্যাপলোর নভোচরদের বসিয়ে আসা ভূকম্পন মাপক যন্ত্র নিয়মমাফিক সংগ্রহ করে পৃথিবীর মানমন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই পরীক্ষাটিও চাঁদের গঠন প্রকৃতি জানতে সাহায্য করবে।

বস্তুত, এ ধরনের চন্দ্র অভিযানের আর একটি মাত্র বাকি। অ্যাপলো-১৭। ঠিক হয়েছে এ বছরের ডিসেম্বরে এটি চাঁদে পাড়ি দেবে। তারপর অ্যাপলো প্রকল্পের সমাপ্তি। আশা করা যায় তখন চান্দ্র-জগতের অনেক মৌলিক রহস্যই অতঃপর আমাদের কাছে উন্মীলিত হবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্যও।

বিজ্ঞান-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে পরিষদ পরিচালিত 'অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগারের' উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়বস্তু: 'ভারতের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ'। ৪০০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ১০০, ৭৫ এবং ৫০ টাকা। যোগাযোগের ঠিকানা: অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগার, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৬। প্রবন্ধ দাখিল করার শেষ তারিখ ১৫ মে, ১৯৭২।

সমরজিৎ কর

॥ ২৪ ॥
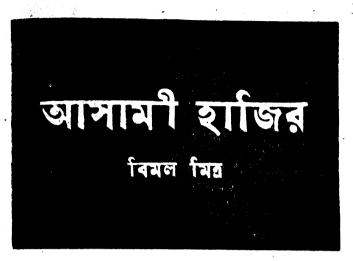
সদানন্দের মনে আছে বাড়িতে তখন সে কী বিশৃংখলা। যে-বাড়িতে একদিন সব কাজ নিয়ম করে চলেছে, যে-বাড়িতে সকাল থেকে সবাই নিয়ম মেনে চলেছে সেই বাড়িতেই যেন হঠাৎ এক অরাজক অবস্থা নেমে এল। একদিকে কর্তাবাবুর অসুখ, অন্য দিকে মামলা আর বাড়ির ভেতরে তখন বেনিয়ম। অথচ সমস্ত কিছুর পেছনে সদানন্দ। তার সামান্য একটু অসহযোগিতার জন্যে এতদিনের সব আইনকানুন যেন একেবারে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল।

এমনিই হয়। সত্যিই এমনি হয়। কারণ সবাই তো সংসারের নিয়মের সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নেয়। সংসারের সঙ্গে আপস করে চলেই সবাই সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারলে বর্তে যায়। কিন্তু এমন লোকও সংসারে জন্মায় যারা সংসারের নিয়মের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে না চলে সংসারকেই নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। লোকে এদেরই বলে বেহিসেবী। অথচ এই বেহিসেবী লোকগুলোর জন্যেই আমাদের এই পৃথিবীটা এগিয়ে চলে। তাদের অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়েই পরবর্তী যুগের মানুষ অনেক অনাচার আর অনেক অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচে।

সদানন্দও বোধ হয় এমনি এক বেহিসেবী মানুষ।

নইলে বেশ তো ছিল সে। তার পূর্ব-পুরুষের পাপের কৈফিয়ত তো কেউ তার কাছে চাইতে যায়নি। কেউ তো বলেনি—তুমি প্রায়শ্চিত্ত করো। কেউ তো তাকে বলেনি, তুমি তোমার পূর্বপুরুষের সব কলঙ্ক নিজের আত্মাহুতির প্রলেপ মুছে ফেল। কেউ তো বলেনি তোমার জন্মদাতার সব অপরাধের উত্তরাধিকারী তুমি। আর তুমিই তার প্রায়শ্চিত্ত করবার একমাত্র হকদার।

বেহারী পাল প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু খবরটা কানে পৌঁছুল তার গিন্নীর মারফত। পাশাপাশি বাড়ি। এ-বাড়ির চিলে-কোঠায় বেড়াল এসে বসলে ও-বাড়ির বেড়াল রাগে গোঁ-গোঁ করে। সেই বেহারী পালের কানে গেল খবরটা।

গিন্নী বললে—ছি ছি ছি, আমার বাপের জন্মেও এমন কাণ্ড কখনও শুনিনি মা—

বেহারী পালের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—তা খবরটা তুমি কার কাছে শুনলে?

—ওই বিষ্টুর মা। বিষ্টুর মার সঙ্গে যে আমার ঘাটে দেখা হল। মাগী বদমাইশ হলে কী হবে, মানুষটার মনটা ভালো।

—কী রকম?

গিন্নী বললে—ওই মাগীই তো বললে ওদের নতুন-বউএর সঙ্গে নাকি চৌধুরী-মশাই-এর ছেলে একঘরে এক বিছানায় শোয় না। আমার তো শুনে বিশ্বাস হলো না। বিষ্টুর মা বললে—বউটা নাকি নষ্ট—

—সে কী?

এ-খবর ক'দিন থেকেই বেহারী পালের কানে যাচ্ছিল। বেহারী পালমশাই নিজের কাজকর্ম করে, আর চৌধুরী-বাড়ি থেকে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজও শোনে। কিন্তু কারণটা এতদিনেও বুঝতে পারতো না। এবার যেন সেটা একটু স্পষ্ট হলো। বুঝতে পারলে চৌধুরী-মশাইএর বংশের মেরুদণ্ডেই ঘুণ ধরেছে। এইবার জব্দ হবে বুড়ো। এইবার মচকাবে কর্তাবাবু।

গিন্নীকে বেহারী পাল একান্তে ডেকে বলে দিলে—তুমি যেন এখন এ-সব কথা কাউকে বলে ফেলো না আবার। বুঝলে?

—কেন? বললে দোষ কী?

বেহারী পাল সাবধানী লোক। বললে—এখন বললে জিনিসটা আর বাড়বে না। এখন একটু বাড়তে দাও, বেড়ে বেড়ে ওর ডাল-পালা গজাক, তখন বলো—

অবশ্য বেহারী পাল বুঝতো মেয়ে-মানুষদের ও-কথা বলাও যা আর না-বলাও তাই। তবু যে কথাটা বলে রাখলো তারও একটা দাম আছে। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। কখন কোন ফাঁকে মেয়ে-মানুষের মুখ ফসকে কথাটা বাইরে ফাঁস হয়ে যায় সেই ভাবনাতেই রাতটা কাটলো। বলতে গেলে রাত্তিরে ভালো করে ঘুমও হলো না বেহারী পালের। তাই ভোর-ভোর ঘুম থেকে উঠে সামনের বাগানের সামনে পায়চারি করছিল। দেখলে কৈলাশ গোমস্তা যাচ্ছে।

বললে—কী গো কৈলাশ, খবর কী? কী রকম সরষে উঠলো তোমাদের?

কৈলাশ বললে—এবার তো নাবি সরষে, তাই ভালো হলো না। শ' পাঁচেক বস্তা হয়েছে কোনও রকমে।

—তা কর্তাবাবু কেমন আছেন?

—কর্তাবাবু আর কেমন থাকবেন, সেই একই রকম।

বেহারী পাল পায়ে-পায়ে কৈলাশ গোমস্তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। বললে—চলো, অনেক দিন তোমাদের কর্তা-বাবুকে দেখিনি, আজ দেখে আসি গে চলো—

এইভাবেই কর্তাবাবুর কাছে বেহারী পালের আসা। পাশাপাশি বাড়ি, অথচ দেখা-শোনা হয় না। প্রথমে কিছু শিষ্টাচার-সম্মত কথা হলো। তারপরেই হঠাৎ কর্তা-বাবু জিজ্ঞেস করে বসলেন—তোমার বাড়িতে অত শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজে কেন হে বেহারী? তুমি কে দীক্ষা নিয়েছো নাকি?

—দীক্ষা?

—হ্যাঁ, দীক্ষা না নিলে অত পুজো-আচ্চার ঘটা কেন তোমার বাড়িতে?

বেহারী পাল তো অবাক। বললে—আমার বাড়িতে শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা? ও তো আমার বাড়িতে নয় কর্তাবাবু, ও তো বাজে আপনার বাড়িতে। আপনার বাড়িতেই তো এক সাধু-বাবাজী এসেছেন, তিনিই যাগ-যজ্ঞ করেন দিনরাত, বাড়ি থেকে দিগ্‌বন্ধন করে ভূত-প্রেত তাড়িয়ে দেন। আপনি এ-সব কিছু জানেন না?

কর্তাবাবুর কথাটা শুনে রেগে আগুন। বললেন—তার মানে, শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজলো তোমার বাড়িতে আর তুমি বলছো আমার বাড়িতে পুজো হচ্ছে? তুমি কি আজকাল জেগে ঘুমোচ্ছ নাকি হে বেহারী? সুদে টাকা খাটিয়ে কিছু টাকা হয়েছে বলে একেবারে [illegible] না এসে তাই-ই বলতে আরম্ভ করেছে?

[illegible] দিকে চাইলেন। [illegible] বেহারীর কথাটা [illegible]?

[illegible] অবস্থা। কর্তাবাবুর কথায় না করতে পারে প্রতিবাদ আর না করতে পারে [illegible]।

বেহারী পাল [illegible] কথা অত-শত জানে না। সে বললে—আজ্ঞে, সুদে আমি টাকা খাটাই বটে, কিন্তু সে কি আজ নতুন কর্তাবাবু? তার জন্যে আমি খামোকা মিথ্যে কথা বলতে যাবো কেন আপনার কাছে? আর শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজাটা কি অন্যায় কর্তাবাবু?

কর্তাবাবু আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—তার চেয়ে বলো না এটা তোমার ভড়ং—ভড়ং বলতে তোমার অত লজ্জা কীসের?

—কী আশ্চর্য, আমি এলুম আপনার কাছে আপনি কেমন আছেন তাই জানাতে, আর আপনি আমাকে গালমন্দ করছেন?

—আমি তোমাকে গালমন্দ করলুম? বা রে মজা! তোমার বাড়িতে শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজার কথা বললেও গালমন্দ করা হলো? তুমি তো আজকাল ভারি বেআক্কেলে হয়ে গেছ হে বেহারী? দুটো টাকা হলেই মানুষকে এমন বেআক্কেলে হতে হয়, ছি ছি ছিঃ—

শেষের ছিঃ-টার ওপর একটু বেশী জোর দিয়ে কর্তাবাবু কথাটা শেষ করলেন। ভাবলেন এই ছিৎকারেই বেহারী পাল নরম হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু না, কর্তাবাবু বেহারী পালকে চেনেননি। ভেবেছেন সেই আগেকার বেহারী পালই আছে। সেই সবে গোঁফ গজানো নিরীহ গোবেচারী মানুষ। কিন্তু তারপরে এতকাল ইছামতীতে যে কত জল গড়িয়ে গেছে, চারপাশের দুনিয়াটা যে কত বদলে গেছে, ঘরের মধ্যে বসে সে-খবর তিনি পাননি। ভেবেছেন সেই কালিগঞ্জের হর্ষনাথ চক্রবর্তীর আমল বুঝি এখনও চলছে। এখনও জমিদার যা বলবে সবাই বেদবাক্য বলেই তা মেনে নেবে! তিনি নিজে যখন নবাবগঞ্জের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তখন যেন আর কোনও ধনী ব্যক্তি এ দিগরে থাকতে পারবে না, থাকতে পারা যেন বে-আইনী। নিজে পঙ্গু মানুষ, তাই ভেবে নিয়েছেন পৃথিবীটাও যেন তাঁরই মত পঙ্গু হয়ে শয্যায় পড়ে আছে।

কথাটা চরমে উঠলো তার পরেই। বেহারী পাল হঠাৎ বলে বসলো—আগে নিজের বাড়ির দিকে নজর দিয়ে দেখুন কর্তাবাবু, পরের ব্যাপার পরেই ভালো করে নজর দিতে পারবে—

—কী বললে তুমি? কী বললে?

বেহারী পাল বললে—এখন তো সবে

নাতির বিয়ে দিয়েছেন। এখন নাত-বউও বাড়িতে এসেছে। এখন সেই দিকেই নজর দিন, নইলে আপনারই ক্ষতি, আমার কলা—

বলে বেহারী পাল তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। কিন্তু উঠে পড়বার আগেই যা হবার তা হয়ে গেল। কর্তাবাবুর মুখ দিয়ে কী-রকম একটা গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোতে লাগলো। যেন কী বলতে যাচ্ছেন, সে-কথাটা জিভের মধ্যেই আটকে গেল। রাগের মাথায় দুটো সচল হাত তুলে কী বলতে চাইলেন তা আর কেউ জানতে পারলে না। বেহারী পাল আর দাঁড়ালো না। সে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

কিন্তু মুশকিল হলো কৈলাশ গোমস্তার। সে ভয় পেয়ে গেল। সে আর সেখানে দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় একতলায় নেমে এসেছে।

নিচেয় তখন চৌধুরী মশাই সদানন্দকে ঘরের ভেতর পুরে দরজায় তালাচাবি বন্ধ করে দিয়েছেন। আর বাড়ির যত লোক আশ-পাশ থেকে উঁকি মেরে কাণ্ডটা লক্ষ্য করছে।

সদানন্দর ঘরের দরজায় তালাবন্ধ হলে কী হবে, পাশেই একটা বিরাট জানালা। ঘরের বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল সদানন্দ এতটুকু প্রতিবাদ করছে না, বাধাও দিচ্ছে না। তালা-চাবি বন্ধ হবার পর সে মাথা নিচু করে ঘরের ভেতরে রাখা খাটের ওপরে গিয়ে বসে মাথা নিচু করে রইলো।

সমস্ত ব্যাপারটা প্রীতির চোখের সামনেই ঘটলো। বললে—ওগো, দরজাটা খুলে দিয়ে যাও, দরজা বন্ধ করে চলে গেলে কেন?

গৌরীও এতক্ষণ নির্বাক হয়ে সব কিছু দেখছিল। সে-ই নিজের হাতে ছোটকর্তাকে তালা-চাবি এনে দিয়েছে। এক মুহূর্তের মধ্যে যে কী কাণ্ড ঘটে গেল তা যেন কেউ তখনি-তখনি কল্পনাও করতে পারলো না। কী যে অপরাধ সদানন্দর, আর কত বড় অপরাধের যে এত বড় শাস্তি, তাও কেউ অনুমান করতে পারলে না।

প্রীতি বাইরের জানালা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে খোকা, তুই কী করেছিলি রে? কর্তা এমন রেগে গেলেন কেন তোর ওপর? তুই কী করেছিলি?

প্রকাশমামাও এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এক যে বাক্যবাগীশ মানুষটা সেও যেন ঘটনার আকস্মিকতায় ও নিকষ্কতার জন্য একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

প্রীতি তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী হয়েছিল রে? তোর জামাইবাবু এত রেগে গেল কেন রে? কী করেছিল খোকা?

প্রকাশ বললে—বাবাজীর ত্রিশূল কেড়ে নিয়েছিল, আর বাবাজীর জটা টেনে ধরে গালাগালি দিচ্ছিল—

—গালাগালি দিচ্ছিল? খোকা গালাগালি দিচ্ছিল? এ হতেই পারে না। খোকা কখনও কাউকে গালাগালি দিতেই পারে না—

ভেতরে সদানন্দ তখনও মুখ নিচু করে খাটের ওপর চুপ করে বসে ছিল। প্রীতি তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে খোকা, তুই বাবাজীকে গালাগালি দিয়েছিলি? কী করেছিল বাবাজী?

সদানন্দ যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে রইল। এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

প্রীতি আবার জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, কথার জবাব দে—

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে একজন প্রশ্ন করছে আর ভেতরে যে শুনছে সে পাথর না গাছ তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

—কথার জবাব দিবি না? বলি আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?

তবু সদানন্দর দিক থেকে কোনও উত্তর নেই।

প্রীতি যেন নিজের মনেই বললে—এ আমার কী মুশকিল হলো বল তো প্রকাশ। এ আমি কাকে কী বলি? তোর জামাইবাবু তো খোকাকে ঘরের ভেতরে রেখে দিয়ে চলে গেল। আবার ওদিকে কর্তাবাবুর কী হলো কে জানে। এখন আমি সংসার দেখবো, না এই ছেলেকে সামলাবো। ছোট ছেলে হলে না হয় তবু তাকে সামলাতে পারা যায়, কিন্তু বুড়ো ধাড়ি ছেলেকে নিয়ে আমি কী করি? বাবাজী সন্ন্যাসী মানুষ, তিনি তো তোর কোনও ক্ষতি করেন নি, তাকে কেন খামোখা তুই মারতে গেলি মাঝ-খান থেকে। তিনি তোর কী করেছিলেন?

প্রকাশ বললে—দাঁড়াও, তুমি কিছু ভেবো না দিদি, তুমি এখান থেকে সরে যাও দিকি, তোমরা সবাই এখান থেকে সরে যাও, সবাই সরে যাও—

গৌরী, বিন্টুর মা, ঝি, বাসী, আরো সব ভেতর-বাড়ির ঝি-ঝিউড়ি যে-যে আশ-পাশ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল সবাই ধমক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গিয়েও পাছে কাছাকাছি থাকে সেই জন্যে প্রকাশ আবার বললে—সবাই ভাগো এখান থেকে, ভাগো—

প্রীতি নিজের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে আগেই রান্নাবাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিল। তার তখন মাথা ঘুরছে একেবারে বন্ বন্ করে। একে কটা রাত ঠায় জাগা। তার ওপর এই

উঠবো ঝামেলা। কিন্তু খাবার সময় তো একটু পেট খালি করে খাবে না। তখন পান থেকে চুন খসলে যত দোষ বাড়ির গিন্নীর। নিমাইএর মা, গৌরী তারাও প্রীতির সঙ্গে অফিস চলে গেছে। প্রকাশ তবু চারদিকে ঘুরিয়ে দেখে নিলে। না, কেউ কোথাও নেই। প্রকাশ জানলার কাছে এগিয়ে গেল।

বললে—এই সদা, শোন্। আয় ইদিকে—

কিন্তু কাকে কথা বলা। সদা প্রকাশমামার কথা শুনলে তবে তো!

প্রকাশমামা আবার ডাকলে—আমার কথা শুনবি না?

এতক্ষণে সদানন্দ মুখ তুললো। চেহারা দেখলে বোঝা যায় সে যেন রাগে ফুঁসছে।

—চা। আমার দিকে চেয়ে দেখ্!

সদানন্দ বলে উঠলো—কী বলবে বলো না—

প্রকাশমামা বললে—আয়, একবার জানলার কাছে আয়, তোর কানে কানে একটা কথা বলবো—

সদানন্দ বললে—যা বলবে তুমি ওখান থেকেই বলো।

প্রকাশমামা জানলার গরাদের কাছে মুখটা নিয়ে গেল। গলাটা একটু নামালো।

বললে—দ্যাখ্, একটা কথা শোন্, মন দিয়ে শোন্, বাড়িতে এখন পরের বাড়ির মেয়ে রয়েছে, এই সময় তুই কেন এমন কেলেঙ্কারী করছিস বল তো? জামাইবাবুর কথা একটু শুনলে তোর কী এমন ক্ষতিটা হয়? তোকে তো এমন কিছু শক্ত কাজ কেউ করতে বলছে না।

বলে প্রকাশমামা চুপ করলো। তারপর সদানন্দর তরফ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে আবার বললে—কী রে, জবাব দিচ্ছিস নে যে?

সদানন্দ বলে উঠলো—তুমি এখান থেকে যাও প্রকাশমামা, আমাকে বিরক্ত কোর না—

প্রকাশমামা বললে—আমি তোকে বিরক্ত করছি? কী বলছিস তুই? আমি তোর ভালোর জন্য বলছি, আর তুই কিনা বলছিস আমি তোকে বিরক্ত করছি?

তারপর একটু থেমে বললে—তা যাক গে, আমি জামাইবাবুকে এখ্খুনি ডেকে নিয়ে আসছি, তুই শুধু তার সামনে বলবি তুই আর অমন করবি না, যা করেছিস তার জন্যে মাফ চাইবি, চুকে যাবে ল্যাঠা। পারবি না? এইটুকুও বলতে পারবি না?

সদানন্দ তবু কিছু জবাব দিলে না। চুপ করে রইল।

—কী রে, আবার চুপ করে রইলি? জানিস ওপরে এখন কী হচ্ছে? তোর দাদুর হঠাৎ অসুখ বেড়েছে, যায়-যায় অবস্থা। বাড়িতে এই রকম বিপদ চলছে আর তোর কি না এই আক্কেল? তোর মা বাবা আমি—সবাই কোন্ দিকটা সামলাই বল্ দিকিনি। তুইও তো সারা রাত জেগে কাটিয়েছিস। বউমারও তো সেই অবস্থা। ওদিকে বাবাজী মানুষটার সেবার ব্যবস্থা আছে। এই সময় কে কাকে দেখে বল তো? একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুই সেয়ানা ছেলে হয়ে এ কী করছিস আমি বুঝতে পারছি না—

এমন সময় দীনু ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে তর-তর করে নেমে আসছিল। তাকে দেখেই প্রকাশমামা জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কর্তাবাবুর কী রকম অবস্থা?

দীনু হাঁফাচ্ছিল। বললে—কর্তাবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছে—

—কেন? অজ্ঞান হয়ে গেছে কেন? মারা যাবে নাকি?

কিন্তু তার আগেই চৌধুরীমশাই নিজেই আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। এসেই প্রকাশকে সামনে দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন—প্রকাশ, ও দীনুকে দিয়ে হবে না। তোমাকেই যেতে হবে—

প্রকাশ বললে—কোথায়?

—নবী ডাক্তারকে ডাকতে। বাবার অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। চোখ উল্টে গেছে।

—তা হঠাৎ এমন হলো কেন?

চৌধুরীমশাই বললেন—সে-সব কথা

পরে হবে। আগে তুমি যাও, ননী ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি ভালো বুঝছি না। বেহারী পাল মশাই-এর সঙ্গে কী নাকি কথা কাটাকাটি হয়েছিল শুনলাম, এখন কী করি।

প্রীতিও চৌধুরী মশাই-এর গলার শব্দ পেয়ে দৌড়ে এলো। বললে—কী হলো। ওপরে কী দেখে এলে?

প্রকাশকে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেই কথাগুলোই চৌধুরী মশাই গিন্নীকে বললেন। কিন্তু প্রীতি সে-কথায় কান দিলে না। বললে—তা তুমি যে খোকাকে ঘরে তালা-চাবি দিয়ে গেলে, ও খাবে না? ও মুখ-হাত-পা ধোবে না? রাগ হলে কি তোমার এই রকমই মাথা গরম হয়ে যায়?

চৌধুরীমশাই এ-কথায় আরো রেগে গেলেন। বললেন—মাথা গরম হবে না? তুমি আমার মাথারই দোষ দেখলে? আর তোমার ছেলে যে কত বেয়াড়া তা তো একবারও দেখতে পাও না?

প্রীতি বললে—তা বুঝলাম না-হয় যে আমার ছেলে বেয়াড়া, তা বলে তাকে ঘরে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে দেবে? তালা-চাবি বন্ধ করলে ছেলে তোমার শোধরাবে? এ কি ছেলেমানুষ ছেলে যে মেয়ে-ধরে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে ভালো করে তুলবে?

চৌধুরীমশাই বললেন—তা অত বড় বুড়ো ধাড়ি ছেলে ওর এতটুকু জ্ঞান-গম্যি থাকবে না তা বলে? ভেবেছে ওর যা খুশী তাই করবে? যে-ছেলে নিজের বাপের মুখের ওপর কথা বলে তাকে এই রকম শাস্তিই দিতে হয়। দরকার নেই ওর খেয়ে। এ-ছেলে আমার থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী! তুমি ও-রকম ছেলেকে পেটে ধরেছিলে কেন?

—আঃ—

বলে প্রীতি বিরক্তিতে একেবারে ফেটে পড়লো। বললে—তোমার কী মুখের আড় থাকতে নেই? তুমি কী বলছো তাও তুমি জানো না। দাও, আমাকে চাবি দাও, আমি দরজা খুলে দেব—

চৌধুরী মশাই চাবিটা চেপে ধরলেন। বললেন—না, চাবি কখখনো দেব না—

প্রীতি বললে—পাগলের মত কাণ্ড কোর না। দাও, চাবি দাও—

—কিন্তু তোমার ছেলে তাহলে বাবাজীর কাছে এখনি ক্ষমা চাক। এখনি বাবাজীর কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাক!

প্রীতি আর কথা না বলে চৌধুরী মশাই-এর কাছ থেকে এক টানে চাবি কেড়ে নিলে। তারপর দরজার তালাটা খুলতে যেতেই চৌধুরী মশাই গিন্নীর হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন—চাবি দাও, চাবি দাও আমাকে—তালা খুলতে পারবে না—

বলে চাবিটার জন্যে গিন্নীর হাতটা ধরে টানতে লাগলেন।

প্রকাশমামা এতক্ষণে চৌধুরী মশাই-এর হাতটা ধরতে গেল। বললে—জামাইবাবু, আপনি করছেন কী? আপনি ঠাণ্ডা হোন—

চৌধুরী মশাই প্রকাশের হাতটা ঠেলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন—খবরদার, তুমি আমার হাত ধরবার কে? যাও এখন থেকে, চলে যাও। একবার তোমাকে ঠেলে দিয়েছি না! আমার গায়ে হাত দিতে এলে আবার তোমাকে উঠোনের মধ্যে ফেলে দেব—যাও—

প্রকাশ বললে—কিন্তু আপনি মাথা ঠাণ্ডা করে জিনিসটা ভেবে দেখুন জামাইবাবু, দিদি যা বলছে ঠিকই বলছে—

—আবার? আবার তুমি আমার সামনে আসছো?

কিন্তু প্রীতি তখন সেই ফাঁকে তালাটা খুলে ফেলেছে। খুলে ফেলে সদানন্দকে ডাকলে—আয় খোকা, আয়, আয়, বেরিয়ে আয়।

সদানন্দ কিন্তু বেরিয়ে আসবার কোনও চেষ্টাই করলে না। প্রীতি এবার নিজেই ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকে সদানন্দর হাতটা ধরে টানতে লাগলো। বললে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বেরিয়ে আয়—

চৌধুরী মশাই তখনও প্রকাশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে ব্যস্ত। বললেন—তুমি আমাদের ব্যাপারে কেন মাথা ঘামাতে আসো শুনি? তোমার নিজের বাড়ি ঘর-দোর নেই?

প্রকাশ বললে—আমি তো যেতে চাই-ই। আমার ছেলে-মেয়ে-বউ সেখানে পড়ে রয়েছে, আমি তো যেতেই চাই সেখানে—

—তা যাচ্ছো না কেন? গেলেই তো পারো। আপদ চোকে—

—কিন্তু দিদি যে আমাকে যেতে দেয় না। সদানন্দর বিয়ের পরই তো আমি যেতে চেয়েছিলুম, কিন্তু দিদিই তো আমাকে আটকে রাখলে।

চৌধুরী মশাই বললেন—দিদি কে? এ আমার বাড়ি, আমি এ বাড়ির মালিক। আমি বলছি তুমি এখান থেকে চলে যাও—তুমি কেন এখানে বসে বসে আমার অন্ন-ধ্বংস করছো—

প্রকাশের মতন হ্যাংলা মানুষের বোধহয় মান অপমান জ্ঞান আছে। নইলে জামাইবাবুর কথায় সেই বা অমন হঠাৎ চুপ হয়ে যাবে কেন? এতক্ষণ তার মুখের যা-চেহারা ছিল তা যেন হঠাৎ এই কথাগুলোয় চুপসে গেল। সে মুখ চুণ করে একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। এতগুলো বাড়ির লোকের সামনে এত বড় অপমান তার জীবনে আর কখনও ঘটেনি।

শুধু একবার বললে—তাহলে নবী ডাক্তারকে ডাকতে যাবো না?

এত কাণ্ডের মধ্যে চৌধুরী মশাই-এর বোধহয় মাথার ঠিক ছিল না। প্রকাশের কথায় যেন মনে পড়ে গেল। বললেন—তা ডাক্তারের কাছে যেতে কি আমি তোমাকে বারণ করেছি? আগে ডাক্তারের কাছে যাও—

প্রকাশ বললে—তা আপনি যে এখ্‌খুনি আমায় বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন?

চৌধুরী মশাই বললে—তুমি দেখছি বড় বে-আক্কেলে মানুষ। ডাক্তারকে ডেকে দিয়ে চলে যাওয়া যায় না? ডাক্তারকে ডেকে দিয়ে খেয়ে-দেয়ে দুপুরের গাড়িতে চলে যেও—

এতক্ষণে প্রীতির কানে কথাগুলো গেছে। সে এগিয়ে এল। বললে—কী হলো? কাকে যেতে বলছো? কে বাড়ি থেকে চলে যাবে?

প্রকাশ মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে—জামাইবাবু আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলছেন—

—কেন? প্রকাশ চলে যাবে কেন?

এতক্ষণে হঠাৎ চৌধুরী মশাই-এর নজরে পড়লো ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে চেয়ে দেখলেন খোকা নেই।

বললেন—খোকা কোথায় গেল?

প্রীতি বললে—তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি—

—ছেড়ে দিয়েছ মানে? কোথায় গেল সে?

—কোথায় গেল তা আমি কী জানি!

চৌধুরী মশাই বললেন—তুমি কেন দরজার চাবি খুলে দিতে গেলে? আমি নিজে তাকে তালাবন্ধ করে দিয়ে গেলুম তবু তুমি তাকে খুলে বার করে দিলে কেন?

প্রীতি বললে—বেশ করেছি—

চৌধুরী মশাই স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুর মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেন একটু সম্বিত ফিরে পেয়ে, গেলেন। বললেন—তুমি এই কথা বললে?

প্রীতি বললে—বলবো না? কেন তুমি এত বড় সেয়ানা ছেলেকে সকলের সামনে এমন অপমান করলে? তার এখন বয়েস হয়েছে, তার বিয়ে হয়েছে, ঘরে তার নতুন বউ রয়েছে, এই সময়ে তুমি এমন করে তার ইজ্জৎ নিলে, আর আমি তালা খুলে দেব না?

চৌধুরীমশাই বললেন—তার ইজ্জত? তার ইজ্জতের কথাটাই তুমি ভাবলে? আর আমি? আমি এ-বাড়ির মালিক, আমার ইজ্জতের কথাটা তো একবারও ভাবলে না? তোমার কাছে তোমার ছেলের ইজ্জতটাই বড় হলো?

প্রকাশ কী করবে তখনও বুঝতে পারছে না। একবার জামাইবাবুর মুখের দিকে চাইছে আর একবার দিদির মুখের দিকে। চৌধুরীমশাই রাগে ফুলছেন। দিদির সঙ্গে জামাইবাবুর এমন ঝগড়া আগে

কখনও প্রকাশ দেখেনি। দিদিও বলছে বেশ করেছে সদানন্দকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে, জামাইবাবুও বলছে—কেন তালা খুলে দিলে। তাহলে কি জামাইবাবুর কথার কোনও দাম নেই?

জামাইবাবু মাঝখানে বলে উঠলো—তাহলে আমি যদি এ-বাড়ির কেউই না হই তো হয় আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, আর নয় তো তুমিই চলে যাও—

দিদি বললে—তুমি কেন যাবে? তুমি কী দোষ করেছ? যেতে হলে আমিই যাবো। আমাকে তুমি বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি যে-কটা দিন বাঁচি সেখানেই থাকবো—সারাদিন তুমি নিশ্চিন্তে তোমার জমি-জমা বউ-ছেলে নিয়ে আরাম করে কাটাবে—কেউ আর তখন তোমাকে কথা শোনাতে আসবে না—

চৌধুরীমশাই বললেন—ওটা তো তোমার রাগের কথা হলো। আমি কি তোমাকে রাগের কথা বলেছি কিছু যে ভাগলপুরে চলে যাবে বলছো?

প্রীতি বললে—তা কোন্ কথাটা বলতে আমাকে বাকি রেখেছ তুমি? মানুষে আবার কী রকম করে লোককে হেনস্থা করে? এই তো প্রকাশ সমনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও-ও তো সব শুনেছে! ও-ই বলুক না তুমি আমাকে অপমান করলে না আমি তোমায় অপমান করলুম? বলুক ও, ওকে ডাক দিয়ে ও বলুক—

প্রকাশ বললে—দিদি তুমি চুপ করো না, কেন কথা বাড়াচ্ছো? তুমি নিজের কাজ করো গে যাও না—

চৌধুরীমশাই যেন এতক্ষণে আবার প্রকাশের উপস্থিতি টের পেলেন। বললেন—তুমি থামো তো হে। তোমাকে কে মাতব্বরি করতে বলেছে? আমি তোমাকে ননী ডাক্তারকে ডাকতে বললুম না—

এমন সময় হঠাৎ ভেতর থেকে মৃদু গলায় আওয়াজ এলো—মা—

এতক্ষণে যেন সবাই সম্বিত ফিরে পেলে। যেন এতক্ষণে হঠাৎ খেয়াল হলো যে এ-বাড়িতে এমন একজন লোক আছে যার সামনে এমন ব্যবহার করা অসংগত। অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও যেন সে-মানুষটার সামনে একটু সংযত হয়ে কথা বলা দরকার। এ-ছাড়াও যেন নতুন করে চৌধুরীমশাই-এর মনে পড়ে গেল যে ওপরে কর্তাবাবুর মরণাপন্ন অসুখ। তারপর আরো মনে পড়ে গেল যে একটু দূরেই বাবাজী রয়েছেন, তাঁর কানেও এই স্বামী-স্ত্রীর কথা-কাটাকাটির শব্দ পৌঁছোন সম্ভব। সকলের সব কথাই মনে পড়ে গেল। পাশের বাড়ির শোনচক্ষু বেহারী পালের কানেও যে শব্দটা পৌঁছুতে পারে সে কথাটাও যেন এতক্ষণে সকলের খেয়াল হলো। খেয়াল হতেই এক মুহূর্তের জন্যে সবাই নিজের আসল স্বরূপটা ফিরে পেলে। লজ্জায় চৌধুরীমশাই যেন সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন। সামনেই দেখলেন প্রকাশ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নিয়েই বার-বাড়ির দিকে চলতে চলতে বললেন—তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছো বড়কুটুম, ওদিকে যে কর্তাবাবু ছটফট করছেন—

জামাইবাবুর এ-রূপটাও প্রকাশের দেখা আছে। যখন প্রকাশকে দিয়ে কোনও জরুরি কাজ করতে হবে তখনই জামাইবাবুর মুখে ওই আদরের 'বড়কুটুম' শব্দটা বেরিয়ে আসে।

প্রকাশও জামাইবাবুর কথায় গদগদ হয়ে গেল। বললে—আপনি কিছুছু ভাববেন না জামাইবাবু, আমি এখ্খুনি যাচ্ছি, যাবো আর আসবো। প্রকাশ থাকতে আপনার কিছুছু ভাবনা করবার দরকার নেই—এই আমি চললুম—

বলে প্রকাশ বেরিয়ে চলে গেল।

প্রীতি পাশের বারান্দায় গিয়েই দেখলে খোকার ঘর থেকে সামনের বারান্দায় বউমা এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোমটায় মাথাটা ঢাকা। কিন্তু ফাঁক দিয়ে মুখের যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে তাতেই বোঝা যায় বউমার চোখ-মুখ যেন শুকিয়ে গেছে। একটু-খানি শুধু 'মা' ডাক। কিন্তু ওই ডাক-টুকুতেই যেন প্রীতি আবার অন্য মানুষ হয়ে গেল। এতক্ষণ যে-মানুষটার স্বামীর সঙ্গে নির্লজ্জের মত ঝগড়া করতে বাধেনি সেই মানুষটাই যেন একেবারে স্নেহে-মমতায়-করুণায় এক মুহূর্তে জননীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বউমার কাছে গিয়ে বললে—কী বউমা, আমাকে ডাকছিলে?

নয়নতারা তেমনি মুখটা নিচু করেই রইল। যেন তার মুখের কথাটা খানিক-ক্ষণের জন্যে মুখেই আটকে রইল। তারপর যেন অনেক কষ্টে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল। বললে—মা, বলছিলুম কি, আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন না—

প্রীতি বললে—কি মা, ও-কথা কি বলতে আছে? এতক্ষণ দেখলে না তোমার শ্বশুর তোমার কথা ভেবে ভেবে কী রকম মাথা গরম করে ফেলেছেন। তোমার কানে তো সব কথাই গেছে। ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না, তোমার শ্বশুরের ওই এক স্বভাব, গেলেন তো গেলেন, তখন স্বভাব, রেগে গেলেন তো গেলেন তখন একেবারে অগ্নিকাণ্ড, আবার ওই মানুষটাই অন্য সময় একেবারে জল। ওঁর কথায় তুমি কান দিও না বউমা, ওঁর কথায় যদি আমি কান দিতুম ত আমিই কোনদিন বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে যেতুম। এ-বাড়ির সব পুরুষ মানুষই ওই রকম। ও-সব কথায় কান দিলে কি সংসার চলে বউমা! শ্বশুরকে আজ যেমন দেখলে, আমার সঙ্গেও তেমনি। রাগলে আর এ-বাড়ির পুরুষ-মানুষদের কোনও দিকে জ্ঞান থাকে না—

নয়নতারা বললে—কিন্তু আমাকে নিয়েই যখন এত অশান্তি, তখন আমি চলে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কিছুদিনের মত চলে যাই না, তারপর যখন বাবার রাগ পড়বে তখন না-হয় আবার ফিরে আসবো—

—না না বউমা, তা হয় না, তুমি পাগলামি কোর না, তুমি ঘরে গিয়ে একটু বোস, আমি রান্নাঘরের দিকটা একবার দেখে আসি, আমি যেদিকে দেখব না সেই দিকেই তো চিত্তির হয়ে যাবে—

বলে বাইরে এসে বিন্টুর-মা'র খোঁজে রান্না-বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ দীনু মুখো-মুখি এসে দাঁড়ালো। বললে—মা, বউমার বাপের বাড়ি থেকে লোক এসেছে তত্ত্ব নিয়ে—

—তত্ত্ব? কীসের তত্ত্ব?

—শীতের তত্ত্ব!

কথাটা শুনেই প্রীতির মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠলো। আর সময় পেলেন না বেয়াই মশাই তত্ত্ব পাঠাবার! এই সময়েই কি না তত্ত্ব পাঠাতে হয়!

(ক্রমশ)

॥৪৪॥

মন্দির 'টেরাকোটা'য় সাহেব

ইতালীয় শব্দ 'টেরাকোটা', পোড়ামাটির সৌধসজ্জা অর্থে, বাঙালী পাঠকদের কাছে এখন বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছে। আট বছর আগে এ রকম সময়ে আমার লেখা 'বাঁকুড়ার মন্দির' পুস্তকটি যখন ধারাবাহিকভাবে 'দেশ'-এ প্রকাশিত হচ্ছিল তখন কিন্তু এ শব্দটিকে বাংলা লেখার সঙ্গে ব্যবহার করতে বেশ কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হত। তারপরে, এ বিষয়ে লেখাও হয়েছে অনেক; সাধারণের মনোযোগ এমনকি অনুরাগও বেড়েছে সেই পরিমাণে। বহু লোক গ্রাম গ্রামান্তরে 'টেরাকোটা' মন্দির-মসজিদগুলির খোঁজ

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খবরও নিচ্ছেন। 'টেরাকোটা' অলংকরণ বলতে যে প্রধানত ধর্মীয় ইমারতের গায়ে নিবদ্ধ পোড়ামাটির সজ্জাকে বোঝায় সে কথা এখন আর সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন হয় না। তবে পোড়ামাটির অন্য ব্যবহারের কথাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। আবহমান কাল মাটি পুড়িয়ে যেসব হাঁড়ি পাতিল প্রভৃতি তৈজসপত্র বা অজস্র প্রকারের মূর্তি ও খেলনা পুতুল তৈরি হয়েছে তারাও 'টেরাকোটা' বস্তু এবং সে জাতীয় প্রাচীন সংগ্রহ যে-কোন মিউজিয়মে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এ শ্রেণীর 'টেরাকোটা' বস্তুর আলোচনার অবকাশ নেই। আজকের আলোচনা সেজন্য সাধারণভাবে মন্দির 'টেরাকোটা' ও বিশদভাবে তার একটি বিশেষ বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রধানত পাথরের অভাবের জন্যই যে উত্তর বাংলার প্রায় যাবতীয় মন্দির-মসজিদ ইটে তৈরি হয়েছে এবং এই একই কারণে তাদের অলংকরণের জন্য যে পাথরের বদলে 'টেরাকোটা'র ব্যবহার করতে হয়েছে এ ঐতিহাসিকভাবে সত্য। এ অঞ্চলে মুসলমান-পূর্ব যুগেও যে পোড়ামাটির ফলকের যথেষ্ট প্রচলন ছিল তার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে পাহাড়পুরে, ময়নামতী, লালমাই, বাণগড়, চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক ও পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)' পুস্তকে বলেছেন (পৃঃ ২২৮)—"বাংলায় প্রস্তর তেমন সুলভ না হওয়ায় মৃৎশিল্প খুব বেশী জনপ্রিয় ছিল এবং লোক-শিল্প হিসাবে পালযুগে, এবং সম্ভবত তাহার পূর্বেও বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। মধ্য যুগেও বাংলার এই জাতীয় শিল্প প্রতিভার কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।" আমার বিবেচনায়, মধ্যযুগের 'টেরাকোটা'-অলংকৃত মন্দির-মসজিদের দৃষ্টান্ত "কিছু কিছু" নয়, ভূরি ভূরি। মোসলেম আবির্ভাবের অব্যবহিত পরের কিছুকাল সহজবোধ্য কারণেই হিন্দুর মন্দির নির্মাণে ভাঁটা পড়েছিল। সে সময়ের খুব কম দেবালয় পরবর্তী কালের জন্য রক্ষিত হয়েছে বলে কোন কোন গবেষক মত প্রকাশ করেছেন যে 'টেরাকোটা' সৌধের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় পোড়ামাটির সজ্জায় মণ্ডিত মসজিদ বা অন্যান্য মুসলমানী ইমারত দিয়ে এবং সেই নিদর্শনগুলি থেকেই হিন্দু মন্দির-ভাস্কররা নতুন করে এ অলংকরণ পদ্ধতিটি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এ মতবাদ সঠিক নয় বলেই আমার ধারণা। মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পের ধারাটি, বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, মোটামুটি অবিচ্ছিন্নভাবেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। মুসলমান আমলের প্রথম দিকে নির্মিত হিন্দু মন্দিরের সংখ্যাল্পতা থেকে এ কথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় না যে সুদীর্ঘকালের এই শিল্পটি সে সময়ে একেবারে উৎখাত হয়েছিল। সে যাই হোক, এ বিষয়ে অন্যত্র যেহেতু যথেষ্ট লিখেছি সেজন্য একই আলোচনায় বর্তমান প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করবার প্রয়োজন দেখি না।

যুগে যুগে কী জাতীয় অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে এসব 'টেরাকোটা' মন্দির, মসজিদে? প্রথমে মসজিদের কথাই বলি। শাস্ত্রীয় নিষেধের জন্য মানুষ, পশু, পাখি

পর্তুগীজ রণতরী ও দেশী নৌকার যুদ্ধ

শিবিকাবাহিত সাহেব

বা অন্য কোন রকম মূর্তি মুসলমানী ইমারতে উৎকীর্ণ করা যায়নি। জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশারই সেখানে একাধিপত্য। কিন্তু হিন্দুর স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর বাস। তার রামায়ণ, মহাভারত ও অগণিত পুরাণ-উপপুরাণ-কিংবদন্তীর জগতে অজস্র চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি। তার ক্ষেত্রে, দেবদেবী নরনারী বা পশু পাখির মূর্তি অথবা ফুলকারি বা জ্যামিতিক মোটিফের রূপায়ণে কখনই কোন বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। ফলে, উভয় বাংলার টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে কী বিচিত্র ও বিপুল পরিমাণ ভাস্কর্য যে উৎকীর্ণ হয়েছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ধর্মের পতাকাবাহীরা শুধু পুরোভাগেই নয়, অধিকাংশ স্থান অধিকার করে থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়কে মন্দিরের দেওয়াল থেকে একেবারে নির্বাসিত করা হয়নি। প্রবেশ পথের দুপাশের ও উপরের দেওয়ালে, থামগুলির গায়ে ও খিলানশীর্ষে মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, নানাবিধ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দেবদেবী মূর্তি, ফুলকারি নকশা প্রভৃতির যেমন স্থান হয়েছে, তেমনি ভিত্তির সমান্তরাল একটি বা দুটি সারিতে সাধারণত নিবদ্ধ হয়েছে নানাপ্রকার সামাজিক দৃশ্যের ভাস্কর্য। সমাজের নীচু তলার অধিবাসী দরিদ্র ভাস্কররা সমসাময়িক কালকে কিভাবে দেখেছেন এগুলি তার অমূল্য দলিল। নারীদের প্রসাধন, বিবাহের সময় কন্যা-সম্প্রদান, বেদে-বেদেনীদের রঙ্গরং বা পাশা খেলা প্রভৃতির অন্তরঙ্গ দৃশ্য তাঁদের দৃষ্টি না এড়ালেও তাঁদের বেশি করে নজরে পড়েছে সমাজের উপরতলার চিত্রকল্প। এ দুর্বলতা সর্ব দেশে সর্বকালের। রাজা-মহারাজারা কি করেন, কি খান; রথী-মহারথীরা কিভাবে জীবনযাপন করেন সে বিষয়ে সাধারণের কৌতূহল এখনও কিছুমাত্র কমেনি। সমাজশীর্ষের এই বুর্জোয়াদের জীবনালেখ্যই সেজন্য প্রাধান্য পেয়েছে এই ভিত্তি-অনুভূমিক ভাস্কর্যের সারিগুলিতে। আর এ কথা কে না জানেন যে আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলাদেশে বড় বড় জমিদাররা যে বিলাসে কাল কাটিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি চোখ-ধাঁধানো জীবনযাপন করেছেন সে সময়ের ইউরোপীয়েরা। তাদের অত্যাচার, দম্ভ, বিজাতীয় রীতিনীতি সবই টেরাকোটা ভাস্করদের কৌতূহল ও অভিনিবেশকে শাণিত করেছে। এবং সেই কারণেই তাঁদের অসংখ্য ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছে 'টেরাকোটা' মন্দিরের দেওয়ালে। জাতিগতভাবে সেগুলি হয়ত পৃথক করা যায় না। তবে বেশি প্রাচীন মন্দিরে রণতরীবাহিত যেসব ইউরোপীয়দের দেখা যায় তারা পর্তুগীজ হওয়াই সম্ভব। কেননা তারাই এ অঞ্চলে এসে পৌঁছেছিল সকলের আগে আর তাদের জলদস্যুতার নির্মম কাহিনী এখনও মুছে যায়নি লোকের মন থেকে।

দুই বাংলায় মধ্য যুগ ও শেষ-মধ্যযুগের যেসব 'টেরাকোটা' মন্দির এখনও বর্তমান তাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় আঠারো ও উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক। সতের শতকের মন্দির খুব বেশি নেই; ষোল শতকের আরও অনেক কম এবং পনের শতকের একটিমাত্র মন্দিরের খবর আমি জানি—১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ঘাটালের সিংহবাহিনী মন্দির। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দেবালয়ে কোন ইউরোপীয়ের মূর্তি নেই। ষোল শতকের কোন মন্দিরেও, যেমন গোকর্ণ মন্দিরে (১৫৮০ খ্রীঃ), সাহেব-ভাস্কর্য দেখা যায় না। সতের শতকের বিখ্যাত 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরের শ্যাম রায় (১৬৪৩ খ্রীঃ) ও জোড়বাংলা (১৬৫৫ খ্রীঃ) এবং বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরে (১৬৭৯ খ্রীঃ) সাহেব-ভাস্কর্য নেই বললেই চলে। যাও বা দু একটি আছে তা জাহাজ-আরোহী সাহেবদের। পরবর্তী দুই শতাব্দীর মন্দিরে ইউরোপীয় জীবনের বিভিন্ন দিক উদ্‌

সাহেবের শ্বাপদ শিকার

ঘটিত করবার যে রকম চেষ্টা হয়েছে, প্রাচীনতর মন্দিরগুলিতে তা অনুপস্থিত। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত প্রথম ছবিটি হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ায় অবস্থিত বাসুদেব মন্দির (১৬৭৯ খৃঃ) থেকে সংগৃহীত। পর্তুগীজদের পর ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজরা তখন এদেশে এসে পৌঁছলেও হয়ত এতদূর প্রতিপত্তিশালী বা বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি যাতে 'টেরাকোটা' ভাস্করদের অভিনিবেশ আকৃষ্ট করতে পারে। বাসুদেব মন্দিরের নৌ-যুদ্ধের দৃশ্যটি সেজন্য হার্মাদ রণতরীর সঙ্গে দেশীয় জলযানের সংঘর্ষের চিত্র হওয়াই সম্ভব।

আঠারো শতক, এদেশের মাটিতে আর সব ইউরোপীয় শক্তিকে পরাজিত করে ইংরেজদের জয়জয়কারের যুগ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকরা সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে রাজসিংহাসন এনেই রেখেছিল সংগোপনে। তারপরে, "বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ড-রূপে।" বাংলাদেশে বণিক অভিযানের সেই প্রথম যুগে, কি রকম জীবনযাপন করত প্রবাসী ইংরেজরা? নানান পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রে এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই এত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমি তার ধার দিয়েও যাব না। শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কুঠিয়াল সাহেব ও 'কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট' জন চীপ-এর উল্লেখ করব, সমকালীন সমাজে যিনি 'চীপ দি ম্যাগনিফিসেণ্ট' নামে খ্যাত ছিলেন ও উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার তাঁর 'অ্যানাল্স অব রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে যাঁকে অমর করে রেখে গেছেন। আঠারো শতকের শেষ দিকে ও উনিশ শতকের প্রথমে তিনি বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার অনেকগুলি কুঠির কর্তা ছিলেন ও কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে যে বেতনাদি পেতেন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি উপার্জন করতেন ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সকলেই এই একই সুবিধা ভোগ করতেন। ফলে, সেই অবিশ্বাস্য রকম সস্তাগণ্ডার বাজারে এসব কর্মচারীদের হাতে এত কাঁচা টাকা এসে জমা হত যে অমিতব্যয়িতার চূড়ান্ত করেও তা শেষ হত না। জন চীপ সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব লিখেছেন, বিভিন্ন কুঠিতে তিনি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করতেন। কৃত্রিম জলাশয় ও বাগানঘেরা সেসব বাড়ি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। তাঁর চাকরবাকর পাইক-বরকন্দাজের সীমা সংখ্যা ছিল না। স্থানীয় বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমার তিনিই নিষ্পত্তি করতেন। বাকিটুকু হাণ্টারের অননুকরণীয় ভাষাতেই বলি—

"The whole industrial classes were in his pay and in his person Government appeared in its most benign aspect. A long unpaid retinue followed him from one factory to another, and as the procession defiled through the hamlets, mothers held aloft their children to catch a sight of his palanquin, while the elders bowed low before the providence from whom they derived their daily bread. Happy was the infant on whom his shadow fell."

ফরাসিবিলাসী সাহেব

এ বর্ণনায় জন চীপের ছবিটিই শুধু—উজ্জ্বল হয়ে ফোটেনি, সমকালীন জনসমাজ তাঁকে ও তাঁর সগোত্রদের কী বিমূঢ়বিস্ময়ে দেখত তাও পরিস্ফুট হয়েছে। নবাবী আমল গত হয়ে, আঠারো-উনিশ শতকে যে নতুন আমলের পত্তন হল তার শোভাবর্ধন করবার জন্য দলে দলে এগিয়ে এলেন আর এক নতুন নবাবের দল। পাঁচ শ' বছরের সাহচর্যে মুসলমান শাসকেরা তবু কিছুটা গা-সহা হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এই সমুদ্রপারের বিদেশীরা তাঁদের চমকপ্রদ জীবনযাত্রায় স্থানীয় জনজীবনে এমন আলোড়ন তুললেন যে 'টেরাকোটা' শিল্পীদের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল। এসব ক্ষণজন্মারা সেজন্য অনায়াসেই 'টেরাকোটা' মন্দিরের দেওয়ালে নিজেদের স্থান করে নিতে পেরেছেন প্রতাপশালী দেবতাদের আশেপাশে।

এবার আবার ছবিগুলির বর্ণনায় ফিরে যাওয়া যাক। 'দ্বিতীয় ছবিটি হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার হরিরামপুর গ্রামের এক প্রাচীন শিব-মন্দির থেকে তোলা। ১৭৩৮ খৃীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয়ে সাহেব-ভাস্কর্য শুধু ভিত্তির কাছের সমান্তরাল সারিতেই নেই, সামনের দেওয়ালের অন্যান্য অংশেও আছে। কোম্পানীর সাহেবদের তখন খুব রবরবা। মাটিতে তখন তাঁদের পা পড়ে কি পড়ে না। যাতায়াতের জন্য যেসব সুসজ্জিত পালকি তাঁরা ব্যবহার করতেন তা দেখে গ্রামবাসীরা থ মেরে যেত। ছবিতে পালকিটিকে বড় করে দেখানোর জন্য আমি নেগেটিভের ছোট একটু অংশ বর্ধিত করে দেখিয়েছি। মন্দিরের দেওয়ালে কিন্তু বেহারাদের আগে-পরে পাইক-বরকন্দাজ-হুঁকাবরদারদের (লক্ষ করবেন, সাহেব ফরসির নল হাতে করে পোষা কুকুর সমেত—চলেছেন), বেশ দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা উৎকীর্ণ আছে। হাণ্টারের বর্ণনার সঙ্গে এ সুখ-ভ্রমণের মিল এত নিকট যে সন্দেহ হয় এ মন্দিরের ভাস্করেরা স্বয়ং জন চীপকে অথবা অন্য কোন পদস্থ সাহেব কে এভাবে স্থানান্তরে যেতে দেখে থাকবেন। ঘোড়ায়-টানা জুড়িগাড়ি এমন কি বলদে-টানা গাড়িতেও সাহেবদের ভ্রমণ-দৃশ্য দেখানো হয়েছে অনেক মন্দিরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাঁদোয়া-ঢাকা বসবার আসনে সাহেব বসে আছেন এক যুবতী সঙ্গিনীর থুতনি ধরে। কোথাও কোথাও বা সহিসের পিছনের পাটাতনের উপরে স্বল্পবসনা নর্তকী নাচছে ঢোলক বাদ্যের তালে তালে।

তৃতীয় ছবিটির প্রাপ্তিস্থান হাওড়া জেলার আমতা থানার অমরাগাড়িতে অবস্থিত দধিমাধব নামের শালগ্রাম-মন্দির। এ দেবালয়ের ভিত্তি-অনুভূমিক সারিগুলিতে সাহেবী জীবনের যে সব ভাস্কর্য খোদিত আছে তা সারা পশ্চিমবঙ্গে এ জাতীয় 'টেরাকোটা' সজ্জার শীর্ষস্থান অধিকার করবার যোগ্য। ১৭৬৪ খৃীষ্টাব্দে নির্মিত এ সৌধের এখন বেশ জীর্ণ দশা বলে রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ প্রায় দু' বছর আগে

'কারণ'-সিন্ধুতীরে সাহেব

সিদ্ধান্ত নেন সরকারী ব্যয়ে এটির সংস্কার করা হবে। প্রধানত ক্ষয়িষ্ণু পুরাকীর্তি সংরক্ষণের জন্য (সংশ্লিষ্ট আইন অন্তত সে কথাই বলে) যে দপ্তরটি বারো বছর ধরে বহাল আছে তাঁরাই বলতে পারবেন এ মূল্যবান কৃষ্টি সম্পদটিকে (অথবা অনুরূপ অসংখ্য পুরাকীর্তিকে) রক্ষা করবার জন্য তাঁরা কী কাজ করেছেন। সে যাই হোক, এ মন্দিরের সাহেবসুবোদের শিকারের দৃশ্যগুলি খুবই উচ্চাঙ্গের। এখানে এবং অন্যত্র শিকারী সাহেবদের সাধারণত হাতি বা ঘোড়ার পিঠে আরূঢ় অবস্থাতেই দেখানো হয়েছে। আক্রান্ত পশু প্রায়ই বাঘ ও ব্যবহৃত অস্ত্র প্রধানত বন্দুক বা বর্শা। পাইক-বরকন্দাজপরিবৃত সাহেবী শিকারের এসব ভাস্কর্য এক অপসৃত যুগের চিত্তাকর্ষক আলেখ্য।

দীর্ঘ প্রবাসকালে সাহেবরা এদেশের যে সব সুখপ্রদ অভ্যাস রপ্ত করেছিলেন তারই এক অন্তরঙ্গ দৃশ্য চতুর্থ ছবিটিতে উপস্থিত। হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার দ্বারহাটা গ্রামে অবস্থিত ও ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রাজরাজেশ্বর মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ এ ভাস্কর্যটি আগের আমলের নবাবদের সঙ্গে পরবর্তীকালের সাহেব প্রভুদের যোগসূত্র নির্ণয়ে সাহায্য করে। বস্তুত টেরাকোটা মন্দিরের দেওয়ালে বিশ্রামরত সাহেবদের প্রায়ই ফরসির নল হাতে ও তাকিয়ায় হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখা যায়। হুঁকাবরদার ও পার্শ্বচরদের এখানেও অভাব নেই।

মদ্যপানের কৃতিত্ব কিন্তু অনেকাংশে সাহেবদের নিজেদেরই প্রাপ্য। উৎসবে-পার্বণে জলপানিতে তাঁদের সাঁতার কাটার কেচ্ছা-কাহিনী সমকালীন সমাজে এতই সুবিদিত ছিল যে টেরাকোটা শিল্পীরাও সে বিষয়ে রীতিমতো অবহিত ছিলেন। পঞ্চম ছবিটি হুগলী জেলার দাদপুর থানার অন্তর্গত কেষ্টপুর গ্রামের এক পরিত্যক্ত মন্দির থেকে সংগৃহীত। পলাশীর যুদ্ধের পরে, ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয়ের ভাস্কররা সেই সময়ের লোক যখন দীর্ঘকালের সহাবস্থানের ফলে তাঁরা সাহেবদের অন্তরঙ্গ জীবন সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছেন। সাহেবদের মদ্যপানের দৃশ্য অন্যত্রও আছে। কিন্তু সামনের চেয়ারে উপপত্নীকে বসিয়ে, দাসী ও ভৃত্যকে অবারিত সরবরাহে নিযুক্ত করে ও স্বয়ং দু' হাতে কুঁজোর মত দুই বোতল ধরে এহেন ইলাহী মদ্যপানের ভাস্কর্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এদেশীয় রমণীর সঙ্গে সাহেবদের মেলামেশার নানান দৃশ্যও উৎকীর্ণ হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক টেরাকোটা মন্দিরে। স্বজাতীয় ললনাদের সঙ্গবিহীন প্রবাস জীবন বড় কষ্টে কেটেছে সেকালের সাহেবদের। হুগলী জেলার কামারপুকুরে, রামকৃষ্ণ মিশন এলাকার অদূরে, লাহা পরিবারের এক দোতলা দালান মন্দিরে এ জাতীয় ভাস্কর্য দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয় সেটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ নির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ আজকের পরিক্রমায় এটিই সবচেয়ে অর্বাচীন মন্দির। টেরাকোটা মন্দিরের বয়ঃক্রমের সঙ্গে সাহেব ভাস্কর্য যে কিছুটা সম্পর্কিত ছিল সে বিষয়ে দু'এক কথা বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি, প্রাচীনতম টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে এ জাতীয় ভাস্কর্য একেবারেই দেখা যায় না। অব্যবহিত পরের দেবালয়গুলিতে ইউরোপীয়দের যুদ্ধবিগ্রহ ও শৌর্যবীর্যের দিকগুলিই বেশি প্রকাশিত। অতঃপর বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ ও শাসনক্ষমতা হস্তগত হবার সঙ্গে তাদের বিলাসব্যসন ও অমিতাচার যেমন বেড়েছে তেমনি তা প্রতিফলিত হয়েছে টেরাকোটা মন্দিরের দেওয়ালে। কামমোহিত সাহেবের ভাস্কর্যও অনেক মন্দিরেই আছে। কিন্তু সে সব দেবালয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের। প্রাচীনতর মন্দিরে এমন নিগড়বিহীন সাহেব-ভাস্কর্য কোথাও আছে বলেও মনে হয় না। ক্রমবিকাশের এই সাধারণ ধারাটি রক্ষা করবার জন্য তাবৎ শিল্পী সমাজ যে কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলেছেন এমন নয়। তবু কালক্রম অনুসারে তাঁরা যে পোশাকি ভাস্কর্য থেকে অন্তরঙ্গ সাহেব-ভাস্কর্যের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন, স্থূলভাবে সে কথা বলা চলে।

(ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

॥ আটচল্লিশ ॥

না কোমা না। কমা নয়, সেমিকোলনেই ছিলাম এতক্ষণ। এমন কি, কোলনেও ছিলাম বলা যায়। রিনির কোলে মাথা রেখে দুধ খেয়েছি মনে পড়তে থাকে আমার। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটবার পর চোখ মেলে দেখি আমি বিছানাতেই শুয়ে। এ কোথায়? এ তো সেই সোফা নয়, এমন কি ডাক্তারবাবুর রুগী দেখার ঘরও নয় এ।

রিনি আমার বিছানার পাশে বসে।—'কোথায় রে আমি?'

'আমাদের তিনতলার ছাদে। চিলেকোঠায়।' রিনি বলল, 'বাড়িতে তো ঘর খালি নেই। ছাদের এই ঘরটাই ফাঁকা। এখানেই তুমি থাকবে।'

'চিল কোঠায়? এই এক চিলতে ঘরে?'

'তোমার একলার থাকার পক্ষে তো যথেষ্টই—তাই নয়?'

'একলা থাকতে হবে আমায়? না বাবা, একলাটি থাকতে পারব না। দারুণ ভয় করবে আমার।'

'ভয় কিসের গো?'

'ভূতের ভয়, আবার কী?' আমি বলি: 'ছোটবেলায় ভূতে ধরেছিল না আমায়? সেই থেকে ভূতের ভয় আমার ভারী।'

'ভূত কোথায় এখানে? কলকাতায় কি ভূত থাকে নাকি? থাকতে পারে? তিষ্ঠোতে পারে কখনো? ভূত যতো সব পাড়াগাঁয়।'

'সেই ভূতটা আমায় ছাড়েনি এখনো। জানিস? মনের মধ্যে রয়ে গেছে আমার। অন্ধকার ঘরে একলাটি পেলেই চেপে ধরে, ভয় দেখায় আমায়, বুকের মধ্যে এমন গুড় গুড় করে। একলা থাকতে হলে......আমি ......আমি হয়ত হার্টফেল করেই মারা যাবো।'

'বেশ। আমিও থাকব না হয় তোমার কাছে। তুমি রুগী মানুষ, রাত বিরেতে কখন কী দরকার পড়ে, ওষুধ টষুধ খাওয়াতে হয় যদি এই সব বলে কয়ে মাকে রাজি করানো যাবে—থেকে যাব না হয় তোমার কাছে কী হয়েছে।'

'তাই বল্। এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো আমার।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলি—'একতলায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম না? একটু আগে......যখন তুই দুধ খাইয়ে দিচ্ছিলিস আমায়? তিনতলায় এলুম কি করে? কিছুই তো মনে পড়ছে না আমার।'

'আমি তুলে আনলাম যে তোমাকে!'

'তুই! তুই আনলি? কি করে আনলি রে তুই। কিছুই তো টের পাইনি।'

'কোলে করে আনলুম তো! একলাই আনতে পেরেছি......'

'বলিস কি রে! অবাক্ করলি আমায়!'

'অবাকটা কিসের? এমন কিছু ভারী কাজ নয়। কেন, চাঁচলে থাকতে তুমি যে আমায় কোলে করে মহানন্দা পার করেছিলে একবার—মনে পড়ে না তোমার?'

তুই তো হাল্‌কা পলকা ছিলিস তখন। এখন আর পারব কি? আর তোকে কোলে নিয়ে মহানন্দা পেরুনো......সে তো মহানন্দের কাজ। তাছাড়া তোকে কোলে করতে পাওয়া তো এক বিলাস! আর আমি —আমি যে একটা দস্তুর মতন লাশ রে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি ব্যাপার......'

'তুমিও এমন কিছু ভারী নও। কদিন ধরে ভুগে ঠিক যেন ফড়িংটি হয়ে গেছ। তোমাকে তুলতে এমন কিছু বেগ পেতে হয়নি।'

'এখনো তোর ছেলের পোশাক বদলাসনি? সেই হাফপ্যাণ্ট পরে রয়েছিস? মা কিছু বলছে না?'

'বলবে না আবার? তবে এখনো বলার ফুরসৎ পায়নি বোধহয়। তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছ, প্লুরিসি না কী যেন হয়েছে তোমার—তাই নিয়ে বাড়ি সুদ্ধ ব্যস্ত সবাই। তাই এখনো আমি আস্ত রয়েছি এতক্ষণ। দেখো না কী হয়...... আমার অদৃষ্টে কী আছে দ্যাখো না! আমাকে নিয়ে কী হয় এর পর দেখতেই পাবে।'

'তা নাহয় দেখব'খন। কিন্তু তুই যে চামচেয় করে আমায় দুধ খাইয়েছিস তাতে ......তাতে যা দুঃখ পেয়েছি কী বলব। সে আমার দুধ খাওয়া নয়, বিষ খাওয়া হয়েছে।' আমি সখেদে কই: 'তোকে এত করে সেদিন বোঝালাম যে মুখ থাকতে হাতের কোনো কাজ নেই—হাত কিসের জন্যে? আর তুই কি না!......কোনো উন্মুখ লোকের কাছে এমন কি সে যদি মরণোন্মুখও হয় না......মুখের কাছে দুধের পাত্র তুলতে হলে মুখটাকেই পাত্র করতে হয়, নিজেই

মুখপাত্র হবি......তা না হবে?

'মুখপাত্র হব? কি করে মুখপাত্র হবো?' সে বুঝতে পারে না যেন।

'কি করে আবার? মুখটাকেই পাত্র করবি তোর। মুখের মধ্যে দুধ নিয়ে না ......চুমুকে চুমুকে খাওয়াবি আমায়। তাই তো নিয়ম।'

'তাই নিয়ম? কোথাকার সৃষ্টিছাড়া নিয়ম—শুনি একবার?'

'মোটেই সৃষ্টিছাড়া নয়। এই সৃষ্টির মধ্যেই। তোর সৃষ্টির মধ্যেই তো? তুই-ই আমাকে অমনি করে খাইয়েছিলিস একবার ......একটা মিষ্টি জিনিস......তাতে ঐ মিষ্টি আরেকটা মিষ্টির সঙ্গে মিশিয়ে ডবোল মিষ্টি করে আমি পেয়েছিলাম......তোর কাছেই খেয়েছিলাম সব প্রথম। আর...... আর বোধ হয় সেই শেষ! মনে নেই তোর?'

'কক্ষণো না! কবে আমি খাওয়ালুম গো তোমায়?'

ওর কথায় আমি আঘাত পাই সত্যিই! যে মুহূর্তক্ষণটি আমার প্রতিমুহূর্ত—

মুখপাত্র হব? কি করে মুখপাত্র হবো?

আমার সারাজীবন তাই ওর কাছে বিস্মরণ হয়ে রয়েছে। ওর যে ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি থেকে আমার আত্মবিস্তৃতি—কোনোখানেই তার বিন্দুমাত্র স্থিতি নেই আর একটুও?'

মেয়েরা বুঝি এমনিই! এমনি করেই মুহূর্তের লীলাবিলাসে কাউকে রাজা করে দিয়ে তার পরেই অবহেলায় তাকে ফকির করে ছেড়ে দেয়। ঈশপের ব্যাঙের গল্পটা মনে পড়ে যে ব্যাঙ নাকি ঢিলছোঁড়া একটা ছেলেকে বলেছিল (নাকি মেয়েকেই?) তোমার কাছে যা নেহাত হাসিখেলা আমার বেলায় তা ভাই মরণদশাই নির্ঘাৎ!

আমার সেই ব্যাঙের জিম্মায়, মনের ব্যাঙ্কে সযত্নে এতদিন ধরে যে অধুলিটি জমিয়ে রেখেছিলাম তাই আজ এই অর্ধচন্দ্র হয়ে দেখা দিল আমায়!

'তাহলে তুই নোস, আর কেউ হবে বোধ হয়। ভুল করে গুলিয়ে ফেলেছি।'

'আমি ছাড়া আবার কে খাওয়ায় তোমায়? তির্যক চাউনি তার—'কার খাও আর?'

তাও তো বটে। কার খাবো আর? তুই ছাড়া আমায় খাওয়াবার কে আছে আবার?' আমি ভাবিত হই—'তুই-ই খাইয়েছিলিস—তবে সেটা স্বপ্নই হবে বোধহয়। স্বপ্নেই দেখে থাকব হয়ত।'

'তাই বলো!' সে হাঁপ ছাড়ে : 'হ্যাঁ, স্বপ্নে ওরকমটা দেখা যায় বটে। কতোদিন আমিও স্বপ্নে দেখেছি অমন—যে তুমি আমায় খাচ্ছ, আমিও তোমায়......হ্যাঁ, সেটা হতে পারে।'

'সে কথা যাক, তুই যে অসহায় অসতর্ক পেয়ে আমার সঙ্গে ঈদৃশ আচরণ করবি তা আমি কখনো ভাবতে পারিনি...'

'কী দৃশ আচরণ?'

'পথ্য দেবার ছলনায় আমার প্রতি অপত্যস্নেহ দেখাবি—এই রকম বাৎসল্য করবি? এটা করা কি তোর উচিত হয়েছে?'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু যদি বুঝতে পারি?'

'অজ্ঞান অবস্থায় ঝিনুকে করে দুধ খাইয়েছিস আমায়? ও তো খোকারা খায় রে! আমি কি খোকা নাকি এখনো? বড় হইনি আমি?'

'সন্দেহ হয়।'

'ঝিনুকে খাবার বয়েস আমার গেছে। আমি এখন চুমুকে দিয়ে খেতে পারি। তাই খাব। চুমুকে চুমুকে খাওয়াবি তো তুই আমায়?'

'হয়েছে! থামো তো। চুপ করো এখন। এখানে ওসব উচ্চবাচ্য একদম না। কেউ শুনলে কি দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। এ তোমার জেলখানা নয়। জেলের স্বাধীনতা এখানে নেই। এটা বাড়ি। বুঝেছ?'

'ভারী শেখাচ্ছিস আমায়! বাড়ি যে জেল তা আমি অনেক কাল আগেই জানি—তুই বাড়ির কী বলবি আর! সেই জন্যেই বাড়ি থেকে পালিয়েছি কবে। চিরদিনের

জন্যই—ঘর ছেড়ে আমি এই ছাম্বরে!'

'তোমাদের বাড়ি জেলখানা? বোলো না বোলো না—অমন কথাটি বোলো না। তোমার বাড়ির পরিবেশ আমি জানিনে নাকি? ওরকম স্বাধীনতা কটা বাড়িতে আছে? আর কী ভালো যে খাও-দাও তোমরা! কতো আম, কতো রসোগোল্লা, কতো ক্ষীর সর পায়েস! আঃ!' আয়েসে ওর চোখ বুজে আসে। 'ওই বাপ-মা অমন ভাই —ক'জন পায় গো? আমি পেলে বর্তে যেতাম!'

'হ্যাঁর এ-ক্লাসের হলেও জেল সেই জেলই! বুঝেছিস?'

'অমন সুখের বাড়ি হয় নাকি! সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় তোমায়। সেই ভূত, যাকে তুমি নাকি দেখেছিলে ছোটবেলায়, এখনো তোমায় ছাড়েনি তুমি বলছিলে না? সেই ভূতটাই। সে-ই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে-ভূত আর কোথাও নেই বাপু, তোমার ওই মনের মধ্যেই বাসা বেঁধে রয়েছে।' তোমায় শান্তিতে থাকতে দেয় না।

'তোরা মেয়েরা তো সেকথা বলবিই রে! তোদের দুঃখ কাঁদিনের আর! কাঁদিনের কারাবাস। বিয়ে হোলো কি বাড়ির জেলখানা ছাড়লি, রাতারাতি আরেক রাজ্য জয় করে বসলি। তোর সেই নিজের রাজধানীতে তুই-ই রাণী—রাজা নেই কেউ সেখানে। নামমাত্র একজন থাকে বটে, সে গোলাম। ভূতের ব্যাপার খাটবার কি পেত্নীর ব্যাপার যাই বল!'

'আর তোমাদের?'

'বিয়ের পরই বনবাস—সেই রামচন্দ্রের মতই। জন্মের থেকে বাপ মার অধীন—তার মায়াপাশ আর বিয়ের পর স্ত্রীপুত্রের তাঁবেদারি—সেই নাগপাশ—আমাদের মুক্তি কোথায়? আজন্ম কারাবাস আমাদের... আমরণ!'

'আহা!' কপট সহানুভূতিতে সে নিশ্বাস ফ্যালে।

'কন্যারাশির রাশি রাশি সুখ, আর কন্যালগ্নের...মানে ওই হতভাগাদের দুঃখের সীমা নেই আর। একযাত্রার পৃথক ফল যদি কোথাও থাকে তো সে এই গোধূলি-যাত্রাতেই।'

'বোলো না বোলো না!'

'বলব না? খুনের আসামীরও হয় ফাঁসি হয় নয় তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—একটাই হয়, দুটো কখনোই নয়। কিন্তু বিয়ের স্বামীদের গোড়াতেই ওই ফাঁসি, তার পরে যাবজ্জীবন কারাবাস!'

আমার অকপট দীর্ঘনিশ্বাস।

'তোমার ভাবনা কিসের? সে-ফাঁড়া তো তোমার কেটেই গেছে। নতুন করে আর তো কোনো ফাঁদে তুমি পড়তে যাচ্ছো না আবার!'

'তাতে কী, যাবজ্জীবনটাই এড়ানো গেছে, ফাঁসির দণ্ড তো মকুব হয়নি আমার।

"পুলিশে ধরেছিল?" শুনেই মা আতঙ্কে ওঠেন

ফাঁস তো লেগেই রইলো এই গলায়! তুই তো দু' দিনেই ভুলে যাবি, আমার কিন্তু তোর জন্যে হাঁসফাঁস করে কাটাতে হবে সারা জীবন!'

'আর আমি বুঝি খুব সুখে থাকবো!'

সেই জন্যেই বলছিলাম কি' ওর দুঃখের কথায় কান না দিয়ে নিজের বিনীত নিবেদন রাখি—'ফাঁসির আসামীও যা চায় জেলে বসেই পায়, যা খেতে চায় তাই দেওয়া হয় তাকে—জানিস তো? কিন্তু আমার কী বরাত দ্যাখ। এত করে চাইছি কিন্তু আমার সেই ফাঁসির খাওয়াটা পাচ্ছিনে আর।'

'পাবে পরে—কিন্তু এখন না। আমার ফাঁসির আগে, ফাঁসি হবার আগের দিনটায় কোনো এক ফাঁকে খাইয়ে যাব তোমায়—অনেকক্ষণ ধরে একখানা। কথা দিচ্ছি। কিন্তু এখন না—লক্ষ্মীটি! দোহাই তোমার। এখন নয়। এক্ষুনি কোথ্থেকে কে এসে পড়বে দেখে ফেলবে—সর্বনাশ হয়ে যাবে। বলেছি না যে জেলখানায় রয়েছি? জেলার সাহেব এখানে না থাকলেও—জেল ঠিকই আছে।'

বলতে বলতে জেলার মেম এসে হাজির!

আমার প্রতি বিরূপ দৃষ্টি হেনে এমন এক ঝঙ্কার তুললেন যে, দুজনেই আমরা চমকে গেলাম।

'বলি এই ধড়াচুড়োগুলো কি ছাড়া হবে রাজকন্যের? নাওয়া-খাওয়া নেই বুঝি আজ?'

'যাচ্ছি মা এক্ষুনি। বাবাকে বাথরুমে ঢুকতে দেখলুম না! এই দশ দিন চান করতে পাইনি জানো মা? কীরকম করছে যে গা-টা!'

'ছিলি কোথায় এই দশ দিন—শুনি? পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেল, এসে আশীর্বাদ করবে, দিনক্ষণ সব ঠিকঠাক, মেয়ে ইদিকে উধাও! বলা নেই কওয়া নেই বেপাত্তা? কোথায় নেচে নেচে বেড়ানো হচ্ছিল ধিঙ্গি মেয়ের?'

'কোথাও না মা! পুলিসে ধরেছিল যে, আমি কী করব!'

'পুলিসে ধরেছিল?' শুনেই মা আতকে ওঠেন—' আঁ!...! পুলিসে ধরেছিল তোকে?'

'ইস্কুল থেকে ফিরছিলাম তো! এক জায়গায় ছেলেরা সব পিকেটিং করছিল! পুলিসে ওদের ঘেরাও করে জায়গাটা ঘিরে
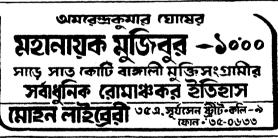
[illegible] আমি কী করে জানব! সেই কুট [illegible], যেমন আসি না রোজ? [illegible] জেলেদের সঙ্গে [illegible] নিয়ে গেল থানায়। আমি কী করব?'

'পুলিসের হাতে পড়েছিলিস, বলিস কি? থানায় নিয়ে গেল পাকড়ে? তোর অমন সুন্দর চুল—কোথায় খোয়ালি?'

'পুলিসে ছেঁটে দিয়েছে যে! আমার কোনো হাত ছিল?'

'পুলিস ছেঁটে দিয়েছে? মেয়েদের গায় হাত দেয় পুলিস?'

'পুলিসের যে কী অত্যাচার তুমি জানো না মাসিমা?'

মাঝখান থেকে বলতে হয় তখন আমার —'প্রাণে মারা যাচ্ছে কত জনা! আমার পাশেই একটা [illegible] এমন চুলের গ'ুতো লাগালো না, [illegible] উঠেই ঢলে পড়ল, চোখ মেলল না আর। নিমি তো তবু রক্ষে পেয়েছে [illegible]। চুলের ওপর দিয়েই গেছে ওর—অল্পের জন্যে রেহাই। এক চুলের জন্যেই বেঁচে গেছে!'

(ক্রমশ)

(১৫)

লণ্ডনে আমরা ভারতীয়রা খুব একটা ওয়েলকাম অতিথি নই এখবর সকলেরই জানা। হিথরো এয়ারপোর্টে নামতে ইমিগ্রেশন কাউণ্টারে এক বিরস বদন, লম্বা-চুল ইংরেজ ছোকরা বসে আছে। আমাদের ইংলণ্ডে আসার উদ্দেশ্য কি এবং আমরা কতদিন থাকব তা এইখানে নিবেদন করার কথা। নিঃশব্দে ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরির চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলাম। ওদের দেশে চিরস্থায়ী বসে যাবার কোন বাসনা আমাদের নেই দেখে ছোকরা সাহেবের মুখে হাসি ফুটল। হেসে বললে—ডোনট্ ওয়ার্ক টু হার্ড, এনজয় ইওরসেলফ!

কিন্তু যে কদিন ইংলণ্ডে ছিলাম মোটের উপর বেশ খাটুনি গেল। কারণ হাতে যা সময় তুলনায় কাজ অনেক বেশীই ছিল। রোজই সকালে ব্রেকফাস্টের পর সোজা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে হাজির হতাম। দুপুরে চট করে একবার বেরিয়ে কিছু খেয়ে দেওয়া, ফাইলের পাতায় চিহ্ন দেওয়া থাকত, ফিরে এসে আবার সেখান থেকে কাজ শুরু। বাড়ি ফিরতে রাত হত রোজই। কিন্তু এই হার্ড ওয়ার্কের ভেতর আনন্দও পেয়েছি প্রচুর।

প্রথমত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির কাগজপত্র ঘাটা একটা অভিজ্ঞতা। আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। পঁচিশ বছরের স্বাধীনতায় পরাধীনতার দিনগুলির অনেক স্মৃতি ম্লান হয়ে গিয়েছিল, অনেক কথাই আবার ফিরে মনে পড়ল। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির আর্কাইভিস্ট মিঃ মার্টিন ময়ার সব কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রথম দিন গিয়েই দেখি স্পেস্যাল রিডিং রুমে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ফাইল গুছিয়ে রাখা আছে। ময়ার সাহেব তাঁর লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে (বর্তমান ব্রিটিশ ইনটেলেকচুয়ালদের সকলেরই লম্বা চুল, য়ুরোপেও লম্বা চুল ফ্যাসন হলেও তার দৌরাত্ম্য ও দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম) প্রায়ই এসে খোঁজ খবর নিয়ে যেতেন সব ঠিকমত হচ্ছে কিনা। লাইব্রেরিয়ান সাটন [illegible] আমাদের কাজে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডে আমাদের একটি মনোরম সাক্ষাৎকার হল অধ্যাপক ওটেনের সঙ্গে। য়ুরোপে তথ্যের সন্ধানে ঘুরতে গিয়ে প্রায়ই সিনেমার ফ্ল্যাশ ব্যাকের মত আমাদের ফিরে যেতে হত ১৯৩৩, '৩৪ বা '৩৫ সালে। কিন্তু ওটেন সাহেব আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন একেবারে ১৯১৬ সালে।

আমাদের ইংলণ্ডের প্রবাসজীবন আরো বিচিত্র হয়ে উঠল কিছু ইতিহাসের ছাত্র গবেষকের সঙ্গে যোগাযোগে, সাংবাদিক সংস্পর্শে আর বাংলাদেশের ছায়া তো সর্বত্রই আমাদের অনুসরণ করছিল।

আমাদের লণ্ডনে আসার খবর পেয়ে প্রথমেই এসে উপস্থিত হল লিওনার্ড গর্ডন। গর্ডন একজন আমেরিকান স্কলার, হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটিতে পড়াশুনো করেছে, বর্তমানে শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছে। সম্প্রতি গর্ডনের সুদীর্ঘ থিসিস 'Bengal and the Indian National Movement' রিসার্চ ব্যুরোর দপ্তরে এসেছে।

প্রচুর খেটে গর্ডন তার ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও বাংলাদেশ পেপারটি করেছে। মোটামুটি এটি তিনটি পর্বে ভাগ করা। প্রথম পর্বে আছে কংগ্রেসের গোড়াকার দিন-গুলির কথা, রমেশচন্দ্র দত্তর কথা। দ্বিতীয় পর্বে অরবিন্দ ঘোষ ও স্বদেশী আন্দোলন। তৃতীয় ও শেষ পর্বটির নাম "বাংলা ও গান্ধী" এবং এই পর্বে যে দুটি মাত্র অধ্যায় আছে তার নামেই বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাবে। একটি অধ্যায় "চিত্তরঞ্জন দাশ : অসহযোগ ও স্বরাজ্য দল"—অপর অধ্যায়টি "সুভাষ বোস, কংগ্রেস ও বাংলার রাজনীতি।" এই শেষ অধ্যায়ে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বেশ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা হয়েছে।

লণ্ডনে গর্ডনের সঙ্গে ওর মূল্যায়ন নিয়ে আলাপ আলোচনা হল। সুভাষ-চন্দ্রের চরিত্রের একটি বিপরীতধর্মী ভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গর্ডন বলছে, ওঁর মধ্যে একই সঙ্গে 'good boy' এবং 'mischief-maker' এই দুই ভাবের সংমিশ্রণ ছিল। ওঁর ভিতরে যেমন একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল তেমনি নিয়ম শৃংখলার প্রতি আনুগত্য ছিল সহজাত। ওঁর বাল্যকালে ও কৈশোরে এই দ্বিধাবিভক্ত মনোভাব বেশ ফুটে ওঠে। গান্ধী-বোস সংঘর্ষ সম্পর্কে গর্ডন বলে, গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উনি রুখে দাঁড়ালেন ও জয়ী হলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি গান্ধী নেতৃত্ব অস্বীকার করতে পারলেন না। ত্রিপুরিতে অত বড় জয়ের পরও সেই কংগ্রেস থেকে

লণ্ডনে সুভাষচন্দ্র (১৯৩৮ জানুয়ারী) সঙ্গে রজনী পাম দত্ত ও শ্রীমতী আশা ভট্টাচার্য

ওঁকে সরে দাঁড়াতেই হল। ওর মত—"The Boses won the first battle but lost the war." অবিভক্ত বাংলার নানা রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যেই পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে দুই বাংলার সঙ্গে দুই কেন্দ্রের তিক্ত সম্পর্কের বীজ নিহিত আছে একথা আলোচনা করে ও বলেছে, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রবলেম এরিয়া হিসেবেই রয়ে গেছে।

লেনি গর্ডনকে অবশ্য কলকাতার অনেকেই নিশ্চয় মনে রেখেছেন। কয়েক বছর আগে কলকাতায় রিসার্চের কাজ করার সময় চারজন বাঙালী সম্বন্ধে ও বিশেষভাবে পড়াশুনো করছিল—রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, এম এন রায় এবং সুভাষচন্দ্র। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। সে যাই হোক, তার রিসার্চের চরিত্র যারা তাদের প্রতি সে একান্ত অনুগত হয়ে পড়ছিল। এদের কারু সম্বন্ধে অপরের অজ্ঞতা বা অজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচনা ও সহ্য করতে পারত না। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওর এই একাত্মভাব অনেক সময় লোকের কৌতুককর মনে হত। একবার দিল্লি থেকে এক বন্ধু কলকাতায় এলেন। লেনি তখন দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভস-এ কাজ করছে। আমরা বললাম, গর্ডনকে দেখলে নাকি ওখানে? সে বললে, হ্যাঁ, ওতে নেতাজীর এক্স-রে প্লেট সব স্টাডি করছে। তার মানে? আমরা একটু অবাক হই! জেলে থাকার সময় নেতাজী অসুস্থ হয়ে পড়লে যেসব এক্স-রে তোলা হয় তা ন্যাশন্যাল আর্কাইভস-এ রয়েছে। লেনিকে দেখা গেছে নিমগ্ন চিত্তে সেইসব এক্স-রে প্লেট ঘাঁটছে।

লেনি গর্ডন আমাদের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির কাগজপত্র সম্বন্ধেও দরকারী খবরাখবর কিছু দিল। যেমন ওটেন সাহেবের ওপর কাগজপত্র গর্ডন বলে না দিলে আমরা হয়ত দেখতেই পেতাম না। ময়ার সাহেব আমাদের জন্য বোস পেপারস সব বার করে রেখেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী আমরা ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত দেখতে পারি অতএব ১৯৪২-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত কাগজপত্র দেখতে পেরেছিলাম। গর্ডনের কাছে ওটেন পেপারের কথা শুনে চাইবার পর ময়ার সাহেব ওটেনের ওপর আলাদা ফাইল এনে দিলেন।

মার্কিন স্কলার গর্ডন ছাড়া অপর যে উৎসাহী স্কলার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে কেম্ব্রিজ থেকে ছুটে এলেন তিনি চেক—নাম মিলান হার্ডনার। হার্ডনার গবেষণা করছেন য়ুরোপে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের উপর। ওঁর থিসিস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা থাকতে থাকতেই হার্ডনার অধ্যাপনার কাজ নিয়ে কেম্ব্রিজ থেকে অক্সফোর্ডে চলে এলেন।

লণ্ডনে আমার গৃহস্বামী কীর্তি নিজে একজন ইতিহাসবিদ, লণ্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধ্যাপনা করছে। প্রধানত কীর্তির উৎসাহে লণ্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ছবিটি দেখানোর ব্যবস্থা হল। সেখানে আমাদের সঙ্গে যারা যোগ দিল তাদের মধ্যে ছিল গর্ডন ও তার একাধারে কাজের সহকারিণী ও বাগদত্তা বধূ সুজী। আর এল হার্ডনার ও তার সুন্দরী চেক স্ত্রী, ভারী সুন্দর পূর্ব য়ুরোপীয়ান চেহারা, আর কথাবার্তাও খুব মধুর। মিসেস হার্ডনার ওরিয়েণ্টাল স্কুলেরই আফ্রিকার স্টাডিজ বিভাগে কাজ করেন।

গর্ডন ও হার্ডনার দুজনের দু ধরণের প্রবলেম। সত্তর সালের আগস্ট মাসে যখন প্রাগের রাস্তায় ট্যাংকের গর্জন শোনা গেল হার্ডনার ঘটনাচক্রে সে সময় লণ্ডনে ছিল। নানা কারণে ওর আর প্রাগে ফেরা হয়ে উঠবে মনে হয় না।

গর্ডন তার দ্বিতীয় রিসার্চ প্রজেক্ট, আধুনিক বাংলার ইতিহাস (১৯০০-১৯৫০) নিয়ে কাজ শুরু করবে বলে

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে ভারতবর্ষ যাবার পথে লণ্ডনে এসেছে। নেতাজীর ওপর আলাদা একটি বই লেখার পরিকল্পনাও ওর রয়েছে। এদিকে নেতাজী সম্বন্ধে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর শরৎ বোস পেপারস্ ওর চোখে পড়েছে। এ নিয়ে যথেষ্ট কাজ করার সুযোগ আছে বলে ওর ধারণা।

এখানে এসে এক বিভ্রাট। ভারত সরকার কিছুতেই ভিসা দিচ্ছেন না। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস বয়ে যাচ্ছে। গর্ডনের স্টাডি লিভ শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু ভিসা নেই। লণ্ডনের হাই-কমিসন দিল্লীকে জিজ্ঞাসা করছে, দিল্লী অনুমতি চাইছে কলকাতার। শোনা গেল কলকাতাতেই ব্যাপারটা আটকে আছে। এই আটকে থাকার পিছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, না রাইটার্স বিল্ডিংস-এর গাড়িমসি এর জন্য দায়ী তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গর্ডন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এর মধ্যে আমি ঠাট্টা করে বলে বসলাম, কেনই বা আমরা তোমাকে ভিসা দেব? যা দুর্ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করছে তোমাদের গভর্নমেণ্ট!! গর্ডন চটে গিয়ে বললে—তুমি কি আমাকে শাস্তি দিয়ে নিকসনকে শিক্ষা দিতে চাও? এটা কি ন্যায়সঙ্গত? তাছাড়া জেনে রাখো, আমেরিকার অ্যাকাডেমিক মহল পুরো পুরি ভারতবর্ষের দিকে এবং বাংলাদেশের সমর্থক। মিছিমিছি খারাপ ব্যবহার করে মানুষের গুডউইল বা সদিচ্ছা নষ্ট করো না।

গর্ডনকে শান্ত করতে আমরা বললাম, আহা চটো কেন। নিশ্চয় ছোট্ট কোন আমলাতান্ত্রিক জট পাকিয়েছে তোমার কেস নিয়ে। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নেতাজী তথ্যচিত্রটি নিয়ে য়ুরোপ যাবার শুরুতে যে বিভ্রাট বেধেছিল সেই গল্প বলি। আর একটু হলে আজ আর লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টল স্টাডিজএ বসে এই ডকুমেণ্টারি দেখার সুযোগ হত না।

নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ছবিটি যথারীতি সেনসর করা ও শিক্ষামূলক ছবি হিসেবে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। কলকাতার বহুলোক রবীন্দ্রসদনে ও নেতাজীভবনে এটি দেখেছেন। তবু য়ুরোপে নেতাজী সম্মেলনে ছবিটি নিয়ে যাবার আগে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো দিল্লীতে পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি চাইবার প্রয়োজন হয়ত ছিল না, তবু ব্যুরোর কর্তৃপক্ষ 'কারেকট' হতে চাইলেন। পররাষ্ট্র দপ্তর জানালেন, আমাদের করণীয় কিছু নেই, তথ্য ও বেতার দপ্তরকে জানিয়ে রাখো। বেশ, তাই করা হল। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল, দুই দপ্তরই নীরব। ধরে নেওয়া হল মৌনতা সম্মতিরই লক্ষণ। এরপর আমাদের যাবার দিন যখন ঘনিয়ে এসেছে, প্রায় এরোপ্লেনে উঠব-উঠব করছি তখন হঠাৎ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক অফিসারের পত্রাঘাত—নেতাজী ফিলমটি দিল্লী নিয়ে এসে আমার অফিসারদের দেখাতে হবে তারপর আমরা বিবেচনা করে দেখব ওটি য়ুরোপে নেওয়া চলবে কি না। সর্বনাশ!

তখন হাতে সময় এত সংক্ষিপ্ত যে ইচ্ছা থাকলেও এ আবদার রাখা সম্ভব নয়। নিরুপায় হয়ে আমাদের কর্মব্যস্ত প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনাটি জানিয়ে রিসার্চ ব্যুরো থেকে চিঠি দিতে হল। তখন সেই চিঠি ডাকে দিল্লী পৌঁছে জবাব আনাতে হলে এরোপ্লেন ফেল হয়ে যাবার উপক্রম। সিদ্ধার্থশংকর রায় সে সময় পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কলকাতা-দিল্লী বলা যায় ডেলি-প্যাসেনজারি করেন। সেদিনই দিল্লী যাচ্ছিলেন, কোনমতে ওঁর ব্যাগে চিঠিটি গুঁজে দেওয়া হল। কলকাতায় তখন রয়েছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের অশোক রায়। উনিও একটা টেলেকস্ পাঠালেন। নেতাজী ফিলম অ্যাকাডেমিক সম্মেলনে য়ুরোপে প্রদর্শিত হবে এর জন্য অনুমতির কি আছে উনি তো ভেবে পেলেন না। যাই হোক, পরদিনই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে টেলিগ্রামে জবাব এসে গেল—অবশ্যই ছবিটি নেওয়া চলবে।

এর পরের অংকে নাটক আরো জমেছিল। [illegible] কেসে অনুমতি [illegible] —সকলেই এক [illegible] লাগল, ছবিটি অবশ্যই নেওয়া চলবে।

দেশে ফিরে আসার পর গর্ডন আমাকে জানিয়েছে তার ভিসার আবেদন একেবারেই নামঞ্জুর হয়েছে। এর জন্য কোন কারণ অবশ্য বলা হয়নি। খবরটা শুনে একটু দুঃখিত না হয়ে পারিনি। ওর প্রকাশিত থিসিস যা দেখেছি তা সত্যিই সুচিন্তিত ও সুলিখিত। আধুনিক বাংলার ইতিহাসের ওপর আর একটি ভাল রচনার থেকে বোধ হয় আমরা বঞ্চিত হলাম। অবশ্য নেতাজীর

জীবনী লেখার আশা ও এখনো ছাড়েনি।

সেদিন ওরিয়েনটাল স্কুল থেকে বেরিয়ে য়ুনিভার্সিটি এলাকাতেই একটি সস্তা রেস্তোরাঁয় বসে টমাটো সস্ সহযোগে স্প্যাগেহটি খেতে খেতে হার্ডনার, গর্ডন, কীর্তি সবার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। পরদিন সকালে আমাদের অক্সফোর্ড য ওয়ার কথা নীরেণ চৌধুরী মশাইর সঙ্গে দেখা করতে। তাই শুনে গর্ডন সাবধান বাণী উচ্চারণ করলে, তবে কাল তোমাদের কপালে একটা অক্সফোর্ডের 'ওয়াকিং ট্যুর' আছে। দিনকতক আগে স্ত্রীকে নিয়ে গর্ডন গিয়েছিল ও'র কাছে। প্রচুর ভাল খাওয়া দাওয়া ও বিদগ্ধ আলোচনার পর উনি বললেন এক ঘণ্টায় অক্সফোর্ড ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন। গর্ডন বললে, মিঃ চৌধুরীর হাঁটা তো জানোই, ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে তাল রাখা দায়।' সত্যই এক ঘণ্টায় পুরো অক্সফোর্ড ঘুরিয়ে তবে ছাড়লেন; আমাদেরও সেই একই অভিজ্ঞতা পরদিন হল। তবে গর্ডন একটু ভুল বলেছিল—'ওয়াকিং' ট্যুর' না বলে 'রানিং ট্যুর অফ অক্সফোর্ড' বলা উচিত ছিল।

(ক্রমশ)

চিত্রকলা, ভাস্কর্যশিল্প, সিনেমা ও সঙ্গীত বিষয়ে নানা নতুন বই, ভারতীয় ও আমেরিকার শিল্পীদের গ্রাফিক প্রিণ্ট ও সেই সঙ্গে, পরে, ভারতীয় ও ওই দেশের কয়েকজন শিল্পীর আঁকা ছবির নিদর্শন দেখা যায় কলকাতার ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আয়োজিত একমাস কাল ব্যাপী একটি প্রদর্শনীতে। স্থাপত্যশিল্প থেকে শুরু করে চিত্রকলা, তথা সৃজনশীল বিভিন্ন কলাক্ষেত্রে আজকাল যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কত রকমের বই লেখা হতে পারে, কর্তৃপক্ষের লাইব্রেরীতে সাজানো কয়েকটি নতুন বই দেখে তার পরিচয় মেলে। বস্তুত, এজাতীয় বই

ফ্রুট ভেণ্ডারস্ —কৃষেণ খান্না

সম্ভবত আমাদের দেশে প্রথম দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। সবচেয়ে বড় কথা, বইগুলি সুলিখিত, সুনির্বাচিতও এবং শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয়, একটির পর একটি বইয়ের পাতা ওলটালে প্রথমেই একটি দীর্ঘশ্বাস গোপনে চাপতে হয়। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, আমাদের দেশ শিল্পকলায় এত উন্নত হলেও, এ দেশে ঠিক এ-শ্রেণীর বইয়ের আজ কত অভাব! ন্যাথান নবকভ-এর দি ভিজুয়াল ডায়ালগ, অ্যালান লম্যাক্স-এর ফোকসঙস অব নর্থ আমেরিকা, পল মাইকেল সম্পাদিত দি আমেরিকান মুভীজ: দি সাউণ্ড এরা, ইয়া, দি শেরউড আর্ট রেফারেন্স গাইড এবং বিশেষ করে জেরাল্ড সাইকস-এর দি পেরেনিয়াল আভাগার্দের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বইগুলি স্থানীয় লাইব্রেরীভুক্ত হলে রসিকজন যে কৃতজ্ঞ হবেন, তা বলা বাহুল্য। এই লাইব্রেরীতে যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁরা শিল্পী

অমিতাভ ব্যানার্জী ও বিকাশ ভট্টাচার্যের আঁকা রঙীন প্রচারচিত্র দেখেও সুখী হয়েছেন সন্দেহ নেই।

সংলগ্ন প্রদর্শনী কক্ষে ছয়জন ভারতীয় ও ১৬ জন আমেরিকান শিল্পীর গ্রাফিক প্রিণ্ট দেখা যায়। আমেরিকার দু-একজন শিল্পীর কাজে আকারের ওপর প্রাধান্যদান চোখে পড়ে, যেমন জ্যাকব ল্যাণ্ডর লিথোগ্রাফ নিদর্শন মেটালজিক। লাল রঙপ্রধান জ্যাকব ল্যাণ্ডর আকারভিত্তিক এই প্রিণ্টটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতি সূক্ষ্ম খোদাই কাজের জন্য হ্যারল্ড অল্টম্যানের পার্ক উইথ ফিগারস প্রিণ্ট গ্রাফিকের সুন্দর নিদর্শন। বাস্তববাদী হলেও ফ্রাইটেনড্ জ্যাক র‍্যাবিট হাইডিং-এ, জ্যানেট টার্নার ছোট্ট খর-গোসের মনোভাব ও অনুরূপ পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। এ দেশের শিল্পীদের নিদর্শনের মধ্যে দু-একটি ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শৈলেন মিত্রের বস্তুপ্রধান লাল ও নীল রঙভিত্তিক কমপোজিশন, দুটি চোখকে কেন্দ্র করে রচিত কেণেলীরঙ প্রধান সনত করের— সিরিজ, ম্যান উওম্যান অ্যাণ্ড নেচার ৯, সুহাস রায়ের বলিষ্ঠ ও কারুকার্যপ্রধান স্টেয়ার ও অমিতাভ ব্যানার্জীর লাল রঙ ও আকারপ্রধান, নীল ও সবুজ সূক্ষ্ম রেখাবহুল কমপোজিশনের নাম করা যায়। অপর প্রদর্শনীতে ১১ জন ভারতীয় ও আটজন আমেরিকান শিল্পীর আঁকা ছবির নিদর্শন দেখা যায়। আমেরিকান ছবিগুলি বিড়লা অ্যাকাডেমির সংগ্রহ থেকে গৃহীত।

ইউ এস আই এস-এর সাংস্কৃতিক অধিকর্তা মিঃ টমাস অ্যাজেল একজন প্রকৃত শিল্পরসিক। ইতিপূর্বে দিল্লী থাকাকালীন ও পরে কলকাতায় আসার পরে তিনি বহু খ্যাতনামা ভারতীয় শিল্পীর ছবি কিনেছেন। বস্তুত, প্রদর্শনীভুক্ত ভারতীয় ছবিগুলি তাঁরই ব্যক্তিগত সংগ্রহসম্ভার থেকে গৃহীত। ছবিগুলি সুনির্বাচিত সন্দেহ নেই, তবে মনে হয়, শৈলজা মুখার্জীর অন্য কোনও শিল্প নিদর্শন থাকলে ভাল হত—ভারতীয় চিত্রকলাক্ষেত্রে শৈলজা মুখার্জীর অবদান অনস্বীকার্য—প্রদর্শনীভুক্ত ছবিটিতে বোধ-হয় তাঁর সঠিক পরিচয় মেলে না। এই প্রদর্শনীটি দেখে প্রথমেই দুটি দেশের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও রচনা-রীতির পার্থক্য চোখে পড়ে। আমেরিকান শিল্পীদের কাজ আধুনিক, পরীক্ষামূলক। ভারতীয়

কমপোজিশন —অজিতাভ ব্যানার্জী

শিল্পীদের রচনাও সমকালীন, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটিতেই নিজস্ব ভারতীয় রূপ ও ঐতিহ্য ধরা পড়ে। সূক্ষ্ম, বলিষ্ঠ এচিং জাতীয় রেখা ব্যবহার থেকে আমেরিকান শিল্পীদের কাজে সূচীশিল্পী ও হিজিবিজি (doodle) জাতীয় ড্রয়িং বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। হেডা স্টানস্-এর ইংক ড্রয়িং এচিং জাতীয়। ইয়র্ক উইলসন এক-একটা ছোট জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ওপর নীল, বেগুনী রঙের ক্ষেত্র এঁকেছেন—পৃষ্ঠভূমির গভীর কালো রঙের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা শতরঞ্চির মত দেখায় (গোরেরো)। এটিতে ভ্যাসারেলির প্রভাব ধরা পড়ে। ক্রিসা নানা প্যানেলে অ্যাকশন পেন্টিং জাতীয় কাজ করে সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন (আনটাইটলড্)। এইচ সি পিয়ারসনের ছবি অপ আর্ট জাতীয়। গভীর বেগুনী রঙের পরিপ্রেক্ষিতে সূক্ষ্ম আঁকাবাঁকা রেখা মাধ্যমে রচিত ছবিটি দেখে মনে হয় যেন কাঁথা জাতীয় সূক্ষ্ম সূচীশিল্প থেকে থেকে নড়ছে এবং সেই সঙ্গে নতুনতর অংকর সৃষ্টি করছে। মেরী অ্যাবট তাঁর পেন্টিং-এ হিজিবিজি রেখা কেটে রূপ সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে কৃষেণ খান্না, হুসেন, সুলতান আলী ও লক্ষ্মণ পাই-য়ের ছবিগুলি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হলুদ রঙের পরিপ্রেক্ষিতে মিশ্র বেগুনী রঙ ব্যবহার করে প্রথমজন একটি গ্রাম্য নারী ও মেয়েকে কেন্দ্র করে 'ফ্রুট ভেন্ডারের' পরিচয় দিয়েছেন—এটির নিছক সরলতা উপভোগ্য। হুসেন কৃত অ্যালেনের প্রতিকৃতি—রচনা হিসাবে বলিষ্ঠ। ছোট ছোট চতুর্ভুজ জাতীয় ক্ষেত্র অবলম্বনে সুলতান আলী মিক্সমেড-এ অপূর্ব কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন। হলুদ রঙের পরিপ্রেক্ষিতে সাবলীল ও গতিশীল আকারের মধ্য দিয়ে লক্ষ্মণ পাই রাগ সারঙ-এ ইঙ্গিতে স্বরলিপির আভাস দিয়েছেন। জ্ঞি আর সন্তোষের এ উইন্টারনাইট প্রতীকমূলক ইমপাস্টো প্রথায় রঙ ব্যবহার লক্ষণীয়। শৈলজা মুখার্জীর হাউস অব ফেম প্যানেল জাতীয় —প্রতীকমূলক হলেও সকলেরই চোখে পড়ে—বিশেষ করে অল্প অথচ নির্বাচিত রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশের জন্য। বিমূর্ত রচনা হিসাবে যতীন দাসের লোনলি সিটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমলা ও নীল রঙ সুকৌশলে ব্যবহার করে শিল্পী যেন আধুনিক শহরের নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। শূন্য স্থান ও আকারের বলিষ্ঠ রেখায় নানাভবে ভাগ করার ফলে কে এস কুলকার্নির দি বীস্ট-এ ভাস্কর্য জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণ রেড্ডির বুল অ্যান্ড ম্যান গ্রাফিক নিদর্শন হিসাবে বলিষ্ঠ। অন্য ছবির তুলনায় রামকুমারের আনটাইটলড অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এই একমাস কালব্যাপী প্রদর্শনীর অংশ হিসাবে ভাস্কর শিল্পী অজিত চক্রবর্তীর একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়—আগামী সংখ্যায় সে বিষয়ে আলোচনা করব।

*

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অ্যাকাডেমি পরিচালিত স্কেচিং ক্লাবের সদস্যদের পঞ্চদশ বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ২৭ জন সদস্যের ১৫০টি স্কেচ ও ড্রয়িং নিদর্শন দেখা যায়। সকলেই জানেন যে, শিল্পী, শিক্ষার্থী ও শিল্পরসিকদের স্কেচ ও মডেল দেখে আঁকার সুযোগদান করার জন্য অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ গত দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ এই স্কেচিং ক্লাব পরিচালনা করছেন। বলতে বাধা নেই, এই ক্লাবের কয়েকজন সদস্য এখন শিল্পী হিসাবে সুপরিচিতি লাভ করেছেন। প্রদর্শনীতে মূলে রঙ পেনসিল, কালিকলম একরঙা ও রঙিন স্কেচ ও মডেল দেখে আঁকার নানা নিদর্শন ও ভাস্কর্য নমুনাও দেখা যায়। সুখের বিষয় কাজগুলি দেখে বোঝা যায় যে, কয়েকজন একান্ত নিষ্ঠা সহকারে শিল্পচর্চা করেছেন। নির্বাচন মোটের ওপর সংগত হলেও কয়েকজন সদস্য-শিল্পীর বহু ছবি কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীতে না রাখলেই ভাল করতেন। কালিকলম-এর ড্রয়িং-এর মধ্যে অজিত মণ্ডল (৭১), কমল সেন (১০৪) ও সুধাংশু ব্যানার্জীর (৩২, ৩৩, ৩৪ ৩৫) প্রশংসা দাবি করতে পারেন। সংক্ষিপ্ত রেখা ব্যবহার ও ওয়াশ প্রথার জন্য প্রেমতোষ মুখার্জী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (৫৭)। স্কেচের দিক থেকে অসিত মণ্ডল (৭৩) ও বিশেষ করে অমিতাভ সেন (৯৩, ৯৪, ৯৫) প্রতিভার পরিচয় দেন। রঙিন স্কেচ ও বহির্দৃশ্য স্টাডির জন্য যাঁদের কাজ চোখে পড়ে, তাঁদের মধ্যে সুধাংশু ব্যানার্জী (৩৯, ৪০), সন্দীপ সেনগুপ্ত (১১৯) ও বিশেষ করে মৃন্ময় মুখার্জীর (৬১, ৬২)-র নাম করা যায়। বি আর পানেসরের একটি স্কেচ অনেকেরই ভাল লাগে (৮০), যদিও তাঁর কোলাজ নিদর্শনটি ঠিক রসোত্তীর্ণ হয়নি। স্টিল লাইফ নিদর্শন হিসাবে রমেন দাঁর বোতলে রাখা আমের আচার অনেকের ভাল লেগে (৫২)। প্রদর্শনীতে কয়েকটি প্রশংসাযোগ্য মডেল স্টাডি দেখা যায়। ন্যুড স্টাডি হিসাবে চন্দ্রশেখর আচার্য (৬), তপন বিশ্বাস (৩০), রমেন দাঁ (৫০) ও বিশেষ করে মাখন রায় (৮৩) প্রশংসা দাবি করতে পারেন। দুঃখের বিষয়, ভাস্কর্য বিভাগে উল্লেখ্য নিদর্শন চোখে পড়েনি। প্রচেষ্টা হিসাবে কুণালকান্তি সাহার দি ন্যুড মন্দ লাগেনি—তবে অনওয়ার্ড (১০৯) কয়েকজনের চোখে পড়ে। সত্যেন মজুমদার সমকালীন রীতিতে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি রস সৃষ্টি করতে পারেননি (৬৭)। এই তরুণ ভাস্কর একটি বিশিষ্ট ধরা অনুযায়ী কাজ করছিলেন, কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে প্রতিশ্রুতির আভাসও মিলেছিল। মনে হয় সেই ধরা অনুযায়ী কাজ করলেই তিনি লাভবান হবেন।

চিত্রপ্রিয়

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৩ ॥
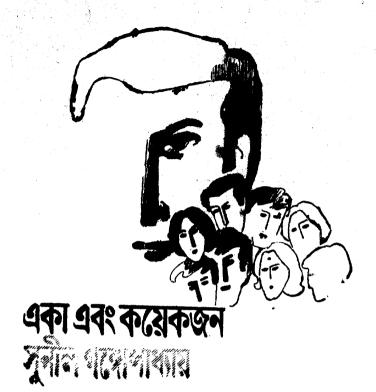
সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বড়বাবু হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চিররঞ্জনকে ডেকে বললেন, চিরু, শুনে যাও, দেখে যাও একবার।

বড়বাবু চিররঞ্জনকে খবরের কাগজের সেই বিশেষ খবরটা দেখালেন। মাঝে মাঝেই এ রকম খবর বেরোয়। পুরুলিয়ার রঘুনাথ-পুর গ্রামে একজন ইস্কুল মাস্টারের সাত বছর বয়েসের ছেলে হঠাৎ একদিন এক জায়গায় এক জোড়া বাঁয়া তবলা দেখে বাজাতে শুরু করে। নিখুঁত লয় অপূর্ব বাজনা। ছেলেটি তার আগে বাঁয়া তবলা কখনো ছুঁয়েও দেখেনি, শেখা তো দূরের কথা। ছেলেটির তখন মনে পড়ে যায়, পূর্ব জন্মে সে তবলা শিখেছিল, তখন সে থাকতো মালদা শহরে। পূর্ব জন্মে তার বাবার নাম ছিল এই, তারা তিন ভাই বোন ছিল, সেই বাড়িটি দোতলা এবং হলদে রঙের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে মালদায় সত্যিই সেই রকম একটি বাড়িতে সেই রকম একটি পরিবার আছে, সেই পরিবারের একটি ছেলে মারা গেছে আট বছর আগে। ছেলেটি তার পূর্ব জন্ম বিষয়ে আরও যা-যা বলে, সবই মিলে যায়! অর্থাৎ ছেলেটি জাতিস্মর। আশেপাশের বহু গ্রামের লোক ভিড় করে দেখতে আসছে ছেলেটিকে।

বড়বাবু বললেন, আমিও দেখতে যাবো। চিরু, তুমি যাবে আমার সঙ্গে!

চিররঞ্জন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখন সেই পুরুলিয়ায় ছুটবেন? আপনি বিশ্বাস করেন এসব?

—তুমি বিশ্বাস করো না?

চিররঞ্জন আমতা আমতা করে বললেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। তবে খবরের কাগজে যখন লিখেছে, তখন কি আর মিথ্যে লিখেছে?

বড়বাবু হো-হো করে হেসে বললেন, তুমি যে রামকৃষ্ণদেবের মতন বললে হে! সেই যে এক বন্ধু খবরের কাগজের ওপর এত ভক্তি যে একটা বাড়ি ভেঙে পড়েছে সেটা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না, লোককে বললেন, দাখো তো খবরের কাগজে লিখেছে কি না। খবরের কাগজে সব সত্যি লেখে?

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি এসব বিশ্বাস করেন না—তাহলে যেতে চাইছেন কেন?

—আমি প্রমাণ না পেলে বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। তবে এই রকম ঘটনা প্রায়ই দেখি। আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে।

—জন্মান্তরবাদের তত্ত্বটা যদি সত্যি নাও হয়, তবু বড় মধুর। কার না ইচ্ছে করে, আবার এই পৃথিবীতে জন্মাই, আবার নতুন করে জীবন ফিরে পাই।

—মানুষ মরে গিয়ে আবার জন্মায় কিনা সেটা প্রমাণ করার কোনো রাস্তা নেই। আগের জন্মের কথা তো কারুর মনে থাকে না—আর মনেই যদি না থাকে তাহলে বার বার জন্মানোর এমন কিছু মূল্য নেই। দুটো জীবন যদি তুলনা করে দেখা না যায় —তাহলে আর মজা কি! এইসব জাতি-স্মরের ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটাই হতে পারে একমাত্র প্রমাণ। তাই না? যে—সব জাতিস্মরের ঘটনা একবার কাগজে ওঠে, দু'চার বছর বাদে তাদের কি অবস্থা হয়, তখনও সব মনে থাকে কি না—সেটা তো আর বেরোয় না!

—আমার কি মনে হয় জানেন। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এই সব ঘটনা কাগজে ছাপাবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই যে সব ছেলে দেশের জন্য লড়াই করছে, ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিচ্ছে—এরা অনেকেই পরজন্মে খুব বিশ্বাস করে। এই সব খবর পড়লে তাদের বিশ্বাসটা অনেক জোরদার হয়।

বড়বাবু দু'এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন চিররঞ্জনের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তোমার কথায় যুক্তি থাকতে পারে। যাই হোক—এ ছেলেটির তো বাপের নাম, গ্রামের নাম সবই দেওয়া আছে। নিজের চোখে দেখে যাচাই করে আসতে দোষ কি। আমি কাল সকালেই রওনা হচ্ছি।

বড়বাবুর মাথায় প্রায়ই এ রকম বাতিক চাপে। তাঁর মনের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তিটা প্রবল। এ বাড়িতে একজন ছুতোর মিস্তিরি আসে প্রায়ই, দরজা-জানলা সারায় কিংবা রান্নাঘরের র‍্যাক বানায়। লোকটি বেশ বুড়ো, মুখভর্তি দাড়ি, লুঙ্গি পরে খালি গায়ে আসে, তার বুকের লোম-গুলোও সাদা। লোকটির একটি অদ্ভুত স্বভাব হচ্ছে এই, সে প্রায় সব সময়েই নিজের মনে মনে কথা বলে। অনেক সময় বেশ জোরে জোরে। উঠোনের এক কোণে সে কাঠকুটো নিয়ে র‍্যাঁদা বা তুরপুন চালাতে চালাতে আপন মনে বকবক করে।

বড়বাবু এই লোকটিকে দেখে কৌতূহলী হলেন। কাঠের মিস্তিরি যখন কাজ শুরু করতো, বড়বাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করতেন ও কি কথা বলে। দু চারদিন শোনার পর বড়বাবু সেই মিস্তিরিকে তাঁর বন্ধু করে ফেললেন। চিররঞ্জনকে বললেন, আমাদের এই রজব মিস্তিরি খাঁটি কর্মযোগী। কাজের সময় ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে কথা বলে, যেন ওরা সবাই ওর আপনজন। কি বলে জানো, র‍্যাঁদা ঘোরাতে ঘোরাতে বলে আরে র‍্যাঁদার পো র‍্যাঁদা, এদিক যা, ওদিক যা। এদিক যা,

[illegible] না। [illegible] ফিনিকে বাগিন। এই জন্যেই তোর জন্মো। তোর কি খুলোর আহ্বান করার টাইম আছে! [illegible] ফিনিকে বাকি। ও হাতুড়ি, তোমার কাম পেয়েছেন মাথা পিটানো, তুই [illegible] মাথা পিটাইয়ে চলে জানন?—লোকটি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গেও [illegible] কথা বলে। যেন [illegible] মগ্ন থাকার সময় আমা ওর সামনে এসে দাঁড়ান। আমার কাছে ও হাতুড়ির নিয়ে নালিশ জানায়!

সেই মিস্তিরি এর পর থেকে এ বাড়িতে কোনো কাজ না থাকলেও আসে। বড়বাবুর বলো কি সব গল্প করে—বড়বাবুর [illegible] থেকে সিগারেট নিজে অভিজ্ঞভাবে ধরায়, পাশ ফিরে ধোঁয়া ছাড়ে। দুজনের বেশ মনের মিল হয়েছে বোঝা যায়।

বড়বাবু আর একবার একটা ভূতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাবেন ঠিক করেছিলেন। কলকাতা শহরে তখন অনেক খালি বাড়ি থাকতো, পথে পথে 'টু-লেট' নোটিশ দেখা যেত। মালিকের অভাবে বা অযত্নে দু' চারটে পোড়ো বাড়িরও অভাব ছিল না। সেই সব বাড়ি ঘিরে আস্তে আস্তে ভূতুড়ে গল্প দানা বাঁধে। দেশ বিভাগের পর রিফিউজিরা এসে কলকাতার সব খালি বাড়ি দখল করে নিয়েছে, [illegible] ভূতদেরও তাড়িয়ে দিয়েছে।

তবে নিজের [illegible] গল্প কিংবা গাল গল্প শুনে ভোলবার লোক ছিলেন না বড়বাবু। সেই সময় উত্তর কলকাতার রামধন মিত্তির লেনের একটা হানাবাড়িকে কেন্দ্র করে একটি চাঞ্চল্যকর ভূতের গল্প খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। বড়বাবু সেখানে যেতে চেয়েছিলেন সত্যের সন্ধানে। তিনতলা এই বাড়িটি বহুকাল পরিত্যক্ত, সদর দরজায় ঘাস গজিয়ে গেছে, দেয়ালে কার্নিসে বড় বড় বট, অশ্বত্থের শিকড়। মধ্য রাতে সেই বাড়ি থেকে বাচ্চা ছেলের চিৎকার, নারী কণ্ঠের কান্না শোনা যেত এবং দেখা যেত একটা সবুজ আলো ছাদের ওপর ঘোরা-ফেরা করছে। যে-সব দুঃসাহসী দিনের বেলাতেও সে বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করেছে, তারা নাকি রক্ত বমি করতে করতে মারা গেছে। একটি প্রাইভেট ব্যাংকের মালিকের ডাকাবুকো সন্তান নিজস্ব এরোপ্লেনে সেই বাড়ির ছাদের ওপর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করেও সেই সবুজ আলো দেখতে পেয়েছে এবং তার কোনো মানে বুঝতে পারে নি।

তখন সেই বাড়ির রহস্য উদ্ঘাটনে যান কালীকিংকর ঘোষাল। এই কালীকিংকর ঘোষাল শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের হেড পণ্ডিত, তান্ত্রিক মানুষ, মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় জটা। তিনি ভূত প্রেতে অবিশ্বাস করে যান নি, গিয়েছিলেন ভূত-প্রেতদের বশ মানাতে। বড়বাবু এই কালীকিংকর ঘোষালকে চিনতেন।

বেশ বলশালী, লম্বা-চওড়া পুরুষ ছিলেন কালীকিংকর ঘোষাল। কিন্তু রামধন মিত্তির লেনের ভূত তাঁকে অদ্ভুত রকম জখম করে দেয়! তাঁর গল্পটি এই রকম: হাতে একটা লাঠি এবং হ্যারিকেন নিয়ে সন্ধের পর সে বাড়িতে ঢুকেছিলেন তিনি। সারা বাড়ি ঘুরে এবং ছাদে পায়চারি করেও কিছু দেখতে পান নি। সারা বাড়ি ধুলোয় ভর্তি, মানুষের আনাগোনার কোনো চিহ্ন নেই। দোতলার একটি ঘর কোনো রকম বাসযোগ্য, সেটাকেই সাফ-সুতরো করে তিনি বসলেন মন্ত্র পড়তে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, কোথাও কোনো শব্দ নেই, ভূতের টিকিটিও দেখা নেই। কালীকিংকর ঘোষাল ধৈর্য হারালেন না। ভূত এ বাড়িতে না থাকলেও তিনি মন্ত্রবলে প্রেতাত্মা ডেকে আনবেন। যে-কোনো প্রেতাত্মা এলেই তিনি জেনে নিতে পারবেন এ বাড়ির অশরীরী বাসিন্দাদের সঠিক খবর।

ঠিক মধ্য রাত্রিতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কালীকিংকর আসন ছেড়ে উঠলেন না। গঙ্গাজলে আচমন সেরে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। তৎক্ষণাৎ দেখলেন দরজার সামনে একটি দীর্ঘকায় মনুষ্য-মূর্তি। তাকে দেখে কালীকিংকর প্রথমে খুবই চমকে উঠেছিলেন। চমকাবারই কথা।

কারণ সেই পাড়ার প্রতিমূর্তির চেহারা হুবহু কালীকিঙ্করেরই মতন। ঠিক যেন কালীকিঙ্করের যমজ ভাই। অথচ কালীকিঙ্করের যমজ কেন, কোনো ভাই-ই নেই। দরজার কাছে দাঁড়ালো কালীকিঙ্করের চেহারা এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট কালীকিঙ্করের দিকে।

কালীকিঙ্কর মোটেই বিচলিত হলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা মায়া। অবিকল প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করা এক প্রকার রাক্ষসী মায়া। কালীকিঙ্কর বসে আছেন, লোকটি দাঁড়ালো, না হলে বলা যেত তিনি যেন আয়নায় নিজের ছায়া দেখছেন।

কালীকিঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে? কি চাস?

লোকটি উত্তর না দিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসলো। তারপর ঘরের মধ্যে এক পা বাড়ালো। কালীকিঙ্কর গঙ্গাজল ছিটিয়ে বল্লেন, যাঃ, যাঃ! অমনি মূর্তিটা মিলিয়ে গেল।

এর পর দরজার কাছে এলো একটি বারো-তের বছরের মেয়ে। কস্তা পেড়ে ধনেখালির শাড়ি পরা, আঁচলটা জড়িয়ে গাছ-কোমর করে বাঁধা। একে দেখে কালীকিঙ্কর আরও বেশি চমকে উঠলেন। মেয়েটিকে দেখতে অবিকল কালীকিঙ্করের নিজের মেয়ে লীলার মতন। তাঁর একমাত্র মেয়ে। মেয়েটিকে দেখে কালীকিঙ্কর দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আসন ছেড়ে উঠলেন না।

মেয়েটি ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললো, তুই কেন এসেছিস?

(ভূত প্রেতরা সব সময় তুই বলে। তুমি বা আপনি তাদের অভিধানে নেই।)

কালীকিঙ্কর এর দিকে গঙ্গাজল ছেটাতে পারলেন না। কুমারী মেয়ের প্রতি মন্ত্র খাটে না। অপাপবিদ্ধা কুমারী অভিশাপের অতীত।

কালীকিঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে রে বেটি!

মেয়েটি আর এক পা এগিয়ে এসে ফের জিজ্ঞেস করলো, কেন এসেছিস? তুই এখানে কেন? তোর মেয়ে বাড়িতে মরতে বসেছে, আর তুই এখানে বসে আছিস?

কালীকিঙ্করের বুক কেঁপে উঠলো। তবু তিনি হেসে উঠে বললেন, আমার মেয়েকে জলজ্যান্ত সুস্থ দেখে এসেছি কয়েক ঘণ্টা আগে—আর এর মধ্যেই সে মরতে বসেছে?

মেয়েটি বললো, যা, বাড়ি গিয়ে দ্যাখ!

কালীকিঙ্কর বললেন, আমার সঙ্গে ছলনা করে তোর সুবিধে হবে না! তুই এই মূর্তি ধরেছিস কেন? আমার মেয়ের কথা আমি বুঝবো। তুই কে বল্!

মেয়েটি তখন হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়লো। মনে হলো যেন অভিমান করে কাঁদবে। ঐ বয়েসের মেয়েরা যেমন কাঁদে। তা কিন্তু নয়, মাটিতে শুয়ে গড়াতে গড়াতে চলে এলো কালীকিঙ্করের দিকে। কালীকিঙ্কর জোড়াসন করে বসেছিলেন, মেয়েটি কাছে এসেই কালীকিঙ্করের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরলো।

কালীকিঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলেন, একি ছাড়, ছাড়!

মেয়েটি কালীকিঙ্করের বুড়ো আঙুল সম্পূর্ণটা মুখে ভরে প্রচণ্ড জোরে কামড়ে ধরেছে। কালীকিঙ্কর পাশে রাখা লাঠিখানা তুললেন তাকে মারবার জন্য। কিন্তু তিনি সাধক মানুষ, একটি মেয়েকে মারার জন্য তাঁর হাত উঠলো না, বিশেষত যে-মেয়ের চেহারা তাঁর নিজের কন্যার মতন। লাঠি রেখে কালীকিঙ্কর হাত দিয়ে মেয়েটিকে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেয়েটির গায় যেন অসীম শক্তি।

যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কালীকিঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন। আসন ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জোর কমে গেল, দরজার কাছে ফিরে এলো আগের সেই মূর্তি, তার পেছনে আরও কে যেন। কালীকিঙ্করের মানসিক দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে গেল, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চ্যাঁচাতে লাগলো, ওরে, ওরে, ছাড়, ছাড়, আর আসবো না, ছেড়ে দে, মরে গেলাম, মরে গেলাম—

পাড়াসুদ্ধ লোক শুনেছিল সেই চিৎকার। আশে পাশের সমস্ত বাড়ির দরজা-জানলা খুলে গিয়েছিল। কালীকিঙ্কর তখন সেই মেয়েটিকে সুদ্ধু ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে ছুটে এসেছিলেন বারান্দায়, সেখান থেকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফ দিয়েছিলেন নীচে। তাঁর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ছিঁড়ে উড়ে গেছে।

খবর পেয়ে বড়বাবু ছুটলেন হাসপাতালে কালীকিঙ্করকে দেখবার জন্য। সত্যি কালীকিঙ্করের এক পায়ের বুড়ো আঙুল নেই। এবং সে রাত্রে কালীকিঙ্করের মেয়ে লীলার সাঙ্ঘাতিক কলেরা হয়েছিল।

বড়বাবু বাড়ি ফিরেছিলেন খুব চিন্তিত ভাবে। চিররঞ্জনকে বলেছিলেন, এ সব গাঁজাখুরি গল্প আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু কথা হচ্ছে কি, কালীকিঙ্কর পণ্ডিত এ মিথ্যে গল্প ছড়াবেনই বা কেন? তা ছাড়া, পায়ের ঐ আঙুলটা—দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়লেও কি পায়ের আঙুল ঐভাবে উড়ে যায়? ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।

বড়বাবু সেই ভুতুড়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। বাড়ির সবাই তাঁকে ভীষণভাবে বারণ করলো, বড়বাবু কিছুতেই কারুর কথা শুনলেন না। বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ঐ প্রতিমূর্তি দেখার ব্যাপারটা। তিনি তাঁর প্রতিমূর্তির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন—বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা তাঁর বলার ছিল।

শেষ পর্যন্ত বড়বাবুর যাওয়া হয় নি। কালীকিঙ্কর সেকালের ঘটনাটা এমনভাবে রটে যায় যে, হাজার হাজার মানুষ গিয়ে ভিড় করে সেই বাড়ির সামনে, পুলিস জায়গাটা ঘিরে রাখে এবং শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশন বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।

খবরের কাগজে জাতিস্মরের ঘটনাটা পড়ার পরদিন বড়বাবু চিররঞ্জনকে নিয়ে পুরুলিয়া রওনা হয়ে গেলেন। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে রঘুনাথপুর গ্রামে যেতে হলে গরুর গাড়ি ছাড়া আর কোনো যানবাহন নেই। কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার পর একখানা গরুর গাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁরা চেপে বসলেন।

প্রায় এক বেলার পথ। রাস্তার অবস্থা

কহতব্য নয়। ঝাঁকুনি খেতে খেতে হাড়-গোড় ভেঙে যাবার উপক্রম। পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে যাবে, সেদিন আর ফেরার প্রশ্ন ওঠে না। সেই গণ্ডগ্রামে কোনো থাকার জায়গা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভরসার কথা এই, গ্রীষ্মকাল, শেষ পর্যন্ত দরকার হলে গরুর গাড়িতেই শুয়ে থাকতে পারা যাবে। পুরোটাই যাতে মরীচিকার পিছে ছোটা হয়ে না যায়, সেই জন্য পুরুলিয়া স্টেশনে তাঁরা খবর নিয়ে এসেছেন। স্টেশনের দু'চারজন লোকও সেই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনেছে।

বড়বাবু চিররঞ্জনকে বললেন, বুঝলে, গিয়ে যাতে সম্পূর্ণ নিরাশ না হতে হয়, সে জন্য প্রস্তুত থাকা ভালো। যদি গিয়ে দেখি পুরো ব্যাপারটাই বানানো, তাহলেও একটা জিনিস ভাবতে হবে। এই রকম এক গণ্ডগ্রামের একজন ইস্কুল মাস্টারের মাথায় হঠাৎ এরকম একটা ঘটনা বানাবার কথা জাগলো কি করে? সবার মাথায় তো এরকম চিন্তা জাগে না। এটাও তো একটা রহস্য।

চিররঞ্জন বললেন, মনে হচ্ছে, হঠাৎ যেন আমাদের বয়েস কমে গেছে। ছেলে ছোকরারাই এই সব অ্যাডভেঞ্চারে যায়।

বড়বাবু সচকিত হয়ে বললেন, তোমার ভালো লাগছে না? কষ্ট হচ্ছে খুব?

—না, না! খুব বেশি ভালো লাগছে বলেই এ কথা বললাম। বয়েস কমে যাবার অনুভূতির চেয়ে প্রিয় আর কি আছে এ বয়েসে।

—তুমি বড্ড বেশি বুড়ো বুড়ো ভাব করো। তোমার কী-ই বা বয়েস। তোমার বয়েসে আমি লছমনঝোলায় থাকতাম—রোজ একখানা পাহাড় ভেঙে যেতাম গঙ্গায় স্নান করতে।

—আপনার গায়ে বয়েসের আঁচড় লাগে না। আচ্ছা, বড়বাবু, হরিদ্বার-লছমন-ঝোলায় আপনি যে বছরখানেক কাটিয়েছিলেন, কি পেয়েছিলেন সেখানে। ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন?

—ঈশ্বরকে কেউ পায়?

—পায় না?

—আমি অন্তত ঈশ্বরকে পেতে যাই নি। আমি দেখতে গিয়েছিলাম সত্যিই ঈশ্বরকে কেউ পায় কি না।

—সেরকম কারুকে পান নি?

—নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। যাঁরা খুব জোর দিয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শনের কথা বলেছেন, তাঁদের আমার মনে হয়েছে মানসিক ভাবে অসুস্থ। তবে এ কথাও ঠিক ঈশ্বর চর্চা যাঁরা খুব মন দিয়ে করেন—তাঁদের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তনের চিহ্ন দেখেছি—যা বেশ আনন্দেরই ব্যাপার। ঈশ্বর-সন্ধানী লোকদের আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু ধার্মিক লোকদের আমি পছন্দ করতে পারলুম না। ঈশ্বর আছেন কিনা আমি জানি না, থাকুন তাতে কোনো ক্ষতি নেই—কিন্তু ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে যে কতগুলি ধর্ম গড়ে উঠেছে—সেগুলো মানুষের বড় ক্ষতি করে।

—কেন, এ কথা বলছেন কেন?

—প্রত্যেক ধর্মের আলাদা আলাদা ঈশ্বর বড্ড হিংসুটে। ওল্ড টেস্টামেন্টে খোলাখুলিই বলা হয়েছে, তিনি জেলাস গড্! এক ধর্ম আর এক ধর্মকে সহ্য করে না। আবার এক একটা ধর্মের মধ্যেও ফাটল ধরে বিভিন্ন টুকরো হয়—তারা আবার নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। এক একটা ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত মানুষ খুন হয়েছে, প্লেগ, কলেরা বা সাপের কামড়েও অত মানুষ মরে না।

—আমাদের বেদে তো হিংসার কোনো কথা নেই।

—তুমি বেদ পড়েছো?

—তেমন ভালো করে পড়ি নি।

—পড়ে দেখো, বেশ মজা পাবে। আমি এক সময় ঝোঁকের মাথায় পড়ে ফেলেছি। বেদকে অনেকে বলে হিন্দুদের একটা ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু ওটা একটা গাঁজাখুরি কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই বেদকে বলেছেন পলগ্রেভ সাহেবের গোল্ডেন ট্রেজারির মতন একখানা পদ্যের বইয়ের সংকলন। উনি ভূয়োদর্শী লোক বলেছেন ঠিক কথাই। যে-সব প্রাচীন আর্য্যরা হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান জরাথুস্ট্রিয়ান—সবারই পূর্ব পুরুষ, তাদের লেখা কিছু কবিতাই তো বেদ নামে চলে। ওরা ছিল প্যাগন, প্রকৃতি পূজারী। আগুন, হাওয়া, বৃষ্টি এগুলোকেই দেবতা বানিয়ে পুজো করার তবু একটা মানে বুঝতে পারি, কিন্তু জগৎ সংসারের সৃষ্টিকর্তা একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব তো দূরে থাক, এরকম কল্পনার কোনো প্রয়োজন আছে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। বেদেও কোনো ধর্মের কথা নেই, ওটা পুরোপুরি ভোগবিলাস প্রিয় মানুষের সাহিত্য। বৈরাগ্য, আত্মোপলব্ধি, ঈশ্বরানুভূতি—এসব ভালো ভালো কথা এসেছে অনেক পরে—উপনিষদের আমলে অনার্য আর দ্রাবিড়দের কাছ থেকে পাওয়া। পুজো শব্দটাই তো বৈদিক সংস্কৃত নয়—দ্রাবিড়দের কাছ থেকে এসে সংস্কৃতে ঢুকেছে। আমরা এখন যেটাকে হিন্দুধর্ম বলে চালাই, সেটা কোনো ধর্মই নয়, একটা জগাখিচুড়ি ব্যাপার। এরা ভালো ভালো সাহিত্য বানিয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে উপদেশ হিসাবে নেওয়ার কোনো দরকার নেই। দেখো না, এই ধর্মের মূল শাস্ত্রগুলোতে কোথাও মূর্তি পুজোর কথা নেই অথচ সারা ভারত জুড়ে কতরকম পুতুলের কতরকম পুজো। আমাদের ব্রাহ্মরা এই ধর্মটা সংস্কার করে একটা পরিষ্কার চেহারা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু লোকদের সেই ধর্ম বাজারে তেমন চললো না। কুসংস্কার ছাড়া ধর্ম টেঁকে না। প্রত্যেকটা ধর্মই কুসংস্কারের ডিপো।

চিররঞ্জন আস্তে আস্তে বললেন, মানুষ যদি কুসংস্কার থেকেই আনন্দ পায়—

বড়বাবু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন, আনন্দ পাওয়ার কথা আলাদা! কিন্তু যখন কেউ এর মধ্যে তত্ত্বের কথা বলে, তখনই আমার রাগ ধরে। বললেই পারিস, আমার গায়ে জোর আছে, মানুষ খুন করে আমি আনন্দ পাই—এর মধ্যে আবার ধর্ম টেনে আনা কেন?

গাড়োয়ান বললো, বাবু, দূরে যে দেখা যায় রঘুনাথপুরের আলো। আপনারা কার বাড়িতে যাবেন? বালক-ঠাকুর দেখতে যাবেন নাকি?

বড়বাবু মুচকি হেসে চিররঞ্জনকে বললেন, দেখেছো, এর মধ্যেই ঠাকুর বানিয়ে ফেলেছে!

(ক্রমশ)

রবির আলোয় দুই কালীপ্রসন্ন

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের কথা। একটানা চার বছর (১৮৭২, ১৮৭৩, ১৮৭৪, ১৮৭৫) সগৌরবে প্রকাশিত হবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন বিদায় নিয়েছে। শোনা যাচ্ছে বটে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় (এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহায়তায়) আবার তা পুনঃ প্রকাশিত হবে। এমনি সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে দরবার করলেন, বঙ্গদর্শনের স্ট্যান্ডার্ডের একটা "মাসিক সমালোচনী পত্রিকা" প্রকাশ করতে চাই। তার সম্পাদক আপনাকেই হতে হবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎই রাজি। পত্রিকাটির নামকরণেও দেরি হল না—ভারতী, "মূল্য ৩।।০, মাশুল সমেত ৪ টাকা।"

১২৮৪ বংগাব্দ থেকে (১৮৭৭ খৃঃ) দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতীর সূচনা। এই উন্নতমানের মাসিক পত্রটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য-রসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

গদ্য ও পদ্য এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা বিষয়বস্তুতে ঠাসা এই মাসিক পত্রটিতে সে যুগের প্রথা অনুযায়ী লেখকদের নাম ছাপা হত না।

ভারতী-র প্রথম বর্ষের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, এই চারটি সংখ্যায় 'কবি কাহিনী' শীর্ষক দীর্ঘ একটি কবিতা প্রকাশিত হল। লেখাটি কারো কারোর ভাল লেগেছিল। দুচারজন উৎসাহী সাহিত্য রসিক লেখক সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন ঠাকুর পরিবারেরই ছেলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাই, রবি। নেহাৎ-ই নাকি ছেলেমানুষ—ষোল বছর বয়েস হয় কিনা হয়।

দীর্ঘ কবিতাটি ভারতীতে প্রকাশিত হবার কিছুদিন বাদেই এক মজার ঘটনা ঘটল। কবির অনুরাগী জনৈক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ কবিকে না জানিয়েই ঐ কবিতাটিকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করে কবির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কবি তখন আমেদাবাদে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। সেদিনটা ৫ই নভেম্বর ১৮৭৮।**

ঘটনাটির শেষ সেখানেই নয়, কে যেন (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ?) কাব্য গ্রন্থখানিকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সে যুগের বিখ্যাত মাসিকপত্র "বান্ধব"-এ পাঠিয়ে দিলেন সমালোচনার জন্য। কালী-প্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩—১৯১০) ছিলেন "বান্ধবের" প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সে যুগে এই দুটি নাম বাঙালীর মুখে মুখে ফিরেছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রটির জন্য পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক এবং সাহিত্য রসিকেরা পর্যন্ত উন্মুখ হয়ে থাকতেন। এমন কি স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে বান্ধবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, "ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র।......রচনা অতি সুন্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাংলার একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পত্র মধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।"

বঙ্গদর্শন তুলে দেবার সময় (১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস) সাহিত্য সম্রাট "বান্ধবের" কথা ভুলে যাননি। বঙ্গ-দর্শনের শেষ পাতায় "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" শীর্ষক বক্তব্যে তিনি জানালেন, "যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে "বান্ধব"...প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গ-দর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই..."

বান্ধব মাসিক পত্রিকাটি চলেছিলও অনেকদিন। প্রথম পর্যায়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৭। মধ্যে অবশ্য দু বছরের ছেদ পড়েছিল, কারণ কালী-প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ভাওয়ালরাজের প্রধান কর্মচারী হিসেবে রাজ্য শাসনে ব্যস্ত ছিলেন। এরপর রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত নতুন পর্যায়ে "বান্ধব" পত্রিকা প্রকাশ করেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ কেবল বান্ধব সম্পাদক-রূপেই নন, একজন নামজাদা প্রবন্ধকার ও সমালোচক, অদ্বিতীয় বাগ্মী ও বহু ভাষাভাষী পণ্ডিত হিসেবে সে যুগে বিশেষ

** এ ঘটনার বহু বছর পরে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন—"এই কবি কাহিনী কাব্যই আমার রচনা-বলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ আকারে বাহির হয়।

আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম, তখন আমার কোন উৎসাহী বন্ধু এই বইখানি ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়া-ছিলেন তাহা আমি মনে করি না। কিন্তু তখন আমার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনমতেই বলা যায় না।"

খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁর একটি চলতি নাম ছিল পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের “প্রভাতচিন্তা”, “নিভৃত চিন্তা” ও “নিশীথ চিন্তা” নামক তিনটি প্রবন্ধ পুস্তকের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন বারবার।**

কিশোর রবি যে কি রকম দুরু-দুরু বক্ষে বান্ধব পত্রিকার সমালোচনার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, সে বোধ হয় এখনও আমরা অনুভব করতে পারি। অবশেষে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের বান্ধবে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় “কবি কাহিনী”-র বিস্তারিত সমালোচনা করলেন। কবির বয়স তখন ঠিক সতেরো বৎসর আট মাস। কোন খ্যাত ব্যক্তির কলমে প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য-গ্রন্থের সর্বপ্রথম সমালোচনা হিসেবে তো বটেই, অসামান্য মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্ন ঘোষের এই সমালোচনাটি বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।**

“কবিকাহিনী (কাব্যগ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত) শব্দে কবিতার শরীর গঠন, ছন্দে উহার ভঙ্গি কিংবা গতির ঠাম, কিন্তু ভাবগত রসই উহার প্রাণ। নিম্নলিখিত পদাবলীতে কবিতার শব্দ আছে, ছন্দ আছে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা নাই। যথা,

> ‘আয়লো অলি, সবায় মিলি
> কুসুম তুলি, মনের সুখে।’
> অথবা
> ‘বকুল বনে, আকুল মনে
> দুকুল উড়ায় গোকুল চোরে।
> বাজলো বাঁশী, গলায় ফাঁসি,
> ঘরে আসি কেমন কোরে।’

এইরূপ ললিত পদাবলীতে শ্রুতিরঞ্জন হয়, কিন্তু মানবহৃদয়ের অন্তস্তল কখনও স্পৃষ্ট কিংবা আলোড়িত হয় না। বাঙালী, দুর্ভাগ্যবশত তরলমতি বালিকাদিগের মত, এইরূপ পদাবলীরই ভক্ত এবং এই নিমিত্তই এদেশে ঈশ্বর গুপ্ত ও হরিশ মিত্র প্রভৃতি ললিতপদ ব্যবসায়ীদিগের এত আদর ছিল। আর একশ্রেণীর পাঠক ললিতপদ অপেক্ষা পদবিন্যাসের মুন্সিয়ানা লইয়া ব্যতিব্যস্ত! তাঁহারা “আয়লো অলি, কুসুম তুলি” শুনিবার জন্য অধীর হন না, এবং “বকুল বনেও” “দুকুল উড়াইতে” ভালবাসেন না। তাঁহাদের রুচি “নিপট কপট শঠ লম্পট ঝম্পটে”।

দাশু রায় তাঁহাদিগের কালিদাস, গোবিন্দ অধিকারী, জয়দেব এবং বর্তমান কালের যাত্রাওয়ালাবর্গ তাঁহাদিগের কবি-সম্প্রদায়।

এই দুই শ্রেণীর পাঠক রবীন্দ্রনাথের ‘কবি কাহিনী’তে অণুমাত্র সুখানুভব করিবেন না। কিন্তু যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাংলা ভাষার নূতন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

ইহাতে যথার্থই কবিত্ব আছে। যে কবিতা ঘনান্ধ নভোমণ্ডলে দামিনীর মত রূপের ছটায় নয়নে ধাঁধা দেয় রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে কবিতা দৃষ্ট হইবে না। যে কবিতা প্রগল্‌ভা রসিকার মত আপনার ভারে আপনি দুলিয়া পড়ে, ইহাতে তাহার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু যে কবিতা শিশিরসিক্ত কমলকলির মত কথা না কহিয়াও মনুষ্য হৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন করে—যে কবিতা ফোটে ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরিস্ফুট সৌন্দর্যে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়, এই “কবি কাহিনী”র সর্বত্রই সেইরূপ প্রীতি-ময়ী পবিত্র কবিতা সুরুচীসম্পন্ন পাঠকের চিত্ত বিনোদন করিবে। এ দেশের কত সহস্র কবিই ভালবাসা প্রসঙ্গে কত সহস্র কথা লিখিয়াছেন কিন্তু “কবি কাহিনীতে” অতি অল্প কয়েকটি পংক্তিতে ভালবাসা কিরূপে বর্ণিত ও সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন। বাংলা কবিতার পঙ্কিলকুণ্ডে এইরূপ নির্মল পুষ্প কি প্রীতিপ্রদ! ইহাতে সৌন্দর্য আছে অথচ সে সৌন্দর্যে কোন অংশেও রুচির বিকার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে সৌরভ আছে, অথচ সে সৌরভে কোন অংশেও মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা নাই। ভাষা ইহার কোথাও শোভা বর্ধনের জন্য কৃত্রিম কারুকার্যে বিভূষিত হয় নাই...এইরূপ নির্মল কবিতায় অনুরাগ জন্মিলে বঙ্গীয় কাব্য-শাস্ত্রের অধোগতি না হইয়া উপকার হইবে, এবং যাহারা কবিতার ইদানীং বীতস্পৃহ, তাঁহাদিগের শুষ্কমনেও কাব্যে পুনরায়

** কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্বন্ধে একটি অতুলনীয় স্মৃতিচিত্র এঁকেছেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তার “ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্যে”

“সেইদিন বোধ হয় ১৮৮১ সন হইবে, আমি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে প্রথম দেখিলাম। ...তখন শীতকাল, মোটা পাড়শূন্য একটা বেগুনে রঙের বনাত তাঁহার গায়ে ছিল। তিনি যখন বক্তৃতা মঞ্চের টেবিলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন দেখিলাম সুদীর্ঘ সুন্দর নাসিকা, উজ্জ্বলগণ্ড, বৃহৎ চক্ষুদ্বয়ে যেন প্রতিভা জ্বলিতেছে, যেমন দীর্ঘ, তেমন স্থূল। বিশাল গোঁফের অন্তরালে দুটি রক্তিম অধর, উদাত্ত করতলটি পদ্মাভ—বর্ণ গৌর। যখন দাঁড়াইলেন তখনই মনে হইল—এ ব্যক্তি শক্তিশালী, তারপরে যখন মৃদুস্বরে দু একটা কথা বলিয়া হঠাৎ ভাষার অপূর্ব উদ্দীপনা অবতারণা করিলেন, তখন সভাগৃহটি একেবারে নীরব ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। ভাষা ওজস্বিনী, বাক্যগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, সমাসবদ্ধ...এ যেন অর্জুন গাণ্ডীবধনু হইতে শরনিক্ষেপ করিতেছেন —সে গাণ্ডীব আর কাহারও ব্যবহার্য নহে। কুড়ি মিনিটকাল শ্রোতারা যেন এক মহাকাব্য শুনিল। সেই কাব্যের শেষ ভাগ করুণ রস মধুর। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমরা সেই বক্তৃতাটি শুনিলাম, বঙ্গভাষার যে কি ভয়ানক শক্তি সেদিন বুঝিলাম। তারপর তো শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কত মনস্বী বাগ্মীর বাংলা বক্তৃতা শুনিয়াছি কিন্তু সেরূপ পাহাড় পর্বত নিক্ষেপকারী দেবাসুরের ক্রীড়ার মত, বিপুল দম্ভময় মেঘগর্জনের মত, শিবের প্রণবধ্বনীর মত —বঙ্গ ভাষার ধ্বনী আর কোথাও শুনি নাই। বঙ্গভাষা যে জগজ্জয়ী হইবে, সেই শিশুকালে একটা অস্পষ্ট আভাসের ন্যায় তখন তাহা আমার মনে হইয়াছিল।...”

* * সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ঘটনার প্রায় ৩৩ বছর পরে জীবনস্মৃতি লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রীতি-মতো একটি অম্লরসাত্মক মন্তব্য করেছেন এই প্রসঙ্গে। মন্তব্যটির সঙ্গে তাঁর গভীর অভিমান জড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য জীবন-স্মৃতি প্রকাশের সময় এই মন্তব্যটি তিনি স্বহস্তে বাদ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র সংগ্রহ-শালায় রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে মন্তব্যটি পাওয়া গেছে।

“বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার ‘বান্ধব’ পত্রে এই কাব্য (কবি কাহিনী) সমালোচন উপলক্ষে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। ইহার পর ভূদেববাবু এডু-কেশন গেজেট (১২৯০ বঙ্গাব্দ, ২রা আষাঢ়) আমার ‘প্রভাত সঙ্গীতের’ সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই বোধ করি আমার শেষ লাভ। প্রথম হইতে সাধারণের নিকট হইতে বাহবা পাইয়া আমি যে রচনাকার্যে অগ্রসর হইয়াছি একথা আমি কোনমতে স্বীকার করিতে পারিব না। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ প্রকাশের পর হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে আমি উৎসাহদাতা বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম। ইঁহার সহিত নিরন্তর সাহিত্যালোচনায় আমি যথার্থ বললাভ করিয়াছিলাম——ইঁহারই কার্পণ্যহীন উৎসাহ আমার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু আমার রচনার আরম্ভকালে সমালোচক-সম্প্রদায় বা পাঠক সাধারণের নিকট এ সম্বন্ধে আমি অধিক ঋণী নহি।”

প্রীতির সন্ধান হইতে থাকিবে।*

কিশোর রবীন্দ্রনাথকে সেই যে কালীপ্রসন্ন হৃদয়ের সবটুকু প্রীতি অর্ঘ দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁর সমগ্র জীবনে আর তার পরিবর্তন ঘটেনি। দিনে দিনে রবীন্দ্র প্রতিভা উজ্জ্বলতর হয়েছে আর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের আনন্দ হয়েছে গাঢ়তর। তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু আনন্দবিহ্বল মন্তব্য পরবর্তীকালের 'বান্ধবের' পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। মৃত্যুর আগের বৎসর (১৯০৯) ঢাকার এক বিরাট সাহিত্য রসিক সমাবেশে তাঁর রবীন্দ্র প্রতিভার উদ্দেশ্যে সেই অসামান্য ভাষণ ("অন্তরের অন্তরতম তুমি হে") হয়ত এখনও কারো কারো স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

তরুণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে ধূমকেতুর মত আরেক কালীপ্রসন্নর উদয় হল। ইনি হিতবাদীর সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭)। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর আশুতোষ চৌধুরীর সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের "কড়ি ও কোমল" কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।**

"কড়ি ও কোমল" প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়েস পঁচিশ। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সুখ্যাতি (এবং অখ্যাতি!!) অর্জন করেছেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের অনেকেই তাঁকে চেনে। তাঁর কাব্য প্রতিভায় এবং তারুণ্যের প্রখর দীপ্তিতে তিনি বহুজনের কাছে হিরো হিসেবে পরিগণিত!! তাঁর একটি সুসংগঠিত ভক্তদল গড়ে উঠেছে। অনেকের কাছে তিনি বাংলার শেলী ও পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে "বাংলাদেশের বুলবুল।"

এই সময়কার তরুণ রবীন্দ্রনাথের ভুবন-ভোলান রূপের ও স্বচ্ছন্দ কবি প্রতিভার এক সুন্দর বর্ণনা দিয়ে গেছেন তৎকালীন কবি দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮) আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে লেখা এক চিঠিতে। দীনেশচরণ সে যুগের একজন নামকরা সাংবাদিকও বটে। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত —স্টেটসম্যান পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

"ঠাকুর বাড়ির প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া দোতলার সিঁড়ির মুখেই রবি-ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নয়নমুগ্ধ, মন আনন্দ সাগরে ডুবিল! কোন ইংরাজী পুস্তকে অমর কবি মিল্টনের দেবমূর্তি দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলে সেই মূর্তিতে রবিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে। দেহ-ছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণবিশুদ্ধ গৌর, মুখ, দীর্ঘ নাসা, চক্ষু, ভ্রূ, সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশ তরঙ্গ (curls) স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।**

তাঁহার স্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট, নম্রতাজড়িত। রবিঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি নাই। তাঁহাকে গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন—"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।" "

রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার জন্য তো বটেই, সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্য পথে তাঁর সচ্ছন্দ গতিভঙ্গি অনেকের মনেই ক্রোধ ও ঈর্ষার মশাল জেলে দিয়েছিল। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এক অদ্ভুত উপায়ে এঁদের আনন্দের সপ্তমস্বর্গে তুলে দিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল "রাহু" ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কড়ি ও কোমল-এর একটি প্যারোডি কবিতার সংকলন "মিঠে কড়া" নাম দিয়ে বাজারে ছাড়লেন। এটাই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম প্যারোডি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তো নেই-ই—এমনকি গ্রন্থাকারে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্যারোডি সংকলনও পরবর্তী কালে কখনও দেখা গেছে কিনা সন্দেহ।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কলমটি ছিল খুবই শক্তিশালী, বিশেষত বিশিষ্ট মানুষের কুৎসা রচনায় তিনি ছিলেন, যাকে বলে সিদ্ধহস্ত। পরবর্তীকালে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অযথা কুৎসা প্রচার করতে গিয়ে "রুচি বিকার" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে মানহানির দায়ে পড়েন এবং নয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অত্যন্ত সঠিক-ভাবেই "কড়ি ও কোমল"-এর প্রথম সংস্করণের দুর্বল কবিতাগুলিরই ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন, প্যারোডিগুলির ঢংও ছিল যেমন মজাদার, লক্ষ্য-ও ছিল অব্যর্থ। রবীন্দ্র ভক্তরা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও রবীন্দ্রনাথ উচ্চবাচ্য করেননি এবং কড়ি ও কোমলের পরবর্তী সংস্করণেই "দুর্বল" কবিতাগুলিকে নির্মম হাতে ছেঁটে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।

একথাও অবশ্য স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সভ্যতা ও শালীনতায় সীমানার বাইরে চলে গিয়েছিলেন বেশ কয়েক বার, তরুণ রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় ভদ্রতায় সে সম্বন্ধে নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে-ছিলেন।

"মিঠে কড়া"-র সে যুগে চাহিদা হয়েছিল জোর! রবীন্দ্রবিদ্বেষীরা তারিয়ে তারিয়ে এর রস চেখেছিলেন! "কড়ি ও কোমল"-এর প্রথম সংস্করণের কয়েকটি মূল কবিতার অংশ ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কৃত তার প্যারোডির কয়েকটি নমুনা এ যুগের পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করা হল। মিঠে কড়ার সূত্রপাত হল এইভাবে,

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ
বঙ্গের আদর্শ কবি।
শিখেছি তাঁহারি দেখে

---

* প্রসঙ্গত বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ঐ সমালোচনার আড়াই বছর পরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক "রুদ্রচণ্ড" (প্রথম প্রকাশ ২৫ জুন ১৮৮১) সমালোচনা করেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বান্ধবের ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায়—"বাবু রবীন্দ্রনাথ এ দেশের এক-জন উদীয়মান কবি। বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গ ছাইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। আমাদিগের বোধ হয় বাংলায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাশালিনী, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না।..."

** ...'আমি তখন কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই সকল লেখায় তিনি [আশুতোষ চৌধুরী] ফরাসি কোন কোন কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই "কড়ি ও কোমলের" কবিতার ভিতর দিয়া নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে।

আশু বলিলেন, "তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব।" তাঁহারই পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"—এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম কথাটি আছে।' [জীবন স্মৃতি]

** এই সময়ে (১৮৮৬) তরুণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) এই টিপ্পনীটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—"আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, রবীন্দ্রনাথ......রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা। সেই অমল, কোমল, কমলশোভা সমন্বিত মুখশ্রী—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসাভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত-পদ্মপলাশলোচন—সেই ঝামর-চামর নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব বেণী বিনায়িত চিকুর ঝলমল মুখমণ্ডল—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি খুশী ভরা অধর প্রান্ত —সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর শুভ্র, পরিষ্কার দর্শনোপমললাট—ভগবানের এই-রূপ অতুল সৃষ্টি কখনও বৃথা হইবার নহে...।"

তোরা কেউ কবি হবি?

* * *

সে যে রবি—আমি রাহু,
তুল্য মূল্যে সবাকার
ধনী সে—দরিদ্র আমি
সে আলো—এ অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,
ধার করা নাম নেবো আমি
হবে না তো সিটি
জানই আমার সকল কাজে
originality,

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ লিখলেন,
মৌলিকতা পথের ধারে
গড়াগড়ি যায়।
ও তার অনুবাদের বিষম ঠেলায়
ব্রহ্মা লজ্জা পায়॥
চুনোগলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে।
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে
রবি ঠাকুর লেখে॥

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,
চোখের আড়াল, প্রাণের আড়াল
কেমনতর ঢং এ গো
তোমার প্রাণ যে পাষাণ সম
জানি সেটা Long ago

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের জবাব,
কেমন ভাষা, বিদ্যা খাসা
দেখ কেমন সং এগো
রোগা হাড় তাই বেঁচে গেল
প্রমাদ অঙ্গ বঙ্গ পড়ে গো।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন
বৃষ্টি পড়ে চিঠি না পাই
মনটা নিয়ে ততই হাঁপাই
শূন্য চেয়ে ততই ভাবি
সকলি ভোজবাজি এ
কিলজ্জাপ মনের মাঝে
ততই উঠে গাঁজিয়ে।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের জবাব,
ষেটের বাছা ষষ্ঠির দাস
সুখে থাক বার মাস
সইতে না হয় তোমায় যেন
"ফিলজফির গাঁজানি।"
কার হাঁড়িতে ফেন খেয়েছ
গাঁজা গোঁজা সব সয়েছ,
বড় বিদ্যা ছরকুটেছ
গন্ধে বেরোয় পরাণ।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,
তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি একরকম।
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছে কেবল বক বকম।
আজকে নাকি মন করেছে
ঠেকছে কেবল ফাঁকা ফাঁকা।
তাই শান্তিকটে ফোঁস ফোঁসিয়ে
বিদায় হল রবি কাকা।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের জবাব,
উড়িস্ নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোর বকবকম্ আর ফোঁসফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা॥
তাও ছাপালি, গ্রন্থ হ'ল,
নগদ মূল্য এক টাকা!!!

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,
জলে বাসা বেঁধেছিলেম
ডেঙায় বড় কিচিমিচি
সবাই গলা জাহির করে
চেঁচায় কেবল মিছেমিছি
জানো তো ভাই আমি হচ্ছি
জলচরের জাত।
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই
ভাসি দিনরাত।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের জবাব,
মাছ সেজেছ বেশ করেছ
"জলচরের জাত।"
আর ভেসো না আর ভেসো না
হবে কুপোকাত॥
কতই সাধ যাচ্ছে কবির
আহা মরে যাই।
পায়রা ছিল, মাছ হয়েছে
মারছে উড়ে ঘাই!
কবি তুমি মানুষ বটে
হলে পায়রা, মাছ
গেলে—স্থলে, শূন্যে জলে
বাকি কেন গাছ?
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে তরুণ রবির একটি অসামান্য ঔদার্যের কথা উল্লেখ না করলেই নয়! তথ্যটি এমনই বিস্ময়কর যে চমকে উঠতে হয়। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বৈষ্ণব কবিতা ও পদাবলীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন। যৌবনে এই আকর্ষণ যে, প্রবলতর ছিল একথা সহজেই অনুমেয়।

"কড়ি ও কোমল"-এর প্রকাশের কয়েক দিন আগে "সাবিত্রী" পত্রিকায় আশ্বিন মাসে (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) একটি পুস্তকের বিজ্ঞাপন বার হয়।

বিদ্যাপতির পদাবলী — শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত ও গোবিন্দলাল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

"প্রায় দশ বৎসরকাল রবীন্দ্রবাবু, বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী যথাসম্ভব নির্দোষ ও নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ফল কথা, সেই প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে—এবং যাবতীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাব বুঝিতে হইলে, রবীন্দ্রনাথবাবু কর্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত। ...১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ তারিখের (১২৯৩) মধ্যে প্রকাশিত হইবে। পিপলস লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।"

বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও এই পুস্তকটি কিন্তু কোনদিনই প্রকাশিত হয়নি। কারণটি হচ্ছে এই, সংকলন গ্রন্থটি প্রেসে পাঠাবার কয়েকদিন আগে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির। তিনি জানালেন, **THE POETS OF BENGAL** নামে ইংরাজিতে একটি কবিতা সংকলন ও বাংলায় বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনের তাঁর একান্ত ইচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করুন, এটাই একান্ত অনুরোধ।

রবীন্দ্রনাথ এক কথায় বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনা করা বাঁধানো খাতাখানি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—"আপনিই এটা ব্যবহার করুন, আপনাকেই দিয়ে দিলাম।"

ভাবতে কি অবাকই না লাগে, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ দুই উপকারের কথা ভুলতে দশ মাসের বেশি সময় নেননি। ঐ ঘটনার দশ মাস পরে রাহু ছদ্মনামে "মিঠেকড়া"য় রবীন্দ্রনাথকে তীব্র বিদ্রূপ করতে তাঁর একটুকু লজ্জা করল না? লজ্জার মাথা তিনি খেয়ে বসেছিলেন নাকি?

এ যুগের পাঠককে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন The Poets of Bengal কোনদিনই প্রকাশিত হয়নি। বিদ্যাপতির পদাবলী কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদন করে প্রকাশিত করেছিলেন বটে—কিন্তু সে বহু বছর পরে, ৩০ অক্টোবর ১৮৯৪ (বঙ্গাব্দ ১৩০১)। প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ঋণ স্বীকার করার প্রয়োজন মনে করেননি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১ আশ্বিন, ১৩০৫) অবশ্য কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ স্বীকার করলেন, "শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন।"

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের চরিত্রের এতগুলি গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যৌথ মূলধনে "হিতবাদী" পত্রিকার সূচনা, আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক, ২৫০০০ টাকা ছিল এর মূলধন। ২৫০ টাকা ছিল এক একটি শেয়ারের দাম, একশোখানি শেয়ার বিক্রি করে ঐ মূলধন সংগৃহীত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই শেয়ার কিনেছিলেন।

কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই হিতবাদীর অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে পড়ে যে উঠে যাবার মত হয়। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক।

অতঃপর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এসে "হিতবাদী"-র হাল ধরলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মে থেকে তাঁর সম্পাদনায় হিতবাদী প্রকাশিত হতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটির প্রচার এতই বেড়ে গেল যে কল্পনাই করা যায় না। উৎসাহিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সাপ্তাহিক হিতবাদীর সঙ্গে সঙ্গে "দৈনিক হিতবাদীর" প্রকাশ আরম্ভ করলেন।

উঃ, তার তো আরও জোর কাটতি। কিছুদিনের মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল—বাংলা সংবাদপত্র মানেই হিতবাদী। এবার কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ হিন্দীতে এক সাপ্তাহিক বার করলেন—নাম দিলেন "হিতবার্তা"।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সাংবাদিকতার কলমটি ছিল যেমন শক্তিশালী, হৃদয়টি তেমনি পূর্ণ ছিল স্বদেশপ্রেমে। রাজনীতিতে উৎসাহী ছিলেন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। গলাটি ছিল একেবারেই বেসুরো, ভাঙা-ভাঙা। কিন্তু অনেকগুলি আশ্চর্য সুন্দর স্বদেশ প্রেমের গান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রচনা ও সুরসংযোগ করে দেশবাসীকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গানের কিছুটা অংশ উল্লেখ করা হল।

বাউলের সুর

মাগো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
"বন্দেমাতরম্‌" বলে

লাল টুপি কি কালো কোর্তা
জুজুর ভয় কি আর চলে?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
পাগল বলে দিক্‌ জেলে
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।
আমায়—বেত মেরে কি মা ভোলাবে?
আমি কি মা'র সেই ছেলে?
দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে॥
আমি, ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সইলে।
ওদের বেত্রাঘাতে, কারাগারে
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে।

এই গুণাবলীর জন্যই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলেন, এরকম অনুমান করা নিশ্চয়ই অসংগত হবে না।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের শেষ জীবনটি বড়ই দুঃখের। "হিতবাদী"-র সম্পাদনার গুরুতর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। এই সময় জাপান যাত্রার সুযোগ তাঁর ঘটে।" তাঁর একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল জাপান ভারতের স্বাধীনতায় উৎসাহী। জাপানে পৌঁছে, সেখানকার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মন নিদারুণ ভেঙে পড়ল। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন জাপানীরা আরও বেশী সাম্রাজ্যবাদী। প্রচুর উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরতি জাহাজে ভারতের দিকে রওনা হলেন তিনি। কিন্তু পথেই বুঝলেন ফেরা আর তাঁর হয়ে উঠবে না। সমস্ত কথা জানিয়ে তিনি তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখলেন। ভাগ্যক্রমে সে চিঠি কলকাতায় পৌঁছেছিল। সেই চিঠির একটি লাইন সে যুগের প্রায় সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—"জাপান ভারতের বন্ধু নহে।"

সমুদ্রের বুকেই ৪ঠা জুলাই, ১৯০৭ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগের দিন জাহাজে তিনি যে কবিতাটি লিখেছিলেন সেটি পড়লে এখনও চোখের জল সামলানো মুশকিল।

"তোমার মহিমা গাব, ওমা বঙ্গভূমি!
লাঞ্ছিত তোমার নাম,
দেখে তবু চলিলাম,
এ দীর্ঘ জীবন বৃথা দেখিলে তো তুমি!
এ দুঃখ রহিল মনে,
তোমার সন্তানগণে,
না দেখিয়া সমাদৃত,—শমন সদনে
যেতে হ'ল,—মন সাধ রহিল মা মনে"

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে মার্জনা করে ঠিকই করেছিলেন!!!

পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে ও বেপরোয়া নকল করার ঝোঁক (গণ-টোকাটুকি) প্রবল হয়ে ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) সবিস্তারে তা বিবৃত করেছেন ('দেশ' ১১ই মার্চ ১৯৭২)। পরীক্ষায় গণ টোকাটুকির কারণগুলোও যেমন তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি প্রতিকার-পন্থারও কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্রীসেন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক যে-সব কারণ দর্শিয়েছেন খুব কম পাঠকই তার সঙ্গে ভিন্নমত হবেন। প্রতিকার প্রসঙ্গেও তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য অভিজ্ঞতা ও বাস্তবচিন্তা প্রসূত, সুতরাং যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাঁর কয়েকটি অভিমত শুধু যুক্তির সীমাই ছাড়িয়ে যায়নি একজন শ্রদ্ধেয় ও বহুদর্শী শিক্ষকের সহজাত সহানুভূতি থেকেও এই অভিমতগুলো বঞ্চিত। এমনকি তাঁর কোন কোন অভিমত অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে আমার মনে হয়েছে—যে নিষ্ঠুরতা কোন অবস্থাতেই কোন আচার্য ছাত্রের প্রতি দেখাতে পারেন না। আগাগোড়া তাঁর আলোচনাতে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসকের দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য পেয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের নয়। পরীক্ষা-পরিস্থিতি বিশ্লেষণে শ্রীসেন যে-সব কারণ তুলে ধরেছেন তা হল :

* বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো হয় কলেজে-কলেজে; আগে এইসব পরীক্ষায় নকল হলে অধ্যক্ষ অধ্যাপকগণ সাহস করে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের ধরতেন, কিন্তু এখন প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে বোমা-বন্দুকবাজী ধরেছে এবং তাদের ভয়ে সব দেখেশুনেও পর্যবেক্ষকগণ চুপ করে যান; প্রহরারত অনেক অধ্যাপক পরীক্ষা হলের ভেতরে পর্যন্ত যান না। 'প্রাণের ভয়ে তাঁরা তাঁদের গুরুদায়িত্বের কথা ভুলে গেছেন'·

* অগত্যা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত অনুসন্ধানী টীম বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্র সরেজমিনে তদন্ত করে যেমন যেমন লিখিত রিপোর্ট দেন, তেমন তেমন ব্যবস্থা (পরীক্ষা বাতিল করা না-করা) গ্রহণ করা হয়ে থাকে। টীমে থাকেন "দায়িত্বশীল অধ্যাপক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী.—সুতরাং তাঁদের রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য কেন হবে না;

* অভিভাবকগণ পরীক্ষা কীভাবে হয় না হয় তার খোঁজ রাখেন না আর নকল হলেও অধ্যক্ষ অধ্যাপকগণ পর্যন্ত তার বিপরীত রিপোর্ট দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও যদি এঁদের মত চোখ বুজে থাকেন, তাতেও নিরপরাধ ছাত্রদের উপকার ও সুনাম বেশী হতনা।
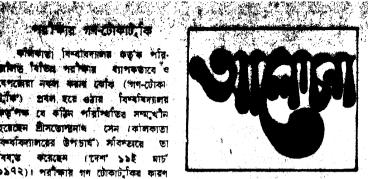
শ্রী সেন ঠিকই বলেছেন 'সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হচ্ছে নিরপরাধ ছাত্রদের নিয়ে।' কিন্তু এটাই কি স্বাভাবিক নয়? তিনি শাস্ত্রের একটি বচন নিরপরাধ ছাত্রদের শাস্তিদানের সমর্থনে উদ্ধৃত করে জিজ্ঞাসা করেছেন 'কয়েকজনের সামান্য ক্ষতি করে যদি বহুজনের হিত করা যায়, তবে কি নীতির দিক দিয়ে অন্যায় হবে?' শ্রী সেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাসক, বহু অপরাধীকে ছেড়ে দিতে হলেও একজন নিরপরাধকে রক্ষা করার যে যুক্তিসম্মত ও মানবিক নীতি এই বিংশ শতাব্দীর বিচার-নীতির কেন্দ্রবিন্দু, তাকে উপেক্ষা করে শ্রীসেন একটি কালজীর্ণ উক্তি নিরীহ পরীক্ষার্থীদের দণ্ডিত করার সপক্ষে তুলে ধরেছেন—এ যেমন বিচিত্র তেমনি বিপজ্জনক। উগ্রপন্থী বন্দুকবাদী তথাকথিত বিপ্লবীরাও কিন্তু ঠিক একই যুক্তি দেখিয়ে থাকে,—তারাও বহুজনকে বিপ্লবের মুক্ত প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার জন্য জনাকয়েককে বুলেটের সাহায্যে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিতে চায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছর যে রক্তক্ষয়ী উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে তাতেও 'গুটিকয়' নিরপরাধ প্রাণই শেষ হয়েছে! সশস্ত্র বিপ্লবীদের তবু যা একটা যুক্তি আছে যে তারা হামলা করে শোষক ও 'কুশাসক' শ্রেণীর লোকের ওপর। কিন্তু শ্রীসেনের দণ্ড-নীতির যারা শিকার শ্রীসেন নিজেই বলেছেন তারা নিরপরাধ, তারা নকলবাজ নয়; অর্থাৎ তাদের একমাত্র অপরাধ তারা সংখ্যায় অত্যন্ত কম।

কিন্তু অন্য ছাত্ররা অর্থাৎ কোন পরীক্ষা হলে অধিকাংশ ছাত্র (শ্রীসেনের মতে) যদি অসাধু হয় বা অসাধুতার প্রবণতা দেখায়, তার জন্য দায়ী কি নিরপরাধ ছাত্ররা? যে যে-অপরাধের জন্য একেবারেই দায়ী নয়, সেই অপরাধের জন্য তার মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দেয়া—আধুনিক সমাজে এমনতর বধ্যনীতি কল্পনাতীত।

উক্তরূপ 'অসাধু' পরিস্থিতির দায়িত্ব [illegible] অধ্যক্ষ-অধ্যাপকদের, এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, এবং আর কেউ কিংবা কিছুর (যেমন গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ), কিন্তু যারা সাধুভাবে, অভিভাবকদের অনেক কষ্টের মূল্যে এবং নিজেদের অনেক কষ্টের বিনিময়ে অধ্যয়ন করে সহজ সরল বুদ্ধি নিয়ে পরীক্ষা দানে প্রবৃত্ত হয়েছে, পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের কিছুমাত্র নয়। দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চালাও হুকুমমতো নিরপরাধ অপরাধীকে একফাট্টা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল,—আর বাকী দুই পক্ষ অর্থাৎ কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যাপকগণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহাল-তবিয়তেই রয়ে গেলেন। বিচারনীতিতে শ্রদ্ধাবান বিন্দুমাত্র সহানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষানুরাগীর পক্ষেও এ ধরনের কাজীর বিচার হজম করা অসম্ভব।

অবিচার শুধু এ-পর্যন্তই নয়—আরো বহু কেন্দ্রে (শহরে ও মফঃস্বলে) নকল হয়ে থাকতে পারে বা হয়েছে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কোন পর্যবেক্ষক টীম পাঠাতে পারেনি (শ্রীসেন নিজেই তা স্বীকার করেছেন); সেখানকার তাবৎ 'অসাধু' পরীক্ষার্থী কিন্তু বেমালুম পার পেয়ে গেল—জুলুম করা হল 'সাধু' ছাত্রদের ওপর, জেনে শুনে। আমি অত্যন্ত ভেবেচিন্তে শান্তভাবেই বলছি, কোন একটি ছাত্রকেও নিরপরাধ জেনেও অপরাধী ছাত্রদের দায়ের বোঝা যদি তার ওপর চাপানো হয়, সে-ব্যবস্থাকে জুলুমবাজী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। জুলুমবাজী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানত শ্রীসেনকে এবং তিনি ছাড়াও আরও অনেক শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাব্রতীকে বছরের পর বছর হয়রাণ করেছে, কলঙ্কিত করেছে গুরু-শিষ্যের যুগ-যুগান্তগত গৌরবময় সম্বন্ধকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও যদি 'সহজ উপায়' হিসেবে সেই জুলুমবাজীই চালাতে চান নিরপরাধ পরীক্ষার্থীদের ওপরেও, তার পরিণাম কী করে ভাল হতে পারে আমি জানি না। 'অসাধু' ছাত্ররা তাঁদের এই দণ্ডনীতির পরোয়া করবে না, মাঝ থেকে সাধু ছাত্রদের একাংশ (ও তাদের অভিভাবকগণ) ক্ষোভে ভেঙে পড়বেন, অপরাংশ 'অসাধুদের দলে ভীড়ে এই অন্যায়ের প্রতিকারে আরও অন্যায় পথ খুঁজবেন। তার পরও কোন পরীক্ষা হবে বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় টিকে থাকবে আশা করা কঠিন।

'সেমেস্টার' (তিন চার মাস পর পর পরীক্ষা) ব্যবস্থা, প্রশ্নপত্রের অভিনবত্ব (যার উত্তর প্রচলিত নোটবইতে পাওয়া যাবে না) প্রভৃতি বিকল্প ব্যবস্থার কথা শ্রীসেন

[illegible] তুলেছেন, [illegible] ও অসাধু ছাত্ররা গায়ের জোরে [illegible] করে নেবে এই [illegible] করেছেন। তিনি আমাদের আরও জানিয়েছেন, শিক্ষকরা জানিয়েছেন ছাত্ররা যদি শিক্ষকদের অপমান ও লাঞ্ছনার পথ পরিত্যাগ না করে তাহলে শিক্ষকদের কর্তব্যচ্যুতির কথাই ওঠে না, অর্থাৎ শিক্ষকরা কোনমতেই দণ্ডনীয় হতে পারে না। শিক্ষায়তনে কিছু কিছু ছাত্রই মারমুখী হয়; কেন, তাদের ছাত্র এভাবে মলিন হয়, কেনই বা বাকী সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্ররা এ ধরনের হিংসাত্মক বিকৃতির মোকাবেলা করবার সাহস পায় না, শিক্ষকরাই বা কেন নিষ্ক্রিয় থাকেন— এই সব অপ্রিয় প্রশ্নের কোনটিরই কোন উত্তর দিতে শিক্ষকগণ দায়ী নন, তবু তাঁরা শিক্ষক, এটা কিছুটা আশ্চর্য নয় কি? অন্যায় না-করতেও তাঁরা শেখাতে পারবেন না, অন্যায়ের প্রতিকারে দাঁড়াবার সাহসও ছাত্রদের দিতে পারবেন না, নিজেরা তো তেমন পরিস্থিতির সরাসরি মোকাবিলা করবেনই না,— অথচ তাঁদের এই সব 'অকর্তব্যের' (কর্তব্য-চ্যুতি না-ই বললাম) ফলে শেষ পর্যন্ত শত শত নিরীহ ছাত্রের ভবিষ্যৎ বিপর্যস্ত হবে?

শ্রী সেন ঠিকই বলেছেন শিক্ষকদের সম্মিলিত সহযোগিতা ব্যতীত নকল বন্ধ করা যাবে কিনা সন্দেহ।' কিন্তু, সে-সহযোগিতা কটা বিদ্যালয়ের কজন শিক্ষক করতে প্রস্তুত? বেশীর ভাগ শিক্ষকই সব রকম সুবিধা নিতে আগ্রহী, কোনরকম অসুবিধার শরিক হতে প্রস্তুত নন। অধিকন্তু, রাজনীতি-বিশারদ কিছু শিক্ষক ছাত্রদের উগ্র বানিয়ে তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে 'শত্রু' শিকার করেন, এ কথাই বা কে না জানে?

এখানেও সেই প্রশ্ন : সুবিধাবাদীরা পার পাবে, আর অধ্যয়ননিষ্ঠ দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ঘরের নিরীহ ছেলেরা মার খাবে?

শ্রীসেন অবশ্যই ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে বলেছেন, 'এখানকার পাইকারী পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়াই ভালো: কলেজ থেকেই সার্টিফিকেট দেওয়া হউক আর চাকুরীর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রার্থীর যোগ্যতা যথাযথ বিচার করে নিন। এ ধরণের প্রস্তাবও নিশ্চয়ই বিবেচনার যোগ্য, —যদিও সেমেস্টার জাতীয় ব্যবস্থা অধিক সঙ্গত বলে আমার মনে হয়, বিদেশেও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখেছি। এবং আমাদের দেশে চিরদিন বন্দুকবাজী বা চোখ রাঙানি থাকবে এবং তার দরুন এই বিষয় ভাবাই হবে না এ রকম চিন্তাও ঠিক নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যবহারধর্মী ও নীতিভিত্তিক আদ্যোপান্ত সংস্কার হলে জবরদস্তি বা অশ্রদ্ধার ভাবও গোড়া থেকেই জব্দ হয়ে যাবে।

কিন্তু শ্রীসেনের মারাত্মক শাস্ত্র-নীতির পরিবর্তে বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতেও বিকল্প শিক্ষার সুযোগ ছিল। যেমন :

গণ-টোকাটুকি হচ্ছে এরকম চটের পাওয়ার (যেমন এম এ পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে অভিযোগ করা ও শাস্তি দেয়া হয়েছে) সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ারী দেয়া, যে, এর পরও কোন হলে নকল হলে সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করে দেয়া হবে। এই হুঁশিয়ারী পেলে অন্তত সাধু ছাত্ররা সাবধান হতে পারত এবং দরকার মত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের পথ স্থির করতে পরত; এম-এ ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা তো তাদের অধ্যাপকরাই দেখছেন, পুনরায় তাঁদের দিয়ে খাতা দেখানোর পথে অন্তরায় কী দাঁড়াল, জানি না। আমি তো শ্রীসেনের মুখেই শুনেছিলাম বিভাগীয় অধ্যাপকদের সে-অনুরোধই করা হয়েছিল। সূত্রান্তরে সংবাদ পেয়েছিলাম, অধ্যাপকগণ তাতে রাজী হননি, কারণ তাঁরা বলেছিলেন তাঁদেরই দেখা খাতা তাঁরা আবার নতুন করে কী দেখবেন? এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য পরিষ্কার : তাঁদের বলতে হবে তাদের বিভাগীয় অধ্যাপকদের কথার ওপর তাঁরা নির্ভর করেন না; এবং তা যদি না করেন তাহলে ভুক্তভোগী ছাত্রদের স্বার্থে খাতা নতুন করে দেখানোর অন্য ব্যবস্থা করতে হয়। তাতে যদি বিভাগীয় সহকর্মীদের ওপর অনাস্থা প্রকাশ পায়, তার জের সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকগণই তাঁদের বিবেচনামত টানবেন।

অর্থাৎ কোনমতেই সাধু ছাত্রদের—সেই-সব ছাত্রের যারা অধ্যয়নশীল ও নিশ্চিত-রূপে উত্তীর্ণ হবেন বলে বিশ্বাসী—তাঁদের ও তাঁদের অভিভাবকদের এ ধরনের উদ্বেগ ও ক্ষতির মুখে ফেলা সমীচীন নয়। আগামীতে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে গেলেও এবার পরীক্ষিত খাতার বিচারেই ফলাফল প্রকাশ করা উচিত—এবং দরকার হলে বছর দুই বর্তমান পদ্ধতির পাইকারী পরীক্ষা বন্ধ রেখে সমস্ত জিনিসটা পুরো-পুরি ভেবে প্রবর্তন করার অবকাশ নেয়া উচিত।

মনকুমার সেন
বেলঘরিয়া, কলি-৫৬।

॥ ২ ॥

গত ১১ই মার্চ 'দেশ' পত্রিকায় 'পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি' শিরোনামে যে প্রবন্ধ পড়লাম, তার লেখক আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, অন্তত গোটা প্রবন্ধ জুড়ে সমসাময়িক কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতির সপক্ষে সাফাই গাইবার যে সুর ফুটে উঠেছে, তা থেকে সেই ধারণাই হয়।

শ্রীযুক্ত সেন [illegible] নীতি [illegible] করিয়ে দিয়েছেন। [illegible] মনে করিয়ে দিয়েছেন—[illegible] এবং মূল চলে চলছে সেই। [illegible] সংস্কৃতির দেয়া নিয়মটুকু [illegible] এমনভাবে ছেঁকে তুলেছেন যে, পাঠক-মাত্রেরই মুগ্ধ না হবার পথ নেই। শ্রীযুক্ত সেন যাই বলুন—বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা বাতিল করতে পারেন পরীক্ষার্থীকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ Candidatewise, কিন্তু Collegewise কখনও নয়। যে-ক্ষেত্রে ব্যাপক গণ-টোকাটুকি হয়েছে অথচ কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কাউকে ধরতে পারেননি —সেটাকে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা বলেই ধরে নিতে হবে। 'আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি ঢুকেছে, তাই আমরা অসহায়'— এ-হেন কথার (সত্যি কথা হলেও) ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যা খুশি তাই কাণ্ড-কারখানাকে মেনে নেওয়া অসম্ভব। ...ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে লেখক লিখেছেন, 'টিমের সভ্যরা ...যদি নকল দেখলেন, তবে নকলকারী ছাত্রদের ধরলেন না কেন?' —লেখক নিজেই অতঃপর এর উত্তর দিয়েছেন, 'টিমের সভ্যরা পরীক্ষার হলে গার্ড দিতে যাননি। তাঁদের সে অধিকার ছিল না। তাঁরা দেখতে গেছেন......ব্যাপক নকল হচ্ছে কিনা।'—কথাটা কি বেসুরো নয়? ঐ টিমকে কতটুকু অধিকার দেওয়া হবে না-হবে, সেটা কি ছাত্রসমাজ নির্ধারিত করে দিয়েছেন? গণ-টোকাটুকি চলা সত্ত্বেও একজনও নকলকারী ছাত্রকে সনাক্ত করবার ক্ষমতা যে-টিমের নেই, সেই টিমকে ব্যাপক ঘুরতে এবং কেন্দ্র বাতিলের ক্ষমতা জাহির করতে পাঠানো হয় কেন? সমস্ত ব্যাপারটাকে যদি 'কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা' আখ্যা দেওয়া হয়, তা হলে কি খুব অন্যায় হবে?—ব্যাপক নকলের কোনো সংজ্ঞা অবশ্য ডঃ সেন দেননি। কিন্তু এর পরেই লিখেছেন : 'কোনো কোনো কেন্দ্র সম্বন্ধে লেখা আছে যে, টিমের সভ্যেরা অতর্কিতভাবে প্রথম ঘরটিতে যাবার পর অন্য ঘরে সে খবর পৌঁছে দেওয়া হয় ও সেখানকার ছাত্রেরা নকলের সঙ্গে বইপত্র এখানে-সেখানে সরিয়ে ফেলে সাধু সেজে বসে থাকে।' —অর্থাৎ কোনো কোনো কেন্দ্রে শুধু প্রথম ঘরেই অসাধু কার্যকলাপ লক্ষ করা গেছে, কিন্তু পরের ঘরগুলোতে আপাতভাবে • সাধু পরীক্ষার্থীরাই ছিলেন। অন্তত ঐ টহলদার 'টিম' তাদের সাধু অবস্থাতেই দেখেছেন। এবং কেন্দ্রটি বাতিল করেছেন। সাধু অবস্থায় দেখতে পাওয়াটা এত দোষের হতে পারে—এটা জানা ছিল না। পরের ঘরগুলো তাঁরা আদৌ দেখলেন কেন? শুধু প্রথম ঘরের অবস্থা দেখেই

কেমন মোটা কোনটির জন্য নির্ধারণ করা সম্ভব?

শ্রী সেনের সমস্ত প্রবন্ধ জুড়েই এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে—যেন রাক্ষস ছাত্র-সমাজের হাতে পড়ে প্রহ্লাদ শিক্ষকসমাজ নিদারুণ অসহায়। শ্রী সেন যেখানে Oral পরীক্ষা নেবার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে তিনি সমস্ত কথাই লিখেছেন শুধু এই কথাটা লেখেননি যে, ঐ ধরনের Oral পরীক্ষাগুলো প্রায়ই পরীক্ষকদের favouritism-এর খেলার মুক্তক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আমি নিজেই এটা দেখেছি। অনার্স পরীক্ষার প্র্যাকটিক্যাল পেপারের কিছু অংশ Oral Test-এর জন্য নির্দিষ্ট থাকে। ঐ মৌখিক পরীক্ষা নিতে এসে পরীক্ষক প্রথমেই নীচু গলায় প্রশ্ন করেছেন: তুমি কি—বাবুর কাছে পড়ো? তোমার নাম কি?—সকলেই জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষায় ছাত্রের নাম জানতে চাওয়া আইনবিরুদ্ধ। তাছাড়া কোনো 'বাবুর' কথাই সেখানে উঠতে পারে না।

বর্তমানে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের একটি বিভাগের ছাত্রদের যে আন্দোলন চলছে (সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি), ডঃ সেন নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অবহিত আছেন। এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (সম্প্রতি পদচ্যুত) এম এস-সি ক্লাসের ছাত্রদের যাকে যখন খুশি পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে হুমকি দিয়ে বেড়াতেন। 'দেখি তোমরা কি করে ফার্স্ট ক্লাস পাও' 'দেখি কি করে রিসার্চ করো'—ইত্যাদি। এ ছাড়া অতীতে কোন কোন ভালো ছাত্রের সর্বনাশ করেছেন, তার বিবরণ দিয়েও ভারী আনন্দ পেতেন। সম্প্রতি ঐ বিভাগের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করলে, উপাচার্য মহাশয় বলেছেন—ঐ অধ্যাপক যে ঐ ধরনের, তা তিনি আগে থেকেই জানতেন। —কিন্তু আন্দোলন করার আগে তা হলে প্রতিকার হয়নি কেন? বিশ্ববিদ্যালয়কে চাপ না দিলে কোনো ভালো কাজ হয় না—এই ধারণা গড়ে উঠতে কর্তৃপক্ষই সাহায্য করছেন। এখনও তাঁরা ঐ অধ্যাপককে অধ্যাপকের উচ্চাসনে বসিয়ে রাখতে দ্বিধা করেননি। ছাত্ররাও তাঁর বর্তমানে পরীক্ষায় বসতে ভয় পাচ্ছেন।

আমি নিজের ছাত্রজীবনে (শ্রীযুক্ত সেনের আমলেই) পরীক্ষায় দুটি স্মরণীয় অন্যায় দেখেছি। প্রথমটা ১৯৬৮ সালের বি এস-সি গণিত পাস পরীক্ষা কেন্দ্র করে। ঐ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ব্যাপকতম হারে পরীক্ষার দু সপ্তাহ আগেই প্রকাশিত হয়ে যায়। আমিও সেটা যথারীতি পেয়েছিলাম। শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে ঐ প্রশ্নপত্রের সাইক্লোস্টাইল কপি বিক্রি হয়েছে তিন টাকা দরে পরীক্ষার দু দিন আগে। পরীক্ষা অন্যায় না থাকলেও আমরা ঐ প্রশ্নের জন্য তৈরী হয়েই গিয়েছিলাম এবং পরীক্ষা-কেন্দ্রে ঠিক ওরই একটি নিখুঁত প্রতিলিপি যখন হাতে তুলে দেওয়া হল তখন বিস্ময় রাখার জায়গা ছিল না। সেবারে প্রশ্নপত্র অন্যান্যবারের তুলনায় অনেক কঠিন হলেও কোনোরকম গণ্ডগোল বা গণ-টোকাটুকি হয়নি। সংবাদপত্রে দেখেছিলাম—উপাচার্য মহাশয় বলেছেন, তিনি তদন্ত করবেন খবরটা সত্যি কিনা দেখবার জন্য। যদি সত্যি হয় তবে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। —আমি কোনোদিন উপাচার্য মহাশয়ের মুখোমুখি হইনি; হলে পরে জানতে চাইতাম ঐ তদন্তের ফল এবং কি ব্যবস্থা নেওয়া হল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

দ্বিতীয় ঘটনাটির সঙ্গে আমি নিজেই জড়িত। মধ্য কলকাতার একটি প্রাচীন কলেজে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সীট পড়েছিল। মোট ছ' ঘণ্টা সময় থাকে। প্রথম চার ঘণ্টা ধরে যন্ত্রটা নাড়াচাড়া করেও যখন নির্দিষ্ট পরীক্ষাকার্য শুরু করা গেল না—তখন বুঝলাম যন্ত্রটার মারাত্মক কোনো গণ্ডগোল আছে। ইনটারন্যাল এবং একসটারন্যাল অধ্যাপকযুগল যেখানে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা-সেবা করছিলেন সেই টেবিলে গিয়ে ধর্না দিতে হল বার বার, কিন্তু একজনও চেয়ার থেকে পা তুলে যন্ত্রটা পরীক্ষা করতে রাজী হলেন না। পাঁচ ঘণ্টার মাথায় ইনটারন্যাল অধ্যাপক হাত লাগালেন এবং বুঝলেন আমি কোনো ভুল করিনি। তখন আমাকে যন্ত্রটা বদলে দেওয়া হল। বাকী আছে আধ ঘণ্টার মতো। আমি আরেক দিন সময় চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। একসটারন্যাল ভদ্রলোকের কাজ কি ছিল আমি জানি না—তিনি চা-কলা-বিস্কুটের নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন সম্ভবত। এ বিষয়ে তিনি মাথাই ঘামালেন না, কোনো কথাই বললেন না—শুধু সরল দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাতে লাগলেন। ইনটারন্যাল অধ্যাপক আমাকে আশ্বাস দিলেন: তোমার graphগুলো আমি এঁকে দেবখন। ভয় নেই। তুমি বাড়ি যাও। ...আমার একজন সহপাঠীরও ঐ একই দশা হল। কন্ট্রোলার মশাইকে চিঠি লিখেছিলাম, নিজের নাম লেখা খাম আর ডাকটিকেট সমেত জবাব কিছু আসেনি। —রেজাল্ট বেরোলে দেখলাম—আমাদের 'সেফ মার্ক' (শতকরা পঞ্চাশ) দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর অন্যান্য কলেজের অনেক ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হল। তাদের মধ্য থেকেও ঠিক আমার মতো কয়েকজনকে পেয়েছি। তাদেরও ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছে একইভাবে, একই অধ্যাপকের হাতে যিনি এখনও বহাল তবিয়তে পরীক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে [illegible] অধিকার কে?

প্রভাস সেনগুপ্ত
কলকাতা-৫৫

॥ ৩ ॥

পরীক্ষায় গণ্ডগোল ডিগ্রী ছোঁড়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সঙ্গে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে এঁদের একটি বিরাট অংশ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার এই অবস্থার জন্য বর্তমান রাজনীতিকে ও বেকারিকে দায়ী করেছেন। অনেকে আবার এই সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্রদের লেখাপড়ার প্রতি মনোভাবকেও দায়ী করেছেন। কিন্তু কেউই এই 'ভিসাস সার্কল' বা পঙ্কিল আবর্ত থেকে বের হবার উপায় বাতলাতে পারেন নি।

প্রথমে আমাদের দেখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের এই হাল কেন হল এবং বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই কোনো-রকম সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব কিনা। এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের প্রবন্ধ (দেশ—১১ই মার্চ, ১৯৭২) স্মর্তব্য।

ডঃ সেনের মতে পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি "শিক্ষকদের সম্মিলিত সহযোগিতা ব্যতীত বন্ধ করা যাবে না"। এবং যতদিন ছাত্ররা ভয় দেখান ও সন্ত্রাসের পথ পরিত্যাগ করবে না ততদিন শিক্ষকদেরও এর জন্য দায়ী করা চলবে না। সুতরাং তাঁর মতে সমস্ত ব্যাপারটাই রাজনৈতিক ও আইনশৃংখলাজনিত। তিনি আরও বলেছেন যে ছাত্ররা এই সন্ত্রাসের পথ ধরেছে, কারণ তারা মনে করে যেন-তেন-প্রকারেণ একটা ডিগ্রী যোগাড় করতে পারলেই চাকুরির বাজারে সুবিধা হবে। প্রবন্ধের শেষে তিনি এই সমস্যার সমাধান হিসেবে এই পরীক্ষা ব্যবস্থাটাই তুলে দিতে বলেছেন।

কিন্তু এই সমাধান কোন সমাধানই নয়। কারণ যেখানে চারটি শূন্য পদের জন্য চার হাজার দরখাস্ত পড়ে এবং সেখানে যদি এক হাজার কর্মপ্রার্থীরও পরীক্ষা নিতে হয় তা হলে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি করার মত অবস্থা হবে।

ডঃ সেন তাঁর প্রবন্ধে একটি ব্যাপার খুব সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। সেটি হল, ছাত্রদের প্রতি কিছু সংখ্যক অযোগ্য শিক্ষকের অবহেলা ও উদাসীনতা এবং শিক্ষকদের নিজেদের দলাদলি ও কোন্দলের হাতিয়ার হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহার করা। যার ফলে লেখাপড়া গৌণ হয়ে যায়। ছাত্রদের সঙ্গে খোলাখুলি-ভাবে কথা বললে এই কথাটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে তারা এইসব শিক্ষকদের ব্যবহারে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ এবং মনো-

ভাবটা ক্রমে গ্রাজুয়েটদের শত্রু-মিত্র পর্যায়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কটা শত্রু-মিত্র সম্পর্কে গিয়ে না দাঁড়ায় সেটা যেমন ছাত্রদের দেখা কর্তব্য, ঠিক তেমনই শিক্ষকদেরও কর্তব্য।

যাই হোক, মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন শ্রেণীর ছাত্র আসে। এক, যারা শুধু ছাত্রনামধারী—লেখাপড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে নেই; দুই, যারা চাকুরির সুবিধার জন্য ডিগ্রীর লোভে আসে এবং তিন, যারা লেখাপড়াই করতে চায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে এত গণ্ডগোলের মূলে কারণ এই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যাধিক্য। এখন এমন একটা ব্যবস্থা হওয়া চাই, যাতে এইসব ছাত্ররা নিরক্ষরও না থাকে অথচ বেশী দূর লেখাপড়াও করতে না হয়। আমাদের দেশের শিক্ষার মূল কাঠামোটারই যদি পরিবর্তন ঘটানো যায়, তবেই এটা সম্ভব হবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও ঘরে ঘরে গ্র্যাজুয়েট বানানোয় আবদ্ধ। অথচ বেশির ভাগ ছাত্র লেখাপড়া করে মূলত চাকুরির দিকে দৃষ্টি রেখে। এই পড়াবার ও পড়বার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই শিক্ষাক্ষেত্র অসন্তোষের মূল কারণ।

যদি দশম অথবা একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করা হয় এবং স্কুলোত্তর শিক্ষা যদি Job-oriented হয়, তবেই এই সমস্যার সমাধান হয়। স্কুলোত্তর শিক্ষা যদি Job oriented করতে হয়, তা হলে একটা তিন-স্তরবিশিষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

প্রথম স্তরে, প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই দশ বা একাদশ বর্ষীয় পাঠক্রম শেষ করতে হবে। দ্বিতীয় স্তরে, স্কুলের পাঠ যারা শেষ করবে, তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলিতে নিয়ে নেওয়া হবে।

বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বলতে আমি বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা (যার বেশির ভাগটাই হবে হাতে-কলমে) দেবে এমন কতকগুলি ট্রেনিং ব্যবস্থাকেই বোঝাতে চাইছি। যেমন উদাহরণস্বরূপ Stenographer-দের জন্য Stenographers' Institute Welder-দের জন্য Welders' Institute ইত্যাদি সবরকম বৃত্তির জন্যই বিশেষ ট্রেনিং ব্যবস্থা থাকবে।

অনেকে বলবেন যে, এইরকম কয়েকটি ট্রেনিং ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। কিন্তু তাতে বিশেষ ছাত্র পাওয়া যায় না; অথবা ছাত্র পাওয়া গেলেও তাদের চাকুরি দেওয়া যায় না।

যদি দেশের সমস্ত নিয়োগকর্তৃপক্ষকেই এই বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অন্যান্যদের আগে নিয়োগ করবার জন্য বাধ্য করা যায়, তবেই সমস্যার সমাধান হবে। এটা সরকার আইন করে করতে পারেন।

এতে দুটো লাভ হবে। প্রথমত, পরীক্ষায় গণ্ডগোল ইত্যাদি এড়িয়ে যাওয়া যাবে, কারণ এখানে পরীক্ষা হাতে-কলমে নেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, Skilled বা Semi-Skilled শ্রমিক পাওয়াতে ট্রেনিং-এর জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, সেটা বেঁচে যাবে।

তৃতীয় স্তরে অল্প কিছুসংখ্যক ভাল ছাত্রছাত্রী যারা থাকবে, তাদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য মনোনীত করা হবে। এদের পড়াবার জন্য আরও ভাল শিক্ষক আনতে হবে। এটা গভীর দুঃখের বিষয় যে, আজকাল অধ্যাপনার মান আগের তুলনায় অনেক নীচু হয়ে গেছে। এবং এই তৃতীয় স্তরের ছাত্ররা পরীক্ষায় যাতে গণ-টোকাটুকি না করতে পারে, তার জন্য গোড়া থেকেই শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কঠোর হতে হবে। তবে অনেক কমসংখ্যক ও ভাল ছাত্রছাত্রী থাকার দরুন এদের পরীক্ষা নেওয়া এখনকার তুলনায় সহজ হবে।

এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের ছাত্রদের কি করে ভাগ করা হবে?

এক, স্কুলের পাঠক্রম শেষ হলে হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মত একটা পরীক্ষা নেওয়া যায়। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে দুই, স্কুলের পাঠক্রম শেষ করবার পর এদের একটা Certificate দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এদের যোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া হবে।

আর একদল থাকবে, যারা স্কুলের পাঠক্রমও শেষ করতে পারবে না। শুধু তাদের জন্যই আলাদা কয়েকটি Course শুরু করা যেতে পারে।

এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলে শ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন হবে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে বা আনতে হবে।

অরূপ দস্তিদার
কলকাতা, ৯

কি আছে এই টিনে ?
NIVEA
creme
FOR THE CARE OF THE SKIN
কি আছে এই টিনে ?
NIVEA
creme
FOR THE CARE OF THE SKIN
কি আছে এই টিনে ?
NIVEA
creme
FOR THE CARE OF THE SKIN
সুন্দর ত্বকের রহস্য!
মহিলামহলে সবাই ত্বকের
পরিচর্য্যার দিকে ঝুঁকেছেন—সেই
সঙ্গে স্বভাবতঃই নিভিয়া ক্রীমের
দিকে। তার কারণ, একমাত্র
নিভিয়াতে আছে সৌন্দর্য-পরিচর্য্যার
অনন্য উপাদান 'ইউসেরাইট' যা
ত্বকের ভেতরে প্রবেশ ক'রে তাকে
সজীব রাখে। হাল্কা ননীর মত
নিভিয়া মেখে দেখুন—আপনার ত্বক
আরও কোমল, তারুণ্যমণ্ডিত,
সুন্দর হ'য়ে উঠবে!
নিভিয়া—সুস্থ, সুন্দর ত্বকের রহস্য!

মৈত্রী মেলা

ময়দানে অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের বিপরীত দিকে সপ্তাহব্যাপী ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী মেলা হয়ে গেল। বাংলাদেশ থেকে শতাধিক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী এই উপলক্ষে এসেছিলেন কলকাতায়, পশ্চিম-বঙ্গের কিছু লেখক শিল্পী তাঁদের সঙ্গে যৌথভাবে নানা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন।

মেলা কথাটির মধ্যে খানিকটা স্বতস্ফূর্ত ভাব আছে। উদ্যোগ-আয়োজন করে মেলায় অংশ গ্রহণ করা সব সময় সার্থক হয় না। কিন্তু যে-হেতু বহুকাল দ্বার বন্ধ ছিল, সেইজন্য এখন কিছুটা উদ্যোগ আয়োজনের নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা আছে—এবং প্রথম প্রথম কিছুটা অব্যবস্থা থাকলেও পরে স্বচ্ছল ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠা সম্ভব।

কলকাতার মানুষ এই সুযোগে উপভোগ করতে পেরেছে বাংলাদেশের শিল্পীদের গান, নাটক, চিত্র প্রদর্শনী, কাব্য পাঠ ও সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা। মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী কাদের সিদ্দিকীর উপস্থিতি মেলার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কবি জসীমউদ্দীন, ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান, সত্যেন সেন; ঢাকার বাংলা আকাডেমির পরিচালক ও নাট্যকার কবীর চৌধুরী। অন্যান্য কবি-লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহিম, মনিরুজ্জমান, লায়লা সামাদ, রফিকুল ইসলাম, বদরুন্নেসা, নির্মলেন্দু গুণ, কায়সুল হক, মহাদেব সাহা, ফজলে খোদা প্রমুখ।

বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে তিন প্রধান শামসুর রাহমান, আল মামুদ এবং শহীদ কাদরী এবার উপস্থিত ছিলেন। এঁদের তিনজনের কবিতা একসঙ্গে শুনতে পাওয়া খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অতিথিদের থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কে কিছু কিছু অভিযোগ শোনা গেছে। প্রথমবারের উদ্যোগে কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করা যায়, অতিথিরা নিজগুণে তা ক্ষমা করেছেন।

পশ্চিম বাংলার সকল শ্রেণীর লেখক-বুদ্ধিজীবীকে এই মেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়নি। দুই বাংলার লেখক-শিল্পীদের পরস্পরের সঙ্গে মেলা-মেশার যথেষ্ট সুযোগ ছিল না। তবে, একথাও ঠিক, এই ধরনের পাবলিক ফাংশানে কোনো না কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর আধিপত্য থাকে, অনুষ্ঠানসূচি প্রণয়নে তাদের অভিমতই প্রতিফলিত হয়। তবু, আশা করবো, এর পর এই জাতীয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করলে দৃষ্টিভঙ্গী আরও উদার হবে।

গঙ্গোত্রীর উদ্যোগে ২১ এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার এক আসরে দু দিকের বাংলার কিছু কবি মিলিত হয়েছিলেন, কবিতা পাঠ ও সঙ্গীতে পরস্পরের চেনাশোনা হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জসীম উদ্দীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রেস ক্লাবে, শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের কবিরা নিজেদের কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন।

কাওয়াবাতা

প্রখ্যাত জাপানী ঔপন্যাসিক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা গত ১৬ই এপ্রিল আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর আত্মহত্যার কোনো কারণ জানা যায় নি। পুলিস তাঁর কোনো শেষ চিঠি'ও পায়নি। কিছুকাল আগেই অপর বিখ্যাত জাপানী লেখক মিসিমার আত্মাহুতির খবর পেয়েছিলাম।

১৯৬৮ সালে কাওয়াবাতা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। জাপানী আর কোনো লেখক এই পুরস্কার পান নি।

কাওয়াবাতার জন্ম ১৮৯৯ সালে ওসাকায়। চার বছর বয়েসে পিতৃমাতৃহীন। শিক্ষাজীবন শুরু হয় টোকিওতে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন এবং অবিলম্বেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পান। তাঁর একটি উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কাওয়াবাতার রচনায় বিষণ্ণতাই প্রধান সুর। তাঁর আত্মহত্যার সংবাদ আচম্বিতে দুঃখজনক কিন্তু খুব বিস্ময়কর নয়। বরং জাপানী লেখকদের মধ্যে এ রকম আত্ম-হত্যার প্রবণতাই বিস্ময়কর। কাওয়াবাতা

এবং মিসিমার ঘটনা অল্পকালের ব্যবধানে ঘটে গেল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আর একজন প্রতিভাবান জাপানী লেখকের কথা, ওসামু দাজাই। তাঁর লেখা দুটি বই, 'নো লংগার হিউম্যান' এবং 'দা সেটিং সান' একদা আমাকে মুগ্ধ করেছিল—কিন্তু, তিনিও তরুণ বয়েসে আত্মহত্যা করেছিলেন। সব মৃত্যুই দুঃখের, তার মধ্যে আত্মহত্যার সংবাদ আমাদের বিচলিত করে।

সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

॥ ১ ॥

বাংলা ভাষাকে আমরা ভারতের সমৃদ্ধতম ভাষা বলে গর্ব করি। অথচ, তার সমৃদ্ধি বড়ই একপেশে। প্রকৃত ঐশ্বর্যশালী ভাষার সমস্ত শাখাগুলিই হবে সমৃদ্ধ। অথচ, ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও রম্য বাদ দিলে বাংলা ভাষায় কতটুকু থাকে?

আইনের শাখায় বাংলা ভাষার যে দীনতা, এরূপ প্রকট দীনতা বোধ হয় আর কোন শাখায় নেই। সাহিত্য সমাজের সহিত সম্পর্কিত। আইনও মানুষের নিত্যসঙ্গী, কিন্তু আইন-সাহিত্য বাংলায় এখনও গড়ে ওঠেনি।

বাংলা সাহিত্যের যদি একটি মনুষ্য মূর্তি কল্পনা করা হয় তাহলে আমার মানস নেত্রে ভেসে ওঠে সুপুষ্ট বক্ষ এক মূর্তি। কিন্তু তার হাত-পা বড়ই শীর্ণ। মস্তক ক্ষুদ্র। অসমঞ্জস এই শরীর নিয়ে তার চলাফেরা করা বড়ই কঠিন। তার এই বেঢপ শরীর কিছু লোকের মনোরঞ্জনের যোগ্য। হৃদয়াবেগ-প্রধান লেখা অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতার বাংলায় ছড়াছড়ি। কিন্তু মানুষের নিত্য চলার সাথী, রুজি-রোজগারের সহায়ক বিষয়, যেমন আইন, কারিগরী বিদ্যা, ডাক্তারী শাস্ত্র সম্বন্ধে বাংলা বইয়ের দুর্ভিক্ষ। তেমনি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থের অভাব বাংলায়।

আমরা আর কতদিন পরভাষাপেক্ষী হয়ে থাকব? এসব বিষয়ের বই বাংলা ভাষাতেও হওয়া প্রয়োজন, এমন কথা বলছেন অনেকেই। কিন্তু আসল কাজে এগিয়ে আসছেন অল্প লোক।

গৌর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-৪২

॥ ২ ॥

গত ১১ই চৈত্র সংখ্যা 'দেশ'-এ ডাঃ সুশীল সামন্ত মহাশয়ের লিখিত পত্রের উত্তর পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো প্রয়োজন বলে অনুভব করছি।

রেভাঃ লালবিহারী দে-র লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য নয়, পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। ১৯৬৯ সালে Editions Indian, 59A, Shambazar Street, Cal-4 থেকে একটি গ্রন্থে Bengal Peasant Life, Folk Tales of Bengal, Recollections of my school-days; edited with an introduction by Mahadevprasad Saha; xi, 555 pages, Rs. 40/-, প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত সাহা পুরনো Bengal Magazine এর file থেকে Recollections of my school-days (autobiography) সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন বলে গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রেভাঃ লালবিহারী দে-র সম্বন্ধে আরও জ্ঞাত হওয়া যাবে।

—সন্তোষকুমার বসাক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলকাতা-৭।

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন। অশ্রুকুমার সিকদার। বাগর্থ ১/৩ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট কলকাতা-৪। সাত টাকা।

তাঁর 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এক বন্ধুর উল্লেখ করে লিখেছিলেন : "বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ বন্ধুত্বধনে-ধনী লোককে লাভ করার সুবিধা এই যে, একজনকে পাইলেই অনেককে পাওয়া যায়।" একাধারে গৃহীতা ও দাতা 'বিশেষ জাতের' এই বন্ধুটির নাম আমরা সকলেই জানি : উইলিয়াম রোটেনস্টাইন। কোন্ সুদূরে ১৯১১ সালে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে আনন্দ কুমারস্বামীর মাধ্যমে ঠাকুরবাড়ির চিত্রশালা দেখতে এসে বিদেশী এই চিত্রীবন্ধু 'আবিষ্কার' করেন তাঁকে। তার পর থেকে আমৃত্যু প্রায়-অক্ষুণ্ণ ছিল দুজনের যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব, রোটেনস্টাইনের কাছেও ছিল, 'পরবর্তী জীবনের এক মহামূল্য সামগ্রী এবং তাঁকে বাদ দিয়ে এই বৎসরগুলির কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না।'

পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে অন্তরঙ্গতায় উত্তরণের এই কাহিনী নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি পর্বের সঙ্গে রোটেনস্টাইনের নাম গভীরভাবে মিশে আছে বলে শুধু নয়—এই দুই বন্ধুর পারস্পরিক যোগাযোগের সূত্রে তিরিশ বছরের এমন এক মূল্যবান ইতিহাস গড়ে উঠেছে যার মধ্যে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য ও অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায় আত্মগোপন করে আছে।

কিন্তু মূল্যবান হলেও এই দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব-ইতিহাস রচনার কাজ বড়ো সহজ নয়। তার প্রধান কারণ, উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা। রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের মধ্যে যোগাযোগের মুখ্য মাধ্যম পত্রাবলী এখনো অপ্রকাশিত। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুটন লাইব্রেরিতে রক্ষিত রোটেনস্টাইনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এবং শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথকে লেখা রোটেনস্টাইনের পত্রাবলী অবলম্বন করে অশ্রুকুমার তাঁর এই নতুন গ্রন্থ রচনা করেছেন। দুরূহ, শ্রমসাধ্য এই কাজের জন্য বিদগ্ধ পাঠক নিঃসন্দেহে তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাবেন। রবীন্দ্রচর্চায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের যে বন্ধুত্ব-ইতিহাস রচনা করেছেন অশ্রুকুমার তার আরম্ভ রোটেনস্টাইনের ভারত ভ্রমণ থেকে, শেষ হয়েছে কবির মহাপ্রয়াণের পর বন্ধু-পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখিত শোকবার্তায়। মধ্যবর্তী তিরিশ বছরের যোগাযোগ-বর্ণনা ছোট ছোট অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন তিনি। এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে কৌতূহল-উদ্রেককারী। যেমন, ব্রিজেস-রবীন্দ্রনাথ-রোটেনস্টাইন সংবাদ। ব্রিজেস তাঁর কাব্য সংকলনে (The Sprit of Man) রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে গ্রহণ করতে গিয়ে যে অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন অশ্রুকুমার। এই প্রসঙ্গে রোটেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে পত্রবিনিময় হয়েছিল সেগুলি পড়লে রবীন্দ্রনাথের তীব্র আত্মসচেতনতা ও শিল্পীসুলভ অভিমানের কথা জানতে পারি। গীতাঞ্জলির অনুবাদ নিয়ে তিক্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এই পত্রাবলীর গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনেকখানি। কিছুকাল পূর্বে 'দেশ' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্রর 'ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডবলিউ বি য়েটস' প্রবন্ধে ইয়েটসের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ছিল। সেই প্রবন্ধের অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে রোটেনস্টাইনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি সংযোজন করেছেন অশ্রুকুমার

উঠতি ক্রিকেটার উদয়ভানু

খেলাধুলো মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে খেলাধুলোর সহজাত প্রবৃত্তি। বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলেদের মধ্যে। তার উপর বাবা, কাকা, দাদার যদি খেলাধুলোয় আগ্রহ থাকে বা পরিবারের কোন ক্রীড়া-ঐতিহ্য থাকে তবে তো কথাই নেই।

বাংলার ১৭ বছর বয়সী স্কুল ক্রিকেটার উদয়ভানু এমন পরিবারের ছেলে যে পরিবারে খেলাধুলো নিত্যকর্মের মত। ছোটবেলা থেকে খেলার গল্প শুনেছে। শুনেছে বাবা মোহিনী ব্যানার্জির ফুটবল খেলার অনেক কাহিনী। খেলোয়াড়দের সঙ্গে উঠেছে বসেছে। তাদের উৎসাহ পেয়েছে। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বড় ভাই প্রদীপও খেলার মাঠে ঢুকে পড়েছে। আর মেজদা কাজল সম্পর্কে শুনেছে সবার প্রশংসাবাণী। সবাই বলছে, কাজলই বাবার নাম রাখবে। বড় ক্রিকেটার হবে।

এই পরিবেশেই ক্রিকেটের ব্যাট-প্যাড-গ্লাভস-এর সঙ্গে উদয়ভানুর পরিচিতি। বাবাই নেতাজী সুভাষ ইন্সটিটিউটে উদয়-ভানুর খেলার ব্যবস্থা করে দেন। সূচনাতেই ওর খেলায় দেখা যায় সহজাত নৈপুণ্যের আভাস। যেহেতু মোহিনীদার ছেলে এবং কাজলের ভাই সেহেতু সবাই ওকে একটু স্নেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে। খেলারও সুযোগ দেয় নিয়মিত। কিন্তু যে ছেলেটির মধ্যে রয়েছে সম্ভাবনার স্বর্ণদ্যুতি তার ক্ষেত্রে এলোপাথাড়ি শিক্ষা শুভ নাও হতে পারে। সুতরাং মোহিনী ব্যানার্জির কাছে অনুরোধ এল : 'ওকে কার্তিক বসুর কাছে কোচিংয়ের জন্য পাঠাও।'

এটা ১৯৬৯ সালের কথা। উদয়ভানুর বয়স তখন ১৪ বছর। মোহিনী ব্যানার্জি ওকে বাংলা ক্রিকেটের দ্রোণাচার্য কার্তিক বসুর ক্রিকেট স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন।

এই বছরই কোচবিহার ট্রফি স্কুল ক্রিকেটে বাংলার দল গড়ার ট্রায়ালে উদয়-ভানুর ডাক পড়ল। বাংলা দলে নির্বাচিত হয়ে খেলতে গেল আসামে। সেখানে বিহারের বিরুদ্ধে ইনিংসে এবং আসামের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে বাংলা দল বিজয়ী হল। প্রথম খেলায় উদয়ভানু ২৯ রান করে রান-আউট হয়ে যায়। দ্বিতীয় খেলায় করে ১৩ রান। একটি করে ইনিংস খেলেছিল।

এবার জোনাল ম্যাচ খেলার জন্য গেল উড়িশায়। সেখানে সেমিফাইনাল খেলায় উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের জয়ের মূলে উদয়ের অবদান ছিল অনেকখানি। ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধেও পূর্বাঞ্চল প্রথম ইনিংসে ৪০ রানে এগিয়ে গেল প্রধানত উদয়ের ৬২ রানের ফলে। কিন্তু পূর্বাঞ্চল কোচবিহার ট্রফি পেল না। তারপর দিল্লিতে স্কুল ক্রিকেট সি কে নাইডু ট্রফির খেলায় পানজাব ও দিল্লি বি দলকে হারিয়ে বাংলা স্কুল ফাইনালে উঠল। ফাইনালে হারল দিল্লি 'এ'-র কাছে। দিল্লি 'বি'-র বিরুদ্ধে উদয় সেনচুরি করেছিল।

ফাইনালে দিল্লি 'এ'-র বিরুদ্ধে ওয়ান-ডাউন ব্যাটসম্যান উদয় পরাজয়ের মুখে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত ৩৬ রানে নট আউট ছিল।

১৯৭০-৭১ মরসুমে কোচবিহার ট্রফির পূর্বাঞ্চলীয় খেলায় উদয় মাত্র দুটি ইনিংসে

উদয়ভানু ব্যানার্জি

[illegible] আসামের বিরুদ্ধে ১০ এবং বিহারের বিরুদ্ধে ৫৯ রান করে। পাটনায় সি কে নাইডু ট্রফির খেলায় ব্যাটের ব্যর্থতা সুদে আসলে পুষিয়ে নেয় বলের বাদুতে। বাংলা স্কুল গুজরাট ও বিহারকে হারিয়ে ফাইনালে গিয়েছিল। ফাইনালে হেরেছিল মহারাষ্ট্র স্কুলের কাছে। লেগ-ব্রেক ও গুগলি বোলার উদয় গুজরাটের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে পেয়েছিল ৬টি উইকেট, মহা-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৩টি।

চলতি মরসুমে অর্থাৎ স্কুল ক্রিকেটে ওর শেষ মরসুমে ব্যাটে-বলে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে উদয়। ওরই অধিনায়কত্বে কোচবিহার ট্রফির খেলায় বাংলা ওড়িশা ও বিহারকে হারিয়েছে। পরে বিহারের সুনীত সোমের অধিনায়কত্বে পূর্বাঞ্চল স্কুল কোচবিহার ট্রফি জয় করে নিয়ে এসেছে বোম্বাই থেকে। জয়ের মূলে উদয়েরই মুখ্য ভূমিকা। অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের উদয়ভানু পশ্চিমাঞ্চলের ক্রিকেট-প্রাধান্যের মধ্যে অস্ত যায়নি। বোম্বাইতে মধ্যাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে উদয় পেয়েছে ১৯টি উইকেট। ফাইনালে উত্তরা-ঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলায় উদয়ের ৮০ রান এবং পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসে ২৯৮ রান হওয়া সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চল প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গেল। শেষ দিন এমন অবস্থা হল যে, ২০৪ রান করলে উত্তরাঞ্চল জিতে যায়। ওরা করল ১ উইকেটে ১০০ রান। আত্মবিশ্বাস নিয়ে জোরে খেলছে। কিন্তু উদয়ভানু দুটি এবং বাংলার বরুণ বর্মণ একটি উইকেট নেবার ফলে লাঞ্চে উত্তরা-ঞ্চলের ৩ উইকেটে ১৩০। লাঞ্চের পর প্রথম ওভারেই উদয় আর একটি উইকেট নিল। পরে আরও একটি। উত্তরাঞ্চলের ৫ উইকেটে ১৫০। শেষ পর্যন্ত ১৮৯ রানে উত্তরাঞ্চল শেষ হয়ে গেল। উদয়ভানু পেল মাত্র ৩৪ রানে ৫টি উইকেট।

এ বছর পুনাতে সি কে নাইডু ট্রফির খেলায় বাংলার স্কুল ক্রিকেট অধিনায়ক উদয়ের আসামের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৬০ রান ও ৪টি উইকেট, অন্ধ্রের বিরুদ্ধে ৪৩ ও ২ রান, উইকেট ৪ ও ১। ফাইনালে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৪৬ ও ২ রান, উইকেট ৩ ও ১। দুটি ইনিংসেই রান-আউট হয়েছে। একবার মলয় ব্যানার্জি এবং একবার অরুণ ব্যানার্জির সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলার সময়। তিন ব্যানার্জির সংযোগ, অথচ রানিং বিটুইন দি উইকেটে গরমিল। শুধু এই দুই ইনিংসেই নয়, প্রতিনিধিমূলক খেলায় আরও তিনবার উদয়ভানু রান-আউট হওয়ায় ভাল রান করতে পারেনি।

এ সম্পর্কে উদয়ের বক্তব্য : "সতীর্থ ব্যাটসম্যান প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে রানের ডাক

গিয়েছে। আমি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেছি। তারপর দেখেছি সতীর্থ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ফিরে গেছে, আমি রান-আউট হয়েছি।"

রানী রাসমণি স্কুলের ক্লাস ইলেভেনের কমার্স ছাত্র উদয়ভানু ওয়ান-ডাউন বা টু-ডাউন ব্যাট করতে নামে। হাতে হুক, পুল, স্কোয়ার কাট মার থাকলেও ড্রাইভ ওর ফেভারিট স্ট্রোক।

পূর্বাঞ্চলের, বিশেষ করে বাংলার আবহাওয়া ক্রিকেটের অনুকূল নয়। ভিজে মাটির ক্রিকেট-চারাগাছ শুকনো মাটির জন্য অপেক্ষা করতে করতে মাটি প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে তেতে ওঠে। অবশ্য চৈতালী ক্রিকেটেরও এখানে আসর বসে। কিন্তু বাংলার ছেলেদের মেজাজ ও চরিত্রের সঙ্গে চৈতালী ক্রিকেট যেন খাপ খায় না। তবু উদয় ক্রিকেটে বড় হতে চায়। মোহিনী ব্যানার্জির পরিবারের উপর দিয়ে একটা প্রবল ঝড় বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ছেলের ক্রিকেট খেলায় ওদের উৎসাহের অভাব নেই। বড় ছেলে প্রদীপ রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে আজ কারান্তরালে। আর মেজো ছেলে কাজল, যে ক্রিকেটে তিনবার বাংলা স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেছে সে ওই একই ঘূর্ণিঝড়ে শেষ হয়ে গেছে। তবু ক্রিকেট-দর্শনের মতই ওঁরা জীবন-দর্শনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ক্রিকেটারের জীবন পদ্ম-পাতায় জলের মতন। মানুষের জীবনও তো তাই। সব কিছুকে সহজে সামঞ্জস্য করাই ক্রিকেটের এক বড় শিক্ষা।

উদয় ব্যাট প্যাড নিয়ে বাড়ি থেকে বের হবার সময় মা জিজ্ঞাসা করেন, "কি রে, আজ সেঞ্চুরি করবি তো?" উদয় জবাব দেয়, "হ্যাঁ, করবো।" কিন্তু করবো বললেই তো ক্রিকেট খেলায় সেঞ্চুরি করা যায় না। তবু মায় বলছে প্রতি খেলায় ওর প্রতিশ্রুতি থাকে। কিংবা মা'র দুঃখের মধ্যেও মাকে সান্ত্বনা দেয়। লীগ, প্রীতি খেলা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় অবশ্য উদয়ভানু এই তিন বছরে পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছে।

মুকুল

প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল থেকে ভারতের বিদায় গ্রহণের পর ব্যাংককে আয়োজিত চতুর্থ এশীয় যুব ফুটবল থেকেও ভারত বিদায় নিল রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে।

রেঙ্গুনের প্রাক-অলিম্পিক ফুটবলে ভারতের বড় দল বরমার কাছে হেরেছিল ৪—৩ গোলে, ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৪—২ গোলে এবং ইজরাইলের কাছে ১—০ গোলে। যুব দল ব্যাংককে ইজরাইলের কাছে ৭—০ গোলে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকারের পর থাইল্যাণ্ডের কাছে ৪—১ গোলে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে এক রকম বিদায় নেয়। এক রকম বলছি এই জন্য যে থাইল্যানডের কাছে হারার পর ভারতের যুব দলের আর কোয়ার্টার ফাইনালে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। গ্রুপ লীগের একটি খেলা মাত্র বাকি থাকে। ফুটবলে শক্তিহীন নেপালকে অবশ্য সে খেলায় ভারতের ছেলেরা ৭—০ গোলে পরাজিত করে গ্রুপ লীগের চারটি দলের মধ্যে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। কিন্তু শক্তিহীন নেপালের বিরুদ্ধে বেশী গোলে জয়ের কি কোন মূল্য আছে।

ইজরাইল অবশ্যই শক্তিশালী দল। গত এশীয় যুব ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন। তাদের কাছে ভারতের পরাজয় অপ্রত্যাশিত না হলেও সাত সাতটি গোলে পরাজিত হবে? দলগত শক্তির কতখানি পার্থক্য থাকলে একটি দল সাত গোলে জিততে পারে তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। তারপর থাই-ল্যানডের কাছে ভারতের ৪—১ গোলে পরাজয়ের কৈফিয়ৎ কি? তবু তো গত-বারের রানার্স দক্ষিণ কোরিয়া বা তৃতীয় স্থানাধিকারী বরমার সঙ্গে ভারতকে খেলতে হয়নি।

এশীয় যুব ফুটবলে ভারতের এই ব্যর্থতা এই কথাই প্রমাণ করছে বড়দের ফুটবলে আমরা যেমন পিছু হটছি ছোটদের ফুটবলেও তেমন উন্নতির পরিচয় দিতে পারছি না। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে এশীয় ফুটবলেও আমাদের মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ আমাদের বিরাট দেশে ফুটবল সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। খেলোয়াড়ের সংখ্যাও ভূরি ভূরি। বহু দিন থেকেই প্রতিকারের কথা উঠেছে, প্রশিক্ষণের কথা উঠেছে। কথা উঠেছে সুষ্ঠু প্রশাসনেরও। কিন্তু পরাজয়ের পটভূমিকায় প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে আমরা যেখানে ছিলাম তার চেয়েও নীচে নেমে যাচ্ছি।

হকিরও এক হাল

ফুটবল খেলার মত সাম্প্রতিক কালের হকি খেলাতেও আমাদের পিছু হটার পরিচয়। মুানিখ অলিম্পিকের দল গড়ার প্রয়াসে আয়োজিত লখনৌ কোচিং ক্যাম্প শেষ হল। ক্যাম্প যোগদানকারী ৩৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে ১২ জনকে বাদ দিয়ে ২২ জন সম্ভাবিত খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে আরও ৪ জনকে বাদ দিয়ে অলিম্পিকের দল গড়া হবে।

অতীত দিনের খ্যাতনামা খেলোয়াড় বাবুর নেতৃত্বে লখনৌ ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে। বাবুকে সাহায্য করেছেন অতীতের আরও কয়েকজন নামী খেলোয়াড়। যেমন লিও পিন্টো, আমীর কুমার, আর এস জেন্টল উধম সিং, ঝমনলাল শর্মা।

খবরে দেখছি লখনৌ ক্যাম্পে খেলোয়াড়রা নিজেদের ভুল ত্রুটি কিছু শুধরে নিতে পারলেও দলগত সংহতি গড়ে তুলতে পারেননি। সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা তা হচ্ছে পুরোভাগের খেলায় যোগাযোগ এবং তীব্রতার অভাব। ট্রায়াল ম্যাচে দেখা গেছে কোন গোলকিপারকেই কেউ বিব্রত করতে পারেননি। আগেও খবর ছিল সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবং স্ট্রাইকারকে নিয়েই ভারতের সমস্যা। লখনৌ ক্যাম্পে এ সমস্যার সমাধান হয়নি। অলিম্পিক খেলোয়াড় হরবীর সিংকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবং রাইট আউটে পৃথক পৃথক সময় খেলানো হয়েছে। সেণ্টার ফরোয়ার্ডের চেয়ে রাইট আউট হিসাবেই তিনি বেশী যোগ্যতা দেখিয়েছেন। গোবিন্দ সম্পর্কেও প্রায় এক কথা। সেণ্টার ফরোয়ার্ডের চেয়ে লেফট আউটেই গোবিন্দ কিছুটা ভাল মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু স্ট্রাইকার হিসাবে কেউ কোচদের মনে ছাপ আঁকতে পারেননি এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ডের সমস্যা একই রকম রয়ে গেছে।

রক্ষণভাগ সম্পর্কে অবশ্য নির্বাচকদের মাথা ব্যথার কারণ নেই। রক্ষণভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী।

হকি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক গণ্ডগোল এবং আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য হকি ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি শ্রীঅশ্বিনীকুমারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ সত্ত্বেও বলবো হকি খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের প্রয়াস প্রশংসনীয়। এর পর পাতিয়ালায় আরও একটি ক্যাম্প খোলার কথা আছে।

আবার এও বলব, এ প্রশিক্ষণ কোন

অলিম্পিকস্তরে মানে ছাঁকনায় পৌঁছাবার মত। মেক্সিকো অলিম্পিকস এবং ব্যাংকক এশিয়ান গেমসের আগেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল। ফল বিশেষ পাওয়া যায়নি।

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে সারা বছরের জন্য, সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের জন্য। কাদুও বলেছেন সে কথা। তার পরিকল্পনা পেশও করেছেন কর্তৃপক্ষের কাছে। এই পরিকল্পনায় রয়েছে প্রতি বছর ২৫ জন স্কুল ছাত্র এবং ২৫ জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে বেছে নিয়ে তাদের কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক। স্কুল ছাত্রদের বয়স হবে ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। তা হলেই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সুপটু করে গড়ে তোলা যাবে।

জাতীয় শুটিং

যদিও দিল্লিতে সদ্যসমাপ্ত ১৭তম জাতীয় শুটিংয়ে অনেকেই অলিম্পিকের যোগ্যতামান অতিক্রম করতে পারেননি, তবু নাম-করা রাইফেল চালকদের মধ্যে অনেকে কৃতিত্বের নজির রেখেছেন। ক্লে পিজিয়ন ও স্কীট শুটিংয়ে অলিম্পিক মান অতিক্রম করেছেন বিকানীরের কারনী সিং এবং পাতিয়ালার রণধীর সিং। ফ্রি রাইফেল প্রোন পজিশনের অলিম্পিক মান অতিক্রম করেছেন বাংলার মিহির সেন ও পরিমল চ্যাটার্জী এবং সার্ভিসেসের এস কে রায়চৌধুরী।

কে কোন্ বিভাগে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আগে তার তালিকাটা খতিয়ে দেখা যাক।

ডাঃ সৌমেনকান্তি সেন—ফ্রি রাইফেল ৩ পজিশনে বিজয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রফি লাভ, ফ্রি রাইফেল প্রোনে প্রথম, স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেল ৩ পজিশনে দ্বিতীয়, এয়ার রাইফেলে (আই এস ইউ) প্রথম, ডিয়ার শুটিংয়ে তৃতীয়। **হরিচরণ সাউ**—বিগ বোর ৩ পজিশনে প্রথম, বিগ বোর স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেলে ৩ পজিশনে প্রথম, ফ্রি পিস্তলে দ্বিতীয়। **পরিমল চ্যাটার্জী**—ফ্রি রাইফেল ৩ পজিশনে দ্বিতীয়, ফ্রি রাইফেল প্রোনে দ্বিতীয়, স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেল ৩ পজিশনে প্রথম, এয়ার রাইফেলে তৃতীয়, ডিয়ার শুটিংয়ে দ্বিতীয়। **এস কে রায়চৌধুরী**—স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেল প্রোনে প্রথম, ফ্রি রাইফেল ৩ পজিশনে তৃতীয়, ফ্রি রাইফেল প্রোনে তৃতীয়। **মিহির সেন**—ফ্রি রাইফেল প্রোনে প্রথম (৪০০ পয়েণ্টের মধ্যে ৩৮৯ পয়েণ্ট)। **গীতা রায়**—মহিলাদের ফ্রি ও স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেল ৩ পজিশনে প্রথম, মহিলাদের ফ্রি রাইফেল ৩ পজিশনে দ্বিতীয়, পুরুষ ও মহিলাদের স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেল ৩ পজিশনে তৃতীয়। **চিত্রা বিশ্বাস**—মহিলাদের ফ্রি রাইফেল ৩ পজিশনে প্রথম, স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেলে তৃতীয়। **রীতা সিংহ ও জয়িতা ব্যানার্জী**—মহিলাদের ফ্রি ও স্ট্যাণ্ডার্ড প্রোনে দ্বিতীয়। **জি দামোদরন**—ফ্রি রাইফেল প্রোনে দ্বিতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড প্রোনে দ্বিতীয়। **তারাপদ ব্যানার্জী**—ফ্রি রাইফেল প্রোনে তৃতীয়। **ক্যাপ্টেন ভিজ**—স্ট্যাণ্ডার্ড পিস্তল, রিভলবার ও র‍্যাপিড ফায়ারে প্রথম।

এবারকার জাতীয় শুটিংয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রফি বিজয়ী শুটার ডাঃ সৌমেনকান্তি সেন

জাতীয় রাইফেল শুটিংয়ে অসংখ্য ইভেন্ট। সব ফলাফল দেওয়া সম্ভব নয়। অনেকের নাম হয়তো বাদ গেছে। বিখ্যাত রাইফেল চালক হরিচরণ সাউয়ের পুত্র অশোক সাউ জুনিয়র বিভাগে কয়েকটি ট্রফি জিতে পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। সবচেয়ে এবার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ডাঃ সৌমেনকান্তি সেন। এবার জাতীয় শুটিংয়ে মহিলা প্রতিযোগিনীর সংখ্যা কম ছিল। তার মধ্যে বাংলার ৪ কন্যা গীতা রায়, চিত্রা বিশ্বাস, রীতা সিংহ ও জয়িতা ব্যানার্জি'র নামই উল্লেখযোগ্য। বিগ বোরে আবার হরিচরণ সাউয়ের শ্রেষ্ঠত্ব। বিগ বোরে আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারেননি। পিস্তল ও রিভলবারের প্রখ্যাত প্রতিযোগী উদয়ন চিণুভাইকে হারিয়ে সার্ভিসেসের ক্যাপ্টেন ভিজ-এর প্রথম স্থান দখল উল্লেখের দাবি রাখে।

জাতীয় শুটিংয়ের সময় কোয়েম্বাটোরের রাইফেল চালক জি দামোদরণের আকস্মিক মৃত্যু সমগ্র রেঞ্জে এক বিষাদের ছবি ফুটে ওঠে। দামোদরণের বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৭ বছর। গত বছর সিউলে আয়োজিত দ্বিতীয় এশীয় শুটিং প্রতিযোগিতায় দামোদরণ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে উঁচু-মান বজায় রাখেন। এবার অনেক আশা নিয়ে তিনি দিল্লিতে এসেছিলেন। কিন্তু ফ্রি রাইফেল ও স্ট্যাণ্ডার্ড রাইফেলের প্রোনে দ্বিতীয় হওয়া ছাড়া তিনি আর কোন স্থান দখল করতে পারেন না। টারগেট ফ্রেমের ত্রুটিই নাকি এর প্রধান কারণ। তাঁর টারগেট ফ্রেম কোণটি নাকি বাঁকা এবং কোণটি ট্যারসা করে লাগানো ছিল। তার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকবার প্রতিবাদও পেশ করেছিলেন। কিন্তু কোন ফল পাননি। শুটিংয়ের মানও উপরে তুলতে পারেননি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা মানসিক আঘাতই দামোদরণের মৃত্যুর কারণ।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে প্রতি বছর জাতীয় শুটিংয়ের টারগেট ফ্রেমের জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয় তা দিয়ে নিখুঁত ইলেকট্রিক ফ্রেম তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু তা না করে কাঠের ফ্রেম দিয়ে টারগেট তৈরী করা হয় এবং তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতিও থাকে। একচুলের এদিক ওদিকে যেখানে লক্ষ্যভেদের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে সেখানে টারগেট ফ্রেমে খুঁত থাকা কাম্য নয়।

একলব্য

অরণ্যদেব লী ফক

না না, ওঁর বাবা নন, প্রথম অরণ্যদেব!
না। তিনি প্রথম অরণ্যদেবের নাতি!
!

লক্ষ্মী ছেলের মতো আগে দুধ খেয়ে নাও তারপর গল্প বলব।
কী মজা!
দুধ?
দাঁড়াও, নিয়ে আসছি।

খুলি গুহায় —
তোমরা জানো, কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, প্রথম অরণ্যদেবের বাবার বয়স তখন খুব কম, তবে তিনিও কলম্বাসের সঙ্গে ছিলেন।
!

তারও অনেক বছর বাদে জলদস্যুদের হাতে তিনি নিহত হন। তাঁরই ছেলে হচ্ছেন প্রথম অরণ্যদেব।

প্রথম অরণ্যদেবও নিহত হন দস্যুদের হাতে, তাঁর ছেলে এই গুহায় তাঁকে সমাহিত করেন।

...তিনি হলেন দ্বিতীয় অরণ্যদেব।
অরণ্যদেব মারা গেছেন! অরণ্যদেব দীর্ঘজীবী হোন!

দ্বিতীয় অরণ্যদেবের ছেলের বয়স যখন দশ বছর তখন লেখাপড়া শেখবার জন্যে তাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হল...
আমাকে কি এই মুখোশ পরতে হবে নাকি?
হ্যাঁ বাবা। ভাল করে লেখাপড়া কোরো। ফিরে এসে আমার জায়গা তোমাকেই নিতে হবে।

ছেলের কিন্তু স্কুল মোটেই ভাল লাগল না.....
এই সেই মুখশ্রী? একদা এরই জন্য সহস্র জাহাজ সমুদ্রে ভেসেছে...
আমি অভিনেতা হব।

অসকার-তত্ত্ব

যথা সমারোহে অসকার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। সমারোহ আছে, নেই শুধু সমঝদারি। অবশ্য অসকার-নির্বাচনে ফিল্ম সমঝদারি বা ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন আশা করা একান্তই অসঙ্গত। অসকার-অধীশরা এমন শপথবাক্য কখনও উচ্চারণ করেননি যে তাঁরা যা দেখবেন আর্ট দেখবেন, আর্ট বৈ কিছু দেখবেন না। অসকার-নীতিটাই বরঞ্চ উল্টো। ইনডাসট্রির পুরস্কার, অতএব এখানে বরদানের লক্ষ্য নির্দিষ্ট। প্রতিবার এমন সব ছবিকেই অসকার-অলঙ্কারে ভূষিত করা হয় যাতে মুভী ইনডাসট্রির গৌরব বাড়ে। উঁচু পর্যায়ের আর্ট ফিল্ম ইনডাসট্রির মর্যাদা বাড়াতে পারে বলে হয়ত অসকার-বিচারকরা বিশ্বাস করেন না। অবশ্য তাঁদের বিশ্বাস বা ধারণা অসকার পুরস্কারের নীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। তাঁরা শুধু কাজ করে যান নিয়মে নিয়মে। চোখ ঝলসানো বড় বাজেটের অমূল্যে ছবি হলেই হল—পুরস্কারের অধিকার সে-ছবিরই। তা না হলে স্ট্যানলি কুব্রিকের "ক্লক ওয়রক অরেঞ্জ" কিংবা পিটার বোগডানোভিচের "দ্য লাস্ট পিকচার শো" শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান থেকে বঞ্চিত হতে পারে? এই দুটি ছবি আমরা দেখিনি সত্য, কিন্তু ছবি দুটি কতটা উন্নত-মানের বিদেশী পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা পড়ে আমরা তা সহজেই অনুমান করতে পারি। প্রকৃত আর্ট ফিল্মের ভাগ্যে অসকার কখনই জোটে না। এই ক্ষতি ওই সব ফিল্মের নয়, ক্ষতিটা অসকারের। এর ফলে অসকারের মূল্যটাই কমে। অসকার অমূল্য হতে পারেনি কখনই। এই একই কারণে। ইনডাসট্রির উন্নতিসাধনের জন্য যে পুরস্কার, সে পুরস্কার মূলত বাণিজ্যিক, তার প্রতি ফিল্ম-বোদ্ধাদের শ্রদ্ধা থাকে না। ইদানীং কান, ভেনিস, বার্লিন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেসটিভ্যালের স্বীকৃতি সম্পর্কে সকলেই আগ্রহশীল। কী চলচ্চিত্রকার কী দর্শক প্রত্যেকেই এই সব ফেসটিভ্যালের বিচারকে গুরুত্ব দেন। আজকের দিনে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন অনেক পরিমাণে বেড়েছে বলেই ফেসটিভ্যালের স্বীকৃতির মূল্যও বেড়েছে। এবং অসকারের মত পুরস্কারের মূল্য কমছে দিনের পর দিন। এখনকার "ফিল্ম সেনস"-এর কাছে এটাই অনিবার্য। চলচ্চিত্র শিল্পের সেবাকল্পে যে পুরস্কার তার মহিমা কীর্তনের অবসর আজকের বিচারবান শিল্পপ্রেমিক দর্শকদের নেই। এদেশে কোন ফিল্ম পত্রিকার পুরস্কার কোন্ ছবি পেল তা যেমন তাকিয়ে দেখবার আগ্রহও বেশির ভাগ লোকের থাকে না তেমনি আন্তর্জাতিক ফিল্ম ক্ষেত্রেও অসকার নিয়ে গুঞ্জন হয় না। তবে ফিল্ম ইনডাসট্রির কাছে এই পুরস্কারের মূল্য নিশ্চয়ই আছে। প্রকৃত ফিল্ম কী—যেখানে এই অনুসন্ধিৎসা সেখানে অসকার কখনই উচ্চারিত হয় না। অসকার পুরস্কার প্রকৃত ফিল্মের হদিস দেয় না। অসকারকে এখনও হয়ত মূল্যবান করে তোলা যায়। যদি তার বিচারের বস্তু হয় আর্ট, ইনডাসট্রির উন্নতিবিধান যদি তার লক্ষ্য না হয়। সেটা কি আদৌ সম্ভব? শিল্পবোদ্ধাদের কাছে অসকার অকিঞ্চিৎকর, তবু বড় ইনডাসট্রির বড় পুরস্কার। অনেকেই হয়ত ফলাফল জানতে চান। এবারের ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

শ্রেষ্ঠ চিত্র—দ্য ফ্রেন্চ কানেকশন; শ্রেষ্ঠ পরিচালক—উইলিয়াম ফ্রায়েডকিন (উক্ত চিত্রের জন্য); শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—জেনে হ্যাকম্যান

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে 'স্ত্রীর পত্র' (পরিচালনা : পূর্ণেন্দু পত্রী) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায়

(ঐ চিত্রে অভিনয়ের জন্য); শ্রেষ্ঠ সম্পাদক—ওয়ার্ট্ ব্রাইসবারগ (ঐ চিত্রের জন্য); প্রকাশিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য—আরনেস্ট টাইডিম্যান (একই ছবির জন্য); শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী জেন ফণ্ডা ("ক্লুট" চিত্রের জন্য); শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—বেন জনসন (দ্য লাস্ট পিকচার শো); শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—ক্লোরিস লিচম্যান (দ্য লাস্ট পিকচার শো); শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিত্রনাট্য—প্যাডি চায়েফসকি (দ্য হসপিটাল); শ্রেষ্ঠ ফোটোগ্রাফি—অসওয়ালড মরিস (ফিডলার অন্ দ্য রূফ); বিদেশী ভাষার শ্রেষ্ঠ চিত্র—দ্য গারডেন অব দ্য ফিন্‌জি-কনটিনিস (ইটালি)।

চিত্র-সমালোচনা

"অপর্ণা" (পরিচালনা : সলিল সেন) ছবিতে তনুজা ও অমৃত মুখোপাধ্যায়

অপর্ণা

সরকার প্রোডাকশনস

পরম সহানুভূতির সঙ্গে নায়কের অপরাধ-জীবনটি "অপর্ণা"-য় বিন্যস্ত করা হয়েছে। নায়ক বারীনই (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) শুধু বিপথে যাননি, তার সংস্পর্শে নায়িকা অপর্ণাও যেন সৎকর্ম বোধেই অবলীলায় রাহাজানির কাজটি আরম্ভ করে দিয়েছে। বারীন অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে গরীবকে দেয়। গরিবী হটাবার এই উদ্ভট কাজে নায়িকার দীক্ষালাভ আরও বিচিত্র। পরিচালক সলিল সেনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, জরাসন্ধর "অপর্ণা" কাহিনীটি তাই। পরিচালককে বরঞ্চ ধন্যবাদ দেওয়া যায় এই কারণে যে এমন একটি কষ্টকল্পিত গল্পের ভিত্তিতেও তিনি একটি আমোদপূর্ণ নাটক গড়ে তুলেছেন। বেশির ভাগ দর্শক যাঁরা এনটারটেনমেনট চান তাঁরা যুক্তির ধার ধারেন না, পরিচালক-চিত্রনাট্যকার সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শককে মোটেই নিরাশ করেননি। দর্শকের মনে নাট্য-কৌতূহল তিনি আগাগোড়াই জিইয়ে রেখেছেন। এবং নায়ক-নায়িকার দলের অপরাধ-কর্মের অ্যাকশন দৃশ্যগুলিও বেশ রোমাঞ্চক করে তুলেছেন—অন্তত বাংলা ছবিতে যতদূর আশা করা যায়।

অপরাধীর দলে মিশে রাজপথে অপর্ণার রাহাজানি দেখানোর কাজটা হিন্দীচিত্রের অভিনেত্রী তনুজার পক্ষে খুব কঠিন হয়নি। এই অংশে অপর্ণা ও হিন্দী-চিত্রেরই চরিত্র। অপরদিকে অপর্ণা বাংলা ছবির নায়িকাই বটে। কৈশোর থেকে সে যার বাগদত্তা হয়ে থাকে একবারও দেখেনি, সেই অজয়কে (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়) একদিনের জন্যও ভুলতে পারেনি অপর্ণা। সিনেমার নায়িকা-সুলভ এই প্রেমনিষ্ঠাও তনুজা ভালই দেখিয়েছেন।

এক্ষেত্রে বিস্ময়কর ব্যাপার হল বারীন ও অপর্ণার সততা। স্ত্রী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যহেতু কোন দুর্বলতা বিন্দুমাত্র তাদের চরিত্রে প্রকাশ পায়নি। বারীনের কাছে এসেই উঠেছে অপর্ণা, একই বাড়িতে ওরা রয়েছে ভাইবোনের মতো। লেখকের মনগড়া যুক্তি অনুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে যখন নায়ককে অপরাধ-জীবন যাপন করতে হয় তখন সেই নায়কের মধ্যে যে একটা আত্মতুষ্টি কিংবা সব কিছু অগ্রাহ্য করার ভাব থাকে সেটা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বারীনের আচার-আচরণেই দেখিয়ে দিয়েছেন। এহেন চরিত্রে যে চটপটে স্বভাবের দরকার হয় সেটাও শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বারীনের মধ্যে আছে। আসলে চরিত্রটাই অবাস্তব, তাই অভিনয়ও তেমন মনে দাগ কাটে না। কাহিনীর শেষের দিকে দেবদূতের মত এসেছে অজয়। অপর্ণাকে সে ভাল-মন্দ মিশিয়ে সকলি বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করেছে। অপর্ণার পাপ-কর্মের কথাও তার অজানা নয়। বারীনের

ইন্দ্র

কাছে যে অপর্ণা এতদিন ছিল তাতেও অজয়ের মনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। অজয় মার্জিত ও উদার। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও বেশ মার্জিত। অজয়-অপর্ণার মিলনের ব্যবস্থা গল্পে পাকা। এ-কারণেই বুঝি আদালতের বিচারে অপর্ণার দণ্ডভোগও হয়নি। অপর্ণা যে নিজের অপরাধের কথা নিজেই গিয়ে পুলিসের কাছে বলেছে তাতেই বোধহয় তার পাপস্খলন। এ কাজ অপর্ণা করত না। অজয়কে চিনতে না পেরে সবলে তার টাকা ছিনতাই করতে গিয়েই অপরাধবোধের জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে অপর্ণা। তাই পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি। অজয় তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এই গল্পের শর্তে অজয়-অপর্ণার মিলন হয়ত অবধারিত ছিল। তবে সেটা যে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে আসতে পারত চিত্রনাট্যে তা অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে চিত্র-নাট্যকার-পরিচালক নাটক রচনা না করলেও ছবির অনন্ত কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত গড়ে তুলেছেন। অপর্ণার বাড়ির নাটক এখানে উল্লেখযোগ্য। অপর্ণার বিপৎগামী বাবা এবং দুঃখিনী মাকে নিয়েই নাট্যরস। এই পর্বে সন্তোষ দত্ত ও গীতা নাগের অভিনয় নাটকোচিত। অপরাধী-দলের কার্যকলাপের সঙ্গে পুলিসী তৎপরতা দেখানোর কাজেও পরিচালক সফল। এই সব দৃশ্যে বারীনের দক্ষিণহস্ত সরলের চরিত্রে অরুণ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়কেও এই ধরনের একটি চরিত্রে মানিয়েছে বেশ। পুলিস অফিসার হিসাবে রাজেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘ চিত্রনাট্যে ঘটনা ও চরিত্র অনেক। গানও (রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরারোপিত) বেশ কয়েকটি। গানগুলি শুনতে ভাল লাগলেও এই ঘটনাবহুল নাটকে সব গান আবশ্যক মনে হয়নি। তবে পরিচালক জনমনোরঞ্জনের দিকটাই ভেবেছেন। তাঁর প্রয়াস বেশ কিছুটা সফল হবে নিশ্চয়ই।

জহর রায়

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

নাট্য-সমালোচনা

সুবর্ণ গোলক

রঙমহল

রঙমহলে হাসির নাটক মঞ্চস্থ হলে দর্শকরা খুবই খুশি হন। কারণ এই মঞ্চের শিল্পগোষ্ঠীর কমেডি নাটক অভিনয়ের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দর্শকরা আগেও পেয়েছেন। এবার তাঁরা অভিনয় করছেন "সুবর্ণ-গোলক"। রংমহল রঙ্গমঞ্চের শততমবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী বেছে নিয়েছেন। নাটকের (রচনা : সন্তোষ সেন) প্রয়োজনে মূল কাহিনী কিছুটা বাড়াতেই হয়েছে। তবে হাসির প্রধান উপকরণটির অদল-বদল হয়নি। কৈলাস থেকে পৃথিবীর দিকে গড়িয়ে দেওয়া সুবর্ণ-গোলককে মহাদেব এক বিশেষ শক্তি সঞ্চার করে দিয়েছেন। গোলকটি হাতে করে কেউ কাউকে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের মধ্যে স্বভাবের বিনিময় হবে। অর্থাৎ দাতা পাবে গ্রহীতার স্বভাব, গ্রহীতা দাতার। কৌতুকের উৎস এইখানেই।

সুবর্ণ-গোলকের মহিমায় বিত্তবান ঘরের জামাই হয়েছে চাকর, আর তার চাকর হয়েছে জামাই। জামাইয়ের শ্বশুর-বাড়ি যাবার পথে এই বিভ্রাট ঘটে। জামাই নিজেকে চাকর ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না। নাটকে হাস্যরসের উদ্ভব এই ঘটনার পর থেকেই। সুবর্ণ-গোলকের চরিত্র-বিনিময় ঘটানোর শক্তি আরও দুটি ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে। জমিদারবাবু হয়েছেন বাড়ির ঝি, বাড়ির ঝি হয়েছে জমিদার। এই সব পরিস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহে যে প্রচণ্ড হাসির রোল শোনা যায় সেটা মুখ্যত শিল্পীদের অভিনয়ের জন্যই। কমেডি নাটক "সুবর্ণ-গোলক"-এ রঙ্গের পরিস্থিতি ও উপকরণ অনেক বেশি থাকতে পারত। নাটকের প্রধান দোষ মন্থরতা। অনেক অনাবশ্যক সংলাপ ও কতকগুলি অবান্তর দৃশ্যে ভারাক্রান্ত এই নাটক। একাধিক চরিত্রের মধ্যে অকারণ সংলাপ বিনিময়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে নাট্যকার যদি সুবর্ণ-গোলক হস্তান্তরে জনিত স্বভাব-বিনিময়ের উপর বেশি জোর দিতেন তবে "সুবর্ণ-গোলক" আগাগোড়াই হাসির বিস্ফোরণ ঘটাতে পারত। দ্বিতীয়ত "সুবর্ণ-গোলক" অনেকটা অপেরাধর্মী। পাত্র-পাত্রীদের মুখে কথায় কথায় গান। গানের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের ঘরোয়া কৌতুক সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে। দর্শকের মন কিন্তু সব সময় সুবর্ণ-গোলকের কৌতুক দেখবার জন্য অধীর থাকে। তাই ঘরোয়া মজা দর্শকের মন ততটা মজাতে পারে না। তাছাড়া সুবর্ণ-গোলকের অলৌকিক শক্তিসম্ভূত কৌতুক-কাণ্ডে গতি সঞ্চার আবশ্যক ছিল। নাটকের অতিরিক্ত গান ও সংলাপ এই গতিতে বাধাসৃষ্টি করেছে। তা-বলে গানের উপর যখন জোর বেশি গানগুলি আরও ভাল গাওয়া হলে কোন ক্ষোভ থাকত না। অবশ্য প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী একটি দৃশ্যে চমৎকার গান শুনিয়েছেন। গানগুলির সুর ভালই দিয়েছেন শৈলেশ রায়।

নাটকের দোষত্রুটি যাই থাকুক, বঙ্কিমচন্দ্রের "সুবর্ণ-গোলক" মঞ্চে পরিবেশনের পরিকল্পনাটাই সাধুবাদের যোগ্য। এবং শিল্পীরাও অনায়াসে নাটকের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে বারে বারেই দর্শকদের প্রাণ খুলে হাসবার সুযোগ দিয়েছেন। শিল্পীদের মধ্যে জহর রায়ই দর্শকদের আশা বেশি পূর্ণ করেছেন। তাঁর অভিনয়ের গুণে নাটকটি বিশেষ রূপে উপভোগ্য হয়েছে। তাঁর পরেই বেশি আনন্দ দিয়েছেন হরিধন মুখোপাধ্যায়। বস্তুত এই দুই শিল্পীর উপস্থিতির সময় নাটকটি সুখভোগ্য। জমিদার-গিন্নীর রূপসজ্জায় সরযূ দেবীও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়েছেন। জমিদারের ছোট মেয়ের ভূমিকায় ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণ প্রাণবন্ত। চরিত্রটির হাসি-খুশি চঞ্চল স্বভাবের সঙ্গে শিল্পী মিশে গিয়েছেন। গানগুলিও তিনি সহজে গেয়েছেন। দর্শককে হাসাবার দায়িত্ব আরও তিনজন শিল্পী সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। এঁরা হলেন মৃণাল মুখোপাধ্যায়, সুজিত দাস ও মিণ্টু চক্রবর্তী। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন

নাটকে দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন। তবে নাটকে অতিরিক্তভাবে তাঁর নিজের নাম বার বার ঘুরে-ফিরে না এলেই হয়ত সুন্দর হত। প্রথম দিকে "অরিজিন্যাল" হারুণ নাট্যকার বাদল সরকারকে যে ডেকে এনেছেন "আবু হোসেন"-এর আধুনিকী-করণের জন্য কৌতুকের প্রয়োজনে সেইটুকুই যথেষ্ট ছিল। অবশ্য দর্শক যে-নাটক দেখতে বসে প্রাণভরে হাসতে পেরেছেন তাতে কোথায় কী বাড়াবাড়ি হল তা-নিয়ে হয়ত মাথা ঘামাবেন না। শতাব্দী-গোষ্ঠীর নিষ্ঠা এবং বাদল সরকারের পরিকল্পনায় এমন আদ্যন্ত উপভোগ্য একটি নাটক প্রযোজনা যে সম্ভব হল তাতেই দর্শকরা খুশি হবেন। সমালোচনায় 'মুড' নিয়ে তাঁরা এই নাটক দেখবেন না।

দলগত অভিনয়ের মান অতি উন্নত। তবুও বিশেষ করে পঙ্কজ মুন্সী (আবু) এবং বাদল সরকারকে (আধুনিক হারুণ) তাঁদের কমিক অভিনয়ের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। গান ওঁরা দুজনেই গেয়েছেন। এঁদের মধ্যে শ্রী মুন্সীর গানের গলা ভাল। অভিনয়ের জন্য অতুল সরকার, ভারতী সরকার, রেবা রকসম, অঞ্জলি বসু প্রভৃতি শিল্পীরাও প্রশংসা পাবেন। পার্টির সময় দুজন নৈতোলিকের অঙ্গভঙ্গি ও মোরাফেরাও উপভোগ্য।

নাটকের মঞ্চ-উপস্থাপনা সরল, অনাড়ম্বর। মঞ্চ-রূপে নয়, শুধু গান ও অভিনয় দিয়ে দর্শককে ভোলাবার পদ্ধতির জন্যই "আবু হোসেন" বিশিষ্ট। তবে হিট ফিল্মী গানের প্যারডি গান না থাকলে কী হত বলা যায় না। অবশ্য সকলের উপরে রয়েছে বাদল সরকারের নাটক নির্দেশনায় বৈশিষ্ট্য এবং রসপরি-পরিবেশণের কৌশল। তাই শতাব্দীর "আবু হোসেন"-কে শুধুই একটি সস্তা "কমার্শিয়াল" নাটক বলা সঙ্গত নয়।

দুটি ছবির মহরতের দৃশ্য। ওপরে সলিল দত্ত পরিচালিত "শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন" ছবির মহরৎ হয় অপর্ণা সেনকে নিয়ে। ক্ল্যাপস্টিক দিচ্ছেন উত্তমকুমার। নীচে : সুশীল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "আমি সিরাজের বেগম" ছবির মহরতে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। ফটো—দেশ

বোম্বাই বিচিত্রা

সেদিন এক নায়কের বসবার ঘরে আড্ডা বসেছিল। আড্ডার নায়কের নাম না-বলা কারণে উহ্য থাকাই শ্রেয়, কেননা আড্ডা জমেছিল বিশেষ কোনো চরিত্র-অভিনেতার চরিত্রকে কেন্দ্র করে। যে দুজন আড্ডার মুখ্য বক্তা ছিলেন তাঁরা, তাঁদের বক্তব্য প্রায় রূপকথার রূপসজ্জায় পরিবেশন করছিলেন। ফলে আমাদেরও বেশ শ্রুতিমধুর লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ আমাদের আড্ডার গুড়ে বালি পড়ল। নায়কের সদরের ডিং ডং বেল বাজলো কিন্তু দরজা খোলার পর যিনি ঢুকলেন তাঁর কণ্ঠস্বর আমাদের সকলকেই উচ্চকিত করে দিল। অনেক কণ্ঠ শুনেছি কিন্তু এমন কণ্ঠ কখনো শুনি নাই। এমন কথা মনে হল সম্ভবত দর্শন এবং শ্রবণের অপার বৈসাদৃশ্য। একটু পরিষ্কার করি। ভদ্রলোক যিনি এলেন, তাঁর উচ্চতা অন্ততঃ ছ ফুটের বেশী, ওজন অন্ততঃ আড়াইশো পাউন্ড, কিন্তু কণ্ঠস্বর একেবারে কোকিল স্বর। স্বরের কথা থাক। আমরা উঠে বসার পর ভদ্রলোকও বসলেন তারপর নিজের পরিচয় দিলেন সবিস্তারে, তারপর পোর্টফোলিও থেকে লেটার হেড বার করে সেটা ধরলেন নায়কের সামনে, তারপর এক গ্লাস জল চাইলেন, তারপর নায়কের বাধ্যের সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন, তারপর হঠাৎ মনে পড়ায়, এ অশোভন কাজের জন্য সবিনয়ে হেসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তারপর জল এলো। তিনি জল পান করলেন। তারপর তাঁর শার্টের ওপরের দিকের দুটো বোতাম খুলে বুকের ভেতর খানিকটা ফুঁ দিয়ে নিজের তারপর বললেন, যে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে আপনার মত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের পূজা করা, অর্থাৎ আপনাদের প্রতিভা প্রচার হবে সেই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মহৎ কর্ম, আর এই প্রতিভা প্রচারের সবচেয়ে শুদ্ধ এবং দিব্য মিডিয়াম হচ্ছে পুরস্কার অর্থাৎ অ্যাওয়ার্ড। তাই আমরা ঠিক করেছি আপনাদের মত ব্যক্তিদের আমরা পুরস্কৃত করব"। নায়ক সব শুনে মৃদু হেসে বললেন, "বেশ তো করবেন কবে কোথায় কি ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপারটা ঘটবে সেটা

সময়মত জানিয়ে দেবেন, নিরুপায় না হলে নিশ্চয়ই উপস্থিত হবো।" নায়কের কথা শুনে ভদ্রলোক একটু বাধা পেলেন, বলে মনে হল। কেননা, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে বললেন, "ব্যাপারটা যদি এই রকমই হয় তা হলে আপনাকে পুরস্কৃত করে আমাদের লাভ কি, আমরাই সব করব আপনি কেবল দয়া করে অনুষ্ঠানের দিনে আসবেন, তাও আবার উপায় থাকলে, আর আমরা পোহাব ঝামেলা:—এটা কেমন কথা মশাই?" ভদ্রলোকের কথা শুনে তো আমাদের চক্ষুস্থির; কিন্তু নায়ক তাঁর মাথা স্থির রেখে বললেন, "আপনি একটু পরিষ্কার করে বলুন তো আপনাদের প্ল্যানটা কি?" ভদ্রলোক আবার পোর্টফোলিও থেকে একটা কাগজ বার করলেন এবং তার থেকে রেফারেন্স নিয়ে বলতে লাগলেন, "আপনাকে যদি আমরা বেস্ট অ্যাকটর অ্যাওয়ার্ড দি তাহলে, আপনি আমাদের কুড়ি হাজার টাকা দেবেন—" নায়ক বাদ সাধলেন "তার মানে আমি যদি আপনাদের কুড়ি হাজার টাকা দিই তাহলে আপনারা আমাকে বেস্ট অ্যাকটর অ্যাওয়ার্ড দেবেন, অর্থাৎ ঐ পুরস্কারটির মূল্য কুড়ি হাজার?" আজ্ঞে, হ্যাঁ, ভদ্রলোক খুব স্বাভাবিক হলেন। নায়ক বললেন, "ঠিক আছে, আপনারা অ্যাওয়ার্ড দিন, তারপর আপনাদের টাকা দেবো।" ভদ্রলোক বললেন, "কিন্তু স্যার কিছু অ্যাডভান্স না দিলে আমরা কাজটা এগোই কি করে—আমাদের যা অবস্থা, বুঝতেই তো পারছেন!" নায়ক বললেন, "হ্যাঁ বুঝতে পারছি, কিন্তু বুঝতে চাইছি না। কেননা, আপনি আপনার কথা আরম্ভ করেছিলেন আমাদের প্রতিভা-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এবং শেষকালে এসে ঠেকেছেন এই প্রোপোজিশনে। নিজের টাকা দিয়ে যদি পুরস্কার পেতে হয় তা হলে সেটার আয়োজনও করাবো নিজের লোককে দিয়ে, নইলে আপনারা যে ধরনের জীব তাতে আজ অ্যাওয়ার্ড দেবেন, কাল ব্ল্যাকমেল করবেন, তারপর চোখ রাঙাবেন—এসবের কি প্রয়োজন মশাই! বেশ আছি—আমরা এখন একটু বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি, আপনি এখন আসুন!" নায়ক ঘুরে বসলেন। ভদ্রলোক উঠতে উঠতে বললেন, "কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম—" নায়ক মুখ না ঘুরিয়েই বললেন, "যাই শুনে থাকুন ভুল শুনেছিলেন—ওসব কথায় আর কান দেবেন না—" একটা দমকা হাসির ঝড়ের পর আবার আড্ডা শুরু হল।

সরল শর্মা

ছবির খবর

"শপথ নিলাম" আগামী সপ্তাহে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রমোদকর-মুক্ত রূপ ও বাণীর "শপথ নিলাম" ছবি আগামী ৫ মে মুক্তি পাচ্ছে। অগ্নিযুগের মুক্তি-সংগ্রামের একটি অধ্যায় অবলম্বনে ছবি পরিচালনা করেছেন শচীন অধিকারী। সংগীত পরিচালক সুকুমার মিত্র। প্রধান চরিত্রগুলিতে সমিত ভঞ্জ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, ভাস্কর চৌধুরী, শিবানী বসু ও সুনন্দা দাশগুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা অভিনয় করেছেন।

"স্ত্রীর পত্র" মুক্তির প্রতীক্ষায়

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে রচিত "স্ত্রীর পত্র" ছবির আবহ সংগীত গত ২০ এপ্রিল টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে গৃহীত হয়েছে। ছবিটির সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। সহযোগিতায় হিমাংশু বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উক্ত ছবিটির দৃশ্য গ্রহণের কাজ দীর্ঘদিন আগে সমাপ্ত। এতে প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখার্জী,... স্মিতা সিংহ, নবাগতা রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী, অসীম চক্রবর্তী, নিমু ভৌমিক, শ্যামল ঘোষ, রূপক মজুমদার, সন্তোষ দত্ত প্রমুখ। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা পূর্ণেন্দু পত্রী।

"সিদ্ধার্থ"-র সংগীত

শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি একটি বিদেশী চিত্রের সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ছবিটির নাম 'সিদ্ধার্থ'। প্রযোজক-পরিচালক কনরাড রুক্‌স। গত ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার তিনি এই কাজের জন্য লণ্ডন রওনা হয়ে গেছেন। লণ্ডনে তাঁর দু' সপ্তাহ থাকার কথা। বিদেশী ছবিতে সংগীত পরিচালনা হেমন্তবাবুর এই প্রথম।

চিৎপুর-চিত্র

বিপদসঙ্কুল পথে চলতে গিয়ে মনে ভরসা পাচ্ছিল না কেউ। প্রতি ক্ষণ, সকল মুহূর্তে কেবল শঙ্কা আর শঙ্কা। যেন যা দেখব তা সাংঘাতিক আকার ধারণ করবে তাই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। অনেকদিন এভাবে কাটবার পর হঠাৎ ভোল বদলে গেছে চিৎপুরের। এখন দেখলে আর চট করে চিনে নেওয়া যাবে না—এ সেই বিষন্ন চিৎপুর, শঙ্কিত ভয়ার্ত মুমূর্ষু চিৎপুরের যাত্রাপাড়া। পরিবর্তে এখন দেখা যাবে মৃদু হাসির আভাস। যদি মনে করেন, এ-পাড়ার মুখে রঙ্গার রূপসজ্জা তা হলে মোটা গোঁফের ফাঁকে তৃপ্তির হাসিটুকু ধরতে কারো কষ্ট হবে না।

গতকাল এক বাঘা পরিচালকের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক দেখেই একমুখ হাসলেন। বললেন, 'নতুন খবর কিছু শুনলেন নাকি?' 'শুনতে এলাম', বললাম আমি। শুনে আর একবার চিৎপুরী কায়দায় চোখ নাচালেন ভদ্রলোক। বললেন, 'প্রথম খবর মেঘ কেটে গেছে।' বললাম, 'কার, আপনার?' এবার জোরে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। সবিনয়ে জানালেন, 'হ্যাঁ, এই মরসুমেই তিনি চতুর্থ বার চাকরি পেলেন। সেই গত

আবার 'ক' দলের পরিচালকরূপে ওঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়। কালীপুজোর পর আসানসোলে গিয়ে দেখেছি উনি 'খ' দলের গদীতে বসে অনেক পাকড়াবার কসরৎ করছেন। পরে মাঘের শেষে তুষারসের যখন কয়েকটি দল, সে সময় কলকাতা থেকে সটান পাড়ি দিয়ে ইনি 'গ' দলে অধিষ্ঠান হন। নববর্ষে ওঁকে দেখলাম আর এক গদী আলোকিত করছে। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়—চিৎপুরের দিন বদলাচ্ছে।

পরিচালক মশাই অনেক আশার কথা শোনালেন এক এক করে। আগে শুনেছিলাম, নিম্নবঙ্গের আসরে নাকি তুষারসের রেওয়াজ প্রায় চালু হয়ে গেছে। অর্থাৎ দু'হাজারে বায়না করে, দেওয়ার সময় দু'শো—। এখন শুনেছি অন্য কথা। চার্করিবিলাসী পরিচালকমশাই জানালেন : আমাদের যে আলাদা আর্ট আছে সে-কথা অনেক পরিচালকেরই জানা নেই। পদ্ধতিটা কী? উত্তরে ভদ্রলোক বললেন : অত্যন্ত সাদামাটা ব্যাপার। মোট কথা নায়েক পার্টিকে সব সময় ঝুলিয়ে রাখতে না পারলে টু-দি পাই নিকেশ করে নেওয়া অসম্ভব। অতএব ধরে নিতে পারা যায় চিৎপুরে অনশায়ের বহর কমেছে।

এদিকে প্রকৃতি দেবীও প্রসন্ন। গেল মরসুমে এ-সময় ছিল অবিরাম বাদলার ঘনঘটা। ফলে চৈত্র শেষেই বেশির ভাগ দলের এস্টেট গদীতে তুলে ছুটির নোটিশ টাঙাতে হয়েছিল। এ-সালে মন্দের ভাল, বর্ষণ প্রায় নেই। ফলে এই আধ-বৈশাখেও চিৎপুরে কোনো ছুটির নোটিশ পড়ে নি। এবং জ্যৈষ্ঠের আগে পড়বে বলেও মনে হয় না। তা যদি হয় তবে একাত্তরের নিদারুণ ক্ষতির সবটা পূরণ না হলেও, কিছুটা অন্তত পূরণ করা যাবে এ ভরসা সকলের মনে মনে। এবং সে কারণেই চিৎপুরের বিষণ্ণ মুখে হাসির ফুল ফুটি ফুটি করছে।

—সূত্রধার

লোকায়নের নাট্য উৎসব

লোকায়ন নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের চারখানি নাটক নিয়ে চারদিনের এক নাট্যোৎসব করলেন অবনমহলে। উৎসবে অভিনীত নাটকগুলি হল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নবীপের রাজা', রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' মোহিতবাবুর 'গন্ধরাজের হাততালি' ও অবনীন্দ্রনাথের 'ভুতপত্রীর যাত্রা।' এই চারটি নাটকই লোকায়নের পূর্ব অভিনীত নাটক, যেগুলি একাধিকবার কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। উৎসবে নতুন কোন নাটক ছিল না, কিন্তু পুরনো নাটকগুলোর প্রযোজনা অনেককেই যে খুশী করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা,

'অরাজিনা আবদাল্লা' (পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত) ছবিতে রবি ঘোষ ও মিঠু মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

প্রযোজনা এবং শিল্পীদের দলগত অভিনয় এবারে আরো পরিণত।

নাটকগুলির নির্দেশনায় ছিলেন অরুণ রায়। সংগীত পরিচালনায় ভূপেন হাজারিকা (নবীপের রাজা), রাজেশ্বর ভট্টাচার্য (মালিনী), অরুণ রায় (গন্ধরাজের হাততালি) ও ব্রজসুন্দর দাস (ভুতপত্রীর যাত্রা)। নাটকের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অরুণ রায়, ব্রজসুন্দর দাস, শান্তিরঞ্জন সিনহা, অতনু রায়, সীমা দাশ, গীতা ভট্টাচার্য, রতন মুখোপাধ্যায়, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, দিলীপ ভট্টাচার্য, বাদল সেন, তুষার মিত্র, অম্বর রায় ও অরুণ মুখার্জী সহ আরো অনেকে। উৎসব উপলক্ষে এঁদের উদ্যোগে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় নাটক নিয়ে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী যে কী প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন, কত রকমের ভাবছেন তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় এই প্রদর্শনী থেকে।

—নাট্য-সমালোচক

পুরুলিয়ার ছো নৃত্য

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত তিনদিনব্যাপী পুরুলিয়ার ছো নৃত্য উৎসব বাংলা সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক দেখিয়ে দিয়েছে। পুরুলিয়ার এই নৃত্যশিল্পীরা সাধারণত কৃশকায়। কিন্তু ওই কৃশতনু নিয়েই তাদের নাচ কী প্রচণ্ড, কী উদ্দাম, অথচ কী সুষম ছন্দময় তাদের অভিব্যক্তি। এই ছো নৃত্যের বিশেষত্ব তার প্রকাশ। [illegible] গণেশ, [illegible]—সকলেই মুখোশ পরে নাচছেন। [illegible] মুখোশ [illegible] আবার তাঁর [illegible]। রাবণের দশানন, বিংশতি হস্ত। মুখোশের চোখের ভিতরে আছে একটু সরু ফুটো। তা দিয়ে কতটুকু দেখা যায়?—কিন্তু তা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই পদক্ষেপ গুণে গুণে শিল্পীরা রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে যে অপূর্ব কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর।

অনেকের ধারণা বাংলায় উন্নতমানের নৃত্য প্রচলিত ছিল না। প্রাচীন সাহিত্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এখানেও ভারতের অন্যান্য অংশের মত উন্নত ধরনের নৃত্য ছিল। পাল ও সেনবংশের অবলুপ্তির পর বিরাট রাজনৈতিক আলোড়নের ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবনতির সময় নৃত্যকলাও সাধারণের মধ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই লুপ্তপ্রায় নৃত্যকলাকে হঠাৎ কলকাতার সুধীজনের সামনে উপস্থিত করার কৃতিত্ব ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের। তাঁর সঙ্গে আর একটি নাম যুক্ত করা প্রয়োজন, —শ্রীমতী মিলেনা সলাভিনি। প্যারিসের এই কন্যাটি ডঃ ভট্টাচার্যের কাছে এই নৃত্যের খবর পেয়ে পুরুলিয়ায় গিয়ে নাচ দেখেন। এবং চার বছরের অক্লান্ত সাধনায় এই শিল্পকলাকে তার গ্রামীন আবেষ্টনী থেকে উদ্ধার করে সর্বজন সমক্ষে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ডঃ ভট্টাচার্য লোকসঙ্গীতের সন্ধানে পুরুলিয়া গিয়ে গ্রামের বাইরে গাছগাছালির ছায়ায় এই নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন। এবং এই বিষয়ে নানা প্রবন্ধ ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা পত্রিকায় প্রকাশ করেন। —তারই ফলে আজ পুরুলিয়ার হারিয়ে যাওয়া অপূর্ব লোকনৃত্যটি বিশ্বের দরবারে মঞ্চস্থ হতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে যে একক গায়ক তাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বরে নৃত্যনাট্যের প্রস্তাবনাগুলি করেছিলেন তাঁকেও অভিনন্দন জানানো উচিত। মাইক ছাড়া খালি গলায় অমন গান আজকাল আর শোনা যায় কি?

—নৃত্য-সমালোচক